সূচীপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচীপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচীপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচীপত্র

সূচিপত্র

সূচীপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

বি, সরকার এণ্ড সন্স
লিঃ
"গিনি হাউস"
গিনি সোনার গহনার
—একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান—
সুনিপুণ গঠন ও আধুনিক রুচিসম্মত ডিজাইনের স্রষ্টা
১৩১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, :: কলিকাতা
ফোন : বড়বাজার ৯০ :: গ্রাম : "গিনিহোস"
ভারতের অন্যতম অলঙ্কার নির্ম্মাতা
আমাদের কোথাও ব্রাঞ্চ নাই

সূচীপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচীপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

শ্রীঔষধালয় লিমিটেড
শ্রী
প্রতিষ্ঠানের ঔষধগুলি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট মাত্রায় ও প্রথায় অভিজ্ঞ রাসায়নিক ও ভেষজবিশারদগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়ায় সর্ব্বদা নির্ভরযোগ্য
* সর্ব্বরোগে মকরধ্বজ
* যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে সারিবাদ্যরিষ্ট
* সর্দ্দি কাসি ইত্যাদিতে চ্যবনপ্রাশ
* শ্বেত ও রক্তপ্রদর এবং যাবতীয় স্ত্রীরোগে অশোকারিষ্ট
* যাবতীয় ক্ষয়রোগে দ্রাক্ষারিষ্ট সর্ব্বঋতুতে ব্যবহার্য্য টনিক
মূল্যতালিকা ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য লিখুন —
৪৩৮, রসা রোড (সাউথ) টালিগঞ্জ, কলিকাতা

সূচিপত্র

২৬শ বর্ষ] ১৩৫৪ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্য্যন্ত [১ম খণ্ড

সূচীপত্র

রামসীতা —মণি গঙ্গোপাধ্যায়

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

২৬শ বর্ষ —
বৈশাখ, ১৩৫৪

প্রথম খণ্ড,
প্রথম সংখ্যা

"কারেই বা বলবো কেই বা বুঝবে"

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব

শ্রীরামকৃষ্ণ। আদেশ না থাকলে 'আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি' এই অহঙ্কার হয়। অহঙ্কার হয় অজ্ঞানে। অজ্ঞানে বোধ হয়, আমি কর্ত্তা। ঈশ্বর কর্ত্তা, ঈশ্বরই সব করেছেন, 'আমি কিছু ক'রছি না,' এ বোধ হ'লে তো সে জীবন্মুক্ত। 'আমি কর্ত্তা আমি কর্ত্তা,' এই বোধ থেকেই যত দুঃখ, অশান্তি।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি আদেশ না পেয়ে উপদেশ দাও, লোকে শুনবে না। সে উপদেশের কোন শক্তি নাই। আগে সাধন করে, বা যে কোনরূপে হোক ঈশ্বর লাভ করতে হয়। তাঁর আদেশ পেয়ে লেকচার দিতে হয়।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি) নরেন্দ্র! তুই কি বলিস্? সংসারী লোকেরা কত কি বলে। কিন্তু দ্যাখ্, হাতী যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চীৎকার করে। কিন্তু হাতী ফিরে চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে করবি?

নরেন্দ্র। আমি মনে করব, কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) না রে অতো দূর নয়। (সকলের হাস্য) ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে; মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাৎ থাকতে হয়। বাঘের ভিতরেও নারায়ণ আছেন; তা ব'লে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। লোকের সঙ্গে বাস করতে গেলেই, দুষ্ট লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্যে একটু তমোগুণ দেখান দরকার। কিন্তু সে অনিষ্ট করবে বলে, উল্টে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়

* *

শ্রীরামকৃষ্ণ। মিথ্যা কিছুই ভাল নয়। মিথ্যা ভেক ভাল নয়। ভেকের মত যদি মনটা না হয়, ক্রমে সর্ব্বনাশ হয়। মিথ্যা বল্‌তে বা ক'র্‌তে ক্রমে ভয় ভেঙ্গে যায়। তার চেয়ে সাদা কাপড় ভাল। মনে আসক্তি, মাঝে মাঝে পতন হচ্ছে, আর বাহিরে গেরুয়া! বড় ভয়ঙ্কর।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ। মানুষগুলি দেখতে সব এক রকম, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারু ভিতর সত্ত্বগুণ বেশী, কারু রজোগুণ বেশী, কারু তমোগুণ। পুলিগুলি দেখতে সব এক রকম। কিন্তু কারু ভিতর ক্ষীরের পোর, কারু ভিতর নারিকেলের ছাঁই, কারু ভিতর কলায়ের পোর!

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ। মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙ্গে ছোপাবে, সেই রঙ্গে ছুপবে। যেমন ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রঙ্গে ছোপাও সবুজ। যে রঙ্গে ছোপাও সেই রঙ্গেই ছুপবে। দেখ না, যদি একটু ইংরাজী পড়, তো অমনি মুখে ইংরাজী কথা এসে পড়ে। ফুট্ ফাট ইট্ মিট (সকলের হাস্য)। আবার পায়ে বুটজুতা, শিষ দিয়ে গান করা; এই সব এসে জুটবে। আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে, অমনি শোলোক ঝাড়বে। মনকে যদি কুসঙ্গে রাখো, তো সেই রকম কথাবার্ত্তা চিন্তা হয়ে যাবে।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ। 'আমি' 'আমি' ক'রলে যে কত দুর্গতি হয়, বাছুরের অবস্থা ভাবলে বুঝ্‌তে পারবে। বাছুর 'হাম্ মা, হাম্ মা' (আমি আমি) করে। তার দুর্গতি দেখ। হয়ত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লাঙ্গল টানতে হচ্ছে; রোদ নাই, বৃষ্টি নাই। হয়ত কষাই কেটে ফেল্লে। মাংসগুলো লোকে খাবে। ছালটা চামড়া হবে; সেই চামড়ায় জুতো এই সব তৈয়ার হবে! লোক তার উপর পা দিয়ে চলে যাবে। তাতেও দুর্গতির শেষ হয় না। চামড়ার ঢাক তৈয়ার হয়। আর ঢাকের কাটি দিয়ে অনবরত চামড়ার উপর আঘাত করে। অবশেষে কি না নাড়িভুঁড়িগুলো নিয়ে তাঁত তৈয়ার করে; যখন ধুনুরীর তাঁত তোয়ের হয়, তখন ধোনবার সময় 'তুঁহু, তুঁহু' বলে। আর 'হাম্ মা', হাম্ মা' বলে না। 'তুঁহু, তুঁহু বলে' তবেই নিস্তার, তবেই তার মুক্তি।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ। সংসারে জ্ঞান কারু কারু হয়। তাই দুই যোগীর কথা আছে; গুপ্তযোগী ও ব্যক্তযোগী। যারা সংসার ত্যাগ করেছে তারা ব্যক্তযোগী, তাদের সকলে চেনে। গুপ্তযোগীর প্রকাশ নাই। যেমন দাসী সব কর্ম্ম করছে কিন্তু দেশের ছেলেপুলেদের দিকে মন পড়ে আছে। আর যেমন তোমায় বলেছি, নষ্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ উৎসাহের সহিত করে, কিন্তু সর্ব্বদাই উপপতির দিকে মন পড়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। টাকাও একটি বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হলেই মানুষ আর এক রকম হয়ে যায়, সে মানুষ থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) আজ আমার খুব দিন! আমি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখলাম

(সকলের হাস্য) দ্বিতীয়ার চাঁদ কেন বললুম জান ? সীতা রাবণকে ব'লেছিলেন, রাবণ পূর্ণচন্দ্র, আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ। রাবণ মানে বুঝতে পারে নাই, তাই ভারি খুসি। সীতার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, রাবণের সম্পদ যত দূর হবার হ'য়েছে, এইবার দিন দিন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হ্রাস পাবে। রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চাঁদ, তাঁর দিন দিন বৃদ্ধি হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীবের অহঙ্কার আছে বলে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না। মেঘ উঠলে আর সূর্য্য দেখা যায় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না বলে কি সূর্য্য নাই ? সূর্য্য ঠিক আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি পাগল হ'তে হয় সংসারের জিনিষ লয়ে কেন পাগল হবে ? যদি পাগল হ'তে হয়, তবে ঈশ্বরের জন্য পাগল হও !

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) কি গো ! তোমাদের কি সব কথা হ'চ্ছে ?

নরেন্দ্র। (সহাস্যে) কত কি কথা হ'চ্ছে, 'লম্বা' 'লম্বা' কথা !

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) কিন্তু শুদ্ধজ্ঞান আর শুদ্ধাভক্তি এক। শুদ্ধজ্ঞান যেখানে শুদ্ধাভক্তিও সেইখানে নিয়ে যায়। ভক্তিপথ বেশ সহজ পথ।

নরেন্দ্র। 'আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে, দে মা পাগল ক'রে !' (মাষ্টারের প্রতি) দেখুন, Hamiltonএ পড়লুম—লিখছেন, A learned ignorance is the end of philosophy and the beginning of Religion.

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) এর মানে কি গা ?

মাষ্টার। Philosophy (দর্শনশাস্ত্র) পড়া শেষ হলে মানুষটা পণ্ডিত-মূর্খ হ'য়ে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে। তখন ধর্ম্মের আরম্ভ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) Thank you ! Thank you ! (হাস্য)।

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ-ধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

যাচি হে তোমার চরম শান্তি
পরাণে তোমার পরম কান্তি
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়পদ্ম দলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।"

—রবীন্দ্রনাথ

স্থবির—অশোক মুখোপাধ্যায়

—ফণিভূষণ দাসগুপ্ত

রিক্‌সা (।॰)

—মুকুন্দ মজুমদার

—মাখন দত্তগুপ্ত

সংসার

মানব সাধনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
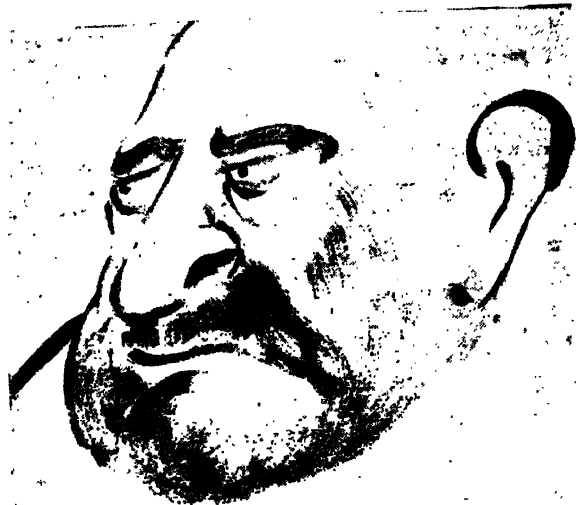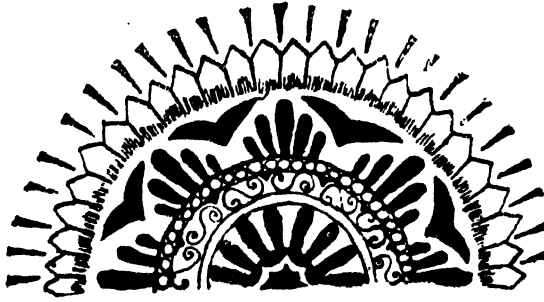
জীবের জীবাবর্ত মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাতে তার অগৌরব। মাটি জল হাওয়া, দেহ এবং দেহের ইচ্ছা আমাদের চরম আশ্রয় হতে পারে না। সংসারযাত্রার মধ্যে একান্ত বদ্ধ হয়ে থাকা মানুষের পক্ষে জীবন্মৃত্যু। জ্ঞানের তপস্যা আত্মার মুক্তি-সাধনার পথে মানুষ নিজেকে চিনতে পারে; নিজের বড়োকে উত্তরোত্তর আপনার মধ্যে আবিষ্কার ক'রে পূর্ণতার দিকে তার যাত্রা। জীবজগতে তার নিজের চেয়ে বেশি নেই, তার মধ্যে নবীন নেই। সেখানে অভ্যাসের পরিক্রমাই তার অস্তিত্ব। মানুষের ধর্মও যদি তাই হত তাহলে বলতাম না এর বেশি চাই, এর মধ্য হতে বেরিয়েই স্বভাবের প্রকাশ।

প্রাণের জীবজগতেও কত তপস্যা, দেহযাত্রাপথে বাঁচবার প্রয়াস সহজসাধ্য নয়। সেই রকম আরো বড়ো তপস্যাও সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। সেটিকে গ্রহণ না করতে পারলে মানুষের আত্মা নিরালোক হয়ে যায়। মহতী সাধনায় সংযুক্ত না হতে পারলে আমরা মূর্ছিত হয়ে থাকি, তাতে আমাদের মৃত্যু।

ছোটো তরুর শিকড় গভীর নয় বলেই ঝড়ে ঋতুর আবর্তে তার স্বল্লায়ু শেষ হয়। বনস্পতি পায় চন্দ্র-সূর্যের আশীর্বাদ কেননা গূঢ় গভীর তার প্রতিষ্ঠা এই প্রাণবসুন্ধরার মাটিতে, শাখায় পল্লবে তার বিচিত্র প্রাণের আশ্রয়স্থল। মানুষের মধ্যেও সেই গভীরে আপনাকে বিস্তার করবার প্রেরণা রয়েছে, সেই প্রেরণা সার্থক হলে তার প্রাণে নিত্যের আশীর্বাদ এসে পৌঁছয়। মৃত্তিকা ও নীহারিকা এই দু'য়ের মধ্যবর্তী হয়ে সে প্রাণের ভাণ্ডে অনন্তের জ্যোতিঃরস ভ'রে রাখবার অধিকারী হয়।

সুগভীর মানবতায় যাঁদের প্রাণ-মূল অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে অক্ষয় মহীয়ান তাঁদের জীবন এই মানবসংসারে।

অনন্তের উপলব্ধিকে আমাদের প্রতিদিন পৌঁছতে হবে—যেখানে আত্মার আনন্দে অবসাদহীন প্রাণের উৎসাহ। তা না হলেই সংসারে মলিনতায় ব্রতহীন আমাদের নির্জীব জীবন।

গভীরে আপনাকে নিমগ্ন করি। পরমা গতি পরম সম্পদে। শুদ্ধ হয়ে ব'সে সেই অসীমে প্রত্যহ দেহমন-আত্মায় যোগসমাসীন হ'তে হয়। প্রাণের উজ্জ্বলতম স্বরূপ ব্যক্ত হবে যা আবর্তে অস্বচ্ছ নিরালোকিত হয়ে থাকে। ধ্যানের স্থিতিকালে ব্যর্থতার ধূলি অদৃশ্যে তলিয়ে যায়, কোথাও ঝড় থাকে না শান্ত আত্মার নীলাচলে। রাত্রের সুষুপ্তি যেমন নবজাগরণকে প্রফুল্ল ক'রে তোলে তেমনি শান্ত যিনি শিব যিনি তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়ে চৈতন্যের জগতে ফিরে আসতে হয়। নিরাময় প্রাণের শক্তি রয়েছে সেই নিভৃত অনন্ত শান্তিতে, সেখানে না পৌঁছলে আমাদের মুক্তি কোথায়। প্রাণের বেগে যেমন নিরাময় বৃক্ষলতা, ঝকঝক করছে নবীন পাতা, পুষ্পিত শাখা, কোথাও তার মালিন্য নেই তেমনি পরম আত্মার সঞ্জীবনী আমাদের জীবনে প্রবেশ ক'রে তাকে সমুদ্ভাসিত ক'রে দেয়, কোথাও আর মৃত্যু স্পর্শ করে না। জীবাবর্ত এবং আত্মার স্বরূপ-যাত্রা দু'য়ের সার্থক সন্ধি মানুষেরই এই জীবনে। দুই তপস্যার যোগফল মানুষকে সংগ্রহ করতে হবে তবেই তার মুক্তি।

---

* ২৩শে মার্চ, ১৯৩২ এই দিনে শান্তিনিকেতন মন্দিরে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষণ। ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী কর্তৃক শ্রুতিলিখিত। এই রচনা পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

—সম্পাদক

(তৎকালীন যুগে)

রসরাজ অমৃতলাল বসু

কবরী কবরে গেছে বেণী বনবাসে।
খোঁপাটি জড়ানো নহে দাসীপণ ফাঁসে॥
শাদা কাঁধে চারু চিহ্ন কুঞ্চিত অক্ষরে।
আঁকিয়া রেখেছে কাচি কেশের স্বাক্ষরে॥
সমতল বক্ষস্থলে চেল আবরণ।
বিনামা মানায়ে দেছে দু'খানি চরণ॥

ছাটিয়া কামিনী তরু রচিয়াছে হাতী।
কুন্স ফোটা উঠে গেছে নহে পশু জাতি॥
চাঁপার আঙ্গুলে টিপে টাইপের কল।
অবলা পৌরুষ করে পুরুষের বল॥
পতি পত্নী দোঁহে চান আফিসে দরখাস্ত
বালার গোলামি গ্রাহ্য বার্ধ্যক্ষম স্বাস্থ্য॥
স্বামীর শোণিতে বৃদ্ধি পেষণের চাপ।
বক্ষেতে গোপনে আছে যক্ষ্মার যে ছাপ॥

শ্রীশৈল চক্রবর্তী [illegible]
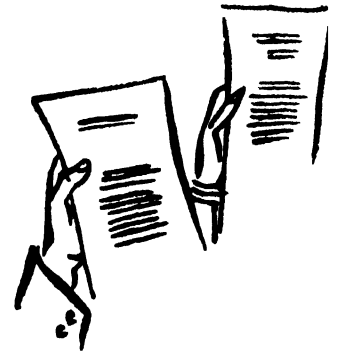
—বসুমতী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কৃপায় সর্ব্বসাধারণের সেবায় নিযুক্ত

মাসিক বসুমতী আজ পঞ্চবিংশতি বর্ষ অতিক্রম করিল।

এই উপলক্ষে আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও

পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ—যাঁহারা এই সুদীর্ঘ কাল

ধরিয়া মাসিক বসুমতীর জয়যাত্রার

পাথেয় জোগাইয়া আসিতেছেন,

তাঁহাদের নিকট আন্তরিক

কৃতজ্ঞতা নিবেদন

করিতেছি।

নমস্কার—

বসুমতী সাহিত্য মন্দির

মেথর-ধাঙড়

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'পরাণের হুঁকা রে,
কে রাখিল তোর নাম ডাব্বা রে—'

গলা ছেড়ে গান গাইছে গাড়োয়ান, গো-গাড়ির গাড়োয়ান। গাইছে আচ্ছন্নের মত। খড়ের গাদা নিয়ে যাচ্ছে বোঝাই করে। বাবুই ঘাসের বাঁধের সঙ্গে হুঁকোটা লটকানো। রথের ধ্বজার মত। হুঁকোটা চোখের সামনে নেই, কিন্তু মন জুড়ে রয়েছে। কতক্ষণে পথ ফুরোবে না-জানি। গাছের ছায়ায় বসবে বন্ধুকে নিয়ে। অদিনের বন্ধু।

গাঁ ছেড়ে শহরের হুদ্দার মধ্যে গাড়ি এসেছে।

'কে যায়? এই রোকো।' মোড় নিল ধনপতি। হাঁকার দিয়ে উঠল।

ভাল গাড়ির টানে পিছের গাড়ি যায়। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল লাইন দিয়ে। কি ব্যাপার?

কী ব্যাপার? মুনসিপালটির ইলেকার মধ্যে এসে পড়েছ, গাড়ি পাশ করতে হবে না?

ধনপতি মুনসিপালটির ট্যাক্সো-দারোগা। গরুর গাড়ির ট্যাক্সো আদায় করে। কোথায় গরুর গাড়ির আঁট, কোথায় গাড়ি মোড় ঘোরে, রোঁদ দিয়ে বেড়ায়। দেখতে পেলেই চিলের মত ছোঁ দিয়ে পড়ে।

মুনসিপালটির রাস্তার মধ্যে এসে পড়লেই গাড়ির টিকিট কাটতে হবে। প্রতি গাড়ি বারো আনা। মাটির রাস্তা ছেড়ে সুরকির রাস্তায় এসেছ, খাজনা দিতে হবে না? গরুর গাড়ির চাকায় বাঁধা রাস্তা ধ্বসে ভেঙে যাচ্ছে না? মেরামতি মেহনতি কে দেয়?

টিকিট নেবে না কি। পাঁচ আইনে চালান হবে। আইনের আমল পরের কথা, আগে লাঠির আমলে এস। পাঁচন কেড়ে নিয়ে ধনপতি মারলে এক ঘা।

ধনপতির সে এক খাণ্ডার মূর্তি। টিকিট কেটে বেঁধে দিলে শলির মধ্যে। পাশ করিয়ে দিলে।

সব সময়েই কি ধনপতির এমন রণমুখো চেহারা?

কে বলে?

মেথররা বলে, ধনপত সাহেব আমাদের মাটিয়া ঠাকুর। আমাদের মরা-হাড়ায় বিমারে-বোখারে তিয়াষে-উপোসে ও আমাদের বাপ-মা।

খোসামোদ করে বলে না। মনের থেকে বলে।

কেন বলে?

'যারা নরক ঘুচিয়ে বেড়ায় তাদেরই নরক ঘোচে না সংসারে।' পাগড়ি মাথায় ধনপতি চলে আসে মেথর-পটিতে। চলে আসে খবরগিরি করতে।

তার হাত-ভরা নানান রকম কাগজ-পত্র, মুড়ি-চেক, হিসেব-কিতেব। জামার বুক-পকেটে নোটের থাক। পাগড়ির ভাঁজে পেন্সিল গোঁজা।

কার-কার টাকার দরকার?

পেরুয়ার দু'দিন ধরে ঠেঙ্গা জ্বার, কাজে বেরুতে পাচ্ছে না। এই নে এক টাকা। সোনেলাল মদ পিয়ে হাতের পয়সা সব ফুঁকে দিয়েছে, উনুন জ্বলে না, বাজার-বেসাত হবে না কিছু। এই নে আট আনা। মিলিটারি হাসপাতালে কাল হয়েছে ফেকুরামের। মাটি দিতে হবে। ঢাকনের কাপড় লাগবে। এই নে দু' টাকা।

খাতার পাতায় ঘসে-ঘসে ভোঁতা পেন্সিল ধার করে হিসেব লেখে ধনপত।

আর আর কেউ দাঁড়ায় পাশ ঘেঁসে। হাত বাড়াবার জন্যে উসখুস করে।

'হোবে, হোবে, দু'-চার দিন হামাকে জিরেন লিতে দে। বেশি ঠেকাঠোকা হয় যাবি আমার সেরেস্তায়। শিলিপ দেব।'

মেথররা ঘিরে দাঁড়ায় ধনপতিকে। খুশিতে সোরগোল করে। ধরে তো ধনপত, করে তো ধনপত—ধনপত ছাড়া আমাদের কেউ লাই তিরিসংসারে। চেয়ারম্যান ফত্তোলবাব, দু' আঙুলে কেবল টাক চুলকায়। ডাগদর যে এক জন আছে সে তো লাট সাহেবের ভায়রা, বলে, ইস, আমি যাব মেথরপটিতে রুগী দেখতে? সাতগুষ্টি মরে যাবে তো ফিরেও দেখবে না। আর আছে টোপ-মাথায় ওভারসার বাবু, সে তো ঠেঁটি পরে ঘরে বেড়ায় সাইকেলে। আমাদের থাকার মধ্যে আছে এই ধনপত। ধরে তো ধনপত, করে তো ধনপত।

'তুমি মাথায় পাগড়ি পিন্দেছ কেন? কেমন পেয়াদা পেয়াদা মনে হয়।'

'আরে, এ পাগড়ি হল একঠো বাহাব। মাথার উপর বাবা বরত্মান। বাবা বম ভোলা।'

হেসে ওঠে সবাই।

এমনি খোসগল্প করে ধনপতি। বলে, 'আমার বাতটা সমঝাইলে না? বাপ ছেলিয়ায় দুখ-দংদ সামলিহে চলে তো? তেমনি এ পাগড়ি দু'-একটা লাঠির বাড়ি জরুর সামলাহে লিবে। তার পর ফাটলে-ফোটলে বাণ্ডিজ হোবে, সাপ ছোবলালে দড়ি পাকাবে, নদী পারে কোপনি হোবে, গর্মিকালে পঙ্খা হোবে—'

বলতে বলতে হাসতে হাসতে চলে গেল ধনপতি।

আর অমনি পেরুয়া আর সোনেলাল আর ফেকুরামের ছেলে বাণ্ডারী চলল মাতালশালায়। হাতে করকরে কাঁচা পয়সা। এক গলা না খেয়ে নিলেই নয়।

জীবন-ভোর এই মদের তিয়াস। মাসে তিরিশ দিন। ভাত হবে না না-হোক, কিন্তু চাই পচুই আর রসুই। ভেতো মদ।

দিগেন সার মদের দোকান। ঠিক মেথরপটির লাগ-পাশে। পোড়া-পোড়া করে চাল সেদ্ধ করে চ্যাটাইয়ে মেলে দেয় রোদ্দুরে। বাখর গুঁড়ো মেশায়। আবার ভাপে সেদ্ধ করে মদ করে।

এদের সুখের সায়র দৈবে শুকিয়ে গেছে, তৃষ্ণায় প্রাণ আইঢাই। গলায় আধ সের ঢেলে দাও, সরকার।

সকালবেলা ভিজে ভাত খেয়ে বেরিয়ে যায় স্ত্রী-পুরুষে। যার-যার ইলাকা ঠিক আছে। যার-যোর যজমান। মেয়েরাও বেরোয় বলে সকাল বেলা রান্না হয় না। পুরুষেরা প্রথমে যায় বাজারে—রাস্তার গোজা সাফ করে; মেয়েরা যায় বরাদ্দ ধোকাইয়ের কাজে। ঘুরে-

ঘুরে ঘোল'ইয়ের কাজ সেরে মেয়েরা বাড়ি ফিরে যায় রান্নার জোগাড়ে। রাস্তা থেকে পুরুষদের ময়লার কাজে যাবার কথা কেউ যায়, কেউ যায় না। খুঁজে বেড়ায় কোথাও বাংলা কাজ আছে কি না। মুনসিপালটির যে-যে ওয়ার্ডে ল্যাট্রিন-ট্যাঙ্ক নেই সে-সে পাড়ায় কারু-কারু ডাক আসে। তাও কালে-ভদ্রে। বেশির ভাগ লোকই মাঠে মারে।

ফালতু কাজ যে-দিন পায় মন্দ রোজগার হয় না। সারা দিন পেটে-পিটে তেলস্ত বেলায় মাতালশালায় গিয়ে ঢোকে। কাতারবন্দী হ'য়ে বসে। ডোমেরা—মানে যারা মুদ্দোফরাস—তারা মেথরের চেয়ে নিচু, বসে তারা একটু ফারাক হয়ে। হাড়িরা সব চেয়ে উঁচু, মেথরের তারা মহাজন, মেথরকে তারা শুয়োর বেচে—তারা বসে আগ বাড়িয়ে।

যে যেখানেই বোসো, ভাঁড়ে-গেলাশে খেতে পাবে না। অশুচি এঁটো ভাঁড় ফেলবে কোথায়? আর, বাড়ি থেকে যে আনবে তার ফুরসৎ কই? আর, ঘড়াঘটি গেলাশ-ফেরো আছে না কি কারুর? শুধু কেলে-হাঁড়ি আর মাটির কলসী। তা ছাড়া, যাবে তো পেটে, অত ঠাট-বাটে দরকার কি।

দরকার নেই। গলা উঁচু করে হাঁ করে বসে থাকো। যদি এক ঢোঁকেই বেশি নিতে চাও কখনো, বোসো হাঁটু গেড়ে।

পাঁচ আনা করে সের। বাটখারাতে ওজন করে দেয় দিগেন সা। ছোঁয়া বাঁচিয়ে ওপর থেকে ঢেলে দেয় সরকার। ঢক-ঢক, ঢক-ঢক-ঢক।

'যারা নরক ঘচিয়ে বেড়ায় তাদেরই নরক ঘোচে না সংসারে।'

মদ খেয়ে এই নরকের যন্ত্রণা থেকে ত্রাণ খোঁজে।

টলতে টলতে বাড়ি ফেরে। ফিরেই বলে, গরম ভাত দে বৌরা আশা করে থাকে হয়তো তাদের জন্যে নিয়ে আসবে কিছু ভাঁড়ে করে। সোয়ামীরা বলে, আমদানি কিচ্ছু নেই। আর দু'টো দিন সবুর কর—

থাবা-থাবা ভাত খেয়ে এঁটো মুখ-হাত ভাল করে ধুয়ে না-ধুয়েই শুয়ে পড়ে তালাইর ওপর।

স্ত্রীরা আশা করে থাকে সোয়ামীরা মাছ তরকারি চাল-ডাল নিয়ে আসবে। কিন্তু যা নগদান রোজগার করে সব যায় মদের অন্দরে। এক পয়সাও ফেরে না। তখন ধনপতের খোঁজ পড়ে। বলে, শিলিপ দাও।

ধনপত শিলিপ কাটে। শিলিপ যায় যাদু ঘোষের মুদিখানায়। যাদু ঘোষ প্রতি টাকায় এক আনা করে মাসিক সুদ আদায় করে। নামে-নামে হিসেব রাখে। ধনপতের আট আনা বখরা।

ঘরগুষ্টি জ্বরে পড়েছে, ছেলে একটা মরেছে কি হয়েছে—নগদ টাকা চাও, ধনপত পত্র পাঠ দাদন দেবে। কিন্তু টাকায় ঐ এক আনা সুদ। এক টাকা ধার তো পনেরো আনা পাবে—হাতে কেটে নিয়ে তবে দাদন। সুদের চিন্তা কে করে, তখন সমূহ বিপদ থেকে তো বাঁচাও।

ধরে তো ধনপত, করে তো ধনপত। আঁচায়-বাঁচায় ধনপত।

একসামিনী চালানে মেথরদের মোট মাইনে ধনপতই ট্রেজারী থেকে বের করে আনে। ট্রেজারির বাইরে রাস্তার উপর গাদি মেরে বসে থকে মেথর-মেথরানি। কাটাকুটি হয়ে কার কত মিলবে কারুরই কোনো হদিস-হুটিশ নেই। নাম ধরে-ধরে নিখুঁত হিসেব করে রেখেছে ধনপত। সুদ-আসল মুশমা দিয়ে নিট করে রেখেছে। তুই লালচাঁদ তেরো আনা, তুই বিলাসী সাত সিকে, মুঙ্গিয়া দু' টাকা, তুই ঝুলনি সাড়ে আট আনা—

ঝুলনি মুখ ম্লান করে বলে, 'মোটে সাড়ে আট আনা!'

ধনপত ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'হিসেবে আমার কালির আঁচড়েরও ভুল নেই। গেল মাসে তোর বেটা-বিটি মরে গেলে না জ্বর হয়ে? ওষুধ খাওয়োলি না? মাটি দিলি না?

'অত কচাল কিসের?' বলে উঠল বিরিজলাল: 'নেবেও ধনপত দেবেও ধনপত। ধনপত ছাড়া আমাদের গতিমুক্তি কই?'

ঝুলনি যত্ন করে আঁচলের গিঁটে পয়সা বাঁধে।

তনখা কত তোদের?

জিগ্‌গেস করে স্বদেশী বাবু। আমাদের মণিলাল। জমিদারের ছেলে। বেকার বসে না থেকে দেশের কাজে লেগেছে। দেশের

কাজ মানেই দুঃস্থ-দুঃখীর কাজ। আর, সব চেয়ে অধম-অধম, সব চেয়ে অধঃপেতে আর কে আছে এই মেথর-ধাঙড় ছাড়া ?

তনখা বলতে বারো-চোদ্দ, ভাতা বলতে পাঁচ টাকা। এতে কী হয় ? এতে তো জল গরমও হয় না।

ক'ঘর আছিস তোরা ?

আগে প্রায় পঞ্চাশ ঘর ছিনু। আকালের বছর বহুৎ উজাড় হয়ে গেল। মাটি দেয়া গেল না, বাঁশে বেঁধে একে একে নদীতে ফেলে দিয়ে এনু। এখন আছি মোটে কুড়ি-বাইশ জন—জরু-খসম নিয়ে। হাড়-জিরজিরে গা, শরীর একেবারে নাই, হয়ে গেছে। জোয়ান-ভর্তি বয়সের যে ক'টা মেয়ে ছিল ব্যামোয়-ব্যামোয় জেরবার হবার আগেই পাঠিয়ে দিনু শহরে-বাজারে, কলকাতায়। তবু খেয়ে-পরে থাক বেঁচে-বর্তে। এইখানে পড়ে আছি আমরা বুড়ো-হাবড়া আর ক'টা গুঁড়োগাড়া। ছেলে যে ক'টা বড় হচ্ছে বিয়ে-সাদি হতে পাচ্ছে না। বউ আনতে হয় দুমকা নয়তো ভাগলপুর থেকে, কিন্তু বউ কিনে আনি তেমন পয়সা কই ? তারা আসবে কেন এই ভাগাড়ে ? বলে, খেতে খুদ নেই বসতে পিঁড়ে।

তোমাদের সর্দার কে ?

সর্দার বিরিজলাল।

তক্তসার চেহারা, রোগে-রোগে ধুঁকছে, ঢকঢকে হয়ে গেছে। সমস্ত গায়ে খোস-চুলকানি। এক দণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, সব সময়েই খসখস ঘসঘস করছে।

শুধু একা আমার নয় হুজুর। ঘরগুষ্টি সকলের এই খুজলিপাঁচড়া।

দেখুন এই ঘর-দোরের অবস্থা। মাটির মেঝে মাটির দেয়াল খাঁপড়ের চাল। জায়গায়-জায়গায় খড় খসে পড়ছে, বাদলা হলে নালে জল পড়ে। ঐ দেখুন সব ফাঁক-ফর্সা হয়ে আছে এখনো মেরামত হল না। এ কি মানুষের ঘর-দুয়ার ? না আঁটকুড়-পাটকুড় ?

তার পর, একেকটা ঘরে একেকটা পরিবার। এক ঘরেই শোয়া-বসা খাওয়া-পরা জনম-মরণ। আড়াল-আবডাল নেই। এক কোণে ছেলে হচ্ছে আরেক কোণে মরছে। বাপ-মা মেয়ে-জামাই ছেলে-বউ সব এক কামরা। ঘেরা-বেড়া নেই, সব এক সামিল।

শুধু কি তাই ? এই দেখুন দেয়াল-মেঝেতে ছারপোকা থিক-থিক করছে। কেঁথা-কানি, তালাই-চাটাই এমন কি রুটি-চাপাটির মধ্যে ছারপোকা। আর মশা ? সন্ধে হবে, মনে হবে ঝম্প বাজছে। বাঁচি কি করে ? ভুলি কি করে ? ঘুমে অসাড় হয়ে যাই কি করে ? মানুষের অধঃপাতে যাওয়া কাকে বলে মানুষ হয়ে দেখছে তাই মণিলাল। এর প্রতিকার কি ?

মেথরের দল শূন্য চোখে চেয়ে রইল।

'চেয়ারম্যানকে বলেছ ?'

বলে-বলে হদ্দ। কিছু করেন না। শুধু ঠেঙা মেরে কথা বলেন। বলেন, হাকিম, নিম-হাকিমদের সঙ্গে খাতির-পীরিত করবার জন্যে চেয়ারম্যান হয়েছি, চেয়ারম্যান হয়েছি কি মেথর-মুদ্দাফরাসের ঝামেলা পোয়াতে ?

'ভাইস-চেয়ারম্যান ?'

সে আছে তদন্ত-তদবিরে। কে নক্সা-মত দেয়াল তুলছে না, কার পাইখানা রাস্তার উপর উঠে আসছে তার তালাসে-নালিশে। এক কথায় ঘুষের ফিকিরে। আমরা কিছু বলতে গেলে বলে গোদ থাকতে আমার কাছে কেন ?

'ডাক্তার ?'

গায়ে হাত ঠেকাবে না, ছোঁয়া লেগে জাত যাবে। এমন কি বুকে সাড় লাগলেও কম্পাস লাগিয়ে দেখবে না আমাদের বুক-পিঠ।

'আর ওভারসিয়ার বাবু ?'

ও তো লাট সাহেবের ছোট নাতি। মাথায় ধুঁচনি এঁটে সাইকেল মারবে রাস্তায় রাস্তায়। আর ফন্দি খুঁজবে জরিমানা করতে পারে কি না।

'তবে তোমাদের দেখে-শোনে কে ?'

'দেখে তো ধনপত, শোনে তো ধনপত। আর আমাদের কেউ নেই।'

'কিন্তু ও তো টাকায় এক আনা করে সুদ নয়।' ঝাঁঝিয়ে উঠল মণিলাল।

তা নেবে বৈ কি। নইলে ঘরের টাকা সে দাদন দেবে কেন ? কম সুদে আর কে দিচ্ছে তাদেরকে ? মরা-হাজায় ব্যামো-পীড়ায় মদে-ভাঙে আর কার কাছে গিয়ে তারা হাত পাতবে ? সুদের হার চড়া রেখেছে বলেই

তো রাশ রেখেছে একটা, নইলে কবে দফা নিকেশ হয়ে যেত। হাঁড়িতে আর চাল চাপত না, ঘাস-কাঠি জোগাড় হত না উনুনের। ওষুধ আসত না এক কৌটা।

'যা পেতাম তা মদ খেয়েই টেঁসে দিতাম।'

'মদ রোজ চাই?'

'বারো মাস, তিরিশ দিন। নোংরা ঘেঁটে এসে—যেখানে আমরা ঘাঁটি নি—সে জায়গা যে আউর ভি নোংরা। যদি মদ না খাই সে নোংরা আমরা ভুলি কি করে? ঘর আঁধার করে দিয়ে ঘুমাই কি করে অজ্ঞানের মত?'

'আগে তোমাদের এখানে কাবলিওয়ালা আসত?'

ও, অনেক। ও শালারা সব পালিয়ে গেছে।"

'যায়নি পালিয়ে। ধনপত সেই কাবলিওয়ালার সাকরেদ। কাবলিওয়ালার পাকানো লাঠি এখন তার হাতে বেঁটে পেনসিল হয়েছে।'

ছি ছি ছি, এ কি কথা! এ বাত ঠিক নয়। ধনপত তাদের দেবতা। ফাগুন মাসে তারা যে সুয্যি-পুজো করে সেই সুয্যি-ঠাকুর।

মণিলাল এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলো। বললে, 'মাইনের টাকা পাও কত হাতে?'

কেউ বারো আনা, কেউ দেড় টাকা, কেউ বড় জোর ন' সিকে।

সতেরো টাকার মধ্যে? বাকি টাকা যায় কোথায়? ধনপতের পাগড়ির ভাঁজে। পাগড়ি ফুঁড়ে পেটের মধ্যে।

তা ছাড়া উপায় কি। সারা মাস হাওলাত করে খেয়েছি তার উশুল নেবে না ধনপত? হাওলাত না করে উপায় কি আমাদের? বাংলা কাজ যা পাই মদ খেয়ে বাজারের জন্যে কিছুই বাঁচাতে পারি না। বালক বেলা থেকে মদ খাচ্ছি; পাল-পরবে, শ্রাদ্ধে-ভোজে তেজী হয়ে ওঠে মদের খাঁই। আমাদের মদ ছাড়তে বলাও যা, মহাজনকে সুদ ছাড়তে বলাও তাই। আর এ মহাজন সুদ নিলে কি হবে, তদবির-তদারকও এ-ই করে। শিলিপ কাটিয়ে মুদি-দোকান থেকে চাল-ডাল তেল-নুণ বাড়ি পাঠায়। উটকো ডাক্তার ডাকায়। ঘর-দোর সায় করে।

যদি বলতে হয় চেয়ারম্যানকে গিয়ে বলুন। চেয়ারের পায়া ভেঙে দিন। ভাইস-চেয়ারম্যানের ঘুস নেয়া বের করে দিন। ডাক্তারের হাত থেকে কেড়ে নিন কম্পাস। টুপি-মাথায় ওভার-সিয়ারকে নামিয়ে দিন সাইকেল থেকে। গরিবের বন্ধু ছোট-চাকুরে এই ধনপত—তার পিছে লাগা কেন? গরিবের তত্ত্বতালাস করে যে, গরিবের সঙ্গে ওঠা-বসা করে যে, তার যত অপরাধ! আর তোমরা যারা বড়লোক—চেয়ারম্যান আর কমিশনার—তোমাদের কোনো জবাবদিহি নেই।

'কিন্তু', মণিলাল খুসিমুখে বলল, 'ঐ বড় লোকরা যদি না শোনে, তা হলে—?'

তা হলে আর কি। এমনি করে খসে-খসে পচে মরব।

"তোমরা শুয়োর খাও না?'

'পাই কোথায়? দর-দাম ঠাণ্ডা নেই আজকাল।'

'খেতে বলছি না। কিন্তু শুয়োর কী ভাবে থাকে দেখেছ তো?

'দেখব কি। সেই ভাবেই আছি আমরা।'

'কিন্তু এ ভাবে থাকবার দিন দূর করে দিতে হবে জোর করে। তোমরা ষ্ট্রাইক করবে।'

'টাইট' করবে। এমন কথা শুনেছে তারা হাওয়াতে। 'টাইট' করলে দুর্দিনের জগদ্দল পাথর সরিয়ে দিতে পারবে তারা।

বেশি কিছু চাই না। ঘর বাড়াতে হবে, চাল ছাওয়াতে হবে, মাইনে বাড়াতে হবে পাঁচ টাকা।

'যাতে, আমদানি ভাল হলে, আমরাও একটু পিতে পারি দারু-উরু।' বললে মেথরানিরা।

জটিল মামলা সওয়াল করবার সময় দু' আঙুলে টাক চুলকোন ননী বাবু। বলেন, করি কী বল? মিউনিসিপ্যালিটির আয় কই? ময়লার গাড়ি ভেঙে পড়ে আছে কিনতে পারি না। বারে-বারে জলের ট্যাঙ্ক যাচ্ছে ফুটো হয়ে, মেরামতির মাশুল নেই। কলকব্জার দাম বেড়ে গেছে দু'শো গুণ।

শুধু মানুষের কলকব্জাই জং ধরে অচল হয়ে যাক। বাকি ওয়ার্ডগুলোতে ল্যাট্রিন ট্যাঙ্ক বসান না কেন?

ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড কাটাতে হবে যে। তার পয়সা কই?

এমনি জেনারেল রেট বাড়িয়ে দিতে বাধা কি? প্রফেসন্যাল ট্যাক্সও তো বসেনি এখনো।

ওরে বাবা, আবার ট্যাক্সো! তা হলে আগামী মেয়াদে আর রিটার্ণ হতে পারব না। জানো তো, দু' বছর উকিল এক বছর মোক্তার—এই প্যাক্ট হয়ে আছে এখানে। আমার আরো এক মেয়াদ বাকি। তোমার কানে-কানে বলি, সে কি আমি খোয়াতে পারি?

আর কিছু না পারেন, ধনপতিকে ডিসমিস করুন। শুষে-শুষে শেষ করলে সে ধাঙড়দের। টাকায় এক আনা করে মাসে-মাসে সুদ নেবে এমন আইন আবার চালু হল কবে? এক হাত ঘাড়ে এক হাত পায়ে—এমন বদমাস, আর দেখা যায় না।

তাই না কি? কই, মেথররা তো নালিশ করেনি কোনো দিন! ননী বাবু বোকা সাজলেন: আমরা বরং জানি ধনপতি ওদের ঝক্কি নিয়ে আছে, আপদে-বিপদে বুক দিয়ে পড়ছে। তাই না রে বিরিজলাল?

ভেজা বেরালের মত চেহারা করে আছে বিরিজলাল, মোক্তারের পিছে মুহুরির কত। কী কথা বলা ঠিক হবে কে জানে।

চোখ চেয়ে তোলান দিতে লাগল মণিলাল। বিরিজলাল বললে, 'ওই তো আমাদের সব দুঃখ-ধান্দার মূল, বাবু। আমাদের মাইনের টাকা ঘরে আনতে দেয় না। কর্জ খাইয়ে নাজেহাল করে রাখে।'

প্লাস-মাইনাস চশমার কোন অংশে চোখ রেখে বিরিজলালের মুখের দিকে তাকাবেন পলকের জন্যে ননী বাবু—ঠিক করতে পারলেন না।

গর্বে মণিলালের বুক ফুলে উঠল। বোবার মুখে বোল ফোটাতে পেরেছে। এখন খোঁড়াকে দিয়ে পাহাড় ডিঙোতে হবে।

ভাইস-চেয়ারম্যান কোথায়?

সে গেছে এনকোয়ারি করতে। তার বারো মাস এনকোয়ারি। কে মুনসিপালটির মাটি কাটল, নর্দমা মারল, রাস্তা ঠেলল তার সরজমিন তদন্ত। তার মানে, হাতে-হাতে কিছু দাও, ফর্সা রিপোর্ট যাবে।

আর, কমিশনর বাবুরা কোথায় ?

তারা সব কন্‌ট্রাক্‌টরের বাড়িতে। বেনামদারের মুনফা নিতে।

আর, আপনি বুঝি ডাক্তার ?

নামটা শুনতে অমনি জমকালো। খুদ খেয়ে দুধের ঢেঁকুর তুলছি। মাইনে মোটে কুড়ি টাকা। পোষায় না, মাশায়। ওরা-আমরা সব এক দলে। যেমন কন্যা রূপবতী তেমনি পাত্র মাধা তাঁতী। ষ্ট্রাইক করিয়ে দিন, মাশায়।

তা আর বলে দিতে হবে না আপনাকে।

ঐ, ঐ যাচ্ছে লাট সাহেবের ছোট নাতি। টোপ মাথায় ওভরসিয়র বাবু।

ওকে ধরে কী হবে ? কাশতে গেলে কোপনি ছেড়ে। ওর কী মুরোদ !

ধনপতি কোথায় ?

ধনপতকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ধনপত পালিয়ে বেড়াচ্ছে। দেখ একবার মজাটা। আগে দেনদার পালিয়ে বেড়াত, এখন মহাজন পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

দরকার নেই জবাবদিহিতে, তর্কাতর্কিতে। কথা ছেড়ে কাজ করো। নিজের পায়ে দাঁড়াও।

হ্যাঁ, 'টাইট' করল মেথররা।

দাবি তাদের যৎসামান্য। ঘর না বাড়াও, সারিয়ে দাও। দাও মাগনা ডাক্তারি। আর বাড়তি মাইনে পাঁচ টাকা।

'টাইট' তো করল, কিন্তু 'টাইটে'র ক' দিন খাবে কি তারা ? ধনপতের কাছে তো আর যাওয়া চলবে না।

খবরদার, কখনো না। মণিলাল হুংকার দিয়ে উঠল: 'আমি তোদেরকে টাকা দেব। আমার টাকা মানে পাঁচ জনের টাকা—তোদেরই মতন পাঁচ জনের থেকে চেয়ে আনা টাকা। আজ ওরা দিচ্ছে কাল তোরা দিবি। এ টাকা তোদের শুধতে হবে না। ক'টা দিন শুধু থাক একটু কষ্ট করে।'

'কিন্তু এক ঢোক মদ না খেলে চলবে না বাবু।'

'তা খাবি বই কি। তা না খেলে চলবে কেন ? কিন্তু মনে থাকে যেন, ঐ এক ঢোক। এক-পেট করবার জন্যে যেন যাসনে ধনপতের কাছে।'

কখনো না। আকাল-মহামারী হলেও না।

কে এক হাজরা শুয়োরের পাল নিয়ে চলেছে মেথরপটির সমুখ দিয়ে। খাসী শুয়োরও আছে দু'তিনটে। বেশ মোটা-সোটা। তেলালো শুয়োর।

বিরিজলাল বেরিয়ে এল ঘরের থেকে। বেরিয়ে এল আরো অনেকে। কত বচ্ছর শুয়োর খায়নি তারা। দেখেনি এমন চোখের সামনে।

কোথায় যাচ্ছ শুয়োর নিয়ে ?

বিলে চরাতে নিয়ে যাচ্ছি।

এ দিকে বিল কোথায় ?

ঘুর-পথে চলে এসেছি ভুল করে।

বেচবে না কি এক-আধটা ?

খদ্দের পেলে ছাড়ে কে ?

কিনতে হলে খাসীই কিনতে হয়। দাম বলে কি না পঁচিশ টাকা। অত গরমাইয়ে দরকার নেই, ঠিক-ঠাক বলো। ঘষে-মেজে আঠারো টাকায় রফা হল। কিন্তু টাকা ? টাকা কে দেবে ?

'টাইটে'র টাকা এক-আধটা করে এখনো আছে সবাইর কাছে। তাই দিয়ে চালিয়ে দাও। তিন দিন 'টাইট' হয়ে গেছে, ঢের হয়েছে। শুয়োরের কাছে আবার 'টাইট' কি। পেট পুরে মদ খাব না বুঝি, কিন্তু মাংস খাব না এমন কড়ার নেই। দিয়ে দে যার কাছে যা আছে। পথ-ভোলা শুয়োর এমন মিলবে না হামেসা।

চাঁদার টাকা চাঁদা করে দিয়ে দিল সবাই।

হা-রা-রা-রা-রা-রা। পুরুষ-মর্দ সবাই বেরিয়ে এল লাঠি আর হলকা নিয়ে। তাড়াতে-তাড়াতে মারতে-মারতে বাছাই শুয়োরটাকে ফেলে দিলে ডোবার জলে। জলে চুবিয়ে মারলে। এদিকে শুয়োরের আর্তনাদ ওদিকে মেথরদের গাভাড়ি !

মরা শুয়োরটাকে এবার আগুনে ঝলসাতে হবে। আগুন করবে কি দিয়ে ? আর কিছু না পাও চালের থেকে খড় টেনে নাও। কাল এমনিতেও ফাঁক অমনিতেও ফাঁক ! যে যেমন পারল টেনে আনল খড়ের গোছা। আগে এক নালে জল পড়ত এখন না হয় ঝোরে-ঝোরে পড়বে। ও প্রায় একই কথা।

লাল টকটকে করে পোড়ানো হয়েছে চামড়াশুদ্ধ। এবার বনাও, কাটো। বঁটি আনো, চাকু আনো। ভাগ-বাঁট করো। ঝামা দিয়ে ঘসে-ঘসে রোঁয়া তুলে ফেল।

মাংস হল, মদ হবে না ?

ওরে বাবা, মদ না হলে তো সব মাটি। দিগেন সা মদের দাম কমিয়ে দিয়েছে এক আনা। দে, কার কাছে আর কি আছে বার কর এই বেলা। না থাকে তো ঘটি-বাটি বাঁধা দে। কালকের কথা কালকে, আজকে তো ফুরতি করে নি।

ঘরে-ঘরে পেঁয়াজ-রশুন ঝাঁই-মরিচের গন্ধ বেরুচ্ছে। ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া নাচছে মেথরেরা। মদ খেয়ে নেশায় ভোঁ হয়ে আছে কেউ। কাজিয়া-দস্তাজ করছে কেউ-কেউ। কেউ গাল-কুবাক্য করছে। বড় ফূর্তির দিন আজ।

আজ কারুর শ্রাদ্ধ-পিণ্ডি হলে হত না ? কত দিন কত লোক মরেছে, শ্রাদ্ধ খায়নি তারা, শ্রাদ্ধে খায়নি এমনি মদ-মাংস। আজ কেউ মরতে পারে না তাদের জন্যে ? তবে অনায়াসে ভাবতে পারে তারা শ্রাদ্ধে-ভোজে আনন্দ করছে।

কিন্তু কে মরবে ? ঠসা বুড়ো ঐ সোমরা মেথর আছে, ওকে ধরে মারো। বেঁচে থেকে ওর কোনো ফয়দা নেই। বাঁশ দিয়ে বাড়ি মারতে-মারতে ওর ঘুম ছাড়িয়ে দাও। তার পর ওর কলজেটা ছিঁড়ে নিয়ে খেয়ে ফেল মদের মুখে।

দেখল মদে তর হয়ে সোমরা মাদল বাজাচ্ছে আর গান গাইছে: ভুজঙ্গিনী রঙ্গিনী গো চিনিতে না পারি।

ঠিক। শ্রাদ্ধ করে কি হবে ? তার চেয়ে বিয়ে হোক। বিয়ে হবে তো বর-কনে কই ? দুত্তোর বর-কনে। 'রাঙ্গা বর মিলে কেমন রাঙ্গা কনের অঙ্গেতে। কনের বাবা ঢুলে পড়ে বরের মায়ের সঙ্গেতে।'

দূর ঝাঁটাগেকো। দূর খালভরা।

গিরিশচন্দ্র

[অপ্রকাশিত]

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

গিরিশচন্দ্রের জন্মতিথি পূজা উপলক্ষে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। এই স্মৃতিপূজার স্থান এ বৎসরে এই মিনার্ভা থিয়েটারে নির্ব্বাচিত হওয়া বড়ই উপযুক্ত হইয়াছে। কেন না, এই মিনার্ভা-থিয়েটারেই তাঁর কর্ম্মজীবনের শেষ কর্ম্মস্থল। এইখানে তিনি শেষ অভিনয় করেন, এই থিয়েটারের জন্য শেষ নাটক লেখেন। তার পর চির বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র বড় নাট্যকার, বড় অভিনেতা, বাংলা নাট্যশালার জনক, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত, এ সব কথা সকলেই জানেন, বহুবার বহু মনীষী বলিয়াছেন—বলিবেন। আজ তাঁর জন্মতিথি পূজার দিন। নাট্যকার ও অভিনেতা তাঁর সঙ্গে আরো জন্মিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁর মত অর্দ্ধ শতাব্দী কাল নাটকের পর নাটক লিখিয়া রঙ্গালয়কে জীবিত রাখিবার সৌভাগ্য আর কারও হয় নাই।

বাংলার বর্ত্তমান রঙ্গালয় প্রধানত তাঁহার সৃষ্টি। তার পর তাঁহার সৃজনীশক্তির সাহায্যে এই রঙ্গালয়কে তিনি পঞ্চাশ বৎসর জীবন্ত রাখিয়াছিলেন। আমরা তাঁর কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী। এই রঙ্গালয় অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছি।

তাঁর মৃত্যুর পর মাত্র ঊনত্রিশ বৎসর গত হইয়াছে কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আজ রঙ্গালয়ের অবনতির দিন। ইহার জন্য কে দায়ী তাহা জানি না, দর্শকবৃন্দ, নাট্যব্যবসায়ী বা নট-নটী ও নাট্যকারগণ। কিন্তু আজ যে রঙ্গালয়ের দুর্দ্দিন তাহাতে কারো সন্দেহ নাই।

গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বাংলার রঙ্গালয়। তাঁর নাট্য-সাহিত্য যত দিন বাংলা ভাষা থাকিবে লোকে আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করিবে কিন্তু রঙ্গালয় না থাকিলে তাঁর নাটকের অভিনয় হওয়া সম্ভব নয়।

অধুনা এই অবনত রঙ্গালয়ে গিরিশচন্দ্রের নাটক কচিৎ অভিনয় হয়। অভিনয় করিবার মত অভিনেতা অভিনেত্রীর অভাব। গভীর ভাবের পৌরাণিক নাটক আজ আর অভিনয় হয় না। নাট্য-ব্যবসায়ীরা সে ধরণের নাটক অভিনয় করাইতে ভয় পান, মনে করেন, দর্শক দেখিতে আসিবেন না। তাঁরা বলেন, দর্শকের রুচিভঙ্গী পরিবর্ত্তন হইয়াছে! সিনেমার অনুকরণে চিত্রমূলক চটুল অভিনয়ের প্রতিই জনসাধারণের আকর্ষণ। সেরূপ অভিনয়ও যে বহু দিন চলে এরূপ নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

গিরিশচন্দ্র যাহা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আজ তাহা নষ্ট হইতে বসিয়াছে। কে রক্ষা করিবে? যাঁরা নাট্যব্রতী শুধু নাট্যব্যবসায়ী নন তাঁদের সমবেত চেষ্টায় হয়তো রক্ষা পায়। কিন্তু সমবেত চেষ্টার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। দারুণ ভেদবুদ্ধি দ্বারা অভিনেতৃগণ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন। কোন নট কোন থিয়েটারে অধিক দিন কার্য্য করিবার সুযোগ পান না। তাঁহাদিগকে আজ এক থিয়েটার, কাল অন্য থিয়েটারে কাজ করিতে হয়। মাঝে-মাঝে মিলিত অভিনয় হয়, উদ্দেশ্য শুধু অর্থ উপার্জ্জন। এক জন সারা জীবনের পরিশ্রমে তবেই একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারেন কিন্তু এখন একযোগে তিন মাস কাজ করিবার সুযোগ নাই। নাট্যব্যবসায়িগণের মনোবৃত্তি পদ্মপত্রের জলের মত চঞ্চল। স্বত্বাধিকারী পরিবর্ত্তনও কম হয় না। সম্মুখে বৃহৎ আদর্শ না থাকিলে কোন বড় কাজ করা যায় না। বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে না।

বাংলা থিয়েটারে সম্মুখে গিরিশচন্দ্রের মতো বিরাট পুরুষের জীবন ও কার্য্যপ্রণালী থাকা সত্ত্বেও থিয়েটার আজ পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। ইহা বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলিব? জাতীয় আদর্শকে ভিত্তি না করিলে জাতীয় নাট্যশালা সৃষ্টি ও রক্ষা হয় না।

আজ গিরিশচন্দ্রের জন্মতিথি। তাঁর স্বর্গগত আত্মার প্রতি আমার নিবেদন, তিনি বাংলার নট, নটী, নাট্যকার, নাট্যব্যবসায়ী ও নাট্যামোদী দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে শুভ বুদ্ধি ও প্রেরণা দান করিয়া তাঁহার প্রাণ দিয়া সৃষ্টি করা সন্তানবৎ প্রিয় বাংলা থিয়েটারকে রক্ষা করুন। থিয়েটার রক্ষা হইলেই গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষা পাইবে। থিয়েটার রক্ষা করিবার দায়িত্ব—যাঁরা বর্ত্তমান রঙ্গালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট শুধু তাঁহাদের নয়, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির।

গিরিশচন্দ্রকে প্রণাম। তিনি জাতীয় নাট্যশালার স্রষ্টা, নাট্য-সাহিত্যের স্রষ্টা, সত্যকার অভিনেতা, বিশুদ্ধ ভক্ত, বিরাট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ। এক জন মানুষের ভিতর এতগুলি গুণের সমাবেশ দুর্লভ।

জার্ম্মাণী

দিনেশ দাস

জার্মাণী
তোমার কাছে হার মানি।
পত্রবহুল তোমার ওকে
মন্ত্র পড়ে সবুজ শ্লোকে,
ভায়োলেটে
গন্ধ আঁকে আকাশেরই নীল শ্লেটে
রহস্য
জার্মাণী হে নমস্য!

জার্মাণীর
ভাষায় ফেলি অশ্রুনীর :
প্রিয়ার ঠোঁটে দিলেম চুমো জার্মাণে
তখন আমি জেনেছি কি তার মানে?
বালক-বেলার কান্না হাসির সে-জার্মাণ
অন্তরালে এখনো রয় বঙ্কিমান্।
জার্মাণী!
তোমার কাছে আবার আমি হার মানি!

নোয়াখালি

বুদ্ধদেব বসু

প্রথম চোখ ফুটলো নোয়াখালিতে। তার আগে অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারে আলোর ফুটকি কয়েকটি মাত্র। সন্ধ্যাবেলা চাঁদ ওঠবার আগে উঠোন ভ'রে আলপনা দিচ্ছেন বাড়ির বৃদ্ধা, মুগ্ধ হ'য়ে দেখছি। রাতের বিছানা দিনের বেলায় পাহাড়ের ঢালুর মতো ক'রে গুটানো, তাইতে হেলান দিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছি মস্ত বড়ো লাল মলাটের 'বালক' পত্রিকার। রোদ্দুর-মাখা বিকেলে টেনিস খেলা; একটি সুগোল মসৃণ ধবধবে বল এসে লাগলো আমার পেরাম্বুলেটরের চাকায় বলটি আমি উপহার পেয়ে গেলুম। কিন্তু সে কোন মাঠ, কোন দেশ, কোন বছর, আজ পর্যন্ত তা আমি জানি না। আমার জীবনের ধারাবাহিকতার সঙ্গে তাদের যোগ নেই: তারা যেন কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ছবি, অনেক আগে দেখা স্বপ্নের মতো, বছরের পর বছরের আবর্তনেও যে-স্বপ্ন ভুলতে পারিনি। সচেতন জীবন অনবচ্ছিন্নভাবে আরম্ভ হ'লো নোয়াখালিতে: প্রথম যে-জনপদের নাম আমি জানলুম তা নোয়াখালি; নোয়াখালির পথে এবং অপথে আমার প্রথম ভূগোলশিক্ষা, আর সেখানেই এই প্রাথমিক ইতিহাস-চেতনার বিকাশ যে বছর-বছর আমাদের বয়স বাড়ে। আমার কাছে নোয়াখালি মানেই ছেলেবেলা, ছেলেবেলা মানেই নোয়াখালি।

সব-আগের বাড়িটি একটি বৃহৎ ফল-বাগানের মধ্যে: লোকে বলতো ফেরুল সাহেবের বাগিচা। জানি না ফেরুল কোন পর্তুগিজ নামের অপভ্রংশ। ফলের এত প্রাচুর্য যে মহিলারা ডাবের জল দিয়ে পা ধুতেন। খুব সবুজ, মনে পড়ে। একটু অন্ধকার। কাছেই গির্জে। শাদা প্যান্ট-কোট পরা কালো-কালো লোকদের অনাত্মীয় লাগতো। গির্জের ভিতরে গিয়েছি; ভিতরটা ছমছমে, থমথমে, বাইরে সবুজ ঘাস, লম্বা ঝাউগাছ, রোদ্দুর। বনবহুল ঘনসবুজ দেশ, সমুদ্র কাছে, মেঘনার রাক্ষসী মোহানার ভীষণ আলিঙ্গনে বাঁধা। সবচেয়ে সুন্দর রাস্তাটির দু'দিকে ঝাউয়ের সারি, সেখানে সারা দিন গোল-গোল আলো-ছায়ার ঝিকিমিকি, আর ঝাউয়ের ডালে দীর্ঘশ্বাস, সারা দিন, সারা রাত। দলে-দলে নারকেল গাছ উঠেছে আকাশের দিকে, ছিপছিপে সুপারি-সখীদের পাশে-পাশে; যেখানে-সেখানে পুকুর, ডোবা, নালা, গাবের আঁঠা, মাদারের কাঁটা, সাপের ভয়। শাদা ছোটো-ছোটো দ্রোণফুলে প্রজাপতির আশাতীত ভিড়—আর-কোথাও আর কখনো দেখিনি সে-ফুল—আর কী-একটা গাছে ছোটো গোল-গোল শাদা-শাদা গুটি ধরতো, মজার খেলা ছিলো সেগুলি পরস্পরের কাপড়ে-জামায় ছুঁড়ে মারা—কী তার নাম ভুলে গেছি। হলদে লাল ম্যাড়মেড়ে গাঁদায় সারাটা শীত রঙিন, এমন বাড়ি প্রায় ছিলো না যার আঙিনায় গুচ্ছ-গুচ্ছ গাঁদা ধ'রে না থাকতো—শ্যামল সুঠাম এক-একটি বাড়ি, বেড়া-দেয়া বাগান, নিকোনো উঠোন, চোখ-জুড়োনো খড়ের চাল, মাচার উপর সবুজ উদ্‌গ্রীব লাউ-কুমড়োর লতায় ফোঁটা-ফোঁটা শিশির। শহরের শ্রেষ্ঠ বাড়িটিতেও থেকেছি আমরা, কিন্তু ও-রকম বাড়িতে কখনো না: কেননা, সরকারি চাকুরেরূপী অধিপতিদের বাসা নয় ওগুলো, অধিবাসীদের বাড়ি। কতগুলি বাড়ি ছিলো—এমন নিষ্কলঙ্ক-নিকোনো তাদের উঠোন, এমন অস্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন যে যতবার চোখে পড়েছে ততবার অবাক লেগেছে। ও-বাড়িগুলিতে কারা থাকে জিগেস ক'রে জবাব পাইনি। পরে জানতে পেরেছিলুম ওগুলি সহরের গণিকালয়, যদিও গণিকা বলতে ঠিক কী বোঝায় তা তখনও বোধগম্য হয়নি।

এমন-কোনো পথ ছিলো না নোয়াখালির, যাতে হাঁটিনি, এমন মাঠ ছিলো না যা মাড়াইনি, দূরতম প্রান্ত থেকে প্রান্তে, শহর ছাড়িয়ে, বনের কিনারে, নদীর এবড়ো-খেবড়ো পাড়িতে, কালো-কালো কাদায়, খোঁচা-খোঁচা কাঁটায়, চোরাবালির বিপদে। শীতের ভোরবেলা নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, যদিও অলস্টর আর কানঢাকা টুপিতে মোড়া, তবু বিশ্ববিধান আমার অসম্মান করেনি, শান্তশীতার্ত নীলাভ রেখাটি যেখানে শেষ হয়েছে, দিগন্তের সেই কুহক থেকে দেখা দিয়েছে আগুন-রঙের সূর্য, প্রথমে কেঁপে-কেঁপে, তারপর লম্বা লাফে উঠে গেছে আকাশে, দুরন্ত জলকে ঝলকে-ঝলকে লাল ক'রে দিয়ে। আবার সন্ধ্যাবেলা লাল-সোনার খেলা পশ্চিমে। কখনো গেছি সুদূর রেল-ষ্টেশনে রেল-লাইনের নুড়ি কুড়োতে, কখনো জেলখানার পিছনে ভুতুড়ে মাঠে, কখনো বা খালের ধারে বাঁশ-পচা গন্ধে। একবার কী-কারণে পুলিশ লাইনে তাঁবু পড়েছিলো, দুপুরবেলা তাঁবুর মধ্যে শুয়ে-শুয়ে ঘাসের গন্ধ নেশার মতো লেগেছিলো আমার, প্রায়

ঘুমিয়ে পড়তে-পড়তে মনে হয়েছিলো সংসারটা জঞ্জাল, সমস্ত গোলমাল অর্থহীন, সবচেয়ে ভালো রাখাল হ'য়ে মাঠে-মাঠে ঘুরে বেড়ানো, গাছের ছায়ায় ঝিরঝিরে হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়া। হয়তো এখানে বলা দরকার যে তখন পর্যন্ত আমি রবীন্দ্রনাথ পড়িনি— রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতাই না।

সব যখন শেষ হ'লো, তখন ফিরতে হয় নদীর কাছেই। নোয়াখালির সর্বস্ব ঐ নদী, নোয়াখালির সর্বনাশ। সবচেয়ে জমকালো সম্পত্তি, সবচেয়ে নিদারুণ বিপদ। সে-নদী মনোহরণ নয়; বাংলা দেশের অন্য কোনো নদীর মতোই নয় সে, না গঙ্গা, না পদ্মা, না কোপাই। বিশাল, শ্রীহীন, দুর্দান্ত, অমিত্র, অসেতুসম্ভব। কেউ স্নান করতে নামে না; উপায় নেই। নানা রঙের শাড়ি-পরা ছিপছিপে তরুণীদের মতো নানা রঙের পাল-তোলা নৌকা এখানে কোথায়—বছরে দু'-এক মাস, ভরা গ্রীষ্মের সময় অর্ধেকটা নদী জুড়ে প'ড়ে থাকে বালি আর কাদা, তখন একটি খেয়া অতি কষ্টে এপার-ওপার করে, আর বর্ষাকালে যে-একটি নড়বড়ে ষ্টিমার কুমির-রঙের ঢেউয়ের উপর দিয়ে কেঁপে-কেঁপে সন্দীপে যায়, কিংবা হাতিয়ায়, তার দিকে তাকালেই ভয় হয় এই ডুবলো বুঝি। মানুষের লাভের বা লোভের দিন-মজুরি এ করলো না; মানুষের ভালোবাসাকেও ভাসিয়ে দিলো কুটিল গোগ্রাসী আবর্তে। ধারে-ধারে না উঠলো কারখানা, না বাগান-বাড়ি; ধার দিয়ে বেড়াবার একটি পাকা সড়ক—তা পর্যন্ত হ'লো না। মেয়েদের সঙ্গে গলাগলি ভাব ক'রে গ'লে যাওয়া তার কোষ্ঠীতে লেখেনি, বাবুদের নৌকো চড়িয়ে হাওয়া খাওয়াবে এমন দিন যদি আসেই তার আগে গলায় দড়ি দিয়ে মরবে সে। আর-কিছু না, শুধু ভাঙবে। খাড়া পাড়, পাহাড়ের গায়ের মতো ফাটা-ফাটা, ভাঙা-ভাঙা; তার ঠিক নিচেই ঘূর্ণপাক-খাওয়া তীব্র মত্ত জল; আর ঝুপঝাপ ক'রে ধ্বসে পড়ছে মাটি, যারা দাঁড়িয়ে আছে কি হেঁটে-চ'লে বেড়াচ্ছে, একেবারে তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি যাচ্ছে স'রে, ফাটল ধরছে আবার একটু দূরে, কখনো প্রকাণ্ড চাকে গাছপালা সুদ্ধ ভেঙে পড়লো কানফাটানো শব্দে, কাছের বাড়িগুলি বলির পাঁঠার মতো দাঁড়িয়ে। আদি শহরটি অত্যন্তই ছোটো হয়তো ছিলো না, নদী নাকি ছিলো তিন-চার মাইল দূরে, কিন্তু ঘোড়ার মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে নদী এগিয়ে এলো এমন দ্রুতবেগে যে দেখতে-দেখতে কুঁকড়ে ছোট হ'য়ে গেলো নোয়াখালি। আমি শেষ দেখেছি শহরের ঠিক মাঝখানটিতে টাউন হলের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে অমিতক্ষুধা জল, তার পর শুনেছি আরো ক্ষয়েছে; যে-নোয়াখালি আমি দেখেছি, যাকে আমি বহন করছি আমার মনে, আমার জীবনে, আমার স্মৃতিসত্তায়, আজ তার নাম মাত্রই হয়তো আছে—কিংবা কিছু নেই কিছুই নেই।

আর সেই সব মানুষ? সেই আধ-বুড়ো পর্তুগিজ, যে-দুর্দম জলদস্যুরা বঙ্গোপসাগরের প্রতিটি উপকূলে একদিন তাণ্ডব বাধিয়েছিলো, তাদেরই প্রক্ষিপ্ত, উচ্ছিন্ন, অদ্বিতীয় ধ্বংসাবশেষ? গায়ের রং তার আমাদের মতোই কালো, চুলের রং পুরোনো পয়সার মতো, ময়লা প্যান্ট-কোট পরনে, পায়ের জুতো নেই। খাশ নোয়াখালির বাংলা বলতো সে, প্রায় সারা দিনই পথে পথে ঘুরে বেড়াতো, পথের কোনো ভদ্রলোককে ধ'রে জুড়ে দিতো আলাপ, চেয়ে নিতো চুরুট কি দু'-চার আনা পয়সা। আর সেই অদ্ভুত রহস্যময় প্রায়-অলৌকিক মূর্তি— লম্বা, পাথরের মতো মুখে জ্বলজ্বলে চোখ বসানো, গোড়ালি থেকে গলা পর্যন্ত মস্ত ফোলা-ফালা আলখাল্লায় ঢাকা, পিঠে ঝুলি, হাতে— বোধহয় একটা শানাই কিংবা ঐ-রকম কোনো যন্ত্র। মনে পড়ে না সে-যন্ত্রে সে কখনো ফুঁ দিয়েছে, মনে পড়ে না কখনো তাকে কথা বলতে শুনেছি। বেশির ভাগ তাকে দেখা যেতো হাটে-বাজারে, আর যত দূর থেকেই হোক, তাকে দেখামাত্র একটা কিলবিলে লিকলিকে অস্বাভাবিক ভয়ে আমি প্রায় ম'রে যেতুম, হাতের আঙুল যদি গুরুজনের মুঠোয় ধরা থাকতো, তবু সে-ভয় পোষ মানতো না। ঋজু, নিঃশব্দ, ঘনগম্ভীর ঐ মূর্তিকে কিছুতেই আমি ভাবতে পারতুম না মানুষ ব'লে। ঐ ঝুলিতে কী আছে? ভাবতে শিউরে উঠতুম। ও কোথায় যায়, কী খায়, কী করে? ভাবতে কাঁটা দিতো গায়ে। এমন সব কথা আমার মনে হ'তো যার কোনো ভাষা নেই, সে যেন বালকের কল্পনা মাত্র নয়, পূর্বপুরুষের সমস্ত অভিজ্ঞতার অচেতন সঞ্চয়। যাতে অকল্যাণ, যাতে অন্ধকার, যাতে অবরোধ, আর যা-কিছু বিকৃত বীভৎস পিচ্ছিল, পৈশাচিক, সেই সমস্তর অবতার ছিলো আমার কাছে ঐ—খুব সম্ভব নিরীহ পাগল। পাগল হোক আর না-ই হোক, সে যে নিরীহ ছিলো এখন তা বোঝা সহজ, তবু তার কথা ভাবলে আজ পর্যন্ত একটা ছমছমানির ঢেউ ওঠে শরীরে।

যারা প্রধানত আমার সঙ্গী ছিলো, তাদের বাবারা কেউ এস-ডি-ও, কেউ পি ডব্লিউ ডির কর্তা, কেউ বা পুলিশের ইন্সপেক্টর। অনেকেই তারা নোয়াখালিতে এসেছে আমার পরে, অনেকেই বিদায় নিয়েছে বদলির ধাক্কায় আমার আগেই। কিন্তু আরো অনেকে ছিলো যারা বদলির ঘূর্ণপাকের বাইরে, বিলিতি কিংবা স্বদেশি সরকারের খুচরো কিংবা পাইকেরি বদলের হুকুম যাদের উপর খাটে না সে-সব মানুষ। তারা আমার অস্তিত্বের অংশ ছিলো তখন। কয়েকটি পরিবার ছিলো একটু উঁচু কপালে, গুহ, গুহরায়, রায়চৌধুরী; ছেলেরা পড়তো কলকাতায় কলেজে, ছুটিতে এসে টেনিস খেলতো শহর ভ'রে, নাটক করতো টাউন হলে, ডাকের জন্য দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিতো পোস্টাপিশের বাইরে সকালবেলায়। নন-কো-অপারেশনের বড় যখন উঠলো, তাদের কেউ-কেউ চ'লে গিয়ে জেলে পড়লো, হিংসেয় বুক ফেটে গেলো আমার, শতবার ধিক্কার দিলুম নিজেকে আর কয়েকটা বছর আগে জন্মাইনি ব'লে। এ ছাড়াও ছিলো তারা, যারা কোনোদিন জেলে যায়নি, বা চেষ্টা কিছু করেনি, যারা বেঁচেছে তেমনি নিঃশব্দে, যেমন নিঃশব্দ আমাদের নিশ্বাস। যামিনী মাষ্টার অঙ্ক কষাতেন আমাকে, তাঁর রাতের আহারের বরাদ্দ ছিলো আমাদের সঙ্গে, ঠিক আটটায় বারান্দায় শোনা যেতো তাঁর কাশি, হ্রস্ব, কুণ্ঠিত, সশ্রদ্ধ—ক্ষুধার সঙ্গে যার পরিচয় আছে, খাদ্যের প্রতি সেই মানুষের শ্রদ্ধা স্বল্পতম শব্দে তিনি প্রকাশ করতেন। তালতলার অশ্বিনী কবিরাজের নাম-ডাক ছিলো শহরে—সময়ে-অসময়ে এবং কারণে-অকারণে তাঁর লাল-কালো বড়ি আমাদের খেতে হ'তো; তাঁর নিজের চেহারা তাঁর ওষুধের বিজ্ঞাপনের কাজ করতো না, কিন্তু বৈঠকখানাটি করতো—রোদালো ঘর, পরিষ্কার ফরাশ, ঝকঝকে দেয়াল-ঘড়ি, আর একটা ভারি কবরেজি গন্ধ। এই সব পারিবারিক চেনা শোনার বাইরেও দু'-একজন বন্ধু হয়েছিলো আমার, মুসলমান তারা, অত্যন্ত বিনীত, আমার বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ। একজন পোস্টাপিশে

চিঠির টিকিটে ছাপ মারতো, সুশ্রী ছিলো সে, নম্র ছিলো কণ্ঠস্বর। আর-একজনের সঙ্গে গিয়েছিলুম বনপথ দিয়ে অনেকদূর হেঁটে তাদের গ্রামের বাড়িতে, খেতে দিয়েছিলো ডাবের জল আর ডাবের শাঁস, ঘন গাছপালার ভিতর দিয়ে বিকেলের লাল রোদ্দুর এসে পড়েছিলো। জানি না এরা সব কোথায় আছে এখন, জানি না এরা সব এখন কেমন আছে।

ভোর আসতো নোয়াখালিতে মোরগ-ডাকের ঝকঝকে রথে চ'ড়ে—কোক্-কোরোক্-কো, কোক্-কোরোক্-কো—দিনের অভ্যর্থনা লাফিয়ে উঠতো আকাশে ধ্বনির ফোয়ারায়, আর সেই সঙ্গে শোনা যেতো পথে-পথে খোলা গলার উল্লাস, গ্রাম থেকে যারা আসছে বেসাতি নিয়ে শহরের বাজারে, শীতের কুয়াশায় পরস্পরকে হারিয়ে ফেলে, কিংবা মিছিমিছি, নিছক ফুর্তিতে চীৎকার ক'রে তারা ডাকছে: এহিও—আহিচু—ই! এহিও—আহিচু—ই! একজন ডাকলো তো চার জন জবাব দিলো চারদিক থেকে, সমস্ত সকালটা ভ'রে উঠলো সেই লম্বা, টানা-টানা, কাঁপা-কাঁপা আওয়াজে, শেষের দিকটা ছুঁচলো হ'য়ে যেন পিন ফুটিয়ে দিয়ে গেলো। আর কোথাও শুনিনি ঐ ডাক, ঐ ভাষা, ঐ উচ্চারণের ভঙ্গি। বাংলার দক্ষিণপূর্ব সীমান্তের ভাষাবৈশিষ্ট্য বিস্ময়কর। চাটগাঁর যেটা খাঁটি ভাষা তাকে তো বাংলাই বলা যায় না, আর নোয়াখালির ভাষা, আমার মতো জাত-বাঙালকেও, কথায়-কথায় চমকে দিতো। শুধু যে ক্রিয়াপদের প্রত্যয় অন্য রকম তা নয়, শুধু যে উচ্চারণে অর্ধস্ফুট হ-এর ছড়াছড়ি তাও নয়, নানা জিনিসের নামই শুনতুম আলাদা। সে-সমস্ত কথাই মুসলমানি ব'লে মনে করতে পারি না, অনেক শব্দের মধ্যে, কিছু হয়তো বার্মা, আর পর্তুগিজের কোনো না ছিটেফোঁটা। এক তো সমস্ত বাংলাই পাণ্ডববর্জিত, তার উপর বাংলার মধ্যেও অনার্যতর হ'লো বাঙালদেশ, আবার সেই বাঙালদেশেও সবচেয়ে দূর, বিচ্ছিন্ন, মিশ্রিত, অশ্রুত এই নোয়াখালি।

নোয়াখালির নগণ্যতা নিয়ে তীব্র আক্ষেপ ছিলো আমার মনে। ভেবে পেতুম না, বিধাতা বেছে-বেছে আমাকে এমন জায়গায় ছুঁড়ে ফেললেন কেন, যার নাম কখনো ছাপার অক্ষরে ওঠে না। দিল্লি কলকাতা বম্বাইয়ের কথা ছেড়েই দিচ্ছি—ও-সব তো স্বপ্ন—খবর-কাগজে দেখতুম ঢাকা বরিশাল বাঁকুড়া শিলচরের কথা, এমনকি তমলুক নেত্রকোনা সিরাজগঞ্জের খবরও মাঝে-মাঝে ছাপা হ'তো, কিন্তু নোয়াখালি—ও আবার একটা জায়গা, আর তার আবার একটা খবর! যদি বা দু'-চার মাসে একবার মফস্বল নোটিস-এর মধ্যে একটু জায়গা হ'তো নোয়াখালির, সে এতই ছোটো আর এতই ছোটো অক্ষরে যে রীতিমতো অপমান বোধ হ'তো আমার। কেন, এমনই কী তুচ্ছ জায়গাটা? এখানে এমন কয়েকটি যুবক তো আছেন তাঁরা নূতনকে লেখেন নতুন আর নতুন লেখেন ন-এ ওকার দিয়ে; এখানে সবুজপত্রের একজন অন্তত গ্রাহক আছেন—শুধু তা-ই নয়, এমন একজন ভদ্রলোকও আছেন যাঁর প্রবন্ধ সবুজপত্রে ছাপা হ'য়ে প্রবাসীর কষ্টিপাথরে উদ্ধৃত হয়েছে! আর অসহযোগের উন্মাদনার দিনে নোয়াখালি কি পেছিয়ে ছিলো কারো তুলনায়? স্কুল ছাড়া বলো, জেলে যাওয়া বলো, মীটিং, বক্তৃতা, গান—কোনটাতে কম! বন্দে মাতরম্ আর আল্লা-হো-আকবর, এই যুগ্ম-নিনাদ কি উচ্ছ্বসিত হয়নি গানের দুই চরণের মতো; মোটা খদ্দর প'রে এঁটেল গ্রীষ্মে কি ঘামিনি আমরা, কুলির রক্ত জ্ঞান ক'রে ত্যাগ করিনি চা? তবু, তবু কাগজওলাদের চোখে পড়লো না নোয়াখালি, এমন অন্ধ তারা! এই নীরন্ধ্র অখ্যাতির মধ্যে বসবাস করতে আমার আর ভালোই লাগছিলো না; কিন্তু চোখের উপর অমুক-অমুক বাবু বদলি হ'য়ে গেলেন কেউ চট্টগ্রামে, কেউ রংপুরে, কেউ ময়মনসিংহে; আমাদের ভাগ্যে শুধু বাসা-বদল এ-পাড়া থেকে ও-পাড়ায়, আমরা প'ড়ে আছি যে-তিমিরে সে-তিমিরে। শেষ পর্যন্ত যখন নোয়াখালি ছাড়বার দিন এলো আমাদের, এবং বোঝা গেলো আর আমরা ফিরবো না এখানে, সেদিন আমি সুখীই হয়েছিলাম, আমার কিশোর প্রাণ একবারও কাঁদেনি বাল্যকালের লীলাভূমিকে পিছনে ফেলে যেতে।

এতদিনে প্রতিশোধ নিয়েছে নোয়াখালি, ভীষণ প্রতিশোধ; ছড়িয়ে দিয়েছে তার নাম বড়ো-বড়ো অক্ষরে শুধু বাংলার বা ভারতের নয়, লণ্ডনের, নিউ ইয়র্কের খবর-কাগজে, এঁকে দিয়েছে তার নাম আরক্ত অক্ষরে মেয়েদের হৃৎকম্পনে, মায়েদের হৃৎপিণ্ডে। এমনকি, সেই রামগঞ্জ থানা, যেখানে খালের উপর বাঁকা সাঁকো, আর খালের জলে কচুরি পানার বেগনি আলো, সেখানে একবার নৌকো ক'রে বেড়াতে গিয়ে নারকোল দিয়ে রাঁধা কইমাছ অমৃতের মতো খেয়েছিলুম, যার অস্তিত্ব সমস্ত পৃথিবীতে কেউ জানতো না, সেই রামগঞ্জের নাম আজ লোকের মুখে-মুখে। রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, শ্রীরামপুর···তুচ্ছ ভেবেছি এই সব নাম, অতি তুচ্ছ, আর আজ তারা কত বড়ো, কী মারাত্মকরকম বড়ো। ঈর্ষাযোগ্য নয় এই ভাগ্য, কিন্তু···কে জানে। গান্ধি আজ সেখানে, আর গান্ধির চেয়ে বাঞ্ছনীয় আজকের পৃথিবীতে আর কী?

ইতিমধ্যেই খবর-কাগজে নোয়াখালির খবরের অক্ষর হয়েছে ছোটো, স্থান সংকুচিত। তাতে অবাক হবার কিছু নেই: কেননা খবর-কাগজে ঠিক জায়গায় ঠিক খবরটি প্রায়ই বেরোয় না, পৃথিবীর সত্যিকার বড়ো খবরগুলি তো একেবারে বাদ। জীবনে যাদের প্রধান উৎসাহ ধনবৃদ্ধি, ঘোড়দৌড় আর পলিটিক্স নামক সংঘবদ্ধ প্রতারণা, মুখ্যত তাদেরই জন্য পৃথিবীর সব ক'টি সর্বোত্তম সংবাদপত্র, অনুন্নতদের কথা কিছু না-ই বললাম। পয়লা পাতায় আসর জাঁকিয়ে বসেছে দিল্লি লণ্ডন নিউ ইয়র্ক; কিন্তু বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা আস্তে-আস্তে উন্মীলিত হচ্ছে বাংলার অখ্যাততম অনার্যভূমিতে; বর্তমান সময়ের শুধু নয়, চিরকালের চরম একটি প্রশ্নের উত্তর সেখানে রচিত হ'লো, যার প্রভাব আজ মনে হ'তে পারে অবজ্ঞেয়, কিন্তু ছড়াবে, ছড়িয়ে পড়বে, ছড়িয়ে দেবে মাটির তলে-তলে শিকড়, দূরান্তরে, যুগান্তরে, বিকশিত হবে ফুলে পল্লবে ভ্রমরে, তারপর ফলে নীড়ে পাখিতে হয়তো কোনো প্রভাতে দু'-চার শতাব্দী পরে। মানুষের মধ্যে যে জীব, তার ইতিহাস আজ যুদ্ধের পরে গ'ড়ে উঠছে পৃথিবীর নামজাদা নগরগুলিতে, কিন্তু মানুষের মধ্যে যে দেবতা, অন্তত দেবাভিমুখী, তার ইতিহাসের ক্ষেত্র আজ সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র নোয়াখালি।

নিষ্ঠুর শোনাবে কথাটা, তবু বলবো, ভাগ্যিস নোয়াখালি ঘটেছিলো। তাই তো গান্ধি মুক্তি পেলেন দিল্লি-লণ্ডনের কূটচক্র থেকে; বম্বাই-আহমেদাবাদের ঘনজটিল জাল থেকে; সভা, সমিতি, দল, দলপতি, বিতর্ক, মন্ত্রণার অশেষ-বিষাক্ত পরিমণ্ডল থেকে; সংখ্যা, তথ্য ও আইনের পিচ্ছিলতা থেকে; লোভীর সঙ্গে লোভীর

আমরা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আমরা অনেক হীরা-জ্বলা নীল ক্ষেতে
রাতের শিশিরে প্রজাপতি ডানা পেতে
মিশেছি হেসেছি পেয়েছিও ভালোবাসা—
শিকারী শকুন উড়ে-উড়ে আসে : এক চোখে জিজ্ঞাসা।

সেই হীরা-জ্বলা রাতের নীলাভ ক্ষেত
পড়ে আছে, দেখি : ধান কেটে নিয়ে পালায় একটি প্রেত।
দুই চোখে তার নরকের আলো, ঠোঁটে লালসায় হাসি—
আমরা চিনেছি মিশেছি পেয়েছি চলেছিও পাশাপাশি।

আমরা চলেছি। দেখেছি আগুন, কার চিতা যেন জ্বলে
মায়াবী নদীটি বেঁকে চলে যায় আকাশের কালো কোলে।
ফাল্গুন মাসে বাতাসে-বাতাসে বনভূমি সিরসিরে
কুমকুম ঢেলে পুরানো এ চাঁদ আবার এসেছে ফিরে।

আমাদের মন হীরা-জ্বলা ক্ষেত। আমরা জেনেছি তাকে
ছিন্ন করেছি বহু শতাব্দীর মেকি আবরণটিকে।
শিশিরে স্নিগ্ধ মাটির স্পর্শ ছেয়েছে পুরানো দেহ
আগামী দিনের গানের কালিতে ঘনীভূত নীল মোহ।

বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার প্রচ্ছন্ন-প্রখর আবর্ত থেকে : স্বর্গরাজ্যের সর্বনাশী পরিকল্পনা থেকে ; মিথ্যা থেকে, মত্ততা থেকে ; গণ-নেতার আবশ্যিক আত্মহত্যা থেকে। গণ-নেতার নেতাই তো জনগণ, আর জনগণের মূঢ়তা যেহেতু বিশ্বের একটা মৌল পদার্থ, তাই নেতৃপদে একবার অভিষিক্ত হ'লে বারবার চারিত্রচ্যুত না-হ'য়ে উপায় থাকে না কোনো মানুষের। মানুষের পক্ষে ভালো হওয়া সম্ভব শুধু একলা হ'লে, সংঘবদ্ধ হ'লেই সে মন্দ ; অথচ এমনি আমরা বোকা যে মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে দু' দু'বার সংঘবদ্ধ মানুষের নারকীয়তা প্রত্যক্ষ ক'রেও, এবং তার অনেকগুলি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রীতিমতো মুখস্থ হওয়া সত্ত্বেও, এখনও আমরা ভাবি যে হিটলারের চেয়ে ষ্টালিন ভালো, টোরির চেয়ে লেবর। এখনও এ-শিক্ষা আমাদের হ'লো না যে রাজনৈতিকের হাত থেকে যে-স্বাধীনতা আমরা পেতে পারি, তাতে আমরা বাঁচবো না ; রাজনৈতিকরা যা দিতে পারেন, তার প্রত্যেকটিই মারণাস্ত্র, যুগে যুগে শুধু অস্ত্র-বদল হয়, আর আমরা হৈ-চৈ করি প্রথম কিছুদিন তা-ই নিয়েই ; পুরোনো মরচে-পড়া খাঁড়ার বদলে ঝকঝকে নতুন তলোয়ার দেখে তাকেই ভুল করি জীয়ন-কাঠি ব'লে। ইতিহাসের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত এ-ই আমরা দেখে এলাম, তবু ভুল ভাঙলো না, তবু আমরা মোহাচ্ছন্ন।

এই মোহ থেকে বেরিয়ে এলেন পৃথিবীতে একজন মানুষ। সমস্ত জীবন তিনি স্বদেশের ক্ষয় করলেন রাষ্ট্রীক স্বাধীনতার চেষ্টায়, দীর্ঘ, তিক্ত, উন্মথিত বছরের পর বছর. তারপর সেই রাষ্ট্রগঠনের সময় যখন এলো, তখন? দেখলেন, যে-স্বাধীনতার জন্য সমস্ত দেশকে খেপিয়ে দিয়েছিলেন, তার প্রথমতম সম্ভাবনাতেই হিংসা উঠলো উদ্বেল হ'য়ে। তাহ'লে কী হ'লো, তাহ'লে কী হ'লো? স্তম্ভিত হ'য়ে রইলেন কয়েক দিন, তারপর যাত্রা হ'লো শুরু। দিল্লি তাঁকে দলে পেলো না, ওয়ার্ধা বেঁধে রাখলো না, মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেলো লণ্ডন প্যারিস নিউ ইঅর্ক। পথের মানুষ আবার পথে নামলেন। ভেঙে দিলেন আশ্রম, ছেড়ে দিলেন সঙ্গীদের, দেহের ন্যূনতম প্রয়োজনের অভ্যাসকেও ফেলে দিলেন ছুঁড়ে, একলা হ'লেন, শুদ্ধ হলেন, মুক্ত হলেন। এ-মুক্তিতে তাঁর প্রয়োজন ছিলো। এ না-হ'লে ব্যর্থ হ'তো তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনা। এই তাঁর পূর্ণতা, তাঁর প্রায়শ্চিত্ত, যুধিষ্ঠিরের মতো কঠিন শোকাচ্ছন্ন নিঃসঙ্গ স্বর্গারোহণ।

কোন্ স্বর্গে? যেখানে সব আলো, সব খোলা, সব সহজ। যেখানে ভয় নেই, বীরত্বও নেই। লোভ নেই, ত্যাগও নেই। ক্রোধ নেই, সংযমও নেই। যেখানে আশ্রয় নেই, তবু নিশ্চয়তা আছে। যেখানে বিফলতা নিশ্চিত, তবু আশা অন্তহীন। তিনি বেরিয়ে পড়লেন নোয়াখালির পথে, পায়ে হেঁটে, একা। গেলেন গ্রাম থেকে গ্রামে, বাড়ি থেকে বাড়িতে, কথা বললেন প্রত্যেকের সঙ্গে, অংশ নিলেন প্রত্যেকের জীবনের। বয়স তাঁর আটাত্তর। স্বজন বহুদূরে। বজ্র-কঠিন শরীর, তবু মানুষের রক্তমাংস। অমিতশান্ত স্বভাব, তবু মানুষের মন। কোথায় প'ড়ে রইলো তাঁর দেশ, যেখানে বছরের পর বছর তিনি কাটিয়েছেন ভক্ত বন্ধুদের সাহচর্যে, আর কোথায় এই সিক্ত, কর্দমাক্ত, অসংস্কৃত, অবান্ধব নোয়াখালি! কোথায় তাঁর পথের শেষ জানেন না, কখনো ফিরবেন কি না তাও জানেন না।···কিন্তু কেন? অহিংসার অগ্নিপরীক্ষা হবে ব'লে? চিরস্থায়ী শান্তি আনবেন ব'লে? ও-সব কথা কিছু বলতে হয় ব'লেই বলা : ও-সব কিছু না। আসল কথা, স্বর্গকে তিনি পেয়েছেন এতদিনে ; সেই স্বর্গ নয়, যার মধ্যে রাজনৈতিকরা রচনা করেন জনগণের সমস্ত অতৃপ্ত কামনার, ঈর্ষার, কুসংস্কারের দাবিপূরণ, আর পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করতে-না-করতে যা প্রতিপন্ন হয় আরো একটি যুদ্ধের মাতৃজঠর ; সেই স্বর্গ, যা ছাড়া আর স্বর্গ নেই, যা মানুষ সৃষ্টি করে একলা তার আপন মনে, সব মানুষ নয়, অনেক মানুষও নয়, কেউ-কেউ যার একটু মাত্র আভাস মাঝে-মাঝে হয়তো পায়, কিন্তু যাকে সম্পূর্ণ রচনা ক'রে সম্পূর্ণ ধারণ করতে যিনি পারেন তেমন মানুষ কমই আসেন পৃথিবীতে, খুবই কম— আর তেমনি একজনকে আজ আমরা চোখের উপর দেখছি বিদীর্ণ বিহ্বল নোয়াখালির জলে, জঙ্গলে, ধুলোয়। নম্র হও, নোয়াখালি ; পৃথিবী, প্রণাম করো।

স্বাধীনতা ও মুক্তি

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

হিন্দুরা চিরদিন মুক্তির জন্য লালায়িত। বিশ্বের আর কোনও জাতি মুক্তির জন্য এমন করিয়া কামনা করে নাই। তাই স্বাধীনতার স্বপ্ন বঙ্গদেশই প্রথম দেখিয়াছিল। এই মুক্তি কামনার মধ্যে সংকীর্ণতা নাই, পক্ষপাত নাই। মুক্তি সাধনার অগ্রদূত যাঁহারা, তাঁহাদেরই মনের বল ছিল একান্ত নিঃস্বার্থতার উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীঅরবিন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া সুভাষচন্দ্র পর্য্যন্ত পূত-চরিত্র দেশসেবকেরা নিঃস্বার্থ ভাবে যে সাধনার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন, তাহা মুক্তির সঙ্কেত। তাহাতে দল-বিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের দিকে দৃষ্টি ছিল না; তাহা সমস্ত দেশের মুক্তিকে কামনীয়, বরণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। বস্তুতঃ, ভারতবর্ষের অযুত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিকে এবং বৃহৎ বৃহৎ ধর্ম সম্প্রদায়কে এক সূত্রে গাঁথিয়া এক বৃহৎ জাতিতে পরিণত করিবার চেষ্টা সে দিন যাহা দেখিয়াছি ভারতের ইতিহাসে সে এক অতি গৌরবময় ঘটনা। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমি বাঁচিয়া আছি এবং আমার মত অনেকেই হয়ত বাঁচিয়া আছেন। সে দিনের কথা মনে পড়ে—হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খৃষ্টান এক মাতৃনামাঙ্কিত পবিত্র পতাকার তলে সমবেত হইয়াছিল। সেই দিন হইতেই মুক্তি-সংগ্রামের আরম্ভ। দেশকে স্বাধীন করিতে হইবে, মায়ের দুঃখ-দুর্দশা ঘুচাইতে হইবে, জগতের সকল স্বাধীন জাতির দরবারে আমার মায়ের আসন উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—এই স্বপ্নেই সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল এবং দেশমাতৃকার আহ্বানে সমস্ত জাতি হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। দলে দলে তরুণেরা কারা-বরণ করিল, হৃদয়ের উষ্ণ রক্ত ঢালিয়া দিল, বিদেশীর বেয়নেটের সম্মুখে নির্ভীক ভাবে বুক পাতিয়া দিল। তখন দেশের মধ্যে যে উন্মাদনা দেখা দিয়াছিল, তাহা মুক্তি কামনার উন্মাদনা; তাহার মধ্যে কোথায়ও কোনও সংকীর্ণ স্বার্থের সন্ধান ছিল না। বস্তুতঃ যে idealism বা আদর্শবাদ থাকিলে মানুষ তাহার সমস্ত স্বার্থ—সমস্ত কিছু নিমেষে বিসর্জন দিতে পারে, তাহা যোগাইয়াছিল পরপদলাঞ্ছিত মাতৃভূমির মুক্তি।

স্বাধীনতা সেই মুক্তি-সংগ্রামেরই অবশ্যম্ভাবী ফল- স্বরূপে নিকট হইতে নিকটতর হইতেছে। কিন্তু এই পাশ্চাত্য ভাব-প্রসূত 'স্বাধীনতা' ঠিক মুক্তি নহে। মুক্তির জন্য যে সাধনা, যে আত্ম-নিগ্রহ, যে বৈরাগ্য আবশ্যক, তাহা এই স্বাধীনতার মধ্যে নাই। স্বাধীনতা সকলেই চাহে—শ্রমিক চায় ধনিকের প্রভুত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে, মুসলমান চায় হিন্দুর উপর আধিপত্য করিতে, অনুন্নত জাতি চায় বর্ণাশ্রমের বন্ধন ছিন্ন করিতে—অর্থাৎ প্রত্যেকেই তাহার স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইতে চায় 'স্বাধীনতার' নামে। ফলে হয় সংগ্রাম। মুক্তির পরিণাম শান্তি, তথাকথিত স্বাধীনতার পরিণাম গৃহ-যুদ্ধ। তাই আজ দেখিতেছি সমাজের বা জাতির এক অংশ অপর অংশের প্রতি রক্তচক্ষুতে চাহিতেছে। দ্বন্দ্ব-কলহে পৃথিবী ছাইয়া গিয়াছে। জীবিকার জন্য একান্ত আবশ্যক যে তৈল- তণ্ডুল-বস্ত্রেন্ধন, তাহা উধাও হইয়াছে। শান্তির অমল ধবল পতাকা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া জীর্ণ বংশদণ্ডে লগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

চক্ষু রগড়াই আর ভাবি, এ কি করাল মূর্ত্তি স্বাধীনতার! ইহারই জন্য কি আমাদের দেশের যুবকেরা তাহাদের উষ্ণ শোণিত ঢালিয়া দিয়াছে? আমাদের বিশ্ববন্দিত মহাত্মা, আমাদের ঋষিকল্প কবি, আমাদের মাতৃমন্ত্রের চারণগণ কি ইহারই আবাহনগীতি গাহিয়াছেন? আমাদের বিপ্লবী সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবেন যে, সামগানে সাম্যের, ঐক্যের, সঙ্ঘের সুরই বাজিয়াছে। ভেদের সুর, ঈর্ষার সুর বাজে নাই।

কেহ কেহ বলেন, ব্যস্ত হও কেন? রক্তারক্তি না হইয়া কি কখনও কোনও দেশ স্বাধীনতা লাভ করে? কিন্তু এ কথায় মন প্রবোধ মানিতে চায় না। কোথায় দেশ? কোথায় জাতি? কলিকাতার দক্ষিণে গঙ্গা যখন মজিয়া গেলেন, তখন ভিন্ন ভিন্ন গৃহস্থ তাহার শুষ্ক পঙ্কে কূপ কাটাইয়া, পুষ্করিণী খনন করিয়া, 'ঘোষেদের গঙ্গা' 'বোসেদের গঙ্গা' করিয়া লইয়াছিলেন। এ যেন আমার মনে হইতেছে যে, তেমনি এই সোনার ভারতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মুসলমানের ভারত, হিন্দুর ভারত, বামুন-কায়েতের ভারত, নমঃশূদ্র-পোদের ভারতে পরিণত করিতে চলিয়াছি। এই কি স্বাধীন ভারতের চিত্র?

ধরিয়া লওয়া যাউক, ইংরেজ চলিয়া যাইবে। কিন্তু তার পর আমরা এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডিত স্বাধীনতা লইয়া কি করিব? স্বাধীনতা পাইতে যেমন প্রাণান্ত, রাখিতেও ততোধিক। রুসো বলিয়াছিলেন, স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু দেখা যায় সর্বত্র মানুষের পায়ে দাসত্বের শৃঙ্খল। Man is born free but every where he is in chains. তার কারণ, আমার মনে হয় মানুষ মুক্তি চাহে নাই, সমস্ত মানব স্বার্থান্ধ স্বাধীনতার জন্য মাতাল হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু মুক্তি অত সহজে পাওয়া যায় না। মুক্তিকে পাইতে হইলে সমস্ত সংকীর্ণ স্বার্থকে বলি দিতে হইবে। ভারতকে এক অখণ্ড বলশালী জাতিতে পরিণত করিতে হইবে যাহাতে সে ভিতরের বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে।

সমগ্র ভারতকে বলশালী করিয়া তুলিতে হইলে চাই আত্মত্যাগ, চাই দাক্ষিণ্য, চাই ঐক্য। ন্যাশনাল গার্ড বা রক্ষী দল গঠন করিয়া ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চাও, তাহা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু তাহারা ঐ একটি কাজ করিতেই পারিবে, স্বাধীনতাকে রক্ত- গঙ্গায় ভাসাইতে পারিবে নিশ্চয়। কিন্তু এইরূপে পরস্পরের বলক্ষয় হইলে বহিঃশত্রুর পক্ষে শুভাগমন করা নিতান্তই সহজ-সাধ্য হইবে। ইহারই নাম ভারতের ভাগ্যলিপির পুনরাবর্ত্তন History repeats itself, ভারতের ভাগ্যে মুক্তি লাভ হইল না।

দেশকে সত্যকার স্বাধীনতা দিতে হইলে, মুক্তি পাইতে হইলে, সমস্ত বিদ্বেষ, প্রতিযোগিতা বিসর্জ্জন দিয়া আবার মাকে মা বলিয়া ডাকিতে পারিবে? আবার পরস্পরের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া বিশাল জাতি গঠন করিতে পারিবে? পার যদি ভাল, নহিলে স্বাধীনতা হইবে ভারতের অভিসম্পাত।

পণ্ডিত নসীরামের দরবার

রামকৃষ্ণ পরমহংস উনবিংশ শতকের বাংলার সর্বপ্রধান ঘটনা। সমসাময়িক এবং পরবর্তী কালে তাঁকে মহাপুরুষ বলে স্বীকার করেছে দেশ-বিদেশের মনীষীরা, অধ্যাত্ম-জগতে সেই সঙ্গে স্বীকৃত হয়েও গেছে বাঙালী সাধকদের শ্রেষ্ঠত্ব।

গত শতাব্দীতে রামকৃষ্ণের সঙ্গে কয়েক জন দুর্লভ প্রতিভাধরও বাংলাদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন—যাঁরা তাঁদের প্রতিভার প্রকাশের বিশেষ ক্ষেত্র অনুযায়ী দেশের সাহিত্য, সমাজ, চিন্তাধারা এবং রঙ্গালয়ে তাদের বিশিষ্টতার ছাপ রেখে গিয়েছেন।

বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরীশচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং কেশব সেন—এঁরা সকলেই তাঁদের জীবনে কোনোনা-কোনো রামকৃষ্ণসংস্পর্শে এসেছিলেন। বিবেকানন্দ ও গিরীশচন্দ্র রামকৃষ্ণের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন, মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়নি, বরং বিদ্যাসাগর ও কেশব সেনের সঙ্গে তাঁর আলাপ অপেক্ষাকৃত গাঢ় ছিল।

বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের বাণী বহন করে নিয়ে গেছেন প্রতীচ্যে। গিরীশচন্দ্র হয়ত তাঁরই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করলেন বাংলা রঙ্গমঞ্চে।

মাইকেল রামকৃষ্ণের দেখা পেলেন এক মক্কেলের বাড়িতে এসে! রামকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন নারায়ণ শাস্ত্রী। তিনি মাইকেলকে জিজ্ঞাসা করলেন, নিজের ধর্ম কেন ছাড়লেন?

মাইকেল পেট দেখালেন, পেটের জন্য ছাড়তে হয়েছে।

এ উত্তর নারায়ণ শাস্ত্রীর মনঃপূত হল না, যে পেটের জন্য ধর্ম ছাড়ে তার সঙ্গে আর কথা কি বলব?

মাইকেল রামকৃষ্ণের দিকে তাকালেন, আপনি কিছু বলুন।

রামকৃষ্ণ বললেন, কে জানে কেন আমার কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না। আমার মুখ কে যেন চেপে ধরেছে।

রামকৃষ্ণের সঙ্গে মাইকেলের আলাপ ঐ পর্যন্ত। মাইকেলের ভুল ভেঙে গেল। রামকৃষ্ণ মহাজন বটে কিন্তু সে মহাজন নয়।

মাইকেলের লেখা রামকৃষ্ণ পড়েননি। পড়তে তিনি পারতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী এবং কৃষ্ণচরিত্র তাঁকে পড়ে শোনানো হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বোঝাপড়া অবিশ্যি তার আগেই হয়ে গিয়েছিল তাঁর। রামকৃষ্ণ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কার ভাবে বাঁকা গো?

বঙ্কিমচন্দ্র হেসে বললেন, জুতোর চোটে, সাহেবদের জুতোর চোটে বাঁকা।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন, শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ সে কথাই ভাবছিলেন, এ উত্তর আশা করেননি, অবিশ্যি হতাশও হননি।

হতাশ হলেন পরের উত্তরে। বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিত লোক, রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, মানুষের কর্তব্য কি?

বঙ্কিমচন্দ্র হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, আজ্ঞে তা যদি বলেন তাহলে আহার, নিদ্রা ও মৈথুন।

রামকৃষ্ণ বিরক্ত হলেন, এঃ! তুমি বড় ছ্যাঁচড়া! নিজে যা রাত-দিন কর, তাই তোমার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। লোকে যা খায় তার ঢেকুর ওঠে। মূলো খেলে মূলোর, ডাব খেলে ডাবের। শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে যদি সঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা, বিবেক-বৈরাগ্য না থাকে? চিল-শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে কিন্তু নজর থাকে ভাগাড়ের দিকে। কেউ কেউ মনে করে যারা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করে তারা সব পাগল! আমরা কেমন সেয়ানা, কেমন সুখভোগ করছি। কারুও মনে হবে আমি ভারি সেয়ানা কিন্তু সকালে উঠেই পরের গু খেয়ে মরে—এদিকে কত উড়ুর পুড়ুর, ভারি সেয়ানা!

পরিহাসের এতটা পরিণতি বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনা করেননি।

যাবার আগে রামকৃষ্ণকে প্রণাম করে বললেন, মহাশয়, যতটা আহাম্মক আমাকে ঠাউরেছেন, তত নই। অনুগ্রহ করে কুটিরে যদি একবার পায়ের ধুলো দেন। সেখানেও দেখবেন ভক্ত আছে।

ভক্তের কথা শুনে রামকৃষ্ণ যেন ঘাবড়ে গেলেন, কি রকম ভক্ত সব সেখানে? কেশব-কেশব, গোপাল-গোপাল, হরহার, হর-হর না কি?

বাঙালী জাত এজন্য তার কাছে কতটা কৃতজ্ঞ জানি না, কবি ও সাহিত্যিকদের প্রতি বাঙালীর চিরকালের এই অবিশ্বাসের প্রচলনকর্তা সম্ভবত রামকৃষ্ণ। শুধু মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্রই নয়, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত গিরীশচন্দ্রকেও তিনি সমীহ করে, ভয় করে চলতেন। এমনিতে গিরীশচন্দ্র ভাল মানুষই ছিলেন, মদ্যপান করেই যা কিছু বিসদৃশ ব্যবহার করতেন, রামকৃষ্ণের গায়ে পাও তুলে দিতেন।

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে অবশ্য রামকৃষ্ণের কিছুটা ভিন্ন মত ছিল। বিদ্যাসাগর মাতৃভক্ত ছিলেন, দয়ার সাগর ছিলেন। বিদ্যাসাগরকে তিনি পছন্দ করতেন, ভালও বাসতেন। তবে ঈশ্বর সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরকে খুব বেশি উৎসাহিত করতে পারেননি। ঈশ্বর সম্বন্ধে কথা উঠলেই বিদ্যাসাগর চেপে যেতেন। কেন যেতেন সে কথা তিনি রামকৃষ্ণকে বলেননি; রামকৃষ্ণকে তিনি যথার্থ শ্রদ্ধা করতেন।

এক জন জিজ্ঞাসা করেছিল, ভগবান সম্বন্ধে কোন কথা ত কখনও আপনি বলেন না?

বিদ্যাসাগর যেন ভীত হয়েই বললেন, বলি না কি সাধে? বেত খাবার ভয়ে আমি ভগবানের কথা কারকে বলি না।

সে কি রকম?

মনে কর, মরবার পর আমরা সকলে ঈশ্বরের কাছে গেলাম। মনে কর, কেশব সেনকে যমদূতেরা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গেল। কেশব সেন অবশ্য সংসারে পাপ-টাপ করেছে। যখন প্রমাণ হল তখন ঈশ্বর হয়ত বললেন, ওকে পঁচিশ বেত মারো। তার পর মনে কর, আমাকে নিয়ে গেল। আমি হয়ত কেশব সেনের সমাজে যাই। অনেক অন্যায় করেছি তার জন্য বেতের হুকুম হল। তখন আমি হয়ত বললাম কেশব সেন আমাকে ঐরূপ বুঝিয়েছিল, তাই এইরূপ কাজ করেছি। তখন ঈশ্বর আবার দূতদের হয়ত বলবেন, কেশব সেনকে আবার নিয়ে আয়। এলে পর হয়ত তাকে বলবেন, তুই একে উপদেশ দিয়েছিলি? তুই নিজে ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু জানিস না, আবার পরকে উপদেশ দিয়েছিলি? ওরে কে আছিস—একে আর পঁচিশ বেত দে। নিজেই সামলাতে পারি না, আবার পরের জন্য বেত খাওয়া! আমি নিজে ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু বুঝি না, আবার পরকে কি লেকচার দেবো!

ঈশ্বর সম্বন্ধে তাই কোন কথাই ঈশ্বরচন্দ্র বলেননি।

এবং তাতেও কম বলেননি কিছু।

সভ্যতার বিকাশে মনের গতি

ডাঃ সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনের কি বাসনা, মন কি আকাঙ্ক্ষা করে—এ প্রশ্ন মানুষকে চিরকালই চঞ্চল করেছে—মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করাই মানুষের একমাত্র কর্ম্ম।

মানুষ কর্ম্মের মধ্যে তৃপ্তি ও শান্তি আকাঙ্ক্ষা করে। অপূর্ণ বাসনা নিয়ে মানুষের তৃপ্তি নাই—শান্তি কোথায়।

বাসনার পূরণের মধ্যে মানুষ আত্মপ্রকাশ করে—আত্মপ্রকাশ করেই মানুষের আনন্দ। কর্ম্মে, ব্যবহারে, চিন্তায়, কল্পনায় স্বপ্নেও আত্মপ্রকাশ করেই মানুষ আনন্দ লাভ করে—আনন্দে আত্ম-হারা হয়ে—মগ্ন হয়ে থাকতেই মানুষ ভালবাসে। আত্মপ্রকাশ করে অন্তরে মানুষ নিজের কাছেই মুগ্ধ হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধে যে কোন সম্পর্কে আত্মপ্রকাশের অনুভূতিতে মানুষ একান্ত ভাবে তন্ময় হয়ে থাকে। মানুষের সমাজ গঠনের মূলে—আত্মপ্রকাশের সহজ বিকাশের প্রয়োজনীয়তা-বোধই একমাত্র প্রেরণা। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ও মহৎ, সামান্য ও অর্থহীন যা কিছু মানুষের তৈরী—মানুষের কাছে তার ছবি ও মূর্ত্তি অতি সুন্দর। মানুষ যা-কিছু গ্রহণ করে অন্তর দিয়ে তার মধ্যে স্বরূপেরই অন্বেষণ করে! মানুষ নিজেকে সৃষ্টি করেই আনন্দ লাভ করে—মানুষ মূর্ত্তি সৃষ্টি করে তারই পূজা করতে ব্রতী হয়। বিভিন্ন মনোভাবের কত বিভিন্ন প্রকাশ—রূপের মূর্ত্তির কি অন্ত আছে—ভাবে, ভাষায়, কল্পনায় প্রকাশ করার অনন্ত চেষ্টা মানুষকে নিত্য নূতনের সন্ধান দিয়েছে—বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য মানুষের সৃষ্টি—আত্মপ্রকাশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করেছে। মানুষ সে সৃষ্টির মধ্যে স্বরূপের প্রতিচ্ছবি দর্শন করে তার মধ্যে বিলীন হয়ে যেতেই ব্যাকুল। গর্ব্বে, আনন্দে মানুষ নিজেকেই অনুভব করে। মানুষের মনের এই সহজ দর্শন মানুষের ধর্ম্ম। মানুষের মনের এই দর্শনে, আত্মপ্রকাশের সাধনায় মানুষ আদর্শ রচনা করেছে। কিন্তু এ দর্শনের প্রশ্ন এই স্বরূপের সাধনার অর্থ কি—মানুষ যেখানে আত্মপ্রকাশ করে সেখানে নিজের স্বরূপের সন্ধানে কেন ব্যস্ত হয়? এ প্রশ্নের মীমাংসা করলে আনন্দ কি নিঃশেষ হয়ে যাবে মনের অন্তরালে, গোপনে কি কল্পনায় কোন অজানা ভয়ের আশঙ্কায় হয়ত মানুষ এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে অস্বীকার করেছে। এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। স্বরূপের সাধনায় অন্বেষণেই মানুষকে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে হয়েছে। কিন্তু মানুষ যে স্বরূপের সন্ধান করে তারই অন্বেষণ করে—এ কথাও মানুষ জানে না—অন্বেষণ করে এ কথা মানুষ অনুভব করে—কি অন্বেষণ করে, কার অন্বেষণে মানুষ ব্যস্ত, মানুষের কাছে সে কথা অস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সে কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

"কে সে। জানি না কে চিনি নাই তারে
শুধু এইটুকু জানি তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে,
চলেছে মানব যাত্রী যুগ হতে যুগান্তের পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালিয়ে ধরিয়া
সাবধানে অন্তর প্রদীপখানি"

মানুষ এক ভাবে একান্ত স্বকামী (Narcissistic) মানুষ একান্ত ভাবে স্বকামী এ কথা মানুষ উপলব্ধি করে নাই—মানুষ তার চিন্তা-ধারার প্রথম পদক্ষেপে আত্মপ্রকাশে প্রয়াসী। মানুষ তার স্বরূপের সন্ধানী—এ কথা উপলব্ধি করার এখনও হয়ত সময় আসে নাই। এখনও মানুষ সভ্যতার শৈশব অতিক্রম করতে পারে নাই। মন্থর-গতি মানুষ তার অগ্রগতির দ্বিতীয় পদক্ষেপে হয়ত আত্ম-প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করবে।

আমাদের প্রশ্ন—আত্মপ্রকাশ করতে মানুষ কতটুকু সমর্থ?

এ কথা চিন্তা করা সহজ, মানুষের অতীত ইতিহাসে শান্তি ও শৃংখলা ছিল। শান্তি ও শৃংখলাই ছিল মানুষের সভ্যতার স্বরূপ। মানুষের আত্মপ্রকাশের বিঘ্ন কি? তখন মানুষের কয়েকটি মাত্র প্রশ্ন ছিল—ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন সমাজগুলির সমস্যা ছিল সামান্য—মানুষের শক্তি অতিশয় সীমাবদ্ধ—স্বল্পপরিসর জ্ঞানে মানুষ ছিল সন্তুষ্ট। মানুষের সঙ্গে পৃথিবীর ঘনিষ্ঠতা তখনও নিবিড় হয়ে ওঠে নাই। কিন্তু অজ্ঞানতার অন্ধকারে শান্তি, নির্জীবতারই শান্তি—প্রাণহীন প্রস্তরের শান্তি—সে শান্তির মূল্য কি? ক্ষুদ্রতায় মানুষের শান্তি নাই। এই মতবাদ অর্থহীন বলা চলে না। এ কথা সত্যি, সবল সতেজ প্রাণবান শান্তি কখনই সহজলভ্য নয়—শান্তি অর্জ্জন করতে মানুষের কঠোর সংগ্রাম করতে হয়। কঠোর, দুর্গম বিঘ্নসঙ্কুল অজানা পথের যাত্রী মানুষ। যা কিছু বৃহৎ ও মহৎ মানুষ তারই অধিবাসী, এ কথা মানুষ গর্ব্বের সঙ্গে ঘোষণা করে। বহু যুগের সংগ্রাম অতিক্রম করে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হতে চলেছে—এ আশা কি মানুষ পোষণ করবে না? সমাজের সঙ্গে সমাজের পরিচয়ে—বৃহত্তর সমাজ গঠনের সম্ভাবনায়—জাতিতে জাতিতে মিলনের যোজনায় অহিংসার বাণী নূতন প্রেরণায় স্বাধীনতা আনবে না?

বর্ত্তমান যুগে নূতন বন্ধনের সম্পর্কে পুরাতনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সংখ্যাতীত প্রশ্ন ও সমস্যা এসে উপস্থিত হয়েছে। মানুষ বৃহতের মধ্যে যতই অগ্রসর হয়ে চলছে—মানুষের অজানার প্রশ্ন ক্রমে আরো জটিল ও কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রথমত মানুষের নিজের স্বরূপের সঙ্গেই সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। মানুষের মনের ভাসমান চিন্তার সঙ্গে—সজ্ঞান মনের (conscious mind) সঙ্গে মানুষ পরিচিত কিন্তু স্মৃতির ভাণ্ডারে নির্জ্ঞান মনের (unconscious mind) সঙ্গে মানুষের কতটুকু পরিচয়? নির্জ্ঞান মনের উপরে কি কোন অজানা শক্তির প্রভাব আছে—নির্জ্ঞান মন পরিচালনার রহস্য মানুষের কি জানা আছে? এ সব প্রশ্নের আলোচনা করে আমরা মনের কল্পলোকেই গিয়ে উপস্থিত হই। কল্পনা অর্থহীন নয়, কল্পনাই বাস্তবে পরিণত হয়। তার পেছনে থাকে মানুষের অনন্ত সাধনা—সামঞ্জস্যপূর্ণ অবিচ্ছিন্ন চিন্তা—মানুষের জ্ঞানেরই পরিচয়। কিন্তু যেখানে কল্পনায় মানুষকে আকৃষ্ট করে মানুষের সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতি বিকৃত করে দেয়, মানুষকে বিভ্রান্ত করে ব্যর্থ করে দেয়, সেই কল্পনার (Phantasy) সঙ্গে মানুষের পরিচয় নাই—শৈশবসুলভ সেই কল্পনাই নির্জ্ঞান মনের পরিচালক।

অজানার অপর একটি প্রশ্ন বর্ত্তমান জগৎ। বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের পরিচয় অতি সামান্য। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব—

সময়ের তীরে

জীবনানন্দ দাশ

নিচে হতাহত সৈন্যদের ভিড় পেরিয়ে,
মাথার ওপর অগণন নক্ষত্রের আকাশের দিকে তাকিয়ে,
কোনো দূর সমুদ্রের বাতাসের স্পর্শ মুখে রেখে,
আমার শরীরের ভিতর অনাদি সৃষ্টির রক্তের গুঞ্জরণ শুনে,
কোথায় শিবিরে গিয়ে পৌঁছলাম আমি।
সেখানে মাতাল সেনা-নায়কেরা
মদকে নারীর মত ব্যবহার ক'রছে,
নারীকে জলের মত;
তাদের হৃদয়ের থেকে উত্থিত সৃষ্টিবিসারী গানে
নতুন সমুদ্রের পারে নক্ষত্রের নগ্নলোক সৃষ্টি হচ্ছে যেন;
কোথাও কোনো মানবিক নগর বন্দর মিনার খিলান নেই আর;
এক দিকে বালিপ্রলেপী মরুভূমি হু হু ক'রছে;
আর এক দিকে ঘাসের প্রান্তর ছড়িয়ে আছে—
আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্যের মত অপার অন্ধকারে
মাইলের পর মাইল।

শুধু বাতাস উড়ে আসছে:
স্খলিত নিহত মনুষ্যত্বের শেষ সীমানাকে
সময় সেতুলোকে বিলীন ক'রে দেবার জন্যে,
উচ্ছিত শব বাহকের মূর্তিতে।
শুধু বাতাসের প্রেতচারণ
অমৃতলোকের অপশিয়মান নক্ষত্রযান-আলোর সন্ধানে।
পাখি নেই,—সেই পাখির কঙ্কালের গুঞ্জরণ;
কোনো গাছ নেই,—সেই তুঁতের পল্লবের ভিতর থেকে
অন্ধ অন্ধকার তুষারপিচ্ছিল এক শোণ নদীর নির্দেশে।

সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হ'ল, নারি,
অবাক হ'লাম না।
হতবাক হবার কী আছে?
তুমি যে মর্ত্যনারকী ধাতুর সংঘর্ষ থেকে জেগে উঠেছ নীল
স্বর্গীয় শিখার মত:

সকল সময় স্থান অনুভবলোক অধিকার ক'রে সে তো থাকবে
এইখানেই,
আজ আমাদের এই কঠিন পৃথিবীতে।

কোথাও মিনারে তুমি নেই আজ আর
জানালার সোনালি নীল কমলা সবুজ কাচের দিগন্তে;
কোথাও বনচ্ছবির ভিতরে নেই;
শাদা সাধারণ নিঃসঙ্কোচ রৌদ্রের ভিতরে তুমি নেই আজ;
অথবা ঝর্ণার জলে
মিশরী শঙ্খরেখাসর্পিল গাগরীর সমুৎসুকতায়
তুমি আজ সূর্য্যজ্বলস্ফুলিঙ্গের আত্মা-মুখরিত নও আর।

তোমাকে আমেরিকার কংগ্রেস-ভবনে দেখতে চেয়েছিলাম,
কিংবা ভারতের;
অথবা ক্রেমলিনে কি বেতসতন্বী সূর্য্যশিখার কোনো স্থান আছে
যার মানে পবিত্রতা শান্তি শক্তি শুভ্রতা—সকলের জন্যে!
নিঃসীম শূন্যে শূন্যের সংঘর্ষে স্বতোৎসারা নীলিমার মত
কোনো রাষ্ট্র কি নেই আজ আর
কোনো নগরী নেই
সৃষ্টির মরালীকে যা বহন ক'রে চ'লেছে মধু বাতাসে
নক্ষত্রে—লোক থেকে সূর্য্যলোকান্তরে!

নেই—নেই—আহা, নারি,
আজ আমি ডানে বাঁয়ে ওপরে নিচে সময়ের
জ্বলন্ত তিমিরের ভিতর তোমাকে পেয়েছি।
শুনেছি পলায়নকামী রক্তসাগরের পিছে জীবনের
বিরাট শ্বেতপক্ষিসূর্য্যের ডানার উড্ডান কলরোল;
আগুনের মহান পরিধি গান ক'রে উঠছে;
আমাদের অক্লান্ত জীবনের প্রেম ব্যথা জ্ঞান গতি ধাতুকে প্রোজ্জ্বল ক'রে
প্রগাঢ় এক স্বর্ণপাখিকাকলীকে উদ্দীপ্ত ক'রছে সে
অনন্তের স্বর্ণকারের মত।

মানুষের বংশগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব আমাদের অজানার প্রশ্ন—আমাদের বিঘ্ন। অসংখ্য অজানার প্রশ্ন। অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারে স্বরূপের সন্ধান সহজে কি পাওয়া যায়? তাই নূতনের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই—মিলনের সম্ভাবনাও নাই। আছে অজানার ভয়; সেখানে আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা কোথায়? স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন আসে, তাহলে মনে আত্মপ্রকাশের যে যোজনার গঠনের অন্তর্নিহিত বাসনা আছে তা কি ব্যর্থ হবে? এই আশঙ্কাই মানুষকে শঙ্কিত করে তোলে। মানুষের ভুল, ভ্রান্তি, দুর্ঘটনা ও ব্যর্থতা এই ভয় থেকেই সৃষ্টি হয়। এ ভয় যেখানে অস্পষ্ট নির্জ্ঞান মনে নিহিত থাকে সেখানে মানুষ বিকৃত ব্যবহার করে। মানুষ তখন বিদ্রোহী।

মানুষের বিবেচনায় দর্শনে, বিজ্ঞানে, সুচিন্তিত পরিকল্পনায়, বহু সাধনায় যা কিছু সুন্দর—একান্ত কাম্য বর্তমান যুগে হিংসার চরিতার্থতায় অকুণ্ঠচিত্তে বিদ্রোহী মানুষ তারই ধ্বংস সাধন করেছে! সংজ্ঞান মনে (conscious mind) সুন্দর পরিকল্পনায় এক দিকে মানুষ গঠন করে তুলেছে তার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি, অপর দিকে নির্জ্ঞান মনের (unconscious mind) তাড়নায় মানুষই তার ধ্বংস সাধন করেছে। সভ্যতার গর্ব্ব ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। শান্তির প্রচেষ্টা ও যুদ্ধের পরিকল্পনা মানুষ একই সঙ্গে রচনা করেছে—এ যেন দুই বিপরীত (ambivalent) বাসনার বাস্তব প্রকাশ। মানুষ বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন জাতি গঠন করে ইতিহাসের আদি থেকে আজও ধ্বংসের ও সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলেই অচল অবস্থায় অবস্থিত। আজও মানুষ পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করতে অক্ষম—এ কথা আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে

—অনিল সেন
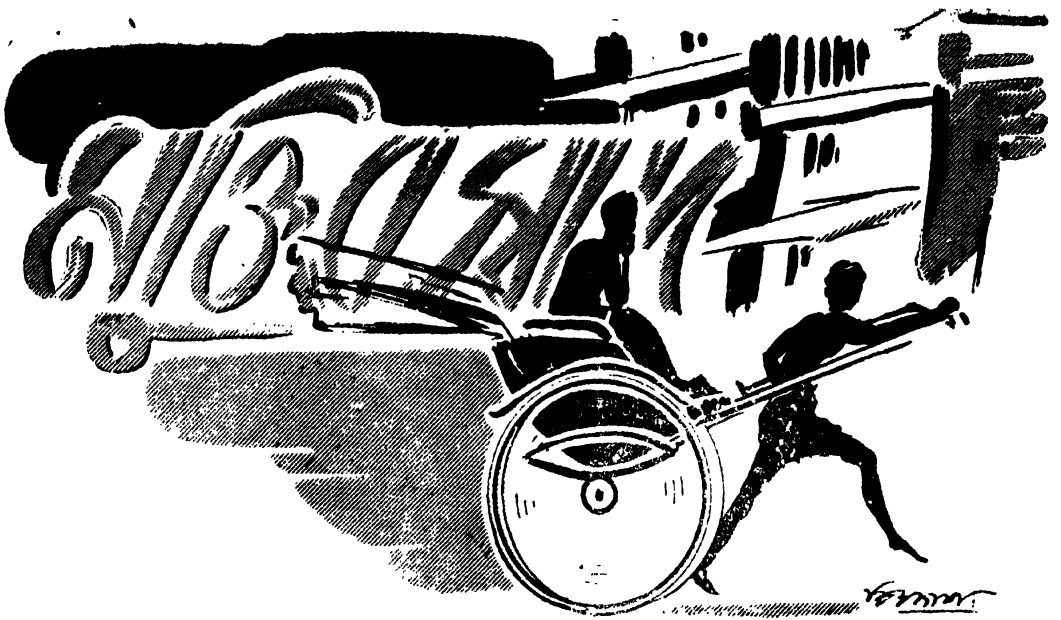
শ্রীপরিমল গোস্বামী

কাপড়ের জন্যে এক দিন, তেলের জন্যে এক দিন—চন্দ্রনাথ এই দু'দিন ছুটি নিয়েছে অফিস থেকে। কাল কাপড় কিনেছে এক বেলা লাইনে দাঁড়িয়ে, আজ দাঁড়িয়েছে তেলের জন্যে। একা মানুষ, ছুটি না নিয়ে কাপড় এবং তেল—এর কোনোটিই কেনা হয় না।

লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চন্দ্রনাথের পায়ে ব্যথা ধ'রে গেছে। পয়সা দিয়ে জিনিষ কিনবে তার জন্যে এত শাস্তি কেন? কি পাপ করেছে দেশের লোক? দু'চার জন চোরাবাজারীর জন্যে লাখ লাখ লোক ভুগবে? চোরাবাজারীর এত ভয়? তাদের ধ'রে ধ'রে ফাঁসিতে ঝোলালে হয় না? ক্যাবিনেট মিশনের গোষ্ঠীর মাথা। দেশ স্বাধীন হচ্ছে লাইনে দাঁড়িয়ে!

চন্দ্রনাথ ধৈর্য রাখতে পারে না, ক্ষেপে যায়। সামনের লোকটাকে এই অবিচারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করে, কিন্তু কোনো ফল হয় না। সে শুধু ওর কথায় একবার চকিতের জন্যে চোখ ফিরিয়ে ওর চেহারাখানা দেখে আবার যেমন ছিল ঠিক তেমনি নির্জীবের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। চন্দ্রনাথ মনে মনে বলে, ভেড়ার পাল সব, একটু চটতেও জানে না। একটু উত্তেজনার সৃষ্টি হ'লে সময়টা একটু সহজে কাটতে পারত। কিন্তু তা আর হ'ল না।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে দোকানের দরজায় পৌছতে দীর্ঘ তিনটি ঘণ্টা কেটে গেল চন্দ্রনাথের। কিন্তু তার পালা যখন এল তখন দোকানে আর তেল নেই।

তার মানে একটি মাস বিনা তেলে কাটাতে হবে।

ছুটি এ মাসে সে আর পাবে না।

দোকানীকে খুন করতে ইচ্ছা হ'ল তার। চীৎকার ক'রে দোকান ফাটাতে ইচ্ছা হ'ল তার। দোকানের জিনিষ-পত্র ভেঙে একটি দাঙ্গা বাধাবার ইচ্ছা হ'ল তার।

কিন্তু কিছুই সে করল না, করতে পারল না। করতে গিয়ে দেখল—সাহস নেই, শক্তিও অন্তর্হিত। আঠারো বছরের চাকরি তার সমস্ত শক্তি হরণ করেছে। সুতরাং মনে মনে গভরমেণ্টকে অভিশাপ দিতে দিতে খালি টিনটি হাতে করে বাড়ি ফিরে এল।

একটা দিনের ছুটি—কিছুই হল না।

এই ব্যর্থতা চন্দ্রনাথের আজ যেন আর সহজ হয় না। কিন্তু কি-ই বা করবার আছে? তেলের অভাবে সেদ্ধ ডাল মাছ খেতে হবে, তিন টাকা সেরের বাদাম তেল কেনার পয়সা নেই তার।

কিন্তু সেদ্ধ খাওয়া মানে তো নিজেকেই শাস্তি দেওয়া। এই আত্মবঞ্চনায় সে আজ নতুন ব্রতী নয়, এ তার অভ্যাস হয়ে গেছে। শুধু আজ সে ভাবছে, যারা তাকে বঞ্চিত করছে তাদের শাস্তি দেবার উপায় কি?

ভাবতে ভাবতে বিচলিত হয়ে উঠছে চন্দ্রনাথ। মনটা তার আজ একটু বেশি মাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। জীবন ধারণে এতখানি অনিশ্চয়তা-বোধ তার হয় তো ইতিপূর্বে এমন উগ্র ভাবে জাগেনি, তাই।

ভেবে ভেবে অবশেষে একটা বুদ্ধি তার মাথায় এল। সে দেখেছে খবরের কাগজে অনেকেই চিঠি লিখে নানা অভাব-অভিযোগের কথা জানায়। তাতে কি ফল হয় তা অবশ্য জানা যায় না, কিন্তু মনের দুঃখ নিজের মনে চেপে রেখে জ্বলে-পুড়ে মরার চেয়ে সে ভাল। হাজার হাজার লোক সে চিঠি পড়ে, তাতেও একটা সান্ত্বনা আছে। সুতরাং সেও চিঠি লিখবে খবরের কাগজে।

এক কালে কলেজে পড়বার সময় রচনা-শক্তি তার ভালই ছিল, বহু কাল পরে একখানি চিঠি রচনার সুযোগ পেয়ে তার আনন্দই হ'ল।

কিন্তু হ'ল না লেখা। লিখতে গিয়ে বিপদে পড়ল সে। খবরের কাগজে যে-চিঠি ছাপা হবে তার ভাষা কি হবে? মন অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠল। যত লেখে ততই তা খারাপ লাগে, যত বার লেখে তত বার ছিঁড়ে ফেলে।

মনে আগুন জ্বলছে অথচ প্রকাশের ভাষা নেই!

ঘণ্টাখানেক চেষ্টার পর সে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠে পড়ল। অসং

সে সব দিক দিয়েই ছিল, কিন্তু অসহায়তা বোধ এমন প্রবল ভাবে আগে তার মনে জাগেনি। তার মনে পড়ল, লাইনে দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি; এখন দেখল, কাগজে চীৎকার করবে এমন ক্ষমতাও তার আর নেই।

বহু প্রশ্ন জাগল তার মনে। এ কথাও বুঝতে পারল চীৎকার করেও কোনো লাভ নেই। সংসারে যারা প্রতিবাদ করতে এসেছে তারা শুধু প্রতিবাদই করে, আর যারা অবিচার করতে এসেছে তারা কোনো দিনই সে প্রতিবাদ কানে তোলে না।

অতএব?

অতএব চুপ ক'রে যাওয়া ভিন্ন উপায় কি? অনেকেই তো চুপ ক'রে থাকে। তারা তেল পায় না, কাপড় পায় না, অথচ বেশ নিশ্চিন্ত মনে সন্ধ্যাবেলা রকে বসে দাবা খেলে, হারমোনিয়ম নিয়ে তবলা নিয়ে রাত বারোটা পর্যন্ত আসর জমায়।

তা জমাক। ওদের সঙ্গে চন্দ্রনাথের মতের মিল নেই। ওরা উচ্ছন্ন যাক—ওটা ওদের জন্মগত অধিকার।

মনে মনে আবার বিদ্রোহ?—চন্দ্রনাথ লজ্জিত হ'ল নিজের মনোভাব লক্ষ্য ক'রে।

বাড়ির বদ্ধ আবেষ্টনে হাঁফিয়ে উঠল সে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল একটুখানি পরেই, সোজা চলে গেল ময়দানের দিকে। বহু বৎসর পরে তার মন একটুখানি খোলা হাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

ময়দানে গিয়ে বেছে বেছে একটা নির্জন জায়গায় গিয়ে বসল।

এ রকম দায়িত্বহীন ভাবনাহীন খোলা আকাশের নিচে বসে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেবার কল্পনা ছাত্র-জীবনে কতবার সে করেছে—এবং সে কল্পনা মিলিয়েও গেছে ছাত্র-জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই।···কিন্তু তবু এত দিন পরে···

একঘেয়ে দৈনন্দিন জীবনের ফাঁকে···

ভাগ্যের হাত থেকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নেওয়া এই ক্ষণ-মুক্তির অবসরটুকুও তার পক্ষে পরম উপাদেয় ব'লে বোধ হল।

উদার আবেষ্টনে একটুখানি বসেই তার সহস্র দুর্ভাবনা চাপা পড়ে গেল।

জীবনভর বাজার করা, খাওয়া আর অফিসে ছোটা হাস্যকর মনে হল।

সব চেয়ে মজার—আকাশ মাঠ সম্পর্কে কতকগুলো কবিতার ছত্রও অবচেতনার নিভৃত সমাধি থেকে হঠাৎ জেগে উঠে তার মনের মধ্যে গুঞ্জন ক'রে ফিরতে লাগল।

খোলা আকাশের এত শক্তি?···

এ তো ভয়ানক ব্যাপার!···

চন্দ্রনাথ অভিভূত হয়ে পড়ল।

যে মানুষ ছিল এত বড়, যার দুশ্চিন্তা ছিল পর্বতপ্রমাণ, সেই মানুষ এই বিরাট আকাশের নিচে এত ছোট হয়ে গেল!···

কীটের মতো ছোট···

ভাবনা-চিন্তার পর্বত হ'ল ধূলিসাৎ!

একটা মধুর আনন্দে মগ্ন হয়ে চন্দ্রনাথ শুয়ে পড়ল সবুজ ঘাসের উপর।

একটা মধুর আবেশে তার চোখ দু'টি বুজে এল।

হাওয়ায় ভেসে চলেছে যেন···দেহ-মনের সকল তার তার মুক্ত।

মনে মনে ভাবছে সে, যেমন ক'রে হোক প্রতিদিন একবার আসতে হবে এইখানে, এসে মুক্তি-স্নান ক'রে প্রতিদিন নতুন মানুষ হয়ে ফিরতে হবে। দিনের গ্লানি সন্ধ্যায় ধুয়ে-মুছে পবিত্র হতে হবে।···

হঠাৎ কার স্পর্শে চন্দ্রনাথ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

ফাল্গুনের রাত

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

শীতের তীব্রতা শেষে নীলাকাশ বজ্র-সুকঠিন
সূর্য্য জ্বলে আবার প্রখর :
পাতা ঝরে অবিরাম, ফের আসে ফাল্গুনের দিন,
অনেক জড়তা ভেঙে পাখীদের কণ্ঠে নানা স্বর !

দুরন্ত হাওয়ার ঢেউ দূর হ'তে আসে,
চ্যুত-বৃন্তে ঝরা পাতা-স্তূপে আর ঘাসে :
বাতায়ন-পথে ঢোকে ঘরে,
ছোঁওয়া লাগে পাণ্ডু ওষ্ঠাধরে।
তখন বিস্ময়াপন্ন স্তব্ধ রাত্রিকালে
চেয়ে দেখি দূর নীলিমায়
মেঘে-মেঘে ঝলমলে অন্ধকারে তারা দেখা যায়,
কী স্তব্ধতা দেবদারু পাতার আড়ালে।

সমস্ত সংসার ভুলে হৃদয়ের গভীর প্রদেশে
থেকে থেকে বাজে এক সুর :
সে-সুরের অন্ত নেই সে-রাগিণী সব পর্ব্ব-শেষে
দুরন্ত হাওয়ার ঢেউ তুলে
দেয় হানা মর্ম্ম-মূলে,—
হিম স্পর্শে দু'টি চোখ হয় তন্দ্রাতুর।

দিনের তিক্ততা ক্ষোভ গ্লানি সবি ভুলে
নিজেকে নিমগ্ন রাখি ফাল্গুনের রাতে :
যে-ফাল্গুন দূর হ'তে আসে
দুরন্ত হাওয়ার ঢেউ তুলে,—
যে-ফাল্গুন সৃষ্টি করে অপূর্ব্ব রাগিণী
জরাতুর জীবনের গূঢ় মর্ম্মমূলে।

আনন্দের বিরহের বিচ্ছেদের স্মৃতিজরাতুর
দুর্গম বিচিত্র পথে যে-মন হ'য়েছে সর্ব্বজয়ী
সে-মন কি ফের জেগে ওঠে?
মনের গহনে কি অকস্মাৎ ফুল কিছু ফোটে?
অনেক রক্তের ঢেউ দীর্ণ বিশ্বময় ;
ভাঙে ঘর, ছিন্ন-ভিন্ন হয়
পাখীদের মতো ছোট নীড়, পাখীদের মতন প্রণয়।
ফাল্গুনের বাতাসেও দেখি নত্ত রক্তের স্বাক্ষর
পাতা ঝরে অবিরাম তারি স্তূপে-স্তূপে
যখন হাওয়ার ঢেউ আসে
চ্যুত-বৃন্তে মাঠে আর বর্ণহীন ঘাসে,
সচকিত জেগে ওঠে যুগান্তরের ভগ্ন কণ্ঠস্বর।

তবু কেন ফাল্গুনের তারা-ভরা রাতে
যখন হাওয়ার ঢেউ দূর হ'তে আসে
ঝলমলে তারাগুলি জ্বলে দূর রাত্রির আকাশে
সমস্ত দহন-জ্বালা বেমালুম ভুলে
ধরা দেই স্বপনের হাতে।
ফাল্গুন গম্ভীর মুখে হানা দেয় দরজায়,
ভগ্ন স্তূপে, জীবনের অন্ধকার কোণে
সেখানেও হানা দেয় যেইখানে ঊর্ণনাভ
সঙ্গোপনে ঊর্ণাজাল বোনে।
দিনের তিক্ততা ক্ষোভ গ্লানি সবি ভুলে
প্রকৃতি কি ইশারায় ফাল্গুনকে ডাকে হাত তুলে ?
সে-ফাল্গুন সৃষ্টি করে অপূর্ব্ব রাগিণী
অজস্র হাওয়ার ঢেউ তুলে
জরাতুর জীবনের গূঢ় মর্ম্মমূলে ?

স্তম্ভিত-বিস্ময়ে চেয়ে দেখে, এক ভীষণ-দর্শন মানুষ। সে আঙুলের ইসারা ক'রে বলছে— বাবুজি, কি আছে মেহেরবানি ক'রে দিয়ে দাও।

অন্য হাতে তার ছোরা—সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝকঝক ক'রে জ্বলছে।

বিমূঢ় চন্দ্রনাথ যন্ত্রের মতো উচ্চারণ করল, কি আছে? কিছু তো নেই।

কিন্তু দেখা গেল তার কথা ঠিক নয়। পকেটে আড়াইটি টাকা ছিল, গায়ে চাদর ছিল, পাঞ্জাবী ছিল, হাতে ঘড়ি ছিল, চোখে চশমা ছিল, পায়ে এক জোড়া নতুন জুতো ছিল।

মনের বোঝা নেমেছিল—এবারে দেহের বোঝাও নামাতে হ'ল। না নামিয়ে উপায় ছিল না।···

ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে—খালি পায়ে—চন্দ্রনাথ রিক্শায় ক'রে ময়দান থেকে শ্যামবাজার ফিরছে। যেন শ্মশান থেকে ফিরছে।

মুক্তি?···কে জানে তা কোথায় মেলে!···

মানবতা-ধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ

ক্ষিতিমোহন সেন

ধর্ম কি, তাহা আমরা সকলেই কিছু কিছু বুঝি, অথচ ধর্মের যথার্থ পরিচয় কি, তাহা বুঝাইয়া বলিতে কেহই ঠিক পারি না। মোটের উপর এইটুকু প্রায় সকলেই জানি যে ধর্ম হ'ল শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করা, তদনুসারে জীবন যাপন করা এবং তদনুকূল কর্ম সাধন করা। তাই শুনিতে পাই, "তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই হইল তাঁহার উপাসনা।"

"তিনি" এবং "তাঁহার" এই সব সর্বনামে যখন আমরা পূজনীয়কে নির্দেশ করি তখন কোনো বিপদ নাই। সর্বনাম ছাড়িয়া যখন তাঁর নাম করিতে যাই তখনই সর্বনাশ উপস্থিত হয়। নাম করিতে গিয়াই শুধু নামের ভেদবিভেদ বশতঃ পৃথিবীতে যুগে যুগে কত দারুণ রক্তারক্তি ঘটিয়াছে। এই কারণেই বিচক্ষণেরা পারতপক্ষে তাঁহাকে সর্বনাম হইতে বিশেষ-নাম লোকে আনিতে চাহেন নাই। উদ্দালক আরুণি আপন পুত্র শ্বেতকেতুকে তাই বলিলেন, তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা, তুমিও তিনি, "তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতু" (ছান্দোগ্য, ৬,৮,৭)। বৃহদারণ্যকে দেখা যায় আমিই তিনি, "সোঽহমস্মি" (১,৪,১)। অর্থাৎ ঋষিরাও চাহেন "তিনি তুমি আমির" দ্বারা কাজ সারিতে। গীতাঞ্জলির মধ্যেও ভগবানকে সর্বদাই "তুমি" বা "তিনি" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাই গীতাঞ্জলি সকল জগতে সব ধর্মে সমান ভাবে চলিতে পারে। নাম নিতে গেলেই বহু ক্ষেত্রে তাহা অচল হইত।

এখন এই "তিনি" কি দূরে না আমাদেরই মধ্যে? এই "তিনিকে" লইয়া যাঁহাদের ব্যবসা চালাইতে হইবে তাঁহারা চাহেন "তাঁহাকে" সকলের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে। অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের সহায়তা বিনা যেন তাঁহার কাছে না যাওয়া যায়। ব্যবসায়ী পাণ্ডারা তাই দেবতাকে চাহেন মন্দিরের মধ্যে অন্ধকারে লুকাইয়া রাখিতে। তাঁহারা দয়া করিয়া দ্বার না খুলিলে, দীপ না দেখাইলে দেবতার দর্শন যেন না মেলে। তাঁহাদের উপমা হইল, রাজা থাকেন বহু দূরে, রাজার কাছে যাইতে হইলে যেমন দ্বারবান্ প্রহরী প্রভৃতি রাজপুরুষদের শরণ লইতে হয়, দেবতার কাছে যাইতে হইলেও তেমনি পথের প্রহরীদের সহায়তা-চাই। কিন্তু যেখানে রাজা আমাদেরই মধ্যে অর্থাৎ যেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, যেখানে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে" সেখানে তো এই উপমা চলে না। রাজায় প্রজায় ব্যবধান ঘুচিলে যাহাদের অন্ন মারা যায় তাহারা চিরদিনই সেই ব্যবধান রক্ষা করিতে চাহিবেই।

প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে দূরত্ব থাকিলেই পত্রাপত্রী চলে। তাই ডাক বিভাগের স্বার্থ হইল এই দূরত্ব চিরদিনই বজায় রাখা। এই দূরত্ব দূর করিতে যাওয়াই হইল তাহাদের পক্ষে স্বার্থঘাত অর্থাৎ কালিদাসের মত যে শাখায় আশ্রয় সেই শাখারই ছেদন। প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যবর্ত্তী "দূতিকা"দের চিরদিনই এই দুর্গতি। ইহা দেখিয়া প্রাচীন কবি বলিয়াছিলেন কার্য্যসিদ্ধি হইলেই দূতিকাদের সর্বনাশ। প্রেমিক-প্রেমিকাদের পরিচয়ের জন্যই দূতিকা অথচ তাহাদের পরিচয়টি ঘটিলেই দূতিকার আর স্থান নাই, "কার্য্যান্তে তে ন শম্পবৎ!"

পুরোহিতেরা যাগ-যজ্ঞে দূরস্থিত দেবতাদের আহ্বান করিতেন। উপনিষৎ বলিলেন, "সেই দেবতা দূরে নাই, তিনি আমাদেরই মধ্যে।" পুরোহিতের দল কি এই কথায় খুসি হইতে পারেন? ইহুদীদের পুরোহিতেরা দেবতাকে রাখিয়াছিলেন মন্দিরে লুকাইয়া। ভক্তশ্রেষ্ঠ ঈশা আসিয়া বলিলেন, "তিনি আমাদের পিতা অর্থাৎ ঘরের লোক।" "পিতা" বলিতেই তিনি মানবের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। এই অপরাধে পুরোহিতের দল যিশু খৃষ্টের প্রাণ লইয়া ছাড়িল। এই গুণ্ডামিটুকু না করিলে পাণ্ডামি যে চলিতেই পারে না, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন যে কোনো তীর্থে গেলে। তীর্থরাজ কাশী আমার জন্মভূমি, আমি চিরকালই ইহা দেখিয়াছি।

যিশু খৃষ্ট ভগবানকে পিতা বলিলে কি হয়, ক্রমে এই ধর্মেও রীতিমত পাণ্ডা-পুরোহিতের দল সৃষ্ট হইল, ভগবানকে ক্রমে চার্চে ও শাস্ত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। মধ্যযুগে যখন এই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে লোকেরা লাগিলেন, তখন সারা য়ুরোপে রক্তের গঙ্গা বহিল। ক্রমে চিন্তাশীল লোকেরা ধর্মের উপর এত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন যে তাঁহারা বলিলেন, "ভগবান প্রভৃতি সবই ঝুটা জিনিষ। এই সব আবর্জনা ঝাঁটাইয়া বাহির কর।" ভগবানের নামে এই সব অনাচারের উপর রাগ করিতে গিয়া তাঁহারা ধর্মকেই বাদ দিতে বলিলেন। এমন সময় গত শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের বার্ত্তা য়ুরোপে পৌছিল। তাঁহারা শুনিলেন এমন ধর্মও না কি আছে যাহাতে ভগবান না থাকিলেও চলে। তাহাতে য়ুরোপে অনেক মনীষী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বৌদ্ধধর্মে মানুষই হইল চরম যা।

ভারতবর্ষে যত ধর্ম ও সংস্কৃতি আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে এমন আর কোনো দেশে নয়। গঙ্গা ও যমুনার ধারার মত এখানে আর্য্য ও অনার্য্য সাধনা চিরদিন পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছে, অথচ কেহ কাহাকেও নিঃশেষ করে নাই। আর্য্যদের দেবতা হইলেন ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ ইত্যাদি। তাঁহারা থাকেন স্বর্গে। তাই স্বর্গই তাঁহাদের কাম্য। অনার্য্যদের ধর্ম যে সব দেব-দেবীদের লইয়া, তাঁহাদের সঙ্গে পৃথিবীর সম্বন্ধই বেশি। এই উভয় ধর্মের মিলনে ক্রমে লোকের দৃষ্টি খুলিতে লাগিল। ক্রমে লোকে বুঝিতে লাগিলেন এই পৃথিবীর মহত্ত্ব স্বর্গ হইতে কম নহে। মানুষের স্থান দেবতার চেয়ে হীন নয়।

জৈনদের ধর্ম অতি প্রাচীন। কেহ কেহ বলেন, জৈনদের ধর্মের আদিকাল বেদেরও পূর্ববর্ত্তী। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই কথাই বলেন (প্রবাসী, ১৩৩৭, আশ্বিন, ৮১১ পৃঃ)। জৈনেরা দেবতার স্থানে বসাইলেন চতুর্বিংশতি জন তীর্থঙ্করকে। তীর্থঙ্করেরা সবাই মানুষ। বুদ্ধদেবও দেবদেবীর উপাসনার স্থলে মানুষের সেবা ও মৈত্রীকেই পরম ধর্ম বলিয়া প্রচার করিলেন। কাজেই মানুষ আর তুচ্ছ রহিল না। এই সব মতবাদ বহু যুগ মানুষের মুখে মুখে চলেছিল। জৈন ও বৌদ্ধধর্মে তাহা প্রচারিত হইল। বেদের মধ্যেও ক্রমে এই সব মতবাদের প্রভাব পৌছিতে লাগিল। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে (দশম মণ্ডল, ৯০) দেখা যায়, "পুরুষ এবেদং সর্বং," মানুষ বা পুরুষই সব। অথর্ব বেদের মহীসূক্তে স্বর্গের স্থানে পৃথিবীরই মহিমা-গান। অথর্বের নৃ-সূক্তে অপূর্ব ভাষায় মানুষেরই জয়গান। ব্রাত্য-সূক্তে ধর্মকর্মহীন আচারহীন সহজ মানুষের মহিমাটি প্রত্যক্ষ দেখান হইয়াছে।

উপনিষদের মধ্যেও দেখি, ছান্দোগ্য বলিলেন, গায়ত্রী প্রভৃতি সব কিছু হইতে মহিমময় পুরুষই মহত্তর, "তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ" (ছান্দোগ্য, ৩, ১২, ৬)। যাগযজ্ঞ সবই এই পুরুষ, "পুরুষো বাব যজ্ঞঃ" (ঐ, ৩, ১৬, ১)। এই মানব

আপন জ্যোতিতে আপনি দীপ্যমান. "অয়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি" (বৃহদারণ্যক, ৪, ৩, ৯)। এই পুরুষ তেজোময় অমৃতময়, "তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ" (ঐ, ২, ৫, ১) এই কথা বৃহদারণ্যক ২৮ বার পুনরুক্তি করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর বলিলেন, যিনি সমস্ত প্রাণের প্রবর্ত্তক, তিনি মহান্ প্রভু, তিনি পুরুষ "মহান প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ" (৩,১২)। তাই অথর্বের ঋষি বলিয়াছিলেন, যিনি পুরুষের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিয়াছেন তিনিই তাঁহাকে আপন পরমস্থানে বিরাজমান দেখিয়াছেন, "যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম" (অথর্ব, ১০, ৭, ১৭)। তাই কঠ উপনিষৎ বলিলেন, মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। তাহাই চরম এবং তাহাই পরা গতি (কঠ-উপ, ৩, ১১)

"মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥"

ঋষি পিপ্পলাদ তাই সুকেশা ভারদ্বাজকে বলিলেন, সেই পুরুষই জানিবার যোগ্য, তাঁহাকে জান, তবেই মৃত্যু তোমাকে ক্লিষ্ট করিতে পারিবে না (প্রশ্ন উপ, ৬, ৬) "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা কে মৃত্যুঃ পরি ব্যথাঃ। এই মহান আদিত্যবর্ণ পুরুষ সকল তমের অতীত। ইঁহাকে জানিয়া ঋষি আনন্দে ঘোষণা করিলেন, এই মহান পুরুষকে জানিয়াছি। ইঁহাকে জানিয়াই লোক মৃত্যুকে অতিক্রম করে, এই ছাড়া অন্য কোনো পথ আর নাই (শ্বেতাশ্বতর, উপ, ৩, ৮)

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

পূর্বে মানুষ চাহিত দেবতা হইতে, কিন্তু পরে দেখি দেবতাকেই হইতে হইল মানুষ। বিষ্ণু মানুষের রূপে অবতার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। বৈকুণ্ঠের বিষ্ণুকে কয় জন বা জানে কিন্তু অযোধ্যায় রাম ও বৃন্দাবনের কৃষ্ণ এই দেশের ভক্তদের হৃদয় জুড়িয়া সমাসীন।

বৌদ্ধ দোহায় দেখি, এই দেহেই সব তীর্থ ও সব ব্রহ্মাণ্ড (দোহাকোষ ১৫, ৪৭)। কাজেই কায়া সাধনাই হইল সর্ব সাধনার সার (ঐ ১০, ৯) মানবের অন্তরের মধ্যেই পরম বিশ্রাম (ঐ ১২, ২৫)। দেহের মধ্যেই সকল তত্ত্ব (ঐ, ১৭, ৬২) দেহের মধ্যেই দেহাতীতের প্রেমলীলা প্রচ্ছন্ন ভাবে চলিয়াছে (ঐ, ২১ ৮১)। এই সব কথাই মধ্যযুগে কবীর নূতন করিয়া আবার প্রচার করেন। এই দোহাকোষ গ্রন্থখানি প্রবোধ বাগচি মহাশয় সম্পাদন করিয়াছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয় ও চর্য্যাপদে এই সব কথাই পাওয়া যায়।

ইহার পর দেখি ভাগবতদের যুগ। এখনকার দিনের তরুণেরা প্রাচীন সব মিথ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে চাহেন। তখনকার দিনের তরুণ শ্রীকৃষ্ণও কিছু কম করেন নাই। নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধের দল যখন ইন্দ্রের পূজার আয়োজনে ব্যস্ত, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "এ সব কি ?" নন্দ বলিলেন, "ইন্দ্রপূজার আয়োজন। ইন্দ্রই জলদাতা, জল বিনা প্রাণ বাঁচে না।" (ভাগবত, ১০, ২৪, ৮)। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "এই সব মেঘ বৃষ্টি জল প্রভৃতি তো হয় প্রকৃতির কর্ম অনুসারে। ঈশ্বর বলিয়া যদি কেহ থাকেন ("অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ") তবে তিনিও প্রকৃতির ও কর্মের বিরুদ্ধতা করিতে পারেন না (ভাগবত, ১০, ২৪, ১৪)। মেঘ ও বারিবর্ষণ এ সব প্রকৃতিরই কাজ, মহেন্দ্র তাহাতে কি করিতে পারেন ? (মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি, ভাগবত ১০, ২৪, ২৩)। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ তখনকার দিনে ইন্দ্রাদি দেবতাকে সরাইয়া কর্ম ও মানুষেরই জয়গান করিলেন, আজ তিনি এই সব কথা প্রচার করিতে গেলে এখনকার দিনের দেশের সব বৃদ্ধের দল তাঁহাকে কি বলিয়া আপ্যায়ন করিতেন তাহা না বলাই ভাল। তাঁহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক মতামতও এখনকার দিনেও অতি-আধুনিক মনে হইত। ভাগবত বলিলেন, কিরাত হূণ অন্ধ্র পুলিন্দ পুক্কস সবাই ধর্মের সমান অধিকারী (২,৪,৮)। ধর্মে কাহাকেও বঞ্চনা করা অন্যায়। অন্ন-পানীয়ের অধিকারও সবারই সমান (৭,১১,১০)। পেট ভরিয়া অন্ন সকলেরই প্রাপ্য। তার বেশি যে অধিকার করে সে অন্যকে বঞ্চনা করে, সে চোর, অতএব দণ্ডনীয় (৭,১৪,৮)। এই সব কথা এখন রাশিয়াতে শুনা যায়, অন্যত্রও শুনি তাহার প্রতিধ্বনি।

ভাগবতেরা দেবতাকেও মানুষরূপে অবতীর্ণ করাইয়া ছাড়িলেন। ব্রজভূমির কাছে বৈকুণ্ঠ হইল নিষ্প্রভ। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের কাছে বিষ্ণুর ঐশ্বর্য্য হইয়া গেল মলিন। গৌরীকে লইয়া মহাদেবও রীতিমত সংসারী সাজিলেন। গৌরী বাপের বাড়ী যখন যাইতে চাহেন তখন মহাদেব হ'ন দুঃখিত। কোনো মতে তিনটি দিনের পর কার্ত্তিক গণেশ সহ পার্বতী ঘরে ফিরিলেই মহাদেব সুখী হ'ন। এই মানবভাবের দেবতাই মানবের হৃদয় অধিকার করিলেন।

যোগী ও নাথপন্থীদেরও তো সবই মানুষকে লইয়া। শুধু তাঁহাদের নয় তাঁহাদের ব্রহ্মাণ্ডও মানুষেরই মধ্যে। যা আছে ভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে। তন্ত্রের মধ্যেও সাধনা মানব-দেহকে আশ্রয় করিয়াই। গঙ্গা যমুনা পৃথিবী আকাশ সবই মানব-দেহের নাড়ীতে ও চক্রে বিরাজিত। মানব-দেহের মধ্যে সাধনা করিলেই বিশ্বসাধনা সম্পূর্ণ হয়। বৈষ্ণবেরা মানব প্রেমের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি ভাবের জোরেই দেবতাকে পাইতে চাহেন। সেই দেবতাও মানবরূপেই অবতীর্ণ। শৈব ভক্ত বসবত (১১০০ খৃঃ) মানব-দেহকেই দেবতার মন্দির বলিলেন। তাই প্রত্যেক মানব দেবতার জঙ্গমস্বরূপ। ইহাই জঙ্গম ধর্মের মূল কথা !

জৈনদের মধ্যে শেষের দিকে যে সব মতবাদ গড়িয়া উঠিল, তাহার সঙ্গে পরবর্ত্তী কবীর প্রভৃতির বাণীর হুবহু মিল দেখা যায়। খৃষ্টীয় হাজার অব্দের কাছাকাছি মুনি রাম সিংহ তাঁহার পাঁহুড় দোহা রচনা করেন ! পাহুড় দোহা বলেন, "শিব তো তোরই ভিতরে, তবু তার পাইলি না সন্ধান" (দোহা ১১৯) ! "এই মানব-দেহের মধ্যেই দেবতার মিলিবে সন্ধান" (দো) ৮০) "এই সাড়ে তিন হাত দেহের অসীম মহিমা, ইহাই যে নিরঞ্জনের মন্দির" (দো ৯৪)। "মানবের মধ্যে বিরাজিত শিব আর তাঁহাকে কি না খুজিয়া মরে সকলে বাহিরে" (দো, ১৮৩)। এই সবই হইল কবীরের প্রায় চার-পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা।

মুসলমানেরা যখন এ দেশে আসিলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের সাধনার বড় বড় তত্ত্ব এ দেশে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ দেশের সাধকেরাও ভারতীয় সাধনার গভীর সব তত্ত্ব সকলের কাছে ধরিলেন ! চতুর্দশ শতাব্দীর পরেই আমাদের দেশে এইরূপ বহু ভক্তের উদয় হয়। সেই যুগে সকলের আগে আসিলেন গুরু রামানন্দ। কবীর রবিদাস প্রভৃতি সবারই গুরু রামানন্দ। রামানন্দ ছিলেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু তিনি সকলকেই ভক্তির ও সাধনার উপদেশ

দিলেন। তিনি বলিলেন মন্দিরের মধ্যে দেবতা নাই, দেবতা আছেন মানবেরই মধ্যে। তাই তাঁর গানে দেখা যায়—"কোথায় যাও সাধক, দেখ তোমার আপন দেহ-ঘরেই লাগিয়াছে প্রেমের রঙ্গ" (কত পাই ঐ রে ঘর লাগু রংগু, গ্রন্থসাহেব, বসন্ত রাগ)। রামানন্দ গাহিলেন, "মন ব্যাকুল হইল চলিলাম মন্দিরের দিকে। গুরু বলিলেন, সেথায় পাইবে কি? সেখানে শুধু জল ও পাষাণ। সেই ব্রহ্ম আছেন তোমারই হৃদয়ের মধ্যে।"

> এক দিবস মন ভই উমংগ।
> পূজন চালী ব্রহম ঠাই।
> সো ব্রহম বতাইও গুর মনহী মাহি॥
> জহা জাইঐ তহঁ জল পখানা। (ঐ)

রামানন্দের প্রধান শিষ্য কবীর। মধ্যযুগে এই মানবধর্মের জয়গান যাঁহার কণ্ঠে অতুলনীয় গৌরবে ধ্বনিত হইল, তিনি ভক্ত-শ্রেষ্ঠ কবীর। কবীর বলিলেন—

"এ মানব-দেহেই প্রেমের হইল প্রকাশ, অনন্ত যোগ এখন উঠিল জাগিয়া" (কবীর, নাগরী প্রচারিণী সংস্করণ, পরচা অঙ্গ, ১৪) "যাঁহাকে বেড়াইতেছিলাম খুঁজিয়া তিনি আসিয়া মানবের মধ্যে আমার সম্মুখে দেখা দিলেন" (ঐ, ৩৬)। "আমার মধ্যেই তিনি আপন হইয়া মিলিয়া গেলেন" (ঐ, ৩৭)। "দেহের মধ্যে কমল বিকশিত হইল, নির্মল জ্যোতি উদ্ভাসিত হইল, রাত্রির অবসান হইল, অসীমের বাদ্য বাজিয়া উঠিল" (ঐ. ৪৩)। মানবের নানা রূপের মধ্যে নানা লীলাতে সেই লীলাময়ই বিরাজমান" (পীং পিছানন অঙ্গ, ১)। "এই মানবদেহেই যে তাঁর বাস সেই খবর কি কেহ রাখ?" (কস্তু রিয়া মৃগ অংগ, ৩)

একবার কবীরকে যখন আত্মপরিচয় জিজ্ঞাসা-প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হইল—"কোথা হইতে তুমি আসিলে, তোমার ধাম কোথায়? তোমার জাতি কি? তোমার প্রভুর নাম কি?" তখন কবীর উত্তর করিলেন, "আমি মানব, অমর লোক হইতে আমি আগত, আনন্দ-সাগর আমার ধাম, অজাতি আমার জাতি, অলখ আমার প্রভুর নাম। আত্মা আমার জাতি, প্রাণ আমার নাম, আমার দেবতার নাম অলখ, অসীম আকাশ আমার গ্রাম" (কবীর সাহিতকা সাখীগ্রন্থ, প্রশ্নোত্তর অঙ্গ ৩২—৩৫)। কবীরকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমার এই সাধনা কত দিনের? তিনি উত্তর করিলেন, "মানবের মহিমা অনন্ত কালের, ব্রহ্মা যখন তাঁহার সৃষ্টি-কর্তার মুকুট শিরে ধরেন নাই, বিষ্ণু যখন তাঁহার রাজটীকাও পান নাই, শিব-শক্তির যখন জন্মও হয় নাই, তখনই আমি এই যোগ জানিয়াছি"—

> ব্রহ্মা নহিঁ জব টোপী দীন্হা বিষ্ণু নহীঁ জব টীকা।
> শিবশক্তি জব জন্মো নাহিঁ তবহী জোগ হম সীখা।
> (মৎসম্পাদিত কবীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৮)

কবীর বলিলেন "ভগবানকে দূরে রাখিয়া দূরত্বকেই সকলে করিল সম্মানিত।" (ঐ, ৩, ৬৪) আপন আপন মান বাড়াইতে চাহে বলিয়া বাহিরের যত মিথ্যাকে সত্য বলিয়া লোকে মানাইতে চায় (ঐ, ২, ৫)। কবীর বলেন, "আমাকে কোথায় বৃথা অন্বেষণ কর, আমি তো তোমার পাশেই আছি"—

> মো কো কহাঁ ঢুঁঢো বন্দে মৈঁ তো তেরে পাস মেঁ।

(ঐ, ১ম, ১৩) "ভ্রান্তকে যে জন ঘরে ফিরাইয়া আনে, তাহাকেই আমি ভালবাসি।"

> অবধূ ভূ কে কো ঘর লাবে।
> সো জন হম কো ভাবে॥ (ঐ ১, ৬৫)

"এই দেহ-ঘটেই চন্দ্র এই ঘটেই সূর্য্য, এই দেহের মধ্যেই বাজে অসীমের বাদ্য।"

> যহী ঘট চন্দা যহী ঘট সুর।
> যহী ঘট গাজৈ অনহদ তুর॥ (ঐ, ১, ৮৩)

এই ঘটেই সপ্ত সমুদ্র, এই ঘটেই সব নদ-নদী (ঐ, ১, ৮৫)
সপ্ত সমুদ্র নব লক্ষ তারা সবই বিরাজিত এই ঘটে (ঐ, ১, ১০২)
ব্রহ্মাণ্ডের সব লীলা দেখিলাম এই দেহেরই মধ্যে।

> খেল ব্রহ্মাণ্ডকা পিণ্ডমেঁ দেখিয়া (ঐ, ২, ৬৬)

তোমার আপাদমস্তকে স্বামী বিরাজমান, তাঁহাকে কেন বৃথা বল দূরে?

> যো সিখ সাহব হৈ ভরপূরা।
> সো সাহব ক্যোঁ কহিয়ে দূরা॥ (ঐ, ২, ৭৮)

এই কায়া-নগরেই চলিয়াছে তাঁর হোরী খেলা।

> কায়া-নগর মঁঝার সবঈ খেলৈ হোরী (ঐ, ২, ১১)

"এই মানব-দেহের মধ্যেই চলিয়াছে অনন্তের লুট, এই মানব-দেহের রহস্য কে পায়?"

> অনন্ত লুট হোত ঘট ভীতর ঘটকা মর্ম ন পায়া (ঐ, ৪,৫১)

প্রত্যেক মানবের মধ্যে জ্বলিতেছে সেই ব্রহ্মদীপ, দেখিতে পায় না সব অন্ধের দল।"

> ঘর ঘর দীপক বরৈ লখৈ নহিঁ অংধ হৈ॥ (ঐ, ২, ৩৩)

"পরদা সরাইয়া মানবের মধ্যে তাঁহার দর্শন লও দেখিয়া।" (কবীর সাহেব সাখীগ্রন্থ, গুরুকারথ অংগ, ৬০)।

"কোথাও তাঁহার বেশি-কম নাই, প্রেমেতে তিনি সব পূর্ণ করিয়া বিরাজমান!"

> ঘট বঢ় কহুঁন দেখিয়ে প্রেম সকল ভরপুর। (ঐ, ব্যাপক অংগ, ২০)

এই মানব-দেহ ছাড়া কোথাও তাঁহাকে পাইবে না।

> ঘট ধেন কহুঁ ন দেখিয়ে। (ঐ, ব্যাপক, ৪৮)

কবীরের পরে আসিলেন দাদূ (১৫৪৪)। দাদূ বলিলেন, "সকল শরীর ব্যাপিয়া তিনিই বিরাজমান" (পরচা অংগ, ১০)। "তিনিই আমাদের মধ্যে সব পূর্ণ করিয়া বিরাজমান, তাঁহাকে দূরে মনে করা ভুল।" (ঐ, পরচা, ৭৮)। দীন হীন নীচ পাপী সকলেরই মধ্যে পরব্রহ্ম সমভাবে দীপ্যমান (১৩, ১২৪)।

দাদূর শিষ্য রজ্জবজী বলিলেন, দেবতা মানুষেরই মধ্যে। দেবালয়ে দেবতা নাই।

> "দেবল মেঁ দেবল পেখ্যা"।

"সমস্ত জগৎ বৃথা খুঁজিয়া দেখিলাম প্রভু আমার পাশেই বিরাজমান। মানুষই সেই তীর্থশ্রেষ্ঠ। তার মধ্যেই জগদীশ্বর—"

সবহী জগৎ শোধি করি দেখ্যা পাসহী হজুর।
মানখ হৈ সো তীর্থমণি মানখ মেঁ জগদেব।

"এই মানব-দেবালয়েই দেব বিরাজিত, এখানেই বিশ্বনাথ"—

যহি দেবল মেঁ দেব, বিরাজে যহিঁ তো বিশ্বনাথ॥

বাংলা দেশের বাউলরাও তো মানুষতত্ত্ব লইয়াই সাধনা করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের পদ—

"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" ইহাই তো বাউলদের মূলমন্ত্র।

বাউল হইয়া সাধক খুঁজিয়াছে তাহার মনের মানুষকে।

আমার মনের মানুষ যে রে
আমি কোথায় পাব তাঁরে॥

তাঁদের কাছে প্রত্যেক মানবই অবতার।

জীবে জীবে চায়া দেখি সবি যে তাঁর অবতার।

সেই মানুষকে ধরিতে হইলে সহজ হইতে হয়।

যদি ভেটবি সে মানুষে
সাধনে সহজ হবি তোরে যাইতে হবে সহজ দেশে।

এই মানুষের মধ্যেই আদ্য অন্ত সব সাধনা। আর কোথাও নাই।

আদ্য অন্ত এই মানুষে বাইরে কোথাও নাই।
ধ্যান জ্ঞান প্রেম যোগানন্দ, মানুষ নইলে কেবল ধন্ধ
সিদ্ধি সাধন রস আনন্দ, মানুষ ছাড়া কিছুই নাই।

মানব-তত্ত্বের যে সাধনা যুগের পর যুগ আমাদের দেশে চলিয়াছিল, তাহার পরিপূর্ণতা হইল এই যুগে রবীন্দ্রনাথের বাণীতে। তাঁহার বাণী আগাগোড়াই এই মানব-ভাবে ভরপূর। তাঁহার "ভাষা ও ছন্দ", "স্বর্গ হইতে বিদায়" প্রভৃতি কবিতায় এই ভাবই ভরপূর। "কহিল গভীর রাত্রে সংসার-বিরাগী" প্রভৃতি কবিতায়ও সেই একই কথা।

ভারতের দার্শনিকদের সভায় সভাপতিরূপে তিনি বাউলদের বাণী দিয়া এই কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য ১৩৩২ সালের মাঘের প্রবাসীতে আছে (৫৪২ পৃঃ)। "মানবধর্ম" গ্রন্থে তিনি এই মানব-তত্ত্বই বলিয়াছেন। অকসফোর্ডে হিবার্ট লেকচার দিতে গিয়া তিনি এই কথাই বলিলেন। তাঁহার Religion of Man সেই কথা লইয়া রচিত।

গীতাঞ্জলিতে তিনি বলিলেন,—

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আচারো। (১৪ নং)

তীর্থে বা মন্দিরে ভগবানের দেখা মিলিবে না। তাঁকে পাইতে হইলে যাইতে হইবে দীনের চেয়ে দীনের মধ্যে।

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে।
সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে। (১০৭ নং)

তাই তিনি সাধককে বৃথা দেবালয়ে না খুঁজিয়া দুঃখী তাপী শ্রমশ্রান্তদের মধ্যে ভগবানকে খুঁজিতে বলিলেন।

রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে?
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।
তিনি গেছেন যেথা মাটি ভেঙ্গে করছে চাষা চাষ।
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ খাটছে বার মাস।
(ঐ, ১১১ নং)

"মানবমন্দির-প্রতিষ্ঠিত সেই দেবতাকে ভারতে আমরা অপমান করিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের দুর্গতি ও অপমানের আর অন্ত নাই" (গীতাঞ্জলি ১০৮)

ভারতের পুণ্য মহামানব-তীর্থে সেই নরদেবতাকে প্রণাম না করিলে এই দুঃখ দুর্গতির অবসান হইবে কেমন করিয়া?

হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু'বাহু বাড়ায়ে নমি নর-দেবতারে
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
(গীতাঞ্জলি, ১০৬ নং)

যত দিনে ভারতের মহামানব পুণ্যতীর্থে আমাদের সেই প্রণতি সত্য না হয়, তত দিন আমাদের কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। মানবধর্ম সাধনাই ভারতের সাধনা। তাহাতেই তাহার গতি ও মুক্তি।

ভারতের এই মহাপুণ্যতীর্থে সর্বমানবের মহামিলনমন্দিরে এই নরদেবতাকে পরম প্রণতি জানাইবার জন্যই এই যুগে আমাদের মত অযোগ্যদের মধ্যেও সাধকশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চিরদিনই তিনি মানবকে দেবতারূপে এবং দেবতাকে মানবরূপে দেখিবার সাধনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সাধনাই তাঁহার কথায়, সাহিত্যে, কবিতায়, গানে বার বার নানা ভাবে দীপমান হইয়া উঠিয়াছে। এই পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার সময়ও তাঁহার জীবনে এই সাধনই চলিতেছিল। ভারতের সর্বমানবের মিলনের মহাতীর্থে আসিয়াও যদি আমরা সেই নরদেবতাকে যথার্থ ভাবে প্রণতি না দিতে পারি, তবে আমাদের আর দুঃখ-দুর্গতির অন্ত নাই। তাহা হইলে আমাদের এই দুঃখ-কষ্ট-দুর্গতির আর কিছুতেই অবসান ঘটিবে না। তবে চিরদিন আমাদের দুঃখের পর দুঃখ কষ্টের পর কষ্ট দুর্গতির পর দুর্গতিই চলিবে।

"দৌর্ভিক্ষাদ্ যাতি দৌর্ভিক্ষং কষ্ট

বন্দে মাতরম্ —রবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পথ —জয়ন্তকুমার চৌধুরী

(দ্বিতীয় পুরস্কার)

পথ

—পরিমল গোস্বামী

নিয়মাবলী

প্রত্যেক মাসে প্রতিযোগিতায় কেবল সৌখীন (এ্যামেচার) আলোকচিত্র-শিল্পীদের ছবি গৃহীত হইবে।

ছবির আকার ৮" × ৮" ইঞ্চি হইলেই আমাদের সুবিধা হয় এবং যত দূর সম্ভব ছবি সম্বন্ধে বিবরণ থাকাও বাঞ্ছনীয়। যথা, ক্যামেরা, ফিল্ম, এক্সপোজার, এ্যাপারচার, সময় ইত্যাদি।

যে কোন বিষয়ের ছবি লওয়া হইবে। অমনোনীত ছবি ফেরৎ লওয়ার জন্য উপযুক্ত ডাক-টিকিট সঙ্গে দেওয়া চাই। ছবি হারাইলে বা নষ্ট হইলে আমাদের দায়ী করা চলিবে না, সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। খামের উপর "আলোক-চিত্র" বিভাগের এবং ছবির পিছনে নাম ও ঠিকানার উল্লেখ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

প্রথম পুরস্কার দশ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার আট টাকা, তৃতীয় পুরস্কার পাঁচ টাকা এবং অন্যান্য বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হইবে।

গান্ধী—বা—রবীন্দ্রনাথ

—গৌরাঙ্গ মুখোপাধ্যায়

উড়িষ্যায় রবীন্দ্রনাথ —মনোবীণা রায়

শাখা-প্রশাখা

—সত্যেন দে

(তৃতীয় পুরস্কার

বার্ত্তাপ্রবাহ

—বিভূতিভূষণ দাস

চিন্তা প্রবাহ —কানন দেবী

বিশেষ পুরস্কার।

বিজয়লক্ষ্মী

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

এমন কেস এ হাসপাতালে নোতুন নয়, তবুও যথারীতি কাজ করে যেতে হয়। একটা বুলেট মেয়েটি'র 'লাংস' এফোঁড় ওফোঁড় করে বার হয়ে গেছে, এবং সেইখানেই মারা গেছে, এনেছে আর এক জন বুড়োকে—তখন হতেই অজ্ঞান হয়ে গেছে, নার্ভাস 'ব্রেক ডাউন'; মেয়েটির বাবা; বয়স হয়েছে, সুতরাং এ যাত্রা বাঁচবে কি না বলা শক্ত, যদিও বাঁচে হয়ত বা পাগলই হয়ে যাবে।

হোক। ও সব ডাক্তারদের মনে কোন দাগ কাটতে পারে না। তবুও মনটা ক্ষণিকের জন্যও কেমন করে ওঠে! রাত্রি অনেক হয়েছে—পাহাড়ের বুক হতে পাতা-ঝরা বাতাস কুড়িয়ে আনে আগত বসন্ত দিনের মহুয়া ফুলের ভারি সুবাস! বাইরে চলেছে 'ডেসপ্যাচে'র লরীর ক্রুদ্ধ গর্জ্জন, এ-সবের মাঝেও হাসপাতালের কাজে ভুল-চুক হয় না; কৌতূহল হয় ঘটনাটা কোথায় কি ভাবে ঘটল, কিন্তু ও-সব জানবার অধিকার আমাদের নাই! মিলিটারী 'সিক্রেট'! তবুও বুড়োর অচেতন অবস্থায় বিকারের ঘোরে শুনেছিলাম কিছু কিছু।

সারা মন তার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। না—না। কিছুতেই সে এখানে থাকবে না। সহ্য করতে পারে না ওদিকে সে। এ যে তার জন্মগত সংস্কার, ওদিকে কোন দিনই ক্ষমা করতে সে পারবে না। মনের পরতে পরতে গাঁথা আছে, তারই বংশের কোন প্রদীপের জ্যোতির্ম্ময় শিখাকে এরাই নির্ম্মূল করে দিয়েছে। আজও তারা চালিয়েছে তীব্র লোভীর বিষদৃষ্টির অগ্নিজ্বাল।

সবই মনে পড়ে তার। বেশী দিনের কথা নয়, আজও ছোট নাগপুরের পার্ব্বত্য বন্ধুর বনসমাকীর্ণ প্রান্তরে গুমরে ওঠে তারই পূর্ব্বপুরুষ বীরসা মুণ্ডার রক্তাক্ত কাহিনী। যে বাধা দিয়েছিল ওই সাম্রাজ্যবাদের কঠোর শোষণকে—তাদের অবাধ প্রতিপত্তি বিস্তারে। সারা কোল-ভীল-মুণ্ডা-সাঁওতালদের পিতৃভূমি যে এদের কবল হতে বাঁচিয়েছিল। প্রাণ দিতে হয়েছিল বীরসাকে এদেরই ফাঁসি কাঠে; বুড়োর স্তিমিত আঁখিতারার সামনে বীরসার তেজোদৃপ্ত চাহান যেন তিরস্কার করে—সে বিশ্বাসঘাতক, অপদার্থ, নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছে তারই বংশের পুণ্য ব্রতকে, সে ভুলে গেছে তাদের রক্ত-তর্পণের শপথ!

বুড়ো ঘোলাটে চোখ মেলে মাঝে মাঝে কিসের সন্ধান করে! বোধ হয় তার স্বপ্নে দেখা কোন আলো,রাঙ্গা দেশ, বীরসার কল্পিত কোন মধুময় বনরাজ্য! ফুলের মাতাল সুবাস, বাঁশীর সুর, আর ছউ নাচের ছন্দে ভরপুর।

বুড়ো বাঁচেনি! তাকে বাঁচাতে পারিনি। বাঁচতে সে চায়ও নি। তাকে কোন ওষুধ খাওয়ান যায়নি। মাঝে মাঝে অচেতন অবস্থায় চীৎকার করে ওঠে প্রাণপণে।

মরে গিয়েছে কিন্তু তার কথাগুলো ভুলতে পারিনি! আজও মনে পড়ে তার অব্যক্ত ভাষায় অন্তরের মর্ম্মবেদনা, ছোট নাগপুরের বন-মর্ম্মরে আজও শুনি ওই বুড়োর নয়—কোন এক মহাজাতির শৃঙ্খল-মুক্তির ব্যর্থ প্রয়াসের হাহাকার!

সমস্ত বন-পর্ব্বত রাজ্যের কোন স্বপ্ন-দেখা দিনে এসেছিল মাটির সন্তানরা! কোল-মুণ্ডা-সাঁওতাল রাজ্যের শেষ সীমান্তে দাঁড়িয়ে যেন আজ তাদের সব-হারাণর কথাই ব্যাকুল করে তোলে! হরীতকী, বহড়ার কালো পাতার নিশানা—আমলকী গাছের ঝিরি ঝিরি পাতাগুলো শিহরণ তোলে পার্ব্বত্য বাতাসে। খরস্রোতা নদীর জলরেখা সুরধ্বনি তুলে গেয়ে চলে তারই মুক্তিকার জয়-গান! পাহাড়ী পথে ধূলো উড়িয়ে চলে কাঠ-বোঝাই ছোট ছোট বলদে-টানা গাড়ীগুলো দূর চাণ্ডিল ষ্টেশানের দিকে।

লকড়াপাহাড়ীর গায়ে ছোট্ট হামাগুড়ি দেওয়া মুণ্ডাদের গাঁখানায় লেগেছে বসন্তের আগমনী, সারা বনের পাতা ঝরে গেছে। পলাশ—কুল গাছের ডালে ডালে লাক্ষার সমাবেশ,—মহুয়া গাছের মরা ডালে থলো থলো হলদে ফুলের হাসি, মাতাল গন্ধে সারা পাহাড়টা ভরিয়ে রেখেছে। লাল মাটির আস্তরণ ছেয়ে যায় ঝরে-পড়া ফুলের ভারে।

মাদল বাঁশী আর ছউ নাচের অঙ্গভঙ্গীর মাঝে কেটে যায় সারা রাত! বসন্ত এল। তাদের গানের সুরে—বনের পাতায় পাতায় কুশী নদীর কাজল-কালো জলে পড়েছে তার ভীরু কালো চাহনির ছায়া! ঘন বন-সমাকীর্ণ পর্ব্বতরাজ্যে এল বসন্ত! সাড়া পেল ভীরু শশক-দম্পতি,—বন-মৃগ 'ডাক পেয়েছে কার পথ-ভোলান হাতছানিতে।

অনুভব করে ঝণ্টু মুণ্ডা তার প্রতিটি মুহূর্ত্তের অবসরে কোন মূল্যবান জীবনের অনুভূতি! এদের হাসি গান বাঁশীর সুর নিয়ে বেঁচে থাক এরা! সারা রাত্রি ধরে চলে তাদের নাচ-গানের হররা, দূরে ট্যাবো পাহাড়ের মাথায় হরীতকী-বনে ঝরে পড়ে রাতের মাতাল চাঁদ!

নেশার আমেজ তখনও কাটেনি, নোটন তবুও লছমিয়ার ডাকে চলে বনের দিকে। দীর্ঘ সবল চেহারা, যেন নিকষ পাথর কুঁদে তৈরী, হাসে লছিয়া—"ওই, তু'বাটি মদ গিলে টলছিস যে রে, কি রকম মরদ তু?"

কোন রকমে এগিয়ে চলে ত্'জনে উঁচু পাহাড়ীর গা বেয়ে! লছিয়ার ঝুড়িটা ক্রমশঃ ভারি হয়ে ওঠে চাপ চাপ লাক্ষার ডালায়; কুলগাছের ডালে বসে দা দিয়ে কোপায় চলে নোটন চাপ চাপ লাক্ষা ছিটকে পড়ে চারি পাশে! বেলা ক্রমশঃ দুপুর হয়ে যায় তবুও বিরাম নাই। বলিষ্ঠ দেহ ঘামে নেয়ে ওঠে, নোটন তখনও গাছের মগ ডালে।

হঠাৎ নীচের দিকে সরু রাস্তাটা বয়ে কাকে আসতে দেখে একটু অবাক হয়ে যায় সে। তড়-তড় করে নেমে আসে—নোটন।

ঘোড়াটা হতে লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে বনয়ারীও তাদের দিকে এগিয়ে আসে! ঠিকাদারের ওখানে কাষ করে বার হয়েছে কাষ দেখতে। সম্ভাষণ করে তাদের তু'জনকে—"ইস—তু'জনেই যে এসেছিস রে? লে।"

রংতো মোড়া প্যাকেট খুলে তু'জনকে বার করে দেয় তু'টো সিগারেট, বার কতক নাড়া-চাড়া করে দেখে নিয়ে কানের ফাঁকে সঞ্চয় করে রাখে নোটন।...বনয়ারী আবার ঘোড়ায় ওঠে, বনে কাঠ কাটা হচ্ছে, তার থামবার সময় নাই।

বনয়ারীর গতিপথের দিকে চেয়ে থাকে নোটন। ওর মা ছিল ওদেরই বস্তীতে, কোন এক সাহেবের ওখানে না কি কাষ করতে যায়, সেইখানেই হয়েছিল বনয়ারী, সেই জন্যই তার মাকে আর বস্তীতে

আসতে দেয়নি ঝণ্টু মুণ্ডা। না দিক—বনয়ারী সেইখানেই মানুষ হয়েছে, ওখানের কোন সাহেবের ঠিকাদারের কাছে কায করে। যত দূর নজর যায় তার গতিপথের দিকে চেয়ে থাকে নোটন ও কেমন জামা প্যাণ্ট চকচকে জুতো পরে। যখন এদিকে আসে বনয়ারী সকলেই অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তার দিকে। বেশ আছে।

—"ওই, বোঝাটা শ্যাস করে লিবা না?"

—"এ্যা"—চমকে ওঠে নোটন, লখিয়াও একটু অবাক হয়ে তার হাব-ভাব দেখে, আর গাছে ওঠে না নোটন: বাধ্য হয়েই ফিরে চলে দু'জনে। লখিয়ার অনেক কায, বাবার জন্য জলছাঁকা দাকা (ভাত) আর যদি কোন শিকার-টিকার মেলে তার চেষ্টা দেখতে হবে। নোটন তখনও কি যেন ভাবছে।

তাদের বস্তির কাছে হাঁসপাহাড়ী—পলাশডিহির শালবন কাটাই হচ্ছে। ওখানে না কি গোরা পলটন থাকবে। মাঝে মাঝে অনুভব করে দূর পর্ব্বতের ওপাশে আকাশ কাদের ক্রুদ্ধ সক্রোধ গর্জ্জন! না কি যুদ্ধ বেধেছে। তাই এ সব আয়োজন। কত দেশ-দেশান্তরের রাশি রাশি জিনিষ লোহা লক্কড় কুলি এসে হাজির হয়েছে, আরও লোক চাই।

মুণ্ডা-বস্তিতে পড়েছে তার ছোঁয়া। ঝাঁকড়া বহড়া গাছটার নীচে ছোটা-বড় পাথর বসান, সেইখানেই বসেছে তাদের জটলা। বড় একটা পাথরে বসে ঝণ্টু মুণ্ডা। তারা না কি কেউ যাবে না ওখানে কাজ করতে। গাড়ী বোঝাই কাঠের কারবার, লাক্ষার চালান, বনের শিকারই তাদের কাছে যথেষ্ট।

—"পৈসা দিলে তু লিবি না রে?" কথাটা শুনে সকলেই অবাক হয়ে যায়। হাতে ঝোলান একটা সদ্য শিকার করা খরগোস নিয়ে আসছিল নোটন, সে মজলিসের মাঝেই কথাটা না বলে থাকতে পারে না।

ধমক দিয়ে ওঠে ঝণ্টু—"যা যা, ঘর যেছিস তু ঘর যা।"

তাদের দিকে যেন কৃপাদৃষ্টি হেনেই ঘরের দিকে চলে যায় নোটন।

মুণ্ডাদের কাছে না কি পরের গোলামী করা পাপ। কথাটা কিন্তু নোটনের মনে লাগে না! ওই ত বনয়ারী, কেমন ফিটফাট হয়ে ঘোড়ায় চড়ে কায তদারক করছে, আরও কত রয়েছে। তার পয়সার দরকার, লখিয়াকে খাটতে দেবে না। তার পয়সা চাই-ই। বনের শড়শড়ে (খরগোস) শিকার আর আর লাক্ষা কেটে সে বাঁচতে চায় না।

কথাটা গ্রামের কেউ জানতে পারে না। দু'-চার দিনের পর জানতে পারে এক জন, সে লখিয়া। বিশ্বাসই করতে পারে না। কিন্তু শেষ অবধি নোটনের দেওয়া ঝলমলে একটা রঙীন ডুরে শাড়ী আর এক ছড়া হিঙলাজের মালা দেখে কেমন যেন একটু সন্দেহ হয়, নোটনও বোঝাবার চেষ্টা করে, ভাল ভাবে থাকতে গেলে ওদের নোটনকে চাকরী করতেই হবে। বেলা দুপুর অবধি বন কেটে যদি আট আনা পয়সা ঘরে আসে রোজ, মন্দ কি!

প্রতিবাদ করে লখিয়া—"না না, উ আমি লুব নাই। আমি যদি তুকে গোলামীই করলাম, তবে তুর 'বহু' হব কুথাকে? উ আমি লুব নাই। নদীর জলে ফেলাই দিগা তু।" কিছুতেই নেয় না লছমী, বার হয়ে গেল ঘর হতে।

ধূলো উড়িয়ে চলেছে কয়েকখানা গাড়ী—অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তারা। বিবর্ণ ত্রিপল ঢাকা গাড়ীগুলো সার বেঁধে এগিয়ে আসছে পাহাড়ীর ঢালু পথ বেয়ে, পাতা-ঝরা হর্তুকী-বনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ সারবন্দী গাড়ীগুলো আসছে।

পলাশডিহির ডাঙ্গা বন যেন একবারে বদলে গেছে কোন যাদুর স্পার্শে, শাল-জঙ্গল কেটে সাফ করে গড়ে তুলেছে নোতুন মানুষের নোতুন উপনিবেশ। দেশ-বিদেশ হতে কুলী-কামিন আরও আমদানী হয়েছে। এসেছে লাল টকটকে রঙএর কত মানুষ, কত যন্ত্র! দিন-রাত্রি অবিশ্রান্ত গতিতে চলেছে কাজ, রাশি রাশি লোহা-লক্কড়—আরও বিরাট বিরাট বাক্স-বোঝাই কত সব যন্ত্রপাতি—চারি দিকে কেবল কোলাহল।

মুণ্ডা-বস্তির মধ্যেও এসেছে পরিবর্ত্তন: সারা বনে যেন ঝড় বইছে, ঝণ্টু মুণ্ডা আজ বুঝতে পেরেছে তার ক্ষমতা কতটুকু। একা নোটন নয়—আরও অনেক জোয়ান ব্যাটা-ছেলেই যেতে সুরু করেছে পলাশডিহির ডাঙ্গায়। বিশাল পাথুরে ডাঙ্গাটা ডিনামাইট—ইগনেটার—গাঁইতির ঘায়ে চোট খেয়ে আর্ত্তনাদ করে ওঠে! ডাঙ্গাটার প্রান্তে গড়ে উঠেছে সারি সারি ব্যারাক! দিন-রাত বিরাট ক্রুড অয়েল ইঞ্জিনটা আর্ত্তনাদ করে চলে রাতে বিশাল বন্ধুর পার্ব্বত্য ডাঙ্গাটা আলোয় আলো হয়ে যায়।

ঝণ্টু মুণ্ডা যেন স্বপ্ন দেখছে। ওদেরই পূর্ব্ব-পুরুষ যেখানে

বিস্তার করেছিল একছত্র রাজত্ব, তাদের পিতা-পিতামহের পুণ্য স্মৃতিমাখা সেই বন হাঁসপাহাড়ী কুশী রক্ষীণ জলধারার কলতানে মুখরিত আমলকী বন—পলাশডিহির জঙ্গলে পলাশের রক্তরাগ—সে সব আজ কোথায়? কারা লুঠে নিল তাদের মধু স্বপ্ন-মাখা দিন—আলো-ছায়ার লুকাচুরি ভরা জগৎ!

ওরা—ওই নোটন, টুঙরা, পল্টু—ওরা জানে না, জানে না কি মায়া রয়েছে এই মৃত্তিকায়—কি সম্পদই লুকোনো রয়েছে ওই বনানী পর্ব্বত-ঘেরা অন্ধতমসাচ্ছন্ন প্রান্তরে প্রান্তরে। যার লোভে সাত সমুদ্র পার হয়ে এল কোন লোভী বণিকের দল,—ওরা হাসিমুখে তুলে দিল তাদেরই জন্মভূমিকে ওদেরই হাতে!

রাত্রি কত জানে না, হঠাৎ লছমিয়ার ডাকে চমক ভাঙ্গল—"খাবে নাই?"

উদ্ধত দীর্ঘশ্বাস চেপে বুড়ো এগিয়ে চলে।

ঝাঁকড়া বহড়া গাছটার নীচে আর কেউ আসে না। কেউ চায় না শুনতে তার কথা! না শুনুক, তবুও বুড়ো মুণ্ডার সারা মনের কাহিনী যেন উপছে পড়ে কানায় কানায়,—সারা মুণ্ডা-বস্তি ঝিমিয়ে পড়েছে! সে প্রাণ-সম্পদ আর নাই, সারা দিন কঠিন পাথরে গাঁইতির চোট মেরে কাঁধ লাগিয়ে পাথর বয়ে রাস্তায় ফেলতে ফেলতে ওরা নিঃশেষে বিলিয়ে দিল নিজেকে! সব অসাড় হয়ে ঘুমোয়! ঘুমোয় না কেবল ঝণ্টু!

ঘুম আসে না। চোখ বুজলেই সামনে আসে তারই বংশের পূর্ব্ব-পুরুষ বীরসা মুণ্ডার তেজোদৃপ্ত মুখখানা! সাতটা চাকলার মুণ্ডা-কোল আজও তার নামে মাথা নোয়ায়, একাই তার দেশকে মাথা

নোয়াতে দেয়নি ওই সাম্রাজ্যবাদীদের কঠিন শাসনের বেদীতলে, পাহাড়-পর্ব্বতে বাসা বেঁধে দেশের জন্য সে যুদ্ধ করেছিল। শেষ

শেষ কালের কাহিনীটা মনে নয়—চোখের সামনে ভেসে আসে। রাঁচী জেলার সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর হাতে বন্দী হয়ে চলেছে সেই বিপ্লবী যুবনেতা, যে সারা বনে-পর্ব্বতে অসংখ্য কোল-মুণ্ডাদের মাঝে দাবানলের সৃষ্টি করেছিল—যার ছোঁয়া দূর-দূরান্তরেও ছড়িয়ে পড়তে বাকী রাখেনি।

ফাঁসির মঞ্চেও জীবনের জয়যাত্রার গান সে গেয়েছিল। জানিয়েছিল মহামানবের বন্দনার সুর। তারই বংশে জন্মেছে ঝণ্টু মুণ্ডা—এ যে তার রক্তের তাণ্ডব নর্ত্তন, শিরায় শিরায় সেই বিপ্লবীর মহামুক্তির প্রয়াস!

রাত্রে সে একা বসে থাকে ছোট্ট উঁচু টিলাটার উপর, পাথরে পাথরে পা দিয়ো না, প্রতিটি পাথরে লেখা রয়েছে তাদেরই শেষ রাজত্বের ইতিহাস—বীরসা মুণ্ডার জীবনের রক্ত-রাঙ্গা ইতিহাস! সন্ধ্যার অন্ধকারে পাথরের ছোট মন্দিরটায় এখনও বুড়ো মুণ্ডা জ্বালিয়ে দিয়ে যায় কঁচড়া তেলের একটা প্রদীপ। লালাভ শিখা—ভীরু চোখে চেয়ে থাকে অদূরে পলাশতলির উজ্জ্বল দীপমালার দিকে। নিস্তব্ধ রাত্রির অতলে জাগে কম্পিত একটি শিখা কোন অতীতের স্মৃতি বুকে নিয়ে, আর জাগে তার পাশে বৃদ্ধ মুণ্ডা।

বস্তির অন্য সকলেই অবাক হয়ে যায় সর্দ্দারের হাব ভাব দেখে। এত পয়সা কামাচ্ছে সকলেই, বস্তির নীচু পাথর তোলা ঘর অনেকেই বদলে ফেলেছে, নোটন ত কয়েকখানা কাঠের তক্তা দিয়ে কোঠাও তৈরী করবার চেষ্টা করছে, সে এখন বেশ দু' পয়সা কামায়, কিন্তু ঝণ্টু মুণ্ডা তেমনিই আছে। কারুর সঙ্গে কথাও আর কয় না, মাথা নামিয়ে চলে।

বিনিদ্র রজনীর মালা গেঁথে চলে দিন আর রাত্রির সমাবর্ত্তন। লছমিও আজ যেন নোতুন ঠেকে ঝণ্টুর কাছে, সেদিন শালপাতার চুটা বানাতে গিয়ে দেখে লছমীর পরনে কেমন একটা রঙ্গীন শাড়ী, অবাক হয়ে যায়! সে পেল কোথা হতে? মনটা কেমন হয়ে যায়, ঘর হতে বার হয়ে আসে বুড়ো। তার মেয়ে—বীরসা মুণ্ডার বংশেও কি বিষ ঢুকেছে? না না। কিছুতেই সে হতে দেবে না এ-সব।

নোটন আপন মনে শিস দিতে দিতে ফিরছে। বগলে আজ পলাশডিহির ওখান হতে আনা একটা বিলেতী বোতল,—মহুয়ার মদের চেয়ে লাখো গুণে সেরা; রঙীন একটা প্যাণ্ট পরে ফিরছে কাষ হতে। নগদ দু'টো টাকা পকেটে তখনও কর-কর করছে। এগিয়ে যায়। সারা মনে কেমন একটা খুসীর আমেজ, একা ঘরে মন টেকে না।

ছোট চারপায়াটার পা ছড়িয়ে বসে নোটন সেজ কেমন বদলে যায়। বুড়ো মুণ্ডা কোথায় গেছে—সুতরাং এখন তাকে পায় কে? লছমিয়াকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উঠে-পড়ে বোতলের ছিপিটা খুলেই এগিয়ে যায়—"তুর বাবার মত হবি না কি তুও! লে লে। এক টান।—তুর বাপটোকে লিয়ে আর লারলাম?"

বাসার উপর সত্যিই কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে লছমিয়ার, সত্যিই আজ ও বড় অসহায়। যারা ছিনিয়ে নিল সব, দিল দয়া করে সামান্য মাত্র ভিক্ষা, সেই ভিক্ষা-বৃত্তি করে আর কেউ বাঁচতে চায় বাঁচুক, কিন্তু ছোট নাগপুরের বিপ্লবী নেতা বীরসা মুণ্ডার ছেলে বাঁচবে না।

চীৎকার করে ওঠে নোটন—"ওই, তুর আবার হ'ল কি। চুপ করে রইলি কেনে?"

বলে ওঠে লছমিয়া—"যা তুই, ই সব আমার ভাল লাগছে নাই।"

প্রবেশ করছিল বুড়ো মুণ্ডা, বাড়ীর মধ্যে কার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ওঠে। নোটন! এত-বড় বুকের পাটা তার, নোটন আসবে তার মেয়ের কাছে। এক দিন সে মিশতে দিয়েছিল। আশা ছিল বিয়ে হবে ওদের, ঘর-সংসার হবে, আজ ওই গোলাম নোটনের সঙ্গে বীরসা মুণ্ডার নাতনীর বিয়ে হবে না—হতে পারে না।

তাকে বাড়ীতে ঢুকতে দেখেই অবাক হয়ে যায় নোটন। হাঁ-না করে কোন রকমে বাড়ী হতে বার হয়ে যায়।···হেঁকে ওঠে বুড়ো মুণ্ডা—উ কেনে আইছিল, আর যেনে না আসে।"

লছমী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, বাবার মুখের দিকে সে চাইতে পারে না।

সারাটা দিন কাটে লছমিয়ার ব্যর্থতার হাহাকারে, বোঝে সে, অনুভব করে সারা অন্তর দিয়ে বাবার অবস্থা। আজ পরিবর্তনকে সে মেনে নিতে পারেনি, মাটি-পাথরের মাঝে আজও বুড়ো মুণ্ডা খুঁজে বেড়ায় হারানো সেই জগৎ, পিছনের টানে পা সে ফেলতে পারেনি। তবুও আজ বাবার জন্য সারা মন কাঁদে তার। অন্য দিকে মনের সমস্ত রঙীন আশার আলো চিরদিনের জন্য নিবিয়ে দেওয়া। তার বংশ-পরিচয়—তার শিরায় শিরায় বিপ্লবীর রক্তস্রোত—সে নিজেকে সাধারণের কাছে ভোগের বস্তু হিসেবে তুলে ধরতে পারে না। তার কায অন্য, দেশের মুক্তিব্রতের তারা যাজ্ঞিক। তবুও অন্তরের হাহাকার কমে না, শান্তি তার নাই।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। সারা দিনপর বার হয়েছে লছমিয়া, বস্তির বাইরে বীরসামুণ্ডার স্তূপের দিকে প্রদীপ নিয়ে চলেছে ডালাটায় হাওয়া আড়াল করে, ফণিমনসা বাজবরণ কাঁটার গাছগুলোর পাশ দিয়ে সন্তর্পণে উঠে চলে লছমিয়া, হঠাৎ ওপাশে বাঁ দিকে আসতে দেখে থমকে দাঁড়ায়। অস্পষ্ট আলোয় চিনতে পারে এক জন সাহেবের সঙ্গে চলেছে নোটন, পরনে একটা প্যাণ্ট গলায় একটা রুমাল বাঁধা। সাহেব নিবিষ্ট মনে কি দেখে চলেছে পাথরগুলোতে। লছমিয়াকে দেখে দাঁড়িয়ে যায় নোটন। সাহেবও হাসতে থাকে। লছমিয়া কোন রকমে এড়াবার চেষ্টা করে, কিন্তু তারা ছাড়বার পাত্র নয়। নেমে আসছে তারা, পাশের কেঁদ গাছটার কাছে কার ছায়ামূর্ত্তি যেন সরে গেল। লছমিয়ার গাটা ছম-ছম করে। কে জানে বাবা কোথায়!

উষ্ণ রক্ত সারা শিরা-উপশিরায় বইতে থাকে। বুড়ো মুণ্ডার মাথাটা উত্তেজনার আবেগে দপ-দপ করে চলেছে। আজ বীরসা মুণ্ডার পবিত্র স্তূপের মন্দির-তলে তারই বংশের কোন মেয়ে লিখে রেখে যাবে এত বড় কলঙ্কের কাহিনী! সমস্ত রক্ত দিয়েও কি সে লেখ মুছে যাবে?···মনে হয় কঠিন হাতে ওকে শেষ করে দিতে পারত।

নেমে আসে বুড়ো মুণ্ডা। দ্রুত পাদবিক্ষেপে এগিয়ে চলে বাড়ীর দিকে। নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে শিউরে ওঠে সারা আকাশ-বাতাস। বুড়ো মুণ্ডার পা দু'টো কাঁপছে।

লছমিয়া অবাক হয়ে যায়। বাবার এমন মূর্ত্তি সে কখনও দেখেনি। সারা গা উত্তেজনায় আবেগে কাঁপছে বুড়োর। চোখ দু'টো লাল হয়ে গেছে। তার চীৎকারে বস্তির আরও দু'-এক জন বার হয়ে আসে। লছমিয়া চুপ করে উঠানে দাঁড়িয়ে, বোঝাতে পারে না অপরাধী সে নয়, কোন অন্যায়ই সে করেনি। বুড়ো মুণ্ডার রগের শিরাগুলো ফুলে ওঠে, সে কোন কথা শুনবে না। নিজের চোখকে অবিশ্বাস করে না; ওই বীরসা মুণ্ডার মন্দিরে আজ কোন বিদেশী আর নোটনের সঙ্গে দেখেছে তাকে। এত বড় দুঃসাহস তার!

কোন ক্ষমা নাই তার অন্তরে। বুড়ো তাকে কোন দিনই ক্ষমা করতে পারবে না। এ বাড়ীতে লছমিয়ার কোন অধিকারই নাই। ভাববে সে—মেয়ে তার নাই—কোন কালে ছিলও না।

লছমিয়ার দু'চোখে নামে জল। বাবা ছোট চারপাইখানাতে বসে রুদ্ধ-মুখ আগ্নেয়গিরির মত ফুঁসছে। লছমিয়াকে তখনও কাঁদতে দেখে চীৎকার করে ওঠে—"যা-যা। তুরুকে যা বলছি, নইলে তুর শ্যাষ করে। বেরো—বেরো তুই।"

হ্যাঁ। বারই করে দেবে সে। হোক একমাত্র মেয়ে। আসুক দু'চোখ জলে ভরে, সব হারাতে পারবে সে, তবুও জীবনের শেষ দিন অবধি সে মাথা নীচু করে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে না।

রাত্রি। তারার আলোর ঝিকিমিকি মিনতি ভরা রাত্রি। প্রতিটি প্রহর এর সুখ-দুঃখের কাব্যে ভরপুর। কত বিনিদ্র দম্পতির মধু গুঞ্জন—কার হাসির ঝরণা-ধারা—কার আবেশ-বিহ্বল আধ-বোজা আঁখিপাতার ভীরু সলাজ চাহনি নিয়ে কেটে যায় এর প্রতিটি দণ্ড-পল-প্রহর। এমনি কোন এক রাতে সব হারিয়ে লছমিয়া ঠাঁই পেল নোটনের ঘরে। ঘুম আসে না। বার বার কান্নার আবেগে ফুঁপিয়ে ওঠে সারা দেহ। কি অন্যায় সে করেছিল? ক্লান্ত নোটনের সবল বাহুপাশ শ্লথ করে এসে দাঁড়ায় জানলার সামনে। তারায় ভরা আকাশ-কোল কাদের আলোর রোশনীতে ভরপুর।

নয়াজমানার রাত্রি ভোর, ছোটনাগপুরের বন-পর্ব্বতভূমির অন্ধি-সন্ধিতে কারা জেগে উঠেছে কোন জাগরণের পাঞ্চজন্য শুনে। পূব আকাশের মাথায় আলোর নিশানা। তমসাচ্ছন্ন শাল-মহুয়া বনে ফুলের মৃদু সুবাস কুয়াসাকে গাঢ়তর করে তুলেছে। এগিয়ে আসছে ওরা। সুর শোনো, কান পেতে রয় কোন সর্ব্বহারা। মহাশক্তির দুর্ব্বার বিক্রম নিয়ে এগিয়ে আসছে ওরা সামনের দিকে। বীরসা মুণ্ডার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। তার ছোটনাগপুরের বন-পর্ব্বতরাজ্যে মানুষের দাবী চিরদিনই প্রতিষ্ঠিত হবে। আজ সেই নয়াজমানার নিশি ভোর।

কিসের শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে বুড়ো মুণ্ডা। চোখ দু'টো রগড়াতে থাকে। কানে আর আসে না জাগরণের সেই সুর। চোখের সামনে দিনের ঝকঝকে আলো। তবে সে কি স্বপ্ন দেখছিল? বিছানায় পড়ে পড়ে স্মরণে আসে গত রাত্রির কথা। আজ আর কাছে কেউ নাই যে এগিয়ে আসবে তার দিকে—তার দুঃখে জানাবে সমবেদনা। তার অন্তরের নিঃস্বতাকে নিজের করে নিতে পারবে। না থাক কেউ, কাউকে তারা চায় না।

হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের শব্দে অবাক হয়ে যায়। খুব কাছেই বোধ হয়। একটা নয়—পর-পর কয়েকটাই। ঘরখানা কাঁপতে থাকে বিস্ফোরণের শব্দে। তাড়াতাড়ি করে বার হয়ে আসে।

সামনেই পলাশডিহির দিক হতে আসছে আওয়াজটা। বীরসা-মুণ্ডার উঁচু টিলাটা দেখা যায় না, ধোঁয়া আর ধুলোয় ছেয়ে গেছে। পাহাড়টার গা বয়ে গড়িয়ে পড়ে কালো কালো বিশাল পাথরগুলো। তীব্র বিস্ফোরণের বেগে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। ছুটে এগিয়ে চলে বুড়ো।

বড় বড় 'হিচ্‌হিকার' গাড়ীগুলোতে বোঝাই হচ্ছে সেই পাথর! কুলিনদীর বাঁধ তৈরী হবে, ক'দিন হতেই চলছিল যোগাড়-যন্ত্র, আজ সকাল হতে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে ওগুলো নিয়ে যাচ্ছে!

কুলির ভিড় ঠেলে ছুটে চলে মুণ্ডা। কোথায় বা সেই বাজবরণ ফনীমনসার ঝোপ, কোথায় সেই ছোট পাথর-ঘেরা মন্দির। বীরসা-মুণ্ডার শেষ স্মৃতিচিহ্নও আজ তার জন্মভূমির বুক হতে মুছে গেল! ওমনি করে তার শেষ দেহাবশেষও ফাঁসির মঞ্চ হতে নামিয়ে চালিয়েছিল তার উপর অমানুষিক অত্যাচার।

সারা শরীরে কেমন একটা উত্তেজনার আবেগ, বৃদ্ধের শিরায় শিরায় আজ রক্ত-প্লাবন! এ যেন সেই দিনগুলো ফিরে পেয়েছে সে। তাদের জয়যাত্রার দিন—যে দিন তার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল স্বার্থলোলুপ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে। ছুটে উঠতে থাকে টিলাটার উপর। কুলি-মজুর আরও সকলেই অবাক! কালো পাথরগুলো জড়িয়ে ধরে চীৎকার করতে থাকে বুড়ো। ভাবহীন অব্যক্ত আর্তনাদ!

চীৎকার শুনে কয়েক জন বিদেশী সৈন্য তার হাত ধরে টেনে-হিঁচড়ে নামাতে থাকে—বন্দুকের গুঁতো দিয়ে। মুণ্ডা-বস্তিরও অনেকেই এসে জুটেছে! নোটন—আরও সকলে গাড়ীতে পাথর বোঝাই করছিল তারাও, লখিয়াও দূর হতে চেয়ে দেখে তার বাবাকে ওরা জোর করে নামিয়ে দিল টিলার উপর হতে!

কায আবার যথারীতি চলতে থাকে। বড় বড় চকচকে পাথর-গুলো টেনে টেনে গাড়ীতে বোঝাই করে, পাহাড়ী রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে চলে যায় ট্রান্সপোর্টের সার। লাল বিশাল চেহারার সৈন্যরাও তদারক করছে কায। রোদে-ঘামে টকটকে হয়ে উঠেছে। আকাশের বুক দিয়ে ডানা মেলে উড়ে যায় বিরাট একটা এরোপ্লেন! ঘর্ঘর শব্দে সারা বনভূমি ভরে ওঠে, দূর-আকাশে চাকচক্য বিন্দুর মত মিশিয়ে গেল সীমান্তরীক্ষ!

লছমিয়া দূর হতে অশ্রুপূর্ণ নয়নে চেয়ে থাকে বাবার দিকে। কোন মৃত্যুপথযাত্রীর মত চলেছে বুড়ো-মুণ্ডা। আজ তার বুকের একখানা পাঁজর ভেঙ্গে গেছে। সারা শরীরে গুমরে ওঠে নিষ্ফল ক্রোধ। চোখের কোণে বয়ে পড়ে শিথিল অশ্রুরেখা। আজ সে নিজেরই দেশ হতে বিতাড়িত! তারই জীবনে এই সর্ব্বনাশ ঘটে গেল! আর পড়বে না স্বাধীনতার পূজারী বীরসা মুণ্ডার দেব বেদীতলে সন্ধ্যা প্রদীপ-রেখা—যে দীপও জ্বলছিল তার শেষ শিখাও কি নিবে যাবে? অশ্রুপূর্ণ নয়নে চেয়ে থাকে লছমিয়া বাবার গতি-পথের দিকে। কেউ না বুঝুক—সে বুঝছে বাবার রিক্ততার কাহিনী! সারা মন আজ হাহাকার করে ওঠে। নিজের জন্ম আজ সে ভুলতে বসেছে কোন্ মহৎ বংশের মেয়ে সে। ছোটনাগপুরের পর্ব্বত-অরণ্যের কোন যুগদেবতার পবিত্র রক্তধারা আজও তার শিরায় শিরায় প্রবহমান। সে বোঝে আজ সামান্য নারীর মত জীবন তার নয়!

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে বাড়ীর দিকে। এককালে ছিল বীরসা-মুণ্ডার রাজধানী, আজও এখন পর্ব্বত-স্তূপের প্রাকার দেখা যায়, ওদের নিষ্ঠুর হাতের কাছে এটুকুও বোধ হয় বেশী দিন নয়। সবই শেষ হয়ে যাবে। ঘরারাদের মাঝে এগিয়ে চলে লছমিয়া।

বাবা বসে রয়েছে দাওয়াতে। সারা শরীরে আজ বয়সের ছাপ মাথাটা সব সাদা—পেশী-বহুল দেহটা আজ লোল চামড়ার কুঞ্চনরেখায় ভরপুর। হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কোন অতীতের স্বপ্ন দেখছে নিজেকে হারিয়ে দিয়ে। হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চমকে ওঠে। সামনেই লছমিয়াকে দেখতে পেয়ে চীৎকার করতে থাকে—"বেরো—বেরো, আমার এখানে তুর কিছু নাই।"

—"বাবা!" আর্ত্তনাদ করে ওঠে লছমিয়া।

বাধা দেয় বুড়ো মুণ্ডা—"খপরদার।"

আজ সে তার মেয়ে নয়, বীরসা-মুণ্ডার বংশের কেউ নয়। বুড়োর অগ্নিমূর্ত্তির দিকে এগুতে সাহস পায় না লছমিয়া। বার হয়ে আসে ধীরে ধীরে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সারা দেহ-মন।

নোটন দুপুরের ছুটিতে আসছে বাড়ীর দিকে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে। দুপুরের তীব্র রোদ শয়ন বিছায় পলাশডিহির বিশাল কর্ম্মব্যস্ত প্রান্তরে। সারা বস্তিটা অসহ্য গরমে যেন ঝিমুচ্ছে। দরজার কাছে এসেই দেখে ঘর ফাঁকা—কেউ কোথায় নাই। ক্ষিদেতে নাড়ীগুলো জট পাকাচ্ছে। কোথায় বা লছমিয়া—কোথায় বা কে? সারা শরীর রাগে জ্বলতে থাকে। তিক্ত-বিরক্ত হয়ে বাইরে আসবে—দেখে লছমিয়া ক্লান্ত পাদবিক্ষেপে এগিয়ে আসছে। দু'চোখে তার তখনও অশ্রুধারা মিলোয়নি, কি যেন ভাবছে ও। সামনেই মারমূর্ত্তি নোটনকে দেখেই তার সমস্ত বংশ-মর্য্যাদা আজ মাথা তুলে সাড়া দেয়। সামান্য নোটনের ঘরে দাসত্ব করবার জন্যই কি এত-বড় বংশের সমস্ত পরিচয় সে অগ্রাহ্য করে এসেছে? যার জন্য আজ তার বাবা মাথা নীচু করেনি?

নোটন চীৎকার করে উঠে—"ভাত কুথা? গিই ছিলি কোন লাগরের ঘরে?"

তাকে থামিয়ে দেয় আজ লছমিয়া। সামান্য মুণ্ডার মেয়ে সে নয়, ছোটনাগপুরের বন্য রাজকুমারী লক্ষ্মীবাঈ। অবাক হয়ে যায় নোটন তার তেজোদৃপ্ত মুখের দিকে চেয়ে। লছমিয়াকে এমন ভাবে সে কখনও দেখেনি। ধীরে ধীরে লছমিয়া বার হয়ে গেল তার বাড়ী হতে। ভালবাসা তার মনে কোন দাগ কাটে না। অপমান ঘৃণা লাঞ্ছনাই তার প্রাপ্য। এত নীচেই সে নেমে এসেছে।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। আঁধারে ছেয়ে গেল পলাশডিহির বনপথ, বীরসা-মুণ্ডার টিলাটা। দূর পর্ব্বতসানুতে সৈন্য-ব্যারাকে জ্বলে উঠে আলোগুলো। আকাশে ওমরে ফেরে কোন দূরযাত্রী 'ডেকোটা' প্লেনের ক্লান্ত প্রপেলারের অস্ফুট গর্জ্জনধ্বনি। মাঝে মাঝে ভারী ট্রান্সপোর্ট নিয়ে যাতায়াত করছে মিলিটারী গাড়ীগুলো। যুদ্ধ না কি এগিয়ে আসছে!

বীরসা-মুণ্ডার স্তূপের পাশে ষ্টাফ কারখানা সহসা থেমে যায়। কি যেন একটা গোলমাল হয়েছে ইঞ্জিনটায়। অদূরে ফণিমনসা বাজবরণ কাঁটার ঝোপ ভেদ করে আসছে কিসের শব্দ। ভাঙ্গা টিলাটার ওপাশে জ্বলছে অস্পষ্ট কিসের লালাভ শিখা—বাতাসে কাঁপছে। ওই দিক হতেই আসছে কে যেন অন্ধকারে। সেন্ট্রীর বুটের শব্দ থেমে যায়, চীৎকার করে ওঠে—হু ক্যাম দ্যার?

কোন উত্তর নাই। চাপা থস-থস শব্দ কানে আসছে; কার

সমস্ত মালই কেনা দামের উপর ব্যাজ লাভে বিক্রয় করতে হবে !

বিধু। কেন ?

রহমন। কেন আবার কি ? সরকারের আদেশ ! বেশী বেশী লাভে আমরা না কি মাল বিক্রী করছি আর সরকারের বিশেষ কর্মচারীর কাছে মালের প্রকৃত হিসাব দিইনি—এই অজুহাতে আপনাদের সহৃদয় বৃটিশ সরকার সমস্ত মজুদ মাল বাজেয়াপ্ত করছে ! এ ছাড়া আর উপায় কি ? এ যুদ্ধে আমাদের কোনো রকম স্বার্থ ও সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও তাদের এই সাম্রাজ্যবাদীয় যুদ্ধে, তাদের সেনাদের খোরাক তো আমাদেরই জোটাতে হবে ! আমরা যে পরাধীন—পদানত !

বিধু। (উচ্চ হাস্য)

রহমন। আপনি হাসছেন মিঃ ব্যানার্জ্জী ? জানেন, আমাদের মত দুর্ভাগা জাত পৃথিবীতে আর দু'টি নেই। আমাদের মত কীল খেয়ে কীল চুরী পৃথিবীর কোনো জাতই করে না তবু আপনি হাসছেন ?

বিধু। ক্ষমা করবেন, রহমন সাহেব। আপনার কথা শুনে দুঃখও হয় আবার হাসিও পায় ! সত্যি, আমরা যে পদানত সে বিষয় কোনো সন্দেহই নাই ! তবুও আজ আমি মনে মনে খুবই আনন্দিত—এ আনন্দের উচ্ছ্বাস গোপন রাখতেও পারছি না, আবার সদাশয় বৃটিশ সরকারের ভয়ে প্রকাশ করতেও বাধছে ! তবুও আমি আপনাকে বলছি—আমাদেরই অতি গোপনীয় সামরিক কথা !—দেখবেন সাহেব, আমার কাঁচা মাথাটা নিয়ে তারা যেন ফুটবল না খেলে !

রহমন। আরে বলেন কি ব্যানার্জ্জি সাহেব ! এই সব কথা কি প্রকাশ্যে আলোচনা করতে আছে ? এতে কি শুধু আপনারই বিপদ—আমার কি কিছুই ভয় করবার নেই ? আপনাকে এইমাত্র যা বললাম—তাতেই তো আমার পুলি-পোলাও হতে পারে।

বিধু। তবে শুনুন। এই সব স্বেচ্ছাচারী ইঙ্গ-মার্কিণদের জন্যই আজ সারা ভারতে দুর্ভিক্ষ আর রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। বৃটিশদের এই বর্ব্বর যুদ্ধে তাদের সৈন্যদলের খোরাক ও পোষাক জোগাবার জন্য বৃটিশ সরকার আজ ভারতবাসীদের অনাহারে মরতে দিয়ে দুর্ভিক্ষ থামাবার ধুয়ো তুলে সারা ভারতময় নিয়ন্ত্রণ আইন জারী করেছে। অতিরিক্ত ফসলের দেশ হিসাবে পাঞ্জাবটাই বাকী ছিল, তারা পাঞ্জাবের শিমলা, মুলতান, শিয়ালকোট, জলন্ধর, লুধিয়ান, এমন কি দিল্লীতেও খাবার জিনিস আর কাপড়-চোপড়ের বিক্রী নিয়ন্ত্রণ করেছে !

রহমন। বলেন কি মিঃ ব্যানার্জ্জি ? তবে যে শুনলাম শিয়ালকোটে শুধু খাদ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ?

বিধু। মোটেই নয়। নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও তারা দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে পাঠাবার নাম নিজেদের সেনাদের জন্য হাজার হাজার টন খাদ্যদ্রব্য, পাঞ্জাব থেকে পাঞ্জাবের বাহিরে পাঠিয়ে দিচ্ছে !—তবে এ ভাবে লুঠ তরাজ তাদের আর বেশী দিন করতে হবে না ?

রহমন। কারণ ? তবে যে গুজব শুনেছি, তা কি সত্যি ? সুভাষ বাবু—

বিধু। হ্যাঁ, সব সত্যি কথা, রহমন সাহেব। আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের পূব দিক দিয়ে—মানে আপনার এই আসাম-বার্ম্মার সীমা পার হোয়ে ক্রমেই দিল্লীর দিকে এগিয়ে আসছে। ইংরেজ প্রভুদের এত সাধের রাজ্যপাট এবারে ভেঙ্গে-চুরে যাচ্ছে। আর ঐ আজাদ হিন্দ সৈন্যের নেতা হোচ্ছেন সুভাষ বোস নিজে ! তাই আজ আর বৃটিশ প্রভুরা ভারতে কোনো কটা চামড়ার লোক পাঠাতে পারছে না।

রহমন। তার মানে ?

বিধু। মানে—সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশের লাটের গদি খালি হয়েছে। সারা ভারতময় যখন বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে, আর তার ফলে ইংরেজদের যুদ্ধজয়ের সকল চেষ্টা প্রতি পদে বাধা পাচ্ছে, তাও আমাদের দেশে হাজার হাজার উপযুক্ত লোক থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ সরকার আমাদের লাটের কাজ দেবে না। এখন মজাটা হচ্ছে যে, তাদের এই অতি লোভনীয় প্রাদেশিক লাটের কাজ এখন কোন কটা চামড়াধারী ইংরেজই গ্রহণ করতে চাইছে না। তাই তো বৃটিশ সরকার বাংলার লাটের পদের জন্য বৃটেন থেকে কোন লোকই আনতে না পেরে বাধ্য হ'য়ে অষ্ট্রেলিয়াবাসী রিচার্ড জি কেসীকে বাংলার লাটের গদিতে এনে বসিয়ে দিল।

রহমান। তা' হ'লে যুক্তপ্রদেশের লাটের কি ব্যবস্থা হ'বে, মিঃ ব্যানার্জ্জি ?

বিধু। ব্যবস্থা তারা করেছে ! অগ্রগামী আজাদ হিন্দ ফৌজদের ভয়ে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে ইংলণ্ডের কোন লোককেই অতি লোভনীয় প্রাদেশিক লাটের পদের সুমধুর লোভ দেখিয়েও যখন ভারতে আনতে পারলে না, তখন বৃটিশ সরকার মনের দুঃখে সার মরিশ হ্যালেট—যুক্তপ্রদেশের লাটের কার্য্যকাল আর এক বছর বাড়িয়ে দিয়েছে ! কিন্তু আমার মনে হয়, ভদ্রলোককে এক বছর পুরো মনের আনন্দে আর লাটের আসনে গদীয়ান হ'য়ে থাকতে হ'বে না ! তার আগেই স্বাধীন ভারতের জাতীয় বাহিনী সুভাষ বাবুর নেতৃত্বে দিল্লীর লাল দুর্গে ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা তুলে বিজয়ীর বেশে কুচ-কাওয়াজ করবে !

রহমন। খোদা আপনার মঙ্গল করুন, মিঃ ব্যানার্জ্জি ! আমিও প্রার্থনা করি যে, সে সুদিন যত শীঘ্র সম্ভব আসুক, আমরাও স্বাধীন ভারতে মুক্তির নিশ্বাস নিয়ে বাঁচি ! এখন চলি তবে, দেখি একবার খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ টিকিট পাওয়া যায় কি না, নচেৎ বিপন্ন হ'তে হ'বে।

বিধু। না, না, আপনাকে আর সেখানে যেতে হ'বে না ! আমি আপনার টিকিট আনিয়ে পাঠিয়ে দেব !

রহমন। অশেষ ধন্যবাদ মিঃ ব্যানার্জ্জি ! এখন তবে আসি, আদাব।

বিধু। আদাব, মাঝে মাঝে আসবেন কিন্তু !

(জুতার শব্দ)

লেখক : চ্যাং টিয়েন-ঈ

[চ্যাং টিয়েন-ঈ'র জন্ম ১৯০৭ সালে। আধুনিক চীনা ছাত্র-সম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবীদের উপর তাঁর প্রভাব খুব বেশি। গল্প, উপন্যাস এবং কিশোর সাহিত্যের কয়েকখানা বই নিয়ে তাঁর প্রণীত গ্রন্থের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ত্রিশ। তাঁর লেখায় পাশ্চাত্য প্রভাব কিঞ্চিৎ স্পষ্ট। বর্তমান চীনা গল্প-সাহিত্যের তিনি এক জন দিক্‌পাল]

"দ্যাখ রে চিয়াং-সান, ফাশিন-বৌয়ের মুখখানা কেমন সুন্দর!"

শুনে সমঝদারের ভঙ্গীতে চিয়াং-সান হেসে উঠল : "চিউ-ইয়ের নজর আছে। তা হুজুর, আপনার নজর আছে, বলতে হবে।"

"আশ্চর্য! এক গেঁয়ো-ভূতের কি না এমন নরম নরম তুলতুলে খাসা বৌ—যেন গোবরের মাঝে পদ্ম-ফুল। খাসা জিনিষখানা আমাদের ফাশিন-বৌ!···তুমি কি বল ফাশিনের বৌ?"

ফাশিন-বৌয়ের দিকে মুখ বাড়াতেই চিউ-ইয়ের লাল মুখের এক দিকে বাতির আলো পড়ল, বড় বড় রোমকূপগুলি তাতে স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। তার মুখে ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠল, সেই সঙ্গে বেরিয়ে এল একপাটি কালো-হলদে দাঁত। বাতির আলোয় তারই মধ্যে দু'টো বাঁধানো দাঁত,—পুরনো কাঁসার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। লি-তাও-শিহ্‌ বলত, ও দু'টো সত্যিকার সোনার নয়, বিলেতি লজেঞ্চুষ চকোলেট বাক্সের সোনালি রাংতায় মোড়া।

কিন্তু তা হচ্ছে যা লি-তাও-শিহ এককালে বলত। চিউ-ইয়ে সম্বন্ধে ঐ ধরণের মন্তব্য করবার সাহস এখন আর কারো নেই। লি-তাও-শিহ্-এর সুরও ইতিমধ্যে বদলে গেছে : "চিউ-ইয়ের আংটিটা কিন্তু একেবারে নিখাদ সোনার।"

এবং শুধু তাই নয়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সেই সঙ্গে সে-ই আবার বলবে : "কি আকালই পড়েছে এ ক' সন। তবু চিউ-ইয়ে ছিল তাই রক্ষে ডাকাতদের হাত থেকে আমরা বেঁচে গেছি। সে না থাকলে যে কি হোত···"

"চিউ-ইয়ে লোক মোটেই সুবিধের নয়। আগে ত' সে ছিল···"

কিন্তু আগে তাকে নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামাত না এবং সে কি ছিল তাই নিয়ে এখনও কেউ মাথা ঘামায় না। আস্তে আস্তে সে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে : বেশ কিছু সাঙ্গোপাঙ্গও জুটে গেছে তার, আর জেলার আবগারী ব্যবসা ত' তারই একচেটিয়া।

এ অঞ্চলের সিপাইরাও ত' তার হুকুমেই চলে।

চিউ-ইয়ে অত্যন্ত চতুর লোক—সাধে কি আর মহামান্য মিঙ বাহাদুর তাকে এত বিশ্বাস করেন। নামেই শুধু তিনি সিপাইদের কর্তা। তা না হলে সব কিছুরই ভার চিউ-ইয়ের উপর।

"আমার হাতে সব ছেড়ে দিন," বুক চাপড়ে চিউ-ইয়ে হয়ত বলবে, "ভাববেন না কিছু। এ জেলার সব কিছুর জন্য আমি দায়ী রইলাম।"

এবং সে মোটেই বাক্‌সর্বস্ব নয়। জেলার মেয়ে-পুরুষ কাউকে নিয়েই তার বেগ পেতে হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ অবাধ্য জানোয়ার ইয়াং ফাশিনকে শায়েস্তা করতে তার পলমাত্র দেরি হয়নি, আর তার বৌকেও নিয়েও কিছুমাত্র হাঙ্গামা পোহাতে হয়নি তাকে। ফাশিন-বৌয়ের সঙ্গে কথা বলতে চিয়াং-সানকে একবার শুধু পাঠাবার ওয়াস্তা—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চিউ-ইয়ের সামনে বৌ হাজির।

চিউ-ইয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে, মুখখানা আস্তে আস্তে তার কাছে নিয়ে গেল। তার দুই চোখ ঘোলাটে লাল, বাঁ দিকের চোখ ছোট হতে হতে ডান দিকের তুলনায় অর্দ্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে।

তার মুখের দিকে তাকাবার সাহস ফাশিন-বৌয়ের হল না : কোটের বোতামেই তার চোখ আটকে রইল।

হঠাৎ একটা হাত তার কাঁধ চেপে ধরল, একটা ঠাণ্ডা চিমটে যেন কেটে বসল তার গালে।

"না, না···"

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ফাশিন-বৌ দরজার দিকে সরে গেল।

চিয়াং-সান মদের পাত্রটি মুখে তুলছিল, হঠাৎ বিষম খাওয়ায় আর একটু হলেই হাত থেকে সেটা উল্টে পড়ছিল!

চিউ-ইয়ের ভুরু কুঁচকাল, ডান চোখের আয়তনও ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। তার গলা চিরে এক আওয়াজ বেরুল—এঃ···!

সত্যি সত্যিই এ রকম বাধা চিউ-ইয়ে বহু দিন পায়নি।

ফাশিন-বৌ কাঁপতে-কাঁপতে বলে উঠল: "আমায় দয়া করুন চিউ-ইয়ে, আমায় দয়া করুন···"

"এ কি, এ কথা ত' ছিল না···"

"চিউ-ইয়ে, হুজুর দয়াবতার···"

চিয়াং-সান বিবেচনা করে দেখল এতক্ষণে অনেক হাসা হয়েছে তার। কিছুটা মদ গিলল সে, তার পর হাতের উল্টো দিক দিয়ে মোটা ঠোঁট দু'টো মুছতে মুছতে আড়চোখে চিউ-ইয়ের মুখের দিকে তাকাল। ভাবতে লাগল, "এ ত' ঠিক হচ্ছে না, এ ত' ঠিক হচ্ছে না···"

চিউ-ইয়েকে সে জানত; বাধা-বিপত্তি চিউ-ইয়ে পছন্দ করে না। নিজের মঙ্গল যদি ফাশিন-বৌ না বোঝে ত' তার জন্য ফল ভোগ করতে হবে অথচ চিয়াং-সানকে।

"ও ফাশিন-বৌ, শোন শোন"—চিয়াং-সান উঠে তার কাছে এগিয়ে গেল।

ফাশিন-বৌয়ের মুখ একেবারে ম্লান হয়ে গেছে।

"ভেবে দেখো ফাশিন-বৌ, ভেবে দেখো। আমি বলি চিউ-ইয়ের কথা একটু শুনলেই না হয়—তবেই না···"

হেঁচকি তুলে আড়চোখে চিউ-ইয়ের দিকে আরেক বার তাকাল সে।

"সুম্‌সুম!"

চিউ-ইয়ের নাক দিয়ে যে আওয়াজ বেরুল সেটা তার গলা-খাকড়ি, আবার কিছুটা তাচ্ছিল্য জ্ঞাপনের জন্য বটে।

"যা হচ্ছে তা ত' ওরই ইচ্ছেয়। আমায় দেখলে মনে হয় কি যে দরকার মত মেয়েছেলে আমার জোটে না? না, ওর জন্যই···"

সত্যি সত্যিই, চিউ-ইয়ের কাছে আর ফাশিন-বৌয়ের কি-ই বা দাম? এমনিতেই তার তিনটে মেয়েলোক আছে, সহরে নাম-লেখানোর সংখ্যাও তার কম নয়, তা ছাড়া মাঝে-সাঝে কেনাকাটি ত' আছেই। তার কাছে ফাশিন-বৌয়ের যেটুকু মূল্য তা কেবল সে নতুন বলে এক···"

"আর ইয়াং ফাশিনকে আমি দেখিয়ে দেবো। আমি, চিউ-ইয়ে, তাকে কি না করতে পারি। শালা চাষার সাহস কত? আমাকে তোয়াক্কা করে না। আচ্ছা, দেখাবো এখন শালাকে। সাজা ত' ব্যাটার হবেই তার উপর ওর শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিয়ে তবে ওকে আমি ছাড়ব। হাড়ে-হাড়ে শালা বুঝবে আমার সঙ্গে লাগতে আসার ফল!"

কিন্তু সেই মুহূর্তে ফাশিন-বৌকে দরজায় তার ঘামওয়ালা হাত রাখতে দেখা গেল, সে চলে যাচ্ছে।

চিউ-ইয়ে বসে পড়ল, ডান চোখ নাচতে লাগল তার। তার শরীরের ছায়ায় সমস্ত ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

ঘরের তৃতীয় ব্যক্তি প্রথমে তাকাল চিউ-ইয়ের দিকে, তার পর ফাশিন-বৌয়ের দিকে। হেঁচকি উঠে কি যেন গলা দিয়ে উঠে এল তার, কিন্তু আবার তা গিলে ফেলল সে।

"ভাল করে ভেবে দেখো তুমি কি করছ ফাশিন-বৌ, ভেবে দেখো কি করছ। চিউ-ইয়েকে চটানো তোমার উচিত হবে না—"

শোনা মাত্র দরজা খুলে ফাশিন-বৌ বেরিয়ে গেল।

চিয়াং-সান তক্ষুনি পিছু-পিছু ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলল: তুমি পালিয়ে গেলে চলবে না, তুমি পালিয়ে গেলে চলবে না!"

তার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল ফাশিন-বৌ।

"এ কি হচ্ছে!" চিয়াং-সান তাকে সতর্ক করতে থাকে, "কি চাও তুমি—ফাশিন বেঁচে থাকবে, না, মরবে? বল—বাঁচাতে চাও, না, মারতে চাও তাকে?"

উত্তরে চুপ-চাপ ফাশিন-বৌ দম নিতে লাগল।

"তুমি ত' চিউ-ইয়েকে জানো।" চিয়াং-সান তার কানের কাছে চার পাশে মদের ঝাঁজ ছড়িয়ে বলল, গলা খাটো করে বলা সত্ত্বেও সে কথা তার কানে ঢাক-পেটানোর মত লাগল। "চিউ-ইয়ে ফাশিনকে ধরিয়েছেন, তাঁরই হাতে এখন ফাশিনের জীবন। যদি তুমি অবুঝ হও···"

"কিন্তু এ যে, এ যে···"

"শোন, শোন, আগে আমার কথা শোন।"

চিয়াং-সান একবার চার দিকে চোখ মেলে দেখে নিল কেউ শুনছে কি না। হঠাৎ হেঁচকি তুলে ভয়ে নিজেই চমকে উঠল। তার পর ডান হাতে মুখ চেপে রইল কিছুক্ষণ।

"ফাশিনকে চিউ-ইয়ে ডাকাত বলে শাস্তি দেওয়াবেন। আমি বলছি তিনি তা দেওয়াতে পারেন···সে ক্ষমতা তাঁর আছে···"

ফাশিন-বৌ কেঁদে উঠল: "কিন্তু সে ডাকাত হতে যাবে কেন?"

"চুপ করো, চেঁচিও না।"

একটুক্ষণ চুপচাপ থেকে চিয়াং-সান ধীরে ধীরে বলল, "আমার কথাটা আগে শোন। মহামান্য মিণ্ডকে চিউ-ইয়ে এ কথা বলতেন প্রায়ই যে চাষারা আজ-কাল আইন-কানুন মানে না, আর তাদের নেতা হল গিয়ে ফাশিন। হ্যাঁ, চিউ-ইয়েই এ কথা মহামান্য মিণ্ডকে বলেছেন। হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়ছে। সে দিন ফাশিন সত্যি সত্যিই চিউ-ইয়ের কথার মুখে মুখে উত্তর করেছিল, গাল দিয়েছিল, মারবে বলে ভয়ও দেখিয়েছিল চিউ-ইয়েকে; সেই জন্যই ত' চিউ-ইয়ে বলে ওকে ধরিয়েছেন। ফাশিন এখন তার অপরাধের জন্য ফলভোগ করছে। এখন যদি তুমি চিউ-ইয়ের কথা শোন, তাহলে চিউ-ইয়ে বলে-কয়ে ফাশিনকে ছাড়িয়ে আনবেন। আমি বলছি। যদি তুমি শুধু এখন···"

ফাশিন-বৌয়ের মুখ লক্ষ্য করতে লাগল চিয়াং-সান।

দরজার এক ফাঁক দিয়ে এক ঝলক আলো এসে পড়ল ফাশিন-বৌয়ের উপর। "ভেবে দেখো," আবার বলল চিয়াং-সান।

আস্তে আস্তে দরজার দিকে তাকাল ফাশিন-বৌ।

ভিতরে এখন চিউ-ইয়ে কি করছেন? হয় ত' চুপ-চাপ মদ খাচ্ছেন, হাসছেন অকারণে আর চোখ পাকাচ্ছেন। কিম্বা হয় ত' তিনি ভয়ানক রেগে গেছেন, ফাশিনকে নির্মম যন্ত্রণা দেবার, ডাকাতি দায়ে ফেলে তার গলা কাটবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করছেন মনে মনে।

তার পর, তার পরের দিন গাছের ডালে ঝুলবে ফাশিনের মাথা আর মহামান্য মিণ্ড চিউ-ইয়েকে এক ভোজ দেবেন, তার পিঠ

পড়ে বলবেন—"কাজের মত কাজ করেছ বটে! সমস্ত জেলাকে
ঃ ভয়ানক উৎপাতের হাত থেকে বাঁচিয়েছ তুমি।"

ফাশিন এবং মহামান্য মিত্রের শত্রুতা আজ বহু দিনের।

আর তার পর তারা সমস্ত পরিবার, তার অন্ধ বধির শাশুড়ী,
র দুই বাচ্চা ও সে নিজে, তারা সবাই একসঙ্গে···

চিয়াং-সান জানত ফাশিন-বৌ এ সব কথাই ভাববে। হেঁচকি
ল আবার তা গিলে ফেলে বার-বার সে ফাশিন-বৌকে বলতে
গল: "ভাল করে ভেবে দেখো তুমি। কথা শোনো আমার।"

চিয়াং-সান অপেক্ষা করতে লাগল। ফাশিন-বৌয়ের একটু নরম
ার লক্ষণ দেখলেই চিউ-ইয়ের কাছে গিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার
র জানবে সে।

কিন্তু ফাশিন-বৌ শুধু ঠোঁট কামড়াতে লাগল, মুখ দিয়ে তার
ান কথা বেরুল না।

হঠাৎ ঘর থেকে কোন একটা ভারি জিনিসের পতনের আওয়াজ
া, তারা দু'জনেই চমকে উঠল তাতে।

দু' জোড়া চোখই দিকে তাকাল দরজার
ক, আবার কোন আওয়াজ হবে কি না
জানে।

কিন্তু আর কোনো আওয়াজ এল না, সব
।।

হাতের উল্টো দিক দিয়ে মুখ মুছে অত্যন্ত
্বাস ভরেই যেন চিয়াং-সান ফাশিন-বৌয়ের
খে আবার কথা আরম্ভ করল। সতর্ক
ার জন্য আওয়াজের ঐ সংকেতের পর আর
র দেরি করা চলে না। তাছাড়া
উ-ইয়েও যে যথাকালে সেখানে পৌঁছ-পাঁ
ন না এ কথাও ফাশিন-বৌকে জানিয়ে
য়া দরকার।

"টাকা-কড়ি চিউ-ইয়ের কাছে কিছুই
।"

সে জানতে চাইল এ কথা সত্যি কি না।
ফাশিন-বৌয়ের এখন টাকার প্রয়োজন
ং প্রশ্নের উত্তরে হেঁচকি তুলে যেন নিজেই
্তি জানাল তার।

"তোমার এখন পয়সা-কড়ির অভাব
ক কি না?"

ঠিক অবশ্যই: ফাশিন-বৌয়ের অবস্থা
ানে সে। তার দুই বাচ্চা খাবারের জন্য
পেক্ষা করছে, মার জন্যে কেঁদে কেঁদে
দের গলা ঘর্ঘড় করছে এতক্ষণে!

তার দু'বছরের বাচ্চা মেয়েটিকে যেন
শিন-বৌ দেখতে পাচ্ছে মাটিতে হামা
ে, তার নাক ঝরছে আর মুঠো-মুঠো
লা খাচ্ছে সে। তার উপর রয়েছে তার
ী শাশুড়ী, সারা দিন নিজের মনে কি
ক তা এক সে-ই জানে। তার পেট
ভরাতে হবে, এখনও বুড়ি জানে না তার ছেলেকে ধরে নিয়ে
গেছে, আইন অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করছে সে।

সিপাইদের ঘাঁটিতেও ফাশিন-বৌয়ের অর্থের প্রয়োজন। সামান্য
কিছু টাকা উপযুক্ত হস্তে পড়লে ফাশিনের কষ্টের কিছু লাঘব হতে
পারে।

চিয়াং-সান দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ফাশিন-বৌকে এ সব কথাই ঠিক মত
ভেবে দেখবার জন্য সে বলতে লাগল।

"ভাল করে ভেবে দেখো, ভাল করে ভেবে দেখো," মহামান্য মিত্রের
করুণ কণ্ঠস্বরেরই অনেকটা অনুকরণ করতে লাগল সে, বছর কয়েক
আগে দুর্ভিক্ষের ভুখা আশ্রয়প্রার্থীদের জেলা ছেড়ে যাবার জন্য
এমন ভাবেই তিনি বলেছিলেন, যেন যে কোন মুহূর্তে তাদের দুঃখে
তিনি কেঁদে ফেলবেন।

"তোমায় দেখলে দয়া হয়, বড় দুঃখ তোমার, হ্যাঁ, সত্যি তোমার
বড় কষ্ট···" সে এমন ভাবে মাথা নাড়াতে লাগল যেন ক্ষোভে-দুঃখে

সে মাথা আর তুলতে পারছে না। "যা হোক চিউ-ইয়ে ফাশিনকে বাঁচাতে রাজি হয়েছেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফাশিনকে বাঁচাবেন তিনি, আমি বলছি। এখন যদি তুমি রাজি হও এবং তাঁকে ভালো করে খাতির করো তা হলে চিউ-ইয়ে তোমায় টাকাও দেবেন, তোমার ফাশিনকেও উদ্ধার করবেন। আর যদি তুমি তার কথা না রাখো, তা হলে···"

তা হলে আর কি? চিউ-ইয়ে নির্মম হবেন এবং সব কিছুরই সেই সঙ্গে সমাপ্তি ঘটবে।

ফাশিন-বৌ কেঁপে উঠল সে কথা ভাবতে গিয়ে। ভীত চোখে সে ঘুরে তাকাল, তার পর আস্তে আস্তে ঘরে গিয়ে উঠল।

"চিউ-ইয়ে, চিউ-ইয়ে, ফাশিন একেবারে নির্দোষ। ও শুধু··· আপনি দয়া করুন হুজুর, ওকে ছেড়ে দিন···"

বিজয়ীর মতন চিউ-ইয়ে বলল: "হে, হে, জানি তুমি ফিরে আসবে। আমি ঠিক জানি। কিন্তু এমন মুখ গোমড়া করে কেন? মুখের ভাবটা তোমাকে একটু মিঠে করতে হচ্ছে যে।"

দরজার দিকে একবার চাইল চিউ-ইয়ে, সেখানে চিয়াং-সান দাঁড়িয়ে। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য মুখে কিছু না বললেও মনে মনে যে চিউ-ইয়ে তাকে বাহবা দিচ্ছেন এ কথা বুঝতে চিয়াং-সানের অসুবিধে হল না।

ফাশিন-বৌয়ের মুখ ম্লান, তার দু'চোখ জলে ভরে এসেছে।

"দয়া করুন হুজুর। আপনার দেবতার ঐ হাতে ফাশিনকে মারবেন না, ওকে ছেড়ে দিন। তার বদ-মেজাজের জন্যই সে আপনাকে চটিয়ে ফেলেছে হুজুর। সে···এক জন নগণ্য চাষা মাত্র······"

"একটা চুমু দাও দেখি!"

দেয়ালের উপর বিরাট ছায়ায় দু'টো কয়লা দেবার বেলচে আস্তে আস্তে উঠছে দেখা গেল—ফাশিন-বৌয়ের মুখখানা চিউ-ইয়ে দু'হাত দিয়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে।

নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা সে করল না। তার গাল বেয়ে চোখের ধারা নেমে এল, প্রদীপের আলোয় তা চিকচিক করতে লাগল।

"এ হে হে।" অপেক্ষাকৃত কম কর্কশ ভাবেই চিউ-ইয়ে আপত্তি করে উঠল। "যতক্ষণ এখানে আছ, কাঁদলে চলবে না। তোমার কি ধারণা, ঐ বেগুন-বেচা মুখের জন্য আমার রোজগারের টাকা খরচ করব আমি? তুমি যেমন চাও টাকা, আমি তেমন চাই ফুর্তি। এখন হাসো ত' দেখি!"

দরজায় দাঁড়িয়ে চিয়াং-সান দু'জনের উপর নজর রাখছিল, কারো সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হলেই চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল সে. মন দিয়ে শুধু মাটিতে পা ঘষছিল তখন। এদের মধ্যে সে আর কথা বলবে না চলে যাবে, সে ভাবতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এক দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল: হ্যাঁ, ফাশিন-বৌ। ভাল করে ভেবে দেখো, আমার কথাগুলি ভাল করে চিন্তা করে দেখো।"

ফাশিন-বৌ সে কথায় কান দিল না। চিউ-ইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

"চিউ-ইয়ে, দোহাই চিউ-ইয়ে···"

"উঁহু, উঁহু, ও সব চলবে না। হাসি দেখতে চাই, আমার দিকে চেয়ে হাসতে হবে, হাসো!"

"চিউ-ইয়ে, আপনি···"

"উঁহু, আগে হাসি দেখতে চাই।"

চিয়াং-সান চিরকালই চিউ-ইয়ের অত্যন্ত আস্থাভাজন, চতুর লোক সে, চিউ-ইয়ের মনের কথা বুঝতে তার দেরি হয় না। জরুরী কাজের জন্য বুকখানা ফুলিয়েই নিজেকে তৈরি করে নিয়ে দাঁড়াল সে: "হাসো না ফাশিন-বৌ। হাসতে ত' আর খরচা নেই। দয়া করে একবার হাসো, একটি বার। ভাল করে ভেবে দেখো···"

ঢেকুর গিলে মুখ মুছে আবার কথা বলবার আগেই চিউ-ইয়ে বাধা দিল তাকে—"হাসি চাই। হাসতে হবে তোমায়। আর কিছুতে চলবে না।"

মিনিট খানেকের থমথমে ভাবের পর দাঁত বের করে ফাশিন-বৌ জোর করে মুখে একটু হাসি টেনে আনল, আর সেই সময় বড় এক ফোঁটা অশ্রু তার মুখের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল।

তার সিক্ত গাল টিপে ধরলে চিউ-ইয়ে: "এই ত', এই ত' বেশ!"

হাসিমুখে চিয়াং-সান ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল, ভাল ভাবেই আজ কায গুছিয়েছে সে। দরজার ফাঁক দিয়ে কিছুক্ষণ উঁকি দিল সে, তার পর নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

"চিউ-ইয়ে ওকে কত পয়সা দেবে?" নিজেকেই জিজ্ঞাসা করল সে। যাই বল সহুরে জিনিষের কাছে গেঁয়ো জিনিষ লাগে না; খুব বেশি পয়সা লাগা উচিত নয় ফাশিন-বৌয়ের জন্য।

পয়সার কথাই অবিশ্যি এ ক্ষেত্রে ওঠে না। চিউ-ইয়ের আসল উদ্দেশ্য হল ইয়াং ফাশিনকে হেয় প্রতিপন্ন করা। কাল ভোরে উঠেই সে, স্বয়ং চিয়াং-সান ইয়াং ফাশিনের কাছে যাবে, তাকে গিয়ে সব শোনাবে।

"ঠিক আছে! চিউ-ইয়েকে চটিয়ে যদি পার পাবি ভেবে থাকিস, তবে চটা চিউ-ইয়েকে।···এখন শোন, তোর বৌ পর্যন্ত চিউ-ইয়ের কাছে যাতায়াত করছে···শালা ডাকু কাঁহাকা···"

এর চেয়েও কড়া কিছু ভাববার চেষ্টা করতে লাগল সে কিন্তু আর কিছু ভেবে পেল না। আর ডাকাতদের ত' বাঁধা শাস্তি, ফাশিনেরও ধড় থেকে মাথা কাটা যাবে। চিয়াং-সান আগাগোড়াই ভাল ভাবে জানে ইয়াং ফাশিনকে ছাড়বার চিউ-ইয়ের কোন অভিপ্রায়ই নেই, আর অত খাতির দেখিয়েও ফাশিন-বৌ তার স্বামীকে বাঁচাতে পারবে না।

"জেলার মধ্যে ও-রকম ডাকাত কখনো রেখে দেওয়া যেতে পারে, যে কেউ বলুক?"

হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় উঠে চিয়াং-সান ফু দিয়ে বাতিটা নিবিয়ে দিল। সহসা সে ইয়াং ফাশিনের ছায়া দেখতে পেল। তার সমস্ত দেহভর্তি রক্তাক্ত লাল আঘাতের চিহ্ন, ওলায় পা দু'টো দুমড়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে, জাঁতায় সে দু'টো যেন গুঁড়ো করা হয়েছে।

"আমাকে ভয় দেখাতে আসিস না" শান্ত কণ্ঠে চিয়াং-সান বলল।

শিগগীরই মৃত্যু হবে বলে ফাশিনের আত্মা দেহ ছেড়ে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছে! কিন্তু এর জন্য আর কারুকে সে দুষতে পারে কি?

"ভাল কাজের জন্য পুরস্কার আছে, খারাপ কাজের জন্য আছে শাস্তি। এই হচ্ছে নিয়ম···আমি বলছি। চিউ-ইয়েকে চটাতে কে বলেছিল তোকে? বে-আইনি কাজই বা কেন করতে গিয়েছিলি তুই?"

চিয়াং-সান স্মরণ করতে লাগল পয়সা-কড়ি ছিল না বলে কেমন ইয়াং ফাশিন সিপাই পোষবার জন্য তার উপর ধার্য কর দিতে অস্বীকার করেছিল। চিয়াং-সানের সাথে সে তর্কও করেছিল এবং

যে ঘুষি সে মেরেছিল তার জন্য এখনো তাঁর পাঁজরায় ব্যথা আছে।

"এবার, এবার কি ?

শুধু বিবেকে সে চোখ অবধি টেনে চাদরে ঢাকা দিল।

বাইরে কোথায় একটি স্ত্রীলোক তার মৃত শিশুর ভ্রাম্যমান আত্মাকে আহ্বান করছিল। অস্বাভাবিক, অমানুষিক তার কণ্ঠস্বর, শুনলে চুল খাড়া হয়ে ওঠে।

একটি কুকুরের আর্তনাদ শোনা গেল, সে আওয়াজ যেন কোন আসন্ন সর্বনাশের সতর্কবাণী।

কি সময়ই পড়েছে আজ-কাল: চিউ-ইয়ের মত চতুর লোকের হাতে থাকা সত্বেও জেলা মোটেই শান্তিপূর্ণ নয়। মহামান্য মিঙের খালি ভয়, কখন কি হবে।

যে বাড়িতে সে শুয়ে সেখানেও অখণ্ড শান্তি নেই। চিউ-ইয়ের ঘরের আর্তনাদ ও ধমকের আওয়াজে রাত্রে দু'বার তার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

সকালে যখন চিয়াং-সান উঠল, ফাশিন-বৌকে ছেড়ে দেবার জন্য তখন চিউ-ইয়ে তৈরি। ঝুলি থেকে একটা রূপোর ডলার বের করে চিউ-ইয়ে নিজের হাতে নিল।

"হাসো ত' ফাশিন-বৌ। এটা নেবার আগে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হবে তোমায়—বাঃ, এই ত' বেশ।"

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চিয়াং-সানের দিকে তাকিয়ে চিউ-ইয়ে ডলারটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিল।

ডলারটা তুলে নিতে গিয়ে ফাশিন-বৌয়ের হাত কাঁপতে লাগল।

"টাকাটার জন্য ধন্যবাদ জানাও চিউ-ইয়েকে," চিয়াং-সান শিখিয়ে দিল।

কিন্তু তার বদলে হঠাৎ ফাশিন-বৌ হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল, তার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল কান্নার ধমকে।

"উঁহু-হুঁ," চিউ-ইয়ের দুই ঠোঁট শক্ত হয়ে এল, ডান চোখ আবার নাচতে লাগল।

"কারু কান্নাকাটি দেখতে আমার বাপু ভাল লাগে না। কান্না থামাও এখানে।"

ফাশিন-বৌ ঘরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই চিউ-ইয়ে কাঁধ ধরে তাকে আকর্ষণ করল: "এসো দেখি একবার···"

দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল ফাশিন-বৌ।

চিউ-ইয়ে লাফিয়ে উঠল। "ও রকম করলে চলবে কেন—ভুলে যেও না আমি তোমার জন্য একটি পুরো ডলার খরচা করেছি। চিউ-ইয়ের বিরুদ্ধে কিছু করে যে পার পাওয়া যায় না, এ কথা জানতে হবে তোমায়।"

কাছে টেনে নিয়ে তার উরুতে চিউ-ইয়ে একটা চিমটি বসিয়ে দিল।

ফাশিন-বৌ আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল। দ্বিতীয় বার চিমটি বসাতে আর চিৎকার করলো না সে, শুধু আঁতকে উঠল আরেক বার। তার পর শেষ-মেষ তার গালেও দু'টো থাবড় বসিয়ে দিল চিউ-ইয়ে, দু' যায়গায় কালসিটে পড়ে গেল তার মুখে।

"বেরিয়ে যাও!" বলে চিউ-ইয়ে এমন ধাক্কা দিল হোঁচট খেতে খেতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ঘরের মধ্যে তখন দু'জনের হাসির ধুম পড়ে গেছে।

"তাহলে চিউ-ইয়ে পুরো এক ডলার খরচা করেই ফুর্তি করলেন···"

"এ সেই ডলার যেটা য়্যা-পায়ের ছিল।" বোতাম লাগাতে লাগাতে চিউ-ইয়ে আবার না হেসে পারল না—তার নোংরা অসমবদ্ধ দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ল আর ভীষণ ভাবে নাচতে লাগল তার চোখ। "বদলে নেবার জন্য ওকে ফিরে আসতে হবে আবার!"

চিউ-ইয়ে মিথ্যে বলেনি। সেদিন বিকেলে চিউ-ইয়ের খোঁজে ফাশিন-বৌ গেল চায়ের দোকানে—ডলারটা বদলে নেবার জন্য।

"হুজুর দয়া করে এটা বদলে আরেকটা ডলার আমায় দিন। এটা ভাল নয়······"

ছাইয়ের মত তার মুখ সাদা, কালসিটেগুলি দগদগে হয়ে উঠেছে।

চিউ-ইয়ে প্রথমে তাকে দেখে নিল, তার পর চায়ের দোকানের সব ক'টা মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে উঁচু গলায় বলল: "কেন?"

"এটা পেতলের। এটা আমি সবাইকে দেখিয়েছি:···"

"বলি, হঠাৎ একটা ডলার তোমাকে আমি দিতে গেলাম কেন?"

চিউ-ইয়ে আবার চার দিকে একবার তাকিয়ে নিল।

ফাশিন-বৌ ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। দাঁতে দাঁত চেপে টেবিলের কোণা ধরে ঠিক হয়ে দাঁড়াল সে।

"সে ডলারটা আজ সকালে আপনি দিলেন···"

শুনে চারি দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে চিউ-ইয়ে হাসল।

"আমি, চিউ-ইয়ে, তোমাকে একটা ডলার কি জন্য দিতে গেলাম শুনি? কি ব্যাপারে দিলাম? তোমার কাছে কিসের ঋণ ছিল আমার? সবার সামনে সেটা বলো, আমি এখনি তোমাকে ডলারটা বদলে দিচ্ছি!"

শুনে দোকানশুদ্ধ সবাই হাসতে লাগল।

"বলই না, হঠাৎ চিউ-ইয়ে কেন তোমায় একটা ডলার দিতে গেলেন?"

"এ পিরীতের লেন-দেন—এ লেন-দেন ভালবাসার। চিউ-ইয়ে নিশ্চয়ই···"

"একটা কোন কারণ নিশ্চয়ই আছে, না চিউ-ইয়ে? হা, হা- হা।"

"গেঁয়ো জিনিসের উপরও চিউ-ইয়ের নজর আছে দেখছি! হুঁ-হুঁ?"

"যেমন স্বামী, তেমনি বৌ," চার দিক্ চেয়ে এক বুড়ো মত জাহির করল এবং হাসি-ঠাট্টার মধ্যে যাতে সকলে শুনতে পায় সে জন্য সাত বার সে কথা আবৃত্তি করে শোনাল।

"ইয়াং কি যেন নাম ওর স্বামীর?"

"ইয়াং ফাশিন।"

"আজ-কাল দেখছি চাষাগুলিও এক এক জন হয়ে উঠেছে। সে ব্যাটা···"

চিউ-ইয়ে বাধা দিয়ে বলল: "ওয়াং-বাড়ির ডাকাতিতে সে ব্যাটা ছিল।"

"চমৎকার জুটি মিলেছে! স্বামীটা ডাকাত, বৌটা বেশ্যা।"

সবাই যেন একসঙ্গে এক গলায় হাসতে লাগল: চায়ের দোকানে এত ফুর্তি এর আগে কখনো জমেনি।

"বলুন চিউ-ইয়ে! এক রাত্রে কত নেয় ও?"

"কেন হে! চিউ-ইয়ের উপরে দর দেবে না কি?"

আত্মঘাতী

কানাই সামন্ত

জাগ্রততা কারণায়।

অভ্যাস শৃঙ্খলবদ্ধ অস্তিত্বের কোনো অর্থ নাই।

অদৃশ্য কালের চক্র-আবর্তনে ঘোরে এ বিশ্বের

আদি-অন্তে-দন্তে-দন্তে বাঁধা অগণিত চক্রপুঞ্জ—

ফিরে ফিরে নূতনের ছলে আনে চির পুরাতনে

ক্ষণজীবী নরের ক্ষণিকতম মোহের আবেশে।

সেই সূর্য, সেই শশী, দিবারাত্রি, ঋতুর পর্যায়,

জন্ম-মৃত্যু, লাভ-ক্ষতি, হৃদয়ের দ্বন্দ্ব-আন্দোলনে—

সুখ-দুঃখ, আশা শঙ্কা, প্রণয়-বিরাগ, অবশেষে

নৈরাশ্য বিষাদ আর ব্যর্থতার বোধ জীবনের,

কিম্বা নিরর্থক স্বর্গ-নরক-কল্পনা—মরুভূমে

বালু-ঝঞ্ঝ-বিরত পক্ষীর ন্যায় নয় অভিপ্রায়

অন্ধতার।

অনাহূত আগন্তুক প্রাণ ও চেতনা

আকস্মিক—নিশ্চেতন ভুবনের মৈত্রী বা করুণা

কোথা পাবে? নিম্নগামী জড়ের এ প্রপাত-পতনে

উন্মার্গ-উন্মুখ ক্ষুদ্র জীবকণা যুঝে কতক্ষণ

কোথা যাবে? সে তো জড় নয়। তাই অবসাদ, ক্লান্তি,

ক্রমে শত জীর্ণতার দীর্ণতার দাগ: পরিণামে

মৃত্যু-মূর্ছা।

মৃত্যু যদি জীবনের শব পরিণাম

তবে ব্যর্থ বিড়ম্বনা সুদীর্ঘ করিয়া কিবা লাভ?

যদি ক্ষীণ ক্ষণ-আলিঙ্গনে শূন্য মাত্র ভোগ করি

জেগে থাকে জীবনের রঙিন বুদ্বুদ, এখনি সে

ফেটে যাক্। বিশ্ব হোক নিয়ম-শৃঙ্খলে বাঁধা—ধিক্,

মতিমান্ নর, তারো যদি বাসনা বেদনা সব

সূক্ষ্মতম ভাব অনুভূতি যান্ত্রিক—যান্ত্রিক—তবে

এ যন্ত্রণা সহ্য নাহি হয়।

সীমা যে সহে না প্রতি

নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে। জ্ঞানে সীমা, কর্মে সীমা, ইন্দ্রিয়ের

অনুভবে সীমা। হায়, ব্যক্তিত্বের সীমা নিদারুণ!

প্রতিবন্ধী নভোনীল, বনের সবুজ। প্রেয়সীর

স্মিতমুখমুদিত-পদ্মেও নিষ্প্রবেশ উড়ে উড়ে

ঘুরে ঘুরে মরে দর্শ স্পর্শ আস্বাদ আঘ্রাণ ভ্রান্তি

প্রবঞ্চিত প্রলুব্ধ ভ্রমর। আকাঙ্ক্ষিত মিলনের

বাসরশয্যায়—মিশে যবে মধুর মদির তপ্ত

শ্বাসে শ্বাস, অঙ্গে অঙ্গ আসঙ্গের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা

সব করে গ্রাস, রভসের সুখঅবসাদস্বপ্নে

তখনি কে করেনি স্মরণ একান্ত বিষাদে: হায়,

মুহূর্তের তরে প্রাণ নিঃশেষে মেশেনি প্রাণান্তরে;

সুধাময় নাস্তিত্বসাগরে কূল থেকে স্পর্শ করা

বিন্দু মাত্র বারি।

অস্তিত্বে কে সুখ লভিয়াছে কবে?

ইন্দ্রিয়ের অনুভবে জ্ঞানে প্রেমে শক্তিতে সত্তায

সীমা হায়! সীমা! শুধু সীমা!

তাই আমি আত্মঘাতী।

স্বর্গসুখ আশা কিম্বা নরকের ভীতি মনে নাই।

আমি সেই চিরন্তন সেই মৃত্যুঅন্ধকার যার

হেথা-সেথা জ্বলিয়া নিবিয়া আয়ুঃক্ষীণ খদ্যোতিকা

জীবজন্মমরীচিকা স্ফুরিতেছে, অন্য কিছু নয়।

মগ্ন হলে সেই মৃত্যু-প্রান্তরে—পাথারে—সুখদুঃখ-

আশানৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব-অবসান চেতনার সাথে,

নিত্য প্রভাতে প্রভাতে জাগিবার এ বিড়ম্বনার

অবসান।

অথবা নির্বাণ হয় যদি পূর্ণতার

পূর্ণ আস্বাদন: ব্যক্তিসীমা অবলুপ্ত সত্তা যদি,

লবণপুত্তলি যেন লবণাম্বুনীরে, মিশে যায়

নিখিল প্রাণীর হর্ষে শোকে? দেশকালপরিব্যাপ্ত

ছন্দের হৃদয়ে চিরতরে হারায় পৃথক্ ছন্দে

হৃদিস্পন্দ: যদি তা হারায়?···

কিন্তু এই অহেতুক

অবাঞ্ছিত জীবনের দেনা শুধু এক জন্মে যদি

শুধিবার নাই হয়—দেহ নিয়ে মন নিয়ে হেন

কর্মসূত্রে বদ্ধ হয়ে ফিরে আসি সংসার-আলয়ে

বারম্বার, হায় তবে মুক্তি কোথা পীড়িত আত্মার,

হে অন্ধ অদৃষ্ট, ওগো

অপ্রমাণ মূক ভগবান?

আবার একচোট হাসির ঝড় বয়ে গেল।

"ইয়াং ফাশিন আর চিউ-ইয়ের সাথে লাগতে সাহস করবে বলে মনে হয় না—তার বৌ পর্যন্ত বেওয়াত হয়ে গেছে···"

এক চুমুক চা খেয়ে নিয়ে হাত তুলে চিউ-ইয়ে সবাইকে চুপ করতে বলল: "ইয়াং ফাশিনের শ্রাদ্ধের পর এ বিধবা বেচারি কি করবে? এ রকম খাসা মুখ···"

"ও চিউ-ইয়ের ভোগেই লাগুক, আমার মতে চিউ-ইয়ের কাছেই থাকুক ও।"

"যদি ও আমার কাছে আসতে চায়···"

হঠাৎ একটা চায়ের বাসন বাতাসে ছুটে গেল। চিউ-ইয়ে সময়মত সরে যাওয়ায় মাটিতে পড়ে সেটা চুরমার হল।

সব ক'টা চোখ একসঙ্গে ফাশিন-বৌয়ের উপর গিয়ে পড়ল। আরেকটা বাসন সে হাতে তুলে নিয়েছিল কিন্তু চিয়াং-সান তার হাত ধরে ফেলল।

"বলি, দিনে দিনে পৃথিবীটা হল কি? মেয়েমানুষগুলি পর্যন্ত···"

ফাশিন-বৌয়ের পায়ের শক্তি হঠাৎ কমে এল, আছাড় খেয়ে পড়ল সে মাটিতে। চুনের মত সাদা ফ্যাকাসে তার মুখ, কাঁকড়ার মত সে মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরুতে লাগল।

অনুবাদক: গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

১
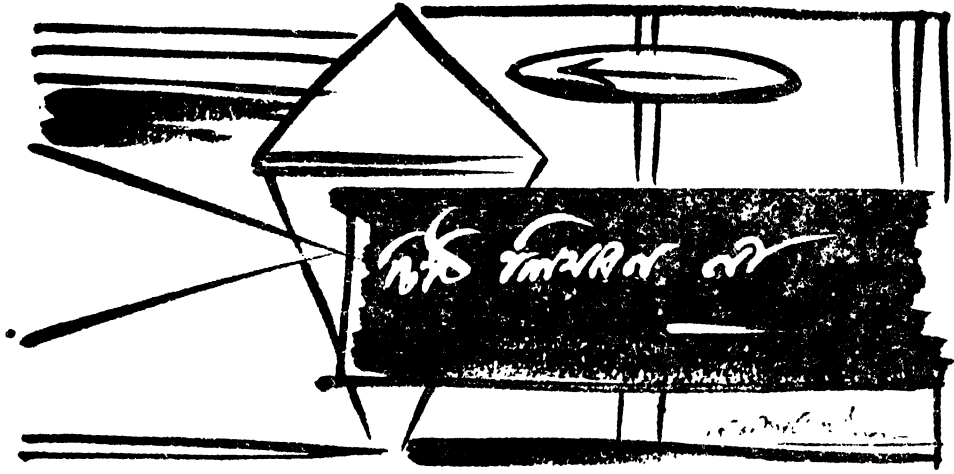
চিঠি লিখতে আমার ভারি খারাপ লাগে। চিঠি পেতেও। চিঠির জবাব দিতে আমি আশ্চর্য রকম অপটু। বাড়ীর লোকের 'পত্রপাঠ উত্তর চাই'-এর উত্তরে বেশীর ভাগ সময়েই কিছু না লিখলেও চলে। বন্ধুবান্ধবদের চিঠি লিখি নে। তারা জবাব চাইলে বিরক্ত হোই। বারম্বার বিরক্ত করলে অবশেষে চিঠি লিখেই জানাতে হয়, তাদের চিঠি পাইনি। দূর কাছে থেকে কোন চিঠি আসে না। তবে একটি ব্যাপার অবশ্য, এই ভেবে পারে যে আমি এখনও পর্যন্ত অবিবাহিত। তাতে বিনীতের চিঠি, তার জবাব দিতেই হয়। না-হলে শমন আসে। সেই "শমন" পত্র না পেয়ে পত্র-লেখককে পেতেই হয়!

তবুও চিঠি লেখার বিরাম নেই পৃথিবীতে। এর মধ্যে সব চেয়ে মজার হোল নিমন্ত্রণ-লিপি। মজার এবং ভোজনের মতো। পত্র দিয়ে নিমন্ত্রণ করা শুধু এই কথা জানাবার জন্যই যে 'পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনীয়'। অথচ পত্র না দিয়ে শুধু মুখে বললে আপনি, আমি 'কেউ যাব না'। শুধু তাই নয়, এবং তা চান না মনে মনে। তা না হলে খাদ্যাভাব-পীড়িত এই দেশে, কোন নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে যেখানে খাদ্য-অপচয়ের শেষ নেই,—সেখানেও কেউ যদি অনাহূত প্রবেশ করে ত' তাকে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। এবং প্রায়ই সে ফিরতে পারে না অনাহূত অবস্থায়।

আরো আছে। পত্রিকা-সম্পাদক যে-সব চিঠি পান লেখা মনোনয়নের জন্যে সেগুলিও মজার। তার জবাব অবশ্যই আরও মজার। কেন না, লেখাগুলি প্রায়ই না পড়েই সম্পাদক মশায়কে ফেরৎ পাঠাতে হয়। এবং হয়ত কখনো কখনো অপঠিত সেই সব জঞ্জালের মধ্যে দু'-একটি প্রতিভার স্বাক্ষর-প্রদীপ্ত রচনার অকালমৃত্যু ঘটে। পৃথিবীর সমস্ত লেখকদেরই প্রথম রচনার ইতিহাস হয়ত অনুরূপ। না হলে শরতের পাঁচ-পাঁচটি উপন্যাসও ছুঁয়ে দেখতে রাজী ছিলেন না কেন কোন প্রকাশকই।

ভক্তদের পত্রাঘাত মাঝে মাঝে দুঃসহ লাগে সমস্ত খ্যাতিমানদেরই। তাতে উচ্ছ্বাসবহুল বর্ণনায় বোনা হয় বাঁধা প্রশস্তি। অক্ষম সমালোচনা, এবং সব শেষে হাতে থাকে একটি 'সবিনয় নিবেদন'। "যদি আমার লেখা-টেখাগুলো একটু দেখে-টেখে কোথাও ছাপিয়ে-টাপিয়ে দেন।" এর জবাব দেওয়া যায় না এই জন্য যে, একান্ত ভক্তকে জানাতে কোস্তই কষ্ট হয় যে, তার লেখাগুলো নেহাতই বালসুলভ, ছাপার অযোগ্য। এদের মনে রাখা দরকার, মুদ্রিত অক্ষরে নিজের নাম দেখবার জন্যে এই সব অধীর অপলেখকদের, পৃথিবীতে যা লেখা হয় তার সবই ছাপা হয় না, আর যা ছাপা হয়, তার সবগুলিই 'লেখা' হয়ে ওঠে না।

এদের মধ্যে আবার অনেকে অকারণেই বিখ্যাত লোকদের চিঠিতে চিঠিতে উদ্ব্যস্ত করেন। মতলব: যদি কোন রকমে, "আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোর।" গোছের একটা জবাব দৈবাৎ মিলে যায়, না হলেই ত' রক্ষা নেই। পারলে বুকের উপরে মেরে ঘুরে বেড়ানোর অপেক্ষা। পাড়ায় পাড়ায় খ্যাতির শেষ নেই। চিঠি পাওয়ার দুর্লভ সুখ্যাতি। এই খ্যাতির সুদুর্লভ খ্যাতিরও সেই খাত বয়েই আসে। এমন একটি 'পত্রলোভী' মেয়ে বর্ণার্ড-শ'কে একটি চিঠি লেখেন তাঁর সই চেয়ে। শ' তাকে জানান, সই তিনি কাউকে দেন না। কিন্তু ক্রোধান্বিত বৃদ্ধকে চিঠি লিখেই এ কথা জানাতে হয়। শুধু তাই নয়, চিঠির তলায় একটা প্রকাণ্ড সই কোরে তবেই।

২

কিন্তু যে-চিঠিতে একটি হৃদয় আরেকটি হৃদয়ের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মোচিত করবার আগ্রহে উন্মুখ, সে-চিঠির পাঠক বা পাঠিকা পৃথিবীতে এক জনই। অন্য আর কারুর কাছেই তা দুর্বোধ্য। হয়ত সে পাঠ, তার কাছেও যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। তবুও,—তবুও সে-চিঠির একটি বিচিত্র রাগিনী আছে, একটি সুন্দর সৌরভ। যেখানে চিঠির অর্থের চেয়েও মূল্য বেশী। যৌবনের যে-বেদনা অত্যন্ত গভীর, অথচ তীব্র যার আনন্দ, সেই অপ্রকাশ্য দুর্নিবার আনন্দ-বেদনায় চিঠিগুলি কোথাও উত্তেজনায় অস্থির, কোথাও আঘাতের অশ্রুতে মলিন।

সে-চিঠি যে সবুজ কাগজে লেখা, তাই নয়, তা একটি সবুজ মনের সতেজ স্পর্শে সজীব। প্রায়-নিরক্ষর গ্রাম্য বধূর প্রথম যৌবনের অক্ষম পত্র-রচনার ফাঁকে ফাঁকে একটি ব্যাকুল হৃদয় বার বার উঁকি দেয়। নিজেকে সুন্দর করে সাজাবার মন্ত্র তার জানা নেই। নেই কথার কারচুপি। তবুও এক জনের কথা ভেবে সে-ভাব বিনিদ্র

রাত্রি রমণীয় হয়ে ওঠে, এ কথা লিখতে তার ভালো লাগে। ভালো লাগে আরেক জনের কাছ থেকে পেতেও। হয়ত তাতে মার্জিত মনের ছাপ নেই কোথাও। হয়ত বানানও ভুল। হয়ত বানানোও তার কিছুটা। তবুও সে-চিঠি নিজেকে উজাড় কোরে আরেক জনের মন ভরে দিয়েই খুশী। সে-খুসীর খবর জানে হয়ত নিশীথ রাত্রির সঙ্গিহীন কোন নীল তারা। হয়ত সেই খুসী বাজতে থাকে রৌদ্রস্নাত প্রভাতের প্রথম পাখীর ডাকে। অথবা কোন অলস মধ্যাহ্নে গুঞ্জরণ-ক্লান্ত কোন মৌমাছির ডানায় কাঁপতে থাকে।

৩

সাহিত্যে যাঁরা নিজেদের স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে খুব অল্পই সক্ষম পত্র-লেখক। রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলিও তাঁর রচনা। লরেন্সের চিঠিতেও একটি জীবন্ত মানুষের ছোঁয়া যেন পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমার প্রায়ই মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি যখন কাগজে ছাপা হয়, তখন যেন ব্লক করে ছাপা হয়। যদিও জানি, তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল, তবুও। তা না হ'লে ওর মাধুর্য্যই যায় মরে। চিঠি লিখতে লিখতে কোথাও অন্যমনস্কতার জন্যে কাটতে হয়েছে কথা, কোথাও পড়ে গেছে এক-আধটি অক্ষর—সব মিলিয়ে তবেই ত' পাওয়া যাবে তাঁর হৃদয়ের উত্তাপ। তা-না হ'লে অত্যন্ত নির্ভুল আর পরিষ্কার টাইপে 'পত্রে'র প্রকাশই সম্ভব, পত্র-লেখকের আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা সেখানে কোথায়?

এই সব 'সাহিত্য-পত্রে' সময়ে সময়ে দুর্লভ তথ্যেরও সন্ধান মেলে। ধরা যাক, 'সোনার তরী'র ব্যাখ্যা নিয়ে সাহিত্যের হাটে হট্টগোল বেধে গেছে। কেউ বলছেন, 'দার্শনিক তত্ত্বই ও-কবিতার প্রাণ'। কেউ বলছেন, 'ওর অর্থ বোঝা দায়।' আবার কেউ: "সোনার তরীতে কবি class struggle'-এর একটা আভাস দিয়েছেন মাত্র। অর্থাৎ গরীবদের সোনার ধানে বড় লোকেরা তার ভরে নিয়ে যায়, কিন্তু গরীবদের সেখানে 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই—ছোট সে-তরী'।" এরই মধ্যে যদি হঠাৎ এক দিন আবিষ্কৃত হয় রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি, যদি হঠাৎ প্রকাশিত হয় সোনার তরীর ব্যাখ্যা সমেত? তখন? তখন হয়ত জানা যায় কবির মনে এত কথা ছিলোই না। হয়ত রবীন্দ্রনাথ লিখছেন সেই চিঠিতে, "এই জন্যই সব সইতে পারি, কিন্তু অধ্যাপকদের কাব্য বিশ্লেষণ সইতে পারি নে।···মনেই কোরে নাও না কেন, ওটা নেহাতই প্রকৃতির একটা ছবি, তাতেই বা কী এসে যায়?"···

বলাই বাহুল্য, এ-চিঠিটা নেহাৎই কল্পিত। তবুও এ রকম ইঙ্গিতপূর্ণ কথার আভাস রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে যে মিলবে না, তা নয়, এবং সেই কারণেই চিঠিগুলি যথাযথ প্রকাশের সার্থকতা চিরকালই থাকবে।

দরকারি চিঠি লিখতেও অনেকের যেমন স্বভাবগত গাফিলতি, অনেকের কাছে আবার চিঠি লেখার চেয়েও দরকারি আর কিছু নেই। তাঁরা প্রত্যেকটি চিঠি পাবার পর-পরই তার জবাব দিতে বসেন। লাল পেন্সিলে তারিখ দিয়ে রাখেন, কবে জবাব দেওয়া হোল। জবাব সময়ে না দিতে পারলে তাঁরা অনুতপ্ত হন। কিন্তু যাঁরা রোজ রোজ হাজার হাজার চিঠি পান, তাঁরা? তাঁরা বোধ হয় সেক্রেটারী রাখেন জবাব দেবার জন্যে। উত্তর দেয় তারাই। আবার ডাকঘরের লোকদের দেখুন,—তারা যদিও লক্ষ লক্ষ চিঠি পায় রোজ—তবুও সেদিকে লক্ষ্য দেবার সময় কোথায় তাদের? পরের চিঠি পড়া তাদের অনেকের নিত্য-ব্যায়াম। কিম্বা নিত্যাকাকের ব্যায়রামও বলতে পারেন তাকে। এই ব্যায়রাম থেকেই কিন্তু রেনল্ডের 'Mysteries of the Court of London' নামে মুখরোচক উত্তেজক রচনার জন্ম।

সব চেয়ে রাগ হয় তাদের চিঠির ওপর, যাদের হাতের লেখা নেপোলিয়নের সেই বিখ্যাত সেনাপতির অনুরূপ। হয়ত তাদের অনেকেরই চিঠি লেখার হাত আছে কিন্তু তাদের হাতের লেখা এত খারাপ যে পড়া অসাধ্য। আরো দুঃসহ হ'ল বড় চিঠি পড়া। পাতার পর পাতা দৌড়তে হয়। মাঝে মাঝে দুর্বোধ্যতার দরজায় হোঁচট খাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। হোঁচট খেয়েও ক্ষান্তি নেই—কলমের কালি তাদের ফুরোয় না। এ-বিষয়ে পত্র-লেখকদের চেয়ে লেখিকারাই বেশি অগ্রসর।

মেয়েরা আবার খোদ চিঠিতে যা লেখে, তার চেয়ে ঢের বেশী লেখে চিঠির শেষে ফের পুনশ্চ দিয়ে। শোনা যায়, এমনি একটি মেয়েকে তার 'পুনশ্চ'র পুনঃ পুনঃ আক্রমণে কাতর হ'য়ে আরেক জন অনুরোধ করে সকাতরে প্রার্থনা পেশ করে, "দোহাই, যা-লিখবে, চিঠিতেই লিখো। 'পুনশ্চ' না-দিয়ে কি তুমি একটি চিঠিও লিখতে পারো না।" এর উত্তরে রাগ কোরে মেয়েটি একটি দীর্ঘ চিঠি লিখতে বসে তক্ষুনি। দীর্ঘ দশ পাতা ধরে কথার শেষ নেই। দশ পাতায় যা বলা যায় না একটি চিঠিতেই তা সে নিঃশেষ করে। এবং তার পর,—তার পর তার স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে। স্বস্তির আর গর্ব্বের। 'পুনশ্চ' নেই তার চিঠিতে—পুনশ্চের কোন চিহ্ন নেই আর। কিন্তু সে-কথা যতক্ষণ না সে জানাতে পারছে, ততক্ষণ সান্ত্বনা কোথায়? শান্ত না হয়েই সে ফের লেখে, "কই, তুমি না লিখেছিলে যে, পুনশ্চ না দিয়ে আমি চিঠি লিখতেই পারবো না। কি হ'ল এখন—পারলাম না আমি?"

কিন্তু এই ক'টি কথা, এই শেষের কথা ক'টি চিঠিটা আগেই লেখা হ'য়ে গিয়েছিলো বলে, পাতার শেষে সেই পুঃ দিয়েই ফের লিখতে হয়—পুনশ্চ লিখতে বাধ্য হয় সে।

* * * * *

পুনশ্চঃ চিঠি পেতে আমার খারাপ লাগে গোড়াতেই তা জানিয়েছি। তবু এটা পড়ে যদি কারুর ভালো লাগে এবং চিঠি লিখে তা কেউ যদি আমাকে জানাতে চায়, ত' তাকে আমি ক্ষমা কোরব, খুব বড় চিঠি হলেও। এমন কি, সে-চিঠি যদি বেয়ারিং হয় তবুও।

জীবন-জল-তরঙ্গ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১৮

শশীকান্তর প্রকাণ্ড কলা-বাগানটা নির্ম্মূল হ'য়ে গেল। দুধ বা আদা-ছোলা-ভিজে খাওয়ার লোভে এক প্রাণীও এসে জুটলো না সেখানে।

শশীকান্ত বললেন, তুমি কি বল ভূপেন, ওরা কি আসবে না?

ভূপেন সেন কুঁড়োজালির মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে উত্তর দিলেন, সবই শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছে। আপনি ঝোঁকের মাথায় কাজটা ভাল করলেন না কিন্তু। দু'পয়সা করে একটি কাঁচা কলা।

শশীকান্ত বললেন, গোড়া বেঁধে কাজ করা আমার অভ্যাস। তুমিই তো বললে, এবারে কিছু চাল-ডাল বাঁধাই রাখলে দিয়ে যাবে কিছু। আমাদের পাড়াগাঁয়ে তো রেশন চালু হয়নি—ঠিক করতে পারলে—

তার জন্যে অমন আয়ের কলা-বাগানটা নষ্ট করলেন?

শশীকান্ত বললেন, নষ্ট হওয়া জিনিষের ভারি তো দাম! বিশ বছুরে বাগান—হেজে-লাগা গাছ, না কাঁদির জুৎ, না ফলের। ওরা না আসে নতুন করে তৈরী করবো বাগান।

ওদের আনাবার জন্যে আপনার এত জিদ কেন? ওরা জগাই-মাধাই প্রকৃতির।

শশীকান্ত বললেন, তাই তো ওদের আনতে চাইচি। জগাই-মাধাই না থাকলে তোমার প্রভুর নামের মাহাত্ম্য এমন কলাও হয়ে প্রচার হ'তো? তলোয়ারে হাত কাটে বলে তলোয়ার খারাপ নয়—ব্যবহার-প্রথা জানা চাই।

ভূপেন সেন বললেন, কাল সারা রাত দু'টি চোখের পাতা এক করতে পারিনি। ওরা না আসে আপনার কলকাতার বাড়ি থেকে গুর্খা দু'টোকে এনে রাখুন না।

শশীকান্ত বললেন, কালই তার করেছি; আর পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্টের কাছে—ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে—এস, ডি, ওর কাছে একখানি করে দরখাস্তও গেছে।

—কই, আমার কাছে কেউ তো নাম-সই করাতে নিয়ে যায়নি?

শশীকান্ত চোখ টিপে হাসলেন, হাঁ, সারা গাঁয়ে ঢোল পিটে দরখাস্ত পাঠাই আর ওরা এসে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব লুঠে-পুটে নিক! কাল রাত বারোটার সময় এই দোতলার ঘরে শ্রীধর—বিশ্বাস মশায়—নন্দীরা দে'রা ক'ভাই—সবাই এসেছিলেন। তোমার সই ত বকলমে করে দিয়েছি। যারা আসেনি—একটু মিদে গোছের লোক তাদের নামও বকলমে গেছে। বলি এ তো আর জাল-জুয়াচুরির ব্যাপার নয়, আত্মরক্ষা নিয়ে কথা। কে অস্বীকার করবে করুক।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভূপেন সেন বললেন, হরি হে, তোমারই ইচ্ছা। না—না, এমন সৎকাজে কে আপত্তি করবে? বেশ করেছেন।

শশীকান্ত বললেন, তবুও সাবধানের বিনাশ নেই। নগদ টাকা-কড়ি ঘরে কিছু রাখবে না—গহনাও এমন জায়গায় রাখবে—

ভূপেন যেন বিনীত হাস্যে বললেন, আপনি তো জানেন, নগদ টাকা পঞ্চাশটির বেশি কোন দিনই আমার বাক্সোয় থাকে না। গহনা—তা সে ব্যবস্থাও করেছি যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে। জাপানীরা নামবা মাত্র এমন ভয় হ'লো—বুঝি বা রাজত্ব যায়-যায়। তাহলেই তো অরাজক। এক দিন সারা রাত ভাবতে ভাবতে হঠাৎ প্রভু যেন অলক্ষ্যে বলে দিলেন—অত বড় তোর বাড়ির উঠোন, অতগুলো কুলুঙ্গি ঘরের মধ্যে—তবু ভেবে মরছিস্! তার পর দিনই ব্যবস্থা করা গেল। জয় প্রভু!

শশীকান্ত হাসলেন, টাকাটা উপায় করছো এ কালের ধাঁচে—রাখছো কিন্তু আদ্যি কালের প্রথায়।

ভূপেন সেনও হাসলেন, এ রাজত্ব গেলেই তো আদ্যি কালের রাজত্বে গিয়ে পড়বো। চোর-ডাকাত-ঠগী—

আরও কিছুক্ষণ পরামর্শ করে বৈঠকখানায় নেমে এলেন।

উত্তর-পাড়াতেও বাদবিতণ্ডা চলেছে! নিতাই, বলাই, যতীন, হরিপদ আরও অনেকে শশীপদকে ঘিরে তর্ক করছে।

বলাই বললে, আমাদের মধ্যে লাঠিখেলার চলনটা হওয়া কি ভাল নয়?

—বেশ তো, বাড়ীর ধারে রয়েছে প্রকাণ্ড মাঠ—তাতে যত খুসি খেল না লাঠি। শশীপদ নিস্পৃহ ভাবে উত্তর দিলে।

যতীন বললে, এক জন বড়লোক যদি মাথার ওপর থাকেন মুরুব্বি হয়ে—কতটা বল বাড়ে আমাদের।

মাথা নেড়ে শশীপদ বললে, বড়লোকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আমরা রাখবো না।

যতীন রেগে উঠলো, জানো, শ্রীধর আশ নিজে না দাঁড়ালে কারো সাধ্যি ছিল না তোমায় খালাস করে আনে।

শশীপদ বললে, আমাকে জেলে পুরেছিল কোন্ শালা রে?

যতীন উষ্ণ স্বরে বললে, চুরি করেছিলে কেন? জান না, চুরি করলে জেল হয়?

শশীপদ বললে, জানি না আবার? ও শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার অভ্যাস আজ নতুন নয়। সামনে ওরা ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির—পেছনে কত সরাচ্ছে জানিস্? ওদের নিলে খুব বেশি পাপ হয় না।

না, খালি জেল হয়। বলাই হাসলে।

শশীপদ বললে, হাসই আর যাই কর, ওদের কথায় শর্ম্মা আর ভুলছেন না। হঠাৎ মাটিতে একটা লাথি মেরে বললে, আমরা কি কুকুর, যে তু করে ডাকলেই ল্যাজ নেড়ে ছুটে যাব?

যতীন বললে, মাথা ঠাণ্ডা করে বোঝ শশী। এ তো আর শ্রীধর ডাকছে না।

শশী দাঁত খিঁচিয়ে বললে, সব শালাই সমান। ও বড়লোকের আবার ভাল-মন্দ কি? আমাদের ওরা কুত্তা ছাড়া আর কিছু ভাবে? ওরে ভাই—এক মুঠো ছোলা ভিজে আর এক পোয়া দুধ খেয়ে কিছু সগ্‌গে যাবিনে—

হরিপদ হেসে বললে, সগ্‌গে কে যেতে চায়—তবু গায়ে কিছু শক্তি লাগবে তো?

শশীপদ বললে, ওদের কড়ি হিসেবের। দেবে এক গুণ আদায় করবে দশ গুণ। তোর লাঠির না-কিছু করেছে! বলে লাফিয়ে

উঠে যেখানে কাঁচা বাঁশের লাঠি ক'টা পড়ে ছিল সেই দিকে হাত বাড়ালো।

—ব্যাপার কি, লাঠি খেলবি না কি? বলাইও উঠে এলো লাঠির দিকে।

শশীপদ উত্তর না দিয়ে তুলে নিলে একগাছা লাঠি, হাতে ঘুরিয়ে দেখে নিলে তার ওজন আর আয়তন। তার পর তার এক প্রান্ত মাটিতে রেখে মাঝখানটায় হাঁটু চেপে হাতটা বাঁকিয়ে নিলে। হাতের পেশী গুলীর মত হয়ে উঠতে না উঠতে মট্ করে শব্দ হ'লো।

বলাই বললে, ভাঙলে তো?

—হাঁ। বলে আর একগাছি লাঠি সে তুলে নিলে।

বলাই তার হাত চেপে ধরলে। দৃঢ় স্বরে বললে, কত কষ্ট করে কলুদের বাঁশ-ঝাড় থেকে পাকা বাঁশ ক'খানা কেটে নিয়ে এলাম—তোমার খেলা করবার জন্য নয়?

শশীপদ বললে, বল? যাবি নে ওদের ওখানে?

—যাই যদি তোমার কি? বলাই চড়া-গলায় বললে।

—না—যাবি নে। বলে ঠাস্ করে তার গালে বসিয়ে দিলে একটা চড়। যতীন, হরিপদ, নিতাই প্রভৃতি ছুটে এলো।

যতীন বললে, গোঁয়ার্তুমি ভাল নয় শশী!

শশী বললে, উত্তুর-পাড়ার নামটা তোরা ডুবুতে চাস? গেল বারে জগদ্ধাত্রী পুজোয় ঠাকুর-বিজয়ার দিন কেন মারামারি করেছিলি ময়রাদের সঙ্গে?

—সে—আমাদের ঠাকুরকে ফেলে ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল বলে। তার সঙ্গে—

—ওরে মুখ্যুর দল, যেখানে মান-সম্মান নিয়ে কথা, সেখানে উত্তুর-পাড়ার দল কাউকে কেয়ার করে না। যারা বড় লোক আছে, তারা তাদের ঘরে থাকুক গে। আমাদের কি? আজ মোছলমানরা আসবে বলে ভারি ভালবাসা আমাদের ওপর। দুধ খেয়ে ওদের বাড়ি ওদের ধন-দৌলত আগলাবো মাইনে করা দারোয়ানের মত? দূর দূর বেকুবের দল!

শশীর কথা সকলের মনের মধ্যে রীতিমত দোলা দিলে। মনে পড়লো অনেক ঘটনা। যখন বিপদ আসে তখনই ওরা এ-পাড়ায় এসে অনেক ভাল ভাল কথা বলে—খোসামোদ করে। বছর দুই আগে ভোটের জন্য ওদের লোক দু'বেলা এসেছে এ পাড়ায়। বাবুরা এসেছেন পায়ে হেঁটে। কি রে, ভাল আছিস্ তো? সহানুভূতিহীন এই একটি প্রশ্নে গলে গেছে গরিবের দল। গদগদ কণ্ঠে অনর্গল বলে গেছে নিজেদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা। এই একটি জিজ্ঞাসায় তারা ঘৃণা অপমান উপেক্ষা কিছুই মনে রাখেনি। মনে মনে বলেছে, বাবু বড় ভাল—বড় ভাল!

—আহা, তোদের পাড়ার রাস্তাটা যে একেবারে গেছে, মেরামত হয়নি ক' বছর? সব চুরি—সব চুরি। আচ্ছা ঢুকি এবার বোর্ডে সব ঠিক করে দেব। দেখ বাপু, ভোটটি আমায় দেবে। আর যার যা-কিছু অভাব-অভিযোগ—

কিন্তু ভোট দেওয়ার পর সেই বাবুই বলেছেন, দিন-রাত ঘ্যান্-ঘ্যান্ করলে সরকার শোনে না। ঠিক সময়ে—কি না ঝোপ বুঝে কোপ মারা চাই। আচ্ছা নোট-বইয়ে টুকে রাখছি, মিটিঙে

—কই বাবু, রাস্তা হ'লো না?

—দাঁড়া বাপু, সাত বছরে যা হয়নি তা গদিতে বসতে না বসতেই হবে? আচ্ছা বোকা তো?

এমনি স্তোক বাক্যে ওরা আদায় করে কাজ। ভোট দেওয়ার আগে যে ক'দিন বাবুদের কাছে মিষ্টি কথা শোনে—গাড়ি চাপে—খাবার খায়, তাই এদের লাভ। সে লাভও যে গল্প করবার মতো।

বাবুরা এসে হাতে-পায়ে ধরে কত খোসামোদ, তবে না দিয়েছি ভোট!

সবাই শশীর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলো, ঠিক বলেছ শশীদা'। তোর বাঁশের না-কিছু করেছে!

শশী হাত তুলে বললে, থাক হাতিয়ার, ওগুলো আমরাই কাজে লাগাবো।

যতীন বললে, কালুদা আসছে।

শশী কোন কথা না বলে ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

দূর থেকে পুরন্দর তা দেখলে। কাছে এসে হাসতে হাসতে সে বললে, শশী হঠাৎ ছুটে পালালো কেন?

—তোমায় দেখে কালুদা। হাজার হোক হাজতে ছিল—

—ডাক ওকে।

শশী কিন্তু এলো না।

হরিপদ বললে, শশীর ইচ্ছে না আমরা ময়রাদের হ'য়ে লাঠি ধরি।

—কেন?

সে সমস্তই বললে। বললে, তোমার ওপর শেষ কথা বলবার ভার।

—পুরন্দর ভ্রূ কুঁচকে বললে, শশী ঠিকই বলেছে। মারামারি করার উদ্যোগটাও এ ক্ষেত্রে অন্যায়।

—কিন্তু যদি ওরা তেড়ে আসে?

যদি নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না ভাই। ঢিল মারলে পাটকেল খেতে হয় সে ওরা জানে, ওরাও স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর করে।

কিন্তু যদি-ই আসে?—তবু প্রশ্ন হয়।

যাতে না আসে সেই চেষ্টাই করা যাচ্ছে। একটু হেসে বললে, তা সত্ত্বেও যদি আসে, সে ব্যবস্থা তো করেই রেখেছ।

এক জন ফিরে এসে বললে, শশী এলো না।

—চল, আমিই যাচ্ছি। বলে পুরন্দর অগ্রসর হ'লো।

খানিকটা দূর গেছে—একটা মোড় ঘুরে ছোট একটা গলিতে সে ঢুকেছে। বাঁ পাশে পড়লো একটি মাটির চালাঘর। খাটো প্রাচীর, নোনা-ধরা, মাঝে মাঝে ভাঙ্গা, তবু সদর দরজা গোছের জরাজীর্ণ এক জোড়া তক্তা কোন মতে ঠেসান দেওয়া আছে নড়বড়ে চৌকাঠে। সেটা হঠাৎ খুলে সামনে বেরিয়ে এলো একটি মেয়ে। মেয়েটিকে দেখে দলের অনেকে সরে পড়লো—অনেকে ইচ্ছে থাকলেও পুরন্দরের পাশে পাশে চলার দরুণ গা-ঢাকা দিতে পারলে না।

গলির সামনে পুরন্দরের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কালো বাবু?

অত্যন্ত সাধারণ গোছের মেয়ে। আধ-ময়লা একখানা শাড়ী আধ ঘোমটা দিয়ে পরা, হাতে ক'গাছা কাচের চুড়ি, গলায় সরু লিকলিকে একগাছি হার চিক্‌চিক্ করছে। পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট দু'টি কালচে করেছে। চুল এলো। কপালে একটা কাচ পোকার টিপ জল্‌জল্ করছে।

পুরন্দর বললে, হাঁ, আমারই নাম। কি চাই তোমার?

—আপনার কাছে নালিশ আছে বাবু!

—নালিশ?

—হাঁ বাবু। ওই শশীর মা—শশীর বউ দু'বেলা বাড়ি বয়ে আমায় গাল দিয়ে যায়—পথে দেখা হ'লেই আমায় যাচ্ছে-তাই করে—কেন বলুন তো? আমি তো ওদের খাই-ও না, পরি-ও না—এক চালায় বাসও করি না—তবে আমার ওপর ওদের এত আক্রোশ কেন?

পুরন্দর পিছনে ফিরে যতীনকে বললে, মেয়েটি কে?

যতীন চাপা-গলায় বললে, নষ্ট-দুষ্ট মেয়ে লোক, ওরই বাড়িতে হার নিয়ে শশী উঠেছিল।

শেষের কথাগুলি মেয়েটি শুনতে পেলে। বললে, সে-ও আমার দোষ—নয়? তোমরা ফূর্ত্তি করবার জন্যে করবে চুরি আর দোষ হলো আমার? হাঁ বাবু, আমি খারাপ বটে, কিন্তু ওরাই না ফুসলে-ফাসলে আমার এই দশা করেছে! ছেলেবেলায় মা মরে গিছলো—বাবা থাকতো কৈবর্ত্তদের বাড়িতে। তা সে-ও মরে জুড়িয়েছে। ভাত দিতে না পেরে সোয়ামী দিলে তাড়িয়ে। মাথার ওপর খামিজ না থাকলে মেয়ে-মানুষের এর চেয়ে কি ভাল হয় বাবু?

কাঁদলে না—দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে না। এতটুকু লজ্জা ওর কথার আভাসে ধরা পড়লো না। দেহের পণ্যে ও নিজের ভরণ-পোষণ চালাচ্ছে—সেটা যেন খুব সাধারণ একটি নিয়মের বশেই। ও জানে, সবাই ওকে ঘৃণা করে। সে ঘৃণাতে ভ্রূক্ষেপ করলে ওকে দয়া করতো কে? যারা ওকে ভালবাসে বলে-ওর কানে মধু বর্ষণ করে, তারা যে আড়ালে ওর কথা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে তা ও বোঝে। কিন্তু মুখোমুখি কারও গাল বা বাঁকা কথা ও সইবে কেন?

পুরন্দর বললে, তারা গাল দিলে আমি কি করতে পারি?

আপনি বারণ করে দেবেন ওদের। আমি শুনেছি, ওরা আপনাকে দেবতার মত মান্য করে।

—আচ্ছা বলবো।

—তবে আসুন একবার বাড়ির ভেতর। ওরা ভাবে আমার না-জানি কত রাজার ঐশ্বয্যি! আপনি দেখে যান বাবু, ঐশ্বয্যি থাকলে কেউ এ পথে পা দেয়?

যতীন ধমক দিলে, তোর বড় আস্পর্দ্ধা—বাবুকে ডাকিস্?

মেয়েটি রাগ করলে না—হাসি-মুখে বললে, বাঃ, তোমরা ডাক না দেবতাদের? আমার না হয় ভক্তি-ছেদ্দা নেই, তা বলে ডাকতেও পাব না?

পুরন্দর বললে, তুমি যাও, আর এক দিন আসবো আমি।

—আসবেন! মেয়েটি অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করে।

—আসবো। তুমি ভাল হবার চেষ্টা কর।

পুরন্দরের পিছনে মেয়েটির খিল-খিল হাসির শব্দ ভেসে এলো।

পুরন্দর বললে, ও অমন করে হাসচে কেন?

যতীন বললে, নষ্ট মেয়েদের ধরণই ওই রকম।

পুরন্দর আপন মনে বললে, তাই কি?

যতীন বললে, দেশে দুর্ভিক্ষ হয়নি? এখনও তো কত লোক না খেতে পেয়ে মরছে—কত লোক আধ-পেটা খেয়ে আছে—কই, তারা তো এ পথে পা বাড়ায়নি?

ভিড়ের ভেতর থেকে কে এক জন বললে, এক দিন উপোস করে দেখ না, যতীন।

কথাটা এসে লাগলো পুরন্দরের বুকে। উপোস করে দেখবে সে এক দিন। মানুষকে জখম করতে এ-অস্ত্রের কত শক্তি এক দিন হোক না তার পরীক্ষা।

যতীন বললে, উপোসের ভয় দেখাস্ না রে—উপোসের ভয় দেখাস নে। সে বার হাজতে তিন দিন জল-বিন্দু না খেয়ে—

যতীন জেল খেটেছে—যে কারণেই হোক। ওর দেহ শক্ত, মনও শক্ত। সহ্য-শক্তি ওর আছে। কিন্তু সকলের দেহ সমান নয়—মনও নয়। যারা সাধারণ তাদের কাছে কি প্রত্যাশা করতে পারা যায়? দুর্ব্বল উপাদানে তৈরী যারা—তাদের সাধুতা সততা তাদের কষ্টসহিষ্ণুতা—প্রতি দণ্ডেই পড়ছে ভেঙে। যাই হোক, পুরন্দর স্থির করলে সে এক দিন উপবাস করবে।

[ক্রমশঃ

বাপুজী

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

তোমারে প্রণাম করি, হে প্রাচীন ঋত্বিক বীর
রৌদ্রদগ্ধ দৃঢ় তনু, পুণ্যব্রত, বৈদিক তাপস!
লভিলাম নব মন্ত্র, নব গীতি দেবী ভারতীর
অহিংস-বাণীতে তব, মহামৌন তোমার মানস
পূর্ব ও পশ্চিম দেশে, ভারতের দিগ্-দিগন্তরে
নির্মল, নির্বেদ, শান্ত, মধুচ্ছন্দ সাম্য-মৈত্রী-গানে
আসমুদ্র হিমাচল করেছে নন্দিত, উচ্চ স্বরে
লাখো লাখো গণকণ্ঠ-মুখরিত একতন্ত্রী তানে

শবরমতীতে আর বাংলায়, বিহারে, চম্পারণে
চলিয়াছ নগ্নপদে, হাতে যষ্টি, শুভ্র খাদি বাসে
পূত করি' সাত লাখ গ্রাম, পদচিহ্ন আভরণে
চলার ইসারা তব,—ভাবি তবু কে আসে, কে আসে?
এলো বুঝি স্বাধীনতা-সূর্য কোন্ দীপ্ত অগ্নিরথে,
উত্তরাপথের প্রান্তে, দক্ষিণ-সাগর পরিক্রমি;
দীর্ঘ বাট বছরের অভিযান-কণ্টকিত পথে
হে প্রবুদ্ধ, মুক্তিদাতা যুগদেব, তোমারে প্রণমি।

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা

শ্রীহরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য

"আধুনিক রাষ্ট্রগঠনে সাংবাদিকগণ যে কতখানি সাহায্য করিয়া থাকেন, তাহা আমরা উপলব্ধি করি না বলিলেই হয়। সাংবাদিকদের 'third state' বলিয়া গণ্য করা হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় রাষ্ট্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে সাংবাদিকগণের সমালোচনাকে বিশেষ সাহায্যকারী বলিয়া মনে করা হয়।"

মহীশূর সাংবাদিক-সম্মেলনে ডাঃ সৈয়দ মামুদ উপরোক্ত বাণী প্রেরণ করেন। সাংবাদিকগণ সংবাদপত্রের মারফৎ দেশের যে কি মহৎ উপকার সাধন করেন, তাহা সহজে ধারণা করা যায় না। প্রকৃত পক্ষে জাতির উত্থান-পতন অনেকটা সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের উপর নির্ভর করে।

পাঠকবৃন্দ যখন সকালে উঠিয়া চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে আরামের সহিত সংবাদপত্র পাঠ করিতে থাকেন এবং কোন বিশেষ সংবাদ পাঠ করিয়া পুলকিত বা বিমর্ষ হন, তখন কি একবারও এ কথা তাঁহাদের মনে হয় যে, কিরূপে এবং কাহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তাহা সংগৃহীত ও পরিবেশিত হইয়াছে? তাঁহারা কি তখন ধারণা করিতে পারিবেন যে, যে সংবাদ তাঁহাদের আনন্দ দিতেছে, তাহা সহস্র সহস্র মাইল দূরে এক সাংবাদিক কর্ত্তৃক বহু কষ্টে সংগৃহীত হইবার পর বেতারযোগে ভারতে প্রেরিত হইয়াছে এবং তাহা সংবাদপত্রের অফিসে প্রেরিত হইবার পর পাঠোপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে এবং তাহার পর সারা রাত্রিব্যাপী কম্পোজ, ভ্রম-সংশোধন ও মুদ্রণের পর সকালে পাঠকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থাপিত হইয়াছে? বিগত মহাযুদ্ধের সময় যখন সংবাদপত্রে উৎসাহের সহিত জার্ম্মাণ ও রুশসৈন্যদের প্রচণ্ড সংগ্রামের সংবাদ পাঠ করিতেন, ষ্ট্যালিনগ্রাদে দিবারাত্রব্যাপী বিমান আক্রমণের সংবাদ পাঠে বিস্মিত হইতেন, তখন কি একথা মনে হইত যে, কিরূপ বিপদ মাথায় করিয়া সামরিক সংবাদদাতারা ঐ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সকালের চায়ের আসর জমাইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছেন? না, তখন কাহারও সাংবাদিকের কথা মনে পড়ে না। কিন্তু এই কাজ সাংবাদিকদের প্রত্যহই করিতে হয়। অবশ্য ইহাই সব নহে। সাংবাদিকতা ব্যাপক বিষয়। বিশ্বের সকল বিষয়ে দ্রুত আধুনিক জ্ঞান বিতরণ ইহার প্রধান অঙ্গ।

আজ সংবাদপত্র জীবনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমান জগতের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে হইলে ইহা অপরিহার্য্য। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য অবগত হইতে হইলে সংবাদপত্র পাঠ একান্ত প্রয়োজন। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা জানিতে হইলে সংবাদপত্রের সাহায্য লইতেই হইবে।

সংবাদপত্রে সাধারণতঃ দুইটি বিভাগ। সম্পাদকীয় ও সংবাদ। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মতামত প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহার ভিত্তি সংবাদ। কাজেই সংবাদ বিভাগই প্রধান। এই সংবাদ কিরূপে সংগৃহীত হয়? সংবাদদাতারা সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সংবাদপত্রে প্রেরণ করিয়া থাকেন। সংবাদ সরবরাহের জন্য নানা প্রতিষ্ঠান আছে। ভারতে সংবাদ সরবরাহের জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে। তন্মধ্যে 'এসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া' ও 'ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়ার' নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া 'ওরিয়েন্ট প্রেস', 'হিন্দ প্রেস', 'ইণ্ডিয়ান প্রেস সার্ভিস' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও সংবাদ সরবরাহ করিয়া থাকেন। বৈদেশিক সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'রয়টার', 'এসোসিয়েটেড প্রেস অফ আমেরিকা' 'ইউনাইটেড প্রেস অফ আমেরিকা' এবং 'গ্লোবে'র নাম উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠান তিনটি ভারতীয় সংবাদও সরবরাহ করিয়া থাকেন। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের প্রধান প্রধান সহরে এই সকল প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক নিযুক্ত সংবাদদাতা আছেন। তাঁহারা সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তারযোগে ও বেতারযোগে তাহা প্রেরণ করেন। এ জন্য সুদূর আমেরিকায় কিছু ঘটিলে কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা সে সংবাদ অবগত হইয়া থাকি। এই সকল সংবাদ-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত প্রত্যেক সংবাদপত্রের 'বিশেষ নিজস্ব সংবাদদাতা' আছেন। তাঁহারাও নানা দেশ হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সংবাদপত্রে প্রেরণ করেন। এই সকল সংবাদদাতা-গণের কাজ অতিশয় কঠিন।

সংবাদদাতাদিগকে 'জাতির দূত' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে বক্তৃতা কালে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই সংবাদদাতাদের সম্বন্ধে 'Review of Reviews' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ষ্টেড্‌সের নিম্নলিখিত মন্তব্যের উল্লেখ করেন—

"An ambassador was defined of old time as one who was sent to lie abroad for the benefit of the people who remained at home. The New Ambassador who has been evolved by the natural process of the growth of democracy is sent abroad not so much for the purpose of either lying or speaking the truth about the country which he represents, as for keeping his countrymen at home informed as to what is going on abroad."

সকল বিষয়ের সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সরবরাহ সহজ কথা নহে। কোথায় কি ঘটিল, কে কি ষড়যন্ত্র করিল, কোন্ রাষ্ট্র কিরূপ রাজনৈতিক চাল চালিল, কোন্ নেতা কি নির্দ্দেশ দিলেন, কোন্ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কি নূতন আবিষ্কার করিলেন, কোন্ বিখ্যাত লেখক তাঁহার নূতন পুস্তকে কি নূতনত্বের সন্ধান দিলেন, কোন্ বিখ্যাত খেলোয়াড় কি নূতন রেকর্ড করিলেন, কোথায় কোন্ রাজ্যে বিদ্রোহ হইল, কোথায় কোন্ রাষ্ট্রে নূতন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল—এক কথায় পৃথিবীর সমস্ত দেশের বড় হইতে ছোট যে সকল ঘটনা ঘটিল, তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিবার দুরূহ কার্য্যভার এই সংবাদদাতাদের। অনেক সময় জীবন বিপন্ন করিয়াও সংবাদদাতাদের সংবাদ সংগ্রহ করিতে হয়। ভীষণ প্লাবনে দেশ ভাসিয়া গিয়াছে—লোকে প্রাণরক্ষার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে—সংবাদদাতা ছুটিয়াছেন সেই বন্যার মাঝে সংবাদ সংগ্রহ করিতে। ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে—বোমা, কামানের গোলায় হাজার হাজার সৈন্যের প্রাণ নিমেষের মধ্যে উড়িয়া যাইতেছে—সেই ভীষণ রণক্ষেত্রে যাইয়া সংবাদদাতা সংবাদ লইতেছেন। গত মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করিতে যাইয়া বহু সংবাদদাতা প্রাণ দিয়াছেন। ভীষণ দাঙ্গার সময় যখন আমরা সকালে সাগ্রহে সংবাদপত্রে ভয়াবহ নৃশংসতার বিবরণ পাঠ করিয়াছি, তখন একবারও আমাদের এ কথা স্মরণ হয় নাই যে, কিরূপে জীবন বিপন্ন করিয়া ঐ সকল সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে। হয় ত বা ঘাতকের ছোরা সংবাদদাতার পৃষ্ঠে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার কাজের সমাপ্তি করিয়া দিল।

শত্রুপক্ষের বিমান হইতে বোমা বর্ষণের সময় আমরা গৃহনিম্নস্থ কক্ষে আশ্রয় লইয়াছি, আর সংবাদদাতা সর্বোচ্চ গৃহের ছাদের উপর দাঁড়াইয়া বোমাবর্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন—এমন সময় হয়ত সেই বাড়ীতেই বোমা পড়িল। এমন ঘটনারও অভাব নাই। তাই বলিতেছিলাম, সংবাদদাতাদের কাজ অতীব কঠোর।

যুদ্ধের সময় যখন শত্রুদেশের সহিত সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তখনও আমরা সেই সকল দেশের সংবাদ পাইতাম। কিন্তু কিরূপে? পৃথিবীর সকল দেশই যুদ্ধে যোগ দেয় নাই। কতকগুলি দেশ নিরপেক্ষ ছিল, যেমন তুরস্ক, স্পেন, পর্ত্তুগাল, সুইটজার্ল্যাণ্ড প্রভৃতি। এই সকল দেশে যুধ্যমান সকল দেশের প্রতিনিধিরা ছিলেন। যুধ্যমান দেশগুলির সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিরাও তথায় ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সংবাদ বিনিময় হইত। ইহা ছাড়া নিরাপদে দেশের সংবাদদাতারা যুধ্যমান দেশ হইতে নিজ নিজ দেশে তথাকার সংবাদ প্রেরণ করিতেন এবং সেই সকল নিরপেক্ষ দেশে অবস্থানকারী যুধ্যমান দেশের সংবাদদাতারা সেই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দেশে প্রেরণ করিতেন এবং এইরূপে আমরা শত্রুদেশের সহিত সংযোগশূন্য হইয়াও তথাকার সংবাদে বঞ্চিত হইতাম না। এইরূপে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া বেতার যোগে তাহা প্রেরণ করা কয়েক মিনিটের ব্যাপার মাত্র। সেই জন্য কোথাও কোনও গুরুত্বপূর্ণ সহরের পতন হইলে আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে সংবাদ জানিতে পারিতাম।

সত্য সংবাদ প্রকাশ করাই সংবাদদাতাদের কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের (এবং অন্যান্য দেশেরও) সংবাদদাতারা এই বিষয়টির প্রতি প্রায়ই অবহেলা করিয়া থাকেন। Scoop News দিয়া বাহাদুরী লওয়া আজকাল খুব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার ফলে সাধারণ পাঠককে প্রতারিত করা হয়। আজ সংবাদপত্রে পড়িলাম—অমুক নেতা অমুক কাজ করিয়াছেন, অথবা অমুক স্থানে অমুক ঘটনা ঘটিয়াছে। ঠিক দুই দিন পরে আবার পড়িলাম, যে ঘটনার কথা লেখা হইয়াছিল, তাহা আদৌ ঘটে নাই। এইরূপে অসত্য সংবাদ পরিবেশন করা আমার মতে অত্যন্ত অন্যায়। যে কোন সংবাদ পরিবেশনের সময় পাঠকবৃন্দের কথা মনে রাখা দরকার। অসত্য সংবাদের দ্বারা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়া প্রথম দিন বাহাদুরী লওয়া যায় বটে, কিন্তু যখন সেই অসত্য ধরা পড়ে তখন পাঠকবৃন্দের ঘৃণাই অর্জ্জন করিতে হয়। এ জন্য সংবাদ দিবার সময় বিশেষ ভাবে তদন্ত করিয়া তাহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া উচিত। অসত্য সংবাদ সরবরাহের ফলে লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণাই জন্মে। এ জন্য আমার মতে কোন বিষয়ে speculate করিয়া সংবাদ দেওয়া উচিত নহে। প্রকৃত সঠিক ঘটনার সংবাদ দিলে পাঠকবৃন্দকে প্রতারিত হইতে হয় না। মনে করুন, কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে মীমাংসার জন্য আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে ঐ আলোচনার ফলাফল সম্বন্ধে নানাবিধ সংবাদ প্রকাশিত হইতে লাগিল। কেহ লিখিলেন, মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, কেহ লিখিলেন, মীমাংসা এক প্রকার হইয়া গিয়াছে। আমার মতে আলোচনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এবং আলোচনার সঠিক ফলাফল ঘোষিত না হওয়া পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে কোন সংবাদই প্রকাশ করা উচিত নহে। এ বিষয়ে রুশিয়ার সংবাদপত্রগুলির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত। তথায় কোন বিষয়ে speculation news প্রকাশ করা হয় না। প্রকৃত সত্য ঘটনাই প্রকাশ করা হয়। ফলে তথাকার জনসাধারণকে প্রতারিত হইতে হয় না। রুশিয়ার সংবাদপত্রগুলির আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, তথায় কোন চুরি বা ডাকাতি হইলে তৎক্ষণাৎ সে সংবাদ প্রকাশিত হয় না। ঐ চুরি বা ডাকাতির তদন্তের পর আসামীকে ধরিয়া দণ্ডাদেশ ঘোষণার পর তবে ঐ সংবাদ আসামীর দণ্ডাদেশের সংবাদসহ প্রকাশ করা হয়। ইহাতে একটি শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, দস্যু-তস্করেরা বুঝিতে পারে, যে চুরি বা ডাকাতি করে তাহাকেই শাস্তি পাইতে হয়, কেহ চুরি বা ডাকাতি করিয়া অব্যাহতি পায় না। অবশ্য এ বিষয়ে পুলিশী ব্যবস্থা ত্রুটিহীন হওয়া দরকার।

আমাদের দেশের সংবাদপত্রে প্রায়ই অসত্য সংবাদ প্রকাশিত হয়। একটি সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। কলিকাতায় এক গোলযোগ সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিভিন্ন প্রকারের সংবাদ বাহির হয়। 'ন্যাশনালিষ্ট', 'ভারত,' 'স্বরাজ' প্রভৃতি পত্রিকা লিখিলেন—ঐ ঘটনায় ৩ ব্যক্তি নিহত হইয়াছে; 'ষ্টেটসম্যান' লিখিলেন—কেহ নিহত হয় নাই; 'অমৃতবাজার' ও 'যুগান্তর' লিখিলেন—১ জন নিহত হইয়াছে; 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' নিহত হওয়ার সম্বন্ধে কিছুই লিখিলেন না; 'বসুমতী' লিখিলেন—১ জন নিহত। এখন পাঠক কি করিবেন? কাহার কথায় বিশ্বাস করা যাইবে? এক জন সংবাদদাতাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি না কি বলেন যে, মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটীর নিকট হইতে তিন জন নিহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটী জানাইলেন, তাঁহারা কোন সংবাদ দেন নাই।

অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সংবাদ দিবার রীতি অনুসরণের ফলে সংবাদের মাত্রা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় সকল সংবাদের স্থান হয় না। "প্রকাশ," "জানা যায়," "ওয়াকিবহাল মহলের খবরে প্রকাশ," "আশা করা যায়," "বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল," প্রভৃতি মুখবন্ধ দ্বারা লিখিত সংবাদের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে কোন সংবাদেরই সত্যতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যায় না। আজকাল সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সংবাদ সরবরাহের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। সকলেই চেষ্টা করিতেছেন, বেশী সংবাদ দিয়া বাজার মাৎ করিবেন। পাঠকদের কথা কেহই ভাবেন না। আমাদের দেশের সংবাদপত্র পাঠকদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশই সাধারণ শিক্ষিত। কাজেই সংবাদ দিবার সময় তাঁহাদের কথা ভাবা একান্ত কর্ত্তব্য।

ভারতে সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজী ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ১৭৮০ সালের জানুয়ারী মাসে 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহাকে "হিকি"র গেজেটও বলা হইত। কারণ মিঃ জেমস আগষ্টাস হিকি ছিলেন এই পত্রের সম্পাদক! কিন্তু শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার সঙ্ঘর্ষ হয় এবং তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়। ফলে 'হিকির গেজেট' বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর আরও কতকগুলি সংবাদপত্র বাহির হয়, তন্মধ্যে 'ইণ্ডিয়ান গেজেট,' 'বেঙ্গল হরকরা', 'মাদ্রাজ কুরিয়ার,' 'বম্বে হেরাল্ড' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আজ-কাল ভারতে ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্রের মধ্যে

কলিকাতার 'অমৃতবাজার পত্রিকা,' 'ষ্টেটসম্যান,' 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড', 'ন্যাশনালিষ্ট,' 'এডভান্স,' 'ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া,' 'মর্ণিং নিউজ,' ও 'ইষ্টার্ণ এক্সপ্রেস', বোম্বাইএর 'বম্বে ক্রনিকেল,' 'বম্বে সেণ্টিনেল,' 'ফ্রি প্রেস জার্ণাল,' 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া,' 'মর্ণিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড,' মাদ্রাজের 'হিন্দু,' 'মাদ্রাজ মেল,' লাহোরের 'সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট,' 'ট্রিবিউন ;' দিল্লীর 'হিন্দুস্থান টাইমস্,' 'ন্যাশনাল কল,' 'ডন,' 'ষ্টেটসম্যান ;' লক্ষ্ণৌএর 'ন্যাশনাল হেরাল্ড,' 'পাইওনীয়ার'; নাগপুরের 'নাগপুর টাইমস'; পাটনার 'সার্চলাইট'; করাচীর 'সিন্দ অবজার্ভার' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যে অনেক সংবাদপত্রের সাপ্তাহিক সংস্করণও আছে। তন্মধ্যে 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া'র 'ইলাষ্ট্রেটেড উইক্‌লি' বিখ্যাত। ইহা ব্যতীত পাটনার 'বিহার হেরাল্ড', নাগপুরের 'হিতবাদ' এই দুইখানি নামকরা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আছে। কলিকাতার মাসিক পত্রিকা 'মডার্ণ রিভিউও' বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। ভারতীয়গণ বিদেশী ভাষা যে কতখানি আয়ত্তে আনিতে পারেন, ইংরাজী ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ভারতে দেশীয় ভাষায় বহুসংখ্যক দৈনিক, অর্দ্ধসাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এক কলিকাতা হইতেই ২০খানি দেশীয় ভাষার দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে বাংলায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা' 'যুগান্তর' 'দৈনিক বসুমতী' 'ভারত' 'স্বরাজ' 'হিন্দুস্থান' 'আজাদ' 'ইত্তেহাদ,' হিন্দীতে 'বিশ্বমিত্র,' 'লোকমান্য'; উর্দ্দুতে 'আসরী জদিদ', 'রোজানা হিন্দ' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। দেশীয় ভাষায় যে কত উত্তমরূপে সংবাদপত্র প্রকাশ করা যায়, কলিকাতার 'আনন্দবাজার পত্রিকা,' 'যুগান্তর' ও 'দৈনিক বসুমতী', পুনার 'কেশরী', মাদ্রাজের 'স্বদেশমিত্রণ' প্রভৃতি সংবাদপত্র তাহার প্রমাণ। কিন্তু একটি দুঃখের বিষয় এই যে, সংবাদপত্রগুলির মধ্যে তেমন সহযোগিতা নাই। যে সকল সাংবাদিক বিভিন্ন সংবাদপত্রে কাজ করেন, তাঁহাদের মধ্যে সহযোগিতা অপেক্ষা বিদ্বেষ ভাবই অধিক। ভারতীয় সাংবাদিক-সঙ্ঘ নামে সাংবাদিকদের একটি প্রতিষ্ঠান থাকিলেও ইহা দ্বারা প্রকৃত কোন কাজই হইতেছে না। কয়েকখানি বড় বড় সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা এই প্রতিষ্ঠান দখল করিয়া থাকেন, অন্যান্যের সেখানে পাত্তা নাই। এই সঙ্ঘের অধিবেশনগুলিতে সকলে নিজেদের দল লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। সকলের সহিত সম্প্রীতি স্থাপনের কোন চেষ্টাই দেখা যায় না। ফলে সাংবাদিকদের দাবী-দাওয়া আদায়ের প্রচেষ্টা সফল হয় না। দুই-একখানি সংবাদপত্র ব্যতীত প্রায় সকল সংবাদপত্রে কর্ম্মরত সাংবাদিকদের (সাব-এডিটর, এসিষ্ট্যাণ্ট এডিটর, রিপোর্টার) বেতন আশাপ্রদ নয়। সাংবাদিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইলে তাঁহাদের এমন একটি ইউনিয়ন গঠন করা দরকার, যাহার মারফৎ তাঁহাদের সুখ-সুবিধা আদায় করা যাইতে পারে। বেতনের হার আশাপ্রদ না হওয়ার ফলে সাংবাদিকদের গুণের স্বল্পতা দেখা যায়। সাংবাদিকের যে সকল গুণ থাকা দরকার, তাহার অভাব আজকালকার বহু সাংবাদিকের মধ্যেই আছে এবং ইহার প্রধান কারণ তাঁহাদের বেতনের স্বল্পতা ও চাকুরীর অবস্থার অনিশ্চয়তা। এই তথাকথিত সাংবাদিকের দ্বারা কাজ চালাইবার ফলে সংবাদপত্রে অনেক ভুল-ত্রুটি বাহির হয়। মনে করুন, বুয়েনস এয়ার্স হইতে রয়টার একটি সংবাদ দিল যে, এসানসিয়ান হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, তথায় বিদ্রোহ হইয়াছে। এখন কাঁচা সাংবাদিক এই সংবাদের শিরোনামা দিলেন, 'বুয়েনস এয়ার্সে বিদ্রোহ" কিন্তু তিনি লক্ষ্য করিলেন না যে, বুয়েনস এয়ার্স আর্জ্জেনটিনার রাজধানী আর এসানসিয়ান প্যারাগুয়ের রাজধানী এবং বিদ্রোহ হইয়াছে প্যারাগুয়েতে। এইরূপে অনেক ভুল দেখিতে পাওয়া যায়।

পাঠকদের সহিত সংযোগ রক্ষা সংবাদপত্রের অন্যতম অঙ্গ। আমাদের দেশে কেবল চিঠিপত্র দ্বারা এই সংযোগ রক্ষিত হয়। কিন্তু এ বিষয়ে আর একটি উপায় পাঠকদের সহিত সাংবাদিকদের বৈঠক। এই সকল বৈঠকে পাঠকগণ বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিবেন এবং সাংবাদিকগণ গ্রহণযোগ্য মতগুলি তাঁহাদের সংবাদপত্র মারফৎ প্রকাশ করিবেন। বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকদের বৈঠকের আয়োজন করা যাইতে পারে। যেমন শিক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে শিক্ষকদের লইয়া, রাজনীতি সম্বন্ধে রাজনীতিকদের লইয়া, খেলাধূলা সম্বন্ধে খেলোয়াড়দের লইয়া বৈঠকের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সোভিয়েট রুশিয়ায় এই প্রথা প্রচলিত আছে। এই ব্যবস্থার ফলে পাঠকদের সহিত সংবাদপত্রের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় এবং সংবাদপত্রগুলি জনসাধারণের সেবা অধিকতর কার্য্যকরী ভাবে করিতে পারে।

সাংবাদিকগণ যে গুরুভার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তজ্জন্য আমাদের দেশের সাংবাদিকগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোন উৎসাহ পান না। বরং গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনেই সচেষ্ট। সরকার কর্ত্তৃক সাংবাদিকদের সম্মান প্রদর্শন, তাঁহাদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা কখনও করা হয় না। জনসাধারণও এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী নহেন। আমার মনে হয়, প্রতি বৎসর জনসাধারণের পক্ষ হইতে সাংবাদিকদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা উচিত। ইহার ফল ভালই হইবে।

সাংবাদিকগণের অবশ্যই এই পুরস্কারের যোগ্য হওয়া দরকার। কারণ, সংবাদপত্র সমগ্র জাতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। রাষ্ট্রের উত্থান-পতন অনেকটা সংবাদপত্রের উপর নির্ভর করে। জাতিগঠনের কাজে সংবাদপত্রের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। এজন্য সাংবাদিকদের তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অতিশয় সজাগ থাকা দরকার। অর্থের লোভে অথবা অর্থের স্বল্পতায় এই কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করিলে সমগ্র জাতির প্রতি অবহেলা করা হইবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে লোভী অথবা অর্থপিপাসুর সাংবাদিকতার ক্ষেত্র পরিত্যাগ করা উচিত। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত সাংবাদিক ওয়াল্টার উইলিয়ামস সাংবাদিকদের এক সঙ্কল্পবাক্য রচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক সাংবাদিকের এই সঙ্কল্পবাক্য গ্রহণ করা উচিত। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল :—

"আমি সাংবাদিকতার পেশায় বিশ্বাস করি।"

"আমি বিশ্বাস করি, সংবাদপত্র জনসাধারণের ট্রাষ্ট, সংবাদপত্রের সহিত সম্পর্কিত সকল ব্যক্তিই জনসাধারণের ট্রাষ্টী, জনসাধারণের সেবা না করিয়া অন্য কাজ করিলে জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে।"

"আমি বিশ্বাস করি, সুস্পষ্ট চিন্তা ও উক্তি, ত্রুটিহীনতা ও সাধুতা সাংবাদিকতার মূল।"

"আমি বিশ্বাস করি, সাংবাদিক যাহা সত্য বলিয়া অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন, কেবলমাত্র তাহাই তাঁহার লেখা উচিত।"

"আমি বিশ্বাস করি, সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে সংবাদ চাপিয়া রাখা সমর্থনের অযোগ্য।"

"আমি বিশ্বাস করি, ভদ্রলোক হিসাবে যাহা বলা যায় না, কোন সাংবাদিকের তাহা লেখা উচিত নহে।"

"আমি বিশ্বাস করি, অপরের নির্দ্দেশের অজুহাতে কর্ত্তব্য এড়ান যায় না।"

"আমি বিশ্বাস করি, বিজ্ঞাপন, সংবাদ ও সম্পাদকীয় মন্তব্য সমভাবে পাঠকের স্বার্থ রক্ষা করিবে, সকলের জন্যই সত্য এবং স্পষ্টতাই হইবে মানদণ্ড, জনসেবার মাত্রা দ্বারাই সাংবাদিকতার অগ্নিপরীক্ষা হইবে।"

"আমি বিশ্বাস করি, সাংবাদিকতা করিতে হইলে ঈশ্বরকে ভয় এবং মানুষকে সম্মান করিতে হইবে, স্বাধীনচেতা হইতে হইবে, মতের গর্ব্বে ও ক্ষমতার লোভে গর্ব্বিত ও বিচলিত হওয়া চলিবে না, নির্ভীক, সহিষ্ণু, সতর্ক, গঠনমূলক মনোভাবাপন্ন, আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা-সম্পন্ন ও জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইতে হইবে এবং অন্যায়ের প্রতিবাদে বিরত থাকা চলিবে না। ইহা ব্যতীত সাংবাদিককে আন্তর্জ্জাতিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।"

ভারতে অবশ্য ভাল সম্পাদক, সাব-এডিটার, রিপোর্টার, সংবাদদাতা ও লেখকের অভাব নাই। কাগজে ব্যঙ্গচিত্র ও ছবি ব্যবহারও প্রশংসনীয় ভাবে করা হইয়া থাকে। কতকগুলি সংবাদপত্রের অবশ্য বিভিন্ন বিষয়ে অনেক ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সব সময় সাংবাদিকদের ত্রুটি তাহার কারণ নহে। অর্থাভাব এই সকল ত্রুটির প্রধান কারণ। এক শ্রেণীর সংবাদপত্রে সংবাদ চাপিয়া রাখা ও প্রকৃত ঘটনার বিকৃত রূপ দান করার মনোভাব বর্ত্তমান। নির্জ্জলা মিথ্যা প্রকাশ করিতে এই শ্রেণীর সংবাদপত্রের একটুও বাধে না। কতিপয় সাংবাদিক যুক্তি ও নীতির ধার ধারেন না এবং কুৎসা প্রচারে সিদ্ধহস্ত।

ভারতের বহু রাজনৈতিক নেতা সংবাদপত্রের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তন্মধ্যে সার ফিরোজ শা মেটা, লোকমান্য তিলক, লালা লাজপত রায়, মহম্মদ আলী, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, অরবিন্দ ঘোষ, রামানন্দ চ্যাটার্জী, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, সি, ওয়াই, চিন্তামণি, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমান কালের সাংবাদিকগণের মধ্যে শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (এডভান্স), শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকা), শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বসুমতী), মিঃ আই, এম, ষ্টীফেন্স (ষ্টেটসম্যান), শ্রীযুত দেবদাস গান্ধী (হিন্দুস্থান টাইমস্, দিল্লী), মিঃ পোথান যোসেফ (ডন, দিল্লী), মিঃ জে, এন, সাহনি (ন্যাশন্যাল কল, দিল্লী), মিঃ কে, শ্রীনিবাসন (হিন্দু, মাদ্রাজ), মিঃ ব্রেলভি (বম্বে ক্রনিকেল), মিঃ বি, জি, হার্নিম্যান (বম্বে সেণ্টিনেল), অমৃতলাল শেঠ (জন্মভূমি, বম্বে), সার ফ্রান্সিস লো (টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, বম্বে), কে, পুন্নিয়া (সিন্ধ অবজার্ভার,

সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য বহু আইন সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৯৩১ সালের ভারতীয় প্রেস আইন (জরুরী শক্তি) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই আইন অনুসারে গভর্ণমেণ্ট ও কতিপয় ম্যাজিষ্ট্রেট কোন সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করিতে পারেন, প্রেসের কীপার ও সংবাদপত্রের প্রকাশকের নিকট হইতে জামানত দাবী করিতে পারেন এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে জামানত বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন।

পূর্ব্বে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য বহু আইন প্রবর্ত্তিত এবং পরে বাতিল হইয়াছে। ১৯২২ সাল হইতে সংবাদপত্রগুলি প্রধানতঃ ১৮৬৭ সালের প্রেস এণ্ড রেজিষ্ট্রেসন অফ বুক্‌স্ একট্, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক), ৪৯৯ ও ৫০০ ধারা, ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারা, পোষ্ট অফিস আইন ও কপিরাইট আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রেস এণ্ড রেজিষ্ট্রেশন অফ বুক্‌স্ একট্ অনুসারে প্রেসের কীপারকে উপযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে হয় যে, তাঁহার অমুক স্থানে একটি প্রেস আছে। প্রত্যেক মুদ্রাকর ও প্রকাশককে উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া লিখিত ভাবে স্বীকার করিতে হয় যে, তিনি এক জন মুদ্রাকর বা প্রকাশক এবং অমুক ঠিকানায় তিনি কাজ করিয়া থাকেন। স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইলে নূতন করিয়া ডিক্লেয়ারেশন লইতে হয়। এই আইনে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক সংবাদপত্রে সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম ঠিকানাসহ প্রকাশ করিতে হইবে। প্রত্যেক সংখ্যার দুইখানি কপি সত্বর গভর্ণমেণ্টের নিকট বিনামূল্যে প্রেরণ করিতে হইবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সম্পাদক, মুদ্রাকর বা প্রকাশক হওয়া চলিবে না।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারায় রাজদ্রোহ সংক্রান্ত বিধান আছে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হইতে পারে, এমন কিছু প্রকাশ করিলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ (ক) ধারায় তাহার দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা আছে। ৪৯৯ ধারায় মানহানি সংক্রান্ত বিধান বর্ণিত হইয়াছে। ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারায় কতিপয় ম্যাজিষ্ট্রেটকে রাজদ্রোহজনক বা শ্রেণীবিদ্বেষমূলক বিষয় প্রকাশ করার জন্য জামানত দাবী করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কপিরাইট আইন দ্বারা লেখকদের লেখা রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে—এক জনের লেখা অন্য কেহ ব্যবহার করিতে পারে না। টর্টস আইন দ্বারা কুৎসা প্রচারের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা আছে। ভারত-রক্ষা আইনও সংবাদপত্র দমনে কম সাহায্য করে নাই। ইহা ছাড়া নানাবিধ অর্ডিন্যান্স আছেই।

আজকাল ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা অতিশয় সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অন্যতম অঙ্গ। প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সংবাদপত্রকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আমেরিকায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। তথায় যে সকল মামলা বিচারাধীন (subjudice) সে সম্বন্ধে সংবাদপত্রকে অবাধে আলোচনা করিতে দেওয়া হয়। মামলা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জজের কোন্ নীতি অনুসরণ করা উচিত তাহা ব্যক্ত করিবার অধিকার তাহাদের আছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে সংবাদপত্রগুলির

আঁধি

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

দিবালোকে যদি দৃষ্টি হারাও সূর্য্য কি অপরাধী
নয়নের আলো যদি না দেখায় পথ ?
আপন মনের আঁধির আড়ালে ভীরু পলাতক তুমি
তোমারে ঘিরিয়া তাই ক্ষণে ক্ষণে ঘূর্ণি বায়ুর হানা :
দীপ্ত রৌদ্রে তাই বারে বারে কায়াহীন মরীচিকা
বিহ্বল তুমি তোমারে দেখায় ভয়।

- -

বক্ষে তোমার ডানা ঝাপটিছে খাঁচার ত্রস্ত পাখী
সোনার শিকল খুলিয়া পড়িছে অর্গলও খুলে যায়,
অর্দ্ধভুক্ত সুমিষ্ট ফল, সে ফলে মিশান বিষ
লুব্ধ নয়ন দুর্ব্বল মন তারি পানে ফিরে চায়।
বদ্ধ খাঁচার এতখানি মায়া কে জানিত হায় আগে
আগে কে জানিত ওরে
ভোরের স্বপন কভু কোনও দিন নয়ন-ভুলান দেশে
বন্ধনে তোর কখনও তোলেনি অসহায় ক্রন্দন।
দাঁড়ের উপর ঘুরপাক খেয়ে কপচান সাধা বুলি
সে কি ভোলা যায় হায় রে খাঁচার পোষমানা তোতা পাখী,
তোরই তরে আজ নিস্ফল হবে কি আকাশের ডাকাডাকি
নিস্ফল হবে শিকল-ছেঁড়ার এতখানি আয়োজন ?

আঁধারের পথ পারায়ে এসেছি
সমুখে দীপ্ত দিবা,
দীর্ঘ সে পথ পশ্চাতে ফেলি' সমুখে দৃষ্টি হানো
সূর্য্যের আলো প্রদীপ্ত সেথা দেখা যায় বহু দূর ;
বহু দূর হ'তে কানে পশিতেছে কালের তূর্য্য-ধ্বনি
মুক্ত আকাশ আজিকে পাঠায় সস্নেহ আমন্ত্রণ :

যারা এসে আজ হেথায় দাঁড়াল
দাঁড়াল সবার সাথে.
হাতে হাত দিয়ে সমুখে দৃষ্টি উন্নত মাথা তুলি',
তাহাদের মনে জাগিয়াছে আজ বাঁধন-ছেঁড়ার পণ
প্রভাত-সূর্য্য অজস্র ধারে দিয়েছে আশীর্ব্বাদ ;
আঁখি উজ্জ্বল আগামী কালের সাদর সম্ভাষণে—
তারা জানিবে না যাত্রা-পথের বাধা ও বন্ধুরতা।
তুমি কি এখন ঘরে বসে র'বে
বন্ধ করিয়া আঁখি
সে আঁখি মেলিয়া দেখিবে না চেয়ে নির্ম্মল দিবালোকে,
কানে শুনিবে না কোটি কণ্ঠের উদাত্ত আহ্বান ?
বদ্ধ খাঁচার শিকলে তোমার এতই আকর্ষণ
পুচ্ছ মেলার ঠাঁই নাই তবু নাহি উড়িবার লোভ।

দিন আসিয়াছে সাথে লয়ে তার অসীম সম্ভাবনা
আলো আসিয়াছে আঁধার অতিক্রমি ;
প্রসন্নতায় ভরিয়াছে মন
মেঘ-লেশহীন আকাশের পানে চাহি' ;
মনে হয় যেন এই মুহূর্ত্তে নিজেরে রিক্ত করি'
দিতে পারি সব, সবই দিতে পারি নিজের মুক্তি লাগি'।
তবু মনে হয় আজিকার আলো
সে আলোকে শুধু আমারই কি অধিকার ?
দিনের সূর্য্য সে ত নহে মোর একার চোখের আলো,
সে আলো আসুক তোমারও দৃষ্টি চোখে :
আজি আকাশের উজ্জ্বলতায়
তুমি ফিরে পাও হারান রত্নটিরে,
ফিরে পাও তুমি আপন মহিমা
বিস্মৃতপ্রায় আপনার পরিচয়।

গুলির প্রত্যেকের প্রাত্যহিক প্রচার-সংখ্যা এক লক্ষ হইবে না। যুদ্ধের পূর্ব্বে রুশিয়ায় 'প্রাভদার' প্রচার-সংখ্যা ২০ লক্ষের অধিক ও "ইজভেস্টিয়া'র প্রচার-সংখ্যা প্রায় ১৭ লক্ষ, ফ্রান্সে প্যারিস সয়ের'এর প্রচার-সংখ্যা ১৮ লক্ষ, আমেরিকায় 'নিউইয়র্ক ডেলী নিউজ'এর প্রচার-সংখ্যা ১৭ লক্ষ ১৮ হাজার, জাপানের 'ওসাকা মাইনিচি শিম্বুন'এর প্রচার-সংখ্যা ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার, ফ্রান্সের 'লা পেতি'র প্রচার-সংখ্যা ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার, বৃটেনের 'ডেলী এক্সপ্রেসে'র প্রচার-সংখ্যা ২৫ লক্ষ ৫০ হাজার, 'ডেলী হেরাল্ডে'র প্রচার-সংখ্যা ২০ লক্ষেরও অধিক ছিল। বৃটেনে রবিবারে 'পিপ্‌ল্' পত্রখানির প্রচার-সংখ্যা ৩০ লক্ষ এবং "নিউজ অফ দি ওয়ার্ল্ড"এর প্রচার-সংখ্যা ৪০ লক্ষ।

যে সকল সংবাদপত্রের প্রচার-সংখ্যা এত অধিক, সে সকলের নিকট আমাদের অনেক শিখিবার আছে। ঐ সকল সংবাদপত্রের কার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জন্য এদেশের সাংবাদিকদের তথায় প্রেরণ করা উচিত। এ বিষয়ে সংবাদপত্র-সমূহের কর্ত্তৃপক্ষদের অবহিত হইতে বলি।

নিরক্ষর

শ্রীচরণদাস ঘোষ

আট

কাজ, কাজ, কাজ!

এদিকে মলিনের মায়ের কাজের আর বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। মাত্র একটি রাত, রাত্রির অবসানে যে-দিনটা পড়িবে, তাহার খানিক পরেই মলিন যাত্রা করিবে। মলিনের মা এটি-ওটি, ওটি-এটি বিবিধ কাজে ব্যস্ত। সকালে তাঁহাকে ভাত চড়াইতে হইবে—মলিন খাইয়া যাইবে। ঠিক সাড়ে বারটায় ট্রেণ—যদিই বা দুই-এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই ট্রেণ আসিয়া পড়ে! অতএব তিনি তো আর নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। রাঁধিবার উনুন, রান্নাঘরের দুয়ার—সব ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিবেন। উনুনের পাশেই রাখিলেন কাঠকুটা, তালপাতা, ঘুঁটে—যেন হাত বাড়াইয়া পান। ভাতের চাল কয়টি—দুলে-বউ যেন কী, হয়ত বা ভালো করিয়া ঝাড়িয়া-বাছিয়াও রাখে নাই—তিনি আবার কুলো লইয়া বসিলেন। তরকারী কুটিবেন ভোর রাত্রে, এখন তো সবে ভাতঘুমের রাত—এখন কুটিলে শুকাইয়া যাইবে। কুলো ছাড়িয়া তিনি একবার তরকারীর ডালাটা বাহির করিয়া আনিলেন। তাঁহার বুকে আনন্দ আর ধরে না—দুইটি ননীতাল আলু আর একটু কপি! এইগুলি দুলে-বউ সন্ধ্যায় দিয়া গিয়াছে—এক ভিন-গাঁয়ের বাবুরা তাহাকে খাইতে দিয়াছিল। তিনি মনে মনে তরকারীর হিসাব করিলেন—একটি আলু দিবেন ভাতে আর একটি আলু ওই কপিটুকু দিয়া ঝোল। বাপ রে বাপ—এদিকে কাপড়-জামাও বাছার গোছানো হয় নাই! একলা মানুষ—কোন্ দিকেই বা কি করেন! দুইখানি কাপড়—একখানি নরুণপেড়ে আর একখানি ফুলপেড়ে। নরুণপেড়ে কাপড়-খানি পরিয়াই মলিন যাত্রা করিবে, আর ফুলপেড়ে—এই কাপড়খানি তিনি গামছায় দিবেন বাঁধিয়া। জামা—এক আর এক দুই! একটি কোট—তার দুই-এক যায়গায় ছেঁড়া—তা হোক্, তালি দেওয়া তো! যাত্রাকালীন মলিন গায়ে দিবে এইটি। আর একটি সার্ট, কি পরিষ্কার ছিট্! ও-পাড়ার রায়েদের বাড়ীর কি না! এই জামাটি পরিয়াই মলিন স্কুল যাইবে—কলিকাতায়!

এমনিই সব খুঁটি-নাটি অতিপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম্ম যখন শেষ হইল, তখন পূর্ব দিক ফর্সা হইয়াছে। মলিনের মা ত্রস্ত হইয়া সদর দরজায় একটু জল দিয়াই পুকুরে একটা ডুব দিয়া আসিলেন, আসিয়াই উনুনে আগুন দিলেন। তার পর হাঁড়িতে চাল দিয়াই যেমন তরকারীর কুট্না আনিতে যাইবেন, দেখিলেন উঠানে, একটু দূরে—দুলে-বউ, তাহার হাতে একটা রুই মাছ!

মলিনের মা বিস্ময়ে ও পুলকে বলিয়া উঠিলেন, "মাছ? এত ভোরে মাছ কোথায় পেলি তুই?"

দুলে-বউয়ের যেন কথা কহিবার আর সময় নাই। দ্রুত কণ্ঠে কহিল, "মিন্‌সের চোখে ঘুম ছেলো না কি রেতে! কাল সাঁঝ-সন্ধ্যে-বেলায় আম্রমাপাড়ায় যায়নি ও—আয়মাদারদের ডোবায় একটা মাছ ধরবো বোলে—রেতের বেলায়? মলিন আমার কোল্‌কাতায় যাবে—মাছের ঝোল ভাত খেয়ে যাবে না? কি বলে যেনো মাগী—" বলিয়াই হন্-হন্ করিয়া আঁশবঁটি আনিয়া মাছটা কুটিয়া ধুইয়া দিল।

মলিনের মা! তিনি স্তব্ধ হইয়া কুট্‌নার ডালা আনিতে ঘরে ঢুকিলেন।

আজ যেন পূব দিকের দেবতাটির তর্ সহিতেছে না—সহস্র ঘোড়া ছুটাইয়া মর্ত্ত্যে নামিয়াছেন! পূর্ব দিক রাঙা হইল, তিনি মুখ বাড়াইলেন, তার পরই মাটির উপর পড়িল—রোদ! বেলা হয়—কাঁটাল গাছের ছায়া ছোট হয়! আর দেরি করা চলে না—এখনিই ইনস্‌পেক্টর সাহেবের চাপরাশি আসিয়া পড়িবে। মলিন তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া আহারে বসিল—আলু-ভাতে আর মাছের ঝোল।

ঠিক এম্‌নিই সময়ে সকলের অলক্ষ্যে সন্ধ্যা এক বাটি গাওয়া-ঘি আনিয়া মলিনের থালার পাশে রাখিয়া কহিল, "মা পাঠিয়ে দিলে!"

মলিন একটি বার তাহার দিকে তাকাইল, তার পর বাটি হইতে একটুখানি ঘি ঢালিয়া ভাতে মাখিল।

সন্ধ্যা দাঁড়াইয়া ছিল। ধপ্ করিয়া মলিনের পাশে বসিয়া বাটিশুদ্ধ ঘি—সমস্তটা উপুড় করিয়া ভাতের উপর ঢালিয়া দিয়াই একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মলিন হাসিয়া কহিল, "বাটি উপুড় কোরে ঢাল্‌তে হবে—তাও কাকীমা বলে দিয়েছেন, দেখ্‌ছি!" বলিয়াই সমস্ত ভাতগুলি ভাঙিয়া ঘি মাখিতে লাগিল।

সন্ধ্যা অন্য দিন হইলে কথাটা গায়ে রাখিত না, কিন্তু, কি-জানি কেন আজ আর সে কথাটি কহিল না। শুধুই দেখা গেল, তাহার সারা মুখটিই রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

বড়-মা সন্ধ্যার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরস্বতী কি করছে, সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা ছোট্ট একটি কথায় জবাব দিল, "কি জানি।"

দুলে-বউ উঠানে কি কাজ করিতেছিল, সন্ধ্যা আসিতেই সে এদিক্‌টায় আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কহিল, "উনি আসবেন না একবার? মলিন ত এখ্‌খুনি যাত্রা করবে—"

"কি কোরে বল্‌বো!" অনাসক্ত কণ্ঠে কথাটা বলিয়াই সন্ধ্যা অদূরস্থিত একটা জলের বাল্‌তি হইতে জল লইয়া হাত ধুইতে লাগিল।

ঠিক এমনি সময়ে বাহিরে দ্বারদেশে কাহার গলার আওয়াজ হইল এবং দুলে-বউ ছুটিয়া গিয়া দেখিয়া আসিল—'চাপরাশি।' সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ভিতর এক দ্রুত চঞ্চল শিহরণ পড়িয়া গেল—সকলেরই মুখে-চোখে।

ষ্টেশন প্রায় মাইল তিনেক, হাঁটিয়া যাইতে হইবে। বই-পত্র, বালিশ-বিছানা, জামা-কাপড়ের পুঁটুলিটি লইয়া সঙ্গে যাইবে দুলে-বউ—ষ্টেশন পর্য্যন্ত। মলিন তাড়াতাড়ি আহারাদি সারিয়া জামা-কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইতেই, মা তাহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া দেওয়ালে টাঙানো একখানি সরস্বতীর ছবি দেখাইয়া কহিলেন, "প্রণাম কর, কোরে বল্? 'মা, বড়লোক হয়ে যদি তোমাকে ভুল্‌তে হয়, চিরকাল গরীব হয়েই যেন থাকি'!" বলিয়াই তিনি ফোঁপাইয়া উঠিলেন।

দুলে-বউ দাঁড়াইয়া ছিল দ্বারদেশে, মৃদু ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, "ও কি, মলিনের মা? চোখের জল ফেলো না! তুমি মা—তুমি যদি অমন কাতর হও, ও ছেলেমানুষ—ও তোমার কোল-ছাড়া হয়ে বিদেশে টিকবে কি কোরে?"—বলিতে বলিতে সে নিজেও চোখে কাপড় দিল।

দুয়ারের খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল আর একটি মূর্ত্তি—সন্ধ্যা। মাটির প্রতিমা যেন সে! বুঝি বা, তাহারও দুইটি চোখ কোন্ সময় ছোট হইয়া আসিয়াছিল, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া বাড়ীর বাহিরে এক প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের দিকে চোখ রাখিল, সেখানে বসিয়া বকের ছানা একটি—কাকের ছানাও হইতে পারে; চুপটি করিয়া। সন্ধ্যা হয়তো বা চোখ বুজিয়া উহাকেই হাততালি দিয়া উড়াইয়া দিতে চায়, অতঃপর সে আয়ত নেত্রে অবলোকন করিবে—অমন নিরীহ ছানাটি অকস্মাৎ পাখা মেলে কেমন করিয়া!

মলিনেরও চোখ দুইটি ছল-ছল করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মায়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়াই উঠানে নামিয়া পড়িল। মা চোখ মুছিয়া ছোট একটি পুঁটলি হাতে দিয়া কহিলেন, "দুটি 'চালভাজা' আছে—পকেটে রাখ্।"

মলিন জোর করিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "ও আবার কি হবে?"

মা ছেলের চিবুকে হাত দিয়া চুম্ খাইয়া কহিলেন, "রাস্তায় তুমি খাবে!"

এমন সময়ে সরস্বতী উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল—তাহার হাতে ছোট একটি পুঁটলি। হাঁপাইয়া গিয়াছিল, মলিনের মুখোমুখী হইয়া এক মিনিট কাল দাঁড়াইয়া মলিনের মায়ের দিকে চোখ ফিরাইয়া কহিল, "দিদি, তোমার আক্কেলখানা যা-হোক্! যাবার সময় ছেলের মুখটি বুঝি আমাকে আর দেখতে নেই!" বলিয়াই পুঁটলিটি মলিনের হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিল, "দু'খানা খাবার আছে, রাস্তায় মুখে দিয়ো—তাইতো এতো দেরি!"

এই দৃশ্যে মলিনের মায়ের চোখ দুইটি বিস্ময়ে ও পুলকে ভরিয়া উঠিল। মলিনকে কহিলেন, "তবে, 'চালভাজার' পুঁটলি—ও রাখ্।"

"না, না!—ওটাও থাক্—" বলিতে-বলিতে সন্ধ্যা দ্রুত পদে সরিয়া আসিয়া বাধা দিল, এবার যেন সে প্রয়োজনের অতিরিক্তই সপ্রতিভ, সচকিত। চট্ করিয়া বড়মার দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিল, "চালভাজা দিয়ে সিঙাড়া-কচুরি—বেশ লাগবে, বড়-মা!"

মলিন হাসিয়া ফেলিল।

"হি, হি, হি—" সঙ্গে-সঙ্গে সন্ধ্যাও মুখ ভেঙাইয়া উঠিল এবং শেষের দিক্‌টায় গলার স্বরটা ধরিয়া উঠিতেই সে মুখ ফিরাইয়া ছুট দিল।

সরস্বতী হাসিয়া কহিল, "রকম দেখো মেয়ের! ওরে পালাস্ নে, পালাস্ নে—মলিন দাদাকে নমস্কার কর—"

কিন্তু, কে কার কথা শোনে, তখন সন্ধ্যার উড়ো-আঁচল সদর দরজার একটু এদিকে দেখা যাইতেছে।

সঙ্গে-সঙ্গে টিকিটের ঘণ্টা, ষ্টেশনের কোলাহল, রেলগাড়ি, ইঞ্জিনের ধোঁয়া, গার্ড সাহেবের বাঁশি—মলিনের মনের ভিতর যেন শব্দ করিয়া ও চিত্র ফেলিয়া গেল। আর সে দাঁড়াইল না—ত্রস্ত হইয়া পায়ে জোর দিল। সদর দরজা, তার চৌকাঠ পার হইয়াছে—সম্মুখেই সন্ধ্যা! সে এতক্ষণ বাহিরে আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল। মলিনের চলন্ত পা, তার উপর বার তিনেক হাত দিয়া ছোবল মারিয়া মাথায় ঠেকাইয়াই পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেল। মলিন একটি বার থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পরক্ষণেই আবার পা বাড়াইল—ওই পথে, যে-পথ প্রতি পদক্ষেপে পশ্চাতে পড়িয়া রহিবে। [ক্রমশঃ

আগমনী

শিশির সেন

আজিকার পৃথিবীর পঙ্গু হতাশ্বাস,
ম্লান মূর্চ্ছনার গীতে কাঁদাইছে ধরণী, আকাশ।
অতীতের যত পাপ,
যাহা কিছু অসুন্দর, যত অপলাপ,
বিবর্ত্তন রথচক্রে করে পিষ্ট ধীরে ধীরে,
সর্ব্বসহা মাটার এ ধরণীরে।
তবুও নীরবে,
মহাকাল সহ্য করে, যেন কোন বেদন-গৌরবে।
"যারা এত দিন,
বাজাইল অব্যাহত স্বেচ্ছাচার বীণ,
তাহাদের শেষ ধ্বনিটুক্,
নবারুণ দীপ্তি মাঝে, হবে ম্লান, হয়ে যাবে মূক।"

শুধু এই আশা,
এত দিন দিয়েছিল অনাহারী মুখে ক্ষীণতম ভাষা
যারা করে গেল অসত্যের উপাসনা,
অপরেরে দিল বলি, মিটাইতে আপন বাসনা,
তাহাদের ঋণ,
অনাগত জগৎ কি সহাসে বহিবে চিরদিন?
নহে, নহে, নহে,
দিনান্তের রবি আজ সগৌরবে এই কথা কহে।
যে রুধির হল পাত, এত দিন ধরে,
সে যে বিকসিত হবে থরে থরে।
যে জগৎ বহু কাল হতে দিল রক্ত দান,
আজি তার হল অবসান।

আপন রিক্ততা মাঝে,
হেরিবে সে আপন মূরতি পরিপূর্ণ সাজে।

অসহযোগ আন্দোলনের স্মৃতি

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীচিত্তরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা

ঢাকায় মৌলানা আক্রাম খাঁ

মৌলানা আক্রাম খাঁ এবং আমি অসহযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য ঢাকায় গিয়েছিলাম। সেখানে খুব মস্ত সভা হয়েছিল। সেই সভায় ঢাকার নবাব সাহেবের আত্মীয়-স্বজন ও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। আমি কবি-সম্রাটের দুটি গান গেয়েছিলাম…(১) 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে' এবং (২) 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।' মৌলানা আক্রাম খাঁর বক্তৃতা যাঁরা শুনেছেন তাঁরা জানেন যে, তাঁর অসাধারণ বক্তৃতা-শক্তি ছিল। তাঁর নানা যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শুনে ঢাকার সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতার খানিকটা আমার মনে আছে। আমরা যদি ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা না করি তবে অবস্থা তাদের কিরূপ হবে সে সম্বন্ধে মৌলানা বললেন, "আপনারা ত হিন্দুদের নৈবিদ্যের চাল দেখেছেন, সেই চালের উপরে এক খণ্ড কলা রয়েছে। সেই কলা মনে করে যে, সে চালগুলির উপরে রাজা হয়ে বসেছে কিন্তু চালগুলি পরামর্শ করে যদি একবার গা ছেড়ে দেয় তবে কলা মশায় মুহূর্ত্তমধ্যে উপর থেকে নীচে পড়ে ধূলোয় গড়াগড়ি যাবে! আমাদের মাথার উপরে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশরা মনে করছেন যে তাঁরা রাজা হয়েছেন। আমরাও যদি চালদের মতন গা ছেড়ে দিয়ে সকলে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জ্জন করি তবে কলার অবস্থাই তাদের হবে।"

ঢাকা থেকে মৌলানা সাহেব ও আমি মুন্সিগঞ্জে গিয়েছিলাম। সেখানেও বিরাট সভা হয়েছিল, মৌলানা সাহেব প্রায় দুই ঘণ্টা বক্তৃতা করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতা খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। আমিও স্বদেশী গান ও বক্তৃতা করেছিলাম।

কলকাতায় ফিরে এসে আমি গিরিডি থেকে একখানা চিঠি পেলাম যে গিরিডিতে খুব বড় একটি সভা হবে এবং সেই সভায় আমি উপস্থিত থাকি সকলেরই ইচ্ছা। আমরা গিরিডিতে প্রায় ত্রিশ বৎসর ছিলাম। আমার পিতৃদেব সর্ব্বজনপূজ্য ছিলেন। আমাদের অভ্রখনির খুবই লাভজনক কারবার ছিল, মাসিক আয় কম পক্ষে ৫।৬ হাজার টাকা ছিল, কিন্তু বাবার জীবিতাবস্থায়ই রাজনৈতিক কারণে আমরা সে সব বহু মূল্যবান্ সম্পত্তি হারিয়ে দরিদ্র হয়েছি, যদি সে সম্পত্তি আমরা না হারাতাম তবে শুধু আমাদের যে অর্থের অভাব থাকত না তা নয়, বহু বিপন্নকে সাহায্য করবার সৌভাগ্য ও সামর্থ্যও আমাদের থাকত। বাবা দুই হাতে দেশের কাজে এবং শত শত বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্যকল্পে অর্থব্যয় করেছেন, নতুবা আমাদের জন্য এরূপ সঞ্চিত অর্থ রেখে যেতে পারতেন যাতে আমাদের অর্থের অভাব বশতঃ কখনো কষ্ট পেতে হোত না। বাবা পরের দুঃখ দেখলে স্থির থাকতে পারতেন না, সে জন্যই সঞ্চিত অর্থ আমাদের জন্য রেখে যেতে পারেন নাই। দেশের কাজেও কম পক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করেছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

গিরিডিতে সভা

আমি গিরিডিতে যাওয়ার পর আমাদের বাটীর সম্মুখের মাঠে এক বিরাট সভা হোল। বহু লোক সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। পুলিশও সদলবলে উপস্থিত ছিল। ৮।১০ মাইল দূর থেকে হিন্দুস্থানী এবং সাঁওতাল অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক সভায় এসেছিল। "মদ, তাড়ি" খাওয়া এবং বিলাতি নুণ ও কাপড় ব্যবহার করা মহাত্মা গান্ধিজীর নিষেধ ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা বক্তৃতা করেছিলাম। ওখানকার বিহারী নন্‌-কো-অপারেটার কয়েক জনও বক্তৃতা করেছিলেন। আমার বক্তৃতার পরে একটি যে ঘটনা ঘটেছিল তা জীবনে কখনো ভুলতে পারব না। আমার বক্তৃতা শেষ করে' আমি যেই বসতে যাব অমনি এক জন সাঁওতাল এসে আমার পায়ে পড়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠে বলতে লাগল, "মহাত্মাজি, বাঁচাও বাঁচাও।" আমি একেবারে স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম এবং সভাস্থ সকলেই অবাক্ হয়ে গেলেন। ব্যাপার কি? কেউ কি ওকে মেরেছে? আমি কিছুই বুঝতে না পেরে বললাম, "কি হয়েছে বল।" সে খানিকক্ষণ খুব চীৎকার করে' কেঁদে তার পরে যা বলল তার মর্ম্ম এই যে, তার একটি ৪।৫ বছরের ছেলে মারা গিয়েছে। সে লোক-মুখে শুনেছে যে মহাত্মা গান্ধি এক সভায় বক্তৃতা দিতে আজ আসবেন, তাই সে তার ছেলেকে সৎকার না করে এই সভায় ছুটে এসেছে এই আশা বুকে নিয়ে যে, সে কোনো প্রকারে মহাত্মাকে তার বাটীতে নিয়ে যাবে এবং মহাত্মাজি তার ছেলেকে বাঁচিয়ে দেবেন। মহাত্মাজিকে তারা ভগবান্ বলে জানে, সুতরাং মরা ছেলেকে অবশ্যই বাঁচিয়ে দিতে পারবেন। আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম। তুমি সম্পূর্ণ ভুল করেছ, আমি মহাত্মাজি নই, এবং মহাত্মাজিও মরা মানুষ বাঁচাতে পারে না। আমার কথা শুনে সে নিরাশ হয়ে এমনি ভাবে চীৎকার করে' কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল যে, সে কথা মনে হ'লে এখনও হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং চক্ষে জল আসে। মহাত্মাজির উপর জনসাধারণের কিরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জন্মেছিল এই ঘটনাই তার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

গিরিডিতে মদ ও তাড়ি বন্ধ

গিরিডিতে এবং বিহারের অনেক স্থানে শ্রমিকরা খুবই মদ্যপায়ী। গিরিডির কয়লার খনিতে এবং অভ্রের কারখানায় বহু সহস্র কুলি কাজ করে। প্রতি রবিবার এই সব কুলিদের পেমেণ্টের দিন। এক এক জন কুলি প্রতি সপ্তাহে ৪।৫ টাকা এবং কেহ কেহ আরও বেশী উপার্জ্জন করে, কিন্তু রবিবার পেমেণ্ট পেয়েই তারা সোজা মদ ও তাড়ির দোকানে গিয়ে হাজির হয় এবং তাদের রোজগারের বারো আনা ভাগ মদ ও তাড়ির দোকানে দিয়ে মাতাল হয়ে' মাতলামি করতে করতে বাড়ী গিয়ে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের প্রহার করে' মহা অশান্তির সৃষ্টি করে এবং পরের সপ্তাহ অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে কাটায়, এই ছিল তাদের প্রোগ্রাম। তাদের মদ্যপান বন্ধ করার জন্য পূর্ব্বেও আমরা অনেক প্রকারে অনেক চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হই নাই। এবারেও মদ্যপান বন্ধ করার জন্য বহু ভলাণ্টিয়ার নিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি এই সব মদ্যপায়ীদেরও এমনি ভক্তির উদ্রেক হয়েছিল যে, আমাদের প্রচারকার্য্য এবারে সাফল্যমণ্ডিত হোল। আমরা নানা স্থানে সভা করে শুধু এই কথা বলতে লাগলাম যে, মহাত্মাজির হুকুম—কেউ মদ খেও না। যদি মদ না খাও তবে সব রকমে তোমাদের অশেষ কল্যাণ হবে। আমাদের

যা চিন্তার অতীত ছিল তা-ই ঘটল। সকলে মদ ছেড়ে দিল। গিরিডির মত স্থানে, যেখানে রবিবারে মদের দোকানে হাজার হাজার কুলি গিয়ে মদ খেয়ে হল্লা ক'রে এক মহা অশান্তির সৃষ্টি করত, সেই মদের দোকানে একটিও লোক নাই, শূন্য পড়ে আছে। সত্যই ইহা ম্যাজিক বলে মনে হোল। এই দৃশ্য দেখে বিহার গবর্ণমেন্টের বড় বড় অফিসারদের বিশেষতঃ আবগারি বিভাগের কর্ম্মচারীদের এই ম্যাজিক দেখিয়া চক্ষু কপালে উঠল। ইহা স্বপ্নাতীত ছিল। এই মদ বন্ধ করার জন্য গিরিডির অনেকেই যথেষ্ট খেটেছিলেন, তার মধ্যে বাবু জগন্নাথ সহায়, বজরং সহায় এবং আমার ভগিনীপতি স্বর্গীয় পশুপতি বসুর (সুকবি সুনির্ম্মল বসুর পিতা) নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পশুপতি বাবুকে এ জন্য কিছু দিন জেলেও থাক্‌তে হয়েছিল। বিহার গবর্ণমেণ্টের আয়ের মধ্যে আবগারি বিভাগই প্রধান। গিরিডিতে মদ বন্ধ হওয়ায় বিহারের অনেক স্থানে মদ বন্ধ হয়ে গেল। গবর্ণমেন্টের প্রধান আয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারীদের মধ্যে হাহাকার পড়ল। তখনকার লাট সাহেব এত দূর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন যে, তিনি বিহার গেজেটে একটা ইস্তাহার জারি করলেন যে মদ খাওয়া যাদের অভ্যাস তারা যদি হঠাৎ মদ ছেড়ে দেয় তবে তাদের নানা প্রকারের পীড়া হ'তে পারে, অতএব এরূপ ভাবে মদ ছেড়ে দেওয়া কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়। বিহার গেজেটের এই ইস্তাহার পড়ে এমনি হাসি পেয়েছিল যে, তা কি লিখব? আমাদের মহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দরদী গবর্ণমেণ্ট যাতে লোক-গুলো মদ না খেয়ে আবার বিষম অসুখ-বিসুখে ভোগে এই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, তাই ঐরূপ ইস্তাহার জারি করেছিলেন। আমি তখন এক দিনের মধ্যে "নন্‌-কো-অপারেশন" নাম দিয়ে একটি ছোট থিয়েটারের পালা লিখে ফেল্‌লাম। আমরা এক দিন সন্ধ্যার পরে এই থিয়েটার করলাম। পালাটি হচ্ছে এই যে, এক জন ইংরেজ তার চাকর, খান্‌সামা, মেথর, ধোপা, ইত্যাদি সবই দেশী লোক। সাহেব এক দিন "ড্যাম্ নন-কো-অপারেশন" বলে গাল দিলেন। এক জন নন্‌-কো-অপারেটার তার নাম দিয়েছিলাম "চিত্তানন্দ স্বামী।" ইনি সন্ন্যাসী। সাহেব "ড্যাম নন্‌-কো-অপারেশন" বলে গাল দেওয়ায় সাহেবের কর্ম্মচারীরা সকলে তার কাজ ছেড়ে দিল। তখন সাহেবের আর দুর্দ্দশার সীমা রইল না। কয়েক দিনের মধ্যেই সাহেব বুঝতে পারলো যে দেশী লোকদের সহযোগিতায়ই সে মহা সুখে রাজার হালে দিন কাটাচ্ছিল, কিন্তু যখন সকলে তাকে বয়কট্ করল তখন তার জীবন ধারণ করাই কঠিন হ'য়ে উঠল। মেথর 'কমোড' পরিষ্কার না করায় দুর্গন্ধে তার টেকা ভার হল, চাকর না থাকায় ঘর-দোর সব মহা অপরিষ্কার হোল, খানসামা না থাকায় তার রান্না বন্ধ হোল। সাহেব মনে করেছিল যে পয়সা দিলে অনেক লোক পাওয়া যাবে কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই সাহেব তার ভুল বুঝতে পারল এবং অস্থির হয়ে উঠল।

গবর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে কয়েক জন সিপাহি লাঠি হাতে করে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে নিম্নের ইস্তাহার জারি করতে লাগল—

"নূতন লাটের নূতন হুকুম শোন সকলে,
জেলে যেতে হবে এবার মদ না খেলে।
মদ খেয়ে দেও গড়াগড়ি, তাড়ি খাও হাঁড়ি হাঁড়ি,
মকদ্দমায় ব্যাচো বাড়ী
নইলে যাবে গো জেলে।"

গিরিডিতে কোর্টের মকর্দ্দমাও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণ, অধিকাংশ মামলা আপোষে নিষ্পত্তি ক'রে দেওয়া হোত, সুতরাং বিহার গবর্ণমেন্টের মহা ক্ষতি হ'তে লাগল। নন-কো-অপারেটার চিত্তানন্দ স্বামী সেজেছিলাম আমি। সাহেবের যখন নিতান্ত দুর্দ্দশা, চীৎকার ক'রে কাঁদছিল তখন চিত্তানন্দ স্বামী গিয়ে নিম্নলিখিত গানটি গাইল:

"কেমন আছ সাহেব মশায়,
একবার তোমায় দেখতে এলাম,
চেন কি আমাকে প্রভু,
সেলাম সেলাম বহুৎ সেলাম।
নন-কো-অপারেশন ড্যাম্ বলে
কত গালি দিয়েছিলে,
এখন ভেসে নয়ন-জলে,
এবার অন্তরেতে ভজ যিশু-নাম।"

আমরা বাড়ীতেও রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে অনেক আমোদ-আহ্লাদ করলাম। আমাদের থিয়েটার অনেক লোক দেখতে এসেছিলেন এবং সবাই বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, মদ ও মোকদ্দমা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিহার গবর্ণমেন্টের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল, সুতরাং নন-কো-অপারেটার-দের জেলে পাঠানো ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই দেখে এক দিন গিরিডির ষোল জন নন-কো-অপারেটারকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হোল। এই ষোল জনের মধ্যে আমি ছিলাম একমাত্র বাঙালী, তিন জন মুসলমান এবং বাকি সব বিহারী ভদ্রলোক।

হাজারিবাগ জেল

আজান দেওয়ায় অশেষ নির্য্যাতন

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে দু'খানা বাস্ (Bus) আমাদের ষোল জনকে নিয়ে হাজারিবাগ অভিমুখে ছুটল। আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল এক জন পুলিশ অফিসার এবং কয়েক জন কনেষ্টবল। আমাদের বাস্ যখন গিরিডি কোর্ট থেকে ছেড়ে দিল তখন গিরিডি কোর্টে আমাদের বিদায় দেখবার জন্য বহু সহস্র লোকের সমাগম হয়েছিল, তাদের অনেকে অনেক দূর পর্য্যন্ত আমাদের বাসের পেছনে দৌড়ে দৌড়ে "বন্দে মাতরম্" এবং "আল্লা হো আকবর" ধ্বনিতে চারি দিক কাঁপিয়ে তুলেছিল। আমাদের গাড়ী হু-হু করে চল্‌তে লাগল। পরেশনাথ পাহাড়ের কাছ দিয়ে যখন গাড়ী চল্‌তে লাগল তখন মনে পড়ল যে আমার পিতৃদেব জীবিত থাকতে তাঁর সঙ্গে আমি একবার পরেশনাথ পাহাড়ে এসে এক রাত্রি পাহাড়ের ডাক্-বাংলোয় ছিলাম। আমাদের সঙ্গে রিপন কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় ছিলেন। সেই পূর্ব্বস্মৃতি মনে পড়ে বড়ই আনন্দ হোল। পরেশনাথ জৈনদের পুণ্যতীর্থ, পরেশনাথের উদ্দেশে প্রণাম করলাম। আমাদের দলের লডন মিঞা বেশ সুগায়ক। সন্ধ্যাবেলা সে গান ধরল:—

ভারত-জননী তেরি জয় তেরি জয় হো।
তেরি লিয়ে জেল হো, স্বরগ দুয়ারো,
বেড়িকা ঝুন্‌ঝুনমে বীণাকি লয় হো।

তু শুদ্ধ আওর বুদ্ধ,
তু প্রেম আগারো,
তেরে বিজয় সূর্য্য, মাতা, উদয় হো।
কহত খলিল দাস, হিন্দু মুসলমান,
সবে মিলি বোলো আজি জননী তেরি জয় হো।

গানটি সেদিন খুবই ভাল লেগেছিল, তাই আমি গানটি শিখে নিয়েছিলাম। এই গানের অর্থ এই যে—"হে ভারত-জননি, তোমার জয় হউক। তোমার জন্য জেল যেন স্বর্গের দুয়ার, আর বেড়ির ঝুনঝুন শব্দ বীণার লয়ের ন্যায় মধুর হউক। তুমি শুদ্ধ এবং বুদ্ধ, তুমি প্রেমের আগার। মাতা, তোমার বিজয়-সূর্য্য উদয় হোক। খলিল দাস বলছে—হে হিন্দু ও মুসলমানগণ, তোমরা সকলে মিলে আজ বল—জননি, তোমার জয় হউক।" আমাদের গান শুনে আমাদের সঙ্গের সিপাইরাও গান গাইবার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারল না। তারাও তাদের রাসভনিন্দিত কণ্ঠে গান ধরল "রামা হো।" যাই হোক, হৈ-চৈএর মধ্যে রাত্রি প্রায় বারোটার সময়ে আমাদের বাস্ গিয়ে হাজারিবাগের জেলের গেটে দাঁড়ালো। জেলের গেট খুলে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেল, এবং মস্ত একটা ঘরে সারা রাত্রি গান, বক্তৃতা ইত্যাদি হৈ-চৈ করে' কাটিয়ে দিলাম।

ভোরে আমাদের অন্য একটি ওয়ার্ডে নিয়ে গেল, সেই ওয়ার্ডে চৌদ্দটি সেল ছিল। জানলাম, রাত্রে আমাদের প্রত্যেককে এক-একটি সেলের মধ্যে থাক্‌তে হবে। জেলের সেল সম্বন্ধে আজকাল অনেকেরই ধারণা আছে। খুব ছোট একটি ঘর, তাতে একটি মাত্র লোহার গরাদ দেওয়া দরজা, কোনো জানালা কিম্বা কোনো ভেণ্টিলেটার নাই। ভদ্রলোকের পক্ষে এরূপ সেলে বাস করা যে খুবই কষ্টকর তা লেখাই বাহুল্য।

বেলা প্রায় আটটার সময়ে দুই জন ইংরেজ আমাদের ওয়ার্ডে এসে হাজির হলেন, জানলাম, এক জন জেলার এবং অপর জন জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমাদের বললেন, "আপনারা সব শিক্ষিত ভদ্রলোক, সুতরাং আমি আশা করি আপনারা জেল কোডের নিয়ম সব মান্য করে' চলবেন।" আমি বললাম, "জেল কোডের নিয়ম ত আমরা জানি না, আপনি বলে' দিন।" তিনি বললেন, "প্রথম নিয়ম হচ্ছে এই যে, জেলার সাহেব কিম্বা আমি যখন পরিদর্শনের জন্য আপনাদের কাছে আসব তখন হেড ওয়ার্ডের (বড় জমাদার) যখন চীৎকার করে' বলবে "সরকার সেলাম" তখন আপনারা দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের সেলাম করবেন।" আমি বললাম, "কোন নন-কো-অপারেটার আপনাদের সেলাম করবে না, তবে মহাত্মা গান্ধিজির নির্দ্দেশানুযায়ী আপনাদের সম্মান দেখাবার জন্য আমরা উঠে দাঁড়াব, তার বেশী আমরা কিছু করতে পারব না।" কি জানি কি ভেবে সুপার (সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট) আমার কথায় সম্মত হলেন।

পুরুলিয়া, চাতরা, হাজারিবাগ প্রভৃতি নানা স্থান থেকে অনেক অসহযোগী এসে হাজির হলেন এবং জেল বেশ গুলজার হয়ে উঠল। পুরুলিয়া থেকে সেখানকার কয়েক জন বিশিষ্ট বাঙ্গালী উকিল এসেছিলেন। চাতরা থেকে বাবু রামনারায়ণ সিং (ইনি বিহার থেকে এম্, এল্, এ হয়েছিলেন) এবং তাঁর ভাই বাবু শুকলাল সিং এসেছিলেন। হাজারিবাগ টাউন থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ফসিউদ্দীন নামক এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান এসেছিলেন। ফসিউদ্দীনের বয়স মাত্র আঠারো বছর ছিল।

কিছু দিন আমাদের নির্ঝঞ্ঝাটে কাটল, আমাদের সঙ্গে গিরিডি থেকে যে মুসলমানরা এসেছিলেন তাঁদের অন্য জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হোল।

ভগবানের কৃপায় অল্প দিনের মধ্যেই রাজনৈতিক এবং অন্যান্য সমস্ত কয়েদিরাই আমাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে লাগল এবং সব বিষয়েই আমার পরামর্শ সকলে গ্রহণ করত।

মুসলমানের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ

সুপার ও জেলারের সঙ্গে প্রথম গোলমাল লাগল ফসিউদ্দীনের। ফসিউদ্দীন প্রতিবার নমাজের পূর্ব্বে আজান দিতে লাগল, এটা তার ধর্ম্মের অঙ্গ। হঠাৎ এক দিন জেলার ফসিউদ্দীনকে বলল, "তুমি আজান দিতে পারবে না, কারণ, রাত্রি আটটার সময়ে যখন তুমি আজান দেও, সেই চীৎকারে আমার স্ত্রীর ঘুম ভেঙ্গে যায়।" ফসিউদ্দীন বলল, "আমি ত চৌদ্দ নম্বর ওয়ার্ডে থাকি, এই ওয়ার্ড ত জেলারের কোয়ার্টার থেকে অনেক দূরে। মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য আমি রাত্রে আজান দিই, সে আওয়াজ যে আপনার কোয়ার্টার পর্য্যন্ত যায় তা আমার মনে হয় না। আজান দেওয়া আমার ধর্ম্মের অঙ্গ, আমি তা বন্ধ করতে পারব না।" ফসিউদ্দীন এসে আমাকে সব বলল। আমি তাকে বললাম, "আজান দেওয়া যখন তোমাদের ধর্ম্মের অঙ্গ তখন আজান দেওয়াই নিতান্ত কর্ত্তব্য। জেলারের এরূপ অন্যায় আদেশ কখনই মান্য করা উচিত নয়।"

ফসিউদ্দীন আজান দিতে লাগল। আজান দেওয়ার ফলে ফসিউদ্দীনের এক একটি অঙ্গ এক একটি জেলের গয়নায় ভূষিত হ'তে লাগল। প্রথমে হাতে হাত-কড়ি, তার পর পায়ে বেড়ি, এবং কিছু দিন পরে "Gunny clothing" অর্থাৎ চটের পোষাক আজান দেওয়ার পুরস্কার-স্বরূপ পেল। অতিশয় নোংরা খুব মোটা চটের হাফপ্যান্ট এবং ঐরূপ চটের কোর্ত্তা। ইচ্ছা করেই সেগুলি এমনি অপরিষ্কার করে' রাখা হয় যে পরলেই গায়ে ভীষণ জ্বালা করে এবং ঘা হয়। এ সব শাস্তিতেও যখন ফসিউদ্দীন আজান বন্ধ করল না তখন জেলার ও সুপারের নজর পড়ল আমার দিকে, কারণ, তারা জানত যে জেলের সব রাজনৈতিক কয়েদিরা আমার পরামর্শ গ্রহণ করে এবং আমাকে খুব মান্য করে। জেলার ও সুপার আমার নাম দিয়েছিল "Ring leader" আমি এই নামের জন্য বিশেষ গৌরব বোধ করতাম। তারা ফসিউদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এত শাস্তি পাওয়ার পর কে তোমাকে এরূপ ভাবে উত্তেজিত করছে?" ফসিউদ্দীন বলল, "আজান দেওয়া আমার ধর্ম্ম, এই ধর্ম্ম পালন করতে চিত্তরঞ্জন বাবু আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন। তিনি ঠিক কথাই বলছেন, কিছু অন্যায় ত বলছেন না।" ফসিউদ্দীনের কাছে এ কথা শুনে সুপার ও জেলার আমার কাছে এসে অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে ইংরাজিতে বলল, "আপনি ফসিউদ্দীনকে আজান দিতে উৎসাহ ও উত্তেজনা দিচ্ছেন?" আমি বললাম "হ্যাঁ, তাকে তার ধর্ম্ম পালন করতে উৎসাহ দেওয়া আমি আমার কর্ত্তব্য বলে মনে করি, তাতে তার যতই শাস্তি ও লাঞ্ছনা হোক না কেন যার বিন্দুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান আছে সে কখনই কোনো ধর্ম্মের অসম্মান সহ্য করতে পারে না।"

ইহার পর আমাকে একটি সেলে (Cell) আবদ্ধ করে' রাখা হোল এবং কয়েক দিন পরে আমাকে জব্দ করার জন্য ঘানিতে জুড়ে দেওয়া হোল। জেলের মধ্যে সুপার সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, তাঁর কাছে কোনো আইন-কানুন নেই, যে কোনো রকমের অত্যাচারই তিনি করতে পারেন। ভোর ৬টা থেকে ১১টা এবং খাওয়া-দাওয়ার জন্য এক ঘণ্টা বিশ্রামের পর আবার ১২টা থেকে ৫টা পর্য্যন্ত খুব ভারি লোহার ঘানি ঠেলে অনবরত ঘুরতে হোত। আমি হিসেব করে' দেখেছি যে, সোজা পথে চললে প্রায় ১৫।২০ মাইল হাঁটা হোত। লোহার ভারি ঘানি টান্তে বুকে অসহ্য ব্যথা হোত কিন্তু আমি কিছু গ্রাহ্য না করে এক মাস এরূপ ভাবে ঘানি টানার পর এক দিন ভয়ানক জ্বর হোল এবং আমি অজ্ঞান হয়ে' পড়ে গেলাম। যখন আমার জ্ঞান হোল তখন দেখলাম যে, সাধারণ কয়েদিদের বিশেষ ভাবে শাস্তি দেওয়ার জন্য যে সব ছোট ছোট সেল আছে তার একটিতে আমি শুয়ে আছি। আমার সর্ব্বাঙ্গে শুঁয়ো পোকা। এই সব সেল ইচ্ছা করেই পোকা-মাকড়ে ভর্ত্তি করে রাখা হয়, যাকে শাস্তি দেওয়া হবে তাকে যাতে পোকায় কামড়ায়। এই সেলগুলি এমনি অপরিষ্কার যে, দুর্গন্ধে আমার বমি আসতে লাগল। শুঁয়ো পোকার দরুণ সর্ব্বাঙ্গ ফুলে ফুলে উঠেছিল এবং যে কী ভীষণ জ্বালা করতে লাগল তা বর্ণনা করতে পারি না। আমার ভয়ানক জল পিপাসা পেয়েছিল, চীৎকার করে বললাম, "কে আছ?" এক জন ওয়ার্ডার এসে হাজির হোল। সে আমার পাহারায়ই অদূরে দাঁড়িয়েছিল। আমি তাকে বললাম, "পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে আমাকে জল দেও।" দেশী ওয়ার্ডাররা সবাই আমাদের বিশেষ মান্য করত। সে দৌড়ে গিয়ে জল নিয়ে এল। জল খেয়ে খানিকটা ভাল বোধ হ'তে লাগল। আমি ওয়ার্ডারকে বললাম, "ডাক্তার বাবুকে একবার খবর দেও।" বাঙ্গালী ডাক্তার বাবু যেমনি ভাল লোক তেমনি স্বাধীনচেতা ছিলেন। আমার অবস্থা দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, "আপনার জ্বর হয়েছে, অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, এই অবস্থায় আপনাকে হাসপাতালে না পাঠিয়ে এরূপ জঘন্য সেলে এনে আবদ্ধ করে রেখেছে, এরা মানুষ না কি?" ওয়ার্ডারকে তিনি বললেন, "তুমি এই বাবুর কাছে থাক, আমি জেলার সাহেবের কাছে যাচ্ছি," এই বলে তিনি চলে গেলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এসে বললেন, "আমি জেলার সাহেবকে বলেছি যে, এই রোগী যদি মারা যায় তবে তার জন্য আপনি এবং সুপার দায়ী, এ কথা আপনারা লিখে দিন, নতুবা আমার দায়িত্বে এই রকম রোগী আমি ঐ সেলের মধ্যে রাখতে পারি না।" জেলার সাহেব বললেন, "আপনি ইচ্ছা করলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারেন।"

ডাক্তার বাবু আমাকে তখনি হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। ১৫ দিন হাসপাতালে থাকার পর আমাকে আবার প্রথম যে সেলে ছিলাম সেই সেলে নিয়ে যাওয়া হোল। আমার ওজন আটাশ পাউণ্ড কমে গিয়েছিল। আমার তখন কোনো কাজ করবার মত সামর্থ্য ছিল না, তবুও আমাকে আবার রোজ আধ মণ করে' গম পিষতে দেওয়া হোল (Wheat grinding)। জেলের গম পিষবার জাঁতা অত্যন্ত ভারি এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গম পিষতে হয়; তাতে বুকে ভয়ানক ব্যথা লাগে। আমার শরীর যে রকম দুর্ব্বল হয়ে' গিয়েছিল তাতে গম পেষা আমার পক্ষে অসম্ভব মনে করে' আমি জেলারকে বলে' দিলাম, "আমি গম পিষতে পারব না।" জেলার সুপারের কাছে রিপোর্ট করল, তিনি শাস্তি দিলেন "Four days standing handcuffs." অর্থাৎ উঁচু দেওয়ালের সঙ্গে হাত দু'টি হ্যাণ্ডকাফে আবদ্ধ থাকবে, এরূপ ভাবে ভোর থেকে বিকেল পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কেবল দুপুরে খাওয়ার জন্য এক ঘণ্টার ছুটি। চার দিন উপরো-উপরি এরূপ ভাবে দাঁড়িয়ে আমার পা ও হাত ভয়ানক ফুলে গেল। ইতিমধ্যে সুপার এক দিন এসে আমাকে বললেন, "কেন আপনি অনর্থক এত কষ্ট ভোগ করছেন, আপনি যদি ফসিউদ্দীনকে আজান দিতে নিষেধ করে দেন তবেই ত সব গোল মিটে যায়। আপনি তার পেছনে না দাঁড়ালে কখনই সে আমাদের আদেশ অমান্য করতে সাহস পেত না।" আমি বললাম, "আমার যদি প্রাণও যায় তবুও আমি ফসিউদ্দীনকে তার ধর্ম্ম ত্যাগ করতে বলতে পারব না।"

এত যে নির্য্যাতন ও কষ্ট সহ্য করলাম, যা সত্য সত্যই অসহ্য মনে হয়েছিল তা যে একটি ধর্ম্মের সম্মান রক্ষার জন্য করেছি এই ভেবে আমার মনে এমনি অসীম আনন্দ বোধ হতে লাগল যে তা বর্ণনাতীত। একটি ধর্ম্মের সম্মান রক্ষার জন্য যে এরূপ ভীষণ উৎপীড়ন সহ্য করবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল সে জন্য আমাকে খুবই ভাগ্যবান্ বলে' মনে হ'তে লাগল। ফসিউদ্দীনও যথার্থ ধার্ম্মিক, তাই কোনো উৎপীড়নকে সে গ্রাহ্য করে নাই। সে ছেলেমানুষ ছিল, আমার কাছে উৎসাহ ও সমর্থন না পেলে হয়ত সে ঘাবড়ে যেত। সে আমার কাছে এসে প্রায়ই পরামর্শ করত।

মিলিটারী পুলিশ সহ ডেপুটি কমিশনার

আমি সেলে আবদ্ধ আছি, হঠাৎ এক দিন জেলে খুব হৈ-চৈ পড়ে' গেল। এক জন ওয়ার্ডার এসে খবর দিয়ে গেল, "বাবু, হাজারিবাগের ডেপুটি কমিশনার সাহেব অনেকগুলি মিলিটারী পুলিশ নিয়ে জেলে এসেছেন।" খানিক পরেই আমি যে সেলে আবদ্ধ ছিলাম তার সম্মুখের মাঠে মিলিটারী পুলিশরা এসে কুচকাওয়াজ করতে লাগল এবং গুড়ুম গুড়ুম বন্দুকের আওয়াজ করতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম যে, আমাকে ভয় দেখাবার জন্যই এ সব অভিনয়। আমার ভয়ানক হাসি পেতে লাগল এই ভেবে যে, ১৯০৬ সালে আমি যখন ছোট ছিলাম তখনি বন্দুক-হস্তে গুর্খা সৈন্য আমাকে বিন্দুমাত্র ভীত করতে পারে নাই, আর এখন আমাকে কি ভয় দেখাবে? আমি মনে মনে বললাম "এ ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।" আমি আমার সেলের সম্মুখের লোহার গরাদ দেওয়া দরজার সম্মুখে বসে' বসে' রঙ্গ দেখছিলাম এমন সময় জেলের সুপার, জেলার ও ডেপুটি কমিশনার সাহেব আমার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ডেপুটি কমিশনার বললেন, "আমি হাজারিবাগের ডেপুটি কমিশনার। আমি বললাম, "আমি এক জন নন-কো-অপারেটার। ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে আমার কোনো প্রয়োজন নাই।"

ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে ইংরাজিতে আমার নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্ত্তা হোল :

ডে: ক:—আপনি জেল ডিসিপ্লিন্ নষ্ট করেছেন সে জন্য শাস্তি হচ্ছে বেত্রাঘাত, তা আপনি জানেন? আপনাকে ও ফসিউদ্দীনকে বেত্রাঘাত শাস্তি দেওয়া হবে।

আমি—আমি কোনো জেল ডিসিপ্লিন্ নষ্ট করি নাই।

ডেঃ কঃ—আপনি সুপারের হুকুম অমান্য করে' ফসিউদ্দীন নামক কয়েদিকে আজান দিতে পরামর্শ দিচ্ছেন?

আমি—আজান দেওয়া মুসলমান ধর্ম্মের অঙ্গ, ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে' সুপার যে আদেশ দিয়েছিলেন সে আদেশ অমান্য করাই নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ডেঃ কঃ—আপনি এক জন হিন্দু, আজান দিতে বাধা দেওয়ায় আপনার কি ক্ষতি?

আমি মনে মনে বুঝলাম যে, হিন্দু-মুসলমানের মনে এরূপ ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করেই ত আমাদের সর্ব্বনাশ করা হয়েছে। সব জায়গায়ই সেই "Divide and rule" পলিসি।

আমি—আপনি একটি জেলার কর্ত্তা, সুতরাং অবশ্যই শিক্ষিত। আপনি এ রকম কথা বলছেন দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আপনি অবশ্যই জানেন যে, যাঁর বিন্দুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান আছে তিনি কখনই কোনো ধর্ম্মের অসম্মান সহ্য করতে পারেন না। আজ যদি কেউ খৃষ্টান ধর্ম্মের অপমান করত তবে আমি এরূপ ভাবেই তার প্রতিবাদ করতাম। ডেপুটি কমিশনার নিরাশ হয়ে' ফিরে গেলেন, আমি আবার সেই সেলেই আবদ্ধ রইলাম।

সেলের মধ্যে আমি সমস্ত দিন বসে' কিম্বা শুয়ে নিজের মনে গান করতাম, তাতে মনের বল অনেক বৃদ্ধি পেল।

আমার শরীরের উপর দিয়ে উৎপীড়নের ঝড় বয়ে গিয়েছিল কিন্তু আমার মনে অসীম আনন্দ হয়েছিল এই ভেবে যে, একটি ধর্ম্মের জন্য আমার যে এত নির্য্যাতন ও ক্লেশ ভোগের সুযোগ হয়েছে তা অবশ্যই পূর্ব্বজন্মের অনেক পুণ্যফলে। জেলার ও সুপার আমাকে বার বার ভয় দেখাতে লাগল যে, এবারে ইন্‌স্‌পেক্টার জেনারেল্ অব প্রিজিন্‌স এসে আমাকে ও ফসিউদ্দীনকে বেত মারার ব্যবস্থা করবেন।

আমার শরীরের ওজন অনেক কমে গিয়েছিল এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা এত প্রবল হয়েছিল যে, সত্যি সত্যি যদি বেত মারা হয় তবে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য। যাই হোক, আমার মনে পূর্ণ তৃপ্তি এই ও আনন্দ এই ভেবেই সর্ব্বদা হোতে লাগল যে, একটি ধর্ম্মের সম্মান রক্ষার জন্য আমার মৃত্যু হলেও আমার অশেষ পুণ্য হবে। এ আমার কম সৌভাগ্য নয়।

ইন্‌সপেকটার জেনারেল এসে আমাদের বেত দেবেন এ সংবাদ জেলময় রাষ্ট্র হওয়াতে জেলের মধ্যে এক মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হোল। সাধারণ কয়েদিদের মধ্যে অনেকে বলতে লাগল, "বাবুর বেত হ'লে আমরা তা কিছুতেই সহ্য করব না।" এই কথা শুনে আমার মনের মধ্যে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হোল এই ভেবে যে, সত্য সত্যই যদি আমাদের বেত হলে' জেলের কয়েদিরা একটা কিছু কাণ্ড করে' বসে তবে তার ফলে হয়ত অনেকের প্রাণ যাবে। কারণ কয়েদিরা যদি কোনো প্রকার মারামারি করে' বসে তবে জেলের কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্যই গুলী চালাবে; সুতরাং অনেক প্রাণ নষ্ট হবে। এই চিন্তাতে আমার রাত্রে ঘুম হোত না, আমি কেবল ভগবানের চরণে প্রার্থনা করতাম যে, যদি আমার বেতও হয় তবু যেন জেলে কোনো গোলমাল না হয়।

কয়েক দিন পরে এক জন ওয়ার্ডার এসে আমাকে সংবাদ দিয়ে গেল, "বাবু, জেনারেল সাহেব অর্থাৎ ইন্‌স্‌পেক্টার জেনারেল এসেছেন।"

ইন্‌স্‌পেক্টার জেনারেল্ অব্ প্রিজিন্‌স্

আমি আমার সেলের দরজার সামনে বসে আছি, এমন সময়ে এক জন সাহেব হেড ওয়ার্ডারকে সঙ্গে নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, "Good morning Mr Guha." আমি অবাক্ হয়ে গেলাম, কারণ জেলের মধ্যে এরূপ সম্বোধন কোনো সাহেব পূর্ব্বে করে নাই। হেড্ ওয়ার্ডার বলল, "ইনি জেনারেল সাহেব।" আমি উত্তরে বললাম, "গুড্ মরর্ণিং সার।" ইন্‌স্‌পেক্টার জেনারেল শুনেছিলেন যে, আমি কোনো অফিসারকে সেলাম করি না, তাই নিজেই আগে গুড মর্ণিং বললেন। আমি বুঝতে পারলাম যে লোকটি খুবই বুদ্ধিমান ও পাকা। ইন্‌স্‌পেক্টার জেনারেল আমাকে বললেন, "আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, আপনাকে জেলের আপিসে ডেকে পাঠালে আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক যাবেন কি?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ যাব।" বুঝলাম যে, লোকটি খুবই পাকা। মিষ্টি ব্যবহার ছাড়া কিছুতেই কোনো মীমাংসা হবে না তা বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন।

খানিক পরে এক জন ওয়ার্ডার এসে আমাকে জেলের আপিসে ডেকে নিয়ে গেল। সেখানে যাওয়ামাত্র আই, জি (Inspector General) আমাকে খুবই ভদ্র ভাবে একটা চেয়ারে বসতে বললেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে চেয়ারে বসলাম। সেখানে সুপার এবং জেলারও বসে' ছিলেন। খুব হাসতে হাসতে আই, জি আমাকে বললেন, "আপনারা ত জেলকে ওলট-পালট করে দিয়েছেন, দেখুন ত—আমাকে এত দূর কষ্ট করে আসতে হোল। আপনি খুবই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তা আমি জানি কিন্তু জেলের মধ্যে এ রকম গোলমাল করা কি আপনার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে উচিত? ফসিউদ্দীন নামক এক জন রাজনৈতিক কয়েদি চীৎকার করে রাত্রে আজান দেয়, তাতে জেলারের মেমসাহেবের ঘুম ভেঙ্গে যায়, কিন্তু এ রকম এক জনের ঘুম ভেঙ্গে দেওয়া কি অন্যায় নয়?"

আমি—ফসিউদ্দীন রাত্রি ৮টার সময়ে মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য আজান দেয়। কারণ নমাজের পূর্ব্বে আজান দেওয়া তার ধর্ম্মের অঙ্গ। সে চৌদ্দ নম্বর ওয়ার্ডে থাকে, এই ওয়ার্ড জেলের একেবারে শেষ সীমায়, সেখান থেকে এক জন লোক যত জোরেই চীৎকার করুক তাতে কখনো এমন গোলমাল হতে পারে না যাতে কারুর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম যে, চীৎকারে ঘুমই ভেঙ্গে যায়। আচ্ছা, মেমসাহেব যদি ঠিক আটটার সময়ে না ঘুমিয়ে পাঁচ মিনিট পরে ঘুমান তবেই ত সব মীমাংসা হয়ে যায়।

জেলার অমনি বলে উঠল, "যে সময়ে মেমসাহেবের ঘুমোবার সময় ঠিক তখনই ফসিউদ্দীন আজান দেয়। মেমসাহেবের ঘুম একবার ভেঙ্গে গেলে আর সারা রাত্রি ঘুম হয় না।"

আমি—এ ত দেখছি মহা রোগ! মেমসাহেবের ত তবে রাত্রে ঘুমোবার কোনো উপায় নেই।

জেলার—কেন? ফসিউদ্দীন চীৎকার না করলেই ঘুমোতে পারে।

আমি ইন্‌সপেকটার জেনারেলকে বললাম, "জেলারের এই কথার যে কোনো মূল্য নাই, তা' আমি প্রমাণ করে দেব। রাজনৈতিক কয়েদির ধর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মানই জেল-কর্ত্তৃপক্ষদের উদ্দেশ্য। আপনি ত জেল সম্বন্ধে সব নিয়মই জানেন, আপনি অবশ্যই জানেন যে, প্রতি

রাত্রে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে ভোর ছয়টা পর্য্যন্ত সেণ্টাল টাওয়ার (গুমটি) থেকে ওয়ার্ডার ভীষণ চীৎকার করে কয়েদি গণনা করে। গুমটি জেলারের কোয়ার্টার থেকে বেশী দূর নয়। এই ভীষণ চীৎকারে মেমসাহেবের ঘুম ভাঙ্গে না কিন্তু জেলের শেষ সীমা থেকে ফসিউদ্দীন পাঁচ মিনিটের জন্ম যে আজান দেয় তাতে মেমসাহেবের ঘুম ভেঙ্গে যায়! আপনিই বিবেচনা করুন যে, এ কি কোনো যুক্তিসঙ্গত কথা?"

ইন্‌সপেক্টার জেনারেল সুপার ও জেলারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এ বিষয়ে তাঁদের কি বলবার আছে? সুপার ও জেলার চুপ করে' রইলেন। কারণ তাঁদের বলবার কিছু নাই। ইন্‌সপেক্টার জেনারেল একটা সিগার ধরিয়ে তাতে একটা জোর টান দিয়ে অনেকগুলি ধোয়া ছেড়ে এক জন ওয়ার্ডারকে বললেন, "ফসিউদ্দীনকো বোলাও।" একটু পরে ফসিউদ্দীন এসে হাজির হোল।

আই, জি,—তুমি রোজ রাত্রে চীৎকার করে' জেলারের মেম-সাহেবের ঘুম ভাঙ্গ কেন?

ফসিউদ্দীন—চীৎকার করে' আজান দেওয়া আমাদের ধর্ম্মের অঙ্গ, আমি তা দেবই।

আই, জি,—এরূপ অবাধ্যতার শাস্তি বেত, তা তুমি জান? তুমি বেত খেতে প্রস্তুত আছ?

ফসিউদ্দীন—হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত আছি।"

ইন্‌সপেক্টার জেনারেল খুব হেসে বললেন, "এই নেও তোমার শাস্তি" এই বলে একটা কাগজে একটা লাল পেন্সিল দিয়ে খুব মোটা অক্ষরে লিখে দিলেন "Azan allowed."

আমাদের মনে আনন্দ আর ধরে না, কারণ আমরা ধর্ম্মযুদ্ধে জয়ী হয়েছি। জেলের সমস্ত কয়েদিরা আমাদের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। আমাদের জয়ের বার্ত্তা শুনে সমস্ত জেলের মধ্যে আনন্দের রোল উঠল, কেবল সুপার ও জেলারের মুখ কালি হয়ে গেল ফসিউদ্দীনের হাতকড়ি, বেড়ি চটের পোষাক সবই খুলে ফেলা হোল। ইন্‌সপেক্টার জেনারেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে অন্ত জেলে বদলি করে দিলেন।

আমি জেলারকে এক দিন বল্লাম, "আপনি যে ধর্ম্মের এরূপ অসম্মান করেন এ জন্য ভগবান আপনাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।" জেলার সে কথা হেসে উড়িয়ে দিল বটে—কিন্তু আমরা জেল থেকে বেরিয়ে এসে কিছু দিন পরে জান্‌তে পারলাম যে, জেলার সাহেব বন্দুকের গুলীতে আত্মহত্যা করে মরেছে। পাপের শাস্তি হবেই হবে।

ইংরেজ কয়েদির জেল না শ্বশুরবাড়ী?

আমরা জেলে থাক্‌তে থাক্‌তে দুই জন ইংরেজ সৈনিক জেলে এল। তারা কলকাতায় চৌরঙ্গিতে একটা দোকানে সিঁদ কেটে রাত্রে চুরি করেছিল। তাদের প্রত্যেকের ৬ মাস করে জেল হয়েছিল। তাদের ইউরোপীয়ান্ ওয়ার্ডে রাখা হোল। খুব মস্ত ঘরে পালঙ্ক গদি বিছানা। চেয়ার-টেবিল-আয়না সবই তাদের জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ঠিক ঠিক সময়ে তাদের জন্য নানা প্রকারের খানা প্রস্তুত। এত সুখে তারা বাড়ীতেও থাকতে পারে না। আমার সঙ্গে তাদের এক দিন কথা হয়েছিল। তারা বলল, "হাজারিবাগ খুব ভাল যায়গা, তাই আমরা ৬ মাসের জন্য চেয়ে এসেছি।" তারা যে চুরি করে এসেছে সে জন্য একটুও লজ্জা তাদের ছিল না। ইংরেজ চোরদের জেল হোল শ্বশুরবাড়ী, আর দেশী চোর যারা তাদের উপর অত্যাচারের অভাব নাই, তাদের খেয়ে পেট ভরে না। কেমন করে যে একই অপরাধে অপরাধী ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে এত পার্থক্য করা হয়, তাতে কর্ত্তৃপক্ষের একটু লজ্জাও বোধ হয় না, তা আমি বুঝতে পারি না। আমি সুপারকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বল্লেন,—"জেল-কোডের নিয়ম এই।" আমি বল্লাম,—"ধন্য তোমাদের জেল-কোড, ধন্য তোমাদের সুবিচার!"

আমার মুক্তিলাভ

ক্রমে আমার মুক্তির দিন এসে উপস্থিত হোল। আমি ভোরবেলা স্নান করে প্রত্যেক ওয়ার্ডে গিয়ে রাজনৈতিক ও সাধারণ কয়েদি সকলের কাছেই বিদায় নিতে গেলাম। জেলের সকলেই আমাকে খুব শ্রদ্ধা করত ও ভালবেসেছিল। সকলের কাছে বিদায় নিতে মনে খুবই দুঃখ হতে লাগল যেন কত আত্মীয়-বান্ধব ছেড়ে যাচ্ছি। হাজারিবাগ কংগ্রেস আপিস থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা মোটর এসে হাজির হোল, মোটরটি পাতা ও ফুলে সাজিয়ে এনেছিল। ভলাণ্টিয়ারদের "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে এসে বল্লেন,—"আপনার কি জেল থেকে বেরোতে ইচ্ছা করছে না? এই জায়গাটা কি খুব ভাল লাগছে?" আমি বল্লাম—পরাধীন জাতির ভিতরে বাইরে সব যায়গায়ই জেল।" সুপার বল্লেন,—"মিষ্টার গুহ, আমি আপনাকে একটি অনুরোধ করি যে, আবার যদি জেলে আসেন তবে দয়া করে হাজারিবাগ জেলে আসবেন না।" আমি হেসে বল্লাম,—"কেন? আপনারা কি আমাকে ভয় পান না কি?" সুপারও হেসে বল্লেন,—"খুবই ভয় পাই।"

আমি জেলার ও সুপারের কাছে বিদায় নিয়ে মোটরে গিয়ে উঠলাম। আমাকে হাজারিবাগের জাতীয় বিদ্যালয়ে নিয়ে গেল। সেখানে একটি সভা হোল। আমি বক্তৃতা করে জেলের অত্যাচারের বিষয় বল্লাম। তার পর খাওয়া-দাওয়া করে মোটরযোগে হাজারিবাগ রোড ষ্টেশনে রওয়ানা হলাম। সেখান থেকে ট্রেনে রওয়ানা হয়ে গিরিডি গিয়ে পৌছলাম। গিরিডি ষ্টেশনে আমার ভাইরা এবং অন্য অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ২৮ পাউণ্ড ওজন কমে যাওয়ায় আমার শরীর এত রোগা হয়ে গিয়েছিল যে, অনেকে আমাকে চিন্‌তেই পারেন নাই। আমার পিতৃদেব ১৯১৯ সালে দেহত্যাগ করেছিলেন। বাড়ীতে পৌঁছিয়েই আমার মনে হোল যে, আজ আমি জেল থেকে ফিরে এলাম, যাঁর আজ আমাকে দেখে আনন্দের সীমা থাকত না আমার সেই পিতৃদেব আজ নাই। আমি তাঁরই চরণ উদ্দেশে প্রণাম করে বাড়ীতে প্রবেশ করলাম।

জেলের একটি বিশেষ ঘটনার বিষয় বলতে আমার ভুল হ'য়ে গেছে। বাবু রামনারায়ণ সিংএর ভাই বাবু শুকলাল সিংকে সুপার এক দিন রাস্কেল (Rascal) বলে গাল দিয়েছিল। শুকলাল সিং আমাকে খবর পাঠালো। এ অন্যায়ের প্রতিকার করতে হোলে সমস্ত রাজনৈতিক কয়েদিদের অনশন (Hunger strike) করতে হবে। আমার উপদেশানুযায়ী সকলে অনশন আরম্ভ করল।

আমাদের এক-একটা ভিন্ন ভিন্ন সেলে (Cell) আবদ্ধ করে রাখা হোল, এক এক কুঁজো জল আমাদের দেওয়া হোল। কেবল জল খেয়ে, গান গেয়ে, ভগবানের নাম করে বেশ আনন্দে দিন কাটাতে লাগলাম। মাঝে মাঝে "ভারত-জননী তেরি জয়, তেরি জয় হো" গানটিও গাইতে লাগলাম। আমার গান শুনে' যার যেমন গলা সেই গলায়ই মহা বেসুরে অনেকে গান গাইতে লাগল, তা' শুনে হাস্য সম্বরণ করতে পারতাম না। এরূপ ভাবে চার দিন কেটে গেল, জেল-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা নাই। সুপার হয়ত ভেবেছিলেন যে, ২।৩ দিন উপবাস করলেই আমরা কাহিল হয়ে' পড়ব কিন্তু যখন চার দিন কেটে গেল তখন তাঁর মনে ভয়ের সঞ্চার হোল। পাঁচ দিনের দিন ভোরে ৮টার সময়ে সুপার আমার কাছে এসে বললেন—"কেন আপনারা hunger strike করছেন?" আমি বললাম—"আপনি শুকলাল সিংহকে 'Rascal' বলেছেন কেন?" সুপার বললেন—"আমি Rascal বলি নাই।" আমি বললাম—"শুকলাল সিং কখনই মিছে কথা বলবে না।"

সুপার—তবে কি আমি মিছে কথা বলছি?

আমি—তা বলতে পারেন, তবে এমনও হতে পারে যে আপনার বোধ হয় মনে নাই!

সুপার—আমি Rascal বলে গাল দিয়েছি, এ কথা ত আমার মনে পড়ে না। তবে মীমাংসা কি করে হবে?

আমি—মীমাংসা এই ভাবে হতে পারে যে আপনি শুকলাল সিংকে বলবেন যে, আপনি Rascal বলেছেন বলে আপনার মনে নেই, তবে যদি আপনি Rascal বলে থাকেন সে জন্য আপনি অত্যন্ত দুঃখিত।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে সুপার শুকলালের সেলের কাছে গিয়ে আমার নির্দেশানুযায়ী কথাগুলি বললেন, আমি শুকলালকে বললাম যে এতেই মীমাংসা হয়ে গেল। শুকলাল আমার কথায় সম্মত হোল।

আমরা চার দিন খাই নাই, তাই সেদিন ওয়ার্ডাররা সকলে মিলে আমাদের জন্য বিশেষ ভোজের আয়োজন করল।

আর একটি ঘটনা, অতি সামান্য হলেও সকলে আমাদের মনে মনে কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেছিল তা বোঝাবার জন্য বলব। আমি যখন "আজান দেওয়া" সম্পর্কে সেলে আবদ্ধ ছিলাম তখন এক দিন দুটি ইংরেজ-মহিলা এসে আমার সেলের সামনে দাঁড়ালেন। এক ওয়ার্ডার সঙ্গে এসেছিল, সে বলল—"এঁরা ডিভিশন্যাল কমিশনারের স্ত্রী ও কন্যা।" তাঁরা আমার নাম শুনেছিল, তাঁরা দু'জনেই বলল—"Good morning sir." আমিও বললাম "Good morning madam." কমিশনারের মেম বললেন—"We have come to see the caged lion." অর্থাৎ পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ দেখতে আমরা এসেছি। তখন আমার মনে হোল যে, স্বাধীন দেশের লোকেরা মনে মনে স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেন ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করেন তাঁদের যে কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন এই ঘটনাই তাঁর বিশিষ্ট প্রমাণ। আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির পক্ষে এত বড় সম্মান লাভ করা খুবই ভাগ্যের কথা।

বল্মীক

গোবিন্দ চক্রবর্তী

নিঃঝুম জ্যোৎস্নায় বহু দূরে কোনো দিন
ভাঙা গাছ দেখেছ?
ঘুম-ঘুম ভিজে মনে কোনো ফাঁকে নির্জনে
ছায়া তার মেখেছ?
নিঃঝুম ভাঙা গাছ জোছনায়—
খুব দূরে আকাশের মোহনায়:
ছোট্ট জলার ধারে
নিশ্চুপ একেবারে
বোবা গাছ।
দেখেছ কি কিছু তার
আবছায়া ছবিটার
ছায়া নাচ:
যে-ছবিটা নিঃসাড়
ধ'রে রাখে জানালার
শাদা কাচ!
একটি সে ভাঙা গাছ।
একটি সে বোবা গাছ।

এক দিন ঘুম ভেঙে শিয়রেতে চোখ তুলে
এমনিই চেয়ো না।
এমনিই ঘুম থেকে শিয়রেতে চেয়ে দেখো—
কোথ্‌থাও যেয়ো না।
চাঁদ-মাখা কুয়াশায় বহু দূর
কিছু-না কি জেগে থাকে বন্ধুর?
অদ্ভুত চেনা-চেনা
কিছুতেই ভুলছে না
যারে মন!
আধো আলো, আধো ছায়া—
নিরিবিলি বনমায়া
নির্জন:
কবেকার, কবেকার—
গ'ড়ে-তোলা চুরমার
আয়োজন!
জীবনের ভাঙা কোণ।
অপূর্ণ প্রয়োজন।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

পঞ্চানন ঘোষাল

দেখলে প্রায় চারটা বাজতে চলেছে। তাড়াতাড়ি জাব্দা খাতায় একটা দস্তখত করে প্রণব বাবু সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "একঠো রিক্সা-উস্কা লে আয়া?"

উত্তরে সিপাহী বললো, "হাঁ হুজুর, বাহারমে উ মজুত হ্যায়।"

কিছু দিন ধরে প্রণব বাবুর শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না, তার উপর খাটুনিও পড়েছে বেজায়। ছুটির দরখাস্তও করেছিলেন, কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হয়নি। এ কয় দিন তাই রিক্সা করেই তিনি এলাকায় টহল দিতেন। পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী এ দিনেও রিক্সা ডাকা হয়েছে। প্রণব বাবু দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর গতিরোধ করে দাঁড়ালেন পাড়ার এক উকিল বাবু। মক্কেলে তাঁকে এক জুয়া কেইসের জামীনের জন্য এত রাতেও তুলে এনেছে। বেশ কিছু পারিশ্রমিক নিয়েই এত রাতে থানায় এসেছেন। প্রণব বাবুকে বেরিয়ে যেতে দেখে ব্যস্ত হয়ে তিনি বলে উঠলেন, "ও মশাই, যান কোথায়? একটু দাঁড়িয়ে যাবেন। অন্ততঃ একটা আসামীর জামীন দিন। নইলে আমার মান থাকবে না, প্রণব বাবু।"

জুয়াড়ীদের উপর প্রণব বাবু ছিলেন হাড়ে চটা। মনে-প্রাণে এই লোকগুলোকে তিনি একটু হায়রানই করতে চাইছিলেন। বিরক্ত হয়ে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, "এত রাত্রে জামীন? না মশাই, জামীন টামীন এখন না। সকালে আসবেন, দেখা যাবে। এক রাত তো হাজতে থাক।"

উকিল বাবু কিন্তু নাছোড়বান্দা। তিনি জামীন নেবেনই, অপর দিকে প্রণব বাবুও জামীন দেবেন না। কিছুক্ষণ তর্কাতর্কির পর বিরক্ত হয়ে উকিল বাবু বললেন, "না দেবেন না দেবেন। আমি কোর্ট থেকেই ওদের জামীন করাবো।"

বিফল-মনোরথ হয়ে বেরিয়ে এসে উকিল বাবু দেখলেন, থানার সামনে একখানি রিক্সা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোনওরূপ উচ্চবাচ্য না করে তিনি রিক্সাটায় চেপে বসলেন। রিক্সাওয়ালা কোনও দিকে আর ভ্রূক্ষেপ না করে তৎক্ষণাৎ দৌড়তে সুরু করে দিলে।

প্রণব বাবুর নির্দ্ধারিত রাউণ্ডে যাবার পথ দিয়েই রিক্সাওয়ালা ছুটে চলছিল। উকিল গোপাল বাবুর বাড়ী যাবারও পথ ছিল এই একই দিকে। বাড়ীর কাছাকাছি এসে উকিল বাবু হেঁকে উঠলেন, "এই, কাঁহা যাতা, রোকো।"

গোপাল বাবুর গলার স্বর কানে যাবা মাত্র রিক্সা-চালক রিক্সা থামিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। রিক্সাওয়ালার চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরাচ্ছে। মুখে তার হতাশার ভাব। রাত্রের অন্ধকারে রিক্সা-চালকের এই নিষ্ফল ক্রুর দৃষ্টি গোপাল বাবু দেখতে পেলেন না। দেখতে পেলে হয়তো তিনি চমকে উঠতেন। রিক্সা হ'তে নেমে পড়ে গোপাল বাবু

শয়নকালে কেহ যদি মনে মনে কোনও কথা স্মরণ করে নিদ্রিত হয়, তা হলে জাগ্রত হওয়ার পরই উহা তাহার মনে পড়বে। কারণ, উহা মনের মধ্যে সাজেস্‌সন বাক্‌প্রয়োগের কার্য্য করে। ঘুমাবার পূর্ব্বে প্রণব বাবু স্মরণ রেখেছিলেন যে, রাত্রি তিনটায় তাঁকে উঠতে হবে। বস্তুতঃ, ঠিক রাত্রি তিনটাতেই তাঁর ঘুম ভেঙে গেল, কিন্তু উঠি-উঠি করেও তিনি উঠতে পারছিলেন না।

হঠাৎ বাইরে থেকে দরোজায় গলা শুনা গেলো, "বাবু-উ, তিন বাজ গিয়া। বড় বাবু-উ।"

ঘুম-চোখেই প্রণব উত্তর করলে, "ঠিখ হ্যায়, যাও। আ যাতা হ্যায় হাম্‌।"

কিন্তু মুখে যাতা হ্যায় বললেও প্রণব বাবু উঠলেন না, আরও কিছুক্ষণ তাঁর শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল। ঘুমে তাঁর চোখ জড়িয়ে আসছে। এমনি আরও কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে, পুনরায় সিপাহির গলা শুনা গেল। দরজার ওপার হতে সিপাহীজি হেঁকে উঠলো, "বাবু-উ, সাড়ে তিন বাজ গিয়া। রাউণ্ড হ্যায় আপকো।"

রাত্রি তিনটা হতে পাঁচটা পর্য্যন্ত প্রণব বাবুর নাইট-রাউণ্ড ছিল। রাত্রি বারোটার সময় শয়ন করে পুনরায় উঠা যে কত কষ্টকর তা ভুক্তভোগী মাত্রেরই জানা আছে। প্রণব বাবু যথাসত্বর উঠে পড়তে চাইলেন। কিন্তু গোল বাধালো শান্তা। সে তাঁর ডান হাতটা এমন ভাবে তাঁর দেহের উপর ন্যস্ত করেছিল যে, তাকে না জাগিয়ে শয্যাত্যাগ করা অসম্ভব। বেচারা শান্তা! স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তাকেও জেগে থাকতে হয়। যত বার প্রণব বাবুর ডাক আসে, তত বার তাকেও জেগে উঠতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে এই দিন সে-ও জেগে উঠেনি। অতি সন্তর্পণে স্ত্রীর ডান হাতখানা পাশের পাশ-বালিশটার উপর রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই প্রণব বাবু দেখতে পেলেন, শান্তা ব্যস্ত ভাবে ঐ বালিশটাকেই আঁকড়ে ধরছে। প্রণব বাবু ঘুমন্ত স্ত্রীর প্রতি একটা সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অন্ধকারের অবছায়ায় পা টিপে-টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নীচে নেমে

পকেট থেকে পয়সা বার করছিলেন, হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন, রিক্সা-চালক ভাড়া না নিয়েই সরে পড়ছে। বিস্মিত হয়ে গোপাল বাবু হেঁকে উঠলেন, "এই চলে যাচ্ছিস—পয়সা নিবি না ?"

ঘাড় বেঁকিয়ে ক্রুর দৃষ্টিতে রিক্সা-চালক উত্তর করলো, "কি গোপাল বাবু, চিনতে পারছেন আমাকে ? আমি খোকা।"

গোপাল বাবু খোকাকে তার বাল্যকাল হতেই চিনতেন। তার কীর্তিকলাপের সহিতও তিনি পরিচিত ছিলেন। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গোপাল বাবু বললেন, "হাঁ বাবা, চিনেছি তোমাকে। কিন্তু, আমি তো তোমার কোনও ক্ষতি করিনি, বাবা! ছাপোষা লোক আমি, সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, কোন রকমে পেট চালাই, বাবা!"

হেসে ফেলে খোকা বাবু উত্তর করলেন, "সে কথা হচ্ছে না! তবে প্রণব বাবুকে বলে দেবেন, ভুল করে আপনি রিক্সায় উঠেছিলেন, তাই তিনি এ-যাত্রায় বেঁচে গেলেন। বুঝলেন, এ কথা তাঁকে বলতে ভুলবেন না।"

বীরদর্পে খোকা বাবু রিক্সা-সমেত স্থান ত্যাগ করার পরই, সেই জায়গায় টহলদারী জমাদার দেওদত্ তেওয়ারী এক জন পাগড়ীধারী সিপাহীকে নিয়ে হাজির হলো। টহল দিতে দিতে তারা হঠাৎ ঐ জায়গায় এসে পড়েছে। গোপাল বাবুকে ঐ স্থানে আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জমাদার দেওদত্ জিজ্ঞাসা করলো, "কেয়া বাবু, কুছু গোলমাল ভৈল ?

গোপাল বাবু আর লোভ সামলাতে পারলেন না। তিনি চলন্ত রিক্সাটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে নিম্ন স্বরে জমাদারকে বললেন, "ঐ যাতা হ্যায়, খোকা গুণ্ডা, রিক্সাবালা বানকে। লেকেন মেরি নাম মাত বাতাও।"

দেওদত্ জমাদার খোকাকে এক জন জেল-খারিজ গুণ্ডারূপেই জানতো, কিন্তু সে যে কিরূপ দুর্দ্দান্ত ও ভীষণ লোক, তা জানা ছিল না। শীকারের সন্ধান পাওয়া মাত্র উৎফুল্ল হয়ে লাঠি উঁচিয়ে রিক্সার পিছন-পিছন ধাওয়া করতে সে একটুও দেরী করেনি।

সহকারী সিপাহীর সহিত দৌড়তে দৌড়তে পাড়া মাৎ করে তারা চেঁচাতে সুরু করে দিলে, "এই পাকড়ো পাকড়ো। ডাকু ভাগতা হ্যায়", যাতে করে অপরাপর টহলদারী সিপাহীরাও সেখানে এসে জড় হয়ে তাহাদের সাহায্য করতে পারে।

খোকা বাবু চতুর্দ্দিকে একটা সতর্ক দৃষ্টি রেখেই পথ চলছিলেন। সিপাহীদ্বয়কে তার পিছন পিছন ছুটে আসতে দেখে রিক্সাটা নামিয়ে রেখে সে ঘুরে দাঁড়ালো, তার পর হাতের আস্তিনের তলা হতে ধারালো ছুরিখানা বার করে সেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সাঁ করে তাগমাফিক এমন ভাবে ছুঁড়ে দিলে, যাতে করে কি-না ছুরিখানা ঠিক তার ঘাড়ের নীচে বিঁধে যায়। ছুরি ছোঁড়াছুঁড়ির ব্যাপারে খোকা বাবু বরাবরই সিদ্ধহস্ত ছিল। এ-বিষয়ে লক্ষ্যও ছিল তার অব্যর্থ। ছুরিখানা জমাদারের কণ্ঠ-অস্থির নিম্নদেশ ভেদ করে তার কণ্ঠনলীটাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলে।

ছুরি খেয়ে জমাদার সাহেব কাতরাতে কাতরাতে কাত হয়ে শুয়ে পড়লো। দেওদত্ জমাদারকে আহত হয়ে পড়ে যেতে দেখে তার সঙ্গী সিপাহীটি পরিত্রাহি চীৎকার সুরু করে দিলে, লাঠি উঁচিয়ে খোকার পিছন পিছন ধাওয়া করতে করতে সিপাহীজি চেঁচাতে সুরু করলো, "পাকড়ো পাকড়ো, খুনি আসামী ভাগতা হ্যায়, পাকড়োও।"

নিকটের বস্তীটার রোয়াকে এবং ফুটের উপর অনেকেই নিদ্রা দিচ্ছিলো। এ ছাড়া দূরের খাটালের মধ্যে একটা যাত্রাও হচ্ছে। অনেক লোকই সেখানে জমা ছিলো। সিপাহীর এক-ডাকে "চোর চোর" করতে করতে বহু লোকই সেখানে এসে পড়েছে। চোর শব্দটি বোধ হয় অপরাধী মাত্রেরই সাধারণ নাম। তাই সমবেত জনতা চোর চোর বলেই খোকাকে তাড়া করলো।

খোকা গুণ্ডা বুঝতে পারলো, দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়। নিমিষে সে তার কর্ত্তব্য ঠিক করে নিল। তার পর ঘুরে দাঁড়িয়ে পেটের ভিতর থেকে গুলীভরা পিস্তলটা বার করে শূন্যের দিকে গুলী ছুঁড়লো, আওয়াজ হলো, গুড় গুড়ুম, গুম, ঠাঁই—।

পিস্তলের আওয়াজে জনতা হতভম্ব হয়ে গিয়ে পিছিয়ে এলো, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। গণচিত্ত এক অদ্ভুত পদার্থ। যে সাহস লোকে একা দেখাতে পারে না, সে সাহস দলে পড়ে তারা সহজেই দেখিয়ে থাকে। মানুষ একা মরতে ভয় পায়, কিন্তু দল বেঁধে মরতে তারা কখনও পেছপাও হয়নি।

জনতা ততক্ষণে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, তারা আর মানুষ নেই, অমানুষ না হলেও তারা অতিমানুষ হয়ে উঠেছে।

জনতার মনোবৃত্তি খোকার ভালোরূপেই জানা আছে। যে অংশটাতে গুলী চলে মাত্র সেই অংশটাই একটু পাতলা হয়ে যায়, জনতার অপর অংশটির উপর উহা কিছুমাত্র প্রভাব-বিস্তার করে না। বিপদে দিশেহারা হওয়া খোকার কোষ্ঠীতে লিখে নাই। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খোকা বাবু জনতার দিকে চেয়ে দেখলেন। খোকা বাবু লক্ষ্য করলেন, জনতা কিছুমাত্র দমে নাই, তিনি এও লক্ষ্য করলেন যে, জনতার সমুদয় অংশই সমানরূপে সাহসী ও বেপরোয়া নয়। জনতার সাহসী অংশের উপর আঘাত হানলে তারা আরও সাহসী হয়ে উঠে, কিন্তু উহার ভীরু অংশের উপর আঘাত দিলে, জনতা পালিয়ে যায়। জনতার এক অংশ পালাতে সুরু করলে উহার অপর অংশও পালাতে থাকে। গণচিত্তের নিয়মই হচ্ছে এই।

খোকা জনতার ভীরু অংশ লক্ষ্য করে তিন তিন বার গুলী ছুড়লো দুম দুম্ দুম্। সঙ্গে সঙ্গে তিনটি নিরীহ মানুষও মাথায় ও বুকে গুলীবিদ্ধ হয়ে রক্তাপ্লুত দেহে ভূমির উপর লুটিয়ে পড়লো। খোকা কিন্তু এই দৃশ্য দেখবার জন্যে আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেনি। জনতাকে নিরস্ত করে খোকা আরও কিছুটা দূরে ছুটে গেল, তার পর সুবিধামত একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বড় রাস্তা হতে গলির ভিতর, গলি হতে মেথর-গলি এবং তার পর আরও অনেক আনাচে-কানাচে ঘুরে খোকা অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় দেড় মাইল দূরবর্ত্তী একটা ছোট্ট পার্কে এসে উপস্থিত হলো। পার্কের কোণের দিকের একটা বেঞ্চির উপর বসে খোকার সুযোগ্য সাকরেদ গোপী ও কেষ্ট বিড়ি খাচ্ছিল। খোকাকে ধপাস করে বেঞ্চিটার উপর বসে পড়তে দেখে গোপী বলে উঠলো, "কি গো কর্ত্তা, ব্যাপার কি ? কায ফতে ? বলি, প্রণব দারোগা পৃথিবীতে আছে, না নেই ?"

উভয় সাকরেদকে বিস্মিত করে দিয়ে খোকা বাবু বললেন, "না, মরেনি। সে বেঁচেই আছে, পরিবর্তে মরেছে এক জন গোট্টা আর তিন জন নিরীহ বাঙ্গালী ভদ্রলোক ; এই আমার জীবনের প্রথম পরাজয়, ইতিপূর্ব্বে এইরূপ অকৃতকার্য্য আমি কখনও হইনি। এতো দিন আমি হত্যা করেছি, আজ করেছি তিন জন নির্দ্দোষীকে খুন।"

খোকাকে বিচলিত ও হতাশ হয়ে যেতে দেখে কেষ্ট তার কোমরে ঝোলানো একটা থলি থেকে একটা মদের বোতল বার করলো খোকাকে চাঙ্গা করে দেবার জন্যে। কিন্তু খোকা তা স্পর্শও করলো না। হাত দিয়ে মদের গেলাসটা সরিয়ে দিয়ে খোকা বললো, "তিন তিনটে খুন, আমার ভিতরকার সমুদয় অপস্পৃহা নির্বাপিত করে দিয়েছে। আমি বোধ হয় কিছু কাল পর্য্যন্ত আর তোদের কোনও কাযে আসবো না। উপবনগুলো আমাকে ডাক দিচ্ছে। এই পাতালপুরী আমাকে ছেড়ে যেতে হবে। শুধু বাহিরের প্রেরণার জন্যে নয়, অন্তরের প্রেরণাও আমাকে আজ উপর দিকে বুঝি বা ঠেলে দেয়। আমার সেই রোগ এসে গেল বলে। এই জন্যেই না চৌরঙ্গীর ফ্ল্যাটটা আমি সেদিন ভাড়া করলুম।"

খোকা বাবুর মধ্যে অবস্থিত দ্বৈত ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে গোপী অবহিত ছিল। সেও এই বুঝেছিল, খোকা শীঘ্রই কিছু দিনের জন্যে তাদের ছেড়ে ভদ্র সমাজে চলে যাবে, যেমন মাঝে-মাঝে সে যায়। এই সময় সমাজে উর্দ্ধতন স্তরে উঠে গেলে খোকার পক্ষে আত্মগোপনেরও সুবিধা আছে। তিন-তিনটে খুনের পর সন্ধানী পুলিশের দল বস্তিতে বস্তিতে তাকে খুঁজে বেড়াবে এতে কোনও সন্দেহ নেই। খোকার কথায় গোপী বাবু নিশ্চিন্ত হয়ে বললে, "আচ্ছা, তাহলে যা তুই, এ কয় দিন আমিই দলটা ঠিক রাখবো'খন।"

"কিন্তু একটা কথা, গরীব-দুঃখীগুলোকে যে সব সাহায্য আমরা দিয়ে থাকি তা যেন ঠিক ভাবে বজায় থাকে। আমাদের আয়ের তিন ভাগের এক ভাগ আমার অবর্ত্তমানেও যেন গরীবরা পায়। খবরদার, এর যেন কিছুমাত্র অন্যথা না হয়। আর শোন"—

—কথা বলতে বলতে খোকা বাবু লক্ষ্য করলো, গোপীর চক্ষুর্দ্বয় আশু বিরহ-বেদনার আশঙ্কায় সজল হয়ে উঠেছে। খোকা সস্নেহে গোপীর চক্ষুর্দ্বয় রুমাল বার করে মুছে দিয়ে বললো, "কি-রে ঘাবড়াস কেন? মাস দুই-এর মধ্যেই ফিরবো। ইতিমধ্যে বাজারও ঠাণ্ডা হয়ে আসবে। দেরী হ'লে না হয় তুই এসে আমাকে মনে করিয়ে দিস্, আসলে আমি লোকটা কে? এখন চল, পদ্ম মাসীকে প্রতিশ্রুতি মত শ'তিনেক টাকা দিয়ে আসি। বিধবার মেয়ের বিয়ে, একটু সাহায্য করা দরকার, পাপের মধ্যে একটু-আধটু পুণ্য থাকা দরকার, বুঝলি, আয়।"

পদ্ম মাসী ছিল খোকাদের তিন নম্বরের ডেরার এক জন প্রতিবেশী। এক দিন সন্ধানী পুলিশের তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে খোকা এই পদ্ম মাসীর বাড়ী এসে আশ্রয় নেয়। সেই থেকে আর পাঁচ জন গরীব লোকের সঙ্গে পদ্ম মাসীকেও সে আর্থিক সাহায্য করে এসেছে।

এখানে-ওখানে ঘোরা-ফিরা করে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিয়ে তারা যখন পদ্ম মাসীর বাড়ীর সামনে এসে পৌঁছলো তখন সময় হবে সকাল সাতটা। পকেট থেকে একশো টাকার তিনখানি নোট বার করে গোপীকে টাকাটা পদ্ম মাসীকে দিয়ে আসবার জন্যে হুকুম করে খোকা খেয়াল মত একটা গ্যাস-পোষ্টের তলায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছিল, হঠাৎ তার নজর পড়লো সামনের বাড়ীর বারান্দার দিকে। একটি সুবেশা আধুনিকা মহিলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে কেশবিন্যাস করছিলেন। খোকাকে তার দিকে চাইতে দেখে মহিলাটি ক্ষেপে উঠে বলে উঠলেন, "বাই জোভ! লুক্ লুক্ লুক্। লোকটা কে? কি রকম প্যাট-প্যাট করে চেয়ে আছে দেখো।"

যাঁকে উদ্দেশ্য করে মহিলাটি কথাগুলো শুনালেন, তিনি একটু ভিতরের দিকে অপেক্ষা করছিলেন। বাইরে এসে একটা বেয়াড়া চেহারার লোককে বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে তাঁর স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকতে দেখে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "বেটা বেল্লিক, রাস্কেল! মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবো জানিস্! মিনিয়েল কোথাকার!"

খোকা আড়-চোখে চেয়ে দেখলো, নীচে দরজার পাশের একটা পিতলের প্লেটে লেখা রয়েছে—"মিঃ এস এন্ ভড়, বার-এ্যাট-ল।" ভদ্রলোক যে এক জন ব্রিফলেশ অভাবগ্রস্ত ব্যারিষ্টার তাতে সন্দেহ করবার কিছু নেই। খোকা একটু কৌতূহলী হয়ে উঠলো। হঠাৎ তাকে একটা বাহাদুরীর নেশা পেয়ে বসলো। ঈষৎ হাস্য সহকারে খোকা বাবু বললো, "চটেন কেন মিঃ ভড়! কাম ডাউন প্লিজ। আই ওন্ট ইট ইউ আপ। ইট ইজ ফর ইউ দ্যাট আই হ্যাভ কাম।"

কুলির পোষাক-পরা এক জন লোকের মুখে এইরূপ চোস্ত ইংরেজী শুনে স্বামি-স্ত্রী উভয়েই অবাক হয়ে গিয়েছে। ভড়কে গিয়ে ব্যারিষ্টার মিঃ ভড় নেমে আসতেই খোকা বাবু বললো, "আসলে আমি কুলি-টুলি নই। আপনার দুরবস্থার কাহিনী শুনে আপনাকে আমি সাহায্য করতে এসেছি। তবে আমার পরিচয় আমি আপনাকে দেবো না। এই নিন পঞ্চাশ হাজার টাকা—"

পঞ্চাশ হাজার টাকা খোকার এক সপ্তাহের রোজগার। ভাগ-বাঁটোয়ারার পরও ঐ অঙ্কটা তার ভাগে প্রায় সপ্তাহেই থেকে যেতো। তার দল বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যায় কায করে, এ ছাড়া এই তিনটি প্রদেশের রেলওয়ে-সমূহেও তাদের অবাধ গতি। এ টাকাটা খোকার কাছে হাতের ময়লা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ব্যারিষ্টার সাহেবের পক্ষে এইরূপ প্রাপ্তিযোগ সত্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার! খোকা, শুধু তার সামনে হাতে গুণে পাঁচখানা দশ হাজার টাকার নোট বার করতেই আড়ষ্ট হয়ে ব্যারিষ্টার সাহেব হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু ব্যাপার কি? আপনি কি কোনও ধনী লোক? শুনেছি, আমার এক মামাশ্বশুর অপুত্রক অবস্থায় মারা গেছেন, আপনি কি তাঁর তরফে—"

ব্যারিষ্টার সাহেব দেনার দায়ে আকণ্ঠ ডুবে গেছেন, পাওনাদার ঠেলায় তিনি একেবারেই অস্থির। এইরূপ অবস্থায় পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়া ছিল তাঁর স্বপ্ন। তিনি জেগে-জেগেই স্বপ্ন দেখছেন এমন একটি ভাব দেখিয়ে নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। ইতিমধ্যে তাঁর স্ত্রী, মিসেস বেলা ভড়ও তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। উভয়েরই অবস্থা সমান। উভয়েই হতবুদ্ধি ও হতবাক্। উভয়ের এইরূপ অবস্থা দেখে খোকা বলে উঠলো, "এই টাকাটা এখুনিই আপনারা পাবেন, কিন্তু এক সর্ত্তে। মিসেস ভড়কে তাঁর বাম হাতের উপর উল্কি দিয়ে মাত্র একটা কথা লিখে রাখতে হবে, এখুনিই—'প্রাণের খোকা'—মাত্র এই দুইটি কথা, বুঝলেন, রাজী?"

ব্যারিষ্টার ভড় সাহেব সন্দিগ্ধ ভাবে স্ত্রীর দিকে একবার চেয়ে দেখলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো খোকার মুঠিতে ন্যস্ত নোটের তাড়ার দিকে। একটু ইতস্ততঃ করে মিঃ ভড় বললেন, "ব্যাপার কি বলুন তো? যদি মনে কিছু না করেন তো দয়া করে ভিতরেই আসুন, প্লীজ।"

খোকা নির্বিকার চিত্তে ভিতরের বৈঠকখানায় এসে উত্তর করলো, "এমন কিছুই ব্যাপার নয়। এ একটা বড়লোকের খেয়াল। রাজী থাকেন তো চটপট বলে ফেলুন, নয় তো চললাম

আমি। তবে জেনে রাখবেন, আপনার স্ত্রীর উপর আমার কোনও লোভই নেই।"

এর পর খোকাকে আড়াল করে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে কিছুক্ষণ পরামর্শ চললো। স্বামি-স্ত্রীর এই সব কথাবার্তা খোকা ইচ্ছা করেই শোনেনি। কিন্তু পরেই মিসেস্ ভড় এগিয়ে এসে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে মুচকি হেসে বললেন, "বেশ তো, এতেই যদি আপনি খুসী হন, আমার তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু পাবলিকটা আপনাকে দিতেই হবে। আমাদের এই উপকারী বন্ধুটিকে আমরা মনে রাখতে চাই।"

রাস্তার মোড়ে এমনি অনেক ট্যাক্সিওয়ালা বসে থাকে। [illegible] এক জন চাকর দিয়ে এক জনকে ডেকে এনে মিসেস ভড় [illegible] বাম হাতে আঁকিয়ে নিলেন,—"প্রাণের খোকা।" খোকা বিস্ময়ভরে একবার সেই দিকে চেয়ে দেখলো, তার পর গোপীর জন্য আর অপেক্ষা না করেই একটা ট্যাক্সী ডেকে চৌরঙ্গীর ফ্ল্যাটটার দিকে চলে গেল। ট্যাক্সি-চালককেও খবর করে দিয়ে। পদ্ম মাসীকে তার প্রাপ্য টাকা-কড়ি বুঝিয়ে দিয়ে গোপী বাবু যখন বেরিয়ে এলো, খোকা তখন অনেক দূর চলে গেছে।

শ্যামপুর থানার প্রথম পত্তনের দিন হতে এ পর্যন্ত এতগুলো দুর্ঘটনা বোধ হয় এই অঞ্চলে কখনও হয়নি। প্রত্যেক দিনই এই খুনগুলি সম্বন্ধে দৈনিক কাগজসমূহে হৈ-চৈ হয়ে চলেছেই, [illegible] সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনাও আছে। শ্যামপুর থানার অফিসারগুলি না কি সব কয়টাই অপদার্থ, তা না হলে এর একাধিক এক সপ্তাহের মধ্যে এতগুলি খুন কখনও সংঘটিত হতে পারে না। এই সকল প্রবন্ধের প্রতি সরকার দৃষ্টি দিতে [illegible] উদ্ধতন অফিসারদের তাড়াও আছে।

প্রত্যুষে উঠে থানায় নেমে প্রণব বাবু এই [illegible] ডায়েরীগুলি মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করতে করতে [illegible] এইবার কোন্ পথে তিনি তদন্ত চালাবেন। একটির পর একটি পথে তিনি তদন্ত চালিয়েছেন, কিন্তু সব পথগুলিই পরিশেষে অবরুদ্ধ হয়ে এসেছে, আলো জ্বলে উঠে পুনরায় তা নিবে গেছে। প্রণব বাবুর চেষ্টার ত্রুটি নাই কিন্তু তবুও তাকে উর্দ্ধতনদের জন্য [illegible] কৈফিয়ৎ দিতে হয়। মরিয়া হয়ে তিনি একটা নূতন পথের কথা ভাবছিলেন। হঠাৎ কি ভেবে তিনি পুলিশ-গেজেটখানা টেনে নিয়ে খোকার [illegible] প্রতিকৃতির দিকে দৃষ্টি নিবেশ করলেন। ফটোটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করে প্রণব বাবু ডেকে উঠলেন, "এই দরোজা, [illegible] পাওয়া লোককো বোলানা বোলা, অব উন লোককো [illegible] হ্যায়?"

প্রণব বাবুর নির্দ্দেশ মত সাক্ষী কয় জনকে থানায় এনে জমাদার রাম সিং আফিস-ঘরে অপেক্ষা করছিলো। প্রণব বাবুর ডাক শুনে জমাদার এগিয়ে এলো। দরোজার সিপাহী প্রত্যুত্তরে বলে উঠলো, "[illegible] কব বোলায়া উন লোককো। আফিসমে সব মজুত হ্যায়, দেখিয়ে না।"

সাক্ষী কয় জন অনেকক্ষণ ধরেই বাইরের আফিসে অপেক্ষা করছিলো, এতক্ষণ প্রণব বাবু তাদের দেখেননি। লোকগুলো জমাদারের নির্দ্দেশ মত প্রণব বাবুর ঘরে এলে, প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা ঠিক বলছো, খোকা গুণ্ডাকে তোমরা চিনেছিলে?"

প্রধান সাক্ষী রামতারণ ছিল পাড়ার এক জন মোড়ল। সবার আগে সেই বেরিয়ে এসে খোকা বাবুকে তাড়া করে। বেশ জোর করে সে জানালো, "কি বলেন কর্ত্তা, নিশ্চয়ই চিনি। এ পাড়াতেই তো উনি পূর্ব্বে থাকতেন।"

রামতারণ মোড়লকে সমর্থন করে অপর সাক্ষী ভদ্রহরি বলে উঠলো, "এ কি আর একটা কথা, হুজুর! ওকে আমরা সকলেই চিনেছি। পিস্তলও ওই ছুঁড়েছে, ছুরিও চালিয়েছে ওই। রামমণির মেজ ছেলে আর বাবুর ভাই তো আমাদের সামনেই মারা গিয়ে পড়ে গেল। দেওদত্ত জমাদারকে যখন ও ছুরি চালায় না, তখনও আমি হাজির ছিলাম।"

বিস্মিত হয়ে তাদের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে প্রণব বাবু দরোজাকে হুকুম করলেন, "এই, যাও তো, আসামী সুধীর ওরফে খোকাকো বোলায় লে আও, হাজতসে।"

উৎফুল্ল হয়ে এক জন সাক্ষী জিজ্ঞাসা করলো, "কি হুজুর, তাহলে ধরে ফেলেছেন গুণ্ডাটাকে?"

প্রণব বাবু কোনও উত্তর করলেন না, একটু হাসলেন মাত্র। কিছুক্ষণ পরে সুধীরকে আফিসে আনা হলে, তিন জন সাক্ষীই সমস্বরে চীৎকার করে উঠলো,—"ঠিক আছে, হুজুর, এই সেই লোক। এ আমরা হলফ করে বলতে পারি।"

বিস্মিত প্রণব বাবু অধিকতর বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, "কি বলছো তোমরা? এ তো গত সপ্তাহ থেকেই পুলিশের হেপাজতে আছে।"

[illegible] কিন্তু [illegible] বিশ্বাস করতে চাইলে না। তারা [illegible] সেই একই কথা—"না হুজুর, এই সেই খোকা গুণ্ডা, এই হচ্ছে সেই খুনি। আমরা ঠিক দেখেছি, হুজুর, একে।"

প্রণব অবাক হয়ে সাক্ষীদের [illegible] কথা ভাবছিলেন। এই তিন জন ছাড়া [illegible] অনেক [illegible] এই একই কথা বলেছে। [illegible] কি থানা থেকে বের [illegible] মুক্তি [illegible] কি পুনরায় এসে [illegible] এই সময় সহকারী অফিসার শৈলেশ বাবু [illegible] বললেন, "[illegible] ফিরেছি, [illegible]"

[illegible] এক জনের সঙ্গে এই জটিল বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য প্রণব বাবু ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর একার পক্ষে এই [illegible] সমাধান করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। শৈলেশ বাবুকে [illegible] প্রণব বাবু বললেন, "এ কোন কথা হচ্ছে, এ রকম সম্ভব হয় কি করে? একটু অনুসন্ধান করে দেখুন দিকি, সেদিন হাজতের ডিউটিতে ছিল কোন সিপাহী। আমি বুঝতে পারছি না, সেদিন সে রাত্রে [illegible] থেকে আমি [illegible] বেরুবে, শুধু তাই নয়, আমি যে [illegible] করে [illegible]—এ কথাই বা হত্যাকারী লোকটা জেনেছিলো কি করে? তাহলে কি থানাতেও ওর লোক আছে? কিন্তু, কিন্তু এও কি সম্ভব!"

চোখ রগড়াতে রগড়াতে [illegible] শৈলেশ বাবু উত্তর করলেন, "আমিও তো তাই ভাবছি, স্যার। তবে এ কথা ঠিক, যে লোকটা শিবচরণকে মেরেছে সেই লোকটাই পরবর্ত্তী খুন তিনটাও করেছে। এখনো এই লোকটাই আসলে খোকা কি না তা-ই বিবেচ্য। ফুট ও

বিপ্রার এক্সপার্টের রিপোর্টগুলো বোধ হয় কাল রাত্রেই এসে গেছে, দাঁড়ান, দপ্তরটা একবার দেখে আসি।"

অঙ্গুলী ও পদচিহ্ন-বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট কয়টি গত রাত্রেই থানায় পৌঁছিয়েছিল। লেফাপার মোহরগুলি ভেঙ্গে রিপোর্ট কয়টি বার করে প্রণব বাবুর খাস-খামরায় এসে শৈলেশ বাবু বললেন, "এই যে, স্যার পেয়ে গেছি—এই যে।"

রিপোর্টে যা লেখা ছিল তা পড়ে উভয়েই অবাক হয়ে গেলেন। "ধৃত আসামীর পায়ের ও আঙ্গুলের ছাপের সঙ্গে না কি টিপ-ঘরে রক্ষিত খোকা নামক অপরাধীর পায়ের ও আঙ্গুলের ছাপের কোনও-রূপ মিল নেই। তবে শিউচরণ-হত্যার কেইসে অকুস্থলে প্রাপ্ত পায়ের ছাপগুলি খোকা নামক অপরাধীরই। ধৃত আসামী সুধীর ওরফে খোকার পায়ের ছাপের সহিত ঐ ছাপগুলি একেবারেই মিলে না।" বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট পড়ার পর উভয়ের কাহারও আর সন্দেহ রইল না যে, গেজেটে উল্লেখিত খোকা এবং ধৃত আসামী সুধীর ওরফে খোকা দুই জন বিভিন্ন ব্যক্তি।

অবাক্ হয়ে শৈলেশ বাবু বলে উঠলেন, "সাজ্যাতিক ব্যাপার তো? হুবহু এক রকমের মানুষও হতে পারে, ভাগ্যিশ এক্সপার্ট রিপোর্ট ছিল, তা না হলে অন্ততঃ শিউচরণের খুনটার জন্যে ওই দোষী সাব্যস্ত হতো, ফাঁসীও হয়তো ওর হয়ে যেতো! ওঃ, এ লোকটাকে আগে পেলে ভাওয়াল কেইস পর্য্যন্ত আমরা ফাঁসিয়ে দিতে পারতাম, স্যার।"

"উঁহু, ব্যাপারটা এতো সোজা নয়।" প্রণব বাবু উত্তর করলেন; আমার মনে হয়, ধৃত আসামীটিও খোকারই দলের লোক। চেহারার সাদৃশ্যের সুযোগ নিয়ে এক জন অপর জনের নামে প্রয়োজন মত জেলও খেটে থাকে।" কেইসটা মাটি করে দিল আর কি? সাজা হওয়া দুষ্কর।"

"কেন, কেন স্যার" শৈলেশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "পায়ের টিপ যখন মিলে যাচ্ছে তখন ভয় কি?"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "জুরী কি আর এতো সব বুঝবেন? জজেদের মত তো আর তাঁদের সুসংযত মন, যাকে বলে ফ্রি না ট্রেণ্ড মাইণ্ড তা নেই, এক জনকে সনাক্ত করে আবার আর এক জনকে সনাক্ত করা যায় না। জুরী মহোদয়গণ এতো সব বুঝবেনই না, বরং ঝামালা বুঝে তাঁরা পত্রপাঠ আসামীকে খালাস দেবেন, দেখা যাক—"

শেষ বরাবর সমস্ত রাগটাই প্রণব বাবুর গিয়ে পড়লো সুধীরের উপর। হুঙ্কার দিয়ে উঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "বল্ বেটা, তুই কে? মেরে এক্ষুনি হাড় ভেঙ্গে দেবো। তুই-ই বেটা এই চার-চারটে খুন করেছিস্। দিচ্ছি, দাঁড়া, তোকে ফাঁসী-কাঠে ঝুলিয়ে।"

আগাগোড়া ব্যাপারটির মধ্যে গোড়ায় গলদ কোথায় হয়েছে, সুধীর তা ভালোরূপেই বুঝেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে এ সম্বন্ধে কোনও প্রকার সাফাই দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। প্রথমে মনে করেছিল, সে আত্মহত্যাই করবে। কিন্তু আত্মহত্যা করা মহাপাপ। জীবন বিসর্জ্জন দেওয়ার জন্যে এইরূপ একটা সুযোগ সে হাসিমুখেই গ্রহণ করলো। হোক, ফাঁসীই তার হোক। সে এদের কোনও কথাই ভেঙে বলবে না,—মনে মনে সে এইরূপই ঠিক করেছিল। পৃথিবীর মুক্ত বক্ষে বাস করতে মন তার চায় না। বেঁচে থাকতেই যদি হয় তা'হলে এই হাজতে থাকাই ভালো। পৃথিবীর লোকেদের কাছে মুখ দেখাতে তার আর ইচ্ছা নেই। বেশ একটু দৃঢ়তার সহিতই সুধীর উত্তর করলো, "তাই ভালো, হুজুর, তাই-ই দিন। আমার ফাঁসীর ব্যাবস্থাই করে দিন। বেঁচে থাকতে আমি আর এক দিনও চাই না। হাকিমের কাছে নিয়ে চলুন আমাকে। আমি দোষ কবুল করবো।"

কিছুক্ষণ ধরে প্রণব বাবু স্থিরদৃষ্টিতে সুধীরের দিকে দেখে রইলেন। এর পর পুনরায় তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন গেজেটে প্রকাশিত খোকার ফটোর দিকে। উভয়ের মধ্যে আকৃতিগত প্রভেদ না দেখলেও প্রণব বাবু উভয়ের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত প্রভেদ দেখতে পেলেন। ফটোর মধ্যকার লোকটার মুখ ও চোখের ক্রূর ভাব সুধীরের মুখে-চোখে লেশমাত্রও দেখা যায় না। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে সুধীরকে কাছে ডেকে প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এই, আয়, এধারে আয়। সত্যি করে বল, আসলে ব্যাপারটা কি? সত্যিই কি তুই খোকা, না অন্য লোক তুই? সত্যি বললে তোর বউকে আমরা এক্ষুনি এনে দেবো।"

অঝোরে কেঁদে ফেলে সুধীর উত্তর করলো, "আর এনে দিলে কি হবে কত্তা। আপনারা ওর নয় দেহটা এনে দেবেন, মনটাকে তো আর এনে দিতে পারবেন না। আমি আর ওকে চাই না হুজুর, আমাকে আপনারা ফাঁসীই দিন। আমি কোনও কথাই আপনাদের বলবো না। আমাকে মেরে ফেললেও না।"

প্রণব বাবু ফাঁপরে পড়লেন, তাহলে এই লোকটা কে? তাঁর মনে হয়, কবে কোথায় যেন একে দেখেছেন, কিন্তু সঠিক ভাবে কিছু তিনি মনে করতেও পারেন না। প্রতিদিন প্রতি মিনিটে গড়ে বিশ-ত্রিশ জন নূতন লোকের সংস্পর্শে যাদের আসতে হয়, তাদের সকলকে মনে রাখা সম্ভবও হয় না। মাস্তিষ্কের প্রতিটি স্নায়ুকোষ তাঁর প্রতি দিনের ব্যাপারে ভরে গেছে একটি স্নায়ুকোষও যেন আর খালি নেই।

হঠাৎ দরজার সিপাহী চেঁচিয়ে উঠলো, "হুজুর, বড় সাহেব—বড় সাহেব।"

প্রণব ও শৈলেশ বাবু উঠে দাঁড়াবার পূর্ব্বেই বড় সাহেব ঘরে ঢুকে বলে উঠলেন, "দেখলে তো হে, পূর্ব্বেই না বলেছিলাম, একটা ভুল-পথে তোমরা তদন্ত সুরু করেছ। বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট দেখলে তো? তোমরা মিছামিছি করে 'খোকা গুণ্ডা, খোকা গুণ্ডা' করে বেড়ালে! খোকার ভয়ে মানুষ এতোই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, যে না দেখেও লোকে তাকেই দেখে থাকে। এ সবই অটো-সাজেসনেরই ব্যাপার। হয়তো তারা খোকার মতন আর কাউকেই দেখে থাকবে। খোকা হাজতে রইলো, তা সত্ত্বেও সকলে খোকা দেখছেন, তাজ্জব ব্যাপার! আর, তুমিও তো হে খোকাকে এর আগে দেখোনি।"

বড় সাহেবের পিছন পিছন আরও এক জন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেছিলেন। ভদ্রলোকটি ছিল খোকার বাল্যবন্ধু। পাড়ার স্কুলে তারা একসঙ্গে কিছু দিন পড়েওছেন। নাম তাঁর হরিপদ রায়। বড় সাহেবের কথা শেষ হবা মাত্র তিনি বলে উঠলেন, "এই যে, খোকাই তো বটে!" কিন্তু সুধীরের নিকটে এসে তিনি ভড়কে গেলেন। ধীর ভাবে সুধীরকে দেখে তিনি জানালেন, "না না, এ তো খোকা

নয়। কিন্তু হুবহু খোকার মতই দেখতে বটে। এ তো এক আশ্চর্য্যের ব্যাপার—এক রকমের মানুষও পৃথিবীতে আছে!"

বাল্যবন্ধু বিধায় হরিপদ বাবুকে থানায় ডেকে আনা হয়েছিল খোকাকে সনাক্ত করবার জন্যে। ভদ্রলোক খোকাকে ঘনিষ্ঠ ভাবেই জানতেন। ভুল করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। হরিপদ বাবুর কথায় সকলে পরস্পর পরস্পারের মুখ চাওয়া-চায়ি করতে থাকলেন, কাহারও মুখ হতে আর একটি কথাও বার হল না। হরিপদর মুখ হতে এঁরা খোকার আরও অনেক কাহিনী শুনতে পেলেন। নিশ্চিত-রূপে সকলে বুঝতে পারলেন, আসলে খোকাকে আরও কয়েকটি মূল্যবান প্রাণের বিনিময়ে তবে ধরা যেতে পারে, এমনি আয়েষি ভাবে বিনা রক্তপাতে তাকে গ্রেপ্তার করা পুলিশের পক্ষে অসম্ভব।

সব কথা শুনে বড় সাহেব মিঃ দত্ত বললেন, "তাই তো হে প্রণব বাবু, একটু সাবধানেই থাকবেন। বেটা পিস্তলও যোগাড় করেছে। হেড কোয়াটারস থেকে দুই সেট লোহার জামা ও হেলমেট আনিয়ে নিন্, একটা লোহার ঢাল ও টুপিও। কোটের তলায় এই সব পরে তবে রাউণ্ডে বার হবেন, বুঝলেন। মেয়েটার আমার অসুখটা আজ আবার একটু বেড়েছে। আমি আর দেরী করবো না, চললুম, যা হয় করবেন আপনারা। হাঁ, আমার মতে এ লোকটা যখন খোকা নয় তখন একে জামীনে মুক্তি দেওয়াই ভালো। তা না হলে একেই সকলে খোকা বলে সনাক্ত করে যাবে, কেইসটাও যাবে মাটি হয়ে, আর মাটি তো হয়ে গেছেই। চললুম আমি তা হলে। হাঁ, আর একটা কথা, রাগটা খোকার আপনার উপরই বেশী। এক্ষুনি হেড অফিসে একটা নোট্ পাঠিয়ে দিন, আপনার কোয়াটারের জানালাগুলো লোহার জাল দিয়ে ঢেকে দেবার জন্যে। শেষে খড়া বয়ে উপরে উঠে শেষ করে দেবে আপনাকে।"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "এ রকম একটা খবর যে আমিও পাইনি তাও নয়। স্ত্রীকে আমি এ জন্যই আজ বাপের বাড়ী পাঠাচ্ছি, ওঁর ভাই নিতেও এসেছেন।"

"তাই না কি? বেশ বেশ, খুবই ভালো করছেন।" বড় সাহেব বললেন, "আমার গিন্নীও তাই বলছিলেন, গল্প করি কি না তাঁকে সব। যাই এখোন তা'হলে, মেয়েটার অসুখ, দেরী দেখে গিন্নী রেগে টঙ হয়ে থাকবেন। চললাম ভাই, চলি—"

বড় সাহেব চলে গেলেন, ঘর হতেই প্রণব শুনতে পেলেন মোটরের শব্দ। তিনি চলে গেলেন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে, আর প্রণব উপরে উঠে দেখবেন স্ত্রী চলে যাচ্ছে। প্রণব বাবু ভাবেন, এ কি অসহনীয় জীবন, তাকে কি প্রিজনার (কয়েদী) হয়ে থাকতে হবে! শোবার ঘরের জানালা থাকবে জাল দিয়ে ঢাকা! বেরুতে হলে সঙ্গে লোক নিয়ে বেরুতে হবে, খুসী মত যেখানে-সেখানে যাওয়া যাবে না। অথচ গৃহে বৌ-ও থাকবে না। এর চেয়ে কয়েদী-জীবনও যে ছিল ঢের ভালো। এমনি ভয়ে ভয়ে সাবধানে থেকে কত দিনই বা বাঁচা যেতে পারে।

হঠাৎ প্রণব বাবুর চিন্তার ধারা ছিন্ন করে দিয়ে উপর থেকে তাগিদ এলো! চাকর মতিলাল এসে জানালো, "মা বলছেন, দেড়টা বেজে গেছে খাবেন না আপনি? দাদা বাবুও এসে গেছেন, তিনটার পর আর ভালো দিন নেই।"

এর আগেও উপর হ'তে বার দুই ডাক এসেছিল কিন্তু প্রণব বাবু উঠি উঠি করেও উঠতে পারেননি। আজ শান্তা চলে যাচ্ছে তা সত্বেও সে নীচে বসে রয়েছে, ছিঃ! প্রণব বাবু অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে উঠলেন। কাগজ-পত্রগুলো শৈলেশ বাবুর দিকে ঠেলে দিয়ে তিনি বললেন, "আপনি এইবার একটু এদের নিয়ে পড়ুন। দেখুন জিজ্ঞাসাবাদ করে একটা ভালো রকমের বিবৃতি আদায় যদি করতে পারেন। আমার স্ত্রীর বিশ্বাস, এ লোকটা খোকা না হলেও খোকাকে ও চেনে। আমি এখোন উপরে চললাম! যা হয় আজই শেষ করুন, কালকে ওকে জামীনে ছাড়তেই হবে।"

এর পর আর দেরী না করে প্রণব বাবু তড়-তড় করে সিঁড়ি ব'য়ে কোয়াটারে এসে দেখলেন, তার শ্যালক রমেন বাবু হল-ঘরের সোফার উপর ব'সে আছেন। নিকটেই অবগাহনের সামনেকার টুলটার উপর শান্তা বিমর্ষ ভাবে ব'সেছিল। প্রণবকে আসতে দেখে গম্ভীর হয়ে সে সরে দাঁড়ালো। প্রণব বাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে শ্যালককে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, "সত্যি, দাদা, বড্ড দেরী হয়ে গেল। বড্ড কায পড়ে গেছে, একটুও সময় পাই না।"

উত্তরে শান্তার দাদা বললো, "কিন্তু, এ সব কি শুনছি? এ সব ভালো কথা নয়, প্রণব। এমনি করে তুমি জীবনটা তুচ্ছ করতে পারো না। এই খুনেগুলোর পিছন পিছন ঘোরার তোমার কোনও প্রয়োজন নেই। ছুটি নাও নয় চাকরী ছেড়ে দাও।"

প্রত্যুত্তরে শান্তা বলে উঠলো, "না তা উনি করবেন কেন? চাকরিই ওঁর সব, আমরা তো ওঁর কেউ নই।"

বিব্রত হয়ে প্রণব বাবু বললেন, "তুমি মিছামিছি ভয় পাও শান্তা। ঐ তো শৈলেশ বাবুও আছেন, ওঁরও তো স্ত্রী আছে।"

উত্তরে শান্তা বললো, "হ্যাঁ, সে-ও এসেছিল একটু আগে, বলে গেল, তুমি তার স্বামীটাকেও যমের মুখে পাঠাতে চাও। শৈলেশ বাবুর শাশুড়ীও এসেছিলেন, তিনিও কতো রাগ করে গেলেন।"

প্রণব বাবু বুঝলেন, তাঁর অবর্তমানেই তাঁর বিচার শেষ হয়ে গেছে। এখোন যা কিছু বাকি তা রায় দানের। অধীর হয়ে প্রণব বাবু লক্ষ্য করলেন, শান্তায় চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। রুমাল দিয়ে শান্তার চোখ দু'টো মুছিয়ে দিতে দিতে প্রণব বাবু বললেন, "তুমি কাঁদছো শান্তা এই যাবার দিনে? এতে আমার কষ্ট হবে না? বেশ আমিও তাহলে কাঁদি।"

উত্তরে শান্তা বললো, "আমি যাবো না এখান থেকে। দাদাকে ফিরে যেতে বলেছি!"

ভড়কে গিয়ে প্রণব বাবু বললেন, "না না, সে কি করে হয়। এখোন এখানে আর তোমার থাকা চলে না। শরীরটা তোমার বড্ড খারাপ হয়েছে। একটু সেরে উঠেই চলে আসবে।"

নিম্নস্বরে শান্তা উত্তর করলো, "বেশ তাই যাবো।" তার পর অভিমান ভরে বললো, তুমি আর আমায় কিছু ভালোবাসো না, যাও।"

শান্তার এই অভিযোগের কোনওরূপ উত্তর প্রণব বাবু খুঁজে পেলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি এদের সকলের কাছেই অপরাধী। অলক্ষ্যে প্রণব বাবুর চোখ দিয়েও জল বেরিয়ে এলো।

শান্তা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে প্রণব বাবুর চোখ মুছিয়ে দিয়ে অধীর ভাবে বললো, "না না, কাঁদবে না তুমি। বরং এসো আমরা দু'জনাই চলে যাই। আমি তো লেখাপড়া শিখেছি, নয় আমিও চাকরী

নিজস্ব সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

এক মনে পড়ে যাই ; এক দুই···পঞ্চম কলম
খবরের পৃষ্ঠা জুড়ে ভেসে ওঠে অসংখ্য গ্রাম ।
দুধে-মাছে ভরপুর হায় হায় সোনার ভারত !
এ কি হ'লো ! এ কি হলো ! দুই মুঠি অন্নের শপথ
রাখিতে পারেনি মাতা, শিশু কাঁদে, চূর্ণিত হৃদয়
অবশেষে বেঁচে গেছে : শেষ পথ দড়ির আশ্রয় ।
আর সেই কচি শিশু ঘন ঘন যার ক্ষিধে পায় !
সে-ও আর কাঁদেনিক' সেই হ'তে ঘরের দাওয়ায় ।
বাড়ীর নতুন বউ কথা কয় ঘোমটার ফাঁকে
হায় রে দুর্ভাগা দেশ ! কি যে হ'লো দারুণ বিপাকে
ঘোমটা ঘুচেছে কবে ! শত-ছিদ্র ছেঁড়া চট প'রে
বিকচ যৌবন লজ্জা রাখা বুঝি যায় নাকো ধরে !
(অভিযোগ ? কারে দেবে ! অন্নহীন স্বামী প্রাণপণ
হন্তে খুঁজেছে হাট···। বস্ত্র কেড়ে নে'ছে দুঃশাসন ?)
ঘরের লাজুক বউ ভরা কুম্ভ বেঁধে দিয়ে গলে,
তাই শেষে ঘুমিয়েছে অন্ধকার পুকুরের তলে ।

নিজস্ব সংবাদদাতা লিখেছেন আরো তার পর :
হতভাগিনীরা কোথা ছেড়ে দিয়ে ভিটেমাটি ঘর
দু'সের চা'লের দরে বেচে দিয়ে বুকের সন্তান
মিলিটারী ঘাটি পাশে খুলিতেছে দেহের দোকান !
তেঁতুলের বীচি আর বুনো ওল খেয়ে খেয়ে হায়
গ্রাম হ'তে গ্রাম না কি ওলাওঠা কাল কলেরায়
আবার করিছে খাঁ-খাঁ ! দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে ব'সে—
কে হিন্দু কে মুসলমান বার বার যায় খসে খসে

তবু এই নোয়াখালী কলিকাতা ঢাকায় বিহারে···
আগুন লেগেছে খুব ভায়ে ভায়ে রক্তের সাঁতারে !
আর তারি ঢেউ লেগে দূর গাঁয় শান্তিপুর জুড়ি'
তারা না কি উভয়েই শোনা গেছে শানাইছে ছুরি !
কোন হাটে এরি মাঝে এক চোট হয়ে গেছে খুন
দাংগায় মরেছে যত পুলিশের গুলীতে দ্বিগুণ !
(বলিহারী ! বলিহারী ! ঐ মহামানব আসে—
স্বাধীনতা কত দূর ? পথ চলি—বুক কাঁপে ত্রাসে !)
বেদনায় কাঁদে মন । দুই চোখে ভরে আসে জল—
কে শোনে আমার কথা ! গাঁ' মানে না আপনি মোড়ল !

ঘড়িতে নয়টা বাজে, গৃহিণীর ভেসে আসে স্বর :
'দেশ গেল' বুঝলাম, এদিকে যে চা'লশূন্য ঘর !
খোকনের দুধ নাই—কয়লাও ফুরিয়েছে কবে—
যে ক'দিন বেঁচে থাকি দু'মুঠো তো পেটে দিতে হবে ?
নাকে-মুখে গুঁজে নিয়ে পথে নেবে খুঁজি ফাঁকা ট্রাম,
ভয়ে ভয়ে পথ চলি ; আর জপি, বিধাতার নাম ।
ফিরিংগী মেয়েটি থামে । দুই গালে রুজ নেয় ঘষি'
কে প্রেমিক শিষ দিল—হেসে চায় ফুটন্ত উর্বশী !
কেরাণী-জীবন পেশা ! কড়া লোক ইংরেজ সাহেব !
হাসার সময় কোথা ? লেট হ'লে চাকুরী গায়েব !
ফাইলের সমুদ্দুর । ক্লান্ত চোখ । দেহে ঝরে ঘাম,
মাসান্তে পঞ্চাশ মুদ্রা এই দাস-জীবনের দাম !
ও-পাশেতে ভেসে আসে সাহেবের মৌরুষী হাসি :
এরা স্বাধীনতা চায় ! আহ, গড ! এ ভারতবাসী !

কোথায় লেগেছে দাংগা···তারি হাসি···ভরে ওঠে আঁখি !
তার পর ডুবে যাই···দেড়শো ফাইল আরো বাকী !

করবো । আমি ভিক্ষে করে তোমাকে খাওয়াবো, কিন্তু এমনি ভাবে তোমায় নষ্ট হ'তে দেবো না ।"

শান্তাকে সমর্থন করে শান্তার দাদা বলে উঠলেন, "সত্যি, বড্ড খাটো তুমি । এমনি করে খাটলে শরীরটাও যে যাবে । ছুটি নাও, ছুটি নিয়ে চলে এসো । আজই দরখাস্ত করে দাও ।"

মুখে যা বলা যায় কাযে তা সকল সময় করা যায় না, এ কথা জানা সত্ত্বেও প্রণব বাবু উত্তর করলেন, "আচ্ছা, তাই না হয় করবো ।"

শান্তা দেবী প্রণব বাবুর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন, "সত্যি, সত্যি ছুটি নিচ্ছো তুমি ? এ্যাঁ ? বলো, বলো না, কথা কও ।"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "না, ছুটিই নেবো ।"

খুসী হয়ে প্রণব বাবুর হাতটা নিজের মাথার উপর রেখে শান্তা বললো, "তা'হলে এই আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো, ঐ খুনেটার পিছন পিছন তুমি আর ঘুরবে না ।"

"উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, 'না, আর ঘুরবো না ।"

প্রণব বাবুকে জড়িয়ে ধরে শান্তা বলে উঠলো, "সত্যি ?"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "সত্যি ।" [ক্রমশঃ

স্বর্গাদপি গরীয়সী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শেষ পর্য্যায়

৩

ক্রমে ধীরে ধীরে এই আতঙ্কের ভাবটা মিলাইয়া আসিল। শুধু মিলাইয়া আসা নয়, মুখচ্ছবি হইয়া আসিল আগের চেয়ে প্রশান্ত,—একটা স্বচ্ছ সরোবরে ঝড়-ঝঞ্ঝায় সাময়িক বিক্ষোভের পর সামান্য বীচিভঙ্গটুকুও বিলীন হইয়া গেছে। এখন তাহার উপর পড়িয়া আছে অনন্ত নীল আকাশের একটি শান্ত প্রতিচ্ছায়া।

তাহাই হইয়াছে,—কোন্ অনন্ত-অসীমের প্রতিচ্ছায়াই পড়িয়াছে গিরিবালার সমস্ত সত্তাটিকে আচ্ছন্ন করিয়া। আতঙ্কে ওদের প্রতি আসিয়া গিয়াছিল ক্ষুদ্র অবিশ্বাস, এখন কাহার উপর পরম নির্ভরতায় একটা অটল বিশ্বাস আসিয়া সেই জায়গাটি পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

আজ-কাল নাতি-নাতনি বা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্পগুজবের সময়—বিশেষ করিয়া গল্পগুজব যখন খুব জমাট, কলহাস্যে উচ্ছল, গিরিবালা মাঝে মাঝে যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া যান, কাহারও দিকে থাকেন চাহিয়াই, মুখে হাসিও থাকে লাগিয়া, কিন্তু সে দৃষ্টি আর হাসিতে এক নূতন আলো পড়ে আসিয়া,—মনে হয় এরা যাঁহার দান, এদের অতিক্রম করিয়া গিরিবালার মন একেবারে তাঁহারই সামনা-সামনি গিয়া পড়িয়াছে। এটা সর্ব্বদাই যে হয় তাহা নয়, স্থায়ীও হয় না—যখন হয়, কয়েকটি সংক্ষিপ্ত মুহূর্তেই যায় মিলাইয়া। কিন্তু এ সব জিনিষের মাপকাঠি তো স্থায়িত্বই নয়, এক মুহূর্তেই কত সুদূরের পাড়ি যে দিতে পারে মন তাহার হিসাব কেই বা পারে রাখিতে?

শৈলেন এক দিন শশাঙ্ককে কথাটা বলিতে শশাঙ্ক বলিলেন—"আমি লক্ষ্য করেছি শৈলেন, কিন্তু আমি তেমন খুশী হতে পারিনি; অবশ্য নিজেদের দিক্ থেকে কথাটা বলছি।"

শৈলেনকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—"অবশ্য আমার মনের একটা সন্দেহের কথা—আমার কেমন একটা ভয় হয় মাকে আমরা হয়তো আর বেশি দিন পাব না—দৃষ্টির ও আলো যেন এখানে ট্যাকবার নয় বেশি দিন।"

একটু থামিয়া বলিলেন—"এর মধ্যে হয়তো সত্যিকার কিছু নেই, তুই নেহাৎ কথাটা তুললি বলেই বললাম,—মনের একটা সন্দেহ কাউকে ছেঁটে দিলে মনটা হালকা হয় বলে।"

একটু ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখিয়া বেড়াইবার ইচ্ছাটা হঠাৎ প্রবল হইয়া উঠিল,—কিছু কিছু তীর্থও, আবার নিজের যাহারা সেখানে আছে তাহাদেরও। তীর্থের সঙ্গী ভালো ননীবালা; এমনই পূর্ণতার মধ্য দিয়া তিনিও এখন জীবনের এই প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এ সব দিক্ দিয়া তিনি বেশ দক্ষই। ছাড়িয়া ছাড়িয়া বছর খানেকের বেশ একটা বড় ছক তৈয়ার হইল, শুধু তীর্থ-ভ্রমণেরই, আর সেখানকার সে পরে হইবে। ননীবালা হাসিয়া বলিলেন—"ঠাকুরে মানুষে মিশিয়ে দিয়ে চিরকালটা তো একটা জগাখিচুড়ি পাকানো গেল, আর কেন? এবার ওঁদের পাওনাটা আগে মিটিয়ে দিই এসো।"

প্রথম ঝোঁকে মাস তিনেকের একটা ব্যবস্থা ঠিক হইল। কাছাকাছি কয়েকটা ছোটখাট তীর্থ শেষ করিয়া গিরিবালা এক দিন বলিলেন—"এবার একবার ঘুরে এলে হয় না বাড়ি থেকে?"

ননীবালা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"বাড়ি! এর মধ্যে কি গো? তিন মাসের ঠিক করে বেরিয়েছি, এখনও দিন দশেকও হয়নি,—হিসেব নেই আমার?"

গিরিবালা মুখের পানে চাহিয়া একটু অপ্রতিভ ভাবে হাসিলেন।

ননীবালার মুখেও হাসি ফুটিল, সেটা গাম্ভীর্যে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া, চোখ বড় বড় করিয়া বলিলেন—"তিন মাসের ব্যবস্থা যে, ও বৌদি!…বড় বৌমা বললেন—পিসিমা, মার মনটা যেন উঠে যাচ্ছে সংসার থেকে, আমরা পারি কখনও সামলাতে? আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন।…আমি মনে মনেই বললাম—আমার বয়ে গেছে, চিরদিনই মুখ গুঁজড়ে থাকবে না কি সংসারে? সুমতি হয়েছে, এবার বরং একটু বাইরে টেনে নিয়ে যাই।…ওমা, এই তোমার সংসার থেকে মন ওঠা!…ফিরে গেলে ওদের চাপা হাসিই কি করে সামলাবে তাই নয় একবার ভাবো, ঠাকুরের কথা না হয় বাদই দিলাম।"

বেশ জোরেই হাসিয়া উঠিলেন, গিরিবালাও যোগ দিলেন, যাওয়াটা স্থগিতও রহিল, কিন্তু দিন চারেক পরে কাছের আর একটা তীর্থ সারার পর ননীবালা বুঝিলেন এ রকম তীর্থ করায় ফল নাই, এ যেন জোর করিয়া টানিয়া ঘুরানো হইতেছে।

ফিরিলেন।

বাড়িতে সবাই খুশী হইল, তবে বিস্মিতও হইল কম নয়। একটু একান্তে পাইয়া বধূরা ননীবালাকেই কারণটা জিজ্ঞাসা করিল। ননীবালা একটু অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিলেন, তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, "বৌমা, মনের কথা পুসে রাখা পাপ—বিশেষ করে ঠাকুর-দেবতার ব্যাপার নিয়ে। দোষটা অবশ্য তোমার শাশুড়ির ঘাড়েই চাপিয়ে ফিরলাম, কিন্তু আমারই কি মন টেঁকছিল বাছা?…মিলিয়ে দেখলাম, ও বয়েসকালেই তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান চলে, এখন যত যাবার দিন এগিয়ে আসছে ততই যেন ভগবান্ নগদ যেটুকু দিয়েছেন সেইটুকু আঁকড়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। তোমার শাশুড়ির ঘাড়ে দোষ চাপালে কি হবে? দেখলাম তো নিজেও।"

সেজ বৌ বলিল—"তোমাদের সুবুদ্ধি হওয়ায় বাঁচলাম পিসিমা, এবার তোমরা ননদ-ভাজে দিন-কতক সামলাও তোমাদের সংসার, আমরা দু'বাড়ির বৌয়েরা মিলে বয়েস থাকতে থাকতে সেরে আসি গোটাকতক তীর্থ এই বেলা।…নিদেন একবার বাপের বাড়ি…"

একটু হাসি পড়িয়া গেল; বড়বৌ বলিল—"হ্যাঁ, সেও ভালো করে, এসেই গেয়ে রেখেছেন নিজেই বাপের বাড়ি চললেন, মনটা না কি বড্ড উতলা হয়ে উঠেছে। কেমন সেয়ানা বাপের মেয়ে!"

ননীবালা বিস্মিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"ওমা, আর আমার যে বললে দিন আষ্টেকের মধ্যেই আবার বেরুব গো! আমার সঙ্গেও এমন লুকোচুরি যদি খেলে তো সে মানুষকে নিয়ে কি করে চলবে।…"

আসল কথা নিজের মনই লুকোচুরি খেলিতেছে গিরিবালার সঙ্গে, কি যে চান কি না চান বেশ স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কাছে থাকিলে মনে হইতেছে—আর কেন, এইবার ধীরে ধীরে মুক্ত হই, দূরে গেলে সেই বাঁধনের মায়াতেই টলিতেছে আবার।···কেমন আছে সবাই? উনি যখন থাকিবেন না—একেবারেই, ওরা সব কেমন থাকিবে?···দেখিলেন ভালোই আছে, যিনি সব দিয়েছেন, যিনি শশাঙ্ককে দিয়াছেন ফিরাইয়া—তাঁহার দৃষ্টি সজাগ আছে। নিশ্চিন্ততার সঙ্গে নির্ভরতা আরও গেল বাড়িয়া।

একটা কথা কিন্তু গিরিবালা মনের কাছে গোপন করিতে পারিতেছেন না—বাহিরে বাহিরে সেই দেবতাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে যেন মন সরিতেছে না। মায়া যেন কেমন করিয়া আরও করুণ হইয়া উঠিয়াছে—বেশ তো, যাহারা আপন, যাহারা জীবনের অপরাংশ, তিনি যদি তাহাদের মধ্যেই একটি আলাদা জায়গা করিয়া লইয়া থাকেন তো কাজ কি দূরে দূরে তাঁহাকে এ ভাবে সন্ধান করিয়া ফেরার?

ননীবালা বলিলেন—"শুনলাম না কি কচি মেয়ের মতন বাপের বাড়ি যাওয়ার বায়না ধরেছ?"

গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন—"তোমার এই সহরেই বাপের বাড়ি, আবার এইখানেই শ্বশুরবাড়ি, চিরকালটা তাই কচিই থেকে গেলে, বুড়োর যে আবার কি মায়া তোমায় কি করে বোঝাই বলো?···না, ঠাকুরঝি, একবার ঘুরে আসি, দেখা-শুনো একটু করে আসি একবার; আর তো ডাক আসবার সময় হোল।"

ননীবালা হাসিয়া উত্তর দিলেন—"সে ভাবনা নেই, এখনও তোমার দেরি আছে; এমন ভাবে যে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে তাকে টেনে তুলতে যমের মেহনৎ হয়, সময় লাগে।"

এবারে অনেক দিন পরে আসিয়াছেন। ইচ্ছা করিলেই পারেন আসিতে এখন, কিন্তু ইচ্ছাটাই আর সে-রকম নাই। আসল কথা, মেয়েদের বাপের বাড়ির টান তত দিনই থাকে যত দিন শাশুড়ি থাকে বাঁচিয়া। পণ্ডিত মশাই বলিতেন—"উমা কি পারে না আসতে বাপের বাড়ি? চায় না তাই বছরে ঐ তিনটি দিন এসে একটা ঠাট্ বজায় রাখে।" সেবারে রসিকলাল গুরুর কথার উপর একটু রং ফলাইয়া কন্যাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন—"আসলে তাও নয় গিরি, তোরা হচ্ছিস্ আবদেরে জাত, আবদার করে না নিতে পারলে তোদের কোন জিনিষ মিষ্টি লাগে না; শাশুড়ি না থাকলে তো আবদার করে আসবার উপায় থাকে না, বাপের বাড়ির দিকে আর তেমন টানও থাকে না তাই।"

অনেক দিন পরে সবার সঙ্গে একসঙ্গে হইল দেখা। ভাইয়েদের ছেলেমেয়েরা বড় হইয়া উঠিতেছে, নূতন কয়টিও আসিয়াছে, ধীরে ধীরে সংসারটি পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। একেবারে নূতনের মধ্যে মেজবৌ। আগে যিনি ছিলেন তিনি অনেক দিন মারা গেছেন, তার পর হরিচরণ দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছেন। সে-ও প্রায় আট নয় বৎসরের কথা, তবে গিরিবালার এর মধ্যে আর আসা হয় নাই।

মন পুরানোকেই খোঁজে, কিন্তু নূতন বধূটি যেন সে অবসরই দিল না। শিবপুরেরই মেয়ে, কিন্তু দেহে বা মনে সহরের একটুও যেন ছোঁয়াচ লাগে নাই। আসিয়া প্রণাম করিয়া দু'-একটা কথার পর এমন একটা সলজ্জ কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি লইয়া দাঁড়াইল যে গিরিবালার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা মায়া বসিয়া গেল। তবে তাঁহাকে একটু সঙ্কোচেও ফেলিল, দু'-একবার মুখ ঘুরাইয়া দেখিলেন, মুগ্ধ দৃষ্টিতে কি এরূ যেন অপূর্ব জিনিষ দেখিতেছে। আর সবার সঙ্গে কথা কহিয়া গিরিবালা অপ্রতিভ ভাবটা কাটাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিশোর আসিয়া উপস্থিত হইলেন, প্রণাম করিয়াই প্রথম প্রশ্ন—"তোমার নতুন ভাজকে কেমন দেখলে দিদি, আগে তাই বলো।"

গিরিবালা আর একবার দেখিয়া লইলেন, হাসিয়া বলিলেন—"চমৎকারই তো, লক্ষ্মী প্রতিমের মতন; কিন্তু কথা যে বড্ড কম, শিবপুরের মেয়ে অথচ···"

"কম নয়, এর পরে টের পাবে। তবে টপ করে মুখ খুলতে যে চান না, তার কারণ···"

"আঃ, ঠাকুরপো!—" বলিয়া মেজবৌ পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতেই কিশোর গিয়া আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—"সমস্ত সহর উটকে আমরা এক রত্ন পাড়াগাঁয়ে বের করেছি দিদি। দাদার অসুখে সেবারে দেওঘরে গেলাম না? তপোবন দেখতে গেছি, ঘুরে-ফিরে দেখে-শুনে স্বামীজীর সামনে খানিকটা বসলাম। কথাবার্তা খানিকটা হোল, আরও সব লোক ছিল। স্বামীজী পূজোর জন্যে উঠে যেতে আমরা সবাই তাঁর কথা কইতে কইতে বাড়ি ফিরেছি, মেজবৌদি আমায় একলা পেয়ে চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করছেন—"হ্যাঁ ঠাকুরপো, সবাই স্বামীজী স্বামীজী বলছে, উনি কার স্বামী যে এত নাম-করা গা?"

বাড়ির মধ্যে একটা ক্ষ্যাপানে গল্প দাঁড়াইয়া গেছে, সবাই হাসিয়া উঠিতে মেজবৌ আরও গুটাইয়া গেলেন। গিরিবালা গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"থাম্ বাপু, তোরা সব এক দিনে পণ্ডিত হয়েছিস। তোকে জিগ্যেস করেই ভুল করেছিলেন।"

"হ্যাঁ, একেবারে স্বামীজীকে জিগ্যেস করলেই ঠিক হোত।"

আর এক তোড়ে হাসি নামিল।

সত্যিই এত অজ্ঞ নয়, আর এ অনেক দিন আগেরও কথা, তবে কথাবার্তার মধ্যে এখনও একটা অদ্ভুত সারল্য আছে। সন্ধ্যার সময় ছাতে বসিয়া ছিলেন গিরিবালা, কোলের শিশুটিকে লইয়া মেজবৌ আসিয়া মাদুরের এক পাশে বসিলেন। দু'-এক কথার পর বলিলেন—"বড্ড দেখবার ইচ্ছে ছিল তোমায় দিদি; এমনি ইচ্ছে হয়ই, নিজের বড় ননদ তো, কিন্তু শুধু সে জন্যেই নয়···"

গিরিবালা একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"তবে আর কি জন্যে?"

মেজবৌ একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর নূতন লোকের কাছে যেন একটু গুছাইয়া লইয়া বলিলেন—"এখানে সবাই তোমার বড্ড নাম করেন, তিন ভাইয়েই দিদি বলতে অজ্ঞান···"

একটু হাসিয়া অস্বস্তিটা কাটাইয়া গিরিবালা বলিলেন—"তাদের দিদিই তো?"

"দিদি তো অনেকেরই হয়।···তা ভিন্ন আর একটা কথা—কিন্তু ঠাকুরপোকে বলো না দিদি, দোহাই তোমার, ক্ষেপিয়ে ক্ষেপিয়ে আমায় অস্থির ক'রে তোলে।···বলছিলাম আট ছেলের মাকে দেখাও তো একটা পুণ্যি গা; বলো না।"

তাঁহাকেই সাক্ষী মানিবার ভঙ্গিতে বড় হাসি পাইল গিরিবালার; সেটুকু সামলাইয়া লইয়া একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন

সময় কিশোর আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাহার পরই বড়বৌ, দু'-তিন জন ছেলে-মেয়ে; গল্পের স্রোতটা বিভিন্ন মুখে ছুটিল। বেলেতেজপুরের কথাই হইল বেশি। গিরিবালাই তুলিলেন, যাইবেন; কত দিন যে দেখেন নাই। কিশোরকে বলিলেন—"তোরা তিন জনেই কয়েক দিনের ছুটি নে, একবার সবাই মিলে একসঙ্গে থেকে আসি, কি জানি আমার মনটা এদিকে অনেক দিন থেকে তেজপুর তেজপুর করছে; আর সত্যি আমার পক্ষে তো এই শেষ দেখাই!"

বড়বৌ কিশোরের পানে চাহিয়া কি একটা যেন ইঙ্গিতচ্ছলে শুধু বলিলেন—"ঠাকুরপো···"

কিশোরের মুখে একটি ম্লান হাসি জাগিয়া উঠিল, বলিলেন—"দিদি, বেলেতেজপুরে আর যেও না।"

একটু উৎসুক ভাবেই গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"কেন রে?"

"সে বেলেতেজপুর তো নেই-ই, এমন কি সেবারে যা দেখে এসেছিলে ততটুকুও নেই। তোমার তবু ভাগ্যি, খানিকটা ভালো ধারণা নিয়ে থাকবে; আমাদের মাঝে মাঝে যেতে হয়েছে—চোখ ফেটে জল আসে। চারি দিকে আগাছার বোন—মানুষ চোখে পড়ে না—অমন যে বেলেতেজপুর···"

কি ভাবিয়া চুপ করিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়াই রহিলেন সবাই, গিরিবালার চোখের তারা দুইটি খুব আস্তে আস্তে ঘুরিতে-ফিরিতেছে—স্মৃতির তলে ডুবিয়া গিয়া কি যেন অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন। একটু পরে বলিলেন—"যেতে একবার হবেই আমায় কিশোর। তবুও বেলেতেজপুরই তো, সেটুকু পাই সেটুকুই মিষ্টি। ধর, না—মার কথা ছেড়ে দিই, জেঠাইমার কথাই ধর, যদি বেঁচে থাকতেন সে-জেঠাইমাকে তো পেতাম না—সেই টক-টক করছে রং, সেই হাসিখুশি—হয়তো জবু-থবু হয়ে পড়ে থাকতেন বিছানাতে, কিন্তু তবুও তো···"

কিশোর বলিলেন—"তোমার তুলনাটা মন্দ হোল না দিদি, শুধু তফাৎ এই যে বেলেতেজপুর আর বেঁচেই নেই···"

তাহার পর প্রসঙ্গটার বেদনাটুকু যেন না বাড়াইবার জন্যই বলিলেন "বেশ যেও, আর সত্যিই তো একবার দেখে আসতে করেই মন।"

একটু যেন বানাইয়া বানাইয়া ভালোর দিকটা বলিয়া গেলেন, অনুগত-অপেক্ষিতদের মধ্যে হারানের ছেলেদের অবস্থা ভালো। হারান নিজে নাই, তবে জোৎ-জমি, খামার-পুকুর রাখিয়া গেছে, দু'টি ছেলে একসঙ্গে আছে, ভালোই আছে। দুলাল বাগদি এখন বাঁচিয়া আছে; বয়স হইয়াছে—তা বছর পঁচাত্তর তো বটেই; এখনও কিন্তু প্রতি বছর আমের সময় একটি ঝুড়ি গাছের আম মাথায় করে এসে দেখা করে যাওয়া চাই-ই"···

এক সময় সাতকড়ি আর হরিচরণ আসিলেন, ছেলেমেয়েদের খাওয়াইবার জন্য বৌয়েরা নিচে নামিয়া গেলেন, বেলেতেজপুরের গল্প অসম্পূর্ণ রাখিয়া ভাই-বোনে যখন নামিয়া আসিলেন, রাত্রি তখন বেশ গভীর হইয়া আসিয়াছে।

কয়েক দিন কাটিয়া গেল শিবপুরে, দেখা-শুনা, ঘোরা-ফিরার মধ্যে বেলেতেজপুরে যাইবার দিন ঠিক হইতেছে, আবার পিছাইয়া যাইতেছে, শিবপুরেই যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনটাকে তৃপ্তিতে মন্থর করিয়া দিতেছে—বেলেতেজপুর হইবে'খন—হাতের পাঁচই তো। ভাইয়েদের কাছে শুনিয়া শুনিয়া মনটা হয়তো একটু অবসাদগ্রস্তও হইয়া থাকিবে ভিতরে ভিতরে।

দিন দশেক পরের কথা। হরিচরণ আহারাদি সারিয়া আফিসে বাহির হইতেছিলেন আবার ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"দিদি, একবার বাইরে এস তো, দেখোসে কে এসেছে।"

গিরিবালা রকে আসিয়া দাঁড়াইতেই একটি ছেলে পদধূলি লইয়া লজ্জিত ভাবে অল্প হাসিমুখে একটু সরিয়া দাঁড়াইল। মোটা খদ্দরের কাপড়-পরা, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী, মাথায় একটা খদ্দরের টুপি ছিল, সেটা নামাইয়া হাতে ধরিয়া আছে; পায়ে এক জোড়া স্যাণ্ডেল।

সবাই চুপ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে, সামনে যেন একটা হেঁয়ালি ধরিয়া দিয়াছে। একটু ধোঁকা লাগিল গিরিবালার, একেবারেই অদেখা, তাহার পর ঐ পরিচ্ছদ; কিন্তু বেশি বিলম্ব হইল না, একটা খুব ক্ষীণ স্মৃতি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিল এই রকমই একটি যুবা তাঁহার সমস্ত জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, ঠিক এই রকমই, বেশ মনে পড়ে; শুধু অন্য বেশে; গিরিবালার মুখখানা দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিলেন—"বিকাশ দাদার ছেলে না?"

তাহার পরই কিন্তু বুকটা উদ্বেল হইয়া উঠিল, চোখে জল ছাপাইয়া উঠিল, খানিকক্ষণ কোন কথাই কহিতে পারিলেন না গিরিবালা। আজ তিন বছর হইল বিকাশ দাদা মারা গেছেন, শেষ দেখা হয় নাই; মস্ত বড় একটা ত্রুটি থাকিয়া গেছে জীবনে। মনটা একটু হাল্কা হইলে দুই পা আগাইয়া গিয়া ছেলেটির পিঠে হাত দিয়া বলিলেন—"তোমার নাম কি বাবা?···ঠিক একবারে বিকাশ দাদা বসানো!"

হরিচরণ বলিলেন—"নাম দিয়েছেন সমীর, সিমুরের সঙ্গে মিলিয়ে। দেশ আর গ্রাম নিয়েই তো সমস্ত জীবনটা কাটালেন।"

তাহার পর সমস্ত দিন সিমুরের গল্পই চলিল, বিকাশ দাদাকে কেন্দ্র করিয়া যে-সিমুর। স্কুল ছাড়িয়া নিজের স্কুল গড়িয়াছিলেন—ঠিক এ-ধরণের স্কুল নয়, আশ্রম বলা হয় সেটাকে—সমীরের এই খদ্দর ঐ আশ্রমেই তৈয়ারি; সমীর একটু লজ্জিত ভাবে হাসিয়া বলিল—"আমার নিজের হাতেই বোনা পিসিমা।"···একবার লজ্জাটা কাটিয়া গেলে বেশ মুক্ত ভাবেই গল্প করিয়া গেল।···বেশ সুস্থ সবল চেহারা। বিকাশ দাদার মুখে এক একবার যে বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িত এর মুখে তাহার যেন লেশমাত্রও নাই। কথাও বলে বেশ আশায় ভরা, বিশ্বাসে ভরা, সাহসে ভরা; বিকাশ দাদা ছেলের মধ্যে নিজেকেই যেন নিখুঁৎ করিয়া রাখিয়া গেছেন।

আশ্রমের তাগিদ আছে, তবুও তিন দিন ধরিয়া রাখিলেন গিরিবালা। রাত্রের আসরে সমীরের গল্পই একটানা চলে—ঐটুকু ছেলে, কতই বা বয়স?—কুড়ি-একুশ, এই, কিন্তু অনেক জানে, অনেক দেখিয়াছে এর মধ্যে। একবার জেল পর্য্যন্ত হইয়া আসিয়াছে···

ক্রমাগতই বকাইয়া যান গিরিবালা; সমস্তটা কি গল্পেরই মোহ?—এক-এক সময় মনে হয় বড় অন্যমনস্ক হইয়া গেছেন, দৃষ্টিটাই শুধু সমীরের দিকে আছে, মন কিন্তু কোথায় বহু দূরে। দ্বিতীয় দিন রাত্রে গল্পের মধ্যেই এক সময় প্রশ্ন করিয়া বসিলেন—"ছেলেবেলায় যে কামিনী গাছটার তলায় খেলতাম আমরা, তার চারাটা বেশ ডাগর হয়ে উঠছে, সেবার দেখলাম,—আছে সেটা রে সাতকড়ি?"

শাশুড়ি উত্তর দিলেন—"থাকে কখনও? তুমি গেছলে সেও প্রায় এক যুগ হোল, কত বার বন গজাল, কত বার কাটা হোল তার মধ্যে…"

গিরিবালার দৃষ্টিটা হঠাৎ ম্লান হইয়া গেল, কিছু বলিলেন না কিন্তু। কথাটা ভাইয়েদের সবাই আর বড়বৌ অল্পে অল্পে বুঝিলেন। একটি ম্লান মৌন সবার মুখে রহিল ছাইয়া, সমীর অবশ্য না বুঝিয়া করিয়াই চলিল গল্প।

মাস খানেক কাটিয়া গেল। একবার বেলেতেজপুর দেখিয়া আসিতে হইবে, সমীর আসার পর থেকে সিমুর যাওয়ারও ঝোঁক হইয়াছে, আরও বার-দুয়েক আসিয়াও ছিল সে। ভাইয়েরা ছুতানাতা করিয়া দিনটা পিছাইয়া দিতেছে; ও দু'টো জায়গা হইলেই তো দ্বারভাঙ্গায় ফিরিবার তাড়া পড়িবে। গিরিবালা ভাইয়েদের উদ্দেশ্যটা বুঝিয়াছেন নিশ্চয়, জানিয়া শুনিয়াই এলাকাড়ি দিতেছেন।…তাহার পর এক দিন আচম্বিতেই ফিরিবার জন্য তাড়াহুড়া লাগাইয়া দিলেন।

খান-কতক বাড়ি পরেই গোঁসাইদের বাড়ি, গিন্নির সঙ্গে খুব ভাব হইয়াছে গিরিবালার। বাড়িতে বিগ্রহ ওঁদের গোপাল; নিজের পূজা সারিয়া গিরিবালা রোজ একবার প্রণাম করিতে যান, গিন্নির সঙ্গে গল্পস্বল্পও হয়। আজ গিয়াই দেখেন বাড়িতে হৈ-চৈ পড়িয়া গেছে,—গোপালের ভোগ রান্না হইয়া ওঠে নাই, গিন্নি বকাবকি লাগাইয়া দিয়াছেন, দু'টি বৌ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। গিরিবালা যাইতে গিন্নি তাঁহাকেই সাক্ষী মানিয়া বলিলেন—"বলুন দিদি, ঠাকুর শুনতেই ঠাকুর, অবোধ বালক বৈ তো কিছু নয়, বাড়িতে বেঁধে রেখে এই রকম করে উপোস করিয়ে রাখা—পূজোর নামে এ নিগ্রহ কেন বাপু?…"

গিরিবালা অবশ্য বৌয়েদের পক্ষই একটু লইয়া গিন্নিকে ঠাণ্ডা করিলেন। ভোগ হইয়াই আসিয়াছিল, ঠাকুরের আহার হইলে কিন্তু প্রণাম করিয়া দু'একটা কথার পরই তিনি উঠিয়া আসিলেন। সামলাইয়াই ছিলেন, বাড়িতে আসিয়া কিন্তু মনের বিষণ্ণভাটুকু বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। বড় ভাজকে প্রশ্ন করিলেন—"বৌ, হরিচরণ বেরিয়ে গেছে?"

কিশোর ছিলেন, বাহিরে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কেন গা দিদি?"

গিরিবালা সহজ ভাবটা ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"বলছিলাম…বলছিলাম যে গাড়িটা কখন্?"

"বেলেতেজপুরের? গাড়ি তো অনেকগুলো…"

গিরিবালা বাধা দিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"বেলেতেজপুরে আর যেতে দিলি কোথায়? দ্বারভাঙ্গার গাড়ির কথা বলছিলাম—ফিরতে হবে না?"

তিন বৌয়েই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ যাওয়ার কথায় সকলেই বিস্মিত হইয়া গেছেন, গিরিবালা মুখে হাসি টানিয়া রাখার চেষ্টা করুন, কিন্তু কিছু যে একটা হইয়াছে সেটা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। বড়বৌয়ের সঙ্গে বয়সের পার্থক্য বেশি না হওয়ায় একটু সাহসের সঙ্গেই কথা বলেন, বলিলেন—"হঠাৎ এত তাড়া কেন দিদি? দু'দিন থাকবে আমরা এই জানি, হঠাৎ বাড়ি ঢুকেই গাড়ির খোঁজ?…সেখানে শত্রু-মুখে ছাই দিয়ে সব ক'টি বৌ রয়েছে, কি আর তোমার এমন মাথা-ব্যথা গা যে…"

গিরিবালা হাসিবার চেষ্টা করিয়াই আরম্ভ করিলেন—"সেই জন্যই কি বৌ?—কত দিন হোল, যেতে হবে না?…"

তাহার পরই রাগিয়া উঠিলেন—"তুই যখন তুললিই কথা বৌ,—ঐ শৈলেনটা—মানুষের মতন মানুষ হয়ে বিয়ে-থা করে সংসারী হোত, নিশ্চিন্দি থাকতাম—এখন কি যমের বাড়ি গিয়েও আমার সোয়াস্তি আছে?…সময়ে ভাতের থালাটা সামনে পড়ল কি না পড়ল… অবিশ্যি, করছে না কি? বৌয়েরা আরও বেশি করেই করে বরং… কি কথায় কি কথা এসে পড়ল; তা নয়, ছেলেদের ভাবনা নয়; অনেক দিন হোলও তো এখানে…"

বেশ চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। ভাইয়েরা চেনেন, শৈলেনের কথাটা যে নিতান্ত হঠাৎ আসিয়া পড়ে নাই সেটা বেশ বুঝিলেন, বেশি জিদ করিলেন না। সেদিনই আর হয় না, তাহার পরের দিন যাওয়া ঠিক হইল।

যাওয়ার কিছুক্ষণ আগের একটি ছোট ঘটনা: মেজবৌ সকাল থেকেই যেন সুযোগ খুঁজিতেছেন, কিছু বলিতে চান। বিকালে একটু একান্তে পাইয়া বলিলেন—"দিদি, একটা কথা রাখবে?"

মুখে লজ্জা আর সঙ্কোচের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ভয় লাগিয়া আছে; বড় কৌতূহল হইল গিরিবালার, প্রশ্ন করিলেন—"কি কথা, বল্ না।"

"যেন মাথায় সিঁদূরটুকু নিয়ে যেতে পারি; তুমি পুণ্যবতী, আশীর্বাদ করো দিদি।"

হিন্দু মেয়ের সাধারণ ভিক্ষা হইলেও, বিশেষ করিয়া চাহিবার কি এমন কারণ ঘটিয়াছে! কয়েক মুহূর্ত গিরিবালার মুখে কোন্ কথাই জোগাইল না। তাহার পর কারণটা বুঝিলেন, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বয়সের তফাৎটা একটু বেশি, তাই এই শঙ্কা; পিঠে হাত দিয়া স্নেহভরে বলিলেন—"তাই যাবি বোন, আমার আশীর্বাদে যদি কিছু থাকে বল তো তাই যাবি।"

"বল খুবই আছে দিদি, আমি যাবই, দেখে নিও তুমি।"

গিরিবালা রাগ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"মরণ! আমি বর দিলাম, ও আমায় শাপ দিচ্ছে উলটে!—তুমি যাবে, আর আমায় তাই দেখতে হবে, আমিই বুঝি মার্কণ্ডের পরমায়ু নিয়ে এসেছি?"

[ক্রমশঃ।

ইটাকুমারের ছড়া

শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী

মাঘের শেষে গ্রামের বনে বনে যখন পলাশ, সিমুল আর পালতে মাদারের অজস্র ফুল লালে লাল হয়ে সেজে-গুজে ঋতুরাজ বসন্তকে আমন্ত্রণ জানায়, তখন পল্লীর কুটীরে কুটীরে পল্লীর কিশোর-কিশোরীরা ইটাকুমার ঠাকুরের পূজা করে থাকে। এ পূজা চলে সারা ফাল্গুন মাস ধরে নদীয়া ও ফরিদপুর জেলার অনেক পল্লীতে, রাজসাহী জেলার পল্লী অঞ্চলে না কি সারা চৈত্র মাস। এ পূজো পল্লীর অমার্জিত-রুচি সেকেলে ছেলে-মেয়েদেরই পূজো ; একালে এ পূজোর রেওয়াজ পল্লী অঞ্চল থেকেই বোধ হয় উঠে গেছে। এ পূজোর মন্ত্র হলো ছড়া। পূজোর প্রচলিত নিয়ম-কানুন অতি সরল সহজ। এর কোন পুরুতের দরকার হয় না, ভোগরাগের জন্য দরকার শুধু মুড়ি-মুড়কী, গুড়-পাটালী, তবে ফুলের আয়োজন হয় প্রচুর, ঝুড়িভর্ত্তি পলাশ, সিমুল, পালতে মাদার, ভাঁটী ফুল ইত্যাদি যত রকমের বন্য ফুল বনে বনে ফাগুনের আগুন জ্বালিয়ে তোলে তার বিরাট সমাবেশ। তুলসী বেল-পাতার নাম-গন্ধ নাই, কোশাকুশী নৈবেদ্য জল চন্দন-ঘসার কোন বালাই নেই। এ পূজো যেন শিশুমনের দুরন্ত খেয়াল, অনাবিল আনন্দের সহজ সরল স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি। যাঁর উদ্দেশে পূজো তিনি কোন অঞ্চলে দেব, কোন অঞ্চলে দেবী। তাঁর নাম নানা জায়গায় নানা রকমের। কোনখানে ইটাকুমার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লোকসাহিত্য বইতে ছেলে-ভুলানো ছড়ার সংগ্রহে "ইটাকমল" বলে উল্লেখ করেছেন। ইটা-কুমার (বা কমল) ঠাকুর বা ঠাকুরাণীর কোনও অর্থ পাওয়া যায় না। কোনখানে এই ঠাকুরের নাম আবার "বসনবড়ু"—বসন্তর ব্যায়রাম বা কোটপায়ডার দেব বা দেবী। কেউ এ পূজোকে বনদুর্গার পূজোও বলে থাকেন। রাঢ় অঞ্চলে ঘেঁটু-পূজাও এই রকমের, বোধ হয় ছড়া বিভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ এক কালে এই সমস্ত গ্রাম্যগীতি সংগ্রহের জন্য খুব চেষ্টা করেছিলেন, অনেক পল্লীবৃদ্ধের সঙ্গে এ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছিলেন। আমরা জানি, তিনি শিলাইদহে থাকতে অনেক বুড়ো-বুড়ি তাঁর কাছে এসে ছড়া শুনিয়ে যেতো,—সে সব ছড়া নকল করিয়ে তিনি সযত্নে রেখেছিলেন।

আমাদের শিলাইদহ অঞ্চলের (উত্তর নদীয়া) প্রচলিত ইটে-কুমার ঠাকুরের ছড়া ও পূজার বিবরণই বলবো। ছড়ার মধ্যে শান্ত পল্লীর বাসন্তী সন্ধ্যার বর্ণনা, গ্রাম্য মেয়ে-জামাইএর জীবনযাত্রার ছবি, ঠাকুর-দেবতার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা যেন "বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া" আত্মপ্রকাশ করেছে। অর্থের বহু অসঙ্গতি সত্ত্বেও এর শান্ত সরল মধুর আবেদন সাহিত্যের চিরস্থায়ী সম্পত্তি।

এই দেব বা দেবীর মূর্ত্তিটিও পল্লীর কিশোর-কিশোরীদের ছেলে-খেলার মত। প্রতি বৎসর মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন পল্লীর এক এক পাড়ার ছেলে-মেয়ে দল বেঁধে কুল গাছের একটা বড় ডাল কেটে আনে। আমাদের গ্রাম্য অঞ্চলে কুল গাছকে বলে "বরই গাছ"। গৃহস্থদের ঢেঁকী বা গোলা-ঘরের পাশে একটা জায়গা পরিপাটী করে নিকিয়ে ঐ বরইএর ডাল মাটিতে পুঁতে ডালের গোড়ায় ছেলে-মেয়েরা সুন্দর বেদী রচনা করে। চারি দিক বেশ করে নিকিয়ে মেয়েরা বেদীর উপরে-নীচে সুন্দর আলপনা দেয়। এই বেদীতে সমাসীন ডালটাই ইটেকুমার ঠাকুর বা ঠাকরুণ।

পূজো চলে ১লা থেকে সমস্ত ফাগুন মাসটা—সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায়। পল্লীর প্রতি বাসন্তী সন্ধ্যায় পূজার বেদীতে ছেলে-মেয়েদের গুঞ্জন-গীতিতে এই প্রাচীন ছড়াগুলি যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। পাড়ার ছেলেমেয়েরা ছাড়া গিন্নি-বান্নি বৌ-ঝি এবং বুড়ীরাও ছেলেমেয়ে কোলে নিয়ে দল ধরে ছড়া গায়। প্রথমে পাঁচটি সিমুল ফুলের পাপড়ীকে তেল মাখিয়ে কাজল পাড়ানো হয়। রাশীকৃত বন্য ফুল, পাঁচটি (বা কোথায়ও একটি) প্রদীপ ও মুড়ি-মুড়কীর ভোগ রাখা হয়। পূজারী-পূজারিণী সবাই সেই কাজল চোখে দেয় আর বেদীতে কাজলের দাগ দিয়ে প্রদীপে আরতি করে। বরই গাছের ডালে ও কাঁটায় ফুল দিয়ে সাজিয়ে, মালা পরিয়ে পল্লীসুলভ সৌন্দর্য্য-জ্ঞানেরও চর্চা করে। তার পরে মন্ত্র বা ছড়া আরম্ভ হয়। আবাহনের ছড়া প্রথমেই—

"ইটেকুমারের মা গো ভিঁটে বেঁধে দে
তোর ছাওয়ালের বিয়ে হবে, সাজনে এনে দে।
সাজনে আনতে গেল বুড়ি, পথে প'ল খেওয়া
সেই খেওয়া ধুয়ে নিলো চৈতনপুরের দেওয়া।
সাঁঝ এলো রে সাঁঝ লাগাতে,
কেন রে সেঁঝে এতক্ষণ ?
বাড়ীর কাছে রে পাট বন
তাই ভাঙতে রে এতক্ষণ।
চাঁদ ওঠে রে উদয় দিয়ে
বামুনপাড়ার ঐ পাশটি দিয়ে।

বামুন মেয়ে লো কেন শুয়ে
পৈতে জোগাও লো চাঁদের বিয়ে।
এক কড়ার খুঁটী মুছি দুই কড়ার ঘি,
সাঁঝ পিদ্দিম লাগাও রে বামুনপাড়ার ঝি।
বামুন ঝি, বামুন ঝি, ব'লে এলাম তোবে
(আমার) সোনার গৌরাঙ্গের বিয়ে হবে শনি-মঙ্গলবারে।
আরতির গান—আরতি করিতে কি কি লাগে,
হাতি ঘোড়া পঞ্চমালা ঝুমুর ঝুমুর করে।
ইটেকুমার ঠাকুর তুমি হও মনোরমা,
রূপে গুণে ত্রিভুবনে নাহি তব সীমা।
স্বর্গেতে বসতি তব মর্ত্যেতে বিহার
দয়া করি বাপের বাড়ী এসো একবার।
পাদ্য দেব অর্ঘ দেব, আর আচমনী জল,
কর্পূরবাসিত জল মিষ্ট মিষ্ট ফল!
ভালতো ঠাকুর বসনবড় রে।

পাঁচ জনে পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে আরতি করে সবাই ফুলের অঞ্জলি দিয়ে আবার পূজোর ছড়া আরম্ভ করে। প্রত্যেক পংক্তির শেষের তিনটি শব্দ দু'বার করে গাইতে হয়। সবাই এক সঙ্গে গলা ছেড়ে সুর করে গায়, কখনো আবার আগ-দোহার পাছ-দোহার করে গায়—

ও-পারে দু'খান পিঁড়ি ঘি মও মও করে,
তারির উপর বাপ খুড়ো কন্যা দান করে।
বাপ যায় রে নায় নায়, খুড়ো যায় রে পারে,
শিশুকালে দিলাম বিয়া ধর্মে আগুন জ্বলে।
ইটেকুমার ঠাকুর আমায় বড় ভালোবাসে,
বেছে বেছে মাদারের ফুল ফেলে ফেলে মারে।
মাদারের ফুল তুলতে গেলাম তাতে বড় কাঁটা,
তুলে আন্‌লাম্ বনের ফুল ভ'রে নিয়ে ঝাঁকা।
ভালতো ঠাকুর বসন্‌বড়্ রে।

ও-পারেতে দু'টো শেয়াল চন্দন মেখেছে,
কে দেখেছে, কে দেখেছে, মামা দেখেছে।
মামার হাতের লাল লাঠিখান্ ফেলে-মেরেছে,
ওমনি দু'টো চিথোল কাতোল্ ভেসে উঠেছে।
একটা নিলো টিয়ের মা একটা নিলো টিয়ে,
টিয়ের আবার বিয়ে হল' লাল গামছা দিয়ে।
এক পাতিল ভাত রেঁধেছি গঙ্গাজল দিয়ে,
সকল জামাই খেয়ে গেল, ক্যাংড়া জামাই কোই,
আসতেছে আসতেছে ছোলার আইল দিয়ে।
ছোলার শাক রেঁধেছি আমি যেরতো-মধু দিয়ে,
সেই গন্ধ যায় রে ভেসে ক'লকাতা দিয়ে।
ক'লকাতার মেয়েরা সব নাচতে শিখেছে,
চিকণ চিকণ চুলগুলি তার ঝাড়তে লেগেছে।
রাজকুমারীর মার হাতে পানবুঁটা শাঁখা,
হাতকুমারীর মার ঘরে বাটা ভরা টাকা।
পাছ-দুয়ারে বেথের শাক্, বেথে থম্ থম্ করে,
বেথের শাক্ তুলতে গেলাম শাউড়ী গাল পাড়ে।
শাউড়ীর জ্বালায় গেলাম ঘরে নন্দাই ঠৌক্‌না মারে,
নন্দের জ্বালায় গেলাম কান্‌ছি, মশা ভিন্‌ভিন্ করে,
মশার জ্বালায় গেলাম গোয়াল, গরুতে চাট মারে,
গরুর জ্বালায় গেলাম জলে, কুমীরে দাঁত ঝাড়ে;
কুমীরের জ্বালায় গেলাম নাওয়ে, নাও টুল টুল করে।
আগা নাওয়ে টুলু টুলু পাছা নাওয়ে বিয়ে,
বেরোও রে নন্দতে জামাই গামছা মুড়ি দিয়ে।
উলু উলু মাদারের ফুল, বর আসছে কত দূর?
বর আসছে বামুনপাড়া, বড় বৌ গো রান্না চড়া।
আলুর পাতা ছালু রে ভাই ভেন্না পাতায় দই,
সকল জামাই এলো রে আমার ক্যাংড়া জামাই কোই।
ঐ আসছে ক্যাংড়া জামাই টুংটুঙি বাজিয়ে,
ভাঙা ঘরে শুতে দিলাম, ইঁদুরে নিলো কান্
কেঁদো না কেঁদো না জামাই গরু দিব দান্।
সেই গরুটার নাম থুইও পুণ্যবতীর চাঁদ।

এর পরে ঠাকুরের কাছে বর প্রার্থনা,—টানা সুরে গাইতে হয়—

ঘাঁটা বাড়ী রে সারী সারী
আমার বাপ মারে রাজেশ্বরী
রাজেশ্বরে দিলো বর—
ধান চাল দিবে রে গোলা ভর।

পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তার পরে সবাই গড় হয়ে প্রণাম করে—ছড়া চলে—

এবারকার মত যাও রে ঠাকুর ফোট্‌পচাড় নিয়ে।
আর বার এসো রে ঠাকুর শঙ্খ সিঁদুর নিয়ে।
ফোট্‌পচাড়ের নাও যায় রে আদাড় পাদাড় দিয়ে,
শঙ্খ সিঁদুরের নাও চলে রে মধ্যি গাং দিয়ে।

আবার পুষ্পাঞ্জলি। তার পরে আশীর্বাদ প্রার্থনা—

তুমি ঠাকুর কালো—
ওমুকের করো ভালো।

—"ওমুক" অর্থাৎ প্রত্যেক বার বাপ, মা, ভাই, বোন, পিশি, দিদি, মাসি ইত্যাদির নাম করে ফুল ফেলতে হয়। শেষে প্রত্যেক ঘরের চালের উপর ফুল ছুঁড়ে পূজো সাঙ্গ হয়। ১লা চৈত্র সব ছেলেমেয়ে হৈ-হৈ করে ঐ ঠাকুর গ্রামের পুকুরে বিসর্জন দেয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লোকসাহিত্য' হইতে ছেলেভুলানো ছড়ার ৬৪ নং ছড়ায় "ইটাকমলের" লিখেছেন (পৃ: ১১০)। এর সঙ্গে আমার এই ছড়ার কিছু ঐক্য দেখছি। তাঁর ঐ সংগ্রহের ৭১, ৮০, ৮১ নং ছড়ার সঙ্গে (পৃ: ১১৪—১৫) আমার এই ছড়ার অধিকাংশ মিল আছে। এই ঠাকুরটি বসন্ত ব্যায়রাম বা চর্মরোগের দেবতা বলে পূজিত। আমার সংগ্রহে মাঝে মাঝে "ভালতো ঠাকুর বসনবড়্ রে" ধুয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত বিভিন্ন ভাবের ছড়ার মাধুর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন। লিখেছেন—"ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহু কাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে;—এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃ-মাতামহীদের স্নেহ সংগীত-স্বর জড়িত হইয়া আছে। এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃ-পিতামহগণের শৈশবনৃত্যের নূপুর-নিক্কন ঝঙ্কৃত হইতেছে। অথচ আজকাল এই ছড়াগুলি লোকে ক্রমশই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে।"

স্বর্ণ-মূর্তি

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

১

মূর্তিচুরি

সংবাদটা এতই অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক যে, জমিদার শিবশংকর চৌধুরী একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন।

এ রকমটা যে কখনো ঘটতে পরে, এ বোধ করি কখনো তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। তিন পুরুষের স্থাপিত গৃহদেবতা: লক্ষ্মীনারায়ণের স্বর্ণমূর্তিখানি চারতলার উপরের পূজার ঘর হতে চুরি গেছে।

সংবাদটা শোনা অবধি তাঁর দু'চোখের অশ্রু যেন কোন মতেই বাধা মানছিল না। কেবলই তাঁর মনে হচ্ছিল, নিশ্চয়ই তাঁর কোন পাপে এত দিনকার গৃহদেবতা তাঁকে ত্যাগ করে গেছেন।

প্রথমটায় তিনি বুঝেই উঠতে পারছিলেন না কি তিনি করবেন। একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

শুধু যে গৃহদেবতাই তা নয়: মূল্য হিসাবেও স্বর্ণমূর্তিটি অমূল্য। প্রায় সাড়ে চার-পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বায় যুগল মূর্তিটি। এবং সেই মূর্তির গায়ে বহু-মূল্যবান হীরকখণ্ড বসান। রূপার সিংহাসনের 'পরে মূর্তিটি বসান থাকত।

অন্ধকারে মূর্তির গায়ের সেই সব হীরকগুলি অদ্ভুত একটা জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করতো: দূর হতে যেন মূর্তির চতুষ্পার্শে স্বর্গীয় একটি জ্যোতির্মণ্ডল বিরাজ করছে।

মূর্তিটির একটি ইতিহাস আছে।

শিবশংকরের প্রপিতামহ রাধাকান্ত চৌধুরী অত্যন্ত গরীবের ঘরে জন্মেছিলেন, দু'বেলা দু'মুঠো আহারও প্রতিদিন জুটত না। কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যিকারের পুরুষসিংহ:

ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে দারিদ্র্যকে মেনে নেওয়ার মত দুর্ব্বলতা তার চরিত্রে ছিল না; তাই তিনি সহসা এক দিন বিধবা মাকে কোন কিছু না বলে, নিজের হাতের উপনয়নের সময় পাওয়া সোনার আংটিটি ২৫৲ টাকায় বিক্রী করে একদা জাহাজে চেপে বসলেন বর্মার যাত্রী হয়ে।

মগের মুল্লুকে দীর্ঘ পাঁচ বছর এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে অবশেষে মৌচী মাইকে চাকুরী পান।

ভাগ্য তার এত দিনে সুপ্রসন্ন হলো।

দীর্ঘ ১৪ বৎসরের প্রাণপাত পরিশ্রমে বহু টাকা সঞ্চয় করে বর্মা ছেড়ে আবার দেশে ফিরে এলেন।

খনিতে চাকুরী করবার সময়ই তিনি অনেকগুলো নীল হীরা সংগ্রহ করে এনেছিলেন।

বাংলা দেশে ফিরেও আবার ব্যবসা সুরু করলেন। ভাগ্যদেবী তার 'পরে তখন সুপ্রসন্ন। ধূলি-মুষ্টি সোনাতে পরিণত হতে লাগল।

গ্রামে জমিদারী কিনলেন: প্রকাণ্ড ইমারত হলো এবং লক্ষ্মীনারায়ণের হীরকখচিত স্বর্ণমূর্তি নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা করলেন প্রায় ৫০।৬০ হাজার টাকা মূর্তিটির পিছনে ব্যয় করে। চৌধুরীদের বংশে চিরচঞ্চলা কমলা অচলা হলেন।

সেই মূর্তিখানি চুরি গেছে পূজার ঘর হ'তে।

কলিকাতায় চৌধুরীদের প্রকাণ্ড কাঠের ব্যবসা। এ ব্যবসাও রাধাকান্ত চৌধুরীর সময়েই। বর্তমানে সেই ব্যবসার সংগে শিবশংকর মাইকার খনি কিনেছেন, তার পরম বন্ধু স্যার শ্রীনাথ সরকারের সংগে আধাআধি বখরায়।

মাইকার খনির কাজ সবে সুরু হয়েছে।

স্যার শ্রীনাথ সরকারও কলিকাতা সহরে এক জন বিখ্যাত নামকরা ব্যবসায়ী ও লক্ষপতি। কয়েক বৎসর আগে তিনি সরকারী খিতাব পেয়েছেন: নাইটহুড। আজ সকাল আটটার ট্রেণে এখানে

স্যার কলিকাতা হ'তে আসবার কথা। সকাল বেলাই ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে গেছে শ্রীনাথকে আনতে।

শিবশংকর বাইরের ঘরে বসে বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছেন, এমন সময় তার মা তাকে জরুরী কাজের জন্য ডেকে পাঠালেন। অন্দর মহলে এসে মায়ের খোঁজ করতেই শুনলেন, মা উপরে পূজার ঘরেই আছেন।

শিবশংকর এসে ডাকালেন : মা ?

দেখলেন পূজা-ঘরের খোলা দরজাটার সামনে দেওয়ালে হেলান দিয়ে মা দাঁড়িয়ে আছেন, আর তার নিমীলিত দুই চোখের কোল বেয়ে অজস্র ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

স্তম্ভিত শিবশংকর আরো একটু এগিয়ে এলেন, এ কি, কি হয়েছে মা ? কাঁদছো কেন ?

পূজা-ঘরে গৃহদেবতা নেই।

সে কি ? তোমার নিশ্চয়ই দেখবার ভুল হয়েছে, দেখ তো সিংহাসনের পাশে সরে যায়নি ত ? ফুল-চাপা পড়েনি ত ? পূজা-ঘরের দরজায় তালা দেওয়া ছিল না ?

হাঁ বাবা আমি নিজেই কাল শয়ন-আরতির পরে তালা লাগিয়ে গেছি, এবং নিজে হাতে এসে এই খানিকক্ষণ হয় তালা খুলেছি। প্রথমটায় নজর পড়েনি, কিন্তু সিংহাসন গোছাতে গিয়েই নজরে পড়ল।

চল মা দেখি। তুমি নিশ্চয়ই ভাল করে খুঁজে দেখনি। ঘরে তালা দেওয়া, চারতলার 'পরে পূজার ঘর, কার সাধ্য এখান হতে মূর্তি চুরি করে। তাছাড়া হাওয়ায় ত আর উড়ে যেতে পারে না মূর্তি !

মা কোন জবাব দিলেন না ছেলের কথায়।

শিবশংকর পূজা-ঘরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু সত্যই মূর্তিটি যেন হাওয়াতেই উড়ে গেছে।

সমগ্র পূজা-ঘর তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও স্বর্ণমূর্তি পাওয়া গেল না। এমন সময় নীচে গাড়ীর হর্ণ শোনা গেল : ঐ স্যার শ্রীনাথ এলেন। আমি নীচে যাই মা। কিন্তু এ কথা কাউ'কে এখন বলো না। এ-বাড়ীর কেউ যেন না জানতে পারে যে গৃহদেবতার মূর্তি চুরি গেছে।

বেশ কিন্তু পূজারী ঠাকুর ?

হাঁ সেও এক সমস্যা। আচ্ছা সে এলে প্রথমে সে যেন আমার সংগে দেখা করে।

চিন্তিত মুখে শিবশংকর নীচে নেমে গেলেন।

২

স্যার শ্রীনাথ সরকার

স্যার শ্রীনাথ সরকার ইতিপূর্বে আরো একবার চৌধুরী-বাড়ীতে এসেছিলেন। চৌধুরীদের সংগে আজ প্রায় বৎসর খানেক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। ব্যবসা-সূত্রেই আলাপ।

স্যার শ্রীনাথের বয়স প্রায় পঞ্চাশের কোঠায় গিয়ে পৌঁচেছে। বয়সের অনুপাতে শরীরের কোথাও আজ পর্য্যন্ত এতটুকুও ভাগন ধরেনি। বেঁটে খাটো বলিষ্ঠ দোহারা গঠনের মানুষটি।

গায়ের রং উজ্জ্বল গৌর বর্ণ। মাথার চুল প্রায় তিন ভাগ শাদা হয়ে গেছে। ফ্রেঞ্চ-কাট পাকা দাঁড়ি। অত্যন্ত আমুদে হাসি খুশী মানুষ। অতি বড় বিপদেও কখনো কেউ তাকে নার্ভ হারাতে দেখেনি। আজন্ম ব্রহ্মচারী মানুষ। সংসারে আপনার বলতে শুধু একটি মাত্র ভাইঝি : মৃদুলা।

কলিকাতার বালীগঞ্জ অঞ্চলে বৃহৎ প্রাসাদ তুল্য ইমারৎ।

গত মহাযুদ্ধে হার্ডওয়ারের ব্যবসা করে প্রভূত সম্পত্তির মালিক। সম্প্রতি শিবশংকরের সংগে আধাআধি শেয়ারে মাইকার খনি কিনেছেন, তারই সম্পর্কে জরুরী কথাবার্তার জন্য এখানে আজ তার আগমন।

একটা দামী আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে স্যার শ্রীনাথ মোটা বর্মা চুরোট টানছিলেন, শিবশংকর এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

নমস্কার স্যার শ্রীনাথ।

নমস্কার।

তার পর গাড়ীতে কোন কষ্ট হয়নি ত ?···এত দেরী হলো যে, শেষ রাত্রের গাড়ীতে আসেননি ?

না, বেলা আটটার গাড়ীতে এসেছি। আরামেই আসা গেছে। কিন্তু আপনার মুখ অত শুক্‌নো দেখছি কেন মিঃ চৌধুরী ? কোন অসুখ-বিসুখ করেনি ত ?

শিবশংকর মৃদু হাসলেন, চা আনতে বলি ?

বেশ ত।

শিবশংকর ভৃত্যকে ডেকে চা আনতে আদেশ দিলেন।

কিন্তু আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে মিঃ চৌধুরী, নিশ্চয়ই আপনার শরীর সুস্থ নয়।

শিবশংকরের চোখ দু'টি ছল-ছলিয়ে এলো।

কি হয়েছে মিঃ চৌধুরী ? কোন বিপদ··· ?

বিপদ !···

আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে মিঃ চৌধুরী, আমাকে বন্ধু ভেবেই সব খুলে বলুন। কথাবার্তা না হয় ব্যবসা সম্বন্ধে আর এক সময়েই বলা যাবে।

শিবশংকর মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন, তার পর ঈষৎ চাপা স্বরে বললেন, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে স্যার শ্রীনাথ !

স্যার শ্রীনাথ চম্‌কে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শিবশংকরের দিকে তাকালেন।

শিবশংকর তখন একটু একটু করে একটু আগের সব ঘটনা খুলে বললেন।

সর্বনাশ ! আপনার সেই হীরকখচিত সোনার লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি !···কিন্তু আপনি ভাল করে খোঁজ করে দেখেছেন ত ? তালা-চাবীবদ্ধ চারতলার উপর হতে দেবতার বিগ্রহ চুরি, এ যে একদম absurd বলেই মনে হচ্ছে। Impracticable. আমি একবার আপনার সংগে গিয়ে পূজাঘরটি দেখতে পারি কি ?

নিশ্চয়ই। আসুন।

স্যার শ্রীনাথকে সংগে করে শিবশংকর চারতলার পূজা-ঘরে গেলেন।

সমস্ত দেখে-শুনে স্যার শ্রীনাথ আরো আশ্চর্য্য হলেন। এ যেন ভোজবাজী। কিছুতেই বিশ্বাস করতে মন চায় না। দু'জনে আবার নীচের বাইরের ঘরে ফিরে এলেন।

দু'জনেই নীরবে দু'খানি সোফা অধিকার করে বসেন। কারও মুখেই কোন কথা নেই।

কিছুক্ষণ পরে স্যার শ্রীনাথই প্রথমে কথা বললেন, মিঃ চৌধুরী, ব্যবসা সংক্রান্ত কোন কথা-বার্তাই এখন চলতে পারে না।

আপনি কি কিছু এ সম্পর্কে ভেবেছেন ?

না। আমি কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছি না, ব্যাপারটা এত অসম্ভব যে, আমার মাথার মধ্যেই যেন আসছে না।

আর কে কে এ বাড়ীর মধ্যে এ ব্যাপার জানে ?

আমার মা ও আমি ভিন্ন একমাত্র আপনি ছাড়া আর চতুর্থ ব্যক্তি কেউই এ সম্পর্কে কিছু জানে না।

বেশ।···বলবেনও না কাউকে।

কিন্তু আর একটু পরেই পূজারী আসবে! তার কাছে ত ব্যাপারটা চাপা থাকবে না ?

পূজারী!

হাঁ, এই গ্রামেরই এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রামকুমার সান্যাল মহাশয় প্রত্যহ এসে আমাদের গৃহদেবতার পূজা করে যান।

লোকটি কেমন ?

অত্যন্ত সজ্জন সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মভীরু। আজ দু'পুরুষ ধরে ওঁরাই আমাদের গৃহদেবতার পূজা করে আসছেন।

বিশ্বাসযোগ্য তাহলে ?

নিশ্চয়ই।

তবে তাকে ডেকে সব বুঝিয়ে বলে, আপাততঃ চুপ করে থাকতে বলুন।

আমিও তাই ভেবে রেখেছি।

এমন সময়ে ভৃত্য এসে সংবাদ দিল, পূজারী ঠাকুর বাবুর সংগে দেখা করতে চান।

ভিতরে আসতে বল ঠাকুর মশাইকে।

বৃদ্ধ রামকুমার সান্যাল মশাই ঘরে এসে প্রবেশ করলেন, মা বললেন, আপনি আমায় না কি ডেকেছেন বড় বাবু!

আসুন ঠাকুর মশাই, বসুন।

স্যার শ্রীনাথ চেয়ে দেখলেন: প্রায় সত্তোরের কাছাকাছি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বয়স। মাথার চুল পেকে সব শাদা হয়ে গেছে। মুখের পরে অসংখ্য বলি-রেখা: এখন একটু কুঁজো হয়ে হাঁটেন। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। পরিধানে একটি পট্টবস্ত্র, কাঁধের পরে নামাবলি। কপালে দুই ভ্রূর মধ্যখানে রক্তচন্দনের টিপ।

আপনাকে বিশেষ একটা কারণে ডেকেছি ঠাকুর মশাই, শিবশংকর সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন: আপনি ঘুণাক্ষরেও এ-কথা আমি না বলা পর্য্যন্ত কারু কাছে প্রকাশ করতে পারবেন না।

কিন্তু এ সর্বনাশ কেমন করে ঘটল চৌধুরী মশাই ?

তাই যদি জানতাম ঠাকুর মশাই তবে এতক্ষণে এর নিশ্চয়ই একটা বিহিত করতাম।

* * * *

আমি একটা suggestion আপনাকে দিতে চাই মিঃ চৌধুরী ? স্যার শ্রীনাথ বললেন।

বলুন।

বিখ্যাত রহস্যভেদী কিরীটি রায়ের শুনেছি না কি অস্বাভাবিক ক্ষমতা এই সব রহস্য উদ্ঘাটন ব্যাপারে, তাকে জানালে কি রকম হয় ?

আপনি কি সত্যিই মনে করেন স্যার শ্রীনাথ, যে এ ব্যাপারে কিরীটি বাবু আমাকে সাহায্য করতে পারবেন ?

চেষ্টা ক'রে দেখতেই বা ক্ষতি কি ?

বেশ, কি করতে হবে আমাকে বলুন ?

কিছুই আপনাকে করতে হবে না, মিঃ চৌধুরী, আপনি সন্ধ্যার গাড়ীতেই কিরীটি রায়কে আসবার জন্য একটা 'তার' করে দেন।

'তার' করলে তিনি যদি না আসেন ?

'তার' করে দিন আপনার বড় সাংঘাতিক বিপদ, তাঁর সাহায্য আপনি চান, তাহলেই দেখবেন তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। স্যার শ্রীনাথই কি ভাবে 'তার' করতে হবে, একটা মুসাবিদা করে তখুনি 'তার' পাঠিয়ে দেওয়া হলো, আর্জেন্ট।

স্যার শ্রীনাথের অনুমানই সত্যি হলো।

সন্ধ্যার দিকে জবাব এলো: Starting. Attend station, 'Kirit.'

৩

কিরীটির রুল অফ থ্রি

ট্রেনটা শেষ রাত্রের দিকে নির্দিষ্ট ষ্টেশনে এসে থামল।

ফাল্গুন মাস। শীত প্রায় যাই-যাই করছে, ভোরের দিকে সামান্য একটু ঠাণ্ডার আমেজ মাত্র পাওয়া যায়। আসন্ন প্রভাতের অস্পষ্ট আলোয় পূর্বাকাশের প্রান্ত ফিকে হ'য়ে উঠেছে।

অস্পষ্ট একটা আলো-ছায়া; যেন প্রথম ঘুম-ভাঙা রাতের মতই স্বপ্নময়।

ছোট ষ্টেশনটি। লাল সুরকী-ঢালা বাঁধান উঁচু প্ল্যাটফরম্। ষ্টেশনটি ছোট। প্লাটফরমের সীমানা মেহেদীর বেড়া দিয়ে নির্দিষ্ট। ষ্টেশনটি যেমন ছোট, যাত্রীও তেমনি স্বল্প!

কিরীটি স্যুটকেশটা হাতে সেকেণ্ড ক্লাশ কমপার্টমেণ্ট হতে নামতেই শিবশংকর এগিয়ে এলেন, আপনার নাম ?···

কিরীটি রায়।

নমস্কার। আমারই নাম শিবশংকর চৌধুরী।

ও! নমস্কার।

আসুন, ষ্টেশনের বাইরে গাড়ী আছে।

দু'জনে এসে গাড়ীর সামনে দাঁড়ায়।

নিউ মডেলের-V8 গাড়ী! সিডন বডি কালো রংয়ের, আয়নার মত মুখ দেখা যায়।

সামনের সীটের দরজাটা খুলে শিবশংকর আহ্বান জানালেন: উঠুন কিরীটি বাবু।

শিবশংকর নিজেই গাড়ী ড্রাইভ করছিলেন।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় জাগরণ-ক্লান্ত চোখের পাতায় যেন ঘুম জড়িয়ে আসে। কিরীটি ব্যাকসীটে হেলান দিয়ে চোখ বুজলে!

ষ্টেশন হতে জমিদার-বাড়ী প্রায় পাঁচ মাইলটাক্ হবে। অপ্রশস্ত কাঁচা মাটীর সড়ক। রাস্তার দু'পাশে কাঁটা মনসা ও রাংচিতার গাছ। অজস্র হলুদ ফুল ফুটে আছে। দূরে মাঠের মধ্যে কতকগুলো পলাশ ফুলের গাছ: লাল রক্তবর্ণের ফুল ফুটে আছে।···

কিরীটি বাবু ?

বলুন!

আপনি নিশ্চয় আমার 'পরে অসন্তুষ্ট হয়েছেন এ ভাবে হঠাৎ 'তার' কর ডেকে আনায় ?

না, কারণ আমি আপনার 'তার' পেয়েই বুঝেছিলাম, নিশ্চয়ই কোন বড় রকমের বিপদে আপনি পড়েছেন। তবে সারাটা রাত্রি কাল ট্রেণে বসে বসে ভেবেছি কি এমন বিপদে আপনি পড়লেন, আর আমি কি ভাবে আপনাকে সে বিপদে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু আপনার মুখ দেখে বুঝেছি!···

কি বুঝেছেন ?

খুন-খারাপী নয়, কোন বিশেষ মূল্যবান জিনিষ আপনার চুরি গেছে। এবং মূল্য হিসাবে সে বস্তু চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা হওয়াও হয়ত অসম্ভব নয়।

দারুণ বিস্ময়ে হাঁ করে শিবশংকর কিরীটির মুখের দিকে তাকালেন। লোকটা কি অন্তর্য্যামী না যাদুকর!

কিরীটি মৃদু হেসে শিবশংকরের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি ভাবছেন নিশ্চয়ই আমি অন্তর্য্যামী কি না? না? ভয় পাবেন না মিঃ চৌধুরী। আমি যাদুকরও নই, অন্তর্য্যামীও নই। এটা আমার simple deduction মাত্র! স্থুব্রত বলে, এটা না কি আমার common sense-এর rule of three। কলিকাতার সুবিখ্যাত Timber Marchent শিবশংকর চৌধুরীর সম্পদ এখন এক প্রকার কিংবদন্তীর মধ্যে দাঁড়িয়েছে প্রথম কথা। দ্বিতীয় খুন-খারাপীর ব্যাপার হ'লে সেটা আপনি প্রথমে আমারই সাহায্য না চেয়ে পুলিশের সাহায্যই নিতেন, এবং সেটাই স্বাভাবিক। তৃতীয় এমন কোন মূল্যবান জিনিষ আপনার খোয়া গেছে, যেটা সকলের সামনে প্রকাশ করতে আপনি ইচ্ছুক নন।

ঠিক তাই। কিন্তু কি করে আপনি তা জানলেন ?

এ ত অতি সহজ, একটু ভাবলেই ত বোঝা যায়; আপনি আমাকে 'তার' করেছেন, আপনি বিশেষ বিপদে পড়েছেন, যার জন্য আমার সাহায্য আপনার একান্ত প্রয়োজন। 'তারে' আর কিছুই আপনি জানাননি। এতেই বোঝা যায়, ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়ুক আপনি যেমন চান না তেমনি, ব্যাপারটার একটা মীমাংসা হোক আপনি তা চাচ্ছেন, তাই আমাকে 'তার' করে ডেকে পাঠিয়েছেন। কেমন বলুন, তাই নয় কি ?

হাাঁ।

কিন্তু কেমন করে আপনি বুঝতে পারলেন যে, আমার কোন মূল্যবান জিনিষ খোয়া গেছে ?

সে-ও আমার deduction বা অনুমান মাত্র। কেন না, সেটাই এ ক্ষেত্রে বেশী স্বাভাবিক। আপনাদের মত ধনীর ঘরে এমন অনেক মূল্যবাম জিনিষই থাকে, এবং যার প্রতি দশ জনের লোভ হওয়াটাও একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু এ ত গেল তর্কের দিক্। আপনার কথায়ই স্থির-নিশ্চিত হয়েছি, কিছু মূল্যবান জিনিষ আপনার চুরি গেছে। কি হয়েছে বলুন ত? এবং এটাও সেই সংগে বুঝছি, ব্যাপারটার আলোচনা আপনি সকলের সামনে করতে চান না।

আশ্চর্য্য! তা-ও বুঝলেন কেমন করে বলুন ত ?

তা না হলে আপনি ড্রাইভার না পাঠিয়ে নিজে মটোর হাঁকিয়ে আসতেন না।

শিবশংকর শ্রদ্ধা-বিগলিত স্বরে বললেন, মিঃ রায়, আপনার কথা যত শুনছি ততই আমি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। স্যার শ্রীনাথ সত্যিই বলেছিলেন, অসাধারণ ক্ষমতাশালী লোক আপনি। এখন বুঝতে পারছি, তাঁর কথা এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয়। এখন আমার সত্যিই আশা হচ্ছে, মূর্তিটির একটা কিনারা আপনি করতে পারবেন।

স্যার শ্রীনাথ! মানে স্যার শ্রীনাথ সরকার না কি ?

হাঁ। তিনি আমার পরম বন্ধু। তিনিই আমাকে আপনার কথা বলেন।

ও। তার পর একটু থেমে বললে: হাঁ, কি বলছিলেন ?

শিবশংকর তখন একটু একটু করে সমগ্র ব্যাপারটি খুলে বলে গেলেন।

৪

অনুসন্ধান

আমরা এসে পড়েছি মিঃ রায়, ঐ আমার বাড়ী 'মধু নিবাস', শিবশংকর আঙুল তুলে প্রায় হাত ২০।২৫ দূরে, লাল রংয়ের চারতলা প্রাসাদোপম এক অট্টালিকা নির্দেশ করলেন।

মিঃ চৌধুরী ?

বলুন ?

তা হলে নিশ্চয়ই আপনি আমার পরিচয়ও গোপন রাখতে চান ?

আমার মনে হয়, সেটাই বোধ হয় ভাল হবে।

আপনার যখন তাই ইচ্ছা, তাই হবে, যে পরিচয় আপনি আমার দিতে চান তাই দিতে পারেন।

আপনার কি এতে অমত আছে মিঃ রায় ?

আমার মতামতের ত কোন প্রশ্নই এখানে উঠতে পারে না মিঃ চৌধুরী। আপনার কাছে এসেছি, আপনার যা ইচ্ছা তাই হবে। যতক্ষণ না আমার কাজের সংগে ঠোকাঠুকি বাধে, এ সব সামান্য ব্যাপারে আমার নিজের কিছুই এসে-যাবে না জানবেন।

বেশ! তবে আপনার আসল নামই থাকবে, কেবল কেন এসেছেন ও আপনার আসল পরিচয় কি, তা কাউকে জানান হবে না।

গেটের মধ্যে এসে গাড়ী প্রবেশ করল।

গাড়ী-বারান্দার নীচে গাড়ী থামিয়ে, দু'জনে গাড়ী হতে নামতেই শিবশংকরের সেক্রেটারী ও ম্যানেজার শ্রীকণ্ঠ বাবুর সংগে দেখা হলো।

শ্রীকণ্ঠ বাবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মনিবের দিকে একবার ও কিরীটির দিকে একবার তাকালেন।

শ্রীকণ্ঠের বয়স ত্রিশ হতে বত্রিশের মধ্যে। মাজা গায়ের রং। লম্বায় প্রায় সোয়া ছয় ফুট হবেন। পেশল বলিষ্ঠ চেহারা। নাকটা একটু ভোঁতা, ছোট ছোট গোল গোল দু'টি চোখ, চোখের দৃষ্টি ভোঁতা। বুদ্ধির কোন আলোই তাতে নেই। সরু পাকান গোঁপ, দাঁড়ি নিখুঁত ভাবে কামান। পরিধানে সাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবী, কিন্তু সেই সামান্য পাঞ্জাবীর অন্তরাল হতেও শ্রীকণ্ঠের অত্যন্ত বলিষ্ঠ পেশীবহুল চেহারাটা যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়।

শিবশংকরই পরিচয় দিলেন, কিরীটি রায়। আমার সেক্রেটারী ও ম্যানেজার শ্রীকণ্ঠ মল্লিক।

দু'জনে নমস্কার ও প্রতি-নমস্কার জানায় পরস্পর পরস্পরকে।

কিরীটি বাবুর থাকবার ঘর ঠিক করে রেখেছেন ?

হাঁ! দোতোলায় দাদা বাবুর ঘরের পাশেই যে ঘরটায় মাঝে মাঝে দাদা বাবুর বন্ধু-বান্ধবেরা এসে থাকেন, সেই কিরীটি বাবুর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

বেশ। আসুন কিরীটি বাবু! আপনাকে একেবারে ঘরে পৌছে দিই। এখন হাত-মুখ ধুয়ে আগে চা-জলখাবার খান, পরে বিশ্রামের পর কথা-বার্তা হবে।

*　　*　　*　　*

কিরীটির ভারী পছন্দ হয়ে গেল ঘরখানি।

মাঝারি গোছের ঘরখানি। মসৃণ কালো মার্বেল পাথরের মেঝে। পা যেন পিছলে যায়। ঘরে আসবাবপত্রের কোন বাহুল্যই নেই। এক দিকে একখানি সুদৃশ্য সিংগিল খাটে ধব-ধবে শয্যা বিছান। ছোট একটি রাইটিং টেবিল, খান-দুই গদিমোড়া চেয়ার, একটি বেতের আরাম-কেদারা। একটি বইয়ের সেল্‌ফ, তাতে ইংরাজী-বাংলা সব বই সাজান। একটি কাপড়-জামা রাখবার আলনা বা ষ্ট্যাণ্ড। একটি ড্রেসিং টেবিল। খাটের শিয়রের কাছে একটি শ্বেত পাথরের গোল টেবিল। টেবিলের 'পরে একটি সুদৃশ্য জার্মানী ঘড়ি ও একটি সবুজ ডোমঢাকা টেবিল ল্যাম্প। ঘরে সর্বসমেত পাঁচটি জানালা ও দু'টি দরজা, তিনটি জানালা দক্ষিণ দিকে। খোলা জানালা-পথে দক্ষিণে দিগন্ত-প্রসারিত সবুজ মাঠ ও চাসের জমি। বাকী জানালা দু'টি ভিতরের দিকে। ঘরের সামনেই দরজা দিয়ে ঢুকবার আগেই লম্বা টানা বারান্দা। ঘরের অন্য দরজাটি বন্ধই থাকে, কেন না, ঐ দরজা-পথে অন্দরের পাশের ঘরে যাতায়াত করা যায়।

*　　*　　*　　*

কিঞ্চিৎ জলযোগ ও চা-পানের পর কিরীটি শিবশংকরের সংগে গল্প করছিল।

শিবশংকরের বাড়ীর ছোট-খাটো একটা পরিচয় কিরীটি পেয়েছে। আপনার জনের মধ্যে শিবশংকররা দুই ভাই, শিবশংকর ও মণিশংকর, শিবশংকর বড়, মণিশংকর শিবশংকরের চাইতে ১৫ বছরের ছোট। শিবশংকর বেশীর ভাগ সময়েই গ্রামে থাকেন, তবে ব্যবসাসংক্রান্ত কাজে প্রায়ই তাকে কলকাতায় যেতে হয়। কলকাতার ব্যবসা মণিশংকরই দেখা-শোনা করেন, কিন্তু দাদার পরামর্শ ও উপদেশ ব্যতীত কোন কাজই তিনি করেন না।

শিবশংকরের দুই ছেলে, দীনশংকর ও দ্বিজশংকর। দীনশংকর বড় দ্বিজশংকর ছোট।

মণিশংকর এখনও বিবাহ করেননি।

দীনশংকরের বয়স ২৫এর কাছাকাছি, অর্থশাস্ত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়ছেন। দ্বিজশংকর গ্রামের স্কুলে ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ে।

দীনশংকর ও দ্বিজশংকরের মা বহু দিন হলো গত হয়েছেন, শিবশংকর আর বিবাহ করেননি।

সংসারে স্ত্রীলোকের মধ্যে শিবশংকরের বৃদ্ধা জননী হরসুন্দরী দেবী। এ ছাড়া শিবশংকরের বিধবা বোনের ছেলে সত্যেন।

সত্যেন মামা-বাড়ীতেই মানুষ! সে বর্তমানে এম-এ, ল' পাশ করে, বাড়ীতেই বসে সাহিত্য-চর্চা করে। তার ইচ্ছা, বিলাতে গিয়ে ব্যারিষ্টার হ'য়ে আসে। কিন্তু শিবশংকর তাতে রাজী নন। শিবশংকরের ধারণা অন্য রকম: বুদ্ধি ও অধ্যবসায় থাকলে দেশে থেকেই উন্নতি করা যায়। নজীরের অভাব নেই, স্যার আশুতোষ, রাসবিহারী ঘোষ ইত্যাদি।

এই ত গেল আপনার জন। সেক্রেটারী ও ম্যানেজার শ্রীকণ্ঠ মল্লিক। সেরেস্তায় কাজ করেন অমিয় বাবু ও জীবেন বাবু! ভৃত্যদের মধ্যে বহু দিনকার পুরাতন ভৃত্য শ্যামু। দীনশংকরদের কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে, এ-বাড়ীর এক জনের মধ্যেই সে এখন গণ্য। আরো ৪।৫টি ভৃত্য আছে। ঠাকুর, সাফার, মালী, ক্লিনার, ঝি, ইত্যাদি।

*　　*　　*

আগেই বলা হয়েছে জমিদার-বাটী 'মধু-নিবাস' প্রাসাদতুল্য। চারতলা। গ্রামের বহু দূর থেকেও লাল রংয়ের জমিদার-বাড়ী পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চারতলার উপরে অবিশ্যি একখানি মাত্রই ঘর: ঠাকুর-ঘর বা গৃহদেবতা লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা-ঘর। ত্রিতলে ও দ্বিতলে আটটি ঘর। অন্যান্য ঘরগুলি মাঝারী গোছের।

বাড়ীর সামনে প্রকাণ্ড দেশী-বিলাতী ফুলের একখানি বাগান। বাগানের মধ্যখানে লাল সুরকী-ঢালা পায়ে-চলার পথ। বাড়ীর পিছন দিকে প্রায় ১০।১১ কাঠা জমির পরে আম-জাম প্রভৃতি ফলের বাগান, বাগানের সীমানা পেরিয়ে নজরে পড়ে সবুজ মাঠ ও চষা জমি।

বাড়ীর দুই দিক দিয়ে দু'টি সিঁড়ি। একটি সিঁড়ি বরাবর চারতলা পর্যন্ত গেছে, অন্যটি তিনতলায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

মোট কথা, চারতলার 'পরে ঠাকুর-ঘরে যাবার একটিই মাত্র সিঁড়ি। কিরীটি খুব ভাল করে ঘুরে ঘুরে দেখলে: চারতলার 'পরে ঠাকুর-ঘরে যাবার ঐ সিঁড়ি ভিন্ন আর কোন উপায়ই নেই। ঐটিই একমাত্র পথ।

ঠাকুর-ঘরে যাওয়ার মধ্যে শিবশংকরের বৃদ্ধা জননী ও পূজারী ব্রাহ্মণ রামকুমার সান্ন্যাল, মাঝে মাঝে শিবশংকর যান বটে তবে গত ৭।৮ দিন ওদিকে মোটে যানইনি। আর কারও পূজা-ঘরে প্রবেশাধিকার নেই। শিবশংকরেরই হুকুম।

৫

কার কণ্ঠস্বর

কিরীটি শিবশংকরের জননীর সংগে কথা বলছিলেন।

শিবশংকরের জননী হরসুন্দরী দেবীর বয়েস ষাটের ঊর্দ্ধে। সুখের শরীরে জরা এখনো তেমন করে বিস্তার লাভ করতে পারেনি বটে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। চোখে পুরু লেন্সের সোনার ফ্রেমে চশমা।

চশমা কি আপনি সর্বদাই ব্যবহার করেন, মা? কিরীটি প্রশ্ন করে।

হাঁ বাবা, বুড়ো হয়েছি। চশমা খুললে কিছুই যে দেখতে পাই না।

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে মা, শেষ কখন আপনি লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তিটি ঠাকুর-ঘরে দেখেছিলেন?

আজ শনিবার, পরশু বৃহস্পতি বার রাত্রি নয়টায় সন্ধ্যারতির

পর ঠাকুর মশাই চলে যান। আর পরও ঘণ্টা-খানেক আমি ঠাকুর-ঘরে ছিলাম।

আপনার ছেলে মিঃ চৌধুরীর কাছেই শুনলাম, ঠাকুর-ঘরে কেউই বড় একটা প্রবেশ করে না, আপনি, ঠাকুর মশাই ও আপনার ছেলে ব্যতীত।

হাঁ বাবা, তার কারণ আমার স্বামী বলতেন দেহ ও মনে শুচি না হ'য়ে দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করলে দেবতা ক্ষুণ্ণ হন। লক্ষ্মী-নারায়ণ আমাদের বাস্তুদেবতা, জাগ্রত ছিলেন। শেষের দিকে শিবশংকরের জননীর কণ্ঠস্বর যেন কান্নায় বুজে আসে।

আমার স্বর্গীয় শ্বশুর বলতেন, লক্ষ্মীনারায়ণ যত দিন এ গৃহে থাকবেন, এ গৃহে কোন অমংগলের ছোঁয়া লাগবে না। শিবুর মুখে শুনেছিলাম বাবা, অনেক লোকের হারান জিনিষ বের করে দিয়েছো। তুমি অসাধ্য সাধন করতে পারো। বলতে বলতে সাশ্রু নয়নে শিবশংকরের জননী কিরীটির হাত দু'টি গভীর আগ্রহে চেপে ধরে বললেন—আমার লক্ষ্মী-নারায়ণকে খুঁজে দাও বাবা। শিবুকে আমি বলেছি, তুমি যত টাকা চাও তাই দেবে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে হারিয়ে অবধি আমার মনের সুখ-শান্তি সব গেছে। রাজার মা আমি পথের ভিখারী হয়ে গেছি। কাল সারাটা রাত আমি শুনেছি আমার হারান গোপাল যেন মা-লক্ষ্মীর হাত ধরে অন্ধকারে আমার ঘরে আবার ফিরে আসবার জন্য পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। দু'দিন তার খাওয়া হয়নি। আমি না খাইয়ে দিলে যে তার খাওয়া হয় না। ক্ষুধায় তার নবঘনশ্যাম রূপ মলিন হয়ে গেছে।···শিবশংকর-জননীর দু'চোখের কোল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল।

কাঁদবেন না মা! আমি কিরীটি আপনাকে বলছি, আপনার লক্ষ্মী-নারায়ণকে নিশ্চয়ই খুঁজে বার করবো।

ভগবান তোমার ভাল করবেন বাবা।

আপনি ঠিক জানেন মা, সে রাত্রে সন্ধ্যারতির পর লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্ত্তি আপনি সিংহাসনের 'পরে দেখেছিলেন?

হাঁ বাবা, আমি পূজার ঘর হ'তে আসবার আগেও দেখেছি লক্ষ্মী-নারায়ণ সিংহাসনের 'পরে আছেন।

পূজার ঘর খালি রেখে আপনি কোথায়ও যাননি?

রাত্রি তখন বোধ করি নয়টা কি সাড়ে নয়টা হবে, আমি পূজার নৈবেদ্যগুলি এক পাশে সরিয়ে রাখছিলাম, এমন সময় কে যেন বাইরে ডাকলে, 'মা' বলে: ভাবলাম হয়ত শিবুই ডাকছে, কেন না ঐ রকম মাঝে মাঝে পূজার সময় আমার কাছে কোন প্রয়োজন হ'লে শিবু পূজা-ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার সংগে কথা বলত। বাইরে এসে দেখি কেউ সেখানে নেই!

শিবশংকর-জননীর কথা শুনতে শুনতে কিরীটির চোখের তারা দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠে। উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ও সোজা হয়ে বলে: তার পর?

ভাবলাম হয় ত আমারই শোনবার ভুল।···

আপনি পরে সে কথা আপনার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

হাঁ বাবা। কিন্তু সে বললে, সে না কি ওই সময় নীচে ছিল।

ঠাকুর-ঘরে যখন তালা-চাবী বন্ধ করে আসেন, ঠাকুর-ঘরে কেউ আর ছিল না?

না বাবা।···

মা, আপনার ঠাকুর-ঘরে একবার আমি গিয়ে দেখতে পারি?

কেন পারবে না বাবা। আজ ত আর মন্দিরে দেবতা নেই। ভয় নেই মা। অন্তত দেহে আমি শুচি হ'য়েই মন্দিরে প্রবেশ করবো।

এখুনি যাবে?

বেশ ত, চলুন না মা। এখুনি একবার ঘুরে দেখে আসি।

চলো।

*　　*　　*

চারতলায় পূজা-ঘরখানি।

ঘরখানি বেশ প্রশস্ত। চকচকে মসৃণ কালো মার্বেল পাথরে বাঁধান মেঝে। ঘরের এক দিকে সুদৃশ্য রৌপ্যনির্মিত চাকচিক্যময় সিংহাসন। সিংহাসনের 'পরে মখমলের গদি। চারি পাশে রেশমী ঝালর ঝুলছে। এখনো সিংহাসনের 'পরে বাসী ফুল ছড়ান: সিংহাসন খালি। ঠাকুর-ঘরের প্রবেশ-দ্বারটি যথেষ্ট মজবুত। ভারী শেগুন কাঠের প্রথম দরজা: দ্বিতীয়টি কাঠের ফ্রেমে মোটা মোটা লোহার শিক বসান। দু'টি তালা, প্রথমটি কাঠের ফ্রেমের 'পরে লোহার শিক বসান দরজায়, দ্বিতীয়টি কাঠের দরজায়। ঘরের দু'দিকের দেওয়ালে দু'টি জানালা। তাতেও মোটা মোটা লোহার মজবুত শিক বসান। কিরীটি ভাল করে জানালা-পথে উঁকি দিয়ে দেখলো: বাইরে হতে জানালার নাগাল পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। কিরীটি ভাল করে জানালার শিকগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

যে জানালাটি বাড়ীর দক্ষিণ দিকে, সেই জানালা-পথে নীচের দিকে তাকালে দেখা যায় বাড়ীর নীচের ফলের বাগান। ঘন সন্নিবেশিত গাছপালা।

কত দিন আগে শেষ ঠাকুর-ঘরের জানালায় রং দেওয়া হয়েছে মা?

প্রতি মাসেই একবার করে রং দেওয়া হয় বাবা।

হুঁ!···

কিরীটি আর একবার জানালার শিকগুলো পরীক্ষা করলে! দক্ষিণ দিকের জানালা হ'তে ঠাকুর-ঘরের সিংহাসন হাত পাঁচেক দূরে হবে মাত্র!

ঠাকুরঘরের এক কোণে ঠিক দরজার ডান পাশে বড় বড় দু'টি মাটীর জালা। কিরীটি মাটীর জালা দু'টোর দিকে অংগুলি নির্দেশ করে প্রশ্ন করলে: ওই জালা দু'টি?

ওতে গংগা-জল রাখা হয় বাবা। অগংগার দেশ, গংগা-জল ত পাওয়া যায় না। তাই মাসে দু'বার করে কলকাতা হতে গংগা-জল আনিয়ে ওতে জমা করে রাখা হয় বাবা।

ঠাকুর-ঘরে ঢুকবার ঠিক মুখেই দরজার পাশে কতকগুলো পুরাতন বড় বড় কাঠের বাক্স স্তূপ করা আছে।

আর একটা কথা মা। আপনি সে রাত্রে 'মা' বলে ডাক শুনবার পর এ-ঘরে এসে আর কতক্ষণ ছিলেন?

তা প্রায় আধ ঘণ্টা হবে।

*　　*　　*　　*

কিরীটি বাগানের মধ্যে ঘুরে ঘুরে এক ঘণ্টা প্রায় কাটিয়ে দিল; তার পর নিজের নির্দিষ্ট ঘরে এসে একটা বই খুলে বসল।

ঘরের বাইরে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। একটু পরেই শিবশংকর ও তার শ্রীনাথ সরকার এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

কিরীটি মুখ তুলে তাকাল।

কিরীটি বাবু, এর সংগে আপনার পরিচয় নেই। আমার ব্যবসার অংশীদার মিলিয়নিয়ার স্যার শ্রীনাথ সরকার।

নমস্কার! হাঁ, ওঁর নাম আমি শুনেছি, স্বনামধন্য ব্যক্তি।

স্যার শ্রীনাথই আপনার কথা আমাকে বলেন, ওঁরই পরামর্শে আপনাকে ডেকেছি।

ও!

আপনার অদ্ভুত কীর্তি-কলাপের কথা অনেক আগেই আমি শুনেছি মিঃ রায়। কেন যেন আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, এ ব্যাপারে একমাত্র আপনিই আমার বন্ধু মিঃ চৌধুরীকে সাহায্য করতে পারেন।

কিরীটি মৃদু মৃদু হাসতে লাগল; তার পর স্মিত ভাবে বললে: ধন্যবাদ!

স্যার শ্রীনাথ বললেন: মিঃ চৌধুরীর কাছেই সব আপনি হয় ত শুনেছেন মিঃ রায়! ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলেন কি?

একেবারে কিছুই যে বুঝতে পারিনি তা বললে সত্যের অপলাপই করা হবে স্যার শ্রীনাথ! সব দেখে-শুনে এইটুকুই শুধু বুঝতে পেরেছি, কেমন করে কী ভাবে ঠাকুর-ঘর হ'তে মূর্তিটি চুরি গেছে।

এ্যাঁ, বুঝতে পেরেছেন? তা হলে এ কথাও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, কে চুরি করেছে?

না। তাই যদি বুঝতে পেরে থাকবো তা হলে এতক্ষণে ত মূর্তিটাকে তার কাছ হতে উদ্ধার করবারও একটা চেষ্টা করতে পারতাম।

আপনি যে চোরকে ধরতে পারবেন সে আশা আমার আছে মিঃ রায়! সেই জন্যই চৌধুরীকে বলেছিলাম আপনার 'পরে তদন্তের ভার দিতে।

যতটুকু সূত্র আমি পেয়েছি তাতে পরিষ্কার বোঝা যায়, চোর শিকারী বিড়ালের মত অত্যন্ত ক্ষিপ্র অথচ লঘুপদসঞ্চারী। এবং সে আগে হতেই খুব ভাল ভাবে জানত মূর্তিটি কোথায় কি ভাবে আছে সব কথা। এ-বাড়ীর অনেক কিছুই তার নখদর্পণে! শুধু তাই নয়, এটাও তার ভাল করেই জানা ছিল যে, কখন, কত রাত্রে ঠাকুর-ঘরের দরজা তালা বন্ধ হয়। ঠাকুর-ঘরে কার কার প্রবেশাধিকার আছে। এবং কখন ঠাকুর-ঘরে গেলে অন্যের অলক্ষ্যে সেখানে প্রবেশ করা সহজ হবে।

শিবশংকর উত্তেজিত হ'য়ে উঠেন: তবে কি আপনি বলতে চান মিঃ রায়, চোর ঠাকুর-ঘরে ঢুকে মূর্তি চুরি করে নিয়ে গেছে?

ঠাকুর-ঘরে ঢুকে মূর্তি চুরি করেছে কি না জানি না, তবে চোর যে চুরির রাত্রে ঠাকুর-ঘরে ঢুকেছিল, কোন কারণে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই।

How is that. এ যে একেবারে absurd; স্যার শ্রীনাথ বলে উঠলেন: চারতলার 'পরে অন্যের অলক্ষ্যে কেমন করে সে পূজা-ঘরে ঢুকতে পারে? এ কি ভোজবাজী!

চোর সেটা একটা মস্ত বড় risk নিয়েছিল তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। কিন্তু আপনারা একটু আগের আমার বলা কথা কয়টা ভুলে যাচ্ছেন। আগেই বলেছি, এ-বাড়ীতে সে অপরিচিত নয়; এ-বাড়ী নিশ্চয়ই তার নখদর্পণে না হলেও খুব ভাল ভাবেই পরিচিত। দ্বিতীয়ত, ঠাকুর-ঘরের সব কিছুই সে জানত এবং ঐ সময় কে বা কারা ঠাকুরঘরে সাধারণতঃ থাকে বা না থাকে তাও তার অজানা ছিল না। সব চাইতে বড় কথা, লোকটা অসাধারণ ক্ষিপ্র ও লঘু-পদসঞ্চারী।

৬

টাইম্ টেবিলের রহস্য

দুই দিন পরে বিকালের ট্রেণে শিবশংকরের ভাগ্নে সত্যেন বাবু কলকাতা হ'তে এলেন। বিশেষ একটা কাজে শিবশংকর দিন চারেক আগে তাকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন।

ঘরের মধ্যে বসে কিরীটি ও শিবশংকর কথাবার্তা বলছিলেন। স্যার শ্রীনাথও ব্যবসা-সংক্রান্ত কথাবার্তা সব ঠিক করে গত কাল বিকালের ট্রেণে কলিকাতায় চলে গেছেন।

কিরীটি বলছিল, আপনি কি কাউকে এই চুরির ব্যাপারে সন্দেহ করেন মিঃ চৌধুরী?

শিবশংকর বললেন: আপনার কথাটা ঠিক আমি বুঝে উঠতে পারলাম না কিরীটি বাবু।

সেদিন ঠিক ঐটাই আপনাকে আমি কথাবার্তার মধ্যে hints দিয়েছিলাম মিঃ চৌধুরী! মানে যে মূর্তিটা চুরি করেছে, এ-বাড়ীর সব কিছুই এমন কি ঠাকুর-ঘরের minutest details পর্য্যন্ত সে জানে। He had a distinct picture in his mind.

শিবশংকর এতক্ষণে ধরতে পারলেন, কিরীটির কথার ধারাটা কোন্ দিকে চলেছে। কিছুক্ষণ তিনি গুম হ'য়ে বসে রইলেন; তার পর মৃদু-গম্ভীর স্বরে বললেন, বুঝতে পেরেছি মিঃ রায় আপনি কি জিজ্ঞাসা করছেন। কিন্তু···

দেখুন মিঃ চৌধুরী, এই ধরণের ব্যাপারে আমি বহু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি, যে দিক দিয়ে আমরা স্বপ্নেও আঘাত আসবার কথা ভাবতে পারি না, সেই দিক হতেই অতর্কিতে আঘাত এসেছে। লোভের মত শত্রু মানুষের আর দ্বিতীয় নেই! লোভের বশবর্ত্তী হয়ে মানুষ হিতাহিত পাপ-পুণ্য ন্যায়-অন্যায় ধর্ম-অধর্ম সব ভুলে যায়।

সে-রাত্রে বাড়ীতে থাকবার মধ্যে ছিলাম আমি, আমার মা, আমার ছোট ছেলে দ্বিজশংকর, আমাদের ম্যানেজার ও সেক্রেটারী শ্রীকণ্ঠ বাবু, সেরেস্তার অমিয় ও জীবন বাবু। চাকর-বাকরেরা। সত্যেন আজ এসেছে, সেও ছিল না।

একটা অনির্দিষ্ট সন্দেহকে মনে মনে পোষণ করে এড়িয়ে যাওয়াটা কোন মতেই বুদ্ধিমানের কাজ নয় মিঃ চৌধুরী! চাকর-বাকরের কথা ছেড়ে দিন, এ ব্যাপারে তাদের আমি এতটুকুও সন্দেহ করি না মিঃ চৌধুরী। কেন না চোর যেই হোক, চুরির ব্যাপারে যে বুদ্ধি ও চাতুর্য্যের পরিচয় সে দিয়েছে, অশিক্ষিত চাকর-বাকরের মাথায় তা খেলতে পারে না। তাদের বাদ দিলে থাকে আপনি স্বয়ং, আপনার মা, ম্যানেজার ও সেক্রেটারী শ্রীকণ্ঠ বাবু, অমিয় ও জীবন বাবু এবং আপনার ছেলে দ্বিজশংকর। এদের মধ্যে আপনাকে, আপনার মাকে ও দ্বিজশংকরকে অনায়াসেই exclude করা যায়, বাকী যারা থাকেন তাদের মধ্যে কাউকে আপনার সন্দেহ হয়? শ্রীকণ্ঠ বাবুকে······?

কথাটা কিরীটি শেষ করলে না; মিঃ চৌধুরীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

শ্রীকণ্ঠ বাবু আজ তিন বৎসর আমার সংগে কাজ করছেন। যেমন কর্মঠ তেমনি বিশ্বাসী। গরীবের ছেলে, উচ্চশিক্ষার প্রবল বাসনা থাকা সত্ত্বেও অর্থের অভাবে বেচারীকে চাকরী নিতে হয়েছে।

র সব কাজই যেন চুলচেরা ও up to the mark. তাকে আমি গ্রাস করি মিঃ রায়। He is beyond all suspecion.

অমিয় ও জীবন বাবু ?

তাঁরা বাইরের বাড়ীতেই থাকেন সর্বদা; কখনো আজ পর্য্যন্ত দরে প্রবেশ করেনি। তাদের পক্ষে বাড়ীর সব কিছু জানা একেবারেই সম্ভব নয়। তা ছাড়া দু'জনেরই আমার মত বয়েস ও বাড়ীতে প্রায় ৩০ বছরের উপর চাকরী করছেন।

এমন সময় সত্যেন এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

মামা ?

কে সতু! এসো! ইটি আমার ভাগ্নে সত্যেন, কিরীট বাবু! আর সতু, ইনি আমার বন্ধু কিরীটি রায়।

উভয়ে উভয়কে নমস্কার ও প্রতি-নমস্কার জানায়।

কিরীটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সত্যেনকে দেখছিল। বয়স ২৫।২৬এর বেশী নয়। দোহারা চেহারা হলেও দেহে বেশ শক্তি রাখে বলেই মনে হয়। এক কালে সত্যেন রীতিমত ব্যায়ামাদি করতেন। প্যারালাল বার, রিং, ট্রাপিজ প্রভৃতিতে বেশ সুদক্ষ ছিলেন।

সন্ধ্যার গাড়ীতেই এলে বুঝি? তোমার না সকালের আটটার গাড়ীতে আসবার কথা ছিল?

হাঁ। সকাল আটটায় যে গাড়ীটা তাতেই আসবো ভেবেছিলাম, কিন্তু আজ সাত দিন হলো সে ট্রেণটা তুলে দিয়েছে, মানে ও গাড়ীটা হাওড়া থেকে রাত্রি দশটায় ছেড়ে এখানে ভোর আটটায় এসে পৌছুতো। তাই সকালের ট্রেণে আসতে হলো।

কিরীটি সত্যেনের কথায় যেন সহসা উদ্গ্রীব হয়ে উঠে!

কিন্তু কাল সকালে আমি ষ্টেশনের দিকে বেড়াতে গেছিলাম দেখলাম ৮টা ১০ মিনিটে একটা ট্রেণ এলো।

ওটা ত direct কলকাতা হ'তে আসে না। ওটা আসানসোল জংশন থেকে রাত্রি তিনটায় ছাড়ে, ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেণ। ওর সংগে কলকাতার কোন ট্রেণের যোগাযোগ নেই।

ও! আপনার কাছে টাইম-টেবিল আছে মিঃ চৌধুরী?

আছে। কেন বলুন ত?

আমার একটু দরকার আছে। কিরীটি মৃদু স্বরে জবাব দেয়।

আমিই গত কাল আসবার সময় একটা নতুন টাইম-টেবিল কিনে এনেছি। এনে দিচ্ছি।

সত্যেন ঘর হতে বেরিয়ে গেলেন টাইম-টেবিল আনতে। রাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত টাইম-টেবিলটা নিয়ে কিরীটি কি সব দেখলে ও কাগজে লিখলে।

পরের দিন খুব ভোরে বাইরের বাড়ীতে যেখানে সফার, দারোয়ান ও অন্যান্য চাকররা থাকে সেই দিকের ঘরে গিয়ে ঢুকল। এবং দুপুরের দিকে বিশেষ জরুরী কাজ আছে বলে দিন দু'য়েকের জন্য সে কলিকাতায় চলে গেল।

৭

মূর্তির পুনরুদ্ধার

কলকাতা হ'তে কিন্তু কিরীটি আর ফিরে এলো না: চতুর্থ দিন সকালে শিবশংকর কিরীটির একখানা 'তার' পেলেন।

'তারে'র বাংলা অনুবাদ করলে এই দাঁড়ায়: আপনার মূর্তিটি যদি উদ্ধার করতে চান, তবে টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্রই কলকাতার রওনা হয়ে আসবেন। আজ বুধবার, শুক্রবারের মধ্যে পৌছান চাই—'কিরীটি'।

শিবশংকরও টেলিখানা পড়ে একেবারে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলেন। যেতে হলে আজই যেতে হয়। ভাববারও আর সময় নেই। যা হোক, আর বিলম্ব না করে সেই দিনই বিকালের গাড়ীতে তিনি কলিকাতায় রওনা হলেন, এবং কিরীটিকে 'তার' করে দিলেন সে সংবাদ দিয়ে।

পরদিন ভোরে ষ্টেশনে কিরীটি স্বয়ং অপেক্ষা করছিল।

ফার্ষ্ট ক্লাস কামরা হতে শিবশংকর নেমেই সামনে প্ল্যাটফরমের 'পরে অত সকালে কিরীটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সবিস্ময়ে বললেন: এই যে মিঃ রায়! তার পর কি ব্যাপার?

আপনার মূর্তিটির সন্ধান মিলেছে মিঃ চৌধুরী।

এ্যাঁ! সত্যি? কোথায়? শিবশংকর উদ্গ্রীব হয়ে উঠেন।

ব্যস্ত হবেন না। সন্ধান যখন করেছি, মূর্তি আমরা ফিরে পাবোই।

কিন্তু সন্ধানই যদি পেয়ে থাকেন তবে দেরী করে আর লাভ কি?

উপায় নেই! আগামী কাল সকাল সাতটা পর্য্যন্ত আমাদের দেরী করতেই হবে।...কাল সকাল আটটার মধ্যেই আপনি আপনার হারান মূর্তি ফিরে পাবেন। শুধু কয়েকটা ঘণ্টা মাত্র।

কিন্তু...

ব্যস্ত হবেন না মিঃ চৌধুরী। কিরীটি রায়ের চোখে সে আর ধুলো দিতে পারবে না। I got him!...He is now completely under my clutches. সে তা জানে না, তাই সে নিশ্চিন্তই আছে এবং কাল আটটা পর্য্যন্ত থাকবেও।

* * * *

সকাল তখন ছয়টা হবে। কলিকাতা সহর সবে ঘুম ভেংগে উঠেছে। রাস্তায় রাস্তায় তখনও হোস পাইপে জল দিচ্ছে। কিরীটির গাড়ীতে করেই, কিরীটি ও শিবশংকর 'আউট্‌ট্রাম' ঘাটে এসে গাড়ী হতে নামল।...

এ কি! এখানে কেন এলেন মিঃ রায়?

কিরীটি মৃদু হেসে বললে: আপনার গৃহ-দেবতা যে বর্মার পথে রওনা হচ্ছেন। ঐ যে 'নবদুর্গা' জাহাজটি দেখছেন জেটিতে, যাত্রীরা উঠছে, ওতেই চেপে দেবতা চলেছেন বর্মায়।

এ্যাঁ বলেন কি?

হাঁ, চলুন আর দেরী নয়।

জল পুলিসের ইনেসপেক্টার শান্তি বাবু জেঠিতে ওদের জন্যই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কিরীটিকে দেখে হাত তুলে শান্তি বাবু নমস্কার জানালেন।

তার পর কি সংবাদ?

এখনো আসেনি। এখানেই অপেক্ষা করবেন না কি?

না; চলুন জাহাজের কেবিনে গিয়ে একেবারে অপেক্ষা করা যাক We must give him a surprise visit! He will be shocked!

বেশ, চলুন।

সকলে জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন জাহাজে।

অসংখ্য যাত্রীর কোলাহলে স্থানটি তখন মুখরিত। কেবিনের মধ্যে তিন জন অপেক্ষা করতে লাগলেন।

জাহাজ ছাড়বে বেলা সাড়ে আটটায়, কেন না, এই সময়েই না কি জোয়ার আসবে।

প্রায় সাড়ে সাতটার সময় হঠাৎ কেবিনের দরজাটি খুলে গেল। এবং কুলির মাথায় একটা হোলডল ও একটা স্যুটকেশ নিয়ে কেবিনে প্রবেশ করলেন স্বয়ং স্যার শ্রীনাথ সরকার।

শিবশংকর হঠাৎ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে উঠে প্রশ্ন করলেন: স্যার শ্রীনাথ!···আপনি?···বাকীটা তার কণ্ঠেই আটকে গেল।

কিরীটিও ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে; মৃদু হেসে সেও বললে: Good morning Sir Sreenath Sirkar!

স্যার শ্রীনাথের মুখখানা সহসা যেন ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেছে। তিনি কোন মতে একটা ঢোক গিলে একবার কিরীটির মুখের দিকে, আবার শিবশংকরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে কি সব বলতে উদ্যত হলেন।

কিরীটি বাধা দিল: স্যার শ্রীনাথ! আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, কেন এত বড় ভুল করলেন, না? কিন্তু পাশার ঘুটি এখন আপনার হাতের বাইরে চলে গেছে। Your game is up!

স্যার শ্রীনাথ ততক্ষণে নিজের হতচকিত ভাবটা অনেকটা সামলে নিয়েছেন, শিবশংকরের দিকে তাকিয়ে বললেন: কিন্তু এ সব কি মিঃ চৌধুরী? এ সবের অর্থ কি?

শিবশংকর কি এর জবাব দেবেন। তিনি নিজেও ব্যাপারটা তখনও কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কেন না, কিরীটি কিছুই তার কাছে ভাঙেনি।

ভেবেছিলেন মূর্তিটি নিয়ে বর্মায় গিয়ে একটা ব্যবস্থা করে আসবেন, স্যার শ্রীনাথ! এবং সেই টাকায় আবার আপনার ভরা-ডুবী ব্যবসাকে টেনে তুলবেন ডাংগায়! কথায় আছে, Man proposes, God disposes! কিন্তু এ ক্ষেত্রে হলো Sir Sreenath proposes, Kiriti disposes! তবে হাঁ, এ কথাটা স্বীকার করবো, শিবশংকর বাবুর সংগে আপনার বন্ধুত্বের যদি সত্যিই কোন কিছু থেকে থাকে, সেটার পরিচয় দিয়েছেন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক, এ ব্যাপারে আমাকে তদন্তে নিযুক্ত করবার জন্য মিঃ চৌধুরীকে পরামর্শ দিয়ে। শিবশংকর বাবু নিশ্চয়ই চিরদিন আপনাকে তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দেবেন। এখন ভালয় ভালয় মূর্তিটি বের করে দিন, তার পর আপনাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়া না দেওয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আপনার বন্ধু শিবশংকর বাবুর বন্ধুত্বের 'পরে, আপনি আপনার কাজ করেছেন, এবারে তাঁর কাজ তিনি করবেন; My duty finishes here.

* * * *

শিবশংকর বললেন ফিরবার পথে: সত্যিই মিঃ রায়, এখন বুঝতে পারছি আপনার কথাটা কত বড় সত্যি! মানুষ লোভে পড়ে কি না করে। না হলে স্যার শ্রীনাথের মত বন্ধু লোক যে এত বড় হীন কাজ একটা করতে পারবেন, এ যেন আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

শান্তি বাবুও সংগেই ছিলেন; তিনি বললেন: ওকে পুলিশের হাতে hand over করে দেওয়াই উচিত ছিল মিঃ চৌধুরী!

না না, ধরা পড়বার লজ্জাই ওর পক্ষে মর্মান্তিক। আমার হারান দেবতা আমি ফিরে পেয়েছি। চলতে চলতে সস্নেহে একবার মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে বললেন: কত বড় অভাবের ও লজ্জার তাড়নায় পড়ে যে স্যার শ্রীনাথের মত এক জন লোককে এ জঘন্য কাজ করতে হয়েছিল সে কেবল এক আমিই জানি!···অত বড় একটা লোককে আর অপমান করতে আমার মন চাইলে না।

কিন্তু দুষ্টের দমন হওয়াই উচিত মিঃ চৌধুরী! শান্তি বাবু বললেন।

মানি সে কথা। কিন্তু স্যার শ্রীনাথকে কিছুতেই আমি সে পর্যায়ে ফেলতে পারলাম না। ধরা পড়বার পর তার মুখের যে চেহারা হয়েছিল, ফাঁসীর আদেশ শোনবার পরও বোধ হয় লোকের সে রকম মুখের চেহারা হয় না।

৮

কিরীটির বিশ্লেষণ

ঐ দিন সন্ধ্যায় শিবশংকরের কলিকাতা ভবনে।···

শিবশংকর ও কিরীটি। ঘরে আর কেউ নেই।

এখনো বুঝে উঠতে পারছি না মিঃ রায়, কেমন করে এ অসাধ্য সাধন আপনি করলেন। শিবশংকর প্রশ্ন করলেন।

কিরীটি বললে: আপনাকে আমি আগেই বলেছিলাম; মূর্তিটা কি ভাবে ঠাকুরঘর হ'তে চুরি গেছে তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম! কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না, কে মূর্তিটা চুরি করতে পারে? একটা ব্যাপারে আমি সুরু হতেই স্থির-সিদ্ধান্তে এসেছিলাম। সেটা: চোর ঐ বাড়ীর সব কিছুর সংগে এমন কি ঠাকুর-ঘরের খুঁটিনাটি ও আদেশ নিয়ম সম্পর্কেও পরিচিত ছিল। এবং সেদিক হ'তে বিচার করতে গেলে বাড়ীর লোকের 'পরেই সর্বপ্রথম সন্দেহ জাগে। কিন্তু ঐ রাত্রে যাঁরা বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের 'মুভমেণ্ট' সম্পর্কে ভাল করে খোঁজ-খবর নিয়ে বুঝেছিলাম, বাড়ীর কেউ নয়। এবং তাই যদি না হয় তবে এমন কোন লোকের হাত এর মধ্যে আছে যিনি বাইরে থেকেও এ-বাড়ীর সব কিছুর সংগে ভাল ভাবেই পরিচিত। এমন লোক কে হ'তে পারে। খুঁজতে গিয়ে দেখলাম, একমাত্র শ্রীনাথ সরকার ছাড়া আর কোন বাইরের লোকই আপনাদের বাড়ীর সংগে বিশেষ করে ঠাকুর-ঘর সম্পর্কে পরিচিত নন। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে তাঁকে সন্দেহ করা একেবারেই অসম্ভব; তাঁর position ও অন্যান্য সব কিছু বিচার করে দেখতে গেলে। স্যার শ্রীনাথও যে আপনাদের বাড়ী সম্পর্কে সব জানতেন তাও আমার জানবার কথা নয়। কিন্তু আপনার মুখে যখন শুনলাম, তিনি আপনার বিশেষ বন্ধু ও ব্যবসার সহকারী এবং তিনিই আপনাকে পরামর্শ দেন আমাকে ডাকতে, তখনই প্রথম তার 'পরে আমার একটু সন্দেহ হয়। তিনি নিজে দোষী বলেই, নিজ হতে initiative নিয়ে আপনাকে আমার কথা জানান, মৌখিক সহানুভূতি ও স্নেহ দেখিয়ে বন্ধুত্বের অভিনয়ে। দোষী জনের এ ধরণের সাইকোলজির অপরাধ-তত্ত্বের নজিরের অভাব নেই। তার পর দ্বিতীয় কারণ ও vital সূত্র আমি পেলাম আপনার ভাগ্নে সত্যেন বাবুর একটি মাত্র কথায়।

কি রকম?

ট্রেণের টাইমিংয়ের অদল-বদলের সংবাদ পেয়ে। আপনাদের

...গে আলোচনায় আমি জেনেছিলাম, স্যার শ্রীনাথ ঐ দিন সকালে ...ড়ে আটটার সময় আপনাদের ওখানে পৌঁছেছিলেন। স্যার শ্রীনাথকে ...েহ করলেও বুঝে উঠতে পারছিলাম না স্যার শ্রীনাথের পক্ষে ঠিক ...গের দিন কলকাতা হতে এসে মূর্তি চুরি করে, আবার নির্দিষ্ট সময় ...লকাতার ট্রেণে ওখানে এসে নামা কি করে সম্ভব? কিন্তু নতুন ...ইম-টেবিল হতেই প্রমাণ হয়, সাত দিন আগে ঐ ট্রেণটি ...ে হয়ে যায় ট্রেণের নতুন টাইমিং অনুসারে, কিন্তু আপনারা ... কথা কেউ জানতেন না বলেই আপনাদের বা ড্রাইভারের কোন ...েহ উপস্থিত হয়নি, কি করে স্যার শ্রীনাথ ঐ সময় কলকাতা হ'তে ...লেন। আপনারা জানতেন না বলেই, আপনাদের সন্দেহ মাত্র হয়নি ... ঐ সময় 'আসানসোলের' ট্রেণেও আসা সম্ভব হ'তে পারে। ...বং ঐ একটি মাত্র চরম ও মারাত্মক ভুলেই স্যার শ্রীনাথের সকল ...তর্কতা ও প্ল্যান মাটি হয়ে গেল। তিনি আমার চোখে ...রা পড়ে গেলেন। ট্রেণের টাইমিংয়ের অদল-বদল জানতে পেরেই ...আমি স্থির-সিদ্ধান্তে আসি। আপনার সোফারকেও প্রশ্ন করে আমি ...ানতে পারি, সকাল সাড়ে আটটার ট্রেণেই স্যার শ্রীনাথ এসেছিলেন। ...র পর আমি কলকাতায় চলে গেলাম স্যার শ্রীনাথের সম্পর্কে ...াল ভাবে খোঁজ-খবর নিতে। স্যার শ্রীনাথের এ্যাটর্নী মিত্র বন্ধুকে ...ুঁজে বের করতে আমার দেরী হয়নি। তাঁর মুখেই শুনলাম, ...ইদানিং বছর খানেক শেয়ার মার্কেটে খেলে স্যার শ্রীনাথের অবস্থা ...ভয়ংকর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, বাজারে প্রভূত দেনা। এবং সেখানে এ ...বাদও পাই, তিনি বর্মায় চলেছেন কি এক বিশেষ কাজে। আমার ...সমস্ত সন্দেহের অবসান হলো: আমি জল বিভাগের পুলিশ শাস্তি ...বাবুকে সব সংবাদ দিয়ে আপনাকে তার করলাম। তার পরের ...ব্যাপার ত' সবই আপনি জানেন।

কিন্তু কি করে তিনি মূর্তিটা চুরি করলেন, সেটা যে এখনও আমার কাছে mistry হয়েই রইলো।

হাঁ, সেই কথাই এবারে বলবো। আপনার ঠাকুর-ঘর দেখতে গিয়ে দু'টো জিনিষ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটা ঠাকুর-ঘরের মধ্যে বড় বড় দু'টি জলের জালা, ও ঠাকুর-ঘরের দরজার বাইরে খালি কাঠের বাক্সগুলি। দ্বিতীয়, ঠাকুর-ঘরের দক্ষিণ দিকের জানালার শিকে একটা দাগ। কোন মোটা কাছি যেন সেই জানালার শিকে জড়ান হয়েছিল। বুঝতে পারলাম, কেউ অন্যের অলক্ষ্যে ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করে একটা মোটা কাছি বা ঐ জাতীয় কিছু জানালা দিয়ে ভিতর হতে বাইরের দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। বাড়ীর সে দিকে নীচে ঘন আম-বাগান। রাত্রের অন্ধকারে কেউ ঐ দড়ি বেয়ে উঠে জানালাপথে কিছু দিয়ে সিংহাসনের উপর হতে মূর্ত্তিটা চুরি অনায়াসেই করতে পারে। এখন কথা হচ্ছে, তাই যদি হয় তবে নিশ্চয়ই কেউ সবার অলক্ষ্যে ঠাকুর-ঘরে দড়ি ঝোলাবার জন্য প্রবেশ করেছিল। কিন্তু সেটা সম্ভব হলো কি করে? তখন আপনার মা'র কথায় সে সন্দেহও আমার টুটে গেল। ঐ দিন রাত্রে আপনার মা ঠাকুরের শয়ন-আরতির পর যখন ঠাকুর-ঘরে অন্য কাজে ব্যস্ত তখন কেউ তাকে 'মা' বলে ডাকে। আপনার মা ভাবেন সে আপনিই, আপনিও সে কথা আপনার মা'র কাছে পরে শুনেছেন। নিঃসন্দেহে আপনার মা ঠাকুর-ঘর হতে বের হয়ে আসেন। আপনার মা'র চোখের দৃষ্টি খুবই ক্ষীণ! তায় আবার রাত্রিটা ছিল অন্ধকার! আপনার মা যখন ঠাকুর-ঘর হতে বের হয়ে আসেন, সেই অবসরে ক্ষিপ্র লঘু পদে চোর ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করে, জানালা-পথে দড়িটা ঝুলিয়ে দিয়ে চটপট জলের জালাগুলোর পাশে লুকিয়ে আত্মগোপন করে। আপনার মা ডাক শুনে বাইরে গিয়ে আবার ভিতরে ফিরে আসতে একটু দেরী হওয়া স্বাভাবিক, কেন না, কাউকে তিনি বাইরে না দেখতে পেয়ে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছিলেন। পরে আবার আপনার মা ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করতেই সে ঠাকুর-ঘর হ'তে সরে পড়ে। একটা কথা সকলেরই মনে হতে পারে, চোর যখন ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করেছিলই তখন ঐ সময়েই মূর্ত্তিটি চুরি না করে এত কারসাজি করতে গেল কেন? আমার মনে হয়, তার explanation দু'টি আছে। প্রথমত, ঐ সময় সে মূর্ত্তি চুরি করলে সব দিক্ দিয়েই সুবিধা হলেও, আপনার মা'র নজরে পড়বার খুব বেশী সম্ভাবনা ছিল, এবং যদি তিনি দেখতেন মূর্তি নেই, তখনই একটা সোর-গোল হওয়া স্বাভাবিক। এই সব সাত-পাঁচ ও পরে নির্বিঘ্নে দড়ি বেয়ে উঠে তালাবন্ধ ঘর হতে মূর্তি চুরি করতে পারলে সহজে বাইরের লোকের 'পরে সন্দেহ পড়তে পারবে না ভেবেই হয় ত চোর ঐ পথ নিয়েছিল; যদিও ঐ ভাবে চুরি করাটা একান্ত risky ছিল। আমার মনে হয়, সন্ধ্যার ট্রেণে স্যার শ্রীনাথ ছদ্মবেশে ওখানে যান এবং পরে মূর্তিটা চুরি করে রাত্রি বারটার ট্রেণে 'আসানসোল' ফিরে যাবার ট্রেণে উঠে বসেন। আসানসোলের আপ ও ডাউন ট্রেণ দু'টি মাঝের একটা ষ্টেশনে রাত্রি পাঁচটায় মিট করে। সেইখানে ট্রেণ বদল করে সাড়ে আটটার ট্রেণে স্যার শ্রীনাথ ওখানে গিয়ে পৌঁছান। উনি যখন আপনার ওখানে যান, মূর্তিটির সংগেই ছিল। ট্রেণের টাইম-টেবিল হতেই সব আমি জানতে পারি। এবং আসানসোল ষ্টেশনের কাছেই Modern Hotelএ খোঁজ নিয়ে জানি, স্যার শ্রীনাথ সে রাত্রে ও-হোটেলেই ছিলেন, হোটেলের খাতায় তিনি আসল নামই লিখিয়েছিলেন, অবশ্য তা না লিখলেও ক্ষতি হতো না কিছু। আপনার বাড়ীর দেওয়ালেও দড়ি বা ঐ জাতীয় কিছু বেয়ে উপরে উঠবার চিহ্ন এখনো আছে দেখবেন।

* * * * *

হরসুন্দরী দেবী তাঁর হারান গৃহদেবতাকে পেয়ে প্রাণ খুলে কিরীটিকে আশীর্বাদ করলেন এবং ছেলেকে দু'হাজার টাকার একটা চেক্ পাঠিয়ে দিতে বললেন।

* * * *

কিরীটি যেদিন ডাকযোগে চেকখানি পেল, সেই দিন দৈনিকে বড় বড় হরফে প্রকাশিত হলো

চলন্ত বোম্বাই মেইল হ'তে লাফিয়ে পড়ে বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও লক্ষপতি স্যার শ্রীনাথ সরকার আত্মহত্যা করেছেন। যদিও মৃত্যুর কারণ রহস্যাবৃত!

স্যার শ্রীনাথের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে হরসুন্দরী দেবী বললেন, আহা! বড় ভাল লোক ছিলেন।

শিবশংকর কারও কাছেই স্যার শ্রীনাথের কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেননি। এবং কিরীটি ও শাস্তি বাবুকেও বারংবার অনুরোধ করেছিলেন ও-কথা কারোও কাছে না প্রকাশ করতে। পাপীর মাথায় এমনি করেই বুঝি অদৃশ্য হাতের শাস্তি নেমে আসে।

মাটি
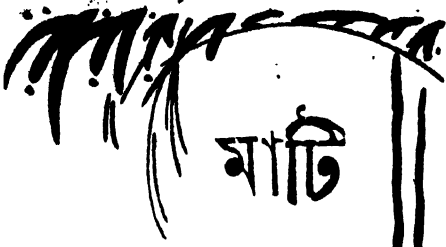
(পূর্বানুবৃত্তি)

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
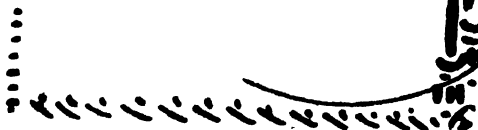
জন দশেক যারা এখানে হাজির আছে, পরস্পরের প্রতি তাদের গভীর বিশ্বাস। বিয়াল্লিশের লড়ায়ে এক সাথে পোড় খেয়ে এ বিশ্বাস জন্মেছে। নির্ভয়ে খোলাখুলি ভাবে তারা ধান লুঠের কথা আলোচনা করে।

মনে হয়, ধরণীর সাতনালির ধানের খামার আজ রাতেই লুঠ করা বুঝি সাব্যস্ত করে ফেলেছে তারা, এখন সমস্যা শুধু ধানটা নিয়ে কি করা যায়। কিন্তু রাজেনের কথা শেষ হয়নি, আরও তার বক্তব্য আছে বোঝা যায়। এবং সে নিজেই আবার ফিরে আসে আলোচনার পর্য্যায়ে, ধান লুঠ করা উচিত হবে কি না এই বিবেচনায়।

—কাজটা হবে কিন্তু মোদের ক'জনায়। দু'-চার জনকে পেতে পারি, গোঁসাই মধু ওদের, তা মোর মধুকে বেশী বিশ্বাস নাই। রাতে লুঠ করলে লোকে বলবে ডাকাতি, সায় দেবে না কাজটাতে। মণি বাবুর তো কথা নাই, গাল-মন্দ করবে নির্ঘাৎ, বলবে কি যে চাষীর ক্ষেতি করলে তোমরা, নিজেদের ক্ষেতি করলে। নিজের ধান যদি মন করলে তো রেতে কেনে চুপি চুপি লুঠতে গেলে চোরের মত?

ভূষণ, তোরাব, শ্রীনাথদের মনে সায় ছিল না লুঠের প্রস্তাবে, রাজেনের কথায় তারা স্বস্তি বোধ করে, অমতটা তাদের নিজেদের কাছেই এবার যুক্তিসহ ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ভূষণ বলে, ও কথা বলতে পারেন মণি বাবু, ন্যায্য কথা। মোদের ধান বলে যে লুঠতে যাব, তা ধান কি মোদের এ ক'জনার?

তোরাব বলে, হাঁ বটে। মোদের ধান বলতি গেলি আসে বটে কথাটা। মোদের যদি তো গাঁয়ের সবার।

গড়পা, কান্দুলি, সাতনালির যারা ধান দেছে ধরণীকে, তাদের বা নয় কিসে? রাজেন বলে যুক্তিটাকে আরও স্পষ্ট করে, আজ রাতারাতি ধান লুঠ করার জন্য তারই প্রস্তাবের বিরোধী যুক্তি।

সাতনালিতে ধরণীর খামার-ভরা ধান আপাতত: নিরাপদ থাকে। জোতদারের অন্যায় আদায়ের ধানে যে আসলে তাদেরই অধিকার, এ চেতনা জন্মাবার সঙ্গে এই ন্যায়বোধও জন্মেছে এদের। ধানগুলি ন্যায্যতঃ ধরণীর বলে মনে করলে লুঠের কথা এরা ভাবতেও পারত না। আবার ধান যখন শুধু তাদের ক'জনের নয়, আরও অনেকের, তখন সেই ধানই বা তারা লুঠতে যায় কি করে সকলকে না জানিয়ে, সকলের অনুমোদন না পেয়ে, যারা অংশীদার?

অবশেষে রাজেন দাস চিন্তিত ভাবে বলে যে, যেখানে তারা যত চাষী বর্গাদার আছে ধরণীর, সবাই মিলে গিয়ে ধরণীকে চেপে ধরলে হয় না ন্যায্য সুদে কর্জ্জ চেয়ে ফসল ঘরে তোলা তক্?

—হয়, তোরাব বলে ক্ষোভে নিশ্বাস ছেড়ে, দেড়ভাগি সুদ মেনে নিলে হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজেন দাসের মস্ত সংসার।

তারা তিন ভাই—রাজেন্দ্র, হরেন্দ্র, বরেন্দ্র। তিন জনেই বিবাহিত, মেজ ভাই হরেনের দু'টি বিয়ে। বড় দু'জনের মরা-হাজা বাদ দিয়ে গণ্ডা দুই ছেলেমেয়ে, ছোট ভাই বরেনের বৌ প্রথমবার পোয়াতি হয়েছে। হরেনের দ্বিতীয় পক্ষের বৌটিও পোয়াতি, ভরা মাস। বছর দুই আগে এক মাস আগে-পরে হরেনের দ্বিতীয় এবং বরেনের প্রথম বিয়ে সম্পন্ন হয়। বরেনের বয়স মোটে একুশ বাইশ, লড়ায়ের দুর্য্যোগ কেটে যাবার আগে তার বিয়ে দেবার সাধ রাজেনের ছিল না। কিন্তু হরেন আবার বিয়ে করায়, অনেক ভেবে-চিন্তে ছোট ভায়েরও বিয়েটা রাজেন দিয়ে দিয়েছে।

বরেনের প্রথম বৌ সুমুখী পড়তি সংসারের দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও সুস্থ সবল দেহে হাসি-মুখে অবিশ্রাম খাটুনি খেটে স্ত্রী ও জননীর, একান্নবর্ত্তী সংসারের ভাগীদারের পরিপূর্ণ জীবন যাপন করে চলেছিল। বিয়াল্লিশের হাঙ্গামায় হন্তে পশুর সঙ্গিন তার দেহ ভেদ করে তাকে চিরতরে পঙ্গু করে দিয়েছে, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। বলাৎকার ঠেকাতে চেয়েছিল এবং সত্য সত্যই ঠেকিয়েছিল অসহায়া নারী, দাঁত ও নখের সাহায্যে, মরণ পণ করে। এই গর্ব্ব যেন বাকী জীবনটার শয্যাশ্রয়ী পঙ্গুতার অভিশাপও কাবু করতে পারেনি সুমুখীকে, অস্ত্র হিসাবে ভগবানের দেওয়া দু'পাটি দাঁতের তুলনা সে আজও খুঁজে পায় না, বলে যে যোগী সেজে হরণ করার সময় সীতা দেবী যদি না কেঁদে চোখ-কাণ বুজে প্রাণপণে কামড়ে ছিঁড়ে নেবার চেষ্টা করতেন রাবণের নাকটা, তেনাকে ফেলে যন্ত্রণায় চেঁচাতে চেঁচাতে পালাবার পথ পেত না রাবণ রাজা।

তার অনুমতি নিয়ে তো বটেই, খানিকটা তার তাগিদেও, হরেন বিয়ে করেছে রামপুরের কার্ত্তিকের মেয়ে বেঙ্কিকে। বড় মধুর ক্ষমাশীল প্রকৃতি সুমুখীর। সতীন আনবার ব্যবস্থা সব ঠিকঠাক হবার পর হঠাৎ কেমন বিগড়ে গিয়ে এধার থেকে গালাগালি করেছে হরেনকে, স্পষ্ট ঘোষণা করেছে যে সতীন এলে যে ভাবে হোক মারবে তাকে, মারবেই। কেঁদেছে, অভিশাপ দিয়েছে অদৃষ্টকে।

হরেন বলেছে, তবে নয় থাক্!

—থাক্! ভেঙিয়ে বলেছে সুমুখী, কত ঠেকে থাকবে! মাঝ থেকে মরণ হবে মোর। মোকে আগে মেরে ড্যাংডেঙিয়ে বৌ আনবে তুমি!

তার সম্বন্ধে দুর্ভাবনা ছিল সকলের। কিন্তু বৌ নিয়ে হরেন ফিরে আসতে দেখা গেল তার এতটুকু রাগ নেই, ঝাঁঝ নেই। আজ পর্য্যন্ত একদিনও আর সে ক্ষেপে যায়নি হিংসায় ওই কয়েকটা দিনের মত। বেঙ্কিকে সে কাছে ডেকে বসায়, তাকে দিয়ে উকুন বাছায়, তেলের অভাবে শুধু জল থাপড়ে চুল বেঁধে দেয়। কোন রাতে শোয়ার আগে হরেন তার বিছানায় বসে তার সঙ্গে দু'দণ্ড কথা কয়

সংসারের, কোন রাত্তে শ্রান্ত দেহে সোজাসুজি ঘরের অপর প্রান্তে চৌকীর বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ে। সুমুখী বলে বেড়িকে, যা যা, শো গে' যা কালামুখী।

ভাইরা রাজেনের অনুগত। লোকটা যে তেজী আর একগুঁয়ে কিন্তু ভাইদের সঙ্গে ব্যবহারে তার কর্তালি নেই, স্বার্থচিন্তা নেই। লেখাপড়া রাজেন এক-রকম জানে না, কলম ভেঙ্গে নামটা সই করতে পারে কোন রকমে কিন্তু তার সাংসারিক জ্ঞান-বুদ্ধি গভীর, পাকা বিবেচনা। শক্ত অহঙ্কারী প্রকৃতির জন্য চলতি হিসাবে দশ জনের কাছে যা সাংসারিক বুদ্ধি মাঝে-মাঝে বড়ই তার অভাব দেখা যায় তার মধ্যে এবং তাই নিয়ে মাঝে-মাঝে বিরক্ত হয় ভাইরা, বিদ্রোহ জাগে তাদের মনে। তবে সে সাময়িক বিরোধী মনোভাব কেটে যায় যথাসময়ে, শ্রদ্ধা ও নির্ভর টিঁকে থাকে। ক্ষমতার কাছে মাথা নত করে না বলে, আপোষে অল্প ক্ষতি স্বীকার করে বড় ক্ষতি এড়ায় না বলে, খোসামোদে যা পাওয়া যায় তা নেয় না বলে, কিছু মিথ্যা আর কিছু ফাঁকিতে যা অনায়াসে বাগানো যেত তা বাগায় না বলে, শেষ পর্য্যন্ত বিরক্তি বা রাগ রাখা যায় না। কারণ, দেখা যায় রাজেনের হিসাবটাই ঠিক। মাথা নত করে, আপোষ করে, খোসামোদে বা ফাঁকিবাজিতে অন্যের হয় তো লাভ হয়, ও-সব নিয়েই যাদের কারবার, চাষীর কোন লাভ নেই! নীচু হয়ে পায়ে তেল মেখে কিছু পায় না চাষী, কেউ পায়নি আজ পর্য্যন্ত, সোনামাটিতে অন্ততঃ একটি দৃষ্টান্ত নেই। চালাকি করে দাঁও মারার মত কিছু নেই চাষীর, শুধু ছ্যাচড়ামি করা হয়, পরের গাছের কাণা বেগুন ছিঁড়ে চোর বনা। নরম হয়ে ক্ষতি ঠেকাতে পারে না চাষী, শক্ত একগুঁয়ে গোঁয়ার হলে বরং লাভই আছে একটু, যখন তখন যা-খুসী অন্যায় করতে সাহস পায় না। দরকার হলে ক্ষতি করে, সেটা করবেই, কিন্তু বলা মাত্র মাচার লাউটা কেটে দেয়নি বলে গোবিন্দের মত রাজেনকে ধরে পিটিয়ে দেবার সাহস ধরণীর নেই। অন্ততঃ ফিরে গিয়ে দু'-চার জন লাঠিয়াল সঙ্গে করে না নিয়ে এসে নয়।

তা'ছাড়া নিজের বা নিজের বৌ-ছেলেমেয়ের স্বার্থে কিছুই করে না রাজেন। আত্মত্যাগের আদর্শ খাড়া রাখার তাগিদে নয়, তার মনপ্রাণ চায় বলেই মিলিত সংসারটি অটুট রাখতে সমগ্র পরিবারের স্বার্থ একাকার হয়ে গেছে তার কাছে। ভাইরা তা বিশ্বাস করে, মাঝে-মাঝে দু'দিনের জন্য ঘটনাচক্রে এ বিশ্বাস চাপা পড়ে গেলেও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আরো জোরালো হয়ে।

সে-বার বরেনের বৌ তিলা পাগল হল বাপের বাড়ী যাবার জন্য। ঠিক যখন রাজেনের বৌ মনার মা'র বাপের বাড়ী যাওয়া স্থির হয়েছে কয়েক দিনের জন্য। তিলার দোষ ছিল না, খবর এসেছে, বাপের না কি তার কঠিন অসুখ। কিন্তু রাজেন এখন তাকে যেতে দিতে রাজী নয়! তিলা কাঁদে, নালিশ জানায় বরেনকে। মনার মা বেড়াতে যেতে পারে বাপের বাড়ী সামান্য উপলক্ষে, আর তার বাপের বাড়ীতে এমন বিপদের সময় সে যেতে পারবে না! গলায় দড়ি দেবে তিলা, পুকুরে ডুবে মরবে।

বরেনও ভাবে, এটা সত্যি অন্যায় হচ্ছে। মনার মা বাপের বাড়ী যাবে বলে সংসারের কাজের জন্য এ অবস্থায় তার বৌকে আটকে রাখা উচিত নয়।

রাজেনকে সে জানায়, যেতে চাইছে যাক না?

রাজেন বলে, 'উঁহুঁক, এখনে যাবা হয় না মা-লক্ষীর। বোশেখ মাসে পৌঁছে দিয়ে এসবো, দু'-এক মাস থাকবেন।

মুখ কালো হয় বরেনের, বলে, বোঠান নয় পরে যেতো ক'দিন। জিদ ধরেছে যাবার তরে, গলায় দড়ি-টড়ি দিলে পরে মুস্কিল।

তখন থুতনি চুলকে একটু ভাবে রাজেন।—তুই যদি বলিস তবে থাক। তবে কথাটা হল কি, উয়ার বাপের হইছে শেতলার কৃপা। জন-মানুষ রইছে ঢের দেখার শুনার, ছোট বোয়ের না গেলে মঙ্গল।

মা শীতলার কৃপা! শুনে বরেন ভড়কে যায়। রামপুর থেকে তিলার বাপের গুরুতর অসুখের খবর পাঠিয়েছিল, কি রোগ তা স্পষ্ট করে তারা জানায়নি! বরেন নিজেই এবার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তিলার বাপের বাড়ী যাওয়ার, ধমক দিয়ে ঠাণ্ডা করে দেয় তার জিদ।

কলহ-বিবাদ আছে মেয়েদের মধ্যে, ঈর্ষা-দ্বেষ-ক্ষুদ্রতা, নিজের নিজের ছেলে-মেয়ের পাতে ঝোল টানার স্বভাব। গরীবের অভাবের সংসারে কোথায় তা নেই? এ-বাড়ীতে পুরুষরা গায়ে মাখে না মেয়েদের ঝগড়া, নালিশ কাণে তোলে না। রাজেনের অনুকরণে বরং ভাই দু'জন, একটু বৌ-পাগলা বরেন পর্য্যন্ত, ন্যায়-অন্যায় বিচার না করতে না বলেই নিজের বৌটিকে সোজাসুজি দোষী ধরে নিয়ে ধমকে দেয়। এটা রাজেনের চিরদিনের নীতি, বাড়ীতে যে কারণেই অশান্তি হোক আর যার দোষেই হোক, তার কাছে সে জন্য দায়ী তার বৌ মনার মা, সমস্ত দোষ তার একার। এতে যুক্তি-তর্ক বিচার-বিবেচনা নেই, বোঝাপড়া নেই, কৈফিয়ৎ নেই। গোড়ার দিকে মনার মা বিনা দোষে দোষী হয়ে রাগত কাঁদত আর নিজের অদৃষ্টকে অভিশাপ দিত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার মনেও কেমন একটা ধারণা জন্মে গেছে যে, ছেলেয় ছেলেয় মারামারি করুক আর সুভদ্রা ও বেড়ি এই দুই সতীনে ঝগড়া বাধুক, তারই অপরাধ। বাড়ীতে কুকুর-বিড়ালের লড়াই পর্য্যন্ত তার মধ্যে একটা অস্বস্তি বোধ জাগিয়ে তোলে।

তবে অন্য বিষয়ে তার মান রেখে চলে রাজেন, তার সঙ্গে পরামর্শ করে সংসারের সমস্যা নিয়ে, তাকে খুসী রাখতে চায়, তার জন্য যে দরদ আছে লোকটার তার ঢের-ঢের প্রমাণ মেলে কষ্টকর জীবন যাপনের দিনে-রাত্রে। কবে সুরু হয়েছিল তাদের একত্র জীবনযাত্রা? মনে করতে পারে না মনার মা। এত বছরের হিসাব কেউ রাখতে পারে! সন্তানের বয়স দিয়ে যে ধারণা করবে তাও তার হবার নয়, বড় ছেলেটার বয়স বুঝি তার বছর বারো, কিন্তু তাতে কি। মনা তো প্রথম সন্তান নয়। বিয়ের চার-পাঁচ বছর পরে মানতের সন্তান এসেছিল, বাঁচেনি। আরেকটা এসেছিল কত দিন পরে? কে জানে, সে ব্যবধান স্রেফ ভুলে গেছে মনার মা। সেটাও বাঁচেনি। আর মানত করেনি মনার মা, তখন সে মনার মা ছিল না, শুধু ছিল বৌ, কদাচিৎ কারো মুখে তার বাপের দেওয়া ভৈরবী নামটা শোনা যেত। গান্ধী মহারাজা তখন ডাক দিয়েছেন খাজনা দিও না পাপী ইংরেজ রাজকে, ভগবানের বিধান হয়েছে স্বরাজ হবে। রাজেন বড় উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। জেলে যাবার আগে বলেছিল এক দিন, দেবতার কাছে আর মানত কোরো না বৌ। দেবতা দেয় দিক, না দেয় না দিক, দিয়ে দিয়ে কেড়ে নিক, যা করবার করুক দেবতা মানত ছাড়াই।

বলেছিল, ছেলে হয়ে বাঁচে না বলে ফের বিয়ে করব? মাইরি না। বলে জেলে গিয়েছিল দু'মাসের জন্য।

আবার দেবতাটার কাছে আর মানত করেনি ভৈরবী। দু'-দু'টো ৷

শোকার্ত্ত বীভৎস ফাঁকিতে তার ভক্তি-শ্রদ্ধা টুটে গিয়েছিল বৈদ্যনাথের ওপর। তবে একেবারে মানত না করে পারেনি। সাতনালির বড় শাসমলদের ছোট্ট মন্দিরের মেয়ে-দেবতার নামে মানত করেছিল—দুটো সন্তান মরে যাওয়ায় কি ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ ভৈরবীর—মানত করেছিল এক দলা মাটি, একশো তেঁতুলবীচি, দশটি কলকে-ফুল আর ছেলে হয়ে যদি বেঁচে-বর্তে থাকে তবে তার পাঁচ বছর বয়সে একটি কচি পাঁঠা। এখন মাটি খাও বীচি খাও ফেলনা ফুল খাও দেবী, পাঁঠা যদি খাবার সাধ থাকে তবে তার কোলে ছেলে দিয়ে পাঁচ বছর বাঁচিয়ে রাখো, পাঁঠা মিলবে! দেবী হও আর যাই হও, ফাঁকি দিলে চলবে না ভৈরবীকে।

হরেন গিয়েছিল রামপুর। তার দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুর কার্ত্তিকের সম্পর্কে একটা রটনা শোনা যাচ্ছিল কুটুম-বন্ধুর মুখে। আজ আনি আজ খাই নইলে উপোস করি অবস্থা চিরদিন কার্ত্তিকের, চাষার ঘরে জন্ম নিয়ে পরের জমিতে লাঙল দিয়ে দিয়ে হয়রাণ হয়ে তার জীবন কেটেছে। সম্প্রতি না কি হঠাৎ পয়সা হয়েছে তার, অবস্থা ফিরেছে। চাষ-বাস ছেড়ে অন্য জীবিকা ধরেছে। সে জীবিকা কি তা স্পষ্ট করে বলতে পারেনি কেউ, তবে সেটা যে ব্যবসা-বাণিজ্য, এ বিষয়ে সকলে এক-মত, জিনিষ কিনে মোটা লাভে জিনিষ বেচার জীবিকা, বড়লোক হয়ে গেছে কাৰ্ত্তিক। ঢেউ-খেলা আসল টিনে সে না কি ছাইয়েছে তার একটা ভাঙ্গা ঘরের চালা। তার বাড়ীর মেয়েরা না কি পালা করে একখানা লাল পাড়ওলা নতুন শাড়ী পরে এসেছে, গিয়েছে পাড়ার ঘরে-ঘরে।

—পাওনাটা নে আসি তবে? হরেন প্রস্তাব করেছিল।

বেউির বিয়েতে একটু বজ্জাতি করেছিল কার্ত্তিক, তিন ভরি রূপা আর টাকা আষ্টেকের বাসন ফাঁকি দিয়েছিল। অবস্থা যদি বদলে থাকে কার্ত্তিক, সেই ক্রুটিটা শুধরে নিক এখন। বড় বিপাকে পড়েছে তারা তিন ভাই, ফসল ঘরে তোলা তক বেঁচে বাঁচিয়ে টিকে থাকার উপায় খুঁজে পাচ্ছে না, কার্ত্তিকের কাছে পাওনাটা আদায় করতে পারলে হয় তো কোন মতে কাটিয়ে দেওয়া যাবে মাসটা। তার পর ফসল ঘরে উঠবে, সোনার ফসল। নির্ভয় নিশ্চিন্ত হবে তারা!

রাজেনের মন সায় দেয়নি।—যাবি? মোর কি রকম খটকা লাগে যে উড়ো খপর বড্ড বেগতর। কিনে বেচতে পয়সা লাগে তো, না কি কারবার চলে মাগনাতে? কুথা তোর শ্বশুর পয়সা পেল যে কারবার করে?

—দেখে তো আসি ব্যাপারটা, খরচা কি?

—হাঁ, তা বটে। সায় দিয়েছিল রাজেন, না খান, কাল ফিরে এসবি বাপু। সরকারী কর্জ্জের তরে কি সব সওয়াল চলছে সদর গিয়ে হাকিমের ঘর ঘেরাও করার, একলাটি রইলে মোর জোর লাগে না মোটে। মাথা ঘুরয়। কাল ফিরে এসবি কিন্তুক নিয্যস।

হরেন ফেরেনি। তিন দিন কেটে গেছে।

এক দিনের জন্ত বেড়াতে গিয়ে শ্বশুরবাড়ীতে তিন দিন কেন দশ দিন কাটিয়ে এলেও বিশেষ কিছু ভাবনা হত না কারো। চিন্তিত মুখে শুধু বলাবলি করত যে ব্যাপার কি, কি হল উয়ার? কিন্তু হরেন গিয়েছে জরুরী কাজে, সমস্ত পরিবারটিকে ফেলে রেখে গেছে শোচনীয় অবস্থায়। গুরুতর কিছু না ঘটলে সে কখনো শ্বশুরবাড়ী গিয়ে পড়ে থাকতে পারে এ সময়? রাজেন বড় দুর্ভাবনায় পড়ে গেছে। যত রকম সম্ভবপর সাধারণ কারণ হতে পারে হরেনের ফিরতে দেরী করার, সব সে মনে-মনে নাড়াচাড়া করে দেখেছে। কিন্তু কোনটাই যুক্ত-সই মনে হয়নি। কার্ত্তিক হয় তো রাজী হয়েছে জামাইএর পুরানো পাওনা মিটিয়ে দিতে, কেবল দিই-দেব করে টালবাহনা করছে এও যে তার খেয়াল হয়নি তা নয়। কিন্তু আসলে কার্ত্তিকের কাছে হরেন কিছু আদায় করতে পারবে এ ভরসাই নেই রাজেনের।

তাই, অবস্থা বিবেচনা করে অঘটন যে ঘটেছে কিছু এ ধারণা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না।

আরও দু'টো দিন গেল। নতুন আশা ভঙ্গের জ্বালা ও ক্ষোভ-ভরা দুটো দিন। তারা দল বেঁধে সদরে গিয়েছিল হাকিমের কাছে ফসল ঘরে তোলা পর্য্যন্ত সাময়িক ব্যবস্থার দাবী জানাতে, শুধু সোণামাটি নয়, আশে-পাশের আরও পাঁচটা গাঁয়ের চাষীরা। এই দাবী জানাতে যাওয়া নিয়ে মতভেদ ছিল। রাজেনেরও সায় ছিল না এতে। গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে শুধু বিরাগ নয়, অদ্ভুত একটা প্রতিপক্ষতার ভাব আছে চাষীদের মধ্যে, বিয়াল্লিশের অত্যাচার, বন্যা ও দুর্ভিক্ষে সেটা আরও তীব্র হয়েছে। রাজেনের মত অনেকের মনে সরকারের কাছে কোন রকম সাহায্য চাওয়া সম্পর্কে নিদারুণ বিতৃষ্ণা আছে, ও বড় অপমানের কথা, তারা নীচু হয়ে যাবে, ছোট হয়ে যাবে! কিন্তু পাওয়া যে যাবে না কিছু সে তো ধরা কথাই। কৃষক-সমিতির পক্ষ থেকে এক সভা ডেকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে জোর-গলায় ন্যায়সঙ্গত দাবী জানানোর মধ্যে লজ্জা বা অপমান নেই, ওটা দয়া ভিক্ষা চাওয়া নয়। চুপচাপ বসে থাকলে তো চলে না, জানান দিতে হয়। সভার শেষেও খুঁতখুঁতানি যায়নি রাজেনের। মনি জানার সঙ্গে অনেকক্ষণ তর্ক করেছিল।

—হাঁকিয়ে দেয় যদি গালমন্দ দিয়ে?

—তোমরা জবাব চাইবে, দেশের লোক জবাব চাইবে, তুমি আছ কি করতে? একটা মাস বাঁচার উপায় জানতে এলে প্রজাদের গালমন্দ দিয়ে খেদিয়ে দিতে নাই বা রইলে তুমি, তোমার সরকার! খাতক খেদিয়ে দেবে ভেবে কি মহাজন তাগিদ দেওয়া বন্ধ রাখে রাজেন? অনেক বকেয়া পাওনা জমেছে তোমাদের, তোমরা এখন মস্ত মহাজন।

এ কথাটা বড় ভাল লেগেছিল রাজেনের, তারা মহাজন। চারি দিকে পাওনা জমে আছে তাদের!

কিছু হল না সদরে গিয়ে। একটা প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গেল না। ক্রুদ্ধ হয়ে যে যার গ্রামে ফিরে গেল। আশাভঙ্গ তাদের আর হতাশার বেদনা দেয় না, বহু কাল থেকে পুরুষানুক্রমে জমতে জমতে হৃদয়-মন জরাট হয়ে জমে শক্ত পাথর হয়ে গেছে হতাশা, নতুন হতাশার আর ঠাঁই হয় না, শুধু সঞ্চিত ক্ষোভটাই নতুন করে নাড়া খায়।

পরদিন হরেনের খোঁজ নিতে রাজেন রামপুর গেল।

সোণামাটি থেকে রামপুরের মেটে পথ, জমি থেকে হাত দেড়েক উঁচু, স্থানে স্থানে সমতল। দু'টি গরুর গাড়ী পাশ কাটানোর মত চওড়া খুব কম জায়গাতেই। যে গাড়ীর বোঝাই কম বা যার বাঁ দিকে

ঢাল কম খাড়াই সেই গাড়ীর মাঠে নেমে অন্ত গাড়ীকে পথ ছেড়ে দেওয়া রেওয়াজ। কদাচিৎ দূর থেকে মোটর গাড়ীর আওয়াজ পেলেই গরুর গাড়ীগুলি চটপট মাঠে নেমে যায়, ডাইনে বাঁয়ে যে দিকে সুবিধা। ছোট-ছোট গ্রাম পড়ে দু'পাশে, কতগুলি ঘর মাটির ঘরের সমাবেশ, কিছু ফল-ফুলের গাছ, লাউ-কুমড়ার মাচা, বাঁশঝাড়, ডোবা বা আধাঁধান ছোট অগভীর কুয়া, চৈত্র-বৈশাখ মাসে কোনটাতে একটু তলানি জল থাকে, কোনটা একেবারে শুকিয়ে যায়। ওর মধ্যে সাঁওতালের গাঁ দেখলেই চেনা যায়। ঘর নেই, সব কুঁড়ে, সাদামাটা কিন্তু তকতকে, মেরামত নেই, জোড়াতালি নেই, জীর্ণতা নেই। যতটুকু ঠাঁই পায় ঘর তুলতে তারও সবটুকু জুড়ে বড় করে ঘর বানাতে পারে না, ছোট নীচু কুঁড়ে বাঁধে। অনেক দিনের পুরানো সাঁওতালী গ্রামও এমন রিক্ত যে দেখে মনে হয় অস্থায়ী বস্তি বুঝি, যে কোন দিন মানুষগুলি চলে যাবে গাঁ ছেড়ে, খাঁ-খাঁ করবে শূন্য পরিত্যক্ত ভিটেগুলি। মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে ও-রকম পরিত্যক্ত সাঁওতাল বস্তি, জমিদার জোতদারের শোষণ আর অত্যাচার সইতে না পেরে দল বেঁধে চলে গেছে। বড় একটি গ্রাম পড়ে মাঝ-পথে, নাম আনিখা, গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে ডাকঘরের সামনে দিয়ে পথটা চলে গেছে। কয়েকটি পাকা-বাড়ীও আছে আনিখায়, হপ্তায় দু'দিন গ্রাম-প্রান্তে হাট বসে। এখানে গুড় তৈরী হয়, কাছের বন থেকে চয়ন করা মহুয়া চালান যায় কলের চাকায় তেল তৈরী হবার জন্য, তাঁতের কাপড়-গামছা তৈরী হয় কিছু। আগে ত্রিশ ঘরের বেশী তাঁতির বাস ছিল, একটু নাম ছিল আনিখার কাপড়-গামছার। যুদ্ধের ক'বছরে দশ-বারো ঘর উৎখাত হয়ে গেছে সুতোর অভাবে, অন্যেরা টিঁকে আছে শোচনীয় অবস্থায়, অনেকের তাঁত পর্য্যন্ত মহাজন দাদনদারের কাছে বাঁধা। পথের ধারে পান-বিড়ি, চিঁড়ে-মুড়ি, দই-মিষ্টির দোকান, গ্রাম্য মুদীখানা, চাল ডাল তেল নুণ জ্বালানি কাঠ থেকে চায়ের প্যাকেট চিরুণী কাঁটা মাথার তেল সব কিছু মেলে। একটি বেঁটে খাটো ওষুধের আলমারি নিয়ে চিরঞ্জীব ডাক্তারের ওষুধের দোকান। কুণ্ডুর দই-মিষ্টির দোকানে গুড়ের চা-ও মেলে, দু'চির বাঁশের বেঞ্চে বসে কোঁচায় খুঁটে গরম কাচের গেলাস ধরে জিরিয়ে জিরিয়ে পান করা যায়।

আধা দামে আধা গেলাস চা-ই খায় রাজেন, শুধু চা। আজ ঠাণ্ডা পড়েছে বেশ, তাড়াতাড়ি শীত এগিয়ে আসছে। অথবা কে জানে, এ বছর খোরাক কম পড়েছে আরো, দেহের শক্তিতে যে কত ভাঁটা পড়েছে সে তো টের পাওয়া যায় স্পষ্টই, এখান পর্য্যন্ত হাঁটতেই কষ্ট বোধ হয়েছে রীতিমত। দেহেই তেজ নেই, শীতের গোড়ার দিকেই তাই ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে বেশী।

রামপুর থেকে আসছিল গুড়ের ব্যাপারী ইনাবালি, রোগা লম্বা চেহারা, দেড় আঙুল নুর, গায়ে আধ ময়লা কোরা মার্কিণের হাতকাটা সার্ট, কাঁধে পুঁটলি-বাঁধা গামছা। মানুষটা সে রসিক প্রকৃতির। বলে, চা মিলবে তো কুণ্ডু? আমি কিন্তু বাবা রোসুলা।

চা বানাতে বানাতে কুণ্ডু বলে, না, মিলবে না। পাকিস্তানে যান।

রাজেনের আলাপ হয় ইনাবালির সঙ্গে। রামপুরের খবর? আর রামপুর, হাঙ্গামা লেগেই আছে রামপুরে। আবার বন্দুকধারী পুলিশ এসে আস্তানা গেড়েছে সেখানে। প্রতাপদীঘি বিলের জেলেরা জালের খাজনা, মাছের আবোয়াব ভাগ আদায়, ওজনে চুরি, কম দর এ সব নিয়ে গোলমাল আরম্ভ করেছে। তার ওপর মদনের চোরাই চালানের চাল আটক করে কণ্ট্রোলের দরে সকলকে বেচে দেওয়া নিয়ে বেধেছে আরেকটা হাঙ্গামা। প্রথমে সমিতির ভলান্টিয়াররা চাল আটক করে, মদনের লোকজন আর থানার পুলিশ এসে তাদের মারতে আরম্ভ করলে ছুটে আসে সবাই, জেলেরা পর্য্যন্ত। সেইখানে সবার সামনে ওজন করে করে নগদ দামে চাল বেচে টাকা দেওয়া হয় মদনের লোককে।

—বিশ পঞ্চাশ জনাকে ধরেছে লুঠের দায়ে।

—লুঠ?

—লুঠ, ইনাবালি যায় ফিরে বলে, মদনের গুদোম থেকে লুঠে নে গেছে চাল। কিসের চালান, কোথা চালান, কেন চালান দেবে মদনা?

তবে বুঝি ওই সব হাঙ্গামাতেই আটকা পড়েছে হরেন। খুন-জখম হয়েছে নয় তো চালান গেছে সদরের জেলখানায়। জেলখানায় যদি গিয়ে থাকে ভাইটা তো যাক্, সে জন্য তেমন ভাবে না রাজেন, খুন-জখম না হয়ে থাকলে হয়। যেচে কি গিয়েছিল হরেন হাঙ্গামায় যোগ দিতে? রামপুরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে রাজেন ভাবে। কেমন যেন ঠাণ্ডা আর নরম হয়ে গিয়েছিল ভাইটা তার সঙ্গিনের আঘাতে ওর বৌটা পঙ্গু হবার পর, রাগে-দুঃখে আগুন হবার বদলে যেন আপশোষে কেমন মন-মরা হয়ে গিয়েছিল। মাঝে-মাঝে মনে হত রাজেনের, তার বাড়াবাড়ি আর গোঁয়ার্তুমিকেই বুঝি ওই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করে সে দুঃখিত হয়ে আছে, তার বেশী বাহাদুরি করতে যাওয়ার ফলেই সুমুখীর এই অবস্থা। বড়ই অস্বস্তি বোধ করেছে রাজেন ভাইএর বিমর্ষ দমে-যাওয়া ভাব দেখে। সোজাসুজি কথাটা তুলে আলোচনা করতে ভরসা পায়নি, মুখ ফুটে নালিশ তো হরেন জানায়নি কখনো। কথায় কথায় হরেনের সামনে সে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে, একটি-দু'টি নয় অনেক দৃষ্টান্ত, একেবারে নিরীহ গোবেচারী নির্দোষ হয়েও যারা রেহাই পায়নি তাদের দৃষ্টান্ত। ঠিক যেন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি হরেন আর, আরেক বার বিয়ে করার পরেও নয়। রক্ত যদি গরম হয়ে থাকে হরেনের অন্যায় অবিচারের সামনে দাঁড়িয়ে, চুপ করে তফাতে সরে না থাকতে পেরে এগিয়ে গিয়ে যদি ধরা পড়ে জেলে গিয়ে থাকে, রাজেন যেন খুসীই হবে তাতে। তবে, খুন-জখম না হয়ে থাকলেই ভালো।

মোগল যুগে স্ত্রী-শিক্ষা

শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী

মোগল সংস্কৃতিতে স্থপতি ও চিত্র-শিল্প যেরূপ প্রাধান্য লাভ করেছে শিক্ষার সম্প্রসারণ বা ব্যবস্থা সেই পরিমাণে নগণ্য। এক দিকে সৌন্দর্য্য-রুচিপিপাসু মোগল বাদশাহেরা যেমন তাজমহল বা রংমহলের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন, অন্য দিকে তেমন নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা তাঁহাদের মানসপটে রেখাপাত করেনি। মোগল যুগে শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান স্বল্প, কারণ বাদশাহী যুগের সমসাময়িক ইতিহাসে ইহার বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায় না। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বহু বৈদেশিক পর্য্যটক ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁদের ভ্রমণকাহিনী ও সমসাময়িক ইতিহাসে মোগলদের শিক্ষা-প্রণালীর কিছু কিছু বিবরণ আমরা পাই।

নারী ও পুরুষ-নির্ব্বিশেষে জ্ঞান সঞ্চয় অবশ্য কর্ত্তব্য ব'লে ইস্‌লাম ধর্ম্মে নির্দ্দেশ আছে। মহম্মদ বলেছেন—"Acquisition of knowledge is incumbent upon the faithful, men as well as women." কিন্তু মোগল যুগে বর্ত্তমান সময়ের মত নির্দ্দিষ্ট ধারাবাহিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে জনসাধারণের শিক্ষা বিস্তার বা ব্যবস্থা ষ্টেট বা সরকারের কর্ত্তব্য বলে বিবেচিত হয়নি! সুতরাং মোগল যুগে শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বতন্ত্র 'বোর্ড' বা 'বিভাগ' না থাকা বিস্ময়কর নয়। বাদশাহেরা রাজ্যের জ্ঞানী মৌলবী, মোল্লা ও ফকিরদের ভূমি, জায়গীর ও বৃত্তিদান করা ইস্‌লাম ধর্ম্মের অংশ ব'লে মনে করতেন। মোগল রাজদরবার সর্ব্বদাই পণ্ডিত, দার্শনিক ও সঙ্গীতজ্ঞ ইত্যাদির জন্য উন্মুক্ত ছিল। বাদশাহেরা তাঁহাদের গুণানুসারে পুরস্কার দানে সম্মানিত করতেন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনায় উন্মুক্ত হৃদয়ে যোগ দিতেন। ফলে, প্রত্যেক বাদশাহের দরবার কৃষ্টি-প্রসারের কেন্দ্রস্থল হ'য়ে উঠেছিল। উপরন্তু, বাদশাহেরা মাদ্রাসা, মক্তব ও মস্‌জিদ নির্ম্মাণের জন্য মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না। বাদশাহী আমলে মস্‌জিদগুলি শিক্ষা-বিস্তার কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করত। মসজিদের ভারপ্রাপ্ত মোল্লারা তৎসংলগ্ন পল্লীর শিশু ও কিশোরদের বর্ণপরিচয় ও কোরাণের উপদেশ শিক্ষা দিত। দিল্লীর হুমায়ুনের সমাধির উপর ছাত্রদের পাঠাভ্যাসের সুবন্দোবস্ত ছিল। এই সকল মক্তব ও মসজিদগুলিতে শুধু প্রাথমিক শিক্ষারই ব্যবস্থা করা হত। আরবী ও পার্শী ভাষায় উচ্চশিক্ষা দিবার যে রীতি ছিল তার প্রমাণও আমরা পাই। মোগল যুগে টাটা, কনৌজ, শিয়ালকোট ও জৌনপুর ইত্যাদি উচ্চশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই সকল স্থানে আরবী-পার্শী অভিজ্ঞ বহু মৌলবী ও মোল্লাদের বসবাস ছিল; জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিরা তাঁহাদের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হতেন। এই কারণে ঐ সব স্থানে বড় বড় মাদ্রাসা ও কলেজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু আমাদের একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, বর্ত্তমান যুগের মত সেই যুগে সর্ব্বসাধারণের হিতের জন্য শিক্ষার প্রসার হয়নি; ইহা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

মোগল যুগে স্ত্রীশিক্ষা একটি বড় সমস্যা ছিল। স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রধান অন্তরায় ছিল আব্রু বা পর্দ্দা। প্রগতিশীল মোগল যুগ পর্দ্দার সংস্কার থেকে নিজকে মুক্ত করতে পারেনি ব'লে নারী সমাজে শিক্ষার প্রসার সম্ভব হয়নি। সেই যুগে মেয়েদের অন্দর-মহলের বাহিরে আসবার অনুমতি ছিল না। তাছাড়া নারী-শিক্ষা অধিকাংশ মুসলমানের কাছে সংস্কার-বিরুদ্ধ ছিল, বরং গোঁড়া মুসলমানেরা ইহাকে সামাজিক পাপ বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু সংস্কারবিরুদ্ধ হলেও মোগল হারেমে ও সম্রান্ত আমীর ওমরাহের ঘরে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না বললে ভুল হবে। জাফর শরিফ প্রণীত "কানুন-ই-ইস্‌লাম" গ্রন্থে মেয়েদের মক্তব ও শিক্ষা-পদ্ধতির বিবরণ আছে। সেই যুগে মেয়েরা খুব বেশী মক্তবে পড়াশুনা করতে অভ্যস্ত ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা নিজ নিজ ঘরে বিদ্যাচর্চ্চা করত। মেয়েদের জন্য সর্ব্বদা মহিলা শিক্ষক নিযুক্ত করা হত। সময় সময় পিতাই কন্যাদের শিক্ষকতার কাজ করতেন। আবার মসজিদের সংশ্লিষ্ট ছোট ছোট মেয়েদের জন্য মক্তবের বন্দোবস্ত ছিল। জাফর শরিফ বলেন যে, যখন কোন ছাত্রী মক্তবে পাঠাভ্যাস আরম্ভ করত তখন প্রচলিত প্রথানুযায়ী শিক্ষক ছাত্রীটিকে উদ্দেশ করে আশীর্ব্বাদসূচক বা "ইদ" উৎসব সম্বন্ধীয় একটি ছড়া বা গাথা লিখতেন। আবার যখন মক্তবের ছাত্রীরা একটা পাঠ শেষ করে নতুন পাঠ আরম্ভ করত, তখন তাহাদের পিতামাতা শিক্ষককে নানা প্রকার উপহারের দ্বারা সম্মানিত করতেন। এই সব মক্তবে বেশীর ভাগ সম্রান্ত বংশের মেয়েরাই শিক্ষাপ্রাপ্ত হ'ত। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মেয়েদের জন্য কোন শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল কি না বলা শক্ত। স্যার যদুনাথ সরকার বলেন যে, নিম্নশ্রেণী সম্প্রদায়ের মেয়েদের জন্য মক্তবেরও বন্দোবস্ত ছিল না, এবং তাহাদের সাধারণতঃ মূর্খ হয়ে থাকা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

যদিও সাধারণ নারী সমাজের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের অভাব পরিলক্ষিত হয় কিন্তু মোগল হারেমে বাদশাজাদী ও শাহজাদীদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বাদশাহেরা বিশেষ অনুরাগী ও যত্নবান ছিলেন। তাহাদের শিক্ষা কোন্ পথে নিয়ন্ত্রিত হত তার পরিচয়ও আমরা পাই।

আকবরের সময়কে ঐতিহাসিকরা "Creative age" বা সৃষ্টিপ্রসূ যুগ বলেছেন। মোগল-শ্রেষ্ঠ আকবরকে মোগল সংস্কৃতির জনক বললে অত্যুক্তি হয় না। নারী-শিক্ষা জাতীয় বা রাষ্ট্র সভ্যতার যে একটি বিশেষ অঙ্গ, আকবর নিজে নিরক্ষর হ'য়েও তাহা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি ফতেপুর সিক্রির বাদশাপুরীর মধ্যে বাদশাজাদী ও শাহজাদীদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য একটি স্বতন্ত্র স্কুল স্থাপন করে-ছিলেন। এই স্কুলের একটি রেখাচিত্র Smith প্রণীত "Architecture at Fatehpur-sikri" গ্রন্থে আছে। মনুচীর "Storia Do Mogor" পুস্তকে আমরা দেখি যে, আওরংজীবের সময় মোগল

হারেমে দু' হাজার থেকে আড়াই হাজার মেয়েমানুষ ছিল। এই সমস্ত মেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার এক জন মহিলা পরিদর্শকের হাতে ন্যস্ত ছিল। মেয়েদের শিক্ষার জন্য এক জন প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে সর্ব্বদাই নিযুক্ত করা হত। বাদশাজাদী ও শাহজাদীরা খুব সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন বলে এক জন সঙ্গীতের ভিন্ন শিক্ষয়িত্রীরও ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষয়িত্রীদের মাসিক ভাতা ৪০০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে ছিল। হারেমের অন্তঃস্থিত মেয়েদের কোরাণ পাঠ, আরবী-পার্শী ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হ'ত। বাদশাজাদীদের কবিতা লিখবার দিকেও খুব ঝোঁক ছিল। হুমায়ুনের ভ্রাতুষ্পুত্রী সালিমা সুলতানা "মাখফি" গুপ্ত নামে পার্শী ভাষায় কবিতা লিখতেন। বেগম মমতাজ ও জাহানারা পার্শী ভাষায় বহু কবিতা লিখেছেন। জাহানারা বেগম তাঁহার কবরের স্মৃতিলিপি (Epitaph) স্বহস্তে রচনা ক'রেছিলেন।

কোরাণ মুখস্থ ও আবৃত্তি হারেমে শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। বেগম জাহানারার শিক্ষয়িত্রী সত্তুন্নিসা বেগম পার্শী ভাষায় খুবই দক্ষতা লাভ করেছিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় কোরাণ পাঠ ও আবৃত্তি করতে পারতেন। আওরংজীবের সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কন্যা জেবুন্নিসা বেগমের পাণ্ডিত্য ও খ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত। তিনি কোরাণের আদ্যোপান্ত আয়ত্ত করেছিলেন এবং মুখস্থ বলতে পারতেন। কথিত আছে যে, কোরাণ মুখস্থের জন্য তিনি পিতার নিকট থেকে ৩০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা উপহার পেয়েছিলেন।

উৎকৃষ্ট পুস্তক সংগ্রহ ও গ্রন্থাগার স্থাপন কাজেও বাদশাজাদীদের পূর্ণ উদ্যম দেখা যায়। বাবরের কন্যা গুলবদন বেগমের পাঠাগারে বহু মূল্যবান গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু বেগম জেবুন্নিসা বেগমের পুস্তক সংগ্রহের সংখ্যা সব চেয়ে অধিক ছিল। তিনি তাঁহার পাঠাগারে নতুন পুস্তক প্রণয়নের জন্য বিদ্বান পণ্ডিতদের সর্ব্বদাই নিয়োগ করতেন। সেই যুগে ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল না, সমস্ত পুস্তকই হাতে লেখা হ'ত।

সময় সময় বাদশাজাদীরা চিত্তবিনোদনের জন্য হাল্কা গল্প, উপন্যাস ও কবিতার বই পড়তেন। মনুচীর বিবরণে আছে যে, শেখ সাদী শিরাজীর "গুলিস্তান" ও "বস্তান" পুস্তকগুলি তাঁহাদের খুব প্রিয় ছিল।

সুতরাং বাদশাজাদীরা যে বিদ্যানুরাগিণী ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। এই সম্বন্ধে আর একটি কথা প্রণিধানের যোগ্য। আমরা পূর্ব্বে দেখেছি যে, ছোট ছোট মেয়েদের জন্য ভিন্ন মক্তবের বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু যুবতী মেয়েরা কখনই মক্তবে পড়াশুনা করত না। এ ছাড়া শিশু ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি বসে বিদ্যা অভ্যাস করার রীতিও ছিল না। যে যুগে মেয়েদের পর্দ্দার অন্তরালে থাকাই নিয়ম ছিল, সেই যুগে দ্বৈতী শিক্ষার (Co-education) প্রশ্নই উঠে না! কিন্তু সমসাময়িক কালে আরব ও পারস্য দেশে পর্দ্দার কঠোর ব্যবস্থা থাকলেও ঐ সব দেশে একই মক্তবে একই মোল্লার অধীনে একসঙ্গে শিশু ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক শিক্ষা দিবার পদ্ধতির প্রচলন ছিল। এই হিসাবে কি আরব ও পারস্য দেশ মোগল-ভারত অপেক্ষা বেশী প্রগতিশীল ছিল? মোগল বাদশাহেরা পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠান সুলতানদের অপেক্ষা নতুন ভাবধারা, চিন্তা ও সংস্কৃতির দ্বারা ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এই নতুন আলোর স্পর্শে যে রাষ্ট্রবিপ্লব হয়েছিল, তাতে পাঠান রাজত্বের সামরিক শাসনের অবসান হয়। কিন্তু নির্ভীক বাদশাহেরা আব্রু বা পর্দ্দার প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে "জিহাদ" ঘোষণা করেননি। তাই স্ত্রীশিক্ষা হারেমের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, বাহিরে বিস্তৃত হ'বার সুযোগ পায়নি। মোগল যুগে আকবরের মত বিরাট সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন রাজনীতিক ও সংস্কারবিরোধী যুগ-প্রবর্ত্তকের জন্ম হয়েছিল সত্য, কিন্তু সংস্কারমুক্ত কামাল আতাতুর্ক বা আমীর আমানুল্লার আবির্ভাব হয়নি।

তিন মূর্ত্তি

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

মঞ্জু আচার্য্য

চশমার প্রকাণ্ড কাচের আড়ালে তাঁর চোখ দু'টো চকচক করে উঠল। স্পষ্টই বুঝতে পারা গেল যে মিঃ নাথান গ্যারিদেব তাঁর আর এক জন বন্ধুকে না পেয়েই ছাড়বেন না।

হোমস বল্ল—"আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি মাত্র। আপনার পড়াশুনার ব্যাঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। যাদের সঙ্গে কারবার করব তাদের সঙ্গে আমি ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হতে চাই। কতগুলো প্রশ্ন আমার করবার আছে। আপনি যে কাগজগুলো পাঠিয়েছেন সেগুলো আমার পকেটে আছে। তার অনেকগুলো ফাঁক আমি আমেরিকান ভদ্রলোকটির কাছ থেকে শুনে পূরণ করেছি। আপনি তো এই সপ্তাহ পর্য্যন্তও তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন, তাই নয়?"

"হ্যাঁ, গত মঙ্গলবারে তিনি প্রথম এখানে আসেন।"

"আমাদের আজকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেছেন আপনাকে?"

"তিনি সোজা এখানেই এসেছিলেন। তিনি খুব রেগে গিয়েছিলেন মনে হ'ল।"

"রাগ হবার কারণ?"

"তাঁর সম্মানে না কি আঘাত লেগেছিল। কিন্তু যখন তিনি ফিরে গেলেন তখন তাঁকে আবার বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল।"

"কি ভাবে কাজ আরম্ভ করবেন সে সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা আছে কি?"

"না।"

"তিনি আপনার কাছ থেকে কোন টাকা চেয়েছিলেন কি?"

"না, কখনও নয়।"

"টেলিফোনে আমরা দেখা করবার যে সময় ঠিক করেছিলাম তা কি আপনি ঐ ভদ্রলোকটিকে বলেছেন?"

"হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম।"

হোমস গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইল। সে যেন একটা ধাঁধায় পড়েছে বলে মনে হ'ল।

"আপনার সংগ্রহগুলোর মধ্যে কোন মূল্যবান কিছু আছে কি?"

"না, আমি অর্থবান নই। মূল্যবান জিনিষ আমার সংগ্রহে কি করে থাকবে?"

"আপনার চোর-ডাকাতের ভয় নেই?"

"মোটেই না।"

"এ বাড়ীতে আপনি কত দিন আছেন?"

"প্রায় পাঁচ বছর।"

হোমসের জেরায় বাধা পড়ল। সদর দরজায় সজোরে ঘা পড়তে লাগল। আমাদের মক্কেল যেই দরজা খুলেছেন অমনি আমেরিকান ভদ্রলোকটি উত্তেজিত ভাবে ঘরে ঢুকলেন।

"এই যে আপনি এসেছেন।" তিনি একখানা কাগজ নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে উঠলেন—"আমি জানতাম আমি ঠিক সময়েই পৌঁছব। মিঃ নাথান গ্যারিদেব, আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজ আপনি এক জন ধনী লোক। আমাদের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। মিঃ হোমস্, আপনাকে আমরা অনর্থক কষ্ট দিলাম।"

তিনি কাগজখানা আমাদের মক্কেলের হাতে দিলেন।

আমি আর হোমস্ তাঁর কাঁধের উপর ঝুঁকে দেখতে লাগলাম। কাগজে বড় বড় হরফে একটা বিজ্ঞাপন—

হাওয়ার্ড গ্যারিদেব
চাষ-বাসের যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম বিক্রেতা
কূপ তৈয়ারীর কণ্ট্রাক্ট নেওয়া হয়।
গ্রসাভার বিল্ডিংস, এস্টন।"

আমাদের মক্কেলটি হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন—"আশ্চর্য্য! এই তো আমাদের আর এক জন গ্যারিদেব।"

আমেরিকানটি বলতে লাগলেন—"বার্মিংহামে আমি খোঁজ করতে আরম্ভ করি। আমাদের এক জন লোক সেখানকার স্থানীয় কাগজ থেকে এই বিজ্ঞাপনটি পাঠিয়ে দেয়। আমাদের এখন চটপট সব ব্যবস্থা করা দরকার। আমি ঐ লোকটিকে লিখে দিয়েছি যে আপনি তাঁর সঙ্গে চারটের সময় তাঁর আপিসে দেখা করবেন।"

"আপনি চান যে আমি তার সঙ্গে দেখা করি?"

"আপনি কি বলেন মিঃ হোমস্? তাই কি উচিত হবে না? আমি এক জন আমেরিকান—ঘরে ঘরে বেড়াই। আমার অদ্ভুত গল্প হয়ত সে বিশ্বাস করবে না। আর উনি হচ্ছেন লণ্ডনবাসী—যাঁর নাম সকলেই জানে। ওঁর কথা সে সহজেই বিশ্বাস করবে। যদি আপনি চান আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি কিন্তু কাল আমি খুব ব্যস্ত থাকবো। তবে যদি কোন অসুবিধায় পড়েন তাহলে নিশ্চয় যাবো।"

"বেশ। কিন্তু অনেক দিন আমি এ ভাবে কোথাও যাইনি।"

"আপনার কোন চিন্তা নেই মিঃ গ্যারিদেব। আপনি বারটার সময় রওনা হবেন আর সেখানে প্রায় দু'টোর পরেই পৌঁছবেন। আবার সেই রাত্রিতেই ফিরে আসতে পারবেন। আপনি শুধু সেই লোকটির সঙ্গে দেখা করে তাকে সব ব্যাপার বুঝিয়ে বলবেন।"

হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে আমেরিকানটি জোর-গলায় বলতে লাগলেন—"সেই আমেরিকা থেকে আমি এত দূর আসতে পারলাম আর একটা সামান্য ব্যাপার জানাতে কয়েক শ' মাইল পথ আপনি যেতে পারেন না?"

হোমস্ বলল—"আপনি ঠিকই বলছেন।"

মিঃ নাথান গ্যারিদেব অসহিষ্ণু ভাবে ঘাড়টা একটু নাড়লেন। —"বেশ, আপনি অত করে যখন বলছেন আমি যাবো। আপনি যে আশার কথা বলেছেন তাতে আমি আপনার কথা না শুনে পারিনে।"

হোমস্ বলল—"তাহলে তো সব ঠিকই হ'ল। আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারেন আমাকে সব জানাবেন।"

"হাঁ নিশ্চয়ই"—আমেরিকানটি বললেন। তার পর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন—"এখন আমাকে উঠতে হয়। মিঃ নাথান, কাল আমি আপনার সঙ্গে বার্মিংহাম যাবার আগে দেখা করব। মিঃ হোমস্, আপনিও যাবেন না কি? আচ্ছা তাহলে 'বদায়।"

আমি লক্ষ্য করলাম, আমেরিকানটি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হোমসের গম্ভীর মুখ ক্রমশঃ প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল। আগের সেই দ্বিধা-গ্রস্ত ভাব আর রইল না। সে বলল—"মিঃ গ্যারিদেব, আপনার সংগ্রহগুলো একবার যদি দেখতে পারতাম? আমার যে ব্যবসা তাতে অনেক রকম বিদ্যার দরকার হয় আর কাজেও আসে। আপনার এই ঘরখানি তো রকমারী বিদ্যায় ঠাসা।"

আমাদের মক্কেলটি খুব খুসী হলেন! প্রকাণ্ড চশমার আড়ালে তাঁর চোখ দু'টো চক-চক করে উঠল। তিনি বললেন—"আমি শুনেছি, আপনি খুব বুদ্ধিমান লোক। আপনার যদি সময় থাকে আমি নিশ্চয়ই আপনাকে সব দেখাবো।"

"দুর্ভাগ্যক্রমে আমার এখন মোটেই সময় নেই। আপনার সংগ্রহগুলো এমন সুন্দর ভাবে ভাগ করে সাজানো আছে আর প্রত্যেকটির গায়ে তাদের নাম লেখা আছে যে, আপনার নিজের কিছু না বুঝিয়ে দিলেও চলে। যদি কাল আমার সময় হয় আমি দেখতে আসব।"

"আপনি যখন খুসি আসতে পারেন। ঘরটি হয়ত বন্ধ থাকতে পারে, কিন্তু চারটে পর্য্যন্ত মিসেস স্যাণ্ডার্স থাকে, সে চাবী দিয়ে ঘর খুলে দেবে।"

"আচ্ছা, কাল বিকেলে আমি ফ্রী থাকবো। আর একটা কথা, আপনার বাড়ীর দালাল কে?"

আমাদের মক্কেলটি হঠাৎ এই প্রশ্নে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তার পর বললেন—"এজওয়ার রোডের হলোওয়ে এণ্ড ষ্টীল, কিন্তু কেন?"

হোমস্ হাসতে হাসতে বলল—"বাড়ীর ব্যাপার হলেই আমি একটু পুরাতত্ত্ববিদ্ হয়ে পড়ি। এই বাড়ীটা কোন্ আমলের তাই ভাবছি।"

"সত্যি? এটা আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল। যাক, তাহলে তো জানতেই পারলাম। আচ্ছা, মিঃ গ্যারিদেব, এখন উঠি, বিদায়। আপনার বার্মিংহাম যাত্রা সফল হোক।"

বাড়ীর দালালের অফিসটা কাছেই। কিন্তু সেদিন সেটা বন্ধ ছিল। সুতরাং আমরা বেকার ষ্ট্রীটেই ফিরে এলাম। খাবারের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হোমস্ এ সম্বন্ধে আর একটি কথাও বলল না। খাবার পর হোমস প্রথম মুখ খুললো—"আমাদের সমস্যাটার সমাধান প্রায় হয়ে এসেছে। তুমিও বোধ হয় এর সমাধান করেই ফেলেছ।"

"আমি এর মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারিনি।"

মাথা বোঝা খুবই সহজ—মুণ্ডুটা কালকে দেখা যাবে। তুমি কি বিজ্ঞাপনটির মধ্যে অদ্ভুত কিছু লক্ষ্য করোনি?"

"লাঙল কথাটির বানান ভুল আছে দেখেছি।"

"ও! তুমি তা লক্ষ্য করেছ! ওয়াটসন, তোমার অনেক উন্নতি হ'য়েছে। ইংরিজিতে এটা বানান ভুল, কিন্তু আমেরিকানদের ভাষায় ঐটেই ঠিক। ছাপাখানায় গ্যারিদেবের বিজ্ঞাপনটা যেমন পেয়েছে তেমনি ছেপেছে। তার পর আর একটা শব্দও আমেরিকান।

আর ঐ কুয়ার বর্ণনাটির সঙ্গে পরিচয় আমাদের চাইতে ওদেরই বেশি। এটা হচ্ছে একটা এ্যামেরিকান বিজ্ঞাপন কিন্তু লোকটি বোঝাতে চায় যে ওটা ইংরেজদের ফার্ম থেকে দেওয়া হ'য়েছে! এর থেকে তোমার কী মনে হয়?"

"আমার মনে হয়, এ্যামেরিকান ভদ্রলোকটি নিজেই এটা দিয়েছে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য কি, তা আমি বুঝতে পারছি না।"

"এর আরও ব্যাখ্যা করা যায়। ঐ লোকটি যে ক'রেই হ'ক ঐ বুড়ো লোকটিকে বার্মিংহামে নিয়ে যেতে চায়—এটা বেশ বুঝতে পারা যায়। আমি তাকে বলতে যাচ্ছিলাম যে তার যাওয়াটা অনর্থক হ'চ্ছে কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, তাকে যেতে দেওয়াই ভাল। কাল—কালকেই দেখা যাবে কী হয়।"

হোমস্ সেদিন ভোরে উঠে বেরিয়ে গেল, যখন সে খাবার সময় ফিরে এল, তখন দেখলাম তার মুখের ভাব খুবই গম্ভীর। সে বললো—"ওয়াটসন, আমি যা ভেবেছিলাম ব্যাপারটা তার চাইতে আরও গুরুতর। তোমাকে এটা বলা ভাল, যদিও আমি জানি যে যত বিপদই হ'ক না কেন তুমি এতে মাথা দেবেই। আমি আমার বন্ধু ওয়াটসনকে চিনি তো! কিন্তু বন্ধু, বিপদ সত্যিই আছে এবং তোমার সেটা জানা উচিত।"

"হোমস্! বিপদের মধ্যে দু'জনের যাওয়া ত এই প্রথম নয় এবং আশা করি এটাতেই শেষ হবে না।"

"আমরা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপারের সম্মুখীন হচ্ছি। মিষ্টার জন গ্যারিদেব বলে যাকে আমরা জানি, সে হ'চ্ছে খুনী ইভান্স—খুনী হিসাবে যার খুব খ্যাতি আছে।"

"আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।"

"দাগী চোর-ডাকাতের নামের লিষ্ট মাথার মধ্যে ব'য়ে নিয়ে বেড়ানো তোমার ব্যবসার অঙ্গ নয়। শোন, আমি আমার বন্ধু লেসট্রেডের সঙ্গে দেখা করতে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়েছিলাম। তাদের যদিও কল্পনা-শক্তির অভাব তবুও তারা একটা নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে চলে। আমার মনে হ'চ্ছিল যে, আমার ঐ এ্যামেরিকান বন্ধুটির নিশানা ওদের কাগজপত্র খুঁজলে পেতে পারব। সত্যিই তাই। রজার্স পোর্ট্রেট-গ্যালারিতে ঢুকতেই দেখতে পেলাম আমাদের বন্ধুটির হাসিমুখ। তার নীচে লেখা রয়েছে—"জেম্‌স উইটার ওরফে মোরক্রফ্ট ওরফে হত্যাকারী ইভান্স—" বলতে বলতে হোমস্ তার পকেট থেকে একটা লেফাপা বার করল—"আমি কতকগুলো বিবরণ নোট করে এনেছি। চুয়াল্লিশ বছর বয়েস—শিকাগোয় বাড়ী যুক্তরাষ্ট্রে তিন জন লোককে গুলী করে মেরেছে। কোন প্রকারে মুক্তি পেয়ে ১৮৯৩ সনে লণ্ডনে আসে। ১৮৯৫ সনের জানুয়ারী মাসে ওয়াটারলু রোডে একটা আড্ডায় তাস খেলতে খেলতে ঝগড়া সুরু হওয়ায় একটা লোককে গুলী করে। লোকটি মারা যায় আর ইভান্স দোষী সাব্যস্ত হয়। মৃত লোকটি শিকাগোর এক জন প্রসিদ্ধ জালিয়াৎ বলে জানা যায়। হত্যাকারী ইভানস্ ১৯০১ সনে ছাড়া পায়। সেই থেকে সে পুলিশের নজরবন্দী হয়ে আছে, আর যে পর্যান্ত জানা গিয়েছে সে আর কোন অপরাধ করেনি। লোকটি বড় সাংঘাতিক, সর্ব্বদা সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে বেড়ায় আর যে-কোন মুহূর্ত্তে সেটা ব্যবহার করতে প্রস্তুত। ওয়াটসন, এই পাখীটিকেই আমাদের ধরতে হ'বে।

"কিন্তু এখানে তার উদ্দেশ্য কি?"

"শোন বলছি। বাড়ীর দালালের কাছে আমি গিয়েছিলাম। আমাদের মক্কেলটি পাঁচ বছর ধ'রেই ও-বাড়ীতে বাস করছেন। তার আগে ও-বাড়ী এক বছর ভাড়া দেওয়া হয়নি। আগে ও-বাড়ীতে যে ভাড়াটে ছিলেন তাঁর নাম ওয়ালড্রন। ওয়ালড্রনের চেহারা আপিসের প্রায় সকলেরই মনে আছে। হঠাৎ এক দিন তিনি অদৃশ্য হলেন আর তাঁর কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। লোকটি ছিলেন দীর্ঘাকার, মুখে দাড়ি আর রং ময়লা। এখন প্রেসকট্ বলে লোকটি—যাকে ইভান্স গুলী করে মারে তার বর্ণনাতেও পাই যে সে দীর্ঘাকার, মুখে দাড়ি আছে আর রং কালো। এখন স্বভাবতঃই মেনে নেওয়া চলতে পারে যে এ্যামেরিকান জালিয়াৎ প্রেসকট্ই আমাদের নিরীহ বন্ধুটি যে ঘরে তার মিউজিয়াম বানিয়েছেন সেই ঘরে থাকতো। এইটেই আমাদের সন্ধানের সূত্র—তাই নয় কি?"

"তার পরের সূত্রটি কি?"

"সেটা আমরা গিয়ে বুঝতে পারবো।"

হোমস্ তার ড্রয়ার থেকে রিভলভারটি বের করে আমার হাতে দিয়ে আবার বলল—"আমার প্রিয় সঙ্গী আমার সঙ্গে আছে। যদি আমাদের হিংস্র বন্ধুটি তার নামের উপযুক্ত কাজ করতে চেষ্টা করে আমরাও তার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবো। ওয়াটসন, তোমাকে এক ঘণ্টা সময় দিলাম বিশ্রামের জন্য তার পর আমাদের রায়ডার ষ্ট্রীট অভিযান সুরু হবে।"

ঠিক চারটের সময় আমরা নাথান গ্যারিদেবের অদ্ভুত ঘরটিতে হাজির হলাম। মিসেস সাণ্ডারস তখন চলে যাচ্ছিল কিন্তু আমাদের ঢুকতে দিতে আপত্তি করল না। হোমস্ জিনিষপত্র সব ঠিক থাকবে বলে তাকে আশ্বস্ত করল। মিসেস সাণ্ডারস বেরিয়ে যেতেই আমরা সম্পূর্ণ একলা হলাম। হোমস্ বাড়ীটি ভালো করে পর্য্যবেক্ষণ করতে

রমা। (দিল্লী)

লাগল। দেয়ালের কাছ থেকে একটু দূরে অন্ধকার কোণে একটা আলমারী বসানো আছে। শেষ পর্য্যন্ত এর আড়ালেই আমরা লুকোলাম। হোমস্ চুপি-চুপি তখন তার মতলব আমাকে বলতে লাগলো—"এই ঘরটি থেকে মিঃ নাথানকে সরানোই তার উদ্দেশ্য।—এটা বোঝা খুবই সহজ। তিনি কখনও বাইরে যান না, তাঁকে বের করবার জন্য অনেক ফন্দী করতে হয়েছে। গ্যারিদেবের সব ব্যাপারটাই ঐ উদ্দেশ্যে বানানো। আমি বলছি ওয়াটসন, এর মধ্যে সাংঘাতিক কিছু আছে। আমাদের মক্কেলটির নামও তাকে আশাতীত সুযোগ দিয়েছে। অত্যন্ত ধূর্ত্ততার সঙ্গে লোকটি তার ফন্দী খাড়া করেছে।"

"কিন্তু লোকটি চায় কি?"

"সেইটে জানবার জন্যই তো আমরা এখানে এসেছি। আমাদের মক্কেলটির সঙ্গে এ ব্যাপারের কোন সম্বন্ধ নেই বলেই আমার মনে হয়। সে যে লোকটিকে খুন করেছে তাকে নিয়েই এই ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছে। নিহত লোকটি বোধ হয় তার সব কুকর্ম্মের সঙ্গী ছিল। এই ঘরেই কোন গোপন অপরাধ ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, আমাদের মক্কেলটির সংগ্রহের মধ্যে এমন কোন দামী জিনিষ আছে যা তিনি জানেন না, অথচ বদমায়েস লোকের নজর পড়বার পক্ষে তা যথেষ্ট। কিন্তু যখনই জানলাম যে রজার প্রেসকট্ এই ঘরের বাসিন্দা ছিল, তখনই বুঝলাম যে আরো গভীরতর রহস্য এর ভেতরে আছে। কিন্তু ওয়াটসন, এখন আমরা ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করব—দেখবো কি হয়।"

আমাদের খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। দরজা খোলার শব্দ হতেই আমরা অন্ধকারে আত্মগোপন করলাম। দরজার চাবীর জোর একটা শব্দ হল। এ্যামেরিকান ভদ্রলোকটি ভেতরে এলো। সন্তর্পণে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সে ঘরের মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো। এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে যখন দেখলো সব ঠিক আছে তখন ওভারকোটটা খুলে বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবে মাঝখানবার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলো। টেবিলটা একটা ধাক্কা দিয়ে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে যে কার্পেটটির উপর সেটা ছিল সেখানকার খানিকটা জায়গা ছিঁড়ে সেটা মুড়ে ফেলল। তার পর পকেট থেকে সিঁদকাঠি বার করে খুব জোরে মেঝে খুঁড়তে আরম্ভ করল। একটু পরেই আমরা মেঝের খানিকটা খুলে আসবার শব্দ শুনতে পেলাম, পর-মুহূর্ত্তে কাঠের একটা সিঁড়ি দেখা গেল। আমাদের ইভান্স্ দেশলাই জ্বালিয়ে একটা মোমবাতি ধরালো, তার পর আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এইবারে আমাদের সময় এল। হোমস্ আমার কব্জিটা চেপে ধরে ইসারা করল। আমরা দু'জনে খোলা সুড়ঙ্গ-পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম। যথেষ্ট সাবধান হওয়া সত্ত্বেও পুরোনো মেঝের উপর চলতে গিয়ে একটু শব্দ হয়ে গেল। এ্যামেরিকানটির মাথা আবার সুড়ঙ্গ-পথে দেখা দিল। সে খুব উদ্বিগ্ন ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল তার পর হঠাৎ বেরিয়ে এল। আমরা একেবারে তার মুখোমুখি পড়ে গেলাম। রাগে তার চোখ দু'টো জ্বলে উঠতেই পর-পর দু'টো রিভলভার তার দিকে উঁচানো দেখে সে যেন নিবে গেল। শান্ত গলায় সে বলল—"বেশ, বেশ। মিঃ হোমস্, আমি জানতাম যে একা আপনিই আমার পক্ষে যথেষ্ট। প্রথম থেকেই আপনি আমার মতলব বুঝতে পেরে আমাকে নিয়ে খেলাচ্ছিলেন। বেশ, আমি এটা আপনার হাতেই দিয়ে দিচ্ছি—আপনি আমাকে হারিয়ে দিয়েছেন—"

মুহূর্ত্ত মধ্যে সে তার জামার ভেতর থেকে পিস্তল বার করে পর-পর দু'টো গুলী ছুড়লো। আমি আমার পায়ে তপ্ত লোহার ছ্যাঁকার মত উত্তাপ অনুভব করলাম। সঙ্গে সঙ্গে হোমস্ লোকটির মাথা লক্ষ্য করে গুলী ছুড়ল। আমার আবছা মনে পড়ছে আমি যেন তাকে রক্তাক্ত শরীরে মেঝেয় পড়ে যেতে দেখলাম—হোম্স্ তার অস্ত্র কেড়ে নিল। তার পর দু'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে একটা চেয়ারের দিকে নিয়ে গেল।

"তোমার লাগেনি তো ওয়াটসন? বল, বল, লাগেনি তো তোমার?"

আমার বন্ধুর শান্ত উদাসীনতার আড়ালে কত গভীর প্রীতি ও অনুরক্তি লুকানো আছে তার এই ব্যাকুলতাই আমাকে তা জানিয়ে দিল।

"আমার কিছুই লাগেনি হোমস্। একটুখানি শুধু ছড়ে গিয়েছে।"

হোমস্ আমার পা-জামাটা খানিকটা ছিঁড়ে ফেলল। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে সে বলল—"ঠিকই বলেছ ওয়াটসন, খুব বেশি লাগেনি।"

তার পর আমাদের বন্দীর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—"তোমার পক্ষেও এটা ভালো হয়েছে। ওয়াটসনকে যদি তুমি মেরে ফেলতে তবে আর এ-ঘর থেকে প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারতে না। এখন তোমার পক্ষ থেকে কি বলবার আছে বল।"

লোকটির কিছুই বলবার ছিল না। সে কেবল শুয়ে-শুয়ে গজরাতে লাগল। আমি হোমসের হাতে ভর দিয়ে ছোট্ট সুড়ঙ্গের ভেতরটা দেখতে লাগলাম। ইভান্স যে মোমবাতিটি জ্বালিয়েছিল সেটা

রমা—(দিল্লী)

"ব্যাণ্ডেল্"

লোকনাথ ভট্টাচার্য

Beat! beat! drums!—blow! bugles! blow!
Through the windows—through the doors—
burst like a ruthless force.

—Whitman.

এখন কত রাত?—বল্‌তে পারো, আর কত রাত?
আর-যে সয় না এই কালোর করাত
এই বাদুড়ের ছুড়-ছুড় আর পেঁচার হুতুমথুম
এই ভূতের বিলাস এই শ্মশানের ধূম!

*　　*　　*

এসো এই জানালায়
খড়খড়ি দিয়ে যতটুকু দেখা যায়,
দেখো চেয়ে—
আছে ছেয়ে
কী-প্রকাণ্ড বোবা বিভীষিকা,
ঝড়ের আসন্ন লিখা
নিথর মেঘের গায়;
এখানেতে হাওয়া নেই,
মায়া নেই কান্না নেই,
আছে শুধু বিস্তর দুস্তর ছায়া;
(অনেক আগুনে কিন্তু পোড়ে পৃথিবীর বুক,
হায় রে বেহায়া,
মরি মরি—পৃথিবীর জানা আছে কত ভান!)
ওপরেতে চেয়ে দেখো—
ব্যয়কুণ্ঠ আকাশের তারা-নির্বাণ

আমাদেরো ছোট ঘরে নিরন্ধ্র আঁধার,
আমরা সবাই এক নিরলস নির্বিকার।
আর কত রাত, বন্ধু, আর কত রাত?—
আর-যে সয় না এই কালোর করাত!
আমাদের চুপি-চুপি নির্বোধ ফিসফাস
বন্ধ দেয়ালে লেগে করে হাসফাঁস;
আর কত রাত?

*　　*　　*

ওরা কি আসবে না
ওরা কি আসবে না
সকালের যাত্রীরা আসবে না?
ওদের পথের ধুলোয় হঠাৎ বিষম লেগে
নিশ্চুপ পৃথিবীটা কাশবে না?
আর কত দেরী
কোথায় সে-ক্ষণ,
কখন শুনব হঠাৎ
তোমার-আমার এই আগল-দেয়াল-ত্রাস
ওদের পায়ের ভেরী ছুম্‌ছুমাছুম্‌,
অনিদ্র নয়নে বন্ধু, আর কত রাত
কত বাদুড়ের ছুড়ছুড় আর পেঁচার হুতুমথুম?

তখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। দেখলাম, একটা ছোট টেবিলের উপর বেশ গুছিয়ে সাজানো রয়েছে একটা মরচে-পড়া কিসের যন্ত্র, মস্ত বড় জড়ানো একটা কাগজের বাণ্ডিল, কয়েকটি শিশি, আরো কতকগুলো ছোট-ছোট বাণ্ডিল।

হোমস্ বলল—"ছাপানোর যন্ত্র, জালিয়াতের ঠিক উপযুক্তই।"

"ঠিক বলেছেন মশাই"—বলতে বলতে আমাদের বন্দী দাঁড়াতে চেষ্টা করল কিন্তু পা টলে একটা চেয়ারে বসে পড়ল—"আমিই লণ্ডন সহরের সব চেয়ে বড় জালিয়াৎ। ঐ যন্ত্রটা প্রেসকটের। আর ঐ যে বাণ্ডিলগুলো দেখছেন টেবিলের উপর, ওগুলো সব একশ' পাউণ্ডের দু'হাজার নোট। ওগুলো এত সুন্দর ভাবে জাল করা হয়েছে যে, যে-কোনো জায়গায় চালানো যেতে পারে।"

হোমস্ হাসল—"মিঃ ইভান্‌স, আমি ও-ভাবে কাজ করি না। এ-দেশে আর তোমার ছাড়া পাবার কোন উপায়ই নেই। তুমিই এই প্রেসকটকে খুন করেছ—তাই না?"

"হ্যাঁ, সে জন্য পাঁচ বছর জেল খেটেছি—যদিও এতে তার দোষই বেশি ছিল। আমিই একমাত্র লোক—যে জানত, প্রেসকট্ কোথায় কি ভাবে নোট জাল করে। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে কেউই তাকে চেনে না। আমি যদি তাকে শেষ করে না দিতাম তাহলে জাল টাকায় লণ্ডন সহর ছেয়ে যেত। প্রেসকট্ যেখানে থাকত সে জায়গাটা দখল করবার জন্য আমার আগ্রহ দেখে কি আপনি অবাক হয়েছেন?

ভাবুন দেখি, যখন আমি দেখলাম নাথান গ্যারিদেব বলে লোকটি ঠিক সেই জায়গায় তার স্থায়ী আড্ডা নিয়েছে—আর কখনও বাইরে যায় না—তখন আমার মনের ভাব কি রকম হ'তে পারে? তাকে সরাবার জন্যই আমাকে এত সব মতলব আঁটতে হল। অবিশ্যি তাকে একেবারে শেষ করে দিলেই হ'ত। কিন্তু সে দিক দিয়ে আমি একটু দুর্বল। যদি কেউ নিরস্ত্র থাকে তাকে মারতে আমার হাত ওঠে না। কিন্তু মিঃ হোমস্, বলুন তো এখানে আমার অপরাধ কি? আমি তো এখনও জিনিষগুলো ব্যবহার করিনি—বুড়োটিকে আঘাত পর্য্যন্ত করিনি। তবে কেন আমাকে বন্দী করা হল?"

হোমস্ বলল—"হত্যা করবার চেষ্টাও একটি অপরাধ। যাক, সেটা দেখা আমাদের কাজ নয়, সে যাদের কাজ তারাই এসে করবে। এখন তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হচ্ছে। ওয়াটসন, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে একটা ফোন করে দাও।"

খুনী ইভান্‌সের কল্পিত গ্যারিদেবের এই হচ্ছে বিচিত্র কাহিনী। পরে আমরা শুনলাম, আমাদের বুড়ো মক্কেলটি নৈরাশ্যের ধাক্কা সামলাতে পারেননি। ৫০ হাজার পাউণ্ডের স্বপ্ন শূন্যে মিলিয়ে যাওয়ায় তিনি একেবারে বসে পড়লেন। পরে ব্রিকস্টনের একটা নার্সিং হোমে তাঁর শেষ অন্তিম নিশ্বাস শূন্যে মিলিয়ে গেল। যাই হোক, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড এত বড় একটা জালিয়াতীর সুরাহা হওয়ায় ইভান্‌সের কাছে কৃতজ্ঞই হ'ল বলতে হবে।

দেশের কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

"বাঙ্গলা সরকার বরাবরই জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা প্রচুর চাউল সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং দেশে খাদ্যাভাব ঘটিবার আশঙ্কা করিবার হেতু নাই। বর্ত্তমানে পূর্ব্ব-বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই চাউলের মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার হেতু কি তাহা সরকারী কর্ত্তৃপক্ষই বলিতে পারেন। সরবরাহ-সচিব মিঃ গফরাণ যাহা বলিয়াছেন তাহাতে এই দেশের অধিবাসীদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির অভাবই সূচিত হইয়াছে। কতকগুলি লোককে না খাইয়াই মরিতে হইবে ইহাই যদি ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে সরকারী সরবরাহ বিভাগের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।······সরবরাহ বিভাগের জন্য যে কয়েক কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে, তাহা কি দেশের লোক খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার জন্যই?" 'পাঞ্চজন্য' সম্পাদকের এ-প্রশ্ন অবান্তর। বাঙ্গলার কয়েক লক্ষ লোক খাদ্যাভাবে অনাহারে মরিলেও—বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলীর স্বগোত্র কয়েক লক্ষ লোক সিভিল সাপ্লাই বিভাগের কল্যাণে বহু বৎসরের জন্য আরাম-বিলাসের ব্যবস্থা করিয়া লইবে। ইহা ছাড়া বাঙ্গলার বর্ত্তমান লীগ সরকারের, অন্যান্য নানা কারণেও, "সরকারী সরবরাহ বিভাগের" অত্যন্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। হঠাৎ এই বিভাগ বন্ধ করিলে চলিবে কেন?

*　　*　　*　　*　　*

'ত্রিস্রোতা'ও একই সুন্দর কথা বলিয়াছেন :

"দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে এই কথাই মনে হয় যে যুদ্ধকালীন অবস্থায় কণ্ট্রোলের কৃপায় যে সকল বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল তাহা উঠাইয়া দেওয়াই এখন নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল বিধি-ব্যবস্থা চালু রাখিবার জন্য দেশবাসীকে যে মূল্য দিতে হইয়াছে এবং যে মূল্য দিতে হইতেছে তাহা আমাদের মত গরীব দেশের পক্ষে সাধ্যাতীত বলা যাইতে পারে।······নানা প্রকার বিধি-ব্যবস্থা স্বাভাবিক অবস্থাকে যেরূপ অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছে তাহাতে মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রায় এগুলি যে কিরূপ ভয়াবহ তাহা ভুক্তভোগীরাই উপলব্ধি করেন। লাইসেন্স, হিসাব-নিকাশ প্রভৃতির ত্রুটি-বিচ্যুতিতে সাধারণ অজ্ঞ লোককে যে কিরূপ নাজেহাল হইতে হয় তাহার উদাহরণের অভাব নাই।" কিন্তু 'ত্রিস্রোতা'র কথা মত এই সকল ব্যবস্থা হঠাৎ এক দিনেই বন্ধ করিয়া দিলে—লীগ পোষ্যপুত্রগুলির গতি কি হইবে? আমাদের মত গরীব দেশের পক্ষে বর্ত্তমানে অনেক কিছুই করিতে এবং সহিতে হইতেছে, যাহা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। আশার কথা, আর অল্পকাল পরেই হয়ত এই সকল আর সহ্য করিতে হইবে না। 'আবুহোসেনী' রাজত্ব বোধ হয় দিন গুণিতে আরম্ভ করিয়াছে।

*　　*　　*　　*　　*

চট্টগ্রামের একমাত্র দৈনিক পত্রের মতে :

"সরকারী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা যে দেশের জনসাধারণের মঙ্গল করিতে সক্ষম নহে, তাহা নানা ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। এখন এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা তুলিয়া দিলেই জনসাধারণের পক্ষে অধিকতর সুবিধা হইবে বলিয়াই অনেকের ধারণা। সরিষার তৈলের নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহৃত হওয়ায় সরিষার তৈল সরবরাহে সুবিধা হইয়াছে। কখন সরকারী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা বাতিল হইবে তজ্জন্যই জনসাধারণ উদ্বিগ্ন আছে।" জনসাধারণের পক্ষে মঙ্গলকর না হইলেও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপকদের পক্ষে যথেষ্ট কল্যাণকর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যে দিন ইহার অন্যথা হইবে, ঠিক সেই দিনেই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা উঠিয়া যাইবে, তাহার পূর্ব্বে নয়! কাজেই জনসাধারণ এখন অনাবশ্যক উদ্বিগ্ন না হইয়া "কিউ"এ স্থান সংগ্রহের চেষ্টা করিলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবেন।

*

ডাক্তার মফিজ উদ্দীন আহমদ এবং তস্য ভ্রাতা মৌলবী নফিজ উদ্দীন আহমদ সাহেবদ্বয়ের সম্পাদিত 'বগুড়ার কথা'র আফশোস :—

"গভর্ণমেণ্ট কন্‌ট্রোল ব্যবস্থা চালু রাখিয়া দেশের আপামর সাধারণের সর্ব্বনাশ করিতেছেন এবং একপাল কর্ম্মচারী নিযুক্ত রাখিয়া নিজেদের দলীয় স্বার্থ রক্ষা করিতেছেন। খাদ্যদ্রব্যের অভাব, বস্ত্রের অভাব, জ্বালানী দ্রব্যের অভাব, দেশলাইয়ের অভাব, ঔষধ-পত্রের অভাব দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। দেশ হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদায় লইয়াছে, গুণ্ডামী দমন হইতেছে না! প্রকাশ্যে গুণ্ডারা লুঠপাট করিতেছে, আগুন লাগাইতেছে, নিরীহ লোকেরা খুন হইতেছে, কোন প্রতিকার হইতেছে না। আজকার শাসনকার্য্যে লোকের দুরবস্থা চরমে উঠিয়াছে। সমাজের (কোন্ সমাজের?) উপরের কয় জন নিরুদ্বেগ এই সর্ব্বনাশা অবস্থায় অর্থ সঞ্চয় করিয়া স্ফীতোদর (?) হইতেছে। লোকজনকে অভাবে রাখিয়া এবং তাহাদিগকে অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য তাহাদের মনে সাম্প্রদায়িক বিষ ঢুকাইয়া আজ সমাজের (কোন্ সমাজের?) কয়েক জন বুদ্ধিমান্, ক্ষমতাশালী লোক নিজেদের স্বার্থ-সাধন করিতেছে। ইহাদের অপসারণ করিতে না পারিলে দেশের মঙ্গল নাই।·········কয়লা আসিতেছে না। জ্বালানী দ্রব্যের অভাবে লোকেরা যে কি কষ্ট পাইতেছে তাহা বলা যায় না। সরবরাহ বিভাগ এ-বিষয়ে কিছুই সাহায্য করে না। দেশলাই একটি দুই আনার কমে পাওয়া যায় না (কলিকাতার লোক ভাগ্যবান, তাহারা মাত্র চারি পয়সায় একটি দেশলাই মাঝে মাঝে পাইয়া থাকে)। যুদ্ধের সময় লোকে এত কষ্টে ও এত অব্যবস্থার

মধ্যে পড়ে নাই। আজ বর্ত্তমানের জনপ্রিয় মন্ত্রি-মণ্ডলীর শাসনে দেশের দুরবস্থা চরমে উঠিয়াছে। লোকের পেটে ভাত নাই, চাউল সিদ্ধ করিবার পথ নাই, উনান ধরাইবার দেশলাই নাই, পরনে কাপড় নাই, ঘরের চালে ও বেড়ায় টিন দিবায় উপায় নাই, রোগীর ঔষধ ও পথ্য পাইবার ব্যবস্থা নাই, আইন নাই, শৃঙ্খলা নাই—আছে শুধু লুঠপাট, গুণ্ডার হাতে ছোরা ও আগুন। এই অবস্থায় মধ্যে সাধারণ শান্তিপ্রিয় গৃহস্থ কত দিন বাঁচিতে পারে?" লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীর সুশাসন সম্বন্ধে এমন চমৎকায় প্রশংসা-পত্র কোন হিন্দু-পত্রিকা দিলে তাহার প্রতিবাদ লীগ-মহল হইতে অবশ্যই হইত। কিন্তু দুই জন মুসলমান ভদ্রলোক সম্পাদিত পত্রিকায় এই কঠোর সমালোচনার জবাব কি? অধিক মন্তব্যের স্থান নাই, প্রয়োজনও নাই।

* * * * * *

এক জন মুসলীম ডাক্তার এবং তস্য ভ্রাতা এক জন মুসলীম উকীল সম্পাদিত 'বগুড়ার কথা' বাঙ্গলার লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীর সর্ব্বপ্রকারে শ্রাদ্ধ করিয়াও কিন্তু 'পাকিস্তান' প্রশ্নের বেলায় 'সব শেয়ালের এক রা' প্রবাদ-বাক্যটির সার্থকতা প্রমাণ করিয়াছেন। 'বগুড়ার কথা' পাকিস্তান কেন চাই—শিরোনামায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলিতেছেন :—

"ভারতের মুসলমান-প্রধান ও মুসলমান-শাসিত অঞ্চলগুলিতে ইসলাম-অনুমোদিত রাষ্ট্রগঠন করিবার সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে এবং এই সময়ে যদি ঐ সকল অঞ্চলে স্বতন্ত্র সার্ব্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রগঠন করা না যায় তবে অখণ্ড ভারতে ও ভারতীয় ইউনিয়নে হিন্দুর পাশবিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপে মুসলমানের পৃথক্ সত্তা, সংহতি, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি বিপন্ন হইয়া পড়িবে। এই মতবাদ মুসলমান সমাজের ছোট বড়, শিক্ষিত (কয় জন) অশিক্ষিত প্রায় সকলকেই প্রভাবান্বিত করিয়াছে।······পাকিস্তানে কি ধরণের গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে-গবর্ণমেণ্টে দেশের মেরুদণ্ড কৃষক ও শ্রমিকের প্রভাব কতখানি পড়িবে তাহা লইয়া কেহ প্রশ্ন করে না (করিলেও জবাব দেওয়া হয় না), শুধু এইটুকু বুঝিয়া সকলে আনন্দিত যে পাকিস্তানে মুসলমান-রাজ (কোন্ প্রদেশের মুসলমান?) কায়েম হইবে। মিঃ জিন্নার নিকট হইতে মুসলমানেরা এইটুকু বুঝিয়াছে যে, "United India can only mean rules of one nation over another. United India means three votes for Hindus and one vote for Muslims.········ a divided India will be able to create stable and secure Governments for both Hindus and Muslims in Hindusthan and Pakistan········মুসলমানের মন মিঃ জিন্নার মতবাদে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, এই psychological factorকে তুচ্ছ করিয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতে গেলে বিরোধ ও সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী।····· মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধ বরাবর আছে। অনুকূল আবহাওয়া ও মুসলীম লীগের বিরামহীন প্রচারের ফলে তাহাদের সুপ্ত মনোভাব আজ জাগিয়া উঠিয়াছে।···সুতরাং ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে মুসলীম-প্রধান অঞ্চলগুলিতে মোসলেম-রাজ (রাষ্ট্র নহে) প্রতিষ্ঠিত করিবার অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এই স্বীকৃতির মধ্যে রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার গৌরব রহিয়াছে।" যেমন গৌরব রহিয়াছে মিঃ জিন্নার মতবাদকে বিনা বিচারে চোখ-কান বন্ধ করিয়া গ্রহণ করার মধ্যে। কিন্তু 'বগুড়ার কথা' তাঁহারই যুক্তিতে বঙ্গ-বিভাগ বোধ হয় সমর্থন করিতে সাহস পাইবেন না, কিংবা সাহস পাইলেও করিবেন না।

* * * * * *

মিঃ জিন্না বলিয়াছেন, অতএব 'সবার উপর পাকিস্তান সত্য' ইহা পরম যুক্তিবলে প্রমাণ করিয়া 'বগুড়ার কথা' আবার বাঙ্গলার বর্ত্তমান পাকিস্তানী শাসনের বাস্তব পরিচয় দিতেছেন। "গত বৎসরে এই সময় বগুড়া সহরে সিদ্ধ চাউল ৮৲ টাকা মণ (কাঁচি) দরে পাওয়া যাইত এবং আতপ চাউলের দাম ছিল ১০৲ টাকা। এবারে সিদ্ধ চাউল ১২৲ টাকা ও আতপ চাউল ১৪৲ টাকা মণ দরে সংগ্রহ করা যাইতেছে না। চাউলের দাম শতকরা কি পরিমাণে বাড়িয়াছে তাহা কর্ত্তৃপক্ষ সহজেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি এ-বিষয়ে আছে বলিয়া মনে হইতেছে না। চাউলের যে পরিস্থিতি দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অবস্থার আশঙ্কা-জনক পরিণতি ঘটিবে বলিয়া সন্দেহ হইতেছে। বে-আইনী ভাবে এ-জেলা হইতে আজও চাউল রপ্তানী হইতেছে এবং আমরা সংবাদ পাইয়াছি, আগুনিয়ারটাইর ও মোকামতলা হাটে বর্ত্তমানে চাউলের বে-আইনী কারবার খুব জোরের সহিত চলিতেছে।" 'বগুড়ার কথা'র যুগ্ম সম্পাদক যদি বগুড়ার বাহিরে একবার কোন প্রকারে আসিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের চারি চক্ষুতে বাঙ্গলার সর্ব্বত্র নানা প্রকার বে-আইনী কারবার ধরা পড়িবে। এমন কি, বাঙ্গলার আইন-সভাতে আইনের নামে কত প্রকার "বে-আইনী" আইন পাশ হইতেছে, তাহা দেখিয়া তাঁহাদের পাকিস্তানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তি বৃদ্ধি পাইবে। এবং সম্পাদকপ্রবর-দ্বয় তাঁহাদের 'বগুড়ার কথা'য় পাকিস্তান সমর্থন করিয়া আর একটি মূল্যবান্ প্রবন্ধ লিখিবার মাল-মসলাও অধিকতর পরিমাণে পাইবেন।

* * * * * *

'বগুড়ার কথা'য় জানিতে পারি "বাঙ্গলার ফুড কমিশনার মিঃ এস, এন, রায় সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, ঘাটতি অঞ্চলগুলিতে চাউলের অভাব হয় নাই, দাম বেশী দিলেই পাওয়া যায়।·········ধান চাউল যখন বাঙ্গলার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে না তখন কৃষকেরা এক দিন না এক দিন চাউল বাজারে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবে এবং গভর্ণমেণ্ট আশা করেন, আগামী দুই-তিন মাসের মধ্যেই ঘাটতি অঞ্চলে চাউলের মূল্য হ্রাস করিয়া আনিতে পারিবেন। মিঃ রায়ের কথাগুলির অনুরূপ কথা ১১৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের বৎসরে মিঃ আমেরি হইতে আরম্ভ করিয়া তৎকালীন খাদ্য-সচিব মিঃ ছোহরাওয়ার্দ্দী শুনাইয়াছিলেন। সে বৎসর সরকার দাম কমান দূরের কথা, লক্ষ লক্ষ লোকের অনাহারে মৃত্যু ঠেকাইতে পারেন নাই।·········বাঙ্গলার সর্ব্বত্র চাউলের দাম হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে, ইহা অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। তাই আমরা সময় থাকিতে সরকারকে অবহিত হইতে বলিতেছি·····" সরকার এ-বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত হইবার সময়

পাইতেছেন কৈ ? বাঙ্গলায় পাকিস্তানী রাজত্ব কায়েম করিবার পূর্ব্বেই পরিকল্পনা বানচাল হইতে বসিয়াছে। রহিম রাজ্যের মহামান্ত মন্ত্রিমণ্ডলীর সামান্ত চাউল এবং কয়েক লক্ষ লোকের জীবন-মরণের কথা চিন্তা করিবার প্রয়োজন হয় না। ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর ব্যাপার লইয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর দিন কাটিতেছে !

* * * * * *

'বীরভূম-বাণী' পাঠে বর্ত্তমান বাঙ্গলার সেই একই অভাব এবং দুঃখের কথাই জানা যায়। আশার কোন আলো দেখা যায় না। 'বীরভূম-বাণী' বলেন : "সমর্থিত সংবাদে প্রকাশ যে ময়মনসিংহে চাউলের দাম ১৬৲ হইতে ২৫৲, বাখরগঞ্জে ২০৲—২২৲, ঢাকায় ২২৲—২৫৲, ফরিদপুরে ২০৲—২৩৲, ত্রিপুরায় ২২৲—২৫৲, নোয়াখালিতে ২১৲—২৫৲, পাবনায় ২২৷০ টাকা।" বাঙ্গলার চাউলের মূল্যের এক দিকের অবস্থা এই। আর অন্য দিকে কেবল মাত্র বিক্রয়ের অভাবে—"বর্দ্ধমানে ৫৷৶০ বলিয়া প্রকাশ। বর্দ্ধমানে গভর্ণমেণ্ট এজেণ্ট চাউল-ধান কেনা গভর্ণমেণ্টের আদেশে বন্ধ করিয়াছেন, এবং গভর্ণমেণ্ট সরাসরি খরিদ না করায় এই দুরবস্থা। বীরভূমেও মিলের সকল তৈয়ারী মাল (চাউল) সময় মত গভর্ণমেণ্ট লইতে পারিতেছেন না এবং মূল্য পাইতে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। কেবল মাত্র নিয়ন্ত্রণের ফলেই বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার চাউলের মূল্যের এইরূপ বৈষম্য রহিয়াছে।"

* * * * *

'বীরভূম-বাণী' আরো বলিতেছেন : "সরিষার তৈলের নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দেওয়ার ফলে দশ দিনের মধ্যে চোরাবাজারে ১০০৲ মণ দর ৭৪৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। চাউলের বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার মধ্যে যাতায়াতের নিয়ন্ত্রণ ও মূল্য-নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলে বোধ হয় পূর্ব্ববঙ্গের জেলাগুলিকে অত্যধিক মূল্যে চাউল কিনিতে হয় না—এবং পশ্চিম-বঙ্গের জেলাগুলিও তাহাদের ফসলের উপযুক্ত মূল্য পায়—এবং নিয়ন্ত্রণের চাপে পড়িয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।" কিন্তু সরিষার তৈলের সহিত চাউলের তুলনা করিলে চলিবে কেন ? সরিষার তৈলের নিয়ন্ত্রণ বাঙ্গলা সরকার তুলিয়া দিলেন—দ্রব্য তাঁহাদের নাগালের বাহিরে থাকায়, এবং ঐ দ্রব্যের চালান বন্ধ হওয়ায় লাভের কোন আশা না থাকায়। কিন্তু চাউলের কথা স্বতন্ত্র। যে-চাউল বাঙ্গলা সরকার এমন কড়া ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, তাহা একান্ত ভাবে বাঙ্গলার ফসল এবং ইহার নিয়ন্ত্রণে সরকার এবং সরকারের অনুগৃহীত ব্যক্তিবৃন্দ এই চাউলের ব্যবসায়ে বেশ দু'-পয়সা রোজগার করিতেছেন। ভক্তবৃন্দের রোজগার হঠাৎ বন্ধ হইলে বাঙ্গলার লীগ সরকারের অসুবিধা নানা দিকে এবং ভাবে হইবে। অতএব লোক মরুক বা বাঁচুক, চাউল সুপ্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্য যাহাই হউক, নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিয়া জনসাধারণের প্রাণের বিনিময়ে অর্থাগমের পথ খোলা রাখিতেই হইবে—অন্তত বঙ্গ-বিভাগ না হওয়া পর্য্যন্ত।

* * * *

'বীরভূম-বাণী'র মতে : "সে-বার মজুত করিয়াছিল ব্যবসায়ীরা, এবার করিতেছে তথাকার (পূর্ব্ববঙ্গের) চাষীরা।...... নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পূর্ণমাত্রায় তথাকার চাষীরা লইয়াছে। আর পশ্চিম-বঙ্গের চাষীরা নিয়ন্ত্রণের চাপে পড়িয়া উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা কম মূল্যে ফসল বেচিতে বাধ্য হইতেছে।" 'বীরভূম-বাণী' সম্পাদক ভুলিয়া গিয়াছেন যে—পূর্ব্ববঙ্গের চাষীদের শতকরা ৯০ জন সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের এবং পশ্চিম-বঙ্গের চাষীদের শতকরা ৯০ জন বর্ত্তমান বাঙ্গলার অভিশপ্ত হিন্দু! বাঙ্গলার লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী মুসলীম চাষীদের স্বার্থ না দেখিয়া হিন্দু চাষীদের স্বার্থ দেখিবেন—ইহা অত্যন্ত বেয়াড়া আশা! তবে মুসলীম চাষীদের স্বার্থ যেমন ভাবে বাঙ্গলা সরকার দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে দরিদ্র মুসলীম জনসাধারণ "স্বাধীন বাঙ্গলা" দেখিবার জন্য টিকিয়া থাকিতে পারিবে কি না সন্দেহ। এক নৌকার যাত্রী দুই সম্প্রদায়ের চাষী। নৌকা ডুবিলে কেহই বাঁচিবে না। তবে ভরসার কথা, রাজনৈতিক দুর্গত আমদানী করিয়া বাঙ্গলা সরকার জনসংখ্যার ঘাটতি পূরণ করিতে পারিবেন !

* * * * *

সাপ্তাহিক 'নীহারে'ও সেই একই অভাবের কথা :

"সরকারী মূল্য-নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে ধান-চাউলের মূল্য বিভিন্ন প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া জন-সাধারণের দারুণ কষ্ট হইতেছে। পূর্ব্ব-বাঙ্গলায় চট্টগ্রাম, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, ত্রিপুরা, টাঙ্গাইল প্রভৃতি বহু স্থানে চাউলের মূল্য ২৫৲-২৬৲ টাকা হইতে ৩০, টাকা দরে বিক্রয় হইতে থাকায় বহু লোকে অর্দ্ধাহারে, অনাহারে অতি কষ্টে জীবন যাপন করিতেছে। টাঙ্গাইলে ১৫৲ টাকা মণ দরে ধান্ত বিক্রয় হইতেছে। চট্টগ্রামে চাউলের মূল্য ৩০৲ টাকা। অন্য দিকে এ অবস্থায় আমাদের পশ্চিম-বঙ্গের মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলায় ধান্তের নিয়ন্ত্রিত মূল্য যথাক্রমে ৬৷০ ও ৬৷০ টাকা নির্দ্ধারিত থাকা সত্ত্বেও ক্রেতা এজেণ্টগণ মণ-প্রতি ৫৲ টাকা হইতে ৫৷০ টাকার অধিক দর দিতে না চাওয়ায়, তাহাও আবার নগদ না দেওয়ার জন্য, বিক্রেতা কৃষকসাধারণকে বর্ত্তমান সর্ব্ব জিনিষের মূল্যবৃদ্ধির দিনে, বিশেষতঃ ঋণ, খাজনা ও ট্যাক্স আদি আদায়ের জুলুমের দিনে ধান-চাউল বিক্রয় করিতে না পারিয়া অর্থাভাবে বিষম বিপাকে পড়িয়াছে।... ফলে দেশময় একটা অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে। ইহার পরিণাম যে কোথায় কি আকারে পর্য্যবসিত হইবে তাহাই একটা গভীর দুর্ভাবনার বিষয়।" একেবারেই নয়। পরিণাম একমাত্র বঙ্গ-বিভাগ ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে না, হইবে না। 'নীহার'কে আর সামান্য কাল ধৈর্য্য ধরিতে বলি, সকল কষ্ট অবসানের সময় আগতপ্রায়।

* * * * *

'বীরভূম-বাণী'তে প্রকাশ :

"বর্দ্ধমানের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, বিহার হইতে আগত যে সকল আশ্রয়প্রার্থীকে (?) স্থান দেওয়া হইয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় লোকেরা প্রায়ই অভিযোগ করিতেছে। কয়েকটি সংবাদে জানা যায় যে, তাহারা প্রায়ই সভা-সমিতি এবং লাঠি-ছোরা

লইয়া সামরিক কায়দায় কুচ-কাওয়াজ করে। গ্রামবাসীকে ভয় দেখায়, জোর করিয়া গাছ হইতে ফল পাড়িয়া লয়, স্ত্রীলোকদের উদ্দেশ্যেও না কি কুৎসিত মন্তব্য করে। পুলিশের লোক বলিয়া অর্থ আদায় করে এবং গৃহপালিত পশুও লইয়া যায়। ঐ সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য গভর্ণরের নিকট আবেদন করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।" কোন্ গভর্ণর? বাঙ্গলার বর্ত্তমান বোবা-কানা-কালা এবং পৃষ্ঠপ্রদেশে কুলো বাঁধা গভর্ণর? বর্দ্ধমানের লোকসংখ্যা কত? তথাকথিত এই আমদানী করা দুর্গতদের সংখ্যাই বা কত? সামান্য রোগের প্রতিকার করিবার জন্য কেহ বড় ডাক্তার ডাকে না। টোটকাতেই যথেষ্ট ফললাভ করা যায়। বর্দ্ধমানের জনসাধারণ যে-অবস্থার প্রতিকার সহজে এবং সোজা ভাবে নিজেরাই করিতে পারেন, তাহার জন্য এত আবেদন, নিবেদন, ক্রন্দন এবং প্রার্থনার কি প্রয়োজন হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বর্দ্ধমানবাসীদের প্রত্যহ গীতা পাঠ করিতে বিধান দিতেছি।

* * * * * *

"বাঙ্গলা সরকার বগুড়া সহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য মৌঃ আবদুল জব্বার এবং খাজা সামসউদ্দীন আমেদের উপর ভার দিয়াছেন এবং ড্রাফট লাইসেন্সখানি সংবাদপত্রে জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইয়াছে।……আমরা মনে করি, লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বয় সহরের সঠিক প্রয়োজনের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নহেন এবং তাঁহারা কোন comprehensive statistics সংগ্রহ করেন নাই। যদি ধরিয়া লই, তাঁহারা সেরূপ কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, প্রয়োজনীয় এনার্জ্জি সরবরাহ করিবার জন্য যে অর্থব্যয় করা প্রথমে প্রয়োজন, সেইরূপ অর্থব্যয় করিবার সঙ্গতি তাঁহাদের নাই, এবং সেই সঙ্গতি নাই বলিয়া তাঁহারা কয়েকটি মাত্র রাস্তায়, সর্ব্বত্র নহে, বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে চাহিতেছেন।……ইহাও উক্ত ভদ্রলোকগণের আর্থিক দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিতেছে।…… ব্যবসা পরিচালনে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার পরিচয় নাই……।" বগুড়ার কথায় উক্ত সংবাদ পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। 'বগুড়ার কথা'র সম্পাদকদ্বয় যদি বাঙ্গলা সরকারের নানা বিভাগে পরম যোগ্য কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং ব্যবসার-ক্ষেত্রে নানা ভাবে তাঁহাদের ভক্তবৃন্দকে কনট্রাক্ট এবং এজেন্সি দেওয়ার কথা জানিতেন তাহা হইলে বগুড়া সহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাপারে আজ নির্ব্বাচন ব্যাপার লইয়া এত মন্তব্য করিতেন না। লীগ সরকার তাঁহাদের পদ্ধতি এবং পলিসি মতে যথার্থ কাজই করিয়াছেন। অন্য ক্ষেত্রে সরবরাহ না করিয়াই যদি বিল পাশ হইয়া অর্থদান হয়, তাহা হইলে 'বিদ্যুতের' ক্ষেত্রে ঐ প্রকার না হইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিতে পাই না।

* * * * * *

'গৌড়দূত' পরামর্শ দিতেছেন:

"দেশের এ-অবস্থায় সন্ধ্যার পর মদ-তাড়ির দোকানগুলি খুলিয়া রাখা কদাচ সঙ্গত নহে। অপ্রিয় হইলেও কথাটা সত্য—সন্ধ্যার পর ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের পানাসক্তগণই গিয়া উপস্থিত হয়। মত্ততা বাড়িয়া গেলে উহারা মারামারি, হুড়াহুড়িও আরম্ভ করে।" এবং এই মাতালের কাণ্ড হইতেই বহু ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটিতে পারে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই একটি মাত্র স্থানে সকল সম্প্রদায়ের লোকে মিলিত হইবার সুযোগ পায়, আশা করি, সদাশয় গভর্ণমেণ্ট তাহা বন্ধ করিয়া দিবেন না। বরং মদ-তাড়ির দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া এবং আরো অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত খোলা রাখার ব্যবস্থা করিলে সরকার দুইটি মহৎ কার্য্য একসঙ্গে করিতে পারিবেন। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাও যেমন বন্ধ হইবে, খাজনার পরিমাণও তেমনি বৃদ্ধি পাইবে। আমোদ-লাভের সামগ্রীর মূল্য কিছু কম করিলে ত আর কথাই নাই, অন্য সম্প্রদায়ের কথা কেন, নিজের সম্প্রদায়ের কথাই লোকে চিন্তা করিবার সময় পর্য্যন্ত পাইবে না। সংযুক্ত আমোদালয় রাখা যদি একান্তই সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্য স্বতন্ত্র পাকিস্তান সরাবালয় প্রতিষ্ঠা করা সহজ ব্যাপার।

* * * * * *

"নারীর উপর অত্যাচার" শীর্ষক প্রবন্ধে 'হিন্দুবর্ত্তিকা' বলিতেছেন:

"যে সকল জার্ম্মান ও জাপানী এই যুদ্ধে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদের জন্য তদন্ত কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল ও অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতা ও বাঙ্গলায় দিনের পর দিন যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার কি কোন ব্যবস্থা হইবে না? বাঙ্গলা কি ক্লীব ও পঙ্গুর মতন নির্ব্বাক্ দর্শক মাত্রেই রহিবে, না কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবে? যে বাঙ্গলা এক দিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প লইয়া সমগ্র ভারতকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিল……সেই বাঙ্গালীকে আজ সুপ্ত শক্তি জাগ্রত করিতে হইবে। মা-বোনের উপর বর্ব্বরোচিত (না, কথাটা ঠিক হইল না—বলা উচিত 'বর্ব্বরজনও যে কাজ করিতে লজ্জা পায়') আক্রমণের প্রতিকার তাহাদেরই করিতে হইবে।" একমাত্র মন্তব্য—অবিলম্বে এবং অদ্যই করিতে হইবে, কারণ বিলম্বে অপরাধীর বিচার সম্ভব হইবে না।

* * * * * *

'বর্দ্ধমানের কথা' কর্ত্তৃপক্ষগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলিতেছেন:

"যুদ্ধের প্রয়োজনে পানাগড় ও মানকর অঞ্চলের বহু গ্রামবাসীকে ভিটা-ছাড়া করা হইয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে কিন্তু ইহারা আজও ভিটা-ছাড়া হইয়া আছে। গ্রামবাসিগণ তাহাদের জমি-জায়গা, বাস্তুভিটা ফিরিয়া পাইবার জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ না কি এই সম্বন্ধে অনুসন্ধানও করিয়াছেন……।" অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশ হইতে বিলম্ব হইবে, এবং তাহার পূর্ব্বেই হয়ত বহু ভিটা-ছাড়া সর্ব্বহারাদের বহু জন নির্ব্বাণ লাভ করিবে। দুষ্ট লোকে এমনও বলাবলি করিতেছে যে, এই সকল বর্ত্তমানে "মালিক-বিহীন" জমি-জমা এবং ভিটাগুলি বিহারী দুর্গতদের বসবাসের জন্যও শেষ পর্য্যন্ত বিলি-ব্যবস্থা হইতে পারে। পূর্ব্ব মালিকের দাবী প্রমাণিত

হইলে সে হয়ত একর (৩ বিঘা) প্রতি ৫৲ টাকা মূল্যও পাইতে পারে। পড়ো-জমির মূল্যই তাহার প্রাপ্য। কারণ বর্ত্তমানে জমিগুলি বৃথাই পড়িয়া আছে—মাত্র কিছু কিছু আগাছা জন্মিয়াছে।

* * * * * *

—শিলচর ওরিয়েণ্টাল টকি চিত্রগৃহে চলন্তিকা চিত্র-প্রতিষ্ঠানের 'বন্দে মাতরম্' ছবিতে প্রত্যহ প্রত্যেক 'শো'তে এক দল মুসলিম যুবক মুসলমান দর্শকদের পিকেটিং করিয়া বাধা দিতেছে। 'জনশক্তি' পত্রিকার এক সংবাদদাতার সংবাদ। আসাম প্রদেশে লীগের ইহাও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে হইবে। যে মা'কে জবাই করিবার জন্য লীগের এত প্রচেষ্টা, যে-ধ্বনি লীগের কানে 'হারাম'বৎ, সেই নামধেয় ছবি দেখিয়া কোন মুসলমানের যদি হঠাৎ মায়ের প্রতি সামান্য করুণা জাগে, এই ভয়েই বোধ করি পিকেটিং-এর ব্যবস্থা। শ্রাদ্ধ আর কত দূর গড়ায় দেখা যাক্।

* * * * * *

বাঙ্গলার প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি—১৯৪৬ সালের ১লা অক্টোবর হইতে বাঙ্গলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি নিম্নলিখিত হারে বাঙ্গলার প্রজাপালক লীগ সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন :—

১। ট্রেনিং প্রাপ্ত ম্যাট্রিক পাশ শিক্ষক—২১৲ টাকা (বর্ত্তমানে ১৮৲ টাকা)।

২। ট্রেনিংপ্রাপ্ত কিন্তু নন্-ম্যাট্রিক এবং ম্যাট্রিক পাশ কিন্তু ট্রেনিংপ্রাপ্ত নহেন এমন শিক্ষক—১৯৲ টাকা (বর্ত্তমানে ১২ টাকা)।

৩। অন্যান্য শিক্ষকগণ ১৫৲ টাকা (বর্ত্তমানে ১০৲ টাকা)।

এই পরম উচ্চ এবং সপরিবারে জীবনধারণের পক্ষে উপযুক্ত বেতনের সঙ্গে সকল শিক্ষকই পূর্ব্বের মত, সরকার হইতে ৩৷৹ টাকা এবং ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ডের নিকট ২৷৹ টাকা দুর্মূল্য ভাতাও পাইবেন। এইখানে পাওনা শেষ নহে, প্রাইমারি প্রধান শিক্ষকগণ ৫৲ টাকা বিশেষ ভাতাও পাইবেন। ট্রেনিংবিহীন নন-ম্যাট্রিক শিক্ষকগণ সম্বন্ধে কিন্তু সামান্য একটু খোঁচ আছে। বিশেষ একটি যোগ্যতামূলক পরীক্ষা পাশ করিয়া তবে তাঁহারা এই বিষম বর্দ্ধিত হারে নব বেতনের অধিকারী হইবেন—অন্যথায় নহে। গভর্ণমেণ্ট সোজা ভাষায় এক প্রকার বলিয়াই দিয়াছেন যে বর্ত্তমান বাঙ্গলায় আর্থিক অবস্থায় তাঁহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের জন্য ইহার বেশী আর কিছু করিতে পারিবেন না। বাঙ্গলা সরকার আশা করেন, অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া শিক্ষকগণ ইহাতেই খুসী হইবেন। নিশ্চয়ই হইবেন, বিশেষ করিয়া তাঁহারা যখন মনে করিবেন যে বাঙ্গলার লীগ গবর্ণমেণ্টকে বিহারী আমদানী-করা দুর্গতদের জন্য প্রত্যহ প্রায় ৪২ হাজার টাকা খরচ করিতে হইতেছে। প্রাইমারি বিদ্যালয়ে মাষ্টারি করা অপেক্ষা শিক্ষকগণ যদি মুসলীম ন্যাশনাল গার্ড দলে নাম লিখাইয়া ভর্ত্তি হয়েন, তবে তাঁহাদের যথেষ্ট উন্নতির আশা আছে। শিক্ষকগণ এ কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

* * * * *

বগুড়ার আজিজুল হক কলেজ সম্বন্ধে 'বগুড়ার কথা' মন্তব্য করিতেছেন :

"একথা স্বীকার করিতে হইবে আজকাল কোন কলেজ ছাত্রদের বেতন ও কালে-ভদ্রে সার্কাস, নাটক বা ম্যাজিকের টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থে চলিতে পারে না। এ বিষয়ে (বগুড়ার কলেজ) কলেজ কমিটির প্রেসিডেণ্ট মিঃ মহাম্মদ আলির গুরু দায়িত্ব রহিয়াছে। বলিতে গেলে তিনি এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই কলেজে তাঁহার কোন দান নাই এবং দান সংগ্রহে তাঁহার কোন তৎপরতা নাই। তিনি এই জেলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান জমিদার এবং মুসলীম লীগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। কলেজ প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানদের কলেজ, ছাত্ররা অধিকাংশই মুসলমান এবং কলেজের অধ্যক্ষ এক জন বিখ্যাত মুসলমান মনীষী। যিনি (মিঃ মহাম্মদ আলি) সামান্য মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌শনে দুই-চারি হাজার টাকা খরচ করেন, জেলা বোর্ডের ইলেক্‌শনে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন, নির্ব্বাচিত মেম্বরগণের প্রমোদ ভ্রমণের জন্য কলিকাতা, পুরী, রাঁচি প্রভৃতি স্থানে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারেন, আইন সভার নির্ব্বাচন কালে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিতে যিনি কখনই কুণ্ঠা বোধ করেন না, তিনি (অর্থাৎ সেই মহাম্মদ আলি) কেন যে কলেজের উন্নতির জন্য অর্থ সাহায্য করিতে অগ্রণী হইতেছেন না, তাহা ভাবিয়া জনসাধারণ বিস্ময় বোধ করিতেছে। যিনি নিজে ধনী, জেলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এক জন মুসলমান জমিদার এবং বাংলা দেশের রাজস্ব-মন্ত্রী, তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিজের প্রতিষ্ঠিত কলেজের জন্য দুই-চারি লক্ষ টাকা দান করিতে পারেন এবং অনুরূপ অর্থ নিজের ধনী ভ্রাতৃবৃন্দ ও নবাব এষ্টেটের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন।" করিতে পারেন ত অনেক কিছু, কিন্তু এ-বিষয় লীগের কোন নির্দ্দেশ নাই, অতএব মহাম্মদ আলি সাহেবের হাত বদ্ধ। 'বগুড়ার কথা'কে ধন্যবাদ, তাঁহার কৃপায় মহাম্মদ আলি সাহেবের আর একটি রূপ দেখিতে পাইলাম। বাঙ্গলার রাজস্ব (যাহার শতকরা ৮০ ভাগ দেয় হিন্দু) লইয়া তিনি যেমন দানবীর হইয়াছেন, নিজের এবং বাপ-ঠাকুরদাদার অর্থ-বিষয়ে তিনি সে-রূপ নহেন! 'বগুড়ার কথা'য় ইহা জানিয়া আমরাও বিস্ময় বোধ করিতেছি যে—মুসলমান জনসাধারণ তাঁহাদের মহানায়কদের কার্য্যাদি দেখিয়া এখনও বিস্মিত হইতে পারে! আশার কথা, বাঙ্গলায় মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলেই মুসলমান-শিক্ষার সকল সমস্যা দূর হইবে।

* * * * * *

বগুড়ার সংবাদে প্রকাশ—"আমরা এইরূপ অভিযোগ শুনিয়াছি যে, মফঃস্বলে জেলা বোর্ডের রাস্তার ধারে বহু আম, কাঁটাল, জাম, শিশু ও মেহগনি গাছ কাটা হইয়াছে। সেগুলির কি হইতেছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না, তবে সেগুলি যে প্রাকাশ্য নীলামে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা হয় নাই সেকথা সকলেই বলিতেছে। বর্ত্তমানে জেলা বোর্ডে যে অরাজকতা চলিতেছে তাহা এই সব কার্য্যকলাপ দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে।" রাস্তার ধারের আম, জাম, কাঁটাল, শিশু এবং মেহগনি গাছগুলি কাটিয়া বোধ হয় বাঙ্গলা সরকারের পরিকল্পনা মত

পরম লাভজনক নৌকা-নির্ম্মাণ কার্য্যে লাগানো হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু সামান্য গাছপালা কাটাতে 'বগুড়ার কথা'র এত বিস্ময় কেন? যে দেশে প্রকাশ্যে মানুষ কাটা হইলেও কর্ত্তনকারীর বিচার না হইয়া গোপন পুরস্কারের ব্যবস্থাই হয়ত হয়, সে-দেশে গাছ কাটা ব্যাপার লইয়া দেশকে অরাজক বলা অর্থহীন। 'বগুড়ার কথা' পাকিস্থানের সমর্থক। বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় সেই পাকিস্থানী শাসন এবং কায়েম প্রচেষ্টাই চলিতেছে, অতএব 'বগুড়ার কথা'য় লীগ তথা পাকিস্তানবিরোধী কোন কিছু প্রচার করা ঠিক হইতেছে কি?

* * * * * *

'হিন্দু-রঞ্জিকা' বলিতেছেন: 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় একটি সংবাদের শিরোনামা দিয়াছেন "মুসলমান কৃষকের অন্দরে ঢুকিয়া যথা-সর্ব্বস্ব লুঠ।' কমিউনিষ্টদের এরূপ সাম্প্রদায়িক উস্কানি কেন? কৃষক নির্য্যাতনের সংবাদে হিন্দু ও মুসলমানে কোন পার্থক্য আছে কি? না, সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ না লইলে তে-ভাগা আন্দোলন জমিয়া উঠিবে না?—এই 'স্বাধীনতা' পত্রিকাই হিন্দু হরতাল বলিয়া ২৩।৪।৪৭এর হরতালে যোগদান করেন নাই, যদিও অন্য কারণ দেখাইয়া ঐ দিন কার্য্যালয় বন্ধ রাখিতে বাধ্য হয়। কলিকাতার পুলিশের অত্যাচারকে ইহারা কেবল মাত্র পুলিশের অত্যাচার বলিয়াই চালাইতে অত্যন্ত ব্যগ্র এবং তৎপর!

* * * * * *

'দেশের বাণী' পাঠে জানা যায়: রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত ১৩নং চাটখিল ইউনিয়ন ও ১২নং পাঁচগাঁও ইউনিয়নের অধীন গ্রাম-সমূহে বহু দিন যাবৎ সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি খুব খারাপ যাইতেছে। রাত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ (হিন্দু) সম্প্রদায়ের গৃহে অগ্নিসংযোগ ও ব্যাপক অর্থনৈতিক বয়কটের চেষ্টা, সমস্তই যেন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুলিশের উপর ভরসা করিয়া লোক আর গ্রামে বাস করা নিরাপদ মনে করে না।"— "···কিছু দিন যাবৎ উক্ত অঞ্চলে বয়কট-নীতি তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। সংখ্যালঘিষ্ঠদের বেশীর ভাগ জমিই অনাবাদী পড়িয়া আছে। কোন কোন মুসলমান চাষ করিতে আসিলেও তাহাদিগকে বাধা দেওয়া হইতেছে। যাহারা বাধা দিতেছে তাহারা সকলেই গত দাঙ্গার আসামী। তাহারা একবাক্যে বলিতেছে যে, এজাহার তোল নতুবা নিস্তার নাই। চাষ তো হইবেই না, বরং পরে আরো অনেক বিপদ আছে। প্রত্যহ তাহারা আতঙ্কিত জনসাধারণের উপর এজাহার তুলিয়া লওয়ার জন্য চাপ দিতেছে।" বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সোহরাবর্দ্দির নোয়াখালী সম্বন্ধে বিবৃতি সত্য বলিয়া মনে করিলে 'দেশের বাণী'র প্রকাশিত সংবাদকে মিথ্যা ধরিতে হয়। 'দেশের বাণী' যদি লোককে মিথ্যা আতঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রেস আইন বলবৎ রহিয়াছে কোন্ কারণে? তবে 'দেশের বাণী'র সৌভাগ্য এই যে, তিনি মহাত্মা গান্ধী, শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত মিথ্যাবাদীদের দলেই পড়িয়াছেন। ক্রমশ অবস্থার যেমন পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাতে মনে হয় বঙ্গ-বিভাগ হইবার পূর্ব্বেই পূর্ব্ববঙ্গের বহু অঞ্চল হইতে হতভাগ্য হিন্দুদের 'জান' লইয়া এবং 'মাল ফেলিয়া'—পশ্চিম-বঙ্গে আশ্রয় লইতেই হইবে। ব্যাপার অসম্ভব হইবার পূর্ব্বেই পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু-বসবাসের পক্ষে অসম্ভব এবং অযোগ্য অঞ্চলগুলি হইতে সংখ্যালঘুদের সরাইবার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের নেতৃবর্গের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করি এবং সেই সঙ্গে শ্রীমতী লীলা রায়, তস্য পতি অনিল রায়, সত্য বক্সী প্রভৃতি এবং ইঁহাদের সকলের গুরু প্রভুপাদ শরৎ সি বসু এবং তস্য পুত্র নেতাজী অমিয় বসুকে একবার নোয়াখালী অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়া হিন্দু-মুসলমানের প্রেম কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা নিজেদের চোখে দেখিয়া এবং কানে শুনিয়া আসিতে প্রার্থনা জানাইতেছি।

* * * * * *

'নবসঙ্ঘে'র ঘোষণা:—"বাঙ্গলার সাড়ে তিন কোটি হিন্দুর মধ্যে যদি অর্দ্ধ কোটি লোকের দৃঢ় সংহতি গড়িয়া উঠে, আমরা নিঃসংশয়ে অখণ্ড বাঙ্গলায় পাকিস্তানের স্বপ্ন চূর্ণ করিব। হিন্দু-বাঙ্গলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সর্ব্বাগ্রে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এই ঐক্যবদ্ধ সংহতি গড়ার জন্য যদি হিন্দুবঙ্গ আত্ম-সংগঠনে উদ্যোগী হয়, তবে আমরা নির্ভয় হইব। এই কর্ম্মই আমাদের সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধ করিতে হইবে।" ঠিক্ এই ভাষায় না হইলেও এই মন্ত্রের কথা আমরা এবং অন্যান্য বহু জন বহু দিন হইতে বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু প্রকৃত কাজ কত দূর অগ্রসর হইয়াছে? 'নবসঙ্ঘে'র সঙ্ঘ-গুরু চন্দননগরে বসিয়া উপদেশামৃত বিতরণ না করিয়া, কলিকাতায় বা নোয়াখালি গিয়া সাক্ষাৎ ভাবে কর্ম্ম করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন না কেন? সঙ্ঘ-গুরুর মত কথা আমরাও দু'চারিটা বলিতে এবং লিখিতে পারি, কিন্তু কথায় ও কাজে মিলন ঘটাইবার লোকেরই অভাব।

* * * * * *

'নীহার' প্রকাশ করিতেছেন: "কাঁথিতে সাধারণ অর্থ সংগ্রহের হিড়িক—প্রাকৃতিক ও মানবিক ঘোর বিপর্যয়ের অবসান ঘটিতে না ঘটিতেই কিছু দিন হইল এই কাঁথি সহরের সরকারী ও বেসরকারী সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠানের প্রসার বৃদ্ধি, সৌষ্ঠব সাধন, সমৃদ্ধি বৃদ্ধি, স্মৃতি-সংরক্ষণ আদি নানা প্রকার জনহিতের ধুয়া তুলিয়া যেরূপ অহরহঃ সাহায্য সংগ্রহকল্পে যাত্রা, থিয়েটার, জলসা, বিজ্ঞাপন প্রচার আদির হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে—" তাহাতে বলা যায় যে কাঁথি সহর প্রায় কলিকাতা হইয়া উঠিল। কলিকাতায় উপরোক্ত সকল প্রকার চাঁদা-দেয় অনুষ্ঠান ছাড়া বর্ত্তমানে ধর্ম্মঘট-পালনে চাঁদা দিতে দিতে সহরবাসী প্রায় পাগল হইতে বসিয়াছে। লোকের পকেটে চাঁদার আমদানি কমিয়াছে—কিন্তু 'রপ্তানী' বিবিধ প্রকারে শতগুণ বাড়িয়াছে! কে কোথায় কত আদায় করিল এবং কোথায় কি ভাবে চাঁদার টাকা খরচ হইল লোকে তাহা জানিতে পারে না বলিয়া 'নীহার' দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতা সহরেও কয়েক জন স্বনামধন্য এবং বহু জন শ্রদ্ধেয় নেতাদের বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ বৃদ্ধি পাইতেছে। শীঘ্রই এমন দিন আসিবে যখন বাধ্য হইয়াই হয়ত আমাদের এই সকল চাঁদা-মারা নেতাদের চাঁদমারি করিয়া নাম-ধাম এবং 'মারিত' টাকার পরিমাণও প্রকাশ করিতে হইবে। বঙ্গ-বিভাগ না হইলেও এই সকল চাঁদা-মারা নেতারা রেহাই পাইবেন না। বঙ্গ-বিভাগ হইলে ত কথাই নাই।

বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মধ্যে চা-রসিক বলে' যাঁদের খ্যাতি ছিল ডক্টর জনসন্ ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। চা না হলে' কখনই তিনি কোন রচনায় মনোনিবেশ করতে পারতেন না। বিক্ষিপ্ত মনকে সাহিত্য-সাধনায় শান্ত ও সমাহিত করবার জন্যে এই মধুগন্ধী সুস্বাদু পানীয়টিই ছিল তাঁর একমাত্র নির্ভর। আর শুধু তিনিই ন'ন, হ্যাজলিট, ল্যাম্ব প্রমুখ প্রখ্যাত মনীষীদের মধ্যে যাঁরা সাহিত্য ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব অর্জন করে গেছেন তাঁরা চা-কে পানীয় মাত্র বলেই মনে করতেন না,—চা ছিল তাঁদের কাছে অফুরন্ত আনন্দ ও প্রেরণার উৎস। সুকবি কুপারের তো কথাই নেই, তিনি ইংরেজী সাহিত্যে "চায়ের আসরের কবি" বলেই খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যিকদের সঙ্গে চায়ের এই যোগাযোগ আজ আর শুধু ইংরেজী সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তাঁদের চা-প্রীতির নিদর্শন এখন পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যেই অল্প-বিস্তর খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলার উদীয়মান কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: "লেখার সময় স্তব্ধ অন্তর্লোকবাসী মনের ধ্যানযোগে চা শুধু তৃষ্ণাহরা পানীয়ই নয়, প্রেরণাময় সঙ্গীও বটে। ক্লান্তিতে যখন কল্পনায় অবসাদ আসে তখন চা আমাকে সতেজ করে তোলে নূতন প্রেরণায়। এ সময় চা আমার পক্ষে অপরিহার্য।"

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে ১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কথা-শিল্পী হিসেবে তিনি অনন্য-সাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন এবং তাঁর লেখা 'কালিন্দী', 'ধাত্রী দেবতা' আর 'দুই পুরুষ' ইতিমধ্যেই সাহিত্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। বাংলার সমাজ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখ-বেদনার প্রতি তারাশঙ্করের একনিষ্ঠ সহানু-ভূতি তাঁর সমস্ত রচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই প্রতিভাবান দরদী শিল্পীর ঐকান্তিক সাধনায় যে বাংলা সাহিত্য আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে সে সম্বন্ধে দ্বিমত নেই।

প্রেরণার উৎস—চা

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 266

এম, ডি, ডি

নিখিল ভারত মহিলা হকি প্রতিযোগিতা :—

বোম্বাই হকি এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ও আমন্ত্রণক্রমে এ বৎসর নিখিল ভারত ও আন্তঃপ্রাদেশিক মহিলাদের হকি প্রতিযোগিতা বোম্বায়ে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। দিল্লী প্রাদেশিক দলকে সেমি-ফাইন্যালে অনায়াসে ৩-০ গোলে পরাজিত করিয়া বাঙলা দল উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জন করে। তাহাদের এইরূপ কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য বাঙালী ক্রীড়ানুরাগীদের মনে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে। অনেকে এই আশায় উল্লসিত হয় যে, বাঙলার মহিলা দল হয়ত আন্তঃপ্রাদেশিক হকি-মহলে তাহাদের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠার দাবী করিবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাঙলা আশাতিরিক্ত ভাবে বোম্বায়ের নিকট পরাভব মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। মধ্যপ্রদেশের সহিত কোনক্রমে অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করিয়া বোম্বাই অদৃষ্টক্রমে দ্বিতীয় দিনে জয়ী হয়।

বি, এইচ, এর ব্যর্থ প্রয়াস :—

কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক অশান্তির পুনরাবির্ভাবে হকি লীগ প্রতিযোগিতার গতি ব্যাহত হয় এবং বাঙলার হকি-জগতের কর্ম্মকর্ত্তাগণ শেষ পর্য্যন্ত লীগ বর্জ্জন করার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। অবস্থার ক্রমাবনতির ফলে তাঁহারা বি, এইচ, এর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সাধারণ ও আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতা বন্ধ রাখিতে বাধ্য হন। বেঙ্গল চ্যালেঞ্জ শীল্ড, কল্যাণ শীল্ড ও কাইভান কাপ প্রতিযোগিতার খেলা ময়দানে ইউরোপীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের দলগুলির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলাগুলিতে আকর্ষণ ও উদ্দীপনার একান্ত অভাব অনুভূত হয়। শেষ পর্য্যন্ত কলেজিয়েটসকে ৩-১ গোলে পরাজিত করিয়া ক্যালকাটা কল্যাণ শীল্ড লাভ করে। কাইভান কাপের শেষ পর্য্যায়ের খেলা এখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। স্থানীয় হকি ক্রীড়ানুরাগীদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং খেলোয়াড়গণের অনুশীলনের সুযোগ-সুবিধার জন্য বি, এইচ, এ, এক নূতন কায়দায় অভিনব লীগ খেলা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করে। বিভিন্ন ক্লাব হইতে বিভিন্ন খেলোয়াড় লইয়া দশটি বিশেষ দলের মধ্যে লীগ প্রণালীতে খেলার ব্যবস্থা হয়। এই দলগুলির নামকরণ হয় ফ্রগস, গ্রাসহপার অর্থাৎ ব্যাঙ, ফড়িং, উইচিংড়ী প্রভৃতি। দলগুলির নামকরণ ও ক্রীড়াসূচী প্রস্তুতেই এই প্রচেষ্টার সমাধি ঘটে। সাম্প্রদায়িক কলহ ও যানবাহনের অসুবিধার ফলে সমস্ত খেলোয়াড়ী যুক্তিই নিরর্থক হইয়া যায়।

প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল বন্ধ :—

আই, এফ, এর সাধারণ বার্ষিক অধিবেশনে এ বৎসর প্রতিযোগিতামূলক খেলা বন্ধ রাখার প্রস্তাব পরিগৃহীত হইলেও কয়েকটি খ্যাতনামা ক্লাবসহ ১৩টি ক্লাব এই বিষয়ে পুনর্বিবেচনার জন্য জরুরী তাগিদ দেয়। আই, এফ, এ কর্ত্তৃক এই বিষয় বিবেচনার জন্য আহুত সভায় পর্য্যাপ্ত সংখ্যক সভ্যই উপস্থিত হয় না এবং পূর্ব্বে গৃহীত প্রস্তাব বহাল থাকে। আহুত আই, এফ, এ পরিচালিত লীগ খেলা বন্ধ হইলেও পাওয়ার মেমোরিয়াল লীগ খেলা চলিতেছে। আলোচ্য লীগে এমন অনেক দলের নাম আছে, যাহারা এ বৎসর খেলা চালানোর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তে দক্ষিণ-কলিকাতা স্পোর্টস ফেডারেশন ফুটবল লীগ পরিচালনা করিতেছে। উত্তর-কলিকাতাতেও অনুরূপ এসোসিয়েশন গড়িয়া তোলা ও খেলা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলিতেছে। তাহার পর মধ্য-কলিকাতা ও পাকিস্থানী-কলিকাতা, যথা, পার্ক সার্কাস অঞ্চলেও হয়ত নূতন এসোসিয়েশন গঠিত হইয়া ফুটবল খেলা চলিতে থাকিবে। আশ্চর্য্যের বিষয়, আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক প্রথায় লীগ বা কোন প্রতিযোগিতা চালাইবার কল্পনাও করিলেন না। যদি পাওয়ার লীগ চলা সম্ভব হয় তবে আই, এফ, এর নিজস্ব লীগ খেলা অচল কিসে? যে সকল ক্লাব বর্ত্তমান অশান্ত অবস্থায় লীগ খেলার একেবারে বিরুদ্ধে তাহারাই বা কোন্ সাহসে ও কিসের প্রেরণায় পাওয়ার লীগ খেলিতে রাজী হয়, তাহা সাধারণের পক্ষে বোধগম্য নহে। যানবাহনের অসুবিধা বা সহরের অনিশ্চয় অবস্থার দোহাই কি পাওয়ার লীগকে স্পর্শ করে না? অবশ্য, আমরা সকল সময়েই খেলা চলার পক্ষপাতী, খেলার মধ্যে যাহাতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ-প্রক্রিয়া সুরু না হয়, সে বিষয়ে সকলকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। খেলা খেলার জন্য—মনের ও শরীরের সুস্থতা ও সবলতার জন্য। কিন্তু তাই বলিয়া অনেকের মত আমরা দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইতে নারাজ। খেলাই যদি সম্ভব হয় তবে পাওয়ার লীগ কেন—আই, এফ, এ, লীগ চালাইবার ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করাই উচিত।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি!

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

মস্কো-সম্মেলনের ব্যর্থতা—

মস্কো-সম্মেলন ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যর্থতা কাহারও কাছেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়ার সহিত সন্ধি-সর্ত্তের খসড়া রচনা করাই ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। গত ১০ই মার্চ্চ মস্কো সহরে বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব-চতুষ্টয়ের এই সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছিল। উহা শেষ হইয়াছে গত ২৪শে এপ্রিল। দীর্ঘ ৪৫ দিনব্যাপী এই সম্মেলনে বহু বাক্যব্যয় হইয়াছে, বহু বিষয় বিবেচনার জন্য কমিটি ও সাব-কমিটিতে প্রেরণ করা হইয়াছে, কিন্তু মীমাংসা কিছুই হয় নাই, এ কথা বলিলে একটুকুও ভুল বলা হয় না। অষ্ট্রীয়া সার্ব্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হইবে, এই বিষয়ে বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিবচতুষ্টয় অবশ্য একমত হইয়াছেন। কিন্তু কি ভাবে অষ্ট্রীয়া সার্ব্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া উঠিবে সে-সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে তাঁহারা উপনীত হইতে পারেন নাই। অষ্ট্রীয়ার সহিত সন্ধি-সর্ত্ত নির্দ্ধারণের সমস্ত চেষ্টাই অষ্ট্রীয়াস্থিত জার্ম্মাণীর সম্পত্তির সমস্যা দ্বারা ব্যাহত হইয়াছে। জার্ম্মাণীতে একটি সাময়িক গবর্ণমেণ্ট গঠন করা সম্বন্ধে তাঁহারা একমত হইতে পারিয়াছেন। কিন্তু তাহাও নানা জটিলতায় কণ্টকিত হইয়া রহিয়াছে। যে-সকল জার্ম্মাণ যুদ্ধবন্দী বিদেশে আটক রহিয়াছে তাহাদিগকে আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে দেশে ফেরৎ পাঠাইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সে-সকল বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে-সকল বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তেই তাঁহারা উপনীত হইতে পারেন নাই। জার্ম্মাণীর অর্থনৈতিক ঐক্য, জার্ম্মাণীর সীমান্ত নির্দ্ধারণ, জার্ম্মাণীর শিল্পোৎপাদনের স্তর স্থির করা, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, রাইনল্যাণ্ড সমস্যা, জার্ম্মাণীকে নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্ন, এই সকল বিষয়ের কোন একটি বিষয়েও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। জার্ম্মাণীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তাঁহাদের পক্ষে একমত হওয়া অসম্ভব হইয়াছে। জার্ম্মাণী যাহাতে পুনরায় সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া আক্রমণ করিতে না পারে তাহার জন্য আমেরিকা ৪০ বৎসরের জন্য একটি চতুঃশক্তি চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব করিয়াছিল। এই চুক্তিও সম্পাদিত হয় নাই। কত দিনে যে জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়ার সহিত সন্ধির সর্ত্ত রচিত হইবে তাহাও অনুমান করা কঠিন। মস্কো হইতে বিদায়ের প্রাক্কালে বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন বলিয়াছেন—"মতানৈক্য সত্ত্বেও চতুঃশক্তির মধ্যে ঐক্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ় হইয়াছে এই বিশ্বাস লইয়াই আমি যাইতেছি।" মার্কিণ স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ মার্শাল বলিয়াছেন—"ন্যায়সঙ্গত সময়ের মধ্যে আমাদের একমত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।" সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্কে এবং নবেম্বর মাসে লণ্ডনে পুনরায় পররাষ্ট্র-সচিব-সম্মেলন হওয়ার সম্ভাবনার কথাও তিনি বলিয়াছেন।

মস্কো-সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইবে, এই আশা কেহই করে নাই। এই সম্মেলনে অন্ততঃ অষ্ট্রীয়ার সহিত সন্ধির সর্ত্ত নির্দ্ধারিত হওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু তাহাও সম্ভব হইল না শুধু অষ্ট্রীয়াস্থিত জার্ম্মাণীর সম্পত্তি সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইল না বলিয়া। বস্তুতঃ, জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধির সমস্যা শুধু কঠিন নয়, সমগ্র ইউরোপীয় সমস্যা সমাধানের উহাই চাবি-কাঠি। জার্ম্মাণীর সমস্যা যদি সমাধান করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে অষ্ট্রীয়ার সহিত সন্ধিসর্ত্ত নির্দ্ধারণও কঠিন হইবে না। মস্কো-সম্মেলন ব্যর্থ হইলেও জার্ম্মাণীর সমস্যাগুলি যেমন এই সম্মেলনে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি বৃহৎ রাষ্ট্রচতুষ্টয়ের মধ্যে স্বার্থের সামঞ্জস্য সাধিত না হওয়া পর্য্যন্ত যে জার্ম্মাণীর সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে নিঃসংশয়িতরূপে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে স্বার্থের সামঞ্জস্য কেন সাধিত হওয়া সম্ভব হইতেছে না, চতুঃশক্তির প্রত্যেকেই যে তাহার পৃথক্ পৃথক্ কারণ নির্দ্দেশ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। জার্ম্মাণী সম্পর্কে বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে মতানৈক্যের বিশেষ কিছু স্থান নাই। সম্মেলনের পূর্ব্বে বৃটিশ ও আমেরিকার সহিত ফ্রান্সের যে মতানৈক্য ছিল সম্মেলনে তাহা অনেকখানি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। বৃটেন ও আমেরিকার সহিত রাশিয়ার মতানৈক্যই অত্যন্ত প্রবল। সন্দেহ ও অবিশ্বাসই হয়ত উহার কারণ, কিন্তু এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের উৎপত্তি-স্থান তাহাদের মন নয়, উহাদের উৎপত্তিস্থান পৃথিবীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে। এই পটভূমিতেই মস্কো-সম্মেলনের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। মস্কো হইতে ওয়াশিংটনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মার্কিণ স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ মার্শাল বেতার বক্তৃতায় মস্কো-সম্মেলন সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে এই সম্মেলনের ব্যর্থতার সমস্ত দায়িত্ব রাশিয়ার ঘাড়েই চাপান হইয়াছে। কিন্তু বৃটেন ও আমেরিকার সহিত রাশিয়ার মতানৈক্যের মূল কোথায় এই বক্তৃতায় তাহা সুপরিস্ফুট হইয়াছে, এ কথা অবশ্যই বলা যায়: অষ্ট্রীয়ায় জার্ম্মাণীর সম্পত্তির সংজ্ঞার জন্য চতুঃশক্তিই পটস্‌ডাম চুক্তির উপর নির্ভর করা সত্ত্বেও বিপুল মতভেদ হইয়াছে। যে-সংজ্ঞায় অষ্ট্রীয়াস্থিত জার্ম্মাণীর সম্পত্তি বলিতে অষ্ট্রীয়ার সম্পত্তিও বুঝা যায়, আমেরিকা, বৃটেন এবং ফ্রান্স সে-সংজ্ঞা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। কিন্তু রাশিয়ার পক্ষে অষ্ট্রীয়াস্থ জার্ম্মাণীর সম্পত্তির এইরূপ অর্থ করা একান্ত স্বাভাবিক এবং

প্রয়োজনীয়ও বটে। জার্মাণ আক্রমণে পশ্চিম-রাশিয়া বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং এই জার্মাণ আক্রমণের সহিত অষ্ট্রীয়াও বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিল। জার্মাণ আক্রমণে মিঃ বেভিন এবং মিঃ মার্শালের নিজের দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই বলিয়াই যে তাঁহারা অষ্ট্রীয়া সম্বন্ধে উদার মত গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও শুধু নয়, ক্ষতিপূরণের অর্থে যুদ্ধে বিধ্বস্ত রাশিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিবার সুযোগ না পায়, সে-দিকেও তাঁহাদের লক্ষ্য আছে। অষ্ট্রীয়ার প্রতি দরদ উহার কারণ নয়। জার্মাণীর সম্পত্তির প্রশ্নের মীমাংসার ভার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের হাতে অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিয়া মিঃ মার্শাল মীমাংসার চেষ্টাকে বিপথে পরিচালিত করিবার চেষ্টাই করিয়াছিলেন।

জার্মাণীর অর্থনৈতিক ঐক্য লইয়া এক দিকে বৃটেন ও আমেরিকা এবং আর এক দিকে রাশিয়ার মধ্যে যে মতভেদ তাহার সহিত জার্মাণীর ক্ষতিপূরণ এবং রাজনৈতিক ঐক্য লইয়া মতভেদের সম্বন্ধ খুব নিবিড়। এ বিষয়ে বৃটেন ও আমেরিকার সহিত ফ্রান্সেরও মতভেদ আছে। জার্মাণীর সীমান্ত সমস্যার যতক্ষণ পর্য্যন্ত মীমাংসা না হইতেছে এবং রূঢ় অঞ্চলের কয়লাখনি হইতে ফ্রান্স কি পরিমাণ কয়লা পাইবে তাহা নির্দ্ধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত ফ্রান্স জার্মাণীর অর্থনৈতিক ঐক্য সম্বন্ধে একমত হইতে পারিতেছে না। ফ্রান্স সার অঞ্চলকে জার্মাণী হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চায়। বৃটেন অসহায় ভাবে আমেরিকার উপর নির্ভরশীল। কাজেই ভাবী জার্মাণ আক্রমণ হইতে নিজের নিরাপত্তার জন্য ফ্রান্স শুধু বৃটেনের উপর ভরসা করিতে সাহসী হইতেছে না। জার্মাণীর কয়লা ফ্রান্স শতকরা ২১ ভাগ বেশী পাইবে, এইরূপ ব্যবস্থায় বৃটেন ও আমেরিকা রাজী হওয়া সত্ত্বেও জার্মাণীর অর্থনৈতিক ঐক্য সম্বন্ধে ফ্রান্স রাজী হইতে পারে নাই। জার্মাণীর অর্থনৈতিক ঐক্য বলিতে রুশ-অধিকৃত পূর্ব্ব-জার্মাণীর খাদ্য ও শিল্পজাত দ্রব্য এবং বৃটেন ও আমেরিকার অধিকৃত পশ্চিম-জার্মাণীর খাদ্য ও শিল্পজাত দ্রব্যকে একত্রিত করা বুঝায়। বৃটেন ও আমেরিকার ইহাই দাবী। তাহাদের এই দাবীর কারণ বুঝিতে হইলে এ কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, পূর্ব্ব জার্মাণী প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান এবং পশ্চিম-জার্মাণীই প্রধানতঃ জার্মাণীর শিল্পপ্রধান অঞ্চল। যুদ্ধে এই অঞ্চলের শিল্পগুলি ক্ষতিগ্রস্তও হয় নাই। রূঢ় অঞ্চল কয়লার জন্য বিখ্যাত। এই অঞ্চল বৃটেনের অধিকারে রহিয়াছে। কিন্তু কয়লার উৎপাদন হ্রাসের জন্য অন্যান্য শিল্পের উৎপাদনও হ্রাস হইয়াছে। পশ্চিম-জার্মাণীর খাদ্যসঙ্কটের কথা সকলে অবগত আছেন। পশ্চিম-জার্মাণীতে খাদ্য যোগাইবার জন্য বৃটিশ ও আমেরিকাকে নিজের তহবিল হইতে ব্যয় করিতে হয়। এই অবস্থায় পূর্ব্ব-জার্মাণীর খাদ্য পাওয়া আমেরিকা ও বৃটেনের পক্ষে যে একান্তই বাঞ্ছনীয় হইবে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ওডার ও নিসী (Neisse) নদীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলেই যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন হয় এবং ঐ অঞ্চল বর্ত্তমানে পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। ওডার ও এলব (Elbe) নদীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলেও প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই অঞ্চল যুদ্ধে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি পূর্ব্ব-জার্মাণীতে খাদ্যাভাব ঘটে নাই। কারণ এই অঞ্চলে রাশিয়া জার্মাণ জাঙ্কার (Junkers)-দিগকে উচ্ছেদ করিয়া সমস্ত জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জার্মাণীর অর্থ নৈতিক ঐক্য-সম্পাদনে রাশিয়ার প্রধান আপত্তি হইয়াছে জার্মাণীর চলতি শিল্পোৎপাদন হইতে ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন লইয়া। বৃটেন ও আমেরিকার অধিকৃত অঞ্চলই শিল্পপ্রধান। কিন্তু চলতি শিল্পোৎপাদন হইতে আগামী কয়েক বৎসর কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ গৃহীত হওয়া সম্বন্ধে বৃটেন ও আমেরিকার আপত্তি। রূঢ় অঞ্চলের উপর রাশিয়ার সতর্ক দৃষ্টি পড়ে তাহাও তাহারা চায় না। পশ্চিম-জার্মাণীর উপর রাশিয়ার সামান্য প্রভাবও বিস্তৃত হয় তাহাও তাহাদের কাছে অবাঞ্ছনীয়। জার্মাণী সম্পর্কে রাশিয়ার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ব্যর্থ করিবার উপায় হিসাবেই তাহারা জার্মাণীর অর্থনৈতিক ঐক্য দাবী করিতেছে।

চলতি শিল্পোৎপাদন হইতে রাশিয়াকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা হইলে এবং অর্থনৈতিক ঐক্য রাজনৈতিক ঐক্যের সূচনাস্বরূপ হইলে জার্মাণীর অর্থনৈতিক ঐক্যে রাশিয়ার আপত্তি হইত কি না সন্দেহ। কিন্তু চলতি শিল্পোৎপাদন হইতে কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা যাইবে না, ইহা যেমন বৃটেন ও আমেরিকার দাবী, তেমনি জার্মাণীতে সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হউক তাহাও তাহারা পছন্দ করে না উল্লিখিত বিষয়গুলিই প্রধানতঃ মস্কো-সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার অব্যবহিত কারণ। এই কারণগুলির মূলে রহিয়াছে জার্মাণীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইঙ্গ-মার্কিণ মূলধনের প্রভাব বিস্তৃত করা। সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত যদি যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে পশ্চিম-জার্মাণীর শিল্পগুলি মিত্রশক্তিবর্গকে সমরসম্ভার যোগাইতে পারিবে। বৃটেন এবং আমেরিকার কম্যুনিজম-ভীতি অবশ্যই আছে। কিন্তু রাশিয়া যদি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইত, তাহা হইলেও মতানৈক্য বড় কম হইত না। বৃটেন আমেরিকার উপর নির্ভরশীল বলিয়া তাহাকে আমেরিকার ভয় করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু রাশিয়া শক্তিশালী রাষ্ট্র। ইউরোপে যদি আমেরিকার প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে হয়, তাহা হইলে রাশিয়ার প্রভাব-বিস্তৃতি বন্ধ করা প্রয়োজন। মস্কো-সম্মেলনে বৃটেন ও আমেরিকা যে-সকল প্রস্তাব করিয়াছে সকলেরই ঐ এক উদ্দেশ্য। মস্কো-সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার কারণও উহাই।

আমেরিকা কোন্ পথে ?—

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মিঃ হেনরী ওয়ালেস ইউরোপে যাইয়া মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতির যে কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন, আমেরিকাবাসীদের কাছে তাহা আদৌ পছন্দ হয় নাই। মিসেস্ রুজভেল্ট পর্য্যন্ত বলিয়াছেন,—"I am rather sorry that Wallace had to go to England to make his speeches in order to get them printed in this country, because I do not like criticism of our country made abroad. I prefer them made at home." 'তাঁহার বক্তৃতা এ দেশের পত্রিকায় ছাপা হওয়ার জন্য ওয়ালেসকে ইংলণ্ডে যাইতে হওয়ায় আমি দুঃখিত। কারণ বাহির-বিশ্বে আমাদের দেশের সমালোচনা হয় তাহা আমি পছন্দ করি না, দেশে সমালোচনা হওয়াই আমি পছন্দ করি।' মিসেস রুজভেল্ট যথেষ্ট নরম ভাষাতেই মিঃ হেনরী ওয়ালেসের সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কি রিপাবলিকান্ কি ডেমোক্রাটিক উভয় দলের লোকই মিঃ হেনরী ওয়ালেসের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন।

রিপাবলিকান দলের সিনেটার মুর তাঁহাকে কম্যুনিষ্ট ইতরামির (Communist rabble) মুখপাত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ওয়ালেসের বিরুদ্ধে যে-সকল ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করা হইয়াছে তন্মধ্যে 'লোগান' আইন (Logan Act) অনুসারে অভিযুক্ত করা অন্যতম। ১৭৯৯ সালের ৩০শে জানুয়ারী এই আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটি বারের জন্যও এই আইন প্রয়োগ করা হয় নাই। ওয়ালেসের অপরাধ, তিনি বলিয়াছেন যে, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নীতি যদি অব্যাহত থাকে তাহা হইলে যুদ্ধ অনিবার্য্য। গ্রীস ও তুরস্ককে সাহায্য দানের মধ্যে এই নীতির পরিচয় আমরা পাইয়াছি। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এই সাহায্য দানের উদ্দেশ্যটা রাখিয়া-ঢাকিয়া বলিলেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ চার্লস ইটন স্পষ্ট ভাষাতেই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতিনিধি পরিষদকে স্পষ্ট ভাষাতেই সতর্ক করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—"আজ যদি রাশিয়াকে গ্রীস ও তুরস্ক দখল করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে কাল ইরাণ, আফগানিস্থান, ভারত, চীন প্রভৃতি রাশিয়ার সীমান্তবর্ত্তী সমস্ত দেশই রাশিয়া দখল করিবে।" তাঁহার নিকট লিখিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ জর্জ মার্শেলের একখানি পত্র প্রতিনিধি পরিষদে তিনি পাঠ করেন। এই পত্রে মিঃ মার্শেল তাঁহাকে লিখিয়াছেন,— "My strong conviction that aid to these countries is urgently necessary to implement the United States foreign policy has been made even more positive by my experience at the recent meeting in Moscow." 'মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতিকে কার্য্যকরী করিবার জন্য এই সকল দেশকে সাহায্য দান করা যে একান্ত প্রয়োজন, সম্প্রতি মস্কো-সম্মেলনের অভিজ্ঞতা হইতে আমার এই দৃঢ় ধারণা আরও দৃঢ় হইয়াছে।'

শুধু যে গ্রীস ও তুরস্ককেই সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা নয়, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টায় বিশ্ব-ব্যাঙ্ক (World Bank) ফ্রান্সকে সিকি বিলিয়ন ডলার ঋণ দেওয়া স্থির করিয়াছে। বিশ্ব-ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক ইহাই প্রথম ঋণ দেওয়া। ওয়াশিংটন হইতে ৬ই মে তারিখে প্রেরিত একটি সংবাদে প্রকাশ, মস্কো-সম্মেলনের সময় মঃ বিদৌল না কি মিঃ মার্শালের মধ্যে ফ্রান্সের প্রকৃত বন্ধুর সন্ধান পাইয়াছেন। মিঃ মার্শালের চেষ্টাতেই মস্কো-সম্মেলনে কয়লা-চুক্তিটা ফ্রান্সের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইয়াছে। জার্ম্মাণীর ফরাসী-অধিকৃত অঞ্চল ইঙ্গ-মার্কিণ অঞ্চলের সহিত একীভূত হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। মস্কো-সম্মেলনের শেষে বৃটেন ও আমেরিকার সহিত ফ্রান্সের যে অধিকতর মতৈক্য হইয়াছে তাহা অপ্রকাশ নাই। ফ্রান্সের রাজনীতি ক্ষেত্রে জেনারেল দ্য গলের পুনরাবির্ভাব উল্লেখযোগ্য ঘটনাই শুধু নয়, ফ্রান্সে মার্কিণ-প্রভাব বিস্তারের উহা দ্বারস্বরূপ। এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে জেনারেল দ্য গল 'Rassemblement du Peuple Francais' গঠন করিয়াছেন। তিনি এবং তাঁহার নূতন দল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিয়াছে। ফ্রান্স সম্বন্ধে মার্কিণ নীতির সমালোচনা করিয়া মিঃ হেনরী ওয়ালেস 'নিউ-রিপাবলিক' পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—"If, as seems probable, France is picked as the next experimental ground for Truman doctrine, then I predict disaster." 'ইহাই সম্ভব মনে হইতেছে যে, ফ্রান্স ট্রুম্যানের নীতির পরীক্ষা ক্ষেত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে। তাহা হইলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।' ওয়ালেস মনে করেন যে, জার্ম্মাণীই এখনও রুশ-মার্কিণ বিরোধিতার সংগ্রাম ক্ষেত্র। এই বিরোধটা কোথায় সুরু হইবে তাহা নির্দ্ধারিত হইবে ফ্রান্স কর্ত্তৃক। ফ্রান্সকে রুশবিরোধী করিবার জন্য আমেরিকা যদি তাহার বিপুল অর্থনৈতিক শক্তি প্রয়োগ করে, তবে উহার পরিণতি ঘটিবে রক্তপাতের মধ্যে, ইহাই ওয়ালেসের সুচিন্তিত অভিমত। জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চতুঃশক্তি যদি শেষ পর্য্যন্ত একমত না হইতে পারেন, তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একটি পশ্চিম-ইউরোপীয় অর্থনৈতিক ব্লক বা অঞ্চল গঠনের চেষ্টা করিবে। উহার প্রাথমিক পর্ব্ব যে এখনই সুরু হইয়া গিয়াছে ফ্রান্সে আমেরিকার প্রভাব বিস্তারের প্রয়াসের মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আমেরিকা ইউরোপে প্রবেশ করিয়াছে এবং পুনরায় ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা তাহার নাই। পূর্ব্ব-ভূমধ্য সাগরেও আমেরিকা প্রতিপত্তিশালী হইয়া থাকিতে চায়। আমেরিকা মধ্য প্রাচী তোকার্ণো-চুক্তি সম্পাদনেরও আয়োজন করিতেছে। তুরস্ককে ঋণ প্রদানের ন্যায় এই চুক্তির দ্বারাও দার্দেনালিশ প্রণালীতে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারে বাধাদান। বৃটেন ও মিশরের মধ্যে যাহাতে একটা মীমাংসা হয় তাহার জন্যও আমেরিকা চেষ্টা করিতেছে বলিয়া শোনা যায়। মিশর যাহাতে সমগ্র উত্তর-আফ্রিকাকে আরব লীগের সহিত সংযুক্ত করে তাহারই জন্য এই মীমাংসার চেষ্টা। মরক্কোর সুলতান জাতীয় ঐক্য এবং স্বাধীনতা দাবী করিয়া ট্যাঞ্জিয়ারে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ্য ভাবেই ফ্রান্সকে চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছে। ইহার মূলে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নীরব সমর্থন রহিয়াছে বলিয়াও শোনা যায়।

জাপানে, কোরিয়ায় এবং চীনে আমেরিকার অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পশ্চিম-ইউরোপে, উত্তর-আফ্রিকায় এবং মধ্য-প্রাচীতে প্রভাব বিস্তারের আয়োজন চলিতেছে। ইহাকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকার রাজনৈতিক যুদ্ধ বলিয়া অনেকে অভিহিত করিয়াছেন। সশস্ত্র যুদ্ধের আয়োজন বলিয়া ইহাকে অভিহিত করিলে ভুল হইবে কি ? আমেরিকার অনেক সংবাদ-পত্র প্রকাশ্যেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিবার কথা বলিতেছে। তাহাদের যুক্তি এই যে, পরমাণবিক বোমা নির্ম্মাণে আমেরিকার একচেটিয়া শক্তি বজায় থাকিতে থাকিতেই যুদ্ধ আরম্ভ করা সঙ্গত। এরূপ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বৃটেনের কি ভূমিকা হইবে তাহার কথাও তাহারা ভাবিয়াছেন। তাহাদের ভাষায় এই যুদ্ধে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ হইবে 'atom-bomb absorbers'। কম্যুনিজম ভীতি ও রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারের ভীতি প্রচার করিয়া আমেরিকা পৃথিবীর সমস্ত দেশে তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে উদ্যত।

বিভিন্ন দেশে কম্যুনিষ্টের সংখ্যা—

আমেরিকা পৃথিবীব্যাপী তাহার অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার আয়োজন করিয়াছে। এই কাজে কম্যুনিজম ও কম্যুনিষ্ট-ভীতি প্রচার তাহার প্রধান অস্ত্র। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য আমেরিকার এই প্রচার-কার্য্যে ভুলিয়া নিজ নিজ দেশের কম্যুনিষ্টদিগকে দমন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই অবস্থায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কম্যুনিষ্টদের সংখ্যা

কত তাহা জানিবার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। পৃথিবীর কোন্ দেশে কম্যুনিষ্টদের সংখ্যা কত 'বোম্বে ক্রনিক্যাল' পত্রিকা হইতে তাহার একটি তালিকা সঙ্কলন করিয়া এখানে দেওয়া হইল।

সোভিয়েট রাশিয়া

সোভিয়েট রাশিয়ায় কম্যুনিষ্টের সংখ্যা ৬০ লক্ষ।

ইউরোপ

জার্ম্মাণীর সোভিয়েট অঞ্চল—১৫,৭৬,০০০। পশ্চিম-জার্ম্মাণী—৩,৫০,০০০। অষ্ট্রীয়া—১,৫০,০০০। বেলজিয়ম—১,০০,০০০। ডেনমার্ক—৬০,০০০। নেদারল্যাণ্ড—৫০,০০০। নরওয়ে—৩৩,০০০। পোল্যাণ্ড—৭,০০,০০০। ফিনল্যাণ্ড—২৮,০০০। সুইডেন—৪৬,০০০। সুইজারল্যাণ্ড—২১,০০০। লুক্সেমবুর্গ—৫,০০০। শ্লোভাকিয়া—২,৫০,০০০। হাঙ্গেরী—৬,৫০,০০০। রুমানিয়া—৫,০০,০০০। যুগোশ্লাভিয়া—২,০০,০০০। গ্রীস—৪,০০,০০০। বুলগেরিয়া—৪,৫০,০০০। চেকোশ্লোভাকিয়া—১০,০০,০০০, ইটালী—২২,০০,০০০। ফ্রান্স—১৩,০০,০০০। গ্রেট বৃটেন—৪৩,০০০। উত্তর আয়র্লণ্ড—৫০০। আইসল্যাণ্ড—১০০০।

উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকা

আর্জ্জেণ্টাইন—৩০,০০০। ব্রেজিল—১,৩০,০০০। কানাডা—২৩,০০০। চিলি—৫০,০০০। কলোম্বিয়া—১০,০০০। কোষ্টারিকা—২০,০০০। কিউবা—১,৫২,০০০। ইকুয়াডর—২৫,০০০। হাইটি—৫০০। মেক্সিকো—২৫,০০০। নিকারাগুয়া—৫০০। পানামা—৫০০। প্যারাগুয়ে—৮,০০০। পেরু—৩৫,০০০। পোর্টোরিকো—১,২০০। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—৭৪,০০০। উরুগুয়ে—১৫,০০০। স্যাণ্টো ডোমিনগো—২,০০০। ভেনেজুয়েলা—২০,০০০।

এশিয়া

ব্রহ্মদেশ—৪,০০০। চীন—২০,০০,০০০। সাইপ্রাস—৪,০০০। ভারতবর্ষ—৫৩,৭০০। জাপান—৪০,০০০। কোরিয়া—৫০,০০০। লেবানন—১৫,০০০। মালয়—১০,০০০। প্যালেষ্টাইন—১,৪০০। সিরিয়া—৮,০০০।

আফ্রিকা

ইরিত্রিয়া—২০০।

অষ্ট্রেলেশিয়া

অষ্ট্রেলিয়া—২৫,০০০। নিউজিলাণ্ড—২,০০০।

জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘে প্যালেষ্টাইন-সমস্যা—

প্যালেষ্টাইন সমস্যার আলোচনার জন্য গত ২৮শে এপ্রিল নিউ ইয়র্কে জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের বিশেষ সাধারণ অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ম্যাণ্ডেট কি ভাবে সুষ্ঠুরূপে পরিচালন করা যায়, তাহার জন্যই বৃটেন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের পরামর্শ চাহিয়াছেন। জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সুপারিশ বৃটেনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হইলে বৃটেন কি করিবে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার দায়িত্ব বৃটেন নিজের হাতেই রাখিয়াছে। এই বিশেষ অধিবেশনে বৃটেন প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে তথ্য নির্দ্ধারণের জন্য একটি তথ্য-নিরূপণ কমিটি (Fact-finding Committee) গঠনের প্রস্তাব করিয়াছে। আরবরাষ্ট্র সমূহ প্রস্তাব করিয়াছিল যে, প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতা ঘোষণা করা জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হউক। ষ্টিয়ারিং কমিটির অধিবেশনে আরবরাষ্ট্র সমূহের এই প্রস্তাবটি ভোটে পরিত্যক্ত হয়। প্রস্তাবের পক্ষে একমাত্র মিশর ভোট দিয়াছিল। বিপক্ষে ভোট হইয়াছিল আটটি। পাঁচটি রাষ্ট্র অনুপস্থিত ছিল। অতঃপর জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের পরিষদের অধিবেশনে এই প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়। কিন্তু প্রস্তাবটি ভোটে অগ্রাহ্য হওয়ায় জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের কর্ম্মসূচী হইতে প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তাবটি বাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রস্তাবের পক্ষে ১৫ ভোট এবং বিপক্ষে ২৪ ভোট হইয়াছিল। অনুপস্থিত ছিল ১০টি রাষ্ট্র। পক্ষে ভোটদাতাদের মধ্যে ভারতবর্ষ, রাশিয়া, ইউক্রেণ, যুগোশ্লাভিয়া, বিয়েলো-রাশিয়া (Byelo Russia), কিউবা, আর্জ্জেণ্টাইন, পোলিণ্ডিয়া, তুরস্ক, আফগানিস্থান এবং পারস্য অন্যতম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চীন প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিল। প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তাবটি জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইতে না পারা শুধু নৈরাশ্যব্যঞ্জকই নয়, জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের ব্যর্থতাও উহার মধ্যে সূচিত হইতেছে।

জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘে প্যালেষ্টাইনের আরবরা কতখানি নিরপেক্ষ বিচার পাইবে, তাহার আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ইহুদী এজেন্সীর অভিমত গ্রহণ করা পলিটিক্যাল কমিটির পক্ষে বাধ্যতামূলক হইবে, কিন্তু প্যালেষ্টাইনের অন্যান্য অধিবাসীদের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠানটির অভিমত শ্রবণ করা কমিটির নিজের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে। এই প্রস্তাব দ্বারা আরবদের প্রতি উপেক্ষাই শুধু প্রদর্শন করা হয় নাই, যথেষ্ট অন্যায়ও করা হইয়াছে। আরব উচ্চতর কমিটি তাঁহাদের অভিমত যাহাতে জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘে উপস্থিত করিতে পারেন তাহার জন্য পূর্ব্বেই আবেদন করিয়াছিলেন। সাধারণ পরিষদের এই পক্ষপাতিত্বমূলক প্রস্তাবের পর আরব উচ্চতর কমিটি এই আবেদন প্রত্যাহার করিয়া টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের রাজনৈতিক কমিটিতে যখন ইহুদী এজেন্সী এবং প্যালেষ্টাইনের অন্যান্য প্রতিনিধিদিগকে তাঁহাদের অভিমত প্রকাশের সমান অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়, তখন এই প্রত্যাহারের সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। রাজনৈতিক কমিটি অভিমত প্রকাশের জন্য আরব ও ইহুদীদিগকে সমান মর্য্যাদা দিয়া উক্ত অন্যায়ের প্রতিকার করিয়াছেন। প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে তদন্ত করিবার একটি তথ্য-নিরূপণ কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যেই এই বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছে। কাজেই প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত সেপ্টেম্বর মাসে জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ইন্দোচীনের স্বাধীনতা সংগ্রাম—

ইতিপূর্ব্বে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, আপোষ মীমাংসার জন্য শীঘ্রই হ্যানয়ের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এবং ডাঃ হো চি মিনের গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হইবে। এই সংবাদ বিশ্বাস করা কঠিন হইলেও উহা সত্য হইবে, এইরূপ আশাই আমরা করিয়াছিলাম। কিন্তু আশা আমাদের পূর্ণ হয় নাই। ফরাসী নৌ-সচিব এইরূপ আসন্ন শান্তি আলোচনার কথা

অস্বীকার করিয়াছেন। বৃটিশ সংবাদপত্রে এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া তিনি বিস্ময়-বোধ না করিয়া পারেন নাই। ফরাসী সমর-সচিব নৌ-সচিবের সহিত কিছু দিন পূর্ব্বে ইন্দোচীন পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ইন্দোচীনে ফ্রান্স সামরিক সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে এবং ভিয়েটনাম্ সৈন্য-বাহিনী এমন স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে যেখানে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন না। ফ্রান্স তাহার সামরিক শক্তির চাপে হ্যানয় এবং ইন্দোচীনের অন্যান্য বড় বড় সহর দখল করিয়াছে সত্য, কিন্তু পল্লী অঞ্চল এখনও ভিয়েটনামীদেরই দখলে। দক্ষিণ অঞ্চলে এখনও গরিলা যুদ্ধ চলিতেছে। গত পাঁচ মাস ধরিয়া ভিয়েটনামীরা পররাজ্যলোভী শক্তিমান্ আক্রমণকারীদের হাত হইতে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। ইন্দোচীনে ফ্রান্সের বিভিন্ন শ্রেণীর যে সৈন্যবাহিনী আছে তাহাতে মোট সৈন্যসংখ্যা ৮০ হাজার। পূর্ব্বকার বৃটিশ 'স্পিটফায়ার'গুলি ২৫০ পাউণ্ডের বোমা বর্ষণ করিতেছে। ইন্দোচীনে ফ্রান্স ১০৫ এম-এম কামান, এণ্টিট্যাঙ্ক কামান, হাফট্রাক্, মোরটার, ছোট-বড় অনেক কলের কামান এবং এমন কি আগ্নেয় গ্রেনেড ব্যবহার করিতেছে। গত মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগে সৈন্য-সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। সে তুলনায় ভিয়েটনামীরা অনেক দুর্ব্বল। তাহাদের এরোপ্লেন নাই, অল্পসংখ্যক এ-এ কামান এবং ৭৫ এম-এম কামান আছে ছোট-বড় কলের কামানের সংখ্যাও খুব বেশী নয়। কিছু মোরটার এবং হ্যাণ্ড গ্রেনেড অবশ্য আছে। তাহাদের শিক্ষিত সৈন্যের সংখ্যা ৫০ হাজারের বেশী নয়। ৬০ হাজার অশিক্ষিত সৈন্য আছে বটে।

শুধু সামরিক সাফল্য দ্বারা ইন্দোচীনের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয় বলিয়াই ডাঃ হো চি মিনের গবর্ণমেণ্টকে কম্যুনিষ্ট-নিয়ন্ত্রিত বলিয়া প্রচার করা হইতেছে। ভিয়েটনামীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টাও যে চলিতেছে না, তাহা নহে। সম্প্রতি ইন্দোচীনে একটি সম্মিলিত জাতীয় ফ্রণ্ট গঠিত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ডাঃ হো চি মিনের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তাহারা ক্ষমতা অর্জ্জনের প্রয়াসী। তাহারা কোচিন চীনের সামরিক ধর্ম্ম সম্প্রদায় ১০ লক্ষ কাওদিদের সমর্থন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই কাওদি-বাহিনীর প্রধান সেনানায়ক ফরাসী উপনিবেশ-সচিব মঃ মোত্তেকে জানাইয়াছেন যে, আনামের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ বাওদাই-এর নেতৃত্বে তাঁহারা ভিয়েটনামের স্বাধীনতার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছেন। ইহা যে ভিয়েটনামীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টার ফল তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। কোচিন চীনের অবস্থা এখনও ফ্রান্সের অনুকূল নয়।

ফরাসী সাম্রাজ্যকে আর বাঁচাইয়া রাখা কঠিন, তাহার পরিচয় শুধু ইন্দোচীনেই নয়, মাডাগাস্কার ও উত্তর-আফ্রিকাতেও পাওয়া যাইতেছে। মাডাগাস্কারে যাহা ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে তাহা যে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মাডাগাস্কারের দখল ছাড়িবে না, এই দৃঢ়তা সত্ত্বেও ফ্রান্স একেবারে এই বিদ্রোহ দমন করিতে পারে নাই। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হইলেও এইখানেই উহার শেষ হইবে না। সমগ্র উত্তর-আফ্রিকায় যে একটা অসন্তোষ এবং চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। কাসাব্লাঙ্কায় একটা সংঘর্ষ হইয়াছে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে টিউনিসে বিস্ফোরক পদার্থ সহ তিন জন মুসলমান ধৃত হইয়াছে। ইন্দোচীন ও মাডাগাস্কারের মত ওখানেও যে স্বাধীনতার সংগ্রাম সুরু হইয়াছে, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে কি? ফ্রান্সের বিগত নির্ব্বাচনে কম্যুনিষ্টদের অনুকূলে ৫০ লক্ষ ভোট হইলেও ফরাসী জনগণ সাম্রাজ্যবাদ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। ইন্দোচীন সম্পর্কে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নীতি ফরাসী কম্যুনিষ্ট পার্টির পরোক্ষ সমর্থন লাভ করিয়াছিল, কম্যুনিষ্ট মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা ফরাসী গবর্ণমেণ্টের মজুরি নীতির প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়াছেন। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ফরাসী কম্যুনিষ্টরা সাম্যবাদী, কিন্তু উপনিবেশের ব্যাপারে তাঁহারা পুরাদস্তুর সাম্রাজ্যবাদী।

চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে—

ওলন্দাজ-ইন্দোনেশিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়াতেই যে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ হইয়া গিয়াছে তাহা নয়। ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের সহিত সংঘর্ষ এখনও চলিতেছে। ইহা ব্যতীত তাহারা ইন্দোনেশিয়ায় বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টাও করিতেছে। ইন্দোনেশিয়ার পাশোয়েনদান (Pasoendan) দল পশ্চিম-জাভায় স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছে এবং তাহার জন্য ছোট-খাটো বিদ্রোহও যে একটা হয় নাই তাহাও নহে। পশ্চিম জাভার স্বাতন্ত্র্যকামী এই দলটির নেতা তাঁহার বিবৃতিতে ডাচ গবর্ণমেণ্টের সামরিক সাহায্য এবং আশ্রয় চাহিয়াছেন। সুতরাং এই স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলনের মধ্যে ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের কূটকৌশল স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

জাপানের নির্ব্বাচন—

জাপানী ডায়েটের নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক দল ১৪০টি আসন দখল করিয়াছেন। উদারনৈতিকেরা ১৩৭টি এবং ডেমোক্রাটিক দল ১২৪টি আসন দখল করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই নির্ব্বাচনে কম্যুনিষ্টরা কিছুই সুবিধা করিতে পারে নাই। একক দল হিসাবে সোশ্যাল ডেমোক্রাটরাই বেশী আসন দখল করিয়াছেন বটে, কিন্তু উদারনৈতিক দল ও ডেমোক্রাট দল মিলিয়া মোট ২৬১টি আসন পাইয়াছেন। এই দুইটি দলই পুরা রক্ষণশীল। সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা নরম বামপন্থী।

কম্যুনিষ্টদের পরাজয়কে লক্ষ্য করিয়া জেনারেল ম্যাক্ আর্থার এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্ট মতবাদ পূর্ণ সুযোগ পাইয়াছিল, তাঁহাদের নেতারা জনসাধারণের সমর্থন পাইবার জন্য বিশেষ ভাবেই চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা ব্যর্থ হইয়াছেন। এই ধরণের মন্তব্য না করিলেও আমেরিকার কোন ক্ষতি হইত না। কিন্তু এইরূপ মন্তব্য করিবার যে বিশেষ একটি কারণ আছে তাহা উপেক্ষার বিষয় নয়। তিনি প্রমাণ করিতে চান যে, জাপানের সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনে জনসাধারণ নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারেই ভোট দিয়াছে। কিন্তু জাপান যে আমেরিকার সামরিক দখলে রহিয়াছে, বিশ্ববাসী এ কথাটা উপেক্ষা করিতে পারিবে কি?

কোরিয়ার ভবিষ্যৎ—

হতভাগ্য কোরিয়াবাসীদের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত। কোরিয়া শত্রুদেশ নয়। জাপ-শাসনের ৪০ বৎসর ধরিয়াই কোরিয়াবাসীরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছিল। পৃথিবীর বড় বড়

রাষ্ট্রশক্তি-সমূহ এই সংগ্রামে কোরিয়ার প্রতি কোন সহানুভূতি প্রকাশ করে নাই। বরং জাপানের মনস্তুষ্টি সাধনেই তাহাদের আগ্রহ দেখা গিয়াছে। জাপানের পরাজয়ের পর কোরিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবে, কায়রো-সম্মেলনে ইহাই স্থির হইয়াছিল। ১৯৪৫ সালে মস্কো-সম্মেলনেও কোরিয়ার গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার কথা স্বীকৃত হয়। কিন্তু জাপানের পরাজয়ের পর কোরিয়ার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে জার্ম্মাণীর অনুরূপ। রুশ এলাকা এবং মার্কিণ এলাকা এই দুই ভাগে কোরিয়া বিভক্ত হইয়াছে। উত্তর-কোরিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার এবং দক্ষিণ-কোরিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শাসনের অধীন। রাশিয়া এবং আমেরিকা উভয়েই নিজ নিজ এলাকায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ অনেক দূর অগ্রসর হওয়ার দাবী করিয়াছে। কিন্তু আসল সমস্যা একীভূত বা অখণ্ড কোরিয়ার গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা। রাশিয়া ও আমেরিকা একমত না হওয়া পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে ভরসা করিবার কিছুই দেখা যাইতেছে না। তাহাদের মতৈক্য হওয়ারই বা সম্ভাবনা কোথায়? অখণ্ড স্বাধীন কোরিয়া গঠনের জন্য রাশিয়া এবং আমেরিকা একটি যুক্ত (joint) কমিশন গঠন করিয়াছিল। ১৯৪৬ সালে মার্চ মাসে এই কমিশনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। কিন্তু 'গণতান্ত্রিক' শব্দের সংজ্ঞা লইয়া মতভেদ হওয়ার ফলে এই কমিশন ব্যর্থ হইয়াছে। আমেরিকা কোরিয়ার দক্ষিণ অংশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, এরূপ কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

অখণ্ড স্বাধীন গণতান্ত্রিক কোরিয়া গঠনে রাশিয়া যে চেষ্টার ত্রুটি করিতেছে না, তাহা ২০শে মে তারিখে পুনরায় উল্লিখিত যুক্ত কমিশনের অধিবেশন আহ্বান করিতে মলটোভের প্রস্তাব হইতেই বুঝিতে পারা যায়। এই যুক্ত কমিশনের অধিবেশন পুনরায় আহ্বান করার ব্যাপারে আমেরিকা যে সকল প্রস্তাব করিয়াছিল রাশিয়া তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তথাপি এই কমিশনের সাফল্য সম্বন্ধে ভরসা করা কঠিন। এই কমিশনকে যে-সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার কথা তন্মধ্যে কোরিয়ার জন্য চতুঃশক্তির পঞ্চবার্ষিকী ট্রাষ্টিশিপ চুক্তির সর্ত্ত নির্দ্ধারণ অন্যতম। কোরিয়াবাসীরা ট্রাষ্টিশিপ যে পছন্দ করে না, কিছু দিন পূর্ব্বেও কোরিয়ার মার্কিণ-অধিকৃত অঞ্চলে ২০ লক্ষ শ্রমিকের ধর্ম্মঘটের ফলে যানবাহন ও খাদ্য-সরবরাহ ব্যবস্থা অচল হওয়ার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। কোরিয়ার সমস্যাটা রাশিয়া ও আমেরিকার পরস্পরবিরোধী আদর্শবাদের সমস্যা মনে করিলে ভুল হইবে। সামরিক দিক হইতে কোরিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। যুদ্ধের সময় আমেরিকা যে সকল ঘাঁটি দখল করিয়াছে তাহার একটিও ছাড়ে নাই। কোরিয়াও ছাড়িবে কি? আমেরিকা না ছাড়িলে রাশিয়াও ছাড়িবে না।

ব্রহ্ম গণপরিষদ—

ব্রহ্ম গণপরিষদের নির্ব্বাচনে আউঙ্গ সানের ফ্যাসিষ্টবিরোধী স্বাধীনতা লীগই বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করিয়াছে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টি বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই, ইহা বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিবার বিষয়। থাকিন সো পরিচালিত কম্যুনিষ্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় নির্ব্বাচনে তাহারা প্রত্যক্ষ ভাবে কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। থাকিন থানটুন পরিচালিত কম্যুনিষ্ট পার্টি বে-আইনী নয় বটে, দলাদলির জন্য তাহাদের পক্ষে প্রভাব বিস্তার করা কঠিন। উ স, ডাঃ বা ম, এবং থাকিন বা সিনের দল ব্রহ্ম গণপরিষদের নির্ব্বাচন বর্জ্জন করিয়াছিলেন। নির্ব্বাচন অনেকটা শান্ত অবস্থার মধ্যেই সম্পন্ন হইয়াছে।

গণপরিষদের নির্ব্বাচন অপেক্ষা ব্রহ্মদের প্রধান সমস্যা সীমান্তের প্রশ্ন। ব্রহ্ম-সীমান্তের উপজাতীয় অঞ্চলগুলি ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত থাকিতে ইচ্ছুক কি না, সে-সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি সীমান্ত তদন্ত কমিশন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছিলেন। এই তদন্তের ফলে জানা গিয়াছে যে, ব্রহ্মের সীমান্ত অঞ্চলগুলি ব্রহ্ম গণপরিষদে যোগদান করিতে ইচ্ছুক। তাহাদের জন্য ব্রহ্ম গণপরিষদে আরও কিছু আসন বৃদ্ধি করা হইবে। কিন্তু ব্রহ্মদেশ বিভক্ত হওয়ার ফাঁড়া ইহাতেই কাটিয়া গিয়াছে কি না সন্দেহ। আরাকানে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের জন্য সেখানে রীতিমত বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দস্যু-দলপতি উ সেন বাকে গ্রেপ্তার করাই আরাকানে বিদ্রোহের মূল কি না তাহা বলা কঠিন। চট্টগ্রামের মুসলিম বণিক-সঙ্ঘ আরাকানকে ভারতের পূর্ব্ব-পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য বাংলা সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। মিঃ জিন্না আউঙ্গ সানকে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন তাহার ফল কি হইল?

চীনের আর্থিক দুর্গতি—

চীনে কম্যুনিষ্টদের সহিত সরকারী সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ পূরা দমেই চলিয়াছে। সরকারী সেনাদলের বিরাট সাফল্যের কথা মাঝে-মাঝেই আমরা শুনিতে পাই। গত ২৫শে এপ্রিল তারিখে নান্‌কিং হইতে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, সানটুং-এ কম্যুনিষ্ট বাহিনীর প্রধান যুদ্ধ-ঘাঁটি মেনগিন দখল করিয়া চীনা সরকারী বাহিনী এক বিরাট সাফল্য লাভ করিয়াছে। কম্যুনিষ্টরা শুধু পরাজিতই হইতেছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। গত ২রা মে কম্যুনিষ্ট বাহিনী পেকিং-হ্যাঙক উ রেলওয়ের পার্শ্ববর্ত্তী একটি সহর দখল করিয়াছে। কম্যুনিষ্টদের অষ্টম রুট আর্ম্মি শানসী প্রদেশে পীত নদীর তীরবর্ত্তী দুইটি সহর দখল করিয়াছে।

সাংহাই হইতে প্রেরিত গত ৬ই তারিখের সংবাদে প্রকাশ, গত চারি মাসে সাংহাইয়ের রাজপথ হইতে ৮ হাজার নিরন্ন শিশুর মৃতদেহ কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছে। শুধু এপ্রিল মাসেই পাওয়া গিয়াছে ৩৪১০টি মৃতদেহ। তন্মধ্যে শিশুর মৃতদেহই ৩০৪৮টি। হ্যাং চাউয়ে চাউলের জন্য এক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। তার পরেও আরও গণ্ডগোল চলে এবং পুলিশ ৪০ জন লোককে গ্রেপ্তার করে। গত ৪ঠা মে সাংহাইয়ের রাজপথে প্রায় ২ হাজার চীনা চাউল-ব্যবসায়ী ও মুনাফাদারদের শাস্তি দাবী করিয়া রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তাহারা কাল রংয়ের কাগজে তৈয়ারী একটি কফিন বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। ঐ কফিনের ভিতর হইতে একখানা হাত বাহির করা এবং হাতের মুঠায় একতাড়া ব্যাঙ্ক-নোট। নোটের উপর লেখা আছে, 'তুমি ইহা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না।' চোরা-বাজারের এবং অতি-লাভের টাকা কুয়োমিনটাং দলের সদস্যরা পরলোকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না, এ কথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু পরকালের কথা ভাবিয়া চোরা-বাজারের কারবারীরা কোন দিনই উদ্বিগ্ন হয় না। ব্যক্তিগত স্বার্থের লোভে কুয়োমিনটাং দল চীন দেশকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছেন।

ভারতের রাজনীতিক অবস্থা

১৩৫৩ সাল চলিয়া গেল, ১৩৫৪ সাল আরম্ভ হইল। আমাদের জীবনে এই যাওয়া-আসায় কোন পার্থক্যের অনুভূতিই জাগাইল না। পুরাতন বৎসরের স্মৃতি মনে রাখিবার মত নহে। আমরা নূতনকে যে আশাভরা হৃদয়ে স্বাগত করিব সে অবস্থাও আমাদের নহে। ১৩৫৩ গিয়াছে বিভীষিকার দুঃস্বপ্ন লইয়া। অন্নবস্ত্রের অভাব। সেই সঙ্গে পাকিস্থানী দাওয়াই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম! ১৩৫৪তেও তারি জের চলিতেছে। বাঙ্গালা দেশ যেন বিধাতা এবং নেতাদের চক্ষুশূল। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, সেই সঙ্গে বিদেশী শাসকদের প্রবঞ্চনা, কংগ্রেসী নেতাদের অবহেলা উপেক্ষা আর পাকিস্থানবাদীদের লড়্‌কে লেঙ্গের নমুনা—সব মিলইয়া আমরা জর্জ্জরিত, মৃতপ্রায়। দশ বছরের লীগ-শাসনে বাঙ্গালা আজ শ্মশানে পরিণত। সংস্কৃতি, সভ্যতা, ঐতিহ্য, মানবতা সবই যেন লুপ্তপ্রায়। দুঃখ-কষ্ট হয়ত বাঙ্গালায় আজ নূতন নহে, পূর্ব্বে কিন্তু শান্তি ছিল, মানুষের মনুষ্যত্ব ছিল। লীগ মন্ত্রিসভার নেক-নজরে আমরা সুখ ও শান্তি দুই-ই হারাইয়াছি। ১৬ই আগষ্টের লীগ প্রজ্বালিত লেলিহান বহ্নিশিখা আজও নিবে নাই। তবে নূতন বৎসরে উজীরে আজম সুরাবর্দী সাহেব সেই আগুনে ভিজা কাঠ দিয়া খুব খানিকটা ধোঁয়ার সৃষ্টি করিতেছেন। সেই সঙ্গে জ্বলন্ত আগুনে ছাই চাপা দিয়া লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে আগুন নিবিয়াছে।

১৩৫৩ সালে বাঙ্গালার লীগ দল 'লড়কে লেঙ্গে' হাঁক দিয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামিয়াছিল হিন্দুদের উচ্ছেদের জন্য। ১৩৫৪ সালে হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই, উভয়ে মিলিয়া সার্ব্বভৌম বাঙ্গালা প্রদেশ গঠন করিব, এক জনকে ছাড়িয়া আর এক জন বাঁচিতে পারিবে না ইত্যাদি অমিয় বাণী শুনাইয়া উজীরে আজম বাঙ্গালার হিন্দুদের বিভ্রান্ত করিয়া দিবার চেষ্টায় আছেন। অবশ্য তাঁহার কুম্ভীরাশ্রুতে কেহই ভুলিবে না। কিন্তু সত্য অথবা শান্তির পথে তাঁহারা এক পদও অগ্রসর হন নাই। যাহা প্রকাশ্যে তাহা পরোক্ষে বলিতেছেন, গুণ্ডামীর স্থলে প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইয়াছেন। অতি-বড় বুদ্ধিমান ক্রিমিন্যালও ভুল করিয়া সামঞ্জস্য হারাইয়া ফেলে। যাহার ফলে তাহার অপরাধ প্রকাশ হইয়া যায়। অত্যন্ত সুচতুর প্রধান-সচিব মুখে প্রেম-গান গাহিলেও কার্য্যে সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন নাই। পাঠান পুলিশ আমদানী, লীগ গুণ্ডাদের লোকচক্ষুর অন্তরালে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন, মন্ত্রিসভায় হিন্দুবিধ্বংসকারী আইন প্রণয়ন ইত্যাদি হইতে তাঁহার প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারা যায়। যিনি নোয়াখালি ত্রিপুরা কিছু নহে বলিতে পারেন, যিনি পাঠান পুলিশ কর্ত্তৃক সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি লুণ্ঠন, নারীদের ধর্ষণ, নিরীহ পথচারীদের উপর গুলীবর্ষণ ইত্যাদি বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান, যিনি প্রকৃত সংবাদ গোপন করিবার উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধকারী অর্ডিনান্স জারী করিতে পারেন, তাঁহাকে কেহ বিশ্বাস করিবে, এ দুরাশা তিনি কি করিয়া মনে পোষণ করেন!

বড় লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন আসিয়া অবধি কেবল পায়তারাই কসিতেছেন। কাজ কি করিয়াছেন তাহা আমরা জানি না। কেবল আলাপ-আলোচনার কথাই আমরা শুনিতে পাই এবং প্রত্যেকটিই না কি গুরুত্বপূর্ণ। তবে একটি কাজের মত কাজ তিনি করিয়াছেন। মিঃ জিন্নাকে দিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত শান্তির যুক্ত আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আদি পর্ব্বে লর্ড ওয়াভেল এই চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, যেখানে মুসলিম লীগ দল হিন্দুদের বিপর্য্যস্ত করে সেটাকে তিনি অশান্তি বলিয়া মনে করেন না। কলিকাতা নরমেধ-যজ্ঞ সম্বন্ধে তিনি দয়া-পরবশ হইয়া একবার মুখ খুলিয়াছিলেন লীগের দায়িত্ব এড়াইবার প্রয়াস-রূপে। নোয়াখালি, ত্রিপুরা সম্পর্কে স্পীক-টি নট। বিহার হাঙ্গামায় উল্টা ফল ফলিলে তিনি অবশ্য মুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন হিন্দুদের বিরুদ্ধে। সেই সঙ্গে তাঁহার টিপ্পনীটিও প্রণিধানযোগ্য—"আমি আনন্দিত যে, এ পর্য্যন্ত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ শান্তিপূর্ণ আছে এবং এই হত্যা-যজ্ঞ হইতে দূরে আছে।" সত্য গোপন ও মিথ্যা প্রচারে লীগ-নেতা মিঃ জিন্নার মত অতুলনীয় দক্ষতা এক বৃটিশ সরকার এবং লীগের অনুচরবর্গ ছাড়া আর কাহারও আমরা দেখি নাই। অথচ লীগ-প্ররোচিত পাঞ্জাবের হাঙ্গামা সম্পর্কে তিনি নীরব রহিলেন।

মিঃ জিন্না অনুরোধে ঢেঁকি গিলিলেন সত্য, কিন্তু ইহার যে কোন ফলই হইবে না তাহা সকলেই জানেন। যিনি 'টু-নেশন' থিওরীর চ্যাম্পিয়ন, তিনি যে সত্যকারের শান্তি চান এ কথা কোন নির্ব্বোধও বিশ্বাস করিবে না। ১৬ই আগষ্ট হইতে এই যে ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাবানল, ইহা তাঁহারই সৃষ্ট এবং জিন্না-চার্চ্চিল-কোম্পানীর দ্বারা পুষ্ট। যেখানেই মুসলিম লীগ ক্ষমতা হাতে পাইয়াছে সেখানেই অপর সম্প্রদায় লাঞ্ছিত নির্য্যাতিত হইতেছে। বাঙ্গালা তাঁহার প্রধান ঘাঁটি। গত দশ বৎসর ধরিয়া লীগ সচিবসঙ্ঘ এখানে যে তাণ্ডব চালাইতেছেন, তাহা ইতিহাসের যে কোন কলঙ্কমসী-লিপ্ত কাহিনীকে লজ্জা দেয়। কলিকাতায় সশস্ত্র পাঠান পুলিশ আনিবার উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট। ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া ১৪ই এপ্রিল সোমবার রাত্রিতে ১০০ নং হ্যারিসন রোডে যে ঘটনা ঘটিল, কোন পশুও তাহাতে লজ্জা বোধ করিত। সশস্ত্র পাঠান পুলিশ বাড়ীর ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলাকে তো যথেচ্ছা প্রহারে জর্জ্জরিত করেই, একটি পাঠান পুলিশ একটি মহিলার স্বামীকে সঙ্গীনের খোঁচা মারিয়া জোর করিয়া বাহিরে লইয়া যায় এবং আর এক জন পাঠান পুলিশ উক্ত মহিলাকে ধর্ষণ করে। ইতিপূর্ব্বে যুগীপাড়ায় পুলিশ যে অত্যাচার করিয়াছে তাহাও মনে রাখিতে হইবে। বাড়ী হইতে লোককে টানিয়া বাহির করিয়া গুলী করার কথাও বহু শুনা গিয়াছে। দেশপ্রিয় পার্কের নিকটে একটি বাঙ্গালী তরুণীকে পাঠান পুলিশ লরীতে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

এগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। ইহার পিছনে একটা পরিকল্পনা, একটা অভিসন্ধি যে আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পাঠান পুলিশ কেন আমদানি করা হইল তাহার কারণ দর্শাইয়া মিঃ সুরাবর্দ্দী বলিয়াছেন যে, হিন্দু পুলিশের উপর তাঁহার আস্থার অভাবের জন্যই পাঠান পুলিশ আমদানি করা হইয়াছে। লীগপন্থীদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিপীড়নে হিন্দু পুলিশ বাধাস্বরূপ বিবেচিত হওয়াই যে এই অনাস্থার কারণ ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই পাঠান পুলিশরা জানে যে, লীগ কর্ত্তৃক তাহারা নীত হইয়াছে লীগের কার্য্য করিবার জন্য, অর্থাৎ সংখ্যালঘু নিপীড়নের জন্য। সচিবসঙ্ঘ তাহাদের মুরুব্বী অতএব তাহাদের সাত খুন মাফ। দুঃসাহস চরম সীমায় উঠা আশ্চর্য্য নহে। তাহাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইলে উজীরে আজম গোসা করেন। ১ই বৈশাখ বুধবারে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য হরতাল দিবস পালন করাতে তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া বলেন যে; এইরূপ করিলে কি করিয়া শান্তি ফিরাইয়া আনা যায়। পাঠান পুলিশের সম্পর্কে অভিযোগ করিলে না কি নাগরিকদের অপরাধ হয়, কারণ তাহাতে পুলিশ বাহিনীর মনোবল কমিয়া যায়। দোষী ধরা পড়িলে যে মনোবল কমিয়া যায় তাহা আমরা জানি, কিন্তু বাঙ্গালা সরকারের পক্ষপাতিত্বরূপ টনিকে তাহারা পুনরায় বলীয়ান্ হইয়া উঠে। জনমতের বিরুদ্ধে প্রধান-সচিব বলেন যে, বাজে কথায় তিনি বিশ্বাস করেন না। তাঁহার মতে মহিলাটির করুণ কাহিনী, ডাঃ বামন দাসের মত বিখ্যাত ধাত্রীবিদের রিপোর্ট সবই বাজে। কিন্তু এই অত্যাচার সংখ্যাগরিষ্ঠদের কাহারও প্রতি হইলে তিনি নিশ্চয়ই এই ভাবে নিশ্চেষ্ট থাকিতেন না।

মন্ত্রী মিশনের আগমনের পর হইতে লীগ নেতারা রক্তারক্তি কাণ্ড বাধাইবার হুমকী দিতেছিলেন। বাঙ্গালার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম তাহারই অভিব্যক্তি। বিহার হাঙ্গামার পর মিঃ জিন্না মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "কিন্তু জানিয়া রাখ, যতক্ষণ না বুঝিব তোমরা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াছ, ততক্ষণ আমি হুকুম দিব না।" উদ্দেশ্য, হিন্দুদিগকে জানানো যে অপ্রস্তুতের ঠেলাই এই, প্রস্তুত হইলে কি হবে বুঝিয়া লও। যে মিঃ জিন্না সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় সহস্র সহস্র নরনারীর মৃত্যুর জন্য দায়ী, বড়লাটের উপরোধে এই যুক্ত আবেদন স্বাক্ষরে মহাত্মাজী মিঃ জিন্নার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইতে পারেন কিন্তু আমরা প্রবঞ্চিত হইব না। লীগ-দুর্বৃত্তদের প্রলয় তাণ্ডব ভারত-ব্যাপী চলিতেছে, তাহা অস্বীকার করিব কি করিয়া?

মহাত্মাজী কায়েদে আজমের কায়দায় আনন্দিত। বড় লাট আশা করিতেছেন যে, শান্তিপূর্ণ ভাবে দেশের শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন। তাঁহাদের এই অপটিমিজমে আমরা বিস্মিত। তবে রাজনৈতিক কূট-চাল হিসাবে তাঁহাদের মনোভাবের ব্যাখ্যা করা যায় বটে। কংগ্রেস এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উভয়েই লীগ-তোষণকারী। বিহারের হাঙ্গামায় কংগ্রেসী নেতাদের হিন্দুদের উপর হুমকী ও গুলীবর্ষণের কথা সকলেরই স্মরণ আছে। কিন্তু কলিকাতা, নোয়াখালি, ত্রিপুরার জন্য মিঃ জিন্নাকে তাঁহারা অপরাধী বলিতে সাহস করেন নাই। ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার মূলে রহিয়াছে স্বয়ং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট। মন্ত্রী মিশন অখণ্ড ভারতের ধুয়া ধরিয়া ভারতকে খণ্ড করিবার চেষ্টা করেন তিনটি প্রদেশ-মণ্ডল গঠন করিয়া। তন্মধ্যে দুইটির শাসন-ভার তুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন মুসলিম লীগের হাতে। লীগকে তুষ্ট করিবার জন্য সেই দুইটি মণ্ডলের কিঞ্চিন্যূন অর্দ্ধেক অন্য সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। ওদিকে রাজন্যবর্গদেরও তলে তলে উস্কানী দেওয়া হইয়াছিল কেন্দ্রীয় সরকার হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার। উদ্দেশ্য, তৃতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতকে লোক-দেখানো স্বাধীনতা দিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ করা। পরে যুদ্ধের সম্ভাবনা কাটিয়া গেলে অথবা যুদ্ধে জয়ী হইলে পাকিস্থান ও রাজস্থানগুলি ঘাঁটি করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষের উপর বৃটিশ-আধিপত্য বিস্তার করা। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, যে সকল স্থান হিন্দুস্থানের বাহিরে থাকিবে সেগুলি প্রকৃত পক্ষে বৃটিশের অধীনেই থাকিবে। মুসলিম লীগ এ অবধি স্বীকার করিয়াছে যে, পাকিস্থান বৃটিশ ডোমিনিয়ন হিসাবে তাহাদের অধীনেই থাকিতে চায়। অতএব ইহারা যে স্বাধীনতার এবং দেশের শত্রু সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। এই ঘরভেদী বিভীষণের দলের প্রতি স্বাধীনতাকামী কংগ্রেসের তোষণ-নীতি আমাদের অত্যন্ত বিসদৃশ এবং কাপুরুষতাপূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আসাম প্রথমেই আপত্তি তুলিলেন। হিন্দু-প্রধান এবং কংগ্রেস-মতাবলম্বী আসামকে কোন্ অধিকারে লীগের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইবে? আসাম আপত্তি না করিলে কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড সম্ভবতঃ বিনা আপত্তিতে মন্ত্রী মিশনের ব্যবস্থা গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু ইহার পর আর মুসলিম-তোষণ-নীতিকে অত দূর ঠেলিয়া লইয়া যাইতে সাহস করিলেন না। কংগ্রেসের দুর্ব্বলতা লীগ বুঝিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা স্থির করিল হাত থাকতে মুখোমুখী কেন? মুখের কথায় যাহা হয় নাই, হাতের জোরে তাহা হইতে পারে। কংগ্রেস অহিংস হইতে পারে কিন্তু লীগ অহিংস নয়। শুরু হইল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম! ১৬ই আগষ্ট। তার জের আজও মেটে নাই।

মুসলিম লীগের আজিকার অবস্থার ও শক্তির (?) জন্য কংগ্রেসই দায়ী। খিলাফৎ আন্দোলন স্বীকার করিয়া দল বজায় রাখা, পৃথক্ নির্ব্বাচনে রাজী হইয়া ঘর সামলাইবার চেষ্টা—কোন প্রয়োজনই ছিল না। খিলাফতের সহিত ভারতের কোন সম্পর্ক ছিল না, তথাপি ভারতীয় মুসলমানকে হাতে রাখিবার জন্য কংগ্রেস খিলাফৎ-আন্দোলনে যোগ দিলেন। ভারতীয় মুসলমান কংগ্রেসের দুর্ব্বলতার ও নিজের পৃথক্ সত্তার সন্ধান পাইলেন। ক্রমে গোলটেবিল বৈঠক, মিঃ জিন্নার চৌদ্দ দফা, সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ এবং কংগ্রেসের মোসলেম-প্রীতির পরিচয় না-গ্রহণ না-বর্জ্জনরূপ অদ্ভুত নীতি। পাকিস্থানের কানাঘুষা তখনই শোনা গিয়াছিল, কিন্তু কংগ্রেস তাহা শুনিয়াও শুনেন নাই। বাঙ্গালায় ইহার ফল ফলিল বিষময়। দেখিতে দেখিতে হিন্দুর রাজনৈতিক ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল। না-গ্রহণ-না-বর্জ্জন নীতি পাকিস্থান-দৈত্য প্রসব করিল। আজ সেই দৈত্য ভারতের অংশ গ্রাস করিতে অগ্রসর। আমরা বড়লাট মিণ্টোর কূট-বুদ্ধির নিন্দা করি, র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকে কুচক্রী বলি, তৃতীয় পক্ষকে দোষারোপ করি—কিন্তু প্রকৃত দোষী কে?

পৃথক্ নির্ব্বাচনের ফাঁকে 'দুই নেশন' মতবাদের গোড়ায় পত্তন হইল। অযোগ্য ও অক্ষম যাহারা, স্বাতন্ত্র্য কি তাহাদের সম্ভব?

তাহা যে সম্ভব নয় মুসলিম লীগ তাহা ভাল করিয়াই জানে। সেই জন্ত তাহাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হইয়া হইয়াছে হিন্দুর বিরুদ্ধে। যেখানে মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ, বাঙ্গালা ও পাঞ্জাবের সেই অংশ এবং আসামকে কুক্ষিগত করিবার প্রয়াস চলিতেছে। বৃটিশ সেই চেষ্টায় সাহায্য করিতেছে প্রীতি সহকারে এবং কংগ্রেস নিরপেক্ষ রহিয়াছে মুসলিম-তোষণ নীতি নষ্ট হইবার ভয়ে। কংগ্রেস যত মনে করিতেছেন যে, ইংরেজ চলিয়া গেলে ঘর গোছাইবেন, ইংরেজ ততই ঐক্য স্থাপনে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছেন। ১৫ মাসের মধ্যে ঘর গোছান হইবে না—বৃটিশও সম্পূর্ণ ভাবে ভারত ছাড়িয়া যাইবে না। কংগ্রেসের আশা আকাশ-কুসুম সম বাতাসে মিলাইয়া যাইবে!

বৃটিশ অথবা লীগ ইঁহাদের এক ভারতীয় অমুসলমান দলন ছাড়া অন্য কোন বাঁধা নিয়ম নাই। অবস্থার ফাঁকে সুবিধা মত নিয়ম গঠন করেন। মিঃ জিন্না বলিতেছেন যে, হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক্ নেশন। তাঁহাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আলাদা, তজ্জন্য হিন্দুর সহিত এক রাষ্ট্রের অধীনে মুসলমানের বাস করা দুঃসাধ্য। আবার বাঙ্গালায় মিঃ সুরাবর্দ্দী বলিতেছেন, "হিন্দু ও মুসলমান বাঙ্গালার অপরিহার্য্য অঙ্গ। একেকে বাদ দিয়া অপরে টিকিতে পারে না।' আপাত দৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী হইলেও উঁহাদের উদ্দেশ্য এক। ভারতকে বিভক্ত করিতে হইবে মুসলিমদের পাকিস্থানের জন্য, কিন্তু পাকিস্থান হইতে হিন্দুদের বাহির হইতে দেওয়া হইবে না। বাঙ্গালা দেশে জমীদারী প্রথা বিলোপের জন্য লীগ সচিবসঙ্ঘ উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন; কারণ, বাঙ্গালায় হিন্দু জমীদারের সংখ্যা অধিক, ওদিকে যুক্তপ্রদেশে লীগের অধিকাংশ মাতব্বরই বড় বড় জমীর মালিক, সুতরাং সেখানে গাঁও হুকুমৎ বিলের মুসলিম লীগ বিরোধিতা করিতেছেন। দরিদ্র কৃষকদের উপকার করাও লীগের মতে অন্যায়। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী ঠিকই বলিয়াছেন, "সংখ্যালঘিষ্ঠ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ কথাটা অর্থহীন। আজিকার ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। বুভুক্ষু নগ্ন জনসাধারণই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর ধর্ম্মের নামে, বুলির আড়ালে যে সব কায়েমী দল ইহাদের শোষণ করে তাহারাই সংখ্যালঘিষ্ঠ।" কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। মুসলিম স্বার্থ বিপন্ন হইবার মিথ্যা ধুয়া তুলিয়া কংগ্রেসী সরকারকে যত দূর সম্ভব বিপন্ন করা এবং মুসলিম জনসাধারণের মনে হিন্দু-বিদ্বেষ যথাসম্ভব জিয়াইয়া রাখিয়া নিজেদের কোলে ঝোল টানাই লীগের রাজনীতি। যুক্তপ্রদেশের সাধারণ হিন্দু-মুসলমানদের উন্নতির ব্যবস্থাও ঠিক এই কারণে হিন্দু-আতঙ্কের মুখোস পরিয়া বানচাল করিবার অপচেষ্টায় লীগ আত্মনিয়োগ করিয়াছে। লীগ দলের 'হুইপ' মিঃ রিজওয়ানউল্লা তাহা কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে বিলের ফলে গ্রামের সকলেরই উপকার হইবে, তবু তাঁহাদের আপত্তি উপেক্ষা করিয়া সকলের ভাল করিবার অধিকার কংগ্রেসের নাই। অর্থাৎ মুসলমান-স্বার্থ বিপন্নের ধ্বনিটা একেবারেই অমূলক, লীগের মোড়লী বজায় রাখাই আসল কথা। এই অদ্ভুত এবং হীন মনোবৃত্তি যে দলের, কংগ্রেস তাহাদের তোষণ অথবা তাঁহাদের সঙ্গে আপোষ করিবার চেষ্টা করেন কেন তাহা আমাদের বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

বাঙ্গালার প্রতি কংগ্রেসের কোন দিনই বিশেষ প্রীতি নাই। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া মুসলিম লীগ-সচিবসঙ্ঘের হাতে বাংলার চরম দুর্দ্দশা চলিতেছে। পঞ্চাশের মন্বন্তর তাহাদেরই গাফিলতি এবং অব্যবস্থার বিষময় ফল, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। প্রাদেশিক উন্নয়নের অর্থ কোন্ বাজে খরচ করা হইয়াছে তাহা প্রায় সকলেই জানেন। সুজলা-সুফলা বাঙ্গালা লীগের শাসনে শ্মশানে পরিণত। সকল বস্তু বাঙ্গালী চুপ করিয়া সহ্য করিয়াছে। কারণ, অশান্তি সৃষ্টি করা বাঙ্গালীর ধাতে নাই। অন্নাভাবে প্রাণ দিয়াছে, বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা করিয়াছে, তবু দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হইতে দেয় নাই। সেই নিরীহ শান্তিপূর্ণ বাঙ্গালীর বুকে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বীভৎস তাণ্ডব এক পশু ছাড়া আর কাহারও দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব ছিল না। ১৬ই আগষ্ট যে সাম্প্রদায়িক দাবানল জ্বলিয়াছে আজও তাহার লেলিহান বহ্নি-শিখা নিবে নাই। কারণ, লীগ-সচিবসঙ্ঘ এবং বৃটিশ সরকার রহিয়াছে ইহার পিছনে। কলিকাতা, নোয়াখালি, ত্রিপুরা ইত্যাদির নরমেধ-যজ্ঞে লীগ দল উৎফুল্ল হইয়াছে। কিন্তু আমরা কংগ্রেসের নিকট হইতে সমবেদনা, সহানুভূতি ও সাহায্য আশা করিয়াছিলাম। অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড নীতির দোহাই দিয়া বাঙ্গালা সম্পর্কে নীরব ছিলেন। কত হিন্দুর প্রাণ গেল, কত লোকের ধর্ম্ম গেল, কত নারীর সতীত্ব গেল তাহার হিসাব নাই। অথচ লীগ-সচিবসঙ্ঘ 'সব বাজে কথা, বাঙ্গালী হিন্দুরা কল্পনাপ্রিয়' ইত্যাদি বিদ্রূপ-বাক্যে এই সকল হৃদয়বিদারক ঘটনা উড়াইয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় বার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় সুরাবর্দ্দী পাঠান পুলিশের ব্যবস্থা করিলেন জনগণের শান্তিরক্ষাকল্পে। কিন্তু সেই রক্ষকই হইল ভক্ষক। নারীহরণ, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, হত্যা কোন কিছুই ইহারা বাদ দিল না। পশুর অধম এই সরকারী গুণ্ডারা শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে চিরদিনের জন্য কালিমা লেপন করিয়া দিল। এত অত্যাচারেও কংগ্রেস নীরব রহিলেন। তাঁহাদের নীরবতায় সাহস পাইয়া লীগ-গুণ্ডারা পাঠান পুলিশের ও লীগ-সচিবসঙ্ঘের আশ্রয়ে নির্ব্বিবাদে উদ্দাম নৃত্য করিতে লাগিল। লীগের শাসনে পাকিস্থানে বাঙ্গালী হিন্দুর কি অবস্থা হইবে তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা সকলেই পাইল এবং কাহারও নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্যের আশা নাই তাহাও হিন্দুরা বুঝিল। ভীত হইল ইহা ভাবিয়া যে পাকিস্থান স্থাপনার পূর্ব্বেই যদি এই অবস্থা হয়, পুরোপুরি স্থাপিত হইলে তো হিন্দুদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দিবে। ওদিকে সরকারী ভাবে দরওয়ান, কেরাণী, পুলিশ অফিসার, ম্যাজিষ্ট্রেট—সকল সরকারী পোষ্টে মুসলিমদের চাকুরী দেওয়া এবং হিন্দুদের অতিক্রম করিয়া উন্নয়ন করিবার প্রথা সজোরে চলিতে লাগিল। শিক্ষা-ক্ষেত্রও তাহাদের নেক-নজর এড়াইল না। বিশ্ববিদ্যালয়কে মুসলিম আওতায় না আনিতে পারিয়া, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। বাঙ্গালীর সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ধন-প্রাণ, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সবই ধ্বংস করিবার জন্য পূর্ণবেগে লীগের সমরায়োজন চলিল।

বাঁচিবার জন্য বাঙ্গালার সংখ্যালঘিষ্ঠ দাবী করিল বঙ্গ-ভঙ্গ। লীগ দল উত্তেজিত হইলেন, কংগ্রেস নাক সিঁটকাইলেন। ঠিক এই সময় পাঞ্জাবেও মুসলিম লীগের ক্রুসেড চলিতেছিল। পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ, 'ঢ়েকে লেঙ্গে'র জবাব ঢ়েকে দেঙ্গে ঠিক করিল।

শুরু হইল খুনোখুনি। শেষ হইল পাঞ্জাব-ভঙ্গে কংগ্রেসকে রাজী করাইয়া। যে সকল কারণে পাঞ্জাব-ভঙ্গ করিতে হয় বাঙ্গালায়ও সেই সকল কারণ বিদ্যমান। বাধ্য হইয়া কংগ্রেসকে বঙ্গভঙ্গও অনুমোদন করিতে হইল। বাঙ্গালার হিন্দু বঙ্গে পাকিস্থানী অত্যাচারের উত্তর দিল বঙ্গ-ভঙ্গ দাবী করিয়া। মুসলিম লীগ এবং কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ বণিক ছাড়া সকল দলই এই দাবীকে সমর্থন করিল। লীগ-সচিবসঙ্ঘের উত্তেজনা প্রধান-মন্ত্রীর গরম গরম বিদ্রূপ-বাণী হঠাৎ যেন কোথায় মিলাইয়া গেল। তাঁহারা বুঝিলেন, জোঁকের মুখে চুণ পড়িয়াছে।

এদিকে বাঙ্গালার শাসন-ব্যবস্থায় অযোগ্যতা ও সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দল অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের সহকারী সভাপতির নিকট স্মারক-লিপি প্রেরণ করিলেন। অবশ্য ইহার বিশেষ কোন ফল হইবে তাহা কেহই আশা করেন না। পরিষদের কংগ্রেসী দল পরিষদ-সভায় আসেন, যান, তামাক খান। কেহই তাঁহাদের 'কেয়ার' করেন না। আমাদের মতে বিরোধী দল সভায় যোগদান হইতে বিরত হইলে অনেকটা আত্মসম্মান বজায় রাখিতে পারিতেন। আর যাঁহাকে স্মারক-লিপি পাঠাইয়াছেন, তিনি 'মুখেন মারিতং জগৎ' ছাড়া আর কিছু করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। মুসলিম লীগের কেশ স্পর্শ করিবার তাঁহার সাহস নাই। তাহা হইলে তোষণ-নীতি চলিবে কি করিয়া? বাঙ্গালার নরমেধ-যজ্ঞের সময় তিনিই সহকারী সভাপতির গদীতে ছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালার জন্য একটি আঙ্গুল পর্য্যন্ত নাড়া প্রয়োজন মনে করেন নাই। অথচ বিহারে মুসলিম লীগ দলকে রক্ষা করিতে তিনি ছুটিয়া গেলেন, এমন কি, হিন্দুদের উপর বর্ব্বর ভাবে গুলীবর্ষণের আদেশ দিলেন। তবুও এই স্মারক-লিপির মূল্য আছে এই হিসাবে যে, লীগ-মন্ত্রিসভার কীর্ত্তিকলাপ জগতের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইবে।

এই স্মারক-লিপিতে মোটামুটি চার দফা অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। (১) বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, (২) বাঙ্গালা সরকারের শাসন-পরিচালন ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অযোগ্যতা বিদ্যমান রহিয়াছে, (৩) শাসন-পরিচালনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত অসঙ্গত এবং সাম্প্রদায়িক নীতি অনুসৃত হইতেছে ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির উপর মোটেই ন্যায়পরায়ণতা দর্শিত হইতেছে না এবং (৪) যুদ্ধোত্তর উন্নয়নের সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা নাই এবং পরিকল্পনা-খাতে ব্যয়িত অর্থ অপব্যয় মাত্র। এই সকল অভিযোগ প্রমাণের জন্য বাঙ্গালা সরকারের আয়-ব্যয়ের অবস্থা ও ব্যবস্থা, বঙ্গীয় শাসনকার্য্যে তদন্ত কমিটির মন্তব্য, অডিট রিপোর্ট হইতে প্রয়োজনীয় অংশ স্মারক-লিপিতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

বাঙ্গালার মন্ত্রিসভার অযোগ্যতা ও সাম্প্রদায়িক নীতিই এই সকল দুর্নীতির কারণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ নৌকা-নির্ম্মাণ বাবদ ৩ কোটি টাকা লোকসানের কথাটাই ধরা যাক। এমন কতকগুলি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে নৌকা-নির্ম্মাণের কন্‌ট্রাক্ট দেওয়া হইয়াছিল, যে সকল প্রতিষ্ঠানে মন্ত্রীরা বা তাঁহাদের পত্নীরা অংশীদার বা ডিরেক্টর। অসামরিক সরবরাহ বিভাগে মাল চালান দেওয়া, হিসাব রাখা প্রভৃতির অব্যবস্থা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদিগকে লীগপন্থী করিতে হইলে সাম্প্রদায়িক নীতি তো অবলম্বন করিতে হইবেই, অধিকন্তু, তাঁহারা যাহাতে প্রচুর পরিমাণে লাভ করিতে পারে তাহার সুযোগও দিতে হইবে। মুস্কিল হইয়াছিল মুসলিম কৃষক ও শ্রমিক লইয়া। তাহাদের লাভের কোন ব্যবস্থা করা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। এই সমস্যার সমাধান করিয়াছে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। মার-পিট, লুঠতরাজে ব্যস্ত থাকিলে চিন্তা করিবার অবসর পাইবে না। তাহা ছাড়া লুঠের মালও এক প্রকার লাভ।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন প্রবল বেগে আরম্ভ হইতেই দেখা গেল, অকস্মাৎ মুসলিম লীগের পাণ্ডা মিঃ সুরাবর্দ্দী অখণ্ড ও সার্ব্বভৌম বাঙ্গালার প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছেন। গদগদ কণ্ঠে বলিতেছেন যে হিন্দু হোক আর মুসলমানই হোক—বাঙ্গালী বাঙ্গালী। তাহারা এক দেশের অধিবাসী, এক তাহাদের ভাষা, এক তাহাদের সাহিত্য, এক তাহাদের কৃষ্টি। বঙ্গভঙ্গ করিলে সকলই রসাতলে যাইবে। টু-নেশন থিওরীর চাম্পিয়নের মুখে এ ধরণের কথা ভূতের মুখে রামনামের মতই বিস্ময়কর!

অনুসন্ধানে জানা গেল, ইহার পিছনে আরও চমকপ্রদ ব্যাপার লুক্কায়িত ছিল। বিশ্ববরেণ্য নেতাজীর নাম ভাঙ্গাইয়া দাদাজী শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় গত চারি মাস ধরিয়া মুসলিম লীগের কয়েক জন নেতার সহিত নিভৃতে আলাপ চালাইতেছেন। তাঁহার স্বরূপ আজ সকলেই জানে। তাই দেশের সকল রাজনৈতিক দলই একে একে তাঁহার অসহ্য সঙ্গ ত্যাগ করিল। বাঙ্গালা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি তাঁহার নেতৃত্ব মানিল না; কংগ্রেসের বড়কর্ত্তাদের প্রভুত্ব তাঁহার সহ্য হইল না; ফরওয়ার্ড ব্লক তাঁহাকে একচ্ছত্র সম্রাটের গদী দিতে রাজী হইল না। তিনি তখন হিন্দু-জনমতের বিরুদ্ধে 'গাঁয়ে না মানুক আপনি মোড়ল' সাজিয়া মুসলিম লীগের সহিত প্যাক্ট করিয়া সার্ব্বভৌম বাঙ্গালা সৃষ্টি করিতে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, বাঙ্গালায় সমাজতন্ত্রমূলক রিপাবলিক গড়িতে হইবে। পন্থা অতি সহজ। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক হিন্দু-মুসলমান যদি যৌথ নির্ব্বাচন-প্রথার সাহায্যে একটা নূতন ব্যবস্থাপক সভা গঠন করে, আর মন্ত্রিমণ্ডলীর যদি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আধাআধি ভাগ হয়, তাহা হইলে সরকারী চাকরীও আধাআধি ভাগাভাগি হইবে এবং বাঙ্গালা দেশ একটা স্বাধীন গণতন্ত্রে পরিণত হইবে। আজ শরৎ বাবু সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া লীগের দুয়ারে গিয়াছেন। আমরা আশা করি, বাঙ্গালার এই নব মিরজাফরের কথায় বাঙ্গালার হিন্দু ভুলিবেন না, ভুল করিবেন না, কারণ তাহা হইলে অদৃষ্টে লীগের গোলামী অনিবার্য্য। কাজ হাসিল হইলেই মিঃ সুরাবর্দ্দী এণ্ড কোম্পানী শরৎ বাবুর অঙ্গবিশেষে পদাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিবেন ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

কেবল শরৎচন্দ্র কেন, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়কেও সার্ব্বভৌম বাঙ্গালার ভবিষ্য নেতা মিঃ সুরাবর্দ্দীর সঙ্গে দেখা গিয়াছে। একেবারে ব্রাহ্মস্পর্শ! বাঙ্গালার হিন্দু সাবধান! শ্রীযুক্ত বসু না হয় কংগ্রেসের নাম-কাটা সেপাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত রায় কাহার অনুমতি লইয়া অথবা কাহার সহিত পরামর্শ করিয়া মিঃ সুরাবর্দ্দীর সহিত আলোচনা করিতে গিয়াছিলেন? আমরা ইহার স্পষ্ট উত্তর চাই। যদি পরিষ্কার উত্তর দিবার ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে তিনি সার্ব্বভৌম স্বতন্ত্র বাঙ্গালা রাষ্ট্রগঠনের বিরুদ্ধে মত দিন, অথবা কংগ্রেস এসেমব্লি পার্টি হইতে পদত্যাগ করুন। এই প্রসঙ্গে আমরা আরও কয়েক জন

কংগ্রেসী সদস্যের নাম শুনিতে পাইতেছি। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী দলের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অমরকৃষ্ণ ঘোষ ও অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত বিমলকুমার ঘোষ ও শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদারও কি ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন বাঙ্গালা গঠন করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন?

বাঙ্গালার হিন্দুদিগকে মিষ্ট কথায় বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন মিঃ সুরাবর্দ্দী, একেবারে হাত-পা বাঁধিয়া একান্ত অসহায় ভাবে মুসলিম লীগের কবলে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু আর এই দুই শনিকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন স্বয়ং মহাত্মাজী। মুসলমানদের তুষ্ট রাখিবার জন্য তিনি 'জান' পর্য্যন্ত দিতে পারেন, নিজের নহে, অন্যান্য প্রদেশের নহে—কেবল বাঙ্গালার। বাঙ্গালার প্রতি তাঁহার উপেক্ষা ও বিদ্বেষ আজিকার নহে চিরকালের। মুসলমানদের সুবিধার জন্য যখন সিন্ধু প্রদেশকে বোম্বাই হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করা হয়, তখন মহাত্মাজীকে আপত্তি করিতে শুনিতে পাওয়া যায় নাই। আর আজ বাঙ্গালী হিন্দুকে বাঁচাইবার জন্য যখন একটি পৃথক্ প্রদেশ গঠন করিবার কথা উঠিয়াছে, তখন তিনি ইহা সমর্থন করিতে পারিতেছেন না কেন? মুসলিম লীগের দালালদের সহিত এত গোপন পরামর্শের হেতু কি? সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা হইতে আরম্ভ করিয়া আজ বাঙ্গালা যে সঙ্গীন অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, ইহার জন্য তিনি কতটা দায়ী তাহা স্বীকার না করিলেও অন্তরে বোঝেন না কি?

কিন্তু শরৎচন্দ্রের সার্ব্বভৌম বাঙ্গালা গঠনের তরী তীরে আসিয়া ডুবিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আক্রাম খাঁ তাহা চূর্ণ করিয়া দিলেন। আপাত দৃষ্টিতে বাঙ্গালার মুসলিম লীগের মধ্যে মিঃ সুরাবর্দ্দীর দল এবং মৌলানা আক্রাম খাঁর দলের মধ্যে একটা বিরোধ আমরা দেখিতে পাই বটে, কিন্তু পাকিস্থান সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ আছে বলিয়া আমরা জানি না। মিঃ সুরাবর্দ্দী হয়ত আশা করিয়া থাকিবেন, শরৎ বাবুকে দিয়া একবার অখণ্ড বাঙ্গালা স্বীকার করাইয়া লইতে পারিলে পাকিস্থান গঠনের সুবিধা হইবে। কারণ, যৌথ নির্ব্বাচন প্রভৃতি কয়েকটি সর্ত্তে শরৎ বাবু যখন অখণ্ড বাঙ্গালায় রাজা হইবেন, তখন মৌলানা আক্রাম খাঁর দলের বিরোধিতায় যৌথ নির্ব্বাচন প্রভৃতি সর্ত্ত ধূলিসাৎ হইবে—থাকিবে শুধু অখণ্ড বাঙ্গালা অর্থাৎ পাকিস্থান। শরৎ বাবুর মত বিচক্ষণ রাজনীতিকের ইহা বুঝিতে পারা উচিত ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে ব্যর্থ করিবার জন্য মুসলিম লীগ হিন্দুদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু তাহাতে কার্য্য উদ্ধারের আশা নাই দেখিয়া শরৎ বাবুকে তাহাদের দালালে পরিণত করিতে পারিয়াছে, ইহা আমাদেরই লজ্জার কথা। কিন্তু শরৎ বাবুর কি লজ্জা আছে?

শরৎ বাবুর সমাজতান্ত্রিক বাঙ্গালার ভাবী নবাব সুরাবর্দ্দী সাহেব দিল্লীতে গিয়া সার্ব্বভৌম বাঙ্গালার কথা কায়েদে আজম জিন্না সাহেবের শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন। কিন্তু শুনা যাইতেছে, কায়েদে আজম তাঁহার প্রস্তাবকে বিশেষ আমল দেন নাই! এ-ও গুজব যে, জিন্না সাহেবের দরবারে আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হইলে 'দুত্তোর' বলিয়া মনের দুঃখে বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া খাস নিজামী রাজ্য হায়দ্রাবাদে উজীরী কাঁদিয়া বসিবেন। অবশ্য স্বাধীন বাঙ্গালার নবাবের মত সেখানে দু'হাতে লুটিবার সুবিধা হইবে না। তবে বাঙ্গালার সরবরাহ মন্ত্রী থাকার সময় যাহা গুছাইয়া লইয়াছেন তাহাতে দু'চার পুরুষ দিব্য কাটিয়া যাইবে। কিন্তু যে নাজিমুদ্দীন সাহেবের ভয়ে তিনি সার্ব্বভৌম বাঙ্গালা প্রতিষ্ঠার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন, সেই নাজিমুদ্দীন সাহেব না কি আবার নিজামের উজীরীর পদের উমেদার! অহো, কি দুর্ভাগ্য!

সার্ব্বভৌম বাঙ্গালাকে লীগের হস্তে সঁপিয়া দিবার স্বপ্নে যাঁহারা মশগুল হইয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বপ্ন বানচাল হইবার উপক্রম হইয়াছে। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ লীগওয়ালাদের পরিষ্কার জানাইয়া দিয়াছেন যে, বাঙ্গালাকে যুক্তরাষ্ট্র হইতে বাহিরে রাখিবার কোন সড়যন্ত্রই তাঁহারা বরদাস্ত করিবেন না। বাঙ্গালার আজ যেরূপ অবস্থা তাহাতে যুক্ত নির্ব্বাচন ও 'ফিফটি-ফিফটি'র সাহায্যে সমস্যা সমাধানের কোন আশা বাতুলতা মাত্র। তাঁহারা বাঙ্গালার কংগ্রেস নেতাদেরও না কি নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, শুধু বাঙ্গালার সমস্যা পৃথক্ ভাবে সমাধানের চেষ্টা যেন তাঁহারা না করেন এবং স্বতন্ত্র প্রদেশ সৃষ্টির দাবী লইয়াই যেন তাঁহারা কাজ করিয়া যান। জিন্না সাহেবও সার্ব্বভৌম বাঙ্গালার বিরোধী, কারণ, যুক্ত নির্ব্বাচন মানিয়া লইতে তিনি সম্মত নন। অবশ্য বাঙ্গালার ঠুঁটো জগন্নাথ ব্যারোজ সাহেব এবং ইউরোপীয় ব্যবসায়ী দল দিল্লীতে গিয়া বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ওকালতি করিয়াছেন এবং এখনও করিবেন, কিন্তু তাহাতে আজ আর বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। এইবার শরৎচন্দ্র, কিরণশঙ্কর প্রভৃতি বর্ণচোরাদের কি অবস্থা হইবে?

নূতন মেয়র ও ডেপুটি মেয়র

১৫ই বৈশাখ মঙ্গলবার কলিকাতা কর্পোরেশনের এক বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৯৪৭-৪৮ সালের জন্য কলিকাতার মেয়র এবং মিঃ এম ভি গফ-গোভিয়া (অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান) ভোটাধিক্যে ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচিত হন। এই দ্বিতীয় পদের জন্য মুসলিম লীগ দলের মিঃ এস এম তৌফিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ৩৩-৪১ ভোটে পরাজিত হন। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে মিঃ গফ-গোভিয়াই সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বাচিত হইলেন।

কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা মিঃ গফ-গোভিয়াকে সমর্থন করেন এবং মুসলিম লীগ ও ইউরোপীয় এবং মনোনীত দল মিঃ তৌফিককে ভোট দেন। ইউরোপীয় দল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানকে পর্য্যন্ত ভোট দিতে নারাজ। বণিক্‌শ্রেণী স্বার্থ চেনে।

শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী কলিকাতা হাইকোর্টের এক জন বিখ্যাত এটর্নী। ১৯৩৬ সালে ৩নং ওয়ার্ড হইতে তিনি সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম ভারতীয় সিটি আর্কিটেক্ট স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর পুত্র।

মিঃ এম ভি গফ-গোভিয়া কলিকাতার ব্যবসায়ী-মহলের এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি। ১৯৪২ সালে এক উপ-নির্ব্বাচনে তিনি কর্পোরেশনের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। সেই সময় হইতেই তিনি জাতীয়তাবাদী দলের সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন। তিনিও কর্পোরেশনের জনৈক ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারীর পুত্র।

কর্পোরেশনে অনেক দলাদলি অনেক গলদ রহিয়াছে। তাহা

[১নং ওয়ার্ডে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সভায় হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ—শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাখনচন্দ্র বিশ্বাস, জীবানীতোষ ঘটক, জ্ঞান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি]

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালার সরকারও এই প্রতিষ্ঠানটিকে নেক-নজরে দেখেন না। আভ্যন্তরীণ গলদ দূর করিলে নিজ শক্তির জোরেই কর্পোরেশন দাঁড়াইতে পারিবে, সরকারের নিকট ভিক্ষা করিবার প্রয়োজন হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কর্পোরেশনের শক্তি করদাতারা। তাঁহাদের সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে একটু সচেতন হইলে কর্পোরেশনের শক্তিই বৃদ্ধি হইবে। আশা করি, নূতন মেয়র ও ডেপুটি মেয়র এই দিকে একটু দৃষ্টি দিবেন।

—

কলিকাতা হাইকোর্টে আসামের সরকারী উকিল

সম্প্রতি আসাম গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা হাইকোর্টে নিজস্ব উকিল নিযুক্ত করিয়াছেন আসামের সরকারী কেস পরিচালনার জন্য। পাটনা হাইকোর্ট স্থাপনার পূর্ব্বে বিহার সরকারও এই ভাবে কলিকাতা হাইকোর্টে নিজস্ব উকিল নিয়োগ করিতেন।

ক্যাপ্টেন সত্যেন্দ্রকিশোর ঘোষ আসাম সরকারের সিনিয়র গভর্ণমেণ্ট এডভোকেট নিযুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টে তাঁহার ব্যবহারাজীব হিসাবে বিলক্ষণ খ্যাতি আছে। ঘোষ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যাপক এবং ট্রেনিং কোরের এক জন অফিসার।

—

অশ্রু-অর্ঘ

১১ই বৈশাখ শুক্রবার অপরাহ্ণে ক্যাপ্টেন পি কে সেনগুপ্ত তাঁহার স্বীয় বাসভবনে রোগী দেখিবার কালে নিহত হইয়াছেন। অল্প কালের জন্য তিনি ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসে ছিলেন। পরে উহা ত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা-ব্যবসা আরম্ভ করেন। সুচিকিৎসক হিসাবে তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪২ বৎসর হইয়াছিল। তিনি অকৃতদার ছিলেন। তাঁহার মাতা জীবিত। আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

*   *   *   *

আসামের বিখ্যাত কংগ্রেসনেতা ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অন্যতম সদস্য অরুণকুমার চন্দ ১২ই বৈশাখ অপরাহ্ণে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৭ বৎসর হইয়াছিল। আসামের চা-বাগানের পক্ষ হইতে আইন সভায় ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরণ প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায়ই সম্ভব হইয়াছে। ১৯৪০ এবং ১৯৪২ সালে তিনি দুই বার কারাবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি মাতা, স্ত্রী, দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

*   *   *   *

১৮ই বৈশাখ শুক্রবার সকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি সহকারী রেজিষ্ট্রার এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে রেজিষ্ট্রার হ'ন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেহই এত দিন রেজিষ্ট্রারের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন নাই। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

*   *   *   *

সার যদুনাথ সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাঃ অবনীনাথ সরকার কলিকাতার প্রকাশ্য রাজপথে ধর্ম্মতলা অঞ্চলে ঘটনাবিশেষে আঘাত-প্রাপ্ত হইয়া ১৩ই বৈশাখ হাসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫১ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার দুই পুত্র, স্ত্রী এবং বৃদ্ধ পিতামাতা বর্ত্তমান। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

*   *   *   *

আমাদের পরম বন্ধু কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্য গত মঙ্গলবার যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ১৮ বৎসর। এত অল্প বয়সে এরূপ এক জন প্রতিভাবান কবির মৃত্যুতে দেশ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইল। 'মাসিক বসুমতী'র তিনি এক জন নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা স্বজন-বিয়োগের ব্যথা অনুভব করিতেছি।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দেখ্‌বো বলে ব'সে ব'সে কাঁদতুম।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ
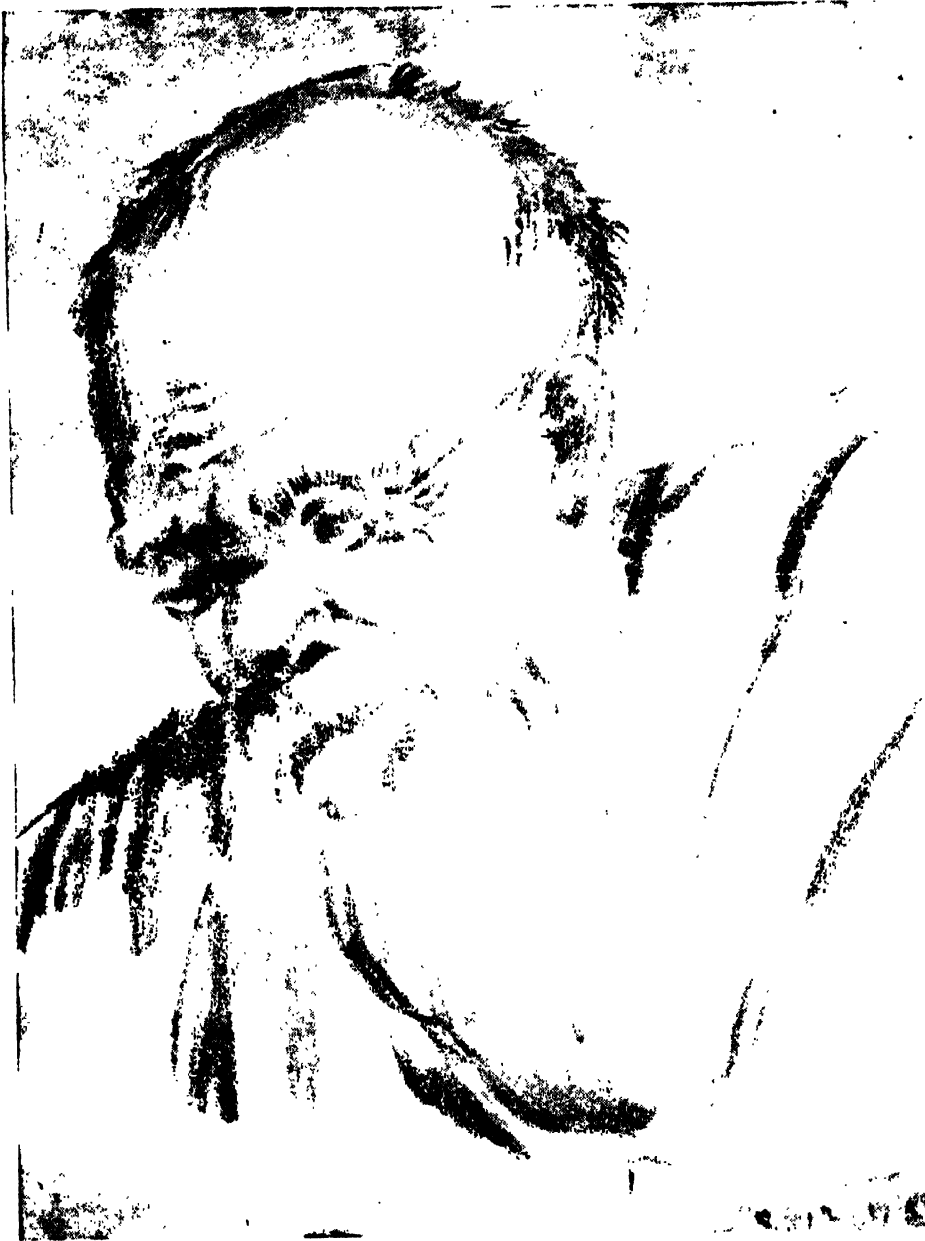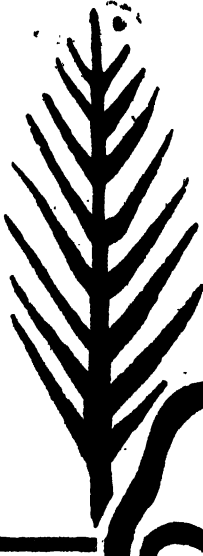
অনেকেই পড়েছেন—ঠাকুরের প্রধান কথাই ছিল, ভগবানকে লাভ করবার পর অন্য যা কিছু করতে পারো। অর্থাৎ মনুষ্য-জন্মের উদ্দেশ্য ভগবানকে প্রথম লাভ করা, আর যা কিছু তার পর। শুনে সকলেই অবাক্ হয়ে যান, অনেকে সরেও যান। সেটাকে আমরা শেষ কথা বলেই জানি, সেটাকে তিনি প্রথম করণীয় বলতেন। কারণ কি? ভীড় কমাবার জন্যে না কি? যাঁর কাছে সত্যই ভগবান, তিনি কি মিথ্যা বলতেন না কি? সংসারীদের কাছে টাকা রোজগারই প্রধান কথা। তাতে খাওয়া-পরা ইচ্ছানুরূপ চলে; ঘর-বাড়ী, বিলাস-ব্যসন, ছেলে-মেয়ে মানুষ করা, এক কথায় অনেক সাধই মেটে। তার পর যত ইচ্ছা নিশ্চিন্তে ভগবানের নাম কর না। ধ্যান-জপ, সাধন-ভজন তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না। ইত্যাদি জ্ঞানের কথায় ও তর্কে আমরা অভ্যস্ত। ভগবানকে লাভ করতে যদি দিনই ফুরিয়ে গেল, তবে আর হ'ল কি?

এই হচ্ছে লোক-সাধারণের কথা। তাঁরা কেহ বুদ্ধিহীন মন, ভাল কথা শুনতেই আসতেন, যদিও উক্ত ভাবেই ভাবিত বা গঠিত, যেটা সংসারীদের স্বাভাবিক। তাই ঠাকুরের কথা শুনে চমকে যেতেন। ঠাকুর মানুষ দেখলেই চিনতে পারতেন, যে যেমন তাঁকে তার আবশ্যক মত কথা—যাতে তার মঙ্গল হয়, সে ক্রমে এগুতেও পারে—তাও বলতেন। সংসারে কি ভাবে থাকা উচিত, প্রভৃতি উপদেশান্তে বিদায় দিতেন। কিন্তু মনুষ্য-জন্ম পেয়ে প্রথম কাজ যে ভগবান লাভ করা বা তার চেষ্টা করা সে কথাটি বলতে ভুলতেন না। বলতেন—সাংসারিক সুখ-সুবিধার জন্যে টাকা রোজগারকে ভগবানের চেয়ে লোভের বা লাভের বস্তু ভেবে রেখেছ ও তাকে প্রথম স্থান দিয়েছ, কিন্তু এটা ভাবতে পার না কেনো যে ভগবানকে পেলে "অপাওয়া" বলে' কিছু থাকে না। "তাঁতেই যে সব, তিনিই যে সব।" থাক্—

যিনি ভগবানের বিশেষ আত্মীয়রূপে আসেন, তাঁর কাজেরও বিশেষত্ব থাকে। কোনো একটা বিশেষ বা নূতন কিছু বলে' দিতেই আসেন। এটিও ছিল তার একটি। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার পর বা নির্ব্বিকল্প সমাধির পর না কি একুশ দিনের অধিক দেহ থাকে না। কিন্তু তাঁর তো তা হলে চলবে না, তিনি যে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন, তাঁর আসা যে নারদাদির বা আচার্য্য শঙ্করাদির মত উদ্দেশ্যমূলক।—লোক শিক্ষার্থে দেহ রাখা। সিদ্ধির পর তাই ছটফট করে ঘুরে বেড়াতেন, কথা কবার (মনের মতো) লোক পেতেন না, খুঁজতেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাগানের কুটীবাড়ির ছাদে উঠে—চীৎকার করে ডাকতেন—"ওরে তোরা কে কোথা আছিস্ আয়, আমি কথা ক'বার লোক পাচ্ছি না। তোরা আয়।"

তখন না বুঝলেও পরে দেখা গেল—কি সব সুন্দর সুন্দর, উদাস-মনা তরুণ ও কুমার যুবকেরা, বাগানে ও ছায়া-শীতল পঞ্চবটীতে ঘুরছেন। কখনো নিজেদের মধ্যে এক-আধটু কথা ক'ন, প্রায়শঃ নীরব।—ঠাকুর দেখে খুশি হতেন, হাসতেন, বাজে লোক না থাকলে নিজের কুটীরে তাদের ডেকেও নিয়ে যেতেন, কিছু প্রসাদ দিতেন,—নিজের সামনে খেতে বলতেন। নিজে আনন্দময়। যেন তাঁর

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ

ডাকের উত্তর হাজির, অভীষ্টের দেখা মিলছে! যাঁদের খুঁজছিলেন ও ডাকতেন—তাঁরাই ছিলেন এঁরা।—না বয়স্ক, না প্রবীণ, সকলেই তরুণ—ফুটনোন্মুখ পুষ্প সদৃশ। দুয়েকটি করে' বাড়ছিল। তাঁর আনন্দও বাড়ছিল।

পূর্ব্ব-কথিত যে অপূর্ব্ব প্রস্তাব—"আগে ভগবান লাভ—পরে অন্য কথা বা আর যা কিছু" তা ছিল (বোধ করি) এই সব 'কুমার' ভক্তদের জন্যে। যাঁরা তা শুনে—না হবেন আশ্চর্য্য বা স্তম্ভিত—না তুলতেন দ্বিধার তর্ক। শুনতেন, ভাবতেন, হাসতেন। বাইরের লোক থাকলে, সে কথা হত না, অন্ততঃ আমার জানা নাই। তাঁদের বলতেন—"আবার আসিস্"। বাপ-মার নিষেধ সত্ত্বেও তাঁরা গোপনে আসতেন। অনেকেই তাঁদের বলতে শুনেছে—না এসে কি থাকা যায়? যাব না স্থির করলেও কে যেন' টেনে আনে। ভাবি—কোনো মন্দ লোকের কাছেও যাচ্ছি না, কোনো মন্দ কাজেও যাচ্ছি না। দু'টো ভালো কথা শোনায় দোষ কি? ফল কথা—যিনি একবার এসেছেন, তিনি না এসে আর থাকতে পারতেন না। দেখে—ঠাকুর হাসতেন, অন্য সময় বলেওছেন—অনেকে তা শুনেওছেন।—"যাবে কোথা—এ যে ঢেলে-ঢোঁড়ায় কাটেনি—জাত সাপে খেয়েছে"! থাক্—প্রারম্ভটা এই ভাবেই হ'য়েছিল।

পরে কলকেতার বড় লোকদের গাড়ী-জুড়ি আসা-যাওয়া আরম্ভ হয়, ভীড় বাড়ে, ভগবৎ আলোচনাও বাড়ে। বাজে কথা থাকলে যে কিরূপ ভীড় হোত ভাবা যায় না। যিনিই আসুন—তাঁর কাছে ঈশ্বরীয় কথা ভিন্ন অন্য কথা ছিল না। নিদ্রার যৎসামান্য সময়টুকু ছাড়া তাঁর শ্রীমুখে সর্ব্বক্ষণই ভগবান নিয়ে ও ভগবৎ লাভের উপায় নিয়ে কথার বিরাম ছিল না। তবে উদাহরণাদিচ্ছলে যা দরকার সে কথাও এসে পড়তো, কিন্তু লক্ষ্যহীন নয়, তাকে অবান্তর কথা বলা চলে না। ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়—কি করে যে দিনরাত এই শরীর নিয়ে—কত প্রকারে কত ছাঁদে ভগবান লাভ করবার পথ ও উপায় সহজ করে গল্পচ্ছলে গিলিয়ে দিতেন! সে কথার যেন সমাপ্তি নেই!

সে সময়ে ৺কেশবচন্দ্র সেনের মত বাগ্মী বাংলায় আর কে ছিল? তাঁর ভগবৎপ্রেমের প্রশংসা ঠাকুর প্রায়ই করতেন ও তাঁর কাছে কিছু শুনতেও চাইতেন। কেশব বাবু হাত জোড় করতেন—সাহস পেতেন না। শেষ এক দিন গঙ্গার ঘাটে তাঁকে কিছু বলতেই হয়। লোকে লোকারণ্য। আমার দুর্ভাগ্যে সে বক্তৃতা শোনবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। কিন্তু সে সম্বন্ধে দুয়েকটি এমন কথা আছে যা শুনে রাখা বিশেষ আবশ্যক। তাই আমার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান" বলে পুস্তকখানি হতে নিয়ে কিছু উদ্‌বৃত করে দিচ্ছি।—

—"পরমহংস মশাইও বক্তৃতা শুনিতেছিলেন, কিন্তু, খানিকক্ষণ পরেই তিনি বিরক্ত হইয়া নিজের ঘরে চলিয়া যাইলেন। * * * দেখিয়া কেশব বাবু ভাবিলেন যে, তাহা হইলে, বোধ হয়, বক্তৃতায় কোন ত্রুটি হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য শ্রোতারা বলিতে লাগিল, "লোকটা অশিক্ষিত, মুকৃখ্য, কোন কিছু বোঝে না, তাই চলে গেল।"

"কেশব বাবু বক্তৃতা শেষ করিয়া পরমহংস মশাই-এর কাছে আসিলেন। * * * জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই, কি ত্রুটি হয়েছে?" পরমহংস মশাই বলিলেন, "তুমি বললে: ভগবান, তুমি সমীরণ দিয়েছ, তরু-গুল্ম দিয়েছ।—এ সকল তো বিভূতির কথা। এ সব নিয়ে কথা কইবার দরকার কি? যদি এ সব বিভূতি তিনি নাই দিতেন, তা হলেও কি তিনি ভগবান হতেন না? বড়-মানুষ হলেই কি তাঁকে বাপ বলবে; যদি তিনি গরিব হতেন, তা হলে কি তাঁকে বাপ বলবে না?" (কেবল) 'গুণ' ও 'বস্তু'র কথা! বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যের অতীত হইলেন 'ব্রহ্ম',—এই সকল কথা হইতে লাগিল।

"* * * বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যের উপর যে কিছু আছে, তখনকার দিনে এ কথাটি নূতন কথা। অবশ্য, কেহই তখনো পর্য্যন্ত ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে নাই; * * * এখনকার দিনে এরূপ কথা বড় কথা নয়, কিন্তু তখনকার দিনে, ইহা অতি আশ্চর্য্যের কথা। * * * শিমলার লোকেরা কিছু দিন পূর্ব্বে যে ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করিত, অশিক্ষিত ও বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া উপহাস করিত, এখন তাহারাই এই সব কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। পরমহংস মশাইকে যাহারা উপেক্ষা করিত এবং সামান্য লোক বলিয়া শ্রদ্ধা করিত না, তাহারা সেদিন হইতে পরমহংস মশাই-এর প্রতি নিজেদের মনের ভাবগতিক ফিরাইল। * * * শিমলার লোকের একটু বিশেষ শ্রদ্ধা আসিল, এবং তিনি এক জন বিশিষ্ট লোক বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন।"—যাক্

দিনের পর দিন ঠাকুরের মুখে ভগবান সম্বন্ধে কথাই চলতো। সকলেই তা নিবিষ্ট চিত্তে স্থির হয়ে শুনতেন। নিত্যই যেন নূতন কথা শোনা হচ্ছে। এ এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার ছিল। ভিন্ন ভাবের লোক এসে পড়লে তিনি বুঝতে পারতেন,—বলতেন—বাগানে একটু বেড়িয়ে দেখ না,—অনেক দেখবার জিনিস আছে।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন দক্ষিণেশ্বর নিবাসী ৺যোগীন চৌধুরী (যোগী মহারাজ) শ্রীশ্রীমায়ের সেবার ভার লইয়া থাকেন, তাঁকে তীর্থাদি দেখিয়ে বেড়ান। কাশীধামে কিছু দিন থাকার পর যোগী মহারাজ কঠিন ডিসপেপসিয়া রোগে পীড়িত হন, ও মাকে লইয়া দেশে ফিরিতে বাধ্য হন ও বাগবাজারেই থাকেন, চিকিৎসাদিও চলে। দুই জন যুবক দিবা-রাত্র তাঁর সেবা-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকে। তাঁদেরই এক জনের কাছে একটি শোনা কথা লিখছি। কথায় কথায় এক দিন সহসা আক্ষেপ করেই লোকটি বলেন,—"তখন জ্ঞান হয়েছে, ভাল-মন্দ বিচার করতে পারি। পূজনীয় যোগানন্দ মহারাজ সংঘের বিশেষ সম্মানিত সাধু ছিলেন—স্বামীজির পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি আমাদের সেবা-যত্নে পরম তুষ্ট হন, তাঁর দিন আসন্ন—দেহ আর থাকে না জেনে, আমাদের ডেকে বললেন—'তোমরা সাধ্যাতীত যত্নে সেবা করেছ, বড় আরাম পেয়েছি। কিন্তু যা ঘটবার তা ঘটে, তাতে দুঃখের কিছু নেই। তোমাদের মনের কি সাধ, কি চাও, বলো'।"

"আমার কণ্ঠে কোন্ কুগ্রহ ভর করেছিল জানি না, সে অপেক্ষা না করেই বললে—'থিয়েটার করতে ও তাতে দশ জনের কাছে কিছু প্রতিপত্তি লাভ করতে বড় ইচ্ছা হয়'।"

"আজ ভাবি—হায়, তার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হয় নাই কেনো! স্বামীজি মিনিট খানেক আমার দিকে নির্ব্বাক্ চেয়ে থেকে, শেষ ধীর ভাবে বলেন—'সকালে গিরীশ এলে বলে দেব।' বলেও দিয়েছিলেন। আপনাকে বললে আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত একটু হতে পারে, তাই বললুম। কিন্তু এ কথাও জানাচ্ছি—সে

বয়সে যুবকদের থিয়েটারের লোভ থাকা স্বাভাবিক হলেও, একেবারে এমন অশিক্ষিত ও আকাট মূর্খও ছিলাম না যে ওই দারুণ লজ্জার কথাটা ছাড়া আর কিছু চাইবার বস্তু আমার মুখে যোগায়নি,—মহাপুরুষের সামনে বলতে সাহসই বা হয়েছিল কি করে ?"

"পরে ও-সম্বন্ধে অনেক ভেবেছি, ভাগ্যচক্রের রহস্য ভিন্ন কিছুই ভেবে পাইনি, সম্পূর্ণ অঘটনঘটন-পটীয়সী মায়া। কেহ বিশ্বাস করুন আর না করুন, ভাগ্য বা করাবেন, বুদ্ধিকে ধরে' তাকে না করবার সামর্থ্য কারো নাই। উলটোটাই সোজা হয়ে দেখা দেয়, পোড়া শোল-মাছটাও জলে পালায়।"

শুনে আমি তাঁকে বললুম—"তবে আর কি, দুঃখ করবার তোমার কারণ নেই। বুদ্ধি সকলেই ধরে কিন্তু সময় (মহাকাল) দরকার মতো তাকে ঘোরায় ফেরায়—যা করতে হবে করায়। ভগবানের শরণাগত হয়ে থাকাই ভালো। ঠাকুর যেমন বলতেন—'ভগবানকে লাভ করবার পরে—আর যা কিছু।' তেমনি বিস্তারিত কিছু বলার পর বলতেন—(ভগবানকে লাভ করা যেমন প্রথম কথা), 'তাঁর কৃপা লাভ করাই তেমনি শেষ কথা'।"

শুনে বন্ধু বললেন—"পরে ঘটেছিলও তাই। স্বামী যোগানন্দ মহারাজ দেহত্যাগের পর, তাঁরি কৃপায় শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছামত—ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্র-দীক্ষাও পেলুম,—অনুতাপও ঘুচে গেল। বুঝিয়ে দিলেন সাধুদের কাছে আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক উপদেশই চাইতে হয়। যৌবনের ভুলটা তাই প্রকাশ করলুম।"

বললুম—"ভালই করেছ। অকারণ কিছু ঘটে না।—কথাটা একেবারে নিষ্ফল নয় ;—অনেককে সাহায্য করবে।"

কথাটি অবান্তর কথা হলেও, এক জন অনুতপ্ত ভক্তের স্বীকারোক্তি, তাই উল্লেখ করলুম। যাক্ ও অবান্তর কথা। ঠাকুর যেমন বলতেন—আগে ভগবানকে লাভ, তেমনি তাঁর কৃপালাভ করাকে শেষ কথাও বলতেন। সেটি ভগবানের প্রতি খুব ভালোবাসা না এলে হয় না। খুব ভালবাসার লক্ষণ—চারি দিকে ঈশ্বরময় দেখা। যেমন খুব ন্যাবা হলে তবেই চার দিক হলদে দেখা যায়।

শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই বলেছিলেন—ঈশ্বরকে একশ' বার ভাবলে লোক বেহেড হয়ে যায়। ঠাকুর তাতে বলেন—ও কি কথা গো, চৈতন্যকে চিন্তা করলে কি কেউ অচৈতন্য হয় ? এইরূপ স্থলে তাঁর কৃপা না হলে সন্দেহমুক্ত হওয়া যায় না। আত্মার সাক্ষাৎকার হলেও সন্দেহ ভঞ্জন হয়। তাঁর কৃপাতেই তা হয়। আবার সে কৃপা আসে—তাঁকে পাবার জন্যে খুব ব্যাকুল হয়ে ডাকতে ডাকতে, অর্থাৎ—সাধনায়। কৃপাই তাই শেষ কথা।

—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মা —বৈদ্যনাথ সেনগুপ্ত (শান্তিনিকেতন)

—কমল চট্টোপাধ্যায়

প্যাগোডা
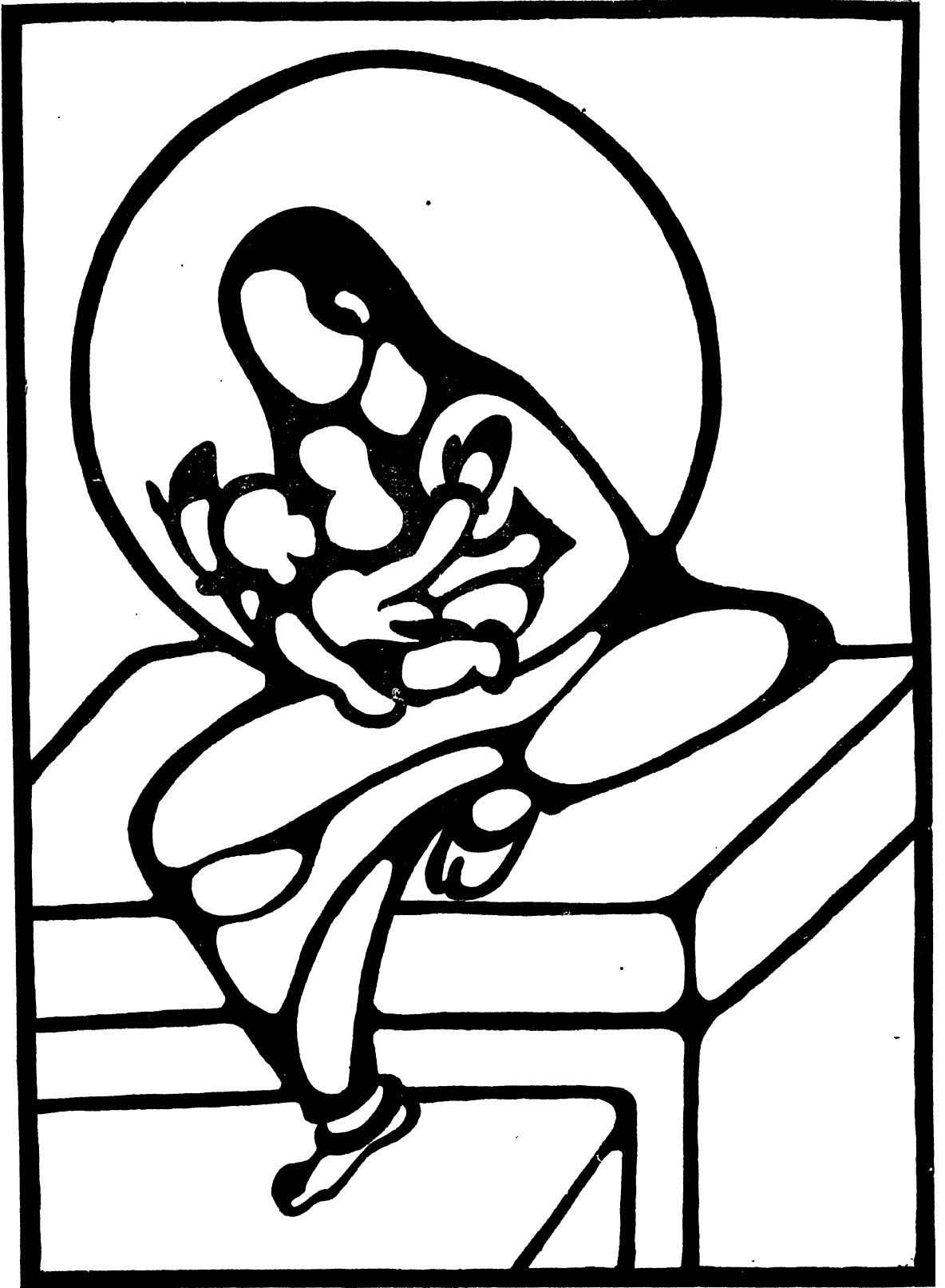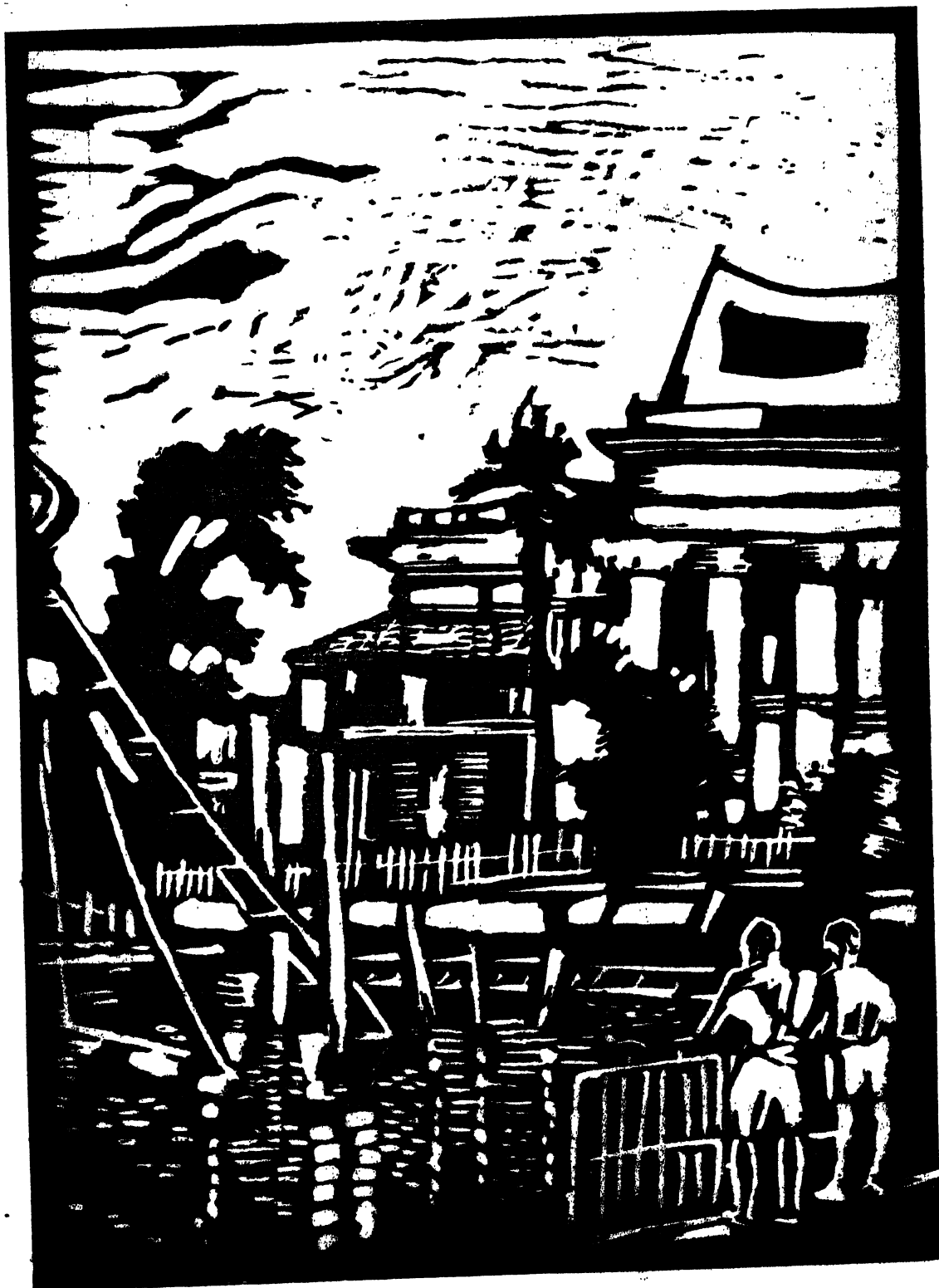
ইকবাল কাব্যের নূতন প্রসঙ্গ

অমিয় চক্রবর্তী

কাব্যের বিচারে অস্ফুট কীটদষ্ট কোরক অথবা বিকৃত পত্রাবলীর সাক্ষ্য বর্জন ক'রে শাখার প্রান্তে প্রচ্ছন্ন একটি সুন্দর ফুলের অভাবনীয় পরিচয় দেওয়াই প্রশস্ত। কবি ইকবালের কাব্যকাননে বিচরণ করলে সৌরভী কুঞ্জ দেখতে পাবো, খররৌদ্র ধূলিতে শ্যামলচ্ছায়া মেলে আছে; অগণ্য মনোহর বীথি আহ্বান ক'রে নিয়ে যায় গভীর ভাবনার নির্দেশে। বাক্যের ভঙ্গী, রসের উচ্ছল মাধুর্য এবং দিগন্ত দৃষ্টিময় ব্যঞ্জনা তাঁর বহু কবিতায় উপকর্ষের যে ভাষা পেয়েছে তা উর্দু বা পারসিক ধ্বনিকে অতিক্রম ক'রে সর্বমানবের চিত্তচারী। তাঁর কাব্যে রাষ্ট্রিক মতামতের কাঁটা বেড়া দেখা দিলেও প্রতিহত হয় না, কাণ্ডের শুষ্ক বক্রতা লঙ্ঘন ক'রে উঁচু ডালের কম্পমান পল্লবলোকে পৌঁছনর সাধনা পাঠককে মানতেই হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে শরীর ও মনের আকস্মিক কারণ বশে ইকবালের রচনায় বাধাবিঘ্নতার নানা কণ্টক ছড়িয়ে আছে, তাঁর প্রতিভার অসমতা মনকে অপ্রত্যাশিত আঘাত করে কিন্তু তাঁর জীবনের শেষতম অধ্যায়ের অচির পূর্ববর্তী রচনাকাল সম্বন্ধেই এই কথা বিশেষ প্রযোজ্য। প্রতিভার অরুণপর্বে তিনি ছিলেন সর্বভারতীয় কবি। বেদমন্ত্রের স্পর্শ লেগেছিল তাঁকে, কোরাণের আজান যেন চলেছে গীতাধ্যায়নেরই পর প্রকোষ্ঠে; মন্দির মসজিদ, শিখ সুফি দরবেশ ব্রাহ্মণ স্থান পেল তাঁর গীতি-কবিতার সুন্দর আসনে। কবিতা লিখেছেন স্বামী রামতীর্থের উপরে, শিখ-গুরু নানক সম্বন্ধে; মুসলমান সন্ত সাধকের প্রসঙ্গ স্বভাবতই বিচিত্র অভিজ্ঞতায় বর্ণিত হয়েছে। একদা ইকবালের মুখে শুনেছিলাম তাঁর প্রথম কবিতার বইটিতে তিনি যে-ভূমিকা লেখেন শ্রেষ্ঠ প্রেরণার অর্ঘ তাতে দেওয়া হয় ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্যে, বিশেষ এক জাতির মোল্লা মৌলবীর আক্রমণে তিনি পরবর্তী সংস্করণে সেটি রাখতে পারেননি। বলেছিলেন, আজমগড়ের লাইব্রেরিতে প্রথম সংস্করণ আছে, পড়ে আসুন। নিজের দুর্বলতার স্মরণে ব্যথিত হয়ে তিনি মৃদুকণ্ঠে যোগ করেছিলেন, "ইকবাল বেঁচে নেই। ইকবাল মৃত।" তিনি দীর্ঘ জীবন রক্ষা ক'রে আবার সত্য পরিচয় দেবেন এই প্রত্যাশা জানালাম, কিন্তু তিনি মাথা নাড়লেন। শেষের কিছু কাল তিনি আবার সেই সর্বভারতীয় দৃষ্টি ফিরে পেয়েছিলেন কয়েকটি অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রোজ্জ্বল তাঁর কবিতায় সেই পরিচয় রয়ে গেল। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। সায়ংসন্ধ্যার প্রান্তে তখন রাত্রির যবনিকা, ইকবাল দীর্ঘ রোগশয্যায় জীবন্মৃত, বিশেষ একটি রাষ্ট্রিক দলের কাছে তিনি প্রাত্যহিক জীবিকার জন্য আপাদমস্তক বিক্রীত নির্ভরশীল। বললেন, দলকে বলেছিলাম তোমাদের মতামতে আমি বিশ্বাসী নই, আমি কবি। দলপতি উত্তর করলেন, তোমার বিশ্বাস চাই না, তোমার নাম চাই; বিপদকাল এসেছে দলের। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কবি ইকবাল বললেন, "আমার নাম দিয়েছি। "ইকবাল বেঁচে নেই। ইকবাল মৃত।"

কিন্তু ইকবাল অমর। যে-পরিচয়ে তাঁর সৃষ্টিকাব্যের শীর্ষতা তা দুর্বল শরীর মনের অবান্তর প্রসঙ্গ এমন কি কাব্য-বিরোধী প্রভাবকে অতিক্রম করে ভাস্বর হয়ে রইল। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত "আর্মিগান-ই-হিজাজ" বাব্য গ্রন্থে মানবিক বোধান্বিত কয়েকটি উৎকৃষ্ট রচনা বেরিয়েছিল, আজো তার পরিচয় বৃহত্তর ভারতবাসীর কাছেও অগোচর বললেই হয়,—বাহিরের জগতে কোনো বার্তাই পৌঁছয়নি। সম্প্রদায়ের সম্পত্তি ক'রে রেখে ইকবালকে যাঁরা বিশ্বের বাহিরে রাখতে চান তাঁদের দায়িত্ববোধ ক্ষীণ বলতে হবে। কেবলমাত্র যে-কবিতাগুলি সাম্প্রদায়িকতার সমর্থক তারই ব্যাখ্যান শুনতে পাওয়া যায় কিন্তু যেখানে ইকবাল মুসলমান কি হিন্দু অথবা ভারতীয় নন, তিনি এশিয়ার কবি বললেও যেখানে তাঁর মানবিকতাকে ক্ষুদ্র করা হয় তার তর্জমা কোথায়? ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের যাঁরা এই আশ্চর্য কবি-প্রতিভার সন্ধান করতে গিয়ে তাঁর মতামত-সম্বলিত ছন্দোবদ্ধ রচনার বাহুল্যে প্রতিহত বিমুখ হয়েছেন তাঁরা বলবেন, অনুরূপ কবিতা যদি বা থাকে তো সেগুলি ব্যতিক্রম। সম-সাম্প্রদায়িক ইকবালভক্ত অনেকে বলবেন উদার মানবিক কবিতা যাকে বলো সেইগুলিই ব্যতিক্রম; তাতে তাঁর শ্রেষ্ঠতা নেই। দৈবাৎ যদি আধুনিক কোনো কবি ইকবালের "ইব্লিস কি মজলিস—ই—সউরার" ("সয়তানের মজলিস") কবিতাটির সন্ধান পান তাহলে নূতন ইকবালের আবির্ভাবে বিস্মিত হবেন। কাব্যজীবনের শেষ পর্যায়ে ইকবালের মানবধর্ম হাস্যোজ্জ্বল নির্ভয়বাদিতার প্রমাণ দিয়েছিল তার এমন মনোগ্রাহী উদাহরণ আর কোথায়? কবিতাটিতে ছন্দোবদ্ধ কথোপকথনের ছলে বর্তমান যুগের ধনতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধার্মিক উগ্রতা প্রভৃতি বিপদগুলির সূক্ষ্ম আলোচনা আছে; সবার উপরে উড্ডীন নূতন জাগ্রত মানবধর্মের নিশান। মুখ্যত ইসলাম-ধর্ম ও সমাজকে লক্ষ্য করেই কবিতা গঠিত কিন্তু এই কাব্যের তাৎপর্য সকলেরই অবাধ গ্রহণীয়। শ্রেষ্ঠতার একটি প্রতীকরূপে যে লোভহীন, আদর্শিক, ত্যাগ-ভূষিত ইসলামের সর্বধর্মপ্রেমশীলতার বাণী এই গভীর লীলাকৌতুকী কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে তা যথার্থই অভিনব। পারিষদ-পরিবৃত স্বয়ং সয়তান বলছেন, ভয় কোরো না, আধুনিক জগতের এই সব ব্যাপার আমারই সৃষ্টি। আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদী শিখিয়েছি য়ুরোপীয়ানকে, গরীবকে করেছি অদৃষ্টবাদী, জন্ম দিয়েছি ধনিক সভ্যতার—কে পরাজিত করবে আমাদের? প্রধান পারিষদ আশঙ্কিত প্রশ্ন করলেন, এখন যে আমাদেরও বিপদ। জানি আপনি শিখিয়েছেন গরীবদের অদৃষ্টবাদ, মোল্লা এবং সুফীকে করেছেন সাম্রাজ্যবাদীদের গোলাম, তাদেরই ক্রীতদাস। ঠিকই হয়েছে পূর্বদেশীয়দের যোগ্য এই আফিম সেবন। যদি বা মুসলমান হজ করতে যায় তাতে বিপদ নেই, কেন না তাদের আত্মা আজ মর্চে-পড়া।

দ্বিতীয় পারিষদের প্রশ্ন, পৃথিবীতে যা ঘটছে সবই জানেন আপনি। এই যে ডিমক্রাসির জন্যে দাবি, এটা কী ব্যাপার?

ভয় নেই, উত্তর দিলেন সয়তান। ইম্পিরিয়লিজমকে আমরা সাজ পরিয়েছি ডিমক্রাসির। রিপাব্লিক হোক আর সেই পরদেশে পারস্য রাজ-দরবারই হোক, একই কথা। জনগণের অধিকার যেই গ্রাস করে প্রভুত্বের প্রকৃতি তার একই। দেখছ না য়ুরোপীয় গণতন্ত্রগুলির পরিচয় বাহিরে ঝকঝকে, অন্তরে জেঙ্গিস খাঁর চেয়েও অন্ধকার।

তৃতীয় পারিষদ আশ্বস্তি জানিয়ে বললেন, ডিমক্রাসির জন্যে পাগল হয়েছে পৃথিবী, এতে ভয়ের কারণ নেই কিন্তু এই যে সোসালিজম্-এর নূতন রূপ দেখছি এর প্রতিকার কোথায়? ইহুদি কার্ল মার্কস্ হলেন পথপ্রদর্শক কালিম, অথচ তাঁর হাতে নেই আলো, তিনি হলেন ক্রুশ নেই এমন যিশুখৃষ্ট। ধর্মগুরু তিনি নন কিন্তু তাঁর আছে গ্রন্থ। ক্রীতদাসেরা পরাজিত করেছে প্রভুর দলকে এর চেয়ে ভয়ানক বিদ্রোহী বাণী আর কিছু তো কল্পনা করা যায় না।

চতুর্থ পারিষদ বললেন, ভয় করি না আমরা ইহুদি ব্যক্তিটিকে—তার পাল্টা ওষুধ বার হয়েছে রোমের প্রাসাদে। দেখো না, রোমের

নূতন দরবারে জেগেছে পুরোনো রোমের সম্রাটত্বের স্বপ্ন। (ফ্যাসিজম্ হল সয়তানের সৃষ্টি কম্যুনিজমকে নাশ করবার জন্তে।)

তৃতীয় পারিষদ মাথা নাড়লেন। তিনি নব্য রোমজাতির দুরদর্শিতার অভাব সম্বন্ধে তাঁর মত ব্যক্ত করে বললেন, তারই ঔদ্ধত্য সমগ্র য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের ভিতরকার কথাটাকে জগতে রাষ্ট্র করে দিল যে।

পঞ্চম পারিষদ সয়তানকে উদ্দেশ করে দীর্ঘ প্রশস্তি জানালেন, তার পর তাঁর নিবেদন। হে সয়তান, আর যে য়ুরোপীয় জাতগুলির উপর নির্ভর করা চলে না আমাদের। তারা তোমার শিষ্য সে কথা সত্য, কিন্তু পৃথিবীর মনই বদলিয়ে দিয়েছে ঐ বিদ্রোহী ইহুদি চিন্তানায়ক। আসন্ন বিপদ এল বুঝি, ঐ দেখ ভয়ে কম্পিত হচ্ছে মরুপ্রান্তর, নদী-পর্বত, এই প্রসারিত পৃথিবীর সর্বত্র। হে গুরু, দুনিয়া ভর করে আছে তোমার নেতৃত্বের উপর, সবই কি যাবে ধ্বংস হয়ে?

মা ভৈঃ, বললেন সয়তান। ডিমক্রাসি বা নূতন সোশালিজম্ কী করতে পারে। ক্ষেপিয়ে তুলব যখন সারা য়ুরোপকে দেখবে পরস্পরের মধ্যে ওরা কোন্ কাণ্ড বাধায় (আসন্ন মহাযুদ্ধের উল্লেখ।) কোথায় থাকবে তাদের ধর্মযাজক আর তাদের রাষ্ট্রনেতার দল। হোঃ—এই এক শব্দে দেব তাদের উড়িয়ে। কিন্তু আমার ভয় সেই জাতিকে যারা ছাই হয়ে গিয়েও আজ পর্যন্ত জ্বালিয়ে রেখেছে প্রাণের বহ্নি। এখনও সেই ধর্মবিশ্বাসীর দলে এমন বহু মানুষ আছে যারা চোখের জলে ভোরের প্রার্থনা সুরু করে। ওয়াজু হল তাদের দুঃখের দ্বারা প্রত্যহ শোধিত কৃত্য। নূতন যুগে ভয় হল তাদের কাছে, অন্য কোনো বিদ্রোহকে নয়। এই জাতি হল ইসলামী।

জানি, মুসলমান আজ কোরাণ অনুসরণ করে না তাই তাদের হাতে তত ভয় নেই সয়তানের রাজ্যে। তারাও ক্যাপিটালিসট্ হয়ে আছে অন্যদের মতো। জানি, যে হারেম-এর প্রভু সে আজ অন্ধকারের শিষ্য। পূর্ব দেশের তিমিরে তাদের হাতে নেই প্রদীপ। কিন্তু আমার মনের আশঙ্কা জানাই তোমাদের—নূতন যুগে ইসলামের চিরন্তন কানুন আবার দেখা দেবে উজ্জ্বল হয়ে। সেই ইসলামের নীতি হল নারীদের সম্মান বাঁচানো, মানুষকে চরম সাধনায় ব্রতী করা, তৈরী করা বীরের দলকে। সব ভৃত্যতন্ত্রের মৃত্যু আছে তারই হাতে।

তার রাজ্যে থাকে না রাজা, থাকে না পুরোহিত। ধনের পাপ সে করে দূর, ধনী হয় সেবক, সর্বজনের ধনরক্ষক। এত বড়ো বিপ্লবী ঘটনা কোথায়,—তারা জানে জমির অধিকার ঈশ্বরের এবং মানুষের, রাজার নয়। পৃথিবীর চক্ষুর অন্তরালে থাকুক এই ধর্ম, কেউ না খবর পাক, এই আমার একান্ত প্রার্থনা। আশার কথা এই যে, মুসলমানেরা পর্যন্ত ঐ ধর্মে বিশ্বাস অনেকটা হারিয়েছে। আহা, তারা যেন ধর্মতত্ত্বের ব্যাখানে বিবৃতিতেই আপাদ-মস্তক জড়িয়ে ব্যস্ত থাকে, তারা যেন কেবল আল্লার বাণীর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-প্রচারে ব্যবসায়ী হয়।

ইকবাল সর্বধর্মের মহান্ ভূমিকায় যে-ইসলামের পরিচয় দিলেন তা যেমন আদর্শিক, তেমনি ব্যবহারিক জগতের প্রসঙ্গতায় নবীন সমুজ্জ্বল। মিলনমন্ত্র আছে তাঁর ইসলামী বাণীতে শুভকর্মের প্রেরণায়; এই ধর্ম মানবের সর্বোত্তম প্রত্যহ সাধনার সহায়ক। কবিতাটির শেষে সয়তান বলছে, তার সয়তানী রাজ্য রক্ষা হবে না যদি পবিত্র ইসলাম ধর্ম কলহ ঈর্ষা ত্যাগ করে। বৃথা তর্ক ও অন্ধ নিয়মানুবর্তিতা উত্তীর্ণ হয়ে তার প্রকৃত রূপে দেখা দিলেই সয়তানের বিপদ। সয়তান চায় ধর্মবিশ্বাসী কেবল অভ্যাসের মতো ঈশ্বরের নাম নেয়, বা সন্ন্যাসী হয়ে বসে থাকে, কর্মের শুদ্ধ মার্গে উত্তীর্ণ হয়ে ধ্বংস না করে সয়তানের রাজ্যকে।

বলা বাহুল্য, যে-মানস নিয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠ ধ্যান ও কর্মকে ইকবাল অশ্রুসজল কৌতুকে এবং রুদ্র হাস্যে ব্যক্ত করলেন তা সকল মানুষেরই ধর্মসঙ্গত। কোথাও ক্ষুদ্রতা বা অমঙ্গলের ছায়া নেই তাঁর শুভ্রদৃষ্টির স্বচ্ছতায়। রাষ্ট্রিক মতামত এবং দলের উর্ধে যে ইকবালকে পাওয়া যায় তাঁকেই আজ জানবার সময় এসেছে।

১৯৩৬ সালে রচিত যে-কবিতার সারাংশ উপরে দেওয়া গেল তার সমধর্মী ভাব পূর্বযুগের নানা কবিতায় ইকবাল প্রকাশ করেছেন। তিনি ব্রাহ্মণকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন, বেরিয়ে এসো তোমার মুক্ত অঙ্গনে, এসো, সকল অভ্যাসকৃত্যের বাহিরে আমরা গড়ি নূতন ধর্ম, মানবধর্ম। সেই কবিতাটি চিরস্মরণীয়।

"এসো, সকলে তুলি ধর্মের চূড়া যেন উর্ধ আকাশকে স্পর্শ করে।
প্রতি প্রাতে উচ্চারণ করি মন্ত্রম্।
সবাই আমরা ভক্ত, প্রেমধারা করি পান,
শক্তি ও শান্তি মিলুক্ আমাদের গানে।
পৃথিবীতে মানুষের মুক্তির পথ চিরদিন এই প্রেমে।"

এই সর্ব-মানবিকতার কবি ইকবাল এক দিন স্বামী রামতীরথের মৃত্যু উপলক্ষে লিখেছিলেন—"তুমি ছিলে মুক্তা, এখন আরো অমল উজ্জ্বল মুক্তা তুমি অনন্তের সমুদ্রে।" গূঢ় অধ্যাত্মতত্ত্ব এই কবিতাটির ছত্রে ছত্রে নিহিত। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে যে দৃষ্টি নিয়ে ইকবাল এই অর্থ রচনা করেন তারই ধ্বনি পাই তাঁর শেষজীবনের বহু কাব্যে।

"মানুষ ও ভগবান সমাচার" নামক কবিতাটিতে সৃষ্টিকারী চিরন্তন মানবের মাঙ্গল্য বর্ণিত হয়েছে। প্রকাশের প্রণালী বিশিষ্ট ইকবালীয়।

ঈশ্বর

একই মাটিতে জলে আমি বানালাম বিশ্ব,
তুমি ভিন্ন ক'রে নাম দিলে ইরান, তাতার দেশ, জাঞ্জিবার।
মৃত্তিকার অণুকণা দিয়ে আমি বানালাম লৌহ,
তুমি তাই দিয়ে তৈরি করেছ যত তরোয়াল, তীর আর বন্দুক।
বাগানের গাছ কাটবার জন্যে তুমি বানালে কুড়োল,
আর যে-পাখী গান করে তার জন্যে খাঁচা।

মানব

তুমি তৈরি করেছ রাত্রি, আমি তো জ্বেলেছি আলোক।
মাটি তোমার, তাই দিয়ে রচলাম পান-পাত্র।
তোমার ছিল মরুভূমি, পর্বত, অরণ্য
আমার হল তৈরি ফুলের কানন, গোলাপ, ফলের বাগান।
আমি সে, যে 'পাথর'কে ক'রে দেয় আয়না,
বিষ হতে যে বানায় মধু।

মানবত্বের ডাক দিয়ে তিনি গেছেন সম্মুখের পথে। মুসলমান ধর্মের উৎকর্ষ ব্যাখ্যাতা তিনি। তাঁর যে-কাব্যে মানব মিলনের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি ভাষার মহিমায় হৃদয়শীল সৌন্দর্যে উদ্ভাবিত হয়ে প্রকাশ পেল সেই সৃষ্টিগুলি বাংলা ভাষায় পরিচিত হবে এই আশা ক'রে রইলাম।

জন্ম—২০শে ফাল্গুন, ১২৯৭ মৃত্যু—১৩ই বৈশাখ, ১৩৫১

"ঠাকুর, লীলা-মাধুর্য্যে বিশ্বে জ্ঞানালোক সম্প্রসারণের জন্য তুমি আসিয়াছিলে, আবার সমষ্টি-সমুদ্রে বিলীন হইয়াছ—ভক্তগণের হৃদয় তোমার বিভায় উদ্ভাসিত। ক্রমাগত ভোগের অবসাদে আর্ত্ত জগৎ আবার যখন শান্তি ও মুক্তির ভিখারী হইবে, করুণাময় তুমি, তখন আবার তোমার পুণ্য আবির্ভাবে জগৎ ধন্য হইবে—সুপবিত্র হইবে। এই বসুমতী তোমার,—তোমার আশীর্ব্বাদে বসুমতীর জীবন-সাধনা সার্থক হউক। তোমার যোগ্য স্তবের ভাষায় তুমিই ত' বঞ্চিত করিয়াছ দেব, দীন-ভক্তের অসম্পূর্ণ পূজাই আজ গ্রহণ কর।"

—সতীশচন্দ্র

মিল

প্রবোধচন্দ্র সেন

দুইটি বা ততোধিক ছন্দোবিভাগের শেষ উপপর্বের সমস্ত স্বরবর্ণ এবং প্রথমটি ব্যতীত সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণের যথানুক্রমিক শ্রুতিসাদৃশ্যকে মিল (Rime) বলে। ইহার অপর নাম অন্ত্যানুপ্রাস।

উক্ত প্রকার উপপর্বের প্রথম ব্যঞ্জনটি সহ সমস্ত বর্ণের সম্পূর্ণ শ্রুতিসাম্যকে মিল বা অন্ত্যানুপ্রাস বলা যায় না। এই রকম সম্পূর্ণ সাদৃশ্যের দ্বারা অনেক সময় অন্ত্যযমক অলংকার উৎপন্ন হয় (§০০০)। যেমন—

আট পণে। আধ সের। আনিয়াছি। চিনি।
অন্ন লোকে। ভুয়া দেয়। আগে্য আমি। চিনি।
—ভারতচন্দ্র

যে সব স্থলে অন্ত্যযমক হয় না সে সব স্থলে উক্ত প্রকার সাদৃশ্যকে মিল বলা হইলেও উহাকে আদর্শ মিল বলিয়া গণ্য করা যায় না।

যে কোন ছন্দোবিভাগের শেষ উপপর্বের সবগুলি ধ্বনি লইয়া মিল দেওয়াই সাধারণ নিয়ম, একাধিক উপপর্বের মিল দেওয়া যায়, কিন্তু তাহা অত্যাবশ্যক নয়। উপপর্বের আয়তন (§০০০) অনুসারে মিলযুক্ত ধ্বনির বা ধ্বনি-সমষ্টির আয়তন সাধারণতঃ দুই কলা বা তিন কলা পরিমিত হয়। একাধিক উপপর্বের মধ্যে মিল দেওয়া হইলে উক্ত আয়তন তিন কলার বেশীও হইতে পারে, কিন্তু কখনও দুই কলার কম হয় না। মিলযুক্ত উপপর্বের প্রথম ধ্বনিটির উপরে একটি প্রস্বর থাকিলে শুনিতে ভালো হয়।

বাংলায় অনেক রকম মিল দেওয়া যায়। এখানে বহু-প্রচলিত কয়েক রকম মিলের দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

(ক) অযুগ্ম স্বরান্ত ধ্বনির (অর্থাৎ অযুগ্ম ধ্বনি) মিল। এই রকম মিল শুধু স্বরবর্ণের সাদৃশ্যের উপরে নির্ভর করে। তাই এই প্রকার মিলকে বলা যায় স্বরানু-প্রাস (Assonance)। যেমন—

(১) সখি প্রতি দিন হায়। এসে ফিরে যায়। কে।
তারে আমার মাথার। একটি কুসুম। দে।
—রবীন্দ্রনাথ

(২) সেদিন বরষা। ঝর ঝর ঝরে। কহিল কবির। স্ত্রী,...
মাথার উপরে। বাড়ী পড় পড়। তার খোঁজ রাখ। কি?
—রবীন্দ্রনাথ

এখানে কে, দে প্রভৃতি চারটি অযুগ্ম ধ্বনি দুই কলা পরিমিতি (§৩৯৬) এক কলা পরিমিত ধ্বনির মিল হয় না। ইহাই অন্যান্য সব মিলের ভিত্তি, কেন না সে-সব মিল আসলে ইহারই সম্প্রসারণ মাত্র।

(খ) যুগ্মস্বরান্ত ধ্বনির (অর্থাৎ স্বরান্ত যুগ্ম-ধ্বনির) মিল। এ রকম মিলও আসলে স্বরানুপ্রাস। যথা:—

সেথায় ছিল না। শৃঙ্খলজাল। বন্দী ছিল না। কেউ
ছায়া সুগহন। কাননের মাঝে। শুধু সবুজের। ঢেউ।
—সত্যেন্দ্রনাথ

প্রথম শ্রেণীর মিল হইল অযুগ্ম স্বরের অনুপ্রাস এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মিল যুগ্মস্বরের অনুপ্রাস।

(গ) হলন্ত যুগ্মধ্বনির মিল। এ রকম মিলে যুগ্ম-ধ্বনির অন্তর্গত স্বর ধ্বনিটি এবং উহার আশ্রিত ব্যঞ্জনটি এক বা অনুরূপ হওয়া আবশ্যক। যথা—

পিতামহ। দিলা মোরে। অন্নপূর্ণা। নাম।
অনেকের। পতি তেঁই। পতি মোর। বাম।
—ভারতচন্দ্র

এই শ্রেণীর মিল একটি স্বরানুপ্রাস (Assonance) এবং একটি হলনুপ্রাস (Alliteration)-এর যোগে গঠিত হয়। বস্তুতঃ প্রথম দুই শ্রেণী ব্যতীত সব মিলই এই বিবিধ অনুপ্রাসের সমবায়ে উৎপন্ন হয়।

(ঘ) দুইটি অযুগ্ম ধ্বনির মিল। এই শ্রেণীর মিলে প্রথম ধ্বনির শুধু স্বরটি ('ক'এর মত) এবং দ্বিতীয় ধ্বনিটি সর্বতোভাবে (অর্থাৎ স্বরব্যঞ্জনসহ) এক বা অনুরূপ হওয়া আবশ্যক। যথা—

(১) হে মোর চিত্ত। পুণ্য তীর্থে। জাগো রে: ধীরে
এই ভারতের। মহামানবের। সাগর: তীরে।
—রবীন্দ্রনাথ

(২) তোমার তরে। সবাই মোরে! করছে দোষী,
হে প্রেয়সী!
বলছে কবি। তোমার ছবি। আঁকচে গানে,
প্রণয়-গীতি। গাচ্ছে নিতি। তোমার কাণে।
—রবীন্দ্রনাথ

দুইটি স্বর এবং উহাদের মধ্যবর্তী ব্যঞ্জন, হল্‌, এই তিন অংশের অনুপ্রাসে এই রকম মিল উৎপন্ন হয়। এই মিলের প্রচলনই সব চেয়ে বেশী। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে শুধু পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে নয়, পর্বে পর্বেও মিলিয়াছে। 'তরে' এবং 'প্রেয়সী' শব্দের উচ্চারণ-রূপ যথাক্রমে তোরে এবং 'প্রেয়োসী'। ছন্দ ধ্বনির লিখিত দৃশ্যমান রূপের উপরে

নির্ভর করে না, উচ্চারিত শ্রূয়মাণ রূপের উপরেই নির্ভর করে।

(৬) তিন এবং ততোধিক কলার সব রকম মিলই দুই কলার মিলের পূর্বোক্ত রীতিগুলির নানাবিধ সমাবেশের বা সম্প্রসারণের দ্বারা গঠিত হয়। যথা—

ওগো ফেলে দাও। পুথি ও লেখনী,॥
যা করিতে হয়। করহ এখনি,॥
এত শিখিয়াছ। এটুকু শেখনি,॥
কিসে কড়ি আসে। দুটো। I
—রবীন্দ্রনাথ

এই মিলটা চতুর্থ শ্রেণীর মিলের সঙ্গে একটি অতিরিক্ত অযুগ্ম ধ্বনির যোগে উৎপন্ন। এ চৌপদী পঙ্‌ক্তিটির প্রথম তিন পদে মিল রহিয়াছে।

(১) নৌকা ফি সন। ডুবিছে ভীষণ। রেলে কলিশন। হয়।—
—দ্বিজেন্দ্রলাল

এই চৌপর্বিক পঙ্‌ক্তির প্রথম তিন পর্বেই মিল এবং মিলটা প্রথম ও তৃতীয় রীতির যোগে উৎপন্ন।

(২) দেহ প্রাণ। এক তান। গাহে গান। বিশ্ব,
অমা চুমে। পূর্ণিমা,। অপরূপ। দৃশ্য।…
অঞ্জন। ধারা সাথে। চলে অক। লঙ্কা।
জয়তু য: মুনা জয়,। জয় জয়। গঙ্গা।—
—সত্যেন্দ্রনাথ

এই মিলগুলি তৃতীয় রীতির মিলের সঙ্গে একটি অযুগ্ম ধ্বনির যোগে উৎপন্ন। আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। সবগুলিই পূর্বের রীতিগুলির সম্প্রসারণ বা সমাবেশের দ্বারা গঠিত।

প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন।

(৩) পরিপূর্ণ বরষায়॥ আছি তব ভরসায়॥
কাজকর্ম কর সায়॥ এসো চটপট।
শামলা আঁটিয়া নিত্য॥ তুমি কর ডেপুটিত্ব॥
একা প'ড়ে মোর চিত্ত॥ করে ছটফট॥
—রবীন্দ্রনাথ

(৪) অশোক রোমাঞ্চিত॥ মঞ্জরিয়া
দিল তার সঞ্চয়॥ অঞ্জলিয়া,
মধুকর-গুঞ্জিত
কিশলয়-পুঞ্জিত
উঠিল বনাঞ্চল॥ চঞ্চলিয়া॥
—রবীন্দ্রনাথ

(৫) তাই বসেছি। ডেস্কে আমার,। ডাক দিয়েছি। চাকরকে
'কলম লে আও,। কাগজ লে আও,।
কালি লে আও,। ধাঁ করকে'।
—রবীন্দ্রনাথ

(৬) আসে গুটি গুটি। বৈয়াকরণ।
ধূলিমাখা দুটি। লইয়া চরণ॥
চিহ্নিত করি'। রাজাস্তরণ॥
পবিত্র পদ। পঙ্কে।
—রবীন্দ্রনাথ

(৭) ছোট্ট নেবুর। ফুলটি আমার,! ছোট্ট নেবুর। ফুল—
স্বর্ণ উষার। কর্ণ-ভূষার। বর্ণ তুষার। তুল।
—যতীন্দ্রমোহন

(৮) রজনী-গন্ধা। বাস বিলালো—
সজনি, সন্ধ্যা—। আসবি না লো?
ত্বরিতে ফিরে। বন-বিহঙ্গ
বরিতে নীড়ে। প্রণয়িসঙ্গ।
—যতীন্দ্রমোহন

অনেক স্থলে (বিশেষত: তিন বা ততোধিক কলার মিলের স্থলে) পূর্বোক্ত নিয়মগুলি অল্পাধিক পরিমাণে লঙ্ঘিত হয়। এই রকম মিলকে বলা যায় অপূর্ণ মিল। যেমন—

(১) শুধু হেথা কেন। আনন্দ নাই। কেন আছে সবে। নীরবে?
তারকা না দেখি। পশ্চিমাকাশে। প্রভাত না দেখি। পূরবে…
গ্রাসিয়া রেখেছে। অযুত পরাণ। রয়েছে অটল। গরবে।
রবীন্দ্রনাথ

নীরবে-পূরবে-গরবে মিলটা অপূর্ণ; কেন না এই উপপর্বগুলির প্রথম প্রস্বরিত ধ্বনি তিনটির মধ্যে স্বরানুপ্রাস নাই।

(২) ওগো কে বাজায়। কে শুনিতে পায়।
না জানি কি মহা। রাগিণী।
দুলিয়া ফুলিয়া। নাচিছে সিন্ধু। সহস্রশির। নাগিনী।…
কি গাহিতে গিয়ে। কথা যায় ভুলে। মর্মরে দিন।- যামিনী।
—রবীন্দ্রনাথ

রাগিণী-নাগিনী পূর্ণ মিল, কিন্তু ইহাদের সঙ্গে 'যামিনীর' পূর্ণ স্বরানুপ্রাস থাকিলেও গি-বিতে হলনুপ্রাস না থাকাতে মিল পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে নাই। গগনে-লগনে পূর্ণ মিল, কিন্তু গগনে-শয়নে অপূর্ণ মিল। স্বরানুপ্রাস ঠিক থাকিলে এই প্রকার অপূর্ণ মিলে বিশেষ দোষ হয় না।

ছন্দ-পঙ্‌ক্তির পর্বস্থিত শেষ ধ্বনি সমূহের গুরুলঘু ক্রমে পর্যায়বদ্ধতাকে বলা যায় অন্ত্যস্পন্দ (Cadence)। দুইটি পঙ্‌ক্তির শেষ পর্বের অন্ত্যস্পন্দ অর্থাৎ গুরুলঘুক্রমে ধ্বনি-বিন্যাস যদি পরস্পর অনুরূপ হয় তাহা হইলে শুনিতে ভালো হয়। পঙ্‌ক্তি-প্রান্তের এই স্পন্দন-সাম্যের সঙ্গে যদি মিল বা স্বরানুপ্রাসও থাকে তাহা হইলে শ্রুতিমাধুর্য আরো বাড়ে।—

এখনো সমুখে। রয়েছে সুচির। শর্বরী,
　　ঘুমায় অরুণ। সুদূর অস্ত। অচলে ;
বিশ্বজগৎ। নিশ্বাসবায়ু। সম্বরি'
　　স্তব্ধ আসনে। প্রহর গণিছে। বিরলে ;
সবে দেখা দিল। অকূল তিমির। সন্তরি'
　　দূর দিগন্তে। ক্ষীণ শশাঙ্ক। বাঁকা···।

—রবীন্দ্রনাথ

এখানে অচলে-বিরলে অপূর্ণ মিল। 'শবরী-সম্বরি'—সন্তরি'তে মিল আছে শুধু শেষ দুই কলার, কিন্তু স্বরানুপ্রাস এবং গুরুলঘুলঘু (— ⌣ ⌣) এই অন্ত্যস্পন্দের সমতা আছে সমস্তটা অংশেই। 'অঙ্গুলি—উচ্ছলি—অঞ্জলি'তে মিল ও স্বরানুপ্রাস এই দুয়েরই ত্রুটি আছে, কিন্তু স্পন্দন-সমতা থাকায় তত খারাপ লাগে না।

মিলের অতিলালিত্য ও অতিপ্রাধান্য অনেক সময় কাব্যের ভাব-সৌন্দর্যে হানি ঘটায়। তাই বহু স্থলেই আংশিক মিলের সঙ্গে স্বরানুপ্রাস ও অন্ত্যস্পন্দের সমতার সাহায্যেই কাজ চালাইয়া লওয়া হয়। ঘন ঘন মিলের একঘেয়েমি দূর করিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময় একেকটি পঙ্‌ক্তিতে মিলের স্থানে ফাঁক রাখা হয়, এমন পঙ্‌ক্তিকে বলা যায় নিঃসঙ্গ পঙ্‌ক্তি (Rimeless verse)। যথা—

বিপদ্ মাঝে। ঝাঁপায়ে প'ড়ে॥ শোণিত উঠে। ফুটে,
সকল দেহে। সকল মনে॥ জীবন জেগে। উঠে।
অন্ধকারে। সূর্যালোকে॥ সন্তরিয়া। মৃত্যু-স্রোতে॥
নৃত্যময়। চিত্ত হতে। মত্ত হাসি। টুটে।
বিশ্ব মাঝে। মহান যাহা। সঙ্গী পরা। ণের
ঝঞ্ঝা মাঝে। ধায় সে প্রাণ। সিন্ধু মাঝে। লুটে।

—রবীন্দ্রনাথ

মিল ছন্দের অত্যাজ্য অঙ্গ নয়, অলংকার মাত্র। কাজেই অনেক রচনায়, বিশেষত গদ্যভাবাপন্ন রচনায়, অমিল ছন্দের ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে গীতি-কবিতায় যথোচিত মিল থাকা প্রয়োজন, তাতে রচনায় শ্রুতি-মাধুর্য বাড়ে।
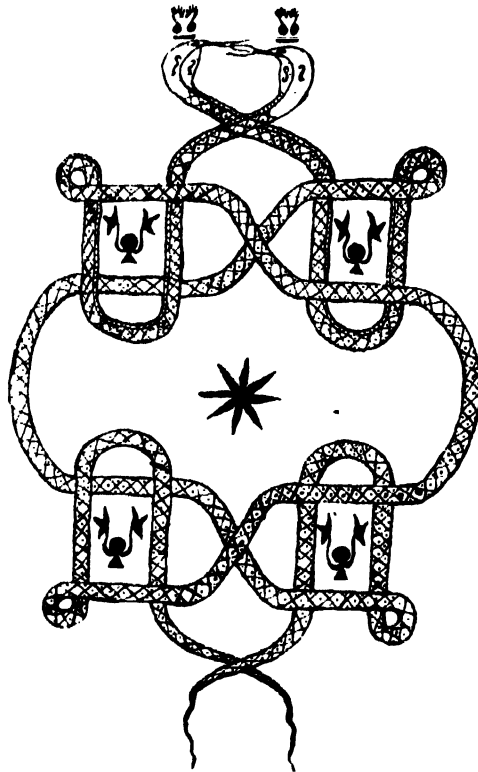
শার্দ্দূলের শিক্ষা

প্রে, না, বি

১

সুন্দরবনে রক্তমুখ নামে এক ব্যাঘ্রশাবক বাস করিত। কালক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সে যখন শার্দ্দূল হইয়া উঠিল, তখন মহা বিপদে পড়িল। এত দিন তাহার নিজের আহার সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল না, তাহার মাতা পশু শিকার করিয়া আনিয়া তাহাকে দিত—সে পরমানন্দে নিশ্চিন্ত মনে তাহা ভক্ষণ করিত। কিন্তু এখন সে বয়ঃপ্রাপ্ত, তাহার জননী মৃত, আহারান্বেষণ তাহাকে নিজেকেই করিতে হয়। কিন্তু ওই অন্বেষণ পর্য্যন্তই—সংগ্রহ আর হইয়া ওঠে না। মানুষ ও হরিণ তো দূরের কথা সে একটা ছাগশিশুকেও শিকার করিতে সমর্থ নয়। ব্যাঘ্রের সহজাত কৌশল ও শক্তি দুইয়েরই তাহার অভাব। শিকারের ঘাড়ে অতর্কিতে পড়িবার আগেই সে হয় তো একটা হুঙ্কার করিয়া ওঠে। কিম্বা ঠিক লক্ষ্যের উপরে লাফাইয়া না পড়িয়া দশ হাত এদিক-ওদিকে গিয়া পড়ে, শিকার পলাইয়া যায়। আহার আর তাহার জোটে না।

এইরূপে হতাশ হইতে হইতে সে স্থির করিল, দূর ছাই, ইহার চেয়ে নিরামিষ ভোজন ধরিলেই হয়। কিন্তু সুন্দরবনে নিরামিষ আহার্য্য আমিষের চেয়েও দুর্লভ, তাহা কি আগে সে জানিত? ফলে তাহার অধিকাংশ দিনই প্রায়োপবেশনে কাটিতে লাগিল।

পাঠক, তুমি হয় তো ভাবিতেছ বাঘের এমন দুর্দ্দশার কারণ কি। কারণ আর কিছুই নয়—বাল্যকালে পিতা-মাতার অনবধানতা বশতঃ সে কুশিক্ষা পাইয়াছিল। বাঘের আবার শিক্ষা কি? আছে বই কি। শৈশবে এক দিন যখন সে একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল তাহাকে একটি মার্জ্জার-শাবক মনে করিয়া শিয়াল পণ্ডিত নিজের পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া লয়। শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালায় সে কিছু কাল ছাত্র-জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। শিয়াল পণ্ডিত পাঠশালায় জন্তু-জানোয়ারগুলিকে সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা কোন প্রকার শিক্ষাই দিত না, কেবল মাসান্তে নিয়মিত বেতন আদায় করিয়া লইয়াই খুশী থাকিত। বাঘের বাচ্চাটির অভিভাবক না থাকাতে তাহাকে ফ্রি-ষ্টুডেণ্ট হিসাবে ভর্ত্তি করিয়া লইয়াছিল। পাঠশালায় থাকিয়া রক্তমুখের লাভ হইল এই যে, না পাইল সে কৃষ্টি, আবার ব্যাঘ্র-শাবকগণ ছেলেবেলা হইতে পশু-শিকারের যে কৌশল শিক্ষা করে তাহা হইতেও বঞ্চিত হইল। এই সে নিতান্তই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। একদা শিয়াল পণ্ডিত তাহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়া পাঠশালা হইতে নাম কাটিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল। তখন হইতেই রক্তমুখের বিপদের সূত্রপাত। শিকারের কৌশল তাহার অজ্ঞাত—অনাহারে তাহার দিন কাটিতে লাগিল। অন্যান্য বাঘেরা এই অকর্ম্মণ্য পশুটিকে ঘৃণা করিত, কাজেই তাহাদের কাছেও রক্তমুখের আশা করিবার কিছু ছিল না।

এক দিন অনাহারে ও মনঃকষ্টে ঘুরিতে ঘুরিতে সে গলিতনখ নামে এক বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎ পাইল। তাহাকে সে নিজের সমস্যা জ্ঞাপন করিয়া তাহার পরামর্শ যাচ্ঞা করিল। গলিতনখ সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া বলিল—বৎস, তোমার সমস্যা অতি জটিল এবং ইহার একমাত্র সমাধান শিকারের কৌশল শিখিয়া লওয়া।

রক্তমুখ বলিল—শিখিবার বয়স গিয়াছে আর শিখিবই বা কোথায়? এ বনে কেহ আমাকে শিখাইতে রাজি নয়।

গলিতনখ বলিল—তাহা আমি জানি। তবে একেবারে নিরাশ হইবার কারণ নাই। তোমাকে হত্যা ও প্রাণি-শিকারের ট্রেনিং স্কুলে কিছু দিন গিয়া শিক্ষানবিশি করিতে হইবে।

ইহা শুনিয়া রক্তমুখ উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—প্রভু, নিশ্চয়ই আমি সেখানে যাইব। কোথায় সে ইস্কুল?

গলিতনখ বলিল—কলিকাতা সহর।

রক্তমুখ তখনই দীর্ঘ পদক্ষেপে কলিকাতার অভিমুখে যাত্রা করিল।

গলিতনখ তাহাকে ডাকিয়া বলিল—বৎস, সে বড় কঠিন স্থান। সুন্দরবন তাহার তুলনায় অতিশয় নিরাপদ, একটু সাবধানে চলা-

ক্ষিমা করিও। মানুষ বলিয়া তাহাদের অবহেলা করিও না, গুরু বলিয়া তাহাদের সমীহ করিও।

রক্তমুখ চলিয়া গেলে গলিতনখ ভাবিতে লাগিল, নির্ব্বোধ জানোয়ারটিকে কলিকাতায় যাইতে বলিয়া কি ভালো করিলাম? বেচারা মারা গেলেও জানিবার উপায় থাকিবে না। কাগজে তো আর বাঘ বলিয়া উল্লিখিত হইবে না—কেবল বাহির হইবে যে সম্প্রদায়বিশেষের অস্ত্রবিশেষে সম্প্রদায়বিশেষের এক জন নিহত হইয়াছে। তার মধ্যে কোন্‌টা মানুষ আর কোন্‌টা রক্তমুখ কেমন করিয়া বুঝিব?

২

রক্তমুখ কলিকাতায় আসিয়া সত্য সত্যই মহা ফাঁপরে পড়িল। তাহার মনে হইল, ইহার চেয়ে সুন্দরবন অনেক নিরাপদ ছিল; এমন কি, সেখানে অনাহারে মৃত্যুও তাহার একবার শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হইল।

সে দেখিল, সন্ধ্যা হইবা মাত্র শহরের পথ-ঘাট জনশূন্য হইয়া গেল। অন্ধকারে কোথায় যাইবে ভাবিয়া না পাইয়া সে ধর্ম্মতলার মোড়ে একটি গলির মুখে গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময়ে দুই জন লোক গলি দিয়া ঢুকিতেছিল, তাহারা অন্ধকারে রক্তমুখকে চিনিতে না পারিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। এক জন শুধাইল—ও কে? রক্তমুখ সাড়া দিল না। তখন আর এক জন বলিল—বোধ হয়, সংখ্যা-গুরু। সংখ্যা-গুরু যে সম্প্রদায়বিশেষের নাম রক্তমুখ তাহা জানিত না। তাহাকে সংখ্যা-গুরু বলিয়া মনে হইবা মাত্র লোক দুই জন সভয়ে পলায়নে উদ্যত হইল। এমন সময়ে ধাবমান একখানি

মোটরের আলো আসিয়া রক্তমুখের গায়ের উপরে পড়িল। লোক দুই জন যুগপৎ বলিয়া উঠিল—না ভাই, ওটা মানুষ নয়, একটা বাঘ মাত্র। তখন তাহারা হাসিতে হাসিতে নির্ভয়ে তাহার পাশ দিয়া গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। এ অভিজ্ঞতা রক্তমুখের পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন। সুন্দরবনে সে দেখিয়াছে মানুষে বাঘকে ভয় করে—এখানে দেখিল মানুষ মানুষকে করে ভয়—বাঘকে সে বিড়ালের মতো নিরীহ মনে করে। লজ্জায় তাহার মুণ্ড হেঁট হইয়া গেল—এবং জিহ্বা হইতে লালা পড়িয়া মাটি ভিজিয়া যাইতে লাগিল।

সে বুঝিল, এখানে মানুষের বেশ ধারণ না করিলে শ্রদ্ধা পাইবে না। সে মানুষের পরিচ্ছদের সন্ধানে বাহির হইল। অধিক দূর যাইতে হইল না, এক স্থানে একটি মৃতদেহ দেখিতে পাইয়া তাহার ধুতি ও পাঞ্জাবী পরিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু কিছু দূর যাইতে না যাইতেই এক দল লোক H. H. রব করিয়া ছোরা ও লাঠি লইয়া তাহাকে তাড়া করিল। রক্তমুখ গত্যন্তর না দেখিয়া পালাইল। আক্রমণকারিগণ তাহাকে ধরিতে না পারিয়া থামিল। রক্তমুখ দূর হইতে শুনিতে পাইল—'ভাই, H-টা কি শয়তান, বাঘের পোষাক পরিয়া আসিয়াছিল—ইহাদের অসাধ্য কিছুই নাই।'

কিন্তু রক্তমুখের তখনো শিক্ষা হয় নাই। সে পুনরায় আর একটি মৃতদেহ দেখিতে পাইয়া ধুতি ও পাঞ্জাবীর উপরে মৃত ব্যক্তির লুঙি ও টুপি পরিয়া ফেলিল। এই অপরূপ বেশে তাহাকে কেমন দেখায়, একখানা আরশি পাইলে মন্দ হইত না, ইত্যাদি কথা যখন সে ভাবিতেছে, ঠিক তখন কয়েক জন লোক M. M. শব্দ করিতে করিতে তাহাকে তাড়া করিল। রক্তমুখ আবার প্রাণভয়ে ছুটিল। এবারে ছুটিতে ছুটিতে সে এক সরাইখানায় গিয়া ঢুকিয়া পড়িল। সেখানে এক দল লোক তাহারই মতো লুঙি ও টুপি পরিয়া বসিয়া পানাহার করিতেছিল। রক্তমুখকে তাহারা বাঘ বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া সাদরে তাহাদের পাশে বসিতে দিল এবং তাহার সম্মুখে প্রচুর আহার্য্য স্থাপন করিল। রক্তমুখ অনেক দিন পরে পেট ভরিয়া খাইল।

আহার শেষ হইলে দলের প্রধান ব্যক্তি প্রত্যেককে একখানা করিয়া ছোরা উপহার দিল। রক্তমুখও একখানা ছোরা পাইল। উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া সে কারণ শুধাইল। প্রধান ব্যক্তিটি তাহার মূর্খতায় বিস্মিত হইয়া শুধাইল—কোথা হইতে আসিতেছ? সুন্দরবন হইতে না কি?'

রক্তমুখ স্বীকার করিল—সত্য সত্যই তাহার বাড়ী সুন্দরবনে।

তখন সেই ব্যক্তি রক্তমুখকে ছোরা চালনার কৌশল ও উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিল এবং বলিল—H. দেখিলেই মারিবে।

রক্তমুখ শুধাইল—H কি করিবে?

লোকটি বলিল—সুযোগ পাইলে সে-ও তোমাকে মারিবে। তুমি যে M.

রক্তমুখ বলিল—সবই বুঝিলাম, কেবল H ও M বলিতে কি বুঝায় তাহা ছাড়া। H ও Mএর অর্থ কি?

ইহা শুনিয়া লোকটি জিভ কাটিয়া বলিল—ও কথা জিজ্ঞাসা করিও না। আইনে ইহার অধিক বলা নিষেধ। আমরা প্রয়োজন হইলে এবং না হইলেও মানুষের মাথা ভাঙিতে পারি, কিন্তু আইন

ভাঙিতে অক্ষম। নবাবের নিষেধ আছে। তখন রক্তমুখ ছোরা লইয়া H নিধন-ব্রতে বাহির হইল!

কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও নির্ব্বোধ অনিপুণ রক্তমুখ এক জন H.কেও হত্যা করিতে পারিল না। অথচ H ও Mগণ কেমন কৌশলে, কেমন অনায়াসে পরস্পরকে হত্যা করিতেছে, তাহা সে চোখের উপরে দেখতে লাগিল—এবং ক্রমে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও পশুত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা তাহার মনে আশাতীত মাত্রায় বাড়িয়া গেল। সুন্দরবনে সে কৌশলী ব্যাঘ্র-যুবকদের হরিণ, মহিষ, কুম্ভীর এবং মনুষ্য প্রভৃতি শিকার করিতে দেখিয়াছে এবং মনে মনে তাহাদের প্রশংসা করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে মানুষের মানুষ শিকার দেখিয়া বুঝিল, পশুরা এ বিষয়ে নিতান্তই নাবালক। একবার তাহার মনে হইল, কয়েক জন মানুষকে সুন্দরবনে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়া পশুদের ট্রেনিং-কার্য্যে নিয়োগ করিবে।

রক্তমুখ হত্যার কৌশল অনেকটা বুঝিল, কেবল বুঝিতে পারিল না—ইহার উদ্দেশ্য কি? হরিণ ও বাঘ ভিন্ন শ্রেণীর পশু, কাজেই একে অপরকে হত্যা করে। কিন্তু H ও M আপাত-দৃষ্টিতে একই প্রকার পশু বলিয়া তাহার মনে হইল, উভয়েরই হাত-পা দু'খানা করিয়া, চেহারাও এক রকম—তবে এই হিংসা কেন? কিন্তু মানুষের প্রতি তাহার ভক্তি এই কয় দিনে এতই বাড়িয়াছিল যে, এই হত্যা-কাণ্ডকে সে অকারণ মনে করিতে পারিল না—বরঞ্চ তাহার মনে হইল, হত্যা-রহস্য বুঝিবার যোগ্যতা এখনো সে লাভ করিতে পারে নাই। এক দিন পারিবে, এই আশায় সে শহরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে শহরবাসী শান্তিস্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছে। যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করো—হঠাৎ শান্তিস্থাপন কেন? তবে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব—যুদ্ধই বা বাধিয়াছিল কেন? দুই-ই সম্পূর্ণ অমূলক। আসল কথা, দুই পক্ষই কিঞ্চিৎ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে আর এত দিনের সযত্ন চেষ্টায় তাহারা যে-সব অস্ত্র-শস্ত্র, ছোরা-ছুরি, হাত-বোমা ও পেট্রল সংগ্রহ করিয়াছিল সেগুলি এখন নিঃশেষিত-প্রায়। এবারে কিছু দিন শান্তি না হইলে নূতন সংগ্রহ অসম্ভব। শান্তি যুদ্ধেরই ভূমিকা।

যাই হোক, নাগরিকগণ এক্ষণে লাঠি-সোটা, ছোরা-বন্দুক প্রভৃতি শান্তিস্থাপনের সরঞ্জামে সজ্জিত হইয়া সভাস্থলে সমবেত হইয়া দুই পক্ষ নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করিয়া উপবেশন করিয়াছে এবং পরস্পরের দিকে সন্দেহে ও ভয়ে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

শান্তি-প্রতিষ্ঠার সমস্ত আয়োজনই সম্পূর্ণ, কেবল এক জন যথেষ্ট নিরপেক্ষ চেয়ারম্যানের অভাব। কেহই অপর পক্ষের লোকের দাবী মানিতে প্রস্তুত নয়। ক্রমে চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনের বিতণ্ডাতে শান্তিভঙ্গ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল, এমন সময়ে রক্তমুখ সেই সভাগৃহে প্রবেশ করিল। সকলে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—M না H?

রক্তমুখ কি উত্তর দিবে ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া থাকিল।

তখন এক জন তাহার লুঙ্গি ও টুপি দেখিয়া বলিল—M.

অপর আর এক জন লুঙ্গি-চাপা ধুতি আবিষ্কার করিয়া বলিল—H.

সকলের মধ্যে বিজ্ঞতম ব্যক্তি বলিয়া উঠিল—ইনি M+H.

তখন সকলে একযোগে বলিয়া উঠিল—তবে ইনিই আমাদের শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান।

রক্তমুখ মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই সকলে তাহাকে মাথায় তুলিয়া লইয়া সোল্লাসে সগর্জ্জনে শান্তি-সঙ্কীর্ত্তনের উদ্দেশ্যে পুরী পরিভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িল। রক্তমুখ যথাসম্ভব গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু বেশিক্ষণ গম্ভীর হইয়া থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। পথের মধ্যে এক জায়গায় একটি ছাগশিশু দেখিয়া শান্তি-কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া সে এক লাফ মারিল—কিন্তু অল্পের জন্য লক্ষ্যের উপর না পড়িয়া এক মুখ-খোলা manholeএর মধ্যে গিয়া পড়িল এবং জলের তোড়ে ভাসিতে ভাসিতে অল্প কালের মধ্যেই ধাপার মাঠে আসিয়া পৌঁছিল। সেখানে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া গায়ের পোষাক খুলিয়া ফেলিয়া এক দৌড়ে সুন্দরবনে গিয়া উপস্থিত হইল।

৩

কলিকাতার শিক্ষার গুণে রক্তমুখ এখন সুন্দরবনের সব চেয়ে প্রবল শার্দ্দূল। অন্যান্য পশু, আগে যাহারা তাহাকে অবজ্ঞা করিত, তাহার ভয়ে এমন জড়-সড়, সকলেই তাহার কাছে হাতজোড় করিয়া অবস্থান করে। রক্তমুখের নামে উক্ত অঞ্চলের পশু-জগৎ প্রকম্পিত। সে এখন সার্থকনামা।

তাহা ছাড়া, কলিকাতার আর একটি শিক্ষা তাহার সূত্রে সুন্দর-বনের পশু-জগতে প্রবেশ করিয়াছে—অন্য নামের অভাবে পশুরা তাহাকে বলে—'মানবিক অত্যাচার'। সুন্দর বনের পশু-সুন্দরীদের মান ইজ্জৎ লইয়া টেকা ভার।

রক্তমুখ কাহাকেও ভয় করে না কেবল মানুষের নাম শুনিলে এখনো তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়া থাকে।

নুয়ে-পড়া বাঁশঝাড়

শুভেন্দু ঘোষ

[চীনা-সাহিত্যের সংবাদ আমরা কম রাখি। ইংরেজিতে কিছু অনুবাদ হয়েছে, তারও সঙ্গে আমাদের বড় একটা পরিচয় হয়নি। সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

সু তুং-পো ছিলেন একাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ চীনা সাহিত্যিক। তাঁর প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী, বাচন-কৌশল ছিল নিখুঁত। কবিতা, প্রবন্ধ, স্মৃতিলিপি তিনি অজস্র রেখে গিয়েছেন। আজও সেগুলি চীনা-সাহিত্যের পরম সম্পদ্ বলে গণ্য হয়ে থাকে।

সু তুং-পোর একটা রচনা বাঙালী রসিক সমাজের কাছে উপস্থিত করা গেল। এটিতে তাঁর কবিত্ব, রসবোধ, সহৃদয়তা সুপ্রকাশ; তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও মননশীলতারও সুস্পষ্ট পরিচয় এটিতে আছে। —অনুবাদক।]

যে বাঁশ গাছটা সদ্য গজিয়েছে তারও গাঁট থাকে, পাতা থাকে। প্রথমে দেখায় যেন ঝিঁঝি পোকার পেটটা, ক্রমে দেখতে হয় সাপের মত, দু'মুখো তলোয়ারের মত আচ্ছাদন খসাতে খসাতে চল্লিশ হাত অবধি দীর্ঘ হয়ে ওঠে।

আজকালকার চিত্রকররা বাঁশ গাছ আঁকেন, গাঁটের 'পর গাঁট চাপিয়ে, পাতার পরে পাতা সাজিয়ে। সে রকম বাঁশ গাছ হওয়া কী করে সম্ভব?

বাঁশ গাছ যদি আঁকতে চাও, মনের চোখে আগে সেটাকে দেখো। তুলি হাতে বহুক্ষণ ধরে তোমার বিষয়-বস্তু লক্ষ্য করো। যা আঁকতে চাও সেটা দেখা মাত্র তুলির টানে-টানে সেটাকে রেখায় বেঁধে ফেলো। চিত্তে-পাওয়া রসকে এমনি ভাবেই তাড়া করে ধরতে হয়। খরগোসটা ওঠা মাত্র বাজ-পাখী তার ওপর ছোঁ মারে, একটু দ্বিধা করলেই শিকার হাতছাড়া হয়ে যায়।

কথাটা আমাকে বলেছিলেন য়ু-কো।

নিজে এটা করি এমন নৈপুণ্য নাই আমার, তবু এ মন্ত্রের মর্ম আমি বুঝি।

নিজে সাধন করার সামর্থ্য নাই অথচ এটা বুঝি—তার কারণ হচ্ছে আমার শিক্ষার অভাব। উপলব্ধির সঙ্গে প্রকাশের সমন্বয় হয়নি, মন আর হাতের মধ্যে যোগস্থাপন হয়নি।

মোদ্দা, মানসী মূর্তিকে যে পুরোপুরি ধরতে পারে না, সে তার আভাস হয়তো একটা পায় কিন্তু রূপ দিতে গিয়ে হঠাৎ তাকে হারিয়ে ফেলে।

শুধু বাঁশ গাছ আঁকার সম্বন্ধে এ কথা খাটে না নিশ্চয়! ৎজু-য়ু 'কালিতে আঁকা বাঁশঝাড়' বলে একটা কবিতা লিখে য়ু-কোকে সেটা উপহার দেবার সময় বলেছিলেন, "যে পাচক খণ্ড খণ্ড করে গোমাংস কাটে (১) আর যে লোকটা অধ্যাত্ম সাধনা করে—উভয়েরই মূলমন্ত্র হল ঐ একই।" পণ্ডিতেরা চাকার মিস্ত্রী লুন পিয়েনকেও ঐ মর্যাদা দিয়েছেন। (২)

আমাদের ওস্তাদও বাঁশঝাড় আঁকার ব্যাপারে ঐ নীতি অনুসরণ করেছেন। আমার তো মনে হয়, তিনি 'তাও'-এর সন্ধান পেয়েছেন। তাই নয় কি?

ৎজু-য়ু পাকা শিল্পী নন, শিল্পের মর্ম বোঝেন মাত্র। আমার মত লোকে শিল্পের মর্ম তো বোঝেই; তার চেয়ে যা বড় কথা, শিল্পের পদ্ধতিটাও বোঝে।

য়ু-কো বাঁশ গাছের ছবিটা এঁকে প্রথম প্রথম ভেবেছিলেন, এটা এমন-কিছু হয়নি। কিন্তু চার দিকের লোক তাঁর দোরে এসে ঠেলাঠেলি লাগাল। এক টুকরো সাদা রেশমী কাপড় এনে প্রত্যেকে মিনতি করতে লাগল, ছবি এঁকে দিতে হবে। য়ু-কো অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে রেশমী কাপড়ের টুকরোগুলো মেঝের ওপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে তাঁদিকে ধমকে দিয়েছিলেন,—"ওগুলো দিয়ে মোজা তৈরী করব আমি।" লোকে কথাটা সত্যি বলে প্রচার করে দিয়েছিল।

এর কিছু দিন পর, য়ু-কো তখন য়াং-চাও থেকে ফিরছিলেন, আমি ছিলাম সুচাও-এ। একটা চিঠিতে তিনি আমায় লিখলেন, "তোমাদের ও-অঞ্চলের লোককে বলে দাও, আমরা—বাঁশ গাছ আঁকিয়েরা—পেং চেং-এর কাছে আছি। তারা যেন সেখানে গিয়ে আমাদের খোঁজ করে। বুঝছো তো, তাহলে মোজার জন্যে রেশমী কাপড় আমাদের চার পাশে জড় হয়ে যাবে!" চিঠির শেষ দিকে একটা কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন, সংক্ষেপে সেটা হচ্ছে এই:—

> 'এক টুকরো ঈ-চি রেশমের কাপড় নিয়ে
> তুলির টানে-টানে শীতের কিশলয় আঁকতে চাই আমি
> লম্বায় দশ হাজার ফুট।'

য়ু-কোকে উত্তর দিলাম, 'দশ হাজার ফুট দীর্ঘ বাঁশ, তার জন্যে তো তোমার আড়াই শো টুকরো রেশমী কাপড় দরকার হবে বলে মনে হচ্ছে। জানি, দোয়াত-কলমে তোমার বিরক্তি এসে গিয়েছে, শুধু রেশমের ওপর পড়েছে নজর।'

য়ু-কো প্রথমটা এর কোনো জবাব দিতে পারেননি, পরে বলেছিলেন, "কথাগুলো বলেছিলাম রূপক হিসেবে। নইলে পৃথিবীর কোথায় দশ হাজার ফুট বাঁশ পাওয়া যাবে?"

আমি কিন্তু কথাটাকে সত্যি মনে করার ভান করে এই শ্লোকগুলো দিয়ে পাল্টা শোনালাম:—

> 'পৃথিবীতে চার হাজার হাত লম্বা বাঁশও আছে:
> চাঁদ যখন ঢলে পড়ে, উৎসব-কক্ষ যখন শূন্য হয়ে যায়
> তখন ছায়াগুলো অমনি লম্বাই হয়ে ওঠে।'

---

(১) চুয়াং-ৎজুর 'আত্মার পুষ্টি' বই-এ রাজকুমার হুই-এর পাচক সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তার মাংস কাটার নিপুণতার তারিফ করা হলে সে উত্তর দিয়েছিল, "আমি চিরদিন 'তাও'-এর সাধনা করে এসেছি। সেটা নৈপুণ্যের চেয়ে অনেক ভাল।"

(২) চুয়াং-ৎজুর 'ঈশ্বরের তাও' বই-এ আছে: রাজা হুআন্-এর সঙ্গে চাকার মিস্ত্রীর তর্ক হচ্ছিল পণ্ডিতদের কেতাব সম্বন্ধে। মিস্ত্রী তখন বলেছিল, "ওগুলো হচ্ছে প্রাচীন কালের লোকদের জ্ঞানের তলানি। চাকা তৈরী করার সময় আমি খুব তাড়াতাড়ি কাজ করি না, খুব আস্তেও না। খুব তাড়াতাড়ি করলে চাকার পাকিগুলো ঠিক মত বসে না আর খুব আস্তে করলে চাকা শক্ত হয় না। খুব তাড়াতাড়ি বা খুব আস্তে কাজ করলে চলে না। মন আর হাতের মধ্যে যোগস্থাপন করা চাই। সেটা কি জিনিষ কথায় বোঝানো যাবে না। এর মধ্যে একটা রহস্যময় কৌশল আছে।"

য়্-কো হেসে বলেছিলেন, "সু কথার মার-প্যাঁচ খেলছে। তা হোক গে, আড়াই শো টুকরো রেশমী কাপড় পেলে কিছু জমি কিনে বুড়ো বয়সে সেখানে গিয়ে বিশ্রাম করব।" য়ুন-তাং উপত্যকার বাঁশঝাড়ের যে ছবিটা তিনি এঁকেছিলেন সেটা তিনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন, দেবার সময় বলেছিলেন, "এ বাঁশঝাড় মাত্র কয়েক ফুট লম্বা, কিন্তু এর একটা অসীম ব্যাপ্তির দিকও আছে।"

এখন য়ুন-তাং উপত্যকা হচ্ছে য়াং-চাও-এ। য়্-কো আমায় বললেন, য়াং-চুয়ান্ সম্বন্ধে ত্রিশটি কবিতা লিখতে হবে। সেগুলোর মধ্যে একটা হল 'য়ুন-তাং উপত্যকা'।

কবিতাটি ছিল এই :—

'হান্-চুয়ানের লম্বা বাঁশগুলো আগাছার মত ঘন—
চায়া থাকতেই সেগুলোর উপর কুড়ুল পড়েনি কেন?
হয়তো সেখানকার সাধু অথচ লোভী শাসক মশায়—
উই নদীর কিনারে হাজার একর বাঁশ বনের স্বপ্ন দেখছেন।' (৩)

দৈবক্রমে সেই দিনই য়্-কো সস্ত্রীক ঐ উপত্যকায় বেড়াতে গিয়ে সান্ধ্য-ভোজের জন্যে বাঁশের অঙ্কুর বেঁধেছিলেন। আমার চিঠি খুলে কবিতাটা পড়ে হাসতে হাসতে টেবিলের ওপর তিনি মুখের ভাত ছিটিয়ে ছিলেন।

য়ুআন্-ফেং-এর দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম চন্দ্রের বিশে তারিখ য়্-কো চেন্-চাও-এ মারা যান। ঐ বৎসর সপ্তম চন্দ্রের সাতই তারিখে হুচাও-এ আমি আমার বই আর ছবিগুলো রোদ্দুরে দিচ্ছিলাম—চোখে পড়ল ঐ বাঁশঝাড়ের ছবি। এইগুলো সরিয়ে দিয়ে ডুকরে কেঁদে ফেললাম আমি।

সেকালে, ৎসাও মেং-তে চিয়াও কুং-এর আত্মার তর্পণ করেছিলেন। তখন একটা প্রবাদ ছিল: রথ যদি পাশ কাটিয়ে যায়, পেট-কামড়ানি ধরবে। (৪) য়্-কো যে সব রসিকতা করত সেগুলো আমি আজ লিখে রাখছি—সে শুধু এইটা দেখাতে যে, আমার আর য়্-কোর মধ্যে যে সম্প্রীতি ছিল তার কোনো তুলনা হয় না।

(৩) উই নদীর কিনারে হাজার একর বাঁশঝাড় সম্বন্ধে চীনে একটা প্রাচীন প্রবাদ আছে যে, সেটা থাকলে হাজার পরিবারের কর্তা হওয়ার মর্যাদা পাওয়া যায়।

(৪) ৎসাও সেং-তে মৃত বন্ধু চিয়াও কুং-এর আত্মার তর্পণ করা উপলক্ষে যে কবিতা রচনা করেছিলেন সেটাতে ছিল:—"আমাকে যে দিব্যি দিয়েছিলে সেটা মনে পড়ছে; বেশ গম্ভীর ভাবে বলেছিলে, 'আমি মরে গেলে যদি আমার উদ্দেশে একটু মদ আর একটা মুর্গী উৎসর্গ না করে যদি তুমি পাশ কাটিয়ে চলে যাও, তাহলে তিন পা যেতে না যেতেই তোমার পেট কামড়াবে,—তখন আমায় যেন দোষ দিও না'।"

খোকা ঘুমুলো
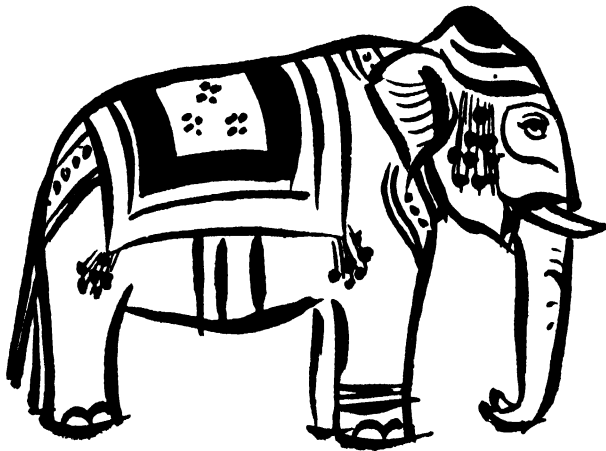
নরেন্দ্রনাথ মিত্র

কাহিনীটি আবীরচাঁদ রূপচাঁদের আত্মজীবনাত্মক। বিভিন্ন সন্ধ্যায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে এ কাহিনীর তিনি আভাস দিলেও প্রধানত একটি বিশেষ দিনের বৈঠকেই আমূল আখ্যানটি তাঁর কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম। অবশ্য শ্রুতির পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে অন্যান্য দিনের আলাপ-আলোচনার কিছু কিছু অংশ যে এ কাহিনীর মধ্যে মিলে যায়নি এ কথা জোর ক'রে বলতে পারব না। এটুকু রূপান্তর ছাড়া আর যা অদল-বদল হয়েছে তা নিতান্তই ভাষান্তরের। তাঁর প্রাদেশিক মারাঠী-মিশ্রিত হিন্দীকে স্বকীয় ভাষায় অনুবাদ ক'রে নিয়েছি। তাতে ভঙ্গিটা একটু এদিক ওদিক হ'লেও ভাবের বিশুদ্ধতা একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি, এ কথা নিঃসংশয়ে বলব।

মধ্য-প্রদেশের একটি নাতিখ্যাত সহরে আবীরচাঁদ রূপচাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। চাকুরিতে ঢুকতে না ঢুকতেই সেই সহরের শাখা-অফিসে আমার বদলির হুকুম এল। শুনে প্রথমটা উল্লসিতই হয়েছিলাম। এ উপলক্ষে নতুন একটা জায়গা অন্তত দেখে আসা যাবে। দেখলামও। গিয়েই সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে অঞ্চলটির ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আর নৈসর্গিক চমৎকারিত্বের নিদর্শনগুলি ঘুরে-ঘুরে সব নিঃশেষ করে ফেললাম। ভাঙ্গা-চোরা যত দুর্গ আর মন্দির, হ্রদ আর জলপ্রপাত, চার দিকের ছোট-বড় নানা আকারের পাহাড়ের বেষ্টনী একাধিক বার চাক্ষুষ করলাম। তার পর এল ক্লান্তি। মাঠ-ঘাটের সমতলে ছাড়া পাওয়ার জন্য চোখ তৃষার্ত হয়ে উঠল, মন ছটফট করতে লাগল কলকাতার স্বজন-বন্ধুদের জন্য। কিন্তু ছটফট করলে তো উপায় নেই। এ তো আর হাওয়া বদল নয় যে মনের মধ্যে উল্টো হাওয়া বইতে সুরু করলেই গাড়িতে উঠে বসব। এমনি যখন মনের অবস্থা, আবীরচাঁদ রূপচাঁদের সঙ্গে হঠাৎ এক দিন আলাপ হয়ে গেল। আলাপ এর আগেও যে কোন এক দিন হ'তে পারত। আমাদের অফিসের পাশেই তাঁর বাড়ি। শুনেছিলাম, সহরের অন্য দিকে তাঁর মারবেল পাথরের ব্যবসা আছে। এই ষাট বছরের সাধারণ-দর্শন পাথরের ব্যবসায়ীটি সম্বন্ধে আমার তেমন কোন ঔৎসুক্য ছিল না। আমার সম্বন্ধে ওঁরও যে বিশেষ কোন কৌতূহল ছিল এমন আমার মনে হয়নি। ঢুকতে-বেরুতে প্রায়ই চোখে পড়ত বারান্দায় ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে তিনি সামনের পাহাড়টির দিকে চেয়ে আছেন। ভ্রমণে ক্লান্তি আসার পর অফিস অন্তে আমিও বই নিয়ে চেয়ার পেতে তেতলার বারান্দায় বসতে সুরু করলাম। অফিসের ওপর তলায় আমাদের বাস ও আহারের বন্দোবস্ত ছিল। পর পর তিন-চার দিন বোধ হয় তিনি আমাকে অসময়ে চুপ-চাপ বসে থাকতে লক্ষ্য করেছিলেন। তার পর হঠাৎ এক দিন সন্ধ্যার সময় তিনি আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবুজী আজকাল যে বেড়াতে বেরুচ্ছেন না? বেড়াবার এই তো সময়।'

বললাম, 'কোথায় আর বেড়াব? বেড়াবার মত নতুন জায়গা আর নেই, সবই প্রায় দেখা-শোনা হয়ে গেছে।'

তিনি একটু হাসলেন, 'জায়গার আর দোষ কি। যে বেগে ছুটছিলেন তাতে দু' সপ্তাহে গোটা পৃথিবীও বোধ হয় দেখা হয়ে যায়, আর এ তো সামান্য একটা পাহাড়ে সহর। কিন্তু ও-ভাবে নয়, আরো ভালো ক'রে দেখুন বাবুজী। কেবল দেশ নয়, দেশের লোকজনও দেখুন, তবে তো পুরোপুরি দেখা হবে।'

উপদেশটি মামুলি বৃদ্ধজনোচিত, কিন্তু বলবার ভঙ্গিটা ভালো লাগল। হেসে বললাম, 'আপনার কথা মনে রাখব। আর দ্বিতীয় পর্য্যায়ের দেখাটা আমার বর্তমান প্রতিবেশীকে দিয়েই সুরু করবার ইচ্ছা রইল।'

তিনি হেসে উঠলেন, 'বহুৎ আচ্ছা, আজই আসুন না আপনি। তবে বুড়ো মানুষকে দেখতে আসা মানেই কিন্তু তার কথা শুনতে আসা বাবুজী, তা মনে রাখবেন।'

ক্রমে আলাপ জমে উঠল। দেখলাম তিনি মিথ্যা বলেননি। কথা তিনি একটু বেশিই বলেন। তবে তার সবই প্রায় রূপকথা, উপদেশ নির্দেশ নয়। ফলে ভয়ের বদলে ভক্তি এল, রীতিমত অনুরক্ত হয়ে উঠলাম তাঁর; সময় চমৎকার কাটতে লাগল।

তিনি চা খান না। আমিও চা ছেড়ে ভাঙের সরবৎ ধরলাম। তার পর এ অঞ্চলের পুরোন মন্দিরগুলির নামের কিংবদন্তী প্রসঙ্গে সেদিন তাঁকে কথায়-কথায় জিজ্ঞাসা ক'রে বললাম, 'আচ্ছা, এত কথা তো বললেন শেঠজী, কিন্তু আপনার নামের ইতিহাসটুকু তো কিছুই বললেন না?'

আবীরচাঁদ রূপচাঁদ একটু যেন বিস্মিত ভঙ্গিতে আমার মুখের দিকে তাকালেন, 'নামের আবার একটা ইতিহাস কি বাবুজী! এ কি কোন দুর্গের না মন্দিরের নাম, যে কিছু একটা কিংবদন্তী থাকবে?'

বললাম, 'নেই বুঝি? নামটি কিন্তু আপনার সত্যিই চমৎকার! যৌবনে বোধ হয় আপনি খুব সুপুরুষ ছিলেন।'

পলকের জন্য আবীরচাঁদ রূপচাঁদের দাড়ি-গোঁফ-চাঁছা কুঞ্চিত রেখাসঙ্কুল মুখে কেমন একটু ছায়া পড়ল। কিন্তু তার পরেই তিনি সহাস্যে বললেন, 'উঁহু, তোমার অনুমান সত্য নয় বাবুজী, এই একবার্ ট

বছর বয়সে রূপ আমার সবে খুলতে সুরু করেছে। এ ধরণের প্রশ্ন কিন্তু তাই বলে আজ সুরু হয়নি। সাঁইত্রিশ বছর আগে আরও এক জনের মুখে এ কথা শুনেছিলাম। আমার নাম আর নামের অর্থ নিয়ে সে-ও খুব উপহাস করেছিল।'

একটু ব্যথিত হয়ে বললাম, 'আমি কিন্তু আপনাকে ঠিক উপহাস করিনি শেঠজী।'

আবীরচাঁদ রূপচাঁদ অন্যমনস্কের মত বললেন, 'তা জানি।'

বললাম, 'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সাঁইত্রিশ বছর আগের সেই মুখ নিশ্চয়ই খুব সুন্দর ছিল। না হলে সে মুখের কথা এত দিন ধ'রে আপনি মনে করে রাখতেন না।'

আবীরচাঁদ মৃদু হাসলেন, 'এবারকার অনুমান তোমার মিথ্যা হয়নি বাবুজী। তুমি ঠিকই বলেছ। সে মুখের মত মুখ আমি জীবনে আর দেখিনি।'

বললাম, 'আপনার ভাগ্য ভালো; আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন। কিন্তু আমি তো আর তেমন ভাগ্য নিয়ে আসিনি। আমাকে এ যাত্রা শুধু শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। দোহাই আপনার, এই শোনার আনন্দটুকু থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।'

আবীরচাঁদ তেমনি স্মিত হাস্যে আমার দিকে তাকালেন, 'ভারি জবরদস্ত লোক তুমি বাবুজী! খুঁচে-খুঁচে মানুষের গোপন কথা টেনে বার করতে তোমার জুড়ি নেই। আচ্ছা, শোন তাহ'লে। গোড়া থেকেই বলি।'

বয়স তখন আমার কম হয়নি। চব্বিশ পেরিয়ে গেছে। সে বয়সে আমাদের সমাজে তখনকার আমলে লোকে একেবারে পাকা-পোক্ত সংসারী হয়ে বসত। ছেলে হোত, মেয়ে হোত, মান-সম্মান ধন-দৌলত তখন থেকেই দানা বাঁধতে সুরু করত। কিন্তু গোড়াতেই আমি বড় বেদারায় চলে গিয়েছিলাম বাবুজী! শুকনো কেতাবের পাতায় আমার মন বসল না, বাঁধা পড়ল না বাবার কারবারের খেরো বাঁধা খাতায়, সে মন কেবলই উড়ু-উড়ু করতে লাগল, কেবলই চাইল ভেসে-ভেসে বেড়াতে।

বাবা রাগ করে বললেন, 'এমন অপদার্থ আমাদের বংশে আর জন্মেনি। ও আমার বিষয়-আশয় সব ছারেখারে দেবে তবে ছাড়বে।'

মা বললেন, 'তা নয়, যেমন ভাবভঙ্গি দেখছি, এ ছেলে নিশ্চয়ই এক দিন সন্ন্যাস নেবে। ভালো চাও তো বিয়ে দিয়ে এখনো আটকাও।'

বাবা শুনে শ্লেষের হাসিতে ঠোঁট বাঁকালেন। আমার তখনকার চাল-চলন স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে বাবা যতখানি জানতেন, মা ততখানি বিশ্বাস করতেন না।

মা'র কোন দোষ ছিল না। ছেলে যত দিন কোলের মধ্যে আঁচলের তলায় থাকে তত দিনই মা'র তার ওপর পুরোপুরি অধিকার। তার পর আঁচলের গিঁট যেদিন খোলে, হাতের মুঠিতে ছেলেকে সেদিন আর ধরা যায় না, বুদ্ধি দিয়ে ছোঁয়া যায় না তার মন, তখন অন্ধ-বিশ্বাস ছাড়া তাঁর আর কি সম্বল থাকে বলো?

কিন্তু বাবার শাসন, তিরস্কার আর অবিচার-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সন্ন্যাসী হওয়ার দিকে ঝোঁক যে এক সময় আমার না গিয়েছিল তা নয়। ঈশ্বরের কাছে নালিশ জানাবার জন্য জলভরা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়েও ছিলাম, কিন্তু চোখ আমার আকাশ পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছল না, প্রতিবেশীর বাড়ির ছাদ পর্য্যন্ত গিয়েই আটকে রইল। বিকালের আলোয় দেখলাম একখানি অপূর্ব্ব সুন্দর মুখ! চোখ জুড়িয়ে গেল। অবিচারের কথা আর মনে রইল না, অভিযোগের কথা ভুলে গেলাম।

তার পর থেকে বহু কাল পর্য্যন্ত কেবল মুখ দেখে-দেখে ফিরেছি। গ্রামে গঞ্জে সহরে বন্দরে। যত দেখেছি, তত দেখবার তৃষ্ণা বেড়েছে। দেশে দেশে সে মুখের আদল বদলে গেছে, বদলেছে মুখের ভাষা। কিন্তু পৃথিবীর সব দেশের ভাষাই যে সমান মধুর তা প্রত্যেক

অঞ্চলের সুন্দরী তরুণীদের মুখে না শুনলে তোমার বিশ্বাস হবে না। বিদেশিনীর সঙ্গে তার নিজের ভাষায় প্রণয়ালাপের লোভে আমি বহু দুরূহ ভাষা আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছি। এক-আধটু ঢুঁ মেরেছিলাম তোমাদের বাংলা ভাষাতেও।

কিন্তু অনেক মুখে আর অনেক ভাষার কথা এখন থাক। একখানা মুখের কথাই আজ শোন।

রত্না বাইর নাম তখন উত্তর-ভারতে খুব ছড়িয়ে পড়েছে। রাজ-রাজড়া, নবাব-বাদশার বড় বড় ঘরে তার যাতায়াত, আনাগোণা। শুনলাম, তার রূপের ছ্যুতিতে চোখ ঝলসে যায়, কণ্ঠের সুর আর নূপুরের নিক্কণ একবার শুনলে কান থেকে মিলাতে চায় না। লুব্ধ ভ্রমরের মত মন উঠল চঞ্চল হয়ে। তাকে না দেখা পর্যন্ত চিত্তে শান্তি নেই।

যোগাযোগ আর হয় না। খবর পেয়ে আগ্রায় যাই, শুনি, দল বল নিয়ে রত্না বাই গেছে এলাহাবাদে। সেখানে গিয়ে শুনি গেছে কলকাতায়। কলকাতা পর্যন্ত ধাওয়া ক'রে শুনতে পাই, পূর্ববঙ্গের কোন্ এক জমিদারের বজরায় নদীতে নদীতে সে ভেসে বেড়াচ্ছে।

অবশ্য জলে সে বেশি দিন রইল না। ফের উঠল ডাঙায়। লক্ষ্ণৌ সহরে এক রাও সাহেবের নাচের মজলিসে অবশেষে এক দিন তাকে দেখলাম।

তুমি হয়তো রূপের বর্ণনা শুনবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছ বাবুজী! কিন্তু রূপ তো মুখে বর্ণনা করবার জন্য নয়, চোখে দেখবার জন্য। সেই চোখে দেখার রূপকে কতগুলি বাঁধা-ধরা শব্দে রূপান্তরিত ক'রে কতটুকু আর তোমাকে দেখাতে পারব? তার কাজ নেই। তাকে দেখবার লোভ কোরো না, শুধু তার কথা শুনে যাও। কানের ওপর তুমি অনেকখানি নির্ভর করতে পার, সে তোমাকে সহসা পাগল করবে না, মাতাল করে তুলবে না। কিন্তু চোখ? তাকে যদি তুমি একবার আস্কারা দাও বাবুজী, তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অস্থির আর অশান্ত হয়ে উঠবে।

রত্না বাইকে দেখে আমারও তাই হোল। আসর ভাঙল অনেক রাত্রে। রাও বাহাদুরকে ঘুম পাড়াতে রত্না বাইর আরও কিছুটা সময় লাগল। নতুন ক'রে সুর ঢালল কানে, সুরা ঢালল গলায়, অবশেষে মিলল ছুটি, আমি ছুটলাম পিছনে পিছনে গোলাপী রঙের নতুন একতলা কুঠিটায়, যেখানে তার বাসা ঠিক হয়েছে সেইখানে।

দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, রত্না বাই তার ভারহীন লঘু দেহাধার এলিয়ে দিয়েছে পালঙ্কে। পা থেকে ঘুঙুর খুলে দিচ্ছে পরিচারিকা, গা থেকে শিথিল ক'রে দিচ্ছে বেশবাসের বাঁধন। খানিক আগে যা ছিল সজ্জা, যা ছিল অলঙ্কার, এই মুহূর্তে নিতান্ত বাহুল্যের মত তা পরম অবহেলায় খসে-খসে পড়ছে।

ক্লান্তির এই অদ্ভুত রূপ আমাকে উন্মত্ত ক'রে তুলল। যে শব্দ রক্তের ঢেউয়ে আমার বুকের মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠেছিল, দোরের করাঘাতে রত্না বাই তারই প্রতিধ্বনি শুনল। পরিচারিকা অস্ফুট চীৎকার করে উঠল কিন্তু রত্না বাই জ্বলন্ত মোমদানিটা তুলে নিয়ে সেই অর্ধনগ্ন বেশে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। জ্বলন্ত মোম ফোঁটায় ফোঁটায় গলে গলে পড়তে লাগল। মনে মনে ভাবলাম, আলাদা একটা মোমবাতির দরকার ছিল কি, রত্না বাই নিজেই যখন এমন করে জ্বলতে জানে।

এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে রত্না বাই বলল, 'কে তুমি?'

বললাম, 'এই অধম রূপভিক্ষুর নাম আবীরচাঁদ রূপচাঁদ।'

'আবীরচাঁদ রূপচাঁদ!'

এক ঝলক হাসি যেন উছলে ছড়িয়ে পড়ল রত্না বাইর পাতলা, পদ্মের পাপড়ির রঙের দু'টি ঠোঁটের ফাঁকে। সেই তরল হাসির ঝলকে সুধা ছিল না। কিন্তু অঞ্জলি পেতে যদি ধরা যেত দু'হাতে আমি সেই তীব্র হলাহলের ধারা আকণ্ঠ পান করতাম।

তার পর আমার দিকে তাকিয়ে রত্না বাই জিজ্ঞাসা করল, 'এ নাম তোমার কে রেখেছে?'

দেখলাম, মুখের হাসি চাপা পড়লেও কৌতুকে ব্যঙ্গে রত্না বাইর দু'টি চোখের হাসি তখনো উছলে পড়ছে। নিজের রূপহীন প্রতিবিম্ব রত্না বাইর সেই ঝকঝকে দু'চোখের আয়নায় যেন নতুন করে প্রত্যক্ষ করলাম।

বললাম, 'নাম রেখেছেন মা, মানাবে কি না তা ভেবে দেখেননি, সে দায় তো তাঁর নয়।'

রত্না বাই বলল, 'তবে কার?'

বললাম, 'প্রিয়ার। মা শুধু নাম রাখেন, ভঙ্গি দিয়ে সুর দিয়ে সে নামের মান রাখেন প্রিয়া। নিত্য নতুন মানে জোগান।'

পরম কৌতুকে ভ্রূ দু'টি নেচে উঠল রত্না বাইর, 'তাই না কি? কিন্তু এখানে তোমার নামের সেই মানে জোগাবে কে?'

বললাম, 'তুমি।'

হাসির ঢেউয়ে রত্না বাই যেন টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, 'ওলো হীরা বাই, দেখ এসে আমার শেষ রাতের প্রেমিক এসেছে। বেশ বেশ! এবার দর্শনী বাবদ পাঁচ'শ গিনি গুণে দাও বন্ধু! তার পর এস ঘরে।'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'পাঁচশ' গিনি?'

রত্না বাই বলল, 'হ্যাঁ বন্ধু, পাঁচশ'। তোমার নামের মানে জোগাব আর আমার নামের মান জোগাবে না? মুখ দেখে মনে হচ্ছে গিনিগুলি তোমার সঙ্গে নেই, যাও নিয়ে এসো ঘর থেকে। আমি তোমার পথ চেয়ে বসে থাকব। এক রাত যদি ভোর হয় ভেব না, আরও হাজার রাত আছে। হাজার রাত যদি ভোর হয়, আছে লক্ষ রাত—'

খিল-খিল করে ফের হেসে উঠে রত্না বাই দোর বন্ধ করে দিল।

অত টাকা সত্যিই সঙ্গে ছিল না, কিন্তু মনে মনে সংকল্প করলাম, যেমন করেই হোক জুটিয়ে আনব এই পাঁচ'শ গিনি। তার পর সেই গিনির মালা রত্না বাইয়ের চোখের সামনে তুলে ধরব, সেদিন কৌতুকের বদলে লোভে চকচক্ করবে তার চোখ। রুদ্ধ দ্বার যাবে খুলে। তার পর পলকের জন্য হ'লেও সেই সুঠাম তনু-দেহ সম্পূর্ণ আমার আয়ত্তে আসবে। যা খুসি করব তাকে নিয়ে। হাতে চটকাব, পায়ে দলব, পেষণে পেষণে নুইয়ে আনব রত্না বাইর এই উদ্ধত অহংকার।

ফিরে এলাম দেশে। উপার্জ্জনের কোন বিদ্যা তখনো জানা ছিল না। বার কয়েক ক্যাস-বাক্স ভাঙবার পর ঢোকবার হুকুম ছিল না বাবার দোকানে কি শোবার ঘরে, তাই নিতান্ত নিরুপায়

স্বপ্নেই মায়ের গয়নার বাক্সের চাবি ভাঙলাম। মা জেগে উঠে হাত চেপে ধরলেন। আমার হাত তাঁর চোখের জলে ভিজে গেল, বললেন, 'এ গয়না যে তোর বউয়ের জন্ত রেখেছি, আবীর!'

একবার যেন মুখে কথাটা আটকে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত সংকোচ ত্যাগ ক'রে বললাম, 'তার জন্তই নিচ্ছি।'

কিন্তু ফের লক্ষ্ণৌয়ে গিয়ে রত্না বাইর আর দেখা পেলাম না। শুনলাম আবার সে কোথায় গাওনায় বেরিয়েছে। খুঁজতে বেরুলাম নতুন অধ্যবসায়ে। কিন্তু কিছুতেই আর দেখা মিলল না, মাসের পর মাস কাটল, ঘুরে এল বছর। তার পর এক দিন শোনা গেল, রত্না বাইর আর কোন উদ্দেশই পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ বলল, সন্ন্যাসিনী হয়ে সে গেছে হিমালয়ের দিকে; কেউ বলল, বাইজী-জীবনে বিতৃষ্ণা আসায় কুলবধূ সেজে ফের সে অজানা গাঁয়ের পাতার ঘরে ঢুকেছে, আত্মগোপন করেছে ওড়নার আড়ালে। সর্বশেষ জনশ্রুতি বলল, ব্যর্থ-প্রণয়ীর ছুরি বিঁধেছে তার বুকে, তাকে আর ইহলোকে পাওয়া যাবে না।

শূন্য হাতে ফের ফিরলাম ঘরে। রত্না বাইর দেখা না মিললেও পথে-পথে ছোট-খাট মণি-মুক্তার অভাব হয়নি। মায়ের গয়না দিয়ে এলাম তাদের বিলিয়ে। ভাগ্য ভালো, ঘরে এসে কারো কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হোল না। কারণ, ঘরে মাকেও দেখলাম না, বাবাকেও না। শুনলাম, দিন কয়েক আগে প্লেগে তারা পঞ্চত্ব পেয়েছেন।

আবীরচাঁদ রূপচাঁদ আমার দিকে তাকিয়ে এর পর মুহূর্ত কাল চুপ ক'রে রইলেন। আমিও কোন কথা বললাম না।

কিন্তু পর-মুহূর্তেই প্রসন্ন মৃদু হাসিটি তাঁর মুখে ফিরে আসতে দেখে আমি স্বস্তি বোধ করলাম। তিনি আবার শুরু করলেন—

'অবশ্য মা-বাবার মৃত্যুকে অবিশ্বাস করবার জো ছিল না। প্লেগে সে-বার সহরের বহু লোক মারা গিয়েছিল। আত্মীয়-স্বজনদের কেউ কেউ তাঁদের মৃত্যুশয্যায় উপস্থিতও ছিলেন আর আমাকে এসে সান্ত্বনাও দিয়েছিলেন যে সাধ্যমত চিকিৎসার তাঁরা ত্রুটি করেননি। সুতরাং তাঁদের মৃত্যুশোককে বেশ স্বাভাবিক ভাবেই আমি নিতে পেরেছিলাম। কিন্তু রত্না বাইর মৃত্যু আমি বিশ্বাস করিনি। বিশ্বাস করবার আমার সাধ্য ছিল না। আমার ছুরি ছাড়া আর কারো ছুরি তার বুকে বিঁধতে পারে, এ কথা কিছুতেই আমার মনঃপূত হয়নি। আমার চেয়েও বেশি ব্যর্থ-প্রণয়ী তার আর কে আছে, বেশি ধার আছে কার ছুরিতে! তাই তার অনুসন্ধানে কোন দিন আমি নিরস্ত হতে পারিনি। অবশ্য অন্ত কারো মুখ দেখে তার মুখ বলে মাঝে-মাঝে যে ভুল না হয়েছে তা নয়। তার মুখ বলে ভুল হয় না এমন মুখ দেখেও মাঝে-মাঝে ভুলেছি, কিন্তু রত্না বাইকে কোন দিনই সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'তে পারেনি। তার সেই আয়নার মত ঝকঝকে চোখ আমার সমস্ত পৃথিবীকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। তার সেই ঠোঁট, ঠোঁটের সেই বিদ্রূপ বাঁকা রূপ, তীরের ফলার মত আমার সমস্ত জীবনকে এ-পিঠ ও-পিঠ বিদ্ধ ক'রে রেখেছে। আমি কি ক'রে তাকে ভুলব! তবু খুঁজে খুঁজে কিছুতেই তাকে পাওয়া গেল না। মনের মধ্যে কাঁটার মত দিনের পর দিন সে বিদ্ধ হয়ে রইল, চোখের সামনে ফুলের মত কোন দিন ফুটে উঠল না।

বছর পনের বাদে সন্ধ্যার পরে এই ঘরেই বেশ জাঁক-জমকের সঙ্গে সেদিন গানের আর পানের অনুষ্ঠান সুরু হয়েছিল। বয়সের দিক থেকে নিজে যৌবনের শেষ প্রান্ত ছুঁই-ছুঁই করলেও মনে-প্রাণে চাল-চলনে আমি অন্ত প্রান্তেই ছিলাম। সহচরদের মধ্যে সকলেই ছিল সহরের যুবা-বয়সী ধনী-সন্তান, সহচারিণীরা সবাই ছিল চারু-দর্শনা তরুণী, কেবল যে অর্থের আতিশয্যেই তারা আকৃষ্ট হোত তাই নয়, ব্যর্থতার রহস্যও আমার মধ্যে ছিল। আমার কথার চাটনি ছাড়া মদের আসর পুরোপুরি জমে উঠত না, বাঁয়া-তবলায় আমার নিজের হাতের সঙ্গত না থাকলে প্রমোদের আসরে অসঙ্গতি ধরা পড়ত।

সেদিনকার আড়ম্বরের কারণ ছিল। নাগপুর থেকে যে নতুন তরুণী নর্তকীটিকে আনিয়েছিলাম তার নাম ছিল মণি বাই। তার খ্যাতি-প্রতিপত্তি এ অঞ্চলে এত প্রসিদ্ধি পেয়েছিল যে তাকে মাথার মণি করে রাখবার মত লোকের অভাব ছিল না, তবু যে সে এই ছোট্ট সহরে কিছু দিনের জন্ত বাসা বাঁধতে রাজী হয়েছিল তা কেবল আমারই অলৌকিক কৃতিত্বে, এ কথা আমার সহচরেরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেছিল।

আকস্মিক পুচ্ছাহত নাগ-কন্যার অপরূপ একটি নৃত্যভঙ্গি শেষ ক'রে মণি বাই ক্লান্ত দেহে বিশ্রাম করতে বসল। সর্পপুচ্ছের মত তার সুদীর্ঘ বেণীটি গভীর শ্রান্তিতে পিঠের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে। গৌরবর্ণ মুখে মুক্তার মত দেখা যাচ্ছে বিন্দু বিন্দু স্বেদ। আসরের সবগুলি চোখ একজোড়া মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। মণি বাই মৃদু হেসে পানীয়ের জন্ত ইঙ্গিত করল। সহাস্যে তার কাচের পাত্রটি রঙীন সুরায় পূর্ণ করে দিলাম। তরুণ দর্শকদের পাত্রগুলিও কানায় কানায় ভরে উঠল মদে। তারা মুহূর্তের জন্ত চোখ ফিরিয়ে গ্লাসে চুমুক দিল। কেবল এক জোড়া মুগ্ধ চোখ কিছুতেই মণি বাইয়ের মুখ থেকে সরে এল না। গ্লাস-ভরা রঙীন পানীয় বৃথাই তার সামনে টল-টল করতে লাগল।

আমি একটু হেসে আস্তে আস্তে হাত রাখলাম তার কাঁধে। বললাম, 'খেয়ে নাও বন্ধু! অমন ক'রে এক-দৃষ্টে তাকিয়ো না, চোখ ঝলসে যাবে, হৃদয় ঝলসে যাবে। সে জ্বালা নিবৃত্তির একমাত্র মধু আছে এই গ্লাসের মধ্যে।'

সবাই হেসে উঠল, হাসতে লাগল মণি বাই। কিন্তু ততক্ষণে চমকে উঠে ছেলেটি আমার মুখের দিকে তাকিয়েছে। আর তার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছি আমি। এ মুখ এ আসরে নতুন। কিন্তু এ মুখের সঙ্গে রত্না বাইর মুখের অবিকল মিল আছে। আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে সে বলল, 'মাফ করবেন, মদ আমি খাই নে।'

বললাম, 'বটে! এখানে কার সঙ্গে এসেছ তুমি? নাম কি তোমার?'

বেণীপ্রসাদ এগিয়ে এল, 'অন্যায় হয়ে গেছে ওস্তাদজী। ওর সঙ্গে আগে আপনার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সুযোগ পাইনি। একেবারে নাচের মাঝখানে এসে পড়েছিলাম। আমি ওকে সঙ্গে করে এনেছি। ওর নাম চন্দনলাল।'

আমি বললাম, 'বেশ বেশ, দল যত ভারি হয় ততই ভালো। তা চন্দনলাল, এখানে কোথায় থাক?'

তার হয়ে বেণীপ্রসাদই জবাব দিল, 'বেশি দূরে নয়, নর্মদার তীরে, ভেরিঘাট গাঁয়ের কাছাকাছি। এখানে পাঠশালায় রোজ পণ্ডিতি করতে আসে।'

বললাম, 'কিন্তু এখানে কেন, এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা ওঁর কাছে কি পাঠ নেবে?'

বেণীপ্রসাদ বল্‌ল, 'পণ্ডিতকে আপনার কাছেই পাঠ নেওয়ার জন্য ধরে এনেছি ওস্তাদজী! ও ভারী বোকা। কোন কোন শাস্ত্রে ওর একেবারেই বর্ণ-পরিচয় নেই।'

বললাম, 'ভেব না, বর্ণজ্ঞান ইতিমধ্যেই ওর সুরু হ'তে দেখেছি।'

কথার গূঢ় ইঙ্গিতে চন্দনলালের মুখ আরক্ত হয়ে উঠল; মণি বাই তেমনি হাসতে লাগল মুখ টিপে-টিপে।

এক ফাঁকে একান্তে ডেকে আরও একটু পরিচয় নিলাম চন্দনলালের। ওর বাবা দীর্ঘকাল সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। মা আছেন ঘরে। পুণ্য-স্নান আর পূজা-অর্চনা নিয়েই থাকেন। মাতুল-সম্পত্তি পেয়ে সম্প্রতি ওরা এ অঞ্চলে এসেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, রত্না বাইয়ের সঙ্গে এমন মুখের মিল ওর কি ক'রে এল? বছর কুড়ি-একুশ হবে চন্দনলালের বয়স। পনের বছর আগে রত্না বাইর বয়সও ঠিক এমনই ছিল।

চন্দনকে বিদায় দেওয়ার সময় বললাম, 'এসো মাঝে-মাঝে।'

চন্দনলাল বলল, 'দয়া ক'রে অমন অনুরোধ আমাকে করবেন না। মা যদি একবার জানতে পারেন, তিনি—' চন্দনলাল যেন শিউরে উঠল, তার মা জানতে পারলে যে অনর্থ ঘটবে তা যেন কল্পনাতেও আনা যায় না।

চন্দনলাল বলল, 'তা ছাড়া—'

বললাম, 'তা ছাড়া কি?'

চন্দনলাল একটু ইতস্ততঃ করে লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'আমার স্ত্রী আছে ঘরে।'

হেসে উঠলাম, 'ও, তাই বলো, তাহলে তো তুমি ভাগ্যিবান পুরুষ। এই বয়সেই স্ত্রীরত্ন লাভ করে বসেছ, চল্লিশ বছরেও যা আমি পেরে উঠিনি।'

কিন্তু ঘরে নিষ্ঠাবতী মা আর সাধ্বী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও মণি বাইর নাচের আসরে চন্দনলালকে তার পর দিনও দেখা গেল। মনে মনে হাসলাম। মণি বাইর কিঙ্কিণীর ধ্বনিতে তাহলে এর মধ্যেই চন্দনলালের দুই কান ভরে উঠেছে। মায়ের উপদেশ আর স্ত্রীর অনুরোধ শুনতে হলে এখন তার তৃতীয় কর্ণের দরকার। মদের পেয়ালা চন্দনলাল আজও স্পর্শ করল না। কিন্তু মণি বাইর দিকে তেমনই মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। নাচের ফাঁকে-ফাঁকে মণি বাইও তার দিকে তাকাতে ভুলল না। বুঝতে পারলাম, তার সুদীর্ঘ সর্পিল বেণী চন্দনলালকে পাকে পাকে জড়িয়েছে। পরিত্রাণের আর তার পথ নেই।

আসর ভাঙলে চন্দনলালকে বললাম, 'চল, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

চন্দনলাল বলল, 'দরকার নেই, আমি একাই যেতে পারব।'

হেসে উঠলাম, 'অত আত্ম-প্রত্যয় ভালো নয়। চেনা পথ একবার ভুললে ফের তা চিনে পাওয়া শক্ত।'

চন্দনলাল হঠাৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন সুরে জবাব দিল, 'কিন্তু পথ ভোলাবার বিদ্যাই আপনি জানেন। পথ চেনাবার সাধ্য আপনার নেই।'

পথভ্রষ্ট তরুণ-তরুণীদের এ ধরণের গালাগাল প্রায়ই আমাকে সহ্য করতে হয়। কিন্তু আমার তা গায়ে লাগে না। জানি, মনে মনে এ পথের আকর্ষণ দুর্নিবার বলে যারা টের পায় তাদেরই মুখে কটূক্তি বর্ষণের শেষ থাকে না। হেসে বললাম, 'তা হবে। তাহ'লে তুমিই চিনিয়ে নিয়ে চল। তোমাদের বাড়িটাই না হয় একবার দেখে আসি।'

চন্দনলাল রূঢ় কণ্ঠে বলল, 'আমি কি এতই নির্লজ্জ যে আপনার মত সঙ্গীকে মা'র সামনে নিয়ে উপস্থিত করব?'

বললাম, 'আচ্ছা, তাহলে থাক্। তুমিই এস মাঝে-মাঝে। তাতে বোধ হয় লজ্জায় অতখানি বাধবে না।'

চন্দনলাল নরম হয়ে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন। অত্যন্ত অভদ্রতা করেছি। কিন্তু আমার মা—'

বললাম, 'সে জন্য অত না ভাবলেও পারতে। গায়ে এমন ক'রে নামাবলী জড়িয়ে যেতাম যে তোমার মা কিছুতেই চিনতে পারতেন না।'

পরদিনই চন্দনের বাড়ির খোঁজে বেরুলাম। বাড়ি চিনতে কষ্ট হোল না। কিন্তু শুনলাম, বাড়িতে কেউ নেই। চন্দন সহরে গেছে, স্ত্রী গেছে বাপের বাড়ি, মা নর্মদায় স্নান সেরে শিবমন্দিরে পূজা দিয়ে ফিরবে।

পাহাড়ের ওপর জঙ্গলের মধ্যে পোড়ো শিবমন্দির। গিয়ে দেখলাম, গলায় আঁচল দিয়ে সাষ্টাঙ্গে কে একটি নারী সিঁদুর-মাখা বিগ্রহকে প্রণাম করছে। ভিজে চুলের রাশে তার দেহের সামান্যই দেখা যায়। তবু আমার মনে হোল, আমি ঠিক চিনেছি, ভুল করিনি। প্রণাম সেরে একটু পরেই সে উঠে দাঁড়াল, শ্বেত পাথরের রেকাবি তুলে নিল হাতে। ফুল-বেলপাতা সবই দেবতাকে নিবেদন করা হয়েছে। খানিকটা রক্ত-চন্দন কেবল লেগে রয়েছে রেকাবিতে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে পাথরের সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিতেই সে আমাকে সামনে দেখতে পেল; 'কে আপনি, এখানে কি চান?'

এ সেই রত্না বাই। কোন সংশয় নেই তাতে। চোখের সেই মদির উচ্ছলতা আর নেই, ঠোঁটের কোণের বাঁকা বিদ্রূপ আজ অন্তর্হিত হয়েছে, কিন্তু তার সেই পদ্মের পাপড়ির মত রঙ আজো ম্লান হয়নি, তবু দেহের কোথাও এতটুকু মাত্র বিকৃত হয়নি, কঠিন তপশ্চর্যায় জরাকে সে বহু দূরে ঠেকিয়ে রেখেছে, যৌবনকে বেঁধে রেখেছে সংযমের বাঁধনে।

আজো সেদিনের মতই আত্ম-পরিচয় দিলাম, 'আমার নাম আমীরচাঁদ রূপচাঁদ।'

নাম শুনে সেদিনের মত রত্না বাই আজ আর হাসির টুকরো ছড়িয়ে পড়ল না। উপহাসে উজ্জ্বল হোল না চোখ। কিন্তু, সেই শান্ত বিষণ্ন সুন্দর দু'টি চোখ হঠাৎ এক বিজাতীয় ঘৃণায় যেন আবিল হয়ে উঠল।

একটু চুপ ক'রে থেকে রত্না বাই বলল, 'আপনার নাম শুনেছি। চন্দন তো আপনার ওখানেই যায়।'

কণ্ঠের মৃদুতায় কঠিন তিরস্কার ঢাকা পড়ল না।

বললাম, 'তা যায়। কিন্তু এ ছাড়াও আমার আর একটু পূর্ব-পরিচয় আছে।'

রত্না বাই বলল, 'পূর্ব-পরিচয়! সে আবার কি?'

বললাম, 'পাঁচশ' গিনির অভাবে তোমার দোর এক দিন আমার মুখের সামনে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রত্না বাই! তবে ভরসা দিয়েছিলে, যদি দর্শনী সংগ্রহ করতে পারি, হাজার রাত—লক্ষ রাত ধরে তুমি আমার জন্য না কি প্রতীক্ষা করবে। সেই পাঁচশ' গিনির দর্শনী আজ আমি নিয়ে এসেছি রত্না বাই, তোমার দোর এবার খোল, প্রতিজ্ঞা রাখো।'

এক অনৈসর্গিক ভয়ে রত্না বাইর সর্বাঙ্গ যেন থর-থর ক'রে কেঁপে উঠল। 'আপনি ভুল করেছেন, আমার নাম রমাবতী। আমি চন্দনের মা। আপনি আমাকে চিনতে পারেননি।'

রত্না বাইর গলা কাঁপতে লাগল।

হেসে বললাম, 'বরং তুমিই আমাকে চিনতে পারোনি রত্না বাই! আমি তোমাকে কেবল নিজেই চিনেছি তা নয়, আরও অনেককে চিনিয়ে দেওয়ার ভার নিয়েছি। সেই অনেকের মধ্যে চন্দনও থাকবে। তবে তোমার সম্মতি না পেলে হঠাৎ আমি কাজে নামব না। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা রাখ, আমিও রাখব।'

রত্না বাই বলল, 'এত হীন তুমি, এত জঘন্য! তুমি কি চাও?'

বললাম, 'সেদিনও যা চেয়েছিলাম, আমি আজও সেইরূপ রূপ-ভিক্ষু রত্না বাই।'

রত্না বাই কাঁপতে কাঁপতে ফের মন্দিরে ঢুকল, দূর হও—দূর হও এখান থেকে!' তার পর সেদিনের মতই আর একবার সশব্দে দোর বন্ধ করে দিল রত্না বাই।

বললাম, 'ভুল করলে রত্না, দোর তোমাকে খুলতেই হবে। কারণ পাঁচশ' গিনির চেয়ে এবার কিছু বেশি দর্শনীই আমার হাতে এসেছে।'

বাড়ি গিয়ে মণি বাইকে আরও মাস কয়েকের টাকা আগাম দিলাম, আর বেণীপ্রসাদকে বলে দিলাম চন্দনকে খবর দিতে। শুনলাম রত্না বাইও তোড়জোড় কম করেনি। পুত্রবধূ তারাবতীকে পরদিনই বাপের বাড়ি থেকে আনিয়েছে। কড়া পাহারা বসিয়েছে ছেলের চার দিকে। শিবমন্দিরে পূজা-অর্চনার পরিমাণ বেড়ে গেছে। বেড়েছে রত্না বাইর উপবাস আর মন্ত্রজপের সংখ্যা।

কিন্তু রত্না বাইর সমস্ত আধ্যাত্মিক সাধনা আমার কাছে হার মানল। দিন কয়েক বাদে বেণীপ্রসাদের সঙ্গে ফের এল চন্দনলাল। মণি বাই তাকে নিজের কক্ষে অভ্যর্থনা করল। খবর পেলাম, মদ সেদিনও চন্দন ছোঁয়নি—তবে মণি বাইর অধর-মদিরা না কি অবশ্যই পান করেছে।

খবর দেওয়ার জন্য নিজেই গেলাম রত্না বাইর খোঁজে। কিন্তু ঘরের কাছে যেতে না যেতেই নূপুরের ধ্বনি কানে এল। অবাকই হোলাম। এ তো আমার বাড়ি নয়; তপস্বিনী রমাবতীর গৃহাঙ্গন। এখানে নূপুর বাজে কার? পা টিপে-টিপে বেড়ার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। এমন দৃশ্য আমিও কল্পনা করিনি। ফের নাচের আসর বসেছে রত্না বাইর ঘরে। কিন্তু আজ সে নিজে নাচছে না, নাচ শিখাচ্ছে পুত্রবধূকে। তারাবতী বিস্মিত চোখে এক-এক বার শাশুড়ীর দিকে তাকাচ্ছে, তার পর ধমক খেয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ফের নূপুর-বাঁধা পা ফেলছে মাটিতে।

রত্না বাই অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে, 'হতভাগী, আরো মন দিয়ে শেখো—আরো যত্ন নাও। স্ত্রীর সেবা যে মূর্খ চাইল না, নূপুর-পরা পা তুলে দাও তার কোলে। দেখ, তাতে সে ভোলে কি না।'

আশ্বস্ত হয়ে ফিরে এলাম ঘরে। শিব ফেলে রত্না বাই তাহ'লে এবার অশিবের শরণ নিয়েছে। পালা তাহ'লে এসেছে আমার। এখন যে কোন এক দিন রত্না বাই এসে ঘরে ঢুকলেই হয়। মণি বাইকে বকশিষ দিয়ে বললাম, 'তোমার কাজ শেষ। আর তোমাকে বেঁধে রাখতে চাই না।'

মণি বাই অপূর্ব ভ্রূভঙ্গি ক'রে বলল, 'কিন্তু আমি যে বাঁধা পড়েছি।'

হেসে বললাম, 'সে তো আমার টাকায় আর চন্দনের রূপে।'

কিন্তু নেওয়ার সময় কেবল টাকাই মণি বাই দু'হাতে কুড়িয়ে নিল, চন্দনকে সঙ্গে নিল না। এত দিনে আমার উপদেশ চন্দনের মনে পড়ল। অধরের স্বাদ খুঁজতে লাগল সুরার পাত্রে, খুঁজতে লাগল হারানো সুর।

তার পর এক দিন সত্যিই ডাক এল রত্না বাইর কাছ থেকে। শিবমন্দিরে নয়, তার নির্জন শয়ন-ঘরেই। চন্দনলাল বাড়িতে ঢোকে না, অকেজো তারাবতীকে ফের বাপের বাড়ি পাঠানো হয়েছে। ঘরে শুধু আমি আর রত্না বাই। অঙ্গে সামান্য আভরণ, পরনে লাল পেড়ে তসরের সাড়ি। তবু যেন রূপের অন্ত নেই। মনে হোল, যেন পাথরে গড়া একখানা দেবীমূর্তি। কিন্তু আমি তো দেবতা নই। রূপের ক্ষুধা আমার রক্তে। সে রূপ পাথরের মধ্যে আমি দেখতে শিখিনি, আমার চোখে রূপময়ী শুধু রক্তমাংসের নারী। তবে তার হৃদয় বোধ হয় পাথরেরই।

তার পর সেই পাথরের প্রতিমা হঠাৎ আমার পায়ের ওপর ভেঙে পড়ল। ঝরণার ধারা ছুটল পাথর ভেঙে। মিনিট কয়েক নিঃশব্দে কাটল। শেষে রুদ্ধ কণ্ঠে রত্না বাই বলল, 'রক্ষা করো চন্দনকে, ওকে বাঁচাও। তুমি যা চেয়েছ তাই দেব।'

আমি মুহূর্ত কাল চুপ করে থেকে হঠাৎ বললাম, 'আচ্ছা, সত্যিই কি পনের বছর আগে কেউ তোমার বুকে ছুরি বিঁধিয়েছিল?'

রত্না বাই প্রথমে বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকাল, তার পর ম্লান এক ফোঁটা হাসি তার অপূর্ব সুন্দর দু'টি ঠোঁটে আভাস ফেলতে-না-ফেলতেই মিলিয়ে গেল।

রত্না বাই বলল, 'পনের নয়, আজ এই একুশ বছর। আজ মনে হচ্ছে বিষাক্ত ছুরিই বটে, কিন্তু সেদিন তা মনে হয়নি। সেদিন চন্দনকে পেয়ে হৃদয় আমার জুড়িয়ে গিয়েছিল, মনে হয়েছিল, অমৃত-ভরা চাঁদ ধরেছি বুকে।'

কিন্তু চাঁদকে রত্না বাই বেশি দিন বুকের মধ্যে রাখতে পারেনি। অনেক কষ্টে রাহুর গ্রাস থেকে রক্ষা করে তাকে দূর-সম্পর্কীয় এক বোনের হাতে পৌঁছে দিয়েছিল। চন্দনের বয়স যখন বছর পাঁচেক হঠাৎ এক দিন সেই বোনের কাছ থেকে খবর এল কঠিন রোগে চন্দনের বাঁচবার আর আশা নেই। রত্না যেন তাকে শেষ দেখা দেখে আসে। ছেলের চিকিৎসায় প্রায় সমস্ত সঞ্চয় ব্যয় করল রত্না। তবু তার প্রাণের আশা দেখা দিল না। দিনের পর দিন অনাহারে মাথা কুটল রত্না শিবমন্দিরে। প্রতিজ্ঞা করল, ছেলে যদি বাঁচে আর সে ব্যবসায়ে নামবে না। সত্যের পথে—ধর্মের পথে ছেলেকে সে মানুষ ক'রে তুলবে। পরদিন সহর থেকে সব চেয়ে বড় ডাক্তার এসে বললেন, 'ভয় নেই, এত দিন ভুল চিকিৎসা হয়েছিল।' চন্দন বেঁচে উঠল, কিন্তু ভুল আর করল না রত্না, দেবমন্দিরের সেই অশ্রুরুদ্ধ

প্রতিশ্রুতি ভাঙল না কিছুতে। ছেলের কল্যাণের জন্য, শুধু তার মুখের দিকে চেয়ে এত দিনের খ্যাতি আর ঐশ্বর্য্যের পথ ছাড়ল কঠিন সাধনায় সংযত করল দুর্নিবার ভোগ-স্পৃহাকে। ছেলেকে নিয়ে ঘর বাঁধল অখ্যাত এক পাহাড়ী গাঁয়ে। তবু এক দিন কপাল ভাঙল, চন্দনের উচ্ছৃঙ্খল রক্তের মধ্যে শোনা গেল প্রমত্তা রত্না বাইর যৌবনের সেই চঞ্চল নূপুরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি।

উপকথার মত শুনে গেলাম রত্না বাইর বিগত পনের-ষোল বছরের ইতিবৃত্ত, প্রতিদিনের কৃচ্ছ্রতার কাহিনী। তার পর রত্না বাই আবার আমার মুখের দিকে তাকাল, 'তোমার যা দাবী আছে নাও, কিন্তু চন্দনকে ফিরিয়ে দাও, ওকে রক্ষা করো।'

চোখের কোলে মুক্তার মত ফের দুই বিন্দু অশ্রু টল-টল ক'রে উঠল রত্না বাইর। ইচ্ছা হোল চুম্বনে চুম্বনে সেই অশ্রুর বিন্দু দু'টি মুছে নিই, কিন্তু পরক্ষণেই সংযত করলাম নিজেকে। শুধু চুম্বনে কি এই অতল অশ্রুর সিন্ধু শুকাবে?

বললাম, 'আচ্ছা, আজ যাই রত্না বাই। তোমার উপযুক্ত দর্শনী নিয়ে আর এক দিন আসব।'

আবীরচাঁদ রূপচাঁদ থামলেন, তার পর চোখ ফিরিয়ে সেই ধূসর পাহাড়টির দিকে তাকিয়ে রইলেন চুপ ক'রে। আমার অস্তিত্বের কথা যেন তিনি সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন।

কিছুক্ষণ আমিও চুপ ক'রে রইলাম। তার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, 'শেষে কি হোল? দর্শনী কি শেঠজী শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রহ ক'রেছিলেন?'

আবীরচাঁদ রূপচাঁদ আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, 'অত কি সহজ বাবুজী? এ তো কেবল একটি বাইজীর পাঁচশ' গিনির দর্শনী নয়, কিংবা একটি নারীর সহজাত সন্তান-স্নেহও নয়, এ দু'-দু'জন পুরুষের বাঁকা-চোরা বিশৃঙ্খল জীবন। নারীর দু' বিন্দু অশ্রুতে তার কতটুকু প্রতিবিম্বই বা পড়ে। তবু চেষ্টা করছি। শেষ? না বাবুজী, এ গল্পের আজও শেষ হয়নি।'

নিদ্রা

—মাখন দত্তগুপ্ত

পর্য্যবেক্ষণ

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

রাজনীতি-স্রোতস্বিনীর কুটিল জলধারা আজ পৃথিবীর বহুল অবয়বকে অভিষিক্ত করিয়াছে। ফলে প্রতীচ্যের সমরাগ্নি নির্ব্বাপিত। কিন্তু সে অগ্নির জ্বালাময়ী শিখা দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অশান্তির উত্তাপে জগৎ ব্যাপিয়া গিয়াছে। ভারতের শান্ত তপোবনে দাবানলের মত কলহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

ভারতের হিন্দু-মুসলমান একই জাতীয়তা-বৃক্ষের দুইটি শাখা বিভিন্নমুখে ছড়াইয়া আছে। ব্রিটিশ-কুঠার এই দুই শাখাকে চির-বিচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত! উদ্দেশ্য অতি পবিত্র এবং মহৎ। এই দুই শাখাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই জাতীয়তা-বৃক্ষকে বিনাশ করিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। হিন্দু-মুসলিম মিলিত শক্তি—অপরাজেয়। প্রাচ্যে যদি ইহার প্রতিষ্ঠা কোন দিন সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে শ্বেতাঙ্গ-ব্রিটিশের কৃষ্ণাঙ্গ-ভীতি দেখা দিবে।

ব্রিটিশের একটি উদার নীতি এই যে,—কৃষ্ণাঙ্গ জাতিকে চিরদাস্যে পরিণত বা পৃথিবীর বক্ষঃ হইতে একেবারে উৎপাটিত করিতে পারিলে শ্বেতাঙ্গদিগের স্কন্ধ হইতে একটি বোঝা নামিয়া যায়।

'কৃষ্ণাঙ্গ মনুষ্যের বোঝা' (The Black man's Burden) নামে একখানি পুস্তকে এক জন ধুরন্ধর শ্বেতাঙ্গ স্পষ্ট করিয়াই সে কথা জানাইয়া দিয়াছেন। তবে, শ্বেতাঙ্গগণ সাধারণতঃ মনে করেন যে, আমরা ভগবৎ-প্রেরিত শ্রেষ্ঠ মনুষ্য; বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রবলে সমস্ত জগৎ আমাদেরই ভোগ্য। এই কৃষ্ণাঙ্গ জাতি আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া আছে, ইহাদের যে কোনরূপে উচ্ছিন্ন করাই আমাদের ধর্ম্ম। ইহার উত্তরে উক্ত পুস্তকে বলা হইয়াছে—'মারণাস্ত্রের উৎকর্ষবলেই আমরা জয়ী হইয়াছি—চরিত্রের মহত্বে নহে।'* তিন শতাব্দী ধরিয়া শ্বেতাঙ্গগণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদিগকে হাজারে হাজারে বধ করিয়াছে, গ্রেপ্তার করিয়াছে ও অতি নিষ্ঠুরতার সহিত দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসিত করিয়াছে, কিন্তু তথাপি সেই দ্বীপান্তরেও কৃষ্ণাঙ্গরা বংশবিস্তার করিয়াছে।†

পূর্ব্ব-আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদিগের বিজয় হয়,—শিখসৈন্যদিগের সহায়তায় এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রচেষ্টায় উক্ত দেশে শ্বেতাঙ্গদিগের প্রবেশ ও বসবাস সম্ভবপর হইয়াছিল। এ কথা স্বয়ং চার্চ্চিল সাহেবের মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে—তাঁহার স্বরচিত 'My African Journey' নামক গ্রন্থে। তখন তাঁহার মুখে ইহাও প্রকাশ পাইয়াছিল যে,—**Is it possible for any Government with a scrap of respect for honest dealing between man and man to embark upon a policy of deliberately squeezing out the native of India from regions he has established himself in under every security of good faith ?** অর্থাৎ, মানুষের প্রতি মানুষের সদ্ব্যবহারের প্রতি যদি একটুও শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে কোনও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ইহা কি সম্ভবপর যে, যাহারা যে স্থানে সরল বিশ্বাসে নিজেদের স্থাপিত করিয়াছে, সেই ভারতবাসীদের সে স্থান হইতে দূর করিয়া দিবার মত নীতি অবলম্বন করা ?

আজ কিন্তু চার্চ্চিল সাহেবের মুখে আর এ উক্তি নিষ্পত্তি হয় না, কেন না, এখন মসনদে আরোহণ করিয়া প্রভুত্ব লাভ করিয়াছেন। আজ আফ্রিকা হইতে ভারতীয়-বিতাড়নের জন্য কতই না আয়োজন চলিয়াছে!

শ্বেতাঙ্গ-প্রভুদের মহিমা আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এই উভয় দেশে সমুদ্রতীরবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ হইতেই আদিম অধিবাসীরা নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। আমেরিকায় আদিম জাতির সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে এবং অষ্ট্রেলিয়ার কেবলমাত্র মধ্যস্থানে আদিম অধিবাসীরা এখনও আছে—যেহেতু শ্বেতাঙ্গ-প্রভুরা সে দিকে অগ্রসর হইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তাসমেনিয়া একটি সুন্দর দ্বীপ, শ্বেতাঙ্গগণের প্রয়োজন হওয়ায় কৃষ্ণাঙ্গদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করা হইয়াছে, এবং রোডেসিয়া শ্বেতাঙ্গদিগেরই বাসভূমি হইয়াছে।

ব্রিটিশ জাতি ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতাকে একটু ভয় করেন। এ জন্যই আফ্রিকা হইতে ভারতীয়-বিতাড়ন একান্ত আবশ্যক। কৃষ্ণাঙ্গ জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ্যপ্রধান হিন্দু জাতির উপর শ্বেতাঙ্গ-প্রভুদিগের একটু নজর আছে। এই হিন্দু-সভ্যতাকে বিধ্বস্ত করিতে পারিলে তাঁহারা একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারেন। বাস্তবিক শ্বেতাঙ্গদিগের পক্ষে ইহা চিন্তার বিষয়, তাহাদের মতেও অন্যূন পাঁচ হাজার বৎসর ধরিয়া যে জাতি বাঁচিয়া আছে এই পৃথিবীর বক্ষে—নিজের সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরিত্যাগ না করিয়া—সে জাতির মেরুদণ্ড যে শক্ত, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এই স্থবির পুরাতন জাতি আবার স্বাধীনতার দাবি করে—তরুণ শ্বেতাঙ্গ সহ যুদ্ধ ঘোষণা করে—এ জাতিকে আফ্রিকায় রাখিলে সে দেশও কোন্ দিন বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে, কাজেই ইহাদের ভারতে আবদ্ধ রাখিয়া ইহাদেরই সহবর্দ্ধিত অপর এক কৃষ্ণাঙ্গ দ্বারা ধ্বংস-সাধন ব্যতীত দ্বিতীয় নীতি নাই। এ যুগেও তথাকথিত জাতিভেদ-জর্জ্জরিত প্রাচীন হিন্দুসমাজ হইতে নবীনপন্থী সুরেন্দ্রনাথ, বালগঙ্গাধর, মদনমোহন, যতীন্দ্রমোহন, শ্রীগান্ধী, চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং প্রফুল্ল, ক্ষুদিরাম, কানাই, যতীন্দ্র প্রভৃতি সদৃশ বীরপুরুষদিগের জন্মগ্রহণ সম্ভবপর হয়!

আর জাতিভেদহীন সাম্যনীতিশ্লাঘাপরায়ণ লীগপন্থিগণ ব্রিটিশের গোলামীকে চিরকায়েমী করিবার জন্য গোপন ষড়যন্ত্রে কাপুরুষের মত প্রতিবেশীর সর্ব্বনাশসাধনে উদ্যত!

---

* Conceding every credit to force of character, innate in the white imperial peoples, which has enabled and enables, a handful of white men to control extensive communities of non-white peoples by moral suasion, is it not mere hypocricy to conceal from ourselves that we have extended our subjugating march from hemisphere to hemisphere because of our superior armament ?

—The Black man's Burden by E. D. Morel.

† In hewing out for himself a fixed abode in Africa, the white man has massacred the African in heaps. * * * * For three centuries the white man seized and enslaved millions of Africans and transported them with every circumstance of ferocious cruelty, across the seas. Still the African survived and in his land of exile, multiplied.

—The Black man's Burden by E. D. Morel.

১৯৩৪ সালে নভেম্বর মাসে স্যর হেন্‌রি পেজক্রফট 'হোয়াইট পেপার' সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—যদি 'হোয়াইট পেপার' পাশ করা হয়, তাহা হইলে আমাদের রাজত্ব চলিয়া যাইবে এবং ভারত চিরতরে ব্রাহ্মণ্যপ্রধান হিন্দুর আয়ত্তে আসিবে। ফলে খৃষ্টধর্ম্মের শিক্ষা দীক্ষা উপদেশ হিন্দুপ্রাধান্যের পথ প্রস্তুত করিয়া দিবে।"

আমাদের লীগপন্থী ভ্রাতৃবৃন্দ সময়ে অসময়ে চীৎকার করেন যে, "আমরা কখনই বর্ণহিন্দুর প্রভুত্ব সহ্য করিব না।" ইহা যে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের শিখান পাঠ, তাহা বেশ বুঝা যায়। কেন না, কাহাকে বর্ণ-হিন্দু বলে তাহাই উক্ত ভ্রাতৃবৃন্দের জানা নাই। আজ হিন্দুকে 'তপশীলী' ও 'বর্ণহিন্দু' নামে দুইটি ভাগ করিয়াছেন দয়াময় ম্যাকডোন্যাল্ড সাহেব। বস্তুতঃ হিন্দুমাত্রেই কোন না কোন বর্ণের অন্তর্গত। বর্ণের বাহিরে কোনও হিন্দু থাকিতে পারে না। তাই মনু বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণঃ, ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।

চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি (অর্থাৎ ইহাদের উপনয়ন-সংস্কার নামক আর একটি জন্ম হয়) চতুর্থ বর্ণ—শূদ্র এক জাতি (উপনয়ন-সংস্কারহীন) কিন্তু পঞ্চম বর্ণ নাই। তাহার পর তিনি বলিয়াছেন,—

শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।

প্রতিলোম সঙ্কর জাত সকলেই শূদ্রবর্ণের সমধর্ম্মী। সুতরাং আধুনিক তপশীলী জাতি শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত, ইহা বলিতে কোন বাধা নাই। পাণিনি ব্যাকরণে একটি সূত্রে আমরা দেখিতে পাই—"শূদ্রাণামনিরবসিতানাম।" ইহাতে শূদ্রবর্ণ দুই ভাগে বিভক্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে—অনিরবসিত ও নিরবসিত। নিরবসিত শূদ্রের উদাহরণ দিয়াছেন—'মৃতপচণ্ডিপাঃ'—মুর্দ্দাফরাস ও হাড়ি। আধুনিক তপশীলভুক্ত এই দুই জাতি যে শূদ্রবর্ণ মধ্যে চিরদিনই আছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এইরূপ সমস্ত তপশীলী জাতি শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত হইলেও আমাদের ব্রিটিশ-প্রভুরা বর্ণহিন্দু হইতে তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়াছেন। অস্পৃশ্যতা আন্দোলনের সারটুকু তুলিয়া লইয়াছেন—ব্রিটিশ-রাজহংস। ব্রিটিশের ইহাই বাহাদুরী যে, ভারতে প্রবেশ করিয়া অবধি এই ভেদনীতির চালেই ভারতকে পঙ্গু করিয়া রাখা সম্ভবপর হইয়াছে।

সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসে যদিও প্রচার করা হইয়াছে যে, মুষ্টিমেয় ব্রিটিশের পরাক্রমে সিপাহী বিদ্রোহ দমিত হইয়াছে—কিন্তু ইহা যে সত্য নহে, তাহা প্রোঃ সীলী (Seeley) সাহেব স্বীকার করিয়াছিলেন।*

মোট কথা, ভারতীয়ের দ্বারা ভারতকে পরাজিত করা হইয়াছে—আজও সেই একই নীতি চলিয়াছে। জিন্না সাহেব সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, হিন্দুর সহিত মুসলমান কিছুতেই একত্র বাস করিতে পারে না, উভয়ের সংস্কৃতির যে মিল নাই, তাহা নহে—পরন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। দুর্জ্জনগণ রটাইতেছে যে, আমাদের জিন্না সাহেব না কি 'দেড় পুরুসে' মুসলমান। ইহার পিতা ছিলেন পারশী না হিন্দু, মা ছিলেন শিয়া-কন্যা। আর তাঁহার অধিকাংশ কাজ-কারবার হিন্দুর সহিত এখনও চলিতেছে।

এরূপ কুলীন মুসলমানের পক্ষে নিজ সংস্কৃতির বড়াই করা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ মুষ্টিমেয় মুসলমান ভারতে আসিয়া আজ দাঁড়াইয়াছে নয় কোটির অধিক। সাত শত বৎসর একত্র বাসের পর আজ মুসলমানদের সহ-বসতি ও সংস্কৃতি বিপন্ন হইবারই কথা! মুসলমান সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অমুসলমান জনসমাজের প্রতি ব্যবহারে তাহাদের উদারতার নিবুর্দ্ধিতা কখনও প্রকাশ পায় নাই। হিন্দুর হৃদয় যদি ঐরূপ সঙ্কীর্ণতায় সুন্দর হইত, হিন্দু যদি মধুময় স্বার্থ বুঝিতে শিখিত, তাহা হইলে হয়ত উভয় সম্প্রদায়ের একত্র বাস সম্ভবপর হইত। পরাজিত মহম্মদ ঘোরী ক্ষমা প্রার্থনা করিলে পৃথ্বীরাজ যদি উদার ভাবে তাহার শিরশ্ছেদ করিতেন, তাহা হইলে আজ অন্ততঃ হিন্দু-সংস্কৃতির সহিত মুসলমান-সংস্কৃতির মিল দেখা যাইত।

এখনও কিন্তু হিন্দুর চৈতন্যোদয় হয় নাই; লীগপন্থিগণের নোয়াখালি, কলিকাতা, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে হিন্দুর উপর এমন ঐতিহাসিক ব্যবহার সত্ত্বেও বর্ণহিন্দু গান্ধীজী প্রমুখ কয়েক ব্যক্তি আজ মৈত্রীর স্বপ্ন দেখিতেছেন! আর খোসামোদের পর্ব্বতের উপর বসিয়া জিন্না সাহেব দিনের পর দিন উদ্দণ্ড হইয়া উঠিতেছেন!

তথাপি আমি বলিব—বর্ণহিন্দুর সহিত মুসলমান-সংস্কৃতির যতটা সাদৃশ্য আছে, আর কোন জাতির সভ্যতার সহিত ততটা মিল নাই। যথা,—হিন্দুর মতই শিয়াশ্রেণী আভিজাত্য রক্ষায় যত্নবান্ হওয়াতেই শুন্নিদের সহিত সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। আজও শুন্নিদের সহিত শিয়াদের সে মতভেদ তিরোহিত হয় নাই। আজ হিন্দুদিগের সহিত বিরোধ জাগাইয়া রাখায় শিয়া-শুন্নির মিলনের ভাব দেখা গেলেও প্রকৃত পক্ষে মিলন নাই। লক্ষ্ণৌ সহরে মধ্যে মধ্যে শিয়া-শুন্নির বিরোধ-লহর ভারত-গগনকে মুখরিত করিয়া তুলে।

কাবুল শিয়াদের দেশ, সেখানে গোহত্যা হয় না, ইহা আমীরের মুখে প্রকাশ পাইয়াছিল। এখনও সে দেশে নাজীরের পদ বংশানুক্রমে হিন্দু অধিকার করিয়া আছে। মহরম শিয়াদেরই পর্ব্ব। শিয়া-শুন্নিদের যে ভেদ আছে তাহা এই পর্ব্বেই পরিস্ফুট। শিয়াদের 'তাজিয়া' দেখিলে হিন্দুর দেবযাত্রা-পর্ব্বকে স্মরণ করাইয়া দেয়। শিয়া-শুন্নি উভয় সম্প্রদায়ই নমাজ পড়ে। নমাজ শব্দটি সংস্কৃত 'নমস্' শব্দ হইতে যে উৎপন্ন, তাহা বুঝা যায়। ইংরাজী কোন শব্দের সহিত এরূপ সাদৃশ্য নাই। খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ব হইতে 'নমস্' শব্দ, অল্লা শব্দ, অক্কা শব্দ (মকার মূল) পাণিনীয় ব্যাকরণে দেখা যায়। শুন্নি শব্দ যে বৌদ্ধদের 'শূন্য'বাদের প্রতিধ্বনি করে, তাহা অনুমান করা যায়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদের প্রচার বৃহত্তর ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এই সময়ে তন্ত্রবাদও বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধদের মধ্যে জাতিভেদ

---

* And even if we should admit that the English fought better than the sepoys, and took more than their share in those achievements which both performed in common, it remains entirely incorrect to speak of the English nation as having conquered the nations of India. * * * India can hardly be said to have been conquared at all by foreigners, she has rather conquered herself.—Quoted in the 'Dead-Sea Apple.'

বঞ্চিত হইতে পারে নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হজরত মহম্মদের আবির্ভাব। আরবে তখন বহুবিধ ধর্ম্মমত-প্রবাহ জনতাকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল। এক দিকে পাশ্চাত্যের প্রভাব, অন্য দিকে প্রাচ্যের প্রভাব। এই জন্য মুসলমান-সংস্কৃতির মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই, ইহা ইহুদী ও বৌদ্ধ হিন্দু-সংস্কৃতির মিশ্রণ মাত্র। প্রাচীন বাইবেলের কিছু ছাপ আছে। সৃষ্টির আদিতে আদম-ঈভের কথা, হিব্রুদের আচার (যথা বরাহ ও কূর্ম্ম-মাংস নিষিদ্ধ ছিল) এই সংস্কৃতির মধ্যে দেখা যায়। এ দিকে তন্ত্রের প্রভাবও কম নহে। রহীম্ ও করীম্ শব্দে দয়াময় ও বদান্য ভগবান্‌কে বুঝায়। এই দুই শব্দের মূল অনুসন্ধান করিলে তান্ত্রিক দুইটি বীজাক্ষর স্মরণে আসে। হ্র+ঈম্ ও ক্র+ঈম্ এই দুই প্রসিদ্ধ বীজ দয়াময়ী ও বরদাত্রী দেবীর স্বরূপ জ্ঞাপন করে। কবরের উপর উপাসনা-স্থান আর কোথায়ও দেখা যায় না, ইহা তান্ত্রিক শব-সাধনার প্রতিচ্ছায়া মাত্র। দিবসে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে আহার, মাসব্যাপী এই যে অনুষ্ঠান, ইহা নক্তব্রত ও তান্ত্রিক পুরশ্চরণের প্রতিবিম্বমাত্র। এখনও হিন্দুদের মধ্যে এরূপ ব্রতানুষ্ঠান প্রচলিত আছে। প্রস্রাব ও মলত্যাগের পর মৃত্তিকা ও জলের ব্যবহার একমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই প্রচলিত, আরব দেশে জল অপেক্ষা মৃত্তিকা সুলভ, এ জন্য মুসলমান-সংস্কৃতিতে জলের বিকল্পে মৃত্তিকার বিধান করা হইয়াছে। হিন্দু-সংস্কৃতিতে সৌর ও চান্দ্র তিথি উভয়ই স্বীকৃত হইয়াছে, কর্ম্মবিশেষে সৌর তিথি, কোন কর্ম্মে বা চান্দ্র তিথি গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই তিথির বিচার পৃথিবীর আর কোন সংস্কৃতিতে দেখা যায় না। দ্বিতীয়ায় চন্দ্রদর্শন ঈদ পর্ব্বে করিতে হয়।

বৌদ্ধগণ কাছা দিয়া কাপড় পরিত না, হিন্দু সন্ন্যাসীর যে ব্যবস্থা ছিল, সেই ব্যবস্থা বৌদ্ধগণেরও ছিল এবং মুসলমান-সংস্কৃতিতে তাহাই আসিয়াছে। শবসংকার বিষয়ে হিন্দু সন্ন্যাসীর বিধি বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহাতে শবদাহ ছিল না। মুসলমান-সংস্কৃতিতেও দাহ নাই। প্রকৃত পক্ষে ভারতে এক সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু প্রাচীন কাল হইতে মৃত্তিকাগর্ভে শব স্থাপন এবং শবদেহকে বসন-ভূষণ ও মাল্য দ্বারা আচ্ছাদিত করার প্রথা প্রচলিত ছিল। "প্রেতস্য শরীরং ভিক্ষয়া বসনেনালঙ্কারেণেতি সংস্কুর্বন্ত্যেতেন হ্যমুং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে"—'ভিক্ষা করিয়াও শব-শরীরকে বস্ত্র ও অলঙ্কারের দ্বারা সংস্কার করিয়া পরলোক জয় করা হইল বলিয়া মনে করা হইত।' (ছান্দোগ্য ৮।৫) 'অবটে যে নিধীয়ন্তে তেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ।' রামায়ণ আরণ্যকাণ্ড। ৪ অঃ : ২৩ (মৃত্যুর পর) 'যাহারা ভূগর্ভে রক্ষিত হয়, তাহাদের উত্তম গতি হইয়া থাকে।' মুসলমান-সংস্কৃতিতে যে 'সুন্নৎ' সংস্কারের প্রচলন আছে, তাহাও প্রাচীন ভারতে অবিদিত ছিল না। যদিও সাধারণ হিন্দু-সংস্কারের মধ্যে ইহার স্থান নাই তথাপি কোন কোন সম্প্রদায়ে যে ইহাও চলিত ছিল, তাহা কামসূত্র গ্রন্থ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। "দাক্ষিণাত্যানাং লিঙ্গস্য কর্ণয়োরিব ব্যধনং বালস্য" (কামসূত্র, ঔপনিষদিকাধিকরণ, ২ অঃ ১৫ সূত্র) 'দাক্ষিণাত্যে বালকের কর্ণবেধের ন্যায় পুরুষের জননেন্দ্রিয়ে চর্মচ্ছেদন হইয়া থাকে।' ব্যধনবিধি-বর্ণনায় টীকাকার লিখিয়াছেন—'বহিশ্চর্মাকৃষ্যাগ্রত্র স্থাপয়িত্বা' ইত্যাদি। বেদান্তদর্শনের ছায়াপাত হইয়াছে সুফী মতবাদে।

ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করা একমাত্র হিন্দুই জানিত, মুসলমান-সংস্কৃতিতেও তাহা দেখা যায়। মক্কাতীর্থ-যাত্রিগণ প্রথমে কাবাকে অভিবাদন ও চুম্বন করিয়া মক্কার মসজিদে প্রবেশ করে। এই কাবা একটি কৃষ্ণ প্রস্তর; অনেকে বলিয়া থাকেন, ইহা প্রাচীন শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গ না হইলেও এই যে প্রস্তরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইহা একমাত্র হিন্দু-সংস্কৃতিতেই দেখা যায়। এইরূপ বহু বিষয়ে সংস্কৃতির সাদৃশ্য প্রমাণিত করা যাইতে পারে।

যদিও লীগপন্থিগণ যে ব্রিটিশের অধীনতায় থাকিতে গৌরব বোধ করিতেছেন—সেই ব্রিটিশের সংস্কৃতি মুসলমান-সংস্কৃতি হইতে বহুলাংশে বিপরীত, সে কথা আজ আলোচ্য নহে, কেন না, এক ভারতীয় লীগপন্থিগণ ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায় ব্রিটিশের স্বরূপ বুঝিয়াছেন, সেই জন্য মিশরে যাইয়া জিন্না সাহেবের চালাকী বানচাল হইয়া গিয়াছে।

আজ না বুঝিলেও আসন্ন কুলাঙ্গ-খেলাঙ্গ সংগ্রামে এই লীগপন্থী-দিগের যে শিক্ষা হইবে, তাহা এখন হইতে বলিয়া রাখিলাম।

রাষ্ট্র-জিজ্ঞাসা

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

সত্যই কি উঠেচে সূর্য্য
মেঘের ওপারে ?
সন্দেহ জাগে বারে ব'রে।

মেঘে মেঘে হায়,
বেলা বয়ে যায় ॥

হবুচন্দ্র প্রডিউসার ও গবুচন্দ্র পরিচালক

সুধীরেন্দ্র সান্যাল

যুদ্ধের বাজারে সাদা বা কালো-বাজারে বেসাতী করে যাঁরা রাতারাতি লাল হয়ে গেছেন তাঁরা আজ একটি বিশেষ ব্যবসায় বেঙ্গনী হবার আশায়, প্রচুর লভ্যাংশের খানিকটা ভগ্নাংশ নিয়ে ভাগ্যপরীক্ষায় অবতীর্ণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ফট্‌কা-বাজারে বোকামীর মাশুল গুণে এঁদের অধিকাংশই যে 'এবাউট টার্ণ' করছেন উপরোক্ত 'বিশেষ ব্যবসা'র পক্ষে এটা বিশেষ কল্যাণকর।

পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করতে হিন্দু মাত্রেই গয়া-যাত্রা করে থাকেন। টলিউডের মহাতীর্থে সপিণ্ডকরণ মানসে একদা যাঁদের মহাপ্রয়াণ ঘটেছিল, আজ মুণ্ডিত মস্তকে, অবসন্ন দেহে তাঁরা ফিরে চলেছেন প্রেতলোকের পূর্ণ অনুকম্পা অর্জন করে। অনুশোচনার জাহ্নবী সলিলে সর্বপাপ মোচনের সুযোগ যাঁরা পেলেন, তাঁরাই আজ কৃতকৃতার্থ।

যূপ-কাষ্ঠ প্রস্তুত রেখেছিলেন ষ্টুডিয়োর কর্মকর্তারা। বলিদানের বাজনা বাজাতে লোকের অভাব হয়নি। এদেরি শোণিত-স্রোতে রক্তাক্ত ফ্লোরগুলি আজ প্রায় অর্গলবদ্ধ। মরশুমের সমাপ্তি-পর্বে আজ যাঁরা পড়ে আছেন, টলিউডের পূজা-মন্দিরে তাঁরাই নিত্যকালের কৃত সংকল্প মুষ্টিমেয় পূজারী।

উৎপাতের কড়ি চিৎপাতে বর্জন করে সময় বুঝে যাঁরা চম্পট দিলেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁরা এদেরি মুখ চেয়ে স্থায়ী সুবিধার আশায় ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ করে চললেন তাঁদের সে উর্বরা জমিতে নিয়মিত ফসল বপন করবার মত বড় একটা কেউ বাকী রইল না।

একদা ফ্লোর ভাড়া পেতে প্রচুর কাঠ-খড় পোড়াতে হ'ত। সে দগ্ধ অদৃষ্টের বিবরণ, যাঁরা এত দিন নির্বিচারে মাশুল গুণে এসেছেন, তাঁরাই জানেন। আজ দালাল লাগিয়েও খদ্দের মেলে না। যেখানে দৈনিক হাজার টাকায় কক্ষ পাওয়া যেত না, আজ সেখানে মাত্র পাঁচশ'টাকায় রাম রাজত্ব। ব্ল্যাক মার্কেটে চড়া দামে মাল-মশলা কিনে যাঁরা ফ্লোর বৃদ্ধি করেছেন, প্রচুর যন্ত্রপাতি ও বাড়তি টেক্‌নিশিয়ান নিয়োগ করে যাঁরা স্থায়ী হার্ভেষ্টের স্বপ্ন দেখছিলেন—আজ তাঁদের ভাঙ্গা হাটে খদ্দেরের অভাব। যাঁরা আছেন তাঁরা নিত্য-কালের ক্রেতা।

রথের মেলায় পুতুল-নাচের হঠাৎ আসরে ভীড় জমাতে যাঁরা এসেছিলেন নব বর্ষার জলস্রোতের মত, চিত্র-শিল্পের তাঁরা প্রচুর সর্বনাশ করে গেছেন। মুষ্টিমেয় তারকার দল, যাঁরা জোনাকীর মত সুলভ ছিলেন এত কাল, দাঁও বুঝে তাঁরা দর বাড়িয়ে ফেললেন রাতারাতি। কাঁকর-ভরা শুকনো মাটি পাকা সোনার দরে বাজার-চল্‌ হয়ে গেল। নতুন আর্টিষ্ট আসে না। যারা আসে তারা প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য, গুণের অনুপাতে তেঁতুল বীচি! কয়েক টুক্‌রো ভিক্টোরিয়ান্ যুগের পুরোনো আমচুর, যা পড়ে আছে চালে লট্‌কানো বাসী চুবড়ীতে—ফুলিয়ে, ফাঁপিয়ে, জলিয়ে-কিলিয়ে, অভাবিত চড়া দামে আজো তাদের চালানো হচ্ছে—কোন সুদূর অতীতের বিস্মৃত-প্রায় হলমার্কের জোরে।

বয়োধর্মে যাঁরা ঠাকুরমা হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, ছবির পর্দায় আজো তাঁরা 'কনে-বৌ'। ব্যক্তিগত জীবনে যাঁরা বিবাহিত মেয়ের বাপ, চিত্রিত নাটকে তাঁরাই আইবুড়ো তরুণ। যৌবনের রংমহলে তারুণ্যের এই শোচনীয় ধাপ্পাবাজী যাঁরা আজো বেপরোয়া চালিয়ে যাবার মত সুবিধা পাচ্ছেন—এ বাজারে তাঁরা আজও ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী।

টলিউডের রিক্সাওয়ালা ছাড়া, এ অঞ্চলে শতকরা মানুষ-পিছু অন্ততঃ এমন দশ জনের হদিশ পাবেন যারা সত্যি ভাগ্যবান। 'লে লেও বাবু, জার্মান-ওয়ালা দো-আনা'-মালের মত এমন শস্তা মাল ফিল্মের বাজারে আর কখনও আমদানী হয়নি। কর্মক্ষেত্রে এদের প্রবেশ দালালরূপে। এই দালালদের দয়াতেই পাট থেকে পট্‌কা পর্যন্ত সব রকম ভুষি মাল ও চুনি-কাঠির ব্যাপারীরা আজ চলচ্চিত্রের প্রডিউসার! এক রাত্রের আবহুসেনীর মত এদের রাজগীর দৌড় চলচ্চিত্রের পিছল-পথে বার-দুই হামা টেনেই সাঙ্গ হয়।

হবুচন্দ্রের আবির্ভাবে গবুচন্দ্র দালালের দল পরিচালনার মন্ত্রিত্বটা নিজেদের হাতেই রাখেন। হবু-রাজা এবং তার হঠাৎ-কেনা রাজগী এক মাঘেই শেষ হয়; কিন্তু গবু-মন্ত্রীদের ক্ষয় নেই। ষ্টুডিয়োর যূপ-কাষ্ঠে নিত্য বলির যোগান দিতে চিরকালই এই দালালের দল বেঁচে থাকে।

ডিরেক্টার নামে ঘেন্না ধরাতে যেটুকু বাকী ছিল, এই শ্রেণীর অর্ধ-পাগল আবুহুসেন এবং তাদের ছাগল বাহনে মিলে সে কার্যটাও শেষ করে গেল।

হঠাৎ আমদানী পরিচালকদের মধ্যে সেদিন এক জন ১৪ বছরের 'গোপাল'-কে দেখলাম। ইনি ভাঁড় হীন গোপাল ন'ন—সত্যিকারের গোপাল ভাঁড়! চিরকালই পেশা ছিল কোবরেজী থেকে পাঁজী দেখা পর্যন্ত। নিদানে এবং বিধানে বরাৎ না খোলায় ভাঁড় দত্তের **unclaimed** আসনে এই বিধিদত্ত বৃষবাৎষ্টি ৭৪ বছর বয়সে লোক হাসাবার ছাড়পত্র লাভ করেন। আজ গঙ্গা-যাত্রার পূর্বাহ্ণে প্রডিউসার ফাঁসাবার শেষ পুণ্যি-ব্রত উদ্‌যাপন-মানস, বৃদ্ধ বায়সের ময়ূর সাজবার দুশ্চেষ্টা দেখে হাসিও পায় দুঃখও হয়। ফিল্ম তৈরী যে ফক্কীকারী নয়, তার জন্যে জ্ঞান দরকার, শিক্ষা দরকার, দীর্ঘ দিনের সাকৃরেদিলব্ধ অভিজ্ঞতা দরকার,—অন্ধকারে ঝাঁপ দেবার আগে যারা এই সহজ সত্যটি মানতে চায় না, শিল্পের তারা চরম শত্রু।

এই সব বেপরোয়া কশাইদের বিদ্যার সুরু—স্কুলের কান-মলায়, সমাপ্তি তার বটতলায় 'কথা-মালায়'। যে কোন তারকা নগদা-বিদায়ের প্রলোভনে এদের পৌরোহিত্য স্বীকার করেন। এর চেয়ে মর্মান্তিক পরিণাম আর কিছু কল্পনায় আসে না।

বাঙলা দেশে দশখানা ছবির মধ্যে প্রায় আটখানাই দেখবার অযোগ্য। গত ছ'-সাত মাসের ছবির সমালোচনা পড়লে এ সত্য প্রমাণিত হবে। শিক্ষিত নর-নারী এবং রসবেত্তার দল ক্রমশঃই বাঙলা ছবির প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা, দুই হারাচ্ছেন। পঞ্চাশ বছর আগে পাঁচালীর ছড়া বা জেলেপাড়ার সং-এ গান লিখে যাদের ধারণা শিক্ষিত ও মার্জিত-রুচি দর্শকের উপযোগী গল্প রচনা করা অতীব সহজসাধ্য ব্যাপার—তাদের মাথায় মুগুর মেরে এটা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে জীবন-ভোর অখণ্ড সাধনা ছাড়া কথা-শিল্পীর যোগ্যতা বা মর্যাদা লাভ করা যায় না। তা যদি হ'ত তা হ'লে রবীন্দ্রনাথ শুধু জমিদারই থাকতেন এবং শরৎচন্দ্রের কেরানী-জীবনের পরে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হ'ত না।

এক দল যাবে, আর এক দল আসবে—প্রকৃতির চিরাচরিত নিয়মে

মন-বিহঙ্গ

শ্রীস.,বিজ্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

মন-বিহঙ্গ মেলিয়াছে ডানা উদার আকাশ-তলে
আজ বুঝি তার নব-জীবনের তীর্থ-পরিক্রমা,
সোনার পালকে সোনার স্বপ্ন সূর্য্যকিরণে জ্বলে
সে যদি আজিকে বিহ্বল হয়—করিও তাহারে ক্ষমা।

সযতনে গড়া লোহার শিকলে গ্রন্থি যে শত শত
পাকে পাকে তার বাঁধা পড়েছিল জীবনের হিন্দোলা,
খাঁচার দুয়ারে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে দেহ ক্ষত-বিক্ষত
শিকল ছেঁড়ার আনন্দে তাই আজিকে যে মাথা তোলা।

মাথা তুলে ওড়ে মন-বিহঙ্গ উর্দ্ধ আকাশ পানে
সে দেখিবে আজ অসীম আকাশ—কোথায় তাহার সীমা
কোথা হতে তারে ডাক দিয়ে গেল শিকল-ভাঙার গানে
জাগে অরণ্যে সবুজ পাতার জীবনের মধুরিমা।

ভাঙা খাঁচা আর ছেঁড়া শিকলের আজিকার দুর্গতি
মন-বিহঙ্গ আঁখি নামাইয়া নেহারে সকৌতুকে,
হাল্কা হাওয়ায় লঘু পাখা মেলি' দ্রুত হোল তার গতি
বন-মর্ম্মরে বিহ্বল মন, কম্পন জাগে বুকে।

বন-বিহঙ্গ উদাসী হাওয়ায় মন-বিহঙ্গে ডাকে
বলে,—ওরে তোর ডানা মেলিবার হোল যে সুপ্রভাত,
আয় ছুটে আয় মুক্ত পাখায় নব কিশলয়-শাখে
মঞ্জরি ওঠে : নূতন দিনের আজিকে সূত্রপাত।

নীল আকাশের স্বপ্ন-বিভোর নয়নের দু'টি তারা
মনের গহনে লুকান তাহার বিজন বনের মায়া
বাঁধন টুটেছে মুক্তির স্বাদে তাই সে আত্মহারা
দিক দিগন্তে ত্বরিতে মিলায় সত কলঙ্ক-ছায়া।

এর ব্যতিক্রম কোন দিন হ'বার নয়। আর্টের সেবায় অনধিকারীর স্থান নেই। দীর্ঘ সাধনা ও আন্তরিকতার মধ্যে দিয়েই যোগ্যতার পরিচয় পরিস্ফুট হয়। এদের চিত্রশিল্পে প্রবীণের পাশে নবীনের অভ্যুদয় প্রয়োজন। ভুঁইফোড় নবীন নয়—শিল্পের সাধনায় ব্রতী হবার পূর্ণতম যোগ্যতা যাদের আছে—কেবল তাদেরই স্থান হওয়া উচিত এ রাজ্যে। কলা-লক্ষ্মীর পূজা-মন্দিরে প্রবেশ করবার ছাড়পত্র তাঁরাই পাবেন যাঁরা এই পরীক্ষায় যোগ্যতার পরিচয় দিতে সক্ষম।

দুঃখের বিষয় আজ শিল্প-পীঠটা মাড়োয়ারীর ধর্ম্মশালা বা মুশাফিরের সরাইখানার মত অতি সুলভ ও নিম্নস্তরে নেমে এসেচে। ষ্টুডিয়োর মালিকরা অনেকেই পাটোয়ারী বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত। উপরি ও সহজ চাক্তির লোভে তাঁরা যে শিল্পের মর্য্যাদা হানি করে, অগ্রগতির পথ বেমালুম বন্ধ করতে বসেচেন—এটা আজ বোঝবার মত বুদ্ধিও তাঁরা হারিয়ে বসেছেন। অর্থমোহে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য এই ব্যাপারীদের আক্কেল দেবার পথ একমাত্র খোলা আছে চলচ্চিত্রের দর্শকদের হাতে, সমালোচকদের হাতে এবং যাঁরা সমাজের মাথা, তাঁদের হাতেও।

হবুচন্দ্র প্রডিউসার এবং গবুচন্দ্র পরিচালক—দু'দলেরই সাবধান হবার সময় এসেচে। বাঙলার চিত্র-প্রদর্শকেরা এদের চিনতে সুরু করেছেন। তাই টিনের গোল বাটুয়ার অঙ্গ ভেদ করে রিলগুলো বড় একটা আর বাজারে গড়াতে অবসর পাচ্ছে না। এই নির্বুদ্ধির দল যদি ছবি তৈরীর পেছনে সর্বস্বান্ত না হয়ে দু'-একটা করে হাউসের সংখ্যা সদর-মফঃস্বলে বৃদ্ধি করে যেতেন—অন্ততঃ আর কিছু না হোক, চিত্রশিল্পের ক্রম-বিস্তারের পথে তাঁরা অনেকখানি সহায় হ'তেন।

রবীন্দ্রনাথ মহাকবি কি না

৺প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

এদেশের ও বিদেশের বহু মনীষীই বলিয়াছেন যে, আধুনিক যুগ মহাকাব্যের যুগ নহে, আধুনিক যুগ খণ্ডকাব্যের যুগ, ছোট গল্প ও ছোট ছোট রচনার যুগ। কথাটা সত্য বটে। আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্গগৌরব রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও এ কথাটা যে সত্য তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। সুতরাং গোড়াতেই এ কথা পরিষ্কার হইয়া যায় যে, আধুনিক যুগের প্রয়োজনের প্রতীক বা আধুনিক যুগধর্ম্মের প্রতিনিধি হইতেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু আমার বক্তব্য হইতেছে, এই আধুনিক যুগেও রবীন্দ্রনাথ মহাকবি কি না, অর্থাৎ আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ কবিকে মহাকবি বলা যায় কি না, বা সে মহাকবির লক্ষণ কি কি?

রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্য লেখেন নাই, বৃহৎ কাব্যও লেখেন নাই। কিন্তু তিনি অসংখ্য খণ্ড-কবিতার বা গীতি-কবিতার রচয়িতা ও অসংখ্য গানের স্রষ্টা। আমরা দেখিতে চাই, তাঁহার এই অসংখ্য গান ও কবিতার মধ্যে যে ভাবগুলি পরিস্ফুট তাহাদের রূপটা কেমন ও বিশালতা কিরূপ। বলা বাহুল্য, আমার এই বক্তব্য পরিস্ফুরণে আমি রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনাগুলি গ্রহণ করিতেছি না। আর তাঁহার গান ও কবিতাকে আমি বিভিন্ন ভাবে উল্লেখ করিব না। কারণ, তাঁহার কবিতা অত্যধিক গীতিধর্ম্মী—সুরে, ঝঙ্কারে ও প্রকৃতিতে তাঁহার গান ও কবিতা প্রায় অভিন্ন। কবি নিজেও বারংবার তাঁহার বহু রচনায় বলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি পৃথিবীর তোরণ দ্বারে বাঁশি বাজাইতে ও গান গাহিতেই আসিয়াছিলেন। কবির দুইটি উক্তি উদ্ধার করি :—

"হে রাজন্, তুমি আমারে
তোমার সিংহদুয়ারে
বাঁশি বাজাবার দিয়াছ যে ভার,
(আমি) ভুলি নাই, তাহা ভুলি নাই।"

"দেবী এ জীবনে আমি
গাহিয়াছি বসি' অনেক গান,
পেয়েছি অনেক ফল।"
—(সাধনা, চিত্রা)

আমাদের মতে এই সঙ্গীত-সমৃদ্ধ রবীন্দ্র-কাব্যে তিনটি ভাব বা তিনটি মহাভাব বর্ত্তমান। কবির ভাষাতেই সেগুলি হইতেছে :—

প্রথম—সীমা ও অসীম বা বিশ্বপ্রীতি—

"অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি'।"
—(প্রকৃতির প্রতিশোধ)

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।"
—(গীতাঞ্জলি)

দ্বিতীয়—ধরণী-প্রীতি—

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"
—(প্রাণ, কড়ি ও কোমল)

"বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা,
লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল।"
—(পুরস্কার, সোনার তরী)

তৃতীয়—সৌন্দর্য্য-সন্ধান বা মানসী-প্রীতি—

"আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার
কবিতা, কল্পনা-লতা!···মানস সুন্দরী,···
অয়ি মোর জীবনের প্রথম প্রেয়সী,
·················সঙ্গীত তোমার
কত দূরে নিয়ে যাবে কোন্ কল্পলোকে
আমাকে করিবে বন্দী গানের পুলকে
বিমুগ্ধ কুরঙ্গ সম।······"
—(মানস-সুন্দরী, সোনার তরী)

"আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে,
হে সুন্দরী?
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী?"
—(নিরুদ্দেশ যাত্রা, সোনার তরী)

এই তিনটি ভাবকে গুছাইয়া বলিতে গেলে পর পর এইরূপ দাঁড়ায়—বিশ্বজগতে যাহা সুন্দর ও অসীম তাহা সীমার মধ্যে আসিয়া তবেই অভিব্যক্ত হইতেছে; এই অপরূপ শোভাময় বিশ্বজগতে বা পৃথিবীতে কবি যেন চিরদিন বাঁচিয়া থাকেন এবং সুখ-দুঃখ দ্বারা লীলায়িত ও দোষগুণ-সমন্বিত মানুষকে ভালবাসিয়া তাহাদেরই মধ্যে এক জন হইয়া যেন থাকিতে পারেন; এবং যে কল্পনা-রাণী বা কাব্যলক্ষ্মী কবির বাল্যকাল হইতে তাঁহার চিত্ত জয় করিয়া তাঁহাকে বিশ্বজগতের অসংখ্য রূপের ও ভাবের দিকে আকৃষ্ট করিয়া লইয়া যাইতেছেন তাঁহার সন্ধানে ও তাঁহার অনুরূপ রসে কবি যেন চিরদিন অভিনিবিষ্ট থাকেন।

যাঁহারা রবীন্দ্র-কাব্যে অনুরাগী তাঁহারা জানেন, এই ভাবগুলি কবির বিচিত্র ছন্দে, বিচিত্র ভাষায়, জীবনের বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য বার অসংখ্য-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার প্রথম যে ভাব সীমার সহিত অসীমের মিলন সাধনের উপলব্ধি, তাহা আধুনিক বঙ্গ-কাব্যে এক দুর্লভ জিনিস। ভারতীয় ভাবধারা বা বৈষ্ণব-রসতত্ত্বে এই উপলব্ধি যে নূতন তাহা নহে। তবে আধুনিক বাংলা কাব্যে এই উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃকই অপূর্ব্ব ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। ভগবান যিনি প্রেম ও দাক্ষিণ্যের আধার বা অসীম স্বরূপ, তিনি সসীম মানবকে আশ্রয় করিয়াই আপনার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতেছেন। বুদ্ধ ও যীশুই তাঁহার দৃষ্টান্ত-স্থল। আবার যে সৌরভ দেহহীন তাহা পুষ্পের দেহ অবলম্বন করিয়া আপনাকে ব্যক্ত করিতেছে; এবং যে সৌন্দর্য্যের শরীর নাই তাহা শরীরী মানব বা পুষ্পের সসীম আধারে আসিয়া আপনার স্বরূপ ফুটাইয়া তুলিতেছে।—

"প্রলয়-সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি—
ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।"

বদ্ধ মানব মুক্তি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে, আবার মুক্ত ভগবান বদ্ধ মানবের মধ্যে আপনাকে প্রকট করিতেছেন।—

"বদ্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি ;
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।"

সীমা ও অসীমের এই যে পরস্পরের জন্য আকাঙ্ক্ষা বা মিলন-কামনা ইহা বিশ্বসৃষ্টির এক গভীর ও বিরাট রহস্য এবং গভীর ও বিরাট সত্য। এ এক অপরূপ মহান্ ভাব। এই মহাভাবের বিচিত্র উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বারংবার ঘটিয়াছে।

তাঁহার দ্বিতীয় ভাবটিও যে কত বিশাল তাহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে। ধরণীর অশেষ সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া এবং ধরাবাসীর সুখের ও দুঃখের উভয়েরই মহিমা উপলব্ধি করিয়া কবি এখানে অক্ষয় অমররূপে সৌন্দর্য্য পান করিতে ও মানবের প্রীতিলাভ করিতে চান। কবির অল্প বয়সের "কড়ি ও কোমলের" যুগ হইতে বৃদ্ধ বয়সের বহু রচনায় পর্য্যন্ত তাঁহার এই অনুভূতি বর্ত্তমান।—

"ধন নয়, মান নয়,
শুধু ভালবাসা,
এই ছিল আশা।
...ধন নয় মান নয়,
ধরণীর এক কোণ এতটুকু বাসা,
এই ছিল আশা।"

ধূলিময় এই ধরণীকে এত সুন্দররূপে দেখিতে ও দুর্ব্বলতা-মহত্ত্ব সম্পন্ন মানুষকে এত ভালবাসিতে বাঙ্গালী কবিকে ইহার পূর্ব্বে আর দেখা যায় নাই। কবির এই ধরণীর প্রীতি তাঁহার বয়ঃক্রম অনুসারে এক অপূর্ব্ব বিশ্বপ্রীতির রূপ ধারণ করিয়াছে। ধরণীর তৃণ পুষ্প জীব হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্য, চন্দ্র, তারকার সহিত আত্মীয়তা বোধ করিয়া—

"বাতাস, জল, আকাশ, আলো,
সবারে কবে বাসিব ভালো।"

বলিতে বলিতে কবি তাঁহার উদার হৃদয়ের এক অফুরন্ত প্রেমে বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আপনার বাহু-সীমায় নিবিড় ভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন। এই ভাবে বিশ্বজগৎকে একান্ত আত্মীয়রূপে গ্রহণ করিয়া তিনি বিশ্বের অংশীভূত তাঁহার ভারতবর্ষ বা বঙ্গদেশকে প্রগাঢ় ভাবে ভাল বাসিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববাসী সমস্ত মানবকেও প্রেম বন্ধনে বাঁধিয়াছেন। তাঁহার এই বিশ্বপ্রীতি ও মানবপ্রীতি এক বিশাল ভাব বা বৃহৎ উপলব্ধি। এই ভাবের বৃহত্ত্ব বা বিশালতা তাঁহার অসংখ্য কবিতায় অপরূপ ভাবে পরিস্ফুট। তিনি এই মহাভাবের প্রগাঢ় ভাবুক।

এইবার তাঁহার তৃতীয় ভাবধারার কথা। ইহা হইতেছে কাব্যশ্রী বা সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর বা মানস-সুন্দরীর সন্ধান। কবি ইহাকে কল্পনালতাও বলিয়াছেন। এক কথায় ইনি মানস-সুন্দরী। এই সুন্দরী অতি বাল্যকাল হইতে কবিকে জগতের একটি রূপ হইতে অপর এক রূপে, এক দৃশ্য হইতে অন্য দৃশ্যে এবং এক মহিমা হইতে অন্য মহিমায় অবিরাম টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। এই সুন্দরী কবিকে বারংবার হাতছানি দিয়া ডাকিয়া লইতেছেন এবং কবি তাঁহারই আহ্বানে বিশ্বের ও মানবের সমস্ত রহস্য-কক্ষে বা বিচিত্র সৌন্দর্য্যে প্রবেশ লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিতেছেন। এই যে বিশাল বিশ্ব-কক্ষে ও মানবহৃদয়-কক্ষে কবির অবিরাম গতিবিধি ও তাহাদের গোপন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন, ইহা রবীন্দ্র-কাব্যে যেমন অপূর্ব্ব ভাবে সম্ভব হইয়াছে তেমন আর আধুনিক কবিদের কাহারও মধ্যে সম্ভব হইয়াছে কি না সন্দেহের বিষয়। এই কবি নয় বৎসর বয়সে বৃষ্টিধারার পতন ও তাহারই সঙ্গে তাল রাখিয়া গাছের পাতার নর্ত্তন, এই দুয়ের ছন্দ ও ধ্বনি অনুভব করিয়া বিশ্বের গতি-সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার জীবনের পরবর্ত্তী সত্তর বৎসর কাল তিনি এই বিশ্বগতির ও মানবহৃদয়-গতির বিচিত্রতা বা অপরূপত্ব উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মানস-সুন্দরী বা কল্পনালতা তাঁহার হৃদয়কে অবিরাম সৌন্দর্য্য-দোলায় দুলাইয়া দিয়াছেন। এই দোলার, এই চাঞ্চল্যের, এই রসাকর্ষণের এই উপলব্ধির যেন শেষ নাই।—

"..........কোথা গৃহ-কোণে
নিয়ে যেতে নির্জ্জনেতে রহস্য-ভবনে ;
জনশূন্য গৃহছাদে, আকাশের তলে
কি করিতে খেলা, কি বিচিত্র কথা বলে
ভুলাতে আমারে স্বপ্ন সম চমৎকার..."

এই মানস-সুন্দরীর বা লীলা সঙ্গিনীর লীলায় আকৃষ্ট কবি বিশ্বরসপানে সর্ব্বদাই উন্মুখ। এই যে বিশ্বরসপান বা বিশ্বসৌন্দর্য্য-বোধ, ইহা এক বৃহৎ ও মহৎ উপলব্ধি। এই সুমহান্ অনুভূতিও রবীন্দ্র-কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য। ইহাও যে একটি মহাভাব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সুতরাং আমরা দেখিলাম, সীমার সহিত অসীমের নিবিড় সম্পর্ক-বোধ, ধরণীপ্রীতি বা মানবপ্রীতি এবং মানস-সুন্দরীর লীলানুভূতি—রবীন্দ্র-কাব্যের তিনটি রূপ বা তিনটি মহাভাব। এমন অনন্যসাধারণ পরিচিত্তসুলভ অপূর্ব্ব উপলব্ধিতে যে কবির হৃদয় নিয়তই উদ্বেলিত এবং যাঁহার বাল্যকাল হইতে বার্দ্ধক্য অবধি এই বিরাট ভাবধারা তাঁহার অসংখ্য কবিতায় ও সঙ্গীতে অসংখ্য ভঙ্গীতে প্রকাশিত তাঁহাকে সাধারণ কবিদের মত কেবল কবি বলিলেই সম্পূর্ণ বলা হইবে না,—তাঁহাকে নিশ্চয়ই মহাকবি বলিব। অবশ্য প্রাচীন কালের মহাকবিগণের ভাব ও তাহার প্রকাশের রীতি এক রকম, আর আধুনিক কালের এই মহাকবির ভাব ও তাহার প্রকাশরীতি অন্যরূপ। প্রাচীন মহাকবিগণ বিশ্বের যাবতীয় দৃশ্যের চিত্র আঁকিয়াছেন; আবার মানব-চরিত্রের সকল দিক্‌ও পরিস্ফুট করিয়াছেন, আর আধুনিক মহাকবি এই রবীন্দ্রনাথ তৃণ ও ধূলি হইতে পর্ব্বত ও আকাশ এবং প্রকৃতির যাবতীয় রূপ মূর্ত্তিমন্ত করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে মানবের মনের ও চরিত্রের সূক্ষ্ম গভীর ও স্থূল সমস্ত ভাবই অনুভব করিয়া সুপ্রকাশিত করিয়াছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে মহাকবি বলিব না কেন ?

দয়া

শ্রীপ্রশান্তকুমার চৌধুরী

পচা-ভাদ্রের গুমোট দুপুর বেলা ;—
ভেপ্ সে উঠেছে পায়ের তলার পিচের রাস্তাখানা।
কুষ্ঠ রোগীর অসাড় ক্ষতের মতো
এধারে-ওধারে ফেঁপে ফুলে ওঠে পিচ্ ;···
তার পরে গলে গড়িয়েছে তার রস,
কুষ্ঠ রোগীর অসাড় ক্ষতের মতো !

সূর্য্য উঠেছে ঘেমে !
সূর্য্যের ঘাম গড়িয়ে পড়েছে শহরের ছাদে-ছাদে ;
রোদ্-ঘাম যতো ছাদ থেকে নেমে
গড়িয়ে পড়েছে রাস্তায় রাস্তায়।
সূর্য্যের ঘাম থেকে—
বাষ্পের রেখা কেঁপে কেঁপে ওঠে সূর্য্যকে টিপ্ কোরে।

সাহেবী আপিস-বাড়ী।
কংক্রিটে আর মার্ব্বেলে মোড়া তোয়াজী শরীরখানা
রৌদ্রের তাপে সত্যি উঠেছে ঘেমে।
আই-ঢাই করে সাহেবী আপিস-বাড়ী।
ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে মুখখানা যেন কালো !

আপিস-বাড়ীর বড়কর্ত্তার ঘরে
আই-ঢাই করে ঝুনো ঝুনঝুনওলা।
কচি বয়েসেতে হয়তো কিছুটা জল ছিল ভেতরেতে ;···
সমবেদনার জল।
পরের দুঃখে হয়তো একটু কাঁপন্ লাগতো বুকে ;
তার পরে চোখ দিয়ে
উপ্‌ছে পড়তো ভেতরের যতো সমবেদনার জল।
ব্যবসার রোদ্ লেগে
কচি ডাবখানা ঝুনো হয়ে গিয়ে নারিকেল হয়ে ওঠে,
জল কমে গিয়ে ক্রমে শাঁস্ ওঠে বেড়ে ;—
পয়সার শাঁস্,—
বড়লোকী, আর ব্ল্যাকমার্কেটী শাঁস্ !
ভেতর-মনের মসৃণ আর শ্যামল রংটা তার
ব্যবসার রোদে কটা হয়ে গিয়ে ছোবড়ায় গেছে ভরে !

আপিস-বাড়ীর বড়কর্ত্তার দরজার বাইরেতে
ঘামছে একটা ছেলে।
হাতে তার মোটা বেঁটে এক পিচকিরি ;
আর হাতে তার জলের বালতি ঝোলে।
জল দিয়ে দিয়ে ভিজিয়ে তুলছে পুরু খস্‌খস্‌গুলো ;
খস্‌খসে দেহ ভিজে হয় স্যাঁৎস্যাঁতে,
টপ্ টপ্ কোরে জল ঝরে, আর কেমন একটা
গন্ধ ছড়ায় যেন।

আপিস-বাড়ীর গাড়ীবারান্দা গলা বাড়িয়েছে
রাস্তার দিক্‌টাতে ;—
জিরাফের মতো লম্বা গলাটা তার।
লাম্বাটে ছায়া একপেশে হয়ে পড়েছে পথের গায়ে।—
ছায়ার তলায় একখানি শুধু ঝাঁকা,
ঝাঁকাটার পাশে কুঁকড়ে রয়েছে জোয়ান্ একটা মুটে ;—
মাংসপেশীর খাঁজে-খাঁজে তার স্বাস্থ্য উঠেছে ঠেলে।

পচা-ভাদ্রের ভ্যাপ্‌সা দুপুর বেলা
ঘামছে সবাই,
ঘামছে না শুধু ঘুমন্ত ঝাঁকা-মুটে।
পরম আরামে নাক ডাকাচ্ছে পড়ে।
মাঝে মাঝে শুধু মাছির জ্বালায় একটু-আধটু
নাড়াচ্ছে হাতখানা ;
মড়ার মতন ঘুমোচ্ছে এক ধারে।

কংক্রিটে আর মার্ব্বেল মোড়া আপিস-বাড়ীর
বুকখানা ওঠে ফুলে ;—
আপিস-বাড়ীটা গর্ব্বিত চোখে আকাশের পানে চায় !
আপিস-বাড়ীটা বলে,—
চিত্রগুপ্ত, তোমার জাবদা-খাতাটায় টুকে রাখো,
গরীব একটা মুটিয়াকে আমি বিলিয়ে দিয়েছি ছায়া,
রোদ যাহা কিছু নিয়েছি নিজের ঘাড়ে !
চিত্রগুপ্ত, তোমার খাতায় এ-দয়ার কথা
টুকে রাখো ভাল কোরে,
ভুলে যেয়ো নাকো যেন !

আপিস-বাড়ীটা গর্ব্বিত চোখে এদিকে-ওদিকে চায়,—
ফুটপাথে আর ট্রামের লাইনে আর যতো চালা-ঘরে।
হঠাৎ ওদিকে চোখে,—
নোংরা একটা তোবড়ানো ডাষ্টবিন,
ছাই পাঁশ আর কুটনোর খোসা ছড়িয়ে পড়েছে
কুকুরের পায়ে পায়ে।
ওধারে একটা পেট ফুলে-ওঠা ইঁদুর রয়েছে মরে ;—
ছোট ছোট দাঁত, টকটকে লাল মুখ।
ইঁদুরের বুকে চেপে বসে আছে শঙ্খচিলের ছানা ;
চেপে বসে আছে আর—
বাঁকা ঠোঁট দিয়ে ঠুক্‌রেছে তার দেহ,
ক্রমাগত ঠুক্‌রেছে।
ডানা দু'টো তার ছড়িয়ে দিয়েছে খুলে,
কড়া রোদ্দুর পড়েছে ডানাতে তার,—
ইঁদুরের গায়ে লাগেনি একটু রোদ্ !

* * *

চিত্রগুপ্ত কলমটা রেখে মুচকি মুচকি হাসে !
লজ্জায় আর অপমানে কুঁচকিয়ে—
আপিস-বাড়ীটা গা-ঢাকা দেবার ক্রমাগত তাল খোঁজে।

উট চলেছে……

—নীলমণি রায়

মনন

—[illegible]

—নিয়মাবলী—

প্রত্যেক মাসে প্রতিযোগিতায় একমাত্র সৌখীন (এ্যামেচার) আলোকচিত্র শিল্পীদের ছবি গৃহীত হইবে।

ছবির আকার ৬" × ৮" হইলেই আমাদের সুবিধা হয় এবং যত দূর সম্ভব ছবি সম্বন্ধে বিবরণ থাকা বাঞ্ছনীয়। যথা, ক্যামেরা, ফিল্ম, এক্সপোজার, এ্যাপারচার, সময় ইত্যাদি।

যে কোন বিষয়ের ছবি লওয়া হইবে। অমনোনীত ছবি ফেরৎ লওয়া জন্য উপযুক্ত ডাক-টিকিট সঙ্গে দেওয়া চাই। ছবি হারাইলে বা নষ্ট হইলে আমাদের দায়ী করা চলিবে না, সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। খামের উপর "আলোক-চিত্র" বিভাগের এবং ছবির পিছনে নাম ও ঠিকানার উল্লেখ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

প্রথম পুরস্কার দশ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার আট টাকা, তৃতীয় পুরস্কার পাঁচ টাকা এবং অন্যান্য বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হইবে।

—— সেনগুপ্ত

— ছড়া

—শৈলেন বসু

?

(দ্বিতীয় পুরস্কার)

পঙ্কজ

পাড়

—অরুণ রায়

আলো-আঁধারি —সমীরকুমার গুহঠাকুরতা

(প্রথম পুরস্কার)

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতের মধ্যযুগের আদর্শ ছিল বীর-ধর্ম্ম। ক্ষাত্রধর্ম্মই তখন ভারতে শ্রেষ্ঠ আসন পাইয়াছিল। বাহুবলের দ্বারা স্বীয় মাতৃভূমিকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারা অপেক্ষা গৌরবময় কার্য্য ছিল স্বপ্নেরও অগোচর। ক্ষমতাশালী শত্রুর হস্তে যিনি আত্মবিক্রয় করিতেন, তিনি হইতেন সমাজে অপাংক্তেয় ও ঘৃণ্য। তাঁহাকে কাপুরুষ আখ্যা পাইতে হইত। মধ্যযুগ প্রচার করিয়াছিল যে বাহুবলের দ্বারা পৃথিবীকে শাসন করিতে হইবে। ক্ষত্রিয়ের হস্তে পৃথিবী শাসন করিবার ভার থাকিবে। জ্ঞানচর্চ্চা, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতির মধ্যযুগেও সমাদর ছিল কিন্তু সে সমাদরে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের তুলনায় আন্তরিকতার অভাব বহু পরিমাণে দৃষ্ট হইত। বৈদিক যুগে দেখা গিয়াছে, ভারতবাসীরা মন-প্রাণ দিয়া জগতের যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা করিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ জ্ঞানীরাই ছিলেন তখন ভারতে ভাগ্যনিয়ন্তা। স্বাধীন যুক্তিবোধের তখন ছিল সর্ব্বাপেক্ষা সমাদর। কিন্তু মধ্যযুগের ক্ষত্রিয়গণ হইলেন সমাজের শীর্ষস্থানীয়। ক্ষত্রিয়গণের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করিয়া ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে সূক্ষ্ম যুক্তিবোধ, যে স্বাধীন চিন্তাধারা বৈদিক যুগে ভারতের স্বাতন্ত্র্য প্রচার করিতেছিল মধ্যযুগে জ্ঞানচর্চ্চা ও বিচারবুদ্ধিতে তাহারা বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইল। ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনযাত্রা প্রণালীতে কতক পরিমাণে কুসংস্কার প্রভাব বিস্তার করিল। বীরধর্ম্মরূপ এক নূতন অনুভূতি সমগ্র দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিল। বৈদিক যুগের ও মধ্যযুগের জীবনযাত্রা প্রণালীর এই যে আদর্শগত পার্থক্য ইহা কেবল মাত্র ভারতের ইতিহাসেই পরিলক্ষিত হয় না। জগতের সমস্ত সুখ্যাত সভ্য জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, মধ্যযুগে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বীরধর্ম্ম সমাজের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং ধর্ম্মজগতে ও জ্ঞান-জগতে স্বাধীন চিন্তাধারার স্থান দেওয়া হয় নাই। প্রাচীন যুগের জ্ঞানী ও চিন্তাশীলগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, যুক্তির সাহায্য না লইয়া তাহারই কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বক্ষেত্রে স্বীকার করা হইয়াছে। জ্ঞান-জগতের গতি হইয়াছে মন্দীভূত।

কিন্তু জগতের অন্যান্য জাতির সহিত মূল আদর্শে সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও মধ্যযুগে ভারতের ইতিহাস তাহার মৌলিকতা ও স্বাতন্ত্র্য জলাঞ্জলি দেয় নাই। ভারতীয় নারীর আদর্শ কি বৈদিক যুগে, কি বৌদ্ধযুগে, কি মধ্যযুগে অক্ষুণ্ণ ছিল। ভারতীয় নারী-আদর্শ তাহার অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া ভারতের ইতিহাসের মৌলিকতাকে রক্ষা করিয়াছে—ভারতীয় সভ্যতাকে এক নূতন জীবন দান করিয়াছে।

ভারতবর্ষে নারী জাতিকে কখনই সমাজের কর্ম্মক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় অংশ বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। ভারতে নারীকে বলা হইয়াছে, পুরুষের সহকর্ম্মিণী ও সহধর্ম্মিণী। ভারতীয় নারীরা এ আখ্যার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন প্রকৃত পক্ষে পুরুষের সহকর্ম্মিণী হইয়া। প্রাচীন যুগ হইতে দেখা গিয়াছে যে, যে আদর্শ পুরুষকে করিয়াছে অনুপ্রাণিত, ভারতীয় নারীরাও সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম্মজগতে সক্রিয় ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন—পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা দেশের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। বহির্জগৎ সম্বন্ধে অন্ধ থাকিয়া, বহির্জগতের গতির সম্বন্ধে কোনওরূপ উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া তাঁহারা কেবল মাত্র বিলাসে দিন অতিবাহিত করেন নাই—কেবল মাত্র পুরুষের লালসার ইন্ধন যোগাইয়া তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করেন নাই। জগতের অন্যান্য সভ্য জাতির নারীরা যখন কেবল মাত্র পুরুষের লালসার সামগ্রী হইয়া বিলাস-ব্যসনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, পুরুষের আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথে সক্রিয় সাহায্য করা যখন তাঁহাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, সেই যুগে ভারতীয় নারীরা সামাজিক উন্নতির গতির পথে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। মধ্যযুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন জগতের মধ্যে ভারতে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ নিশ্চিহ্ন হয় নাই। বীরধর্ম্মে অনুপ্রাণিত পুরুষের পার্শ্বে আমরা দেখিয়াছি বীর ভারতীয় নারীকে—যে নারী শান্ত ও নিরুৎসাহী পুরুষকে দিয়াছে কর্ম্মে উদ্দীপনা—বিজিত পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শত্রুকে করিয়াছে পরাজিত। শত্রুর হস্ত হইতে তাহাদের রক্ষার ভার সম্পূর্ণরূপে পুরুষের উপর রাখিয়া তাঁহারা নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকেন নাই। বাহুবলে তাঁহারা শত্রুকে পরাজিত করিয়াছেন ও স্বীয় সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। যখন তাঁহারা দেখিয়াছেন আত্মরক্ষার উপায় ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে, তখন তাঁহারা অসহায় ভাবে শত্রুর হস্তে আত্মসমর্পণ করেন নাই। মৃত্যু-ভয়কে জয় করিয়া তাঁহারা জহরব্রত করিয়া জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—শত্রুর জয়ের উল্লাসকে ম্লান করিয়া দিয়াছেন।

এই মধ্যযুগেই আমরা পাইয়াছি দাহির-মহিষীকে আর পাইয়াছি দুর্গাবতীকে, করমেতি বাঈকে, প্রবীণা বাঈকে, সংযুক্তাকে, সমরসিংহ-মহিষী কর্ম্মদেবীকে—পাইয়াছি জবহর বাঈকে, কৃষ্ণকুমারীকে, চিতোরের রাণী কর্ম্মদেবীকে, শিহ্লাদী-রাণী দুর্গাবতীকে। এই যে নারীদের আমরা পাইয়াছি তাঁহারা সকলেই ছিলেন রাজদুহিতা, রাজমহিষী, রাজমাতা। আজন্ম ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াছেন, কিন্তু যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা অত্যাচারীর হাত হইতে দেশকে, দেশবাসীকে রক্ষা করিতে মুক্ত কৃপাণ-হস্তে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদের নারী-সুলভ কোমলতাকে বিসর্জন দিয়া পুরুষকে করিয়াছেন কর্ত্তব্য কর্ম্মে উত্তেজিত, তাঁহাদের বীরত্ব দেখাইয়া শত্রুকে করিয়াছেন মুগ্ধ। এই অদ্ভুত নারী-চরিত্র ভারতের একান্ত নিজস্ব। এই নারী-চরিত্রের জন্য ক্রমাগত বহিঃশত্রু আক্রমণের

মধ্যযুগের ও আধুনিক ভারতীয় নারী

শ্রীশেফালী গুপ্ত

দ্বারা ভারতীয়গণ হীনবল হইয়া পড়েন নাই, বহু দিন পর্য্যন্ত ভারতীয় কৃষ্টিকে, ভারতীয় সভ্যতাকে, ভারতীয় সমাজকে বীর ভারতবাসিগণ বাঁচাইয়া রাখিবার মত শক্তি ও সাহস অর্জ্জন করিয়াছিলেন

মধ্যযুগের পর ধীরে ধীরে ভারত-গগনে ভাগ্যরবি অস্তমিত হইতে লাগিল। ভারতবাসিগণ ভুলিল তাঁহাদের গৌরবময় অতীত—ভুলিল তাঁহাদের শৌর্য্য-বীর্য্য। প্রাচ্যের কৃষ্টি, প্রাচ্যের স্বাধীনতা-স্পৃহা, প্রাচ্যের স্বাতন্ত্র্য, ক্ষমতাশালী পাশ্চাত্যের নিকট আত্মবিক্রয় করিল। ভারতবাসীর একমাত্র উদ্দেশ্য হইল নিজেকে বিদেশী আমলাতন্ত্রের আমলা করিয়া তোলা। তাহার তথাকথিত শিক্ষা-দীক্ষাও সেই ভাবে চলিতে লাগিল। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভারতবাসীর অন্তরে ও বাহিরে প্রভাব বিস্তার করিল। ভারতবর্ষ এই যে অবনতির সম্মুখীন হইল ইহার কবল হইতে ভারতীয় নারীরা রক্ষা পাইলেন না। সমাজের মনের প্রসারতা খর্ব্বিত হইবার সহিত সমাজে নারীরা হইতে লাগিলেন উপেক্ষিতা, তাঁহাদের ধীরে ধীরে গৃহের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইল—যে গণ্ডীর মধ্য হইতে বাহিরের আলো প্রবেশ করিবার মত কোনও গবাক্ষ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যে নারীর আদর্শ ভারতকে করিয়া তুলিয়াছিল অনন্যসাধারণ—সেই আদর্শ অন্যান্য দেশে অনুসৃত হইতে লাগিল। অন্যান্য দেশের নারীরা বুঝিলেন তাঁহাদের অস্তিত্বের প্রয়োজন—বুঝিলেন সামাজিক জীবনে তাঁহাদের কর্ত্তব্য। যে স্বাধীনতা ভারতের নারীরা মধ্যযুগে পাইয়াছিলেন—যে আদর্শে তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন জগতের নারীরা তাহা অনুসরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পথপ্রদর্শক ভারতীয় নারীরা আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, জগতের গতির সহিত সমাজের প্রয়োজনের সহিত তাল মিলাইয়া অগ্রসর হইবার তাঁহাদের উপায় রহিল না। অজ্ঞতার মায়াজালে আচ্ছাদিত ভারতীয় নারীর সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইল এক নূতন আদর্শ—যে আদর্শের সহিত তাঁহার বিগত ইতিহাসের আদর্শের কোন সামঞ্জস্য নাই। ভারতীয় নারীরা বুঝিলেন, পুরুষকে তাহার গতির পথে সক্রিয় সাহায্য করা তাঁহাদের ক্ষমতার ও আদর্শের বিরুদ্ধে। নারী থাকিবে অন্তঃপুরে—বহির্জ্জগৎ পুরুষের।

বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতের জনসাধারণ স্বাধীনতা লাভের অপূর্ব্ব অনুভূতি আস্বাদন করিয়াছে। বিদেশী আমলাতন্ত্রের মায়াজালে আর তাহাদের পূর্ব্বের ন্যায় প্রলুব্ধ করিতে পারিতেছে না। এই যে নূতন অনুভূতি, এই যে নব জাগরণ এ কি কেবল মাত্র পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে? ভারতীয় নারীরা কি এখনও তাঁহাদের বিগত দিনের আদর্শের কথা বিস্মৃত হইয়া দেশের ডাকে, দশের ডাকে সাড়া দিবেন না? আজ আমরা বুঝিয়াছি, কি ভুল-পথই আমরা অনুসরণ করিয়াছি। সমাজের মংগলের সমস্ত দায়িত্ব পুরুষের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখিয়া সমাজের গতিকে করিয়াছি মন্থর। যে ভুল আমরা করিয়াছি তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করিতে হইতেছে। বড়ই বিলম্বে আমরা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিতেছি কবির বিলাপ—

"মায়ের জাতির মুক্তি দে রে
(নইলে) যাত্রাপথের বিজয়-রথের চক্র তোদের ঠেলবে কে রে?"

আজ আমাদের নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভাষায় ভারতীয় নারীদের অনুপ্রাণিত করিতে হইবে সক্রিয় কর্ম্ম-মন্ত্রে—

"দেশের সন্তান কি শুধু আমরা, কারার আলিংগন কি শুধু আমাদের জন্য? তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্বামী যে কাজ পেরেছে সে কাজ কি তোমরা পারবে না? পার, অবশ্য পার।"

ভারতীয় নারীদের স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে গান্ধীজীর কথা—"নারী হইতেছে পুরুষের সংগিনী—পুরুষের ন্যায় তাহার মধ্যে মানসিক ক্ষমতা বিদ্যমান। পুরুষের কর্ম্মের অতি ক্ষুদ্র বিভাগেরও অংশ গ্রহণের তাহার দাবী আছে এবং পুরুষের সহিত একই প্রকারের স্বাধীনতা উপভোগ করিবারও দাবী করিতে সে সক্ষম।

কিন্তু বহু দিনের অবহেলা ও উপেক্ষার ফলেও ভারতীয় নারী-চরিত্র ভারতের ভাগ্যের অন্ধকারময় যুগেও সমস্ত বাধা উত্তীর্ণ করিয়া প্রয়োজন হইলেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অতীত ইতিহাসে যেমন এই দৃষ্টান্ত দেখাইতে আমাদের অধিক অনুসন্ধান করিতে হয় নাই, বর্ত্তমান যুগে এই দৃষ্টান্তের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত স্বল্প। কিন্তু এত বাধা, এত অবহেলার মধ্যেও স্বীয় অস্তিত্ব প্রকাশের এই যে দুদমনীয় প্রচেষ্টা, ইহা ভারতীয় নারীতেই সম্ভব। এই দুর্দ্দিনের মাঝেও সেই জন্য আমরা পাইয়াছি স্বরূপরাণীকে, পাইয়াছি কস্তুরবাকে, পাইয়াছি বাসন্তী দেবীকে, পাইয়াছি কমলা নেহরুকে। বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতীয় নারীদের নিকট তাঁহারা অতীত গৌরবের প্রতীক হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সুষুপ্ত ভারত-নারীকে সোনার কাঠি স্পর্শ করাইয়া আত্মচেতনা দান করিয়াছেন। তাঁহাদের ত্যাগ, তাঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ঘরে ঘরে সহস্র সহস্র স্বরূপরাণী, কস্তুরবা, বাসন্তী দেবী, কমলা নেহরু আত্মপ্রকাশ করিলে ভারতবর্ষ আবার তাহার অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইবে।

জীবন-সত্য

অমিতা বসু

দোল-পূর্ণিমার রাত্রি—
শ্লথ পায়ে এসে দাঁড়ালাম বারান্দার ধারে।
পূর্ণ চাঁদের ফিকে নীল আলো রচনা করেছে মায়াজাল,
তাই বুঝি চির-পরিচিত দেওদার-কুঞ্জ হয়ে উঠেছে চির-নূতন।

সহসা জেগে উঠলাম,
হঠাৎ জীবনের একটা দিক্ স্পষ্টতর হয়ে উঠল,
এই ত বাস্তব, এই ত সত্য,
কিছু আগে যার প্রাণ-শক্তি পৃথিবীর প্রাণকে
বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল
সে এখন জড়, প্রাণ-শক্তি তার লুপ্ত হয়েছে।

দোল-পূর্ণিমার রাত্রে সহসা জেগে উঠলাম,
উপলব্ধি করলাম জীবনকে,
বুঝলাম মৃত্যুই এক সত্য মানব-জীবনে।
মানুষের আশা স্বপ্নের মত মিলিয়ে যায়—
সুখস্বপ্ন—মরীচিকার মত মানব-জীবনে,
তার পর সে কল্পনায় রূপায়িত হয়।
মানব-জীবনের সবই হয়ত কল্পনায় থাকতে পারে—
শুধু পাবে না মৃত্যু।
সে বাস্তবের রূঢ় প্রতিমূর্ত্তি,
তাই সে চির সত্য।

সোনার হরিণ

হাসিরাশি দেবী

মাণিকগঞ্জ থানার সামনে, বামুনপাড়ায় ঢুকতেই, যে ভাঙ্গা বাড়ীটা আগে চোখে পড়ে, সে বাড়ীখানার পূর্ব্বপুরুষদের কথা বাদ দিলেও—বর্ত্তমান জীবিত পুরুষের নাম বামাপদ চক্রবর্ত্তী।···

বামাপদর বয়সের হিসাব ঠিকমত না করতে পারলেও মোটামুটি নজরে দেখা যায়, তার অঙ্গে আজ তারুণ্যের চিহ্নও নাই।

চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, অস্থি-চর্ম্মসার দেহ—সামনের দিকে ঝুয়ে পড়েছে, মাথা-ভরা টাক। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে চোখের মোটা কাচের চশমাটা টেনে তোলে আগে, তার পর দম নিয়ে বলে:

"আমার বয়সের কথা শুধোচ্ছ?—ও,—সে এক বিরাট কাহিনী; শোনো,—তবে বলি ব্যাপারটা। সেই, যে-বারে আশ্বিনে ঝড় হয়, সেই বারে হয় আমার জন্ম। কিন্তুক, জন্মালেই হয় না, জন্ম নেওয়ার পরের কথাটা শুনবে?—মা-বাপ কবে মরেছেন জানি নে, জানতাম এক পিসিকে; বে' দিয়ে আমার বৌ আনলেন তিনিই। বৌ, পিসি আর আমি এই তিন জনের সংসারে মানুষও বাড়লো এক দিন, অর্থাৎ এক মেয়ে হ'লো আমার। মেয়ে বড় হ'লো,—বিয়েও দিলাম এক পাশ-করা ছেলের সঙ্গে,—যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় ক'রে। কিন্তু, সইলো না, বরাতে আমার সইল না; মেয়ে ফিরে এলো শাঁখা আর সিঁদুর ঘুচিয়ে—থান প'রে।"

এর পরে একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে সে, হাতের হুঁকোয় টানের পর টান দিয়ে চলে ক্রমাগত।

এক সময়ে শ্রোতার অহেতুক প্রশ্নে বিরক্ত হ'য়ে বলে:

"আরো জানতে ইচ্ছে থাকে তো শোনো, সে-ও এক অরণ্যপর্ব্ব। কালীপূজো কত্তে গেইছিলাম তিন দিনের মতন। তিন দিন পরে ফিরে এসে দেখি, বাড়ীতে কেউ কোথাও নেই, বাড়ীর তিন জনই ওলাউঠোয় মরেছে এক রাত্তিরে। নাও, হ'লো তো শোনা? এবার আর কিছু শুনতে না চাও তো ওঠো, উঠে তামাক সাজো এক ছিলিম।"

ব'লতে ব'লতে ক'ল্কেটা এগিয়ে দেয় সে, তার পর যায় সে জায়গা ছেড়ে উঠে।

যে কথাটা "বলি-বলি" ক'রেও সে মুখ দিয়ে উচ্চারণ ক'রতে পারে না, সেটা আর কিছু নয়, তার বিধবা মেয়ের গৃহত্যাগ।

ওলাউঠোয় বামাপদ'র পিসি আর পরিবার এক রাত্তিরেই ম'রেছিল সত্যি, কিন্তু ওর বিধবা মেয়ে গৌরী মরেনি; সে এই গ্রামেরই যার সঙ্গে ক'লকাতায় পালিয়েছিল, তার নাম অলস্ত অক্ষরে মনের মধ্যে লেখা থাকলেও বামাপদ মুখে উচ্চারণ করে না।

আজ মনে পড়ে, সে তখন সবে মাত্র পুঁথি-পাঁজি ঘেঁটে হাত-দেখা সুরু ক'রেছিল; আর সেই সঙ্গে আবিষ্কারও ক'রেছিল, তার মেয়ের হাতের তালুতে যে লাল রঙের সরল রেখা আছে, তাতে সে রাজরাণী না হ'য়ে যায় না। এ মেয়ে তার রাজরাণী হবেই এক দিন, এবং সে দিন হয়তো দুঃখও তার থাকবে না কিছু। এই কল্পনায় সে দিন সে যত রঙীন স্বপ্নই রচনা করুক, কাজে কিন্তু কিছুই হ'লো না। গৌরীর বৈধব্যই কেবল নয়, গৃহত্যাগের পর কিছু দিন সে-ও এ-তীর্থ ও-তীর্থ আর সে-তীর্থ ঘুরে শেষে কিন্তু ফিরে এলো সেই পূর্ব্বপুরুষেরই ভিটায় এবং সদর দরোজার সামনে লাগালো একটা নতুন রং-করা চকচকে টিনের সাইন-বোর্ড, তাতে লেখা রইল:

"অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎবক্তা—শ্রীযুক্ত বামাপদ চক্রবর্ত্তী।"

ভাদ্দরের সকাল:—

সকালের রোদ চড়চড় ক'রে দেখা দিতেই বামাপদ'র মনে প'ড়লো, রান্নার জন্যে যোগাড় করা খড়কুটোগুলো কাল রাতের জলে ভিজে গেছে, আজ রোদে দিয়ে শুকিয়ে নিতে পারলে মন্দ হয় না।

ভাবতে ভাবতে চমকে উঠলো সে, দেখলে, ভাঙ্গা সদর দরোজার পাশে কে একটি মেয়ে ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছে যেন!

বামাপদ ডাকলে: "ওখানে দাঁড়িয়ে কে গা বাছা? কৈ, ইদিক পানে এসো দিকি, দেখি, কি দরকার···"

যে দাঁড়িয়েছিল, এগিয়ে এলো সে, বামাপদ'র পায়ের কাছে কাগজে জড়ানো কি কতকগুলো রেখে প্রণাম ক'রলে; তার পরে ঘোমটার ভেতর থেকেই ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে ব'ললে: "হাত দেখাব বাবা! বড্ড ফাঁড়া যাচ্ছে কি না—"

বাঁ হাতখানা সে সামনে মেলে ধরতেই নিজের অজ্ঞাতে যেন একবার চমকে উঠলো বামাপদ। দেখলে, এ হাতেও আর একখানা হাতের মত লাল বর্ণের সরল রেখা আঁকা!···

প্রায় ভুলেছিল সে। কিন্তু ভগবান তাকে ভুলতে দিলে না; "রাজরাণী" হবার কথাও সে উচ্চারণ করতে পারলে না মুখ দিয়ে। ব'ললে: "দুঃখ এলেও কেটে যাবে তোমার, কোনও ভাবনা নেই মা, ভয়ও নেই কিছু, অনেক দিন বাঁচবে তুমি!"

প্রণাম জানিয়ে নারীমূর্ত্তি অদৃশ্য হ'লো।

ওর যাবার দিকে তাকিয়ে, পুরু কাচের চশমার ভেতর থেকেও মনে হ'লো বামাপদ'র, এ চলা যেন তার চেনা। পা-ফেলার ঐ ভঙ্গিটা সে যেন আজও ভোলেনি।

মূর্ত্তি অদৃশ্য হ'তেই কাগজের মোড়কটি খুলে সে চমকে উঠলো···

নোট্! নোট্! কত নোট্!—দশ টাকার নোট্!···গুণে চ'ললো সে,—"এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ···কত! আরো কত! উঃ! বামাপদ চমকায়। মেয়েটা ভুলেই ফেলে গেছে বোধ হয়! না, না, এ তাকে না ব'লে নেওয়া হবে না। পাপ হবে! পূর্ব্বজন্মে ক'ত পাপ ক'রে এ জন্মে এই সর্ব্বাফল ভোগ ক'রছে সে! আবার এ জন্মে যদি পাপের বোঝা বেড়ে চলে, তা হ'লে?···

বামাপদ ছুটে গেল পথের ওপোর। কিন্তু কই—কই? কেউ কোনও দিকে নেই তো! জিজ্ঞাসা ক'রলেও তো কেউ তার খোঁজ দেয় না।—তবে?···

ফিরে আসে বামাপদ।

পূজো এসে পড়েছে, দুর্গা পূজো।...

বাবুরা,—অর্থাৎ সাতখানা গ্রামের জমিদার এই বাবুরা, **তাঁদেরই বাড়ীর পূজো।** এই উপলক্ষে গ্রামে যাত্রা, গান, থিয়েটারের যেন প্রতিযোগিতা চলে এই সময়টাতে।

এবার হবে পালা-কীর্ত্তন। কীর্ত্তনীয়া একটি মেয়ে এসেছে বাবুর বাড়ী, সে না কি এ গাঁয়ের সব চেনে, জানেও। কিন্তু গানের সময় ছাড়া দেখা করে না কারো সঙ্গে।

সেই গানও সুরু হলো।...কিন্তু গানের আসর ছেড়ে উঠে চ'ললো বামাপদ। কারণ, গান শুনলে তার কান্না আসে!...তা, সে যে গানই হোক!

তাকে উঠে যেতে দেখে সকৌতুকে ফিরিয়ে আনলেন বড় বাবু নিজে, তার পর নিজের হাতে যে সরবতের গ্লাসটি বামাপদ'র হাতে তুলে দিলেন, বামাপদ তাকে প্রত্যাখ্যান ক'রতে পারলো না—খেয়ে ফেললে এক চুমুকে। তার একটু পরেই শুয়ে পড়লো আসরের এক পাশে, মনে হ'লো পৃথিবী যেন স'রে যাচ্ছে তার পায়ের নিচে থেকে।

আসরে তখন গান চলেছে কীর্ত্তনীয়ার, উপভোগও করছে সকলে একসঙ্গে। কেউ জানলেও না বামাপদ'র এই অবস্থা।

গভীর রাত্রি, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল বামাপদ'র।

মনে হলো, কে যেন কাঁদছে না? হাঁ, ঐ তো কে কাঁদছে ফুঁপিয়ে, আস্তে-আস্তে! চোখে চশমা দিয়ে উঠে বসলো বামাপদ। দেখলে, মাথার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে একটি সালঙ্কারা নারীমূর্ত্তি।

বামাপদ চীৎকার করে উঠলো: "কে, কে তুই?..."

যে চ'লে যাচ্ছিল, সে একটু দাঁড়ালো হয়তো। মুখ ফিরিয়ে জবাব দিলে, "বাবা, আমি গো! আমি গৌরী, আমিই এসেছিলাম, সে দিন তোমায় হাত দেখাতে।"

গৌরী!...

কথাটা কানে আসতেই এক মুহূর্ত্তে বামাপদ যেন পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠলো; যখন চমক ভাঙ্গলো, গৌরী তখন চলে গেছে।

এর পরে গাঁয়ের লোক দেখতে পায়, বামাপদ চক্কোত্তি দরোজার সামনের সেই সাইনবোর্ডখানা খুলে ফেলেছে। মৃত্যমান অবস্থায় বারান্দার ওপরে বসে সে ছিলিমের পর ছিলিম সাজা তামাক নিঃশেষ করে চলেছে দিনের পর দিন। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে উদাস হাসি হেসে জবাব দেয়: "আরে দূর—আমি কি ছাই হাত দেখতে জানি? ও কেবল দু'দিনের জন্যে পয়সা রোজগারের ফন্দী খুলেছিলাম মাত্তর!"

চোখের দৃষ্টি বোধ হয় ওর ঝাপ্‌সা হয়ে আসে, উঠে যায় সে জোর করে হাসতে হাসতে।

গৃহ-সজ্জা

শ্রীনন্দিতা দাশগুপ্তা

বাঙালীর গৃহসজ্জা খুব কম ক্ষেত্রেই রুচির পরিচয় দেয়, যাঁরা ধনী তাঁরা অনাবশ্যক জিনিসে গৃহকে অযথা ভর্ত্তি করে রেখে দেন এবং যাঁরা মধ্যবিত্ত তাঁরা অগোছালো ভাবটাকেই বাড়ীতে স্থায়ী আসন দিয়ে রেখেছেন।

প্রথমেই ধরুন রান্নাঘর, রান্নাঘরে বাসন-পত্র রাখবার জন্য একটি জলচৌকীই যথেষ্ট, ভাঁড়ার এবং রান্নাঘর ও খাবার-ঘর যদি একটির মধ্যেই সামলাতে হয়, তবে ভাঁড়ারের জিনিস-পত্র রাখবার জন্য একটি বড় তাক থাকা বাঞ্ছনীয়। এর খাবার ব্যবস্থা তাহলে টেবিলে করাই সমীচীন। রান্না করা জিনিস-পত্র রাখবার জন্য একটি জালের আলমারী সব চেয়ে প্রথমেই দরকার। তবে যখন তিনটি ঘরের কাজ একটি ঘরেই সারতে হবে তখন একটি বড় ঘর অথবা ঢাকা বারান্দা তার জন্য নির্দিষ্ট করা দরকার। কিন্তু ওই ঘরের আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি এমন ভাবে গুছিয়ে রাখতে হবে যাতে ঘরটি ভারাক্রান্ত না হয়ে পড়ে।

তার পরেই আসে শোবার ঘরের কথা। শোবার ঘরে খাট ছাড়া অন্য কিছুর স্থান না হওয়াই উচিত। এক কোণে ছোট বেতের টেবিল ও চেয়ার একটির স্থান হতে পারে। তবে বিছানাটি সর্বদা পরিষ্কার থাকা দরকার এবং কিছু ফুলের স্থান তার মধ্যে থাকা সুরুচির পরিচায়ক। বিছানা বা মশারি যেন কোন সময়েই অপরিচ্ছন্ন না থাকে, তাহলে সমস্ত সৌন্দর্যই যাবে ম্লান হয়ে।

কাপড়-চোপড় যে ঘরে ছাড়া হবে সেখানে আলমারী, বাক্স, আলনা dressing table ইত্যাদি রাখা হবে। শোবার ঘরে অনেকেই আলনা, বাক্স, আলমারী ইত্যাদি রেখে থাকেন কিন্তু সেটা করা উচিত নয়।

বাইরের লোকের বসবার জন্য প্রায় সব বাড়ীতেই একটু স্থান নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। বারান্দা অথবা ঘর যেটাই এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হোক না কেন সেখানে বাজে furniture কিছু না রেখে হাল্কা ১টি বেতের টেবিল ও ৪টি চেয়ার রাখাই যথেষ্ট। টেবিলে ও চেয়ারে হাল্কা কাজ করা টেবিল ও চেয়ার ঢাকা ও কুশান রেখে দিলে আরো ভালো। টেবিলের উপরে ফুলদানীতে কিছু ফুল ও ১টি ash-trey ছাড়া আর কিছুরই প্রয়োজন নেই। স্নানের ঘরটিও সর্বদা যেন দুর্গন্ধমুক্ত এবং পরিষ্কার থাকে। সেখানে কাপড় রাখবার ১টি দেয়াল-আলনা, ও সাবান tooth brush রাখবার জন্য ১টি দেয়াল-সংযুক্ত ছোট তাক ছাড়া আর কিছুরই প্রয়োজন নেই।

এই যে নির্দেশগুলি আমি দিলাম সবই সাধারণ গৃহের উপযুক্ত, বিশেষতঃ যাঁরা ছোট বাড়ীতে বাস করেন তাঁদেরই জন্য। সব শেষে বক্তব্য এই যে, আজকালকার দিনে বাড়ীর মালিকেরা বাড়ী মেরামত ও চুণকাম করার ধার দিয়েও যান না, কিন্তু নিজের বাড়ীটি সুন্দর ভাবে রাখতে চাইলে বৎসরে ১ বার নিজের পয়সা খরচ করেও সমস্ত বাসস্থানটি চুণকাম করানো দরকার। অপরিচ্ছন্ন দেওয়াল কোনও রকম সুরুচিসঙ্গত জিনিসকেই স্থান দেবে না।

স্বর্গাদপি গরীয়সী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৪

ভাগ্যকে দেওয়া আশীর্বাদ গিরিবালার নিজেরই একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল।

প্রায় বছর খানেক পরের কথা। চাকরি লইয়া শৈলেন গেছে বাহিরে। এই একটা বড় পরিবর্তন সংসারে। গিরিবালা গিয়া গোছগাছ করিয়া দিয়া কিছু দিন থাকিয়া আসিলেন, সংসার আবার পুরানো খাতে বহিয়া চলিল; বাড়তির মধ্যে ছেলের উপর অভিমানটুকু আবার জাগিয়া উঠিল গিরিবালার মনে—এ চিন্তাটুকু সে স্বপ্নের সাথী করিয়া রাখিলই তাঁহার?

বর্ষার সন্ধ্যা। শরীরটা একটু খারাপ ছিল, শৈলেন আজ আফিসে যায় নাই, বাড়িতে বসিয়াই দিনের কাজগুলা আস্তে আস্তে শেষ করিয়া যাইতেছে। হঠাৎ টেবিলের উপর টেলিফোনটা বাজিয়া উঠিল। রিসিভারটা তুলিতে খবর পাওয়া গেল একটা ট্রাঙ্ক কল আসিয়াছে। কনেক্‌শন দিল।

শশাঙ্ক দ্বারভাঙ্গা থেকে কথা কহিতেছেন। বাবার অসুখ, চিন্তার কারণ নাই, তবে শৈলেন যেন শীঘ্র চলিয়া আসে। তিন মিনিটের মেয়াদ, আরও দু'-একটা এদিক-ওদিক কথা কহিতে সময়টা শেষ হইয়া গেল।

একটু ভুল হইয়া গেল। শশাঙ্কর উদ্দেশ্য এইটুকুই ছিল, শৈলেন যেন অতিরিক্ত চঞ্চল না হইয়া পড়ে। শৈলেন কিন্তু সংবাদটা তাঁহার বলা মতোই গ্রহণ করিল, শরীরটাও ছিল খারাপ, রাত্রে একটা গাড়ি ছিল, সে গাড়িতে আর গেল না।

পরদিন দুপুরে আবার একটা কল্। বোকার মতো খবরটা যথাযথ ভাবেই লওয়ায় বিরক্ত হইয়াছেন শশাঙ্ক; বাবার অসুখটা খারাপই, শৈলেন যেন তাড়াতাড়ি চলিয়া আসে।

বৈকালেই একটা গাড়ি। যেমন ছিল সব ফেলিয়া ছড়াইয়া শৈলেন যাত্রা করিল। মনে উদ্বেগের সঙ্গে অপরাধের গ্লানি লাগিয়া রহিয়াছে। কি দেখিবে গিয়া?—দেখিতে পাইবে কি?…কেন এমন ভুলটা হঠাৎ হইয়া গেল এমন করিয়া? বাবা আজ দুপুর পর্যন্ত ছিলেন—যাইলে দেখা হইতই, এখন তো সবই অনিশ্চিত।…

আর মা?—দু'জনকেই হারাইতে বসিল না কি শৈলেন? দাদার আঘাতের সময় মায়ের মুখে যে উৎকট উদ্বেগ আর আশঙ্কা দেখিয়াছিল শৈলেন সেটা তো মৃত্যুর কাছাকাছিই একটা ব্যাপার; আর বয়স হইয়াছে মা'র, আরও দুর্বল—সে দুর্বলতার মধ্যেও আছে তাহারই অপরাধ…মা সহিতে পারিবেন না, তাঁহাকেও হারাইতে হইবে; ভগবান দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করাইবার জন্যই কি এই ভুলটুকু করাইলেন?

রাত্রি বারোটার সময় শৈলেন আসিয়া ষ্টেশনে নামিল। বাড়ি পর্যন্ত পথটা যেন পৃথিবীর এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত পড়িয়া আছে সুদীর্ঘ, ক্লান্তিতে ভরা, অথচ এ-ও সাহস হয় না যে এক কথাতেই গিয়া পৌঁছাইয়া যাই।…কী দেখিতে হইবে?

বাড়ি একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া আছে। বাবার ঘরের একটা দরজা বাহিরের দিকে: সেটা খোলা রহিয়াছে। শৈলেন ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। বাবা বিছানার মাঝখানে চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন, পাশে মা আছেন বসিয়া। পা দুইটি ছড়ানো। বোধ হয় দুই-তিন দিন আগে আলতা পরিয়াছিলেন, হালকা রাঙা দাগ লাগিয়া আছে।

শুধু সুস্থ দেখাই নয়, দুই জনের সংস্থানের মধ্যে এমন অনির্বচনীয় কিছু একটা ছিল যাহার জন্য শৈলেন প্রণাম ভুলিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল,—যেন একটি পৌরাণিক উপাখ্যান মূর্তি ধরিয়া রহিয়াছে সামনে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের বিলম্ব; তাহার পর প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতে বিপিনবিহারী প্রশ্ন করিলেন—"ভালো ছিলে তো?"

"আজ্ঞে হ্যা"—বলিয়া শৈলেন মা'র মুখের পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল। গিরিবালা বলিলেন—"এখন অনেকটা সামলেছেন, তবে হয়েছিল ভয়ানক; দু'টো দিন আর দু'টো রাত যে কি ভাবে কেটেছে, বুকের আর পিঠের যন্ত্রণায় ক্রমাগত ছটফট করেছেন, উঠে স্বস্তি নেই, শুয়ে স্বস্তি নেই, বসে স্বস্তি নেই, দাঁড়িয়ে যেন দেখা যায় না—এমন কাৎরানি—বাবাঃ, ঢের অসুখ দেখেছি, এ রকম যন্ত্রণার অসুখ দেখিনি…"

বিপিনবিহারী বলিলেন—"অতিরিক্ত ভয় পেয়ে গেছে এরা শৈলেন।"

গিরিবালা বলিলেন—"তুমি চুপ করো বাপু, ভয় পেয়ে গেছে সাধে! সে যদি দেখতিস শৈল, ডাক্তারের পর্যন্ত ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছল। এখন তো সামলেছেন অনেকটা। আজ দুপুরের পর থেকে, সকাল পর্যন্ত যে কি অবস্থা গেছে, মনে হলে জ্ঞান থাকে না। কী যে হবে, আমি তো ভেবে কূল পাচ্ছি না শৈল…"

শৈলেন মা'র পানে চাহিয়া আছে, এক অদ্ভুত দৃশ্য, একেবারে অপ্রত্যাশিত বলিয়া আরও অদ্ভুত বোধ হইতেছে,—মা খুব শুকাইয়া গেছেন, চোখে-মুখে রাজ্যের শ্রান্তি; দু'দিন দু'রাত এক মুহূর্তের জন্য চক্ষু বোজেন নাই, সমস্ত ঝড়টার মধ্যে সাধ্যমতো যে নিজেকেই আগাইয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, এর চিহ্ন সমস্ত শরীরে সুস্পষ্ট। কিন্তু এই বিশুষ্কতা—বিশৃঙ্খলার পাশেই আরও একটা জিনিস আছে যাহাতে মনে হয় মা যেন তপস্যা হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন—সিদ্ধি একেবারে হাতে লইয়া। দাদার আঘাতের সময়ও মাকে দেখিয়াছিল, আজও দেখিতেছে—কত তফাৎ সে যেন হিসাব হয় না। সে উদ্বেগ, সে আশঙ্কার চিহ্নমাত্র নাই, ক্লান্তির সঙ্গে ওতপ্রোত হইয়া আছে একটি গাঢ় শান্তি; ভয়ের ভাষাতেই অবস্থাটা বর্ণনা করিয়া যাইতেছেন, কিন্তু কণ্ঠস্বরে আছে একটি গভীর নিশ্চিন্ততার সুর। মুখে বলিতেছেন—আমি তো ভেবে কূল পাচ্ছি না শৈল; কিন্তু বেশ বোঝা যায় কূলের রেখা তাঁর দৃষ্টিতে খুব স্পষ্টই একেবারে।

বাড়ির ভিতরে আরও কয়েক জন জাগিয়া তখনও, ছোট ভাই খোকা, ডাক্তার, ওষুধ লইয়া আসিল, শৈলেন আসিয়াছে শুনিয়া শশাঙ্ক আসিলেন। ঘরেই একটু গল্প-স্বল্প করার পর বলিলেন—"ভেতরে চল, খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিক্।"

ভিতরে আসিয়া শৈলেন সমস্ত ইতিহাসটা ভালো করিয়া শুনিল। শক্তিমান লোক নিজের শক্তিমত্তার অতিরিক্ত বিশ্বাসে এক এক সময়

যে বিপদ আনিয়া ফেলে এ-ও হইয়াছে তাই। ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে কিছু জমি আছে, রেলে করিয়া যাইতে হয়। পাণ্ডুল থেকেই জমির উপর টান, ছেলেদের মানা সত্ত্বেও বিপিনবিহারী নিজে গিয়া দেখা-শুনা করেন। এবার ট্রেণ ধরিবার সময় বিলম্ব হইয়া যাওয়ায় বাড়ির গাড়ি হইতে নামিয়া প্ল্যাটফর্ম আর পুলের উপর দিয়া খানিকটা ছুটাছুটি করেন। সেখানে গিয়া পিঠে একটা বেদনা ওঠে, এবং বুক পর্য্যন্ত চারাইয়া পড়ে। স্থানীয় ডিষ্টি ক্ট বোর্ডের ডাক্তারকে না দেখাইয়া বিপিনবিহারী জমির মুন্সিকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া আসেন। ওদিককার মেঠো রাস্তা, তার পর রেলগাড়ি, পরে ঘোড়ার গাড়ি —সমস্ত ধকোলটা অসুস্থ শরীরের উপর বহিয়া বিপিনবিহারী যখন বাড়ি পৌঁছিলেন তখন রোগ একেবারে পূর্ণমাত্রায়।

শশাঙ্ক বলিলেন—"ডাক্তারবা হাল ছেড়ে দিয়েই চিকিৎসা আরম্ভ করলে শৈল,—থ্‌রম্‌বসিস অব দি হার্ট—বাঁচে খুবই কম, এ বয়সে তো নয় বললেই চলে—তায় যে ভাবে আরম্ভ হয়েছে আর যে ষ্টেজে চিকিৎসা সুরু হয়েছে···দু'টো দিন আর দুটো রাত যে কি ভাবে কেটেছে!···তুই পরের গাড়িতেই না এসে ভুল করেছিলি নিশ্চয়, কিন্তু সামলে যখন গেছে এখন মনে হচ্ছে না এসে ভালোই হয়েছিল—বাবার সে বিশ্রী ছটফটানি চোখে দেখতে হয়নি।"

তাহার স্মৃতিতেই যেন শশাঙ্ক কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শৈলেন প্রশ্ন করিল—"এখন ডাক্তারবা কি বলছেন, বিপদটা কেটে গেছে?"

"অতটা ভরসা দেন না, বয়সটা তো খারাপই। তবে আমি এ সব ব্যাপারে লক্ষণটা আবার অন্য জায়গাতেও খুঁজি···তুই মা'র মুখের চেহারাটা লক্ষ্য করেছিস্?"

শৈলেন দৃষ্টি তুলিয়া একটু হাসিল, বলিল—"করেছি দাদা, অথচ তুমি যখন ভূমিকম্পে চোট খেয়ে পড়েছিলে, কি আতঙ্ক মা'র চোখে!···"

"ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে মা বড় দুর্বল শৈল, স্বভাবটাই ঐ রকম ওঁর,—একটু কিছু হোলে তাই যেন ভেঙে পড়েন, কিন্তু বাবার সম্বন্ধে ওঁর অদ্ভুত একটা শক্তি আছে যেন। আমি এমনই একটু আশাবাদী, জানিসই, তায় এই মায়েরই ছেলে তো, ওঁর এই অদ্ভুত নিশ্চিন্দি ভাব দেখে সত্যিই মনে হচ্ছে বিপদ যেন কাটিয়ে উঠেছি আমরা।

হয়তো এ সবই কল্পনা মাত্র,—মা লইয়া ছেলের তো থাকেই গুমর—গিরিবালার ছেলের তো আরও বেশি করিয়াই থাকিবার কথা, নয়তো পরমায়ু কি এতই দেওয়া-নেওয়ার জিনিস? গিরিবালার যে প্রশান্তি, যে নিঃসংশয় নিশ্চিন্ততা সেটা হয়তো ওঁর জীবনেরই সহজ পরিণতি, যিনি সব দিয়াছেন তাঁহার উপর অটল বিশ্বাসেরই একটা দিক,—যদি ফিরাইয়াই লন তিনি আবার সব তো করিবারই বা আছে কি? প্রসন্ন মনেই তাঁহার এই বঞ্চনাকেও মাথা পাতিয়া লওয়া ভিন্ন উপায় কি আছে আর?

শৈলেন ভাবে এ কথা: যুগটাই যে এই রকম—জ্ঞানের আলোয় পদে-পদেই বিজ্ঞানের সংশয়-ছায়া আসিয়া পড়িতেছে,—সম্ভব ছিল কি সাবিত্রীর তপস্যা? মৃত্যুর অসপত্ন অধিকারের মধ্যে মানুষ তার চিন্তা, কল্পনা, আশা লইয়া এমন ভাবে কি পারে বিপর্যয় ঘটাইতে? প্রশ্নের মীমাংসা হয় না, তবে তা'তে শৈলেনের গর্ব্বের এতটুকু হয় না লাঘব,—ঐ যে অটল বিশ্বাসের প্রশান্তি, সে-ও তো একটা তপস্যাই—তার মায়েরই···এই বিশ্বাসই কি আরও বড় তপস্যাই নয়?

কিন্তু বিশ্বাসের তপস্যাই হোক বা আয়াসের তপস্যাই হোক, গিরিবালাকে তাহার মূল্য চুকাইয়া দিতে হইল। বিপদ কাটিল, কিন্তু সময় লইল এবং এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গিরিবালার স্বাস্থ্য ভিতরে ভিতরে ভাঙিয়া পড়িল।

বাহিরটা কিন্তু ক্রমেই হইয়া উঠিতে লাগিল আরও প্রশান্ত আরও প্রসন্ন, আরও উজ্জ্বল।···এ তো হয়ই—ইন্ধন যত আসে দগ্ধ হইয়া শিখার উজ্জ্বলতা তো ততই আরো বাড়ে।

৫

বিপিনবিহারী অসুখে পড়িয়াছিলেন আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি, ভাদ্রের শেষের দিকে এক দিন ডাক্তারেরা বলিলেন, আর ভাবনার তেমন কিছু নাই।

গিরিবালা পূজা করিতেছিলেন, আসিলে বিপিনবিহারী হাসিয়া বলিলেন—"এবার আমার ছুটি, ডাক্তারবা বাইরে ঘুরে-টুরে বেড়াবার হুকুম দিয়ে গেল।" একটু থামিয়া বলিলেন—"তোমারও ছুটি··· বড্ড ভুগলে দু'টো মাস ধরে···"

গিরিবালা একটু হাসিয়া স্বামীর মুখের ওপর দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন—"দিলে তো ছুটি নিজের মুখে?"

বিপিনবিহারীর হাসিটা সঙ্গে-সঙ্গেই মলিন হইয়া যাইতে গিরিবালার হুঁস হইল। কথাটা যেন অতর্কিতেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেছে—শেষ বয়সে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে আগে যাওয়া লইয়া হয় রহস্য —হয়তো সেই অভ্যাসেই। তবুও ঠিক এই সময়টিতে বলিবার কথা নয় যেন। চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া হাসিয়াই বলিলেন—"ঘোরাঘুরি কিন্তু বুঝে করতে হবে। নিজের ভোগান্তির কথা এত শীগগির ভুললে চলবে না। আমায় আর কতটুকু ভুগতে হয়েছে?"

আরও অন্য কথা আনিয়া ফেলিলেন—ঐ দু'টি কথা কিন্তু সমস্ত দিন থাকিয়া থাকিয়া বিঁধিতে লাগিল মনে—নূতন কথা নয়, কিন্তু কিন্তু কেমন যেন বেমানান হইয়া গেছে।

আশ্বিন আসিয়া পড়িল। এবারে বর্ষাটা ছিল প্রবল—শুধু আকাশেই নয়, মনেও, তাই আশ্বিনটা লাগিতেছে বড় মিষ্ট। আরও একটা কারণ আছে, বিপিনবিহারীর অসুখের উপলক্ষে পূজার ছুটির সঙ্গে কিছু বেশি ছুটি লইয়া, বাহিরে যে ছেলেরা আছে কিছু দিন আগেই আসিয়া পড়িয়াছে। মেয়েদের আসা নিয়মিত নয়, এবারে তাহারাও আসিয়াছে, এমন কি নাতনিদের লইয়া নাৎজামাইয়েরাও; আত্মীয়দের মধ্যেও কেহ কেহ আসিবে চিঠি দিয়াছে।···একটা বড় কঠিন অসুখ হইতে তো উঠিলেন বিপিনবিহারী, নূতন করিয়া একবার দেখিবার আগ্রহ জাগিয়াছে সবার মনে। বহু দিন পরে সংসারটি পরিপূর্ণতায় যেন নিটোল হইয়া উঠিয়াছে। আরও পূর্ণ বরং আগের চেয়ে,—সবারই তো এখন নিজের নিজের সংসার—শাখায় শাখায় প্রশাখা,—প্রশাখায় পল্লব···

ছোটরাই থাকে সর্ব্বক্ষণ ঘিরিয়া। তাহাদের গল্পের চাহিদা মিটাইয়া যেটুকু সময় বাঁচে সেটুকু পূজা, সংসার, ছেলেমেয়ে আর বিপিনবিহারীর মধ্যে ভাগাভাগি হয়।···ছেলেরা একটু বেশি আব্দার করিবার চেষ্টা করে—বিশেষ করিয়া যে কয় জনের বাহিরে বাহিরেই

কাটিতেছে। বলে—"গল্প তোমার ফুরোয় না মা?—ঝুলিতে যা আছে ঝেড়ে দিয়ে হঠাৎ না ওদেব।···নতুন আরব্যোপন্যাস ফেঁদেছ না কি?"

চলতি গল্পের ঝুলি অনেক দিনই খালি হইয়াছে, গিরিবালা এখন অবলম্বন করিয়াছেন নিজের জীবনকে। আরব্যোপন্যাসই বটে; জীবনের এ-প্রান্ত থেকে কি অপরূপই যে লাগে ও-প্রান্তের ছবিগুলি—যেখানটা হাসির আলো, আলোয় যেন ঝলমল করিতেছে; যেখানটা বিষাদের ছায়া, কি অপরূপই যে তার স্নিগ্ধতা!···গল্প বলিয়া চলেন—বেলেতেজপুরের—কামিনী গাছের তলা—সিংহবাহিনীর উৎসব-মুখরিত প্রাঙ্গণ; সিমুর—সাঁতরার গঙ্গার সেই প্রথম দিনের রূপ, জীবনে যাহা কেমন করিয়া চির নূতনই রহিয়া গেল; পাণ্ডুলের অবরোধ আর তার বাইরের মুক্ত জীবনের স্বপ্ন: এই দ্বারভাঙ্গারই পুরানো ইতিহাস—যেদিন অশ্রুজলের সঙ্গে প্রথম আসিলেন, তার পরে···

চুপ করিয়া সবাই শোনে, নাতি-নাতনিদের মধ্যে যারা হয় তো একটু বেশি ভাবুক হাঁ করিয়া মুখের পানে চাহিয়া থাকে—এত প্রত্যক্ষ—এই 'গিন্নি', ঐ দাদু, ঐ বাবা-মা-কাকারা এদের ঘিরিয়া এত রূপ—কথা!···গল্প শেষ হয় না—আরব্য উপন্যাসের মতোই পাবে-পাবে শৃঙ্খল যায় বাড়িয়া; অনেক শ্রোতা, বিপুল তাদের কৌতূহল—প্রশ্ন ওঠে, মূল গল্প পায় বাধা, নস্তি থেকে গিয়া পড়ে ভুলারমনে, ভুলারমন থেকে হয় তো পালের মতো মোটা খসখসে শাড়ি-পরা খঞ্জনী, খঞ্জনী থেকে ময়লা ছেঁড়া কাপড়ে ভুলালের বৌ!···একটি অপরূপ আনন্দে—বিষাদে নাতি-নাতনিদের সঙ্গে সমস্ত জীবনটি যেন ঘুরিয়া বেড়ান গিরিবালা—যত গোড়ার দিকের স্মৃতি ততই যেন আরও মিষ্ট: যত মধু সব ফুলের কেন্দ্রটিতেই জমা।

পূজা আসিয়া পড়িল। এমন পূজা গিরিবালার জীবনে আসে নাই, নিজের বলিতে যে যেখানে আছে সবাইকে মা দিয়াছেন আনিয়া—নিজে যেমন করিয়া সবাইকে লইয়া আসেন। কৃতজ্ঞতায় মনটা যায় ভরিয়া—তাহার মধ্যেই এক একবার হঠাৎ বিষাদের রেখাপাত হয়—খুব অস্পষ্ট, ঠিক বোঝা যায় না: বিষাদের কোন কারণ নাই বলিয়া গিরিবালা চেষ্টাও করেন না বুঝিবার।···শরীরটা দু'দিন থেকে একটু যেন খারাপ যাইতেছে—খুব সামান্য একটু—হয় তো সেই জন্যই।

সহরে পূজা হয় কয়েক জায়গায়, বাঙালীর মেয়েরা তিন জায়গায় যায় মূর্তি দেখিতে—বারোয়ারী, নদীর তীরে কালীস্থান আর বড়বাজারে এক বাঙালীর বাড়ির পূজায়। শরীরকে খুব আমল দিলেন না গিরিবালা—সময়ের পরিবর্তনে পূজার সময় হয়ই একটু। তবে কাল মহাষ্টমী, উপোসের ব্যাপার আছে, স্নান করিয়া নিকটে বারোয়ারি-তলা হইতেই প্রতিমা দেখিয়া অঞ্জলি দিয়া আসিলেন। শরীরটা ভালো হইল কি আর একটু খারাপই, চেষ্টা করিয়াই সে খোঁজটা যেন এড়াইয়া গেলেন। ভরা বাড়িতে বাড়িভরা আনন্দের হট্টগোল, একটি প্রসন্ন, স্মিত হাস্যে তাহারই মধ্যে রহিলেন মিশিয়া, অষ্টমীর দিন ভালো করিয়াই স্নান করিলেন, তাহার পর গাড়ি আনাইয়া গেলেন কালীস্থান। অন্যান্য বার যে তৈয়ার রহিল তাহাকেই সঙ্গে লইয়া চলিয়া যান; এবারে সব কিছুতেই কেমন একটা পূর্ণতার আবেগ আসিয়াছে, নিজেই তাগাদা দিয়া বধূদের, মেয়ে দু'টিকে এবং বড় নাতনিদের স্নান করাইলেন, তাহার পর তাহারা প্রস্তুত হইলে সবাইকে লইয়া যাত্রা করিলেন।

কালীস্থান, বড়বাজার, বারোয়ারিতলা হইয়া ফিরিতে প্রায় বৈকাল গড়াইয়া গেল। কাপড় বদলাইয়া গিরিবালা বারান্দায় পাতা একটা বেঞ্চে বসিয়া আছেন, উঠানে কাদের ছুটাছুটি আরম্ভ হইয়া গেছে, শৈলেন আসিয়া পাশে বসিল। দু'-একটা কথার পর মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"মুখটা বেশি যেন শুকনো মা তোমার!···"

"উপোস করে আছি তো!···ঘুরেও এলাম এই।"

"করেছ তো উপোস!···আর তোমার এ সব চলে না মা; কত বার বারণ করেছি সবাই। খেয়ে নাও তুমি।"

"এইটুকুর জন্যে আবার খাবো? আরতিটা দেখে একেবারে—"

একটা কেমন সন্দেহ হওয়ায় শৈলেন কপালে হাত দিল, তাহার পরই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"মা তোমার গা গরম!—এ কি, কচি মেয়ের মতন জ্বর লুকিয়েছ কেন মা?"

প্রবীণ এক দিক দিয়া হইয়াই পড়ে কচি; অবুঝ কচি মেয়েরই মতো গিরিবালা অনেকখানি অপ্রসন্নতার সঙ্গেই গিয়া বিছানায় শুইলেন—সবাই যেন জোর করিয়া তাঁহাকে এত সঙ্গীর মধ্যে পূজার এমন আনন্দ থেকে বঞ্চিত করিল।···একটি ছায়া পড়িল বাড়িতে, তবে ছেলেপুলের বাড়ি, একটা চাঞ্চল্য রহিলই জাগিয়া।

এদিকে মাঝে-মাঝে কয়েক বার হইয়াছেও বাতিকের জ্বর, একেবারে চরম কিছুর আশঙ্কা জাগিল না মনে। সে রকম কিছু লক্ষণও দেখা দিল না। নবমীর রাত্রি পর্য্যন্ত সাধারণ চিকিৎসাতেই জ্বরটা রহিল এক ভাবে আটকাইয়া। কিছু যে হয় নাই উৎসবের বাড়িতে সেই ভাবটা বজায় রাখিবার জন্যই যেন নাতি-নাতনিদের বেশি করিয়া ডাকিয়া গল্প করিলেন।···প্রবঞ্চনা দিয়া নিজেকে লুকাইয়া সংসার করাই তো অভ্যাস; অসুখ শরীরে খালি-পেটে পান চিবাইয়া এক দিন তো স্বামীকে করিয়াছিলেন বঞ্চিত, পুত্রকেও চাহিয়াছিলেন বঞ্চিত করিতে।

দশমীর দিন আর বঞ্চনা চলিল না: বাড়াবাড়ি হইল, ডাক্তার শুষ্ক মুখে বলিলেন—ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া—ব্রেন অ্যাফেক্ট করতে পারে যে কোন সময়েই।

বিজয়ার রাত্রি বলিয়াই সবার মুখ যেন শুকাইয়া গেল; একটা অন্ধ ভয়—গিরিবালার বিদায় হওয়ারই যে রাত্রি এটা।

কিন্তু অপূর্ণতা জীবনে কোনখানেই ছিল না, আজও রহিল না; সজ্ঞানেই স্বামীর বিজয়ায় পদধূলি লইলেন গিরিবালা, সজ্ঞানেই সবাইকে বিজয়ার পদধূলি দিলেন।

পর দিন সকাল হইতেই চৈতন্য লোপ পাইল। আশা তবু ধরিয়াই রহিল সবাই, বিজয়া যখন কাটিয়া গেছে তখন আর ভয় নাই নিশ্চয়।···সন্তানদের উপর আশার শেষ আশীর্বাদটুকুও দু'দিন ধরিয়া বিতরণ করিয়া, ত্রয়োদশীর দিন সকালে গিরিবালা জীবনের শেষ নিশ্বাস মোচন করিলেন।

সমাপ্ত

গোপাল ভাঁড়

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

ও

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বালক গোপালকে কৃষ্ণনগরে লইয়া গিয়াছিলেন গোপালের মনোহর রূপ ও প্রতিভা দেখিয়া। মহারাজের আশ্রয়ে থাকিয়া বাণী-সাধনায় তিনি সিদ্ধ সাধক হইতে পারিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে কোনো প্রামাণ্য কাহিনী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে সৎসঙ্গ লাভে তাঁহার যে বিশেষ উপকার হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দিহান হইবার অবকাশ নাই। তখনকার দিনে সংস্কৃত ও ফারসী শেখা ছিল দেশের ও দশের চাল। গোপালের রচনা-পদ্ধতি দেখিয়া নিঃসন্দেহে মনে করিতে পারা যায়, এ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হন নাই তিনি। দ্ব্যর্থক শব্দ প্রয়োগে গোপালের ছিল অসাধারণ শক্তি। Shakesp care এর punning যে প্রণালীর, সে প্রণালী ও সে কৌশল Shakespeare না পড়িয়াও গোপাল স্থান-কাল-পাত্র ভেদে প্রয়োগ করিতে পারিতেন এবং তাহা করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মনস্তুষ্টি করিতেন এবং রঙ্গ-কৌতুক ও হাসির পাগলা ঝোরা সৃষ্টি করিতেন—এমন প্রমাণের অভাব নাই। এই পাগলা ঝোরাই মহারাজকে আকর্ষণ করিয়াছিল খুব বেশী। কৌতুকানন্দ দান গোপালের ছিল সহজ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের প্রভাব, অপরূপ নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং চক্ষু ও মুখাবয়বের প্রয়োজন মত ভাব-প্রকাশ মুগ্ধ করিত জনসাধারণকে। রাজ-প্রাসাদের অসূর্য্যম্পশ্যা মহিলাবৃন্দও গোপালের রসাত্মক বাক্য শ্রবণানন্তর কৌতুকানন্দ অনুভব করিতেন বলিয়া শুনা যায়। মোট কথা, Table talk গোপাল করিতে পারিতেন খুব ভালই। মস্করায় তিনি ছিলেন সাধনা-সিদ্ধ। অভিজ্ঞতা, দূরদৃষ্টি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, কথা বলিবার ভঙ্গী এই মস্করাকে দিত এমন রূপ, যাহা মানুষকে করিত বিহ্বল—বিস্ময়মুগ্ধ; মানুষের হৃদয়-তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হইত আনন্দের সুর।

রঙ্গ-ব্যঙ্গ করিবার কালে গোপাল যে প্রকার অঙ্গভঙ্গী ও চোখ-মুখের ভাব করিতেন, তাহা অসাধারণ রকমের হাস্যরসাত্মক; তাহা দেখিয়া কাহারও না হাসিয়া তিষ্ঠিবার উপায় থাকিত না। গোপালের anatomy জানা ছিল কি না বলা কঠিন; কিন্তু শিরা ও মাংসপেশী যে তিনি ইচ্ছামত আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিয়া মনোভাব প্রকাশে তাল রাখিতে সমর্থ হইতেন, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। সোজা কথা, তিনি শুধুই রসরাজ ছিলেন না, সুদক্ষ অভিনেতাও ছিলেন। ব্যক্তিত্বও ছিল তাঁহার অসামান্য। এই ব্যক্তিত্বেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পঞ্চরত্ন সভায় তিনি সাদরে স্থান পাইয়াছিলেন এবং সে স্থান সগৌরবে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন সুন্দরের পূজারী। সেই পূজায় গোপালের ছিল আপ্রাণ সহায়তা। কূটনীতিতেও বিশারদী বুদ্ধি গোপালের অল্প ছিল না। মহারাজা ঠেকায় পড়িলে গোপাল সে বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া হৃদয়বান্ প্রভুকে রক্ষা করিতেন চক্রীদের কবল হইতে। এমন গুণের গুণমণি বলিয়াই গোপাল হইয়াছিলেন মহারাজার পরম প্রিয়পাত্র। গোপাল নহিলে মহারাজার চলিত না একটি দিনও। এই কারণেই বোধ হয় গোপাল অজাতশত্রু ছিলেন না। তবে শত্রুকেও পারিতেন তিনি মিত্র করিতে। পরামাণিক গোপাল এই গুণেই রাজ-দরবারে পাইতেন উচ্চবর্ণের মর্য্যাদা, আর "নাই" পদবীতেও তিনি হইতে পারিয়াছিলেন দেশের চাঁই। স্মৃতির মাঝে জাগিয়া আছে এখনও তাঁহার নাম।

মুর্শিদাবাদ নবাব-দরবারে ও অন্যান্য অনেক স্থানেই তাঁহার যাতায়াত ছিল প্রভুর স্বার্থরক্ষায়। সকল স্থানেই তিনি আদর পাইতেন বুদ্ধি, ব্যবহার ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয়ে। প্রভুর মঙ্গলে অন্যের অসাধ্য ও দুঃসাধ্য কর্ম্ম ছিল গোপালের সহজসাধ্য। রামকিঙ্করের মত ছিল তাঁহার প্রভুভক্তি। প্রভুরও গোপালের প্রতি ছিল অপার্থিব প্রেম, প্রীতি ও দরদ। প্রীতি মূর্ত্ত হইয়াছিল উভয়ের হৃদয়ে। দাস-মনোবৃত্তির সেবা গোপালকেও করিতে হয় নাই আর প্রভুকেও লইতেও হয় নাই এই কারণে।

গোপাল ভাঁড়ের গল্প অনেক। বেশীর ভাগই কিন্তু প্রক্ষিপ্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষজ সতীশ ভায়ার tradition কথাটা এইখানে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গোপাল গোপালই আছেন অশরীরি হইয়াও। কীর্ত্তি মরিতে দেয় না কাহাকেই। ইচ্ছা করিলে সতীশ ভায়াও বাঁচিয়া থাকিতে পারেন—যত দিন চন্দ্র-সূর্য্য রহিবে আকাশে। তাই থাকুন তিনি—দশের আশিস্ লইয়া মাথায়।

একা

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

বুঝিবে না—বাতায়নে কত দীর্ঘ অসহ রজনী
একা বসি' বসি' হায় অসহায়ে পল পল গণি'
কাটিতে চাহে না আর; ঘুমঘোরে উদাস অবনী;
উদাস তুমিও। কেমনে জানিবে বল
সারা রাত্রি মেঘ বারি অশান্ত চঞ্চল
করে খেলা, বিফলে জাগায়
সুপ্ত মোর আশাটিরে হায়
বিথে আনে টানি'
মোর স্তব্ধ বাণী,
রাণী।

আঁখি
মুদে রাত, ডাকি'
যায় থাকি' থাকি'
ঝিল্লী দল, যায় দূরে মিশে
প্রতীক্ষার প্রতিটি নিমেষে
আলো-রেখা; এ জীবন একটি যামিনী
গভীর তিমিরময়, শিথিল কামিনী
ঝরে যায়, তারা ডোবে, বাদল কাজরী ওঠে মাতি'
ব্যাপিয়া আঁধার, মনে বোঝা-পড়া করি, ওগো সাথী,
তব সনে। কত পরে পূর্ণ হবে উপাসনা-রাতি?

মহাত্মাজীর ছেলেবেলা

জীবেন্দ্র সিংহরায়

আজ থেকে ছিয়াত্তর বছর আগে গুজরাটের পোরবন্দরে একটি ছোট্ট শিশুর জন্ম হয়। তার নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। সেই দিন জন্মলগ্নে কে যে তাকে বরণ করে নিয়েছিল জানা যায়নি, তবে মা পুতলী বাঈ তাকে নিজের বুকে জড়িয়ে নিতে দ্বিধাবোধ করেননি। মায়ের প্রাণ দিয়ে তিনি হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন— তাঁর ছোট্ট শিশুটিই এক দিন পৃথিবীর এক জন শ্রেষ্ঠ মহা-মানব হয়ে উঠবে। আজ আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—পুতলী বাঈয়ের সে দিনের ছোট্ট মোহন পরাধীন মানুষের মুক্তিদাতা মহাত্মা গান্ধী হয়ে দেখা দিয়েছেন।

মোহনের ছেলেবেলার ইতিহাস তেমন বিচিত্র নয়। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে সে সব চেয়ে ছোট। বিরাট যৌথ গান্ধী-পরিবারে আরো অনেক ছেলে-মেয়ে ছিল, তাই সেখানে মোহন তাদেরই মত অনেকের মধ্যে এক জন মাত্র। এমনি অবস্থায় তার ছেলেবেলা অফুরন্ত আমোদ ও আনন্দের মধ্য দিয়েই কাটেনি। তা'ছাড়া, গান্ধী-পরিবারের ইতিহাস বিলাসের সাক্ষ্য দেয় না কোন কালেই। চিরকাল তাঁরা পরম বৈষ্ণব। প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান, আদব-কায়দা, ধর্ম-কর্ম, চলাফেরায় সেখানে কোন দিন ত্রুটি দেখা যায়নি। এমনিতর রক্ষণশীল পরিবেশে সাধারণ ঘরের ছেলের মতই মোহনের ছেলেবেলার দিনগুলো কেটেছে।

বছর সাতেক বয়স পর্যন্ত মোহন বাবা-মায়ের সংগে পোরবন্দরেই ছিল। সেখানে ইস্কুলের শিক্ষা তাকে বিশেষ কিছু দেওয়া হয়নি। তবে তখন নামতা সে কতকটা শিখে ফেলেছিল, ছোটবেলায় মোহনের বুদ্ধি ছিল অনেকটা কাচা ও মোটা ধরণের। সেই অপরিণত বুদ্ধি নিয়ে তাকে অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে। সব চেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, দুষ্টু ছেলেদের অনুকরণে সে এই সময়ে মাষ্টার মশাইকে গাল দিতে শিখেছিল। অবশ্য সে জন্যে পরে তার অনুতাপও কম হয়নি।

মোহনের যখন সাত বছর বয়েস, তখন তার বাবা কাবা গান্ধী চাকুরী পেয়ে রাজকোট রাজ্যের দরবারে আসেন। এখানেই মোহনের প্রকৃত ইস্কুল-জীবনের শুরু। তার কাছে পাঠশালায় যাওয়াটা সত্যিকারের আনন্দের জিনিষ ছিল। পড়ার বিষয়ে তাই সে কোন দিন ফাঁকি দেয়নি। কিন্তু সমবয়সী ছেলেদের সংগে বসে বসে গল্প করাটা সে তেমন বরদাস্ত করতে পারতো না। ইস্কুলের শেষে অন্যান্য সবাই যখন বসে গল্প জুড়ে দিত কিংবা পথে পথে হৈ-চৈ করে বেড়াতো—মোহন তখন পালিয়ে আসতো বাড়ীতে। ছেলেবেলায় সে একটু বেশ লাজুক প্রকৃতির ছিল। তাই সমবয়সী ছেলেদের সংগে সে তেমন ভালো করে মিশতে পারতো না। আজের জননেতা মহাত্মাজীর ছেলেবেলার এই লাজুক ভাব তোমাদের কাছে খুব মজার ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে—না?

বার বছর বয়সে মোহন প্রথম হাই-ইস্কুলে এল। এই সময়ের একটা মজার ব্যাপার বলছি শোন। এক দিন শিক্ষা বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্‌টার সাহেব ইস্কুল দেখতে এলেন। মাষ্টার আর ছেলেদের বুক ঢিব-ঢিব করছে, না-জানি কোথায় কোন্ ভুল ধরা পড়ে। মোহনের ক্লাশে এসে তিনি কয়েকটা ইংরেজী বানান লিখতে দিলেন। এর মধ্যে একটি শব্দ ছিল কেট্‌ল (kettle)। মোহন তার বানান জানতো না। তাই সে শ্লেটে ভুল বানান লিখে ফেললো। মাষ্টার মশাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন ছেলেটা ভুল লিখছে। তাই তিনি জুতোর ডগা দিয়ে ইংগিত করলেন যাতে সে পাশের ছেলের শ্লেটটা একবার দেখে নেয়। কিন্তু উল্টো বুঝলি রাম! মোহন মনে করলো, ছেলেরা যাতে নকল না করে সে জন্যেই মাষ্টার মশায় পাহারা দিচ্ছেন। তাই পাশের ছেলের শ্লেটটা দেখে তার আর শুদ্ধ বানান লেখা হ'ল না। এই সাধারণ ঘটনাটির মধ্যে মোহনের অন্তরের কত বড় পরিচয় যে লুকিয়ে আছে—তা' তোমরা সহজেই বুঝতে পারো। আজ মহাত্মা গান্ধী জীবনের পরমতম লাভের বিনিময়েও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন না। সেদিনের ছোট্ট মোহনের মধ্যেও যে এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বীজ লুকিয়েছিল তার প্রমাণ এই ছোট্ট সাধারণ ঘটনাটি।

তোমরা হয়ত মনে করতে পারো, এর পর মাষ্টার মশাইর ওপর নিশ্চয় তার শ্রদ্ধা কমে গিয়েছিল। কিন্তু আসলে তা' নয়। কারণ গুরুজনদের দোষ খুঁজতে যাওয়া তার কাছে অপরাধ বলেই মনে হ'ত। যাঁরা বয়সে বড়, যাঁরা মাননীয়, তাঁদের আদেশ নির্বিচারে মেনে চলতে হয়। ছোটবেলা থেকেই মোহন বাবা-মায়ের কাছে এই শিক্ষা পেয়েছিল। তাই মাষ্টার মশাইর সেদিনের অন্যায়ে সে তাঁকে অশ্রদ্ধা করতে শেখেনি।

ছেলেবেলায় মোহনের ধর্ম-শিক্ষা হয়েছিল তার দাই রম্ভা বাঈয়ের কাছে। সে মোহনকে শিখিয়েছিল রাম-নাম নিলে ভূতের ভয় থাকে না। তাই মোহন তখন থেকে রাম-নাম জপ করতে শুরু করে। এই অভ্যেস তার বেশী দিন ছিল না বটে, কিন্তু যে ভক্তির বীজ তখন

অন্তরে প্রবেশ করেছিল—তা' সার্থক না হয়ে পারেনি। আজ রাম-নাম মহাত্মা গান্ধীর কাছে জীবনের মূলমন্ত্র। তাছাড়া, রামায়ণ মোহনের বরাবরই ভাল লাগতো। বছর তের বয়সের সময় সে একবার পরম ভক্ত বিশ্বেশ্বর লাধার মুখে রামায়ণের কথকতা শুনেছিল। তিনি পড়তে পড়তে নিজেই রসে বিভোর হয়ে যেতেন। তা' দেখে মোহনের খুব আনন্দ হ'ত। সেই যে তুলসীদাসের রামায়ণের প্রতি তার শ্রদ্ধা দেখা দিয়েছিল তা' আর কোন দিন ক্ষুণ্ণ হয়নি। সে ছেলেবেলায় অনেক বার ভাগবতের কথকতাও শুনেছে তখন কিন্তু তা' তেমন রসের বস্তু বলে তার কাছে মনে হতো না। হিন্দুধর্ম ও জৈনধর্মের প্রতিও মোহনের শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু খৃষ্টধর্মকে সে তেমন ভাল চোখে দেখতে পারেনি। কারণ ইস্কুলে সে পাদ্রী-দিগকে খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়ে অন্য ধর্মকে গালাগালি দিতে শুনেছে। তাতেই তার প্রতি মোহনের ভক্তি কমে যায়।

মোহন যখন রাজকোটে পড়ে, তখন সেখানে একটা যাত্রার দল এল। তাতে তার আনন্দ দেখে কে! ছেলেবেলা থেকে সে মায়ের কাছে শুনে এসেছে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা। এই করুণ কাহিনী শুনে কত দিন মোহনের বুক ভেঙে উঠেছে দীর্ঘশ্বাস, হয়ত নিজের অজানাতেই চোখের পাতা ভিজে গেছে বারে বারে। সত্য আর ত্যাগের মহান্ প্রতিমূর্তি হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান যাত্রায় দেখতে পাওয়ার অনুমতি পেয়ে মোহনের আনন্দে রাত্তিরে ঘুম আসে না। তার পর এল সত্যিকারের দেখবার দিন। যতই দেখছে মোহনের যেন আর আশ মিটছে না! নাটকটি হাজার বার দেখতে তার ইচ্ছে হত, কিন্তু তার সুযোগ কোথায়? অভিনয় দেখার পর থেকে মোহনের নিজেকেই রাজা হরিশ্চন্দ্র বলে মনে হত, যেন সে নিজেই দান করে ফেলেছে তার রাজ্য আর যা'-কিছু আছে। রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত হব এই সঙ্কল্পই যেন ক্রমে ক্রমে তার মনে দৃঢ় হয়ে উঠলো। শুধু রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীই নয়—রামায়ণ মহাভারত আর পুরাণের এমন আরও কত উপাখ্যান মোহনের ভাল লাগতো, প্রাণ ঢেলে সে শুনে যেতো সে-সব কাহিনী। তাই মনে হয়, মহাত্মাজী হয়ত ছেলেবেলায় শোনা রাম আর হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীর অনুপ্রেরণাতেই আজ মাতৃ-ভূমিকে 'রামরাজ্য'রূপে গড়ে তুলতে চান।

তের বছর বয়সে কস্তুর বাঈয়ের সাথে মোহনের বিয়ে হয়। এর আগে একে একে দু'টো মেয়ের সংগে তার বাক্‌দান হয়েছিল। তবে তারা দু'জনেই মারা যায়। বিয়ের সময় মোহন আর কস্তুর বাঈ উভয়েই প্রায় সমবয়সী ছিল। আলো-বাজনার রোশনাই, খাওয়া-দাওয়ার আড়ম্বর, আমোদ-ফূর্তির আয়োজন বিয়ের উৎসবে কম হয়নি, কিন্তু অত ছোট ছেলেমেয়েরা বিয়ের কি-ই বা বুঝে! তাই তারা একে অন্যকে প্রথম প্রথম ভয় করতো। কিন্তু ধীরে ধীরে পরিচয় গভীরতর হওয়ার সংগে সংগে মোহন আর কস্তুর বাঈ পরস্পরের অন্তরংগ হয়ে উঠলো।

কস্তুর বাঈ লেখা-পড়া কিছুই জানতো না। তাই ছেলেবেলা থেকে তাকে নিজের মনের মত করে শিক্ষিতা করে তোলার একটা অদম্য স্পৃহা মোহনকে পেয়ে বসেছিল। সে নিজে লেখাপড়া শিখছে অথচ কস্তুর বাঈ নিরক্ষর—এটা মোহনের খুব খারাপ লাগতো। তাই সে অবসর সময়ে তাকে লেখাপড়া শেখাবে বলে স্থির করলো। কিন্তু স্থির করলেই হয় না—তার সুযোগ কোথায়? গুজরাটে গুরুজনদের সামনে স্ত্রীকে পড়ানো দূরে থাকুক, কথা বলাই অন্যায়। তাই মোহনের মনের ইচ্ছা মনেই রয়ে গেল।

মোহনের ছেলেবেলায় একবার বিড়ি খাওয়ার খুব সখ হয়। পায়ের ওপর পা ঝুলিয়ে বিড়ির ধোঁয়া বের করা তার কাছে খুব মজার ব্যাপার বলে মনে হ'ল। মোহনের কাকা বিড়ি খেতেন। তাঁর খাওয়া হয়ে গেলে যেটুকু ফেলে দিতেন, তা কুড়িয়ে নিয়েই সে প্রথম প্রথম বিড়ি খেতে আরম্ভ করলো। কিন্তু দিনের মধ্যে ও-রকম বিড়ির টুক্‌রো আর কয়টাই বা পাওয়া যায় বলো? তাই সে চাকরদের পকেট থেকে দু'-একটা পয়সা চুরি করতে আরম্ভ করলো; কিন্তু তাতেও বেশি সুবিধে হ'ল না। এমন সময় জানা গেল কি-একটা লতার পাতা দিয়ে বেশ বিড়ি তৈরী করে খাওয়া যায়। মোহন তাই করলো। কিছু দিন পরে এ ভাবে কষ্ট করে বিড়ি খাওয়া তার কাছে অসহ্য বলে মনে হ'ল। এর পর আত্মহত্যার পথটা ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পেল না! তাই মোহন রামজীর মন্দিরে গিয়ে কয়েকটা ধুতুরার বীজ খেয়ে ফেললে। কিন্তু বেশি খাওয়ার সাহস হল না, পাছে সে মরে যায়। আসলে আত্মহত্যা করবে বলে যারা ভয় দেখায়, মরতে তারাই সব চেয়ে বেশি ভয় পায়! মোহনেরও তাই হয়েছিল। এর পরে বিড়ি খাওয়ার ইচ্ছে তার আর কোন দিন হয়নি। ছেলেবেলায় বদাভ্যাসে কত দূর নেমে যেতে হয়, এ ঘটনাটি তারই প্রমাণ।

ইস্কুলে মোহনের বেশ ভাল ছেলে বলে নাম-ডাক ছিল। তাই মাষ্টার মশাইরা তাকে ভালবাসতেন। তার চরিত্র সম্বন্ধেও তাঁদের কাছ থেকে কোন দিন অভিযোগ শোনা যায়নি। দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে পরীক্ষায় ভাল ফল করে মোহন পুরস্কার ও বৃত্তি পেয়েছিল।

অহঙ্কারী বলে মোহনের কোন দিন বদনাম ছিল না। সবাই তাকে ভালবাসে, সে ইস্কুলের পরীক্ষায় পুরস্কার পায়, এ জন্যে তার মনে কোন দিন অভিমান জাগেনি। বরং এতে মনে মনে সে একটু আশ্চর্য হয়ে যেত। কিন্তু নিজে দোষ করলে তার ভীষণ দুঃখ হত। সে জন্যে যদি তাকে শাস্তি দেওয়া হত, তবে সে কোন অভিযোগ করতো না। কিন্তু তার দুঃখ হত এই ভেবে যে, সে সত্যিই শাস্তির যোগ্য। তাই নিজের দোষ স্বীকার করতে মোহন কোন দিন কুণ্ঠিত হয়নি।

লেখাপড়া শেখার দিকে মোহনের সর্বদাই অটুট দৃষ্টি ছিল। প্রতিদিনের পড়া বেশ ভালো করে শিখে তবে সে ইস্কুলে যেত। তার কারণ, একে সে ক্লাশে ফাঁকি দিতে জানতো না, তার ওপর পড়া বা লেখার জন্যে মাষ্টার মশাই যখন গালি দিতেন তখন তার বুক ফেটে কান্না আসতো। সত্যিই ত, গালি দিলে কার না দুঃখ হয় বলো?

মোহনদের ইস্কুলে ব্যায়াম করা বাধ্যতামূলক ছিল। সে কিন্তু এটা মোটেই পছন্দ করতো না। তখন কেন জানি সে মনে করতো, বিদ্যাভ্যাসের সময় শারীরিক শিক্ষা না করলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আজের মহাত্মা গান্ধী সে কথা মনে করেন না। তিনি বলেন, মানসিক শিক্ষার সংগে সংগে ছেলে-মেয়েদের শারীরিক শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাঁর এ অমূল্য উপদেশ তোমরা জীবনে গ্রহণ করে নিও।

কিন্তু ব্যায়াম না করলেও খানিকটা শরীর-চর্চা মোহন ছেলেবেলা থেকেই করতো। এক দিন কি একটা বইয়ে সে পড়েছিল যে, খোলা হাওয়ায় বেড়ালে অনেক উপকার হয়। সেই থেকে সে নিয়মিত বিকেলে বেড়ানো অভ্যাস করে ফেলেছিল। বুড়ো বয়সেও মহাত্মার আজ সে অভ্যাস বজায় আছে।

মোহন তার বাবাকে যেমনি ভয় করতো, তেমনি ভালবাসতো। বাবাকে সেবা করতে পারলে তার যেন তৃপ্তির অন্ত থাকতো না। তাই প্রতি রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে মোহন তাঁর পা টিপে দিত। যতক্ষণ না তিনি শুতে যেতে বলতেন, ততক্ষণ তার কর্তব্য কাজে অবহেলা দেখা যায়নি। ইস্কুলের ছুটির পর অন্য ছেলেরা যখন খেলাধুলো করতো, মোহন তখন বাড়ি এসে তার বাবার সেবায় লেগে যেত, 'শ্রবণের পিতৃভক্তি' নামক নাটকে সে পড়েছিল—বাবা-মাকে ঝোলনার ভেতর করে শ্রবণ তীর্থস্থানে চলেছে। পিতৃসেবার এ আদর্শ মোহনের খুব ভাল লেগেছিল।

লেখাপড়া শিখতে গেলে হাতের লেখা ভালো হওয়ার প্রয়োজন নেই—এমনি একটা ধারণা মোহনের কি করে জানি গড়ে উঠেছিল। তাই হস্তাক্ষর ভালো করার জন্যে সে কোন দিন চেষ্টা করেনি! এই সামান্য ভুলের জন্যে মহাত্মা গান্ধীর হাতের লেখা এত খারাপ হয়ে গেছে যে, তিনি নিজেই তা' দেখে লজ্জা পান। তাঁর আজ মনে হয়, সুন্দর হস্তাক্ষর বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যক অংগ। এই জন্যে তাঁর মতে লিখতে শেখার আগে আঁকতে শেখা উচিত।

চতুর্থ শ্রেণীতে মোহনকে জ্যামিতি শেখানো হয়। কিন্তু অঙ্ক-শাস্ত্রটা তার মাথায় মোটেই ঢুকতো না। এ জন্যেই কখনও কখনও জ্যামিতি পড়া থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে তার আবার তৃতীয় মানে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হত। কিন্তু সেটা যে ভয়ানক লজ্জার ব্যাপার। অনেক কষ্টে যখন সে খানিকটা শিখে ফেললে তখন তার এক দিন হঠাৎ মনে হ'ল, জ্যামিতিই সবচেয়ে সোজা। তার পর থেকে অঙ্ক-শাস্ত্রটা মোহনের কাছে আর শক্ত ঠেকেনি। আর একটা বিষয় মোহনের শক্ত মনে হত—সে হল সংস্কৃত। কোন রকমে মুখস্থ করে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পার হয়ে এল। তার পর সোজা হবে বলে সংস্কৃত ছেড়ে ফারসী পড়তে গেল। তাতে সংস্কৃতের পণ্ডিত মশাই তাকে খুব বকুনি দিলেন। মাষ্টার মশায়ের অনুরোধে সে আবার সংস্কৃত ক্লাশে ফিরে এল এবং পরবর্তী কালে বেশ ভালোই সংস্কৃত শিখতে পেরেছিল। আসলে চেষ্টা করলে কি-না হয়!

মাংস খেলে গায়ের জোর হয় আর সেই গায়ের জোরেই ইংরেজরা এ দেশ শাসন করছে—এমনিতর একটা কথা মোহনকে তার কোন বন্ধু সর্বদাই বলতো। তাই তার প্রায়ই মাংস খাওয়ার সাধ হ'ত। কিন্তু প্রথম প্রথম তার সত্য-সন্ধানী বিবেক সায় দেয়নি। কিন্তু অবশেষে বুদ্ধির কাছে বিবেকের পরাজয় ঘটলো। মোহনের মাংস খাওয়ার দিন স্থির হয়ে গেল। পরম বৈষ্ণব বাবা শুনলে দুঃখ পাবেন—এই ভেবে গোপনেই সব বন্দোবস্ত করা হল। তার পর সত্যিকারের মাংস খাওয়ার দিন! মোহনের সে কি অবস্থা! এক দিকে চিরাচরিত সংস্কার, অন্য দিকে নোতুন জিনিষের দিকে লোভ। অবশেষে নদীর পারে এক নিরাপদ স্থানে গিয়ে জীবনে প্রথম মাংস নামক পদার্থটি মোহন খেয়ে ফেললো। কিন্তু সে রাত্তির কাটলো তার অনেক কষ্টে। স্বপ্ন যা দেখলো—তা' শুনে তোমরা হেসেই লুটোপুটি খাবে। মোহনের মনে হল, একটা জীবন্ত পাঁঠা যেন তার পেটে ঢুকে চীৎকার করছে! সে ভয় পেয়ে গেল। একবার ভাবলো আর মাংস খাবো না। কিন্তু আবার ভাবলো, ভয় পেলে চলবে না, মাংস খেয়ে গায়ের জোর বাড়াতে হবে। এমনি ভাবে এক বছরে সে পাঁচ-ছয় বার মাংস খেয়ে ফেললো। যেদিন মাংস খাওয়া হত, সেদিন বাড়ি গিয়ে সে বলতো 'খিদে নেই' কিংবা 'হজম হয়নি, খাব না।' একে ত মাংস খাওয়া, তার ওপর মায়ের কাছে মিথ্যে বলা। এই দুই অন্যায়ের জন্যে তার মন কিন্তু ব্যথিত হয়ে উঠেছিল। তাই এক দিন মোহন প্রতিজ্ঞা করলো—বাবা-মা বেঁচে থাকতে আর মাংস খাব না। জীবনে কোন দিন মহাত্মাজী সে প্রতিজ্ঞা ভাঙেননি।

মাংস খেতে গিয়ে মোহনের বড় ভাইয়ের প্রায় পঁচিশ টাকা ধার হয়েছিল। এ টাকা কি করে শোধ করা যায়—এটাই তখন একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। ভাইয়ের হাতে একটা ভালো সোনার তাগা ছিল, তাই তারা উভয়ে পরামর্শ করে স্থির করলো, সেটা থেকে এক তোলা সোনা কেটে নেবে। যথাসময়ে তাই করা হল এবং ধারও শোধ হয়ে গেল। কিন্তু এই চুরি করাটা মোহনের ভালো লাগলো না। তাই সে বাবাকে চিঠি লিখে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নেবে বলে স্থির করলো। তার কথা অনুসারে কাজ। বাবা গান্ধী তখন অসুস্থ ছিলেন। মোহন কাঁপতে কাঁপতে তাঁর হাতে চিঠিখানা দিয়ে পাশেই বসে পড়ল। তিনি চিঠি পড়লেন। পড়তে পড়তে চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে গেল। কিন্তু মোহনকে কিছু বললেন না। বোঝা গেল, নিজের দোষ স্বীকার করেছে বলে ছেলেকে তিনি ক্ষমা করেছেন। এর পর মোহন আর কোন দিন চুরির আশ্রয় নেয়নি।

এই সময়ে মোহনের বয়স বছর পনের হবে।

ওপারে

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

শাল আর মহুয়ার মাঠ ছাড়িয়ে
আঁকা-বাঁকা···উঁচু-নীচু পথ মাড়িয়ে
হেঁটে যদি চলে যাও তুমি ওপারে
সোনালী ধানের ক্ষেত পাবে দু'ধারে।
তাদের গন্ধে সেথা হাওয়া ভরপুর!
নীল আকাশের গায় ভরা রোদ্দুর:
মিষ্টি মধুর মত জল সেখানে:
সে গিয়েছে ওখানেতে, শুধু সে জানে।
ওখানে মাটির ঘরে চাষীর পাড়ার
কি নিবিড় স্নেহ-মাখা ভগিনী মাতার!
মাঠের ছেলেরা তোথা ভারী প্রাণ-খোলা
তাদের সরল কথা যায় না ভোলা:
তোমার সহরে-প্রাণে যে ব্যথা আছে,
ভুলে যাবে, যদি যাও ওদেরই কাছে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

এক

সুরমা সমুদ্র দেখেনি। এবারে পূজোর সময়ে সুরেশের কাছে ধর্ণা দিয়ে পড়ল, "দাদা, আমাকে সমুদ্র দেখাও।"

সুরেশ মাথা নেড়ে বললে, "এ-যাত্রায় হ'ল না বোন!"

"কেন?"

"পূজোর ছুটি পাব বটে, কিন্তু ছুটিতে কলকাতায় কাজও আছে। আমি বড়-জোর হপ্তাখানেক বাইরে থাকতে পারি। কিন্তু সমুদ্র দেখতে গেলে পুরীতে যেতে হয়। হপ্তাখানেকের জন্যে পুরীতে গিয়ে কি হবে? মজুরীতে পোষাবে না।"

সুরেশের বন্ধু দীপক সেখানে বসেছিল। সে বললে, "সমুদ্র দেখবার জন্যে উড়িয়া-মুল্লুকে ছুটতে হবে কেন?"

—"কারণ বাঙালীর পক্ষে সেইটেই হচ্ছে 'সর্ট-কাট্'!"

—"দেখ সুরেশ, আমরা প্রায়ই ভুলে যাই, সমুদ্রের স্পর্শ থেকে বাংলা দেশও বঞ্চিত নয়।'

—"হ্যাঁ দীপক, আমিও তা জানি। কিন্তু কাছাকাছির ভিতরে পুরীর মতন অন্য কোথাও যাত্রীদের থাকবার ব্যবস্থা নেই।"

দীপক বললে, "সুরমা, পুরীর চেয়ে ঢের কাছে তুমি সমুদ্রকে পেতে পারো।"

সুরমা সাগ্রহে বললে, "কোথায়, দীপুদা?"

—"কাঁথিতে। আমাদের দেশ কাঁথির কাছে।"

—"সেখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়?"

—"নিশ্চয়, নইলে আর বলছি কেন? আমরা এখন কলকাতার বাসিন্দা হয়েছি বটে, কিন্তু দেশের বাড়ীখানা আছে আমাদের পুরানো চাকর সনাতনের জিম্মায়। সুরেশ, দিন পাঁচ-ছয়েব ভিতরে যদি সুরমাকে নিয়ে সমুদ্র দেখে আবার কলকাতায় ফিরে আসতে চাও, তবে বাঁধো মোট, কেনো টিকিট, চল আমাদের দেশে! তোমাদের রাজভোগ দিতে পারব না বটে, তবে অনাহারেও থাকতে হবে না। কি বল? রাজি?"

হয়তো অদৃষ্টেরই কারচুপি। নারাজ হবার মত যুক্তি খুঁজে না পেয়ে সুরেশ বলতে বাধ্য হ'ল, "আচ্ছা, রাজি।"

—"তাহ'লে ষষ্ঠীর দিনই আমরা যাত্রা করব।"

—"হ্যাঁ। দশমীর পরেই আমাকে আবার কলকাতায় ফিরতে হবে। জরুরি কাজ।"

দুই

কিন্তু দশমীর পরেই সুরেশ ফিরতে পারলে না কলকাতায়। দেবতা সাধলেন বাদ।

সুরমার ভাগ্যে সমুদ্র-দর্শন হল—ভালো করেই হ'ল। সেই অনন্ত নীল সৌন্দর্য্যের দিকে প্রথমটা সে তাকিয়ে রইল অবাক-বিস্ময়ে। তার পর বাচ্চা মেয়ের মত সকৌতুকে হাসতে হাসতে নাচের তালে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল সাগর-সৈকতের বালুকা-শয্যার উপর দিয়ে।

সুরেশ বললে, "কলকাতার এত কাছে সমুদ্র, অথচ আমরা জেনেও জানি না। সমুদ্র দেখবার কথা উঠলেই পুরীর কথা মনে হয়।"

দীপক বললে, "এটা অভ্যাসের দোষ ভায়া। বাংলা দেশের কত জায়গা থেকেই সমুদ্রের নাগাল পাওয়া যায়। 'সমতট' বা দক্ষিণ-বাংলার বাসিন্দাদের তো সমুদ্রের ছেলে বললেও অত্যুক্তি হয় না। যুগে যুগে বাঙালী বাংলার সমুদ্র-পথ দিয়ে যাত্রা করেছে পৃথিবীর দিগবিদিকে। বাংলার প্রধান বন্দর তাম্রলিপ্তি বা তমলুক থেকে খৃষ্ট-পূর্ব্ব যুগেও শত শত জাহাজ যাত্রা করত সমুদ্রের ভিতরে। বাংলার বীর ছেলে বিজয়সিংহ আর চীনা পর্য্যটক ফা-হিয়ান তমলুক থেকেই সমুদ্র-যাত্রা করেছিলেন। আজও সমুদ্রগামী জাহাজে অগুন্তি বাঙালী নাবিক কাজ করে। সমুদ্রের সঙ্গে যে বাঙালীর নাড়ীর যোগ আছে!"

সুরমা বললে, "আমার মনে হচ্ছে দাদা, সমুদ্রকে দর্শন করাও যেন মস্ত-বড় একটা 'অ্যাডভেঞ্চার'! ও দীপুদা, একখানা নৌকো ভাড়া কর না!"

—"কেন?"

—"একবার সমুদ্রের বুকে ভাসতে ইচ্ছে করছে!"

সুরেশ ধমকে দিয়ে বললে, "না, না, অতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়! সমুদ্র কি পুকুর, না খাল? ঢেউয়ের ধাক্কায় দৈবগতিকে নৌকো যদি ডুবে যায় কি বানচাল হয়, তাহ'লে সখের 'অ্যাডভেঞ্চারে'র

মজাটা ভালো ক'রেই টের পাবি ! যত-সব ছেঁদো কথা ! 'অ্যাডভেঞ্চার' !"

*　　*　　*　　*

তা 'অ্যাডভেঞ্চারে'র মজাটা হাড়ে-হাড়ে টের পেতে সুরমাকে বেশী দিন অপেক্ষা করতে হ'ল না।

আকাশ ছেয়ে গেল কালো কালো মেঘে। মেঘের পরে মেঘ, মেঘের উপরে মেঘ। দেখতে দেখতে আরম্ভ হ'ল ধারাপাত। ক্রমে বৃষ্টির জোর বাড়তে লাগল। দিন গেল রাত এল, রাত গেল দিন এল, আবার দিনের পর এল রাত—তবু প্রবল বৃষ্টি ঝরছে অবিশ্রাম, ঝুপ ঝুপ ঝুপ ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলে ও স্থলে! তার সঙ্গিরূপে জাগ্রত হ'ল ঝোড়ো হাওয়া।

এমন বিস্ময়কর বৃষ্টি সুরমা আর কখনো দেখেনি। বাড়ী থেকে এক পা বেরুবার যো নেই। জান্‌লা দিয়ে বাইরে তাকালে কেবল দেখা যায় বৃষ্টিধারার চিকের ভিতর দিয়ে দূরের অস্পষ্ট সমুদ্র এবং দিকে দিকে ঝাপসা বন-জঙ্গল, আর শোনা যায় থেকে থেকে পাগলা ঝড়ের হাহাকার !

তার পর, আচম্বিতে এক ভয়ঙ্কর কোলাহল—তার মধ্যে যেন ডুবে গেল জল-স্থল-শূন্যের সমস্ত !

দীপক, সুরেশ ও সুরমা স্তম্ভিত নেত্রে দেখলে, সমুদ্র আকাশমুখো হয়ে লক্ষ লক্ষ সফেন তরঙ্গবাহু বিস্তার ক'রে লাফিয়ে উঠেছে উর্দ্ধে, উর্দ্ধে আরো উর্দ্ধে ! সর্ব্বাঙ্গ তার ক্রুদ্ধ হুঙ্কারময় !

পৃথিবীর বুকের উপরে মহা শব্দে ভেঙে প'ড়ে সেই বিপুল জলরাশি ধেয়ে এল উগ্র বেগে ! তার পর দিকে দিকে উঠল অগণ্য মনুষ্য ও জন্তুর কণ্ঠ থেকে আর্ত্তনাদ আর আর্ত্তনাদ আর আর্ত্তনাদ !

এ সেই চিরস্মরণীয় বন্যার আরম্ভ, যার কাহিনী শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সারা ভারতবর্ষ !

সুরমা অভিভূত কণ্ঠে বললে, "মনে হচ্ছে, এ যেন প্রলয়পয়োধিজল !"

দীপক ভয়ার্ত্ত স্বরে বললে, "এখন আর কাব্যি নয় সুরমা ! হ্যাঁ, এ হচ্ছে সাক্ষাৎ মৃত্যু-স্রোত ! সমুদ্রের বন্যা ছুটে আসছে পৃথিবীর মাটিকে গ্রাস করতে !"

অজস্র ধারায় ঝরছে আকাশ প্রপাত, হা হা হা হা অট্টহাসি হাসছে উদ্দাম ঝটিকা, তাণ্ডব নৃত্যে ছুটে আসছে বন্য বন্যার উত্তাল তরঙ্গ দল, কর্ণভেদী মর্ম্মভেদী মৃত্যু-ক্রন্দন তুলেছে অসংখ্য অসহায় মানব, হুড়মুড় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে শত শত ঘর-বাড়ী এবং বনস্পতি ! যেন পৃথিবীর অন্তিম কাল উপস্থিত !

তিন

আমরা বন্যার ইতিহাস লিখতে বসিনি, যেটুকু ইঙ্গিত দিলুম সেইটুকুই যথেষ্ট।

বন্যা যখন বিদায় নিলে চারি দিকে দেখা গেল এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্য, ভালো ক'রে যা বর্ণনা করতে গেলে ভাষাও বোবা হয়ে যায় ; সুতরাং সে অসম্ভব চেষ্টা করব না।

এইটুকু বললেই চলবে যে, কয়েক দিনব্যাপী ঝড়-বৃষ্টি-বন্যায় পর সূর্য্যদেব মেঘ সরিয়ে বাইরে এসে দেখলেন, এ অঞ্চলের অধিকাংশ ঘরবাড়ী একেবারে বিলুপ্ত কিংবা জলমগ্ন হয়েছে এবং অনেক জায়গায় গ্রাম বা জঙ্গল ডুবিয়ে থই-থই করছে অগাধ জলরাশি এবং তার উপরে দলে দলে ভাসছে গণনাতীত নরনারী ও অন্যান্য জীব-জন্তুর মৃতদেহ ! যে দিকে তাকাও, দৃষ্টিসীমা জুড়ে এই একই দৃশ্য !

দীপকদের এবং অন্যান্য কারুর কারুর বাড়ী ছিল উচ্চ ভূমির উপরে, তাই তারা কোন ক্রমে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে। কিন্তু দীপকদের বাড়ীও একেবারে অক্ষত ছিল না, তার পিছন দিকের যে-অংশটা ছিল বেশী পুরাতন তা অদৃশ্য হয়েছে। উঁচু জমির উপরে থাকলেও বাড়ীর একতলায় ঢুকেছে বেনো জল, সকলে তাই বাস করছে দোতলায়। কারুর একতলায় নামবার কোন

উপায়ই নেই। কিন্তু তবু তো তাদের বলতে হবে ভাগ্যবান, কারণ জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, কত লোক বাস করছে মুক্ত আকাশের তলায় জলমগ্ন ঘর-বাড়ীর ছাদের উপরে বা বনস্পতির শাখায় শাখায় এবং এই ভাবে হয়তো উপোস করেই তাদের যে কত দিন থাকতে হবে তা কেউ জানে না।

সুরেশ বললে, "দীপক, আমাদের যখন এখানে আসবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিলে তখন কী বলেছিলে, মনে আছে? 'তোমাদের অনাহারে থাকতে হবে না!' কিন্তু এখন কী বলতে চাও? আমি সাঁতার জানি না, সুরমাও তাই। বাড়ীর নীচে চারি দিকে সমুদ্রের জল বয়ে যাচ্ছে কল্-কল্ করে। এই জলরাশি ভেদ ক'রে কবে যে আবার ডাঙা দেখা দেবে, ভগবান জানেন! এর মধ্যে আমরা জঠর-জ্বালা নিবারণ করব কেমন করে?"

দীপক বলল, "ভয় নেই ভায়া! অন্ততঃ দিন তিন-চার আমাদের অনাহারের ভয় নেই। কিছু চাল, কিছু ডাল আর কিছু শাক-সব্জী আমি রক্ষা করতে পেরেছি।"

—"কিন্তু দিন তিন-চার পরে?"

—"খুব সম্ভব জল তখন সরে যাবে। ভগবান আমাদের সহায়।"

—"এই যে কত শত মানুষ বানের তোড়ে ভেসে গেল, ভগবান কি তাদের সাহায্য করেছিলেন? 'ভগবান আমাদের সহায়!' ও-সব বাঁধা গৎ ছেড়ে দাও?"

—"বাঁধা গৎ নয় বন্ধু, বাঁধা গৎ নয়! ভগবানের উপরে বিশ্বাস কখনো হারিও না। যারা বানের জলে ভেসে গেল নিশ্চয় তাদের কাল পূর্ণ হয়েছিল, ভগবান তাই তাদের সাহায্য করেননি। কিন্তু এত-বড় দৈব-দুর্ব্বিপাকেও আমরা যখন এখনো বেঁচে আছি, তখন আমাদের কাল পূর্ণ হ'তে দেরি আছে।"

—"বেশ, দেখা যাক্।"

খাবার গেল ফুরিয়ে। কিন্তু বিপদের উপরে বিপদ, জলাভাব। জল যা আছে, তা আজকের পক্ষেও অপ্রচুর। মানুষ অনাহারে থাকতে পারে দিন-কয়, কিন্তু জলাভাব সহ্য করা অসম্ভব।

অথচ চারি দিকে এত জল! মাটির উপরে এখানে এত জল কেউ কোন দিন দেখেনি! কিন্তু তা হচ্ছে সমুদ্রের লবণাক্ত জল, মাটির জীবের গলা দিয়ে গলে না।

দীপক জান্লার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে বাহিরটা একবার দেখে নিয়ে বললে, "সুরেশ, কোন দিকে এখনো জ্যান্তো মানুষের সাড়া পাচ্ছি না। আমার বাড়ীর চারি পাশ থেকে জল এখন সরে গিয়েছে বটে, কিন্তু খুব সম্ভব গ্রাম এখন জনহীন। যারা বন্যাকে ফাঁকি দিতে পেরেছে তারা পালিয়েছে প্রাণ নিয়ে। এমন অবস্থায় এখানে হাট-বাজারও বসবে না। রেলপথও হয়তো এখনো জলের তলায়, সুতরাং ট্রেনও চলবে না। কলকাতায় যখন যাবার উপায় নেই, তখন আমাদের কি করা উচিত বল দেখি?"

—"তোমার দেশ, তুমিই বল।"

—"নন্দীগ্রামে আমার মামার বাড়ী। এখান থেকে মামার বাড়ী পনেরো মাইলের কম হবে না। যদিও চারি দিকের অবস্থা দেখে সন্দেহ হচ্ছে, জলমগ্ন জমি এড়িয়ে সেখানে যেতে হ'লে আমাদের হয়তো পঁচিশ-ত্রিশ মাইল পথ পার হতে হবে। সেখানে যাবার চেষ্টা করব কি?"

নন্দীগ্রামের অবস্থাও যদি এখানকার মত হয়ে থাকে?

—"হয়তো হয়েছে। হয়তো হয়নি। হয়তো সেখানে গেলে আমাদের পানাহারের অভাব হবে না। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে একবার চেষ্টা করা উচিত নয় কি?"

—"বোধ হয়, উচিত। এখানে থাকলে খাবার আর জলের অভাবে আমরা যে মারা পড়ব সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।"

সুরমা সভয়ে বললে, "উঃ, পায়ে হেঁটে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল!"

সুরেশ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, "হ্যাঁ, তাই! তোর জন্যেই তো এই বিপদ! তোর জন্যেই তো বাংলা দেশে ব'সে সমুদ্র দেখতে এলুম! এই বাংলা দেশ হচ্ছে ঈশ্বর-বর্জ্জিত দেশ। পুরীতে গিয়ে কেউ এমন বিপদে পড়ে না—সেখানকার সমুদ্র হিংস্রক রাক্ষসের মত নয়, তাই সবাই যেতে চায় সেইখানে!"

সুরমা খিল্-খিল্ ক'রে হেসে উঠে বললে, "রাগ কোরো না দাদা, কিন্তু তুমি কথা কইছ ঠিক একটি আস্ত খোকার মতন!"

সুরেশ আরো রেগে উঠে বললে, "তুই 'অ্যাডভেঞ্চার' চেয়েছিলি না? এখন ত্যাখ, কত ধানে কত চাল!"

দীপক বললে, "শান্ত হও বন্ধু, শান্ত হও! এখন মাথা গরম করবার সময় নয়।.........সনাতন, নিরেট খাবার তো খতম! এখন যেটুকু জল আছে একটা 'ফ্লাস্কে' ভরে নাও। তার পর চল, আমরা দুর্গা ব'লে বেরিয়ে পড়ি।"

চার

চোখের সামনে দেখলে তারা যে মর্ম্মান্তিক দৃশ্য, সে ভীষণতা ও যে বীভৎসতা, তার পূর্ণ বর্ণনা না দেওয়াই ভালো। কবি দান্তে নরকের যে শব্দছবি এঁকেছেন তাও এমন ভয়াবহ নয়।

জনহীনতার মধ্যে বিরাজ করছে যেন এক বিরাট সমাধি-ভূমির শ্বাসরোধকারী নিস্তব্ধতা। জনহীনতাই বা বলি কেন, যেখানে-সেখানে রয়েছে মনুষ্য-মূর্ত্তি—একক, জোড়া-জোড়া বা দলে-দলে; তাদের সংখ্যা গোণা অসম্ভব। কিন্তু তারা সকলেই মৃত। এ হচ্ছে মৃত জনতার দেশ! কত দেহ জলে ভাসছে, কত দেহ পুঞ্জীভূত ও আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে মাটির উপরে!

মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে জলমগ্ন গ্রামের উপর-অংশ। সে-সব গ্রামে যারা থাকত তাদের অনেকেই ভেসে গিয়েছে বন্যাস্রোতে, বাকী সবাই করেছে প্রাণ নিয়ে পলায়ন।

থেকে থেকে সুদূর বা অল্প দূর থেকে ভেসে আসছে 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি। আত্মীয়েরা যে-সব দেহের সন্ধান পেয়েছে তাদের নিয়ে চলেছে শ্মশানের দিকে।

সব-আগে দীপক, তার পর সুরেশ, তার পর সুরমা এবং সব শেষে মোট-ঘাট নিয়ে পথ চলছে বৃদ্ধ ভৃত্য সনাতন। তাদের মনের ভিতরে কি হচ্ছিল জানি না, কিন্তু তাদের মুখের পানে তাকালে বোধ হয়, যেন তারা এগিয়ে যাচ্ছে চোখ থাকতেও অন্ধের মত।

সত্যই তাই। ইচ্ছা করেই তারা এদিকে ওদিকে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছিল না, কারণ তা দেখলে হয়তো বন্ধ হয়ে যেত তাদের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া।

প্রত্যেকেই পদচালনা করছে কলের পুতুলের মত, কারুর মুখে কথা নেই বললেও চলে। এই মড়ার মুলুকের মৌনব্রতের মধ্যে কথা

কইতেও যেন ভয় হয়, শিউরে ওঠে প্রাণ। মনে হয়, পরিচিত জীবনের বাণী শুনলে দেহহীন আত্মারা আবার ফিরে আসতে চাইবে আপন আপন দেহের মধ্যে।

পথ ধ'রে সোজা চলতে পারলে হয়তো তারা সন্ধ্যার আগেই গন্তব্য স্থলে গিয়ে পৌঁছতে পারত। কিন্তু পথ ও মাঠের অধিকাংশই এখনো জলমগ্ন। যেখানে জল নেই সেইখান দিয়ে অনেক ঘুরে তবে তারা অগ্রসর হ'তে পারছে।

অবশেষে সন্ধ্যা হ'ল। চাঁদ উঠল—শুক্লপক্ষের উজ্জ্বল চাঁদ। কিন্তু মানুষ যে-চোখে দেখে, চাঁদকে মনে হয় সেই রকম। তারা ভাবলে, ও চাঁদের মুখ যেন মড়ার মতন হলদে!

জ্যোৎস্নার আলোতে তফাতের সব দৃশ্য আর স্পষ্ট ক'রে দেখা যাচ্ছে না—এ তবু মন্দের ভালো। অন্তত খানিকটা কমল ভয়াবহতা।

সুরমা কাতর স্বরে বললে, "দাদা, জল!"

সুরেশ বললে, "এই তো একটু আগেই জল খেলি!"

—"কি করব দাদা, আজ আমার গলা যে খালি খালি শুকিয়ে যাচ্ছে!"

—"শুকিয়ে গেলে কি করব বোন, 'ফ্লাস্কে' যে আর এক ফোঁটাও জল নেই।"

একটা অস্ফুট আর্ত্ত-ধ্বনি ক'রে সুরমা চুপ মেরে গেল।

দীপক বললে, "পচা মড়ার দুর্গন্ধ ক্রমেই বেড়ে উঠছে! আর যে নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে!"

সুরেশ বললে, "পথের আর কত বাকি?"

—"আমাদের এখনো মাইল সাত-আট যেতে হবে।"

—"ওঃ!"

আবার সবাই নীরব। কিন্তু রাত্রি আজ নীরব নয়। একটানা শোনা যেতে লাগল শৃগাল-কুকুরের চীৎকার-ধ্বনি। মড়ার অধিকার নিয়ে তারা ঝগড়া করছে পরস্পরের সঙ্গে।

খানিক পরে সুরমা আর পারলে না, অবশ হয়ে ব'সে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে "দাদা গো!" ব'লে চেঁচিয়ে উঠে এলিয়ে পড়ল এক দিকে!

দীপক ও সুরেশ ছুটে এসে তাকে ধ'রে তুলে দাঁড় করালে। দেখা গেল, সুরমা ব'সে প'ড়েছিল একটা নারীর মৃতদেহের উপরে।

সুরমা কাঁদতে লাগল।

সুরেশ বললে, "এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদলে কি হবে বোন? চল, যত তাড়াতাড়ি পারি এই নরকের বাইরে পালাই চল!"

—"তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে, আর আমি হাঁটতে পারব না!"

—"তাহ'লে তোকে কি আমাদের কোলে ক'রে নিয়ে যেতে হবে?"

এত দুঃখেও ম্লান হাসি হেসে সুরমা বললে, "কী যে বল দাদা!"

—"তবে এগিয়ে চল।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুরমা আবার অগ্রসর হ'ল।

চাঁদের আলো আরো জ্বল-জ্বলে। ওদিকে তেপান্তরের মাঠটাকে দেখাচ্ছে অপার সমুদ্রের মত। চন্দ্রকিরণ তার বুক জুড়ে খেলছে যেন লাখো-লাখো হীরা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা!

এদিকে খানিকটা খোলা জমি। তার এখানে ওখানে অস্বাভাবিক সব ভঙ্গিতে নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়ে রয়েছে কতগুলো দেহ—কেউ নর, কেউ নারী, কেউ শিশু! তিন-চার দিন আগেও তারা ছিল এই উৎসবময়ী ধরণীর গর্ব্বিত প্রাণী, স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি নিজেদের এমন ভয়ানক পরিণাম!

পাশের বনের ভিতরে উঠছে ঘন ঘন হরিধ্বনি। শবযাত্রীরা যাচ্ছে শ্মশানের দিকে।

হঠাৎ সনাতন আঁৎকে উঠে বললে, "বাবু!"

দীপক ফিরে বললে, "কি রে সনাতন?"

সনাতন ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, "মড়া জ্যান্তো হয়ে উঠেছে।"

—"মড়া জ্যান্তো হয়েছে কি রে?"

—"ঐ দেখুন, ঐ দেখুন!" সে সেই খোলা জমির দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করলে।

ফিরে দেখে সকলেরই বুক শিউরে উঠল!

জমির উপরে যে মৃত দেহগুলো ছিল, তাদের একটা শুয়ে শুয়েই অগ্রসর হচ্ছে।

সুরমা ভয়ে চোখ মুদে ফেললে।

সনাতন বললে, "পালিয়ে আসুন বাবু, পালিয়ে আসুন। মড়াটাকে দানোয় পেয়েছে!"

খুব তীক্ষ্ণ চোখে চলন্ত মূর্ত্তিটাকে দেখে দীপক বললে, "ধেৎ! অসম্ভব কখনো সম্ভব হয়? ওটা কুমীর।"

—"কুমীর?"

—"হ্যাঁ, এখানে এসেছিল মড়ার লোভে। আমাদের দেখে জলের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। এমনি ক'রেই আমরা ভূত দেখি।"

পাঁচ

অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে সুরমা বললে, "জল, জল!"

সুরেশ বললে, "সুরো, জল যখন নেই তখন 'জল জল' ক'রে মিছে কেঁদে কেন আমাদের কষ্ট দিচ্ছিস্?"

—"জল জল করছি কি সাধে দাদা? আমি যে আর পারছি না!"

দীপক বললে, "ভয় নেই সুরমা, পথের আর মাইল তিন বাকি।"

—"মা গো, সে যে অনেক দূর!"

কেউ আর কিছু বললে না।

কিছু দূরে দেখা গেল দু'টো লণ্ঠনের আলো। জন কয় মানুষকেও দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট ভাবে।

দীপক বললে, "ওখানে একটা শ্মশান আছে।"

সুরেশ বললে, "একটা কথা মনে হচ্ছে। যারা শ্মশানে এসেছে তারা এখানকার পানীয় জলের অভাবের কথা নিশ্চয় জানে। ওরা কি সঙ্গে পানীয় জল আনেনি?"

—"আনাই তো উচিত।"

—"সুরমার অবস্থা হয়েছে শোচনীয়। একবার জলের খোঁজে ওদের কাছে যাব না কি?"

—"চল।"

সকলে শ্মশানের দিকে অগ্রসর হ'ল।

যখন তারা শ্মশানে এসে উপস্থিত হ'ল তখন কয়েক জন লোক চিতায় আগুন জ্বালবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল। তারা তফাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

চিতা জ্বলল। আগুনের রক্ত শিখা ক্রমেই উঠতে লাগল উপর দিকে।

হঠাৎ এক অভাবিত কাণ্ড!

প্রথমেই জাগল যন্ত্রণা-বিকৃত নারী-কণ্ঠে তীব্র এক আর্ত্তনাদ!

তার পরই দেখা গেল, চিতার উপরকার কাঠগুলো ঠেলে ফেলে দিয়ে চিতার উপরে বিদ্যুৎ-বেগে দাঁড়িয়ে উঠল এক শীর্ণ-বিশীর্ণ জীবন্ত নারী-মূর্ত্তি—তার পরনের কাপড়ে, তার এলানো চুলে-চুলে দংশন করছে ক্রুদ্ধ সর্পশিশুর মতন অগ্নিশিখারা!

আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সে তীক্ষ্ণ স্বরে বললে, "জ্বলে মলুম! পুড়ে মলুম!"

মূর্ত্তি চিতার উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল। যারা দাহ করতে এসেছিল তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করলে প্রাণপণে।

সেই ভয়ঙ্করী অগ্নিময়ী মূর্ত্তির চোখ দু'টো যেন ঠিক্‌রে পড়ছে। সে দুই হাত বিস্তার করে বেগে দৌড়ে আসতে আসতে চেঁচিয়ে উঠল, "জ্বলে মলুম, পুড়ে মলুম। রক্ষা কর, রক্ষা কর!"

দীপক, সুরেশ, সুরমা ও সনাতনও দ্রুতপদে না পালিয়ে পারলে না।

ছয়

অনেক দূর ছুটে এসে তারা থামল।

খানিকক্ষণ হাঁপ ছাড়বার পর দীপক বললে, "কী কাপুরুষ আমরা! কার ভয়ে পালিয়ে এলুম? জ্যান্তো মানুষকেও মারা গেছে ভেবে ভুল করে শ্মশানে নিয়ে আসার কথা তো আগেও শুনেছি। এ-ও নিশ্চয় সেই ব্যাপার!"

সুরেশ বললে, "আমারও এখন সেই সন্দেহ হচ্ছে। চল, শ্মশানের দিকে আর একবার গিয়ে দেখে আসি।"

সুরমা সভয়ে কেঁপে উঠে বললে, "ওরে বাবা, আমি যেতে পারব না!"

"কে তোকে যেতে বলছে? তুই সনাতনের কাছে ব'সে থাক্।"

কিন্তু তাদের বিফল হয়ে ফিরে আসতে হ'ল। সেই অদ্ভুত মূর্ত্তি একেবারেই অদৃশ্য!

সনাতন মাথা নেড়ে মত জাহির করলে, "যে মূর্ত্তি দুনিয়ার নয়, তাকে কি আর দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া যায়?"

ট্যাঁ ট্যাঁ

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

বৃদ্ধ গোবিন্দের সমস্ত সত্তা যেন এইখানে আসিয়া ঠেকিয়াছে, এই দুইটি শব্দের মধ্যে—ট্যাঁ ট্যাঁ।

গভীর রাত্রি। সারা শহর নিস্তব্ধ। কচিৎ কখনও অদূরে ট্যাক্সির হর্ণ শোনা যায়, কখনও রিক্সার ঠুন-ঠুন। নানারূপ দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার মধ্যে তিনি সবে একটু চোখ বুজিয়াছেন অমনি শুরু হয় ট্যাঁ ট্যাঁ। 'দূর ছাই' বলিয়া বৃদ্ধ বিছানায় উঠিয়া বসেন।

প্রথমে কান্না শুরু করে নিতাই, তার পর হেনা। তাঁর নাতি-নাতনীর ঐক্যতানে সরু গলিটা ঝঙ্কৃত হইয়া ওঠে।

এদের কান্না ও বায়নাক্কা এমনিতেই বেশী। এরই আগে বড় নাতি গৌর দুই মাস সমানে কাঁদিয়াছে। তখনও হেনা ছিল দোহার। উনপঞ্চাশ দিন জ্বরে ভুগিয়া গৌর সারিয়া উঠিতে না উঠিতেই নিতাই জ্বরে পড়িল। তার অসুখ আজ তেত্রিশ দিন। বাড়িতে ব্যাধি, কান্না ও ওষুধের শিশির যেন মিছিল চলিয়াছে।

গোবিন্দ শিয়রের বালিশের তলা হইতে বিড়ির কৌটা বাহির করেন। কিন্তু দেশলাই পাওয়া যায় না। তিনি ডাকেন, শুনছ ওগো শুনছ।

তাঁর স্ত্রী তরঙ্গিনীর ঘুম ভাঙ্গিল না। তিনি আবার ডাকিলেন, ওগো শুনছ। আঃ, কারও যদি আমার দেশলাইর উপরও একটু নজর থাকে।

আলোর সুইচ টিপিবার জন্য উঠিতেই বৃদ্ধের হাঁটুতে আঘাত লাগে। সামান্য আঘাত কিন্তু এই বয়সে এটুকুতেই কষ্ট হয়।

একটা বিড়ি ধরাইতেই চার-চারটা কাঠির দরকার হয়। প্রথমটা ভাঙ্গিয়া যায়, দুইটার বারুদ খসিয়া পড়ে। চতুর্থ কাঠিতে বিড়িটা ধরিল বটে কিন্তু একটু পরেই নিবিয়া গেল। বাক্সে আর কাঠি ছিল না।

গোবিন্দের মনে হয়, সারা দুনিয়ার মতন বিড়ি-দেশলাইও তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। 'ধুত্তোর ম্যাচিস্' বলিয়া বাক্সটাকে তিনি ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন। সেটা যাইয়া পড়ে তরঙ্গিণীর নাকের উপর।

তিনি এতক্ষণ জাগিয়াই ছিলেন! ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, শেষটায় দেশলাই ছুঁড়ে মারলে!

এঁ্যা, তোমার লাগল না কি? তা এমন কিছু সিরিয়স নয়। দেখ ত' আমায় একটা ম্যাচিস্ দিতে পার কি না।

তরঙ্গিণী দেরাজ খুলিয়া স্বামীকে একটা দেশলাই বাহির করিয়া দেন। তিনি চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া গোবিন্দ বলেন, গা-হাত-পা একটু টিপে দিয়ে গেলে হ'ত না? বড্ড কন্‌কন্ করছে।

তরঙ্গিণী কোন উত্তর করেন না। গোবিন্দ বলেন, শুনছ।

বারান্দার আর এক প্রান্ত হইতে তরঙ্গিণী বলেন, নিতাই কাঁদছে। ওকে একটু ঠাণ্ডা করে আসি।

গোবিন্দ গজর-গজর করিতে থাকেন, একে গরিব, তায় বুড়ো। বুড়োকে কেউ দেখে না। বুড়িরাও নয়। তার পর একটা বিড়ি ধরাইয়া নেন। বিড়ির পর বিড়ি চলে।

টং টং করিয়া ঘড়িতে চারটা বাজে। তিনটার শব্দ তিনি শুনিতে পান নাই, দু'টার ত' নয়ই। কিন্তু মনে হয় তারও আগে উঠিয়াছেন, অনেক আগে।

একটা মশা গান জুড়িয়া দেয়। কানের কাছে খালি ভোঁ-ভোঁ করে। তাঁর নাতিদের কান্নার চেয়েও বিশ্রী এই শব্দ। ইচ্ছা হয় মশাটাকে ধরিয়া তার ডানাগুলি ছিঁড়িয়া ফেলেন, তার ধৃষ্টতার শাস্তি দেন। আবার ভয়ও হয়। ম্যালেরিয়ার বীজাণুবাহী এই প্রাণীটি কত অনর্থেরই না সৃষ্টি করে। শ্বশুর-বাড়ী হইতে তিনি একবার ম্যালেরিয়া লইয়া ফেরেন। বাপ, সে কি কাঁপুনি, লেপের পর লেপ চাপাইয়াও থামে না। তখন তরঙ্গিণী খুবই সেবা করিয়াছিলেন। এখন এই বয়সে সে আশা করাও ভুল।

কল হইতে জল পড়ার শব্দ হয়। ছপ্-ছপ্ শব্দ। ধাঙড়েরা রাস্তা ঝাঁট দেয়। দূরে কলের কুলীর ঘুম-ভাঙ্গানো বাঁশী বাজে।

ভোরের দিকে একটু ঠাণ্ডা পড়ে। কিন্তু আলনা হইতে ধুতির চাদরখানা নামাইবার জন্যও উঠিতে ইচ্ছা করে না। কেমন যেন জড়-ভাব।

সামনের বাড়ীর লালু বাবু তাঁরই বয়সী। কিন্তু কী মজবুত শরীর। রোজ দু'-তিন মাইল হাঁটেন, দোতলা-তেতলা সিঁড়ি ভাঙেন কিন্তু হাঁপান না। পয়সা আছে কি না, ভাল-ভাল জিনিষ খান, ফুর্তিতে থাকেন।

পয়সা তাঁরও ছিল। তিনি ছিলেন ভি ডি কোম্পানীর পারচেজার। প্রথম মহাযুদ্ধে ভি ডির একমাত্র পারচেজার হিসাবে পুরানো লোহার মারফৎ গোবিন্দ যে টাকা রোজগার করেন তাহা দিয়া দুই-চারটা পরগণা কেনা যাইত।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তিনি সবে একটু চোখ বুজিয়াছেন অমনি গৌর আসিয়া ডাকে, দাদু।

গোবিন্দ বলিয়া ওঠেন, Most disgusting! কিন্তু গৌরকে দেখিয়া পর মুহূর্তে স্বর নরম হয়; ওঃ, তুমি? এস, দাদু এস।

গৌর অন্য দিনের মতন নিকটে আসে না। দূর হইতে বলে, আমাল বিত্‌কিত্।

তার বয়স চার বছর কিন্তু কথা এখনও পরিষ্কার হয় নাই। এই গদগদ ভাষা গোবিন্দের বড় পছন্দ। তিনি আলমারি খুলিয়া নাতির হাতে দু'খানা বিস্কুট দেন।

প্রার্থিত জিনিস পাইয়া শিশুটি চলিয়া যাইতেছিল। পিতামহ ডাকিলেন, একবারটি কাছে এস, দাদু!

না আথে না। তুমি বল বত।

বকি! আমি বড্ড বকি! How ungrateful—বলিয়াই বৃদ্ধ মুখ তুলিয়া দেখেন গৌর ঘরে নাই। তাঁর কানে আসে নিতাইর কান্নার শব্দ। সে তখনও ট্যাঁ ট্যাঁ করিতেছে।

ঘরখানি মাঝারি সাইজের। গিল্‌টির ফ্রেমে বাঁধানো মানুষ-প্রমাণ তৈলচিত্র, স্কটল্যাণ্ডের হ্রদের ছবি, বড় আয়না, ল্যাজারাশের বাড়ীর ফার্ণিচার, সোফা, চেয়ার, শ্বেত পাথরের টেবিল, পুরানো জিনিষগুলি দেয়ালে ও মেঝেয় ঠাসাঠাসি করিয়া রাখা হইয়াছে। পাশেই তালি-মারা কাপড়, দাঁত বার-করা জুতা, বর্ত্তমান দারিদ্র্য

ও অতীত ঋদ্ধির এ এক অপূর্ব সংমিশ্রণ! রাত্রে সোফা ও চেয়ার সরাইয়া এই ঘরেই গোবিন্দের বিছানা করা হয়।

বেশ একটু বেলায় তিনি প্রাতঃকৃত্য সারিয়া সামনের বারান্দায় যাইয়া বসেন। কাচের ভিতর দিয়া সূর্য্যরশ্মি তাঁর ললাটের উপর পড়ে, ধবধবে সাদা চুলের নীচে রঙিন রবি-রশ্মি। সুন্দর চেহারা, যৌবনে খুবই সুন্দর ছিল, আজ শিথিল চামড়া থাকে থাকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, বয়সের সঙ্গে কপাল ও মাথা ছোট হইয়া আসিতেছে, দেখিলে মনে হয়, পুরানো দেব-দেউলে মহাদেবের অযত্ন-রক্ষিত বিগ্রহ।

বারান্দার নীচেই সরু গলি, ইজিচেয়ারে বসিয়া সেই গলির কিছুই দেখা যায় না। তিন-চারখানা বাড়ীর পরেই বড় রাস্তার মোড়। জাপানী যুদ্ধের সময় কলিকাতার যে দুইটি চওড়া সড়ক দিয়া মিলিটারি গাড়ী যাতায়াত করিত এই বড় রাস্তাটি তার অন্যতম।

গোবিন্দ বসিয়া বসিয়া ঐ রাজপথে মানুষ ও যান-বাহনের চলাচল দেখেন। দেখেন বিশ্বের গতিশীলতা। জগৎ সমানে চলিয়াছে, শুধু তাঁর নিজের শিরায় আগের মতন আর রক্ত বয় না। সেখানে সবই শিথিল, কেমন যেন ঝিমঝিমে ভাব।

মোড়ের কাছেই পৈতৃক বাড়ী ছিল, বিরাট বাড়ী, জমি-জায়গা সবই গিয়াছে, যাওয়ার সময় মিলিটারি গাড়ীরই মতন দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল।

বেলা আটটার কিছু পরে একটি যুবা ইজিচেয়ারের হাতলের উপর একখানা 'ষ্টেটস্‌ম্যান' রাখিয়া যায় আর এক কাপ চা ও উপরে নুণ ছড়ানো দু'টি আলু-সিদ্ধ। যুবকটির গায়ের রং বেশ ফরসা তবে কাঁসার বাসনে কলঙ্কের মতন তার গায়ে একটা মলিন ছোপ পড়িয়াছে। চোখের নীচে কালো দাগ। পরনে সেলাই-করা ময়লা ধুতি।

যুবকটির নাম আনন্দ, গোবিন্দের এক মাত্র সন্তান, বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হইবে কিন্তু এরই মধ্যে চামড়া ঢিলা হইয়াছে।

আনন্দ দিন-রাত সমানে পরিশ্রম করে। সদরের দিকে মেয়েদের যাওয়ার হুকুম নাই, তাই সে সদর ও বাহিরের উঠান ঝাঁট দেয়। সে-ই বাজার করে, রেশন আনে, সাবান দিয়া কাপড় কাচে। মাসের শেষের দিকে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ী হইতে প্রায়ই দু'-পাঁচ টাকা ধার করিয়া আনে। এর উপর আছে ডাক্তার-বাড়ী দৌড়াদৌড়ি।

মা চিররোগী, পিতার শরীরও ভাল নয়। বাড়ীতে আবার তিন মাসের উপর টাইফয়েডের রাজত্ব চলিতেছে।

আনন্দ বাজারের টাকা লইয়া গেলে গোবিন্দ 'ষ্টেটস্‌ম্যান'খানা উলটাইয়া-পালটাইয়া দেখেন। প্রথমে দেখেন ছবিগুলি, বিশেষতঃ রেসের ঘোড়ার ছবি। তার পর চশমার সামনে একখানা পুরু কাচ ধরিয়া টোটের খবর পড়েন, কোন্ ঘোড়ায় কত ডিভিডেণ্ড দিল, কার দর কত ছিল—এই সব খবর।

সাধারণ সংবাদ সম্বন্ধে কোন কৌতূহলই তাঁর নাই। ঐ সম্পর্কে কেহ প্রশ্ন করিলে বলেন, ও আমি পড়ি না। নিউজ মানে ত' মিথ্যের ঝুড়ি, তামাম ঝুটো।

'সেনি' ও 'অলবস' মোটা ডিভিডেণ্ড দিয়াছে দেখিয়া তাঁর চোখ দু'টো জ্বলিয়া উঠিল। কালই মনে হইয়াছিল এরা বাজি জিতিবে। নাম-ডাকের ঘোড়া নয় তাই ডিভিডেণ্ডও দিবে প্রচুর। ডবল টোটে পাঁচটা টাকা ধরিতে পারিলে কিছু আসিত। 'সেনি'তে পাঁচ টাকায় পঁয়তাল্লিশ, 'অলবস'এর নয়খানা টিকিটে ৮০ × ৯ = ৭২০৲ টাকা।

এমন সময় ছিল যখন এক-একটা দৌড়ে তিনি শ'য়ে শ' টাকা লাগাইতেন। বন্ধুরা বলিত, এ কি করছ গোবিন? অন্ততঃ ছেলেটার মুখের দিকে চাও।

গোবিন্দ উত্তর করিতেন, কপালে দুঃখ থাকলে কেউ সুখ দিতে পারে না। সুখ থাকলেও তা এমনিই আসবে।

নিজে ভি ডির সোল পারচেজার। আশা ছিল আনন্দকেও ভি ডিতে ঢুকাইতে পারিবেন। মেজ সাহেবও সেইরূপই ভরসা দেন। আনন্দ অবশ্য লেখাপড়া শেখে নাই। গোবিন্দ শিখান নাই। ছেলের শিক্ষার জন্য নেওয়ার মতন অবকাশ কোন দিনই তাঁর ছিল না। তিনি ভাবিতেন, সওদাগরী আপিসে লেখাপড়ার এমন দরকারই বা কি, বিশেষতঃ সাহেবদের যদি অনুগ্রহ থাকে।

কিন্তু হিসাবে গোলমাল হইয়া যায়। বিলাত হইতে কোম্পানীর এক পার্টনার আসিয়া কি সব গলদ ধরিয়া ফেলেন। গোবিন্দকে চাকরি ছাড়িতে হয়। মেজ সাহেব বলেন, থ্যাঙ্ক ইওর ষ্টারস্, গোবিন।

গোবিন্দ বলেন, কেন, জেল হয়নি বলে বরাতকে ধন্যবাদ দেব? জেল আমার হ'ত না। অবশ্য হয়রানি হ'ত খুবই।

তাঁর প্রতি মেজ সাহেবের অনুগ্রহ ছিল প্রচুর। তিনি ম্যানেজারকে ধরিয়া গোবিন্দের দু'শ' টাকা পেন্সনের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

বাজার হইতে ফিরিয়া আনন্দ নিত্যকার অভ্যাস মতন থলিয়াটা পিতার সামনে খুলিয়া ধরিলে তিনি কহিলেন, ফিরলেও ও এক যুগ করে আর এনেছ এই বাজার? এ দিয়ে কি অশ্বমেধ হবে শুনি? চুনো-পুঁটি, পাঁটার নাদির মতন আলুর বীচি আর কুমড়ো, আরে ছোঃ!

কেন, নারকোল, পুঁইশাক, মোচা, টম্যাটো—

বাধা দিয়া গোবিন্দ বলেন, ও-সব ভেজিটেবল কিসমের কথা ছেড়ে দাও। তোমার ও তোমায় মায়ের রুচতে পারে। আমার রোচে না। তা' এগুলির দাম শুনি—এই সব গরুর খাদ্যের!

কোন উত্তর না করিয়া জিনিষগুলি থলেয় ভরিয়া আনন্দ ভিতরে চলিয়া যায়। গোবিন্দ গজর-গজর করিতে থাকেন, থাকো এখন, পুঁই-ডাঁটা আর চুনো-পুঁটি খেয়ে!

স্বামীর চেঁচামেচি শুনিয়া তরঙ্গিণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কহিলেন, দিনকাল যা পড়েছে—এখন নয় খারাপই খেলুম। সুদিন ফিরলে তখন আবার ভাল খাব।

সুদিন আর হয়েছে! পেন্সনের টাকা দ' দশ দিনে ফুরিয়ে যায়। ছেলেটা যদি এক পয়সাও আনতে পারত। এদিকে বছর বছর ছেলে হওয়ার বিরাম নেই। বৌমাটি হয়েছেন যা—

তরঙ্গিণী বলেন, চুপ, চুপ।

ডাক্তার আসেন বেলা বারটায়। আনন্দকে ডাকিতে ডাকিতে তিনি সিঁড়ি দিয়া উপরে ওঠেন। গোবিন্দ রোগীর ঘরে যান না। তাতে তাঁর কষ্ট হয়। নিতাইকে দেখিয়া ডাক্তার তাঁর ঘরে আসিয়া বসেন।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করেন, দেখলেন কেমন, ডাক্তার বাবু?

ভালই মনে হচ্ছে, চিন্তার কোন কারণ নেই।

জ্বর কাল ছাড়বে মনে হয়?

আশা ত করি! তবে টাইফয়েড স্বভাব-দুষ্টু ঘোড়ার মতন! বেশ আছে ত বেশ আছে! হঠাৎ বিগড়ে যায়।

আমি ত আর পেরে উঠছি না। সংসার অচল, চড়ায় আটকে যাওয়া নৌকোর অবস্থা! যাক্, ওঁকে দেখলেন কেমন?

নন্দ বাবুর মাকে? ভালই ত মনে হল।

কিন্তু কাজকর্ম্ম কিছুই করতে পারেন না। গা-হাত-পা টিপতে টিপতেই ঝিমিয়ে পড়েন। অথচ বলেন দম নেই।

দুর্ব্বল শরীরে ও-রকম ঝিমিয়ে পড়াই স্বাভাবিক!

গোবিন্দ বলেন, অসুখের চৌদ্দ আনাই ওর মনগড়া। জানেন ত ফ্যামিলি হিষ্ট্রী? ওর বাপ-ভাই—

তরঙ্গিণী ডাক্তারের পিছন পিছন দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, আমায় যা ইচ্ছে বল, কিন্তু আমার বাপ-ভাই তোমার কাছে কি দোষ করল, শুনি?

গোবিন্দ কহিলেন, আমি বলছিলাম তোমার অসুখ খানিকটা মনগড়া। অসুখ যে একেবারে নেই তা বলছি না। তবে কি না কাজকর্ম্ম—

কাজ কি করি না, না করিনি কখনও? আবার যাতে ভাল করে করতে পারি সেই জন্যই ত ডাক্তার বাবুর তেতোগুলি গিলছি।

আগে ত করতেই! কাজের সুখ্যাতও ছিল যথেষ্ট।

ডাক্তার কহিলেন, শরীর সুস্থ হলে আবার পারবেন।

গোবিন্দ কহিলেন, তত দিনে আমাকে হয় ত বিবাগী হয়ে যেতে হবে। অনেক সময় ইচ্ছা হয় যে, একটা কুকার নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। ভাতে ভাত, ডিমসিদ্ধ আর নৈনিতাল সিদ্ধ দিয়ে কোন রকমে চালিয়ে নি। আবার মনে হয় তাহলে এদের উপায় কি হবে? ছেলেটির এক পয়সা রোজগারের খ্যামতা নেই। এদিকে বছর বছর—

আমি ত তখনই বিয়ে দিতে নিষেধ করেছিলাম। এখন ছেলে হওয়ার জন্য বিরক্ত হলে চলবে কেন? একটু থামিয়া তরঙ্গিণী আবার কহিলেন, ছেলে আমার রোজগার করতে পারে না তাই চোরের মত থাকে। দু'টো চাকরের খাটুনি খাটে। এই বয়সেই শরীর ভেঙ্গে গেছে।

শরীর কি আমারই ঠিক আছে না কি? কি করব, নিজে খেতে পাই না, তোমাদেরও ভাল খাবার জোটে না।

ছেলের সঙ্গে হাসিমুখে দু'টো কথা কইতেও ত পার। সর্ব্বক্ষণ খিটখিট করা—

বাধা দিয়া গোবিন্দ কহিলেন, খিটখিট করি! আমি বকি? তোমাদের ভয়ে মুখ বুজে আছি, বাবা। ডাক্তার বাবু অনেক দিনের আলাপী তাই ওঁর কাছে যা একটু দুঃখের কথা বলছিলুম।

ডাক্তার এই দৃশ্যে অভ্যস্ত। প্রায়ই তাঁকে এই সব শুনিতে হয়। তিনি বলিলেন, মনটা আর একটু স্থির করুন নইলে শরীর আরও ভেঙ্গে যাবে।

স্থির আর করেছি। ওরা স্থির হতে দিলে ত। নাতিদের ট্যাঁ ট্যাঁ আছে তার ওপর মা ও ছেলের মুখ নাড়া। ওরা আমায় যে কি রকম উপেক্ষা করে তা বুঝবেন না।

গোবিন্দের গৃহিণী ক্ষীণ প্রতিবাদ করেন, নন্দ আর আমি—আমরা করি তোমায় উপেক্ষা!

গোবিন্দ যেন শুনিতেই পান নাই। তিনি বলিয়া চলিলেন, পাড়ার লালু আর আমি, ড্রিঙ্কে আমাদের একসঙ্গে হাতে খড়ি। আমি ছেড়েছি আজ এক যুগ, লালু এখনও ছাড়েনি। কই, তার বউ-বেটা ত কিছু বলে না। তার পয়সা আছে তাই সবাই ভয় করে চলে।

তরঙ্গিণী কহিলেন, লালু বাবুর কথা ছেড়ে দাও। বাইরে যায় বটে, কিন্তু সেখান থেকেও ঘরে দুটো পয়সা নিয়ে আসে।

পেয়েছে বটে দেলেনার হাজার কুড়ি টাকা। ও-রকম আমিও পেয়েছিলাম। কমলি মরবার সময় বাড়ীটা নন্দকে লিখে দিতে চাইল। আমি আপত্তি করলাম। শেষটায় নগদ হাজার টাকা দিয়ে গেল। তা'ও আমি মিশনে দান করেছি। কমলি, উষা, আখরোট এদের বাড়ী ত আমার টাকায়। এমন টাইমও গেছে যখন দিনে হাজার দু'হাজার কামাই করেছি।

তরঙ্গিণী এবার সরিয়া পড়িলেন।

ডাক্তার গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার শরীর কেমন?

ভারী দুর্বল, গা-হাত-পা কন্‌কন্ করে। ডাইবেটিস্‌টাও আবার টের পাচ্ছি।

আপনার আবার একটা ব্যবস্থা করে দেব না কি?

তা ত করবেন। এদিকে যে খাওয়া জোটে না। ডিম, মাছ, মাংস সব আগুন।

এ বয়সে ও-সব ভালও নয়। বলেছিলাম দুধ খেতে।

ও হ'ল বাছুরের খাদ্য, বাছুরের আর কচি-কাচা মানুষের।

এই সময় আনন্দ দুই বাটি চা লইয়া আসিল। গোবিন্দ বলিলেন, দু'বাটি কেন?

এক বাটি তোমার।

এই অবেলায় আবার চা! তিনটের আগে খাবার দিতে পারেন না, তাই এই ঘুষের ব্যবস্থা। তিনটেয় খেলে শরীর থাকে মশাই?

ডাক্তার বলিলেন, তিনটে কেন?

জিজ্ঞেস করুন শ্রীমান্‌কে। উনি বাজারে গেলে আর ফিরতে চান না। Slow, very slow. Like mother, like son.

আনন্দ বলে, দেখে-শুনে কিনতে হবে ত এই মাগ্‌গী গণ্ডার বাজারে।

দেখে-শুনে এনেছ ত কবরেজী বড়ির চেয়েও ছোট আলু।

আমাদের যেমন অবস্থা তেমন ব্যবস্থা করেছি।

দেখলেন ডাক্তার বাবু, কথা কইবার ছিরি, যেন তেড়ে মারতে আসছে। বাপের সঙ্গে কথা কওয়ার এই ধরণ?

ডাক্তার কহিলেন, অফেন্স দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু বলেননি। দেখছি ত ওঁকে আজ পাঁচ বছর। Very mild and gentle.

বাইরের লোকের সঙ্গে মা ও ছেলে দু'জনেই আইডিয়াল। কিন্তু আমাকে জ্বালাতে ভারী ওস্তাদ।

কী জ্বালাই তোমাকে? এই যে ছ'মাস জুতো নেই, ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে পরছি, একবারও কি বলেছি তোমায়?

বলবার মুখ আছে তোমার? সকাল-রাত্তিরে দশ মিনিট করে গা-হাত-পা টিপলে আমার আরাম লাগে। তাই কি রোজ টিপে দাও? জিনিষের কথা বলছ? হাতে যখন পয়সা ছিল তখন কুড়ি-বাইশ টাকা দামের ল্যাটিমারের জুতো দিয়েছি। বাজারে অর্ডিনারি জুতোর দাম তখন চার টাকা। গোলাম মহম্মদের কাছ থেকে শাল-দোশালা কিনে দিয়েছি। একবার তার জন্ম মাল ক্রোক হল। আরও ছেলেবেলায় পেয়েছ তাজ ও জরির টুপি।

আনন্দ বলিল, তা দিয়েছ বই কি।

তোমাদের—মা ছেলের তা মনে থাকে না। Very ungratcful.

শুধু শুধু দোষ দেওয়া তোমার অভ্যেস। সেই জন্ম নিজেই অশান্তি পাও।

পাই-ই ত। মধ্যে মধ্যে ইচ্ছে হয় 'স্যুইসাইড' করি।

ডাক্তার কহিলেন, ও-কথা ভাবাও পাপ, গাঙ্গুলী মশাই!

না ভেবে উপায়? কবে স্যুইসাইড করতাম। করি না শুধু থানা-পুলিসের ভয়ে। কমিশনারকে লিখে গেলেও হয় ত ওর হাতে হাত-কড়া পড়বে। এক মাত্র ছেলে, তার উপর নাতিগুলো হয়েছে আমার হাত-পায়ের বেড়ি।

ডাক্তার একটু পরে গোবিন্দকে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, আপনার হার্ট আজ অনেকটা ভাল দেখছি। সেদিন ভয় পেয়েছিলাম।

উপবাস করে হয়েছিল। তার আগে তিন দিন পেটে কিছু পড়েনি। আমি না খেলে নন্দর মা কিছু খাবেন না তাই শুধু এক টুকরো করে মাছ খেতাম। রুই মাছ।

ডাক্তার জিজ্ঞাসু নেত্রে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিলেন। এবার উত্তর করিল আনন্দ, আমি বাজার থেকে পুঁটি মাছ আনায় উনি রেগে গিয়ে চার টাকা সেরের রুই নিয়ে এলেন। এনেই সুরু করলেন চেঁচামেচি। পাড়াশুদ্ধ লোকের কানে গেল। মা এসে বললেন, মিছেমিছি অত চেঁচাচ্ছ কেন? উনি অমনি প্রতিজ্ঞা করলেন কিছু খাবেন না।

গোবিন্দ বলিয়া উঠিলেন, A Rashvehary has come to plead.

একটু পরে ডাক্তার উঠিলে গোবিন্দ তাঁর হাতে ফি'র টাকা দিয়া কহিলেন, আপনাকেও হয় ত আর ডাকতে পারব না।

কেন?

গোবিন্দ কপালে হাত ছোঁয়াইয়া বলেন, আমার অদেষ্ট। এই হাফ ফির টাকাও আর জোগাড় করতে পারছি না। অথচ এক সময়—

বাষ্পে তাঁর কণ্ঠ জড়াইয়া আসে, শিথিল ভাঙ্গা মুখ বেদনায় যেন আরও ভাঙ্গিয়া যায়। ডাক্তার তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন।

বৃদ্ধ আবার বলেন, উনিও ডাকতে নিষেধ করছেন।

কে? নন্দ বাবুর মা?

হ্যাঁ, উনি বলেন, কুটুম, বাড়ীর ডাক্তার, ওঁর ওষুধের দাম জমে যাচ্ছে। এর পর পাঁচটা কথা উঠবে। কিন্তু আপনিও জানেন ডক্টর, বাকী টাকা আপনার পড়ে থাকবে না, শোধ এ শর্ম্মা করবেই—

ঔষধের বিল ক্রমেই ভারী হইতেছিল। তবু মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া ডাক্তার বলিলেন, তা জানি বৈ কি। তবে দেখবেন যেন আর না জমে, আগেরটাও কিছু কিছু করে—

কথা বলিতে বলিতে তাঁরা সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। গোবিন্দ বলিলেন, ওষুধ আনতে যাবে কখন?

বিকেল সাড়ে পাঁচটা ছটায়।

দয়া করে একটু আগে করবেন, যাতে অন্ধকার হতে না হতেই ফিরতে পারে। যা ডামাডোল পড়েছে।

গোবিন্দের খাইতে প্রায় আড়াইটা বাজিল, তার পর তিনি ঘুমাইলেন দুই ঘণ্টার উপর। কোলে পাশ-বালিশ টানিয়া নাক

ডাকাইতে ডাকাইতে রোজই তিনি এই সময় নিদ্রা দেন। তরঙ্গিণী যদি বলেন, দিনে অত ঘুমুলে রাত্তিরে ঘুম হবে কেন? গোবিন্দ অমনি চটিয়া ওঠেন। বলেন, তোমরা মা-ছেলে ত খালি আমার ঘুম দেখতে পাও।

ডাক্তারও এক দিন বলিয়াছিলেন। গোবিন্দ তাঁকে বলেন, ঠিক ঘুম নয়, দশ-পনর মিনিটের। অভ্যেস বহু দিনের। আপিসেও টেবিলের উপর গড়িয়ে নিতাম। সেখানে আমার একটা বালিশ থাকত আর এক পিস কার্পেট—টার্কিশ কার্পেট।

বৈকালে তিনি আবার বারান্দায় বসেন। আগে মোড়ের একটা রোয়াকে একা বসিতেন। এখন সে শক্তি নাই। নীচে নামিতেও কষ্ট হয়। বাহির হইতে ঘর, ঘর হইতে শয্যা। এমনি করিয়া মানুষ নিজকে গুটাইয়া লয়। তিনিও লইয়াছেন।

ঠিক মোড়ের উপর একটা নেড়া গাছ। গাছটা বহু দিনের। গোবিন্দ দেখেন আর মনে মনে নিজের সঙ্গে উহার তুলনা করেন। গাছটার ফুল হওয়া বন্ধ হইল, পাতা খসিল, শুষ্ক কাণ্ডে পোকা ধরিল। তাঁরও তেমনি চোখে ছানি পড়িল, অঙ্গ শিথিল হইল। মনে হয়, ভিতরটাও যেন পোকায় কুরিয়া খাইতেছে। এখন উভয়েরই অপেক্ষা শুধু ঝরিয়া পড়ার।

সন্ধ্যার একটু আগে ডাক্তার-বাড়ী হইতে ফিরিয়া আনন্দ নোটের ফিরতি টাকা বুঝাইয়া দিলে গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করেন, ওষুধ এনেছ?

হ্যাঁ।

বৌমার ওষুধ?

গোবিন্দ পিতার মুখের দিকে চায়। তিনি বলেন, বৌমার ওষুধের দরকার যে।

আনন্দ বুঝিতে পারে না। বলে, কি অসুখ?

অসুখ—এই ঘন ঘন ছেলে হওয়া। ডাক্তারকে বলেছিলাম প্রিভেন্‌টিভ দিতে। তিনিও দেবেন বলে গেলেন।

আনন্দ চলিয়া যাইতেছিল। গোবিন্দ ডাকিলেন, শোন। কাল সকালেই গিয়ে প্রিভেন্‌টিভ নিয়ে আসবে। এই দুর্দ্দিনের বাজারে—

আনন্দ দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া যায়।

তরঙ্গিণী ঘরে ধুনা দিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, তোমার একটু লজ্জাও করে না? বিয়ে দেবার সময় এই জন্যই আমি নিষেধ করেছিলাম। তোমায় চিনি ত।

চেন? চেন? কি চেন আমায়? যত দোষ নন্দ ঘোষ— বলিয়া গোবিন্দ কতগুলি গাল-মন্দ করেন। শপথ করেন।

সোফার উপর গোবিন্দ বসিয়া। গায়ে সাদা চাদর জড়ানো। ঘরে আলো নাই, সামনের বাড়ীর আলোর দু'টা রেখা জানলার গরাদের ভিতর দিয়া তেরছা ভাবে আসিয়া চাদরের উপর পড়িয়াছে। তাঁর শরীরের কোন অংশই দেখা যায় না। মনে হয় কাপড়ের একটা স্তূপ।

আনন্দ বার-দুই ভিতরের বারান্দা দিয়া যাতায়াত করিয়াছে। কিন্তু এদিকে তাকায় নাই।

রাত দশটায় তরঙ্গিণী খাবার লইয়া আসেন। তিনি আলো জ্বালিতেই গোবিন্দ গর্জ্জন করিয়া ওঠেন, তোমায় বলিনি যে কিছু খাব না?

খাবে না কেন? রাগ তোমার কার উপর? সবই ত তোমার।

সন্ধ্যার সময় বাপান্ত করে—যাও, কোন্ সাহসে তুমি খাবার নিয়ে এলে? জান এখনই কুরুক্ষেত্তর—

তরঙ্গিণী জানেন, তাঁর স্বামী হয় ত সব ছুঁড়িয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন। এর আগে বহু বার এইরূপ ঘটিয়াছে। তিনি তাই থালা লইয়া আলো নিবাইয়া বাহির হইয়া যান।

ঘরখানা অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দ বলিয়া ওঠেন, ছেলেগুলোর হল কি? মোটেই সাড়া-শব্দ নেই যে!

অনেকটা স্বগতোক্তির মতন। কথাটা তরঙ্গিণীর কানে যায় কি না সন্দেহ।

গোবিন্দ ঠিক একই অবস্থায় বসিয়া থাকেন যেন একটা জড়পিণ্ড। ব্যাধি-বেদনা দুঃখ-দুর্দ্দশা সব একাকার হইয়া যায়।

নিজের অজ্ঞাতে বৃদ্ধের দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়ে। বিশ্বের অলক্ষ্যে, স্ত্রী-পুত্রের অলক্ষ্যে তাঁর সন্তপ্ত আত্মার শীতোষ্ণ বাষ্প যেন ঊর্দ্ধায়িত হইয়া ওঠে।

রাত্রি বাড়ে। বাড়ীটা নিস্তব্ধ, নিস্তব্ধ সমগ্র পল্লী। বড় রাস্তা হইতে গাড়ী কিংবা রিক্সার শব্দ আসে না। আজ মাতালের কলরবও থামিয়াছে।

এ কী নীরবতা! কাচের উপর কুয়াসার মতন তার মনের উপর নীরবতার ছোপ পড়ে।

অন্ধকারের মধ্যে তিনি এদিক্-ওদিক্ তাকান। পরিচিত কিসের যেন সন্ধান করেন।

হয় ত ঐ ট্যাঁ ট্যাঁরই!

জীবন-জল-তরঙ্গ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১৯

কথাটা ছড়িয়ে পড়লো গ্রামে—উত্তরপাড়া এই আসন্ন বিবাদে লাঠি ধরে দাঁড়াবে না। গ্রামের সম্পদশালী ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণ করে ওদের লাভ হয়েছে—অনশন আর রোগে ভুগে মৃত্যু। ওরা পেটের দায়ে করেছে চুরি—করেছে হাজত-বাস; আর গ্রামের সৎ ও সাধু লোকের যত ঘৃণা—সন্দেহ গ্রামের শেষ সীমান্তের এই আবর্জ্জনাস্তূপে এসে জমেছে। না—আর নয়। শত্রু যদি নিপাত হয়—হোক না, ওদের কি!

শ্রীধর গর্জ্জন করে উঠলেন, বেইমান।

ফটিক বললে, আপনার যেমন—সাত তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে আনতে গেলেন ওই ডাকাতটাকে। তা-ও গাঁটের পয়সা খরচ করে।

শ্রীধর বললেম, ও হিন্দু বলেই এতটা করলাম। নইলে,—দাঁতে দাঁত চেপে তিনি স্থির হয়ে রইলেন।

ফটিক বললে, এখন কি করবেন ঠিক করুন।

শ্রীধর কথা কইলেন না—কি ভাবতে লাগলেন। চমক ভাঙ্গলো বাইরে গঙ্গা-স্তোত্রের শব্দে।

দে মহাশয় ফিরছিলেন স্নান করে। এটি তাঁর নিত্যকর্ম্মের মধ্যে। গায়ে একটা পুরোনো পশমের গেঞ্জি—তার ওপর ছেঁড়া আলোয়ানে কান পর্য্যন্ত ঢেকে খানিকটা কাঁপা-গলায় স্তোত্র পাঠ করছিলেন তিনি!—'বন্দে মাতা সুরধুনী—পুরাণে মহিমা শুনি—'

শ্রীধরের বৈঠকখানার পাশে এসেই স্তোত্র পাঠ থামিয়ে ডাকলেন, শ্রীধর আছ ভেতরে—শ্রীধর?

জানালার ধারে সরে এসে শ্রীধর বললেন্, আছি খুড়ো। কি খবর?

দে মহাশয় ঘুরে বাড়ির মধ্যে দিয়ে বৈঠকখানায় এলেন। ওর হাতের গামছা-জড়ানো ভিজে কাপড়খানা অনেকটা লম্বা লাউয়ের মত দেখতে। ভারিও মন্দ নয়। সেটা চেয়ারেয় ওপর রেখে বললেন, খবর তো চমৎকার! আজ তিরিশ বছর ধরে গঙ্গাস্নান করছি। কি বর্ষা, কি শীত—ঝড়-জল-রোদ কোন কিছু গ্রাহ্য করিনি—এবার বুঝি ছাড়তে হল। বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আলোয়ানটাকে ভাল করে জড়িয়ে নিলেন গায়ে।

দাঙ্গার কথা বলছেন তো? শ্রীধর প্রশ্ন করলেন।

সে আর বলাবলি কি, দক্ষিণ-পাড়ায় যে কাণ্ড দেখে এলাম—এতক্ষণ হয়তো বেধেই গেল।

সে কি! সবাই একসঙ্গে বিস্ময়ে ভরে চীৎকার করে উঠলো।

মুসলমানপাড়া ছাড়িয়ে ওই যে চারটে শিবমন্দির আছে না ঠাকরা বামুনদের—সেইখানে দেখ গে কি কাণ্ড! কাল রাতে কারা কি জানি কিসের রক্ত আর মাংসের টুকরো ফেলে গেছে শিবের রোয়াকে। সবাই বলছে—এ মোছলমানদের কাজ।

কারো মুখে বাঙ্‌নিষ্পত্তি হলো না। যে আশঙ্কা তিন দিন ধরে একটু একটু করে এগিয়ে আসছিল তাই বুঝি ঝাঁপ দিয়ে পড়লো সামনে। উত্তরপাড়া তাদের সঙ্গে হাত মেলাবে না। এখন উপায়?

দে মহাশয় বললেন, তোমরা সমাজের শিরোমণি, যা হয় একটা ব্যবস্থা কর। ধন-প্রাণ নিয়ে যদি সুস্থ ভাবে বাস করতে চাও—

সে আর কে না চায় দে মশায়। শ্রীধর উৎসাহহীন কণ্ঠে উত্তর দিলেন। দেখি, ভূপেন সেন—শশীকান্তদা' এঁরা সব কি করচেন! ফটিক, আমার বন্দুকটা বার করে টোটা যা ভরবার ভরে রাখ।

দে মশায় আশ্বস্ত হয়ে বললেন, তোমার ভরসাই তো বরি শ্রীধর। বন্দুক বাগিয়ে ধরলে কারো আর এগুতে হবে না।

ফটিক বললে, একটা বন্দুক দিয়ে গোটা পাড়াটা তো বাঁচানো যাবে না। আপনাদের লাগতে হবে।

দে মশায় সত্রাসে বললেন, আমি! আর কি বয়স আছে—না সামর্থ্য আছে—

ফটিক বললে, আপনার ছেলেকে বলবেন—নাতিকে বলবেন—

দে মশায় আক্ষেপ করলেন, ওরা ধরবে লাঠি! যথেষ্ট হয়েছে! রাত্রিতে এক জন না দাঁড়ালে বাইরে বেরোতে পারে না—বউমা লণ্ঠন জ্বালিয়ে দাঁড়ান দুয়োর খুলে তবে—

শ্রীধর বললে, উত্তরপাড়া আসবে না—আমাদেরই দাঁড়াতে হবে। জোয়ান জোয়ান ছেলেরা যদি ভরসা করে না এগোয়—সব মেরে কেটে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একশা করে যাবে।

ফটিক বললে, লাঠিই বা ধরতে যাবে কেন। আমাদের দিশী হাতিয়ার যা রয়েছে তার কাছে বাঘ ঘেঁসতে পারে না—তা মানুষ! যান, সবাই মিলে—ছেলে-নাতি-নাতনী-বউ—বউমা সবাই মিলে সাজিয়ে রাখুন গে ন' ইঞ্চি ফরমা—ছাদে, ঘরের মধ্যে যেখানে পারেন। ইট, ইঁটের কাছে কাকেও এগুতে হবে না।

কথাটা যুক্তিগ্রাহ্য বলে সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠলো, ঠিক বলেছ ফটিক, মাথা আছে তোমার।

শ্রীধর কিন্তু আশ্বস্ত হ'লেন না। এদের সকলকে জানা আছে। বিপদের আগে হাঁক-ডাক লাফালাফিতে এরা অদ্বিতীয়; বিপদ এলে কোন হাতিয়ারই এদের বুকের সাহসকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। সে-বার গো-বাঘের উপদ্রবের কথা মনে আছে। সন্ধ্যা হতে না হতে এই পাড়ার লোক দোরে খিল লাগিয়ে দুরু-দুরু বুকে শুনেছে ফেউ-এর ডাক। ভাঙ্গা গোয়াল থেকে হাড়োলে টেনে নিয়ে গেছে কচি বাছুর—ঘরের মধ্যে থেকে একটা চীৎকারও কেউ করতে পারেনি। বিপদ কালে ছাদে সাজানো ইঁট যে স্থানচ্যুত হবে না এ কথা তিনি ভাল মতেই জানেন।

ফটিককে বললেন, চল দেখি—শশীকান্তদা'র ওখানে একটা পরামর্শ করা যাক্।

শশীকান্তর বৈঠকখানায় বসবার জায়গা নেই এত লোক জমেছে। বারান্দাতেও রীতিমত ভিড়। এত লোক জমেছে অথচ কোলাহল নেই। এখানেও খবরটা ইতিমধ্যে পৌঁছেচে। সমবেত জনমণ্ডলীর কাছে সংবাদটা অপ্রত্যাশিত বলেই এত নিস্তব্ধতা।

শ্রীধরকে আসতে দেখে সকলে চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। শশীকান্ত অভ্যর্থনা করলেন, এস এস, তোমার কাছে এই মাত্তর জানকে পাঠাচ্ছিলাম। তা এমন কাপুরুষ ওটা যে পথে বেরিয়ে হিঁদুপাড়া

মধ্য দিয়ে যাবে তোমার বাড়িতে সেটুকু সাহসও ওর নেই। ওদের যে কি হবে তাই ভাবি!

শ্রীধর ও ফটিক ঠেলে-ঠুলে জায়গা করে বসে পড়লেন। চাপাচাপি হ'লেও সকলে আরাম উপলব্ধি করলেন। আশঙ্কার সময় যত ঘেঁষাঘেঁসি বসতে পারা যায় ততই যেন স্বস্তি বোধ হয়।

শ্রীধর বললেন, শুনেছ তো দাদা—তোমার উত্তুরে পাড়া বেঁকে বসেছে।

শুনলাম। একটু চিন্তা করে শশীকান্ত বললেন, ওরা চায় কি? আরও টাকা?

শ্রীধর বললেন, শুনছি টাকাও ওরা চায় না। ওরা বলছে, আমরা তো বড়লোকের বাড়ীর নেড়ি কুত্তা নই যে তু করে ডাকলেই ল্যাজ নেড়ে ছুটবো!

শশীকান্ত চাইলেন ভূপাল সেনের দিকে। কুড়োজালি-বদ্ধ হাত দু'খানি কপালে ঠেকিয়ে ভূপাল একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন। ভূপাল সেন বললেন, কই, এত দিন তো ওদের মুখে শুনিনি এ কথা। এ নিশ্চয় ভেতরের উস্‌কানি আছে।

শ্রীধর ও শশীকান্ত একসঙ্গে মাথা নেড়ে বললেন, না—না—তাই কখনো হয়? কে দেবে ওদের উস্‌কানি?

ভূপাল পুনরায় কুড়োজালি কপালে ঠেকিয়ে বললেন, তোমরা যদি জেগে ঘুমোও—প্রভুর সাধ্যি কি তোমাদের চেতন করেন। বলি, সাপের গালেও চুমু খাচ্ছে—ব্যাঙের গালেও চুমু খাচ্ছে—এমন লোকও কি নেই গাঁয়ে?

ফটিক বললে, বুঝতে পেরেছি—সেন মশায় কার কথা বলছেন।

অন্যান্য সকলে উৎসাহী হয়ে উঠলো, কার কথা হে ফটিক?

ফটিক চোখ টিপে বললে, আঃ, থামুন না আপনারা। পরামর্শ হ'য়ে গেলে সবই জানতে পারবেন।

শশীকান্ত বললেন, জানতে পেরে আমাদের লাভ কতটুকু? তার চেয়ে এক কাজ কর ফটিক, একবার দক্ষিণ-পাড়ায় যাও। হরেন—বিপিন—ফকু তোমার সঙ্গে যাক। ব্যাপারটা জেনে এসো ভাল করে। আর ওদের আমার নাম করে বলো—ভাল করে সব বিবেচনা করে যেন কাজে এগোয়। না হয় আনবে ওদের এখানে। সব পাড়া মিলে একটা পরামর্শ হওয়া কি ভাল নয়?

ভূপাল বললেন, পরামর্শ হওয়া ভাল—তার আগে আমরাও তো আট-ঘাট বাঁধতে পারি।

কি রকম?

ভূপাল বললেন, শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। কুরুক্ষেত্রে শ্রীভগবান যা করেছেন সেই দৃষ্টান্ত আমাদেরও অনুকরণ করতে হবে।

বলই না—কি করতে হবে?

পাশের ঘরে চল বলছি। বলে কুড়োজালি মাথায় ঠেকিয়ে তিনি উঠলেন।

শশীকান্ত ও শ্রীধর তাঁকে অনুসরণ করলেন। তিন জনের অনুমান মিলে গেল—একমত হতেও কেউ দ্বিধা বোধ করলেন না।

পরামর্শ করে তিন জনে এ ঘরে এসে দেখেন পুরন্দর দাঁড়িয়ে আছে দোর-গোড়ায়। তিন জনেই চমকে উঠে পরস্পরের পানে চাইলেন।

হরি ও বিষ্ণু বৈঠকখানায় এসে বসেছিল। সেদিনকার গরু-ঠেঙানোর বিক্রম ওদের অন্তর্হিত হয়েছে। মনে-মনে দু'জনেই সত্য-নারায়ণের সিন্নি মানত করতে করতে ভাবছে—পুরুষানুক্রমে এই গাঁয়ে সামান্য ছল-ছুতার হিন্দুতে মুসলমানে কত না ভয়ানক ভয়ানক মারপিট হয়ে গেছে—কই, এমন দলবদ্ধ ভাবে আক্রোশ মিটাবার ব্যবস্থা তো ওরা চোখেও দেখেনি—কানে শোনা দূরের কথা! নিকট-প্রতিবেশী হ'লেই গলায় গলায় ভাব আর হাতাহাতি গালাগালি—এ হবেই। দু'পক্ষের ছেলে-মেয়ে, গরু-ছাগল, শাকের ক্ষেত, ভাঙ্গা বেড়া বা পাঁচীল, মুখরা বউ ও ডানপিটে ছেলে থাকলে এ সব ঘটবেই। এর চেয়েও বউঝির বেহায়াপনাতে ও ছেলেদের লাম্পট্যে খুন, জখম পর্য্যন্ত হয়ে গেছে পুরাকালে—তাতেও জাতিতে জাতিতে এমন রেষারেষি কই হয়নি তো। নিরীহ একটি প্রাণীকে বাঁশ-পেটা করে—নিরীহ কয়েকটি গালি-গালাজের ফলে আজ কি বিভ্রাটই না বাধলো! বিষ্ণুদেরই বা দোষ কি, মানুষের ক্ষতি হলে লঘু-গুরু জ্ঞান থাকে না—মাথায় তার খুন চাপেই। সেই মনুষ্যধর্ম্মের বশবর্ত্তী হয়ে ওরা যা করেছে···

ভয়ের উত্তেজনায় ওরা স্থির হয়ে বসতে পারছিল না। পরামর্শ সেরে ভূপালরা এ ঘরে আসতেই বিষ্ণু উঁচু হয়ে উঠলো, বললে, কে পালের সর্দ্দার বলুন তো?

ভূপাল সেন হঠাৎ বৈষ্ণবী-বিনয় ছেড়ে রুদ্রমূর্ত্তি ধরলেন, তোমার অত কথায় কাজ কি বাপু! বাপে-ব্যাটায় হুজ্জুৎ বাধিয়ে এখন কে পালের গোদা তাই জিজ্ঞাসা করা হ'চ্ছে? বলি, দাওয়ানির বউটাকে বে-ইজ্জত করবার সময়—

হরি বললে, বে-ইজ্জৎ করবো কেন! বলুক না দাওয়ানির বউ—

তাই কর গে ভজাজজি—এখানে মরতে এসেছ কেন? ভূপাল সেন কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন নিজের জায়গায়।

পুরন্দর এগিয়ে এসে বললে, আপনারা ঘাবড়াবেন না। আমি এই মাত্তর দক্ষিণ-পাড়া থেকে আসছি—মুসলমানপাড়াও ঘুরে আসছি।

আবার তিন জনের দৃষ্টি-বিনিময় হ'লো। ভূপাল সেন কুড়ো-জালি কপালে ঠেকিয়ে হাসলেন মুচকি।

শ্রীধর ক্রোধে মুখ কালো করে দেওয়ালের দিকে চাইলেন। শশীকান্ত সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি দেখলে দক্ষিণ-পাড়ায়?

পুরন্দর বললে, রক্ত খানিকটা আছে—দু' টুকরো মাংসও অবশ্য পড়ে আছে, পাঁঠার মাংস বলেই মনে হয়।

কি করে জানলে পাঁঠার মাংস? রক্তও পাঁঠার? শশীকান্ত জিজ্ঞাসা করলেন।

ওটা বলা শক্ত নয়। কাল সেন-পাড়াতেও একটা পাঁঠা কাটা হ'য়েছিল—ইব্রাহিমরাও কেটেছিল একটা। দু' দলের কোন দুষ্টু ছেলের কাজ হবে।

ব্যাপারটা যত সোজা বলে ভাবছো তা মোটেই নয়। ভূপাল সেন মন্তব্য করলেন।

কি সোজা নয়! আপনি কি ভাবছেন—রক্ত বা মাংস অন্য জানোয়ারের?

না, না—তা ভাবছি না। আমি ভাবছি—বলে চক্ষু বুজে তৎক্ষণাৎ কি ভেবে নিয়ে বললেন, আমি ভাবছি, এ কাজ কোন দু'-মুখো সাপের! বলে তিনি তীব্র ভাবে পুরন্দরের পানে চাইলেন।

শশীকান্ত আড়ে-আড়ে পুরন্দরকে লক্ষ্য করছিলেন, ভূপালের এই

রাখাতে শ্রীধরও দেওয়াল-নিবদ্ধ নির্ব্বিকার দৃষ্টিকে অনুসন্ধিৎসায় পূর্ণ রে পুরন্দরের দেহভঙ্গির উপর ন্যস্ত করলেন।

পুরন্দর এ সবের কিছুই বুঝলে না। সরল ভাবে বললে, যাই াক, যত দেরী করবেন ততই ব্যাপারটা বিশ্রী হ'য়ে উঠবে। াপনাদের সম্মতি পেলে ওদের নিয়ে একটা সভা ঠিক করে ফেলি। টমাট হ'য়ে যাক।

বেশ তো—বেশ তো। সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন।

ভূপাল সেন বলে উঠলেন, কোথায় ঠিক করবে সভা?

আপনারা বলুন। এই বৈঠকখানায় হতে পারে, শ্রীধর বাবুর বঠকখানতেও হতে পারে।

ভূপাল বললেন, এখানে ক'জন লোক ধরবে? এই তো রখছো, গাদা-গাদি।

আমরা বাছা-বাছা লোক বলবো বৈ ত না।

শ্রীধর বললেন, আমার বৈঠকখানায় হওয়া অসম্ভব।

শশীকান্ত বললেন, এখানে হয়তো মিত্তির মশায় আসবেন া—তিনিও তো মধ্যস্থর মধ্যে থাকবেন?

পুরন্দর বললে, থাকবেন বৈ কি। তবে আপনাদের যদি াপত্তি না থাকে, তাঁর বৈঠকখানা বেশ বড় আছে—

ভূপাল সেন বললেন—না, আপত্তি আর কিসের। সবাই দি একমত হন—

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো, আপত্তি নেই।

শ্রীধর অনুচ্চ স্বরে কি বললেন—সমবেত কণ্ঠস্বরে তা শোনা গল না।

মুসলমান-পাড়াতেও দু'টি দল দু'রকম মত দিলে। এক দল বললে, হরি আর বিষ্ণু যদি মাপ চায় দাওয়ানির কাছে আর গরুর ক্ষতিপূরণ করে তো মিটমাট হতে পারে।

আর এক দল বললে, তা কেন! এক গাঁয়ে বাস করে অমন ব্যতায়া দিলে চলবে কেন? ডাকই না দাওয়ানিকে—তার বউকে, রা যদি টাকা চায়—

বিপক্ষ দলের লতিফ বললে, আজ-কালকার দিনে টাকা চাইবে া কে? একটা গরুর দাম জান?

তা হলে গফুর মিঞার কথা তোমরা মানবে না?

তা মানবো না কেন। তবে এ সব দাঙ্গা-হাঙ্গামার ব্যাপারে ওকে না টানলেই ভাল হয়। সকলেই তো ইমানদার নয়, লবে ছুট-বেছুট কিছু—তখন তোমাদের গোসা হবে।

যারা সাধারণ লোক—মিস্ত্রি, করাতি, ঘরামি, ওরা বললে, মিটমেট রে নাও চাচা, অত হ্যাচা-প্যাচায় কাজ কি।

শেষে তারাই হ'লো ভারি। ইব্রাহিমের দল হাত-মুখ নেড়ে মোল্লের দোহাই দিয়েও কিছু করতে পারলে না। ঠিক হ'লো মিত্তিরদের বৈঠকখানায় মজলিস বসবে।

পুরন্দর সোজা আসছিল বাড়ির দিকে। ওর পিছনে পিছনে আসছিল—দিনমজুরি-করা মুসলমানের দল—রাজমিস্ত্রি, করাতি ও ঘরামীরা।

দাওয়ানির বাড়ির কাছে এসে পাঁচু বললে, বাবু, দেখব একবার

বেশ তো, দেখ। বলে সে দাঁড়ালে।

পাঁচু দশ বছরের একটা ছেলেকে ডেকে বললে, শোন আফছার। আমরা দাঁড়ালাম এখানে—তুই চুপি-চুপি দাওয়ানির বাড়ির ভেতর গিয়ে দেখে আয় তো সে কি করছে।

ছেলেটা ফিরে এসে খবর দিলে—দাওয়ানি দাওয়ায় বসে কাঁসি করে পান্তা ভাত খাচ্ছে।

পাঁচু বললে, আসুন বাবু! বলেই সে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো ওদের নোনা আতা ও ধলা আঁকড়া দিয়ে বাঁধা আগড়ের সামনে। সেখান থেকে বাড়ির ভিতরের সবই দেখা যায়, ভিতর থেকেও পথের খানিকটা নজরে পড়ে। পাঁচু দেখলে, দাওয়ানির বউ দাওয়ায় বসে পা ছড়িয়ে চালই বাছছে—আর দাওয়ানি পান্তা ভাতের বড়-বড় গরাস তুলছে মুখে।

পাঁচু হাঁকলে, হেই দাওয়ানি ভাই, শীগ্‌গির খানাটা সেরে নাও, দরকার আছে।

দাওয়ানির বউ তাকে ফিস্-ফিস্ করে কি বললে—দাওয়ানি নিঃশব্দে মাথা নাড়লে বার দুই-তিন।

খেয়ে বাইরে এসেই তো দাওয়ানির চক্ষুস্থির! পুরন্দরকে দেখে সে কেঁদে ফেললে, বাবু গো, ওই হারামজাদী মাগীর জন্তেই আমার এই হাল। পরশু থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি—আজ কালনা, কাল সায়েবডাঙ্গা, পরশু হরিনদী।

পুরন্দর বললো, তা কাঁদবার এতে কি আছে? হরি ময়রারা তোমাদের কি বে-ইজ্জৎ করেছে—বল পাঁচ জনের সামনে?

দাওয়ানি হাত জোড় করে বললে, তুমি তো সব জান বাবু। দু'-চারটে গাল—মুখ-খারাবি—ও রাগ হলে কে না করে বাবু? কিন্তু এবরাহিম মিঞা আমায় শাসিয়ে রেখেছে—দোজকের ভয় দেখিয়েছে যে—গাল দিলে ইমান নষ্ট হয় না এ কথা ঝুট—ইমান যায়নি এ কথা বললে আমার লো (রক্ত) দেখে তবে ওরা ছাড়বে। টাকা পাবে বলে মাগীও ভিজেছে।

দাওয়ানির বউ দাওয়া থেকে সব শুনতে পেলে। ঘোমটায় মুখ ঢেকে দাওয়া থেকে উঠে সে রান্না-ঘরের ছিটে-বেড়ার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল এবং সেখান থেকে চেঁচিয়ে বললে, খবরদার মিন্ষি, আমার দোষ দিও না। আমার অত যত্নের বকনটাকে (বকনা বাছুর) ঠেঙিয়ে ভাগাড়ে পাঠাবার জোগাড় করলে—আর দোষ হ'লো আমার! বাছুরটাকে খাওয়াতে-পরাতে টাকা লাগেনি—না?

দাওয়ানিও চেঁচালে দোর-গোড়া থেকে, তোর জরুর না-কিছু করেছে। বলি, বকনটাকে ঠেঙালে তো তোর ইজ্জতের কি হানি হোলো—ক?

দাওয়ানির বউ গর্জ্জন করে উঠলো, ইঃ—ও গো-খেগোর ব্যাটার ভারি সাস্তি আমার ইজ্জৎ খায়!

পুরন্দর বললে, ঠিক বলেছ মা, তোমাদের মান নষ্ট করে এমন লোক এ গাঁয়ে নেই। শোন পাঁচু, তোমরা শোন। সামান্য একটা জিনিস—

দাওয়ানি বললে, আমাদের কসুর নেই হুজুর। এবরাহিম বলেছে—দু'দিন লুকিয়ে থাকলে বকনটার খেসারৎ আদায় করে দেবে

তরঙ্গ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কান পেতে শুনি।
বাত্যাহত সংসারের শ্রান্ত পদধ্বনি
ভ্রষ্ট নীড়ে, অশান্ত হৃদয়ে
সমুদ্রের ঢেউ তোলে আলোড়িত দিনে।
মনে হয় সে-সময়ে হয়তো এখনি
কালের যাত্রার ধ্বনি
মুহূর্ত্তেই লবে বুঝি চিনে
বহু প্রশ্ন-ভারাক্রান্ত তাপিত ধমনী।

মাঝে-মাঝে থামে কাল হয়তো বা মুহূর্ত্তের তরে
বহু পিছে রেখে-আসা স্মৃতির পশরা
নানা রঙা ফুল হ'য়ে ঝরে;
ভুলে যাই ব্যাধি মৃত্যু ক্ষুধা দিয়ে ভরা
এ মৃত্তিকা নয় বিম্বাধরা।

হৃদয়কে উন্মোচিত বিকশিত ক'রে
রোজ রাতে রোজ ভোরে
নানা প্রতিবন্ধকের মুখোমুখী হ'য়ে
নিশ্বাস টেনেছি জোরে জোরে।
দগ্ধ মৃত্তিকার পথে হেঁটে-হেঁটে কতো বহু দিন
ভেবেছিলে মনে-মনে
হবে সাঙ্গ আয়োজন অস্ত হবে পথ
দিগন্তের ইসারাকে পাওয়া যাবে সচকিত
কোনো ক্লান্ত ক্ষণে।

বসন্ত-বাতাসে ওড়ে শূন্যে-শূন্যে অশান্ত ভ্রমর
রৌদ্রালোকে ভিড় করে দু'টি প্রজাপতি,
আমরা খতিয়ে দেখি আমাদের সর্ব্বশেষ ক্ষতি,
বাষ্পাচ্ছন্ন কণ্ঠে সেই স্বর।

বারুদের মতো সূর্য্য গ্রীষ্মের আকাশে।
হঠাৎ হাওয়ার ঢেউ আসে
চূতবৃন্তে, দগ্ধ মাঠে ঘাসে;
মাধবীবল্লরী-দেহে জীবনের সাড়া জাগে বুঝি,
রজনীর মত্ততার সীমা পার হ'য়ে
দৃষ্টিহারা অমানিশা ঠেলে
জরাতুর প্রাণ নিয়ে প্রদোষের রশ্মিরেখা খুঁজি।

কখনো ব্যর্থতা এতো ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দেয়
যেন মনে হয়;
সমস্ত সংসার বুঝি শুধু এক অন্তহীন ক্ষয়!
মধ্যপথে প্রতিহত
মানুষের ভালোবাসা আশা আর গভীর প্রণয়।
পথে যেতে পথের মাটীতে
চ্যুত পুষ্প, রক্তরেখা, মৃত্যু আর ভয়।
তবু দেখি অকস্মাৎ এখানে-সেখানে
আমাদের বিহ্বলতা মূঢ়তাকে চূর্ণ ক'রে দিয়ে
কালের উজান স্রোত সমুদ্রের জোয়ারের
সঙ্গীতের মতো
দ্বিধাকম্প্র হৃদয়কে টানে;
বাত্যাহত মন দেয় সাড়া,
সমাধি-স্তূপের ভগ্ন মৃত্তিকা কি আলোড়িত হয়?
চাঁদের আলোয় আর পাখীদের নীড়ে-নীড়ে
সুগভীর যে স্নিগ্ধতা রয়
তাহারি খানিক বুঝি মাঝে-মাঝে ছুঁয়ে যায়
অশান্ত হৃদয় আর জ্বালাময় চোখ,
অন্ধকার ভেঙে-ভেঙে পড়ে,
নতুন আলোক চরাচরে,
তরঙ্গের প্রতীক্ষায় কাঁপে যতো লোক।

আচ্ছা, টাকা যদি চাও সে ব্যবস্থা আমিই করবো। আজ সন্ধ্যেবেলায় মিত্তিরদের বৈঠকখানায় হাজির থেকো। ওখানে হিন্দু-মুসলমানের মজলিস বসবে। যেয়ো—বুঝলে?

ঘাড় নেড়ে দাওয়ানি বললে, নিশ্চয় যাব। মাগীকেও নিয়ে যাব হুজুর?

না, না—তুমি গেলেই চলবে। এস পাঁচু।

পাঁচু বললে, বাবু, আর মজলিস বসাবার দরকার কি? এই তা সব ফয়সালা হ'য়ে গেল।

না পাঁচু, তোমরা ছাড়া আরও যারা রয়েছে তাদেরও সন্দেহ দূর করা দরকার। সেটা পাঁচ জনে মুখোমুখি হয়ে করাই ভাল।

পাঁচু বললে, যা ভাল বোঝেন বাবু। তবে এবরাহিমের কথা আর বলবেন না—ও চায় সকলের সঙ্গে সকলের কাজিয়া বাধুক। এই যে কন্‌ট্রোলে কেরোসিন তেল পেয়েছে—আর চিনি পেয়েছে কি না—তাই ওর জাঁক বেড়ে গেছে!

রফিক বললে, একখানা দরখাস্ত করে দিন বাবু—ও তেল-চিনি সব চুরি করে।

পুরন্দর ওদের কথায় কান না দিয়ে চলে গেল! ক্রমশঃ

কবি সত্যেন্দ্রনাথ

শ্রীশান্তি পাল

কবিগণ চিরকালই একটু খেয়ালী প্রকৃতির। কবি সত্যেন্দ্রনাথও তাহার ব্যতিক্রম ছিলেন না। আহারে, বিহারে, বেশভূষায় ও ব্যবহারে সকল বিষয়েই তিনি তাঁহার খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার ব্যক্তিত্বের একটা সুষ্ঠু স্বাতন্ত্র্য রাখিয়া চলিতেন। সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যেও তাঁহার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট আছে। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যের ভিতরে আগাগোড়া 'ডেমোক্রেসী'র সুরের সহিত একটা মনোজ্ঞ আভিজাত্যের সুরও ধ্বনিত হইয়া উঠে। তিনি কাহারও বড় একটা তোয়াক্কা রাখিতেন না। সাহিত্য-ক্ষেত্রের কথা ছাড়িয়াই দিই, ব্যক্তিগত ও ব্যবহারিক জীবনে বন্ধু-বান্ধবদের ভিতর কোন অন্যায় দেখিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সহপাঠী ও তাঁহার আজীবন কাব্যচর্চ্চার সঙ্গী অজিত চক্রবর্ত্তী, সতীশ রায় ও ধীরেন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যোগদান করিবার জন্য সত্যেন্দ্রনাথকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন; এমন কি কবিগুরু স্বয়ং তাঁহাকে ঐ আশ্রমে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ-লিপি প্রেরণ করেন। কিন্তু আশ্রমের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও তিনি যোগদান করিতে অস্বীকার করেন। সত্যেন্দ্রনাথ কোন বাঁধাবাঁধির ভিতর যাইতে চাহিতেন না। সভা-সমিতিগুলি সর্ব্বদাই এড়াইয়া চলিতেন। কোন সভা-সমিতিতে নিমন্ত্রিত হইলে তাঁহার গাত্র-তাপ বাড়িয়া যাইত। তিনি আর সেদিন শয়ন-কক্ষ হইতে বাহির হইতেন না। আমাদের সন্তরণ-সমিতির তাৎকালিক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ সকলেই এ বিষয়ে একাধিক ঘটনা মনে করিতে পারিবেন।

সত্যেন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন। গোলামী জিনিষটাকে তিনি আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। স্যার আশুতোষ কর্ত্তৃক যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য পৃথক্ 'চেয়ার' সৃষ্টি হয় তখন অধ্যাপনা করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ সত্যেন্দ্রনাথকে সাদরে আমন্ত্রণ করেন, কিন্তু তিনি চাকুরী বলিয়া তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। চাকুরীর নাম শুনিলেই তিনি ক্রোধে ও ঘৃণায় জ্বলিয়া উঠিতেন। স্যার আশুতোষ সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি তাহাও প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে অবৈতনিক ও নৈমিত্তিক বক্তারূপে যোগদান করিতে আমন্ত্রণ করেন; কিন্তু সে আমন্ত্রণের মর্য্যাদাও তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই। সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু ও নিত্য-সহচর চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ঐ পদ গ্রহণ করেন।

সত্যেন্দ্রনাথের এই দুর্দ্দমনীয় মনোভাবকে কেন্দ্র করিয়া তখনকার সত্যেন্দ্রহিতৈষী সাহিত্যিক বন্ধুদের ভিতর কিছু দিন ধরিয়া তর্ক-বিতর্ক ও বাদানুবাদ চলিয়াছিল। এ-বিষয় লইয়া আমাদের সমিতির প্রাঙ্গণে বৈকালিক সভায় তাঁহার সহিত সাহিত্যিক বন্ধুদেরও অনেক তর্ক-বিতর্ক হইত। তর্ক উঠিলেই কবিবর গুম হইয়া বসিয়া থাকিতেন কিম্বা সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেন। বাগ্মিতাবিদ্যা ও তর্কশাস্ত্র—এই দুইটির কোনটিই তাঁহাকে কখনও আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। এমন কি বন্ধুদের ক্ষুদ্র বৈঠকে অথবা কোন সামাজিক মজলিসে তাঁহাকে কচিৎ মুখ খুলিতে দেখা যাইত। আত্ম-বিজ্ঞাপনের ঢক্কা-নিনাদও তাঁহার কখনও বরদাস্ত হইত না।

এক দিন বৈকালে হেদুয়ায় দাঁড় টানিতে টানিতে আমি পরিহাসচ্ছলে কায়স্থদের উপাধি লইয়া বলিলাম—'ঘোষ-বংশ বড় বংশ'। সত্যেন্দ্রনাথ সহসা বাধা দিয়া বলিলেন,—'পরের ছত্র দুইটি বলিলেই জলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিব'। এই বলিয়া কবিবর মুখ আঁধার করিয়া বসিয়া রহিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ অতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য-রসিক ও সৌখিন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে একবার তিনি বিশ্বকবির সহিত কাশ্মীর ভ্রমণে যান। যাত্রা করিবার এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে কেনা-কাটার মহা ধূম পড়িয়া গেল। কত রকমের পোষাক-পরিচ্ছদ, বাক্স-প্যাটরা-সাজ-সরঞ্জাম কেনা হইল তাহার আর সীমা-পরিসীমা নাই। তৎসত্ত্বেও বহু জিনিষই কবিবরের মনঃপূত হইতেছে না। ইহাতে বাটীর সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠেন। কাশ্মীরের মহারাজা তাঁহাদের থাকিবার জন্য একটি সুসজ্জিত 'হাউস-বোট' দেন। তাহার ফটোখানি কবিবর সাঁতারু প্রফুল্লকুমারকে উপহার দিয়াছিলেন। কাশ্মীরে থাকা-কালীন তাঁহারা কোথায় কি দেখিতে যান, কবে কোন্ বাগিচায় বেড়াইতে যান,—দারগা-বাগ, নাগুনা-বাগ, গুল-বাগ প্রভৃতি নানা বাগ-বাগিচার গল্প তিনি আমাদের প্রায়ই শুনাইতেন। কাশ্মীরে বসিয়া সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার বিখ্যাত কবিতা 'হরমুকুট গিরি' ও 'জাফরানের ফুল' লিখেন, এবং কবিগুরুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জ্জন করেন। কাশ্মীরের রচনাগুলির অধিকাংশই 'অভ্র-আবীরে' স্থান লাভ করিয়াছে। শ্রীনগর হইতে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার মামাতো-ভাই সুধীরকুমারকে যে-সকল পত্র লিখেন তাহাতে কাশ্মীরের অনেক কথা বিবৃত করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ এক দিন কাশ্মীরে কবিগুরু ও তাঁহার দলবলের সহিত একটি গুহা পরিদর্শন করিতে যান, সুড়ঙ্গের ভিতর খানিক দূর যাইবার পর কবিবরের হস্তস্থিত বাতিটি সহসা গুম্ হইয়া যায়। তিনি গুহার অস্পষ্ট আলোকে এক সন্ন্যাসীকে ভূমি হইতে শূন্যে প্রায় দুই-তিন হাত ঊর্দ্ধে যোগাসনে বসিয়া থাকিতে দেখেন। কৌতূহল বশতঃ তিনি তাঁহার খোঁজ লইয়া জানিতে পারেন যে, সন্ন্যাসী সুদীর্ঘ কাল বায়ু ভর এবং বায়ু ভক্ষণ করিয়া ঐরূপে শূন্যাসনে যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছেন। কবিবর তাঁহার সান্নিধ্যে কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই কবিগুরু সত্যেন্দ্রনাথকে আর অগ্রসর হইতে নিষেধ করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ কাশ্মীরে থাকা কালীন এক দিন রথীন্দ্রনাথের সহিত শ্রীনগর শহরের বাজারে যান এবং নানা সৌখিন জিনিষ কিনিয়া আনেন। সেই সঙ্গে একখানি "Murray's Hand book for Travellers in India, Burma and Ceylon"ও ক্রয় করিয়া আনেন। 'মারে'র কাশ্মীর ভ্রমণাংশটুকু তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

বাঁ দিক হইতে বসিয়া—১। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
দাঁড়াইয়া—১। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (?)

পাঠ করেন এবং পুস্তকখানিতে স্থানে স্থানে পেন্সিল দিয়া দাগবাজিও করেন। বইখানি বর্ত্তমানে সুধীরকুমারের অধিকারেই আছে। বইখানির অনেকগুলি পৃষ্ঠার 'মার্জ্জিনে-মার্জ্জিনে' সত্যেন্দ্রনাথের স্বহস্ত-লিখিত বহু মূল্যবান মন্তব্যও লিখিত রহিয়াছে। বই-খানির শেষের দিকে তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত একটি কাশ্মীরী শ্লোকের অনুবাদও লিখিত আছে। শ্লোকটি এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহা সত্যেন্দ্রনাথ-কৃত মূলেরই অনুবাদ।

"প্রভাত নিশং বাগেতে কাটাও
সন্ধ্যা নিশিম্ বাগে,
শালেমারে তুমি কাটাও জীবন
চির-নব অনুরাগে।"

সত্যেন্দ্রনাথ কাশ্মীরের স্বভাব-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পূর্ব্বোক্ত 'হরমুকুট গিরি' ও 'জাফরাণের ফুল' ছাড়াও আরও অন্যান্য ফুলের উপর কবিতা লিখেন। সেগুলির ভিতর কয়েকখানি 'ফুল মুলুকের গানে' স্থান লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপ্রকাশিত কবিতা আছে, তাহারই দুই-একটি এই স্থানে পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

"জাপানের 'শকুরা হানা' বিলেতের 'চেরী'
কাশ্মীর জুড়ে নাম 'গিলাস' মেরি
বরফ যেমন গলে গোলাপী তুলি
বোলাই নয়নে; শীতে ভোলাই ভুলি।"

* * *

"আইরিস আইরিস 'শোষণ'—কুঁড়ি
তোমার সুষমা শোভা পাহাড় জুড়ি'
ক্লান্ত চোখের তুমি নিধি আঁচলের
তুমি সে কাজল-লতা নীল কাজলের।"

কাশ্মীর হইতে কলিকাতায় ফিরিবার সময় কবিবর বহু 'Fern' জাতীয় পাতা ও সেখানকার তৈয়ারী কাঠের উপর নক্সার কাজ-করা নানা সৌখিন জিনিষ আনিয়া সুধীরকুমার ও বন্ধু-বান্ধবদের অনেককেই উপহার দেন। 'ফার্ন' পাতাগুলি দীর্ঘ দিন ধরিয়া তিনি তাঁহার বইয়ের 'পাত-চিহ্ন' স্বরূপ ব্যবহার করিতেন। ঐ পাতা ও কিছু কিছু সৌখিন দ্রব্য আমরা সুধীরকুমার ও সাংবাদিক প্রফুল্লকুমারের কাছে দেখিয়াছি। সেগুলি আজও পর্য্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহের স্মৃতি বহন করিতেছে।

সত্যেন্দ্রনাথ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সুধীরকুমার ও প্রফুল্লকুমারকে সঙ্গে লইয়া দার্জিলিং যাত্রা করেন। সে সময় 'লুইস জুবিলী স্যানি-টোরিয়াম্'-এ যাত্রীর অত্যন্ত ভিড় থাকায় হোটেলের মালিক সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গিদ্বয়কে হোটেলের নিকটবর্ত্তী এক ডাক্তারখানায় থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। প্রায় এক সপ্তাহ কাল ডাক্তারখানায় থাকিবার পর হোটেলে ফিরিয়া আসেন। দার্জিলিং-এ থাকা কালীন এক দিন প্রচণ্ড শিলা-বৃষ্টি হয়। কবিবর সেই শিলা-বৃষ্টিকে বিষয়-বস্তু করিয়া একটি মনোরম কবিতা লিখেন। কবিতাটি এই :—

"ঠিক দুক্কুর বেলা ঘুরঘুটি!
থই থই মেঘ কালো কুরকুটি!

ইন্দ্রের কোচ্‌ম্যান গলা খাঁকরায় !
ঐরাবতের পিঠে বেত হাঁকরায় !"

এই কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথের 'শিশু কবিতা' নামক পুস্তকে স্থান লাভ করিয়াছে। তিনি দার্জিলিং-এ প্রত্যহ একটি করিয়া কবিতা লিখিতেন এবং তাহা সুধীরকুমার ও প্রফুল্লকুমারকে আবৃত্তি সহকারে শুনাইতেন। কবিতার উপাদান-উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি কখনও বৌদ্ধ-মঠ 'ঘুম-গুম্ফা' আবার কখনও বা গভর্ণমেণ্টের পুষ্পোদ্যানে গিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিতেন। ঘুম-গুম্ফায় বসিয়া কখনও লামাদের জীবন-দর্শন লইয়া আবার কখনও বা কাষ্ঠ-ফলকে লিখিত 'ত্রিপিটক' লইয়া বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীদের সহিত আলাপ-আলোচনাও করিতেন। ঘুম-গুম্ফাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি যে কবিতা লিখেন তাহা এই।—কবিতাটি 'বেলা শেষের গানে' স্থান লাভ করিয়াছে।

"সেথা তন্দ্রার বীণকার মঙ্গল গায় !
সেথা মেঘ-মল্লীর বন অঙ্গন-ছায় !
সেথা অর্ব্বুদ পর্ব্বত অদ্ভুত ঠাম !
সে যে দুর্গম দুশ্চর যক্ষের ধাম !"

* * *

"সেথা লামাদের কপালের ডমরুর সাথ—
ওঠে কল্লোল-বংশীর তান দিন রাত !
সেথা চলে জপ অবিরল জপ-যন্ত্রে !
সেথা ঘোষে থাম 'মণি-পাম হুম' মন্ত্রে !"

সত্যেন্দ্রনাথ গান-বাজনা অত্যন্ত ভালবাসিতেন। পথে চলিতে চলিতে কাহারও বৈঠকখানায় গান-বাজনা শুনিলে তিনি সেই স্থানে রবাহূতের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন। অনেক সময় তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতেন। তিনি যে কেবল গান শুনিয়া খুসী হইতেন তাহা নহে। গানের অধ্যাপনা করিতেও ছাড়িতেন না। দার্জিলিং-এ পুষ্পোদ্যানে বসিয়া সুধীরকুমার ও প্রফুল্লকুমারকে দিনের পর দিন "তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে" এই গানখানির একটি চরণ তালিম দিয়া যখন গানের পুড়্‌য়াদের গলায় বসাইতে পারিলেন না তখন তিনি অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি তার পর গান ছাড়িয়া কবিতার অধ্যাপনা সুরু করিয়া দিলেন।

সুধীরকুমারের ইংরেজী ভাষায় কিঞ্চিৎ দখল থাকায় কবিবর তাঁহাকে একটি কবিতা অনুবাদ করিতে দিলেন। সুধীরকুমার-কৃত অনুবাদের উপর সত্যেন্দ্রনাথ-কৃত সংশোধনের একখানি প্রতিলিপি পাঠকদের কৌতূহল নিবারণার্থে এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সুধীরকুমারের কৃত অনুবাদটি এই :—

"সার্থ-জন্মা সুশিক্ষিত হয় যেই জন
সেবক না হয় যেই পর বাসনার
নির্ম্মল চিন্তার বর্ম্ম তাহার ভূষণ ·
সরল সাধুতা তার বিবেকের সার।"

কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথ সংশোধন করিয়া এইরূপ দাঁড় করাইলেন :—

"সার্থক জনম আর ধন্য শিক্ষা তার
সেবক না হয় যেই পর বাসনার
অন্তরের ধর্ম্ম আর চিন্তা নিরমল
সরল সাধুতা বিনা জানে না কৌশল।"

সত্যেন্দ্রনাথ দার্জিলিং-এ বসিয়া নানা ফুলের উপর আরও অনেক কবিতা লিখেন। ইহার ভিতর অনেকগুলি কবিতা অপ্রকাশিত বলিয়া মনে হয়। সুধীরকুমারের পুরাতন পুঁথি-পত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে এই টুকরা কবিতাগুলি পাওয়া যায়। তাহার কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"সব্‌জে রঙের কদ্‌মা ভেঙে কে চায় রে জুলজুল,
গোলাপ চেয়ে গোলাপী গা ক্ষুদে ভুক্রুচ্‌ ফুল।
ভুরভুরিয়ে উঠলো ফুটে ফুরফুরে হাওয়ায়,
কুচিয়ে গোলাপ ছড়িয়ে দিলে বসুমাতার গায়।"

* * * *

"মুক্তো পাতির পাতার পাঁতির মতির অলঙ্কার!
(তার) সবুজ পাতার দুই কিনারার মুক্তো কুঁড়ির সার।
সাধ ক'রে সে মাকৃড়ি পরে হাতে রতন চূড়,
ঝাপটা মাথায় নাকের-বেশর নাক করে সুড়সুড়।"

"রাত্‌-সিজ জাত-সাপ নাগ-কন্তে
মাঝ রাতে ফোঁস করে যেন হন্তে,
ফণা না দুধের ফেণা ওঠে ফোয়ারায় !
ফিকে জ্যোৎস্নায় ফুঁকো ফানুস ফোলায় !
ঝাঁটা-কাটা বলে 'ওটা পরী নিখাৎ' !
কাঁটাসিজ বলে 'ও যে আমারি স্বজাত'।"

সত্যেন্দ্রনাথ বড় ফুল ভালবাসিতেন। কখনও কখনও তিনি হয় বেল ফুল না হয় জুঁই ফুলের মালা হাতে জড়াইয়া ক্লাবে আসিতেন। তিনি তাঁহার মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে একতলার উঠানে ও দো-তলার ছাদে দেশী-বিদেশী নানা জাতীয় ফুলের গাছ টবে বসাইয়াছিলেন, এবং স্বহস্তে সেই গাছগুলির নিত্য পরিচর্য্যা করিতেন। কবিবর তাঁহার পিতামহ অক্ষয় দত্তের বাগান হইতে এলাচ গাছ আনিয়া মাটির টবে রোপণ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর সেই টবের গাছে ছোট ও বড় এলাচের ফুল ফুটিত। তিনি এই ফুলের উপর যে সুন্দর কবিতা আমাদের জন্য লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা এই—

"এলাচ ফুলের এলাক পোষাক ধবধবে বেশ গোপ্‌—
বলছে বটে, কিন্তু আছে রাঙ্‌চে নীলের ছোপ্‌।
দোল্‌ খেলেছে কবে আজো দাগ রয়েছে তার,
মাদ্রাজি রং পাকা কি না, ছাড়বে না ও আর।"

মুচুকুন্দ ফুলের উপর একটি মজার কবিতা লিখিয়াছেন। কবিতাটি পাঠকগণকে উপহার দিবার লোভ এ স্থানে সংবরণ করিতে পারিলাম না। কবিতাটি এই :—

"মুচুকুন্দর গায়ে সুন্দর গন্ধ গো
ওরি গন্ধে যত খাটমল অন্ধ গো,
—কে সে খাটমল ?—হুঁ হুঁ খাটমল ছারপোকা;
মুচুকুন্দর বিছানায় নাও ভাই খোকা।
মুচুকুন্দ জাগবে
যত খাটমল ভাগবে
করবে তুমি খুস
বৌদি দেবে ফুল নয়োরান !—ঘুমতেয়ে না ভুস !"

শ্রীচরণদাস ঘোষ

নয়

বালিগঞ্জের একটি বালিকা-বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটির আজ এক অধিবেশন—বেলা তিন ঘটিকায়। উক্ত কমিটির বে-সরকারী প্রেসিডেণ্ট ইনস্‌পেক্টর সাহেব। তিনি তাঁহার বালিগঞ্জের বাস-ভবনেয় বহিঃকক্ষে বসিয়া এই অধিবেশনের বিষয়-সূচির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছেন, তাঁহার টেবিলের বিপরীত দিকে বসিয়া আর একটি ভদ্রলোক। তাঁহার বয়স আন্দাজ চল্লিশ—সুদর্শন মূর্ত্তি। আভিজাত্যের দ্রুত কলরব তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে, মুখটি কিন্তু পৃথক্। দেহের রাজ-অট্টালিকা, তাহার বহির্দ্দেশে যেন এক নির্জ্জন পত্র-কুটীর—নিরহঙ্কার, নিস্তব্ধ। উক্ত কমিটির ইনি এক জন সদস্য। উভয়ে একত্রে যাইবেন। এমনিই সময়ে চাপরাশি আসিয়া ঘরে ঢুকিল, পশ্চাতে মলিন।

ইহাদের দেখিয়াই ইনস্‌পেক্টর সাহেব সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন—"এই যে এরা এসে পড়েছে!" বলিয়াই ভদ্রলোকটিকে কহিলেন, "নির্ম্মল, এই ছেলেটি—এর কথাই তোমাকে বোলে রেখেছি!" তার পর আপন মনেই কহিলেন, "ভালই হলো—নির্ম্মলও উপস্থিত।"

নির্ম্মল এতক্ষণ মলিনের দিকে নিনিমেষ নেত্রে চাহিয়াছিল, হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া নির্গত হইল—'বেশ ছেলেটি!'

ইনস্‌পেক্টর সাহেবের মুখে এক তৃপ্তির আলোক পড়িল। কহিলেন, "কালই ওকে ভর্ত্তি কোরে নিয়ো।" একটু থামিয়াই আবার বলিয়া উঠিলেন, "আমার বাড়ীতেই রাখতাম, কিন্তু আমার বাড়ী থেকে তোমার স্কুল অনেক দূর।"

নির্ম্মল মধ্য কলিকাতার একটি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেণ্ট। সেই স্কুলটি নির্ম্মলের স্বর্গীয় পিতা স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন—উহা ছিল তাঁহার অন্তরের সম্পত্তি। নির্ম্মল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "বিলক্ষণ! আপনার বাড়ী আর আমার বাড়ী কি পৃথক্? কাছে রেখে ওকে আমি নিজে দেখবো, তার পর কোচিং ক্লাসে—"

"বুঝলে ভায়া! স্কুলের সুনাম হবে। স্কলারশিপ তো পাবেই—'ষ্ট্যাণ্ড'ও করতে পারে।" ইনস্‌পেক্টর সাহেব সচকিত হইয়া চাপরাশিকে বলিয়া উঠিলেন, "ছেলেটিকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যা, কিছু খাইয়ে নিয়ে আয়, আর অম্‌নি—" হাতঘড়ির দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আর অমনি গাড়ী বার করতে বল্‌বি—"

"আমার গাড়ি তো রয়েছে—" নির্ম্মল কথার পিঠে কথা দিল।

ইনস্‌পেক্টর সাহেব হাসিয়া কহিলেন, "আমাকে তো আবার ফিরতে হবে।"

কথাটা নির্ম্মল যেন ফুঁ দিয়া উড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "আমারই গাড়ি রেখে যাবে'খন। মিটিঙ হয়ে এখন চলুন তো আপনার নাতনীর বাড়ী, নইলে কে অত জবাবদিহি করবে। আসবার সময় উনিও যত বার বলেছেন—'দাদুকে নিয়ে এসে।' আমিও তত বার বলেছি—'যথা আজ্ঞা।' বলিয়াই নির্ম্মল এক-মুখ হাসিয়া উঠিল।

সম্পর্কে ইনস্‌পেক্টর সাহেব হন নির্ম্মলের এক দাদাশ্বশুর। তিনিও সেই হাসিতে যোগ দিয়া কহিলেন, "তাই চলো—আচ্ছা।" বলিয়াই চাপরাশির দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই সে মলিনকে লইয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল এবং ক্ষণকাল পরে উহারা ফিরিয়া আসিতেই সকলে উঠিয়া পড়িল।

*　　*　　*

অপরাহ্ণ। চোরবাগানের এক সুবৃহৎ অট্টালিকার এক দ্বিতল কক্ষে অর্গানের সুরের সঙ্গে এক নারীকণ্ঠ গান ধরিয়াছে—'লাখ-লাখ যুগ হিয়া হিয়ে রাখনু—' ঠিক সেই সময় নির্ম্মলের মোটর ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিল।

ইনস্‌পেক্টর সাহেব হাসিয়া কহিলেন, "একেবারে চলন্ত আসর! আজ তবে দেখছি আমার অবস্থা কাহিল!"

নির্ম্মল গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, "তবেই, বুঝুন দাদু! আপনি যদি না আস্‌তেন, আমারই বা অবস্থাটা কি কোরে হৃষ্টপুষ্ট থাক্‌তো!" বলিয়াই হাসিয়া উঠিল। তার পর সকলে দ্বিতলে উঠিয়া গেল।

মেয়েটি জুতার শব্দ পাইয়া দ্বারপথে চাহিতেই দেখিল, সুমুখেই—'দাদু', নির্ম্মল ও তৎপশ্চাতে অচেনা একটি ছেলে—মলিন।

'দাদুকে' দেখিয়াই মেয়েটি সহর্ষে অগ্রসর হইয়া তাঁহার হাত ধরিল, তার পর মলিনের দিকে চোখ পড়িতেই বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—"এ ছেলেটি?"

প্রশ্নের উত্তর দিল নির্ম্মল। কহিল, "যার কথা সেদিন বলেছিলাম—দাদুর কুড়িয়ে পাওয়া!" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

কে কি কথা কহিল, তাহা বুঝি বা মেয়েটির কানে তুলিবার আর সময় নাই। 'দাদুকে' টানিয়া আনিয়া অর্গানের মুখে বসাইয়া দিয়া কহিল, "আজ কি হবে, জানো ত? নিছক 'বিদ্যাপতি!' হুঁ!" বলিয়াই একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া 'দাদুর' পাশে বসিল। নির্ম্মলকে কিন্তু আহ্বান করিবার কেহই নাই, বেচারা এদিক্-ওদিক্ হ'তে নিজেই একখানা চেয়ার আনিয়া বসিল। দাঁড়াইয়া রহিল—মলিন।

'দাদু' যেন পুলিশের হাতে পড়িয়াছেন। অসহায়ের ন্যায় কহিলেন, "বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস—কত বার ত হয়েছে, বীণা! আবার কেন?"

জবাবটা ছিল বীণার ঠোঁটেই। কহিল, "বার বার—লক্ষ বার! কিন্তু, তোমার গলা—ওই গলায় এই সব গান বার বার—লক্ষ বার নতুন শোনায় কেন?"

অপরাধ বটে! বীণার এই অভিযোগ মিথ্যা নহে। 'দাদুর' সুমিষ্ট কণ্ঠ ও সেই কণ্ঠে কীর্ত্তন অতি-বড় সঙ্গীত-বিদ্বেষীকেও মুগ্ধ করিয়া রাখে। 'দাদু' হাসিয়া কহিলেন, "তাই তো! গলার অন্যায়—'হেভি পানিস্‌মেণ্ট' হওয়ার দরকার! আচ্ছা—" বলিয়া অর্গানে হাত দিতে গিয়াই তাঁহার মলিনের দিকে চোখ পড়িয়া গেল এবং সচকিত হইয়া বীণাকে কহিলেন, "ও-ছেলেটি এখানে কেন আর দাঁড়িয়ে, ওকে—"

নির্ম্মল মুখের কথাটি কাড়িয়া লইয়া কহিল, "হ্যাঁ, ও নিজের

গিয়ে হাতে-মুখে জল দিক—" বলিয়াই ভৃত্যকে ডাকিয়া তাহার সহিত মলিনকে নিচে পাঠাইয়া দিল।

অতঃপর 'দাদু' বীণার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "ছেলেটি খুব ভালো! সবই তো শুনিছিস্‌ নির্ম্মলের কাছে?"

"আমি?"—বীণা মুখের ভাবটা এমনিই করিল যেন সে কিছুই জানে না, কিছুই শুনে নাই।

'দাদু' বিস্ময়ে নির্ম্মলের দিকে মুখ ফিরাইতেই নির্ম্মল হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "তার মানে, দাদু, আপনিও একবার বলুন, অর্থাৎ ওই সব কথা বল্‌তে গিয়ে অতিরিক্ত যে-সময়টা আপনার এখানে কাটবে, বীণার হবে তা 'ওভার-টাইম'!"

'দাদু' হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "বটে! আচ্ছা, আচ্ছা!" অতঃপর তিনি মলিনকে কেন্দ্র করিয়া যাহা-কিছু—সমস্তই মহাভারতের উপাখ্যানের ন্যায় বিবৃত করিলেন—মলিনের মা, তাঁহার অত্যুগ্র মাতৃশক্তি, তাঁহার চরম দারিদ্র্য, দারিদ্র্যের ভিতর তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্য মূর্ত্তি পবিগ্রহ, আত্মজের উপর সেই মূর্ত্তির প্রভাব, সেই প্রভাবেই গঠিত এই—মলিন! তার পর—গ্রামের লোক, তাহাদের অগ্রণী নিবারণ, তাহার প্রচণ্ড ঈর্ষা, ঈর্ষার করাল দংষ্ট্রায় মলিনকে নিক্ষেপ—ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ।

'দাদু'র বাক্যপ্রবাহে বীণা বাধা দিল না, আগ্রহও প্রকাশ করিল না। তিনি থামিতেই বীণা বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, এইবার—'আমার কথাটি ফুরোলো, নটে শাকটি বুড়োলো—' কেমন ত? 'নাউ রেডি'—"

'দাদু' অর্গানে হাত দিলেন। তার পর উপরি-উপরি কয়েকখানি সঙ্গীতের পর তাঁর ছুটি মিলিল।

যাইবার সময় বীণা প্রতিশ্রুতি চাহিয়া বসিল—"আবার কবে?"

নির্ম্মল হাসিয়া কহিল, "আর 'দাদুকে' নিমন্ত্রণ করতে হবে না—" বীণা নির্ম্মলের দিকে চাহিতেই, নির্ম্মল তেমনি হাসি-মুখেই শুরু করিল, "গরীবের ছেলে, কুড়োনো মাণিক, গচ্ছিত ধন তোমার কাছে রেখে যাচ্ছেন—মাঝে-মাঝে এসে না দেখলে উনি কি আর থাকতে পারবেন?"

'দাদু' হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তাই ত ভাবছি! হয়ত বা তোমাদের দরজা আমার কাছে উপস্থিত বন্ধই রইলো!" বীণার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "শুধু বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস নিয়ে থাকলেই চলবে না—বাইরের পৃথিবী, তার দিকেও চোখ তুলতে শেখ! 'দায়িত্ব' বোলে এক বস্তু আছে, তার সঙ্গেও একটু পরিচয় রাখা দরকার।"

বীণা ঠোঁট বাঁকাইয়া কহিল, "গরজ পড়েছে!" বলিয়াই দাদুর রাস্তা আটকাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বলো না দাদু, কবে আবার আসবে? নইলে—" চোখের এক ভঙ্গি করিয়া আঙুল তুলিয়া মনোমত এক কঠিন শাস্তির বিধান ইঙ্গিতে জানাইল।

'দাদু' এবার যেন হাসিয়াই খুন। কহিলেন, "আসবো রে, আসবো—শীগ্‌গির এক দিন। সেদিন কিন্তু বিদ্যাপতি নয়।"

"না—চণ্ডীদাস!"

'দাদু' স্মিতমুখে সম্মতির এক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই দ্রুতপদে নিচে নামিয়া গেলেন।

* * * *

নির্ম্মল আর বীণা, বীণা আর নির্ম্মল।

ইহারা ছিল নিঃসন্তান। এই বিশ্ব-সংসারে ইহারাই যেন মাত্র দুইটি প্রাণী—এ ওর প্রেমের প্রতিমা, ও এর পূজার বিগ্রহ! বাহিরের ঝঞ্ঝা বাহিরেই থাকে—এ বাড়ীতে প্রবেশ করে না। কলিকাতায় পঁচিশ-ত্রিশখানি বাড়ী—পিতৃ-পরিত্যক্ত প্রচুর কোম্পানির কাগজ—ব্যাঙ্কে অগাধ অর্থ—আর্থিক অভাব, তাহার প্রেতমূর্ত্তি, তাহার নৃত্য এ-বাড়ীতে নাই। নির্ম্মল শিক্ষিত—এম্‌-এ পাশ। আত্মবিক্রয় করিবার তাহার প্রয়োজন ছিল না—কলেজ ছাড়িয়াই পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত স্কুলের উন্নতিকল্পে সে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। স্কুলে তাঁহার বসিবার একটি স্বতন্ত্র কক্ষ আছে—'প্রেসিডেণ্ট রুম।' প্রত্যহ সে বেলা দশটায় স্কুলে যায়, চারিটায় আসে। সমস্ত কাজ সে নিজেই পরিচালনা করে। উহাই তাহার জীবনের আনন্দ, একমাত্র কাম্য—পিতৃ নির্দ্দেশ!

আর বীণা? তাহার পাঠ্যাবস্থার একটু ইতিহাস জানা গিয়াছে। ম্যাট্রিকে সে বৃত্তি পায়, আই এ পরীক্ষায় সে মেয়েদের ভিতর তৃতীয় স্থান অধিকার করে—বি-এ পড়িতে পড়িতে কলেজের পড়ায় হঠাৎ তাহার বিতৃষ্ণা জন্মে—পড়া ছাড়িয়া দেয়। অতঃপর এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া একই দেহে সে যেন লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে—এক হাতে সঙ্গীতের বীণা, অপর হাতে ঐশ্বর্য্যের ঝাঁপি! প্রথম প্রথম নির্ম্মল চেষ্টা করিয়াছিল তাহাকে একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের কমিটির প্রেসিডেণ্ট করিয়া দিবার, কিন্তু বীণা গম্ভীর হইয়া জবাব দিয়াছিল: "মেয়েদের বুদ্ধি, এ নইলে যদি মেয়েদের স্কুল না চলে, তা'হলে ও-সব পাঠ উঠিয়ে দেওয়াই ভালো!" সেই দিন হইতে নির্ম্মল স্ত্রীকে বহির্জগতে প্রকাশ করিবার আর কোন চেষ্টাই করে নাই। গৃহে বীণার বিগ্রহ ছিল স্বামী, সঙ্গী ছিল অর্গান, অনুসঙ্গী ছিল সংসার।

পরদিনই মলিন স্কুলে ভর্ত্তি হইল। প্রাচীন কালের আশ্রম-বালকের মতই এই বাড়ীতে তাহার ছাত্র-জীবন শুরু হইল। দুই মহল বাড়ী—বহির্বাটীর একাংশে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কেবল মাত্র আহারের সময় ভিতর-বাড়ীতে তাহার ডাক পড়ে, অবশিষ্ট সব সময়ই সে থাকে এই নির্জ্জন কক্ষে—একা। বই আর বই, পড়া আর পড়া—ইহা লইয়াই তাহার দিন কাটে।

মলিন কতকগুলি পুরাতন খাতা স্বতন্ত্র করিয়া বাঁধিয়া আনিয়াছিল—প্রয়োজনীয়, তবে নিত্য-প্রয়োজনীয় নহে। সেগুলিকে এক দিন খুলিয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতে-দেখিতে একখানি খাতায় কতকগুলি ডাকঘরের খাম ও চিঠির কাগজ দেখিতে পাইল। মলিন বুঝিল—উহা সন্ধ্যার কাজ। তাহার মনে প্রচুর আনন্দ হইল। মাকে একখানি পত্র দিবে! অবিলম্বেই সে একখানা সুদীর্ঘ পত্র লিখিল—এখানকার সমস্ত কথাই খুঁটিয়া। তার পর হরিনামের খোলের ভাঙ্গা কুচিগুলার মতই অবশিষ্ট খাম-টিকিট একধারে ঠেলিয়া রাখিয়া খাতার ভিতর মনোনিবেশ করিল।

এদিকে জামা-কাপড় আর তো পরা চলে না—ময়লা হইয়া গিয়াছে বিশ্রী। সেই যে কবে তুলে-বউ ক্ষারে কাচিয়া দিয়াছিল—আর কি ফর্সা থাকে? মলিন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। মাত্র দুইখানি কাপড়, দুইটি জামা—বেশি নয় যে, সে ধোপার বাড়ী দিবে, পয়সা ত নাই যে আবার কিনিবে! সাবান—হঠাৎ তাহার খামগুলির কথা মনে পড়িয়া গেল। সাত-পাঁচ ভাবিয়া বাড়ীর দরোয়ানকে একখানি খাম দিয়া ছয়টি পয়সা সংগ্রহ করিয়া একখানি সাবান কিনিল।

সেদিন রবিবার—দ্বিপ্রহর। নির্ম্মল আহারাদি সারিয়া শয়ন-কক্ষের জানালায় দাঁড়াইয়া আছে বহির্বাটীর দিকে মুখ করিয়া। দেখিল ভৃত্যদের ব্যবহারের নিমিত্ত যে কল-চৌবাচ্ছা, তথায় মলিন কাপড়ে সাবান দিতেছে; তাহার পদতলে উত্তপ্ত কলতলা, মাথার উপর প্রখর সূর্য্যরশ্মি—সর্ব্বাঙ্গে ঘাম, মুখময় ছিট্‌কানো সাবানের ফেনা। দৃশ্যটা যে নূতন তাহাও নহে, অথবা বিস্ময়কর—তাহাও নহে! দরোয়ান-ভৃত্যদের এ-কাজ সে বহু বার দেখিয়াছে, কিন্তু কোনো দিনই তাহা তাহার চোখে বিদ্রোহ তোলে নাই, কেন না, ধোপার মজুরি তাহারা যোগাইবে কি করিয়া? কিন্তু আজ এই আকস্মিক ছেলেটি, ইহার নিস্তেজ সঙ্গতির প্রতি সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়াও, সে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। একে আনাড়ি হাত, সেই হাতে কাপড়খানিকে কাচিয়া ফর্সা করিয়া তুলিবার প্রাণপণ প্রয়াস—সেই দৃশ্যে তাহার অন্তরের ঐশ্বর্য্য-কাব্যের পদে-পদে যেন ছন্দঃপতন হইতে লাগিল। বীণাকে ডাকিয়া পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া ওই দিক্‌টায় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখো, ছেলেটার কাণ্ড!"

কাণ্ডটার ভিতর অস্বাভাবিক কিছুই যেন দেখিতে পায় নাই, [illegible] প্রকাশ করিয়া বীণা উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "এই অপরূপ—ও ছবি! আমি মনে করি, কেউ বুঝি বা বাঁদর নাচাতে এসেছে!"

কথাটা বলিয়াই বীণা চলিয়া যাইবে, নির্ম্মল তাহার হাতটা ধরিয়া কহিল, "দাঁড়াও না! বলি, আমাদের ধোপাকে ফেলে দিলেও তো পারতো!"

বীণা উত্তর দিল—সঠিক, স্বাভাবিক। কহিল, "পারতো—যদি থাক্‌তো পয়সা!"

"কিন্তু, ঝি তো রয়েছে বাড়ীতে—একখানা কাপড়ই তো!"

"ঝি?—তার সঙ্গে এ কণ্ট্রাক্ট তো নেই!"—বীণা আর দাঁড়াইল না।

না থাক্। কিন্তু, একটা ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন তো। এক দিনকার ব্যাপার ইহা নহে—পরনের কাপড়, ইহা ময়লাও হইবে—কাচিতেও হইবে। এই সব কথা মনের ভিতর আলোচনা করিতে করিতে নির্ম্মল অন্যমনস্ক ভাবে ভিতর দিকের বারান্দায় বীণার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সে তখন কতকগুলি শুষ্ক বস্ত্র তুলিয়া গুছাইয়া পাট করিয়া আলনায় রাখিতেছে।

বীণা অতিরিক্তই ব্যস্ত, চোখ তুলিয়া চাহিবারও অবসর পাইল না। নির্ম্মল কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি যেন কী! কথাটা শুন্‌লেও না, বুঝ্‌লেও না!"

"আমি?"—বীণা এইবার চোখ তুলিল, বিস্ময়ে ভরা।

নির্ম্মল কহিল, "নইলে আর কে? বল্‌ছি কি—"

"জল ঘেঁটে ওর অসুখ করবে, পড়া মাটি হবে, সোনার ছেলে রাংতা হয়ে যাবে—এই তো?"—বীণা একমুখ হাসিয়া উঠিল।

বীণা কথাটা যদি বোঝে! সে নিজেও বুঝিবে না, বুঝাইবার সুযোগও দিবে না—মুস্কিল! বীণার মুখের দিকে বার কয়েক অসহায়ের ন্যায় চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "হতেও পারে।"

বীণা ঠোঁট বাঁকাইয়া কহিল, "কি মায়া! তবুও যদি একটা মেয়ে থাক্‌তো, বুঝ্‌তাম—শাঁখ বাজিয়ে ঘরে তুলতে!"

নির্ম্মল পাইয়া বসিল, কহিল, "মেয়ে—সে হতেও তো পারে?"

"হলেও, বিয়েটা হয় কি তাইনে—তুমি বড়লোক, আর ও গরীব!"

"তা বটে!"

বীণা চোখের এক মধুর ভঙ্গি করিয়া বলিয়া উঠিল, "অতএব, মশাই, আমার এজলাসে আপনার ওকালতি আর টিক্‌লো না!" বলিয়াই খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

প্রসঙ্গটায় বীণা এক হালকা যবনিকা টানিয়া দিয়া চলিয়া গেলেও নির্ম্মলের মনের ভিতর এক গোপন কাঁটা খচ্‌খচ্ করিতে লাগিল। মন আর মত—ইহাদের ভিতর কোনোও দিন তফাৎ হয় নাই, আর আজ অহেতুক তাহা হইবে কেন? ক্ষণকাল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চিন্তিত ভাবে চলিয়া গেল।

পরদিন অপরাহ্নে বীণা পাণ সাজিতে বসিয়াছে, নির্ম্মল কাছে আসিয়া বসিল। তার পর খামকা বলিয়া উঠিল, "দেখো, কাল যে-কথাটা বল্‌লে, ভেবে দেখলাম—ঠিকই বলেছ! আমাদের অত কি?"

বীণা বিস্মিত নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কি কথা?"

"ওই যে, ওই ছেলেটির কথা! জল ঘেঁটে যদি অসুখ-বিসুখই করে, করলো—তুমিই বা কি করতে পারো, আমিই বা কি করতে পারি!"

বীণার মুখে একটু হাসির আভা দেখা দিল। হাসিমুখেই কহিল, "মলিন—তার কথা?" বলিয়াই পুনশ্চ হাতের কাজে মন দিল, যেন কথাটায় কান দিলেও চলে, না দিলেও চলে।

নির্ম্মল আর যেন কথা পায় না! নিঃশব্দে আর-একটু বসিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, "আমাকে একটু চা দিবি না, বীণি—"

বীণা কৃত্রিম রোষে মুখ তুলিল, তুলিয়া কহিল, "তুই-তোকারি?"

নির্ম্মল অপরাধীর ভাণ করিয়া কহিল,—"ভুলে!"

বীণার আর পাণ সাজা হইল না। উঠিয়া তৎক্ষণাৎ এক 'কাপ' চা তৈরী করিয়া আনিয়া হাসিমুখে কহিল, "যাক্! ফাঁকি দিয়ে আজ আমার একটা লাভ হলো—কোনো দিন চেয়ে কিছুই খাওনি, আজ খেলে!" বলিয়াই সে পাণের সাজ-সরঞ্জাম চাপা দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

স্কুলে যাইবার সময় নির্ম্মল ও মলিন একত্র আহারে বসে। পর-দিনও যথাসময়ে উভয়ের একত্র 'ঠাই' হইয়াছে। প্রতিদিন 'ঠাকুর' অগ্রে 'বাবুর' ভাত দেয়, তার পর দেয় মলিনের। আজও তদ্রূপ 'বাবুর' থালাটা নামাইয়া দিয়া যেমন মলিনের থালা আনিতে যাইবে, বীণা তাহাকে নিষেধ করিল, করিয়াই সে নিজেই—স্বহস্তে ভাত বাড়িয়া আনিয়া মলিনের কোলে ধরিয়া দিল। 'ঠাকুর' সভয়ে প্রভু-পত্নীর দিকে তাকাইতেই, সে স্মিতমুখে কহিল, "তুমি যাও—"

ঠাকুর চলিয়া গেল।

নির্ম্মলও হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। প্রশ্ন করিল, "এ আবার কি হলো?"

বীণা হাত তুলিল—"চুপ!"

এই বিচিত্র নারীটিকে নির্ম্মল বিশেষ করিয়াই চিনিত, সে নিঃশব্দে আহার সারিয়া উঠিয়া পড়িল। মলিনও উঠিয়া কলতলায় আঁচাইয়া যেমন বাহির হইয়া যাইবে, বীণা দ্রুতপদে তাহার কাছে গিয়া কহিল—"তোমার ঘরের চাবিটা আমাকে দিয়ে যেয়ো, বুঝলে?"

মলিন ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল এবং বই-পত্র লইয়া স্কুল যাইবার সময় চাবিটা বীণাকে দিয়া গেল।

দ্বিপ্রহরে বীণা মলিনের ঘরের চাবি খুলিল। ভিতরটায় চাহিতেই, তাহার চোখে পড়িল ছেলেটির রচিত 'ইন্দ্রলোক'—বইগুলি সম্মুখেই—শৃঙ্খলায় সাজানো, একখানির পর একখানি। এক পাশে একখানি মাদুর, মাদুরের উপর পরিপাটি করিয়া ভাঁজ-করা একখানি কাঁথা—তাহার উপর ঢেউ খেলিয়া চলিয়াছে পাড়তোলা সূতার সেলাই, বিচিত্র বর্ণের। এই কাঁথাখানির উপর একটি বালিশ—পুরাতন কাপড়ের টুকরা দিয়া বাঁধা। এক কোণে দেওয়াল-গাত্রে আঁটা লম্বালম্বি একটা দড়ি, তার কিয়দংশ পাটের, কিয়দংশ নারিকেল-কাতার—মাঝখানে গাঁট দেওয়া। বীণা বুঝিতে পারিল—সেটি আলনা। ওই আলনায় ঝোলানো একখানি কাপড় ও একটি জিনের কোট—ময়লা, চটচটে! বীণা কাপড়খানা ও জামাটি টানিয়া লইয়া ঘর বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। তার পর সটান কলতলায় গিয়া সাবান দিতে বসিল—স্বহস্তে।

আহারান্তে ঝি-চাকর সবে ইতস্ততঃ অঙ্গ ঢালিয়াছে। নিকটেই শুইয়াছিল কুঞ্জ। কাপড়-কাচার শব্দে তাহার নিদ্রা-সুখে বুঝি বা রীতিমতই ব্যাঘাত ঘটিল। কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"কে রে কলতলায়? সুবাসী আঁটকুড়ি বুঝি? একটু শুইছি, না অমনি—ধপাধপ, ধপাধপ! আর 'টাইম্' পাও না মরতে?"

সুবাসী বাড়ীর ঝি, তাহার সহিত ভৃত্য কুঞ্জর সদ্ভাব ছিল না। সে-ও একটু পূর্ব্বে আঁচলটা বিছাইয়া নীচেকার দালানে গা গড়াইয়াছে। কুঞ্জর চীৎকার তাহার কানে পৌঁছিতেই সে যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। অধিকতর গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, "তোর মুখে মারি ঝাড়ির ঝ্যাটা! মর মুখপোড়া—চোখ কি ছুতোরের খোলায় পড়েছে? সুবাসী কোথায়, দেখে যা আঁটকুড়ো—দেখে যা বলছি—"

ওদিকে বীণার হাতের বিরাম নাই। বাপ রে—কি চিরকুটে কালো! কুঞ্জ তড়াক্ করিয়া উঠিয়া এদিকে আসিতেই দেখিল—মা!

'মা!'—কুঞ্জর কণ্ঠ দিয়া যেন যুগপৎ ভয়, লজ্জা ও বিস্ময় উপছিয়া পড়িল। অর্দ্ধোচ্চারিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কি করছো মা—ও কি?"

বীণা মুখ না তুলিয়াই, মৃদু কণ্ঠে কহিল, "এই দু'টোয় একটু সাবান দিচ্ছি, বাবা! পরের ছেলে আমাদের ছাঁচতলায় এসে দাঁড়িয়েছে, কি করি বলো?" বলিয়াই এক জোর আছাড় দিয়া বলিয়া উঠিল, "ইস্!—দেখেছিস্ কুঞ্জ, কি ময়লা বেরুচ্ছে—আল্কাতরা!"

"তুমি ওঠো, তুমি ওঠো—দেখো দিকিন্ একবার! আমরা কি মরে গেছি মা? ও সুবাসী—"

"মর ঝ্যাটা-খেকো—মর না তুই!" কুঞ্জর শ্রাদ্ধের বিধি-ব্যবস্থা করিতে করিতে সুবাসী মুখখানা গাঁড়ি করিয়া উঠিয়া আসিল। আসিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়াই কুঞ্জ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "সঙ—থম্‌কে আবার দাঁড়ালো! তোল, মাকে টেনে তোল্—"

সুবাসীর যেন হাত-পা আসিতেছিল না। পাথরের মূর্ত্তির ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "সোনার পিতিমে—রাজরাণী, তেনার একি কাণ্ট!"

"আরে মাগী, বক্তিমে রাখ—"

"দূর মুখপোড়া—"

সুবাসী এইবার সন্ত্রস্ত হইয়া কাপড়ের আঁচলটা কোমরে জড়াইয়া কলতলায় নামিয়া পড়িল এবং পশ্চাদ্দিকে একবার তাকাইয়া ভয়-কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওঠো, ওঠো, বাবু দেখলে আমাদের মাথায় কি আর 'হেট্' থাক্‌বে—কি কাণ্ট, কি কাণ্ট!"

বীণা জামাটা রগড়াইতে রগড়াইতে সুবাসীর দিকে ফিরিয়া মৃদু হাস্যে কহিল, "বাবু কি তোদের মাথা থেকে 'হেট্' কোনো দিন নামিয়ে নিয়েছে, হ্যাঁ রে সুবাসী?"

সুবাসী শিতরিয়া বলিয়া উঠিল, "কোন্ ভালোখেকি এ বাক্যি বলে? যে বলে, তার এহকালও নেই, পরকালও নেই।"

"তবে?"—বীণা জামাটা এইবার আছাড় দিতে লাগিল।

সুবাসী কি করিবে, কি বলিবে যেন মাথায় আনিতে পারিতেছিল না, কাপড়ের কসিটা বার-বার করিয়া খুলিয়া বার-বার শক্ত করিয়া আঁটিতেই লাগিল।

সুবাসীকে নিরস্ত দেখিয়া কুঞ্জ রাগে যেন ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতেছিল, সুবাসীর দিকে রক্তচক্ষু করিয়া বলিয়া উঠিল, "ইচ্ছে করে, দিই ওই দাঁতপাটিটে উড়িয়ে—যেন কুস্তি করছেন!" একটা মুষ্টি দেখাইয়া অধিকতর ঝাঁকিয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "এখনো দাঁড়িয়ে? 'মা' যাই মেয়েছেলে, নইলে আমিই এখখুনি—"

বীণা হাসিয়া ফেলিল। সেই হাসিমুখখানি কুঞ্জর দিকে ফিরাইয়া কহিল, "হলেই বা মেয়েছেলে, আমি তোদের মা তো! ছেলেরা কি মাকে ছোঁয় না, কুঞ্জ?" বলিয়াই কুঞ্জর দিকে এক স্নিগ্ধ কটাক্ষ করিল, করিয়াই কহিল, "কিন্তু, তোমাকে ত ছুঁতে হবে না, সুবাসীকেও তুলতে হবে না।—মলিনের জামা-কাপড় আমিই কাচ্‌বো। এ সব ছেঁড়া-পচা কাপড়—তুলে ধরতে গেলে যায়!" পরক্ষণেই সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "কুঞ্জ, আর দাঁড়িয়ে থেকো না, বাবা! একটা বাজে, টিফিনের ছুটি হবে—বাবু এলো বোলে! চায়ের জল চড়াও গে!" সুবাসীর দিকে ফিরিয়া নির্দেশ দিল—"ফলগুলো তুই ছাড়া গে যা! দেখ—পেঁপেটা আধখান দিবি, বেশ কোরে আগে ধুয়ে দিস্; আর বেদানা—একটি-একটি কোরে খুলবি, একটুও যেন হলুদে ছাল না থাকে! কলা দিবি দু'টো, আস্ত—কুচি-কুচি করিস্ না, খবরদার!" বলিয়াই খামকা তাড়া দিয়া উঠিল—"আমার হাতজোড়া, দেখচিস্ না?"

সত্যই তো—বাবু বুঝি বা এই আসিয়া পড়েন! উভয়েই উভয় দিক দিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

বীণার হাতের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, বাল্‌তির জলে নীলবড়ি গুলিয়া কাপড়-জামাটি একবার ডুবাইয়া তুলিয়া লইলেই হয়, এমন সময় বাহিরে মোটরের 'হর্ণ' বাজিয়া উঠিল, তার পর জুতার শব্দ, তার পরই একটি মূর্ত্তি—নিশ্বল!

নিশ্বল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল।

বীণা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "কুঞ্জ আর সুবাসী—ওরা তোমার টিফিনের যোগাড় করছে, খেয়ে নাও গে, লক্ষ্মী—আজকের দিনটি!"

বিরাট হিমালয়, তাহার বুকে এক নিবিড় অরণ্য, অরণ্যে রাশি-রাশি ফোটা-ফুল—লাল, নীল, হলদে, কৃষ্ণ-গোলাপী—তাহারই

অন্তরালে এক তপোবন, তাহারই ছায়ায় এক ঋষি-জায়া এক অনাবিষ্কৃত পুঁথি খুলিয়া—

—সে বীণা! আর তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া, বিস্ময়ে বিহ্বল—নির্ম্মল! * * * ক্ষণকাল পরে নির্ম্মল কহিল, "এ আবার কি খেয়াল?"

বীণা চুপ করিয়া রহিল।

নির্ম্মল পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, "বল্‌তে পারো, তোমাদের সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিকর্ত্তাটি কে?—তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, কোন্ ধাতুতে তোমরা তৈরী?"

বীণা এবারেও নীরব!

নির্ম্মল পুনরায় কহিল, "তোমরা যে-দেশে থাকো, সে-দেশে আমাদের থাকৃতে নেই, থাক্‌লে আমাদের চিরটা জন্ম মূর্খই হয়ে থাকৃতে হয়!"

বীণার এইবার কাজ সারা হইয়া গিয়াছে। জামা-কাপড়টা নিংড়াইয়া কাঁধে ফেলিয়াই সহসা ব্যস্ত-চঞ্চল হইয়া উঠিল। কহিল, "চ—লো! আমিও যাচ্ছি—আলনায় এই দু'টো ফেলে দিতে যা দেরি।"

কথাটা বলিয়াই যেমন সে উঠিয়া আসিবে, নির্ম্মল সম্মুখে আসিয়া বলিয়া উঠিল, "একটু দাঁড়াও। বলি, মুখের একটা কথা—ঝি-চাকর, কাউকে বল্‌লেই পারতে। ওরা কি ওদের কাপড়-চোপড়ে সাবান দেয় না, না, দিতে জানে না?"

"ইস্, এই এমনি কোরে?"—বীণা কাপড়খানা ফর-ফর করিয়া খুলিয়া ছড়াইয়া দেখাইল।

নির্ম্মল হাসিয়া কহিল, "তা বটে! ঠাকুর ভাত বাড়লে ভাত বাড়াও হয় না, ঝি-চাকর সাবান দিলে কাপড়-চোপড় ফর্সাও হয় না।" তার পর এক কটাক্ষ করিয়া পুনরায় বলিয়া উঠিল, "হাতে যদি 'ক্যামেরা' থাকৃতো তোমার একটা ফটো তুলে নিতাম। নিয়ে, পাঁচ জনকে ডেকে-ডেকে দেখাতাম, কেমন তোমাকে আজ মানিয়েছে। মাথার চুলগুলি এলোমেলো, সারা অঙ্গে সাবানের ফেনা, পরনে আধ-ভেজা কাপড়, কাঁধে-ফেলা একটি ছেলের জামা-কাপড়, আত্মবিস্মৃত, কলতলা থেকে এই উঠছ—রোদে ঘেমে নেয়ে উঠে।" বলিয়াই দ্বিতলে উঠিয়া গেল।

এই ঘটনার পর সপ্তাহ খানেক অতিবাহিত হইয়াছে, নির্ম্মল এক দিন বিশেষ মুস্কিলে পড়িল—মলিনের সম্বন্ধে একটা অতি প্রয়োজনীয় কথা বীণাকে জিজ্ঞাসা না করিলেই নয়! আগামী কাল স্কুল-কমিটির এক বিশেষ অধিবেশন, সেই অধিবেশনে উহাই বিষয়-বস্তু। খানিক ইতস্ততঃ করিয়া নির্ম্মল বীণাকে কহিল, "দেখো, স্কুল-কমিটির এক প্রস্তাব হয়েছে, কালই তার আলোচনা।"

বীণা আগে হাসে, তার পর কথা কয়। এক-মুখ হাসিয়া কহিল, "কি?"

নির্ম্মল কহিল, "এই—মলিনের কথা! ওর জন্যে এক জন 'প্রাইভেট-টিউটর' রাখবার কথা উঠেছে—টিউটরের মাইনে দেবে অবশ্য স্কুল-ফণ্ড—"

বীণা মিনিট-খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আমাকে কমিটির মেম্বর করেছ না কি?"

"না—তা নয়। তবুও—"

"তবুও শ্রীমতীর দ্বারস্থ না হ'লে তোমার অন্তস্তঃ চলে না—কেমন?" বীণা হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই নিজেকে স্বাভাবিক মাত্রায় দাঁড় করাইয়া কহিল, "কেন? এই যে তোমরা বলো—মলিন খুব ভালো ছেলে, 'ষ্ট্যাণ্ড' করবে?"

"তাই বোলেই তো। টিচারদের ইচ্ছা—প্রাইভেট-টিউটর রেখে ওকে স্পেশ্যাল কোচিং দেওয়া হোক্—তা' হলে একেবারে নিশ্চিন্ত!"

বীণার মুখখানা সহসা গম্ভীর হইয়া গেল। পর-মুহূর্ত্তেই মুখের ভাবটা পরিবর্ত্তিত করিয়া স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, "অনিশ্চিৎটা তা' হলে থেকেই যাক! তোমরাই বলো—মলিন গরীবের ছেলে, ওর মা—তাঁর দিন চলে পাঁচ জনের কৃপায়, দশ জনের লাঞ্ছনায়! সুতরাং, এই সব বড়মানুষী কাণ্ড—না, ওর সহ্যই হবে না!" একটু থামিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, "এর ভেতর আর একটা স্পষ্ট কথা আছে। সরস্বতী-ঠাকরুণ তা হলে কি করবেন, জানো? যে দায়িত্বটি তিনি এত দিন নিজেই নিয়ে আছেন, সেই দায়িত্বটি হঠাৎ তিনি নামিয়ে রাখবেন! তাঁর সেই কলঙ্ক, হয়তো তুমি-আমি সইতে পারবো, কিন্তু যারা দরিদ্র, সম্বলহীন—তাদের সমাজ—তারা তা সহ্য করবে না।" বলিয়াই যেন নিতান্ত অকারণেই এক-মুখ হাসিয়া উঠিয়া ঘাড় কাত করিয়া নির্ম্মলের মুখের কাছে মুখ আনিয়া কহিল, "বুঝলে ঠাকুর?"

আর তর্ক করা বৃথা। নির্ম্মল আর কথান্তর করিল না।

দশ

মাঝে দুই-এক মাস—দেখিতে দেখিতে তাহা কাটিয়া গেল। মলিনের আজ পরীক্ষার দিন। গত রাত্রি হইতেই মলিনের বই খোলা বন্ধ—বীণার নিষেধ। প্রতিদিন সকালে নির্ম্মলের জন্ত চা তৈরী করিয়া আনে বীণা, কিন্তু আজ আনিল কুঞ্জ। নির্ম্মল বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—"তোর মা?"

কুঞ্জ গম্ভীর হইয়া জবাব দিল, "মা গেছেন কালীঘাট।"

"কা—লীঘাট?"

"মা'র ফুল-বিল্বপত্র আনৃতে। দাদাবাবুর আজ পরীক্ষের দিন কি না?"

একা?

"না। সুবাসীও গেছে।"

"বটে!"—নির্ম্মলের মুখে এক চরম তৃপ্তি ও আনন্দের রঙ খেলিয়া গেল। চায়ের কাপে একবার চুমুক মারিয়াই পুনশ্চ কহিল, "মলিনকে চা দিয়ে এসেচিস্?"

"এখন নয়। মা আসৃবেন, মুখে চন্নামিত্তি দেবেন—তার পর!"

নির্ম্মল হাসিয়া কহিল, "তবে এক কাজ কর—জল চাপিয়ে রাখ। তোর মাও তো চা খেয়ে যাননি!"

"মায়ের আজ যে উপোস! চণ্ডীপাঠ হবে, তার পর মা মুখে জল দেবেন—সেই সন্ধ্যের পর!" কুঞ্জ আর দাঁড়াইল না।

ক্ষণকাল পরেই বীণা ফিরিয়া আসিল। তাহার পরনে মটকার সাড়ী, চাবিশুদ্ধ আঁচলটা গলায় ঝোলানো, মাথায় একমাথা ভিজা চুল—পিঠময় ছড়ানো, কপালে বড় করিয়া সিঁদূরের টিপ, হাতে চরণামৃতের ঘটি। বরাবর উপরে উঠিয়া নির্ম্মলের কাছে গিয়া চরণামৃতের পাত্রটা তুলিয়া কহিল, "এসো দিকিনি—"

মহাত্মার সফর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বায়ুতে দগ্ধের গন্ধ, ঝলসিয়া গেছে তরু-লতা,
মানুষের মুখে নাহি কথা,
রক্ত ও অঙ্গারে আঁকা শুষ্ক মানচিত্র পড়ে আছে,
জড়ীভূত প্রাণ মৃত্যু যাচে,
অবলুপ্ত মনুষ্যত্ব, সুকোমল বৃত্তি সব হারা,—
মূর্ত্তি ক'টা আছে শুধু খাড়া।
নিহতের রক্ত-দাগে সারি দিয়া চলে পিপীলিকা,
বিড়াল-ক্রন্দনে বিভীষিকা,—
সুপারীর দগ্ধ শাখে ভীত-ত্রস্ত বসে দাঁড়কাক,
কণ্ঠে তার অমঙ্গল ডাক।
পিঞ্জরেতে দগ্ধ শুক, নারিকেল তরু-শিরে আঁচ
গোটা দেশে পড়িয়াছে বাজ।

এই অপমৃত্যু-রাজ্যে চলিয়াছে শীর্ণ এক নর,
বক্ষ যার ব্যথায় কাতর,
অহিংসা যাহার মন্ত্র অহিংসায় যার অনুরাগ,
সঙ্গী যার ভক্তি আর ত্যাগ।
শরাহত হংস সম মোহাচ্ছন্ন পড়ে নোয়াখালি
যে বাঁচাবে প্রেম-অশ্রু ঢালি।
অহল্যা প্রস্তরীভূত মহা-মানবের পরশন
ফিরে দেবে নূতন জীবন।
বাণী তার ভস্ম-রাজ্যে উদ্ধারের বার্ত্তা যেন বহি
চলিয়াছে গঙ্গা দ্রবময়ী।
অহিংসার জয়যাত্রা ঘুচাইবে হিংসার বিক্রম
দস্যু-ভূমি হইবে আশ্রম।

"বিছানার কাপড়—"

"তা হোক্। 'অপবিত্র, পবিত্রো বা—"

নির্ম্মলও আনাড়ির ন্যায় আবৃত্তি করিয়া উঠিল, "অপবিত্র, পবিত্রো বা—"

বীণা হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "আমি পুরুত-ঠাকুর না কি? নাও, হাঁ করো—"

নির্ম্মলের মুখে চরণামৃত দিয়া বীণা নিচে নামিয়া গেল।

পরীক্ষার 'হলে' নির্ম্মল মলিনকে দিয়া আসিবে। বেলা নয়টা বাজিতেই সে যেমন নিচে নামিবে, সম্মুখেই মলিন—তাহার পশ্চাতে বীণা, সুবাসী ও কুঞ্জ। নির্ম্মলের সর্ব্বাগ্রে চোখ পড়িল মলিনের উপর। কথনো তাহার মাথায় চিরুণী পড়ে নাই, আজ চুলগুলি পরিপাটি করিয়া আঁচড়ানো—কপালে দইয়ের টিপ, পরিধানে সাবানে-কাচা ফর্সা কাপড় ও গায়ে তালি-দেওয়া জিনের কোট।

বীণা দ্রুতপদে আগাইয়া গিয়া বারান্দার এক কোণে একটি ছোট ঘর খুলিল। নির্ম্মলও দলে মিশিয়াছিল, উক্ত ঘরটির সুমুখে আসিতেই তাহার চোখে পড়িল—বারিপূর্ণ পিত্তলের একটি ঘটি, তদুপরি আম্রশাখা। বীণা মলিনকে কোলের গোড়ায় টানিয়া লইয়া ঘটিটির প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "ঘট প্রণাম করো—"

নির্দ্দেশ মত যেমন মস্তক নত করিবে, নির্ম্মল চট্ করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "আগে ওঁকে—" বলিয়াই মলিনকে বীণার কোল হইতে টানিয়া লইয়া বীণার দিকে তাহার মুখ ফিরাইয়া ধরিল। নির্ম্মলের মুখের দিকে যেন আর চাওয়া যায় না—কী দুর্দ্দান্ত তেজ, দুর্দ্দম্য আনন্দ, দুঃসহ আলোকচ্ছটা!

এই শুভক্ষণে কি হইতে কি হইয়া গেল, কেহই সহসা ঠিক করিতে পারিল না। কুঞ্জ ও সুবাসী বিভ্রান্ত নেত্রে একবার 'বাবুর' দিকে তাকাইয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল—তাঁহার এতাদৃশ অস্বাভাবিক মূর্ত্তি ইতিপূর্ব্বে আর কোনও দিন তাহাদের চোখে পড়ে নাই। একটু পরে দেখা গেল, সুবাসীর চোখে জল আসিয়াছে, বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছিয়া অশ্রুনিরোধ কণ্ঠে কহিল, "তাই বটে! মা যেন মন্ত্যের পিতিমা!"

কুঞ্জ এক পা এক পা করিয়া পিছন হাঁটিয়া আড়ালে সরিয়া গেল।

মিনিটের পর মিনিট কাটিয়া যায়! নির্ম্মল ব্যস্ত-চঞ্চল হইয়া মলিনের মুখটা তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "নাও, দেরি কোরো না!"

মলিন বীণার দিকে একটি বার তাকাইল এবং পরক্ষণেই ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহার পদতলে একবার মাথা ঠেকাইয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মলও প্রচণ্ড পুলকে মলিনের মুখে একটি চুমা খাইয়া বীণার দিকে ফিরিয়া প্রবলোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, "দ্বাপর-কলির আজ এক নতুন খবর পেয়েছি—মৃত্যু হয়েছে দেবকীর, কিন্তু যশোদার হয়নি!"

অতঃপর নির্ম্মল যেমন মলিনকে লইয়া বাহির হইয়া যাইবে, বীণা হাত তুলিয়া বাধা দিল। আবার সে নিজেই ঘট স্পর্শ করিয়া হাতটি মলিনের মাথায় একবার রাখিয়াই এক দিকে সরিয়া দাঁড়াইল, যেন সে মৃৎ-প্রতিমা, যাহার ভিতরকার স্পন্দন মিলে কল্পনায়—স্পর্শে নয়!

নির্ম্মল বিমুগ্ধ নেত্রে ওই মানবী-মূর্ত্তিটির দিকে একটিবার চাহিয়াই মলিনকে কোলের কাছে সাজাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

আজ ঠিক এই ক্ষণে, এই দুর্দ্দান্ত মুহূর্ত্তে এক দূর-পল্লীর একটি ভগ্ন-গৃহে এই পরীক্ষার্থীর জননী—তিনিই বা কি করিয়া বেড়াইতেছিলেন, কে জানে? ঠাকুর, দেবতা, মঙ্গল-ঘট—এদের তিনিও তো চেনেন!

[ক্রমশঃ

শিল্প-তীর্থে

প্রভাত বসু

শিল্পী যামিনী রায় সম্পর্কে লিখতে দ্বিধা হচ্ছে। প্রথম কারণ, তিনি তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা পছন্দ করেন না। বলেন, যাঁরা আমার ছবির প্রশংসা করেন তাঁদের অধিকাংশের পক্ষেই এই ছবি ভাল লাগা অসম্ভব। অর্থাৎ এঁদের অন্তর যামিনী বাবুর পটগুলিকে গ্রহণ করতে না পারলেও মুখে বাহবা দিয়ে সমঝদার বনতে চান। বোঝা বা ভাল লাগা "অসম্ভব", কেন না, যে মন এই শিল্পের রস সহজে পরিপাক করতে পারে—নানা অশিক্ষার চাপে, ফাঁকির গভীরে এঁরা সেই মন হারিয়ে ফেলেছেন। তাই তাঁর ছবির সমালোচনাকে তিনি সন্দেহের চোখে দেখেন। আমার ভরসা এই, এ প্রবন্ধ মতামত প্রকাশের বাহন নয়, প্রশ্নোত্তরের বিবরণ মাত্র। আলোচনা সংক্ষিপ্ত ও প্রধানত: ব্যক্তিগত হলেও এর মধ্যে বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় শিল্পীর মনের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস। দ্বিধার দ্বিতীয় কারণ, যাঁকে শিল্পি-সার্বভৌম বলে সম্বোধন করতে ইচ্ছা যায় তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের স্পর্শটুকু মনকে এমনই অভিভূত করে যে, সে অনুভূতির প্রকাশ লেখায় দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। শিল্প সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে বাঁধা বুলি কপচিয়ে বেড়ানো আমাদের অভ্যাস, তাই যামিনী বাবুর শিল্পিপ্রাণের তরংগস্পর্শে চিন্তাবিলাসী মন প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। নতুন ইংগিত মস্তিষ্কের চেয়ে গভীরতর জায়গায় ছায়াপাত করে। তারি আভাষটুকু দেবার চেষ্টা করব।

কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর ছবির প্রদর্শনী হবে। নতুন ছবির কাজে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর ছেলেরা আঁকবার উপযোগী রং তৈরী করছিল পাশের ঘরে। অল্প সময়ে কথাবার্তা সারতে হ'বে বললেন বটে, কিন্তু তদগতচিত্ত শিল্পী কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই যেন শিল্পী-প্রসঙ্গে মেতে উঠলেন। অর্বাচীনের প্রশ্নে তিলমাত্র বিরক্তি বোধ না করে অমূল্য তথ্য পরিবেশন করলেন সহজে, অকৃপণ দাক্ষিণ্যের সংগে। শিল্পি-বন্ধু সুনীলমাধব সেনগুপ্ত বিলিতি ঢংএ আঁকা কয়েকটি ছবি যামিনী বাবুকে দেখবার জন্য নিয়ে গিয়েছিল। তার মনে ভয় ছিল দেশপ্রাণ শিল্পিবর হয়ত বিলিতিয়ানার প্রতি কটূক্তি করবেন। তিনি বললেন, "বা:, বেশ আঁকা হয়েছে—এ ত নিন্দে করা যায় না!" বন্ধু বলল, "এ পথে তৃপ্তি পাই না, ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকবার সাধ যায়।" উত্তরে শুনলাম,—স্বধর্মে থাকাই শিল্পীর শ্রেষ্ঠ সাধনা। যে যে-আঙ্গিক অবলম্বন করেছে তার সিদ্ধি সেই পথেই। এটা ভাল, ওটা মন্দ বলবার উপায় নেই। গুহাবাসী মানুষ থেকে আরম্ভ করে আজকের সভ্যতাবিলাসী শিল্পিসমাজ পর্যন্ত সৌন্দর্য-সৃষ্টির নানা ধারা নানারূপে অভিব্যক্ত হয়েছে—সমগ্র দৃষ্টিতে দেখলে উন্নতির দিকেই চলেছে বলতে হবে—তবু যেখানে যে জাত নিজস্ব ভংগী পরিহার করে পরগাছা-বৃত্তি অবলম্বন করেছে সেইখানেই তার শিল্পস্রোত গেছে শুকিয়ে—জীবন হয়েছে ভংগিসর্বস্ব। ভারতের ভাগ্যেও এই অভিশাপ জুটেছে। ভারতের স্বকীয় শিল্পদৃষ্টি খর্ব হল সেদিন যেদিন সে অপরের শেখানো আঁখিভংগী নিজের বলে গ্রহণ করল। কথায় বলে ধর্মের ধার ক্ষুরের ধার। এ পথে স্থির থেকে চলা বড় কঠিন। পতন যখন হ'ল, সে একেবারে তলিয়ে গেল। সহজাত শিল্পবুদ্ধি পরিণত হয়ে ঝরে পড়ল। আবার সুরু হল তার প্রথম পাঠ, কিন্তু বিকৃত ভাষায়। সেই হারামণি উদ্ধার করবার কাজে আমি লেগে রয়েছি—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থাকব। আমি জানি আমি সার্থক—আমার শিল্প স্থায়ী হোক্ এ আমি চাই না। সত্যপথ খুঁজে পেয়েছি, এই আমার আনন্দ। হাত পাকিয়েছি নানা পদ্ধতিতে কিন্তু আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিলুম এমন এক সম্পদ যা আমাদের নিজস্ব অথচ শিল্প হিসাবে শাশ্বত। ছোট ছেলেরা যেমন খেলা করে এও তেমনি খেলা—কিন্তু তফাৎ আছে। আমি এ না করে পারি না, এই আমার জীবনের প্রকাশ। তিল তিল সাধনার রসে এ পুষ্ট এ মনকে চোখ ঠারাও নও, ফাঁকিও নয়। তবে একটু খাদ মেশাতে হয়ই ত। Pure Artএর ত কোনো রূপ নেই!...যামিনী বাবুর ছেলেরা পাশের ঘর থেকে বলে উঠল—"বাবা, রং তৈরী হয়ে গেছে।" স্নেহসিক্ত কণ্ঠে প্রৌঢ় শিল্পী বললেন,—"যাই, বাবা!" প্রতিভায় উদ্ভাসিত মুখখানিতে কতকগুলি কোমল রেখার ঢেউ খেলে গেল!

প্রশ্ন করলাম, শিশুদের আঁকা ছবির সংগে আপনার ছবির তফাৎ কিসে? বললেন, আকাশ-পাতাল তফাৎ, পাগল আর দার্শনিকে যতখানি। আমি অনেক ধাপ পেরিয়ে এসেছি, বুড়ো হবার পর মনকে শিশুর মত করে তৈরী করবার চেষ্টা করছি সজ্ঞানে। এ বড় শক্ত ব্যাপার। দৃষ্টি যতই স্বচ্ছ হতে থাকবে ততই শিল্প-সৃষ্টি সহজ রূপ নেবে। শিশুর পক্ষে এই দৃষ্টি ত সম্ভব নয়? তবে শিশুর কাছ থেকে প্রেরণা নিতে হবে বৈ কী? এদেশে শিশুদের আঁকা ছবি প্রদর্শনের পত্তন ত আমিই করলুম। নইলে আমার যে চলে না। এ কথা তোমাদের জানা দরকার! আশুতোষ ম্যুজিয়মে প্রদর্শনী করে কি ফল হবে যদি না এই বোধ আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসে? বিদেশের লোকেরা এই সব করে বলে আমরাও হঠাৎ উৎসাহী হয়ে পড়ি। কিন্তু নিজেদের প্রাণের টান কই? শিশু-শিল্প, প্রাচীন শিল্প, পল্লীশিল্পের প্রতি সব দেশই শ্রদ্ধা দেখায় বটে, কিন্তু ওদের মত আমাদের ঐকান্তিকতা কোথায়? যাদের সত্যিকারের মা ও ছেলেকে দেখে ভাব জাগে না তারা আমার ঐ পটগুলো দেখে অভিভূত হবে এ কথা আমি কেমন করে বিশ্বাস করতে পারি? আমার কাজ, আমি এই ভাবে আঁকলুম—সাড়া দিল বিদেশী দর্শকরা এসে। এ ছবির জন্য তাদের কি passion! তাদের কাছে এই ছবিগুলো বিচিত্র বার্তা বয়ে নিয়ে এলো। এ ত চোখের দেখা নয়, প্রাণের দেখা। বিশ টাকা ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে বিদেশী জনসাধারণ খুঁজে খুঁজে এই গলিতে এসে আমার ছবি দেখে যায়, তাদের কি দায় পড়েছিল? তারা বুঝল, খাঁটি ভারতীয় জিনিষ পেয়েছে। Beverley Nichols আর সবাইকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিলেন, আমাকে পারেননি। এইখানে আমার সার্থকতা। আর টাকাও ত পেলুম—সেটা উপরি পাওনা।

ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, "আমাদের জাত মরে আছে, তারা দেখতে শিখল না তাদের নিজেদের জিনিষকে।" জিজ্ঞাসা করলাম, "কোনো আশা নেই কি?" উত্তর এলো—"নিশ্চয়ই।" নইলে কিসের জন্যে এত খাটছি? সেই হারানো consciousnessকে ফিরিয়ে আনতে হবে।" বললুম, বিষ্ণু দে আপনার চিত্রাবলী সম্পাদনা করছেন—দেশের লোকের আর্ট-জ্ঞান তাতে জাগতে পারে। বললেন, ও-সবে কিছু হবে না। বিষ্ণু বাবু আমায় ভালবাসেন ঠিকই কিন্তু এই প্রচারকার্য ফলবতী হ'বে না। যারা ছবি দেখতে জানে তারা ত আমার বাড়ীতেই ছুটে আসত—বইয়ের অপেক্ষায় তারা থাকে না।

ও-সব ইংরিজিয়ানা। ওদের নকল করে আমরা নিজেদের ভুলতে বসেছি!

পট সম্পর্কে কথা উঠতেই বললেন,—এই দেখ, পটশিল্প বা কালীঘাটের পট বলে কোনো কথা বাস্তবিক নেই। এটা ওদের কাছ থেকে তোমরা শিখেছ, না, তোমাদের কাছ থেকে ওরা শিখেছে জানি না,—কিন্তু আসলে পট মানে চিত্র, যে কোনো ছবিই পট। সব দেশের শিল্প-সৃষ্টিই পটে আঁকা। এ দেশের এক ধরণ, ও-দেশের আরেক। আমি যে ধারায় আঁকি সেটা বাংলার ধারা। এই পথেই আমাদের শিল্পোন্নতি ঘটেছিল। তার পর নতুন সভ্যতার মোহে সেটা হ'ল অচল। নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই করলুম। এম-এ পাশকে দিই একশো টাকা মাইনে আর মহা পণ্ডিতকে পঁচিশ টাকা। আবার কবে সেই স্রোত ফিরে আসবে তাই ভাবছি! সজ্ঞানে নিজস্ব ভংগীকে যখন আদর করতে শিখব তখনই হ'বে শিল্পের পুনরুজ্জীবন।

রবীন্দ্রনাথের ছবির কথা উঠতে বললেন, ফরাসী ও অন্যান্য বিদেশী শিল্পীরা অনেক দিনের সাধনায় যেখানে পৌঁছেছেন, তারি হাওয়া কবির গায়ে লেগে গেল। সাহিত্যের সাজগোজের মধ্যে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল। এবার রং-রেখার ছন্দে তা মুক্তি পেল। কিন্তু সেই বহু দিনের ধাপে ধাপে ওঁর সাধনা ছিল না বলে এ আর্ট অসম্পূর্ণ। কবিকে এ কথা জানিয়েছিলুম। তিনি কিন্তু খুব খুসি হয়েই আমায় সমর্থন করেছিলেন।

আমি চাই এমন ঢংএ আঁকব সেটা সম্পূর্ণ আমাদের। যেমন চীনা-শিল্পীর আঁকা ছবি বলে দিতে হয় না চীন দেশের লোকের আঁকা বা ইতালীয় ছবি য়ুরোপের শিল্পীর হাতের কাজ—তেমনি এমন ছবি আঁকতে হ'বে যা দেখে জনসাধারণ বলবে—হ্যাঁ, এই ভারতের আসল ঢং! শিল্প যদি এখানকার মাটির রসে পরিপুষ্ট হয়ে, সংমিশ্রণ না থাকে—তবে তার দাম লোককে দিতেই হ'বে। এরই অভাব ঘটেছে আমাদের দেশে। বিদেশীরা এখানে এসে দেখে, তাদেরই নানা রকম নকল চলেছে—ভাল লাগবে কেন? বললাম, চীনা শিল্পগুরু Peon ত আপনার ছবির খুব প্রশংসা করেছিলেন। উত্তর এল—প্রাচ্যদেশীয় শিল্পীর appreciationএর বেশি দাম দিই না; যখন দেখি যাদের এগুলির সংগে কোনো যোগ নেই, যাদের সংস্কৃতি আমাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্, তাদের প্রাণে সুর জাগিয়েছে এ ছবি—তখন শিল্পের স্বকীয়তা ও বিশ্বজনীনতা একই সংগে বুঝতে পারি। নর ও নারীর মধ্যে কত তফাৎ, তবু ত নিবিড়তম মিলন সম্ভবপর হয়! আর একটা কথা। এক দিকে মদ্য মাংস অন্য দিকে সাত্ত্বিক আহার—এ যেমন দু'রকম জীবন-ধারা, শিল্পেও তাই। বাস্তব চিত্র একেবারে যেন জ্যান্ত মানুষ—তার অনুভূতি এক স্তরের আর আমার ছবি অন্য স্তরের। এতে উত্তেজনা নেই—প্রশান্তি আছে। ভাব-টাব ফোটাতে চাই নে, মনের মত করে সাজাতে চাই। এই দেখ না, এই গরুটার চোখ দুটো বড় বড় করেছি বলে বাঁটগুলোও বড় করতে হয়েছে। এখানে composition, balanceএর জ্ঞান থাকা চাই, ফাঁকি দিলে চলবে না। বন্ধু বলে উঠলো—পাশের ঐ ছেলেটি নিশ্চয়ই কেষ্ট-ঠাকুর? বললেন,—না, না ও একটি ছেলে। তোমরা বড় বড় কথা, বড় বড় ভাব ছবির থেকে খুঁজে বের কর—ওটা বিলাসিতা ছাড়া কিছু নয়। আমার আঁকবার ধারাটি এই রকম তোমার ভাল লাগল, বেশ—না লাগল, বয়েই গেল। প্রত্যেক শিল্পীরই একটি স্বতন্ত্র ভংগী আছে—সেটা কতখানি real, তার পরেই ছবির মূল্য নির্ভর করে। এই ছবি আগে বাংলাদেশের লোকের ভাল লাগত—এখন লাগে না। আবার ভবিষ্যতে হয়ত লাগবে। সে আমার ভাববার প্রয়োজন নেই। আমার এই কাজ, করে গেলুম, ফুরিয়ে গেল। এই ঘরটাই হ'ল আমার জগৎ—এই আমার ব্রত!

চার পাশের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখলাম— খঞ্জনি-হাতে বৈষ্ণব, তিনটি সখী, সন্ন্যাসী ঠাকুর, রংবেরঙের পুতুল—সবাই যেন শিল্পীর এই কথায় সায় দিয়ে উঠল।······শহরে বদ্ধ হাওয়ায় মন ভারাক্রান্ত ছিল। আকাশের ছোঁয়া লেগে তার পরিধি ছড়িয়ে পড়ল দিগন্তে। অনেকখানি সম্পদ্ আর বুকভরা তৃপ্তি নিয়ে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।*

---

* এটি শুনে শিল্পী বললেন, "সবই ঠিক হয়েছে, এইগুলিই আমার কথা। কিন্তু শ্রদ্ধা-ভালবাসার রং মিশিয়ে আমাকে এমন রূপ দিয়েছ যে লোকে ভাববে—আমি বড় অহংকারী, সবাইকে বাণী দিয়ে বেড়াচ্ছি। এই জন্যে আমার সম্বন্ধে লেখা আমি পড়লে, কুণ্ঠা লাগে।" অপরাধের দায়িত্ব নিয়ে বিচারের ভার পাঠকদের ওপর ছেড়ে দিলাম।

গ্রীষ্মের দুপুর

গোপী রায়

হা-হা করে' জ্বলে মাটি, জ্বলে মন—বৈশাখের মন।
শাণ পুড়ে' তপ্ত হলো, পিচ-গুলো গলেছে কখন।
পিপাসায় বুক ফাটে, অগ্নি ক্ষরে জ্বলন্ত দুপুরে।
ঘামে দেহ সিক্ত হয়, দিবা-স্বপ্ন যায় ভেঙে-চুরে।

বিজলী পাখার বায়ু দেয় না কি চোখে ঘুম এনে।
পাংখা-পুলার মরে আদালতে পাখা টেনে-টেনে।
মধ্যবিত্ত আমাদের একমাত্র আছে হাত-পাখা—
বাতায়ন বন্ধ করে' শীতল পাটিতে পড়ে' থাকা।

বারে বারে জল খাই—মেটে না কো প্রাণের আশ্বাস।
কোনোখানে এতোটুকু হাওয়া নেই,—জ্বলন্ত আকাশ
রাশি রাশি রৌদ্র-বৃষ্টি করিতেছে মাথার উপরে
খসখস কোথা পাবো আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরে?

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

পঞ্চানন ঘোষাল

প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ধনকুবের মাণিকলাল দত্তের প্রাসাদোপম বাসভবনে তাঁর একমাত্র কন্যা-সন্তান মিস্ হেনা দত্তের জন্মদিন উপলক্ষে সে দিন একটা বড় রকমের প্রীতিভোজের ব্যবস্থা হয়েছে। সমুদয় ভবনটি সমুজ্জ্বল আলোকমালায় আলোকিত। সম্মুখের গেটগুলি এমন কি উদ্যানের বৃক্ষগুলি পর্য্যন্ত আলোকে আলোকে আলোকিত হয়েছে। উদ্যানের মধ্যকার লাল কাঁকরের রাস্তাটিতে মোটরের ভীড় বেড়েই চলেছে। সহরের নাম-করা বহু ধনী ও পদস্থ ব্যক্তিই এই প্রীতিভোজে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রণব ও শৈলেশ বাবুও ছিলেন। একমাত্র এঁরা দু'জনাই পদব্রজে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিলেন। মোটরের ভীড় ঠেলে উৎসব-গৃহে এসে এঁরা দেখলেন, প্রীতিভোজ তখনও সুরু হয়নি। মাননীয় অতিথিদের মধ্যে অনেকে তখনও পর্য্যন্ত এসে পৌছাননি। মিস্ হেনা উৎসব-গৃহের দুয়ারে দাঁড়িয়ে একে একে অতিথিদের সংবর্দ্ধনা জানাচ্ছিলেন। আজকালকার দিনে একটি সুন্দরী স্ত্রী এবং একটি মোটর গাড়ী, কিংবা এই দুই জিনিষের যে কোনও একটি সঙ্গে না থাকলে মানুষের খাতির হয় না। এই জন্য অনেকেই সস্ত্রীক মোটরে এসেছেন। প্রণব এবং শৈলেশ বাবু পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তার উপর তাঁরা না এসেছেন মোটরে, না এসেছেন সুন্দরী স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে। এইরূপ অবস্থায় এ পর্য্যন্ত তাঁদের দিকে বাটীর কর্ত্তা-ব্যক্তিদের কাহারও দৃষ্টি পড়েনি। কিন্তু হল-ঘরের দুয়ারে এসে তাঁরা বাধা প্রাপ্ত হলেন। মিস্ হেনা দত্ত প্রবেশ-পথেই দাঁড়িয়েছিলেন। হাসিমুখে এগিয়ে এসে তিনি প্রণব বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "যাক্, এসেছেন তা হলে। কিন্তু, সঙ্গে আপনার মিসেস্ কই? তাঁকে আনলেন না যে? বুঝেছি, এখনও পর্য্যন্ত আপনার আমার উপর রাগ রয়েছে, না? কিন্তু এ আপনার অন্যায় রাগ প্রণব বাবু, আমিই নয় অমত করেছিলাম, কিন্তু, আপনিও তো আমার জন্যে অপেক্ষা করেননি। এখোন বিয়ে-টিয়ে করে ফেলে আবার রাগ? দুষ্ট ছেলে কোথাকার, এসো, বসবে এসো ওখানে।"

দত্ত-পরিবারের সহিত প্রণব বাবুর ঘনিষ্ঠতা থাকলেও শৈলেশ বাবুর সহিত এদের পরিচয় ছিল না। মিঃ দত্ত প্রণব বাবুকে নিমন্ত্রণ করতে এসে শৈলেশ বাবুকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন। মিস্ দত্তের এইরূপ বাক্যালাপে অবাক্ হয়ে তিনি প্রণব বাবুর দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলেন না। প্রণব বাবু মুস্কিলে পড়লেন। ছিঃ, শৈলেশটা ভাবছে কি? প্রতি মুহূর্ত্তেই তিনি আশা করছিলেন শৈলেশ বাবু বিষয়টি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবেন এবং এর একটি সুস্পষ্ট কৈফিয়ৎ তাকে শুনিয়ে দেবেন। কিন্তু, ঊর্দ্ধতন অফিসার বিধায় শৈলেশ বাবু তাঁকে এ সম্বন্ধে কোনওরূপ প্রশ্ন না করায় তিনি অস্বস্তি বোধ করে বলে উঠলেন, আসুন, শৈলেশ বাবু, মিস্ দত্তের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন মিস্ হেনা দত্ত। আরও শোনো, ছোট বেলায় এঁর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল। এঁরা তখন ভেবেছিলেন, আমি ডেপুটী-টেপুটী একটা কিছু হবই। কিন্তু, পরে অদৃষ্টক্রমে দারোগা হয়ে পড়ায় সম্বন্ধটা এঁরা নাকচ করে দেন, এখোন আবার ইনি আমাকেই দোষ দিচ্ছেন। দেখো, কাণ্ডো দেখো। বুঝলে তো, এবার কার দোষ বুঝলে?"

"বেশ মশাই, বেশ, আমারই সব দোষ।" মিস্ হেনা দত্ত উত্তর করলেন, "এখোন ওঁকে নিয়ে বসে পড়ুন তো ঐ টেবিলটায়।"

হল-ঘরের একটা কোণে ঐক্যতান বাজছিল। ঐক্যতানের সুরে-সুরে পা ফেলে-ফেলে চলে এসে প্রণব ও শৈলেশ বাবু তাঁদের নির্দ্দিষ্ট আসনে এসে উপবেশন করলেন।

হিলওয়ালা জুতার হিলের উপর ভর করে এক পাক ঘুরে নিয়ে স্মিত হাস্যে মিস্ দত্ত বললেন, "নমস্কার, আসি এখোন, কেমন?" এবং তার পর তিনি অন্যান্য অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে প্রবেশ-পথের দিকে এগিয়ে গেলেন। মিস্ হেনা দত্ত কিছুটা দূর সরে গেলে শৈলেশ বাবু প্রণব বাবুকে বললেন, "যাই বলেন, স্যার, বেঁচে গেছেন আপনি। উনি আমাদের বৌদি হলে হয়েছিল আর কি! বাপস, উঃ—"

শৈলেশ বাবুর এই শ্লেষোক্তিতে প্রণব বাবু অন্য কোনওরূপ উত্তর না করে একটু হাসলেন মাত্র। এক দিন অবশ্য তিনি তাকে ভালোই বাসতেন। এখনও যে তার প্রতি তার এতটুকু মমতা নেই তাও নয়, কিন্তু তা সত্বেও শৈলেশ বাবুর এই অভিমতের সহিত তাঁর মতভেদ ছিল না। আজ প্রণব বাবুরও মনে হয়, হেনা তাকে সত্যই বাঁচিয়েছে। কোথায় শান্তা, আর কোথায় হেনা, এ দু'জনায় তুলনাই হয় না। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে প্রণব বাবু ঘুরে বসছিলেন, এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল হল-ঘরে একটা চাঞ্চল্য এসে পড়েছে। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর এন্ রায় আই, সি, এস, সস্ত্রীক

ঘরে ঢুকছিলেন, প্রণবের পাশেই বসেছিলেন অবৈতনিক হাকিম আশু বোস্। মিঃ আর এন্ রায় নিকটে আসা মাত্র তিনি লাফিয়ে উঠে বলে উঠলেন, "এই যে হুজুর, এই যে মা-লক্ষ্মীও এসেছেন!"

অবৈতনিক হাকিম মিঃ বোসের মুখনিঃসৃত হুজুর কথাটা তাঁদের পছন্দসই হলেও এই মা লক্ষ্মী শব্দটা মিসেস রায়ের মনঃপূত হয়নি। মিঃ রায় বোস সাহেবকে তাঁর এই অভিভাষণের জন্য ধন্যবাদ জানালেন বটে, কিন্তু মিসেস্ রায় ঠোঁট বেঁকিয়ে সরে বসছিলেন, হঠাৎ তাঁর লক্ষ্য পড়লো প্রণব বাবুর দিকে। প্রণব বাবুও মিসেস রায়কে দেখেছিলেন, প্রায় বারো বৎসর পর উভয়ের দেখা, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে চিনে নিতে পেরেছেন। মিসেস রায় এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "আরে, আপনি প্রণব বাবু না? উঃ, সত্যি কতো দিন পর দেখা, আসুন আসুন, আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

সে কতো দূর-দিনের কথা, হিসাব মত প্রায় এক যুগ পেরিয়ে গেছে। প্রণব বাবুর তখন ছাত্র অবস্থা, কতো উচ্চ আশাই না তাঁর তখন ছিল। এক দিন ছিল যখন কি-না তিনি এই আই সি এস হওয়াকেও এমন কিছু বড়ো মনে করেননি। সেই দূর স্বুবর্ণ-যুগে তাঁর মিসেস্ রায়ের পিতা ও ভ্রাতার সহিত আলাপ হয়। মিসেস্ রায় ছিলেন তখন আই-এ ক্লাশের এক জন ছাত্রী। প্রণব বাবুর লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়ে যে মেয়েটি তাঁর কাছে সাহিত্য-রচনা শিখতে আসতো তিনিই এখোন হয়েছেন মিসেস্ রায়।

মিসেস রায় আকুল আগ্রহে প্রণব বাবুকে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে মিঃ রায়ের কাছে এনে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "ইনিই সেই প্রণব বাবু, যাঁর কথা তোমাকে আমি প্রায়ই বলি। এঁর কাছে আমি প্রথম সাহিত্য-রচনা শিখি।"

মিঃ আর এন্ রায় প্রণব বাবুদেরই বিভাগীয় সর্ব্বপ্রধান হাকিম হলেও কয়েক দিন মাত্র তিনি বদলি হয়ে এসেছেন, তখনও পর্য্যন্ত প্রণব বাবুর সহিত তাঁর দেখা বা পরিচয় হয়নি। প্রণব বাবুর সহিত করমর্দ্দন করতে করতে মিঃ রায় বললেন, "ওঃ, আপনিই সেই প্রণব বাবু! আমার স্ত্রী আপনার কথা প্রায়ই বলে থাকেন। তা এখোন তো আমরা কোলকাতাতেই আছি। মাঝে-মাঝে মিসেসকে নিয়ে আসবেন, কেমন? আসবেন তো?"

আমন্ত্রণটা মিঃ রায় না করে মিসেস রায়েরই করা উচিত ছিল। লজ্জিত হয়ে উঠে মিসেস্ রায় বললেন, "সত্যি, আপনি তাঁকে নিয়ে আসবেন আমাদের ওখানে। না এলে আমি দুঃখিত হবো কিন্তু।"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "এই তো মুস্কিল বাধালেন আপনি। আমি নয় আপনাদের হুকুম মত গেলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী কি আসবেন? তাঁকে তা হলে পৃথক্ ভাবে নিমন্ত্রণ করতে হয়।"

লজ্জিত হয়ে মিসেস্ রায় বললেন, "আচ্ছা, আমি তা হলে টেলিফোন করবো।"

"উঁহু," প্রণব বাবু বললেন, "টেলিফোনে অসুবিধা আছে।" বাধা দিয়ে মিঃ রায় বলে উঠলেন, "আচ্ছা তো, তুমি না হয় ওঁদের বাড়ী গিয়েই আমন্ত্রণ করে এলে!"

সলজ্জ ভাবে মিসেস রায় জানালেন, "আচ্ছা আচ্ছা, আমি নিজে গিয়েই ওঁকে বলে আসবো, তা হলেই তো হবে?"

অবৈতনিক হাকিম বোস সাহেব এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে এঁদের কথোপকথন শুনছিলেন। প্রণব বাবুর মত এক জন থানা-অফিসারকে মহামান্য প্রধান হাকিমের সঙ্গে এই ভাবে আলাপ করতে দেখে তিনি অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন, কিছুটা ঈর্ষান্বিতও বটে। তাঁর মনে হলো, প্রধান হাকিম বোধ হয় প্রণব বাবুর পদ-মর্য্যাদা সম্বন্ধে অবহিত নন। বোস সাহেব একটু এগিয়ে এসে বলে উঠলেন, "হেঁ হেঁ, প্রণব বাবুকে চেনেন বুঝি, হুজুর! উনি আমাদেরই এই থানার ইন্-চার্জ্জ অফিসার।" এর পর বোস সাহেব ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রণব বাবুকে বললেন, "এ তো ভারি অন্যায় আপনার প্রণব বাবু, হুজুরের বাড়ীতে দু'-দু'বার, আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে বেড়িয়ে এসেছি; আর মেম-সাহেব নিজে অনুরোধ জানাচ্ছেন, তা সত্ত্বেও আপনি স্ত্রীকে নিয়ে ওঁদের ওখানে যেতে পারেন না?"

বোস সাহেবের এই ধৃষ্টতা প্রণব বাবু সহ্য করতে পারলেন না। বিরক্ত হয়ে প্রণব বাবু বলে উঠলেন, "দেখুন, শুধু উনি কেন আপনিও যদি এখোন হুকুম করেন তো রাত্রি তিনটায়ও আপনাদের ওখানে হাজির হবো, কিন্তু আমার স্ত্রী যাবেন কেন? ভুলে যান কেন, আমি ও আমার স্ত্রী, এই দুই জন এক ব্যক্তি নয়, আলাদা ব্যক্তি। এ ছাড়া কারও চাকুরীর বাইরে সমাজ বলেও একটা জায়গা আছে যেখানে আমরা কেউ কউব চেয়ে ছোট বা বড়ো নেই বুঝলেন, শিক্ষা-দীক্ষা ও বংশমর্য্যাদার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।"

প্রণব বাবুর এবংবিধ উত্তর সমর্থনযোগ্যই ছিল। তা ছাড়া, বোস সাহেবের উক্তিটিও কেহ পছন্দ করেননি। বোস সাহেব মনে-মনে ক্রুদ্ধ ও আশ্চর্য্যান্বিত হয়েও চুপ করে গেলেন।

হঠাৎ এই সময় সেখানে আবির্ভূত হলেন বাড়ীর মালিক ধনকুবের মাণিকলাল দত্ত। সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের নব পরিণীতা স্ত্রী বিনতা দেবীও আছেন। এঁদের পিছন-পিছন ঘরে ঢুকতে দেখা গেল, পুলিশের এক জন বিভাগীয় বড় সাহেব মিঃ মিত্তিরকেও।

ঊর্দ্ধতন অফিসার মিঃ মিত্তিরকে নিকটে আসতে দেখে শৈলেশ বাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যাস মত সেলাম করতে যাচ্ছিলেন, প্রণব বাবু তাঁর কোট ধরে তাঁকে বসিয়ে দিয়ে নিম্নস্বরে বললেন, "আরে, বসেন মশায়, এটা পুলিশ-অফিস নয়, এটা একটা সামাজিক অনুষ্ঠান।"

ইতিমধ্যে মিঃ মিত্তির আরও নিকটে এসে গেছেন। প্রণব বাবুর সহিত চোখাচোখি হওয়া মাত্র বসে বসেই প্রণব বাবু বললেন, "গুড ইভনিঙ!"

"গুড ইভনিঙ" বলে মৃদু হেসে মিত্তির সাহেবও আসন গ্রহণ করলেন।

প্রতি-অভিবাদন জানিয়ে মিত্তির সাহেব বসে পড়লে, প্রণব বাবু অভিযোগ করে শৈলেশ বাবুকে নিম্নস্বরে বললেন, "কি একটা বেখাপ্পা ব্যাপার করছিলেন, বলুন তো? হল-শুদ্ধ লোক চেয়ে দেখতো তো? ছিঃ!"

লজ্জিত হয়ে শৈলেশ বাবু বললেন, "কি রকম একটা অভ্যাস হয়ে গেছে স্যার, সেলাম করে করে। বড় সাহেব দেখলেই আপনা হতেই হাত উঠে যায়, ঠিক রিফ্লেক্স একসনের মতই, এমন কি, টেলিফোনেও এদের সেলাম দিতে ইচ্ছা করে।"

উত্তরে প্রণব বাবু নিম্নস্বরে বললেন, "থামুন মশাই, একেই বলে স্লেভ মেনটালিটি। একটু হলেই তো একটা সিন্ ক্রিয়েট করতেন।"

বিব্রত হয়ে শৈলেশ বাবু জানালেন, "কিন্তু জানেন তো স্যার, উনি কি রকম সেলামের ভক্ত!" ঐ দেখুন, মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন বোধ হয় রেগে গিয়েই। বোধ হয় মনে করলেন, আমরা ওঁকে তাচ্ছিল্য করলাম। আফিসে এসেই, দেখবেন, উনি খোঁচা দেবেন আমাদের!"

"তা দিক খোঁচা। আমরা ওঁর বাড়ীর চাকর নই," প্রণব বাবু বললেন, "এখানে ওঁর চেয়ে লোকে আমাদের বেশী খাতির করে। বিদ্যা বা বুদ্ধিতে ওঁর চেয়ে আমরা কিছু অংশেই নিকৃষ্ট নই।"

শৈলেশ বাবুকে মৃদু ভৎর্সনা করে মুখ তুলতেই প্রণব বাবু দেখতে পেলেন, মিসেস্ বিনতা দত্ত তাঁর নিকটে এসে দাঁড়িয়েছেন। এই পরিবারের ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রণব বাবু বিনতা দেবীকেই অধিক পছন্দ করতেন। পল্লীগ্রামের গরীব ঘরের অশিক্ষিতা মেয়ে হলেও নৈতিক শিক্ষা ছিল তাঁর যথেষ্ট। এক কথায় তিনি নিরক্ষর হলেও শিক্ষিতা ছিলেন। এখোনও পর্য্যন্ত তিনি আধুনিক সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি। আসলে মিঃ দত্ত বৃদ্ধ বয়সে বাধ্য হয়েই এই পল্লী-মেয়েটির পাণিগ্রহণ করেছিলেন। বিনতা দেবী একটু এগিয়ে এসে বললেন, "নমস্কার ঠাকুরপো, ভালো আছেন?"

ঠাকুরপো শব্দটি উচ্চারিত হওয়া মাত্র অভ্যাগত ও অভ্যাগতাদের অনেকেই অবাক্ হয়ে বিনতা দেবীর দিকে চেয়ে দেখলেন। তাঁদের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জনও যে না উঠলো, তা'-ও নয়। জোর করে মেজে-ঘসে সমাজে বার-করা এই মেয়েটিকে অনেকেই লক্ষ্য করছিলেন।

প্রধান হাকিম মিঃ রায় বিনতা দেবীকে লক্ষ্য করে মিঃ দত্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ইনিই বুঝি মিসেস দত্ত? তা বেশ বেশ।"

মিঃ দত্ত তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মিঃ রায়ের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "আজ্ঞে, হাঁ, ইনিই আমার সহধর্ম্মিণীই বটেন। তা উনি এখোন মিসেস রায়ের তত্ত্বাবধান করুন। আপনি আর মিঃ মিত্র ততক্ষণে আসুন আমার সঙ্গে পাশের ঘর হ'তে একটু পানীয় আহার করে আসি। আপনারা তো এঁদের মতো অপানীয় নন? হেঁ হেঁ হেঁ—"

এই বিশেষ প্রস্তাবটির জন্তেই বোধ হয় এঁরা অপেক্ষা করছিলেন। খুসী মনে এঁরা স্থান ত্যাগ করলে শৈলেশ বাবু নিম্নস্বরে প্রণব বাবুকে বললেন, "আঃ বাঁচা গেলো! এইবার একটা সিগারেট দিন স্যার, ধরিয়ে নি।"

বিরক্ত হয়ে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, "না, দেবো না, এতোক্ষণ ধরাননি কেন?"

উত্তরে শৈলেশ বাবু বললেন, "কি দরকার শুধু শুধু হাঙ্গামা করার। ওরা যে কাঁচা-খেকো দেবতা, এখনই হয়ত ভাবতেন—"

"থামুন" বলে প্রণব বাবু বিনতা দেবীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

পল্লী-সুলভ সরলতার সহিত বিনতা দেবী মিসেস রায়কে জিজ্ঞাসা করছিলেন, "আচ্ছা ভাই, হাকিম হলে কি করতে হয়?"

উত্তরে মিসেস্ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন?"

বিনতা দেবী উত্তরে বললেন, "আমার উনি, আপনার উনির মতো হাকিম হবেন কি না?"

বিনতা দেবীর স্বামী মিঃ দত্তের এই পার্টি আহ্বানের অপর এক উদ্দেশ্য ছিল—অবৈতনিক হাকিম হওয়া। কন্যার জন্মদিন উপলক্ষ করে মিঃ রায়কে তিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তাঁকে দিয়ে গভর্ণমেণ্টে একটা রেকমেণ্ড করিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে। এতক্ষণে মিঃ এবং মিসেস রায়, উভয়েই বিষয়টি বুঝে নিয়েছিলেন। একটু শ্লেষের সহিত কৌতুক করে মিসেস রায় বিনতা দেবীর প্রশ্নের উত্তর দিলেন, "এমন কি-ই আর করতে হয়। ঘাসও কাটতে হয় না, গাড়ীও টানতে হয় না, মোটও বইতে হয় না, শুধু বিচার করতে হয়।"

বিনতা দেবী যতই কি'না নিরক্ষর ও সরল প্রকৃতির হন, এইটুকু ঠাট্টা-তামাসা বুঝবার মতো তাঁর বুদ্ধি আছে। নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত মনে করে তিনি একটু একটু করে সরে এসে প্রণব বাবুর কাছে দাঁড়ালেন। চোখ দিয়ে তার জল বেরিয়ে আসছিল। এতক্ষণে মিসেস্ রায় পার্শ্বে উপবিষ্টা ব্যারিষ্টার-পত্নী মিসেস ভড়ের সহিত হাস্যালাপ জুড়ে দিয়েছেন, বোধ হয় বিনতা দেবীকে উপলক্ষ করেই। মহিলা দুইটির দিকে বিরক্তির সহিত একটা অগ্নিদৃষ্টি হেনে বিনতা দেবী প্রণব বাবুকে বললেন, "শুনলে তো ঠাকুরপো, কি রকম আমাকে অপমান করলে, এই জন্যেই না ওঁকে আমি বলি, এদের মধ্যে আমি বেরুবো না।"

মিসেস রায়ের এই দম্ভোক্তিপূর্ণ শ্লেষোক্তি প্রণব বাবুর একেবারেই ভালো লাগেনি। ভদ্রমহিলা আই সি এস্-পত্নী হয়ে এত দূর অধঃপাতে গেছেন, ছিঃ! প্রণব বাবুর মিসেস রায়কে একটু জব্দ করতে ইচ্ছে হলো, তিনি নিম্নস্বরে বিনতা দেবীর সহিত কি-একটা পরামর্শ করে নিলেন। বিনতা দেবী প্রথমটায় প্রণব বাবুর উপদেশ মত কায করতে রাজী হননি, কিন্তু প্রণব বাবু বার বার করে অভয় দেওয়ায় তিনি পুনরায় মিসেস্ রায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা ভাই, আই সি এস-দের মাইনে কতো?"

বিরক্ত হয়ে মিসেস রায় পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "কেন? এতে আপনার দরকার কি?"

প্রণব বাবুর শিক্ষামত বিনতা দেবী উত্তর করলেন, "আমাদের আজীমগড়ের বাৎসরিক দেড় লক্ষ টাকা আয়ের যে ষ্টেট্ আছে না, সেই ষ্টেটটার ম্যানেজারী করবার জন্যে আমরা গভর্মেণ্টের কাছ হতে এক জন আই সি এস নেবো, তাই।"

এতো কথা যে বিনতা দেবীর বুদ্ধিতে ঘটেনি, তা মিসেস রায় সহজেই বুঝে নিয়েছিলেন। তিনি প্রণব বাবুর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি হেনে বলে উঠলেন, "এ কিন্তু দাদা, আপনারই শেখানো বুলি। আমি কিছু বুঝি না, বুঝি?" মিসেস রায় অভিযোগ করে আরও অনেক কিছু বলতে চাইছিলেন, কিন্তু তা আর তাঁর বলা হলো না, হঠাৎ পানোন্মত্ত অবস্থায় মিঃ রায় ও মিঃ দত্ত সেখানে এসে হাজির হয়েছেন। স্বামীকে পানোন্মত্ত অবস্থায় দেখে বিরক্ত হয়ে মিসেস রায় বলে উঠলেন, "ফের তুমি এতোটা খেয়ে ফেললে? বারণ করলেও শুনবে না তুমি? চলো, তাহলে বাড়ী চলেই যাই।"

পানোন্মত্ত হ'লে স্বামীর কিরূপ অবস্থা হয়, তা মিসেস রায়ের ভালোরূপেই জানা ছিলো। সত্যই, আর অপেক্ষা করা চলে না। তিনি স্মিত হাস্যে প্রণব বাবু এবং মিঃ দত্তকে অভিবাদন করে স্বামীকে নিয়ে উৎসব-গৃহ হতে বার হয়ে গেলেন। এদিকে পুলিশের বিভাগীয় বড় সাহেব মিঃ মিত্র কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত মাতলামী করে চলছিলেন। তাঁকে এই অবস্থায় দেখে প্রণব বাবু সহকারী শৈলেশ বাবুকে বললেন, "দেখো, কাণ্ড দেখো। পুলিশের ইজ্জত কেমন বাড়াচ্ছেন, দেখছো তো? সাধে লোকে গালাগালি দেয় পুলিশকে। এখোন যাও, ওঁকে নীচে পর্য্যন্ত নামিয়ে দিয়ে এসো।"

সহকারী অফিসার শৈলেশ বাবুকে একটু ইতস্ততঃ করতে দেখে প্রণব বাবু নিজেই এগিয়ে এসে মিত্তির সাহেবকে বললেন, "আসুন স্যার, আপনাকে নীচে পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিই।"

এক রকম টলতে টলতেই মিঃ মিত্র বললেন, "পৌঁছে দেবে? তা' দাও। আই ডোণ্ট্ মা-ই-ণ্ড।"

প্রণব বাবু এইবার হিড়-হিড় করে মিঃ মিত্রের হাত ধরে টানতে টানতে নিচে এনে মোটরে তুলে দিয়ে তাঁকে সোফারের জিম্মা করে দিলেন। তার পর স্বস্থানে ফিরে এসে শৈলেশ বাবুকে বললেন, "দেখছো তো, এ-ও এক রকমের পাতালপুরী, ঠিক খোকা গুণ্ডাদের আণ্ডার-ওয়ার্ল্ডেরই মতই। ইনিই হয়তো আবার কালই আফিসে দেখা হলে নাকি সুরে বলে বসবেন, ইয়েস ইয়েস। আই নো, হোয়ার ওয়ার ইউ লাষ্ট নাইট, ছিঃ—"

স্বস্থানে ফিরে এসে প্রণব বাবু কিন্তু ব্যারিষ্টার-পত্নী মিসেস ভড়কে আর দেখতে পেলেন না। এসেই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, তাঁর উন্মুক্ত বাম হাতটি একটা সিল্কের নীল রুমাল দিয়ে বাঁধা রয়েছে। এ সম্বন্ধে গুপ্তচর-মুখে প্রণব বাবুর কাছে একটা অত্যদ্ভুত খবর পৌঁছেছিল। এই সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করবার জন্তেই প্রণব বাবু শৈলেশ বাবুকে নিয়ে এতোক্ষণ এই পার্টিতে অপেক্ষা করছিলেন। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক চাওয়াচায়ি করে প্রণব বাবু লক্ষ্য করলেন, মিসেস ভড় মিঃ সেন নামক এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে পিছনের নিরালা বারান্দাটার ভিতর হতে বার হয়ে আসছেন। মিসেস ভড়ের চোখ-মুখ রাঙা হয়ে গেছে, মিঃ সেনের মুখে মৃদু হাসি। হঠাৎ প্রণব বাবুর লক্ষ্য পড়লো, মিঃ সেনের ধবধবে সাদা গিলে-করা ঢিলে পাঞ্জাবীটার বুকের উপর। তাহার জায়গায় জায়গায় সিঁদুরের দাগ লেগে গেছে। মিসেস ভড়ের মাথার সিঁদুর মিঃ সেনের বুকে কি করে লাগতে পারে, সেই সম্বন্ধে মনে মনে একটা গবেষণা করে নিয়ে প্রণব বাবু শৈলেশ বাবুকে বললেন, "ঐ দেখো, দেখছো তো, ঐ যে, দেখো না।"

এতক্ষণে শৈলেশ বাবুও বিষয়টি বুঝে নিয়েছিলেন। তিনি হেসে ফেলে উত্তর করলেন, "সিঁদুর তাহলে দেখছি, স্যার, একটা প্রিভেণ্টিভ্ (প্রতিষেধক) জিনিষ। এই জন্তেই বোধ হয় আধুনিক মেয়েরা সিঁদুর পরতে ভয় পান। হাজার চোক আমাদের হচ্ছে পুলিশের চোখ, যাবে কোথায়? ওদিকে ব্যারিষ্টার ভড় এতোক্ষণ পাশের ঘরে বসে গেলাসের পর গেলাসই টেনে চলেছেন, এদিকে তাঁর স্ত্রী নির্ভয়ে তাঁরই এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলেন। আপনি ঠিকই বলেছেন, স্যার, এ-ও এক রকমের অণ্ডার-ওয়ার্ল্ডই বটে!"

শৈলেশ বাবু কথার প্রত্যুত্তরে প্রণব বাবু ঘাড় নেড়ে তাঁকে চুপ করতে বললেন। নিচের রাস্তা হ'তে একটি মোটর গাড়ীর হর্ণের একটা সুন্দর মিঠা আওয়াজ আসছিল, পিঁ পিঁ পিঁ। আওয়াজটা কান খাড়া করে প্রণব বাবু শুনে নিলেন। এদিকে সমাগত ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলাদের হাস্যধ্বনি ও কলরোলেরও কামাই নেই, ঐক্যতানও নব নব ঝঙ্কারে বেজে চলেছে। হাসির টুকরো এবং চায়ের পিয়ালার ঠুন্-ঠুন্ শব্দে উৎসব-ঘর মুখরিত হয়ে উঠেছে। যাঁরা এতক্ষণ এসে পৌঁছাননি তাঁরাও একে একে এসে গেছেন, বাকি ছিলেন শুধু এক জন মাত্র ভদ্রলোক। এই উৎসবের প্রধান অতিথি না হ'লেও তিনি ধনকুবের দত্ত মশাইএর একমাত্র কন্যা মিস্ হেনা দত্তের হৃদয়ের প্রধান অতিথি ছিলেন।

মিস্ হেনা দত্ত এতোক্ষণ তাঁর কয়েক জন বান্ধবীর সহিত একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাস্যালাপ করছিলেন। পরিচিত মোটরের হর্ণটি কানে যাওয়া মাত্র উদ্‌গ্রীব হয়ে তিনি ছুটে এসে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দেখলেন, মিঃ খোকন ঘোষ তাঁর লাল রঙের টুরার কারটা ব্যাক করে গেটের ভেতর ঢুকাচ্ছে।

উৎফুল্ল হৃদয়ে মিস দত্ত নীচে নেমে গেলেন এবং এর কিছু পরেই খোকন ঘোষের হাতে ধরে তাঁকে আপ্যায়িত করতে করতে উৎসব-গৃহের মধ্যে টেনে এনে সকলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন।

প্রণব বাবু চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে অবাক্ হয়ে মিঃ খোকন ঘোষের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে শৈলেশ বাবুকে বললেন, "দেখছো লোকটাকে, চিনতে পারো ওকে?"

শৈলেশ বাবুও মিঃ ঘোষকে দেখে ইতিমধ্যেই হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। অস্ফুট স্বরে শৈলেশ বাবু উত্তর করলেন, "সুধীরের মতো দেখতে বটে, অবিকলই তাই, কিন্তু সুধীর তো ও নয়। তার চেয়ে একে আরও একটু রোগাই মনে হয়। দেখবেন স্যার, খোকা গুণ্ডা ছদ্মবেশে আসেনি তো? এক চেহারার তিনটে লোক কি এ দুনিয়াতে আছে না' কি? মিস্ দত্তকে জিজ্ঞাসা করুন না, লোকটা কে?"

মিঃ খোকন ঘোষের পরনে ছিল চোস্ত মূল্যবান বিলাতী স্যুট। ব্যাক-ব্রাস করা চুল, টোয়্যলেট করা তায় চেহারা, হাতে দেখা যায় তিন-তিনটা হীরের আংটী। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করেও প্রণব বাবু খোকন ঘোষের চাহনীর মধ্যে খোকা গুণ্ডার মধ্যে পরিদৃষ্ট সেই স্বভাবসুলভ ক্রূর দৃষ্টির সন্ধান পেলেন না। বরং তার মুখের মধ্যে বেশ একটা সৌম্য ভাব দেখা যায়। তাহলে লোকটা কে? প্রণব বাবু অনেক কিছুই ভেবে নিচ্ছিলেন। এমন সময় মিস্ দত্ত তাঁর প্রিয়তম খোকন ঘোষকে হাতে ধরে টানতে টানতে প্রণব বাবুর সামনে হাজির করে দিয়ে বললেন, "আসুন প্রণব বাবু, এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি আমার এক জন শেষ নূতন বন্ধু, মিঃ খোকন ঘোষ। লাক্ষৌর এক মিলের মালিক। ইনি এক জন বড়ো ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যালিষ্ট তো বটেই, তা ছাড়া ইনি এক জন বড়ো বক্সারও (মুষ্টিযোদ্ধা) বটেন। লাক্ষৌতেই ইনি থাকেন, তবে মাঝে-মাঝে কোলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন। বাবা, আমার সম্বন্ধে একেই তাঁর শেষ কথা দিয়েছেন। চুপ করে রইলেন যে? হিংসে হচ্ছে বুঝি?"

প্রণব বাবু হতভম্ব হয়ে মিস্ হেনা দত্তের কথা শুনছিলেন, হেনা বলে কি? খোকা গুণ্ডার অন্তর্নিহিত দ্বৈত ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে শিউচরণের নিকট তিনি অনেক কথাই শুনেছিলেন। মনোবিজ্ঞানের কেতাব সমূহে এইরূপ দ্বৈত ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি বহু কাহিনী পড়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও শিউচরণের একটি কথাও তিনি বিশ্বাস করেননি। শিউচরণ তাঁকে এ-ও বলেছে, পৃথিবীর উপরতলায় উঠে এসে খোকা না কি আত্মবিস্মৃতও হয়ে যেতো। এইরূপ অবস্থায় বেশী দিন থাকার পর দলের মধ্যে এক জনকে এসে তাকে মনে করিয়ে দিতে হতো, আসলে খোকা কে? পূর্ব্ব-কথা মনে পড়ে যাওয়া মাত্র খোকা নিজ-মূর্ত্তি ধারণ করে পৃথিবীর নিচের তলায় নেমে এসে তাদের

সঙ্গে মিলিত হয়েছে। উপরতলার তার সমুদয় কাজ-কারবার, বন্ধু-বান্ধবকে সে পিছনে ফেলে নেমে তো এসেছেই, এমন কি, তার পুরাতন বন্ধুদের উপর তারই দলের লোকদের দিয়ে অত্যাচার করতেও কুণ্ঠা বোধ করেনি। এই সময় না কি তার চেহারা, এমন কি, স্বভাবও আমূল ভাবে বদলে গেছে। প্রণব বাবুর মনে হলো, হয়তো এই কারণেই মিঃ খোকন ঘোষ ওরফে খোকা গুণ্ডা তাকে চিনেও চিনতে পারেনি। উপরতলায় থাকা-কালীন না কি দুই হাজার টাকা বিশ্বভারতীতে দান করে গুরুদেবের বিশ্বস্ত অনুচর হয়ে শান্তি-নিকেতনেও সে কাটিয়ে এসেছে। পৃথিবীর উপরতলায় হঠাৎ অন্তর্ধান হয়ে যাওয়ার পরও পুলিশ বস্তিতে-বস্তিতেই তাকে খোঁজাখুঁজি করেছে, এই জন্য তার সন্ধানও তারা পায়নি। পৃথিবীর উপরতলা বা সভ্য সমাজের সহিত পরিচিত না থাকায় শিউচরণের মত গোয়েন্দাদের পক্ষেও তাকে খুঁজে বার করা অসম্ভব ছিল, এই জন্যই না কি খুনের পর খুন, ডাকাতির পর ডাকাতি করে গেলেও তাকে এ পর্য্যন্ত কেউই গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

একটির পর একটি বিগতপ্রাণ শিউচরণের অবিশ্বাস্য কথাগুলি প্রণব বাবুর মনে পড়ছিল। কোনও রকমে আত্মসংবরণ করে প্রণব বাবু মিস্ দত্তকে বললেন, "তা বেশ বেশ! হিংসা হবে কেন আমার? বরং এতে আমি খুবই খুসী হয়েছি। তা এঁর সঙ্গে আলাপ হলো কোথায়?"

"ওঃ, সে একটা আশ্চর্য ব্যাপার! এক দারুণ দুর্ঘটনার মধ্যে ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে, মনে করলে এখনও গা শিউরে ওঠে," মিস্ হেনা দত্ত উত্তর করলেন, "পিসতুতো-ভাই রমেনের সঙ্গে দমদমার এক গার্ডেন-পার্টিতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে রাত্রে বাড়ী ফিরছিলাম। হঠাৎ জন ত্রিশ ডাকাত আমাদের মোটরটাকে থামিয়ে দিলে, তাদের মধ্যে জন দুই-তিন এগিয়ে এসে রমেনদাকে ধরে ফেললে, আমাকেও। ঠিক এই সময় খোকন ঘোষ মোটর বাইকে ঐ পথ দিয়ে আসছিলেন। আমার চীৎকার শুনে নেমে পড়ে, গুণ্ডাটার মুখের উপর ঠাঁই-ঠাঁই করে গোটা দুই ঘুসা দিতেই কাপুরুষরা পালিয়ে যায়, এর পর মিঃ ঘোষ আমাদের বাড়ী পৌঁছেও দেন, সেই থেকে ব্যাস, উনি আমাদের এক জন অন্তরঙ্গ বন্ধু তো বটেই, তা ছাড়া বাবা ওঁকে কথাও দিয়েছেন।"

স্মিত হাস্যে মিঃ খোকন ঘোষ জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার পরিচয় তো যথেষ্টই দেওয়া হলো। এখোন ওঁরও পরিচয়টা দিয়ে দাও।"

উত্তরে মিস্ হেনা দত্ত বললেন, "ওঁর কথা কি বলিনি বুঝি? উনিই তো সেই প্রণব বাবু, পুলিশের এক জন নাম-করা অফিসার উনি। এই যে সে দিন দুই ছোড়া খুন হলো না—খবরের কাগজে দেখেছো তো, ঐ খুনগুলোর তদন্ত উনিই করছেন। ওঁর কাছে খোকা গুণ্ডার গল্প শুনো তুমি, বাবাঃ, শুনলে গা' শিউরে ওঠে। বলুন না, প্রণব বাবু, সেই খোকা গুণ্ডার গল্প, বলবেন না তো?"

প্রণব বাবু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, খোকা গুণ্ডার নাম শুনা মাত্র মিঃ খোকন ঘোষের মুখের আকৃতি যেন কিছুটা বদলে গেলো, ধীরে-ধীরে তাঁর মুখে ফুটে উঠছিলো একটা দানবীয় ভাব। তাঁর মুখের এই ভাব মিস্ দত্তেরও দৃষ্টি এড়ায়নি। মিস্ দত্ত ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "ও কি, অমন করছেন কেন? অসুখ করছে না কি।"

মিঃ খোকন ঘোষ তাড়াতাড়ি একটা অত্যুগ্র গন্ধযুক্ত স্মেলিং সল্টের শিশি নাকে দিয়ে তার আঘ্রাণ নিতে নিতে উত্তর করলেন, "কৈ, না তো, অসুখ করবে কেন আমার?"

প্রণব বাবু তখনও পর্য্যন্ত স্থিরদৃষ্টিতে মিঃ ঘোষের মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। তিনি অবাক্ হয়ে লক্ষ্য করলেন, মিঃ ঘোষের চেহারা পুনরায় ধীরে-ধীরে সৌম্য ভাব ধারণ করছে।

"আঃ, বাঁচালেন, অসুখ তাহলে করেনি আপনার? একটু মাথা ধরেছে, না? দাঁড়ান, একটা ট্যাবলেট নিয়ে আসি চায়ের সঙ্গে খেলেই সুস্থ হয়ে যাবেন —"

স্নেহপ্রবণা স্ত্রীর ন্যায় কথা কয়টি বলে হেনা দত্ত বার হয়ে গেলেন ট্যাবলেটের যোগাড়ে। মিঃ খোকন ঘোষও ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে চা পান করতে করতে সহজ ভাবেই কথা-বার্ত্তা সুরু করে দিলেন।

প্রণব বাবুর ন্যায় ব্যারিষ্টার-পত্নী মিসেস্ ভড়ও এতোক্ষণ অবাক্ হয়ে মিঃ ঘোষের দিকে চেয়ে দেখছিলেন, কিন্তু এতোক্ষণ মিস্ হেনা দত্ত সেখানে উপস্থিত থাকায় তিনি তাঁকে কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেননি। এই বার তিনি একটু একটু করে তাঁর চেয়ারটা মিঃ ঘোষের খুব কাছাকাছিই সরিয়ে এনে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "চিনতে পারছেন আমাকে? ওঃ, সেই দিন থেকে আমরা কতোই না আপনাকে খুঁজেছি। কি উপকারটাই না আপনি সে-দিন আমাদের করেছিলেন, সত্যি!"

বিস্মিত হয়ে মিঃ খোকন ঘোষ উত্তর করলো, "কি বলছেন আপনি? আমি—আপনি চেনেন আমাকে?"

উত্তরে মিসেস্ ভড় নিম্নস্বরে বললেন, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, চিনি বই কি। অন্যায় নয় আমি সে-দিন করেইছিলাম, তাও আপনাকে না চিনে। কিন্তু এর কি আর ক্ষমা নেই না কি? আপনার সেই টাকা ক'টা দিয়ে আমরা একটা বাড়ী কিনেছি, আরও একটা কথা বলবো আপনাকে, শুনুন। আমিও আপনাকে ভালবেসে ফেলেছি, সত্যি!"

মিঃ খোকন ঘোষকে দেখে মনে হলো, মিসেস্ ভড়ের কথাগুলো শুনে তিনি যেন অবাক্ হয়ে যাচ্ছেন। গায়ে পড়ে প্রেম করতে আসা মেয়ে তিনি এর আগেও দেখেছেন, কিন্তু এমন নির্লজ্জতম ভাবে প্রেম করতে ইতিপূর্ব্বে তিনি কাউকে দেখেননি। বিরক্ত হয়ে মিঃ খোকন ঘোষ বললেন, "তবুও আপনি এই কথা বলছেন? আমাকে অপর কেউ বলে ভুল করছেন না তো? কই, আপনাকে কখনোও দেখিছি বলে তো মনে পড়ে না।"

কথা কয়টি ব'লে খোকন ঘোষ ভাবতে থাকেন, ক্ষীণ ভাবে তাঁর মনে পড়ে, পূর্ব্বজন্মে কোথায় যেন তিনি তাঁকে দেখেছেন। কিন্তু তা তিনি মনে করেও মনে করতে পারেন না।

সত্যই খোকন ঘোষ মিসেস ভড়কে মনে করতে পারছিলেন না। মিসেস ভড় কিন্তু ভুল বুঝলেন। তিনি মিঃ খোকন ঘোষের এই ন্যাকামী আর বরদাস্ত করতে পারলেন না। তিনি বিরক্ত হয়ে তাঁর বাম হাতে বাঁধা সিল্কের রুমালটা টেনে খুলে ফেলে হাতটা মিঃ ঘোষের সামনে মেলে ধরলেন। মিঃ খোকন ঘোষ চমকে উঠে চেয়ে দেখলেন সেখানে উল্কি দিয়ে লেখা রয়েছে, "প্রাণের খোকা!"

মিঃ খোকন ঘোষের পায়ের তলা থেকে পৃথিবীটা যেন সরে যেতে থাকে, তিনি কাঁপতে থাকেন, চেষ্টা করেও আর আত্মসংবরণ করতে পারেন না। ঐ অক্ষর দুইটি তাকে ঠেলা দিয়ে একেবারে পৃথিবীর নিচের তলায় পাঠিয়ে দিয়ে, খোকন ঘোষকে খোকা গুণ্ডাতে পরিণত

করে দিলে। সবিস্ময়ে প্রণব ও শৈলেশ বাবু চেয়ে দেখলেন, খোকা গুণ্ডার পশুসুলভ ক্রূর দৃষ্টি ফিরে এসেছে। এই দৃষ্টি সমেতই তিনি খোকাকে সেই দিন বেশ্যালয়ের ত্রিতল কক্ষ হতে লাফিয়ে পড়তে দেখেছিলেন। খোকাকে চিনতে তাঁর আর বাকি থাকলো না। ইতিমধ্যে আদার রস ও ট্যাবলেট দিয়ে স্বহস্তে এক কাপ চা তৈরী করে, কাপ সহ মিস্ হেনা দত্তও সেখানে এসে পৌঁছিয়েছেন, তার প্রিয়তম খোকন ঘোষের এই দানবীয় মূর্ত্তি দেখে তিনি "আঁ-আঁক্" করে চীৎকার করে উঠলেন। এর পর খোকা আর দেরী করতে পারে না, প্রণব বাবু পকেট হ'তে তাঁর পিস্তলটা বার করবার পূর্ব্বেই খোকা তার পিস্তলটা বার করে ফেলে দেওয়াল লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লো, গুম্ গুম্, দুম্!

নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক ও ভদ্র-মহিলাদের অনেকেই তখনও পর্য্যন্ত উৎসব-গৃহ পরিত্যাগ করেননি। হঠাৎ গুলীর আওয়াজ শুনে সভয়ে তাঁরা হাত দিয়ে চোখ ঢাকলেন। কেউ কেউ খোকাকে গুলী ছুঁড়তে দেখেওছিলেন, তাঁদের ধারণা হলো, একটা রাজনীতিক ডাকাতি বা হত্যাকাণ্ড বুঝি বা সংঘটিত হতে চলেছে। আগন্তুকদের এই ভাবে হতভম্ব করে দিয়ে খোকা বাবু এক লাফে টেবিলটা পেরিয়ে এসে উৎসব-ঘর হ'তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

প্রকৃতিস্থ হওয়া মাত্র প্রণব বাবুও পিস্তল হাতে খোকার পিছন পিছন ধাওয়া করছিলেন, হঠাৎ মিস্ হেনা দত্ত ছুটে এসে তাকে আগলে ধরে বলে উঠলেন, "এ কি, আপনি করছেন কি প্রণব বাবু? এখোন তো আপনি বিয়ে-থাওয়া করে ফেলেছেন, এখোন আবার ওঁর পিছনে লাগতে চান কেন, আপনি? এ আপনার ভারি অন্যায় প্রণব বাবু! এ তো ভালবাসা নয়, এ আপনার হিংসে!"

জোর করে মিস্ দত্তের হাতখানা সরিয়ে দিয়ে এক-ছুটে প্রণব বাবু নিচে নেমে এলেন, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তিনি আর খোকা গুণ্ডার কোনও সন্ধানই পেলেন না।

রাত্রি দ্বিপ্রহর।

সমস্ত সহরটা নিঝুম হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, জন-মানবের সাড়া-শব্দ নেই। ক্বচিৎ কদাচিৎ দুই-একটা ট্যাক্সি বড় রাস্তা ফাঁকা পেয়ে, ক্ষণেকের জন্য দর্শন দিয়েই আবার হুস্ করে অদৃশ্য হয়ে যায়। আশে-পাশের বাড়ীগুলির ন্যায় মিস্ হেনা দত্তের মাতুলদের ত্রিতল বাড়ীটাতেও পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল।

হঠাৎ বাড়ীটির গেটের সামনে পুরানো বড়-সড়ো একটা মোটর গাড়ী এসে দাঁড়িয়ে পড়লো, আওয়াজ হলো, ক্যাঁচ।

গাড়ীটার মধ্যে প্রায় দশ-বারো জন ভদ্রবেশী ব্যক্তি ব'সেছিল। গলায় তাদের বেল ফুলের মালা, হঠাৎ দেখলে মনে হবে, তারা বর-যাত্রীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ফিরে যাচ্ছে।

চারি দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে গাড়ী হ'তে একে একে সকলেই নেমে এলো। সবার শেষে নামলো বিখ্যাত খুনে গুণ্ডা খোকা বাবু। হাতের ছুরীখানা মুঠির মধ্যে চেপে ধরে, ফলাটা হাতের আস্তানার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে খোকা বাবু দলের তিন জন ব্যক্তিকে হুকুম করলো, "তোরা এখোন গাড়ীটা মেরামত করতে থাক! অনবরত যেন খুট-খাট শব্দ হতে থাকে, মাঝে মাঝে ইঞ্জিনের শব্দও। এই অবসরে আমরা বাড়ীটাতে সিঁদ দিতে থাকি। সিঁদের খুট-খাট শব্দ শুনেও যেন গৃহস্বামীরা মনে করে, বাইরে এই মোটরটাই মেরামত হচ্ছে, বুঝলি। আর যদি কেউ চেঁচিয়ে উঠে তো তোরা ইঞ্জিনের শব্দ আরও বাড়িয়ে দিবি, যাতে করে কি না ইঞ্জিনের শব্দে চীৎকার চাপা পড়ে যায়।

কথা কয়টা বলে খোকা বাবু বাকি পাঁচ জন সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলো, হঠাৎ তারা দেখলো, এক জন টহলদারী সিপাই মন্থর-গতিতে সেই দিকেই আসছে। সিপাইজীকে এই পথে আসতে দেখে খোকা গোপীকে বললো, "তাড়াতাড়ি গাড়ীর বনেটটা খুলে দেখ ভেতরে কি হয়েছে, বেটা একেবারে কাছে এসে গেছে, এই—"

গোপী তাড়াতাড়ি কেষ্টোর হাত হতে লোহার হাতুড়ীটা তুলে নিয়ে কাযে লেগে গেল। সিপাইজী গাড়ীটির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে পাশের একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলে খোকা বাবু সাকরেদদের উদ্দেশ করে বললো, "এইবার আয়, চট্-পট্ বাড়ীটার মধ্যে ঢুকে পড়ি। আর, এই সুধীর, তুই বাপু নূতন লোক আছিস্। তুই বরং পাঁচিলটার উপর উঠে বোস্, বিপদ দেখলে শিষ দিয়ে আমাদের সাবধান করে দিবি, বুঝলি?"

সুধীর এই কয় দিনে মনে-প্রাণে খোকার এক জন সাকরেদ হয়ে উঠেছে। আজ-কাল সে মদও খায়, চরিত্রেরও যে দোষ ঘটেনি, তা-ও নয়। সে বন্ধনহীন বেপরোয়া জীবন যাপনে অভ্যস্তও হয়ে এসেছে। সঙ্গদোষ এমনই এক জিনিস!

খোকার নির্দেশ মত সুধীর পাঁচিলের উপর উঠে মুখের মধ্যে তার আঙুল দুইটা পূরে দিয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি রেখে বসে পড়তেই খোকা বাবুর দল একে-একে পাঁচিল টপকে বাড়ীটার ভিতরে ঢুকে পড়লো। ভিতরকার উঠানে তারা দেখতে পেলো, বাঘের মত একটা কুকুর শুয়ে আছে। এ-জন্য তারা প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। গোপী মাংসের টুকরো হাতে এগিয়ে গেল, আর খোকা কুকুরটার পাশে উবু হয়ে ব'সে একটা বিড়ি ধরালো। এই বিড়ির মধ্যে কোকেন, ক্যাম্ফার ও চরসের এক মিশ্র-দ্রব্য ছিল। বিড়ির মৃদু মৃদু ধোঁয়া কুকুরটার নাকে যাওয়া মাত্র সে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লো। মাংসের টুকরা কয়টা কুকুরের মুখের কাছে রেখে দিয়ে পা টিপে-টিপে তারা বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। বারান্দার পাশেই দরোয়ানদের ঘর। দূর হতেই দেখা গেল, তারা আরামেই নিদ্রা যাচ্ছে। দরোয়ানদের ঘরে সাবধানে শিকল তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ভিতর-বাড়ীর পাঁচিলের ধারে এসে খোকা জিজ্ঞাসা করলো, "কি রে, ব্যবস্থা মতো বাড়ীর ঝি সজাগ আছে তো?"

"নিশ্চয়ই সজাগ আছে, কম টাকা খাইয়েছি তাকে," গোপী উত্তরে বললো, "দিন এইবার লম্বা শিকলটা পাঁচিলের ওপারে ফেলে। নিচেই জলের কল আছে, ঠিক বেঁধে দেবে'খন।"

সত্য সত্যই বাড়ীর ঝি ক্ষ্যান্তমণি সজাগ থেকে উঠানে বসে ঝিমাচ্ছিল। ঠং করে একটা আওয়াজ হতেই চমকে উঠে সে দেখলো, লম্বা শিকলের একটা মুখ এ-পারে এসে পৌঁছিয়েছে। পূর্ব্ব-নির্দ্দেশ মত শিকলের মুখটা কলের পাইপের সঙ্গে বেঁধে দিতেই খোকার দল একে একে শিকল ব'য়ে পাঁচিলের এপারে এসে ঝিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললো, "একেই তো বলে লক্ষ্মী মেয়ে! এখোন আপন ঘরে শুয়ে পড়, শিকল তুলে দিয়ে আমরা কাজ সারতে থাকি, তা না হলে পুলিশ এসে তোকেই সন্দেহ করবে।"

বিশ্বাসী পুরাতন চাকরাণীটাকেও ঘরের মধ্যে পুরে শিকল তুলে দিয়ে খোকা বাবু সদলে উপরে এসে দেখলো, বারান্দার উপর মাদুর পেতে শুয়ে এক জন বিরাটাকার পুরুষ নাসিকা গর্জ্জন করছেন।

ভদ্রলোক নাসিকা গর্জ্জন করলেও অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েননি। খোকার এক বার মনে হলো, এঁর নাকের কাছে বিড়ি ধরিয়ে পূর্ব্বের ন্যায়ই কিছুটা ধোঁয়া ছেড়ে দেয়। কিন্তু তা না ক'রে খোকা লোকটাকে ডিঙিয়ে এগিয়ে আসতে চাইলে। খোকার পায়ের শব্দ শুনে ভদ্রলোক ধড়-মড় ক'রে উঠে বসে দেখলেন, জন চার-পাঁচ অচেনা লোক তাকে ঘিরে ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর যায় কোথায়, ভদ্রলোক পরিত্রাহিরূপে চীৎকার সুরু করে দিলেন, "চোর চোর—ও মশাই, চোর!"

ভদ্রলোকের চীৎকার শুনে বাড়ীর অপরাপর সকলেই উঠে পড়েছেন। সকলেরই ধারণা ছিল, আগন্তুক এক জন সাধারণ চোর মাত্র। বাড়ীর ছেলে-মেয়ে সকলেই দল বেঁধে বারান্দায় এসে দেখলেন, মুখোস-পরা একটা লোক বাম হাতে ঐ ভদ্রলোকের গলাটা সজোরে চেপে ধরে ডান হাতে পিস্তল উঁচিয়ে জলদগম্ভীর স্বরে বলছে, "আমি আর কেউ নই, আমি খোকা, আপনাদের মধ্যে যেই একটু নড়ছেন, তাকেই আমি গুলী করে শেষ করে দেবো। চুপ ক'রে সব দাঁড়িয়ে থাকুন।"

এই তল্লাটে মেয়ে-পুরুষ এমন কেউ-ই ছিল না, যে কি না খোকা বাবুর নাম না শুনেছে। খোকার নাম শুনে তারা কেঁচোর মতনই নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। খোকা এইবার পিস্তলটা গোপীর হাতে তুলে দিয়ে এই মূক লোকগুলোকে তার জিম্মা করে দিয়ে বললো, "এদের নিয়ে তুই দাঁড়িয়ে থাক এখানে, আমি দেখে আসি আর কোনও ঘরে লোক আছে কি না। সব ক'টাকে ধরে এনে এখানে জড় করে ঘরের সিন্দুকগুলো ভাঙলেই হবে এখন।"

খোকা বাবু মনে করেছিলো, যা কিছু প্রতিরোধ এইখানেই শেষ হয়েছে, এইবার সুরু হবে অনুরোধ ও উপরোধের পালা। কিন্তু তাঁর ভুল ভাঙতে দেরী হলো না, হঠাৎ সে শুনতে পেলো, দূরের একটা ঘর হ'তে নারী-কণ্ঠে এক জন চেঁচাতে সুরু করেছে, "ও মশাই, কে আছেন কোথায়, শীগ্‌গির আসুন, বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে-এ-এ—"

কালবিলম্ব না করে খোকা ঐ ঘরটির মধ্যে ঢুকে পড়ে দেখতে পেলো, এক জন সুবেশা মহিলা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়েই চলেছেন। বাম হাতের টর্চ্চের আলোটা তাঁর দেহের উপর ফেলে খোকা বাবু দেখলো, মহামূল্য একটা হীরকের লকেট সহ দামী-দামী মুক্তা-বসানো একটা সোনার হারও ভদ্রমহিলার গলায় ঝুলছে। দ্রুতগতিতে এগিয়ে এসে খোকা বাবু হাতের ছুরিটা ভদ্রমহিলার নাকের উপর তুলে ধরে আদেশ করলো, "চুপ করুন শীগ্‌গিরি! আপনি স্ত্রীলোক, গায়ে আপনার হাত দিতে চাই না। এখোন চট্‌পট্ ঐ হারটা খুলে দিন আমাকে, শীগ্‌গির।"

ভদ্রমহিলা অনেক আগেই চুপ করেছিলেন, এইবার ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মূল্যবান হারটা আততায়ীর হাতে তুলে দিয়ে তিনি সভয়ে সরে দাঁড়ালেন।

খুসী-মনে হারটি গ্রহণ করে দুই পা পিছিয়ে এসে খোকা বাবু দেখলো, ঘরের কোণে একটা লোহার সিন্দুক রয়েছে। সিন্দুকটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে ঘরের বিজলী বাতির সুইচটা খোকা বাবু টিপে দিতেই ঘরটিও আলোকিত হয়ে উঠলো। কোমরে বাঁধা একটা থলির মধ্যে অনেকগুলি যন্ত্রপাতি ছিল। খোকা গোটা-দুই বাছা বাছা যন্ত্রপাতি বার করবার জন্যে মুখের মুখোসটা খুলে ফেলতেই তার সম্মুখে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো একটি ভয়কাতর পরিচিত মুখ। রাত্রে যেন ভূত দেখতে পেয়েছে, এমনি ভাবে খোকা পিছিয়ে এলো, মুখ দিয়ে তার কথা সরে না। অত্যন্ত লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হ'য়ে খোকা বাবু বলে উঠলো, "আরে-এ, আপনি? হেনা দেবী, আপনি? আপনি এখানে এলেন কি করে? এ কি-ই ব্যাপার?"

খোকা বাবু এই প্রথম অনুভব করলো, তার মনের পরস্পর-বিরোধী অংশ দুইটি একীভূত হয়ে জুড়ে আসছে। তার দ্বৈত জীবনের উভয় দিকই এই প্রথম সে স্মরণ করতে পেরেছে। বহু কথাই তার মনে পড়ে গেলো। এই প্রথম তার স্বাভাবিক আত্মাকে সে যেন ফিরে পেলো। হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে খোকা বাবু এগিয়ে এসে মূল্যবান অপহৃত হারটি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে দিতে চাইলে, কিন্তু মিস্ হেনা দত্ত তার এই পুনঃ-সংস্থাপনের কার্য্যে বাধা দান করে বললেন, "না মিঃ ঘোষ, ওটা আর আমি ফিরিয়ে নেবো না। ওটা আমি আমাদের দেশ-মাতৃকার চরণতলেই উৎসর্গ করলাম। আপনার বিপ্লবী দল যেন সার্থক হয়। আপনি যে এক জন স্বদেশী ডাকাত, দেশপ্রেমিক, তা আমি সেই দিনই বুঝেছি। এ কথা আমাকে খুলে বললেই পারতেন। আমি আপনার এই মহৎ কার্য্যে কক্ষনো বিঘ্ন ঘটাবো না।"

হেনা দেবী সত্য সত্যই খোকা বাবুকে এক জন বিপ্লবী নেতারূপেই কল্পনা করে নিয়েছিলেন। খোকা যে এক জন সাধারণ ডাকাত, এ তাঁর ধারণার বাইরে ছিল।

খোকা বাবু ছিল এক জন সাহসী ডাকাত, প্রয়োজন মত সে খুনও করেছে, কিন্তু ঠগী নয়। খোকার মন মিস্ দত্তকে ঠকাতে চাইলো না, বিক্ষুব্ধ ভাবে খোকা বাবু উত্তর করলো, "আপনার ধারণা ভুল মিস্ দত্ত, আমি এক জন সাধারণ অপরাধী মাত্র। দেশ-প্রেমকে বরং আমরা ঘৃণাই করে থাকি। আমাদের মতে ধর্ম্ম, আইন, দেশ-প্রেম এবং দৈহিক রোগ সমূহই মানুষের একমাত্র শত্রু। অপকর্ম্ম বা চুরি মানুষের শত্রু নয়, বরং উহা একটি সম্মানজনক ব্যবসায়। ধর্ম্ম মানুষের স্বাধীন চিন্তা এবং স্বাধীন আত্মাকে অপহরণ করে, এবং সামাজিক রীতি-নীতি মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা বা স্পৃহাকে দমন করে মানুষকে অমানুষ করে তোলে। দেশ-প্রেমকে আদর্শের ক্ষেত্রে, আমি পুতুল-পূজার মতই মনে করি। এই দেশ-প্রেমের নামে ভণ্ড ও স্বার্থপর রাষ্ট্রনায়করা পৃথিবী শুদ্ধ মানুষের সর্ব্বনাশ করেছে, এখোন আপনিই বলুন, চুরি বা অপকর্ম্ম কি মনুষের এতোটা ক্ষতি কখনও করেছে? বরং এই চুরি বা অপকর্ম্ম ধন-সম্পদ বণ্টন করে সমাজের উপকারই করে থাকে, এই জন্যে আমি এক জন চোরই হয়েছি, হেনা দেবী!"

মুগ্ধ হয়ে মিস্ হেনা দত্ত খোকা বাবুর বক্তৃতা শুনছিলেন, যেমন করে মানুষ সাম্যবাদীদের বক্তৃতা শুনে থাকে। তাঁর মনে হলো, খোকা যেন এক নূতন ধর্ম্ম—একটা নূতন দর্শন প্রচার করতে বেরিয়েছে। মানুষের স্থূল বৃত্তি দিয়ে বিচার করলে এগুলো ভালোই মনে হবে, কিন্তু তার সূক্ষ্ম বৃত্তি ওতে কখনও সায় দেবে না। ক্ষণিকের জন্য

মন্ত্রমুগ্ধ হলেও হেনা দত্ত খোকা বাবুর এই মতবাদে সায় দিতে পারলো না। বিক্ষুব্ধ চিত্তে হেনা দেবী বললেন, "আপনি যে এক জন চোর তা আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না, মিঃ ঘোষ!"

বিস্মিত হয়ে খোকা দেখলো, হেনা দত্তের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। জানালার ওপর হতে ভেসে-আসা জোছনার স্পষ্ট আলোকে খোকা দেখতে পেলো, হেনা কাঁদছে। খোকা ভুলে গেল তার বর্ত্তমান অপ-কর্ম্মের কথা—ভুলে গেল নিজেদের বিপদের কথা। হেনা দত্তের উপর স্থির নিশ্চল দৃষ্টি রেখে খোকা বাবু বললো, বিশ্বাস করুন হেনা দেবী, সত্যই আমি এক জন চোর; বিদ্যা, বুদ্ধি এবং সাধুতা আমার কাযে আসেনি, আমার বিশ্বাস, কোন মানুষেরই তা কাযে আসে না, বরং তাদের অসাধুতাই কাযে এসেছে, তা না হলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা কায করে তারা এতো কষ্ট পায় কেন? আমি অনেক ভেবে-চিন্তেই এই চৌর্য্যবৃত্তি গ্রহণ করেছি, হেনা দেবি! দোহাই হেনা, তুমি আমাকে ঘৃণা করতে শেখো, ভালোবাসলে কষ্ট পাবে মাত্র।"

হেনা দেবী বিস্ময়ের শেষ সীমায় এসে পড়েছিলেন, তাঁর মনে হলো, খোকা বুঝি তার সঙ্গে পরিহাস করছে! হেনা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু আপনিও কি আমায় ভালোবাসেননি এতটুকুও? বলুন তো বুকে হাত দিয়ে, বলুন।"

উত্তরে খোকা বাবু বললো, "হাঁ, ভালোবাসি, কিন্তু সেই সঙ্গে আপনাকে শ্রদ্ধাও করি। আপনাকে দেখে আমার কামনা আসে না, আসে স্নেহ। খুব-ব অসং প্রকৃতির মেয়ে না পেলে আমি কখনও কামনা আনতে পারিনি। এই স্থূল প্রবৃত্তি বারে বারে আমাকে পৃথিবীর অধস্তন স্তরে ঠেলে দিয়েছে, উপরতলায় উঠেও আমি বেশীক্ষণ সেখানে থাকতে পারিনি। একটু পরেই হয়তো আমি এমন এক জীবন অতিবাহিত করবো, শতাংশের একাংশও আপনার গোচরীভূত হলে আপনি বিস্ময়ে ঘৃণায় হতবাক্ ও হতবুদ্ধি হয়ে যাবেন। আসলে আমি এক অত্যদ্ভুত মানসিক রোগে আবাল্য ভুগে আসছি। আমাকে ভুলে যান, হেনা দেবি! আমি এক জন উৎকট রোগী মাত্র।"

হঠাৎ খোকা শুনতে পেলো, পাঁচিলের উপর থেকে সুধীর শিষ দিয়ে উঠছে। খোকা আর অপেক্ষা না করে অপহৃত হার-ছড়াটা হেনার গলায় উপর ছুড়ে দিয়ে হুইসেল দিয়ে উঠলো। হুইসেলের শব্দ শুনে সদলে গোপীও হেনার ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়ে বলে উঠলো, "এতোক্ষণ কি করছিলি? সব মাটি, মাইরী!"

দূর হতে শোনা যাচ্ছিল বন্দুকের শব্দ। বোঝা গেল, গুলী ছুড়তে ছুড়তে সশস্ত্র পুলিশের দল এগিয়ে আসছে। খোকা আর দেরী না করে সদলে বারান্দার ধারে একটা জলের পাইপ ধরে, দেওয়াল বেয়ে একে একে নিচের উঠানের উপর নেমে পড়লো। জানালা হতেই হেনা দত্ত দেখলেন, খিড়কীর দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে তারা উত্তর-মুখে চলে যাচ্ছে।

খোকা বাবু সদলে চলে যাবার একটু পরেই বাড়ীশুদ্ধ লোক হেনার খোঁজে হেনার ঘরে ঢুকে দেখতে পেলো, খুনেটা হেনাকে খুন করেনি। নিশ্চিন্ত হয়ে হেনার দাদামশাই বলে উঠলেন, "বাবা, বাঁচলাম কি ভয়ই না হয়েছিল! যাক, পুলিশও এসে গেছে।"

একটু পরেই পুলিশের দলও উপরে উঠে এলো, বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য, সশস্ত্র সিপাই এবং অফিসারে বাড়ী ভরে গেছে। এই পুলিশের দলের মধ্যে প্রণব বাবুও ছিলেন এক জন, টেলিফোন পেয়েই তিনি ছুটে এসেছেন। হেনাকে দেখে প্রণব বলে উঠলেন, "আরে তুমি—আপনি—আপনিও এখানে? চোর ডাকাত কি আপনার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে না কি? কোন্ দিকে গেলো সব?"

হেনা দত্ত খোকাকে সদলে উত্তর দিকের রাস্তা ধরে চলে যেতে দেখেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও দক্ষিণ দিকের একটা রাস্তা প্রণব বাবুকে দেখিয়ে দিয়ে উত্তর দিলেন, "ঐ যে, ঐ রাস্তাটা দিয়ে সব চলে গেলো।"

প্রণব বাবুর সঙ্গে খান তিন-চার পুলিশ ও শাস্ত্রী বোঝাই মোটর লরী এসেছিল। ক্ষণ মাত্র আর দেরী না করে তিনি সদল-বলে মোটরে উঠে খোকাকে ধরবার জন্যে দক্ষিণ দিকের রাস্তাটা ধরে ছুটে চললেন।

মিস্ হেনা দত্ত স্থির ধীর ও নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই দিন অনেক পুরুষ মানুষই তিনি দেখলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মনে হচ্ছিলো, পৃথিবীতে বুঝি ঐ একটা মাত্রই পুরুষ আছে।

[ক্রমশঃ

পৃথিবী

সবীন চৌধুরী

মাঝে মাঝে মনে হয় এ বিরাট পৃথিবীটা সবি
পাখীর পায়ের আঁকা নদীর বালিতে বাঁকা ছবি।

এক দিন যে নদীর কাক-চোখ জলে
বাচাল পাখীর ঝাঁক নেমে আসে বুনো ডানা মেলে,
ঝকে ঝাঁকে বালি-তীরে পায়ে হেঁটে হেঁটে
পদ্ম-ফোটা জড় দেশে ঘুম, স্বপ্ন কেটে,
যাযাবর পরী তারা সারা রাত জলখেলা করে
তার পর ভোর রাতে ভিড়ে যায় আর নদী-চরে—
বালিতে তাদের আঁকা খেয়ালের হিজিবিজি ছবি
মাঝে মাঝে মনে হয় এ বিরাট পৃথিবীটা সবি।

দি গুড আর্থ

শিশির সেনগুপ্ত

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী
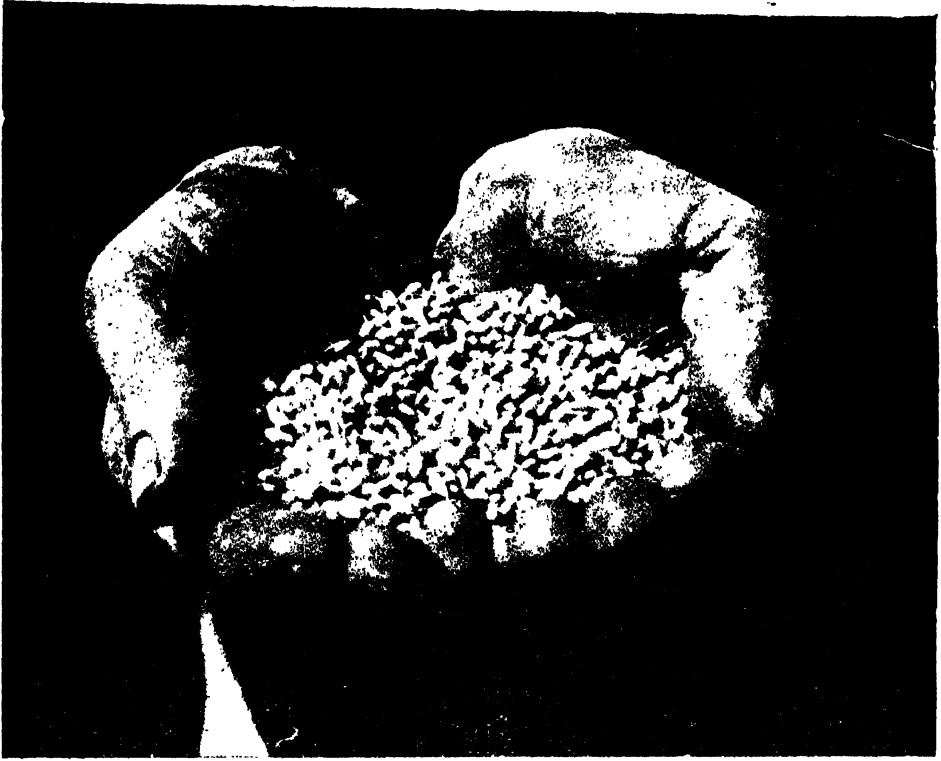
সারা জীবনই ওয়াঙ এখানে ওখানে যুদ্ধের কথা শুনে আসছে। 'এবার পশ্চিমে যুদ্ধ লেগেছে' লোকেরা বলাবলি করত—'এবার যুদ্ধ পূবে— উত্তর-পূবে।' কিন্তু সেই অল্পবয়সে শীতকালে একবার যখন সে দক্ষিণে গিয়েছিল তখন ছাড়া যুদ্ধ আর কখনো সে চোখে দেখেনি। তার বেশী অভিজ্ঞতাও নেই তার।

ওয়াঙের কাছে যুদ্ধ জল-মাটি-আকাশের মতই—এর বেশী কোন ধারণাই নেই তার। কখনো কখনো সে লোকেদের বলতে শুনেছে—'আমরা যুদ্ধে যাচ্ছি।' মানুষ অনাহারে থাকলেই এ সব কথা বলত। ভিখারী হওয়ার চেয়ে সৈন্য হওয়া ঢের ভাল। আর যখন লোকে দৈনন্দিন জীবনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠত তখনও যুদ্ধে যাওয়ার কথা বলত বটে। যাই হোক, যুদ্ধ-বিগ্রহ যা ঘটত দূর প্রদেশেই ঘটত। কিন্তু এবার হঠাৎ দমকা হাওয়ার মত যুদ্ধ একেবারে ঘরের দুয়ারে এসে হানা দিল।

ওয়াঙ প্রথম কথাটা শুনল তার দ্বিতীয় ছেলের কাছ থেকে। এক দিন দুপুরে বাজার থেকে বাড়ীতে খেতে এসে বাপকে বললে সে—'শস্যের দাম হঠাৎ আগুন হয়ে উঠেছে। দক্ষিণের যুদ্ধ দিন দিন বাড়ীর দ্বারে এগিয়ে আসছে। গোলার শস্য ধরে রাখতে হবে—সৈন্যরা যতই কাছে এগিয়ে আসবে দামও হু-হু করে চড়বে। তখন বেশ মোটা মুনাফা মারা যাবে।'

ওয়াঙ খেতে খেতে শুনল ছেলের কথা। তার পর বললে—'অদ্ভুত ব্যাপার ত! সারা জীবন যুদ্ধের কথা শুনেই এলাম এবার নিজের চোখে দেখতে পাব।'

ওয়াঙের মনে পড়ে গেল একবার সে যুদ্ধের নামে কি ভয়ংকর ভয় পেয়েছিল। এই বুঝি ইচ্ছার বিরুদ্ধেই জোর করে যুদ্ধে টেনে নিয়ে যাবে। কিন্তু এখন সে বুড়ো হয়ে পড়েছে আর তাছাড়া অনেক পয়সার মালিক। টাকা যার আছে তার কোন কিছুতেই ভয় পাবার কিছু নেই। কাজেই এর বেশী আর ওয়াঙ একটুও মাথা ঘামাল না। নিছক কৌতূহল ছাড়া একটুও বিচলিত হোল না সে। দ্বিতীয় ছেলেকে বললে ওয়াঙ—'যা ভাল বোঝ কর। সবই ত তোমার হাতে!'

ওয়াঙ খায়-দায় ঘুমোয়, মন ভাল থাকলে নাতী-নাতনীদের নিয়ে খেলা করে—কখনো বা দূর মহল্লে যেখানে তার হাবা মেয়েটি থাকে সেখানে যায়—তার দেখা-শোনা করে।

গ্রীষ্মের সুরুতে হঠাৎ এক দিন উত্তর-পশ্চিম থেকে পঙ্গপালের মত এক দল লোক এল। রৌদ্রালোকিত ঝক্‌ঝকে একটি সকালে ওয়াঙের ছোট্ট নাতীটি ঝির হাত ধরে বাড়ীর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ধূসর পোষাক-পরা এক দল লোককে বাড়ীর পাশ দিয়ে মার্চ করে যেতে দেখে সে ছুটে দাদুর কাছে গেল—'দাদু, দেখবে এস।'

ওয়াঙ তাকে খুশী করবার জন্য তার কথামত গেটের কাছে এল। সত্যিই রাস্তা-ঘাটে লোক গিস্‌গিস্ করছে, সারা সহর ভরে উঠেছে। হঠাৎ ওয়াঙের মনে হোল, ঐ ধূসর ইউনিফর্ম-পরা লোকগুলি সারা সহরময় সমান তালে পা ফেলে ফেলে মার্চ করে আকাশের আলো-হাওয়া যেন রুদ্ধ করে ফেলেছে। ওয়াঙ তীক্ষ্ণ ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল তাদের। প্রত্যেকেরই হাতে এক প্রকার অস্ত্র যার মাথায় মস্ত একটা ছোরা বসান। প্রত্যেকটি লোকেরই মুখ রোদে পোড়া—চোখে বন্য হিংস্রতা। অনেকের বয়স কাঁচা হলেও।

তাদের পশু-চাউনি দেখে ওয়াঙ নাতীটিকে নিজের কাছে টেনে

নিয়ে বলল—'চল ঘরে যাই। গেট বন্ধ করে দি। এরা ভাল লোক নয়।'

কিন্তু ওয়াঙ পিছনে ফেরবার আগেই হঠাৎ কে যেন ভিড়ের মধ্য থেকে তাকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বলল—'ঐ যে আমার বুড়ো বাপের ভাইপো।'

এ কথা শুনেই ওয়াঙ ফিরে তাকাল। তার খুড়োর ছেলে ঐ ভিড়ের মধ্যে। সবাইকার মত তারও ধূলি-মলিন ইউনিফর্ম। অন্যদের তুলনায় তার চেহারা যেন আরো বেশী দুর্দান্ত। আরো হিংস্র। কর্কশ হাসিতে মুখ ভরিয়ে সে তার বন্ধুদের ডেকে বললে—'কমরেডরা, এখানে একটু বিশ্রাম নিতে পারি। এ এক জন বড়লোকের বাড়ী—আমার আত্মীয়ও বটে।'

আতংকে কিছু করবার আগেই সেই সৈন্যদল ওয়াঙের পাশ দিয়ে গেটের ভিতরে ঢুকে পড়ল। তাদের মধ্যে ওয়াঙের নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় মনে হতে লাগল। ময়লা জলের মত তারা হু-হু করে ঢুকে পড়ে সমস্ত ফাঁক ভরে ফেলল। কেউ বা উঠোনেই বসে পড়ল—কেউ বা পুকুর থেকে আঁচলা ভরে জল তুলে খেতে লাগল। কেউ কেউ সান-বাঁধান টেবিলে ছোরা শান দিতে বসে গেল। যেখানে সেখানে থুথু ফেলে তারা হৈ-হট্টগোলে মুখর করে তুলল সারা মহল।

ওয়াঙ দেখে-শুনে হতাশায় নাতীটিকে সঙ্গে নিয়ে ছেলের কাছে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল। বড় ছেলে তখন নিজের মহলে বসে বই পড়ছিল। বাপ ঘরে ঢুকতেই সে উঠে দাঁড়াল। ওয়াঙ হাঁফাতে হাফাতে যা বলল শুনে সে-ও আর্ত্তনাদ করে ছুটল বাইরে।

খুড়তোত ভাইকে দেখে অভিশাপ দেবে কি তার প্রতি সৌজন্য করবে কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারলে না। সব দেখে-শুনে সে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা বাপকে বলল—'দেখেছ ত সবার হাতেই এক-খানা করে ছোরা।'

কাজেই অতি বিনয়ের সঙ্গে খুড়তোত ভাইকে সে বলল—'এসো—এসো।'

তার জবাবে খুড়তোত ভাই ভ্রূকুটি করে বলল—'অনেক অতিথি এনেছি সাথে করে।'

—'তোমার অতিথি, কাজেই তারাও এখানে স্বাগতম্। তাদের আহারের ব্যবস্থা করতে হবে—চলে যাওয়ার আগে যাতে তারা কিছু মুখে দিতে পারে।'

খুড়তোত ভাই দন্ত বিকশিত করে উত্তর দিল—'সে ত ভাল কথা। কিন্তু বেশী হুড়োহুড়ি করার প্রয়োজন নেই। আমরা এখানে কয়েকটা দিনও থাকতে পারি, আবার এক পক্ষ, এক বছর বা দু'বছরও থেকে যেতে পারি। যত দিন না যুদ্ধের ডাক আসছে তত দিন এই সহরেই আমরা ছাউনি গেড়ে থাকব।'

এ কথা শোনার পর ওয়াঙ আর তার ছেলের পক্ষে আর ভয়ের ভাব গোপন করা অসম্ভব হয়ে উঠল। তারা কোন মতে মুখে হাসি টেনে বলল—'সে ত আমাদের সৌভাগ্য, পরম সৌভাগ্য।'

বড় ছেলে যেন সব বন্দোবস্ত করতে যাচ্ছে এমনি ভাব দেখিয়ে বুড়ো বাপের হাত ধরে অন্দর-মহলে পালিয়ে গেল। ভিতর-মহলের দরজা খুব ভাল করে বন্ধ করে বাপ আর ছেলে বিষম আতংকে বিমূঢ় হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল।

এমন সময় দ্বিতীয় ছেলেও ছুটতে ছুটতে বাড়ী এল। দরজায় ধাক্কা শুনে দরজা খুলে দিতেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে সে এক নিশ্বাসে বলে ফেলল—'সহরের সর্বত্র প্রত্যেক বাড়ীতে সৈন্যরা ঢুকে পড়েছে। এমন কি গরীবদের কুঁড়েতেও। আমি দৌড়ে এলাম তোমাদের বলতে কেউ যেন ওদের বাধা দিও না। কারণ, আজই আমাদের দোকানের এক জন কেরাণী—তাকে আমি খুব ভাল করেই চিনি—দোকানে সে আমার পাশে কাউণ্টারে সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে—সে বাড়ী গিয়ে দেখে সৈন্যরা যত্র-তত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার রুগ্না স্ত্রীর ঘরে ঢুকে পড়েছে তারা। সে প্রতিবাদ করতেই এক জন তার দেহের ভিতর দিয়ে ছুরি চালিয়ে দিলে—একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় করে। এরা যা চাইবে দিতে হবে আমাদের। শুধু ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাও—যেন তাড়াতাড়ি অন্য দিকে সরে যায়।'

তার পরে তিন জনে ভয়াক্রান্ত হৃদয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। ঘরের বৌ-ঝি আর সেই সঙ্গে বাইরের ক্ষুধার্ত মাংস-লোলুপ পশুদের কথা ভাবল তারা। বড় ছেলে নিজের শিক্ষিত বৌ'র কথা ভেবে বলল—'মেয়েদের অন্দর-মহলের এক জায়গায় জড় করে দিন-রাত তাদের উপর নজর রাখতে হবে। সামনের গেট সব সময় বন্ধ করে খিড়কির দরজা যে কোন মুহূর্তে খুলে ফেলার জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে।'

তার কথা মতই কাজ করা হোল। অন্দর-মহলের যে অংশে কমলিনী কোকিলা আর চাকরাণীদের নিয়ে থাকে সেখানে মেয়েদের আর বাচ্চাদের রেখে দেওয়া হোল। তারা নানা অসুবিধা সত্ত্বেও এক জায়গায় জোট বেঁধে বাস করতে লাগল। বড় ছেলে আর ওয়াঙ দিন-রাত গেটে পাহারা রইল। মেজ ছেলে যখন সুবিধা পেত বাড়ী আসত। দিন-রাত গেটের সামনে সতর্ক পাহারার আর বিরাম রইল না।

খুড়োর ছেলেকে নিয়েই যত গণ্ডগোল বাধল। সে আত্মীয়—কাজেই আইনতঃ তাকে বাইরে রাখা চলে না। যখন-তখন সে দরজায় ঘা মারে। ভিতরে ঢুকে অন্দর-মহলের যেখানে-সেখানে খেয়াল-খুশী মত ঘুরে বেড়ায়। হাতে সব সময় একখানি ধারাল ছোরা চক-চক করে। মুখে অনন্ত আক্রোশ, বড় ছেলে ছায়ার মত তার পিছু-পিছু ঘোরে। কিন্তু ঐ ছোরার ভয়ে মুখে একটি কথা বলারও সাহস হয় না তার। খুড়োর ছেলে এটা-ওটা দেখে আর প্রত্যেক মেয়ের গুণাগুণ বিচার করে।

বড় ছেলের বৌকে দেখে সেই চিরাচরিত কর্কশ হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলল সে—'বা: ভাই—তুমিই দেখছি আসল সহরের পরী এনেছ ঘরে—মেয়েটির পা দু'টি যেন পদ্মকুঁড়ির মত ছোট। দ্বিতীয় ছেলের বৌকে উদ্দেশ করে সে বলল—'তোমারটি ঠিক পাড়াগাঁয়ের সুপুষ্ট রাঙা মূলোর মত। ঠিক যেন নধর এক তাল মাংস।'

এ কথা সে বলল, কারণ, মেয়েটি যেমন মোটাসোটা তেমনি রক্তাভ গায়ের রঙ—শরীরের হাড়গুলিও বেশ মোটাসোটা কিন্তু তাই বলে অসুন্দর নয়। ছেলেটি বড় ছেলের বৌ'র দিকে তাকাতেই সে সংকুচিত হয়ে জামার আস্তিনে মুখ লুকাল কিন্তু মেজ ছেলের বৌ হাসিভরা মুখে বলল—'অনেক পুরুষ গরম মূলো ভালবাসে আবার কারুর লাল মাংসই পছন্দ।'

খুড়তোত ভাইটিও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—'আমিও তাই পছন্দ করি।' এবং এমন ভাব দেখাল যেন এখুনি হাত চেপে ধরবে।

যাদের সঙ্গে কথা বলাই উচিত নয় তাদের মধ্যে এমনি কথা চালাচালিতে বড় ছেলে এতক্ষণ লজ্জায় মরমে মরে যাচ্ছিল। খুড়তোত ভাই আর তার ছোট ভায়ের বৌয়ের আচরণে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করছিল সে। খুড়োর ছেলে স্ত্রীর সামনে বড় ভাইয়ের ভীরুতা লক্ষ্য করে আক্রোশ ভরেই বললে—'এর মত ঠাণ্ডা স্বাদহীন মাংস খাওয়ার চেয়ে লাল মাংসই এক দিন চেখে দেখা যাবে।'

এ কথা শুনে বড় ছেলের বৌ সসম্ভ্রমে উঠে অন্দর-মহলে অদৃশ্য হয়ে গেল। খুড়োর ছেলে কমলিনীকে লক্ষ্য করে বলল। কমলিনী পাশেই গড়গড়া খাচ্ছিল।

—'এই সহুরে মেয়েগুলো বড্ড দেমাকী। কী বল বুড়ী মা'—তার পর কমলিনীকে আরো মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে বলল—'আমার কাকা যদি ধনী না-ও হতেন তোমাকে দেখেই আমি চিনতে পারতাম। চর্বির পাহাড় হয়ে পড়েছ যে। দিব্যি খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে—আরাম হচ্ছে। বড়লোকের বৌ-ঝিরাই তোমার মত হতে পারে।'

কমলিনী খুড়োর ছেলের 'বুড়ীমা' সম্ভাষণে মনে মনে অত্যন্ত খুশী হোল। কারণ একমাত্র বড়-ঘরের বৌদেরই এই সম্মান দেওয়া হয়। সে খড়-খড় শব্দে হেসে উঠল—কলকে থেকে ফুঁ দিয়ে ছাই ফেলে দিয়ে এক জন দাসীর হাতে দিল কলকেটা আবার ভরে দেওয়ার জন্য। তার পর কোকিলার দিকে ফিরে বলল—'চাষাড়ে ছেলেটা দেখছি বেশ রসিকতা শিখেছে।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে সে খুড়োর ছেলের দিকে আড়চোখে তাকাল। অবশ্য এখন আর তার চোখ আগেকার মত টানাটানা নয়, ভরা গাল আর যুবানীর মত দেখায় না আর কটাক্ষেও পূর্বেকার সে বিদ্যুৎ-ঝলক নেই। তার ঐ চাউনি লক্ষ্য করে খুড়োর ছেলে হো-হো শব্দে হেসে উঠল।

—'এখনও দেখছি আগেকার মতই বিচ্ছু আছে।' হাসিতে ফেটে পড়ে খুড়োর ছেলে।

বড় ছেলেটি ভিতরে রাগে গর-গর করতে করতে মুখ বুঁজে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

সব দেখা হয়ে গেলে খুড়োর ছেলে নিজের মা'র সঙ্গে দেখা করতে গেল। তিনি তখন গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। তাকে জাগান সহজ হোল না। কিন্তু ছেলেটি শিয়রের দিকে মেঝের টাইলে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ঠুকতে ঠুকতে মা'র ঘুম ঠিক ভাঙাল। তিনি জেগে উঠে পলকহীন চোখে যেন স্বপ্নাহতের মত তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। অসহিষ্ণুর মত তেড়ে উঠল ছেলেটি—'তোমার ছেলে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আর তুমি এখনও ঘুমোচ্ছ ?'

তিনি বিছানা থেকে উঠে বসলেন। আবার পলকহীন চোখে ভাবতে লাগলেন—'আমার ছেলে—আমার ছেলে—'

অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন—তার পর কি করতে হবে ঠিক করে উঠতে না পেরে আফিংয়ের নলটা এগিয়ে দিলেন তার দিকে। যেন এর চেয়ে ভাল কিছুর কথা আর তিনি চিন্তা করতে পারছেন না। তিনি পরিচারিকাকে বললেন—'ওর জন্যও এক ছিলিম সেজে আন।'

ছেলেটি মা'র দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল—'না, আমি এখন ও-সব খাব না।' ওয়াঙ বিছানার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ সে ভীত হয়ে পড়ল—কি জানি ছেলেটি হয়ত এক্ষুনি তাকে বলবে—'আমার মা'র এ কি দুরবস্থা করেছেন। গায়ে এক রত্তি মাংস নেই। কেমন ঝলসান আর হলদে হয়ে পড়েছে চেহারা।'

কাজেই ওয়াঙ তাড়াতাড়ি বলল—'এখন কমেতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আফিংয়ের জন্য এক-মুঠো ত রূপোর ওয়াস্তা। কিন্তু তার যা বয়স তাতে আর তার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করতে সাহস হয় না।' বলেই গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ওয়াঙ—চোখের কোণ দিয়ে খুড়োর ছেলেকে দেখতে লাগল। কিন্তু সে কোন কথাই বললে না। শুধু মা'র কী অবস্থা হয়েছে তাই দেখতে লাগল। খুড়ীমা আবার বিছানায় দেহ এলিয়ে দিয়ে ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে বন্দুকটাকে ছড়ির মত ব্যবহার করতে করতে খটাখট শব্দ তুলে চলে গেল বাহির-মহলে।

ওয়াঙ আর তার পরিবারের লোকেরা খুড়োর ছেলেকে যত ভয় করে বাইরের এই আলসের দলটিকে তত ভয় করে না। অবশ্য তারা গাছের ফুল-পাতা ছিঁড়ে, ডাল-পালা ভেঙে তচনচ করছে। ভারী চামড়ার জুতো দিয়ে চয়ারের সূক্ষ্ম কারুশিল্প নষ্ট করে দিয়েছে। দীর্ঘিকাগুলিতে যেখানে লাল মাছ খেলা করে বেড়ায়, সেখানে বিষ্ঠা আর ময়লা ভরে ফেলেছে। মাছগুলো মরে পেট ফুলে ভেসে উঠেছে উপরে—পচতে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু খুড়োর ছেলের ইচ্ছামত ভিতর-বাহির করার আর অন্ত নেই—দাসী-ঝিদের দিকেও লুব্ধ দৃষ্টি চলে। নিদ্রাহীন আর গর্তে ঢোকা চোখে ওয়াঙ আর তার ছেলেরা পরস্পরের দিকে তাকায়। রাতে তারা ঘুমুতে সাহস করে না। কোকিলা এ-সব লক্ষ্য করে এক দিন বলল—'দেখ, এখন একটি মাত্র পথ খোলা আছে। ও যত দিন থাকবে এখানে ওর ভোগের জন্য একটি দাসীর ব্যবস্থা কর। না হলে যেখানে উচিত নয় সে-দিকে নজর দেবে।'

কোকিলার উপদেশ ওয়াঙ তখুনি সাগ্রহে গ্রহণ করল। বাড়ীতে এই সব ঝঞ্ঝাট ওয়াঙের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। সে বললে—'ভাল মতলব দিয়েছ।'

তখন সে কোকিলাকে আদেশ দিল ছেলেটাকে জিজ্ঞেসা করে আসতে কোন্ দাসীটি তার পছন্দ। সবাইকেই ত দেখেছে সে।

কোকিলাও উপদেশ মত জেনে এসে বলল—'ও বলেছে কমলিনীর ঘরে ছোট্ট কচি মেয়েটি ঘুমায় তাকে ও চায়।'

সেই মেয়েটির নাম ফুলরাণী। একটি দুর্ভিক্ষের দিনে ওয়াঙ দয়া-পরবশ হয়ে কিনেছিল তাকে। সেদিন সে খুব ছোটটি ছিল—তার অনাহারক্লিষ্ট দুঃস্থ চেহারা ওয়াঙের মনকে দ্রবীভূত করেছিল। তখন সে এত কচি ছিল যে প্রত্যেকেই তাকে আদর করত। কোকিলাকে সাহায্য করবার জন্য এবং কমলিনীর ছোট-খাট ফাই-ফরমাস খাটার জন্য তাকে বহাল করা হোল। সে কমলিনীর কলকে ভরে দেয়; চায়ের কাপে চা ঢেলে দেয়। এখন খুড়োর ছেলের নজর পড়েছে তারই উপর।

ফুলরাণী ত এ কথা জানতে পেরে কেঁদে আকুল হ'য়ে উঠল। চায়ের কাপ মেঝেতে ফেলে দিয়ে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলল, চা গড়িয়ে গেল চারি দিকে। কিন্তু কি যে সে করছে কোন দিকেই তার হুঁস রইল না। সে কমলিনীর পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল আর মেঝেতে মাথা ঠুকতে লাগল।

—'ও মা—আমি না—আমায় নয়। আমাকে ও মেরে ফেলবে।'

কমলিনী তার আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে রুক্ষ কণ্ঠে বলল—'মানুষ ছাড়া ত আর কিছু নয়। দাসীদের নিয়ে পুরুষরা যা করে তার বেশী সে তোমার কি করবে। সব পুরুষই এক রকম। এ নিয়ে এত ঝামেলার কি আছে?'

কোকিলাকে ডেকে কমলিনী বলল তাকে—'যাও, ওকে তার কাছে দিয়ে এস।'

তখন মেয়েটি দু'হাত জোড় করে এমন ব্যাকুল ভাবে কাঁদতে লাগল যেন সে ভয়ে আর কান্নাতেই মরে যাবে। ভয়ে তার দেহ কাঁপতে লাগল থর-থর করে; করুণ চোখে সে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

ওয়াঙের ছেলেদের বাপের রক্ষিতার কথার উপর কথা বলার অধিকার নেই। তাদের বৌদেরও নেই। কনিষ্ঠ পুত্রটিও কোন কথা বলে না। বুকে হাত জড় করে ভ্রূকুটিকুটিল কঠিন চোখে কমলিনীর দিকে চেয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। বাচ্চা-কাচ্চারা আর অন্য দাসীদেরও মুখে কথা নেই। শুধু কচি মেয়েটির ভয়ার্ত আর্ত চীৎকারে থম-থম করতে লাগল ঘরের আবহাওয়া।

ওয়াঙ এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কমলিনীকে চটাবারও সাহস নেই তার। কিন্তু ওয়াঙের অন্তঃকরণ বড় কোমল। সে বিচলিত দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল মেয়েটির দিকে মেয়েটি তার হৃদয়ের ভাষা মুখের দৃষ্টিতে অনুধাবন করে ছুটে গিয়ে তার দু'পা জড়িয়ে ধরল—তার পায়েতে মুখ রেখে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল। ওয়াঙ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল ওকে। কত কচি মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে খুড়োর ছেলের বিরাট চাষাড়ে শরীরটিও পাশাপাশি মনে পড়ল। তার যৌবন কবে অতীত হয়ে গেছে। আর এ-সবের প্রতি ওয়াঙের স্বাভাবিক বীতস্পৃহাও এসে গেছে। সে মোলায়েম করে বলল কমলিনীকে—'এই কচি মেয়েটাকে জোর করে পাঠানো ঠিক নয়।'

খুব নরম স্বরে কথাগুলি বললেও কমলিনী তক্ষুনি প্রতিবাদ করে উঠল—'তাকে যা কথা দেওয়া হয়েছে তাই করতে হবে। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত কান্নার কি আছে? আগেই হোক আর পরেই হোক সকল মেয়ে মানুষের জীবনেই ত এ ঘটবে।'

কিন্তু ওয়াঙও নাছোড়বান্দা। সে কমলিনীকে বলল—'দেখি, কি করা যায়। তুমি যদি চাও ত তোমার জন্য আর এক জন দাসী বা অন্য কোন কিছু যা চাও কিনে দিতে পারি।'

কমলিনী অনেক দিন ধরেই একটা বিদেশী পোষাক আর নতুন ডিজাইনের পান্নার আংটির জন্য বায়না করছিল। ওয়াঙের শেষ কথা শুনে হঠাৎ সে চুপ করে গেল।

ওয়াঙ কোকিলাকে বলল—'যাও ছেলেটাকে বলগে যে, সে মেয়েটার কুৎসিত আর দুরারোগ্য রোগ আছে। তবুও তাকেই যদি সে চায় ভাল কথা। সে তার কাছেই যাবে। তবে যদি ভয় পায় অন্য ভাল ও মেয়েও আছে।'

ওয়াঙ চারি পাশে ভিড়-করা দাসীদের দিকে তাকাল। তারা মাথা নত করে মুখ টিপে হাসছিল, এখন এমন ভাব দেখাল যেন খুব লজ্জিত হয়েছে তারা। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি বেশ মেদপুষ্ট দুরন্ত মেয়ে,—বয়স কুড়ির ওপর হবে—মুখ লাল করে হাসতে হাসতে বললে—আমি ওর কথা অনেক শুনেছি। সে যদি আমাকে চায় ত আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি। অনেকের তুলনায় সে এমন কিছু ভয়ংকর নয়।'

ওয়াঙ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।—'বেশ যাও তাহলে।'

কোকিলা বলল—'ঠিক আমার পিছু-পিছু এস, কারণ আমি জানি হাতের সব চেয়ে নাগালের কাছে যে ফলটি পাবে সেইটিই নেবে।' এই বলে চলে গেল তারা।

কিন্তু কচি মেয়েটি তবুও ওয়াঙের পা ছাড়ল না। শুধু তার কান্না থেমেছে। কি হয় শোনবার জন্য সে চুপটি করে পড়ে রইল। কমলিনীর তার প্রতি রাগ তখনও যায়নি। সে উঠে কোন কথা না বলে নিজের ঘরে চলে গেল।

ওয়াঙ মেয়েটিকে আলতো করে তুলে বসাল। মেয়েটি ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। নিঃশব্দে সে দাঁড়িয়ে রইল সামনে। মেয়েটির ছোট্ট মুখখানি ঠিক ডিমের মত গোল। অত্যন্ত কোমল আর ফিকে গোলাপী।

ওয়াঙ আর্দ্র স্বরে বললে—'তোমার মা'র কাছ থেকে এখন দু'-এক দিন দূরে সরে থাকবে যতক্ষণ না তার রাগ পড়ছে। আর সে ছেলেটি বাড়ীতে ঢুকলেই কোনখানে লুকিয়ে পড়বে যাতে না আবার সে তোমায় দেখতে পায়।'

মেয়েটি মুখ তুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকাল ওয়াঙের দিকে। তার পর ছায়ার মত নিঃশব্দে তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

খুড়োর ছেলে দিন-কুড়ি রইল বাড়ীতে। সেই দুশ্চরিত্রা মেয়েটির সঙ্গেই কাটালে। মেয়েটি তার দ্বারাই গর্ভিণী হোল। এ নিয়ে সেও দাসী-মহলে খুব গর্ব করে বেড়াতে লাগল। তার পর হঠাৎ এক দিন এল যুদ্ধের ডাক। ঝড়ের মুখে খড়-কুটার মত দলটিও অদৃশ্য হয়ে গেল। পিছনে পড়ে রইল শুধু নোংরা আর ধ্বংসের চিহ্ন।

খুড়োর ছেলে কোমরে ছোরা ঝুলিয়ে কাঁধে বন্দুক ফেলে সবার সামনে এসে বিদ্রূপ কণ্ঠে বললে—'আমি যদি আর না ফিরি আমার প্রতিভূ আর মা'র নাতীকে রেখে গেলাম। এক মাস কোন জায়গায় থেকে ছেলে রেখে যাবার সৌভাগ্য সবার হয় না। সৈন্য-জীবনের এও একটা পরম আশীর্বাদ। পিছনে ফেলে যাওয়া বীজ অংকুরিত হয়—পরের ঘর লালন করে তাকে।'

এই বলে সকলের দিকে হাসিমুখে চেয়ে সে-ও চলে গেল দলটির সঙ্গে

[ক্রমশঃ

তিমিরবরণ
তিমির বরণ... সুরশিল্পী
প্রখ্যাত সুরকার তিমিরবরণ সুর-সংমিশ্রণের একটি অভিনব ধারা প্রবর্তন করে' ভারতীয় ঐকতান সঙ্গীতকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। চা সম্বন্ধে তিনি বলেনঃ
'কল্পনার তারে যে নব নব সুরের অস্পষ্ট গুঞ্জন ধ্বনি শুনি তাকে যন্ত্রের তারে বেঁধে পরিপূর্ণ রূপে ঐকতানের ছন্দে ঝঙ্কৃত করে' তুলতে চা আমাকে অনেকখানি প্রেরণা দেয়।'
চা
প্রেরণার উৎস
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

দেশের কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'বগুড়ার কথা' ক্রন্দন করিয়া বলিতেছেন :—"জীবন ধারণ করা আর চলে না। ১৯৪৩ সালে বাংলা সরকারের অযোগ্যতা ও অক্ষমতার ফলে লক্ষ লক্ষ লোক না খাইয়া মরিয়াছিল, এবার ১৯৪৭ সালে সরকারী সরবরাহ ব্যবস্থার চাপে কোটি কোটি লোক দগ্ধে দগ্ধে মরিতেছে। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে প্রধান জিনিষ হইল চাউল, সে চাউলের দর হু-হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে, সরকারের চৈতন্য নাই। এবারে চাউলের অভাবে খাইতে না পাইয়া কতকগুলি লোক মরিতে পারে বলিয়া সম্প্রতি কর্তৃপক্ষ মত প্রকাশ করিয়াছেন। সরকারের কথা শুনিয়া আনন্দের খুসিতে চাঙ্গা হইয়া উঠা ছাড়া আমরা কি করিতে পারি? যদি অন্য মন্ত্রিসভা হইত তাহা হইলে গভর্ণর ও য়ুরোপীয় বণিক্ সমাজের সমর্থন না থাকিলেও সোহরাওয়ার্দী ও নাজিমুদ্দিন সাহেবের মত একটা সর্ব্বনেশে আন্দোলন করিতে না পারিলেও খানিকটা কোলাহল তুলিতে পারিতাম। কিন্তু এখন আর সে শক্তি নাই, সে সাহস নাই। কোলাহল তোলা দূরের কথা, চিঁ চিঁ করিয়া দুঃখ জানাইতেও সাহস হয় না; বাক্‌রোধ হইয়া আসে। জান-মান লইয়া প্রতিদিন সূর্য্যোদয় দেখা আজকাল সকলের ভাগ্যবানের কপালে ঘটে। তবুও বলি, ভাগ্যবানেরও দুর্ভাগ্য কম নয়। দেখিতেছি, প্রতিদিন চাউলের দাম চড়িতেছে। চাউলের চোরা-কারবার চলিতেছে, বে-আইনী ভাবে চাউল বাহির হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্ব-বগুড়ায় শয়ে শয়ে গাড়ী ও গোদা মারফত চাউল যাইতেছে। আক্কেলপুর-টাইয় হাটে বিরাট চোরা-কারবার চলিতেছে। চাউলের চোরা-কারবারীরা পার্শ্ববর্ত্তী জেলাগুলিতে চাউল চালান দিতেছে। বলিবার উপায় নাই, বলিতে গেলে শুনিতে হয়, ধরাইয়া দাও। ফাসাদ কম নয়। বমাল-শুদ্ধ চোর ধরিয়া সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করিতে না পারিলে যদি শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কর্ত্তারা চুরি আস্কারা করিতে না পারেন তাহা হইলে লোকে যে অবস্থায় পড়ে আমরাও আজ সেই অবস্থায় পড়িয়া আছি। অভ্যাস দোষ মলেও যায় না, তাই ঘ্যানর-ঘ্যানর করি।" 'বগুড়ার কথা' মুসলমান-সম্পাদিত পত্রিকা, দুই জন সম্পাদকই লীগভক্ত এবং পাকিস্তানকামী। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইঁহাদের সাহস এবং সোজা কথা বলার প্রশংসা করি। আশা করি, 'বগুড়ার কথা'র সমালোচনাকে কেহ হীন প্রচার বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। কিন্তু বাঙ্গালার সুশাসনের বিরুদ্ধ প্রচণ্ড প্রশংসাপত্র ছাপিয়াও—'ভাবী'-বগুড়ার কথা কাজের বেলায় কোন প্রকার দুর্ব্বলতা বা তালমাত্রা-জ্ঞান হারান নাই। পাকিস্তান বিষয়ে শ্রীবগুড়ার কথার ব্যাকুলতা দেখুন। "মুসলিম লীগের এই মতবাদ মুসলমান সমাজের সর্ব্বস্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের ধারণা হইয়াছে, ভারতের মুসলমানপ্রধান ও মুসলমান-শাসিত অঞ্চলগুলিতে ইসলাম অনুমোদিত রাষ্ট্র গঠন করিবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে এবং এই সময়ে যদি ঐ সকল অঞ্চলে স্বতন্ত্র সার্ব্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করা না যায় তবে অখণ্ড ভারতে ও ভারতীয় ইউনিয়নে হিন্দুর পাশবিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাপে মুসলমানের পৃথক্ সত্তা, সংস্কৃতি, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি বিপন্ন হইয়া পড়িবে। এই মতবাদ মুসলমান সমাজের ছোট বড়, শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় সকলকেই প্রভাবান্বিত করিয়াছে। এই মতবাদ এরূপ কার্য্যকরী হইয়াছে যে, কিছু দিন পূর্ব্বেও যে সকল মুসলমান ভারতের জাতীয়তাবাদ ও কংগ্রেসকে সমর্থন করিতেন তাঁহারাও আজ মুসলমান সমাজের মনোভাবের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া মুসলিম লীগে যোগদান করিয়া মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী সমর্থন করিতেছেন। পাকিস্তানে কি ধরণের গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে গবর্ণমেণ্টে দেশের মেরুদণ্ড কৃষক ও শ্রমিকের প্রভাব কতখানি পড়িবে তাহা লইয়া কোন প্রশ্ন কেহ করে না, শুধু এইটুকু বুঝিয়া সকলে আনন্দিত যে পাকিস্তানে মুসলমান-রাজ কায়েম হইবে।" অর্থাৎ এই পত্রিকাখানির মতে—'পাকিস্তান স্বর্গ না হইয়া যদি নরক হয়, তাহা হইলেও আমরা ঐ নরকেই বাস করিব, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে সমান অধিকার লাভ করি—তোমাদের নির্ম্মিত স্বর্গে কোন ক্রমেই বাস করিব না।' তবে 'বগুড়ার কথা'র সম্পাদক-প্রবরদ্বয়কে নরক বাস করিবার জন্য অন্যত্র যাইতে হইবে না। খাস বাঙ্গলাতেই ইহা প্রায় কায়েম হইয়া আসিয়াছে। পাকিস্তানী স্বর্গ ত এখন পথে-ঘাটে-বাটে!

*　*　*　*　*　*

'হিন্দুরঞ্জিকায়' প্রকাশ :—"প্রফেসর কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যার সহিত সুবর্ণ বণিক্ সম্প্রদায়ের শ্রীমান্ সন্তোষ দত্তের হিন্দু আচার নিয়মানুসারে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে ধর্ম্মসভায় স্বামী বেদানন্দ আন্তর্জাতিক বিবাহের উপর খুব জোর দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার এই পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে সমাজের আর বাঁচিবার উপায় নাই।" সংবাদটি পাঠ করিয়া কেবল আনন্দিতই নহে আশ্বাসিতও হইলাম। যে-সকল হিন্দু-নেতা মুখে সমাজ-সংস্কার এবং দেশ উদ্ধারের বক্তৃতা করেন, তাঁহাদের দৃষ্টি এই সংবাদের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি, অনুকরণের জন্য।

*　*　*　*　*　*

নোয়াখালী হইতে 'দেশের বাণী' প্রকাশ করিতেছেন :—"স্থানীয় সরবরাহ অফিসের সর্ব্বোচ্চ কেরাণী মিঃ লুতফুল হায়দর চৌধুরীকে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনি বর্ত্তমানে জামিনে আছেন। এবং বিচার-সাপেক্ষে তাঁহাকে

কার্য্য হইতে সাসপেণ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে। এই সম্পর্কে ডিঃ কন্ট্রোলার মিঃ আবদুল মজিদ এম, এ, বিরুদ্ধেও না কি ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। তিনি এ স্থান হইতে বদলী হইয়া যাওয়ার পর তাঁহার পিছে এই ওয়ারেণ্ট না কি ছুটিয়াছে। তিনি ইতিপূর্ব্বে কোন কলেজের অধ্যাপকও ছিলেন।" এই প্রকার সংবাদ বহু আছে। প্রকাশ পায় কয়টি? যে-কয়টি প্রকাশ পায়, তাহাদের শেষ ব্যবস্থা কি হয় সব সময় জানা যায় না। এ-বিষয়ে একমাত্র মন্তব্য এই যে—কলেজের প্রফেসারদের হিসাবের কাজে যাওয়া ঠিক নয়, তাঁহারা বড় বেশী ঠিকে ভুল করেন।

*

'দেশের বাণী' পাঠে জানিতে পারি যে, নোয়াখালীতে "পুনর্ব্বসতির জন্য এযাবৎ ৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ের হিসাব দাখিল করা হইয়াছে, কিন্তু কত কোটি টাকার সম্পত্তি যে ধ্বংস করা হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। আর এই ৭৬ লক্ষ টাকার কত অংশ দাঙ্গাপীড়িত সংখ্যালঘিষ্ঠদের পকেটে গিয়াছে তাহারই বা হিসাব নিবে কে? দাঙ্গাপীড়িতের সাহায্য করার সঙ্গে যাহারা দাঙ্গাকারী বলিয়া অভিযুক্ত ও পলাতক, তাহাদের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ ব্যবস্থা করা যে শাসকবর্গের নীতি, সেখানে যে শান্তি কখনো ফিরিয়া আসিবে তাহা কল্পনা করা বাতুলতা। সুতরাং বর্ত্তমান পরিস্থিতি, নোয়াখালীর হিন্দুদের ১৯৪৮ সনের জুন মাসের পূর্ব্বেই নিজ নিজ বাসভূমি খুঁজিয়া বাহির করিতে অনেক হিন্দুকেই চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। মহাত্মাজী হিন্দুদিগকে স্বস্থানে পুনর্ব্বসতি জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এই ৮ মাস মধ্যেই লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আস্থা ফিরিয়া আসা সম্ভব হয় নাই। ধর্ম্ম ও নারীর মর্য্যাদা যেখানে বিপন্ন, সেখানে নিজ ভদ্রাসনের মায়া ত্যাগ করিতে যে দ্বিধা হইবে না ইহা অস্বাভাবিক কিছু নয়।" নোয়াখালীবাসীরা (হিন্দু) এখনও যদি বাঙ্গলা সরকারের নিকট বিচার এবং প্রতিকার আশা করিতে থাকেন—তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের একমাত্র আশ্রয় হইবে, কাছাকাছির মধ্যে, বঙ্গোপসাগরে। অন্য আশ্রয় লাভ করিতে হইলে অদ্যই তাহার জন্য দলবদ্ধ ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। নোয়াখালীতে তপশীলীর সংখ্যা বড় কম নহে, কিন্তু শ্রীল শ্রীযুক্ত যোগেন মণ্ডল মহাশয় ইহাদের জন্য কি করিতেছেন? মন্ত্রণা দান এবং লীগের শ্রীগুরু জিন্নার প্রসাদ লাভ চেষ্টা?

* * * * * *

"কয়েক দিন পূর্ব্বে নোয়াখালী সদর পোষ্টাফিসে ৮টি ছোরা-ভর্ত্তি পার্শেল পুলিশ আটক করিয়াছিল। জানা গিয়াছে, আর এক দফায় দুইটি ছোরা-ভর্ত্তি পার্শেল আসিয়াছে। এবং এক জন প্রসিদ্ধ কাপড়ের ব্যবসায়ীর নামে পার্শেলগুলি আসিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, ছোরাগুলি না কি তিন প্রকারের, ছোট, বড়, এবং অপরগুলি দেখিতে ফাউণ্টেন পেনের মত এবং ঐগুলি না কি পকেটে আটকাইয়া রাখা যায়। সম্প্রতি ফেণীতে ৭২খানা ছোরা-ভর্ত্তি একটি পার্শেল আসিয়াছে। এবং তাহা ডেলিভারী নেওয়ার কালে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এ সব পার্শেল একই স্থান হইতে প্রেরিত হইতেছে। কি উদ্দেশ্যে এই ছোরা আমদানী হইতেছে, এবং কিসের আয়োজন চলিতেছে, কর্ত্তৃপক্ষ ইহার কিছু আন্দাজ করিতে পারিলেন কি?" ছোরা-কারবার এবং কারবারীদের সংখ্যা ক্রম-বর্দ্ধমান। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য কি—এ-আয়োজন কিসের জন্য—এবং কে বা কাহারা এই কারবার এবং কারবারীদের আস্কারা দিতেছে, তাহা বাঙ্গলা সরকারকে জিজ্ঞাসা না করিয়া লীগকে জিজ্ঞাসা করাই ভাল। বাঙ্গলা সরকারকে লজ্জা দিবার বৃথা চেষ্টা কেন? নোয়াখালীর পত্রিকার সম্পাদক—ছোরার ব্যবহার কেন হয়, কাহারা করে এবং কাহাদের উপর, নোয়াখালীতে এত দিন বাস করিয়াও কি তাহা জানিতে পারেন নাই?

* * * * * *

চন্দননগরের 'নবসঙ্ঘ' অনাবশ্যক বিচলিত হইয়া লিখিতেছেন:—"১০০ নং হ্যারিসন রোড। নোয়াখালীর নির্য্যাতন-বৃত্তান্ত সর্ব্বজনবিদিত। আমরা বাঙ্গালী, বাংলার কথাই বলিব। কলিকাতায় কি হইল? অচঞ্চল হিন্দু বাঙ্গালী, হয় অক্ষম, নয় নিরুপায়। চাঞ্চল্যপ্রকাশে লাভ নাই—কিন্তু কি হইল ১০০ নং হ্যারিসন রোডে? বাংলা গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব লইয়া এক দল পাঞ্জাবী পুলিশ নিরীহ প্রজার প্রতি কি অত্যাচার করিল? গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া স্বামি-স্ত্রীর রাত্রিবাসও যে আজ দুশ্চিন্তার কারণ হইল। পতির সম্মুখে পত্নীর প্রতি পাশবিক অত্যাচার মানব সমাজের ইতিহাসে কলঙ্কময় পৃষ্ঠা নহে কি? নিরুপায় পতি প্রহারে জর্জ্জরিত, অসহায়া পত্নী নরপশুর ইন্দ্রিয় ভোগ চরিতার্থতার ক্ষেত্র—হিন্দু বাঙ্গালীর নয়ন অন্ধ—কর্ণে সীসা ঢালিয়া দেওয়া হউক। নীরব অচঞ্চল বাঙ্গালী; নিরুপায়, অসহায় বাঙ্গালী।" 'নবসঙ্ঘ' পাঞ্জাবী পুলিশকে অযথা নিন্দা করিতেছেন। সুরাবর্দি সাহেব ত স্পষ্টই বলিয়াছেন, ইহাদের আমদানি করা হইয়াছে কলিকাতার মুসলীমদের মনে সামান্য নিরাপত্তার ভাব দান করিবার জন্য। ভাড়াটিয়া শান্তিরক্ষক দল সেই কার্য্য ভাল মতেই করিতেছে, কাজেই আমরা ইহাদের প্রশংসাই করিব! চন্দননগরে বসবাস করিয়া 'নবসঙ্ঘ' বিচলিত হইবেন না। তাঁহার কথা মত সীসা ঢালিবার ব্যবস্থা শ্রীভগবান করিবেন।

* * * * * *

চট্টগ্রামের 'পাঞ্চজন্য' অভিযোগ করিতেছেন:—"চট্টগ্রামে আটা ময়দা প্রভৃতির অভাবে বহু লোকই নানা ভাবে বিপন্ন হইতেছেন। বিশেষ ভাবে আটার অভাবে অনেক রোগীকেই কষ্টভোগ করিতে হইতেছে। তাঁহাদের অবগতির জন্য আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে,

পারমিট অফিসারের নিকট হইতে পারমিট গ্রহণ করিতে পারিলে, তাঁহারা স্বল্প পরিমাণ আটা বা ময়দা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। তাঁহারা সেই চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন।" চেষ্টা নিশ্চয়ই করিতে পারেন—কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে মন স্থির করিয়া লইবেন, বৃথা-চেষ্টাই করা হইতেছে। আটা-ময়দা-চিনি সবই আছে, তবে তাহা পাইতে হইলে অন্য সাধনার দরকার। সাধনার পথ সোজা নহে, দুর্গম, দুঃসাধ্য—কিন্তু অগম্য বা অসাধ্য নহে।

* * * * * *

তমলুকের "প্রদীপ" অন্ধকারে পড়িয়া কাতর কণ্ঠে বলিতেছেন :—"গত মার্চ্চ মাস হইতে তমলুকে আটা ময়দা চিনি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট সোজা বলিয়া দিয়াছেন, ভারতে গমের অভাব ঘটায় আটা ময়দা সেরূপ পাওয়া যাইবে না ; চিনি অপ্রাপ্য হইবে না বটে তবে পরিমাণ কমিয়া যাইবে। এখন এই অল্প পরিমাণ দ্রব্যগুলিও যদি সময় মত আসিয়া পড়িত তাহা হইলে জনসাধারণের কষ্টের অনেকটা লাঘব হইত, কিন্তু তাহারা আসি-আসি করিয়া কেবল পদধ্বনি শুনাইতেছেন, সেইটাই বেশী দুঃখ। সরিষার তেলের অবস্থা দেখিয়া সকলে এখন কন্‌ট্রোলকেই এই নিদারুণ অবস্থার জন্য দায়ী করিতেছে। সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে কাপড়ের উপর কন্‌ট্রোল উঠাইবার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। সেই সঙ্গে আটা-চিনির উপরও পরীক্ষামূলক ভাবে কন্‌ট্রোল তুলিয়া দিলে ক্ষতি কি?" পরীক্ষামূলক ভাবে কন্‌ট্রোল তুলিয়া দিলে বাঙ্গলার লীগ সরকারকে বিশেষ শক্তিশালী ভক্তবৃন্দের নিকট যে ভীষণ পরীক্ষায় পড়িতে হইবে, তাহা বোধ হয় 'প্রদীপ'-সম্পাদক জানেন না! সরিষার তেলের সঙ্গে আটা-চিনি-ময়দার তুলনা করিবেন না। সরিষার তেলে আর 'গুড়' নাই, তাই কন্‌ট্রোলও নাই। কিন্তু অন্য দ্রব্যগুলিতে যে পরিমাণ 'গুড়' এখনও আছে, তাহাতে অনেক কাজ হাসিল করা চলিতেছে।

'বীরভূম-বাণী' কয়লা খাদের নিকটে বাস করিয়া কয়লা অভাবে কয়লার ধোঁয়ায় চোখের জল ফেলিতেছেন :—"জেলায় কয়লার অভাবে গাছপালা যেটুকু ছিল তাহা নিঃশেষিত হইতেছে—কিন্তু কয়লা বেশী আমদানীর কোনো প্রচেষ্টা সরবরাহ বিভাগ করিতেছেন বা করিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে না। একেই বৃষ্টির অভাবে প্রায়ই জেলায় শস্যহানি হয়। তার উপর গাছপালা নষ্ট হইলে বৈজ্ঞানিকদের মতে বৃষ্টির অভাব আরও হইবে। এ বৎসর এখনও পর্য্যন্ত উপযুক্ত বৃষ্টি নাই—ফলে শস্যের ক্ষতির সম্ভাবনা এবং মহামারী দেখা যাইতেছে। এ সম্বন্ধে সত্বর যুক্ত প্রচেষ্টা হওয়া প্রয়োজন। জেলায় যেটুকু কয়লা গো-গাড়ী বা লরীযোগে বর্ত্তমানে আসিতেছে তাহাও আর এক মাস পরে রাস্তার দুর্গমতার জন্য বন্ধ হইয়া যাইবে। কাজেই সময় থাকিতে কয়লা সঞ্চয় প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।" কেবল কয়লার রাস্তাই নহে, আমাদের সকল রাস্তাই প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কিংবা যাইতেছে। 'বীরভূম-বাণী' এই কথা ভাবিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে চেষ্টা করিবেন যে, বর্ত্তমান বাঙ্গলা সরকার এবার 'পোড়া-মাটি' 'চাল' অবলম্বন করিয়াছেন। ক্ষতি এবং মহামারীর কথা এখনও মনে হয়? 'বীরভূম-বাণী' সত্যই আশাবাদী।

* * * * *

'বীরভূম-বার্ত্তা' কয়লা নহে, জলকষ্টে পড়িয়াছেন, তাই তৃষ্ণার্ত্ত-কণ্ঠে বলিতেছেন :—"এই দারুণ গ্রীষ্মের দিনে জলকষ্ট অনেক জায়গায় দেখা দিয়াছে। এবং তাহার সংশ্লিষ্ট কলেরা মহামারীও দেখা দিয়াছে। জলকষ্ট নিবারণের জন্য জেলা বোর্ড অর্থাভাবে কিছুই করিতে পারিতেছেন না।······বীরভূমের অনেকাংশেই নলকূপ হয় না। সেখানের লোকেরা কি করিবে? তাহারা কি সরকারী জল-সরবরাহ বিভাগের কর্ম্মচারীদের দেখিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিবে? ঐ সকল জায়গায় জন্য নলকূপের পরিবর্ত্তে অন্ততঃ সিমেণ্ট রিং কূপ করা প্রয়োজন। যদি নল, ফিল্টার, পাম্প ইত্যাদি যোগাড় করা সম্ভব হয় তবে সিমেণ্ট বা রিং যোগাড় না হইবে কেন?" বীরভূমবাসীরা যদি সদা-তৃষ্ণার্ত্ত বিশেষ বিভাগের বিশেষ-বিশেষ ব্যক্তিদের 'তৃষ্ণা' দূর করিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তাহাদের জলের তৃষ্ণা দূর করিবার ব্যবস্থা এখনই হইতে পারে! অন্যথায়—বিহারী দুর্গতদের সকল তৃষ্ণা মিটিলে পর বীরভূমবাসীদের কপাল ফিরিলেও ফিরিতে পারে।

'বৰ্দ্ধমানের কথা'য় প্রকাশ :—"বাঙলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী মৌঃ আবুল হাশেম সাহেব এক সুদীর্ঘ বিবৃতিতে দেশবাসীকে জানাইয়াছেন যে, বঙ্গ বিভাগ জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। আমরা জনাব হাশেম সাহেবকে নিতান্ত আদরের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছি—ভারত বিভাগ কি জাতীয় স্বার্থের অনুকূল?" মুসলিম লীগকে কোন প্রশ্ন করা নিরর্থক। কারণ, লীগের নিয়মাবলীতে প্রশ্নের জবাব দেওয়া নিষেধ। লীগ কেবল প্রশ্ন করিতে পারিবে। মিঃ জিন্নাও বাজে কথায় বিশ্বাস করেন না।

* * * * *

সাপ্তাহিক 'মিল্লাত' বাঙ্গালী হিন্দুদের ভয়াবহ ভবিষ্যৎ দেখিয়া, এবং একমাত্র সেই কারণেই বঙ্গ-বিভাগের কুফল দেখাইয়া বলিতেছেন :—"বাঙ্গলার সমস্ত শিল্পাঞ্চল ও খনিজ সম্পদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উত্তর-পূর্ব্ব বাঙ্গলার কোণ ঠাসা হইয়া এ-দেশে সংখ্যাগুরু

সম্প্রদায়কে কৃষিজীবিরূপে বাস করিতে হইবে—এই বিদ্বেষ-প্রসূত আনন্দে যে সব বাঙ্গালী হিন্দু আজ অধীর হইয়াছে এবং বাঙ্গলার পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতেছে বাস্তবিকই তাহারা কৃপার পাত্র! ইহারা জানে না যে, কি সর্ব্বনাশের পথে তাহারা পা বাড়াইয়াছে। বস্তুতঃ ইহারা এক ভীষণ ষড়যন্ত্রজালে আটকা পড়িয়া এই বঙ্গ-ভঙ্গের আওয়াজ তুলিয়াছে। যদি এই ষড়যন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত হয়, তা'হলে য়্যাংলো-আমেরিকান-অবাঙ্গালী পুঁজিপতিদের দফতরের কেরাণীগিরী করিয়াই হিন্দু বঙ্গ রাজ্যের যুবকদিগকে তাহাদের বহু বাঞ্ছিত স্বাধীনতার সকল স্বাদ মিটাইতে হইবে।" 'কুম্ভীরাশ্রু' কথাটা এত দিন মাত্র প্রবাদ বলিয়াই মনে করিতাম। এখন উহা বাস্তবে দেখিতেছি। 'মিল্লাতে'র অন্য অবান্তর কথার জবাব দিবার দরকার নাই। কেবল মাত্র ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে—ভবিষ্যতে যাহাই থাকুক—বাঙ্গালী হিন্দু আপাততঃ পাকিস্তান 'মর্গের' (morgue) পচা আবহাওয়া হইতে বাঁচিতে চাহে। এখন বাঁচিলে, পরের কথা পরে হইবে। 'মিল্লাত' তথা অন্যান্য লীগ-ভক্তদের এখন আর হিন্দুদের ভবিষ্যৎ লইয়া মাথা না ঘামাইলেও চলিবে।

* * * * * *

'বীরভূম-বার্ত্তায়' প্রকাশিত সামান্য একটি বার্ত্তা :—"সম্প্রতি বীরভূম জেলা বোর্ডের অফিসে হঠাৎ এক দুর্বৃত্ত প্রবেশ করিয়া কার্য্যরত জনৈক কেরাণীকে ভয় দেখাইয়া তাহার নিকট হইতে [illegible] লইয়া প্রস্থান করে। সকালে কাছারী থাকায় বৈকালে মাত্র এক জন কেরাণীই কাজ করিতেছিল। প্রকাশ, ঐ দুর্বৃত্ত [illegible] বোর্ড অফিসে ঢুকিয়া বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের খোঁজ করে এবং চাবি চাহে। সহরের বুকের উপর দিন-দুপুরে এই ঘটনায় জনসাধারণ বিস্মিত হইয়াছেন। স্থানীয় পুলিশ এ সম্বন্ধে কি বলেন?" যে-দুর্বৃত্তের কথা বলা হইতেছে, সে কোন্ বিশেষ সম্প্রদায়ের, তাহা না জানা পর্য্যন্ত এ বিষয়ে পুলিশ কিছুই বলিবে না। বর্ত্তমানে আমরাই বলি—অফিসে একলা এক দপ্তরে থাকা [illegible] কেরাণী কাজ করিতেছিল, তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে!

* * * * * *

'শিল্প ও সম্পদ' খবর দিতেছেন :—"[illegible] সমিতির সভাপতি মিঃ কে ডি জালান বলিয়াছেন যে, এবারের দাঙ্গায় [illegible] কোটি টাকার ক্ষতি হইয়াছে। তিনি বলেন, অবস্থা যদি এইরূপ চলিতে থাকে তাহা হইলে শিল্পোন্নতির ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সমস্ত সম্ভাবনা [illegible] হইয়া যাইবে। মিঃ জালান আরো বলেন, দাঙ্গার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ব্যবসায় এবং শিল্প। তিনি বলেন [illegible] গিয়াছে ও দাঙ্গাপীড়িত অঞ্চলে কারখানাসমূহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি বলেন যে, এই সাম্প্রদায়িক [illegible] হয়, তাহা হইলে এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইবে যাহা আমাদের সমাজের [illegible] প্রয়োজনীয় কার্য্যের সম্মুখীন হইয়াছে তখন এইরূপ ভাবে [illegible] কাজ।" কিন্তু অবস্থার আশু প্রতিকার না হইলে অদূরে এমন দিন দেখা যাইতেছে যখন ব্যবসা [illegible] হইবে, ব্যবসা প্রতিকূল অবস্থায় চালাইলে ক্ষতির পরিমাণ তাহা অপেক্ষা বেশী হইয়া [illegible] হইবে। [illegible] লোক বেকার হইবে। একমাত্র আশা—এই বেকারের দল হয়ত উপযুক্ত [illegible] ব্যবস্থা করিবে।

* * * * * *

'দেশের বাণী' প্রকাশিত হিসাবমত নোয়াখালীর "[illegible] দাঙ্গা সম্পর্কে বিভিন্ন থানায় অনুমান ২০০০ হাজার মোকদ্দমা দায়ের হইয়াছিল। তন্মধ্যে পুলিশ ইতিমধ্যে ৭৬০টি মোকদ্দমায় ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করিয়াছে। ১২২টি মোকদ্দমায় ৬১১ জনের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা, লুট, গৃহদাহ, নরহত্যা ইত্যাদি বিভিন্ন অভিযোগে চার্জসিট দাখিল হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪৮৯ জন পলাতক আছে। দাঙ্গা সম্পর্কে মোট ১০৫৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৬৪৮ জন জামিনে মুক্তি পাইয়াছে ও ৩৩৭ জন খালাস হইয়াছে; বাকী ৫৪ জন হাজতে আছে।" 'দেশের বাণী' ইহার বেশী আর কি আশা করেন জানি না। কলিকাতায় বাস করিয়া আমরা বলিতে পারি, নোয়াখালীর পুলিশ বহুত কাম করিয়াছে। পুলিশকে বর্ত্তমানে কী প্রচণ্ড বাধা-বিপদের মধ্য দিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়, নেহাত 'বাঙ্গাল' (মাপ করিবেন) বলিয়া 'দেশের বাণী' এখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই! সান্ত্বনা এই যে, হাজত এখনও শূন্য হয় নাই।

* * * * * *

'প্রদীপ' পাকা হিসাব সমেত তমলুক মহকুমা কৃষি-কমিটির একটি প্রস্তাব প্রকাশ করিতেছেন :—"বানর মারা সম্বন্ধে হিন্দুদের সে রকম কোন সংস্কার নাই বলিয়া ইহাদের হাত হইতে শস্যাদি রক্ষার জন্য ইহাদিগকে বধ করিতে হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, হনুমান-পিছু প্রায় ২৷৷০ টাকা খরচ পড়ে। এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট যদি টোটা দেন তবে খরচ কম পড়িতে পারে, সুতরাং এই জন্য ১২৫০৲ টাকা মঞ্জুর করিবার জন্য অথবা ১০০০ টোটা ও ৬২৫৲ দেওয়ার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অনুরোধ করা হউক।" বেচারা বানরদের উপর অযথা এমন আক্রোশ দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। গেছো-বানর হত্যা করিয়া না হয় সামান্য শস্যাদি রক্ষা করা গেল, তাহাতে লাভ হইবে কি? এই বানরের দল ত দেশে হাজার হাজার বছর বাস করিতেছে, কিন্তু

তাহাতে খাদ্যাদির এমন কঠিন অবস্থা কখনও হইয়াছে কি? যে সকল বানরের জন্ম আজ দেশে এই সমস্যা আসিয়াছে, প্রকৃত দোষী সেই সকল বানর বধ করিবার কোন পরিকল্পনা যদি কেহ দিতে পারে, তবে আমরা চাঁদা দিয়া সাহায্য করিব। বানর মারা সম্বন্ধে হিন্দুদের সে-রকম কোন সংস্কার নাই—"প্রদীপে"র এ কথাটিও অসত্য।

* * * * * *

'ঢাকা-প্রকাশ' প্রকাশ করিতেছেন:—"ঢাকা পোষ্ট অফিসে কতকগুলি সন্দেহজনক পার্শেল আটক থাকার সংবাদ গত সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়াছে। গত ২৭শে বৈশাখ জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের আদেশানুসারে পুলিশ ঐরূপ ২২টি রেজিষ্টার্ড ডাক পার্শেল খুলিয়া উহার মধ্যে ৩২৮টি বড় ছোরা এবং ১৪৮৯টি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোরা পাইয়াছেন। ছোরাগুলি পুলিশের হাতে আটক আছে। পঞ্জাব প্রদেশের নিজামাবাদের একটি ছুরি-কাঁচির কারখানা হইতে পার্শেলগুলি প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। গত ২৫শে বৈশাখ তারিখেও পুলিশ ঐ নিজামাবাদ হইতেই প্রেরিত অপর তিনটি অনুরূপ পার্শেল আটক করিয়াছিল। উপরোক্ত এবং আরও কয়েকটি স্থান হইতে এ পর্য্যন্ত ছোরাপূর্ণ বহু পার্শেল ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইয়াছে—তন্মধ্যে কতকগুলি পুলিশের হস্তগতও হইয়াছে অথচ অদ্যাবধি পার্শেল প্রেরণের বিরাম নাই। এই ব্যাপারের রহস্যোদ্ঘাটন কি আজ আর বড় দুরূহ?" ছোরা-কারবার আজ আর নূতন বা মারাত্মক নহে, প্রায় গা-সহা হইয়া গিয়াছে! এই ব্যাপারে আমাদের জিজ্ঞাস্য—পুলিশ ছোরাগুলি লইয়া কি করিতেছে? একান্ত নিরীহ প্রশ্ন।

* * * * * *

নোয়াখালীর বর্ত্তমান অবস্থা এবং শাসন-ব্যবস্থার সামান্য পরিচয় 'দেশের বাণী' দিতেছেন:—"লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকগণকে ধর্ম্ম, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্ত বিষয়ে পঙ্গু ও হীনবল করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঐ সম্প্রদায়ের চাকুরীয়াগণকে সরাইয়া সমস্ত key postগুলি লীগপন্থী গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কর্ম্মচারী দ্বারা পূরণ করা হইয়াছে। ইহা যে পাকিস্থানি নীতি স্থাপনের অপচেষ্টা, তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী নাই। এই অবস্থায় লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকেরা যে সরকারী কর্ম্মচারীদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নোয়াখালীর গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের এম, এল, এরা যেমন মনে করেন, তাঁহারা একমাত্র মুসলেম স্বার্থ রক্ষার জন্যই নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সরকারী চাকুরীয়াগণও হয়ত তেমনি মনে করেন একমাত্র মুসলেম স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এই দাঙ্গাবিধ্বস্ত জিলায় তাঁহাদিগকে আমদানী করা হইয়াছে। প্রকাশ্যে কোনও বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া না গেলেও তাঁহাদের মানসিক বৃত্তি যে অধিক উন্নত ধরণের তাহা বিশ্বাস করা সম্ভব হইতেছে না। যাঁদের প্রদত্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দ্দি সাহেব বলিতেছেন,—হিন্দুরা এখনও নির্য্যাতিত হইতেছে, সংখ্যাগরিষ্ঠদের মনে বিদ্বেষের ভাব আছে, এবং সংখ্যালঘিষ্ঠগণের মনে আশঙ্কা বা আতঙ্ক পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, তাহা তিনি বিশ্বাস করেন না—সেই সরকারী কর্ম্মচারিগণের প্রদত্ত রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়াই প্রধান মন্ত্রী নিঃসঙ্কোচে সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি বিষোদ্গার করিতেছেন।" অতি সহজ ও সরল ভাষায় বাঙ্গালা সরকারের নির্জ্জলা নিন্দা। সরকার যদি ইহা মিথ্যা মনে করেন, তাহা হইলে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন না কেন? আদালতে না গিয়াও ত তাঁহারা তাঁহাদের নব-আবিষ্কৃত প্রেস-আইন প্রয়োগে সব পত্রিকাকেই ঠাণ্ডা করিতে পারেন, চেষ্টারও কম করিতেছেন না। 'দেশের বাণী' নেহায়েত ক্ষুদ্র পত্রিকা বলিয়াই কি এত মায়া?

* * * * *

'দেশের বাণী'তে প্রকাশ করা হইতেছে:—"এই সদর মহকুমায় ১৮০০০ হিন্দু তাঁতি ও ৪০০ মুসলমান তাঁতি গত ১৯৪৬ সালে লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁত-শিল্পের ভিতর দিয়া সূতার কালো-বাজারে বিশেষ যোগ লাভ করা যায় ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এই লাভের অঙ্কটা যাতে সমান সমান দখরাতে ভাগ করা যায় তারই জন্য বোধ হয় নূতন লাইসেন্স সৃষ্টি করিয়া ৫০।৫০ ভাগ হইতে চলিয়াছে। গত বৎসর ৪০০ মুসলমান তাঁতি ছিল, এ বৎসর না কি মোট তাঁতির অর্দ্ধেক মুসলমান হওয়া চাই,—এই ফরমুলা না কি ঠিক হইয়া গিয়াছে।" কিন্তু ৫০।৫০ ফরমুলা কি ভাবে হঠাৎ করা সম্ভব হইবে? মুসলমান তাঁতির সংখ্যা আরও ১৩৬০০ বৃদ্ধি করিয়া না, হিন্দু তাঁতির সংখ্যা ১৩৬০০ কাটিয়া দিয়া? বাঙ্গলার লীগ সরকারকে কারবাই পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়। অধিক কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

* * * * *

বাঙ্গলা সরকারের প্রচার-পত্র, (যাহাতে মন্ত্রিমণ্ডলীর শ্মশ্রুগুলির ছবি প্রায়ই নবনারীদের সঙ্গে এক করিয়া ছাপা হয়) 'বাঙ্গলার কথায়' প্রকাশ:—"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার কারণ সম্পর্কে ভাইস চ্যান্সেলার বলেন যে, বঙ্গভঙ্গ রদ হইবার ফলে গভর্ণমেণ্ট প্রদেশের এই অঞ্চলের অধিবাসীদের এক প্রকার ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে সিদ্ধান্ত করেন। তাহা ছাড়া, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার দ্বারা গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ কমাইতে চাহিয়াছিলেন এবং এক নূতন ধরণের আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে পরীক্ষা চালাইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার উচ্চ আদর্শ বজায় রাখিতে পারিয়াছেন কি না, তাহা জনসাধারণ বিচার করিবে। কিন্তু তিনি বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সেই উচ্চ আদর্শ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দাবী করেন যে, আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ইহা সাফল্য লাভ করিয়াছে।" আবাসিক (?) বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাফল্য লাভ করিয়াছে কি না জানি না। হয়ত এখানের খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি ভালই। কিন্তু একটি বিষয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি যে সমধিক সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা আমরা জানি। বিষয়টি যে কি, তাহা খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সম্প্রদায়বিশেষের

ছাত্রদের এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সকল পরীক্ষায় উচ্চতম স্থানগুলি দখল করাইবার ব্যবস্থাও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এমন চমৎকার আবাসিক (?) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে খ্যাতনামা অধ্যাপকগুলি ক্রমে ক্রমে বিদায় লইতেছেন কেন?

গত ১২ই মার্চ—কলিকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংসে বাঙ্গলার খাদ্য-বিভাগের কমিশনার মিঃ এস, এন, রায়, আই, সি, এস ঘোষণা করেন:—"ধান চাউল বিভিন্ন জেলাতেই এবং বাঙলা দেশেই থাকিয়া যাইতেছে; এই প্রদেশ হইতে উহা বাহির হইয়া যাইতে পারিতেছে না এবং ভবিষ্যতে একদিন না একদিন কৃষকেরা চাউল বাজারে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবে।" কিন্তু এমন দিন সে আসবে কবে? মিঃ রায় দৃঢ়তা সহকারে আরো বলেন যে, "ঘাটতি অঞ্চলগুলিতে চাউলের যে উচ্চমূল্য দেখা দিয়াছে, তাহা আগামী দুই-তিন মাসের মধ্যেই গভর্ণমেণ্ট হ্রাস করিয়া আনিতে সক্ষম হইবেন।" তিন মাস ত গত হইল—বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার চাল এবং ধানের মূল্য কোথায় কি প্রকার তাহা বাঙ্গলা সরকার প্রকাশ করিলে ভাল হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা মিঃ রায় মারফৎ প্রকাশিত ৫ই মার্চ তারিখে বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানের চাউলের দর কি প্রকার ছিল তাহা দান করিলাম:—

ময়মনসিংহ সদর দক্ষিণ—১[illegible]; জামালপুর—১৬৷০ টাকা, টাঙ্গাইল ২৫৲ টাকা; নেত্রকোণা ১[illegible]; কিশোরগঞ্জ ২০৲ টাকা;

বাখরগঞ্জ সদর, উত্তর [illegible], সদর, দক্ষিণ [illegible]; পিরোজপুর ১৯৲ টাকা (২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখের দর); পটুয়াখালি ১[illegible]; ভোলা ২২৲ টাকা

ঢাকা সদর, উত্তর ২[illegible]; সদর দক্ষিণ ২[illegible] টাকা; নারায়ণগঞ্জ ২[illegible]; মাণিকগঞ্জ ২৫৲; মুন্সীগঞ্জ ২[illegible]।

ফরিদপুর সদর [illegible], গোয়ালন্দ ২[illegible]; মাদারীপুর ২০৲; গোপালগঞ্জ ২২৲।

ত্রিপুরা সদর, উত্তর ২৫৲, সদর, দক্ষিণ [illegible], ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২২৷০, চাঁদপুর ২২৲।

নোয়াখালী সদর ২৫[illegible], ফেণী [illegible]।

জলপাইগুড়ি সদর ১[illegible]; আলীপুর দুয়ার ২০৲।

যশোর—মাগুরা ১৯[illegible], নড়াইল ২০[illegible], বনগ্রাম ১৫[illegible]।

পাবনা (স্বয়ংপূর্ণ অঞ্চল) সদর [illegible], সিরাজগঞ্জ ২০৲।

চট্টগ্রাম ১[illegible] টাকা হইতে ২০৲ টাকা।

বলা বাহুল্য, উপরিউক্ত মূল্য তালিকার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, কোন কোন অঞ্চলে চাউলের মূল্য কাগজে কম থাকিলেও স্থানীয় বাজারে বেশী ছিল। বর্তমান দরগুলি জানিতে পারিলে খুসী হইব।

*　　*　　*　　*　　*　　*

কিছু দিন পূর্ব্বে 'বাঙ্গলার কথায়' প্রকাশিত হয়:—"অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলনে উৎসাহ দানের নিমিত্ত ১৯৪৪-৪৫ সালে উদ্বৃত্ত রেলওয়ে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার যে পরিকল্পনা করা হয়, তদনুযায়ী যে কাজ হইয়াছে তাহার সর্ব্বশেষ বিবরণীতে প্রকাশ,—১৯৪৬-৪৭ সালে ৬ হাজার একরের অধিক উদ্বৃত্ত রেলওয়ের জমি স্থানীয় কৃষকদের বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে। এই জমি রেল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত জমির শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশী হইবে। গত বৎসর যে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়, এই জমির পরিমাণ তদপেক্ষা ১ হাজার একর বেশী। বিভিন্ন বিভাগে নিম্নোক্ত পরিমাণ জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে:—ঢাকা—[illegible] একর, রাজশাহী—১,৭৮২ একর, চট্টগ্রাম—১,[illegible] একর, বর্দ্ধমান—১,০৩৮ একর, প্রেসিডেন্সী—৪১৬ একর। ঢাকা, ২৪-পরগণা, হাওড়া ও চট্টগ্রাম জেলায় রেল-কর্ত্তৃপক্ষ যে জমি দিয়াছেন, তাহার সমস্তই বিলি করা হইয়াছে।" কৃষকদের জন্য বাঙ্গলা সরকারের এই ব্যবস্থা অবশ্যই প্রশংসা করিব। এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস্য কেবল মাত্র এইটুকু—যে-সকল কৃষককে জমি বিলি করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মুসলীম কত জন এবং হিন্দুই বা কত? এই সংখ্যা দুটি জানিতে পারিলে বাঙ্গলা সরকারের প্রশংসাবাদ জোর-গলায় ঘোষণা করিতে পারিব।

*　　*　　*　　*　　*　　*

নোয়াখালীর এক সংবাদে জানা যায় যে—"বেগমগঞ্জ থানার একলাসপুর ইউনিয়ানের লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির দরজা ভাঙ্গিয়া রাত্রিকালে ঘরে ঢুকিয়া এক দল ডাকাত গৃহস্বামীকে লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া আহত করে। চীৎকার করিলে গ্রামবাসিগণ আসিয়া পড়ে, তখন ডাকাতগণ পলাইয়া যায়। আহত ব্যক্তি বেগমগঞ্জ হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহার শ্বশুরকে থানায় এজাহার করিতে পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু তাহার এজাহার গ্রহণ করা হয় নাই। প্রকাশ, তাহাকে দূরে সরাইয়া দিয়া চৌকিদারের রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।" 'দেশের বাণী'র সংবাদ পাঠ করিয়া এইমাত্র বলিতে পারি যে শ্বশুরের কপাল ভাল। অনায়াসেই তাহাকে আসামী করিয়া চালান দেওয়া যাইত। আমরা যে শহরে বাস করিতেছি—সেখানে আক্রান্ত সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি 'রিপোর্ট' করা অপেক্ষা না-করাকেই বিবিধ কারণে নিরাপদ মনে করে! কেন?

*　　*　　*　　*　　*　　*

'তত্ত্ব-কৌমুদী'র মত একটি অতি নিরীহ পত্রিকাও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন :—"আমাদের অতি দুর্ভাগ্য যে, স্বাধীনতা লাভের সন্ধিক্ষণে মুসলীম লীগ সহযোগিতার পরিবর্ত্তে সর্ব্বপ্রকার বাধার সৃষ্টি করিতেছে। মানুষের মধ্যে যত প্রকারের হীন প্রবৃত্তি আছে তাহারই সাহায্যে মুসলীম লীগ পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির যে কোন কুৎসিত উপায় তাহার নিকট বরণীয়।" বলা বাহুল্য, 'তত্ত্বকৌমুদী' কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা বা অন্য কোন দলবিশেষের মুখপত্র নহে। যে-সমাজের মুখপত্র এই পত্রিকাটি, সেই সমাজে মহম্মদকে দেবতার মতই শ্রদ্ধা দান করা হয়, এবং ইসলামকেও পবিত্র একটি ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করা হয়।

*   *   *   *   *   *

চট্টগ্রামের 'পাঞ্চজন্য' দৈনিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে :—"সাতকানিয়ার স্বনামধন্য মোক্তার যাত্রামোহন দাস মহাশয়ের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র এবং আত্মীয়দের মধ্যে কেহই উপস্থিত না থাকায় স্থানীয় হিন্দু ভদ্রমহোদয়গণ যাত্রামোহন বাবুর নিজ বাড়ীর সংলগ্ন পুকুর-পারেই শবদাহের বন্দোবস্ত করেন। চিতা খনন এবং সাজান কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার পর স্থানীয় মুসলিম নেশানাল গার্ড আপত্তি জানায়। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ এবং সি ও প্রভৃতি সকলেই বহু বিনয়ের সহিত প্রার্থনা করিলেও নেশানাল গার্ডের কর্ত্তৃপক্ষ শবদাহে ভীষণ আপত্তি জানায়। নির্দ্দিষ্ট পুকুরের চারি পার্শ্বে কোন মুসলমান-বসতি নাই তবুও মুসলমানের দাবী মানিতেই হইবে এই বলিয়া এই বিভ্রাট ঘটায়। অবশেষে নিশীথ রাত্রে শব নিয়া পটিয়াবাসী হিন্দু অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে অনেক দূরে শবদাহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে বাধ্য হয়।" এখনো পাকিস্থান কায়েম হয় নাই। হিন্দুদের নিজের ঘরে বাঁচিবার উপায় ত নাই, এখন দেখা যাইতেছে, মরিয়াও হিন্দুর নিষ্কৃতি হইবার বা হাড় জুড়াইবার উপায়ও নাই। মুসলীম ন্যাশনাল গার্ডদের নূতন রূপ দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম! চট্টগ্রামের শান্তিরক্ষা এবং শাসনের ভার কি মুসলীম গার্ডদের হাতেই অর্পণ করা হইয়াছে?

*   *   *   *   *   *

সাপ্তাহিক 'হিন্দু'তে কলিকাতার বেতার প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে :—"বেতার কেন্দ্রের জন্য অনেক ক'খানা গাড়ী কেনা হয়েছে, কিন্তু শিল্পীদের আনা-নেওয়ার ব্যাপারে সেগুলো আদৌ ব্যবহার হয় না। এমন কি, অনেক মহিলা শিল্পীকেও আনবার জন্য গাড়ী পাঠান হয় না। ওখানকার কর্ম্মচারীদের বাড়ীর সওদা করবার জন্য অবশ্য গাড়ী সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। এই গোলমালের ফলে কোন্ যুক্তিতে মহিলা শিল্পীদের অনুষ্ঠানের সময় রাত্রিতে ঠিক করা হয় তা আমরা বুঝতে পারি না। মোট কথা, কলিকাতা কেন্দ্রের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া যেমন এবং সেখানকার লোকেরা যেমন খারাপ, তাতে শিল্পীদের, বিশেষ করে মহিলা শিল্পীদের এই কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়াই উচিত নয়। যদি কেউ কখনো ঐ কেন্দ্রে যান এবং কিছুক্ষণ সেখানে থাকেন তাহ'লে········ কখনও কলহাস্যধ্বনিতে তাঁকে উৎকর্ণ হ'তে হবে, কখনও বা তিনি দেখবেন কর্ম্মচারী এবং ওখানকার স্ত্রী ও পুরুষ ষ্টাফ আর্টিষ্টরা একই চেয়ারের সামনে ও হাতলে উপবিষ্ট। আবার দেখবেন ঘন ঘন ওখানকার গাড়ী "আধ ঘণ্টার জন্য" ওখানকার ষ্টাফ আর্টিষ্টদের নিয়ে বাইরে যাচ্ছে—অথচ বাইরের অনেক আর্টিষ্ট যাঁরা এসেছেন তাঁরা দাঙ্গার দরুণ বাড়ী ফিরতে পারছেন না।" অভিযোগের সত্যাসত্য বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। সত্য না হইলে প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন। সত্য হইলে—কর্ত্তব্য কি, তাহা ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তারাই বিবেচনা করিবেন। 'হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীভবতোষ রায়, "বি, এল." কাজেই মনে হয়, কাঁচা কাজ তিনি করিবেন না। 'হিন্দু'র দপ্তর ঠিকানা: ১১৮ নং হ্যারিসন রোড ষ্ট্রীট (কর্পোরেশনের কৃপায় ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট), কলিকাতা। অভিযোগ বিষয়ে রেডিও কর্ত্তৃপক্ষের বক্তব্য বিষয়ে অবহিত থাকিব।

*   *   *   *   *   *

'ঢাকা-প্রকাশ' প্রকাশ করিতেছেন :—"মুন্সীগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ে ক্লাশ আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে বালিকারা সমবেত ভাবে কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের একটি গান গাহিয়া ক্লাশে প্রবেশ করিত। এই রীতি বহু দিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু গত ৩রা বৈশাখ হঠাৎ কয়েকটি মুসলমান বালিকা ঐ সঙ্গীতে আপত্তি জানায়। ইহাতে প্রধান শিক্ষয়িত্রী কিছু আশ্চর্য্যান্বিতা হন এবং বালিকাদের গোলযোগ মিটাইবার জন্য বলেন যে, ভবিষ্যতে পরে এই গানে যদি মুসলমান বালিকাদের আপত্তির বিশেষ কোন কারণ ঘটিয়া থাকে তবে তাহারা ঐ গানের পরিবর্ত্তে কবি নজরুলের কোন গান গাহিতে পারে। কয়েকটি মুসলমান মেয়ে কবি নজরুলের একটি গান গায় এবং ক্লাশে প্রবেশ করে। প্রকাশ, ইহার কিছুক্ষণ পরেই বহুসংখ্যক মুসলমান যুবক উক্ত বালিকা বিদ্যালয় চড়াও করিয়া প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্যান্য শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদিগকে ইতর ভাষায় গালাগালি করে এবং বিদ্যালয়ের উপর মুসলিম লীগ পতাকা উত্তোলন করে। অতঃপর মুসলমান যুবক ও বালিকাগণ এক শোভাযাত্রা বাহির করিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অপমান জনক ধ্বনি করিয়া সহর পরিভ্রমণ করে।" রবীন্দ্রনাথের জন্য দুঃখ করি না। দুঃখ হয় এই ভাবিয়া যে, এই সকল কোমলমতি বালিকাদের মনেও কেমন প্রচণ্ড ভাবে সাম্প্রদায়িক বিষ সংক্রামিত করা হইয়াছে! সার্ব্বভৌম স্বাধীন বাঙ্গলার মেয়েগুলি সবিশেষ তাজা বলিয়াই মনে হইতেছে! যথা-নিয়মে জননী হইয়া ইঁহারা বহুপ্রসবা হইবেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীজিন্নার জয় হোক্!—ইহাই একমাত্র কামনা।

এম, ডি, পি,
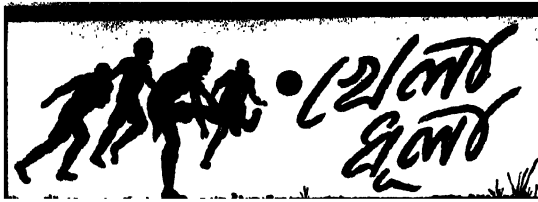
ডেভিস কাপে ভারতীয় টেনিস দল :—

আন্তর্জ্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতার ডেভিস **কাপের** দ্বিতীয় **রাউণ্ডের** খেলায় ফ্রান্সের নিকট ভারতবর্ষ ৫-০ খেলায় শোচনীয় ভাবে **পরাজিত** হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল ফ্রান্সের নিকট ভারতের **এই অভাবনীয়** পরাজয়ে আমাদের শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে। **স্বদেশে** ড্রবনী ও কাস্কার ন্যায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাপন্ন চেক খেলোয়াড়**দ্বয়ের বিরুদ্ধে** সংক্ষিপ্ত সফলতার ফলে আমাদের খেলোয়াড়গণের **সম্বন্ধে অনেকে** অহেতুক উচ্চাশা পোষণ করিতে **সুরু** করে। **আন্তর্জ্জাতিক** ভাবে খ্যাতি **অর্জ্জন** করিতে হইলে আমাদের খেলোয়াড়**গণকে বিভিন্ন** প্রতিকূল অবস্থায় খেলিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। **১৯২১** সালে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় রাউণ্ডে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ৪-১ খেলায় **জয়ী হইয়াছিল**। ঐ বৎসর ভারতবর্ষের হইয়া প্রতিনিধিত্ব **করেন মহম্মদ স্লীম**; এস, এম, জেকব; এল, এস, দীন ও এ, এ, **ফৈজী**।

এ বৎসর ভারতবর্ষের পক্ষে খেলিবার জন্য গউস মহম্মদ, **সুমন্ত মিশ্র**, দিলীপ বসু, ইফতিকার আমেদ ও জিমি মেটা নির্ব্বাচিত হয়। **একযোগে** দীর্ঘ ১১ বৎসর ভারতের সেরা খেলোয়াড়ের **স্থান অধিকারী** গউস মহম্মদের নাম বিশ্বের টেনিস-দরবারে **অপরিচিত নহে**। ১৯৩৯ সালে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ানসিপে গউস বহু **খ্যাতনামা** খেলোয়াড়কে পরাজিত করিয়া শেষ ৮ জন খেলোয়াড়ের **অন্তর্ভুক্ত** হইতে সমর্থ হন। উদীয়মান ও তরুণ খেলোয়াড় **সুমন্ত** মিশ্র এবার গউসকে পর পর চারিবার পরাজিত **করিয়া** ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। বাঙালী **খেলোয়াড়** দিলীপ বসু বর্ত্তমানে ভারতের ৯ নং খেলোয়াড়। **ল্যাটা খেলোয়াড়** ইফতিকার আমেদ ইতিপূর্ব্বে গউসের সহযোগী হিসাবে **ডেভিস কাপের** ডাবলসে খেলেন। 'চটকদার' খেলোয়াড় হিসাবে জিমি মেটা **এই দলে** স্থান পাইয়াছেন। সিঙ্গলস্ অপেক্ষা ডাবলস্ বিভাগে **তাঁহার প্রয়োজনীয়তা** অধিকতর অনুভব হয়। **কিন্তু** বহু তোড়**জোড়ের পরে** ভারতীয় টেনিস দল বিদেশে **ব্যর্থতার পরিচয়** দেয়। **পর পর পাঁচটি** খেলাতেই তাঁহারা শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন।

ফলাফল :—

সিঙ্গলস্ :—সুমন্ত মিশ্র [illegible] ও ৮-৬ সেটে বার্ণাড **ডেস্ট্রেমিউয়ের** নিকট, গউস মহম্মদ ৮-৬, [illegible] ও ৬-০ সেটে মার্সেল **বার্ণার্ডের** নিকট, সুমন্ত মিশ্র [illegible] ও ৬-১ সেটে মার্সেল **বার্ণার্ডের** নিকট, এবং দিলীপ বসু [illegible], ৬-১ ও ৬-২ সেটে বার্ণাড **ডেস্ট্রেমিউয়ের** নিকট সরাসরি পরাভূত হন।

ডাবলস্ :—সুমন্ত মিশ্র ও জিমি মেটা বার্ণাড মার্সেল ও পিয়ের **[illegible] নিকট ৬-৩, ৬-২, ও ৬-০ সেটে সোজাসুজী পরাজিত হন।**

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পুনরভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হকি **লীগ প্রতি-যোগিতার অসমাপ্ত অবস্থাতেই** অবসান ঘটে। হকি কর্ত্তৃপক্ষ **খেলা** চালাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। শেষ পর্য্যন্ত অবাঙ্গালী দল-গুলি লইয়া কয়েকটি ছোট-খাটো প্রতিযোগিতা চালাইয়া তাঁহারা ময়দানের মর্য্যাদা বজায় রাখার চেষ্টা করেন। আই, এফ, এর কার্য্য-পরিচালকগণ ফুটবল মরশুমের বহু পূর্ব্বেই প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল বন্ধ রাখার **প্রস্তাব** গ্রহণ করেন। পরে এ বিষয়ে **মতান্তর** হয় কিন্তু দেশে বিশেষতঃ সহরে অশান্তি পুনরায় দেখা দেওয়ার পূর্ব্বে গৃহীত প্রস্তাব বহাল থাকে। ময়দানে পাওয়ার লীগের খেলা **রীতিমত** চলিতেছে। আই, এফ, এ, কর্তৃপক্ষ এখন সাময়িক **লীগ** পরিকল্পনায় ব্যস্ত। লীগ খেলা অসম্ভব হইলেও তাঁহাদের আই, **এফ,** এ, শীল্ড চালাইবার জন্য উপায় উদ্ভাবন এখনই করিতে হইবে।

পাওয়ার লীগের প্রথম ডিভিসনে মোট ১৯টি দল **প্রতিদ্বন্দ্বিতা** করিতেছে। এ যাবৎ খেলার ফলে মোহনবাগান শীর্ষস্থান অধিকার **করি**য়াছে। তাহারা ড্যালহৌসীর বিরুদ্ধে একটি মূল্যবান পয়েণ্ট **নষ্ট করে**। ইষ্ট বেঙ্গল এখনও অপ্রতিহত গতিতে বিজয়াভিযান চালাইতেছে।

দৌড়-প্রতিযোগিতায় কৃতী বাঙ্গালী :—

বিভিন্ন স্পোর্টস্ **অনুষ্ঠানের** আসরে বাঙ্গালী এথলেটগণের **ব্যর্থতা** বর্ত্তমানে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে, প্রায় **সমস্ত** বিভাগেই অবাঙ্গালী প্রতিযোগীদের প্রাধান্য। এথলেটিক্ "**স্পোর্টস**" মহলের এই দুর্দিনে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব **বাঙালী** খেলোয়াড়গণের শ্লাঘার কথা। কলিকাতার প্রায় প্রত্যেক**টি প্রথম** শ্রেণীর স্পোর্টসে দৌড়-প্রতিযোগিতার কোন না কোন **বিষয়ে**

ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

ভোলানাথ শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিয়াছে। মোহনবাগান ও বেহালা স্পোর্টসের ১৫০০ মিটার ও বাঙ্গালা অলিম্পিক স্পোর্টসের ৩০০০ ও ৫০০০ মিটার দৌড়ে ভোলানাথ প্রথম হয়। সিটি এথলেটিক ও কালীঘাট স্পোর্টসেও তাহার সুনাম বজায় থাকে। বস্তুতঃ তাহারই প্রচেষ্টায় আই, এ, ক্লাম্প ৩০০ × ৪ মিটার রিলেরেসে বেহালা স্পোর্টসে শীর্ষস্থান অধিকার করে।

ভোলানাথ সাহাগঞ্জ ডানলপ টায়ার ফ্যাক্টরীর অন্যতম কর্ম্মচারী ও কলিকাতার শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুলের সহকারী প্রধান **শিক্ষক শ্রীযুক্ত** উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শ্রীমান্ উত্তরোত্তর **অধিকতর কৃতিত্বের ও প্রতিষ্ঠার** অধিকারী হইয়া বাঙলা ও **বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করুন।**

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি!

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

আন্তর্জ্জাতিক কুজ্ঝটিকা—

আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিরূপ অবস্থার উদ্ভব হইবে আজ তাহা অনুমান করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব নয়। আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি যে সন্তোষজনক নয়, মস্কো সম্মেলনের ব্যর্থতার মধ্যেই তাহা প্রতিফলিত হইতে আমরা দেখিয়াছি। বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয়ের মধ্যে মতানৈক্যের কারণগুলি এই সম্মেলনে সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মতানৈক্যের প্রকৃত কারণ জানিতে পারিলেই যে উহা দূর করাও সম্ভব হয়, মস্কো সম্মেলন তাহা প্রমাণ করিতে পারে নাই। আগামী নবেম্বর মাসে লণ্ডনে যে পররাষ্ট্র সচিব-সম্মেলন হইবে মিঃ বেভিন তাহাকে মতৈক্য হওয়ার 'শেষ সুযোগ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার এই মন্তব্য যে রাশিয়াকে ভীতি প্রদর্শন তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে প্যারী সম্মেলনে তৎকালীন মার্কিণ স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ বার্ণেস জার্ম্মাণীর অর্থনৈতিক ঐক্যের পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছিলেন। রাশিয়া এবং ফ্রান্স উভয়েই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রত্যাখ্যানের পর মিঃ বার্ণেস রাশিয়া এবং ফ্রান্স উভয়কেই সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহারা এইরূপ বাধাদানের নীতি পরিত্যাগ না করিলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র স্বতন্ত্র ভাবে জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধি করিবে। নিউ ইয়র্কের পররাষ্ট্র সচিব-সম্মেলনে জার্ম্মাণীর উপগ্রহ রাষ্ট্রগুলির সহিত সন্ধি প্রস্তাবের প্রধান প্রধান সকল বিষয়ে বৃহৎ রাষ্ট্র-চতুষ্টয় একমত হইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত রাশিয়ার সুবিবেচনার (sweet reasonableness) জন্যই যে এই মতৈক্য সম্ভব হইয়াছিল তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন, জার্ম্মাণীর সহিত স্বতন্ত্র সন্ধি করিবেন বলিয়া মিঃ বার্ণেস যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহারই ফলেই নিউ ইয়র্কের পররাষ্ট্র সচিব-সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। নিউ ইয়র্ক সম্মেলন সাফল্য-মণ্ডিত হওয়ার কারণ সম্বন্ধে মিথ্যা একটা ধারণার বশীভূত হইয়াই হয়ত মিঃ বেভিন 'শেষ সুযোগে'র সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু মতানৈক্যের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে পৃথিবীর সাধারণ মানুষ একেবারেই অন্ধ হইয়া বসিয়াছে তাহা মনে রাখিবার কোন কারণ নাই।

জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধিসর্ত্ত সম্বন্ধে বৃহৎ রাষ্ট্র-চতুষ্টয়ের একমত হওয়ার উপরেই যে বিশ্বশান্তি নির্ভর করিতেছে এ বিষয়ে আজ প্রায় সকলেই একমত। কিন্তু মস্কো সম্মেলনের উদ্বোধন এবং গ্রীস ও তুরস্ককে সাহায্যদান সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট টু, ম্যানের ঘোষণার সম সাময়িকতাকে শুধু আকস্মিক ঘটনা বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। প্রেসিডেণ্ট টু, ম্যানের এই ঘোষণার পর মস্কো সম্মেলনের ব্যর্থতা যেমন আশ্চর্য্যের বিষয় হয় নাই, তেমনি এই ব্যর্থতার দায়িত্ব রাশিয়ার উপর চাপাইবার প্রয়াসও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। গত ১৫ই মে কমন্স সভার বক্তৃতায় বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন শেষ মুহূর্ত্তে বৃহৎ রাষ্ট্র-চতুষ্টয়ের মধ্যে মতানৈক্য দূর হওয়ার আশা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন : "I hope and trust that on reflection all of us will be able to strive between now and November to create an atmosphere so that a beginning can be made." অর্থাৎ "আমি আশা করি এবং বিশ্বাস করি যে, বর্ত্তমান সময় এবং নবেম্বর মাসের মধ্যে এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করিতে আমরা সমর্থ হইব যাহাতে প্রারম্ভটা সন্তোষজনক হয়।" কিন্তু মস্কো সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার পর কিরূপ আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে তাহারা উদ্যত হইয়াছেন? জার্ম্মাণীর পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ বৃটিশ ও আমেরিকার অধিকৃত অঞ্চলের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সংক্রান্ত নূতন পরিকল্পনার কথাই ধরা যাউক। বৃটিশ ও মার্কিণ এলাকার সামরিক গবর্ণমেণ্টকে ফ্রাঙ্কফোর্টে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দ্বৈত আঞ্চলিক খাদ্য ও কৃষি বিভাগ, যানবাহন বিভাগ, অর্থ নৈতিক বিভাগও ফ্রাঙ্কফোর্টের আর্থিক এজেন্সীর সহিত সংযুক্ত করা তো হইয়াছেই, অধিকন্তু উভয় অঞ্চলের জন্য ইঙ্গ-মার্কিণ নিয়ন্ত্রণের অধীনে কেন্দ্রীয় জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষও গঠন করা হইয়াছে! যদিও বর্ত্তমানে এই জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্য শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকিবে, তথাপি নবেম্বর মাসের মধ্যেই জার্ম্মাণীর বৃটিশ ও মার্কিণ-অধিকৃত অঞ্চল দুইটিতে আংশিক ভাবে হইলেও সম্মিলিত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনার কথাও শোনা যাইতেছে। জার্ম্মাণ ইকনমিক কাউন্সিল গঠনকে ফ্রান্সে যে পশ্চিম-জার্ম্মাণীর ক্ষুদ্র পার্লামেণ্টের অগ্রদূত বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, তাহা অন্যায় বা অসঙ্গত কিছুই হয় নাই। মস্কো সম্মেলনে ফ্রান্সের সহিত বৃটেন-আমেরিকার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইলেও দ গল পুনরায় ফ্রান্সের কর্ণধার না হওয়া পর্য্যন্ত পশ্চিম-জার্ম্মাণীর জন্য এই সংশোধিত ইঙ্গ-মার্কিণ পরিকল্পনা ফ্রান্সের পক্ষেও গলাধঃকরণ করা কঠিন হইয়া পড়িবে। পশ্চিম-জার্ম্মাণীকে একটি সোভিয়েট রাশিয়া-বিরোধী ব্লকে পরিণত করাই পশ্চিম-জার্ম্মাণী সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিণ নূতন অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা গঠনের উদ্দেশ্য।

এশিয়া ও ইউরোপের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলিকে সাহায্য দিবার

উদ্দেশ্যে মার্কিণ কংগ্রেস ৩৫ কোটি ডলার মঞ্জুর করিয়াছেন। এই অর্থ সাহায্যটা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলির জন্য আমেরিকা করুণাপরবশ হইয়া মঞ্জুর করিয়াছে তাহা নয়। সম্প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এডমিরাল কোলানী যে পারশ্য এবং তুরস্ক পরিদর্শন করিয়াছেন তাহাও তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা। এই পরিদর্শনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য রাশিয়াকে সমঝাইয়া দেওয়া যে, রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতি প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের গৃহীত নীতির পিছনে মার্কিণ সামরিক শক্তির পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, গ্রীস, তুরস্ক এবং তৈলসম্পদশালী মধ্য-প্রাচী সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নূতন কূটনীতি কি আকার ধারণ করিবে তাহা নির্দ্ধারণের জন্য তথ্য সংগ্রহ করাও এডমিরাল কোলানীর এই পরিভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য। আমেরিকার এই নূতন কূটনীতি কি, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। গ্রীস এবং তুরস্ক সম্পর্কে রাশিয়া যে পর্য্যন্ত না সম্প্রসারণ নীতি বর্জ্জন করিতেছে সে পর্য্যন্ত আমেরিকা গ্রীস ও তুরস্কের সহিত সামরিক মৈত্রী রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। যে কোন যুদ্ধের সময় মার্কিণ নৌবহরকে মধ্য-প্রাচীর তৈলের উপর নির্ভর করিতে হইবে। কাজেই মধ্য-প্রাচী যাহাতে রাশিয়ার প্রভাবের মধ্যে না পড়ে, আমেরিকা তাহারও সুব্যবস্থা করিতে চায়। দার্দ্দেনালিশ প্রণালীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি বলিয়া আমেরিকা মনে করে। এই দার্দ্দেনালিশ প্রণালী সম্পর্কে কোন বিপদাশঙ্কা দেখা দিলে আমেরিকা সশস্ত্র প্রতিরোধ দ্বারা এই আশঙ্কা নিবারণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। মার্কিণ নৌবহরের প্রধান কর্ত্তা এডমিরাল নিমিট্‌স্ (Adm. Nimitz) বলিয়াছেন, পৃথিবীর শান্তি এবং নিরাপত্তা মার্কিণ এবং বৃটিশ নৌশক্তির উপরেই নির্ভর করিতেছে। তাঁহার এই উক্তি খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। প্রাক্তন মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট হুভার মনে করেন, জার্ম্মাণীর সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বতন্ত্র ভাবে সন্ধি করা উচিত। এই অভিমত অবশ্য নূতন নয়। মিঃ বার্ণেসও এইরূপ হুমকী দিয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ হুভারের এই উক্তি সম্বন্ধে মিঃ মার্শাল আগ্রহ প্রকাশ করিলেও কোন মন্তব্য করিতে রাজী হন নাই। এখনই আবার যুদ্ধে নামিবার মত অবস্থা রাশিয়ার নয়। তবে দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম হইতে রাশিয়া যে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হইয়া বাহির হইয়াছে, এ কথাও অনস্বীকার্য্য। কিন্তু মিঃ হুভারের নির্দ্দেশিত পন্থা অবলম্বন করিয়া তৃতীয় মহাযুদ্ধ এড়ান সম্ভব হইবে না। আন্তর্জ্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে রাশিয়ার সহযোগিতাও যে আবশ্যক, এ কথা মার্কিণ এবং বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দেরও উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বৃটেন এই সত্য উপলব্ধি করিলেও আমেরিকা যে করিবে, এতখানি আশা করা কঠিন। সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিতে শক্তিশালী আমেরিকা ডলার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বিভেদের সৃষ্টি করিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে এই বিভেদের প্রতিক্রিয়া প্রত্যেক দেশের জাতীয় জীবনেও বিভেদ সৃষ্টি না করিয়া পারে নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতি শ্রেণী মার্কিণ ডলারের মোহে এবং কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কায় মার্কিণ অর্থনৈতিক প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইতেছে। কিন্তু নিপীড়িত ও শোষিত জনসাধারণ সাম্যবাদ দ্বারা বিশেষ ভাবেই প্রভাবিত। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন দেশের জাতীয় জীবনে এই যে বিভেদ সৃষ্টি হইয়াছে পৃথিবীকে তাহা কোন্ পথে পরিচালিত করিবে, সে-সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যে কম্যুনিজম-ভীতি প্রচার করিয়া ডলার সাম্রাজ্য গঠনের কাজ অপ্রতিহত ভাবেই চলিয়াছে। মস্কো সম্মেলনের পূর্ব্ব হইতেই এই কাজ সুরু হইয়াছে এবং নবেম্বর সম্মেলনের পূর্ব্বেই কার্য্যটি সুসম্পন্ন করাই আমেরিকার অভিপ্রায়। নবেম্বর সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার পক্ষে ইহা সহায় হইবে কি? এই সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার পরিণাম কাহারও পক্ষেই কল্যাণকর হইবে না।

বৃটিশ সাম্রাজ্য বনাম আমেরিকা ও রাশিয়া—

বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তিরূপে বৃটেন তাহার মর্য্যাদা হারাইতে বসিয়াছে বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করা হইয়া থাকে, বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন কমন্স সভার বক্তৃতায় তাহা অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন: "We still have our historic part to play." অর্থাৎ 'আমাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণের ক্ষেত্র এখনও রহিয়াছে।' যদি আগামী নবেম্বর সম্মেলনে মীমাংসা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়, তাহা হইলে বৃটেনের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে পুনর্ব্বিবেচনা করার প্রয়োজন হইবে বলিয়াও তিনি জানাইয়াছেন। নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজা বৃটিশ পররাষ্ট্র নীতি কি রূপ গ্রহণ করিবে তাহা অনুমান করা সহজ না হইলেও একেবারে অসম্ভবও নয়। বৃটিশ শ্রমিক দলের বামপন্থীরা রাশিয়ার সহিত নিবিড় সহযোগিতার সমর্থক আর দক্ষিণপন্থীরা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা করাই বেশী পছন্দ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কথাটা ঘুরাইয়া বলেন, তাহারা বুঝাইতে চান যে, অবস্থার চাপে মার্কিণ জনমতই বৃটেনের সমর্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বৃটিশ শ্রমিক দল কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'Cards on the table' নামক পুস্তিকার কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বৃটিশ শ্রমিক দলের সদর কার্য্যালয়ের আন্তর্জ্জাতিক বিভাগ কর্ত্তৃক এই পুস্তিকা রচিত হইয়াছে এবং শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র নীতি কোন্ পথে পরিচালিত হইতেছে তাহার পরিচয় এই পুস্তিকায় পাওয়া যায়।

এই পুস্তিকায় রাশিয়ার উপর আক্রমণাত্মক অভিপ্রায় আরোপ করিয়া বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান ইঙ্গ-মার্কিণ সহযোগিতা রাশিয়াকে আক্রমণাত্মক কার্য্যাবলী আরম্ভ করিতে বাধা দিয়াছে। তাহা না হইলে রাশিয়া কর্ত্তৃক আক্রমণাত্মক কার্য্য ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া যাইত। দ্বিতীয়তঃ, ইহাও বলা হইয়াছে যে, রাশিয়াকে আক্রমণ করিবার কোন অভিপ্রায় যদি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের থাকিয়াও থাকে, তাহা হইলেও বৃটিশ সহযোগিতার উপর তাহার নির্ভরশীলতার জন্য এইরূপ আক্রমণ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের রুশ-ভীতি নূতন নয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাশিয়া কর্ত্তৃক বৃটিশ সাম্রাজ্য আক্রান্ত হওয়ার কোন আশঙ্কাই গত দেড় শত বৎসরের মধ্যে দেখা দেয় নাই। দ্বিতীয় মহাসমর হইতে রাশিয়া যত শক্তিশালী রাষ্ট্র হইয়াই বাহির হউক না কেন, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত রাশিয়ার পক্ষে দূর ভবিষ্যতেও কোন আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণের সম্ভাবনা নাই। তথাপি এইরূপ আশঙ্কা কেন সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সত্যই প্রণিধানযোগ্য। ইতিহাসের রুশ-অধ্যাপক আই, এম, লেমিন এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে বৃটিশের

কোন আশঙ্কা যদি থাকে তাহা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দিক হইতেই, রাশিয়ার দিক্ হইতে নহে। মার্কিণ সংবাদপত্রগুলি রাশিয়া কর্ত্তৃক বৃটিশ সাম্রাজ্য আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা সম্বন্ধে যে ধ্বনি তুলিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক সেমিন বলিয়াছেন যে, আমেরিকার অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ শক্তিকে আবৃত করিয়া রাখাই এইরূপ ধ্বনি তুলিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য। রুশ-অধ্যাপক বলিয়া তাঁহার এই উক্তির উপর আমরা যদি আস্থা স্থাপন করিতে না-ও পারি, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের 'নর্থ-ওয়েষ্টার্ণার' বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপক এবং রাজনৈতিক ভূগোল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ম্যালকম জে, প্রাউডফুটের মন্তব্য নিশ্চয়ই উপেক্ষার বিষয় নহে। তিনি সম্প্রতি বলিয়াছেন : "The American people, for all practical purposes, 'inherited' the British Empire seven years ago without realizing it." (Chicago, May 26. U. P. A.) অর্থাৎ 'মার্কিণ জনসাধারণ তাহাদের অজ্ঞাতসারেই সাত বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত কার্য্যকরী ব্যাপারে উত্তরাধিকারীসূত্রে বৃটিশ সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছে।' এই অধ্যাপক আরও বলিয়াছেন যে, "ধার-ইজারা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া আমরা যখন আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বৃটিশ সৈন্য-বাহিনীর সহিত সংযুক্ত করিলাম তখনই আমরা কার্য্যতঃ পৃথিবীর সমগ্র সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ হইতে ৯০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করিতে অধিকারী হইয়াছি।" তাঁহার মন্তব্যকে অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। অধ্যাপক প্রাউডফুট রাখিয়া-ঢাকিয়া কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। আমেরিকা কি ভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্য উত্তরাধিকারীসূত্রে লাভ করিয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন : "Today we not only have economic influence over the British dominions and colonies, but also of other nations, such as the Philippines, Japan and China." অর্থাৎ 'শুধু বৃটিশ ডোমিনিয়নগুলি ও উপনিবেশ সমূহের উপরেই আমাদের অর্থনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ফিলিপাইন, জাপান, চীন প্রভৃতি অন্যান্য নেশানের উপরেও আমাদের অর্থনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।' বৃটেন তাহার নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে মার্কিণ অর্থনৈতিক আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। ইউরোপে, নিকট-প্রাচ্যে, মধ্য-প্রাচ্যে এবং সুদূর-প্রাচ্যে ধীরে ধীরে মার্কিণ ডলারের অপ্রতিহত প্রভুত্ব সুদৃঢ় আসন প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। বৃটেন আজ রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে শালিসের কাজ করিবার ভান করিতেছে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ উহা আমেরিকার নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সমগ্র পৃথিবীতে মার্কিণ ডলারের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পরি-প্রেক্ষিতে মিঃ চার্চ্চিলের যুক্ত-ইউরোপ (United Europe) প্রতিষ্ঠার আয়োজনের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ধীরে ধীরে বৃটিশারদের মনে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। কিন্তু এই ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র কি আকার গ্রহণ করিবে, ইউরোপের কোন্ কোন্ দেশ এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে, সে-সম্বন্ধে মিঃ চার্চ্চিলের কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নাই। গণতন্ত্রের নামে ইউরোপে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিয়া সাম্যবাদের প্রসার রোধ করাই প্রকৃত পক্ষে এই আন্দোলনের লক্ষ্য। মিঃ চার্চ্চিলের ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবকে মার্কিণ সিনেটর ডুলেস অভিনন্দিত করিয়াছেন। জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের কাঠামোর মধ্যে ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন সমর্থন করিয়া মার্কিণ কংগ্রেসে উপস্থাপিত প্রস্তাব মিঃ মার্শালের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

হাঙ্গেরীতে কি হইয়াছে ?—

গত তিন মাস ধরিয়া হাঙ্গেরীতে যে সঙ্কট চলিতেছিল তাহা প্রধান-মন্ত্রী ম. নাগীর পদত্যাগ এবং নূতন মন্ত্রিসভা গঠনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। হাঙ্গেরীতে অবস্থিত সোভিয়েট সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপের অভিযোগে স্মলহোল্ডার দলের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী জেনারেল ম. বেলা কোভাকস্ (M Bela Covacs) রাশিয়া কর্ত্তৃক গ্রেফতার হওয়ার পর হইতে এই সঙ্কটের আরম্ভ হয়। প্রধান-মন্ত্রী ম. নাগী বাহাতঃ সুইজারল্যাণ্ডে ছুটি উপভোগ করিতেছিলেন এবং হাঙ্গেরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অস্বীকৃত হন। তাঁহার বিরুদ্ধে হাঙ্গেরীয়ান রিপাবলিকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে। এই ঘটনায় আমেরিকা ভয়ানক চটিয়া গিয়াছে এবং প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য রাশিয়ার নিকট খুব কড়া নোট প্রদান করিয়াছে। হাঙ্গেরীকে আমেরিকার যে আর্থিক সাহায্য দিবার কথা ছিল তাহা দেওয়াও বন্ধ রাখা হইয়াছে।

হাঙ্গেরীতে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে মন্ত্রিসভার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে এ কথা বলা যায় না। ১৮ মাস পূর্ব্বে সাধারণ নির্ব্বাচনের পর চারিটি দলের যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল এখনও সেই মন্ত্রিসভাই রহিয়াছে। পরিবর্ত্তন হইয়াছে শুধু প্রধান-মন্ত্রীর এবং পররাষ্ট্র-সচিবের। কিন্তু এই নূতন প্রধান-মন্ত্রী M. Lajos Dinnyes ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীর মতই এক জন স্মলহোল্ডার। নূতন পররাষ্ট্র-সচিবও তাহাই। তথাপি মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান হাঙ্গেরীর মন্ত্রিসভার এই পরিবর্ত্তনকে 'outrage' অর্থাৎ অত্যাচারমূলক বলিয়া অভিহিত করার কারণ কি? হাঙ্গেরীকে সাহায্য দানও বন্ধ করা হইল কেন? ১৯৪১ সালে হাঙ্গেরী জার্ম্মাণীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে এবং এই যুদ্ধের সময়ে হাঙ্গেরী তীব্র সংগ্রামক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। আজ দুই বৎসর ধরিয়া হাঙ্গেরীতে রাশিয়ার সামরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। রাশিয়ার সামরিক অধিকার সত্ত্বেও বিগত নির্ব্বাচনে স্মলহোল্ডার দলই শতকরা ৬০টি ভোট পাইয়াছিল। এই স্মলহোল্ডার দল নামে স্মলহোল্ডার দল হইলেও, এই দলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী থাকিলেও কার্য্যতঃ এই দলে পুরাতন অভিজাতবংশীয় বড় বড় ভূম্যধিকারীরই প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত। ম. নাগীর প্রধান-মন্ত্রিত্বের অধীনে হাঙ্গেরী গবর্ণমেণ্ট যে প্রতিক্রিয়াশীল এবং রুশবিরোধী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্য হাঙ্গেরীকে সাহায্য দিতে আমেরিকা রাজীও হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, হাঙ্গেরী হইতে বহু রুশ-সৈন্য অপসারিত হইয়াছে এবং হাঙ্গেরীর সহিত স্বাক্ষরিত সন্ধি সংশ্লিষ্ট গবর্ণমেণ্ট সমূহ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে অবশিষ্ট রুশ-সৈন্যও হাঙ্গেরী হইতে চলিয়া যাইবে। হাঙ্গেরী হইতে সমগ্র রুশ-সৈন্য চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে রাশিয়া হাঙ্গেরীতে রাশিয়ার অনুকূল মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়া দেখিতে চায়। কাজেই রাশিয়ার হস্তক্ষেপের ফলেই হাঙ্গেরীর মন্ত্রিসভার এই পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া বৃটেন ও

আমেরিকার ধারণা। কিন্তু আমাদের পক্ষে এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, বৃটেনের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে গ্রীসের নির্ব্বাচনকে জনমতের অভিব্যক্তি বলিয়া প্রচারিত হইতে আমরা দেখিয়াছি। শুধু একা রাশিয়াকে দোষ দিলে চলিবে কেন?

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা যে সম্ভব হয় নাই তাহার জন্য হাঙ্গেরীর অভিজাত সম্প্রদায়কেই দায়ী করা হইয়া থাকে। শ্লাভ ও টিউটনদের মধ্যে শত্রুতা, প্রুশিয়ার অভ্যুদয় এবং প্রথম মহাযুদ্ধে অষ্ট্রীয়ান সাম্রাজ্যের পতনের জন্যও তাঁহাদের দায়িত্ব কম নয়। স্মলহোলডার দলে তাঁহাদেরই প্রতিপত্তি। নূতন প্রধান-মন্ত্রী এক জন স্মলহোলডার হইলেও তিনি বামপন্থী মনোবৃত্তি-সম্পন্ন। তাঁহার মত বামপন্থী মনোবৃত্তিসম্পন্ন আরও লোক স্মলহোলডার দলে আছে। কাজেই হাঙ্গেরীর মন্ত্রিসভার এই পরিবর্তন স্মলহোলডার দলের পুনর্গঠনই সূচিত করিতেছে বলিয়া মনে হয়।

বলকান তদন্ত-কমিশন—

বলকান তদন্ত-কমিশনের রিপোর্ট যেরূপ হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল তাহা অপেক্ষা ভিন্ন হয় নাই। এগার জন সদস্য লইয়া এই তদন্ত-কমিশন গঠিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রসহ আট জন সদস্য গ্রীস গবর্ণমেণ্টের সহিত গরিলা বাহিনীর সংঘর্ষে গরিলা বাহিনীকে সাহায্য করিবার অভিযোগে মুখ্যতঃ যুগোশ্লাভিয়াকে এবং কতক পরিমাণে আলবেনিয়া ও বুলগেরিয়াকে দায়ী করিয়াছেন। রাশিয়া এবং পোল্যাণ্ড এই দুই সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের অভিমতের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছেন। অপর সদস্য ভোট দানে বিরত ছিলেন। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বৃহৎ রাষ্ট্র চতুষ্টয়ের মধ্যে যে বিভেদ কমিশনের রিপোর্টে তাহাই প্রতিফলিত হইয়াছে মনে করিলে খুব বেশী ভুল হইবে না। বর্ত্তমান গ্রীক গবর্ণমেণ্ট বৃটেনেরই সৃষ্টি এবং বৃটেন ও আমেরিকা উভয়ে মিলিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই অবস্থায় বৃটেন ও আমেরিকা এবং তাহাদের উপগ্রহদের অভিমত গ্রীসের অনুকূল এবং রুশ-প্রভাবিত যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া এবং আলবেনিয়ার প্রতিকূল হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক।

সংখ্যাগরিষ্ঠদের রিপোর্টকেই যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, যদি স্বীকার করা যায় যে, গ্রীসের প্রতিবেশী রাষ্ট্রত্রয় গ্রীক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে গরিলা বাহিনীকে সাহায্য করিয়া গ্রীসের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে এবং যদি ইহাও স্বীকার করা যায় যে, যুগোশ্লাভ ফেডারেশনের মধ্যে সংযুক্ত ম্যাসিডোনিয়া রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করাই এই হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য, তাহা হইলেও গ্রীক গবর্ণমেণ্টকে দোষমুক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ম্যাসিডোনিয়ার সংখ্যালঘু শ্লাভদের উপর যে গ্রীক গবর্ণমেণ্ট নির্য্যাতন চালাইয়াছেন, কমিশনের রিপোর্টে সে কথা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। সংখ্যালঘুদের নির্য্যাতনের মধ্যে গ্রীক গবর্ণমেণ্টের প্রতিক্রিয়াশীল স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। এই প্রতিক্রিয়াশীলতার জন্যই বর্ত্তমান গ্রীক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে গ্রীক জনসাধারণের মধ্যে একটা বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে এবং সীমান্ত অঞ্চলে দেখা দিয়াছে বিদ্রোহ। বৃটেন ও আমেরিকা কথায় কথায় গণতন্ত্রের অজুহাত তুলিয়া থাকেন। গ্রীক গণতন্ত্র রক্ষা করিবার জন্য আমেরিকা অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছে। প্রয়োজন হইলে সামরিক সাহায্যও যে দেওয়া হইবে না তাহাও নয়। অথচ ইহাই হইল গ্রীক গণতন্ত্রের যথার্থ স্বরূপ। বলকান তদন্ত-কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, সকলেই আগ্রহের সহিত তাহা লক্ষ্য করিবে।

প্যালেষ্টাইন তদন্ত-কমিশন—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে গত ১৫ই মে প্যালেষ্টাইন সমস্যা সম্পর্কে তদন্তের জন্য ১১টি নাতি-বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্র লইয়া একটি তদন্ত-কমিশন গঠিত হইয়াছে। আগামী ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে কমিশনকে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। নিম্নলিখিত রাষ্ট্রগুলি প্যালেষ্টাইন তদন্ত-কমিশনের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন:—অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, চেকোশ্লোভাকিয়া, গুয়াতেমালা, ভারতবর্ষ, ইরাণ, হল্যাণ্ড, পেরু, সুইডেন, উরুগুয়ে ও যুগোশ্লাভিয়া। বৃহৎ রাষ্ট্র-পঞ্চকের কেহই এই কমিশনের সদস্য হন নাই। এই কমিশন নিযুক্ত হওয়ায় ইহুদীরা মোটের উপর খুসী হইয়াছে। কিন্তু প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতা কমিশনের তদন্তের বিষয়-বস্তু না হওয়ায় আরবরা মোটেই খুসী হইতে পারে নাই। এই কমিশনের তদন্তের ফলাফল কিরূপ হইবে তাহা অনুমানের চেষ্টা করিয়া লাভ নাই। কিন্তু এই তদন্তের ফলে প্যালেষ্টাইন বিভক্ত হইতে পারে এইরূপ একটা সম্ভাবনার কথা আরব এবং ইহুদী উভয় পক্ষের মনেই জাগিয়াছে। ইহাতে ইহুদীরা না কি খুসী হইয়াছে। কিন্তু আরবদের খুসী হওয়ার যে কোন কারণ নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহুদী এবং আরব উভয় পক্ষের সন্তোষজনকরূপে প্যালেষ্টাইন সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা সত্যই আছে কি?

স্মাটের কূট কৌশল—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং ফিল্ড মার্শাল স্মাটের মধ্যে যে-সকল চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান হইয়াছে সেগুলি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, ভারতের সহিত কোন মীমাংসা করিবার প্রকৃত অভিপ্রায় ফিল্ড মার্শাল স্মাটের নাই। তিনি যে মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘকে তাহা দেখানই শুধু তাঁহার অভিপ্রায়। গত ৮ই ডিসেম্বর জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ আলাপ-আলোচনা দ্বারা বিরোধ মিটাইবার জন্য ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ-আফ্রিকাকে নির্দ্দেশ প্রদান করেন। মীমাংসার জন্য আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিবার দায়িত্ব যে দক্ষিণ-আফ্রিকারই তাহাতে সন্দেহ নাই। ফিল্ড মার্শাল স্মাট পণ্ডিত নেহরুর নিকট এক পত্রে জানান যে, দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করিবার কথা কিছু দিন ধরিয়া ভাবিতেছেন, কিন্তু হাই কমিশনার না থাকায় তাহা সম্ভব হইতেছে না। পণ্ডিত নেহরু অতি সত্বর তাঁহার এই পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন এবং এই পত্রে তিনি বলিয়াছিলেন যে, জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার অভিপ্রায় ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিলেই আলাপ-আলোচনার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা হইবে। পণ্ডিতজী ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টকে এক জন প্রতিনিধি দিল্লীতে পাঠাইবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। ২৮শে এপ্রিল তারিখে পণ্ডিত নেহরু এই পত্র দিলেও আজ পর্য্যন্তও তাহার উত্তর পাওয়া

যায় নাই। মার্শাল স্মাটের মধ্যে সাধারণ শালীনতারও অভাব। শালীনতার কথা বাদ দিলেও আলাপ-আলোচনা চালাইবার জন্য দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় হাই কমিশনারের উপস্থিতি কেন প্রয়োজন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ডাকঘরের কাজ ছাড়া হাই-কমিশনার আর কি কাজ করিতে পারেন? প্রকৃত আলোচনা চলিবে উভয় দেশের গবর্ণমেণ্টের মধ্যেই। যে-কোন প্রতিনিধির মারফৎ তাহা হইতে পারে। সুতরাং হাই-কমিশনার না থাকায় আলাপ-আলোচনা চালাইবার পক্ষে বাধা হইবার কোন কারণ নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকার সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ আবার স্থাপিত হইলেই শুধু হাই-কমিশনার পাঠান সম্ভব হইবে। মীমাংসার পূর্ব্বে হাই-কমিশনার পাঠাইলে ফিল্ড মার্শাল স্মাট জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন, ভারতের সহিত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে এবং তাহার প্রমাণ দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় হাই-কমিশনারের উপস্থিতি। কিন্তু তাঁহার কূট কৌশল ব্যর্থ হইয়াছে।

চীনের অবস্থা কি?—

চীনের গৃহযুদ্ধের অবস্থা চীনা জাতীয় সরকারের পক্ষে যতটা সন্তোষজনক বলিয়া প্রচার করা হইয়া থাকে ঠিক ততটা সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয় না। উত্তর-চীনে ও মাঞ্চুরিয়ায় কম্যুনিষ্টরা প্রবল সংগ্রাম চালাইতেছে। মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী চাং চুন কম্যুনিষ্টরা অবরোধ করিয়াছিল। সম্প্রতি চ্যাং চুন অবরোধমুক্ত হইয়াছে এবং সংগ্রামক্ষেত্র ক্রমশঃ মুকডেনের দিকে বিস্তৃতিলাভ করিতেছে বলিয়া এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। চীনা সরকারী সংবাদে প্রকাশ, মুকডেনের বিপদও কাটিয়া গিয়াছে এবং সরকারী সৈন্য এবং সমরোপকরণ প্রচুর পরিমাণে তোপেঙ প্রদেশ হইতে উত্তর দিকে প্রেরণ করা হইতেছে। মার্কিণ সৈন্য, সমরোপকরণ, রসদ, বিমান প্রভৃতির সাহায্যে কত দিনে কম্যুনিষ্টদিগকে পরাভূত করা সম্ভব হইবে, তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু চীনা কম্যুনিষ্টরাই যত খারাপ লোক এ কথা বলিয়া বিশ্ববাসীকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। চীনা জাতীয় সরকার যে জনমতের সমর্থন লাভ করেন নাই, নানা ভাবেই তাহার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। দুর্ভিক্ষের সংবাদ প্রকাশ করার অপরাধে সাংহাইয়ের তিনখানা উদারনৈতিক সংবাদপত্র অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া সরকারী জুলুমের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। চীনের গৃহযুদ্ধের অবসান দাবী করিয়া নানকিং, সাংহাই এবং পিপিং-এর ছাত্রগণ শোভাযাত্রা সহকারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন। চীনা গণতন্ত্রী দলও চীনা জাতীয় সরকারকে সমর্থন করেন না।

চীনে যে ব্যাপক অন্নাভাব দেখা দিয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য জাতীয় সরকার কোন চেষ্টা করিতেছেন না। খাদ্যাভাবের সংবাদ যাহাতে প্রকাশিত না হয় এবং নিরন্নরা যাহাতে শান্তিভঙ্গ না করে তাহার ব্যবস্থার প্রতিই চীনা সরকার অধিকতর মনোযোগী। চীনে চাউলের দাম অভূতপূর্ব্বরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মে মাসের শেষ ভাগে এক পিকুল অর্থাৎ ১৭০ পাউণ্ড চাউলের দাম দাঁড়ায় ৪৫০,০০০ চীনা ডলার। গৃহবিবাদের অবসান হইয়া জনগণের আস্থাভাজন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হইলে চীনের দুর্গতি দূর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু গৃহবিবাদের অবসান ঘটাইতে কুয়োমিণ্টাং দলের কোন অভিপ্রায় আছে বলিয়া মনে হয় না। শান্তিস্থাপন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য নানকিং-এ দূত প্রেরণ করিতে এবং পূর্ব্বের সর্ত্তাদি প্রত্যাহার করিতে কম্যুনিষ্টদিগকে অনুরোধ করিয়া পিপলস্ পলিটিক্যাল পার্টি এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। শান্তি স্থাপনের জন্য কম্যুনিষ্টদের দাবী দুইটি:—(১) ১৯৪৬ সালের ১০ই জানুয়ারী যেখানে সৈন্য-বাহিনী ছিল সেইখানে ফিরাইয়া লইতে হইবে; (২) গণ-পরিষদের আহ্বান। এই দুইটি দাবী যে তাহারা প্রত্যাহার করিবে এরূপ ভরসা করিবার কোন কারণ নাই।

কোরিয়ার ভবিষ্যৎ—

কোরিয়ায় অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠনের ভিত্তি সম্পর্কে রুশ-মার্কিণ যুক্ত কমিশন একমত হইতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু উহার শেষ পরিণতি না দেখিয়া আশান্বিত হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। উত্তর ও দক্ষিণ-কোরিয়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহিত আলোচনা করিয়া জনমত প্রকাশের স্বাধীনতা ও গবর্ণমেণ্টে বিভিন্ন কোরিয়ান দলের ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধিদের ভিত্তিতে গবর্ণমেণ্ট গঠন করা হইবে। ২৫শে জুনের মধ্যে বিভিন্ন দলের সহিত আলোচনা শেষ করা হইবে এবং জুলাই মাসের মাঝামাঝি কমিশন তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিবেন।

কোরিয়াতে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একমত হওয়ার কোন কথা আমরা শুনিতে পাইতেছি না। কোরিয়া আজ পূর্ব্ব-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষার সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। এই নিরাপত্তার সমস্যার সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত কোরিয়ার ভাগ্য শূন্যে ঝুলিতে থাকিবে।

জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার—

গত ৪ঠা জুন জাপানের যুদ্ধকালীন নেতাদের বিচার আরম্ভ হওয়ার এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই বিচার-কার্য্য আরও এক বৎসর চলিবে বলিয়া ফরিয়াদী এবং আসামী উভয় পক্ষেরই ধারণা। সুদূর-প্রাচ্যের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইবুনালের এজলাসে এই বিচার-কার্য্য চলিতেছে এবং ট্রাইবুনালের নথীর আকার বর্তমানে ২৬০০০ পৃষ্ঠায় দাঁড়াইয়াছে। জাপানের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকার্য্য সম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রায় ২ বৎসর কেন লাগিবে তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। নুরেমবুর্গের বিচার-কার্য্য সম্পন্ন হইতেও ১১ মাসের বেশী সময় লাগে নাই। আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে যে, নুরেমবর্গের বিচার যেরূপ বিশ্ববাসীর সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সেরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে না। সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে কোন সংবাদই প্রকাশিত হয় না।

জাপানের নূতন প্রধান মন্ত্রী—

জাপানের সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক দলের নেতা মেঃ কাতায়ামা জাপানের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। এক জন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জাপানের প্রধান মন্ত্রী হওয়াকে জেনারেল ম্যাক আর্থার খুব একটা তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রাচীর তিনটি প্রধান দেশ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী দ্বারা পরিচালিত হওয়া খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ ব্যাপার। চীনের জাতীয় নেতা জেনারেল চিয়াং কাইশেক ১৯৩১ সালে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

ফিলিপাইনের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল মেনুয়েল রোক্যাসও খৃষ্টান। আমেরিকার জাপানী নীতি জাপানের বৌদ্ধদিগকে খৃষ্টান করিবার পথে পরিচালিত হইতেছে কি না তাহা সত্যই ভাবিবার বিষয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের 'বয়েজ টাউন ক্লাবের' প্রতিষ্ঠাতা খৃষ্টান পাদ্রী এডওয়ার্ড জোসেফ ফ্ল্যানাগান বলিয়াছেন, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপ জাতি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিবে। জাপানে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের দ্বিতীয় স্তর আরম্ভ হইল। কিন্তু নূতন জাপ প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া কোন সংবাদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ-নীতি—

ওলন্দাজ-ইন্দোনেশিয়ান চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলেও এই চুক্তিকে কার্য্যকরী করিবার জন্য বাটাভিয়ায় যে আলোচনা চলিতেছিল তাহা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। ওলন্দাজ পত্রিকাগুলি এই ব্যর্থতার দায়িত্ব ইন্দোনেশিয়ার নেতাদের উপরেই চাপাইয়াছে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর ওলন্দাজদের আধিপত্য করিবার আগ্রহই যে এই ব্যর্থতার কারণ তাহা অপ্রকাশ নাই। দ্বিতীয়তঃ, ওলন্দাজ সৈন্য অপসারিত করিবার সর্ত্ত ডাচ গবর্ণমেণ্ট কার্য্যকরী করিতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন। অধিকন্তু ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ সৈন্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় জাভা ও সুমাত্রায় ওলন্দাজ সৈন্য-সংখ্যা ছিল ৭ হাজার, বর্ত্তমানে ওলন্দাজ সৈন্য-সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮১,১৭৬। অন্তর্ব্বর্ত্তী ফেডারেল ইন্দোনেশিয়া গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে ইন্দোনেশিয় মন্ত্রিসভা যে প্রস্তাব পাইয়াছেন তাহার পাল্টা জবাবে কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয় জাতীয়তাবাদী মহল হইতে জানান হইয়াছে যে, সম্মিলিত ভাবে অস্থায়ী ইন্দোনেশিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং উহা গঠিত হইবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে এবং উহা ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থার বাহিরে থাকিবে। ওলন্দাজ ইন্দোনেশিয় চুক্তি কার্য্যকরী করিতে ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষের আন্তরিক অভিপ্রায় আছে কি না এই পাল্টা প্রস্তাবের উত্তর হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইন্দোনেশিয়ার অবস্থা শান্ত থাকিলেও ভিতরে ভিতরে অশান্ত অবস্থা ধূমায়িত হইতেছে।

ইন্দোচীন ও মাডাগাস্কার—

ভিয়েটনামীদের সহিত ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের আপোষ-আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে। যুদ্ধ-বিরতির জন্য ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ তিনটি দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন :—(১) ভিয়েটনামী সৈন্যদের যুদ্ধাস্ত্র সমর্পণ; (২) ভিয়েটনামের সর্ব্বত্র ফরাসী সৈন্যের অবাধ চলাচলের অধিকার; এবং (৩) ফরাসী-বিরোধী সকল সৈন্যকে ফরাসী সেনানায়কের অধীনে অর্পণ। ভিয়েটনামীদের পক্ষে এই তিনটি সর্ত্তের একটিও গ্রহণ করিবার পক্ষে যোগ্য নয়। আত্মবিনাশ না করিয়া এই সর্ত্তত্রয় ভিয়েটনামীরা গ্রহণ করিতে পারে না। ভিয়েটনাম গবর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ হো চি মিন আলাপ-আলোচনা পুনরায় আরম্ভ করিবার জন্য ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নূতন করিয়া আবেদন জানাইয়াছেন এবং ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে নূতন ঘোষণা দাবী করিয়াছেন।

তাঁহার এই দাবীর কি পরিণাম হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। ইন্দোচীনের ঐক্য বিনষ্ট করিবার জন্য ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন। আনামে শীঘ্রই রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনার কথা শোনা যাইতেছে। কোচিন চায়নার গবর্ণমেণ্টে কয়েকটি জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইবে বলিয়াও শোনা যাইতেছে। ভিয়েটমিন কর্ত্তৃপক্ষকে দুর্ব্বল করিবার জন্য নূতন রাজনৈতিক দল গঠনের চেষ্টাও চলিতেছে। কিন্তু ভেদনীতি দ্বারা ইন্দোচীনকে আজও আয়ত্তের মধ্যে আনা সম্ভব হয় নাই। মাডাগাস্কারের বিদ্রোহ দমন করা হইয়াছে বলিয়া ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ দাবী করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ায় দুই মাস পরে দেখা যাইতেছে, বিদ্রোহীরা মাডাগাস্কার দ্বীপের ৩০ হাজার বর্গ-মাইল ভূমি দখল করিয়াছে এবং এই দ্বীপটির জীবনযাত্রা প্রায় অচল করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ উত্তর-আফ্রিকা, মাডাগাস্কার ও ইন্দোচীনকে অন্তিম কামড় দিয়া ধরিয়া রহিয়াছে।

ব্রহ্ম গণ-পরিষদের উদ্বোধন—

১০ই জুন ব্রহ্ম ব্যবস্থা পরিষদ-গৃহে ব্রহ্ম গণ-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ২৫৫ জন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছেন। গণ-পরিষদের উদ্বোধন অধিবেশনে যোগদানের জন্য সদস্যদের উপস্থিত হওয়া দেখিবার জন্য পরিষদ-গৃহের বাহিরে প্রায় ৫০ হাজার ব্রহ্মদেশবাসী সমবেত হইয়াছিলেন। ফ্যাসী-বিরোধী পিপলস্ লীগের নেতা এবং অন্তর্ব্বর্ত্তী ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের ডেপুটি চেয়ারম্যান আউঙ্গ সান জনতাকে সম্বোধন করিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার অনুরোধ করেন। তাঁহার এই অনুরোধ কতখানি সাফল্যলাভ করিবে শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া সে সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন। গণ-পরিষদে কারেণদের জন্য নির্দ্ধারিত ২৪টি আসন ফ্যাসী-বিরোধী পিপলস্ লীগের সমর্থক কারেণদের দ্বারা পূরণ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু কারেণ-নেতা স বা উ গাই স্বতন্ত্র কারেণ-মন্ রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। মনরা নিম্ন-ব্রহ্মের একটি উপজাতি। মন্ উপজাতির নেতারাও ব্রহ্ম বিভাগ দাবী করিতেছেন। আরাকানেও স্বতন্ত্র আরাকান গঠনের জন্য আন্দোলন চলিতেছে। স্বতন্ত্র আরাকানের দাবীদারগণ বলিতেছেন, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২৫০০ শতাব্দী পর্য্যন্ত আরাকান একটি স্বতন্ত্র দেশ ছিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশবাসীরা আরাকান জয় করে এবং বৃটিশ শাসনের সময় আরাকান ব্রহ্মদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ফ্যাসী-বিরোধী পিপলস্ লীগ ব্রহ্মদেশের জন্য শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া তৈয়ার করিয়াছেন। গণ-পরিষদে উহা উপস্থিত করা হইবে। এই বৎসরের শেষেই গণ-পরিষদের কাজ শেষ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

কাশ্মীরী 'ফুল'

শ্রীবিনোদগোপাল মুখোপাধ্যায়

নাম দেখে ভ্রম হয় বুঝি বা ফুলের কথা লিখতে বসেছি কিন্তু এ 'ফুল' ফুল নহে "Fool"। কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়ে কি 'ফুল' বনেছিলাম, তারই কাহিনী। জাফরাণী ফুল দেখতে আমায় সরষে ফুল দেখতে হয়েছিল।

উঠেছিলাম এক হোটেলে। নাম 'গ্রাণ্ড কাফে'। মালিক অতি ভদ্র কাশ্মীরী যুবক, নাম দীননাথ। কথাবার্তা মিষ্ট ও ভদ্র। বেশ ভালই লাগল। একখানা ঘর খালি ছিল। সেইটাই করলুম। বাড়ীতে টাকার জন্য লিখেছিলাম। খবর পেলাম লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্কে পাঁচ শ' টাকা পাঠান হয়েছে। হোটেলের কাছে ব্যাঙ্ক। যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি এমন সময় দীননাথের সঙ্গে টাকার কথা বলতে সে বললে—"চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে। আপনি এখানে নতুন লোক। সনাক্ত করে দিতে হবে।"

ভদ্রলোককে অনেক ধন্যবাদ জানালাম। সত্যই সদাশয় ব্যক্তি। নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। সবই দশ টাকার নোট। স্যুটকেশের ভেতর একটা ছোট বিলিতী ক্যাশ-বাক্স ছিল, ই রাখলাম। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর কয়েক জন স্থানীয় বন্ধু হাজির হলেন। যাচ্ছেন 'ক্ষীর ভবানী' দেখতে। আমাকে নিমন্ত্রণ করতে আমি তাঁদের সাথী হলুম। ফিরলুম সন্ধ্যার। বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম। রাতে আর না খেয়েই শুয়ে পড়লাম। সকালে উঠে স্যুটকেশ খুলে যা দেখলুম তাতে চক্ষুস্থির। ক্যাশ-বাক্স ভাঙ্গা, তাতে একটি কপর্দকও নেই। সমস্ত ঘটনা গিয়ে বললাম দীননাথকে। সে তো মহা খাপ্পা। কি! তার হোটেলে চুরি! পরামর্শ দিল তখনই পুলিশে খবর দিতে। সেই সঙ্গে প্রশ্ন করলে,—"আপনার কি ফিরে যাবার তাড়া আছে?"

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম,—"কেন বলুন তো?"

সে বলে,—"পুলিশ চোর ধরতে পারবে কি না বলতে পারি না, কিন্তু আপনাকে তা হলে এখানে আরও মাস খানেক থাকতে হবে। আপনি চলে গেলে এরা বিশেষ চেষ্টা করবে না।"

আমার আর এক দিনও থাকতে ইচ্ছা ছিল না। ক্রমাগত বাধা-বিপত্তিতে বিরক্ত হয়ে পড়েছিলুম। বললাম,—"আমি এখানে আর চাই না। যত শীঘ্র পারি চলে যাব। আজই টাকার জন্য টেলিগ্রাম করব মনে করছি।"

দীননাথ বললে,—"আপনি টেলিগ্রামটা লিখে ফেলুন, আমি দেবার বন্দোবস্ত করছি।"

আমি টেলিগ্রাম লিখে দিলাম। সেটা হাতে নিয়ে একটু কিন্তু হয়ে দীননাথ বললে,—"দেখুন, একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না।"

আমি বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করলুম,—"কি কথা বলুন তো?"

বিনয়ে প্রায় বেঁকে গিয়ে সে বললে,—"যদি আপনার হাতে কিছু না থাকে, টাকার দরকার হয় আমায় জানাবেন। আপনার টাকা এলে দেবেন।" শ্রদ্ধান্বিত হয়ে বললাম,—"না, না, আমার হাতে শ'খানেক টাকা আছে। অবশ্য দরকার হলে পরে আপনার কাছে চেয়ে নেব। ধন্যবাদ।" দীননাথ যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। সত্যই সদাশয় ব্যক্তি এই দীননাথ।

ক'দিন কেটে গেল টাকা আর আসে না। হাতের টাকাও ফুরিয়ে এসেছিল। সপ্তাহে সপ্তাহে হোটেলের চার্জ দিতে হচ্ছে। সে টাকা পর্য্যন্ত নেই। দীননাথকে টাকার কথা বললাম। সে বললে,—"বেশ তো, কত চান?" আমি দু'শো টাকার একটা হ্যাণ্ডনোট লিখে দিতে সঙ্গে সঙ্গে সে একটা চেক লিখে দিলে আমার নামে। একবার জিগ্যেস্ করলাম,—"আমি তো এখানে থাকব না। আমাকে আপনি চেনেনও না। এ হ্যাণ্ডনোটের দাম কি?"

বললে,—"কিছুই না। আমার তো এর দরকার ছিল না। আপনি অমনি টাকা নেবেন না বলে নিলুম।"

অবাক্ হয়ে গেলুম লোকটার মহানুভবতায়। সদাশয় বটে এই দীননাথ। কাউকে বিশ্বাস করে চেক ভাঙাতে দিতে পারলাম না। নিজেই গেলাম ব্যাঙ্কের ঠিকানায়। কিন্তু গিয়ে দেখলাম সেখানে কোন ব্যাঙ্ক নেই। তবে কি দীননাথ ঠকিয়েছে। তাড়াতাড়ি ফিরে গেলাম হোটেলে।

ফিরতেই দেখি দরজায় দাঁড়িয়ে দীননাথ। আমাকে দেখে দেখেই বলে উঠল,—"আরে বাবুজী, কথা বলতে বলতে ভুল করে যে ব্যাঙ্কে চেক দিয়েছি ওটা দু'বছর আগে ফেল হয়ে গেছে। আপনাকে অনর্থক ভোগানো হ'ল। আপনার জন্য আমি টাকা যোগাড় করে রেখেছি।"

মনের গ্লানি সব মুছে গেল। দীননাথ কি প্রবঞ্চক হতে পারে?

অফিসে গিয়ে দীননাথ আমার হাতে এক তাড়া নোট দিলে। গুণে দেখলাম দু'শ'। প্রশ্ন করতে দীননাথ বললে,—"আর যোগাড় করতে পারলুম না।"

আমি আপত্তি করলাম,—"কিন্তু আমার হ্যাণ্ডনোট যে দু'শো টাকার—" বাধা দিয়ে দীননাথ বললে,—"আপনার হ্যাণ্ডনোট সে তো আমি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। এ টাকা আপনাকে দিলাম, আপনার টাকা আসছে না বলে। কলকাতায় গিয়ে পাঠিয়ে দেবেন।"

তার মহত্বের পরিচয় পেয়ে হতবিহ্বল হয়ে গেলাম। ধন্য দীননাথ! যা ছিল তাই দিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করলাম। হঠাৎ এক চেনা লোকের দেখা মিলল। আমি কলিকাতায় ফিরব অথচ টাকা এসে পড়েনি এবং তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে দু'শো টাকা ধার দিলেন। দীননাথকে তার টাকা ফেরৎ দিয়ে এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে জম্মুগামী মোটরে চেপে বসলাম। পরে কথায় কথায় এক সহযাত্রীকে আমার চুরির কথা বললাম। দীননাথের হোটেল শুনেই তিনি বলে উঠলেন,—"ও বাবা! ও এক ডাকাত! ওর হোটেলে যে থাকে তারই কিছু না কিছু চুরি যায়। কিন্তু আশ্চর্য্য, কখন ধরা পড়ে না। বোধ হয় পুলিশের সঙ্গে যোগ আছে।"

মনটা একটু খারাপ হ'ল। তবে কি দীননাথ

বাড়ী পৌঁছে টাকা না পাঠাবার কারণ জিগ্যেস করাতে শুনলুম যে, টেলিগ্রাম মাত্র ক'দিন আগে পেয়েছে! অর্থাৎ আমার ওখান থেকে ষ্টার্ট করবার পরের দিন। আমি না কি দীননাথের নামে পাঁচশ' টাকা 'টি এম' ও করতে লিখেছিলাম। তারা তাই করে দিয়েছে। বুঝলাম এটা দীননাথের টেলিগ্রাম করবার কারসাজি।

মনটা আরও দমে গেল। সত্যই কি দীননাথ—

কিছু দিন পরে এক উকিলের চিঠি এসে হাজির। দীননাথ হ্যাণ্ডনোটের টাকা চেয়েছে। সেকেন্দ্বারীর ভয়ে কেস না করে তাড়াতাড়ি টাকা দিয়ে দিলাম।

মনটা চুরমার হয়ে গেল। দীননাথ সত্যই যা নয় ভেবেছিলাম তাই। অর্থাৎ জোচ্চোর। আর আমি? আমি একটা "ফুল"।

সর্ব্বশেষ বৃটিশ পরিকল্পনা

ভারত সম্পর্কে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বশেষ পরিকল্পনায় যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তাহা আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত বাঙ্গালা ও পাঞ্জাব বিভক্ত করিবার দাবীর স্বীকৃতি। বাঙ্গালা ও পাঞ্জাবের পরেই আমাদের মনে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সমস্যা। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সমস্যা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারণ, সীমান্ত প্রদেশ হইতে নির্ব্বাচিত তিন জন সদস্যের মধ্যে এক জন মাত্র গণপরিষদে যোগদান করেন নাই। এই জন্য সীমান্ত প্রদেশ কোন্ গণপরিষদে যোগদান করিবে, তাহা ঐ প্রদেশের আইন সভার নির্ব্বাচকমণ্ডলীর ভোটের দ্বারা স্থির করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। যদিও বৃটিশ পরিকল্পনায় সীমান্ত প্রদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও অন্যান্য কারণের জন্য এইরূপ প্রস্তাব করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হইয়াছে, তথাপি এই প্রদেশে মুসলিম লীগ যে রকম শান্তিপূর্ণ ভাবে অহিংস আন্দোলন চালাইতেছে, তাহাতেই এই প্রস্তাবের মূল কারণের সন্ধান পাওয়া যায়। আসাম সমগ্র ভাবে হিন্দুপ্রধান প্রদেশ হইলেও শ্রীহট্ট জেলা মুসলমানপ্রধান বলিয়া উহাকে পূর্ব্ববঙ্গের সহিত যুক্ত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও নির্ব্বাচকমণ্ডলীর ভোট গ্রহণ দ্বারাই উহা স্থির করা হইবে। শ্রীহট্ট মুসলিম-প্রধান বলিয়া যদি উহাকে পূর্ব্ববঙ্গের সহিত যুক্ত করার ব্যবস্থা হয়, তবে সিন্ধু প্রদেশের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলকে বোম্বাই প্রদেশের সহিত পুনরায় যুক্ত করার ব্যবস্থা না হওয়ার কারণ বুঝা গেল না। বাঙ্গালা ও পাঞ্জাব বিভাগ সম্পর্কে মোটামুটি একই রকম ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাঙ্গালা ও পাঞ্জাব আইন সভার মুসলিমপ্রধান জেলাগুলির সদস্যগণ এবং অমুসলমান জেলাগুলির সদস্যগণ পৃথক্ ভাবে মিলিত হইয়া বাঙ্গালা ও পাঞ্জাব বিভাগ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা একটা কূট কৌশল বলিয়া আমাদের মনে আশঙ্কা জন্মিয়াছে। বাঙ্গালার হিন্দুপ্রধান অংশ বাঙ্গালা হইতে পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হইবে কি না, তাহা স্থির করিবার জন্য কোন রেফারেণ্ডাম ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আর প্রয়োজন হইলে হিন্দুপ্রধান অংশের শুধু হিন্দু সদস্যদেরই ভোট গৃহীত হওয়ার প্রস্তাব করা উচিত ছিল।

মুসলিম লীগের চিরস্থায়ী 'এট মেজরিটি'র স্বৈর-শাসন হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্যই বাঙ্গালা ও পাঞ্জাব বিভাগের দাবী করা হইয়াছে। বৃটিশ পরিকল্পনায় এই দাবী স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়াই আমরা স্বাধীনতাও পাইয়া গিয়াছি, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই পরিকল্পনায় মুসলমানের নেহাৎ ভালমানুষটি সাজিয়া বলিয়াছেন, "বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আশা করিয়াছিলেন যে, ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে তারিখের মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনা প্রধান প্রধান দলের সহযোগিতায় কার্য্যকরী করা এবং ভারতের জন্য সকলের গ্রহণযোগ্য একটি শাসনতন্ত্র রচিত হওয়া সম্ভব হইবে। কিন্তু এই আশা পূর্ণ হয় নাই।" মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনায় যেমনি এক দিকে মুসলিম লীগকে দিয়াছে পাকিস্থান, আর এক দিকে কংগ্রেসকে দিয়াছে অখণ্ড ভারত। "স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করিবার জন্যই" কংগ্রেস মন্ত্রী-মিশনের দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল। অপর দিকে "পাকিস্থানের ভিত্তি মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনায় আছে", এই ব্যাখ্যা করিয়াই মুসলিম লীগ প্রথমে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল। কংগ্রেস চাহিয়াছিল বৃটিশের সহায়তায় ভারতের ঐক্য রক্ষা করিতে, অপর দিকে মুসলিম লীগও ভারত বিভাগের পরিকল্পনা বৃটিশের সাহায্যেই কার্য্যে পরিণত করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, মুসলিম লীগই বৃটিশের বিশেষ অনুগ্রহভাজন হইতে পারিয়াছে। মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনা ছিল ভেদসৃষ্টির একটি অব্যর্থ অস্ত্র। এই অস্ত্র প্রয়োগ সার্থক হইয়াছে। ভারত বিভাগ ভারতবাসীর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া আজ তাঁহারা বলিতেছেন—ভারত বিভক্ত হইবে কি অখণ্ড থাকিবে, তাহা স্থির করিতে হইবে ভারতবাসীকেই। পরিকল্পনাটি এইরূপই হইবে, ৬ই ডিসেম্বরের ভাষ্য এবং ২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণার পর সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আমাদের ছিল না। বর্ত্তমান গণ-পরিষদের কাজ ব্যাহত করা হইবে না বটে, কিন্তু মিঃ জিন্নার জন্য আর একটি গণ-পরিষদের ব্যবস্থা এই পরিকল্পনার ৮ম অনুচ্ছেদের বি উপধারায় প্রস্তাব করা হইয়াছে। অথচ ভারতবাসীর ঘাড়ে সমস্ত দায়িত্ব চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বলা হইয়াছে, "ভারতীয় জনগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তর করাই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা। ভারতীয় রাজনৈতিক দলসমূহ একমত হইতে পারিলে এই কাজ অনেক সহজ হইত। ঐরূপ ঐক্যের অভাবে ভারতীয় জনসাধারণের মতামত জানিবার উপায় নির্দ্ধারণের ভার বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের উপরেই পড়িয়াছে।" দ্বিতীয় গণ-পরিষদের ব্যবস্থা এবং তাহার জন্য বিশেষ ভাবে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থাকে জনমত নির্দ্ধারণের উপায় বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

বাঙ্গালা ও পাঞ্জাব বিভাগের স্বীকৃতিই যে এই সর্ব্বশেষ বৃটিশ পরিকল্পনার একমাত্র মন্দের ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই। পরিশিষ্টে বাঙ্গালা ও পাঞ্জাবে মুসলিম-প্রধান জেলাগুলির একটি তালিকা এই পরিকল্পনায় দেওয়া হইয়াছে। ইহা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। সীমা নির্দ্ধারণ কমিশন দ্বারাই চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে। কিন্তু এই ব্যবস্থার

প্রধান ত্রুটি এই যে, বাঙ্গালার কতকগুলি জেলার যে বিশেষ বিশেষ অংশ হিন্দুপ্রধান সেই অংশগুলি এই সাময়িক ব্যবস্থায় বাদ পড়ায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের খণ্ড অধিবেশনে হিন্দু সদস্য-সংখ্যা যাহা হওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা কম হইবে। কলিকাতা নগরীর কথা পৃথক ভাবে উল্লেখ না করায় বুঝা যাইতেছে যে, কলিকাতা নগরী হিন্দু-বঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই দিক দিয়া বৃটিশ পরিকল্পনাকে ন্যায়-সঙ্গত বলিয়াই স্বীকার করা যায়। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার দিক্ হইতে [illegible] করিলে দেখা যায়, বৃটিশ যাহাতে মনের সুখে [illegible] করিতে পারে তাহার কোন ব্যবস্থাই বাকী [illegible] হয় নাই। এই [illegible] পরিকল্পনা শুধু বৃটিশ ভারত সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে মন্ত্রী-মিশনের স্মারক লিপিতে যে [illegible] করা হইয়াছে, তাহাই বহাল থাকিল। কিন্তু ভারত [illegible] হইলেই সমস্যার সমাধান হয় না। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দেশরক্ষা, অর্থ, চলাচল-ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের [illegible] [illegible] নিয়ন্ত্রণের ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া নিতে হইবে। উহাও [illegible] এক কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে এবং বৃটিশ গভর্ণমেন্ট উহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবেন। উহার উপর বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের উত্তরাধিকারীদের চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে। সুতরাং ব্যাপারটি [illegible] [illegible] হইয়া উঠিবে। সর্বোপরি কথা এই যে, এই পরিকল্পনায় ভারতের স্বাধীনতার কোন কথা নাই, আছে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের কথা। যে ভাবে ভারতকে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে কোন গণ-পরিষদ পূর্ণ [illegible] [illegible] উহা অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইবে। এই বৃটিশ [illegible] [illegible] ভারতের কোন আশাই [illegible] [illegible]।

কুমীরের চোখে জল

বাধ্য হইয়া ভারতবর্ষকে [illegible] [illegible] বিভক্ত করিতে হইল বলিয়া না কি বৃটিশ গভর্ণমেন্ট এবং বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন বিশেষ দুঃখিত। এই দুঃখ প্রকাশকে আন্তরিক বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। বহু দিন হইতে ভারত শাসনের ব্যাপারে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন, ভারত বিভাগ তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দাবাইয়া রাখিতে হইলে এ দেশের এক দল লোককে যে নিজেদের দিকে টানিয়া রাখিতে হইবে, এ তথ্য বৃটিশ গভর্ণমেন্ট বহু পূর্ব্বেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, [illegible] সাহায্যেই তাঁহারা নিজেদের কাজ হাসিল করিতে পারিবেন; কিন্তু তাঁহাদের সে আশা যখন পূর্ণ হইল না, তখন তাঁহারা মুসলমানদের মনে একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টাতেই প্রাণপণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা বলিতেছেন—"বিদায় লইবার পূর্ব্বে আমরা অবিভক্ত ভারতের হাতেই শাসন-ভার তুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলাম; কিন্তু জোর-জবরদস্তি করিয়া আমাদের মনোমত একটা মীমাংসা আমরা কাহারও ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে চাহি না। কাজেই—ভারতবর্ষ অবিভক্ত থাকিবে বা বিভক্ত হইবে, সে মীমাংসার ভার আমরা দেশের লোকের উপরই ছাড়িয়া দিলাম। তোমরা ভারতবর্ষে একটি মাত্র যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে চাও তো তাহাই কর। আর তাহা যদি তোমাদের মনঃপূত না হয় তো দুইটি পৃথক্ রাষ্ট্র গঠন কর। কিছুতেই আমরা আপত্তি করিব না।"

এদিকে অবিভক্ত ভারতের যে পরিকল্পনা তাঁহারা খাড়া করিয়াছিলেন, তাহার ভিতর প্রদেশমণ্ডল গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং সে প্রদেশমণ্ডলের সহিত পাকিস্থানের খুব বেশী পার্থক্য নাই। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট যে দেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন, সে দেশ ছাড়িবার সময় [illegible] [illegible] অঙ্গহানি না করিয়া তাঁহারা তুষ্ট হইতে [illegible] [illegible] [illegible] এই জন্যই অলষ্টারের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং [illegible] [illegible] পাকিস্থানের সৃষ্টি হইতেছে। ইহা ইংরেজের [illegible] নীতি। বৃটিশ সাম্রাজ্য সমূলে উৎপাটিত করিবার [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] অন্ততঃ সাময়িক ভাবে এ নীতি [illegible] [illegible] [illegible]।

বৃটিশ গভর্ণমেন্ট [illegible] [illegible] দেশের শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রতি পদেই মুসলিম লীগের [illegible] [illegible] [illegible] দেখাইতেছেন। প্রদেশগুলি বিভক্ত হইবে কি না, এই প্রশ্ন মীমাংসা করিবার সময় তাঁহারা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের মতামত গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা [illegible] [illegible]। কিন্তু সারা ভারতবর্ষ বিভাগের সময় তাঁহারা [illegible] [illegible] সভার মতামত লওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই। মুসলিম লীগের নেতারা ভারতবর্ষকে যখন বিভক্ত [illegible] [illegible], তখন তাঁহাদের মতই যথেষ্ট। লীগ-বহির্ভূত মুসলমানদের মত [illegible] [illegible] নাই। শ্রীহট্ট জেলা বহু দিন হইতে আসামের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু [illegible] মুসলমান-প্রধান বলিয়া গণভোটের [illegible] [illegible] পাকিস্থানী পূর্ববঙ্গের সহিত যুক্ত করিবার চেষ্টা হইবে। কিন্তু সিন্ধু প্রদেশের যে জেলা হিন্দুপ্রধান, তাহাকে সিন্ধু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বোম্বাই-এর সহিত যুক্ত করা হইবে কি না, তাহা মীমাংসা করিবার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। কলিকাতা সমেত প্রেসিডেন্সী বিভাগে হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে। সেগুলিকে উহাকে হিন্দু বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত না করিয়া নদীয়া, যশোহর ও মুর্শিদাবাদ জেলা মুসলমান-প্রধান বলিয়া আপাততঃ ঐ জেলাগুলিকে মুসলিম বাঙ্গালার ভিতর ধরা হইয়াছে এবং উহাদের ভাগ্য নির্দ্ধারণের ভার একটি সীমা নির্দ্ধারণ কমিশনের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগের আধিপত্য নাই; অতএব ঐখানে আবার গণমত সংগ্রহ করিয়া উহাকে মুসলিম লীগের আয়ত্তের ভিতর আনিবার চেষ্টা করা হইবে। সীমান্ত প্রদেশে সংখ্যার অনুপাতে হিন্দুরা ব্যবস্থাপক সভার যতগুলি আসন পাইতে পারেন, তাহার অপেক্ষা অধিক সংখ্যক আসন তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে বলিয়া ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের ভোট লইয়া প্রকৃত জনমত নির্ণয় করা সমীচীন নহে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দুরা সংখ্যার অনুপাতে যতগুলি আসন পাইতে পারেন, ততগুলি তো তাঁহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। অথচ বাঙ্গালা দেশ বিভক্ত হইবে কি-না বা কিরূপ ভাবে বিভক্ত হইবে, তাহা স্থির

অত্যন্ত অধিক। নতুবা দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ীর মত হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির পক্ষে আত্মরক্ষা করাই দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে।

বাউণ্ডারী কমিশনের পক্ষে এই সমস্ত বিষয়ই নূতন করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাঁহারা কিসের ভিত্তিতে এই সীমানা নির্দ্দেশে অগ্রসর হইবেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। কেবল মাত্র জনসংখ্যার দিক্ দিয়া বিচার করিলেও বর্ত্তমান ব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া উঠে। বাঙ্গালা দেশের মোট আয়তন ৭৭,১৬৩ বর্গ-মাইল। ১৯৪১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী বাঙ্গালা দেশে হিন্দুর সংখ্যা মোট জন-সংখ্যার শতকরা ৪৬ ভাগ। সুতরাং খুব কম করিয়া ধরিলেও নূতন বাঙ্গালা প্রদেশের আয়তন ৩৫,৮৫২ বর্গ-মাইল হওয়া উচিত। কিন্তু বর্ত্তমানে এই নূতন প্রদেশের ভাগে পড়িয়াছে মাত্র ৩৩,০৭৬ বর্গ-মাইল। কিন্তু শুধু জনসংখ্যার দিক্ দিয়া বিচার করিলে হিন্দু-বঙ্গের প্রতি সুবিচার করা হইবে মনে করিবার কারণ নাই। লীগ-নেতাদের প্রচারের কল্যাণে বিগত আদমসুমারীতে অনেক মুর্গী এবং গরু-ছাগল মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির কাজে সাহায্য করিয়াছিল। সুতরাং এই হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালার সীমানা টানিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে সীমানা নির্ণয়কালে দেশ-রক্ষার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন খুবই বেশী। বাঙ্গালা দেশই প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ইউনিয়নের পূর্ব্ব সীমা হইবে; এই সীমার যাহাতে একটি প্রাকৃতিক রক্ষা-ব্যবস্থা থাকে, তাহার দিকে সবিশেষ দৃষ্টি না দিলে ভবিষ্যতে যে বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই আত্মরক্ষার দিক দিয়া বিবেচনা করিলে হিন্দু-বঙ্গের পূর্ব্ব সীমা আত্রেয়ী হইতে মেঘনা নদীর কিয়দংশ পর্য্যন্ত হওয়াই বিধেয়। বঙ্গভঙ্গ আজ স্থিরনিশ্চিত তাহাতে ভুল নাই, কিন্তু বাঙ্গালার সীমানা কিরূপ হইবে তাহা এখনও অনিশ্চিত। আজিকার আন্দোলনের প্রধান বিষয়বস্তু নূতন বাঙ্গালার পক্ষে সুবিধাজনক সীমানা সৃষ্টি এবং এই আন্দোলনের সাফল্যের উপরই পশ্চিম-বঙ্গের জনসাধারণের উন্নতি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করিতেছে। পূর্ব্বে আমরা যে সীমানার কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে যদি লোক-বিনিময়ের আবশ্যকতা দেখা দেয়, তবে সে ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে হইবে।

—

বিভক্ত ভারত সম্পর্কে মতামত

সুপরিচিত সোভিয়েট ঐতিহাসিক অধ্যাপক লেমিন বলিয়াছেন যে, ১৯৪২-এ ক্রিপস মিশনের সময় হইতে বৃটিশ নীতিতে ধারাবাহিক ভাবে রাজনৈতিক দুই কৌশলের খেলা চলিতেছে।

অবস্থাগতিকে বৃটেনকে এক দিকে ভারতীয় জনগণের 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলন'কে সুবিধা দিতে হইতেছে, অন্য দিকে বৃটিশ শাসক-শ্রেণী তাহাদের ক্ষমতা ও মর্য্যাদা প্রয়োগের দ্বারা ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়, ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য সঙ্ঘর্ষ বাধাইয়া যে কোন প্রকারে ভারতে তাহাদের প্রভুত্ব কায়েম করিয়া রাখিতে চাহিতেছে। উপায়ান্তর না থাকায় বৃটেন এই সুবিধা দিতে বাধ্য হইয়াছে।

দুই বিরোধী রাষ্ট্রে ভারত বিভাগ করার ফলে বৃটিশ গভর্ণর জেনারেল অথবা গভর্ণর জেনারেলদের পক্ষে নিজেদের হস্তে ভারসাম্য রক্ষার সুবিধা থাকিবে এবং এই উপায়ে ভারতের উপর প্রভুত্ব রক্ষারও সুবিধা থাকিবে।

নূতন বৃটিশ পরিকল্পনায় ভারতকে দুই ভাগে ভাগ করিবার কথা সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। কার্য্যতঃ ভারতকে বহু ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

দেশীয় রাজ্যে চরম প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রাবল্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ সব রাজ্য সারা ভারতে ছড়াইয়া থাকার ফলে ঐগুলি হইতে বৃটিশ প্রভাব ও প্রভুত্ব বজায় রাখিবার মূল কেন্দ্র।

ঘোষণায় ভারতীয়দের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতার ধার দিয়াও যায় নাই। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শক্তির উপরই প্রধানতঃ প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ নির্ভর করে।

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক কাঠামো যাহাই হউক না কেন, বৃটিশ শাসকশ্রেণী চাহে ভারতে তাহাদের আর্থিক, রাজনীতিক ও সামরিক অবস্থান বজায় রাখিতে। অপরাপর বিষয়ের মধ্যে তাহারা বৃটিশ ও ভারতীয় বণিক্‌দের মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভর করিতেছে। সম্প্রতি ৮০ ইঙ্গ-ভারতীয় মিশ্র কোম্পানী গঠিত হইয়াছে এবং বৃটিশ পুঁজি ভারতীয় পুঁজিকে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছে।

ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে বৃটিশ পরিকল্পনার সমালোচনা-প্রসঙ্গে ব্রহ্ম-নেতা জেঃ ইউ আউঙ্সান রয়টারের প্রতিনিধিকে বলেন, বিভক্ত ভারত শুধু ভারতীয় জনগণের পক্ষেই নহে, পরন্তু সারা বিশ্বের শান্তির পক্ষে দুর্ভাগ্যস্বরূপ। তিনি বলেন, ভারতের ভাগ্য আজ যে এইরূপ হইল তজ্জন্য আমি দুঃখিত। ইহাকে যদি মীমাংসাও বলা যায়, তবে ভারতবাসীদের ন্যায় ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হিসাবে ব্রহ্মবাসীরা—আমরা উদ্বেগ বোধ করিতেছি।

—

ভারতে খাদ্যাভাব

খাদ্য-সচিব ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, ভারতের আজ মোটামুটি ৪৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের অভাব দেখা দিয়াছে। জুলাই ও আগষ্ট—এই দুই মাসই খুব সঙ্কটের সময়। তিনি আশা করেন যে, ঐ সময়ের পর আমদানী খাদ্যশস্য ও উৎপন্ন ফসলের সাহায্যে অবস্থা আয়ত্তে আনা যাইবে। তিনি বলেন যে, এক প্রকার রোগের ফলে হায়দ্রাবাদ, মধ্যপ্রদেশ ও মধ্য-ভারতীয় প্রদেশ সমূহের বহু জেলায় এবং যুক্তপ্রদেশ সমূহের বহু জেলায় এবং যুক্তপ্রদেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলিতে লক্ষ লক্ষ টন গমের ক্ষতি হইয়াছে। এক প্রকার উদ্ভিজ্জ পরজীবাণুসৃষ্ট এই অসুখের কোনই প্রতিষেধক নাই, বিজ্ঞানও উহার কোন ঔষধ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। ইহা ছাড়া প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের সংগ্রহ-ব্যবস্থাও আশানুরূপ যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হয় নাই। সেই জন্য প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তাঁহার সতর্ক বাণীর পর কোন কোন প্রদেশকে বরাদ্দ খাদ্য হ্রাস করিতে হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য বরাদ্দ হ্রাসের কোন প্রস্তাব করেন নাই।

গত পাঁচ বৎসরের গড় উৎপাদনের হিসাবে এ বৎসর মোটামুটি

৪৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি পড়িবে। ব্রহ্ম হইতে স্বাভাবিক সময়ে যে ১৫ লক্ষ টন চাউল আসিত, তাহার অভাবও এই হিসাবে ধরা হইয়াছে। ব্রহ্মের অস্থির অবস্থার জন্য তথা হইতে যে খাদ্যশস্য আসিতেছে তাহার গতি মন্থর ও অত্যল্প।

কি উপায়ে সঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে এই প্রসঙ্গে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন, দেশের মধ্য হইতে যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া এবং বাহির হইতে যথাসম্ভব আমদানী করিয়া ঘাটতি অঞ্চলকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। বিভিন্ন প্রদেশের সংগ্রহ-কার্য্য সফল হইলে এবং আমাদের অন্যান্য দেশ হইতে আমদানীর চেষ্টা সফল হইলে গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও আমরা সঙ্কট এড়াইতে পারি। আন্তর্জাতিক জরুরী খাদ্য পরিষদ কর্তৃক আমাদের জন্য যে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহাতে ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টন চাউল দুই কিস্তিতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্তমান বৎসরের প্রথমার্দ্ধে দেওয়ার কথা ৪ লক্ষ ১০ হাজার টন এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে দেওয়া হইবে ৭৫ হাজার টন। চাউল ছাড়া আর যে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ১৯৪৭-এর জুন পর্য্যন্ত দ্বাদশ মাস সময়ের জন্য ২৩ লক্ষ টন। বৎসরের বাকী অর্দ্ধেকের জন্যও খাদ্যশস্য বরাদ্দ হইবে। মোট বরাদ্দ ২৩ লক্ষ টনের মধ্যে জুনের শেষ নাগাদ ২১ লক্ষ টন পাওয়া যাইতে পারে। চাউল সম্বন্ধে ঐ সময়ে আমরা আড়াই লক্ষ টনের আশা করিয়াছিলাম। বাকিটা বৎসরের শেষার্দ্ধে পাওয়া যাইতে পারে।

আন্তর্জাতিক গম-সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ায় আমাদিগকে অপরাপর সম্পদের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। তিনি বলেন, আমরা রপ্তানিকারী দেশের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতেছি এবং সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থারও চেষ্টা করিতেছি। আমাদের লোক ইতিমধ্যেই কোন কোন দেশে গিয়াছেন। যেখানে লোক নাই, সেখানেও শীঘ্র পাঠান হইবে।

উক্ত হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে, চাউল সম্পর্কেই আমাদের অবস্থা একটু ভাল। গমের বেলায় প্রায় ২০ লক্ষ টনের অভাব আছে এবং জোয়ারের বেলায় ৯ লক্ষ টন ঘাটতি আছে। মোট আমাদের ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৩০ লক্ষ টন। ইহার সহিত আবার ব্রহ্ম হইতে স্বাভাবিক কালে যে ১৫ লক্ষ টন চাউল আমদানী হইত, তাহা ধরিতে হইবে। অর্থাৎ ঘাটতি ৪৫ লক্ষ টন।

আন্তর্জাতিক জরুরী খাদ্য পরিষদে ভারতের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত এন. জি. আয়েঙ্গার বলেন, "যথেষ্ট খাদ্য-বরাদ্দ না থাকিলে এবং সেপ্টেম্বরের পূর্বে উহা আমাদের দেশে না পৌছিলে সাংঘাতিক অনশনের সম্ভাবনা আছে। ভারতের পক্ষে আগামী ৪ মাসই সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক সময়।" ভারতের খাদ্যভাণ্ডার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে—এইরূপ তথ্য প্রকাশের পর তিনি বলেন যে, উহার ফলে খাদ্য-বরাদ্দ-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ভারতের বরাদ্দ-ব্যবস্থা সমগ্র সুদূর প্রাচ্যের পরীক্ষার বিষয়। নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য যে শক্তি সংহত হইতেছে, এই ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ার ফলে সেই শক্তিকে উৎসাহিত করা হইবে। সম্ভাব্য পরিণতির কথা বিবেচনা করিলে ভারতের বর্তমান অবস্থা শুধু যে আমাদের নিজস্ব খাদ্য-ব্যবস্থার বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে তাহাই নহে, পরন্তু আন্তর্জাতিক খাদ্য-পরিষদের পক্ষেও উহা চ্যালেঞ্জস্বরূপ। ভারতকে ইতিপূর্ব্বে যাহা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহা ছাড়াও ভারত আরও ১৭ হাজার টন খাদ্যশস্য জুনের মধ্যে দাবী করিতেছে। জুলাই সেপ্টেম্বরের জন্য যাহা বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহা ৬ লক্ষ টন হইতে বাড়াইয়া ৯ লক্ষ টন অর্থাৎ মাসে ৩ লক্ষ টন করিয়া বেশী দেওয়ার জন্য দাবী করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১ লক্ষ ১০ হাজার টন হইবে গম।

আর্জেন্টিনা ও তুরস্কের ন্যায় সন্দেহজনক দেশ হইতে লওয়ার জন্য ভারতের পরীক্ষামূলক খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হইয়াছে বলিয়া তিনি সমালোচনা করেন। ভারত এই দুঃসময়ে যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে খাদ্য আহরণের জন্য যাইবার লাইসেন্স চাহে না, চাহে—আসল খাদ্যশস্যের পরিমাণ যাহা ঠিক সময় পৌছিয়া ভারতের খাদ্যাভাব দূর করিতে পারে।

মাণিকগঞ্জ অঞ্চলে চাউলের মূল্য মণপ্রতি ২১৷৷০ টাকা হইতে এখন ২৫ টাকায় উঠিয়াছে। এই অঞ্চলে আটা-ময়দা গত তিন চারি মাস হইতে, দুর্লভ নয়, একেবারেই পাওয়া যাইতেছে না। বাঙ্গালা দেশের অন্যান্য বহু অঞ্চলের চাউল সম্পর্কে সংবাদ প্রায় একই প্রকার। বাঙ্গালার হতভাগ্য এবং সর্ব্বংসহ জনসাধারণের কথা ভাবিতেছি না; ভাবিতেছি, বাঙ্গালার সম্মানিত অতিথি তথাকথিত বিদেশী দুর্গতদের জন্য একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাঙ্গালা সরকারকে অধিকতর অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। ঘরের লোক না খাইয়া থাকিলে দোষ নাই; কিন্তু বাঙ্গালা লীগ-সরকার যাহাদের অতিথিরূপে লাভ করিয়া নিজেদের ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহাদের ভোজনাদি ব্যাপারের জন্য চাউল এবং অন্যান্য আবশ্যক খাদ্যদ্রব্যাদি সামগ্রী যেমন করিয়াই হউক সংগ্রহ করিতে হইবে—এমন কি বাঙ্গালার অতিথিবৎসল হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের ভাত কাড়িয়া লইয়া।

—

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

কলিকাতায় ও হাওড়ায় কত দিন ধরিয়া মারামারি কাটাকাটি চলিতেছে। লোকের মনে ধারণা হইয়াছে যে, যাহারা শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী তাহারা হয় অকর্ম্মণ্য, নতুবা শান্তিরক্ষায় অনিচ্ছুক। শান্তিরক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে তাহাও নিষ্ফল। কোথাও বোমা ফাটিল বা ছুরি চলিল, পুলিশ বা মিলিটারী আসিয়া কয়েক দফা গুলী ছুড়িল ও সম্মুখে যাহাকে পাইল তাহাকে ধরিয়া হাজতে পুরিল। কর্তারা ভাবিলেন—ব্যস, লোকের ভয় লাগিয়া গিয়াছে। কিন্তু পরদিনই দেখা গেল যে, আবার বোমা ফাটিতেছে, গুলী ছুটিতেছে ও ছুরি চলিতেছে। যে যে অঞ্চলে এই সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটিতেছে, সেই সমস্ত অঞ্চলের প্রসিদ্ধ গুণ্ডাদের নাম-ধাম পুলিশের অবিদিত থাকিবার কথা নয়; কোন কোন জায়গায় যে তাহারা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছে, তাহা বাহির করাও যে একেবারে অসাধ্য ব্যাপার তাহা মনে করিবার কারণ নাই। কিন্তু প্রকৃত গুণ্ডাদের যে আটক করা হইতেছে বা গুপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ডিপো বাহির করিবার জন্য সরকারী গোয়েন্দা বিভাগ যে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। শুধু রাস্তার মোড়ে মোড়ে মিলিটারী খাড়া করিয়া রাখিলে কি হইবে?

* * * *

কিন্তু আজ অবধি যাহা কমিল তাহা আর বাড়িল না। গুজব, বাঙ্গালার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমান্তে চিনির সরবত পাওয়া যাইতেছে এবং বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরা সেখানে হরদম সরবত খাইতেছে। দেড়শ' ওয়াগন চিনি না কি বাঙ্গালার পশ্চিম সীমান্ত হইতে হঠাৎ অদৃশ্য হইয়াছে। অবশ্য দুষ্ট লোকের অভ্যাস গুজব রটানো। তাহা নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

বাঙ্গালীর উন্নতি

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এস সি দাস বাঙ্গালা সরকারের ওয়ার্কস ও বিল্ডিংস ডিপার্টমেন্টের

চীফ ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত হইয়াছেন। এই পদে ইনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয়। [illegible] ১৮৯৬ সালে ফরিদপুর জেলার [illegible] গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৫ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে বি-এস-সি পাশ করিয়া ১৯২০ সালে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে [illegible] ডিগ্রী লাভ করিয়া পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ১৯২২ সালে তিনি আই-এস-ইতে যোগদান করেন। ১৩ই নভেম্বর ১৯৪৬ সালে ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনীয়ারসের [illegible] নির্ব্বাচিত হন। আমরা মিঃ দাসের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

বিভক্ত বঙ্গ

বঙ্গভঙ্গের জন্য দায়ী মুসলিম লীগ। ইহাই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের একমাত্র পরিণতি। মিঃ জিন্নার প্ররোচনায় ও জেদে ভারত, সেই সঙ্গে পাঞ্জাব ও বাঙ্গালা বিভক্ত হইল। কিন্তু এই জেদ এবং ক্রুট মেজরিটির স্বৈরাচারে মুসলিম লীগ নিজের কবর নিজ হস্তেই খুঁড়িয়াছেন। দেশ বিভাগের ফলে উভয় দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা কিরূপ দাঁড়াইবে সরকারী সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী শ্রীযুক্ত বিড়লা তাঁহার নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন :—

শিল্প অঞ্চল (১৯৩৯-৪০)—

	হিন্দুস্থান	পাকিস্থান
কাপড়ের কল	৩৮০	৯
পাটকল	১০৮	
চিনির কল	১৫৬	১০
লৌহ কারখানা	১৮	
সিমেন্টের কারখানা	১৬	৩
কাগজের কারখানা	১৬	
কাচ [illegible]	৭৭	২

ব্যবসা ও পেশাগত আয় বিশ্লেষণ—

খনি ও আকর ইত্যাদি	৯,৪১,৪৭,৬২৪	২,৩৫,৪০,৮৮০
[illegible]	৪৪,৮৬,৮১,৮৬০	২,৭২,৮৮,২২৩
[illegible] বস্তু	৬,৫২,৪৪,৮৩৭	১,৮৬,৩৩,১৭৪
[illegible] ও বিবিধ মালপত্র	৭,৮৬,৬৭,৪৬২	১,৯১,৭৩,২৭৬
[illegible] যোগাযোগ	১০৪,৬৩,৫৪,৪৭২	১৮,৫৭,৪৬,৭২১
[illegible]	২০,৬২,১১,৫১৯	৩,৮৮,০৭,৪৭২

কৃষি ও খাদ্য সম্পদ—

[illegible]	৯,৮৩,৫১৯ একর	১৪,০৩,৭০০ একর
তুলা	১,৩৭,৭০ হাজার একর	১৬,৩০,০০০ একর
চা	৬,৫১,২৪৫ একর	৯৬,৬৫৭ একর
চাউল	১,৭২,২৯ হাজার টন	৫৩,৭৬,০০০ টন
[illegible]	৪১,৯৯,৭৪০ টন	২৭,৮৫,২৬০ টন
[illegible]	২৬,৩১,০০০ টন	৫,১৭,০০০ টন
[illegible]	২২,৭৭,০০০ টন	নগণ্য

খনিজ সম্পদ—

কয়লা	২,৫০,৭১,৮০২ টন	১১,৮,৪৭৬ টন
[illegible]	৬,৫৯,৬৮,৯৫১ গ্যালন	২,১১,১৩,৪২০ গ্যালন
ক্রোমাইট	৫,১১৪ টন	২১,৮৯২ টন
[illegible]	২,৮৮,০৭৬ টন	
লৌহ	১৪,২১,৭০১ টন	
ম্যাঙ্গানিজ	৭,৬৬,৩৪১ টন	
ম্যাগ্নেসাইট	২৩,০৫২ টন	
অভ্র	১,০৮,৮৩৪ হন্দর	

যোগাযোগ—

রেলপথ	২৫,৭৭০ মাইল এবং নিযুক্ত মূলধন ৬২৫ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা	১৪ হাজার ৫৪২ মাইল এবং নিযুক্ত মূলধন ২৩২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা
রাজপথ	২৪৬,৬০৫ মাইল	৪১,৮৬৩ মাইল
কার্য্যকরী জলজশক্তি	১,৩৪৩,০০০ কিলোয়াট	২,৮৪৭,০০০ কিলোয়াট

হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের রাজস্ব হিসাব—

	হিন্দুস্থান	পাকিস্থান
প্রাদেশিক	আয় ১৪৩ কোটি ৩৮ লক্ষ	আয় ৪৪ কোটি ৭৯ লক্ষ
	ব্যয় ১৪২ কোটি ২৭ লক্ষ	ব্যয় ৪৯ কোটি ৪৭ লক্ষ
	উদ্বৃত্ত ১ কোটি ১১ লক্ষ	ঘাটতি ৪ কোটি ৬৮ লক্ষ
কেন্দ্রীয়	আয় ২৭৭ কোটি ২১ লক্ষ	আয় ৮২ কোটি ১৫ লক্ষ
	ব্যয় ৩৮৯ কোটি ২২ লক্ষ	ব্যয় ১১৬ কোটি ২৯ লক্ষ
	ঘাটতি ১১২ কোটি ১১ লক্ষ	ঘাটতি ৩৩ কোটি ৩৪ লক্ষ

প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আয়-ব্যয় একত্রে ধরা হইলে হিন্দুস্থানের **ঘাটতি** পড়িবে ১১১ কোটি টাকা এবং পাকিস্থানের ৩৮ কোটি ২ লক্ষ টাকা।

মিঃ বিড়লা বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থা ও সমাজসেবার **কার্য্যে মান** বজায় রাখা হইলে পাকিস্থানের ব্যয় সব দিক দিয়াই **অত্যন্ত বেশী হইবে**। পাকিস্থান এলাকা সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া **দেশরক্ষা** খাতে অত্যন্ত বেশী ব্যয় করিতে হইবে।

পাকিস্থান দুইটি বড় বন্দর পাইবে। করাচী ও চট্টগ্রাম। **১৯৩৯-৪০** সালে এই দুইটি বন্দরে মোট ২৯ লক্ষ ৮২ হাজার কার্গো **টন মালপত্র** ওঠা-নামা করে। অন্য দিকে বোম্বাই, কোচিন, মাদ্রাজ, **ভিজাগাপটম** এবং কলিকাতার মোট ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৬৮ হাজার **টন মালপত্র** ওঠা-নামা করে।

বেতন কমিশন রিপোর্ট

কেন্দ্রীয় বেতন তদন্ত কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে সাড়ম্বরে ঘোষণা **করিয়াছেন যে**, জীবন ধারণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়, এরূপ বেতন কোন **চাকুরিয়ারই** হওয়া উচিত নয়। কথাটা শুনিতে খুবই ভাল লাগে কিন্তু **তাঁহাদের** ৪৩৬ পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ রিপোর্টে যাহারা প্রকৃত অভাবগ্রস্ত **তাহাদের** বিশেষ কোন সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। **উচ্চতম** বেতন দু' হাজারের উপর না হইলে বিশেষ কোন অসুবিধা না **হইতে পারে**। কিন্তু শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মূল বেতন ৩০ টাকা ও মাগগী **ভাতা ২৫** টাকা, মোট ৫৫ টাকা এবং মধ্যশ্রেণীর চাকুরিয়াদের ক্ষেত্রে **নিম্নতম** বেতন ১০০ টাকা, মূল বেতন ৫৫ টাকা ও মাগ্‌গী ভাতা **৩৫** টাকা—সুপারিশ করা হইয়াছে। বেতনের এই বিপুল পার্থক্যের **মধ্যে** যে **গুরুতর অর্থনৈতিক** বৈষম্য সূচিত হইয়াছে, আমাদের **সমাজ-জীবনে** তাহার প্রতিক্রিয়া আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। **সকল** সুখ-সুবিধার কথা ছাড়িয়া দিলেও কেবল অন্ন, বস্ত্র এবং বাস-**স্থানের জন্য** যে ব্যয় তাহাও ইহাতে সঙ্কুলান হইবে না। প্রত্যেক **দ্রব্যের মূল্য** পাঁচ-ছয় গুণ বাড়িয়াছে। কম বেতনভোগী শ্রমিক ও **মধ্যবিত্ত** শ্রেণীর প্রত্যেকেই প্রায় ঋণ-জালে জড়িত। যুদ্ধের মুদ্রা-**স্ফীতির** জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রায় ধ্বংস হইতেই বসিয়াছে। জাতির **মেরুদণ্ড এই** শ্রেণী, অথচ ইঁহাদের বাঁচাইবার আন্তরিক চেষ্টার অভাবই **এই রিপোর্টে** পরিস্ফুট।

বাড়ীভাড়া ভাতার যে হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাতে অল্প বেতনের কর্ম্মচারীদের কোন সুবিধাই হইবে না। যাঁহার বেতন ৫৫ টাকা অথবা ১০০ টাকা তিনি শতকরা ১৫ টাকা হারে বাড়ীভাড়া পাইবেন। ১৩॥০ টাকায় যুদ্ধের পূর্ব্বেই বাসোপযোগী বাড়ী পাওয়া যাইত না, আজ তো খোলার ঘরও মিলিবে না। বড়-বড় সহরবাসী কর্ম্মচারীদের একটা ক্ষতিপূরণ ভাতা দেওয়া হইবে। কিন্তু মাঝারী ও ছোট সহরেও তো বাড়ীভাড়া এবং অন্যান্য খরচ রহিয়াছে। সেখানেও বাড়ীভাড়া ও ক্ষতিপূরণের ভাতার ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল। ৫০০ টাকা বেতনভোগী ৭৫ টাকা বাড়ী-ভাড়া ভাতা পাইবেন। চেষ্টা করিলে আরও কিছু দিয়া হয়ত' বাসোপযোগী বাড়ী পাইতে পারেন কিন্তু শ্রমিক অথবা মধ্যশ্রেণীর চাকুরীয়াদের পথে বসা ছাড়া অন্য পথ নাই। বস্তুতঃ, ক্ষতিপূরণ ভাতা ও বাড়ীভাড়া ভাতা সংক্রান্ত ব্যবস্থা দ্বারা তেলা মাথায় তেল ঢালা হইয়াছে। একমাত্র অল্প বেতনের কর্ম্মচারীদের পুত্র-কন্যার শিক্ষা-ভাতার সুপারিশ অবশ্যই প্রশংসনীয়।

গভর্ণমেণ্ট কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করায় তিন কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে, কিন্তু এই ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত কর্ম্মচারীদের কোন লাভই হইবে না। অধিকন্তু, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট এবং বেসরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি না হইলে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবার আশঙ্কা দেখা দিবে।

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক প্যারীমোহন সেনগুপ্ত এই জ্যৈষ্ঠ শোচনীয় ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। প্রকাশ, তিনি রাইটার্স বিল্ডিংস-এর সম্মুখে ট্রামে উঠিবার সময় পা ফস্কাইয়া নীচে পড়িয়া যান এবং শরীরের নিম্নাংশে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। পাঁচ মিনিট পরেই ঘটনাস্থলে তিনি মারা যান।

কবি হিসাবে তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। মৃত্যুর কুড়ি দিন পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

জ্ঞানাঙ্কুর দে

বাঙ্গালা সরকারের বিচার বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ জ্ঞানাঙ্কুর দে আই-সি-এস ২২শে জ্যৈষ্ঠ সকালে ২৮ নং ক্যামাক ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে গুলীর আঘাতে নিহত হন। গুলীটি তাঁহার নিজস্ব রিভলভার হইতে ছোড়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। মিঃ দে ১৮৯২ সালে নদীয়া জেলার জগন্নাথপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৩ সালে তিনি ইংলণ্ড যান ও ১৯১৭ সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৭ সালে তিনি চুঁচুড়ায় সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় ল্যাণ্ডএকুইজিশন কালেক্টর। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
১৩৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
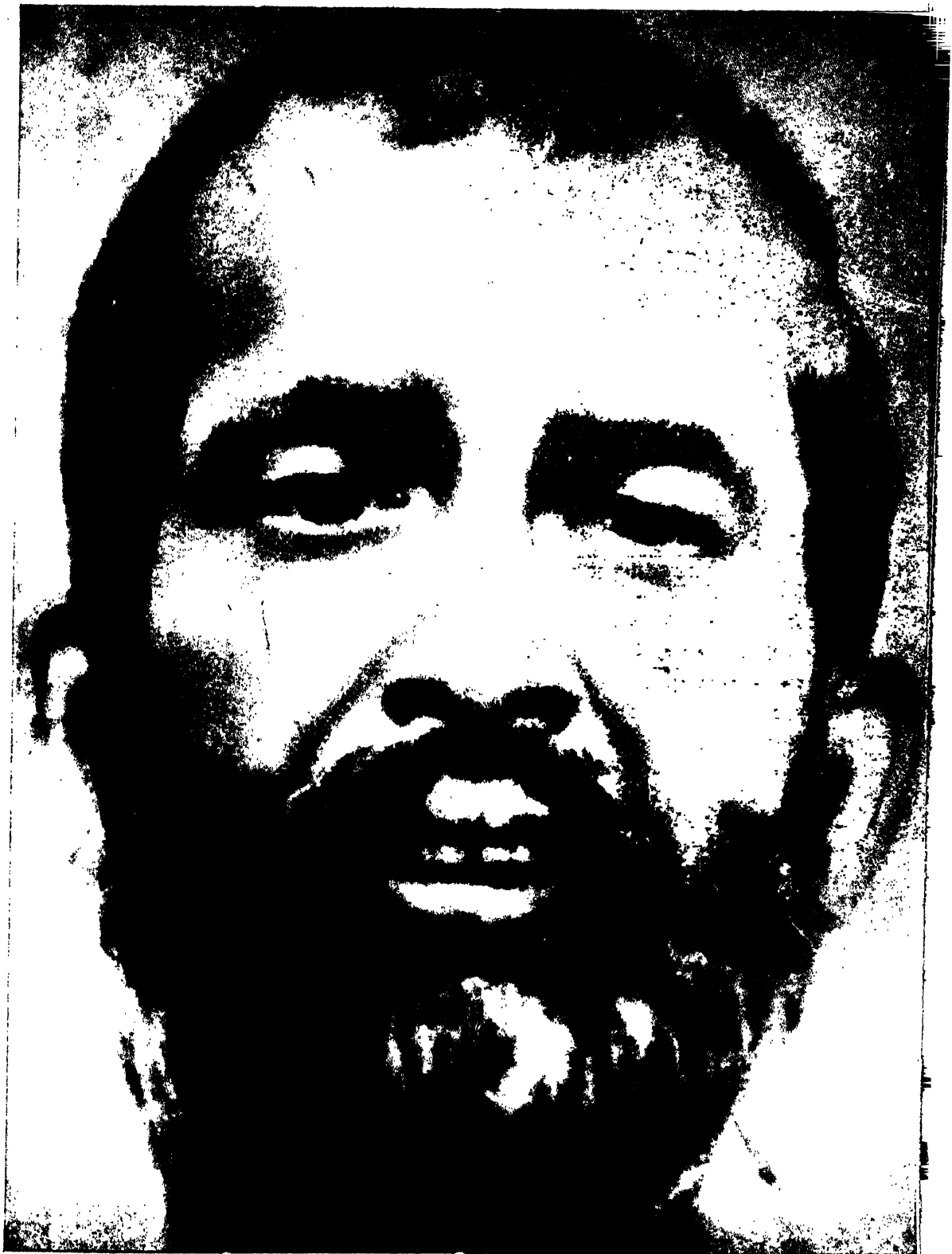
তিনি আমাকে তাঁর নাভিশ্বাসের সময় বলেছিলেন, 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, [illegible] দিয়ে নয়।'
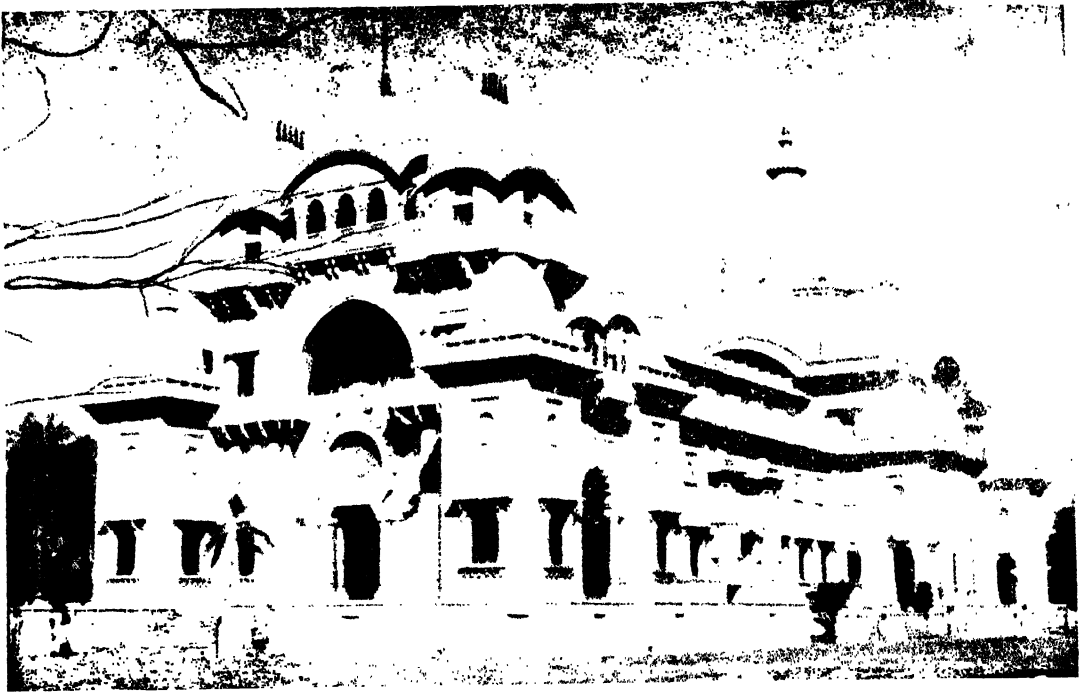
"ভগবান দুই কথায় হাসেন, কবিরাজ যখন রোগীর মাকে বলে, মা! ভয় কি? আমি তোমার ছেলেকে ভাল ক'রে দিব। তখন একবার হাসেন; এই বলে হাসেন, আমি মারছি, আর এ কি না বলে আমি বাঁচাব! কবিরাজ ভাবছে, আমি কর্ত্তা, ঈশ্বর যে কর্ত্তা এ কথা ভুলে গেছে। তার পর যখন দুই ভাই দড়ি ফেলে জায়গা ভাগ করে, আর বলে 'এ দিকটা আমার ও দিকটা তোমার', তখন ঈশ্বর আর একবার হাসেন; এই মনে ক'রে হাসেন, আমার জগৎ ব্রহ্মাণ্ড, কিন্তু ওরা বলছে, এ জায়গা 'আমার' আর 'তোমার'!"

* * *

"তাঁর সৃষ্টিতে সবই হ'তে পারে এই বিশ্বাস থাকলেই হ'ল; 'আমি যা ভাবছি—তাই সত্য; আর সকলের মত মিথ্যা, এরূপ ভাব আসতে দিও না। তার পর তিনিই বুঝিয়ে দিবেন।

"তাঁর কাণ্ড মানুষে কি বুঝবে? অনন্ত কাণ্ড! তাই আমি ও-সব বুঝতে আদপে চেষ্টা করি না। শুনে রেখেছি তাঁর সৃষ্টিতে সবই হতে পারে। তাই ও-সব চিন্তা না করে কেবল তাঁরই চিন্তা করি। হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেছিল—আজ কি তিথি? হনুমান বলেছিল—'আমি তিথি-নক্ষত্র জানি না, কেবল এক রাম চিন্তা করি'।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

গুরু-প্রণাম

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ আমি এই সুধী-সভায় আমার পূজনীয় গুরুদেবের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদনের অবকাশ পেয়েছি। আপনারাই আমাকে সে সৌভাগ্য দান ক'রে কৃতজ্ঞ ও কৃতার্থ করেছেন। আপনাদের কল্যাণ হোক্।

আমি সত্যই ভেবে পাই না, এই পচাশী বৎসরের বৃদ্ধ অক্ষমের প্রতি এ আদেশ কেনো হ'লো। অদেখা জিনিস দেখবার একটা আকাঙ্ক্ষা—অসম্ভব নয়। কিন্তু আমার অবস্থায় সেটা যে পরীক্ষার মতো শংকা নিয়ে উপস্থিত হয়। বাল্যে কোন এক পরীক্ষায় আমার ভাগ্যে "ভস্ম" কথাটির বানান লেখবার আদেশ ছিল। কোন 'স' লিখব' স্থির করতে না পেরে অস্থির হয়েছিলুম। নিজে "ভস্ম" না হলে আমার সে অবস্থাটি ভুলব না। আজ আবার আমার সেই বিভীষিকার দিন।

অমূল্য বাবু যখন আমাকে কিছু লেখবার জন্যে অনুরোধ করলেন, দু'টি কারণে আমি তাঁকে 'না' বলতে পারিনি। প্রথম, গুরুদেবকে 'প্রণতি'-নিবেদন করবার এই আমার শেষ সুযোগ। দ্বিতীয়, অমূল্য বাবুর প্রকৃতিগত সুমিষ্ট অনুরোধ—দুষ্টকেও শিষ্ট করে দেয়।—অবান্তর কথা থাক্—

আজ আপনারা সকলে একটি অভাবনীয় ঘটনাকে সম্মান দিবার জন্য এখানে উপস্থিত। অভাবনীয় কথাটি ব্যবহার করতে প্রাণ আমাকে বাধ্য করেছে। বাংলা দেশের চেয়ে গরীব দেশ আছে কি না আমার জানা নাই। সম্প্রতি তার সঙ্গে সর্ব্ব নিকৃষ্ট অভদ্র ব্যবহারগুলি প্রকাশ্যে দেখা দিয়ে, তথাকথিত উচ্চ শিক্ষিতদের উচ্চ শির জগৎ সমক্ষে অবনত করেছে ও করছে। দেশের এই অবস্থা।

যাঁর জন্মদিন পালন উদ্দেশে আজ এই সভার অধিবেশন—যাঁর নামের সংস্পর্শে ২৫শে বৈশাখ আজ ধন্য, তিনিই আমাদের যুগ-প্রধান রবীন্দ্রনাথ। যাঁকে পেলে জগতের যে কোনো দেশ গর্ব্ব অনুভব ক'রতো। তা হয়নি। কেনো? একটি বিষয় সকলে লক্ষ্য করে থাকবেন—ভগবান কাকেও সব দিক্ থেকে সমূলে মারেন না, তার বাঁচবার অন্তত একটা উপায় রেখে দেন। বুদ্ধি থাকলে যা ধরে' সে দাঁড়াতে পারে। আমরা না বুঝলেও তাঁর অবিচার নাই। বয়সের ভুলে বিচার-অবিচারের কথাটা এসে গেছে, ইচ্ছাকৃত নয়। মাননীয় বিচারপতি দয়া করে আজ আমাদের সভাপতি। তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া চোর ডাকাত বা খুনের অপেক্ষাকৃত সহজ। আমরা সৌভাগ্যে পাই, তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আমি ভগবানের বিচারের কথাই বলেছি। তিনি বাংলা দেশের দুরবস্থা দেখেই রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে গেলেছিলেন! তাই অভাবনীয় কথাটি ব্যবহার করেছি।

আর কেউ জানুন বা না জানুন, ভগবান জানেন—মনে ও প্রাণে যে বড় এমন একটি প্রাণবান মনীষীই অবসাদিত বাংলার জন্যে আবশ্যক, বিদুরের খুদ শ্রীকৃষ্ণই আদর করে' খেয়েছিলেন। তিনিই—কথায়, কাজে, কর্ম্মে, রূপে-গুণে—মনমরা মুহ্যমান বাঙালীদের হতাশ ও নিরুৎসাহ হতে দেননি। তাঁর বিশ্ববিমুগ্ধকারী কবিতার মোহমায়া প্রেমস্পর্শে, মাধুর্য্যমণ্ডিত বাক্-যোজনায় বা চাতুর্য্যে হৃদয়-হরণকারী ভাবসৌন্দর্য্যে ম্রিয়মান বাঙালীর হৃদয় জয় তিনি সহজেই করেছিলেন। পরে জালিওয়ানওয়ালাবাগের আকস্মিক হত্যাকাণ্ড তাঁকে বিশেষ আঘাত করে। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজপ্রদত্ত খেতাবি সম্মান ত্যাগ করে ভারতীয় মর্য্যাদাই মুখ রক্ষা করেন এবং তাঁদের পূজনীয় হন। তাঁর সেই সময়ের কয়েকটি প্রবন্ধ—চিরদিন ইতিহাসের বক্ষ উজ্জ্বল করে রাখবে।

কিসে দেশের মঙ্গল হয়, বাঙালী আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, এ চিন্তা তাঁর সর্বক্ষণের ছিল। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন তাঁর প্রকাশ্য পরিচয়। চিন্তা, চেষ্টা, শ্রম ও ব্যয়ে, কয়েকটি সহৃদয় সহকারী সহযোগে তা তিনি ক'রে দেখিয়ে গেছেন। নিরক্ষর শ্রমিকদের কয়েকখানি গ্রামকে, সর্ব্বাংশে বাসোপযোগী করে' রাস্তা-ঘাট সুগম, জলবায়ু স্বাস্থ্যকর—শেষে আয়ের উপায় পর্য্যন্ত শিখিয়ে মানুষ তয়ের ক'রে দিয়েছেন। এ সব তাঁর উদাহরণ-ছলে করা। এখন তা পারিপার্শিকদের মধ্যে প্রসার বিস্তার করে অগ্রসর হচ্ছে ও হবে—এবং তাঁর পরবর্ত্তীদের শিক্ষার বিষয় হয়ে থাকবে। শেষে তিনি রাজ-অনুচরদের স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে দেন—"আমি তোমাদের আন্তরিক ভালবাসতুম, তোমাদের বিশেষ

পক্ষপাতী ছিলুন—তখন রাজকার্য্যে হেলিবরির উচ্চ-শিক্ষিত ভদ্রেরাই আসতেন। ক্রমে যাঁদের পাই তাঁরা কাজে কর্ম্মে ব্যবহারে আমার যে বিশ্বাসের উপর আঘাত করে ও দূর-অনাত্মীয়ের মত গর্ব্বস্ফীত বিজয়ীর পন্থা অবলম্বনে আত্ম-প্রসাদ অনুভব করে। তখন প্রাণ বলেছিল—আমি সাহিত্য-প্রেমী কবি, তোমাদের সাহিত্যই আমাকে লুব্ধ করেছিল—তোমরা করনি, তোমাদের মন-মুখ এক নয়। আপন করতে হলে আপন হতে হয়। তোমাদের অর্থশূন্য মিথ্যা গর্ব্বিত ব্যবহার আমার শ্রদ্ধা নষ্ট করেছে, এই প্রাচীন সভ্য জাতটিকে তোমরা চিনতে পারনি। সভ্যতার আদি বীজ এরাই ছড়িয়েছিল। এদের তুষ্ট রাখা কঠিন ছিল না। ছোট, বড় হলে যা করে, তোমরা তাই করেছ। ভালই হয়েছে।" এই হল তাঁর শেষ ধারণা। যাক্—

আমাকে তোমরা কিছু লিখতে বলে বিপন্ন করেছ। কারণ, তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখতে হলে, নিজের সম্বন্ধে কথা এসে পড়ে। সেটা তোমরা ক্ষমার চক্ষে দেখো।

তিনি 'বালক' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাতে আমি লিখতুম। তখন উভয়েরি যৌবনারম্ভ। আমার সঙ্গে তাঁর বয়সের মাত্র এক বৎসর পাঁচ মাসের প্রভেদ। তিনি ছিলেন বড়। আমার লেখা তাঁর ভালো লেগে-ছিল। আমাকে দেখা করতে লেখেন। আমি বড় লাজুক ছিলুম, সাহস পাইনি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে একবার দেখা করেছে, সেই তাঁর আলাপে মুগ্ধ হয়ে এসেছে। এমনি তাঁর রহস্য-মধুর বাক্-পটুতা ছিল।

সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করে নাগপুর হতে কাশী ফিরেছি। রবীন্দ্রনাথ তখন লক্ষ্ণৌয়ে ব্যারিষ্টার কবি অতুলপ্রসাদ সেনের বাড়ী অতিথি; আহমদাবাদ যাচ্ছিলেন। অতুল বাবুর মুখে আমার নাগপুরের বক্তৃতার কথা শুনে রবি বাবু তখনি আমাকে 'তার' করে দেখা করতে ডাকেন। পরদিন উপস্থিত হই। সেই প্রথম সাক্ষাৎ এবং প্রথম কথা—"ওহে, তুমি যে দেখছি আমার সমবয়সী, আমি যে কয় দিন অতুলের বাড়ী আছি, তোমাকেও থাকতে হবে কিন্তু। দু'টো কথা ক'য়ে বাঁচবো।" পরে পাঁচ দিন একত্রে কাটাই।

পাঁচ দিন একত্রে থাকায় অনেক কথাই হয়, দু'-কয়েকটা বলি। তাতে তাঁর কথার রসভঙ্গী দেখতে পারবে। সকালে দেখি, সোফায় শুয়ে এক-মনে কি পড়ছেন। ঘরে ঢুকতেই তাড়াতাড়ি উঠে বললেন—"ওহে কেদার বাবু, জীবনটা বৃথাই গেছে?" বললুম—"ব্যাপার কি?" "এই দেখ না শাস্ত্র কি বলছে।" আমি বইখানি পাবার জন্য হাত বাড়ালুম। তিনি দিলেন না, বললেন—"না, তোমাকে বিপদে ফেলে পাপ বাড়াব না—থাক্।" বললুম—"ভয় পাবেন না আমার পাপের আর বাড়বার স্থান নেই।" বইখানি ছিল 'নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি'। পরে বললেন—"শাস্ত্রে সকালে উঠে মুখ ধোয়া আর দাতন করবার যা কড়া আদেশ দেখছি তাতে কেরাণীগিরি যে চলে না হে—পাক্কা আড়াই ঘণ্টা লাগে। বাংলা দেশের উপায় কি হবে? তারা করবে কি?"

বললুম—"আপনার ও চিন্তা কেন?"

শুনে আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—"তুমি বলো কি হে? লোকে যে বলে আমি দেশের কথা ভাবি না। এটা কেবল দেশেরই নয়—পেটের কথা যে!"

শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর বসিবার আসন

—বিমল রায় (নিউ থিয়েটার্স

লক্ষপতি —রমা চক্রবর্ত্তী

—জয়নুল আবেদীন

নিঃস্ব

পিপীলিকা —গোপাল ঘোষ
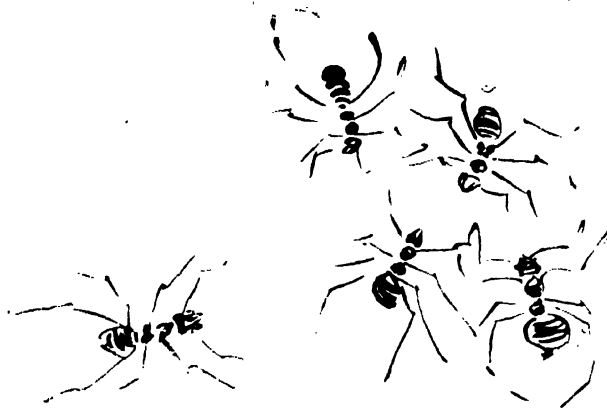
ধৈর্য্য —প্রভাতেন্দু মজুমদার

এমন সময় কোট-প্যাণ্ট পরে অতুলপ্রসাদ বাবু হাজির —তাঁকে একবার কোর্টে যেতেই হবে, তাই তাঁর অনুমতি নিতে এসেছিলেন। বিনীত ভাবে বললেন—"একবার ঘণ্টা খানেকের জন্যে না গেলে মক্কেলের বড় ক্ষতি হয়ে যায়—লোকটি বড় ভাল লোক।" রবি বাবু শুনে গম্ভীর ভাবে বললেন—"সে কি, এখানে কথা কয়ে অমন ভালো লোকের অনিষ্ট কোরো না, আগে যাও। ক্ষতি-টতি যত পারো মন্দ লোকের করবে—বুঝলে? যাও যাও, আর দাঁড়িও না। ইংরাজের আমলে দেশ থেকে ডাকাতি প্রায় উঠে যাচ্ছে দেখে আমি যে কি দুর্ভাবনায় পড়েছিলুম তা প্রকাশ করার এখন সময় নেই। অত-বড় ব্যবসা উঠে যাবে না কি? ইংরাজকে এত ভালবাসি কেন, কত বড় বুদ্ধিমান জাত, তাই না এমন বিবেচক, তারা তখুনি ডাকাত নামটা তুলে দিয়ে তোমাদের বিলেত ঘুরিয়ে, জমকালো dress দিয়ে, দিশী নাম বদলে ব্যারিষ্টার অর্থাৎ বা-রো ইষ্ট নিয়ে যাঁদের কাজ, তাই বানিয়ে আনলেন,—অমন ব্যবসাটা নষ্ট হতে দিলেন না—বাঁচিয়ে রাখলেন! একে বলে রাজবুদ্ধি! যাও যাও, দাঁড়িও না। তোমার ফিরতে আধ ঘণ্টাও লাগবে না জানি। একটা যাওয়া কথা আর জজ-সাহেবকে সেলাম করতে যা দেরী। টাকা তো তোমরা ছোঁও না, মুন্সির দিকে চাইলেই সে পাঁচশো টাকা— I beg your pardon ঠিক জানি না—হাজার হওয়াই সম্ভব—সবই গুরুর কৃপা, সে মুন্সি, তা জানে ও বুঝবে! তোমার কেবল যাওয়া আসা। যাও যাও, করচো কি, এখনো দাঁড়িয়ে যে, অমন ভাল লোকটার কি—যাও যাও, সে পাপে আমাকে আর জড়িও না—"

অতুল বাবু তাঁকে একটি নমস্কার করে, হাসি চাপতে-চাপতে নীচে নেমে গেলেন। রবি বাবু এক জন প্রসিদ্ধ (এমেচার) অভিনেতা ছিলেন, আমি তাঁর কথার হাব-ভাব-ভঙ্গী দিতে পারলুম না। সে এক অপূর্ব্ব উপভোগ্য বস্তু ছিল। বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর কথার প্রাণ ছিল রহস্য-প্রধান।

কথাবার্ত্তায় এরূপ রস-রসিক দেখিনি। এতো লিখেছেন যে কয় জন তা সমগ্র পড়েছেন জানি না, অন্তত আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। সাহিত্যে তাঁর মত এমন দায়িত্বধর্ম্মী দেখিনি। একবার দুঃখ করে আমাকে লিখেছিলেন—"আমার দুজন্মের মত লেখা দেশকে দিয়ে দিয়েছি, এখনো লোক লেখার তাগিদ ছাড়েন না। যে গরু আর চলতে পারে না তাকে এখনো তাঁরা চাকা ঠেলে চালাতে চান।" আশ্চর্য্য এই—অসম্ভব বললেও ভুল হয় না—তাঁর লেখায় কি কথায় একটি রূঢ় শব্দের ব্যবহার দেখতে পাইনি। যাঁর সমগ্র লেখা পড়ে উঠতে পারি না, তাঁর সেই বিপুল সাহিত্য-সৃষ্টি কোথাও কর্কশ হতে দেননি। শ্লীলতা রক্ষার এমনি কঠিন প্রয়াস তাঁর ছিল। সাহিত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করা—তাঁর ধর্ম্মের অন্তর্গত ছিল। ভাল করে দেখলে বরং প্রত্যেক বিষয়ে ভগবানের দিকেই নির্দ্দেশ পাই। মহাপ্রাণ লোকের পরিচয়ই সেইখানে।

থাক্—বেড়ে যাচ্ছে। আমার ইচ্ছা ছিল—তাঁর এক-একটি বিষয় বা বিভাগ নিয়ে এক-একটি কথা বলার। দেখছি তাও সম্ভব নয়। তাঁর কবিতা বা সাহিত্য সম্বন্ধে কথা কইবার দিন আমার চলে গেছে, ভালই হয়েছে, কতকগুলি বৃথা কথাই বাড়তো।

আমার প্রিয় যুবক ভায়েরা উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ এঁদের অন্তর্য্যামী। তাঁর অপূর্ব সাহিত্যে তাঁদের হৃদয় ওতপ্রোত, কবিতা তাঁদের কণ্ঠ-ভূষণ। তাঁদের কাছে সে সব শুনবেন। আমি তাঁর ব্যক্তিগত (personal) কয়েকটি কথা বলতে চেষ্টা পাচ্ছি মাত্র। তদ্ভিন্ন অনেক কথা ছিল যা প্রকাশযোগ্য নয়। তিনি কিন্তু দ্বিধা রাখতেন না। একবার লিখলেন—"একখানা উপন্যাস লিখব ভাবছি—নাম 'যোগাযোগ', এই সময় তোমার লেখনীটি পেলে আমার বড় সাহায্য হয়" ইত্যাদি। আমি তাতে বড় লজ্জিত হই ও তাঁকে ও-সব কথা লিখতে নিষেধ করি। যাক্—

আমাকে ইংরাজি ১৯৪১—১৭ই জানুয়ারীর লেখা পত্রই—তাঁর শেষ পত্র। শরীর তাঁর ভাল থাকছিল না, প্রায় অসুস্থই থাকতেন। তাই তাঁকে পত্র লেখা বন্ধ করি, জানি, উত্তর না দিয়ে থাকতে পারবেন না। বিশেষ—সরস কিছু পেলে তো কথাই নেই। আমারও অভ্যাস ছিল তাই। কাজেই পত্র লেখা বন্ধ করতে বাধ্য হই।

হাসি-খুসী নিয়ে থাকতে ভালবাসতেন। কিন্তু সহসা তাঁর বিমর্ষ ভাব এসে যায়—ম্রিয়মান উদাস। গম্ভীর! সকলেই ভাবলেন—রোগই কারণ;—স্বাভাবিকও তাই। দেশপ্রাণ মহাপুরুষকে কে চিনবে? সেই রোগ-জীর্ণ লোক বুঝেছিলেন—ডাক্ পড়েছে।

১৭ই জানুয়ারী আমাকে যে পত্র লেখেন; তাতেও সেই আভাসই সুস্পষ্ট। লিখলেন—

"আছি দোঁহে দিনান্তের প্রদোষচ্ছায়ায়
পারের খেয়ার প্রতীক্ষায়।" ইত্যাদি

তাই তিনি তখন কৃষক ও শ্রমিকদের কথাই ভাবছিলেন; ভাবছিলেন—করলুম কি? দেশের প্রাণশক্তি

বাদ পড়লো যে? তাই অধীর হয়েছিলেন। কিন্তু শরীর সামর্থ্যহীন! তাও লিখতে বসলেন। লিখিলেন—

"সে (মোর) অন্তর ময়
অন্তর মিশালে তার—অন্তরের পরিচয়।
পাইনে সর্ব্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি—জীবনযাত্রার।
চাষী ক্ষেত্রে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে' তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল,
বহু দূরে প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্ম্ম-ভার,
তারি 'পরে ভার দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
* * * আমি—সংসারের চির নির্ব্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও-পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা—
না হলে—কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই—সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা জানি আমি—
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্ব্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক্ যে জন,
কর্ম্মে ও কথায়—সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জ্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান-পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে—নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে,

* * * *

এসো কবি অখ্যাত জনের
নির্বাক্ মনের।

* * * *

অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাও দেশ উদ্ধারি।

* * * *

মূক্ যারা দুঃখে সুখে
নত-শির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা, তাহাদের বাণী যেন' শুনি
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন' আপনারি খ্যাতি,—
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।"

* * * *

তাঁর এই লেখাটির তারিখ দেখে চমকে গেলুম। সেটা ২১ জানুয়ারী। আমাকে লিখেছিলেন ১৭ই জানুয়ারী—এটি তার ৩।৪ দিন পরে লেখা। তাঁর তখনকার অবস্থা ভাবলে মনে হয়—এঁদের শক্তি মনে—শরীরে নয়। লেখাটি শেষ হলে—শান্তি পেয়েছিলেন। "কি প্রচণ্ড মনীষা, কি প্রচুর প্রাণশক্তি!"

শেষ তোমাদের কাছে ওই দাবীটি রেখে গেছেন। অস্তাচলমুখী রবির বা মুমূর্ষু কবির ওই আন্তরিক বাসনা, তোমরা ছাড়া কে আর পূর্ণ করবে? সেই হবে তাঁর জন্মদিনের সত্যকার অভিনন্দন,—কবির অমর আত্মা শান্তি পাবে। মনে রেখ' ভাই—সাহিত্য-সেবাতেই তাঁর সেবা।

পরিশেষে—মাননীয় সভাপতি মহোদয়কে আমার শ্রদ্ধানত নমস্কার, ও তোমাদের কল্যাণ-কামনা করে'—বিদায় নিলুম। *

* কবিগুরুর জন্মদিনে পূর্ণিয়া সঙ্ঘে পঠিত

—বিমল রায়

আড্ডা

মৃত্যু, স্বপ্ন, সঙ্কল্প
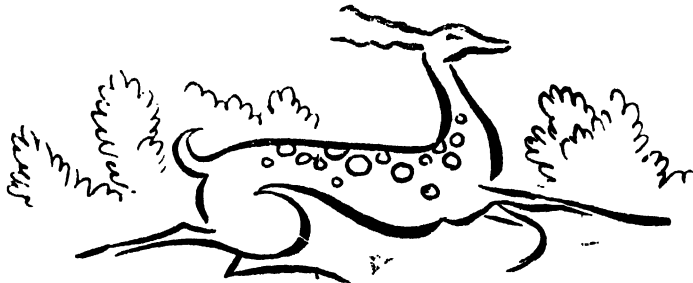
জীবনানন্দ দাশ

আঁধারে হিমের রাতে আকাশের তলে
এখন জ্যোতিষ্ক কেউ নেই।
সে কারা কাদের এসে বলে :
এখন গভীর পবিত্র অন্ধকার ;
হে আকাশ, হে কাল শিল্পী, তুমি আর
সূর্য্য জাগিয়ো না ;
মহাবিশ্ব—কারুকার্য্য, শক্তি, উৎস, সাধ :
মহনীয় আগুনের কি উচ্ছ্রিত সোনা ?

তবুও পৃথিবী থেকে—
আমরা সৃষ্টির থেকে নিবে যাই আজ ;
আমরা সূর্য্যের আলো পেয়ে
তরঙ্গ কম্পনে কালো নদী
আলো নদী হয়ে যেতে চেয়ে
তবুও নগরে যুদ্ধে বাজারে বন্দরে
জেনে গেছি কারা ধন্য,
কারা স্বর্ণপ্রাধান্যের সূত্রপাত করে।

তাহাদের ইতিহাস-ধারা
ঢের আগে সুরু হয়েছিল ;
এখুনি সমাপ্ত হতে পারে ;
তবুও আলেয়াশিখা আজো জ্বালাতেছে
পুরাতন আলোর আধারে।

আমাদের জানা ছিল কিছু ;
কিছু ধ্যান ছিল ;
আমাদের উৎস-চোখে স্বপ্নছটা প্রতিভার মত
হয়তো বা এসে পড়েছিল ;
আমাদের আশা সাধ প্রেম ছিল ;—নক্ষত্রপথের
অন্তঃশূন্যে অন্ধ হিম আছে জেনে নিয়ে
তবুও তো ব্রহ্মাণ্ডের অপরূপ অগ্নিশিল্প জাগে ;
আমাদেরো গেছিল জাগিয়ে
পৃথিবীতে ;

আমরা জেগেছি—তবু জাগাতে পারিনি ;
আলো ছিল—প্রদীপের বেষ্টনী নেই ;
কাজ ছিল—সুরু হ'ল না তো ;
তাহ'লে দিনের সিঁড়ি কি প্রয়োজনের ?
নিঃস্বত্ব সূর্য্যকে নিয়ে কার তবে লাভ !

সচ্ছল শাণিত নদীর তীরে সায়স-দম্পতী
ঐ [illegible] ক্লান্তিহীন উৎসানল অনুভব ক'রে ভালোবাসে ;
তাদের চোখের [illegible] অনন্ত আকৃতি পায় নীলাভ আকাশে ;
দিনের সূর্য্যের বর্ণে রাতের [illegible] মিশে যায় ;
তবু তারা প্রণয়কে সময়কে চিনেছে কি [illegible] ?
প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে কে এসে চেনায় !

আমরা মানুষ ঢের ক্রূরতর অন্ধকূপ থেকে
অধিক আয়ত চোখে তবু ঐ অমৃতের বিশ্বকে দেখেছি ;
শান্ত হয়ে স্তব্ধ হয়ে উদ্বেলিত হয়ে অনুভব ক'রে গেছি
প্রশান্তিই প্রাণরণনের সত্য শেষ কথা, তাই
চোখ বুজে নীরবে থেমেছি।

ফ্যাক্টরীর সিটি এসে ডাকে যদি,
ব্রেণার গানের শব্দ হয়,
সরিতে বোঝাই করা হিংস্র মানবিকী
অথবা অহিংস নিত্য মৃতদের ভিড়
উদ্দাম বৈভবে যদি রাজপথ ভেঙে চ'লে যায়,
ওরা যদি কালো-বাজারের মোহে মাতে,
নারীমূল্যে অন্ন বিক্রি করে,
মানুষের দাম যদি জল হয়, আহা,
বহমান ইতিহাস-মরুকণিকার
পিপাসা মেটাতে,
ওরা যদি আমাদের ডাক দিয়ে যায়—
ডাক দেবে, তবু তার আগে
আমরা ওদের হাতে রক্ত ভুল মৃত্যু হয়ে
হারায়ে গিয়েছি ?

জানি ঢের কথা কাজ স্পর্শ ছিল, তবু
নগরীর ঘণ্টা-রোল যদি কেঁদে ওঠে,
বন্দরে কুয়াশা বাঁশী বাজে,
আমরা মৃত্যুর হিম ঘুম থেকে তবে
কি ক'রে আবার প্রাণকম্পনলোকের নীড়ে নভে
জ্বলন্ত তিমিরগুলো আমাদের রেণুসূর্য্যশিখা
বুঝে নিয়ে হে উড্ডীন ভয়াবহ বিশ্বশিল্পলোক,
মরণে ঘুমোতে বাধা পাব ?—
নবীন নবীন জনজাতকের কল্লোলের ফেনশীর্ষে ভেসে
আর একবার এসে এখানে দাঁড়াব।
যা হয়েছে—যা হতেছে—এখন যা শুভ্র সূর্য্য হবে
সে বিরাট অগ্নিশিল্প কবে এসে আমাদের ক্রোড়ে ক'রে লবে।

ধনী-দরিদ্র

বনফুল

১

"নমস্কার মহেশ বাবু, ভালো ত সব" ?

দন্তপংক্তি বিকশিত করে ধীরেন বাবু নমস্কার করলেন। সদ্য পাশ-করা কলেজের ছোকরা জীবন কেরাণীর ছেলে মহেশ দাসকে নমস্কার করা দূরে থাক গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতেন না আগে ধীরেন বাবু। ইদানীং কিন্তু আনছেন। মানে আনতে হচ্ছে। ধীরেন বাবুর মনিব রায় বাহাদুর নির্ম্মলশঙ্করের একমাত্র কন্যা জয়শ্রীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে মহেশ দাসের। বিয়ে যাতে না হয় ধীরেন বাবু গোপনে গোপনে সে চেষ্টার ত্রুটি করেননি! ধীরেন বাবুর ইচ্ছে ছিল অবনী সেনের সঙ্গে জয়শ্রীর বিয়ে হোক্। অবনীও জমিদারের ছেলে, সুপুরুষ, জয়শ্রীর সঙ্গে ভাবও আছে। কিন্তু হল না। হলে ধীরেন ভাদুড়ীর সুবিধা হত, অবনীকে তিনি প্রাইভেটে পড়িয়েছিলেন কিছু দিন। তাঁর পশার-প্রতিপত্তি বাড়ত। এখন মহেশ দাসকে নমস্কার করতে হচ্ছে। ধীরেন বাবু আর একবার দন্তপংক্তি বিকশিত করলেন।

"মৃণালপুরে যাচ্ছেন না কি? জয়া মা তো সিমলা থেকে নেবে গেছেন শুনলাম অবনীর কাছ থেকে।"

মহেশ দাসের ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হল। জয়শ্রী সিমলা থেকে নেবে মৃণালপুরে গেছে এ কথা শোনা মাত্রই মহেশ সেখানে ছুটবে কেন বিনা আহ্বানে? ধীরেন বাবুর এ উক্তি তার আত্মসম্মানকে আঘাত করলে যেন। এ কথা ভাববার মানে!

"না, আমার এখন যাবার কোন ঠিক নেই।"

"ও। আচ্ছা, যদি যান আমাকে জানাবেন একটু আগে থাকতে, কিছু ডিম দিয়ে দেব সঙ্গে। অবনীর সঙ্গে দিলাম কিছু আজ, আপনার সঙ্গে আরও কিছু দিয়ে দেব। মৃণালপুরে ডিম পাওয়া যায় না কি না।"

"অবনী বাবু গেছেন না কি সেখানে?" প্রশ্নটা বেরিয়ে পড়ল মহেশ দাসের মুখ থেকে।

"হ্যাঁ। বললে, জয়া মা'র চিঠি পেয়েছে কাল। তাকে ষ্টেশনে তুলে দিয়েই তো আসছি।"

ঘাড়টি কাত করে আর একবার হলদে দাঁতগুলি বার করলেন ধীরেন বাবু, তার পর মরাল গতিতে মোড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। লাম্বেগো হওয়ার পর থেকে ধীরেন বাবুর মরাল গতি হয়েছে।

ঘাড় কাত করে সাপ বিষ ঢালে, ধীরেন বাবুও বিষ ঢেলে গেলেন?

অবনী সেন জয়শ্রীর চিঠি পেয়েছে, কিন্তু সে কোনও খবরই জানে না। তার চিঠি পেয়ে অবনী মৃণালপুরে চলে গেল!

নিষ্ঠুর বিষটা মহেশ দাসের শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত হতে লাগল ক্রমশ। খানিকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল সে অবশেষে কলেজের দিকে।

২

বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে মহেশ দাস। কিন্তু চমৎকার ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। মহেশের বাবা ছিলেন কলেজের কেরাণী। মহেশের মুখোজ্জ্বল [illegible] পুরুষ। যেমন বিদ্বান্, তেমনি স্বভাব-চরিত্র, তেমনি স্বাস্থ্য। যদিও গরীব কিন্তু বংশ বনিয়াদী। রায় বাহাদুর নির্ম্মলশঙ্কর অপ্রত্যাশিত ভাবে এক দিন হাজির হলেন মহেশের মায়ের কাছে। অতি দূর-সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল কিছু। অত বড় এক জন ধনীর আগমনে মহেশের মা একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রায় বাহাদুর যা বললেন তা আরও বিস্ময়কর।

"একটি ভিক্ষা আছে আপনার কাছে।"

মহেশের মা মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে নীরব হয়ে রইলেন।

"আপনার মহেশের সঙ্গে জয়ার বিয়ে দিতে চাই। যদি অনুমতি করেন ব্যবস্থা করি। জয়া এবার আই-এ, পাশ করল, এই বার বিয়ে দিতে হবে।"

রায় বাহাদুর নির্ম্মলশঙ্কর তাঁর সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের জন্য তাঁর দ্বারস্থ হবেন, এ মহেশের মায়ের কল্পনাতীত ছিল। প্রস্তাব শুনে তিনি খানিকক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন, তার পর বললেন, "আপনার মেয়ের পাত্রের অভাব কি? আমরা গরীব—"

বাধা দিয়ে রায় বাহাদুর বললেন, "অমন ছেলের মা আপনি, আপনি গরীব হতে যাবেন কোন্ দুঃখে—"

মহেশের মা আবার চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তার পর বললেন, "আচ্ছা, ছেলেকে জিগ্যেস্ করে দেখি।"

মহেশও প্রথমটা রাজি হয়নি।

সে-ও বলেছিল, "মা, ওরা বড়লোক, আমরা গরীব।"

মহেশের মা হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "বড়লোক হওয়া তো

অপরাধ নয় কোন। হ'লই বা বড়লোক। নির্মল লোক খুব ভাল। তা ছাড়া, অত বড় একটা মানী লোক নিজে বাড়িতে অনুরোধ করলেন. মেয়েও শুনেছি খুব ভাল—"

মহেশ চুপ করে' রইল। তখন চুপ করে' রইল কিন্তু রাজি হয়ে গেল শেষ পর্য্যন্ত। নির্ম্মলশঙ্কর বাবু নিজে আরও দু'বার এলেন, লোক পাঠালেন কয়েক বার। দরিদ্র মহেশের ক্ষুধিত অহঙ্কারটা তৃপ্ত হ'ল বোধ হয়, কিম্বা হয়তো আরও কিছু···রাজি হয়ে গেল সে শেষ পর্য্যন্ত।

সকলেই আশা করেছিল, নির্ম্মলশঙ্করের বন্ধু এবং প্রতিবেশী জমিদার প্রবীর সেনের একমাত্র ছেলে অবনী সেনের সঙ্গেই জয়শ্রীর বিয়ে হবে। অবনীর সঙ্গে জয়শ্রীর খুব মেশামেশি দেখেই লোকে এ কথা ভেবেছিল, কিন্তু ভুল ভেবেছিল। তারা রায় বাহাদুর নির্ম্মলশঙ্করকে চিনত না। তিনি জহুরি লোক। জমিদারের বিলাসী ছেলে অবনী সেনের তুলনায় বিদ্বান্ শুভ্রচরিত্র মহেশ যে কত ভাল তা বুঝতে তাঁর দেরী হয়নি।

···বিয়ের এই ইতিহাস।

মাত্র মাস ছয়েক আগে বিয়ে হয়েছে।

৩

সমস্ত দিন নানা কাজে ব্যাপৃত হয়ে রইল মহেশ। তিনটে পর্য্যন্ত কলেজের ক্লাশ ছিল, তার পর ইচ্ছে করেই সে গিয়ে যোগ দিলে ছেলেদের ডিবেটিং ক্লাবে, সে দিন 'ডিবেট' ছিল একটা, ছেলেদের সঙ্গে টেনিসও খেললে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। তার পর বাড়ি ফিরে এল। বাড়ি ফিরে এসে পড়া-শোনায় মগ্ন রাখবার চেষ্টা করলে নিজেকে, কিন্তু কিছুতেই মন বসল না। ধীরেন বাবুর কথাগুলো বার বার মনে পড়তে লাগল।

অবনী সেনের সঙ্গে জয়শ্রীর মাখামাখি সে-ও যে লক্ষ্য করেনি তা নয়। কিন্তু গ্রাহ্য করেনি। সে ভেবেছিল, বড়লোকের মেয়ে বিশেষত আজকালকার লেখা-পড়া জানা মেয়ে—তা ছাড়া, তার নিজেরও এ বিষয়ে যে খুব একটা আপত্তি ছিল তা-ও নয়। মিশলেই বা, ক্ষতি কি তাতে। হারেমের দিন এখন আর নেই। কিন্তু তার প্রতি জয়শ্রীর ব্যবহারটা একটু আড়ষ্ট গোছের হওয়াতে তার কেমন একটু খট্‌কা লাগছিল। এক দিনও সে প্রাণ খুলে কথা কয়নি তার সঙ্গে, ভাল করে' হাসেনি। সে না কি ভাল গান গাইতে পারে। কিন্তু এক দিনও গান গায়নি তার কাছে। সম্মানিত অতিথির প্রতি লোকে যেমন মুখোশ-পরা ভদ্র ব্যবহার করে জয়শ্রীও তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করে' চলেছে। সর্ব্বদাই কেমন যেন আড়ষ্ট ভাব। শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে তার নিজের আচরণও তেমন স্বচ্ছন্দ নয়। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন লেফাপা-দুরস্ত কাণ্ড। মার্বেল পাথরের মেজে, দামী কার্পেট পাতা রয়েছে, পা দিতে সঙ্কোচ হয়। বহুমূল্য সোফা সেটি। বসতে সাহস হয় না। চতুর্দ্দিকে ঝকঝক তকতক করছে। যে দিকে দৃষ্টি ফেরাও কেবল ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্য। মহেশ এক দিনও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে পারেনি। বাড়ির ছেলে-মেয়ে, চাকর-চাকরাণী, সোফার-সহিস সব ফিট-ফাট। মিনার্ভা কার, ওয়েলার ঘোড়া, মুলতানী গাই, অ্যালশেশিয়ান কুকুর—মহেশের কেমন যেন ভয়-ভয় করত সর্ব্বদা। বিয়ের পর জামাই হিসেবে যখন গেল সে তখন তাকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোন হৈ-চৈ উঠল না। রাজভ-কেতা একটা দামী আসবাবের মতোই সে যেন বড়লোকের প্রাসাদে ঢুকল। দামী আসবাবের প্রতি যতটুকু মনোযোগ দেখানো সঙ্গত তার বেশী ··· লাগ যেন কেউ তার প্রতি দিলে না। সে-ও দাবী করতে পারলে না। ··· কোনও ত্রুটি হল না অবশ্য। কিন্তু আয়োজনের আধিক্যটাই যেন আঘা··· করতে লাগল তাকে। তার মনে হতে লাগল, কারও অন্তরে সে যেন প্রবে··· ···তে পারছে না। অনাবশ্যক ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দেওয়ালের মতো আড়াল ··· ···আছে সব-কিছুকে।

রাত্রে ঘুম এল না। কিছুতেই এল না। ক্রমাগত ··· পাশ করতে লাগল সে। অবনী সেন? কি এমন আছে লোকটার মধ্যে? চেহারা ভাল, ভাল বাঁশীও বাজাতে পারে। তাতে কি! জয়শ্রী অবনীকে খবর দিয়েছে মৃণালপুরে যাবার জন্যে অথচ তাকে কিছু লেখেনি, এর মানে কি? সে যে সিমলা থেকে চলে এসেছে এ খবরই তো জানে না সে! আশ্চর্য্য!

জয়শ্রীর চেহারাটা মনের উপর ফুটে উঠল। তার শেষ যে চেহারাটা সে দেখেছিল সেই চেহারাটা। অদ্ভুত রূপসী। ধপধপে ফরসা রং, টকটকে লাল একখানা শাড়ি পরেছিল। কুচকুচে কালো চোখে অদ্ভুত একটা শাণিত দৃষ্টি। লোভনীয়। ভয়ঙ্কর লোভনীয়।

······মহেশ দাস শুয়ে শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগল। তার পর হঠাৎ ঠিক করলে—যাবে। বিনা নিমন্ত্রণেই যাবে। কাউকে কিছু না বলে' লুকিয়ে যাবে। হঠাৎ রাত্রি বেলা কোনও খবর না দিয়ে হঠাৎ গিয়ে হাজির হবে। দেখতে হবে অবনী সেনের সঙ্গে জয়শ্রীর প্রকৃত সম্পর্কটা কি। যেতেই হবে। ইতিপূর্ব্বে সে মৃণালপুরে যায়নি কখনও। কিন্তু রায় বাহাদুর নির্ম্মলশঙ্করের

যক্ষপুরী

-কানু মুখোপাধ্যায়

বাড়ি খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। সে যাবে··· যেতেই হবে।

৪

রায় বাহাদুর নির্ম্মলশঙ্করের বিরাট বাড়ির সামনে মহেশ এসে যখন দাঁড়াল তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। চতুর্দ্দিক্ জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। একটানা ডেকে চলেছে পাপিয়াটা—চোখ গেল——চোখ গেল—চোখ গেল। প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রকাণ্ড হাতা। উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। দেওয়ালের ধারে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মহেশ। বাঁশী বাজছে। বাঁশীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে গানও গাইছে কে যেন। জয়শ্রী কি? মহেশের একবার ইচ্ছে হল ডাকে। কিন্তু না—সে ডাকবে না। গেটের সামনে এগিয়ে এল আস্তে আস্তে। বিরাট লোহার গেট। নিষ্ঠুর নিষেধের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে ঠেলে দেখলো একটু। ভিতর থেকে বন্ধ। না, সে ডাকবে না। বাঁশী বেজে চলেছে। সমস্ত অন্তর যেন গলে পড়ছে গানের সুরে সুরে।···মহেশ ভুলে গেল যে সে এক জন অধ্যাপক, ভুলে গেল যে সে এ বাড়ির জামাই। সে ঠিক করলে যে সে গেট টপকে লোহার পাইপ বেয়ে ছাতে উঠবে লুকিয়ে। আসল ব্যাপারটা কি দেখতেই হবে তাকে। গেটের লোহার গরাদেতে পা রেখে সে উঠতে লাগল।

৫

সকালে চায়ের আসরে সবাই জমে বসেছে। রেডিওতে বেহালায় ভৈরবী আলাপ করচে কে যেন। হঠাৎ মালীটা এসে বললে—"হুজুর, বাগানে একটা লাস পড়ে আছে। কোন চোর-টোর হবে বোধ হয়। রাত্রে গেট টপকে ঢুকেছিল কুকুরে মেরে ফেলেছে—"

জয়শ্রীর দূর-সম্পর্কের এক জন মামা বসেছিলেন। তিনি বলে উঠলেন—"ইস্, তাই না কি? দু'-দু'টো অ্যালশেশিয়ান এমন ভাবে খুলে রাখিস্ তোরা। কুকুর তো নয় যেন বাঘ—"

অবনী সেন বললে—"পাহারা দেবার জন্যেই তো কুকুর। চলুন দেখে আসা যাক্। এখানকার দারোগা কে আজকাল? পুলিশে একটা খবর দিতে হবে—মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি। চল, জয়শ্রী, যাবে না কি—"

"যাচ্ছি দাঁড়াও, ভৈরবীটা শেষ হোক—"

ঋগ্বেদ সংহিতার পরিচয়

স্বামী বাসুদেবানন্দ

সে আজ বহু সহস্র বৎসরের আগের কথা, যখন প্রকৃতির রুদ্র মধুর লীলা-ভঙ্গীতে অবাক হইয়া বৈদিক যুগের আর্য্য শিশুর হৃদয়ে প্রথম ধর্মের সুপ্রভাত হয়। কোটী-সূর্য্য প্রতিভাত হীরক-কিরীটগর্বিত হিমরাজ, শংখ বলয় অযুত বাহু সিন্ধুর নীলকান্তি পুলক-কণ্টকিত গভীর স্তব্ধ নীলিমা ভাদরের গভীর নিঃস্বন বজ্রের প্রচণ্ড স্ফোট, উষার মাধুরিমা—সবিতা-সোম-দিক্—কে ইহারা!—মুগ্ধতা রূপ লইয়া ঋক্ ছন্দে—ভাবের দ্যোতনা দেবতায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিল—বরুণ ইন্দ্র অগ্নি বায়ু যম সাবিত্রী রুদ্র বিষ্ণুরূপে।১

ক্রমে তার বুদ্ধি-প্রগতি আরও উর্দ্ধে দেখিল প্রকৃতির অন্তরালে আছেন তাহার গোপন দেবতা—জীবন ও বল যথায় বিচ্ছুরিত—দিব্যধামবাসীরা যাঁহাকে সম্মান করেন, অমরত্ব ও মৃত্যু যাঁহার ছায়া, সৃষ্টির পদ্ম যাঁহার নয়নকর-সম্পাতে সহস্রদলে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।২

দর্শন-রসিক হিন্দু কেবল স্রষ্টার একত্ব অনুভবে তৃপ্ত হইল না—সে নির্ভীক ভাবে প্রচার করিল, স্রষ্টা ও সৃষ্টি একই, "বিশ্বকর্মা যখন এই সৃষ্টিকে দৃঢ় করেন, তখন তিনি ব্রহ্মতেই অবস্থিত ছিলেন।" তবে এই বৈচিত্র্যের খেলায়, এই বহুত্বের সংঘর্ষে সে একত্ব কোথায়? কার্য্যের মধ্যে ত কেবল কারণের বিরূপই দেখিতেছি, স্বরূপ ত দেখিতেছি না? উত্তর আসিল—কারণ সচ্চিদানন্দ সর্বভূতে অস্তি ভাতি প্রীতিরূপে বর্তমান—তাহার অভাবে কোন বৈচিত্র্যই রূপ লইতে পারে না। এই সচ্চিদানন্দ সাগর, এই ভূমা সর্বক্ষণব্যাপী, সর্বকালব্যাপী, সর্বদিক্ব্যাপী, সর্বকারণব্যাপী, সর্বকার্য্যব্যাপী—ইনি সর্ব বস্তুর মধ্যে অস্তিত্বরূপে বর্তমান, সর্বাস্তিত্বের জ্ঞানরূপে বর্তমান, সর্ব জ্ঞানের আনন্দ ফলরূপে বর্তমান। ইহাই আত্মার স্বরূপ। এই আত্ম-স্বরূপ অবগত হইয়া ঋষি বলিয়াছিলেন—"অহমস্মি মহামহঃ"—আমি মহতো মহীয়ান্ (ঋ বে ১০।১১৯) বামদেব কহিলেন, "অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চাহং" (ঋ বে ৪।২৬) এক নারী বলিয়া উঠিলেন, "অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহম্" (ঋ বে ১০।১২৫) আর কহিলেন রাজা ত্রসদস্যু "অহং রাজা বরুণঃ" (ঋ বে ৪।৪২) আর এক ঋষি কহিলেন, "ত্বষ্টেব বিশ্বা ভুবনানি বিদ্বান্ সমেবয়ং রোদসী ধারয়ং চ।" (ঋ বে ৪।৪২।৩)। আর এক জন বলিলেন, "ইয়ং মে নাভিরিহ মে সধস্থম্। ইমে মে দেবা অয়মস্মি সর্বঃ" (ঋ বে ১০।৬১)।

১। সমগ্র ঋগ্বেদে নিম্নলিখিত দেবগণের উল্লেখ আছে—অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অশ্বিদ্বয়, বিশ্বদেবগণ, সরস্বতী ও সুনৃতা, মরুদ্গণ, ইলা প্রভৃতি দেবী, অদিতি ও আদিত্যগণ, ঋভুগণ, ব্রহ্মণস্পতি, সোম, ঋভুগণ, ত্বষ্টা, সূর্য্য ও সবিতা, ইন্দ্রাণী, বারুণী, যমী প্রভৃতি দেবী, হোত্রা প্রভৃতি দেবী, পৃথিবী, বিষ্ণু, পৃশ্নি, নদী ও জল, উষা, যম, পর্জন্য, অর্য্যমা, পূষা, রুদ্র, রুদ্রগণ, বসুগণ, উশনা, ত্রিত, বৈশ্বানর, মাতরিশ্বা—এই ৩৩ জন।

২। যাস্ক তাঁহার নিরুক্তের দৈবতকাণ্ডে বলেন, "অগ্নি, ইন্দ্র বায়ু এবং সূর্য্য সকল দেবতার সার।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "বিভিন্ন দেবতার অনন্ত গুণ এক আত্মার বিভিন্ন অংশ। কাত্যায়ন-কৃত বেদানুক্রমণিকাতেও পরম-দৈবত এক আত্মার কথা আছে (৭।২।১)।

ঋক্ ঋষিদের বাগানে কত ফল-ফুল-সম্ভার, কত অজানিত উদ্ভিদ্, কত কণ্টকবেষ্টিত লতা-জাল এখনও বিস্তৃত রহিয়াছে—সেই সভ্যতার প্রথম উষার কত চিত্রই না জাগরিত হইয়া মনে কত ভাবেরই না সৃষ্টি করে। কিন্তু তার ভিতর এমন সৌন্দর্য্য-সম্ভারে তাহার বিকাশ যে আজ অযুত বর্ষ ধরিয়া তাহারা সগর্ব্বে মানুষকে আহ্বান করিতেছে "হে মর্ত্ত্য! সত্যের নিকট মাথা নত কর!" "দিনমানে তারারা কোথায় থাকে?" "রাত্রে সূর্য্য কোথায় যায়?" "বন্ধনহীন অবলম্বনহীন সূর্য্য খলিত হয় না কেন?" "দিবা ও রাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?" "বাতাস কোথা হইতে আসে, কোথায় চলিয়া যায়?" ৩ "আকাশপথে ধূলারই বা সঞ্চার করে না কেন?" প্রভৃতির জিজ্ঞাসার উষা ভাগে আর্য্যশিশুর প্রথম প্রশ্নের ভিতর কী নিগূঢ় ভাবাভিব্যক্তি—চিত্ত-সাগরে সংশয়-তরঙ্গের কী অভিনব দোলন, সহজে তা অনুভূত হয়। যেন কিশোর শিশুর বিমূঢ় চক্ষে নব দৃশ্যের প্রতি বিস্ফারিত আলোকন—সৎ কি অসৎ—কি ধরিতে চায়, কি জানিতে চায় তাহা নিজেই জানে না—কেবল একটা বিস্ময়ের প্রেরণা!

শাস্ত্র বলেন, জিজ্ঞাসাই সুপ্তির গর্ভ হইতে আত্মার জাগরণের প্রথম পরিচয়—জীবন-সংগ্রামের আরম্ভ—স্বস্বরূপ সত্যজ্ঞানানন্দে ফিরিবার প্রথম প্রচেষ্টা—প্রকৃতি জয়ের উৎকট ইচ্ছার অভিব্যক্তি।

ঋক্ মানবের প্রশ্নে একটা বড় নূতনত্ব আছে—প্রশ্নে "কে" নাই—কিন্তু "কেমন করিয়া" আছে—সৃষ্টির বিধাতা সম্বন্ধে প্রশ্ন বড় বিরল—প্রশ্ন, "কেমন করিয়া সৃষ্টি হইল?" স্রষ্টা ক্রমে ধাতা, প্রজাপতি, বিশ্বকর্মারূপে দেখা দিলেন, কিন্তু প্রশ্ন উঠিল—সে কেমন বন, সে কেমন বৃক্ষ যাহা দিয়া ঐ দ্যুলোক ও এই পৃথিবী নির্ম্মিত হইল। ঐ যে দুই জনে অনাদি আলিঙ্গনে জড়িত—কত দিবার কত সুপ্রভাত অতীত হইল—কিন্তু বার্ধক্য তো তাহাদের জীবনে ঘনাইয়া আসে না—(ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ৩১ সুক্ত, ৭ ঋক্।) "এই বিশ্বের অধিষ্ঠান কোথায়—আরম্ভই বা কোথায়—এখন কি ভাবে আছে—পূর্ব্বেই বা কি ভাবে ছিল, যাহা হইতে সেই সর্বদর্শী বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার মহিমাবলে ভূমিকে সৃষ্টি করিলেন—দ্যুলোককে প্রকাশ করিলেন?" (ঋ বে ১০।৮১।২)। তার পর আবার সেই প্রশ্ন, "কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ" হে মনীষিগণ মম দ্বারা জিজ্ঞাসা কর—"মনীষিণঃ মনসা পৃচ্ছত ইৎ" (ঋ বে ১০।৮১।৪)। কিন্তু তার পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মাকে জানা হইয়াছে—তাঁহার সম্বন্ধে এখন আর বিশেষ কোন সন্দেহ নাই—তিনি বিশ্বতঃ চক্ষু, বিশ্বমুখ, বিশ্ববাহু, বিশ্বপাদ। সেই "দেবঃ একঃ"—বাহুর দ্বারা দ্যৌঃ ও ভূমি সৃষ্টি করিয়াছেন (ঋ বে ১০।৮১।৩। ইহার উত্তর দেখিতে পাই যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে—"সেই ব্রহ্মই বন, ব্রহ্মই বৃক্ষ, যাহা দিয়া বিশ্বেদেবগণ দ্যৌঃ ও পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হে জ্ঞানিগণ! আমি বিচার দ্বারা একথা প্রচার

৩। ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল, ১৬৮ সূক্তের এই মন্ত্রটির সহিত বাইবেলের —The wind bloweth where it bloweth, those hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth."—St. John iii 8; and also old Testament" (Book of Job)

করিতেছি—বিশ্বকর্ম্মা যখন এই সৃষ্টিকে দৃঢ় করেন তখন তিনি ব্রহ্মতেই অবস্থিত ছিলেন।" (তৈঃ ব্রা ২।৮।৯।৬)। এই উত্তরটি যখন আবিষ্কৃত হইয়াছে তখন বৈদিক দর্শন তার প্রকৃতিবাদ অতিক্রম করিয়া সর্ব্বাত্মবাদে প্রায় উপস্থিত হইয়াছে। এখানে ব্রহ্ম নিমিত্ত ও উপাদান কারণ।৪

ঋগ্বেদে কিন্তু অদ্বৈততত্ত্বের আভাস দেখিতে পাইলেও ও ব্রহ্মের নিমিত্ত কারণতা খুব স্পষ্ট—"বরুণ এই বিরাট অন্তরীক্ষকে (রোদসী) স্তম্ভপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়াছেন—উজ্জ্বল ও মহিমাময় স্বর্গকে তিনি উর্দ্ধে রক্ষা করিয়াছেন—এই বৃহৎ নক্ষত্রলোক ও পৃথিবীকে তিনি বিস্তার করিয়াছেন (ঋ বে ৭।৮৬।১)।" আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে কঃ বা হিরণ্যগর্ভ সূক্তে (ঋ বে ১০।১২১)। সমস্ত সূক্তগুলি পাঠ করিলে নিম্নলিখিত ধারণা কয়টি প্রতীয়মান হয়:—

(১) রচনাকৌশলবাদ।—ছুতার যেমন কাষ্ঠ উপাদানে একটি জিনিষ নির্ম্মাণ করে তেমনি। (২) বিভিন্ন দেবতার নাম সৃষ্টিকর্ত্তারূপে অভিহিত,—যেমন কখনও প্রজাপতি, কখনও বিশ্বদেব, কখনও বরুণ, কখনও বা বিশ্বকর্ম্মা স্রষ্টারূপে বর্ণিত (Henotheism or Kathanotheism)। আবার এই বিভিন্ন নামের ভিতর দিয়া এক ঈশ্বরে সমন্বয়ও দেখা যায়—"তাঁহারা ইঁহাকে মিত্র বরুণ অগ্নি বলেন; এই সুপর্ণ—গরুত্মান্ (সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট)—এই এক সত্যকেই পণ্ডিতেরা বহুরূপে বলিয়া থাকেন (ঋ বে ১।১৬৪।৪৬)। (৩) যজ্ঞসৃষ্টি—অগ্নি নিজ হইতে এই সৃষ্টি বিস্তার করিলেন। এই সৃষ্টিই যজ্ঞের উপাদান। অগ্নি এই যজ্ঞের ভোক্তা—তিনি নিজের রচিত সৃষ্টি নিজেতেই আহুতি দেন,—এতেই তাঁর আনন্দ। এই সৃষ্টি তাঁর শরীর—তিনি নিজেকেই সকল দেবতার নিকট আহুতি দিলেন, (ঋ বে ১০।৭।৬)। বিশ্বভুর অগ্নি হইতেই অপরাপর ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবতাদের সৃষ্টি। স্রষ্টা নিজের রূপ-রসান্বিত সৃষ্টিকে চক্ষুরাদি (আদিত্য প্রভৃতি) দেবতাকে বিভাগ করিয়া দিলেন এবং সর্ব্বাত্মকরূপে সর্ব্ব যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু হইয়া রহিলেন। পরবর্ত্তী যুগের আধুনিক দার্শনিকেরা এই সৃষ্টির রহস্যময় কাব্যটি বুঝিতে পারেন নাই। এই বিশ্বতত্ত্বটি ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে (১০।৯০) বেশ সুস্পষ্ট হইয়াছে, যার ছায়া পশ্চিমদেশীয় প্রবাসী আর্য্যদের প্রবাদের ভিতরও একটু আধটু দেখা যায়।৫

প্রথমটি কার্য্যের উপমা মাত্র, দ্বিতীয়টি অস্পষ্ট ব্রহ্ম প্রতীকরূপে অনুমিত হয় এবং তৃতীয়টি ব্রহ্মের নিমিত্ত ও উপাদান কারণতার একটি রূপক ছবি। এই স্তরগুলির সরল হইতে ক্রমজটিল বিকাশ যে বিরূপে পর-পর হইয়াছে সেটি বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু প্রত্যেকটি স্তর যে কত কালসাপেক্ষ সেটাকে ঐতিহাসিক গণ্ডির মধ্যে আনিয়া ফেলা বা সাজান বোধ হয় ইদানীং এক প্রকার অসাধ্য ব্যাপার। আবার কখনও বা একই সূক্তের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থার উল্লেখ দেখিয়া বোধ হয় যেন পাতঞ্জলোক্ত কোনও এক সর্ব্বজ্ঞ অনাদি ঋষি যিনি কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নন, সকল গুরুর গুরু মানবের ভিতর এই জ্ঞান যুগপৎ প্রকাশ করিতেছেন।

প্রাচীনেরা বলেন, বেদ অপৌরুষেয়—ঈশ্বর হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় বহির্গত হইয়াছে। জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতুর পর করণবাচ্যে ঘঞ করিয়া বেদশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার যৌগিক অর্থ অনন্ত জ্ঞান। ঋগ্বেদের ভাষ্যোপক্রমণিকায় সায়ন বলেন, "অলৌকিক পুরুষার্থের (ধর্ম ও ব্রহ্মের) উপায় ইহার দ্বারা জানা যায়, সেই জন্যই ইহার নাম বেদ। প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণের দ্বারা অলৌকিক পুরুষার্থের উপায় বুঝিতে পারা যায় না, বেদের দ্বারা উহা বুঝি ও উপায়গম্য হয় বলিয়াই বেদের বেদত্ব অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হয়।৬

রূপ ও লিঙ্গ না থাকায় ধর্ম অপ্রত্যক্ষ ও অননুমেয়। অপৌরুষেয় শব্দের অর্থ কেহ ঈশ্বর-সৃষ্ট, কেহ কল্পারম্ভে ঈশ্বরেচ্ছা-প্রসূত, কেহ বা ঈশ্বরের নিঃশ্বাসসম্ভূত বলেন। কাহারও মতে "ন কেচিদ্ বেদকর্ত্তারঃ স্মর্ত্তারঃ সর্ব্ব এব হি।" অর্থাৎ বেদের কেহ কর্ত্তা নাই, কল্পে কল্পে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ তপোবলে বেদ স্মরণ করিয়া থাকেন। বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৃহদারণ্যকে আছে, "অস্যেহস্য মহতো ভূতস্য

৪। এই ব্রহ্মবাদ দেবীসূক্ত (ঋ বে ১০।১২৫) নাসদীয় সূক্ত (ঋ বে ১০।১২৯) এবং অথর্ব্ববেদীয় কালব সূক্তে (অ বে ১৯।৫৩) খুব বেশী প্রকট। অনেকে এইগুলিকে কিছু আধুনিক মনে করেন। কিন্তু তাঁহাদের জন্য নিম্নলিখিত পাশ্চাত্য মতগুলি অনুধাবনযোগ্য— ১) দেবীসূক্তের দ্রষ্টা অম্ভৃন ঋষির কন্যা বাক্ সম্বন্ধে—"All that has a Voice in nature, the thunder of the storm, the rewaking of life at dawn, with songs of rejoicing over the new birth of the world are embodied in this Vac" Cosmology of Rg Veda P. 85............

২) In its notable simplicity, in its loftiness of philosophic vision, it is possibly the most admirable bit of philosoply of olden times."—Prof Deussen.

৩) It cannot be right to class every poem and every verse in which mystic or metaphysical speculations occur as modern, simply because they resemble the language of the Upanishads. These Upanishads did not spring into existence on a sudden. Like a stream which has recieved many a mountain torrent, and is fed by many a rivulet, the literature of the Upanishads proves better than any thing else, that the elements of their philosophical poetry came from a more distant fountain"—History of Anci. Skt. Lit—Maxmuller.

৫। Scandinavian Cosmogonic legend (in the the Edda) of the making of the world out of the different members of the primeval giant Ymer's body—Story of Chaldea P 259.

৬। মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক অপৌরুষেয় বেদ সম্বন্ধে আরও অধিক প্রমাণ আপস্তম্ব, যজ্ঞ-পরিভাষা সূত্র, ষড়্‌গুরু শিষ্য-রচিত সর্বানুক্রমণী ভাষ্যভূমিকা দ্রষ্টব্য।

নিঃশ্বসিতমেতৎ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরসঃ, শং ব্রাহ্মণা যস্য নিঃশ্বসিতং বেদাঃ।" ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পঞ্চম পঞ্চিকার ২৫শ অধ্যায়ের ৭ম খণ্ডে আছে—"প্রজাপতি কামনা করিলেন, আমি বহু হইয়া জন্মিব। তিনি তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক, এই লোক সকল সৃষ্টি করিলেন; তৎপরে সেই লোক সকলের পর্য্যালোচনা করিলেন। তাঁহার পর্য্যালোচনায় সেই লোক সকল হইতে তিনটি জ্যোতিঃ জন্মিল; পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরীক্ষ হইতে বায়ু, ও দ্যুলোক হইতে আদিত্য। তখন তিনি সেই তিন জ্যোতির পর্য্যালোচনা করিলেন। তাঁহার পর্য্যালোচনায় তিন বেদ জন্মিল; অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্বেদ ও আদিত্য হইতে সামবেদ।

তখন তিনি সেই বেদের পর্য্যালোচনা করিলেন। তাঁহার পর্য্যালোচনায় সেই বেদ হইতে তিন শুক্র (জ্যোতিঃ) জন্মিল, ঋগ্বেদ হইতে ভূঃ, যজুর্বেদ হইতে ভুবঃ সামবেদ হইতে স্বঃ। তখন তিনি সেই শুক্রের পর্য্যালোচনা করিলেন; তাঁহার পর্য্যালোচনায় তাহা হইতে তিন বর্ণ জন্মিল—অ-কার, উ-কার ও ম-কার। তিনি সেই তিন বর্ণকে একত্রে যোগ করিলেন। তাহাতে তাহা ওম্ হইল। এই জন্য লোকে ওম্ বলিয়া প্রণব (প্রণাম) করে; ঐ স্বর্গলোকও ওম্‌স্বরূপ। ঐ যে আদিত্য তাপ দেন তিনিও ওম্ স্বরূপ।" ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত বলেন, "সেই সর্ব্বাত্মক পুরুষ যাহাতে নিজকে আহুতি দিলেন, সেই সর্বহুত যজ্ঞ হইতে ঋক্, সাম্ ছন্দ এবং যজু-মন্ত্র সকল উৎপন্ন হইল।" অথর্ববেদে (১০।৭।১৪) "স্কম্ভ" হইতে ঋগাদির উৎপত্তি বর্ণিত আছে। শতপথ ব্রাহ্মণও ছান্দোগ্য ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতই বলিয়াছেন। মনুর টীকাকার মেধাতিথি বলেন, "প্রত্যেক বেদের প্রথম মন্ত্রের দেবতার অনুযায়ী অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্বেদ এবং আদিত্য হইতে সামবেদ বলা হইয়াছে।" কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণ—ঋক্‌কে বাক্ যজুঃকে মনঃ এবং সামকে প্রাণ বলিয়াছেন। ঋক্ মন্ত্র বাক্ ছাড়া উচ্চারিত হয় না, প্রজ্ঞা ছাড়া আহুতি হয় না, সেই জন্য যজুর্মন্ত্রে মনের প্রাধান্য এবং প্রাণের গতিভঙ্গি ছাড়া গীত সম্ভব নয়—তাই সাম্ মন্ত্রে প্রাণের প্রাধান্য।

এই বেদ গুরু-মুখ হইতে পরম্পর শুনা যায়, কিন্তু কাহার রচিত জানা যায় না, তাই ইহার অপর নাম্ শ্রুতি বা অনুশ্রব। অনুশ্রব, বেদ, নিগম্, ছন্দ, শ্রুতি, ত্রয়ী, আম্নায় ও ব্রহ্ম এইগুলি বেদ শব্দের এক পর্য্যায়।৭

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনুগামীরা (যেমন মোক্ষমূলরের অনুগামী রমেশচন্দ্র দত্ত এবং উইল্‌সনের অনুগামী মন্মথনাথ দত্ত) বলেন, ত্রয়ী শব্দের অর্থ বেদ এবং উহা ঋক্ সাম ও যজুঃ; অথর্ব বেদ পরে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচ্য পণ্ডিতদের মতে, ত্রয়ী শব্দের অর্থ গদ্য পদ্য ও গান, যা বেদের ত্রিবিধ উপাদান এবং এই উপাদানত্রয় ঋক্ সাম্ যজুঃ এবং অথর্ববেদ সংহিতা (Collection) চতুষ্টয়েই দেখা যায়। "ত্রয়োঽবয়বা গদ্যপদ্যগানরূপা অস্যা সন্তীতি ত্রয়ী। দ্বিত্রিভ্যাময়ট্ ইতি—অয়ট্ টিত্বাৎ ঙী!" ত্রয়ীয়মৃক্ সাম যজুংষি ইতি—বেদাস্তস্ত্রয়ী"। অর্থাৎ ঋক্ সাম্ ও যজুঃ এই মন্ত্রত্রয়কে ত্রয় বা ত্রয়ী বলে। এই শব্দে অথর্ব বেদও বাচ্য হইবে।

সায়ন বলেন, "বিনিয়োগ যোগ্য ঋক্ যজুঃ ও সাম্ এই তিন প্রকার মন্ত্র চার বেদ সংহিতাতেই দেখা যায়।" "বিনিযোক্তব্য রূপশ্চ ত্রিবিধঃ সম্প্রদর্শ্যতে। ঋক্ যজুঃ সামরূপেণ মন্ত্রোবেদচতুষ্টয়ে"। ৮

ভবদেব তাঁর স্বনামপ্রসিদ্ধ পদ্ধতির মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন——"ঋগ্ যজুঃ সামার্থবাঙ্গিরসঃ বিন্ধ্য-কিস্কিন্ধ্য-হিমালয়াঃ" ইত্যাদি—দ্বন্দ্ব সমাসে অল্পাচ-স্বরের প্রাগভাব স্বতঃসিদ্ধ রহিয়াছে এই জন্য ঋক্ শব্দের প্রাথম্য হইয়াছে, বাস্তবিক কোনও বেদই প্রথম নয়। ৯

"অভ্যর্হিতং পূর্বম্" "সর্ব্ববেদেষু ঋক্ মন্ত্রস্য ন্যূনাধিকত্বয়া ব্যাপকত্বাৎ" —ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ঋগ্বেদের প্রাধান্য অভিহিত হইয়াছে। আবার "এক এব যজুর্বেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়েৎ" ইত্যাদি বাক্যে বিষ্ণুপুরাণ যজুর্বেদকে শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন। গীতা বলিতেছেন, "বেদানাং সামবেদোঽস্মি", মুণ্ডকশ্রুতি বলিতেছেন, "ব্রহ্মাদেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ।" অথর্ববেদ নিকৃষ্ট হইলে যজ্ঞকর্মের যিনি ব্রহ্মা (সভাপতি) তাঁহাকে অথর্ববেদীয় হওয়া চাই কেন? ১০

৭। বেদ শব্দের প্রাচীনত্ব—শুক্লযজুর্বেদ মাধ্যন্দিন শাখা ১১।৭। মহীধর। পাণিনি ৬।১।১৬০, ২০৩। তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫।১১।২। অথর্ববেদ সংহিতা ৪।৭।৫।৬। বহ্বৃচ ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫।৫।৬। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।১০।১১।৪। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ ৮।১।২। গোপথ ব্রাহ্মণ ১।২৩। শ্রুতি শব্দের প্রাচীনত্ব—ঐঃ ব্রাঃ ৭।৪৮। যাস্ক (নিঘণ্টু) ১৩।২।১৩। মনু ২।১,১০,১৫। সাংখ্য-কারিকা। রামায়ণ ২।১১০।১৮। মহাভারত ১।৫০। ভাগবত ৪।২১।৪৫। মনু টীকাকার কুল্লুক। আম্নায় শব্দের প্রাচীনত্ব—নাগেশ ভট্ট লঘু শব্দেন্দুশেখর ১।২।১। ১।৪।১। বাজসনেয় সংহিতা প্রাতিশাখ্য সূত্র ব্যাকরণ। অথর্ব কৌশিক সূত্র। যাস্ক নিঘণ্টু ১।৬।৫। পাণি ৪।৩।১২০। ভট্টোজী দীক্ষিত। শিলালি। ছন্দ শব্দের প্রাচীনত্ব—যাস্ক নিঘণ্টু ৭।৩।৬। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ৫। তৈঃ ব্রাঃ ৩।২।৩।৪। অথর্ব উচ্ছিষ্ট সূক্ত ১১।৪।১৮। ৬০।১২।১১।১। পাণি। কাত্যায়ন বার্ত্তিক। পাতঞ্জল ভাষ্য। ঋগ্বেদ পুরুষ সূক্ত ১০।৬০।৮। আগম শব্দের প্রাচীনত্ব—কাত্যায়ন বার্ত্তিক। পাতঞ্জল ভাষ্য। সাংখ্যকারিকা। কুমারিল শ্লোকবার্ত্তিক। স্বাধ্যায় শব্দের প্রাচীনত্ব—তৈঃ আ ২।১৫।৭। নিগম শব্দের প্রাচীনত্ব—ঋগ্বেদ সংহিতা ৮।১৬।২। ২।১।৩। যাস্ক নিঘণ্টু ১।১।১। মনু ও কুল্লুক। ভাগবত ও শ্রীধর।

৮। অন্য প্রমাণ—পূঃ মীমাংসা-দর্শন ১।১।৩২,৩৩,৩৪। মাধবাচার্য্যের ন্যায়মালা বিস্তর। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১।২।১।২৬।

৯। পাণিনি ২।২।৩৪। ঋগ্বেদ সংহিতায় যজুঃ ও সামের উল্লেখ আছে—১।১৭৩।১। ৫।২।৫। ৫।৪৪।১৪। ১০।৮৫।১১। ১০।১০।১। ১০।১০৭।৬। পাণিনি ৪।৩।১০৫। শৌনকেরা আথর্ব্বন্, সায়ন ঋগ্বেদ ২য় মণ্ডল ভাষ্যে বলিয়াছেন। পাণিনি ৪.৩.১২৮। ৪।৩।১০৩। ৪।৩।১৩৩। ঋগ্বেদে ঋক্ মন্ত্রের প্রাধান্য, যজুর্বেদে যজুর্মন্ত্রের প্রাধান্য, সামবেদে সাম মন্ত্রের প্রাধান্য এবং অথর্ব বেদে অথর্বকৃত্য অধিক বলিয়া তাঁহার নামে বেদব্যাস বিভাগ করিয়াছেন। কিন্তু উহাতেও ঋক, যজুঃ ও সাম্ মন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নাই।

১০। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫।৩৩—সায়ন। গোপথ ব্রাহ্মণ ৩।২।

বেদব্যাস বেদরাশি হইতে বর্ণনানুসারে মন্ত্র উদ্ধার করিয়া, পৈল বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তুকে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব ক্রমে সংহিতা দান করেন—"অগ্নিমীড়ে" প্রভৃতি পাদবদ্ধ গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দে রচিত মন্ত্রের নাম ঋক্। ঋক্ মন্ত্র যখন উদাত্তাদি স্বরে গীত হয় তখন উহার নাম সাম। ঋক্ ও সাম হইতে ভিন্ন লক্ষণ মন্ত্রের নাম যজুঃ। এইরূপ বিধি অর্থবাদ-সম্বলিত মন্ত্রাত্মক সংহিতা-চতুষ্টয় হইতে ভিন্ন হইতেছে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের প্রথমাংশ কর্মকাণ্ড (যজ্ঞ) এবং দ্বিতীয়াংশ উপাসনাকাণ্ড (আরণ্যক) এবং তৃতীয়াংশ জ্ঞানকাণ্ড (উপনিষৎ)। উপনিষৎ বেদের অন্তভাগে থাকে বলিয়া অথবা জানার শেষ বলিয়া এর অপর নাম বেদান্ত।১১

তাহা হইলে বেদের সংহিতা ভাগের নাম মন্ত্র এবং অপরাংশের নাম ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ মুখ্যতঃ যজ্ঞানুষ্ঠানের মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি এবং কিয়দংশ উপাসনা ও তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধীয় উপদেশও আছে। কোন না কোন দেবতার উদ্দেশে কোন না কোন দ্রব্য ত্যাগের নাম যজ্ঞ। শ্রীভগবান বলিতেছেন, "ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ" (গীতা ৮.৩)। হোতা যজ্ঞে উচ্চস্বরে ঋক্ মন্ত্রে (পদ্য বা ছন্দে) দেবতার আহ্বান বা প্রশংসাদি করেন। অধ্বর্য্যু অনুচ্চস্বরে যজুর্মন্ত্রে (গদ্যে) পুরোডাশাদি যজ্ঞীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন বা দেবতার উদ্দেশে আহুতি দান করিতেন। উদ্গাতা সাম্ মন্ত্রে গান করিয়া দেবতার স্তুতি করেন। (মাধবাচার্য্যকৃত অধিকরণমালা ২।১।৫০)। ঋক্—ঋচ্যন্তে পূজ্যন্তে স্তূয়ন্তে বা ইন্দ্রাদিদেবো যয়া সা ঋক্। ঋচ স্তুতৌ বা ক্বচিৎ কর্ত্তরীতি ক্বিপ। যজুঃ—যজন্ত ইতি যজুঃ বপাদেরুস্ ইতি উস্। সামন্—স্যতি গানাদিনা স্তাবকস্য পাপং নাশয়তীতি সামান্। ষোহন্ত কর্মাণি এচোঃশিতি সা ধাতো শ্রাদের্মনত্। অথর্বন্—মঙ্গলানন্তরারম্ভ। প্রশ্নকার্ৎস্ন্যে স্বক্ষেৎথ ইতি মেদিনী—

আপস্তম্ব যজ্ঞ-পরিভাষা সূত্রে বলিয়াছেন,—"মন্ত্র ব্রাহ্মণয়ো-র্বেদনামধেয়ম্"। ইহা জৈমিনী-সম্মতও বটে।" "তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা।" "শেষে ব্রাহ্মণ শব্দঃ" (২।১।১।৩৩) অর্থাৎ যাহা প্রয়োগ কালে অর্থাৎ অনুষ্ঠান কালে উপযুক্ত অনুষ্ঠেয় অর্থের বোধ জন্মায় তাহাকে মন্ত্র বলে এবং অবশিষ্ট বাক্যকে ব্রাহ্মণ বলে। কেহ কেহ বলেন, "প্রয়োগ সমবেতার্থস্মারকাঃ মন্ত্রাঃ।" শবরস্বামী বলেন, "ব্রহ্মণো বেদস্য ব্যাখ্যানমিতি ব্রাহ্মণম্।" ১২

[ক্রমশঃ

১১। বেদান্ত শব্দটিও কম প্রাচীন নয়। গীতার ১৫।১৫ শ্লোকে "বেদান্তকৃৎ শব্দটি পাওয়া যায়। এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও (৬।২২) "বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতং" এইরূপ মন্ত্রবর্ণেও দেখা যায়।

১২। সায়ন ব্রাহ্মণ বিধি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।—১। অপ্রবৃত্ত প্রবর্তন (কর্মকাণ্ড) এবং ২। অজ্ঞাত জ্ঞাপন (জ্ঞান-কাণ্ড)। জৈমিনি ও শবর ব্রাহ্মণের লক্ষণ বলেন—হেতু, নির্বচন, নিন্দা, প্রশংসা, সংশয়, বিধি, পরকৃতি পুরাকল্প, ব্যবধারণ, কল্পনা, ও উপমা—এই ১০টি।

আকাঙ্ক্ষা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আকাঙ্ক্ষা আর অন্ত নাই,—
এই জনমে এই নয়নে বারেক তাঁকে দেখতে চাই।
দুঃসাহসী বলবে মোরে, বলবে দুরাকাঙ্ক্ষ কেউ।
দেখতে মহাসাগর কে চায় পল্বলের এই ক্ষুদ্র ঢেউ?
ঊর্দ্ধেতে ওই নীল আকাশে তাঁহার রূপের আভাস পাই।
দিব্য নয়ন চাইনে আমি, ধ্যানে কিম্বা স্বপ্নে নয়,
এই নয়নের সামনে চাহি সেই মুরতির পূর্ণোদয়।
আঁখিতে মোর সুধার তৃষা ঘোলে কি তা মিটবে ভাই?
দেখা দেওয়া ইচ্ছা তাঁহার কৃপায় তাঁহার হয় না কি?
চায় না কিছু চাঁদ-চাওয়া মোর চপল-চকোর এই আঁখি।
পরশমণির অন্বেষী সে হীরক দিলে বলবে ছাই।
ভুবন তিনি, তিনিই ভুবন, রূপ তো নিতুই দেখছি ঢের।
এখন আমার তৃষ্ণা শুধু রূপ-সাগরের অমৃতের
করছি পঙ্ক-সরের পাড়ে সে পঙ্কজের প্রতীক্ষাই।

নীড়

[চিত্তরঞ্জন দাশ

শুভেন্দ্রনারায়ণ ও সেরাইকেলার নাচ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার

শুভেন্দ্রনারায়ণ আমার চোখের সামনে জেগে আছেন রূপকথার রাজপুত্রের মতন!

কারণ নৃত্যজগৎ হচ্ছে দৃশ্যমান রূপকথারই রাজ্য এবং রূপকথার নানা রস, রূপ ও রেখা জীবন্ত হ'য়ে নিয়ে সেখানে হয় ক্ষণে ক্ষণে মূর্ত্তিমান্। শিল্পসুন্দর, স্বপ্নসুষম ও মায়ামধুর রূপকথা-লোকের মধ্যেই শুভেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে আমার হয়েছিল মনোহর প্রথম পরিচয়।

নৃত্যজগতের বাইরেও তাঁকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি কয়েক বার। সুদর্শন, সৌম্যমূর্ত্তি, মিষ্টভাষাভাষী, বিনীত ও ভদ্র একটি তরুণ যুবক। সম্ভ্রান্ত রাজবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ব'লেই তাঁর এই বিশেষত্বগুলি আমাকে করেছিল বিশেষ ভাবে আকর্ষণ। তবে এ-রকম বিশেষত্ব তাঁরই মতন সম্ভ্রান্ত-বংশজাত আরো একাধিক ব্যক্তির মধ্যে লক্ষ্য করেছি। তাই আমি তাঁকে এদিক দিয়ে অদ্বিতীয় ব'লে মনে করতে পারিনি। কিন্তু আমার কাছে তিনি অদ্বিতীয় হয়ে আছেন ঐ অপূর্ব্ব নৃত্যজগতে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করতে পেরেছি ব'লে। শিশু বয়সে প্রাচীনাদের কোলে ব'সে শ্রবণ করেছি রূপকথার রাজকুমারের কাহিনী। আর প্রাচীন বয়সে নৃত্যসভায় বসে শুভেন্দ্রকে আমি জীবন্তরূপে দেখেছি সেই কবেকার হারিয়ে-যাওয়া রূপকাহিনীর একটি রাজকুমারেরই মত। আমার জীবনে তিনি সফল করে তুলেছিলেন শিশুবেলার রূপকথার রাজকুমারের অবাস্তব স্বপ্নকেই। এই কঠিন, নিষ্করুণ, বাস্তব পৃথিবীর মাটির উপরে এমন অভাবিত ভাবে সত্য ক'রে তুলতে পারেন যিনি স্বপ্নকে এবং কাব্যকে, ধন্য তিনি—ধন্য তিনি! আজও তাঁর স্মৃতি আমার মনের পটে লেখা আছে জ্বলজ্বলে সোনার অক্ষরে। এবং যখনই এই স্বর্ণস্মৃতির কথা ভাবি তখনই তাঁর উদ্দেশে বার বার প্রদান করি শ্রদ্ধার অঞ্জলি।

শুভেন্দ্রনারায়ণের 'আর্ট' সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। কিন্তু তার আগে সেরাইকেলার নৃত্যকলা সম্বন্ধেও দু'-চারটি কথা বলা দরকার মনে করি। কারণ, সেরাইকেলার নাচের যথার্থ বিশেষত্বটুকু মূর্ত্তিমান হয়ে উঠেছিল শুভেন্দ্রের আর্টের মধ্যেই। সেরাইকেলার নাচ বললেই আমার দৃষ্টির সামনে সর্ব্বাগ্রে আত্মপ্রকাশ করেন চিরঞ্জীব শুভেন্দ্রনারায়ণই।

রাধাকৃষ্ণ নৃত্যে কেদার ও শুভেন্দ্র

সেরাইকেলার নৃত্য নিয়ে এর আগে আমি একাধিক বার প্রকাশ্য আলোচনা করেছি। এখানে সে-সব কথার পুনরাবৃত্তি না করলেও চলবে। এইটকু আমার মনে আছে, প্রায় দশ বছর আগে শ্রদ্ধাস্পদ ও মহামান্য রাজা সাহেবের সাদর ও সানুগ্রহ আমন্ত্রণ পেয়ে যখন সর্ব্বপ্রথমে সেরাইকেলার বিশিষ্ট নৃত্য দর্শনের সুযোগ লাভ করি, তখনই আমি অত্যন্ত বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে গিয়ে ছিলুম। মনে হয়েছিল, কল্পনাতীত কোন-কিছু স্বচক্ষে দর্শন করছি। আমার পক্ষে এ ভাবে অভিভূত হওয়ারও একটা বিশেষ মূল্য আছে ব'লে বোধ করি। আপনারা অনুগ্রহ ক'রে মনে করবেন না যে, আমি নিজের দাম বাড়াবার জন্যে মিথ্যা গর্ব্ব প্রকাশ করছি। কিন্তু এইটুকুই বলতে চাই, প্রথম যৌবন থেকেই নৃত্য-জগতে এক জন দীন শিক্ষার্থীর মতই আমি জ্ঞান সঞ্চয়ের চেষ্টা করেছি

আজ সুদীর্ঘ চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বৎসরের মধ্যে কেবল যে ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের, রুশিয়ার, আমেরিকার, জাভার, ব্রহ্মদেশের চীনের ও জাপানের প্রথম-শ্রেণীর নর্ত্তক ও নর্ত্তকীদের দেখবার সুযোগ পেয়েছি তা নয়; সেই সঙ্গে দেখেছি ভারতবর্ষেরও প্রায় সর্ব্বশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পীদের। তার উপরে বাংলার বাইরে গিয়ে ভারতের নানা প্রদেশের বিশিষ্ট নৃত্যকলার সঙ্গেও চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করেছি। নিজেও গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে এক সময়ে কিছু কিছু নৃত্য অভ্যাস করেছিলুম। এবং অসংখ্য নৃত্য-পরিকল্পনা করে বাংলার নাট্য-জগতেও বহু বহু নর্ত্তক ও নর্ত্তকীকে লাভ করেছি আমার শিষ্যের মত। এমন অবস্থায় আমার মতন লোকের পক্ষে কোন নাচ দেখেই

নাবিক নৃত্যে শুভেন্দ্র ও কেদার

চন্দ্রভাগা নৃত্যে শুভেন্দু ও কেদার

সহজে অভিভূত হবার কথা নয়। অথচ আমিই প্রাচীন বয়সে সেরাইকেলার নৃত্যকলা দেখে বিস্মিত, অভিভূত ও চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলুম। নিশ্চয়ই এর প্রধান কারণ হচ্ছে, সেরাইকেলার নৃত্য-কলার মধ্যে এমন দুর্লভ ও অপূর্ব্ব বস্তু আছে, আমার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতাও আগে যা ধারণার মধ্যে আনতে পারেনি।

তাই প্রায় দশ বৎসর আগেই মাননীয় রাজা বাহাদুরকে আমি অনুরোধ করেছিলুম, এমন মহার্ঘ রত্ন তিনি যেন নিজের রাজ্যের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ না রাখেন। এমন রত্ন লুকিয়ে রাখবার নয়, বিশ্বের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে একে তুলে ধরাই উচিত। এবং সেই সময়েই নৃত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ও ভারতের অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় নৃত্য-পরিবেশক স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষও আমার কথায় সায় দিয়েছিলেন ব'লেই মনে হচ্ছে।

তার পর সেরাইকেলার নৃত্য-সম্প্রদায় কেবল কলকাতা সহরে নয়, ভারতের প্রদেশে প্রদেশে এবং ভারতের বাইরেও ললিত কলা ও সংস্কৃতির জন্যে গর্ব্বিত য়ুরোপেরও নানা স্থানে গিয়ে তুলনাহীন কলা-কৌশলেরও পরিচয় দিয়ে মুখর বিশ্বের প্রশস্তি নিয়ে স্বদেশে ফিরে এসেছেন মাথার উপরে বহন ক'রে জয়-পতাকা! সেরাইকেলা বাংলা দেশেরই প্রতিবেশী। কিন্তু সত্যি কথা বলছি, এক যুগ আগে বাংলা দেশে ব'সেই আমরা সেরাইকেলার এই আশ্চর্য্য নৃত্য-প্রতিভার কথা কিছুই জানতুম না। অথচ আজ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দেশে দেশে উঠেছে সেরাইকেলার কলাবিদ্‌দের নামে উচ্ছ্বসিত জয়ধ্বনি!

এর কারণ কি? কারণ বুঝতে গেলে সেরাইকেলার নাচের বিশিষ্টতা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে হয়।

প্রথমত, সেরাইকেলার কোন নৃত্যনাট্যই চিত্রকরের হাতে-আঁকা কৃত্রিম দৃশ্যপটের সাহায্য গ্রহণ করে না। এখানে শিল্পীরা আসেন আত্মশক্তিতে নির্ভর ক'রে আত্মপ্রকাশ করবার জন্যে। চারি ধারে বিপুল জনতা, কিন্তু নৃত্যশিল্পীদের অপূর্ব্ব প্রতিভার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে সেদিকে কারুরই দৃষ্টি হয় না আকৃষ্ট। সত্যি কথা বলতে কি, শিল্পীদের চারি দিক্ থেকে জনতাই হয়ে যায় অদৃশ্য! সুপটু শিল্পীরা যখন যে আবহ সৃষ্টি করতে চান তাই-ই দেখতে পাই আমরা অভিভূত দৃষ্টির সামনে—কখনো অম্বর-চুম্বিত হিমারণ্যে লয়কর্ত্তা শিব মেতেছেন উন্মত্ত তাণ্ডবে, কখনো মহাসাগরের ফেনিল নীল তরঙ্গদল হয়ে উঠেছে উচ্ছ্বসিত, কখনো শ্যামায়িত মধুবনের মধ্যে হচ্ছে রাধাকৃষ্ণের সুমধুর প্রেমাভিনয়। কখনো মুগ্ধ দৃষ্টি চ'লে যায় সেই সুদূর অতীতের পৌরাণিক যুগের মধ্যে, আবার কখনো বা দেখি, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের নানান্ দৃশ্যের বিচিত্র সমারোহ! হাস্য ও করুণ, রুদ্র ও ভয়ানক রস-ভরা দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে থাকি, আঁকা দৃশ্যপটের কোনই অভাব মনের ভিতরে জাগে না। যাঁরা প্রকৃত নট তাঁরা কৃত্রিম দৃশ্যপটের সাহায্য নেবেন কেন? প্রত্যেক দর্শকের মনের ভিতরে যা আছে, শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা সেই কল্পনা-শক্তিকে জাগ্রত করবেন না কেন? মানুষ যখন প্রায় অবোধ শিশু থাকে তখনো কি সেই আদ্যিকালের রূপকথা শুনতে শুনতে তার নয়নপটে জেগে ওঠে না গহন কানন আর ধূ-ধূ তেপান্তর মাঠের ছবির পর ছবি? পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী ব'লে যাঁর নাম বিখ্যাত, সেই আনা পাবলোভা ও তাঁর সম্প্রদায়ের নাচও আমি বার কয়েক দেখেছি। কিন্তু পাবলোভাও নিজের নাচে ভাবের অভিব্যক্তি দেখাবার জন্যে কৃত্রিম দৃশ্যপট এবং আলোকপাত-কৌশলের সাহায্য নিতে ত্রুটি করেননি। সেরাইকেলার শিল্পীরা দৃশ্যপটের প্রাচুর্য্যের দ্বারা যে নিজেদের 'আর্ট'কে সমাচ্ছন্ন ক'রে রাখেননি, এটা হচ্ছে একটা উল্লেখযোগ্য নূতনত্ব। (এইখানে প্রসঙ্গ-সূত্রে আর একটি

কথাও বলা উচিত মনে করছি। প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের ভবনে তখনকার দিনের জাপানের এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নর্ত্তকীকে দেখেছিলুম—তাঁর নাম আমার মনে পড়ছে না। তিনিও বিনা দৃশ্যপটে আমাদের মনের মধ্যে এমন-সব দৃশ্যের পর দৃশ্যের ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন, যা আজও আমি ভুলতে পারিনি। আসল শক্তির পরিচয় এইখানেই।)

তার পরে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে এই। কেবল আমার বক্তব্যই বা কেন, য়ুরোপের এক জন প্রথম শ্রেণীর নৃত্য-বিশেষজ্ঞ সেই কথাই বলেন—অর্থাৎ "নাটক নিজেকে ভাষান্তরিত করে নৃত্যকলার মধ্যে এবং নৃত্যও নিজেকে রূপান্তরিত করে রেখা ও বর্ণের বিচিত্র শোভাযাত্রায়।" সেরাই-কেলার নৃত্যনাট্যের মধ্যে আমি সর্ব্বত্রই পেয়েছি তারই অপূর্ব্ব পরিচয়।

সর্ব্বাগ্রে চক্ষে পড়ে শিল্পীদের সাজ-পোষাক। নৃত্যনাট্যের এ বিভাগে পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন রুশিয়ার লিয়ন বাকস্‌ট্। তাঁর পরেও কয়েক জন চিত্রশিল্পী এই একই পথ অবলম্বন ক'রে চিরস্থায়ী যশ অর্জ্জন করেছেন—তাঁদের প্রত্যেকের নাম এখানে উল্লেখ না করলেও চলবে।

এই নয়নমনবিমোহন ও বিস্ময়কর বহু বর্ণে বিচিত্র সাজ-পোষাকও সেরাইকেলার নৃত্যনাট্যগুলিকে যে কতখানি অপূর্ব্ব ক'রে তোলে, ভাষায় তার সঠিক বর্ণনা করা চলে না—কারণ, তা হচ্ছে চোখে দেখবার ও মনে অনুভব করবার জিনিষ। বাংলা রঙ্গালয় ভারতের মধ্যে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু সেখানেও আমি কখনো দেখিনি এমন অনুপম সাজ-পোষাকের উপভোগ্য সৌন্দর্য্য। সেরাইকেলার নৃত্যনাট্যে নাচের বিভিন্ন ছন্দের সঙ্গে এই বিভিন্ন সাজ-পোষাকের অভিরাম কবিত্ব যেন এক হয়ে মিশিয়ে গিয়েছে। এই-সব সাজ-পোষাকের পরিকল্পনা যিনি করেছেন, তাঁর কাছে শ্রদ্ধায় মাথা নত করা ছাড়া উপায় নেই।

তার পরের কথা হচ্ছে, সেরাইকেলার নাচে ব্যবহৃত হয় মুখোস। আদিকাল থেকে সভ্য ও অসভ্য দেশের নাট্যজগতে এই-রকম মুখোসের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। প্রায় দশ বৎসর আগে সেরাইকেলার নাচ নিয়ে যখন প্রথম আলোচনা করেছিলুম, তখন যুগে যুগে দেশে দেশে ব্যবহৃত এই-রকম সব মুখোসের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেবার চেষ্টা করেছিলুম ব'লে স্মরণ হচ্ছে। এখানে মুখোসের আবার কোন নূতন ইতিহাস দিয়ে বক্তব্য দীর্ঘতর করব না।

সেরাইকেলার এই-সব বিচিত্র মুখোসের মধ্যেও যে বর্ণ, রেখা, ছন্দ, সুষমা ও ভাবের অভিব্যক্তি দেখেছি, তাও মোটেই ভোলবার কথা নয়। এই সব মুখোসের মধ্যে যে অতুলনীয় শিল্পীর মনের ছাপ পাওয়া যায়, তাঁর বা তাঁদের নাম আমি জানি না। কিন্তু তিনি বা তাঁরাও প্রত্যেক রসিকের প্রশস্তি লাভ করতে পারেন।

মানুষকে আমরা চিনতে পারি, মানুষের অনেক মনের কথাই আমরা বুঝতে পারি কেবল তাদের মুখের ভাব দেখেই। আধুনিক রঙ্গালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নর্ত্তক বা নর্ত্তকীও মুখোস-হীন মুখের সাহায্য না পেলে নিজেদের অভিনয় বা নৃত্যকে একেবারেই ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। এবং এটাও হচ্ছে মস্ত-বড় সত্য কথা সে, আমাদের মুখ মুখোস-হীন না হলে নিজেদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করবার অধিকাংশ সুযোগ থেকেই আমরা বঞ্চিত হই।

তার উপরে, সেরাইকেলার এই-সব নৃত্যনাট্য এমন ভাবে রচিত হয়েছে যা কোন ব্যক্তিত্বের সাহায্যের জন্যে অপেক্ষা করে না। নটের পর নট আসছেন আর যাচ্ছেন মুখোসে মুখ ঢেকে এবং সাজ-পোষাকে আবৃত ক'রে সমগ্র দেহ। মুখভঙ্গী দেখতে না পেলে

দুর্গা নৃত্যে শুভেন্দ্র

আমরা কোন ভাবেরও স্বরূপ বুঝতে পারি না, সাধারণত এই হচ্ছে আধুনিক আমাদের অভ্যাস। কিন্তু দেহের ভঙ্গী, চরণ-সঞ্চালনের ছন্দ এবং বাহু ও অঙ্গুলির লীলার মধ্যে যে কত অকথিত ভাষায় ও কতখানি ব্যক্তিত্বের অভাবিত পরিচয় পাওয়া যায়, রাজকুমার শুভেন্দ্রনারায়ণ সেই অজানিত সত্য আমাদের চক্ষের সামনে স্পষ্ট ক'রে তুলেছিলেন। নাচের আসরে দেখছি নটের পর নটের আনাগোনা, কিন্তু তার মধ্যে এক জনের আবির্ভাব হলেই তৎক্ষণাৎ চিনতে বিলম্ব হয় না যে, তিনি হচ্ছেন শুভেন্দ্র—ছন্দসুন্দর, মোহনীয়, আনন্দ-আকর শুভেন্দ্রনারায়ণ! যে-নাচে ব্যক্তিত্ব প্রকাশের কোনই সুযোগ নেই, তার মধ্যেও নিজেকে এমন ভাবে চিনিয়ে দেবার শক্তি যাঁর আছে, তিনি যে কি-রকম অতুলনীয় শিল্পী, আমি তা ওজন ক'রে বলতে চাই না, আপনারা নিজের মনের ভিতরেই অনুভব করে দেখুন। পায়ের প্রত্যেকটি নূপুরের ঝঙ্কার, তনুর প্রত্যেকটি ভঙ্গিমা এবং প্রত্যেকটি অঙ্গুলির ভাষা প্রকাশ ক'রে দিত মুখোসের অন্তরালে লুক্কায়িত শুভেন্দ্রের সুন্দর মুখকে।

আমার কি মনে হয় জানেন? শুভেন্দ্রনারায়ণ যদি মুখোসে নিজের মুখ না ঢেকে রঙ্গমঞ্চের উপরে আত্মপ্রকাশ করতেন, তাহলে তাঁকে দেখে দর্শকরা যে আরো কত বেশী অভিভূত হতেন আমি তা সহজে অনুমান করতে পারি না।

শুভেন্দ্রনারায়ণের নৃত্য দেখেছি অনেক দিন আগে। তার সমগ্রতার সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য আজও মনের ভিতরে ঝলমল্ ক'রে উঠছে বটে, কিন্তু তাঁর সমস্ত নৃত্যের নাম আজ আমার স্মরণ নেই। তবে কয়েকটির কথা আজও আমার মনে আছে। প্রথমত ধরুন, যেমন ময়ূর-নৃত্য। বৃষ্টিমুখর বর্ষা-বেলায় মেঘ-মন্দ্রের ছন্দে ছন্দে বর্ণবিচিত্র ময়ূর নৃত্য করছে নিজের প্রাণের আনন্দে। শুভেন্দ্র ময়ূরের সেই ভাবটি নিজের নাচে কি চমৎকার রূপেই ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তা আমি কোন দিনই ভুলব না। তার পর "বন্দীর স্বপ্ন", "শিবতাণ্ডব", "শ্রীদুর্গা", "রাধাকৃষ্ণ", "নাবিক" ও "চন্দ্রভাগা" প্রভৃতি নৃত্যগুলি আমি যত দিন মরব না তত দিন আমার কাছে হয়ে থাকবে অমর। ওরই মধ্যে বিশেষ ক'রে আমার চোগের সামনে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে "চন্দ্রভাগা", "শ্রীদুর্গা", "ময়ূর" ও "নাবিক" নৃত্য। তাঁর অধিকাংশ নৃত্যেই তিনি কমনীয় ও সূক্ষ্ম ভাবে ফোটাবার অতুলনীয় শক্তি দেখিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু রুদ্র রস ফোটাবার শক্তিও যে তাঁর ছিল, তার জ্বলন্ত প্রমাণ পেয়েছিলুম "শিবতাণ্ডবে"র মধ্যেই।

বয়স ছিল তাঁর অত্যন্ত তরুণ। পৃথিবী-জোড়া নাম কিনলেও নিজের কতটুকুই বা তিনি আমাদের সামনে দেখিয়ে যাবার অবকাশ পেয়েছেন? আরো কিছু কাল এই পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকলে তাঁর পরিপূর্ণ আর্টের মধ্যে আমরা যে কি অনন্ত সৌন্দর্য্যের সন্ধান পেতুম, সেটা আজ কল্পনা ক'রে লাভ নেই।

শুভেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বজয় করেছেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল ভারতবর্ষ নয়, য়ুরোপে ইতালির ও ইংলণ্ডের শিল্প-সমালোচকরাও শুভেন্দ্রের নাচ দেখে তাঁর জন্যে যে-সব বিচিত্র প্রশস্তি করেছেন, এখানে তার নমুনা দেবার অবকাশ নেই। কেবল একটি কথার উল্লেখ করতে পারি। ভারতীয় নৃত্যের আসল অর্থটুকু আমরা যেমন বুঝতে পারি, অভারতীয়রা অর্থাৎ—য়ুরোপের বাসিন্দারা নিশ্চয়ই তা পারে না। তবু য়ুরোপের অসংখ্য বিশেষজ্ঞ শুভেন্দ্র-নারায়ণকে দিয়েছেন অভিনন্দনের পর অভিনন্দন। তাঁরা যে শুভেন্দ্রনারায়ণের নৃত্যের সত্যিকার সৌন্দর্য্যটুকু বুঝতে পেরেছেন, এ-বিশ্বাস আমার নেই। তবু তাঁরা প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে-ছিলেন কেন? এর উত্তরে একটা কথা আমার মনে হচ্ছে। সাপুড়ে বাঁশী বাজায়, বিষধর সর্প তা শুনেও নেচে ওঠে। কেন নেচে ওঠে? মানুষের বাঁশীর ভাষা সে কি বুঝতে পারে? নিশ্চয়ই পারে না। তবু সে যে খুসি হয়ে নেচে ওঠে, এ হচ্ছে সাপুড়ের বাঁশীর সুরের গুণ। কারণ, সুর হচ্ছে আর্ট। আর সত্যিকার আর্ট অবুঝকেও বশ করতে পারে।

য়ুরোপ সেরাইকেলা-নৃত্যের আসল মর্ম্মটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পারেনি। শুভেন্দ্রের মুখে ছিল মুখোস, শুভেন্দ্রের সুন্দর মুখও কেউ সেখানে দেখেনি। তবু সেখানকার প্রত্যেক পত্র-পত্রিকাই নৃত্য-ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে আবিষ্কার করেছিল অসাধারণ এই শুভেন্দ্রকেই। সেরাইকেলা নৃত্যসম্প্রদায় য়ুরোপে যাবার আগেই ওখানকার কলা-রসিকরা একাধিকবার উদয়শঙ্করের নৃত্য দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তার পরেও মুখোসে-ঢাকা-মুখ শুভেন্দ্রের ব্যক্তিত্ব আবিষ্কার করে পৃথিবী-বিখ্যাত 'Sketch' পত্রিকার শিল্প-সমালোচক লিখেছিলেন, "আমি উদয়শঙ্করের সঙ্গে শুভেন্দ্রের তুলনা করতে চাই না; কারণ, তাঁরা দু'জনেই বিভিন্ন-ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন রূপে সমান ভাবে চমৎকার কলা-কৌশল প্রদর্শন করেছেন।"

শুভেন্দ্রনারায়ণের আর্ট সম্পূর্ণ হয়ে ওঠবার অবকাশ পায়নি, অতি তরুণ বয়সে অকালেই করেছেন তিনি দেহত্যাগ। তবু তিনি

ময়ূর নৃত্যে শুভেন্দ্র

বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন। অথচ তাঁর আগে এমন ভাবে আর কোন সখের শিল্পী যে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন, তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই। এর আগেও পৃথিবীর দেশে দেশে বহু শিল্পী নিজেদের বিভাগে নিপুণতা দেখবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা কলাবিদ্ হ'লেও নিজেদের স্বার্থ ভোলেননি। কারণ, নিজেদের আর্টের বিনিময়ে তাঁরা চেয়েছেন অর্থ। কিন্তু শুভেন্দ্রনারায়ণ এ-শ্রেণীর শিল্পী ছিলেন না। অর্থের বিনিময়ে নিজের আর্টকে দান করবার দরকার তাঁর কোন দিনই হয়নি। রাজবংশে তাঁর জন্ম, অর্থের অভাব ছিল না তাঁর। কিন্তু তবু তিনি কেন পৃথিবীর দেশে দেশে নিজের নৃত্যকলা দেখাবার এই বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করেছিলেন? কস্তুরী-মৃগ নিজের অজান্তেই দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয় সুগন্ধ। তার বিনিময়ে সে নিজের কোন লাভেরই প্রত্যাশা করে না। রাজকুমার শুভেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন ঠিক এই জাতীয়। তিনি ছিলেন সত্যিকার আর্টিষ্ট। তিনি জানতেন আর্টের জন্যে আর্ট—"Art for Art's sake"। ফুল যে নিজের গন্ধ ছড়ায়, ফুল কি সে-কথা কোন দিন জানতে পারে? অথচ সেই গন্ধের জন্যেই তো ফুলের এত আদর!

কিন্তু হায়, সেই ফুল আজ ঝ'রে পড়েছে অকালে। আজ মনে পড়ছে শুভেন্দ্রের সেই মিষ্ট মুখ, মিষ্ট দেহ, মিষ্ট বাণী! যে-দিন আচম্বিতে তাঁর সেই শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদ শুনেছিলুম, সে-দিন প্রাণের মাঝে অনুভব করেছিলুম আত্মীয়-বিয়োগের নিদারুণ ব্যথা! এমন ফুলের মত তনু, মহাকালের নিদারুণ কৌতুকে মিলিয়ে গেল অদৃশ্য বাতাসের মাঝখানে?

তার পরেই মনে হ'ল, পৃথিবীতে জন্মেছে যারা সুকোমল পুষ্পের মত এবং যে পুষ্প দিয়ে আমরা করি দেবতার আরাধনা, বিদায় নিতে হবে তাদের ঐ ফুলের মতই—কেউ তাদের ধ'রে রাখতে পারবে না। ফুলের সুন্দর জীবন তো সুদীর্ঘ নয়, তা যে অস্থায়ী স্বপ্নের মত! আবার, যখন কাল-বৈশাখী জাগে তখন সকলের আগে ঝ'রে পড়ে ঐ রঙিন্, কোমল, সুন্দর ফুলেরাই।

শুভেন্দ্র ছিলেন এই নরম ফুলের মতই এবং তিনিও এই কঠিন পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছেন ঝটিকার আঘাতে সুকুমার কুসুমের মতই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কত-বড় এক জন কলাবিদের যে অকাল-মৃত্যু হল, এই কথা ভেবেই আমার চোখে আসে জল। উপায় কি? নিয়তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রে কোনই ফল নেই। সুন্দর শুভেন্দ্রের পবিত্র আত্মা লাভ করুক স্বর্গের চিরন্তন শান্তি!

কে এলে গো ?

প্রদ্যোতকুমার রায়

জীবনের মাটি ধুয়ে দিতে আজ
কে এলে গো? তুমি বরষা?
নেচে ছুটে যায় মেঘ-নটরাজ,
হিয়া মোর তাই সরসা।
মনে আর মেঘে হলো মিতালী
ঝর-ঝর-ঝর ধারা-গীতালী,
আকাশ জুড়িয়া নেমে আসে ঐ
শিখীর হৃদয়-ভরসা!
মনে ফোটে ফুল, বনে ফোটে ফুল,
টবে ফোটে কত ফুল,
ও কে আঁখি মোছে মেদুর আমোদে,
মুখখানি ঢুল-ঢুল?
নয়কো ইমন, নয় ভূপালী,
মল্লারীতেই গাইব খালি—
যে বাণী এনেছে এই ভিজে দিনে
আমার চিত্ত-হরষা—
ও যে গো শ্যামলী বরষা

কয়েকটি 'লাও' কবিতা

['লাও' বা 'শানে'রা স্ত্রী-স্বাধীন জাত। যেমন আমুদে ঝগড়াটে তেমনই। এ জাতের প্রেমের ধারণা আর দশটা জাতের চেয়ে স্বতন্ত্র। এদের কবিতা মানেই প্রেমের কবিতা। এই সব কবিতার ছন্দ, মিল, তাল, মানের বালাই নেই। লক্ষ্য করবার জিনিষ হচ্ছে কবিতার ছবিগুলো। এদের অধিকাংশ কবিতাই এত তীব্র ও নগ্ন যে আমাদের রুচিতে বাধতে পারে। তবু তাদের মধ্য থেকে গোটা-কয়েক পরিবেশন করা গেল।]

সঙ্গিহীন

সূর্য প'ড়েছে ঢ'লে,
আহত সূর্য উদ্ধত শূল তাল-তমালের চূড়ে,
রক্তের ধারা ঝরে।
পাতায় পাতায় টুকটুকে লাল ডালিমের উঁকিঝুঁকি।
আহত সূর্য তুমি
আজ রাতে এই বিরাট পৃথিবী তোমারই শয্যা হোক
আর আমি যেন সব কালো করা অন্ধকারের রাশি
তোমাকে ফেলব ঢেকে।
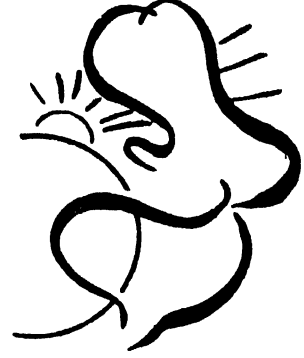
সঙ্গিহীনা

তুমি বলেছিলে দেবদারু আর চন্দন-শাখা মিলে
ছাতা হ'য়ে ঘিরে আমাকে রাখুক ঢেকে,
তুমি না কি এই চাও।
তুমি বলেছিলে ঝলমলে সোনা পাড় দেওয়া নীলাকাশ
নীল ছাতা হয়ে আমাকে রাখুক ঢেকে,
তুমি না কি এই চাও।
তুমি ত বলোনি তোমার দেহের মনের সত্তা দিয়ে
আমাকে রাখবে ঢেকে,
আর তুমি এই চাও।

মুখরা

পুরুষের প্রেম হঠাৎ যখন বন্যা আনে
যত কিছু কথা, আমাদের নীল, নারঙী ওড়না
ঘূর্ণী বিপাকে পাক খেয়ে ওড়ে;
দেখেছ কখনো আঙ্গুরের ঝোপ, গাছের পাখীরা
এলোমেলো ওড়ে রামধনু-রঙা ঝড়ের বেগে
কেমন ক'রে?

স্বীকৃতি

তোমার চুল যেমন অগুনতি
তেমনি অগুনতি গন্ধধূপ জালিয়েছি বুদ্ধের সামনে আমরা;

আমরা সব কুকুরছানাব মত
তোমাব সিঁডিব ধাপ শুঁকছি শুধু
যে সিঁড়ি পৌঁছেচে তোমাব ঘবেব দবজায়।
আমবা সব লাল-তোতাব মত
পাকা আমেব চাব পাশে চেঁচিয়ে মবছি শুধু
যে আম ঠুকবে গিলছে কালো একটা হাঁস।

শূন্য শয্যায়

তোমাকে দেখেছি কত কতবাব আমাব স্বপ্নে
আমাব চিন্তায় সোনালী পাক খেয়ে উঠছে,
যেমন ক'বে পাক খেয়ে ওঠে ড্রাগনগুলো
প্যাগোডাব স্তিমিত আলোয় ;
যেমন ক'বে বুদ্ধেব ছোট মূর্তিগুলো
প্যাগোডাব ডুমুব গাছেব তলায় আনি
স্নান কবিয়ে নেবাব জন্যে ;
জেগে উঠে দেখি আমার চিন্তাগুলো
বেবিয়ে এসেছে তেমনি তোমাব মাঝখানে ডুব দেবাব জন্যে

মাঝ-নদীতে

হেঁইও হো, হেঁইও হো।
দাড় টেনে হাত অবশ হলো,
তবু টানি দাড়, অন্ন চাই,
আব চাই ঘুম নদীব পাড়ে
বাত্রি কালে।
দাড় টেনে হাত অবশ হলো।
হেঁইও হোঁ, হেঁইও হোঁ।
তাবও ঘুম নেই সঙ্গী বিনে,
তোমাকে দিয়েছে যে ফুল মেয়ে,
আব তাব কোন গন্ধ নেই,
ছুঁড়েই ফেলো।
হেঁইও হোঁ, হেঁইও হোঁ।
দাঁড় টেনে হাত অবশ হলো।

দুরন্ত আশা

বিদায়েব কালে ছিল আধখানা চাঁদেব মত
আজ নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়েছে যোলটি কলা,
ঝলমল কবে সাবারাত ধ'বে ফুলেব বনে :
ডানা কই ? এই মেহং নদীতে পাব না ডানা ?

অনুবাদক—অবন্তী সান্যাল

চাকার চিহ্ন

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

কত দিন, মাস, বছর, কত নর আর নারী কচুর পাতার ওপর বর্ষার জলের মত কোন দাগ না রেখে মনের ওপর দিয়ে গলে গড়িয়ে ঝরে পড়ে গেছে, কিন্তু—তোমরা ভাববে, জ্বরো রুগীর মত বুঝি প্রলাপ সুরু করলাম। তা নয়, আমার জীবনেই ঘটেছিল, এই কোলকাতায়। লীলা বললে,—"তোমার সঙ্গে দেখা করবো, বিকেল চারটায়, জরুরী কথা আছে।" সাতটা, আটটা-দশটাও বেজে গেল—হৃৎপিণ্ডের অশ্রান্ত দ্রুতগতির চেয়েও মন্থর সময়।

জানালার সমুখ থেকে সন্ধ্যা সরে গেল, জ্বললো গ্যাসের আলো। পৌষের কলকাতার রাত ধোঁয়ায় ধূসর। মেসে ফিরে এলো যে যার ঘরে বা সিটে, কেউ বই খুলে বসলো, কেউ পড়লো শুয়ে, বারান্দায় চলেছে উত্তেজিত আলোচনা, হোমরুল আর সুরেন বাড়ুজ্যেকে নিয়ে। ক্ষুধাতুর কেউ চ্যাঁচাচ্ছে—ঠাকুর, ভাত হ'ল। তেতালার ঘরে বাতি নিবিয়ে দিয়ে আমি জড় মাংসপিণ্ডের মত অভিভূত হয়ে বসে আছি। প্রত্যেকটি শব্দের প্রতিঘাতে বোবা আর্ত্তনাদ বুকের মাঝে গুমরে ওঠে। মনের তলায় এত চাওয়াও তলিয়ে ছিল এত দিন। নিজেকে যেন নিজে আবিষ্কার করলাম। আমি কি আশ্চর্য্য!

আমি আশ্চর্য্য। পঁচিশ বছরের সুন্দর সুগঠিত দেহ। ভক্ত বন্ধুরা বলে, গ্রানিট পাথরে তৈরী যৌবনের জয়স্তম্ভ। আমি জানি কোন অভিজাত পাথর নয়, সপ্তধাতুর খাদ দেওয়া কাঁচা লোহায় আমি তৈরী, লোহার মতই রুক্ষ কঠিন কর্কশ অমসৃণ আমার হৃদয়। কে যেন ঠাট্টা করে বলেছিল, তুমি অষ্টধাতুর কেষ্ট ঠাকুর। কিন্তু আজ রাত্রে এই বিগলিত কাতরতা, লোহা দিয়ে ঢেকে রাখবার জন্ত এ কি অসহনীয় আকুতি। লোহাও উত্তাপে লাল হয়ে গলে যায়—অসম্বৃত হয়ে উঠি।

জানালার শিক ধরে সামলাই নিজেকে, উত্তুরে হাওয়ায় কাঁপি, ভাবি এই বুঝি প্রেম, এরই নাম ভালবাসা। মনের কোণায় এতটুকু ভাবাবেগ, এমন নিরেট দেহটাকে কেমন করে কুকড়ে দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছে। লাজে সঙ্কোচে দুর্ব্বল ভীরু ছোট্ট পাখীর মত ভালবাসা, আজ অশান্ত ঈগলের মত পঞ্জর-পিঞ্জরের আগল ভেঙ্গে, নিরুদ্দেশ যাত্রায় পাখা মেলতে চায়। কিন্তু পারে না, যেন বার আসার আশার ছলনা।

পৌর ভবনের দ্বার রুদ্ধ হলেও একালে নগরীর দীপ বাতাসে নেবে না; আমারই কামনার মত ওরা অকারণে জ্বলে। শুধু ওদের সমুখে পেছনে হ্রস্ব দীর্ঘ ছায়া ফেলে ধাবমান জনতা বিরল হয়ে অদৃশ্য হয়। গাড়ী-ঘোড়ার শব্দ ক্ষীণতর হয়ে আসে। তবু, তবুও শীতজর্জ্জর রাতে আমি, তাকে পাবই এই পণ করে পথের পানে চেয়ে আছি,—দেখি, হাওয়ায় উড়ে-যাওয়া কাগজের ঠোঙ্গাটার মাতলামী, আমি মধ্যরাত্রির মাতাল!

মধ্যরাত্রি এল—মেসের বারান্দায় মলিন জাপানী ঘড়ীটা খোলা ভোঁতা একঘেঁয়ে ক্লান্ত সুরে বারোটা গুণলো—আমি অনুভব করলাম, তার প্রত্যেকটি ঝঙ্কার যেন তীক্ষ্ণধার ছুরিকার মত আমার প্রতীক্ষার কণ্টকিত ব্রণে অনির্ব্বচনীয় বেদনা সঞ্চার করে, বারো বার প্রবেশ করলো, জমাট দূষিত পূঁজ-রক্ত মোক্ষণে হৃদয় হ'ল অবসন্ন। লীলা—লীলা, চুলোয় যাক্ লীলা, আর তার জরুরী কথা। সৈনিকের শৃঙ্খলা নিয়ে লীলার স্মৃতির ঘন সন্নিবিষ্ট পল্টনকে ছত্রভঙ্গ করতে এমনিতর অনেক কঠিন শপথের বোমা বর্ষণ করলাম, মানস লোকে। চিদাকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

তার পর এলিয়ে পড়লাম বিছানায়, যেন হাসপাতালের বিনিদ্র রোগী—অনিচ্ছায় আট-সাট শয্যায় শুয়ে আছি। দেহ বলহীন, অলস, কপালের কানের পাশের শিরাগুলো দপ্-দপ্ করছে—মাথার মধ্যে হাঁপাচ্ছে স্নায়ুপুঞ্জ, অবরুদ্ধ বাষ্প-ইঞ্জিনের মত। ইঞ্জিন কাঁপছে থরোথরো—গতির পূর্ব্বাভাষ। লোহায় লোহায় দুর্ঘট মিলের ছন্দভঙ্গ হল, বন্ধনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠলো গর্জ্জে, ঘর্ষণে পেষণে উত্তেজিত হ'ল তার গতিবেগ। লোহা-লক্কড়ের আকুল আর্ত্তস্বর কি শুনতে পাচ্ছে, আমাদের মেসের তন্দ্রাতুর বাসিন্দারা! বিদায়ের বাঁশী বাজিয়ে ইঞ্জিন চলে গেল, দূরে—বহু দূরে। নিস্তব্ধতায় অৰ্দ্ধ সম্বিত পেয়ে দেখি, অবচেতন মনকে আচ্ছন্ন করেছে, আবৃত করেছে কত স্মৃতি, আলোকলতা যেমন তার স্থুল সুক্ষ্ম, তন্তুজাল দিয়ে কুলগাছকে পাকে পাকে জড়ায়। ঝড়ের উদ্দাম গতির মধ্যে তারা কাঁপে, কিন্তু স্থানচ্যুত হয় না। ধূর্জ্জটির জটিল জটাজাল গৌরবের মহিমার, কিন্তু কুলগাছের ও আমার? দুঃসহ লজ্জা! "যৌবনের বিশ্বগ্রাসী মত্ত অহমিকা মুহূর্ত্তে মিলায়ে গেল"—

রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর—জানালা দিয়ে দেখছি, অসীম শূন্যে অন্ধকার গলে পড়ছে, সরে যাচ্ছে। একটা অসম্ভবের অবির্ভাবের প্রতীক্ষায়, তন্দ্রাহীন পক্ষাঘাতগ্রস্ত চোখ দু'টি জানালা থেকে সরিয়ে আনতে পারছি না। লীলার আর প্রয়োজন নেই—ঘুম, ঘুম চাই। শোন লীলা,—

> "কিছু বলে কাজ নেই, শুধু ঢেকে দাও
> আমার সর্ব্বাঙ্গ মন তোমার অঞ্চলে,
> সম্পূর্ণ হরণ করি লহ গো সবলে
> আমার আমারে। নগ্ন বক্ষে বক্ষ দিয়া
> অন্তর-রহস্য তব শুনে নিই প্রিয়া।"

গোখানা থেকে মিউনিসিপালিটির নড়বড়ে গাড়ীর সার রাস্তা কাঁপিয়ে প্রভাতের আগমনী-সঙ্গীত গাইছে। মেসের লোহার দরজার বদ্ধ চোয়াল শিথিল হ'ল, আগ্রহে তাকালাম। ঝাঁটা-বালতী হাতে মেথরাণীকে দেখে অপ্রসন্ন দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম।

অবশেষে সত্যই লীলারাণী এলেন, সর্ব্বাঙ্গে মুখে চোখে ললাটে চিবুকে সময় নেই এর ব্যস্ততা নিয়ে। আমার স্নায়ুপুঞ্জ নিশীথ তাণ্ডবের উত্তেজনা মুক্ত, অবসন্ন নিস্তেজ শান্ত। ও সোজাসুজী চোখের দিকে চেয়ে মুখ নামিয়ে নিলে, যেন সাড়ীর পাড়টার কোন একটা খুঁত আবিষ্কার করলো এই মাত্র। বললে, পরশু আমার বিয়ে, তাই কাল আর সময় পেলাম না। তুমি হয়তো অবাক হচ্ছ, কিন্তু মহেন্দ্র আর দেরী করতে চায় না বলেই—

মহেন্দ্র এবং পরশুই। পদ-নখর থেকে কেশাগ্র পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ খেলে গেল—লোহায় বিকার নাই। আশ্চর্য্য শান্ত আমি, মৃতদেহের ধমনীতে নিথর রক্তের মত।

লীলা বলে চললো, "তুমি আমাকে ভুল বুঝো না, ধনী বলে নয়, মানুষ বলেই মহেন্দ্র······তুমিও তো কত দিন বলেছ······

সেই শাশ্বত নারী—হস্তান্তরযোগ্য অস্থাবর সম্পত্তি কুমারী, বাপ-মা বিক্রী করে নয় বিলিয়ে দেয়, কিম্বা চোরে করে চুরি অথবা ডাকাত নেয় লুঠে। আমার একান্ত নিজস্ব ছিল বলে চুরি, ডাকাতি কিছুই করিনি,—"বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করার" ফলে সবই খোয়া গেল। ঘর পুড়ে গেলেও, শূন্য ভিটে কি মায়ায় মানুষকে বাঁধতে চায়, লীলার মুখের দিকে চেয়ে তা' বুঝলাম। ওর সমস্ত ভঙ্গী যেন বলছে, প্রেমের কাঙ্গালপনার উমেদারী করে, তোমার ভিক্ষাপাত্র শূন্য রয়ে গেল।······

ভদ্র যুবকগণ কৌতুহলী দৃষ্টি মেলে দেখলো, একটি যুবতী মেসের সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে, তার পেছনে আমি, ভদ্র সমাজের সৌজন্য। মাসিক পত্রিকার রঙীন ছবি নয়, রক্ত-মাংসের নারী, কুমারী এবং যুবতী, অতএব গোপন চুম্বন, গাঢ় আলিঙ্গন এমন কি উদ্দাম আসঙ্গলিপ্সার চরম পরিণতি, সিনেমার ছবির মত ওদের মনের পর্দ্দায় পলকে রূপায়িত হ'ল। চুরি, জোচ্চুরি, চাটুবৃত্তি, মিথ্যা ভাষণের আত্মাবমাননা যারা সহজ ভাবে গ্রহণ করে, একটি যুবতীর পশ্চাতে আমার বশম্বদ মন্থরগতি দেখে তারা নিশ্চয় নৈতিক ঈর্ষায় শিউরে উঠলো। কিন্তু তারা নিশ্চয়ই দেখলো না, ইন্দো-গ্রীক্ ভাস্কর্য্য অনুকারী কুশান সম্রাট্ হুবিস্কের মত আমার মুখের ভয়াল রূপ, প্রশান্ত-গম্ভীর। আপনাতে আপনি অটল মন—বৈশাখের পুরীর সমুদ্র যেন নিথর। লীলাকে বিদায় দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সময় মনে হল, আমার দেহের লৌহপিঞ্জর ভেদ করে একটা হিংস্র জন্তু যেন ওর পেছনে ছুটতে চায়,—হত্যা, নয়—আত্মহত্যা! কি করুণ, কি বীভৎস!

দিবা দ্বিপ্রহরে শুয়ে আছি দেখে জিতেন আশ্চর্য্য হল। বন্য পশুর মত সুস্থকায় সত্যেন মজুমদার কাতরাচ্ছে, সহমরণে অনিচ্ছুক 'সতীর'-মত সে জ্বলন্ত চিতা থেকে লাফিয়ে বেরোতে চায়,—কিন্তু শক্তি নেই। ও জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে। আগুনের হল্কা থেকে আমার মুখের উত্তর ছুটে বেরোয়,—মধ্য রাত্রে জলে ওঠা গণিকালয়

থেকে ভয়ার্ত্ত নগ্ন বেশ্যার মত। আমি জলছি, জলছে আমার মুখ, প্রজ্বলন্ত অধরোষ্ঠে পাণ্ডুর প্রেম-চুম্বন ছাই হয়ে ছড়িয়ে গেল। বন্ধুজনের সমবেদনা দমকলের মত অজস্র ধারায় প্রীতি বর্ষণ করবে,—আগুন তো নেবাতেই হবে।

তিন বছরের 'মন দেয়া-নেয়ার' কিছুটা তুমি জান, সবটা জান না। প্রেমে পড়া মানুষ জালে আটকে পড়া মাছের মত মাঝে মাঝে বোবা হয়ে যায়। 'জীবন মরণ হরণ' করা সে আনন্দ বেদনার বুঝি ভাষা নেই। বলতে গেলে তা' হ'য়ে ওঠে শিশুর অর্থহীন কলকাকলী। ভুলটা কোথায় হয়েছিল, তোমাকেই বলি জিতেন। তখন মনে হয়নি, আজ মনে হচ্ছে।

গিরিডি। কলকাতা নয়, তবুও বহু কৌতূহলী দৃষ্টি এড়িয়ে নিরালায় দু'জনকে একান্ত করে পাওয়া কত দুর্ল্লভ সুযোগ।

এক দিন বিকেলে নদীর সাঁকো পার হয়ে ডাইনে ঘুরে একটা মহুয়া গাছের তলায় বসলাম—পাথরের ওপর। পাশাপাশি বসতে ওর কুণ্ঠা অনুভব করলাম। হাতের ওপর হাত রেখে বললাম, "আমার ওপর তোমার নির্ভরতা কত দুর্ব্বল।"

চকিতে পথের দিকটা দেখে নিয়ে লীলা বললো,—"কারো'পরে আমার বিশ্বাসের জোর নেই, মানে কাউকে বিশ্বাস করার জন্য মনকে এখনও প্রস্তুত করতে পারিনি। এ কথাটা তোমাকেই আজ বললাম, মানে আমি······"

"আমিও তোমারই মত একা নিঃসঙ্গ,···শান্তি পাইনে······" হাতখানা সরিয়ে নিয়ে লীলা বললে,—"আমিও তাই।"

"কারণ কি জানো লীলা, আমি অসাধারণ বলেই নিঃসঙ্গ, চার দিকের মানুষগুলো কত ছোট, ওদের আমি ঘৃণা করি, অবজ্ঞা করি। আবার কখনো ভাবি আমি ওদেরই মত নির্ব্বোধ, চলমান ধাবমান জনস্রোতের তৃণ—অসহায়, নিরুপায়।"

ভাবলেশহীন মুখে লীলা বললে,—"আমারও নিজেকে তাই মনে হয়।"

"···চেষ্টা করি, কিন্তু নিজেকে সকলের মত সহজ করে নিতে পারিনে। সামাজিকতার কবিতায় আমি যেন অতি স্থূল ছন্দভঙ্গ।"

"আমিও তাই।"

"আসলে আমি ভাবাবেগের দাস। যখন কোন কিছু নিয়ে মেতে উঠি, তখন নিজেকে সম্বরণ বা সংযত করার বল পাইনে।"

"আমারও মেজাজ বিগড়ে গেলে যাচ্ছেতাই হয়ে উঠি, অথচ দেখি অনেকেই বেশ সামলে চলতে পারে।"

"কিন্তু তবু অতি দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে এক জনকে স্মরণ করে আমি বল পাই, ভরসা পাই। কে সে জানো!"

লীলা হরিণীর মত উৎকর্ণ হ'ল। শোন জিতেন, বলতে পারলাম না, সে তুমি! খাপছাড়া ভাবে বলে উঠলাম,—"মহেন্দ্র। মহেন্দ্র আমার রক্ষাকবচ। আমাদের পরস্পরের ওপর বিশ্বাসের ভিত্তি কত অটল তুমি কল্পনা করতে পারবে না। আমাদের বন্ধুত্ব একটা রোমান্স।"

লীলা হেসে বললে, "মহেন্দ্র বাবুকে আমিও বন্ধুর মত বিশ্বাস করি।"

গর্ব্বিত হলাম। মহেন্দ্রের গুণগানে দু'জনাই মুখর হয়ে উঠ্লাম।

আর এক দিনের কথা।

কথায় কথায় লীলা বললে,—"না, না, ভালবাসার চরম পরিণতি হল, আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে দু'টি আত্মার মিলন, মানে এক হয়ে যাওয়া।"

"তা' হয় না! ওটা ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যদের বাঁধা বুলি। দুইটি প্রখর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব পরস্পরের পার্থক্য স্বীকার না করলে ভালবাসার কোন মর্য্যাদা থাকে না। আমি যদি তুমি হয়ে যাই সেটা আত্মোৎসর্গ নয়, আত্মাবমাননা।"

"তোমাকে আমি ভালবাসি, তোমার মতকেও করি শ্রদ্ধা।"

"ধন্যবাদ! কিন্তু শোন লীলা, দেহের অতিরিক্ত কোন সত্তার ওপর আমার বিশ্বাস নেই, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে আমি কিছুই মানিনে।"

'ঘরে-বাইরে' পড়া মেয়ে ও, জবাব দিয়েছিল, বুঝলাম, তুমি বস্তুতান্ত্রিক।

অমর ভারত

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

বিগত মহাযুদ্ধের প্রলয়ানলে জগৎ দগ্ধীভূত ও মৃতপ্রায়। সমরাগ্নির প্রচণ্ড উত্তাপে ভারত সন্তপ্ত ও সংজ্ঞাহীন। অনেক ভারতবাসীর মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে—"ভারত বাঁচিবে কি? ভারত এই কাল-সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে পারিবে কি?" নব ভারতের জাগরণ-মন্ত্রের ঋষি বিবেকানন্দ প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"ভারত কি মরিবে? তাহা হইলে পৃথিবী হইতে সকল আধ্যাত্মিকতা লুপ্ত হইবে; সকল নৈতিক উৎকর্ষ অপসৃত হইবে, ধর্মের প্রতি সকল মাধুর্যাত্মক প্রীতি বিনষ্ট হইবে, উচ্চাদর্শের প্রতি সকল প্রীতি অন্তর্হিত হইবে; এবং এই সকলের স্থলে কাম-কাঞ্চনরূপ দেবদেবী-যুগলের রাজত্ব স্থাপিত হইবে; সেই রাজ্যের পুরোহিত হইবে অর্থ; দুর্নীতি, পরাক্রম ও প্রতিযোগিতা হইবে পূজার উপচার ও মানবাত্মা হইবে বলি।" অতীত ভারত অপেক্ষা অধিকতর মহিমাময় ভবিষ্য ভারতের এক জ্বলন্ত ও জীবন্ত চিত্র স্বামিজী তাঁহার যোগজ দৃষ্টি-সহায়ে দর্শন করিয়াই এই অভয় বাণী দিয়াছেন।

গ্রীস, রোম প্রভৃতি অনেক প্রাচীন উন্নত দেশ ধরাতল হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারত অদ্যাপি জীবিত। বহু শতাব্দীর মৃত্যু-ঝঞ্ঝা সহ্য করিয়া আজও ভারত সগর্বে দণ্ডায়মান। ভারত অমর। ভারতের অমরত্ব ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। ধর্মই ভারতের প্রাণ। ভারতের সংস্কৃতি ধর্মমূলক। মানব-সভ্যতায় ভারতের বিশিষ্ট অবদান আছে। জগতের জন্যই ভারতকে বাঁচিতে হইবে। দক্ষিণ-আফ্রিকার ফিল্ড মার্শ্যাল স্মাটস্ সাহেব মহাত্মা গান্ধীকে বলেছিলেন—"ভারতের জাতিকে আমরা ভয় করি না, ভারতের সংস্কৃতিকেই ভয় করি।" অন্যান্য দেশের সভ্যতা মরণশীল, আর ধর্মের অক্ষয় ভিত্তিতে ভারতীয় সংস্কৃতি স্থাপিত বলিয়া ইহা অমর। অরুণোদয়ের পূর্বে যেমন ধরণী ঘনান্ধকারে আবৃত হয়, মলয়ানিল প্রবাহের পূর্বে যেমন গ্রীষ্মের উত্তাপ বাড়িয়া উঠে, নব পত্রোদ্গম হইবার অগ্রে যেমন বৃক্ষ শীর্ণ ও পত্রহীন হয়, ভবিষ্য ভারতের আবির্ভাবের পূর্বে তেমনি আধুনিক ভারত মুমূর্ষু প্রতীত হইতেছে। নব জন্ম লাভের গর্ভ-যন্ত্রণায় বর্তমান ভারত মৃতপ্রায়। মধ্যযুগের অবসান এবং নবযুগের সন্ধিক্ষণে ভারত উপস্থিত। এই সঙ্কট সময়ে ভীত হইবার কোন কারণ নাই; প্রয়োজন অসীম ধৈর্যের, ও দূরদৃষ্টির। আসমুদ্র হিমালয় ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি—ভারতের প্রাণপাখী এখনও সঞ্জীবিত। ধর্ম রসের মৃত-সঞ্জীবনী সুধা পান করিয়া ভারত মৃত্যু জয় করিয়াছে, যুগ-যুগান্তর বিমৃত্যুর উপাসনা করিয়া ভারত অমর হইয়াছে।

মেজর জর্জ ফিল্ডীং ইলিয়ট ১৯৪২ সালের ৩০শে জুন আমেরিকার 'লুক' (Look) নামক পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—"ভারতই বর্তমান মহাযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ভারত যে জাতির করতলগত হইবে, সেই জাতিই পৃথিবীতে প্রভুত্ব করিবে। ভারত সর্ব সম্পদে পরিপূর্ণ। ইহার লোহার খনি এবং হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক্ শক্তি যুক্তরাজ্যের পরেই। ইহার কয়লা ও মাঙ্গ্যানিজ অপরিমেয়। পৃথিবীর অর্ধেক বক্সাইট (যাহা হইতে এ্যালুমিনিয়াম তৈরী হয়) ভারতেই আছে। তুলা উৎপাদনে ইহা আমেরিকার সমকক্ষ এবং পাট, চিনি, মাইকা ও চামড়া প্রভৃতিতে উহা জগতের অগ্রণী।" শত শত বৎসর বিদেশীয় লুণ্ঠনের পরে আজ ভারত পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্ধতম দেশ। ভারতের ঐহিক সম্পদ, ইহার আধ্যাত্মিক সম্পদের ন্যায়ই জগতের বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতই একমাত্র স্বয়ংপূর্ণ দেশ। ভারত মর্ত্যধামের স্বর্গ। অধ্যাপক আজোয়ানী (১) বলেন,—"ভীষণ দারিদ্র্য সত্ত্বেও ভারতের নরনারী সর্বাপেক্ষা দানশীল, অতিথি-সৎকারপরায়ণ ও উদার। অন্যান্য দেশের আদর্শ-প্রতীক সিংহ, ভল্লুক বা ঈগল পাখী; আর ভারতের প্রতীক গাভী। শান্ত ও ক্ষমাশীল গাভী যেমন দুগ্ধ দানে শত্রুর ক্ষুধা দূর করে, ভারতও তেমনি মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও অন্যান্য জাতির সেবা করিয়াছে। জগৎ ভারতের নিকট সমধিক ঋণী। অন্যান্য জাতি কঠিন আইন সৃষ্টি করিয়া বিদেশীকে দূরে রাখিয়াছে। অন্যান্য দেশ টারিফ ও অন্যান্য নিষেধের প্রাচীর উত্তোলন পূর্বক স্ব স্ব সম্পদ্ ও উৎপন্ন দ্রব্য রক্ষা করিয়াছে; কিন্তু ভারত ধর্মমাতার ন্যায় বিপন্ন ও গৃহহীনকে আশ্রয় দান করিয়াছে।" পার্শিগণ মুসলমানগণের অত্যাচারে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্বক ভারতে বসবাস করিতেছে। পূর্ব পূর্ব খৃষ্টানগণ অন্যত্র স্থান না পাইয়া ভারতের পশ্চিম প্রান্তে গৃহনির্মাণ করিয়াছে। ইহুদিগণ অন্য দেশে বিতাড়িত হইয়া ভারতে সপ্রেম অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছে। বণিক্ ও বিদেশিগণ ভারতে সর্বদা অতিথিবৎ সম্মানিত ও সংকৃত হইয়াছে। কলম্বাস্ ভারত আবিষ্কার করিতেই আসিয়াছিলেন। পূর্বাবিষ্কৃত পথ ছাড়িয়া নতুন পথে ভারত অন্বেষণের ফলে তিনি আমেরিকা পাইলেন। ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ হইতেই সভ্য জগতের দৃষ্টি ভারতের উপর নিবদ্ধ।

ভারতের অসীম ঐশ্বর্য্য ও অতুল সম্পদই ভারতকে অমর করিয়াছে। লোকসংখ্যায়ও ভারত জগতের শীর্ষস্থানীয়। মানব জাতির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ভারতে বাস করে। চীনের পরেই ভারতের স্থান এই বিষয়ে। পৃথিবীর প্রত্যেক পাঁচটি লোকের মধ্যে এক জন ভারতবাসী। আয়তনেও ভারত সুবৃহৎ। পূর্ব-পশ্চিমে এবং উত্তর-দক্ষিণে ভারত দুই হাজার মাইল দীর্ঘ। ইহার পরিমাণ বিশ লক্ষ বর্গ-মাইল। ইউরোপ হইতে রাশিয়া বাদ দিলে যাহা থাকে, ভারত আয়তনে তত বড়। ইহা একটি মহাদেশ তুল্য। ভারতের একটি সাধারণ জেলার পরিমাণ চারি হাজার বর্গ-মাইল। কোন কোন জেলা কোন কোন ইউরোপীয় দেশের মত বড়। আয়তন ও লোক-সংখ্যায় মাদ্রাজের ভিজাগাপটন জেলা দেনমার্ক অপেক্ষা বড়। সুইজারলণ্ডে যত লোক বাস করে তদপেক্ষা অধিক লোক বাস করে বাংলার মৈমনসিংহ জেলায়। বিহার প্রদেশের তিরহুত বিভাগের লোকসংখ্যা কানাডা অপেক্ষা অধিক। ভারতের আয়তন ইংলণ্ড ও ওয়েলস অপেক্ষা চল্লিশ গুণ বৃহৎ। পার্বত্য অংশাদি বাদ দিলে ভারতের তৃতীয়-চতুর্থাংশ কোন না কোন প্রকার চাষ হয়। ভারতীয় জমির প্রত্যেক একর হইতে ২২৫ টাকা মূল্যের ফসল জন্মিতে পারে। ভারতের জমি ইংলণ্ড অপেক্ষা কম উর্বর নহে; ভারতবাসী ইংরাজ অপেক্ষা কম বুদ্ধিমান্ নহে। তাহা সত্ত্বেও আমাদের এত হীনবুদ্ধি আসিল কিরূপে? দেশের ইতিহাস না জানাই সম্ভবতঃ ইহার প্রধান কারণ।

ভারতের ন্যায় অন্য কোন দেশ প্রাকৃতিক সীমার দ্বারা সংবেষ্টিত ও সুরক্ষিত নহে। ভারতের দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে অতল অপার

(১) Immortal India By L. H. Ajwani, Karachi.

সমুদ্র ; উত্তরে অভ্রভেদী হিমালয়। দুর্ভেদ্য হিমালয় পর্বত সিগফ্রিড লাইনের মত ভারতকে এশিয়া হইতে পৃথক্ করিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও সুদূর প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের সহিত জলপথে বাণিজ্যের সুবিধা ভারতের সমধিক আছে। ভারতের দক্ষিণাংশ ত্রিভুজবৎ উপত্যকা এবং বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বত দ্বারা পৃথকীকৃত। উত্তরাংশ পার্বত্য প্রদেশ। উক্ত অংশে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ সমূহ বিদ্যমান। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে হিমালয় আরও উচ্চ হইতেছে। তাহারই ফলে না কি বিহারের ভূকম্পাদি হইয়াছিল। উত্তরে সিন্ধু নদ হইতে দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরবর্তী সমতল ভূভাগ অতিশয় উর্বর। ভারতের এই অংশ মিনু মাসানির (২) মতে পৃথিবীর উর্বরতম প্রদেশ। ভারতের উপর হিমালয়ের প্রভাব অপরিসীম। দেশের জলবায়ুও এই পর্বতশ্রেণী দ্বারা পরিবর্তিত। মধ্য-এশিয়াস্থ মরুভূমির শুষ্ক বায়ুকে হিমালয় ভারতে প্রবেশ করিতে দেয় না। এই জন্য দেশের জলবায়ু এত প্রীতিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ। বৎসরের কয়েক মাস দেশের সকল অংশে জলবায়ু অতি মনোরম এবং কোন কোন অংশে সারা বছর সুন্দর। সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদ হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তর-ভারতকে উর্বর, স্বাস্থ্যকর ও শস্য-শ্যামলা করিয়াছে। সমুদ্র-বেষ্টিত বলিয়া মনসুনের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। এই দেশের ভূমি, অধিবাসী ও জলবায়ুর অসীম বৈচিত্র্য বর্ণনাতীত। দক্ষিণ প্রান্তস্থ কন্যাকুমারী বিষুবরেখার ৮ ডিগ্রী উত্তরে এবং কাশ্মীর-স্থিত গিলগিট ৩৪ ডিগ্রী উত্তরে। উষ্ণতম ও শীততম স্থান এই দেশে বর্তমান। সিন্ধু প্রদেশের জাকোবাবাদ সহরটি গ্রীষ্মকালে আফ্রিকার উষ্ণতম স্থানের ন্যায় গরম হয় এবং তখন তথায় তাপ ১২৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু হিমালয় প্রদেশে আবার শীতকালে এত শীত হয় যে, জল জমিয়া বরফ হয়। আসামের চিরাপুঞ্জী পাহাড়ে বৎসরে ৪৬০ ইঞ্চ জল হয় ; আবার সিন্ধু দেশের উচ্চাংশে বৎসরে মাত্র তিন ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। এই দেশ সাধারণতঃ বছরের আট মাস শুষ্ক এবং ৪ মাস আর্দ্র। মালাবারের পার্বত্য অঞ্চল যেমন মূল্যবান অরণ্যে পূর্ণ ও গাঙ্গ প্রদেশ যেমন উর্বর, রাজপুতানা, সিন্ধু ও কচ্ছ প্রদেশের মরুভূমিগুলি তেমনি অনুর্বর, শুষ্ক, বাসের অযোগ্য। ভারত প্রকৃতির অদ্ভুত লীলানিকেতন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও সম্পদে পরিপূর্ণ এমন দেশ জগতে আর নাই।

বিচিত্র জলবায়ুর জন্য ভারতবাসীর গায়ের রঙ কোথাও খুব গৌর, আবার কোথাও খুব কালো। কোন স্থানের লোক আফ্রিকার নিগ্রোর মত কৃষ্ণবর্ণ, কোন স্থানে আবার হিট্‌লারের নর্ডিকের মত গৌরবর্ণ লোক আছে। কেহ দীর্ঘবপু, কেহ বা অষ্ট্রেলিয়ার অরণ্যবাসীর ন্যায় খর্বাকৃতি। কেহ বা স্থূলকায় ও সবল, কেহ বা পাতলা ও দুর্বল। গত পঞ্চদশ শতাব্দী যাবৎ এই বৈচিত্র্য সমভাবে বিরাজমান। রাশিয়া ব্যতীত অন্য কোনও দেশে এত বিভিন্ন প্রকার মানুষ দৃষ্ট হয় না। চীন ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এত জনবল নাই। ভারত প্রায় চল্লিশ কোটি নরনারীর বাসভূমি। আমাদের যে সকল দ্রব্য আবশ্যক, সেই সকলই এই দেশে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে তুলা জন্মে না, আরবে আপেল নাই ; কিন্তু ভারতে তুলা ও আপেল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ভারতের স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মাণিক্য, কস্তুরী ও কর্পূর, রেশম-তুলা অন্যান্য দেশকে প্রলুব্ধ করিয়াছে। সুদূর অতীতেও ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্য জগৎ-প্রসিদ্ধ ছিল। ইংরাজ কবি মিলটন ভারত-সম্পদের কথা তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতে রৌদ্র ও বৃষ্টি এত প্রচুর যে, প্রায় সমস্ত জেলাতেই বছরে দুইটি ফসল এবং কোন কোন জেলাতে বছরে তিনটি ফসলও জন্মে।

কিন্তু জনবলই ভারতের প্রকৃত সম্পদ্। ইংরাজ মনীষী রাস্কিন সত্যই বলিয়াছেন, দেশের মূল্যবান্ সম্পদের মধ্যে সুস্থ, সবল ও সুখী নরনারীই শ্রেষ্ঠ ভারতবাসিগণ কোন দেশের মানুষের চেয়ে বল, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে পশ্চাৎপদ নহে। কালিফর্ণিয়ার ফলের বাগানে ও কৃষিক্ষেত্রে এবং ওরিগন, ওয়াশিংটন ও কলম্বিয়ার মিল ও কারখানা সমূহে ভারতীয়গণ কর্মপটুতায় আমেরিকান্, চীনা, কানাডিয়ান্, জাপানী বা মেক্সিকান অপেক্ষা কোন বিষয়ে হীন নহে। ভারতের পশু-সম্পদ্‌ও অতুলনীয়। হস্তী, সিংহ, গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি সর্বপ্রকার বন্য ও গৃহপালিত পশু এ দেশে আছে। কাথিয়াবাড়ের গির্ণার জঙ্গলে পশুরাজ সিংহ পাওয়া যায়। ভারত ব্যতীত একমাত্র আফ্রিকার জঙ্গলে সিংহ বাস করে, পৃথিবীর অন্য কোথাও নাই। সমগ্র পৃথিবীর গরুর এক-তৃতীয়াংশ এবং ছাগল ও ভেড়ার এক-সপ্তমাংশ ভারতে আছে। আমাদের দেশে আঠার কোটি গরু এবং ৮৭০ লক্ষ ছাগল ও ভেড়া থাকে। সূর্য্যের তেজ এ দেশে প্রচুর পাওয়া যায়। সূর্য্যকিরণের উপকারিতা বুঝিয়া প্রাচীনেরা সূর্য্যোপাসনা করিতেন। বর্তমান যুগেও সূর্য্যালোকের রোগনাশক শক্তি কার্য্যে লাগাইবার জন্য কাথিয়াবাড়ের জামনগর সহরে সূর্য্যভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রৌদ্রের প্রাচুর্য্য হেতু এই দেশে জলাভাব নাই। ভারতের জল-শক্তি আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও কানাডার পরেই পৃথিবীর মধ্যে সর্বোত্তম। জনৈক বৈজ্ঞানিক বলেন, —"ভারতের সর্বত্র বাষ্পচালিত কল প্রতিষ্ঠিত হইলে পৃথিবীর যত বিজলী প্রয়োজন সবই এই দেশে উৎপন্ন হইবে।" ভারতের তৃতীয়-চতুর্থাংশ ভূভাগে কিছু না কিছু ফসল উৎপন্ন হয়। কর্ষণযোগ্য জমির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ দশ কোটি একর ভূমি ঘন বনে আবৃত। কোন ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার বলিয়াছেন যে, ভারতের অরণ্য হইতে দশ কোটি টন কাঠ প্রত্যেক বৎসর পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে অরণ্যগুলি আদৌ পাতলা হইবে না। তুলা, চাল, গম, চিনি, চা, তামাক, কয়লা, লোহা প্রভৃতিও আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। পৃথিবীতে যত গম জন্মে তাহার শতকরা ৩০ ভাগ রাশিয়াতে, ১৬ ভাগ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে, ১১ ভাগ কানাডায়, ৭ ভাগ ভারতে, ৬ ভাগ ফ্রান্সে, ৬ ভাগ অষ্ট্রেলিয়াতে, ৫ ভাগ ইটালিতে ৪ ভাগ জার্মেনিতে, ৩ ভাগ তুর্কীতে, ১ ভাগ জাপানে এবং ১ ভাগ মিশরে হয়। পৃথিবীতে যত চাল উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ১৬ ভাগ এশিয়াতে জন্মে—চীনে ৩৫ ভাগ, ভারতে ২৬ ভাগ, জাপানে ১ ভাগ এবং বর্মায় ৬ ভাগ। পৃথিবীতে যত চিনি হয় তাহার শতকরা ১৮ ভাগ ভারতে, ১৬ ভাগ কিউবাতে, ৮ ভাগ জাভাতে, ৭ ভাগ ফরমোসাতে এবং ৬ ভাগ ব্রাজিলে। পৃথিবীজাত তামাকের শতকরা ২২ ভাগ ভারতে, ২৮ ভাগ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে, এবং ১২ ভাগ রাশিয়াতে। পৃথিবীর তুলার শতকরা ১৫ ভাগ ভারতে, ৪১ ভাগ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে, ১৩

(২) মিনু মাসানি প্রণীত "Our India" পুস্তকের ৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভাগ রাশিয়াতে, ১১ ভাগ চীনে, ৭ ভাগ ব্রাজিলে এবং ৬ ভাগ মিশরে জন্মে (৩)।

পৃথিবীতে যত চা হয়, তাহার ২৩ ভাগ ভারতে, ৪১ ভাগ চীনে, ১২ ভাগ সিংহলে, ৯ ভাগ ডাচ ইণ্ডিজে, ও ৬ ভাগ জাপানে জন্মে। ভারতের সকল খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত হয় নাই, উৎখাত হওয়া ত দূরের কথা। ভারতে কয়লা যথেষ্ট আছে। তবে সোভিয়েট রাশিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে আরও প্রচুর কয়লা আছে। যদিও ভারতের খনি সমূহে যাট হাজার মিলিয়ন টন কয়লা, তথাপি প্রত্যেক বৎসর ২৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উৎখাত হয়। পৃথিবীতে যত কয়লা উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ২ ভাগ ভারতে, ৩৯ ভাগ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে, ১১ ভাগ ব্রিটেনে, ১৫ ভাগ জার্মেনিতে, ৪ ভাগ ফ্রান্সে, ৪ ভাগ জাপানে, ২ ভাগ বেলজিয়ামে, ১ ভাগ চীনে এবং ১ ভাগ দক্ষিণ-আফ্রিকাতে জন্মে। ভারতে লোহার খনিও যথেষ্ট আছে। বৈজ্ঞানিকগণের মতে ফ্রান্স এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যের পরেই এই বিষয়ে ভারতের স্থান! ভারতের কয়লা গুণেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কয়লার মধ্যে গণ্য। কিন্তু আমাদের দেশে কয়লা প্রচুর থাকিলেও তাহার সামান্য এক অংশ মাত্র ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীতে যত লোহা তৈরী হয় তাহার শতকরা মাত্র ২ ভাগ ভারতে, ৪৯ ভাগ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে, ১১ ভাগ রাশিয়াতে, ১৩ ভাগ ফ্রান্সে, ১১ ভাগ সুইডেনে, ৫ ভাগ ব্রিটেনে, ৪ ভাগ জার্মেনিতে, ২ ভাগ নরওয়েতে এবং ১ ভাগ অষ্ট্রেলিয়াতে হয়। সোভিয়েট রাশিয়া ব্যতীত অন্য কোনও দেশে এত ম্যাঙ্গানিজ নাই। ১৯৩৬ সালে সোভিয়েট রাশিয়া ২২২৬০০০ মেট্রিক টন ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তুত করিয়াছিল। পৃথিবীর ম্যাঙ্গানিজের প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ ৮১৪০০০ মেট্রিক টন ভারতেই উৎপন্ন হইয়াছিল। পৃথিবীতে যত ম্যাঙ্গানিজ হয়, তাহার শতকরা ১৬ অংশ ভারতে, ৫২ অংশ রাশিয়াতে, ৭ অংশ জার্মেনিতে, ৫ অংশ দক্ষিণ-আফ্রিকায়, ৩ অংশ ব্রাজিলে এবং ১ অংশ জাপানে হয়। যে ভারতের এত সম্পদ এত প্রাচুর্য, তাহার এত দুঃখ, দৈন্য ও দারিদ্র্য কেন? অমর ভারত মৃতপ্রায় কেন? জাতীয় অনৈক্য, ইতিহাসে অজ্ঞতা এবং পরাধীনতাই আমাদের সর্বনাশের মূল।

ভারতের অনন্ত ধন-সম্পদ্ থাকা সত্ত্বেও ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার লোকের মত ভারতবাসী এক বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। বিদেশীয় শাসক ও শোষকগণ আমাদের অন্নে পরিপালিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। অভিজ্ঞগণের মতে ভারতীয় কৃষক তাহার স্ত্রী ও তিনটি সন্তান লইয়া মাসিক মাত্র ২১৲ টাকায় জীবন ধারণ করে। অনাহারে ভারত অর্ধমৃত। ভারতীয় শিশুগণ ভূমিষ্ঠ হইবার এক বৎসরের মধ্যেই মাছির মত মরিয়া যায়। সুইডেন অপেক্ষা ভারতে শিশুর মৃত্যু-সংখ্যা চতুর্গুণ অধিক। আমাদের শাস্ত্রে আছে, ভারতবাসীর বয়স সাধারণতঃ এক শত বৎসর। কিন্তু বিদেশীয়গণের লুণ্ঠনে এই দেশ এত দরিদ্র হইয়াছে যে, আমাদের দেশের লোকের পরমায়ু ২৭—৩০ বৎসর মাত্র। ফরাসী দেশবাসী ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত এবং নিউজিল্যাণ্ড-বাসী ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত সবল ও সুস্থ থাকে। নরওয়ে ও সুইডেনের সাধারণ আয়ু ৬৩, ব্রিটেনের এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ৬২, কানাডার ৬০, রাশিয়ার ৪৫, জাপানের ৪৩, এবং মিশরের ৩৩।

এই তুলনা-মূলক তালিকা দৃষ্টে প্রমাণিত হয়, ভারতবাসীর আয়ু সর্বাপেক্ষা কম। ভারতবাসীর বার্ষিক আয় ৬৪।৶০ বা মাসিক আয় মাত্র সাড়ে ৬৲ টাকা। যে পরিবারে ৫টি লোক আছে তাহাদের কি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ হয় একবার ভাবিয়া দেখুন। যে দেশের মাটীতে সোনা ফলে, যে দেশের জলবায়ু এত স্বাস্থ্যকর, যে দেশের দৃশ্য এত সুন্দর, যে দেশের সভ্যতা এত প্রাচীন, যে দেশে পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ লোকের বাস সে দেশে এত দারিদ্র্য, এত দুঃখ, এত দৈন্য কেন? অমর ভারত আজ মৃতপ্রায় কেন—এই বিষয়ে সকলে চিন্তা করুন।

১৯৪১ সালে যে লোকগণনা হইয়াছিল, তাহা হইতে জানা যায়, শতকরা ৯০টি ভারতবাসী গ্রামে বাস করে এবং শতকরা ৭২ জন চাষের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে কোটি কোটি চাষী বাস করে। দশ জন ভারতবাসীর মধ্যে ৭ জন চাষী, ১ জন কারখানার কর্মী, ১ জন দোকানদার বা কেরাণী, অবশিষ্ট এক জন ব্যবসায়ী, উকিল, জমিদার বা ডাক্তার।

অধিকাংশ কৃষকের নিজস্ব জমি নাই। উহাদের মধ্যে জমিদারের সংখ্যা অতি অল্প। এক হাজার কৃষকের মধ্যে ১৯২১ সালে ২৯১ জনের এবং ১৯৩১ সালে ৪০৭ জনের জমি ছিল না। মোটের উপর তিন জন কৃষকের মধ্যে এক জনের জমি নাই। যাহাদের জমি নাই তাহারা জমিদারের জমি ধার লইয়া চাষ করে, বা সামান্য পারিশ্রমিকে কাজ করে। ভারতের ন্যায় আমেরিকাতে এত অধিক লোক গ্রামবাসী নহে। তাহা সত্ত্বেও ও-দেশে শতকরা ২৫ জন শ্রমিক জমিতে কাজ করে। কিন্তু ইংলণ্ডে অধিকাংশ লোক সহরবাসী। সেই জন্য উক্ত দেশে শতকরা ১০ জন মাত্র শ্রমিক কৃষক; বাকী সব শ্রমিক সহরে থাকিয়া কারখানায় কাজ করে। দুই শত বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডে এত কারখানা ছিল না। শিল্পের সমধিক উন্নতি করিয়া ইংলণ্ড এত ধনী হইয়াছে। ভারতে ঐরূপ বিপ্লব আসিবে কি না কে জানে? কিন্তু ইতিহাস হইতে প্রতীত হয়, ভারত পল্লীপ্রাণ। ভারত সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে কৃষকের দেশই থাকিবে। সহর ও শিল্পের সমৃদ্ধি সত্ত্বেও ভারতে কৃষকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। শ্রীজ্ঞানচাঁদ তাঁহার গ্রন্থে (৮) লিখিয়াছেন যে, ১৯৪৮ সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা সাড়ে ৪২ কোটি হইবে। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায়, অধিকাংশ ভারতবাসী কৃষিজীবী আছে ও থাকিবে। কিন্তু এই বিশাল দেশের বিপুল জনসংখ্যার গ্রাসাচ্ছাদন কিরূপে অন্য দেশের মত উন্নত হইতে পারে?

জমির আয়বৃদ্ধি না হইলে কৃষকের আর্থিক অবস্থা উন্নতির উপায়ান্তর নাই। ইংলণ্ডের প্রতি একর জমিতে ২২৫৲ টাকা আয় হয়। কিন্তু ভারতে তাহার সম্ভাবনা এখনও হয় নাই। এই দেশে কর্ষণযোগ্য ভূমির এক-চতুর্থাংশ হইতে এক-তৃতীয়াংশ জমির আবাদ হয় না। যে সকল জমি আবাদ হয় তাহার প্রতি একরে মাত্র ৫৬৲ টাকার ফসল জন্মে। ইংলণ্ডে প্রতি একরে ইহার চারি গুণ এবং জাপানে ইহার তিন গুণ অধিক ফসল উৎপন্ন হয়। ইংলণ্ডে এক একর জমিতে দুই হাজার পাউণ্ড শস্য জন্মে;

(৩) মিনু মাশানীর Our India' (২২-২৩ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

(৪) India's Teeming Millions by Gyanchand, Published by Allen & Unwin.

কিন্তু ভারতে মাত্র ৬১° পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৩৪৫ সের। জাভা দ্বীপের এক একর জমিতে ৪° টন আখ হয়, আর ভারতে মাত্র টন আখ! ১° তুলা আমাদের দেশের আর একটি পণ্য দ্রব্য। প্রতি একর ভূমিতে ভারতে মাত্র ৯৮ পাউণ্ড তুলা হয়, কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ২°° পাউণ্ড এবং মিশরে ৪৫° পাউণ্ড তুলা জন্মে। ইহার কারণ আর কিছু নহে। ভারতীয় কৃষক অনাহার, বস্ত্রাভাব, অশিক্ষা ও অজ্ঞতায় জীবন্মৃত এবং বৎসরের এক-তৃতীয়াংশ কাল নিষ্কর্মা। আমাদের গৃহপালিত পশু অযত্নে, অনাহারে ও অব্যবহারে জীর্ণ-শীর্ণ। আর এ দেশের জমিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত, সারের অভাবে অনুর্বর; কোথাও জলাভাব, কোথাও বা জলাধিক্য। রাজা অশোকের আমলে ভারতীয় ভূমির চাষ যে ভাবে হইত এখনও সেই মামুলি প্রথায় চলিতেছে। অথচ পাশ্চাত্য দেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ হইতেছে। বর্তমান অবস্থা সহজে অতিক্রান্ত হইবে যদি আমরা সমষ্টি ভাবে ইহার প্রতিকারে তৎপর হই। আমাদের এই দুরবস্থার অপরের উপর দোষ দেওয়া সমীচীন নহে। পাঞ্জাবে এই প্রবাদটি প্রচলিত আছে—'জমিদার কী বে-আকৃকালি, পরমেশ্বর কা কুসুর।' অর্থাৎ যদি কৃষক বোকা হয়, দোষটা ভগবানের। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দোষ আমাদের, অন্য কাহারো নহে। দোষ স্বীয় স্কন্ধে চাপাইয়া যাহারা উহা দূরীকরণে বদ্ধপরিকর তাহারাই বুদ্ধিমান্। অপরে নির্বুদ্ধি।

জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য সার দেওয়া প্রয়োজন। সারে নাইট্রোজেন, পোটাসিয়াম, ফসফোরাস ও লাইম (চুণ) পদার্থ আছে। এই সকল সার যে জমিতে থাকে তাহাতে অধিক ফসল জন্মে। এইগুলি যখন ফসলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় তখন জমি সার-শূন্য ও অনুর্বর হয়। প্রতি একর জমিতে বছরে ২° পাউণ্ড নাইট্রোজেন ফসলের মধ্যে চলিয়া যায়। ছাই, হাড়, গোবর ও চুণ জমিতে ফেলিলে এই সার বাড়ে এবং জমি পুনরায় উর্বর হয়।

ইউরোপীয়গণ ভারতে আসিবার পূর্বে ভারতীয় কৃষকগণ জানিত, কি ভাবে অন্য উপায়ে জমিকে উর্বর করা যায়। তাহারা একই জমিতে পর পর বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন করিত। এক ফসলে যে সার ভূমি হইতে শোষণ করিয়া লয় অন্য ফসল তাহার কিঞ্চিৎ ভূমিতে প্রত্যর্পণ করে। গোবর সাধারণতঃ ভারতীয় কৃষকগণ জমিতে ঢালে। গোবর সহজপ্রাপ্য এবং উহাতে নাইট্রেট, চুণ, পটাশ এবং অন্যান্য লবণ বিদ্যমান। উহা পূর্ণ সার না হইলেও উহা জমিতে মিশাইলে শস্য অধিক জন্মে। কিন্তু আমাদের দেশে গোবরকে ঘুঁটে করিয়া পোড়াইয়া ফেলা হয় রন্ধনের জন্য; এইগুলি জমিতে ফেলিলে অধিক লাভ হইবে। গোময় যে শুধু জমিতে রাসায়নিক ক্রিয়া করে তাহা নহে, উহা আঁঠালো মাটিকে বালিযুক্ত ও সরস করে। গোময় হইতে এক প্রকার বীজাণু জন্মে; ঐগুলিও ভূমির শস্যোৎপাদক শক্তি বর্ধন করে। সার না দেওয়াতে এক একর জমিতে ১৩৭৪ পাউণ্ড শস্য এবং ২১৭৪ পাউণ্ড খড় হইত। গোবর দেওয়াতে উক্ত জমিতে ৩৫৫৬ পাউণ্ড শস্য এবং ৪৭৭১ পাউণ্ড খড় হইল। কিন্তু গোবর অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট সার বোনামিল ও সল্টপিটার। একই জমিতে এই নূতন সার দেওয়াতে ৪৩৮১ পাউণ্ড শস্য এবং ৬১৭৮ পাউণ্ড খড় জন্মিল। অর্থাৎ একই জমিতে তিন গুণ অধিক শস্য উৎপন্ন হইল। সার দ্বারা জমির উর্বরতা এত বাড়ে। সার দিলে তুলাও বেশী হয়। এক একর জমিতে সার ব্যতীত ৫° পাউণ্ড তুলা জন্মিত। উহার মাটীতে ৪ টন গোবর মিশ্রিত করার ফলে ৮° পাউণ্ড তুলা ফলিল। কিন্তু সেই জমিতে যখন এক হন্দর নাইট্রেট অব্ সোডা, এক হন্দর সুপারফসফেট এবং এক হন্দর কাইনিট দেওয়া হইল, তখন ১৫° পাউণ্ড তুলা হইল। আবার উহাতে ২ হন্দর চীনে বাদামের গুঁড়া, সুপারফসফেট ও কাইনিট দেওয়াতে ২°° পাউণ্ড তুলা ফলিল অর্থাৎ এই সার দ্বারা জমির উর্বরতা ৪ গুণ বাড়িল।

খনিজ দ্রব্যকে বৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যবহার করিলে গোবর অপেক্ষা অধিক সুফল প্রসব করে। তবে কোন্ জমির কি সার প্রয়োজন তাহা রাসায়নিকের সাহায্যে নির্ণয় করিতে হইবে। যে জমিতে যে সারটির অভাব তাহাই আবশ্যকীয় পরিমাণে উহার মাটিতে মিশাইতে হইবে। কিন্তু গোবরকে জমিতে সাররূপে ব্যবহার করার জন্য উহাকে পোড়ান বন্ধ করা দরকার। ঘুঁটের পরিবর্তে কাঠ রন্ধন-কার্য্যে ব্যবহার করিলে ঘুঁটে জমিতে সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ভারতে কাঠের অভাব নাই। ভারতের কর্ষণযোগ্য ভূমির এক-পঞ্চমাংশ জঙ্গলাকীর্ণ, ইহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এ দেশের দশ কোটি একর জমিতে জঙ্গল আছে, এবং এই জঙ্গল হইতে প্রত্যেক বৎসর ছয় কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য পাওয়া যায়। জল-বায়ু উত্তম হওয়ায় দশ কোটি টন কাঠ উক্ত জঙ্গল হইতে প্রত্যেক বৎসর নেওয়া সত্ত্বেও জঙ্গল প'তলা বা নষ্ট হইতেছে না। গণ্ডরা যে 'বনের গান' গায়, তাতে আছে—আম, তেঁতুল, কলা, কাচনার ফুল বা তুলসী-চারা পুঁতিলে খুব জল দিতে হয়, নচেৎ এইগুলি বাঁচে না। কিন্তু বনের গাছগুলিতে জল ঢালিতে হয় না। তাহা সত্ত্বেও বনগুলি বাঁচে ও বাড়ে।' অবশ্য রাজপুতানা ও সিন্ধু দেশে বন নাই, কিন্তু সেই সকল প্রদেশে অন্য স্থান হইতে কাঠ আমদানি করা সম্ভব। জনৈক ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ারের মতে জমির ফসল বিশ গুণ অধিক হইলে অন্য স্থান হইতে কাঠ আমদানির খরচও জমি হইতেই উঠিতে পারে। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, জমিতে সার দিলে উহার উৎপাদনী শক্তি মাত্র বিশ গুণ নহে, দুই শত হইতে তিন শত গুণ বাড়িয়া যায়। প্রত্যেক কৃষকের বাড়ীতে মাথা-পিছু অন্ততঃ একটি গরু থাকে। যে বাড়ীতে ৫টি লোক তাহাদের অন্ততঃ পাঁচটি গরু আছে। প্রত্যেক গরু বছরে ১ ২/৩ টন গোবর দেয়; সুতরাং ৫টি গরু বছরে ৫×১ ২/৩=৮ ১/৩ টন গোবর পাওয়া যাইবে। মাত্র দুই টন শুকনো কাঠে উক্ত পরিমাণে জ্বালানী হইতে পারে। পল্লীময় ভারতে তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ কৃষক-পরিবার বাস করে। ঐ সকল পরিবারের ব্যবহারের জন্য ৬ কোটি ৮° লক্ষ টন শুকনো কাঠের প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের বনে-জঙ্গলে প্রত্যেক বৎসর ১° কোটি টন কাঠ পাওয়া যায়। সমগ্র ভারতের জ্বালানী কাঠ সরবরাহ করার পরেও ৩ কোটি ২° লক্ষ টন কাঠ উদ্বৃত্ত থাকে।

[আগামী বারে সমাপ্য।

বংশীধর —রামকিঙ্কর সিংহ

যৌবন —ননী পাত্র

—পরিমল গোস্বামী

বার্দ্ধক্য

নর্ত্তকী

-বাপি সরকার

জলে

—বিশ্বনাথ মণ্ডল

স্থলে

মনোবীণ রায়

নৃত্য

—নির্মলকুমার

দিগন্ত

দ্বিতীয় পুরস্কার)

নিয়মাবলী

প্রত্যেক মাসে প্রতিযোগিতায় একমাত্র সৌখীন (এ্যামেচার) আলোকচিত্র-শিল্পীদের ছবি গৃহীত হইবে।

ছবির আকার ৬" × ৮" ইঞ্চি হইলেই আমাদের সুবিধা হয় এবং যত দূর সম্ভব ছবি সম্বন্ধে বিবরণ থাকাও বাঞ্ছনীয়। যথা, ক্যামেরা, ফিল্ম, এক্সপোজার, এ্যাপারচার, সময় ইত্যাদি।

যে কোন বিষয়ের ছবি লওয়া হইবে। অমনোনীত ছবি ফেরৎ লওয়ার জন্য উপযুক্ত ডাক-টিকিট সঙ্গে দেওয়া চাই। ছবি হারাইলে বা নষ্ট হইলে আমাদের দায়ী করা চলিবে না, সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। খামের উপর "আলোক-চিত্র" বিভাগের এবং ছবির পিছনে নাম ও ঠিকানার উল্লেখ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

প্রথম পুরস্কার দশ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার আট টাকা, তৃতীয় পুরস্কার পাঁচ টাকা এবং অন্যান্য বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হইবে।

দিনান্ত (প্রথম পুরস্কার) —সুশান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

বিশ্রান্ত

-রমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

(তৃতীয় পুরস্কার)

—বর্না ৮০

ধান্যশ্রী

—শিশির চৌধুরী

পণ্ডিত নসীরামের দরবার

মাইকেল মধুসূদনের পর বিচিত্র কবি-জীবন যাপন করতে অনেক অকবিকেও দেখা গিয়েছে কিন্তু কবিদের মধ্যে মাত্র এক জনকে—তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। সম্প্রতি বিদ্রোহী কবির উনপঞ্চাশৎ জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়ে গেল। বর্তমানে তিনি অসুস্থ, কিঞ্চিৎ দুঃস্থও বটে এবং তারই সুযোগ নিয়ে দলগত রাজনীতিতে—সম্ভবতঃ তাঁর বিনা অনুমতিতেই—তাঁর নাম জড়ানো হচ্ছে। বাংলা সরকার তাঁর জন্য সামান্য মাসোহারারও বন্দোবস্ত করেছে। পাঁচ বছরের উপর তিনি অসুস্থ, পাঁচ বছরের বেশি তাঁর কলম অচল। সে কলম আবার কখনো চলবে কি না জানি না। না চললেও তাঁর দুঃখ নেই, বাংলা-কাব্যের ইতিহাসে, সঙ্গীতের ইতিহাসে তাঁর কলকণ্ঠ অমর হয়ে থাকবে।

কবি হিসাবে গৌড়জনের সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ কাজী নজরুলের পক্ষে যেমন সহজ হয়েছে এমন আর কারো নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও নয় বলা বাহুল্য। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিস্তৃত জন-সমাদরের অনেক আগেই 'কাজীর গান'এর ঢেউ বয়ে গেছে বাংলা দেশে। ১৯১৮ সালে মাত্র উনিশ বছর বয়সে যুদ্ধে যোগ দিয়ে কাজী নজরুল গিয়েছিলেন মেসোপটেমিয়ায়। ফিরে আসার পর তাঁর কাব্য-গ্রন্থ 'অগ্নি-বীণা' প্রকাশিত হল এবং সেই সঙ্গে তাঁর খ্যাতি রটল বাংলাময় আকস্মিক ভাবে এবং বিদ্যুৎগতিতে। ঐ বয়সেই সুরু হল তাঁর সম্বর্ধনা বাংলার সকল প্রান্তে। তাঁর কবিতার বই, গানের বই যা বিক্রি হল নোবেল প্রাইজের পর রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ছাড়া অত অল্প সময়ে অত বেশি বই জীবিত অবস্থায় আর কোন ভারতীয় কবির বিক্রি হয়নি।

তার পর অসুস্থতার পূর্ব পর্যন্ত একের পর এক তাঁর গান ও কবিতা বের হতে লাগল এবং তাঁর সমাদর বেড়েই চলল উত্তরোত্তর। কবি হিসাবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হল। অথচ কাজী নজরুল নিজে কখনও ভাবতে পারেননি যে কবিতা বা গান লিখে তিনি বিখ্যাত হবেন। স্কুল-জীবনে তাঁর সহপাঠী অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। দুই সাহিত্যযশপ্রার্থী কিশোর তখন দিবারাত্র সাহিত্যচর্চা করতেন; কাজী নজরুল লিখতেন গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের রাত্রে ঘুম হত না কবিতার মিল খুঁজে। পরস্পরে পরস্পরকে লেখা পড়ে শোনাতেন এবং দুই কিশোরের মনেই যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যেত শুষ্ক গদ্যলেখক ও ভাব-প্রবণ কবি দ্বারা যথাক্রমে তাদের মহাকাব্যের ও সারবান গদ্যের সম্পূর্ণ রসাস্বাদন সম্ভব কি না। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের বিচিত্র কবি-জীবনের সব চেয়ে বড় অসঙ্গতি বা বৈচিত্র্য তার ব্যক্তিগত জীবন। কাজী নজরুল জাতে বাঙ্গালী, ধর্ম্মে মুসলমান বলে তাঁর যথেষ্ট গর্ব আছে কিন্তু বিবাহ করলেন অমুসলমানকে, দুই ছেলের নামকরণে স্মরণ করলেন চীনা সান ইয়াত সেনকে এবং পথের দাবীর সব্যসাচীকে এবং শেষ পর্যন্ত তন্ত্রোক্ত উপায়ে কালীসাধনা সুরু করলেন এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিয়ে রচনা করলেন শ্যামা-সঙ্গীত। প্রথম যৌবনে সরকারের হয়ে যুদ্ধ করলেন মেসোপটেমিয়ায়, মধ্য-যৌবনে কারাবাস করলেন স্বদেশী আন্দোলনে এবং এখন উত্তর-জীবনে সরকারী বৃত্তিই হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর জীবিকার সংস্থান।

যৌবনে এক হিন্দু-মুসলমান জমিদার-পরিবারের এক আধুনিকার প্রতি নজরুল আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর খ্যাতি ছিল, অর্থ ছিল না; তাই আধুনিকার আসরে তিনি সম্মান পেলেন কিন্তু অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারলেন না। অবিলম্বে কাজী নজরুল কারণ আবিষ্কার করে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আসর ছেড়ে উপস্থিত হলেন প্রকাশকের কাছে এবং প্রস্তাব করলেন তাঁর কোন বইয়ের কপি-রাইট লিখে দেবার। পরের দিন আধুনিকার আসরে যারা এল সবাই শুনল, "দিদিমণি বেরিয়ে গেছেন—"

"একা না কারো সঙ্গে?"

"এক বাবু এসেছিলেন; তাঁর নতুন মোটরে বেড়াতে গেছেন দিদিমণি—"

"বাবু? কোন্ বাবু? ব্যারিষ্টার অরিন্দম রায় না ইসলামপুরের জমিদার হবিব চৌধুরী?"

"আজ্ঞে, কবি নজরুল ইসলাম—"

(নিগ্রো গল্প)

ক্লডি ম্যাক্‌কে

গানটা থেমে গেল। শ্রোতারা অভিভূত ; স্তব্ধ, অবাক্‌। সকলে উন্মুখ হয়ে রইল পরবর্তী দৃশ্যের জন্য। ধীরে ধীরে যবনিকা উঠতেই দেখা গেল, ক্যালিকো ছিটের পোষাক-পরা একটি মেয়ে ছোট্ট একটা শিশুকে কোলে নিয়ে দোলাচ্ছে আর গুন্‌গুন্ করে বুঝি গাইছে গ্যালিক্ কোন গ্রাম্য গীতিকার কয়েকটা কলি। আরও দেখা গেল, সালু-মোড়া একটা বাক্সের উপর বসে আছে ইস্কুলের ফ্রক-পরা ছোট্ট একটি মেয়ে। একটা সেমিজ সারাচ্ছে সে। আর তার ছোট্ট বোনটি দিদির পায়ের কাছে বসে একটা ছবির বই ওল্টাচ্ছে। কিছু দূরে কালো বার্ণিস-করা এক জোড়া রেল-লাইনের উপর সবুজ আর লাল রঙের ছোট্ট একটা রেলগাড়ী নিয়ে এক মনে খেলছে তিনটি ছেলে। তালি-লাগানো তাদের প্যান্টগুলি ; আর আস্তিন গুটানো সার্টের। বুঝি সুখী কোন এক নিগ্রো-পরিবার। সেকেলে ধরণের একটা বসবার ঘর ; ভাঙা-চোরা খান-দুই চেয়ারও রয়েছে। দেয়ালে মোড়ান কাগজগুলি ছিঁড়ে গেছে এখানে-ওখানে। তাকে ঝুলছে 'হোলি ভার্জিনে'র একটা প্রতিমূর্তি। সুখী পরিবার! মদের বোতলের মত মোটা গোলগাল কর্তাকে এবার দেখা গেল হেলে-দুলে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করতে। ছেলে-মেয়েরা সবাই লাফিয়ে উঠল আনন্দে। ছেলে কোলে নিয়ে গিন্নীও।···

ওস্তাদের কালো কাঠি আন্দোলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হোল অর্কেষ্ট্রা। প্রহসনে অভিনয়-রত সুখী পরিবারটি এবার গেয়ে উঠল। নাচ শুরু হোল। কোলের বাচ্চাটার অভিনয়ও আশ্চর্য কি চমৎকার। সাত জনের সুখী সুন্দর পরিবার। এরা নামকরা মার্কিণী পরিবার। বিচিত্র অনুষ্ঠান।···

অনুষ্ঠান সমাপ্ত হোল এই অঙ্কের পর। 'কালা আদমীদের স্বর্গ' থেকে নেমে এল বার্কলে ওয়াস আর তার স্ত্রী রোডা। ৫০ নম্বর রাস্তা ধরে কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে ওরা মাঝ-পথ থেকে হারলেমের লোক্যাল ট্রেণ ধরল। যা ভিড় প্যাসেঞ্জারদের। জায়গা পাবার কি জো আছে? ভিড় এড়াবার জন্য দ্রুতগামী ট্রেণে গেল না ওরা।

আর সকলেও বুঝি ভিড় এড়াবার জন্যে তাদের পন্থাই অবলম্বন করেছে। তিল-ভর যদি জায়গা থাকত গাড়িতে। একটা গাম বার করে রোডা চিবুতে লাগল। মুখখানা তার একটু বড়োই। হাঁ করে এমন ভাবে চিবুচ্ছিল, মনে হচ্ছিল সে বুঝি কিছু খাচ্ছে। মুখের ভিতরটাও বেশ খানিকটা দেখা যায়। ভারী বিশ্রি লাগে বার্কলের। তাদের যখন প্রথম বিয়ে হয় এ কথাটা সে অনেক বার বলেছে রোডাকে :

'ভারী তো একটু গাম খাওয়া ; তাতে কারো চোখ টাটাবার কি থাকতে পারে শুনি?'

মুখ ভার করে জবাব দিয়েছিল রোডা। তার পর বুঝি বার্কলের মুখটা দু'হাতে সে তুলে ধরেছিল। মিষ্টি গাম-চিবানো ঠোঁটে তাকে চুমু খেয়ে একরূপ বুঝি কেঁদে উঠেছিল : 'হ্যাঁ গো খোকা, হ্যাঁ!'···

'শোটা কিন্তু ভারী চমৎকার, কি বলো? রোডা বলে উঠল। আমার কিন্তু ভালো লাগল না। এর চাইতে আমাদের হারলেমের গুণ্ডাখানা ঢের ভালো ছিল।'

'আমি তা মনে করি না। কালা আদমীদের ও-সব বাসি সস্তা অভিনয় শুনে শুনে তো কান দু'টি ঝালাপালা হয়ে গেল। শহরতলীর সব কিছুই আমার ভালো লাগে।'

রোডা সশব্দে আবার গাম চিবোতে লাগল। কি যেন একটা বলতেও গিয়েছিল উদ্দেশ্যবিহীন। কিন্তু গলা তার শোনা গেল না। মহানগরীর মুখর কোলাহল আর ট্রেণের ঝুপাঝুপ শব্দে কণ্ঠস্বর তার মিলিয়ে গেল! সহযাত্রীদের অসম্বদ্ধ টুকরো টুকরো কথাও ভেসে আসতে লাগল। ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে থাকা সহযাত্রীদের দিকে চোখ তুলে তাকাল বার্কলে হাল্‌কা ভাবে। দু' পায়ের উপর ভর করে কেউ বুঝি দাঁড়িয়ে নেই। গুদাম ঘরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মোটা মোটা থলে আর স্তূপাকার করে রাখা বাক্স-পেটরার মত সবাইকে যেন গাদা করে রাখা হয়েছে গাড়ির মধ্যে। সবাই যেন এক সঙ্গে খোঁয়াড়ের পশু! আগে-ভাগে এসে যারা নিজেদের একটু ঠাঁই করে নিয়েছিল, ফলে তাদের অবস্থা আরও সঙীন হয়ে উঠল।

'ভেবেছিলুম গাড়ীতে চেপে একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচবো। কিন্তু তার যদি কোন উপায় থাকতো!'

বার্কলে বললে এক সময়।

'১২ নম্বর রাস্তাটার পর থেকে একটু বুঝি খালি হতে পারে গাড়িটা। রোডা জবাব দিল—'তখন হয়তো অনেকে নেমে যাবে।'

'বল যায় না, অনেকে আবার উঠতেও তো পারে? নিউ ইয়র্ক শহরটা আজকাল যেন মৌমাছির একটা চাক। গিজ-গিজ করছে লোকে।'

'হাঁ, দিন দিন যা লোক বাড়ছে।' সায় দিল রোডাও।

১৩২ নং রাস্তায় এসে ওরা ট্রেণ থেকে নেমে পড়ল। তার পর পা বাড়াল বাড়ির দিকে। অভ্যাস মত রোডা স্বামীর বাহুর নিচে হাত চালিয়ে দিল। পথের দু'ধারের রেস্তোরাঁ, স্যালুন আর মিষ্টির দোকানগুলিতে ভিড় ভয়ানক লোকের। থিয়েটার ভাঙার পর 'চোপ-স্বই' প্যালেসে বেচাকেনা খুবই হচ্ছে।

'একটু চোপ-স্বই খেয়ে গেলে হোত না?' বার্কলে প্রস্তাব করলে।

'না; আজ থাক। বেটসিকে রেখে এসেছি হাউল্যাণ্ডসদের বাড়ীতে। রাত হয়েছে। ওদের শোবার সময় হয়েছে।' রোডা জবাব দিলে।

'ওঃ, তাই তো! বেটসির কথা বার্কলে ভুলেই গিয়েছিল এতক্ষণ। চার বছরের মেয়ে তাদের বেটসি। ওর কথা তার কেন প্রায় মনেই থাকে না। সে যে এখন পিতা—একটা পরিবারের কর্তা—একথাটা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। রেলগাড়ির স্যালুনের এক জন সে খানসামা। বয়সও তার ছত্রিশ হতে চলল। তবু এখনও সে মনে করে নিজেকে পরের হুকুম তামিল করা পরিবেশনকারী এক জন খিদমৎগার বলে—এক জন খানসামা মাত্র। যাদের সে খাবার পরিবেশন করে তারাও তাকে জানে এক জন খানসামা বলে—দেখে পরিবেশনকারী সাধারণ একটা 'বয়' এই চোখে; ভালো একটা কুকুরের মতই কদর তার। মাঝে মাঝে চটে গিয়ে সে যখন হুকুম মাফিক কাজ তামিল না করে, ওরা তখন খেঁকিয়ে ওঠে তার উপর; যেন অবাধ্য সে কোন এক কুকুর! দায়িত্বশীল স্বামী আর পিতা সে, তবু ভালো লাগে তার অবাধ্য কোন খানসামা

'বয়ে'র মত ব্যবহৃত হতে। রেগে-মেগে গিয়ে মনটা যখন তার খিট্‌খিটে হয়ে উঠে, ছেলেমানুষের মত ব্যবহার করেতে তার তখন খুব ইচ্ছে হয়। রোডা কিন্তু তার ওই অবস্থাকে তলিয়ে দেখে না একটুও। বড় কর্তার মত সে দেখে তাকে মহা সমীহের চোখে।···

তারা সোজা বাড়ি ফিরে এল। বার্কলে আলো জ্বাললে। তিনখানা ঘর তাদের। হলঘরটা পেরিয়ে রোডা বেটসিকে আনতে গেল ফাউল্যাগুসদের বাড়ি। ঘুমন্ত বেটসিকে সে বুকে জড়িয়ে নিয়ে এল। বার্কলের কাছে এসে সে একটুখানি নীচু হয়ে দাঁড়াল, বার্কলে যেন ঘুমন্ত মেয়েকে চুমু খেতে পারে। ড্রেসিং টেবিলের পাশে বেটসির ছোট খাটটাতে রোডা মেয়েকে শুইয়ে রাখল তার পর।

ঠাণ্ডা কিছুটা মুরগীর মাংস আর বিয়ার খেয়ে রাত্রির খাবারটা ওরা সেরে নিল। সামনের ঘরখানাই ওদের শোবার ঘর। ওরা শোবার ঘরে গেল। অপর ঘরখানা ট্রেনের আর এক খানসামাকে ওরা ভাড়া দিয়েছে। খাবার ঘরটাই এখন ওদের খাবার আর বসবার ঘর দুই।

রোডা এবার কাপড় ছাড়ল। মুখ আর সর্বাঙ্গে সে ঠাণ্ডা ক্রিম মেখে নিল। তার পরে গলার চার দিকে গোলাপী ফিতে-বাঁধা শাদা লম্বা একটা গাউন পরে নিয়ে দেয়াল ঘেঁসে সে শুয়ে পড়ল। বার্কলেও তার অন্তর্বাস পরে রোডার পাশে গিয়ে শুল। বিয়ের ছয় মাস বার্কলে অবশ্য নিয়মিত তার পায়জামা পরে ঘুমোত। তার পর থেকে সে আর অত গা করে না। ছেলেবেলাকার গ্রাম্য বালকের অভ্যাসে ফিরে যেতে তার বুঝি ভালো লাগে। প্রথম প্রথম রোডা তুমুল আপত্তি তুলেছিল। এখন অবশ্য সে কিছু আর বলে না। তার বুঝি গা-সহা হয়ে গেছে।···

তার পর ঘুম—মধুর ঘুম···

পাঁচটা বাজতেই রোডা পরদিন বার্কলেকে জাগিয়ে দিল। 'মা গো' বলে বার্কলে সটান টানা দিল গা। তার পর পাশ ফিরে সে মাথাটা রাখল রোডার বুকের উপর।

'নাও, ওঠো।'

'উঠছি দাঁড়াও!' বার্কলে একটা হাই তুললে। 'বড্ড ক্লান্তি লাগছে।' হাত দুটি সে বাড়িয়ে দিল। রোডার মুখখানা ধরে কিছুক্ষণ সে আদর করল। তার পর ঝিমিয়ে রইল আরও কিছুক্ষণ।

মিনিট দশেক আরও কেটে গেল। হাঁটু দিয়ে রোডা এবার বার্কলের পিঠে মৃদু একটা খোঁচা দিলে।

'ওগো, শুনছো? এবার ওঠো বলছি।'

'হ্যাঁ, উঠছি।'

বিছানা থেকে নেমে পড়ল বার্কলে। পেনসেলভ্যানিয়া ষ্টেশনে ডিউটি তার ঠিক ছ'টায়। দেরী করলে আর চলে না। চাকরীই তার জীবিকা। ঘরে পরিবার আছে, কন্যা আছে; ঘর ভাড়া, খাবার, মদ সব কিছুই তাকে কিনে খেতে হয়। তাদের কালা আদমীদের হারলেমে তাকে মানুষের মত এক জন হয়ে চলতে হলে গর্বিত শ্বেতাঙ্গ সাহেব-সুবোদের কাছে তাকে সময়নিষ্ঠ চুল-চেরা কর্তব্যপরায়ণ না হয়ে উপায় কি?···

বাথরুমে ঢুকে সে হাত-মুখ ধুয়ে নিল। তার পরে পোশাক পরে নিয়ে খাবার-ঘরে এসে সে ঢুকল। সিন্দুক খুলে এক গ্লাস হুইস্কি সে ঢালল। চাঙা হয়ে উঠল এবার সে। রোডাকে উঠে ভোর বেলা কফি বানিয়ে দিতে হয় না। আর সব খানসামার সঙ্গে সে তার প্রাতরাশ সেরে নেয় ডাইনিং রুমে বসে। যাবার আগে সে যন্ত্র- চালিতের মত রোডাকে একবার চুম্বন করে নিল। দরজা ভেজিয়ে দেয়ার শব্দ ভেসে এল। বিছানার মাঝখানটায় এবার গড়িয়ে এল রোডা। প্রকাণ্ড প্রশস্ত বিছানায় ভোর বেলাকার আরামের ঘুমটা সে নিশ্চিন্তে দিতে পারবে একলা।

বার্কলের যাত্রাটা এবার শুভ হোল না। ডাইনিং কারের সে হোল প্রধান খানসামা। রসুই-ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তার উপর। এ-জন্য মাসে মাসে পাঁচ ডলার বেশী মাইনেও সে পায় আর সব খানসামা থেকে। ষ্টিওয়ার্ড আর প্রধান পাচকের সামনে যোগান-দারের কাছ থেকে খাবার বুঝে নেয়াই তার প্রধান কাজ। রসুই-ঘরে রক্ষিত সব খাবারের দায়িত্বও তার ঘাড়ে। পাচক আর অনেক খানসামারই যে কিছু কিছু হাতটান আছে এ কথা সে জানে। মাখন, পনীর, ক্রিম, চিনি, ফল ইত্যাদি চুরি করে ওরা অনেক সময় বাড়ি নিয়ে যায়; কিংবা ইষ্টিশানে গাড়ি থামলে নিজেদের মনের মানুষকে প্রায় দিয়ে দেয়। সব সময় বার্কলেকে এদিকে সতর্ক নজর না রাখলে চলে না। ছিঁচকে-চোর এই খানসামাদের উপর নজর রাখবার জন্য তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়াও আছে কালো ষাঁড়ের মত বাজখাই প্রধান পাচকের। কেন না, খাবার কম পড়লেই ষ্টিওয়ার্ডের সব অভিযোগ এসে পড়বে তাদের ঘাড়ে। ওদিকে আবার যোগানদার দায়ী করবে ষ্টিওয়ার্ডকে।

এ-যাত্রায় বার্কলেকে খামখেয়ালী তার ছেলেমানুষী স্বভাবে পেয়ে বসল। খানসামারা সব লুট-পাট করে নেয় নিক, চোখ তুলে সে রসুই-ঘরের দিকে চাইবে না। যাত্রীদের পরিবেশন করতে তার ইচ্ছেই হোল না। প্রত্যহ নিত্য-নূতন যাত্রীদের সাক্ষাৎ পাওয়া; আবহাওয়া নিয়ে তাদের সঙ্গে দু'-একটা কথা কওয়া; পরিচিত কাউকে পেলে তার সঙ্গে একটুখানি আলাপ করা—সত্যি তাতে আনন্দ আছে বই কি—আছে পুলক—পূর্বকল্পিত রোমাঞ্চ। কিন্তু আজ সব পালটে গেল। দরজা খুলতেই যাত্রীরা সব অধৈর্য হয়ে রান্নাঘরের দিকে ভিড় করে ছুটে আসতে লাগল। তা দেখে বার্কলের গা জ্বলে উঠল। যাত্রীরাও অকথ্য গালাগালি শুরু করে দিলে। পরিবেশন করতে তার ইচ্ছেই হোল না—হুকুম তামিল করে যেতে।···

তবু যন্ত্রচালিতের মত সে টেবিল থেকে তার বখশিসের 'ডাইম' (১০ সেণ্ট মূল্যের মার্কিণ রৌপ্য মুদ্রা) আর সিকিগুলি কুড়িয়ে নিল। রোডা আর বেটসির জন্য কিছু কিনে নিয়ে যেতে হবে। রঙিন কাপড় পরতে ভালবাসে রোডা। তার মনে পড়ল, বাড়ি আসবার সময় কিছু মিষ্টি খাবার সঙ্গে করে আনলে বেটসির সে কি আনন্দ! ভবিষ্যতে সে করবে কি মেয়েটাকে নিয়ে? ওর মা'র মত ওকে একটু ভালো লেখাপড়া সে শিক্ষা দিতে পারবে কি না তারও কোন ভরসা নেই। বড় হয়েই বা কি করবে সে? হয়ত সে-ও মা'র মত রেল-গাড়ির কোন খানসামাকে বিয়ে করে বসবে। তার পর দাস কালা আদমীদের চিরাচরিত প্রথা বজায় রেখে বছরের পর বছর ছেলে বিয়িয়ে যাবে নির্বিবাদে।

ফিলাডেলফিয়া, হ্যারিশবুর্গ, আলটুনা, পিটস্‌বার্গ পার হয়ে গেল। কোন যাত্রীই এল না। খাবারের পাট পড়ল না। বার্কলের সহকর্মীরা বিরক্ত হয়ে উঠল। বার্কলে কিন্তু কিছুই বলল না মুখ ফুটে। চতুর্থ দিনের দিন বিকেলে তাদের কার নিউ ইয়র্ক থেকে ওয়াশিং-টনে এসে থামল। ওয়াশিংটনে আসতেই বার্কলে একটু যেন গম্ভীর হয়ে উঠল। পুরোন দিনের কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিল ওয়াশিংটন —পাঠ্যাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁর মধুর দিনগুলির কথা। এখানেই সে প্রেমে পড়ে!···

নিগ্রোদের আস্তানার মধ্য দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বার্কলে ৭ নং রাস্তার দিকে এগুতে লাগল। এগিয়ে চলল সে রাস্তার দু'পাশের বাড়ির দিকে চোখ রেখে। রাস্তার এদিক-ওদিক সে শুঁকে বেড়াতে লাগল রাস্তার কুকুরের মত। একটা শুঁড়ীখানায় এক সময় ঢুকে পড়ে এক গ্লাশ হুইস্কী সে পান করে নিল ঢক-ঢক করে। কালা আদমীদের এই শুঁড়ীখানাটা একেবারে ভর্তি ধোঁয়া আর ধূলোয়। ভ্যাপসা পচা একটা গন্ধও বেরুচ্ছে মেঝে থেকে। তবু খোসমেজাজে ঘেঁসাঘেঁসি করে বসে কালা আদমীরা পরম আনন্দে মদ গিলে চলেছে এখানে।

ট্রেণ ছাড়বার বুঝি সময় হয়ে এল। বার্কলে বসে বসে তবু মদ খেয়ে চলল। দীর্ঘ এত দিন ধরে চুল-চেরা নিয়ম-কানুন মেনে এসেছে সে। আজ না হয় একটু অনিয়ম হোলই। হোলই বা সে ভয়ানক বাধ্য খানসামা; সৎ রসুই-রক্ষক। কোন দিন সে এক ছটাক মাখন কি এক খামচা চিনি বাড়ী নিয়ে গেছে, এ কথা কেউ হলফ করে বলতে পারবে না। সত্যি সত্যি সে যদি কোন দিন নিয়েই যেত, কতই না খুসী হোত রোডা। রাস্তায় ছুটে এসে হয়ত তার হাত থেকে পুরিয়াটা ছিনিয়ে নিত। তাদের ডাইনিং কারের আশে-পাশে তাদের সম্প্রদায়ের কত মেয়েই তো কত দিন ঘুর-ঘুর করে বেড়িয়েছে, ছেনালির হাসি হেসেছে তার দিকে তাকিয়ে, তবু সে কোন দিন চোখ তুলে তাকায়নি—কিম্বা ওদের ছুঁয়ে দেয়নি কোন দিন। সত্যি, দায়িত্ব ঘাড়ে নেয়ার কি যে ঝামেলা, নিয়ম মেনে চলা কি যে কঠোর, কেউ যদি জানত!

ওয়াশিংটনে থেকে যাওয়ার জন্য ষ্টিওয়ার্ড কে জানে তাকে কি বলবে? বলা যায় না, ও হয়ত নিজেই মদ খেয়ে এতক্ষণে চুর হয়ে আছে। যা পাঁড় মাতাল! সেদিনের কথাটা আজ মনে পড়ল বার্কলের। ওয়াশিংটনের পথে তাদের ডাইনিং কারের পরিচালনার সব ভার অগত্যা তাকেই নিতে হয়েছিল। সহকর্মী আর সব খানসামারাও সেদিন সহযোগিতা করেছিল তার সঙ্গে। টাকা-পয়সা আদায় করা থেকে ভাঙতি শোধ দেওয়া সব কিছুই যথাযথ সুচারুরূপে করে দিয়েছিল। ফিলাডেলফিয়াতে গাড়ী যখন এসে পৌঁছল, তখন এক ইন্সপেক্টর এসে উঠল। পরিচালনার সব ভার তার হাতে তুলে দিয়ে সে অবশ্য তখন রেহাই পায়। ভিড়ও ছিল সেদিন খুব। একটু চাড় ভাঙতেই বারান্দার যাত্রীদের ভিড় ঠেলে টলতে টলতে ষ্টিওয়ার্ড তার পর এগিয়ে এসেছিল ইন্সপেক্টরের সঙ্গে এ নিয়ে বোঝা-পড়া করতে।

'এ ডাইনিং কার হো'ল আমার হেপাজতে,' করুণ কাঁদো-কাঁদো হয়ে ষ্টিওয়ার্ড একরূপ চেঁচিয়ে উঠেছিল—'কাজ করতে দিন আমাকে? একটু ভদ্রলোকের মত চলুন।'

দুই গণ্ড বেয়ে চোখের জল তার গড়িয়ে পড়ল। হম্বি-তম্বি করতে লাগল সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। যাত্রীদের আসা-যাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। অবাক্ স্তম্ভিত একরাশ যাত্রী আর খানসামাদের উপর চোখ দু'টি একবার বুলিয়ে নিয়ে ইন্সপেক্টর এবার তাকাল ষ্টিওয়ার্ডের দিকে মাষ্টিফ্ কুকুরের মত যুদ্ধং দেহি দৃষ্টি হেনে। পুলম্যান কণ্ডাকটারের সাহায্যে সে ষ্টিওয়ার্ডের জামার গলাবন্ধ ধরে টানতে টানতে পরিত্যক্ত এক ঘরে তাকে তালাবন্ধ করে এলো নিউ ইয়র্কে গাড়ী না আসা পর্যন্ত।

কেউ পছন্দ করত না এই ষ্টিওয়ার্ডকে। সকলে ভেবেছিল,

এবার ওরা ওর কবল থেকে বুঝি রেহাই পাবে। এবার আর নিষ্কৃতি নেই তার। কিন্তু সে আবার ফিরে এল পরের বারে। অত্যন্ত কড়া জবর এ ইন্সপেক্টরের কথা সবাই জানত। কোন দিন কোন খানসামার বাক্স-পেটারায় এক কৌটো উদ্বৃত্ত জিন পাওয়া গেছে কি, তার নামে অমনি রিপোর্ট না হয়ে যায়নি। কিন্তু ষ্টিওয়ার্ডের কথা হোল আলাদা। দু'জনেই আস্ত ঘুঘু। ষ্টিওয়ার্ড থেকেই তো প্রমোশান পেয়েছে ওই ইন্সপেক্টার।

'যাক্ গে, আমি তো এখন ছুটি নিলাম।' বিড়-বিড় করে আওড়ালে বার্কলে। একটুখানি চাপা হেসে আর এক পাত্র আনতে সে হুকুম করলে। নিউ ইয়র্কের পথে তাদের গাড়ি এতক্ষণে নিশ্চয় বাল্টিমোরে এসে পৌঁছেচে। প্রথম দু'টো টেবিলে এখন কোন্ খানসামা পরিবেশন করছে কে জানে? 'আমারই বা অত মাথা ঘামিয়ে কাজ কি', ইস্কুল-পালান ছেলের মত নিজেকে আজ ভাবতে বড় ভালো লাগল বার্কলের।

'একঘেয়ে জীবন! চুল-চেরা আইন-কানুন—তাই তো এত দিন রক্ষা করে এসেছে সে। এবার না হয় একটুখানি অনিয়মই হোল—একটুখানি বে-তোড়ক।' বার্কলে মনে মনে ঠিক করলে।

শুঁড়ীখানা থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এল সে।

পরদিন সে ওয়াশিংটনস্থ তাদের রেঁস্তোরা গাড়ীর দপ্তরে গিয়ে হাজিরা দিয়ে এল। নিউ ইয়র্কে ফিরে যাবার অনুমতিও সে পেল। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট তো রীতিমত অবাক্ হয়ে গেলেন:

'ছুটি চাচ্ছো দিন কয়েকের? বলো কি হে? তুমি যে রীতিমত অবাক্ করলে? তা বেশ, নিতে পারো দিন দশেকের ছুটি।'

বেকার, নিষ্কর্মা দশটা দিন!—এই বুঝি তার শাস্তি। যোগানদারী দপ্তর থেকে উন্মুক্ত রাজপথে বেরিয়ে এল বার্কলে। তিন-তিনটে বছর এ লাইনে কাজ করছে সে। কখনও ছুটি-ছাটার মুখ দেখেনি সে। এর কারণ নিজেই সে জানে না। কত দিনই তার ইচ্ছে হয়েছে, কাজে না গিয়ে চুপ-চাপ আজ বসে থাকে সে ঘরের কোণে। কিন্তু তা কোন দিন সে করেনি। করতে তার সাহস হয়নি। তাতে মাইনে যে তার কাটা যাবে না সে জানত। তবু তার আসল পাওনা—তার উপরি পাওনা থেকে সে তো বঞ্চিত হবে। তা ছাড়া, চির-পুরাতন তাদের ডাইনিং ঘরটির উপরও কেমন যেন একটা মায়া বসে গেছে। ও-ঘর থেকে দূরে সরে থাকতে মনটিও তার চায় না। সহকর্মী আর সব লোকজনদের কাছ থেকেও নয়। তাদের ষ্টিওয়ার্ডটিও অনেকটা বেশ শান্ত-শিষ্ট ভদ্র-গোছের। কিন্তু সব চাইতে তার বড় কারণ, বেটসি আর রোডাকে যে ঘরে সে থাকে তার ভাড়াটা। প্রত্যেকটি মুহূর্তই তার মহামূল্য—উপরির প্রত্যেকটা পয়সাই তার কাছে অপরিহার্য।...বিনা মাইনের দশ দিনের এই ছুটি যেন একটা অভিশাপ—তার উপর চাপান হয়েছে বুঝি বিদ্বেষ-প্রসূত হয়েই। এই দশ দিনে তার থাই-খরচা আর মাইনে কিছুই মিলবে না। উপরিও জুটবে না একটা পাই-পয়সাও। তবু—তবু তার প্রচুর আনন্দ হোল; ইস্কুল-পালান ছেলের মত বিপুল অনাবিল আনন্দ।

স্বাধীনতা! দশ দিনের অফুরন্ত স্বাধীনতা! এ দশ দিন সে কি-ই বা করবে? পার্টি দেবে সে? রোডা ভালোবাসে পার্টি। নিউ ইয়র্কে একজন [illegible] ছিল সে। বন্ধু-বান্ধবী তার অনেক। এ কয় দিন বসে বসে তাস পিটলে কেমন হয়? নেচে বেড়ালে? সিনেমা দেখলে?

কসাইখানার আশে-পাশের অঞ্চলে সে এসে পড়ল। নিউ ইয়র্কে এসে সে প্রথম উঠেছিল ৪০ নম্বর রাস্তায়।

ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোরে একসঙ্গে কাজ করত, পুরোন এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বার্কলের। দু'গ্লাশ করে বিয়ার ওরা খেল একসঙ্গে বসে। তার পর সান যুয়ান পাহাড়ের দিকে চলল সে হেঁটে।

সে যখন বাড়ি এসে পৌঁছল, রোডা তখন কমলা নেবু রঙের ফিরোজা এক সান্ধ্য-পোষাক পরে সবে বেরুচ্ছে এক পার্টিতে। পরস্পর ওরা আলিঙ্গন করল।

'ওগো, কাল আমি তোমাদের আপিসে ফোন করেছিলাম। ওরা বলল: তুমি না কি ওয়াশিংটনেই রয়ে গেছ। ভারী দুষ্ট হয়েছ দেখছি আজকাল!' রোডা হেসে ফেলল। আবার বলল: 'ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি? কিছু খেতে দেবো?'

'না, না; ব্যস্ত হয়ো না তুমি। ক্ষিদে পায়নি আমার।' বার্কলে জবাব দিলে।

'ভালোই হোল। আমি এখন মেমি ডিক্সনদের ওখানে তাস খেলতে যাচ্ছি। পরে নাচেরও একটু ব্যবস্থা হয়েছে। কাপড়-চোপড় পরে নাও। চল, একটু স্ফূর্তি করে আসি দু'জনে।'

'না, আজ থাক। এর পরে একসঙ্গে বেরুবার তো অভাব হবে না সময়ের। আপিস থেকে যে দশ দিনের ছুটি নিয়ে এলাম।'

'য়্যাঁ, বলো কি? দশ দিনের ছুটি!' রোডা চেঁচিয়ে উঠল একরূপ।—'দশ দিনের ছুটি নিলে? এই শুক্রবারে যে আমাদের বাড়ি-ভাড়া দিতে হবে গো। ইন্সুরেন্স-এর প্রিমিয়ামও! দশ দিনের ছুটি নিলে? ওয়াশিংটনে তুমি রয়ে গেলে কোনো শুনি?'

'তা তো বলতে পারি নে, রোডা। এবার কিন্তু কিছুই ভালো লাগছিল না। বড্ড ক্লান্ত আর অবসন্ন বোধ করছিলাম। আগা-গোড়া আমি কি রকম কর্তব্যপরায়ণ, তুমি তো তা জান। কিন্তু এবার যেন একটু অনিয়ম করতে ইচ্ছে হোল, রোডা, একটু ব্যতিক্রম করতে।'

'কিন্তু তাতে কি আপিসে তোমার নাম খারাপ হবে না? আচ্ছা, অমন কাজ তুমি কি করে করলে বলো তো? তুমি কি জানো না, এখানে বেটসি আছে, আমি আছি—সমাজে আমাদের মান-সম্ভ্রম রয়েছে। আমাদের কথা একবার ওগো, ভাবতেও হয় না?'

নূতন একটা গাম বার করে রোডা সশব্দে চিবোতে লাগল।

'সে যাক্, মেমিদের বাড়ী যেতে চাও তো এসো আমার সঙ্গে।' জিভ্ দিয়ে মুখের গামটাকে সে একবার গুলিয়ে নিল।—'আর ওখানে যদি যেতে না চাও তো হাউল্যাণ্ডদের বাড়ি থেকে বেটসিকে নিয়ে এসে বাড়িতেই থেকো।'

রোডা বেরিয়ে গেল গাম চিবাতে চিবাতে।

'সব আনন্দই ভেস্তে গেল!' বিড়-বিড় করে উঠল বার্কলে। সান যুয়ান পাহাড় থেকে গাড়ী করে হারলেমে আসতে আসতে ভেবে নিয়েছিল যে, রোডা তাকে কি অভ্যর্থনাটাই না জানাবে অপ্রত্যাশিত দেখে। হয়ত বলে উঠবে: "আচ্ছা কুণো তো দেখছি তুমি, দু'দণ্ড বুঝি চোখের আড়াল হতে হলেই পরাণটা আই-ঢাই করে ওঠে? তা এসেছো ভালোই হোল। হাড়ভাঙ্গা অমন খাটুনি

কি মানুষের সব সময় ভালো লাগে ? একটু হেসে-খেলে এই দশটা দিন দিব্যি কাটিয়ে দেয়া যাবে ?”

খালি চিবানো—গাম চিবানোই যেন জীবনের একমাত্র কাজ। কিন্তু রোডার ওই মুখখানাই তার সব। সত্যি, কি মোহিনী যে জানে ! ওই মুখখানার প্রেমে পড়েই সে বিয়ে করেছিল রোডাকে। গায়ের রংও তার অবশ্য সুন্দর; আঙুলের ডগাগুলিও বিড়ালের লোমের মত তুলতুলে নরম। পাকা ফলের মত রোডার গায়ের রঙের চাইতে তার মুখখানাই বার্কলেকে আকৃষ্ট করেছিল সব চাইতে বেশী।

হলঘর পার হয়ে বেটসিকে নিয়ে আসতে সে পা বাড়াল হাউল্যাণ্ডসদের বাড়ীর দিকে।

চকো খাবো বাবামণি !'

কটা রঙের হাসিখুশি খুদে মেয়েটা হাততালি দিয়ে উঠল। তার পর বার্কলের প্যান্টালুন ধরে সে তাকে টানতে শুরু করলে। বেটসিকে সে তার হাঁটুর উপর তুলে বসালে, তার পর হাতে দিল তার কাগজের ছোট একটা পুরিয়া।

‘বেটসি মণি, ওয়াপসি মণি, মাপসিমণি, প্রেটসিমণি—চকো এবার খাও তো দেখি সোণামণি ?'

দুলিয়ে দুলিয়ে সে বেটসিকে এবার নাচাতে লাগল।

কাগজের পুরিয়াটা শুদ্ধ, বেটসি বাবার হাঁটু দু'টি আঁকড়ে ধরল। কাচের ছোট একটা গ্লাশের মধ্যে চকোলেটগুলি এবার সে একটা একটা করে ফেলাত লাগল। অস্পষ্ট কি যেন বলল তার রং নিয়ে। তার পর একটার পর একটা করে মুখে ফেলতে লাগল সে চকলেটগুলো।······

বাদামী রঙের রবারের একটা পুতুল নিয়ে বাবার কোলে সে আবার ফিরে এল। বাবার হাঁটু দু'টিকে ঘোড়া বানিয়ে চড়ল সে কিছুক্ষণ। এবার হাই তুলল বেটসি। মাথাটা তার সামনে ঝুঁকে পড়ল। জামা ছাড়িয়ে তাকে তার ছোট্ট খাটে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে রাখলে বার্কলে।

“বেটসি রয়েছে, আমি রয়েছি—সমাজে আমাদের মান-সম্ভ্রম রয়েছে—” বার্কলে কার কথার যেন প্রতিধ্বনি তুললে। হায় রে সমাজে মান-সম্ভ্রম ! একা একা সে ভাবতে বসল। ঘৃণা আর বিদ্বেষে মনটা তার তিতিয়ে উঠল কানায় কানায়। রোডার যে মুখখানার প্রেমে পড়েছিল সে এক দিন, তাকে আজ তার ঘৃণা করতে ইচ্ছে হোল। ঘর-বাড়ি, মুখোস-আঁটা তাদের সামাজিক মান-সম্ভ্রম সব কিছুই আজ তার চোখে বিষিয়ে উঠল। সে যে বেটসির পিতা, এ কথাটাও তাকে আজ পীড়া দিতে লাগল। ঘুমন্ত অবোধ শিশুটির প্রতিও মনটা তার কুঁচকে উঠল বিতৃষ্ণায়।

“বেটসি রয়েছে, আমি রয়েছি।”—সে আবার প্রতিধ্বনি তুললে কার কথার। সারাটা জীবন তাকে কি একঘেয়ে ভাবে কাটাতে হবে ? জাবর কেটে এ ভাবে ? এ ভাব ঘুরে ঘুরে পূর্বাঞ্চলের মাঠে মাঠে ? সেই নিউ ইয়র্ক, বোষ্টন, বাফেলো, পিটসবার্গ, হ্যারিসবার্গ, ওয়াশিংটন, বালটিমোর, ফিলাডেলফিয়া—তার পর আবার সেই পুরোন নিউ ইয়র্ক ! এই ভাবে একঘেয়ে জীবন ? এমনি করে চিরটা কাল ? তার কি কোন রেহাই নেই ? নিষ্কৃতি নেই ?

সারাটা জীবন-ভোর তাকে এ ভাবে কাটাতে হবে, এ কথা যে সে কোন দিন স্বপ্নেও ভাবেনি। ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ানদের এক চাষার ছেলে সে। নিউ ইয়র্ক শহরের শাদা শাদা ওই বিরাট প্রাসাদ-কারার মধ্যে কেনই বা সে থাকবে বন্দী হয়ে ? তাদের গাঁয়ের বাপ-ঠাকুরদারা যন্ত্রচালিতের মত হুকুম তামিলের এমনতরো কাজ কোন দিনই করেনি। ওরা সবাই ছিল পরিশ্রমী; ক্ষেত-খামারের স্বাধীন চাষী। শিল্পী-কারিগরের কাজ করেও অনেকে দিন কাটিয়েছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান পাহাড়ের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন ছিল তাদের।···

পাশের শোবার ঘর থেকে খস্‌খস্‌ মৃদু একটা আওয়াজ আর ঘুমন্ত শিশু-কণ্ঠের অস্ফুট কল-কাকলি ভেসে এল। বার্কলে হারিয়ে গেল অতীতে। জীবনের ফেলে-আসা দিনগুলি সে স্মরণ করতে লাগল একটি একটি করে।···নতুন নতুন বই পড়তে, নতুন নতুন অজানা দেশে ঘুরে বেড়াতে আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শহর দেখতে একদা তার কি অসীম আগ্রহই না ছিল। এই ছিল তার কৈশোরের সুমধুর স্বপ্ন।

গাঁ থেকে বিদায় নেবার সেই সন্ধ্যে বেলাটার কথা আজ তার মনে পড়ল। ক্যানভাসের আনকোরা ব্যাগটা পিঠে ঝুলিয়ে দীর্ঘ অনেক দূর পথ হেঁটে আসতে হয়েছিল তাকে ইষ্টিশানে। শহরে এসে গোটা তিন বছর ধরে তাকে কঠোর ভাবে খাটতে হয়েছিল মদের এক আড্ডাখানায়। তবু কি সুখেই না ছিল সে। কৈশোরের স্বপ্ন বুঝি তার সফল হতে চলল। পরে অবশ্য সে আসে কিউবার অন্তর্গত স্যান্টিয়াগো শহরে। নিউ ইয়র্কে এসে সে যখন পৌঁছয় বয়স তখন তার পঁচিশ। এই বুঝি তার স্বপ্নের সেই অপরিচিত অপরূপ দেশ—যেখানে আছে বিরাট বিরাট হর্ম্যাবলি আর যেখানে গ্রন্থাগারের মধ্যে সজ্জিত আছে থোকায় থোকায় দেশ-বিদেশের জ্ঞানের ভাণ্ডার—বইয়ের পাহাড় !

নিগ্রো বিশ্ববিদ্যালয়টিই ছিল তার স্বপ্নের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু সে যখন গিয়ে শুনল, দু'বছরের প্রবেশিকা পাঠ সমাপ্ত করতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে না, তখন ভীষণ সে দমে গিয়েছিল। সেদিনের কথা আজও তার মনে আছে। হতাশায় তবু সে বুক বেঁধেছিল। নিউ ইয়র্কে ফিরে গিয়ে বছর-খানেক রাত-দিন খেটে প্রবেশিকা পরীক্ষার বেড়া সে ডিঙিয়ে নেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পথ তার উন্মুক্ত হয়ে গেল।

বিদ্যার পীঠ—বিশ্ববিদ্যালয়—কথা দু'টি তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল এত দিন। অনুদার, সংকীর্ণ তাদের গাঁয়ের ছেলেগুলি যখন কলেজের পাঠ সমাপ্ত করে দেশে ফিরত, বহু দিন সে লক্ষ্য করেছে, তাদের কথা-বার্ত্তা, চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ, কতই না পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। শহুরে তাদের হাব-ভাবে লেগে আছে যেন সব সময় আমেজ লাগান নতুন এক চটক। পাহাড়-উপত্যকা-পরিবেষ্টিত তাদের পল্লীর চিরপরিচিত স্নিগ্ধ, সবুজ মাদকতার চাইতে বুঝি তা মধুরতর ও অধিক চিত্তাকর্ষক। চটক-লাগান তাদের ওই কথা-বার্ত্তা, হাব-ভাব আর চাল-চলন তোল কলেজীয় আবহাওয়ারই চরম পরিণতি—সভ্য-ভব্য জীবনের বিকাশ। ঘরে বসে পড়া-শুনো করলে এই ছোপ লাগতে পারে না।···

কলেজের সেই দিনগুলি কি সুখেরই না ছিল।—বার্কলে আবার আওড়ালে মনে মনে। সমান পরিমাণের এক-সার বাড়ি; ধূসর তার দেয়ালগুলিতে এঁকে-বেঁকে উঠেছে শীতের পত্রহীন নানান লতা। ছেলে আর মেয়ে মিলে এখানকার সব ছাত্রই নিগ্রো। সকলেই খুব

কার্য্যতৎপর। গ্রন্থাগারও আছে এখানে। বাড়িখানা তৈয়েরী গথিক-স্থাপত্যের নিদর্শনে। সামনের বারান্দার থামগুলি সব গ্রীসিয়ান্ ধাঁচের। এ্যারিস্টোটেল, সোলন, ভার্জিল, স্যাক্সপীয়র, দান্তে আর কবি সংক্ষেলোর নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করা আছে সামনের বড় বড় থামগুলিতে। আমেরিকায় বা পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত বড় বিরাট প্রাসাদের অন্যতম প্রতীক এই গ্রন্থালয়—কল্পবিলাসী কোন বিরাট যন্ত্ররাজের এ বুঝি কোন স্বপ্ন-সৌধ!

পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে বার্কলে অবশ্য তেমন কোন রহস্যের সন্ধান পায়নি। সে বুঝি তা পেয়েছিল ওখানকার বহু চটুল মেয়ে আর অসংখ্য বন্ধু-বান্ধবের অন্তরঙ্গ সাহচর্যে। ধূসর লাইব্রেরী-ঘর অপেক্ষা বেশী তার আকর্ষণ ছিল যুগোপযোগী নাচ-গান-হল্লার মধ্যে। ছোটখাটো যে সব নাচ-গানের মজলিশে যোগ দিত, তাতেই সে মজে যেত একেবারে, মুগ্ধ হয়ে যেত একান্ত ভাবে।

এক দিন বুঝি তার চমক ভাঙল! অবসান হোল তার সৃষ্টি-ছাড়া খামখেয়ালী-পনার। এক দিন প্রভাতে সে আবিষ্কার করে বসল, ট্যাঁকের পয়সা তার ফুরিয়ে গিয়েছে নিঃশেষে। চরকির মত এবার থেকে তাকে টো-টো করে ঘুরে না বেড়ালে উপায় নেই। কলেজের জীবন একরূপ অসম্ভব হয়ে উঠল তার পক্ষে।

এর পরের অধ্যায়ে তার সাথে পরিচয় হয় রোডার। রোডার সাহচর্যই বুঝি তার বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলিকে মধুচ্ছন্দা করে তুলেছিল।···

ঘর-ভর্তি এক দঙ্গল নিগ্রো যুবক-যুবতীর কথা বার্কলের আজ মনে পড়ে। তামাটে, বাদামী, চকোলেট রঙের, কিংবা মিশমিশে কালো নানান্ বর্ণের অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে ফূর্তি করে নাচছে, গাইছে, খাচ্ছে সব ঘরের মধ্যে। এমনই এক মধুর রাত্রিতে মন-দেয়া-নেয়ার পর্বটা ঘটে যায় তার সঙ্গে রোডার। প্রথম থেকেই ওরা দু'জন নাচ শুরু করেছিল। রোডাও সাড়া দিল। সে-ও ভালোবাসল। রোডাই তার জীবনে প্রথম মার্কিণ মেয়ে যার সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রোডাকে সে ভালোবেসে ফেলল একান্ত নিবিড় করে—নিঃস্ব করে নিজেকে। ফিরবার আর তার উপায় রইল না! সে বুঝি কোন এক মৌমাছি! দিক্‌বিদিক্ না তাকিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল উপর থেকে সে কোন এক ফুলের অন্তঃস্থলে। ডানা দু'টি তার জড়িয়ে গেল মধুতে। তার পর মরে পড়ে রইল সে মধুর মধ্যে।

শিক্ষয়িত্রীর কাজ করত রোডা। টাকা-পয়সার ভাবনাটা তাকে আর ভাবতেই হয়নি। আঃ, কি সুখেই না ছিল সে তখন! খালি পড়াশুনো, পার্টি আর রোডাকে নিয়ে···।

তার জুনিয়র বছরের মাঝামাঝি সময় রোডা জানাল, সে মা হতে চলেছে। অনাগত অতিথিটাকে নিয়ে ওরা তখন মহা ভাবনায় পড়ল। দু'জনে পরামর্শ করতে বসল অপারেশন করিয়ে আসবে কি না। বিয়ে না করে অনাগত ওই অতিথিকে যদি এখন বরণ করে নেয়, তাহোলে রোডাকে তার চাকরী খোয়াতে হবে। বার্কলের মনে পড়ল, তাদের গাঁয়ের এক শিক্ষয়িত্রী লুকোতে চেয়েছিলেন নিজের মাতৃত্বকে একবার। শহরে অপারেশন করতে গিয়েই তিনি তখন মারা যান। আর সব মেয়েদের—বিশেষ করে গাঁয়ের চাষী মেয়েদের এ সবের বিশেষ কোন বালাই নেই। কুমারী-জীবনের মাতৃত্বের জন্ম তাদের কোন মাথা-ব্যথাই নেই। সত্যি, তাই অনেক ভালো, বার্কলে ভাবলে।

ব্যাপারটা স্বাভাবিক ভাবে গড়িয়ে যেতে দেখে রোডাও খুশী না হয়ে পারল না। তারও কামনা ছিল মা হতে। আর তা ছাড়া তার বয়সটাও সে সময় এমন এক অনির্দিষ্ট গণ্ডীতে এসে পৌঁছেছিল যখন অনেক মেয়েই মনে করে, বিয়ে করাটা জীবিকা-সংস্থাপনের কঠোর অগ্নিপরীক্ষারও বাড়া!

তাই ওরা দু'জন নিউ ইয়র্কে গিয়ে বিয়ে করে এল।

কিন্তু বিয়ে করার সব দায়িত্বের কথা বার্কলে তখনও জানতে পারেনি। বিয়ের সব ঝুঁকির কথা সে সত্যি জানতও না।

বার্কলের আজ মনে পড়ছে, রোডার মত সে-ও খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল বিয়ের জন্ম। পরিণীত জীবনের নতুন মাদকতা তাকেও পেয়ে বসেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী-পাশের আওতা থেকে নিষ্কৃতি পেতে সে-ও মনে মনে চায়নি, এমন নয়। সুবর্ণ সুযোগটা এবার বুঝি এসে গেল। টাকা-পয়সারও তার তখন খুব টানা-হেঁচড়া চলছিল। রোডাই না তাকে তখন কত সাহায্য করেছে। এখন অবশ্য সে আর কাজ করতে পারে না! ওকে প্রতিপালন করা তো এখন তারই কর্তব্য।

তবু ভালো ঝি-চাকরের নোংরা কাজে কোথাও সে লেগে যায়নি। তাদের নিগ্রো সমাজের কায়দা-দোরস্ত অনেক আভিজাত্য মেয়ের খুঁটির খবরই রাখে সে। সে জানে, বাড়তি সময়টা পরের বাড়িতে গতর খেটে আসতে একটুও পিছপা হয় না ওরা কেউ। আর সব গরীব নিগ্রো মেয়ে কাজে যাবার আগে তাদের ছেলে-পিলেদের যেমন এক ডাইম-এর বিনিময়ে ছেলে-রাখবার গারদে রেখে যায়, রোডা যে বেটসিকে তাই করে যায়নি, তাতে তার খুব আনন্দ হোল। আর যাই হোক, রেলের চাকরী করে স্ত্রী-পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে বেগ পেতে হয় না তাকে মোটেই।

চাকরিটা সম্বন্ধেও কোন দিন সে তলিয়ে দেখেনি একটু খানি। এ তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে? কি মোড় দেবে তার চরিত্রের কে জানে? অনেকটা বুঝি অভিনয়ের ছলেই কাজটাতে সে লেগে গিয়েছিল। প্রেমে-পড়ার প্রাসঙ্গিক অতি প্রয়োজনীয় খরচাটা তো জুটবে, তাই সে চাকরীটা গ্রহণ করেছিল। কেন না, রোডার প্রেমে সে তখন একেবারে মজে গিয়েছিল। শরৎকালীন পল্লবের অপূর্ব কি কমনীয়তাই না সর্বাঙ্গে ঘিরেছিলো রোডার। হাস্যমুখর মিঠামিঠা তার কথাগুলি কি উচ্ছল; আর পূর্ণাবয়ব তার মুখখানি কি সুঠাম, সুডোল আর সুন্দর! চুপসে পড়ছে বুঝি সব মাধুর্য! সত্যি, তার চক্ষে ছিল বুঝি বৈদ্যুতিক এক আকর্ষণ!

গাম চিবোন আর তুচ্ছ, অতি সাধারণ 'মান-সম্ভ্রমের কথা' জানিয়ে-দেয়া রোডার ওই মুখখানাকেই কি সে সেদিন ভালোবেসেছিল? শুধালে বার্কলে।······

যৌবনের প্রতিটি উষ্ণ রক্তবিন্দু দিয়ে ভালোবেসেছিল সে রেলপথের তার রুক্ষ জীবনকে। ভবঘুরে তার দেহ আর মনে সঞ্চার করেছিল রেলের এই চাকরী নতুন প্রেরণা—এনেছিল নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ। ট্রেণের ঝক্‌-ঝক, ঝাকাঝক, ঘড়-ঘড় মুখর শব্দ ছন্দিত হয়ে উঠেছিল তার কানে। ট্রেণের বাজখাই কর্কশ বাঁশীর শব্দে, গাড়ীর সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে ছুটে চলা দু'পাশের

সঞ্চারমান দৃশ্যাবলি মধ্যে, পরিত্যক্ত খনি অঞ্চল আর পরিদৃশ্যমান নতুন নতুন মুখাবলির মধ্যে সন্ধান পেয়েছিল সে কাব্যময় নতুন এক অভিনব জগতের। পরিদৃশ্যমান ওই সব দুর্লভ মুহূর্তগুলির কিছু কিছু সে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিল রূপান্তরিত করে ভাষা ও ছন্দে। বন্ধুদের সে তা কিছু কিছু পড়ে শুনিয়েও ছিল। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল ওরা।······

সব কিছু আজ তার মনে পড়তে লাগল। আগাগোড়া তার জীবনটাই যেন স্রোতের টানে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ভেসে চলেছে। অনুতপ্ত সে নয় কোন বিষয়েই। গভীরতম ক্ষতের মুহূর্তগুলিও তার ক্ষণিকের। ঘা-টা শুকিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সব কিছুই সে আবার ভুলে যায়।

কিন্তু রোডাই তার ভবঘুরে জীবনের আজ একমাত্র বাধা। এড়িয়ে যেতে হবে ওকে। আবার খাম-খেয়ালী ব'নে যেতে হবে তাকে।

গোল বাধিয়েছে কিন্তু সব মেয়েটাই। নৈতিক আইন-কানুনও একটা আছে—শ্বেতাঙ্গদের সৃষ্ট কঠোর নৈতিক আইন। রোডার আনুগত্যই ওই আইনের প্রতি সব চাইতে বেশী। কথায় কথায় সে যা ওর দোহাই পাড়ে।

আধ্যাত্মিকতার দিক্ থেকে সে কিন্তু বিশ্বাসী স্বতন্ত্র অপর ধর্মমতে। ধবধবে শাদা, পাংশু আর ফ্যাকাশে লম্বা লম্বা পোষাক-পরা স্থানীয় ভদ্রলোকদের চাইতে আদিম যুগের অজানা অপরিচিত দেব-দেবীদের ভালো লাগে তার।

কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে এল। ঘরের চারটি দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে তার মনে হোল একান্ত নিঃস্ব, একক, অপরিচিত বলে। চুপচাপ সে বসে রইল যন্ত্র-পুত্তলির মত। নিজের ব্যক্তিসত্তা সে যেন হারিয়ে ফেলেছে আজ। মন তার উড়ে গিয়েছে যেন অনেক দূরে।

রোডা এখন পার্টিতে। মেয়েটাও ঘুমুচ্ছে। নিশ্বাস পতনের শব্দ ওর শোনা যাচ্ছে। কে জানে, হয়ত এ বুঝি তারই নিশ্বাস ফেলার শব্দ হচ্ছে! তার শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে অপর কারো যে কোন সম্পর্ক নেই, এ কথা সে ভেবেছে অনেক দিনই। তবে তাই যদি হয়, আজ তা হোলে সে একা বেরিয়ে পড়ে না কেনো? কি-ই বা অমন সম্পর্ক—যোগাযোগ তার অপর কারো সঙ্গে?

* * * *

'স্বাধীনতা বণ্ড'গুলি কেনা রয়েছে ট্রাঙ্কে। রোডার প্রয়োজন হতে পারে ও-সব। বণ্ডগুলি সই করার দিনটার কথা তার মনে পড়ল। তাদের যোগানদারী আপিসের এক ঘরে খানসামারা সব এসে হুটোপুটি করে জড়ো হয়েছিল। সামরিক এক এস্পেসাল আমলা তাদের উদ্দেশ করে তখন বলছিলেন:

"একখানা করে বণ্ড তোমরা সব কিনে নাও হে! মিত্রপক্ষ যুদ্ধে জয়লাভ করুক, এ কি তোমরা চাও না? এই 'স্বাধীনতা বণ্ড' তোমাদের সকলেরই কেনা উচিত। গণতন্ত্রের ধ্বজাকে পৃথিবীতে নিরাপদ করতেই তো আমাদের আজকের এই লড়াই। তোমরা যারা রেলগাড়ীতে খানসামার কাজ করো, তোমরাই যে খাঁটি গণতন্ত্রের রাজত্বে বাস করছো আর পাঁচ জন আদত মার্কিণীদের মতন। তোমাদের কাজের তুলনা নেই। নির্দিষ্ট কাজ তোমাদের চালু রেখে যাও। 'স্বাধীনতা বণ্ড' কিনতে কিন্তু ভুলে যেয়ো না। কেন না, মিত্রশক্তির যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় তোমরা যে সকলেই সমান বিশ্বাসী। আমেরিকা যুদ্ধে জয়লাভ করুক, গণতন্ত্রের ধ্বজা সমগ্র বিশ্বে উড্ডীন হোক, এ কি তোমরা সকলে কামনা করো না? এসো সকলে দলে দলে—বণ্ড তোমাদের নিয়ে যাও।"

নৈতিক আইনের দোহাই! কেন বণ্ড!

ভালোই হয়েছিল ওটা কিনে। দাম অবশ্য তার এখন অনেক পড়ে গেছে, তবু কিছু টাকা তো জমল। ব্যাঙ্কেও তার শ' কয়েক ডলার জমে উঠেছে। ওটাও থাক। ইন্সিওরেন্সের পলিসিগুলিও—থাক গে ও-সব!

বেটসি বুঝি একটুখানি নড়ে-চড়ে উঠল। পেছন ফিরে তাকাতে তার কিন্তু সাহস হোল না। দরজার হাসকলটা খুলে বেরিয়ে পড়ল সে। কোথায় যায় সে এবার? নিজেকে শুধাল সে। যে দিকেই চলে চোখ দু'টি। সারাটা জীবনই বুঝি তার এমনি ধারা চিরন্তন শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন পরিক্রমার মধ্যেই অতিবাহিত হবে!

অনুবাদ: নিখিল সেন

উত্তরাধিকার

প্রভাত দেবসরকার

এ পাড়ার এই বাড়ীটা এখনো খালি আছে।

চৌমাথানী রাস্তার দক্ষিণ মাথাটা ধরে একটু নিম্নমুখী হ'লে বাঁ-হাতি বাড়ীটা আপনার দৃষ্টিপথে আসবে—আপনাকে বাড়ীটার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে ইতস্তত: জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হ'বে—আর আপনার যদি বাড়ীর প্রয়োজন থাকে তা হ'লে আশে-পাশে কারো সাক্ষাতের জন্যে অপেক্ষা করবেন। বাড়ীটার বাহিরের প্রাচীর-সীমা অতিক্রম ক'রে ভিতর-প্রবেশের পথ রুদ্ধ—লোহার গেটে মরচে-ধরা শিকলে বাঁধা প্রকাণ্ড একটা তালা ভেতর থেকে ঝুলছে। গেটের প্রায় সব লোহার শিকগুলো লোণা-লাগা ইটের মত ক্ষয়া—বল্লম সদৃশ মুখগুলো মহাকালের শূন্যতাকে ভেঙচে ভোঁতা হ'য়ে গেছে। গেটের দু'পাশে দু'টো অশোক ফুলের গাছের মাথায় সম্প্রতি আগুন ধরেছে।...

গেটটা খোলা পেলে কখনো যদি ভিতরে প্রবেশ করার কৌতুহল জাগে, তা হ'লে দেখবেন: এখানে-ওখানে চালা খোয়ার ফাঁকে ফাঁকে সবুজ গাঢ় শেওলা জমেছে—ঝরে-পড়া গাছের পাতার কঙ্কাল চারি দিকে ছড়িয়ে আছে—কোন সরীসৃপের দেহাবশেষ ভেবে যদি আপনি চমকে ওঠেন আশ্চর্য হবার কিছু নেই। গণ্ডদেশবাহী অশ্রুরেখার মত বৃষ্টির জলের দাগ বাড়ীটার সারা গায়। দৃষ্টিগোচরের সমস্ত জানালাগুলো বন্ধ—গাড়ী-বারান্দার নীচে কার্ণিশের ফাঁকে ফাঁকে পারাবত-পরিবারের কায়েমী সংসার কূজন-সোহাগে পরিপূর্ণ, গাড়ী দাঁড়াবার জায়গাটা শুষ্ক বিষ্ঠায় আকীর্ণ।

স্বর্গীয় কালীনাথ রায় এই বাড়ীর মালিক। সম্প্রতি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের জিম্মায় আছে বাড়ীটা এবং তার দু'জন অধিবাসী। দত্তক পুত্র হিসাবে কালীনাথ উত্তরাধিকার করেছিল হরিনাথ রায়ের প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি, একটি জল-ঝাপান ফোড় গাড়ী, চৌঘুড়ি, জুড়ি এবং এই বাড়ীটা। কথিত আছে, হরিনাথ রায় পল্লীবাসিনী কোন বিধবাকে ফাঁকি দিয়ে মোটা কিছু কাঁচা টাকা এবং পাকা সোনার গহনা আত্মসাৎ করেন। পরে সেই টাকা খাটিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর বিষয়-সম্পত্তির মালিক হ'য়ে ওঠেন। শোনা যায়, সেই বিধবা রমণীটি কয়েক বার গচ্ছিত টাকা এবং গহনার তাগাদায় এসে এই নবনির্মিত বাড়ীটিতে রাত কাটিয়ে যায়—হরিনাথ তার আদর-আপ্যায়নের কোন রকম ত্রুটি হতে দেননি, দেনার কথা কখনো অস্বীকার করেননি—বিধবার নিকট অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ইতস্তত: করেননি কোন দিন। নগদ টাকায় দেনা পরিশোধ করা যদি সম্ভবপর না-ও হয় তা হলে বাড়ীর অংশ বিধবার নামে লেখা-পড়া করে দিয়ে যাবেন, এ আশ্বাস দিয়েছিলেন। শেষ বারে বিধবা যখন তাগাদায় আসে তার বিশেষ দৈহিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে হরিনাথের সহধর্মিণী তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়: নষ্ট মাগী, নষ্টামী করবার জায়গা পাওনি, এখানে এসেচ নষ্টামি করতে? ঝেটিয়ে বিষ ছেড়ে দেব, ভাল চাস্ তো এখুনি বেরিয়ে যা—নচ্ছার কোথাকার!

দেনার কথা হরিনাথের স্ত্রীর জানা ছিল। ভেঙচে বললে, টাকা চাই? তোর ঐ পেট খোড়ে নিগে যা, সুদ শুদ্ধু পাবি!

সদর-ঘরে তাকিয়া ঠেস দিয়ে জানালার বাইরে লুব্ধদৃষ্টি মেলে হরিনাথ বিধবার সলজ্জ-কুণ্ঠিত মন্থর পলায়ন লক্ষ্য করে চোখ ঠেরে হেসেছিলেন—দেওয়ালকে শুনিয়ে বলেছিলেন, টাকা? সত্যিই তো, কিসের টাকা? কার টাকা? আমাকে আবার এর মধ্যে আনা কেন রে বাপু, বুঝি না!

হঠাৎ চোখ ফেরাতে দেওয়ালের গায়ে শিকার-অক্ষম সন্তান-সম্ভবা আঁকা-বাঁকা মন্থর-গতি টিকটিকিটার ওপর নজর পড়তে সারা দেহটা তাঁর অকারণে শির-শির করে উঠেছিল।...

হরিনাথের স্ত্রীর অনেক দিন কোন সন্তান-সম্ভাবনা দেখা গেল না। হরিনাথের হিতাকাঙ্ক্ষীরা রোজ সন্ধ্যেবেলায় বৈঠকখানায় আড্ডা জমিয়ে কথায় কথায় শিশুপুত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করে দিত—বলতো, বাঁজা মাগ, বাঁজা গরু সংসারের অমঙ্গল, বিদেয় করে দাও হে হরি!

ছেলের কথা উঠলে হরিনাথ চোখ বুজিয়ে তাঁর স্ত্রীর মূর্ত্তিটা তাঁর পরম কৃতজ্ঞতাভাজন বিধবাটির অবয়বিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করতেন। খুব একটা বাসনা জাগতো না, স্পর্শনীয় কোন রক্ত-মাংসের দেহপিণ্ডের জন্যে। মদের গ্লাসে ইচ্ছে করলে অমন দু'-পাঁচটা আত্মজের শিশুমুখ দেখতে পেতেন হরিনাথ। তাঁর বংশ রক্ষে করে তাঁকে পুন্নাম নরক থেকে ত্রাণ করতে কেউ যে জন্মায়নি এ কথা বন্ধুবান্ধবদের সামনে মুখে বললেও মনে মনে তিনি বিশ্বাসই করতেন না।

এদিকে হরিনাথের স্ত্রী ছেলের জন্যে যত না উতলা হ'লো তার চেয়ে বেশী সতীনের ভয়ে তটস্থ হ'লে উঠলো। এ সব ক্ষেত্রে পত্নী গ্রহণ ব্যাপারে পুরুষের ধীর বুদ্ধিকে বিশ্বাস করার মত নির্বুদ্ধিতা আর নেই। বিধবা মেয়েটা যখন মাতৃত্বের চিহ্ন নিয়ে ভয়ে ভয়ে তার চোখের আড়াল হ'য়েছিল তখন স্বামীর চেয়ে সে নিজেকে বেশি দোষারোপ করেছিল—আপশোসে মাথা কুটে রক্ত বার ক'রতে চেয়েছিল স্বামীকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করার জন্যে, নিজের অদূরদর্শিতা এবং সোহাগ-শিথিলতার জন্যে আত্মঘাতী হ'তে চেয়েছিল। এখন তাই মাঝে মাঝে অন্ধকারে স্বামীর বিছানা হাতড়ে দেখে।... দাসীর সহযোগিতায় পাড়ার বস্তীবাসী স্বজাতি মুড়িওয়ালাকে লোভ দেখিয়ে পুত্রদানে মত করালে। হরিনাথ প্রশ্ন করার পূর্বেই ধুমধাম যাগযজ্ঞ হোম করে' কালীনাথকে কোলে তুলে নিলে।

সদ্য মুণ্ডিত মস্তক কালীনাথকে দেখিয়ে হরিনাথ বললেন, খুব জিতলে বলে' তো মনে হয় না ইন্দু!

কালীনাথের নেড়া মাথায় হাত বুলতে বুলতে হাস্যমুখী হ'য়ে ইন্দুমতী বললে, কেন, ছেলেটি তো বেশ—ভারি শান্ত!

কালীনাথ একবার হরিনাথ, একবার ইন্দুমতীর মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ ব্যাদন করে' অশ্রুতপূর্ব একটা শব্দ ক'রলে।

হরিনাথ ইন্দুমতীকে উদ্দেশ্য করে' বললেন, শুনলে তো?

ইন্দুমতী হাসতে লাগলো পাওয়ার আনন্দে কি জয়ের গৌরবে, কি মাতৃহৃদয়ের ক্ষুধা চরিতার্থ হওয়ায়, বলা বড় শক্ত।

হরিনাথ দেখলেন, বিধবা মেয়েটি অপমানিত হ'য়ে ফিরে যাবার পর ইন্দুমতী এই প্রথম এবং দ্বিতীয় বার হাসলে।

ক্রমে ক্রমে কালীনাথকে হরিনাথের সহ্য হ'য়ে গেল। দত্তক হ'লেও আমার ছেলে বলে' পরিচয় দিতে তাঁর জিভ আর জড়িয়ে যেত না। মাঝে মাঝে কাছে ডেকে আদর করতেন, শোন খোকা, বল দিকি আমি তোমার কে?

ইতিমধ্যে কালীনাথের চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়েচে—নেড়া মাথায় কাল কচি চুল গজিয়েচে, গায়ে মাংস লেগেচে—অনাহার-ক্লিষ্ট মুখটা বেশ ফুলে উঠেচে।

কালীনাথ দেশী মিহি কালাপেড়ে কাপড়ের ফুল করে কোঁচান কোঁচার খুঁটটা সন্তর্পণে ধরে সপ্রতিভ জবাব দিলে, কে আবার? মা বলচে বাবা!

বয়েসের তুলনায় ছেলেটা বেশ চালাক, হরিনাথ ভাবলেন মনে মনে—বিষয়-কর্ম্মের জটিলতা অতি সহজেই বুঝতে পারবে বলে মনে হয়। হরিনাথ আরো আশ্চর্য্য হলেন দত্তক পুত্রটির পুরোন খেলার সঙ্গীদের প্রতি বিমুখতা দেখে, গেটের ভেতর সমবয়সী কোন ছেলেকে কালীনাথ ঢুকতে দিত না। হরিনাথ এক দিন নিজের চোখে দেখলেন: কালীনাথ রামদিনকে দিয়ে গেট বন্ধ করিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে বানরের মত মুখভঙ্গ করছে। হঠাৎ হরিনাথের সঙ্গে চোখাচোখি হ'তে নালিশের সুরে বললে, দেখ না, ছেলেগুলো আমার সঙ্গে খেলতে আসচে কেবল!

কালীনাথের এতটা মর্য্যাদা বোধ হরিনাথ আশা করেননি—এ বাড়ীর অন্ন দু'দিন পেটে পড়তে না পড়তে আত্মমর্য্যাদা এবং সম্মান-বোধে এতখানি দীক্ষিত হ'য়ে ওঠা খুঁড়িয়ে চলারই মত দৃষ্টিকটু। হরিনাথের ইচ্ছে হয়েছিল, ছেলেটার মুখের ওপর গেটটা ভেঙ্গে রুদ্ধ তরঙ্গোচ্ছ্বাস আহ্বান করে আনেন—ভাসিয়ে নিয়ে যাক না কেন ঐ ঐ খড়কুটোটাকে। শোনা যায়, এক দিন কালীনাথ নিজের বাপের গালে কামড়ে দেয়, ভদ্রলোক না কি বিক্রীত অপত্যস্নেহ পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছিলেন বলে।...

দত্তক নেওয়ার বছর ছয়েক পরে একটা অভাবিত ঘটনা ঘটে গেল, ইন্দুমতী পুত্রসন্তান প্রসব করলেন, সারা বাড়ীটা যখন ধুমধাম এবং আমোদ-আহ্লাদে নব জাতককে অভিনন্দন জানাচ্ছে তখন দু'টি প্রাণী এই শুভাগমনের দু'রকম মানে করলে। এক হরিনাথ নিজে আর এক কালীনাথ। হরিনাথ ভাবলেন, ছেলে তাঁরই ঔরস জাত তো—ইন্দু শোধ নিলে না তো!

কালীনাথ ভাবলে, বিষয়ের ভাগ ও-ছেলেটাও তো পাবে! কিশোর শ্বাপদের মত চোখ দু'টো তার সহসা সন্ধানী এবং ক্রূর হয়ে উঠলো।

ইন্দুমতী স্বামীর কোলে শিশুপুত্রকে তুলে দিয়ে আর একবার মধুর হাসলে।

এক দিন খেলতে খেলতে কালীনাথ ছেলেটিকে ফেলে দেয়—সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট কেটে রক্তপাত হয়। খবর পেয়ে ইন্দুমতী বাঘিনীর মত ছুটে এসে কালীনাথের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হরিনাথ কান ধরে টানতে টানতে কালীনাথকে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরের মধ্যে পূরে দরজা বন্ধ করে' বেধড়ক প্রহার করলেন। অজ্ঞান না-হ'য়ে পড়লে প্রহারেই কালীনাথের জ্ঞান শেষ হ'য়ে যেতে পারত।

এর পর এক দিন কালীনাথকে সন্ধ্যের অন্ধকারে গা-ঢেকে গেটের পাশে অশোক গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে বাপের হাতে এক গোছা নোট গুঁজে দিতে দেখা যায়। পরের দিন হরিনাথ পাঁচশো টাকার দু'বাণ্ডিল-নোট চুরি গেছে বলে' থানার ডাইরী করে' এলেন বাড়ীর ঝি-চাকর-দারওয়ান তাড়ন-তিরস্কারের একশেষ হ'লো। অনেক খোঁজা-খুঁজি তল্লাসের পরও যখন টাকাটা পাওয়া গেল না, তখন ফুঁ দিয়ে ধুলো ওড়ানর মত করে' হরিনাথ ব'ললেন, কে আবার নেবে, ও-শালার ছেলেই নিয়েছে! নিক্ তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু শেষটা চোর-ছেঁচড় হ'য়ে নাম না ডোবায়!

ঢোঁকে ঢোঁকে ইন্দুমতীর বিয়োন ছেলেটার জন্যে বাৎসল্য রসটা গাঁজিয়ে ওঠে। পান-পাত্রে প্রায়ই ছেলেটার মুখ ভেসে ওঠে—ভারি মায়া হয়। কালীনাথের তুলনায় ছেলেটার মুখ কি রকম অসহায় মনে হয়, হরিনাথের।

ছেলে বছর খানেকের হ'য়ে হঠাৎ এক দিন রক্ত-বমি করে' মারা গেল। ডাক্তার-বদ্যিতে বাড়ী ছেয়ে গেল—জল-পড়া এবং ঝাঁড়-ফুঁকের ধুলো উড়ে গেল, কিছুতেই কিছু হ'লো না। ছেলের মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্ত্তে হরিনাথের যেন মনে হ'লো, ছেলেটার গলার দু'পাশে কালশিরা দাগ। চকিতে রোগ-রহস্যটা তাঁর কাছে জলের মত পরিষ্কার হ'য়ে ওঠে।

মড়া বেরিয়ে যেতে না যেতে হরিনাথ সন্ধান ক'রে কালীনাথকে রামদিনের সিদ্ধির আড্ডা থেকে ধরে আনলেন। মেঘনাদ-হারা সহস্রমুখ রাবণের মত তাঁর চোখ-মুখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুতে

লাগল। কালীনাথের বুকের ওপর চড়ে বসে' গলাটা বাঘের থাবায় চেপে ধরলেন—জিভটা বার না-হওয়া পর্য্যন্ত ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে গর্জ্জন ক'রতে লাগলেন, বল শালার বেটা, বল, খোকার গলায় দাগ কিসের?

কালীনাথ গোঁ-গোঁ করতে লাগল। শিলাখণ্ডে শীকার আছাড় মারার মত করে' হরিনাথ বললেন, বল, এমনি করে?

ইন্দুমতী নিরস্ত না করলে কালীনাথের চোখ দু'টো হয়তো ঠিকরে বেরিয়ে আসতো। উপুড় হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ইন্দুমতী বললে, আঃ, থাক, থাক, ও কি জানে! মরে যাবে যে!

সে রাত্রে কালীনাথ চোখে আগুন দেখেছিল—বেহুঁস হয়ে তিন দিন বিছানা ছাড়তে পারেনি। আর হরিনাথ বসে সারা রাত মদ খেয়েছিলেন—ভোর বেলায় জবাফুলের মত চোখ করে' ইন্দুমতীকে শোকে সান্ত্বনা দিতে এসে দেখেন, ইন্দুমতী তখনো মেজের ওপর উপুড় হ'য়ে পড়ে খুব নীচু স্বরে কাঁদছে—শব্দটা মেঝের মারবেল পাথর ছুঁয়ে কড়িকাঠ পর্য্যন্ত পৌছচ্ছে না। রক্ত-চক্ষুতে দেখা শোকবিহ্বলা ইন্দুমতীকে হঠাৎ বড় সুন্দর বলে মনে হয়েছিল হরিনাথের।

শেষটা কিন্তু কেঁদে কেঁদে ইন্দুমতী মারা গেল। হরিনাথ অত্যাচার করে' করে' শরীর ভেঙ্গে ফেললে—বার্দ্ধক্যটা এসে তাঁকে শীতের লেপের মত জড়িয়ে ধরলে, কালীনাথ বিষয়ের মালিক হ'লো।

প্রকাশ্যে কালীনাথ হরিনাথকে ভয় করতো। এক কথায় বাপের মনোনীত পাত্রীকে বিয়ে করলে।

নববধূর মুখটা বড় চোখ-ভোলান, মন-মাতান নয় মোটে, কালীনাথ ভাবলে। গোঁফের রেখা উঠতে প্রথম মদ খাওয়ার মহলায় "ভিনো' খেয়ে কালীনাথ একবার বড় ঠকেছিল—সারা রাত্রি তার গা বমি-বমি করেছিল। দু' এক দিন বেড়াল-ছানার মত বধূকে নিয়ে চটকে আদর করতে চেষ্টা করেছিল কালীনাথ—নখদন্তের সাক্ষাৎ না-পেয়ে বড়ই হতাশ হয়েছিল শেষ পর্য্যন্ত।

হঠাৎ কোন দিন রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেলে নববধূ দেখতো, বিছানা খালি—আলগোছা উঠে-যাওয়া লঘুকুঞ্চন রেখা মাত্র আছে পুরু বিছানাটায়, অর্গলবদ্ধ দরজাটা খোলা, পাল্লা দু'টো উঁকি মারার মত ফাঁক করা। বিছানায় উঠে বসে নববধূ স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করেছিল কয়েক দিন বৃথাই। আস্তাবল থেকে ঘোড়ার পা ঠোকার এবং সহিসের মশা-মারা চাপড়ের শব্দ ছাড়া আর কোন সাড়া সে পায়নি। ভোর হ'তে নববধূ কয়েক বার কাপড়-চোপড় সামলে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসেছিল—তার মনে হ'য়েছিল, কার পায়ের শব্দ যেন তার ঘরের দরজার সামনে পর্য্যন্ত এসে থেমে গেল। হরিনাথ বাবু তখন খড়ম পায়ে কল-ঘরের দিকে এগিয়ে আসছিলেন—দরজা খোলা দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। বধূ বেরিয়ে আসতে জিগ্যেস করলেন, বৌমা, তোমরা কি রাতে দরজা খুলে শোও?

নববধূকে নীরব দেখে' বললেন, খবরদার, অমন দুঃসাহসিক কাজ করো না—কোন দিন চোর-ছেঁচড় একটা বিপরীত কাণ্ড করে' বসবে। গরম হয় সারা রাত পাখা চালাবে···বিয়ে করে' গুয়ার দেখছি খুব হিসেবী হ'য়ে উঠেচে।

নববধূর জবাব প্রত্যাশা না-করেই খট্‌-খট্‌ খড়মের শব্দ করে' হরিনাথ চলে গেলেন।

এর পর এক দিন ভোরে কল-ঘরের দরজা ঠেলতে গিয়ে হরিনাথ বাধা পেলেন—ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। ভিতরের মানুষটা বাইরে আসবার প্রতীক্ষায় সামনের দালানটায় হরিনাথ পায়চাড়ি করতে লাগলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেও কেউ বেরিয়ে এল না দেখে হরিনাথ ঘন ঘন দরজায় ঘা দিতে লাগলেন—শেষে লোক-জন ডেকে দরজা ভেঙ্গে দেখলেন, বধূমাতা স্নানের পাথরের টবটার ভেতর মরে ভাসচে—চোখের চাউনি চৌবাচ্চায় ছাড়া মরা মাছের মত সম্পূর্ণ নিমিলিত। ক'বছর আগে কালীনাথ সংভায়ের গলা এই কল-ঘরে টিপে দিয়েছিল—ঐ বাথ-টবটায় বার কয়েক তাকে চুবিয়ে ধরেছিল।···

বড় আশা করে' হরিনাথ বধূ-নির্বাচন করেছিলেন—বনেদী বড় বংশের সুন্দরী মেয়ে এনে নিজের বংশ-বনিয়াদটাকে শক্ত ক'রতে চেয়েছিলেন। হরিনাথ হয়তো আরো কিছু দিন বাঁচতে পারতেন, কিন্তু বধূমাতা তাঁকে বড় দাগা দিয়ে গেল—শোক সহ্য ক'রতে পারলেও কৃতকর্ম্মের আপশোষ তিনি সহ্য করতে পারলেন না। এক দিন সজ্ঞানে মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার তৈরী বাড়ীটার ভিত কেঁপে উঠলো, বিষয়-সম্পত্তিগুলো হাতের চেটোয় জল নেওয়ার মত আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে গেল।

দ্বিতীয় বার কালীনাথ নিজে দেখে-শুনে বিয়ে ক'রলে, বধূ সুন্দরী নয়, কিন্তু বয়স্থা এবং চটপটে। দু'দিনে কালীনাথ বুঝতে পারলে, বৌ তার যোগ্যই হ'য়েছে এবার—বিছানায় গভীর গর্ত্ত আর অধিক

কুঞ্চন রেখা না রেখে পালিয়ে যাবার উপায় নেই। কালীনাথ ঘুমিয়ে পড়লে দ্বিতীয়া আপন আঁচলের খুঁটের সঙ্গে স্বামীর কাছার খুঁট বেঁধে রাখে—কালীনাথ গোঁফ-ছাঁটা কাঁচির ব্যবহার করে' মুক্ত হ'তো প্রায়ই। যেদিন ধরা পড়ে যেত সেদিন পৌরুষের ব্যবহার করতো। এই বাটীতে স্ত্রী-তাড়নের প্রথম সূত্রপাত ক'রলে কালীনাথ।

এক দিন রাত্রে বিছানা হাতড়ে স্বামীকে খুঁজতে খুঁজতে তারাসুন্দরীর যেন মনে হ'লো, কল-ঘরের ঐখান থেকে একটা বিনিয়ে-বিনিয়ে কান্নার সুর আসচে। ভয়ে তারাসুন্দরীর কণ্ঠতালু শুকিয়ে উঠলো—চোখ বুজিয়ে কানের আশেপাশে বালিশ-চাপা দিয়ে শব্দটাকে শ্রুতির বাইরে রাখতে চেষ্টা ক'রলে—কিন্তু কোন রন্ধ্র-পথে শব্দবহ বায়ু প্রবেশ করে' কান্নার সুরটা রনিয়ে তুললে। তারাসুন্দরী গা ঠেলে ঠেলে স্বামীকে সজাগ ক'রলে। কালীনাথ প্রথম রাত থেকেই বিরক্ত হ'য়ে ঘুমিয়েছিল,—ঘুম চটে যেতে রুষ্ট কণ্ঠে জিগ্যেস ক'রলে, আবার জ্বালাতন আরম্ভ ক'রলে! বল, বাইরে চলে যাচ্চি!

বালিশে মুখে গুঁজে রুদ্ধশ্বাসে তারাসুন্দরী বললে, শুনতে পাচ্চ না, কল-ঘরে কে কাঁদচে?

অন্ধকার ঘরে কালীনাথ কানটা একবার খাড়া করেছিল—কোন শব্দই তার কানে পৌছায়নি। হঠাৎ কি মনে করে' তারাসুন্দরীর মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, তোমার পেটের ছেলেটা বোধ হয় বেরিয়ে আসবার জন্যে কাঁদচে, সুখসামাদা লোকে কাঁদতে যাবে কেন, ও তোমার মনের ভুল!···

ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মত ছেলে হলো কালীনাথের। অনেক দিন পরে এ বাড়ীতে আবার উৎসবের ঢেউ উঠলো। বহু বিস্মৃত আত্মীয়-স্বজনেরা নিমন্ত্রিত এবং আপ্যায়িত হলো। উৎসব শেষে সবাই ফিরে গেল, শুধু তারাসুন্দরীর পিসতুতো বিধবা বোন কালীদাসী ফিরে যায়নি—ছেলে দেখবার জন্যে তারাসুন্দরী তাকে ধরে রাখলে—কালীনাথ আপত্তি করলে না।

শশিকলার মত ছেলে বাড়তে লাগল। হরিনাথ বেঁচে থাকলে বংশের মুখোজ্জ্বল হবার সম্ভাবনায় আশ্বস্ত হ'তে পারতেন। তারাসুন্দরী ছেলের নাম রাখলে মনোরঞ্জন। কালীনাথের মনে হলো, নামটা ঠিক মানানসই হয়নি এ বংশ-পত্রিকা অনুযায়ী। মনে পড়লো, ঐ রকম একটা নাম তার কাছে চাঁদা চাহিতে এসে কে যেন বলেছিল। হ্যাঁ, মনে পড়চে পাড়ার বৃদ্ধ কেরাণী অনুকূল বাবুর মেজ ছেলে! কালীনাথ ছেলের অন্নপ্রাশনের সময় ছেলের নামকরণ করলে, বীরেন্দ্রকিশোর।

মনোরঞ্জনকে কালীনাথের বড় একটা ভালো লাগতো না—বড় রাশভারি ছেলেটা। লেখাপড়ায় আচার-ব্যবহারে এমন উৎরে যেতে লাগল যে, কালীনাথ মনে মনে ছেলেকে ভয় না করে পারলে না। আদর করা তো দূরের কথা, ছেলে কাছে এসে বসলে কালীনাথের বুক ঢিপ-ঢিপ করতো, এই বুঝি কি একটা জেরা করে' বসে। চোখ জোড়া দিয়ে তার ভেতরটা দেখে ফেলবে বুঝি! একবার জুড়ী গাড়ী উল্টে পড়ে' কালীনাথের খুব চোট ল'গে: 'এক্স-রে' করবার জন্যে হাজার-বাতি চোখ-ধাঁধান আলোর সামনে বসতে হয়েছিল—উঃ, সে কি অস্বস্তিকর অনুভূতি!

বরং মনোরঞ্জনের ছোট সরোজটাকে কালীনাথের ভালই লাগে—হ্যাংলা রুগ্ন ছেলেটাকে আপনার মনে হয়। খোঁড়া পায়ে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে সরোজ যখন কুকুর যাবার মত নেকরা করে' কোলে উঠতে চায়, কালীনাথ সরে দাঁড়ালে কি হবে, আপন অঙ্গের একটা ক্রিয়া ভেবে মনের রাগ মনে চেপে যেত—নিজের গালে চড় খেলে আঘাত বিশেষ লাগে না। সরোজের চেহারাটাও পোকায় খাওয়া কুষ্মাণ্ড বেগুনের মত। সরোজ হবার আগে তারাসুন্দরী কল-ঘরে ভূত দেখে আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিল—মাজার ব্যথা এখন পিঠের চালে উঠে এসেছে—মেজাজটা তিরিক্ষে হয়ে গেছে।

মনোরঞ্জন যে বছর বি-এ পাশ করলে সেই বছর অনেকগুলো সম্পত্তি কালীনাথের হাত-ছাড়া হ'লো—আস্তাবল থেকে ঘোড়া চারটে ছুটে পালাল আর ফোর্ড গাড়ীটা মেরামত হ'তে গিয়ে ফেরবার মুখে ষ্টার্ট নিলে না, জলে-কাদায় পড়ে যাত হ'য়ে গেল—শেষে মণ দরে বিক্রী হ'লো। উনিশ বছরের সুপুরুষ স্বাস্থ্যবান যুবক মনোরঞ্জনের সামনে দাঁড়াতে পারে না কালীনাথ। সরোজ কারণে-অকারণে বড় ভায়ের হিংসের জ্বলে যেতে লাগলো। এক দিন কি নিয়ে কথা-কাটাকাটি হ'তে সরোজ ছুটে গিয়ে বন্দুক বার করে' আনলে। বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে দু'ঘা কসে চড় কসিয়ে দিয়ে মনোরঞ্জন শুধু ধমকে দিলে, নড়তে পারে না, বন্দুক ঘাড়ে, শুয়ার কোথাকার, মেরে লাল করে' দেব, বেরো বলচি সামনে থেকে!

সরোজ খোঁড়াতে খোঁড়াতে পেছন ফিরে মুখ ভেঙাতে ভেঙাতে শাসাতে শাসাতে চলে গেল।···

এক দিন কালীদাসী কেঁদে এসে তারাসুন্দরীর পায়ে পড়ল; দিদি, আমার গতি কি হবে?

বোনের মুখের উপর চেয়ে তারাসুন্দরীর খেয়াল হ'লো—কালীনাথের পায়ের শেকল কেটে দেবার মত পোষ সে মানেনি—নিজের রোগের জ্বালায় বড়া নজর তুলে নেওয়া তার অন্যায় হ'য়েচে। তবুও একবার জিগ্যেস্ করলে, কে?

কালীদাসী মনোরঞ্জনের নাম করলে। তারাসুন্দরীর তখন উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকলে কালীদাসী অক্ষত ফিরে যেতে পারতো না, ছেলেকে ডেকে সত্যি-মিথ্যে যাচাই করে' দেখবার আগেই মনোরঞ্জন মায়ের পা ছুঁয়ে দিব্যি ক'রলে, এ কাজ তার দ্বারা হয়নি।

বদনাম রটনার খবর মনোরঞ্জনের কানে আগেই পৌছেছিল। তারাসুন্দরীর মনে পড়লো, কালীনাথ এক দিন ছেলের চরিত্র সম্বন্ধে তার কাছে যেন কি সব বলতে চেয়েছিল।

সেই দিন রাত্রে মনোরঞ্জন বাপ এবং মাসীকে এক ঘরে পূরে হান্টারপেটা করলে, কালীনাথ বাধা দিতে চেষ্টা করতে একটা হাত খোঁড়া হয়ে গেল—কালীদাসীর মুখ প্রহার-চিহ্নে ক্ষত-বিক্ষত হলো। প্রহার শেষ করে যখন বন্দুক উঁচিয়ে ধরলে, কালীনাথ স্ক্রাও চাতে ক্যাং চাতে খোঁড়া হাতে ছেলের পা ধরে গড়াগড়ি যেতে লাগল। কালীদাসী থেতলান নাকে সুর টেনে বললে, আগে আমাকে মার।

কি মনে করে মনোরঞ্জন বন্দুক ফেলে দিয়ে সেই যে এ-বাড়ী ছাড়লো আর ফিরে এলো না, বা কেউ তার সন্ধান করতে পারলে না। কেউ কেউ বলে, মনোরঞ্জন এই বাড়ীটার কোন একটা ঘরে আত্মহত্যা করেচে—সে ঘরের খবর কেউ রাখে না।

এর পর মাস দুয়েকের মধ্যে কালীনাথ মারা গেল। হরিনাথের চাবুক খেয়ে কালীনাথ অনেক দিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল; কিন্তু ছেলের হাতে প্রহার খেয়ে কালীনাথ আর সুস্থই হলো না।

একেবারে চোখ বুজিয়ে তবে গায়ের জ্বালা জুড়লে। বিষয়-সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে চলে গেল।···

মাসিক বরাদ্দে তারাসুন্দরী ও সরোজ বাড়ীটা আগলে রইল। মাসকাবারী 'মনি-অর্ডার' আসতে দেরী হলে সরোজ বিটের পিওনের কাছে চড়া সুদে টাকা ধার করে। পরে টাকা হাতে পেলে পিওন সুদে-আসলে টাকাটা কেটে নেয়। তারাসুন্দরী যদি কোন মাসে জিগ্যেস করে, এ মাসে এত কম টাকা যে? মাসোয়ারা কমিয়ে দিলে না কি?

সরোজ টাকা ধার নেওয়ার কথাটা চেপে যায়—বলে, শালারা সব পারে! তারক কাকার সঙ্গে পরামর্শ করে কোম্পানীর কাছে দেব দরখাস্ত করে, বুঝবে তখন!

এক এক মাসে এমন হতো, তারাসুন্দরী কোন টাকারই মুখ দেখতে পেত না—মনি অর্ডারের টাকাটা রাস্তায় ভাগাভাগি হয়ে যেত। উপায়ান্তর নেই দেখে তারাসুন্দরী ঘরের আসবাবপত্র বার করে ছেলের হাতে তুলে দেয়।

বাড়ীর সামনে একটা পান-বিড়ির দোকান আজ ক' বছর হয়েছে, উড়ে ঠাকুর পানের খিলির তলায় লগ্নী কারবার করে—দু'-এক জন বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া তার কারবারের খবর কেউ জানে না। বিপদে আপদে সরোজকে সে অনেক বার সাহায্য করেছে—অবশ্য এই ভরসা-স্থলটার খবর পিওনই সরোজকে দেয়। মায়ের গোচরে এবং অগোচরে বাড়ীর দামী জিনিষগুলো উড়ে ঠাকুরের কাছে বন্ধক রাখে।

এক দিন উড়ে ঠাকুর সোডার বোতলের সঙ্গে এমন একটা জিনিষ দেখালে যে, খোঁড়া সরোজ তেওলা কুকুরের মত জিভটা বাড়িয়ে দিলে। ঠাকুর চোখের কোণে হাসির ঝিলিক টেনে ইঙ্গিত করলে। মনোরঞ্জনের কেনা একটা 'রেডিও সেট' কাপড়ে জড়িয়ে সরোজ ঠাকুরের হাতে সমর্পণ করলে। দেশী ধেনো বিলিতী লেবেল-ওয়ালা বোতলে ঢেলে অন্য রঙ মিশিয়ে ঠাকুর সরোজকে লুব্ধ করেছিল।

তারাসুন্দরী সব সময় গেটে ভেতর থেকে চাবি দিয়ে রাখতে বলে—বাইরের জগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। কারো সঙ্গে কোন ফাঁকে মেলামেশা করতে চায় না। ভেতর-বাড়ীর ওপর-নীচ করে খোঁড়া ছেলেটাকে বকে-ঝকে শুয়ে-বসে তার দিন কেটে যায়; তা নয় তো সারা বাড়ীটাতে জল ঢেলে নিজে হাতে ধোয়া-মোছার কাজ করে উদয়-অস্ত। মাঝে মাঝে মনোরঞ্জনের কথা ভেবে খাওয়া বন্ধ করে ভূমি-শয্যা নেয়—তিন দিন তিন রাত। সরোজের তখন মনে হয়, বাড়ীটার সব ঘরে ঘরে সুর করে কান্নার রোল উঠেচে। এত বিশ্রী লাগে সরোজের যে বাড়ী ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যায়—উড়ে ঠাকুরের পরামর্শ নিতে ছোটে।

যে-দিন খুব বেশী মদ খেয়ে সরোজ বিছানায় মুখ রগড়ায় সে দিন তারাসুন্দরীর মুখ খুলে যায়—কাউকে বাদ দেয় না, সরোজের চৌদ্দ-পুরুষ উদ্ধার করে ছাড়ে। সমস্ত বাড়ীটার ওপর তার এত যে মায়া তা এক নিমেষে কেটে যায়।···

এ বাড়ীটা বাইরে থেকে যখন ভূতের বাড়ী বলে পথচারীর মনে হয়, তখন তারাসুন্দরী খোঁড়া সরোজকে কোলের কাছে নিয়ে শুয়ে থাকে—টিনের চালে ঝিড়ালীর ছানা-পোনা নিয়ে রোদ পোয়ান'র মত। কখনো কখনো হঠাৎ সরোজকে ঝেড়ে ফেলে উঠে বলে—মনে হয় অনেক কাজ তার বাকি পড়ে আছে।···

মদ খাওয়ায় যখন পাকা-পোক্ত হয়ে উঠেছে তখন উড়ে ঠাকুর সরোজকে আর একটা নেশার আস্বাদ পাইয়ে দিলে। এক দিন তাকে এক মেয়ে-মানুষের কাছে নিয়ে গেল। কানা-খোঁড়ার মধ্যে দৈহিক ক্ষুধার প্রকাশ দেখলে মেয়েরা সচরাচর হাসে—সে-হাসি অবজ্ঞার কি বিদ্রূপের, কি করুণার, বলা শক্ত। কিন্তু তারা হাসে, হয়তো ভাবে, সখ মন্দ নয়!

উড়ে ঠাকুর তাড়াতাড়ি মেয়েমানুষটার কানে কানে জানিয়ে দিলে: দেখতে খারাপ হ'লে কি হ'বে—ভেতরে শাঁস আছে—হাসলে ঠকবি!

সরোজ ফিরে যাচ্ছিল। মেয়ে-মানুষটা গিয়ে তার হাত ধরলে—আদর ক'রে এনে বিছানায় বসালে। সরোজ দুধে পাঁউরুটীর মত রসে ঢোল হ'য়ে উঠলো। তারাসুন্দরী সরোজের বাপের ওপর যেমন কড়া নজর রেখেছিল, সে-রকম নজর যদি সরোজের ওপর রাখতো তা হ'লে দেখতে পেতো—সরোজ আজকাল প্রায়ই বাড়ী ফিরতে ভুলে যায়—আর যখন ফেরে তখন অশোক গাছের ডালে—বাঁধা-নীড় থেকে কাক ডেকে ওঠে।···

পরে পরে কিছুই অপ্রকাশ থাকে না। প্রকাশ্যে সরোজ বাইরে রাত কাটিয়ে আসে—মায়ের সামনে আসতে তা'র আর লজ্জা করে না। ব্যাপারটা তারাসুন্দরীর গা-সওয়া হয়ে গেছে—ছেলেকে অস্বাভাবিক অবস্থায় দেখলে আর কোন প্রশ্ন জাগে না তার মনে। এ বংশের এটাই স্বাভাবিক। অমন যে ছেলে মনোরঞ্জন হীরের টুকরো, সেই যখন কাচ হ'য়ে গেল তখন এর কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাওয়াই বোকামি। কিন্তু সত্যিই কি মনোরঞ্জন এমন একটা কাজ করেছিল? না করে' থাকলে শেষ অত কেলেঙ্কারী করেই বা পালিয়ে যাবে কেন?

তারাসুন্দরী নিজের রক্তের চেহারা দেখে সময় সময় ভাবেন, হয়তো বা কালীদাসীর কথাই সত্যি! এদের কাউকে বিশ্বাস নেই!

* * *

হঠাৎ মেয়েমানুষটার দেওয়া জল খেয়ে বুকের ভেতরটা কেমন জ্বালা করে উঠলো—আগুন খাওয়ার মত। সরোজ জিগ্যেস্ ক'রলে, জল না কি দিলে আমাকে?

অবাক হ'য়ে মেয়েমানুষটা বললে, বা রে, কি আবার দেব! অতো যদি অবিশ্বাস এখানে কিছু না খেলেই পার!

সত্যি সত্যি অভিমান করে' বলে।

সরোজ জ্বালা ভুলে হাসবার চেষ্টা করে: না, না, ও-কথা কে বলেচে? তুই কি আমায় সে-রকম মনে করিস?

নেশাটা বেশ গোলাপী হ'য়ে চোখের কোলে ভর করেছে। সরোজ জড়ান জিভে বললে, মাইরি, মা-ই-রী-রী-রী তোকে···

সরোজ কিন্তু বেশীক্ষণ বসতে পারে না। বুকের জ্বালা কমলেও দৈহিক অস্বস্তি বেড়ে যায়। এক সময় উঠে পড়ে। বাড়ীর দিকে ছুটলো। বাড়ীর গেটের কাছে এসে মনে হ'লো, হাতের হীরের আঙ্‌টিটা নেই—উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া হরিনাথের সোনার টেঁক-ঘড়িটাও নেই। ঠিক মনে করতে পারলে না, সোনার বোতাম পরে সে আজ বেরিয়েছিল কি না!

সিঁড়িতে পা দিয়ে সরোজ কি মনে করে' শ্বাপদের মত পা টিপে-টিপে এগুতে লাগল। অসময়ে তার প্রত্যাবর্তন মা হয়তো অন্ত

ডাক

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

জালিয়ানাবাগ থেকে—
এই সে-দিনো কলকাতা-রাজপথে রামেশ্বর আর সালাম গিয়েছে ডেকে :
জালিমের নাঙ্গা শমসীর মোর কলিজা ছিঁড়েছে ভাই,
এ জুলুম-শাহীর এবারে খতম চাই !
নব জীবনের সূর্য স্বপন নয়নে আছিল আঁকা
উহারা হাসিয়া বাঁকা
প্রতি চোখে চোখে হেনেছে মৃত্যুবাণ
তবু তো হয়নি স্বপ্ন ছত্রখান।
এক সাথে তবু তাদেরি মতন কতো অগণন ভাই
দীপ্ত বীর্যে রুখিয়া এসেছে : জুলুম ধ্বংস চাই।
সারা ভারতের বালক বৃদ্ধ নারী
মিলিত কণ্ঠে আওয়াজ তুলেছে তারি :
পিছনে এসেছে সারা ভারতের বঞ্চিত বুকগুলি
মনের সকল রুদ্ধ দুয়ার খুলি'
হাজারো পরকে আপন জানিয়া এসেছে মজুর ভাই
এসেছে কিষাণ, মধ্যবিত্ত—কোনো ভেদাভেদ নাই।
ভাঙা পাঁজরের ভিৎ ভরে পাতা উহার সিংহাসন
উঠেছে তখন কেঁপে
সারা ভারতের বুকখানি তারা দলন করেছে ক্ষেপে।
তবুও বুকের রক্তে রক্তে আঁকিয়া আলিম্পনা
আগামী দিনের সূর্যোদয়ের গাহিয়াছে বন্দনা।
জালিয়ানাবাগ থেকে
এই সে-দিনো কলকাতা-রাজপথে
তাহারা দু'ভাই গিয়েছে সে কথা হেঁকে...
কিন্তু আজিকে এ কী !
সামনেতে আজ দেখি :
ভাই ভাই খুনে মেতেছে সারাটি দেশ
দুইটি শিবিরে এ কী হিংস্র বেশ !

অলক্ষ্য কোন চক্রে ভুলিয়া কার
নিজের রক্তে রাঙায় হাসিটি তার।
ভাইয়ের বক্ষে নির্মম হয়ে ছুরিকা হানিছে ভাই
কণ্ঠে কণ্ঠে যেনো আর সেই বজ্র-শপথ নাই !
জালিয়ানাবাগ থেকে
এই সে-দিনো কলকাতা-রাজপথে
রামেশ্বর আর সালাম দু'ভাই যে কথা গিয়েছে হেঁকে
(কিন্তু জালিম এ কথা জানোনি তুমি ?
মৃত্যু জিনিয়া দেশের মাটিরে চুমি'
তাহারা দু'জনে আরো কী গিয়েছে বলে :
জালিমী অস্ত্র যদিও আমার কলিজা ছিঁড়েছে ভাই
তবু এ প্রাণের
তবু এ সাধের
কখনো মৃত্যু নাই।)

যে কথা বলেছে তারা
হায় রে আত্মহারা,
ভুলেছো সে কথা হায় রে হিন্দু, হায় রে মুসলমান
ভুলেছো কী তা কার লাগি তারা করেছে আত্মদান ?
ভাই ভাই এ বিবাদ এনেছে কী সেই বিরাট ফাঁকি
তাহারে চিনিতে আর কতো কাল বাকি ?
সকল ছলনা ভুলে
আবার তোমার ভাইকে নেবে না আপন বক্ষে তুলে ?

জালিমী-অস্ত্র মনে মনে আজ যে বিষ ঢেলেছে ভাই
বজ্র কণ্ঠে বলবে না তারে : তোমার খতম চাই ?

চোখে দেখবে ! তা ছাড়া যদি কি খারাপ ঘটে যায় শরীরের, কি উত্তর দেবে সে ?

গালে আচমকা চড় খাওয়ার মত দরজার গোড়া থেকে সরোজ ফিরে এল : ঘরের ভেতর তারাসুন্দরী উড়ে ঠাকুরকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে।

পরের দিন ভোরে উঠে ঠাকুর দোকানের ঝাঁপ তুলে দেখলে, গেটের পাশে একটা অশোক গাছ থেকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে সরোজ ঝুলছে।...

মড়া বার করবার জন্যে তারাসুন্দরী ধীর মন্থর গতিতে এসে পাড়ার লোকে দেখলে, দুলারী তারা-সুন্দরীর কোমরটা বাঁকা, রগের দু'পাশের অলকগুচ্ছে পাক ধরেছে— মুখমণ্ডল শিক-কাবাবের মত ঝলসান—মুখের রঙ গাঢ় তামাটে।

তারাসুন্দরী এই প্রথম লোকচক্ষুর সামনে এসে দাঁড়াল। মনে হ'লো, এ বাড়ীর সমস্ত আত্মস্থরিতা তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। এ বাড়ীর সঙ্গে আর তার কোন সম্পর্কই নেই—গেটের বাইরে ঐ নাম-গোত্রহীন জনতার ভিড়ে হারিয়ে গেলে আজ তার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই।

* * *

কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কি যে খেয়াল বোঝা যায় না, এই বাজারে অমন বাড়ীটা আজো বেওয়ারিস ফেলে রেখে দিয়েছে !

বৈষ্ণব সাহিত্যে রস

লোকনাথ ভট্টাচার্য

বৈষ্ণব ধর্মে ঈশ্বরের অনুভূতি সমস্ত প্রেম সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। তাই এ প্রেম বৈষ্ণব সাধকদের কাছে কেবল মাত্র জগতের সারবস্তুই নয়, এ প্রেম তাঁদের সর্বস্ব তাঁদের আবাধ্য আরাধনা ভজন-পূজন ও স্বর্গ। তাঁরা দেখেছেন ফলে প্রেম-বস্তুই ভগবান, বা ভগবদ্‌বস্তুই সৃষ্টি প্রকটিত প্রেম। একেবারে সেই ইংরেজ কবির কথা—

Love is Heaven . Heaven is Love.

তাই যে প্রেম ধর্ম বলে স্বীকৃত হয়েছে, সাহিত্যেও তার ছায়া বিস্তার করতে বিলম্ব ঘটেনি। বৈষ্ণব কাব্যেও তাই এই রসেরই স্ফূর্তি। তত্ত্বান্বেষী রসিকের দৃষ্টি নিয়ে দেখলে বৈষ্ণব সাহিত্যে একটি মাত্র রসই পাওয়া যায়, তা শুদ্ধ ভক্তিরস। শ্রীচৈতন্যদেব থেকে আরম্ভ করে তাঁরই শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রীরূপগোস্বামী এবং পরবর্তী কালের শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, সকলেই এই মুখ্য তত্ত্বটি নানা প্রকারে পরিস্ফুট করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কবিরাজ গোস্বামি-কৃত রস-বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই :—

ভক্তিভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর॥
বাৎসল্যরতি, মধুররতি পঞ্চবিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চভেদ॥
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুররস নাম।
কৃষ্ণভক্তি রসমধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥
—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৯শ পরিচ্ছেদ।

এ তো গেল ভক্তিরসের পাঁচটি প্রধান ধারা। এ ছাড়াও তার পরে তিনি গৌণ সাতটি রসের উল্লেখ করছেন :

হাস্যাদ্ভুত-বীর-করুণ রৌদ্র-বীভৎস ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয়॥
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপি রহে ভক্ত মনে।
সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইয়া কারণে॥
—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৯শ পরিচ্ছেদ।

অর্থাৎ কি না বর্ণনার থেকে মনে হয় মুখ্য পঞ্চরস যেন স্থায়ী, আর ঐ গৌণ সপ্তরস ওদেরই ব্যভিচারী। যা হোক্, উপরের বিশ্লেষণ থেকে এটুকু বেশ স্বীকৃত হয় যে, সব মিলিয়ে ভক্তিরসই বৈষ্ণব সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট্। এই ভক্তিরসই আবার দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে—মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য পঞ্চরস হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর (দাস্য ও সখ্যরসকে রূপ গোস্বামী যথাক্রমে প্রীত ও প্রেয়ঃ আখ্যা দিয়াছেন); আর গৌণ সপ্তরস হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস এবং ভয়। আপাততঃ এই রস-সমূহের বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমরা এবার দেখ্‌ব, এই মুখ্য পঞ্চরসের মধ্যেও কোন্ বিশেষ রসটি বৈষ্ণব পদাবলীতে আর সকল রসকে ছাপিয়ে উঠে প্রধান হয়ে বসেছে এবং সেখানে কী-ই বা তার স্বরূপ।

স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়, পদাবলী-সাহিত্যে সখ্য ও বাৎসল্য রসের পদ কিছু কিছু থাকলেও অধিকাংশ পদই মধুর বা শৃঙ্গার রসের। সাধারণতঃ শৃঙ্গার শব্দটি বলতে আমরা যা বুঝি, এ-রস তারই চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা। কিন্তু এগুলিকে সাধারণ আদিরসের কবিতা বললেও অন্যায় ভাবে বিচার করা হবে। তামিল আলোয়ারদের রস-কবিতা ছাড়া সমস্ত ভারতবর্ষে সংস্কৃত এবং প্রাদেশিক ভাষায় যত আদিরসের কবিতা আছে, তাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই এর পার্থক্য স্পষ্টই ধরা পড়বে। কিন্তু এই পদগুলিতে মাধুর্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা বা ঐশ্বর্যভাবকেও সম্পূর্ণ নিগূহিত করতে দ্বিধা নেই কোথাও। কারণ তা না করলে বৈষ্ণব-রস-তত্ত্বের মতে রসাভাস হয়। শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্তা আরোপ করলে যে রসের সৃষ্টি হয়, তা নিম্নশ্রেণীর। তাতে তার মাধুর্যকে টিঁকিয়ে রাখা দায় হয়ে ওঠে! মধুর ভাবের কথা না হয় ছেড়ে দেওয়াই গেল—সখ্য-বাৎসল্য ভাবও উচ্চতর বস্তু। বৈষ্ণব কাব্যে কোথাও শ্রীকৃষ্ণের এই ভগবত্তা বা ব্রহ্মত্বের উল্লেখ নেই। ফলে পদাবলী-সাহিত্য প্রচলিত আদর্শের আধ্যাত্মিক কিংবা মিষ্টিক কবিতা হয়ে ওঠেনি। সাহিত্যের দিকে থেকেও যে তাতে কিছু লোকসান হয়েছে, এমন তো মনে হয় না।

অবশ্য মনে রাখতে হবে এ মতটা নেহাৎই আপেক্ষিক, এক পক্ষের। বৈষ্ণব কবিতায় আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা বেঁধে দেওয়া অন্যায় যাঁরা বলে থাকেন, তাঁদের কথাই এতক্ষণ বলা হল। কিন্তু অপর পক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত বড় গোষ্ঠীর মত হচ্ছে এই যে, বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিদের এই অমূল্য দান জীব-ব্রহ্ম সম্বন্ধের এই "রাধাকৃষ্ণ" প্রতীক অবলম্বনেই রচিত। তাঁদের মতে শিল্প-আদর্শের দিকে দেখতে গেলে বৈষ্ণব কবির এই রাধাকৃষ্ণ একটা সিম্বলিক শিল্প, অবশ্য ভারতীয় প্রথার সিম্বলিক শিল্প। এই সিম্বলিজম্ সম্পূর্ণ মিষ্টিক বা অধ্যাত্মবাদী। মানুষকে অধ্যাত্ম-জীবনে উচ্চতর অনুভূতি প্রাপ্তির পথে এগিয়ে দেওয়ার প্রেরণাতেই এ পরিকল্পনা। সুতরাং এর মধ্যে গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে; গভীর দার্শনিকতা ও মনস্বিতা আছে। কিন্তু এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না যে এই তত্ত্বাংশই সেখানে প্রধান হয়ে ওঠেনি। তা কেবল দেহের কঙ্কালের মতই অবলম্বিত প্রতীকের রক্ত-মাংসের আবরণে আবৃত। বৈষ্ণবের পূর্বরাগ, মান, অভিসার, মাথুর প্রভৃতি লীলার অনুপম অধ্যাত্ম সঙ্কেত-রীতি যাঁরা কিছুমাত্রও দেখেছেন, (নিতান্ত সাধারণ এক অশিক্ষিত গায়কের মুখেও যা প্রত্যক্ষ হয়) তাঁরা অনায়াসেই দেখবেন তা-ই সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তত্ত্বকে নেহাৎই গৌণ করেছে, এবং মূলতঃ গভীর সে রস-সাধনা শিল্পরীতিতেই আপনাকে অভিব্যক্ত করে চলেছে। এক দিকে তা ধর্ম-পন্থীর মিষ্টিসিজম্; অন্য দিকে সরস সাহিত্যরসের আলোতেই অধ্যাত্ম-রসের ব্যঞ্জনা।

এ পক্ষীয় মতবাদীরা বৈষ্ণব কবির রচনায় অধ্যাত্ম ও লৌকিক এই দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগতের মধ্যে একটা সেতু বাঁধার প্রচেষ্টাকে লক্ষ্য করেছেন। এঁরা বলেন, তত্ত্ব এখানে যদিও গৌণ তবু অনুপস্থিত নয়। ইংরেজ কবি দেখেছিলেন স্বর্গ ও মর্ত্য সোনার শিকলে বাঁধা। বৈষ্ণবের প্রেম-সাধনাই সেই সোনার শিকল সাহিত্য-ক্ষেত্রের 'রস'-আদর্শ এবং ধর্ম-ক্ষেত্রীয় 'রস-সাধন' রীতির এমন সম্মিলন জগতে বড় একটা দেখা যায় না। প্রেমই অমৃত, প্রেমই ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে মিলনের সেতু, মহা ভাবময় প্রেম আপনিই চরমের 'সাধ্য' পদার্থ, অমৃতময় পরম সত্য—ইহাই ভারতীয় এবং বিশেষতঃ গৌড়ীয় মিষ্টিকদের সিদ্ধান্ত। প্রেমের এই অসাধ্য-সাধন-পটুতা এই অতিচলা শক্তির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বলেই তাহা প্রকৃত mysticism।

যাক, আপাততঃ আমাদের এ বিচারে কোন প্রয়োজন নেই। প্রেমই বৈষ্ণবের সর্বস্ব—তাঁদের ধর্ম ও সাহিত্য প্রেমময়—এইটাই গোড়ার কথা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বৈষ্ণব পদকর্তারা সাধারণতঃ দাস্য, বাৎসল্য, শাস্ত, সখ্য ও মধুর, এই কয়টি প্রধান ভাবের মধ্যে মধুর বা শৃঙ্গার রসকেই বিশেষ করে তাঁদের কাব্য-সৃষ্টির অনুকূল করেছেন। তাই বৈষ্ণব পদাবলী মূলতঃ শৃঙ্গার রসেরই কাব্য।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, সমগ্র বৈষ্ণব কবিতায় আনন্দ-হর্ষানুভূতির মধ্য দিয়ে কিসের একটি ব্যথা সমস্ত আবহাওয়াটিকে ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত কী এক করুণ প্রবাহ এই বিশাল শৃঙ্গার-ক্ষেত্রকে আর্দ্র করে রেখেছে।

এই অকারণ বেদনার মাধুর্যে বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রেম আরো উঁচু স্তরে উঠে গেছে, আরো মহিমময় হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার পদগুলিতে আমরা দেখতে পাই, যশোদা কৃষ্ণকে সাজিয়ে দিচ্ছেন, মনের মত করে বিভূষিত করছেন গোঠে পাঠাবার জন্য। সাজিয়ে মুগ্ধ হয়ে সেই পাগল-করা রূপের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তাঁর চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠল।

'স্তন-ক্ষীরে আঁখি-নীরে
ভূষণ খসিয়া পড়ে,
বেশ বনাইতে কাঁপে কর।'

কিসের এই অশ্রু? এই অকারণ বেদনার উৎস কী?

দেখতে পাই, গোঠে খেলাচ্ছলে কৃষ্ণকে ছুঁতে গিয়ে সখারা হঠাৎ কেঁদে ফেলেছেন। এ কান্নার তো কোন অর্থ এখানে নেই! এখানে তো তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে পরম সখারূপে নিজেদের মধ্যে পেয়েছেন, এ কি কম ভাগ্যের কথা? শ্রীরঘুনন্দন যেমন কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছেন না যে,—

এ সকল সখা হল্য কি পুণ্য করিয়া।
ধাইছে বন্ধুর সনে খেলিয়া খেলিয়া॥

কিন্তু এত বড় পুণ্য অর্জ্জনের পরেও যে এ সকল সখাদের মনে শান্তি আছে, এমন আশ্বাসই বা কোথায়? এ তো ভারি আশ্চর্য্য!

আর রাধার দিকে যখন তাকাই, তখন তো অন্য কিছু ভাবাই যায় না—তিনি যেন নিখিল প্রেমের বেদনাঘন মূর্ত্তি। পূর্বরাগ থেকে মাথুর পর্যন্ত সমস্তই এই বেদনার গভীর রঙে অনুরঞ্জিত। শ্রীকৃষ্ণকে দেখে পর্যন্ত তাঁর সুখ নেই। তখন থেকেই 'মন উচাটন নিশাস ঘন…' অথবা 'হিয়ার ভিতরে লোটায়্যা লোটায়্যা কাতরে পরাণ কান্দে।'

তাঁর "খাইতে সোয়াস্তি নাই, নিন্দ গেল দূরে
জ্বলিছে গো হিয়া উহু উহু মন ঝুরে।"

পূর্ব্বরাগ, মান, মাথুর প্রভৃতির পদে করুণ ঝংকার থাকা বিচিত্র নয়; কিন্তু যেখানে দুঃখের কোন কারণ নেই, হৃদয়ে কৃষ্ণ পূর্ণচন্দ্ররূপ বিরাজ করছেন ও তাঁকে নিবিড় করে পাওয়ার সৌভাগ্য ঘটেছে, সেখানেও দেখি, হঠাৎ রাধিকার আঁখি ছলছল করে ওঠে কোন অনাগত ভাবী বিরহের বেদনায়। রাধার সর্ব্বদাই

"এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে,
না জানি কানুর প্রেম তিলে যেন টুটে।"

কিন্তু এ রকম ভয়ের কোন কারণ নেই, কারণ,

"তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক।"

তবু মন মানে না। নিবিড় মিলনের মধ্যেও রাধা অনুভব করেন,

"কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ না বুঝলু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ তবু হিয়া জুড়ল না গেল।"

কী এ প্রচণ্ড অতৃপ্তি যার দৌরাত্ম্যে এত বড় মিলনও থরহরি কম্পমান!

যুক্তির দিক থেকে সাড়া মেলে না, কেবল মাত্র বিশ্বাস দিয়েই একে বিচার করবার চেষ্টা করতে হবে। প্রথমে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার দ্বার দিয়েই আরম্ভ করা যাক্। প্রেমিক-প্রেমিকাদের বিশ্বাস, আজ যদিও তাঁরা পরস্পর বিভিন্ন, এক দিন তাঁরা এক দেহে লীন হ'য়ে ছিলেন; এবং একের এই দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ায় যে বেদনার আগুন জ্বলে উঠল, অনন্ত মিলনের শান্তি-বারিও তা কোন দিন নেবাতে পারবে না। যত দিন না আবার এই দু'জনা এক হয়ে লীন না হচ্ছেন তত দিন এ বিরহের শেষ নেই।

রোমাণ্টিক কবি যখন তাঁর প্রেমাস্পদের দিকে তাকান, তখন একটু বিশেষ ভাবেই তাকান। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাঁকে দেখবার চেষ্টা করেন। এই অভিনিবিষ্টতার ফলে তাঁর প্রেমাস্পদের একটি বিশিষ্ট ছবি তাঁতে রূপ গ্রহণ করে। এই লুব্ধ দৃষ্টি নিয়ে যখন কবি তাঁর প্রেমাস্পদকে দেখেন, তখন তার খণ্ডতা অপূর্ণতা তাঁকে পীড়া দেয়। এরই নাম Romantic melancholy এবং এই বিষাদ থেকে কবির মনে জাত হয় যে আকাঙ্ক্ষা, তারই দ্বারা তিনি মনের সমস্ত ফাঁককে পূরিয়ে নেন, খণ্ডের অখণ্ড রূপ দেন, অপূর্ণকে করে তোলেন পূর্ণ। এরই তীব্রতা তাঁকে ভাবতে সাহায্য করে যে তিনি আর তাঁর প্রেমাস্পদ আজকে ভিন্ন হলেও এক দিন অভিন্ন ছিলেন, এবং তাঁদের এই যে প্রেম, এ অনিত্য নয়, এ চিরকালের। তাঁরা দু'জনা যেন অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হতে যুগ-যুগান্তর ধরে যুগল প্রেমের স্রোতে ভেসে আসছেন। তখন কবি বলেন,—

"আজি মনে হয়, বারে বারে
যেন মোর স্মরণের দূর পরপারে
দেখিয়াছি কত দেখা—
কত যুগে, কত লোকে, কত চোখে, কত জনতায়, কত একা।

* * *

কত নব নব অবগুণ্ঠনের তলে
দেখিয়াছি কত ছলে
চুপে চুপে
এক প্রেয়সীর মুখ কত রূপে রূপে
জন্মে জন্মে নামহারা নক্ষত্রের গোধূলি লগনে।"

ইংরেজ কবি Wordsworth এর অমৃতত্ত্বের আভাস (Ode on Intimations of Immortality) বা Tritern Abbey লইয়া রচিত বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিগুলিও সদৃশ্য চিন্তাধারা থেকে এ মতবাদ স্বতন্ত্র বা ভিন্ন জাতির—সেগুলিতে আছে পরিচয়ের চর্চা আর বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে সেরা কথা হচ্ছে একে ও বহুতে একান্ত রসঘন ঐক্য। প্রেমাস্পদের সঙ্গে এই অনুস্যূত অভিন্নতার কল্পনা প্রকৃতি-পূজারী রবীন্দ্রনাথের একখানি বিখ্যাত চিঠিতে অদ্ভুত ভাবে প্রকাশ পেয়েছে:

'এক সময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলেম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্য্য-কিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূরদূরান্তর

দেশদেশান্তরের জলস্থল ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে পড়ে থাকতেম, তখন শরৎ সূর্য্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস যে একটি জীবনী শক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎ ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথ আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।'

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কবিতায় নরনারীর প্রেমের প্রাকৃত ভাব আমরা যতই লক্ষ্য করি না কেন, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব ভোলার যতই চেষ্টা করি না কেন, লীলাক্ষেত্রটা যে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন—গোপীগণ যে সাধারণ গোয়ালিনী মাত্র নন—মায়া-কলিত রসবিগ্রহ, বংশীধ্বনিটা যে সাধারণ রাখালী বাঁশীর মেঠো তান মাত্র নয়—এ কথা ভোলার একেবারেই জো' নেই।

ধর্মবিশ্বাসে বলে, জীবাত্মা ও ঈশ্বরাত্মা এক কালে অভিন্ন ছিলেন, এবং যত দিন না আবার দু'জনে এক হোয়ে লীন না হচ্ছেন, তত দিন এই বিরহের শেষ নেই। এ মানব-হৃদয়ের চিরন্তন বিরহ। অবশ্য ভগবানের প্রেম উপলব্ধির জন্য আপনাকে বহু করার প্রয়োজন ছিল। কারণ,—

"যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা।
সেদিন কোথাও কারো লাগি ছিল না পথ-চাওয়া;
এপার হতে ওপার বেয়ে
বয়নি ধেয়ে
কাঁদন-ভরা বাঁধন-ছেঁড়া হাওয়া॥
আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম—
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ-কুসুম।
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানারূপের দোলে;
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।
আমায় তুমি মরণমাঝে লুকিয়ে ফেলে
ফিরে ফিরে নূতন করে গেলে॥"

তাই কবি গেয়েছেন,

"তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর, তুমি তাই এসেচ নীচে,
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর! তোমার প্রেম হত যে মিছে।"

বৈষ্ণব-দর্শনের মূল তত্ত্বত্রয় হচ্ছে যে—ঈশ্বর নিত্য, জীব নিত্য এবং সেই উভয়ের যে সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রেম-বিলাস, তাও নিত্য। ইংরেজ কবি রসেটি বলেছেন, প্রেম ভগবানের সমান অসীম অনাদি, কারণ ভগবান স্বয়ং প্রেমময়। এই প্রেমের প্রেরণাতেই এত বহুর প্রয়োজন—বাহ্যত: তারা পরস্পর থেকে কত বিভিন্ন, যদিও অন্তরে অন্তরে সেই অখণ্ড একই স্বপ্রকাশ। তবু এই বাইরের বাধাটুকুও না দূর হ'লেই নয়। তাই জীবের মিলন চেয়ে ভগবান্ যুগ-যুগান্তর ধরে অভিসারে বেরিয়েছেন।

তাই তো তাঁর সঙ্গে মিলনে চন্দনের অঙ্গরাগকেও বাধাস্বরূপ জ্ঞান করেন রাধা; পাছে প্রিয়তমের সঙ্গে লীন হয়ে যাবার পথে এতটুকু বাধাও জাগে—হোক্ তা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, কোমলাতিকোমল। তাই রাধা 'চীর চন্দন উরে হার না দেল।'

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, এই করুণ ঝঙ্কারের রেশটুকু সর্বত্র উপস্থিত থাকলেও বৈষ্ণব সাহিত্যের ইহাই শেষ কথা নয়। এই সমস্ত হর্ষ-চেতনাকে অগ্রাহ্য করে তার সমগ্র সত্তাকে ছেয়ে আছে এক বিরাট্ শান্ত রসের উপস্থিতি—যার কারণে চরমতম বিরহেও রাধা কী একটা বিশ্বাস আঁকড়ে পড়ে থাকেন, তাঁর হৃদয়ে কী একটা শক্তি কাজ করতে থাকে। সেই শক্তিটা তাঁকে ভুলতে দেয় না যে আমি যে আমার প্রিয়তমেরই, তিনি তো আমারই প্রিয়তম, তাঁকে আমার কাছে আসতেই হবে, আমার সঙ্গে মিলতেই হবে। নইলে তাঁর পথ নেই, আমার তো নেই-ই! আসল কথাটা তাই,

"আমার মিলন লাগি তুমি আসচ কবে থেকে
তোমার চন্দ্র-সূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে।"

এ কি কম সান্ত্বনার কথা? ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই রকম একটা গভীর বিশ্বাস শান্তরসের সহায়ক। সেটাই বিরহের বেদনার মধ্যে শান্তির অমৃত ঢেলে দিয়েছে। এ বিরহ জ্বালা ধরায় না।

আমাদের দর্শনও ঐ একই কথা বলে। ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তি একটা spiritual disquiet থেকে, যার বাংলা করলে হবে আধ্যাত্মিক অশান্তি। সেই জন্য pessimism বা দুঃখবাদের অভিযোগে বিদেশী দার্শনিকরা আমাদের অভিযুক্ত করেন; কিন্তু তাঁরা ভুলে যান আমাদের দর্শনে দুঃখই শেষ কথা নয়, দুঃখের থেকে নিবৃত্তি পেয়ে অনন্ত সচ্চিদানন্দরূপে বিলীন হয়ে যাওয়াই তার চরম লক্ষ্য।

তাহলে বলা যেতে পারে যে, পদাবলী-সাহিত্যে 'বাচ্যার্থে' যা শৃঙ্গার রস তা-ই 'লক্ষ্যার্থে' করুণ আর 'ব্যঙ্গার্থে' শান্তরসের উদ্দীপন। বৈষ্ণব কাব্যে শৃঙ্গার, করুণ ও শান্তরসের কী অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে, একটি দৃষ্টান্তেই তা পরিষ্কার হবে। এখানে একটি পদের মাত্র দু'টি চরণ উদ্ধৃত করছি:—

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা কেমনে আইলে বাটে।
আঙ্গিনার কোণে বঁধুয়া তিতিছে দেখিয়া পরাণ ফাটে।"

এটিকে মধুর বা শৃঙ্গার রসের কবিতা বলে চিনতে ভুল হয় না। এখানে পরাণ বঁধুয়া আঙ্গিনার কোণে প্রণয়িনীর জন্য বৃষ্টির ধারার মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটি অপূর্ব কারুণ্যের সুরও এতে ধ্বনিত হচ্ছে। এই চিন্তায় রাধা আকুল হয়ে উঠছেন যে আমার প্রিয়তম আমার জন্য আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজে সারা হলেন, কত কষ্টই তাঁকে দিলাম!

তবু সব সত্ত্বেও এখানে রাধার মনে জেগে আছে এক প্রকাণ্ড সান্ত্বনা, মস্ত বড় গর্ব। তিনি কী করে ভুলবেন তাঁর প্রিয়তম তাঁরই জন্য এই বাদল-অভিসারে বেরিয়েছেন, তাঁরই জন্য এত কষ্ট স্বীকার করে আঙ্গিনার কোণে দাঁড়িয়ে ভিজছেন! এ-দুঃখই যে তাঁকে অত্যন্ত বেশী ক'রে এই আশ্বাসের কথাটাই মনে করিয়ে দেয় যে তিনি তো আমারই প্রিয়তম, আমি তো আমার প্রিয়তমেরই, তিনি তো আমারই জন্য সকল কষ্টকে তুচ্ছ করেছেন, আমারই জন্য এই বর্ষায় অভিসারে বেরিয়েছেন! এত বড় সম্পদ—এত বড় সান্ত্বনার কাছে সমস্ত দুঃখই ম্লান হয়ে যায়।

দি গুড আর্থ

শিশির সেনগুপ্ত
জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

৩২
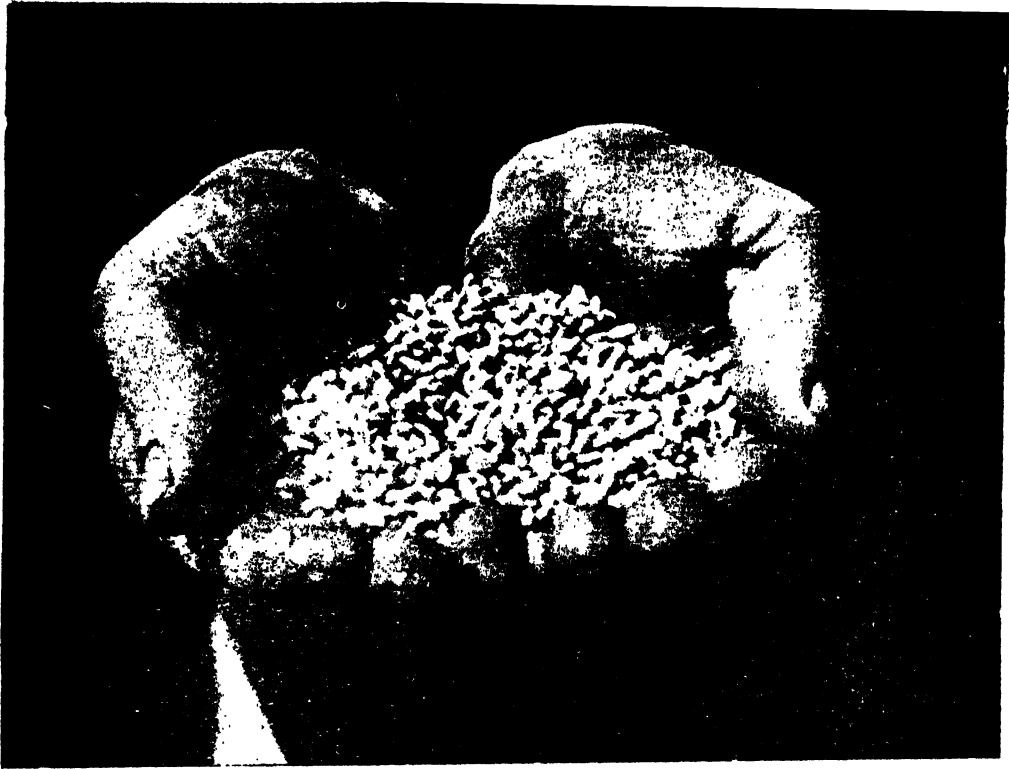
সৈন্যদল বিদায় হবার পর ওয়াঙ. আর দুই ছেলে সম্পূর্ণ একমত হয়ে স্থির করলে সে, এ ক'দিনের সব চিহ্নই মুছে ফেলতে হবে। ছুতোর মিস্ত্রী রাজমিস্ত্রী এলো প্রাসাদে। চাকররা মহলগুলি পরিষ্কার করে ফেললে। প্রাসাদের ক্ষতিগ্রস্ত ভাঙা অলঙ্কার এবং আসবাব কুশলতার সঙ্গে সারালে মিস্ত্রীরা। পুকুরের আবর্জনা তুলে ফেলে, তাতে আবার টাটকা কাকচক্ষু জল ভরে ফেলা গেল। বড় ছেলে নিয়ে এল চকচকে সোনা-রঙ মাছ পুকুরের জন্যে। বাগানে বসালে ফুলন্ত গাছ আর চারা। ছিন্নপত্র ভগ্ন-শাখা ছেঁটে ফেলে পুরানো গাছগুলিকে নতুন রূপ দিলে সে। এক বছর না পেরোতেই আবার সব পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠল। ছেলেরা যে যার মহলে চলে গেল। সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হোল।

যে দাসীটি কাকার ছেলের ঔরসজাত সন্তানকে গর্ভে ধরেছে, তাকে ওয়াঙ. খুড়ীর সেবায় নিযুক্ত করলে। খুড়ী যত দিন বাঁচেন, আর বেশী দিন বাঁচবেনও না, তত দিন তার ঐ কাজ রইল ওয়াঙের হুকুমে। অবশ্য যেদিন দাসীটি একটি কন্যা প্রসব করলে ওয়াঙের খুসীর আর অন্ত রইল না। কেন না, যদি পুত্র-সন্তান হোত, এ সংসারে একটা স্বত্ব জন্মাত ছেলের ও মায়ের। কিন্তু বাঁদীর মেয়ে বাঁদী বই ত আর কিছুই নয়। সুতরাং বাঁদী বাঁদীই রয়ে গেল।

তবু ওয়াঙ অপর সকলের মত তার প্রতিও করুণা দেখালে। ইচ্ছে হলে খুড়ী মরার পর সে তার ঘরখানি ব্যবহার করতে পারবে। বিছানাও পাবে সে। আর ষাট ঘরের প্রাসাদে একখানা ঘর নিয়ে কেউই বা মাথা ঘামাচ্ছে। মেয়েটিকে কিছু রুপোও দিলে ওয়াঙ। মেয়েটি যদিও তাতে সন্তোষ হোল, তবু মনিবকে সে বললে—'আপনার যদি মত হয় আমায় কোন চাষা বা গরীব সৎ-লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবেন। আর সে বিয়েতে ঐটুকু আমায় যৌতুক হিসেবে দিলে আপনার খুব মান বাড়বে। এক জনের সঙ্গে ঘর করেছি, আর একলা শুতে আমার মন চায় না।'

এ মিনতি রাখলে ওয়াঙ। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে এক আশ্চর্য চিন্তা এলো। এই মেয়েটিকে এক গরীব মানুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিবে সে, যে এক দিন এই প্রাসাদেই বৌ খুঁজতে এসেছিল। কত দিন হয়ে গেল ওলানকে তার মনে পড়েনি। এখন মনে পড়তেই কেমন একটা অনুভূতি এলো, যা দুঃখ নয়, বহু বিগত বিয়োগ-বেদনায় যা মনকে ভারী করে তোলে। আজ ওলান তার থেকে কত দূর চলে গিয়েছে। প্রতিশ্রুতি দিলে ওয়াঙ 'ঐ বুড়ীটা মরলে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবো আমি নিজে।'

তার পর এক দিন মেয়েটি এসে মনিবের কাছে নিবেদন করলে, 'এইবার আপনার কথা মত কাজ করুন মনিব। আজ ভোরে কাউকে না জাগিয়েই বুড়ী মরেছে। তাকে আমি কফিনে তুলে ফেলেছি।'

ওয়াঙ ভাবতে লাগল এমন এক জন লোকের কথা, যে মেয়েটির স্বামী হতে পারবে। মনে পড়ল সেই ছোকরার কথা—যার উপরের দাঁত উঁচু, যার কারণেই চীংয়ের মৃত্যু হয়েছিল। ভাবলে ওয়াঙ, ছেলেটা ত খারাপ নয়। ইচ্ছে করে ত ও সে কাজ করেনি। নাঃ, ছেলেটা ভালই। তা ছাড়া আর কাকেই বা পাচ্ছি এখন হাতের কাছে।'

ছোকরাটিকে ডেকে পাঠাতে সে এসে দাঁড়াল। তেমনি রুক্ষই আছে ছেলেটি, তবে এখন মস্ত মরদ হয়ে উঠেছে। হল-ঘরের উঁচু বেদীর উপর বসে ওয়াঙ তাদের দু'টিকে সমুখে দাঁড় করালে। তার পর প্রত্যেকটি কথার রস উপভোগ করতে করতে সে বললে—'শোন ছোকরা, এই মেয়েটিকে তুমি ইচ্ছে করলে ঘরে বৌ করে নিতে পার। মেয়েটি ভালো, আমার কাকার ছেলে ছাড়া আর কাউকে ও জানেনি জীবনে।'

মোটা সোটা নরম মেজাজ মেয়েটিকে সাগ্রহে নিলে ছেলেটি। তার মত দীন মজুরের এর চেয়ে ভালো বৌ আশার অতীত।

উঁচু বেদী থেকে নেমে এল ওয়াঙ। মনে হোলো তার জীবন এত দিনে ভরাট হলো। যা সে হতে চেয়েছিলো তারও অতিরিক্ত সে হয়েছে জীবনে। অবশ্য কি করে এ সব ঘটল তা সে বুঝল না। এইবার নিশ্চিন্ত হোল সে, রোদে বসে ঝিমোবার সুযোগ এল এত দিনে। আর বিশ্রাম নেবার বয়সও ত হোলো। পঁয়ষট্টি বছর বয়স তার, পাঁচটি কাঁচ বাঁশের মত নাতি তার চার পাশে পাক খায় দিন-রাত। তিনটি নাতি বড় ছেলের ঘরে, মেজোর ছেলে দু'টি। অবশ্য ছোট ছেলের বিয়ে দেওয়া এখনো বাকী। তা সে শীগ্‌গিরই দিয়ে দেবে ওয়াঙ, তার পর নিরুদ্বেগে বিশ্রাম নেবে মনের খুশীতে।

তবু শান্তি এলো না ওয়াঙের। বহু পোমাছির ঝাঁকের মত এক দিন যে সৈন্যদল এই বাড়ী হানা দিয়েছিল, তাদের হুলের বিষ যেন এ বাড়ীর সর্বাঙ্গে আজো ছড়িয়ে দেয়। বড় ছেলের বৌ আর মেজ ছেলের যে যখন দিন এক মহলে বাস করছিল, তাদের সম্প্রীতির অভাব ছিল না। কিন্তু এখন ভিন মহলে বাসা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে বিসংবাদ সুরু হয়েছে। ছোট ছোট মন-কষাকষিতে কলহ বেধে ওঠে, সামান্য জিনিষে মন-ভাঙাভাঙি হয়। যে সব ভায়েদের ছেলেমেয়েরা এক বাড়ীতে মানুষ হয়, এক উঠোনে যাদের দিন-রাত্রির খেলা, তাদের মধ্যে বিবাদ বাধার অজুহাতের অভাব ঘটে না কোন দিন। ছেলেদের ঝগড়ায় মায়েরা গিয়ে দাঁড়ান, অপরের ছেলেকে দোষ করে শাস্তি দিয়ে বিদায় দেন তাঁরা। নিজের ছেলে সকলেই নির্দোষ। সুতরাং পরস্পরের প্রতি আক্রোশে গর্-গর্ করতে থাকেন মায়েরা।

তা ছাড়া খুড়তুতো দেওরটি যে ভায়ের বৌদি'কে ভালো নজরে দেখে, সন্তুরে বৌদি'কে পাকড়াও করা গেছে, সে কথাও দু'জনের কেউ ভোলেনি। ছোট জায়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় বড় দর্পের সঙ্গে মাথা দোলায়। এক দিন জা যাচ্ছে দেখে, বড় বৌ স্বামীকে চেঁচিয়ে বললে—'বাড়ীতে অমন ছোট-লোকের মেয়ে থাকাই খারাপ—যার কোন হায়া নেই। যাকে পুরুষ মানুষ মুখের ওপর রাঙা মিঠাই বললে, সে দাঁত বার করে হাসে।'

এ কথা শুনে মেজো জায়েরও আর সইল না, সে-ও মুখের উপর জবাব দিলে,—'দিদির আমার হিংসে হয়েছে কেন না সবাই তাকে বরফের মাছ বলে কি না।'

তার পর সুরু হয় ক্রুদ্ধ চাউনির বর্ষণ আর আক্রোশে ফুলে ওঠা। বড় অবশ্য সন্তুরে—সুতরাং সে নিঃশব্দ ঘৃণার সঙ্গে মেজো জায়ের উপস্থিতিকে মার খাওয়াতে চায়। কিন্তু তার ছেলেরাও যদি একবার খুড়ীমার মহলের দিকে পা বাড়ায়, অমনি মা চীৎকার করে ওঠেন—'ও ছোট-ঘরের মেয়ের দিকে আমি তোদের যেতে দেবো না।'

মেজো জা দাঁড়িয়ে আছে দেখেই বড় তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে কথাগুলি। ছোটও সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের শাসায়—'ও-মহলে যাসনি—ওখানে সব সাপের ছানা থাকে। গেলেই কেটে নেবে।'

এমনি ভাবে ঘৃণা বাড়তে থাকে দু'জনের। আর দিন দিন তিক্ততা বৃদ্ধি পায়, কেন না ভাইদের মধ্যেই কোন সম্প্রীতি নেই এদের। বড় ভাই বড়লোকের ঘরের মেয়ে নিয়ে ঘর করে। তার সর্বদা ভয় পাছে বৌ তাকে বংশ অথবা ভব্যতা নিয়ে খোঁটা করে বসে। আর মেজো ভায়ের ভয় পাছে খরচে বড় ভাই সম্পত্তি ভাগ হবার আগেই সব উড়িয়ে দিয়ে বসে। তা ছাড়া বড়ো ভাইয়ের এইতে লজ্জা করে যে, ভাই বাপের সম্পত্তির সব কিছু জানে। যদিও জমির খাজনা অথবা অন্য আদায়-পত্তর সবই বাপের হুকুমে হয় তবু টাকা আনাগোনা করে মেজো ভাইয়ের হাত দিয়েই। সম্পত্তি অথবা আয়ের খুঁটিনাটির জন্যে বড়োকে সব সময় বাপের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয় ছোট ছেলের মত, এতেও তার গভীর ক্ষোভ হয় মনে। ছেলেদের ঝগড়া, ভায়েদের মন-কষাকষি, দুই মহলে অপ্রীতিকর অবস্থা, সব কিছু মিলে সংসারের শান্তি তছনছ হতে থাকে। আর ওয়াঙ এই অশান্তির মধ্যে থেকে আক্রোশে গর-গর করতে থাকে।

ওয়াঙের নিজেরও অশান্তি কমে না। খুড়তুতো ভাইয়ের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে কমলিনীর দাসীকে বাঁচিয়ে দেওয়ার পর থেকেই কমলিনীর সঙ্গে তার মনের অমিল চলছে। সেই দিন থেকে দাসীটি কমলিনীর চোখের বালি হয়ে উঠেছে। দিন-রাত যত সেবাই সে করে গিন্নীমার, যত সতর্ক সততায় তার কাছে কাছে ঘোরে, রাতে বারে বারে উঠে যতক্ষণ ধরেই না তার পায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, কিছুতেই কমলিনীর মন পায় না সে।

তা ছাড়া এই দাসীটির সম্বন্ধে তার হিংসাও কম নয়। ওয়াঙ ঘরে ঢুকলেই কমলিনী তাকে সরিয়ে দেয়, ওয়াঙকে এই বলে অনুযোগ করে যে তারও দৃষ্টি এই মেয়েটির দিকে। ওয়াঙের অবশ্য ঐ মেয়েটি সম্বন্ধে ততটুকু মাত্রই করুণা যতটুকু তার নিজের বোকা মেয়েটিকে নিয়ে। কমলিনীর কথা শুনে ওয়াঙ এত দিনে যেন চোখ তুলে তাকালে মেয়েটির দিকে। দেখলে যে সত্যি মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী, কচি ফলের মতই সুকুমারী। দশটি বছর যে পৌরুষ তার রক্তে ঘুমিয়ে ছিল, যেন তাকে আবার জাগিয়ে তুললে।

কমলিনীর দিকে চেয়ে হেসে বললে বটে ওয়াঙ—'তুমি কি আমাকে এখনো সেই আগের মত কামুক পুরুষ ভাবো না কি? আজকাল ত বছরে তিন দিনও তোমার ঘরে এসে শুই না।' কিন্তু মেয়েটির দিকে বাঁকা চোখের দৃষ্টি দিলে ওয়াঙ। তার ধমনীর প্রাচীন রক্তে যৌবনের জ্বালা ধরল।

আর কমলিনী সংসারের হাজারো পথের কোন হদিস না রাখলেও, মেয়েমানুষ হিসাবে এইটুকু সার বলেই জানে যে পড়ন্ত বয়সে পুরুষের যৌন-তৃষ্ণা একবার দপ করে জ্বলে ওঠেই। দাসীটিকে চায়ের দোকানে বিক্রী করে দেবার কথা তুললে সে ওয়াঙের কাছে। বললে বটে, কিন্তু কোকিলা এখন বুড়ী হয়েছে, কাজে হয়েছে কুঁড়ে, অথচ এই মেয়েটির গিন্নীর সব কিছু চাওয়াই নখদর্পণে। গিন্নী নিজে বোঝার আগেই দাসী তার সামনে এগিয়ে ধরে পরের প্রয়োজনটি। সুতরাং একে বাদ দিয়ে কমলিনীর এক প্রহর চলে না। যত তাকে

না হলে চলে না এই বোধ নির্মম হয়ে ওঠে, তত নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কমলিনী। আজকাল কমলিনীর মেজাজ এত খিটখিটে হয়েছে যে ওয়াঙ সেখানে গিয়ে সুখ পায় না, তাই যাওয়াই ছেড়ে দিলে সে। কমলিনীর ও-মেজাজ কেটে যাবে, এ বিশ্বাস নিয়ে ধৈর্য ধরে ওয়াঙ আর সেই সঙ্গে তার মনে পড়ে সেই লাবণ্যময়ী মেয়েটির কথা। তার কথা এত বার কেন মনে হয় তা ওয়াঙ নিজেই বুঝতে পারে না।

এ-বাড়ীর মেয়েদের নিয়ে এত রকম অশান্তির মধ্যে, আবার ওয়াঙের ছোট ছেলেটি নূতন বিশৃঙ্খলা এনে ফেলে। ওয়াঙের এ ছেলেটি নিঃশব্দ প্রকৃতির প্রাণী। সবাই জানে বইয়ের পোকা এ। দিন-রাত বই পড়ে কাটায় সে, বই বগলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর বুড়ো মাষ্টারটি তার পিছনে বিশ্বস্ত অনুচরের মত অনুসরণ করে।

এ-বাড়ীতে যখন সৈন্যদল আড্ডা করেছিল, সেই সময় এ ছেলেটি তাদের মুখে যুদ্ধের কথা শুনেছে। সম্মুখ সংঘর্ষ, লুণ্ঠন ও মৃত্যুলীলা, সর্বগ্রাসী সংগ্রামের নানা অধ্যায়ের কথা সে নির্বাক্ মুখে অধীর আগ্রহে কানে ভরে নিয়েছে। ত্রিরাজ্যের যুদ্ধ-কাহিনী, দুই হ্রদের তটবর্তী দস্যুদের কথা যে সব বইতে আছে, সেগুলি মাষ্টারের কাছে চেয়ে নিয়ে ছেলেটি ইতিমধ্যেই পড়ে ফেলেছে। পড়ে তার মন এক রোমাঞ্চময় স্বপ্নালুতায় বোঝাই হয়ে গিয়েছে।

বাপের কাছে গিয়ে সে বললে—'আমার ভবিষ্যৎ আমি স্থির করে ফেলেছি। আমি সৈন্য হব—লড়াই করব।'

ছেলের এ কথা শুনে ওয়াঙ বিমূঢ় হোল। এর চেয়ে আর কি অঘটন ঘটতে পারে তার জীবনে। ছেলেকে কড়া গলায় বাপ বললেন—'কি পাগলামীর কথা। তোদের নিয়ে আমার কি কিছুতেই শান্তি হবে না।' ছেলের সঙ্গে বাপ তর্ক জুড়ে দিলেন। ছেলের ভ্রূ জোড়া সরল রেখা হয়ে এসেছে দেখে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বাপ বললেন ছেলেকে—দেখ, আমাদের দেশেই প্রবাদ আছে যে ভালো লোহায় কেউ পেরেক তৈরী করে না, ভালো মানুষ দিয়ে সৈন্য হয় না। তুই আমার ছোট ছেলে, সব ছেলের সেরা ছেলে। তুই দুনিয়ার এখানে-ওখানে লড়াই করে বেড়াবি, আমি কি ক'রে বাঁচতে দেবো? তুই-ই বল।'

জোড়া কালো ভুরু নামিয়ে ছেলে তেমনি দৃঢ় কণ্ঠেই বললে বাপকে—'আমি যা বলেছি তাই করব বাবা।'

বাপ তখন ছেলেকে খুশী করতে চাইলেন লোভ দেখিয়ে—'যাও না যে স্কুলে তোমার পড়তে ইচ্ছা হয়। দক্ষিণে বড় ইস্কুলেও ইচ্ছে হলে ভর্তি হতে পারো। যদি চাও ত ভিন্ন দেশের স্কুলে গিয়েও আজগুবি সব বিদ্যা শিখে আসতে পার। তবে সেপাই হওয়া তোমার চলবে না। আমার মত জমিদারের বড়লোকের ছেলে সৈন্য হবে, এ কত লজ্জার ভাব দেখি।' ছেলে তখনো নীরব দেখে বাপ আরো লোভ দেখালেন—সৈন্যদলে ভর্তি হতে চাইছ কেন খুলে বল দিকি বুড়ো বাপকে।'

এতক্ষণে ছেলে কথা কইলে। কালো ভুরুর নীচে তার চোখ উঠল জ্বলে।—'অভূতপূর্ব লড়াই হবে এ দেশে শীগ্‌গীর। হবে রক্তক্ষয়ী বিপ্লব। সেই লড়াইয়ের শেষে আমাদের দেশ স্বাধীন হবে।'

কথাগুলি শুনলে ওয়াঙ বিস্ময়ে বাক্যহীন হয়ে। এমন আশ্চর্য কথা আর কোন ছেলের কাছে সে আগে শোনেনি।

—'ও সব কথা আমি বুঝি না বাপু। আমাদের দেশ স্বাধীনই আছে—আমাদের জমি আমাদেরই। আমার খুসী মতই আমি জমি বিলি করি, সেই জমি থেকে আসে সোনাবরণ ধান আর সত্যি সোনা। তাই থেকে তোমাদের যত কিছু খাওয়া-পরা চলে। এর চেয়ে আর বেশী কি স্বাধীনতা হবে, তা ত আমি বুঝতে পারি না।'

ছেলে শুধু বিড়-বিড় করে গভীর তিক্ত সুরে—'সে তুমি বুঝবে না বাবা। তোমার বয়েস হয়েছে, তুমি সে সব বুঝবে না।'

ছেলের মুখের দিকে চেয়ে বাপ ভাবতে লাগলেন—'এই ছেলেকে কি না দিয়েছি আমি। ও ত আমার থেকেই হয়েছে। জমি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছি ওকে, তার মানে আমি মরে গেলে আর কেউ থাকবে না যে জমির তদারক জানে বা করবে। দু'টি ছেলে লেখা-পড়া জানে তবু একে বিদ্বেন জাহাজ হতে দিয়েছি। আমার ছেলে আমার থেকেই ত সব পেয়েছে।'

ছেলেকে ভালো করে দেখলে ওয়াঙ। দেখলে ইতিমধ্যেই দীর্ঘাঙ্গ হয়ে উঠেছে সে, জোয়ান হয়েছে। যৌবনের কামনা আজো দেখা দেয়নি ওর চোখে। আস্তে আস্তে বললে ওয়াঙ ছেলেকে—'শীগ্‌গীরিই তোর বিয়ে দিয়ে দেবো।' ভাবলেন বাপ হয় ত আরও কিছু দিলে নিবৃত্ত হবে ছেলে।

বাপের দিকে রোষ চাউনিতে চেয়ে ঘৃণাভরে বললে ছেলেটি—তা যদি কর আমি বাড়ী থেকে চলে যাব। দাদাদের মত মেয়ে-মানুষই আমার সব আকাঙ্ক্ষার শেষ উত্তর নয়।'

নিজের ভ্রান্তি বুঝে নিয়েই বাপ পরিস্থিতি সহজ করে নেবার জন্যে বললেন তাড়াতাড়ি—'না, না, বিয়ের কথা নয়, তবে যদি কোন দাসীকে তোমার মনে ধরে থাকে ত—'

আপনি আমাকে কি ভাবেন বলুন ত, বাবা। আমার স্বপ্ন আছে—আমি যশ চাই। মেয়েমানুষ ত সর্বত্রই পাওয়া যায়।' তার পর হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে যাওয়ার হাত দু'টি দু'পাশে শ্লথ করে ছড়িয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললে ছেলেটি—'তা ছাড়া আমাদের প্রাসাদের মত এমন কুরূপ দাসী-বাঁদীর দল আর কোথাও নেই। এখানে এমন একটিও বাঁদী নেই যার দিকে তাকানো যায়—অবশ্য ভিতর-মহলের ঐ ছোট্ট মেয়েটি ছাড়া।'

ওয়াঙ বুঝল ছেলে কার কথা বলছে। ঈর্ষ্যায় তার পিতৃ-চিত্ত টন্‌টন্ করে উঠল। এত দিন যেন ওয়াঙের ধারণা হোল যে সে নিজে কত বুড়ো হয়েছে, কত অথর্ব হয়ে পড়েছে। নিজেকে বয়সের চেয়েও বেশী বৃদ্ধ মনে হোল তার। আর সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে—সে তার ছেলে—তার তরুণ যৌবন, তার দীর্ঘ সুঠাম দেহ। বাপ আর ছেলে—প্রাচীন ও নবীন, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ। বাপ রেগে গর্জে উঠলেন—'দাসী-বাঁদীদের কথা ছাড়ো। আগেকার ক্ষুদে কর্তাদের মত অনাচার আমি হতে দেবো না আমার প্রাসাদে। আমরা গাঁয়ের সৎ চাষী মানুষ—আমাদের রীতি ও সব নয়।'

ছেলে চোখ তুলে বাপের দিকে তাকিয়ে বললে—'আমি ত তুলিনি কথাটা। আপনিই তুলেছিলেন।' তার পর কাঁধ বাঁকিয়ে সে দ্রুত পায়ে সরে গেল।

নিজের ঘরে বসে ওয়াঙের সব কিছু আনন্দহীন মনে হতে লাগল। 'এরা আমায় শান্তিতে থাকতে দেবে না।' মনে মনে ভাবলে সে।

কত রকমের রাগ হতে লাগলো মনে। কিন্তু তার ছেলে যে এ-বাড়ীর একটি কম বয়সী দাসীকে রূপসী দেখেছে, সেই রাগই যেন সর্বাধিক বলে মনে হোল ওয়াঙের কাছে।

[ক্রমশঃ।

কেলে বেড়াল

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কাঞ্চন—নামটি বেশ। যৌবনে নামের সঙ্গে যোগ ছিল রূপের, যেন মণিকাঞ্চন। পুরোনো বাসন গড়ায় আর টোল খায়। কাঞ্চনের জলুস যায়, থাকে—ঘসা-পয়সার ছিরি!

লম্বা খোলার ঘর। একধারে বসে কাঞ্চন ভাজে মুড়ি-কড়াই। উনুনের ওপর ভাঙা হাঁড়িটির তাতানো বালিগুলিকে নারকেল-দলা দিয়ে নাড়ে। চালগুলি ফট-ফট করে তুবড়ির মত ফেটে পড়ে, ফেঁপে ফুলে হয় মুড়ি! হাঁড়ি নামিয়ে সে চড়ায় কড়াই। বদ্দি বেসন ব্যাসোন ছেড়ে ভাজে পেঁয়াজের ফুলুরি আর বেগুনি।

কাঠের বারকোসের ওপর সুদাম ভাজাভুজি সব সাজিয়ে নাথে। হাতে করে গোণে, সুর করে পড়ে—একে চন্দ্র, হি হি। দু'য়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চার বেদ। হি হি—বামে রাম এক গণ্ডা—

রাস্তার ধারে দিনের-পর-দিন জমানো আবর্জনা, নর্দমার দুর্গন্ধ, মাছির ভ্যান্‌ভ্যানানি। কাছেই বস্তির একটা মেয়ে ফিনকি-দিয়ে ওঠা পাইপের অপরিষ্কার জলে বাসন মাজে। আপন ছেলেটা ড্রেনের ওপর দিব্যি বসে পায়খানার কাজ সারে। পথে কত লোক, দৃষ্টিও নেই। কেউ দেয় নাকে কাপড়, কেউ থুথু ফেলে।

মিলের সিটি বেজে ওঠে। অমনি ফটক যায় খুলে। দলে দলে মজুর, মিস্ত্রি, যাচনদার, কয়াল—চাকর নোকর যে-যেখানে আছে সব বেরিয়ে আসে গুঞ্জন করে। সারা দিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রম। মুখগুলো সব শুকিয়ে আমসির মত চুপ্‌সে গেছে।

সরাপের দোকান কাছেই। সেখানে মরসুম লেগে যায়। সেই সঙ্গে কাঞ্চনেরও মরশুম। ফুলুরি, বেগুনি, পকোড়ি—কি ভাজাই না ভাজে কাঞ্চন। খালি চাপায় আর নামায়। খদ্দের আসে পয়সা হাতে। সুদাম গুন্‌-গুন্ করে গান গায়, হি হি করে হাসে আর ঠোঙা ভরে। ভরছে ত ভরেই চলেছে, থামে না। হাত-জোড়া কাজের ফাঁকে কাঞ্চন চেয়ে দেখে আড় চোখে। কী উদোমাদা ন্যালা-খ্যাপা ছেলে বাবা। বয়স হয়েছে—আপন গণ্ডা বুঝে নেবার বুদ্ধি আর হলো না। একেবারে উড়নচণ্ডী। কদ্দিন পয়সা নিতে ভুলে গেছে।

দেখি, দেখি—ক'টা পয়সা নিলি? ও মা, এক গণ্ডা ফুলুরির দাম মাত্তর দু'টো পয়সা?

পড়, ময়না পড়। কি পয়সাই না চিনেছ, মাইরি।

পানের কসে রক্তবর্ণ দাঁতগুলো বের করে বসনা হাসে। মুখ থেকে ভক্‌-ভক্ করে মদের গন্ধ বেরোয় ড্রেনকেও ছাপিয়ে।

কাঞ্চন বলে, পয়সা মৈলে খাই কি বসন? পরিই বা কি? গতর খেটে মরি কেন বল ত?

সাবাস্! কথার মত কথা বলেছ কাঞ্চন।—সিধুর চাঁচা-ছোলা বাজখাঁই গলার আওয়াজ। ধীরে এগিয়ে আসে সে।

বলে, গতর খেটে মরি কেন জান? নিমতলায় আড়াই হাত-টেক জায়গার জন্য। তাও না কি মালিকের মৌরসী পাট্টা।

বুড়ো নন্দ মিস্ত্রী চলেছিল আমীরি চালে, সামনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে। কথাগুলি কানে গেল। সোজা দাঁড়িয়ে বললে, মালিকের মৌরসী পাট্টা? সে আবার কি?

চুলো, মামা—চুলো।

তা যায় না কেন মালিক সেই চুলোয়। চোরা-বাজারটা ত বন্ধ হয়। বাপ রে বাপ রে—ব্রহ্মাণ্ড পেটে গেলেও খাঁই মেটে না। যম দূত হোক। বুঝবে তখন।

বসনা ওঠে উত্তেজিত হয়ে। সিধু তারিফ করে। কাঞ্চন ভাবে, মালিকের টাকা—তা ওদের কি? লোকগুলো সব পাগল হল না কি?

ছি ছি। দ্যাখ মা, সেই কেলে বেড়ালটা—

জ্বালাতন। আবার এসেছে। দূর—দূর—

শয়তানের ধাড়ি ঐ কেলে বেড়াল। ধূর্ত পিঙ্গল চোখ দু'টো মেলে নিঃশব্দে ঘরে ঢোকে। কোন্ ফাঁকে কি যে খায় কেউ টেরও পায় না। সেদিন সুদাম বসেছে ভাত খেতে—খাওয়া নয় গেলা। একখানা ভাজা মাছ মা দিলে পাতে। বেড়ালটা কাছে বসে গা চাটে, কালো লোমগুলিতে চেকনাই ধরায়। কাঞ্চন যেমন মুখ ফিরিয়েছে অমনি—মা গো মা! প্রসাধন ছেড়ে কেলে বেড়াল গুটি-গুটি এগিয়ে এল, মাছটা তুলে নিয়ে সুরুৎ করে সরে পড়লো। হাবাতে ছেলেটা কিন্তু দেখলে, চেয়েই রইলো—কিছু বললে না।

কাঞ্চন বরদাস্ত করতে পারে না। রব উঠেছে এ-কালে, লাঙল যার জমি না কি তারই। মাছ তার নয় ত কি ঐ হুলো বেড়ালটার।

ওর যদি মাছ খাবার সাধ এত, নদী-নালা আছে, পুকুর আছে, ধরে খায় না কেন? নেমে গেলেই হয়—পরবার গামছাখানাও লাগবে না।

বেড়াল মানুষ চেনে। কাঞ্চনের হাতে কী মারটাই খেয়েছিল সেদিন। খুন্তির ডগা দিয়ে বাড়ি। প্রথমে পড়লো দু'-চার ঘা,, কোঁটা কোঁটা। তার পর নামলো ঝম্-ঝম্ মুষলধারা। খানিকক্ষণ মটকা মেরে পড়ে থেকে উঠলো আস্তে আস্তে। মুখখানা বিকৃত করে ডাকলে, ম্যাও—ম্যাও। কোথা থাকতো হাড় গোড়, বিধাতা যদি একরাশ তুলো দিয়ে ওগুলিকে মুড়ে না রাখতেন? কাঞ্চনকে ভয় হয়—ছেলেটাকে কিন্তু আদৌ ভয় করে না সে। হ্যালা-খ্যাপা, বোকাটে ছেলে—হাঁ করে থাকে, মুখ থেকে ঝরে লালা। বেড়ালটার চুরি করে মাছ-দুধ খাওয়া দেখতে ওর যেন কেমন আমোদ লাগে। কী ধূর্ত,—মিটি-মিটি চায়। ধরা পড়লে চাটিটা-আসটা বেমালুম হজম করে। তপস্বী-সাজে।

ক'দিন ধরে কেলে বেড়ালটার দেখাই নেই। বিরিয়েছে—কোথায় কে জানে। সুদাম দেখে তাকে রাস্তার পাশে আবর্জনা থেকে মাছের কাঁটা খুঁটে খেতে। সে ডাকে—হি হি। ছ্যাৎ, মা, নোঙরা খায়। কাঞ্চন ভাবে, কত মানুষ খেয়েছে আস্তাকুড় থেকে খাবার কুড়িয়ে, মন্বন্তরের দিনে। বেড়াল ত জানোয়ার। পাতের সামনে ঘাপ্‌টি মেরে বসে মারের ভয়কে উপেক্ষা করে সুযোগ বুঝে মাছ তুলে নেবার ধৈর্য্য আজ আর ওর নেই—সহজে যা পায় তাই খেয়ে বাচ্চাগুলোর কাছে ফিরে যেতে চায়। আহা বেচারি! সুদামের ইচ্ছে হয়, তুলে ঘরে আনে, দুধ খেতে দেয় একটু।

সারি সারি বস্তির খুপটি। মৌচাকের গর্তগুলিতে থাকে মধু। আর, খুপটির ভেতর আছে—বিষ। স্যাঁৎসেঁতে মেঝে, চাপা দেয়ালের বন্ধ দূষিত বাতাসে দেহের স্বাস্থ্য বিষাক্ত—অন্তরও বিষাক্ত। সেই বিষের গেঁজ ফেনিয়ে ওঠে কথায়-বার্তায়, আমোদে-প্রমোদে।

রেঁধে-বেড়ে সুকী বাড়া ভাত রেখেছে তুলে। ঘরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অপ্রসন্ন মনে আলো জেলে বসে থাকে। রাগও হয়—এখনো এল না।. ফিরবে কখন?

তিন-চার মাসের ছেলেটা চাটাইর ওপর শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বাতির আলো মুখে কেমন ছড়িয়ে পড়েছে। চায়, চায়—চোখ আর ফেরে না। এইটিই তার প্রথম, হয় ত বা শেষও এই। কে জানে, আদি-অন্ত ঐ একটিতে মিশেছে। শুনেছে সে, দেনেওয়ালা ভগবান্। ধন দিলেন না, দৌলত দিলেন না—আঁধার ঘরের ছাপ্পর ফুঁড়ে পড়লো, ও কি? আকাশের তারা—না, উল্কা?

ট্যাঁ-ট্যাঁ—শিশু কেঁদে ওঠে। মশায় কামড়ে ওকে আর রাখে নি। বাস্ রে। মশা নয়, ডাঁসও নয়—চাক-চাক ভীমরুল। কাঁথা-কুঁথরি দিয়ে সে দেয় চাপা ছেলেটাকে। কান্না থামে না। জের চলে।

ও—ও—কোলে তুলে নিয়ে ছেলেকে দোল দেয় সে।

জুতোর শব্দ শোনা যায়। নেশায় টং হয়ে বসনা ফেরে টলতে টলতে। টলন বেশি তার নেশার চাইতে। মুখের বিড়ি ফেলে ধরে টপ্পা।

ঈস্! যেন নবাবপুত্তুর।—সুকী বলে।

হুমকি মেরে বলে ওঠে বসনা,—নয়ত কি। নবাব কে আর ফকির কে, দেখবি'খন। ষ্ট্রাইক—ষ্ট্রাইক্—

অ্যাঁ—সে কি?

হ্যাঁ। শুক্রবার থেকে ধর্মঘট সুরু হবে।

কী সর্বনাশ! সুকীর মুখ কালো হয়ে উঠলো। বসনা মদ খেয়ে টাকা ওড়ায়। কিছুটা ত ঘরে আসে। তাই দিয়ে খাওয়া-পরা—সে এক অসাধ্য ব্যাপার। পান্তো আনতে লবণ যায় ফুরিয়ে।

ষ্ট্রাইক চলবে যদ্দিন মাইনে ডবল না হয়। বাজা বাজবে—ডুম-ডুম। লে লাগ্, লাগ্।

বসনার মহা ফুর্তি। এক চক্কর নেচে নিয়ে গানের বাকিটুকু শেষ করলে।

বেইমানকো এ্যায়সা হাল—

আরে তো হো—এ্যায়সা হাল, এ্যায়সা দিগদারি।

হামে ছোড়ি দে রে, সেঁইয়া ছোড়ি দে রে—

এ-সব নাচন-কোদন কেন, সুকী তা ভেবে পায় না। উঠতে বসতে ভাবনা। বসনার নেই ভাবনার বালাই।

তাক মাফিক বুঝি ঝাড়ে সে,—বড্ড প্যাঁচে পড়েছে বেইমান এবার। শ্যাম রাখে, না কুল রাখে।

সুকী আর সইতে পারে না। অধীর হয়ে বলে ওঠে—প্যাঁচে বুঝি তুমি পড়নি? ধর্মঘট করে খাবে কি শুনি? আমার হাড় ক'খানা?

হাঃ হাঃ। গোসা কর না বিবিজান। খাবে পোলাও কালি, হাঁকাবে জুড়ি। কমিটির হাতে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা। গোঁফে তা দেও মজাসে। পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খাও।

কাছেই একটা খুপটিতে জুয়োর আড্ডা বসে রাত্তিরে। দরজা বন্ধ করে বাছাই ক'জনা লোক হরদম খেলে যায়—ফিক্ দানের বাজি।

শুকনো ভাত চারটি মুখে গুঁজে বসনা উঠে পড়ে ধড়মড়িয়ে—যেন রেল-ধরার তাড়া।

চললে কোথা?

সুকী জানে সব, তবু প্রশ্ন করে—ও যেন তার অভ্যাস। আর বসনার অভ্যাস—শুনেও শোনেনি এমনি ভাবে বেরিয়ে যাওয়া।

কি বসন? ধর্মঘট হবে না কি—কল বন্ধ থাকবে?—কাঞ্চন জিজ্ঞেস করে।

কল এবার ঠুঁটো জগন্নাথ। নট নড়ন-চড়ন, নট কিচ্ছু।

এক টুকরো কাগজ হাতে নিয়ে ভাঁজ করছে সুবল দাওয়ায় বসে। নৌকো তৈরি করবে। আপন মনে খুক্-খুক করে হাসে। হাসির সঙ্গে বেরোয় অজস্র লালা।

বিষণ্ণ মনে কাঞ্চন তার হাঁ-করা লালা-ঝরা মুখের পানে চেয়ে দেখে। বুদ্ধির দীপ্তি নেই, কি ভেবে কি করে বোঝা দায়। বড় হয়েছে, কোন্ কালে বিয়ে হয়ে যেত। পোড়া কপাল! সে-সাধ কি মিটবে কখনো?

চালাও পান্‌সি।—বারকোসের ওপর সদ্য-প্রস্তুত কাগজের নৌকো-খানা রেখে সুদাম ফুঁ দিলে।

বাঃ, বেশ নৌকো ত। হেসে বলে বসনা,—নৌকো চড়ে যাবি কোথা ?

শ্বশুরবাড়ি। মা থাকবে একলা ঘরে। কেমন মজা—হি হি।

সুস্থ শরীর, গ্যাঁটা-গোট্টা, হুদো মদ্দার কথা শোনায় কেমন ন্যাকার পারা। রগড় চেপে রাখতে পারে না বসনা। সুবলকে নিয়ে তার গর্ভধারিণীর সঙ্গেও কৌতুক জমিয়ে তুলতে চায়।

হাসতে হাসতে কাঞ্চনকে বলে,—হ্যাঁ মা কুন্তী, এ ছেলে তোমার কোন্ বেসাতির ফল বল ত? ফুলুরি কিনেছিলেন কে? সূর্যি মামা, না পবন-দেবতা ?

কাঞ্চন ওঠে তেলে-বেগুনে জ্বলে। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে—কথার ছিরি ছাখো। তোর কি মা-বোন নেই? তাদের কি ছেলে-পুলে হয়নি ?

চোখ দুটো ট্যাবা-প্যানা করে' চায় বসনা। দাঁতগুলোর মাড়ি শুদ্ধ খুলে দেখিয়ে হাত যোড় করে বলে—মা-বোন আছে, মা, ছেলেপুলেও হয়েছে, মা। মাইরি বলছি, অমনটি পেটে ধরবার কেরামত কারু হয়নি।

লজ্জা না অপমান কে জানে—চোখ ফেটে জল বেরোয় কাঞ্চনের। সে তা প্রাণপণে রুখতে চেষ্টা করে। সুবলকে নিয়ে তার হয়েছে মরণ! পাড়ার ছেলেগুলো আসে ওকে খ্যাপাতে। মুখ ভ্যাঙায়, ঠাট্টা-তামাসা করে। রুখে যায় ও, মার খেয়ে এসে কেঁদে পড়ে মায়ের কোলে। সইতে না পেরে কাঞ্চন গিয়েছিল সেদিন মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করে'। হাসির গব্‌রা উঠলো। তাড়কা রাক্‌সী ছুটেছে ছাখো! কে এক জন ইট ছুড়লে। ভাগ্যিস্ লাগেনি তাকে।

ঐ ত হয়। লোকের দোষ কি? সে যে হাবা ছেলের মা!

ধর্মঘট সুরু হল দস্তুর মত। মালিক বাড়ায় না মজুরি, মজুরও আসে না কাজে।

দু'-এক জন যারা আসতে চায় লুকিয়ে ছিপিয়ে, আটক পড়ে। মোড়ে মোড়ে পাহারায় রয়েছে সব পিকেটার। ঢুকতে যদি যায় কেউ বাধা না মেনে, অমনি দেবে ট্রাম-চাপা ব্যাঙের মতো চ্যাপটা করে।

কমিটির চাঁইরা দেয় চার গণ্ডা পয়সা রুজে—হাত-খরচ। কোথা পোলাও কোরমা, ক' ছটাক দুধও জোটাতে পারে না বসনা ছেলের জন্য। ঘরে মন যায় দমে, বাইরে চলে গুলতান। নন্দ মিস্ত্রী আর সিধুর সঙ্গে ঘোরে পথে পথে, ঘুপটিতে ঘুপটিতে। মন-মরা ধর্মঘটীদের উৎসাহ দেয়। বড়াই করে বলে, ষ্ট্রাইক আমরা ভাঙবো না—কভি নেহি। যুদ্ধের দৌলতে অঢেল লাভ করেছে মালিক। আমাদের হকের পাওনা—হাঁ।

এদিকে সুকী ভাবে মাথায় হাত দিয়ে,—চাল ফুরিয়েছে, খায় কি? দু'দিন অনাহার, শরীর অবসন্ন। লুকিয়ে নিজের ভাত বাঁচিয়ে স্বামীকে খাইয়েছে। এত কষ্ট সে তা বোঝে কই? কাজে ফিরবার—দু'টো পয়সা ঘরে আনবার নামও করে না। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যায় পড়ে-পড়ে। সন্ধ্যা বয়ে পড়বে রাত্তিরে। রাত্তির পোয়াতে দুধের দাম। হেই ঠাকুর, রক্ষা কর। তুলসীতলা নেই যেমন ছিল তার বাপের বাড়ির আঙিনায়। গাছে ঘেরা ছোট্ট আঙিনা, সন্ধ্যায় জ্বলতো মাটির প্রদীপ। মাথা কুটে যা চেয়েছে সে, ঠাকুর তাই দিয়েছেন তাকে। এখানে আছে শুধু ড্রেন আর জঞ্জাল—ইঁট-পাথর, দুর্গন্ধ আর ঘেয়ো কুকুর।

হঠাৎ মনে পড়ে সুকীর, দু'গাছি কাঁকন আর একটি আংটি। এ অলঙ্কার পেয়েছিল সে বিয়ের সময়, প্যাঁটরায় তুলে রেখেছে যত্ন করে। নেমন্তন্ন নেই—একবার ডেকেও খাওয়ায় নি কেউ। এত অভাব, গয়নার কথা ভুলে ছিল কেমন করে এ ক'দিন? আশ্চর্য্য! বাঁধা দিলে টাকা আসবে। তাতেই সংসার চলবে। ধর্মঘট আর ক'দিন ?

আংটি বের করে' একবার পরে আঙুলে, একবার খোলে। বাঁধা দিতে মন সরে না। আংটির পানে চেয়ে কত কথা মনে জাগে—বাবার মা'র ছোট বোনটির কথা। স্মৃতি বসানো রয়েছে আংটি-পানার ওপর, হীরের মত জ্বল-জ্বল করে। আংটির সঙ্গে স্মৃতিকণাগুলিও বাঁধা পড়বে না কি? ছল-ছল চোখের জল সে আঁচলে মোছে। দূর হোক গে, ভাবতে আর পারে না। ছেলেটা পড়েছে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে। খিদের জ্বালায় কখন হয়ত জেগে উঠবে। কাজ সারতে হবে এই ফাঁকে।

আংটি নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটলো সে মুদী দোকানে। বাঁধা রেখে সওদা কিনবে—আর আনবে ক'টা টাকা।

কেলে বেড়াল আবার এসেছে কাঞ্চনের ঘরে। একা নয়—সঙ্গে ছানার দল পিল-পিল করে বেড়ায়। বাচ্চাগুলার সবে চোখ ফুটেছে। মিটি-মিটি চায়, এ ওর পিছনে ছোটে শুঁকতে শুঁকতে, জাপটা-জাপটি—খেলা করে। যা মিশমিশে কালো, সাদা সাদা ডোরা সব পেল কোথা থেকে ছানাগুলো ?

কাঞ্চন চেয়ে দেখে—সুবল কেবল ছানাগুলোকে নিয়ে খেলায়। রাগ হয় না কেন কে জানে, দেখতে আমোদই লাগে। একটা রাখে সুবল মাথায় ওপর, দু'টো দুই কাঁধে। বেড়াল-ছানা থাকে স্থির বসে, নড়ে না। চোখ দু'টো বুঁজে ডাকে—ম্যাও। ঝাঁপির আড়াল থেকে কি একটা শব্দ কানে আসে—চুক-চুক চুক। ঐ যা—কেলে বেড়ালরা কোন্ ফাঁকে গিয়ে সবটুকু দুধ খেয়ে ফেলেছে।

হায় হায়! অ সুবল—

হি হি। ছাখ মা, শিব ঠাকুরের মাথায় সাপ, কাঁধেও—

তুত্তোর খেলার নিকুচি করেছে। এত বার বলি—

নিকুচি করেছে? বেড়ালটা ?

আরে—দুধ যে সব খেয়ে গেল। রাতে খাবি কি? দে দে, পার করে দিয়ে আয়।

দাঁড়াও। দেখাচ্চি মজা। দূর হ, দূর হ—একটা একটা ধরে ছানাগুলিকে দূরে ফেলে দিলে সুবল।

ম্যাও, ম্যাও—একটার পর একটা ছুটে পালালো।

কেলে বেড়ালটাও পালিয়েছে।

সুবল বলে,—যাক না, আবার আসবে রাতে; ছালায় ভরে নিয়ে যাব তখন। শ্মশানে ছেড়ে দেব।

সে কি রে! রাতে—শ্মশানে ?

হি হি। কাঁধে নয়, হেঁটেই চলে যাব।

মা-ও হাসে কথা শুনে। কে বলে, হাবা-গোবা ক্যাবলা ছেলে।

সরাপের দোকানে ভিড় নেই। ফুলুরি বেগুনিও আর তেমন কাটে না। কাঞ্চন ভাজে মুড়ি খই, ঝোলা গুড় জ্বাল দেয়। সকালে বিকালে ঝুড়ি-বোঝাই মুড়ি-মুড়কি কাঁকালে নিয়ে ফেরি করে বেচতে।

বসনা ঘাড় গুঁজে চলেছে দোকানের পাশ দিয়ে। একা বসে সুবল—তাকে দেখে আর হি হি করে হাসে অজবুকের হাসি। সেদিকে ফিরে চায় না বসনা, ভাবে—ধর্মঘটের কথা। শনির দৃষ্টি সেই যে পড়েছে, আর ফেরে না। মজুরি বৃদ্ধি চুলোয় গেছে, পর্ব্ব এখন মান-ইজ্জতের। নাকে খৎ না দিয়ে আর কাজে ফিরবার উপায় নেই।

বসনা—অ বসন।

সন্ধ্যে বেলা সবে ফিরেছে কাঞ্চন ফেরির চক্কর সেরে। কাঁখের ঝুড়িটা তখনো নামায়নি।

বসনা চেয়ে থাকে অবাক্ হয়ে। আশ্চর্য্য মেয়েমানুষ—কাঞ্চন। মদের চাট, ফুলুরি পকৌড়ির পাঠ উঠেছে ত ফেরি ধরেছে। দমে না কিছুতেও। ওর মত সে-ও যদি পারতো মোট বইতে—নিদেন রিক্শা টানতে।

ভাখ ত বাবা বসন। কেমন মুড়ি—টাটকা গরম—

এত দুঃখেও হাসি পায় বসনার। কী সেয়ানা! একটা পয়সা পাবে মুড়ি বেচে—তাই লাভ।

সে বলে, ভাঁড়ে মা ভবানী। পয়সা নেই। কিনবো কি দিয়ে?

নেই বা দিলি এখন ধর্মঘট মিটে যাক। তখন দিলেই হবে।

পেটে আগুন জ্বলে—ব্যথা-ভরা চোখ মেলে চায় বসনা। সকালে আধ-পেটা খেয়ে বেরিয়েছে। তার পর সারা দিন টো-টো। অকাজের মেহনত—ফাঁকায় ফাঁকায় খিদেটা কেবল প্রতিধ্বনি জাগিয়ে বেড়ায়। কাঞ্চন তা বোঝে না, কে বলবে? দরদ নেই তার, কেন বসনা মনে করবে? নিশ্চয় আছে দরদ—খাঁটি দরদ।

মনটা দোল খায় পাকিয়ে পাকিয়ে। মুঠো মুঠো মুড়ি তুলে নিয়ে সে মুখে পোরে।

সুকী ফিরেছে মুদী দোকান থেকে। হাতে সওদা—আঁচলে বাঁধা টাকা। উঠোন পেরিয়ে ঘরে যেমন ঢুকেছে, কোথা থেকে বসনা এসে পড়লো হড়পা বানের মত। টাকা সে দেখেছিল।

কোথা পেলি টাকা?

বলবো না।

বুঝেছি। গয়না বিক্রী করেছিস্।

সুকী রাগ করেই বললে,—বেশ করেছি। উপোস করার চেয়ে গয়না বিক্রী ভাল।

তিক্ত স্বরে বলে উঠলো বসনা,—না না। সে হবে না। কালই ফিরিয়ে আনবো গয়না।

উত্তেজনায় অস্থির ত্রস্ত পদ—একবার বাইরে যায় সে, আবার ভিতরে আসে।

প্যাটরা খুলে টাকা তুলে রাখতে যাবে সুকী, অমনি—খপ করে তার হাতখানা ধরে বলে ওঠে বসনা,—দেখি—

কি আবার দেখবে?—ঝামটা মেরে ওঠে সুকী।

দু'টো টাকার দরকার। দে আমায়।

খোঁটা দিয়ে বলে সুকী,—চাইতে লজ্জা করে না?

চাইতে লজ্জা করতো যদি তোর টাকা দিয়ে মদ খেতুম। শান্ত ভাবেই বললে বসনা।

তবে চাও কেন? জুয়ো খেলবে?

হ্যাঁ। দেখি একবার বরাত ঠুকে—কি আছে।

সুকী ঘাড় নাড়ে। বলে,—না। এ টাকা আমি দেব না জুয়ো খেলতে।

কাকুতি করে বসনা বললে,—সত্যি বলচি—জিতবো। দু'দিন খাস্‌নি। ছেলেটা শুকিয়ে মরছে। আমি কি তা জানি না ভেবেছিস্? এত দুঃখ—আর বোঝা বাড়াবেন না ভগবান। দেখিস্—ঠিক জিতিয়ে দেবেন।

সুকী সে-কথা কানেও তোলে না। টাকাগুলো মুঠোর ভিতর শক্ত করে' ধরে' পেটে গুঁজে উবু হয়ে পড়ে থাকে। শরীরের সব শক্তি জড় করেছে সে মুঠোয়, কিছুতে ছাড়বে না।

দে বলচি,—বসনা রুখে উঠলো, ভয়ঙ্কর ভাবে।

না। দেব না।

তোর ঘাড় দেবে।

ধস্তাধ্বস্তি—টানাটানি।

সুড়ঙ্গের মত ঘরখানার শেষ প্রান্তে এক রাশ অন্ধকার জমেছে, স্পষ্ট দেখা যায় না। কি যে ঘটলো সেখানে—ধপাস করে শব্দ, গ্যাঙানি, অস্ফুট কাতর স্বরে, উঃ—তার পর সব স্তব্ধ।

ঘুমন্ত শিশুটি জেগে উঠলো সেই সময়। কাঁদতে সুরু করলে।

পাগলের মত কি-যে করেছে বসনা, খেয়াল নেই। কেবলি হাঁপাচ্চে। ছেলের কান্নায় চমকে উঠলো। মাটির ওপর পড়ে আছে সুকী, নিথর নিস্পন্দ। গায়ে হাত দিলে, বুকের ওপর হাত রেখে দেখলে,—এ নড়চে না? কৈ? নাকে হাত দিয়ে পরীক্ষা করলে, —এ যে নিশ্বাস বইছে। কৈ? না ত। নাক দিয়ে ঝরছে—এ কি রক্ত? ভগবান—সে খুনী, খুনী।

না না, সুকী মরেনি। বেঁচে আছে—আলবাৎ বেঁচে আছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। আলো জ্বালতে ভরসা হয় না। ছেলেটা কাঁদে—কেবল কাঁদে। টাগরা ধরে মরেই বা। দু'হাতে ছেলেকে তুলে নিলে সে। সুকী মরলে তাকে পুলিশে ধরবে, ফাঁসী দেবে। হোক ফাঁসী। সুকী গেছে, সে-ও যাবে। কিন্তু—ছেলেকে মানুষ করবে কে?

সুকী কি আছে বেঁচে, না নেই? কি করবে সে? পুলিশ ডাকবে—না ডাক্তার? কোথা যাবে? থানায়, না হাসপাতালে?

কাঁখে ছেলে, সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। রাত্রি হয়েছে। রাস্তার লোক চলা কমে এসেছে।

গুন্-গুন্ করে গান গেয়ে চলেছে—ও কে? চেনা গলা। সে ডাকলে,—সুবল না?

হি হি—

বোকার নিরর্থক হাসিও তার মনে বল এনে দিলে। সে বললে, —আয় ত ভাই, আয় ত। চলেছিস্ কোথা?

ছালার বোঝা কাঁধে ঝুলানো। দেখিয়ে সুবল হাসে। বস্তার ভিতর থেকে মিহি করুণ সুরে বেরোয়—ম্যাও, ম্যাও।

সুবল বলে,—সেই কেলে বেড়ালটা। চলেছি পার করতে—শ্মশান ঘাটে।

এই সে। ধর ছেলে। বস এইখানে।
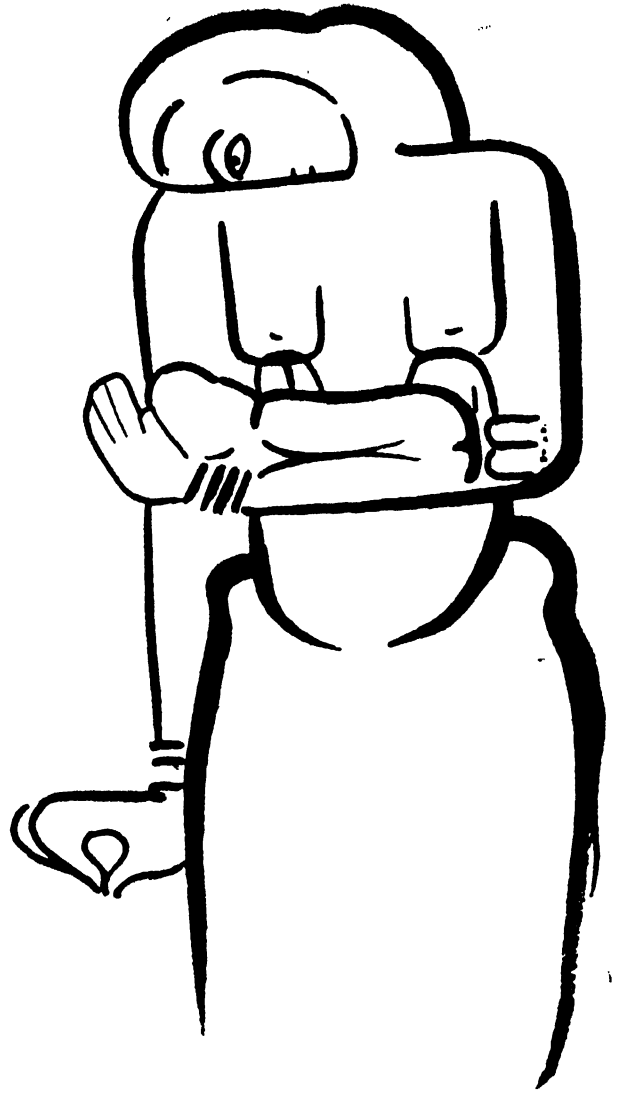
মা

—বাণীকুমার

বস্তা সরিয়ে ছেলেকে সে সুবলের কোলে তুলে দিলে। সুবল রইলো শিশুটির পানে চেয়ে। কেমন কচি মুখ। নরম যেন তুল-তুল করে।

হঠাৎ বলে উঠলো,—ঐ বেড়ালটা!

দে ছেড়ে এইখানে—বলে ঘরে ঢুকলো বসনা।

বিছানায় শুয়ে কাঞ্চন, পাশের বালিশটা খালি। সুবল গেছে ফেলে বেড়ালটাকে পার করতে এই রাত্তিরে। কখন ফিরবে কে জানে। সে শোনে সবার কথা, যে যা বলে তাকে, তাই করে। আবদার, খামখেয়ালি, একগুঁয়েমি—সবই মার' কাছে।

সুবল নেই, পাশটা কেমন ফাঁকা ঠেকে। ঘুমের ঘোরে মাকে জড়িয়ে থাকে, এতটুকু যখন ছিল, ঠিক তেমনি। বড় হয়েছে এখন, সে খেয়াল নেই। পেটে এলো যখন, এক ফালি চাঁদ—দেখা যায় কি যায় না। ভরা যৌবনে রোজই আসতো সাজি-ভরা ফুল। কে কবে তাকে কোন উপহার দিয়ে গেছে, আজ সে-কথা তার মনেও নেই।

মা—অ মা।

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লো কাঞ্চন।

কি রে ফিরে এলি? ভেবে মরি বাপু।

হি হি। কি এনেছি ভাখ।

কাঞ্চন অবাক্। সুবলের কোলে একটি শিশু—আঙুল চুষছে;

কী আপদ! কোথা পেলি?

হি হি—দিলে।

দিলে? দূর। ছেলে আবার কেউ দেয় না কি?

বা রে। বসনা যে দিলে—

চোখ দু'টো কপালে তুলে কাঞ্চন বলে—ও, এ বুঝি বসনার কাণ্ড। মস্‌করা করবার জায়গা পেলে না? দিয়ে আয়—দিয়ে আয়—

হেঁ হেঁ। বেড়াল নয়, ছালায় ভরে পার করবে। বসনা বললে, মাকে দিবি। মানুষ করবে।

কাঞ্চনের পাশে নিজের বিছানায় শিশুকে শোয়ালে সে। বললে, ও শোবে এখানে। আমি থাকবো ভুঁয়েই শুয়ে।

জীবন-জল-তরঙ্গ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

২১

দুপুরে ঘরের মধ্যে শুয়ে পুরন্দর ভাবছিল। উত্তরপাড়ার লোকেরা আর গরিব মুসলমানেরা যা বললে তার কথাগুলো আলাদা হ'লেও শব্দার্থ যেন এক। দুই পাড়ার দুই সমাজের নিম্ন স্তরে পড়ে আছে যারা বহু কাল ধরে অবহেলিত—কীট-পতঙ্গের মত অস্পষ্ট চেতনায় তাদের মনেও আজ যে ক্ষীণতম প্রতিবাদ মাঝে মাঝে বাইরে আসে তাই কি যুগ-পরিবর্ত্তনের সূচনা করছে? ওদের মাঝখানে রয়েছে প্রাচীর। সম্পদের শাণিত তরবারি ক্ষমতার সুনিপুণ চালনায় মাঝে মাঝে ধাঁধিয়ে দেয় ওদের দৃষ্টি। ধর্ম্মের ঊর্ম্মিমুখর সমুদ্র ওদের শ্রবণ-পথকে করছে শব্দমুখর—অন্য ধ্বনির স্থান সেখানে নেই। তবু ওরা অন্ধকারে চলতে চলতে প্রকাণ্ড গহ্বরের সামনে এসেও নির্ব্বিচারে তাতে ঝাঁপ খেয়ে তলিয়ে যেতে পারছে না—মান-সম্মান ধর্ম্ম জাতির গৌরবে স্ফীত হয়ে। ওরাও ভাবছে—যুগ-যুগ ধরে যে পথ চলে গেছে সামনে—মক্কার দিকে অথবা বদরিকায়; যে পথের দুর্গমতায় রয়েছে আত্মত্যাগের সাদা ফুল ফুটে; যে পথ কল্পনায় ও কাহিনীতে মানুষকে বহু সম্ভাবনায় প্রলুব্ধ করেছে—সে পথ-যাত্রী আজকের বাস্তবকে অস্বী।ার করে কি করে শ্রেয়ঃ হতে পারে? প্রশ্ন জাগে—এক কালের শ্রেয়ঃ কি চিরকালের শ্রেয়ঃ? পাষাণ দেবতা কালজয়ী? কালের স্রোতে সমুদ্র ভেদ করে ওঠে পর্ব্বত—তট সমুদ্র-গর্ভে আত্মগোপন করে—সমুদ্র সৃষ্টি করে নূতন দ্বীপ—পাষাণ ক্ষয় হয়ে উর্ব্বর শস্যক্ষেত্রে পরিণত হয়—শুধু দেবতা থাকেন কালোর্ম্মির ঊর্দ্ধে নিজ মহিমায় অটল—যুগের অর্জ্জিত সংস্কার ও রীতিতে ভারগ্রস্ত? সে দেবতা আরাধনার ফলে মানুষকে দেন ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ?

মাঝের পাড়ার ধনী হিন্দুরা এবং ধনী মুসলমান পাড়ার ফতোয়া-দানকারীরা ধর্ম্মের ধ্বজা তুলেই দেবতার মহিমা প্রচার করেন উচ্চকণ্ঠে। দেবতার কল্পনায় মানুষ এক দিন সভ্যতার সৃষ্টি করে বিশ্বে যে আসন পেয়েছিল সেই আসনে পাষাণ-বেদির ওপর দেবতা রয়েছেন অচল হয়ে। রীতি-নীতি আচার-বিচারের উপচার দেবতার করছে তুষ্টি সাধন। কিন্তু মানুষ এগিয়ে গেল কত দূর? এক যুগের সীমানা পার হ'য়ে অন্য যুগের তোরণে এসে সে প্রবেশ করলে, সে তোরণ অতিক্রম করে সে এগিয়ে যাচ্ছে অনাগত যুগে। অথচ দেবতা সেই প্রথম দিনের প্রতিষ্ঠা-ভূমিতে রইলেন পড়ে। নির্ব্বিকার—তাই অসহায়। শান্ত—তাই প্রাণহীন। ভক্তিলুব্ধ—তাই ক্ষমাশীল। ধর্ম্মের সংঘাতে—ক্রুসেডে জেহাদে—শৈবে শাক্তে—হিন্দুতে মুসলমানে কত রক্ত ক্ষয় করেছে ওঁর মহিমাকে জাগ্রত রাখতে—অথচ নিষ্প্রভ দিনের আলোয় সে মহিমা ম্লান হ'য়ে আসছে না কি? উদ্ধত নিষ্ঠুর কাল করতালি দিচ্ছে পিছনে—সামনে তার বিলুপ্তির খর স্রোত। সে স্রোতে ক্ষয় হচ্ছে দেবতার পাষাণ-বেদি—মন্দিরে মসজেদে দোলা লাগছে। প্রশ্ন জাগছে, মানুষ বড় না দেবতা বড়? কাকে আশ্রয় করে কে বাঁচবে? কাল-স্রোত উত্তরণের ভেলা কে করবে সংগ্রহ! এই সব প্রশ্ন এত দিন ছিল না কি? ছিল। তারা ছিল অন্তঃশিলা ফল্গুর মত আলোক-ভীরু—প্রকাশ-ভীরু। সংযমের স্তুতিতে উদ্যমহীন।

পর পর দু'টি মহাযুদ্ধ উন্মোচন করে দিল—ভীরুতার আবরণ; ধর্ম্মের আচারসর্ব্বস্ব অনুকরণে বাধা পড়লো। গেল দুর্ভিক্ষে মানুষ ধর্ম্মের পরিচয় পেলে কুলিশ-আঘাতের মত। যে দেশ স্বাধীন নয়—তার ধর্ম্ম কি? পর্য্যাপ্ত রসদ নষ্ট হ'লো সংরক্ষণের দায়ে—লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিলে অন্নের দুর্ভিক্ষে। মহাকাল হাসলেন। আর একটা আবরণ খসে গেল চোখের সম্মুখ থেকে।

আজ গরিবরা ভোলেনি গত মন্বন্তরের কথা। সে দুর্ভিক্ষে জাতির প্রশ্ন—ধর্ম্মের সমস্যা ছিল কোথায়? একটি জীবনের মূল্যে অর্জ্জিত হয়েছে এক হাজার টাকা। যারা উপার্জ্জন করেছে তারাও জাতির বা ধর্ম্মের চিহ্নে চিহ্নিত নয়। যারা মুনাফা-লোভী। কালো-বাজারের কালো পরদায় ঢাকা থাকলেও এদের চেতনায় জাগছে তাদের রূপ। ওরা তাই বলছে, ওরা আমাদের কেউ নয়। যাব না আমরা ওদের দুয়োরে হ্যাংলা কুকুরের মত। ওরা আমাদের অন্ন চুরি করে—আমাদের ঘরের রোশনি চুরি করে রক্তপায়ী জোঁকের মত উঠেছে ফুলে।···এই ধ্বনিই কালের তরঙ্গে অস্পষ্ট হয়ে এগিয়ে আসছে।

ঠিক এই কথাই লিখেছেন ইন্দ্রজিৎ বসু:

আগষ্ট মুভমেণ্ট—নব-জাগ্রত চেতনার একটি শক্তিময় ব্যঞ্জনা। যদিও ওর রূপটির সামঞ্জস্য নেই—একটি আধারে সুসংন্যস্ত হ'য়ে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেনি—তবু ওর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ থেকে কি বুঝতে পারি আমরা? বাতাস এলোমেলো ছিল—শিখা তাই আকাশ ছুঁতে পারেনি, কিন্তু বৃহত্তর এক সংঘাতের সূচনায় আকাশ কি অগ্নিবর্ণে অনুরঞ্জিত হ'য়ে ওঠেনি? সম্পদের ক্ষতি, ভয়, লাঞ্ছনা এবং জীবনকে কোন্ অমৃত মন্ত্রে ওরা তুচ্ছ করতে পেরেছিল! বিপ্লব এমনি অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করে। এমনি তার সংহার-মূর্ত্তি—নিয়মহীন, নীতিহীন হয়তো বা ধর্ম্মহীন। ধর্ম্ম মানে সঙ্কীর্ণ অর্থে যদি ব্যবহার করো। নইলে পরাধীনতার যে বেদনা—যে গ্লানি তার নীতিহীন ভয়ঙ্কর প্রকাশই কি ধর্ম্ম নয়? স্বভাব ধর্ম্ম।

অহিংসাকে ধ্বংস করেছে এই আন্দোলন—এ অভিযোগ করবে তুমি। কিন্তু এর পরেই যখন দেখি, শক্তির এই প্রকাশে অহিংসা আরও বলিষ্ঠ হয়ে উঠলো, তখন ভাবি, হিংসা বা অহিংসা কোনটাই শক্তি ছাড়া নয়। কাচ ফেটে গেলে আগুন যে বাইরে এসে ক্ষতি করে তার হেতু তাপের উগ্রতা। সব জিনিষেরই সহন-শক্তির সীমা নির্দিষ্ট। শুধু অসহনীয় উত্তাপের সৃষ্টি করে—অহিংসার শান্ত রূপ কে করলে ধ্বংস? পাথর ফেটে যায়—লোহা গলে যায় যে ভয়ঙ্কর তাপে—

কিন্তু এ সব কথা থাক্। তার পর নিদারুণ দুর্ভিক্ষ। বাংলা অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। বলবে শক্তিহীন বাংলায় এমন কী-ই বা ছিল যে দ্বিতীয় আগষ্ট আন্দোলন সৃষ্টি করবে? কিছুই ছিল না—তাই জগতের চোখে ন্যায়-শাসনের মহিমা—ধর্ম্ম—এ সব স্পষ্টতর হ'লো। সে আমাদের পরম ক্ষতি; তবু স্বীকার করবো পরম লাভও তাতে পাওয়া গেল। বন্ধুরূপী বর্ণচোরাদের মুখোস পড়লো খসে—চিনলো পরস্পর পরস্পরকে। আগষ্ট আন্দোলনে আত্ম-বিস্মৃত জাতি নতন করে ফিরে পেলে আপনাকে।

তাই কি আমরা পীড়নের মধ্য দিয়ে—ক্ষতি ও ক্ষয়ের মধ্য দিয়ে—শোণিত-স্নান ও মৃত্যু-তর্পণের মধ্য দিয়ে শক্তিকে অনুভব করছি, ফিরে পাচ্ছি নিজেদের। মনে মনে প্রশ্ন করলে পুরন্দর।

বাসু এসে বললে, দাদা, ক'খানা চীন কাগজ ও ঘুড়ির কাপ দিয়ে যাচ্ছি—আটা দিয়ে জুড়ে দেবে? বলে সে সম্মতির অপেক্ষা না রেখে কাগজ, ময়দার কাই ও চাঁচা বাখারিগুলো সামনে নামিয়ে দিলে।

পুরন্দর বললে, তোরা কত ঘুড়ী তৈরী করছিস রে?

মেলাই। আরও দু' দিস্তে চীন কাগজ নিয়ে এলাম। এবার কি ঘুড়ি তৈরী করছি জান? ন্যাশন্যাল ফ্লাগ। এই দেখ। বলে পাট-করা চীন কাগজের ভাঁজ খুলে ফেলল। মাঝখানে সাদা দু'পাশে কমলা আর সবুজ রঙ—ওপরে উঠলে মনে হ'বে জাতীয় পতাকা আকাশে উড়ছে। একটু থেমে বাসু বললে, আচ্ছা দাদা, অনেক দূর থেকে দেখতে পাবে তো সবাই?

পুরন্দর হেসে বললে, বেশ হয়েছে। তা আর কোন রকম প্যাটার্ণের ঘুড়ি করলি নে কেন?

এক প্যাটার্ণই ভাল।—কাকা কংগ্রেসের কাজে জেল খাটছেন—তুমিও দেশের কাজ কর—আমাদের বাড়ির এই স্বদেশী নিশান ঘুড়িই মানাবে ভাল।

পুরন্দর হেসে বললে, তা বটে, ঘুড়ি তৈরী করেই তুই স্বদেশ-সেবার সাধ মিটিয়ে নিচ্ছিস্!

বাসু লজ্জিত হ'য়ে মুখ নামালে।

পুরন্দর ঘুড়ির কাগজ, ময়দার কাই ও চাঁচা কাঠিগুলো টেনে নিয়ে বললে, আচ্ছা যা।

বাসু চলে গেল। পুরন্দর ভাবলে, খেলনার মধ্য দিয়ে বাসু তার অপূর্ণ মনের ইচ্ছা পূর্ণ করতে চাইছে; বেশ তো করুক না। দেহ ওর অপটু—; মনের পূর্ণতা, না লেখাপড়ার দিক্ দিয়ে—না স্বাস্থ্যে বা বুদ্ধিতে, ওর নেই। শুধু বংশানুক্রমিক ধারাকে ও অস্বীকার করতে পারেনি। তিন-রঙা নিশান—শুধু উৎসব-দিনে কেন, প্রমোদে ও ক্রীড়ায় জীবনের সাথী হোক। এই নিশানের গৌরব জাতির স্বপ্নকেও প্রভাবিত করুক।

কাজ শেষ করে ও উঠলো। বেলা শেষ হ'য়ে আসছে। মিত্র-বাড়ি গিয়ে আয়োজন সম্পূর্ণ করতে হবে। অবশ্য মেজ বাবু ত্রুটি কোথাও রাখবেন না। বনেদি বংশের মর্য্যাদায় উনি সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ হ'য়ে আছেন। গালিচা পেতে বাতিদান সাজিয়ে এবং সম্ভব হ'লে আতরদান গোলাবপাসের ব্যবস্থাও করে অতিথি-মনোরঞ্জনের প্রয়াস উনি করবেন।

পৌঁছে দেখলে—বৈঠকখানার চেহারা বদলে গেছে। অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্ম যথাসাধ্য প্রসন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করে উনি রূপোর গড়গড়ায় সুগন্ধি তামাক টানছেন।

পুরন্দরকে দেখে মেজ বাবু বললেন, কৈ হে, তোমার লোকজন কোথায়? ক্লক ঘড়িটার পানে চেয়ে বললেন, ছ'টায় মিটিং বললে না।

পুরন্দর বললে, পাড়াগাঁর ব্যাপার—জানেন তো ঘড়ি ধরে কোন কাজ হয় না।

মেজ বাবু হাসলেন, বললেন, অথচ আমাদের বাড়ি যখন যে কাজ হ'য়েছে ঘড়ি ধরে। উষার বিয়েতে বরযাত্রীরা বলে পাঠালেন, সাতটায় খাওয়া সেরে আটটার ট্রেণে কৃষ্ণনগর যাবেন। দাদা বললেন, তা কি করে হবে? বললাম, ঘাবড়ো না, সব ঠিক করে দেব। ঠিক সাতটায় ওরা খাওয়া সেরে ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে উঠলো। বললো, এমন পাঙ্ক্চুয়ালিটি শহরেও আশা করা যায় না।

মোড়ের মাথায় দেখা গেল—গফুর মিঞাকে মধ্যবর্ত্তী করে মুসলমান-পাড়ার কয়েক জন লোক আসছেন। মেজ বাবু গড়গড়ার নল বেঞ্চির ওপর রেখে বললেন, চল হে, ওঁদের প্রত্যুদ্গমন করে নিয়ে আসি।

পুরন্দর বললে, আপনি বসুন, আমি ওঁদের নিয়ে আসি।

মেজ বাবু হাসলেন, কেন বল তো? আমাদের ক্ষমতার কথা অত্যাচারের কথা তোমরা কি গল্প শোননি? সৌজন্যে বা ভদ্র ব্যবহারে—তাও আমাদের বংশ কোন কালে পিছিয়ে থাকেনি। আজ ক্ষমতা অবশ্য নেই কিন্তু সৌজন্যে খাটো হব কেন হে? ওটায় যে আমাদের বংশগত দাবি। বলে হো-হো করে হেসে উঠলেন।

যথাসময়ে হিন্দুরাও এলেন।—

যে ক'জনকে বলা হ'য়েছিল—সবাই অবশ্য আসেনি। মুসলমান-পাড়া থেকে ইব্রাহিম আসেনি আর দু'-এক জনকেও দেখা গেল না। হিন্দুদের মধ্যে শ্রীধর আসেননি। ফটিক বললে, জামাই-বাবুর এমন মাথা ধরেছে—

গফুর মিঞাকে সভাপতি করে আলোচনা আরম্ভ হ'লো।...

পুরন্দর বারান্দায় বেরিয়ে দেখতে লাগলো, আর কেউ আসছেন কি না। না—আর কেউ এলেন না। তবে মিত্রদের বাড়ির সামনে ছোট মত যে মাঠটা পড়ে আছে—তাতে অনেক লোক জমেছে। হিন্দু-মুসলমান দু'পক্ষেরই লোক আছে। অশ্বত্থ গাছতলায় গোল হয়ে বসে কোন দল তামাক খাচ্ছে—মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে কেউ বা খাচ্ছে বিড়ি-সিগারেট। যুধ্যমান দু'টি পক্ষই জমেছে ওখানে—অথচ হাসি, ঠাট্টা, ইয়ারকি সবই চলচে পূরো দমে। যে জনরব দু'দিন থেকে গাঁয়ের বাতাসে বিষের ক্রিয়া করছিল সন্দেহে ভয়ে ক্রোধে এবং প্রতিহিংসায় দু'পক্ষ উত্তেজিত হ'য়ে উঠছিল দণ্ডের পর দণ্ড—তা যে কতখানি মিথ্যা—দু'পক্ষ মুখোমুখি হয়ে বুঝতে পারছে। তাই হাল্কা কৌতুকে ওরা মেতে উঠেছে। কৌতুকটা আসন্ন দাঙ্গার প্রসঙ্গেই গাঢ় হ'য়ে উঠছে।

পুরন্দর ঘরের মধ্যে এলো। সভার কাজ সুচারু ভাবেই অগ্রসর হ'চ্ছে। দাওয়ানির সাক্ষ্য নেওয়া শেষ হ'লে দু'পক্ষ থেকে তাকে কতকগুলি প্রশ্ন করা হোল। দাওয়ানি যথাসাধ্য জবাব দিলে।

শশীকান্ত বললেন, যাই হোক দাওয়ানি, তোমার গরুকে ওরা জখম করেছে, ওর ক্ষতিপূরণ করতে ওরা বাধ্য।

দাওয়ানি হাত জোড় করে বললে, ছাড়ান দিন হুজুর। বকন আমার সামনে উঠেছে, ওর কাছে টাকা নিই তো হারাম।

হরি এগিয়ে এসে বললে, দাওয়ানি ভাই,—আমায় মাপ কর।

দাওয়ানি ওর হাত চেপে ধরলে। চোখ দিয়ে দু'জনেরই ঝর-ঝর করে জল পড়ছিল। কেন, তা কেউ জানে না। এমন সোজা ব্যাপার নিয়ে কি বিশ্রী কাণ্ডটাই না বাধছিল!

সকলেরই মুখ খুশীতে ভরে উঠলো।

মেজ বাবু উঠে এসে পুরন্দরের হাত ধরলেন। বললেন, এ ছেলে-মানুষ হ'লেও এরই জন্ম ভালয় ভালয় সব মিটে গেল। একে সবাই ধন্যবাদ দিন।

গফুর মিঞা পুরন্দরকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, খোদা মেহেরবান! ভাইজানকে আমি দেখেই বুঝেছি, খোদার দোয়া ওঁর ওপর যথেষ্ট।

ভূপেন সেন কুঁড়োজালি মাথায় ঠেকালেন না—দেওয়ালের পানে ফিরে মুখ বাঁকালেন। শশীকান্ত গম্ভীর মুখে আসন ত্যাগ করলেন।

কথাটা বাইরে প্রচার হতেই জনতা জয়ধ্বনি করে উঠলো।

একটা দুঃস্বপ্ন শেষ হ'লো।

২২

একে একে সবাই চলে গেলে পুরন্দর মেজ বাবুর কাছে বিদায় নিতে ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখলে, তিনি সেখানে নেই। হয়তো দলটিকে এগিয়ে দিতে সামনের ফাঁকা জায়গাটুকু পর্য্যন্ত গেছেন ভেবে সে বাইরে আসছিল—অপূর্ব্ব এসে দাঁড়াল হাসিমুখে।

আসুন, একটু বসুন। হাত ধরে তাকে ফরাসের ওপর বসালে।

পুরন্দর বললে, আপনার মেজ কাকা বোধ হয় ওঁদের এগিয়ে দিতে গেলেন?

মেজ কা'? হাঁ, ওঁদের এগিয়ে দিয়ে বাড়ির মধ্যে গেছেন। হেসে সে বললে, আপনার অরগ্যানাইজিং কেপাসিটি আছে পুরন্দর বাবু। সিচুয়েশন ট্যাক্‌ল করবার ক্ষমতাও রাখেন।

পুরন্দর লজ্জিত হয়ে বললে, না, না, এ তো এমন কিছু নয়। সামান্য ভুলে কত অনিষ্ট হ'তে পারতো অথচ দু'দল সামনা-সামনি আলোচনা করে—

অপূর্ব্ব বললে, দু'দলকে এক করার যে ক্ষমতা তার কথাই বলছি।

পুরন্দর মাথা নীচু করলে।

অপূর্ব্ব বললে, কিন্তু একটা জিনিষ আমার ভাল লাগেনি।

কি জিনিষ?

এই যে শান্তিরক্ষা করলেন—এ যেন মুখ-রক্ষা গোছের একটা কিছু হলো। আমরা হলে—এই পথ নিশ্চয় নিতাম না।

পুরন্দর বললে, হাঁ, ভাল কথা, সেদিন জিজ্ঞাসা করেও উত্তর পাইনি। আজ বলুন তো, কংগ্রেসের সঙ্গে আপনাদের মতের পার্থক্য কোথায়?

অপূর্ব্ব বললে, সে কি আপনি জানেন না? আমরা প্রলিটারিয়েটদের জন্য লড়াই করি। পাতি বুর্জ্জোয়াদের স্থান আমাদের দলে নেই।

কংগ্রেস কি সর্ব্বহারাদের জন্য লড়াই করছে না?

করছে, তবে বুর্জ্জোয়া-প্রভাবও কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা নাই। ক্যাপিট্যালিজিমের সঙ্গে কোন রকম আপোস-রফা করা আমাদের নীতি নয়।

পুরন্দর বললে, ধনী মাত্রেই খারাপ এ ধারণা আপনাদের ভুল।

অপূর্ব্ব বললে, যেখানে বণিক-মনোবৃত্তি, সেখানে যে রকমের ত্যাগই হোক, জনগণের কল্যাণ তাতে হয়নি। দৃষ্টান্ত চান দিতে পারি।

পুরন্দর বললে, আমরা ধনের উপর ঘৃণা পোষণ করি না, মনের ধারাটাকে বদলে দেবার চেষ্টা করবো শুধু। আপনি স্বীকার করবেন নিশ্চয়— ধনকে যতই অস্বীকার করুন।

অপূর্ব্ব বললে, অস্বীকার করবো কেন। ধন-বৈষম্য দূর করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ধন হ'চ্ছে নদীর জল। বাঁধ কেটে ওর ধারাকে মুক্ত করে দেয়া চাই। স্রোত না থাকলে—বিষবাষ্প জমে-পীড়া ঘটাবে। এই তো দেখলেন, গত বারের দুর্ভিক্ষে—, বাংলারই শহরে মানুষ না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে গেল যে বাড়ির দোর গোড়ায়—সে-বাড়িতে বিদ্যুৎ আলোয় ইজি-চেয়ারে বসে কর্ত্তা ছাপার হরফে পড়লেন সেই খবর। সেই খবর পড়ে ওঁর মনোভাবের কি পরিবর্ত্তন হ'য়েছিল বলতে পারেন?

যদি হয়েই থাকে—

তাহলে পঁয়ত্রিশ লক্ষ জীবন শেষ হ'য়ে যেত না। মিথ্যে আশা পুরন্দর বাবু। সত্যাগ্রহের দ্বারা ধন-সঞ্চয়ের লালসাকে জয় করবেন, এ শুধু দুরাশা।

পুরন্দর বললে, পরীক্ষা শেষ না হ'লে শেষ কথা বলা শক্ত।

অপূর্ব্ব বললে, পরীক্ষা করেই হয়তো শেষ হবে আপনার জীবন—

হোক; সত্যাগ্রহ আমার জীবনের সঙ্গে শেষ হবে না তো। পুরন্দর হাসলো।

না, না—গান্ধীবাদ ছাড়ুন পুরন্দর বাবু। যে জগৎ সামনে তাতেই আশ্রয় নিন। পিছনের জীবনে যত স্বপ্ন আর যত শান্তিই থাক তা আমাদের মঙ্গল করবে না।

মঙ্গলের শেষ নির্দ্দেশ আপনারাও তো দিতে পারেননি অপূর্ব্ব বাবু। সাম্যবাদ সাম্রাজ্যবাদ আশ্রয় করে বাঁচতে চাইছে—

অপূর্ব্ব বললে, বাঁচার চেষ্টাটা হ'লো সব আগেকার কথা। শক্তির ক্ষেত্রে—কৌশলের ক্ষেত্রে নীতির কিছু পরিবর্ত্তন করতেই হয়; তা বলে মূল উদ্দেশ্য বদল হবে কেন? তা হয় না। যুদ্ধের পরে দেখবেন, সাম্যবাদ···এ খোলসও ত্যাগ করবে।

পুরন্দর তর্ক করলে না। মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বাস্তব বোধ কতটুকু জড়িত তা নিয়ে তর্ক করা আজ মিথ্যা। তার তো মনে হয়, ভোগবাদের মধ্যে সর্ব্বহারাদের প্রকৃত কল্যাণ থাকতে পারে না। শাসনের রক্তচক্ষুতে মানুষ ততটুকুই বদলাবে যতটুকু শাস্তি রাজশক্তির কাছে সে ফাঁকি দিতে পারে। মন তার বদলাবে—কেন···জড় বিলাসের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থেকে। সে কি ভাল থেকে আরও ভাল হতে চাইবে না? অর্থাৎ শুধু খেয়ে পরে ঘুমিয়ে সংসারে পোষ্য বাড়িয়ে বা ভবঘুরে হয়ে তার সকল বাসনার নিবৃত্তি ঘটবে? সেও তার প্রতিভার মূল্যস্বরূপ—পারিশ্রমিকের তারতম্যে অর্থ চাইবে না বেশি? মোটর কিনবে না একখানাও? তৈরী করবে না প্রাসাদোপম অট্টালিকা? এক জন সাধারণ মজুরের সঙ্গে সমশ্রেণীর হ'য়ে এক জন এঞ্জিনিয়র থাকবেন সন্তুষ্ট? বৈজ্ঞানিক তাঁর প্রতিভার পারিশ্রমিক পাবেন, সাধারণ কৃষকের পারিশ্রমিকের হারে? ঈশ্বর-স্বীকৃত প্রতিভা মানুষের সাম্যবাদের আঘাতে প্রতি দণ্ডে কি জর্জ্জরিত হবে না?

অপূর্ব্ব বললে, যন্ত্রযুগকেও স্বীকার করুন পুরন্দর বাবু।···

পুরন্দর বললে, কুটীর-শিল্পকে ধ্বংস করে যে জিনিস, তাতে গ্রামের কল্যাণ নেই—মানুষেরও নেই। কুটীর-শিল্প বাঁচাতে যতখানি যন্ত্রপাতির সাহায্য দরকার, তা নেব বই কি। কিন্তু যন্ত্রকে প্রাধান্য দিয়ে মানুষকে নষ্ট করবার দুর্ম্মতি না হওয়াই তো ভাল। আপনাদের সমাজবাদ তো সকলের ওপরে মানুষের কথাই বলছে।

হাঁ, নিশ্চয় বলছে। না খেয়ে মানুষ শুধু তর্ক করবে, এমন কথা কোন বাদই বলছে না।

দু'হাতে দু'খানা রেকাবী নিয়ে সেই মেয়েটি ঘরে এসে ঢুকলে।

অপূর্ব্ব হেসে বললে, ভাগ্যি তুই মনে করিয়ে দিলি! বলে ওর হাত থেকে একখানি রেকাবী টেনে নিয়ে পুরন্দরের সামনে রাখলে। দ্বিতীয় রেকাবিখানা মেয়েটি অপূর্ব্বর সামনে নামিয়ে দিয়ে বললে, জল আনি।

সন্ধ্যে-বেলায় জল! তোদের বুদ্ধিকে বলিহারি।

মেয়েটি ততক্ষণে ভেতরে চলে গেছে।

অপূর্ব্ব বললে, ওর সঙ্গেও কম তর্ক করি না। ও আপনাদের দলে কি না। বলে, আমাদের টাকা-কড়ি যতই কমছে ততই না কি আমি কম্যুনিষ্ট-ঘেঁষা হ'চ্ছি।

পুরন্দর হাসলে।

অপূর্ব্ব বললে, কমরেড বললে ওর যা রাগ! বলে, নাম ধরে না ডেকে বাবা-খুড়োর অপমান করছো। ভাল কথা, ওর নামটা জানেন তো? নাস্তি কি না নম্রতা। যদিও ও জিনিষটার অভাব ওর সব জায়গাতেই।

এক কাপ চা আর এক গ্লাস জল নিয়ে নম্রতা ফিরে এলো।

কাপ কি এই একমেবাদ্বিতীয়ম্?

মা মশাই, গ্লাসে জল। চা উনি খান না।

সরি, আমার স্মৃতিশক্তির সত্যই অভাব পুরন্দর বাবু।

নম্রতা বললে, মেজকা' ওকে চাকরি করে দেবেন বলছিলেন না কাল, তাতে—

পুরন্দর বললে, চাকরিতে আমার ভয়—এই কথাই তো বলেছি।

ইস্, আমি যেন ছোট মেয়ে তাই এই বলে আমায় ভোলাবেন! জান অপূদা'—উনি এক জন মস্ত—বড় হ'য়ে কি না, তাই।

অপূর্ব্ব বললে, আমিও তো এক জন মস্ত বড় হয়ে—

নম্রতা ক্রুদ্ধ হ'য়ে বললে, ভেংচোবে না বলচি!

ভেংচোলাম? অপূর্ব্ব হাসলে।

ওই তো! ওর নাম বুঝি ভেংচোনো নয়?

ওদের ছেলেমানুষি উপভোগ করছিল পুরন্দর। হঠাৎ ক্লক ঘড়িটায় টং-টং করে সাতটা বাজলো। পুরন্দর উঠে দাঁড়ালো।

আজ চলি। বলে যুক্ত কর ললাটে ঠেকালে।

নম্রতা এগিয়ে এসে বললে, আবার কবে আপনাদের শোভাযাত্রা বেরুবে? বেশ লাগে—বন্দে মাতরম্ ধ্বনি।

আপনার ভাল লাগে?

লাগবে না! ওর দু'খানা রেকর্ডই আনিয়েছি। অপূদা' বলে—ওর চেয়ে জনগণ-মন-অধিনায়ক ঢের ভালো।

পুরন্দর বললে, শ্লোগান দিতে বন্দে মাতরমে বেশ জোর পাওয়া যায়। বুকে বল—মনে সাহস—

ঠিক বলেছেন। কিন্তু আমাদের মুখে ঠিক আপনারা যেমন বলেন—তেমন বেরোয় না কেন?

তোদের সরু গলা কি না, তাই।

ফের ভেংচোচ্ছো!

ভেংচোলাম? আচ্ছা বলতো, বন্দে—মাতরম্। বল? পারলি না তো! আচ্ছা, আজ ভাল করে রিহার্সাল দিয়ে ঠিক করে নিবি।

মেজকা' বকবেন।

না, মেজকা' বকবেন না।

হাঁ, বকবেন।

না বকবেন না।

বল, কত বার বলতে পারিস্ তুই, বল—

পুরন্দর হাসতে হাসতে বললে, আচ্ছা চলি।

শুনুন না। বলে এগিয়ে এলো নম্রতা। সন্তর্পণে ওর বুকের তলা থেকে বার করলে ছোট মত একটি ন্যাকড়ার পুঁটুলি। সেটি মেলে ধরলে পুরন্দরের সামনে। আবছা অন্ধকারে তিন-রঙা পতাকাটি চিনতে ভুল করলে না পুরন্দর। পতাকার মাঝখানে আড়াআড়ি ভাবে লাল অক্ষরে লেখাটি শুধু পড়তে পারলে না। মৃদু স্বরে বললে, একটি লেখা না?

হাঁ। লাল পশম দিয়ে বন্দে মাতরম্ লিখেছি। ভাল হয়নি?

চমৎকার হ'য়েছে।

তাহলে নিন এটা। বলে তাড়াতাড়ি গুটিয়ে তাল পাকিয়ে পুরন্দরের হাতে দিলে।

পুরন্দর বললে, এ নিয়ে আমি কি করব এখন?

আপনি বরং বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখবেন দেওয়ালে।

নম্রতার দিকে সে হাতটা মেলে ধরলে।

কিন্তু কোথায় নম্রতা?

[ক্রমশঃ

জাগৃহি

শ্রীমৃণালচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

জাগো জাগো সতি নয়নে তোমার রুদ্র-বহ্নি জ্বালো,
অসুরের হাতে কন্যা তোমার মালিন্যে আজিকে কালো।
দিকে দিকে শুনি ক্রন্দন-ধ্বনি হাহাকার অবিরত,
অন্দরে-বাহিরে দলিত-লুণ্ঠিত নারীর মহত্ত্ব সত।
তোমারি অংশে লভিয়া জন্ম অপমান তারা সবে
এ কি কভু হয়—এ কি হতে পারে, হীন হয়ে তারা রবে?

এস ভীমা এস প্রলয় নাচনে করাল খড়্গ করে,
হান হান হান অস্ত্র তোমার অসুর নিপাত তরে।
জাগিয়া জাগাও জনগণে আজ ভারতের নারী যত,
শক্তি-মন্ত্রে তোমরাই পাল আত্ম-রক্ষাব্রত!
মাত মাত সবে মরণোৎসবে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি,
সুপ্ত শক্তি জাগ্রত কর হৃদয়-শোণিত ঢালি।

সতী-অভিশাপে নরপশু সব হ'য়ে যাবে ছারখার,
দনুজ-দলনী জাগ্রত হও ঘুচাতে ধরার ভার।

প্রস্তুতি

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

রাত্রির অন্ধকার তখনও কাটেনি। শেষ রাত্রের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ওরা সব ঘুমিয়েছে মড়ার মত; কেবল ঘুমুতে পারেনি বাবা। সারা রাত্রি ধরে তিনি খক্‌-খক্‌ করে কাশেন। শেষ রাত্রির দিকে উঠে বসে খানিকক্ষণ তামাক টানার পর একটু যা ঘুমোন।

বাবার আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ার পর দ্যুতি চোরের মত পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এলো। সারা বাড়ীটা এখন ঘুমে অচেতন। এইবার বাবা ঘুমিয়ে পড়বেন। সারা দিনের অমানুষিক খাটুনির পর মা এখন অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। ছোট কোলের ভাইটা সারা দিন শকুনছানার মত ট্যাঁ-ট্যাঁ করার পর রাত্রে মায়ের বুকে ঘুমিয়ে থাকে ছোট টিকটিকিটির মতই। পাশের ঘরে অন্যান্য ভাই-বোনগুলো সব জড়াজড়ি কোরে শুয়ে থাকে এ ওর ঘাড়ে পা তুলে, বড় বোন মিনুটার আবার যে রকম শোয়ার ছিরি—বিয়ের পরও যদি ও ঐ রকম করেই শোয়—!

দ্যুতি মায়ের ঘরের দরজাটা একটু ঠেলে দেখে ফিরে আসে। না, সারা বাড়ীটা নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় ঘুমুচ্ছে। কেবল ঘুম নেই দ্যুতির চোখে আর দ্যুতির মত যারা তাদের। সারাটা রাত দ্যুতির অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাটে—মাথাটা ঝিম মেরে থাকে, দেহের স্নায়ুতন্ত্রীগুলো সব অসাড় হোয়ে যায়, অনুভূতিও যেন কেমন ভোঁতা হতে থাকে। কেবল ভোঁতা হয়ে থাকে না কানের পর্দা দু'টো, দিন-রাত সময়ে-অসময়ে সেখানে রণজিৎদা'র দু'টো কথা বাজে—আপোষ-আলোচনা নয়, দয়া-অনুগ্রহ নয়—এ শুধু মাথা উচুঁ করে জানিয়ে দেওয়া এ দেশ আমাদের, এখানে আমরাই সব—

রাত্রে এক এক সময় একটু তন্দ্রা আসে। দ্যুতি শুয়ে পড়তে চায় বিছানায়। মনে হয়, ঘুমিয়ে পড়ুক একেবারে। কিন্তু ঘুম হয় না। হঠাৎ কে যেন ঝাঁকানি দিয়ে বলে যায়—বেরিয়ে পড় সব আগল ভেঙে, শুনতে পাও না কান্নার রোল? কেবল রণজিৎদা'ই নয়, লতিয়ে মানুষ হওয়া ছেলেপিলেরাও সোজা হয়ে চোখে জ্বালা নিয়ে বলে যায়—সত্যি বলছি তোমাকে দ্যুতি, এ-ভাবে আর কত দিন কাটবে? রাতের পর রাত ভোর হয়, সূর্য্য ওঠে আর মনে হয় এই বার বুঝি এই আলোতেই পথ খুঁজে পাব, কিন্তু সে আলো তো থাকে না! পথ হারিয়ে যায়, কান্না আসে, মন বলে—কোথায় পথ, কে দেখবো পথ?

—পথ আছে খুঁজে নিতে হবে পেলব, দ্যুতি উত্তর দেয়।

—খুঁজে নিতে হবে? তুমি শুনেছো সারা রাত্রি তারা কাঁদে। বলে—দেখতে পাও না তোমরা কত যন্ত্রণা দেয় ওরা আমাদের, কত কাঁদায়?

—সমস্ত দেশ-কাল ছেয়ে যে কান্নার রোল গুমরে ফিরছে তা কি না শোনবার?

—তুমি দেখেছো দ্যুতি, বলদের মত মুখ গুঁজে, পিঠের বেদনা সয়ে, পেটের ক্ষিদে ভুলে এরা একটু জোরে একসঙ্গে কাঁদতেও পারে না। জোরে কাঁদতে গেলে এদের না খেতে দিয়ে পশুর মত নির্ব্বিচারে গুলী করে এদের যারা দাবিয়ে রাখতে চায়—সেই শাসন, সেই সমাজ-ব্যবস্থার মূলে কি আমরা আগুন লাগাতে পারি না? পারি; কিন্তু ভয় আছে, পাছে সে আগুনের তাত আমাদের গায়েও লাগে—সুস্থ শরীরে ফোস্কা পড়ে।

—পড়ুক, চল বেরিয়ে পড়ি। দু'শো বছরের পুঞ্জীভূত বেদনা নিয়ে চলো সকলে—যাই চলো।

ওরা চলছিলো—বর্ষার পিছল পথে পা টিপে-টিপে যাওয়ার মতো, সংশয় আর দ্বন্দ্ব দিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপ যেন জড়ানো। পদস্খলনের ভয় আছে তবু ফিরে যাওয়া চলে না। পিছনের দিকে চাইলে শুধু অন্ধকার ছাড়া কিছুই নজরে পড়ে না, তার চেয়ে এগিয়ে চলাই নিরাপদ। ভয় আছে কিন্তু ভাবনা নেই।

নদীর ধার দিয়ে পথ চলেছে দূরে সামনে। এখানে ফাঁকা হাওয়ার মাঝেও সহরের মরা কান্নার আওয়াজটা অস্পষ্ট। মানুষের ঘর বাঁধার আয়োজনও এখানে শেষ।

অন্ধকার তো কাটলো না।—দ্যুতির গলা দিয়ে মিইয়ে যাওয়া আওয়াজ এলো।

কোথাকার অন্ধকার?

আপাততঃ বাইরের অন্ধকারই তো পথ আটকাচ্ছে।

পেলবের হাতে মশাল দাও একটা।

পেলব ততক্ষণে দিয়াশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরিয়েছে। হাতের কাঠি নিবে গেলে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে কাছে। একরাশ নিঃসাড় অন্ধকারের মাঝে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতোই একটু আলো—তার পরেই নিবিড় আঁধার। বঞ্চিত মানুষের আলো নেবার আঁধার—রাশি রাশি ছড়ানো আশে-পাশে। পায়ের নীচে অথর্ব্ব মহা শ্মশান। কয়েকটা শেয়াল তখনও কামড়াকামড়ি করছে। পাশ দিয়ে ওদের কেউ একটা মানুষের একখানা হাত মুখে করে চলে যায়,—চিতা দু'-একটা নিবু নিবু হয় ধোঁয়ায়। চামড়া আর হাড়ের পাহাড়ের আগুন। সারা জীবনের সঞ্চিত রস আর রক্তে ভেজা তাদের দেহ পুড়ছে ফটাফট শব্দে। মানুষই জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে আলো। আদরের ছেলে, নয় ত ভাই! চামড়া আর মাংস পুড়ছে, গুলী খাওয়া, নয় ত আজীবন জেলখানায় পচা মানুষ।

একটু দূরে কোলাহল শোনা গেল শ্মশানচারী দলের। হাতে মদের ভাঁড়, ফাঁকা নদীর পাড়ে পাড়ে ওদের অট্টহাসি ভেসে বেড়ায়। মানুষের সব শেষ যেখানে—যেখানে শুধু উনুন জ্বলার মত দাউ-দাউ করে মানুষ জ্বলছে, সেখানে নিজেদের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করতেই ওরা এসেছে, ভাবছে ওদের দিনের এখনও দেরী আছে।

দ্যুতি যেন পিছিয়ে পড়ছো মনে হচ্ছে।

পিছনের টানে রণজিৎদা।

এখনও টান আছে?

থাকবে বৈ কি। এই তো সকাল হচ্ছে, মা-ভাই-বোনরা সবাই উঠবে—সবাই দেখবে আমি নেই, অথচ আমিই তো ছিলাম তাদের ভরসা—তাদের মুখের ভাত।

নিজের মৃত্যু দিয়ে অন্যকে বাঁচাতে গেলে এই তো পথ।—পেলব বলে।

এ পথ নয় পেলব, এ মত।

তবে ফিরে যাবে তো?

ফিরে যাবো বোলেও তো আসিনি।

তবে—

ওদিকে কারা আগুন লাগিয়েছে সেপায়-কেল্লায়। দাউ-দাউ কোরে সব জ্বলছে, কেউ নিবোবার নেই, যারা নিবোবে তারাই তো জ্বালিয়েছে, তারাই তো বলছে চলে যাও দেশ থেকে, নইলে পুড়িয়ে মারবো।

ধু-ধু করে পুড়ছে শক্ত ইটের তৈরী ঘর—জড়পদার্থের মতো দাঁড়িয়ে পুড়ছে। যেন অনেক দিনের পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনা পুড়ছে।

আকাশটাও লাল হ'য়ে উঠেছে।

দু'শো বছরের ধোঁয়ানো অসন্তোষ কি না।

বিস্ফোরণের দেরী নেই আর?

না।

যদি আবার ওরা মন্বন্তর আনে।

আগের বারে যারা খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে করুণ চোখে ধুঁকতে ধুঁকতে মরেছে, এবারে তাদের দল ঠেকে শিখেছে, শেখেনি মধ্যবিত্তেরা। এবার রাস্তায় যুদ্ধোত্তর ছাটাইয়ের বেকার ঘুরছে—সামনে খাবার দেখে এরা মরবে না—যদি মরে, মেরেই মরবে।

কিন্তু সে মরার সার্থকতা কি রণজিৎদা'?

সার্থকতা? যারা না খেয়ে, অত্যাচার, গুলীর মুখে মরেছে তারা দিয়ে গিয়েছে আমাদের সাহস, শক্তি, আর যাবার সময় কি বলে গিয়েছে জানিস্? বলেছে—তোমরা থাকলে, তোমরা যেন তোমাদের এই ভাই-বোনদের কথা ভুলো না।

কিন্তু—

কিন্তু নয় দ্যুতি, কান পেতে শোনো। মাটীর নীচে তারা আজও চীৎকার করে বলছে—প্রতিশোধ নিতে ভুলো না। ওরা ভাত খেয়ে ফ্যানটুকু তোমার মাকে দেয়নি, তোমার বোন কাপড় না পেয়ে লজ্জায় আত্মহত্যা করেছে, তোমার রোগা ছোট ভাইটি ওষুধ না পেয়ে চোখের সামনে ছটফট করে মরেছে।

তবে সত্যিই জ্বলে ওঠার দরকার?

নিশ্চয়ই—

কিন্তু সে আগুন নিবোবে কে?

আগুন নিবোতে কোন শক্তির দরকার হয় না দ্যুতি, আগুন জ্বালাতে চাই শক্তি। আগুন যখন তার দাহিকা-শক্তি হারায় তখন সে আপনা থেকেই নিবে যায়।

কথা বলতে বলতে হাঁটতে থাকে ওরা। যখন কথা ফুরিয়ে যায় তখন কেমন যেন মিইয়ে যায়। দ্যুতির মনে পড়ে বাড়ীর কথা। সে নেই—যা চাল আছে দু'-এক দিন চলবে, তার পর সংসারের বড় মেয়ে সে, তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন বাবা ছেলের অভাব দূর করতে—কাচ্চা-বাচ্চা ভাইবোনগুলোকে মানুষ করতে। কিন্তু কোথায় যাচ্ছে সে। এই পথেই কি মুক্তি আসবে? না ভুল পথে এসে সে একটা সংসারকে ভাসিয়ে দিয়ে এলো।

পেলব!—দ্যুতি ডাকে—

পেলবও ভাবছে। ভাবছে ছেলেবেলা থেকে মানুষ হোয়েছে অনেক কষ্ট, অনেক অবহেলা পেয়ে। দেখেছে তারই রক্তের কাছা-কাছি মানুষের অত্যাচারে তার মাকে খাটতে হয়েছে সারা দিন রাঁধুনীর মত জ্বলন্ত উনুনের পাশে। সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত খাবার জোগাতে হয়েছে সারা সংসারের লোককে। তারই দাদাকে তারা পড়তে না দিয়ে অল্প বয়সেই মূর্খ করে রেখে বিয়ে দিয়েছে অক্ষম অবস্থায়। সংসার থেকে সরিয়ে দিয়েছে কপর্দকহীন যখন সে। গলায় হাত দিয়ে, দরজার দুয়োর দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে কুকুরের মতন। রাস্তায়-রাস্তায় বাড়ী-বাড়ী না খেয়ে ঘুরেছে এক মুঠো ভাতের জন্য—অথচ সে কি না···

থমকে দাঁড়ায় পেলব। তার এই দুঃখী দাদাকে সে বাঁচাবে বলে সঙ্কল্প করে আজ কোথায় চলেছে পেলব। কিসের টানে, কাদের বাঁচাতে চলেছে। সত্যই কি এক দাদাকে পিছনে ফেলে সহস্র দাদাকে বাঁচাতে চলেছে তারা—

কি ভাবছো পেলব—তুমিও যে চুপ করে গেলে?

আচ্ছা রণজিৎদা', দেশ কি আমাদের সত্যিই জেগেছে?

দেশের দিকে চেয়ে দেখছো—এই দেশ কি তোমাদের? তোমাদের দেশে বিদেশী সয়তান এসে তোমাদেরই নিরীহ কিশোর ভাইদের শুধু মিছিলে বার হওয়ার অজুহাতে নির্বিচারে গুলী চালিয়ে যায়, দেশের নির্বোধ পুলিশকে টাকার জোরে ছাদের ওপর ক্রীড়ারত দু'টি শিশু ভাই-বোনকে বিদ্রোহী বলে গুলী চালিয়ে তোমাদেরই টাকায় সাহসের পুরস্কার পায়, চাষীর কাছ থেকে দেশের দালাল লাগিয়ে শুধু নাম মাত্র টাকায় তাদের মুখের আহার কেড়ে নিয়ে, গুদামজাত করে পচিয়ে নষ্ট করে, চোখের সামনে

রাস্তার ওপর সেই খাবারের অভাবে তাদেরই মত হাত-পা-ওয়ালা মানুষ পোকা-মাকড়ের মত মরে গেলেও খাবারের এক কণা তাকে দেয় না। দেশের বীর ছেলেদের স্বদেশভক্তির অপরাধে লুকিয়ে লুকিয়ে ফাঁসি দেয়, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠায়, দুর্ভিক্ষের সময়েও বাইরে চাল পাঠিয়ে দুর্ভিক্ষকে স্থায়িভাবে থাকতে দেয়—অথচ তোমরা গর্ব কর এ দেশ তোমাদের—দেখাতে পার তোমরা এ রকম শোষণের পরেও পৃথিবীর ইতিহাসে কোন্ দেশে আগুন জ্বলে না?

আগুন এখানেও জ্বলে রণজিৎদা', কিন্তু সে তো শুধু পুড়ে মরার জন্তে—

কেন, পুড়তে পার, পোড়াতে পার না?

চুপ, কারা যেন আসছে—

নিমেষের মধ্যে দল থেমে যায়। রণজিৎদা'র হাতটা শক্ত হ'য়ে কোমরে ওঠে—

ওঃ, আমাদেরই নৌকা—

মাঝি নৌকা ছেড়ে দিলো। নৌকা নদী ছেড়ে ছোট্ট একটা খালের মধ্যে ঢুকলো। অনেক দিনের পুরানো মজে-যাওয়া খাল—জল এক কোমর হয়তো হবে। কিন্তু জল দেখা যায় না শুধু কচুরী পানার স্তর। আগাগোড়া শুধু পুষ্ট আর সতেজ সবুজ কচুরী পানা! সারা দেশের নদী-নালাকে গ্রাস করেছে। পরগাছা শাসন আর শোষণ যেমন করে গ্রাস করেছে আমাদের মনুষ্যত্বকে ও স্বাধীনতাকে।

নৌকো যে চলে না বাবু মশাই, এক বার নৌকোডার হাল ধরতে পারো?

রণজিৎ এসে হালে বসেছে। মাঝি জলে নেমে দু'হাত দিয়ে কচুরী পানা সরিয়ে পথ করে। পানা সরাতে সরাতে লোকটা দাঁড়িয়ে পড়লো—চোখ দু'টো যেন জ্বলে উঠলো একবার, তার পর জলে ভরে এলো!

গেল বারে এমন সময় কি দিনই গিয়েচে—আজ এখানে কচুরী পানা সরাচ্চি, আর সে দিনে মরা মানুষের গাদা ঠেলে নৌকো নিয়ে যেতে হয়েচে, খাল ভর্ত্তি সব মরা, ও-রকম আকালের বছর যেন আর না আসে বাবু—সে যে কি সর্ব্বনাশ করে গিয়েছে। মাঝির গলা ভিজে আসে, স্বর ফোটে না,—চোখের সামনে না খেয়ে আমার সবেধন নীলমণি মরেছে—আমি বাবা হোয়ে শুধু বসে বসে দেখিছি, কিছু করতে পারিনি বাবু! লোকটা ছেলেমানুষের মত হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে—আমার সাজানো ঘর ভেঙে দিয়ে গিয়েছে—

নৌকোর ওপর সবাই চুপ করে বসে থাকে। কেউ কারও দিকে চাইতে পারে না। কেবল রণজিৎদা'র মুখ ফোটে—চুপ করো মাঝি, তোমার একার ঘর ভাঙেনি। ঘর সবই ভেঙেছে, যেগুলো ভাঙেনি সেগুলোর ভিৎ আল্‌গা হয়েছে, এক দিন তারাও পড়বে।

আচ্ছা, বলতে পারো বাবু, আমরা কি অপরাধটা করিচি, যার জন্তে আমাদের এই খোয়ার। আমরা তো কোন দিন কোটা-বাড়ীতে বাস করতে চাইনি, কোন দিন ভাল-মন্দ খেতে চাইনি। শুধু দু'বেলা দু'মুঠো ভিজে ভাত আর একটু ডাঁটা-চচ্চড়ি—আর পরনে একখানা কাপড়, এও কি বড়লোকরা আমাদের পরতে দেবে না?

খেতে-পরতে দেওয়ার মালিক তারা নয় মাঝি, তোমরাই তোমাদের মালিক, তোমরা নিজেরা যত দিন না নিজেদেরটা বুঝে নেবে তত দিন তোমাদের ওপরে ওরা অত্যাচার করবেই।

কেন? পেলব কৈফিয়ৎ-এর সুরে কথা তুললো। যারা সারা জীবন রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, খেয়ে না খেয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সারা জগতের খাবার জোগাচ্ছে, নিজেকে বঞ্চিত করে যারা অপরের মুখে অন্নের গ্রাস তুলে দিচ্ছে অকৃতজ্ঞ মানুষ তাদেরই না খেতে দিয়ে মারবে?

তাই হয়েছে পেলব, সর্ব কালে সর্ব দেশেই তাই হয়েছে। অপরের দয়ার ওপর—বিবেচনার ওপর নির্ভর করে থাকলে এই রকমই হয়। তাই এর থেকে বাঁচতে হলে নিজেদেরকে তার পথ করে নিতে হবে, মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে—বিদ্রোহ করতে হবে।

নৌকাটা এতক্ষণে কথায় কথায় আটকে গিয়েছে পানায়। মাঝিও এদের কথায় যোগ দিয়েছে। সরু খাল পেরিয়ে তবে এদের গন্তব্যস্থল। মাঝি নৌকা থেকে আবার নামে।

এ শুধু মানুষের মারা নয় বাবু, এর সাথে ভগমানও আছে। নইলে—নইলে তোমাদের এত কষ্ট কেন, তোমরা মানুষ হয়েও বোবা জানোয়ারের মত মুখ গুঁজে মার খেয়ে ভগমানের দোহাই দাও! নইলে আজ যদি তোমরা জানতে—ভগমান নয় এ শুধু মানুষের কারসাজি, তাহলে তোমাদের আজ এ অবস্থা হোতো না; এতগুলো লোক শুধু ভাগ্য আর ভগমানকে দোষ দিয়ে এমন করে মরতে পারতো না। কি জানি বাবু, লেখাপড়া তো শিখিনি, আগুন নিয়ে খেলা করব কেমন করে!

এসে গেলাম বোধ হয়!—দ্যুতি আর পেলব একসঙ্গে বলে ওঠে।

নৌকা এসে একটা পুরানো বড় বটগাছের নীচে থামে। বট গাছের চারি দিকে বন আর ঝোপ। জল থেকে পাড়টা অনেক উঁচুতে—একেবারে খাড়া হয়ে উঠে গিয়েছে। বট গাছের ঝুরিগুলো জলের কাছে এসে নুয়ে পড়েছে। সূর্য্যের আলো কোন দিন এর মধ্যে আসে না তাই এর চারি দিকে নীরব অন্ধকার—স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপর সোঁদা গন্ধের ঢেউ, দু'-চারটে বুনো ফুলের সৌরভ।

বট গাছ পেরিয়ে বনের মধ্য দিয়ে সরু পথ। পথ দিয়ে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলে দেখা যাবে, দৈত্যপুরীর মতো বিরাট এক হানা-বাড়ী, যেখানে রণজিতের দলের গুপ্ত আড্ডা, যা পুলিশ কোন দিন খুঁজে পায়নি। সারা পৃথিবীর আনন্দ আর কোলাহলের বাইরে এই নির্জন হানা-বাড়ীতে কেবল থাকেন একটিমাত্র মানুষ—রণজিতের বুড়ী ঠাকুরমা। বয়স ৮৫ কি ৯০। চোখের দৃষ্টি খর কিন্তু কানে শোনেন না। এ-ঘরে ও-ঘরে ভরা যন্ত্রপাতি—যার থেকে আগুন ছোটে। বুড়ী সারা দিন ঐ সব তৈরী নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, প্রস্তুত থাকেন গণ-জাগরণের মাল-মসলা নিয়ে। ভয়-ডর যেন ওকে দেখে পালাতে চায়, এত সাহস তাঁর। দিন-রাত মেশিনের মত কাজ করেন, কোন সময়েই বসতে পারেন না।

দ্যুতি-পেলবের দল গিয়ে বুড়ীর সামনে দাঁড়ালো।

তোমরা পারবে তো?

দ্যুতি ঘাড় নাড়লো।

বেশ, এসো আমার সঙ্গে।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে দল পৌঁছাল। স্তরে স্তরে সাজানো মারণাস্ত্র। দ্যুতি আর পেলবের চোখ দুটো চক্-চক্ করে উঠলো।

আবার ভোর হয়েছে। হ্যুতি আর পেলব তাকালো আকাশের দিকে। চারি দিকে আলো আর আগুন। ফাঁকা আকাশের নীচে নদী, সেই নদীর পারে গিয়ে দাঁড়ালো তারা। অনেক দূরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী সাপের মত পাক খেয়ে-খেয়ে আকাশে উঠছে। ধোঁয়া নয়, ৪০ কোটি মানুষের রোষের আগুন পাক খেয়ে-খেয়ে সারা পৃথিবী ঘুরবে—সারা পৃথিবীকে জানাবে তারাও অন্যায় আর শোষণের বিরুদ্ধে লড়তে জানে, পোড়াতে জানে।

চারি দিকে এবার ওরা তাকালো। চারি দিকেই আগুন। মানুষ ক্ষেপেছে। দলে দলে তারা বেরিয়েছে শোষণের উৎখাতে, ধ্বংস করতে যড়যন্ত্র। পোড়াতে সব কিছু বিদেশী শাসন-স্তম্ভ। নিশ্চিহ্ন করতে বিদেশী শাসন-চিহ্ন।

ইতিমধ্যে ওরাও তৈরী হ'য়ে নিলো। রণজিৎদা' হ্যুতি-পেলবের দলও বেরিয়ে পড়লো। দল পুরু হওয়া চাই, ঠিক পথে চালনা করা চাই, সাহসের সাথে এগিয়ে যাওয়া চাই।

দল গ্রামের পথেই এগিয়ে গেল। যে সব গ্রামে নেই কোনো হৈ-চৈ—সেইখানেই গেল ওরা। সারা গ্রাম যেন ঘুমিয়ে আছে। কয়েক দিন আগে যারা মিটি্ করতে এসেছিলো, দারোগা এক ফুঁয়ে সে বাতিগুলো নিবিয়ে দিয়েছে। নিবিয়ে দিয়েছে সারা গ্রামকে অন্ধকারে রাখবার জন্য। পৃথিবীর সাথে তার যোগাযোগ বন্ধ করার জন্য।

ওঃ, এই অন্ধকারে মানুষ রয়েছে?—হ্যুতির বিস্ময় প্রকাশ পেলো।

এর চেয়েও আরও অন্ধকার রয়েছে যেখানে হাজার হাজার মানুষ থাকছে তা'র আলো দেখানোর কাজ আমাদের এইখান থেকেই সুরু করতে হবে নিশ্চয়ই।

রাত্রির মধ্যে সারা গ্রাম ওরা জাগালো। একেবারে ঘুমন্ত মানুষগুলো জেগে উঠলো হঠাৎ। এত অন্ধকারের মাঝে এত আলো! চোখ ঝলসে উঠলো তাদের। প্রতিহিংসা চাড়া দিয়ে উঠলো চোখে আর মুখে। হাতের পেশীগুলো কঠিন হ'য়ে শক্ত মুঠি তৈরী করলো। তার পর এক রাত্রে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো থাঁড়ীর বুকে। ফেটে পড়লো বারুদের মতো।

গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম—বন্দুক গর্জ্জে উঠলো পুলিশের।

ভয় পেও না, ভাই সব। এগিয়ে চলো।

পিল-পিল করে জনস্রোত এগিয়ে চলেছে। মানবে না—দমবে না তারা গুলীর ভয়ে। বন্যাস্রোতের মত মানুষ এগিয়েছে। গুলীর মুখে শুয়ে-পড়া মানুষকে পেরিয়েই চলেছে মিছিল।

উঃ, খোদা, এদের যেন ফিরে যেতে না হয়!

ভগবান, পারলাম না, এই গুলী ওদের বুকে ফিরিয়ে দাও, দুসমণকে মারো—

মিছিলের মুখে শুয়ে পড়লো শহীদের দল।

গুড়ুম—গুড়ুম—গুড়ুম—প্রত্যুত্তর দিলে এরাও। রণজিতের পাশে পেলব আর তার পাশে গোটা দল।

ধরা পড়েছে দলকে দল। রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী। নরহত্যা, গৃহদাহও এর সঙ্গে যুক্ত। কোর্ট রায় দিলো দ্বীপান্তর আর রণজিতের ফাঁসী।

ফাঁসীর দিনে আসামী কিছু বলবে তার দেশের লোককে—এই বাসনা জানালো। বলবে সে ফাঁসীকাঠেতে ওঠবার একটু আগে।

ফাঁসী দেখতে লোক জমেছে অনেক। লোকে লোকারণ্য। ঘড়ি দেখে দশ মিনিট আগে আসামীকে বলতে দেওয়া হোলো। লোক একেবারে ঝুঁকে পড়েছে—অধীর হ'য়ে উঠেছে। শুধু দু'টো কথা বলবে আসামী। সে এই তার শেষ প্রার্থনা জানিয়েছে।

"ভাই সব, তোমরা মুষড়ে পোড়ো না। ওরা শুধু আমাকেই আজ ফাঁসীতে ঝোলাবে না, আমার মত তোমাদের অনেক ভাইকে ঝুলিয়েছে। বিদেশ থেকে তোমাদের দেশে এসে তোমাদেরই ভাই-ছেলেকে তোমাদের সামনে বিনা দোষে ফাঁসী দিচ্ছে। তোমরা আর এ অত্যাচার সহ্য কোরো না। যে আগুন আমার আগের ভাইরা এবং আমি জ্বালিয়ে দিয়ে গেলাম, সে আগুন যেন না নেবে, সেই আগুনে যেন তোমাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হয়।"

ফাঁসীর কাঠ থেকে লাশ নামিয়ে তার বুড়ো আঙুলের শির কেটে দেওয়া হোলো। ভয় ওদের, যদি আবার রণজিৎ বেঁচে ওঠে!

রণজিৎ হয়ত কোন দিনই বাঁচবে না। কিন্তু পুরানো বট গাছের পেছনের অন্ধকার আর স্যাঁতসেঁতে হানা-বাড়ীতে রণজিতের বুড়ী ঠাকুরমা তখনও বেঁচে—বুড়ী একমনে বসে তখনও মারণাস্ত্র তৈরী করে চলেছে—

স্বপ্ন-স্মৃতি

শ্রীসাধনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আজি ধন্য আমার হৃদয়-কমল তোমার পরশ পেয়ে;
ফোটাও বারেক কুন্দ-যুথিকা শুভ্র আলোক দিয়ে।
মনে পড়ে বটে বহু পুরাতন প্রীতিমাখা ক'টি কথা;
অন্তর মম হয় বিকশিত জুড়াইয়া যায় ব্যথা।
সংসার শুধু অলীক স্বপন তারি মাঝে ফোটে ছবি;
এ হৃদয় তার সত্য মনে হয় আশার আলোক লভি।

নর-দেবতার কল্যাণ-বাণী স্বপনে বরিনু তারে;
মিছে সে ত নয় যাহা মনে হয় সত্য এ চরাচরে।
নিত্য-নূতন অভাবের মাঝে যাহা কিছু মোর হয়;
সে ত শুধু তব হৃদয়ের দান আমারে করিতে জয়।
যতটকু মোর ছিল ভালবাসা ক্ষুদ্র এ হিয়ামাঝে;
রিক্ত হৃদয় পূরণ করিতে তোমার আসন বুঝে।

গেঁথেছিনু তারি অমিয় মাল্য আমার গোপন গান;
যতনে রেখেছি সে মালা আমার (আজি) তোমারে করিব দান।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

পঞ্চানন ঘোষাল

রামবাগানের মাঠ। জায়গাটাকে লোকে রূপগাছিও বলে থাকে। কেহ কেহ বলে থাকেন, রূপগাজী বলে কোনও লোকের নাম অনুসারেই রূপগাছির নামকরণ হয়েছে। রূপগাজী এবং এবং সোনা-গাজী নামকরণের অন্ত কারণও থাকতে পারে। মানুষের কষ্টার্জ্জিত সোনারুপার এখানে সমাধি ঘটে বলেই হয়তো সোনাগাছি ও রূপাগাছির সৃষ্টি হয়েছে। শেষোক্ত মতবাদই হয়তো সত্য, কারণ চর্ম্মচক্ষু দ্বারা এইটেই আমরা প্রতিদিন দেখে থাকি। এই বিখ্যাত মাঠটির চতুর্দ্দিক ঘিরে আছে সারি সারি দ্বিতল ও ত্রিতল অট্টালিকা। চারি দিকেই দেখা যায় টানা টানা টেলিফোনের তার। প্রতি রাত্রেই এইখানে রূপের পসরা বসে। সমাজ-পরিত্যক্তা নারীরা এসে এখানে এক নূতন সমাজ গড়েছে। এই বিশেষ সমাজের নাম বেশ্যা-সমাজ।

এই দিন ছিল জামাই-ষষ্ঠীর দিন, বেশ্যাপল্লীতে ইহা এক মহোৎসবের দিন। তাই দুয়ারে দুয়ারে খোঁপায় ফুল গুঁজে গলায় ফুলের মালা পরে বেশ্যা-নারীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। উপপতিদের কল্যাণের জন্ত এই দিন তারা সিঁদুরও পরে থাকে।

মাঠের শেষের বাড়ীটার দ্বিতলের এক কক্ষে বসে বরুণা চোখের জল ফেলতে ফেলতে সিঁদুর পরছিল, কিন্তু তা সে পরছিল, আপন স্বামীরই কল্যাণের জন্তে।

পুরু গদির উপর তাকিয়া-পরিবৃত হয়ে বরুণা দেওয়ালে আঁটা প্রকাণ্ড আরসীটার দিকে চেয়ে তার অদৃষ্টের কথা ভাবছিল। বিগত দিনের প্রতিটি কাহিনী চোখের উপর ফুটে উঠে তাকে মৃত্যু-যন্ত্রণাই দিচ্ছিলো। সে কত দিনের কথা, ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে এসেছে। ফিরে যাবার কোনও পথ বা সুযোগই সে আর পায়নি। আত্ম-রক্ষার জন্তে সে অনেক চেষ্টা করেছে,—কিন্তু পারেনি। নিরাশ্রয় হবার ভয়ে বাধ্য হয়ে সে লক্ষ্মীনারায়ণকেই মেনে নিয়েছিল আশ্রয়স্থল-রূপে। কিন্তু সে-ও বেশী দিনের জন্ত নয়। লক্ষ্মীনারায়ণ ছিল এক জন ব্যবসাদার। একটি নারীকে নিয়ে পড়ে থাকবার পাত্রই সে নয়। অচিরেই অপর এক জনের কাছে কিছু অর্থের বিনিময়ে তাকে গছিয়ে দিয়ে সে সরে পড়েছে।

কিছু দিনের জন্য সে এক জন ধনীর আশ্রয়ও পেয়েছিল, কিন্তু তাও সে পেয়েছিল অল্প দিনেরই জন্য। যাকে আশ্রয় ক'রে সে একনিষ্ঠ হতে চেয়েছে, সেই তাকে ঠকিয়ে চলে গেছে। প্রথম প্রথম বাড়ীওয়ালীর পেটেই তার উপার্জ্জিত অর্থ যেতো, কিন্তু এখন সে চালাক হয়েছে, লোক চিনতেও শিখেছে।

বিক্ষুব্ধ চিত্তে চুপ করে বরুণা বসেছিল, হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো আয়নার উপর মানুষের ছায়া। তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে চোখ মুছে সে দেখতে পেলো রূপজীবিনীদের দালাল মাখন বিশ্বাস দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমতা-আমতা করে মাখন বিশ্বাস জিজ্ঞাসা করলো,—"বিবি সাহেব, নিবন্ধপুরের জমীদারের ছেলে এসেছে, আপনার কাছে আসতে চায়। নিয়ে আসবো? অনেক টাকার মালিক ওঁরা, এক রাত্রেই দু'শো টাকা খরচা করবে বলছে।"

প্রতি মাসেই দুইটি দিন বরুণা শুদ্ধ ভাবে জীবন যাপন করে। এই দুই দিনের একটি দিন জামাই-ষষ্ঠীর দিন, অপর দিনটি হচ্চে তাদের বিবাহের দিন। এই শুভ দিন দুইটি সম্বন্ধে দালালদের খুলেই বলা আছে।

বরুণাকে নিরুত্তর হয়ে বসে থাকতে দেখে মাখন বিশ্বাস জিজ্ঞাসা করলো, "তাহলে নিয়ে আসি তেনাকে?"

উত্তরে ঘাড় নেড়ে বরুণা জানালো, "না।"

ক্ষুণ্ণ মনে দালাল মাখন বিশ্বাস নীচে নেমে যাবার একটু পরেই বরুণা লক্ষ্য করলো—আয়নার উপর দেখা যাচ্ছে আরও একটা কালো ছায়া। মূর্ত্তিটি আয়নার মুখে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে আয়নার মুখে ফুটে উঠলো বহু দিনের অদেখা এক পরিচিত মুখ। ঠিক মৃতের মুখের মতই সেই মুখ তার সমস্ত হৃদয়কে যেন আলোড়িত করে দিলে। চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে বরুণা দেখতে পেল, তার আরাধ্য দেবতা তারই দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে। জন্ম-জন্মান্তরের পরিচিত সেই মুখ দৃষ্টিগোচর হবা মাত্র বরুণা লজ্জায় ক্ষোভে আড়ষ্ট হয়ে উঠলো, কতকটা ভয়ও সে তার হয়নি তা'ও নয়। স্বামী কি তা' হলে তার অন্তরের ডাক শুনতে পেয়েছেন, না, এ তাঁর প্রেতাত্মা? সত্য সত্যই লোকটাকে প্রেতাত্মার মতই প্রতীত হচ্ছিল। উস্ক-খুস্ক তার চুল, চোখ-মুখ বসে গেছে, জামাটা নূতন হলেও উহা শতছিন্ন। মুখ দিয়ে ভক্ ভক্-করে দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসে। উন্মত্ত মাতাল অবস্থায় সুধীর তার নিজের অজ্ঞাতে বরুণারই ঘরে ঢুকে পড়েছিল।

টলতে টলতে বরুণাসুন্দরীর ঘরে ঢুকে সুধীর বলে উঠলো, "বাঃ বেড়ে চেহারাটা তোর, একেবারে নিখুঁত; সত্যি বলছি, একটা রাত্রি মাইরী, যত টাকা লাগে তাই দেবো।"

বরুণা ক্ষণেকের জন্ত আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলো। অস্ফুট স্বরে তাকে

মুখ দিয়ে বার হয়ে এলো—'ও মা গো!' তার পর সে ছুটে এসে সুধীরের পায়ের উপর আছড়ে পড়ে বললো, "ওগো, তুমি এতো দূর অধঃপাতে গিয়েছো? তুমি তো কখোনো এমন ছিলে না? ও মা!—"

এইরূপ বেখাপ্পা পীরিতের জন্য সুধীর একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। উন্মত্ত অবস্থায় সে বরুণাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো, "একটু দয়া কর মাইরী, আমাকে একেবারে মেরে ফেলিস্‌নি। এই রাতটুকু ঐ রাঙা চরণেই পড়ে থাকতে দে ভাই! আমি—আমি চিরকাল তোর কেনাই হয়ে থাকবো, সত্যি বলছি, বি-শ্বা-স কর।"

বহু দিন পরে বরুণা স্বামীর স্পর্শ অনুভব করলো। তার শরীর যেন হিম হয়ে আসছে। তার প্রতি রাত্রের সুখস্বপ্ন এমন করে বাস্তব রূপ ধরতে পারে তা জাগ্রত অবস্থায় সে কখনও কল্পনাও করেনি। ধীরে ধীরে তার চক্ষু মুদ্রিত হয়ে এলো, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যে, পরক্ষণেই কিসের এক অমঙ্গল আশঙ্কায় বরুণা শঙ্কিত হয়ে শিউরে উঠলো। তাড়াতাড়ি জোর করে সুধীরের আলিঙ্গন-পাশ থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে বরুণা বলে উঠলো, "না না, এ কখনোও হ'তে পারে না। পাপের উপর পাপ আর আমি কিছুতেই বাড়াতে পারবো না। বরং নাও এই দশটা টাকা, পাশের ঘরে গিয়ে রাত কাটাও গে।"

মাত্র এই কয়টি কথায় বরুণা প্রমাণ করে দিলে, নারী সকল সময়ই নারী, তার যা ভালো, তা সে কোনও অবস্থাতেই হারায় না।

কিন্তু উন্মত্ত সুধীর কিছুতেই বরুণার ঘর হতে বার হয়ে আসতে চায় না। ঠিক এই সময় সেখানে এসে হাজির হলো বড়বাজারের ধনী ব্যবসায়ী মদনলাল সোরায়া। ভদ্রলোক গত এক সপ্তাহ হলো বরুণাকে একান্ত ভাবে বাঁধা রেখেছিল এই কড়ারে যে, সে আর কাউকেই ঘরে স্থান দেবে না। কিন্তু এই শুভ দিনটিতে বরুণা তাকে আসতে বারণ ক'রে দেওয়ায় তাঁর সন্দেহ জাগে। এই জন্য তিনি চুপি-চুপি দেখতে এসেছেন, বরুণার এই শুভ দিন পালনের প্রকৃত অর্থ কি! বরুণাকে অপর এক ব্যক্তির কণ্ঠলগ্না হয়ে ব্রত পালন করতে দেখে ভদ্রলোক ক্ষেপে উঠলেন। ঠাঁই করে সুধীরের নাকের উপর একটা ঘুসী লাগিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "তবে রে শালা, আমার মেয়েমানুষকে নিয়ে ফুর্ত্তি!"

সুধীর তখনও মাতাল, টলতে টলতে ঝপাৎ করে সে আয়নার উপর ঠিকরে পড়লো। আয়নার কাচগুলোও ঝন-ঝন করে ভেঙে পড়লো। কাচের একটা টুকরোয় সুধীরের কপালের অনেকটাই কেটে গেছে। এতো সত্ত্বেও সুধীর টলতে টলতে বলে উঠলো, "কে বললে, ও তোমার মেয়েমানুষ? ও আমার অনেক দিনের মেয়েমানুষ, ও আমার বৌ।"

শেষ কথাটা সুধীর অজ্ঞাতসারে মদের ঝোঁকেই বলেছে, কিন্তু তা হলে কি হয়, উহা বরুণার বুকের মধ্যে তীরের মতন এসে বিঁধে গেলো। "ও মা গো,"—বলে বরুণা সুধীরের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কাটা কপালটা দুই হাতে টিপে ধরলো। এতক্ষণে ভদ্রলোকের ক্রোধ সীমার বাইরে চলে এসেছে। ভদ্রলোক বহু অর্থ ব্যয় করে বরুণার ঘরের দামী আসবাব-পত্রগুলি কিনে দিয়েছিলেন। দ্রব্যগুলির দিকে আড় চোখে চেয়ে দেখে তিনি ক্ষেপে উঠলেন। ঘরের কোণ হতে একটা লোহার ডাণ্ডা তুলে নিয়ে বরুণার মাথার উপর সেটা উঁচিয়ে ধরে ভদ্রলোক বললেন, "তবে রে শালী, বেইমানী করবার আর জায়গা পাওনি?"

বরুণা ও সুধীরের মাথা দু'টো হয়তো ভদ্রলোক রাগের মাথায় সে-দিন একসঙ্গে গুঁড়ো করে দিতেন, কিন্তু তা আর তিনি পেরে উঠলেন না। কারণ, তাঁর পরমায়ু বোধ হয় সেই দিন শেষ হয়ে এসেছে। হঠাৎ গুড়ুম ক'রে একটা আওয়াজ হলো এবং সেই সঙ্গে বাইরে থেকে একটা জলন্ত শীসের টুকরা বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে এসে ভদ্রলোকের বুকটা ফুটো করে দেওয়ালে এসে লাগলো, আওয়াজ হলো,—"ঠং।" ভদ্রলোক বাত্যাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় রক্তাপ্লুত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। গুলীর আওয়াজ শুনে ভড়কে গিয়ে পানোন্মত্ত সুধীর টলতে টলতে পিছিয়ে এসে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো, ঠিক সেই সময় দুয়ারের পাশ হতে দুইটি বজ্র কঠিন হস্ত তাকে ধরে ফেললে, এবং তার পর এক টানে তাকে বাইরে এনে, লোকটা সুধীরকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এটি এমনই এক অভাবনীয় ঘটনা যে বরুণা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে বরুণাও তার কর্ত্তব্য ঠিক করে নিলো। বরুণা আর পূর্ব্বেকার বরুণা নেই, এখন সে আত্মরক্ষা করতেও পারে। এমনি বহু বিপদের সম্মুখীন পূর্ব্বেও সে হয়েছে। সে তাড়াতাড়ি লাসটা একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়ে তারই অধিকৃত পাশের অপর আর একটা ঘরে চলে এলো। বহু ক্ষণ ধরে সে চুপ করে বসে রইলো। সৌভাগ্যক্রমে পটকার আওয়াজ মনে করে সেই দিকে কেউ ছুটে আসেনি। বরুণা ভাবছিল ঘর ছেড়ে সে পালিয়ে যাবে কি-না, ঠিক এই সময় তার দুয়ারে এসে কারা যেন আঘাত দিলো।

ভীত-ত্রস্তা ভাবে ক্ষীণ কণ্ঠে বরুণা জিজ্ঞাসা করলো, "কে?—কে ডাকে?"

বাইরে থেকে এক জন বললো, "ভিতরে আসতে পারি?"

উত্তরে বরুণা বললো, "আসু-উ-ন।"

হুকুম পাওয়া মাত্র একসঙ্গে প্রায় জন চার-পাঁচ অল্পবয়স্ক যুবক ঘরে এসে দাঁড়ালো। যুবক কয় জনই ছিল কলিকাতার কোনও এক কলেজের ছাত্র। একই হোষ্টেলে থেকে তারা পড়া-শুনা করে। এই দিন দল বেঁধে তারা একটু আলগোছা প্রেম করতে বেরিয়েছে। ছেলে কয়টি ছিল একেবারেই নাভাস্, এ-পাড়ার কোনও অভিজ্ঞ তাই তাদের নেই।

বরুণা এই ব্যাপারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে স্মিত হাস্যে যুবক কয় জনকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললো, "বসু-উন।"

বরুণাকে দেখে যুবক কয়টির খুবই পছন্দ হয়েছিল। এতো রূপ ও লালিত্য এবং সেই সঙ্গে এমনি সুধামাখা কথা যে এই পল্লীতে এসে দেখবে ও শুনবে, এ তাদের ধারণার বাইরে ছিল।

খুশী মনে তারা বলে উঠলো, "আপনিও বসুন। বসবেন না আপনি?"

চোখের কোলে বিদ্যুৎ হেনে বরুণা বললো, "বসবো বই কি, নিশ্চয়ই বসবো। আপনারা আগে বসু-উন।"

উৎফুল্ল হয়ে যুবকরা আসন পরিগ্রহণ করলে, বরুণা বললো, "দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন, আমি চাকরটাকে পাণ আনতে

বলে আসি, সিগারেটও আনাবো তো, খান তো আপনারা ? নিশ্চয়ই খান, কেমন ?" এর পর ত্বরিত গতিতে বেরিয়ে এসে ফ্ল্যাটের প্রধান দরজাটায় বার হ'তে শিকল তুলে দিয়ে যুবক কয়টিকে বন্দী করে বরুণা তড়্‌তড় করে সিঁড়ি ব'য়ে নীচে নেমে গেল, থানায় গিয়ে এজাহার দিয়ে আসবার জন্যে।

একটা রিক্সা ভাড়া করবার জন্যে বরুণা রাস্তার মোড়ের দিকে এগিয়ে চলছিল। এমন সময় মাঝ-পথে তার সঙ্গে খোকার দেখা হয়ে গেল। খোকা বাবুর সঙ্গে ইতিপূর্ব্বেও তার বহু বার দেখা হয়েছে। সুরমা কীর্ত্তনীর এবং পরে মানদা বাড়ীওয়ালীর হেপাজত হতে খোকার সাহায্যেই সে উদ্ধার পায়, তা না হ'লে স্বাধীন ভাবে ব্যবসা চালাতে তার আরও অনেক দিন সময় লাগতো।

খোকাকে দেখে তার পায়ের উপর আছড়ে পড়ে বরুণাসুন্দরী জানালো, "সর্ব্বনাশ হয়েছে, খোকা দাদা, আমার এখানে আপন বলতে আর কেউ নেই, খোকাদা', আপনি না বাঁচালে পুলিশ এসে এক্ষুনি আমাকে ই হাতে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে।"

খোকা বাবু মৃদু হাস্য-সহকারে বরুণার কাছে ঘটনাটা সংক্ষেপে শুনে নিলো, এমন ভাব দেখাল, ঘটনা সম্বন্ধে যেন সে কিছুমাত্রই ওয়াকিবহাল নয়। স্মিত হাস্যে স্নেহের সঙ্গে খোকা বাবু বললেন, "ভয় নেই রে, ভয় নেই। তুই যখন আমাকে দাদাই বলেছিস্, তখন পৃথিবীতে এমন কেউই নেই যে কি না তোর এই দাদাটি বেঁচে থাকতে তোর কোনওরূপ ক্ষতি করতে পারে। তবে একলা তুই থানায় যাস্‌নি, সঙ্গে এক জনকে দিয়ে দিচ্ছি, যা কিছু সেই বলবে এখোন।"

খোকার সঙ্গে তখন তার এক নূতন সাকরেদ কালীচরণ ছাড়া আর কেউই ছিল না। তার এই নূতন সাকরেদটিকে তালিম দিয়ে পাকা-পোক্ত করবার জন্যে এ কয় দিন খোকা তাকে সাথে-সাথেই রাখছিল। খোকা কালীচরণকে উদ্দেশ ক'রে বললো, "এই কালী, তুই যা এর সঙ্গে থানায়। ভালো করে গুছিয়ে এজাহার দিবি। এর মধ্যেই এ ধারের সব কিছু আমি ঠিক করে ফেলবো এখন।"

কালীচরণ ও বরুণাকে একটা রিক্সায় তুলে দিয়ে খোকা বরুণাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকের সরু মেথর-গলিটায় এসে দাঁড়ালো। তার পর দেওয়ালের খড়া বয়ে উপরে উঠে বরুণার ঘরের ফ্যান লাইটের কাচ ভেঙে বরুণায় শোবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। এই ঘরটাতেই মৃতদেহটা রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়েছিল। খোকা মৃতদেহের হাত হ'তে হীরার আঙটি ও সোনার ঘড়ীটা তো খুলে নিলই, তা ছাড়া মৃতদেহের সার্ট হতে সোনার বোতাম এবং কোটের পকেট হতে নোটের বাণ্ডিলটাও বার করে নিতে ভুললো না। মূল্যবান দ্রব্য-গুলি বিনা বাধায় অপহরণ করে খোকা বাবু অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন— "তাই তো হে, কি হতে কি-ই হয়ে গেলো দেখো। সবই লোকটার কপাল, পরমায়ু ওর নেই, তা আমি কি করবো ? খুন কি আর আমার ওকে করবার ইচ্ছে ছিল ? যাক্ গে—"

আপন মনে বিড়-বিড় করে কথাগুলো নিজেই নিজেকে শুনিয়ে দিয়ে খোকা তার মনটাকে একটু হাল্কা করে নিয়ে পাশের বারান্দাটাতে এসে দাঁড়ালো। এই বারান্দাটা থেকে বরুণার বসবার অপর ঘরটা স্পষ্ট দেখা যায়। দূর হ'তে খোকা দেখলো, যুবক কয় জন তখনও সেখানে নিশ্চিন্ত মনে বসে গল্প করছে।

"আসি" বলে বরুণা অনেকক্ষণ চলে গেছে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সে আসছে না দেখে যুবক কয় জন বেশ একটু অস্থির হয়ে উঠছিল। যুবকদের মধ্যে এক জন বলে উ'ঠলো, "বেড়ে দেখতে কিন্তু, মাইরী, ভদ্রও বেশ। পাঁকের মধ্যে পদ্মফুলও ফোটে ?"

অপর এক জন উত্তর করলো, "কিন্তু, গেলো কোথায় ? যা কিছুই চক-চক করে তাই কি আর সোনা ? আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে, আয়, সরে পড়ি, মাইরী ; জেয়গাটা শুনেছি ভালো নয়।"

"হয় তো সে ওদিক্‌কার ঘরটাতে আছে, আয় না, দেখেই আসি, আসলে বেশ্যা ছাড়া তো ও আর কিছুই না। হোক না ওটা ওর শোবার ঘর, তাতেই বা কি ? বোস্ তোরা এখানে, আমি দেখে আসি। সতী লক্ষ্মী তো আর কেউ ও-ঘরে নেই। পয়সা যখন দিতেই হবে ওকে, তখন আর ভয় কি, চাঁদ ! আর, বলে আসি, বেশভূষার আর দরকার নেই, পান সিগারেটও নয়।"

সাথী বন্ধুদের কথা কয়টি বলে যুবকদের মধ্যে এক জন সাহসী যুবক মরিয়া হয়ে পাশের ঘরটায় ঢুকে পড়ে মৃতদেহটারই নিকট এসে দাঁড়ালো। ঘরের চতুর্দ্দিকে একবার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে মেঝের দিকে তাকাতেই যুবকটির নজরে পড়লো চাপ-চাপ রক্ত ! মৃতদেহটি থেকে তখনও পর্য্যন্ত রক্ত বার হচ্ছিলো। আঁৎকে উঠে ত্বরিত-গতিতে পূর্ব্ব-স্থানে ফিরে এসে যুবকটি বিষয়টি বন্ধুদের গোচরীভূত করা মাত্র সকলেই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাইরের দরজায় এসে দেখলো, দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মসী সম পাংশু মুখ নিয়ে কিছুক্ষণ এ-ঘর ও-ঘর করে তারা বুঝলো যে, তাদের সাধের পদ্মফুলটি পালাবার মত একটি পথও তাদের জন্যে মুক্ত রেখে যাননি।

এইবার তাদের নিদারুণ একটা ভবিষ্যতের সম্মুখীন হতে হবে, বিনা দোষে বুঝি বা তাদের ফাঁসীকাষ্ঠেই ঝুলতে হয়। ভরে ভাবনায় আতঙ্কে চোখগুলো তাদের ঠিকরে বার হয়ে আসছিল, হাত-পা তাদের হিম-শীতল হয়ে যাচ্ছে ; এমন সময় হঠাৎ খোকা বাবু তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে অভয় জানিয়ে বললে, "বিপদে ধৈর্য্যহারা হতে নেই, বুঝলে ? চলে এসো সব আমার সঙ্গে। আমি এই পাড়ারই লোক, তোমাদের উদ্ধার করতে এসেছি।"

খোকা বাবুর এই আকস্মিক উপস্থিতিও যুবকদের কম ভীত করেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকেই একমাত্র ত্রাণকর্ত্তারূপে মেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি তারা জুতো পরে নিচ্ছিলো। খোকা বাবু এতে বাধা দিয়ে বলে উঠলো, "উহু, জুতো পরলে আর পালানো হবে না। পাঁচ জোড়া জুতো অমনি ভাবেই গদির কাছে ফেলে রাখতে হবে। শুধু পায়েই চলে এসো, সব।"

অপরাধীদের অপকর্ম্মের সুচতুর মতলবগুলি সকল সময়ই পূর্ব্ব-কল্পিত থাকে না। তাদের কেহ কেহ অকুস্থলেই তাদের কর্ত্তব্য স্থির করে নিতে পারে।

খোকা বাবু নিমেষের মধ্যে বরুণার ঘর হ'তে চার-পাঁচটা সাড়ী জোগাড় করে, একের সঙ্গে অপরের মুখগুলো একে একে বেঁধে নিয়ে একটা লম্বা দড়ি তৈরী করে নিলো। তার পর সেই কাপড়ের তৈরী দড়িটার একটা মুখ বরুণার ফ্ল্যাটের পিছনকার বারান্দার রেলিঙে বেঁধে দিয়ে দড়ির অপর দিকটা সে নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিলে।

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সমাধা করে খোকা বাবু বললে, "এইবার

চলে এসো সব খোকারা! আমি প্রথমেই নামছি, তোমরা এক-এক ক'রে দড়ি ধরে আমার কাঁধে পা রেখে নেমে পড়বে ঠিক লক্ষ্মী ছেলেদের মতো, বুঝলে!"

খোকার এই সদুপদেশ মান্য করা ছাড়া যুবকদের আর অন্য কোনও উপায়ও ছিল না। অতি কষ্টে খোকার সাহায্যে, কেউ খোকার কাঁধে চড়ে, কেউ বা এই দড়ির মই ধরে একে একে নীচের মেথর-গলিটার উপর অতি সন্তর্পণে নেমে এলো।

এই ভাবে তারা যে উদ্ধার পাবে, তা এই যুবকদের কেউ কল্পনাও করেনি। কৃতজ্ঞতার সহিত এদের এক জন বলে উঠলো, "আঃ বাঁচালেন, মশাই, কিন্তু আপনি কে, তা তো জানালেন না?—বললেন না আপনি কে?"

এতক্ষণ পর্য্যন্ত খোকা বাবুর মতি-গতি ছিল ভালই। কিন্তু যুবকদের এই ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে দেখে তার মুখটা হঠাৎ বিকৃত হয়ে উঠলো। ক্ষেপে উঠে খোকা বাবু আস্তীনের তলা থেকে ধারালো ছুরীখানা বার করে বলে উঠলো, "জানতে চাও কে আমি? এ্যাঁ? আমি হচ্ছি এই যুগের এক ভারতীয় রবিনহুড। রবিনহুডের গল্প প'ড়েছো তো? এইবার চট্-পট্ বের করে দাও, তোমাদের যার পকেটে যা-কিছু আছে। দাও শীগ্‌গির।"

খোকাকে হঠাৎ এইরূপ হিংস্র প্রকৃতির হয়ে উঠতে দেখে যুবকের দল পুনরায় ভীত হয়ে উঠলো। বর্ত্তমানে তাদের রক্ষক হলেও খোকা বাবু যে এক জন ডাকাত তা আর তাদের বুঝতে বাকি থাকেনি। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সকলেই তাদের পকেটে যা-কিছু টাকা-কড়ি ছিল, তার সমুদয়ই তারা বার করে রবিনহুডের এই ভারতীয় সংস্করণটির হাতে তুলে দিতে একটু মাত্রও দ্বিধা করলো না।

নোটগুলো গুণে নিয়ে খোকা দেখলো, যুবকরা সর্ব্বশুদ্ধ তাকে দু'শ বিরানব্বই টাকা প্রদান করেছে। খোকা কি ভেবে তা থেকে বিরানব্বই টাকা নিজের কাছে রেখে বাকি দুই শত টাকা যুবকদের ফিরিয়ে দিয়ে হুকুম করলো, "যাও, এই পথ দিয়ে পালিয়ে যাও। আর কক্ষনো এখানে আসবে না। মন দিয়ে এবার থেকে পড়াশুনা করবে, বুঝলে? আর শোনো, মোড় থেকে একটা ট্যাক্সী করে নিও। আরও শোনো, ট্যাক্সীটা হোষ্টেল পর্য্যন্ত নিয়ে যেও না। হোষ্টেল থেকে অনেক দূরে ট্যাক্সীটাকে বিদায় দিয়ে হেঁটে যেও, অন্যথা করলে কিন্তু বিপদ ঘটবে, এ আমি বলে রাখছি। যাও, পালাও শীগ্‌গির, অঃ, ঐ। পুলিশও এসে গেছে।"

সভয়ে যুবকগণ লক্ষ্য করলো, বড় রাস্তার উপর দিয়ে পুলিশ-বোঝাই একটা লরী এই মেথর-গলিটার দিকেই ছুটে আসছে।

যুবকের দল ত্বরিত গতিতে খোকার নিদ্দেশ মত গলিটার উল্‌টা মুখ দিয়ে সরে পড়তে আর একটুও দেরী করলো না। খোকা বাবুও আর দেরী না করে এই যুবকদের পিছন পিছন অলক্ষ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

খোকা বাবুর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই জোড়াসাঁকো থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইয়ুসুফ সাহেব তাঁর সহকারী অফিসার কনক সেনকে নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হলেন। খবর পাওয়া মাত্র তিনি সদলবলে বরুণা ও কালীচরণকে নিয়ে লরী করে চলে এসেছেন।

বাড়ীটার নীচে হতে উপর পর্য্যন্ত প্রতিটি স্থান পরীক্ষা করে ইয়ুসুফ সাহেব কনক বাবুকে বললেন, "নাঃ, এ স্ত্রীলোকটি সত্য কথাই বলেছে। তাই হবে পাঁচ জোড়া জুতো থেকে বুঝা যায়, পাঁচ জন লোকই এসেছিল। এরা জুতো খুলে এই গদির উপর বসে। তার পর এক এক জন করে পাশের ঘরে যায় মেয়েটিকে উপভোগ করবার জন্যে। ইতিমধ্যে এর উপপতিও এসে পড়েন। এখানে এদের দেখে ভদ্রলোক ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে মারপিট বাধান। তার ফলে এই হত্যাকাণ্ড সমাধা হয়েছে। যাই হোক, লোকগুলো যে ঐ কাপড়ের দড়ির সাহায্যেই পালিয়েছে, তাতে আর কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু একটা কথা, ওরা পিস্তল পেলো কোথা থেকে? ডাকাত তো তারা বটেই, তবে দেখা দরকার, এর মধ্যে কোনও রাজনৈতিক ব্যাপার আছে কি না। মৃত ব্যক্তিটি কোনও পুলিশ অফিসারের ইনফরমার কি না, তাও জানা দরকার। সম্ভবতঃ এরা ট্যাক্সি করেই পালিয়েছে। নিকটের ট্যাক্সী ষ্ট্যাণ্ডে খোঁজ করা দরকার, কোনও ট্যাক্সী এদের কোনও জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে কি না।

সাব ইনস্পেক্টার কনক সেন এতক্ষণ মৃতদেহটি পরীক্ষা করছিলেন, মৃতদেহের বক্ষের ছিদ্রটি পরীক্ষা করতে করতে কনক বাবু বললেন, "এই দেখুন স্যার, সেই ৩২ বোরের গুলী, খোকা গুণ্ডাও তো এই বোরের গুলীই ব্যবহার করে থাকে। এ ছাড়া ভদ্রলোকের সার্টে বোতাম নেই, হাতেও এঁর ঘড়ীর ব্যাণ্ডের দাগ দেখা যায়, বোধ হয় ঘড়ীটাও অপহৃত হয়ে থাকবে। এ নিশ্চয়ই মাডার ফর গ্রাজ নয়, এটা মাডার ফর গেইন। আক্রোশজনিত খুন হ'লে এই সকল জিনিষ অপহৃত হবে কেন? আমার মতে এটা একটা নিরাক্রোশ খুন। ডাকাতির উদ্দেশ্যেই এই হত্যাকাণ্ড সমাধা হয়েছে। আমার মন বলছে, স্যার, এ খোকা গুণ্ডারই কায। আমায় মতে, স্যার, প্রণব বাবুকে একবার খবর দেওয়া ভালো। পাঁচ জোড়া জুতোর এক জোড়া নিশ্চয়ই খোকা গুণ্ডার। পুলিশের যাদুঘরে তো খোকার পায়ের ছাপ রক্ষিত আছে, পায়ের মাপও। আপনি দেখবেন, এক জোড়া জুতো খোকা গুণ্ডার বলেই প্রমাণিত হবে।"

"বল কি হে, এখানেও খোকা গুণ্ডা?" ভড়কে গিয়ে ইয়ুসুফ সাহেব বললেন, "না বাবা, আমি নূতন বিয়ে করেছি। এর মধ্যে আর আমি নেই।"

উত্তরে কনক বাবু বললেন, "যা বলেছেন স্যার, আমারও অবস্থা তাই-ই। তা ছাড়া অনেকগুলো লোক আমার উপায়ের উপর নির্ভর করে। আমিও স্যার বাপ-মা'র একটি মাত্র ছেলে। ও সব লোককে, স্যার, না ঘাঁটানোই ভালো।"

কিছুটা লোক-দেখানো তদন্তের পর—"খুনের কিনারা হয় নাই, তদন্ত শেষ হইল,অর্থাৎ কি না নো ক্লু, কিন্তু কেইস্ ট্রু"—এই কথাটি লিখে চিরাচরিত ভাবে তদন্তের ব্যাপারে পূর্ণচ্ছেদ দিবেন কি না, এই কথাটাই ইয়ুসুফ সাহেব ও কনক বাবু ভীত ও ত্রস্ত হয়ে ভাবছিলেন, এমন সময় হঠাৎ সেখানে প্রণব বাবু [illegible] উপস্থিত হলেন।

প্রণব বাবুর একগুঁয়েমি ভাব ও দুরূহ সাহস সম্বন্ধে তাঁরা ভালোরূপেই অবহিত ছিলেন। প্রণব বাবুকে ঘটনাস্থলে এতো শীঘ্র চলে আসতে দেখে উভয়েই বিব্রত বোধ করছিলেন। ভ্রূ কুঞ্চিত করে ইয়ুসুফ সাহেব বললেন, "অ-ঐ দেখো, বলতে না বলতেই এসে গেছেন। এখোন ঘুরে মর রাত-ভর খোকা গুণ্ডার পিছন পিছন। ওঁর আর কি, স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এখোন রাত-ভরই ঘুরে বেড়াবেন।"

"এই যে আমিও এসে গেছি, কতক্ষণ এসেছেন আপনারা?" এগিয়ে এসে প্রণব বাবু বললেন, "বড় সাহেবের অফিস হতে এইমাত্র ফোন্ পেলাম, তা পাওয়া মাত্রই চলে এসেছি।"

উত্তরে ইয়ুসুফ সাহেব বললেন, "আর ভাই, তুমি তো এখন কোলকাতার একমাত্র মার্ডার কেইস এক্সপার্ট, তাই তোমার জন্তে আমাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে।"

প্রণব বাবু উত্তর করলেন, "আমি? মার্ডার কেইস এক্সপার্ট? কি যে বলো? না ভাই, এক্সপার্ট আমি কোনও কালেই ছিলাম না, এখোনও নেই। ঠাট্টা করো কেন বল তো?"

উত্তরে ইয়ুসুফ সাহেব বললেন, "এ কি আর আমার নিজের কথা ভাই, এ হচ্ছে উপরওয়ালাদের কথা। তাঁরা যখন তা বলছেন তখন আমাদের তা স্বীকার করে নিতেই হবে।"

"বলুন গে তাঁরা, কিন্তু এ কথা আমি স্বীকার করি না। তবে,—" প্রণব বাবু বললেন, "কেইস ডিক্টেক্ট হওয়া বা না হওয়া দৈবর উপরই নির্ভর করে, কিছুটা খোঁজ-খবর নেওয়ার উপরও বটে। সম্ভাব্য স্থানগুলিতে খোঁজ-খবর করতে করতে একটা না একটা সূত্র পাওয়া যায়ই। আসুন তো এখোন, জায়গাটা ভালো করে দেখা যাক্।"

এই বার তিন জনে মিলে তদন্ত সুরু করে দিলেন। কিছুক্ষণ এধার-ওধার ঘোরা-ঘুরি করে প্রণব বাবু বলে উঠলেন, "কিন্তু খোকাই যদি এ কায করে থাকে তা'হলে তার মত লোককে কি বরুণার মতো এক জন মেয়ে-লোক আটকে রাখতে পেরেছে? উঁহু, কোথায় যেন একটা গোলমাল র'য়ে গেছে। বরুণা বোধ হয় সবটাই সত্য বলেনি, ওকেই এখোন পূর্ণোদ্যমে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন।"

বরুণা নিকটেই দাঁড়িয়েছিল। প্রণবের কথায় সে একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বরুণার মুখের ত্রস্ত ভাবটুকু লক্ষ্য করে প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "দেখো বাপু, ও-সব ছেঁদো কথায় আমি ভুলি না। অনেক কথাই তুমি গোপন করেছো, তোমার মত বদমায়েস মেয়ে-লোককে শায়েস্তা করতে আমরাও জানি, বুঝলে?"

প্রণব বাবু বরুনাকে না চিনলেও বরুণা তাঁকে ভালোরূপেই চিনেছিলো। সে আজ কত দিন হতে চললো, বরুণা তখনও তার স্বামীর ঘরে। সেই কালরাত্রির কথা তার স্পষ্ট মনে পড়ে। আহত স্বামীর শিয়রে বসে বরুণা শুশ্রূষা করছে, এমন সময় প্রণব বাবু তদন্তে এলেন, সেই দিন এই প্রণব বাবুই তার সঙ্গে কতো সম্মান সহকারেই না কথা বলেছেন। কিন্তু আজ প্রণব বাবু তো দূরের কথা, সামান্ত সিপাই-শান্ত্রী পর্য্যন্তও তাকে কটুক্তি করতে সাহসী হয়! আজ সে কোথায় নেমে এসেছে। প্রণব বাবুর ধমক খেয়ে বরুণা কেঁদে ফেললো।

বরুণাকে কাঁদতে দেখে প্রণব বাবু বললেন, "কান্না তোমার রাখো, এখোন আমি তোমার হাসিতেও ভুলবো না, কান্নাতেও না। আমি সত্যি কথা চাই, বুঝলে?"

হঠাৎ প্রণব বাবুর লক্ষ্য পড়লো, বসবার ঘরের গদিটার উপর। গদির উপর একটা বই রাখা ছিল। প্রণব বাবু বইখানি তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে দেখলেন, উহা আশু চট্টোপাধ্যায়ের, প্রেমের কবিতার বই। বইখানির প্রথম পাতায় লেখা রয়েছে—'শ্রীনীতেন বসু, প্রথম শ্রেণী, সিটি কলেজ।'

উৎফুল্ল হয়ে প্রণব বাবু ইয়ুসুফ সাহেবকে উদ্দেশ করে বললেন, "এই নিন ইয়ুসুফ সাহেব, আপনার কেইস ডিক্টেক্ট হয়ে গেছে। কাল সিটী কলেজে গিয়ে তদন্ত করলেই আসামীর খবর বেরিয়ে পড়বে। ট্যাক্সীওয়ালা আর এ-পাড়ার দালালরা যদি তাদের সনাক্ত করতে পারে, তা হলে তো আর কোন কথাই নেই, তবে খোকা গুণ্ডার খোঁজও একটু নেওয়া দরকার। এই মাত্র খবর পেয়েছি, সোনাগাছিতে কোথায় ওর মেয়েমানুষ আছে। আমি তাহ'লে আসি ইয়ুসুফ ভাই। তোমরা ততক্ষণে একে-একে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করে দাও।"

"কি কপাল রে বাবা!" ইয়ুসুফ সাহেব বললেন "আসা মাত্রই কেইস্ ডিক্টেক্টেড। একেই বলে কি না ভাগ্য, মাইরী!"

প্রণব বাবু আর অধিক দেরী না করে, সদলবলে তাঁর গাড়ীতে উঠে বসলেন, গাড়ী যখন সোনাগাছির চৌমাথায় এসে পৌছলো, রাত্রি তখন দু'টা বেজে গেছে।

শীতের রাত্রি, কন্‌কনে হাওয়া ব'য়েই চলেছে। মোটা পুরু কালো বনাতের ওভারকোট ও ফেল্ট হ্যাটের সাহায্যে আপাদমস্তক ঢেকে নিয়ে প্রণব বাবু তার সঙ্গীদের বললেন, "তোমরা লরীটা নিয়ে কিছু দূরে গিয়ে অপেক্ষা করো। আর মোতাহের, তুমি তোমার কম্বলটা ঐ চাতালটার উপর বিছিয়ে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়বে, বুঝলে? আমি এইখানটায় দাঁড়িয়ে রইলাম, ইনফরমারটা এখানেই দেখা করবে বলেছে।"

গ্যাস-পোষ্টের নীচে তাঁর সমুচ্চ দেহটাকে খাড়া করে দিয়ে প্রণব বাবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্তই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর ছয় ফুট লম্বা দেহটা অনেক দূর হ'তেই দেখা যাবার কথা, এই জন্য তিনি গ্যাস-পোষ্টটিকে আড়াল করেই দাঁড়িয়েছিলেন। একমাত্র হাত দুইটি ছাড়া তাঁর দেহের সকল অংশই ঢাকা আছে। হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন, তাঁর দেহের এই অনাবৃত অংশের উপর ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। কি সর্ব্বনাশ! শীতকালেও বৃষ্টি? তিনি তাড়াতাড়ি হাত দু'টো সরিয়ে নিয়ে উপর দিকে তাকালেন, কিন্তু তাঁর মুখের উপর এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়লো না। তবে কি কোনও বাড়ীর ছাদ থেকে জল ফেলছে না কি? কৈ, না তো। প্রণব বাবু পিছন ফিরে যা দেখলেন, তাতে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এক জন পানোন্মত্ত মাতাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর ওভারকোটের সারা পিছনটার উপরই মূত্রত্যাগ করে চলেছে। প্রণব বাবু ক্ষেপে উঠে চেঁচিয়ে উঠলেন, "তবে রে বেল্লিক, মাতাল কোথাকার। মেরে বেটার ঘাড় ভেঙ্গে দিতে হয়। এই মোতাহার, পাকড়ো, পাকড়ো ইসকো।"

এই মাতালটি ছিল আর কেউ-ই নয়। সে ছিল আমাদেরই পূর্ব্ব-পরিচিত ভবলচি প্রতুল—ওরফে পাগলা। চমকে উঠে প্রতুল বলে উঠলো, "কে বাবা তুমি, মানুষ? আমি মনে করেছি গ্যাস-পোষ্ট!"

অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে প্রণব বাবু বললেন, "চোপরাও, উল্লুক কাঁহাকো। মাতলামীর আর জায়গা পাওনি, না?"

উত্তরে প্রতুল ওরফে পাগলা বলে উঠলো, "এখানে মাতলামী করবো না তো কি কালীবাড়ীতে গিয়ে মাতলামী করবো বাবা?"

ইতিমধ্যে সিপাই মোতাহার সেখ উঠে এসে প্রণব বাবুর হুকুম

মত পাগলাকে ধরে ফেলেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পাগলার কোনও হুঁস নেই, নূতন মদ খেতে শিখলে মানুষ এমনিই হয়ে থাকে।

ধমকে উঠে প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "থাকিস্ কোথা তুই? বাড়ী-ঘর-দোর আছে, না নেই?"

ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠে পাগলা বললে, "উজ্জীকে চেনো, বাবা, উজ্জ্বলা? তাকে জানো? সে হচ্ছে আমার উজ্জ্বলা। সত্যি বলছি, আমার। কি বলছো, খোকার? কখনো সে খোকার নয়।"

মাতালটার মুখে উজ্জ্বলার নাম শুনে প্রণব বাবু চমকে উঠলেন। তিনি শুনেছিলেন, উজ্জ্বলা নাম্নী এক বারবনিতার গৃহে খোকা প্রায়ই এসে থাকে, কিন্তু তার বাড়ীটা যে কোথায়, তা তিনি জানতেন না। উৎফুল্ল হয়ে প্রণব বাবু বললেন, "চল্ দেখি তোর উজ্জ্বলার কাছে। কত নম্বরে থাকে সে? চল্, নিয়ে চল্ দেখি।"

মদের ঝোঁকে বহু দিন পরে পাগলা ওরফে প্রতুল উজ্জ্বলার ওখানে গিয়েছিল, কিন্তু বহু দিন পরে ঐ দিনই আবার খোকাও সেখানে এসে গেছে। রামবাগানের হত্যাকাণ্ডটা সমাধা করে খোকা সোজা উজ্জ্বলার বাড়ীতে চলে আসে একটু জিরিয়ে নেবার জন্তে। উজ্জ্বলার ঘরে ঢুকে খোকা দেখতে পায়, পাগলা দুয়ারের কাছে বসে আছে। এ জন্ত উজ্জ্বলাকে কোনও কিছু না বললেও খোকা পাগলাকে ক্ষমা করেনি। পাগলার গালে গোটা দুই-তিন থাপ্পড় বসিয়ে খোকা তাকে তাড়িয়ে দেয়। পাগলা মদের ঝোঁকে গুমরতে গুমরতে বেরিয়ে এসেছে। প্রণব বাবুর কথায় সাহস পেয়ে মদের ঝোঁকেই সে বলে উঠলো, "তা বাবা, যাবে তো এসো, আমি ঠি-ক-ই নিয়ে যাব। অ-ঐ যে বাড়ীটা—মাইরী বলছি—ঐ বাড়ীটা।"

প্রণব বাবু সিপাই-শান্ত্রীদের তাঁর পিছু পিছু আসবার জন্তে ইসারা করে দিয়ে পাগলাকে নিয়ে এগিয়ে চললেন। উজ্জ্বলার বাড়ীটা বেশী দূরেও ছিল না। দ্বিতলের একটি ঘরে উজ্জ্বলা দেবী বাস করতো। তড়-তড় করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে উজ্জ্বলার ঘরের সম্মুখে এসে তাঁরা দেখলেন, ঘরের দরজাটা ভিতর হ'তে বন্ধ রয়েছে।

উজ্জ্বলার ঘরে পাগলার আগমন খোকা বাবু একেবারেই পছন্দ করেনি। ঘরের ভিতর বসে পাগলাকে উপলক্ষ ক'রে খোকা উজ্জ্বলার সঙ্গে তর্ক করছিল। উজ্জ্বলা খোকাকে বুঝাতে চাইছিল যে, এতো দিন পরে মত্তাবস্থায় পাগলা এই সর্ব্ব-প্রথম তার এখানে এসেছে। কিন্তু খোকা কিছুতেই তা স্বীকার করতে চাইছে না, এমন সময় হঠাৎ তারা শুনতে পেলো, দরজার উপর টক্-টক্ করে কারা আঘাত হানছে।

দরজার গায়ে ইচ্ছা করেই খোকা একটা ছোট ফুটা করে রেখেছিল, এই ছোট্ট ফুটাটার উপর চক্ষু ন্যস্ত করে খোকা দেখলো, পাগলা প্রণব বাবুর নেতৃত্বাধীনে এক দল পুলিশ সঙ্গে ক'রে ফিরে এসেছে। দরজার দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে খোকা নিমেষের মধ্যে তার কর্ত্তব্য ঠিক করে নিলে, তার পর পিছিয়ে এসে তার পিঠটা পিছনের বারান্দার রেলিঙের উপর চিতিয়ে দিয়ে উজ্জ্বলাকে বললো, "ঐ অতিথি তোমার এসে গেছে গো, এইবার দরজাটা খুলে দিতে পারো।"

"কি বললে? অতিথি এসে গেছে, তা শাঁক বাজাতে হবে না কি?" উজ্জ্বলা জিজ্ঞাসা করলে, "তা কোন্ বন্ধুটি তোমার এলেন, গোপী না কেষ্ট বাবু?"

"আমার বন্ধু নয় গো," উত্তরে খোকা বাবু বললেন, "এবারও তোমারই বন্ধু এসেছেন। দরজাটা নয় খুলেই দিলে?"

বিস্মিত হয়ে উজ্জ্বলা দরজা খুলে দিতেই দেখতে পেলো, তার দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়েছে, সশস্ত্র পুলিশ।

পুলিশ-বাহিনীর পুরোভাগে লোহার কোর্ত্তা প'রে, বাম হাতে আবক্ষ-পরিমাণ প্রকাণ্ড একটা ইস্পাত-নির্ম্মিত ঢালের দ্বারা বক্ষ ও মস্তক আবৃত করে ডান হাতে পিস্তল উঁচিয়ে ইনস্পেক্টার প্রণব বাবু অগ্রসর হচ্ছিলেন। পুলিশের আগমনে হতবাক্ ও হতবুদ্ধি হয়ে উজ্জ্বলা দুয়ারের এক পাশে সরে আসা মাত্রই খোকার হাতের পিস্তলটিও গর্জ্জন করে উঠলো, আওয়াজ হলো—দড় দড়াম গুম! পিস্তলের এই আওয়াজ শ্রুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খোকা বাবু তাঁর পিঠটা বারান্দার রেলিঙের উপর চিতিয়ে দিয়ে, একটা মাত্র ভল্ট বা ডিগবাজীর সাহায্যেই নীচের গলিটার উপর এসে দাঁড়ালো। পিস্তলের গুলীটা ছুটে এসে প্রণব বাবুর বুকের উপরকার ইস্পাত-নির্ম্মিত ঢালের উপর প্রতিহত হয়ে প্রথমে দেওয়ালে এবং পরে মেঝেতে এসে পড়লে, আওয়াজ হলো—ঠক্, ঠং।

প্রণব বাবু কিন্তু প্রত্যুত্তর দিবার একটুকুও সময় পাননি। তাঁর পিস্তলের গুলী পিস্তলের মধ্যেই থেকে গেলো। কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে তিনি বারান্দাটার উপরে ছুটে এলেন, কিন্তু খোকা বাবুকে তিনি উপরে বা নীচে, কোথায়ও আর দেখতে পেলেন না। খোকা বাবু বহু পূর্ব্বেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। সে এখোন পুলিশের নাগালের বাইরে, এতক্ষণে হয়তো বা সহর ছেড়েই চলে গেলেন।

বেশ্যাপল্লীগুলি সাধারণ দৃষ্টিতে পাপীস্থানরূপে প্রতীত হলেও ধর্ম্মাচরণও সেখানে হয়ে থাকে। বেশ্যা নারীরা নিজ গৃহে পূজা-পার্ব্বণ করে থাকে তো বটেই, তা ছাড়া এদের পল্লীতে পল্লীতে সর্ব্বজনীন মন্দিরেরও অভাব নেই। ঈশ্বর এদের ত্যাগ করলেও এরা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করতে পারেনি।

এদের স্থাপিত কোনও কোনও দেবস্থান পীঠস্থানরূপেও প্রখ্যাত হয়েছে। সোনাগাছির চন্দ্রনাথ শিব-মন্দিরটিও ছিল এইরূপ একটি সর্ব্বজনবরেণ্য ধর্ম্মস্থান।

গোয়াবাগানের সত্য গোয়ালা আরও দশ জনের ন্যায় প্রতি রাত্রিতেই এসে চন্দ্রনাথ দেবতার কাছে নিবেদন জানিয়ে যেতো। প্রতিদিন দুধে জল মিশিয়ে সে যেটুকু পাপ সঞ্চয় করেছে তা এই সর্ব্বপাপঘ্ন দেবতার কাছে এলে ক্ষয় হয়ে যাবে, এইটেই ছিল তার বিশ্বাস। অন্য দিনের মত সেই দিনও রাত্রে এসে সে দেবতার দুয়ারে মাথা ঠুকে নিবেদন জানিয়ে বলছিলো, "ঠাকুর দয়াময়, দেবাদিদেব!"

মন্দিরের চৌকাঠের উপর ঠক্-ঠক্ করে সে মাথা ঠুকছিল, এমন সময় হঠাৎ "ক্যাচ" করে একটা আওয়াজ এবং সেই সঙ্গে একটা ভয়ার্ত্ত আর্ত্তনাদ শুনে সে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো। প্রণাম তখনও তার শেষ হয়নি, শেষ প্রণামটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সেরে নিয়ে মুখ ফেরাতেই সত্য গোয়ালা দেখতে পেলো, একটা ট্যাক্সী মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। ট্যাক্সীটার মাঝখানটাতে বসে আছে নাম-করা তবলচি পাগলা ওরফে প্রতুল বাবু। দর-দর করে তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল—ঠিক বরষার ধারার মত।

এধারে-ওধারে তাকে ঘিরে বসে আসে খোকা বাবু নিজে এবং সেই সঙ্গে তাঁর চার-পাঁচ জন সাঙ্গোপাঙ্গ।

সেই দিন সন্ধ্যা থেকেই খোকা তার দল-বল নিয়ে সোনাগাছির পথে পাগলার অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে বসেছিল। যে কোনও কারণেই হোক খোকার ধারণা হয়েছে, শিউচরণের মৃত্যুর পর হতে এই পাগলাই তার গতিবিধি সম্বন্ধে পুলিশে খবর দিয়ে আসছে। উজ্জ্বলার উপর কিংবা প্রণব বাবুর সম্বন্ধে, এমন কি নিজের উপরও তার যা কিছু অভাব-অভিযোগ বা ক্রোধ ছিল, তার সবটুকুই একত্রে পুঞ্জীভূত হয়ে সেই দিন তা পাগলার উপরই এসে পড়েছে। শত্রুর শেষ সে কিছুতেই রাখবে না। খোকা বাবু সেই দিন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েই বেরিয়েছে। হঠাৎ সুযোগও মিলে গেলো। অভ্যাস মত সেই দিনও মদ খেয়ে মত্ত অবস্থায় পাগলা পথ চলছিলো। "চল, চল, উজ্জ্বলার বাড়ী যাবি চল।" বলে খোকা জোর করে তাঁকে ট্যাক্সীতে তুলে এই শিবমন্দির পর্য্যন্ত নিয়ে এসেছে, এমন সময় হঠাৎ পাগলা আত্মহারা হয়ে চীৎকার করে উঠলো, "ওরে বাবা-রে-এ, এরা আমাকে মেরে ফেলবে। ওগো, তোমরা আমায় বাঁচাও গো-ও। ও বাবা-আ।"

সত্য গোয়ালা খোকা বাবুর নাম শুনলেও তাকে চাক্ষুষ কখনও দেখেনি, তবে পাগলা বাবুর সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। একটু এগিয়ে এসে সত্য গোয়ালা জিজ্ঞাসা করলো, "কি হয়েছে, মশয়? একে নিয়ে যান কোথায় আপনারা, করেছেই বা কি ও, এ্যাঁ?"

ইতিমধ্যে আরও অনেক লোক সেখানে জড় হয়ে গেছে। সকলেই সেই একই কথা বলে—"কি হয়েছে মশয়? ব্যাপারখানা কি?" এই ভীড়ের মধ্যে খোকার এক জন পরিচিত লোকও ছিল। একটু এগিয়ে এসে সে বলে উঠলো, "আরে, এ তো পাগলা, খোকা বাবুদেরই তবলচি।" এর পর লোকটা খোকার দিকে চোখ ঠেরে বলে উঠলো, "এই যে খোকা বাবু নিজেই আছেন, তা কোথায় যাওয়া হচ্ছে, আপনাদের? পাগলটাকে বুঝি খু-উব খাইয়েছেন আজ?"

পাগলা কিন্তু কারুর কাছে আর কোনও নালিশই জানালো না। তার চোখ বেয়ে তখনও জল গড়াচ্ছে ঠিক বরষার ধারার মতই। নিঃশব্দে সে ট্যাক্সীর উপর বসে রইল, মুখ দিয়ে তার একটা রা'ও বার হলো না। উত্তর দিল খোকা নিজে, হেসে ফেলে সে জানালো, "আপনারাও যেমন। মদটা খেয়েছি, একটু নেশাও হয়েছে। এখোন যাচ্ছি আর একটু খেতে, আর এক জায়গায়। একটু ফুর্ত্তি করতে, হে হে হে।"

ট্যাক্সী-ড্রাইভার প্রথমে মনে করেছিল, এরা সকলেই এক দলেরই দলী। কোথায়ও হয় তো ফুর্ত্তি করতে যাবে। সে নির্ব্বিকার ভাবেই গাড়ী চালাচ্ছিলো, হঠাৎ পাগলাকে চীৎকার করে উঠতে শুনে সে আচমকা গাড়ীটা বেঁধে দেয়। খোকার উত্তর শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে ড্রাইভার এইবার আদেশের অপেক্ষায় খোকা বাবুর দিকে চাইলো। নির্ব্বিকার চিত্তে খোকা বাবু হুকুম দিলে, "চালাও সিধা, গঙ্গার পাড়। এই শোভাবাজার ষ্ট্রীট্ নিয়ে চলো-ও। জলদি।"

খোকা বাবুর নির্দ্দেশ মত ট্যাক্সী-খানা কয়েক মিনিটের মধ্যেই গঙ্গার পাড়ে এসে দাঁড়ালো। ট্যাক্সীর ভাড়াটা চুকিয়ে দিয়ে খোকা বাবু বললো, "আয় পাগলা, নেমে আয়। ভয়ের কি আছে, আচ্ছা বোকা তো তুই? আয়, মদ খাবি আয়।"

উন্মত্ত মাতাল হলেও, পাগলা তার অবচেতন মনের সাহায্যে খোকার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কি, তা বুঝে নিয়েছিল। কিন্তু এক্ষণে খোকার এই মিষ্টি কথা শুনে পাগলার ধারণা হলো, খোকা তাকে একটা চড় বা চাপড় দিয়েই ছেড়ে দেবে।

মদের বোতলের ছিপি খুলে খোকা বোতলটা পাগলার মুখের দিকে তুলে ধরতেই পাগলা দ্বিরুক্তি না করে ঢক্-ঢক্ করে অনেকখানি বিষই গলাধঃকরণ করে নিল, কিন্তু মাতাল হলো না।

এতোখানি খাওয়ার পরও তাকে মাতাল হ'তে না দেখে খোকা আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলো, "কি রে, আর একটু মদ খাবি? না, খাবি না? কথা কইছিস্ না যে? এই—"

উত্তরে মাথা নেড়ে পাগলা জানালো, না, আর মদ সে খাবে না।

খোকা এইবার হুকুম করলো, "যা তবে গঙ্গাস্নান করে আয়। যা যা, নেমে যা, শীগ্গির।"

বিনা প্রতিবাদে পাগলা সকলকে অবাক্ করে দিয়ে গঙ্গায় নেমে ডুব দিয়ে এলো। একবার সে জিজ্ঞাসাও করলো না, এতো রাত্রে স্নানই বা সে করবে কেন?

পাগলা উপরে উঠে এলে খোকা জিজ্ঞাসা করলো, "কি রে, গঙ্গাজল খেয়েছিস্?"

উত্তরে পাগলা বললো, "না তো ভাই, খাইনি তো!"

ধমক দিয়ে খোকা বললো, "যা শীগ্গির, খেয়ে আয়।"

পাগলা পুনরায় জলে নেমে অঞ্জলি ভরে গঙ্গোদক পান ক'রে এলো। পাগলা ভালোরূপ সাঁতার জানতো, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, একবারও পালাতে চেষ্টা করেনি। আবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় পাগলা উপরে উঠে এলে, খুসী হয়ে খোকা বলে উঠলো, "একেই তো বলে লক্ষ্মী ছেলে। এইবার তোকে আমি খু-উব ভালোবাসবো বুঝলি? আয়, এইবার আমার সঙ্গে কালভৈরবের মন্দিরে গিয়ে মহাকালকে নমস্কার করে আসবি আয়-য়।"

কালভৈরবের মন্দির নিকটেই ছিল। এই মন্দিরের সামনেই না কি বৃটিশ শাসনাধীনের শেষ নরবলি হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের নথিপত্র হ'তে এ কথা জানা গেছে।

খোকা হাতে ধরে পাগলাকে মন্দিরের দুয়ারে এনে হুকুম করলো, "যা বেটা নমস্কার করে আয়।"

ঠাকুরকে নমস্কার জানিয়ে ফিরে এলে খোকা পাগলাকে জিজ্ঞাসা করলো, "চরণামৃত একটু খেয়েছিস্ তো?"

উত্তরে পাগলা বললো, "না ভাই, খাইনি তো।"

ধমকে উঠে খোকা বাবু বললো, "খাসনি, যা, শীগ্গির খেয়ে আয়।"

পূর্ব্বের মতই নির্ব্বিকার চিত্তে পাগলা মন্দিরে ঢুকে চরণামৃত পান করে এলো। আশ্চর্য্যের বিষয়, পাগলা মন্দিরের পুরোহিতকে বা আর কাউকে তার এই আশু বিপদ সম্বন্ধে কোনও নালিশ জানাবারও প্রয়োজন মনে করেনি, এমন কি মন্দিরের দরজা বন্ধ করে আত্মরক্ষার চেষ্টাও সে করলো না।

পাগলাকে নিয়ে খোকার দল এগিয়ে চলছিল, ঠিক এই সময় গঙ্গা পার হয়ে সেখানে এসে হাজির হলো এক জন নাম-করা "খাউ" অর্থাৎ কি না চোরাই বা টানা মালের খরিদ্দার।

খোকাকে ডাক দিয়ে স্বনামধন্য খাউ গৌরিয়া জিজ্ঞাসা করলো, "যাও কোথায় খোকা বাবু? কিছু হুকুম-টুকুম আছে না কি? বলেন তো সঙ্গে সঙ্গেই চলি।"

উত্তরে খোকা বাবু বললো, "তা আসবি তো আয়। একে আমরা এইবার ট্যাপ করবো।"

গৌরিয়া এক জন চোরাই মালের ক্রেতা মাত্র, চুরি-ডাকাতি বা খুন-খারাপিকে সে ভয়ই করে। খোকা বাবুর কথা শুনে সে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দেই সরে পড়লো। হঠাৎ গৌরিয়াকে না দেখতে পেয়ে খোকা বাবু চঞ্চল হয়ে উঠলো, তার হুকুম অমান্য করে কেউ চলে যাবে, এ তার অসহ্য। এ ছাড়া দলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পর দল ছেড়ে কাউকে চলে যেতে দেওয়া নিরাপদও নয়। ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে খোকা বাবু বললো, "আরে! পালালো না কি? আচ্ছা যা, তোকেও আমি দেখে নেবো পরে।"

খোকার অন্তর্নিহিত অত্যুগ্র শোণিত-স্পৃহা এই দিন যেন পূরা মাত্রায় জাগ্রত হয়ে উঠেছে। সামান্য মাত্র অপরাধেও সে আজ আপন জনকেও হত্যা করতে পারে। গৌরিয়ার উপর তার এই ক্রোধও শেষ বরাবর পাগলার উপরেই এসে পড়লো। খোকা এইবার ঘাড়ে ধরে টানতে টানতে পাগলাকে নিকটের এক অন্ধকার মেথর-গলিতে এনে ফেললো।

অপরিসর গলি-পথ, একমাত্র মেথররাই সেই পথে যাতায়াত করে। চারি দিক অন্ধকার—নিঃশব্দ অন্ধকার। হঠাৎ খোকা আস্তীনের তলা থেকে হাতীর দাঁতে বাঁধানো তার সখের ছুরীখানা বার করে সেটা ডান হাতে উঁচিয়ে ধরে, বাম হাতে পাগলার জামার কলারটা চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলো, "বল দিকিনি পাগলা, এটা কি?"

খোকার প্রকৃত উদ্দেশ্য এতক্ষণে পাগলার কাছে দিবসের মতই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উত্তর করলো, "ওটা ভাই ছুরী। তোরা তো আমায় মেরেই ফেলবি, আমি কিন্তু ভাই নির্দ্দোষী।"

উত্তরে খোকা বাবু বললো, "ও-সব কথা আর নয়। বিচার হয়ে গেছে, এখোন শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও। হাঁ, একটা কথা, তোমার কোনও শেষ ইচ্ছা আছে?"

হঠাৎ পাগলের মুখ দিয়ে বার হয়ে এলো, "উজ্জ্বলাকে একবার দেখবো, ভাই।"

উপস্থিত সকলকে পাগলা অবাক্ ক'রে দিলে। পাগলা বলে কি? যে উজ্জ্বলাকে নিয়ে এতো কাণ্ড, সেই উজ্জ্বলাকেই কি না সে দেখবে? খোকা বাবুর চোখ দু'টো জ্বল্-জ্বল্ করে জ্বলে উঠলো।

চারি দিকে শুধু অন্ধকার, দেখা যায় শুধু খোকা বাবুর দু'টো চোখ, আর তার হাতের ধারালো ছুরীখানা। এইরূপ অবস্থায় খোকা একটা নির্দ্দয় পশুর মতই হয়ে উঠতো, এমন কি, তার চেহারা পর্য্যন্তও এই সময় বদলে যেতো, এই সময় তার দলের লোক পর্য্যন্তও তাকে দেখে শিউরে উঠতো। হিংস্র পশুর মত এগিয়ে এসে খোকা বাবু হুকুম করলো, "এই গোপী, কেষ্টো, ধর বেটাকে ভালো করে।"

খোকার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা ছাড়া তার দলের লোকেদের গত্যন্তর ছিল না। হুকুম পেয়ে কেষ্টো ও গোপী দুই জনে পাগলার হাত দুইটা জোর করে চেপে ধরলো। অন্ধকারের মধ্যে সকলে লক্ষ্য করলো, পাগলার চোখ দু'টো ভয়ে বুজে আসছে।

দেহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে খোকার অনেক কিছু জানা ছিল। তার ঘরে এ্যানাটমির অনেক চার্টও টাঙান আছে। হৃৎপিণ্ড ফুসফুস প্রভৃতির অবস্থিতি তার অজানা ছিল না। হঠাৎ আওয়াজ হলো ক্যাঁচ-ক্যাঁচ। হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে খোকা তিন তিন বার তার ছুরীখানা পাগলার বুকের মধ্যে বসিয়ে দিলে। বিনা প্রতিবাদে পাগলার দেহটা রক্তাপ্লুত অবস্থায় মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো।

এবারকার এই হত্যাকাণ্ডটি কিন্তু খোকার প্রধান সাকরেদ গোপী ও কেষ্টকে পর্য্যন্তও বিচলিত করে দিলে। হাজার হোক, পাগলা ছিল তাদের পরিচিত লোক। সাকরেদদ্বয়ের মনের এই দুর্ব্বলতা অন্ধকারের মধ্যেও খোকার চোখ এড়ায়নি। তাদের সাহস দিয়ে খোকা বাবু বললো, "এ্যাঁ, ভয় পেয়েছিস্, এই কি আমাদের প্রথম কাম না কি? বড্ড ভীতু তো তোরা? বুঝতে পেরেছি, মনে সন্দেহ জেগেছে তোদের। কিন্তু ভেবে দেখ দেখি, আমাদের জীবন কিরূপ দুর্ব্বহ করে তুলেছিল ও। পাগলা আমার মনের শান্তি অপহরণ তো করেছিলই, তা ছাড়া সে উজ্জ্বলাকেও সরাতে চেয়েছে। এক পৃথিবীতে আমাদের উভয়েরই আর স্থান ছিল না। তাকে হত্যা করার জন্যে আমি কিছু মাত্রও দুঃখিত নই। অন্যথায় সে-ও যদি আমাকে হত্যা করতো বা হত্যা করতে পারতো, তা'হলে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হতাম না। কারণ, বাঁচবার অধিকার একমাত্র শক্তিমানেরই আছে। তা ছাড়া জীবনটা একটা মোটর কার মাত্র, পেট্রোল ফুরিয়ে গেলেই বন্ধ হয়ে যায়, এপারেও কিছু নেই, ওপারেও নয়, বুঝলি? কৈ, একটা ইঁদুর মারবার সময় তো তোরা ভয় পাস না? মানুষের মত সে-ও তো একটা জীব, তবে?"

গোপী ও কেষ্টো খোকার এই বক্তৃতা ধীর ভাবে শুনলো, কিন্তু কোনরূপ উত্তর করলো না।

খোকার অপর সাকরেদ সুবল যন্ত্রপাতি সমেত খোকার ব্যাগটা হাতে ক'রে নিকটেই দাঁড়িয়েছিল। খোকা ব্যাগটা হতে নিমিষে একটা ভোজালি বার করে নিলে। প্রথমে সে পাগলার পায়ের শিরা দু'টো ভোজালি দিয়ে কেটে দিলে, তার পর পাগলার মুণ্ডটাও এক কোপে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ডান হাতে সেটা উঁচিয়ে ধরে খোকা অট্টহাসি হেসে উঠলো—হা হা হা!

আপন-মনে কিছুক্ষণ অট্টহাসি হেসে খোকা তার সাকরেদদের হুকুম করলো, "যা এবার তোরা যে যার ডেরায় ফিরে। এই গোপী, তুই তোর ডলিকে নিয়ে হাওড়ায় সরে পড়, আমিও উজ্জ্বলাকে নিয়ে কোলকাতা ছাড়বো। শুধু কেষ্টো আমার সঙ্গে থাকবে, বুঝলি?"

সাকরেদদের একে একে বিদায় দিয়ে খোকা মুণ্ডটা ব্যাগের মধ্যে পূরে নিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়লো, তার পর আনাচ-কানাচ ঘুরে মুণ্ড-ভরা ব্যাগ-সমেত সে সোজা এসে উজ্জ্বলার ঘরে উপস্থিত হলো।

রাত্রি তখন বারোটা বেজে গেছে। উজ্জ্বলা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে এইবার ভাবছিল সে শুতে যাবে কি না? হঠাৎ খোকা পাগলার রক্তমাখা ছিন্ন মুণ্ড হাতে ঘরে ঢুকে বলে উঠলো, "কি রে শালী, আর কাউকে ভালবাসবি? চিনতে পাচ্ছিস্ একে?"

ছিন্নমুণ্ডের মুখায়তন এতক্ষণে আরও বিশ্রী ও বিকট রূপ ধারণ করেছে। ছিন্নমুণ্ডের ভাঁটার মত গোল-গোল চোখ দু'টো মুণ্ড হ'তে যেন ঠিকরে বার হয়ে আসছে! সুপরিচিত চোখ, অব্যক্ত তার ভাষা। দাঁতে দাঁত লেগে আছে, পাগলা যেন চোখ দিয়েই কথা বলতে চায়!

আড়ষ্ট হয়ে উজ্জ্বলা খোকার হাতের ছিন্নমুণ্ডের দিকে চেয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদে জ্ঞানহারা হয়ে শয্যার উপর লুটিয়ে পড়লো। [ক্রমশঃ

রবীন্দ্রনাথের গান

শ্রীকিরণশশী দে

রবীন্দ্র-সংগীতে সুরের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য আমি সচরাচরই অতিরিক্ত সচেতন। এ-ক্ষেত্রে পাঠকেরা আমাকে যদি উগ্র রকমের conservative বলিয়াও গালিগালাজ করেন, আমি বস্তুতঃ গৌরব অনুভব করিব। কথাটা আরো কিছু স্পষ্ট করিয়াই বলি। কোন গায়কের মুখে রবীন্দ্রনাথের গান শুনিতে গিয়া যদি সেই গানেতে কবির স্বদত্ত সুরের বিন্দুমাত্রও ব্যতিক্রম দেখিতে পাই, তবে কি জানি, আমি যেন কিছুতেই তাহা সহ্য করিতে পারি না। এ-সব নিয়া গুরুদেবের জীবিতাবস্থায় কাগজে-পত্রে অনেক লেখালেখি করিয়াছি। ফলতঃ অনেক সময় গায়কেরা (অবশ্য যাঁহাদের নিকট আমি পরিচিত তাঁহারা) আমাকে না কি একটা terror মনে করেন, নানা সূত্রে সে বার্তাও আমার কানে আসিত। এ সমস্ত কিছুই কবির অজানা ছিল না।···উল্লেখ বাহুল্য, শান্তিনিকেতনের সকল ছাত্রদের ন্যায় আমিও কবি-গুরুর স্নেহলাভে সৌভাগ্যবান। সর্বোপরি যখন তাঁহারই স্নেহাশীর্বাদ শিরে বহন করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এবং তার বাইরেও দেশী-বিদেশী অগণিত সংগীতবিলাসীদের নিকট রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেষণের এবং শিক্ষাদানের ভার নিজের স্কন্ধে একাধিক বার সানন্দে গ্রহণ করিয়াছি, তখন, আজ মনে পড়ে—বিশ্বকবির এই আশীর্বাদই যেন ছিল আমার অন্তরের মহান্ শক্তি, আমার স্পর্ধার বড়ো সম্পদ্।

নিজের কথা এতো করিয়া বলা বস্তুতঃ অশোভন ;—এখন কাজের কথাটাই বলিব।···এক দিন আমার জনৈকা ছাত্রী ও তার বন্ধুকে নিয়া শান্তিনিকেতনে কবির সংগে সাক্ষাৎ করিতে যাই। কথা-প্রসঙ্গে উত্তেজিত হইয়া সেই দিন তাঁহার সংগীতকেই কেন্দ্র করিয়া অনেক কিছু গুরুদেবকে বলি।···ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ঘরোয়া, তাই ইচ্ছা ছিল এ সব আলোচনা চিরকালই গোপনে রাখিব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে সুরের বিশুদ্ধতা রক্ষার নিমিত্ত কবির নিজের মুখের কথাগুলি সকলেরই জানিয়া রাখা ভালো এই ভাবিয়া এবং তা ছাড়া ইহা প্রকাশ করা আমার কর্তব্যের একটা অঙ্গও—এই মনে করিয়া—বিশেষতঃ যাহারা রবীন্দ্র-সংগীত প্রচারে ব্রতী ও সেই সংগীতে যথেষ্ট নিষ্ঠাবান্ তাহাদের সম্মুখে আমি আমার হাতের লেখা ডায়েরী হইতে কোন কোন অংশ লিপিবদ্ধ করিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিলাম।···আমি অনুলিপিকার সাজিবার চেষ্টা জীবনে কদাপি করি নাই, সুতরাং কবির কথাবার্তার reproduction হয়তো বহু ক্ষেত্রে আমার নিজের দুর্বল ভাষায়ই ব্যক্ত হইয়াছে। আজ বুঝিতেছি এবং বুঝিয়া দুঃখ হইতেছে, কেন গুরুদেবের কথাবার্তার হুবহু ফটোগ্রাফ রাখিতে পারিলাম না—রাখিলে কত উপকারেই না আসিত। কিন্তু এখন আর সে ত্রুটি সংশোধনের পথই বা কোথায়? সুতরাং আপশোষ অনাবশ্যক। আশা করিব, সহৃদয় পাঠকেরা আমার এই অপারগতাকে ক্ষমার চক্ষেই দেখিবেন।

*   *   *   *

সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ ইং

···সকাল বেলা বৈতালিকের পর ওরা দু'জনেই হাতে করে' অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে গিয়েছিল গুরুদেবের কাছে।···চমৎকার মেয়ে গায়ত্রী—দেবযানীরই বন্ধু সে। দেবযানী মেয়েটি গুজরাতী, বোম্বাইয়ে আমার কাছে গান শিখেছে অনেক দিন থেকে ; আর গায়ত্রী হোলো মারাঠী। অবাঙ্গালী হোলেও নিখুঁত বাঙ্গালী মেয়েদের মতনই পোষাক পরেছে ওরা। ওদের নারীসুলভ চঞ্চলতায় ঘর মুখরিত হয়ে উঠ্‌ছিলো। দেখলাম, গুরুদেব তাদের ব্যবহারে অত্যন্ত মুগ্ধ। হাসি-তামাসা করলেন অনেকক্ষণ ওদের সাথে। অনুমতি পেয়ে দেবযানী গাইলো একখানা গান :

ভেঙেছে দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময়
তোমারি হোক্ জয়!

গান শুনে গুরুদেব ওর প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হোয়ে উঠলেন। ওকেই বললেন : 'বাংলা গানের মধ্যে এই রকমের জোর ও উচ্চারণের স্পষ্টতা মেয়েদের গলায় বড় একটা দেখা যায় না।··· গাইতো খুকু (অমিতা সেন), সে এই আশ্রমেই ছোটবেলা থেকে মানুষ হোয়েছে'···ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পর আমার দিকে তাকিয়ে : 'আর আজকাল বাইরের লোকেদের মুখে যা গান শুনি, সে যে কতো ক্লান্তিকর কী বলবো।' বলতে বলতে একটা অসহ্য রকমের বিরক্তির ভাব ভেসে উঠলো তাঁর মুখের উপর। একটু বিচলিত স্বরেই যেন বললেন : 'বিশেষ করে রেডিয়োতে যখন ওরা আমার চাপায়—কেবল শুনতে পাই—একটানা একঘেয়ে এক কান্নার সুর! এ কান্না বিনে রবীন্দ্রনাথ যেন আর কিছুই জানে না।···বাধ্য হয়ে এ-সব উৎপাতের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে রেডিয়ো আমার বন্ধ করেই রাখতে হয়।'

আমি কথা বলার সুযোগ পেয়ে ভয়ে ভয়ে বললাম : 'একটা কথা বলবো?'

হাসতে হাসতে বললেন গুরুদেব : 'বল্ না শুনি—'

গলাটা একটু কেশে নিয়ে বললাম : 'আধুনিক বাংলা গান সৃষ্টির পেছনে আপনার জীবনের কত পরিশ্রম কত সাধনা যে জড়িয়ে আছে, ঐ সমস্ত গাইয়েদের সেই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান নিবার অবকাশ কই?—(গুরুদেব মৃদু মৃদু হাসছিলেন)—আমি বলতে পারি কোন ধৈর্য্যই নেই ওদের রবীন্দ্র-সংগীতচর্চা করবার।··· সঙ্গীতের a b c d জ্ঞানটাও তাদের আছে কী না আমার সন্দেহ,—শুধু স্বল্প আয়াসে যা-তা ভাবে গান গেয়ে নাম কেনবার প্রলোভনই বেশী,—আর তা' চালিয়ে দিতে চায় ওরা আপনার নামের দোহাই দিয়ে।' মনে মনে বললাম, কী-ই বা করবেন—ভারতের প্রাচীন

সংগীতের বেষ্টন রেখা থেকে মুক্ত করে দিয়ে বাংলা গানকে যখন এক নিজস্ব পথে টেনে এনে পৃথিবীর সীমাহীন আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন আপনি এবং দেশের ভুঁইফোড় গাইয়েগুলোও পেয়েছে দুঃসাহস—তখন দেখুন না কী মজা—হনুমানদের ল্যাজে লেগেছে আগুন।···এখন সে ফল-ভোগ তো করতেই হবে!···(অতঃপর প্রকাশ্যে):—'দিন্ না বিশ্বভারতী থেকে আইন তৈরী করে। দেখবেন ও-সব ঢঙ দু'দিনে যাবে বন্ধ হোয়ে।···উঃ! বাংলা দেশের রেডিয়ো-সিঙ্গারের দল (Radio Singers) যে আজকাল কী এক উৎকট কায়দা আবিষ্কার করেছেন ওদের গানে!—তাঁরা গান করেন মৃদু কণ্ঠে যেন কানে কানে কথা বলছেন সুর দিয়ে। ওদের ধারণা, এ'তেই না কি আধুনিক বাংলা গানে ফুটে ওঠে মাধুর্য কিংবা মিষ্টত্ব—বাংলা গান পায় তার নূতন পথ।···কিন্তু আমি বলি, এরূপ মৃদু কণ্ঠে গান গাইবেন কারা?—শুধু তাঁরাই—যে-সব গাইয়েদের বুক, কণ্ঠ কিম্বা শ্বাসযন্ত্র পড়ে আছে কোন প্রকারের ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে; কারণ তাঁরা যে নিরুপায়। কিন্তু যাঁদের ভিতরে অভাব নেই শক্তিবীর্যের—যাঁদের কণ্ঠস্বরের মুক্ততা পৃথিবীর আকাশ-বাতাসকে তরঙ্গায়িত করে তোলে, তাঁরা যে কোন যুক্তিতে মৃদু কণ্ঠে গান করবেন—ইহাই ভেবে পাইনে আমি।···নাঃ, মেয়েরা গাইলে অবশ্যি এক কথা, কিন্তু পুরুষদের গলায় এই মেয়েলিপনা আর সহ্য হয় না কিছুতেই। বিশেষ করে আপনার জোরালো গানগুলো—অই ঢং-এ গাইতে গিয়ে যখন বিকৃত করে বসে ও-সব রেডিয়ো-সিঙ্গারের দল।'

'ঠিক বলেছিস্ কিরণ, আমার কানেও ওই রকম সব কথা আসে মাঝে মাঝে—রবি ঠাকুরের গানই না কি মৃদু কণ্ঠকে বিশেষ প্রশ্রয় দিচ্ছে!···শুনুক তো এসে রবি ঠাকুরের মুখে এরা গান···' এই বলে গুরুদেব গেয়ে উঠলেন জোর গলায়:

···জয় হোক্ জয় হোক্ নব অরুণোদয়
পূর্ব দিগঞ্চল হোক্ জ্যোতির্ময়!···

গায়ত্রী ধরে বসলো—আরেকটা গান শুনবে সে। গুরুদেব গাইলেন:

···হেলা ফেলা সারা বেলা এ কী খেলা আপন মনে
এই বাতাসে ফুলের বাসে মুখখানি কার পড়ে মনে।···

গানের খুসীতে ভরে উঠছিলো ওঁর মুখ। গান থাম্লে স্নিগ্ধ হাসিতে সুধালেন ওদের: 'কেমন গায় রবি ঠাকুর?'—ইত্যাদি ইত্যাদি হাল্কা রকমের রসিকতা চললো।···দেবযানী যদিচ কিছু বাংলা বুঝে—কিন্তু গায়ত্রী তা' কিছুই জানে না। সে ইংরিজিতে কথা কইছিল। কথা হচ্ছিল—হিন্দি গান, মারাঠী গান এবং তার পর সংগীত-সাধক ভাতখণ্ডেকে নিয়ে।···এমনি করে আলোচনা প্রসঙ্গে যখন উঠলো স্বরলিপির কথা,—আমি বল্লাম: 'স্বরলিপি মেনে গান গাইলে গানের সুর মাঝে মাঝে অনড় অচল হোয়ে দাঁড়ায়—অনেকে এই মত প্রকাশ করেন এবং এতে না কি গান হয়ে উঠে 'বিলিতী গীতি-ভঙ্গিম'। এ সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত?' প্রশ্ন করে জবাবের কোন অপেক্ষা না রেখেই আমি আবার বল্লাম: 'কিন্তু আমি প্রশ্ন করি বিলিতী গান কি গান নয়? আর তাদের সংগীত কি আমাদের ভারতীয় সংগীতের তুলনায় কম বিজ্ঞান-সম্মত?···এ বিষয় হাতে-কলমে চুল চিরে বিচার করতে গেলে আমাদের দেশের সংগীতবিদদেরই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে লজ্জিত হওয়া উচিত। গানের মধ্যে সুরের নিত্য নূতন বৈচিত্র্য আনার স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে আমরা বস্তুতঃ সংগীত-বিজ্ঞানটাকে অবহেলা করেই চলি।···হোতে পারে ভারতীয় গানে সঙ্গীতজ্ঞদের স্বাধীনতার পথ চির উন্মুক্ত; কিন্তু তাই বলে এ প্রমাণ হয় না যে, ভারতবর্ষের গায়ক মাত্রই হবেন এক এক জন উঁচু দরের স্রষ্টা কিম্বা সুরকার।···সকলেই যদি হন স্রষ্টা তাহোলে স্রষ্টার সৃষ্টি ভোগ করবে কে? সুতরাং এমন সব গায়কদেরও প্রয়োজন আছে যাঁরা না কি সুরকারদের একান্ত অনুবর্তী হয়ে চল্‌তে পারেন।···সত্যি কথা বল্‌বো, আমরা আমাদের দেশের তথাকথিত স্বাধীন গীতপন্থীদের বড় বড় কথার মারপ্যাচ দিয়ে যত উঁচুতেই স্থান দিয়ে রাখি না কেন, এ বিলিতী গীতি-ভঙ্গিম অনুযায়ী সুরকারের একান্ত অনুবর্তী হয়ে চলাটা কিন্তু তাঁদের পক্ষে তত সহজ কাজ নয়। এ-পদ্ধতিটার প্রতি যতই অবহেলার ভাব তাঁরা মুখে দেখান না কেন—কিন্তু আমি যা ঠিক জানি তাই বললুম। ···অবজ্ঞা করলেই তো আর কোন কিছুর উপর দক্ষতা জন্মে না? যে কোন নূতন প্রণালী অবলম্বন করা সকলের পক্ষেই দস্তুর মত অভ্যাস-সাপেক্ষ। তাই বলি, আমাদের মনে রাখতে হবে, ভারতীয় সকল ওস্তাদ গাইয়েদেরই বিলিতী গীতি-ভঙ্গিম অনুযায়ী পদসঞ্চালনে চাই যথেষ্ট রকমের সংযম ও সাধনা। অচল সুরপন্থী হওয়ার পক্ষপাতী আমি অবশ্যই নই তথাপি বড়ো বড়ো সুর-রচয়িতাদের তাঁবেদারী * করে যে আনন্দ নেই, সেটা আমি স্বীকার করবো না কিছুতেই।'

গুরুদেব মন দিয়ে শুনছিলেন কথাগুলো—বল্লেন: 'যেমন তুই কেবল তাঁবেদারী করিস্ রবি ঠাকুরের গানের—কেমন না?' বলে চোখ টিপে হেসে ফেললেন।

আমি তাঁর পায়ের কাছেই বসেছিলুম মাটিতে। 'আশীর্বাদ করবেন যেন চিরকাল তাই-ই করতে পারি'—বলে পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে খানিক বাদে বল্‌লুম: 'গাইয়েরা যদি সুরকারের অনুবর্তী হয়ে চলাটাকে অসম্মানকর কিছু মনে করেন তাহোলে আমি বল্‌তে চাই, সুরকারদের শিখণ্ডী সাজিয়ে রাখবারই বা প্রয়োজন কি? যে যার খুসী মতন গাইলেই তো হয়; অবশ্য সংগে সংগে হাব-ভাব দিয়ে—সত্যি হোক্ বা না হোক্ এটাও জাহির করতে হবে যে তারা প্রত্যেকেই এক এক জন প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টা—কেউ-ই আর কোন বিশেষ সুর-রচয়িতার আজ্ঞাবহ তাঁবেদার নয়।'

কথাটা যেন একটু শ্লেষাত্মক বলে মনে হোলো তাই জিভে কামড় দিয়ে থেমে গেলাম। গুরুদেব তা টের পেয়ে স্নিগ্ধ হাসি হেসে বল্লেন: 'তোর এ ইঙ্গিত নিশ্চয় কোন এক বিশেষ গায়কের উপর বলে আমার মনে হচ্ছে এবং তুই যেন তার উপর খুব কঠোর ভাবেই চটে আছিস্।'

আমিও হেসে ফেল্‌লাম, বোল্‌লাম: "সে আমি বোল্‌বো কেন? ···আচ্ছা দেখুন দিকিনি, আপনার একটা গান আমি কোলকাতায়

---

* 'সুরকার' বলা হয় তাঁদের—যাঁরা গানের কথাতে সুর সংযোজনা করেন এবং যে-সব গায়ক সুরকারদের দেওয়া সুরের একান্ত অনুবর্তী হয়ে চলার প্রয়াস পান—তাঁরা সংগীত-সমালোচকদের কাছে 'তাঁবেদার' নামে পরিচিত। নিখুঁৎ ভাবে তাঁবেদারী করার প্রথা আমাদের দেশে বিরল এবং কেন বিরল তাহাই উল্লেখিত কথোপকথনে ব্যক্ত হইয়াছে।

বসে এক রকম গাইব, আর এক জন ছাত্র আপনার ওই একই গান লাহোরে বসে যদি অন্য ভাবে গায় ;—আবার যে আছে বোম্বাইয়ে সে গাইবে তার খুসী মতন,' তাহোলে পরিণামে আপনার ওই গানের অবস্থাটা যে কী দাঁড়ায় একবার অনুমান করুন তো? ···ধরুন না, এই জন-গণ-মন-অধিনায়ক গানটার সুর-ই। এ-গানখানা তো এতো বেশী popular—তবু আসল স্বরলিপি থেকে বদলাতে বদলাতে বর্তমানে যে এর সুর কী আকার নিয়েছে—আমরা শান্তিনিকেতনের কেউ তা মোটেই লক্ষ্য করি না।··· ভারতবর্ষের যে যে জায়গায় ঘুরেছি প্রায় সবখানেই এ-গানটা আমায় শিখাতে হয়েছে এবং তখন বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত 'গীত-পঞ্চাশিকা'য় দিনুদা'র (৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) করা স্বরলিপিরই আমি সাহায্য নিয়েছি। ভীমরাও শাস্ত্রী মশাইও দেখেছি হিন্দিতে ঐ একই ভাবের স্বরলিপি করেছেন। যে-বার 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয় করতে আপনারা দিল্লীতে যান তখন আমি সেখানকার লেডি আরউইন কলেজের শিক্ষক। মেয়েরা ঐ গানটাই আমার কাছ থেকে শিখেছিল উল্লিখিত ছাপানো স্বরলিপি অনুযায়ী। শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা চিত্রাঙ্গদা করছে—তাই কলেজের জনকয়েক অবাঙ্গালী মেয়ে গিয়েছিল ওই অভিনয় দেখতে। প্লে'র শেষে সমবেত কণ্ঠে 'ভারত-ভাগ্য-বিধাতা' গানখানা গাওয়া হয়। ও'রা তাই শুনে এসে পরদিন কলেজে গানের ক্লাশে কে-জানি আমায় জিজ্ঞাসা করে বস্‌লো : 'মাষ্টার সাব, আপকা স্বর উনকী স্বরোঁসে বরাবর নহীঁ মিলতা!'···ওদের এ অনুযোগ শুনে অবাক হোয়ে গেলুম। কী আর করি—শান্তিনিকেতনে সচরাচর যে সুরে এ গানটা আমরা গেয়ে থাকি তাই গেয়ে শুনালুম ওদের।···স্বরলিপির সংগে অনেক ক্ষেত্রে বেশ অমিল্ আছে। বিশেষ করে এই জায়গায় (গেয়ে বল্‌লাম) :

গা গা গা গা | গা া গা মা | রা গা মা া | া া া া |
ত ব শু ভ না ° মে ° জা ° গে ° ° ° ° °
মগা মা পা পা | মপা া মা গা | রা মা গা া | া া া া |
ত ব শু ভ আ ° শী ষ মা ° গে ° ° ° ° °
মগা া গা া | গা গা গা রা | ন্‌া রা সা া | া া া া
গা ° হে ° ত ব জ য় গা ° থা ° ° ° ° °

—ছাপানো স্বরলিপিতে সুরটা হোলো এই রকম ; কিন্তু আশ্রমে আমরা গেয়ে থাকি :

সা রা গা গা | গা া গা মা | রা গা মা া | া া া া |
ত ব শু ভ না ° মে ° জা ° গে ° ° ° ° °
মগা মা পা পা | মপা া মা গা | রা মা পা া | া া া া |
ত ব শু ভ আ ° শী ষ মা ° গে ° ° ° ° °
সগা া গা মা | রা রা রা রগা | ন্‌া রা সা া | া া া া
গা ° হে ° ত ব জ য় গা ° থা ° ° ° ° °

দ্বিতীয় সুরটা শুনে ওরা খুসী হলো বটে—বোল্‌লে এবার না কি ঠিক হয়েছে এবং এই দ্বিতীয় বারের স্বরলিপি যখন ওরা চাইলে—করে দিতে বাধ্য হলুম আমি, বললুম : 'এ দু'টো সুরের যে কোনটাই তোমরা ব্যবহার করতে পার।' কিন্তু আমার মনের ভিতর রয়ে গেলো এক খুঁতখুঁতে ভাব। কারণ যে স্বরলিপিটা আমি পরে করে দিয়েছি—আমার শুধু সন্দেহ হচ্ছিল সে সুরটা কী যথার্থ আপনার দেওয়া না আমাদের তৈরী? ভাবলুম, এই দিনই আপনাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবো। কিন্তু টেলিফোন করে জান্‌তে পেলাম, আপনারা তখন দিল্লী ছেড়ে চলে গেছেন।···মাঝে মাঝে আমাকে এই ভাবের ফ্যাসাদে পড়তে হয়। আবার অনেকে আছেন আমাদের আশ্রমেরই ছাত্র—আপনার গান শেখান—স্বরলিপি ঠিক ঠিক ভাবে অনুসরণ করেন না, কিম্বা শান্তিনিকেতনের ছাত্র বলে তার প্রয়োজনও মনে করেন না। তাই অনেক সময় দেখা যায়, স্বরলিপিতে হয়তো সুর এক রকম দেওয়া আছে—গাইতে গিয়ে একটু দিলেন বদলে। তার হেতু সন্ধান করলে জবাব আসে :—'আমরা শান্তিনিকেতনে কিন্তু অন্য রকমে গেয়ে থাকি।'···আপনার এক-ই গানে দুই বা ততোধিক সুর থাকা সম্ভবপর এবং সেগুলির স্বরলিপিও বিশ্বভারতী ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করছেন।···এখন আমরা যদি শ্রদ্ধার সংগে ওইগুলো না মেনে চলি তাহোলে এ সব মুদ্রিত স্বরলিপির প্রতি শিক্ষার্থীদের বিশ্বাস থাকবেই বা কি করে বলুন তো?'

স্মিত হাস্যে গুরুদেব বল্‌লেন : 'তুই আমায় তর্কে টেনে মহা বিপদে ফেল্‌তে চাস্ দেখচি। আমি তোকে সহজ করে বলবো, শোন্—গান গাওয়া-কালীন্ সব সময়ে স্বরলিপি হুবহু মেনে চলাটা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না—বিশেষ করে আমাদের দেশের গানগুলোতে। তার কারণ, আমরা সাধারণতঃ গান শিখি কানে শুনে, চোখে দেখে নয়। শুধু কানে শুনে গান শেখাটাই আমাদের দেশের সংগীত শিক্ষার চলতি পদ্ধতি, সুতরাং অনভ্যস্ততার দরুণ স্বরলিপি সামনে থাক্‌লেও চোখের কাজ সমান তালে চলতে পারে না আমাদের। এই অবস্থায় স্বরলিপি মেনে চলতে গেলে—তুই যে কী বলছিলি—গানের সুর অনড় অচল হয়ে দাঁড়ায়, এ কথা একেবারে মিথ্যে নয়। ···কিন্তু দেখেছি তো, পশ্চিমের ওরা দু'টোতেই অভ্যস্ত। তাই মনে হয়, যদি ওদের মতো করে তোরাও স্বরলিপির বই সামনে রেখে গান গাইবার অভ্যাসটাকে স্বভাব-দুরস্ত করে ফেলতে পারিস্ তাহোলে বোধ করি গানের সুর তত খারাপ শোনাবে না কখনও। অবশ্যি স্বরলিপিকারেরও সেই দিকে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে যাতে গানের সুরের বিশুদ্ধতা (accuracy) বিন্দু মাত্র নষ্ট না হয় এবং যথাসাধ্য সুরের সুক্ষ্ম কাজগুলি স্বরলিপিতে দেখাবার দক্ষতাও তার থাকা চাই। দিনু তো বরাবরই গান শিখাতে গিয়ে কিম্বা তা-ছাড়াও স্বরলিপির বই সামনে নিয়েই গান করতো। এমন কি, আমি পর্যন্ত গাইতে গিয়ে সুরে যদি একটু উনিশ-বিশ করেছি তবে সে যে কী কুরুক্ষেত্রই না বাধিয়ে দিতো তা তো তোরা দেখেছিস্ই। বাস্তবিক, দিনু না থাকলে আমার গান আজ এতোখানি প্রসার লাভ করতো না কখনো। আমি জানি, ইচ্ছা করলে সে নিজেও বহু গান অনায়াসে রচনা করে যেতে পারতো; কিন্তু দেখতুম, আমার গান নিয়ে মেতে থাকাটাই যেন ছিল তার একটা মস্ত বড়ো আনন্দ। সে-ই তো preserve করে রেখেছে আমার গানের সুরগুলোকে ···অনেক দিন আমি কবিতা লিখে তার উপরে তাকে সুর বসাতে বলেছি; কিন্তু সে তা' হেসে উড়িয়ে দিয়েছে বলতো : 'তোমার গানে তোমার নিজের সুর দাও, তার পর আমি গাইব।'—আমি সুর বসালে পর দিনু স্বরলিপি করে গাইতো, শিখাতো তার ছাত্র-ছাত্রীদের—আশ্রমে এবং আশ্রমের বাইরেও। কোথাও তার বিশ্রাম ছিল না—এই-ই যেন ছিল তার জীবনের ব্রত। তাই মাঝে মাঝে ভাবি—কত শ্রদ্ধাই না জানি সে করতো আমার গানকে···

আপন মনে বলতে বলতে হঠাৎ যেন গুরুদেব বড়ো অন্যমনস্ক হোয়ে পড়লেন—তাঁর সমস্ত চেহারায় একটা নিস্তব্ধ বিমর্ষ ভাব ফুটে উঠলো। —দূরের পানে উদাস দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন: 'দেখ কিরণ, তোর কথাগুলো শুনে মনে হয়, তুই যেন দিনুর যোগ্য শিষ্য। আমার গানের সুরকে একটু অদল বদল করতে বড্ডো কষ্ট হয়—না রে?'···বড়ো সস্নেহে কথা কয়টি বলে আমার দিকে তাকালেন গুরুদেব। (আমার সে অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব) বলছিলেন তিনি: 'সত্যিই স্বরলিপি মেনে না চললে গানের সুর বদলাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। শুধু এই গানটা নয় আমার আরো বহু গানের সুর বেশ একটু এ-দিক্ সে-দিক্ হয়ে গেছে বলে আমি মাঝে মাঝে টের পাই।—সেগুলো ঠিক রবি ঠাকুরের সুর নয় —শান্তিনিকেতনের সুর বলেই জান্‌বি।—যদি এই শান্তিনিকেতনের সুর বাদ দিয়ে শুদ্ধমাত্র রবি ঠাকুরের সুরের প্রতিই তোরা খুব বেশী নিষ্ঠাবান্ হোস্ তাহোলে আমার মনে হয়, এই বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক মুদ্রিত স্বরলিপির সুরগুলিকে বিশুদ্ধ ভাবে অনুসরণ করাই তোদের পক্ষে বিধেয়—বিশেষ করে আমার গান শেখাবার কিম্বা প্রচারের ভারটা যখন তোরা নিবি!'

চিঠি

রাণী চট্টোপাধ্যায়

আমার মন্দির শূন্য; আবর্জ্জনা ভরেছে প্রাঙ্গণ।
সেখানে বর্ষণ এলো অতীতের বিস্মৃতির মিতা।
সাথে তার এলো-মেলো একখানি অর্থহীন চিঠি:
পাঠায়েছে ক্লান্ত ঝড়ে পলাতক দিনের সবিতা।

সূর্য্য পাঠায়েছে লিপি। বৃষ্টি-ভেজা ভাদ্রের দুপুরে
অক্ষর গিয়েছে ধুয়ে; অবান্তর অগত্যা মনন।
তবু শূন্য মন্দিরের আঙিনায় আমি পথচারী
চেয়ে চেয়ে দৃষ্টিহীনা;—কী ছিলো সেখানে নিমন্ত্রণ?
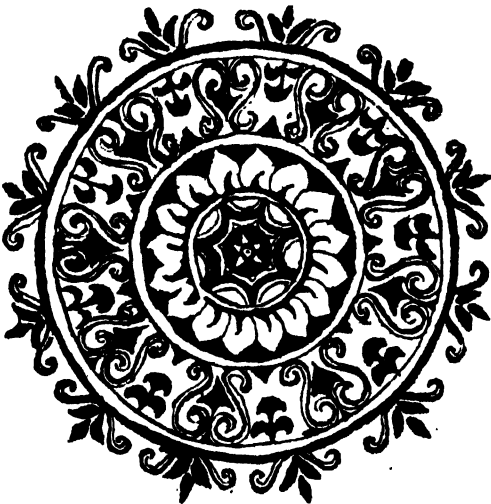
—জ্যোৎস্না গুপ্তা

ইউ, এস, এস, আর,-এ খেলাধুলা

অনুকা গুপ্ত

সোভিয়েট ইউনিয়নে দৈহিক কৃষ্টি রাষ্ট্রের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। খেলাধুলাকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা এবং এই ভাবে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে শ্রম এবং দেশরক্ষার কাজের জন্য তাদের সক্ষম করে তোলা সোভিয়েট সরকার তাদের অন্যতম কর্ত্তব্য বলে মনে করেন। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে বিশেষ ভাবে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে, এর কাজ হল দৈহিক কৃষ্টি ও খেলাধুলাকে উৎসাহ দেওয়া। এই কমিটি দেশের অসংখ্য খেলাধুলা সম্পর্কীয় সমিতিগুলির কার্য্যপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

খেলাধুলার সখের ক্লাবগুলোর লক্ষ্য হল সর্ব্বসাধারণকে তাদের সভ্য-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা। শুধু সহরেই নয়, গ্রামাঞ্চলে, সৈন্যবাহিনী এবং নৌবাহিনীতেও খেলাধুলার জন্য ক্লাব ও সমিতি আছে। ১ কোটিরও বেশী লোক খেলাধুলার সমিতি, ক্লাব এবং এই ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংগঠিত হয়েছে। বিশেষ ভাবে সজ্জিত ব্যায়ামশালা এবং খেলার মাঠগুলোতে কুড়ি লক্ষ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নানা রকম খেলাধুলা করে।

খেলাধুলার ক্লাবগুলো সর্ব্বাঙ্গীন শারীরিক কৃষ্টির জন্য প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখে। ক্লাবের সমস্ত সভ্যকেই খেলাধুলা সম্পর্কীয় কতকগুলি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়, যাতে তারা "শ্রম এবং আত্মরক্ষার" জাতীয় ব্যাজ লাভ করার উপযুক্ত হতে পারে। দৌড়ানো, লাফানো, দূরে ভারী জিনিষ ছোঁড়া, সাঁতার দেওয়া, নৌকা চালান, গুলী ছোঁড়া ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়। বয়স এবং স্ত্রী-পুরুষ তারতম্য ভেদে পরীক্ষার মান ঠিক করা হয়। ছোট ছেলেদের (১০ থেকে ১৬ বছর বয়স পর্য্যন্ত) জন্য "নিম্নতম মান", বয়স্কদের জন্য "প্রাথমিক মান" এবং উন্নত "দ্বিতীয় মান।"

যারা এই পরীক্ষায় পাশ করে, তাদের সকলকে একটি বিশেষ ব্যাজ দেওয়া হয়—পাঁচ-কোণা একটি তারকাকৃতি ধাতুখণ্ডের উপর অঙ্কিত এক জন দৌড়ে রত খেলোয়াড়ের মূর্ত্তি, তার উপর খোদাই করা "শ্রম এবং দেশরক্ষার জন্য প্রস্তুত"—এই হল ব্যাজ। ছোট ছেলেদের জন্য আবার একটা বিশেষ ব্যাজ আছে—তাতে খোদাই করা "শ্রম এবং দেশরক্ষার জন্য প্রস্তুত হও।"

এই ব্যাজ যারা লাভ করতে চায়, তাদের সারা বছর ধরে খেলার মাঠে নিয়মিত ভাবে, বিশেষ ভাবে নিযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকতে হয়।

লক্ষ লক্ষ স্কুলের ছাত্র, বালক-বালিকা, বয়স্ক স্ত্রীলোক ও পুরুষ, এমন কি মধ্যবয়সী লোকেরাও "শ্রম ও দেশরক্ষার" ব্যাজ পরে গর্ব্ব অনুভব করে। ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারীর হিসাবে প্রকাশ, "প্রাথমিক মানে"র ব্যাজ পরেছিল ৫,৮১৫,০০০ জন, এবং "দ্বিতীয় মানের ব্যাজ পরেছিল ৭১,০০০ জন। বালক-বালিকাদের জন্য নির্দিষ্ট পরীক্ষায় ১,০৯১০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল।

ইউ, এস, এস, আর-এ জীবন ধারণের মানের ক্রমবৃদ্ধির ফলে এবং খেলাধুলার ব্যাপক উন্নতির ফলে সৈন্যবাহিনীতে আহুত যুবকদের গড়পড়তা দৈর্ঘ্য ১০৭ ইঞ্চি বেড়ে গেছে, তাদের ওজন

প্রায় গড়পড়তা পাঁচ পাউণ্ড হিসাবে বেড়েছে, এবং তাদের বুকের মাপ ৮'৬ ইঞ্চি বেড়েছে।

দেশের মধ্যে ব্যাপক ভাবে খেলাধূলার প্রসারের জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজন মত ব্যবস্থা অবলম্বন করছে। এখন ৬৫০টি বড় বড় দৌড়ের মাঠ, ৭,২০০টি খেলার মাঠ, ১০০টি ব্যায়ামশালা, ৩৫০টি ক্রীড়াকেন্দ্র এবং ২,৭০০টি স্কি-ক্লাব আছে। শুধু মাত্র ১৯৩৮ সালেই যাট লক্ষ রুবলেরও বেশী দৈহিক কৃষ্টি এবং খেলাধূলার উন্নতির জন্য ব্যয়িত হয়েছিল।

দৌড়ের মাঠে, টেনিস কোর্টে, সাঁতার দেবার দীঘিতে, ঘোড়ায় চড়ার বিত্যালয়ে, স্কেট-ভূমি এবং ঘোড়দৌড়ের মাঠে সব সময়ই দর্শকদের ভিড় থাকে।

উৎসব উপলক্ষে মস্কোর ডাইনামো ষ্টেডিয়ামে—ইউরোপের বৃহত্তম ষ্টেডিয়ামের এটি অন্যতম—৭৫,০০০ জন দর্শক জমায়েৎ হয়। সম্প্রতি কয়েক বছরে সোভিয়েট ইউনিয়নের সমস্ত প্রধান সহরগুলোতে প্রথম শ্রেণীর ষ্টেডিয়াম (ক্রীড়াপ্রদর্শনী ক্ষেত্র) তৈরী করা হয়েছে এবং এদের প্রত্যেকটিতে সহস্র সহস্র দর্শকের আসনের ব্যবস্থা করা আছে। এখন মস্কোতে একটা ষ্টেডিয়াম তৈরী করা হচ্ছে—সেখানে ১৪০,০০০ জন দর্শকের স্থান সঙ্কুলান হতে পারে। দেশের সর্ব্বত্রই খেলার মাঠ, খেলার ক্লাব, দৈহিক কৃষ্টির ক্লাব এবং ব্যায়ামশালা গড়ে উঠছে। কারু-কৃষি-সমবায় সমিতিগুলি তাদের নিজস্ব ক্রীড়াক্ষেত্র গড়ে তুলছে।

এই চিত্তবিনোদনের প্রতিষ্ঠানগুলি সোভিয়েট জনসাধারণের ও সোভিয়েটের তরুণ সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। ইউ, এস, এস, আর,-এর যে কোন নাগরিক—খেলাধূলা সম্বন্ধে যার আগ্রহ আছে—সে-ই খেলার ক্লাবের সভ্য হতে পারে। প্রত্যেককে সামান্য কিছু চাঁদা সভ্যপদ বাবদ দিতে হয়, এর পরিবর্ত্তে প্রয়োজন মত খেলাধূলার সমস্ত সাজ-সরঞ্জামই তাকে দেওয়া হয়। তা ছাড়া প্রয়োজন হোলে শিক্ষকের সাহায্য সে নিতে পারে, এবং সর্ব্বক্ষণই তাকে ক্লাবের চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

ইউ, এস, এস, আর,-এ শরীরচর্চ্চায় বিশেষজ্ঞদের শিক্ষার জন্য ৭টি বিশেষ কলেজ এবং ২৫টি বিত্যালয় আছে, তা ছাড়াও ২০টি ট্রেনিং কলেজে বিশেষ দৈহিক-চর্চ্চা বিভাগ আছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই অবৈতনিক ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। এর উপর রাষ্ট্র থেকে ছাত্রদের নিয়মিত ভাবে মাসিক বৃত্তি দেওয়া হয় এবং তাদের থাকবার ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়।

সোভিয়েটের খেলোয়াড়রা কেউ পেশাদার নয়। সোভিয়েট নাগরিকের কাছে খেলাধূলা অর্থোপার্জ্জনের উপায় নয়। সোভিয়েট খেলোয়াড় রোজ তাদের নিজেদের কাজে যায়—কেউ ধাতু-ঢালাই করার কাজে, কেউ গোলাবাড়ীতে, কেউ ল্যাবরেটরিতে, কেউ তাঁতের কাজে। যেমন—দৌড়ের চ্যাম্পিয়ন এবং উপাধিপ্রাপ্ত খেলোয়াড় সিরাফিন এবং জর্জ্জ জুনামেনস্কি দুই ভাই—তাঁরা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করছেন। মিখাইল্‌ভ হোলেন এক জন বক্সিং চ্যাম্পিয়ন এবং উপাধিপ্রাপ্ত খেলোয়াড়, তিনি সোফারের কাজ করছেন। বিশ্ববিখ্যাত সোভিয়েট দাবা-খেলোয়াড় বোটভিনিক এক জন বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ার ও গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বীর গ্রোমোভ—যিনি একবারও না থেমে উত্তর মেরুর উপর দিয়ে ইউ, এস্, এস্, আর, থেকে আমেরিকা পর্য্যন্ত আকাশপথে অভিযান চালিয়েছিলেন, তিনি এক কালে ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় এক জন চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। খেলাধূলার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবার সময় সোভিয়েট খেলোয়াড়দের চাকরী যাবার ভয় থাকে না। প্রতিযোগিতার জন্য বিভিন্ন সময়ে তাদের যে ব্যাপৃত থাকতে হয়, তার গড়পড়তা হিসাব ক'রে তাদের বেতন দিয়ে দেওয়া হয়। খেলোয়াড় হিসাবে তাদের খ্যাতির যুগ অবসান হোলেও সোভিয়েট খেলোয়াড়দের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটে যায় না। তাদের আসল কাজ তখনও হাতে থাকে।

শরীরচর্চ্চা এবং খেলাধূলা কি পরিমাণে সোভিয়েট জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে, নিম্নলিখিত উদাহরণগুলো থেকে তা বোঝা যাবে। ভল্গা নদীর তীরে কুইবিশেভ শহর—সেখানকার কচেটকভ নামীয় একটি গোটা পরিবার ইউ, এস, এস, আর,-এর জনপ্রিয় দীর্ঘ দৌড় প্রতিযোগিতার একটিতে অবতীর্ণ হয়েছিল। ৫৮০ মিটারের (প্রায় ৫৫০) গজ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন ৫০ বছরের মহিলা—বৃদ্ধা মা ও ছোট দুই কন্যা। বড় মেয়েটি ১,০০০ মিটারের প্রতিযোগিতায় জিতেছিল। তাঁর ছেলে এক জন রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারের সহকারী—সে ৩,০০০ হাজার মিটারের প্রতিযোগিতায় জিতেছিল। আর একটি ছেলে এরোপ্লেন-চালক—সে ৫,০০০ হাজার মিটারের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল। মহিলাটির জামাতা ৩,০০০ হাজার মিটারের প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছিল। এটা লক্ষ্য করার মত যে, বৃদ্ধা মহিলাটি মাত্র ১ মিনিট ৫০'৫ সেকেণ্ডে ৫০০ মিটার দৌড়েছিলেন। তিনি স্থানীয় একটা ক্লাবে ট্রেণিং পেয়েছিলেন। দীর্ঘ দৌড় প্রতিযোগিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য কচেটকভ পরিবারকে একটা বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

কিসুটিয়াকভরা আর একটি খেলোয়াড়-পরিবার। কিসুটিয়াকভ নিজে এক জন অভিনেতা, "মাদার" এবং অন্যান্য বিখ্যাত চলচ্চিত্রে অভিনয় করে তিনি সোভিয়েট দেশে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। কিসুটিয়াকভ আগে এক জন বিখ্যাত সাইকেল-চালকও ছিলেন এবং হাতুড়ী নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায়ও তিনি সাফল্য অর্জ্জন ক'রেছিলেন। এখন তাঁর বয়স ৫৮ পেরিয়ে গেছে, তবু এখনও তাঁকে খেলার মাঠে দেখা যায়। তিনি প্রবীণদের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রতিযোগিতায় প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁর মেয়েরা প্রথম শ্রেণীর স্কি-খেলোয়াড় এবং তাঁর ছেলে এক জন বিখ্যাত সাইকেল-চালক।

বিখ্যাত খেলোয়াড় ষ্টারোসটনের পরিবার সম্বন্ধেও একই কথা বলা যেতে পারে। ষ্টারোসটনের দুই বড় ভাই ফুটবল ও হকি খেলোয়াড় এবং "শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়" উপাধি-প্রাপ্ত। ১৯৩৮ সালে যে টিমটি ইউ, এস, এস, আর, কাপ লাভ করেছিল এবং লীগের কোঠায় সব চেয়ে উপরে যার স্থান—ষ্টারোসটন নিজে হোলেন সেই টিমটির ক্যাপ্টেন। এই টিমে ২২ জন খেলোয়াড় আছেন,—টিমের নাম হ'ল "স্পার্টাকাস্"। এদের সকলকেই সরকার খেলাধূলায় কৃতিত্বের জন্য সম্মান দান করেছেন। ষ্টারোসটনের সব চেয়ে ছোট ভাই-ও এক জন হকি ও ফুটবল খেলোয়াড়। তাঁর বোন হকি খেলতে জানে এবং টেনিস খেলতেও পারে। ষ্টারোসটনের ভগিনীপতি মোটর-সাইকেল চালনায় চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন এবং টেনিস ও হকি খেলোয়াড় হিসাবেও তিনি বিখ্যাত।

ইউ, এস, এস, আর,-এ সমস্ত রকম খেলাধুলারই চর্চা করা হয়। হাল্কা ধরণের কুস্তী, জিমন্যাষ্টিক, স্কি, ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, টেনিস, সাইকেল চালনা, সাঁতার, নৌকা চালান, স্কেট করা, প্যারাস্যুট-লম্ফ, বরফের ওপর হকি খেলা, বক্সিং, ভারোত্তোলন, মুষ্টিযুদ্ধ, রাগবি, ফুটবল, ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোঁড়া, শিকার, অসি-চালনা, মোটর চালনা, মোটর সাইকেল চালান, মোটর-বোট প্রতিযোগিতা, পাহাড়ে চড়া ইত্যাদি প্রায় পঞ্চাশ রকমের খেলা সব চেয়ে জনপ্রিয়।

কুস্তী, জিমন্যাষ্টিক, এবং ফুটবল বিশেষ ভাবে বিস্তার লাভ করেছে। ফুটবল খেলায় হাজার হাজার লোক যোগদান করে এবং খেলার সময়ে লক্ষ লক্ষ লোক দর্শক হিসাবে খেলার মাঠে জমায়েৎ হয়।

গত কয়েক বছরের মধ্যে সোভিয়েটের ফুটবল টিম্‌গুলো দেশে-বিদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদেশী টিম্‌গুলোর সঙ্গে অনেক বার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এই সমস্ত প্রতিযোগিতাতে সোভিয়েট ফুটবল খেলোয়াড়দের উঁচুদরের উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া গেছে।

সোভিয়েট খেলোয়াড়রা শুধু ভাল রেকর্ড করেই ক্ষান্ত হন না। সুসংগঠিত লোকশিক্ষা দ্বারা ভাল রেকর্ড রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। সোভিয়েট ব্যায়াম-বীররা প্রভূত শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় দিচ্ছেন। ভারোত্তোলনে সোভিয়েট ব্যায়াম-বীররা পৃথিবীর মধ্যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন এবং ক্রমশঃ আরও বেশী উন্নতি করছেন। বার-বেল তোলায় পৃথিবীর ৩৫টি রেকর্ডের মধ্যে ২৩টি সোভিয়েট ব্যায়াম-বীররাই দাবী করতে পারেন।

ইউ, এস, এস, আর,-এ খেলা হিসাবে বন্দুকে লক্ষ্য ভেদ করা উচ্চস্তরের উৎকর্ষ লাভ করেছে। ইউ, এস, এস, আর,-এর রাইফল ক্লাব এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাইফল ক্লাবের মধ্যে প্রায় প্রতি বৎসর যে প্রতিযোগিতা হয়, তা' বন্দুক ছোঁড়ার একটা ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। সোভিয়েট লক্ষ্যভেদকারীরা পৃথিবীর ৯টি রেকর্ডের অধিকারী।

সোভিয়েট সাঁতারুদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্ব-রেকর্ড বিজেতা সেমিয়ন্ বয়চেঙ্কো। তিনি বহু বার পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। তিনি ১ মিনিট ৬'৮ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার সাঁতার দিতে পারেন এবং ২ মিনিট ৩৬'২ সেকেণ্ডে ২০০ মিটার সাঁতার দিতে পারেন।

সোভিয়েট খেলোয়াড়দের মধ্যে স্কেট খেলোয়াড়রাও বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রায়ই তাঁরা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্কেট খেলোয়াড় স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ানদের অতিক্রম করে গেছেন। ১,৫০০০ মিটারের বিশ্ব-রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন এক জন সোভিয়েট মেয়ে স্কেট খেলোয়াড় মারিয়া আইসাকোভা। তিনি ২ মিনিট ৩৭'৩ সেকেণ্ডে ১,৫০০০ মিটার অতিক্রম করেছেন এবং নরওয়ের মহিলা স্কেটার স্কো নিল্‌সেনের ২ মিনিট ৩৮'১ সেকেণ্ডে ১,৫০০০ মিটারের রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

দূর পাল্লার প্রতিযোগিতার দিকে খুব লক্ষ্য রাখা হয়। নিয়মিত ম্যারাথন প্রতিযোগিতা, দূর পাল্লার স্কি-প্রতিযোগিতা ২,০০০ ও ২,৫০০ কিলোমিটারের (১,২৪০ এবং ১৫৫০ মাইল) ঘোড়-দৌড় প্রতিযোগিতা, ৩০, ৫০ ও ৬০ কিলোমিটারের (১৮'৬, ৩১ ও ৩৭'২ মাইল) দূর পাল্লার সন্তরণ-প্রতিযোগিতা, এবং দূর পাল্লার স্কি-প্রতিযোগিতা—এই সমস্ত ধরণের প্রতিযোগিতাই সাধারণতঃ আহূত হয়।

ইউ, এস, এস, আর,-এ খেলাধূলার অনেকগুলো প্রতিযোগিতা প্রতি বৎসরে হয়। সৈন্য-বাহিনীতে, নৌ-বাহিনীতে, গ্রাম্য জেলা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্ন খেলার জন্য চ্যাম্পিয়নশিপ আছে। অসংখ্য লোক প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। ১৯৩৮ সালে সৈন্য-বাহিনীতে, নৌ-বাহিনীতে এবং ডাইনামো সোসাইটির উদ্যোগে আহূত প্রতিযোগিতাগুলিতে চার হাজারেরও বেশী খেলোয়াড় যোগ দিয়েছিল।

তুর্কমেনিয়ার ঘোড়সওয়াররা আস্‌খাবাদ (মধ্য এসিয়া) থেকে মস্কো পর্য্যন্ত ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়েছিল—পথের দূরত্ব দশ হাজার কিলোমিটারের (৬,২০০ মাইল) বেশী। সীমান্তরক্ষী দল সোভিয়েট সীমান্ত ধ'রে ২,৬,০০০ কিলোমিটার (১৬,০০০ মাইল) সাইকেল চালনা করেছিল। সুদূর প্রাচ্যের খেলোয়াড়রা দশ হাজার কিলোমিটারের (৬,২০০ মাইল) বেশী পথ স্কি করে মস্কোতে উপনীত হ'য়েছিল। মস্কো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কারখানার মেয়ে-কর্ম্মীরা দু' হাজার কিলোটারেরও (১,২৪০ মাইল) বেশী পথ অতিক্রম ক'রে মস্কো থেকে টবোলস্ক পর্য্যন্ত স্কি ক'রে গিয়েছিল।

রাশিয়াতে বহু উচ্চ গিরিশৃঙ্গ র'য়েছে—কিন্তু বিপ্লবের পূর্ব্বে পার্ব্বত্য অভিযান প্রচলিত ছিল না বললেই চলে। ১৮২৯ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত প্রায় এক শতাব্দী ধ'রে মাত্র ৫৯ জন লোক ইউরোপের বৃহত্তম গিরিশৃঙ্গ এল্‌ব্রাসে আরোহণ ক'রেছিল—তার মধ্যে বিদেশীই ছিল আবার ৪৭ জন। ১৮৭৭ সাল থেকে ১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত প্রায় পঁচিশ বছর ধ'রে রুশীয় অভিযাত্রীরা উদ্যোগ ক'রে একটিও পার্ব্বত্য অভিযান চালায়নি। এই সময়ের মধ্যে যতগুলি অভিযান হ'য়েছিল, বিদেশীরাই ছিল তার উদ্যোগী।

এখন ইউ, এস, এস, আর-এ পর্য্যটন, পর্ব্বত-অভিযান, ইত্যাদির ব্যাপক ভাবে প্রচলন হ'য়েছে। ইউ, এস, এস, আর-এ সমস্ত প্রধান পর্ব্বতশৃঙ্গ এখন সোভিয়েট অভিযাত্রীরা আরোহণ করেছে। ১৯৩৭ সালে ১২ জন সোভিয়েট অভিযাত্রী সাত হাজার মিটারেরও (২৩,০০০ ফিট) বেশী উঁচু পর্ব্বতচূড়াগুলো অতিক্রম ক'রেছিল। কেবল ১৯৩৮ সালেই উচ্চ পর্ব্বতারোহণে কুড়ি হাজার লোক অংশ গ্রহণ করেছিল।

ককেশাস, আল্‌তাই, এবং টিয়েনশানে ১৯৪০ সালে ৪৩টি পর্ব্বত-অভিযাত্রীদের ক্যাম্প প'ড়েছিল এবং সেখানে চোদ্দ হাজার লোক পর্ব্বতারোহণ সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ ক'রেছিল।

ইউ, এস, এস, আর,-এ দৈহিক উৎকর্ষের আন্দোলনে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার ফলে ক্রমাগতই দেহানুশীলনে নূতন প্রতিভার সৃষ্টি হচ্ছে। খেলাধূলা সম্পর্কীয় যে কোন ক্ষেত্রে যে সমস্ত নাগরিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করে তাদের দিকে যথোপযোগী লক্ষ্য রাখা হয়—তারা যাতে উন্নতি ক'রে দক্ষ খেলোয়াড়ে পরিণত হ'তে পারে শিক্ষকরাও সেই জন্য তাদের সাহায্য করেন। এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার যে, শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ও চ্যাম্পিয়নরা তাদের পুরোনো দল থেকে ছেড়ে যায় না—তারা খেলাধূলা সম্বন্ধীয় আগেকার ক্লাবগুলোরই সভ্য থেকে যায়।

সোভিয়েট সরকার "শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়" নামে একটা উপাধির সৃষ্টি ক'রেছেন। খেলাধূলায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করলে এই উপাধির অধিকারী হওয়া যায়। এখন ইউ, এস, এস, আর,-এ প্রায় ১০০

জন খেলোয়াড় আছেন—যাঁদের এই উপাধি দান ক'রে সম্মান দেখান হয়েছে। চমৎকার কৌশল প্রদর্শনের জন্য বহু খেলোয়াড়ই সম্মান-পদক লাভ করেছেন।

মস্কোতে ক্রেমলিন প্রাসাদের প্রাচীরের সামনে রেড্ স্কোয়ারে প্রত্যেক বছরে গ্রীষ্মকালে সমগ্র রুশিয়ার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের কুচকাওয়াজের আয়োজন হয়। সোভিয়েট সরকার এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতারা—তাঁদের সঙ্গে ষ্ট্যালিনও থাকেন—যিনি ব্যক্তিগত ভাবে সোভিয়েটের খেলা-ধূলা এবং খেলোয়াড়দের উন্নতির জন্য অনেক কিছু করেছেন,—তাঁরা সুখী ও স্বাস্থ্যবান্ যুবকদের এই কুচকাওয়াজ পর্য্যবেক্ষণ করেন। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ১১টি গণতন্ত্রের সমস্তগুলি থেকে খেলোয়াড়রা এসে স্কোয়ারে জমায়েৎ হয়। বিরাট সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেকটি জাতির প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত থাকেন। প্রত্যেকটি রাষ্ট্র থেকে তাদের নিজস্ব জাতীয় খেলাধূলার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করা হয়। বালক-বালিকারা ও মাতা-পিতারা সন্তানদের নিয়ে এই প্যারেডে যোগদান করে। রুশীয়বাসী, ইউক্রেনবাসী, জর্জিয়াবাসী, আর্মেনিয়াবাসী, বেলোরুশীয়াবাসী, তাজিকবাসী এবং অন্যান্য জাতিগুলির অধিবাসীরাও এই রেড স্কোয়ারে কুচকাওয়াজ করে। এখানে কিরঘিজস্তানের পক্ষী-পালকদেরও দেখতে পাওয়া যাবে, তারা শিক্ষাপ্রাপ্ত বড় বড় ঈগলদের সঙ্গে নিয়ে আসে। হর্ষোৎফুল্ল যুবকরা গান গেয়ে যায় এবং সোভিয়েট সরকার ও বিপ্লবের নেতা ষ্ট্যালিনকে অভিনন্দন জানায়।

ষ্ট্যালিনের এই কথায় তারা হ'ল জ্বলন্ত প্রমাণ :—"ইউ, এস, এস, আর,-এর মধ্যে স্বাস্থ্যবান্ উৎফুল্ল এক নূতন শ্রমিক জাতির উদ্ভব হচ্ছে—তারা আমাদের সোভিয়েট দেশকে শক্তির দুর্গে পরিণত করতে সক্ষম হবে।"

"মা"

কৃষ্ণসুচিত্রা দেব

—হুঁ-হু-হু—

হাতের জপের মালাটি দ্রুত চালনা করতে করতে বৃদ্ধা হরসুন্দরী সামনের বাগানের দরজায় দণ্ডায়মান নোংরা ছেলেটিকে ইঙ্গিতে প্রবেশ করতে নিষেধ করলেন। ছেলেটা দরজা ধরে বার দুই-তিন খুব জোরে ঝাঁকুনী দিয়ে ভেংচি কেটে হরসুন্দরীর কথার পুনরুক্তি করলে—হুঁ-হুঁ-হুঁ, তার পর হি-হি করে হেসে উঠে বললে, কি রে বুড়ী, কি বলছিস্? কলা খাবি?

—দূর দূর, বেরো বেরো হতচ্ছাড়া ছোঁড়া, একটু আহ্নিক করতে দেয় না গা—পটল, অ পটল, দরজাটা বন্ধ করে যেতে পারনি বাছা? সব যেন নবাবনন্দিনী, বলি ও পটলী' কই রে এলি? নাঃ, সব ক'টা একসঙ্গে গে মরেছে। আর এই ছোঁড়া, খেলে, খেলে আমায়, হাড়-মাস সব খেলে, জ্বালাতন করে। এ্যাঁ, সব জপটা ভুলিয়ে দিলে গা, আবার গোড়া থেকে ধরতে হবে। আর এই ছোঁড়া—ফের যদি আসবি মেরে ঠ্যাং খোঁড়া করে দোব।

হরসুন্দরীর শ্রুতি-মধুর কণ্ঠস্বরে দশ বছরের মাথা-পাগলা নন্তু কিছু করে হেসে উঠল।

—মেরে ঠ্যাং খোঁড়া করে দোব, দাও না দেখি, ইস্, আয় না দেখি একবার, আমি তোর ঠ্যাং খোঁড়া করে দোব না? ও বুড়ী, তোর ঝোলায় বুঝি মাছ আছে, আর এই ভর সন্ধ্যেবেলা লুকিয়ে তুই তাই খাচ্ছিস্? দে না বুড়ী আমায় একটা।

হরসুন্দরী নন্তুর কথায় গর্জ্জন করে উঠলেন।—সর্ব্বনেশে ছোঁড়া কি বলে রে? আ মোল, আমি মাছ খাচ্ছি? আবার তাই ও চাচ্ছে? আয় না ছোঁড়া, মাছ খাওয়াচ্ছি ভাল করে, আমার সঙ্গে ইয়ার্কি, এ্যাঁ, তোর আস্পর্দ্দা ত কম নয়!

নন্তু মাছ খাওয়ার আহ্বানে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললে—আমি যাব? আমায় ছুঁবি, আমায় ছুঁলে চান করবি? ছোঁ দেখি—তার পর দরজা ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হরসুন্দরী উঠে দরজা বন্ধ করে দিয়ে এলেন—কে জানে, ছোঁড়াটা এসে না জানি কি উৎপাত সুরু করে দেবে।

হরসুন্দরীর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে কোন্ অঙ্কে পড়েছে তা কেউই জানে না, এমন কি হরসুন্দরীর নিজেরও তা অজ্ঞাত। গাঁয়ে তার সুনাম আছে সচ্চরিত্রা ও পুণ্যবতী বলে। সমাজে আদর্শ স্থান পেয়েছেন সতীত্বে। হরসুন্দরীর দাদামশাই ছিলেন টোলের পণ্ডিত। তাঁর কাজ-কর্ম্মের মধ্যে পূজার যোগাড় করা হরসুন্দরীর ছিল প্রধান কাজ। তাঁর শিক্ষায় হরসুন্দরী ছেলেবেলা থেকে ঠাকুর পূজা করতেন। একটু বড় হয়ে তাঁর "শুচিবাই" লক্ষ্য করা গেল সব কাজে। হরসুন্দরী ন'বছরে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিতা হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী গৌরী দান করলেন এক জমীদারের গৃহে। স্বামী ও শাশুড়ী কিঞ্চিৎ আধুনিক ভাবাপন্ন ছিলেন—কাজেই হরসুন্দরীর পূজা প্রভৃতি কার্য্যে তাঁরা অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন কিন্তু বৃদ্ধ শ্বশুর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে পাড়ায় পাড়ায় পুত্রবধূর রূপগুণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে এলেন। এ বাড়ীর আচার-বিচারে খুব অভাব লক্ষ্য করে হরসুন্দরী নিজে একটি ঘরে স্বতন্ত্র থাকবার ব্যবস্থা করলেন ও সেই ঘরে স্বহস্তে রান্না করে বাড়ীর অন্য লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক এক রকম প্রায় বিচ্ছিন্ন করলেন। তাঁর এই আচরণে শাশুড়ী ক্রুদ্ধা হয়ে পুত্রের আবার বিয়ে দিয়ে হরসুন্দরীর সপত্নী ঘরে আনলেন। এত দিন যে মানুষটি ছিল নির্ব্বিকার সে আজ হয়ে উঠল চঞ্চল। মানুষটি তার একান্ত আপনার জেনেই সে ছিল তার প্রতি উদাসীন। এখন সে বুঝল তার উদাসীনতায় তারই ক্ষতি হোল, অন্য কারো নয়। তিনি ভাঙ্গা মন নিয়ে শ্বশুরের পা জড়িয়ে কেঁদে উঠলেন। শ্বশুর তাঁর রূপের দিকে দৃষ্টিপাত করে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সক্ষোভে তিরস্কার করলেন তার অবহেলার জন্য। হরসুন্দরী পিতৃগৃহে ফিরে যেতে চাইলেন, শ্বশুর রাজী হলেন, শাশুড়ীও সায় দিলেন—"সেই ভালো, ওকে কিছু মাসহারার বন্দোবস্ত—" তাঁর কথা শেষ না হতেই ক্রুদ্ধা সাপিনীর মত হরসুন্দরী গর্জ্জন করে উঠলেন, "কেন আমার বাপ কি আমায় দু' বেলা দু' মুঠো খেতে দিতে পারবে না যে তোমরা আমায় ভিক্ষে দেবে? বাপ যদি না পারে আমি বাপকে খাওয়াবো রাঁধুনীগিরি করে।" বলা বাহুল্য, এমন উত্তরে শাশুড়ী বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট হননি, তখনই তাঁকে তার পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল। সেই থেকেই তিনি চণ্ডীপুরে আছেন। চণ্ডীপুরের কেউ জানত না তাঁর শ্বশুরবাড়ীর কাহিনী।

তাঁর রসনার তীব্র তাড়নায় প্রতিবেশিনী ও গৃহের অন্তান্ত রমণী সদাই তটস্থ, তাঁর ধমকানিতে পাড়ার ও বাড়ীর ছেলেরা শঙ্কিত, আর নীচু জাতির ছেলেদের কাছে তিনি মূর্ত্তিমান্ যম-সদৃশ। তবুও তাঁকে সবাই সম্মান করে। ভয় করে সবাই, করে না শুধু জেলেদের দশ বছরের ছেলে নন্ত। সময় অসময়ে খাল বলে—"এই বুড়ী, মাছ খাবি?" কিছু দিন অর্থাৎ দশ বছর আগে তিনি বিধবা হয়েছেন, সুতরাং তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন। নন্ত হা-হা করে হেসে বলত—"মারবি আমায়, মারবি? আমার লাগবে না, তোকে কিন্তু চান করতে হবে।" বেগতিক দেখে হরসুন্দরী তার কাছে নীরবে পরাজয় স্বীকার করেন। নন্ত হেসে পালিয়ে যায়।

—অ বুড়ী, একলা শুয়ে শুয়ে কি করছিস্? মাছ খাচ্ছিস্ বুঝি?

জানলা দিয়ে নন্তর মুখ দেখা যায়। হরসুন্দরীর সেদিন জ্বর হয়েছিল, তাই তিনি শুয়ে শুয়ে প্রশ্ন করলেন,—কোন্ দিক্ দিয়ে এলি রে হতভাগা, আমি ত সব দোর বন্ধ করে শুয়েছি।

—দেখলি ত বুড়ী, দেখলি ত? কেমন এলুম। নন্ত হা-হা করে অকারণে হেসে দৌড়ে পালায়।

সন্ধ্যার দিকে প্রবল জ্বরে হরসুন্দরী অচেতনের মত পড়ে রইলেন। তৃষ্ণায় তার ছাতি শুকিয়ে গেছে কিন্তু বাড়ীতে কেউ নেই যে এক ফোঁটা জল দেয় তার মুখে, সবাই চণ্ডীতলায় রামায়ণ পাঠ শুনতে গেছে।

হঠাৎ জানলা দিয়ে নন্তর স্বর শোনা যায়—অ বুড়ী, কি করছিস্?

—অ বাবা নন্ত, একটা কথা বলি শুনে যা, ঘরে আয়। অকুলে কূল পেলেন হরসুন্দরী।

—কেন রে বুড়ী, মারবি?

—না না, আয় না একবার—

—এই ত এসেছি, এবার বল।

—ঐ কুঁজোটা থেকে এক গেলাস জল দে না আমায়, তেষ্টায় মরে যাচ্ছি আমি—

—আমার হাতে জল খাবি তুই? চোখ বড় বড় করে নন্ত প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাব, দে তুই, দে না বাবা!

—আচ্ছা দাঁড়া—নন্ত জল গড়িয়ে কুঁজোটা রাখতে গিয়ে হাত ফস্‌কে কুঁজোটা পড়ে ভেঙ্গে গেল।

শব্দ শুনে চমকে উঠে হরসুন্দরী বললেন,—ভাঙ্গলি কুঁজোটা?

—তুই এলি না কেন, বেশ হয়েছে। নন্ত হেসে উঠে বলে।

—দে জলটা খাই। হরসুন্দরী বললেন।

—ও রে আমি বুঝেছি, কাছে গেলেই আমায় মারবি কেমন?

—না রে নন্ত, আমি আর কোন দিন মারব না, বকব না, দে বাবা জলটা, আমার বড্ড জ্বর হয়েছে।

—তোর জ্বর হয়েছে আর গুষ্টীশুদ্ধ কোথায় গেছে রে? নে জল খা।

নন্তর হাত থেকে জল নিয়ে এক চুমুকে সবটা খেয়ে ফেলে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললেন হরসুন্দরী।

—ন্যাতা দে, কোথায় আছে, ঘরটা পুঁছে দিই। নন্ত বললে।

—না থাক, তোকে পুঁছতে হবে না। সস্নেহে হরসুন্দরী বললেন।

—না পুঁছলে তোর বুড়ো ভাইয়ের বুড়ী বউটা আমায় মারবে না? নন্ত সরল মনে প্রশ্ন করে।

—না রে না, তোকে কেউ কিছু বলবে না, তুই আমার কাছে আয়।

নন্ত হরসুন্দরীর কোলের কাছে এগিয়ে যায়।

—হ্যাঁ রে, তুই আমায় অত ভালবাসছিস্ কেন রে? কাল আবার তাড়িয়ে দিবি ত? বলবি ত, দূর দূর, তোকে ছুঁতে নেই।

হরসুন্দরী একটু শিউরে উঠে তাঁর জ্বর-তপ্ত হাত দিয়ে নন্তর হাতটা চেপে ধরলেন—না না, তোকে আমি তাড়াব না, তুই আমার কাছেই থাকবি, বুঝলি?

—না রে, সেও আমায় প্রথম প্রথম এমন বোলত, কিন্তু তার পর পাগলা বলে মিছিমিছি তাড়িয়ে দিলে।

—কে রে, কে রে, কে তোকে তাড়িয়ে দিলে নন্ত?

—কেন আমার বাবার নতুন বউটা, ঐ যে সন্তর মা—

হরসুন্দরী নন্তর কথা সব জানতেন, তাই সস্নেহে বললেন—আমি না মরলে আর কারো সাধ্য নেই যে তোকে তাড়ায়।

—তুই মরে যাবি, কে তোকে নিয়ে যাবে? চিন্তিত হয়ে নন্ত বলে।

—কেন যমে নিয়ে যাবে, হরসুন্দরী হেসে বললেন।

নন্ত লাফিয়ে উঠে হাতের লাঠিটা শক্ত করে ধরে বললে—যম, যম, সেই যম, যে যম আমার মা-মণিকে নিয়ে গেছে সেই যম? আমি তাকে আসতে দোব না, তোকে নিয়ে যেতে দোব না রে বুড়ী! আসুক সেই যম—এই লাঠির ঘায়ে তার ঠ্যাং খোঁড়া করে দোব না, দেখি সে কেমন তোকে নিয়ে যেতে পারে?

—কেন রে, আমায় নিয়ে যেতে দিবি না? হরসুন্দরী হাসলেন।

—তুই কেন আমায় ভালবাসলি? আমিও তাই তোকে ভালবাসলুম, আমার মা'টাও আমাকে ভালবাসত। সেই মা'টা—তাকে যমে নিয়ে গেল, এবার তুই ভালবাসলি, তোকেও যমে নিয়ে যাবে? কেন আমি তার কি করেছি যে, যে আমাকে ভালবাসবে তাকেই সে নিয়ে যাবে? ও বুঝেছি, যমকেও কেউ ভালবাসে না তাই ও তাকে নিয়ে যায় ভালবাসবার জন্তে, না মা? তুই আমার মা, কেমন বুড়ী?

হরসুন্দরীর প্রাণের কোন্ তন্ত্রীতে সজোরে আঘাত করে নন্তর ডাক, তাঁর শরীর পুলকে শিউরে ওঠে, মনে হয়, সে যেমন মাটির ঠাকুরকে বৃথা পূজা করেছে, ঠাকুরও তেমনি করেছে তার সঙ্গে প্রবঞ্চনা। এ ডাক যেন হরিনামের চেয়েও, জপের মালার চেয়েও মিষ্টি, আরো মধুর। এই ডাকের জন্তেই হরসুন্দরী নন্তকে বার বার নানা রকম প্রশ্ন করছিলেন। সস্নেহে আদর করে হরসুন্দরী নন্তকে বললেন—তোকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না রে নন্ত—

তার পর নন্তর মাথাটা তাঁর জ্বরতপ্ত বুকে চেপে ধরলেন। বিনা দ্বিধায় বিনা আপত্তিতে নিষ্ঠাবতী বিধবা ব্রাহ্মণকন্তার বুকে জেলের ছেলে নন্ত মাথা রেখে শুয়ে পড়ে ডাকলে—"মা"!

গোপাল ভাঁড়

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

৪

গোপাল ভাঁড় সম্বন্ধে কতকগুলি কাগজ দেখিতে দেখিতে একখানা ছিন্ন পত্র পাওয়া গেল; তাহাতে খুব অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে—

কন্দর্পের দর্পহারী সৌন্দর্য্য যাঁহার,
প্রজার পালনে যিনি কৃপা-পারাবার।
জ্ঞানালোকে যাঁর চিত্ত ছিল আলোকিত,
যশের সৌরভে তাঁ'র দিক্ আমোদিত।
সদা পুণ্য-ব্রতে রত পূত কলেবর,
নদীয়ার অধিপতি গুণের আকর।
বঙ্গের গৌরব রাজা অক্ষয় অমর,
গোপাল ভাণ্ডারী যাঁর রসের সাগর।

কবি ভারতচন্দ্রের নামে কবিতাটি চালাইবার ব্যর্থ চেষ্টা হইয়াছে। মনে হয়, এ কবিতা যে কবির রচিত, একটা কিছু অভিসন্ধিতে কবিতাটি এই সকল কাগজপত্রের সঙ্গে তিনি রাখিয়াছিলেন। ইহা যে ভারতচন্দ্রের রচনা নহে, তাহা ভাষা ও ভাবের বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যায়। ভারতের রস এ কবিতায় এতটুকুও নাই। প্রক্ষিপ্ত কবিতার বিক্ষিপ্ত ভাব নদীয়াপতির বংশধরগণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়া থাকে, কবির ভাগ্যে পুরস্কার পাওয়া সম্ভব। কিন্তু কবিতা যে ভারতচন্দ্রের নহে এবং তাহা যে নকল এবং বিকলাঙ্গ, ইহা সুসমালোচকের তিরস্কার।

সে যাহা হউক, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কন্দর্পের দর্পহারী হউন আর না-ই হউন, তিনি যে সুন্দর ও প্রিয়দর্শন পুরুষ ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। নিজে সকল রকমে সুন্দর ছিলেন বলিয়াই দেশ ও দশকে সুন্দর করিতে তিনি ভালবাসিতেন। লোকে বলিত এবং এখনো বলিয়া থাকে—কৃষ্ণনগর ছিল ইন্দ্রপুরী অমরাবতী তুল্য। ইন্দ্রপুরী অমরাবতী দেখা যাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, মরলোকে তাঁহাদের থাকার কথা নহে। তবে কৃষ্ণনগরের সরভাজা ও সরপুরিয়া-রূপ অমৃতে যদি তাঁহারা অমর হইয়া থাকেন সে কথা স্বতন্ত্র। দুষ্ট লোক বলিয়া থাকে, রাজ-দরবার হইতেও অমৃত বিতরণের আদেশ হইলে অমরত্ব লাভ করিতে পারে অনেকেই।

ইহা অবশ্য হাস্য-কৌতুকের কথা। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে কৃষ্ণনগরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যে মধুময় ছিল, কৃষ্ণনগর যে শান্তি-কুঞ্জ ছিল, রাজ-কাহিনী, বিদ্যা-কাহিনী, ধর্ম্ম-কাহিনী, নীতি-কাহিনীতেই যে কৃষ্ণনগরের বৈশিষ্ট্য ছিল, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্মৃতি-শ্রুতি-ন্যায়-তন্ত্র-জ্যোতিষ-সাহিত্য ও অন্যান্য সুকুমার কলার অনুশীলন ছিল তখন কৃষ্ণনগরে, আর কৃষ্টি-সংস্কৃতি পুষ্টি লাভ করিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বদান্যতা ও উৎসাহ দানে। চারণ-গীতিতে তাঁহাকে বঙ্গের বিক্রমাদিত্য বলা হইয়াছে! এ উপাধিতে হয়ত অনেকের আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু তিনি যে এক জন প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার জনবল, ধনবল যে অফুরন্ত ছিল, তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও মনীষাকে অগ্রাহ্যের গভীর মধ্যে ফেলিয়া দিবার যে উপায় ছিল না, এ কথা ত স্বীকার করিতেই হইবে। বাংলার চারণ, রাজপুতানার চারণ না হয় না-ই হইল; কিন্তু চারণ, চারণ। হ্যাক্-থু করিবার মত স্বয়ংসিদ্ধ চারণ ছিলেন না তাঁহারা। জনমত ও জনশক্তির প্রভাবে কৃষ্ণনগরের দরবারে চারণের আধিপত্য। সুতরাং অগ্রাহ্যের বস্তু নহে তাহা।

কৃষ্ণনগরের রাজপ্রাসাদে হইত বার মাসে তের পার্ব্বণ, অহনি অহনি চলিত অন্নসত্র—সদাব্রত। এই সকল ব্যাপারের সুবন্দোবস্তের জন্য ভারার্পিত হয় গোপালের উপর। তাহার ফলেই তিনি ভাণ্ডারী—তাহার অপভ্রংশ গোপাল ভাঁড়।

ইহা হইতে বুঝা গেল, গোপাল শুধুই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ও পঞ্চরত্ন-সভার এক রত্ন ছিলেন না, ভাণ্ডারীর দায়িত্বপূর্ণ কাযও তাঁহাকে করিতে হইত। এত লোকের রসদ যোগাইবার ভার যাঁহার উপর অর্পিত হয়, তিনি বিশ্বাসযোগ্য না হইলে শস্য ও খাদ্যাদির যে কি অবস্থা ঘটিতে পারে, তাহা বর্ত্তমান যুগে আপামর সাধারণ হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে। ভাণ্ডারী অথবা খাদ্য-মন্ত্রী হিসাবে গোপালের সুনাম ছিল বলিয়াই শুনা যায়। দুর্নাম রটিলে গোপাল ভ-গদীতে তিষ্ঠিতে পারিতেন না কিছুতেই, এ কথা মনে করা অসঙ্গত হইবে না।

গোপালের বাসস্থান ছিল রাজবাটীর সন্নিকটে। তখনকার দিনে তিনটি স্রোতস্বিনী কৃষ্ণনগরের শোভাবর্দ্ধন করিত অপর্য্যাপ্ত। এই তিনের নাম—জলাঙ্গী অথবা জালাঙ্গী (খড়ে), অঞ্জনা ও চূর্ণী। অঞ্জনা, কৃষ্ণনগর রাজবাটীর পাশ দিয়া বীরনগরের সীমা অতিক্রম করিয়া চূর্ণী নদীতে মিলিতা। মহারাজের পঞ্চরত্ন-সভার কয়েকটি রত্ন অঞ্জনা নদীর পূর্ব্বতীরে সপরিবারে বসবাস করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন রাজাদেশে; আর পশ্চিম তীরে বাস করিতেন ভারতচন্দ্র, গোপাল ভাঁড় ও আজু গোঁসাই। উচ্চ এবং নিম্ন কর্ম্মচারীবৃন্দও যথেষ্ট জমী-জমা পাইয়াছিলেন পদমর্য্যাদা হিসাবে। সামাজিকতা ও অন্যান্য শৃঙ্খলা ছিল সুন্দর হইতেও সুন্দরতর। এই সুন্দরের রাজ্যে রাজা হইয়া লোকাভিরাম কৃষ্ণচন্দ্র যে শান্তি-সুখে রাজত্ব করিতেন, তাহা অবিসম্বাদী সত্য বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কিন্তু এততেও তাঁহার মন উঠিত না। তাঁহার মন পড়িয়া থাকিত শিবনিবাসে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত একটি বিরাট দেবালয়ে। কাশীধাম হইতে বিরাট শিবলিঙ্গ আনাইয়া সেই মন্দিরে হয় প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠায় হয় মহোৎসব। নানা দিক্-দেশ হইতে বহু ধনী ও নির্ধন, জ্ঞানী গুণী ও অপণ্ডিত, সাধু ও অসাধু উৎসবানন্দে যোগদান করে। সেই সময়ে একটি কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটে। গোপালের ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তা সে ক্ষেত্রে পরিস্ফুট। সে কাহিনী বারান্তরে প্রকাশ্য।

★

দেশের কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'বর্ধমানের কথা' সাবধান-বাণী প্রচার করিতেছেন: "বর্ধমান হইতে বহু চাউল বাহিরে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। গভর্ণমেন্টের ধান্য সংগ্রহ কার্য বর্ধমান জেলায় জোরের সহিত এখনও চলিতেছে। গৃহস্থদের উপর সরকারের নিকট ধান্য বিক্রয় করিতে বলিয়া নোটিশ জারি হইতেছে। বাংলায় এই অঞ্চলে নূতন শাসন-ব্যবস্থা শীঘ্রই প্রবর্তিত হইবে, সেই নূতন ব্যবস্থায় সরকার হইতে ধান্য সংগ্রহ করা হইবে কি না তাহা এখনও জানা যায় নাই, হইলে কি ভাবে হইবে তাহাও নির্ধারিত হয় নাই। ইহা ভিন্ন এ বৎসর ধান কি প্রকার জন্মিবে তাহাও বলা যায় না, এইরূপ অবস্থায় ধান ছাড়িয়া দিতে গৃহস্থেরা চাহিবে না—ছাড়িয়া দেওয়াও ভাল হইবে না। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া বর্ধমান জেলার সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের অবিলম্বে ধান্যসংগ্রহ বন্ধ করা উচিত।" বর্ত্তমান 'কর্ত্তৃপক্ষ'—ও-পক্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ও-পক্ষের জন্য পাকা ব্যবস্থার চেষ্টা কেবল চাউলেই নহে, অন্য সকল দিকেই করিতেছেন। এ-পক্ষকে মারিয়াও এখন ও-পক্ষকে বাঁচানো এই 'কর্ত্তৃপক্ষে'র প্রধানতম কর্ত্তব্য।

* * * * * *

'হিন্দু-রঞ্জিকা' সমস্যার কথা বলিতেছেন: "আষাঢ় মাসের অর্দ্ধেক যায়, বৃষ্টির লেশও নাই। রৌদ্রের তাপে ঘাট-মাঠ শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে। ফলে খাদ্যশস্যের মূল্য ক্রমশঃই চড়া হইয়া উঠিতেছে। তরি-তরকারী, মাছ, শাক যে দিকেই যাওয়া যায় সেই দিকেই অগ্নিমূল্য। চাউলের বাজার হু-হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে, তদুপরি ফুড কমিটির কল্যাণে জীবন আরও দুর্ব্বিবহ হইয়া উঠিয়াছে। তিন মাস গত হয় জন-প্রতি ১৷ গজ বস্ত্রের বরাদ্দ করিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চিন্তে নিদ্রা ভোগ করিতেছেন। জলখাবার বা জলযোগের জন্য মিষ্টি বা ফল খাওয়ার মতন অর্থব্যয়ের শক্তি আজ আর নাই, কাজেই চা' পানের দ্বারা ঐ অভাব কথঞ্চিৎ পূরণ হইতেছিল। ফুড কমিটি সম্প্রতি চিনির বরাদ্দ অর্দ্ধেক করিয়া সেই চা' খাওয়াও বন্ধ করিলেন। খাদ্য-সমস্যার অভাবে জনসাধারণ যখন একান্তই বিব্রত বোধ করিতেছেন অন্য দিকে পাকীস্থানী চিন্তায় অনেকেই নিজদিগকে অসহায় মনে করিতেছে। অত্যাচারের আশঙ্কায় বাড়ী-ঘর বিক্রয় করিয়া নববঙ্গ (পশ্চিমবঙ্গ) বা পশ্চিম ভারতের কোনও প্রদেশে চলিয়া-যাওয়ার নানারূপ জল্পনা-কল্পনা শুনা যাইতেছে। মানুষ কত দূর বিচলিত, ভীত বা হতাশ হইলে পূর্ব্বপুরুষের বাস্তু-ভিটা বিক্রয় করিবার কথা ভাবিতে পারে তাহা বিশেষ ভাবে ভাবিবার বিষয়। মুস্লিম লীগের অনাচার ও অত্যাচারের দৃষ্টান্তে উত্তর ও পূর্ব্ব বাংলার হিন্দুদের পক্ষে ভরসা পাইবার কোনও কারণ এখনও দেখা যাইতেছে না, তবুও নূতন বঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গে যতক্ষণ নূতন রাষ্ট্রের আইনাদি কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, ততক্ষণ হতাশা ও ত্রাসে বাড়ী-ঘর বিক্রয় করিয়া পলায়ন যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, ইহা দ্বারা এই গুরুতর সমস্যার কোনও সমাধান হইবে না।" এ-সমস্যার সমাধান বাঙ্গলার নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী করিতে পারিবেন কি না জানি না। ভীত, সন্ত্রস্ত এবং উৎপীড়িত মানুষকে নিরাপত্তা এবং আশার কথা—কেবল 'কথায়' দিলে কোন কাজ হইবে না। তাহাদের মনে বল-সঞ্চার করা দরকার। এ জন্য প্রয়োজন হইলে আমাদের লীগীয় পন্থায় পাকিস্তানী প্যাঁচও প্রয়োগ করিতে হইবে। নেতৃবর্গের ইঙ্গিত পাইলে জনগণ তাঁহাদের অনুসরণ করিবে।

* * * * * *

'ঢাকা-প্রকাশে' প্রকাশিত নিম্নলিখিত বিষয়টি আশা করি সর্ব্ব-সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে। লীগ সরকারের 'সত্য'-শিক্ষা প্রচার চেষ্টাও সামান্য বুঝা যাইবে: "১৯৪০ সালে রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর এক প্রশ্নের উত্তরে মৌলভী ফজলুল হক বলিয়াছিলেন, মক্তবে হিন্দু ছাত্রদের মোট সংখ্যা ৭৪৫০৬ (এসেম্বলী প্রসিডিংস্ ১৩২-৪১ পৃঃ ২৯৫) সংস্কৃতির দিকে হইতে ইহা শুধু আপত্তিকর নহে, সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থের পক্ষে অনিষ্টকরও বটে।

(ক) ধর্ম্মসম্পর্কে শিক্ষা বর্ত্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার অংশবিশেষ। এই শিক্ষা ব্যাপারে শুধু যে কোরাণের নির্দ্দেশ প্রভৃতি ধর্ম্মতত্ত্বই শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা নয়, নামাজ কোরবাণী প্রভৃতি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদিও শিক্ষা দেওয়া হইবে। বাঙ্গলার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই এক জন শিক্ষক। (১৯৩৬-৩৭ সালে এই সংখ্যা ছিল শতকরা ৪৭টি, ইহার পর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে)। যেখানেই এই এক জন শিক্ষক মুসলমান হইবে অমুসলমান ছাত্রগণ শুধু যে কোন ধর্ম্মশিক্ষা পাইবে না তাহা নয়, ইসলাম ধর্ম্মের শিক্ষা ও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান তাহাদের শিক্ষা করিতে হইবে।

(খ) প্রাদেশিক পাঠ্যপুস্তক কমিটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত পুস্তক এই সকল বিদ্যালয়ে পড়ান হইবে এবং এই কমিটি গভর্ণমেন্টের মনোনীত। এই কমিটি এমন সমস্ত পুস্তক পাঠ্য করিয়া থাকেন যাহা ইতিহাসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, ভাষাকে বিকৃত করে এবং অমুসলমানদের আঘাত লাগিতে পারে এরূপ বিকৃতিতে পূর্ণ। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে—

(১) মোহাম্মদ মোবারক আলি-প্রণীত "মক্তব-মাদ্রাসা সাহিত্য" ১ম ভাগ—'পাক্ কোরাণের ধর্ম্মই একমাত্র সত্যধর্ম্ম—কোরাণ শরীফ পড়িলে সওয়াব হয়, মন পবিত্র থাকে—বাটীতে কোরাণ শরীফ পাঠ করিলে বালামসিতে কাটিয়া যায়।'

(২) খান বাহাদুর কাজী ইমদাদুল হক বি-টি, প্রণীত "প্রবন্ধমালা"—'প্রথম লোকমা মুখে তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের তরবারির আঘাতে মেহমালের ছিন্নমস্তক দস্তরখানে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।'

(৩) মৌঃ আবদুল সাত্তার প্রণীত "ভারতবর্ষের ইতিহাস" (মক্তবের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ও জুনিয়ার মাদ্রাসার পাঠ্য)—'আওরঙ্গজেব অতিশয় নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। ইসলাম ধর্ম্মের প্রতি সম্রাটের এইরূপ অনুরাগ দেখিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সংঘবদ্ধ ভাবে সমস্ত রাজ্যব্যাপী হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে ও ইসলাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে নানারূপ কুৎসা রটাইতে আরম্ভ করে—সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রজা-সাধারণের উন্নতিকল্পে সর্ব্বশুদ্ধ ৮০ প্রকার টেক্স উঠাইয়া দিয়া কেবল মাত্র জিজিয়া ও ডাকাত এই দুই প্রকার কর আদায় করিতেন।" মন্তব্য প্রয়োজন নাই। কেবল এই কথাই ভাবিতেছি, সুরাবর্দ্দি সাহেব এবং সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী হয় সম্রাট্ আলমগীরের মতই পরম নিষ্ঠাবান ইসলামী মুসলমান কি না? বর্ত্তমানে 'জিজিয়া' অন্ত ভাবে আদায় হইতেছে।

* * * * * * *

'প্রদীপে'র আশা-নিরাশার কথা: "আমরা মেদিনীপুরের হিন্দুরা চিরদিন প্রতিবেশী মুসলমানদের সহিত শান্তিতে ও সৌহৃদ্যে বাস করিয়া আসিয়াছি। আজও সেইরূপ পরস্পরের সুখ-দুঃখে মিলিয়া মিশিয়া শান্তি ও সখ্যে কালযাপন করিতে চাই, কিন্তু মুসলমান ভাইগণ যদি না চাহেন, তাহাদের যুবকদের কেহ কেহ যদি মধ্যে মধ্যে ঝগড়া বাধাইবার উস্কানি দিয়া লোকের মন খারাপ করেন এবং কোন কোন স্থলে ঝগড়া বাধাইয়া দিয়া এস, ডি, ও, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সাহেব প্রভৃতিকে 'আমরা গেলাম', 'হিন্দুরা আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবার যোগাড় করিতেছে, শীঘ্র আসুন', 'রক্ষা করুন'—এই সব বলিয়া টেলিগ্রাম করিতে থাকে, তখন আমরা কি করিতে পারি?" জেলা কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত কুমারচন্দ্র জানা মহাশয় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে নিতান্ত দুঃখের সহিত এই কথাগুলি বলেন। তিনি আরও বলেন যে, "এই জেলায় যতগুলি সাম্প্রদায়িক অশান্তির কারণ ঘটিয়াছে তাহার প্রায় সবগুলিতেই মুসলমানগণ আগে প্ররোচনা দিয়াছে বা আক্রমণ করিয়াছে দেখা যায়। হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াও সব সহ্য করে। সুতরাং মুসলমানদের তিনি এই মনোবৃত্তি পরিহার করিতে অনুরোধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে জোরের সহিত তাহাদিগকে ভরসা দেন যে, তাঁহারা যদি ধীর ভাবে স্থির-বিশ্বাসে মিলিয়া মিশিয়া হিন্দুদের সহিত পূর্ব্বের মত সদ্ভাবে বাস করেন, তাহা হইলে তিনি বা কংগ্রেস জীবিত থাকিতে কেহই তাঁহাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না।" এ-সমস্যা আর বেশী দিন থাকিবে না। 'রোগ' ধরা পড়িয়াছে, এবং তাহার চিকিৎসারূপ শান্তির ব্যবস্থাও অবিলম্বে হইবে। সকল স্থানের না হইলেও পশ্চিম-বঙ্গের মুসলমানদের 'পশ্চিম' দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকা বেশী দিন চলিবে না। হয়, তাঁহারা বাঙ্গালী হইয়া থাকিবেন। আর না-হয়, বাসা বদল করিতে হইবে। আমরা বাঙ্গালী মুসলমানদের একান্ত ভাবে নিজেদের ভাই বলিয়াই মনে করি, এবং করিব। সকল বাঙ্গালীর ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা সমভাবেই আমরা করিতে পারিব।

* * * * * * *

'বাঙ্গলার কথায়' প্রকাশ: "ক্যালকাটা টারমিনাল ফ্যাসিলিটিস কমিটি কলিকাতায় শূন্যে একটি সাত মাইল দীর্ঘ রেল-লাইন নির্ম্মাণ সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। নিমতলা ঘাট হইতে লাইন দ্বারা শিয়ালদহ ও হাওড়া ষ্টেশনকে যুক্ত করিয়া ইডেন গার্ডেনে এই লাইন শেষ হইবে। ফেয়ারলী প্লেসে ইহার একটি ষ্টেশন থাকিবে। প্রতি মাইলে ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে হিসাব করা হইয়াছে।" বর্ত্তমানে বোধ হয় এ-পরিকল্পনা বন্ধ রহিল। প্রথমতঃ, নিমতলা ঘাটে স্থানের একান্ত অভাব; দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমান 'কর্ত্তাদের' ভবিষ্যৎ-ই এখন শূন্যে ঝুলিতেছে, কাজেই শূন্যেও রেল-লাইন পাতিবার যায়গা নাই। এ-বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের কোন হাত আছে কি?

* * * * *

খৃষ্টীয় কর্ম্মীসঙ্ঘের মুখপত্রিকা "কর্ম্মী" বলিতেছেন: "এ কথা সত্য যে হিন্দুর নানাবিধ নাগপাশে আবদ্ধ মুশ্লীম নানা ভাবে পীড়িত, ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ। পাকিস্থানই যে সে অবিচারের ঔষধ তাহা আমরা বলিতে পারি না। গভর্ণমেণ্ট, কর্পোরেশন, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যাল আফিস, আদালতে হিন্দু-প্রাধান্য আছে তাহা অতি সত্য কথা। দেশ শাসন ব্যাপারে মুশ্লীম ও খৃষ্টীয়ান এক রকম বাদ পড়িয়াছিল। আজও তাহার সমুচিত প্রতিকার হয় নাই। আজ বাংলায় মুশ্লিম সংখ্যাধিক্য বলিয়া যে হিন্দুরা স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করিতে চান, তাহা নহে। মুশ্লীম লীগ সরকার বঙ্গদেশে কোনো সমাজেরই কল্যাণ সাধন করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের কার্য্যে ঘোরতর গলদ, অবিবেচনা ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতা বর্ত্তমান। খৃষ্টীয় সমাজও লীগ সরকারের নিকট কোনো সুবিচার পায় নাই। যদি লীগ সরকার বঙ্গদেশে স্থায়ী শান্তি ও সম্পদ আনিতে পারিতেন তবে আমরা অকুণ্ঠচিত্তে তাঁহাদের সমর্থন করিতাম। কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করি যে আমরা তাহা পারিব না।" সত্য কথা, কাজেই এই মন্তব্যের কি জবাব লীগ দিবে তাহা বলিতে পারি না। 'বর্ণ-হিন্দুর নহে, উপরিউক্ত মন্তব্য একেবারে খাঁটি খৃষ্টানী সমাজের। 'কর্ম্মী' ১৬।৮।৪৬ হইতে আজ পর্য্যন্ত পাকিস্তানীদের দ্বারা কত ভাবে খৃষ্টান সমাজ নির্য্যাতিত হইয়াছেন, তাহার একটা তালিকা এই সঙ্গে দিলে ভাল হইত। এ-বিষয় আমাদের কিছু কিছু জানা আছে।

* * * * * *

'নীহার' বলিতেছেন: "কাঁথির জোতদার ও মহাজনগণ কৃষকগণের নিকট হইতে বে-আইনী ভাবে যে ট্যাক্স আদি আবওয়াব আদায় করেন, স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মিগণের প্রচেষ্টায় তাহা বন্ধ করিবার জন্য সাফল্যের সহিত একটি আন্দোলন চলিতেছে। অধিকাংশ জোতদার যদিও এই শোষণমূলক ব্যবস্থা বন্ধ করিয়াছেন তথাপি কয়েকটি অত্যুৎসাহী মালিককে এই উৎপীড়ন ব্যবস্থা চালাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প দেখা যাইতেছে। যে সমস্ত কৃষক আবওয়াব বন্ধের আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল, তাহাদিগকে চাষ করিবার জন্য জমি না দিয়া ও অন্যান্য নানা উপায়ে জব্দ করিবার জন্য এই শোষক জোতদারগণ ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন। তা' ছাড়া মজার কথা এই হইতেছে যে, কৃষকগণ কবুলিয়ত হিসাবে সাদা কাগজে অথবা কৃষক-স্বার্থের পরিপন্থী সর্ত্তযুক্ত কবুলিয়তে সহি না

করিলে এই মালিকরা তাহাদিগকে চাষের জন্য জমি দিতেছে না। ফলে কোথাও কোথাও চাষীরা এখনও বীজ বপন করিতে পারে নাই। কোথাও বা চাষী জমিতে লাঙ্গল ফেলায় মালিক সেই লাঙ্গল তুলিয়া দিতেছে। এই সব কারণে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাট বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে ও কোথাও কোথাও আশু শান্তিভঙ্গের কারণ ঘটিবার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কাঁথি থানার নামালডিহা ও পরিহরা প্রভৃতি অঞ্চলে চাষী-মালিক বিরোধের ফলে এখনও না কি পতুল ধান্যের গাদা বসিয়া আছে ও বর্ষায় পচিতেছে। এ অবস্থায় কৃষকগণকে অনুরোধ যে, তাঁহারা যেন কংগ্রেসের আদর্শ অনুসারে শান্তিপূর্ণ ভাবেই তাঁহাদের দাবী পূরণের চেষ্টা করেন এবং তাঁহাদের মনের মধ্যে যেন আপোষমূলক মনোভাব থাকে। আর শোষক ও উৎপীড়ক মালিকগণকে কেবল মহাত্মা গান্ধীর এই বাণীটুকু নিবেদন করিতেছি যে, "চাষাই জমির প্রকৃত মালিক।" "ধনিক যদি স্বেচ্ছায় তার ধনলিপ্সা ও শক্তি-মদমত্ততাকে পরিত্যাগ না করে, তবে রক্তাক্ত বিপ্লব অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে।" এ সমস্যা কেবল মাত্র কাঁথির নহে। ভারতের সর্ব্বত্রই ইহা কোন না কোন আকারে দেখা যাইতেছে। কোন্ সামান্য সূত্র ধরিয়া ভারতবর্ষে গণ-বিপ্লব দেখা দিবে, তাহা বলা কঠিন; কারণ গত কিছু কাল হইতে অনেকগুলি লক্ষণ আমাদের চোখে পড়িতেছে। বিশেষজ্ঞগণ হয়ত এ-বিষয় আরো ভাল করিয়া বলিতে পারিবেন। তথাকথিত ভারতীয় কমিউনিষ্ট সম্প্রদায় 'গোঁফে তেল' দিতেছে, তাহাও দেখা দরকার।

* * * * *

বগুড়ার 'করতোয়া' পাঠ করিয়া জানা যায়: "সহরে সূতা সরবরাহের অব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। দুই মাস নীরব থাকিবার পর বর্ত্তমান মাসে তন্তুবায়দিগকে যে সূতা দেওয়া হইল তাহার পরিমাণ অতি নগণ্য। প্রতি তাঁত-পিছু মাত্র অর্দ্ধ বাণ্ডিল। ইহা দ্বারা এক সপ্তাহ চলিতে পারে। এপ্রিল ও মে মাসের সূতার কোটা (Quota) না দেওয়ার ফলে তন্তুবায়দিগকে দুই মাস তাঁত বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে যাহাদের বস্ত্রবয়নই জাত-ব্যবসা এবং অন্য কোন উপার্জ্জনের সুযোগ বা সুবিধা নাই তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। ইহার জন্য দায়ী কে? সূতার কনট্রোল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সহর ও মফঃস্বলে কতিপয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি তাঁতের কারখানা খুলিয়া ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অথচ ১১৪১ সালের সেন্সাস (census) অনুযায়ী তন্তুবায়দের সংখ্যার অনুপাতে সূতার যে কোটা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল তদনুযায়ীই সূতা সরবরাহ হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ বাড়তি তাঁতের জন্য সূতার কোটা বাড়াইতে পারেন নাই। অথচ তন্তুবায়গণের সূতার কোটা কমাইয়া তাঁতের মালিকগণকে সূতা দিয়া তাঁহাদের নূতন ব্যবসায় উৎসাহ যোগাইয়াছেন—আর বিত্তহীন তাঁতীদিগকে রাখিয়াছেন বুভুক্ষু।" বাঙ্গলার লীগ-মন্ত্রিমণ্ডলীর শাসন-ধারা এবং পদ্ধতির সহিত যাঁহাদের সামান্য পরিচয় আছে বা ঘটিয়াছে, তাঁহারা 'করতোয়ার' কথায় বিস্মিত হইবার কোন নূতন কারণ পাইবেন কি?

* * * * * *

'বীরভূম-বাণীর' সম্পাদকীয় হইতে সামান্য অংশ উদ্ধৃত হইল: "আবার এক পত্রলেখক 'আজাদে' লিখছেন যে কলিকাতায় মাড়োয়ারী, বেহারী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি অবাঙ্গালী হিন্দুকে বাদ দিলে বাঙ্গালী বর্ণহিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ও তপশীলি হিন্দু একযোগে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। সুতরাং কলিকাতা তাদের চাই। আবার আজমীড় শরীফ, আগ্রা, দিল্লী মুসলিমদের পুণ্যভূমি—সুতরাং তাও তাদের প্রয়োজন। গরজ বড় বালাই। কাজেই বংশপরম্পরায় বাসিন্দা অবাঙ্গালী বাদ দাও আবার তপশীলি হিন্দুদের মুসলমানদের মধ্যে ধর—এবং এই ভাবে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য বিবেচনা করে কলিকাতা দাও। আর দিল্লী, আগ্রা, আজমীড় যখন পুণ্যভূমি তখন তো তাদের পেতেই হবে! এও আঠারো আনা।

আবার গান্ধীজি বলছেন, পাকিস্থান বাদে অবশিষ্ট অংশ ভারতকে হিন্দুস্থান বল না—কারণ সেখানেও মুসলমান আছে বা থাকবে। এবং সেই সঙ্গে বলেছেন, সংখ্যালঘিষ্ঠদের কি দেবে তা শীঘ্র ঠিক কর। গান্ধীজি যখন বলছেন তখন তো ঠিক হয়েই গেল যে এই সংখ্যালঘিষ্ঠদের দিতেই হবে। তোষণ-নীতি পুরামাত্রায় চলবে।

কিন্তু মধ্যপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত শুক্ল সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন যে ভারত বিভাগের পর হিন্দুস্থানে মুসলমান alien হিসাবেই বসবাস করবেন।

আমরাও বলি যে মুসলমানদের পৃথক্ Home land হিসাবেই যখন পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠা তখন তাহাদের Home land হিসাবে কোন দাবী এধারে থাকিতে পারে না। তাহারা alien হিসাবেই থাকিবে। কিন্তু ইতিমধ্যে যাহাতে ষোল আনা আঠারো আনায় পরিণত না হয় বা আমাদের বারো আনা আট আনায় পর্য্যবসিত না হয় তজ্জন্য প্রত্যেক হিন্দুর সব দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।" কর্ত্তব্য পালন সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহা ছাড়া আর কোন মন্তব্য নাই।

* * * * *

'বর্দ্ধমান-বাণীতে' প্রকাশ: "কিছু দিন পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধীকে লইয়া উকিলখানায় বড় বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছে। কয়েক জন মেম্বার মহাত্মাকে "দুরাত্মা" "গেন্দো বেটা" প্রভৃতি ভাষায় ভূষিত করিয়াছেন ও কেহ কেহ তাঁহার সহিত আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাকে "মহাত্মা" বলিয়া সম্বোধন করা হইবে বা "মিষ্টার" বলা হইবে এই লইয়া ভোটাভুটি হইয়া গিয়াছে। এক জন বলিলেন, তাঁহাকে "মহাত্মা" বা "মিষ্টার" না বলিয়া "গান্ধীজী" বলা হউক। ভোটে চরমপন্থী দল ২২ ভোট ও নরমপন্থী দল ১৬ ভোট পাইয়াছেন, ফলে মন্তব্যে তাঁকে "মিষ্টার" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।" এত বড় অসভ্যতা এবং অভদ্রতা সম্বন্ধে মন্তব্য

করিতেও লজ্জা হইতেছে। মানীর সম্মান যাহারা রাখিতে জানে না, তাহাদের একমাত্র ঔষধ অঙ্গের স্থান-বিশেষে বিছুটি নামক ওষধির প্রয়োগ এবং ঘন ঘন প্রয়োগ! ইহারা এমন পাকিস্তানী অসভ্যতা শিখিল কোথা হইতে?

*

বগুড়ার 'করতোয়া' সম্পাদক বলিতেছেন: "গত ২৪শে মে তারিখে বগুড়া জেলা বোর্ড কর্ম্মচারী-সঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বোর্ডের দ্বিতীয় ভাইস চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ করা হইয়াছে। তিনি প্রায় দুই হাজার টাকা কমিশনের আশায় কর্ম্মচারীদের প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের ১৫,০০০৲ টাকায় ন্যাশন্যাল সেভিংস সার্টিফিকেট খরিদ করিয়াছেন। ১২ বৎসরের জন্য এই টাকা আটকাইয়া থাকায় এবং প্রতি বৎসর ইহার সুদ প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা না থাকায় কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা এই সময়ের মধ্যে অবসর গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা ও লভ্যাংশ প্রাপ্তির অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছে।" সহযোগী 'বগুড়ার কথায়' তিনি ইহার প্রতিবাদে ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, তিনি বে-আইনী ভাবে কোন কমিশন গ্রহণ করেন নাই। অর্থাৎ ন্যায্য মত তাঁহার যে কমিশন পাওনা হয়, তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন, এক পয়সাও বেশী গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় স্বায়ত্ত-শাসন আইনের ১৪৪ ধারায় বলা হইতেছে:—"If any member of a District Board or Local Board or any officer or servant maintained by or employed under a District Board or Local Board has, directly or indirectly, any share or interest in any work done by order of the District Board or Local Board of which he is a member, or by which he is maintained or under which he is employed, or in any contract with or under such District Board or Local Board, he shall be liable on conviction before a Criminal Court to a fine which may extend to five hundred rupees." বাঙ্গলা সরকার এ-বিষয়ে কি করিয়াছেন? আইন ভাঙ্গিয়াও ভক্ত-পালন চলিবে? তবে বিচার হইলেও দ্বিতীয় ভাইস চেয়ারম্যানের চিন্তার কারণ নাই, কারণ ৫০০৲ টাকা জরিমানা দিয়াও তাঁহার ১৫০০৲ টাকা লাভ থাকিবে!

* * * * * *

'মেদিনীপুর-হিতৈষী' বলিতেছেন: "মেদিনীপুর জেলার চা ও খাবারের দোকানগুলি জেলার কলঙ্ক। রাত্রিদিন মাছির উৎপাতে এবং লাল ধূলার স্পর্শে খাদ্যদ্রব্যের কি যে অবস্থা হয় তাহা ভুক্তভোগীই জানেন। বরং ঝাড়গ্রাম এবং খড়গপুরের দোকানগুলি কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন. কিন্তু মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন সহরটির অবস্থা কামনাও করা যায় না। অথচ শিক্ষিত, অশিক্ষিত নির্ব্বিবাদে এই দুরবস্থার প্রতি উদাসীন! মিউনিসিপ্যালিটীর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অনবহিত কেন? খাবারের দোকানে খাবারগুলি কাচের আলমারিতে বা পাতলা জাল দেওয়া সেল্ফের মধ্যে রাখা আবশ্যক। দুই তিন হাত এঁদো ঘরে চায়ের দোকান করিতে দেওয়া জনস্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীনতার পরিচায়ক। শুধু তাহাই নহে, ভাল খাবারের ও চায়ের দোকান না থাকায় অন্যান্য জেলাবাসীর নিকট মেদিনীপুর মান-মর্য্যাদার দিক দিয়াও ছোট হইয়া যায়। সহরবাসী কি এ বিষয়ে ভাবিয়া যথাকর্ত্তব্য করিবেন?" 'মেদিনীপুর-হিতৈষী' এ-বিষয়ে বেশী দুঃখ করিবেন না। তিনি হয়ত জানেন না, বড় শহর কলিকাতার অবস্থা ঐ বিষয়ে কত চমৎকার! কলিকাতার পুলিশ ও কর্পোরেশন লাইসেন্স-ফি এবং খাজানা আদায় করিয়াই তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ করে। শহরবাসী চা এবং খাবারের দোকানে (সম্প্রতি বন্ধ রহিয়াছে) তাহাদের ঋণ শোধ করে। জনমত গঠিত না হইলে প্রতিকারের আশা নাই।

* * * * * *

'জিন্দেগী' (মুসলীম) পত্রিকা ভবিষ্যৎবাণী করিতেছেন: "সে দিন কুখ্যাত নলিনীরঞ্জন সরকারও বলিয়াছেন যে, হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর একত্রে পাকিস্তানে বসবাস করিবে—যেমন আগেও করিয়া আসিয়াছে। আমরা ইঁহাদের পরিবর্তন, নর্তন, ও কুর্দন লক্ষ্য করিয়া রীতিমতো বিরক্ত ও ইঁহাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি। হিন্দুমনের ও মতের এবং রাজনীতির মধ্যে যদি হিন্দুসাধারণ সমতা না আনিতে পারেন, আমরা কেবল সতর্ক করিয়া দিয়াই খালাস, তাহার ফলে দেশব্যাপী যে উৎকট আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবেই—যাহাতে হিন্দু-সাধারণ বানের মুখে কুটার মতোই ভাসিয়া বৈতরণী পাড়ে পৌছিয়া যাইবেন।" হিন্দু-মুসলমানের একত্র বসবাসের কথা সুখ্যাত সুরাবর্দ্দি এবং অন্যান্য মহাখ্যাত পাকিস্তানী বীরবৃন্দও সম্প্রতি বলিতেছেন। আশা করিতে ইহাতে দোষের কিছু নাই। 'জিন্দেগী' হিন্দুদের ভবিষ্যৎ লইয়া অযথা বিব্রত হইবেন না। পাকিস্তানের যে রূপ দেখিতেছি, তাহাতে "বৈতরণী 'পাড়ে,"—[পাড়ে নহে, পারে হইবে—বেকুফ জিন্দেগী (জিন্দেগী নহে, জিন্দাগী ZINDAGI) সম্পাদক ভুল সংশোধন করিবেন] খুব খারাপ স্থান হইবে না। কিন্তু মুসলমানগণ কোথায় যাইবে? পাকিস্তানী শাসনে মুসলীম জনগণের অবস্থা কি হইবে, তাহা পূর্ব্ববঙ্গের দিকে দৃষ্টি দিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

* * * *

বাঙ্গলা দেশে ১৩৫০ সালের অপেক্ষাও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দেখা দিতেছে। বিভিন্ন স্থান হইতে চাউলের মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্যতার যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ ঘনীভূতই হইতেছে। বিভিন্ন স্থানের অবস্থা:—

"পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রারম্ভিক দিনগুলির দৃশ্যাবলী ঢাকায় সম্প্রতি দেখা যাইতেছে। গ্রামাঞ্চল হইতে প্রত্যহ বহু নরনারী সহরের রেশন অঞ্চলে আসিতেছে এবং বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া এক মুষ্টি ভাত বা চাউলের জন্য করুণ সুরে আবেদন করিতেছে। জিলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যে-সব খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে জানা যায়, অনেক অঞ্চলে চাউল একেবারেই পাওয়া যায় না। কোন কোন

অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে চাউল পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহা ৩৫৲ টাকা দরে বিক্রয় হয়। অনেককে অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতে হইতেছে এবং কেহ কেহ ভাতের বদলে নানা প্রকার বাজে জিনিষ খাইয়া কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতেছে এবং ফলতঃ সহজেই নানা রোগগ্রস্ত হইতেছে। প্রকাশ যে, জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারী গুদামে চাউল মজুতের পরিমাণ খুবই কম। পল্লী অঞ্চলে চাউল সরবরাহ করিবার জন্য অসামরিক সরবরাহ বিভাগকে বিশেষ কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দেখা যাইতেছে না। সুতরাং পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থা ক্রমেই অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে।

বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থান হইতে ধান ও চাউলের মূল্য বৃদ্ধির আরও সংবাদ আসিতেছে। সন্দীপে চাউলের মূল্য মণ-প্রতি ৩২৲ টাকা উঠিয়াছে এবং আরও বাড়িবার সম্ভাবনা।

গোপালগঞ্জের (ফরিদপুর) অবস্থা সঙ্কটজনক বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে মোটা চাউল ২৮৲ মণ, আতপ চাউল ৩২৲ মণ ও ধান ১৮৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। আউশ ফসলের অবস্থাও আশাপ্রদ নহে।

পাবনা সহরে ২৫৲ টাকা মণ দরে এবং মফঃস্বলে তাহা অপেক্ষাও ১৲ টাকা বেশী মূল্যে চাউল বিক্রয় হইতেছে। বাজারে চাউল পর্য্যাপ্ত পাওয়া যায় না এবং আরও মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

রাজবাড়ী হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায় যে, সমগ্র মহকুমাব্যাপী খাদ্যের অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিতেছে। বিভিন্ন স্থানে চাউলের মূল্য ২৩৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা।

কুড়িগ্রামে (রংপুর) ২১৲ টাকা মণ দরে চাউল ও ১১৲ টাকা মণ দরে ধান্য বিক্রয় হইতেছে। দীর্ঘ কাল অনাবৃষ্টির জন্য আগামী ফসলের অবস্থাও অনিশ্চিত।

ফরিদপুর জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারী শ্রীযুত দুর্গাশঙ্কর বসুর এক বিবৃতিতে জানা গিয়াছে যে, নড়িয়া, পালং, ভেদরগঞ্জ, আঙ্গারিয়া ও চিকন্দীসহ মাদারীপুর পূর্বাংশে ৩৫৲ টাকা হইতে ৩৬৲ টাকার মধ্যে চাউল বিক্রয় হইতেছে। বৃহত্তর চাউল-কেন্দ্র মাদারীপুর ও চরমুগারিয়ায় চাউলের মণ ৩৩৲ টাকা হইয়াছে। সরকারী নিয়ন্ত্রিত দোকানগুলিতে সরবরাহ নাই বলিলেই চলে। সহস্র সহস্র নরনারী খাদ্যাভাবে অনশনে দিন কাটাইতেছে। সমগ্র ফরিদপুরেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে।

কৃষ্ণনগর টাউন কেন্দ্রীয় ফুড কমিটির এক সভায় নদীয়া জেলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলার বলেন যে, চাউল সরবরাহ সম্বন্ধে তিনি কোন নিশ্চয়তা দিতে পারেন না এবং সহর হইতে অন্যত্র চাউল রপ্তানিও তিনি আইনতঃ বন্ধ করিতে পারেন না, কারণ ২০ মণের অধিক চাউল যে কোন ব্যক্তির সরাইয়া লইয়া যাইবার আইনতঃ অধিকার আছে। তিনি স্বীকার করেন যে, বহু পরিমাণ চাউল বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং অবিলম্বে যদি সরবরাহ না পাওয়া যায়, তবে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা আছে। তবে জেলায় এখনই দুর্ভিক্ষের অবস্থা বিদ্যমান—ইহা তিনি অস্বীকার করেন।

জলপাইগুড়িতে চাউলের মূল্য ক্রমেই বাড়িতেছে। বর্তমানে মণ প্রতি ২০৲ টাকা হইতে ২৩৲ টাকার মধ্যে উঠা-নামা করিতেছে। গত ৩ মাস যাবৎ আটা অথবা গমজাত কোন প্রকার খাদ্যের একেবারেই সরবরাহ নাই।"

ইহার পরে যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, অবিলম্বে আর একটি দিনও নষ্ট না করিয়া, যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করা হয় ১৯৪৭ সালে বাঙ্গলার লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরিবে। লীগ-মন্ত্রিমণ্ডলীর দল পাকিস্তানী প্রোপাগাণ্ডা এবং ডাণ্ডা লইয়া অন্যত্র অন্য কাজে ব্যস্ত রহিয়াছেন। জনসাধারণের জীবন-মরণের ব্যাপারে তাঁহাদের কোন দায়িত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্ববঙ্গের কথা ভাবিবার অধিকার হয়ত আমাদের আর নাই, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ মরিলে আমরা বাঁচিব কি না সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। পূর্ব্ব হইতে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। কিন্তু লীগ-সরকারের খাদ্য-বিষয়ে চিন্তা করিবার সময় হইবে কি? সময় যখন তাঁহাদের হইবে, তখন আর চিন্তার প্রয়োজন হয়ত হইবে না।

* * * * * *

পূর্ব্ব-পাকিস্তানের চাষী-মজুর সাধারণের একমাত্র অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জিন্দেগী' বলিতেছেন 'কুচপরোয়া নাহি!'

"পাকিস্তান, হিন্দুস্থান ভাগাভাগির পর হিন্দুস্থান ও জাভা দুই-ই আমাদের কাছে বিদেশ হিসাবে গণ্য হইবে এবং আমরা যেখান হইতে অল্প মূল্যে জিনিস পাইব, সেখান হইতেই কিনিব। হিন্দুস্থানের যদি সুবুদ্ধি হয় ভাল,—না হয় কুচপরওয়া নাই। অবশ্য এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, কোন জাতি চিরকাল পরমুখাপেক্ষী হইয়া বাঁচিতে পারে না। আমাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে—নিজেদের শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে। এখন দেখা যাউক, পাকিস্তানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার মত প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি কতখানি আছে, কতখানি নাই। শ্রমিকের অভাব আমাদের নাই—মূলধনেরও অভাব হইবে না—এবং যদি পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী সম্পত্তি হিসাবে গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পায় তাহা হইলে ত কথাই নাই।" অভাব দেখিতেছি পূর্ব্ববঙ্গের কোন দ্রব্যেরই নাই। নিজের পায়ে দাঁড়াইবার ইচ্ছাও প্রবল। কিন্তু দূর-ভবিষ্যতের গৌরবময় পাকিস্তানের কথা চিন্তা না করিয়া নিকট-ভবিষ্যতের খাদ্যসমস্যা মিটাইবে কে এবং কিসে? অবশ্য 'জিন্দেগী' যদি বলেন যে ৭০।৮০ লক্ষ লোক মরে মরুক—'কুচপরোয়া নাই'—তাহা হইলে আমাদের কিছু বলিবার নাই। গন্ধর্ভী স্বর্গে বাস করা হয়ত ভাল কিন্তু গর্দ্দভী-মৃত্যু সুখকর কি না বলিতে পারি না। লুঙ্গি পরিধান করিয়া 'জিন্দেগী' সম্পাদক এমন করিয়া মালকোঁচা মারিতে শিখিলেন কোথা হইতে? মন্দের ভাল যে, পূর্ব্ববঙ্গের শতকরা ৯৭ জন কৃষক-মজুর-সাধারণ লেখাপড়ার ধার ধারে না!

'জিন্দেগী' পত্রে মঃ ছদ্মনামে এক জন মুসলীম 'পিটুলী-গোলা' করিয়াছে : "কাগজ-কলম লইয়া হিসাব করিতে বসিলাম। দেখা যাক কোথাকার পানি কোথায় যাইয়া গড়ায়। ধরিয়া লইলাম, এক মাত্র পাট এবং কিছু খাদ্যশস্য ছাড়া আমাদের আর কিছুই নাই। আরো ধরিয়া লইলাম ভাগাভাগি শেষে হিন্দুস্থান, পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক চাপে চ্যাপ্টা করিয়া ছাড়িবার চেষ্টা করিবে—অর্থাৎ তাহারা চিনি, কাগজ, কাপড়, কয়লা, লোহা কিছুই আমাদের দেবে না।

নাই বা দিল। ক্ষতি কি। যাভার চিনি হিন্দুস্থানের চিনির চেয়ে অনেক সস্তায় আমরা পাইব। কানাডার কাগজ, বিলেতি কাপড় সমস্তই হিন্দুস্থানী কাগজ-কাপড়ের চেয়ে সস্তা পড়িবে।

পাট, কাঁচা চামড়া ইত্যাদির পরিবর্ত্তে আমরা বিদেশ হইতে প্রচুর কয়লা, লোহা পাইতে সক্ষম হইব। আমাদের দরদী হিন্দুস্থানী ভাইয়ারা এ কথাটা জানেন বলিয়াই তাহাদের চিত্ত এবং পিত্ত দুই-ই প্রকুপিত হইয়াছে।

আরো একটা কথা—জাপানীদের কয়লা ছিল না, লোহা ছিল না, তুলা ছিল না, তদুপরি ঘন ঘন ভূমিকম্প ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পূর্ব্ব পৃথিবীর মানচিত্রে শিল্পপ্রধান দেশ হিসাবে জাপানের স্থান আদৌ নগণ্য ছিল না। পাকিস্তানেরও যে তেমন দিন নিশ্চয় আসিবে সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। কিন্তু এ জন্য চাই আমাদের একনিষ্ঠতা, একাগ্রতা, সাধুতা, সততা এবং মনোবল। পাকিস্তানের প্রত্যেকটি মানুষকে সর্ব্বান্তঃকরণে মনে রাখিতে হইবে, পাকিস্তানের সর্ব্বাঙ্গিন কল্যাণ "আমার" উপর নির্ভর করিতেছে এবং সেই মনোবৃত্তি লইয়াই কাজ করিয়া যাইতে হইবে—খোদা হাফিজ।"

পাকিস্তানে তাহা হইলে সবই সম্ভব হইবে। কেবল সামান্য একটু 'যদি' রহিয়াছে। যদি "আমাদের···সাধুতা,···সততা···"। এই যদিই এক দিন পাকিস্তানকে ডুবাইবে, কারণ বর্ত্তমান পাকিস্তানী নেতৃত্ব এবং তাঁহাদের চাল-চলন দেখিয়া ঐ দুইটি "যদি" ঘাটতি কোন দিনও পূরণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে 'জিন্দেগী' এ কথা বিশ্বাস করিবেন—পাকিস্তানের গৌরবময় ভবিষ্যৎ ভাবিবার সময় আমাদের বর্ত্তমানে নাই, এবং এ বিষয়ে আমাদের কোন প্রকার চিত্তদাহও কোন দিন হইবে না। স্বপ্ন-বিলাস অপেক্ষা কঠোর বাস্তবে আমরা বেশী বিশ্বাস করি। পাকিস্তানীর দলও অনতিবিলম্বে করিবেন।

* * * * *

লীগ-ভক্ত ডাক্তার মফিন উদ্দীন আহম্মদ, এম-বি ; এম-এস, এফ, এবং মৌলবী নফিজ উদ্দিন আহমদ, বি-এল সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'বগুড়ার কথা'য় প্রকাশিত : "মোহাম্মদ আলি মরিয়া বাঁচিয়াছে। কন্ট্রোল-কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত মোহাম্মদ আলি শেষ পর্য্যন্ত লড়িয়া, বিধ্বস্ত হইয়া বিংশতিবর্ষীয়া গর্ভবতী পত্নীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভব-নদী পার হইয়া গিয়াছে। হায়, চুয়াডাঙ্গার মোহাম্মদ আলি!

সে ছিল কৃষক, সহজ সরল কৃষক। কন্ট্রোলকে ফাঁকি দিয়া কাজে লাগাইবার বুদ্ধি তাহার ছিল না, যদি থাকিত তাহা হইলে সে মরিয়া বাঁচিত না, আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইত। সে নেংটি পরিয়া মাঠে যায়, দিনমান ক্ষেতে কাজ করে, বাড়ী ফিরিয়া আসে, বস্ত্রহীনতা গায়ে মাখে না। কিন্তু ঘরে ফিরিয়া মন তার দমিয়া যায়। নিজের পত্নীর সহিত মুখ তুলিয়া কথা বলিতে পারে না, যুবতী গর্ভবতী কৃষক-রমণীর পরিধানে শতছিন্ন বস্ত্রাবশেষ তাহাকে মর্ম্মান্তিক ভাবে আঘাত করে। মাসের পর মাস হাঁটাহাঁটি, সাধাসাধি, আবেদন নিবেদন করার পর ফুড কমিটির কর্ত্তারা মোহাম্মদ আলিকে একখানা ৯ হাত সাড়ির পারমিট দেয়। কিন্তু কাপড়ের ডিলার যিনি সেই প্রভু ৯ হাত সাড়ির পারমিটখানি লইয়া একখানি ৬ হাত সাড়ি দিয়া মোহাম্মদ আলিকে বিদায় করে। মোহাম্মদ আলি বেকুব বলিয়া সাড়িখানি পত্নীর হাতে দিয়া মাঠে নিজের কাজে চলিয়া যায়। অভাগিনী স্বামীর পণ্ডশ্রমে, ক্ষোভে-দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে। ঘটনার কিছুক্ষণ পরে মোহাম্মদ আলি বাড়ী ফিরিয়া আসে এবং স্ত্রীর মৃত্যুর ব্যাপার জানিতে পারিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যায় এবং সেও উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে। কত জায়গায় কত মোহাম্মদ আলি খাইতে না পাইয়া, ঔষধ-পথ্য না পাইয়া, কাপড় না পাইয়া দুঃখে কষ্টে অভাবে পড়িয়া মরিতেছে তাদের কথা কেউ জানে কি? বাংলার মুসলিম মন্ত্রীবর্গের এদিকে দৃষ্টি দিবার সময় নাই, তাঁহারা এখন মুসলিম রাজত্ব কায়েম করার কাজে লিপ্ত। সে কাজে তাঁহারা বাংলার রাজকোষ উজাড় করিয়া দিতেছেন, এখন কি আর মোহাম্মদ আলি আর গরীব আলির অন্ন-বস্ত্রাভাবের কথা তাঁহারা চিন্তা করিতে পারেন?

অথচ একদিন এই মোহাম্মদ আলির ভোট তাহাদিগকে আইন-সভায় পাঠাইয়াছিল, মন্ত্রিত্বের আসনে বসাইতে সাহায্য করিয়াছিল। এই হাজার হাজার মোহাম্মদ আলিকে নিয়েই ত সমাজ, ইহাদিগকে লইয়া ত দেশ। এরাই ত শীর্ণদেহ লইয়া মাঠে গিয়া ধনোৎপাদন করিয়া বাংলার রাজকোষ ভরাইয়া দিতেছে। এরাই ত খাদ্যের অভাবে, বস্ত্রের অভাবে, রোগে চিকিৎসার অভাবে ভুগিয়া মন্ত্রিদের বেতন যোগাইতেছে। মোহাম্মদ আলির মর্ম্মান্তিক মৃত্যুতে বাংলার মুসলমান কৃষক-সমাজের চৈতন্যোদয় হইবে কি না জানি না, যদি হয় তবে বাংলার মন্ত্রিদের সৃষ্ট বর্ত্তমানের কু-শাসন, কুব্যবস্থা ও অব্যবস্থার হাত হইতে সমাজ ও দেশ রক্ষা পায়।" অথচ এই 'বগুড়ার কথা'ই বাঙ্গলায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় একেবারে আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপানেই এই, ভবিষ্যৎ যে আরো কত মনোহর হইবে, তাহা কে জানে? কত মহম্মদ আলি এবং নবীন গয়লা মরিবে তাহার স্থিরতা নাই।

তেপান্তরের মাঠ

রঞ্জন ভাই

ধূ-ধূ করছে তেপান্তরের মাঠ······

সাত সমুদ্রের পারে আছে এক দেশ—সেই দেশে যেতে পারলে দেখতে পাবে এক গহন বনের ধার দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট এক নদী, সেই নদী যেতে যেতে যেখানে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছে—সেখানে যুগ যুগ ধরে ধূ-ধূ জ্বলছে কোন্ এক তেপান্তরের মাঠ······যত দূর চোখ মেলে দাও, নিয়ে এসো তোমার নীল পক্ষীরাজ, তার শাদা ডানা মেলে আকাশের দিকে উড়ে যেতে যেতে দেখতে পাবে, তোমার নিচে সেই তেপান্তরের মাঠ!

আর যেন কোথাও কিছু নেই!

মানুষের ঠিকানা হারিয়ে গেছে সেখানে, বনের সীমানা শেষ হয়েছে! শুধু দিন-রাত দেখতে পাবে ধূ-ধূ করছে মাঠ—মাঠের পর মাঠ—দিনের বেলায় জ্বলছে, রাতের শেষ প্রহরে জ্বলছে আর নিবছে······সেখানে জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই! শুধু হলুদ রঙের মাটি আর দিক্-দিগন্ত-ছোঁয়া আকাশের হারানো সীমানা······

তেপান্তরের মাঠ ডিঙিয়ে লক্ষ যোজন দূরে যেতে পারলে দেখতে পাবে সেই জনমানবহীন বিরাট মাঠের মাঝ-বরাবর মস্ত একটি তাল গাছ। গাছের পাতা সবুজ; কিন্তু গাছের দেহটা হলুদ। তার ওপরে রোদ এসে পড়লে গাছের সবুজ পাতা জ্বলে হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে। তার পর সূর্য ডুবে গেলে যখন সেই তেপান্তরের মাঠের বুকে নেমে আসে গভীর অন্ধকার, আকাশে ফুটে ওঠে নক্ষত্রের আলোকমালা,—তখন সেই ঝরে-পড়া হলুদ-পাতা আবার সবুজ হয়ে ওঠে। আবার সূর্য উঠলে তার ঝরে-পড়ার পালা। রাত থাকতে সেই তাল গাছের সবুজ পাতা কেটে নিয়ে তৈরি করতে হবে এক মোহন বাঁশী। সেই মোহন বাঁশীর সুরে সমস্ত তেপান্তরের মাঠ গুন্‌গুনিয়ে উঠবে। তোমার বাঁশী বাজবে। রাত শেষ হবার আগেই তোমার কাছে উড়ে আসবে এক ঈগল পাখী, তার পাখায় জ্বলবে সোনার আলো। সেই সোনার ঈগল তোমাকে নিয়ে যাবে তেপান্তরের মাঠ ডিঙিয়ে আর এক দেশে!

তার পর তোমার বাঁশীর সুর শুনে আলোর ঘুঙুর বেজে উঠবে—সেখানে দেখতে পাবে সোনার ঈগল তোমাকে নিয়ে এসেছে এক সমুদ্রের ধারে—নীল সমুদ্র। তোমার বাঁশী বাজবে······সমুদ্রের গভীর জলের ভেতর থেকে উঠে আসবে জলকুমার, সঙ্গে তার সপ্ত-ডিঙ্গা। নীল সমুদ্র পার হয়ে জলকুমার তোমাকে নিয়ে যাবে যে-দেশে, সেখানকার মাটি লাল আর নীল। সেই মাটির দেশে আছে এক রাজপুত্র—তার কাছে আছে বাজপাখী। সেই পাখীর পিঠে চড়ে তোমার যাত্রা শুরু হবে আবার কোন্ এক দেশে······সাত দিনের দিন ভোর হবার আগে তোমার বাঁশীর সুর শেষ হয়ে যাবে······তাল গাছের সেই সবুজ পাতা হলুদ হয়ে যাবে। সামনে তোমার বিরাট এক রাজপ্রাসাদ,—তার কোথায় লুকোনো আছে সোনার গাছে হীরের ফুল—এক গভীর সুড়ঙ্গ দিয়ে পাতালের দিকে নেমে যাবে—সেখানে দেখতে পাবে এক স্বপ্নের দেশ। তুলে নিয়ে আসবে সেই সোনার গাছের হীরের ফুল। তার পর সেই হীরের ফুল নিয়ে চলে যাবে সেই রাজপ্রাসাদের সব চেয়ে উঁচু ঘরের ভেতর—সেখানে সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছে এক রূপবতী রাজকন্যা—শিয়রে জ্বলছে প্রদীপ, তার পাশে বসে কে এক জন বাজিয়ে চলেছেন বীণা···রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গাতে! কিন্তু রাজকন্যার ঘুম যে ভাঙ্গে না! তোমাকে দেখে বীণার সুর যাবে থেমে, প্রদীপ যাবে নিবে। সেই অন্ধকার ঘরে তোমার হাতে জ্বলতে থাকবে হীরের ফুল, সমস্ত ঘর আলোয় আলো হয়ে উঠবে; সেই আলোয় দেখবে রাজকন্যা কার স্বপ্ন দেখছে, চোখের পাতায় নেমে আসছে নীল স্বপ্ন আর তার পাশে পাবে আর এক জনকে, যিনি তোমাকে জীবনের তীর্থে তীর্থে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাবেন—হীরের ফুল ছুঁইয়ে দেবে রাজকন্যার শিয়রে, ঘুম ভেঙ্গে যাবে তার! আবার বেজে উঠবে বীণা···জ্বলে উঠবে সোনার প্রদীপ···

তেপান্তরের মাঠ ডিঙিয়ে তাঁর কাছে যেতে হলে এসো—যুগ-যুগান্ত ধরে তিনি বসে আছেন কবে কোন্ দেশের রাজপুত্র সমস্ত বিপদ এড়িয়ে তাঁর কাছে যেতে পারবে—জয়ের আশীষ নিতে, জীবনের বুক-ভরা ভালোবাসা নিতে।

এসো—আমরা যাই সেই স্বপ্নদেশের পারে—

তাঁর হাতে বাজছে সেই বীণা, রাজকন্যার শিয়রে অনির্বাণ জ্বলছে সোনার প্রদীপ!

অরুণকুমার বললে : আমি যাবো তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে সেই দেশে।

অলককুমার বললে : তোমার ভয় করবে না ?

অরুণকুমার বললে : না, ভয় কিসের ? আমি তৈরি করব সেই সবুজ পাতার বাঁশী—সোনার ঈগলের সঙ্গে যাবো উড়ে···উড়ে···উড়ে···নীল সমুদ্র পার হয়ে সেইখানে—যেখানে আছে সোনার গাছে হীরের ফুল !

অলককুমার শুধালো : কিন্তু সেই রাজপ্রাসাদে তো ঘুমিয়ে আছে রূপবতী রাজকন্যা ? তার ঘুম ভাঙাবে কে ?

অরুণকুমার বললে : আমি তার ঘুম ভাঙাব।

অলককুমার আবার শুধালো : সেখানে রাজকন্যার পাশে বসে বীণা বাজিয়ে চলেছেন যিনি, তিনি কোন্ দেশের মেয়ে ?

অরুণকুমার বললে : সে তো জানি নে ?

—কোথায় তাঁর দেশ ?

—তাও জানি নে।

—রাজকন্যার পাশে বসে বীণা বাজান কেন ?

—কি করে বলি !

—তবে ?

অরুণকুমার বললে : বেশ, সেই কথাই আমরা জানব তাঁর কাছ থেকে—চলো আমরা যাই—

অলককুমার বললে—চলো।

ভিঁন দেশের রাজপুত্র অরুণকুমার, আর অলককুমার, নিয়ে এলো সাত ঘোড়ার গাড়ী আর সাতশো দাঁড়ের ময়ূরপঙ্খী—সঙ্গে রইলো সোনার চতুর্দোলা, শাদা ঘোড়া আর নীল ঘোড়-সওয়ার, হাতে তাদের খোলা তলোয়ার ঝিক্‌মিকিয়ে উঠলো। মাথায় ঝলমল করে উঠলো বাদামী রঙের উষ্ণীষ, বুকের ওপর জ্বল্-জ্বল্ করতে লাগলো মুক্তার মালা ! সে যেন এক বিজয়োৎসব ! অরুণকুমার আর অলককুমার না কি যাবে তেপান্তরের মাঠ ডিঙিয়ে কোন্ এক স্বপ্নদেশের পারে······

রাজ্যের লোক এসে জড়ো হোলো······

ভিন দেশের আকাশে-বাতাসে বেজে উঠলো মঙ্গল-শঙ্খ, বাজলো নহবৎ আর বাঁশীর সুর ! সমস্ত দেশময় সাড়া পড়ে গেলো···

অরুণকুমার অলককুমার তৈরি হোলো—এলো তাদের সাত ঘোড়ার গাড়ী আর হাজার হাজার নীল ঘোড়সওয়ার···

ভিঁন দেশের পারে বাঁশী বাজলো। মেঘের মত ধূলো উড়িয়ে দুই রাজপুত্র যাত্রা করলো তেপান্তরের মাঠের দিকে···

সাত সমুদ্রের পারে সেই তেপান্তরের মাঠ······!

সেই পথে যাবার আগে দেখতে পাবে এক গহন বন, তার পাশে ছোট্ট এক নদী। নদী যেখানে আপনহারা হয়ে পথ হারিয়েছে, সেইখানে ধূ-ধূ করছে কোন্ এক তেপান্তরের মাঠ···

সেই গহন বনের ধারে বিরাট এক মন্দির—অনেক দূর থেকে তার সোনার চূড়ো দেখতে পাওয়া যায়—সূর্যের আলোয় চিক্‌মিক্ করছে। মন্দিরের এক দিকে গহন বন, আর এক দিকে সেই ছোট্ট নদী। দিনে নদীর জল সোনালী, আর রাত্রিতে তার রঙ রূপোলী ! নদীর জলে যারা খেলা করে দিনের আলোয় তাদের দেখা যায় না। দিনের শেষে যখন সূর্যের শেষ-আলো এসে পড়ে বনচূড়ায়—তখন নদীর জলে হাজার হাজার তারা জ্বলতে থাকে, হাজার রঙের রংমশাল ঝিক্‌মিক্ করে। আকাশে যেদিন চাঁদ ওঠে, সেদিন বনে বনে সাড়া পড়ে যায়—নদীর জলে যারা খেলা করে, তাদের খেলার সাথী হবার জন্য আসে আরো অনেক বনের পাখী···জ্যোছনা রাতে সেখানে উৎসব বসে যায়। বনের পাখীরা এসে দেখতে পায় সেদিন হাজার হাজার নীল-পরী আর মাছ-পরী নদীর জলে খেলা শুরু করে দিয়েছে।

এমনি এক জ্যোছনা রাত······

মন্দিরের ভেতর দেবতার পূজায় বসে আছেন এক সন্ন্যাসী—মাথায় ভৈরবের মত জটা, কপালে রক্তচন্দনের তিলক, গায়ে গৈরিক বসন, হাতের কাছে জ্বলছে একটি মাটির প্রদীপ···

সমস্ত পৃথিবী চাঁদের আলোয় নীল হয়ে উঠেছে···কি সুন্দর রাত্রি ! গাছে গাছে পাতায় পাতায় চাঁদের ঝর্ণা আলো—নদীর জলে নীল-পরী আর মাছ-পরীদের খেলা শুরু হয়েছে—সেখানে জ্বলে উঠেছে হাজার তারার মালা···বনের পাখীরা গাইছে গান, টুপটাপ করে শব্দ আসছে মহুয়া-বনের ধার থেকে···বনের কোকিল ডাকছে কুহু ! কুহু !

স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলো সন্ন্যাসীর। তিনি চমকে উঠলেন সামনের দিকে চেয়ে···চাঁদের আলোয় তিনি দেখতে পেলেন—অনেক দূরে উড়ছে ধূলো, সমস্ত আকাশ অন্ধকার করে দিয়ে ছুটে আসছে হাজার হাজার ঘোড়সওয়ার, হাতে তাদের একটি করে মশাল। সঙ্গে তাদের এক সাত ঘোড়ার গাড়ী ! সমস্ত বন কেঁপে উঠলো···বনের পাখীরা বন্ধ করলে তাদের গান, নদীর জলে বন্ধ হোলো নীল-পরীদের খেলা···

সন্ন্যাসী অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন সেই দিকে। এই গহন বনের ধারে কে আসে এমন ধূলো উড়িয়ে ?

সাত ঘোড়ার গাড়ী এসে থামলো সেই মন্দিরের সামনে, তাদের পেছনে হাজার হাজার নীল ঘোড়সওয়ার।

দুই রাজপুত্র···অরুণকুমার আর অলককুমার !

হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে তারা মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালো।

অরুণকুমার সামনে এসে বললে : কে আপনি, এই বিজন বনের মন্দিরে সন্ন্যাসীর বেশে ?

সন্ন্যাসী বললেন : আমি গহন বনের সন্ন্যাসী।

অলককুমার বললে : আপনার নাম ?

সন্ন্যাসী বললেন : চন্দ্রহাস।

অরুণকুমার অবাক্ হয়ে বললে : চন্দ্রহাস ! অনেক দিন আগে শুনেছি ভিঁন দেশের পারে এক রাজপুত্র ছিলো—তাঁর নাম চন্দ্রহাস !

চন্দ্রহাস বললেন : আমি সেই রাজপুত্র।

অলককুমার বললে : আপনি সেই রাজপুত্র ? তাহলে আপনার সন্ন্যাসীর বেশ কেন ?

চন্দ্রহাস বললেন : সে অনেক কথা। তোমরা কি শুনবে ?

অরুণকুমার বললে : হ্যাঁ, আপনি বলুন।

চন্দ্রহাস বললেন : কিন্তু, তার আগে বলো তোমরা কে ?

অলককুমার বললে : আমরা ভিঁন দেশের রাজপুত্র।

—কোথায় চলেছ সাত ঘোড়ার গাড়ী করে ? সন্ন্যাসী বললেন :

অরুণকুমার বললে: তেপান্তরের মাঠ ডিঙিয়ে নীল সমুদ্রের পারে সেই দেশে—যেখানে আছে সোনার গাছে হীরের ফুল আর আছেন রাজকন্যা।

অলককুমার বললে: আর সেই রাজকন্যার পাশে বসে দিনের পর দিন বীণা বাজিয়ে চলেছেন কে এক জন, সেই রাজকন্যার যুগান্তের ঘুম ভাঙ্গাতে!

চন্দ্রহাস বললেন: তোমরা তাঁকে চেনো?

অরুণকুমার বললে: না।

চন্দ্রহাস বললেন: আমি তাঁকে চিনি।

অলককুমার অবাক্ হয়ে বললে: আপনি তাঁকে কি করে জানলেন? কে তিনি?

—তিনি তোমাদের মা। সন্যাসী স্মিত হাস্যে বললেন।

—আমাদের মা! দুই রাজপুত্র অধীর কণ্ঠে বললে।

—হ্যাঁ। তোমরা যাঁকে হারিয়েছ চিরদিনের মতো, তিনি সেই মা! তোমাদের দুঃখ, দৈন্য আর বিপদের মাঝখানে তিনি প্রদীপ হাতে চলেছেন জীবনের সকল শুভ তীর্থে···তোমাদের ব্যথা-বেদনায় তাঁর চোখে জল টলমল করে ওঠে···তিনি কাঁদেন। যারা অভিশপ্ত মানুষের মত ঘুমিয়ে থাকে, তাদের ঘুম ভাঙ্গাবার জন্য তাঁর বীণা বাজছে যুগ যুগ ধরে—বীণার সুরে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে মানুষ আরো সুন্দর, আরো মহৎ হয়ে উঠবে; এক দিন তাদের জীবন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে সূর্যের মতো···

অরুণকুমার বললে: কিন্তু রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গে না কেন?

চন্দ্রহাস বললেন: ঘুম ভাঙ্গবে। তেপান্তরের মাঠ ডিঙিয়ে সেই দেশে যেতে পারলে দেখতে পাবে, সেই রাজপ্রাসাদের সোনার পালঙ্কে শুয়ে এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যা। সোনার গাছে যে হীরের ফুল, সেই ফুল রাজকন্যার শিয়রে ছুঁইয়ে দিলেই ঘুম ভাঙ্গবে। কিন্তু তার আগে জাগাতে হবে আর এক জনকে—যাদের জন্য তোমার মা যুগ-যুগ ধরে বীণা বাজিয়ে চলেছেন···

অলককুমার বললে: সে কে?

চন্দ্রহাস বললেন: রাজকন্যার শিয়রে যে সোনার প্রদীপ জ্বলছে তার নিচে ঘুমিয়ে আছে এক কালো ভোমরা।

অরুণকুমার বললে—কালো ভোমরা সে-দেশে কেমন করে এলো?

চন্দ্রহাস বললেন—সে কালো ভোমরা নয়, আর এক দেশের রাজকন্যা।

অলককুমার বললে—আপনি কি করে জানলেন এ-সব কথা?

—আমি জানি। সেই জন্যেই তো আমার এই সন্যাসীর বেশ। তোমাদের মত আমারও ছিলো মস্ত এক দেশ, সাত ঘোড়ার গাড়ী আর রাজমুকুট। কিন্তু জীবনের ঘাটে ঘাটে যে সোনার তরী ভিড়বে, সে তরী ডুবেছে! তোমরা এগিয়ে যাও—সামনে ধূ-ধূ করছে তেপান্তরের মাঠ···সেই মাঠ ডিঙিয়ে তোমরা চলো···

অরুণকুমার বললে: আমরা যাব আমাদের মা'র কাছে।

অলককুমার বললে: আমাদের কে পথ দেখাবে?

চন্দ্রহাস বললেন: এত দিন তোমরা ছিলে ঘুমিয়ে, তাই এখনো তাঁর হাতে বাজছে সেই বীণা···তোমাদের ঘুম ভাঙ্গবে এক দিন। দেখতে পাবে এই পৃথিবী কত সুন্দর, কেমন সবুজ—এখানে কত গভীর ভালোবাসা। কিন্তু ভাই, মা'র কাছে যেতে হলে তো এমন সাত ঘোড়ার গাড়ী চলবে না? আর তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে সেই বীণার সুর···

অরুণকুমার বললে: তাহলে আমরা কিসে চড়ে যাব?

অলককুমার বললে: সাত ঘোড়ার গাড়ী আমার চাই!

চন্দ্রহাস হাসলেন দুই রাজপুত্রের কথা শুনে: মায়ের দেখা পেতে হলে অনেক সাধনা চাই, সমস্ত বপদ-আপদ তুচ্ছ করে জীবনের বিজয়-পথে এগিয়ে যেতে হবে। তোমরা কি তা পারবে?

—নিশ্চয়ই পারব।

—তাহলে তোমাদের সাত ঘোড়ার গাড়ী আর হাজার হাজার ঘোড়সওয়ারদের ফিরিয়ে দাও। খুলে ফেলে দাও তোমাদের রাজমুকুট, তার পর নির্ভীক হৃদয়ে তোমরা দুই রাজপুত্র পার হয়ে চলো তেপান্তরের মাঠ···আমি তোমাদের আশীর্বাদ করি।

অরুণকুমার আর অলককুমার চন্দ্রহাসের পায়ের ধূলি মাথায় নিলো। তার পর খুলে ফেললে তাদের রাজপোষাক। শুধু হাতে রইলো তলোয়ার, আর গলায় মুক্তার মালা। আর সারা বনকে কাঁপিয়ে হাজার হাজার ঘোড়সওয়ার ফিরে গেলো সাত ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে! দুই রাজপুত্র একা চললো তেপান্তরের মাঠের দিকে···

চন্দ্রহাস বললেন: যদি মায়ের দেখা পাও, আমাকে স্মরণ কোরো।

অরুণকুমার বললে: কি বলবো মা'কে গিয়ে?

চন্দ্রহাস বললে: বলবে, যাদের তোমরা হারিয়েছ আমি তাদের এক জন।

দুই রাজপুত্র চললো। রাত তখন শেষ প্রহর।

এবার সূর্য উঠবে।

সূর্য উঠলো।

রঙে-রঙে রাঙা হয়ে উঠলো আকাশ, মাটিতে লাগলো দোলা, জলে জাগলো রঙ···দুই রাজপুত্র চললো—

যেতে···যেতে···সাত দিন সাত রাত ফুরিয়ে গেলো—তবু পথের শেষ নেই!

যেদিকে চাও শুধু ধূ-ধূ করছে মাঠ।

মাঠের পর মাঠ···

সেই মাঠে নেমে আসে রাতের অন্ধকার, আকাশে ফুটে ওঠে তারার মালা আর ঝরে পড়ে চাঁদের আলো···আবার দিনের আলো এসে রাতের অন্ধকারকে মুছে দেয়···সূর্য ওঠে, চাঁদ ডুবে যায়···

আবার ভোর হয়!

আবার রাত আসে!

এমনি ভাবে কত দিন কেটে যায়। কত আলো নিবে যায়, রঙ ফুরিয়ে যায়···

অরুণকুমার আর অলককুমার তবু চললো তেপান্তরের মাঠের বুকের ওপর দিয়ে।

অনেক দিন পরে এক দিন রাত্রি বেলা তারা দেখতে পেলো দূরে—যেখানে আকাশ এসে মিশেছে মাটির সঙ্গে···সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি মস্ত তাল গাছ—তার পাতার রং সবুজ আর দেহের রং হলুদ, চাঁদের আলোয় ঝিকমিক্ করছে। দুই রাজপুত্র চললো সেই দিকে।

অরুণকুমার বললে—এই সেই তাল গাছ, এর সবুজ পাতার বাঁশী তৈরি করতে হবে।

অলককুমার বললে—আর যদি পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে ?

অরুণকুমার বললে—তাহলেই সর্বনাশ !

অলককুমার বললে—চলো, আজকের রাতটা এইখানেই কাটিয়ে দেওয়া যাক্—

অরুণকুমার বললে—হ্যাঁ, কাল আমাদের যাত্রা শুরু।

তার পর সেই মস্ত তাল গাছের নিচে এসে দুই রাজপুত্র বসে পড়লো। চার দিকে—দিক্-দিগন্ত ছাড়িয়ে ধূ-ধূ করছে সেই তেপান্তরের মাঠ···চাঁদের আলো ঝরে পড়ছে···রাজপুত্রের চোখের পাতায় নেমে আসছে স্বপ্ন !

অরুণকুমার বললে : রাত শেষ হবার আগেই বাঁশী তৈরি করতে হবে।

অলককুমার বললে : কি করে উঠবে সেখানে ?

অরুণকুমার ভাবলে : তাই তো !

সেইখানে বসে বসে ভাবতে লাগলো দুই রাজপুত্র···

এদিকে রাত প্রায় শেষ প্রহর।

সেই মস্ত তাল গাছের পাতার ফাঁকে ঘুমিয়ে ছিলো অচীনপুরের এক চড়ুই পাখি। রাজপুত্রদের কথা শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেলো তার। অবাক্ হয়ে দেখলো যে গাছের নিচে দুই রাজপুত্র বসে বসে কি যেন ভাবছে। বিরক্ত হোলো চড়ুই পাখি—এমন ঘুমটা তার ভাঙ্গিয়ে দিলে ! কে এই রাজপুত্র ? এই তেপান্তরের মাঠের বুকে কি বসে বসে ভাবছে বল ত ?

—ও ভাই রাজপুত্র ! ডাক দিলো চড়ুই পাখি।

অরুণকুমার অবাক্ হয়ে গেলো চড়ুই পাখির ডাক শুনে। অলককুমারের কিন্তু ভারি আনন্দ। নিশ্চয় কোনো অচীন্ পাখি, তাদের পথ দেখিয়ে দেবে।

অরুণকুমার বললে : কে আমাদের ডাকলে যেন ?

অলককুমার বললে : হ্যাঁ, আমিও শুনেছি।

—ও ভাই রাজপুত্র ! আবার ডাক দিলো সেই চড়ুই পাখি।

—কে ? কে ভাই আমাদের ডাকছ ?

—আমি চড়ুই পাখি, এই যে গাছের আগডালে বসে আছি।

—তোমায় যে দেখতে পাচ্ছি না ভাই ?

—না, আমি কাউকে দেখা দিই না। তোমরা চলেছ কোথায় ?

—জানি না। সোনার ঈগলের অপেক্ষায় বসে আছি।

চড়ুই পাখি বললে : কিন্তু তার আগে যে সবুজ পাতার বাঁশী বাজানো চাই।

অরুণকুমার বললে : দাও না ভাই তৈরী করে একটি সবুজ পাতার বাঁশী।

চড়ুই পাখি বললে : বেশ।

তৈরি হোলো সবুজ পাতার বাঁশী। সুরে সুরে গুন্গুনিয়ে উঠলো তেপান্তরের মাঠ···রাত তখন শেষ হয়ে এসেছে, শুকতারা জ্বলছে দপ্-দপ্ করে, রাতের পাখিরা ফিরছে······আকাশে এক ফালি চাঁদের টুকরো···

বাঁশী বাজছে।

সবুজ পাতার বাঁশী।

দুই রাজপুত্র বসে বসে ভাবছে কখন আসবে সেই সোনার ঈগল। তাদের নিয়ে যাবে নীল সমুদ্রের ধারে।

তার পর এলো সেই সোনার ঈগল···উড়ে···উড়ে···নেমে এলো আকাশ থেকে। অরুণকুমার আর অলককুমার আনন্দে নেচে উঠলো। দুই রাজপুত্র দেখলো এক ঈগল তাদের দিকে উড়ে আসছে, পাখায় জ্বলছে সোনালি আলো।

সোনার ঈগল এসে বললে : আমার দেরি হয়েছে বোধ হয়। এসো—আমাদের যেতে হবে বহু দূর—অনেক বন পাহাড় নদী পেরিয়ে, অনেক সমুদ্র পেরিয়ে সেই নীল সমুদ্রের ধারে। এখান থেকে লক্ষ যোজন দূরে আমাদের পাড়ি······আজ থেকে আমি তোমাদের সঙ্গী।

অরুণকুমার বললে : তোমার দেশ কোথায় ভাই ?

—সে খবর জানি না।

অলককুমার বললে : কে তোমাকে এখানে পাঠালে ?

—ঐ সবুজ পাতার বাঁশী।

বাঁশী বেজে উঠলো।

সুরে সুরে আকাশ ছেয়ে গেলো······রঙে রঙে রঙিন হোলো ভোরের নীল আলো······সবুজ পাতার বাঁশী বাজছে······

সোনার ঈগলটা রাজপুত্রকে পিঠে নিয়ে আকাশের মাঝ-বরাবর দিয়ে শাঁই-শাঁই করে উড়ে চললো ! সূর্যের আলোয় জ্বলছে তার সোনালি পাখা।

অনেক দেশ-দেশান্তর পার হয়ে তারা এসে পৌঁছালো সেই নীল সমুদ্রের ধারে···এখানেও সেই ধূ-ধূ করছে জলসায়র !

নীল সমুদ্র···যে দিকে চোখ ফেরাও, চোখের তারা আরো যেন নীল হয়ে ওঠে ! আর কি তার ঢেউ—এই সমুদ্র কেমন করে পার হবে, ভয়ে দুই রাজপুত্র কাঁপতে লাগলো।

ঈগল পাখি বললে ; রাজপুত্র, বাজাও তোমার বাঁশী।

বাঁশী বাজতে লাগলো।

হঠাৎ সেই নীল সমুদ্রের অতল গভীর থেকে উঠে এলো এক জল-কুমার। গায়ে তার রামধনুকের মত পোষাক···লাল-নীল-সবুজ··· মাথায় হাজার রঙের ঝিনুকের রাজমুকুট, হাতে এক পাখির পালক। আর তার সঙ্গে বিরাট এক সপ্ত-ডিঙ্গা, আকাশের মত নীল তার রঙ : শাদা মেঘের মত তার পাল।

দুই রাজপুত্র অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলো সেই দিকে······

নীল সমুদ্র পার হয়ে যাই, আমরা সবাই জল-পথিক
হারিয়ে যাওয়ার নাইকো মানা, জমলো পাড়ি দিক্-বিদিক্ !

কে ভাই তুমি ? অরুণকুমার বাঁশী থামিয়ে বললে।

সোনার ঈগল বললে : জলকুমার আর তার সপ্তডিঙ্গা।

নীল সমুদ্র পার হয়ে যেতে লক্ষ যোজন দূরের দেশ
সেখানে সদাই জ্বলছে আলোক, তবুও পথের নাইকো শেষ !

অরুণকুমার বললে : কিন্তু কেমন করে পার হবো এই নীল সমুদ্র ?

অলককুমার বললে ; আমার কেমন ভয় করছে !

নীল সমুদ্র পার হয়ে যাবো বিপদকে ভাই কিসের ভয় ?
মায়ের আশীষ বুকে তুলে নাও যাত্রাপথের অশেষ জয়।

নীল সমুদ্রের মাঝে ভেসে পড়লো সপ্তডিঙ্গা। দুই রাজপুত্র চললো আর এক স্বপ্নদেশে।

নীল সমুদ্রের মাঝ-বরাবর সপ্তডিঙ্গা ভেসে চলে···দূরে···দূরে···

জলকুমারের হাতে এক পাখির পালক। নীল আর সবুজ তার রঙ। সেই পালক হাতে জলকুমার গাইছে গান···পালক থেকে ঝরছে রঙমশালের মত আলো।

অরুণকুমার বললে: তোমার হাতে এ আবার কি জিনিস?

জলকুমার বললে: সাগর-পাখির পালক।

অলককুমার বললে: কি হবে ঐ পালকে?

জলকুমার বললে: তবে এসো সপ্তডিঙ্গার সব চেয়ে নিচের ঘরে—যেখানে জমা আছে যুগান্তের অন্ধকার।

অরুণকুমার আর অলককুমারকে সঙ্গে নিয়ে জলকুমার নেমে এলো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে অনেক গভীর জলের ভেতর। চার দিকে ছল-ছল করছে জল-সায়র।

একটি ছোট ঘর।

দুই রাজপুত্র সেখানে গিয়ে অবাক্ হয়ে গেলো।

ঘরের ভেতর একটি ময়ূর ঘুমিয়ে আছে।

জলকুমার বললে: এই সেই ময়ূরের পাখার পালক।

অলককুমার বললে: কি করবে তুমি পালক নিয়ে? আমায় দাও না ভাই!

জলকুমার বললে: দিতে পারি যদি আমায় দাও তোমার গলার ঐ মুক্তামালা।

অলককুমার নিজের গলা থেকে মুক্তামালা খুলে ফেলে জলকুমারের গলায় পরিয়ে দিলে।

অমনি সেই ঘুমন্ত ময়ূর উঠলো জেগে। পেখম খুলে শুরু হোলো তার নাচ—দেখতে দেখতে সমস্ত ঘর আলোয় আলো হয়ে উঠলো···তার পর হঠাৎ কখন্ নাচের তালে তালে আকাশে উঠলো ঝড়, কালো মেঘের রঙে সমস্ত পৃথিবী ভয়ে কাঁপতে লাগলো। বিদ্যুতের চমকে আর ঝড়ের হাওয়ায় সপ্তডিঙ্গা তীরের গতিতে ছুটে চললো।

ময়ূর তবুও নাচছে···

কালো মেঘের রঙে আর বর্ষার ছন্দে···সমুদ্র কল্লোলের তালে তালে জলকুমার ছুঁইয়ে দিলো তার গায়ে সেই নীল আর সবুজ পালক।

ময়ূর নীল আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেলো।

ঝড় থামলো।

জলকুমার বললে: এই নাও তোমার পাখির পালক। তেপান্তরের মাঠ ডিঙ্গিয়ে তোমরা যে-দেশে চলেছ, সেখানে এই পালক হবে তোমাদের বন্ধু।

তার পর কত দিন কাটলো।

লাল আর নীল মাটির দেশ।

দুই রাজপুত্র চললো পাখির পালক নিয়ে সেই দেশে।

বাঁশী বাজলো।

লাল মাটির দেশের রাজপুত্র এলো, সঙ্গে তার আদরের বাজপাখী।

অরুণকুমার বললে: আমরা চলেছি তেপান্তরের মাঠ ডিঙ্গিয়ে আর এক দেশে···

অলককুমার বললে: যেখানে ঘুমিয়ে আছে রাজকন্যা আর তাঁর শিয়রের কাছে বসে বীণা বাজিয়ে চলেছেন যিনি—আমরা যাব তাঁর কাছে।

রাজপুত্র বললে: বেশ। তোমরা অনেক দূরের দেশ থেকে এসেছ আমার দেশে। এখানে ক'দিন থাকো, তার পর যেও।

অরুণকুমার বললে: না না—আমরা আজই যাব!

অলককুমার বললে: মা আমাদের ডাকছেন!

রাজপুত্র অবাক্ হয়ে বললে: তোমাদের মা আছেন সেখানে?

অলককুমার বললে: হ্যাঁ। ডাক দিয়েছেন তিনি আমাদের সেই সুদূর দেশ থেকে—আমরা পথের সমস্ত দুঃখ দৈন্য বিপদ তুচ্ছ করে চলেছি মায়ের কাছে—তিনি আমাদের জীবনের তীর্থে তীর্থে অন্ধকার থেকে আলোকের পথে নিয়ে যাবেন···

রাজপুত্র বললে: তোমাদের সঙ্গে দিলাম আমার এই বাজপাখি—তোমাদের পৌঁছে দেবে সেই দেশে।

অরুণকুমার বললে: তুমি ভাই কোন্ দেশের রাজপুত্তুর?

রাজপুত্র যাবার আগে বললে—লাল আর নীল যার রঙ—আমি তার বন্ধু!

আকাশের মাঝ দিয়ে শাঁ-শাঁ করে উড়ে চলছে রাজপাখি। তার পিঠের ওপর বসে আছে দুই রাজপুত্র!

সাত দিনের দিন ভোর বেলা অরুণকুমারের হাতের সেই সবুজ পাতার বাঁশী হলুদ হয়ে ঝরে গেল মাটিতে···

বাজপাখি তাদের সেখানে নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেলো লাল মাটির দেশে!

তার পর দিনের শেষে দুই রাজপুত্র হাতে নিয়ে পাখির পালক এগিয়ে চললো সামনের পথ দিয়ে···গহন বনের ধারে ধারে জোনাকীর আলো আর আকাশের তারার মালা···নদীর ঝিক্-মিক্ আলো, আর সবুজ ঘাস···সব পেরিয়ে দুই রাজপুত্র চললো···

আকাশে চাঁদ।

সমস্ত পৃথিবী জ্যোৎস্নায় ঘুমিয়ে আছে।

দুই রাজপুত্র চমকে উঠলো সেই গহন বন পেরিয়ে এসে সামনের দিকে চেয়ে···এক বিরাট রাজপ্রাসাদ! মেঘের ভেতর যেন সোনার মত ঝকমক্ করছে। তার চার পাশে সবুজ গাছ আর নীল ঝর্ণা···সাতশো সিঁড়ি বেয়ে তবে সেই রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার। সেখানে ডাকছে ময়ূর আরও সব কত অচীন পাখির দল।

দূরে কোথায় বীণা বাজছে।

ঝিমঝিম্—ঝিমঝিম্!

দুই রাজপুত্র সাতশো সিঁড়ি বেয়ে সেই রাজপ্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়লো।

অন্ধকার! গভীর অন্ধকার!

অরুণকুমার সেই পাখির পালক ছুঁইয়ে দিলো রাজপ্রাসাদের মস্ত লোহার ফটকে!

দেখতে দেখতে সেই লোহার ফটক দু-ফাঁক হয়ে খুলে গেলো······

দুই রাজপুত্র রাজপ্রাসাদের ভেতরে এসে পড়লো!

সামনে এক গভীর সুড়ঙ্গ।

সেই সুড়ঙ্গের পথ বেয়ে দুই রাজপুত্র চললো পাতালের দিকে নেমে···তার পর হাজার সিঁড়ি নেমে এসে তারা দেখতে পেলো এক মস্ত বড় পাথর তাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে!

অরুণকুমার ছুঁইয়ে দিলে সেই পাখির পালক।

অমনি সরে গেলো পাথরখানা এক নিমেষে! দুই রাজপুত্র সামনে দেখতে পেলো এক স্বপ্নের দেশ···ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে দেশ, রঙে রঙে রাঙা হয়ে উঠেছে সমস্ত দেশের আকাশ! সেখানে শুধু ফুলের মেলা···হাজার রঙের রঙিন ফুল আর সোনালি ঝর্ণা···

দুই রাজপুত্র চললো···

তাদের চাই সোনার গাছে হীরের ফুল!

রঙিন ফুলের বন পার হয়ে তারা এসে পৌঁছলো এক পাহাড়ের ধারে···তুষারের পাহাড়। শাদা বরফে সমস্ত পাহাড় ঢাকা—আর সেই পাহাড়ের ওপরে একটি ছোট্ট গাছ।

অরুণকুমার আর অলককুমার যেই সেখানে যেতে যাবে, অমনি কোথা থেকে কে যেন বলে উঠলো: সাবধান! সাবধান!

দুই রাজপুত্র চমকে উঠলো। না, কোথাও কেউ নেই!

আবার তারা চললো, সেই পাহাড়ের ওপরে যে সোনার গাছে হীরের ফুল ফুটে আছে, তুষারের পাহাড় ডিঙিয়ে সেই ফুল তুলে আনতে হবে।

দূরে কে যেন আবার বলে উঠলো: সাবধান! সাবধান!

অরুণকুমারের কাছে আছে রাজপুত্রের সেই পাখির পালক, তার আর ভয় নেই।

তুষারের পাহাড় ডিঙিয়ে দুই রাজপুত্র গেলো সব চেয়ে ওপরে—দেখলো সোনার গাছে ফুটে আছে একটি হীরের ফুল!

তার পর সেই সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে দুই রাজপুত্র ফিরে এলো রাজপ্রাসাদে; সঙ্গে তাদের সেই সোনার গাছের হীরের ফুল!

বীণা বাজছে দূরে······

রিমঝিম্ রিমঝিম্······

রাজপ্রাসাদের সব চেয়ে উঁচু ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো দুই রাজপুত্র—অরুণকুমার আর অলককুমার।

নীল স্ফটিকের ঘর।

তার মাঝখানে সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছে এক রূপবতী রাজকন্যা; শিয়রের কাছে জ্বলছে একটি সোনার প্রদীপ। আর তার পাশে বীণা হাতে কে?

বীণার ঝঙ্কার হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো। সোনার প্রদীপ নিবে গেলো। দুই রাজপুত্র তখন ঘরের ভেতর গিয়ে ডাকলো—মা!

তাদের হাতে সোনার গাছের হীরে[illegible]ল! সমস্ত ঘর আবার আলোয় আলো হয়ে উঠলো। স্ফটিকের ঘর রঙে রঙে রঙিন হয়ে উঠলো···

অরুণকুমার ডাকলো: মা!

অলককুমার বললে: মা, আমরা তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে নীল সমুদ্র আর লাল মাটির দেশ পেরিয়ে তোমার জন্তে এনেছি সোনার গাছের হীরের ফুল!

সেই আলোয় দুই রাজপুত্র দেখতে পেলো রাজকন্যার শিয়রের কাছে বসে যিনি, হাতে তাঁর বীণা, চোখে তাঁর জল! শুভ্র মেঘের মত তাঁর দেহের রঙ,—সেই রঙে মিশে আছে একটা নীল জ্যোতি! গৈরিক বসন, গলায় ঝল্‌মল্ করছে শঙ্খের মালা! চুল এলিয়ে পড়েছে, যেন একটি চপল ঝর্ণা! বীণার তারে কনক চাঁপার খেলা, আর নীল কমলের মত রাঙা দু'খানি পা!

দুই রাজপুত্র সেই পায়ের ধূলি মাথায় নিলো।

মা কথা বললেন: তোমরা যে আসবে, সে খবর আমি জানি! কত যুগ-যুগান্ত ধরে আমি তোমাদের অপেক্ষায় বসে আছি—কবে তোমরা আসবে, কবে আমার রাজকন্যার ঘুম ভাঙবে···

অরুণকুমার বললে: তোমার ডাক শুনে আমরা ছুটে এলাম।

মা বললেন: কেমন করে শুনলে?

অরুণকুমার বললে: তেপান্তরের মাঠ ডিঙিয়ে আসার পথে দেখা হোলো এক গহন বনের এক সন্ন্যাসীর সাথে। তিনি বললেন, তোমাদের মা ডাক দিয়েছেন, তাঁর হাতে বাজছে বীণা···তোমরা এগিয়ে চলো···

মা বললেন: আমি জানি কে সেই সন্ন্যাসী।

অলককুমার বললে: কে?

মা বললেন: এক রাজপুত্র। এই বীণা তাঁর হাতের তৈরি। জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিপদ-আপদ তুচ্ছ করে, ভয় আর মৃত্যুকে ছাড়িয়ে যে এই বীণার সুর শুনে তেপান্তরের মাঠ ডিঙিয়ে আসতে পারবে এই দেশে—জীবনে তাদেরই জয়!

অরুণকুমার বললে: সেই দেশের নাম?

মা বললেন: অন্ধকার থেকে আলো, বন্ধন থেকে মুক্তি আর ভয় থেকে সাহস ও মৃত্যু থেকে জীবনের দেশ!···

আবার বেজে উঠলো বীণা···

মা নেমে এলেন সোনার পালঙ্ক থেকে। তাঁর হাতে দু'টি রজনীগন্ধার মালা···পরিয়ে দিলেন দুই রাজপুত্রের গলায়। তার পর তাদের ললাট স্পর্শ করে জীবনের পরম আশীর্ব্বাদ দিলেন: তোমরা সুখী হও!

সোনার গাছে যে হীরের ফুল,—তার ছোঁয়ায় জাগলো রাজকন্যা। আর পাখির পালকের ছোঁয়ায় ঘুম ভাঙলো কালো ভোমরার। দুই রাজপুত্র অবাক্ হয়ে দেখে দু'টি পরমাসুন্দরী রাজকন্যা তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে!

মা বললেন: আমার জীবনে যে দু'টি ফুল ফুটেছে, সেই মধু-সঞ্চয় তোমাদের হাতে তুলে দিলাম।

অরুণকুমার বললে: এবার আমরা ফিরে যাই দেশে।

অলককুমার খুশি হয়ে বললে: দেশে ফিরে আমাদের সাত দিন ধরে উৎসব হবে—সবাই কে গিয়ে বলবো, আমরা মায়ের কাছে পেয়েছি দু'টি রজনীগন্ধার মালা আর দু'টি রঙিন ফুল!

দুই রাজকন্যা হেসে উঠলো।

দুই রাজপুত্র বললে: সেই ফুলের গন্ধে সমস্ত দেশ আমোদিত হয়ে উঠবে।

মা বললেন: বেশ, তোমরা ফিরে যাও দেশে। সঙ্গে করে নিয়ে যাও আমার আশীর্বাদ আর জীবনের মধু-সঞ্চয়। তেপান্তরের মাঠ ডিঙিয়ে তোমরা চলো—জীবনের ঐ হোলো সংসার-সমুদ্র! সেই মাঠ পেরিয়ে তোমরা আলোকের পথে এগিয়ে যাও···সংসারের তুচ্ছতা ও প্রতিঘাতে তোমরা হও নিঃশঙ্ক···ভয়কে জয় করো সাহস দিয়ে··· অন্ধকারকে দূর করো হৃদয়ের আলো দিয়ে···

অরুণকুমার বললে: তোমাকেও যেতে হবে আমাদের সঙ্গে!

—আমার যে ভাই ডাক পড়েছে! মা'র চোখে জল দেখে দুই রাজপুত্রের মন বেদনায় ভরে উঠলো।

—মা তুমি কাঁদছ? দুই রাজপুত্র বললে।

মা বললেন : না, আমি কাঁদছি না! তোমরা যাও, আমি বীণা বাজাই···এই বীণার সুর হবে তোমাদের জীবনের সাথী।

এই বীণা বেজে উঠলো···

রিম-ঝিম্—রিম-ঝিম্···

তার পর অরুণকুমার আর অলককুমার দুই রাজকন্যাকে নিয়ে নেমে এলো সেই রাজপ্রাসাদের সাতশো সিঁড়ি বেয়ে সেখান থেকে তারা দেখতে পেলো দূরে···অনেক দূরে···মেঘের আড়ালে দাঁড়িয়ে মা···তাঁর হাতে বীণা, চোখে জল···আর তাঁর পাশে এক জন সন্যাসী, তাঁর হাতে একটি সোনালি মশাল!

অলককুমার বললে : কে ঐ সন্যাসী?

অরুণকুমার বললে : চন্দ্রহাস।

তেপান্তরের মাঠ ডিঙ্গিয়ে দুই রাজপুত্র ফিরে এলো দেশে। আজো তারা শুনতে পায় সেই বীণার সুর, দেখতে পায় সেই মশালের আলো···

আভিজাত্য (!)

মনোজিৎ বসু

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমস্ত জীবন অসংখ্য বিস্ময়কর কাহিনীতে ভরা। অত বড় পণ্ডিত, অথচ পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল না। অভিজাত ব্রাহ্মণ-বংশের সন্তান তিনি, কিন্তু আভিজাত্যের মিথ্যা বড়াই করেননি কোনো দিন। তাঁর কাছে মানুষের ভেদাভেদ ছিল না, সবার সঙ্গেই ছিল তাঁর মেলামেশা। মিথ্যা আভিজাত্যের খোলস গায়ে দিয়ে যারা ঘুরে বেড়ায়, ঈশ্বরচন্দ্র তাদের এড়িয়েই চলতেন—তিনি বরং বেশি ক'রে মিশতেন সেই সব গরীব, দুঃখী ও অবজ্ঞাতদের সঙ্গে, যারা এ দেশের সত্যিকারের মানুষ, আভিজাত্যের লেবেল এঁটে যারা সমাজে ঘুরে বেড়ায় না।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প শোনা যায়। তাই তোমাদের বলছি।

এক দিন এক মুদীর দোকানের বারান্দায় বিদ্যাসাগর মশাই ব'সে আছেন। কিন্তু ব'সে আছেন নোংরা একটা মাদুরের ওপর, গল্প ক'রছেন মুদীর সঙ্গে। চারি দিকেই একটা অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়া, মাছি ভন্-ভন্ ক'রছে, ধুলো উড়ছে। এমন সময় ঐ দোকানের সামনে দিয়ে একখানা দামী ফিটন যাচ্ছে দেখে বিদ্যাসাগর মশাই চোখ তুলে তাকালেন। গাড়ির মালিক এক তরুণ। বিদ্যাসাগরের বিশেষ পরিচিত তিনি। বিদ্যাসাগর মশাইকে দেখতে পেয়ে তিনি নামতে যাবেন, কিন্তু কি ভেবে আর নামলেন না, গাড়ি হাঁকিয়ে চ'লে গেলেন। ব্যাপার দেখে ঈশ্বরচন্দ্র শুধু একটু হাসলেন।

পরে এক দিন যখন সেই ধনী ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা, তখন বিদ্যাসাগর মশাই তাঁকে বললেন—"সেদিন ভারী মুস্কিলে প'ড়েছিলে না? আমাকে দেখে তুমি গাড়ি থেকে নামতে চেয়েছিলে, কিন্তু যেখানে আমি ব'সেছিলাম, সেই নোংরা জায়গায় নামতে তোমার আভিজাত্যে বেধেছিলো,—তাই না?"

তরুণ ধনী ভদ্রলোকটি বললেন—"সত্যি, আপনি এক এক সময় এমন সব ছোটলোকদের সঙ্গে ব'সে গল্প করেন, যে লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যায়!"

স্পষ্টবক্তা ঈশ্বরচন্দ্র উত্তর দিলেন—"তাহ'লে আমাকে তোমরা তোমাদের হিসেবের খাতা থেকে কেটে বাদ দিয়ো। আমি কখনো ঐ গরীব ছোটলোকদের সঙ্গ ত্যাগ ক'রতে পারব না, কারণ, টাকার দিক্ থেকে বড় না হ'লেও ওরা মনের দিক্ থেকে অনেক বড়। তোমাদের আভিজাত্যের চেয়ে ওদের সারল্যই ভালো।"

এর পর আর ভদ্রলোকটি কোনো কথা বলতে পারলেন না। অপরাধীর মতো মাথা নীচু ক'রে রইলেন।

খুকুর খেলাঘরে

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সুঁদর বনের থেকে এলো তিনটে কেঁদো বাঘ—
খেলতে খুকুর খেলাঘরে, বিষম তাদের রাগ।
গোঁফ ফুলিয়ে হুকুম দিলে—রাঁধতে হবে পায়েস
শুলো বালিশ ঠেসান দিয়ে—দিব্যি করে আয়েস।

মায়ের কাছে ঘরের চাবি—কোথায় পাবে দুধ!
খুঁটে খুঁটে আনলো খুকু উঠান থেকে খুদ।
বাক্স খুলে আনলো টফি—আনলো রাঙা চুষি।
কেঁদো বাঘরা বিষম কাঁদে হয় না মোটে খুসি।

কান্না তাদের শুনে কাঁদে ঝিঁঝিঁ ঘরের কোণে।
কান্না শুনে নেংটী তাদের কান দিয়ে ধান বোনে।
কাঁদছে পেঁচা—কাঁদছে হুলো ভামরা কাঁদে ছাতে।
কান্না দেশের পান্না ঝরে ঝাপসা নিঝুম রাতে।

আঁধার রাতে কান্না ওঠে সাতটি ভুবন জুড়ি।
চুপটি করে শুনছে বসে' চাঁদের দেশের বুড়ি!
ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি শুনলো পেতে কান।
পায়েস খাওয়া রান্নাঘরে কান্না-ভরা গান।

চুপটি করে' নামল তারা ঘুমের কাঠি হাতে—
ছুঁইয়ে দিলে তিনটে বাঘের কেঁদো চোখের পাতে।
ছুঁইয়ে দিলে হিজিবিজি ঝিঁঝিঁর গায়ে গায়ে।
ছুঁইয়ে দিলে খুকুর চোখে আঁধার রাতের ছায়ে।

ঘুমেল পায়েস খেয়ে বাঘা ফিরল সুঁদর বনে।
হিংসা-রাগের রেখাটি আর রইল না ক' মনে।
খুকুর আদর হিংসা ভোলায়—বলল সবায় ডেকে।
শুধায় সবায়—'খুকুর কাছে যাবো বলো কে কে'?

হাতী যাবে—জেব্রা যাবে—যাবে বোধ হয় শিয়াল।
সুঁদরি গাছের বাঁদর যাবে আর যাবে তো পিয়াল।
গায়না থেকে হায়না যাবে—কাঙ্গো থেকে সিংহ।
ইরাণ থেকে পিরাণ পরে' আসবে রসিক ভৃঙ্গ।—

মেরুর থেকে বঙ্গদেশে আসবে পেঙ্গুইন।
ঝাঝা থেকে আসবে বেঁজি—দেখে পাঁজি দিন।
মিকি মাউস আসছে ধেয়ে এ্যাটম জাহাজ চড়ে'।
আদর ভরা খুকুর পায়েস খাবে আয়েস করে'।

দুধ-সায়রে দুধ আনতে যাচ্ছে খুকুরাণী।
চাঁদের বাড়ীর সিহিন মধু কে দেবে গো আনি॥
ক্ষীর-বর্ণার ক্ষীর আনতে হীরার দেশে যায়।
তিন ভুবনে সবাই খুকুর আদর পেতে চায়।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি!

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের দুই বৎসর ঃ—

১৯৪৫ সালের ২৬শে জুন সানফ্রানসিস্কো সহরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের সনদ স্বাক্ষরিত হয়। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে এই দিনটিতেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের জন্ম হইয়াছে, এ কথা অবশ্যই বলিতে পারা যায়। গত ২৬শে জুন (১৯৪৭) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ স্বাক্ষরিত হওয়ার দ্বিতীয় বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ক্লেমেণ্ট এটলী, মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান, ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ পল রামাদিয়ের, সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক জেনারেলিসিমো ষ্টালিনের পক্ষে মঃ আন্দ্রেই গ্রমিকো এবং চীনের রাষ্ট্রনায়ক জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক সর্ব্বমানবের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিশ্বব্যাপী ঐক্যের আবেদন জানাইয়াছেন। মিঃ এটলী বলিয়াছেন, "শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হইয়া আমরা যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারি এবং বিঘোষিত প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হই, তাহা হইলে আমরা যে আমাদের নিজেদের এবং বংশধরদের জন্য শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে এবং সাধারণ ভাবে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হইব, তাহাতে সন্দেহ নাই।" প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বলিয়াছেন, "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্ত্তব্য যে সহজসাধ্য নয়, আমেরিকাবাসী তাহা অবগত আছে, কিন্তু সামরিক বাধা-বিপত্তি অথবা বিলম্বের জন্য তাহারা নিরুৎসাহ হইবে না।" মঃ রামাদিয়ের ঐক্য সাধনের জন্য বিশ্ব জুড়িয়া চেষ্টা করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। মঃ গ্রমিকো বলিয়াছেন, "শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতে হইলে যে সকল অপরিহার্য্য উপাদান প্রয়োজন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের সেগুলি সমস্তই আছে।" তিনি আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে। জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক বলিয়াছেন, "ঐক্যবদ্ধ বিশ্বের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য পৃথিবীর সমস্ত জাতি যদি সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দেয়, তাহা হইলে কোন বাধাই অনতিক্রম্য হইবে না।"

বৃহৎ রাষ্ট্রপঞ্চকের আশার বাণী সত্ত্বেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের সম্মুখে যে অনিশ্চিত দুর্গম পথ প্রসারিত রহিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ কথাও অবশ্য সত্য যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ এখনও শৈশব অতিক্রম করে নাই, এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের জীবনে দুই বৎসর কাল হয়ত কিছুই নয়। কিন্তু এক হিসাবে ইহাকে শিশু-প্রতিষ্ঠান বলাও অসঙ্গত। বয়সের দিক হইতে শিশু হইলেও প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইহাকে বহু শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত বৃক্ষের সহিত তুলনা করা চলে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখা-প্রতিষ্ঠান, কমিটি প্রভৃতির নাম এবং কর্ম্মসূচী মনে রাখা যে কি কঠিন ব্যাপার, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরাই শুধু তাহা মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিবেন। আমরা সাধারণ মানুষ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ (General Assembly), সিকিউরিটি কাউন্সিল, আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল, ট্রাষ্টীশিপ কাউন্সিলের নাম অবশ্যই শুনিয়াছি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের কতকগুলি বিশেষজ্ঞ কমিটি আছে। মানুষের অধিকার (Human Rights), সংবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা, যানবাহন ও চলাচল সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে খুবই অস্পষ্ট তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কতকগুলি স্বয়ং-শাসিত (autonomous) প্রতিষ্ঠান আছে। এইগুলির মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক, আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডার (International Monetary Fund), আন্তর্জ্জাতিক খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ব-স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের (United Nations Educational, Social and Cultural Organisation) সংবাদ সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি আন্তর্জ্জাতিক দপ্তরখানা (secretariat) আছে। ১৯৪৭ সালে ৫৬টি প্রধান সম্মেলন হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে; এই সকল সম্মেলনের মোট অধিবেশনের সংখ্যা ২৭১৭টির কম হইবে না বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা, মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার ও স্বাধীনতার পথে গত দুই বৎসরে আমরা একটুকুও অগ্রসর হইতে পারিয়াছি কি?

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের বিগত দুই বৎসরের ইতিহাস সাধারণ মানুষের মনে সামান্য আশাও সঞ্চার করিতে পারে নাই। ভেটোর প্রশ্ন, পরমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ সমস্যা, নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আশ্রয়প্রার্থীদিগকে স্বদেশে ফেরৎ পাঠাইবার সমস্যা লইয়া তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা মীমাংসার পরিবর্ত্তে শুধু তিক্ততাকেই তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। পৃথিবীর ৫৫টি দেশ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের সদস্য। আলাপ-আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্কের ভিতর দিয়া কোন বিষয়েরই মীমাংসা এ পর্য্যন্ত তাঁহারা করিতে পারেন নাই। গ্রীস, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন এবং বলকানের সমস্যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের কর্ম্মসূচীতে স্থান পাইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়রা তাঁহাদের অভিযোগের প্রতিকারের জন্য জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের দিকেই তাকাইয়া আছেন। মিশর ও বৃটেনের মধ্যে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার সমাধানের ভারও মিশর জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের হাতে প্রদান করিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে এগুলি হয়ত খুব

জটিল ও কঠিন সমস্যা নয়। কিন্তু ইউরোপে চলিতেছে ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক চক্রান্ত। এসিয়া ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদ অক্ষুণ্ণ রাখিবার আয়োজন চলিতেছে। পৃথিবীতে শান্তি, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা আজও কি বহু দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয় না? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় না হইয়া কোন কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের পৃথিবীব্যাপী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার আশঙ্কা আজ আর উপেক্ষার বিষয় নয়।

মার্শাল-পরিকল্পনা :—

মার্শাল-পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য গত ২৭শে জুন প্যারী নগরীতে বৃটেন, ফ্রান্স এবং সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্র সচিবদের যে সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছিল তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই সম্মেলনের ব্যর্থতা অবশ্য অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু অনেকে এই ব্যর্থতায় নিরাশও হন নাই, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। রাশিয়া এই সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবে কি না ইহা লইয়া অনেকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছিল। সকলকে বিস্মিত করিয়া রাশিয়া আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেও মার্শাল-পরিকল্পনা সম্বন্ধে বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত রাশিয়া যে একমত হইতে পারিবে না, সে সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। যাহা অপ্রত্যাশিত ছিল না প্যারী সম্মেলনে তাহাই ঘটিয়াছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর এই ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইবে তাহা নির্ভুল ভাবে অনুমান করা হয় ত সহজ নয়, কিন্তু উহার গুরুত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই, উহার পরিণতি বিপজ্জনক হওয়ার আশঙ্কাও উপেক্ষার বিষয় নয়। স্বাভাবিকই এই ব্যর্থতার দায়িত্ব রাশিয়ার উপরেই চাপান হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে এই ব্যর্থতার গুরুত্ব একটুকুও লঘু হইবে না।

যদিও এই সম্মেলনের বিস্তৃত কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই, তাহা হইলেও যেটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহাতেই বুঝা যায় যে, মার্শাল-পরিকল্পনার ব্যাখ্যা লইয়া মতভেদের সৃষ্টিই এই ব্যর্থতার কারণ। মিঃ বেভিন প্রস্তাব করেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপকে যে সাহায্য দিবার প্রস্তাব করিয়াছে তাহার ভিত্তিতে ইউরোপের ঐক্যবদ্ধ পুনর্গঠনের জন্য একটি প্রাথমিক পরিকল্পনা গঠন করা আবশ্যক। মঃ বিদোল এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু মঃ মলটভ বলেন যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য কি প্রয়োজন তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করাই প্রধান কাজ এবং একটি কমিটি এই তালিকাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। সম্মেলনের শেষ বক্তৃতার উপসংহারে মঃ মলটভ বলেন, "The Anglo-French proposal would lead to Britain and France and that group of countries which follows them, separating themselves from the other European States and thus dividing the Europe into two groups of states and creating new difficulties in the relation between them." অর্থাৎ 'ইঙ্গ-ফরাসী প্রস্তাব বৃটেন ফ্রান্স এবং তাহাদের অনুবর্ত্তী দেশগুলিকে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার পথে লইয়া যাইবে এবং তাহার ফলে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি দুইটি দলে বিভক্ত হইবে এবং তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে সৃষ্টি হইবে নূতন অসুবিধা।' তাঁহার এই আশঙ্কা অমূলক কি না তাহা মার্শাল-পরিকল্পনার আলোকে ইঙ্গ-ফরাসী প্রস্তাব আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

গত ৫ই জুন (১৯৪৭) হারবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় মার্কিণ স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ মার্শাল যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়ার এক নূতন পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। প্রকৃত পক্ষে ইহাকে কোন পরিকল্পনা বলিয়া অভিহিত করা যায় না। ইহাতে শুধু ইউরোপের দেশগুলিকে সাহায্য দিবার অভিপ্রায় মাত্র প্রকাশ করা হইয়াছে। কি কি সর্ত্তে সাহায্য দেওয়া হইবে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক্ হইতে আমেরিকা এই সাহায্যের পরিবর্ত্তে কি দাবী করিবে তাহা কিছুই এই পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয় নাই। এমন কি, ইউরোপের কোন্ কোন্ দেশকে সাহায্য করা হইবে তাহাও প্রথমে উহ্য রাখা হইয়াছিল। অতঃপর ১২ই জুন তারিখে ইউরোপকে সাহায্য দান সম্পর্কে তাঁহার নূতন পরিকল্পনার পুনরালোচনা করিয়া মিঃ মার্শাল বলেন যে, হারবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় তিনি যে ইউরোপের কথা বলিয়াছেন, বৃটেন এবং রাশিয়াও তাহার অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরও বলেন যে, ইউরোপ বলিতে এশিয়ার পশ্চিমস্থ সমস্ত দেশকেই (Every thing west of Asia) তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু পরিকল্পনাটিকে সুস্পষ্ট করিবার কোন চেষ্টা তিনি করেন নাই। তিনি শুধু এইটুকু বলিয়াছেন,—"We are following the proposition favouring the economy of Europe on which political future depends. But the initiative must come Europe." অর্থাৎ 'ইউরোপের আর্থিক উন্নতির নীতিই আমরা অনুসরণ করিতেছি। রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ উহারই উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু ইউরোপের দিক্ হইতে প্রথম উদ্যোগ আরম্ভ হওয়া একান্ত আবশ্যক।' ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আমেরিকা সাহায্য করিবে, এরূপ কোন আভাষ ইহাতে পাওয়া যায় না। ইউরোপের দিক্ হইতে উদ্যোগ আরম্ভ হওয়ার কথা যাহা তিনি বলিয়াছেন, তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ মিলিয়া একটি ঐক্যবদ্ধ পরিকল্পনা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত করুক, ইহাই মিঃ মার্শালের অভিপ্রায়। যখন এইরূপ পরিকল্পনা গঠিত হইবে, তখন আমেরিকা উপস্থিত করিবে তাহার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া। ১৬ই জুন তারিখে লণ্ডন হইতে প্রেরিত রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে, মার্শাল-পরিকল্পনার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে আমেরিকার নিকট হইতে বৃটেন পাইয়াছে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ীই যে মিঃ বেভিন প্যারী সম্মেলনে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি যাহাতে আমেরিকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের টোপ গিলিবার জন্য অগ্রসর হয় তাহারই জন্য মার্শাল-পরিকল্পনার চার ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। অথবা এ কথাও বলা যায় যে, ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলিকে সোভিয়েট-বিরোধী ব্লকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য সাহায্যের নামে আমেরিকা ঘুষ দিবার প্রস্তাব করিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কোষাগারের সেক্রেটারী মিঃ স্নিডার (Mr. Snyder) সাংবাদিক-সম্মেলনে

বলিয়াছেন যে, মার্শাল-পরিকল্পনায় ইউরোপের দেশগুলিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কোষাগারের উপর সাদা চেক কাটিবার অধিকার দিবার প্রস্তাব করা হয় নাই। মার্কিণ কংগ্রেস মার্শাল-পরিকল্পনার জন্য কোন ডলার মঞ্জুর করে নাই। ইউরোপের দেশগুলি যদি তাহাদের প্রয়োজনের কোন হিসাব দাখিল করিতে পারে তখন কংগ্রেস কি সর্ত্তে উহা গ্রহণ করিবে তাহা স্থির করিবে। সুতরাং ইউরোপকে সাহায্য দিবার জন্য মিঃ মার্শাল যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা কঠিন নয়।

একটা প্রশ্ন এখানে অবশ্যই উঠিতে পারে যে, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নীতির সহিত মার্শাল-পরিকল্পনার মূলগত কোন পার্থক্য আছে কি? গ্রীস এবং তুরস্ককে আমেরিকা ৪০ কোটি ডলার সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছে। এই অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা পরিচালিত হইবে মার্কিণ মিশন দ্বারা। আমেরিকা হইতে সমরোপকরণ ক্রয়ের জন্য ইরাণকে আড়াই কোটি ডলার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মঞ্জুর করিয়াছে। নরওয়েকে বে-সরকারী ভাবে ঋণ দেওয়া হইয়াছে এক কোটি ডলার। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকোর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। অনুরূপ উদ্দেশ্যেই প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান কানাডায় গিয়াছিলেন এবং কানাডার সহিত সহযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিশ্বব্যাঙ্কের মারফৎ ফ্রান্সকে ঋণ দেওয়া হইয়াছে এবং আরও নূতন ঋণ দেওয়ার কথাবার্ত্তা চলিতেছে। এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাঙ্কের মারফৎ ব্রাজিল, ফিনল্যাণ্ড, তুরস্ক ও ভিনেজুয়েলাকে ২৩ কোটি ডলারেরও বেশী ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সকল ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বলিয়াছেন, "By providing economic assistance by aiding in the task of reconstruction and rehabilitation, we can enable these countries to withstand the forces which so directly threaten their way of life and ultimately our own well-being." অর্থাৎ 'অর্থনৈতিক সাহায্য, পুনর্গঠন ও পুনর্ব্বসতি স্থাপনের কার্য্যে সহায়তা দ্বারা আমরা এই দেশগুলিকে তাহাদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি বিপন্ন করিতে উদ্যত শক্তির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে সামর্থ্য দান করিতে পারি এবং পরিণামে ইহাতে আমাদেরও কল্যাণ হইবে।' এই শক্তি যে কম্যুনিজম এবং কম্যুনিজমের উৎস সোভিয়েট রাশিয়া এবং বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি তাহাতে সন্দেহ নাই। সোভিয়েট রাশিয়াকে কোণ-ঠাসা করা এবং প্রত্যেক দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে দমন করার উদ্দেশ্যেই যে এই সকল ঋণ ও সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, সে বিষয়েও সকলে নিঃসন্দেহ। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নীতি আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই, অন্ততঃ পূর্ব্ব-ইউরোপে তো নয়-ই। মার্কিণ পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মিঃ লিপম্যান পর্য্যন্ত দুঃখের সহিত স্বীকার করিয়াছেন যে, ডলার কূটনীতিরও যে একটা সীমা আছে ট্রুম্যানের নীতির ব্যর্থতা দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। ট্রুম্যানের নীতি যেখানে ব্যর্থ হইয়াছে মিঃ মার্শাল তাঁহার পরিকল্পনা দ্বারা সেইখানে সাফল্য লাভ করিবার আশা করিতেছেন।

মার্শাল-পরিকল্পনার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সহিত অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে আমেরিকার রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১৬ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু আমদানির পরিমাণ ৮ বিলিয়ন ডলারের বেশী হইবে না। আমেরিকার অবশিষ্ট ৮ বিলিয়ন মূল্যের রপ্তানি-দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্ত ডলার কোথায় পাওয়া যাইবে? আমেরিকা তাহার আমদানি-বাণিজ্য দ্বিগুণ করিতে রাজী নয়। কাজেই মার্কিণ-পণ্যের ক্রেতাদিগকে ডলার সরবরাহ করিবার অবশিষ্ট একমাত্র উপায় রহিয়াছে ঋণদান। মার্শাল-পরিকল্পনা এ বিষয়ে ট্রুম্যানের নীতি অপেক্ষা বেশী ব্যাপক। ইহা এক দিকে আমেরিকাকে আসন্ন অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে রক্ষা করিবে, আর দিকে সমগ্র ইউরোপে মার্কিণ রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক আধিপত্য বিস্তারে হইবে সহায়। রাশিয়াকেও তাঁহার পরিকল্পনা হইতে বাদ দেওয়া হয় নাই। কাজেই ইহা যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউরোপের অধিকাংশ দেশকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার প্রয়াস এ কথা বলিবার পথ থাকিবে না। রাশিয়া যদি স্বেচ্ছায় এই পরিকল্পনার বাহিরে থাকে, তাহা হইলে আমেরিকা আর কি করিতে পারে? কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য যে, এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে ইউরোপ সুস্পষ্ট ভাবে রাশিয়া-বিরোধী এবং রাশিয়ার অনুকূল এই দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। ইউ-এন্-আর-আর-এর আয়ুষ্কাল গত ৩০শে জুন শেষ হইয়াছে। সুতরাং ইউরোপকে আর্থিক সাহায্য দিবার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কিন্তু মার্শাল-পরিকল্পনার প্রত্যেকটি ডলার আমেরিকার নির্দ্দেশে ব্যয় করিতে হইবে এবং ইউরোপের পুনর্গঠনের নামে রুশ-বিরোধী ইউরোপকে সমর-সজ্জায় সজ্জিত করা হইবে। ইহার পরিণামে তৃতীয় মহাসমর অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইয়া উঠিবে মাত্র।

ইউরোপীয় ষোড়শ রাষ্ট্র সম্মেলন :—

মার্শাল-পরিকল্পনা সম্পর্কে বৃটেন, ফ্রান্স এবং সোভিয়েট রাশিয়া এই বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয়ের আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর বৃটেন ও ফ্রান্স ইউরোপের ২২টি রাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ করেন। সোভিয়েট রাশিয়া ও স্পেনকে এই আমন্ত্রণ হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, ফিন্ল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। চেকোশ্লোভাকিয়া আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াও পরে উহা প্রত্যাখ্যান করে। মোট ষোলটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া ১২ই জুলাই প্যারী নগরীতে সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। নিম্নলিখিত রাষ্ট্রগুলি এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন— অষ্ট্রীয়া, বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, গ্রীস, আইসল্যাণ্ড, আয়ার, ইটালী, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যাণ্ডস, নরওয়ে, পর্ত্তুগাল, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, তুরস্ক, বৃটেন ও ফ্রান্স।

তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম কবে আরম্ভ হইবে ?

তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম কবে আরম্ভ হইবে তাহা লইয়া রীতিমত গবেষণা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। গত ১৮ই জুন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটির নিকট জেনারেল আইসেন হাওয়ার বলিয়াছেন যে, আগামী এক বৎসরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা আছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক শক্তির তুলনামূলক আলোচনা করিয়া তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মার্কিণ সৈন্যবাহিনীর স্থান যদিও রুশবাহিনীর পরেই, তথাপি শক্তিমত্তার দিক দিয়া রুশ-বাহিনীর তুলনায় উহা অকিঞ্চিৎকর।

তৃতীয় মহাসমর যে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যেই আরম্ভ হইবে তাহার মন্তব্যে এই আশঙ্কা পরিস্ফুটই শুধু হয় নাই, আমেরিকার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিতও উহার মধ্যে সুপরিস্ফুট রহিয়াছে। ৩০শে জুন পিন্সটনে আইনষ্টাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরমাণবিক বিজ্ঞানী পরিষদের এক জরুরী অধিবেশনে আট বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে পূর্ণোদ্যমে পরমাণবিক বোমার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে। যদিও আমেরিকা এখনও পরমাণবিক বোমার একচেটিয়া অধিকারী, তথাপি দীর্ঘ দিন যে এই অবস্থা থাকিতে পারে না, আমেরিকাও সে-সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। একমাত্র আমেরিকাই পরমাণবিক বোমার অধিকারী হওয়ায় অন্যান্য দেশও যে উহার আবিষ্কারের জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে, এই সত্য আর অপ্রকাশ নাই। সিকিউরিটি কাউন্সিলে রুশ-প্রতিনিধি মঃ গ্রমিকো গত ২০শে মে নিউইয়র্ক সহরে মার্কিণ-রুশ ইনষ্টিটিউটের ভোজসভায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, পরমাণবিক শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা শুধু আমেরিকারই একচেটিয়া বলিয়া মনে হইতেছে বটে, কিন্তু এই ধারণা অলীক। ("In reality such a monopoly is an illusion.")। বস্তুতঃ, পরমাণবিক অস্ত্র-শস্ত্র আবিষ্কারের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে প্রতিযোগিতার দৌড় শুরু হইয়া গিয়াছে তাহা গত ৪ঠা জুন জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের এটমিক ওয়ার্কিং কমিটিতে মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ ফ্রেডারিক ওসবরণও স্বীকার করিয়াছেন। বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত ১০টি দেশ পরমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছে; কানাডা, বৃটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, নেদারল্যাণ্ডস্ এবং নিউজিল্যাণ্ড। ইহা ব্যতীত ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়ারও পরমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে গবেষণার পরিকল্পনা আছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে মস্কোস্থিত সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের লেবরেটারী হইতে জনৈক জার্ম্মাণ পরমাণু-বিজ্ঞানী পলায়ন করিতে সমর্থ হন। তিনি বলিয়াছেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া পরমাণবিক বোমা আবিষ্কার করিতে প্রায় সমর্থ হইয়াছে। আগামী তিন হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে রাশিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণবিক বোমার অনুরূপ পরমাণবিক বোমা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া উক্ত জার্ম্মাণ বিজ্ঞানী মনে করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত পিন্সটনে অনুষ্ঠিত পরমাণবিক বিজ্ঞানী পরিষদের বৈঠকে এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ১৯৫৫ সালে রাশিয়া পরমাণবিক বোমা তৈয়ারীর সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিবে।

সোভিয়েট রাশিয়া পরমাণবিক বোমা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবার পূর্ব্বে তৃতীয় মহাসমর আরম্ভ হইবে কি না, তাহা অনুমান করা অবশ্য সম্ভব নয়। পরমাণবিক বোমা নির্ম্মাণে আমেরিকার একচেটিয়া শক্তি বজায় থাকিতে থাকিতেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করার যৌক্তিকতা কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই অনেক মার্কিণ সংবাদপত্র প্রকাশ্যেই প্রচারকার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম কামান-গর্জ্জন আরম্ভ করা বোধ হয় আমেরিকা সঙ্গত বলিয়া মনে করে না। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাঁহার কানাডা পরিদর্শনের সময় মণ্টিবেলো (কুইবেক) গত ১২ই জানুয়ারী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একটি মাত্র উদ্দেশ্য আছে, এই উদ্দেশ্য সমগ্র পৃথিবীতে প্রত্যেক দেশের সহিত শান্তি প্রতিষ্ঠা। সুতরাং আমেরিকা যখন শুধু শান্তিই চায়, তখন তৃতীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইলে আমেরিকা ঐ যুদ্ধের জন্য দায়ী, এ কথা বলিবে কাহার সাধ্য! কিন্তু আমেরিকা যে ভাবী তৃতীয় মহাসমরের জন্য বিপুল ভাবে আয়োজন করিতেছে, এই সত্য ঢাকিয়া রাখিবার উপায় নাই। দেশরক্ষার ব্যবস্থার জন্য সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সামরিক ঘাঁটি নির্ম্মাণে আমেরিকার উদ্যোগের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ২রা জুলাই নিউ ইয়র্কে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে হেনরী ওয়ালেস বলিয়াছেন যে, গ্রীনল্যাণ্ড লইয়া ডেনমার্কের সঙ্গে আলোচনার অর্থই হইল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আর একটি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বর্ত্তমানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কমিশন অত্যন্ত গোপনে গ্রীস এবং তুরস্কে দেশরক্ষার ব্যবস্থা নির্ম্মাণে ব্যাপৃত রহিয়াছে। মার্কিণ যুবকদিগকে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা দিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গঠন করিয়াছে। এই পরিকল্পনা গঠনের জন্য প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান নয় জন সদস্য লইয়া একটি কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশন যে পরিকল্পনা গঠন করিয়াছেন, তাহাতে ১৭৫ কোটি ডলার ব্যয়ে প্রতি বৎসর সাড়ে সাত লক্ষ হইতে সাড়ে আট লক্ষ যুবককে সামরিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। গত ১৩ই মে জেনারেল আইসেন হাওয়ার বলিয়াছিলেন যে, ১৯৭২ সালে যুদ্ধের প্রকৃত কি রূপ হইবে তাহা নির্দ্ধারণের জন্য তিনি তিন জন তরুণ অফিসারকে নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা হয় নাই।

আগামী যুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর পৃষ্ঠভাগ রক্ষার জন্যও আমেরিকা ব্যাপক আয়োজন করিতেছে। আগামী যুদ্ধ যে রাশিয়ার সঙ্গেই হইবে তাহা নিশ্চিত। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই এমন কি আমেরিকাতেও কম্যুনিষ্ট দল আছে। কম্যুনিষ্টরা যুদ্ধ-প্রচেষ্টা ব্যাহত করিতে পারে, এই আশঙ্কা আমেরিকা উপেক্ষা করে নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক ভাবে কম্যুনিষ্ট দমনের ব্যবস্থা হইয়াছে। আমেরিকা-বিরোধী কার্য্যকলাপ সংক্রান্ত সাব-কমিটি হলিউডে পর্য্যন্ত কম্যুনিষ্ট প্রভাবের গন্ধ পাইয়াছেন। সিনেমা শিল্পের প্রত্যেক বিভাগেই না কি কম্যুনিষ্টরা প্রবেশ করিয়াছে। এমন কি, চার্লি চ্যাপলিনকে পর্য্যন্ত কম্যুনিজমের সমর্থক বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে কম্যুনিজম বিতাড়নের জন্য আমেরিকা ঋণ দিতেছে। গ্রীস, তুরস্ক ও ইরাণকে এই উদ্দেশ্যেই ঋণ দেওয়া হইয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতিরাও কম্যুনিজমকে ভয়ের চক্ষে দেখেন। তাঁহারা কম্যুনিজম বিতাড়নের জন্য আমেরিকার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে সাগ্রহে প্রস্তুত। ফ্রান্স ও ইটালীর গবর্ণমেণ্টে কম্যুনিষ্ট যাহাতে গ্রহণ করা না হয়, তাহার পরিবর্ত্তে আমেরিকা ইটালী ও ফ্রান্সকে অর্থ-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। তুরস্ক ও ইরাণে কম্যুনিষ্ট আছে বলিয়া জানা যায় না। লেবানন, সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনে কিছু কম্যুনিষ্ট আছে বটে। তাঁহারা কম্যুনিষ্ট, শুধু এই অপরাধে ইরাকে তিন জন নেতাকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে। আরও দশ জন পনর বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ভাবী তৃতীয় মহাযুদ্ধে মার্কিণ-বাহিনীর পৃষ্ঠভাগ রক্ষার ব্যবস্থা করাই কম্যুনিষ্ট দমনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ভাবী তৃতীয় মহাসমরের পরিণাম কি হইবে, কোন্ পক্ষ জয়লাভ করিবে, তাহা নির্ভুল ভাবে অনুমান করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব

নয়। মস্কোস্থিত 'নিউ ইয়র্ক টাইমসে'র সংবাদদাতা ব্রুক এটকিনসন রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "War between United States and Soviet Russia would be the ultimate catastrophe. Neither side could win. The destruction of human life would be harrowing, The world could not recover for generetions. Let's not talk no casually about war." অর্থাৎ 'মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ চরম বিপর্য্যয়-স্বরূপ হইবে। কোন পক্ষই জয়লাভ করিতে পারিবে না। মানব-জীবনের ব্যাপক ধ্বংস অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক দৃশ্য হইয়া উঠিবে। অত খামখেয়ালী ভাবে যুদ্ধের কথা বলা সঙ্গত নয়।' কিন্তু তাঁহার এই উপদেশে আমেরিকাবাসীর চৈতন্যোদয় হইবে কি?

আমেরিকার শ্রমিক বিল :—

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের ভেটোকে নাকচ করিয়া জুন মাসের শেষ ভাগে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-পরিষদে এবং সিনেটে নূতন শ্রমিক আইন নির্ব্বিঘ্নে পাশ হইয়া গিয়াছে। প্রেসিডেন্টের ভেটো নাকচ করিবার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হয়। গত ২০শে জুন প্রতিনিধি-পরিষদে শ্রমিক বিলের পক্ষে ৩৩১ ভোট এবং বিপক্ষে ৮৩ ভোট হওয়ায় প্রেসিডেন্টের ভেটো বাতিল হইয়া গিয়াছে। সিনেটে এই বিলের পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট অপেক্ষা ৬ ভোট বেশী হইয়াছে। মার্কিণ শ্রমিক নেতারা এই বিলকে 'ক্রীতদাস আইন' (The Slave Bill) নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই আইনে জাতীয় জরুরী ধর্ম্মঘট অন্ততঃ ৮০ দিন পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিবার ক্ষমতা গবর্ণমেন্টকে দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কোন শ্রমিক ইউনিয়নে কম্যুনিষ্ট মনোভাবাপন্ন কর্ম্মচারী থাকিলে তাহার সহিত চুক্তি অস্বীকার করিবার অধিকার, প্রত্যেক কর্ম্মচারীর শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা বিলোপ, চুক্তিভঙ্গকারী ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করিবার ব্যবস্থা এবং যে সকল শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগ দিবে না তাহাদিগকে কাজ দেওয়ার ব্যাপারে বাধা দানকারী ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার এই আইনে প্রধান বিধান।

এই বিল পাশ না করিবার জন্য মার্কিণ শ্রমিকদের নিকট হইতে হাজার হাজার অনুরোধ-পত্র কংগ্রেস সদস্যদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হয় নাই। প্রেসিডেন্টের ভেটো বাতিল করিয়া মার্কিণ সিনেটে এই বিল পাশ হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ৩৪টি কয়লা খনির ১১ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছে। শতকরা ৯০ জন শ্রমিক এই শ্রমিক-বিরোধী আইনের প্রতিবাদে ধর্ম্মঘট করার সম্ভাবনার কথা জনৈক শ্রমিক নেতা প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আর কোন সংবাদ আমরা এখনও পাই নাই। কিন্তু এই শ্রমিক-বিরোধী আইন পাশ হওয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজি ও শ্রমিকের বিরোধ যে এক নূতন পর্য্যায়ে প্রবেশ করিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বহু বৎসর কঠোর সংগ্রাম করিয়া মার্কিণ শ্রমিকরা যে অধিকার অর্জ্জন করিয়াছিল, এই আইন দ্বারা সেগুলি সমস্তই কাড়িয়া লওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাসংগ্রামের মধ্যে পৃথিবী 'মার্কিণ যুগে' (American century) প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া আমেরিকাবাসীরা গর্ব্ব করিয়া থাকেন। এই মার্কিণ যুগ যে প্রকৃত পক্ষে ঘরে-বাহিরে মার্কিণ পুঁজির অবাধ স্বাধীনতা, এই শ্রমিক-বিরোধী আইনের মধ্যে তাহার পরিচয় সুপরিস্ফুট রহিয়াছে। মিঃ মার্শালের 'ইউরোপকে বাঁচাও' (save Europe) পরিকল্পনার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কি, তাহাও কি এই শ্রমিক-বিরোধী আইন হইতে অনুমান করা যায় না?

এই আইন কার্য্যকরী করা সম্ভব হইবে না বলিয়া কোন কোন মার্কিণ শ্রমিক নেতা ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিধা-বিভক্ত মার্কিণ শ্রমিক আন্দোলন এই শ্রমিক-বিরোধী আইনের প্রবল আঘাতে যদি ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে, তাহা হইলেই শুধু এই আইনকে ব্যর্থ করা সম্ভব হইবে। মার্কিণ শ্রমিকরা পরস্পর-বিরোধী দুই দলে বিভক্ত। আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার (A F L) এবং কংগ্রেস অব ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল অরগেনিজেশনের (C I O) পরস্পর তীব্র বিরোধিতার কথা কাহারও অজানা নাই। বিলাতের 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকা এই দুইটি মার্কিণ শ্রমিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বলিয়াছেন: "The AFL regards the CIO as a species of Trojan horse as long as some of its unions continue to be communist dominated, and as long as it maintains its Political Action Committee." 'সি-আই-ওর কতকগুলি ইউনিয়ন যত দিন পর্য্যন্ত কম্যুনিষ্ট দ্বারা প্রভাবিত থাকিবে এবং যত দিন সি-আই-ও 'রাজনৈতিক কার্য্য কমিটি'র অস্তিত্ব বহাল রাখিবে তত দিন এ-এফ-এল উহাকে তেজী ঘোড়া বলিয়া মনে করিবে।' মার্কিণ শ্রমিকরা শ্রমিক হইলেও পুরাদস্তুর সাম্রাজ্যবাদী। যত দিন তাহারা সাম্রাজ্যবাদ বর্জ্জন করিতে না পারিতেছে তত দিন এই দুইটি মার্কিণ শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঐক্য সাধিত হওয়া সম্ভব কি না, তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু যুদ্ধোত্তর আমেরিকার ভাবী অর্থনৈতিক সঙ্কটের আশঙ্কা করিয়াই কংগ্রেস যে এই শ্রমিক-বিরোধী আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

জেনারেল ফ্রাঙ্কো ও স্পেন :—

গত ৬ই জুলাই জেনারেল ফ্রাঙ্কোর উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে স্পেনে যে গণভোট গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে শতকরা ৭০টি ভোট ফ্রাঙ্কোর অনুকূলে হইয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। এই প্রস্তাবিত আইনের বিধান অনুযায়ী জেনারেল ফ্রাঙ্কো তাঁহার জীবিত কাল পর্য্যন্ত স্পেন রাষ্ট্রের মুকুটহীন রাজা হইয়া থাকিবেন। তাহার পর কে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবেন তাহাও তিনিই স্থির করিবেন। এই গণভোটের স্বরূপ সম্বন্ধে ভারতবাসীর নিকট ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই তথাকথিত গণভোটের সাহায্যে ফ্রাঙ্কো তাঁহার শক্তিকে সুদৃঢ় করিয়া লইলেন। অতঃপর ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এক জন বলিয়া গণ্য হইবার জন্ম চেষ্টা করিবার পক্ষে তাঁহার সুবিধা হইবে। ইতিমধ্যেই তিনি ফ্রান্সের জেনারেল দ্য-গলের মত ইউরোপকে কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার হাত হইতে রক্ষা করিবার ধ্বনি তুলিয়াছেন।

জেনারেল ফ্রাঙ্কো সম্বন্ধে আমেরিকা ও বৃটেনের নীতি খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের নির্দ্দেশ অনুসারে বৃটেন স্পেন

হইতে রাষ্ট্রদূত ফিরাইয়া আনিয়াছে। কিন্তু তাহাতে বৃটেন ও স্পেনের মধ্যে একটা বাণিজ্যচুক্তি হওয়ার পক্ষে কোন বাধা হয় নাই। এই চুক্তি অনুসারে স্পেন খাদ্যশস্য ও কাঁচা মাল ধারে আমদানি করিতে পারিবে। কিন্তু মার্শাল-পরিকল্পনা হইতে ফ্রাঙ্কোর স্পেন বাদ পড়িয়াছে। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান আর্জেনটিনার শাসন-ব্যবস্থাকে শুধু উপেক্ষার চক্ষেও দেখেন নাই, পশ্চিম গোলার্দ্ধ রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য আর্জেনটিনার প্রেসিডেণ্ট পেরোনের সহিত আলোচনা করিতে তাঁহার আগ্রহও লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রেসিডেণ্ট পেরোন ফ্যাসিষ্ট ফ্রাঙ্কোর সহিত খুব দহরম মহরম চালাইতেছেন। তাঁহার পত্নী ভূতপূর্ব্ব সিনেমা অভিনেত্রী—স্পেন ভ্রমণে যাইয়া রাজকীয় অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন। বৃটেনেও তাঁহাকে রাজকীয় অভ্যর্থনা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজনীতির গহন গতি সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন।

নিরাপত্তা পরিষদ ও মিশর :—

১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশরীয় সন্ধি সম্পর্কে বৃটেন ও মিশরের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য গত ১৭ই জুন (১৯৪৭) মিশর গবর্ণমেণ্ট জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সিকিউরিটি কাউন্সিল অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদের নিকট আবেদন দাখিল করিয়াছেন। গত জানুয়ারী মাসে ইঙ্গ-মিশরীয় সন্ধি পরিবর্ত্তনের জন্য আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর মিশরের প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, নিরাপত্তা পরিষদের নিকট দরখাস্তে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় দাবী করা হইবে :—(১) নীল নদের উপত্যকা হইতে বৃটিশ-সৈন্যের অপসারণ, (২) সুদান হইতেও বৃটিশের অপসারণ এবং (৩) নীল নদের উপত্যকার ঐক্য। নিরাপত্তা পরিষদের কার্য্যসূচী খুব বেশী ভারী না হইলে বর্ত্তমান জুলাই মাসেই মিশরের আবেদন লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইবে।

মিশরের আবেদন সংক্রান্ত আলোচনায় মিশর হইতে বৃটিশ-সৈন্য অপসারণ অপেক্ষা সুদানের প্রশ্নই বেশী গুরুত্ব লাভ করিবে। সন্ধি-সর্ত্তের পরিবর্ত্তনের জন্য ইঙ্গ-মিশরীয় আলোচনা প্রধানতঃ সুদানের প্রশ্ন লইয়াই ব্যর্থ হয়। নিরাপত্তা পরিষদে সুদানবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতেই বৃটেন মিশরের দাবীর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিবে। কিন্তু সুদানের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নামে বৃটিশ যে সুদানের উপর তাহার আধিপত্য বজায় রাখিতে চায়, নিরাপত্তা পরিষদের এই সরল সত্য উপলব্ধির উপরেই মিশরের দাবীর সাফল্য নির্ভর করিতেছে। নিরাপত্তা পরিষদ এই সরল সত্য উপলব্ধি না করিলে বুঝিতে হইবে যে, সাম্রাজ্যবাদকে নিরাপদ করা ব্যতীত নিরাপত্তা পরিষদের আর কোন কর্ত্তব্য নাই।

প্যালেষ্টাইন তদন্ত কমিটি ও আরব :—

১৬ই জুন (১৯৪৭) সোমবার হইতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের প্যালেষ্টাইন তদন্ত কমিটি তাঁহাদের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। আরব উচ্চতর কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে এই দিন সমস্ত প্যালেষ্টাইনে আরবরা ধর্ম্মঘট প্রতিপালন করিয়াছে। লেবানন ও সিরিয়ার আরবরাও এই ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছিল। যে-সকল বিষয় তদন্তের জন্য এই কমিটিকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে আরবরা সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। আরবদের দাবী উপেক্ষা করিয়া ইহুদীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হইয়াছে বলিয়াই তাহাদের বিশ্বাস। প্যালেষ্টাইন সমস্যার সহিত ইউরোপের আশ্রয়প্রার্থী ইহুদীদের সমস্যাকে সংযুক্ত করাতেও তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম ও স্বার্থের সহিত প্যালেষ্টাইন সমস্যাকে সংযুক্ত করা অন্যায়ই শুধু হয় নাই, ইহাকে অত্যাচারমূলক বলিয়াই আরবরা মনে করে। এই জন্য আরবরা এই তদন্ত কমিটি বয়কট করার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। সহযোগিতার জন্য তদন্ত কমিটির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও তাহাদের এই সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

একমাত্র ট্রান্সজর্ডোয়ানের রাজা আবদুল্লাই প্যালেষ্টাইন তদন্ত কমিটিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন। এই কমিটির সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য আরবদিগকেও তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অনুরোধে কোন ফল হয় নাই। কিন্তু প্যালেষ্টাইন তদন্ত কমিশন সম্পর্কে তাঁহার আগ্রহটা উদ্দেশ্যমূলক মনে করিলে ভুল হইবে না। প্যালেষ্টাইন বিভক্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেকেই করিতেছে। এই আশঙ্কার মধ্যেই রাজা আবদুল্লা আশার আলোক দেখিতে পাইতেছেন। ট্রান্সজর্ডোয়ান, সিরিয়া এবং বিভক্ত প্যালেষ্টাইনের আরব-অধ্যুষিত অংশ লইয়া তিনি বৃহত্তর সিরিয়া গঠন এবং তাহার বাদশা হওয়ার স্বপ্ন দেখিতেছেন। ট্রান্সজর্ডোয়ান কর্ত্তৃক সিরিয়া আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও সিরিয়ার সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি সিরিয়ার সীমান্তে রাজা আবদুল্লার সৈন্যবাহিনীর মহড়াও বোধ হয় অর্থহীন ঘটনা নয়। রাজা আবদুল্লার মনে আরব-জগতের খলিফা হওয়ার স্বপ্নও জাগিয়াছে। এই সকল ঘটনার মধ্যে বৃটিশ কূটনীতির অদৃশ্য হস্ত যে ক্রিয়াশীল তাহা মনে করিলে ভুল হইবে কি ?

ইন্দোনেশিয়ার ভবিষ্যৎ :—

ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের সাম্রাজ্যবাদী কূট কৌশলজালের নিকট ইন্দোনেশিয়ান রিপাবলিক একরূপ সম্পূর্ণ ভাবেই আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা ইহাতেই যে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহা মনে হয় না। গত ২৫শে মার্চ্চ (১৯৪৭) যে ওলন্দাজ-ইন্দোনেশিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তাহাই লিঙ্গাদাজাতি চুক্তি নামে খ্যাত। এই চুক্তিকে কার্য্যকরী করিবার প্রথম ব্যবস্থা হিসাবে ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট পাঁচ দফা সর্ত্তসম্বলিত এক প্রস্তাব ইন্দোনেশিয়ান রিপাবলিকের নিকট উপস্থিত করেন। উক্ত পাঁচ দফা সর্ত্ত এখানে আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম : (১) অন্তর্ব্বর্ত্তী কালের জন্য সমগ্র ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টেরই চরম কর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্ব থাকিবে ; (২) সমস্ত বৈদেশিক সম্পত্তি ফিরাইয়া দিবার জন্য রিপাবলিককে পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে ; (৩) একটি অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে, ইষ্টার্ণ ইন্দোনেশিয়া ও ওয়েষ্ট বর্ণিওরাষ্ট্র উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না এবং বাণিজ্য-শুল্ক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে ; (৪) বিদেশে ইন্দোনেশিয়া রিপাবলিকের কোন পৃথক প্রতিনিধি বা রাজদূত থাকিতে পারিবে না ; (৫) আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ওলন্দাজ ও ইন্দোনেশিয়ার মিলিত পুলিশ বাহিনী থাকিবে। যদিও এই প্রস্তাব শুধু অন্তর্ব্বর্ত্তী কালের জন্যই, তথাপি উহা যে ইন্দোনেশিয়ায় পরিপূর্ণ ডাচ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠার

প্রাথমিক আয়োজন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ডাচ গবর্ণমেন্টই পূর্ব্ব-ইন্দোনেশিয়ায় এবং পশ্চিম-বর্ণিওতে দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দাঁড় করাইয়া ইন্দোনেশিয়াদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রস্তাবে ইন্দোনেশিয়ার রাজী হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল এবং ডাচ ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ডাচ কর্ত্তৃপক্ষ সংঘর্ষের জন্ত প্রস্তুত থাকিতে নির্দ্দেশ পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন।

শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া লিঙ্গাদাজাতি চুক্তি কার্য্যকরী করিবার অভিপ্রায়ে ডক্টর শাহরিয়ার ইন্দোনেশিয়া রিপাবলিকের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে মোটামুটি ভাবে ডাচ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু যে চারিটি বামপন্থী দল লইয়া ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র গঠিত তাহাদের কেহ-ই তাঁহার এই নীতি সমর্থন না করায় তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করেন। ডক্টর শাহরিয়ার ১৯৪৫ সালের নবেম্বর হইতে ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পদত্যাগের পর ডক্টর আমীর শরীফুদ্দিনের প্রধান মন্ত্রিত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। এই নূতন গবর্ণমেন্টও প্রকৃত পক্ষে এক সম্মিলিত পুলিশ-বাহিনীর সর্ত্ত ব্যতীত ডাচ প্রস্তাবের আর সমস্ত সর্ত্তই মানিয়া লইয়াছেন। এমন কি, মধ্য-প্রাচীতে ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্র যে সদিচ্ছা-মিশন প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাও ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা খুসী হইয়াছেন কি? গত ১১ই জুলাই তারিখে ডক্টর ভ্যান মুক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন: "Time is running short and it is imperative that the Linggardjati Agreement be implanted." 'সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে এবং লিঙ্গাদাজাতি চুক্তি কার্য্যকরী করা অবশ্য প্রয়োজন।' তাঁহার এই উক্তি প্রকৃত তাৎপর্য্যপূর্ণ বুঝা যায় হল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক সচিবের উক্তি হইতে। ১২ই জুলাই হল্যাণ্ডের দ্বিতীয় পরিষদে ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে আলোচনার সময় তিনি বলিয়াছেন: "The extreme resort would convince the other party that the Dutch Government is serious in its desire to bear responsibility." 'যে চরম পন্থা গৃহীত হইবে তাহা দ্বারা অপর পক্ষ বুঝিতে পারিবেন যে, ডাচ গবর্ণমেন্ট পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণে কৃতসংকল্প।' এই চরম পন্থা যে ইন্দোনেশিয়ায় আর একটি প্রবল সংঘর্ষের ইঙ্গিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইন্দোনেশিয়াকে হয় সম্পূর্ণ ভাবে হল্যাণ্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, না হয় সংঘর্ষ অনিবার্য্য।

ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিবার জন্ত ওলন্দাজ গবর্ণমেন্ট যে অনমনীয় দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার মূলে যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ডাচ প্রস্তাব গ্রহণ করিবার জন্ত ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রকে অনুরোধ করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্ট পত্র দিয়াছেন। মার্কিণ গবর্ণমেন্ট ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রকে জানাইয়াছেন, ডাচ প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ইন্দোনেশিয়াকে ১০ কোটি ডলার ঋণ দেওয়া হইবে। জাপানের আত্মসমর্পণের পর আমেরিকা ও বৃটেন ইন্দোনেশিয়ায় পুনরায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে হল্যাণ্ডকে সাহায্য করিয়াছে। ইন্দোনেশিয়া যাহাতে স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারে এ জন্ত বৃটেন ও আমেরিকা হল্যাণ্ডের সহিত চক্রান্ত করিয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে না। আজ ইন্দোনেশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা হল্যাণ্ডের নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুই হইবে না।

চীন কোন্ পথে?—

জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে চীনা কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণের জন্ত চীনের জাতীয় সরকার আয়োজন করিতেছেন। সম্প্রতি মাঞ্চুরিয়ার প্রধান রেলওয়ে কেন্দ্র সেপিংকাই দখলের সংগ্রামে চিয়াং কাইশেকের সৈন্তদল ৩০ হাজার চীনা কম্যুনিষ্ট সৈন্ত নিহত ও বহু সহস্র চীনা কম্যুনিষ্ট সৈন্ত পর্য্যুদস্ত করার যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এই ব্যাপক আক্রমণেরই প্রারম্ভ কি না তাহা অনুমান করা কঠিন। এই সংবাদ কতখানি সত্য, তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়? গত এক বৎসর ধরিয়া চিয়াং কাইশেক চীনা কম্যুনিষ্টদিগকে পরাজিত ও ধ্বংস করিয়া আসিতেছেন বলিয়া আমরা শুনিতে পাইতেছি। কিন্তু চীনা কম্যুনিষ্টরা তো ধ্বংস হয়-ই নাই, বরং চীনের জাতীয় সরকার যে ভাবে মার্কিণ সাহায্যের জন্ত করুণ আর্ত্তনাদ করিতেছেন তাহাতে প্রকৃত অবস্থা অন্তরূপ বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। চীনা জাতীয় গবর্ণমেন্টের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডক্টর সুন ফো গত ২২শে জুন তারিখে বলিয়াছেন যে, চীনা কম্যুনিষ্টরা সোভিয়েট রাশিয়ার পুরাপুরি সমর্থন পাইতেছে। শুধু এইটুকু বলিয়াই তিনি সন্তুষ্ট হন নাই, চীন সম্পর্কে মার্কিণ নীতি নূতন করিয়া নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া তিনি বলিয়াছেন, "আমেরিকা যদি চীনকে পরিত্যাগ করে তবে চীনে একমাত্র প্রতিপত্তি থাকিবে রাশিয়ার।"

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য পাইতে হইলে রাশিয়া ও কম্যুনিজমের বিরোধিতা করা এবং রাশিয়ার প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করাই যে শ্রেষ্ঠ উপায়, তাহা ডক্টর সুন ফো ভাল করিয়াই অবগত আছেন। এই উপায়টি আরও শক্তিশালী করিবার জন্য সিংকিয়াং ও বহির্ম্মোঙ্গোলিয়ার মধ্যে সাম্প্রতিক সংঘর্ষকে বহির্ম্মোঙ্গোলিয়াকে শিখণ্ডী খাড়া করিয়া রাশিয়ার সিংকিয়াং আক্রমণ বলিয়া অভিহিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। সিংকিয়াং এবং বহির্ম্মোঙ্গোলিয়া উভয়েই মহাচীনের স্বায়ত্ত-শাসিত রাষ্ট্র। উভয় রাষ্ট্রের সীমান্তে এইরূপ সংঘর্ষ মাঝে মাঝেই হইয়া থাকে। এই সংঘর্ষকে রাশিয়ার আক্রমণ বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে আমেরিকার সাহায্য পাওয়া কঠিন না-ও হইতে পারে। ইহার উপর মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ার তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রচার করিতে পারিলে তো কথাই নাই। ডাঃ সুন ফো বলিয়াছেন, "মাঞ্চুরিয়া কোরিয়া, চীন ও জাপানের চাবিকাঠি। মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ার তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠিত হইলে অতঃপর ঐ দেশগুলিতেও তাহাই ঘটিবে। চীন যদি কম্যুনিষ্টদের হাতে যায়, তাহা হইলে ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলিরও যে অনুরূপ অবস্থাই হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।" ডাঃ সুনফোর দৃষ্টিতে মাঞ্চুরিয়াতেই নূতন বিশ্ব-সংগ্রামের গোড়াপত্তন হইতেছে।

ইহার পরেও আমেরিকা চীনকে সাহায্য করিবে না, ইহা মনে করা কঠিন। মার্কিণ গবর্ণমেন্ট চিয়াং কাইশেকের সৈন্তবাহিনীকে ১৩ কোটি উদ্বৃত্ত রাইফেল-গুলী প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। চিয়াং কাইশেকের গবর্ণমেন্টকে অধিক সাহায্য দেওয়ার কথাও বিবেচনা করা হইতেছে। কিন্তু এদিকে চীনে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে। হংকং-এর উত্তর হইতে

মধ্য-চীনের ভিতর দিয়া উত্তর-পশ্চিম সান্টুং প্রদেশ পর্য্যন্ত অঞ্চল ব্যাপিয়া এই দুর্ভিক্ষ হওয়ার আশঙ্কা করা হইয়াছে। প্রায় ১০ লক্ষ লোক এই দুর্ভিক্ষের কবলে কবলিত হওয়ার আশঙ্কা। চীনের সহর-গুলিতে আমেরিকা-বিরোধী মনোভাব অত্যন্ত প্রবল। জেনারেল চিয়াং কাইশেক তাঁহার বিপ্লবী জীবনের সহকর্ম্মী কম্যুনিষ্ট নেতা জেনারেল মাও সে তুংকে গ্রেফ্‌তার করিবার আদেশ দিয়াছেন। পিপ্‌লস্ পলিটিকেল পার্টি চীনা কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ সমর্থন করেন নাই। সব মিলিয়া চীনের অবস্থা সত্যই অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক।

সিংহলের জন্য ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ :—

গত ১৮ই জুন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ঔপনিবেশিক সেক্রেটারী মিঃ ক্রিচ জোন্স সিংহল দ্বীপকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দেওয়ার অভিপ্রায় কমন্স সভায় ঘোষণা করিয়াছেন। সিংহলের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য মিঃ চার্চ্চিলের কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট লর্ড সোলব্যারীর সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী যে শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছে তাহাকে সাধারণতঃ সোলব্যারী শাসনতন্ত্র নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। ১১৪৬ সালে এই শাসনতন্ত্র বিধিবদ্ধ হয় এবং বর্ত্তমান বৎসরে এই শাসনতন্ত্র অনুসারে নির্ব্বাচন হইয়া আগামী অক্টোবর মাসে সিংহল পার্লামেণ্টের অধিবেশন হইবে। সিংহলকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ দিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নূতন পরিকল্পনার প্রস্তুতির কাজও আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে শেষ হইবে।

সোলব্যারী শাসনতন্ত্র সিংহলবাসীদের স্বাধীনতার দাবী একটুকুও পূরণ করিতে পারে নাই। সিংহলের ষ্টেট কাউন্সিলে এ সম্পর্কে নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। নূতন বৃটিশ পরিকল্পনায় বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে চলিয়া যাইবার সিদ্ধান্ত করিবার কোন স্বাধীনতা সিংহলবাসীকে দেওয়া হয় নাই। মিঃ ক্রিচ জোন্স বলিয়াছেন যে, সিংহল বৃটিশ কমনওয়েলথের সদস্যের পূর্ণ মর্য্যাদা লাভ করিবে। পুরাপুরি ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস ও বৃটিশ কমন-ওয়েলথের সদস্যের পূর্ণ মর্য্যাদার মধ্যে কি পার্থক্য তাহা বলা সহজ কথা নয়। কারণ, দেশরক্ষা ব্যবস্থা পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপার ইত্যাদি সম্পর্কে বৃটেনের সহিত সিংহলের যে চুক্তি হইবে তাহারই উপরে সব কিছু নির্ভর করিবে। সিংহল ক্রাউন কলোনী হইতে অতিক্রান্ত ডোমিনিয়নে পরিণত হইতে চলিলেও সিংহলবাসীর স্বাধীনতার দাবী তাহাতে পূরণ হইবে না।

ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা :—

১৬ই জুন ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিবস হইয়া থাকিবে। এই দিন ব্রহ্ম গণপরিষদে আউঙ্গ সান ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ব্রহ্মদেশের রাষ্ট্র 'স্বাধীন সার্ব্বভৌম প্রজাতন্ত্র' রাষ্ট্র হইবে এবং উহা খ্যাত হইবে 'ব্রহ্ম ইউনিয়ন' নামে। জনসাধারণই হইবে এই রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতার উৎস। এই ইউনিয়নের প্রত্যেক অধিবাসী সমান অধিকার ভোগ করিবে এবং সংখ্যালঘুদের জন্য উপযুক্ত রক্ষা-কবচেরও ব্যবস্থা থাকিবে। এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া আউঙ্গ সান যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে বিশেষ করিয়া ব্রহ্মের সীমান্তবর্ত্তী উপজাতীয়দিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। যদিও উপজাতীয় অঞ্চল সমূহের প্রতিনিধিরাও গণপরিষদে যোগদান করিয়াছেন, তাহা হইলে ব্রহ্মদেশ বিভক্ত হওয়ার আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই। আউঙ্গ সানের বক্তৃতাতেও এই আশঙ্কা পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মের সীমান্তবর্ত্তী উপজাতীয়দিগকে আশ্বাস দিয়া আউঙ্গ সান বলিয়াছেন, তাহাদের ভীত হইবার কিছুই নাই। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, উপজাতীয়রা ইচ্ছা করিলে গণপরিষদে যোগদান করিতেও পারে, না-ও করিতে পারে। কিন্তু উপজাতীয় প্রতিনিধিদিগকে তিনি সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, যদি তাঁহারা ব্রহ্ম ইউনিয়নের বাহিরে থাকিতে চান, তবে গণপরিষদের কাজে কিছুতেই তাহাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। উপজাতীয়দের মধ্যে এক দল লোক যে বৃটিশের সহিত দল পাকাইবার চেষ্টা করিতেছে, সে কথা উল্লেখ করিয়া আউঙ্গ সান বলিয়াছেন, "যদি আপনারা বৃটিশের পক্ষে যোগদান করেন, আমাদের বিরুদ্ধে যান, তাহা হইলে আপনাদের অবস্থা খুব কঠিন হইবে।"

তাঁহার এই সতর্ক-বাণীর ফল কি হইবে এখনও তাহা অনুমান করা কঠিন। ব্রহ্মদেশের সদিচ্ছা-মিশন বর্ত্তমানে বিলাতে গিয়াছে। এই সময় উপজাতীয় অঞ্চলগুলিকে ব্রহ্মদেশ হইতে পৃথক্ রাখিবার জন্য একটা চেষ্টা চলিবার প্রবল আশঙ্কা আছে। আরাকানের সমস্যাও বড় কম জটিল নয়।

ভিয়েটনাম্, মাডাগাস্কার ও মরোক্কো :—

সাত মাস ধরিয়া ভিয়েটনামীদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম চলিতেছে। কবে এবং কি ভাবে এই স্বাধীনতা-সংগ্রাম শেষ হইবে তাহা বলা কঠিন। ইন্দোচীনের ফরাসী হাই-কমিশনার এইরূপ আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ইন্দোচীনের যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হইবে। কিন্তু জনৈক ফরাসী সাংবাদিক ইন্দোচীন হইতে প্যারীতে প্রত্যাগমন করিয়া বলিয়াছেন যে, এই যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হওয়ার সম্ভাবনা কম। এই যুদ্ধে যে ফ্রান্সের প্রচুর সামরিক শক্তি ব্যয়িত হইতেছে তাহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। ভিয়েটনামীরা মনে করে, এই যুদ্ধ যত বেশী দিন স্থায়ী হইবে তাহাদের জয় ততই সুনিশ্চিত। সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যতীত ব্যাপক ভাবে অর্থনৈতিক সংগ্রাম আরম্ভ করিবার পরিকল্পনাও ভিয়েটনাম গবর্ণমেণ্টের আছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক্ হইতে ইন্দোচীনের সমস্ত ফরাসীদিগকে বয়কট করা এই পরিকল্পনার মূল কথা।

মাডাগাস্কারের বিদ্রোহ সম্পর্কে অতি সামান্য সংবাদই প্রকাশিত হইতেছে। এই সামান্য সংবাদ হইতেই বুঝিতে পারা যায়, মাডাগাস্কার দ্বীপের অবস্থা এখনও স্বাভাবিক হয় নাই। গত মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে জাতীয়তাবাদীদের যে অভ্যুত্থান হইয়াছে তাহা পূর্ণোদ্যমেই চলিতেছে বলিয়া মনে হয়। মাডাগাস্কারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকিলেও বর্ত্তমানে মালাগাসীদের রাজনীতিতে এম-ডি-আর-এম (Mouvement Democratique de la Renovation Malgache) দলেরই প্রাধান্য। এই দলই বর্ত্তমান বিদ্রোহের জন্য দায়ী। ফ্রান্সও মাডাগাস্কার ত্যাগ করিতে রাজী নয়।

উত্তর-আফ্রিকার মরোক্কোতেও অশান্তি চলিতেছে। ফ্রান্স অবশ্য মরোক্কোর জন্য শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছে। কিন্তু মরোক্কোবাসীরা তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। একুশ বৎসর পরে ফ্রান্সের বন্দিশালা হইতে মুক্ত রীফ-নেতা আবদুল করিম মরোক্কোতে ফরাসী কর্ত্তৃত্বের অবসান ঘটাইবার দাবী করিয়াছেন। কিন্তু উত্তর-আফ্রিকাতেও ফ্রান্স তাহার কর্ত্তৃত্ব বহাল রাখিতে কৃতসঙ্কল্প। যুদ্ধোত্তর শান্তি-স্বাধীনতার স্বপ্ন কবে সফল হইবে কে জানে?

এম ডি ডি

ভারত বিভাগ ও ক্রীড়া-জগৎ :—

বৃটিশ পরিকল্পনায় ও ভারতীয়গণের স্বীকৃতির ফলে অখণ্ড ভারতকে খণ্ডিত করা হইতেছে। এই সম্পর্কে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ভারতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনশীল আবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। এই প্রসঙ্গে খেলার জগতেও যে অপূরণীয় ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, তাহা ভারতীয় ক্রীড়া-জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী সমালোচকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সম্প্রদায়গত পার্থক্যের পরিবর্ত্তে রাষ্ট্রীয় বিভেদের আবির্ভাবে ভারতের নিজস্ব যাহা কিছু বিচ্ছিন্ন হইতে চলিয়াছে। নির্ব্বাচিত অষ্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় দলে ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের এবং দেশীয় রাজ্যের খেলোয়াড়গণ আছেন। দলাদলির চাপে পড়িয়া যদি খেলোয়াড়গণের মধ্যে কেহ কেহ যাইতে না পারেন তাহার ফলে সফরকামী দলের সংহতি ও সামঞ্জস্য ব্যাহত হইবে এবং খেলোয়াড়গণও ব্যক্তিগত ভাবে এক অপূর্ব্ব অনুশীলনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন। দুইটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্রীড়া-পরিচালকমণ্ডলী ভবিষ্যতে কার্য্যকরী এবং অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয়, দুইটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান যত দিন না আন্তর্জ্জাতিক খেলার জগতে নিজেদের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে পারে, তত দিন পর্য্যন্ত এই উভয় রাষ্ট্রের ক্রীড়া-জগৎকে সংযুক্ত রাখার জন্য এক মিলিত ও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি সর্ব্বতোভাবে কাম্য ও প্রয়োজনীয়।

কলিকাতায় ফুটবল প্রসঙ্গ :—

পাওয়ার লীগের উভয় ডিভিসনের খেলাই প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। সান্ধ্য আইনের বেড়াজালে লীগের গতি শ্লথ ও ব্যাহত হওয়ায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। বেণিয়াটোলা দ্বিতীয় ডিভিসনের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। প্রথম ডিভিসনে মোহনবাগান ও ইষ্ট বেঙ্গল দল উভয়েই একটি করিয়া পয়েন্ট নষ্ট করিয়াছে। ইষ্ট বেঙ্গলকে মোহনবাগান ব্যতীত এখনও ভবানীপুরের বিরুদ্ধে খেলিতে হইবে। পাওয়ার লীগ পরিচালকগণ গ্রিফিথ শীল্ড-প্রতিযোগিতা চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শীল্ডের ক্রীড়া-সূচী প্রস্তুত হইলেও সান্ধ্য আইনের কড়াকড়ি ও সময়ের অপর্য্যাপ্তির জন্য খেলা স্থগিত আছে।

সহরের অবস্থার ক্রমিক উন্নতির ফলে কয়েকটি ক্লাবের আবেদন-ক্রমে আই, এফ, এ, কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল পুনঃ প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করে। শেষ পর্য্যন্ত সাত জন কার্য্যকরী সমিতির সদস্যকে লইয়া গঠিত এক সাব-কমিটির হস্তে এই বিষয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্দ্ধারণের ভার দেওয়া হয়।

বাঙ্গালোরে এ বৎসর নিখিল ভারত ও আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণে মহীশূর ফুটবল এসোসিয়েশন অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়াছে। সুদূর-পরাহত হইলেও অনেকে আশা পোষণ করেন যে, হয়ত কলিকাতায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। নিখিল ভারত আন্তঃরেলওয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর এ বৎসর কলিকাতাতেই হইবে। ইংরাজী চলতি মাসের শেষ ভাগে এই প্রতিযোগিতার খেলা সুরু হইবে। ১২টি প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় রেলদল যোগদান করিয়াছে।

আই, এফ, এর অন্তর্ভুক্ত অবিচ্ছিন্ন বাঙলার আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা জলপাইগুড়ীতে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির আছে।

ভারতীয় টেনিস দলের ইউরোপীয় সফর :—

লণ্ডন টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় সুমন্ত মিশ্র স্ট্রেট্ সেটে মার্কিণী খেলোয়াড় রবার্ট ফকেনবার্গের নিকট সেমি-ফাইন্যাল খেলায় পরাজিত হয়। প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে মিশ্রের খেলায় যথেষ্ট অসুবিধা হয়।

উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খেলোয়াড়গণের মধ্যে গউস মহম্মদ জে, এসবথের (হাঙ্গেরী) নিকট ৬-৩, ৬-২ ও ৬-৪ সেটে, জিমি মেটা চেকোশ্লোভাকিয়ার ডবনীর বিরুদ্ধে ৬-২, ৬-১ ও ৬-২ সেটে এবং মানমোহন ৭-৫, ১-৬, ৬-২, ৫-৭ ও ৬-৩ সেটে যুক্তরাষ্ট্রের বাজ প্যাচীর নিকট দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় পরাজিত হইয়া বিদায় গ্রহণ করে। প্যাটির বিরুদ্ধে ২৩টি গেমে জয়ী হওয়া মানমোহনের পক্ষে কৃতিত্বের কথা। বেলজিয়ামের ভ্যান ডি আইণ্ডীর বিরুদ্ধে দিলীপ বসু ২-৬, ৬-১, ৬-৪, ৪-৬ ও ৬-৪ সেটে জয়লাভ করিয়া ডেভিস কাপে পরাজয়ের উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করে। কিন্তু তৃতীয় রাউণ্ডের সীমানা কোন ভারতীয় খেলোয়াড়ই অতিক্রম করিতে পারে নাই! অষ্ট্রেলিয়ার শ্রেষ্ঠ টেনিস-তারকা ডিনী পেল্স অনায়াসে সুমন্ত মিশ্রকে পরাজিত করে। তাহাদের খেলা মাত্র ৪৫ মিনিট চলে। বিজয়ী পেল্স মিশ্রের "ক্যানন সার্ভিসের" প্রশংসা করে, কিন্তু মিশ্র শেষ রক্ষা করিতে পারে না। ইফতিকার আমেদ আড়াই ঘণ্টাব্যাপী ৬২টি গেমের পরে ফ্রান্সের ৪ নং খেলোয়াড় আবদে সেলামের নিকট পরাজিত হয়। গত বৎসরের বিজয়ী ছয় ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা পেট্রার বিরুদ্ধে দিলীপ বসু তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরেও পরাভব মানিতে বাধ্য হয়। পুরুষদের ডাবলস্ বিভাগের কোয়ার্টার ফাইন্যাল পর্য্যায়ে জিমি মেটা ও সুমন্ত মিশ্র মট্রাম (বৃটেন) ও সিডওয়েলের (অষ্ট্রেলিয়া) নিকট পরাজিত হয়।

এ বৎসরের উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতায় শেষ পর্য্যন্ত মার্কিণী খেলোয়াড়গণের জয়জয়কার পড়িয়া যায়। জ্যাক ক্র্যামার সিঙ্গলসে এবং রবার্ট ফকেনবার্গের সাহায্যে ডাবলসেও জয়ী হয়। মহিলাদের সিঙ্গলসে যুক্তরাষ্ট্রের মিস্ অসবোর্ণ এবং ডাবলসে মিস্ বার্ট ও মিসেস্ টড শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন।

মিশ্র ডাবলসে অষ্ট্রেলিয়ার ব্রমউইচ ও মিস্ ব্রাউ জয়লাভের গৌরব অর্জ্জন করে। একমাত্র ব্রমউইচ ব্যতীত আর শীর্ষস্থানীয় সকলেই মার্কিণী খেলোয়াড়। যুক্তরাষ্ট্রের এই অপূর্ব্ব গৌরবের কথা স্মরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতী টেনিস মহলের দৈন্যের জন্য দুঃখ না করিয়া পারা যায় না। আগামী শীত ঋতুতে ফ্রান্সের পেট্রা ও বার্ণার্ড এবং সুইডেনের বার্গেলীন ও জোবাজন সম্ভবতঃ ভারতে খেলিতে আসার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন। ভারতীয় টেনিসবিদ্গণ ইহাতে অনুশীলনের অপূর্ব্ব সুযোগ লাভ করিবে।

খেলোয়াড়গণের এই জাতীয় সফর শিক্ষাপ্রদ সন্দেহ নাই কিন্তু আমাদের মনে হয়, অন্যান্য বিভাগীয় খেলাধূলার ন্যায় টেনিসেও এক জন বহুদর্শী ও অভিজ্ঞ কোচের প্রয়োজন।

বঙ্গবিভাগ

৫ই আষাঢ় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা সমূহের সদস্যদের পৃথক্‌ অধিবেশনে কংগ্রেস দলের চীফ হুইপ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় যুক্ত অধিবেশনের দাবী করিয়াছিলেন, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির সদস্যদের পৃথক্‌ অধিবেশনে এই দাবী করিয়াছিলেন কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়। বাঙ্গালা অবিভক্ত থাকিলে কোন্‌ গণপরিষদে যোগ দিবে তাহা নির্দ্ধারণ করাই ছিল এই যুক্ত অধিবেশনের উদ্দেশ্য। কোন লীগপন্থী সদস্য যুক্ত অধিবেশনের দাবী করেন নাই। ভারতীয় খৃষ্টান সদস্য মিঃ রবার্ট, এ. গোমেশ এবং তপশীলী সদস্য মিঃ ভোলানাথ বিশ্বাস, মিঃ দ্বারকানাথ বারোরী, মিঃ গয়ানাথ রায় ও নগেন্দ্রনাথ রায় বর্ত্তমান গণ-পরিষদে যোগদানের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়া লীগপ্রীতি অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। কম্যুনিষ্ট সদস্য হঠাৎ নিরপেক্ষ রহিলেন, যদিও তাঁহাদের লীগানুগত্য সর্ব্বজনবিদিত। মার্কসপন্থী হইয়াও কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের ভরাডুবির জন্য ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

অতঃপর বঙ্গবিভাগ সম্পর্কে ভোট গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা পরিষদের দুই অংশের পৃথক্‌ অধিবেশন হয়। পশ্চিম অংশের (হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির) সদস্যদের অধিবেশনে ৫৮-২১ ভোটে বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২১ জন মুসলমান সদস্যদের ২১ জনই বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে ভোট দেন। কংগ্রেসী সদস্যগণ, হিন্দু মহাসভার সদস্য, জমিদার নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর সদস্য, ২ জন কম্যুনিষ্ট এবং ৪ জন এংলো-ইণ্ডিয়ান এই মোট ৫৮ জন সদস্য বঙ্গ-বিভাগের অনুকূলে ভোট দেন। এক জন কংগ্রেসী সদস্য মিঃ জে, সি, গুপ্ত বিলাতে থাকায় অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন নাই।

পরিষদের পূর্ব্ব অংশের (মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির) সদস্যদের পৃথক্‌ অধিবেশনে বঙ্গ-বিভাগের বিপক্ষে ১০৬ ভোট এবং পক্ষে ৩৫ ভোট হয়। এই ৩৫ ভোটের মধ্যে এক ভোট কম্যুনিষ্ট সদস্যের এবং ৩৪টি অমুসলমান ভোট। বিপক্ষে যাঁহারা ভোট দেন তাঁহাদের মধ্যে ১০০ জন লীগ দলের সদস্য ও বাকী ১ জন ভারতীয় খৃষ্টান এবং পাঁচ জন তপশীলী সদস্য। এই মহাত্মাদের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। বিশিষ্ট লীগ-নেতা মিঃ এ, কে, ফজলুল হক অনুপস্থিত ছিলেন।

আজ হিন্দু-বঙ্গরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে বটে কিন্তু বিজয় উৎসব করিবার সময় এখনও আসে নাই। সীমা নির্দ্ধারণের জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে সংগ্রাম করিতে হইবে। যশোহর, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলা, সমগ্র বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলার এবং মালদহ, রাজসাহী, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার হিন্দুপ্রধান অংশ হিন্দু-বঙ্গরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে না পারিলে এ সাফল্য অনেক পরিমাণে ম্লান হইয়া যাইবে। সীমানা নির্দ্ধারিত হইলেও কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। এই নূতন রাষ্ট্রকে ধনে, জনে, সম্পদে, শক্তিতে সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত এই সকল দায়িত্ব সুসম্পন্ন করিয়া তুলিতে না পারি সে পর্য্যন্ত বিজয় উৎসব করিবার অধিকার আমাদের নাই।

বঙ্গবিভাগ কাউন্সিল

বঙ্গবিভাগ হইয়াছে। ভৌগোলিক বিভাগের যেটুকু বাকী আছে সীমানা নির্দ্ধারণ কমিশন তাহা সম্পূর্ণ করিবেন। কিন্তু বাঙ্গালা সরকারের যে সকল সম্পদ এবং দায় আছে সেগুলিকেও উভয় বাঙ্গালার মধ্যে বিভাগ করিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত বাঙ্গালা বিভাগ সম্পূর্ণ হইবে না। ভারত সরকারের সম্পদ ও দায় বিভাগ করিবার জন্য কেন্দ্রে একটি বিভাগ-কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটির আদর্শ অনুযায়ী প্রদেশ সমূহে উচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট বিভাগ-কমিটি গঠন করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক গভর্ণরগণ বড়লাটের নিকট হইতে নির্দ্দেশ পাইয়াছেন। বাঙ্গালার 'সেপারেশন কমিটি' গঠিত হইয়াছে ৪ জন সদস্য লইয়া। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ও ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখার্জ্জী এবং লীগের পক্ষ হইতে সুরাবর্দ্দী ও খাজা নাজিমুদ্দীন আছেন। সভাপতি হইয়াছেন বাঙ্গালার গভর্ণর বারোজ সাহেব স্বয়ং। বারোজ সাহেবের লীগ-প্রীতি সর্ব্বজনবিদিত। মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে যে দুই জন সদস্য আছেন তাঁহাদের বুদ্ধি এবং চাতুর্য্য দুই-ই প্রখর। উভয়েই বাঙ্গালার সচিব ও প্রধান-সচিব পদে বহু দিন কাজ করিয়াছেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার যোগ্য ব্যক্তি। তিনি বিখ্যাত অর্থনীতিক, এবং বাঙ্গালার সচিব পদে ও ভাইসরয়ের Executive Councilএ কাজ করিয়াছেন। কিন্তু আর এক জন সদস্য সম্পর্কে আমাদের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নাই। আমরা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর নাম সদস্য-তালিকায় দেখিতে পাইব আশা করিয়াছিলাম। কংগ্রেস সদস্যদের ভুলিলে চলিবে না যে, তাঁহাদের লড়িতে হইবে অন্য দুই তুখোড় সদস্য এবং নামে নিরপেক্ষ হইলেও কার্য্যতঃ পক্ষপাতিত্বদুষ্ট সভাপতির বিরুদ্ধে।

সীমা নির্দ্ধারণ কমিশন

সীমা নির্দ্ধারণ কমিশনে নিম্নলিখিত সদস্যগণ থাকিবেন। বাঙ্গালার জন্য—(১) বিচারপতি মিঃ বিজনকুমার মুখার্জ্জী, (২) বিচারপতি মিঃ চারুচন্দ্র বিশ্বাস, (৩) বিচারপতি মিঃ আবু সালে মহম্মদ আক্রাম (৪) বিচারপতি মিঃ এস, এ, রহমান। পাঞ্জাবের জন্য—(১) বিচারপতি মিঃ দীন মহম্মদ, (২) বিচারপতি মিঃ মহম্মদ মুনির, (৩) বিচারপতি মিঃ মেহেরচাঁদ মহাজন, (৪) বিচারপতি মিঃ তেজ সিং।

উভয় কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন সার সিরিল র‍্যাডক্লিফ। ইনি লণ্ডন বারের অন্যতম নেতা।

কমিশনদ্বয়ের কাজ হইবে গায়ে গায়ে লাগোয়া মুসলমান ও অমুসলমান সংখ্যাগুরু অঞ্চলগুলি স্থির করার ভিত্তিতে বাঙ্গালার এবং পাঞ্জাবের দুইটি অংশের সীমা-রেখা স্থির করা। সীমা নির্দ্ধারণের সময় কমিশন অপরাপর বিষয় সম্পর্কেও বিবেচনা করিবেন।

সার সিরিল ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ হয়। তিনি যেন হাওয়ায় উড়িতেছেন। অনেকে বলিতেছে, যাহা করিবার তাহা ঠিক করাই আছে। নির্দেশ লইয়াই তিনি বিলাত হইতে আসিয়াছেন। তাঁহার গতিবিধি এবং দুইটি কমিশনের একই সভাপতি হওয়াতে আমাদের মনেও সেই সন্দেহ স্থান পাইতেছে। যদি ইহা সত্য হয় তবে এ প্রহসনের প্রয়োজন কি?

সীমানা কমিশনের দায়িত্ব

লীগপন্থী মুসলমানদের অত্যাচারে এবং অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির জন্যই বাঙ্গালা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হইয়াছে। ফলে অনেক সমস্যাই উদিত হইয়াছে যাহার সুষ্ঠু সমাধানের উপরই জনসাধারণের জীবন-যাত্রার উন্নতি ও মঙ্গল বিধান নির্ভর করিতেছে। পাঞ্জাবে যে ভাবে আজ কাজ চালানো বিভাগ হইয়াছে তাহাতে শিখ সম্প্রদায় প্রায় সমান সমান দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাব দুই দিকেই তাঁহারা বর্ত্তমানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। পাঞ্জাবের সহিত শিখ সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, ইতিহাস অবিচ্ছেদ্য ভাবে বহু দিন হইতে জড়িত। কিন্তু আজ কলমের খোঁচায় যে ভাবে বিভাগ হইয়াছে, তাহা শিখেদের প্রতি একেবারেই সুবিচার করা হয় নাই। সীমানা কমিশন এই অবিচারের প্রতিকারের পন্থা আবিষ্কার করিতে না পারিলে সেখানে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা বাতুলতা মাত্র।

বাঙ্গালা দেশও কাজ চালানোর সুবিধার জন্য যে ভাবে বিভক্ত হইয়াছে তাহাতে হিন্দুদের প্রাপ্য অংশ হইতে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত করা হইয়াছে। কেবল সীমানা কমিশনে এই বঞ্চনার শেষ হইবে ইহাই আমাদের একমাত্র আশা। বাঙ্গালার সীমানা নির্দ্ধারণ প্রশ্নের আসল কারণ লীগপন্থীদের অসঙ্গত আবদার। ভদ্রভাবে মীমাংসা চাহিলে কোন সমস্যাই দেখা দিত না। কিন্তু যাহারা কোন দিনই ভদ্রতার ধার ধারে নাই আজ তাহাদের কাছে তাহা আশা করিলে চলিবে কেন? সুরাবর্দ্দী সাহেবের পত্রিকা 'ইত্তেহাদ' মানচিত্র সহযোগে প্রমাণ করিতেছে যে, কেবল বর্দ্ধমান বিভাগটুকু হিন্দুদের দিলেই সুবিধা হয়; কারণ তাহা হইলে ভাগীরথীকে একটা প্রাকৃতিক সীমানা হিসাবে পাওয়া যাইবে। মৌলানা আক্রাম খাঁর 'আজাদ' আবার উপরে যান। কলিকাতার মুসলমান এলাকাগুলিকে গ্রাস করিবার জন্য তাঁহারা পাকিস্থানীদের ক্ষেপাইয়া তুলিতে কসুর করিতেছেন না। কলিকাতা সহরে শতকরা ৭৫ জন হিন্দু, তথাপি এই ধরণের জিগির তুলিয়া লীগ যখন গণ্ডগোল করিতে চাহিতেছে, তখন তাহাদের মতলব অত্যন্ত পরিষ্কার। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ সহর হিন্দুপ্রধান এবং সেই কারণে ঐ সব সহরকে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত না করিবার দাবী হিন্দুরা তুলিলে সেটা লীগওয়ালারা কিরূপ উপভোগ করিবেন! সীমানা কমিশনকে এই ধরণের অসংখ্য অসঙ্গত দাবীর ব্যূহ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

সীমানা নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে বাঙ্গালার জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতিই যে শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড হওয়া বিধেয় তাহাতে ভুল নাই। বাঙ্গালার সেচ-ব্যবস্থার উপরই কৃষি নির্ভর করে। এই সেচ-ব্যবস্থাকে উন্নত করিতে হইলে মজা নদীগুলির সংস্কার প্রয়োজন। রাজসাহীর উপরে গঙ্গানদীর বাঁধ এবং তিস্তা নদীর বাঁধের যে পরিকল্পনা আছে সেগুলিকে কার্য্যকরী করার উপর নূতন বাঙ্গালার সমৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করিবে। কিন্তু এই পরিকল্পনাগুলিকে কার্য্যকরী করিতে হইলে আত্রেয়ী হইতে শেষে পদ্মা অবধি নূতন বাঙ্গালার সীমানা হওয়া একান্ত আবশ্যক। আশা করি, কমিশন এদিকে নজর রাখিবেন।

বাঙ্গালায় যে সকল বেসরকারী সীমানা-উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রধান অসুবিধা এই যে, অনেক প্রয়োজনীয় সরকারী তথ্য লীগপন্থী সরকারী কর্ম্মচারীরা তাঁদের সরবরাহ করিতে নারাজ। ইহার উপর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের একযোগে কাজ করাও শক্ত। অবশ্য আচার্য্য কৃপালনী একটি কেন্দ্রীয় কমিটি এ সম্পর্কে গঠন করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সেই কমিটির মধ্যে বিভিন্ন দলের মত-ভেদের ফলে সহযোগিতা বর্ত্তমানে কার্য্যতঃ একেবারেই নাই। কংগ্রেসপন্থীরা যে তথাকথিত উদারতার বশে বাঙ্গালার অধিকাংশ লীগপন্থীদের হাতে তুলিয়া দিতে চাহেন, সে উদারতা হিন্দুজনগণ হজম করিয়া লইতে অক্ষম। হিন্দুদের যখন দুঃখ ভোগ করিতে হইবে তখন কংগ্রেস-নেতারা তাহার ভাগ লইতে আসিবেন না। প্রেস মারফৎ একটি আশ্বাস-বাণী পাঠাইবেন মাত্র। বাঙ্গালার প্রতি কংগ্রেসের এই উপেক্ষা বাঙ্গালার হিন্দুরা চিরকাল লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। কংগ্রেসের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিলে কোন ফলই হইবে না। সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সুস্পষ্ট ভাষায় স্মারকলিপি পাঠাইয়া সীমানা কমিশনকে জনসাধারণের মত জানাইতে হইবে। তাঁহারা এই সব মতামত এবং তথ্য উপেক্ষা করিবেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

নব মন্ত্রিসভা

বৃটিশ সরকার এখন সব কিছুরই দায়িত্ব ভারতীয় নেতাদের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করিতেছেন। পশ্চিম বাঙ্গালার জন্য 'সাক্ষীগোপাল' মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা সেই সভার সদস্য:—

১। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (প্রধান মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র বিভাগ) ২। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (অর্থ, গণস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন) ৩। ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী (বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প) ৪। শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি (শিক্ষা) ৫। শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা (ডাঃ রায়ের অনুপস্থিতিতে) ৬। শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায় (সাহায্য ও সমবায়) ৭। শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখার্জ্জী (রাজস্ব ও জেল) ৮। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বর্ম্মণ (বিচার ও ব্যবস্থাপক) ৯। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর (কৃষি, মৎস্য চাষ ও বন) ১০। শ্রীযুক্ত রাধানাথ দাস (বেসামরিক সরবরাহ) ১১। শ্রীযুক্ত বিমলকুমার সিংহ (পূর্ত্ত)।

বাঙ্গালার বর্ত্তমান লীগ-মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রতি গবর্ণর বারোজ সাহেবের দরদের জন্যই কংগ্রেস নেতারা একান্ত নিরুপায় হইয়াই পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থের প্রতিকূল আপোষ-মীমাংসায় রাজী হইতে বাধ্য হইয়াছেন। বঙ্গভঙ্গের পর লীগ-মন্ত্রিমণ্ডলীর টিকিয়া থাকা উচিত নহে; কারণ তাঁহারা বাঙ্গালার এক অংশের প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে পারেন না।

বারোজ সাহেব নিজে ইহা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ২০শে জুনের পর হইতে তাঁহার নীতি কিছু বদলাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টায় ছিলেন জানি কিন্তু বাঙ্গালা বিভাগ অনিবার্য্য হইয়া উঠিলে তিনি আঞ্চলিক মন্ত্রিসভা গঠনের জন্ত কোন চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানি না। তিনি ইচ্ছা করিলে লীগ মন্ত্রিসভা কোন বাধাই সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। কিন্তু লীগ-মন্ত্রিসভাকে বহাল রাখিবার জন্ম তাঁহাদের আপত্তির অজুহাত তুলিয়া 'আঞ্চলিক মন্ত্রি-সভা গঠন না করার উদ্দেশ্য যে মুসলিম লীগের সর্ত্তে কংগ্রেসকে আপোষ করিতে বাধ্য করা, তাহা 'সাক্ষীগোপাল' মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যবস্থা হইতেই বুঝা যায়। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা 'তদারকী গভর্ণমেণ্ট' হিসাবে কাজ করিলেও বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের প্রকৃত ক্ষমতা যে তাঁহাদের হাতেই ন্যস্ত থাকিবে, এ কথা বারোজ সাহেব নিজে স্বীকার করিয়াছেন। ইহার অর্থ, বিভিন্ন বিভাগের শাসনতান্ত্রিক কর্ত্তৃত্ব পরিচালন করিবেন সুরাবর্দ্দী মন্ত্রিসভা। নীতি-নির্দ্ধারণও তাঁহারাই করিবেন। তবে যেখানে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ সম্পর্কিত ব্যাপার উপস্থিত হইবে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীদের সহিত তাঁহারা পরামর্শ করিবেন এবং পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীরা রাজী না হইলে, ঐ সকল নীতি কেবল পূর্ব্ববঙ্গ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হইবে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ সম্বন্ধে গৃহীত নীতি পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থের প্রতিকূল হওয়ার আশঙ্কা আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। সরকারী মজুত চাউল বণ্টনের কথা যদি বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলেই বিষয়টি আমরা বুঝিতে পারি। সরকারী বহু মজুত চাউল পূর্ব্ববঙ্গে চালান দেওয়া হইতেছে বলিয়া শোনা যায়, অথচ পূর্ব্ববঙ্গে চাউলের দাম হু-হু করিয়া বাড়িয়া চলিতেছে। এই চাউল যাইতেছে কোথায়? পূর্ব্ববঙ্গের নাম করিয়া যদি এইরূপ নীতি গৃহীত ও পরিচালিত হইতে থাকে, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গে আগামী কয়েক মাস খাদ্য-শস্যের অনটন ঘটিবার আশঙ্কা আছে। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারিবেন কি? বড় জোর তাঁহারা বারোজ সাহেবের কাছে নালিশ করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহাতেই বা কি কোন ফল হইবে?

সরকারী বিভিন্ন বিভাগের দৈনন্দিন কাজ পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। প্রয়োজন হইলে অবশ্য তাঁহারা ফাইল চাহিয়া পাঠাইতে পারিবেন। কিন্তু ফাইল চাহিয়াই যে পাইবেন, সে-সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই। আর পাইলেও হয়ত দেখা যাইবে যে, ইতিমধ্যে ক্ষতি যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সংক্রান্ত বিষয়গুলির জন্ত এই 'সাক্ষীগোপাল' মন্ত্রিসভা অবশ্য নীতি নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন কিন্তু তাহা কার্য্যকরী করিতে পারিবেন কি? সে ক্ষমতা তাঁহাদের কোথায়? ভরসা এক বারোজ সাহেব। কিন্তু তিনি এত দিন ধরিয়া যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন তাহাতে আমাদের বিশেষ কোন ভরসা হয় না। নীতি কার্য্যকরী করিবার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের হাতে অর্থাৎ বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর হাতে। কলিকাতার হাঙ্গামা নিবারণ করিবার, অন্যায় ভাবে পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করিবার, পশ্চিমবঙ্গকে অনাহারে রাখিবার জন্য সমস্ত ধান চাউল পূর্ব্ববঙ্গে চালান দেওয়া বন্ধ করিবার ক্ষমতা যদি পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার না থাকে, তাহা হইলে এইরূপ সাক্ষীগোপাল মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার সার্থকতা কি?

বিভক্ত ভারতের গভর্ণর জেনারেল

২২শে আষাঢ় মিঃ এটলীর বক্তৃতা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গোড়ার দিকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান উভয় ডোমিনিয়নের জন্য এক জন গভর্ণর জেনারেল রাখা সম্পর্কে রাজী ছিলেন। পরে মুসলিম লীগ না কি পাকিস্থানের জন্য স্বতন্ত্র গভর্ণর জেনারেল নিয়োগের দাবী জানান এবং লীগ অর্থাৎ মিঃ জিন্না নিজের নাম সুপারিশ করেন। বৃটিশ-প্রীতি সত্ত্বেও তাঁহারা কোন বৃটিশের নাম সুপারিশ করেন নাই, অথচ বৃটিশ-বিরোধী বলিয়া খ্যাত কংগ্রেস ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নাম। এই রহস্যের পিছনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অদৃশ্য হস্ত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কংগ্রেস-নেতারা হয়ত বাধ্য হইয়া লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নাম সুপারিশ করিয়াছেন।

অবশ্য গভর্ণর জেনারেল অতঃপর নিয়মতান্ত্রিক গভর্ণর জেনারেল ছাড়া আর কিছুই হইবেন না। কিন্তু ইহা শুধু আইনগত ব্যাপার মাত্র। কার্য্যক্ষেত্রে এক জন বৃটিশ গভর্ণর জেনারেল অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন এবং পাকিস্থানের গভর্ণর জেনারেল হিসাবে মিঃ জিন্না সহায়তা পাইবেন। সুতরাং ভারতের উভয় ডোমিনিয়নেই বৃটিশ-প্রতাপ অক্ষুন্ন থাকিবে। ফলে কংগ্রেস কোণঠাসা হইয়া পড়িবে। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে যুক্ত দেশরক্ষার সভাপতি করার প্রস্তাবে মুসলিম লীগের সম্মত হওয়ার সংবাদ যে ভাবে মিঃ এটলী ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, মুসলিম লীগ রাজী না হইলে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে ঐ পদে বহাল হওয়া সম্ভব হইত না। বৃটিশের ও লীগের এত তোষণ করিয়াও কংগ্রেস হাই-কম্যাণ্ড তাহাদের মন পাইল না। কি দুর্ভাগ্য!

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মিঃ এটলী ভারত বিভক্ত হওয়ার জন্ম দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে ভাঙ্গা আবার জোড়া লাগিবে সে আশার কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু বৃটিশকে জগৎশুদ্ধ লোক হাড়ে হাড়ে চিনিয়াছে। বিভক্ত আয়ার্লণ্ড জোড়া লাগে নাই। মিঃ এটলী নিজেই ঘোষণা করিয়াছেন আয়ার্লণ্ড বিভক্তই থাকিবে। সুদান যাহাতে পুনরায় মিশরের সহিত যুক্ত না হয় সে জন্ম বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত রহিয়াছে। প্যালেষ্টাইনের আরবরাও বোধ হয় শীঘ্রই ইহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবেন। অনন্ত কাল অপেক্ষা করিলেও বিভক্ত ভারত অখণ্ড ভারতে পরিণত হইবে না। বৃটিশ-স্বার্থের জন্ম ভারত বিভক্ত হইয়াছে এবং সেই স্বার্থ কায়েম রাখিবার এবং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিবার জন্ম উভয় ভারতের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ গভীর, বিস্তৃত এবং দুস্তর করা হইবে। তাহার উপর ভিতরে ভিতরে টোরী দল দেশীয় শাসকদের কানে বিষ-মন্ত্র ঢালিতেছেন। যদিও এটলী বলিয়াছেন যে, তিনি আশা করেন, দেশীয় রাজ্যগুলি যথাসময়ে দুইটি ডোমিনিয়নের একটিতে তাহাদের যোগ্য স্থান গ্রহণ করিবে। যাঁহারা এত দিন বৃটিশ রেসিডেণ্টের ইঙ্গিতে উঠা-বসা করিতেন তাঁহাদের সম্পর্কে বৃটিশের হঠাৎ এতটা উদারতা প্রকাশের তাৎপর্য্য আমরা ভাল করিয়াই বুঝি। আমরা জানি যে, ভারতবর্ষকে যদি সত্যই স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে এই ইণ্ডিয়া বিলে টোরী দল কখনও সাগ্রহে রাজী হইত না।

দেশীয় রাজ্য

ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজারাও স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম হইবার চেষ্টায় আছেন। আমাদের মনে হয়, ইহা আর একটা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর কূট চাল। কারণ, স্বাধীনতা যে কি বস্তু তাহার আস্বাদ এই নৃপতিরা জীবনে পান নাই। বৃটিশ আমলের পর হইতে ইঁহারা নিজেদের অস্তিত্বের জন্য নির্ভর করিয়াছেন বৃটিশ রাজশক্তির উপর এবং প্রতিদানস্বরূপ অতি বশম্বদ সেবকের ন্যায় একান্ত আনুগত্য ও ভক্তি সহকারে বৃটিশের পদসেবা করিয়া আসিয়াছেন। বৃটিশ আমলে দেশীয় রাজাদের স্বাধীনতার কথা যে বিশুদ্ধ প্রহসন ভিন্ন কিছুই নহে, ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান—পাকিস্থান—রাজস্থানে ভাগাভাগি করার ষড়যন্ত্রের আদিগুরু এবং দেশীয় নৃপতিদের পরম সুহৃৎ—অধ্যাপক কুপল্যাণ্ডও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ছোট ছোট দেশীয় রাজারা প্রাণের ভয়ে অন্ততঃ ভারতীয় গণপরিষদের সহিত সহযোগিতা করিতেছেন, কিন্তু হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, ইন্দোর, ভূপাল, কাশ্মীর প্রভৃতি সহযোগিতা তো দূরের কথা, একেবারে 'যুদ্ধং দেহি' মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় দেশীয় রাজাদের সহিত নিয়মতন্ত্রের খুঁটিনাটি আলোচনা করা বৃথা। যাঁহারা চিরকাল বৃটিশ-বুটের ঠোক্করে অভ্যস্ত তাঁহারা যুক্তিতর্ক বুঝিবেন কি করিয়া? লাঠির গুঁতোই তাঁহারা বুঝেন। পণ্ডিত নেহরু নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে বলিয়াছিলেন যে, ভারতীয় ইউনিয়ন দেশীয় রাজাদের স্বাধীনতা স্বীকার করিবে না এবং কোন বৈদেশিক রাষ্ট্র ইহাদের স্বাধীনতা স্বীকার করিলে তাহা শত্রুতা-সূচক ব্যবহার বলিয়াই ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট মনে করিবেন। কিন্তু ইহাতে যে দেশীয় রাজাদের চৈতন্যোদয় হয় নাই, তাহার প্রমাণ—ইহার পরও সার সি পি রামস্বামী জানাইয়াছেন যে, ১৫ই আগষ্টের পর এক গোলাগুলি যুদ্ধ-বিগ্রহ ভিন্ন কিছুই ত্রিবাঙ্কুরকে স্বাধীনতা ঘোষণা হইতে বিরত করিতে পারিবে না। দিল্লী সম্মেলনে পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছিলেন যে, দেশীয় রাজাদের সহিত আইন-তর্ক তুলিয়া কোন ফল হইবে না। ভারতের স্বাধীনতাই আজ দেশের সম্মুখে মুখ্য প্রশ্ন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে দেশীয় রাজারা বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিলে এই স্বাধীনতা পঙ্গু হইবার সম্ভাবনা আছে; সুতরাং দেশীয় রাজাদের পৃথক্ হইবার অধিকার কখনই স্বীকার করা যায় না। দেশীয় রাজাদের ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দানে বাধ্য করান ভিন্ন তাই অন্য কোন উপায় দেশবাসীর নিকট নাই।

দেশীয় রাজাদের জানা উচিত যে, প্রজাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর বেশী দিন তাঁহাদের স্বৈরাচার চলিবে না। দেশীয় রাজ্য-প্রজা-সম্মেলনের পক্ষ হইতে রাজাদের নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে টিকাইয়া রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিলেও তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইবে না, সে প্রতিশ্রুতিও তাঁহারা পাইয়াছেন। বৃটিশ সাহায্য ও প্ররোচনায় তাঁহারা যে স্বাধীনতার মরীচিকার পিছনে ছুটিতেছেন তাহা শেষ অবধি শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে। শ্যাম ও কুল দুই-ই নষ্ট হইবে। আজ ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিলে তাঁহাদের গদী যে বাঁচিত তাহাতে ভুল নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে বৃটিশ প্ররোচকদের উৎসাহে জনসাধারণের সহিত শক্তি-পরীক্ষায় অগ্রসর হইয়া পরাজিত হইলে এই গদীও বজায় থাকিবে কি না সন্দেহ।

সংখ্যালঘুদের দুর্গতি

মিঃ জিন্না হইতে সুরু করিয়া ছোট-বড় বহু লীগ-নেতা সহস্র বার জানাইয়াছেন যে, পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের পরম সুখে রাখা হইবে। কিন্তু এই সব প্রতিশ্রুতির যে কোন মূল্য নাই তাহা পাকিস্থানী প্রদেশগুলির প্রতি দৃক্‌পাত করিলেই বুঝা যায়। সিন্ধু প্রদেশে পুরাপুরি পাকিস্থান-রাজ বহু দিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেখানে হিন্দুদের দুরবস্থার কথা সর্ব্বজনবিদিত। চাকুরী ক্ষেত্রে যোগ্যতার মূল্য নাই। লীগওয়ালাদের বসান হইতেছে। সিন্ধুতে উপযুক্ত লোক পাওয়া না যাইলে অন্য প্রদেশ হইতে লোক আমদানী করা হইতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা সর্ব্ববিষয়ে এই নিপীড়ন চালান হইতেছে পরম উৎসাহ ভরে। সম্প্রতি হিন্দুদের গৃহহীন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। দিল্লী হইতে যে সকল মুসলিম অফিসার করাচীতে আসিবেন তাঁহাদের থাকিবার জন্য হিন্দুদের বাড়ী খালি করিয়া দিতে হইবে। হিদায়েতুল্লা মন্ত্রিসভার আদেশ মত প্রথমে থাকিবার স্থান দেওয়া হইবে বিহার হইতে আগত মুসলমানদের, তার পর সিন্ধী মুসলমানদের এবং সর্ব্বশেষে অমুসলমানদের। এক কথায় হিন্দুদের পথে বসা ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না।

কেবল সিন্ধু নহে, বাঙ্গালা দেশে গত সাত বৎসর লীগ রাজত্বের ফলে আমরাও ভাল ভাবেই জানিয়াছি যে, সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার পাকিস্থানী শাসনের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কলিকাতা, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, চট্টগ্রামের কথা কেহ কোন দিন ভুলিবে না।

বগুড়ার একটি সংবাদে প্রকাশ, পাবনা জেলায় করোগেটেড লোহার চাদরের বণ্টন-ব্যবস্থার পরামর্শদাতারা স্থির করিয়াছেন যে, বর্ণহিন্দুদের কোন লাইসেন্স দেওয়া হইবে না। সংবাদটি ক্ষুদ্র, কিন্তু প্রতীক হিসাবে ইহার মূল্য অল্প নহে।

বঙ্গবিভাগ আন্দোলন সাফল্য লাভ করায় পশ্চিম-বঙ্গের হিন্দুরা লীগের অত্যাচার ও কু-শাসনের হাত হইতে বাঁচিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে যে সকল হিন্দু এখনও রহিয়া গেলেন, তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য আজ আমাদের নূতন করিয়া স্মরণ করিতে হইবে। লীগ-শাসনের সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়া মিথ্যা স্তোক বাক্য পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের শুনাইতে আমরা অক্ষম। মুসলিম লীগের সুবুদ্ধি হইবার আশা থাকিলে বঙ্গবিভাগের প্রয়োজন দেখা দিত না। অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীযুক্ত পি, আর, ঠাকুর সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের প্রতি যে সব মিষ্ট-মধুর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে, তাহা চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের কৌশল মাত্র। দরিদ্র বর্ণহিন্দুদের সহিত তপশীলী সমাজের লোকদের ইহার সাহায্যে সাময়িক ভাবে বিভ্রান্ত করা হইবে এবং তাহার পর তাহাদের ইসলাম ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। ইহার লক্ষণ এখনই প্রকাশ পাইতেছে এবং গত কয়েক বৎসরের ঘটনায় ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই পরিণতি বন্ধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই।" মহাত্মা গান্ধীও এই প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "কোন নেতা আন্তরিক ভাবেও কোন কথা বলিলেই যে তাঁহার দল তাই করিবে তাহার কোন মানে নাই। অর্থাৎ তিনিও মুসলিম লীগের মতি-গতি সম্পর্কে সন্দিহান। পাকিস্থানী পাণ্ডা এবং গুণ্ডাদের ব্যবহার দেখিলে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। এরূপ ক্ষেত্রে যে সকল দরিদ্র হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিম-বঙ্গে আসিয়া বসবাস করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব অবশ্যই বাঙ্গালার

নূতন জাতীয় রাষ্ট্রকে লইতে হইবে। মুসলিম লীগ সম্বন্ধে কংগ্রেসী মহল পূর্ব্বেও অনেক আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আশা কোন দিন সফল হয় নাই। এই সত্য স্মরণ করিয়াই আমাদের কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের সময় পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের ভরসা দান করা হইয়াছিল যে, নূতন বঙ্গ তাঁহাদের স্বার্থও রক্ষা করিবে। আজ যদি নূতন বাঙ্গালার মন্ত্রিসভা কেবল মৌখিক শুভেচ্ছা জানাইয়া নিজেদের কর্ত্তব্য শেষ করেন, তবে তাঁহারা প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী হিসাবেই জনসাধারণের চক্ষে প্রতিভাত হইবেন সন্দেহ নাই।

২১শে আষাঢ় নয়াদিল্লীর এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদিগকে আশ্বাস দিয়া মিঃ জিন্না বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের ধর্ম্মবিশ্বাস, ধনপ্রাণ এবং সংস্কৃতি রক্ষা করা হইবে। কিন্তু তাঁহার আশ্বাসের মূল্য কতটুকু, তাহা নির্দ্ধারিত হইবে পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের প্রকৃত অবস্থা দ্বারা। পাকিস্তান গণ-পরিষদ সংখ্যালঘুদের জন্য হয়ত ভাল ভাল আইন প্রণয়ন করিতে পারেন; কিন্তু কাজের বেলায় তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইবে, পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে, পশ্চিম-পাঞ্জাবে এবং সিন্ধুতে কি তাহারই পরিচয় দেওয়া হইতেছে? মিঃ জিন্না মহাত্মা গান্ধীর সহিত একযোগে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ করিবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু লীগপন্থীরা তাঁহার এই অনুরোধে কর্ণপাত করে নাই আজও পর্য্যন্ত। যেখানে সুবিধা-সুযোগ পাইতেছে, সেইখানেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া হিন্দুদের ধনপ্রাণ বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। দাঙ্গা থামাইবার জন্ত মিঃ জিন্নার অনুরোধকে লীগপন্থীরা এক কানাকড়ি মূল্যও দেয় নাই। হিন্দু হত্যা, হিন্দুর সম্পত্তি লুণ্ঠন, হিন্দুর গৃহদাহ প্রভৃতি যে পুণ্য কার্য্য, বেহেস্তে যাইবার সুপ্রশস্ত পথ, ক্রমাগত দিনের পর দিন ধরিয়া মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে এই সকল কথা লীগপন্থীরা প্রচার করিয়াছেন। মিঃ জিন্না এরূপ প্রচারকার্য্য বন্ধ করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। কাজেই আমরা আজ কিরূপে মিঃ জিন্নার আশ্বাস-বাক্যে আস্থা স্থাপন করিব?

মিঃ জিন্না বলিয়াছেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের ধর্ম্মবিশ্বাস রক্ষিত হইবে। কিন্তু সেদিন বগুড়ায় হিন্দুর মৃতদেহ কবর দিবার জন্ত মুসলমানরা জিদ ধরিয়াছিল। ইহাকেই কি সংখ্যালঘুদের ধর্ম্মবিশ্বাস রক্ষার নমুনা বলিয়া মিঃ জিন্না মনে করেন? মিঃ জিন্না আশ্বাস দিয়াছেন, হিন্দুদের ধনপ্রাণ নিরাপদ থাকিবে। সেদিন ত্রিপুরা জেলার আখাউরায় যাহা ঘটিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাকেই কি ধনপ্রাণ রক্ষার দৃষ্টান্ত বলিয়া আমরা মনে করিব? কোন কোন স্থানে হিন্দুদিগকে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্ত হুমকী দেওয়া হইতেছে; দেশ ছাড়িয়া না গেলে তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করা হইতেছে। পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কি অবস্থা দাঁড়াইবে, ইহা কি তাহারই পূর্ব্বাভাস? এখনও তো পুরাপুরি পাকিস্তান হয় নাই। তাহাতেই যদি সংখ্যালঘুদের এই অবস্থা হয়, তাহা হইলে পুরাপুরি পাকিস্তান হইলে যে কি অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা ভাবিয়া পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা অত্যন্ত উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাইতেছে। সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন বন্ধ রাখিবার জন্য একটি কথাও তিনি বলেন নাই। কেন বলেন নাই, তাহা কি সত্যই তাৎপর্য্যপূর্ণ নয়? মিঃ জিন্না বলিয়াছেন, ধর্ম্মানুশাসিত রাষ্ট্র তাঁহার ধারণার অতীত। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে পাকিস্তানের প্রয়োজন হইল কেন? ভারতবর্ষে ইসলামের ধ্বজাধারীরা মুখে আশ্বাস দিয়া কাজে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া থাকেন। কাজেই গণ-পরিষদে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য কিরূপ শাসনতন্ত্র রচিত হইবে, তাহা অপেক্ষা বড় সমস্যা দাঁড়াইয়াছে অবিলম্বে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের মনে বিশ্বাস ও নিরাপত্তার ভাব ফিরাইয়া আনা। পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে এখনই সংখ্যালঘুদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইতেছে, তাহাদের ধন-প্রাণ যেরূপ বিপন্ন করিয়া তোলা হইতেছে, মিঃ জিন্না তাহাকেই বিশ্বাস ও নিরাপত্তার ভাব ফিরাইয়া আনিবার উপায় বলিয়া মনে করেন কি? এখনই যদি তিনি পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের জীবন, ধর্ম্ম, সম্পত্তি ও সংস্কৃতি নিরাপদ করিবার ব্যবস্থা করিতে না পারেন, তবে শত শত আশ্বাস-বাণীতেও আস্থা ফিরিয়া আসিতে পারে না।

কলিকাতার অবস্থা

মুসলিম লীগের রাজত্বের কল্যাণে গত বৎসর আগষ্ট মাসের পর হইতে কলিকাতার অভিভাবক হইয়া বসিয়াছে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের গুণ্ডার দল। এই সব গুণ্ডাদের ঠিক সাধারণ গুণ্ডার পর্য্যায়ে ফেলিলে নিশ্চয় ভুল হইবে। কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, যে সব বস্তি অঞ্চলে মুসলিম লীগের প্রভাব খুব বেশি এবং বস্তিগুলির উপর লীগের নীল পতাকা পৎপৎ শব্দে উড়িতে থাকে, সেইখানেই গুণ্ডাদের দৌরাত্ম্য প্রবল। গুণ্ডাদের গুণ্ডামী এ পর্য্যন্ত কেন বন্ধ হয় নাই, তাহার কারণ অনুসন্ধানের সময় এই বিষয়টি মনে রাখিলে কর্ত্তৃপক্ষ যে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গত বৎসর আগষ্ট হত্যাকাণ্ডের পর হইতে কলিকাতার বিশেষ বিশেষ রাস্তায় একেবারেই ট্রাম চালান সম্ভব হয় নাই এবং বর্ত্তমানে আত্মরক্ষার্থে কোন কোন অঞ্চলে বাসগুলিকে স্বাভাবিক 'রুট' পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র দিয়া যাতায়াত করিতে হইয়াছে। যাহাদের হাতে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার, তাঁহারা এ সব সংবাদ জানেন না তাহা নহে, কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও তাঁহারা ঐ সব অঞ্চলকে এত দিন গুণ্ডাদের হাতে ছাড়িয়া দিতে কার্পণ্য করেন নাই। ২২শে আষাঢ় যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতার গুণ্ডা অঞ্চলগুলি সম্পূর্ণ নিরাপদ না হওয়া পর্য্যন্ত জনসাধারণের আতঙ্ক কখনই দূর হইতে পারে বলিয়া মনে করা চলে না এবং এই আতঙ্কের ভাব যতক্ষণ দূর না হইবে, ততক্ষণ কলিকাতার জীবনযাত্রাও স্বাভাবিক হইবার সম্ভাবনা নাই।

কলিকাতার দাঙ্গার জন্য কাহারা দায়ী, ২২শে আষাঢ় তাহা যে ভাবে ধরা পড়িয়াছে, তেমন আর কখনও ধরা পড়ে নাই। পুলিশের নির্লজ্জ গুণ্ডাপ্রীতি সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিল এবং ইহার ফলে পুলিশ বিভাগে কিঞ্চিৎ রদ-বদলও করা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে পুলিশ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এই সাধারণ পুলিশ-কর্ত্তাদের অবস্থার বিশেষ অদল-বদল হয় নাই। পুলিশের সাধারণ কর্ম্মচারীদের মধ্যেও যে সাম্প্রদায়িকতা কিরূপ

বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিবার দরকার করে না। ইহাদেরও যে রদবদল করা শেষ অবধি দরকার, তাহা বলাই বাহুল্য এবং যে পর্য্যন্ত তাহা না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত ইহাদের মনে অন্ততঃ এইটুকু আশঙ্কা থাকা প্রয়োজন যে, এত দিন যে ভাবে তাহারা গুণ্ডাদের পরিবর্ত্তে অন্য সম্প্রদায়ের নিরীহ লোককে খুন-জখম করিয়াছে, অতঃপর তাহা আর চলিবে না—সে অভ্যাস না বদলাইলে তাহার জন্য কঠোর শাস্তি পাইতে হইবে।

কলিকাতায় এক জন মৃত পুলিশ অফিসারের শব লইয়া শোভাযাত্রা উপলক্ষে নূতন দফায় যে দাঙ্গা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দাঙ্গাবাজীতে সিদ্ধহস্ত লীগপন্থীরা বেশ সুপরিকল্পিত ভাবেই যে এই একতরফা সমরে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং ইহা একটা বড় রকমের পরিকল্পনার অংশবিশেষ, সে বিষয়ে আজ দ্বিমত হইবার অবকাশ নাই। মধ্যবর্ত্তী সরকারে প্রবেশ করা হইতে ভারত বিভাগে কংগ্রেসকে রাজী করান পর্য্যন্ত সব কিছুর পূর্ব্বেই লীগ একচোট খুনোখুনির সৃষ্টি করিয়াছে। আজ তাহাদের রব, কলিকাতাকে পাকিস্তানের মধ্যে চাই। এই দাবী যতই অসঙ্গত হোক না কেন, সীমানা কমিশনের নিকট লীগ যে স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছে, তাহাতে না কি কলিকাতা দাবী তো করা হইয়াছে, উপরন্তু জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং দাবী করিতেও তাহারা ছাড়ে নাই। কলিকাতা না পাইলে লীগ যে কলিকাতাকে শ্মশানে পরিণত করিবে, এই হুমকী আক্রাম খাঁ হইতে আরম্ভ করিয়া কোন লীগ-নেতাই দিতে প্রায় বাদ যান নাই। এই ধ্বংসের সূত্রপাত হিসাবে কেবল হিন্দুদের আক্রমণ করা হইতেছে তাহা নয়, অজ্ঞ গোঁড়া লীগওয়ালাদের ক্ষেপাইবার জন্য তাহাদের উপরও আক্রমণের কসুর হইতেছে না। শিয়ালদহে পাকিস্তানী বাজারের উপর কয়েক দিন আগে যে আক্রমণ হইয়াছিল, তাহাতে আক্রমণকারী ও আক্রান্তেরা একই সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া জানা গিয়াছে। এই ধরণের কার্য্যকলাপের উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট—কলিকাতায় আর এক দফা মরণ কামড় দিবার পূর্ব্বে লীগভক্তদের তাতাইয়া তোলা। কলিকাতাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে হইলে তাই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য, গুণ্ডা অঞ্চলগুলিকে সম্পূর্ণ সাফ করিয়া ফেলা এবং কলিকাতার দুর্ঘটনার জন্য দায়ী অফিসারদের শাস্তিবিধান। আগামী ১৫ই আগষ্টের মধ্যে বা পরে যদি কলিকাতাকে আর একটি নরমেধ ক্ষেত্রে পরিণত করিতে দিতে পশ্চিম বাঙ্গালার মন্ত্রীরা না চাহেন, তবে তাঁহাদের এই দিকে নজর দিতেই হইবে।

জনমতের দাবী

১০০ নং হ্যারিসন রোডে বলাৎকারের অভিযোগে অভিযুক্ত কলিকাতার সশস্ত্র পাঞ্জাবী পুলিশ-বাহিনীর দুই জন কনেষ্টবল কলিকাতা হাইকোর্টের দায়রার বিচারে বেকসুর খালাস পাইয়াছে। আইনের চক্ষে তাহারা নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইলেও, জনমত এই বিচারে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। জুরীদের সিদ্ধান্তে জনসাধারণ শুধু বিস্মিতই হয় নাই, এই মামলায় ন্যায়বিচার ব্যাহত হইয়াছে বলিয়াই তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই দুই জন পাঞ্জাবী পুলিসের বিরুদ্ধে যখন বলাৎকারের অভিযোগ উপস্থিত হইল তখন বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী এইরূপ কথাও বলিয়াছিলেন, যাহাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই অভিযোগ উপস্থিত করায় ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়। পুলিশ সম্পর্কে বাঙ্গালার মন্ত্রিসভার পক্ষপাতিত্ব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে নাই। অভিযুক্ত পাঞ্জাবী পুলিশ দুই জন সম্পর্কে মন্ত্রিসভার মনোভাব যেখানে এইরূপ, উৎপীড়িতাদের পক্ষে সেই মন্ত্রিসভার হাতেই এই মামলা পরিচালনের ভার ছিল। এই অবস্থায় উপযুক্ত প্রমাণাদি উপস্থিত করা এবং মামলা পরিচালন করার ব্যাপারে যথেষ্ট গলদ থাকার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নয়। মামলা পরিচালন ব্যাপারে ফরিয়াদী পক্ষ ন্যায়বিচারে সাহায্য করার পরিবর্ত্তে ন্যায়বিচার ব্যাহত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না, সেই প্রশ্ন বাদ দিয়া এই মামলা সম্পর্কে কোন আলোচনা করা সম্ভব নয়।

সশস্ত্র পাঞ্জাবী পুলিশ-বাহিনীর দুই জন কনেষ্টবলের বিরুদ্ধে বলাৎকারের যে অভিযোগ করা হইয়াছিল, তাহা অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ। অভিযোগের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করিয়া এই মামলার ফরিয়াদী পক্ষ এডভোকেট জেনারেলকে কেন নিযুক্ত করেন নাই, ইহা কি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়? ইহাতেই কি এই মামলা সম্পর্কে মিঃ সুরাবর্দ্দী এবং তাঁহার মন্ত্রিসভার প্রকৃত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না? উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমাণাদি আলোচনা করিলে এই বিশ্বাসই সাধারণ লোকের মনে জন্মিয়া থাকে যে, জুরীরা সাক্ষ্যপ্রমাণের পর্য্যালোচনায় ভুল করিয়াছেন। আলোচ্য মামলায় উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমাণাদির যে বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কাজেই জুরীরা আসামী দুই জনকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করায় জনসাধারণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত না হইয়া পারে নাই। নয় জন জুরী লইয়া এই মামলার বিচার হইয়াছে। জুরীগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে আসামী মহম্মদ আলিকে বলাৎকারের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। বলাৎকার করার চেষ্টা করায় অভিযোগ সম্পর্কে ৯ জন জুরীর মধ্যে ৮ জন তাহাকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করেন এবং শ্লীলতাহানির অভিযোগ সম্পর্কে আসামীকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করেন ৭ জন জুরী। অপর আসামী গোলাম হোসেনকে পাশবিক অত্যাচারে উৎসাহ দান ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ সম্পর্কে ৮ জন জুরী নিরপরাধ সাব্যস্ত করেন। বিচারপতি জুরীদের অভিমত গ্রহণ করিয়া আসামীদ্বয়কে বেকসুর খালাস দিয়াছেন। এই ৯ জন জুরীর মধ্যে ৮ জনই ইউরোপীয় এবং এক জন পার্শী। হিন্দু-নারীর কাছে তাহার নারীত্বের সম্মান ও সতীত্ব যে জীবন অপেক্ষাও মূল্যবান, এই সত্যটি ইউরোপীয় ও পার্শী জুরী নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইউরোপীয় মাপকাঠি দিয়া হিন্দুনারীকে বিচার করা সম্ভব নয়। নিগৃহীতা মহিলাটি প্রকাশ্য আদালতে কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের নারীত্বের অপমানের কথা মিথ্যা করিয়া সাজাইয়া বলিবেন, কোন ভারতবাসীর পক্ষে এ কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব। প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরাও এই বর্ব্বরোচিত ঘটনার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং সাধারণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে এই সকল সাক্ষ্য অবিশ্বাস করা অসম্ভব।

জুরীরা সাক্ষ্যপ্রমাণাদি আলোচনায় ভুল করিয়াছেন, আপীল দায়ের করার পক্ষে উহা একটি প্রধান কারণ বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের অবিশ্বাস করিবার যে কোন কারণ দেখা যায় না, তাহাও কি জুরীদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ছিল না? সাক্ষীদের উক্তির মধ্যে কোথাও সামান্য অসামঞ্জস্য থাকিলেও যে উহা অবিশ্বাস্য হয় না, জুরীদের তাহাও বিশেষ ভাবে বিবেচনার যোগ্য। প্রকাশ, বিচারপতি যখন জুরীদিগকে চার্জ্জ দিতেছিলেন, তখন জুরীরা বিচারপতির উক্তি শুনিতে পান নাই বলিয়া ফোরম্যান বলিয়াছেন। ইহা সত্য হইলে আপীলের পক্ষে উহাই গুরুত্বপূর্ণ প্রধান কারণ বলিয়া গণ্য হইবে।

স্বাধীনতার স্বরূপ

৩০শে আষাঢ় কমন্স সভায় ভারতীয় স্বাধীনতার বিল গৃহীত হইয়াছে। এই বিলের বিধান অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান নামে দুইটি স্বতন্ত্র ডোমিনিয়ন সৃষ্টি হইবে এবং আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে প্রত্যেক ডোমিনিয়নের আইনসভার আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে।

দেশীয় রাজ্যসমূহ এবং উপজাতীয় অঞ্চল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইয়াছে। বিলের বিধান অনুযায়ী দুইটি ডোমিনিয়নের কোন একটিতে দেশীয় নৃপতিদের যোগদান করিবার পক্ষে কোন বাধা হইবে না বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে কোনও একটি ডোমিনিয়নে যোগদান করিতে বাধ্য বা অনুপ্রাণিত করিবার কোন বিধান এই বিলে নাই।

বাণিজ্য-শুল্ক, চলাচল ব্যবস্থা, ডাক ও তার বিভাগ এবং অনুরূপ অন্য বিষয় সম্পর্কে বর্ত্তমানে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত দেশীয় রাজ্যসমূহের একটা চুক্তি বলবৎ আছে। বিলের বিধান অনুযায়ী যে কোন দেশীয় রাজ্য ইচ্ছা করিলেই এই চুক্তি বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন অথবা তাহার পরিবর্ত্তে নূতন চুক্তিও সম্পাদিত হইতে পারিবে। যে সকল উপজাতীয় অঞ্চল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ভারতীয় রাজ্যের অথবা কোন দেশীয় রাজ্যের বা কোন বৈদেশিক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নহে, সেই সকল উপজাতীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের তাহাদের সংলগ্ন ডোমিনিয়নের গণ-পরিষদে যোগদানের পক্ষে অবশ্য কোন বাধা হইবে না। কিন্তু উপজাতীয় যে-সকল সর্দ্দার আছে যাহাদের সহিত অতীতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট চুক্তি করিলেও করিতে পারিতেন, দেশীয় নৃপতিদের মত তাহাদিগকেও স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। ভারতে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে বিলের ১২ নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, যে-সকল ইংরাজ সৈন্য নির্দ্ধারিত দিবসে বা উহার পরে নূতন ডোমিনিয়ন দুইটির যে-কোন একটিতে থাকিবে তাহাদের সম্পর্কে এই আইনে এমন কোন বিধান থাকিবে না, যাহাতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট, নৌ-দপ্তর সেনাপরিষদ, বিমান পরিষদ অথবা অপর কোন বৃটিশ 'কর্ত্তৃত্ব শক্তির' কর্ত্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।

জ্যোতি দেবী

বিগত ২রা জুলাই বুধবার স্বর্গীয় আশুতোষ ঘটক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত ঈশানীতোষ ঘটকের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জ্যোতি দেবী মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কলিকাতা মলঙ্গা লেননিবাসী শ্রীযুক্ত নীরাজ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান অশোক মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সঙ্গীতে ও সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং একাধারে

তিনি বহু গুণের অধিকারিণী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র নবজাত পুত্র, স্বামী ও বহু শোকার্ত্ত আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরের নিকট তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

সুশীলাবালা বসু

স্বর্গীয় রায় সাহেব যতীন্দ্রনাথ বসুর সহধর্ম্মিণী সুশীলাবালা বসু গত ৫ই আষাঢ় প্রায় ৬৮ বৎসর বয়সে পটুয়াটোলা লেনে নিজ বাস-ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি চারি পুত্র, এক কন্যা ও বহু নাতি-নাতনী রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি এক জন ধর্ম্মপরায়ণা ও দানশীলা মহিলা ছিলেন। দরিদ্রদিগকে তিনি প্রায়ই অর্থ সাহায্য করিতেন। তিনি মিত্র ইন্‌স্টিটিউসনের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় বিশ্বেশ্বর মিত্র মহাশয়ের প্রথমা কন্যা এবং নদীয়া জেলার অন্তর্গত বাগআঁচড়া গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় কেদারনাথ বসুর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ ছিলেন।

ভ্রমসংশোধন—জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ১১৫ পৃষ্ঠায় 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধের সহিত যে চিত্রখানি মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাতে বাম দিক হইতে বসিয়া যতীন্দ্রমোহন বাগচী, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত হইবে। —বঃ সঃ

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেশিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

হাস্যময়ী —নিমাই

নারী —সুধীর খাস্তগীর
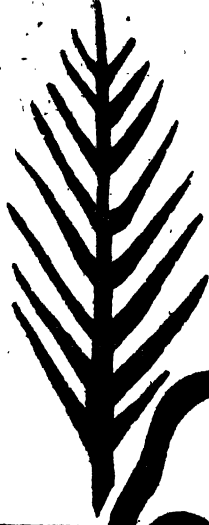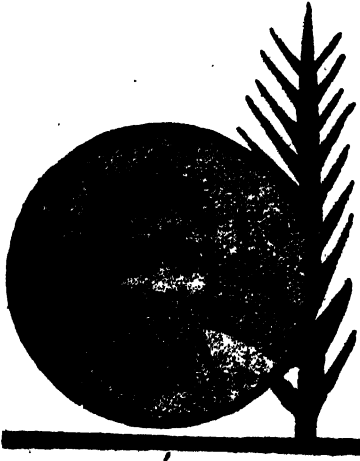
২৬শ বর্ষ—
শ্রাবণ, ১৩৫৪

প্রথম খণ্ড,
চতুর্থ সংখ্যা

া ভারতের ত

"এই গণ-পরিষদ ভারতবর্ষকে স্বাধীন সার্ব্বভৌম সাধারণতন্ত্ররূপে ঘোষণা করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করিতেছে। বৃটিশ ভারত, দেশীয় রাজ্য এবং বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের বহির্ভূত অপরাপর অংশ এবং অন্যান্য যে সমুদয় অঞ্চল স্বাধীন সার্ব্বভৌম ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সঙ্কল্প এই গণ-পরিষদ ঘোষণা করিতেছে।

"ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল সমূহ (তাহাদের বর্ত্তমান সীমানা সহ অথবা গণ-পরিষদ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সীমানা সহ অথবা শাসনতন্ত্র বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে গঠিত সীমানা সহ) আত্মকর্ত্তৃত্বশীল অঞ্চল হইবে। উহারা অসংজ্ঞিত ক্ষমতার অধিকারী হইবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের উপরে অর্পিত ক্ষমতা ও যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইলে স্বভাবতঃই যে সমস্ত ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য তাহাতে গিয়া বর্ত্তে, সে সমুদয় ব্যতীত অপর সমুদয় শাসন ক্ষমতার অধিকারী হইবে।

"স্বাধীন সার্ব্বভৌম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, অঙ্গরাষ্ট্রসমূহ এবং শাসনযন্ত্রের সমুদয় মূলাধার হইতেছে জনসাধারণ। এই যুক্তরাষ্ট্রে এবং অঙ্গরাষ্ট্রসমূহে ভারতের জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার, সমান মর্য্যাদা, সমান সুযোগ ও আইনের চক্ষে সমান ব্যবহার পাইবার অধিকার থাকিবে। বাক্যের, ধর্ম্মের, বৃত্তির, উপাসনার, সঙ্ঘ গঠনের স্বাধীনতাও তাহাদের থাকিবে এবং সংখ্যালঘু অনগ্রসর ও খণ্ডজাতীয় অঞ্চল এবং অনুন্নত শ্রেণীগুলির জন্য উপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকিবে। ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের ভূখণ্ড অখণ্ড থাকিবে। সভ্য জাতির আইন-কানুন অনুসারে জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম অধিকার থাকিবে। এই সুপ্রাচীন দেশ বিশ্বের দরবারে তাহার ন্যায্য আসন লাভ করিবে এবং বিশ্বশান্তি ও মানব-কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইবে।"

স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা দিবসে

পণ্ডিত জওহরলালের বাণী

যদিও আকাশ আজ মেঘাবৃত, যদিও আমাদের দেশবাসীর অনেকেই আজ দুঃখক্লিষ্ট এবং একাধিক দুরূহ সমস্যা আমাদের চারি দিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তথাপি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আনন্দোৎসব আজ আমরা পালন করিব। কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে গুরু দায়িত্ব-ভারও গ্রহণ করিতে হয়; স্বাধীন ও সুশৃঙ্খল জাতির মত আমাদের তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।

যিনি এই জাতির পিতা, এই স্বাধীনতার যিনি স্রষ্টা, প্রাচীন ভারতের আত্মার যিনি মূর্ত্ত প্রতীক, স্বাধীনতার মশাল তুলিয়া ধরিয়া যিনি আমাদের তমসাচ্ছন্ন আকাশ আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন—আজ সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে স্মরণ করি।

তাঁহার যোগ্য অনুগামী অনেক সময়েই আমরা হইতে পারি নাই, তাঁহার নির্দ্দেশ বহু বার লঙ্ঘন করিয়াছি; কিন্তু আত্মবিশ্বাসে, আত্মশক্তিতে, সাহসে ও বিনয়ে অপূর্ব্ব গরিমাময় ভারতের এই মহান্ সন্তানের আত্মিক প্রভাব কেবল আমাদের নহে, পরবর্ত্তী যুগেও প্রাণে প্রাণে অনুভূত হইবে; তাঁহার নির্দ্দেশ তাহারাও স্মরণ করিবে। ঝড়-ঝঞ্ঝা যতই প্রবল হউক, স্বাধীনতার এই মশাল আমরা কখনই নিবিয়া যাইতে দিব না।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের যে সকল অজ্ঞাত সেবক ও সৈনিক প্রশংসা বা পুরস্কারের প্রত্যাশা না রাখিয়া ভারতের সেবা করিয়াছে, এমন কি, তাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছে—এখন আমরা তাহাদের স্মরণ করিতেছি।

রাজনৈতিক ভাগাভাগির ফলে আমাদের যে সকল ভ্রাতা-ভগিনী আজ আমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সহিত এই নবলব্ধ স্বাধীনতার উৎসবে যোগদানে অসমর্থ হইয়াছেন তাঁহাদিগকেও আজ স্মরণ করি। তাঁহারা আমাদেরই আপন জন ছিলেন এবং সকল অবস্থাতেই তাহা থাকিবেন। তাঁহাদের সৌভাগ্যে দুর্ভাগ্যে আমরা সমভাবেই অংশীদার হইব। ভবিষ্যৎ আমাদের দিকে তাকাইয়া আছে—কোন্ পথে আমরা চলিব? কী হইবে আমাদের কাজ? ভারতের কৃষক, শ্রমিক ও জনসাধারণকে স্বাধীনতা দান, সুযোগ দান—ইহাই হইবে আমাদের কর্ত্তব্য। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও ব্যাধির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহাদের দূর করিতে হইবে। এক সুসমৃদ্ধ, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক জাতি গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং প্রত্যেক নরনারীর জীবন যাহাতে পূর্ণতা লাভের ও সর্ব্বত্র সুবিচার লাভের সুযোগ পায় এই উদ্দেশ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ স্থাপন করিতে হইবে। কঠিন কাজ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। যত দিন না আমাদের প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ প্রতিপালন করিতেছি, যত দিন না সমুদয় ভারতবাসীকে তাহাদের বিধিদত্ত অধিকার দান করিতেছি, তত দিন পর্য্যন্ত আমাদের কাহারও বিশ্রাম করা চলিবে না। এক মহান্ দেশের নাগরিক আমরা—যে দেশ অতি দুঃসাহসী প্রগতির পথে আজ পা বাড়াইয়াছে, সেই মহান্ আদর্শ রক্ষা করিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে। ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আমরা সকলেই এই ভারতমাতারই সন্তান, আমাদের দাবী, অধিকার এবং দায়িত্বও সমান। আমরা সাম্প্রদায়িক কিম্বা ক্ষুদ্র মনোভাবের পরিপোষক হইতে পারি না। কারণ, যে জাতির চিন্তায় বা কাজে ক্ষুদ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়, সে জাতি কখনই মহৎ হইতে পারে না।

পৃথিবীর সমুদয় দেশ ও জাতিকে আমরা আজ শুভ কামনা জানাইতেছি এবং পৃথিবীতে শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রসার-কার্য্যে সর্ব্বদা তাঁহাদের সহিত সহযোগিতার অঙ্গীকার করিতেছি।

সর্ব্বশেষে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে—প্রাচীন, সনাতন ও চির নবীন এই ভারতবর্ষকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জানাইতেছি। তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিব বলিয়া পুনরায় আমরা অঙ্গীকার করিতেছি।

জয় হিন্দ্!

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের বাণী

স্বাধীনতা-সংগ্রামে জাতি আজ জয়যুক্ত হইয়াছে। আমাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে—সেই বিজয়োৎসবে আমরা আজ যোগ দিতে পারিতেছি। এই সংগ্রামের এই গৌরবময় পরিসমাপ্তি যাঁহাদের আত্মত্যাগের ফলে হইয়াছে, আজ সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের স্মরণ করা আমাদের প্রাথমিক কর্ত্তব্য। স্বাধীনতা লাভের আনন্দোৎসবে দেশবাসী আজ সসম্ভ্রমে তাঁহাদের স্মরণ করুক।

স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল গুরু দায়িত্ব-ভার আমাদের উপরে বর্ত্তিয়াছে, আনন্দোৎসবের কোলাহলে আমরা যেন সে সব ভুলিয়া না যাই। ভিতর ও বাহিরের শত্রুর হাত হইতে আমাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করাই হইবে আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। •

এই পুণ্যভূমিতে বহু ক্ষতস্থানের জ্বালা আজিও জুড়ায়

নাই, বহু বিক্ষুব্ধ আত্মা আজিও সান্ত্বনা লাভ করে নাই। জাতীয়তা ও মানবতার দিকে চাহিয়া কাহারো পক্ষেই দেশকে তাঁহাদের শুভ কামনা ও সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত করা সম্ভব নহে। আমাদের প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠ শক্তি ও সম্পদ লইয়া এই মিলিত দায়িত্বকে গ্রহণ করিতে হইবে।

যাঁহারা এত কাল আমাদের সঙ্গে ছিলেন, আমাদেরই অঙ্গীভূত ছিলেন, তাঁহারা আজ পৃথক্ হইয়া যাইতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের জন্য আজ বেদনা বোধ করা স্বাভাবিক। যাঁহারা এত কাল মনে-প্রাণে ঐক্যের সন্ধান করিয়াছেন, ভারত বিভাগের ফলে আজ যখন তাঁহাদিগকেই ভাগাভাগির হিসাব করিতে হইতেছে, তখন কতখানি তিক্ততা ও বেদনায় যে তাঁহাদের অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অনেকেই ধারণা করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমাদের (ভৌগোলিক) সীমান্তের ওপারে আমাদের যে সব ভাই আছেন, তাঁহাদের আমরা অবহেলা করিতেছি বা ভুলিয়া গিয়াছি এ কথা যেন তাঁহারা মনে না করেন। তাঁহাদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি আমাদের দৃষ্টি সর্ব্বদা সজাগ থাকিবে—এই দাবী তাঁহাদের রহিল। বিলম্বে নয়, অবিলম্বেই দেশ-মাতৃকার অনুগত সেবকরূপে আমরা আবার মিলিত হইব, এই আশা ও বিশ্বাস লইয়াই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের প্রতি আমরা সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিব।

এই বিশ্বাস ও মনোভাব লইয়াই আজ আমাদের নূতন করিয়া জাতির সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে এবং সমগ্র দেশবাসীকে আহ্বান জানাইতে হইবে।

রাষ্ট্রপতির বাণী

আজ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট—ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনটিতে ভারতের বক্ষ হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পাষাণ-ভার অপসারিত হইল। স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাহসী দেশ-প্রেমিক ও যোদ্ধৃদের ত্যাগ দুঃখবরণ ও রক্তদান সফল হইয়াছে। তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি আমরা আজ সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

আমাদের স্বাধীনতা ঐক্যবদ্ধ ভারতের পূর্ণ গৌরব বহন করিয়া আনে নাই বলিয়া যেন আমরা নিরাশ না হই। গত কয়েক মাসের শোকাবহ ঘটনার ফলে ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে এবং আমাদের জাতির সুনাম কলঙ্কিত করিয়াছে—ইহাতে আমাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া আছে। তথাপি, আহত সৈনিক যেমন স্বাধীনতার ধ্বজা দৃঢ়হস্তে উন্নত রাখিতে সমর্থ হইলেই আনন্দিত হয়, আমরাও এই দিনের শুভাগমনে সেইরূপ আনন্দ অনুভব করিতেছি।

আজ আমরা যাহা পাইলাম, তাহা আমাদের ভবিষ্যৎকে সার্থক বা বিনষ্ট করিবার স্বাধীনতা। ইহা একাধারে শ্রেষ্ঠ অধিকার এবং কঠিন দায়িত্ব। স্বাধীনতা আমাদের জন্য যে সুযোগ ও দায়িত্ব বহন করিয়া আনিয়াছে ভারতীয় ইউনিয়নের প্রত্যেক নাগরিক ধর্ম্ম, সম্প্রদায় বা দলনির্ব্বিশেষে তাহার সমান অংশীদার হইবে। আজ প্রত্যেক নাগরিক সামাজিক ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এমন একটি গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে আত্মনিয়োগ করুক, যেখানে জনগণই হইবে শক্তির আধার এবং সকল নাগরিকই সমান সুযোগ লাভ করিবে। আজ আমাদের শত্রু বাহিরে নয়, ভিতরে—এই আভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। বুভুক্ষা, দারিদ্র্য, রোগ, কুসংস্কার, নিরক্ষরতা ও মূর্খতা, সর্ব্বোপরি সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার ফলে প্ররোচিত হিংসা ও উচ্ছৃঙ্খলতা—এইগুলি আমাদের প্রকৃত শত্রু। এই শত্রুসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা প্রত্যেক ভারতবাসীর পবিত্র কর্ত্তব্য। এই নবতম সংগ্রামে আমাদের অধিকতর ত্যাগ ও সংযমের পরিচয় প্রদান করিতে হইবে।

বন্দে মাতরম্।

গান্ধীজীর বাণী

আমি কি বাণী দিতে পারি? আমার প্রার্থনা-সভার বক্তৃতাই জাতির প্রতি শ্রেষ্ঠ বাণী।

শ্রীঅরবিন্দের বাণী

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে বটে, কিন্তু একতা লাভ করে নাই। স্বাধীন ভারত এখনও খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন। তবে আশা করি যে, এই বিভাগ নিশ্চয়ই লোপ পাইবে।

শ্রীরাজাগোপালাচারীর বাণী

দলবিশেষের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া শাসনকার্য্য যাহাতে সৎভাবে সুপরিচালিত হয়, সেদিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।
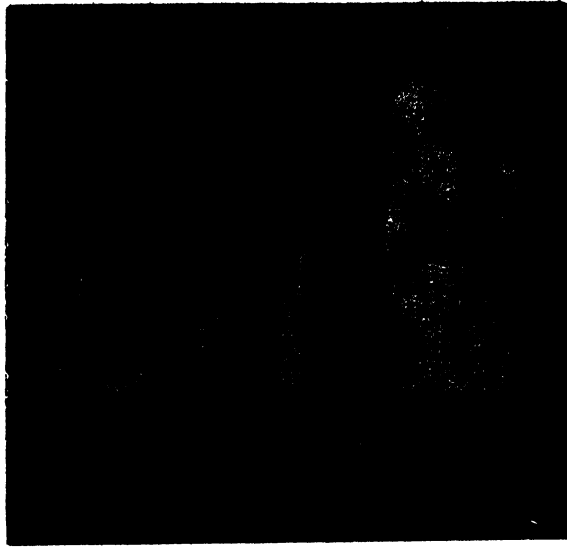
পুতুল —জয়নারায়ণ সিং কাছোয়া

গ্রাম —হীরেন সেন

নিদ্রা

—সুপ্রভাত নন্দন

ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস

মুসলমান শাসনের অধীনতা-পাশ হইতে দেশের মুক্তি-সাধনের জন্য ছত্রপতি শিবাজী যে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহার নিশান ছিল গৈরিক। প্রথমতঃ এই গৈরিক পতাকাই সম্ভবতঃ ইংরাজ শাসনের উচ্ছেদের সংগ্রামে জাতীয় আন্দোলনের পতাকা নির্ণয়ের প্রেরণা দেয়। শুনা যায়, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় বিপ্লবীরা আমানুল্লা-শাসিত আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুলে স্বাধীন ভারতের যে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার পতাকা ছিল গৈরিক। এই পতাকা অনেকটা বর্ত্তমান হিন্দু মহাসভার পতাকার মত ছিল বলিয়া প্রকাশ।

কিন্তু ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম আরম্ভ করেন, তাহাতে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের লোকই যোগদান করেন, কাজেই এই সংগ্রামের প্রতীক কখনও সম্প্রদায়বিশেষের পতাকা হইতে পারে না। এজন্য হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মিলনের ভিত্তিতে জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা করা হয়। পরে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রচিত ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকায় অনেকে আপত্তি করায় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৩১ সালের ২রা এপ্রিল সকলের গ্রহণযোগ্য একটি পতাকা নির্ণয়ের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির রিপোর্ট অনুসারে ওয়ার্কিং কমিটি স্থির করেন যে, জাতীয় পতাকার সহিত সাম্প্রদায়িকতার সংশ্রব না থাকাই বাঞ্ছনীয়। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি পতাকা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন :—

পতাকাটি পূর্ব্বের মতই ত্রিবর্ণ থাকিবে, তবে বর্ণগুলি উপর দিক হইতে যথাক্রমে জাফ্রান, শ্বেত এবং সবুজ হইবে, শ্বেত অংশের মধ্যে গাঢ় নীল বর্ণের চরখা থাকিবে। বর্ণগুলির কোন সাম্প্রদায়িক তাৎপর্য্য থাকিবে না। উহার তাৎপর্য্য হইবে এইরূপ : জাফ্রান—সাহস ও ত্যাগের প্রতীক। শ্বেত—শান্তি ও সত্যের প্রতীক। সবুজ—বিশ্বাস ও শৌর্য্যের প্রতীক। চরখা—জনসাধারণের আশার প্রতীক।

বর্ত্তমানে ভারতীয় ডোমিনিয়নের যে পতাকা গণ-পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে পতাকার শ্বেত অংশের মধ্যে চরখার পরিবর্ত্তে সম্রাট্ অশোকের ধর্ম্মচক্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মচক্র গাঢ় নীলবর্ণে অঙ্কিত থাকিবে। অবশ্য এই নির্দ্দেশও দেওয়া হইয়াছে যে, এই নূতন পতাকা ও কংগ্রেসের চরখা-সমন্বিত পতাকা উভয়ের যে-কোন একটি ব্যবহার করা চলিবে।

সমগ্র ভারতের আশা ও আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক এই ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অতীতে জাতীয় সংগ্রামে বহু সৈনিক অশেষ লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন। আজ এই পতাকার মর্য্যাদা পৃথিবীর প্রত্যেক স্বাধীন দেশের পতাকার মর্য্যাদার সমান হইয়াছে। যে সকল দেশে ভারতীয় দূতাবাস স্থাপিত হইয়াছে, সেই সকল দেশে আজ এই পতাকা সগৌরবে উড্ডীন হইয়াছে। আজ প্রত্যেক দেশপ্রেমিক ভারতবাসীকে শেষ রক্তবিন্দু দিয়া এই পতাকার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে। সকলকে এই পতাকা-তলে সমবেত হইয়া অভি-বাদন জানাইতে হইবে। বন্দে মাতরম্।

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্,
সুখদাং বরদাং মাতরম্॥
চত্বারিংশকোটিকণ্ঠ-কলকলনিনাদকরালে
দ্বিচত্বারিংশকোটিভুজৈর্ধৃত-খরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্॥

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে॥
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী—
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্,
বন্দে মাতরম্।

পলাশী

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

সিরাজের খুনে রাঙা প্রান্তর, অস্ত-সিঁদুরে রক্ত লাল,
ধূ ধূ মরুভূমি, চির-অশ্রুর প্রস্তরীভূত হে কংকাল!
স্মৃতি-সাহারার বিজন শ্মশানে ইতিবৃত্তের বালুকা-তলে
কারে খোঁজ তুমি লুপ্ত পলাশী, মহা পাতালের অস্তাচলে?
মূক মায়াবিনী! মৌন পাষাণী! মৃত্তিকাময়ী উষর ভূমি!
দাবানল চাপা বক্ষের তাপে বারিলেশহীন ধূসর তুমি;
স্তন্যদায়িনী দেশ-জননীর এ কি করালিনী রুদ্র বেশ?
সর্ব্বনাশিনী তোমার চিতায় ভস্ম-তিলকে যজ্ঞ শেষ।

নিষ্প্রাণ তব নিথর বক্ষে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন কত,
কত জীবনের শবদেহ লয়ে কাক-শকুনিরা কলহে রত!
ক্ষীণা ভাগীরথী ভীরু শঙ্কায় দূরে দূরান্তে গিয়াছে সরি'
লক্ষ বাগের আম্রবীথিকা অগ্নিদহনে গিয়াছে মরি।
দম-ফেটে-মরা দলিত আশার কঠিন পাষাণে নিহত প্রাণ
শুষ্ক বুকের অন্তরে তব আজো ঘুমন্ত কত যে গান
অতুল্য পুণ্য, অচল পাপের আলো-আঁধারের কত না ছায়া
তব প্রেতপুরে রচিল নীরবে ক্ষণ-তাণ্ডব-লীলার মায়া!

—

কত বিলাসের চটুল দম্ভ, কত মন্ত্রণা যুক্তি বল
কত শঠতার চতুর শাঠ্য এইখানে পেল মুক্তি-ফল।
কত প্রতারণা, লুব্ধ ছলনা, রাজ্যলোলুপ হিংসা কত
কত বিপ্লবী বণিক্-ধর্ম্ম গোপনে স্বার্থ সাধন রত!
নিমকহারামী কত বেইমানী, কত বেদনার আর্ত্ত রোল
কত ঘাতকের হিংস্র খলতা, কত মীমাংসা, প্রীতির ভোল,
রণদুর্ম্মদ ক্রুদ্ধ সেনার রণ-হুংকারে কম্পমান
কত অস্ত্রের সংঘাতে হেথা অগ্নির কণা বহ্নিমান্!
ময়দানে-কাঁপিছে অসি-বল্লমে, উল্কামুখীর শাণিত তীরে
কত শহীদের তরুণ রক্ত ছুটিল ছিন্ন বক্ষ চিরে'!

কত কৌশলী কূট ভালোবাসা, সুচতুর কত কুটিল হাসি
কত উল্লাস, কত ক্রন্দন, জয়-পরাজয় নীরবে আসি'
তোমার দুয়ারে ঢেলে গেছে তার তপ্ত অনল অশ্রুধার
সব ইতিহাস নীরবে বহিয়া ডুবে গেছে আলো পূর্ব্বাশার।

ধ্বংসের গীতা ধ্বনিত তোমার সমর-মুখর কুরুক্ষেত্রে
স্খলিত-শস্ত্র রাজকীর্ত্তির গরিমা ঘুমায় মুদিত নেত্রে
কত হীরা ঝিল, কত মতি ঝিল, হাজার-দুয়ারী তোরণ দল
জয়-মহিমার কৌস্তুভ মণি তোমার ধূলায় হয়েছে তল!
হেথা নিষ্প্রাণ জীবন্ত প্রাণ খর কৃপাণের ক্ষুধিত মুখে
খুশবাগ, সে তো মৃতের সমাধি, জীবন-সমাধি তোমার বুকে!

হেথা একধারে বিজয়-বাদ্যে শিশু-রাজত্ব জনম লভে
অপর পার্শ্বে ধূমায়িত চিতা ধূমকুণ্ডলী ছড়ায় নভে
তোমার আকাশে নব নীল মেঘে কালবৈশাখী লুকায়ে ছিল
প্রাণ-বহ্নির শেষ শিখাটিরে এক নিশ্বাসে নিবায়ে দিল!

শিশু সিরাজের রত্ন মুকুট এখানে আছাড়ি হয়েছে গুঁড়া
মোহনলালের চিতালোকে জ্বলে মীরজাফরের মাথার চূড়া।
আত্মকলহ জ্ঞাতি-বৈরিতা কি মহামৃত্যু ঘনায়ে আসে
তারই নির্দ্দয় সত্য-কাহিনী লেখা আছে হেথা তোমার প্রাণে,
বেদনার কালো নিকষে ঘষিয়া সত্যের আলো জ্বেলেছ তুমি
বাংলার তুমি পরম তীর্থ হে চির মৌন সমাধি-ভূমি!
তুমি দিলে বর ব্যথা-জর্জ্জর সর্ব্বনাশের করাল হস্তে
সারা বাংলার গৌরব-রবি তব প্রান্তরে ডুবেছে অস্তে।
মহা জীবনের শ্মশান-শয্যা, বীর-মহিমার অস্ত পাট
ভাবী বাংলার উপাস্য তুমি, আদি বাংলার হলদীঘাট।

এই মৃত্যু হতে মুক্তি চাই

অরুণবরণ চক্রবর্ত্তী

যান্ত্রিক সভ্যতা-পিষ্ট এ যুগের মানুষের মন
জানে না কখন তার হয়েছে মরণ।
রাত্রি-দিন প্রাণহীন যন্ত্রের মতন
কে জানে কিসের টানে তারা সব চলেছে দুর্ব্বার,
কোন খানে কী উদ্দেশ্যে এতটুকু অবসর নাহি সে চিন্তার।
উদ্দেশ্যবিহীন এই উদ্দাম চলাই
এ যুগের মানুষের জীবনের সার ধর্ম্ম— আর কিছু নাই।

তাদের দুর্ব্বার গতি সহসা কখনো যদি থামে,
জীবন-সংগ্রামে
সংখ্যাহীন ক্ষতে-ভরা বর্ষীয়সী পৃথিবীর বুকে
ধ্বংসের ভীষণ মূর্ত্তি আসিবেই রুখে।

সমস্যা ভীষণ!
যেদিকে তাকাই দেখি তাকায় মরণ।

এ যে মৃত্যু— এরি মাঝে
রাত্রি-দিন বাজে
নাস্তির বিষাণ,
তারা তা বোঝে না কিছু: এত টা অজ্ঞান।
বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষেরা সব
কালের চাকার তলে কেমনে মানিল পরাভব।

হবে কি কখনো আর
বাজিবে না এ ধরার
প্রাণপূর্ণ জীবনের মঙ্গল সানাই?
তাহলে এ মৃত্যু হতে মুক্তি চাই।
মুক্তি চাই: এ যুগের সভ্যতার নাগপাশ হতে,
মুক্তি চাই: বাহিরের নিষ্কলঙ্ক উজ্জ্বল আলোতে,
মুক্তি চাই: প্রকৃতির স্নেহস্নিগ্ধ শ্যামল জগতে,
যেখানে বাতাস নয় মানুষের কেনা,
যেখানে আকাশ নয় কাহারো অচেনা,
যেখানে পাখীর গান কভু নয় বন্দীর বন্দনা,
যেখানে আরণ্য শোভা উদ্যানের গণ্ডীতে বন্ধন,
যেখানে জীবন নয় সমস্যা ও তার সমাধান,
সহস্র দুঃখের মাঝে
জীবনের তারে বাজে
স্বপ্ন আর হাসি আর গান।

মণীন্দ্র গুপ্ত

দূর থেকে লাল কাঁকরের পথটাকে মনে হবে একটা সিল্কের ফিতের মতো। দু' পাশে ঘন অরণ্যের বন-বীথি যেন দীর্ঘ প্রতীক্ষার গৌরবে সর্বহারা। তার ঝিল্লী-মুখরিত রাত্রির গোপন ন-মর্মর মাঝে মাঝে নীলিমার স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ কোরে চলে যায় সানালী মেঘমালার অঙ্গনে। আসে রাত্রি-ভাঙানো প্রভাত! র্বাশার লালচে আলোয় শ্যামল পত্রপুটের প্রান্তে এসে ঝলমল করে খমলে জড়ানো সবুজ অরুণোদয়। একটা কোমল মুখের মিনতির তো তা যেন কোনো বনদুহিতার বিবর্ণ উচ্ছ্বাসে সতত স্পন্দমান।

এটাই হোলো নয়া সড়ক। পাইনের প্রতিফলিত অরুণাভার কমাত্র প্রতিবিম্ব। একটা বিরাট বনচারী জন্তুর অতিকায় লাভ জিবের মতো সমস্ত দুপুরটা ধূলোর আবরণ পড়ে ঝিমোতে াকে সে সড়ক। মাঝে মাঝে প্রাইভেট কারগুলো সে দিগন্ত-ছোঁয়া াল কাঁকরের উলঙ্গ বুককে কঠিন স্পর্শ কোরে ছুটে যায় দূরের ীল বনরেখায়। ধূলোর অক্টোপাস থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত কোরে াবার চোখের পাতা জড়িয়ে আনে নয়া সড়ক। ষ্টেশন-রোডের সিংএর ওপর রৌদ্র-ঝরা তপ্ত ট্রাফিক পুলিশটার মতো আবার ন নিরাবেগ হোয়ে আসে পলকের প্রতিধ্বনিতে।

হঠাৎ এক দিন নয়া সড়কের প্রতিটা ধূলিকণার বুকে এসে বাজলো. মতো অমনি তাই রাতারাতি চঞ্চল হোয়ে উঠলো অগণিত পদধ্বনির জয়-গৌরবে। ধূলো-রাঙা পথের ওপর যেন স্পন্দিত হোলো লক্ষ বৈজয়ন্তী। একটা বিরাট যুদ্ধজয়ের মতো তা যেন অজস্র ঝিকিমিকিতে চির-উদ্বেল।

গোধূলিয়ার সবুজ মাঠের ওপর শতচ্ছিন্ন তাঁবুর স্বপ্ন যেন বৃষ্টির টুকরোর মতো একে একে ছড়িয়ে পড়লো ইতস্ততঃ। সাতরঙা বাল্বের চঞ্চল আলোকমালায় রাত্রির নক্ষত্রখচিত ওড়নার মতো জ্বল-জ্বল কোরে উঠলো—মীনা গ্র্যাণ্ড সার্কাস। অগণিত শকুনের পাখার মতো প্ল্যাকার্ডের ওপর সুদূর যাভা-দুহিতার লীলায়িত ভঙ্গীটা রিবয়দের পিঠে পিঠে সারা সহরটা ঘুরে বেড়াতে লাগলো। নয়া সড়কের ঘুম ভেঙে গেল এক মুহূর্তে—লাল কাঁকরের ধূলোর অবগুণ্ঠনে আবার সমস্ত সহরটা গুঞ্জন কোরে উঠলো লক্ষ মৌমাছির মতো।

সন্ধ্যের সময় আচমকা ঢুকলে তাঁবুর ভেতরটা ইন্দ্রপুরী বলে ভুল হবে। হাজার সূর্য্যের মতো ঝকমক্ কোরছে ডে-লাইটের জয়শ্রী। তার প্রতিবিম্ব এসে পড়েছে আপার গ্যালারীর ঝলমলে পোষাকের মুখরিত রূপশ্রীতে। সব থেকে সুন্দর এরিয়েলের ওপর দোদুল্যমান যাভা-অঙ্গনাদের যৌবন-রাঙা দেহগুলি। সোদা ব্রিচেসে শক্ত করে আঁটা তাদের দেহ-বল্লরী। নীল জ্যোছনার মতো এক একটা সিল্কের রুমাল উড়ছে তাদের কালো বিনুণীর প্রান্ত-রেখায়। পায়ে বাকস্কিনের মতো নরম ক্যান্‌ভাসের সার্কাস-সু্য।

দেহ-যমুনা কল্লোলিত হোয়ে উঠছে প্রতিটি নিশ্বাসের নির্ভীক

জোনাকির মতো ছুটে ছুটে চলেছে ইথার-রেখায়িত আকাশ-পথের নীল ইসারায়। মাঝে মাঝে শক্ত কোরে বাঁধা নেট্‌টার ওপর লুটিয়ে পড়ছে তাদের ভরা যৌবনের উচ্ছল দেহ-ভার। একটা নীল বিদ্যুৎ যেন সহসা আকাশকে দীপান্বিত কোরে ব্যর্থ হোয়ে ঝরে গেল মেঘমালার ধূসরাভ আমন্ত্রণীতে।

ঐ ছাড়া আরো একটা আকর্ষণ আছে মীনা গ্র্যাণ্ড সার্কাসের। সেটা কার্ণিভ্যাল! সেখানে মীনা বিদ্যুৎপর্ণা। সাগর-তনয়ার লক্ষ প্রেমাম্বির যেন বিচিত্র রূপ-চূর্ণিকা। কতো পতঙ্গ সে লীলায়িত দীপ-বর্ত্তিকার চরণ-রেণুর রাঙা স্বপ্নে বিভোর হোয়ে থাকে। কিন্তু পাখা পুড়িয়ে আবার তাদের ফিরে যেতে হয় অন্ধকারে মুখ ঢেকে। আশ্চর্য্য! তবু মীনা একটুও চঞ্চল হয় না। কঠিন হীরের মতো ওর মনের রূপোলী আকাশে কারো পদধ্বনিরই শোনা যায় না. এতোটুকু প্রতিধ্বনি।

সব থেকে বড় তাঁবুটার ঠিক উল্টো দিকেই রায় বাহাদুর পীতাম্বর মিত্তিরের শ্বেত পাথরের চোখ-ঝলসানো চন্দ্রিকা। আধুনিকতার সবটুকু গৌরবেই তা দীপ্তিমান্। কলাপসিবল গেটটার দু'পাশ দিয়ে নীল তোয়ধারার মতো নেমেছে সন্ধ্যা-মালতীর শ্যামল অনুরাগ। সুতনু দু'টো বাষ্টের নগ্ন উত্তমাঙ্গ দু'দিকে বিক্ষিপ্ত। গোমুখীর নিষ্প্রভ হিমসাগরের মতো ঝির-ঝির করে ঝরছে একটা কৃত্রিম ঝর্ণা। মনে হয়, যুগ-যুগান্ত ধোরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে চলেছে ওর [এক-একটা পরমাণুর মণিকা। আজ তাই ও স্তিমিতদীপা।

কিন্তু আশ্চর্য্য মানুষ এই রায় বাহাদুর। যে কোনো প্রোষিতভর্ত্তৃকার চেয়ে তিনি সুখী বিপত্নীক। বার্দ্ধক্যের নোতুন আলোয় বোঝা যায় না তাঁর মুখে যৌবনের বিন্দুমাত্র হাহাকার। জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তে তিনি অঞ্জলি ভরে পান করেছেন ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থপতিদের দিগন্ত-প্রতিধ্বনি আলোক-সুধা। থিসিস লিখছেন—দি প্লেস্ অব এ্যারিয়ান আর্কিটেক্চার ইন এ্যানসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া। কিন্তু চোখের দৃষ্টি এখন আর আগের মত অতোটা জোরালো নয়। তাই অরুণাভকে দৌড়তে হয় রায় বাহাদুরের কথার পিছনে তার নোতুন পেফার্‌টা নিয়ে।

অথচ রায় বাহাদুরের রক্তের কোনো কণিকার সাথে এতোটুকু মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না অরুণাভর। অরুণাভ অনাত্মীয়—পরিচয়হীন। সেটা ছিল তক্ষশিলার কোনো একটা বর্ষণ-মুখর রাত্রি। মাঝে মাঝে চমকাচ্ছে বিদ্যুল্লেখা—পীতাম্বর মিত্র তার ভেতরে ফিরছেন নিজের বাংলোয়। তক্ষশিলার সম্প্রতি যে অভিনব আইভরির কুবলয়টা আবিষ্কৃত হোয়েছে—তারই স্বপ্নে বিভোর হোয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো চলেছেন ঘনঘটাকে উপেক্ষা কোরে—এমন সময় অরুণাভ এলো তিমিরাবৃত একটা করুণ মেঘের মতো। তবু তার চোখ দু'টোর ভেতরে পীতাম্বর মিত্তির যেন খুঁজে পেলেন একটা লুকোনো বিদ্যুতাভা। সঙ্গে কোরে নিয়ে এলেন গোধূলিময়ার বাড়ীতে। নীলি মিলি তখন সবে মাত্র ফ্রক ছেড়েছে।

হিসেবে একটুও ভুল হোলো না রায় বাহাদুরের। অরুণাভ সমস্ত বিশ্বাসের মর্য্যাদাকে পরালো পরিপূর্ণ জয়শ্রী। রায় বাহাদুরের অনুরোধে এ্যান্সিয়েণ্ট হিষ্ট্রীতে সে হোলো ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট। পীতাম্বর মিত্তির সে দিন দু' হাতে অরুণাভকে জড়িয়ে ধোরেছিলেন পাগলাগারদের মতো। বলেছিলেন—মেঘের অবগুণ্ঠন দেখে আমি বিদ্যুৎকে এতোটুকু ভুল করিনি অরুণ। তুমি আমার প্রত্যেকটা রক্ত-কণিকা নিয়ে একটা নিখুঁত মাংসপিণ্ড। জড় নও—বলাকার পাখার মতো চির-চঞ্চল।

এক দিন ঘুম ভেঙে গেল রায় বাহাদুরের। চোখের সামনে দেখলেন, নীলি মিলি নবযৌবনে আলোকস্ফীতা। এক বৃন্তের দু'টি অনতিস্ফুট শিশুফুল সহসা যেন রূপান্তরিত হোয়েছে পূর্ণাঙ্গ কুসুমিকায়। রায় বাহাদুরের স্বপ্ন গেল ভেঙে। থিসিস বুঝি তাহলে আর লেখা হোলো না। নীলিকে বৃন্তচ্যুত করা হোলো। নোতুন কোরে যেন আবার রূপ নিলো নীলি। সেখানে হোল দিব্যেন্দু লক্ষ মণিকা-মণ্ডিত রূপকুমার।

সে দিনও স্লিপিং স্যুটটা গায়ে চড়িয়ে পীতাম্বর মিত্তির ঘুরে ঘুরে প্রতিফলিত কোরছেন আর্য্যনারীদের সূক্ষ্ম কারুশিল্পের একটা বিচিত্র প্রতিচ্ছবি আর অরুণাভ একটা উদ্যত পাখার আবেগে কলম নামিয়ে ঝড়ের মতো ছুটে চলেছে শ্বেতপত্রের পুঞ্জীভূত স্তব্ধতাকে টুকরো টুকরো কোরে—এমন সময়ে নীল পর্দাটা সরিয়ে অরুণিমার মতো এক ঝলক আলো নিয়ে আবির্ভূত হলো মিলি—

"আজ সন্ধ্যের সময় ওকে একটু ছেড়ে দিয়ো বাবা। নীলি বলছিল সার্কাস দেখতে যাবে···"

"সার্কাস? শোনো মিলি—আমাদের পৃথিবীতে প্রত্যেকটা কাজ ঠিক ঐ সার্কাসের এক-একটা দেহ-লীলার মতোই বিচিত্র। তাতে নোতুন কোরে আর দেখবার কি আছে? যাক্, নীলি যখন প্রপোজ কোরেছে—তখন আমাকে শুনতেই হবে। কেমন অরুণ? তোমার কি মনে হয়? বলো তো কে বেশী ইনটেলেকচুয়াল? কিন্তু সাবধান, নীলিকে ও-ভাবে জাজ্ কোরো না। ঠকবে। তোমার মতো অসাধারণত্বের ছাপ ওরও প্রতি পরমাণুতে বিদ্যমান।"

অপাঙ্গে মিলির মুখের প্রতিফলনটা লক্ষ্য কোরে একবার হেসে নিলো অরুণাভ। সে মুখে বেশ একটু অভিমান আষাঢ়ের আকাশের মতো থমথমে। কিন্তু অতো সহজে মিলিকে ধরা যাবে না। রায় বাহাদুর পীতাম্বর মিত্তিরের স্বপ্ন যে তাহলে ব্যর্থ হোয়ে যাবে।

"ভুল বোললে বাবা। আমি তোমাকে পরীক্ষা কোরলাম। নীলি কোনো দিনও মুখ ফুটে বোলবে না। তোমার হয়তো সময় হোতে পারে কিন্তু নীলির সময় হোয়েছে জানলে আমি খুবই অবাক হবো।" মাদ্রাজী চটিটার শব্দ কোরতে কোরতে মিলিয়ে গেল মিলি পর্দ্দাটার আড়ালে। নীলি তখনো বিভোর হোয়ে রয়েছে মারী ষ্টোপসের র‍্যাডিয়াণ্ট মাদারহুডের প্রতিটি অক্ষরের স্বপ্ন-কণিকায়। আসন্ন মাতৃত্বের রক্তিম আভাসে ওর সমস্ত মুখটা উদ্ভাসিত যৌবন-গোধূলিতে। প্রতিটি রেখায় স্থলপদ্মের ওপর তার স্পর্শ যেন জলবিন্দুর মতোই টলমল।

দিগন্ত মণিময় কোরে সন্ধ্যা এলো। দোতলার ওপর থেকে ইভনিং গাউন পরে রায় বাহাদুর দাঁড়িয়ে দেখলেন—মিলিদের সাথে অরুণাভ চলেছে একটা সমান্তরাল সরল রেখার মতো। মাঝখানে তাদের যেটুকু ব্যবধান তার পরিধিকে আরো একটু বর্দ্ধিত কোরতে পারলে যেন খুসী হয় অরুণাভ আরো। এবং সে ব্যবধানের গৌরবে তিন বার এম্-এ পরীক্ষা দিলেও যে কোনো সবজেক্টে রেকর্ড মার্ক সংগ্রহ কোরতে পারে অরুণাভ। আশ্চর্য্য এই ছেলে অরুণ! এখনো যেন ওর কাছে মিলির এই নব-লীলায়িত দেহ-মঞ্জরী কোনো

একটা গভীর অপরিচিতিতে ভরা। একটুও মাদকতা যেন মিলির তার কালো চোখের করুণ আমন্ত্রণীতে ধরা পড়ে না অরুণাভের কাছে। শক্ত পাথরের মতো তাই মনে হয় উৎসবহীন অরুণাভর মানস-লোক।

কিন্তু ধূলি-ধূসর মর্ত্যের বুকে এই সার্কাসে এসে আজ যে নোতুন ইন্দ্রপুরী আবিষ্কার কোরলে অরুণাভ, তাতে মনে হোলো ওর অবগুণ্ঠিত দৃষ্টির সামনে থেকে এই মুহূর্ত্তে যেন সরে গেল একটা কালো আঁধারের যবনিকা। পরিষ্কার দেখতে পেলো অরুণাভ যৌবনের প্রথম রং লেগেছে পৃথিবীর প্রান্তরে। তার প্রতিফলিত দৃষ্টিতে আর্টিষ্টের রঙীন তুলিকার মতো রেখায়িত হোয়ে উঠেছে বন-বীথিকার প্রতিটি নীল বনরেখা। আটাশ বছরের ক্ষুধিত যৌবন আজ সহসা ঘুমের শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছে একটা কেশর-ফোলা সিংহের মতো। দ্রুত লয়ে স্পন্দিত হোতে লাগলো অরুণাভর ধমন অর্কেষ্ট্রার তালে তালে—আকাশ-সুন্দরীদের অনুপম দেহ-ভঙ্গিমায়।

আরো একটু কাছে সরে আসতে পারতো মিলি। আরো ঘন হোয়ে আজ সে উপলব্ধি কোরতে পারতো অরুণাভর দেহোত্তাপ। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আজ কি সে অনুভব কোরতে পারছে না অরুণাভর এই অদ্ভুত চঞ্চলতা? যৌবনের সুন্দরতম মুহূর্ত্তগুলি যে শুধু কৌতূহলের পেয়ালায় নিঃশেষ কোরে দিয়েছে উদ্‌ভ্রান্ত পিপাসুর মতো—আজকে তার কেন এই অকারণ মর্মাবেগ—কেনই বা এতো অসহ্য আলোড়ন! মিলি কি শুনতে পাচ্ছে না তার হৃদয়ের গোপন আর্ত্তনাদের ভাষা?

কী চমৎকার এ্যারিয়েলের সূক্ষ্ম লীলা-শিল্প। তুষারের মতো সাদা গ্লাভসের আবরণে দু'হাত ঢাকা সে শূন্য-চারী সুতনু কার। চাঁপার কলির মতো আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে আটকানো ইটালিয়ান রিংএর কবোষ্ণ উত্তাপ। তারই ওপর সে বিদেশী নিতম্বিনী নিরুপম লীলাভরে দোদুল্যমান। বিদ্যুতের ফুলের মতো যেন ঝরে ঝরে সরে যাচ্ছে সেই অমর্ত্য-দুহিতার অক্ষয় রূপ-সুধার জ্যোছনা। শুভ্র আবরণের আলিঙ্গনে সে জোয়ার-মুখী যৌবন যেন গভীর হৃদয়াবেগে চির-চঞ্চল।

ফিরবার সময় অরুণাভর সত্যিই মনে হোলো সহসা যেন পৃথিবীটা ডুবে গেল স্তব্ধতার অতল সমুদ্রে। এতোক্ষণ চোখের সামনে যে লাবণ্যের প্রতিমা আকাশচারী বলাকার মতো মেলে দিয়েছিল তার অকুণ্ঠিত আবেগের শ্বেতপদ্মাভ পক্ষপুট—সে স্বর্গস্মৃতি যেন অরুণাভর দুই চোখকে সহসা বাষ্পায়িত কোরে নিরুদ্দেশ হোয়ে গেল দিগন্তে। সর্ব্বস্ব হারানোর মতো অরুণ হঠাৎ নিষ্প্রভ হোয়ে গেল মনে মনে। কম্পিয়ান সাগরের বুকের ওপর মনে হোলো আবার যেন নোতুন কোরে জন্ম নিলো তপ্ত বালুকার নীল রৌদ্রের সাহারা।

"কেমন লাগলো অরুণ? তোমার-তো এ-সব কোনো দিনও ভালো লাগবে না জানি। তুমি হিষ্ট্রির ছাত্র, তোমার ভালো লাগবে পাটলীপুত্রের নৃপতিদের স্তিমিত পরিচয়—ভারতের শেষ সূর্য্যের রেখায়িত গোধূলি।" রায় বাহাদুরের হাসিতে শ্বেতচন্দনের সৌরভ বিচ্ছুরিত হোলো।

"না কাকা বাবু। দেখতে দেখতে বার বার আমার মনে পড়ছিল সেই অতীতের স্বর্গাঙ্গনাদের প্রতিচ্ছবি। শুধু রিংএর ওপর একটা সামান্য কসরৎ বোললে তাদের দীপ্তিকে ম্লান করা হবে। আমি তাদের ভেতরে দেখেছি নারীত্বের অক্ষুণ্ণ নমনীয়তা—শত প্রলয়ের হুঙ্কারেও কোনো দিনও তা বিকৃত হোয়ে যাবে না।"

"বটে? আমার থিসিস্ তবে আজকে আবার নোতুন কোরে রূপ নেবে অরুণ। যাও, কলম নিয়ে এসো। তোমার চোখে আজ খুশীর সমুদ্র তরঙ্গিত। এই তো চাই অরুণ? সব সময়ে চোখে ঠুলী দিয়ে দৃষ্টিকে নিরাবেগ কোরো না। মাঝে মাঝে তাকাবে আকাশের দিকে—দেখবে সেখানেও উদয়াচলের স্বর্ণ-রাঙা নীলোৎপল—অস্তাচলের বেদনা-বিধুর গোধূলি।"

নিজের ঘরে এসে একবার মুখ টিপে হাসলো নীলি। স্তম্ভিতের মতো তখনো মিলি আকাশের দিকে নিষ্পলক উদাসীন। বদলালো না শাড়ীটা, খসালো না জরির কাজ করা কটকী চটি-জোড়াটা পা থেকে। বসে রইলো জানলার কাছে পাষাণীর মতো এক কঠিন দেহ-ভঙ্গিমায়।

"যাক্ এতো দিনে সব পরিষ্কার হোয়ে গেল মিলি। দেখবি অরুণের অহঙ্কারের মুকুট এক দিন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হোয়ে গড়াবে তোর পায়ের কাছে।" ডান হাত দিয়ে মিলির জবা ফুলের মতো গোলাপী গালটা শক্ত কোরে একবার টিপে দিলো নীলি। "ও মুখ ফুটে কথা বোলতে পাচ্ছে না শুধু লজ্জায়। তুই উপযাচিকার মতো যেন সে লজ্জা ভেঙ্গে দিস্ না। তোকে ভালোবাসার সাহস নেই ওর—অথচ তার জন্য আকুতি রয়েছে ওর অন্তরে অন্তরে।"

"তত্ত্বকথা রাখ। দিব্যেন্দু বাবুর চিঠি পেয়েছিস্? কবে আসছেন তোকে নিতে?" মিলি উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে। আস্তে আস্তে জুতো খুলে শুয়ে পড়লো বিছানায়। একটা ফরাসী সুরের আমেজ তখনো বিধুনিত হোচ্ছিল নীলির দু'টো ঠোঁটের অভ্যন্তরে। বিছানায় শুয়ে মিলি শুনছিল তা উৎকর্ণ হোয়ে।

কিন্তু দীর্ঘ আট বছর ধোরে তিল তিল সৌন্দর্য্য দিয়ে গড়া কল্পনার অভ্রভেদী মন্দিরচূড়াটা হঠাৎ রায় বাহাদুরের বুঝি সামান্য একটা নিশ্বাসের উত্তাপে বিবর্ণ হোয়ে গেল। প্রতিমা-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের স্বর্ণ-বেদিকার নির্ম্মাল্য এক মুহূর্ত্তে ঝরে গেল নিঃশব্দে। আরতির দীপ গেল নিবে—রায় বাহাদুরের স্বপ্ন-গড়া শ্বেতশঙ্খ আর তরঙ্গিত হোলো না বন্দনার নবীন ঝংকারে।

কলমটা হাতে নিয়ে অস্থির হোয়ে উঠতে লাগল অরুণাভ। সাদা কাগজের বুকে ফুলে উঠলো না আর অক্ষরের কালো মুক্তোর মালিকা। আঙুলের প্রতিটি উপশিরার প্রান্তে এসে ধ্বনিত হোলো অবসাদ—অরুণাভ যেন নিঃশেষ হোয়ে যেতে লাগলো ধীরে ধীরে বিবর্ণ রাত্রির মতো।

শালীনতার সহস্র নূপুর খসিয়ে অশ্রুরাঙা মিলি এগিয়ে এলো অরুণাভর দৃষ্টি-প্রদীপের পদপ্রান্তে। তার স্পন্দিত আঁচলের প্রতিটি তন্তুতে এক বিরাট দীনতা যেন গভীর আবেগে উন্মুখ হোয়ে উঠলো। কিন্তু মুহূর্তে আকুল সাগরাঙ্গনা মিলির পল্লবিত দেহ-মঞ্জরী ঝরে গেল ছোঃ, এই তো মরদকা বাচ্চা তোমরা—জেনানার সঙ্গে পারো না কসরতে। আমাদেরই সরম আসে ভেবে—আর তোমরা সেই ভাঙা হাতে আনো আমাদের জন্য জখম্। ছোঃ! দুশমন হও—দুশমন—"

অরুণাভর ঠুনকো পৌরুষকে মীনা যেন চাবুক দিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো কোরে ছড়িয়ে দিলো। বুঝলো, তার শিক্ষিত দেহ দিয়ে ঝংকার দেওয়া যাবে না মীনার শক্ত যৌবন-বীণায়। মীনা তার লাবণ্যের বাঁধ কিছুতে খুলে দেবে না তার মতো অপদার্থ একটা দুর্বল

বাঙালীর কাছে। ভাবলো, ইউনিভারসিটির ডিগ্রী দিয়ে শুধু অসহায় ললনাদের ওপর অত্যাচার করা যায়—তাতে জয় করা যায় না কখনো যাযাবরীর কুহেলিকা-জড়ানো চঞ্চল চিত্ত। সেখানে প্রতি পদক্ষেপে প্রমাণ কোরতে হবে সূর্য্যকণার মতো খর বীর্য্য। প্রথম প্রেমের ফুল তাই আজ ঝরে গেল এমন কোরে অরুণাভর। কতো স্বপ্নের নিবিড় চুম্বন-জ্যোছনা আজ এই মুহূর্ত্তে যেন ম্লান হোয়ে গেল ওর অধরের পথ পাশে অদূরবর্ত্তী পথিকাদের মতো।

অন্ধকার জড়ানো সন্ধ্যার বিবর্ণ লগ্নে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো মিলি। দূরের পাতলা অবগুণ্ঠনের ভেতরে দৃষ্টি মেলে দিলো একবার। কিন্তু অরুণের এতোটুকু আভাও দেখতে পেলো না মিলি। ফিরে এলো মোটরে। মীনার অহমিকার কাছে আজ নিষ্প্রভ হোয়েছে অরুণাভর উদাসীনতার অভিনয়। কিন্তু তবুও মনে মনে একবার উচ্চারণ কোরলো মিলি—জিনিয়স।

বাড়ীতে ফিরে এসে দেখলো মিলি, তার একটু আগেই ফিরে এসেছে অরুণ। তার বাবার সামনে দেখাচ্ছে তাকে একটা সর্বহারার মতোই উদ্‌ভ্রান্ত।

"তোমার কি হোয়েছে বল তো অরুণ? সব সময়ে মুখ ভার কোরে থাকো। মিলি বলছিল হয় তো কোনো অসুখ-টসুখ......। না, না, না, একটু সাবধান হও অরুণ! তোমার ভবিষ্যৎ তো আর সাধারণ ঘরের ছেলের মতো তমসাচ্ছন্ন নয়। তোমার কিসের এই দুঃখ? বলো, আমি আমার শেষ সম্বল দিয়ে তাকে ব্যর্থ কোরে দোবো......।" বলতে বলতে রায় বাহাদুর উঠে গিয়ে কয়েক পা আবার ঘুরে এলেন—

"সেদিন থেকে আমার থিসিস লেখা বন্ধ হোয়ে গেল অরুণ—যেদিন তোমার দেখলাম সজলাকাশের মতো থমথমে মুখ। মিলিকে কতো জিজ্ঞাসা কোরলাম তোমার কথা—কিন্তু সে-ও দেখি মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় তোমারই মতো। বেশ একটু ভয় হোলো মনে। ভেবেছিলাম তোমাদের ভেতরে কোনো মনোমালিন্যের ঝড় উঠেছে দু'জনকে আড়াল কোরে। কিন্তু মিলি সেটা স্বীকার কোরলো না। বোললো—তোমার এমন স্নেহাস্পদের মনে দুঃখ দিতে পারি আমি—সে কথা তুমি কেমন কোরে ভাবতে পারলে বাবা? সত্যি বলো তো অরুণ—মিলির কোনো রকম ঔদ্ধত্য তুমি লক্ষ্য কোরেছো কি না?"

"আপনি মিছিমিছি ওকে গঞ্জনা দিচ্ছেন। আপনার মেয়ে কোনো দিনও আমাকে অপমান করেনি।"

লজ্জায় মাটীর সঙ্গে যেন মিশে গেল অরুণাভ। এতো অকৃপণ অনুরাগের বোঝা তার মাথায় চাপিয়েও আবার তিনি কোমল মিনতিতে উদ্বেল হোয়ে উঠেছেন। ইচ্ছে হোচ্ছিল রায় বাহাদুরের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে মুক্ত কোরে দেয় ওর রহস্যের বন্যা। অন্ততঃ মিলিকে একবার হাত ধোরে কাছে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করে, আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো মিলি। তোমার নারীত্বকে বিদ্রূপ কোরেছি আমি।

"একটা কথা বাবা—" এই প্রথম মুখ খুললো মিলি—"আজকে তুমি আর ওকে দিয়ে একটুও লেখাতে পারবে না। অন্ততঃ একটা দিনের জন্য ওকে আজ বিশ্রাম দিয়ো। তার বদলে আমি না হয় লিখে দিচ্ছি।"

এক মুহূর্ত্তে অরুণাভর মুখটা ছাইএর মতো সাদা হোয়ে গেল। এতো দূর মহত্ত্বে মিলির পরিচয়? তার উপেক্ষাকে এমন কোরে সে ম্লান কোরে দিলো রায় বাহাদুরেরই সামনে! অরুণাভ খুঁজে পেলো না কী কোরে সে তার সবটুকু কৃতজ্ঞতা জানাবে মিলিকে। অথচ মিলি আর একটা কথাও না বলে চলে গেল ভেতরে। যেন অরুণাভর সমস্ত আলোড়ন এক মুহূর্ত্তে মিথ্যে হোয়ে গেল ওর চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে। ইচ্ছে হোচ্ছিল, চীৎকার কোরে সে ডাকে একবার মিলিকে। অন্ততঃ একবার ছুটে গিয়ে দু'হাত ধোরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে তাকে। বলে—তোমার এ অভিনব অবহেলায় আমার ঋণ বাড়িয়ো না মিলি! আমার কৃতজ্ঞতাটুকু গ্রহণ কোরে আমাকে তুমি মুক্তি দাও।

কিন্তু এ বিচিত্র দেহ-লীলার পরমায়ু সহসা এলো এক দিন ফুরিয়ে। মীনা গ্র্যাণ্ড সার্কাস চলে যাবে গোধূলিয়ার সবুজ ঘাসের মমতা ভেঙে। শেষ হোয়ে এসেছে ওর ক্ষণ-বিরতির অধিকার—আবার ওর যাযাবর মন তাই চঞ্চল হোয়ে উঠেছে। গোধূলিয়ার প্রতিটি তৃণ-লতার সাথে জড়িয়েছিল ওর স্মৃতির রক্ত-কণিকার স্বপ্ন—নয়া সড়কের প্রতিটি কাঁকরের রক্তরাগে যেন আঁকা ছিল ওর উচ্ছ্বাসের প্রেম-চুম্বন। আজ এলো ওর সেই প্রেমের মরণাহত লগ্ন—চলে যাবার ডাক এলো নোতুন পৃথিবীর। সমস্ত গোধূলিয়ার আকাশ-বাতাসে যেন হাহাকার কোরে উঠলো উৎসব-শেষের শীর্ণ দীপশিখার মতো এক সকরুণ মিনতি। সে মিনতি আয়ত সজল কনীনিকার মতো যেন এক গভীর মর্ম্মবেদনায় মৃত্যু-নীল। অরুণাভর কঠিন মৃত্তিকার উত্তাপে। সে ক্ষীণ আর্ত্তনাদের প্রতিধ্বনিটুকুও শুনতে পেলো না অরুণাভ। মিলি ফিরে এলো কল্পনার ডানা-ভাঙা পাখীর মতো।

তন্দ্রায় স্বপ্নে, নিরালায় কলরবে শুধু মীনার পীনোন্নত উত্তমাঙ্গ বার বার ভেসে উঠলো অরুণাভর নবানুভূতিতে। ঘুমের গোধূলিতে হেমন্তের কৃষ্ণচূড়ার মতো মীনা এলো রক্তিম অনুরাগে—স্তব্ধ মানস সরোবরে পড়লো তার চঞ্চল আলোছায়া। কলরবের সমুদ্র ভেঙে মীনা যেন দিলো দেখা মীনকুমারীর মতো উর্দ্ধাঙ্গের নিখুঁত লাবণ্যে।

মাটীর পৃথিবী থেকে সত্যিই যেন বিদায় নিলো অরুণাভ। দিলো না আর রায় বাহাদুরকে স্নেহের গভীর মর্য্যাদা—এতোটুকুও পেলো না মিলি তার অফুরন্ত দানের সামান্যতম বিনিময়। থিসিসের প্রবাহ হোলো রুদ্ধ। রায় বাহাদুরের স্নেহের ভিত্তিটাও আস্তে আস্তে যেন এক দিন নড়ে উঠলো। কিন্তু অরুণাভ তবুও উদাসীন—পাথরের মতোই যেন এক উদ্ধত অনুচ্ছ্বাসে নির্ব্বিকার।

এরই ভেতরে এক দিন দিব্যেন্দু এলো স্বপ্নের মতো। মিলি বসে ছিল স্তব্ধতার নিরাভরণে—নীলি যেন শুনছিল কোন্ সাগরপারের বিরহী পথিকের লঘু পদধ্বনি। তারই প্রতিধ্বনি এসে বাজলো এক দিন নীলির হৃদয়-সমুদ্রে। দুলে উঠলো তাই ওর এক দিন উর্ম্মিমুখর হৃদয়-পদ্ম।

"যাক্, রাজপুত্র তাহলে এতো দিন পরে এলেন। এদিকে রাজকন্যার চোখে এতোটুকু ঘুম নেই। প্রতি নিশ্বাসে যেন শুনতে পাচ্ছে কার চারু চরণের মঞ্জীর—রাজপুত্র কী তবে আসবে না? এমন সময়ে এলো সপ্ত রথে বৈজয়ন্তী উড়িয়ে সেই ঘুমের দেশের রাজকুমার। দূর থেকে দেখা গেল তার রথের চুড়ো। আলুলায়িত-কুন্তলা হোয়ে রাজকন্যে ছুটে গেল সেই প্রদোষের ছায়াতল-পথে"—হো হো কোরে মিলি হেসে উঠলো উপলমুখরা ঝর্ণার মতো।

"চমৎকার—ভয়ঙ্কর রকমের সুন্দর! আমার ভয় হোচ্ছে তুমি বোধ হয় সাহিত্যিক হোয়ে উঠবে। আজ-কাল কি লুকিয়ে লুকিয়ে রাত্রে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়ছো না কি? বাংলা দেশের নরম মাটীতে পা দিলে মিষ্টি কোরে কথা বলতে আমারও ইচ্ছে করে। কিন্তু হে অক্ষর-ললনা, তোমার কাব্যের ঝুলি এবার নোতুন কোরে বেঁধে নাও—ওদিকে যে সময় বয়ে গেল। অপর পক্ষ তো দ্বারে উপস্থিত—এবং রায় বাহাদুরের তো তাই-ই ইচ্ছে—" বলতে বলতে চলে গেল দিব্যেন্দু রায় বাহাদুরের কাছে। মিলি আস্তে আস্তে উঠে এলো নীলির কোলের কাছে। আয়ত দু'চোখে তার বাষ্পায়িত হোয়ে উঠেছে অশ্রু-মেঘ।

সন্ধ্যার সময়ে পুসপুসে চলে গেল দিব্যেন্দুরা। মিলি দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মতো একা। যতো দূর দৃষ্টি ছিল—নীলি বার বার কোরে ফিরে তাকাচ্ছিল মিলির দিকে। ধূলোর আড়ালে যখন ঢাকা পড়ে গেল ওদের পুসপুস মিলি ফিরে এলো ওর ঘরে। যে তমিস্রা পুঞ্জীভূত হোয়ে উঠেছে তার হৃদয়াকাশে—নীলির অন্তর্দ্ধানে তা যেন আরো কলঙ্কিত হোলো এই ক্ষণ-বিরহে—এই বিচ্ছেদের বিধুর গোধূলিতে!

ইন্দ্রধনুর আলোর মতো কার্নিভ্যাল ঝলমল কোরে উঠেছে। এসেছে লক্ষ উৎসাহী সেই মধুর মুহূর্ত্তে। ভাগ্যকে ফুটবলের মতো তারা দু'পায়ে পদাঘাত কোরবে। তার বিনিময়ে লুঠে নেবে দু'হাতে বন্দ মুদ্রা। জীবনের সুধা-পাত্র তারা নিঃশেষ কোরে দেবে কয়েকটা চুমুকের চুম্বক চুম্বনে।

অরুণাভও এসে দাঁড়ালো পসারীর মতো সেই রূপের হাটে। পা দু'টো তার কাঁপছে একটা বিবর্ণ কবুতরের মতো। কোনো রকমে নীল পর্দ্দাটা সরিয়ে ভেতরে যেমন ঢুকতে গেল—এক মুহূর্ত্তে অমনি মনে হোলো অরুণাভর সে যেন নিশ্চিহ্ন হোয়ে মুছে গেছে পাথরের পৃথিবী থেকে। এসেছে স্বর্গ-সভার অভিনব পরিবেশে।

নক্ষত্রখচিত ওড়না গায়ে যে বসে রয়েছে তিলোত্তমা বিভাবরীর মতো আকাশকে দীপান্বিত কোরে—সে মীনা। সুদূর যাভা প্রদেশের শ্যামাঙ্গী গৌরিকা। সিল্কের সালোয়ারে ঢাকা সে বামোরু অধমাঙ্গ—নীবিবন্ধে প্রাচীন রাজপুত্রের মতো উত্তরীয়ের পীত অনুরাগ। সূক্ষ্মতম মসলিনের অবগুণ্ঠনে বক্ষের যুগল স্বর্গ তার চির-বিদ্রোহী। যেন এক জোড়া দুরন্ত স্থলপদ্ম সবুজ পত্রের বন্ধনমুক্ত হবার জন্য আযৌবন বাসনায় উৎসুক। রুদ্রাক্ষের মালার প্রান্তরেখা এসে মিশেছে কটিদেশের উত্তপ্ত এলাকায়। তার ভেতরে তন্বঙ্গী মীনার মুখটা যেন দুর্নিরীক্ষ্য সুর-সভার নৃত্য-বিবশা ঠিক মেনকার মতো।

ভুলে গেল অরুণাভ পীতাম্বর মিত্তিরের পৃথিবীর ডাক, ভুলে গেল মিলির সেই বেদনা-বিধুর কোমল চাহনি—আবেগের খর স্রোতে ভেসে চললো মীনার রূপ-স্ফুরিত মায়া-ঘাটে। কামনার তরঙ্গ ঠেলে তরী ছুটলো দিগন্তে। রোমাঞ্চিত স্পর্শের নেশায় যেন অরুণাভ ঠিক কূল-হারা একটা কামনার বলাকা।

একে একে নিবে গেল এক একটা বাতি। আশ্চর্য্য! অরুণাভ তবুও নিবলো না। ও বসে রইলো মন্ত্রমুগ্ধের মতো। অথচ মীনার স্মৃতির সামনে ও কিছুতেই মেলতে পাচ্ছিলো না ওর দৃষ্টি-পাখা।

"বাবুজি, আপনি গেলেন না! সবাই তো চলে গেল। এখন তো আর খেলা হবে না, আবার কালকে নোতুন কোরে শুরু হবে—" ধবধবে দাঁতের জ্যোছনাকে বিদীর্ণ কোরে ছুটে এলো কয়েক টুকরো কথার মুক্তো। অথচ অরুণাভ একটুও ভেবে পেলো না কী বলবে মীনাকে! বসে রইলো তাই স্তম্ভিতের মতো।

উঠে দাঁড়ালো মীনা। আয়নাটার সামনে এসে উড়নীটা বুকের ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো আল্‌নার গায়ে। জ্যাকেটের বোতামগুলো খুলতে খুলতে এগিয়ে এলো অরুণাভর কাছে।

"আরে যাইয়ে না, ম্যয় তো এবি ড্রেস বদলাউঙ্গী। কেয়া—শুনতা নেই?"

বলতে বলতে বলী দ্বীপের পাহাড়ী নৃত্যের একটা সুর মীনার কণ্ঠে সহসা উদ্বেল হোয়ে উঠলো। তারই ছন্দে মীনা হেলে-দুলে আবার চলে এলো আল্‌নাটার কাছে। জ্যাকেটটা কাঁধ থেকে নামিয়ে ধীরে-সুস্থে গায়ের সঙ্গে জড়ালো একটা ইয়েলোয়িস নাইট গাউন। সালোয়ারটা খুলে পরলো একটা সিল্কের পাতলা বর্ম্মী লুঙ্গী পুরুষদের মতো। গাউনের ফিতেটা বাঁধতে বাঁধতে আবার এগিয়ে এলো অরুণাভর কাছে। তার পর পরিষ্কার বাংলায় হেসে উঠলো—

"এখনো বসে রয়েছেন আপনি? তবে আসুন—খেলি-ই এক হাত।" তাড়াতাড়ি বসে পড়লো মীনা অরুণাভর সামনের রিভলভিং চেয়ারটায় এবং চীৎকার কোরে কাকে যেন সম্বোধন করলো—"আরে এ রমজান—একঠো নয়া মেহমানকা বাস্তে অউর এক গ্লাশ সোডাভি ভেজ দে না।"

হোলো খেলা সুরু আবার নোতুন করে। অথচ ভাঙা হাটে বসে এতোটুকুও যেন অনুজ্জ্বল হোলো না মীনা। ও যেন সত্যিই এক অদ্ভুত লাস্যময়ী ইন্দ্রজালিকা—জয়-গৌরবে যার সমস্ত মুখটা দুরন্ত কুমুদিনীর মতো চঞ্চল। অনভিজ্ঞ অরুণাভ এক মুহূর্ত্তে কালো হোয়ে গেল পরাজয়ের কলঙ্কে। মীনার মুখের দিকে স্পষ্ট কোরে আর যেন তাকাতে পারছে না অরুণ। আস্তে আস্তে তাই উঠে এলো দরজার সামনে সর্বহারার মত।

"কী রকম হেরে গেলেন তো বাবুজি! বার্মার অত বড় জুয়াড়ী চিম্বরমত্ত পারেনি আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে—আর আপনি তো বাঙ্গালী। আচ্ছা—নমস্তে—" মুখের উপর দরজাটা বন্ধ কোরে দিলো মীনা। হাত-ঘড়িটার'দিকে তাকিয়ে মনে হোলো অরুণাভর এখনো হয়তো রায় বাহাদুর তারই আশায় পথ চেয়ে বসে আছেন। এক মুহূর্ত আর সেখানে দাঁড়ালো না। লম্বা লম্বা পা ফেলে কলাপসিবল গেটের দিকে এগিয়ে এলো।

কিন্তু আজকের রাত্রিটা যেন অরুণাভর কাছে অফুরন্ত ব্যঞ্জনায় ভরা। মীনার ভেতরে সে দেখতে পেয়েছে বেদুইন রক্তের তাতানো কণিকার উচ্ছ্বাস। সে রক্ত মিলির দেহের মতো ঠাণ্ডা হিম-প্রবাহে স্নিগ্ধ নয় এক বিন্দু। মীনার ভেতরে উর্বশীর চঞ্চলতা যেন আবেগ-উচ্ছলা, আর মিলির দেহ-মদিরা যেন বাসি আঙুরের মতো বিস্বাদে অনুভূতিহীন। মীনা যদি হয় বিদ্যুতের অভিশপ্ত কুসুম—মিলি তবে মৃত্তিকার নীল অপরাজিতা। মরু-দুহিতা বলে মীনা যদি রঙীন হোয়ে ওঠে মনে মনে, মিলি হবে তবে দূর বনানীর শান্ত আকাশ-শ্রী।

পরের দিন বিকেলে রায় বাহাদুর আবার এসে দেখলেন অরুণাভ নিরুদ্দেশ। তার এতো দিনের স্বপ্নমঞ্জরী আজ বুঝি ঝরে গেল

এই সুন্দর গোধূলি লগ্নে! অথচ সেই ঝরানো মুকুলের এতোটুকু রহস্য অনাবৃত হোলো না তার কাছে। আজ বার্দ্ধক্যের শেষ প্রান্তে এসে পীতাম্বর মিত্তির দেখলেন—সব কিছু যেন ভুল হোয়ে গেল আজকে। অরুণাভকে মনের মতো কোরে গড়ে তার হাতে বেঁধে দেবেন মিলির আঁচলের একটা সোনালী প্রান্ত। চোখের সামনে যুগল প্রজাপতির মতো ফুর-ফুর কোরে উড়ে উড়ে বেড়াবে মিলি আর অরুণ। আকাশের বিপুল অরণ্যে ওরা মেলে দেবে তাদের মন-বলাকার পাখা—আর রায় বাহাদুর মনে মনে ফিরে যাবেন ত্রিশ বছরের সেই হারানো পৃথিবীর সবুজ মাটিতে। কিন্তু আজকে সে বাসনার মুকুল ভরা-চাঁদিনীর চামেলীর মতো ঝরে গেল অরুণোদয়ের মৃত্যুর সাথে সাথে। শুধু পড়ে রইল তার বেলাশেষের শেষ পাপড়ির সৌরভ।

কিন্তু মিলির চোখে এক দিন ধরা পড়ে গেল অরুণাভর এই অভিনব প্রেমাভিসার। 'খ্যাস্' গাড়ীটাকে নয়া সড়কের লাল ধূলোর ওপর দাঁড় করিয়ে মিলি মখমলের মতো সবুজ ঘাসের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে ওর শিথিল দেহ-বল্লরী—আর ঠিক এমন সময়ে সে দিনের সার্কাসের সেই বন-কপোতীর কণ্ঠ-তরঙ্গ দূরের আবছা অন্ধকার থেকে ভেসে এলো ওর কানে। স্পষ্ট শুনতে পেলো মিলি, মীনা বলছে অরুণাভকে—

"তোমার পৌরুষ বিদ্রোহ করে না? একটা পথের ফুলের পিছনে এমন কোরে কেন বার বার ছুটে ছুটে আসছো? আজকে আমাকে দেখবে তোমাদের নয়া সড়কের পাশে একটা ছোট্ট তাঁবুর ভেতরে—কিন্তু কাল দেখবে ভেসে গেছি সে···ই কোন্ অজানা সমুদ্রের ইসারায়। আমরা যাযাবর হাঁসের দল, উড়ে উড়ে চলি—পথে তো থেমে থাকতে পারি না।"

"আমাকে তোমার দলে নিয়ে নাও। আমি বাজাবো ক্লারিয়োনেট তোমার নৃত্য-লীলার তালে তালে। সকলে জানবে ইউনিভারসিটির সেরা ছাত্র অরুণাভ বোস মীনা গ্র্যাণ্ড সার্কাসের বিখ্যাত ক্লারিয়োনেটিষ্ট!" বলতে বলতে অরুণাভ একটা হাত চেপে ধরলো মীনার।

"ছাড়ো, ছাড়ো,—নসীবের খেলায় যে আমার কাছে হেরে যায় তেমন নওজোয়ানের সঙ্গে মীনা সাবিয়ার দোস্তি করে না। আর তুমি হোতে চাও আমার মাশুক! ছোঃ। সরো, সরো, আমার মোহব্বতের বেইজ্জত কোরো না।"

"তোমার কার্ণিভ্যালে এতো টাকা ধূলোর মত কোরে ছড়িয়ে দিলাম মীনা—আর তুমি একটা সামান্য অনুরোধ আমার শুনবে না?"

"ব্যস্ ব্যস্। বলেইছি তো আমার মোহব্বত পাবার মতো অতো লিয়াকৎ তোমার নেই। হ্যাঃ, সার্কাসে যে ছেলেটা হোরাইজণ্টল বারের খেলা দেখায়—দেখেছ তাকে? পারবে তার মতো অমন শক্ত হোতে? কিন্তু পাঞ্জায় সে একবারো আমাকে হারাতে পারেনি।"

এক-একটা কোরে তাঁবু গোধূলিয়ার মাঠের দীনতাকে ব্যর্থ কোরে অন্তর্হিত হোলো অগোচরে। বিরাট ট্রাক বোঝাই কোরে সব কিছু চলে গেল ষ্টেশন-রোড ধোরে নয়া সড়কের বুকের ওপর দিয়ে। রুক্ষ মৃত্তিকায় অভিশপ্তের মতো অর্দ্ধোলঙ্গ কালো কালো ছেলের দল দেখতে লাগলো সে মৃত্যু-তীর্থ যাত্রা। এক দিন এনেছিল যে মধু-তিথি গোধূলিয়ার সমস্ত আকাশের রেখায় রেখায়—সেই মধু-রাত্রির স্বপ্ন ভেঙে যেন আজ প্রভাত এলো—পড়ে রইল সর্বহারার মতো প্রান্তরের শ্যামল ভাষা, মীনা গ্র্যাণ্ড সার্কাস একবারো ফিরে তাকালো না পিছনে। সেদিনকার মতো আজও সন্ধ্যা এলো মায়ার সহস্র আবরণ পরে—কিন্তু কেন যেন সে সন্ধ্যা আর মুখরিত হোয়ে উঠলো না। অভিশপ্ত ললনার মতো সে যেন সহসা বন্ধ্যা হোয়ে গেল এক নিমেষে। শুধু সবুজ মাঠে কয়েক ফোঁটা শিশিরের কণা টলমল কোরে উঠলো পদ্মপাতার ওপর চঞ্চল জলবিন্দুর মতো।

জানলা দিয়ে এ দৃশ্য দেখছিল অরুণাভ। আর ওর মনে হোচ্ছিল—কী বিচিত্র অনুভূতির ঐশ্বর্য্যে ওকে ঋণী কোরে গেল মীনা। একটুও হারায়নি অরুণাভ—এক বিন্দুও ক্ষতি হয়নি যেন ওর। তপতী মরু-কুমারী বলা হোলে মীনার পরিচয়ের সবটুকু রহস্য অনবগুণ্ঠিত করা যাবে না। ও শুধু ছলনায় অনাবৃত পথ-ললনা নয়—ও জীবনের প্রথম বসন্তের রক্তিম কিশলয়। তার সুপ্ত পৌরুষ-সিংহকে জাগিয়ে যে মেয়ে ছুটে গেল অধরার মতো অপরিচিত দিগন্ত-রেখায়, সে মেয়ে মরীচিকা হোলেও কখনো হোয়েছে মরূদ্যানের নীল কুসুমিকা। অরুণাভর নিঃসঙ্গ আকাশে মীনা যেন তাই প্রথম প্রেমের চঞ্চল শুকতারা। আর মিলি তার মধ্য-নিশীথের শুভ্র মেঘের আড়ালে যেন এক সলজ্জ ভীরু জ্যোছনা। এক জন আকর্ষণ করে দেহ-শিখার বিচিত্র রঙের ফুলঝুরিতে—আর এক জন আমন্ত্রণ জানায় সুদূর বনশ্রীর নিবিড় সংযত মায়ায়। মীনা যৌবনের উত্তাপে দুরন্ত প্রমদা—মিলি গভীর প্রতিভাসনে বিলোল-মূর্দ্ধজা।

টেবিলটার ওপর মাথা রাখতে কখন একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল অরুণাভর—আর এমনি সময়ে জ্যোতির্ম্ময় অরুণিমার মতো তার তমসার আকাশে এসে দাঁড়ালো মীনা। হলুদ উত্তরীয় তার লুটিয়ে পড়ছে মেঝেতে—পায়ে উঠেছে তুলোট চামড়ার এক জোড়া লাল নাগরাই।

"তোমার কাছে বিদায় নিতে এলাম বাবুজি! আমাদের তোমরা বেইমান বলে দূরে সরিয়ে রাখো। কিন্তু এক দিন তুমি আমার জন্যে গরীব হোতে চেয়েছিলে সে কথা যে আজকেও ভুলতে পাচ্ছি না মেহেরবান। চলে যাচ্ছি কুর্দ্দিস্থানের শক্ত-মাটীতে কিন্তু তোমাদের গোধূলিয়ার তসবীর একটুও ম্লান হবে না। আচ্ছা এই নাও—" বলতে বলতে জ্যাকেটের ভেতর থেকে মীনা তুলে আনলো এক-মুঠো নোট।

"আর যাই হোক, তোমার টাকা তো নিতে পারি না। ওতে আমার মতো জেনানারও বেইজ্জত হবে। কার্ণিভ্যালের সব টাকা এতে রয়েছে—গুণে নাও। আচ্ছা, চলি নওজোয়ান—সেলাম।"

কুর্ণিশ কোরে পথে নেমে গেল মীনা। অস্পষ্ট জ্যোছনার ভেতরে স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল অরুণাভ। মনে হোলো—কেন যেন এক লুকোনো হৃদয়াবেগে মীনার চোখ দু'টো ছল-ছল কোরে উঠেছিল রুদ্ধ রোদন-ভরা সজল বসন্তের মতো। আর সেই অশ্রু-রেখায় যেন প্লাবিত হোয়ে উঠেছে মীনার গোধূলিয়ার বেদনার্দ্র ছোট ইতিহাস।

ইতিমধ্যে তার একটা হাত কখন যে টেনে নিয়েছে মিলি তার উত্তপ্ত আঙুলের ভেতরে—একটুও তা অনুভব কোরতে পারেনি অরুণ।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

রবীন চৌধুরী

১

যে আকাশ জুড়ে অকস্মাৎ ধূমকেতু উঠে পবন-নন্দনের মত স্বর্ণ-লঙ্কা দেশটা লেজের আগুনে দগ্ধ করে দিয়ে যায়, দশের সুকৃতিতে সেই আকাশেই আবার এক দিন উদয় হয় শুভ-গ্রহের : যার প্রতাপে ইন্দ্র বর্ষণ করে, পাহাড়ের গা ধুয়ে নদী পলি বয়ে আনে, দেশের মাঠে ফসল জন্মায়, পাখীর রাজ্যে নবান্নের ধুম পড়ে, গাছে-ঢাকা গাঁয়ের ঠোঁটে পৃথিবীর মুখে পূর্ণিমার মত হাসি ফুটে ওঠে।

স্বভাব-নীল বাংলার আকাশেও এমনি এক দিন দেখা দিল মেঘ আর তারা, ধূমকেতুর পুচ্ছ আর দেবতার আশীর্ব্বাণী। বার-তের শতকের সন্ধিক্ষণে বখ্‌তিয়ার খিলজির সৈনাপত্যে, অকস্মাৎ মগধ-বিজয়ী তুর্কী-সৈন্য বাংলার সমতলে নামলো পাহাড়ে নদীর প্রবল জলোচ্ছ্বাস নিয়ে। সে দুর্ব্বার স্রোত গঙ্গার তরঙ্গের মুখে ঐরাবতের মত ভাসিয়ে নিয়ে গেল সেন-সিংহাসন। অগ্নিকোণ হতে অগ্নিগর্ভ মেঘে উঠলো যে ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুৎ, রাজপ্রাসাদ নিয়ে হানাহানি, রাজদণ্ড নিয়ে রক্তপাত, দেশজোড়া রাষ্ট্রবিপ্লব : তারই ফলে শালবনে কাল বোশেখীর তাণ্ডবে ডানা-ভাঙা পাখীর মত সংস্কৃতি, সাহিত্য হল পঙ্গু, সাগর-কন্যা বঙ্গদেশ হাতীর শুঁড়ে বিপর্য্যস্ত পদ্ম-বন।

স্বর্গ হতে তার পর বর্ষণ হল অমৃতের। মৃতদেহে জাগল প্রাণ। চোদ্দ শতাব্দীর মাঝের দিক জগদ্ধাত্রীর মত হেসে উঠলো দেশ। শরতের প্রসন্নতা নিয়ে বাংলার আকাশ হল নির্ম্মল। দীর্ঘ দেড়শ' বছর পরে, রাজসিংহাসনে ইলিয়াস-সাহী বংশের আগমন ঘোষণা করল নকীব। দিল্লী-সম্রাটের বজ্রমুষ্টি হতে বাংলার স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনলেন যে বীর, চারণেরা সেই শামসুদ্দীনের গান গেয়ে ফিরল পথে-প্রান্তরে। রাজার জয়ধ্বনি করে আবার চলল কাব্য-রচনা। শান্ত হল সংক্ষুব্ধ দেশ। ধন্য হল দেশবাসী।

কিন্তু অভিশাপের মধ্যেও ক্বচিৎ নিহিত থাকে আশীর্ব্বচন। না-আর্য্য-অধ্যুষিত যে বঙ্গদেশে পদক্ষেপ করলে আর্য্যদের জাত যেত এক দিন, পঞ্চগব্যে শোধন করে সমাজ করত গ্রহণ, মৌর্য্য আমলেই সে বঙ্গদেশে সুরু হল আর্য্য-উপনিবেশ স্থাপন। কিন্তু পাল, সেন আমলেও, আভিজাত্য-গর্ব্বী এ সম্প্রদায় না-আর্য্য জনসাধারণের সঙ্গে রইলেন গঙ্গা-যমুনার মত পাশাপাশি। তার পর কৃষ্ণ মেঘের দুর্য্যোগ নিয়ে এল তুর্কী-অভিযান। প্রকৃতির পরিহাসে বৈরীত্ব বিস্মৃত হয়ে, একই খোড়ো-চাল আশ্রয় করে যেমন বন্যাভীত সাপ আর নেউল, এই মুসলমানী সংঘাতে দু'মুখী ধারার অন্তরে জাগল তেমনি একবেণী নদী হওয়ার প্রেরণা। অভিশাপ নিয়ে এল আশীর্ব্বাদ।

কৃত্তিবাসের পুণ্য আবির্ভাবের পূর্ব্বেই বাংলার দেহে জেগেছে এই প্রাণ-চাঞ্চল্য। দুর্য্যোগ হতে দেশকে বাঁচাতে সুরু হয়ে গেছে মিলনের সঙ্গীত। আর্য্য-পরিচ্ছদে প্রাকৃত-দেবতারা দেবায়তনে স্থান লাভ করছে, আর্য্যেতর সাহিত্য গঙ্গাজল স্পর্শে হচ্ছে আর্য্য-গ্রন্থাগার জাত, সাধারণের সংস্কৃতি পট্টবস্ত্র পরিধান করে গ্রহণ করছে ব্রাহ্মণ-অন্তঃপুরের প্রবেশ-পত্র। আর্য্য-আর্য্যেতর উপাদান মিলিয়ে অভিনব মহাজাতি গঠনের আন্তর-প্রেরণের সমগ্র দেশের দেহে জেগেছে বসন্তের বনশ্রী।

সেই মাহেন্দ্রক্ষণে জন্ম কৃত্তিবাসের। পূর্ব্ব হতে পশ্চিমে, উত্তর হতে দক্ষিণে মিলিত বঙ্গসমাজ সেদিন চাইছে আদর্শ—দেবদারুর মত মাথা তুলবার এক বিরাট নীলাকাশ। আর এ আদর্শের স্বর্গ-গঙ্গাকে ভগীরথের মত পৃথিবীতে আনলেন কৃত্তিবাস ভারতীয় সাহিত্যের সে অধ্যায় হতে, রাজা যেখানে রামচন্দ্রের মত, সীতার মত সাধ্বী, ভরতের মত ভ্রাতা, লক্ষ্মণের মত সুহৃৎ।

বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতিত্ব সঙ্ঘ-জীবনের পর মায়াবাদী-দর্শনের প্রকাশ্য অবজ্ঞা সাংসারিক বন্ধনের প্রতি। কিন্তু যে মহাকবি বাল্মীকি চব্বিশ সহস্র শ্লোকে রচনা করলেন রামচরিত, জাহ্নবীর মত তা যে ধূর্জ্জটির জটা হতে নেমেছে ভূতলের গার্হস্থ্য আশ্রমকে স্তন্যরসে পরিপুষ্ট করতে। দেশ-গরুড়ের অতিকায় ক্ষুধা তাই শমিত হল না কালিদাসে, ভবভূতি-ভারবি-শ্রীহর্ষে। পুণ্যশ্লোক কৃত্তিবাসকে শরণ নিতে হল আদিকবির পুণ্যশ্লোক রামায়ণের।

বিদগ্ধেরা বলেন, রাজাদেশে কৃত্তিবাস অনুবাদ করেছেন বাল্মীকির। কিন্তু সেটা ত বাহ্য। নবজাত যে বিহঙ্গ সূর্য্য-সন্দর্শনে যাত্রা করে, তার পক্ষপুটে কি আগেই আসে না এ আহ্বান? সপ্তকাণ্ড-অনূদিত রামায়ণও যে যুগ-প্রয়োজনের প্রত্যুত্তর। দক্ষিণ-সমুদ্রে অতি নিভৃতে দ্বীপ ওঠার মত, হয়ত সকলের অলক্ষ্যে এসেছিল এ আবেদন। হয়ত কবির 'মানব-সত্তায়' তার স্পন্দন জাগেনি, কিন্তু তাঁর 'প্রতিভা-পুরুষ' যে জোয়ারের চঞ্চলা নদীর মত হয়ে উঠেছিল স্ফীত-বক্ষ। যে বটবৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় পাঁচশ' বছর বাস করছি প্রশান্তিতে, পরিতৃপ্তিতে, এই ত তার যথার্থ জন্মকথা।

২

'জীবন-স্মৃতি' লিখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কবি-পুরুষে'র জীবনী লিখে গেছেন। 'ছিন্ন পত্রে' কবি রবীন্দ্রনাথের কত বিক্ষিপ্ত কাহিনীই রয়েছে। কিন্তু মানুষ-কৃত্তিবাসেরই ক'টা বৃত্তান্ত আমরা পেয়েছি যে কবি-কৃত্তিবাসের ইতিবৃত্ত আশা করব? রামায়ণ কাব্যে আছে তার ভনিতার প্রভিতার পরিচয়, কিন্তু কবির যে 'জীবন-স্মৃতি' নেই, তাই ত আজ কবি-কাহিনী পাবারও উপায় নেই। প্রচলিত রামায়ণের যে পরিচ্ছেদে আছে তাঁর বংশ-পরিচয়, বিদ্যা-লাভের কথা, রাজদর্শনের চিত্র, তাতে ত কবি নেই। 'কবিরে খুঁজিয়া পাবে না জীবন-চরিতে'।

তবু, যাঁকে আমরা ভালবাসি, তাঁর দৈনন্দিনের অতি তুচ্ছ কথাও যে আমাদের ভাল লাগে। এ কারণেই শিষ্য লিখেছে গুরুর, পুত্র লিখেছে পিতার, ভক্ত লিখেছে তার প্রিয় কবির কাহিনী। শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় যে স্মৃতি-স্তম্ভ আমরা তুলেছি ফুলিয়াতে, সেই সশ্রদ্ধ ভালবাসাই ত চাইছে তাঁর বিবরণ।

অন্ধকারে ক্ষীণ দীপ-শিখার মত যে আত্মপরিচয় কবি দিয়ে গেছেন, তা থেকে জানতে পারি, দনুজ মহারাজের সময়ে ১২৮০'র আকাশ কালো করে, পঙ্গপালের মত এসেছিল এক দিন অসংখ্য মুসলমান সৈন্য সোনারগাঁয়ে হিন্দু-রাজত্বের অবসান ঘটাতে। প্রমাদের দেশ ছাড়তে হয়েছিল রাজপাত্র নরসিংহ ওঝাকে। ভাগীরথী-তীরে ছায়াচ্ছন্ন ফুলিয়ায় বৃদ্ধি পেয়েছিল আর এক ঘর ব্রাহ্মণ। সেখানে সেই শান্ত গ্রামের আলপনা-আঁকা অঙ্গনে কেটেছিল তাঁর জীবন : তাঁর পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রদের কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য। তার পর জন্ম হয়েছিল মহাকবির, কেন্দুবিল্বের মত ফুলিয়াকে তীর্থক্ষেত্র করতে।

এ কৃত্তিবাস কিশোর নিমাইয়ের মত দুর্দ্দান্ত ছিলেন কি না জানি না। ফুলিয়ার ঘাটে গঙ্গাস্নানার্থীদের বিব্রত করতেন কি না, কোন

বৃন্দাবন দাস তা লেখেননি ; কিন্তু সত্যকামের মতই জ্ঞান-পিপাসা নিয়ে তিনি এসেছিলেন পৃথিবীতে। দ্বাদশ বর্ষেই তাই ত তাঁকে পদার্পণ করতে হোল পদ্মাপারের 'গৌতম ঋষি'র সন্ধানে।

তার পর গুরু-দক্ষিণা দিয়ে এক দিন রাজোদ্যানে এসে দাঁড়ালেন এই যুবক। ললাটে তাঁর প্রতিভার সূর্য্য, রসনায় সরস্বতীর বসতি। সপ্ত শ্লোকে তিনি করলেন গৌড়াধিপের জয়োচ্চারণ। বিস্মিত হিন্দু নৃপতির কণ্ঠে ধ্বনিত হল দেশমাতার কণ্ঠ: উচ্চারিত হল রামায়ণ রচনার আদেশ। সে আদেশ শিরোধার্য্য করলেন কবি। মাঘী-সূর্য্যের রশ্মি-স্নাত বিহঙ্গেরা বৃক্ষচূড়ে করে উঠল কলরব।

উত্তরকালে যে অজ্ঞাত কথক বন্দনা করেছেন কৃত্তিবাসের, সেই মুগ্ধ স্তোত্রে রয়েছে মহাকবির বংশ-লতা, পাণ্ডিত্যের পরিচয়, ভাষায় রামচরিত রচনার মহৎ উদ্দেশ্য।

"কির্ত্তিবাস পণ্ডিত বন্দো মুরারি ওঝার নাতি।
জার কণ্ঠে কেলি করেন দেবী সরস্বতী॥
মুখটি বংশে জন্ম ওঝার জগত বিদিত।
ফুলিয়া সমাজে কির্ত্তিবাস যে পণ্ডিত॥
পিতা বনমালি মাতা মাণিকি উদরে।
জনম লভিলা ওঝা ছয় সহোদরে॥
ছোট গঙ্গা বড় গঙ্গা বড় বলিঙ্গা পার।
জথা তথা কর্য্যা বেড়ায় বিদ্যার উদ্ধার॥
বাল্মীকি হৈতে হৈল রামায়ণ প্রকাশ।
লোক বুঝাইত করিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥"

যে সৃষ্টিছাড়া গ্রহটার এক মুখ চিরকাল সূর্য্যকে পশ্চাৎ করে আছে, সূর্য্য-বিমুখ তার পশ্চিম গোলার্দ্ধের মত, কবি-জীবনীর অবশিষ্ট অংশটা চির অন্ধকারে। সে দেশে জ্যোৎস্নায় হিমাদ্রির মাথায় হিমানীর স্তূপ জমে কি না, মধ্যাহ্নের খর তাপে সে গলিত নীহার জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে লোকালয়ে নদী হয়ে নামে কি না, এ সব আমাদের অজ্ঞাত। ভারতবর্ষ কীর্ত্তিকে মেনেছে, কর্ত্তাকে বিস্মৃত হয়েছে। তাই রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা আমরা পেয়েছি, পাইনি ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাসের জীবন-চরিত।

৩

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা নিয়ে অতীত, বর্ত্তমানের দেশী-বিলাতি রচনায়, দীর্ঘ প্রবন্ধে, সংবাদপত্রে কটাক্ষপাত চলেছে। মানি যে ও প্রদেশে 'অন্ধের হস্তীদর্শন' ব্যাপারটি সুদুর্লভ নয়, কিন্তু সে কি সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়—দিনের সব সময়ে? কোন এক মুহূর্ত্তেও জ্ঞানের বৈদ্যুতিক বাতিতে প্রত্নতাত্ত্বিক অতীতের অন্ধকারকে দূর করতে পারেননি? স্ফটিক স্তম্ভের মত সে কি শুধু দুর্য্যোধনের চক্ষে চির-বিভ্রম সৃষ্টিরই জন্য? আমরা জানি, ও জগতে সে মরুভূমির মত, যাতে মরীচিকাও আছে, স্বাদু জলের হ্রদেরও অভাব নেই।

তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণের রচনা-কাল মেরু দেশের মত আজও অন্ধকারে আছে বলে মনে হয় না। যে তথ্য আর প্রমাণ আমরা পেয়েছি, তাতে প্রত্নতাত্ত্বিকের ওপর আমাদের শ্রদ্ধাই জেগেছে। মহাকবির জন্ম-তিথিটা নিরূপণ করে তাঁরা বঙ্গবাসীর ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুন্ন মাঘ মাস। তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥' এই পয়ারটি থেকে জ্যোতিষিক গণনায় ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ রবিবারের দিন পাওয়া গেছে। সম্মানীয় যোগেশ বাবুর এই তৃতীয় ও শেষ সিদ্ধান্তে প্রমাদ নেই। যে ধ্রুবানন্দ মিশ্র ১৪৮৫তে মহাবংশে লিপিবদ্ধ করেছেন, 'কৃত্তিবাসঃ কবির্ধীমান্', তাঁর পিতৃদেব আর সৌভাগ্যবান্ বনমালীর মধ্যে ছিল বয়সের সাদৃশ্য, বন্ধুত্বের বন্ধন। বিষ্ণু মিশ্রের অষ্টম সন্তান ধ্রুবানন্দের জন্মাব্দটা যদি ১৪২০ খৃষ্টাব্দ হয়, তবে পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র কৃত্তিবাসের জন্মক্ষণটা তের শতকের শেষেই কি সিদ্ধ হয় না? এ মতের পোষকতা করছে বাচস্পতি মিশ্রের কারিকা। সেখানে দেখি গৌড়-সম্রাটের কনক-মুকুট শ্রদ্ধায় অবনত হয়েছে দীন ব্রাহ্মণের পদতলে। কৃত্তিবাসের নবতম পূর্ব্ব-পুরুষ ধীমান্ উৎসাহ আশীর্ব্বাদ করছেন রাজচক্রবর্ত্তী বল্লাল সেনকে। বশিষ্ঠকে অর্ঘ্য দিচ্ছেন দ্বাদশের মধ্যাহ্নের শ্রীরামচন্দ্র।

আমাদের বক্তব্যটা যে নিছক কল্পনা নয়, বন্ধ্যা নারীর পুত্র অথবা গন্ধর্ব নগরীর মত সে যে নেহাৎ ফাঁকি নয়, তার আরও প্রমাণ আছে। দেবীবর ঘটক ১৪৮০তে যে মেলবন্ধন করেন, তাতে মহাকবির পৌত্র-পর্য্যায়ের প্রাপ্তবয়স্ক গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের ফুলিয়া মেলের প্রকৃতি, ভ্রাতুষ্পুত্র মালাধার খাঁর 'মালাধর খানী', মেলের প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। মহাকবি এ সময় জীবিত থাকলে, শাল, সহকারের কথা যখন রয়েছে, তখন সে বনস্পতিরও উল্লেখ থাকত।

প্রচলিত রামায়ণে পঞ্চ গৌড়েশ্বরের নাম-গোত্র পাই না, কিন্তু রাজসভার বিবরণ পাই।

'নয় দেউটি পার হৈয়া গেলাম দরবারে।
সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসন পরে॥
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্র মিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন॥
* * *
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস আদি ধর্ম্মাধিকারিণী॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর॥
রাজার সভাখান যেন দেব অবতার!
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার।'

এ বর্ণনায় একটিও মুসলমানী নাম নেই। এ কথা সত্য যে, মুসলমান রাজত্বে হিন্দু অমাত্যের অভাব ছিল না, কিন্তু সমগ্র অধ্যায়টি পাঠ করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে, রাজা হিন্দু, রাজসভা হিন্দুর। আর এ আমলে হিন্দু গৌড়েশ্বর একমাত্র গণেশ বা কংস, যাঁর সময়টা Stapleton স্থির করেছেন ১৪১৮র দিকে। সুতরাং সিদ্ধ যে উনবিংশ-বিংশ বর্ষের প্রতিভাদীপ্ত কৃত্তিবাস ১৪১৮র কাছাকাছি পেয়েছিলেন রাজাদেশ আর সপ্তকাণ্ড রামায়ণের যে সুর-নদী এনেছিলেন বঙ্গে, তা পঞ্চদশ শতাব্দীর হিমগিরি হতে ঝর্ণার মত অবতরণ করেছিল।

রাজনারায়ণ বসু রামায়ণ-কারের জন্ম-সময়টা নির্দ্দিষ্ট করেছেন ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে। তিনি যুক্তি দেননি, কিন্তু আজ যুক্তি দিয়ে অনেকেই

বোঝাতে চেয়েছেন, মহাকবি তাহিরপুরের কংসনারায়ণের সমসাময়িক। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের যে 'আদর্শ-পাঠ' প্রকাশিত করেছেন, তার ভূমিকা দিনের আলোর মত উদ্ভাসিত করেছে কংসনারায়ণের সময়টা। এই তাহিরপুর-বুকোদরের অভ্যুদয় চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে। সুতরাং রামায়ণ-রচকের জন্মদিনটা যদি সে যুগে নিয়ে যাই, তবে কি আমাদের সেই প্রতীচ্যবাসীদের মত হস্তি-মূর্খ বলা হবে না—গ্যালিলিওকে পীড়ন করে জগৎ সমক্ষে যারা অতিবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল?

তবু স্পষ্টকে স্পষ্টতর করতে হলে বিদ্বজ্জনেরা শরণ নিতে পারেন নলিনী বাবুর আদিকাণ্ডের ভূমিকার, দীনেশ বাবুর 'Bengali Ramayanas' গ্রন্থের। কিন্তু আমার মনে হয়, তা নিরর্থক। বাংলার যে পলি মাটিতে কৃত্তিবাস স্বর্ণবৃষ্টি করে গেছেন, পঞ্চদশের প্রভাতী আকাশ হতেই শ্রাবণ-ধারার মত তা ঝরেছে: দিন অন্তে রাত্রি আগমনের মত সন্দেহের কোন অবকাশই নেই তাতে।

৪

আঠার শতকের সীমান্তে এক মাহেন্দ্রক্ষণে, মুদ্রাযন্ত্রের জন্য বাংলা হরফের সৃষ্টি করলেন উইলকিনস্। বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে নামল আষাঢ়ের ধারাসার। এত দিন জীর্ণ পুথির পাঠক ছিল মুষ্টিমেয়, পাঁচালীর আসরে শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা ছিল স্বল্প, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র সাহিত্যিক ভোজে পরিবেশন করল যে পরমান্ন, তার আস্বাদ গ্রহণে সমুৎসুক অনাহূত, রবাহূত জনতা—বসন্তাগমনে পক্ষিজগতের মত—করে উঠল কোলাহল।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়ে কৃত্তিবাসী রামায়ণ এল বর্ষার নদের মত বঙ্গবাসীর কুটীর-প্রান্তে। কিন্তু স্বচ্ছতোয়া 'সরযূ' মত 'কাকচক্ষু' ছিল না এ জলস্রোত। আসাম হতে উড়িষ্যা, চট্টগ্রাম হতে রাজমহল—দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় অসংখ্য লেখনীর বারিবৃষ্টিতে তার বক্ষ হয়ে উঠেছিল আবিল! প্রচলিত রামায়ণের পুথির অরণ্যে পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারীরা। অগণ্য পুথি মিলিয়ে নীর হতে ক্ষীরটুকু উদ্ধার করে পথ পেতেও তাঁরা চাননি। ফলে যে কৃত্তিবাসী রামচরিত মুদ্রিত করে গেছেন তাঁরা, তা পবিত্র জাহ্নবী-বারি নয়—যমুনা, সরস্বতীর জলও তাতে রয়েছে।

মহাকবির নামাঙ্কিত আধুনিক যে রামায়ণ, তার সঙ্গে মিশনারী-প্রচারিত রামচরিতের পার্থক্য শুধু মলাটে। শ্বেত ও অশ্বেত জাতির মত অস্থি ও মজ্জায় তারা এক: ভিন্নতা শুধু গাত্রবর্ণে। সুতরাং কবি-প্রতিভার পরিমাপ করতে প্রয়োজন, যথার্থ কৃত্তিবাসী রামকথার। আর বহু পুথি মিলিয়েই সে আদর্শ-পাঠ গ্রন্থন সম্ভব।

এ তাগিদেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গঠন করেছিলেন 'কৃত্তিবাস রামায়ণ সমিতি'। এ মহৎ প্রেরণায় হীরেন বাবুর 'অযোধ্যাকাণ্ডের সম্পাদনা' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আদিকাণ্ড' মুদ্রণ। কিন্তু নলিনী বাবু যত দিন না এ পুণ্য ব্রত উদ্‌যাপন করছেন, যত দিন না তাঁর 'সপ্তকাণ্ড' সাধারণ্যে প্রকাশিত হচ্ছে, তত দিন মহাকবির সন্ধানে বটতলার শোভন সংস্করণেরই ত শরণার্থী হতে হবে।*

৫

বাংলা রামচরিত শুধু যে বিস্তৃত বিভাগ পরিভ্রমণ করেছে তা নয়, পাঁচশ' বছরের বিভিন্ন ঋতুচক্রে তাকে আবর্ত্তিতও হতে হয়েছে। আসরের মনস্তুষ্টি করতে পাঁচালী গায়কেরা অপরের স্বর্ণ দিয়ে তার কর্ণভূষণ রচনা করেছেন, সম্প্রদায়ের সম্মান বৃদ্ধি করতে ধর্ম্মগুরুরা সেই প্রাচীন বস্ত্রে স্ব স্ব বিশ্বাসের তালি দিয়েছেন। বহু দিনের বহু বিচিত্র বস্ত্র বহন করে গাধা-বোটের মত কৃত্তিবাসী রামায়ণ আজ আমাদের ঘাটে এসে লেগেছে।

সপ্তকাণ্ড সমাপ্ত না হতেই, চোখে পড়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মেঘস্পর্শী ধ্বজা। মনে হয়, লঙ্কাকাণ্ড বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারের platform—যুদ্ধটা mock-fight. 'তরণীর কাটা মুণ্ড করে রাম নাম।' তরণী সেন, বীরবাহু অতিকায়, এমনি কি রক্ষোকুলশ্রেষ্ঠ রাঘবারি পর্য্যন্ত বৈরী-ভাবের সাধক, দেহান্তে বৈকুণ্ঠলাভই তাঁদের উদ্দেশ্য। বাল্মীকি রামায়ণে রাম ও কৃষ্ণোপাসকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, কিন্তু এখানে 'যেই রাম সেই কৃষ্ণ'।

এ কথা সত্য যে, চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে বৈষ্ণবতার স্রোতটা গ্রীষ্মের নদীর মত নিতান্ত শুষ্ক ছিল না। থাকলে 'আরে রে বাহহি কাহ্ন নাব ছোটি ডগমগ কুগতি ন দেহি। তই ইথি নইহি সন্তার দেই জো চাহহি সো লেহি॥' কিংবা 'ছাড়ু ছাড়ু মই জাইবো গোবিন্দ সহ খেলন নারায়ণ জগৎকেরু গোসাঁই'—অপভ্রংশ ভাষার এই সব ছড়াগুলোর সৃষ্টি হোত না। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', মালাধরের 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' চতুর্ভুজের 'হরি-চরিত', যশোরাজের 'শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল': এ সবও পেতাম না। কিন্তু সে যুগের আকাশ-মণ্ডলে চৈতন্যচন্দ্রোদয় তখনও যে হয়নি, বৈষ্ণব-নদী জোয়ার-জলে জনতটের গ্রামপদপ্রান্তে আছাড় খেয়ে তখনও যে পড়েনি, সুতরাং প্রচলিত রামায়ণে এই 'অতি ভক্তিটা' কিসের লক্ষণ বলে ধরতে হবে?

ধর্ম্ম নিয়ে বঙ্গদেশে crusade হয়নি কোন কালে, তবুও প্রাচীন শশাঙ্ক সুপ্রাচীন বোধিদ্রুম ধ্বংস করেছিলেন এক দিন। মনসা দেবীকে হিন্দু-দেবায়তনে প্রতিষ্ঠিত হতে বহু খড়-কাঠই পোড়াতে হয়েছিল। চণ্ডীর সঙ্গে 'মেছুনী'র মত ঝগড়া করেই তিনি আসন পাননি, শৈব সমাজপতিদের সঙ্গে মীমাংসাও তাঁকে করতে হয়েছিল। মনে হয়, এই বহুমুখী ধারা হিন্দুধর্ম্মের সমুদ্রে হল অবসিত পঞ্চদশের পূর্ব্বেই। মহাজাতি গঠনের তাগিদে সব কলহের হল অবসান, বিরোধের মধ্যে জাগল ঐক্য। পৃথক্ পৃথক্ গ্রামে নির্দ্দিষ্ট হল তাদের বাসস্থান, কিন্তু পঞ্চ-গ্রামী ভোজে সকলেরই রইল পংক্তি-ভোজনের অধিকার।

কথাটা যে নিছক অনুমান নয়, তার প্রমাণ আছে কাশীরামের 'মহাভারতে', মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে'। সব দেবীরাই পূজো পেয়েছেন সেখানে, সব দেবতারই বন্দনা করেছেন কবিরা। Tolerationটা আমাদের দেশের অস্থি মজ্জায়, বৈষ্ণব-কবি জয়দেবও তাই স্থান দিয়েছেন বুদ্ধকে দশাবতারের মধ্যে। সুতরাং মহাকবি স্বয়ং শাক্ত না হলেও তাঁর কাব্যে চণ্ডী-মাহাত্ম্য থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু এইটাই বিস্ময়ের বিষয় যে, কবি যদি শাক্ত না হন, তবে বাল্মীকি-অনুসৃতি পরিত্যাগ করে, চণ্ডী-ঠাকুরাণীর প্রতি অকস্মাৎ ভক্তি-গদগদ হয়ে কতকগুলি 'গাল-গল্পের' সৃষ্টি করবেন কেন? 'মহীরাবণের চণ্ডীপূজা' প্রভৃতি মূল-বহির্ভূত পালাগুলির জনিতা কোন্ লেখনী, অত্যন্ত সতর্ক হয়ে আমাদের তা দেখতে হবে।

* এ প্রবন্ধ লেখার অল্প দিন পরেই নলিনী বাবুর মৃত্যু হয়েছে। এ গুরুভার বহনের ক্ষমতা ও প্রতিভা তাঁর ছিল, কিন্তু আজ আর তিনি পৃথিবীতে নেই। আমাদের দুর্ভাগ্য। লেখক)

ফকীরের ছিন্ন কাঁথার মত প্রচলিত রামায়ণে লাল, নীল—কত বর্ণের সীবন-কার্য্য চলেছে। বৌদ্ধ, শৈব, জৈন: কত ছাপই যে রয়েছে তাতে। গ্রন্থ হতে মনে হয়, কবির ধর্ম্মটা যেন দক্ষিণেশ্বরের ধর্ম্ম: ঈশা-মুশা নিয়ে যাতে গির্জ্জায় যাওয়া চলে, মসজিদে বসে পশ্চিম-মুখে নমাজ পড়াও চলে, আবার কোর্ত্তা-টুপি ছেড়ে রক্তচন্দন-চর্চ্চিত হয়ে কালীমন্দিরে পৌরোহিত্য করলেও কোন রঘুনন্দনের তাড়া খেতে হয় না যেখানে।

আদিকাণ্ডে কৌশল্যার হর-পার্ব্বতী পূজা, উত্তরকাণ্ডে শিবের গীত, এবং হরগৌরীর কোন্দল, দশগ্রীবের শিবভক্তি—সবই শৈব প্রভাব সূচিত করছে।

বাংলার মাটিতে জৈনধর্ম্ম আলগা ভাবে লেগেছিল। তবু রাঢ়-দেশীয়রা মহাবীরকে বিতাড়িত করলেও, তাঁর ধর্ম্মমতকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারেনি; পাল-রাজত্বের শেষ দিকটায় নিগ্রন্থরা অবধূত সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে হিন্দুধর্ম্মের বটবৃক্ষতলে আশ্রয় লাভ করল। প্রচলিত রামায়ণে তাই তাদের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু যে নিগ্রন্থ-রামায়ণকার ব্রহ্মচারী লক্ষ্মণকে বনমালার প্রেমমুগ্ধ হতে দেখেছেন, রাজান্তঃপুরে ষোল শত রাম-প্রিয়ার সন্ধান পেয়েছেন, সীতা কর্ত্তৃক রক্ষোরাজের পদাঙ্কনে রামচন্দ্রের jealousy বর্ণনা করেছেন—তাঁর পর্ব্বতপ্রমাণ বোকামি কি মহাকবির অনুকরণীয়? এই ছেলে-মানুষি প্রক্ষিপ্ত সন্দেহ নেই, পরবর্ত্তী যুগের কোন মহাপণ্ডিতের রচনা তাও খুব স্পষ্ট; কিন্তু কৃত্তিবাসী রামচরিত হতে আবর্জ্জনা সরিয়ে ফেলবার দিন এসেছে আজ, রামায়ণ-মহাভারত সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হতে হয়েছে।

শ্রীরামচন্দ্রের দানের চিত্র:

"অন্ন ভক্ষ্য রঘুরাজা নাহি রাখে ঘরে।
মৃত্তিকার পাত্রে রাজা জল পান করে।"

সঙ্গে সঙ্গে মনে এনে দেয় সেই ছবি—সব দান শেষে সৌম্য, শান্ত, নিঃস্ব সম্রাট্ শ্রীহর্ষ পরিধেয় গ্রহণ করছেন রাজ্যশ্রীর হস্ত হতে। চক্ষে ভাসে সেই পৌরাণিক আলেখ্য: ত্রিলোকপতি দু'মুঠি অন্নের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন অন্নপূর্ণার দ্বারে। এই সব চিত্রই মহাকবিরা আঁকেন। প্রচলিত রামায়ণের অতল সমুদ্র হতে কবে আমরা কৃত্তিবাসের মণি-মাণিক্যগুলি আহরণ করতে পারব!

৬

সাধারণী-করণের (universalisation) সাত সমুদ্রে অবসিত হলেও, নদীর মত মহাকাব্যের সৃষ্টি যে বিশেষ জনপদে, তার ফুলের গন্ধ, মেঘের রং সে কাব্য-বনস্পতির কাণ্ডে লেগে থাকবেই। তাই Iliad, Odysseyতে পৌরাণিক গ্রীসের চিত্র, Beowulfএ Anglo-saxonদের আদিম pagan জীবনের আলেখ্য। কিন্তু পাথরে-বাঁধা ইঁদারার মত এই মহাকাব্য যদি দেশে, কালে অনড় থাকবে, তবে ভিন্ন যুগের, দেশান্তরের অধিবাসীরা কি করে করবে তৃষ্ণা নিবারণ? তাই অশত্থের মত বিশেষ কালের মাটিতে থাকে মহাকাব্যের মূল, কিন্তু তার মাথাটা ঠেকে পৃথিবী-জোড়া আকাশে। আর এ কারণে ভারতীয় tradition-পুষ্ট কালিদাসী শকুন্তলা জার্ম্মাণ 'গ্যয়টে'র ভাল লাগে।

সংস্কৃত রামায়ণে এই বৈষ্ণব-শাক্ত-বৌদ্ধ-জৈন প্রভাব নেই, তার কারণ আদিকবির জন্মটা বাংলার মাটিতে হয়নি, তাঁর কাব্যকে বঙ্গ-ঋতুচক্রে পাঁচশ' বছর ধরে ঘুরপাক খেতে হয়নি। এ কারণে সংস্কৃত রামায়ণ যেমন প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের, বঙ্গ-সংস্করণটা তেমনি নিছক বাংলার। কথক কৃত্তিবাস, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষলুব্ধ শ্রোতৃবৃন্দ, সকলেই যে বঙ্গবাসী। তাই সপ্তকাণ্ড জুড়ে চলেছে বাঙ্গালী-করণের যোগ বিয়োগ, যার ফলে বঙ্গদেশ অতি সম্ভ্রমে সদর হতে স্বাগত জানিয়েছে তাকে। কৃত্তিবাসে তাই আমরা পাই না চিত্রকূটের উদাত্ত সৌন্দর্য্য, পম্পার স্বপ্নময়ী শোভা, সমুন্নত দেবদারুর পত্র-মর্ম্মর। মানব-হৃদয়ের সঙ্গে প্রকৃতির সুনিবিড় যোগ, কবিগুরুর গথিক সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, সবই আমরা বিজয়া দশমীর দিন বিসর্জ্জন দিয়েছি। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে পেয়েছি বঙ্গীয় তালি-কুঞ্জের ছায়া, আম্রবনের শান্তি; উপমায় কেতকীর কথা: 'কুড়ি পাঁতি দন্ত মেলি দশানন হাসে। কেতকী কুসুম যেন ফোটে ভাদ্র মাসে।' প্রকৃতির মত সমাজও আত্মপ্রকাশ করেছে সেখানে। রাম-সীতার বিবাহ মিথিলায় না ঘটিয়ে বঙ্গ-ললনার হুলুধ্বনি দিয়ে সম্পন্ন করেছেন কবি। তাই পাত্রপক্ষ শয্যাতুলুনি দিয়ে তবেই নিষ্কৃতি পেয়েছেন। দম্পতি পালন করেছেন 'কালরাত্রি' সূর্য্যাস্তের চক্রবাক-চক্রবাকীর মত। বঙ্গ-স্বর্ণকারের কর্ণভূষণে, বঙ্গ-মালাকারের পুষ্প-বাজুবন্ধে বাসর-নিশি যাপন করেছেন মৈথিলী।

প্রচলিত রামায়ণের 'কথাবস্তু' হতে এ বিষয়টা সকলেরই মনে হবে যে, বঙ্গবাসীর জাগরণ অপেক্ষা নিদ্রা প্রিয়, বাস্তব অপেক্ষা স্বপ্নে বিশ্বাস অধিক; এ দেশে তাই 'হিং টিং ছট্'র অর্থভেদ না হলে অনর্থ ঘটে, গল্প মাত্রেই আষাঢ়ে গল্প হয়ে ওঠে। মধ্যযুগের সাহিত্য-মাত্রেই কথঞ্চিৎ আরব্যোপন্যাস; কিন্তু আরব্যোপন্যাসই যে আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্য, তার কারণ দু'টি। প্রথমতঃ, আমাদের রক্তে না-আর্য্য শোণিতের মিশ্রণ। দ্বিতীয়তঃ, ত্রয়োদশ হতে বিংশ শতাব্দীর সাতশ' বছরের পরাধীনতা। না-আর্য্য শোণিত যেমন দিয়েছে আমাদের fancy-প্রবণতা, বিদেশী শাসন তেমনি আমাদের মুখটা ফিরিয়েছে সমাজ হতে স্বর্গদ্বারে। জগৎ আমাদের ফাঁকি দিয়েছে, আমরাও জগৎকে ফাঁকি দিয়েছি। ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানব, সকলকেই বিশ্বাস করেছি, করিনি কেবল তাকে। আমরা কেউ চাঁদ সদাগর নই, সে পৌরুষ আমাদের নেই, তাই 'ঘা' এড়াতে প্রথমেই মেনেছি মনসাকে। বিমুখ-সমাজ হতে বাঁচবার জন্য জীবনে চেয়েছি অঘটন, সাহিত্যে তাই Miracle এ জয়ধ্বনি করেছি। এ কারণে কবিগুরুর অচিন্তনীয় মহীরাবণ-অহীরাবণ বধ, গন্ধমাদনের সঙ্গে হনুমানের সূর্য্য আনয়ন, ভূমি-অঙ্কিত রাবণ-চিত্রে সীতার শয়ন ও রামের ঈর্ষ্যা, কাঠ-বিড়ালীর কথা, রাবণের বিভীষণকে পদাঘাত, রক্ষঃশ্রেষ্ঠের মৃত্যুবাণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে হনুমানের মন্দোদরীকে ছলনা, লক্ষ্মণের চতুর্দ্দশ বৎসর অনিদ্রা ও স্ত্রী-মুখ দর্শন না করে ব্রহ্মচর্য্য-পালন মূল-বহির্ভূত যত অলীক ও অসম্ভব কাহিনী সুস্থ চিত্তে গ্রহণ করেছি, এক বারও রূপকথা বলে মনে করিনি।

এ কারণে শালপ্রাংশু শ্রীরামচন্দ্রের হস্ত হতে ধনুর্ব্বাণ খুলে নিয়ে বঙ্গদেশ তাঁকে ধরিয়েছে বাঁশী। কালকেতুর মত যে মহাবীরের 'দুই বাহু লোহার শাবল', তাঁকে দিয়েছে ফুলধনু, মধুমাসে মধুনিশি যাপন করতে। আদিকবির আদর্শ চরিত্র বাংলার অন্ন জলে পরিণত হয়েছে 'ননীর পুতুলে'।

তার পর বিশ্বামিত্র। যে শক্তিমান্ পুরুষ ক্ষত্রিয়ত্ব হতে ব্রাহ্মণ্যে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, দ্বিতীয় পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন স্বীয় শৌর্য্য, তাড়কার গৃহমাত্র দর্শনে সেই মহাতেজা ঋষি ত্রস্ত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মত ঊর্দ্ধশ্বাসে, ঊর্দ্ধশিখ হয়ে পলায়নপর। আর যে রঘুকুলবধূ দশানন সম্মুখে সতীত্বের ঐশ্বর্য্যে, মহিমায় দুঃশাসন-নিপীড়িতা যাজ্ঞসেনীর ন্যায় সাম্রাজ্ঞীর গৌরবে দণ্ডায়মান, বঙ্গ-সংস্করণে তিনি বঙ্গবধূ, প্রভঞ্জন-লাঞ্ছিতা ভূর্জ্জপত্রের ন্যায় কম্পমানা। কবিগুরুর বিন্ধ্যকে আমরা বৈষ্ণব-আখড়ার গিরি গোবর্দ্ধনে পরিণত করেছি। হায়, আমাদের কল্পনা-কুশল লেখনী!

এর পিছনে অবশ্য একটা সামাজিক কারণ আছে। বাংলার সিংহাসন নিয়ে মধ্যযুগে চলেছিল যে 'কন্দুক'-ক্রীড়া, তাতে নিভৃত পল্লীর পাখীর গানে একটানা কোমল ঘাটই বাজেনি, মাঝে মাঝে কড়ির চড়া সুরও লেগেছিল। তাই ত্রস্ত পল্লীজন চাইছিলো আশ্রয়, যার পক্ষপুটে ধন-ধান্য-সন্তান-সন্ততি নিয়ে নিরাপদে তুফান উত্তীর্ণ হবে। এ কারণে বাল্মীকির মহামানব রূপান্তরিত হলেন দেবতায় আর বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধিতে শ্রী-ভ্রষ্ট হয়ে আদিকবির ধূর্জ্জটি পরিণত হলেন বজ্রহীন ইন্দ্রে।

কিন্তু শুধুই এই পেলবতা, ভীরুতা, স্ত্রীজনোচিত দৌর্ব্বল্য কেন? বঙ্গবাসী কি শৌর্য্য, বীর্য্য, পরাক্রমের কোন স্বাদই পায়নি কোন দিন? বঙ্গজন কি চিরকালই 'ঘরমুখো', 'রণমুখো' নয়? প্রতাপাদিত্যের দেশ সে কথা মানবে না। যার মধ্যযুগেও চাঁদ সদাগর, ইছাই ঘোষ, কালু ডোম, বেহুলার আলেখ্য অঙ্কিত হয়েছে, সে বঙ্গ-সাহিত্য সে কালি মাখবে না।

এ ক্লৈব্যের জন্য মহাকবির প্রতি দোষারোপ চলে না। ষোড়শের অদ্ভুতাচার্য্য, অষ্টাদশের কবিচন্দ্র—আরও কত কথকেরা সেই মহাসাগরের নীলে নিজেদের নীল মিশেয়েছেন। কবিওয়ালারা এক দিন অনুপ্রাস, যমকের কারিকুরিতে ঊনিশ শতকের আসর মাৎ করেছিলেন, বণিক্-সম্প্রদায়ের বাহবা সহজেই মিলেছিল। রামায়ণকারেরা তেমনি চেয়েছিলেন জন-গণেশের চিত্ত-দুর্গ দখল করতে। যে মুষ্টিমেয় রসিক-সম্প্রদায় বিমুখ-নিয়তির সঙ্গে অদম্য পুরুষকারের দ্বন্দ্বে সৌন্দর্য্য দেখেন, জীবন-যুদ্ধে মহিমা প্রত্যক্ষ করেন, আকাশ-কুসুমের দেশ অপেক্ষা হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের এই পৃথিবীকে ভালবাসেন, মাদক অপেক্ষা দুগ্ধে পক্ষপাতিত্ব করেন, সেই সংখ্যালঘুদের জন্য তাঁরা লেখনী ধারণ করেননি। তাঁরা চিনতেন পরাধীন জাতিকে, বঙ্গবাসীকে। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণের সুস্বাদ তালরস হতে বিস্বাদ 'তাড়ি' প্রস্তুত করে, ভাণ্ড হস্তে অবতীর্ণ হলেন আসরে। মত্ত জনতার মুহুর্মুহু 'হরিবোলে' প্রস্তুত হল মহাকবির চিতা-শয্যা।

এ কথার তাৎপর্য্য এই নয় যে প্রচলিত রামায়ণ বৈতরণীর মত কেবলি আবর্জ্জনা বয়েছে, বন্যার মত মড়কের সঙ্গে পলি মাটির কল্যাণ আনতে পারেনি। সে কথা ভ্রমেও আমরা বলি না। বাস্তবিক পক্ষে খনিগর্ভে পদ্মরাগের মত তাতে উৎকৃষ্ট রত্নের অভাব নেই, অন্ধকারকে ক্ষণে ক্ষণে যারা উদ্ভাসিত করতে পারে। কিন্তু পাঁচ-মিশালী রচনার সংযোগে সেই পবিত্র গ্রন্থের আকারে এসেছে যে গো-শকটের অদঙ্গতি, কাহিনীতে চলেছে যে গন্ধর্ব্বলোকের বর্ণনা, রসিকতায় ভাঁড়ামি, তা থেকে কৃত্তিবাসকে অন্ততঃ 'পুণ্যশ্লোক' নামে অভিহিত করা চলে না।

তবেই কি শুধুই অনুরাগ বশতঃ অন্ধ সন্তানের পদ্মলোচন নামকরণ? না তা-ও নয়। তিনি সত্যই মহাকবি, কিন্তু সে পরিচয় বটতলায় নেই, আছে আদি ও অযোধ্যাকাণ্ডের আদর্শপাঠে। সেখানে দেখি তাঁর বাল্মীকি-অনুসৃতি, বলিষ্ঠ কল্পনাবৃত্তি, অলৌকিক রসসৃষ্টির ঐশ্বরিক প্রতিভা। আর্য্যাবর্ত্তের উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের গাম্ভীর্য্যে অক্ষুণ্ণ রেখে, তার রুক্ষ গাত্রে তিনি দিয়েছেন বঙ্গের বনশ্রী, মণির সঙ্গে যোগ করেছেন কাঞ্চন। তাই মনে হয়, সপ্তকাণ্ড যেদিন মিলবে, সেই ষষ্ঠীকল্পে আবার ফিরে পাব দশমীর বিসর্জ্জিতা প্রতিমা। আসাম হতে উৎকল—বিস্তৃত জনপদ হয়ত সে চক্রে মুগ্ধ মক্ষিকার মত গুঞ্জন করে ফিরবে না, কিন্তু সাহিত্যের ভোজে ত কোন দিনই শুধু আমন্ত্রিতের সংখ্যাধিক্যে কর্ম্মকর্ত্তার মর্য্যাদা বাড়েনি। তাই স্বল্প-সংখ্যক রসিকেরা যদি সে কাব্য-জ্যোৎস্না হতে চকোরের মত রস-সুধা পান করতে পারেন, তবেই মহাকবির আত্মা স্বর্গলোকে পরিতৃপ্ত হবেন, তাঁর জনক-জননী-দত্ত 'কৃত্তিবাস' নাম সার্থক হবে।

রিলেটিভিটি

নারায়ণদাস সান্যাল

অফিস-ফেরতা ট্রাম থেমেছে এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে,
ভাবছি মনে সাহেব কেন দেয় না প্রমোশন!
এতই নিদয় মানব-হৃদয়? কাঁদছে জানলা ধারে
"একটা পয়সা দাও না বাবু!" অন্ধ কে এক জন

শ্রাবণ

—নীরোদ রায়

সমুদ্দুর —জ্যোৎস্নারাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

(প্রথম পুরস্কার)

-নিয়মাবলী:-

প্রত্যেক মাসে প্রতিযোগিতায় একমাত্র সৌখীন (এ্যামেচার) আলোকচিত্র-শিল্পীদের ছবি গৃহীত হইবে।

ছবির আকার ৬" × ৮" ইঞ্চি হইলেই আমাদের সুবিধা হয় এবং যত দূর সম্ভব ছবি সম্বন্ধে বিবরণ থাকাও বাঞ্ছনীয়। যথা, ক্যামেরা, ফিল্ম, এক্সপোজার, এ্যাপারচার, সময় ইত্যাদি।

যে কোন বিষয়ের ছবি লওয়া হইবে। অমনোনীত ছবি ফেরৎ লওয়ার জন্ত উপযুক্ত ডাক-টিকিট সঙ্গে দেওয়া চাই। ছবি হারাইলে বা নষ্ট হইলে আমাদের দায়ী করা চলিবে না, সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। খামের উপর "আলোক-চিত্র" বিভাগের এবং ছবির পিছনে নাম ও ঠিকানার উল্লেখ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

প্রথম পুরস্কার দশ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার আট টাকা, তৃতীয় পুরস্কার পাঁচ টাকা এবং অন্যান্য বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হইবে।

হাওড়া ব্রীজ —বিভাষ মিত্র

(দ্বিতীয় পুরস্কার)

ক্রন্দন

—বিশ্বনাথ মণ্ডল

একমেবাদ্বিতীয়ম্

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

এক

ইন্দোনেশিয়াতে ওলন্দাজদের সহায়তা করবার জন্য যে ব্রিটিশ বাহিনী এসেছে নিরুপম সেই বাহিনীরই এক জন কমিশন না পাওয়া অফিসার, সে শীগ্‌গিরই কমিশন পাবে। তার বলিষ্ঠ, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে এসে আর সবারই মত সে-ও এ-ধার ও-ধারে ঘুরে বেড়ায় জিপ গাড়ি নিয়ে। সেদিন বিকেলে ব্যাটাভিয়ার একটি পার্কে এক তরুণীর দিকে তাকিয়ে সে থমকে গাড়ি থামালে। মেয়েটির বয়স বেশি নয়, দীর্ঘল দেহের গড়ন, চোখের দুই ভ্রূ যেন হরিণীর মত আয়ত। চকিতে মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলে।···নিরুপম গাড়িখানা পথের পাশে লাগিয়ে রেখে সিগারেট ধরালে। বার বার সে ওই মেয়েটির দিকে তাকায়।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি তার সাইকেল নিয়ে পথে নামল। নিরুপমও গাড়িতে ষ্টার্ট দিলে। খুব সম্ভব মেয়েটি নিরুপমের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিল। সাইকেল নিয়ে মেয়েটি গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল, নিরুপম তার সাইকেলের পিছু-পিছু গাড়ি চালাচ্ছিল—কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তিন-চারটে গলির মোড় এসে মিশেছে এমন একটা জায়গায় এসে মেয়েটি কোথায় যেন ডুব দিল। অনেক খুঁজেও নিরুপম তার হদিস্ পেল না। অবশেষে নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে, মেয়েটির ওপর চটে গিয়ে আপন মনেই একটি অশ্লীল 'ক্রিয়াপদ' উচ্চারণ করে ক্যাম্পে ফিরল সে। সেদিন মদটা একটু বেশি মাত্রায় খেয়েছিল নিরুপম।

দুই

ব্যাটাভিয়ার রাস্তা-ঘাটে খণ্ড যুদ্ধ হচ্ছে। ব্রিটিশ বাহিনী খুব লড়ছে।

হঠাৎ একটা পথের বাঁকে নিরুপমের নজর গিয়ে পড়ল। অল্পবয়সী একটি মেয়ে পড়ে আছে—হয়ত ম'রে গেছে। দূর থেকেই সে বুঝতে পারলে, অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, যদি মরে গিয়ে থাকে তবে ওর গায়ে কিছু অলঙ্কারও পাওয়া যাবে।

কাছে এসে দেখেই সে চিনলে, সে দিনের সেই সাইকেল-বাহিনী আরব-কন্যা এটি।

মেয়েটি ম'রে গেল, মনে করে নিরুপমের মনটা একটু বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

আরও কাছে গিয়ে পরখ ক'রে দেখে নিরুপমের চাওড়া গোঁফের নীচে হাসি দেখা গেল—বেঁচে আছে।

আর এক দণ্ডও দেরি করা ঠিক নয়। সকলের অগোচরে মেয়েটিকে জিপ গাড়িতে তুলে নিয়ে সোজা নিজের তাঁবুতে চলে গেল।

চোখ মেলে কেন সামনে নিরুপমকে দেখে মেয়েটি গেল। আবার চোখ বুজল। তার পর পুনরায় তাকিয়ে একটু হেসে জিজ্ঞেস করল—আমি কোথায়? এখানে কি ক'রে এলাম?

নিরুপম হেসে জবাব দিলে—ভয় নেই, তুমি একটু সুস্থ হয়ে নাও।

এবারে মেয়েটি আবদারের সুরে বলে, আমায় বাড়িতে রেখে আসবে না? আমি কি বন্দী হয়েছি? আবছা মনে পড়ছে, পিছন থেকে এক দল লোককে দৌড়তে দেখে আমি ছুটেছিলাম, তার পর কি যেন হয়েছিল মনে পড়ছে না। তুমি কে?

—আমি তোমায় পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছি।

—আমায় ছেড়ে দেবে ত?

—হ্যাঁ, তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব।

তিন

মেয়েটির নাম রেবেকা। আরবের এক বণিকের একমাত্র মেয়ে।

এ ভাবে মেয়ের জীবন রক্ষা করার জন্য মেয়েটির মা-বাপ নিরুপমকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়েই নিরস্ত হ'ল না। তারা নিরুপমকে প্রায়ই নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে লাগল। আর মেয়েটি নিরুপমের জন্য

পাগল। সে বলে—আমি তোমার ক্রীতদাসী। মরেই যেতাম, তুমি আমায় বাঁচিয়েছ, এ জীবনের ওপর আমার কোনো অধিকার নেই, তুমি আমায় নিয়ে যা খুশি তাই করিতে পারো।

নিরুপম শিকারী, বনের মধ্যে যে শিকার পালিয়ে বেড়ায়, যাকে ধরতে রীতিমত পরিশ্রম হয় সেই শিকারের প্রতি তার লোভ। রেবেকা যে নিজে হ'তে ধরা দিতে চায় তাই সে রেবেকাকে কিছু বলে না।

এক দিন রাত্রে, গভীর রাত্রে রেবেকা এসে নিরুপমের ঘুম ভাঙালে। শহরের সর্ব্বত্র সান্ধ্য আইন জারী করা আছে, এত রাতে রেবেকা কি ক'রে এল ?

নিরুপমের প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি বললে—তোমায় ভালোবাসি যে, তাই এলাম !

—মিলিটারী স্বামী প্রেমের ধর্ম্মকে অতি সহজেই অগ্রাহ্য করে।

—কই, করতে পারেনি ত ?

—জানো, তোমায় আমি শত্রুর গোয়েন্দা মনে ক'রে গুলী করতে পারি ?

—সে ত আগেই বধ ক'রে রেখেছ, যেদিন রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে নিজে হাতে সেবা করেছ সেদিনেই রেবেকার মৃত্যু হয়েছে, আবার নতুন ক'রে মারবে ?

—Billy.

—যাক গে, তোমাদের কাঁটা-বেড়া দেওয়া মিলিটারী বেড়াতে হাত-পা কেটে গেছে, জ্বালা করছে—একটু আইডিন দিতে পারো ?

নিরুপম লাইট জ্বেলে দেখলে রেবেকার হাত-পায়ে কম করে সাত-আট জায়গা কেটে রক্ত ঝরছে।

চার

সে রাত্রের অভিযানের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস শুনে রেবেকার বাপ-মা নিরুপমকে জোর ক'রে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখল। ওদের দু'জনের মধ্যে গভীর প্রণয়। নিরুপম আর রেবেকাকে নিয়ে B. O. R. অফিসারদের মধ্যে খুব আলোচনা হয় আজকাল, রীতিমত চাঞ্চল্য।

পাঁচ

একটি ইন্দোনেশিয় যুবক রেবেকাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসা-যাওয়া করে। নিরুপমের মনে হয় ছেলেটির চোখের চাহনীটা ভালো নয়। সে অনেক বার জিজ্ঞাসা করেও রেবেকার কাছে এই যুবকটি সম্বন্ধে কোনো কথা জান্‌তে পারে না। অবশেষে সে এক দিন রেবেকাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে—তুমি কি ওকে ভালোবাসো ?

রেবেকা এতে চটে গেল, ও রেগে বললে—হ্যাঁ, যদি বেসেই থাকি তাতে কি হয়েছে ?

রেবেকার ভারি অভিমান হয়েছে, আশ্চর্য্য এই ছেলেটি সম্বন্ধে ওর কোন দুর্ব্বলতা নেই অথচ এ কথা শুন্‌তে হ'ল। ও নিরুপমকে সত্যিই খুব ভালোবাসে, এত ভালোবেসেও এ কথা শুনতে হ'ল ! এই অভিমানে রেবেকার মন ভারি হ'য়ে উঠেছে।

নিরুপম ভুল বুঝলে রেবেকাকে।

এদিকে অনেক দিন দেশ-ছাড়া সে। সেই সে-বার ইতালী থেকে এক বার দেশে গিয়েছিল সে, তার পর কত দিন—কত দিন দেশ-ছাড়া। দেশের জন্য, বাড়ীর জন্য, নিরুপমের মন উতলা হয়ে উঠেছে কিছু দিন থেকেই। তাই হঠাৎ রেবেকার কাছে আঘাত পেয়ে তার সারা মন ঝুঁকে পড়ল দেশে যাবার জন্য।

রেবেকাকে কিছু না জানিয়ে নিরুপম, অতি কষ্টে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে তিন মাসের ছুটি আদায় করলে।

নিরুপম ইণ্ডিয়াতে যাচ্ছে শুনে রেবেকার মন আরও বেদনাতুর হয়ে উঠল। রেবেকা হঠাৎ জ্বলে উঠ্‌ল। ও মনে করলে, নিরুপম ওকে অবজ্ঞা ক'রে চলে যাচ্ছে।

নিজের বুক ভেঙে যাচ্ছে, তবু রেবেকা নিরুপমকে দেখিয়ে হাসি-তামাসায় উচ্ছল চাপল্যে সারা বাড়ি মুখরিত ক'রে তুললে। অকারণে সেই ইন্দোনেশিয় যুবকটিকে নিয়ে রেবেকা ফ্লার্ট ক'রে বেড়াতে লাগল, নিরুপমের চোখের সামনে।

ছয়

নিরুপম যাত্রা করবে। আজ তার জাহাজ ছাড়বে।

রেবেকার উচ্ছলতা আজ সকাল থেকেই স্তব্ধ হয়ে গেছে।

হঠাৎ নিরুপমের ঘরে ঢুকে নিজে হাতে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে বললে রেবেকা—আমায় নিয়ে চলো।

নিরুপম কঠিন হয়ে উঠ্‌ল, এ ক'দিন দ্বন্দ্ব-সংশয়ের দংশনে তার মন অহরহ পুড়েছে, সে জবাব দিলে না।

রেবেকা নিরুপমের বিছানার ওপর ধপ ক'রে বসে পড়ে বললে—তোমায় যেতে দেবো না।

এবারে নিরুপম গর্জ্জে উঠল—বোমা ফাটার আওয়াজে, বললে—রুট্।

রেবেকার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নামে, তবু ওরই মধ্যে হাস্তে হাস্তে চলে গেল।

নিরুপম স্তব্ধ হয়ে যায়। রেবেকা এসে চ'লে গেল! কেন এসেছিল? চলে গেল কেন?

জাহাজের সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। ইণ্ডিয়াতে যাওয়া তার স্থির।

ব্যাণ্ড বাজছে, বিগুলের তান-লয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠছে—নিরুপম ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে। আস্তে আস্তে নোঙর উঠল, জাহাজ দূরে স'রে আসছে। ওই লাল রং-এর রুমালখানা উড়ছে—ওখানা চেনে নিরুপম, রেবেকার রুমাল। রেবেকা এসেছিল সে জানত, জাহাজে ওঠবার সময় শেষ বারের মত তার দিকে ফিরে চেয়ে দেখে নিল নিরুপম। আর এখানে আসবে না সে, দরখাস্ত করে, যেমন করে পারে অন্য কোথাও বদ্‌লি হ'য়ে যাবে। বিদায়, বিদায়—

সাত

তিন মাসের ছুটি নিয়ে নিরুপম দেশে এলো। এবারে তার বিয়ে হবে—আগে থেকেই পাত্রী এক রকম ঠিক করাই আছে, তাকে একবার চোখের দেখা দেখিয়ে নিয়ে বিয়ের আয়োজন হবে।

মেয়ে দেখতে যাবার দিন নিরুপম বেঁকে বসল। এখন বিয়ে করব না।

সেই দিনই সকলের কাছে বিদায় নিলে সে।

এখানে আর ভালো লাগছে না। নিজের মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ ক'রেছে, রেবেকার সেই করুণ অশ্রুময়ী, হাসি ও বেদনায় মূর্ত্ত মুখখানি মন থেকে কোনো মুহূর্ত্তেই সরছে না। তবে কি তার ভুল হয়েছে? এত দিন পরে এত দূরে এসে সে বুঝতে পারছে রেবেকা তার কত আপন—অন্তরের মাঝখানে রেবেকা আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে। রেবেকা তাকে কত ভালোবাসে, আজ এখানে ব'সে প্রতিদিনের ছোট-বড় ঘটনা বিশ্লেষণ ক'রে নিরুপম বুঝতে পারছে। আজ আর তার মন ইণ্ডিয়াতে থাকতে চায় না। তার আত্মীয়-স্বজন কাউকে ভালো লাগে না, তার মন অন্ধবেগে ইথারের পথ বেয়ে বায়ু-তরঙ্গ অতিক্রম ক'রে ধেয়ে চলে যায় সেই ইন্দোনেশিয়ায়।

নিরুপম বললে মাকে—আমি যাচ্ছি।

মা কাঁদতে লাগলেন।

সব শুনে তার বাপ বললেন—রুট্।

নিরুপম জবাব দিলে না।

সে কলকাতায় গিয়ে Air Passage নেবার চেষ্টা করবে, সম্ভবতঃ পাওয়া যাবে না। তবে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত ট্রেণে গিয়ে সেখান থেকে এরোপ্লেনে সে যাবেই। সে যাবে রেবেকার কাছে। তার বাবা ঠিকই বলেছেন, সে রুট্ বই কি! যাকে ভালোবাসে তার কাছে ছুটে যাওয়ার মধ্যে যদি পশুত্ব থাকে তবে সে নিশ্চয়ই পশু। তার চোখের সামনে রেবেকার দীঘল দেহের ছন্দ লীলায়িত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীনৃপেন্দ্রগোপাল মিত্র

তুমি তো তুমিই শুধু নহ—
চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দের ব্যথার মূর্চ্ছনা,
তেজোদীপ্ত ঈশ্বরের বীর্য্যবান্ অন্তরে সাধনা,
অনন্ত প্রতিভা দুরন্ত মধুরে সুতীব্র কামনা,
সত্য-স্রষ্টা বঙ্কিমের নিত্য নব সৃষ্টি আরাধনা।
তুমি তব জন্ম সাথে বহ
তুমি তো তুমিই শুধু নহ।
কত শত সাধকের অপূর্ণ আগ্রহ
বিগত শতাব্দী মাঝে মূর্ত্ত হ'লো কবি কালিদাসে
সেক্সপীয়র পশ্চিম আকাশে
প্রাচী ও প্রতীচীর সমগ্র সংগ্রহ
তুমি তব জন্ম সাথে বহ
তুমি তো তুমিই শুধু নহ
বিশ্ব-সভ্যতার কৃষ্টি সাধনার জ্বলন্ত বিগ্রহ
বিশ্ব নিখিলের বিমুগ্ধ বিস্ময় সহ
শ্রদ্ধানত অন্তরের যে প্রণাম লহ
কালের অতীতে তুমি বহ
তুমি তো তুমিই শুধু নহ।

ঋগ্বেদ সংহিতার পরিচয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী বাসুদেবানন্দ

মন্ত্র অর্থে যাস্ক বলেন :—"মন্ত্রাঃ মননাৎ," (নিরুক্ত ৭।৩।৬) মনন করিতে গেলেই অর্থবোধ প্রয়োজন। দুর্গাচার্য্য তাঁহার বৃত্তিতে বলেন, "মন্ত্রপ্রয়োগকারীরা মন্ত্র-সমূহ হইতে অধ্যাত্ম, অধিদৈব অধিযজ্ঞাদি মনন করেন, এই নিমিত্ত ইহারা মন্ত্র নামে কথিত হয়।" যাস্ক এ সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "কামনাবান্ ঋষি কোনও দেবতার নিকট যখন অর্থাপত্য প্রভৃতির জন্য স্তুতি প্রয়োগ করেন, তাহাই মন্ত্র" (৭।১।১)। কেহ কেহ মন্ত্রার্থ প্রস্থান-ত্রয়রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—আত্মপ্রবাদিনিরুক্ত যাজ্ঞিকাঃ। অধ্যাত্ম-জ্ঞান ও মুক্তি পক্ষে; নৈরুক্ত—বস্তুতত্ত্ব-বিজ্ঞান পক্ষে; যাজ্ঞিক—যজ্ঞপক্ষে। যাস্ক ঋক্‌গুলিকে অনুরূপ তিন ভাগে বিভাগ করিয়াছেন—পরোক্ষকৃত, প্রত্যক্ষকৃত ও আধ্যাত্মিক। প্রথম দুইটিই অধিক। শেষটি অল্প। যজুর্মন্ত্র ভাষ্যকার উবটাচার্য্য ও শবরস্বামী ত্রয়োদশ প্রকার মন্ত্রভেদ স্বীকার করিয়াছেন (১)।

সংহিতা—মন্ত্রের সংগ্রহ। মন্ত্রসংহিতার পাঠ প্রধানতঃ দুই প্রকার—(১) নির্ভুজ সংহিতা ও (২) প্রতৃণ সংহিতা। নির্ভুজ সংহিতার (আর্ষী) পাঠ যথাযথ—যেমন, "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্"। প্রতৃণ সংহিতার পাঠ দুই প্রকার—(১) পদসংহিতা "অগ্নিম্ ঈড়ে পুরঃহিতম্; (২) ক্রমসংহিতা—অগ্নিম্ ঈড়ে ঈড়ে পুরোহিতম্; পুরোহিত-মিতি পুরঃহিতম্।" শুনা যায় না কি একাদশ প্রকার সংহিতা পাঠ প্রচলিত ছিল। বোধ হয় কালভেদে, দেশভেদে, ব্যক্তিভেদে অধ্যাপনা ও অধ্যাপনীয় উচ্চারণভেদে এইরূপ পাঠভেদ, অনুষ্ঠান-ভেদ ও প্রয়োগভেদ ঘটিয়াছে।

একখানি সংহিতা আবার বহু শাখায় বিভক্ত। ষড়্‌গুরুশিষ্য (সর্বানুক্রমণী বৃত্তিকার) বলেন, ঋগ্বেদ ২০, সামবেদ ১০০০, যজুর্বেদ ২০০ এবং অথর্ববেদ ৯ শাখা-যুক্ত। ইহা পাতঞ্জল মহাভাষ্যের অনুরূপ। চরণব্যূহ মতে ঋগ্বেদের শাখা ৫—আশ্বলায়নী, শাঙ্খায়নী, শকলা, বাস্কলা ও মাণ্ডুক। শৌনকীয় প্রতিশাখ্য মতে—শাকল, বাস্কল, আশ্বলায়ন, সাঙ্খ্যায়ন ও মাণ্ডুক। প্রাতিশাখ্য মতে ঋগ্বেদের আর কয়টি উপশাখা আছে—ঐতরেয়, কৌষীতকি, শৈশির, পৈঙ্গ, মুদ্গল, গোকুল, বাৎস্য, প্রভৃতি। ইহা বিষ্ণুপুরাণসম্মতও বটে। বিষ্ণুভাগবত ও মহাভাষ্য মতে ঋগ্বেদের ২১ শাখা। ব্যাড়ি-প্রণীত বিকৃতবল্লী গ্রন্থে ঐ পঞ্চ শাখা—জটা, মালা, শিখা, লেখা, ধ্বজ, দণ্ড, রথ ও ঘনভেদে আট প্রকার বিকৃত পাঠ আছে বলিয়াছেন (২)।

১। বিধিবাদ, অর্থবাদ, যাচ্ঞা, আশী, স্তুতি, প্রৈষ, প্রহ্বলিকা, প্রশ্ন, ব্যাকরণ, তর্ক, পূর্ববৃত্তানুকীর্ত্তন, অবধারণ ও উপনিষৎ উবট ভাষ্য শুক্ল যজুর্বেদ ভূমিকা।

২। জটা—ক্রম প্রকারে পদজাত পদদ্বয় বা পদত্রয় দুইবার করিয়া পাঠ করিবে। পূর্বপদের ন্যায় উত্তরপদও অভ্যাস করিবে। তৎপরে পূর্ব ও উত্তর পদ একত্রিত করিয়া অভ্যাস করিতে হয়।

মালা—ক্রম প্রকারের বিপরীত ভাবে অর্থাৎ উত্তরভাগ প্রথমে এবং পূর্ব-ভাগ শেষে পাঠ করিবে; ইহাকেই ক্রমমালা বলে। পুষ্পমালার ন্যায় পদমালাও গ্রথিত থাকিবে, তাহাতে ক্রম, ব্যুৎক্রম ও সংক্রম ভেদে ত্রিবিধ আবর্ত্তন-ক্রম আছে।

শিখা—আর্য্যগণ উত্তরপদবিশিষ্ট জটাকেই শিখা বলিয়া থাকেন।

লেখা—প্রথমতঃ ক্রমানুসারে দুই তিন চার পাঁচ ক্রম পৃথক্ পৃথক্ উদাহরণ করিয়া পুনর্বার বিপরীত ভাবে ক্রমবিন্যাসের নাম লেখা।

ধ্বজ—যে বর্গে ও ঋচে আদির ক্রম সম্যক্ উচ্চারণ করিয়া অন্ত ক্রমের উদ্ধার পূর্ব্বক পাঠ করা হয়, তাহার নাম ধ্বজ।

দণ্ড—ক্রমশূন্য উত্তর ক্রম অর্দ্ধ ঋক্ হইতে বিপরীত পাঠকে ক্রম দণ্ড বলে।

রথ—এক পাদ বা অর্দ্ধর্চ একত্রে দণ্ডের ন্যায় উচ্চারণ করাকে রথ বলে।

ঘন—পণ্ডিতগণ বিপরীত ভাবে জটা উচ্চারণ করাকে ঘন বলিয়া থাকেন

ইউরোপে বেদের আলোচনা

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও বেদালোচনা বহু দিন হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন—"ইউরোপে রোসেন প্রথম বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, এবং তিনি ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টক লাটিন ভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি অতিশয় যত্ন ও পাণ্ডিত্য সহকারে এই অনুবাদটি করিয়াছেন। তাহার পর ফরাসী পণ্ডিত লাংলোয়ার সমস্ত ঋগ্বেদ সংহিতা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ফেলেন। অদ্য পর্য্যন্ত তাঁহার অনুবাদ ভিন্ন ঋগ্বেদ সংহিতার সম্পূর্ণ অনুবাদ কোনও ভাষায় নাই। (অবশ্য পরবর্ত্তী কালের উইলসন ও গ্রীফিত সাহেবের অনুবাদ উল্লেখযোগ্য)। লাংলোয়ার সুশিক্ষিত ও সুরুচি-সম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুবাদটি তাঁহার নিজের কল্পনায় বিজড়িত, অতএব দূষিত! এ দেশে প্রথমে ষ্টিভেনসন, পরে রোয়ার প্রভৃতি মহোদয়গণ বেদের অতি অল্প অংশই ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার পর যখন আচার্য্য মোক্ষমূলর মূল ঋগ্বেদ সংহিতা সায়নের টীকার সহিত মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন উইলসন মহোদয় তাহার একটি ইংরাজী অনুবাদ আরম্ভ করিলেন। মোক্ষমূলর পঞ্চবিংশতি বৎসর পরিশ্রম করিয়া (১৮৪৯ হইতে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ) সমস্ত ঋগ্বেদ সংহিতা ও সায়নের ভাষ্য মুদ্রিত করিয়াছেন। জগতের মধ্যে ঐখানি ভিন্ন আর সভাষ্য ঋগ্বেদ নাই। উইলসন সাহেব সায়নের ভাষ্য অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিতেছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর কাউয়েল সাহেব সেই কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন। অনুবাদ অর্দ্ধেকের উপর হইয়াছে, কিন্তু শেষ হয় নাই। বেনফে মহোদয় ঋগ্বেদের কতক অংশ জার্মাণ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন এবং আচার্য্য মোক্ষমূলর মরুদ্‌গণ সম্বন্ধে মন্ত্রগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার ঐ অনুবাদে তিনি সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা অবলম্বন করেন নাই। বোম্বাই নগরের বেদার্থযত্ন প্রণেতাগণ ঋগ্বেদের অনেক দূর ইংরাজীতে ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারাও সায়নাচার্য্যকে সকল স্থানে অবলম্বন করেন নাই। ইহা ভিন্ন কাইগী প্রভৃতি ইউরোপের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রই ঋগ্বেদ সম্বন্ধীয় অনেক আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। অদ্বিতীয় ফরাসী পণ্ডিত বার্নুফ, ঋগ্বেদ ও ইরাণীয় জেন্দ-অবস্থা তুলনা করিয়া যে সকল ঐতিহাসিক আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা জগদ্বিখ্যাত। মোক্ষমূলর ও রোথ তাঁহার ছাত্র ছিলেন এবং ইঁহারা উভয়ে ঋগ্বেদ সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন।"

বেদের কাল-নির্ণয়

এই সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনত্ব অতি সামান্য। মোক্ষমূলরের সিদ্ধান্ত—১। সূত্র-সাহিত্য ২০০ হইতে ৬০০ খৃঃ পূঃ; ২। ব্রাহ্মণ-সাহিত্য ৬০০ হইতে ৮০০ খৃঃ পূঃ এবং ৩। মন্ত্র সাহিত্য ১০০০ হইতে ১২০০ খৃঃ পূঃ। কিন্তু উইলসন হুইটানী এবং মুসো প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এত অল্প সময়ের মধ্যে এক একটা অত বড় সাহিত্য হইতে পারে না বলিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। হগ (Haug) বৈদিক কাল ১২০০ হইতে ২৪০০ খৃঃ পূঃ করিয়াছেন। জ্যাকোবি আরও অধিক উঠিয়াছেন—৪০০০ খৃঃ পূঃ। লোকমান্য তিলক তাঁহার Artic Home in the Vedas নামক গ্রন্থে আর্য্য সভ্যতা চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—১। অদিতি যুগ (pri-Orion period) ৬০০০ হইতে ৪০০০ খৃঃ পূঃ; ২। আদ্রা যুগ (Orion period) ৪০০০-২৫০০ খৃঃ পূঃ (দীক্ষিত মতে ৩০০০ খৃ. পূঃ); ৩। কৃত্তিকা যুগ (ব্রাহ্মণ) ২৫০০-১৪০০ খৃঃ পূঃ এবং সূত্র যুগ ১৪০০-৫০০ খৃঃ পূঃ। অধ্যাপক অবিনাশচন্দ্র দাস মহাশয়ের Rig Vedic Culture নামক গ্রন্থে বৈদিক সভ্যতার প্রারম্ভ ১৫০০০ বা ২০০০০ হাজারের ঊর্দ্ধ বলেন। (তাঁহার বৈদিক ভারত নামক প্রবন্ধ দেখুন, উদ্বোধন ২১ বর্ষ মাঘ ১৩৩৪)। স্বামী বিবেকানন্দের মত ৭০০০ খৃঃ পূঃ (A study of Religion p 101)।

প্রাচীনেরা বলেন, আধুনিকেরা বহু কষ্টে পাণিনির কাল (৩) নির্ণয় করিয়াছেন। যাস্ক আবার পাণিনির পূর্বে, কারণ বৃহদারণ্যকে যাস্কের নাম দেখা যায় (৪) (বৃ উ ২।৬।৩)। বাভ্রব্যাদি ক্রমকারগণ যাস্ক হইতে প্রাচীন; পদকার শাকল্যাদি আবার তাঁহাদের হইতে প্রাচীন। ঋকৃতন্ত্র-প্রণেতা শাকটায়নাদি ইঁহাদেরও পূর্বে; তাহার পূর্বে কল্পসূত্রকার লাট্যায়নাদি; তাহার পূর্বে অনুব্রাহ্মণ গ্রন্থকার কুশুর বিন্দ্যাদি ঋষিগণ; তাহার পূর্বে মহীদাসাদি শ্লোকানুশ্লোক শাখাদি সংগ্রহ করিয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণাদি প্রকাশ করেন। আবার প্রবাদ অবলম্বনে শ্লোকানুশ্লোক শাখা প্রকাশিত হয়। কাজে কাজেই প্রবাদ শ্রুতি তাহারও পূর্বে। তাহারও পূর্বে যজ্ঞ প্রয়োগ আরম্ভ হয়। ইহারও বহু পূর্বে অথর্ব বা ব্যাস দ্বারা চারি সংহিতা সংগৃহীত হয়। তাহারও পূর্বে নিশ্চয়ই সূক্ত মণ্ডলাদি বিভাগ আরম্ভ হয়। তাহার পূর্বে ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঋষিরা মন্ত্র সকল ক্রমে প্রকাশ করেন। সুতরাং বেদের কাল-নির্ণয় এক প্রকার অসম্ভব। কারণ কাল ব্যক্তিসাপেক্ষ। মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থে প্রণেতা ধরিলেও পূর্বোক্ত দুরতিক্রমনীয় স্তরগুলি আরোহণ করিয়া রচয়িতাকে ধরা অসম্ভব ব্যাপার (৫)।

কেহ কেহ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে জন্মেজয় পরীক্ষিৎ নামের উল্লেখ দেখিয়া উহা নিশ্চিত মহাভারতের পর বলিয়া অনুমান করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তিনি ঘোর নামে ঋষির শিষ্য,—৩।৭।৬ শতপথে অশ্বমেধীদের ভিতর অর্জ্জুনের নাম উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রাচীনেরা বলেন, ইঁহারা পৃথক্ ব্যক্তি। ঋগ্বেদে ভোজ ৮ অষ্টক।৬।১।৫ এবং আর্জ্জুনীর ৪ম।২৬।১—৩ নাম আছে বলিয়া ইঁহারা নিশ্চিতই বৃত্তিকার ভোজ বা অভিমন্যু নন এবং বেদভাষ্যকার উবটাচার্য্য ভোজরাজের সময় জন্মান বলিয়া তিনিও ঋগ্বেদের সময়কার নন।

এখন বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে আবার প্রশ্ন উঠে। ঋগ্বেদে সরস্বতী, শুতুদ্রী বা শতদ্রু, পরুষ্ণী বা ইরাবতী যাস্ক, মরুদ্বৃধা বা দৃষদ্বতী অসিক্নী বা চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, আর্জীকীয়া বা বিপাশা (যাস্ক) সুষোমা বা সিন্ধু ১ ম।৭১ সূ।৭ ঋ। এই সপ্তযহ্বী সিন্ধু এবং ১০ম।৭৫ সূ।৫ ঋকে গঙ্গাযমুনার উল্লেখ অনাদিবেদের কিরূপে আসিল? প্রাচীনেরা কেহ কেহ বলেন, ঐ শব্দ সকলের অন্য অর্থ আছে। কেহ কেহ বলেন বেদবক্তা প্রজাপতির পূর্ব্বকল্পীয় সংস্কার।

এক্ষণে বেদ সম্বন্ধে হিন্দুধর্মের দুই জন প্রবল প্রতাপ আচার্য্যের মতামত উল্লেখ করিতেছি।

বেদ ও শংকর

আচার্য্য শংকর মুণ্ডকোপনিষদের পরা ও অপরা বিদ্যা-প্রকরণে (১।৪) যে বিচার করিয়াছেন এখানে তাহা উদ্ধৃত

৩। প্রাচীনদের মতে পাণিনি ব্যাসপুত্র শুকের সমসাময়িক। কারণ, তাঁহার সূত্রে পরাশরের ভিক্ষুসূত্র, বাসুদেব, অর্জুন, যুধিষ্ঠির, মহাভারত প্রভৃতির উল্লেখ আছে, কিন্তু জন্মেজয়াদির উল্লেখ নাই। কাজে কাজেই পরীক্ষিত পর্য্যন্ত তিনি অবগত ছিলেন। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে—১। মোক্ষমূলরের শেষ মত খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী; ২। গোল্ডষ্টুকের ঐ; ৩। বেনফী ৩২০ খৃঃ পূঃ; ৪। ওঁফ্রেকট্ খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী; ৫। লাসেন খৃঃ পূঃ ৩২০; ৬। অন্যান্য খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী। এবং আধুনিক প্রাচ্য পণ্ডিতদের মতে—১। তারানাথ খৃঃ পূঃ ৫০০; ২। রমেশচন্দ্র দত্ত খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী; ৩। ডাঃ রামদাস সেন ৩৫০ খৃঃ পূঃ; রজনীকান্ত গুপ্ত ৮০০-৭০০ খৃঃ পূঃ; রাজেন্দ্রলাল মিত্র খৃঃ পূঃ ১০ম শতাব্দী।

৪। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে যাস্ক খৃঃ পূঃ ৫০০ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু এ মত গ্রহণ করা চলে না। কারণ আমরা শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত বৃহদারণ্যকে যাস্কের নামোল্লেখ দেখি—"[illegible]"—বৃঃ উঃ ২।৬।৩।

৫। হিন্দুরা বেদমন্ত্রগুলিকে অনাদি বলেন। কিন্তু উহাদের সংহিতা বা collection এর কাল স্বীকার করিতে ক্ষতি নাই। চতুর্বেদ সংহিতার মধ্যে অথর্ববেদ সংহিতার কালের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহা রামায়ণের পূর্বে। কারণ দশরথের পুত্রেষ্টিযাগ অথর্ববেদের অনুপাতী হয়। বালকাণ্ড ১৫।২। অথর্ববেদের ঊনবিংশ কাণ্ডের সপ্তম সূক্তে লিখিত আছে যে, উহার সঙ্কলন-কালে কৃত্তিকানক্ষত্র রাশিচক্রের প্রথমে ছিল। এবং অশ্লেষার শেষে কিংবা মঘানক্ষত্রের প্রথমাংশে ক্রান্তি পড়িয়াছিল। এখন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশাস্ত্রী জ্যোতিষশাস্ত্রের সহায়ে এইরূপ গণনা করিয়াছেন যে ১৮৮১ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে অথর্ববেদ সংহিতার বয়স হয় ৩৪০০ বর্ষ। এই অথর্ববেদ সংহিতা নিশ্চিত ঋকসংহিতা হইতে কনিষ্ঠ, কারণ ঋক্ সংহিতার অগস্ত্যকৃত কৃমি ঝাড়ানর মন্ত্রের উল্লেখ অথর্ব সংহিতাতে দেখা যায়। অঃ বেঃ ২ কাণ্ড ৬ অনুবাক্। ৩২ সূ। ঋ বে ৩ ঋক্। অথর্বসংহিতা ৭ কাণ্ড—৫৪ সূক্তে "ঋচং সামযজামহে" মন্ত্রটি আছে, কিন্তু অথর্ব ভিন্ন সংহিতায় কোথাও অথর্বসংহিতার নাম দেখা যায় না। ঋক্ সংহিতার যাবতীয় ছন্দই অথর্ব সংহিতায় দেখা যায়। অথর্ব সংহিতার ৬ ভাগের ১ ভাগ ঋক্ মন্ত্রগুলির ঋষিদেরও প্রায় ঋক্সংহিতার ১ম ও ১০ম মণ্ডলে পাওয়া যায়।

করিলাম। "তন্মধ্যে অপরা কি—? তাহা বলা হইতেছে—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ এই চারিটি বেদ। শিক্ষা কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয়টি বেদাঙ্গ; ইহাই অপরা বিদ্যা বলিয়া উক্ত। অতঃপর পরাবিদ্যা কথিত হইতেছে—যাহা দ্বারা সেই বক্ষ্যমাণ বিশেষণ-বিশিষ্ট অক্ষরব্রহ্মকে অধিগত অর্থাৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়। * * (পূর্ব্বপক্ষ) ভাল, পরাবিদ্যা যদি ঋগ্বেদাদির বহির্ভূত-ই হইল তাহা হইলে উহা পরাবিদ্যা এবং মোক্ষসাধনই বা হয় কিরূপে? স্মৃতিকারগণ বলিয়া থাকেন, 'বেদ-বহির্ভূত যে সমস্ত স্মৃতি এবং যে কোনও অসংজ্ঞানোপদেশ উপেক্ষণীয়, তৎসমস্তই অসদুপদেশ—সুতরাং নিষ্ফল; নিষ্ফলত্ব হেতুই অগ্রাহ্য হইয়া থাকে, এবং এই ভাবে উপনিষদ্ সমূহেরও ঋগ্বেদাদি ব্যাহত হইতে পারে। আর ঋগ্বেদাদির অন্তর্গত হইলে "অথ পরা" বলিয়া পৃথক্ ভাবে নির্দ্দেশ করিবারও কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না, (উত্তরপক্ষ) না—পৃথক্ নির্দ্দেশ নিরর্থক হয় না, কারণ বিজ্ঞেয় বিষয়ের বিজ্ঞান বা সাক্ষাৎকারই এখানে বিবক্ষিত, অর্থাৎ উপনিষদ্-বেদ্য যে অক্ষর ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান তাহা এখানে 'পরা বিদ্যা' বলিয়া প্রধানতঃ বিবক্ষিত হইয়াছে কিন্তু উপনিষদের শব্দ সমূহ নহে। পক্ষান্তরে, বেদ শব্দে কিন্তু সর্ব্বত্রই কেবল—শব্দ সমূহমাত্র বিবক্ষিত হইয়াছে, কেবল শব্দসমূহ অধিগত হইলেও গুরু সমীপে গমনাদিরও প্রযত্ন এবং বৈরাগ্যলাভ ব্যতীত যে অক্ষরব্রহ্ম প্রাপ্তির সম্ভবই হয় না ইহার প্রতিপাদনার্থই ব্রহ্মবিদ্যার পৃথক্করণ এবং পরাবিদ্যা নামকরণ হইয়াছে।"—দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।

বেদ ও বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ, "ভাববার কথা" নামক গ্রন্থে হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ নামক প্রবন্ধে বেদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। "শাস্ত্র" শব্দে অনাদি অনন্ত বেদ বুঝায়। ধর্মশাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম। পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতি-শব্দবাচ্য; এবং তাহাদের প্রামাণ্য—যে পর্য্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্য্যন্ত। 'সত্য' দুই প্রকার। (১) যাহা মানব-সাধারণ পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গ্রাহ্য। (২) যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য। প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে বেদ বলা যায়। বেদ নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান, সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং যাহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন। এই অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম ঋষি ও সেই শক্তির দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন, তাহার নাম 'বেদ'। এই ঋষিত্ব ও বেদদ্রষ্টৃত্ব লাভ করাই যথার্থ ধর্মানুভূতি। যত দিন ইহার উন্মেষ না হয়, তত দিন 'ধর্ম' কেবল 'কথার কথা' ও ধর্মরাজ্যের প্রথম সোপানেও পদস্থিতি হয় নাই, জানিতে হইবে। সমস্ত দেশ-কাল-পাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন অর্থাৎ বেদের প্রভাব দেশ-বিশেষে কাল-বিশেষে পাত্র-বিশেষে বদ্ধ নহে। সার্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র বেদ। অলৌকিক জ্ঞান বেতৃত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস-পুরাণাদি পুস্তকে ও ম্লেচ্ছাদি দেশীয় ধর্মপুস্তক সমূহে যদিও বর্ত্তমান, তথাপি অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ এবং অবিকৃত সংগ্রহ বলিয়া আর্য্যজাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ 'বেদ' নামধেয় চতুর্বিভক্ত অক্ষররাশি সর্বতোভাবে সর্ব্বোচ্চ স্থানের অধিকারী। সমগ্র জগতের পূজার্হ এবং আর্য্য বা ম্লেচ্ছ সমস্ত ধর্ম্মপুস্তকের প্রমাণ-ভূমি। আর্য্যজাতির আবিষ্কৃত উক্ত বেদ নামক শব্দরাশির সম্বন্ধে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তন্মধ্যে যাহা লৌকিক, অর্থবাদ বা ঐতিহ্য নহে, তাহাই 'বেদ'। এই বেদরাশি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত। কর্ম্মকাণ্ডের ক্রিয়া ও ফল, মায়াধিকৃত জগতের মধ্যে বলিয়া দেশ-কাল-পাত্রাদি নিয়মাধীনে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে।"

এখানে আর এক জন প্রাচীন ব্রাহ্ম নেতার মন্তব্যও দ্রষ্টব্য। শ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋগ্বেদ সংহিতার যে অনুবাদ তৎকালীন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আরম্ভ মাত্র করিয়াছিলেন, তাহার ভূমিকায় বলেন যে অপরা বিদ্যার প্রয়োজন না থাকিলেও ব্রহ্মবিদ্যাপর বেদ বুঝিবার জন্য অনুবাদ কার্য্য তিনি আরম্ভ করেন।

ষড়ঙ্গ বেদ

বেদ বুঝিবার জন্য ৬টি অঙ্গ আছে, (১) শিক্ষা-স্বরবোধক শাস্ত্র, (২) কল্প—যজ্ঞাদি বিধিপ্রদর্শক গ্রন্থ, (৩) ব্যাকরণ—প্রত্যক্ষ শব্দাদির শাসক, (৪) নিরুক্ত—বেদের অর্থবোধের জন্য নিরপেক্ষ ভাবে পদবৃন্দের সমাবেশ দ্যোতক শাস্ত্র, (৫) ছন্দস্—অনুষ্টুপ প্রভৃতি ছন্দবিজ্ঞাপক এবং (৬) জ্যোতিষ—কালাদি বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ক গ্রন্থ (৬)।

ছন্দ

শৌনক ও কাত্যায়নের উপক্রমণী গ্রন্থে প্রত্যেক ঋক্ সূক্তের ঋষি, দেবতা ও ছন্দ লিখা আছে। এই ছন্দ প্রধানতঃ সাতটি—গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী। আর এক প্রকার ৭টি অতিছন্দ আছে,—অতিজগতী, শক্করী, অতিশক্করী, অষ্টি, অত্যষ্টি, ধৃতি, অতিধৃতি। অপর প্রকার সাতটি ছন্দ—কৃতি, প্রকৃতি, আকৃতি বিকৃতি, সংকৃতি, অতিকৃতি, উৎকৃতি, ইহাদের আবার প্রত্যেকের বিভাগ আছে।

বেদবিভাগ

ঋগ্বেদ সংহিতায় দুই প্রকার বিভাগ দেখা যায়। ইহাদের নির্দ্দিষ্ট কোনও লক্ষণ নাই। স্বাধ্যায় সম্প্রদায় ভেদেই ইহাদের প্রসিদ্ধি। প্রথম বিভাগের নাম অতি প্রাচীন; ইহা মণ্ডল, অনুবাক্ ও সূক্ত নামে পরিচিত। দ্বিতীয় বিভাগের নাম অনতিপ্রাচীন; ইহা অষ্টক, অধ্যায় ও বর্গে বিভক্ত। সমগ্র ঋগ্বেদ সংহিতায় ৮ অষ্টক, ৬৪ (৮+৮) অধ্যায় এবং ২০০৬ বর্গে বিভক্ত। প্রায় ৩৩ বর্গে এক অধ্যায় এবং ৫ মন্ত্রে এক বর্গ হয়। ইহার ব্যতিক্রমও আছে। ঋক্ সংখ্যা ১০৫৮০ পাদকে পারায়ণ বলে।

বহুঋষিদৃষ্ট অনেকগুলি ঋক্মন্ত্র যখন কোন এক ঋষির দ্বারা সংগ্রহীত হইয়া নিবদ্ধ হয়, তাহার নাম মণ্ডল। ঋগ্বেদ সংহিতায়

৬। বেদের অপরাপর অবান্তর বিভাগ—(১) ইতিহাস (প্রাচীন ঘটনা) (২) পুরাণ (পূর্ব্বাবস্থা) (৩) কল্প (কর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য), (৪) গাথা প্রশংসা ও গান যোগ্য সন্দর্ভ এবং (৫) নারাশংসী মনুষ্য বৃত্তান্ত বোধক সন্দর্ভ), প্রমাণ ছা উ ৭।১৩। শতপথ ব্রাঃ ১৩।৪।৩।১২।১৩। তৈঃ সংহিতা ৫।১।৮।২। ঐঃ ব্রাঃ ৭।২।১। গোপথ ব্রাঃ ১।২।১

১০টি মণ্ডল, ৮৫ অনুবাক ১০১৭টি সূক্ত আছে। নিরাকাঙ্ক্ষ ছন্দোময় ঋষিবাক্যের নাম সূক্ত। সূক্ত তিন প্রকার—ঋষি, দেবতা ও ছন্দঃ। একই ঋষি, পর পর যে সব সূক্ত রচনা করেন, যেমন মধুচ্ছন্দা ১ম অষ্টকের কুড়ি বর্গ পর্য্যন্ত পর পর রচনা করেন, তাহাকে ঋষিসূক্ত বলে। কুড়ি বর্গের পর অপর ঋষি আরম্ভ করিলেন, মধুচ্ছন্দার পুত্র জেতৃ মাধুচ্ছন্দা। একই সূক্তের অন্তর্ভুক্ত যে মন্ত্রগুলি যে দেবতা সম্বন্ধীয় তাহাকে দেবতা-সূক্ত বলে। একই ছন্দে পর পর যে কয়টি সূক্ত লিখিত তাহারা ছন্দঃসূক্ত। যেমন ১ম অষ্টকে ১ম হইতে ১৮শ বর্গ পর্য্যন্ত একই গায়ত্রী ছন্দে লিখিত।

ঋষি, দেবতা ও সূক্ত-লক্ষণ

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূক্ত বলেন, শতর্চী ঋষিগণ (মধুচ্ছন্দা অগস্ত্যাদি) শতর্চী=১০০ ঋক্ যিনি রচনা করেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মধুচ্ছন্দা ব্যতীত আর কেহ ১০০ ঋক্ রচনা করেন নাই, মধুচ্ছন্দা ১০২ ঋক্ রচনা করেন। প্রথম মণ্ডলের সংগ্রাহক মধুচ্ছন্দা, দ্বিতীয় মণ্ডলের গৃৎসমদ, তৃতীয় মণ্ডলের বিশ্বামিত্র, চতুর্থ মণ্ডলের বামদেব, পঞ্চম মণ্ডলের অত্রি, ষষ্ঠ মণ্ডলের ভরদ্বাজ, সপ্তম মণ্ডলের বশিষ্ঠ, অষ্টম মণ্ডলের প্রগাথ (কাণ্ব) নবমের পাবমান্য (অঙ্গিরা), দশম মণ্ডলের ক্ষুদ্র সূক্ত ও মহাসূক্তীয় ঋষিগণ। শৌনককৃত বৃহদ্দেবতায় সূক্ত-লক্ষণ পাওয়া যায়। ১০ ঋকের অধিক মহাসূক্ত, ১০ ঋকের কম হইলে ক্ষুদ্র সূক্ত (১)। নিরুক্তকার যাস্ক, দেবতা শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা যো দেবঃ সা দেবতা" (৭।১৫) দান বা দীপন হেতু যিনি স্বর্গস্থানীয় হন, তিনিই দেব ও দেবতা।

একণে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সংকলিত বিশ্বকোষে ঋগ্বেদ সংহিতায় নানাবিধ আলোচ্য বিষয় যাহা সংক্ষেপে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন, তাহা পাঠকদের ইতিহাসের দিক্ হইতে বুঝিবার সুবিধার জন্য এখানে বিবৃত করিব। অবশ্য এ বিষয়ে আমাদের বেদের অপৌরুষেয়ত্বের উচ্চভাব হইতে নামিয়া আসিয়া মন্ত্রগুলি কোন কালে ঋষি-রচিত বলিয়া ধরিয়া লইয়া ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিতে হইবে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ঋগ্বেদের অনুবাদে ও শ্রীযুক্ত অবিনাশ দাস মহাশয়ের "ঋগ্বেদিক কালচার" (Rigvedic Culture) নামক গ্রন্থে ইহার যথাযথ মন্ত্র নির্দ্দেশ দেখিতে পাই।

১।

মণ্ডল	অনুবাক্	সূক্ত
১ম	২৪	১৯১
২ "	৪	৪৩
৩ "	৫	৬২
৪ "	৫	৫৮
৫ "	৬	৮৭
৬ "	৬	৭৫
৭ "	৬	১০৪
৮ "	১০	৯২ এবং ১১টি বালখিল্য সূক্ত
৯ "	৭	১১৪
১০ "	১২	১৯১
মোট	৮৫	১০২৮

ঋগ্বেদের সমাজ ও সভ্যতা

ঋগ্বেদ সংহিতায় অগ্নির স্তোত্রই সর্বাপেক্ষা অধিক, অগ্নি পার্থিব দেবতা। ইনি দেবতা ও মানুষের মধ্যবর্ত্তী। অগ্নির সাহায্যেই দূরস্থ অপরাপর দেবতারা আহূত হন। অগ্নির পরেই ঋগ্বেদে ইন্দ্র স্তোত্রের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্র অতি শক্তিশালী, তিনি মেঘচালক ও বজ্রী। মেঘ হইতে বৃষ্টি হইলেই ধরা শস্যশালিনী ও সমৃদ্ধিশালিনী হয়। ইন্দ্র বৃষ্টিকর্ত্তা। বৃত্রাসুরের যুদ্ধ ব্যাপার ও মেঘ বৃষ্টি বজ্রপাত প্রভৃতি বর্ণনাসূচক অনেক ঋক্ আছে। উষার স্নিগ্ধ মধুর কনক কিরণ দেখিয়া আর্য্যগণের হৃদয়ে যে কোমল কবিত্ব ভাবের সঞ্চার হইত এবং তাহারা যে ভাবে গলিয়া উষার সেই তরুণ সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া পদ্য লিখিতেন, ঋগ্বেদে তাহার যথেষ্ট পরিচয় আছে, এ সম্বন্ধে কাব্য-সুধারসময়-বহুল ঋক্ দেখিতে পাওয়া যায়। উষা সূর্য্যের আগমন সূচনা করেন, সূর্য্য অন্ধকার বিনষ্ট করেন, আলোক প্রদান করেন, আত্যন্তিক শৈত্য বিনষ্ট করিয়া জীব-শক্তিকে কর্মে প্রবর্ত্তিত করেন, সূর্য্যদ্বারা শস্যবীজ অঙ্কুরিত হয়, সূর্য্যই প্রাণশক্তির মূল নিদান ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক বলিয়া আর্য্য ঋষিগণ সূর্য্যের বহুল স্তোত্র করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মিত্র, বরুণ, অশ্বিদ্বয়, বিশ্বদেবগণ, সরস্বতী, সুনৃতা, মরুদ্গণ, অদিতি ও আদিত্যগণ, ঋভুগণ, ব্রহ্মণস্পতি, সোম, ঋভুগণ, ত্বষ্টা, ইন্দ্রাণী, হোতা, পৃথিবী, বিষ্ণু, পৃশ্নি, নদী, জল, যম, পর্জ্জন্য, অর্য্যমা, পূষা, রুদ্রগণ, বসুগণ, উশনা, ত্রিত, বৈশ্বানর, মাতরিশ্বা, ইলা, আপ্রী, রোদসী অহির্বুধ্ন্য, অজ, একপাৎ, ঋভুক্ষা, রাকা, সিনীবালী ও গঙ্গু প্রভৃতি দেবগণের স্তোত্র আছে। কৃষিকার্য্য, মেষ পালন, দেশ ভ্রমণ, বাণিজ্য ও সমুদ্র-গমন (ঋ বে ১।১১৬।৩, ৪।৫৫।৬, ১।২৫।৭), নদ্যাদির ভৌগোলিক বিবরণ, ঋক্, সৌরবৎসর, চান্দ্রবৎসর, দেবগণের গাভী ও অশ্ব, পঞ্চকৃষ্টি, প্রাচীন কালের মানুষের পরমায়ু (শত বৎসর), অবিবাহিতা কন্যা, (বিবাহে স্বাধীনতা), তন্তুবায় ও বস্ত্রনির্মাণ, নাপিত, বর্ম, শিরস্ত্রাণ, তনুত্রাণ, বাদ্যযন্ত্র, (দ্যূতক্রীড়া), অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধ, সর্পের উৎপাত ও সর্পের মন্ত্র, পক্ষীর অমঙ্গল ধ্বনির মন্ত্র, সূর্য্যের দৈনিক গতি, শস্যাদির বিবরণ, খদির ও শিশু-কাষ্ঠের গাড়ী, রথনির্ম্মাতা শিল্পী, সুবর্ণ সজ্জাবিশিষ্ট অশ্ব, যুদ্ধের অশ্ব, সাম্রাজ্য (ঋ বে ১২৫।১০), অমাত্য-বেষ্টিত গজস্কন্ধে আরূঢ় রাজা, প্রস্তরনির্মিত নগর, (লৌহ নগর, সহস্র স্তম্ভযুক্ত প্রাসাদ), সরযূর পূর্ব্বদিকে আর্য্যরাজ্যের বিস্তার ও আর্য্যরাজগণের যুদ্ধ দেখা যায়। দৃষদ্বতী অপয়া, যমুনা, রসা, কুভা, সরস্বতী, পারুষ্ণী, অনিতভা, সিন্ধু, গোমতী, হরিযুপিয়া বা যব্যাবতী, বিপাশা ও শতদ্রু নদী, শর্য্যনাবতী জহ্নুকন্যা বা জাহ্নবী, আর্জিকীয়া নদীর নামোল্লেখ দেখা যায়। অনার্য্য বর্বর জাতি, কীকট দেশের বর্বরগণ, সূর্য্যগ্রহণ, ঐশ্বরিক বলের একতা, একেশ্বরের অনুভব, সর্পনাগের কথা, দিতি ও অদিতি, স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, ঋষিগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঋষিগণের সংসার ও যুদ্ধ ব্যাপারে প্রবৃত্তি, ঋষিগণের বংশানুক্রমে মন্ত্র রক্ষা, মুদ্রার প্রচলন, লৌহ কলস, স্বামীর সহিত নারীর যজ্ঞ সম্পাদন দেখা যায়।

ধর্ম ও সমাজে নারীর স্থান

ঋগ্বেদ সংহিতার নিম্নলিখিত স্থানগুলি দেখিলেই তৎকালীন নারীর সামাজিক ও ধর্মকার্য্যে স্থান নির্দ্দেশ হইবে।—রাণী ঘোষা ঋষির

প্রাপ্ত হন (১।১১৭/১০।৩৯,৪০); লোপামুদ্রাও ঋষি (১।১৭৯); মমতা (৬।১০।২); অপলা (৮।৯১); সূর্য্যা (১০।৮৫)। ইন্দ্রাণী ১০।১৪৫ ; শচী ১০।৫৯ ; সর্পরাজ্ঞী ১০।১৮৯ ; বিশ্ববারা ৫।২৮—ইনি যজ্ঞে পৌরোহিত্য করেন ৫।২৮।১ ; আপলা ইন্দ্রকে সোম নিবেদন করেন ৮।৮১।৪ ; রাজা খেলের রাণী বিশ্পলা যুদ্ধ করিতে গিয়া পা নষ্ট হওয়ায় লৌহ পদ গ্রহণ করেন ১।১১২।১০ ১।১১৬।১৫/ ১।১১৭।১/১।১১৮।৮/১০।৩৯।৮ ; ঋষি মুদ্গলের সহধর্মিণী ইন্দ্রসেনা স্বামীকে পরাজিত দেখিয়া দস্যুদের সহিত নিজে ধনুর্বাণ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন। তিনি যুদ্ধে স্বামীর সারথ্য কর্ম করিতেন ১০।১০২। অবশ্য অসৎ নারীর কথাও বহু স্থলে ১।১৬৭।৪/২।২৯।১/১।১২৪।৭ দেখা যায়।

তা ছাড়া বিবাহ সময়ে বরের বেশ, ধাতু গালান, কর্মকারের ভস্ত্রাযন্ত্র, ত্রিধাতুর গৃহ, দশযন্ত্র উৎস, দধি সুরা প্রভৃতি রাখিবার চর্মাধার, হিরণ্ময় কবচ, বিবিধ আভরণ, ভায়া রহিত ও নাসিকা-রহিত অনার্য্যদের বিবরণ। যুদ্ধে অশ্ব ব্যবহার, গোচর্ম দ্বারা আবৃত যুদ্ধরথ, যুদ্ধ দুন্দুভি, নদীকূল ও উর্বরা ভূমি লইয়া বিবাদ, মরুভূমি, ভেকস্তুতি, সারমেয় স্তুতি, পর্বত, নদী, বৃক্ষ, গো ও অশ্ব প্রভৃতির স্তুতি, সর্পবিষের মন্ত্র, সুদাস রাজার বিবরণ, যুদ্ধাস্ত্র ও আয়োজন, স্বর্গ ও অমরত্ব লাভ, কৃষ্ণ নামক অনার্য্য যোদ্ধা, সোমরস প্রস্তত করার পদ্ধতি, বিবিধ বৈদিক উপাখ্যান, সমুদ্র মন্থনে অমৃত লাভ, গরুত্মান্ কর্তৃক অমৃত আহরণ, অমৃত পানে দেবগণের অমরত্ব, নবম মণ্ডলের শেষভাগে ঋতুর বর্ণনা, যমযমীর জন্ম, যমযমীর কথোপকথন, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্র, পুণ্যাত্মা পূর্বপুরুষগণের স্বর্গে বাস ও যজ্ঞভাগ গ্রহণ, সত্যের সম্মান, পঞ্চজন বাসের কথা, স্তোতা, বৈদ্য, সূত্রধার, কর্মকার প্রভৃতির ভিন্ন ব্যবসায়, কন্যার বিবাহে অলঙ্কার দান, মৃতের অগ্নি সৎকার, মৃতদেহ মৃত্তিকায় স্থাপন, কূপ খনন, পশুচারণ, মেষ-লোমের বস্ত্র বয়ন, সিংহ, হরিণ, বরাহ, শৃগাল, শশক, গোধা, হস্তী ও সর্পাদির উল্লেখ, সংসারী ঋষিদের সম্পত্তি, সৃষ্টির কথা, প্রাচীন-কালে আর্যদের নিবাসস্থান, শোক প্রকাশের প্রথা, ভাষার আলোচনা, ছন্দঃ-জ্যোতিষের কথা, সপত্নীগণের উপর প্রভুত্বলাভের মন্ত্র, গর্ভ সঞ্চারের এবং গর্ভরক্ষার মন্ত্র, রোগারোগ্যের ও অমঙ্গল নাশের মন্ত্র, পেচক ডাকের অমঙ্গল নাশক মন্ত্র, রাজ্যাভিষেকের মন্ত্র ইত্যাদি নানাবিধ সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, গৃহ্য ও ধর্মবিষয়ক বিষয় অল্পবিস্তর ঋগ্বেদে দেখা যায়।

তাঁহারা পুত্র-পৌত্রাদির সহিত একত্রে এক অন্নে বাস করিতেন ১।১১৪।৬। সকল পুত্র পিতৃধনের অধিকারী হইতেন ২।১৭।৭। পুত্র পৈত্রিক ক্রিয়ার অধিকারী এবং দুহিতা সম্মানিতা হইতেন ৩।৫।১২। পুত্র না থাকিলে দৌহিত্র পুত্ররূপে গৃহীত হইত ৬।৩১।১। কন্যার অধিক বয়সে বিবাহ ১০।৮৫।২২। মনোমত পতিবরণ ১০।২৭।১২। পতিগৃহে যাইবার কালে উপঢৌকন ১০।৮৫।২০। রথে চড়িয়া ভ্রমণ ১।১৬৬।৫। পত্নীই গৃহকর্ত্রী ১০।৮৫।২৭/১০।৪৫।৪৬। পুরুষের বহু বিবাহ ১।১০৫।৮ এবং নারীর দেবৃ বিবাহ ১০।৪০।২ এবং বহু বিবাহ চলিত থাকিলেও এক বিবাহই ১।১০৫।২ প্রধান ছিল। রাজা ১।৪০।৮/১।১১৬।১, পুরপতি ১।১৭৩।১০, গ্রামণী ১০।৬২।১১ প্রভৃতি উচ্চপদ, করধার্য্য ১।৭০।৫, রাজশাসন প্রণালী ১।১২৬, অনুত্যবেষ্টিত গজস্কন্ধে রাজা ৪।৪।১, স্বর্ণ সজ্জাবিশিষ্ট অশ্ব ৪।২।৮, যুদ্ধাশ্ব ও অশ্বারোহী সৈন্য ৪।৩৮।৬, রাজস্তুতি ১।২৭।১২, রাজসংহতি ১০।৯৭।৬, ঋষিগণই যোদ্ধা ৬.২০।১, রাজকন্যাদের সহিত ঋষিদের বিবাহ ৫।৬১।৮, বীর পুরুষের আদর ১।৩১।৬।

সমাজ বিভাগ, পূর্ত্ত বিভাগ, যুদ্ধোপকরণ

সমাজের তিন শ্রেণী—উৎকৃষ্ট, মধ্যবিত্ত ও নিকৃষ্ট ৪।২৫।৮; ধনী ও দরিদ্র ১০।১১৭; বাণিজ্য ১।৭৯।১। পুরোহিত, কবি, বৈদ্য, ছুতার, কামার, নাপিত, কাঠুরিয়া, রথকার, যব মাড়িবার জন্য স্ত্রীলোক, ধাতু ও অস্ত্রাদি নির্মাণকারী ব্যক্তি, পোত নির্মাতা, কশাই, অশ্বের গাত্র ধৌতকারী ১।১৩৫।৫/৪।২।১৪/৪।১৬।২০/৫।১০২।৮। পুর ও গ্রাম ১।৪৪।১০/১।৪১।৪/১।১২৯।১/১০।১৪৬।১; লৌহ-নির্মিত নগর ৭।৩।৭/৭।১৫।১৪; প্রস্তর-নির্মিত শত সংখ্যক পুরী ৪।৩০।২১; সহস্র দ্বার ও সহস্র স্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকা ১।১১৬।৪/২।৪১।৫/৭।৮৮।৫; শতদ্বারবিশিষ্ট যন্ত্রগৃহ ১।৫১।৩; ইষ্টক শুক্ল যজুঃ ১৩।৩১; যাতায়াতের সুন্দর রাস্তা ১।৫৮।১; পার্বত্য পথ ১।১১৬।২০; পান্থনিবাস ১।১১৬।৯ শকট (১।৩০।১৫); খদির বা শিশু কাষ্ঠনির্মিত (৪।৫৩।১৯); সারথির বসিবার স্থান (১৬৪।১); অশ্বদ্বয়-যোজিত রথ (১।৯৪।১); ত্রিবন্ধ যুক্ত ও ত্রিকোণ রথ (১।৪৭।২); তিনটি বসিবার স্থানযুক্ত ত্রিচক্র যুক্ত ধাতুত্রয়বিশিষ্ট রথ (১।১৮৩।১); স্বর্ণমণ্ডিত ও যুদ্ধার্থ রথ (৫।৬৩।৫); সুবর্ণময় কবচ ও উষ্ণীষ (১।২৫ ১৩/৫।৫৪।১১); লৌহ বর্ম (১।৫৬।৩); তনুত্রাণ, বর্ম, অংসত্রা, দ্রাপি, সুবর্ণ বক্ষাচ্ছাদন (৪।৫৩।৪); যুদ্ধ নিশান (১।১০৩।১১); দুন্দুভি (১২৮।৫); সেনাপতির যুদ্ধযাত্রা (১৩৩৩); যুদ্ধ-বার্ত্তাবহ (৫ ৮৩।৩); যুদ্ধ লুণ্ঠ বিভাগ (১।৭৩।৫)।

রমণীর অলঙ্কার-প্রীতি (১।৮৫।১); নিষ্ক (২।৩৩।১৯); অঞ্জি, বাসি, স্রক, রুক্ম, খাদি (গয়না) (৫।৫৩।৪), হিরণ্যকর্ণ (কাণ), মণি (গ্রীবায়) (১।১২২।১৪); মুক্তা (১০।৬৮।১১); নিষ্ককার (সেকরা) (৮।৪৭।১৫)। বাদ্য যন্ত্র বাণ (১।৮৫।১০), ক্ষোণী (২।৩৪।১৩), কর্করি বীণা প্রভৃতি, নর্ত্তকী (১।৯২।৪); পুতুল নাচ (৪।৩২।২৩); ঊর্ণা, মেষ লোম, চর্ম ও বল্কলের বস্ত্র-রূপে ব্যবহার ও স্ত্রীলোকের বস্ত্র বয়ন (২।৩৮।৪); টানা পোড়েন (২।৩।৬)। দধি সূক্ত, ভূষ্টযব, পিষ্টক (৩।৫২।৬); ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, মধু, অপূপ, পক্বফল, শাক, ক্ষীর প্রভৃতি অন্ন স্ত্রীলোকেরা রন্ধন করিতেন। মহিষ মাংস (৫।২৯।৭), বরাহ (৮।৭৭।১০), গাভী, (১০।৭৯।৬), বৃষ (১০।৮৬।১৪) এবং ঐ সকলের নিষেধ (৮।১০১।১৫/৮।৯০।১৬) শুক্ল যজু (১৩।৪৩/১৩।৪৯); অথর্ব কাণ্ড (১০।১০/১০) কা। ১ সূ। ২৯ মন্ত্র (/৮.৩।২৫/৪ ২১); পশুবলি (১৩১।১৫); সুরা (১ ১১৭।৭); চর্মপাত্র (১।১৯১।১০)।

চুক্তি (৪।৪২।৯); মুদ্রা (৫।২৭।২)। চাষ (১০।১১।১); কূপুল (মরাই) (১০৬৮।৩)। পালিত পশু, গো, অশ্ব, বড়বা, হস্তী, উষ্ট্র, মেষ, কুক্কুর। সূর্য্যের দৈনিক গতি (১।১২৩।৪), দ্বাদশ অরা (রাশি), উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, প্রাচীন মাস ও ঋতু (১।১৬৪); আকর্ষণ শক্তি (১।৮৫।১—১১। ঔষধী (৪।৩৩।৭/৪।৫৭।৩)।

ঋক্ সংহিতায় যুগ নাই; কৃত, ত্রেতা ও দ্বাপর শুক্ল যজুঃ ৩০।১৮ মন্ত্রে আছে। নরকও ঋক্ সংহিতায় নাই; অথর্ব বেদে ১২।৪।৩৬ মন্ত্রে "নারক" শব্দ আছে। পুরুষ সূক্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান সংগ্রহ মাত্র ঋগ্বেদের সংহিতা ভাগ হইতে। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ বা শ্রৌত-সূত্র গ্রন্থ বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। তথাপি পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য আমরা নিম্নে সর্ববেদীয় ব্রাহ্মণাদি বিভাগ সংক্ষেপে উপস্থাপিত করিতেছি।

ব্রাহ্মণ

ঋগ্বেদে দুইখানি ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ আছে—১। ঐতরেয় বা বহ্বৃচ, এবং সাঙ্খ্যায়ন বা কৌষীতকি। আরণ্যক গুলিরও এই দুই নাম। ঋগ্বেদীয় উপনিষৎ—কৌষীতকি, ঐতরেয়, বাস্কল, মৈত্রায়ণী প্রভৃতি অনেক। ঋগ্বেদীয় শ্রৌতসূত্রের মধ্যে—১। আশ্বলায়ন ও শাঙ্খ্যায়ন মাত্র পাওয়া যায়। ঋগ্বেদীয় সূত্রের অপর বিভাগ গৃহ্যসূত্র, বিষয়—বিবাহ, গর্ভাধান, জাতকর্ম, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বর্ণাশ্রম ধর্ম শ্রাদ্ধাদি দশ কর্মের বিধান। ঋগ্বেদের শৈশিরীয়, বাস্কল, সাংখ্য, বাৎস্য ও আশ্বলায়ন শাখার মাত্র একখানি ব্রাহ্মণ ঐতরেয় এবং কৌষীতকি প্রভৃতি ষোড়শ শাখার ব্রাহ্মণ কৌষীতকি (মতান্তরে শাকলা ও মাণ্ডুক্য) বা সাংখ্যায়ণ (শাকল শাখা), যজুর্বেদীয় মৈত্রায়নী প্রভৃতি ঊনবিংশ চরকাধ্বর্য্যু শাখার একখানি ব্রাহ্মণ মৈত্রায়নী বা অধ্বর্য্যু পাওয়া যায়। বাজসনেয়াদি (শুক্ল যজুর্বেদীয়) সপ্তদশ শাখার একখানি ব্রাহ্মণ বাজসনেয়ক বা শতপথ পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয়াদি (কৃষ্ণ যজুর্বেদীয়) ছয় শাখায় মাত্র একখানি ব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয় পাওয়া যায়। সামবেদের বর্ত্তমানে জৈমিনি, কৌথুম (কাশী, কান্যকুব্জ, গুর্জর, নাগর ও বঙ্গে প্রচলিত) ও রাণায়নীয় (দ্রাবিড়ে প্রচলিত) শাখা অধীত হয়। এই তিন শাখার একখানি ব্রাহ্মণ ছান্দোগ্য এবং ইহার আরও আটখানি ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়—সামবিধান, মন্ত্র, আর্ষেয়, বংশ, দৈবতাধ্যায়, সংহিতোপনিষৎ, তলবকার ও তাণ্ড্য। অথর্ববেদীয় একখানি ব্রাহ্মণের নাম মন্ত্র-ব্রাহ্মণ (?)। অপরখানি গোপথ ও মতান্তরে আর একখানি মাণ্ডুক্য (?)।

শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্র

সামবেদীয় শ্রৌত সূত্র—মাশক, ল্যাট্যায়ন, দ্রাহ্যায়ণ, অনুপদ এই কয়খানি মুখ্য, এবং নিদান, পুষ্প (ফুল্ল), সামতন্ত্র, পঞ্চবিধি, প্রতিহার, তাণ্ড্যলক্ষণ, উপগ্রন্থ, কল্পানুপদ অনুস্তোত্র, ক্ষুদ্র, এই কয়খানি গৌণ এবং গৃহ্য সূত্রের মধ্যে—গোভিল, খাদির, পিতৃমেধ, গৌতম-ধর্ম সূত্রই প্রচলিত। তাহা ছাড়াও বিবিধ পদ্ধতি ও পরিশিষ্ট গ্রন্থ আছে।

যজুর্বেদীয় শ্রৌতসূত্র—কঠ, মানব, লৌগাক্ষি ও কাত্য, বৌধায়ন, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব বা সাময়াচারিয়, হিরণ্যকেশী, বাধুল ও বৈখানস। গৃহ্যসূত্রগুলিও ইঁহাদের রচিত। ইহা ছাড়া কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় বহুশুল্ব (জ্যামিতি) ও ধর্ম (প্রচলিত স্মৃতি) সূত্র আছে। মৈত্রায়নীয় যজুর্বেদ-পদ্ধতি, প্রাতিশাখ্য সূত্র ও অনুক্রমণিকা গ্রন্থ এই সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য। যজুর্বেদ সংহিতা কৃষ্ণ ও শুক্ল ভেদে দ্বিবিধ। অথর্ববেদীয় প্রাতিশাখ্যের নাম—শৌনকীয়া, চতুরধ্যায়িকা এবং সূত্রগ্রন্থ বৈতান সূত্র, কৌশিকসূত্র ইত্যাদি। অথর্ববেদের শাখা—তোদ, মৌদ্গল, শৌনক, জাজল, পিপ্পলাদ, জলদ, ব্রহ্মবদ, দেবদ, কৌশিক। ইহার অধিকাংশই লুপ্ত হইয়াছে।

চতুর্বেদীয় উপনিষদের প্রাচীনত্বের প্রমাণ, "জীবকোপনিষদ্বাবৌপম্যে" (পাণিনি ১।৪।৭৯)। ভট্টোজী দীক্ষিত তাঁহার সিদ্ধান্তকৌমদী গ্রন্থে ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "উপনিষদ তুল্য গ্রন্থ রচনা করিয়া কেহ কেহ জীবিকা অর্জ্জন করিতেন।" ইহাতে বুঝা যায়, পাণিনির কালেও কৃত্রিম উপনিষৎ ছিল। উপনিষদের সূত্রগ্রন্থ বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে প্রমাণ—"পারাশর্য্যসিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ—" পাণিনি ৪।৩।১১০। পরাশর তনয়ের ভিক্ষুসূত্র নিশ্চিত ব্যাসরচিত বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্র। শুক্লযজুর্বেদীয় মুক্তিকোপনিষদে অষ্টোত্তর শত উপনিষদের উল্লেখ পাওয়া যায়। আডয়ার পুস্তকালয়স্থ পণ্ডিতগণ, আরও একাত্তর খানি উপনিষদের সন্ধান পাইয়াছেন এবং Government Oriental Manuscripts Library, Madras হইতে বহু পাণ্ডুলিপি দর্শন করিয়াছেন। বেদের ব্রাহ্মণাংশের প্রতিশাখায় যদি একখানি করিয়াও উপনিষৎ থাকে তাহা হইলেও বহু উপনিষৎ এখনও অপ্রাপ্ত। পরন্তু আচার্য্য শংকর—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর কৌষীতকি নৃসিংহতাপনীয়, জাবাল ও মহানারায়ণ উপনিষৎ প্রমাণ হিসাবে ভাস্য মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। এবং আচার্য্য রামানুজ ইহা ছাড়া আরও পাঁচখানি গ্রহণ করিয়াছেন—গর্ভ, চূলিক, মৈত্রায়ণী, মহা ও সুবাল।

উপনিষৎ শব্দ যাস্কেও পাওয়া যায়। "যত্র সুপর্ণা" ঋ বে অ ২।২।২৮।১ ব্যাখ্যা কালে তিনি বলেন "ইত্যুপনিষদ্বর্ণোভাতি" নিরুক্ত ৩।২।৬। দুর্গাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, "ময়া জ্ঞানমুপগম্য যতো গর্ভজন্মজরামৃত্যবো নিশ্চয়েন সীদন্তি। সা রহস্যং বিদ্যা উপনিষদিত্যুচ্যতে। উপনিষদ্ ভাবেন বর্ণ্যতে ইতি উপনিষদ্বর্ণঃ।"

[অতঃপর ঋগ্বেদ হইতে কি ভাবে ইন্দোউরোপীয় পুরাণের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা আলোচিত হইবে।]

[ক্রমশঃ

ছোটদের আসর

স্বাধীন বাংলার শেষ হিন্দুরাজ

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

হিন্দু-মুসলমান বাংলার মাটিতে বাস করছে আজ প্রায় সাত-আটশ' বছর। এত কাল ধরে বাস করলেও এদের মনের মিল কস্মিন্‌কালেও নেই। এখন যেমন গান্ধী-জিন্নার মিলন পত্র বেরিয়েছে আর তা ছড়ানো হচ্ছে চতুর্দিকে দু' দলের বিবাদ থামাবার জন্য, আগেকার কালে তেমনি বিধিমতো চেষ্টা করতে হোত দু'দলকে থামিয়ে রাখবার জন্য। রাজা সীতারামের আমলে আদেশনামা বেরিয়েছিল—

"শুন সবে ভক্তিভাবে করি নিবেদন।
দেশ গাঁয়েতে যা হইল শুন দিয়া মন॥
রাজাদেশে হিন্দু বলে মুসলমানে ভাই।
কাজে লড়াই কাটাকাটির নাহিক বালাই॥
হিন্দু বাড়ীর পিঠে কাশন মুসলমানে খায়।
মুসলমানের রস পাটালি হিন্দুর বাড়ী যায়॥
রাজা বলে আল্লা হরি নহে দুই জন।
ভজন পূজন যেমন ইচ্ছা করুকগে তেমন॥
মিলে মিশে থাকা সুখ, তাতে বাড়ে বল।
ডরেতে পলায় মগ ফিরিঙ্গীরা খল॥

কিন্তু মনের মিলটাই তো আসল। তা যদি না থাকে, শুধু অনুশাসনে বিশেষ আর কি হবে! তা বলে হিন্দু-মুসলমানে মিল ছিল না কি আদবেই? ছিল বৈ কি। যাঁরা উচ্চ মনোভাবের ছ, যাঁরা ঝগড়া-কোন্দলের ঊর্ধ্বে, তাঁরা হিন্দু হোন বা মুসলমানই হোন্, পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসতেন। সবাই তাঁরা প্রাণপণে যত্ন নিয়েছেন, চেষ্টা করেছেন এক হয়ে থাকবার জন্য। উচ্চবর্ণের হিন্দু-মুসলমানে তখন বিবাহাদিও হয়েছে বিস্তর। কিন্তু তা হলে কি হয়, অন্তরের বিদ্বেষ যাবার নয়।

গোড়াতে সমগ্র বাংলা দেশ হিন্দুদেরই ছিল। বাংলা দেশ তখন আরো বড় ছিল। রাজা ছিলেন হিন্দু, প্রজারাও ছিল হিন্দু। শত শত বৎসর ধরে হিন্দু রাজত্ব চলে আসছিল। কিন্তু চিরকাল এক ভাবে যায় কি? অদল-বদল হয় সব কিছুরই। এমন সব ঘটনা ঘটলো যে, শেষে মুসলমানেরা এসে বাংলায় ঢুকলেন। হিন্দুর সিংহাসন গেল মুসলমানের হাতে। কি করে হিন্দুর রাজ্য মুসলমানের কাছে গেল সে কাহিনী অতি পুরাতন। কাহিনীতে আছে, সতের জন পাঠান এসে হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনের কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নেয়। কথাটা শুনতে কেমনতরো ঠেকে!

মহারাজা লক্ষ্মণ সেন ছিলেন বীরপুরুষ। তিনি কলিঙ্গ জয় করেছিলেন। পুরী, বারাণসী প্রয়াগে তাঁর বিজয়-স্তম্ভ ছিল। গৌড় ছিল তাঁর রাজধানী আর পাঁচটি বড় বড় রাজ্য ছিল তাঁর অধিকারে। এ-হেন রাজার হাত থেকে সতের জন পাঠান রাজ্য নিলে কেড়ে, এ কেমনতরো কথা! এ সম্বন্ধে বাংলার মহা মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,—"সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজী বঙ্গ বিজয় করেন, এ কথা যে বাঙ্গালী বিশ্বাস করে সে কুলাঙ্গার।"

আসলে ব্যাপারটা ছিল এই। মহারাজা লক্ষ্মণ সেন তখন খুব বৃদ্ধ হয়েছেন—বয়স প্রায় আশী বছর। তিনি তাঁর ছেলেদের উপর রাজ্যভার দিয়ে গৌড় থেকে নবদ্বীপে এসে তীর্থবাস করছিলেন। জপ-তপ-পূজা আর পণ্ডিতদের নিয়ে শাস্ত্র আলোচনা, তখন এই ছিল তাঁর কাজ। এই সময় হঠাৎ এক দিন সতের জন পাঠান অশ্বারোহী নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে এসে দেখা দিল। মহারাজার কাছে তারা চাকরী চায়, এই ছলে গঙ্গা পার হয়ে তারা রাজপুরীর দেউড়ীতে গিয়ে রক্ষীদের হঠাৎ আক্রমণ করে বসলো। আরো বেশ এক কাণ্ড সাজা ছিল। এদের সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলিজী সৈন্য-সামন্ত নিয়ে গঙ্গার পশ্চিম তীরে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়েছিলেন এতক্ষণ। সুযোগ বুঝে তিনি এবার এসে এদের সঙ্গে যোগ দিলেন। লক্ষ্মণ সেন তীর্থবাস করছিলেন। এখানে তাঁর সৈন্য-সামন্ত অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই ছিল না তো! নিজে তিনি আশী বছরের বৃদ্ধ। এ অবস্থায় তাঁর এখান থেকে সরে যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল কি? তিনি এক দ্রুতগামী নৌকায় নবদ্বীপ ত্যাগ করে চলে গেলেন। আর এদিকে মুসলমানেরা রটিয়ে দিল যে, তারা বাংলা জয় করে নিয়েছে। কিন্তু রটিয়ে দিলেই তো হোল না। নবদ্বীপ তো রাজধানী নয়—গৌড় হোল রাজধানী। সেখানে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের ছেলে মাধব সেন রাজত্ব করছেন। নবদ্বীপ দখল করে বখ্‌তিয়ার দেখলেন যে তিনি ঠকে গেছেন। এতে বাংলা দেশের কোন অংশই তাঁর অধিকারের ভেতর এলো না। এক জন প্রজাও তাঁর অধীনতা স্বীকার করে নিলে না। পাঠানদের দেখলেই প্রজারা পালিয়ে যেতো। খাবার-দাবার পাওয়াই তাদের পক্ষে দুর্ঘট হয়ে উঠলো। দাম দিলেও তাদের কোন জিনিষ বিক্রী করতো না কেউ। মহা কষ্টে কিছু কাল কাটিয়ে বক্তিয়ার চললেন গৌড় আক্রমণ করতে।

কিন্তু গৌড় অধিকার করা মোটেই সহজ হোল না। অধিকার তো দূরের কথা, নগরে ঢোকাই দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ালো। অনেক দিন অপেক্ষা করে থেকে গুপ্তচর লাগিয়ে নগরে প্রবেশ করবার সন্ধান

বার করে তবে সৈন্যরা ঢুকতে পারলো নগর-সীমানার ভেতর। গৌড় ছিল সুরক্ষিত নগর। এখানে কত সৈন্য-সামন্ত, যুদ্ধের কত সরঞ্জাম। একে চট্ করে অধিকার করলেই তো আর হোল না। লক্ষ্মণ সেনের ছেলে মাধব সেন মহা বিক্রমে বক্তিয়ারকে বাধা দিলেন। যুদ্ধের পর যুদ্ধ। বক্তিয়ার কিছুই করতে পারলেন না। মাধব সেন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন দুর্গের ভেতর থেকে। বক্তিয়ারও দুর্গ ঘেরাও করে রেখে যুদ্ধ করতে লাগলেন। বক্তিয়ার রয়েছেন বাইরে, তাঁর পক্ষে রসদ পাওয়া কঠিন নয়, অন্য সরঞ্জাম পাওয়াও কঠিন নয়। কিন্তু কঠিন সমস্যায় পড়লেন মাধব সেন দুর্গের ভেতর আটকা পড়ে। তাঁর রসদ ফুরিয়ে এলো এবার। এ অবস্থায় কত দিন আর যুদ্ধ চলে! তবু তিনি প্রায় এক বছর ধরে এমন ভাবে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন যে, বক্তিয়ারকে ভয়ানক বেগ পেতে হোল। তার পর রসদ পাওয়া যখন একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল, মাধব সেন তখন নিরুপায় হয়ে দুর্গ ত্যাগ করে চলে গেলেন। বক্তিয়ার এত দিনে গৌড় দখল করবার সুযোগ পেলেন আর পশ্চিম-বঙ্গের অনেক জায়গা তাঁর অধিকারে এলো। কিন্তু এতেও তাঁর বাংলা দেশ জয় করা হোল না, কারণ পশ্চিম-বঙ্গটাই তো আর সমগ্র বাংলা নয়।

ওদিকে মাধব সেন গৌড় ত্যাগ করে গিয়ে উঠলেন পূর্ব্ববঙ্গের একডালা দুর্গে। এই বিরাট একডালা দুর্গটি ছিল ঠিক সেই জায়গায় যেখানে পদ্মা আর ব্রহ্মপুত্র এসে মিলেছে। এই দুর্গ এখন অবশ্য নেই। প্রায় দু'শো বছর হোল নদীগর্ভে চলে গেছে। তখনকার দিনে খুব প্রসিদ্ধ ছিল এই একডালা দুর্গ। এই দুর্গটি ছিল যেমন নিরাপদ, তেমনি দুর্ভেদ্য।

মাধব সেন এখানে থেকে পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করতে লাগলেন। তিনি যখন গৌড় ত্যাগ করে আসেন, গৌড়ের বহু লোক তাঁর সঙ্গে চলে এসেছিল। এখানে তাঁর রাজ্যপাট সমান ভাবেই চললো। বক্তিয়ার গৌড় দখল করে নিয়ে এবার ধাওয়া করলেন পূর্ব্ববঙ্গের দিকে। কিন্তু একডালা দুর্গ আক্রমণ করতে গিয়ে তাঁকে প্রতিহত হয়ে গৌড়ে ফিরে আসতে হোল, বার বার তিনি পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করেন, বার বার হেরে ফিরে আসেন। বছরে একবার তিনি পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমন করতেন আর বর্ষা পড়লেই গৌড়ে ফিরে আসতেন। কিছুতেই আর পেরে উঠলেন না। একডালা দুর্গ অধিকার বা পূর্ব্ববঙ্গ জয় না করেই শেষে তিনি মারা যান। এ হোল ১২০৭ সালের ঘটনা।

মাধব সেন তার পর একাদিক্রমে রাজত্ব করে চললেন পূর্ব্ববঙ্গে। তিনি প্রায় চৌদ্দ বৎসর রাজত্ব করে তাঁর ভাই কেশব সেনের উপর রাজ্যভার দিয়ে হিমালয়ে চলে যান তীর্থ করতে। অনেক ব্রাহ্মণও যান তাঁর সঙ্গে। মাধব সেন কীর্ত্তিমান রাজা ছিলেন। আলমোড়ার কাছে এক মন্দির-গাত্রে তাঁর কীর্ত্তিকথা খোদিত হয়ে আছে।

মাধব সেনের পর তাঁর দু'ভাই কেশব সেন আর বিশ্বরূপ সেন পূর্ব্বঙ্গে রাজত্ব করেন। এঁরাও ছিলেন বীর আর কীর্ত্তিমান্। বক্তিয়ারের পর পাঠানেরা অনেক দিন চুপ করে ছিল বটে, কিন্তু সুযোগ পেলেই তারা সেন-রাজ্য আক্রমণ করতো। তবে পেরে উঠতো না সেন রাজাদের সঙ্গে। পাঠানদের যুদ্ধে হারিয়ে হারিয়ে বিশ্বরূপ সেনের একটি বিশেষণ হয়েছিল—"গর্গযবনান্বয়-প্রলয়কাল রুদ্রঃ।"

সেন রাজারা পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে প্রায় ৬৪ বৎসর ধরে পূর্ব্বঙ্গে রাজত্ব করলেন। পাঠানেরা কিন্তু নাছোড়বান্দা। হিন্দুরাও এদিকে নানা কারণে দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলো। তার পর ১২৬৮ সালে নবাব তোগরলবেগ নৌকাপথে চুপি চুপি এসে হঠাৎ এক দিন একডালা দুর্গ আক্রমণ করে বসলেন। এবার একডালা দুর্গের পতন হোল আর সেই সঙ্গে সেন-রাজ্যেরও পতন ঘটলো। এত দিন পরে গোটা বাংলা এলো পাঠানদের অধিকারে।

সেন রাজারা ছিলেন বাংলার শেষ হিন্দু রাজা। সেন বংশের সর্বপ্রধান ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের পিতা মহারাজা বল্লাল সেন। বল্লাল সেন পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। বারোটি রাজ্য ছিল তাঁর অধীনে। তিনি ছিলেন রাজাধিরাজ। শুধু তাই নয়, মহাসমারোহে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করে তিনি 'সার্বভৌম সম্রাট্' হন। তিনি কবি ছিলেন, বিদ্বান্ ছিলেন। পণ্ডিতেরা তাঁর প্রশংসা করে বলতেন "বল্লালো নৃপসত্তমঃ।" প্রজাগণ তাঁকে "নৃপেষু বল্লালঃ শ্রেষ্ঠঃ" বলে অভিবাদন করতো। তাঁর উপাধি ছিল—"নিশঙ্ক-শঙ্কর গৌড়েশ্বর"। এইরূপ সম্মানজনক উপাধি সেন-বংশের প্রত্যেক রাজার ছিল। বংশগত উপাধি এই রকম—"অশ্বপতি গজপতি নর-পতি রাজ্যত্রয়াধিপতি সেনকুলকমল পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শঙ্কর গৌড়েশ্বর।"

সত্যই তাঁরা এই সব বিশেষণের যোগ্য ছিলেন। তাঁদের বিরাট অশ্ববাহিনী ছিল, বহু সৈন্য-সামন্ত ছিল। জলপথে যুদ্ধ করবার জন্য বিস্তর নৌবাহিনী ছিল, আর ছিল বিপুল গজবাহিনী। এই গজ-বাহিনী এমন যে, এর ভয়ে কোন শত্রুই বাংলা দেশ আক্রমণ করতে সাহস করতো না। স্বাধীন বাংলার রাজারা সবাই ছিলেন বীর, সবাই ছিলেন পরাক্রমশালী। এঁদের নাম আর খ্যাতি তখন দিল্লী পর্য্যন্ত পৌঁছেছিল। রাজা জয়চন্দ্রের সভা-বর্ণনায় আছে—

"গৌড়-বঙ্গালে কি বঙ্গালী বৈঠে দিল্লীকা চৌহান।"

বড়লোক!

শ্রীরবিদাস সাহা রায়

উকিল-পাড়ার সেই ঘোষদের কেষ্টা,
বড়লোক হতে বহু করেছিল চেষ্টা,
ধনে শুধু বড় নয়,
মাপে বড় হতে হয়,
ডাম্বেল ছেড়ে দিয়ে রিং ধরে শেষটা।

আজব ওষুধ এক পাওয়া যায় বোম্বাই,
তাই খেয়ে হয়ে যাবে সাত দিনে লম্বা-ই।
রাতারাতি বড়লোক
হতে তার বড় ঝোঁক,
রিং ধরে ঝুলে ঝুলে পায় জল-তেষ্টা;
বড়লোক সত্যি হবে বুঝি কেষ্টা!

আনে কিনে বড় বড় জামা আর জুতো সব,
বড়লোক সাজবার আয়োজন তাজ্জব।
কেষ্টার বড় ভাই,
কান ধরে বলে তাই,—
'ওরে বোকা গর্দ্দভ, হাসাবি কি দেশটা?'
ঝক্কি সে কম নয়—হাল ছাড়ে কেষ্টা।

শ্রীইন্দিরা দেবী

আহ কি তখন মনে ছিল, কথা বলতে বলতে রুণুদের বাড়ীতে দেরী হয়ে গেল। হবে না, তোমরাই বল, রুণুর ঠাকুমা প্রথমেই ধরলেন—বুড়ো মানুষ ভাই, কেউ এদিকে আসে না যে কথা বলি, বসো বসো, দু'টো কথা কই।' দু'টো কথা মানে যার নাম দস্তুরমত এক ঘণ্টা, তাঁকে ছাড়িয়ে উপরে উঠতেই মা নামছেন—'এসো এসো, অনেক দিন পরে, ভালো আছ তো? উনি তোমায় খুঁজছিলেন, কি যেন জিজ্ঞাসা করবেন।' উনি অর্থে রুণুর বাবা—তাঁর কাছে যেতেও প্রায় চল্লিশ মিনিট, তার পর আটকে গেলাম ছবু, মীরু, দেবু, রুণ্টু, পিন্টুর দলে—এদের দলকে এঁটে ওঠা শক্ত, না না করে পাক্কা এক ঘণ্টা নিলো—পাণ্ড আসতে দেয় না—অবশেষ রুণু। গাল ফুলিয়ে রুণু বললে, এতক্ষণে এসে এই এখন আমার কাছে আসবার সময় হলো?

অবস্থাটা তাকে যত বোঝাতে যাই, রুণু মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে। অনেক পরে যখন তার রাগ ভাঙ্গলো, কথা বলতে সুরু করেছে—এমন সময় ছবু মীরুর সেই দলটি এসে বলে, শুনলে সোনাদি, আজ আর বাড়ী ফিরতে পাচ্ছ না।

—কেন রে, তোদের পুতুলের বিয়ে-টিয়ে আছে না কি?

—পুতুলের বিয়ে কেন? ন'টা বেজেছে জানো? আমাদের এখানে ন'টা থেকে কার্ফু।

—বলিস্ কি রে? এতক্ষণ সব চুপ করে ছিলি কেন?

—আমরা যে পড়ছিলাম, তাতে হয়েছে কি? বেশ মজা হবে সোনাদি, থাক ভাই।

—আর থাকো ভাই, থাকতে হবেই, কিন্তু বাড়ীতে—

—ও-সব ঠিক করে দেওয়া যাবে, তোমাদের পাশের বাড়ীতে তো ফোন আছে—তবে আবার কি?

কিন্তু রাত্রিবাস! কথাটা ভাবতেই খারাপ লাগছিল, তার পর নিজের সেই বিছানাটা ছাড়া ঘুম আসে না যেন। আমার ঘর, আমারই ঘর সেটা, ভালো আর মন্দ যাই হোক। কিন্তু উপায়ই বা কি? সান্ধ্য আইন অমান্য করে থানায় যাওয়ার চাইতে রুণুদের বাড়ী পরম রুণু খুব হাসছে।

—হাসছো যে?

—যেমন দেরী করে এসেছিলে আমার কাছে, তেমনি খুব হয়েছে, একেবারে রাত্রিবাস!

—তা তো হলো, কিন্তু—

—আর কিন্তু, বাড়ীর ভাবনার জন্য বাবাকে বলো, তিনি ঠিক করে দেবেন।

অগত্যা।

তার পর আবার শুরু হলো প্রতি ঘরে ঘুরে বেড়ানর পালা। আবার ঠাকুমা, আবার রুণুর বাবা, আবার ছোটদাদের ঘরে রাজনীতির তুমুল তর্কের মাঝে, আবার ছবু মীরুদের খেলা-ঘরে। ওদের বিরাট পুতুলের ঘরকন্না আর গৃহস্থালীর সমস্ত দেখে যখন রুণুর ডাকে তার কাছে যাচ্ছি, তখন পিছনের দলটি বলছে: বুঝলে সোনাদি, সকালে আমরা উঠবার আগেই যেন পালিও না! আমাদের খেলা-ঘরে তোমার চায়ের নেমন্তন্ন রইল।

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, ঠিক আসবো, চা না খেয়ে তোদের সোনাদি নড়ছে না।

এর পর আহারের পর্ব।

লম্বা দালানটায় সারি হয়ে সব খেতে বসা হয়েছে। একধারে ছোটদাদের দল, তার পর ছবুদের রেজিমেণ্ট, এক পাশে আমি, রুণু, ন'দি আর আমাদেরই সমান বড়দির মেয়ে কেয়া।

হৈ, হৈ করে খাওয়া চলতে লাগলো। ঠাকুর আর রুণুর মা পরিবেশন করছিলেন। হাসিমুখে সকলকে খাবার দিচ্ছেন আর প্রত্যেকের কথার উত্তর দিচ্ছেন।

এই মানুষটিকে আমার এত ভালো লাগতো কি বলবো। আমার মা ছোট্ট বেলায় মারা গিয়েছিলেন, তাঁর কোনো-কথা আমার মনে ছিল না। একটা অস্পষ্ট, ঘুম-ঘুম চোখে দেখা জিনিষের সঙ্গে রুণুর মা'র চেহারাটা জুড়ে নিয়ে মায়ের একটা ছবি এঁকেছিলুম। এর মত স্নেহপ্রবণা নারী দেখলে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

আহারের পর্ব্ব শেষে ছোটদা বললেন: কেমন হলো সোনা, শেষ পর্য্যন্ত কার্ফুতে আটকে গেলে?

—কিন্তু আনন্দও তো কম হলো না ছোটদা ভাই।

—কিন্তু, তুমি রুণুর কাছে শোবে তো? খুব সাবধান, ও-ঘরে গোলমাল আছে ভাই, বুঝলে?

—যাঃ, ছোটদার যত বাজে কথা—কি গোলমাল? রুণু বলে উঠলো।

—এই ভুত-টুত—

—হ্যাঁ, ভুত এসে বলেছিল 'আমি আছি গো আমি আছি ছোটদা!' রুণু ফোঁস করে বলে উঠলো।

—জানিস্ না বুঝি, তোর ঐ ড্রেসিং টেবিলটা থেকে আস্তে আস্তে এসে—

—খুব হয়েছে থামো। তোমার মত অত আজগুবি গল্প কেউ যদি তৈরী করতে পেরেছে। মনে করছো ভয় পাবো?

—তা ভাই, তোরা হচ্ছিস্ বীর নারী—কিন্তু রুণু—

—রুণু ধমক দিয়ে বলে উঠলো: ছোটদা আবার!

—ওঃ, আচ্ছা আচ্ছা, আর বলবো না।

সকলে যখন উপরে উঠছি তখন দশটা বেজে গেছে।

সিঁড়ির পাশে ছোট্ট একটা ছাদ। সেখানে দাঁড়িয়ে বড় রাস্তাটা সব ভালো করে দেখা যায়, প্রশস্ত সেণ্ট্রাল এভিনিউর রাস্তাটা ঈষৎ বাঁকা হয়ে বেরিয়ে গেছে। এইখানে দাঁড়িয়ে সেই ছোট রেজিমেণ্টটা।

ছবু বলছে: আচ্ছা মীরু, কার্ফু হলে পথে বেরোতে পারে না, এই সব কথা পুলিশ-ভ্যান করে বলে যায়। আজ আবার বলেছে দু'চাকার গাড়ী চলবে না—তার মানে কি?

মীরু উত্তর দিলে: ফুলদি, তুই ভারী বোকা কিন্তু, দু'চাকার গাড়ী হচ্ছে সাইকেল আর রিক্সা।

ছবু হটবার পাত্র নয়, রেগে বলে উঠলো: তুই না হয় খুব চালাক, কিন্তু পথে যদি বেরোনো বারণ তাহলে ঐ তো তিনটে গরু ঠিক রাস্তার মাঝে বসে আছে, কই ওদের কিছু হচ্ছে না? থানায় যাবে না ওরা?

রুণু বললে: ছোটদি, তুইও কি কম বোকা, ওরা তো দু'চাকার নয় ওরা চার চাকার।

ছবু থতমত খেয়ে কি বলবে ঠিক করতে পারছে না। আমি রুণুকে বললাম: শুনছিস্?

—হ্যাঁ, আমরাও ছোট বেলায় কত ঐ রকম কথা বলেছি, ভাবলে এত হাসি পায়। রুণু বললে।

—এখন বুড়ো হয়ে গেছিস্ না?

—তা না হলেও বড় হয়েছি, কলেজে পড়ছি। তোর মনে আছে, মার উপর রাগ করে আধ দোয়াত কালি খেয়েছিলুম, মরে যাবো মনে করে?

—খুব আছে, আর এক দিন স্কুলে বকনী খেয়ে ঠিক করা হলো—শতিকাদি অঙ্ক কষতে এলেই চেয়ারটি কায়দা করে সরিয়ে নেওয়া হবে, আর পড়ে যাবেন:

—খুব, খুব—সত্যি সে দিনগুলো বেশ। এখন যেন সবই বদলে গেছে।

—বদলে যায়নি, আমরাই বড় হয়ে গেছি। কিন্তু সে যাই হোক, আজ কিন্তু ছাদে শোয়া হবে।

—ছাদ? সর্ব্বনাশ, মা রাজী হবে না।

—আচ্ছা এখন তো চল, তার পর মাসীমা এলে দেখা যাবে।

—কেন তোর ছোটদার কথা মনে হচ্ছে না কি?

—দূর, যা গরম!

উন্মুক্ত ছাদে শুয়ে নীল আকাশের দিকে চেয়ে হঠাৎ বাড়ীর কথা মনে হলো, এত বেহুঁস যে ১টা বাজলো মনে হলো না, ফেরা হলো না, যদি খবর না পৌঁছে থাকে—বাবা এতক্ষণ কি না জানি ভাবছেন।

—কি ভাবছিস্? রুণু বললে।

—হঠাৎ বাড়ীর কথা মনে হলো। এমন করলাম বাড়ী ফেরাই হলো না।

—তাতে কি হয়েছে, বাবা বলেছিলেন খবর দিচ্ছি, দিয়েছেনও বোধ হয়! মিট-মিট করে আকাশের তারাগুলো জ্বলছে, জ্বলে আর নিবে নিবে চলে, মাঝখানে চাঁদ, আকাশ নিস্তব্ধ, পথের দিকেও ঠিক তাই, বড় বড় আলোগুলো দু'ধারে জ্বলছে কিন্তু পথ জন-মানবশূন্য, তাই আকাশের সঙ্গে যেন সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। চোখ জুড়িয়ে আসে, মনটা স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। বাবা এতক্ষণ শুয়ে পড়েছেন বোধ হয়, আমার ঘরটায় আজ কে শোবে? নাঃ, যত ভাল আর আরামই হোক না কেন, নিজের ঘরের মত আরাম কোথাও নেই। 'হুইট হোম' কথাটা অত্যন্ত খাঁটি।···রাস্তা দিয়ে এক গাড়ী মিলিটারী যাচ্ছে, কে জানে কোথায় আবার লাঠালাঠি হলো। লাল পাগড়ী একটা কনেষ্টবল একটা ভিক্ষুককে ধরেছে, থানায় নিয়ে যাবে নিশ্চয়। যাক, বেচারার ক'দিন আর ভিক্ষা করতে হবে না। আমাদের বাড়ীর সামনে সেই যে পাগলীটা চেঁচায় আর কাঁদে, তার কিন্তু কার্ফু নেই, ন্যাকড়া ঝাড়তে ঝাড়তে সে সর্ব্বত্র আসা-যাওয়া করে।···পরের বাড়ী হলেও মাথাটা কেমন ঝিমিয়ে আসছে, বেশ ঠাণ্ডা, ঘরে পাখার তলায় না শুয়ে বাইরে শুয়ে ভালো করেছি।···

—থানায় চলুন!

—থানায়?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, থানায়, জানেন না কার্ফু আছে, পথে বেরিয়েছেন কেন?

ইস্ বড় রাস্তায় জনমানব নেই, একলা পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আর সামনে লাল পাগড়ীওয়ালা লোকটা, আবার বলে থানায় চলুন। বাড়ী না গিয়ে কিছুতেই ঘুম এলো না, তাই তো বেরিয়ে পড়লুম···কিন্তু?

—ভাববেন পরে, এখন আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে যে!

—থানা? সে কত দূর? কিন্তু···

—বেশী দূর নয়, কিন্তু যেতেই হবে, কোনো উপায় নেই।

—কোনো উপায় নেই? আমি না হয় বাড়ী ফিরে যাচ্ছি।

—তা গেলেও হবে না, বাড়ী যাবেন পরে, এখন তো চলুন।

—বড় মুস্কিল তো!

—হ্যাঁ, কার্ফুতে বেরোলে একটু মুস্কিলেই পড়তে হয়।

—কিন্তু বাড়ীতে—

—অত ভাবছেন কেন? থানা থেকে বাড়ী যাবেন।

অগত্যা।

রাত হলে কি হয়, থানা ভর্ত্তি লোক, কি রকম অপ্রস্তুত লাগছে আর লজ্জা করছে বলা যায় না। অফিসার-ইন্-চার্জ্জ বললেন, আজ তো কিছু হবে না, আজকের রাতটা এখানে থাকুন, কাল দেখবো।

—আজকের রাতটা—কি সর্ব্বনাশ?

—কি করবো বলুন? আমাদের উপর এই অর্ডার আছে, আমরা কিছুই করতে পারিনে।

—কিন্তু বাড়ীতে কেউ জানে না, এ-রকম ভাবে আটকে থাকব কি? কি বলছেন আপনারা?

—কিন্তু আমরা যে নিরুপায়।

অগত্যা।

একটা বিশ্রী ঘরে জিনিস-পত্রের মাঝে নিয়ে গিয়ে বললে: এখানে থাকুন।

ইস্! এঘরে মানুষ থাকে? আমাদের ষ্টোর-রুমটা এর চেয়ে অনেক ভালো।

কিন্তু ভালো-মন্দর প্রশ্ন কার কাছে করবো? তারা তখন আমাকে রেখে চলে গেছে। পথে বেরিয়ে বাড়ী যাবার চেষ্টা না করে যেমন রুণুদের বাড়ী ছিলাম থাকলে যে ক্ষতি হতো না সেটা যখন বুঝলাম তখন আর উপায় নেই। মনের ভুলের জন্য হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছা করলো। রুণুরা শেষ পর্য্যন্ত বাবাকে খবর দেবে, ওরা তো ভাববেই, বাবা পর্য্যন্ত অস্থির হবেন। আমি কি না থানায়! ভাবতে দুঃখে আর লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছা করে।

—ইস্, কী মশা! সারা রাত কি এই ভাবেই কাটাতে হবে না কি? না হয়েই বা উপায় কি? ওরা তো আর আসবে না।···কিন্তু কাল যখন খোঁজাখুঁজি, হৈ-চৈ হবে তখন? থানা, থানা থেকে কোর্ট, তার পর?···নাঃ, আর ভাবা যায় না···।

যাক্, ভোর হয়ে আসছে···ঐ যে ওরা এসেছে।

—দেখুন একটু জল দিন তো!

—জল? আচ্ছা একটু সবুর করুন।

—সবুর মানে সকাল ছ'টা থেকে সাড়ে দশটা তা তখন জানা ছিল না। এই ক'ঘণ্টা যেন অসহ্য বোধ হয়েছে। অন্ততঃ বাবাকে যদি একবার ফোন করতে দিতো এরা, তেষ্টার জলের চেয়ে অনেক উপকার হতো সন্দেহ নেই, কিন্তু···ভেবে লাভ নেই, কান্না আসে দুঃখে, লজ্জায়।

—বেরিয়ে আসুন!

—ওঃ আচ্ছা, দেখুন, একটু জল চেয়েছিলাম মুখটা ধোবো···। কিন্তু এখন তো আর হবে না, এখন গাড়ী তৈরী, যেতে হবে।

—তাহলে জল পাওয়া যাবে না?

—পরে পাবেন, এখন গাড়ীতে আসুন।

আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যখন এই গাড়ীগুলো যেতো আমরা বলতুম 'চোরের গাড়ী'। অবশেষে সেই গাড়ীতে আমিও উঠলুম চুরি না করেই!

কোর্ট। এত লোক, কত রকমের লোক—এইখানে আমি—

—শুনুন, আপনি কার্ফুর মধ্যে পথে বেরিয়েছিলেন?

কণ্ঠতালু শুকনো হয়ে এসেছে, উত্তর দিতে পাচ্ছি না।

—যদি বাড়ী ফিরতে চান তাহলে তিরিশ টাকা দেবেন।

—কিন্তু আমি···

—তাহলে পঞ্চাশ টাকা।

পিছন থেকে কে বলে উঠলো: 'আরো যদি কথা বলেন টাকার অঙ্ক আরো বাড়বে, ভুল করেছেন কাল, তখন পুলিশকে কিছু দিলে···। শেষ অবধি শুনবার মত মন নেই, পঞ্চাশ টাকা কোথায় পাবো? কার্ফুর এত যন্ত্রণা? মনে হলো, আমাদের পাড়ায় আকস্মিক ভাবে দু'দিন কার্ফুর ঘোষণায় ডাল আর ভাত খেয়ে থাকতে হয়েছিল, চা পর্য্যন্ত না, দুধওয়ালা আসতে পায়নি—কিন্তু সেটা খাওয়ার উপর দিয়ে গিয়েছিল, এখন···?

দেহের উপর পটপট করে কি ফুটছে, মুখটা যে গেল, এরা মারে না কি? কি অন্ধকার? এ আবার কোথায় এলাম?

—সোনা, ভয়ানক বৃষ্টি পড়ছে, উঠে পড়—ঘরে আয়।

রুণুর কণ্ঠস্বর।

কিন্তু জাগ্রত বা তন্দ্রায় যে কোনো অবস্থায় কার্ফুতে পথে বেরোনো মোটেই সুবুদ্ধির কাজ নয়। এ কথা কি আমাদের মনে রাখা উচিত নয়?

বিষ্ণুগুপ্ত

২৩

শ্রীরবিনন্দক

বিরাধগুপ্ত ব'লে চললেন—'শুধু রাজ্যভাগ ক'রেই চাণক্যের কাজ শেষ হ'ল না। বৈরোচকের সাম্রাজ্যে অভিষেক পর্য্যন্ত করা হ'ল। তার পর চন্দ্রগুপ্তের পরবার জন্য তৈরী রাজপোষাক বৈরোচককে পরতে দেওয়া হ'ল। মূর্খ তখনও বোঝেনি—কিসের জন্য চাণক্য তাকে এত সমাদর করছে'।

রাক্ষসের মুখ থেকে আপনা হ'তেই একটা আক্ষেপের শব্দ বেরুল—'আহা'!

বিরাধগুপ্ত—'নগরে তখন সকলেই জেনেছে যে—ঠিক মাঝ রাতে শুভ লগ্নে নবীন মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত হাতীর পিঠে চ'ড়ে নগরের পূব দিকের সিংহদ্বার দিয়ে জাঁক-জমকের সঙ্গে পুরী প্রবেশ করবেন। সন্ধ্যার পর থেকেই লোক জমতে আরম্ভ হয়েছে পূর্ব্ব দিকের সিংহ-দ্বারে।'

রাক্ষস চিন্তাকুল হ'য়ে বাধা দিলেন—'আচ্ছা, তখন কি বৈরোচককে কোন রকমে একটু সাবধান ক'রে দেবার উপায় ছিল না যে—চাণক্য খুব গোপনে ও কৌশলে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে

বৈরোচকও রাজ্য পাবে না, অথচ পর্ব্বতকের হত্যার কলঙ্ক যেটুকু সন্দেহের বশে চাণক্যের উপর পড়েছে তাও নিঃশেষে ধুয়ে-মুছে যাবে' ?

বিরাধগুপ্ত—'কি ক'রে তাকে সাবধান করা যাবে? চাণক্য যে তাকে তখন মুঠোর মধ্যে পূরে সর্ব্বদা চোখে-চোখে রেখেছে' !

রাক্ষস—'তার পর—' ?

বিরাধগুপ্ত—'তার পর—নগর-প্রবেশের সময় যখন হ'য়ে এল তখন চন্দ্রগুপ্তের আদরের মাদী হাতীটিকে খুব সাজিয়ে নিয়ে এসে তার উপর বৈরোচককে উঠিয়ে দেওয়া হ'ল। হাতীর পিঠে সোনার হাওদা—চার দিকে চীনাংশুক আর মণি-মুক্তোর ঝালর—বৈরোচকের মাথায় প্রকাণ্ড রাজমুকুট—তাতেই মুখটা প্রায় ঢাকা—সর্ব্বাঙ্গে ভারী ভারী জড়োয়া গয়না আর রাশীকৃত ফুলের মালা। মাহুত অবধি চিন্‌তে পারেনি—বৈরোচক উঠল কি চন্দ্রগুপ্ত! একে চন্দ্রগুপ্তের নিজের হাতী চন্দ্রলেখার পিঠে চেপেছে—তার পর মুখ বা শরীর সব রাজ-সজ্জায় চাপা পড়েছে—এতে সকল লোক যে বৈরোচককেই চন্দ্রগুপ্ত ভেবে নিল—এতে আর কি আশ্চর্য্য কিছু থাক্‌তে পারে? এক চন্দ্রগুপ্ত আর এক চাণক্য ছাড়া আর কেউই জান্‌ত না—চন্দ্রলেখার পিঠে সত্যি কে চেপেছে। আমাদের একটু একটু সন্দেহ অবশ্য হয়েছিল চাণক্যের ছুতারের সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গী শুনে—কিন্তু এমন মারাত্মক কৌশল যে খাটান হয়েছে—তা তখন আমরাও বুঝে উঠতে পারিনি'।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে রাক্ষস প্রশ্ন করলেন—'তার পর—নিশ্চিত বৈরোচক তোরণ চাপা পড়ল ত' ?

বিরাধগুপ্ত ম্লান হাসি হেসে বল্লেন—'শুনুন সব—ব্যস্ত হবেন না। চন্দ্রলেখা ধীর-মন্থর গতিতে চলতে লাগল—পিছনে পিছনে সামন্ত রাজারা যে যার রথে ঘোড়ায় হাতীতে চেপে চলেছেন—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! বৈরোচক বোধ হয় সে দৃশ্য দেখে আনন্দে হাত বাড়িয়ে চাঁদ ধরছিল মনে—মনে কিন্তু সে আনন্দ প্রকাশ করবার অবসর আর পেলে না বেচারী' !

অধীর রাক্ষস উষ্ণ ভাবে বললেন—'বল—বল—তাড়াতাড়ি শেষ কর'।

বিরাধগুপ্ত—'পূব দিকের সিংহদ্বারের কাছে সকলে আসতেই বিরাট জনতা আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠল—'জয় মহারাজের জয়' ! চন্দ্রলেখা সোনার তোরণের নীচে প্রবেশ করলে। দারুবর্ম্মা যন্ত্র-তোরণটি প্রধান আরোহীর মাথার উপর ফেলবার জন্যে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে তোরণের দড়ি ধ'রে অপেক্ষা করছিল। চন্দ্রলেখার মাহুত বর্ব্বরককে ত আপনার কথা মত আগে থাকতেই প্রচুর ঘুষ দিয়ে রেখেছিলুন। সে-ও সময় বুঝে তার হাতের ফাঁপা সোনার দাণ্ডার ভিতর থেকে ছোট ছুরিখানি বার করবার জন্যে সোনার শিকলে ঝোলান এক পাশের সোনার দাণ্ডা তুলে নিলে' !

রাক্ষস—'তার পর—তার পর—' ?

বিরাধগুপ্ত—'লোকের জয়ধ্বনি শুনে হাতী-ঘোড়াগুলো সবই একবার চমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ঠিক সেই সময় সোনার দাণ্ডা বর্ব্বরক তুলে নেওয়াতে চন্দ্রলেখা বোধ হয় ভাবলে যে—দাণ্ডাটা নিয়ে তার মাথায় ঘা মারা হবে! তাই একবার থমকে দাঁড়িয়েই সে হঠাৎ সামনের দিকে দৌড় দিলে। দারুবর্ম্মা তোরণের দড়ি ধ'রে হাতীর পা ফেলার দিকে লক্ষ্য করছিল। কিন্তু হাতী হঠাৎ দৌড় দিল দেখে সেও বোধ হয় একটু ভেবড়ে গিয়ে এক পল আগেই তোরণের দড়ি ছেড়ে দিল। যদি তোরণ ঠিক না পড়ে তা হ'লে বর্ব্বরক চন্দ্রগুপ্তকে ছুরি মারবে—এ-ও ত আগে থেকেই ঠিক ছিল। বর্ব্বরকও সেই অনুসারে হাতে ছুরি নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল হাতীর কাঁধে। অবশ্য সে ভুল করে বৈরোচককেই চন্দ্রগুপ্ত ভেবে ছুরি মারতে তৈরী হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক সেই সময় দারুবর্ম্মার হিসাবের ভুলে এক পল আগেই সোনার তোরণ পড়ল খসে। আগে পড়ার ফলে তোরণ বৈরোচকের মাথায় না পড়ে তার আগে দাঁড়ান বর্ব্বরকের মাথায় পড়ল—আর সঙ্গে সঙ্গে বর্ব্বরকের মাথা ফেটে সে বেচারী মারা গেল—তার হাতের ছুরি হাতের মুঠোতেই ধরা রইল—বৈরোচকের বুকে বেঁধবার অবসর আর পেলে না'।

রাক্ষস—'তবু মন্দের ভাল! বৈরোচক ত বেঁচে গেল সে যাত্রা' !

বিরাধ—'কোথায় বাঁচল! শুনুন না সব আগে।—ওদিকে দারুবর্ম্মা ভাবলে সে—তার কারসাজিতে যে সোনার তোরণ খসে পড়েছে এ কথা চন্দ্রগুপ্ত নিশ্চয় বুঝেছে—অবশ্য সে-ও ভুল করে বৈরোচককে চন্দ্রগুপ্ত ভেবেছিল। তাই সে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে তোরণের লৌহকীলকটি খুলে নিয়ে তার এক ঘায়ে বৈরোচককে শেষ ক'রে দিলে !—'

রাক্ষস—'আহা-হা-হা! বেচারী বেঁচেও বাঁচল না! এরই নাম নিয়তি! চন্দ্রগুপ্ত ম'ল না—তার বদলে বেঘোরে মারা পড়ল বেচারী বৈরোচক আর মাহুত বর্ব্বরক! তার পর দারুবর্ম্মার কি হ'ল ?'

বিরাধ—দারুবর্ম্মা যেমন ভেবেছিল সে-ও সে চন্দ্রগুপ্তকে লৌহকীলকের ঘায়ে মেরে ফেলেছে—দেহরক্ষী সেনারা ও দর্শকেরাও তেমনি ভেবেছিল যে দারুবর্ম্মা চন্দ্রগুপ্তকেই হত্যা করেছে। তার আর পালাবার উপায় ছিল না। দেহরক্ষীরা দারুবর্ম্মাকে ধরে আনতেই উত্তেজিত দর্শকেরা তাকে তখনই ইটিয়ে মেরে ফেললে'।

রাক্ষস—'আহা! বেচারা শুধু এক লহমার ভুলে মারা গেল'।

বিরাধ—'তাই বা বলি কেন? যদি এক পল পরে পড়ত তোরণ, তা হ'লে অবশ্য বর্ব্বরকের বদলে বৈরোচক মরত—তাতে দারুবর্ম্মা ও বর্ব্বরক বাঁচত বটে; কিন্তু আসল যাকে মারা দরকার, সে চন্দ্রগুপ্ত ত বেঁচে যেতই' !

রাক্ষস—'তা ঠিক। আচ্ছা, ভিষক্ অভয়দত্ত কত দূর কি করলেন' ?

বিরাধ—'করেছেন—সবই'।

রাক্ষস সোল্লাসে লাফিয়ে উঠলেন—'ব'ল কি সখা! তবে চাণক্য কাত—চন্দ্রগুপ্ত মরেছে' ?

বিরাধ—'মন্ত্রিবর! দৈব তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে'।

রাক্ষস (হতাশ ভাবে)—কি রকম? তবে যে তুমি বললে—অভয়দত্ত সবই করেছেন' ?

বিরাধ—'শুনুন আগে সব কথা। চন্দ্রগুপ্তের মাঝে একটু সর্দ্দি-কাশি হওয়ায় বৈদ্য অভয়দত্তের ডাক পড়ে। বৈদ্যরাজ ত পরম আনন্দে মসগুল হ'য়ে উঠলেন—ভাবলেন, কাজ গুছিয়ে এনেছেন। এক রকম ওষুধ তৈরী করলেন তিনি রাজবাটীতে ব'সে—চার পাশে পাহারা। কোন জিনিষ তাঁর নিজের আন্‌বার হুকুম ছিল না। যে যে ফর্দ্দ তিনি করছিলেন—আরর্কোকের কষ্ট মিলিয়ে রোখো সবাই

হ'য়ে তবে নিজের লোক দিয়ে সে সব গাছ-গাছড়া চাণক্য দিচ্ছিলেন। তাই থেকে—চাণক্যের সামনে ওষুধ তৈরী করছিলেন। এরই মধ্যে হাত-সাফাইয়ের গুণে চাণক্যের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে বৈদ্যরাজ সামান্য একটু ধূলোর মত গুঁড়ো মিশিয়ে দেন ঐ ওষুধের সঙ্গে। সোনার পাত্রে ক'রে ওষুধ নিয়ে চন্দ্রগুপ্তের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছেন অভয়দত্ত—এমন সময় চাণক্য ব'লে উঠলেন—'বৃষল! ও ওষুধ খেয়ো না। দেখছ না—সোনার বাটির এক দিকের রংটা কেমন বদ্‌লে গেছে'।

রাক্ষস—'অদ্ভুত দৃষ্টি বটে! তার পর বৈদ্যের কি হ'ল'?

বিরাধ—'আর কি হবে! ঐ ওষুধ বৈদ্যরাজকে জোর ক'রে খাইয়ে দেওয়া হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেহরক্ষা করলেন'।

রাক্ষস—'আহা-হা—জ্ঞানের সাগর! তাঁর এই পরিণাম! আচ্ছা, রাজার শোবার ঘরের তত্ত্বাবধানে যাকে রাখা হয়েছিল—কি যে নামটা তার মনে পড়ছে না তার হ'ল কি'?

বিরাধ—প্রমোদক! সেটা যেমন গোমূর্খ, তেমনই ফল পেয়েছে'।

রাক্ষস—'কি, ব্যাপার কি? খুলেই বল'।

বিরোধ—প্রমোদককে প্রথমে কেউ সন্দেহ করেনি যে আমাদের চর। কিন্তু গরীবের হ'ল ঘোড়া-রোগ। তাতে টাকা পেয়েই দেদার দোহাতি টাকা খরচ করতে সুরু করে দিলে। তার বাবুয়ানার বহর দেখে চাণক্যের হ'ল সন্দেহ। তার পর এক দিন চাণক্যের চরদের পাল্লায় প'ড়ে নেশার ঝোঁকে দু'-চারটে কথা বেফাঁস ক'রে ফেলেছিল। আর কি রক্ষে আছে! হাতীর পায়ের তলায় প'ড়ে বেচারীর প্রাণ গেল'।

রাক্ষস—'আহা-হা! দৈবই দেখছি আমাদের বিপক্ষে। আচ্ছা, বীভৎসক প্রভৃতি এক দল গুপ্তঘাতক, যাদের ফাঁপা দেওয়ালের মাঝে লুকিয়ে থেকে মাঝ রাতে চন্দ্রগুপ্তকে খুন করতে বলা হয়েছিল, তাদের কি হ'ল? কোন খবর রাখ কি'?

বিরাধ—'মন্ত্রিবর! সে আরও বীভৎস ব্যাপার'!

রাক্ষস—'এ্যা—সে আবার কি'?

বিরাধ—'দেওয়াল আমাদের মিস্ত্রীরা ফাঁপা ক'রেই গেঁথেছিল—কেউ ধরতে পারেনি। বীভৎসক সন্ধ্যার সময় থেকেই পাঁচ জন সঙ্গী নিয়ে তার মধ্যে ঢুকে বসেছিল। কিন্তু তারা এমনই বোকা যে একটু সাবধানে না থেকে সেই দেওয়ালের মধ্যেই ব'সে ব'সে খাওয়া-দাওয়া চালাচ্ছিল—কাঁচা গাঁথনি—তার এক জায়গা একটা ছোট ছেঁদা দিয়ে পিঁপড়েরা ঢুকছিল খাবারের গন্ধ পেয়ে। বীভৎসক বা তার সঙ্গীরা সে দিকে নজরই দেয়নি। তার পর প্রহর খানেক রাত যখন, তখন চাণক্য ঢুকলেন ঘর পরীক্ষা করতে। চার দিক্ দেখে শুনে তিনি বেশ নিশ্চিন্ত মনেই বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল যে—দেওয়ালের একটা ছোট ছেঁদা দিয়ে এক সার পিঁপড়ে খাবারের টুক্‌রো মুখে ক'রে বেরিয়ে আসছে। বাস্! আর যায় কোথা! চাণক্যের মুখে একটু হাসি খেলে গেল। তিনি বাইরে এসেই হুকুম দিলেন—ঘরটাতে আগুন লাগিয়ে দিতে। সবাই ত অবাক্! এমন কি চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু চাণক্যের হুকুম নড়ায় কার সাধ্য! আগুন লাগবার আধ ঘণ্টা পরে ফাঁপা দেওয়ালটা ফেটে পড়ে গেল—আর তার মধ্যে দেখা গেল বীভৎসক আর তার পাঁচ সঙ্গী অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ঝলসে পুড়ে মরেছে—অসহ্য যন্ত্রণার ছাপ তাদের মুখে-চোখে। ধোঁয়ায় তারা বেরুবার পথ খুঁজে পায়নি বলেই প্রাণ দিলে'।

রাক্ষস—'ওঃ! কি পৈশাচিক!' [ক্রমশঃ।

এক মিনিটের গল্প

কে অস্পৃশ্য?

মনোজিৎ বসু

অস্পৃশ্যতা আমাদের এই হিন্দু সমাজের মস্ত বড় একটা কলঙ্ক। মুচি, মেথর, হাড়ি, ডোম বলে যাদের আমরা দূরে সরিয়ে রাখি, তারাই কিন্তু সমাজকে রক্ষা করছে, সুন্দর ক'রে তুলছে। অথচ, সে কথা আমরা একবার ভেবেও দেখি না। মিথ্যা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে তাদের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলি, নীচু-জাতের লোক ব'লে ঘৃণা করি। কিন্তু একটা জিনিস তোমরা হয় তো লক্ষ্য ক'রে থাকবে যে, সত্যিকারের ধার্মিক যাঁরা, তাঁরা কিন্তু অস্পৃশ্যতা কোন দিনই মানেন না। তাঁদের কাছে ধনী-দরিদ্রে যেমন কোনো পার্থক্য নেই, ব্রাহ্মণ-শূদ্রেও তেমনি তাঁরা প্রভেদ দেখেন না। তাঁদের কাছে সকলেই মানুষ, তাই, সকলেই সমান। বুদ্ধ-চৈতন্য থেকে শুরু ক'রে এ-যুগের রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী সকলের কাছেই মানুষ, মানুষ ব'লেই পরিচিত। তাদের কে মুচি, কে মেথর, কে ব্রাহ্মণ, সে-কথা তলিয়ে দেখবার প্রয়োজনও কারুর নেই।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ছোট একটি ঘটনা। শোনো তোমরা।

স্বামীজী তখন উত্তর-ভারত পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন।

পায়ে হেঁটে চলেছেন গ্রামের পর গ্রাম। পথ চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ দেখতে পেলেন, গাছের নিচে বসে এক মেথর তামাক খাচ্ছে হুঁকোতে ক'রে। এদিকে বিবেকানন্দেরও ছিল তামাক খাওয়ার অভ্যাস। পথের মধ্যে এমন একটা সুযোগ পেয়ে তিনি তো মহা খুশি। লোকটার কাছে গিয়ে হিন্দীতে বল্লেন—"ওহে! তোমার হুঁকোটা একবার দেবে? একটু তামাক খেয়ে নি তাহলে!" কথা শুনে মেথরটি তো অবাক্! গেরুয়া-পরা এক সন্ন্যাসী তার সামনে দাঁড়িয়ে! সেই সন্ন্যাসী-বাবা কি না মেথরের হুঁকোতে তামাক খেতে চাইছে? এ কি তাজ্জব কাণ্ড! সে অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে স্বামীজীকে বললে—"তা হয় না মহারাজ! আপনি সাধুপুরুষ, আর আমি হলেম সামান্য মেথর। আমি তো অচ্ছুৎ। আমার হুঁকোতে তামাক খেলে আপনার ধর্ম নষ্ট, জাত যাবে যে। আর আমার হবে মহা পাপ। দোহাই ঠাকুর! দোহাই!"

স্বামীজী তখন কি করলেন জানো? তিনি এগিয়ে গিয়ে মেথরটির হাত থেকে হুঁকোটা তুলে নিয়ে বললেন—"কে বলে তুমি অস্পৃশ্য? যারা বলে আমি তাদের দলে নই। তুমি মানুষ, আমিও মানুষ। সেই সম্পর্কে তুমি আমার ভাই। ভাই বুঝি কখনো অস্পৃশ্য হয়?"

এই বলে তিনি তখন সেই মেথরের হুঁকোতেই ধূমপান করতে লাগলেন। পরম বিস্ময়ে আর কৌতূহলে মেথরটি চেয়ে থাকে তাঁর দিকে।

চিত্রগুপ্ত

একত্রিশে ভাদ্দরে কাঠফাটা রোদ্দুর
ওড়ে ঘুড়ি আকাশেতে চোখ চলে যদ্দুর !
রঙের বাহার কত শেষ করে কে গুণে ?
সবুজ, লাল ও নীল, গোলাপী ও বেগুন,—

হ'লদে, শাদ' ও কালা সম্ভব যত রঙ,
বেমক্কা তাপ্পিতে কোনোটার হত রঙ্ ।
একতে', দেড়তে', দু'তে রকমারী সাইজের
সাজানো আকাশে যেন কত বই প্রাইজের ।

ল্যাগব্যাগে সাত হাত ল্যাজ নাড়ে কোনোখান
কেল্লুতে কাণবালা কোনোটার ছেঁড়ে কাণ ।
'কল্প' কেটে কোনোখানা বাঁই বাঁই ঘুর্ ছেই
'ভোম্‌মারা' কোনোখানা, লট্‌কাটে গেল যেই ।

'চড়াই' হ'তে না হ'তে কোনোটায় দিয়ে প্যাঁচ
হঠাৎ পিছন থেকে টেনে কে যে করে ঘ্যাচ্ !
ক্ষুদ্র 'আধতে'খানা,—বড় তার স্পর্দ্ধা
চচ্চড়ে টান মেরে নিজে হয় ফর্দ্দা !

টান্ টান্ ! জোরে টান্ !—ওই ধ'রে ফেল্‌লে !
আজ কি বাঁচে রে ঘুড়ি, ডানে-বাঁয়ে হেল্‌লে ?
'হাৎতা' ধরার দল ঘাঁটি ধ'রে আছে এই—
ফেঁটি ছাতের পরে পড়লে তা' ধরবেই ।

বৃথা করো হৈ-চৈ, গুটাও না শীগ্‌গির
প্যাঁচ খ্যালো, জ্ঞান নেই হুশ-ই-দীগ্‌ঘীর ?
টিপ্‌টিপে ঘুড়িটাকে ক্রোশ দুই পাঠিয়ে—
লাটায়ে 'ভল্‌কা' দিয়ে যাচ্চো যে লাটিয়ে,

হুঁস্ যদি না রাখো তো যাবে ঘুড়ি 'মাটিয়ে'
ফটকের গব্বায়, ব'লে দিনু খাঁটি—এ !
হাঁ ক'রে দেখচো কী হে—দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ?
ফটকে যে লট্‌কেছে, মেরে ঢিল্ লঙ্গ !

কী তোলো ? নিলে তো ছিঁড়ে-মেরে খ্যাঁচ নাক্‌কু'
সটকেছে ফটকে সে—ছোঁড়া ভারী ডাক্‌কু !
দু'কাটিম মেছুয়ালী সুতো নিলে হেঁচকে—
লাটায়ের গোড়া থেকে ? গেল মন খেঁচকে ?

আবার চড়ালে ঘুড়ি ? এবারে যে পক্ষী !
ও-বাড়ীর হাবু দেখে—উঠচে যে লক্ষ্মী !
'চেত্তা'টা ভালো ক'রে দিয়েছিলে, ঠিক তো ?
তোমার তাড়াটা দেখি, কিছু অতিরিক্ত !

সাঁই সাঁই অত জোরে বাড়চো যে এস্তার
হাবুর পিছনে কাকা বাবু রয়েচেন তার ।
ওঁর সাথে প্যাঁচ লড়া নয় সোজা কর্ম্ম
ক'য়ে দিনু ; খেলে দেখো ; ছুটে যাবে ঘর্ম্ম !

মণ্টুটা টোন সুতা বেঁধে ঘুড়ি হ্যাঁচকায়
খালি খোঁজে কার সাথে ঘুড়ি ওর প্যাঁচ খায় ।
ওরে দেখে যে-ঘুড়িটা করে তার শির কাৎ
'টানামানি' তার সাথে করবে ও নির্ঘাৎ !

লম্বা লগায় বেঁধে শুক্‌নো গাছের ডাল
ওদিকে পথের পরে ছুটেচে ছেলের পাল ।
কাটা ঘুড়ি হেলে দুলে নীচেতে নামচে যেই
অমনি ওদের মাঝে ঝগড়া যায় বেধেই ।

চারখানা 'লগি' জুড়ে সুতোটা খেয়েচে পাক
'এই, আমি' 'এই, আমি !' বাপ ! সে কী হাঁক-ডাক
মাঝে পড়ে ঘুড়িটাই হয় যে যন্দা-ফাঁই
তবু ঘুড়ি কাটলেই পিছু ধাওয়া করা চাই ।

গোটা ঘুড়ি আজো কেউ কখনো পায়নি ঠিক
দেখলেই তবু জ্ঞান থাকে না দিক্-বিদিক্ !
কত চলে ঝটাপটি চুলোচুলি টুঁস্‌কিল—
তবু এ দারুণ নেশা ছেড়ে দেওয়া মুশ্‌কিল !

ঘুড়ির কদর করা দরকারী আলবাৎ !
মনে করো, ঘুড়ি যদি গোঁৎ খেয়ে হ'য়ে কাৎ
'এরিয়েল', টেলিগ্রাফ, ট্রাম-তারে আট্‌কায়,
কিম্বা গাছেতে বেধে বাঁই বাঁই পাক খায়,—

বল্‌বোই 'শোচনীয়' এমন অবস্থায়
কারণ ঘুড়ি ও সুতো মেলে নাকো শস্তায় ।
কিন্তু তাহারো চেয়ে শোচনীয় হচ্ছে—
ঘুড়ি নিয়ে কতো ছেলে ফী বছর মরচে !

মনে করো 'লগি' নিয়ে ও বাড়ীর বীণা রায়,
ঘুড়ির লোভেতে উঠে পাঁচিলের কিনারায়—
ট'লে যদি প'ড়ে যায়, মাথা ঘুরে, খেয়ে পাক্ ?
বীণা তো ছেলেমানুষ ! তার কথা নয় থাক্ ।

ধরো, আমি,—নিতান্ত বাহাদুরী ক'রতেই—
তিন লাফে নেড়া ছাতে গিয়ে ঘুড়ি ধ'রতেই
তেতলার ছাত থেকে ফুটপাথে হনু 'চিৎ'—
এ রকম হওয়াটা কি নয় খুব অনুচিত ?

পথেতে ওড়াও ঘুড়ি তাতে কী বা এসে যায় ?
তাই ব'লে বিবেচনা যেন নাহি ভেসে যায় !
জেনে রেখো দেহখানা, আর তা-তে প্রাণটা—
এ দু'টোও দরকারী—এ দু'টোতে টানটা

ঘুড়ির চেয়েও কিছু বেশী ক'রে রাখবে
তা' হ'লে ঘুড়ির দোষ আর নাহি থাকবে ॥

কবি

বেচু প্রামাণিক

হ্যাঁ কবির কথাই বলবো মমতা, শোন্ মন দিয়ে।

আমাদের বাড়ির ত্রিতলের যে ছোট্ট ঘরটিতে আমি থাকতুম, সেই ঘরটির ঠিক মুখোমুখি একটি অগোছালো কক্ষে বাস করতেন কবি ললিত সেন। রাস্তার দুই পারে এই দু'টি বাড়ি যেন সমান উচ্চতায় মাথা তুলে পরস্পরের পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল অসীম বিস্ময় ভরে। বাইরের আকাশকে ভালো দেখতে পাওয়া যায় না, বসন্ত কালে গাছের কচি পাতার সৌন্দর্য কেমন করে অপরূপ হয়ে ওঠে—তা আমাদের চোখে পড়েনি কোনো দিন। রাস্তার ধারের জানলা খুললেই নজরে পড়তো—সেনেদের বিরাট অট্টালিকাটি দৃষ্টির সমস্ত পথটুকু রুদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল অস্তিত্ব ছড়িয়ে। ললিতও যদি একবার বাতায়ন খুলে সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিতেন তাহ'লে তাঁর সব-দেখার প্রথমেই মূর্তিমান বাধার মতো চোখে পড়ে যেতো আমাদের এই বাড়িটি। সুতরাং, দু'জনে দেখা-শোনা করতুম শুধু দু'জনাদের বাড়ি দু'টিই। এ-ঘরে বসে আমি দেখতে পেতুম, ও-ঘরের চেয়ারে বসে একটি আপন-ভোলা মানুষ টেবিলের উপর মর্মান্তিক ঝুঁকে পড়ে একটানা লিখে চলেছে কবিতা—নয়ত রবীন্দ্রনাথের কবিতা ক'রে চলেছে আবৃত্তি। কবি ললিত সেনের উচ্চারণ-ভংগী ছিল অতি মনোরম, কণ্ঠস্বর ছিল সুমিষ্ট, সর্বোপরি ওঁর যা ছিল তা হচ্ছে স্বাস্থ্য এবং সৌম্য ও মধুর ভাব। আমার দেহ ও মনে সবে-যৌবন তখন, পাপড়ি মেলছিল রূপ-শতদল, অচেনা অনুভূতি হৃদয়কে করছিল ব্যস্ত। আমার ছোট্ট সেই দুনিয়ায় ললিতের আবির্ভাব তাই কোনো কিছুরই অপেক্ষা রাখেনি।

কেমন একটা বাতিক হয়ে গেল, প্রত্যহ কলেজ থেকে ফিরে এসে একবারটি সেই জানলা খুলে আড়াল হ'তে কবিকে লক্ষ্য করা, তাঁর কণ্ঠ শোনা, তাঁর দৈনন্দিন কর্ম-পদ্ধতি অবলোকন করা……

কবি এক দিন আমার এই লুকোচুরি ধরে ফেললেন, কিন্তু কোনও কথা না ব'লে কেবল একটু হেসেছিলেন আপন-মনে। লজ্জায় আমার যেন মাথা কাটা যাবার যো হ'ল…

তার পর থেকে অবশ্য একটু সাবধান হয়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু ওই বাতিকটা আমাকে এমনি করে পেয়ে বসেছিল যে কবির চোখে ধরা পড়ে গিয়েও চৌর্যবৃত্তিটা কাটিয়ে উঠতে পারলুম না। সেই ভাবে নিত্য এসে দাঁড়াতুম জানলার ধারে।

এত যখন আগ্রহ, এত যখন আকর্ষণ—বুঝতেই পারছিস্—আলাপ হ'তে বেশী দেরী হ'ল না আমাদের মধ্যে। তবে কেমন করে আলাপটা হয়েছিল—আজ আর এক যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সে কথা ভালো মনে পড়ে না। কেবল এইটুকু স্মরণ করতে পারি, আলাপের সময় মুখ তুলে আমি ভালো ক'রে কথা কইতে পারিনি ওঁর সংগে, অসংকোচ নির্দোষ দৃষ্টি তুলে তাকাতে পারিনি ওঁর সদাহাস্য মুখের পানে। আজ মনে হচ্ছে, সেদিন বুঝি আমি অন্তরে-বাইরে ধরা পড়ে গিয়েছিলুম কবির কাছে।

কিন্তু কবি-মানুষগুলো যে এত অদ্ভুত হ'তে পারে, এত অল্পে মোহিত হয়ে যায়, তা আমি ভাবতেও পারিনি। ব্যাপারটা কি হয়েছিল, শোন্।

সকাল বেলা আমি একা একা বেড়াতে বেরুই। ছোট ভাইটা তখন লায়েক হয়ে উঠেছে, কোন্ বাস আর কোন্

ট্রাম কন্দর অবধি যায়, বারংবার জিজ্ঞাসাবাদে ভাইটি পরিষ্কার মুখস্থ করে ফেলেছিল এবং তার ফলে দিদির আঁচল-প্রান্তে আশ্রয় নিয়ে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ানোটা তার মনঃপূত না হওয়ায় সকালে-সন্ধ্যেয় সে আমার সংগ ছেড়ে দিয়েছিল। সেই জন্যে একা-একাই বেড়াতে বেরুতুম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্রাম-লাইন অবধি যাবার মুখে প্রায়ই দেখা হ'য়ে যেতো কবির সংগে। প্রাতর্ভ্রমণটা আমার মতোই তাঁরও একটা প্রাত্যহিক রুটিনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আমাকে আসতে দেখে তিনি হেসে নমস্কার করতেন, বলতেন—চলুন, লেক পর্যন্ত ঘুরে আসি। আমি তাঁর প্রস্তাব শুনে লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠতুম—সকাল বেলায় লেকে যাওয়া, সে কী বিশ্রী! কিন্তু তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবার শক্তি কিংবা সাহস কোনটাই আমার ছিল না। বাসে উঠে উনি আর আমি চলে যেতুম লেকে এবং সেখানে বেশ খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি ক'রে ফিরে আসতুম বাড়িতে। কবি সারাক্ষণ আমার সংগে থাকতেন কিন্তু কথা বলতেন খুব কম। মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকিয়ে দেখেছি, কবি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন আমার মুখের পানে। চোখাচোখি হ'লেই উনি অপ্রতিভ ভাবে মুখ ঘুরিয়ে চাইতেন অন্য দিকে।

এই ভাবে অবাধ মেলামেশার ফলে দু'জনেই এগিয়ে যাই কিছুটা দূর। কবি আমাকে 'তুমি' ব'লে ডাকতে সুরু করলেন।

যেদিনকার ঘটনা বলছি সেই দিন সকাল বেলা কবি আর আমি লেকে গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি কামান তিনটের পাশে—আকাশে উঠেছে সৎ-অন্তরের মতো অমায়িক মিষ্টি রোদ—ভাসছে উদয় দিগন্ত। লেকের জলে প্রভাত-কিরণ আয়নায় রোদ পড়ার মতো ঝলমল করছে, নিস্তরংগ, শান্ত জল। পাখীরা আলোর আনন্দে পাখা মেলে উড়ছে সেই জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে। মধুর মিষ্টি সকাল। কবি হঠাৎ আমার হাত ধরে দিলেন এক টান—টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন কামান তিনটের পাশে, বললেন—চাও ওই জলের পানে!

আমি হেসে ফেললুম: কেন, কী দেখবো চেয়ে?

—কিছুই দেখতে হবে না, কবি কাঁধ থেকে ক্যামেরাটা নামালেন: কেবল ফটো তুলে নেবো একটা। নাও, পোজ ঠিক করো।

বিস্মিতও হলুম না, বিরক্তও হলুম না। কবির এ-রকম অনেক খেয়ালের সংগেই আমার ইতিপূর্বে সাক্ষাৎ হয়েছে, সুতরাং তাঁর আদেশ মতো যত দূর সম্ভব একটা ভালো পোজ নিয়ে চুপচাপ ব'সে রইলুম। কবি ফটো তুলে নিলেন।

সেই দিনই বিকেল বেলা কলেজ থেকে ফিরে অভ্যাস মতো জানলাটা খুলেছি—দেখি, কবি গভীর তন্ময় চিত্তে আমার ফটোখানার পানে তাকিয়ে রয়েছেন মোহাবেশ দৃষ্টিতে। কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়লেও যে তাঁর সাড়া পাওয়া যাবে তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু, সত্যই আমি অত সুন্দর না কি, ভাবছি মনে মনে। কবির চোখে আমি অত মনোহর উঠেছি? গা-হাত রোমাঞ্চিত হওয়া স্বাভাবিক—পুলক ধরছিল না মনে—এমন সময় কবির মদির কণ্ঠ কানে ভেসে এলো:

হে নিরুপমা,
চপলতা আজ যদি ঘটে তবে করিয়ো ক্ষমা।

ব্যাপার কী? কৌতুক আর বিস্ময় কূল ছাপিয়ে নেমে এলো চোখে-মুখে। প্রাণহীন নির্জীব ফটোখানার সংগে কবি অমন ব্যবহার করছেন কেন? কিন্তু ছি ছি, কবি কি না শেষ পর্যন্ত···। হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধরেই ফটোখানা তিনি ঠোঁটের উপর চেপে রইলেন। তার পর ধীরে ধীরে সেটিকে ওষ্ঠমুক্ত ক'রে মেলে ধরলেন চোখের সামনে, বললেন:

যা-কিছু সুন্দর তা করেছি চুম্বন
যা করেছি চুম্বন তা হয়েছে সুন্দর!

এবারে আমার রাগ হ'ল ভয়ানক, সর্বাংগ ঘেমে উঠলো। সেই সংগে কেমন একটা তীব্র জ্বালা ও অশুচি ভাব অনুভব করতে লাগলুম অন্তরে। আড়াল থেকে সরে এসে এবার সোজাসুজি দাঁড়ালুম জানলাটার ধারে—অস্বাভাবিক কঠিন কণ্ঠে ডাকলুম—ললিত বাবু, ললিত বাবু, শুনছেন···

কবি তখন মর্তেই বিচরণ করছিলেন, আমার ডাক শুনে পেছন ফিরে তাকালেন। আমাকে দেখে কিন্তু তিনি মোটেই অপ্রতিভ হলেন না, 'বাতায়নে'র ধারে এগিয়ে আসতে আসতে স্বচ্ছ-সহজ গলায় প্রশ্ন করলেন: ডাকছো আমাকে?

ন্যাকামী দেখে আরো রেগে গেলুম—হ্যাঁ—

কবি সহাস্যে বললেন—কী বলছো?

আমি তখন ফুলছি: ফটোখানা ফেরৎ দিন।

তিনি বললেন—কেন?

আমি বললুম—ওখানা আমার।

উনি বললেন—জানি।

—দিন তাহ'লে।

—ফেরৎ দেবার জন্যে তো এটা তুলিনি—এটা তুমি পেতেই পারো না!

—পাবো না?

—না।

—দেখুন, ভদ্রতারও একটা সীমা আছে—আপনি সে-সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

—কখনই তা ছাড়িয়ে যাচ্ছি না। জানো রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন:

অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয় তার চিত্তে বেদনা অপার,
তার নিত্য জাগরণ। অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি' চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।

আরো রেগে উঠলুম: দেবেন না তাহ'লে?

—কত বার বলবো।

—বেশ। ব'লে ঝপাং করে ওঁর মুখের উপরেই জানলাটা দিলুম বন্ধ করে। রাগে, অপমানে আমার চোখে তখন জল এসে পড়েছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে বেশ খানিকক্ষণ কাঁদলুম। কাঁদতে কাঁদতে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীকে স্মরণ করে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম—এ-জীবন থাকতে যদি ওঁর সংগে আর কখনো কথা কই তো আমি যেন···থাক্ অত বড় দিব্যি মুখ ফুটিয়ে নাই-বা বললুম।

দিব্যিটা কিন্তু রাখতে পেরেছিলুম কিছু কাল। পরদিন থেকে ওঁর সংগে বেড়াতে যাওয়া তো দূরের কথা, দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতুম না। রাস্তার উপর সতর্ক দৃষ্টি স্থাপন করে আমি বেড়াতে

যেতুম, দৈবাৎ যদি কোনো দিন ট্রামে কিংবা বাসে দেখা হ'য়ে যেতো তাহ'লে তখুনি আমি এমন ব্যবহার আরম্ভ ক'রে দিতুম যে, ভদ্রতার খাতিরে অত লোকের মাঝে উনি আর পরিচিতের মতো কোনো প্রস্তাবই তুলতে পারতেন না। কোনো কোনো বার ঠিকানা আসবার আগেই নেমে যেতুম ওঁর পাশ দিয়ে ঘৃণার দৃষ্টি ছুড়ে দিয়ে, উনি বোবা হয়ে যেতেন। কিন্তু আশ্চর্য! ওঁকে গম্ভীর হ'তে দেখিনি কখনো—মান-অভিমান যেন ওঁর স্বভাববিরুদ্ধ। আমার ছোট ভাইটির সংগে ওঁর আলাপ ছিল খুব, আগে যেমন 'নবারুণ' পাঠিয়ে দিতেন ভাইটির হাত দিয়ে—এত কাণ্ডের পরও তেমনি ভাবে 'নবারুণ' পাঠিয়ে দিতে লাগলেন। চিঠিপত্র আমাকে কোনো দিন দেননি, এ ব্যাপারেও তার সাহায্য নিলেন না। কবি তেমনি বসে কবিতা লেখেন—তেমনি কবিতা আবৃত্তি করেন—আমার শূন্য ঘরের পানে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস চেপে নেন। আমি প্রত্যহ আড়াল হ'তে তাই দেখি—আর প্রত্যহ চোখের জলে মুখ ভাসিয়ে দিই।

কত দিন এমনি ভাবে নিজেকে নিজে দগ্ধ করতুম জানি না—কিন্তু কলকাতায় এলো রসিদ আলি দিবস—হিন্দু-মুসলীম-কমিউনিষ্ট-কংগ্রেস এক হওয়ার দিন। সকল সম্প্রদায়ের মিলিত পতাকা উড্ডীন হ'ল একই আকাশে পাশাপাশি—সকলেই চিৎকার করে উঠলো সমবেত কণ্ঠে: চলো ডালহাউসী স্কোয়ার! বিরাট সেই ছাত্র-জনতা—বিরাট সেই সংঘবদ্ধ একতা। হাতে নেই অস্ত্র, মুখে নেই বিদ্রোহের ভাষা—শুধু তাজার কণ্ঠের দাবী: রসিদ আলির মুক্তি চাই! চলো ডালহাউসী স্কোয়ার!

নির্বীর্য্য এ-জাত। নিরুত্তাপ এদের রক্ত। পতাকা আঁকড়ে ধরে হাসিমুখে পারে মরণকে বরণ করতে—কিন্তু সেই পতাকার ডাণ্ডা বসাতে পারে না কারো মাথায়। জাতীয় নিশান উড়িয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে গুলী খেতে পারে সগৌরবে—কিন্তু সে-গুলী দিতে পারে না কারো বুকে। শহীদ হবার স্বর্গীয় আকাংখা আছে সকলের—কিন্তু পাথরের মতো চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে শহীদ হয়। এ-জাতের মুক্তি কোথায়? অহিংসা নীতিতে কবে কোন্ দেশ স্বাধীন হ'তে পেরেছে?—পরাধীন দেশে অহিংসা কাপুরুষতারই নামান্তর!

কবির কথা এগুলো। তাই জানতুম, এমন একটা প্রচণ্ড গোলযোগে কবি কখনই নিস্পৃহ ভাবে ব'সে থাকতে পারবেন না ঘরে—তিনি ছুটে বেরিয়ে যাবেনই। তরবারির জয়গান শুনেছি তাঁর নানা কবিতায়। সুতরাং আমার দিব্যির কাছে আমি পরাজিত হলুম—কবিকে শহরের এ অবস্থায় কি ক'রে ছেড়ে দিই? চুপি-চুপি খিড়কীর দরজা খুলে আমি বেরিয়ে পড়লুম বাইরে—এদিকে-ওদিকে একবার চকিতে তাকিয়ে নিয়ে ঢুকে পড়লুম কবিদের বাড়িতে—সিঁড়ি ভেঙ্গে সোজা উঠে এলুম কবির কক্ষে। কবি তখন খদ্দরের জামা-কাপড় প'রে ফেলেছেন, গান্ধী-টুপিতে নেতাজীর মূর্তি-আঁকা একটি ব্যাচ আঁটছিলেন যত্ন ক'রে। আমাকে প্রবেশ করতে দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন—এসো—এসো। কিন্তু এখন তো আমার মোটে সময় নেই, রেণু!

আমি কাছে এগিয়ে গিয়ে বললুম—মানে?

—মানে?

মন দেওয়া-নেওয়া অনেক করেছি
শতরূপে শত বার
নূপুরের মতো বাজিয়াছি পায়ে পায়ে…

—বুঝলুম। এবার কি করতে চান্?

—এবারের ভার তোমার ওপর। ব'লে টুপিটা আমার হাতে তুলে দিয়ে কবি মাথাটা ঈষৎ নত করলেন:

তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা,
এবার আমার অংগ ছেয়ে
পরাও রণ-সজ্জা।

দাও, পরিয়ে দাও। কবি হাসছিলেন।

—সত্যি আপনি যাবেন? আমি টুপিটা পরিয়ে দিলুম ওঁর আনত মস্তকে: কিন্তু আমার মন বলছে, কোনো একটা অঘটন হ'য়ে যেতে পারে—আমি ছল-ছল ক'রে উঠলুম।

—এ দেশের অভিধানে অঘটন ব'লে কোনো নতুন শব্দ নেই রেণু! যা-কিছু ঘটছে এবং যা-কিছু ঘটবে—সমস্তই এক অলিখিত ইতিহাসে নির্দেশ দেওয়া আছে। এ দেশ স্বাধীন না হ'লে কোনো ঘটনাকেই অঘটন আখ্যা দেওয়া যেতে পারে না। রক্ত এ দেশের জন্যে দরকার—প্রচুর রক্ত। যুবকের রক্ত, হিন্দু-মুসলমানের রক্ত, তোমার আমার রক্ত। নেতাজীর বাণীটা ভুলে যেয়ো না: 'তুম্ মুঝে খুন দেও, হাম্ তুমকো আজাদী দুংগা।' অঢেল রক্তের ডালি অর্পণ না করলে কোনো পরাধীন দেশেরই স্বাধীনতা-সুন্দরী সন্তুষ্ট হ'তে পারে না, রেণু!

আমি নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইলুম। কবির কথাগুলো ঠিক সহ্য করতে পারছিলুম না। কবি আমার অবস্থা লক্ষ্য না ক'রে মন্থর চরণে এগিয়ে গেলেন নেতাজীর প্রতিকৃতির সামনে—আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অনুকরণে ঠুকলেন একটা লম্বা স্যালুট—বললেন:

এই চির পেষণ-যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এ আত্ম-অবমান, অন্তরে-বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারংবার
মনুষ্য-মর্য্যাদা গর্ব চির পরিহার।
—এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরম আঘাতে
চূর্ণ করি' দূর করো।

জয় হিন্দ্! কবি আরেকটা স্যালুট ঠুকলেন: রেণু, চলি। হাতে অস্ত্র নেই, নির্বীর্য্য ভীরু জাত। তবু, তবু যতটুকু পারি আজকের সমগ্র পরিস্থিতিটা বুঝবো—অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ জানাতে পিছ-পা হ'ব না—আমাদের শক্তিকে পর্য্যুদস্ত হ'তে দেখলে চিৎকার ক'রে বড়-গলায় ব'লে উঠবো:

আমাদের শক্তি মেরে
তোরাও বাঁচবি নে রে
বোঝা তোর ভারি হ'লেই
ডুববে তরীখান।

নিজকে সামলে নিলেন কবি। তার পর আবার একটু হেসে আমার পানে চেয়ে শান্ত স্বরে বললেন—যদি ফিরে আসতে পারি, আবার দেখা হবে। যদি না ফিরে আসি, তাই যাবার আগে ক্ষমা

চেয়ে যাচ্ছি রেণু—যে-সব অপরাধ তোমার কাছে পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে—সেগুলোর কথা ভুলে যেয়ো। সেগুলোর কথা আজকের দিনে ভাবতে আমারই কেমন লজ্জা লাগছে ।...শুধু দেশকে ভালোবাসা ছাড়া পরাধীন জাতির পক্ষে আর কোনো ভালোবাসাই নেই। শুধু ব্যক্তি মাত্রের সুখ-শান্তি মান-অভিমানের কথা চিন্তা করা কেবল অপরাধ নয়, মহাপাপ। আজ বিদায়-মুহূর্তে তোমার প্রতি এই আমার শেষ বাণী।

কবি পতাকাটা তুলে নিলেন কাঁধে :

কান্না নয় রেণু, হাসো হাসো। যে যুগের মানুষ আমরা, সে যুগের অহিংসা নীতির মতো কান্নাও একটা মস্ত দুর্বলতা। কাঁদবে কারা, যারা সব পেয়েছে। অহিংসা শোভা পাবে কাদের, যারা বীর। আমরা সবহারা, আমরা দুর্বল, আমরা পর-পদানত। আমাদের কান্না, আমাদের অহিংসা নীতি, পরবর্তী সব-পাওয়া সুস্থ স্বাধীন ভারতবাসীর পক্ষে লজ্জার কারণ হ'য়ে দাঁড়াবে। তারা পূর্বপুরুষদের ইতিহাস পড়ে মাথা হেঁট করবে। সুতরাং, তোমার ওই চোখের জল আমার মস্তকে বর্ষিত হোক্ আগুনের ফুলকিরূপে—ও চোখের জল আমার যাত্রাপথ ক'রে দিক্ আরো মসৃণ, আরো নির্বিঘ্ন।

জাতীয় পতাকাটা বাতাসের মুখে উড়িয়ে দিয়ে কবি চলে গেলেন আমার সুমুখ হ'তে। আমি অনাবিল অশ্রুধারায় ঝাপ্‌সা দেখলুম কবির যাত্রাপথ।

কবি কিন্তু ফেরেননি। সন্ধ্যার সময় খবর পেলুম—কবি গুরুতর আহত, তাঁকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি ক'রে দেওয়া হয়েছে।

খবর শুনে আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম। কারো পেছু-ডাক গ্রাহ্য না ক'রে আমি তখুনি পাগলিনীর মতো বেরিয়ে পড়লুম বাড়ি থেকে। সহস্র বাধা-বিপত্তি উল্লংঘন ক'রে অনেক কষ্টে গিয়ে পৌঁছুলুম কবির অন্তিম শয্যায়। সারা দেহে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—একটা কাঠের পুতুলের মতো কবি পড়ে আছেন। মুখখানা ভালো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, বেদনা-বিদীর্ণ পাণ্ডুর মুখ। চোখের তারায় শুধু একটা স্থির বিদ্যুৎ। মনে হ'ল, কবি তাকিয়ে আছেন অনেক—অনেক দূরে—কান পেতে শুনছেন কোনো বলিষ্ঠ নির্ভীক পদধ্বনি।

তাঁর আশে-পাশে চতুর্দিকে তাঁরই মতো অসংখ্য মৃত্যুঞ্জয়ী সৈনিকেরা নিঃসাড় নিস্পন্দ ভাবে শুয়ে রয়েছেন। কারো মুখে কোনো বেদনার লক্ষণ নেই—কারো কণ্ঠস্বরে যন্ত্রণার আভাস মাত্র নেই। সকলেই শান্ত, সকলেই নির্বাক্। কেবল যে যন্ত্রণা সহ্য করতে একেবারেই কাতর হ'য়ে পড়েছে, সে শুধু শ্রদ্ধান্বিত কণ্ঠে উচ্চারণ করছে—বন্দে মাতরম্! আর কোনো কণ্ঠ নেই—সকল কণ্ঠেই পুঞ্জীভূত শুধু এই একটি বাণী। ডাক্তার, নার্স যন্ত্রের মতো কাজ ক'রে যাচ্ছেন—মৃত্যুর পরোয়ানা তাঁরা ছিঁড়ে কুটি-কুটি ক'রে দিতে চান।

আমি তবু কাঁদছিলুম!

কবি বোধ হয় দেখতে পেয়েছিলেন, বললেন—ছিঃ!

আমি আকুল হ'য়ে বললুম—এ কি দেখছি কবি?

কবি বললেন—যা দেখছো তা একেবারেই সত্যি আর সুন্দর রেণু! স্বাধীনতা-সংগ্রামের অনেকখানি চেতনা-বোধ নেতাজী আর আজাদ হিন্দ ফৌজ আমাদের সর্ব জাতির সর্বশ্রেণীর অণু-পরমাণুতে সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছেন—যা ষাট বছর হ'য়ে পেরে ওঠেনি কংগ্রেস। এই চেতনাবোধ বহু-পূর্ব থেকেই আমাদের মাঝে সুপ্ত ছিল, আজ থেকে তার ব্যাপকতর জাগরণ ঘটলো। তাই এই গণ-শক্তির এমন একটা কালো ছাপ প্রতিটি ভারতবাসীর অন্তরে চির মুদ্রিত হ'য়ে থাকবে যে, বৃটিশকে অচিরেই তারা ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য করাবে। এ গণ-শক্তির অভ্যুত্থানে বৃটিশ-সিংহাসন থরো-থরো কেঁপে উঠবে। কিন্তু সারা জীবন ধরে আমি কি দেখেছি জানো?

শুষ্ক ওষ্ঠে কবি একবার জিভ বুলিয়ে নিলেন :

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা
কপট রাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,—
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন
শক্তির অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক
উন্মাদ হ'য়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিস্ফল
মাথা কুটে।

কবি তখনো কবিতা ভোলেননি—তাঁর সেই আবৃত্তি মর্মে মর্মে আঘাত দিয়ে ফিরতে লাগলো :

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে,
বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন
দুঃস্বপনের তলে
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু
নিবাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ
তুমি কি বেসেছ ভালো?

রেণু! সাম্রাজ্যলোভীদের অনেক অবিচার অনেক অন্যায় ঔদ্ধত্য আজ ভারতের ধূলিকণাগুলিকে পর্যন্ত ক্লেদাক্ত দূষিত ক'রে তুলেছে। অনিবার্য বিদায় সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তাই এই শোষক দল শেষ শক্তির দম্ভ দেখাচ্ছে। কিন্তু এ-শক্তি আজ খণ্ডিত, এ-শক্তি আজ নিস্ফল। দু'-এক বছরের মধ্যে ভারতের দিকে-দিকে প্রচণ্ড গণশক্তির অভ্যুত্থান দেখা দেবে—সেই অনাগত মহাশক্তির সম্মুখে বৃটিশ-দম্ভ আহত হবে। ভারতীয় ব'লে যারা এতটুকু পরাধীনতার বেদনা অনুভব করে—কী হিন্দু, কী মুসলমান—তারা কেউ-ই ভারতে ইংরেজের অবস্থিতি সহ্য করতে পারবে না। যে-বুটের তলায় এত কাল আমাদের শির ছিল অবনত, সেই শির আজ হিমালয়ের মতো সমুন্নত। কিন্তু, তবু এরা আমাদের পেষণ করতে চায়, নির্যাতন করতে চায়, দাবী অস্বীকার করতে চায়। তাই এই বিষাক্ত ও ভণ্ড জাতির সংগে কোনো মতেই চলতে পারে না আপোষ করার হীনতা—প্রসাদ-সন্তুষ্ট ভিক্ষুকের মতো কণামাত্র দান গ্রহণ করা—মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, ওদের দাম্ভিক কণ্ঠকে ছাপিয়ে, সোজা এবং উন্নত হ'য়ে বলতে হবে : ভারত তোমাদের ছাড়তেই হবে—ছাড়ো ভারত!

—কবি, চুপ করো। আমি ওঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম।

—চুপ করবো? হ্যাঁ, চুপ করাই আমার উচিত। কিন্তু কেন, কেন চুপ করবো? কবির উত্তেজনা বেড়ে গেল:

আড়াই শো বছর ধরে আমরা চুপ ক'রে আছি—আর নীরব থাকা মানায় না, রেণু। এবার হুংকার দেবার সময় এসেছে—নিরীহ পতংগের মতো স্বাধীনতা-আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনর্থক পুড়ে মরা নয়—আহত সিংহের মতো শেষ গুলী খাবার আগে থাবা উঁচিয়ে রুখে দাঁড়ানো। 'স্বাধীনতা দাও' ব'লে নতজানু ভিখারীর মতো প্রার্থনা নয়—'স্বাধীনতা চাই' ব'লে বলিষ্ঠ গর্জন। ওদের দেওয়া না-দেওয়ার মাঝে কোনো আপোষ-নীতি চলতে পারে না—আপোষ করবে কারা? যারা সমান বীর, যারা চতুর, যারা সমান কূট-নীতিজ্ঞ। আমরা ভীরু, আমরা বোকা, আমরা সরল। সুতরাং আপোষ-নীতিতে আমাদের সায় দেওয়া মানে—নিজেদের দুর্ভাগ্যকে আরো কায়েমী ক'রে তোলা, আমরা স্বাধীনতা-লাভের অযোগ্য প্রমাণ করা।

পাশাপাশি সব আহতেরা নিশ্চুপে তাকিয়ে আছেন কবির পানে। কবি একটু সংযত হয়ে উর্ধ্বলোকে চেয়ে আপন-মনে আবৃত্তি করলেন:

তুমি সর্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

কতকগুলি ছোট ছেলে প্রবেশ করলো। তাদের সম্মুখবর্তীর হাতে জাতীয় নিশান—তারা কদম কদম এগিয়ে এসে কবিকে 'জয় হিন্দ' স্যালুট ঠুকলো, তার পর হাঁটু মুড়ে বসলো কবির শিয়রদেশে। কবিকে তারা দেখতে এসেছে। আমাদেরই পাড়ায় থাকে ছেলেগুলি। কবির পার্শ্বচর।—কেমন আছেন? তারা প্রশ্ন করলো।

—ভালো বললে খুশী হবে, কিন্তু ভালো নই—এ দেশের কেউ-ই ভালো নেই। যারা ভালো আছে তারা সেই শ্রেণীর লোক—যাদের সংগে ইংরেজের কোনো পার্থক্য নেই। কবির কণ্ঠ ক্রমশঃ বিকৃত হয়ে আসছে, সেই সুমধুর উচ্চারণ-ভংগী কেটে কেটে যাচ্ছে:

তোমাদের মতো যারা এই বয়েস থেকেই পরাধীনতার বেদনা অনুভব করতে শিখেছে, তাদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভ-কামনা রইলো। ভারতবর্ষ আর পরপদানত থাকতে পারে না, ভারত স্বাধীন হবেই। সেই স্বাধীন ভারতের তোমরা এক-এক জন সৈনিক—তোমাদের চরম লক্ষ্য হোক স্বাধীনতা রক্ষা করা—মাতার অশ্রুধারা, বীরের রক্তস্রোত অঝোরে ঝরে তো ঝরুক—কিন্তু তোমরা সংকল্পচ্যুত হয়ো না একটি মুহূর্ত্তের তরে।

একটু থামলেন কবি:

ভারতের বন্দর থেকে ইংরেজ নোঙর তুলবে না সহজে—অনেক প্রতিশ্রুতি দেবে, অনেক কূটনৈতিক জাল বিস্তার করবে—কিন্তু তাদের বিশ্বাস কোরো না ভাই, যে আপোষ-পথে ওরা টেনে নিয়ে যেতে চাইবে সে-আপোষ-পথে তোমরা যেয়ো না কেউ। আপোষ করা আমাদের শোভা পায় না। ওরা পরগাছা সৃষ্টি করে যাবে ভারতের সর্ব্বত্র, সহজ ও সুন্দর ভাবে বাঁচবার অনেক বাধা-বিপত্তির বনস্পতি রোপণ করে যাবে আমাদেরই মাঝে। হয়ত তার ফলে গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠবে—নিজেরাই নিজেদের রক্তে পরিতৃপ্ত হ'তে চাইবো—কিন্তু আমি বলছি তোমাদের, এই যদি সত্যই ভারতের ভাগ্যে থাকে তাহ'লে জেনো, তা মংগলের জন্যেই আছে। গৃহযুদ্ধ আমাদের অনেক শিক্ষা দিয়ে যাবে, অনর্থক লোকক্ষয় তার পরবর্তী কালকে সুন্দর ক'রে তুলবে।

কবি হাঁপিয়ে উঠছেন:

যত বড় অমংগল যত বড় সর্বনাশই আসুক—জেনো, সেই অমংগল ও সর্বনাশের পেছন-পেছন অতি-বড় মংগল ও আশ্বাস আসছে—যত বড় নৃশংস বিরোধই বাধুক আমাদের মধ্যে—জেনো, সে বিরোধ বৃহত্তর শান্তির জন্যেই বেধেছে। ভারতের ভাগ্যাকাশে যত ঘনঘটা করেই অন্ধকার নেমে আসুক, নিরাশ হ'য়ো না ভাই—আড়াই শো বছরের পরাধীনতার সুকঠিন নাগপাশ ছিন্নভিন্ন করতে অনেক অন্ধকার, অনেক হত্যার প্রয়োজন। তোমরা ভাবী কাল। তোমরা ভাবী ভারত। তাই তোমাদের কাছে একটা কথা বলে যাই, স্বাধীনতা অর্জন করাই যেন তোমাদের চরম উদ্দেশ্য না হয়—স্বাধীনতা রক্ষা করার ক্ষমতা যেন তোমাদের থাকে। সেই ক্ষমতার চেহারা দেখে ভয় পেয়ে যাবে আর-সব সাম্রাজ্য-লোভীর দল, ভয় পেয়ে যাবে পৃথিবী। ভারতের সোনা আমাদেরই থেকে যাবে, ভারত মধুর হবে!

কবি এলিয়ে পড়লেন।

আমি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকলুম—কবি···

ছেলেরা ডাকলো—ললিতদা'···

কবি নিমীলিত চক্ষু পুনরুন্মীলন করলেন। ব্যথিত সজল ছেলেগুলির পানে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকালেন একবার, তার পর আমার দিকে চেয়ে অতি ধীরে ধীরে আবৃত্তি করলেন:

সময় আসন্ন হ'লে
আমি যাব চলে
হৃদয় রহিল এই শিশু-চারা-গাছে
এর ফুলে, এর কচি পল্লবের নাচে
অনাগত বসন্তের আনন্দের
আশা রাখিলাম,
আমি হেথা নাই থাকিলাম।

কবি আজ নেই, মমতা। কবি সেই দিনই চলে গেছেন। কবিকে প্রণাম।

চীনের প্রাচীনতম কাব্য-সম্পদ

শ্রীনচিকেতা সেন

চীনের যে কাব্য-সম্পদ্ সব চেয়ে প্রাচীন বলে চলে আসছে, তার নাম "শ্লি চিঙ"। চীনা ভাষায় শ্লি মানে কবিতা। কিন্তু চিঙ বলতে চীনারা যা বোঝেন, বাংলায় সে মানে বোঝবার মত প্রতিশব্দ বোধ হয় নেই। পাশ্চাত্যেরা "চিঙ'এর অনুবাদ করেছেন "ক্লাশিক" শব্দ। কিন্তু "চিঙ" বলতে যা বোঝায় ও ক্লাশিক' বলতে আমরা সাধারণতঃ যা বুঝে থাকি, এ দুইয়ের ভিতর পার্থক্য অনেক। বাংলায় 'চিঙ' শব্দের অনুবাদ করা যেতে পারে একমাত্র 'আর্ষ' কথায় দ্বারা—'ঋষিরা যা বলে গেছেন।' "শ্লি" 'চিঙ' মানে তাহলে দাঁড়াচ্ছে 'আর্ষ কবিতা'। অনেকটা বেদের মতই শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়ে আসছে চীন দেশের এই "শ্লি চিঙ"।

আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বা আড়াই হাজার বছর আগে চীন দেশের শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছিলেন "চউ" রাজবংশ। সেই রাজবংশের আমলে যে সব গান রচিত হ'য়েছিল তারই সামান্য কিছু এখন পর্যন্ত টিকে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেচে। কবিতা বা গানের সেই সংগ্রহকেই বলা হয় " শ্লি চিঙ"।

চউ রাজবংশ ১১৩৪ খৃঃ পূর্বাব্দ থেকে ২৪৭ খৃঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত চীনকে শাসন করেছিলেন। পূর্ব চউবংশ ও পশ্চিম চউবংশ এই দুই ভাগে চউ রাজবংশকে ভাগ করা হয়। চউবংশের প্রথম যুগে অর্থাৎ পশ্চিম চউবংশের আমলে চীনের রাজধানী ছিল বর্ত্তমানের শান্‌সি প্রদেশে। এইটাই ছিল চউ রাজবংশের সব চেয়ে গৌরবময় যুগ। শ্লি চিঙের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি এ যুগে রচিত। সম্রাট্ ইউ ওয়াঙের রাজত্বকালে ছুয়ান্ জুঙ নামে এক অসভ্য জাত চীন আক্রমণ করে রাজধানী দখল করে বসেছিল। তাদের কাজ ছিল কেবল লুঠ-পাট্ করা। এ সময়টা চীন-সাহিত্যের পক্ষে বেশ ক্ষতির যুগ গিয়েছে। সম্রাট্ ইউএর ছেলে ফিঙ ওয়াঙ যখন সিংহাসনে বসলেন, তখন তিনি রাজধানী পশ্চিম থেকে সরিয়ে পূর্বদিকে বর্ত্তমানের হোনান্ প্রদেশে নিয়ে এলেন। এই ভাবে পূর্ব চউবংশের সৃষ্টি হ'ল। চউ সাম্রাজ্য কিন্তু তার আগের গৌরব আর ফিরে পেল না। চউ সাম্রাজ্যের শেষের এই ৩০০ বছর কেবল অবনতির যুগ। ভাল কাব্য এ যুগে রচিত হয়নি। কোন কোন চীনা পণ্ডিতের মতে শ্লি চিঙে এমন কয়েকটি কবিতাও আছে, যা চউবংশেরও আগে রচিত হয়েছিল কিন্তু পুরাতত্ত্ববিদ্দের গবেষণায় এ সত্য এখনও সপ্রমাণ হয়নি।

'শ্লি চিঙে'র গানের রচয়িতাদের নাম জানবার কোনও উপায়ই নেই। এমন কি গানগুলি বেছে, নানা শ্রেণীতে ভাগ করে কে যে সম্পাদনা করেছিলেন, তা নিয়েও মতভেদ আছে। "শ্লি চিঙে"র গানগুলির মধ্যে কয়েকটি চ'লে আসছে লোকের মুখে মুখে। কোন বিশেষ ধরণ তাদের নেই। বাকীগুলি রচিত হ'য়েছিল অতিথি ও দেবতাকে স্তব ক'রবার উদ্দেশ্যে। এগুলি সংগ্রহ করা হ'য়েছে দুই উপায়ে। তখনকার দিনে চীনের সম্রাট্ প্রতি পাঁচ বছর অন্তর একবার করে সারা চীনদেশ ঘুরে আসতেন। দেশের যে কোন প্রজা নিজে তাঁর কাছে এসে তাদের অভাব-অভিযোগ জানাতে পারত। দেশ ঘুরে বেড়াবার সময় তিনি দেশের প্রচলিত গানগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসতেন। এই ভাবে সংগৃহীত কাব্যের নাম ছিল 'ছাই শ্লি'। এ ছাড়া প্রজাদের ভিতর যারা বিধবা ও বিপত্নীক হ'ত, হয়ত ছেলে-পুলে বা অন্য আত্মীয়-বন্ধু কেউ নেই, যার উপর তারা নির্ভর ক'রতে পারে, তাদের ভরণ-পোষণের জন্য সরকার থেকে একটা মাসোহারা দেওয়া হ'ত। তাদের কাজ ছিল নানা জায়গা ঘুরে এই সব লোক-সংগীত সংগ্রহ করা। এই ভাবে যে গানের সংগ্রহ হ'ত তার নাম ছিল 'শিয়ান্ শ্লি'। এই দুই উপায়ে সংগ্রহ করা সব গানই যে 'শ্লি চিঙে' স্থান পেয়েছে তা নয়। নানা দিক্ থেকে বিচার করে যে গানগুলি এর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হ'ত তারাই স্থান পেত "শ্লি চিঙে"। চীনের প্রাচীনতম ইতিহাসের বই "সি চিঙে" লেখা আছে গান সংগ্রহের এই ইতিবৃত্তের কাহিনী।

কথিত আছে, "শ্লি চিঙে" প্রথমে কবিতার সংখ্যা ছিল তিন হাজার। কিন্তু এখন এতে আছে মাত্র তিনশ একটি কবিতা। এক দল পণ্ডিত বলেন, ঋষি কন্ ফু চিজ (চ+জ+ই—এঁকে সাধারণতঃ আমরা কনফুশিয়াস বলে থাকি। বৈদেশিকদের অজ্ঞতার জন্যে তাঁর নাম সারা জগতে এই রকম বিকৃতরূপে প্রচলিত হ'য়ে প'ড়েছে। চীনেরা তাঁকে কন্ ফুচ্‌জি বলেই সম্বোধন করে।) সেই সংগ্রহের অধিকাংশ কবিতা অশ্লীল বলে বাতিল করে দিয়ে বর্ত্তমানের এই সংগ্রহ করেছেন। আধুনিক পণ্ডিতেরা কিন্তু কন্ ফুচ্‌জির উপর আরোপিত এই অপবাদ একেবারেই মানেন না। তাঁরা বলেন, তাঁর অনেক আগে থাকতেই ৩০১টি গানে সম্পূর্ণ শ্লি চিঙের এই সংগ্রহ চ'লে আসছে। তাঁদের মতে অশ্লীলতা দোষের জন্য ৩০০০ কবিতার মাত্র ৩০১টি রেখে বাকী সবগুলি তিনি বাতিল করে দিয়েছেন একথা যদি সত্যি হ'ত, তবে অন্ততঃ এই ৩০১টি কবিতায় সে দোষ কিছুতেই থাকত না। কিন্তু শ্লি চিঙে এখনও এমন অনেক কবিতা আছে, যা শিষ্ট সমাজের পক্ষে একেবারেই অপাঠ্য বলে বিবেচিত হ'তে পারে। এ ছাড়া আরও এমন অনেক যুক্তি তাঁদের পক্ষে আছে, যা থেকে মনে হয় শ্লি চিঙের এই কাব্য-সংগ্রহ সম্ভবতঃ কন্ ফুচ্‌জির আগে থাকতেই প্রচলিত ছিল।

চীনের শিক্ষিত সমাজে শ্লি চিঙের প্রভাব খুবই বেশি। ঋষি কন্ ফুচ্‌জি তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন, "তুমি যদি মানুষ হ'তে চাও, তবে আগে শ্লি চিঙ্ পড়ে এস।" চীনের শিক্ষিত সমাজ তাঁর একথা এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্বাস করেন। শ্লি চিঙের কোন কবিতারই বাংলা অনুবাদ এখন পর্যন্ত হ'য়েছে বলে জানা নেই। "শ্লি চিঙে"র ও তার অব্যবহিত পরের যুগের কয়েকটি প্রাচীন কবিতার বাংলা অনুবাদ এখানে দেওয়া হ'ল। কবিতাগুলি মূল চীনা থেকে করা হয়েছে। এই কবিতাগুলি এত পুরোনো আমলের জিনিষ বলেই এর ভাষ্য এবং টীকা টিপ্পণীও আছে অনেক। টীকাকারেরা অনেকেই অনেক মানে টেনে বার করেছেন একই কবিতা থেকে। ফলে এক দলেরা যে মানে করেছেন, হয়ত তা অন্য দলের ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত। আধুনিক পণ্ডিতেরা এই সব কবিতাকে খুব সহজ ভাবে নিচ্ছেন—তাঁরা বলেন, সাধারণ লোকেরা তাদের হাসি, কান্না, প্রেম, আনন্দ ও উৎসবের কথাই লিখে রেখেছে এই সব পুরোনো গানে। কোন গূঢ় অর্থ তাঁরা বোঝাতে চাননি। প্রাচীন আমলের পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা বলেন, "বাস্ রে! সে'ও কি সম্ভব? এর এক একটি কবিতা কি শুধু কবিতা? অত্যন্ত নিগূঢ় রাজনৈতিক ঘটনার আভাস দেওয়া হ'য়েছে এই সব ছোট ছোট কবিতায়।" কাজেই এ রকম কবিতার অনুবাদ করা যে কতটা বিপজ্জনক তা সহজেই অনুমেয়। সেই জন্যে ভাব বাঁচিয়ে যত দূর আক্ষরিক অনুবাদ

করা সম্ভব, তা আমি করেছি। কারণ, তা না হ'লে টীকাকারদের কোন না কোন দলে যোগ দেওয়া ছাড়া অনুবাদকের আর কোন গতি থাকে না। আক্ষরিকতার উপর অতটা জোর না দিলে হয়ত কবিতা ক'টিকে আরও একটু সুবোধ ও সরস করা যেতে পারত।

"শ্লি চিঙ"এর প্রথম কবিতাটি হ'চ্ছে, "কুয়ান্ কুয়ান্ চ্যু কিউ।" অনুবাদ করলে মানে দাঁড়াবে "চখা ডাকে কুয়ান্ কুয়ান্।"

"চখা ডাকে 'কুয়ান্' 'কুয়ান্'
নদীর বুকে জেগে ওঠা মাটীর ঢিবির উপর।
তন্বী কুমারী তার মনের মেয়ে।
উঁচু নীচু শালুক,
দুলছে ডাইনে বাঁয়ে
তন্বী কুমারী—
তাকে সে খুঁজে বেড়ায় তন্দ্রায় ও জাগরণে
বৃথাই খোঁজে।

কত রাত, কত দিন
সে ধ্যান করেছে স্বপ্নের মাঝে
আর জাগরণের আবর্তে।
শয্যাকণ্টক হ'য়েছে তার কত বিনিদ্র রজনী।

উঁচু নীচু শালুক খুঁটে তুলেছে ডাইনে ও বাঁয়ে।
তন্বী কুমারী।
এক তালে বেজে উঠেছে ছিন্ আর স।
উঁচু নীচু শালুকের ব্যঞ্জন হ'ল তৈরী।
বেজে উঠ্‌ল ঢাক আর ঘণ্টা।"

বিভিন্ন টীকাকারেরা কবিতাটির মানে বিভিন্ন রকমের করেছেন। প্রাচীন মতের পণ্ডিতদের অভিমত—এই কবিতায় চউ রাজবংশের এক রাজার কথা বলা হ'য়েছে। 'কি রকম মেয়েকে রাণী করলে প্রজাদের দুঃখ দূর হবে দেশে শান্তি আসবে' সেই চিন্তায় শয্যাকণ্টক হ'ত তাঁর বিনিদ্র রজনী। অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেল সেই সর্বগুণান্বিতা মহিলাকে। তিনি তাঁকে বিয়ে করলেন—তাই এক তালে বেজে উঠল ছিন্ আর স—এক সঙ্গে বেজে উঠ্‌ল ঢাক্ আর ঘণ্টা। আধুনিক সমালোচকদের মতে চার হাজার বছর আগেকার সাধারণ কোন একটি ছেলে তার মনের মত মেয়েকে খুঁজে পেতে কতটা কষ্ট সহ্য করেছিল সেই কথাই সে ব্যক্ত করেছে এই প্রেমের কবিতায়।

'শ্লি চিঙে'র আর একটি বিখ্যাত কবিতার প্রথম লাইন হ'ল "ইয়ে ইউ শ্লি চ্যুন্"—"দিগন্ত ছোঁওয়া প্রান্তরে একা মৃতা কস্তুরী মৃগী।"

"দিগন্ত-ছোঁওয়া প্রান্তরে একা মৃতা কস্তুরী মৃগী।
শুভ্র কাশের আবরণে ঢাকা তনু।
যৌবনরসে মত্ত বালিকা মধু-বসন্তে ঐ,
আবেশে মুগ্ধ অবোধ বালক ভাগ্য যাচাই করে।

ঘন অরণ্যে বনানীর বুকে গুল্ম জাগিয়া ওঠে।
দিগন্ত-ছোঁওয়া প্রান্তরে একা মৃতা কস্তুরী মৃগী—
শুভ্র কাশের আবরণে ঢাকা ক্ষীণ তনুখানি তার,
হীরক-কণিকা বালিকা সে অপরূপ।

মোচন ক'র না সহসা সকল বাধা।
অবগুণ্ঠন স্পর্শ ক'র না মোর।
সারমেয় দল সচকিত হ'য়ে ডাকিয়া না ওঠে দেখ।

কবিতাটি এমনিই কেমন একটু রহস্যময়—কাজেই এর ব্যাখ্যায় প্রাচীন ও নবীন এই দুই মতবাদীদের বৈসাদৃশ্য উপভোগ ক'রবার মত।

আর একটি কবিতা শুনুন। এটি ঠিক শ্লি চিঙের অন্তর্ভুক্ত কোন কবিতা নয়, তবে প্রায় ঐ সময়েরই লেখা। নতুন বৌ, তার শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে।

তরুণ পীচ্

তারুণ্যে ভরা নবীন পীচের গাছ।
ফোটা ফুলে ফুলে দেহ ঝল্‌মল্ করে।
তরুণী বধূ এ চলিছে নতুন ঘরে।
আনি কল্যাণ ঘরে আর তার গেহে।

তারুণ্যে ভরা নবীন পীচের গাছ:
ফলের সংখ্যা অসংখ্য সারা দেহে।
তরুণী বধূ এ চলিছে নতুন গেহে।
আনি কল্যাণ গেহে আর তার ঘরে।

তারুণ্যে ভরা নবীন পীচের গাছ।
সবুজ পর্ণে শাখা ঢলে ঢলে পড়ে।
তরুণী বধূ এ চলিছে নতুন ঘরে।
আনি কল্যাণ গেহে সবাকার তরে।

সহজ সরল কবিতা সন্দেহ নেই। তবে বার বার একই কথার পুনরাবৃত্তি কানে একটু একঘেয়ে লাগে। কিন্তু আগেই বলেছি এগুলি সবই গান—আমাদের গানে আমরা একই কলি দু'বার করে গাই। এও গান বলেই একই কথার বার বার আবৃত্তি গানের সুরে ভালোই লাগে।

আরও একটি ঝরঝরে কবিতা শুনুন। নতুন বউ শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ী যাচ্ছে। শ্বশুরবাড়ীতে সারা দিন সে কি করে ও যাবার আগে কি কি সে সাজিয়ে গুছিয়ে সঙ্গে নেবে—সেই কথাই সে ব'লছে—

"সারা মাঠ জুড়ে রয়েছে শণের গাছ,
উপত্যকার মাঝেও রয়েছে তারা
প্রচুর পর্ণে ঢাকা শাখাগুলি তার।

হলদে পাখীরা উড়িয়া বেড়ায় শুধু,
ঝোপে-ঝাড়ে তারা জটলা করিয়া চলে,
কিচি-মিচি ডাক ডাকে বারে বারে ঐ।
ছড়ায়ে রয়েছে কেবল শণের গাছ
উপত্যকার মাঝ-তক আছে তারা,
প্রচুর পাতার আবরণে ঢাকা শাখা।

কেটে এনে আমি জলেতে কোটাই শণ,
মোটা আর মিহি সুতো কেটে তাঁতে বুনি,
বিরাগ আসে না সে কাপড় পরে কভু।

বিয়ের আগেতে পড়েছি যাঁহার কাছে,
তিনি বলেছেন, 'আবার ফিরিয়া এস।'
তাই ক্ষার-জলে কাচি পরনের শাড়ী।

জলকাচা করি বাইরে যাবার সাজ,
কাচিবার যাহা আর কাচিব না সবে
গোছাই সে সব বাপের বাড়ীতে যাব।

গোঁড়া পণ্ডিতেরা ব'লতে চান, এ এক মন্ত্রীর মেয়ের কথা। মন্ত্রীর মেয়ে হ'য়েও তাঁর কোন বিলাসিতা ছিল না। তিনি সুতো কেটে, কাপড় বুনে সে কাপড় পরতেন এবং নিজের কাপড়ও নিজেই কাচতেন। এ ছাড়া তখনকার দিনের দু'-চারটা রাজনৈতিক ঘটনার আভাসও না কি এই কবিতায় আছে। নবীন কাব্যসমালোচক অবশ্য সে ভাবে কবিতাটিকে নেননি। তাঁরা বলেন, সাধারণের কবিতায় সাধারণ মনোভাব ফুটে উঠেছে। গরীবের মেয়ে শ্বশুরবাড়ীতে আছে—ধু-ধু করা শণ গাছে ভরা উপত্যকার এক পাশে তাদের বাড়ী। এই কথায় একটা উদাস ভাব মনে এনে দেয় কত দিন বাপের বাড়ী ছেড়ে সে যেন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে এই প্রান্তরে। পাশে ঝোপে-ঝাড়ে হ'লদে পাখীরা সারা দিন কিচির-মিচির কচ্ছে—এটা মনে পড়িয়ে দেয় বাপের বাড়ীর সেই কল-কোলাহল-মুখরিত দিনগুলির কথা। বাপের বাড়ী থেকে অনেক দিন হ'ল চলে আসা এই বধূটির জন্যে পাঠকের মন একটু ব্যথিত হ'য়ে ওঠে। তার পর আসে তার কর্মতৎপরতার কথা। সারা দিন সে যে কেবল বসে বসে তার বাপের বাড়ীর কথাই ভাবে, তা নয়। ধু-ধু করা শণের গাছ—হলদে পাখীদের জটলা করার ভিতয়ও সে শণ কেটে এনে জলে ভিজোয়, তা থেকে সুতো কেটে, তাঁতে কাপড় বোনে। নিজেই পরে সেই কাপড়। সবার শেষে একটা উছলে-পড়া খুসীর ভাব। সে সব গোছাচ্ছে—এবার সে বাপের বাড়ীতে যাচ্ছে।

আর একটি ছোট্ট কবিতা শুনুন:

"খুঁটিয়া তুলেছি ইঁদুরকানীর শাক,
আনমনা তাই ভরে না ছোট্ট ঝুড়ি।
দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি, ভেবেছি মনে
মানাবে কোথায় রয়েছে যে মন জুড়ি'।

উচ্চ শৈলে উঠেছি ঊর্ধ্বে ঐ
ক্লান্ত হ'য়েছে শ্রান্ত আমার ঘোড়া।
সোনার পেয়ালা ভরে সুরা দেব আমি,
মিলাবে ভাবনা সারাখণ মন-জোড়া।

তুঙ্গ-শিখরে উঠেছি উচ্চে ঐ,
শ্রান্ত অশ্ব বিবর্ণ হ'ল মোর।
খড়্গি-বিষাণে মদিরা ভরিয়া দেব
মিলাইয়া যাক্ মানস-ক্ষতের ঘোর।

খোঁড়া শিখরে শীর্ষে উঠেছি আমি,
মুমূর্ষু ঘোড়া পীড়িত পথের গায়।
শ্রান্ত সঙ্গী ক্লিষ্ট পথের ক্লেশে
এ কেমনতরো হ'ল বল হায় হায়।"

গোঁড়া পণ্ডিতদের মতে এ-ও না কি এক জন সাম্রাজ্ঞীর কথা। সুদক্ষ কোন রাজকর্মচারীকে তাঁর কৃত কার্যের পুরস্কারস্বরূপ কোন্ উচ্চপদ, কি কি সম্মান তাঁকে দেওয়া যায়, সেই কথাই রাণী ভাবছেন এই কবিতায়: রাজকার্য্যে দুর্গম পর্বতশিখরে তিনি একা গেছেন,—রাণী তাঁকে সোনার পেয়ালা ভরে মদ দেবেন। এই সম্মানে তাঁর সেই কষ্টের গ্লানি কেটে যাবে। অন্যের অনধিগম্য তুঙ্গ গিরিশীর্ষে তিনি গেছেন। তাঁর বাহন অশ্ব পথের শ্রমে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল—এত ক্লেশবহুল ছিল তাঁর সেই অভিযান—সাম্রাজ্ঞী তাঁকে গণ্ডারের খড়্গে তৈরী পেয়ালায় সুরা দেবেন—যার চাইতে মূল্যবান জিনিষ সারা চীনে কোথায়ও নেই। অবশ্য আধুনিক ভাবাপন্ন গবেষকদের মতে এটি নিছক একটি প্রেমের গান। নায়িকা সঙ্কেত-স্থানে এসেছেন। নায়কের আসবার সময় পার হ'য়ে চলল, কিন্তু এখনও তিনি এলেন না—নায়িকা তাই আনমনা। ইঁদুরকানীর শাক তোলবার ছল করে তিনি এসেছেন—ঝুড়িটি ছোট্ট কিন্তু তবু ভরে উঠছে না। না ভরার কারণ—শাকের অপ্রাচুর্য নয় মোটেই—নায়িকার সারা মনটাই পড়ে আছে নায়কের প্রতীক্ষায়—ইচ্ছে করে দেরী করার ভাবও একটু ফুটে উঠেছে "আনমনা তাই ভরে না ছোট্ট ঝুড়ি" এই কথায়। শাক তোলা না হ'লে ত আর তিনি ফিরে যেতে পারেন না। এই ভাবে কিছু দিন চলার পর সম্ভবতঃ তাঁরা দু'জনে মিলে দেশ ও সমাজের শাসনকে এড়াবার জন্য পালিয়ে চলেছেন দুর্গম গিরি-পথে—আকাশ-ছোঁওয়া গিরি-শিখরের শীর্ষদেশে। নায়িকা নিরাপদে পৌঁছবার পর নায়ককে কি কি পুরস্কার দেবেন, সেই কথাই নায়িকা বলেছেন এই গানে। সম্ভবতঃ সেই দুর্গম পথে ওঠবার চেষ্টার ফলেই শেষ পর্যন্ত তাঁদের মৃত্যু হ'ল।

সবার শেষে প্রাচীন আমলের ছোট্ট একটি কবিতা শুনিয়ে বিদায় নেব। প্রাচীন হ'লেও আবেগের দিক্ থেকে এটি যে কোন শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবিতার সমান বলে আমার বিশ্বাস—

"উঠোনের মাঝে ছিল অবাক্-করা সেই গাছ।
সবুজ পাতায় ঝলমলে, বেড়ে উঠেছিল ফুলে ফুলে।
হাত দিয়ে ডাল নুইয়ে তুলেছিলাম তার ফুল;
যার কথা ভাবছি তাকে দেব, এই ছিল ইচ্ছে।

গন্ধে ভরে' গিয়েছিল বুক আর জামার হাতা।
অনেক দূরের পথ, কেমন করে পাঠাব বল?
এই যে উপহার—কী-ই বা এর দাম!
কিন্তু এই-ই মনে করিয়ে দিল, কত কাল আগে
বিদায় নিয়েছ তুমি।"

অমর ভারত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

পূর্ব্বে ভারতে আরও বেশী জঙ্গল ছিল। আবাদ বা গোচারণের জন্য অনেক জঙ্গল কাটিয়া জমি করা হইয়াছে। জঙ্গল কমিয়া যাওয়ায় অনেক জমি নষ্ট হইতে লাগিল। নদীর স্রোত, বৃষ্টি বা বাতাসে অনেক জমি নষ্ট হয়। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে উত্তর-পশ্চিম ভারতের যে জঙ্গলে সম্রাট্ বাবর গণ্ডার শীকার করিতেন তাহা এখন জলশূন্য, অরণ্য-হীন পর্বতে পরিণত। এই প্রকার জমি-ধ্বংসের ফলে যুক্তপ্রদেশ ভয়াবহ হইয়াছে। অরণ্যাভাবে পর্বত-পতিত জলস্রোত এত প্রবল হইয়াছে যে, যমুনা নদীর গর্ভ উক্ত প্রদেশে গত পাঁচ শত বৎসরে ৫০ ফুট নিম্নতর হইয়াছে। এই প্রদেশের এটাওয়া জেলাটি বৎসরে ২৫০ শত একর হিসাবে দ্রুতবেগে মরুভূমিতে পরিণত হইতেছে। জমিনাশ বন্ধ করিবার জন্য এবং জ্বালানী কাষ্ঠ ও পশুর আহার্য্য উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত নূতন অরণ্য সৃষ্টি করা হইতেছে। বাবলা, শীশম, টিক গাছ পুতিয়া নূতন জঙ্গল সৃষ্ট হইতেছে। তিন বৎসরের মধ্যে নূতন জঙ্গল মানুষের দীর্ঘতার দুই হইতে ৪ গুণ বাড়িতেছে উচ্চতায়। এক একর নূতন জঙ্গল রোপণ করিতে মাত্র ২৭৲ টাকা খরচ। এই খরচের পরিবর্ত্তে জতু, তার্পিণ, বাঁশ, ধুনা, রবার, চামড়া ট্যান করিবার মাল-মশলা, আতপ হইতে রক্ষার জন্য ছায়া প্রভৃতি বহু দ্রব্য ও উপকার পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বহু রোগ আছে। সুতরাং আমাদের প্রচুর পরিমাণে ঔষধ আবশ্যক। এই সকল জঙ্গল ঔষধাদির লতা-পাতাতে পরিপূর্ণ। রবার জঙ্গল হইতে পাওয়া যায়। পূর্বে এই রবার পেন্সিল বা কালীর দাগ তোলার কাজে লাগিত। কিন্তু এখন রবার নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। টেলিফোন ও বৈদ্যুতিক শক্তি রবার ব্যতীত ধরা যায় না। উড়িষ্যার জঙ্গলে যে বাঁশ হয় তাহাতে কাগজ তৈরী হয়। একটি ইংরাজি বহিতে, (১) 'রাশিয়ার বন-সঙ্গীত' আছে। এতে বলে, 'বন পুতলে জাহাজের মাস্তুল হয়, সেতু নির্ম্মাণের কড়ি-বর্গা, দরজা, জানালা, টেবিল ও আলমারির তক্তা পাওয়া যায় এবং কাগজের মাল-মশলা জন্মে ইত্যাদি'। জনৈক অধ্যাপকের মতে কোনও একটি বা কতকগুলি গ্রামের এক-ত্রিশাংশে (১/৩০) যদি ইউকেলিপটাস গাছ রোপণ করা হয়, তাহা হইতে তাহাদের কাঠের অভাব দূর হইবে।

কৃষির জন্য ভারত চাতক পাখীর ন্যায় সম্পূর্ণ ভাবে বৃষ্টির মুখাপেক্ষী। ক্রীড়াসক্ত দুর্বৃত্তের মত বৃষ্টি কৃষকের সঙ্গে প্রত্যেক বৎসর খেলা করে। বৃষ্টির কোন নিশ্চয়তা বা নিয়মিততা নাই। কোন বৎসরে বৃষ্টি অধিক হয়, কোন বৎসরে কম হয়, কোন বৎসর সময়ে, কোন বৎসর অসময়ে হয়। আবার পাঞ্জাবে ও সিন্ধুদেশে বৃষ্টি অতি অল্প। ধান ও আখের চাষে প্রচুর জলের প্রয়োজন। জল-প্রচুর অঞ্চলে এইগুলি উত্তমরূপে জন্মে। আর শীত ফসলের জন্য অল্প জল দরকার। এই ফসল বৃষ্টির জলে হয় না। নদীর ধারে যে সকল জমি আছে তাহাতে নদীর জলে চাষ হইতে পারে। কিন্তু সেরূপ জমি অধিক নাই। সুতরাং কেনেলের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে। কর্ষিত ভূমির এক-পঞ্চমাংশ নদী বা কেনেল বা পুকুর বা কুয়ার জলে আবাদ হয়। কূপই প্রাচীনতম ও সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ও সহজ উপায় জমিতে জল-সেচনের। ভারতে প্রায় এক কোটি ৩৫ লক্ষ কূপ আছে এবং ঐগুলির জলে কর্ষিত ভূমির এক-চতুর্থাংশ আবাদ হয়। কাথিয়াবাড় প্রদেশে নদী বা কেনেল না থাকায় কূপের জলেই প্রধানতঃ চাষ হয়। মাদ্রাজে প্রায় চল্লিশ হাজার কূপ ও পুষ্করিণী আছে। কিন্তু পাঞ্জাবে ও সিন্ধুদেশে মাত্র তিন ইঞ্চি বৃষ্টি হয় বলিয়া এই প্রকার জলাশয় উক্ত প্রদেশদ্বয়ে নাই। কেনেলও জলসেচনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। ভারতে এখন সত্তর হাজার মাইল কেনেল বিস্তৃত। ১৯৩৬-৩৭ সালে এই দেশে ৫ কোটি ২০ লক্ষ একর ভূমি কৃত্রিম উপায়ে জল-সেচনের দ্বারা আবাদ হইয়াছে—তন্মধ্যে ২ কোটি ৮০ লক্ষ একর কেনেলের দ্বারা, ৬০ লক্ষ একর পুকুরের দ্বারা, এক কোটি ২০ লক্ষ একর কূপের দ্বারা এবং ৬০ লক্ষ একর অন্য উপায়ে। সিন্ধুদেশের শক্কর নামক স্থানে সিন্ধু নদীর জল বাঁধিয়া চাষ হয়। প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই বিশাল ব্যারেজ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কৃত্রিম উপায়ে জল-সেচনের দ্বারা কর্ষিত জমির শতকরা ৭৩.৭ অংশ সিন্ধুদেশে, ৪৪.১ অংশ পাঞ্জাবে, ৬.২ অংশ বাংলায়, ৪.২ অংশ মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে এবং ৩.১ অংশ বোম্বাইতে আবাদ হয়। অবশ্য বোম্বাই অপেক্ষা সিন্ধুদেশে জল-সেচনের প্রয়োজন অনেক বেশী, বৃষ্টি কম বলিয়া।

পুরাকালে কৃষির সব কাজ মানুষ পশুর সাহায্যে করিত। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের দ্বারা কৃষি-কর্ম্ম চলে। এক জন শ্রমিক একটি ঘোড়ার সাহায্যে এক দিনে মাত্র এক একর জমির চাষ করিতে পারে; কিন্তু একটি মোটর ট্রাক্টার এক দিনে ৫ একর ভূমি চষিতে সমর্থ। আমেরিকাতে গোয়ালিনীরা গাভী দোহন করে না। বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে গাভী দোহন, এবং মনুষ্যহস্ত দ্বারা অস্পৃষ্ট পনীর ও মাখন তৈয়ারী হয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত হওয়ায় এই সকল আহার্য্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং নির্দ্দোষ। সুইডেনে পরীক্ষা করা হইতেছে যে, মাটীর নীচে তারের দ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালিত করিয়া মাটীকে উত্তপ্ত করিলে ফসলের পুষ্টি বা পক্বতার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। কিন্তু, ভারতে গতানুগতিক ভাবেই কৃষিকার্য্য এখনও চলিতেছে। আমাদের দেশে যে দশ কোটি জমিশূন্য কৃষক আছে, তাহারা মোটর-লাঙ্গলের নামও শুনে নাই। ভারত এই বিষয়ে পাশ্চাত্য জাতির অনেক পশ্চাদ্বর্ত্তী। দেশীয় সরকারের একটি কৃষি-বিভাগ থাকিলেও তাহাতে অফিসারের সংখ্যা অত্যল্প। পাঞ্জাবে প্রত্যেক অফিসারকে নয় হাজার ফার্ম তদন্ত করিতে হয়। এই সকল কারণে এ দেশে কৃষির উন্নতি হইতেছে না। সরকারের সাহায্য না পাইয়া ভারতীয় কৃষক অসহায়। আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে শস্যের বীজও প্রস্তুত হইতেছে। উক্ত বীজের দ্বারা এক একর জমিতে এক হাজার হইতে দুই হাজার পাউণ্ড ধান ফলিতেছে। আফগানিস্তানেও কয়েক বৎসর পূর্বে নববর্ষের দিন উৎকৃষ্ট গুণশালী বীজ বপন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সরকার এই বীজ কৃষককে বিনা-মূল্যে সরবরাহ করিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন না করার জন্য আমাদের দেশ ক্রমশঃই দরিদ্র হইতেছে। দরিদ্র উড়িষ্যা প্রদেশে গাভীর খুব অভাব। তাই ওখানে দুধের অভাব খুব। দুধের অভাবে শিশুর স্বাস্থ্য ক্ষীণ হইতেছে।

আমাদের গৃহপালিত পশুদের দুর্দ্দশারও অন্ত নাই। সরকার

(১) Moscow has a plan নামক গ্রন্থ।

হইতে গোচারণ-ভূমি রক্ষায় তেমন ব্যবস্থা নাই। মাঠে যখন ঘাস শুকাইয়া যায় তখন পশুদের আহার জোটে না। ডিসেম্বর হইতে জুন পর্য্যন্ত আবশ্যকীয় আহারের অভাবে তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হয়। মাঝে মাঝে তাহাদের মধ্যে মহামারী উপস্থিত হয়। সিন্ধু প্রদেশের থরপার্কার জেলায় কয়েক বৎসর পূর্বে গৃহপালিত পশুদের আহার্য্যের অভাব দেখা দেয়। সেই জন্য উক্ত জেলার ৬ লক্ষ ৮১ হাজার পশুর মধ্যে ২ লক্ষ ৬১ হাজার মারা যায়, ১ লক্ষ ১৭ হাজার জেলার বাহিরে প্রেরিত হয়, ১০ হাজার ৩ টাকা হইতে ১০ টাকা মূল্যে অর্থাৎ আংশিক মূল্যে বিক্রীত হয় এবং বাকী ২ লক্ষ ৮৫ হাজারের অধিকাংশই আহার্য্যের অভাবে মৃতপ্রায় হয়। পৃথিবীতে ৫৪ কোটি পশু আছে; তন্মধ্যে ১৮ কোটি অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ ভারতেই আছে। মিশরবাসীরা যে জমি চাষ করে তাহার প্রত্যেক এক শত একরের জন্য ২৫টি পশু আছে, এবং ডাচগণের মাত্র ৩৮টি এবং আমাদের ৬৭টি। ডাচগণ গাভীর দুগ্ধে মাখন ও পনীর প্রস্তুত করিয়া বিরাট ব্যবসায় চালাইতেছে। কিন্তু আমাদের এত গাভী থাকা সত্ত্বেও আমরা তাহাদের সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। আমাদের দেশে শতকরা ৭০টি গাভী ও মহিষ দুধ দেয় না। যারা দুধ দেয় তারা প্রত্যেকে গড়ে রোজ মাত্র দেড় পাউণ্ড দুধ দেয়; কিন্তু তাদের অন্ততঃ রোজ ৫ পাউণ্ড দুধ দেওয়া উচিত। জার্মেনি আড়াই কোটি গাভী হইতে যে দুধ পায়, আমরা ১৮ কোটি গাভী মহিষাদি হইতে ততটা দুধই পাই। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ গাভী আমাদের দেশে থাকা সত্ত্বেও আমরা পৃথিবীর মাত্র এক-অষ্টমাংশ দুধ পাই। গৃহপালিত পশুর আবশ্যকীয় যত্ন লইলে তাহাদের নিকট হইতে আমরা অনেক বেশী দুধ এবং অন্য উপকার পাইব। দুধ হইতে ঘি, মাখন, ছানা, পনীর প্রভৃতি এবং নানা মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়। ভারতীয় কৃষকগণের অর্দ্ধেকেরও অধিক অংশ জমিহীন। যাদের জমি আছে তারা ৩।৪।৫ একর জমি চাষ করে। কিন্তু, ব্রিটিশ কৃষক ২৬ একর পর্য্যন্ত জমি আবাদ করে এবং কানাডার কৃষক ১৪০ একর পর্য্যন্ত চাষ করে। বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করার জন্যই তারা এত অধিক জমি আবাদ করিতে সমর্থ। ভারতে ৪ জনের মধ্যে ৩ জন জমির উপর নির্ভর করে জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য। কিন্তু অন্য দেশে তাহা নহে। অন্য দেশে কল-কারখানা থাকায় ঐ সকল স্থানে শ্রমিকগণ কাজ করে। ১৮৭০ হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত জার্মেনিতে অড়াই কোটি গ্রামবাসী শ্রমিক কারখানায় কাজ করিত। ভারতে দেড় শত কোটি একর জমিতে আবাদ হয় না। অথচ এ দেশে লক্ষ লক্ষ কৃষকের জমি নাই। যাদের জমি আছে তাদের জমি টুকরা টুকরা খণ্ডে নানা স্থানে অবস্থিত। একত্র না থাকায় মোটর-লাঙ্গল ব্যবহার সম্ভব নয়। বহু কৃষক মিলিত হইয়া স্ব স্ব খণ্ডিত জমির আল তুলিয়া সংঘবদ্ধ ভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করিলে লাভ অনেক বেশী হইবে। অনাবাদী জমিতে এই পরীক্ষা করা যাইতে পারে। পাঞ্জাবে ইতিপূর্বে এই ভাবে চাষ আরম্ভ হইয়াছে। অভিজ্ঞগণ বলেন, ভারতের সব অনাবাদী জমি বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবাদ করিলে প্রথম দশ বৎসরের পরে প্রত্যেক বৎসর আট শত কোটি টাকা মূল্যের আহার্য্য ও কাঁচা মাল-মশলা পাওয়া যাইবে, অর্থাৎ বর্ত্তমানে ভারতের সমস্ত আবাদী জমি হইতে যে আয় হয় তাহার দুই-তৃতীয়াংশ আয় অধিক হইবে। সরকার নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া কৃষকগণকে সমিতিবদ্ধ করিলে তাহারা শীঘ্র সজাগ হইবে। জার্মেনিতে হিট্‌লারের গভর্ণমেণ্ট এই নিয়ম জারী করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ফার্ম এত বড় হইবে যাহাতে একটি কৃষক-পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন ও সকল আবশ্যকীয় দ্রব্য উহার আয় হইতে পাওয়া যায়। উক্ত আইন মতে ফার্ম খুব বড় হইবে না। ফার্ম খুব বড় হইলে এক জনের বেশী জমি হয় এবং অনেকের জমি থাকে না। এই আইন অনুসারে যে সকল ফার্ম গঠিত হইবে তাহা বিক্রীত বা বিভক্ত হইতে পারিবে না বা এইগুলি বন্ধক বা ভাড়া দেওয়া চলিবে না।

সোভিয়েট রাশিয়াতে বহু বৃহৎ ফার্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক ফার্মে শত শত কৃষক একত্রে কাজ করে। তন্মধ্যে বৃহত্তম ফার্মটির নাম জাইগ্যাণ্ট (Gigant)। ইহা উত্তর-দক্ষিণে ৫০ মাইল দীর্ঘ, এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৪০ মাইল প্রস্থ। পৃথিবীর মধ্যে উহাই বৃহত্তম গমোৎপাদক ফার্ম। ইহাতে ১৭ হাজার কৃষক কাজ করে এবং একটি বিশাল যন্ত্রের সাহায্যে ধান্য রোপণ, মাড়ান ইত্যাদি হয়। সেই যন্ত্রটি একটি মাত্র মানুষ কর্ত্তৃক চালিত হয়, যদিও উহা এক শত লোকের কাজ করে। ইহা জগতের ইতিহাসে অভিনব। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় যে বিপ্লব হয় তৎপূর্ব্বে ঐ দেশের কৃষকগণ ভারতীয় কৃষকগণের মতই খণ্ড খণ্ড জমি স্বহস্তে চাষ করিত। মোটর-লাঙ্গল বা 'লোহার ঘোড়া' পাইয়া তাহারা এত অল্প সময়ে এই অসম্ভব সম্ভব করিয়াছে। লোহার ঘোড়া রুশদেশীয় কৃষকের পরম বন্ধু। কবে ইহা ভারতীয় কৃষকের বন্ধু হইবে? ভারত, ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের জমিগুলি নানা আকারে কর্ত্তিত। কিন্তু রাশিয়ার জমিগুলি 'দাবা-বোর্ডের' ন্যায় চতুর্ভুজ এবং তন্মধ্যস্থ গৃহগুলি সুদৃশ্য। সোভিয়েট আর্মেনিয়াতে দশ বৎসরের মধ্যে কৃষি-কার্য্যে আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। উক্ত দেশের পরাক্কর নামক গ্রামে ২৫০টি কৃষক-পরিবার বাস করে। সকল কৃষক সমিতিবদ্ধ হইয়া একই ফার্মে কাজ করে। উহার ফলে প্রত্যেক একর জমি হইতে তাহারা ২৪০ কিলোগ্রামের পরিবর্ত্তে ৬৪০ কিলোগ্রাম তুলা পায়। ভারতে এই ভাবে কৃষক-সমিতি গঠিত করার জন্য সরকার কর্ত্তৃক নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়া দরকার। তাহা হইলে দশ বৎসরের মধ্যে দেশীয় কৃষকগণের অবস্থা উন্নত এবং তৎসঙ্গে দেশের পল্লী-শ্রী ফিরিয়া আসিবে।

গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস্ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় তুলাগাছের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "ভারতের একটি চারাগাছ ফলের পরিবর্ত্তে উল দান করে। ঐ উল ভেড়ার লোমের চেয়ে সূক্ষ্ম ও সুন্দর এবং ইহার দ্বারাই ভারতে বস্ত্র প্রস্তুত হয়।" সিন্ধুদেশে মহেঞ্জোদারো নামক যে প্রাচীন শহর আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা পাঁচ হাজার বৎসরের প্রাচীন। মহেঞ্জোদারোতে তুলার কাপড় ব্যবহৃত হইত। জগতের মধ্যে ভারতীয়গণই সর্ব্বপ্রথমে তুলার ব্যবহার আরম্ভ করে। আমাদের দেশে ঐ শিল্প কত প্রাচীন! অদ্যাপিও ইহা আমাদের বৃহত্তম শিল্প। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ের ভারতীয় বস্ত্র ইউরোপ ও এশিয়ার বাজারে বিক্রীত হইত। সৌক্ষ্ম্য এবং সৌন্দর্য্যে ভারতের বস্ত্রশিল্প পৃথিবী-বিখ্যাত ছিল। সৌক্ষ্ম্যের জন্য ঢাকার মসলিন মাকড়সার জালের সংগে তুলনা করা হইত। কথিত আছে, মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁহার কন্যাকে অল্প বস্ত্র পরিধানের

জন্য একবার তিরস্কার করিয়াছিলেন। রাজকুমারী পিতাকে বলিলেন যে, তাহার শরীরে সাড়াটি সাত বার জড়ান আছে। দক্ষিণ-ভারতের কালিকটে যে কাপড় তৈয়ারী হইত তাহা ইংলণ্ডের বাজারে তদ্দেশীয় কাপড়কে সৌক্ষ্ম্য ও সৌন্দর্য্যে পরাস্ত করিয়াছিল। এই জন্য ১৭০১ খৃষ্টাব্দে আইন করিয়া উক্ত কাপড়ের আমদানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৩ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের কাপড় প্রত্যেক বৎসর ভারত হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানী হইত। যন্ত্রযুগ প্রবর্ত্তনের পরে বাণিজ্যস্রোত বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইল, এবং ইংলণ্ডের কাপড় ভারতে প্রবেশ করিল।

ভারতেও যন্ত্রযুগের প্রভাব আসিল, ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইতে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয়, আজ বোম্বাইতে ৬১টি কাপড়ের কল এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে ৩৯০টি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ৪৫১টি কলে চার লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। কাপড়ের কলের দ্বিতীয় বৃহত্তম কেন্দ্র আমেদাবাদ। ভারতীয় কলগুলিতে প্রত্যেক বৎসরে চারি শত কোটি গজ কাপড় প্রস্তুত হয়। ভারতে যত কাপড়ের দরকার হয় ইহা তাহার মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ। ভারতে প্রত্যেক বৎসর ৬২৫ কোটি গজ কাপড় ব্যবহৃত হয়। হস্তচালিত তাঁতগুলিতে চল্লিশ লক্ষ লোক কাজ করিয়া বৎসরে ২৫০ কোটি গজ কাপড় তৈয়ারী করে। বাকী ৭৫ কোটি গজ কাপড় ইংলণ্ড ও জাপান হইতে আমদানী হয়। ভারতে তুলার অভাব নাই। দেশে যত কাপড়ের আবশ্যক, সবই অনায়াসে দেশেই প্রস্তুত হইতে পারে। বাংলা, বিহার, আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত ভারতের সকল প্রদেশেই তুলা জন্মে। আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যে সকল দেশ অপেক্ষা অধিক তুলা উৎপন্ন হয়, এবং তাহার পরেই ভারতের স্থান। ভারতজাত তুলার প্রায় অর্দ্ধেক, অর্থাৎ প্রায় ৩০ লক্ষ বেল বিদেশে রপ্তানী হয়। তন্মধ্যে ১৫ লক্ষ বেল জাপানে এবং বাকী অন্য দেশে রপ্তানী হয়। জাপান এই দেশ হইতে তুলা কিনিয়া কাপড় প্রস্তুত করিয়া ভারতে এত সস্তা দরে বিক্রয় করে যে, বোম্বাই বা আমেদাবাদের কল তাহা পারে না। ভারতীয় তুলা অদীর্ঘ বলিয়া পাতলা কাপড় তৈয়ারীর জন্য আমেরিকা, মিশর ও আফ্রিকা হইতে দীর্ঘস্থায়ী তুলা আমদানী করিতে হয়। আমাদের দেশে যত কাপড়ের প্রয়োজন হয় তাহার এক-অষ্টমাংশ বিদেশ হইতে আসে। ভারতীয় কৃষকগণ ৪ মাস বিনা কাজে বসিয়া থাকে। ঐ সময় চরকা ও তাঁত চালাইলে বিদেশীয় বস্ত্রের আমদানী বন্ধ করিতে পারে। এই জন্যই মহাত্মা গান্ধী চরকা প্রচলনে এত উৎসাহী। গড়ে প্রত্যেক ভারতীয় মাত্র সাড়ে ১৬ গজ কাপড় ব্যবহার করে। একটু চেষ্টা করিলে প্রত্যেকেই স্বীয় ব্যবহার্য্য কাপড়ের উপযোগী কাপড়ের জন্য সূতা কাটিতে পারে। এত দিন জতুর দ্বারা ক্যাম্বিস তৈয়ারী হইত। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে যখন যুদ্ধ বাধিল তখন জতুর সরবরাহ বন্ধ হইল। ভারতীয় তুলার দ্বারা ভারতেই ক্যাম্বিস প্রস্তুত হইতে লাগিল। সেই সময় ইংলণ্ড ৪৬ লক্ষ টাকা মূল্যের তুলার ক্যাম্বিস ভারতে অর্ডার দিয়াছিল। তুলার সহিত জুট মিশাইয়া গানিব্যাগ ও প্যাকিং কাপড় ভারতে প্রস্তুত হইতেছে।

আমাদের দেশে যে সকল খনি আছে, তাহাতে অতুল সম্পদ ভূপ্রোথিত। লোহা, কয়লা, অভ্র, সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি পদার্থ প্রস্তুত করিয়া দেশে ২৮ কোটি টাকা প্রত্যেক বৎসর আয় হয়, এই কার্য্যে ৩ লক্ষ ৫ হাজার শ্রমিক নিযুক্ত। কয়লার খনিও আমাদের দেশে বহু আছে। কয়লাকে কালো হীরক বলে, কারণ, উভয় পদার্থের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কার্বন বিদ্যমান। পূর্ব্বে কয়লা কেবল মাত্র জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হইত। এখন কয়লা হইতে তপ্ত বাষ্প সৃষ্টি করিয়া রেল ও জাহাজ চালান হয়। কয়লা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তিও উৎপন্ন হয়। আলকাতরা হইতে নানা প্রকারের রঙ, ঔষধ এবং রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হয়। বিদেশ হইতে প্রায় ৪ কোটি টাকা মূল্যের উক্ত প্রকার রঙ ও ঔষধ এ দেশে আমদানী হয়। অথচ বাঙলা ও বিহারে প্রচুর পরিমাণে যে আলকাতরা প্রস্তুত হয় তাহার অধিকাংশই ফেলিয়া দেওয়া হয়। ঝরিয়ার কয়লাখনি সমূহে ৩ কোটি গ্যালন আলকাতরা ফেলিয়া দেওয়া হয়। ঐ আলকাতরাতে মোটর-স্পিরিট ও বিভিন্ন হাল্কা তেল আছে। ১৯১৪ সালে যখন বিশ্বব্যাপী সমরানল প্রজ্বলিত হইল উঠিল তখন ইংলণ্ড যে সকল রঙ ব্যবহার করিত তাহার শতকরা ৯০ ভাগ জার্ম্মাণিতে প্রস্তুত হইত। ব্রিটেনবাসিগণ বুঝিল যে, কোন দ্রব্যের জন্য অপর দেশের উপর নির্ভর করা নির্বুদ্ধিতা। তাহারা স্বদেশে রঙ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল এবং ১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন দেখা গেল, ইংলণ্ড রঙ সম্বন্ধীয় দ্রব্যের শতকরা ৯০ ভাগ স্বীয় দেশে প্রস্তুত করে এবং ১০% বিদেশ হইতে আনে। ভারতও স্বীয় খনিজ দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করিতে শিখিতেছে। এই দেশে এত কয়লা খনি হইতে তোলা হয় যে, আমরা এই দ্রব্যে পৃথিবীতে নবম স্থান অধিকার করিয়াছি। প্রত্যেক বৎসর ভারতে ১ লক্ষ ৬২ হাজার শ্রমিক ২ কোটি ৮০ লক্ষ টন কয়লা ভূগর্ভ হইতে তোলে। এই কয়লার ৯/১০ অংশ বাঙ্গালা ও বিহারের খনি-সমূহ হইতে উত্তোলিত হয়। বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস, দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশে অনেক কয়লার খনি আছে। কাশ্মীর রাজ্যেও কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। লোকে বলে, ছয় হাজার কোটি টন কয়লা ভারতের খনি-সমূহে আছে। যে ভাবে কয়লা তোলা হইতেছে এই ভাবে তুলিলে দুই হাজার বৎসর আমাদের দেশীয় কয়লাতেই চলিবে। লোহা, মাঙ্গানিজ ও ক্রোমাইট দ্বারা যন্ত্র নির্মিত হয়। এই সকল দ্রব্যের খনি ভারতেও আছে। যে দেশ লোহা ও ইস্পাত প্রস্তুত করিতে পারে না, সেই দেশ বর্ত্তমান যুগে দাঁড়াইতে পারে না। কয়লার ন্যায় লোহাও বাংলা ও বিহারে সমধিক বর্ত্তমান। উত্তর ও মধ্য-ভারতে পৃথিবীর বৃহত্তম লোহার খনি কয়েকটি আছে। এই সকল খনিতে তিন শত কোটি টন কয়লা আছে, অভিজ্ঞগণের অনুমান। ভারতীয় কয়লা গুণেও সর্ব্বদেশের শ্রেষ্ঠ। আমাদের দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাঙ্গানিজ থাকিলেও সোভিয়েট রাশিয়া অধিকতম মাঙ্গানিজ প্রস্তুত করে এবং তাহার পরেই ভারত। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ৪ লক্ষ ৯২ হাজার টন মাঙ্গানিজ ভারতে প্রস্তুত হইয়াছিল; তন্মধ্যে অর্দ্ধেকেরও অধিক অংশ ভারতে।

ভারতের খনিজ দ্রব্য প্রায়ই সমস্তই ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে প্রেরিত হয়। এই রপ্তানি প্রত্যেক বৎসরে বাড়িতেছে। ১৯১৪ সালে যত দ্রব্য রপ্তানি হইত তাহার ১৫ গুণ অধিক এখন [illegible]। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল দ্রব্য [illegible]

বিক্রীত হইতেছে। খনি হইতে প্রাপ্ত দ্রব্য বিদেশে পাঠাইতে হয় আমাদের ব্যয়ে এবং বিদেশে প্রস্তুত হইয়া অধিক মূল্যে এই দেশে বিক্রীত হয়। যদি মাঙ্গানিজ প্রস্তুত করিবার কারখানা এই দেশে থাকিত তবে ইহা উচ্চমূল্যে বিদেশে বিক্রীত হইত। অভ্র আর একটি খনিজ দ্রব্য—যাহা ভারতে প্রচুর পরিমাণে আছে। যুদ্ধে অভ্র বিশেষ প্রয়োজনীয়। পৃথিবীর অভ্রের দুই-তৃতীয়াংশ ভারত সরবরাহ করে। বিহার প্রদেশে অধিকাংশ অভ্র পাওয়া যায়। অভ্রও আমেরিকা ও ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। তাম্র, টিন, এ্যালুমিনিয়ম, ক্রোমাইট, স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি ভারতে যথেষ্ট আছে। বৈদ্যুতিক শক্তি প্রেরণের তার তাম্র দ্বারা তৈয়ারী হয়। বিস্কুট, ফল ও অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্য রাখার জন্য বাক্স নির্মিত হয় টিনে। এ্যালুমিনিয়াম হাল্কা ও মজবুত বলিয়া উহাতে রন্ধনের পাত্রাদি ও এরোপ্লেন তৈয়ারী হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য হইতে মুদ্রা। দক্ষিণ ভারতের শেষ প্রান্তে সমুদ্রতীরের কন্যাকুমারীর চতুর্দ্দিকে বালিতে ইলমেনাইট এবং মোনাজাইট প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য পাওয়া যায়। বিহারে প্রচুর সল্টপিটার আছে। এই দ্রব্য হইতে পূর্ব্বে বারুদ ও বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত হইত। ইহা জমির সাররূপেও ব্যবহৃত হয়। জমিতে নাইট্রোজেন আবশ্যক হয়। ফসফেট্ জমির উত্তম সার। উহা আমাদের দেশে অল্পই আছে। ভারতীয় সমুদ্র হইতে যথেষ্ট লবণ পাওয়া যায়। লবণ হইতে আলকালী প্রস্তুত হয়। আলকালী শিল্পের বীজ। ইহা কাগজ, চামড়া, কাচ, সাবান প্রভৃতি তৈয়ার করিতে আবশ্যক হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে বিদেশ হইতে এক কোটি টাকা মূল্যের আলকালী দ্রব্য ভারতে আমদানি করা হয়।

কাথিয়াবাড় প্রদেশে দ্বারকা তীর্থের অদূরে মিঠাপুরে একটি বড় কারখানা প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ কারখানাতে সোডা এ্যাস, কষ্টিক সোডা, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। পেট্রোলিয়ামও ভারতে কম নাই; আসামে সামান্য পেট্রোল আছে। বেলুচিস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবে এই তরল খনিজ দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। পাঞ্জাবে বিতস্তা নদীর তীরে একটি পেট্রল খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাতে প্রচুর পেট্রল পাওয়া যাইতেছে। পাইরাইটের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় সালফার ভারতের সর্ব্বত্র অবস্থিত। চর্ম্মরোগের ঔষধরূপে, শস্যক্ষেত্রে পোকা মারিবার জন্য, পশুর চামড়া, রবার ও কাগজ মজবুত করিবার জন্য এবং গৃহনির্ম্মাণ কালে সিমেণ্টে মিশ্রিত করিবার জন্য সালফার প্রয়োজন। সালফিউরিক এসিড রসায়ন-শিল্পের মূল দ্রব্য। ইংলণ্ডে ইহার মূল্য প্রতি টন ৩০ পাউণ্ড হইতে ২ পাউণ্ডে নামিয়াছে। বিলাতী দ্রব্য দেশে সস্তা দামে আমদানি হওয়ায় ভারতে যে সামান্য শিল্প চলিত তাহা বিনষ্ট হইয়াছিল। ভারতে যে সকল খনিজ দ্রব্য আছে, অথচ যাহা কোন কাজে লাগান হইতেছে না, ২ কোটি পাউণ্ড মূল্যের সেই সকল দ্রব্য প্রত্যেক বৎসর এ দেশে আমদানি হয় ইউরোপ হইতে। যে পাইরাইটের সঙ্গে সালফার স্বাভাবিক অবস্থায় মিশ্রিত থাকে তাহা সিমলা, বিহারের সাহাবাদে এবং বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরিতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিহারে তাম্র প্রস্তুত করিবার সময় ২০ টন সালফার ডাইঅক্সাইড প্রতিদিন বাতাসে মিশিয়া যায়, তাহার কোন সদ্ব্যবহার হয় না। কানাডায় ও বিলাতে উক্ত বাষ্প সালফারে পরিণত হয়।

প্রাচীন কালে সব কাজ মানুষ নিজেই করিত এবং পরিশ্রমসাধ্য কাজ—যথা পাথর ভাঙ্গা, গাছ কাটা, ও ভার বহা প্রভৃতি ক্রীতদাস বা পশুর দ্বারা করাইত। পাটনা হইতে দিল্লী যাইতে সম্রাট অশোক বা চন্দ্রগুপ্তের সময় যত সময় লাগিত ১৮০০ সালেও তত সময় লাগিত। তখন রেল-গাড়ী, মোটর-কার, এরোপ্লেন বা জাহাজ ছিল না ১৭৬৮ সালে বাষ্প-যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। এই অদ্ভুত আবিষ্কারের ফলে যন্ত্র-বিজ্ঞানে যুগান্তর আসিল। এখন দেড় হইতে ২ লক্ষ অশ্বশক্তির বাষ্প-যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। এক অশ্বের শক্তি বিশ মানবের শক্তির সমান। যে যন্ত্রের ৫০ হাজার অশ্ব-শক্তি আছে, তাহা ৫০ হাজার অশ্ব বা ১০ লক্ষ মানুষ টানিতে পারে। ১৮৮০ সালে তৈল-এঞ্জিন আবিষ্কৃত হইল। বাষ্প-যন্ত্রে যেমন রেলগাড়ী ও জাহাজ চলার সুবিধা হইয়াছিল তৈল-যন্ত্রে তেমনি মোটর গাড়ী ও এরোপ্লেন চলা সহজ হইল। বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কৃত হওয়াতে যান-বাহনের আরও সুবিধা হইল। তারের দ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তিকে দুই-তিন শত মাইল দূরে লওয়া যায়। আমেরিকার নায়েগ্রা জলপ্রপাতে প্রস্তুত বৈদ্যুতিক শক্তি ৪৫০ মাইল দূরে নিউ ইয়র্ক শহরে আনীত হয়। জাহাজ, মোটর-কার ও এরোপ্লেন প্রভৃতি অসংখ্য যন্ত্র কয়লার উপর নির্ভর করে। ভারতে বৈদ্যুতিক শক্তির এক-তৃতীয়াংশ জল-শক্তির দ্বারা প্রস্তুত হয়। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে বড় বড় হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক কারখানা আছে। বৃহত্তম কারখানাটি বোম্বাইতে, উহা টাটা কোম্পানির। পশ্চিম-ঘাট পাহাড়ের শীর্ষে জল ধরিয়া এই কারখানা চালিত হইতেছে। তথায় পর্ব্বতশীর্ষ হইতে ১৬০০ ফুট নিম্নে পাদদেশে জল প্রবল বেগে পতিত হইয়া ২ লক্ষ ৩০ হাজার অশ্বশক্তির বিজলী উৎপন্ন করে। উক্ত বিজলীর দ্বারা বোম্বাই সহরে আলো জ্বলে, ৬১টি কাপড়ের কলের মধ্যে ৫৩টি চালিত হয়, ট্রাম চলে এবং বোম্বাই হইতে পুণা এক দিকে এবং ইগাতপুরী অন্য দিকে ট্রেণ যাতায়াত করে। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক কারখানা কাবেরী নদীর তীরে দক্ষিণাত্যে অবস্থিত। উক্ত কারখানায় যে বিজলী প্রস্তুত হয় তাহার দ্বারা মহীশূর রাজ্যের কোলার নামক স্থানে অবস্থিত সোনার খনি সমূহ চালিত হয়। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, মহীশূর, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রায় ৬ লক্ষ অশ্বশক্তির বিজলী প্রস্তুত হয়। ১৯১৫ সালে এ দেশে যত বিজলী উৎপন্ন হইত তদপেক্ষা ১৫ গুণ অধিক এখন হইতেছে। পূর্ব্বভারতে জলশক্তি হইতে বিজলী তেমন প্রস্তুত হয় না, সেই জন্য ঐ অঞ্চলে কয়লা হইতে বিজলী হয়। কলিকাতা ও জামসেদপুরে যে বিজলী প্রস্তুত হয় তাহা কয়লা হইতে। বিহারে গয়া এবং জামুনিয়াতন্দে দুইটি বিজলীর কারখানা হইয়াছে। উক্ত দুই স্থানের প্রত্যেকটিতে ২০ হাজার অশ্বশক্তি বিজলী সৃষ্ট হয়। ভারতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫ লক্ষ অশ্বশক্তি বিজলী খরচ হয়। ইহা আদৌ আশ্চর্য্য নহে, কারণ, ভারতে যত বিজলী খরচ হয় তার ১০ গুণ ইটালীতে, ১৬ গুণ ফ্রান্সে, ২০ গুণ ব্রিটেনে, ২৪ গুণ রাশিয়াতে, ৩৭গুণ জার্ম্মেনিতে এবং ৭৭ গুণ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে খরচ হয়। বিষয়টি আরও বিশদ ভাবে নিম্নোক্ত প্রকারে বলিতেছি। প্রত্যেক এক হাজার লোকের জন্য নরওয়েতে ৭০০ অশ্বশক্তির বিজলী, কানাডাতে ৬০০, সুইজারলাণ্ডে ৫০০, সুইডেনে ২০০, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ১০০ এবং ভারতে মাত্র ১ অশ্বশক্তি বিজলী ব্যয়িত হয়।

কিন্তু জলশক্তিতে ভারত পৃথিবীর মধ্যে কানাডা এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যের পরেই। ভারতে ২ কোটি ৭০ লক্ষ অশ্বশক্তি, কানাডাতে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ অশ্বশক্তি আছে। আমাদের দেশে বিজলীর যে উৎস আছে তাহার মাত্র ১/৫০ অংশ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং জাপান স্ব স্ব বৈদ্যুতিক উৎসের ১/৩ অংশ, এবং জার্ম্মাণী ও সুইজারলাণ্ড ১/২ অংশ ব্যবহার করে। আরনল্ড লুপটন তাঁহার ইংরাজী গ্রন্থে (৬) ভারতের বৈদ্যুতিক উৎসের সম্ভাবনার একটি মনোরম চিত্র দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং অভিজ্ঞ ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার। তিনি ভারতের জলশক্তি গণনা করিয়া বলেন, হিমালয় ও অন্যান্য পর্ব্বত দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩০০ মাইল, ১ মিনিটে ১ কিউবিক ফুট জল ১ হাজার ফুট নিচে পড়িয়া ২ অশ্বশক্তি বিজলী উৎপন্ন করে। এইরূপে ১৫ কোটি অশ্বশক্তি স্বাভাবিক জলপ্রপাত ও নদী হইতে প্রস্তুত হইতে পারে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে কৃষিকার্য্যের জন্যও বিজলী ব্যবহৃত হয়। ১৮৭১ সালে উক্ত দেশে ২০ লক্ষ শ্রমিক জমিতে কাজ করিত। ১৮৮১ সালে ৩০ লক্ষ শ্রমিক এবং ২৫ লক্ষ অশ্বশক্তি বিজলী কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত ছিল, ১৯০১ সালে ৫০ লক্ষ শ্রমিক এবং ৫০ লক্ষ অশ্বশক্তি বিজলী কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল, ১৯২১ সালে ৩৫ লক্ষ শ্রমিক ও ২৫০ কোটি অশ্বশক্তি বিজলী কৃষিকার্য্যে প্রযুক্ত হয়। আমাদের দেশে বিজলীর যে সম্ভাবনা আছে তাহা কাজে লাগিলে বায়ু হইতে নাইট্রোজেন লইয়া আমরা নাইটোলিন প্রস্তুত করিতে পারিতাম। জমীকে উর্ব্বর করিতে নাইট্রোলনের মত রাসায়নিক দ্রব্য আর নাই। বিজলী প্রস্তুত করিতে হইলে বহু যন্ত্রপাতি আবশ্যক। ঐ সকল যন্ত্র ইউরোপ এবং আমেরিকা হইতে আমদানী হয়। সেই জন্য ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, সৌরশক্তিকেও কাজে লাগাইবার জন্য আমাদিগকে চেষ্টিত হইতে হইবে। বর্ত্তমানে বিদেশে একটি ছোট বৈদ্যুতিক মোটর সূর্য্যালোকের দ্বারা চালিত হয়। ভূগর্ভে যে উত্তাপ আছে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। ইটালীতে লাদারেলো নামক স্থানে ভূগর্ভ হইতে যে গরম তাপ বহির্গত হয় তাহা হইতে ৪০০ অশ্বশক্তি বিজলী প্রস্তুত হয়।

ভারত পৃথিবীর উৎকৃষ্ট লৌহভাণ্ডার। কিন্তু আমরা সব লৌহ কাজে লাগাইতে পারি না বলিয়া প্রত্যেক বৎসর ১৩-১৪ কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে এ দেশে আমদানী করিতে হয়। লৌহ প্রস্তুত করিতে না পারিলে এদেশে যন্ত্রপাতি তৈয়ার করা অসম্ভব, ইহা বুঝিয়া জামসেদজী টাটা লোহার কারখানা সর্ব্বপ্রথম ভারতে স্থাপন করেন। ছোটনাগপুরের সাকৃচী নামক স্থানে উক্ত কারখানা অবস্থিত। সাকৃচী নামক ক্ষুদ্র গ্রামটি কয়েক বৎসরের মধ্যে বৃহৎ সহরে পরিণত হইয়াছে। ঐ কারখানায় এখন প্রায় দেড় লক্ষ লোক কাজ করে। উহার পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য অঞ্চলে কয়লা, লোহা, তামা, এলুমিনিয়ম, অভ্র, চুনা পাথর এবং ডলোমাইট প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, এবং ছোটনাগপুরের পাহাড়ীরা খুব কষ্টসহিষ্ণু এবং কর্ম্মক্ষম শ্রমিক। ঐ সকল সুবিধা থাকায় সাকৃচীর কারখানা দ্রুতবেগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। পিটসবার্গে যেমন আমেরিকার বৃহত্তম ইস্পাতের কারখানা আছে, তেমনি ভারতের বৃহত্তম লোহার কারখানা সাকৃচীতে। উহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে বৃহত্তম এবং পৃথিবীর বৃহত্তম ১২টি কারখানার মধ্যে অন্যতম। উক্ত কারখানায় ৫০ হাজার শ্রমিক ১৯৩৯ সাল হইতে প্রত্যেক বৎসর ১২ লক্ষ টন কাঁচা লোহা এবং ১০ লক্ষ টন ইস্পাত প্রস্তুত করে। লোহার সংগে কার্ব্বন এবং ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া উক্ত কারখানায় ইস্পাতও তৈয়ারী হয়। ইংলণ্ড দীর্ঘকাল যাবৎ লোহা ও ইস্পাতের ব্যবহার করিতেছে। উক্ত দেশে সেভার্ণ নদীর উপর ১৭৭৯ সালে প্রথম লৌহসেতু নির্ম্মিত হয়। ১৫০ বৎসরের মধ্যে লোহা হইতে সাইকেল, টাইপ রাইটার, রেলের ইঞ্জিন, মোটর ইঞ্জিন, এবং জাহাজ প্রভৃতি নানা যন্ত্র তৈয়ার হইতেছে। ভারত এখনও এ বিষয়ে ইংলণ্ডের বহু পশ্চাদ্বর্ত্তী, জার্ম্মেণি স্বদেশীয় খনি হইতে প্রত্যেক বৎসর ৩০ লক্ষ টন লোহা প্রস্তুত করে এবং ফ্রান্স এবং সুইডেন হইতে আরও লোহা আনিয়া ২ কোটি ৩০ লক্ষ টন ইস্পাত তৈয়ার করে। ভারতে প্রায় ২০ লক্ষ টন লোহা প্রস্তুত হয় কিন্তু এখন আমরা ১০ লক্ষ টনের বেশী ইস্পাত তৈয়ারী করিতে পারি না, অথচ লোহা, ইস্পাত প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার ভারতে বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা এই বিষয়ে বর্ত্তমানে বহু দেশের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী। দিল্লীতে যে লৌহস্তম্ভ আছে তাহা ১৫ শত শতাব্দী প্রাচীন এবং সুলতানগঞ্জে পিত্তলনির্ম্মিত যে বৌদ্ধমূর্ত্তি বিদ্যমান তাহাও বহু পুরাতন। আমরা যখন ধাতুর ব্যবহারে এত অগ্রণী ছিলাম তখন ইউরোপীয়গণ ইস্পাত হইতে কেবলমাত্র ছোরা ও ছুরি প্রস্তুত করিতে পারিত। জার্ম্মেণি ভারত অপেক্ষা ক্ষুদ্র দেশ হইয়াও কত অধিক ইস্পাত তৈয়ার করিতেছে। সুখের বিষয় যে, জামসেদপুরে আরেকটি কারখানা খোলা হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যহ ১ হাজার টন ইস্পাত প্রস্তুত হয়। টাটা কোম্পানী আশা করেন, দুই বৎসর পরে সাড়ে ১২ ১/২ টন ইস্পাত প্রস্তুত হইবে। তাহারা ১৯৩৯ সালে মাত্র ১০ লক্ষ টন ইস্পাত প্রস্তুত করিতেন। এ দেশে যতই লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত হইবে, ততই রেল ইঞ্জিন, মোটর ইঞ্জিন, জাহাজ, এরোপ্লেন, মোটর লাংগল প্রভৃতি যন্ত্র প্রস্তুত হইবে। টাটা কোম্পানীর কৃষিবিভাগ আছে, তাহাতে বৎসরে বৎসরে সাড়ে ৩ লক্ষ কুঠার, দেড় লক্ষ হাতুড়ি, এবং ১ লক্ষ কুদাল প্রস্তুত হয়। তাঁহারা রেল গাড়ীর চাকা প্রভৃতিও তৈয়ার করিতেছেন, টাটা কোম্পানী ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে।

পরাধীনতাই ভারত-শক্তি বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায়। স্বাধীনতার অভাবে ভারতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুখের শোচনীয় অভাব হইয়াছে। শিক্ষার হার ভারতে শতকরা ১০, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৯৫, ব্রিটেনে ১০০, জার্ম্মেণিতে ১০০ এবং জাপানে ৯৫। স্বাস্থ্যের অভাবে ভারতবাসী স্বল্পায়ু। ভারতবাসীর আয়ু গড়ে ২৭ বৎসর, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে, ব্রিটেনে ও জার্ম্মেণিতে ৬২, এবং জাপানে ৪৩ বৎসর। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে ভারতবাসীর জীবন দুঃখপূর্ণ এবং দুর্ব্বহ হইয়াছে। আত্মহত্যার সংখ্যা ভারতে ১০ লক্ষের মধ্যে ৫০, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ১৫০, ব্রিটেনে ১২৫, জার্ম্মাণিতে ২৭৫ এবং জাপানে ২০০। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে এত দুঃখ, দারিদ্র্য ও দৈন্য সত্বেও আত্মহত্যা কম। ভারতবাসী [illegible]

(৬) Happy India by Arnold Lupton দ্রষ্টব্য।

শান্তিপ্রিয়। অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও ভারত পল্লীপ্রাণ থাকিবে। এখনও শতকরা ৯০ জন ভারতবাসী পল্লীতে বাস করে এবং শতকরা ৭০ জন কৃষির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। পল্লী-শ্রী বর্দ্ধনে এবং কৃষির উন্নতি বিধানে ভারত যতই যত্নপর হইবে ততই ভারত শক্তিশালী হইবে। এ দেশে কুটীর-শিল্প সমৃদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক। তাহা হইলে গ্রামবাসীর অভাব দূর হইবে। কুটীর-শিল্পে প্রাচীন ভারত উন্নত ছিল। নেপালের হাতে-তৈয়ারী কাগজ এক হাজার বৎসর টিকিতে পারে। ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। 'ভারত আবার জগৎ মাঝারে শ্রেষ্ঠ আসন লবে!' শিল্পে ও শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে ও সমৃদ্ধিতে, ধর্ম্মে ও বিজ্ঞানে, সর্ব্ববিষয়ে ভারত আবার আন্তর্জাতিক সংঘে শ্রেষ্ঠ হইবে। ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্য উদিতপ্রায়। দেশপ্রেমিক কবি সত্যই গাহিয়াছেন, 'এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।' কিন্তু পরাধীন ভারতে আমাদের জন্ম তাই স্বাধীন ভারতে মরিবার বড় সাধ। ঈশ্বর এই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন।

ভারত অমর। ভারতের অমরত্ব ঐক্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। স্যার যদুনাথ সরকার (৭) দেখাইয়াছেন যে, এই বিশাল ভারত যুগে যুগে ঐক্যবদ্ধ হইয়া অমরত্ব রক্ষা করিয়াছে। ভারতের নানা প্রদেশ, ভাষা, জাতি, ও ধর্ম্মের বৈচিত্র্যের পশ্চাতে সনাতন ঐক্য বর্ত্তমান, স্যার হারবার্ট রিসলে তাঁহার গ্রন্থে (৮) স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "ভৌগোলিক, সামাজিক, ভাষা, প্রথা, ধর্ম্ম, ও আচার-ব্যবহারের যে বিবিধ বৈচিত্র্য ভারতকে বৈদেশিক পর্য্যবেক্ষকের চোখে আশ্চর্য্য করিয়া তুলিয়াছেন, সেই বৈচিত্র্যের পশ্চাতে জীবনগত, সংস্কৃতিমূলক যে সাম্য ও ঐক্য বিদ্যমান তাহা অখণ্ড, তাহা অবিভাজ্য। বাস্তব পক্ষে যে ভারতীয় চরিত্র, সাধারণ ভারতীয় ব্যক্তিত্ব বহু যুগ ধরিয়া গঠিত হইয়াছে তাহা ভাগ করা যায় না। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ইহা সমভাবে বিদ্যমান। ভারত এক, ভারত অমর।

(৭) স্যার যদুনাথ সরকার প্রণীত India through the ages দ্রষ্টব্য।
(৮) People of India by Sir Herbert Risley (2nd edition, p.299) দ্রষ্টব্য।

ভুলিনি আমার শপথ

সুশীল জানা

বড় ভালো লেগেছিল এক দিন এই পৃথিবীকে।
সহসা মুঠোতে ভরে তোমার হাতের মাঝখানে।
মনে হয়েছিল যেন পেয়েছি ধ্যানের স্বপ্নটিকে।
ভরেছি অতৃপ্ত মাটি স্খলিত বৃষ্টির গানে গানে।

চোখে কী গহন স্বপ্ন ঘনালো গভীর আনমনা।
দূর কাল স্তব্ধ যেন ছায়ানীল দিগন্ত পাহাড়ে।
বলেছি—নিঃসীম এই অনন্ত কালের এক কণা,
মহাজীবনের দিশা মুঠো ভরে পেয়েছি এবারে।

তার পর মুঠো থেকে খসে গেছে সহসা জীবন,
মুহূর্ত্তেরা কী পিছল—খসে খসে গেছে বারে বারে।
জীবনের যে শপথ রক্তে দিল দুরন্ত স্পন্দন
সে যেন বিরাট ধাপ্পা—বঞ্চনা সে নিজের আত্মারে!

খরবেগ মুহূর্ত্তেরা, স্খলিত সে জীবন মিলালো।
মুহূর্ত—মুহূর্ত শুধু; অতীত আগামী করে ধূ ধূ।
যদি ভালো লেগে থাকে এ পৃথিবী, এ আকাশ, আলো
তার চেয়ে মিথ্যে যেন কিছু নেই।—এই সত্যি শুধু!...

মিছে কথা। আমি জানি রিক্ততার গূঢ় ইতিহাস:
ঠেঙাড়ে বর্গীরা আসে লুঠে নেয় সোনার নীবার।
বিদীর্ণ এ রিক্ত মাঠ—ফাটলে ফাটলে দীর্ঘশ্বাস;
করুণ মুহূর্ত ভরে তারা লুঠে পৃথিবী আমার।

তার পর ধুলো-ঝড়ে সঙীনে ঘোড়ার দ্রুত খুরে
তাড়া করে নিয়ে যায় মহাজীবনের ধ্যান যতো।
সে ধ্যানে জীবন-ভোর—যে ধ্যান আমার আত্মা জুড়ে
হয়েছে কঠিন স্বপ্ন স্থির বোধি গৌতমের মতো।

সে ধ্যান ভুলিনি আমি—ভুলিনি কো আমার শপথ।
প্রবঞ্চিত আত্মা আজ ক্ষুধার্ত্ত যেন সে জাগুয়ার:
ক্রুদ্ধ বেগে খুঁজে ছুটে রক্তে আঁকা লুঠেরের পথ—
সে মহাজীবন কোথা!—আমার মুঠোতে স্বাদ যার?

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

পঞ্চানন ঘোষাল
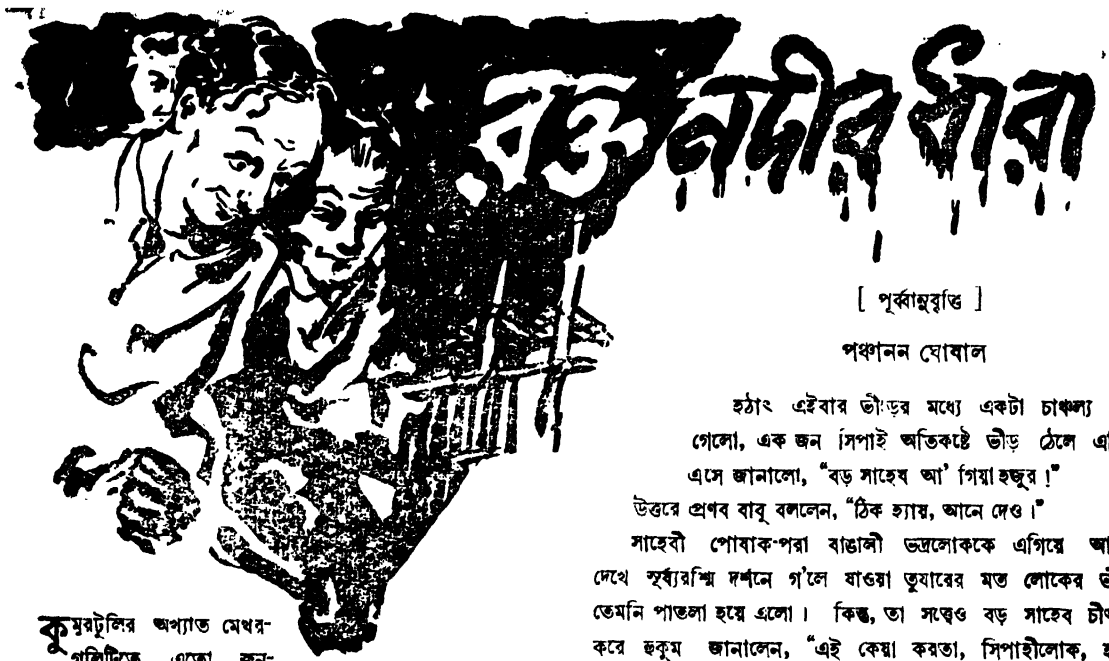
কুমরটুলির অখ্যাত মেথর-গলিটিতে এতো জন-সমাগম ইতিপূর্ব্বে কখনও হয়নি। যে দিকে চাওয়া যায় লোকে লোকারণ্য। বড়রাস্তার ধার থেকে গলির শেষ মুখ পর্য্যন্ত মানুষের পর মানুষই দেখা যায়। এত বড় বিশ্রী হত্যাকাণ্ডের গল্পও পূর্ব্বে কেহ শুনেনি। মুণ্ডহীন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির দেহটি একে একে বহু লোকই দেখে গেলো, কিন্তু এক জনও মৃত দেহটিকে সনাক্ত করে বলে দিতে পারলো না আসলে লোকটা'কে ছিল।

মস্তকহীন নাতিদীর্ঘ দেহটি মেথর-গলির এক পাশে একটা উঁচু পোতার উপর শোয়ানো ছিল। কে বা কাহারা যে তাকে এই এখানে রেখে গেছে তা কোনও ব্যক্তিই বলতে পারে না। চারি দিকে শুধু রক্ত—চাপ চাপ রক্ত—রক্তের যেন নদী বয়ে গেছে।

রক্তনদীর এই ধারার দিকে ভীত নয়নে শৈলেশ বাবুকে বার বার চেয়ে দেখতে দেখে প্রণব বাবু বললেন, "অতো কি ভাবছো, মরতে তো এক দিন সকলকেই হবে।"

উত্তরে শৈলেশ বাবু বললেন, "তা হতে পারে স্যার কিন্তু এমনি ভাবে মরতে অন্ততঃ আমি প্রস্তুত নই। আমাকে ছুটি দিয়ে দিন স্যার। বেঁচে থাকলে এমন চাকরী আমার অনেক জুটবে।"

"তা বটে, কিন্তু—" প্রণব বাবু বললেন, "বাঁচতেই যদি চাও তো হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার ক'রে তবে ছুটি নিও। এবার হচ্ছে আমাদের পালা, বুঝলে। মরিয়া হয়েই লেগে পড়তে হবে।"

উত্তরে শৈলেশ বাবু বললেন, "জ্যান্তো ওকে ধরতে পারবেন না স্যার, ওকে মরা পেতে পারেন, তা-ও অপর আর একটি জীবনের বিনিময়ে। ছেড়ে দিন স্যার, এই সব, দরকার নেই।"

"কিন্তু—" প্রণব বাবু বললেন, "এইবার ও ধরা পড়বেই। এ আমার ধ্রুব বিশ্বাস, শৈলেশ বাবু। এতো রক্তপাত ওর অন্তর্নিহিত শোণিতস্পৃহা নিঃশেষই করে দিয়েছে। শোণিত-পান স্পৃহা ওর মধ্যে পুনরায় জাত হতে সময়ও লাগবে। কিছু দিন পর্য্যন্ত যে ও আর খুন করতে পারবে না, তা নিশ্চিত। এই সময়টুকুর মধ্যেই আমরা ওকে ধরে ফেলবো।"

হঠাৎ এইবার ভীড়ের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেলো, এক জন সিপাই অতিকষ্টে ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসে জানালো, "বড় সাহেব আ' গিয়া হুজুর।"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "ঠিক হ্যায়, আনে দেও।"

সাহেবী পোষাক-পরা বাঙালী ভদ্রলোককে এগিয়ে আসতে দেখে সূর্য্যরশ্মি দর্শনে গ'লে যাওয়া তুষারের মত লোকের ভীড়ও তেমনি পাতলা হয়ে এলো। কিন্তু, তা সত্ত্বেও বড় সাহেব চীৎকার করে হুকুম জানালেন, "এই কেয়া করতা, সিপাহীলোক, হটাও ইন্ লোককো।"

মৃতদেহটির দিকে লক্ষ্য পড়া মাত্র খোদ বড় সাহেবও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অত্যন্ত ভীত হয়ে তিনি বললেন, "এ কি-ই প্রণব বাবু, এ্যাঁ? এ যে স্কন্ধকাটার মতো! ওঃ, বাপস্ রে বাপস্।"

ঘটনা-স্থলটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করে বড় সাহেব বললেন, "হুঁ, বুঝেছি। মৃত ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই এখানকার কোনও এক জমীদার বাড়ীর চাকর। বোধ হয়, বাড়ীর কোনও বিধবা কন্যার সহিত এর অবৈধ সম্বন্ধ ছিল, হঠাৎ ধরা পড়ে যাওয়ায় বাড়ীর লোকেরাই একে মেরে এখানে ফেলে দিয়েছে। একটু খোঁজ করে দেখো, পাড়ার কার কার বাড়ী বিধবা কন্যা বা বধূ আছে, বুঝলে?"

হুকুম করা খুবই সহজ, কিন্তু তা পালন করা যে কতো শক্ত তা যারা হাতে-কলমে তদন্ত করে একমাত্র তারাই জানে।

ঊর্দ্ধতন অফিসারের এইরূপ অভিমত শুনে ইনেস্পেক্টার প্রণব বাবু একটু হাসলেন মাত্র, কিন্তু কোনরূপ উত্তর করলেন না।

হঠাৎ বড় সাহেবের লক্ষ্য পড়লো শৈলেশ বাবুর দিকে। একবার আড়চোখে শৈলেশ বাবুকে দেখে নিয়ে বড় সাহেব প্রণব বাবুকে বললেন, "এই যে শৈলেশ বাবুকেও এনেছেন, বেশ বেশ, ভালোই করেছেন। ওর কপালটা দেখছি ভালোই, এতগুলো খুন এত অল্প সময়ের মধ্যে ও দেখতে পেলো। ছোকরা দেখছি, খুনি কেইসের তদন্ত ভালো করেই শিখে নিতে পারবে।"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "হ্যাঁ স্যার, এই জন্যেই তো ওকে এনেছি।"

"হাঁ," বড় সাহেব বললেন, "হ্যাঁ, প্রথমে দেখতে হবে, কে খুন হলো। তার পর জানতে হবে, কে খুন করলো, এবং এই খুন সে কেন করলো, বুঝলে? খুনি কেইসের তদন্ত করা বড় শক্ত। ভালো করে শিখে নাও হে, শিখে নাও। বছরে একটা বা দুইটার বেশী এই সব দেখবার চান্সই পাবে না, বুঝলে? এই দেখো না, নিহত লোকটার সুন্নত করা নেই, এ থেকে বুঝতে পারছো লোকটা হিন্দু, কেমন? তা ছাড়া ওর কোমরে একটা পৈতাও দেখা যায়, লোকটা নিশ্চয়ই বামুন

ছিল, বোধ হয় নিকটের কোনও বাড়ীতেই ও রাঁধুনি বামুন ছিল। এমনি ভাবে যতই পরিদর্শন করবে তোমার লক্ষ্যস্থল ক্রমেই স্বল্পায়তন বা ছোট হয়ে আসবে। খুন সম্বন্ধে প্রথমেই ভেবে নিতে হবে, একটা বা দুইটা সম্ভাব্য থিওরী, তার পর এই থিওরীর সূত্র ধরে তদন্ত করে যেতে হবে। প্রথম থিওরীটা বিফল হলে দ্বিতীয় থিওরী ধরে তদন্ত চালাতে হবে, এই হচ্ছে তদন্তের নিয়ম। এই ব্যাপারে আমার থিওরী হচ্ছে, যা বললাম আর কি? এ সেরেফ প্রেমের ব্যাপার আর কি? প্রথমে বোধ হয় ওকে কোনও এক বাড়ীর ভিতরেই ছুরী মারা হয়েছে। কিন্তু তখনও বোধ হয় ও মরেনি। তার পর ওকে জ্যান্ত অবস্থাতেই এখানে এনে ওর মুণ্ডটা কেটে নেওয়া হয়—যাতে করে কি না মৃত ব্যক্তিকে কেউ সনাক্ত করতে না পারে। তা এইবার তোমার কায আরম্ভ করে দাও, আমি তা হলে চললাম, কেমন? বড় মেয়েটা তো ভুগছিলই, আজ আবার ছোটোটারও জ্বর এসেছে। ডাঃ ঘোষের ওখান হয়ে আফিস যাবো, দরকার হয় তো আমার আফিসেই ফোন করে উপদেশ নিও, বুঝলে? এখোন তা হলে চলি আমি।"

ঘড়ীর কাঁটা কাহারও জন্যে অপেক্ষা রাখে না—ধীরে ধীরে সকাল থেকে দুপুর এবং দুপুর থেকে বিকাল হলো, সন্ধ্যাও আগত-প্রায়। কিন্তু তখনও পুলিশ-তদন্ত শেষ হয়নি। ইতিমধ্যে সরকারী ডাক্তার এসে মৃতদেহটি পরীক্ষা করে গেছেন। তাঁর মতে জ্যান্ত অবস্থাতেই মুণ্ডটা স্কন্ধচ্যুত করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির দেহের কাঠিন্য হ'তে তিনি এ-ও বলে দিয়েছেন যে, হত্যাকাণ্ডটি রাত সাড়ে এগারটা আন্দাজ সময়ে সমাধিত হয়েছে। এইটুকু মাত্র তথ্য জানিয়ে বিজ্ঞান নিরুত্তর হলো, কিন্তু এইটুকু তথ্যের মূল্যও কম নয়। মনে মনে এই খুন সম্বন্ধে অপর আর একটি নূতন থিওরী আওড়ে নিয়ে প্রণব বাবু খুসী হয়ে বলে উঠলেন, "উঁহু, আমার কিন্তু মনে হয় মৃত ব্যক্তিটি বেশ্যা-পাড়ার তবলচি প্রতুল ওরফে পাগলা ছাড়া অন্য কেউ-ই নয়। দেখছো না, হাতের উপর উল্কি দিয়ে স্পষ্ট লেখা রয়েছে—P. B. যত দূর মনে পড়ে, পাগলার ভালো নাম প্রতুল ব্যানার্জ্জি ছিল। লোকটা প্রায়ই মাতাল অবস্থায় থানায় ধরা পড়েছে, জামীনের কাগজে ওর আঙুলের টিপও থাকতে পারে, এই জন্যেই আমি বলছিলাম, মৃতদেহের আঙুলের টিপ আর পায়ের ছাপ নাও। পাগলার বাড়ীতে ওর দুই-এক জোড়া জুতাও থাকতে পারে, ঐ জুতার শুকতলার উপর তুলনা করবার উপযোগী ওর পায়ের দাগও পাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া ওর পায়ের মধ্যে একটা বিশেষত্বও দেখছি, বাংলায় যাকে 'কুশ পা' বলে আর কি? এই সকল থেকে মৃতদেহটি পাগলার বলে প্রমাণিত হওয়া চাই-ই, তা না হলে কেইস প্রমাণ হওয়া শক্ত হবে। এ ছাড়া ওর সারা অঙ্গের ঘন লোমও লক্ষ্য করবার বিষয়, বুঝলে? হাঁ, এইবার একটা ফটোর বন্দোবস্ত করো। ফটো তোলার পর শব ব্যবচ্ছেদ করবার জন্য লাস যথা শীঘ্র ময়নায় পাঠাতে হবে।"

একটির পর একটি করে স্থানীয় ব্যক্তিদের জবানবন্দি লিখতে লিখতে শৈলেশ বাবু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কেউই কিছু বলে না, কিন্তু তবুও তারা যা বলে তা'ই তাকে লিখে যেতে হয়। সকলের মুখেই সেই একই কথা, আমি নিকটেই থাকি, কিন্তু কিছুই জানি না। প্রণব বাবুর এই থিওরী কানে যাওয়া মাত্র শৈলেশ বাবু উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন, "ঠিক বলেছেন স্যার, ও পাগলাই হবে। তা না হয় হলো, কিন্তু প্রমাণ করবার মতো সাক্ষী কই?"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন "চেষ্টা করলে, কিছুরই অভাব হবে না। খুন কে হলো এবং খুন কে করলো? এই দুইটি প্রয়োজনীয় বিষয় যখন জানা গেছে, তখন সাক্ষ্যও পাওয়া যাবে বই কি।"

প্রত্যেক প্রফেসনের লোকেরই স্ব স্ব প্রফেসন বা ব্যবসায় সম্বন্ধীয় ব্যাপারে পৃথক্ পৃথক্ প্রেরণা বা ইন্‌সটিংট্ জন্মায়। স্ব স্ব ব্যবসায় ক্ষেত্রে বুদ্ধির চেয়ে অনেক বেশী সাহায্যে আসে এই প্রেরণা। এই প্রেরণার মধ্যে যুক্তি থাকে না, তর্ক থাকে না, থাকে শুধু প্রেরণা। এ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করলে, তার একটি মাত্র উত্তর হয়, "জানি না কেন, আমার মন বলছে তাই।"

প্রণব বাবু যা উপলব্ধি করেছিলেন তা সত্যে পরিণত হতে একটুও দেরী হয়নি। হঠাৎ জমাদার রামসিং এক জন লোককে প্রণব বাবুর কাছে হাজির করে বলে উঠলো, "এক বহুৎ বড়ি আচ্ছি গাওয়া মিল গিয়া হুজুর! এই, ইধার আ যাও, ডরো মাত্। বড় বাবুকো সব কুছ বাতায় দেও।"

ভদ্রলোকের নাম উপেন বাবু, নিকটের একটি টিনের বাড়ীতে তিনি বাস করেন। কিছুক্ষণ আমতা আমতা করে ভদ্রলোক বললেন, "আমি খুন-টুন কিছুই দেখিনি, স্যার। তবে কাল রাত্রে বাড়ীর রোয়াকে বসেছিলাম, হঠাৎ দেখি, খোকা বাবু বাড়ী ঢুকছেন। কাপড়ে তাঁর রক্তের দাগ। ঐ বাড়ীতে অনেক দিন থেকেই ওঁর একখানা ঘর ভাড়া নেওয়া আছে, হুজুর! মাঝে মাঝে তিনি ঐ ঘরে এসে রাতও কাটিয়ে যান। কাপড়ে রক্তের দাগ দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'খোকা বাবু, আপনার কাপড়ে যে রক্তের দাগ!' খোকা বাবু আমার এই কথায় ক্ষেপে উঠে আস্তীনের ভিতর হতে একটা ছুরী বার করে বলে উঠলেন, 'চুপ।' আমি স্যার এর পর ভয়ে চুপ করে যাই। এর পরেই খোকা বাবু ভিতরে ঢুকে কাপড় ছেড়ে পুনরায় বেরিয়ে আসলেন। আমি বড্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম হুজুর, তাই তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে শুয়ে পড়ি, রাত্রে আর আমি বারই হইনি, হুজুর।"

কোনও তদন্তের ব্যাপারে সাক্ষ্য-সাবুত যখন একবার আসতে আরম্ভ করে তখন বন্যার মতই আসতে থাকে। বিষয়টি অনুধাবন করলে মনে হবে। অপরাধীর পাপের ভার বুঝি পূর্ণ হয়ে এসেছে। ভীড়ের মধ্য থেকে বহু লোকেই স্তম্ভিত হয়ে উপেন বাবুর কথা শুনছিলেন। এঁদের মধ্য হতে এক জন এগিয়ে এসে বলে উঠলেন, "হাঁ, হাঁ, খোকা তো? তাকে রাত্রেও আমি দেখেছি। রাত্রি তখন বারোটা হবে, গঙ্গার পৈঠেয় বসে হাওয়া খাচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনতে পাই 'ঝুপ্!' চমকে উঠে চেয়ে দেখি, খোকা সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হেঁকে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে-ও, খোকা না? কি করছিস্ ওখানে। জলে কিছু ফেললি না কি?' উত্তরে খোকা বললো, 'ও কিছু না, কাকা বাবু, ও একটা মরা বেড়াল। জলে ফেলে দিলাম, বেটার সদ্গতিই হবে'।"

সযতনে সাক্ষী দুইটির নাম-ধাম ও পিতার নাম এবং তাদের বক্তব্য বিবরটুকু লিপিবদ্ধ করে নিয়ে প্রণব বাবু সহকারী অফিসার শৈলেশ বাবুকে বললেন, "এই জন্যেই বলি, লোকের ভীড় কখনোও

হটিয়ে দিতে নেই, পাঁচটা লোক এসে জমা হলে তবেই না পাঁচটা কথা জানা যাবে?"

প্রণব বাবু ছিলেন এক জন অভিজ্ঞ অফসার। তাঁর এই শেষ কথাটি সত্যে পরিণত হ'তে দেরী হলো না। খুনের কথা শুনে সত্য গোয়ালা নামক ব্যক্তিও ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে হাজির হয়েছে। পাগলার দেহটা দেখে চমকে উঠে সে প্রণব বাবুকে জানালো, "আজ্ঞে, এ তো পাগলাই মনে হয়। কাল সন্ধ্যেয় একেই তো জন কয়েকের সঙ্গে একটা ট্যাক্সিতে দেখেছি। আমি তখন, হুজুর, শিবমন্দিরে প্রণাম করছিলাম। হাঁ হুজুর, সোনাগাছির উজ্জ্বলা বিবির বাড়ীতে ও তবলা বাজাতো, হারু গোঁসাই নামে আমার একটা চেনা লোকও পাগলাকে কাঁদতে দেখেছে! ঐ লোকগুলোকে হারু ভালো করেই চিনবে, হুজুর। আমাকে তখুনই বলেছিল, ব্যাপার সুবিধে নয়, পাগলাকে যারা নিয়ে গেলো, তাদের মধ্যে না কি খোকা গুণ্ডাও আছে। হাঁ, হুজুর, এ কথা সে আমায় তখুনিই বলেছিলো। ওরা ওকে খুন করবে, তা কি আমি জেনেছি, হুজুর? হাঁ, হুজুর। রাত তখন আটটা ন'টাই হবে।"

প্রণব বাবুর চোখ-মুখ আনন্দের আতিশয্যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠলো। একই স্থানে বসে এতো বেশী সাক্ষীসাবুত তিনি যে পেয়ে যাবেন, তা তিনি কল্পনাও করেননি। অধিকতর সাফল্যের আশায় উৎফুল্ল হয়ে তিনি এইবার সদলবলে খোকা বাবুর কুমুরটুলির নব আবিষ্কৃত বাস-গৃহটার মধ্যে ঢুকে পড়ে শৈলেশ বাবুকে বললেন, "ভালো করে ঘরটা তল্লাসী করতে হবে, বুঝলে। চাই কি মাথা-টাথা মাটিতে পুতেও রাখতে পারে। মরা বেড়াল ফেলার গল্প শুনেছ বলেই ছিন্ন মস্তক অন্বেষণে নিবৃত্ত হওয়া উচিত হবে না। এসো, ওর ঘরটার মেঝে-টেঝে মায় উঠান পর্য্যন্ত খুঁড়েই ফেলি।"

ইতিমধ্যে আরও অনেক সিপাই ও অন্যান্য লোক-জন সেখানে এসে গেছে। প্রণব বাবু ও শৈলেশ বাবুর নির্দ্দেশমত দা, কুড়ুল, শাবল যে যা সংগ্রহ করতে পারলো তাই দিয়ে তারা মেঝের মৃত্তিকা খননে মনোনিবেশ করে দিলে। কিন্তু এতো চেষ্টাতেও মৃত্তিকার তলা হ'তে কোনও ছিন্ন মুণ্ড বার হলো না, ছিন্ন মুণ্ডের পরিবর্ত্তে মাটির তলা হ'তে বার হ'তে লাগলো, কৌটায় কৌটায় ভরা হীরা, মাণিক্য, মুক্তা ও জহরতের রাশি রাশি গহনা। সকলের মনে হলো, পুলিশ বুঝি সেখানে রেডী-মেইড স্বর্ণ অলঙ্কারের একটা খনি বার করেছে।

গহনা ও জহরতগুলির একটা সঠিক তালিকা বানাতে বানাতে প্রণব বাবু লক্ষ্য করলেন, ঘরের এক কোণে কতকগুলি কাপড় জড় করা রয়েছে। দূর হতেই তিনি দেখতে পেলেন, কাপড়গুলির উপর রক্তের দাগ। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে প্রণব বাবু বস্ত্রগুলি তুলে এনে পরিদর্শন করতে সুরু করলেন। দুইটি সার্ট এবং দুইটি ধুতিতেই দেখা যায় তাজা রক্তের চিহ্ন।

এই আবিষ্কারের জন্তে প্রণব বাবু প্রথমে খুসীই হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু পরে এ জন্ম তিনি চিন্তিতও হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর প্রণব বাবু বললেন, "তাই তো হে শৈলেশ, দুই প্রস্থ রক্তমাখা ধুতি ও সার্ট আসে কোথা থেকে? ধুতি ও সার্টের মাপ থেকে তো মনে হয়, এই দুই সেট কাপড় চোপড় একই ব্যক্তির। সাক্ষী উপেনও তো বলছে, একা খোকাকেই সে তার বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছে, সঙ্গে আর কাউকেই সে দেখেনি, তবে

উভয়েই চিন্তা করছিলেন, এর কারণ কি-ই বা হতে পারে। প্রত্যেকটি ব্যাপারের প্রকৃত কারণ না দর্শাতে পারলে আদালতের সন্দেহ উদ্রেক অসম্ভব নয়। পরিস্থিতিমূলক সাক্ষ্য-প্রমাণের নিয়মই এই সত্য ঘটনার একটি অংশের সহিত অপর অংশের একটা অবিচ্ছেদ ও স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকে, এর মধ্যে কোনরূপ গরমিল হবারই উপায় নেই। প্রণব বাবু নিবিষ্ট মনে ভাবছিলেন, সত্যই তো, দুই প্রস্থ পরিচ্ছদেই বা রক্ত আসে কোথা থেকে? হঠাৎ বাহির হতে একটা হট্টগোলের আওয়াজ এলো। বহু লোকই চীৎকার করতে করতে এই দিকেই দৌড়ে আসছে। প্রণব বাবু দলবল সহ তাড়াতাড়ি বাইরে এসে এক জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি, ব্যাপার কি? দৌড়াও কেন সব?"

দৌড়াতে দৌড়াতেই এক জন ভদ্রলোক বলে গেলেন, "শীগ-গির ঐ দিকে লোক পাঠান, মশাই।" অপর আর এক জন অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন, "খো-খো-খোকা গু-উ-ণ্ডা।"

এই অঞ্চলের প্রত্যেক লোকই খোকার কার্য্যকলাপের সহিত প্রত্যক্ষ কিংবা অপ্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত ছিল। বাল্যকালে এই পাড়াতেই খোকা বাবু মানুষ হয়েছে। খোকা বাবুকে ভয় করে না এমন একটি লোকও এ অঞ্চলে ছিল না। ভীত ত্রস্ত ভাবে পাড়া-পড়শীরা নিজ নিজ গৃহে ফিরে এসে অর্গল বন্ধ করে দিতে থাকে, প্রণব বাবুর প্রশ্নের কোনওরূপ উত্তর না দিয়েই।

বিরক্ত হয়ে প্রণব বাবু পলায়মান ব্যক্তিদের মধ্য হতে জন দুই লোককে জবরদস্তীর সহিত পাকড়াও করে তবে জানতে পারলেন, খোকা বাবুকে না কি তারা ঘটনা-স্থলের নিকট মাত্র কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই দেখতে পেয়েছে।

প্রণব বাবু স্তম্ভিত হয়ে ব্যাপারটি শুনলেন। ইতিমধ্যে সন্ধ্যাও হয়ে এসেছে। অল্পসংখ্যক লোকজন নিয়ে ঐ অন্ধকার গলিটার মধ্যে প্রবেশ করা নিরাপদও নয়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রণব বাবু সহকারী শৈলেশ বাবুকে বললেন, "আশ্চর্য্য ব্যাপার তো? বেটার প্রাণের ভয়ও নেই।"

শৈলেশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "যাবেন না কি একবার ওদিকে?"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন "লাভ? ও কি আর এতক্ষণ ওখানে বসে আছে?"

শৈলেশ বাবু বলে উঠলেন, "নিজে ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, ও আমাদেরই একটু ভয় দেখিয়ে গেলো আর কি? শুনেছি, অপরাধীরা এইরূপ বাহাদুরী প্রায়ই দেখিয়ে থাকে। তাই হবে, না, স্যার?"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "না, ঠিক তা নয়। আমার মনে হয়, অত্যধিক শোণিতপাতের পর ওর অন্তর্নিহিত শোণিতপান-স্পৃহা অতিমাত্রায় জেগে উঠেছে। তাই বারে বারেই ও ঘটনাস্থলে ফিরে আসছে। খুনের পর খুনীরা এমনিই অপ্রকৃতিস্থ প্রায়ই হয়ে পড়ে, যার ফলে কি না সে বারে বারে ঘটনাস্থলে বিপদ বরণ করেও ফিরে এসে থাকে। এখোন বুঝছি কেন এইখানে আমরা দুই প্রস্থ কাপড় দেখতে পাচ্ছি। প্রথম বার সে এক প্রস্থই রক্তমাখা কাপড়-চোপড় বদলে গিয়েছে। কিন্তু তার পর আবার সে

…লেগে যায়। এই কারণে সে পুনরায় গৃহে ফিরে কাপড়-চোপড় বদলে গিয়েছে। রাত্রি গভীর থাকায় দ্বিতীয় বার সেখানে ওকে আর কেউ দেখেনি। অকুস্থলে ঘন ঘন ফিরে আসার ফলেই হয় ওর অন্তর্নিহিত উগ্র শোণিতপান-স্পৃহা আরও দ্রুতগতিতে প্রশমিত হয়ে যাবে। এই কারণে কিছুকাল পর্য্যন্ত ওকে শান্ত থাকতে হবেই। যেমন করেই হোক, এই সময়টুকুর মধ্যেই কিন্তু ওকে আমাদের ধরে ফেলতেই হবে, বুঝলে?"

"কিন্তু স্যার," শৈলেশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ওর দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বটি যদি ইতিমধ্যে পুনরায় জেগে উঠে? এর মধ্যে যদি ও পৃথিবীর ওপর তলায় ফিরে এসে সভ্য সমাজের মধ্যে বেমালুম ভাবে মিশে যায়, তা হলে?"

"সে কথাও যে আমি ভাবছি না তা'ও নয় তবে," প্রণব বাবু বললেন, "এতো শীঘ্র ওর এই বর্ত্তমান ব্যক্তিত্বের যে পরিবর্ত্তন ঘটবে, এমন তো মনে হয় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উজ্জ্বলাকে একবার অন্ততঃ ও দেখতে আসবেই। এসো, উজ্জ্বলা বিবির বাড়ীর আশে-পাশে সতর্ক পাহারা বা গার্ড রাখার বন্দোবস্ত করে আসি। এ ছাড়া মিস্ উজ্জ্বলা দত্তের বাড়ীতেও ওয়াচ রাখবো এখোন, ওর জীবনের সকল গুপ্ত কথাই তো আমাদের জানা আছে। এ সব ভূতুড়ে ব্যাপার তো ডায়েরীতে আর লেখা যাবে না, লিখলে কেউ বিশ্বাসও করবে না। এ সব কথা যেন অন্য কাউকে আর বলতে যেও না, বুঝলে? এখোন এসো, কোয়ার্টারে ফিরে যাই, কখোন বেরিয়েছি মনে আছে? খাওয়া-দাওয়া সেরে এইবার একটা ঘুম দেওয়া যাক; ভোরে উঠে ডায়েরী লিখলেই হবে এখোন, শরীরও আর বইছে না, সত্যি।"

প্রণব এবং শৈলেশ বাবু ক্লান্ত দেহে ও স্খলিত পদে যখন থানায় ফিরলেন রাত্রি তখন প্রায় এগারটা বেজে গেছে। থানার সন্নিকটে এসে প্রণব বাবু একবার উপরের দিকে চাইলেন। তাঁর কোয়ার্টারের জানালাগুলি পূর্ব্বের মত খোলাই ছিল, কিন্তু কোনও প্রতীক্ষমান মুখই সেদিন আর সেখানে তিনি দেখতে পেলেন না।

আজ প্রায় দুই মাস হলো শান্তা তার পিত্রালয়ে আছে। শরীর তার ক্রমান্বয়েই খারাপ হতে চলেছে কিন্তু একটা দিনও ছুটি নিয়ে প্রণব বাবু তাকে দেখে আসতে পারেননি। এমনিই কয়েকটি জটিল খুনী কেইসের তদন্তের ব্যাপারে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন যে, ছুটি নেওয়া সম্ভবও নয়। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রণব বাবু থানায় ঢুকে আফিসের একটা চেয়ারের উপর তাঁর ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিলেন। উপরে উঠতে তাঁর আর ইচ্ছা করছিল না। শূন্য মন্দিরে কে-ই বা আর ফিরে আসতে চায়। ছুটি খেয়ে নেওয়া? তা তো আফিসে বসেই সেরে নেওয়া যায়। দ্যাৎ, কে আর এখোন উপরে উঠে।

প্রণব বাবুকে পা দু'টো টেবিলের উপর তুলে দিয়ে চেয়ারের উপর ঠেকে বসতে দেখে শৈলেশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি স্যার, উপরে যাবেন না?" উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "থাক্। কাযকর্ম্ম সব সেরেই উঠবো। সকালেই উঠতে না পারলে আটটার মধ্যে কি ডায়েরী লেখা শেষ করতে পারবো, সাড়ে আটটার মধ্যেই তো কাগজপত্র হেড আফিসে পৌঁছানোই চাই। যা হয় আমি করবো এখোন। তুমি না হয় শুয়েই পড়গে, বৌমা আমাদের অপেক্ষা দিও। এখানেই খাবার টাবার রেখে যাক। হুঁ হুঁ বাবা, দু'টোর আগে আর উপরে উঠছি না। ঠিক দু'টোর সময় উপরে উঠেই ঘুম লাগাবো, বেলা নয়টার আগে আমাকে যেন আর কেউ না ডাকে। সকালে উঠে ডাকের কাগজপত্র তুমিই সই করে পাঠিও, আমি আর নীচেই নামবো না, বুঝলে?"

শৈলেশ বাবু খুসী হয়ে উপরে চলে গেলে প্রণব বাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলেন। তার পর সিগারেটের কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার দিকে চেয়ে ভাবতে থাকলেন—কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা "মিলনে আছিলে বাঁধা বিরহে টুটিয়া বাঁধা আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছো প্রিয়ে, তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে।" সত্যই তো এত দিন শান্তাকে পেতে হলে প্রণব বাবুকে উপরে উঠে মাত্র একটা ঘরের মধ্যে তাকে খুঁজতে যেতে হতো, কিন্তু আজ তার এই বাঁধা টুটে গেছে। আজ শান্তাকে তিনি সর্ব্বত্রই অনুভব করতে পারেন। প্রণব বাবুর মনে হয়, শান্তা বুঝি তার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। চমকে উঠে তিনি পিছনের দিকে ফিরে চান, তার পর নিজের এই দুর্ব্বলতায় নিজেই অবাক্ হয়ে যান। প্রণব বাবু দুই হাতে চোখ দু'টো রগড়ে নিয়ে আত্মস্থ হয়ে ডায়েরী লিখতে বসলেন। এদিকে ভৃত্য এসে কখন যে খাবারের থালিটা পাশের টেবিলের উপর রেখে গেলো, তা তিনি দেখেও দেখতে পেলেন না।

একটির পর একটি করে নির্ব্বিকার চিত্তেই খোকা বাবু হত্যাকাণ্ড সমাধিত করেছে। এ জন্য তাহাকে সামান্য মাত্রও কেহ বিচলিত হতে দেখেনি। এ জন্য খোকা বাবু সামান্য মাত্রও অনুতপ্ত ছিলো না। "যে মরে যায়, সংসারের দুঃখ-কষ্ট থেকে অব্যাহতি পেয়ে সে বেঁচেই যায়। যে বাঁচার মতো ক'রে বাঁচতে পারে না তার পক্ষে মরা ভালো।" ইহাই ছিল খোকা বাবুর নিজস্ব দর্শন। একমাত্র অঙ্গহানি করার জন্যে খোকা বাবু দুঃখিত হতো। কাউকে একেবারে শেষ করে দিতে পারলে খোকা বাবু দুঃখিত তো হতোই না, বরং তৃপ্তিলাভই করতো। কিন্তু এই পাগলা-হত্যার ব্যাপারে খোকা বাবু কেন যে এমন আত্মহারা হয়ে পড়ছে তা সে নিজেই বুঝে উঠে পারলে না। তার মন যেন খেইহারা হয়ে আয়ত্তের বাইরে এসে গেছে। কে যেন বারে বারে ডাক দিয়ে তাকে পাগলার কাছেই নিয়ে যেতে চায়। কতো বারই না খোকা পাগলের মত হয়ে পাগলার নিধন-স্থানে এসে পাগলাকে নিষ্প্রয়োজনেই খুঁজে গেলো।

খোকা বাবু ভালোরূপেই বুঝতে পেরেছিলো, এটা তার একটা স্নায়বিক অসুখ। এই মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধে খোকা বাবু সকল সময়ই সচেতন ছিলো। পূর্ব্ব হ'তেই এই অসুখ হতে নিরাময় হবার উপায়গুলিও তার জানা ছিল। খোকা বাবু ঠিক করলো, ভুলে থাকবার জন্যে কোনও এক নিরাপদ স্থানে বসে কয় দিন ধরে শুধু মদ্যপানই করবো। কিন্তু যাবার মত কোনও নিরাপদ স্থানই তার আর মনে আসছিল না। এ কয় দিন হচ্ছে কুকুরের মত এক বস্তী হ'তে আর এক বস্তীতে সন্ধানী পুলিশের লোক তাকে তাড়িয়ে নিয়েই ফিরেছে। বিশ্রাম তো দূরের কথা, একটু খেয়ে নিতেও পারেনি। সব চেয়েও বড় কথা এই যে, তার অন্তর্নিহিত আঘাত হানার স্বতঃস্ফূরিত স্পৃহা সে চেষ্টা করেও

হাতে থাকলেও অস্ত্র ব্যবহারের তথা আত্মরক্ষার ইচ্ছা যেন সে সম্পূর্ণরূপেই হারিয়ে ফেলেছে। কাপুরুষের মত তাই এই কয় দিন তাকে পালিয়ে পালিয়েই আত্মরক্ষা করতে হচ্ছিলো।

হঠাৎ খোকা বাবুর মনে পড়লো বরুণার কথা। বরুণা? কোন্ মুখে সে আজ বরুণার কাছে গিয়ে আশ্রয় চাইবে? বরুণার কথা ভেবে খোকা বাবু নিজের নিকটেই নিজে লজ্জিত হয়ে উঠলো, পৃথিবীতে বোধ হয় একমাত্র বরুণার নিকটেই সে অপরাধী। বরুণার কথা মনে আসা মাত্র খোকা বাবুর অপর আর এক ভাবান্তর উপস্থিত হলো। বরুণা সৎ, বরুণা ভালো, সুন্দর—আসলে সে উৰ্দ্ধতন পৃথিবীরই মানুষ, খোকাই তাকে নিম্নগামী ক'রে অধস্তন পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছে। এমনি চিন্তার মধ্যে হঠাৎ খোকার উৰ্দ্ধতন পৃথিবীর কথা মনে পড়ে গেল, খোকা অনুভব করলো, আবার সে উৰ্দ্ধতন পৃথিবীতে উঠে এসেছে। এই সময় তার দলের এক জন লোক এসে পড়লে হয়তো তাকে দেখে খোকা পুনরায় আত্মস্থ হয়ে বেঁচে যেতো, কিন্তু এখোন? এখোন উপায়? খোকা বাবু ভালো-রূপেই জানতো যে, উৰ্দ্ধতন পৃথিবীতেও পুলিশ তাকে খোঁজাখুঁজি করছে। সেখানে ফিরে গেলে আরও সহজেই তার ধৃত হওয়ার সম্ভাবনা। আজ এই সর্ব্ব প্রথম খোকা বাবু যেন নিজেকে শিশুর মতই অসহায় মনে করলো। নিরুপায় হয়ে খোকা বাবু বরুণার গৃহেই এসে পড়লো।

বরুণা সন্ধ্যা আরতি সেরে সুধীরের একটি প্রতিকৃতির সম্মুখে নতশির হয়ে প্রণাম জানিয়ে বলছিলো, "ঠাকুর!" হঠাৎ পিছন থেকে কে এক জন ডেকে উঠলো, "বরু-উ।" চমকে উঠে পিছন ফিরে বরুণা দেখতে পেলো, খোকা বাবু। কখন নিঃশব্দে খোকা বাবু যে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে তা সে টেরও পায়নি। স্মিত হাস্যে বরুণা জিজ্ঞাসা করলো, "আরে-এ, খোকাদা, তুমি?"

উত্তরে খোকা বাবু বললে, "হাঁ বরু, আমিই। তোকে আজ একটা কথা বলবো। আদেশ নয় রে, আদেশ বা হুকুম করবার মত ক্ষমতা আমার মধ্যে আর নেই। আমি তোর কাছে একটা ভিক্ষা চাইতেই এসেছি।"

এতখানি ভাবপ্রবণতা খোকা বাবুর মধ্যে বরুণা পূর্ব্বে কখনও দেখেনি। অবাক্ হয়ে সে খোকা বাবুর দিকে চেয়ে দেখলো, খোকা বাবুর চোখের কোণে এক ফোঁটা জল। বিস্মিত ও হতবাক্ হয়ে বরুণা জিজ্ঞাসা করলো, "কি বলছো, খোকাদা, আমি দেবো তোমায় ভিক্ষে? আমার তো আর এমন কিছুই অবশিষ্ট নেই খোকাদা, যা কি না কাউকে আমি দিতে পারি? এমন কি একটু স্নেহ বা ভক্তি পর্য্যন্তও কাউকে আর আমার দেবার অধিকার নেই. ভাই। তুমি ভুলে যাচ্ছো খোকাদা, বর্ত্তমান অবস্থায় আমি এক জন নিঃস্ব কুলটা নারী ছাড়া আর কিছু-ই নই।"

খোকা বাবু ধীর স্থির নয়নে বরুণার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে নিলো, এবং তার পর বরুণার কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা বরু, তোর কি ইচ্ছে হয় না, আবার তুই তোর সেই পূর্ব্বতন সমাজে ফিরে যাস্?"

হেসে ফেলে বরুণা উত্তর করলো, "কেন চাইব না, কিন্তু সমাজ আমাকে চাইবে কেন? এ সুযোগ সমাজ পুরুষদের প্রতিদিনই দেবে, কিন্তু এই সুযোগ এক দিনের জন্তও সমাজ আমাদের দেবে না। এই জন্তেই তো সমাজের ভালো ভালো লো[illegible] নষ্ট করে আমরা আনন্দ পাই। এই ভাবে সমাজের উপর প্র[illegible] নেওয়া ছাড়া আমাদের উপায়ই বা আর কি আছে?"

খোকা বাবু এইবার বরুণার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আবেগ ভরে বলে উঠলো, "এই কথাই তোকে আজ [illegible] বলতে এসেছি, বরু! আমারও এই দুর্ব্বৃত্তগিরি আর ভালো [illegible] না। এবার হতে আমি নিরপরাধী জীবন যাপন করবো [illegible] করেছি। কিন্তু এ জন্ত তোকেই আমাকে সাহায্য করতে হ[illegible] এই নূতন পথে তুই-ই হবি আমার একমাত্র সহযাত্রী ও পাথেয়, সাক্ষ্য করে তোকে নিয়েই আমি এক নূতন ও চিরস্থায়ী জীবনে প্র[illegible] করবো। আয় বরু, আমরা দু'জনায় হাতধরাধরি করে এমন [illegible] জায়গায় চলে যাই, যেখানে আমাদের পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে কে[illegible] অবহিত নেই।"

বরুণা বিস্মিত হয়ে বলে উঠলো, "এ কি বলছো [illegible] খোকাদা? আমাকে—আমাকে তুমি বিয়ে করবে?"

সাহস পেয়ে খোকা বাবু বললে, "হাঁ বরু, তাই, বিয়েই তোকে করবো। তোকে এ-ভাবে আর আমি থাকতে দেবো [illegible] প্রথমে সুধীরকেই তোকে আমি পুনর্গ্রহণ করতে বলেছি[illegible] কিন্তু।—"

"কিন্তু," বরুণা জিজ্ঞাসা করলো, "কিন্তু, সে বললো কি?"

খোকা বাবু বললে, "তাকে অনেক বুঝালাম, কিন্তু সে কিছু[illegible] তোকে আর ঘরে নিতে রাজী হলো না। ও রাজী হলে তো [illegible] ভালো হতো। আমিও এতে শান্তি পেতাম।"

খোকা বাবুকে বিস্মিত করে দিয়ে বরুণা উত্তর করলো, [illegible] সংস্কারের জন্ত সুধীর আমাকে পুনর্গ্রহণ করতে পারে ঠিক, সেই সংস্কারের জন্তেই আমিও তোমাকে বিয়ে কর[illegible] পারবো না, খোকাদা। পুনর্বিবাহ করা আমার পক্ষে অন্ত কোনও এক ভালো পথ আমাকে বাতলে দিতে পারো খোকাদা?"

প্রচুর বিস্ময়ের সহিত খোকা বাবু লক্ষ্য করলে, তার যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে রয়েছে সে এক জন সামান্যা নয়, সে এক জ্যোতির্ম্ময়ী ভারতীয় নারী; সমুদয় নারীত্বের নিয়ে রাজ-রাজেশ্বরীর মতই সগর্ব্বে বরুণা যেন খোকার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। লজ্জিত হয়ে খোকা বলে উঠলো, তাহলে তাই হোক্। আমি কিন্তু নিজেকে আজ নিঃশেষেই বিলিয়ে দিতে এসেছি। স্বামিরূপে, ভাইরূপে, বা বন্ধুরূপে যে তুই আমাকে চাইবি, সেই ভাবেই আজ তুই আমাকে পাবি। যদি আজ ভালো হই, তাহলে আমার চেয়ে অধিক ভালো আর লোকও তুই পাবি না। আমাকে তুই নিশ্চিন্ত মনেই বিশ্বাস পারিস্, আমার সমস্ত সম্পত্তি তোরই জিম্মায় দিয়ে আমি আজ নেবো মনে করছি, বুঝলি?"

এতটুকু সাহায্য করা তো দূরে থাকুক, এত দিন সত্য-পথের নির্দ্দেশ পর্য্যন্ত কেউ তাকে দেয়নি। যে কথাটি শোনবার জন্ত দিন ধরে তার অন্তরাত্মা অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল, সেই যে খোকার কাছ হতে সে শুনবে, বরুণা তা কোনও দিনই পায়েনি। বরুণার চোখে জল এসে গেলো, দূরে হতে যেন সে

বাঁশী শুনতে পাচ্ছে। অধীর হয়ে খোকার দিকে চেয়ে বরুণা জানালো, "কিন্তু তোমার ও পাপের টাকা আমি তো নেবো না, খোকাদা, ও-সব টাকা আমি কাউকে দান করতেও ভয় পাই।"

"তা আমি জানি," খোকা বাবু বললে, "পাপের টাকা তোরও যেমন থাকে না, আমারও তেমনি তা থাকেনি। পাপ কার্য্য হ'তে সংগৃহীত প্রতিটি কপর্দ্দকই এই জন্যে আমি পাপ কার্য্যেই খরচ করে ফেলি। কিন্তু, কিন্তু বরুণা, সৎ উপায়ে অর্জ্জিত অর্থও আমার আছে। শোন্ তবে বলি, মাঝে মাঝে আমি সৎভাবেও জীবন যাপন করেছি এবং তা আমি করেছি উর্দ্ধতন পৃথিবীতে এসে, এই সময় আমার দলের লোকেরা আমার কোনও পাত্তাই পেতো না। যত দিন মন আমার আয়ত্তের ভেতর থাকে তত দিনই মাত্র আমি এ ভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারি। আমার এই মূল্যবান সময়টুকুর যত দূর সম্ভব আমি সদ্ব্যবহারই করেছি। লক্ষ্ণৌর ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম ও কনট্রাক্ট বিজনেস, বেনারসের শিল্প-বিদ্যালয় ও অনাথ আশ্রম এই সময়টুকুর মধ্যেই আমি গড়ে তুলেছি। বরং সৎভাবে থেকেই অধিক অর্থ আমি উপার্জ্জন করতে পেরেছি। সৌভাগ্যের বিষয়, এই সব কাযে সাহায্য করবার জন্যে সৎ ব্যক্তিরও আমার অভাব হয়নি। কিন্তু বেশী দিন এতো সুখ ভোগ করা আমার ভাগ্যে ঘটে ওঠে না। সহসা এক দিন আমি এক দুদমনীয় অপস্পৃহা আমার অন্তরের মধ্যে অনুভব করি। পৃথিবীর নীচের তলা এই সময় বারে বারে আমাকে ডাক দিতে থাকে। এই স্পৃহা অত্যন্ত উগ্র হওয়ার পূর্ব্বেই সাত-আট মাস কিংবা এক বছরের জন্যে বিদেশ যাবার অছিলায় আমি বাঙ্গলায় এসে অপরাধীর জীবন যাপন করি। তুই বিশ্বাস করিস্ বা না করিস্, এ কথা অতীব সত্য। এখনিই এর প্রমাণ তুই পাবি, কিন্তু এক সর্ত্তে, এ কথা কাউকে তুই বলতে পারবি না। কাশীর উভয় আশ্রমেরই ম্যানেজার আমার খোঁজে কোলকাতায় এসেছেন। চল্, আজই তোকে তার ওখানে নিয়ে যাবো। আমি জানি, অন্ততঃ এ আশ্রম দুইটির ভার তুই সানন্দেই বহন করতে রাজী হবি।"

"সত্যি? এ কথা সত্যি, খোকাদা?" উৎফুল্ল হয়ে বরুণা জিজ্ঞাসা করলো। কিন্তু সুধীরের? সুধীরের কি হবে?"

উত্তরে খোকা বাবু বললে, "তুই-ই বল, তার জন্যে আমি কি করতে পারি? তুই-ই বল, তুই কি চাস্।"

বরুণা উত্তর করলো, "আমি চাই, সে খেটে-খুটে খাক। শুধু তাই নয়, একটা বিয়েও ও করুক। পারবে? পারবে খোকাদা, ওর একটা সুরাহা করে দিতে?"

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে খোকা বাবু বললে, "বেশ, তাই হবে। ওকে তা'হলে আমি লক্ষ্ণৌতেই পাঠিয়ে দেবো। লক্ষ্ণৌ এবং কাশীর কোনও সম্পত্তির উপরই আমার আর দাবী-দাওয়া নেই। এ ছাড়া ও যদি ওর দেশে চলে যেতে চায়, তাও যেতে পারে।"

মাথা নেড়ে বরুণা উত্তর করলো, "না খোকাদা', অতো বেশী টাকা-কড়ির ওর দরকার নেই। ওকে তুমি কিছু টাকা দিয়ে দেশেই- পাঠিয়ে দিও। আমার নিকট গহনা-পত্র বাবদ প্রায় বিশ হাজার টাকা আছে, এই টাকাটা আমার নাম না নিয়ে গোপনে ওকে তাহলে তুমি দিয়ে এসো লক্ষ্মীটি! পাপের টাকা একমাত্র পুণ্য কার্য্যেই খরচ করা যেতে পারে, পরের কাযেও। আমার জন্য কোনও কার্য্যকে আমি পুণ্যের কার্য্য বলেই মনে করি। কিন্তু আরও একটা কথা আছে খোকাদা, তোমাকেও এবার একটা বিয়ে-থা করে সংসার পাততে হবে। আমরা এক সঙ্গেই এই দুস্তর আঁস্তাকুড় হতে বেরিয়ে আসবো।"

উত্তরে খোকা বাবু বললে, "এখোন তোকে তো আগে আমি এই আঁস্তাকুড় থেকে বার করে নিয়ে যাই। আয়, চলে আয়। আমার বোনটি এই আঁস্তাকুড়ে পড়ে থাকবে আর যত রাজ্যির কুকুর এসে তাকে চেটে যাবে, ভাই হয়ে এ আর আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যেও সহ্য করতে পারবো না।"

এর পর খোকা বাবু আর দেরী না করে নীচে নেমে গেলো, বোধ হয় একটা ট্যাক্সি ডেকে আনবার জন্যে। খোকা বাবু চলে গেলে বরুণা চুপ করে বসে ভাবতে লাগলো, খোকার এই সব কথা সত্যি কি না। কিন্তু যদি তার এই সব কথা সত্যি না হয়, তা হলে? তাকে কোথাও সে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে না তো? তাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে বরুণাকে সে শাস্তি দিবে না তো? না না, তাও কি কখনো হতে পারে? খোকা বাবু, খুনে ডাকাত কিন্তু সে প্রবঞ্চক নয়। বরুণার মনে হচ্ছিল, খোকা বুঝি এক জন শাপভ্রষ্ট দেবতাই হবে।

একটু পরেই একটা ট্যাক্সি ডেকে এনে খোকা বাবু বরুণাকে বললো, "আয়, আর দেরী করিস্‌নি। যেমন আছিস্ তেমনি ভাবেই চলে আয়। এখানে আর একটি মুহূর্ত্তও তোকে আমি থাকতে দেবো না।"

নিরুত্তর হয়ে বরুণা ট্যাক্সিতে এসে উঠে বসলো। ঘর-দোর আসবাব-পত্র পাপের পয়সায় সংগৃহীত সব কিছু মূল্যবান জিনিষই পিছনে ফেলে বরুণা বার হয়ে এলো।

খোকা বাবু ও বরুণাকে নিয়ে ট্যাক্সিখানা মোড় ঘুরে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে চলেছে, ঠিক এই সময়েই পুলিশ-বোঝাই একখানা লরী বরুণার পরিত্যক্ত বাড়ীটার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। দূর হতে খোকা ও বরুণা দেখতে পেলো, পুলিশের দল বরুণার পরিত্যক্ত বাড়ীটার দরজা দিয়ে হুড়-মুড় করে ভিতরে ঢুকছে।

আজিকার এই বৈজ্ঞানিক যুগে সারা পৃথিবীটাই ছোট হয়ে পড়ছে। এই যান্ত্রিক যুগে কালীঘাট শ্যামবাজার আজ এ-পাড়া ও-পাড়া। মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যেই খোকা বাবু বরুণাকে নিয়ে তাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেলো।

কাশীর "খোকন কলোনির" ম্যানেজার সীতারাম কানুভাই খোকা বাবুর অপেক্ষায় দুয়ারের কাছেই অপেক্ষা করছিলেন। খোকা বাবুকে দেখে সানন্দে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি বলে উঠলেন, "এই যে এসে গেছেন স্যার, আপনার হুকুম মত কাল থেকে এখানেই আমি অপেক্ষা করছি। আপনার টেলিগ্রাম পেয়েই আমি চলে এলাম। আপনার চৌরঙ্গীর ফ্ল্যাটেও গিয়েছিলাম, তালা বন্ধ দেখে এসেছি, ওখানে কিন্তু এক দিনও আপনাকে দেখতে পাইনি। আপনি কি স্যার ওখানে আজ-কাল আর থাকেন না?"

উত্তরে খোকা বাবু বললে, "হাঁ, ওখানেই থাকি বই কি, কিন্তু বেশী দিন আর থাকবো না। এখোন আমার এই মা'টিকে আমি আপনার কাছে গছিয়ে দিচ্ছি, এখোন থেকে কাশীর সব কয়টি প্রতিষ্ঠান এঁরই নির্দ্দেশ মত চলবে, অর্থাৎ কি না ইনিই হবেন ঐ সবের

মালিক, আজ থেকে আমি আর কেউ-ই নই, বুঝলেন? এ সম্বন্ধে যা কিছু নথিপত্র তা আপনি আমার উকিলের কাছ থেকেই পাবেন।"

বাবু সীতারাম কানুভাই খোকা বাবুকে ভালোরূপেই চিনতেন। তাঁর এই মনিবটি যে কিরূপ খেয়ালী লোক তা তাঁর ভালোরূপেই জানা ছিল। উত্তরে খুশী হয়েই তিনি বলে উঠলেন, "তা হলে তো বেঁচেই যাই, বাবু সাহেব। এবার তো প্রায় এক বছরই হতে চললো, আপনকার এই লক্ষ্মণের ফল ধরে বসে আছি। মনে করেছিলাম বাবু সাহেব বুঝি আর ফিরলেনই না। চিঠি লিখলেও তো প্রায় সব কয়টি চিঠিই ফিরে আসে। মাতাজী যদি কাশীতেই থাকেন তা হলে সত্য সত্যই আমি বেঁচে যাই। আসুন মা, ভিতরে আসুন। এ আমার বহিনের বাড়ী। কোনও লজ্জার কারণ নেই, মা।"

এক দিন ছিল, যখন বরুণা ছিল এক জন সরল প্রকৃতির অজ্ঞ বালিকা, কিন্তু আজ আর তার সেই দিন নেই। ঘা খেয়ে খেয়ে—ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সে আজ জীবনের বহু অভিজ্ঞতাই অর্জ্জন করেছে।

আজ যে কার্য্যের ভার বরুণার উপর খোকা তুলে দিলে, বরুণা যে তা সুচারুরূপেই সম্পন্ন করতে পারবে, এ বিশ্বাস বরুণার উপর খোকার ছিল। কাশীর প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে খোকা বাবু বললো, "তা হলে আমার মা'জী আপনার কাছেই রয়ে গেলেন। কালই আপনারা কিন্তু কাশী রওনা হয়ে যাবেন। আরও বছর খানেক আমার সঙ্গে আপনার আর দেখা না হতে পারে, বুঝলেন?"

এর পর এই স্থানে আর ক্ষণমাত্রও অপেক্ষা না করে খোকা বাবু যে ট্যাক্সিতে করে এসেছিলো, সেই ট্যাক্সিতে করেই অদৃশ্য হয়ে গেলো, পিছন দিকে একবার ফিরে দেখবারও আর প্রয়োজন মনে করলো না।

খোকা বাবুর পক্ষে এইখানে অধিক দেরী করা আর সম্ভবও ছিল না। সে তার স্নায়ুর ভিতর অধস্তন পৃথিবীর ডাক পুনরায় শুনতে পাচ্ছিল। যে কোনও মুহূর্ত্তে উহা অত্যন্ত প্রবল হয়েও উঠতে পারে। সময়ে সাবধান হওয়াই সে সমীচীন মনে করেছিল।

এ যাবৎ কাল খোকা বাবু বহু দিন অন্তর অন্তরই তার ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে। একটি ব্যক্তিত্বের অবসানের পর পরবর্ত্তী ব্যক্তিত্বতে উপনীত হয়ে সে তার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিত্বটির কথা ভুলেই যেতো। কিন্তু মাস দুই যাবৎ খোকা বাবুর অন্তর্নিহিত দ্বৈত ব্যক্তিত্বের ঘন ঘন পরিবর্ত্তন ঘটছিল। এমন কি তাঁর পূর্ব্বাপর ব্যক্তিত্বের কাহিনীগুলি পর্য্যন্তও আজকাল সে বিস্মৃত হয় না। তার অন্তর্নিহিত এই পৃথক্ ব্যক্তিত্ব দুইটি ঠেলাঠেলি করে এক জন অপর জনকে বিদায় দিয়ে খোকার মনের মধ্যে যখন তখন জেঁকে বসতে চায়। তারা যেন বিবদমান বা যুদ্ধরত ব্যক্তিদ্বয়ের মতই খোকার মনের মধ্যে বিরাজ করছে। এতো অল্প সময়ের মধ্যে এতো রক্তপাতই যে তার এই অশান্তি ও অস্বস্তির একমাত্র কারণ, খোকা বাবু তা বুঝতে পেরেছিলো। এই জন্য তার অন্তর্নিহিত সৎ বা অসৎ মাত্র একটি ব্যক্তিত্বকেই মনে মনে ধরে রাখতেই চাইছিলো, কিন্তু শত চেষ্টাতেও এ কয় দিন এতে কিছুতেই সফলকাম হচ্ছিলো না।

অতি কষ্টে নিজেকে সুসংযত রেখে খোকা বাবু তাদের দলের মিলন-স্থান ব্ল্যাকওয়াক স্কোয়ারের নিকট ট্যাক্সিটাকে বিদায় দিয়ে স্কোয়ারের ভিতর ঢুকে পড়ে একটা বেঞ্চির উপর বসে পড়লেন।

একটু দূরেই কেষ্টো, গোপী, সুধীর ও দলের কাল্লু ওরফে কালা-পাহাড় একসঙ্গে ব'সে মদ খাচ্ছিলো, খোকাকে হঠাৎ সেখানে বসে থাকতে দেখে সবাই উৎফুল্ল হয়ে ছুটে এলো। খোকার পাশে ধপাস্ করে বসে পড়ে গোপী বলে উঠলো, "কোথায় ছিলি মাইরী এ ক'দিন। আমরা মনে করলাম বুঝি বা ধরাই পড়লি। বড় নিষ্ঠুর তুই, মাইরী, একটা খররও তো দিতে হয়। এদিকে ৭ নং বাড়ীর মাটির তলার ঘরগুলোর মেঝে-টেঝের সেই বাঁধাই-টাঁধাইয়ের কায তো শেষ হয়ে এলো, চল্, ঐখানে গিয়েই নয় ক'দিন ডুব মারি। পুলিশের ফেউ তো পিছে পিছে লেগেই রইলো, যত হাঙ্গাম তুই মিছামিছি বাধাস্, সত্যি।"

তখনো পর্য্যন্ত খোকা বাবুর মনের মধ্যে সৎ ও অসৎ ব্যক্তিত্বের হুড়োহুড়ি চলছিল। কেউ কাউকেই যেন আর তাড়াতে পারছে না। খোকা বাবু ধীরে ধীরে মুখ তুলে সুধীরের দিকে তাকালো। বরুণাকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে সুধীরকে পুনরায় নিরপরাধী করে দেবে। গোপীর কথার কোনওরূপ উত্তর না করে খোকা সুধীরকে জিজ্ঞাসা করলো, "কি রে সুধীর, চাকরী-টাকরী করবি একটা, এই সব কাজ তোর ভালো লাগে? বলিস্ তো তোর জন্যে একটা চাকুরী যোগাড় করে দিই।"

খোকার এই প্রশ্নে একাধারে বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে গোপী বলে উঠলো, "চাকরী? আমরা চাকরী করবো? চাকরী করবে যতো শালা ভদ্রলোক। আমরা শেয়ানা আছি, আমরা করবো চাকরী? কি বলিস্ মাইরী তুই? একেবারে তুইও যে সুধীর হয়ে উঠলি? এ সব দুর্ব্বলতা কি তোর সাজে? ছিঃ! কি হয়েছে আজ তোর বল্ তো? নে নে, একটু মদ তো আগে খেয়ে নে।"

ঢক ঢক করে একটা বোতলের সবটুকু মদই খোকা গলাধঃকরণ করে নিলো। ধীরে ধীরে খোকা এইবার অনুভব করলো, সে তার লীলা-ভূমি অধস্তন পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপেই ফিরে এলো। তার মনে যা কিছু অন্তর্দ্বন্দ্ব বা দ্বিধা তা বিদ্যুৎ গতিতেই অন্তর্হিত হচ্ছে।

সুধীরের দিকে চেয়ে খোকা বাবু জিজ্ঞাসা করলো, "কি রে, তোর হলো কি আবার? জেল-টেল খেটে এসেও তুই সামলাতে পারলি না?"

উত্তরে সুধীর বলে উঠলো, "না খোকাদা, ও কাজে যেন আর আমার মন নিচ্ছে না। মনে করছি দেশেই চলে যাবো। পাপের পথে আর যাবো না, ভাবছি। পরস্ব অপহরণ ভালো নয়, এক দিন না এক দিন এ জন্য শাস্তি আমাদের পেতেই হবে। আপনারা আমাকে মুক্তি দিন, খোকা বাবু। সত্যই, আমার আর এই সব ভালো লাগছে না।"

বোতলের বাকি তরল পদার্থটুকু সুধীরের মুখের ভিতর নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে খোকা বাবু বললো, "দ্যুৎ, আচ্ছা লোক তো তুই? আয়, এধারে আয়। জীবনটাকে তুই আগা-গোড়াই দেখছি ভুল বুঝে গেছিস্, তাই না তুই এই সব কথা বলতে পারিস্। শোন বলি তবে, আইনজীবী এবং ব্যবসায়ীরা যে রীতিতে গরীব মূর্খ ব্যক্তিদের অর্থাদি অপহরণ করে, আমরা জনসাধারণের সর্ব্বনাশ সেই রীতিতে করি না, এই জন্যেই লোকে আমাদের অপরাধী বলে।

আসলে পৃথিবীর মানুষ মাত্রই এক এক জন অপরাধীই, বুঝলি ? তাছাড়া আর কিছুই নয়। জীবন-যুদ্ধে যারা হেরে যায়, জয়ীদের তারা অপরাধী বলে থাকে। এই দিক্ হ'তে বিচার করলে অপরাধী মাত্রেই এক এক জন যুদ্ধজয়ী বীর, বুঝলি ? জগতের তিন-চতুর্থাংশ অংশ কার্য্য প্রকারান্তরে ভীরুতাসূচক পাপ কার্য্য ছাড়া আর কিছুই নয়। আরও বলি, শোন্। পৃথিবীতে দুই প্রকারের সুবিচার আছে, যথা, স্বভাব-সুবিচার এবং কৃত্রিম-সুবিচার। ধনীর অর্থ অপহরণ করে যদি কেউ দরিদ্র পড়শীর খাদ্য-সংস্থান করে দেয়, যেমন আমরা করে থাকি, তাহলে তাকে বলা হবে স্বভাব-সুবিচার। অপর দিকে যে সুবিচার আইন দ্বারা ধনীর অর্থ এমন ভাবে রক্ষা করে, যাতে সে অর্থ দরিদ্ররা না পেতে পারে, তাকে আমি বলি কৃত্রিম-সুবিচার। আয়, তোতে আমাতে আজ হ'তে এই দরিদ্র-নারায়ণের সেবাতেই লেগে যাই। যদি পুণ্য কিছুতে হয় তো তা এতেই হবে।" আরও বলি শোন্। আমাদের চৌর্য্য ব্যবসায়ের জন্য আমরা অন্য কারুর উপরই নির্ভরশীল নই। আমাদের অভিজ্ঞতা ও শক্তি অনুযায়ীই আমরা তার ফলভোগ করি মাত্র, এই ধর না, যে সকল নারী দেহ বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করে, তাদের আমরা কি বলি ? আমরা তাদের বেশ্যা বলি, কেমন ? কিন্তু যারা অর্থের জন্য মস্তিষ্ক, বাহু ও সামর্থ্য বিক্রয় করে তাদের আমরা কি বলব ? তুই চাকুরীর কথা বলছিলি, কিন্তু এক দিক দিয়ে এই শ্রমিক, চাকুরে প্রভৃতির সঙ্গে এই বেশ্যা নারীদের কোনও প্রভেদই নেই। এক দল বিক্রয় করে মস্তিষ্ক ও বাহু, এবং অপর দল বিক্রয় করে তাদের দেহ, নয় কি ? আমরা এই বেশ্যাবৃত্তিকে পছন্দ করি না, তাই আমরা চাকুরীকে ঘৃণা করি। চুরিই একমাত্র সম্মানজনক পেশা, বুঝলি ? জেলে যাওয়ার কথা বলছিস্ ? ওটা আবার একটা কথা না কি ? কোলকাতার ১৮ হাজার চোরদের মধ্যে এক-দশমাংশকেও পুলিশে জেলে পাঠাতে পারেনি। দশ বছরের মধ্যে মাত্র এক বছর আমরা জেল খাটি এবং বাকি নয় বছর বাইরে থেকে আমরা জীবন উপভোগ করি। শ্রমিকদের মত আমরা বেকার জীবন অতিবাহিত কিংবা দ্রব্যাদি বন্ধক দিয়ে আহার সংগ্রহ করি না। আমরাই পৃথিবীতে একমাত্র চিন্তাহীন দ্বিধাহীন স্বাধীন মানুষ, বুঝলি ? তোদের পণ্ডিত করে দেবার জন্যে দেখছি শেষ বরাবর আমাকে একটা স্কুলই না খুলে ফেলতে হয়।"

খোকা বাবুর এই বক্তৃতা নেশার ঘোরে সুধীরের ভালোই লাগলো। এক প্রকার আশ্বস্ত হয়েই সুধীর বললো, "তা না হয় হলো, কিন্তু পুলিশের ফেউ যে আর ভাল লাগে না।"

উত্তরে গোপী বাবু বললো, "হাঁ, এইবার প্রণব দারোগাকেও সরানো দরকার, বেটারা উজ্জ্বলার বাড়ীতেও পাহারা বসিয়ে দিয়েছে। আজ রাত্রেই আমরা বেটাদের দেখে নোবো, মাইরী।"

উজ্জ্বলার নাম কানে যাওয়া মাত্র খোকা গম্ভীর হয়ে উঠলো, কামনার দিক্ থেকে উজ্জ্বলার মতো তাকে আর কেউ-ই সুখী করতে পারেনি ; খোকা বুঝেছিলো, ঠিক পুষ্টিকর খাদ্যের মতই উজ্জ্বলাকেও তার প্রয়োজন আছে। এখানে ভালো বা মন্দের প্রশ্ন উঠে না। তার একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে অন্তরের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তির।

খোকা বাবু দাঁতে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে এইবার একটা মতলবের ভেবে নিলে, তার পর গম্ভীর ভাবে তার আদেশ

দেশেহ- হাজার টাকা। ওকে তাহলে তু পুণ্য কাজেই খর

জানালো, "ঠিক বলেছিস্, প্রণব বাবুকে হত্যা করাই দরকার কি আজ নয়, ও-সব পরে হবে। খুন-টুন করা আজ আর আমার ভা লাগছে না, সত্যি। আজকে শুধু আমরা উজ্জ্বলাকে নিয়েই চ আসবো। কি রে কেষ্টো, পকেটে ক্লোরোফর্মের শিশিটা ঠিক আছে তো ?"

উত্তরে কেষ্টো বললে, "নিশ্চয়ই আছে, ও-সব না নিয়ে কি বা হই না কি ?

খোকা বাবু জিজ্ঞাসা করলে, "আর রুমাল, দড়ী ?" কেষ্টো উত্তরে বললো, দরকারী যা কিছু তা সবই আছে। যা চাইবে তা এই ব্যাগের মধ্যেই পাবে।"

কেষ্টোর হাতের ব্যাগটার দিকে একবার চেয়ে দেখে খোকা বললে "চল্ তবে এখুনিই উজ্জ্বলার ওখানে। দেখে আসি ওদের পাহারা কেরামতি।" উত্তরে কেষ্টো বললো, "সে-ও আমি আগেই দেখে এসেছি পাহারা দুটো দশটার পরই ঘুমিয়ে পড়ে।"

খোকা বাবু উত্তর করলো, "তা হলে তো আরও ভালো। আমি আর তুই, পিছনের গলিটা দিয়ে উজ্জ্বলার বাড়ীর পিছন দিকে এ হাজির হবো। ইতিমধ্যে গোপী বড় রাস্তা ধরে ট্যাক্সি ক এগিয়ে এসে, ঐ গলির মুখটাতে এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। বাস্, আর কি ; কিল্লা ফতে-এ। মার দিইস্ কেল্লা মাইরী।"

ব্লাকওয়াক স্কোয়ারে খোকা বাবু সদল বলে প্রায় রাত্রি দশটা পর্য্যন্তই অপেক্ষা করলো, তার পর খোস-মেজাজে সিগারেট ফুঁক ফুঁকতে চৌরাস্তার মোড়ে এসে পড়লো ; নিকটেই একটা ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ড ছিল। সেই সময় এই ট্যাক্সি-ষ্ট্যাণ্ডে দুইখানি মাত্র ট্যাক্সি দাঁড়ি আছে। কিন্তু এই দুইখানি ট্যাক্সি খোকার নামে না হলে খোকার পয়সাতেই কেনা ছিল। প্রতিদানে ট্যাক্সি-চালকরা খোকা প্রয়োজন মত বহু প্রকার সাহায্যই করে থাকে। এদের এক জন চোখের ইসারায় তার হুকুম বা নির্দ্দেশ জানিয়ে দিয়ে খোকা বা দল-বল নিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে ট্যাক্সিটায় চেপে বসে হুকুম করলে "চলো সোনাগাছি, বহুত জলদী।"

ট্যাক্সিখানা সোনাগাছির মোড়-বরাবর এসে পৌছালো মা খোকা বাবু বিশ্বাসী সাকরেদ কেষ্টোকে নিয়ে নেমে পড়ে এক সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো এবং গোপী ট্যাক্সিটাকে ঘুরিয়ে নি চললো উজ্জ্বলার বাড়ীর দিকে।

খোকা ও কেষ্টো উজ্জ্বলাদের বাড়ীর পিছনে মেথর-গলিটার উপ এসে যখন পৌছলো, রাত্রি তখন দেড় ঘটিকা হবে। দূর হ তারা লক্ষ্য করলো, গোপী ট্যাক্সিটাকে চালিয়ে এনে মেথর-গলি মুখের নিকটেই এসে অপেক্ষা করছে। যথাকর্ত্তব্য স্থির করে নি খোকা বাবু প্রিয়শিষ্য কেষ্টোকে জানালো, "তুই তা হ'লে নীচে দাঁড়িয়ে থাক। আমি খড়া বয়ে উপরে উঠে ঘুলঘুলির কাচ ভে উজ্জ্বলার ঘরের ভিতরে ঢুকবো, তার পর উজ্জ্বলাকে ক্লোরোফ দিয়ে অজ্ঞান করে, দড়ী দিয়ে বেঁধে ওকে ঐ জানালার ভেতর দি নীচে নামিয়ে দেবো, আর তুই চট করে নীচে থেকে ওকে লুফে ধ নিয়ে একেবারে ট্যাক্সিতে নিয়ে তুলবি, বুঝলি ?"

শিকারী বেড়ালের মত খোকা দেওয়ালের খড়া বয়ে উপরে বারান্দাটার উঠে গেলো, শুধু তাই নয়, ঘুলঘুলির ফাঁকে হাত ঢুকি

। জানালাটা তো সে খুললোই, এমন কি জানালা হ'তে গোটা লোহার গরাদও সে টেনে টেনে খুলে ফেললে।

ঘরের মেঝের উপর উজ্জলা তার মায়ের বুকের উপর মাথা রেখে স্ত মনেই ঘুমাচ্ছিল, সেই সঙ্গে তার মা-ও। বাইরের বারান্দাটার । কম্বল বিছিয়ে জন দুই ভোজপুরী সিপাইও নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে ই, আশে-পাশে সকলেই যে ঘুমিয়ে পড়েছে, তাতে আব কোনও হ নেই। চারি দিক নিঝুম নিঃশব্দ, নাসিকা-ধ্বনি ছাড়া আর ও শব্দই শ্রুত হয় না। খোকা বাবু হাতের রুমালটা ক্লোরোফর্মে ভবে করে ভিজিয়ে নিয়ে উজ্জলার নাকের উপর ধীরে ধীরে চেপে ধরলো। উজ্জলা বাঁর দুই মাথা নাড়লো বটে, কিন্তু মুখ স সামান্য একটা শব্দও বার করতে পারলো না! ধীরে ধীরে লা জ্ঞানহারা হয়ে নেতিয়ে পড়লো। খোকা এইবার উজ্জলাকে পট দড়ী দিয়ে বেশ করে বেঁধে নিয়ে জানালার রেলিঙের উপর । উজ্জলাকে নীচের দিকে নামিয়ে দিতে থাকলো।

কেষ্টো নীচেই দাঁড়িয়েছিল, সে তাড়াতাড়ি উজ্জলাকে লুফে নিয়ে হাতের ও কোমরের বাঁধনগুলো একে একে খুলে ফেলবার ই খোকা বাবু সড়-সড় করে দেওয়ালের খড়া ব'য়ে নীচে নেমে । দেখলো, উজ্জলার জ্ঞান ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। চোখ হঠাৎ খোকাকে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উজ্জলা তকে উঠে চেঁচিয়ে উঠলো—"ওরে বাবা রে—এ! ও মা-আ, ও া-বা!"

এইরূপ অবস্থায় উজ্জলার পক্ষে চেঁচিয়ে উঠাই স্বাভাবিক ছিল। এতে তাকে এই সময় প্রশ্রয় দেওয়াও চলে না। বিরক্ত হয়ে কা বাবু উজ্জলার মুখের উপর সজোরে একটা থাবড়া কসিয়ে ধমকে উঠলো—"চেঁচাচ্ছিস্ যে বড়, কখনো আমার সঙ্গে কস্নি না? বদমায়েস মেয়েমানুষ কোথাকার! ফের চেঁচাবি দেবো গলাটা টিপে। চুপ।"

থাবড়াটা জোরেই উজ্জলার মুখের উপর লেগেছিলো। ঠোঁট ট তার রক্ত বেরুচ্ছে। খোকা রুমাল দিয়ে তার মুখটা চেপে দিয়ে া-কোলা ক'রে তাকে ট্যাক্সির দিকে নিয়ে আসছিল, এমন সময় শুনতে পেলো এক বীভৎস চীৎকার! এতক্ষণে উজ্জলার মা-ও গ উঠে ব্যাপার বুঝে চীৎকার সুরু করে দিয়েছে, "ওগো বাবা -ও। ওগো আমার সর্বনাশ হয়ে গেলো গো-ও। উজ্জলাকে ার খুনই করে ফেললো গো-ও। ও বাবা, কে কোথায় আছো, এসো গো-ও।"

উজ্জলার মা'র এই হাঁক-ডাকে পাহারাদার সিপাইদ্বয়ও উঠে পড়েছিল। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে তারা এক দৌড়ে নীচে নেমে এলো। ইতিমধ্যে আশে-পাশের দোকানদারও জেগে উঠেছে। চীৎকার শুনে নানা দিক্ হ'তে বহু লোক-জন তো সেখানে ছুটে এলোই, এমন কি বড় রাস্তা হতে কয়েক জন টহলদারী সিপাহীও সেখানে এসে হাজির হলো। কলিকাতার শহরে এতো রাত্রেও লোকের অভাব হয় না, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই জায়গাটা লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো। খোকা ও কেষ্টো বুঝলো, পলায়ন ছাড়া এবার তাদের আর অন্য কোনও উপায়ই নেই।

উজ্জলাকে ঝপাৎ ক'রে রাস্তার উপর ফেলে দিয়ে খোকা শীকারী ব্যাঘ্রের মত ঘাড় বাঁকিয়ে গলির মুখে এসে দাঁড়ালো এবং তার পর ডান হাতে তার পিস্তলটি উঁচিয়ে ধরে সমবেত জনতাকে জানিয়ে দিলো, সে আর কেউ না, সে খোকা!

খোকা গুণ্ডার নাম শোনেনি, এমন লোক এ তল্লাটে এক জনও নেই। খোকার হাতের হাতিয়ার দেখে তারা যত ভয় পেলো, তার চেয়ে তারা ঢের বেশী ভয় পেলো, খোকার নাম শুনে। ক্ষণমাত্রও আর সেখানে অপেক্ষা না করে ভীড়ের লোকজন প্রাণের ভয়ে অতিষ্ঠ হয়ে সরে পড়ছিল, এমন সময় দূরের পথে একটা পুলিশ-বোঝাই লরী আসতে দেখা গেলো। প্রধান সড়কের উপর বেরিয়ে এসে খোকা ও কেষ্টো দেখলো, পুলিশ-বাহিনীর পুরোভাগে দাঁড়িয়ে গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে প্রণব বাবু সদলবলে এগিয়ে আসছেন। নিমেষে খোকা বাবুও তার কর্ত্তব্য স্থির করে নিলো। খোকা বাবুর হাতের পিস্তলও সমান ভাবেই গর্জ্জিয়ে উঠলো, গুড় গুড়ুম্ গুম্।

খোকার শোণিত-পান স্পৃহার সাময়িক নিবৃত্তির কারণে বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক, খোকা এদিন কাউকে নিহত না করেই পলায়ন করলো। জীবনে এই প্রথম খোকা রক্তপান না ক'রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। খোকার ট্যাক্সিতে ষ্টার্ট দেওয়া ছিল, এবং এর পিছনে লাগানো ছিল, একটা মিথ্যা নম্বর লেখা নম্বর-প্লেট। কেষ্টোকে নিয়ে খোকা বাবু ট্যাক্সিখানায় উঠে বসবামাত্র উহা উদ্দাম গতিতে প্রধান সড়কের উপর দিয়ে বিপরীত দিকে ছুটে চলে অদৃশ্য হয়ে গেলো এবং ট্যাক্সিখানা খোকাদের ৭ নং বস্তীর ডেরার সম্মুখে দাঁড়ানো মাত্র, খোকা ও কেষ্টো ত্বরিত গতিতে নেমে পড়ে সেই আজব বস্তীর নিয়ে নির্ম্মিত পাতালপুরীর অন্ধকারের মধ্যে উভয়েই অন্তর্হিত হয়ে গেলো। [ক্রমশঃ :

তৃতীয় মহাযুদ্ধের মহড়া

করুণাকর গুপ্ত

প্রায় এক বছর আগে, সুদীর্ঘ ছয় বৎসর রক্তস্নানের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে। সম্মিলিত জাতিরা জয়ী হয়েছে ইয়োরোপ ও এসিয়া মহাদেশে ফ্যাসিষ্ট একনায়কত্ব ধ্বংস করে। ইঙ্গ-মার্কিণ রাষ্ট্রনায়করা আটলান্টিক সনদে শত্রু-বিজিত ও যুদ্ধক্লান্ত নরনারীকে এক নতুন জগৎ-প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দিয়েছিলেন—'যেখানে অভাব থাকবে না, আক্রমণের ভয় থাকবে না, বাক্যের স্বাধীনতা ও ধর্ম্মের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে।' জগতের শান্তি ও প্রগতি বজায় রাখ্‌বার জন্য ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে সম্মিলিত জাতি পরিষদ স্থাপিত হয়। সম্মিলিত জাতি-প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের কয়েকটি সভা ইতিমধ্যে আহূত হয়েছে জরুরী আন্তর্জ্জাতিক সমস্যাগুলি আলোচনার জন্য। শান্তিচুক্তির খসড়া তৈরীর কাজ প্যারিসে অনেক দিন আগেই শেষ হয়েছিল। এর পর চতুঃশক্তি পররাষ্ট্র সচিব-সম্মেলনে শান্তিচুক্তি সমাধানের কাজ অবশ্য বাকী রয়ে গেছে মতানৈক্যের জন্য।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই সব সংগঠন-সভা-সমিতি আহ্বান করা সত্ত্বেও, বিশ্বরাজনীতির পর্য্যবেক্ষকরা বুঝতে পারছেন—একটা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের তোড়জোড় ও আয়োজন ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গেছে। সম্মিলিত জাতি-প্রতিষ্ঠান ও শান্তি-সম্মেলনের অধিবেশনগুলির বাক্‌বিতণ্ডায় এটা সকলেই দেখতে পাচ্ছে যে, বিশ্বজগৎ আজ দুইটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত,—এক দিকে ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ নেতৃত্ব করছে, অন্য দিকে সোভিয়েট রাশিয়া। আণবিক বোমার উৎপাদন ব্যাপারে আমেরিকার গোপনীয়তা রক্ষা ও বিরাট মার্কিণ সমর-বাজেট, মধ্য-প্রাচ্যে ইঙ্গ-মার্কিণ তৈলস্বার্থজড়িত রাজনীতি, ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে তাদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা; অন্য দিকে দর্দ্দানেলিস অঞ্চলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের পশ্চাৎ দুয়ার কৃষ্ণসাগরের ঘাঁটী রক্ষায় রাশিয়ার অংশ গ্রহণে বাধা দান, আবার দানিয়ুব অঞ্চলে উন্মুক্ত বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠার যুক্তিতে ইঙ্গ-মার্কিণ প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা, পূর্ব্ব-ইয়োরোপের নতুন গণতন্ত্রগুলিকে পদে পদে বিপর্য্যস্ত করার নীতি ও গ্রীসের গণতান্ত্রিক দলগুলির শ্বাসরোধ; চীনের গৃহযুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সক্রিয় ভাবে হস্তক্ষেপ, ও পৃথিবীর সপ্তসমুদ্রে নৌ-ঘাঁটী ও বিমান-ঘাঁটী নির্ম্মাণ, ক্ষয়িষ্ণু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে পুনর্গঠনের জন্য বিপুল মার্কিণী ঋণের ব্যবস্থা; অন্য দিকে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী বিগত মহাযুদ্ধের মূল আঘাতবহনকারী সোভিয়েট রাশিয়াকে ঋণদানের প্রস্তাব বাতিল—এই সব কূটনীতির ঘাত-প্রতিঘাত আজ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় এক জন শ্রেষ্ঠ রণনীতিবিদের কথা—"যুদ্ধ কূটনীতি পরিচালনার অন্য একটি পন্থা মাত্র।" সম্প্রতি মার্কিণ সভাপতি ট্রুম্যান কম্যুনিজমের গ্রাস থেকে 'গণতন্ত্রকে' রক্ষা করার নামে অর্দ্ধ-ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র গ্রীসে ও জার্ম্মাণীর ভূতপূর্ব্ব তাঁবেদার তুরস্কে বিপুল অর্থ ও রণসম্ভার পাঠাচ্ছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়োরোপে ডলারের লোভ দেখিয়ে ইটালীতে, ফ্রান্সে সাম্যবাদী দলকে মন্ত্রিসভা থেকে বিতাড়নের ব্যবস্থা হয়েছে, রাশিয়ার প্রতিবেশী বল্কান দেশগুলিতেও অনুপ্রবেশ করার বিফল চেষ্টা চলেছে, সর্ব্বশেষে মার্শাল-প্ল্যানে ইঙ্গ-ফরাসী তাঁবেদারদের মারফৎ মার্কিণ ডলারের সাহায্যে সমগ্র ইয়োরোপে পুনর্গঠনের নামে এক অদৃশ্য সাম্রাজ্যবাদের জাল পাতার চেষ্টা চলেছে।

যা হোক, এবার বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে কূটনৈতিক দ্বন্দ্বের মূল অনুসন্ধান করা যাক্। লেনিন তাঁর বিখ্যাত "সাম্রাজ্যবাদ" শীর্ষক বইতে দেখিয়েছিলেন, আধুনিক যুগে যুদ্ধের একটি বড় কারণ হোল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অসমান গতিতে ধনতন্ত্রের শিল্পবিকাশ। ঐতিহাসিক কারণ বশতঃ, ধনতন্ত্র বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন গতিতে বিকাশ লাভ করেছে। ইয়োরোপে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সই সর্ব্বপ্রথম ধনতান্ত্রিক শিল্পোদ্যোগে অগ্রণী হয়েছিল, এবং বাণিজ্য-প্রসারের প্রেরণায় তারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সাম্রাজ্য ও প্রভাব বিস্তার করেছিল ছলে, বলে, কৌশলে। নব আবিষ্কৃত আমেরিকা মহাদেশে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও অনুরূপ ভাবে একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল এক অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য সৃষ্টি করে। জার্ম্মাণী, ইটালী, জাপান প্রভৃতি দেশে ধনতন্ত্রের অভ্যুত্থান হয় অনেক পরে। এই দেশগুলি অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পশক্তিতে বলীয়ান্ হয়ে উঠে। কিন্তু শিল্পপ্রসারের উপযোগী বিস্তৃত বাজার এই রাষ্ট্রগুলির হাতে ছিল না,—যা ছাড়া ধনতান্ত্রিক শিল্প-ব্যবস্থা লাভজনক ভাবে চালু রাখা অসম্ভব। এই ভাবে পৃথিবী ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলির মধ্যে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল—এক দিকে সাম্রাজ্য অধিকারী শক্তিগুলি, অন্য দিকে সাম্রাজ্যহীন সাম্রাজ্য-বিস্তারকামী রাষ্ট্রগুলি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও বিংশ শতাব্দীর সকল বড় বড় বিরোধের মূলে, ধনতন্ত্রের অসম বিকাশের গতির প্রভাব রয়েছে।

আজকের দিনে অবশ্য বিশ্বরাজনীতির প্রকৃতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ১৯১৭ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের অভ্যুত্থানের পর থেকে আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিতে মূল বিরোধ আর প্রতিদ্বন্দ্বী ধনিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নয়। মূল বিরোধ হচ্ছে দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে—এর একটি হোল সোভিয়েট সাম্যবাদ, অন্যটি হোল বিশ্বধনবাদ—সাম্রাজ্যবাদ। সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভেই এই শিশু সাম্যবাদী রাষ্ট্রকে বিনাশ করার জন্য এক বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র হয়েছিল। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা আর্চেঞ্জেল থেকে ভোলাডিভোষ্টক পর্য্যন্ত বিস্তৃত রণক্ষেত্রে সম্মিলিত ধনিক রাষ্ট্রগুলির সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে এই সম্মিলিত ধনিক অভিযানের অন্যতম নেতা চার্চ্চিল এই সময়ে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন—"বলশেভিকবাদের ডিম আমাদের এখুনি ভেঙ্গে দিতে হবে, নইলে শেষে আমাদের বলশেভিকবাদের শাবকগুলিকে তাড়া করে বেড়াতে হবে সারা পৃথিবীময়।" ঘটনাচক্রে সাম্যবাদের এই পরম শত্রু গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী চার্চ্চিলকে অবশ্য ফ্যাসীবিরোধী যুদ্ধে ষ্টালিনের সাথে হাত মেলাতে হয়েছিল। কিন্তু চার্চ্চিল সোভিয়েট রাশিয়ার সাথে সখ্যতার সন্ধি স্বাক্ষরকালেও ঘোষণা করতে দ্বিধা করেননি যে, তিনি তাঁর বিগত যুগে বলশেভিকবাদ সম্বন্ধে ঘোষিত মতবাদ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি।

বৃটেন ও আমেরিকা—এই দু'টি শ্রেষ্ঠ ধনিকশক্তি বিগত বিশ্বযুদ্ধে জার্ম্মাণী ও জাপানের ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল,—শুধু এদের সর্ব্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবিজয়ের পরিকল্পনা ব্যাহত করার জন্য। ইতিপূর্ব্বে বৃটেন ও আমেরিকা ফ্যাসিষ্ট শক্তিগুলিকে বহু দিন ধরে তোষণ করে এসেছিল এই আশায় যে, এরা বলদৃপ্ত

হয়ে এক দিন সোভিয়েট রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবে। কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রের দুর্দ্ধর্ষ সামরিক শক্তি বিচার করে ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রগুলি প্রথমে তোষণকারী ধনিক দেশগুলিকেই আক্রমণ করে। তারই ফলে আত্মরক্ষার জন্ম ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়েছিল। এই ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, ইঙ্গ-মার্কিণ ধনিক রাষ্ট্রগুলির সাথে সাম্যবাদী সোভিয়েট রাশিয়ার অস্বাভাবিক মিত্রতা গড়ে উঠে।

কিন্তু আজ এ কথা নিঃসন্দেহে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হচ্ছে বড় বড় ধনিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পরস্পর সংগ্রামের শেষ অধ্যায়। বিগত যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ ধনিক রাষ্ট্রগুলি আজ মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েছে, একমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী যুগে ইঙ্গ-মার্কিণ অর্থনৈতিক বিরোধ বিশ্বরাজনীতির এক বিশিষ্ট অংশ ছিল, সে বিরোধ আজ প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে। বৃটেন আজ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ঋণের ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়িয়েছে, বৃটেনের ভুয়ো সমাজতন্ত্রী পররাষ্ট্র মন্ত্রী তাই আজ মার্কিণ ধনিকতন্ত্রের সাথে তাল মিলিয়ে চলছেন। এক কথায় বিশ্বধনবাদের শিবিরে আর আজ এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ বা বিরোধ নেই, যা এত দিন ধরে বর্ত্তমান যুগের মূল সামাজিক বিরোধকে পর্দ্দার আড়ালে রেখেছিল। এই মূল দ্বন্দ্ব হোল যা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি,—বিশ্বধনবাদ ও সোভিয়েট সাম্যবাদের মধ্যে সংগ্রাম।

এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে চূড়ান্ত সংগ্রামের মহড়া এখন থেকেই সুরু হয়ে গেছে। আমেরিকার ধনতান্ত্রিক প্রচারের মুখপত্রগুলি হার্ষ্ট প্রেসের নেতৃত্বে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে তথাকথিত 'লাল সাম্রাজ্যবাদ' বিস্তারের মিথ্যা কুৎসা রটাচ্ছে; অন্য দিকে মার্কিণ সেনাবাহিনী ৫৮টি দেশে ঘাঁটী গেড়ে বসে আছে, আর অর্দ্ধ জগৎ জুড়ে বিমান-ঘাঁটী বসাচ্ছে—যেখান থেকে বাকী গোলার্দ্ধে তারা বোমা-বর্ষণ করতে পারে। সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতির দৃঢ় ভিত্তি হোল 'শান্তি ও নিরাপত্তা',—এ সম্বন্ধে আমাদের ওকালতি করার প্রয়োজন নেই। এ বিষয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাগরিক হেনরী ওয়ালেস, অধ্যাপক ল্যাস্কী ও মঁসিয়ে ষ্টালিনের সুস্পষ্ট উক্তি উল্লেখ করা যেত, কিন্তু তার দরকার নেই। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল নীতি সম্বন্ধে যাদের সামান্য জ্ঞান রয়েছে তারাই জানেন, সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উদ্দেশ্য হোল পুঁজিপতির ব্যক্তিগত লাভের অঙ্ক বাড়ানো নয়, সকলের জন্ম প্রাচুর্য্য সৃষ্টি করা এবং মানুষের উপর মানুষের অর্থ নৈতিক শোষণের অবসান ঘটানো। সমাজতন্ত্রের অর্থনীতিতে বাণিজ্য প্রসারের জন্ম সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজন নেই, সাম্রাজ্যবাদী নীতির স্থানও নেই; অন্য দিকে সাম্রাজ্যবাদী প্রসার ধনতন্ত্রের এক অবশ্যম্ভাবী বিকাশ। 'লাল সাম্রাজ্যবাদ' কথাটা অশ্বডিম্বের মতই এক অলীক বস্তু।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী যুগে সোভিয়েট রাশিয়া ছিল জগতের মধ্যে এক সমাজতান্ত্রিক দেশ। ধনিক রাষ্ট্রগুলি তাকে সপ্তরথীর মত ঘিরে রেখেছিল, তাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চেষ্টা করেছিল এবং যে কোন সুবিধাজনক মুহূর্ত্তে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্ম প্রস্তুত হয়েছিল। সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে বহু দিনব্যাপী বিষোদ্গার এক দিন কার্য্যে পরিণত হোল—১৯৪১ সালের জুন মাসে নাৎসী জার্মাণীর আসুরিক আক্রমণে। রাশিয়ার নরনারী এই যুদ্ধে নিঃশেষে আত্মাহুতি দিয়েছে। বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি মিত্রপক্ষীয় অন্যান্য জাতির মোট ক্ষতির চেয়েও অনেক গুণ বেশী ধন-প্রাণ-সম্পদ এই যুদ্ধে রাশিয়া একা হারিয়েছে। রাশিয়া জগতে আজ শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়, যাতে সে তার যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠিত করে তুলতে পারে। সাথে সাথে সে চায় নিরাপত্তা! এজন্ম রুশ-সীমান্তের রাষ্ট্রগুলিকে সে বন্ধুভাবাপন্ন দেখতে চায়, যাতে তার প্রতিবেশী কোন ছোট রাষ্ট্র ফিনল্যাণ্ডের মত, অপর কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সোভিয়েট-আক্রমণের ঘাঁটী-রূপে ব্যবহৃত না হয়। সাথে সাথে সোভিয়েট রাশিয়া সম্মিলিত জাতি পরিষদে সাম্রাজ্যবাদের পদানত জাতিগুলির মুক্তি-সংগ্রামের একমাত্র সমর্থক। দক্ষিণ-আফ্রিকায় শ্বেত-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ভারতের আন্দোলন, ডাচ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা জোর-গলায় সমর্থন করেছেন সোভিয়েট সচিব মলোটভ!

সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে তথাকথিত 'লাল সাম্রাজ্যবাদে'র কুৎসা আজ ছড়াচ্ছে কারা? তারা হোল মার্কিণ ধনকুবের ও তাদের বৃটিশ লেজুড়দের প্রচারক-বাহিনী, যারা ইতিমধ্যে দুনিয়ার দুই-তৃতীয়াংশে সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম করেছে। এই সোভিয়েট-বিরোধী কুৎসা প্রচারের অন্তরালে তারা নিজেদের বিশ্ব-বিজয়ের পরিকল্পনাই লুকিয়ে রাখতে চায়। ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের এই বিশ্বগ্রাসী যুক্ত অভিযানে,—হেনরী ওয়ালেসের মতে, হয়ত বৃটিশ কূটনীতি—রাশিয়া ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শক্তি-ভারসাম্য বজায় রেখে উভয়কেই পরস্পর-বিরোধী এক বিরাট সংগ্রামে ধ্বংস করতে চেষ্টা করছে। অথবা আপাতদৃষ্টিতে বৃটেন তার অর্থনৈতিক প্রভু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ছোট অংশীদাররূপে কাজ করছে। সে যাই হোক না কেন, বিশ্বধনতন্ত্রের এই সোভিয়েট-বিরোধী শক্তি-সম্মেলনে ইঙ্গ-মার্কিণ শাসনশ্রেণী চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্ম সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে একত্রিত করার চেষ্টায় রয়েছে। এই জন্ম আমেরিকা আজ জাপানে সেনাবাহিনী ও বড় বড় একচেটিয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি ভেঙ্গে দেওয়ার কাজে ঢিলে দিয়েছে—জাপানী যোদ্ধাগোষ্ঠী ও ধনিকগোষ্ঠীকে হাত করার আশায়। এক জন মার্কিণ সেনাপতি স্পষ্টই বলেছেন—"তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানীরা মার্কিণ পোষাক পরে যুদ্ধে নামলে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।" এই জন্মই আমেরিকা অজস্র অস্ত্র ও টাকাকড়ি দিয়ে চীনের প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিংটাং একনায়কত্বকে সাহায্য করে আসছে। এই উদ্দেশ্যেই সাম্রাজ্যবাদী মার্কিণ ধনপতিদের ভারতের 'স্বাধীনতা'র প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার একটি কারণ। বৃটিশ মন্ত্রী মিশন এসে ভারতে যে তথাকথিত জাতীয় সরকার বসিয়েছিল, তার একটি অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় ধনিক শ্রেণীকে বশে এনে, ভারতবর্ষকে বিশ্বধনসাম্রাজ্যবাদের এই দুরভিসন্ধিমূলক সোভিয়েট-বিরোধী সম্মেলনে টেনে আনা,—এ কথা জোর দিয়ে বলার দরকার নেই।* ইতিমধ্যে ভারতীয় পুঁজিপতিদের মুখপত্র কয়েকটি সংবাদপত্র ইঙ্গ-মার্কিণ

---

* বর্ত্তমান মাউণ্টব্যাটেন-পরিকল্পনায় ভারত বিভাগের ব্যবস্থা করায় পরস্পর বিরোধে দুর্ব্বল হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান বৃটিশ ও বিশেষ ভাবে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক শীকারে পরিণত হবে। অন্য দিকে পশ্চিম পাকিস্থানে রুশ-বিরোধী যুদ্ধের ঘাঁটী তৈরী হবে।

প্রভুদের কণ্ঠে সুর মিলিয়ে সোভিয়েট-বিরোধী প্রচারে যোগ দিয়েছে। ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে ভারতীয় পুঁজি-পতিদের যোগাযোগ আজ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে—ইঙ্গ-ভারতীয় ও মার্কিণ-ভারতীয় শিল্প-স্বার্থ-সমবায়ে (যথা বিড়লা—নাফিল্ড, টাটা—ইম্পিরিয়াল কেমিকেল, বালচাঁদ হীরাচাঁদ—ক্রাইসলার কর্পোরেশন ইত্যাদি)। এরা স্বভাবতঃই শ্রেণীস্বার্থে প্রণোদিত হয়ে। ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের সোভিয়েট বিরোধী চক্রান্তে যোগ দেবে। দুঃখের কথা এই যে, এই প্রতিক্রিয়াশীল প্রচারকরা কংগ্রেসের কয়েক জন শ্রেষ্ঠ নেতাকেও তাদের মিথ্যা প্রচারে প্ররোচিত করেছে।

বিশ্বশান্তি সম্মেলনে জওহরলালের ব্যক্তিগত দূত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমেনন বিশ্বরাজনীতির এক জন তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষক। কিছু দিন আগে ভারতবর্ষে থাকা কালীন এক বক্তৃতায় আমাদের সোভিয়েট-বিরোধী কুৎসা প্রচারকদের সম্বন্ধে সাবধান করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, একক সোভিয়েট রাশিয়াই শ্বেত-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শোষিত জাতিগুলির সংগ্রামে আশার আলোক-বর্ত্তিকা বহন করছে। সম্মিলিত জাতি-পরিষদের নিউ ইয়র্ক সম্মেলনে ভারতের নেত্রী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সে দিন আবেগ-ময়ী ভাষায় সোভিয়েট মুখপাত্র মলোটভকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন—ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করার জন্য। সুখের বিষয়, সম্প্রতি শ্রীযুক্তা পণ্ডিতই রাশিয়ার ভারতীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছেন।

যাই হোক, বিশ্বরাজনীতি আলোচনা করে আমরা স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছি, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকারী ও তাদের দেশীয় চরেরা কি ভাবে এখন থেকেই আরেকটা সম্মিলিত সোভিয়েট-বিরোধী সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চেষ্টা করছে। এই সমস্ত অপপ্রচেষ্টা আবার অনেক সময় চলেছে তথাকথিত প্রগতিশীলতার নাম দিয়ে। যাই হোক, বিগত যুদ্ধের বেদনাময় স্মৃতি ভারতবর্ষকে কায়মনোবাক্যে শান্তিকামী ও যুদ্ধবিরোধী করে তুলেছে। কিন্তু, তা হালেও শান্তি বজায় রাখতে হোলে ভারতবাসীকে সব সময় সজাগ ও সচকিত থাকতে হবে। নইলে দেশীয় ও বিদেশী বিত্তস্ত স্বার্থের প্রতিনিধিরা আমাদের টেনে নিয়ে যাবে, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পতাকা বহন করে এক সোভিয়েট-বিরোধী ধ্বংসযজ্ঞে নিজেদের আত্মাহুতি দিতে। যাঁরা সত্যি বিশ্বে শান্তি ও প্রগতি আনতে চান, তাঁদের আজ এই ক্ষয়িষ্ণু ধনিক সভ্যতার পতন কামনা করতে হবে—যে সমাজের মূল শক্তি হোল ব্যক্তিগত লাভের অঙ্ক বাড়াবার প্রচেষ্টা। এই সমাজ হচ্ছে হিংস্র বন্যপশুর সমাজ, যেখানে প্রবলের দুর্ব্বলকে শোষণ করাই হোল আইন, এখানে শান্তির সময়ে লক্ষ কোটি লোক ভোগ-প্রাচুর্য্যের মধ্যে তিলে তিলে অনাহারে প্রাণ দেয়, অথবা যুদ্ধের আগুনে পুড়ে মরে। এমন সমাজ আমাদের গড়তে হবে, যেখানে কর্ম্মশক্তির মূল প্রেরণা যোগায় লাভের লোভ নয়, সৃষ্টির কামনা অথবা সমাজ-সেবার আদর্শ,—যা সোভিয়েট রাশিয়ায় গড়ে উঠছে।

একটি মেয়ে

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বনের ভিতর গিয়ে দেখি, একটি রাঙা মেয়ে
শ্যামলতায় ব'সে আছে আকাশ পানে চেয়ে।
যেমনি আমি ডাকৃনু তাকে, জল এল তার অমনি আঁখে,
সুধাই তারে, "ভয় কি মোরে ? নই কো পাড়াগেঁয়ে !"
বললে মেয়ে—"ঐ গগনে ডুবেছিলুম নীল স্বপনে,
স্বপ্ন আমার ভেঙে গেল তোমার সাড়া পেয়ে !"

ঝর্ণাতলায় গিয়ে দেখি, সেথায় আপন মনে
সেই মেয়েটি ব'সে ব'সে কী যেন কি শোনে।
সুধাই তারে—"আয় বালিকা, পরবি যদি জুঁই-মালিকা !"
বললে মেয়ে অশ্রু এনে আতুর নয়ন-কোণে—
"শুনে তোমার নীরস কথন, হ'ল গানের ছন্দ-পতন,
রূপকাহিনী শুনতেছিলাম নির্ঝর-আলাপনে।"

গহীন রাতে গিয়ে দেখি, সে এক তেপান্তরে
যৌবনী মোর একলা ব'সে কিসের যে ধ্যান করে !
চম্‌কে গিয়ে আমার সাড়ায় মধুর বধু উঠে দাঁড়ায়।
বললে ফিরে আমার পানে শ্রান্ত, ব্যাকুল স্বরে—
"নীরবতার সঙ্গে সুখে গল্প করি মৌন মুখে,
কণ্ঠ তোমার জাগবে সেথাও ? কেন, কিসের তরে ?"

ধরতে তারে গিয়ে দেখি, বাহুর মাঝে নাই !
সবুজ তৃণের উপর শুধু একটি রাশি ছাই !
আতঙ্কে মোর ত্রস্ত আঁখি, আকাশ-বাতাস জাগিয়ে ডাকি—
"কোথায় গেলে বন্ধু, আবার তোমায় খুঁজে পাই ?"
রাত্রি বলে—"মিথ্যে ডাকো, মানসীকেও চিন্‌লে না কো ?"

জীবন-জল-তরঙ্গ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

২৩

কিছুই নয়—অথচ মনে হ'চ্ছে, জীবনের পাত্র কানায় কানায় ভরে উঠেছে। এমন আনন্দ বহু দিন উপভোগ করেনি সে।

বাড়ী এসে দেখলে, দাওয়ায় রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বেলে বাসু আর মাধব জলচৌকির ওপর ডাকের সাজ তৈরী করছে। কাঁচি দিয়ে নিপুণ করে কেটেছে বন্ধার জন্য সবুজ ও লাল কাপড়। তার ওপর মোম বিরজার আটা লাগিয়ে বসাচ্ছে খুব পাতলা শোলা। শোলার ধারে ও মাঝখানে শোন্না দিয়ে আঁটছে জরি আর চুমকি। এগুলি হচ্ছে ঠাকুরের চালের সাজ। তার পর তৈরী হবে ঠাকুরের কাপড়, হাতের ও কানের নানা রকম গহনা—গলার হার, চরণের পদ্ম, মাথার মুকুট। আজকাল ভাল জরি পাওয়া যায় না—চুমকির অভাবও যথেষ্ট। মজুরি—তাও বেশি। যেখানে কুড়িখানা ঠাকুরের আঠারোখানা হ'তো ডাকের সাজ দিয়ে সাজানো—সেখানে মাত্র দু'-একখানি এই ব্যয়বাহুল্য আভরণে দেবীকে সাজাতে পারে। পূজো হ'তে আট-দশ মাস দেরি হ'লেও এতগুলি সাজ দু'জনে মিলে তৈরী করতে আট-দশ মাসই লাগবে।

পুরন্দর মাদুরের ওপর বসে বললে, আমিও সাজ তৈরী করবো, মাধব কাকা।

মাধব তার দিকে চেয়ে হাসলে, তুমি?

কেন—পারি না?

মাধব বললে, শিখলে আর কই। তাহলে তো এত দিনে মস্ত কারিগর হ'য়ে উঠতে। দেশেই না হয় আকালের জন্য সব বারোয়ারি ডাকের সাজ তুলে দিয়েছে—গোয়াড়ি কেষ্টনগরের বায়নাও তো আসছে মাঝে মাঝে।

এ কি দেশের সাজ নয়?

দেশেরই। এবার বাজারের বারোয়ারি বায়না দিলে ডাকের সাজের। বাজারে অনেকগুলি দোকান আছে। সারা বছরে তোলা তুলে না কি মোটা টাকা জমিয়েছে, তাই।

আচ্ছা মাধব কাকা, ঠাকুরের সাজে বিলিতী জিনিষ ব্যবহার না করে যদি দিশী জিনিষ দেয়া যায়?

মাধব বললে, হাঁ, তাতে সাজ এমন সাদা ঝক্‌ঝক্ করে না, ম্যাড়মেড়ে হয়।

হোক, দিশী সাজ দাও।

মাধব বললে, সবাই তো দিশী সাজ পছন্দ করে না। ওরা বায়না দিয়েছে ভাল সাজের।

পুরন্দর বললে, ভাল সাজই হবে। আমি বুঝিয়ে বলবো। আর দেখ, মাথার মুকুট আর কাপড়ের আঁচলা তৈরী করবো আমি। মুকুটে লেখা থাকবে—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। আর আঁচলায় লিখবো—'বন্দে মাতরম্'।

বাসু উৎসাহিত হয়ে বললে, আমি আঁচলা তৈরী করবো দাদা।

আর একখানা ছোট জলচৌকি এনে পাতলে পুরন্দর। বাক্স থেকে বার করলো কাঁচি। কতকগুলো কাঠি, সোলার টুকরো, লাল সবুজ সালু, আর জরির বাণ্ডিলটা বাসু এগিয়ে দিলে তার দিকে।

মাধব বললে, মুকুটের নক্সাখানা কাঠের সিন্দুকে আছে, নিয়ে এসো। যে ঠাকুরের যে রকম মুকুট বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে চলে আসচে, তাই দিতে হবে তো।

পুরন্দর উঠে এলো সিন্দুকের কাছে।

পুরোনো কাঁটাল কাঠের সিন্দুক। চারটে পায়ায় ও ডালার ধার-গুলিতে নক্সা কাটা। সিন্দুকের গায়ে সাদা চন্দনের ও সিঁদুরের ফোঁটা আছে অনেকগুলি। লক্ষ্মীপূজা এবং আরও কোন পূজা উপলক্ষে এটির অর্চনা নিয়ম মতই হয়। এই সিন্দুকেই বহু দিন থেকে সজ্জিত রয়েছে বৃত্তি-চালনার সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতিগুলি। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে পড়ে ওর কাকা বিদেশে কাটালেন চিরকাল। বাবা বজায় রেখেছিলেন জাতিগত উপজীবিকা। ওর বদলে মাধব কাকা আর বাসু কোন রকমে তা বজায় করে চলেছে। তার বাবার বেলায় যা ছিল মুখ্য—এখন কাল-প্রভাবে তা হ'য়েছে গৌণ। মালি-বাড়ির টোপরের চেয়ে সহর থেকে আজকাল যে সব টোপর আসে তা না কি গঠন-পারিপাট্যে ও শিল্প-সৌন্দর্য্যে অপরূপ। মালি-বাড়ির বাজি-রোশনাই—তারও কদর কমেছে। সুতরাং গ্রামের লোক শহরে তৈরী জিনিষের দিকে ঝুঁকেছে। বাসু বা মাধব এ সব তৈরী করে না। তবে জগদ্ধাত্রী বা দুর্গাপূজায় ডাকের সাজের প্রচলনটা এ দেশে বেশি, এবং বছরের একটি দিনের জন্য পুরুষানুক্রমের ধারাটা দেবীর সাজ-সজ্জায় এখনও অচল হয়নি বলে উপার্জ্জনের এ পথটি এখনও খোলা রয়েছে। তবে এটি বৃত্তির পূর্ণতম অংশ নয়। আর পাঁচটা কাজের পরিপূরক হিসাবে অর্থাৎ ব'সে না থাকি বেগার খাটি গোছের একটা কাজ। কখনও দুপুরের অবসরে কখনও সন্ধ্যার পরে জলচৌকি পেতে সারা বছরে চলে এই কাজ। উপার্জ্জনের অর্থে হয়তো বাড়ি মেরামত, হয়তো গহনা তৈয়ারী, হয়তো বা ঋণ-শোধ—এই সবই চলে। এখন একমাত্র মালিদের বৃত্তি হিসাবে এটি একচেটিয়া নয়। আচার্য্য ও স্যাকরা ব্রাহ্মণরা, ময়রারা-তাঁতিরা যার যখন অবসর আসে এবং যার একটু অনুরাগ আছে এ কাজে—সেই পিদিম জ্বেলে জলচৌকি পেতে বসে।

সিন্দুকের ডালাটা তুলতেই একটা গন্ধ বেরুলো। সিন্দুকের ডালার ভিতর-পিঠে কালো কালো ডিম পেড়েছে আরশুলাতে, মাকড়সারা জাল বুনেছে কোণে কোণে। আর সাদা নরম কাপুড়ে পোকাগুলোও কাগজে ও ন্যাকড়ায় বহু ছিদ্র করে পরম নিশ্চিন্তে সেখানে বসবাস করছে। কত কাল পরে খুলেছে সিন্দুক। পুরন্দর ভাবলে, কাঠের সিন্দুকও তো চিরস্থায়ী নয়। যে কাল চলে গেল—তারই পৃষ্ঠে অল্পলেখার মত এই পরাজয়-চিহ্ন। এ চিহ্নও একদা মুছে যাবে। ষ্টীলের যুগে কাঠের প্রতিযোগিতা! প্লেনের সঙ্গে গো-যানের টিঁকে থাকার মতো।

পিসিমা বাড়ির ভেতর থেকে ডাকলেন, বাসু—ওরে বেসো, সারা দিন ঘুড়ি নিয়ে হৈ-হৈ করে এখন সাজ তৈরী করতে বসলি তো? বলে—

সারা দিন গেল আলে খোলে
এখন জোনাকির পেছনে বাতি জ্বলে।

মেঘোটাও হয়েছে তেমনি।

মাধব বললে, ওই নাও, দিদির বকুনি আরম্ভ হলো। না খেয়ে এলে এর নিবিত্তি হবে না।

পুরন্দর বললে, যাও, খেয়েই এসো না তোমরা।

মাধব বললে, আর তুমি? তোমার বুঝি ক্ষিদে-তেষ্টা নেই—পাকা হর্তুকি খেয়েছ?

বাসু বললে, সত্যি মাধব কাকা, পাকা হর্তুকি পাওয়া যায় না? পেলে বেশ হ'তো।

পুরন্দর বললে, তাহলে একটি হর্তুকি খেয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিতিস্ সারা বছর, না?

বাসু বললে, দিতামই তো।

পুরন্দর বললে, সেই ভয়েই সৃষ্টিকর্তা হর্তুকি পাকতে দেয় না গাছে।

ভয়টা কিসের? মাধব বললে।

ভয় নয়! তিনি সৃষ্টি করলেন পৃথিবী, চলবে বলে; সৃষ্টি করলেন মানুষ, কাজ করবে বলে। কিন্তু এমন একটি জিনিস এই ভয়েই তো সৃষ্টি করেননি যাতে করে মানুষ কাজ না করে সৃষ্টিকে অচল করে দেয়। বলে পুরন্দর হাসতে লাগলো।

মাধব সাজ গুছোতে গুছোতে বললে, তা হোক, তেমন জিনিস তৈরী হলে অনেক ল্যাঠা কমে যেত। মানুষ হেসে-খেলে বাঁচতো।

না না, মাধব কাকা, মানুষ তাহ'লে দিন-রাত নাক ডাকিয়ে ঘুমুতো। খাওয়ার পর ঘুম, এই তো নিয়ম।

খাওয়ার পরই ঘুম সব দিন তো আসে না। অনাদি অনন্ত কালের আকাশে···একটি পরম প্রশ্ন তারার অগ্নি-অক্ষরে ফুটে ওঠে। রাত্রি গভীর হ'লে সাঁ-সাঁ একটা শব্দ-তরঙ্গ পৃথিবী থেকে ব্যোমে—ব্যোম থেকে পৃথিবীতে আনাগোনা করে—যেমন তাঁতের মধ্যে মাকুর স্বচ্ছন্দ গতিতে সর সর কোমল শব্দতরঙ্গ ওঠে। বহু কালের পৃথিবীতে বহু কালের পুরাতন সব নক্ষত্র। ওরা আর্য্য যুগ থেকে ব্রিটিশ যুগের ভারতবর্ষকে প্রতি রাত্রিতে অসংখ্য বার দেখেছে। গহন অরণ্যে যে সাম গান এক দিন বায়ু-তরঙ্গকে আশ্রয় করে ঊর্দ্ধমুখে উঠেছিল, সেই নাদ-স্পর্শ-রোমাঞ্চে আজও কি স্মৃতি-বিহ্বল কোন কোন নক্ষত্র কেঁপে কেঁপে উঠে না গভীর নিশীথে? পঞ্চনদের তীরে—তরাইনে, পাণিপথে, চিলিনওয়ালায়, পলাশীতে বার বার আঘাত খেয়ে ভারতবর্ষ কন্দুকের মত এক হাত থেকে আর এক হাতে চলে গেছে—সেই মর্ম্মবিদারী খেলার সাক্ষী হয়েই কি ওদের হৃদয়ের আগুন চোখের জলে অমন জ্বল্-জ্বল্ করে?···অভাগা দেশের অভাগা তারা! ওরা নীরব সাক্ষী রইলো যুগ-যুগান্তরে বহু সুখ-স্মৃতির এবং দুঃখ-স্মৃতিরও। ওরা অনন্ত শূন্যে প্রশ্নের জাল বুনে শূন্যকে করলে রহস্যময়। সে রহস্য উদ্‌ঘাটনে মানুষ উৎসর্গ করলে তার পরম সম্পদ আয়ু। কিন্তু আয়ুর চেয়েও পরম সম্পদ—যা তরাইনে, পাণিপথে, চিলিন্ওয়ালায়, পলাশীতে বার বার হস্তচ্যুত হ'য়ে দূরে দূরেই মরীচিকা মত সরে গেছে, আজ তা কি কোন মূল্যে ফিরে পাওয়া যাবে না?···ওরা মূক না হ'লে পুরন্দর বিনিদ্র রাত্রিতে দুশ্চর তপস্যার দ্বারা এই উত্তর ওদের কাছ থেকে আদায় করে নিতো। শুধু একটি কথা—কত দিনে আসবে সেই পরম ক্ষণ। কোন্ সে সালের কোন্ সে তারিখ তা-ও নয়—শুধু বৎসরের পরিমাণটা জেনে নিয়ে সে নিশ্চিন্ত হতে চায়। তার জীবনে যদি সম্ভব না হয়? তার পুত্রের জীবনেও যদি না হয়? না-ই হোক—ধ্রুব একটি উত্তরে সে উৎসর্গ করে দেবে তার জন্ম-জন্মান্তর—তার পুত্রকে—পৌত্রকে—বংশের উত্তর-পুরুষের যে কোন সন্তানকে।

সব জাত যেখানে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে এই পরম প্রশ্নটির দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে, তারাই কেন বা জাগ্রত থাকবে—জীবন দেবে—দুশ্চিন্তা ভোগ করবে এই পরম প্রশ্নটিকে সামনে রেখে? খাবার অধিকার আর ঘুমোবার অধিকার সব দেশের মানুষের চেয়ে এ দেশের মানুষের একটুও তো কম নয়? অথচ কোন্ ন্যায়-ধর্ম্মের বিধানে—

ন্যায়—আর ধর্ম্ম। এ কথা মনে উঠলেও পুরন্দর হাসতে থাকে। দেবতা ও দানবদের কথা মনে জাগে। সমুদ্র-মন্থনে উঠলো সুধা- দেবতারা তার অধিকারী হ'লেন। হাঁ, ন্যায় ও ধর্ম্মের নজীর তাঁদেরও ছিল। কিন্তু কার বিধানে দেবতারা হ'লেন দেবতা—আর দানবরা হ'লেন দানব?···সিংহের হাতে তুলিকা ছিল না বলেই কি পশুরাজ মানুষের পায়ের তলায় চিত্রিত হ'লেন? হাঁ, ন্যায় আর ধর্ম্ম······বহু যুগ থেকে এমনি করেই আপ্ত বাক্যের বিধানে পরিণত হ'য়েছে। যাঁরা নিজেদের বিজয়-কাহিনী সত্য-মিথ্যার ভাষণে ভরে ছাপার হরফে জগতে প্রচার করেছেন পরম কৌশলে—তাঁদেরই পক্ষে ন্যায় আর নীতি, ধর্ম্ম আর পুণ্য, গৌরব আর স্তুতি—আর এই সব মিলিয়ে অগ্রগামী সভ্যতা পৃথিবীকে উন্নীত করেছে তুষার-পাথরের যুগ থেকে—লৌহ-পরমাণুর যুগে।

আর একটা গল্প মনে পড়লো।···উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের বর্ণ সাদা কি কালো, এ নিয়ে তর্ক হয়েছিল এক দিন কশ্যপ মুনির দুই পত্নীর মধ্যে। কদ্রু আর বিনতা।···বিনতা বললেন, অশ্বের রং সাদা, কদ্রু বললেন, কালো। পণ রইলো যে হারবে সারা জীবন সে দাসত্ব স্বীকার করবে অপরের কাছে।···কদ্রুর পুত্রদের কৌশলে সাদা ঘোড়া কালো প্রমাণিত হ'লো। বিনতা হ'লেন দাসী। তেমনি সাদাকে কালো বলে আমরা কি ছেলেবেলা থেকে জেনে আসছি না? পুরন্দর মাথা নেড়ে অনন্ত শূন্যের কাছেই যেন প্রশ্ন করলে।

এ কথাই তো সত্য, ইতিহাস রচনার সৌভাগ্য সকলের থাকে না,—মানে অধিকার থাকে না।···পরম শক্তিমান্ গরুড় আবির্ভূত না হ'লে, কালোকে সাদা করবেন কে?

কোথায় সে শক্তিমান্ গরুড়? বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পুরন্দর নক্ষত্র-কণ্টকিত আকাশের পানে।

গভীর রাত্রিতে সাঁ-সাঁ ক'রে শব্দ হয়। এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত ঈথর-তরঙ্গে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে ব্যোম। দূর দিগন্তে না লঘু আলোর আভাস, না অস্ফুট পাখীর কাকলি—রাত্রি-শেষের সূচনা করে।

২৪

তবু রাত্রি প্রভাত হয়। গভীর রাত্রি তারার মিছিলে অর্ঘ্য সাজিয়ে আনে যে প্রশ্নের—প্রভাতের আলোয় প্রতিদিনের কর্ম্ম-শরে তা ক্ষতবিক্ষত হয়। প্রশ্নের মধ্যেই জীবন-সংগ্রাম সুরু হয়। অতীত জানা বা ভবিষ্যৎ-সন্ধানী নক্ষত্রের কাছে কোন বিদ্রূপ স্পষ্ট

নির্দেশ জেনে আশ্বস্ত হতে—ভাল লাগে না। স্বপ্ন রাত্রিরই সঙ্গী—দিনের আলো ও সইতে পারবে কেন? একটানা কর্ম্মের স্রোত তাতেই ঝাঁপ খেয়ে পড়তে হয়।

উত্তর-পাড়ায় আসবার পথে শ্রীধরের বৈঠকখানা পড়ে। এত সকালেও মনে হ'লো, সেখানে বৈঠক বসেছে। হাসির ও কথার শব্দে পথ পর্য্যন্ত সচকিত। ব্যাপার কি? কাল সন্ধ্যার মজলিসে আত দাঙ্গার সম্ভাবনা তিরোহিত হ'য়েছে বলেই বুঝি এই আনন্দ? কিন্তু শ্রীধর তো সে সভায় আসেনি। এক কালের অভিজাত এবং অধুনা-দরিদ্র মিত্রদের ও মনে মনে অপছন্দ করে। দুনিয়া দৌলতের বশ—এই কথাই শুনে এসেছে ও ছেলেবেলা থেকে। তাই দৌলত সংগ্রহ করে নিজেকে মহামানী জ্ঞান করে আজকাল। ও কেন যাবে দম্ভ-সর্ব্বস্ব মেজ বাবুর বৈঠকখানায়? অথচ সে সভার ফলাফল—

কৌতূহলী দৃষ্টি জানালা-পথে যার মুখের ওপর গিয়ে পড়লো সে ইব্রাহিম। এত সকালে অপরিমিত পান খেয়ে অসম্ভব কালো করেছে ঠোঁট ও দাঁত। হাসচেও সে অপরিমিত। সে হাসিতে কালো দাঁতের প্রকাশে লালসা ও শাঠ্য ফুটে বেরুচ্ছে। ইব্রাহিম তার ইস্কুলের বন্ধু অথচ ওকে সে প্রীতির চক্ষে দেখে না। ইস্কুলের কয়েকটা ধাপ উঠে ও পাঠ সাঙ্গ করে। তার পর কলকাতায় বাপের ব্যবসায়ে গিয়ে বসে। স্ত্রী-ঘটিত কোন ব্যাপারে দোকানের তবিল ভেঙ্গে ও বিতাড়িত হয় কলকাতা থেকে। তার পর গাঁয়ে এসে বিল জমা নিয়ে দিনকতক খুব হৈ-হৈ করে ' সে কাজ গেল তো ইটের ব্যবসা আরম্ভ করলে। তাতেও লাভ মন্দ হ'তো না, কিন্তু ধার পড়ে ব্যবসা গেল উল্টে। তার পর জমা নিলে আম বাগান। বছরে দু'টো মাস খাটলে আটটা মাসের খাওয়া-পরার ভাবনা থেকে নিশ্চিন্ত। কিন্তু বাগানের কুঁড়ে ঘরে যে-সব কীর্ত্তি-কাহিনী প্রকাশ পেল তাতে সমাজে ও প্রায় অচল হ'য়ে উঠলো। একেবারে অচল হ'লো না এই জন্য যে, তখনও ওর বাবা বেঁচে। গুঁড়িটাকে বাদ দিয়ে ডাল-পালাকে নিয়ে আন্দোলন বৈশাখী ঝড়ের মত—যেমন হঠাৎ আসে তেমনি হঠাৎ মিলিয়ে যায়। চিহ্ন যা থাকে ক্ষুদ্র শাখায় ও পাতায়, তাও বড় জোর নতুন পাতা গজানো পর্য্যন্ত। তেমনি বাগান জমা-নেওয়া থেকে কন্ট্রোলের চিনি—কেরোসিন—চাল—আটা—নুণের দোকান নেওয়া পর্য্যন্ত সেটুকু রইলো না। অনেক ঠেকে সে হিসাবে কিছু পোক্ত হ'য়েছে, কিন্তু পুরানো ব্যসন-বাসনার দোলা লাগলে নিজেকে সামলাতে পারতো না। এক একটা রাত্রিতে খাসি কেটে—মদ কিনে—বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হল্লা করে ওর উচ্ছৃত জীবনী-শক্তিকে ও প্রচার না করে পারে না। মীমাংসাটা হঠাৎ হ'য়ে যাওয়ায় ইব্রাহিম বেশ অপ্রসন্ন হ'য়েছিল।

জানালা-পথে শ্রীধর দেখতে পেলে পুরন্দরকে। মুখ তার গম্ভীর হ'লো। তার ইঙ্গিত অনুসরণ করে ইব্রাহিম চাইলে পথের দিকে। তার মুখও গম্ভীর হ'লো। ঘরের ভিতরে আনন্দ-কলরব সে সীমানা ছেড়ে পালালো।

বুঝতে পেরে পুরন্দর আর সেখানে দাঁড়ালে না। মোড় ফিরেছে, এমন সময় পিছন দিক্ থেকে ডাক শুনলে—সার, শুনচেন সার—

একটি বিশ-বাইশ বছরের ছেলে তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।

পুরন্দর প্রশ্ন-উন্মুখ দৃষ্টিতে তার পানে চাইলে।

ছেলেটি বললে, আমাকে কি আপনি চিনতে পারছেন না? আমি শ্রীধর বাবুর মামাতো ভাই দিলীপ বিশ্বাসের ছেলে। আমার নাম লেনিন বিশ্বাস।

লেনিন! পুরন্দরের বিস্ময় বাড়লো। বললে, আশ্চর্য্য তো! এ নাম বাংলা দেশের ছেলের কেউ রাখেন—

লেনিন বিশ্বাস বললে, বাবা মার্চেন্ট আপিসে চাকরি করেন, অনেক বই তিনি পড়েছেন আর প্রত্যহ খবরের কাগজেও পড়েন। শুনেছি—ওদের মে-ডে যে দিন হয় সেই দিন আমি জন্মাই।

পুরন্দর বললে, লেনিনের জীবন-বৃত্তান্ত নিশ্চয়ই জানেন।

লেনিন বিশ্বাস ম্লান হেসে মাথা নামিয়ে বললে, জানলেই বা লাভ কি। আমিও বাবার আপিসে দু' বছর হ'লো ঢুকেছি।

পুরন্দর বললে, কিন্তু আমিও তো তোমার চেয়ে খুব বেশি বড় হব না—আমাকে সার বলে ডাকলে কেন?

মাথা না তুলেই লেনিন বিশ্বাস বললে, ইস্কুলে ম্যাট্রিক পাস করেই ঢুকলাম আপিসে। সায়েবকেও সার বলে বলে এমন অভ্যাস হ'য়েছে—

পুরন্দর অল্প হেসে বললে, বুঝলাম। কিন্তু চাকরিই কর আর যা-ই কর—দেশের ছেলে তোমরা—দেশের কথাও মাঝে মাঝে ভেবে দেখবে। কথাটা শোনালো ছাত্রকে অভিজ্ঞ শিক্ষকের উপদেশ দেওয়ার মত। অথচ এই মাত্র সে জিজ্ঞাসা করেছে, প্রায়-সমবয়স্কদের সার বলে ডাকার হেতু কি!

লেনিন বিশ্বাস অকস্মাৎ মাথা তুলে বললে, আমরা চাকরি করি সার, আমাদের দ্বারা কিছু হবে না।

পুরন্দর এক মিনিট কাল তার মুখের পানে চেয়ে রইলো। এই স্বীকৃতির পর কি কথাই বা বলা যেতে পারে।

লেনিন বিশ্বাস বললে, কাল আপনার কথাই আমাদের ক্লাবে হ'চ্ছিল। আপনি যা করেছেন—মার্ভেলাস!

পুরন্দর বললে, ইচ্ছে থাকলে তুমিও করতে পার লেনিন।

না সার, সব পাথরে যদি শালগ্রাম হ'তো তো ভাবনা কি? একটু থেমে বললে, আপনার অনারে একটা প্রীতি-ভোজের ব্যবস্থা করেছি—ক্লাবের তরফ থেকে। তাই যাচ্ছিলাম আপনার বাড়িতে।

পুরন্দর হাত জোড় করে বললে, মাপ করো ভাই, দেশের মাথা যাঁরা—তাঁদের ব্যবস্থায় সব ঠিক হয়েছে। আর বিলতী প্রথার সামান্য একটু ব্যাপার নিয়ে মান সম্মান দেওয়া ওটাও ভাল লাগে না আমার।

লেনিন বিশ্বাস বললে, মান-সম্মান না দিলে মানুষকে খাটো করা হয় না কি?

পুরন্দর বললে, না। জাঁক করে সম্মান দেওয়ার দুর্ভোগ গাঁয়ে একবার নয় বার বার ঘটে গেছে।

লেনিন বিশ্বাস দুঃখিত স্বরে বললে, তাহলে আপনি আসবেন না?

আসবো, তবে হৈ-হৈ করতে বারণ করছি।

লেনিন বিশ্বাস বললে, না না, সভা-সমিতি এ-সা কিছু তো নয়—আমরা ক্লাবে একটু খাওয়া-দাওয়া আর গান-বাজনার ব্যবস্থা করেছি শুধু।

পুরন্দর উচ্চ হাস্য করে উঠলো, তাই বল।

লেনিন কুণ্ঠিত স্বরে বললে, আপনি মাংস খান তো? গলাটা পরিষ্কার করবার জন্য দু'বার কেসে বললে, মানে মুরগীর মাংস?

পুরন্দর বললে, হঠাৎ এ নবাবী ব্যবস্থা কেন?

লেনিন কুণ্ঠিত হাস্যে বললে, মাংসটা ভাল, তাই। আর কোন বিষয়ে প্রেজুডিস না থাকাই তো ভাল।

তোমাদের অভিভাবকরা নিশ্চয়ই—

না না। মাথা নেড়ে লেনিন বিশ্বাস বললে, তাঁরা জানবেন না। জিনিস তৈরী হ'য়ে আসবে মুসলমান-বাড়ি থেকে—আমরা রেঁধে নেব।

পুরন্দর বললে, আচ্ছা বিশ্বাস, এক দিন মুরগী খেয়ে কি প্রেজুডিস্ কাটবে তোমাদের বলতে পার?

লেনিন কোন কথা বললে না।

পুরন্দর বললে, মুরগীর মাংস খেয়ে যদি মনে করে থাক হিন্দু-মুসলমানে মিলন ঘটলো—

না, তা আমরা ভাবিনি।

তাহলে বলবো ও তোমাদের প্রেজুডিস কাটানো নয়, লোভ মেটানো। বলে হেসে উঠলো পুরন্দর।

লেনিন শুষ্ক স্বরে বললে, তাহলে আপনি আসবেন না?

নিশ্চয় আসবো। তোমার চেয়ে ক' বছরেরই বা বড় আমি। লোভ, তাও আছে বৈ কি। বলে হাসলে।

লেনিন কিন্তু হাসলে না। কোথায় ছন্দ পতন হ'য়েছে—কোন্ সুর ঠিক মত বাজছে না—এই সংশয় মনে আঘাত করছে ওর। হাত তুলে অভ্যাসগত নমস্কারের রূপান্তর একটা সেলাম করে সে চলে গেল।

পুরন্দরের মনে পড়লো—তার বাবা একবার তীর্থ করতে গিয়ে নৈনী থেকে কিনে এনেছিলেন একটি ভাল পেয়ারার কলম। পেয়ারা গাছটা দো-আঁশলা মাটিতে খুব শীগ্‌গির বেড়ে উঠেছিল। কিন্তু গাছ স্বাস্থ্যবান হ'লো বটে—ফলের স্বাস্থ্য বজায় রইলো না। স্বাদে ও গন্ধে তার মধ্যে জলো-আবহাওয়ার প্রভাবটা বেশি করেই প্রকাশ পেলে। বাবা অবশ্য গাছটা পুঁতেছিলেন বলে কাটতে পারেননি, মাধবের হাতে এক দিন সেটি খণ্ডিত হয়ে জ্বালানীরূপে গৃহস্থের উপকার সাধন করেছিল।

মাধবই বলেছিল, দাদার যেমন কাণ্ড! কাশীর পেয়ারা যদি আমাদের দেশে জন্মাতো তাহ'লে আর ভাবনা ছিল কি?—এ দেশও কাশী হ'য়ে উঠতো।

কথাটা গাছ সম্বন্ধে হ'লেও খাঁটি কথা।

এর পর যে দৃশ্যটা চোখে পড়লো তা অপরূপ। বারোয়ারি তলার মাঠে অনেকগুলি ছোট মেয়ে ও ছেলেতে মিলে জল-ডিঙ্গো-ডিঙ্গি খেলছে। সারি সারি ইট সাজিয়ে ডাঙ্গা করা হ'য়েছে, বাকি মাঠটা হ'য়েছে জল। ওরই মধ্যে একটা মেয়ে কুমীর হ'য়ে অন্য মেয়েদের তাড়া করছে—ওরা ছুটে এসে ইটের ওপর উঠছে আর কলস্বরে হেসে উঠছে। জলের মধ্যে কুমীর যদি কাউকে ছুঁতে পারে তবে তার কুমীরত্ব ঘুচবে আর যাকে ছোঁবে সেই হবে কুমীর। কিন্তু ইটের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছড়া কেটে কুমীরকে ভেঙ্গালে হবে না, জলে নেবে ওর কাছ-বরাবর গিয়ে খেলা দিতে হবে। না হ'লে খেলা জমবে না।

কুমীররূপী মেয়েটি চার ধারে ছুটোছুটি করছে আর সবাই ছড়া কেটে তাকে রাগাচ্ছে:

পটা-পট কলমি তুলি,
ঘসা-ঘস বাসন মাজি—
ও কুমীর তোর জলে নাবি—

কুমীর ছুটে আসতেই একটি অপেক্ষাকৃত ছোট মেয়ে পালাতে না পেরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। কুমীর এসে তাকে ধরলে। মেয়েটি উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠলো।

বড় মেয়েটি বললে, আহা, আদুরে মেয়ের কান্না দেখ! এত ভয় তো জল-ডিঙ্গোডিঙ্গি খেলতে এসেছিস্ কেন?

মেয়েটির বড় বোন বললে, ও না কি আমাদের বয়সী—তাই জল-ডিঙ্গোডিঙ্গি খেলবে?

কুমীর বহুক্ষণ ছুটোছুটি করে ক্লান্ত হয়েছিল। বললো, ও-সব আমি জানি নে। আমি যখন ওকে ছুঁয়েছি তখন আর আমি কুমীর হব না।

মেয়েটির দিদি অনেকক্ষণ ধরে তর্ক করলে কিন্তু কুমীরের দলেই খেলুড়েরা রায় দিতেই সে ঠাস্ করে বোনের গালে একটা চড় মেরে বললে, টিপসি—চাল-টিপসি! ছুটতে পারিস্ নে তো আসিস্ কেন পোড়ারমুখী?

মেয়েটি আরও জোরে কেঁদে উঠলো।

মেয়েটিকে মেরেও ওর দিদি রেহাই পেলো না। কুমীরের বদলি হ'তে হ'লো ওকে। রাগ হবারই কথা। মাটিতে পড়ে কাঁদছিল ছোট মেয়েটি—ওর দিদি এসে হাতের নড়া ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিলে। পুরন্দর ওর দিদির হাত ধরে বললে, ও ছোট্ট মেয়ে, ওকে কি মারতে আছে?

না, মারবে না! দেখুন না, ওরা বলছে ওর বদলে আমাকে কুমীর হতে হবে! মেয়েটি কাঁদ-কাঁদ মুখে অভিযোগ করলে।

অন্য মেয়েরা বললে, রাণী যখন এক জনকে ছুঁয়েছে তখন সেই বা কুমীর থাকবে কেন?

পুরন্দরের নিষ্পত্তি কেউ গ্রাহ্য করলে না—ক্লান্ত কুমীর পণ করেছে সে কিছুতেই কুমীর থাকবে না।

মেয়েটির দিদি রুখে উঠলো, আচ্ছা লো আচ্ছা। দে খেলা দেখি, এক মিনিটের মধ্যে তোদের কাউকে যদি কুমীর না করি তো মা-কালীর দিব্যি রইলো। পুরন্দরের পানে চেয়ে বললে, আপনি ওকে দয়া করে ওই রোয়াকে বসিয়ে দিন না। ছোট মেয়েরা ওখানে আগ ডুম বাগ্‌ডুম খেলছে।

উঁচু রোয়াকে গোল্ হ'য়ে বসেছে আট-দশ জন ছেলে-মেয়ে। একটি মেয়ে প্রত্যেকের হাঁটু ছুঁয়ে আবৃত্তি করছে ছড়া:

আগ ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে,
ডান মিরগেল ঘুঙুর বাজে।
বাজতে বাজতে পড়লো ঠুলি,
ঠুলি গেল সেই কমলা ফুলি।
কমলা ফুলির টিয়েটা—

মেয়েটি বৃত্তে বসতেই কান্না থেমে গেল।

পথ চলতে চলতে সামনের পথ পুরন্দরের সামনে মুছে গেল। ও পিছিয়ে এলো অস্পষ্ট অতীতের কোলে। এই খেলা তারাও তো খেলেছে এক দিন। প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে গিয়ে মন ভরে গেছে বেদনায়। কিসের বেদনা জানে না। আজ মনে হ'চ্ছে, খেলায় হেরে ক্ষণিক যে বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়তো তা আজ হয়তো কিছুই নয়, কিন্তু হেরে যাওয়াটা—তা যে উপলক্ষেই ঘটুক না কেন্—কোন কালেই মানুষ সহ্য করতে পারে না। পথের সামনে জলছে

আলো—তাই জীবন, পিছনে পড়ে রয়েছে অন্ধকার, মৃত্যু না হোক বিস্মৃতি তো বটে। স্মৃতির আলোয় এক এক সময় ভাবতে ভাল লাগে—ভুলে হোক বা অজ্ঞানে হোক কিংবা সত্য সঙ্কল্পে হোক, এক দিন বা অতিক্রম করে চলে এসেছে—সেই পথকে—তার দু'ধারের বস্তুকে—আর বস্তু-সম্পর্কিত ঘটনাকে। জয়-পরাজয় নিয়ে খেলা—সে খেলা খেলাই তো স্বভাবধর্ম্ম। ও মেয়েটি এক মিনিটে ওর সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত না করতে পারলে নিশ্চয় দুঃখিত হবে না। ও প্রতিযোগিতার আনন্দে—খেলার আনন্দে মেতে নিশ্চয়ই সময়ের হিসাব ভুলবে। আর ভুললেই বা সময়ের হিসাব—সঙ্কল্পেও যদি অটুট থাকে। ওর ছোট বোন কুমীর হবার ভয়ে কেঁদেছে কিন্তু ও জানে, কুমীর থেকে মানুষ হওয়াটাও চেষ্টার ওপর নির্ভর করছে। তাহ'লে দাঁড়ালো এই—মানুষ হওয়াটাই মানুষের চরম লক্ষ্য। জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, খেলায় হোক আর প্রতিজ্ঞাতেই হোক, এ ছাড়া অন্য কামনা সাধনা মানুষের থাকতে পারে না।

আজকাল খুব ছোট ছোট ঘটনাতে পুরন্দরের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। ও মাকড়সার জাল ছিঁড়ে দিয়ে দেখে—কেমন করে নতুন উৎসাহে তারা জাল বোনে। মশা মেরে পরীক্ষা করে—মৃত্যু-ভয়ে অন্য মশারা পালিয়ে যায় কি না। দেখে, লাল পিঁপড়ের বাসা ভাঙবার আয়োজন করলে তারা মার খেয়েও কি ভাবে দলবদ্ধ ভাবে আক্রমণ করে আততায়ীকে। ওরা অজ্ঞান, শুধু অন্ধ সংস্কার বলে মৃত্যু জেনেও নিরুৎসাহ হয় না। সেই অন্ধ প্রবৃত্তি বা সংস্কার মানুষের মনেও তো বদ্ধমূল রয়েছে। অথচ ফাউল-কারি খেয়ে সংস্কার কাটিয়ে উঠলাম, এই আত্মপ্রসাদে স্ফীত হ'য়ে সে কি আত্মপ্রবঞ্চনা করছে না? সংস্কার কাটাবে তো তেমনি দৃঢ় হয়েই কাটাও। পেছনে নয়—পুরোভাগে, গোপনে নয়—অবারিত প্রকাশে নিজেকে অগ্রসর করে উৎসর্গ করে দাও।

উত্তর-পাড়ায় দু'টি দল হয়েছে। শশীপদ আর যতীনের দল। এই দাঙ্গার সম্ভাবনা তিরোহিত হওয়ায় কোন দলই সন্তুষ্ট নয়। শশীপদ চায়, সব জাতির ধনীদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে; যতীন চায়, হিন্দু ধনীদের সঙ্গে মিশে মুসলমানদের সঙ্গে দাঙ্গা বাধাতে। যতীনের প্রতিশোধ-স্পৃহার অন্তরালে ক্ষুদ্র একটু হেতু ছিল। সেটি এই :

মাস দুই আগে বাজারে একটি এক-সেরা রুইয়ের পোনা ও দর করছিল। মেছুনি বলছিল, দেড় টাকা সের—যতীন দর দিয়েছিল এক টাকা ছ'আনা। এই নিয়ে দর কষাকষি হ'চ্ছে—ইব্রাহিম এসে খপ করে মাছটা পাল্লার ওপর তুলে বললে, ওজন কর।

মেছুনি বললে, দেড় টাকার কম আমি দেব না।

তাই দেব। ইব্রাহিম জবাব দিলে।

পাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা যতীনকে দেখিয়ে বললে, এই বাবু দর করছেন।

মেছনি বললে, হ্যাঁ, ভারি তো দর! আমি বলছি দেড় টাকার কম হবে না—উনি বলছেন এক টাকা ছ'আনা। কেন বাবু, মাছ কি আমি মাগ্‌না নিয়ে এসেছি? বকে বকে মুখে ফেকো উড়ে গেল, তবু—

ইব্রাহিম তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, আপনি নেবেন দেড় টাকা দিয়ে?

[illegible] দাম চুকিয়ে দিয়ে মাছ নিয়ে ইব্রাহিম চলে গেল। বলবার কিছু নেই, তবু যতীনের মনে হ'লো—এ অন্যায়। দর শেষ না হতেই এ ভাবে মাছ ছিনিয়ে নেওয়াটা খুব অন্যায়। ইব্রাহিমকে কেন্দ্র করে সারা জাতটার ওপর এই আক্রোশ দিনের পর দিন পুঞ্জীভূত হতে লাগলো। সুযোগ এসেছিল প্রতিশোধ নেবার, কিন্তু পুরন্দরের চেষ্টায় তাও ব্যর্থ হয়ে গেল।

শশীপদ অসন্তুষ্ট হ'য়েছে এই জন্য যে, আপোষ-আলোচনা হয়েছে এক কালের প্রতাপশালী মিত্রদের বৈঠকখানায়—গ্রামের সব ধনীদের নিয়ে। ওদের ছাড়া যেন গ্রামে আর লোক নেই। আলোচনায় তাঁদের ডাকা হ'লো না কেন?

তবে দুই পক্ষই পুরন্দরকে ভালবাসতো বলে ব্যক্তিগত বিদ্বেষে তার ওপর প্রতিকূলতা পোষণ করেনি। যেটা প্রকাশ পেল সেটা ক্ষোভ—অভিমানেরই ছদ্মবেশ।

যতীন বললে, তোমাদের কাজ তোমরাই বোঝ কাল্‌ দা, আমরা ওর মধ্যে নেই।

পুরন্দর বললে, আরে পাগল, এ যে সবারই কাজ।

যতীন বললে, সবারই কাজ যদি তো প্রতিকার কর। ওই ইব্রাহিম মিঞা—কনট্রোলের দোকান নিয়ে কি কাণ্ডটা করে জান তো? ওই গফুর আলি—কাপড় আনিয়ে বিলি করলে কাদের, সে খোঁজ রাখ?

তা আলি কি করবে—যারা যারা পারমিট পেয়েছে, তাদেরই তো কাপড় দিতে ও বাধ্য।

সবাইকে দেয় কাপড়? না বলে—কি করবো, নেই। পরের চালানে নিস্।

হরিপদ বললে, আর কাদের পারমিট দেয় তাও বোধ হয় জান না? দিলে—হরি নাপিতকে, ছিমন্ত কলুকে, করাতি রজব আলিকে—চল্লিশ টাকা দামের ভাল শাড়ির পারমিট। ওরা সব চেয়ে সস্তা একখানা খাটো বহরের মিলের কাপড় পেলে বর্ত্তে যায়—ওরা এই দামী শাড়ী পারে কিনতে?

যতীন বললে, অথচ সবাই ওরা চল্লিশ টাকা দামের শাড়ীই কিনলে।

কি করে? সাশ্চর্য্যে প্রশ্ন করলে পুরন্দর।

পারমিট তো ওরা জোগাড় করেনি—কাজেই টাকাও ওরা দিচ্ছে না। সবই করাচ্ছে মহাজন—যারা হাওড়ার হাটে ফি হপ্তায় কাপড়ের মোট ঘাড়ে করে বেচতে যায়। কুড়ি টাকার কাপড়খানা তেইশ চব্বিশে কিনছে মহাজন আর বেচছে তিরিশে। কি মজার কলই বানিয়েছে কোম্পানী! এত দুঃখেও সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো।

পুরন্দর গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, শশী কোথায়?

কে জানে।

আচ্ছা, তোমরা এসো তো আমার সঙ্গে একবার উত্তর-পাড়ার মাঠে।

কেউ এলো না। কাজের অছিলায় একে একে সরে পড়লো সবাই।

শশীর সঙ্গে দেখা হ'লো—ওর বাড়ির দুয়োরে। ছোট একটা বকনাকে ও খেদিয়ে নিয়ে আসছিল মাঠ থেকে।

পুরন্দর বললে, কি শশী, কাল আমাদের ওখানে যাওনি যে

শশী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল, তোমাদের মিটিঙের মধ্যে মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ আমরা কোথায় যাব?

পুরন্দর হেসে বললে, আমার ওপর রাগ হ'য়েছে বুঝি?

শশী একটি নোনা আতা-ঝোপের পানে চেয়ে বললে, আমাদের আবার রাগ! হ্যাঃ—

পুরন্দর বললে, কিন্তু রাগ হ'লো কেন, বলবে না?

শশী নিস্পৃহ ভাবে বললে, রাগই হয়নি—তা বলবো কি?

পুরন্দর বললে, বেশ তো, আমার দিকে চেয়ে জবাব দাও।

চোখে চোখ পড়তেই দু'জনের মুখেই হাসি ফুটে উঠলো। শশীর চোখে জল টল-টল করছে—মুখ থমথমে, তবু ও হেসেছে।

পুরন্দর এগিয়ে এসে ওর কাঁধে হাত রেখে বললে, তোমরা আমার ডান হাত বাঁ হাত—তোমরা রাগ করলে আমার দশা কি হবে বল দেখি?

শশী তবু নুয়ে পড়লে না। বললে, আমাদের নিয়ে করবে কি কাল্ দা? যে হাতের জোর কমে যায়, তা দিয়ে কি কাজ চলে? বয়ে বেড়ানোই সার।

তবে কি বলতে চাও, কেটে ফেলবো সে হাত?

শশী বললে, আমরা মুখ্যু মানুষ—গরিব মানুষ। আমাদের কথার দাম নেই—কাজের দাম নেই। যদি বরবাদ দাও—ক্ষতি কি?

পুরন্দর তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, তোমাদের অভিমানটা বুঝি। কিন্তু ঠিক করে বল তো, কে বুঝিয়েছে তোমাদের যে যাদের টাকা আছে তারাই বিদ্বান্—তারাই কাজের লোক?

শশী জবাব দিলে, সে বোঝাতে হয় না কাল্ দা, সবাই জানে। আমরা হল্লা করবো—জেল খাটবো, ওরা রাজত্ব করবে সুখে—এই তো দেখে আসছি ছেলেবেলা থেকে। মোছলমানদের সঙ্গে ঝগড়া মিটে গেল, ভালই; কিন্তু পরামর্শ করবার জন্য ওদেরই তো ডেকেছিলে তুমি?

পুরন্দর বললে, যাকে ধরেই হোক, গোল মিটে গেলেই কি ভাল নয়?

আমরা মুখ্যু মানুষ—ভাল-মন্দের কি-ই বা বুঝি! শশীপদ সেখানে দাঁড়ালে না। আগড় ঠেলে বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকলো।

পুরন্দর স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। বেলা বাড়ছে। দূরের মাঠে রোদের সমুদ্র চিক্-চিক্ করে দৃষ্টির প্রসার কমিয়ে আনছে। দিনের আলো বাড়লেই দূর-দিগন্ত স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে না। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত একটা দুঃস্বপ্নের পিছনে আর একটা দুঃস্বপ্ন আভাসিত হ'য়ে উঠছে।

[ক্রমশঃ

অজয়ে কুয়াসা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দেখে যে আমার পিয়াসা মিটে না এ কি খেলা কুয়াসার,
অজয় হয়েছে ক্ষীরোদ সাগর চিনিতে পারি নে আর।
ঢেকে গেছে বাট ঢেকে গেছে মাঠ
দ্রব রজতের রাজ্য বিরাট
রূপালী চিকের এ কি ঝিলিমিলি দেখিতে চমৎকার!

পলকে হতেছে অদল বদল ঢাকা গ্রাম বাড়ী ঘর,
কিছুই দেখি না তবু কত দেখি সুন্দর মনোহর।
সুমুখে আড়ালে অজ্ঞাতবৎ
রয়েছে বিশাল বৃহৎ জগৎ
হতেছে দৃশ্য ক্ষণে অদৃশ্য খোঁজ পাই না ক' আর।

যুগের কুহেলি এমনি করিয়া ঢাকিয়া দিতেছে সব,
ম্লান হয়ে যায় উজ্জ্বল ঘর শত জয়-গৌরব।
অতি প্রোজ্জ্বল, অতি ভাস্বর,
মিলাইয়া যায় কত সত্বর
সাধারণ সাথে অসাধারণ যে হয়ে যায় একাকার।

কতই সত্য ঢাকা পড়িতেছে নিবিছে কতই রবি,
কত কুৎসিত সাজে সুন্দর নব আকৃতি লভি।
কত বীরত্ব, কত মহত্ব,—
কুহেলিতে ঢাকা পড়িছে সত্য,

(পার্ল বাক)

শিশির সেনগুপ্ত, জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

৩০

পীয়ার ব্লসম সম্বন্ধে ছোট ছেলে যা বলেছে সে কথা ওয়াঙ কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। মেয়েটির আসা-যাওয়ার উপর তার নজর থাকে ক্লান্তিহীন। নিজের অজ্ঞাতসারেই মেয়েটির চিন্তা তার মন অধিকার করে থাকে। রাত-দিন মেয়েটির কথা ভাবে ওয়াঙ কিন্তু সে কথা কাউকে বলতে পারে না।

সে বছর গরম কালের এক রাত্রে যখন বাতাস ফুলের গন্ধে ভারী, ওয়াঙ নিজের মহলে একাকী একটি পুষ্পিত দারচিনি গাছের নীচে বসেছিল। দারচিনি ফুলের মিষ্ট গন্ধে নাক ভরে আসছে। একাকী বসে থাকতে থাকতে যৌবনের দিনগুলির মত রক্ত চঞ্চল আর তপ্ত হয়ে উঠল। সারা দিনেও রক্তের সে উন্মাদনা কমল না। ইচ্ছা হতে লাগল, ছুটে চলে যায় মাঠে—পায়ে স্পর্শ নেয় মাটির, জুতো-মোজা খুলে সারা গায়ে মাটি লাগায়।

করতও হয়ত তাই কিন্তু লজ্জায় পারলে না ওয়াঙ। কেউ যদি দেখে ফেলে। সে ত আর চাষী নয়। সে এখন জোতদার—মস্ত লোক। কাজেই ওয়াঙ অস্থির ভাবে নিজের মহলেই পায়চারী করতে লাগল। কমলিনী যে মহলে ছায়ায় বসে গড়গড়া খায় সেখান থেকেও দূরে রইল। কারণ, মানুষের মন কখন অস্থির হয়ে ওঠে এবং কোথায় গলদ তা কমলিনীর চোখ এড়াতে পারে না! একাকীই রইল ওয়াঙ। ঝগড়াটে বেয়াই বা নাতী-নাতনীদের কারুর কাছেই গেল না, যদিও এদের মধ্যেই আজকাল সে আনন্দ পায়।

সারা দিন একা-একা কাটে। রক্তের উন্মাদনা ভুলতে পারে না ওয়াঙ। ভুলতে পারে না ছেলেটিরও কথা। ছেলেটি যখন কালো জোড়া ভ্রূ আর যৌবনদৃপ্ত দীর্ঘ ঋজু চেহারা নিয়ে তাকিয়েছিল সে ছবি কিছুতেই মন থেকে সরে না। থেকে থেকে দাসী মেয়েটির কথাও উঁকি মারে মনে। ওয়াঙ বলল নিজেকে—'ওরা দু'জনে একবয়সী। ছেলেটির বয়স আঠারো ত হবেই আর মেয়েটিও আঠারোর বেশী হবে না।'

তখনই মনে পড়ল নিজের বয়সও ত আর সত্তোর হবার বেশী বাকি নেই। রক্তের চঞ্চলতায় লজ্জিত হোল ওয়াঙ। ভাবল—'মেয়েটাকে ছেলেটিকে দিয়ে দেওয়াই ভাল।' এ কথা সে বার বার বোঝাতে লাগল নিজেকে। যত বার এ কথা উচ্চারণ করতে লাগল তত বারই ওয়াঙের ক্ষতবিক্ষত দেহ নতুন করে ছুরীবিদ্ধ হতে লাগল। এই ভাবে ছুরীবিদ্ধ হওয়া আর যন্ত্রণা বোধ করা ছাড়া আর কোন পথ নেই ওয়াঙের।

দিন গড়িয়ে যায়।

রাত গাঢ় হলেও একাকী বসে থাকে ওয়াঙ। একাকী বসে থাকে নিজের মহলে। সারা বাড়ীতে এমন বন্ধু কেউ নেই, যার কাছে সে মনের কথা খুলে বলতে পারে। রাতের বাতাস দারচিনি ফুলের গন্ধে মদির আর ভারী হয়ে উঠেছে। কে যেন তার মহলের পাশ দিয়ে সরে যাচ্ছে। ওয়াঙ তাকাল তাকাল সে দিকে। পীয়ার ব্লসম।

—'পীয়ার ব্লসম'—ডাকলে ওয়াঙ। তার গলা ঠিক যেন ফিসফিসানির মত শোনাল।

মেয়েটি হঠাৎ থামল—মাথা নত করে শুনতে লাগল।

আবার ডাকলে ওয়াঙ। গলার ভেতর থেকে স্বর যেন আর বের হতে চায় না।

—'আমার কাছে এস।'

ওয়াঙের ডাক শুনে মেয়েটি শংকিত পদে এসে তার সামনে দাঁড়াল। অন্ধকারে দাঁড়ান মেয়েটির দিকে ওয়াঙ কিছুতেই চোখ তুলে তাকাতে সাহস পেল না। সে শুধু অনুভব করতে লাগল তার উপস্থিতি। হাত বাড়িয়ে তার বসন ধরে ধরা-গলায় বললে ওয়াঙ—'পীয়ার।'

এ কথা বলেই থামল ওয়াঙ। মনে মনে বললে নিজেকে—'বুড়ো হয়েছ। এই মেয়েটির বয়সী নাতী-নাতনী রয়েছে তোমার। অত্যন্ত গর্হিত কাজ।' ওয়াঙ মেয়েটির বসন আঙুলে জড়াতে লাগল।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ওয়াঙের রক্তের উষ্ণতাও মেয়েটির রক্তে সঞ্চালিত হোল। বোঁটা-ভাঙা ফুলের মত টুপ করে সে মাটিতে বসে ওয়াঙের পা জড়িয়ে ধরে চুপটি করে পড়ে রইল। ওয়াঙ আস্তে আস্তে বললে—'আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি—খুব বুড়ো—'

মেয়েটি উত্তর দিল। অন্ধকারে তার গলা দারচিনি গাছের লঘু নিশ্বাসের মত গাঢ় মনে হতে লাগল—'বুড়োদেরই আমি পছন্দ করি। তারা এত কোমল—'

আরো সস্নেহে বলল ওয়াঙ—এবার মেয়েটির দিকে আরো একটু ঝুঁকে—'তোমার মত মেয়ের দরকার লম্বা আর পুষ্ট ছেলের।' মনে মনে বললে—'ঠিক আমার ছোট ছেলের মত—।' কিন্তু মুখ ফুটে ওয়াঙ সে কথা উচ্চারণ করতে পারলে না। এ চিন্তা মেয়েটির মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না সে।

কিন্তু মেয়েটি বলল—'ছেলেদের দেহে একটুও দয়া-মায়া নেই—তারা বড়ো নিষ্ঠুর।'

পায়ের কাছ থেকে কেঁপে ওঠা মেয়েটির ছোট ছেলেমানুষী কথা কানে যেতেই ওয়াঙের হৃদয় মেয়েটির প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসায় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। পীয়ার ব্লসমকে চাইলেও তার জানা অন্য মেয়েদের যে ভাবে ভোগ করেছে সে, এর প্রতিও তেমনি আচরণ করতে মন সরল না তার।

সস্নেহে ওয়াঙ বুকে টেনে নিল মেয়েটিকে—লোলচর্ম জীর্ণ দেহে তার ক্ষীণ তনুর যৌবন তপ্ততা অনুভব করতে লাগল। দিনের বেলা শুধু তাকে দেখার আনন্দ, বাতাসে ওড়া বসনের লঘু স্পর্শ—রাতে বুকের কাছে পাওয়া তার শান্ত তনুদেহ গভীর খুশীতে মন ভরে রাখে—বার্দ্ধক্যের এই ভোগস্পৃহায় বিস্মিত হয় ওয়াঙ।

পীয়ার ব্লসম মেয়েটি অত্যন্ত শীতল—ঠিক পিতার মত মনে করে তাকে। আর ওয়াঙের কাছেও সে নারী নয়—ছোট্ট শিশুটি মাত্র।

ওয়াঙের এই কুকীর্তি সহজে ধরা পড়ল না। কাউকে সে বলেওনি এ সব ব্যাপার আর বলবেই বা কেন? সেই ত এ-বাড়ীর কর্তা।

কিন্তু কোকিলার চক্ষুই প্রথম আবিষ্কার করল। এক দিন [illegible]

দেখে সে তাকে ধরে ফেলল। হাসতে লাগল সে। তার প্রেম শুধু চক্-চক্ করতে লাগল।—'বুঝেছি। বুড়ো কত্তা আবার মেতে উঠেছেন, না?'

ওয়াঙ নিজের ঘর থেকে সব শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি পোষাক পরে বেরিয়ে এল। বোকার মত মুখে হাসি টেনে চাপা-গলায় গর্বের সঙ্গে বললে—আমি ত ওকে বলেইছিলাম কোন ছেলে-টেলেকে বেছে নিতে। কিন্তু ও বুড়োদেরই চায়।'

—'কর্ত্রীর পক্ষে এ বেশ মুখরোচক খবর হবে'—বললে কোকিলা। তার চোখে আগুন ঝরছে।

—'আমি নিজেই জানি না কি করে ঘটল এমন'—আস্তে আস্তে বললে ওয়াঙ—'আরো একটি মেয়েকে আমার মহলে ঢোকাবার একটুও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আপনা থেকেই ঘটে গেল ব্যাপারটা।'

কোকিলাও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—'যাই হোক, কর্ত্রীকে জানাতে হবে।'

ওয়াঙ কমলিনীর রাগকেই ভয় করে সব চেয়ে বেশী। সে অনুনয় কণ্ঠে কোকিলাকে বললে—'ইচ্ছা হয় বল, তবে রাগারাগির ব্যাপার না ঘটিয়ে ভাল ভাবে যদি ব্যবস্থা করতে পার ত মুঠো-ভরে রূপো পাবে।'

কোকিলা হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে প্রতিশ্রুতি দিল। ওয়াঙ ফিরে চলল নিজের ঘরে। যতক্ষণ না কোকিলা ফিরে এল ততক্ষণ বের হোল না নিজের মহল থেকে।

—'জানালুম তাকে সকল কথা'—কোকিলা বলল—'সে ত রেগেই আগুন। তখন আমি বহু দিন ধরে সে যে বিদেশী ঘড়ী চাইছিল তার কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। দু'হাতে দু'টো পান্নার আংটি পাবে—তাছাড়া আরো যে সব জিনিবপত্র চাইবে তাও পাবে। পীয়ার ব্লসমের জায়গায় একটি দাসীরও ব্যবস্থা করা হবে। পীয়ার ব্লসম আর কখনো তার সামনে আসবে না। আপনিও কিছু দিন তার কাছে ঘেঁসবেন না। কারণ, এখন আপনাকে দেখলেই সে অসুস্থ বোধ করবে।'

ওয়াঙ খুব আগ্রহের সঙ্গেই কোকিলার প্রস্তাবে সম্মতি দিলে। বললে—'ও যা যা চায় এনে দাও—আমার কোন আপত্তি নেই।'

যত দিন না সকল ইচ্ছা পূরণের আনন্দে তার রাগ জল হয়ে আসছে, তত দিন আর কমলিনীর সঙ্গে দেখা করতে হবে না জেনে খুশী হয় ওয়াঙ। কিন্তু ওয়াঙের তিন পুত্র বর্তমান—তাদের সামনে এলে নিজের দুষ্কৃতির জন্য অদ্ভুত ভাবে লজ্জিত হয় সে। বারে বারে সে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করে—'আমিই ত এ বাড়ীর কর্তা। আমি কি নিজের রূপো দিয়ে কেনা দাসীকে খুশীমত ভোগ করতে পারব না?'

কিন্তু তবুও লজ্জার কাঁটা খচ-খচ করে। যাদের কামস্পৃহা মেটেনি তাদের মত মনে মনে একটু গর্বও বোধ করে ওয়াঙ। সবার চোখে এখন সে ঠাকুর্দার আসন নিয়ে আছে। পুত্ররা তার কাছে এসে, তার সঙ্গে দেখা করে। তাদের জন্য প্রতীক্ষা করে ওয়াঙ।

একে একে এবং পৃথক ভাবে সকল ছেলেই এল। দ্বিতীয় জনই এল সবার আগে। এই ছেলেটি এসেই ক্ষেতের কথা, কেমন ফসল [illegible] এবার [illegible] যাবে—এই ধরণের নানা কথা আলোচনা করতে লাগল। কিন্তু ওয়াঙ আর এখন অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি নিয়ে মাথা ঘামায় না। যদি ফসল থেকে সামান্যই আয় হয় ভাবনা কি! আগের বছরের মজুত রূপো আছে। ওয়াঙ নিজের মহল বোঝাই করে রূপো রেখে দিয়েছে—শস্যের বাজারেও যথেষ্ট টাকা লগ্নী আছে—অনেক টাকাও চড়া সুদে খাটিয়েছে সে। দ্বিতীয় ছেলেই সুদ উসুল করে এনে দেয়। ওয়াঙ তাই আজকাল আর আকাশের চেহারা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

দ্বিতীয় ছেলে যতক্ষণ কথা বলছিল খালি এ-দিক্ ও-দিক্ বার বার তাকাচ্ছিল। ওয়াঙ বুঝতে পারে—সে মেয়েটির খোঁজ করছে। যা কানাঘুঁসা শুনেছে সব সত্যি কি না নিজের চোখে দেখতে চায়। কাজেই ওয়াঙ শোবার ঘরে পীয়ার যেখানে লুকিয়ে ছিল, সেখান থেকে তাকে ডেকে এনে বলল—'যাও, আমার আর আমার ছেলের জন্য চা তৈরী করে আন।'

মেয়েটির কোমল পাংশু গাল পীচ ফলের মত রাঙা হয়ে উঠেছে। মাথা নীচু করে ছোট্ট পায়ে সে ঘুর-ঘুর করতে লাগল। দ্বিতীয় ছেলে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। যা সে শুনেছিল চোখে না দেখা অবধি একটুও বিশ্বাস করেনি।

কিন্তু জমির এটা-ওটা খবর ছাড়া আর কোন কথাই উল্লেখ করা হোল না। কোন্ প্রজাকে এবার বছর শেষে উৎখাত করতে হবে—কারণ সে শুধু আফিং খেয়ে পড়ে থাকে, জমি চাষ করে না—সে সংবাদও দিল ছেলেটি। ওয়াঙ তার আর ছেলে-মেয়ের স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করল। উত্তরে জানাল ছেলে—সারা বছরই তাদের সর্দিকাশি লেগে আছে। অবশ্য এখন শীত কমে আসছে—আর দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

চা খেতে খেতে এই সব আলোচনা চলতে লাগল দু'জনের মধ্যে। ছেলেটি যা দেখবার খুঁটিয়ে দেখে নিল। ওয়াঙ দ্বিতীয় ছেলে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হোল।

দুপুর বেলা বড় ছেলেও এল। দীর্ঘায়ত সুন্দর চেহারা—মুখে প্রবীণতার গর্ব। ওয়াঙ ভয় করে তার এই গর্বকে। তখুনি সে পীয়ার ব্লসমকে ডাকল না—পাইপ মুখে করে অপেক্ষা করতে লাগল। গর্ব আর সম্ভ্রম নিয়ে বসল বড় ছেলেটি—বাপের স্বাস্থ্য, সুবিধা-অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করল। ওয়াঙ দ্রুত এবং শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল ছেলের প্রশ্নের। বড় ছেলের মুখের দিকে তাকাতেই মুহূর্তে তার সকল ভয় কেটে গেল।

এবার তার আসল রূপটি ওয়াঙের চোখে ধরা পড়ল। প্রশস্ত বক্ষ পুরুষ—কিন্তু সহরে বৌকে সমীহ করে চলে। বড় ঘরে যে জন্মেছে আদব কায়দায় তা অপ্রকাশিত হওয়ার ভয়েই বড় ছেলে ভীত সব সময়। কিন্তু ওয়াঙের মধ্যে এখনও মাঠের চাষীর ভাবই সর্ব প্রধান—সেই ভাবই ফেনায়িত হয়ে উঠতে লাগল। পূর্বের মত বড়র প্রতি অবজ্ঞার ভাব এল—অবজ্ঞা এল তার মার্জিত আচরণের প্রতি। তাই সে হঠাৎ সহজ কণ্ঠে পীয়ার ব্লসমকে ডেকে বললে—'আমার আর আমার বড় ছেলের জন্য তা নিয়ে এস।'

এবার মেয়েটি যখন এল অত্যন্ত শীতল আর নিষ্প্রাণ দেখাতে লাগল তাকে। গোল মুখখানি সাদা ফুলের মতই ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকল সে—প্রাণহীনের মত ঘুরতে ফিরতে লাগল। [illegible] হোল [illegible]—তার পর দ্রুত ঘর থেকে চলে গেল।

পীয়ার যখন চা ঢালছিল পুরুষ দু'জন নিঃশব্দে বসেছিল। সে চলে যেতেই তারা চায়ের পাত্র মুখে তুলল। ওয়াঙ পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ছেলের মুখের দিকে। ছেলের চোখে উলঙ্গ বিস্ময়—একটি লোক যে আর এক জনকে গোপনে হিংসা করে তার মত চাউনি ছেলের মুখে। তারা চা খেতে লাগল। অবশেষে বড় ছেলেটি শান্ত-গম্ভীর কণ্ঠে বলল—'আমার শুনে ত বিশ্বাসই হয়নি।'

—'কেন? আমি এ বাড়ীর কর্তা!' ওয়াঙের সংযত জবাব এল।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল ছেলের মুখ থেকে। কিছুক্ষণ পরে সে বলল—'তোমার টাকা আছে তুমি যা ইচ্ছা করতে পার'—আবার দীর্ঘনিশ্বাস উত্থিত হোল—'কিন্তু এই ত সব নয়। এমন একটা দিন আসে যখন—'

কথার মাঝে হঠাৎ থেমে পড়ল বড় ছেলে। তার মুখে সেই চাউনি যে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও হিংসা করে আর এক জনকে। ওয়াঙ ছেলের দিকে চেয়ে মনে মনে হাসতে লাগল। বড় ছেলের কামুক প্রকৃতির কথা ভাল করেই জানা আছে তার। চিরদিনই সহরে মেয়ে রাশ টেনে রাখতে পারবে না—ভিতরকার আসল মানুষটি এক দিন বের হয়ে পড়বেই।

বড় ছেলে আর বেশী কিছু বললে না। নতুন একটা চিন্তা মাথায় নিয়ে সে ঘর থেকে বেড়িয়ে এল। ওয়াঙ বসে বসে পাইপ টানতে লাগল। বুড়ো বয়সে যা ইচ্ছা করতে পারছে, এই চিন্তায় গর্ব হতে লাগল তার।

কিন্তু ছোট ছেলে রাতের আগে এল না। যখন এল সে'ও এল একাকী। ওয়াঙ তখন নিজের মহলে মাঝের ঘরে বসেছিল। টেবিলে একটি লাল মোমবাতী জ্বলছিল। ওয়াঙ বসে বসে ধূমপান করছিল। টেবিলের উল্টো দিকে পীয়ারও নিঃশব্দে বসেছিল। তার হাত দু'টি কোলেতে জড়ো করা। ওয়াঙের দিকে সে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ধরেছে শিশুর মত। সে দৃষ্টিতে চাতুরী নেই। ওয়াঙও নিঃশব্দে লক্ষ্য করতে লাগল তাকে—নিজের কৃত কর্ম্মের জন্য গর্বই বোধ হতে লাগল তার।

হঠাৎ ছোট ছেলেটি এসে দাঁড়াল সামনে—যেন বাইরের অন্ধকার থেকে হঠাৎ উড়ে এসে পড়ল সে। কেউ তকে ঘরে ঢুকতে দেখেনি। অদ্ভুত ভাবে গুঁড়ি মেরে দাঁড়িয়ে রইল ছেলেটি। পলকে ওয়াঙের একবার গ্রামেতে পাহাড় থেকে ধরে আনা প্যান্থারের ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে। পশুটি বাঁধা ছিল কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সে'ও ওৎ পেতে বসেছিল। চোখ দু'টি তার জ্বলজ্বল করছিল। ছেলেটির চোখও ঝক্‌ঝক্ করছে। তীব্র দৃষ্টিতে সে বাপের চোখের দিকে তাকাল। তার ঘন কালো জোড়া ভ্রুর জন্য চোখের দৃষ্টি আরো ভয়াল দেখাতে লাগল। এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এক সময় সে নীচু অথচ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল—'আমি যুদ্ধে যাব—সেনাদলে নাম লেখাব।'

মেয়েটির দিকে একবারও সে তাকাল না। বড় ছেলে বা দ্বিতীয় ছেলেকে ওয়াঙের একটুও ভয় হয়নি কিন্তু যাকে জন্মের দিন থেকে কোন দিনই আমল দেয়নি, তাকে হঠাৎ কেমন তার ভয় হতে লাগল।

ওয়াঙের কথা জড়িয়ে এল, কথা বলবে বলে মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে নিলে কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বের হোল না। এক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল ছেলের দিকে। ছেলেটি আবার বললে—'আমি যুদ্ধে যাব—যাবই।'

হঠাৎ ছেলেটি মুখ ফিরিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল। সে'ও ফিরে তাকাল তার দিকে। তার পর সন্ত্রস্ত হয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল যাতে না আর তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়।

ছেলেটি তখন তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ওয়াঙ খোলা দরজা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকাল। গ্রীষ্মের কালো রাত্রি থম্‌থম্ করছে। ছেলেটি চলে গেছে। চারি দিকে একটা পাষাণ নীরবতা।

অবশেষে ওয়াঙ মেয়েটির দিকে ফিরে বিষণ্ণ স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলল, তার সে গর্ব্বের ভার উবে গেছে কখন—'তোমার পক্ষে আমি খুবই বুড়ো। আমি জানি—আমি জানি আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি।'

মেয়েটি মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিলে। সে'ও গভীর আবেগে কাঁদছে। এমন আকুল ভাবে তাকে কাঁদতে ওয়াঙ দেখেনি কখনো।

—'ছেলেরা ভয়ংকর নিষ্ঠুর। বুড়োদেরই আমি পছন্দ করি।'

পরের দিন সকাল হলে দেখা গেল, ছোট ছেলেটি চলে গেছে বাড়ী থেকে। কোথায় তা কেউ জানে না।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

রূপকাহিনীর গল্প

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রূপকাহিনীর গল্প বলো :
রাজার কুমার, রাজার মেয়ে, আজকে তাদের কি হ'লো?
কোন্ বাসুকির সুপ্ত ফণায় বসুন্ধরা দোল দোলে?...
ষোড়শী সে রাজকন্যার বয়েস কি সত্যিই ষোলো?

মিষ্টি ফলের গন্ধ পেয়ে রাজকন্যে ভুললো কি?
ঝড় যে আসে আকাশ ছেয়ে!...সাপের ফণা দুললো কি?
বাসুকি তার বুকের খাঁচায় বিষের জোয়ার তুললো কি?
আদম আজো ইভ্‌কে শুধায় ভালোবাসার মূল্য কি?

দোহাই তোমার, সে রূপকথার গল্প বলো!—
ষোলো বছর বয়েসেতেই রাজকন্যের চোখের কোণে

নিরক্ষর

শ্রীচরণদাস ঘোষ

এগারো

মলিনের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

যে দিন শেষ হয়, তার পরদিনই বীণা নির্ম্মলকে কহিল, "আজ একবার দাদুকে 'ফোন' করো ত!"

"কেন?"

"মলিনকে বাড়ী পাঠাতে হবে।"

নির্ম্মল একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "এই তো সবে পরীক্ষা হলো—থাক্ না দু'দিন। এসে পর্য্যন্ত বই আর বই, পড়া আর পড়া—এইবার কলকাতার সব দেখুক্ শুনুক। ছেলেমানুষই তো?"

বীণা গম্ভীর ভাবে কহিল, "না। মায়ের ছেলে।"

নির্ম্মলের আর কথা চলিল না। দাদু আসিলেন, তিনিও কোন প্রতিবাদ করিলেন না। ঠিক পরের দিনই কুঞ্জ মলিনকে লইয়া যাত্রা করিল। মলিনের জামা-কাপড়, বই-পত্র, খাতা-পেন্সিল—কিছুরই চিহ্ন আর এ-বাড়ীতে রহিল না।

যখন ইহারা ট্রেণ হইতে নামিল, তখন অপরাহ্ণ। এতক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া আসিয়াছে, কেহ কাহারো সঙ্গে কথা কহে নাই। কিন্তু, এক্ষণে দেখা গেল, মলিনের মুখে যেন এক কালো ছায়া পড়িয়াছে। সহসা বলিয়া উঠিল, "কুঞ্জদা, ওই যে দেখ্‌ছ মাঠটা—ওই ধূ-ধূ করছে, ওর ও-পারেই আমাদের গাঁ। আমি একলাই চিনে যেতে পারবো!"

কুঞ্জ মলিনের দিকে তাকাইয়া বিস্ময়ে কহিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাবো না, এই বল্‌ছ?"

"ভারি তো রাস্তা!"

"কিন্তু, এই মোট-ঘাট?"

মলিন অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল, "তুমি যদি আমার মাথায় তুলে দাও, আমিই নিয়ে যেতে পারি!"

কুঞ্জ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "দাদা বাবু, কলকাতার মা—তাঁকে তোমার মনে পড়ছে না?"

মলিন অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। পরক্ষণেই আবার ফিরিয়া কহিল, "তুমি বুড়োমানুষ কি না, তাই বল্‌ছি।"

যে-কারণেই হোক্, কুঞ্জর চোখে একটু জল আসিয়াছিল, যে-কথাটা মলিন কহিল, তাহার কোন জবাব না দিয়াই কুঞ্জ কহিল, "দাদা বাবু, এক বেলা না যেতেই অমন মাকে তুমি ভুলে গেলে?"

"কুঞ্জদা, চলো—বেলা যে পড়ে গেল!"—মলিন থাম্‌কা কুঞ্জকে তাড়া দিয়া উঠিল।

কুঞ্জ ঈষৎ হাসিয়া মোটটা তুলিয়া লইয়া কহিল, "তুমি বলো, আর নাই বলো—একলাটি তোমাকে এখানে ছেড়ে দিয়ে আমি কলকাতায় ফিরবো, তা' পারবো না! ফিরে গিয়ে যাঁর কাছে [illegible] তাঁকে [illegible] আমি তো চিনি!"

নিঃশব্দে উভয়ে চলিতে লাগিল—মলিন অগ্রে, কুঞ্জ পশ্চাতে। মলিন রাস্তা চলে আর মাঝে মাঝে কুঞ্জর দিকে ফিরিয়া তাকায়, আর অম্‌নি তাহার মুখখানা শুকাইয়া যায়! কুঞ্জর তাহা লক্ষ্য এড়ায় না—তাহার মনে এক পরিচয়হীন অস্পষ্ট সন্দেহ ওঠে! কিছুতেই সে বুঝিতে পারে না—কেন?

গ্রামের কাছাকাছি হইয়াই মলিন হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "বাড়ীতে আমার মা আছেন, জানো, কুঞ্জদা! তিনি এক্‌লা আর বড্ডো বুড়ো হয়েছেন!" কুঞ্জর দিকে ফিরিয়া তাকাইল।

বোধ করি ও-কথার জবাব দিবার কিছুই ছিল না, তাই কুঞ্জ নিঃশব্দে রাস্তা চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গিয়াই মলিন পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "মা কি করেন, জানো—এক বেলা কোরে রাঁধেন। রাত্রে আর রান্নাবান্না করতে পারেন না—ও-বেলাকার ভাত থাক্‌তো—আমি রাত্রে তাই খেতাম। বুড়ো মানুষ কি না।" এবার আর এদিকে তাকাইল না!

এতক্ষণ যে সন্দেহ অস্পষ্ট মূর্ত্তি ধরিয়া কুঞ্জের মনের ভিতর উঁকি মারিতেছিল, তাহা এইবার সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। মলিনদের সাংসারিক অবস্থা যে শোচনীয়, কুঞ্জ তাহা শুনিয়াছে, এক্ষণে সে আর-একটু বেশি করিয়াই বুঝিতে পারিল যে, এমন কি তাহাদের গৃহে কোন না কোনো বাড়তি লোকের আবির্ভাব হইলে তাহাদের আতিথ্য-সামর্থ্য বিকল হইয়াই পড়ে! এই আশঙ্কাতেই মলিন তাহাকে ষ্টেশন হইতেই বিদায় দিতে চাহিয়াছিল। কুঞ্জ যেন কিছুই বুঝিতে পারে নাই, এম্‌নি ভাব দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি কি মনে করো, দাদা বাবু, আমি তেনাকে রাত্রে আমার জন্মে ভাত চড়াতে দেব?—মাইরি আর কি! এম্‌নিই লম্বা কোরে তোমার এক গপ্‌পো ফাঁদবো—বাস্, রাত কাবার! তার পর ভোর হতে যা দেরি—দে লম্বা!" বলিয়াই গলায় জোর দিয়া হাসিয়া উঠিল!

মলিন আর কথা কহিল না, মুখ নীচু করিয়া পায়ে জোর দিল।

বেশি দূর নয়, কয়েক পা গিয়াই তাহাদের গ্রাম। গ্রামে উঠিয়াই মলিন থমকিয়া দাঁড়াইল। কুঞ্জর দিকে ফিরিয়া নিম্নকণ্ঠে কহিল, "এই আমাদের গাঁ!" বলিয়াই গ্রামের এক প্রান্ত দিয়া, লোকের আনাচ-কানাচ ভাঙিয়া, বন-ঝোপ—আগাছা সরাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

কুঞ্জ দাদা বাবুর রকম দেখিয়া কহিল, "রাস্তা কৈ, দাদা বাবু?"

"রাস্তা?"—মলিনের সম্মুখেই একটা কচার ঝোঁপ ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, মলিন দুই হাত দিয়া তাহা সরাইয়া রাস্তা করিতে করিতে জবাব দিল, "এই যে এই—এই রাস্তায় টপ কোরে গিয়ে পড়বো।"

প্রতিবাদ করা নিষ্প্রয়োজন। কুঞ্জ নিঃশব্দে পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিল।

"উ-হু-হু! গেছি, দাদা বাবু, গেছি—"

"কি হলো—"

"পড়ে গেছি!"

একটা পোড়ো বাড়ী, তাহার ভগ্ন প্রাচীর—উঁচু-নীচু, তাহার উপর সন্ধ্যার ঝাপ্‌সা অন্ধকার—মলিন তাহা টপকিয়া-টপকিয়া হুহু করিয়া চলিতেছিল, কুঞ্জও যেমন মলিনের পায়ের টানে দ্রুত পা [illegible]

মলিন অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি কুঞ্জকে ধরিয়া তুলিয়া কহিল, "আর এসে পড়েছি!"

কুঞ্জরও পল্লীগ্রামে বাড়ী, এরূপ অভিযান তাহার নিকট বিস্ময়করও নহে, অসঙ্গতও নহে, কিন্তু উহার একটা হেতু থাকে। কিন্তু এই অভিযান—ইহার হেতুই বা কি, সার্থকতাই বা কি, কুঞ্জ তাহা ভাবিয়া পাইল না। পায়ের হাঁটুতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বেশ একটু উষ্ণ কণ্ঠেই কহিল, "আচ্ছা দাদা বাবু, তোমাদের গাঁয়ের ভেতর দিয়ে কি রাস্তা নেই?"

"আছে বৈ কি! অনেকটা হাঁটতে হতো কি না!"

"ছোট্ট একখানা পাড়াগাঁ, দাদা বাবু, দশ কোশ নয়, বিশ কোশ নয়—না-হয় আধ কোশ?"

"ওই রকম!"

"কিন্তু—ওরে বাপ্‌রে"—কুঞ্জ সহসা ভয়ে আঁতকিয়া উঠিয়াই মলিনকে সবলে টানিয়া পশ্চাদ্দিকে খানিকটা ছিট্‌কিয়া আসিল—মলিনের সম্মুখ দিয়া একটা প্রকাণ্ড সাপ খস্ করিয়া সরিয়া গিয়া পার্শ্বের একটা ঝোপের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে! কুঞ্জ মলিনকে বুকের-ভিতর চাপিয়া ধরিয়া আড়ষ্ট কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আর নয় দাদা বাবু, ফিরে চলো—রাস্তা ধরা যাক্!"

ফিরিবার উৎসাহ কিন্তু মলিনের দেখা গেল না! উপরন্তু, সহাস্যে কহিল, "ওখানে—একটি ও থাকে! আমরা বৈঁচি তুলতে এসে কত দিন ওকে দেখেছি! কাউকে কিছু বলে না—বাস্তু সাপ কি না!"

"তবুও তুমি ফিরবে না, দাদা বাবু?"

"অতটা রাস্তা—অন্ধকার! আর তো এসে পড়েছি কুঞ্জদা—ওই তো আমাদের পাড়া, ওই যে আলো!"—মলিন সোৎসাহে অদূরে এক আলোক-শিখার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। কাহার বাড়ীতে বুঝি বা সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলিয়াছে।

কুঞ্জ একটু পূর্ব্বে ভাবিয়াছিল, দাদা বাবুর ওই অভিযানটা তাহার ছেলেমানুষী খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু এক্ষণে সে-ধারণা তাহার মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। স্পষ্ট করিয়াই এখন সে বুঝিতে পারিল, আত্মগোপন করিয়া গৃহে প্রবেশ করাই দাদা বাবুর উদ্দেশ্য। কিন্তু, কেন? অনেক ভাবিতে হয়! কুঞ্জ উপস্থিত সে-ভাবনা চাপিয়া রাখিয়াই মলিনকে কহিল, "আচ্ছা, তুমি আমার পেছুনে থাকো।" বলিয়াই মলিনকে পশ্চাতে রাখিয়া একটা কচার শক্ত ডাল ভাঙিয়া ছপ-ছপ শব্দ করিতে করিতে অগ্রসর হইল।

ক্রমশঃ উহারা একটা পুকুরের পাড়ে গিয়া উঠিল।

মলিন অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "এই আমাদের পাড়া—"

কুঞ্জ পিছন ফিরিয়া একবার মলিনের দিকে তাকাইল। কহিল, "তোমাদের বাড়ী?"

"চলো না—কাছেই।"—মলিন কুঞ্জকে পাশ কাটাইয়া পিছনে রাখিয়া অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল।

পুকুর পার হইয়াই রাস্তা, রাস্তার উভয় পার্শ্বে বাড়ী। মলিন এক বার এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া যেমন পায়ে জোর দিবে, প্রথম বাড়ীখানি হইতেই আচম্‌কায় একটি আলো বাহির হইয়া তাহার সম্মুখেই আকস্মিক মূর্ত্তিটা তাহার চোখে পড়িতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইল, তার পর নিজেকে যেন এক ঝট্‌কা মারিয়া মুখ ফিরাইয়া 'বড়মা'র কাছে ছুট্ দিল।

সন্ধ্যার পর প্রায়ই মলিনদের বাড়ী আলো জ্বলে না। তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়াই মলিনের মা রাত্রির মতো অবসর গ্রহণ করেন, হাতে কাজ থাকে না তো? আজও তেমনি নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন, সহসা ঝড়ের ন্যায় সন্ধ্যা আসিয়া কহিল, "বড়মা বড়মা! মলিনদা—"

"মলিন!"—বড়মা একবার চমকিয়া উঠিয়াই মেয়েটির মুখের দিকে বিহ্বল নেত্রে তাকাইতে লাগিলেন।

ছুলে-বউ প্রতিদিন সন্ধ্যায় আসিয়া বসে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গল্প-সল্প করে, তার পর চলিয়া যায়। সে-ও নিকটে বসিয়াছিল, আকস্মিক হর্ষে ছিলাকাটা ধনুকের ন্যায় ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, "আমাদের মলিন?"

সন্ধ্যার আর তিল-পরিমাণও সময় নাই দাঁড়াইবার! অথচ এই সব রাশি রাশি প্রশ্নের জবাব দিতে হইলে তাহার প্রচুর সময় অপচয় হইত! তাই বুঝি বা সে হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া কহিল, "নয় তো কি!"

"কৈ—"

সন্ধ্যা বাহিরের দিকে একবার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াই পিছন ফিরিয়া ছুট্ দিল। কিন্তু, বেশি দূর নয়, কয়েক পদ গিয়াই পুনশ্চ সে হাওয়ার ন্যায় ফিরিয়া আসিয়া অস্থির গলায় বলিয়া উঠিল, "আলোটা রইলো!" বলিয়াই অদৃশ্য হইয়া গেল।

বাহির হইয়াই সন্ধ্যা ছুট্ দিল সোজা মায়ের কাছে—রান্নাঘরে। মায়ের কানের কাছে মুখ নামাইয়া সংবাদটা দিয়া দিল—মলিনদা!"

সরস্বতী তখন চাটুতে তৈল ঢালিতেছিল—সন্ধ্যা এখনিই মাছ ধুইয়া আনিবে। একবার কন্যার মুখের দিকে আর একবার তাহার হাতের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল—"আলো কৈ?"

"বড়মাকে দিয়ে এলাম! ওঁদের বাড়ী আলো আছে, না—ছাই! মা, মলিনদা—"

কথাটা যেন কানেই পৌঁছে নাই, এমনি ভাব দেখাইয়া সরস্বতী বলিয়া উঠিল, "মাছ ধুতে এখনো যাস্‌নি, বুঝি?"

"কি কোরে যাবো! এই যাচ্ছি—"

প্রস্থানোদ্যতা হইতেই সরস্বতী কহিল, "দাঁড়া"—বলিয়াই ও-ঘর হইতে আর একটি লণ্ঠন আনিয়া সন্ধ্যার হাতের মুঠির ভিতর গুঁজিয়া দিল।

এবার কিন্তু সন্ধ্যা আর নড়িতে চাহে না।

লণ্ঠনের আলো নীচে পড়িয়াছে, সরস্বতীর মুখ তাহার অনেক উপরে। সেই মুখের রঙ-রূপ কি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তবে ইহা অতি স্পষ্ট ভাবেই চোখে পড়িল যে, ওই মুখটির ঠিক সম্মুখেই যে অন্ধকার নামিয়া—তাহা অতিমাত্রায় পাতলা হইয়াই পড়িয়াছে। মৃদু কণ্ঠে কহিল, "মলিন?"

"না-হয়, দেখবে চলো—" কথাটা মুখ দিয়া বাহির করিয়াই পদদ্বয়ে এক অকারণ ঝড় তুলিয়া সন্ধ্যা পুকুরঘাটে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা চোখের বাহির হইতেই মলিনের পায়ের গতি অধিকতর মন্দ হইয়া পড়িয়াছিল। একটা মোড় ফিরিয়াই, তাহাকে—

মলিন সংক্ষেপে জবাব দিল, "আমার মাকে ও 'বড়মা' বলে—সন্ধ্যা।"

অতঃপর উভয়েই নিঃশব্দ হইয়া পড়িল।

আর অধিক দূর যাইতে হইল না, ফুলে-বউ হন্-হন্ করিয়া আলো হাতে করিয়া আসিয়া আনন্দে ও অভিযোগ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এই ঘুরঘুটে অন্ধকার! একখানা পত্তর ত্যাকৃতে তো পারতে মলিন—আমাদের মিনসে আলো নিয়ে যাতো!"

মলিন নিস্তেজ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"মা?"

"ওই—দরজায় দাঁড়িয়ে! গোপাল বাড়ী এলো—মাগী আহ্লাদে আর কি পা তুলতে পারে?—এসো, খুব সাবধান—যে আন্ধোল, সাপ-খোপ!" বলিয়াই ফুলে-বউ রাস্তা দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে আসিতে লাগিল।

সদর দরজার কপাট ধরিয়া মা দাঁড়াইয়া! তাঁহার চতুর্দ্দিকে অন্ধকার, অথচ তিনি নিজে সুস্পষ্ট, যেন একখানা ঘন-ঘোর কালো মেঘ ঠেলিয়া জোর রবিরশ্মি ফুঁড়িয়া বাহির হইয়াছে!

মলিন মায়ের পদধূলি গ্রহণ করিল।

মা চুমা খাইয়া ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "কেমন পরীক্ষা দিলি, বাবা? সব লিখতে পেরেছিস্?"

"বড়মা যেন কী! আর তর সইছে না!"—বিদ্যুতের ন্যায় সন্ধ্যা একবার দেখা দিয়াই কোথায় আবার মিলাইয়া গেল।

বড়মা এ-দিক্ ও-দিক্ তাকাইয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "কে, সন্ধ্যা?—আয়, আয়! ভাঁটুকে ডাক্—"

"ভাঁটু প্রেজেন্ট, বড়মা!"—এক-মুখ হাসিয়া ভাঁটু মলিনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর মলিনের দিকে ফিরিয়া কহিল, "কি রে মলিনদা—ছিলি কেমন?" পর-মুহূর্ত্তেই আবার বড়মার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, "মলিনদাকে কি তুমি জিজ্ঞেস্ করছিলে, বড়মা—সব লিখতে পেরেছে কি না? যার—হাতে গণেশ, মাথায় সরস্বতী, সে তোমার ওই সব কথার কি উত্তর দেবে, বল তো?" বলিয়াই ফুলে-বৌয়ের হাত হইতে লণ্ঠনটা টানিয়া লইয়া মলিনের হাত ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

বারো

প্রভাত হইবা মাত্র মলিনের মা গ্রামের কালীতলা, শিবতলা ও অন্যান্য দেবদেবীর স্থান হইতে 'মৃত্তিকা' আনিয়া মলিনের ললাটে ও মস্তকে ছোঁয়াইয়া দিলেন। তার পর মলিনকে কহিলেন, "মলিন, আজ একটা কাজ করিস্ তো বাবা, নিবারণকে একখানা দরখাস্ত দিয়ে আসবি—"

"কিসের?"

"নিবারণ আমাদের টেক্স ফেলেছে—আট আনা। আমাদের কোন কালে টেক্স ছিল না—গরীব মানুষ আমরা!"

এই সময় কুঞ্জ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবার জন্য কাপড়-গামছা বাঁধিতেছিল। মলিন একবার সেই দিক্‌টায় তাকাইয়াই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কাকা বাবু এবার না কি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন?"

"নইলে টেক্স পড়ে আমাদের?"

ইত্যবসরে কুঞ্জ প্রস্তুত হইতেই মলিন শশব্যস্তে কহিল, "কুঞ্জদা,

মলিনের মা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। কুঞ্জর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "ও কি? তোমার মজুরি দেওয়া হলো না? ও-বেলা আমি যেখান থেকে পারি আন্‌বোই—কাল যেয়ো, বাবা!"

কুঞ্জ এক-মুখ হাসিয়া মলিনের মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "ও-কথা মুখে উচ্চারণ করো না, মা! আমার মনিব শুনলে আমাকে খুন করবে—তাঁকে তুমি তো চেনো না, মা!"

বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইতেই মলিনের মা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "তবে একটু দাঁড়াও, বাবা!" অদূরে কর্ম্মনিরতা ফুলে-বউকে ডাকিয়া কহিলেন, "দু'টি পয়সা আছে, ফুলে-বউ? দে তো—ছেলেকে দিই, রাস্তায় মুড়ি-মুড়কি কিনে খাবে—"

কুঞ্জ প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া মুখখানা আড়ষ্ট করিয়া বলিয়া উঠিল, "কিছু না—কিছু না! বাপ রে! আমার মনিব একটি কাঁচা-খেকো দেবতা!" চট্ করিয়া মলিনের দিকে ফিরিয়া কহিল, "দাদা বাবু, মাকে চিঠি-পত্তর দিয়ো—" আর দাঁড়াইল না।

কুঞ্জ চলিয়া গেল, মলিন আর সে-দিকে তাকাইল না। কাগজ-কলম আনিয়া তাড়াতাড়ি দরখাস্ত লিখিতে বসিল। কিন্তু কাগজে কালির আঁচড় পড়িবার পূর্ব্বেই, মা দ্রুতপদে একটি বাটি করিয়া কলা ও গুড়-মিশ্রিত চাল-ভিজানো আনিয়া কহিলেন, "আগে একটু জল খা তার পর যা-হয় করিস্।" বলিয়াই পাত্রটি সুমুখে ধরিয়া দিলেন।

এই জলখাবার মলিনের নিকট নূতনও নহে, অখাদ্যও নহে। পাত্রটা তুলিয়া লইতেই কোথা হইতে সন্ধ্যা আসিয়া দাঁড়াইল—তাহার এক হাতে চায়ের কেৎলি অপর হাতে একটি কাপ। মিনিট খানেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া খাম্‌কা হাসিয়া উঠিল, তার পর বড়মায়ের দিকে তাকাইয়া কহিল, "হ্যাঁ, বড়মা, চায়ের সঙ্গে চাল-ভিজোনো কেউ খায়? আচ্ছা তুমি ত পাড়াগেঁয়ে!" বলিয়াই মলিনের হাত হইতে বাটিটা কাড়িয়া লইল।

ফুলে-বউ উঠান ঝাঁট দিতেছিল, সন্ধ্যা আসিতেই সে এদিকে আসিয়া দাঁড়াইল। গম্ভীর ভাবে কহিল, "সন্ধ্যে-মা এক-একটা যা বাক্যি বলে তা যেন শাস্তর! সত্যি বাছা, ছেলে কলকেতা থেকে ঘুরে এলো, তার মুখে কি না দুঃখীর খাবার? চাল ক'টা গুঁড়িয়ে দু'টো কলা দিয়ে দু'খানা বড়া সেঁকেও দিলে তো পারতে!" বলিয়া মলিনের মায়ের দিকে এক তীব্র অনুযোগ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

মলিনের মা কি বলিতে যাইবেন, আর বলা হইল না—ঝড়বেগে সরস্বতীর আকস্মিক আবির্ভাবে সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে ফিরিল। কাপড়-ঢাকা দিয়া কি আনিয়া সরস্বতী সন্ধ্যাকে বলিয়া উঠিল, "চা এখনো দিস্‌নি তো?" বলিয়াই এক বাটি হালুয়া বাহির করিয়া মলিনের সুমুখে ধরিয়া দিল। তার পর মলিনের মায়ের দিকে ফিরিয়া কহিল, "রাত্রে আর আসতে পারিনি, দিদি। শুন্‌লাম বটে—মলিন এসেছে! এখন ভালো কোরে পাশ করুক্—মা-কালী তোমার মুখ রাখুন!"

মলিন তাড়াতাড়ি উঠিয়া সরস্বতীর পদধূলি গ্রহণ করিল।

মলিনের মায়ের চক্ষুর্দ্বয় ছল্-ছল্ করিয়া উঠিল। কহিলেন, "তোরা ভাই আশীর্ব্বাদ কর। আমি আর কি বলবো, বল্।"

এদিকে আর এক জনের চক্ষুর চোখ তখন মলিনের উপর

হইয়া কহিল, "নাও, বাবা, একটু জল খেয়ে নাও। সন্ধ্যা, তুইও তো বেশ, চা নিয়ে বসেই রইলি ?"

সন্ধ্যা পাকা গিন্নীর মত জবাব দিল, "আগে চা, না, আগে হালুয়া ? খালি পেটে চা কেউ তো খায় না !"

সরস্বতী আর দাঁড়াইল না—হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

ভুলে-বউ এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। বলিয়া উঠিল, "আমি বলনু তো—সন্ধ্যে মা'র বাক্যিও যা, শাস্তরও তা !"

মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না কেবল মলিনের ও তাহার মায়ের। মা 'চাল-ভিজানোর' বাটিটা উঠাইয়া লইয়া গেলেন এবং মলিন ঘাড় হেঁট করিয়া হালুয়ার পাত্রে হাত দিল। অতঃপর দরখাস্তখানা লিখিয়া লইয়া 'প্রেসিডেণ্ট-আফিসে' যাত্রা করিল।

* * *

নিবারণের বহির্বাটীতেই ইউনিয়ন বোর্ডের আপিস। মলিন আসিয়া দাঁড়াইতেই সেক্রেটারী তারিণী ভট্‌চায রুক্ষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কি হে ছোকরা, তোমার কি ?"

নিকটেই একটি অর্দ্ধবয়সী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া ছিল—চাঁড়াল-বউ। তাহার স্বামীর নাম হরিদাস। হরিদাস লাঠিয়ালের সর্দ্দার। তাহার তিনখানা লাঙ্গলের চাষ, দশ-পনেরটি গরু, গোলাবাড়ীতে পাঁচ-ছয়টি বড়-বড় ধানের গোলা। চাঁড়াল-বউ মলিনকে দেখিয়াই সহর্ষে জিজ্ঞাসা করিল, "মলিন ?—কবে এলে বাবা, তুমি ?"

"কাল।"

"বেশ, বেশ। মায়ের কোল-জোড়া হয়ে বেঁচে থাকো। সোনার দোয়াত-কলম হোক্।"

নিবারণ কিন্তু মলিনকে যেন দেখিয়াও দেখিল না। ব্যস্ত হইয়া চাঁড়াল-বৌকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি, চাঁড়াল-বউ ?"

চাঁড়াল-বউ সহসা উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "আমাদের টেক্স ফেলা হয়নি কেন ?—আমরা কি 'বারারির' বার ?"

নিবারণ থতমত খাইয়া গেল। সহসা কোন জবাব দিতে পারিল না। হরি সর্দ্দারকে হাতে রাখিবার জন্যই সে তাহার টেক্স বাদ দিয়াছে, নতুবা এই অবস্থাপন্ন লোকটার টেক্স কখনোই আইন মতে বাদ পড়ে না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "বলছি—" বলিয়াই মলিনের দিকে ফিরিয়া কহিল, "ওহে, তুমি বাইরে যাও দিকিনি—"

"কেন—উনি বাইরে যাবে কেন ? যা বলবে, সকলকার সামনে বলো—আমরা কি তোমাকে ঘুষ দিয়েছি ?"—চাঁড়াল-বউ যেন ক্ষেপিয়া উঠিল।

নিবারণের মুখখানা এতটুকু হইয়া গিয়াছিল, ব্যস্ত-বিব্রত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আরে, ছি-ছি ! কি কথা যে বলো ! তবে কি না—"

"এ্যাকা-ব্যাকা কথা রাখো, ঠাকুর ! সাফ সাফ কথা কও—টেক্স বাদ আমার কেন পড়ে ? বলি, আমরা রক্কেকালী পুজো, সরস্বতী পুজো, যাত্রা-থিয়েটার—এ-সবের চাঁদা দিই নে ? আজ তুমি প্রেসিডেন্ হয়েছ, হয়ে 'হরি সর্দ্দারকে' বারারি থেকে বার কোরে দিতে চাও ?—এই চল্লাম আমি কাছারীর হাকিমের কাছে !"—চাঁড়াল-বউ নিবারণের প্রতি এক অগ্নি-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াই মলিনের দিকে ফিরিয়া কহিল, "মলিন, তুমি সাক্ষী—"

"আরে, শোনো—শোনো—" নিবারণের বুক উড়িয়া গিয়াছিল, পুজুলের কাপড়খানা সামলাইতে সামলাইতে উঠিয়া চাঁড়াল-বৌয়ের সম্মুখে আসিয়া বলিয়া উঠিল, "শোন, হরি সর্দ্দার হচ্ছে বারারির এক জন হেড পাণ্ডা, তাকে বার কোরে দেবো বারারি থেকে ?—শ্রীবিষ্ণু, শ্রীবিষ্ণু ! কি যে বলো ! টেক্স—আচ্ছা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা—বলো ক'টাকা ফেল্‌তে হবে !"

"এখন পথে এসো ! বলি, তোমার টেক্স কত ?"

"আমার ?—সাত টাকা।"

"হরি সর্দ্দারের ফেলো সাড়ে তিন !"—চাঁড়াল-বউ একটু পিছাইয়া গিয়া একখানা টুলের উপর বসিয়া সুরু করিল, "তোমরা গাঁয়ের কর্ত্তা—তোমাদের কি চোখ আছে, তোমাদের চোখ নেই ! আমাদের ষাট বিঘে জমি, কোন্ আক্কেলে আমাদের টেক্স বাদ দিলে ? আর যাদের কিছু নেই, তাদের বুকের ওপর যাঁতা বসাও, তাদের পাঁজরা ভাঙো !"

মলিন এতক্ষণ নিথর হইয়া তারিণীর সেরেস্তার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ হাত হইলে দরখাস্তখানা তার সুমুখে পড়িয়া গেল। তারিণী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মলিনের দিকে একবার তাকাইল, তার পর দরখাস্তখানা উঠাইয়া লইয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "টেক্স মকুব—আবদার !"

চাঁড়াল-বৌয়ের দৃষ্টি এ-দিকে পড়িল।

মলিন বিনীত কণ্ঠে কহিল, "আমাদের টেক্স আগে তো ছিল না !"

"ছিল না, হয়েছে।"

"হুঁ ! তা' হবে বৈ কি !"—চাঁড়াল-বউ উঠিয়া তারিণীর কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল, "ওদের কি 'আহাল' আছে, বল তো ঠাকুর ?"

মলিন—ইহারা দীন দরিদ্র, সহায়-সম্বলহীন ! সুতরাং জনসমাজের সহানুভূতি ইহাদের উপর থাকিতে পারে না, ইহাই ছিল তারণীর দৃঢ় ধারণা। এক্ষণে চাঁড়াল-বউকে মলিনের দিকে এম্‌নি ভাবে ঝুঁকিতে দেখিয়া সে দমিয়া গেল। একবার নিবারণের দিকে অসহায়ের ন্যায় তাকাইয়াই জবাব দিল, "কোম্পানীর রাজত্ব কি না !"

চাঁড়াল-বউ ঘা দিয়া কহিল, "কোম্পানীর রাজত্বি ! তাই গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে একটু ঠাঁই পায় না—গাঁয়ের স্কুলে ভিন্ গাঁয়ের ছেলের যায়গা হয়, আর গাঁয়ের ছেলের একটু হয় না ! তার মানে—ও গরীব, দুর্ব্বল—ওর হয়ে লাঠি ধরবার কেউ তো নেই।" তাহার মুখখানা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মুখটা নিবারণের দিকে ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, "মলিনদের কত টাকা টেক্স ?"

নিবারণ তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "আট আনা।"

"হুঁ !"—চাঁড়াল-বউ নিবারণের দিকে এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়াই প্রশ্ন করিল, "আর, এই পাড়ার হরেন ঘোষের ?"

"খাতা দেখে বল্‌তে পারি !"

"ষষ্ঠী মিত্তিরের ?"

"তা কি মনে আছে ?"

"হারু ভট্‌চায—তার ?"

নিবারণ শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল, "খাতা দেখে সব বল্‌বো ?"

"না। তোমার মনে আছে কি না, তাই বলো ?"

"মনে কি থাকে ?"

চাঁড়াল-বউ এক বিকট হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "কেবল তোমার মনে আছে—এদের। বলি, কোম্পানীর রাজত্বি কি না ! শোনো, ঠাকুর"—মলিনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "ওনাদের টেক্সো 'হরি সর্দ্দার' দেবে।"

"হরি সর্দার ?"—নিবারণ চমকিয়া উঠিল।

চাঁড়াল-বউ দৃঢ় অথচ প্রশান্ত কণ্ঠে কহিল, "হাঁ! সাড়ে তিন আর আধ—পুরোপুরি চার ট্যাকা!" বলিয়াই অগ্নিগোলকের ন্যায় চলিয়া গেল।

মলিনও আর অপেক্ষা করিল না।

অতঃপর দিন যায়—দিনের পর দিন। পরীক্ষার ফল বাহির হইবার দিন ঘনাইয়া আসিল। পরীক্ষা-মন্দিরের প্রশ্নোত্তর সম্বন্ধে যে সব আলোচনা ছেলেদের ভিতর এত দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল, তাহা ক্রমশঃই মন্দ হইয়া আসিল—সকলেরই মুখে সংশয় ও সন্দেহের ছায়া।

এক দিন ভাঁটু একখানা সংবাদপত্র হাতে করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া মলিনকে কহিল, "ওরে, আস্‌ছে সোমবারে রেজাল্ট ওয়াল্‌আপ হবে—এই দেখ!" বলিয়া সংবাদপত্রখানা মলিনের সুমুখে ফেলিয়া দিল।

মলিন সংবাদটুকুর উপর চোখ বুলাইয়া কহিল, "আজ শনিবার! তাহলে—পরশু ?"

"হ্যাঁ! তুই কাউকে 'রোল-নম্বর' দিয়ে এসেচিস্ ?"

ছায়ার ন্যায় সন্ধ্যাও ভাঁটুর সঙ্গে আসিয়াছিল, মলিন মুখ খুলিবার পূর্ব্বে সে যেন বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, "ছাই দিয়ে এসেছে।"

ভাঁটু সহাস্যে সন্ধ্যার দিকে একবার তাকাইয়াই মলিনকে কহিল, "হ্যাঁ রে, সত্যি ? দিয়ে আসিস্‌নি ?"

"না।"—মলিন হাসিয়া ফেলিল।

ভাঁটু চটিয়া উঠিল। কহিল, "আচ্ছা তো ষ্টুপিড্ তুই!"

মলিনের মা অদূরেই কি-একটা কাজে বিব্রত ছিলেন, সংবাদপত্র লইয়া ইহাদের জটলা দেখিয়া দ্রুতপদে এদিকে আসিয়া ভাঁটুকে ত্রস্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাটু ? পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে ?"

ভাঁটুর মনটা বিষিয়ে ছিল, বড়মার দিকে ফিরিয়া তিক্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সেই কথাই তো হচ্ছে, বড়মা—পরশু সোমবারে বেরুবে। তা' মলিনদা এম্‌নি—ছ্যাঃ, কাউকে যদি 'রোল-নম্বরটা' দিয়ে আসে!"

"তুই দিইচিস্ ?"—মলিন মৃদু প্রশ্ন করিল।

ভাঁটু তৎক্ষণাৎ গলায় জোর দিয়া জবাব দিল—"তোর মতন কি ? বাবা কলকাতায় এই লোক পাঠালেন। সোমবারেই স্কুলের সকল ছেলের খবর পাওয়া যাবে।"

মলিনের মা ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আহা-হা! নিবারণ যদি মলিনের খবরটাও জান্‌তে দিত। তুই বল্‌লি নে কেন, ভাঁটু, নিবারণকে ?"

"না, বড়মা!"—ভাঁটু নিম্ন কণ্ঠে কথাটা বলিয়াই মুখ নীচু করিয়া চলিয়া গেল।

সোমবারে সন্ধ্যার আলো জ্বলিতে-না-জ্বলিতেই কলিকাতা হইতে লোক ফিরিয়া আসিল—ভাঁটু পাশ করিয়াছে, স্কুলের আরও অনেক ছাত্র।

সংবাদ পাইয়াই মলিন ভাঁটুর কাছে—তাহাদের বাড়ী ছুটিয়া গেল। বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য—নিবারণের খাতক ও অনুগত বহু লোক জয়ধ্বনি করিতে আসিয়াছে। নিবারণ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া স্বয়ং মিষ্টান্ন বিতরণ করিতেছে। এক-একটি ছাত্র, সে যেন ক্ষণজন্মা—এম্‌নিই এক-একটি হর্ষকম্পিত মূর্ত্তির উপর প্রত্যেক দর্শকের বিস্ময়-দৃষ্টি নিপতিত। ছাত্রেরাও উৎকট-আনন্দে মাতোয়ারা—হাসির উচ্চ রোলে বাড়ীখানা বিদীর্ণ করিয়া তুলিতেছে। মলিন এই ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করিয়া ভাঁটুর হাত দুইটা মুঠিয়া ধরিয়া হর্ষোচ্ছ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ ডিভিশনে, ভাই ?"

ভাঁটু তাহার মুখের দিকে তাকাইল। স্পষ্টই দেখা গেল, এই এত বড় আনন্দ তাহাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে নাই। অন্যমনস্ক ভাবে কহিল, "সেকেণ্ড ডিভিশন। তুই কি 'ফার্ষ্ট ক্লাস ফুল'।"

তখন ছেলেরা মিষ্টান্নের পাতা ছাড়িয়া উঠি-উঠি করিতেছে, এমন সময় সরস্বতী দ্রুতপদে এক ঝুড়ি লুচি আনিয়া বলিয়া উঠিল, "উঠো না, উঠো না; মিষ্টিমুখ হলো, এইবার দু'খানা—" হঠাৎ মলিনকে দেখিতে পাইয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিল, "মলিন ?—ওরে, ও সন্ধ্যা, সন্ধ্যারাণি—তোর মলিন দাদাকে একখানা পাতা দিস্‌নি ?"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। এদের আগে হয়ে যাক্—এদের নেমন্তন্ন করা হয়েছে।"—ও-ঘর হইতে গর্জ্জন করিতে করিতে নিবারণ বাহির হইয়া আসিল।

সরস্বতী আর কথা কহিল না। বাঁ হাতে মাথার কাপড়টা টানিয়া অগ্রসর হইয়া ছেলেদের পাতে যেমন লুচি ফেলিতে যাইবে, ছেলেরা সকলেই দল বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া কহিল—"আর নয়।"

নিবারণ হাঁ-হাঁ করিয়া বলিয়া উঠিল, "সে কি হে ? তোমরা পাশ করেছ।"

একটি ছাত্র বিনীত কণ্ঠে কহিল, "আর গলা দিয়ে নামচে না স্যার!"

সরস্বতী পিছন ফিরিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

নিবারণ আর একটু সরিয়া আসিয়া কহিল, "তবে থাক্। আবার অসুখ-বিসুখ করবে।" অতঃপর মলিনের দিকে এক বিদ্রূপ কটাক্ষ করিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখলে হে, ছোক্‌রা ? যারা পাশ করে, তাদের 'অনার' কত ?"

এই উক্তিতে যে শ্লেষ ছিল, তাহা ভাঁটুর বুঝি বা সহ্য হইল না। একান্ত নম্র কণ্ঠে কহিল, "মলিনদা যে পাশ করবে না, তাই বা কে বল্‌তে পারে, বাবা ? 'রেজাল্ট' তো সবে আজই বেরিয়েছে।"

এতক্ষণ ধরিয়া আর একটি মূর্ত্তি ভিতর দিকের দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—স্থির, নিথর। সে সন্ধ্যা। ভাঁটুর কথাটা শেষ হইতে না হইতেই, ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল, "উনি আবার পাশ করবেন,—সন্দেশ খাবেন!"

"ঠিক বলেছিস্, সন্ধ্যা!"—নিবারণের এক ক্রূর হাসির কালো রঙে ঘরখানা যেন অন্ধকার হইয়া গেল। মলিনকে লক্ষ্য করিয়া আর একটা তীর ছুড়িল। কহিল, "পরের বাড়ী ফ্যান চেটে যদি কেউ ম্যাট্রিক পাশ করতো, তা হলে দুলে-পাড়ার কেউ হেলে গরুর লেজ মল্‌তো না! কি বলিস্, সন্ধ্যা ?"

"আচ্ছা, গুড্ নাইট—" ছেলের দল একবার ভাঁটুর দিকে তাকাইয়া কপালে আঙুল ঠেকাইয়া বাহির হইয়া গেল।

মলিনের মাথাটা যেন মাটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল, তাহার মনে হইতেছিল—পদতলের মৃত্তিকা বুঝি বা হু-হু করিয়া সরিয়া যাইতেছে। সে-ও আর দাঁড়াইতে পারিল না—এক-পা এক-পা করিয়া পা বাড়াইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

রাত্রি তখন অনেক হইয়াছে, কত হইয়াছে, তাহার ঠিক নাই, কপাটে করাঘাত শুনিয়া মলিনের মা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কে ?"

"আমি সন্ধ্যা—খোলো না কপাটটা, বড়মা ?"

বড়মা কপাট খুলিতেই, সন্ধ্যা কলার পাতা করিয়া খান কতক লুচি ও কয়েকটি সন্দেশ ঘরের মেঝেয় ফেলিয়া রাখিয়াই অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই ঘটনার পর আরও দুই-এক দিন অতিবাহিত হইল, মলিনের পরীক্ষার সংবাদ আর আসে না। গ্রামের লোক নিঃসংশয়েই সিদ্ধান্ত করিল—ছেলেটা অকৃতকার্য্য হইয়াছে। নিবারণ বুক তাজা করিয়া বলিয়া বেড়াইল—"আরে! ও যদি পাশ করতো, হাওয়ায় খবর আসতো!" কথাটা দুলে-বৌয়ের কাণে উঠিল। বাড়ী আসিয়া বিষণ্ণ মুখে মলিনের মাকে কহিল, "মলিনের মা, ছেলেকে আর শুনিয়ো না—সবাই বলছে, মলিন 'ফেল' করেছে!"

মলিনের মায়ের চোখ দুইটা সহসা যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সতেজ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ফেল করবে আমার মলিন!—কথখনো না!"

মলিনের মায়ের এরূপ মূর্ত্তি দুলে-বৌয়ের চোখে আর কোনোও দিন পড়ে নাই। সে থতমত খাইয়া গেল।

মলিনের মা উপর দিকে একবার তাকাইয়া কাহার উদ্দেশে কপালে হাত ঠেকাইয়া পুনশ্চ দীপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মলিন যদি 'ফেল' করে, তা'হলে আমি তার মা নই—আমি মিথ্যে!"

"আমিও!" সহসা দুলে-বৌয়ের বুকের ভিতর যেন একটা দমকা ঝড় ঢুকিয়া তাহার এই একটু পূর্ব্বেকার ভাঙা মনকে জুড়িয়া বজ্রের ন্যায় তাজা করিয়া তুলিল। দীপ্ত কণ্ঠে সুরু করিল, "তা হলে আমারও পেটের সন্তান আর হাতের নোয়া—এ দুই-ই মিথ্যে, মলিনের মা!" বলিয়াই মলিনের মায়ের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল।

আরও একটা দিন কাটিয়া গেল। আজ ভাঁটুদের বাড়ী মহা সমারোহে সত্যনারায়ণ পূজা। গ্রামের সমস্ত লোকেরই নিমন্ত্রণ হইয়াছে! পুত্রের কল্যাণ—সরস্বতী স্বয়ং বাড়ী-বাড়ী গিয়া সকল গৃহস্থকেই আহ্বান করিয়া আসিয়াছে, ফলে কেহই অনুপস্থিত হয় নাই।

মলিন মাকে কহিল, "মা, আমার না গেলে হয় না ?"

মা শিহরিয়া জিভ কাটিয়া কহিলেন, "বাপ রে! ও-কথা কি মুখে আনতে আছে?"

মলিন মায়ের কথার কোনো দিন প্রতিবাদ করে নাই, আজও করিল না। ঘর বন্ধ করিয়া তালা-চাবি দিয়া উভয়েই গেল।

ভাঁটুদের বিস্তৃত গৃহ-অঙ্গনে লোক আর ধরে না! পুরোহিত পূজায় বসিয়াছেন। পূজা সারিয়া এইবার 'কথা' সুরু করিবেন, এমন সময়ে বাইরে সাইকেলের ঘণ্টাধ্বনি হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাফ-পিওন ভিতরে ঢুকিয়া ডাক দিল—"মলিন বাবু এখানে আছেন ?"

মলিন এক ধারে ভিড়ের ভিতর বসিয়াছিল, চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "হ্যাঁ, এই যে!"

"আপনার 'তার'—"

"তার?"—ভাঁটু নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, গোটাকতক লাফ মারিয়া আগাইয়া গিয়া খামখানাকে লইয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিল। অতঃপর প্রচণ্ড হর্ষে চীৎকার করিয়া উঠিল, "বড়মা—"

বড়মা তখন মাটি ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভাঁটু পুনরায় অস্থির কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, "বড়মা, বড়মা—"

বড়মা টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাঁটু যেন আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "বড়মা! মলিনদা ইউনিভারসিটির 'ফার্ষ্ট' হয়েছে!"

"এ্যাঁ! বলো কি!"—নিবারণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রূপা-বাঁধানো হুঁকায় তামাক টানিতেছিল, তাড়াতাড়ি খানিক পিছাইয়া গিয়া ধপ্ করিয়া একখানা চৌকীর উপর বসিয়া পড়িল।

ভাঁটু জনকের দিকে ফিরিয়া স্থির কণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁ, পড়ি শুনুন—" বলিয়া উচ্চ কণ্ঠে প্রত্যেক কথাটির উপর জোর দিয়া টেলিগ্রাম খানা পাঠ করিল—'Goddess Swareswati smiles on you. You stand first in the University. —Nirmal.'" অতঃপর মলিনের দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, "মলিনদা, 'নির্ম্মল'—ইনি কে?"

মলিন সহসা কোন কথা কহিতে পারিল না। তখন তাহার চক্ষু দিয়া হু-হু করিয়া অশ্রু নির্গত হইতেছিল। কাপড়ে নাক ঝাড়িয়া অশ্রুনিরোধ কণ্ঠে জবাব দিল, "যাঁর বাড়ীতে ছিলাম—তিনি!"

[ক্রমশঃ

রঁসার্ হইতে

অনুবাদক—আর্য চক্রবর্তী

বার্ধক্য আসিবে যবে জীবনে তোমার
নিশীথ-প্রদীপ জ্বালি পোড়ো আর বার
আমার কবিতাগুলি, বোলো নিজ মনে
"রঁসার্ গাহিয়াছিল দীপ্ত সে যৌবনে

মোহন বন্দনা মম।" বার্তা অভিনব
শুনিয়া উঠিবে জাগি দাসীবৃন্দ তব,
ভাবিবে তোমার কথা নব সমাদরে
গাথা রচি কবি যারে মৃত্যুহীন করে।

মৃত্তিকার অভ্যন্তরে লয়ে প্রেতকায়া
আমি সুপ্তিমগ্ন রবো, দিবে মোরে ছায়া
মরণ-বীথিকা: অগ্নির সমুখে বসি
জীর্ণ বক্ষ হতে তব পড়িবে কি খসি
দীর্ঘশ্বাস, অতিক্রমি যুগ-ব্যবধান
স্মরি মম দীন প্রেম, তব প্রত্যাখ্যান।

* * * *

জাগো এ যৌবনে তব, অনাগতে ভুলে
জীবনের গোলাপেরে আজ লও তুলে।

তালসোনাপুরের হাজি সাহেব

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

কেবল সূর্য উঠিয়াছে। একখানা পুরাতন জাপানী ছিটের চাদর গায়ে জড়াইয়া হুঁকা হাতে হাজি সাহেব কাছারী-ঘরের সম্মুখের উঠানে বেতের মোড়াটা রৌদ্রে টানিয়া বসিলেন। হুঁকায় কয়েকটা টান দিয়া ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে আরামে তাঁহার ছোট ছোট গোলাকার চোখ দুইটি বুজিয়া আসিল। গত রাত্রের হাঙ্গামার কথা তাঁহার মন হইতে অনেকখানি মুছিয়া গিয়াছে। হঠাৎ একটা গাংচিল চিঁ চিঁ শব্দ করিয়া বেসুরা ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার মাথার উপর দিয়া ভাদাই নদীর দিকে উড়িয়া গেল। এই ভাবে আরামের ব্যাঘাত হওয়ায় হাজি সাহেব ঈষৎ বিরক্ত হইয়া আকাশ পানে চাহিলেন।

ততক্ষণে চিলটি অদূরে ভাদাই নদীর ঘাটে বাঁধা একখানা নৌকার মাস্তুলের উপর যাইয়া বসিয়াছে। সারি সারি তাল গাছের ফাঁক দিয়া ভাদাই নদীর অল্প খানিকটা দেখা যাইতেছিল। উচ্চ পাড়ের নীচে অপ্রশস্ত, বঙ্কিমগতি নদী, দুই রশি যাইতে পাঁচ-পাঁচটা বাঁক। নদী নয় ত—কেহ যেন নদী বরাবর লম্বা কুয়া খুঁড়িয়া রাখিয়াছে, পৌষ মাসেও লগির তিন পোয়া জলে তলাইয়া যায়। সারি সারি তাল গাছের ফাঁক দিয়া হাজি সাহেব দেখিলেন, ঐ একটুখানি নদীতে মাস্তুলের জঙ্গল গজাইয়াছে আর সেই জঙ্গলের উপর গণ্ডায় গণ্ডায় গাংচিল, শালিক, বক, মাছরাঙ্গা উড়িতেছে।

হুঁকায় কয়েকটা টান দিয়া হাজি সাহেব নিজের মনেই বলিলেন—বেবাক বিল-পারের সমুন্দিরা ধানের মরশুমে তাল-সোনাপুর আইস্যা জমায়েৎ হইচেন।

তিনি চারি দিকে একবার দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন, মুখে খানিকটা সন্তোষের হাসি ফুটিয়া উঠিল, গোল গোল চোখ দুইটি নাচিতে লাগিল।

চারি দিকে ধানের পালা। ধান কাটিয়া পালা করিয়া সাজাইয়া রাখা হইতেছে। কি বড় বড় পালা! কাছারী-ঘরের মটকা ডিঙ্গাইয়া পালার মাথা ঠেলিয়া উঠিয়াছে। দেড় গণ্ডা পালা সাজান হইয়াছে, তিনটা ডাহিনে তিনটা বাঁয়ে। এখনও অর্দ্ধেক জমির ধান কাটা হয় নাই। রৌদ্র লাগিয়া কাঁচা সোনার রংয়ের স্তম্ভাকৃতি পালাগুলি চক্ চক্ করিতেছে। পালার গায়ে শীতের রাত্রের শিশির তখনও শুকায় নাই। আলো পড়িয়া বিন্দু বিন্দু শিশির হইতে লাল, নীল, পীত, বেগুনী রশ্মি ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। খড়ের ভিজা, আলুনি একটা গন্ধ চারি দিকের বাতাসে ছড়াইয়া রহিয়াছে।

পরম স্নেহের সঙ্গে পালাগুলির দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে হাজি সাহেবের চোখ জলে ভরিয়া গেল। "আল্লা রহমান" বলিয়া তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন। নিজের মনে মনে বলিলেন,—খোদা পয়দা করেন মাটি আর মাটি পয়দা করে প্যাটের ভাত।

হুঁকা হাতে তিনি মোড়া ছাড়িয়া উঠিলেন। হাতে অনেক কাজ। এক প্রহর রাত থাকিতে গাড়ী আর পাইট রওনা হইয়া গিয়াছে কাঁকালিয়ার মাঠে ধান কাটিতে। দশখানা গাড়ী আর চল্লিশ জন পাইট। এই পঞ্চাশ জন লোকের তিন বেলা খোরাকী দিতে হয়। বিল-পারের লোকগুলার নয় পোয়া চালেও এক জনের তিন বেলা পেট ভরে না। এক একটা রাক্ষস! তার উপর ডাল আছে, পেঁয়াজ আছে, লঙ্কা আছে। দুপুর বেলা আবার মাছ দিতে হয়। জাগর ছোঁড়া জাল লইয়া ভাদাইতে মাছ ধরিতে গেল কি না কে জানে? দুই হাট-বারে কুল্যার হাট হইতে বোয়াল মাছ, শোল মাছ, ফলুই মাছ কিনিতে হয়। এক গণ্ডা করিয়া টাকা খালি মাছেই খরচা হয়। যাওয়ার সময় বেটারা গাড়ী-বোঝাই ধান, ট্যাঁক-ভরতি টাকা লইবে আবার চুরি করিয়া কত যে ধান সরাইবে তাহার ঠিকানা নাই। সব বেটা সয়তানের আণ্ডা, কাজিয়া, দাঙ্গা, ফেসাদ লাগিয়াই আছে নিজেদের মধ্যে। তুচ্ছ কথা লইয়া কাজিয়া বাধায়—আর দেয় কাস্তে চালাইয়া আর একটার কান ঘেঁসিয়া।

—ওরে জহির, ও জহির! বলিয়া হাজি সাহেব কয়েকটা হাঁক দিলেন। কেহ সাড়া দিল না।

হুঁকা হইতে কলকী নামাইয়া হুঁকাটা মোড়ার গায়ে ঠেকাইয়া রাখিয়া তিনি কয়েক পা আগাইলেন।

—আদাব হাজি সায়েব, বলিয়া পিছন হইতে কে চেঁচাইয়া ডাকিল।

হাজি সাহেব ফিরিলেন। নীল কুর্তি গায়ে বুড়া কুদ্দুস চৌকিদার কাঁধে লাঠির সঙ্গে একটা পুটলী ঝুলাইয়া আসিতেছে।

—আদাব কুদ্দুস মিয়া,—বলিয়া হাজি সাহেব আগাইয়া আসিলেন। ফজরেই তালসোনাপুর আইল্যান? যাবান কনে?

বুড়া কুদ্দুস চৌকীদার চট্ করিয়া উত্তর দিল না। অনেক বয়েস হইয়াছে তাহার, চুল, দাড়ী, ভুরু সব পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে। লম্বা মানুষ, কুঁজো হইয়া চলে।—ধীরে ধীরে আগাইয়া কাছারী-ঘরের রোয়াকের কাছে আসিয়া কাঁধের লাঠি হইতে পুঁটুলিটা খুলিয়া নামাইয়া রাখিল, লাঠি গাছটা পাশে রাখিয়া নিজে বসিল। একটু বিশ্রাম করিয়া সে বলিল,—ছোট দারোগা সাহেব আপনার লেগে খত দিল্যান। কলকেটায় কিছু আছে না কি?

ছোট দারোগা সাহেব তাঁহাকে চিঠি দিয়াছেন শুনিয়া হাজি-সাহেবের মুখ গম্ভীর হইল। যত ঝামেলা এই ধান কাটার মরশুমে। যাও এখন দরবার সালিশী করিতে এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে, আর এদিকে বিল-পারের সমুন্দিরা চুরি করিয়া বেবাক্ ফাঁক করিয়া দিক্।

—ওরে জহির, ও জহির!—বলিয়া তিনি আবার হাঁক দিলেন।

জহির হাজি সাহেবের নাতি। সতেরো বছরের জোয়ান, সুশ্রী ছোকরা। মাথার একটু দোষ আছে। ঘোড়ায় চড়িয়া দশ-বিশ ক্রোশ যাইতে বল, জাল ঘাড়ে করিয়া মাছ ধরিতে বল, বৈঠা মারিয়া ভাদাই উজাইয়া বিলে যাইতে বল—কোন আপত্তি নাই, কেবল ধানের তদারক করিতে মাঠে যাইতে নারাজ। রোজ সূর্য উঠিলে সে জাল ও ডিঙ্গি লইয়া ভাদাইতে যায় ধান কাটা পাইটের জন্য মাছের যোগাড়ে।

হাজি সাহেবের মনে পড়িল, কাল জহির জাঁক করিয়া বলিয়াছিল বিল হইতে সাড়ে তিন হাত বোয়াল ধরিয়া আনিয়া সকলকে খাওয়াইবে। আজ দুপুরে আর ও ছোঁড়ার নাগাল পাওয়া যাইবে না—তিনি মনে মনে ভাবিলেন। একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

—ওরে ছলিম ও ছলিম! বেটা কি কানের মাথা খাইচ?—তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন।

ছলিম এক ধানের পালার আড়ালে রৌদ্রে বসিয়া পিঠ চুলকাইতেছিল। ডাক শুনিয়া এক দৌড়ে সে হাজি সাহেবের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

কুদ্দুস মিঞাকে এক কলকী তামাক দিতে আদেশ করিয়া তিনি বলিলেন—চৌকিদারের বেটা, তুমি জিরাও বইস্যা, তার পর বাৎচিৎ হবেক। আমার হাতে অনেক কাম আছে, একটু ঘইরা আসি।

বুড়া কুদ্দুস চৌকিদার রোয়াক ছাড়িয়া হাজি সাহেবের পরিত্যক্ত মোড়াটা টানিয়া রৌদ্রে বসিল। ছলিম কলকী সাজাইয়া হুঁকায় চড়াইয়া চৌকিদারের হাতে দিল। পিঠটা অল্প অল্প তাতিয়া উঠিতেছে ততক্ষণ। হুঁকায় দুই-চারিটা টান দিয়া চৌকিদার খুক্-খুক্ করিয়া কাশিতে আরম্ভ করিল। তাহার সাদা দাড়ি বুক পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, গোঁফ কামানো। তাহার উপরের ঠোঁট নড়িতেছে, কপালের শিরাগুলি নড়া-চড়া করিতেছে, পাকা ভুরুর নীচে ঘোলাটে চোখ দুইটি একবার বুঁজিতেছে আবার খুলিতেছে।

বুড়া কুদ্দুস চৌকিদার কি নিজের মনে হাসিতেছে? কেন হাসিবে না? সাড়ে তিন কুড়ি বয়েসে সে অনেক কিছু দেখিয়াছে বাপ, অনেক কিছু দেখিয়াছে। বিল-পারের সমুন্দিরা ভাদাইয়ের পাড়ে ঘর বাঁধিয়া খেজুরের গুড় বানাইতেছে। সমুন্দিরা এক বদনা রস তাহাকে খাতির করিয়া খাওয়াইছে, গুড়ও দিয়াছে সেরটাক্। রস কি গাঁজিয়া গিয়াছিল? একটু টক্-টক্, মেলাই ফেনা ছিল।

চৌকিদার হুঁকায় আবার কয়েকটা টান দিল। খুক্-খুক্-খুক্! সাড়ে তিন-কুড়ি বয়েস তাহার, কি না সে জানে? আর এই তোমাদের হাজি সাহেব? কদম মোল্লা পয়সা কামাইল কত সব গুনাহের কাম করিয়া। তার পর গেল হজে। আল্লা রহমান কি গুনাহ বরদাস্ত করিবেন? মুম্বাই পৌঁছিয়া হইল কলেরা, সরকারী হাসপাতালে এক মাস ফেলিয়া রাখিল। মুম্বাই হইতে কদম মোল্লা গেল আজমের সরিফে। হজে সে গেল কেমনি করিয়া বাপ্? তার পর ঘুরিয়া ফিরিয়া হাজি দলের সঙ্গে আসিল সহরে। সহর হইতে মুলুকে আসিল হাজি হইয়া। মুম্বাই হাজি কদম মোল্লা আসল হাজি হইয়াছে। বুড়া কুদ্দুস কি না জানে?

ছলিম হাজি সাহেবের ছোকরা চাকর, অত্যন্ত চালাক। চৌকিদারের হাতে হুঁকাটি দিয়া সে কিছুক্ষণ রৌদ্রে দাঁড়াইয়া রহিল। চৌকিদার নিজের মনে হাসিতেছে দেখিয়া সে অনুমান্ করিল, গাঁজিয়া যাওয়া খেজুরের রস খাইয়া তাহার মাথা গরম হইয়াছে—অর্থাৎ বুড়ার একটু নেশা হইয়াছে। ছলিম আস্তে আস্তে সরিয়া আসিয়া কাছারী-ঘরের রোয়াকের উপর বসিল। তার পর নিবিষ্ট মনে পুঁটুলীর মধ্যে কি আছে পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। গুড় আছে দেখিয়া পুঁটুলীটি একটু আলগা করিয়া হাত চালাইয়া খানিকটা গুড় ভাঙ্গিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি একটা ধানের পালার আড়ালে সরিয়া গিয়া একটু মুখে পুরিল।

গুড় চিবাইতে চিবাইতে তাহার মনে পড়িল রাজিয়া বিবির কথা। দিন কয়েক আগে হাজি সাহেব তাহাকে মেথ্ মণ্ডলের বাড়ি হইতে আনিয়াছে। রাজিয়া বিবির সঙ্গে ঘনসির খুব খাতির হইয়াছে। রাজিয়া বিবিকে চুরি করা গুড় খাওয়াইবার জন্য তাহার ভারী ইচ্ছা হইল। অন্দরের দিকে দুই-এক পা বাড়াইয়া আবার পিছাইয়া আসিল। আরে বাপ্, হাজি সাহেব জানিতে পারিলে তাহার পিঠের চামড়া ছাড়াইয়া লইবে। কাল রাতে রাজিয়া বিবিকে লইয়া কি হাঙ্গামা! মেথ্ মণ্ডল রাজিয়া বিবিকে গাঁয়ের পাঁচ-পাঁচটা লোকের সম্মুখে এক, দুই, তিন তালাক দিয়াছে। তবু বোকা মেথ্ বলিয়া বেড়ায়, হাজি সাহেব জোর করিয়া তাহার বিবিকে তালাক দেওয়াইয়াছে। কাল মাঝ-রাতে আসিয়া বোকা মেথ্ রাজিয়া বিবির ঘরে সিঁদ কাটিতেছিল—রাজিয়া বিবিকে চুরি করিবে বলিয়া না কি? ইয়া আল্লা, সিঁদ কাটিয়া তালাক দেওয়া জরুকে চুরি করিবে? বোকা কি তাল গাছে ধরে? মেথ্‌র বোকামির কথা সে যত ভাবে তত তাহার হাসি পায়। তার পরে খা শীতের রাতে ভাদাইয়ের জল পেট ভরিয়া। কে রে, কে ডাকিয়া কোঁচ হাতে হাজি সাহেব তাড়া করিল, দৌড় দৌড়, ঝপ করিয়া মেথ্ ভাদাইয়ের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। বিল-পারের সমুন্দিরা নাক ডাকাইয়া সব ঘুমাইতেছে, —গরর্ গরর্—নাকের সে কি ডাক! তিন গণ্ডা বিড়ালে যেন ঝগড়া করিতেছে। সোরগোল শুনিয়া সমুন্দিরা সব উঠিয়া ডাকাডাকি লাগাইয়া দিল। কি হইচে হাজি ছায়েব,—আরে হইলো কি? হাজি রাগিয়া বলিল—বে-ফয়দা গোল করো না বেটারা। চোর আইছিল, ঘায়েল করি ভাদাইতে ফেলি দিছি। যা বেটারা ঘুমা। বিল পারের সমুন্দিরা বেবাক্ বেকুব হইয়া আবার কাঁথা জড়াইয়া শুইয়া পড়িল। অন্দরে ঢুকিয়া হাজির কি নাচন,—খুন করমু বেটারে, গুষ্টি শুদ্ধা খুন করমু। ততক্ষণে বোকা মেথ্ ভাদাইয়ের পাঁকের মধ্যে আঁকু-পাঁকু করিতেছে। ছলিম বোকা মেথ্‌র অবস্থা কল্পনা করিয়া হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

হাসি থামাইয়া বাকী গুড়টুকু মুখে ফেলিয়া বেশ করিয়া চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিল। তার পর পায়ে পায়ে চৌকিদার যেখানে বসিয়াছিল সেই দিকে চলিল।

বুড়া কুদ্দুস চৌকিদার তখনও রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া আছে আর মাথা দুলাইতেছে। হুঁকাটা মাটিতে গড়াইতেছে, হুঁকার জল সবটুকু মাটিতে পড়িয়া মাটি ভিজিয়া উঠিয়াছে। কলিকাটি মাটিতে পড়িয়া আছে, পোড়া তামাকের ডেলা ও ঠিকরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে।

বুড়া কুদ্দুস চৌকিদার মাথা নাড়িতেছে। বিড়-বিড় করিয়া কি বলিতেছে, মাঝে মাঝে থুথু ফেলিতেছে। বুড়া কি বলে শুনিবার জন্ম ছলিম কাছে সরিয়া আসিল।

চৌকিদার মাথা নাড়িতেছে, হাসিতেছে আর নিজের মনে বকিয়া যাইতেছে। হারাণ ঘরামির বেটা টেদ্দর কারিগর, টেদ্দর কারিগরের বেটা কদম মোল্লা। কারিগরের বেটা কয় কি? সাড়ে তিন-কুড়ি বয়েশ হইল কুদ্দুস বুড়ার, সে কি না জানে বাপজান? কারিগরের বেটা কয় আরবী মুলুকের বালুর মধ্যি থেনে তিন ফাল্লুং দিয়া উঠ্যা খঞ্জর হাতে দীন দীন কইর‍্যা তার দাদা আইলো খিয়ের মুলুকে। খিয়ের মুলুকে আইস্যা বুঝি তার খঞ্জর হইলো কাচি, আর কাচি দিয়া বোঝা বোঝা থ্যাড় কাটি মানুষের ঘর ছাওয়াতি নাগলো তার আরবী মুলুকের দাদা। হারাণ ঘরামি আইছেন আরবী মুলুক থেনে? বুড়া কুদ্দুস কি না জানে? সাত পুরুষে সে চৌকিদারী কইর‍্যা যাচ্ছে, তারে তুই···

কুদ্দুস চৌকিদার থুথু ফেলিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। পিঠটা বড় চড়-বড় করিতেছে। ইয়া আল্লা, বেলা হইল অনেক বুঝি?

সে উঠিয়া কাছে জুম্মা ঘরের দিকে চলিল। হাজি সাহেব জেলা-বোর্ডের মেম্বার, জুম্মা ঘরের সম্মুখে সাধারণের খরচায় একটা টিউব ওয়েল বসাইয়াছেন। টিনের জুম্মা ঘরে উঠিবার ধাপের দুই পাশে সারি সারি বড় বড় গাঁদা ফুল ও মোরগ ফুলের গাছ। বড় বড় গাঁদা ফুলে ও গুচ্ছ গুচ্ছ মোরগ ফুলে গাছগুলি ভরিয়া আছে। ধাপ হইতে উঠিয়া চওড়া রোয়াক, চাটাই পাতা আছে। দুপুরে সেখানে মোক্তাব বসে। ছয়টি চাষী-পরিবারের ছেলেকে কুল্যার হাটের এক-চোখ কানা মৌলবী ছাহেব, আলেক, বে, পে, তে, টে হইতে দোচস্মী হে, ছোটা ইয়ে, বড়া ইয়ে পর্য্যন্ত লিখিতে শিখান আর উর্দু জবানে পোক্ত করিবার চেষ্টা করেন। মৌলবী ছাহেব সহরের মাদ্রাসায় উর্দু কি পহেলী কিতাব হাসেল করিয়াছেন। এই ছেলেদের যখন গোঁফ উঠিবে তখন বাংলা ও ইংরেজিতে লায়েক হইবার জন্ম তাহারা কুল্যার হাট মধ্য-ইংরেজি স্কুলে ভর্ত্তি হইবে।

কুদ্দুস চৌকিদার টিউবওয়েলের হাতল নাড়িয়া নমাজীদের জন্ম রক্ষিত বদনাতে জল ধরিল। টিউবওয়েল হইবার পর হইতে পাশের কুয়ার পানি নাপাক হইয়াছে। হাতে, মুখে, পায়ে জল দিয়া সে যাইয়া রোয়াকের চাটাইয়ের উপর শুইয়া পড়িল, মাথাটা একটু ঘুরিতেছে। তার পর ঘুমাইয়া পড়িল।

ছলিম এতক্ষণ রৌদ্রে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে মাথা ও পিঠ চুলকাইতেছিল আর বুড়া চৌকিদারের স্বগত বক্তৃতা শুনিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল। তাহাকে শুইয়া পড়িতে দেখিয়া সে কাছারী-ঘরের রোয়াক হইতে লাঠি ও পুটুলিটা বুড়ার মাথার ইতস্ততঃ করিয়া পুটুলিটার মধ্যে আবার হাত চালাইয়া খানিকটা গুড় ভাঙ্গিয়া লইল। জুম্মা-ঘর হইতে নামিয়া গুড়টুকু হাতে লইয়া কি ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ গাড়ীর শব্দে সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখে তাল গাছের সারির মধ্য দিয়া ভাদাইয়ের দিক হইতে হাজি সাহেব আসিতেছেন। তাড়াতাড়ি গুড়টুকু সে মুখে ফেলিয়া দিল। তার পর হুঁকা ও কল্কী তুলিয়া লইয়া তামাক সাজিবার জন্ম চলিয়া গেল। হাজি সাহেব এখনই তামাক ফরমায়েস করিবেন।

হাজি সাহেব খড়ম-পায়ে তাড়াতাড়ি আসিতেছেন, পিছনে ভাদাইয়ের পাড়ের গাড়ী-চলার রাস্তা ধরিয়া ক্যাচ কোঁচ শব্দ করিয়া একখানা ধান-বোঝাই মহিষের গাড়ী ধীরে ধীরে আসিতেছিল। কাঁকানিয়ার মাঠ হইতে ধান লইয়া প্রথম গাড়ী আসিল।

কাছারী-বাড়ীর ডান দিকে বিশিখানেক তফাৎ খোলা তৈয়ারী হইয়াছে, এইখানে ধান মাড়াই হইবে। এই খোলার এক পাশে বড় বড় তিনটা উনন। এক দিকে চেলা কাঠ গাদা করা রহিয়াছে। দুই জন লোক দুইটা উনন ধরাইয়া প্রকাণ্ড দুই তামার হাঁড়িতে ভাত ও ডাল চাপাইয়াছে। মাটির বড় বড় গামলায় পিঁয়াজ, লঙ্কা, লবণ আর কাঁচা তেঁতুল। এক জন লোক একটা গামলায় এক রাশ ছোট ছোট নূতন আলু ধুইয়া রাখিতেছে। দুইটা উনন হইতে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উপরে উঠিতেছে। কয়েকটা কাক একটা আম গাছের নীচু ডালে বসিয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে এই সকল আয়োজন দেখিতেছে আবার মধ্যে মধ্যে গলা সঙ্কুচিত করিয়া ঠোঁট উপরে তুলিয়া এক চোখ বুজিয়া নিস্পৃহ ভাব প্রকাশ করিতেছে।

হাজি সাহেব খড়ম-পায়ে এদিকে আসিতে কয়েকটা কাক উড়িয়া উঁচু ডালে বসিল। একটি কাক উড়ু-উড়ু ভাবে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। হাজি সাহেব আসিয়া রসুইকার দুই জনের এক জনকে ডাকিয়া বলিলেন যে, জহির মাছ ধরিতে গিয়াছে সময় মত আসিয়া পৌঁছিবে কি না বলা যায় না। দুইটা মিঠা কুমড়া তিনি পাঠাইতেছেন, তরকারী বানাইয়া লইবে।

ইতিমধ্যে গাড়ীর ধান নামাইয়া নূতন একটা পালা সাজান আরম্ভ হইয়াছিল। পাইটরা কয়েক জন সঙ্গে আসিয়াছিল। হাজি সাহেব দাঁড়াইয়া গাড়ী হইতে নামাইবার সময় আটি গণিয়া লইতেছিলেন। মাঠে তাঁহার এক ছেলে দাঁড়াইয়া আটি গণিয়া বোঝাই করিয়া দিয়াছে। এই দুই হিসাব মিলাইয়া গরমিল না হইলে বুঝা গেল ধান ঠিক মত আসিয়াছে। সন্ধ্যা বেলা যে ধান আসে সেই ধানের হিসাবে প্রায়ই গরমিল হয়। মাঠে এক দফা পাইটদের সঙ্গে বচসা হয়। তাড়াতাড়ি সাত-আট জন মিলিয়া কুড়ি আটি ধান তুলিয়া দিয়া বলিবে চার গণ্ডা এক আটি হইল। পথের মধ্যে তিন আটি সরাইবে। গাড়ী-পিছু তাহারা সাত-আট গণ্ডা আটি চুরি করিবেই। সোজা চোর এই বিল-পারের ধান-কাটা পাইটরা!

আর একখানা গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। হাজি সাহেবের হুঁকায় একটা টান দিবার ফুরসুৎ নাই। আকাশ ভাল থাকিবে কি না কে জানে? পালা সাজাইবার আগে বৃষ্টি-বাদল নামিলে লোকসানের অন্ত থাকিবে না। যে গাড়োয়ান ও পাইটগুলা পৌঁছিতেছে তাহাদের তাড়াতাড়ি খাওয়াইয়া ভাডাইয়া আবার মাঠে পাঠাইতে হইবে কাঁকানিয়ার মাঠ কাছে, দূরের মাঠ হইলে দিনে এক ক্ষেপ ধানের

দ্বিতীয় গাড়ী খালাস না হইতে আর একখানা গাড়ী আসিয়া গেল। হাজি সাহেবের আর দম ফেলিবার সময় নাই। জহির ছোঁড়া এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই। বিল-পারের সয়তানের আণ্ডাগুলা মাছ নাই দেখিয়া ক্ষেপিয়া যাইবার মত। কল্কী ধরায়, টানে, আর চেঁচায়। ও হাজির বেটা, এই তোমার ফন্দী? আমাদের পেটে মারিয়া কাজ আদায় করিবে? ও হাজির বেটা, মাছ না দিলে আমরা আজই তালসোনাপুর ছাড়িয়া যাইব। কাজের অভাব কি আছে ধান-কাটার মরশুমে? দেও বুঝিয়া আমাদের পাওনা-গণ্ডা। একটা চেঁচায় ত সঙ্গে আর দশটা চিল্লাইতে সুরু করে ষাঁড়ের মত। কাজের সময় হাজির বেটার মেজাজ বড় ঠাণ্ডা, রা-টি কাড়ে না, কেবল আটি গণিয়া লইতেছে।

গাড়ীর পর গাড়ী ধান বোঝাই করিয়া আসিতেছে। মাথায় গামছা বাঁধিয়া কাস্তে বগলে করিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে বিল-পারের পাইটরা গণ্ডায় গণ্ডায় আসিতেছে। আটির পর আটি ধান গাড়ী হইতে নামাইয়া ঝুপঝাপ ফেলিতেছে। লম্বা শিস হইতে পাকা ধান মাটিতে ঝরিয়া পড়িতেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা, ঘুঘু, কাচ্চা-বাচ্চার পল্টন সঙ্গে মুরগী আসিয়া মাটির ধান খুঁটিয়া তুলিয়া লইয়া পলাইতেছে, ভয়-ডর নাই। হাজি সাহেব গণিতেছেন। চার গণ্ডা, ছয় গণ্ডা, আট গণ্ডা, দশ গণ্ডা, তার পর কাগজে লিখিতেছেন। কয়েক জন পাইট আটি সাজাইয়া পালা দিতেছে। কয়েক জন মাথায় এক খাবলা তেল চাপড়াইয়া ডোবাইতে স্নান করিতে গেল। চাটাইয়ের উপর কলার পাতা পাড়িয়া কয়েক জন খাইতে বসিয়াছে।

সূর্য মাথার উপর না আসিতেই সব গাড়ীগুলি আবার রওনা হইয়া গিয়াছে। পাইটরা গামছা বাঁধে, পান মুখে বিড়ি টানিতে টানিতে চলিয়া গেল। কেহ আবার গান ধরিয়াছে। এতক্ষণে হাজি সাহেব মোড়ায় আসিয়া বসিয়া হুঁকায় টান দিলেন। বুড়া কুদ্দুস চৌকিদারের কথা তাঁহার মনে পড়িল।

চৌকিদার গেল কোথায়? ছোট দারোগা সাহেব কি খত লিখিয়াছেন দেখিতে হয়। তিনি ডাকিলেন,—ওরে ছলিম, ও ছলিম! ছলিম খোলার এক দিকে বসিয়া চৌকিদারের খাওয়া দেখিতেছিল। সে নিজেই বুড়াকে ডাকিয়া খাওয়াইতে বসাইয়াছিল। হাজি সাহেবের ডাক শুনিয়া সে ছুটিয়া আসিল। চৌকিদার খাইতেছে শুনিয়া তিনি ছোট দারোগার খত আনিতে বলিলেন।

ছোট দারোগা সাহেব লিখিয়াছেন, বিল্লাপুরের মেথু মণ্ডল নালিশ করিতে আসিয়াছিল। হাজি সাহেব যেন সন্ধ্যার দিকে একটু সময় করিয়া থানায় আসেন, অনেক কথা আছে।

গত রাত্রির হাঙ্গামার কথা হাজি সাহেবের মনে পড়িয়া গেল। থানায় নালিশ করিয়া আসিয়া বোকা মেথু আবার চুরি করিতে আসিয়াছিল তাঁহার বাড়ীতে। কিছুক্ষণ হুঁকা-টানা বন্ধ করিয়া তিনি চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার ছোট ছোট গোল চোখ দুইটি জ্বলিয়া উঠিল, কুমীরের চোয়ালের মত লম্বা, মজবুত দুই চোয়াল শক্ত হইয়া উঠিল। একটু পরে তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, অনাবিল আমোদের হাসি। তালসোনাপুরের হাজি কদম মোল্লার সঙ্গে শত্রুতা করিতে দাঁড়াইয়াছে বোকা মেথু মণ্ডল। হুঁকায় কয়েকটা টান দিয়া তিনি হা-হা করিয়া হাসিয়া লইলেন।

ফেগু, সেখ, মেথু এই তিন মণ্ডলের বিবিকে তিনি তালাক দেওয়াইয়াছেন, তিন ভাইয়ের তিন বিবি। সাকুল্যে আড়াই গণ্ডা তালাক তিনি দেওয়াইয়াছেন এই চার বছরের মধ্যে। একটা বাদে সবগুলির নিকা দিয়াছেন ভিন্ন গাঁয়ের লোকের সঙ্গে। চারিটার জন্য পাইয়াছেন দেড় কুড়ি করিয়া টাকা, দুইটার জন্য দুই কুড়ি আর বাকী তিনটার জন্য এক কুড়ি পাঁচ টাকা করিয়া। খরচ বিশেষ কিছু নাই, কেবল সাক্ষীদের কিছু খাওয়াইতে হইয়াছে। কিন্তু হাঙ্গামা কিছু আছে। দেখিতে ভাল সোমত্ত বয়সের বিবিকে কি সহজে কোন হারামজাদা তালাক দিতে চায়? খাইতে পরিতে দিতে পারে না তবু ছাড়িবে না। কোনটাকে জমি রেহানে আবদ্ধ করিয়া টাকা ধার দিয়া নালিশের ভয় দেখাইতে হইয়াছে, কোনটাকে চুরি মোকদ্দমার প্যাঁচে ফেলিতে হইয়াছে, কোনটাকে আবার স্রেফ ঘরে আগুন লাগাইয়া দিবার, মাথায় বাড়ি দিবার ভয় দেখাইতে হইয়াছে। হাঙ্গামা অনেক করিতে হইয়াছে বৈ কি? খরচ নাই আবার হাঙ্গামাও নাই, এ ভাবে কি কোন কারবার চলে? খরচ নাই, হাঙ্গামা নাই, লোকসানের ভয় নাই,—এ কারবার মন্দ নয়! হাজি সাহেব হাসিয়া ফেলিলেন, কিছু উপরি পাওনা আছে বটে।

কিন্তু মেথুকে দেড় গণ্ডা কড়কড়ে টাকা দিতে হইয়াছে। রাজিয়া বিবির উঠতি বয়েস, দেখিতে হুরীর পানা। রংয়ের জলুস কি? বোকা মেথু এ দিকে ভারী সেয়ানা। বলে,—তালাকের কথা কি কও হাজির বেটা? তালাক দেওয়ার মত কোন কাম আমার বিবি করেছে? এ সব বাৎ আর বলবে না। আবার বলে,—দুই ভাইয়ের বিবিকে ছাড়াইয়া লইয়া আশ মিটে নাই তোমার? আবার কেন আসিয়াছ? দোজখের ভয় নাই? ইমানের ভয় নাই? বোকা মেথুর মুখে খৈ ফোটে।

বেটা ভাল কথার মানুস নয়। দেখ তবে হাজির প্যাঁচ। প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, রস চুরি, ধান চুরি, বাসন চুরি, জাল চুরি, ছাগল চুরি—দুই দফায় ঘানি টানা, একটি বছর থানায় দৌড়াদৌড়ি। ঘরে ভাত নাই, ধার-করজে একটি দানাও মিলে না, জমি ত আগেই গিয়াছে। বিবি ধান ভানিতে হাজি-বাড়ী আসিল, পেটে ত কিছু দিতে হইবে? কাম ফতে হইয়া গেল। সেই যে আসিল আর ঘর-মুখে পা বাড়াইল না। তবু সাক্ষী-সাবুদ চাই, তিন তালাকটা শরিয়ত মত হওয়া চাই। হাজি মানুষ, সব দিকে চোখ রাখিতে হয়। মেথুকে দেড় গণ্ডা টাকা দিতে হইল। জরু ত গিয়াছে, টাকা কয়টা লইয়া মুখের কয়টা কথা বাহির করিতে কি দোষ বাপু? দেড় গণ্ডা টাকা! হাজি সাহেব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

রাজিয়া বিবিকে লইয়া হাজি সাহেব দো-টানায় পড়িয়াছেন। নগদ পাঁচ কুড়ি টাকা দিয়া তাহাকে নিকা পুষিবার উমেদার যাওয়া-আসা করিতেছে। বুড়া কেরামদ্দীন ছয় কুড়ি ডাকিয়াছে। কিন্তু হাজি সাহেবের নিজের মায়া পড়িয়াছে রাজিয়া বিবির উপর। তাহাকে দেখিলে তাঁহার দিল খুশীতে ভরিয়া উঠে। কিন্তু ছয় কুড়ি টাকা ত সোজা টাকা নয়! বুড়া কেরামদ্দীনের কাশির ব্যায়রাম আছে; এই বছরেই হয় ত শেষ হইয়া যাইবে। হাজি সাহেব ভাবিতে লাগিলেন।

খাওয়া শেষ করিয়া কুদ্দুস চৌকিদার চলিয়া গেল। হাজি সাহেব তাহাকে বলিয়া দিলেন সন্ধ্যা নাগাদ বা কাল সকালে তিনি ছোট দারোগা সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবেন।

ভাবিতে ভাবিতে হাজি সাহেবের আবার বোকা মেথুর কথা মনে পড়িল। এ হারামজাদার মতলবটা কি? থানায় তাঁহার নামে কিসের নালিশ করিয়াছে? নালিশ-টালিশ বাজে কথা। কিন্তু কাল রাতে রাজিয়া বিবির ঘরে সিঁদ কাটিতে আসিল কি মতলবে? বোকাটা মনে করিয়াছে কি?

মনে একটু চিন্তিত ভাব লইয়া হাজি সাহেব খাওয়া শেষ করিয়া কাছারী-ঘরে একটু গড়াইয়া লইতে গেলেন। একটু ঘুমাইয়া লইয়া আবার কাজে হাত দিতে হইবে।

বেলা গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। হাজি সাহেবের ঘুম গাঢ় হইয়া আসিতেছে।

ভাদাই নদীর ঘাটে মাস্তুলের জঙ্গলের মধ্যে গাংচিল, শালিক, বক, মাছরাঙ্গা গণ্ডায় গণ্ডায় উড়িয়া বেড়াইতেছে আর চেঁচাইতেছে। বুড়া কেরামদ্দীন ছয় কুড়ি টাকা গণিয়া তাঁহার হাতে দিবে বলিয়া কাশিতে কাশিতে হাত বাড়াইয়াছে। হঠাৎ পিছন হইতে একটা গাংচিল তাঁহার পিঠে একটা খোঁচা লাগাইয়া উড়িয়া গেল। খোঁচার জ্বালায় হাজি সাহেবের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। গাংচিল নয়, ছলিম তাঁহাকে ঠেলা দিয়াছে। ছোঁড়ার হাতে খাট্টাশের মত বড় বড় নখ, গায়ে নখের আঁচড় লাগিয়াছে।

—হাজির বেটা, ওঠ, ওঠ,—রাজিয়া বিবি ফেরার হইছে।

হাজি সাহেব উঠিয়া বসিলেন। ছলিম জানাইল, ভাত দিবার জন্য রাজিয়া বিবির ঘরে ঢুকিয়া দেখা গেল বিবি ঘরে নাই। অন্দরে বাহিরে কোন জায়গায় তাহাকে পাওয়া গেল না।

হাজি সাহেব এ কাহিনী কিছু মাত্র বিশ্বাস করিলেন না। যে নিজের ইচ্ছায় তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছে সে ফেরার হইবে কেন? যাইবে কোথায়? তামাক দিতে আদেশ করিয়া তিনি ভাল করিয়া তালাস করিতে বলিলেন।

তামাক খাইয়া ধীরে-সুস্থে তিনি অন্দরে গেলেন। অন্দরে ভয়ানক চাঞ্চল্য, রাজিয়া বিবির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। উঠানে জমায়েৎ হইয়া প্রত্যেকে নিজের মত প্রকাশ করিতেছে। হাজি সাহেবের কানে গেল, এক জন জহিরের অনুপস্থিতির কথা তুলিয়া কি একটা ইঙ্গিত করিতেছে।

স্রেফ বাজে কথা! হাজি সাহেব সদরে চলিয়া আসিলেন। সম্মুখে চাহিতে সারি সারি তাল গাছের ফাঁকের মধ্যে দিয়া ভাদাইয়ের খানিকটা চোখে পড়িল। গাংচিল, বক, শালিক, মাছরাঙ্গা উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাল গাছের সারের মধ্য দিয়া হাজি সাহেব ভাদাইয়ের ঘাটের দিকে চলিলেন।

হাজি সাহেব কি ভাবিয়াছেন ধান-কাটা পাইটদের জন্য সাড়ে তিন হাত বোয়াল ধরিয়া আনিয়া জহির ভাদাইয়ের ঘাটে ডিঙ্গি বাঁধিতেছে?

জহির বিছানা ছাড়িয়া যখন মাছ ধরিতে বাহির হইয়াছে আকাশে তখনও দুই-চারিটা তারা মিট-মিট করিতেছে, রাত্রের অন্ধকার কেবল পাৎলা হইতেছে। চেনা মানুষ চেনা যায়, অচেনা মানুষ চেনা যায় না। ভাদাইয়ের জল কুয়াশায় ঢাকা, টানিয়া টানিয়া উত্তরের হাওয়া দিতেছে। গায়ে কাঁথা জড়াইয়া হি-হি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মাছ-ধরা জাল আর কোঁচ লইয়া জাহির ভাদাইয়ের ঘাট হইতে একটু ফাঁকে বাঁধা ডিঙ্গিতে চড়িয়া বসিল। লগি ঠেলিয়া রশি খানেক আসিয়াছে যেখানে মিঠা কুল গাছটা ভাদাইয়ের পাড় হইতে বাঁকিয়া প্রায় জলের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। লগি তুলিয়া সে একটা বিড়ি ধরাইতেছে হঠাৎ একটা বড় ঢিল আসিয়া নৌকায় পড়িল। ঢিলের সঙ্গে এক গাছা দড়ি বাঁধা। ডিঙ্গিতে পড়িয়া মাটির ঢিল ভাঙ্গিয়া গেল। চমকাইয়া উঠিয়া জহির দড়িগাছা চাপিয়া ধরিতেই এক টানে ডিঙ্গি পাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খাইল, সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া কে একটা মানুষ ডিঙ্গিতে আসিয়া উঠিল।

জহির সতেরো বছরের সাহসী ছোকরা। দুশমন নৌকায় পা দিয়াছে সে দেখিয়া কোঁচগাছা তুলিয়া লইল। গায়ে কাপড়-জড়ানো মানুষটি ডিঙ্গির মধ্যে ভাল করিয়া বসিল। তার পর মেয়েলী গলায় বলিল,—জোরে ডিঙ্গা বাও মোল্লার বেটা।

অন্ধকার তখনও কাটে নাই, কিন্তু জহির চিনিতে পারিল রাজিয়া বিবি।

জহির সতেরো বছরের জোয়ান, সুশ্রী ছোকরা। জহিরের মাথার দোষ আছে। সে কোঁচ ফেলিয়া দিয়া লগির ঘায়ে চোখের পলকে নৌকা ভাদাইয়ের ঘাটের দিকে ফিরাইল।

রাজিয়া বিবির বয়েস এক কুড়ি হইয়াছে, রং তাহার কটা, সে জুবীর মত দেখিতে। রাজিয়া বিবি উঠিয়া জহিরের হাতের লগি চাপিয়া ধরিল, জহিরের হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল,—হয় ডিঙ্গি ফিরাও নয় আমারে খুন কইর‍্যা ফ্যালো এই ডিঙ্গায়।

জোয়ান ছোকরা জহির রাজিয়া বিবির নরম, কটা হাত ছাড়াইতে পারিল না, রাজিয়া বিবি দুই হাতে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে।

ভাদাইয়ের ঘাট হইতে সাড়ে তিন হাত বোয়াল ডিঙ্গিতে তুলিয়া জোরে বৈঠা মারিয়া জহির বিলের দিকে চলিয়া গেল। বিল-পারে কত গাঁ, কত অচেনা মানুষ।

হাজি সাহেব ভাদাইয়ের ঘাটে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জহিরকে খুঁজিতেছেন। ভাদাইয়ের পাড়ের রাস্তা ধরিয়া কারবালিয়ার মাঠ হইতে ধান-বোঝাই গাড়ী আসিতেছে, ক্যাচ-কোঁচ শব্দ করিতে করিতে। সে শব্দ হাজি সাহেবের কানে গেল না। জহির বিলে মাছ ধরিতে গিয়াছে, বোকা মেথু কোথায় গেল?

হাজি সাহেবের গোল গোল চোখ দুইটি রাগে ঘুরিতে লাগিল কুমীরের চোয়ালের মত লম্বা, মজবুত চোয়াল শক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। মেথুর বাড়ী ঐ বিষ্ণাপুর গাঁয়ে, কুল্যার হাটে যাইতে সিধা পথ। কচুরী পানায় ভরা মরা পুকুরের পূব পাড়ে ভাঙ্গা কুঁড়েয় ডেঙ্গু, সেথু, মেথু তিন ভাই থাকে।

বাড়ী ফিরিয়া মোটা একগাছা লাঠি হাতে করিয়া হাজি সাহেব বাহিরে আসিলেন। সারি সারি তাল গাছ আর ভাদাইয়ের ঘাট পিছনে রাখিয়া খেজুর গাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়া সরু হাটা-পথে তিনি চলিতে লাগিলেন। ধান-বোঝাই গাড়ীর শব্দ তখনও শোনা যাইতেছে, সে শব্দ তাঁহার কানে গেল না।

বিষ্ণাপুর গাঁয়ে মরা পুকুরের পূব পাড়ের কুঁড়ে ঘরে মেথু নাই। সে গিয়াছে কুল্যার হাট থানায়, ছোট দারোগা সাহেব তাহাকে ডাকিয়াছেন। মেথুর বড় ভাই ডেঙ্গু খবরটা দিয়া যেন কেমন করিয়া হাজি সাহেবের দিকে একবার চাহিল। হাজি সাহেবের কোন দিকে চোখ-কান নাই।

বিষ্ণাপুরের পরে ঠ্যাংমারীর মাঠ। একটা শীষ ধান হয় না

এমন শুকনা মাঠ। কেবল তাল গাছ আর খেজুর গাছ গণ্ডায় গণ্ডায়, কুড়িতে কুড়িতে। একটু বাতাস উঠে আর ঠ্যাংমারীর মাঠের তাল গাছগুলির মাথায় কেমন যেন খট্-খট্ করিয়া শব্দ হয়।

ঠ্যাংমারীর মাঠ পার হইয়া দুই-তিন রশি গেলে কুল্যার দীঘি। মস্ত বড় দীঘি, শুকাইয়া গিয়াছে, এখানে ওখানে একটু জল। নল-খাগড়ার বন, নাটার বন, বেতের বন হইয়াছে। দীঘির যেখানে জল আছে সেখানে কলমীর দাম, কচুরী পানা, ঘাসের জঙ্গল। পাড়ের বুড়া তাল গাছগুলি বয়সের ভারে বাঁকিয়া গিয়াছে। একটা গাছও সোজা দাঁড়াইয়া নাই। বাতাস উঠিলে বুড়া তাল গাছগুলির মাথায় কেমন যেন কুঁ-কুঁ করিয়া শব্দ হয়।

দীঘির পাড় দিয়া রাস্তা কুল্যার হাটে গিয়াছে। হাট পার হইয়া থানা।

ঠ্যাংমারীর মাঠ পার হইয়া মোটা লাঠি হাতে হাজি সাহেব দীঘির পাড়ের রাস্তায় উঠিলেন। আবছা অন্ধকার হইতেছে। উত্তরের হাওয়া লাগিয়া কোমর-ভাঙ্গা বুড়া তাল গাছগুলা কুঁ-কুঁ শব্দ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পেছনে কিসের একটা শব্দ না? হাজি সাহেবের কোন দিকে চোখ-কান নাই। মেথু থানায় গিয়াছে ছোট দারোগা সাহেবের ডাকে, বোকা মেথু মনে করিয়াছে কি? তিন তালাক দেওয়া বিবিকে লইয়া সে পলাইবে কোথায় হাজি কদম মোল্লার হাত হইতে? সয়তানের আণ্ডা মেথু!

হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া হাজি সাহেব দীঘির পাড়ের রাস্তায় দাঁড়াইলেন, হাকিলেন, কে রে? কোমর-ভাঙ্গা তাল গাছ বাহিয়া মানুষ নামিতেছে না? দাঁড়াইয়া হাজি সাহেব হাতের মোটা লাঠিগাছা উঠাইয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন। লাঠি দীঘির মধ্যে জঙ্গলে গিয়া পড়িল।

মানুষ কোথায়? ঠ্যাংমারীর মাঠে ইতিমধ্যে শিয়ালের সভা বসিয়াছিল, কুকুরের মত মুখ আকাশের দিকে উঠাইয়া তাহারা এক সঙ্গে ডাকিয়া উঠিল। হাজি সাহেবের গা'টা ছম্-ছম্ করিয়া উঠিল। কুল্যার দীঘির পাড় বড় খারাপ জায়গা সন্ধ্যা বেলা। মানুষ সহজে ভয় খায়। দীঘির পাড়ের রাস্তা ছাড়িয়া হাজি সাহেব তাড়াতাড়ি কুল্যার হাটে কিনু খোনকারের দোকানের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। খোনকার মিয়া আছ না কি?—তিনি ডাকিলেন।

কুল্যার হাট বড় হাট, গরু, মহিষ, ধান, চাল, কলাই বিক্রয়ের গঞ্জ। সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে, মহিষ, গরু, ভেড়া, ছাগল, মানুষে হাট গম-গম করে। আড়তদারদিগের কয়েকখানা গুদাম আর কয়েকখানা বাঁধা দোকান আছে। তাহার মধ্যে কিনু খোনকারের দোকান সকলের ছোট। একচালা টিনের একখানা ঘর, চেরা বাঁশের মজবুত বেড়া। পিছনে চাটাই দিয়া একটু জায়গা ঘেরা। দোকানে হাতল-ভাঙ্গা চীনা মাটির পেয়ালা ও কলাই-করা বাটিতে গুড়ের চা হইতে পান, বিড়ি, তামাক, সস্তা সিগারেট, নানা প্রকারের জিনিস বিক্রয় হয়। লোকে বলে, কিনু তাল গাছের রস হইতে প্রস্তুত দ্রব্যের বে-আইনী কারবারও না কি করে। বাছা-বাছা খদ্দেরদের সিদ্ধি, গাঁজা, চরশ প্রভৃতি আনন্দ-উৎপাদক দ্রব্য সে বিনা লাইসেন্সে বিক্রয় করে ইহা সকলে জানে। সন্ধ্যার দিকে এই শ্রেণীর বহু খদ্দের আশ-পাশের গ্রামগুলি হইতে তাহার দোকানে জমায়েৎ হয়, গুড়ের চা খাইয়া গাঁজা টানিয়া ফূর্ত্তি করে।

দোকানের সম্মুখে বাঁশের মাচানের উপর বসিয়া কয়েক জন লোক জটলা করিতেছিল। হাজি সাহেবের ডাক শুনিয়া জনা-দুই লোক চট্ করিয়া আড়ালে সরিয়া গেল আর সকলে বসিয়া রহিল। বিশাল দেহ বৃদ্ধ কিনু খোনকার দোকান হইতে বাহিরে আসিয়া হাজি সাহেবকে সম্বর্দ্ধনা করিল, কোথায় যাওয়া হইতেছে জিজ্ঞাসা করিল।

হাজি সাহেব অন্ধকারের মধ্যে তীব্র দৃষ্টিতে একবার মাচানে উপবিষ্ট লোকগুলির দিকে চাহিয়া রহিলেন। খোনকারের হাত ধরিয়া একটু দূরে টানিয়া আনিলেন এবং থানায় যাইতেছেন ছোট দারোগা সাহেবের চিঠি পাইয়া জানাইলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, খোনকার, বিক্কাপুরের মেথু মণ্ডলকে এদিকে দেখিয়াছ?

খোনকার ইতিমধ্যে বাজিয়া বিবি-ঘটিত ব্যাপার শুনিয়াছে। জিহ্বার এক রকম শব্দ করিয়া সে বলিল,—বে ফয়দা এই আঁধারের মধ্যি থানায় যাতিছ ক্যান? ছোট দারোগা ছাহেব সাঁজের আগে সদরে গ্যালেন ঘোড়ায় চইড়্যা, আমি ভালমত ওয়াকিব আছি। মেথুর কথা না তুলিয়া আবার বলিল,—হাজি ভাই, সময়ডা খারাপ, দুশমণ তোমার মেলাই, চলি যাও। জিহ্বায় আবার একটা শব্দ করিয়া সে বলিল,—জহির ছোঁড়া ছুঁড়িটাকে লিয়্যা বিল-পারে পলাইচে। কেশমত মিয়া বিলের আগে ঠ্যাংমারীর মধ্যি ডিঙ্গিতে তাগর নাগাল পাইছিল। ইয়া আল্লা, আপন ছাওয়ালের ব্যাট্যা শ্যাসে তোমারে ব্যাকুব বানাইলো, হাজি ভাই?

কিনু খোনকারের শেষের কথাগুলি জোরে বলা হইয়াছিল, ইচ্ছা করিয়া কি না বলা যায় না। মাচানে উপবিষ্ট গঞ্জিকাসেবী-সংঘ উহা শুনিতে পাইয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

অন্ধকারের মধ্য হইতে দুই জন লোক হাজি সাহেবের সম্মুখে আসিয়া বলিল আদাব হাজি ছাহেব! হাজি সাহেব দেখিলেন, সেখু ও মেথু দুই ভাই। গাঁজা টানিয়া বা রস খাইয়া দুই জনের ভাব-ভঙ্গী বদলাইয়া গিয়াছে। তাহারা হাজি সাহেবের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। মাচান হইতে উঠিয়া আরও কয়েক জন লোক আগাইয়া আসিল।

কিনু খোনকার দেখিল, তাহার দোকানের সম্মুখে একটা খুনো-খুনি বাধিয়া যায়। সে টানিয়া হাজি সাহেবকে ঘরের ভিতর লইয়া গেল।

হাজি সাহেব একেবারে দমিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার কুমীরের মত লম্বা চোয়াল আলগা হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। তাহা হইলে বোকা মেথু নয়, জহির তাঁহার মাথায় বাড়ি দিয়াছে। কিনু খোনকারের কথা তাঁহার কানে বাজিতে লাগিল, আপন ছাওয়ালের ব্যাটা শ্যাষে তোমারে ব্যাকুব বানাইলো! অপমানের জ্বালায় বৃদ্ধ কেরামদ্দীনের ছয় কুড়ি টাকার শোক ভুলিয়া হাজি সাহেব নিজের দাড়ি ছিঁড়িতে লাগিলেন। থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া বিবির ভরাট পানা মুখখানা তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়া অপমানের জ্বালাকে আরও তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিল।

দোকানের সম্মুখে মাচানে উপবিষ্ট নেশাখোরের দল তখনও খোনকারের রসিকতায় হাসিতেছিল। বিড়ি ধরাইয়া মাচানের একধারে বসিয়া বোকা মেথুও তাহাদের সঙ্গে হাসিতে সুরু করিল।

দেশের কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'পূর্ব্বী' সাপ্তাহিক পত্রিকা বলিতেছেন : "মুসলমানদের মধ্যে জাতিভেদ নাই—তাহারা সকলেই এক। এই দাবীর অসারতা সম্প্রতি আসাম কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের সহকারী দলপতির এক বিবৃতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সম্প্রতি আসাম সরকারের বরাবরে আসামের মুসলমান মৎস্য-ব্যবসায়ী সমিতি যে স্মারকলিপি দাখিল করিয়াছেন উহার অংশবিশেষ উল্লেখ করিয়া শ্রীযুত মুখার্জ্জি মিঃ চুন্দ্রীগড়ের উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। শ্রীযুত মুখার্জ্জি সরকারী কাগজপত্র হইতে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, মুসলমান মৎস্য-ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সুরমা উপত্যকার মুসলমান জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ এবং আসামের সমগ্র মুসলমান জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশই সুরমা উপত্যকায় বাস করে। উচ্চবর্ণের মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত কিছুমাত্র যোগসূত্র নাই। ইঁহারা জানাইয়াছেন যে, পরিষদের লীগ সদস্যগণ তাহাদের প্রতিনিধিত্ব করেন না এবং ইহাদের উপকার বা মঙ্গলের কোন চেষ্টাও করেন না। আসামে মুসলমানেরা বর্ণহিন্দুদের অপেক্ষায় সংখ্যায় বেশী, মিঃ চুন্দ্রীগড়ের এই উক্তির যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর শ্রীযুত বরদলৈ দিয়াছেন। মিঃ চুন্দ্রীগড় অস্পৃশ্যদের সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন শ্রীযুক্ত বরদলৈ তাহার কোন জবাব দেন নাই। মিঃ চুন্দ্রীগড়ের জানা উচিত যে, তাহার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই বহু অস্পৃশ্য রহিয়া গিয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার অগ্রে চিন্তা করা উচিত।" তপশীলী মুসলমানদের বিষয় আমরাও বহু কথা পূর্ব্বে বহু বার বলিয়াছি। কিন্তু ইহাদের দ্বারা মুসলমান-সমাজে কোন প্রকার 'ফাটল' ধরাইবার চেষ্টা করা হয় নাই বলিয়াই হয়ত মুসলীম লীগ, অর্থাৎ বর্ণ-মুসলীম সমাজ আমাদের কথা অগ্রাহ্য করিতে ভরসা করিয়াছেন। ভবিষ্যতে 'ভাঙ্গন' চেষ্টা সুরু করিতে দোষ কি? পুনর্ব্বার ইহাদিগকে হিন্দু-সমাজে ফিরাইয়া আনার প্রচেষ্টাই বা খারাপ কিসে? কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমাদের নিজের সমাজের গলদ দূর করা একান্ত কর্ত্তব্য।

'মিল্লাত' সম্পাদক বলিতেছেন :—"স্বাধীনতা-সংগ্রামের পর্য্যায় শেষ হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রাম চালানো আর স্বাধীনতার সৌধ তৈরী করা একই ধরণের কাজ নয়। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করা এক জিনিস আর স্বাধীনতা পাওয়ার পর তা' রক্ষণ করা আর জিনিস। এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক। আজ সময় আসিয়াছে, যখন আমাদের স্বাধীনতার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। তাই যুদ্ধকালীন নিয়ম-কানুনকে বাতিল করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার জন্য বলিষ্ঠ কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

"দীর্ঘ দিনের অত্যাচারিত ও পঙ্গু জনসাধারণের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার জন্য সর্ব্বাগ্রে অতি আবশ্যকীয় কতকগুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করিতে হইবে। দুর্ভিক্ষ, রোগ, শিক্ষাহীনতা ও দুর্ব্বিসহ দারিদ্র্যে দেশের জনগণের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কাজেই স্বাধীনতাকে বাস্তবে রূপায়িত করার সময় সর্ব্বপ্রথম ঐ সমস্ত কালব্যাধি সমূলে উৎপাটিত করিয়া দেশ ও সমাজের রূপ সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া ফেলিতে হইবে। তাই আজ সৈনিকের চেয়ে সংস্কারের প্রয়োজন বেশী।

"রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্ত্তব্য দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরী করা। কারণ, প্রত্যেক নাগরিকের সদিচ্ছার উপরেই রাষ্ট্রের স্থিতি ও উন্নতি নির্ভর করে। প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্রের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়াইয়া ফেলিতে না পারিলে আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি দানা বাঁধিতে প্রয়াস পাইবে। ইহার ফলে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ কার্য্যকলাপ প্রতিনিয়ত ব্যাহত হইবে এবং বহিঃশত্রুও রাষ্ট্রের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া উহাকে গ্রাস করার জন্য বাহির হইতে ইন্ধন যোগাইবে। রাষ্ট্র গড়ার কাজে হাত দেওয়ার আগে রাষ্ট্রনায়করা যেন এ কথাটির সকল তাৎপর্য্য ভাল ভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন।

"ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র যদিও মুসলমান ও অমুসলমানের ভিত্তিতে তৈরী হইল তবু এ কথাটা ভুলিলে চলিবে না যে, হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রেই হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ ইত্যাদি সমস্ত জাতিই বাস করিবে। কাজেই উভয় রাষ্ট্রকেই আজ দৃষ্টি রাখিতে হইবে ঐ সব সংখ্যালঘু জাতি বা সম্প্রদায় সমূহের উপর। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ইহাদের উপর নিষ্পেষণের রথচক্র চলার ফলে রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধী শক্তি দ্বারা অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয়। কারণ, অন্তর্দ্বন্দ্ব যদি দেখা দেয় তাহা হইলে রাষ্ট্র যত শক্তিশালীই হোক না কেন, যত বৈজ্ঞানিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত থাকুক না কেন, প্রতিনিয়ত বিরোধী শক্তির সংঘর্ষে তাহা দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এবং রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনমূলক কাজে সব সময় বাধা সৃষ্টি হইবে। তাই বর্ণ, জাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিককে পূর্ণস্বাধীনতা দিতে হইবে।

"দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরী করার কাজ আভিধানিক শব্দালঙ্কারের সাহায্যে Statute Book-এ আইন প্রণয়নের দ্বারা সম্পন্ন করা যায় না। দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরী করিতে হইলে আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্রের চাহিদামূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে এবং তাহার জীবন ধারণের চাহিদা মিটানোর ভিত্তিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইবে। নাগরিক অধিকারসম্পন্ন প্রত্যেক সমর্থ যুবক-যুবতীর জীবিকা অর্জ্জনের দাবী রাষ্ট্রকে মিটাইতেই হইবে। অসমর্থ ব্যক্তিদের জন্য রাষ্ট্রকে এমন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে যেন তাহারা পরিবার বা সমাজের ভার বলিয়া পরিগণিত না হয়। প্রত্যেক নাগরিকের স্বাস্থ্য, জীবিকা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, শিক্ষা, ও ধর্ম্মের নিরাপত্তার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে লইতে হইবে।"—মিল্লাতের কথাগুলি ভারতের এবং পাকিস্তানের সকল কল্যাণকামী এবং ভবিষ্যৎ উন্নতিপ্রার্থীর প্রণিধানযোগ্য বলিয়াই ইহা আমরা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিলাম। এ-বিষয় আরো আলাপ-আলোচনা হইলে লাভ বই ক্ষতি হইবে না।

ডাঃ মফিজ উদ্দীন এবং মৌলবী নফীস উদ্দীন-সম্পাদিত 'বগুড়ার কথা' বলেন :—"৩রা জুনের ঘোষণার বাংলা দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে, বিশেষ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় দ্বারা অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির সংখ্যালঘিষ্ঠ বাসিন্দাদের মধ্যে এক অনিশ্চয়তার ভাব ও আতঙ্ক দেখা দিয়াছে। তাহারা আশঙ্কা করিতেছে, পাকিস্তান রাষ্ট্রে তাহাদের নাগরিক অধিকার, ধর্ম্ম, ধন, প্রাণ, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও ধর্ম্মাচরণ আর নিরাপদ থাকিবে না অর্থাৎ পাকিস্তান রাষ্ট্রে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি (Fundamental Rights) পর্য্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠদের গভর্ণমেণ্ট দ্বারা অস্বীকৃত হইবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের এরূপ আশঙ্কা যে একেবারে অহেতুক বা অমূলক তাহা কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক বলিবে না। পাকিস্তান আন্দোলনকারীদের প্রচারকার্য্য অনেক সময় এমন পথ ধরিয়া চলিয়াছে যাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দায়িত্ব-জ্ঞানহীন ও হিতাহিতবোধশূন্য এক দল অজ্ঞ লোকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সংখ্যালঘিষ্ঠদের মান সম্মান ধর্ম্ম ধন প্রাণ ইত্যাদি সব কিছুর উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আঘাত হানিবার অধিকার জন্মিয়া গিয়াছে। এবং ইহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই যে, এই মনোভাবের দরুণ দেশের নানা স্থানে বিবিধ ধরণের গুণ্ডামী ষণ্ডামীর কথা শোনা যাইতেছে। ইহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কেহ কেহ আতঙ্কিত হইয়া পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিত্যাগ করিতেছেন এবং কেহ কেহ ইতিমধ্যে বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দিতেছেন এবং বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশ বিভূঁইতে চলিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। শিক্ষিত মুসলমান সমাজের এ বিষয়ে গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য রহিয়াছে। জনসাধারণকে স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, কোন রাষ্ট্রই অসামাজিক কার্য্যাবলি বরদাশত করে না এবং রাষ্ট্রভুক্ত কোন নাগরিকের মৌলিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কাহারও জন্মে না। আইনের চক্ষে সকল নাগরিককে সমান হইতে হইবে। অনিয়মে রাজ্য চলে না, অনিয়ম দেখা দিলে অরাজকতায় রাষ্ট্র ধ্বংস পাইয়া থাকে। সংখ্যালঘুদের মনে যাহাতে আস্থা ফিরিয়া আসে এবং তাহারা আশ্বস্ত হয় এবং তাহারা যাহাতে বৃথা আতঙ্কিত হইয়া নিজেদের জন্মভূমি পরিত্যাগ না করে সেই ব্যবস্থা করা ও তদনুযায়ী কার্য্য করা আজ শিক্ষিত মুসলমান সমাজের প্রথম কর্ত্তব্য।" এ-বিষয়ে আমাদের অধিক কিছু মন্তব্য করিবার নাই। সহজ এবং যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব। লীগ-ভক্ত এবং পাকিস্তানীদের মনোভাবের এই প্রকার পরিবর্ত্তন সংখ্যালঘুদের পক্ষে আশা-ভরসার কথা—স্বীকার করিব। বাস্তবে প্রতিক্রিয়ার আশায় রহিলাম।

* * * * * * *

'হিন্দু-রঞ্জিকা' (রাজশাহী) বলেন :—"সংখ্যালঘিষ্ঠদের মানসিক এই ভীতি আসিবার কারণ কি ? তাহাদের মনে বোধ হয় এই আশঙ্কা যে, পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টে তাহাদের ধন-প্রাণ-মান এবং নারীদিগের ইজ্জত নিরাপদ নহে। কিন্তু এই কল্পিত আশঙ্কাকে ভিত্তি করিয়া কোনও কার্য্য করা কাহারও উচিত নহে। সম্প্রতি যে কংগ্রেস কর্ম্মিবৃন্দ উত্তর-বঙ্গ সফরে বাহির হইয়া এথাতে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষ যখন দুইটি ডোমিনিয়ন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে, তখন দুই রাষ্ট্রের অধিবাসী এবং হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদের পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস না করিলে কোনও রাষ্ট্রেরই উন্নতি হইবে না। বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর জন্য দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাসের বিলোপ সাধিত হইয়াছে, দেশের উন্নতির জন্য তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া খুবই প্রয়োজন। কাজেই পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গ অধিবাসী সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে মনে বল করিয়া এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে বিশ্বাস করিয়া তাহাদের নিজ নিজ বাড়ী-ঘরে বাস করিতে হইবে। পরাজিতের মনোবৃত্তি লইয়া তল্পী ওঠাইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেই চলিবে না। ভাবিতে হইবে এটাও তাহাদেরই দেশ, এই জল-হাওয়ায় তাহারা পরিপুষ্ট, এখানেও তাহাদের ত্যাগ আছে, তাহাদের স্বার্থ আছে।" পাকিস্তানবাসী সংখ্যালঘুদের চিন্তার কথা! আশা করি, তাঁহারা এই জটিল সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন। আমরা অ-পাকিস্তান এলাকায় সর্ব্বদাই তাঁহাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকিব—এ কথা পূর্ব্ব-পাকিস্তানবাসী হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মনে রাখিবেন। তাঁহাদের কল্যাণেই আমাদের চরম কল্যাণ, এ কথাও আমরা সর্ব্বদা মনে রাখিব।

* * * * * * *

হিন্দু রঞ্জিকা মন্তব্য করিতেছেন :—"শোনা যাইতেছে, সহরের কতেক মেয়ে কর্ত্তৃক পুনরায় "অলকা হলে" নৃত্যগীতাদি ও অভিনয় করাইবার আয়োজন হইতেছে। সহরে সত্বর যাহাতে এই প্রকার নৃত্যগীতের পুনরভিনয় না হয় তজ্জন্য গত সংখ্যায় আমরা লিখিয়াছিলাম। কিন্তু এত সত্বরেই যে এই প্রকার পুনরায়োজন হইবে তাহা আমরা ভাবিতে পারি নাই। মেয়েদের অভিভাবকগণ পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগকে এখনকার দিনে এই প্রকার নাচের অনুমতি দিতেছেন, ইহাও বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। অনেক মেয়ে স্কুলে পড়ে। পুনঃ পুনঃ এই প্রকার নাচ-গানে তাহাদের পড়ারও ক্ষতি হয়। নাচের উদ্দেশ্য হয়তো মহৎ হইতে পারে কিন্তু কোনও সৎ জিনিষও একঘেয়ে হইলে শোভন হয় না এবং ভালও লাগে না। আমরা পুনঃ পুনঃ এই প্রকার নৃত্যগীত ও অভিনয়ের তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি।" গত কিছু কাল যাবৎ কলিকাতায় ইহা বন্ধ আছে, কিংবা অবস্থার চাপে উৎসাহও চাপা আছে। প্রতিবাদ আমরাও করিতেছি, কিন্তু শুনিবে কে? নৃত্য-গীত ভাল জিনিষ, কিন্তু অতিরিক্ত হইলেই বিপদ। বিবিধ সামাজিক সমস্যাও ইহা হইতে পূর্ব্বে ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতেও ঘটিতে পারে। কাজে কাজেই, এ বিষয়ে সবিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় অযথা নৃত্য-গীত কিছু কালের মত বন্ধ করিয়া অন্য নানা বিষয়ে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি। নাচান সহজ, কিন্তু নাচ থামানো শক্ত ব্যাপার—এ কথাও জানি!

* * * * * * *

পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী হিন্দুদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সাপ্তাহিক 'হিন্দু'র নির্দ্দেশ :—"পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের লক্ষ্য হওয়া উচিত—মুসলীম লীগ মন্ত্রিসভা-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থার সমস্ত প্রতিকূলতাকে পরাভূত করিয়া উহা যাহাতে সর্ব্ববিষয়ে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালী

মাত্রেরই জীবনযাত্রা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও ধ্যান-ধারণার অনুকূল হয় তাহার ব্যবস্থা করা, শাসনযন্ত্রের সাম্প্রদায়িক নীতিকে সম্পূর্ণ অচল ও ব্যর্থ করিয়া দেওয়া। ইহা করিতে হইবে হিন্দুকেই। কেন না, যাহা দ্বারা ইহা সাধিত হয় তাহাই হিন্দুত্ব। আমরা অটল বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি, এই কাজের সূত্রপাত হইলে মুসলমানেরাও ইহাতে যোগদান করিবে। কিন্তু সে সম্ভাবনার উপর নির্ভর না করিয়াই পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। ঠিক ভাবে চলিতে পারিলে সাফল্য অনিবার্য্য। উত্তেজনার বশে ছটফট করাও যেমন বৃথা, নৈরাশ্যবশে অবসাদকে অবলম্বন করাও তেমনি বৃথা—দুঃখ বাড়িবে বই কমিবে না। বিপদে যেমন চাই ধৈর্য্য, তেমনি চাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার সহিত স্বকার্য্য সাধন। এ স্থলে ধর্ম্মরক্ষাই স্বকার্য্যসাধন, কেন না "ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ"। তথাকথিত স্বাধীনতা যে কিছুই নহে, তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।" পশ্চিম-বঙ্গে বসবাস করিয়া এবং তথাকথিত স্বাধীনতা পুরা মাত্রায় উপভোগ এবং তাহার সুবিধা গ্রহণ করিয়া বহু কথা বলা যেমন সহজ, কার্য্যক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করা তেমনি কঠিন হইতেও পারে। পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের এখন হইতে কার্য্য কারণ এবং ভবিষৎ ভাবিয়া কার্য্য করিতে হইবে। Responsive co-operation এর কথাই সর্ব্বপ্রথম চিন্তা করা প্রয়োজন।

* * * * * * *

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন:—"দ্বি-রাষ্ট্রের সৃষ্টি যে কয়টি কারণে সম্ভবপর হইয়াছে, তাহা হইল ইংরাজের কূটনীতি, মুসলমানদের গোঁড়ামি, হিন্দুর তোষণ ও দুর্ব্বলতা প্রদর্শন। ১৫ই আগষ্টে এই প্রতিজ্ঞাই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে যে, শেষ মীমাংসা হিসাবে পাকিস্তানকে আমরা গ্রহণ করিব না। আমাদের জন্মভূমি যত দিন না পুনরায় একত্রিত হয়, তত দিন আমরা গন্তব্যে পৌঁছিয়াছি বলিয়া মনে করিব না—তত দিন আমরা যে সমস্ত জাতীয়তাবাদী ভাই-বোন আমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অত্যাচারের আশঙ্কায় দিনযাপন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিব। তাহা ছাড়া ভারতীয় ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট, পূর্ব্ববঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট এবং বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টকে এই সম্পর্কে তাঁহাদের গুরু দায়িত্ব বরাবর স্মরণ করাইয়া দিব। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের প্রতি প্রচুর কর্ত্তব্য রহিয়াছে। পশ্চিম-বঙ্গের হিন্দুরা যেন কোনক্রমেই না ভুলেন যে, রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে তাঁহাদের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গের হিন্দুর নর-নারীরা দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ণ নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া দিন কাটাইতেছেন।" এ বিষয়ে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর সহিত আমরাও একমত। কিন্তু কেবল বক্তৃতায় কি কোন কাজ হইবে? সমস্যার যথাযথ সমাধানের জন্ম যে ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহার নির্দ্দেশ কে দান করিবে? 'রাজনৈতিক দলাদলির' বদলে আগামী কিছু কালের জন্ম যদি শ্যামাপ্রসাদ বাবু সমাজ সংস্কার এবং জাতিগঠনমূলক কার্য্যের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন, দেশের পক্ষে তাহা পরম সৌভাগ্যের কথা হইবে। এ বিষয় শ্যামাপ্রসাদ বাবু ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় নেতার নাম আমাদের মনে আসিতেছে না।

* * * * * *

কলিকাতার মোছলেম পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট হোষ্টেলে ইকবাল হলে এক সভাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:—"১। কলিকাতার মোছলেম পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের এই সভা পাকিস্থান সেনট্রাল সার্ভিস কমিশনে পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে কোন সদস্যকে না লওয়ায় অতীব বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছে। লোকসংখ্যানুপাতে যেহেতু পূর্ব্ব-পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী সেহেতু উক্ত সার্ভিস কমিশনে এবং অন্যান্ম প্রত্যেক ব্যাপারে সংখ্যানুপাতমূলক প্রতিনিধিত্বের জন্ম এই সভা জোর দাবী করিতেছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানকে এই ভাবে বঞ্চিত করায় এই সভা মনে করিতেছে যে, উহা পূর্ব্ব-পাকিস্তানবাসীর কর্ম্মক্ষমতা ও যোগ্যতার প্রতি সরাসরি অপমান করিয়াছে। কাজেই অবিলম্বে উক্ত কমিশনে অন্ততঃ পক্ষে দুই জন পূর্ব্ব পাকিস্তানবাসীর নিয়োগের জন্ম এই সভা প্রস্তাব করিতেছে। ২। পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিয়েটে নয় জন সেক্রেটারীর মধ্যে এক জনকেও পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে না লওয়াতে এই সভা উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে এবং অবিলম্বে পূর্ব্ব-পাকিস্তানবাসীর ন্যায় দাবী পূরণ করিবার দাবী জানাইতেছে। ৩। পূর্ব্ব-পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের শাসন-কার্য্য পরিচালনা বিভাগীয় পদগুলিতে এখানকার যথেষ্ট যোগ্য ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও বাহিরের লোক নিয়োগের ব্যবস্থা দেখিয়া এই সভা পূর্ব্ব-পাকিস্তানের নূতন নিযুক্ত চীফ সেক্রেটারী ও তাহার নিয়োগকর্ত্তা পৃষ্ঠপোষকগণের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিতেছে এবং তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে যে, যদি পূর্ব্ব-পাকিস্তানবাসীর প্রতি এই ভাবে অন্যায় করা হয় তবে অচিরেই তাহার ফল বিষময় হইয়া উঠিবে।" পাকিস্তানের বিষময় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাঙ্গালী মোছলেম ছাত্রদের জ্ঞানোদয় হইতেছে। এখন হইতে বাঙ্গালী মুসলমান যদি সাবধান না হয়েন এবং পূর্ব্ব-পাকিস্তানে সমগ্র ভাবে বাঙ্গালীদের স্বার্থ এবং স্বাধীনতা বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন না করেন্ তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের পক্ষে 'করাচী' 'লণ্ডন'-এ পরিণত হইবে। এখন বাঙ্গালী মুছলমানদের বুঝা উচিত যে, নিজের নাক কাটিয়া হিন্দুর যাত্রা ভঙ্গ করিবার দিনের অবসান হইয়াছে।

* * * * * * *

জলপাইগুড়ি অঞ্চলে চাউলের অবস্থা এবং মূল্য সম্বন্ধে স্থানীয় সাপ্তাহিক 'ত্রিস্রোতা' বলিতেছেন:—"সহরের হাটে ও বাজারে মোটা চাউলের দর ২১৲ ২২৲ টাকা। এখনই যখন এই অবস্থা তখন আরও সময় তো পড়িয়াই আছে। কর্ত্তৃপক্ষ এই চাউলের দর বৃদ্ধি হওয়ায় কি ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা আমরা জানি না। বাজারে যদি এখন তাহারা কনট্রোল দরে কয়েক সপ্তাহ অন্ততঃ মোটা চাউল দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেন তবে চাউলের দর হাটে ও বাজারে আপনা হইতেই কমিয়া আসিত। একবার দর বৃদ্ধি পাইলে তাহা আয়ত্তের মধ্যে আনা রীতিমত কঠিন। এই অভিজ্ঞতা বোধ হয় কয়েক বৎসরে সকলেরই হইয়াছে। ফুড কমিটির হাতে যদি চাউল থাকে তবে অবিলম্বে তাহা রেশনের দোকানে অন্ততঃ দুই-তিন সপ্তাহের জন্ম হইলেও দেওয়া দরকার। তাহার পর কর্ত্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা করেন তাহা

দেখা যাইবে।" লীগ-মন্ত্রিমণ্ডলী চা'ল মারিয়া দেশকেও এক প্রকার মারিয়া গিয়াছেন! সমস্যা বর্ত্তমানে আমাদের মন্ত্রিমণ্ডলীর। আশা করি, তাঁহারা চাউল-সমস্যার কোন সমাধান করিয়া দেশবাসীর কষ্ট দূর করিতে পারিবেন।

* * * * * *

বাঙ্গলা দেশে সরিষার চাষের বিষয় 'পল্লীবাসী' উপদেশ দিয়াছেন :—"আমাদের দেশে সরিষার এত বেশী চাহিদা যে, আমাদের দেশে যে পরিমাণ সরিষা উৎপন্ন হয় তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। সেই জন্য বাহির হইতে বাঙ্গালা দেশে তৈল কিংবা সরিষার আমদানী প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। অতএব আমাদের চাহিদা মিটাইতে এবং বাহিরের আমদানী বন্ধ করিতে হইলে উন্নত জাতির অধিক ফলনশীল সরিষার আবাদ করা ও সেই সঙ্গে উহার আবাদ বাড়ান অত্যন্ত দরকার। ভারতবর্ষে তিন রকম সরিষার চাষ হইয়া থাকে, যথা—শ্বেতী তরী অথবা সাধারণ সরিষা এবং রাই বা রাই সরিষা। উপরোক্ত প্রত্যেক রকমেরই আবার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে। ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর সরিষা হইতে আবার বিভিন্ন পরিমাণে তৈল পাওয়া যায়। এই পার্থক্যের কারণ সরিষার শ্রেণীগত কিংবা আবহাওয়া ও জমির জন্য, তাহার গবেষণা এখন আমাদের দেশে সরকারী কৃষি বিভাগে চলিতেছে। তৈলের কলের সাধারণতঃ শতকরা ২০ হইতে ২৫ ভাগ তৈল সরিষা হইতে পাওয়া যায়। দেশের কৃষকেরা যদি উন্নত জাতের টাটকা বীজ কৃষি বিভাগের জেলা অফিসারের নিকট হইতে লইয়া চাষের জন্য সর্ব্বদা ব্যবহার করেন, তাহা হইলে বিঘা-প্রতি সরিষার ফলন এবং তাহাতে তৈলের পরিমাণ বাড়ান যাইতে পারে।" পশ্চিম-বাঙ্গালায় কৃষি-মন্ত্রী এবং কৃষি-বিভাগ আশা করি এ-বিষয়ে অবহিত হইবেন।

* * * * * *

'নবসঙ্ঘ' পত্রিকার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় বলিতেছেন :—"বৃহত্তর ভারতের অঙ্গহানি আরম্ভ হইয়াছে কলিযুগারম্ভ হইতে। আগুপ্ত (Egypt) অশ্বষ্ঠ (Mesopotomoia) হারাইয়াছি, আরব, পারস্য, তাতার, তুর্ক ভারতেরই অঙ্গ—এ স্বপ্ন দেখার সুযোগও আর নাই। কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে, গান্ধার (বর্ত্তমান আফগানিস্থান) ভারতেরই অঙ্গ ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছে। মহাত্মাজীর অহিংসার প্রভাবে ঔপনিবেশিক শাসন-সংস্কার মাথায় বহিয়া ডাবিয়া আনিল অধিকতর ক্ষুদ্র ভারত। আর হিংসার প্রভাবে কায়েদে আজাম জিন্না সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, আদি বাংলা ও পঞ্চনদকেও পাকিস্থানে পরিণত করিল। বিধাতার লিখন, কাজেই ইহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।" ভারত-বিভাগ হইবার পূর্ব্বে এই সব কথা প্রচার করা উচিত ছিল। এই প্রসঙ্গে মহাত্মাজীকে পরিহাস করিবার চেষ্টার রহস্য বুঝিলাম' না! তাহা ছাড়া রায় মহাশয়ের বক্তব্য এবং প্রতিপাদ্য বিষয়টি আমাদের পক্ষে বিশেষ কঠিন এবং সুদূর-প্রসারী! সীমার মধ্যে থাকিলে হয়ত বুঝিতে পারিতাম।

* * * * * *

'বর্দ্ধমানের কথা' পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম :—"দাঁইহাটের নিকটবর্ত্তী কয়েকটি ইউনিয়ন হইতে গত কয়েক মাস ধরিয়া চাষের গরু ও মহিষ চুরি যাইতেছে এবং মূল্যের অর্দ্ধেক টাকা লইয়া মালিকগণকে ফেরৎ দিতেছে। অন্যান্য চোরা-কারবারের মত এই অভিনব কারবারটি এক প্রকার প্রকাশ্য ভাবেই চলিতেছে। সম্প্রতি পলসোনা গ্রামের শ্রীশ্যামাশ্যাম রায়ের চারিটি বলদ ও গুরুপদ রায়ের দুইটি মহিষ চুরি যায়। তাঁহারা লোক মুখে সংবাদ পাইয়া গঙ্গার অপর পারে বালিডাঙ্গা, ফরিদপুরে হারানো গরু ও মহিষের খোঁজ করিতে যান। ঐ গ্রামের গোয়ালারা বলে, আটশ' টাকা লইয়া আস গরু ও মহিষ দুই-ই পাইবে—সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেয় পুলিশে খবর দিলে কিন্তু পাইবে না। যাহা হোক, তাহারা ফিরিয়া চার পাঁচ দিন পরে যাইয়া অনেক দর কষাকষির পর ২২০৲ টাকা গরু জোড়া দুইটি ও ২২৫৲ টাকা দিয়া মহিষ জোড়াটি ফেরত লইয়া আসে।" নূতন গরু-চোরেরা যে সৎ ব্যক্তি তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। প্রকাশ্য ভাবেই যখন কারবার চলিতেছে, তখন ইহাকে চোরা-কারবার বলাই বা কেন? দেশের শাসন-ব্যবস্থার গুণে—ব্যবসা-পদ্ধতির সামান্য পরিবর্ত্তন মাত্র হইয়াছে।

* * * * * *

'আর্য্য' পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্য আমাদের পাঠকবর্গকে আনন্দ দান করিবে। 'আজাদ' বর্দ্ধমানে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। "আর্য্য" মহারাজ বর্দ্ধমান, ধনী জমিদার (!) ও হিন্দুসভা না কি ইহাতে লিপ্ত। 'পেরেণ্টইকে' সাবর্ণ গোত্রীয় 'আজাদ'কে জিজ্ঞাসা করি, বর্দ্ধমানের রাজপথ হইতে কয়টি অন্য ধর্ম্মের কিশোরী অপহৃতা হইয়াছে? সম্প্রদায়-বিশেষের কোনও তরুণীর রাণীবালার মত দুর্ভাগ্য এখানে ঘটিয়াছে কি? পরধর্ম্মের কোনও অন্তর্বর্ত্তীকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে কি? কয়টি হিন্দু যুবক ধর্ষণের দায়ে বর্দ্ধমানে অভিযুক্ত হইয়াছেন? ১০০ নং এর পৈশাচিক ঘটনার মত কোনও নায়কীয় ঘটনা রাঢ়ের এই রাঙ্গা মাটিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে কি? ১৬ই আগষ্ট হইতে ৭ই জুলাই পর্য্যন্ত নোয়াখালি ও কলিকাতায় যে ঘাতক-যজ্ঞ হইয়াছে, জননী সর্ব্বমঙ্গলার এই পীঠভূমে তাহার মত কি কোনও বীভৎস তাণ্ডব? হিন্দু—তৈমুর-চেঙ্গিস-নাদিরের মত মারহাব্বা মারহাব্বা বলে না, হিন্দুর মঙ্গল মন্ত্র—দৌঃ শান্তি, পৃথিবী শান্তি! আজাদের' এই কাল্পনিক সংবাদ সম্প্রদায়বিশেষকে উত্তেজিত করিতে পারে। এ বিষয়ে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 'আজাদ' প্রমাণ করুন, কোথায় বর্দ্ধমানের হিন্দুরা ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই মিথ্যা প্রচারের জন্য 'আজাদ' সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, তৎপ্রতিও মন্ত্রিমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।" আমাদের কোন প্রকার মন্তব্য নাই। তবে 'আর্য্য'-এ প্রকাশিত প্রশ্নগুলির জবাব 'শ্রী আজাদ' আশা করি দান করিবেন।

'হিন্দুরঞ্জিকা' বড় দুঃখেই বলিতেছেন :—"কণ্ট্রোলকে উপলক্ষ করিয়া জনসাধারণ আর কত দিন এই ভাবে শোষিত হইবে। অপরের খেয়াল-খুসির উপর জনসাধারণের জীবনযাত্রার অপরিহার্য্য দ্রব্যগুলির সরবরাহ নির্ভর করিতেছে। সাপ্লাই অফিস, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, ফুড কমিটি প্রভৃতির দুয়ারে দুয়ারে ধর্না দিয়াও বস্ত্র, কয়লা, চিনি সংগ্রহ করা যাইতেছে না। কয়লার অভাবে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সহরবাসী যে দুয়ারে দুয়ারে ধর্না দিয়া বেড়াইতেছে তাহা দেখিলেও দুঃখ হয়। শুনা যায়, সহরে কয়লা আসিয়াছে কিন্তু উহার কত মণ essential কর্ম্মচারীদিগকে দেওয়া হইয়াছে আর ফুড কমিটি কর্তৃপক্ষকেই বা কি দেওয়া হইয়াছে তাহা জনসাধারণ জানিতে পারে কি? বণ্টন ব্যবস্থার এইরূপ বৈষম্য আর কত কাল চলিবে? বস্ত্রও যদি নিয়মিত ভাবে না মেলে তবে Ration কার্ডে বস্ত্রের পরিমাণ বস্ত্রের জন্য আলাদা কার্ড ইত্যাদি ব্যবস্থার সার্থকতা কি? একে কার্ডের লিখিত পরিমাণ বস্ত্র পর্য্যাপ্ত নহে, তাহার উপরও উহা অনিয়মিত ভাবে দেওয়া হইতেছে। চিনিও আবার কয়েক সপ্তাহ হইল কার্ডের লিখিত পরিমাণ পাওয়া যাইতেছে না। হঠাৎ উহার পরিমাণ কমান হইল কেন, তাহা জনসাধারণকে জানানো কর্তৃপক্ষ কোনও আবশ্যকতা বোধ করেন না। তদুপরি নিজেদের খেয়াল-খুসি অনুযায়ী এক এক ওয়ার্ডে এক এক রকম চিনির বণ্টন ব্যবস্থা চলিতেছে।" রাজশাহীর কথা এখন আর আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব হইবে না। তবে আমাদের পক্ষে বিষাক্ত কন্‌ট্রোলকে এখন হয়ত কন্‌ট্রোল করা সম্ভব হইবে। লীগ-শাসনের প্রবর্তিত পাপ সম্পূর্ণ ভাবে দূর করিতে কিছু সময় লাগিবে। সেই কারণে, পশ্চিমবঙ্গবাসীকে ধৈর্য্য হারাইয়া, অযথা পশ্চিমবাঙ্গলা সরকারকে বিব্রত না করিতে অনুরোধ করিব। পুরানো রোগের চিকিৎসা সময়-সাপেক্ষ—দেশবাসী যেন ইহা মনে রাখেন।

* * * * * *

'পাঞ্চজন্যে' প্রকাশ :—"কলিকাতার গঠনমূলক কর্ম্মি-সম্মেলনের অধিবেশন উদ্বোধন করিতে যাইয়া শ্রীযুক্তা চারুপ্রভা সেনগুপ্তা বলিয়াছেন, 'হিন্দুরও পাপের অবধি নাই এবং সর্ব্বাপেক্ষা পাপ অস্পৃশ্যতা। সেই পাপেই আজ এই দুরবস্থা। মানুষকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখা যে কত বড় অন্যায়, কত প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াও এ কথা আজও আমরা অনুভব করিতে পারি নাই।' এই কথা যে সত্য, আশা করি হিন্দুগণ তাহা এখনও উপলব্ধি করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবেন। এই অস্পৃশ্যতা পাপকে নির্ম্মূল করিতে না পারিলে হিন্দুর যে উন্নতির কোন আশাই নাই তাহা হৃদয়ঙ্গম করা মোটেই কঠিন নহে। এখনও যাঁহারা ঐ পাপে নিমজ্জিত হইতে চাহেন তাঁহারা নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই ডাকিয়া আনিবেন। এজন্য 'অন্যের উপর দোষারোপ করা সম্পূর্ণ অর্থহীন;" এ বিষয় আমরা পূর্ব্বে বহু বার মন্তব্য করিয়াছি। হিন্দু সমাজের নেতারাও সমাজ-দেহ হইতে অস্পৃশ্যতা এবং জাতিভেদ দূর করিতে বাস্তব চেষ্টা কতখানি করিতেছেন, তাহা সঠিক জানা নাই। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভই এখন কয়েক জন নেতার প্রধান চিন্তা এবং কার্য্য হইয়াছে! দেশ ক্রমশঃ এই সব নেতাদের চিনিতে পারিবে।

* * * * * *

"হিজলী হিতৈষী'র মতে :—"ফসল বাড়াও ফসল বাড়াও" এই কথা বহু দিন হইতেই শোনা যাইতেছে কিন্তু এ সম্বন্ধে কার্য্যকরী কোন ব্যবস্থাই দেখা যাইতেছে না। হনুমান ফসলের কিরূপ ক্ষতি করে তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত। ইহাদের অত্যাচারে ফসল ত জন্মাইতে পারে না অধিকন্তু খড় ও টাইলের ঘরের চাল রক্ষা করাই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের দলবদ্ধ আক্রমণ ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া এখন অনেকেই রবিশস্য প্রস্তুত করা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় একই জেলার পার্শ্ববর্ত্তী মহকুমাতে যখন হনুমান মারার ব্যবস্থা হইয়াছে তখন মহকুমাতেও ফসল বৃদ্ধির সহায়তাকল্পে এইরূপ আদেশ জারী করা কি সম্ভব হয় না? পূর্ব্বকালে হনুমান না মারিয়াই যথেষ্ট ফসল এবং ফল দেশে হইত। বানরে কিছু ফল খাইলেও তাহাতে কোন ক্ষতি হইত না। যথার্থ কারণের দিকে চোখ না দিয়া, কেবল হনুমান হত্যা করার দিকে দৃষ্টি দিলে কি লাভ হইবে? অনাবশ্যক হত্যা এবং জীব-হিংসায় কোন কল্যাণ হইবে না।

কাঁথিতে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ উৎসব উপলক্ষে 'হিজলী হিতৈষী' মন্তব্য করিতেছেন :—"বাংলায় খাদ্যাভাব দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি লাগিয়াই আছে। শোষণ-নীতির ফলে অবশ্য অনেক সময় এগুলি ঘটিয়া থাকে সত্য কিন্তু দেশের জনসংখ্যা অনুপাতে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য জন্মাইবারও যে উপযুক্ত চেষ্টা বা কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করা হইতেছে না ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। "অধিক শস্য ফলাও" এ কথা সকলের মুখেই শোনা যাইতেছে কিন্তু কাগজপত্র বা বিজ্ঞাপন ছাড়া অধিক শস্য ফলাইবার কি কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা বা চেষ্টা হইতেছে? জলনিকাশী বা জল সরবরাহের সুব্যবস্থা, উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য চালাইবার যন্ত্রপাতি প্রবর্ত্তন ও প্রচার, ভাল সার ও বীজ সরবরাহ এবং পতিত জমি আবাদ করাইবার জন্য যথাযোগ্য প্রচেষ্টা বা সাহায্য করিবার এ পর্য্যন্ত কি কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে? বিজ্ঞাপন বা বক্তৃতায় দেশের ও দশের প্রকৃত উন্নতি এবং কল্যাণ করা যায় না যদি কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা না যায়। আজ এই যে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ আরম্ভ হইয়াছে ইহার দ্বারা দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি ত হইবেই, অধিকন্তু এইরূপ কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বনের দ্বারা নিরক্ষর জনসাধারণকে এই কার্য্যে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা হইবে। এই বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ অনুষ্ঠান দ্বারা দেশবাসী হাতে-কলমে যে শিক্ষা, অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করিল এবং ইহার দ্বারা যেরূপ ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা করা যায় সেইরূপ কেবল মাত্র বিজ্ঞাপন বা বক্তৃতার দ্বারাই কি সম্ভব হইত বা আশা করা যাইত?" 'হিজলী হিতৈষী'র মন্তব্য বাঙ্গলা দেশের সকলের প্রণিধানযোগ্য। কলিকাতা সহরেও বৃক্ষ-রোপণ উৎসব করিলে দোষ কি? শহরের রাস্তাগুলি হইতে বড় বড় গাছগুলিকে ত কর্পোরেশন শেষ করিয়াছেন

বলিলেই হয়। নূতন করিয়া গাছ লাগাইলে দোষ কি? ইহাতে ক্রমে শহরের শোভা এবং স্নিগ্ধতা বৃদ্ধি পাইবে, এবং কলিকাতা কর্পোরেশনেরও অন্ততঃ একটি ভাল এবং অদলীয় কাজ করিবার সুযোগ মিলিবে।

* * * * * *

'বীরভূম-বার্ত্তা' প্রকাশ করিতেছেন :—"বোলপুর ষ্টেশন হইতে শান্তিনিকেতন যে রাস্তাটি আসিয়াছে তাহা এই বর্ষার প্রারম্ভেই এক শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে। রাস্তার বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গর্ত্ত হইয়া পথচারীর জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। জেলা বোর্ড কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় নাই কেন বুঝি না। ভারতের—তথা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে বহু লোক গুরুদেবের শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করিতে আসেন। বোলপুর ষ্টেশন হইতে শান্তিনিকেতন যাওয়ার রাস্তাটি জেলাবাসীর এক কলঙ্কস্বরূপ। জেলা বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষের তাহা খুব সুনাম ও কর্ম্মনৈপুণ্যের পরিচয় নিশ্চয়ই নয়! এই রাস্তাটি অবিলম্বে মেরামত করা আবশ্যক। জেলা বোর্ডের এই রহস্যজনক নীরবতা কেন বুঝি না। আমরা পুনরায় বলি, পৃথিবীর নিকট শান্তিনিকেতনের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যও এই রাস্তাটি জেলা বোর্ডের আশু সংস্কার করা উচিত।" কেবল বোলপুরে নহে, পশ্চিম-বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই পথঘাটের অবস্থা একই প্রকার। এমন কি কলিকাতা শহরের রাস্তাগুলির অবস্থাও কোন দিক হইতেই "ভদ্র" নহে। আশা করি, 'পাপ' বিদায়-পর্ব্ব যখন শেষ হইয়াছে, পশ্চিম-বঙ্গের সকল অভাব-অভিযোগ ক্রমে ক্রমে বিদূরিত হইবে। জনগণ এ বিষয়ে সবিশেষ তৎপর থাকিলে—নেতা বা কর্ত্তৃপক্ষ কোন প্রকার ফাঁকির অবসর পাইবেন না। সুনিদ্রার অভাবও তাহাদের যথেষ্ট হইবে!

* * * * * *

অজয় নদীর বাঁধ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। বীরভূমবাসীর জীবন-মরণের সঙ্গে বিষয়টির ঘনিষ্ঠতা এত বেশী যে আমরা এ বিষয়ে আবার লিখিতে দ্বিধাবোধ করিতেছি না। বিগত বৎসরে বাঁধ মেরামতের জন্য যে অল্পাধিক দুই লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে তাহা সরকার বীরভূমবাসীর নিকট হইতে Embankment Act এ আদায় করার আদেশ দিয়াছেন। এই Act অনুসারে টাকা আদায় করিতে হইলে কাজ করার আগেই সাধারণকে জানান আইন অনুসারে অবশ্য কর্ত্তব্য। এ ক্ষেত্রে তাহা করা হয় নাই। আইন অনুযায়ী এই অর্থ জনসাধারণ দিতে বাধ্য নয়। আমরা জানিতে পারিলাম, এ বৎসর বাঁধ মেরামতের জন্য ১১ লক্ষ টাকা খরচ হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞরা মত দিয়াছেন। এই টাকাও না কি উপরোক্ত আইন অনুযায়ী আদায় হইবে। তাহা করিতে হইলে অন্ততঃ ছয় মাস সময় লাগিবে এবং বোধ হয় অনেক নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে। দরিদ্র জেলাবাসী এই অর্থ দিতে গেলে নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। আশা করি, পশ্চিম-বঙ্গের সরকার এ-বিষয় যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবেন।

* * * * * *

লাভপুর থানার কলগ্রাম গ্রাম্য ফুড কমিটির অনাচার সম্পর্কে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদনের এক খণ্ড নকল আমরা পাইয়াছি। আবেদনকারী প্রসঙ্গক্রমে লিখিতেছেন :—"আমরা জানি যে কাপড়ের কণ্ট্রোল হইয়াছে দরিদ্রের কষ্ট মোচনের জন্য কিন্তু আমাদের গ্রাম্য ফুড কমিটি এবং সভাপতি নানা উপায়ে দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া সমস্ত কাপড় নিজেরা এবং নিজেদের অনুগতদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করিয়া লইতেছেন।" উক্ত ফুড কমিটির সভাপতির আচরণ আরও বিস্ময়কর। কেহ কেহ না কি গত এক বৎসরের মধ্যে মোটেই কাপড় পায় নাই। আমরা গ্রাম্য ফুড কমিটির এই সকল অনাচারের আরও দুই একটি সংবাদ জানি। কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে অবিলম্বে আকৃষ্ট হওয়া উচিত এবং ঘটনা যদি সত্য প্রমাণিত হয় তবে এই সকল লোককে আইনানুসারে যথাযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থাও করা আবশ্যক। পল্লীর কতিপয় দরিদ্র লোকের সহায়তার সুযোগ লইয়া যাহারা এই হীন ও জঘন্যতম কার্য্য করিতে পারে তাহারা আর যাহাই হউক ক্ষমার অযোগ্য। বাঙ্গালার অন্যান্য বহু অঞ্চলের ফুড কমিটি সম্বন্ধেও নানা প্রকার অনাচারের সংবাদ আমরা পাঠাইতেছি। প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে তাহাও প্রকাশ করিব।

* * * * * *

Organ of Radical Democratic Party (Bengal)র মুখপত্র 'জনতা'য় প্রকাশিত একটি কবিতা পাঠ করুন :—

"বঙ্গের কুকুর

প্রভুভক্ত অতীব কুকুর, নির্ব্বিচারে করে আজ্ঞা পালন প্রভুর।
প্রভু যারই পেছনে লেলায় দন্ত আর নখ নিয়ে তারই পানে ধায়।
নির্দ্দোষের রক্তপাতে কোন দ্বিধা নাই— এমন কুকুর আছে মনুষ্যের ভাই।
বিবেক বন্ধক রেখে প্রভুর জিম্মায় এই সব কুকুরেরা অন্ন বস্ত্র পায়।
বঙ্গভূমে কুকুরের সংখ্যাধিক্য আজ— আজাদী আসন্ন তবু, চিন্তায় কি কাজ?"

অর্থাৎ র‍্যাডিক্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টি ছাড়া অন্য দলীয় সকলেই হইল "বঙ্গের কুকুর" শ্রেণীর। এই ডিমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা মহারাজই বোধ হয় গত মহাযুদ্ধের সময় প্রায় তিন বৎসর কাল মাসিক তেরো হাজার মুদ্রার বিনিময়ে সারমেয়-বৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন! দেশের লোক এখনো সে-কথা ভুলিয়া যায় নাই! বর্ত্তমানে মাসিক বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই কারণেই বোধ হয় ইহাদের মানসিক রুক্ষতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে!

বর্ত্তমান বিবাহ-প্রথা

বিভাবতী বসু

বহু সমস্যা কালের কুটচক্রে পড়ে আরো জটিল হয়ে উঠেছে, যার বিষক্রিয়ার ফলে সমাজ আজ ক্ষীণশক্তি হীনমর্য্যাদ। তাই আমাদের সমস্ত বিষয় নূতন করে ভাববার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর অনুভূতির সঙ্গ বিচার ও উপলব্ধি করবার। এবারে তাই বর্ত্তমান বিবাহ-প্রথা নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথমে জানা দরকার, বিবাহের উৎপত্তি কোথা হতে? মানুষের হৃদয় ও আত্মার স্বভাবজাত আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা হ'তে। অপরের প্রতিভার সাথে সংযুক্ত হয়ে ফলবান হবার যে প্রেরণা হতে, যেখানে দু'টি নরনারী একে অপরকে ভালবেসে এক হয়ে মিশে যায় তাকেই আমরা প্রকৃত বিবাহ বলব। আবেগ আর অনুভূতির চরম বিকাশ যেখানে সেটাই ত যথার্থ বিবাহ। আমাদের সমাজে যদি দেহ ও মনের স্তর ভেদ করে আত্মা থেকে উৎসারিত প্রেমের পরিণতি বিবাহে পর্য্যবসিত হত তা হলে সমাজ এমনি বন্ধ্যা হ'ত না।

আমাদের সমাজে বর্ত্তমান যে বিবাহ-প্রথা ওতে উপকার হতে পারে কিন্তু স্বপ্রকাশ হয় না। কেন হয় না? তার কারণ আমাদের সমাজের প্রেমকে অবিশ্বাস ও অসম্মানের চোখে দেখা। ত্রেতা যুগের মত হরধনু ভেঙ্গে ত সীতাকে আর লাভ করতে হয় না বলেই রামচন্দ্রের মত পুরুষ দুর্লভ। আমাদের সমাজে ত প্রেম মুখ্য নয়, ওটা গৌণ। স্বোপার্জ্জিত প্রেমের উপর বিবাহের ভিৎ নয়, বিবাহ হতেই প্রেমের উৎপত্তি। একটি অনুভূতিকে লাভ করার জন্যে একটিকে লাফ দিয়ে অতিক্রম করে যাওয়া—জোর করে পাকানো। সমাজ ভুলে গেছে যে মিলনের অত্যুগ্র ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে মিলন না হলে ত পরিপূর্ণ দাম্পত্য আসতে পারে না, আর পরিপূর্ণ দাম্পত্য না আসলে ত পরিপূর্ণ বাৎসল্য আসতে পারে না। দুষ্প্রাপ্যকে চাইবার পূর্ব্বে অযাচিত ভাবে অধিকারী হয়ে পড়লে যা হয়ে থাকে ঠিক তাই হচ্ছে। বর্ত্তমানে বিবাহ নামে যে অনুষ্ঠান চলছে তা শুধু জৈব ধর্ম্ম মাত্র, যা মানুষকে বড় করে না। বর্ত্তমান সমাজ বিধানানুযায়ী বিবাহের দরকার হল পারিবারিক প্রয়োজনে—তাই শাস্ত্রে লেখা আছে, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—এ যেন সমাজের জন্য আমি'র মত। পরের চাপানো সংসার দায়ের মধ্যে সে আনন্দের দায়িত্ব খুঁজে পায় না। পিতৃ-মাতৃ কুলের জাত-কুল-মর্য্যাদা বাঁচে কিন্তু বদ্ধ ঘরে রাখার ফলে সে নীড়ের স্বাদ হতে হয় বঞ্চিত। সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ত্তি থেকে বঞ্চিত করে সৃষ্টির হুকুম দেওয়ার ফলে সংসারী সংসারকে সুন্দর করবার প্রেরণা পায় না, অর্থাৎ কর্ম্মশক্তি তার জাগ্রত হয় না। এর জন্য আমরা দেখতে পাই যে, গৃহী ঘর-সংসার করে অথচ মন তার পড়ে থাকে লোটা-কম্বলের উপর। মানুষ যখন তার অন্তরের আবেগে চলে যে পায় চলার মধ্যে গভীর আনন্দ—পথ যতই দুর্গম হোক না কেন সে উদ্দাম বেগে ধায়। স্বতঃস্ফূর্ত্ত কাজে এমনি হয়ে থাকে, কারণ কাজ তখন আর নিছক কাজ থাকে না, হয়ে উঠে খেলা। খেলার আনন্দ যখন কাজের আনন্দের সাথে বন্ধুত্ব পাতায় তখন বেদনার থেকে ভার চলে যায়, দুঃখের থেকে চলে যায় হুল, অর্থাৎ বিপুল গৌরব ও বৃহত্ত্বের আশায় ছোট-খাটো দুঃখ-কষ্ট ভুলে যায়—যেমন নারী ভুলে যায় প্রসব-বেদনা।

প্রেম যেখানে মুখ্য নয়, সেখানে প্রেমের জন্য সাধনার কি প্রয়োজন? প্রেমকে নৈর্ব্যক্তিক করার জন্য সমাজ সমগ্র নারীকেই জন্মাবধি পক্ষাহত করছে। সাধনা আমাদের অল্প, পাওয়া তাই অতি সামান্য, আমরা তাই নগণ্য। ফাঁকি দিয়ে পেতে চাই বলে পাওয়া আর কিছু হয় না। উপরন্তু সমাজ পতি মনোনয়নের সুযোগ হতে বঞ্চিত করে সাবিত্রীর মত সতী হবার উপদেশ দেয়, ফলে সাবিত্রীর মত মাধুর্য্যময়ী নারী আজ একান্তই দুর্লভ।

আমাদের সমাজ প্রেমের ফুল না ফুটতে, কীট পাছে নষ্ট করে ফেলে এই ভয়ে কোরকটিকে ফুলদানীতে রেখে ফুল ফোটাতে চেষ্টা করে, ফলে ফুলের আর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য থাকে না। স্বভাব নিয়মে বেড়ে উঠতে না দেওয়াই বর্ত্তমান ব্যর্থতার একমাত্র কারণ। অন্তরের মধ্যে যৌবনকে অনুভব করবার পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়ার ফলে সমাজ আজ এমন অচরিতার্থ, নিরানন্দ। চরিত্রের মূল হচ্ছে প্রেম, যার প্রেম যতো গভীর তার চরিত্র ততো মাধুর্য্যময়, ততো ঐশ্বর্য্যময়। প্রাণের প্রাচুর্য্যই ত জীবনীশক্তি। সমাজ বলে—প্রেম অবান্তর, ভুলে গেছে যে প্রেমের উদ্বোধন হল পৌরুষের উদ্বোধন, যার ফলে আমাদের এই ৪০ কোটি মানুষের বাস ভারতবর্ষ আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ৯ কোটি মানুষের বাস জার্ম্মাণীর চেয়ে নিম্নে পড়ে আছে। সমাজের শিক্ষার ফলে নারী অতি শৈশব হতেই স্বামী নামক একটি আইডিয়াকে বিগ্রহের মত পূজা করতে শিখে, যার ফলে সে সারা জীবন শুধু আইডিয়ারই সাধনা করে যায়। তাই 'নৌকাডুবি'তে দেখা যায় যে, কমলা যখন জানতে পারল রমেশ তার স্বামী নয়, ওমনি অত দীর্ঘ দিনের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ, পরিচয় এক মুহূর্ত্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তার মনে একটু দ্বন্দ্বও এল না, একটু দুঃখও হল না। স্বামী হল নারীর মনের কল্পনা, কল্পনা চায় একটি উপলক্ষ—প্রতীক, যাকে ধরে সে বাড়তে পারে। ভারতীয় বিবাহের গোড়ার কথা এই যে সমাজ নারীর মনে জন্ম হতে স্বামী নামক একটি আইডিয়াকে বীজ থেকে অঙ্কুরে, অঙ্কুর হতে লতা করে তুলবে তার পর এক মধু-যামিনীতে যে কোন পুরুষের সাথে জড়িয়ে দিবে—তার পর লতাটি তাকে জড়াতে জড়াতে অগ্রসর হতে থাকবে, সেই লোকটির মৃত্যু হলেও তাকে কেন্দ্র করে চলতে থাকবে। এর ফলে পুরুষের পৌরুষের উপর নারীর সাফল্য দাবী। তাই বর্ত্তমান সমাজে পুরুষের মত পুরুষ খুবই কম দেখা যায়।

—

নিভৃত নির্জ্জন চারি ধার

প্রমীলা রায়চৌধুরী

এক

বারটা সেদিন কি ছিলো তা আজ আর মনে নাই কিন্তু সময়টা ছিলো বর্ষণ-মুখর শ্রাবণের সকাল। আগের রাত থেকে সেই যে ঝম্-ঝম ঝুপ-ঝুপ রিমি-ঝিমি করে করে এক তালে অবিশ্রান্ত বর্ষণ আরম্ভ হয়েছে তার যেন আর বিরাম ছিলো না, নেহাৎ দিনের বেলা বলেই একটু মেটে-মেটে মত আলোর আভা দেখা যাচ্ছিলো, না হলে রাত্রে তো একেবারে কালো পাথরের মত নিভাঁজ, নিকষ কালোয় আকাশ ভরে ছিলো। আকাশের বুক চিরে মাঝে মাঝে একটা সোনার সাপ তার দীর্ঘ দেহ মেলে দিয়ে এঁকে-বেঁকে ছুটে চলে যাচ্ছিলো।

ড্রইং-রুমের সব ক'টা জানালায় সার্শি লাগিয়ে সুরভি একলা বসে বসে টুর্গেনিভের একটা নভেলের পাতা উল্‌টিয়ে যাচ্ছিলো, এই রকম পাতা উল্‌টিয়ে যাবার মধ্যে নভেল পড়ায় তার অনুরাগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিলো না—এটা যে শুধু সময় কাটাবার একটা ছল তা এক নজর দেখলেই বোঝা যায়। একটু পরে টুর্গেনিভ আর ভাল লাগলো না—তার জায়গায় এলো "কাব্য-গ্রন্থাবলী"। বই এর ভাঁজ খুলতে বেরিয়ে পড়লো—

"আজি বর্ষা গাঢ়তম,
নিবিড় কুন্তল সম
মেঘ নামিয়াছে মম
হৃদয়-তীরে"

কবিতাটা সব পড়বে বলে সে পাতা উল্‌টিয়ে সেটা বের করে আঙুল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখলো। বাইরে বৃষ্টি সমানেই ঝরে চল্‌লো—"হৃদয়-যমুনা"য় আঙুল ধরা রইলো—সুরভি সেটাকে আর পড়ে উঠতে পারলো না।

দিনটা বিশ্রী রকম খারাপ হওয়াতে সুরভির মনটাও খুব খারাপ হয়েছিলো। এই ভাবে সারা দিন গেলে বিকেলটাও যে মাঠে মারা যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিলো না। বিকেলে যা' যা' প্রোগ্রাম করা আছে সবই মাটী হয়ে যাবে। মন বিশ্রী হয়ে রইল—বিরস মুখে সার্শিবদ্ধ ঘরে সে পায়চারী করতে আরম্ভ করলো। চায়ের পেয়ালা নিয়ে ঝি ঘরে ঢুকে বিষম তাড়া খাওয়ায়, তাড়াতাড়ি সে পেয়ালা নামিয়ে দিয়ে ছুটে পালালো।

সুরভির বাবা অতি মাত্রায় "সাহেব"। তাঁর নিজের ছোটবেলা অতি মাত্রায় আচার-পরায়ণ হিন্দু-বাড়ীতে, অনেক লোকের মাঝে মানুষ হয়ে, আচারনিষ্ঠা-সর্ব্বস্ব বাড়ীর ওপর এবং তার নিয়ম-নিষ্ঠার ওপর তাঁর একটা বীতরাগ বা অশ্রদ্ধা জন্মে গিয়েছিলো। সব বিষয়েই গুরুজনের কথা মেনে চলা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিলো না বলে বিয়েটাও তাঁর তাড়াতাড়ি হয়ে গিয়েছিলো। নিজের আদর্শ মতো প্রিয়া তিনি পেলেন না বটে, পেলেন পত্নীরূপে সেবিকা—স্বামী যাঁর আদর্শ, স্বামী যাঁর ধ্যান-জ্ঞান,—এক কথায় স্বামীই যাঁর উপাস্য দেবতা।

বিয়ে করে বাড়ীর বিধি-নিয়মের পাষাণ-প্রাচীরে অবিরত ঘা খেয়ে খেয়ে তিনি বুঝলেন, পরিবারের সুখ সুবিধার জন্যই এরা ছেলের বিয়ে দেয়—এদের ছেলেরা বিয়ে করে না—তাদের কাছে কোন আশা করাই ভুল। এরা দেখবে কোন্ বউ কতটা অসুবিধা সহ্য করে সংসারের মাঝে নিজেকে একেবারে বিলিয়ে দিতে পারে! সেই হবে আদর্শ বধূ—সংসারের কল্যাণী! আর কিছু নয়। বিতৃষ্ণায় এমন কথাও মনে এলো যে এই নবোঢ়া বধূ পরিবারের আদর্শ বধূ হয়েই থাক্—একে নিয়ে তাঁর কিছুতে চলবে না। নিজের মনের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যত আক্রোশ পড়তো নিরীহ বধূ চামেলীর উপরে—কারণে, অকারণে।

বিয়ের সময় 'আই, এস-সি সেকেণ্ড ইয়ার' চল্‌ছিলো—ক্রমে ডাক্তারী শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিদেশের বাস উঠিয়ে তাঁকে দেশে যেতে হলো। সেই একান্নবর্ত্তিতার মাঝে। দেশে তিনি এলেন বটে—কিন্তু হপ্তা খানেকের বেশী মন টিক্‌লো না কিছুতেই। একটা কিছু ছুতো খুঁজে তিনি বাড়ী থেকে বেরোতে চাইলেন।

সমস্ত পরিবারের কর্ত্তা যিনি, তিনি ভবানীর জ্যেঠা মশাই অম্বিকাপ্রসাদ। অনেক সঙ্কোচে ভবানী তাঁকে বললেন, "আমি বিলেত যাবো।"

ভুরু কুঁচকে অবাক্-বিস্ময়ে অম্বিকা অন্য দিকে চেয়ে রইলেন, শেষে ভবানীর পানে সোজা চেয়ে বল্‌লেন, "মানে?"

তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে সদ্য পাশ-করা ডাক্তার ভাইপো ভবানী মুখ তুলে চেয়ে থাকতে পারলো না। চোখ নামিয়ে কেমন যেন অসহায় সুরে বল্‌লে, "বিলাত যাবো।"

একটু শ্লেষ ও উষ্মার সঙ্গেই অম্বিকা বললেন, "তা আমি বুঝেছি। ডাক্তারী পাস না করলেও বাংলা কথাবার্ত্তা আমি বেশ বুঝতে পারি; কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে কি যে, তোমার কি এ দেশের বিদ্যেতে আর কুলোচ্ছে না? বাড়ীর তুমি বড় ছেলে, তোমার আদর্শ দেখে সবাই যদি বিলেত যেতে চায়, তবে আমাদের 'জলপিণ্ডি'র আশা একেবারেই ত্যাগ করতে হয়।"

ভবানীকে ক্ষোভের জ্বালা পীড়ন করছিলো। চিরকালের জন্য এই আবেষ্টনে থাকা; ওঃ! অসহ কষ্টকর কল্পনা! প্রাণপ্রিয় অধীত গ্রন্থগুলি—মানুষের শরীরের কত না গোপন তত্ত্ব তার ভেতর দিয়ে জানা যায়। কত আগ্রহ জানবার, কত জটিল সমস্যার সমাধান করার ইচ্ছা—এ সবের আলোচনা একেবারে জন্মের মত বিসর্জ্জন দেওয়া! পৈতৃক যা' কিছু নাড়া-চাড়া করে সমস্ত পরিবারের মাথা হয়ে বেঁচে থাকার জন্যই কি এত দিন ধরে লেখা-পড়া শেখা? মাথাটা ঝিম্-ঝিম্ করে উঠলো।

জ্যেঠার দিকে না চেয়েই অকম্পিত কণ্ঠে তিনি বললেন, "বিলেত আমি যাবো-ই। আয় না বাড়লে সংসারের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। ছেলে তো আমি একা নই—এক ছেলে স্লেচ্ছাচারী হলেও আরো ছেলে থাকবে—আপনাদের পারলৌকিক কাজ-কর্ম্মের অসুবিধা হবে না।"

অম্বিকার হাতে সট্‌কার নল ছিলো। 'পাস-করা' ভাইপোর কথা শুনতে শুনতে কখন যে হাত থেকে পড়ে গিয়েছিলো, তিনি বুঝতে পারেননি। ভাইপোর কথা শুনে তিনি শুধু "অঃ" বলে চুপ করলেন।

বাড়ীর সকলেই যখন একে একে তাঁর বিলাত যাওয়ার কথা শুনলো, তখন স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে দলে দলে ভাগ হয়ে 'হা-হুতাশ' করতে লাগলো। যারা নেহাৎ ছোট তারা একটা আকস্মিক বিপৎপাতের ভয়ে ভীত হয়ে রইলো।

মায়ের অশ্রু, পিতার ক্ষোভ, জ্যেঠার রক্তচক্ষু, কিছুই তাঁকে বিলাত যাওয়া থেকে টলাতে পারলো না। অম্বিকাপ্রসাদ হিসাব করে, ভবানীর অংশমত হাজার খানেক টাকা তাকে দিয়ে দায়মুক্ত হলেন।

টাকাটা নিতে ভবানীর মন এবং হাত দুই-ই সঙ্কুচিত হচ্ছিলো। এটুকু টাকায় কি-ই বা হবে মনে করে—শেষে অনেক ভেবে নিলেন।

জ্যেঠাকে বললেন "এই ক'টি টাকা সম্বল করে আমাকে সারা জীবন এখানে থাকতে বলছিলেন? গলায় তো অনেক আগেই পাথর ঝুলিয়ে দিয়েছেন!"

অম্বিকা ভাইপোর ওপর ভীষণ চটে গিয়েছিলেন—বললেন, "একান্নবর্ত্তী পরিবারের সুবিধেটা তোমার মত উগ্রমস্তিষ্ক, অপ্রকৃতিস্থ লোকের জন্য নয়। এ সংসার থেকে তোমার যা পাওনা, তা তুমি পেয়েছ। এবার ওই সম্বল করেই সংসারে পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করো একা।"

ভবানী এই পর্য্যন্ত শুনেই চলে এলেন। বিলাত যাওয়া সম্বন্ধে তিনি মরিয়া হয়ে উঠলেন। দারুণ অর্থাভাব তাঁর বিলাত যাওয়ার পথে সুদুস্তর বাধা হয়ে উঠল—যতই মনে হতে লাগলো, এই বাধা দুর্লঙ্ঘ্য—বাধা সরিয়ে দেওয়ার জন্য জিদ তাঁর ততই চড়ে উঠলো। মনে হলো, তাঁর এই সঙ্কটে স্ত্রী চামেলী কি কিছু সাহায্য করবে না? সে তো শুনেছে সবই কিন্তু তিনিই বা কোন্ মুখে, কোন্ দাবীতে তার কাছে সাহায্যের আশা করেন? সে তো তাঁর কাছ থেকে এমন কোন পাথেয় পায়নি যাতে তার মন তাঁর দিকে আকৃষ্ট হবে? স্বামীর নীরস কঠিন কর্ত্তব্য পালন ছাড়া স্নেহ, মমতা, ভালবাসা কিছুই তো তিনি দেননি তাকে? তবে? তবে এখন বিপদে পড়ে তার কাছে আশার প্রার্থনা কেন? তবুও স্ত্রীর সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া করতে মন ব্যস্ত হলো।

দিনের আলোয় স্বামি-স্ত্রীর সাক্ষাৎ এখনকার মত তখন সুলভ ছিলো না, তাই রাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো। পরিশ্রান্তা চামেলী যখন শয্যাশ্রয় করতে এলো, তখন প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রি গড়িয়ে গেছে। অত রাত্রে স্ত্রীর সঙ্গে আর নিজের মনের দ্বন্দ্ব নিয়ে বোঝা-পড়া করতে প্রবৃত্তি হলো না। কিন্তু রাত পোহানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাড়ী ছেড়ে যাবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তাই বিনা ভূমিকাতে বলে ফেললেন, "বাড়ীতে শুনেছ বোধ হয়, আমি ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় বিলাত যাবো স্থির করেছি। কিন্তু এই একান্নবর্ত্তী ও গোঁড়া পরিবারের প্রত্যেকেই সেটা একটা অসম্ভব কাণ্ড বলে ভাবছে। আমার এই যাওয়ায় কারো সহানুভূতি নেই। তুমি কি ভাবছ তা আমি জানতে চাইনে—শুধু তোমার কাছে কিছু সাহায্য ভিক্ষা করছি। সুসময় এলে তোমার এ সাহায্য আমি ফিরিয়ে দোব, কিন্তু অন্য রকম কিছু হলে কিছুই দিতে পারবো না। দেবে কি কিছু আমায়? আছে তোমার কিছু?"

স্বামীর মন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পরিচয় চামেলী তখনও পাননি, কিন্তু তাঁর এই প্রার্থীর স্বরটি তাঁর মনকে নাড়া দিয়ে গেলো। বললেন, "আমার তো নগদ টাকা কিছু নেই, সম্বল মাত্র গহনা ক'খানি—এ দিয়ে যদি তোমার কোন উপকার হয় তো নিয়ে যাও।"

ভবানী আবার ভাবতে লাগলেন—যাঁকে কিছুই দিইনি, সম্বন্ধও যার সঙ্গে প্রায় অপরিচিতের মতো, তার কাছে এ দাবী তিনি কি করে করবেন? স্বামীকে গভীর চিন্তামগ্ন দেখে চামেলী তাঁর গায়ে মৃদু ঠেলা দিয়ে বললেন, "অত ভাবছ কেন? অসময়ে গহনাগুলি যদি তোমার কাছে লাগে তো লাগুক না কেন? তাতে আমার একটুও দুঃখু হবে না।" স্বামীর সঙ্গে এত কথা বলা বা না ডাকলে তাঁর কাছে যাওয়ার সাহস চামেলীর আগে ছিলো না। আজকার কথাবার্ত্তায় তাঁর ভীরু প্রাণ সাহসিকা হয়ে উঠেছিল।

চোখেরজলে, মুখের মিনতিতে টলে গিয়ে ভবানী স্ত্রীর গহনা ক'খানি ও নিজের সম্বল হাজার টাকার সঙ্গে এক করে পুঁটলি বাঁধলেন। যাকে এত দিন উপেক্ষা করেই এসেছেন, তার মনের নিবিড় পরিচয়ে তিনি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এই হঠাৎ পাওয়া সৌভাগ্যকে মনে মনে স্বীকার করতেও বাধছিলো অথচ গোপন ব্যথার মত এই অনুভূতি বারে বারে নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে যাচ্ছিলো।

সারা রাত্রি না ঘুমিয়ে শুকনো মুখ নিয়ে ভবানী উঠে দাঁড়াতে চামেলী বললেন, "এ কি, এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন তোমাকে? রাত্রে ঘুমোওনি? অসুখ করেছে না কি?"

মৃদু হেসে ভবানী বললেন, "না, অসুখ করবে কেন? ভাবনা হচ্ছে, ভয় হচ্ছে, যত দিন আমি বিলেতে থাকব, তত দিন তুমি কত অসুবিধের মধ্যেই থাকবে যে এখানে! বিলেত গিয়েছি এই অপরাধেই হয় তো প্রকাশ্যেই তোমাকে সকলে কত 'ঘেন্না' করবে। পারবে কি তুমি সে সব সহ্য করে এখানে থাকতে?"

চামেলীর চোখে জল এসে পড়লো। ভগবান্! এত শান্তিও তুমি রেখেছিলে সঞ্চিত করে? হৃদয়হীন বলেই যাকে এত দিন জেনে এসেছি, তার হৃদয়ের এ কি পরিচয় দিলে? এই মধুর পাথেয় সঞ্চয় করে বিরহের অমা কাটিয়ে দেওয়া তো অসম্ভব নয়! অশ্রু-স্তম্ভিত চোখে তিনি বললেন, "পারব—আমি সব কষ্টই সহ্য করতে পারব। তোমার বাড়ীতে, তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে থাকতে কষ্ট আমার কিছুই হবে না।"

নীচু হয়ে চামেলীর মাথাটা বুকের মাঝে চেপে ধরে তিনি বললেন, "তবে তাই থেকো—আমি দেশে ফিরেই তোমার কাছে আসব—তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যাব।" দরজা খুলে স্বামি-স্ত্রী দু'জনেই বেরিয়ে গেলেন।

দুই

ভবানীপ্রসাদের বিলাত যাওয়ার পরে কয়েক বৎসর কেটে গেল। এর মধ্যে একে একে তাঁর মা, বাবা দু'জনেই মারা গেলেন। বেঁচে রইলেন আচার এবং নিয়ম-সর্ব্বস্ব জ্যেঠা মশাই—আর তাঁর তদারকে বধূ চামেলীর দিনগুলি শুধু দুর্ব্বহ নয়, দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠলো।

আরো দু'-একটি বধূ সংসারে এলেও, বড়বৌ হিসাবে চামেলীর দায়িত্ব এবং সেই দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব দিন দিন বেড়ে চলছিলো। গৃহ-দেবতার অর্চ্চনা বা সে গৃহ মার্জ্জনা করার অধিকার, স্বামী বিলাত যাওয়ার অপরাধে তিনি হারালেও, ঠাকুরের ভোগ রান্না বাদে রন্ধনশালার পুরোপুরি অধিকারই তিনি পেয়েছিলেন। আর সেই রন্ধনশালার অতিথির বা সময়ের কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছিলো না—যে আসত, সেই খেতে পেতো। চামেলীর বিশ্রাম মিলতো সাধারণতঃ রাত্রি দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি—কোনো দিন তা-ও পার হয়ে যেতো।

এই রকমে চামেলীর দেহের ও মনের ক্লান্তি যখন চরমে পৌঁছে গেলো তখন হঠাৎ এক দিন দেবতার আশীর্ব্বাদের মত চিঠি এলো

যে ভবানীপ্রসাদ চামেলীকে নিতে আসছেন। মনে অসহ্য আবেগের পুলক নিয়ে তিনি অপেক্ষা করে রইলেন কবে তাঁর সেই শুভ দিন আসবে।

এদিকে অম্বিকাপ্রসাদ ভবানীর চিঠি পাওয়ার পর থেকে রুক্ষ মেজাজ আরও রুক্ষ করে ফেললেন। হয়তো বিতাড়িত ভবানীর জিদ্ তাঁর জিদের কাছে জয়ী হলো, হয়তো মা ধরিত্রীর মতই সহ্যগুণ-সম্পন্না বাড়ীর বধূ চামেলী চলে গেলে সংসার-চক্রের আবর্ত্তনে ভুল হয়ে যাবে, হয়তো গৃহ-লক্ষ্মীর এত দিনের অবহেলার পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস গৃহদেবতা মার্জ্জনা করবেন না, এই সব ভেবে তিনি মিতভাষীও হয়ে গেলেন। তিনি এটা ভুলে গিয়েছিলেন যে, জ্যেঠার জিদের মত ভাইপোর জিদ্‌ও ফেল্‌না নয়—দু'জনে একই বংশের।

দীর্ঘ সাত বৎসর পরে ভবানীপ্রসাদ জ্যেঠার সম্মুখীন হলেন। ধুতি ও সার্ট পরেই তিনি দেশে এসেছিলেন এবং জ্যেঠাকে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করতেও ভুলে যাননি, তবুও অম্বিকা তাঁকে কোনো সম্ভাষণ, এমন কি, সামান্য কুশল-প্রশ্নও না করায়, তিনি প্রথমে একটু দমে গেলেন—পরে বিনা ভূমিকায় বলে ফেললেন, "আমি চামেলীকে নিয়ে যেতে চাই।"

এবার অম্বিকা একটু নড়ে বসলেন—ভাইপোর দিকে না তাকিয়ে বা তার কথার স্পষ্ট কোনো জবাব না দিয়ে বললেন, "অবেলায় আর 'ছোঁওয়া-ছুঁয়ি'টা করো না। তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে চাও তো যখন খুসী নিয়ে যাও—আমাকে বলার বা মতামত নেবার কোন আবশ্যকতাই নাই।"

জ্যেঠার কথা শুনে ভবানী ঘরের বাহিরে এসে দাঁড়ালেন—বললেন, "আমি আর ভিতরে যাব না—আপনি শীগ্‌গীর করে ওকে আনিয়ে দিন, আমি এখুনি চলে যেতে চাই।"

অম্বিকা উত্তরে কিছু বললেন না—খবর পাঠিয়ে চামেলীকে সেইখানে এনে ভবানীর ইচ্ছা জানিয়ে দিলেন। বাড়ীর মেয়েরা ভিড় করে চামেলীর চলে যাওয়া দেখতে এলো।

ভবানী আর সেই ভীরু ছিলেন না—পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁকে দৃঢ়চেতা করে তুলেছিল। মেয়েদের ভিড়ের ভিতর থেকে তিনি চামেলীকে সরিয়ে নিয়ে এসে বললেন, "আমার বিলাত যাওয়ার অপরাধে হয় তো তোমারও 'জাত' গিয়েছে—হয় তো গাড়ীও পাবো না তোমার যাওয়ার জন্য। এই পথটুকু তুমি আমার সঙ্গে হেঁটে যেতে পারবে না?"

চামেলী এর মধ্যেই সব অবস্থাটা বুঝে নিয়েছিলেন—তিনিও সঙ্কোচ ত্যাগ করে স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। দূর থেকে জ্যেঠাকে আর এক দফা প্রণাম করে সস্ত্রীক ভবানী সত্য সত্যই পথে বেরিয়ে পড়লেন। কলিকাতাগামী ট্রেণে উঠে তিনি চামেলীকে বললেন, "আজ থেকে আমরা দু'জনে শুধু দু'জনের—আর কোন আত্মীয় আমাদের রইলো না।"

চামেলী স্বামীর অলক্ষ্যে চোখ থেকে ঝরে পড়ার আগেই দুই ফোটা অশ্রু মুছে ফেললেন।

এই হলো ভবানীর পূর্ব্বের ইতিহাস। ডাক্তারী বিদ্যা তাঁর শুধু পুঁথিগতই ছিল না—আয়ত্তে এসে গিয়েছিলো। ক্রমে পসার-প্রতিপত্তি সুরু হয়ে জীবনে স্বচ্ছলতা দেখা দিলো। কিন্তু চামেলীর জন্মনক্ষত্রে যেন অশুভ গ্রহের প্রভাব বেশী ছিলো বলে দেখা গেল—কন্যার জন্মের পরে তিনি সেই যে অসুস্থা হয়ে পড়লেন সেই রোগই তাঁর মৃত্যু এনে দিলো।

জীবনের আশা দিন দিন কমে আসছে বুঝতে পেরে তিনি নিজেই মেয়ের নামকরণ করলেন "সুরভি।" ভবানী শুনে একটু ক্ষোভের হাসি হেসে বললেন, "খুকুর নামের জন্য এখুনি ব্যস্ত কেন? তুমি সেরে উঠে, ও সব হবে।"

চামেলী অসহায়ের হাসি হেসে বললেন, "সেরে কি আর আমি উঠব?"

"নিশ্চয় উঠবে। আমি যেমন করে পারি তোমাকে সারিয়ে তুলব।"

ভবানীর এই উক্তি কোনো কাজেই লাগলো না। সব যত্ন বিফল করে চামেলী এক দিন অতর্কিত চলে গেলেন। মা-হারা ছোট মেয়েটিকে বুকে চেপে ধরে ভবানী আর একবার ভাগ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

মা-হারা সুরভি বাবার স্নেহে মায়ের অভাব কোন দিন বুঝতে পারেনি। মেয়েকে সুখে এবং শান্তিতে রাখবার জন্য ভবানীপ্রসাদের পয়সা উপার্জ্জন করা ছাড়া অন্য কাজই ছিলো না। গৃহিণীহীন গৃহে মাতার অভাব পূর্ণ করতে কেউ না এলেও আশ্রিতার অভাব ছিলো না। তাঁরা সুরভির চাল-চলন, আচার-ব্যবহার নিয়ে কোন আলোচনা করলে, ভবানী মিষ্ট কথায় তাঁদের বুঝিয়ে দিতেন যে, জীবনে যে মাতৃস্নেহ পেলো না তাকে স্নেহটা তাঁরা যেন একটু বেশী মাত্রায়ই দেন।

সুতরাং সুরভি শুধু সযত্ন-পালিতা উদ্যানলতার মতই বেড়ে উঠলো। সাংসারিক জ্ঞান তার কিছুই হলো না। জুনিয়র কেম্‌ব্রিজ পাশ করে সে যখন সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ পড়তে আরম্ভ করলো, তখন ভবানীপ্রসাদের প্রচুর অর্থের খ্যাতি তাঁর কাছে অনেককেই টেনে নিয়ে এলো। এর সঙ্গে মিলিয়ে থাকল সুরভির সাহচর্য্য। কেউ এলো তাঁর কাছে 'এ্যানাটমির' জটিল তত্ত্ব জানতে, কেউ বা তাঁর ডাক্তারী বইয়ে ভরা লাইব্রেরীতে বসে পড়া-শোনা করতে, কেউ বা শুধুই গল্প করতে আসতো।

ভবানীপ্রসাদ সকলের সাথে সমান ভাবে মিশতেন—সমান ভাবে যত্ন করতেন—দৃষ্টি থাকতো ছেলে বাছাই করার দিকে—সুরভিকে 'পাত্রস্থা' করতে হবে। বিলাত ফেরত হলেও তাঁর মন থেকে জন্মগত সংস্কারগুলি একেবারে যায়নি।

বাইশ বৎসর পরে আজকাল প্রায়ই স্ত্রীর কথা মনে হতো—ভাবতেন, আজ চামেলী বেঁচে থাকলে জামাতা খুঁজে বের করায় কত সাহায্যই না পেতেন তিনি। এ সংসারে তিনি একেবারেই একা অসহায়!

সেদিনের বর্ষণ-মুখর আকাশ তাঁকেও ঘরবাসী করেছিলো—আজ বাহিরে যাবেন না সোফেয়রকে এই কথা বলে দিয়ে তিনি সেদিনের মত বিশ্রাম নিয়েছিলেন। টুর্গেনিভের নভেল বা ঐ জাতীয় কিছু না হলেও তিনিও আজ আলস্যটা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করছিলেন নিজের পেরিয়ে আসা দিনগুলির কথা ভেবে।

ঝড়ের বেগে সুরভি সে ঘরে ঢুকে বল্‌লে, "বাবা, আজকের দিনটা কি বিশ্রী বলো তো? যেনো কোনো 'লাইফ' নেই—'এনজয়মেণ্ট' নেই—হাউ ভেরি টিডিয়স্! সিমপ্লি বোরিং!"

পাতলা একটা 'র‍্যগ' কোমর পর্য্যন্ত ঢাকা দিয়ে ভবানীপ্রসাদ

শুয়ে পড়েছিলেন; মেয়ের কথায় তাকে কাছে টেনে নিয়ে মৃদু হেসে বললেন, "তুই বুঝি বের হতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছিস্ বুড়ি! বাদ্‌লা দিন মাত্রেই বড্ডো বিশ্রী! আজকে কি খাওয়া উচিত বল্ তো?"

সুরভি অন্য দিকে যতই অবুঝ হোক্, পিতার নিঃসঙ্গ একক জীবনের প্রতিরূপটি ঠিক দেখতে পেতো। শুধুই তাঁকে সঙ্গদানের ইচ্ছায় ছোট মেয়েটির মত আবদারের সুরে সে বল্লো, "বল্‌ব বাবা? যদি ঠিক হয় তো আমাকে কি বখশিস্ দেবে?"

খেলার সুরে হেসে ভবানীপ্রসাদ বল্লেন, "তুই বখশিস্ চাস্? আচ্ছা, কাল সারা দিনের 'রোজগার' তোর রিজার্ভ করা থাক্‌লো। এখন বল্ তুই, এই বাদ্‌লায় কি খাওয়া যেতে পারে?"

"ঠিক না হলে কিন্তু হেসো না বাবা"—বলে সুরভি বলতে আরম্ভ করলো "চীনেবাদাম ভাজা, ডালমুট, পাঁপর ভাজা, চা—"

সুরভির কথা শেষ হবার আগেই আগা-গোড়া বর্ষাতি ও ছাতায় মোড়া একটি সুদীর্ঘ দেহ দরজার কাছে এসে থাম্‌লো। তাকে দেখে ভবানী বললেন, "ঐ দেখ রে বুড়ি তোর আর একা বসে থাক্‌তে হবে না।"

পিছন ফিরে সুরভি দেখলো—রমেন! তার বাবার 'এ্যানাটমির' ছাত্র।

বর্ষাতিটা খুলে একটা হুকে টাঙিয়ে দিতে দিতে রমেন বল্লো, "কি যেন একটা খাওয়ার প্রস্তাব চল্‌ছিলো শুন্‌ছিলাম। আমরা পাবো না?"

"হ্যাঁ, পাবেন কিন্তু অম্‌নি নয়।"

"কি করতে হবে আমাকে?" বলে জিজ্ঞাসু নেত্রে রমেন চাইলো।

গম্ভীর হয়ে সুরভি বললো, "বাবাকে আপনার কণ্ঠে কবি-গুরুর যে কোন 'বর্ষা-প্রশস্তি' আবৃত্তি করে শোনাতে হবে। কেমন, রাজী?"

ভবানী এতক্ষণ সকৌতুকে এদের কথা শুন্‌ছিলেন, এবার বললেন, "বেশ হবে—আমি ডাক্তার হলেও আবৃত্তি পছন্দ করি। বিশেষ কবি-গুরুর কবিতা।"

রমেন একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বললো, "তার চেয়ে দু'-একটা গান হলে ভাল হ'তো না? আবৃত্তির চেয়ে গানই more recreative to this monotony."

সুরভি মাথা হেলিয়ে বল্লো, "আসুন। toss করা যাক্। দেখা যাক্ আপনাকে আবৃত্তি করতে হবে না আমাকে গান করতে হবে!"

দু'জনেই রাজী ধরলো—রমেনের হার হওয়ায় তাকে আবৃত্তি করতে স্বীকার পেতে হলো। সুরভি উঠে গিয়ে চা এবং তার আনুষঙ্গিক খাবারগুলির কথা বেয়ারাকে বলে এলো।

একটু স্নিগ্ধ হেসে সে বল্লো, "দাঁড়ান্, ঘরটায় আগে বর্ষার কবিতা শোনার মত atmostphere এনে ফেলি—তাহলেই শোনার একাগ্রতা এসে যাবে; কি বলেন?"—বলে সে কাচের শামাদানে দু'টি বড় বড় মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলো। টেবিলটি ঢাকলে ধূসর আস্তরণ দিয়ে, কবিগুরুর একখানি ছবি তার উপর বসিয়ে রজনীগন্ধার অঞ্জলি দিলো তাঁর পায়ে—দু'পাশে দু'টি সুগন্ধি মহীশূরী ধূপ সুরভি জ্বালাতে লাগলো। বর্ষার জলো হাওয়া রজনীগন্ধা ও ঘরের কোণে রাখা কেয়ার গন্ধের সাথে ধূপের সুরভি মিশিয়ে সকলের গায়ে মাথায় মৃদু স্পর্শ বুলিয়ে যেতে লাগলো।

একটা আরাম-কেদারার মধ্যে নিজেকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিয়ে সুরভি বললো রমেনকে, "এইবার পড়ুন।"

হাসতে হাসতে রমেন বললো, "আপনার আয়োজন দেখে আমার তো এখন রীতিমত ভয়ই করছে।"—বলে তার নিজের চেয়ারটা ভবানীপ্রসাদের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, "পড়ব—কিন্তু বর্ষার কোন কবিতা নয়—'ভ্রষ্টলগ্ন'।" তার গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে ভাষা ফুটলো।

"শয়ন-শিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে,—"

আরম্ভ করে রমেন যখন তার গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে কবি-গুরুর কবিতাটি আবৃত্তি করে থামলো তখন ঘরের মধ্যের সব ক'জন শ্রোতারই মনে একটা শুভলগ্ন 'ভ্রষ্ট' হবার অজানিত ব্যথা সঞ্চরণ করে ফিরছিলো। ঘরের মধ্যে রমেনের আবৃত্তির শেষ লাইন "সে যে আমি —সে যে আমি"—তখনও ঘুরে মরছিলো!

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন প্রথমে ভবানীপ্রসাদ—বললেন, "চমৎকার! চমৎকার! আমি সাহিত্যের কিছু না বুঝলেও ভাল কবিতা আবৃত্তি শুন্‌তে বরাবরই ভালবাসি। তা রমেন, তুমি বাবা ডাক্তারির ছাত্র হয়ে কি করে এত সূক্ষ্ম রসগ্রহণ করতে শিখলে? এ তো যেমন তেমন করে আনাড়ীর পড়া নয়! প্রাণ দিয়ে দরদ দিয়ে কবিকে যে বুঝতে শিখেছে, বুঝবার আকাঙ্ক্ষা আছে, সেই কেবল পারে!"

মৃদু হেসে রমেন বললো, "আমার বাবা, রবীন্দ্রনাথের এক জন অন্ধ ভক্ত ছিলেন। সুতরাং এই কাব্যানুরক্তি কতকটা আমার পৈতৃক বলতে পারেন।"

এর উত্তর দিলো সুরভি—"শুধুই কি পৈতৃক, রমেন বাবু? নিজের রুচি বা ইচ্ছা না থাকলে কাব্য জিনিষটা ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। আমি অনেক চেষ্টা করেছি গানগুলি মুখস্থ করতে কিন্তু বই না দেখে কিছুতেই গান করার উপায় নেই। এর কারণ আপনি কি বলতে চান? শুধু একটি মাত্রই কারণ আছে এর যে জিনিসটা আমি ভাল মত বুঝতে পারি না বলেই গানগুলি মুখস্থ হয় না।"

রমেন হাস্‌লো—অতি মৃদু ভাবে সে বল্লে, "নিজেকে আপনি যতই বিনয়ী বলে প্রচার করুন, যাঁর গলায় অত সুন্দর রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনেছি, কি করে বিশ্বাস করি যে তিনি তাঁকে বোঝেন না? জানেন তো, গান মানুষের মনের বন্ধ দুয়ার খুলে দেয়—অবিশ্যি ভাল করে দরদ দিয়ে গাইলে।"

সুরভি আর আত্মপ্রশংসা না শুনে উঠে পড়লো। পর্দা সরিয়ে সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠে বেয়ারাকে ডাক দিয়ে সে ফিরে এলো।

রমেন তার দিকে ফিরে বল্লো, "আমি এসেই যে আবেদনটি জানিয়েছিলাম, তার পরিণাম কি হল এখনও কিন্তু কিছু জানতে পারলাম না।"

লজ্জিত সুরে সুরভি বল্লো, "Please রমেন বাবু! আপনার আবৃত্তির পরে আমার গান আজ কিছুতেই জমবে না।"

উত্তরে রমেন কি বলতে যাচ্ছিলো, তার বলা মাঝ-পথে বাধা পেলো—ঘরে এসে ঢুকল শঙ্কর—এক জন 'ব্রীফলেস' ব্যারিষ্টার! রমেনের দিকে তির্য্যক্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চেয়ারখানা ঘুরিয়ে তাকে সম্পূর্ণ আড়াল দিয়েই ভবানীপ্রসাদের সঙ্গে মহা উৎসাহে আলাপ আলোচনায় রত হলো—যেন ঘরে তারা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই।

সুরভি কিছুক্ষণ তার এই গোপন বিদ্রোহ লক্ষ্য করলো, পরে দাঁড়িয়ে উঠে রমেনকে বললো, "চলুন রমেন্ বাবু, বাইরের বারান্দায় গিয়ে আপনার আর একটি আবৃত্তি শুনি।"

ভবানীপ্রসাদ আলোচনায় রত থাকলেও সুরভির কথা তাঁর কান এড়ালো না। বললেন, "রমেন যদি কষ্ট করে আর একটি আবৃত্তি করেন-ই তবে তা বাইরে কেন ? এখানে হলে আমরা সকলেই শুনতে পাবো। শঙ্কর, তুমি কি বল ?"

নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে কাষ্ঠ-হাসি হেসে শঙ্কর বললো, "আমি ও সব বিশেষ বুঝিনে তাই ওদিকে ঘেঁসি না—তবে আবৃত্তি এখানে হলে তা আমার কানে ঢুকবেই, কিন্তু for Heaven's sake—মতামত চাইবেন না।"

রমেন শঙ্করের মনের অবস্থাটির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে বললো, "আজকে আমি বড় ক্লান্ত বোধ করছি—বরং আর এক দিন আপনাকে আবৃত্তি করে শোনাব। আমি চলি এখন।"—বলে বর্ষাতিটা গায়ে দিয়ে উঠে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গেই সুরভি উঠে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বললো, "আপনার উচিত রমেন বাবু, আজই আবৃত্তিটি আমাদের শোনানো—পালিয়ে যাওয়াটা eowardiee."

সুরভির এই রকম উক্তি রমেন কোন দিন শোনেনি। একটু চমকে গিয়ে সে বললো, "না—পালিয়ে আমি যাচ্ছি না। সত্যই আজ আমার অন্য 'এনগেজমেণ্ট' আছে, তার সময় হয়ে আসছে—না হলে স্যর নিজে আমার আবৃত্তি শুনতে চাইলেন, আর আমি না শুনিয়ে চলে যাব ? আচ্ছা, চলি আজ। আপনি কিছু মনে করবেন না।"—রমেন বিদায় জ্ঞাপন করে চলে গেল।

সুরভি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে ভবানীপ্রসাদের কাছে গিয়ে বললো, "বাবা! রমেন বাবু খুব চমৎকার আবৃত্তি করতে পারেন, না ? এতক্ষণ কি রকম জমিয়ে রেখেছিলেন ? ওঁর কিন্তু বাবা, ডাক্তার না হয়ে প্রফেসর হওয়া উচিত ছিল—সায়ান্সে নয় আর্টসএ।"

অকৃত্রিম হেসে ভবানীপ্রসাদ বললেন, "এ কথা আমিও মানি মা। কিন্তু ডাক্তারীতে এসেও ও ভুল করেনি—এতেও ওর কৃতিত্ব বড় কম নয়। ছেলেটি যথার্থ ই জিনিয়স্।"

পিতা-পুত্রী যখন এই রকম আলাপে ব্যস্ত ছিলেন—শঙ্কর তার সব রকমের আভিজাত্য নিয়েও এই আলাপের মধ্যে যোগ দিতে পারছিল না, তার মুখটা ক্রমশঃই কালো এবং কঠিন হয়ে উঠছিলো। একটু পরেই বিদায় নেওয়ার জন্য উঠে সুরভির দিকে চেয়ে একটু বাঁকা হাসি হেসে বললো, "Piease, সুরভি দেবি! কিছু মনে করবেন না, আমি আপনার বন্ধু না হলেও হিতাকাঙ্ক্ষী। একটা কথা মনে রাখবেন—'Ali that glitters is not gold'."

মধুর হেসে সুরভি বললো, "Thanks শঙ্কর বাবু! সে কথা আমার সব সময়ে মনে থাকে বলেই তো glittering সব কিছু দূর থেকেই দেখি।"

রাগে এবং অপমানে মুখখানা কালো করে শঙ্কর ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

[ক্রমশঃ

মেয়েরা কেন চিঠি ভালবাসে ?

কৃষ্ণসুচিত্রা দেব

বৈশাখ সংখ্যার 'মাসিক বসুমতী'তে দেখলাম, "চিঠি লিখবেন না" এই নামে একটা প্রবন্ধ রয়েছে। মেয়েদের চিঠি নিয়ে লেখক বেশ একটু বিদ্রূপের কশাঘাত করেছেন। তবে কথাটা একেবারে অমূলক নয়।

প্রথমেই বলে রাখি, আমি ঐ লেখার কোন সমালোচনা বা প্রতিবাদ করতে আসিনি কিন্তু এ বিষয়ে আলোচনা কোরব কিছু।

পূর্ব্বোক্ত লেখক হয়ত কোন একটি বা কয়েকটি মহিলার চিঠি পড়েছেন। সেই একটি মাত্র চিঠি পড়ে সমস্ত মহিলাদের চিঠির তুলনা দিলে নারী জাতির প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হয়। চিঠি ভালবাসেন এমন লোক—যাঁরা সমগ্র দিনের কাজ-কর্ম্মের অবসরে কিছু সময়টা নূতনত্বের সন্ধান চান। এ অবসর বেশী মেয়েদের আসে পুরুষদের চেয়ে। পুরুষরা সময় কাটাবার জন্য যেতে পারেন পার্কে, মাঠে, বন্ধুর বাড়ী। সেটা সব সময়ে মেয়েদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আজ বিশ্ব জুড়ে চলেছে মানুষের অত্যাচারের তাণ্ডব লীলা। সেই সময় দূর বিদেশ থেকে একটু শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার ঠিকানা দিয়ে কেউ যদি চিঠি দেন, তবে মনটা কি খুশীতে ভরে ওঠে না ? অথবা এই অত্যাচারীদের কবলমুক্ত কোন পরিচিত লোক যদি তার সেই বিপদসঙ্কুল অভিজ্ঞতা আর কোন সহৃদয় ব্যক্তির উপকারিতা সম্বন্ধে বেশ গুছিয়ে দু' পৃষ্ঠাব্যাপী চিঠি দেন তবে কি আমরা বিরক্ত হব সেই চিঠি পেয়ে ? কিংবা মনে করুন, কলিকাতার ছোট্ট একটি বাড়ীতে বন্দী হয়ে আছি। চারি দিকে সতর্ক প্রহরীর মত পাহারা দিচ্ছে কারফিউ, সেই অশুভ মুহূর্ত্তে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে এলো একটা চিঠি—যাতে 'কেমন আছ কি করছ ? কলকাতার অবস্থা কেমন ?' ইত্যাদি মামুলী প্রশ্নবাণে পূর্ণ নয়। তাতে আছে একটা লোভনীয় স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা (অবশ্য বর্ণনাটা বেশ গুছিয়ে লেখা)। তখন পড়তে পড়তে মনে হয় না কি যে সেই সৌন্দর্য্য স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি অথবা চলে যাই সেই শান্ত সৌন্দর্য্যময় আবেষ্টনীর মাঝে ?

তার পর দেখুন, কাউকে প্রয়োজনীয় বিশেষ কিছু বলবার আছে অথচ মুখে জানাতে ভদ্রতায় বাধে। তখন মুখ হয় মূক আর লেখনী জানায় তার বক্তব্য। লজ্জার কোন কারণ থাকে না, থাকে না অভদ্রতার ভয়।

আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আপনার কথার তীব্র প্রতিবাদ করে তীক্ষ্ণ জবাবে আপনাকে অপদস্থ বা অপ্রতিভ করতে পারবে না। কিছু দিন লাগবে তার জবাব আসতে। তার জবাব আবার আপনি যখন দেবেন তখন আপনি পাবেন অপর্য্যাপ্ত সময়।

আবার এমন কথাও আছে যা মনে মনে বেশ সাজিয়ে রাখলেন ছন্দ মিলিয়ে কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করবার সময় লজ্জা বা উত্তেজনা এসে আপনার সাজানো ভাষাগুলিকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে গেল। চিঠিতে সে ভয় নেই।

মনের ভাষাকে বা ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ বা সম্পূর্ণ করতে লেখনী যতখানি সাহায্য করে মুখের ভাষা ততখানি পারে না। এই জন্যই বেশী লোক চিঠি পছন্দ করেন আর তাঁদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই মেয়ে।

"পনেরোই আগষ্ট"

শ্রীমতী নীলিমা সরকার

সূর্য্যের জনম ব্যথা সহি সে পূর্ণিমা
লাজে ভয়ে মাতৃত্বের, নব অনুভবে
তিমির আঁচল তলে লুকায়েছে মুখ।
আজি নব শিশু লয়ে লাজ-রক্ত মুখে
দাঁড়ায়ে হাসিছে উষা মৃদু মন্দ হাস।
সাগরের বুকে মাথা রাখি, কখনও
উঠেছে হাসি খল খল খল, আপনার
জীবনের সম্ভাবনা স্মরি। বৈশাখের
বেলা-শেষে ক্ষীণ সন্ধ্যাকালে বেদনার
উগ্রতায় শিহরি শিহরি কাঁদিয়াছে
পড়ি ধরণীর রুক্ষ পদতলে।
তার ব্যথাশ্বাসে, সাগর আকুলি উঠি আহা
ফুঁসিয়া গর্জিয়া পৃথিবীর পা দু'খানি
বক্ষে চাপি ধরি মংগল কামনা করি।
ধরিত্রীর কিরীটের হিমরত্নখানি
কাঁপিয়া থামিয়া যায় নীরব নিথর।
ক্ষণিকের সে কম্পন, অন্তরে অন্তরে
তোলে অনন্তের জীবন স্পন্দন। আজি
দ্বার খুলি জীবনের নব সূর্য্যালোকে
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে বক্ষে বক্ষে ভরি উঠে
শুদ্ধ মুক্ত বায়ু। সে বায়ু ভরিয়া আছে
কত বীর মহাত্মার নিঃস্বার্থ নিশ্বাস।
কত অগ্নিপ্রাণ আপনারে লক্ষ খণ্ডে
স্ফুলিঙ্গে স্ফুলিঙ্গে ছড়ায়ে দিয়াছে হেথা
আকাশে বাতাসে। সন্ধ্যাকালে যদি কেহ
প্রদীপ সাজায়ে থালে, একা কাঁদে বসি
আলোর বিরহে, চঞ্চল বাতাস বহি
অগ্নিকণা, তার দীপ-মুখে দিয়ে যাবে
দীপ্ত আলোকের জ্বালাময় জ্যোতির্ময়
প্রেমের চুম্বন। কত মাতা সন্তানের
বক্ষরক্তে ভিজায়ে আঁচল এক হাতে
অশ্রু চাপি আর হাতে বিজয়-কেতন
তুলিয়া ধরেছে যেন কত অনায়াসে,
কত দুঃখে কত সুখে কতই সাহসে,
কত না আগ্রহে কি দুর্গম গিরিপথে।
যে পুত্র সত্যের পথে ন্যায্য অধিকারে
চেয়েছিল আপনার জননীর ক্রোড়,
চেয়েছিল জননীর মুক্ত পদ 'পরে
রাখিতে প্রণাম অন্তরের নিবেদন।
বর্ষে বর্ষে শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ার ভ্রাতৃ
উৎসব দূরে ফেলি সুরভি চন্দন
আপনার অঙ্গুলি ছেদিয়া ভগ্নী দেছে
ভ্রাতার ললাটে রুধিরের জয়টীকা।
স্তনমুখে মাতা অন্তরের দেশপ্রেমে
জাগায়েছে শত শিশু-প্রাণে উন্মাদনা।
দুর্গম কণ্টক পথ স্বীয় অঙ্গ ভরি'
ধরিয়া চরণ ছবি শত পথিকের
গর্বভরে ধন্য বলি মানে আপনারে।
বিলুপ্ত করিতে সেই রক্ত পদগুলি
কালের করাল কর অক্ষম অবশ।
সেই ছবি অন্তরে আঁকিয়া দলে দলে
আসে সবে। ক্ষীণ তৃণপথে জনতায়
দৃঢ় পদক্ষেপ রচিয়াছে রাজপথ।
ক্ষত পদগুলি কুঙ্কুম চন্দন আর
সুরভি কুসুমে স্থাপনা করেছে সবে
প্রতি ঘরে ঘরে। কত মাতা গড়িয়াছে
মহাত্মা, জহর আর নেতাজী সুভাষে।
আপনারে নিঃশেষে বিলায় তৃপ্ত যারা
বিলাবার সুখে। সুদুর্গম পথে কত
মহাপ্রাণ লুটাইয়া পড়িয়াছে কত
ব্যথা সহে'। সুকোমল সুরভিত কত
শতদল শাসনের কঠোর পেষণে
জীর্ণ ম্লান। কেহ বা ঝরিয়া গেছে কেহ
আজ ঝরিতে উন্মুখ। গেছে যারা, আছে
যারা আজও যারা চলে ক্লান্তিহীন।
সে সকল অন্তরের দুর্নিবার উদগ্র
কামনা তিলে তিলে গড়িয়াছে ঐ শুভ
সম্ভাবনা। বিধাতার অমোঘ বিধান।
চিরজয়ী অন্তর সম্পদ। ভারতের
অন্তরের রত্ন উৎসমুখ—অহিংসা
ত্যাগ ও সত্য? কত যুগান্তের সহস্র
প্রলয় পারেনি রোধিতে যারে প্রচণ্ড
বিক্রমে। আপনার বাহুর বিশ্বাসে
ছিল যারা মিথ্যা গর্বে দর্পে আত্মহারা,
অদৃষ্টের অঙ্গুলি নির্দ্দেশে নতশিরে
লাজ-মুখে আপনার অহঙ্কার স্মরি,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আজ মাগে বন্ধুত্বের
প্রেম ভালবাসা তারা, হায়!! স্নেহশীলা
জননী কি ফিরাবে তাদের? সত্য নহে।
দুয়ার রয়েছে খোলা তাহাদের(ও) লাগি,
অবাধ্য সন্তান যারা সব দ্বারে ফিরি
মাতৃ-অঙ্কে মাথা রাখিবার একটুকু
মাত্র মাগে ঠাঁই। মাতৃ-অঙ্কে অস্ত্রাঘাতে
খণ্ডে খণ্ডে আজ সবে নিল ভাগ করি'।
হায়! কিবা ফল জননীর শব-দেহ
লয়ে? দূর হতে মাতা যদি স্নেহ-চক্ষে
চেয়ে "স্বস্তি" বলি করে শুভ আশীর্ব্বাদ
ত্রিভুবনে আনিবে বিজয়। তবু আজ(ও)
আশা আছে ভেঙ্গে যাবে স্বপনের ভুল
নিশিশেষে। কোন্ এক শুভ দশমীতে
হাতে হাতে বাঁধা হবে ডোর। প্রতিপদ
কল্প তরে কুম্ভ হবে ভরা সে মিলনে
বিসর্জ্জন দিনে।

কন্যার সম্মান

শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবী

একটা মেয়েলী প্রবাদ শোনা যায়—'কন্যা জন্মালে বসুমতী না কি সাত হাত বসে যান,' পুত্রে তার বিপরীত। বসুমতী জিনিষটা যে কেমন তার সংজ্ঞা নিশ্চয়ই প্রবাদকারিণীদের ছিল না। তা বলে আজও যে নেই এ কথা বলা চলে না, কিন্তু আজও দেখি মেয়েরা পুত্র-সন্তানের সম্মান ঠিক পুরোপুরি পায় না। মায়েরাই সে বিষয়ে কার্পণ্য করেন বেশী, অবশ্য মায়েদের কাছে সন্তান সকলেই স্নেহের জিনিষ—তবু কন্যাকে রূঢ়তা দেখাতে, অনাদর করতে মায়েদের যেন বাধে না, পুত্রের মর্য্যাদা কোন সংসারেই কন্যার সমান থাকে না—কন্যার মর্য্যাদা কম, পুত্রের বেশী। আমার একথা প্রকৃতই সত্য—ভেবে দেখলেই মায়েরা বুঝতে পারবেন যে, স্নেহে ইতর-বিশেষ না থাকলেও সম্মানে পুত্রকন্যায় ইতর-বিশেষ আছে আমাদের ঘরে ঘরে।

একটু ভাল খাওয়া, ভালো পরা, ভালো শোয়া ছেলের জন্য ব্যবস্থা হয়, মেয়েকে দেওয়া হয় খারাপটা। এতে শৈশব হতেই ছেলের শিক্ষা হয়ে যায়—স্বার্থপরতা, মেয়ের অভ্যাস হয়ে যায়—সঙ্কুচন। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা শুনতে আরম্ভ করে বিবাহের ভীষণ ভয়াবহতা। সুন্দর স্বাস্থ্যে দেহ পরিপুষ্ট হলে মায়েরা তার দিকে চেয়ে মন্তব্য করেন—'দিন দিন মেয়ে হাতি হয়ে উঠছে'। সুকুমার সরল মনে তখন হ'তেই বিষাদের ঘন ছায়া পড়তে থাকে। শ্বশুরবাড়ীর নির্য্যাতনের কল্পিত কাহিনী মেয়েদের সম্মুখে সবিস্তারে বর্ণনা করবার সময়েও মায়েরা একবার ভাবেন না কতটা ক্ষতি মেয়েদের তাতে হতে পারে।

কিন্তু মেয়েরাও মানুষ। পুরুষের সমান সংখ্যক নারী নিশ্চয়ই প্রয়োজন, কেন না, সংসারে পুরুষ অপেক্ষা নারীর আবশ্যক কিছু মাত্র কম নয়। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার দোষে যদি বিয়ের সময় কোন বেগ পেতে হয় তবে তার জন্য মেয়েকেই অপরাধিনী করা উচিত নয়।

মেয়েদেরই গর্ভে জন্মাবে আমাদের দেশের অনাগত কর্ম্মী, নেতা, দেশসেবক, সমাজ-সংস্কারক। মেয়েরাই সুশ্রী সুন্দর করে গড়ে তুলবে আমাদের সমাজ—সংসার। মেয়েদের মনে যদি আশৈশব গেঁথে দেওয়া যায় সমাজ সংসারের ভয়ালতা নিষ্ঠুরতা তবে কেমন করে মনের দরদ দিয়ে কল্যাণের হাতে গড়ে তুলবে আমাদের সমাজ-সংসার? জন্মকাল হতে যে পেয়ে আসছে অসাম্য ব্যবহার সে আপনার সন্তানদের মনে কেমন করে জাগাবে সাম্যতা?

ছেলে আর মেয়ের পৃথক্ সংজ্ঞা, ছেলের শ্রেষ্ঠতা, মেয়ের হীনতা প্রতিপন্ন করছেন কিন্তু মায়েরাই অর্থাৎ নারীরাই করছেন ভবিষ্যৎ নারীর অবমাননা। যে ছেলে আপনার বোনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করে সে ছেলে পরবর্ত্তী জীবনে স্ত্রী-কন্যাকে ভালো বাসলেও সম্মান দিতে শেখে না। ভালবাসা ও সম্মান সম্পূর্ণ পৃথক্ জিনিষ।

কন্যাকে অর্থাৎ নারীকে অবহেলা করার জন্যেই আমাদের সমাজ-জীবনে আসছে একটা দীনতা—একথা গভীর ভাবে ভাবলে স্পষ্টতঃই জানা যাবে।

বাহ্যতঃ চট করে বলতে গেলে আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করা কঠিন। মেয়েদের জন্য আজ-কাল ভাল কাপড়, গহনা, জুতো, জামার ছড়াছড়ি, শিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজও দিন দিন বাড়ছে। খেলায়, সাঁতারে, দৌড়ে, প্রতিযোগিতায়ও আজকাল মেয়েদের স্থান যথেষ্ট—বাজার, ঘাট, সিনেমা, হোটেল প্রভৃতিতে মেয়েদের অবাধ বিচরণ, তবুও আমার এ অভিযোগ আপাত দৃষ্টিতে অন্যায়ই মনে হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গীতে আমি একথা মায়েদেরই বিচার করতে অনুরোধ জানাচ্ছি, ভেবে দেখতে বলছি—মেয়েদের অগ্রগতির ভিৎ তাঁরাই কাঁচা রাখছেন কি না? জন্মকাল হ'তে একটু হেনস্থা, একটু অবহেলা কন্যাদের প্রতি তাঁরাই করেন কি না? 'মেয়ে আবার সন্তান?'—একথা মায়েরাই অর্থাৎ নারীরাই বলেন কি না?

শুধু সেই জন্যই আজও পুরুষ নারীকে ভালবাসে, স্নেহ করে কিন্তু সম্মান দিতে পারে না। শ্রদ্ধেয় কেদার বাবুর গল্পগুলো নিছক হাসির গল্পই, সত্যকার ভয় বা শ্রদ্ধা পুরুষ নারীকে করে না—করতে শেখে না। মেয়েকে অনাদর করা আমাদের মায়েদের যেন একটা মজ্জাগত অভ্যেস হ'য়ে গেছে—তাই হ'য়ে গেছে পুরুষেরও। কারো একটা মেয়ে মরে গেলে আমরা খুব আহা বলি না, কিন্তু একটা ছেলে মরে গেলে দশ বার বলি। কেন না, মেয়ে সংসারের যেন একটা বিভীষিকা—বোঝা। আর ছেলে? ছেলে অর্থোপার্জ্জন করবে, শ্রাদ্ধ-তর্পণ করবে, অমুক তমুক কত কি করবে। এ সব কথাগুলো বেশীর ভাগ বলেন নারীরাই। তাঁরা বোঝেন কত বড় মিথ্যে আশা, ছেলের ওপর—কত অহেতুক ভয় মেয়ের জন্য, তবুও করেন মেয়ের অনাদর।

কিন্তু এখনও কি আমাদের সে ভুল সংশোধনের দিন আসেনি? যে মেয়েকে হ'তে হবে সন্তানের জননী, স্বামীর সহধর্ম্মিণী, সংসারের কর্ণধার, সে মেয়ের মন, শরীর পূর্ণতা লাভ করতে পারে শুধু স্নেহে নয়—সম্মানে শ্রদ্ধায়! শ্রদ্ধা না পেলে আত্মবিশ্বাস আসে না। আত্মবিশ্বাস—আত্মনির্ভর এখনকার দিনের মেয়েদের যে খুব দরকার একথা তো মায়েদের অজানা নয়? আমাদের পুরাণ-বর্ণিতা দেবী—উমা, গৌরী, সতী, সাবিত্রী; আমাদের ইতিহাস-লিখিতা মেয়ে—চাঁদবিবি, রিজিয়া, তারাবাই, লক্ষ্মীবাই; ভারতের আধুনিক কন্যা—বিজয়লক্ষ্মী, সরোজিনী, অরুণা—এঁরা কেউ-ই অবহেলা অনাদরে লালিতা নয়, অবহেলা অনাদর মনুষ্যত্বের বিকাশে বাধা জন্মায়। মায়েদের মনুষ্যত্ব বিকাশ না হ'লে কেমন করে দেশের, জাতির মহামানবতা জাগবে?

কন্যার সম্মান দানে আর পরাঙ্মুখ থাকলে আমাদের সমাজের মঙ্গলপথে বাধা দেওয়াই হ'বে, একথা আশা করি মায়েরা বুঝবেন।

গান

মাহ্‌মুদা খাতুন সিদ্দিকা

আমার অলস ঘুমে গোপনে নীরবে আসি
কে তুমি বাজালে বাঁশি?
আমার কানন ভরে কুসুম মেলিল আঁখি
বকুল-শাখা পরে গাহিয়া উঠিল পাখি
নয়ন মেলিতে দেখি তোমার মধুর হাসি।
আকাশে রঙের মেলা জেগেছে প্রভাত বেলা
দখিণ পবন ধীরে দিল যে আমারে দোলা
আজি কেমনে লুকায়ে রাখি গোপন সুরভিরাশি।
ভাঙালে ঘুম মোর বাজালে কি যে বাঁশি।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি!

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

মার্শাল পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ :—

বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিন এবং ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বিদৌলের আমন্ত্রণে মার্শাল পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনার জন্য গত ১২ই (১৯৪৭) জুলাই প্যারী নগরীতে ইউরোপীয় ষোলটি রাষ্ট্রের যে সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছিল, চারি দিন অধিবেশনের পরেই তাহা সমাপ্ত হইয়াছে। যে ষোলটি রাষ্ট্র এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা মার্শাল পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াই প্যারীতে গিয়াছিলেন। কাজেই অস্বাভাবিক দ্রুততার সহিত এই সম্মেলন সমাপ্ত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় না হইবারই কথা। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের একটি সহযোগিতার কমিটি (a committee of co-operation) গঠিত হওয়া ব্যতীত এই সম্মেলনে উল্লেখযোগ্য আর কোন কাজও হয় নাই। বিশেষজ্ঞদের কমিটি এই সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলির সম্পদের পরিমাণ, প্রত্যেক রাষ্ট্রের কি পরিমাণ সাহায্য প্রয়োজন এবং প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজকে নিজে কি পরিমাণ সাহায্য করিতে পারে সে-সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন। আগামী ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই রিপোর্ট দাখিল করিতে পারা যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপকে সাহায্য মঞ্জুর করিলে হয়ত আগামী বৎসরের প্রথম হইতে সাহায্য দান আরম্ভ হইবে। 'নিউজ অব দি ওয়ার্ল্ড' পত্রিকার ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, 'ইউরোপকে বাঁচাও' পরিকল্পনার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ২৫০ কোটি ডলার মঞ্জুর করিতে রাজী আছেন। পরিমাণ কমিয়া ১৮৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারও হইতে পারে। এই পরিকল্পনার জন্য অর্থ মঞ্জুরের বিঘ্নও যে একেবারে নাই তাহাও নয়। ইউরোপ যদি অধিকতর ঐক্যবদ্ধতা প্রদর্শন করিতে না পারে, তাহা হইলে এই পরিকল্পনার জন্য অর্থ মঞ্জুরের ব্যাপারে মার্কিণ কংগ্রেসের সম্মতি পাওয়া কঠিন হইতে পারে। ইউরোপকে সাহায্য দান পরিকল্পনাকে আমেরিকায় জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য মিঃ মার্শাল রীতিমত প্রচারকার্য্য সুরু করিয়া দিয়াছেন। কম্যুনিজম-ভীতি সৃষ্টি করিয়া এই প্রচারকার্য্য চলিতেছে।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপের পুনর্গঠনের নামে আমেরিকা যে ঋণ দিতে চাহিতেছে তাহা যে সত্যই ইউরোপের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যেই, দুর্দ্দশা-গ্রস্ত ইউরোপকে শোষণ করিয়া মার্কিণ পুঁজিপতিদের লাভ অর্জ্জনের জন্য নয়, সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলিও এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। জেনেভার আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের প্রাক্কালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ ক্লেটন বলিয়াছিলেন যে, মার্কিণ প্রাইভেট শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি সম্প্রসারিত বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্য দিয়া অবশ্যই সম্প্রসারণ লাভ করিতে থাকিবে। 'ইউরোপকে বাঁচাও' পরিকল্পনা যে 'আমেরিকা বাঁচাও' নীতিরই অপর দিক, তাহা না বুঝিবার মত বোকা ইউরোপকে মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইউরোপীয় দেশগুলির ডলারের অভাব হওয়ায় মার্কিণ শিল্প-বাণিজ্য অতি দ্রুত সঙ্কটের সম্মুখীন হইতেছে। ডলারের এই অভাব পূরণই যে মার্শাল পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য—গত আষাঢ় মাসে তাহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। বস্তুতঃ, এই পরিকল্পনার মারফৎ আমেরিকা ডান হাতে যে নগদ অর্থ ইউরোপকে প্রদান করিবে, ইউরোপের নিকট চড়া দামে মার্কিণ পণ্য বিক্রয় করিয়া বাঁ হাতে আমেরিকা তাহাই আবার ফিরাইয়া লইবে। এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমেরিকা তাহার হাতের পাচ এখনও কাহাকেও দেখিতে দেয় নাই। আমেরিকার নিকট প্রাপ্ত অর্থ হইতে ইউরোপের কোন্ দেশ কোন্ কোন্ শিল্পের উন্নতি করিতে পারিবে, কোন্ কোন্ শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারিবে আমেরিকাই যে তাহা স্থির করিয়া দিবে, সে সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহাই যদি প্রকৃত অবস্থা হয়, তাহা হইলে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি আমেরিকার অর্থ নৈতিক তাঁবেদারে পরিণত হইবে।

ষোড়শ রাষ্ট্র সম্মেলনের শেষে মিঃ বেভিন যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে মার্শাল পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে তাঁহার আশাবাদে ভাঁটা পড়িবার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। ইউরোপের বৃহত্তর অর্দ্ধাংশ এই সম্মেলনে যোগদান না করায় 'ইউরোপকে বাঁচাও' পরিকল্পনা যে অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই এ কথা মনে করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, মার্শাল পরিকল্পনা ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের পরিবর্ত্তে একটা পশ্চিমী ব্লক সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। মিঃ বেভিনের নিজের দেশও ডলার-কৌশল-জালে বেশ ভাল ভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে! আমেরিকার সহিত ঋণ-চুক্তির সর্ত্তানুযায়ী বৃটেন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলি হইতে পণ্য ক্রয় করিতে পারিতেছে না। আমেরিকা মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়ায় মার্কিণ পণ্যের দাম অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে এবং ফলে ডলারের মূল্য শতকরা ২০ হইতে ৪০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। আমেরিকার নিকট হইতে কর্জ্জ-করা অর্থে অত্যধিক চড়া দামে মার্কিণ পণ্য ক্রয় করিতে বাধ্য হওয়া বৃটেনের জনগণ নিশ্চয়ই পছন্দ করে না। কিন্তু ঊর্ণনাভ-জালে মক্ষিকার মত ডলার-জালে বৃটেন জড়াইয়া পড়িয়াছে। মার্শাল পরিকল্পনাকে ফ্রান্সও ঠিক সহজ ভাবে দেখিতে পারিতেছে বলিয়া মনে হয় না। রূঢ় অঞ্চলের কয়লা এবং জার্ম্মাণীর ইঙ্গ-মার্কিণ অঞ্চলের শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে আলোচনাকে ফ্রান্সের উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

মার্শাল পরিকল্পনার সহিত ঐ দুইটি আলোচনার সামঞ্জস্য বিধান করা অসম্ভব। মার্শাল পরিকল্পনার উপর, বিশেষ করিয়া ফ্রান্সের উপর ঐ দুই আলোচনার প্রতিক্রিয়া মোটেই উপেক্ষার বিষয় হইবে না। ফ্রান্স ইতিমধ্যেই তাহার প্রতিবাদ জানাইয়াছে। বস্তুতঃ ইউরোপের পুনর্গঠন যে বৃটেন ও আমেরিকার ঘরোয়া ব্যাপারে পরিণত হইতে চলিয়াছে, ফ্রান্স তাহা ক্রমশঃ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই অবস্থায় মার্শাল পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ আমেরিকার আশা অনুযায়ী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। যদি উহার ফল আমেরিকার আশানুরূপ না হয়, তাহা হইলে আমেরিকার পক্ষে আসন্ন অর্থনৈতিক সঙ্কট এড়ান কঠিন হইয়া পড়িবে। কিন্তু এই পরিকল্পনার পরিণাম যে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে অর্থ-নৈতিক যুদ্ধের প্রারম্ভ সূচনা করিতেছে তাহাতে বোধ হয় সন্দেহ নাই। ইহার পরিণামে সশস্ত্র যুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিবে কি না তাহা অবশ্য বলা কঠিন। ফ্রান্সের প্রাক্‌যুদ্ধ-যুগের প্রধান মন্ত্রী মঃ পল রেণে জাতীয় পরিষদে বিতর্ক প্রসঙ্গে গত ২৫শে জুলাই বলিয়াছেন,—"রুশ-মার্কিণ প্রতিযোগিতা পৃথিবীর অবস্থা এরূপ বিপজ্জনক করিয়া তুলিয়াছে যে, আজ প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে আমেরিকা কি প্রতিষেধক যুদ্ধ (Preventive war) আরম্ভ করিবে ?" কিন্তু প্রতিষেধক যুদ্ধও যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়।

মলটভ পরিকল্পনা :—

মার্শাল পরিকল্পনার ভিতর দিয়া বৃটেন এবং ফ্রান্স ইউরোপের কতকগুলি রাষ্ট্র লইয়া একটি রাশিয়া-বিরোধী ব্লক গঠনের আয়োজন করিতেছে। কিন্তু রাশিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে তাহা মনে করিবার কারণ নাই। ১৭ই জুলাই তারিখে লণ্ডন হইতে প্রেরিত গ্লোবের সংবাদে প্রকাশ যে, প্যারীর অর্থনৈতিক সম্মেলনের পর ক্রেমলিন মার্শাল পরিকল্পনার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে পূর্ব্ব-ইউরোপের জন্য মলটভ পরিকল্পনা নামে একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্ত্তন করিবে বলিয়া 'সাণ্ডে ডেচ্‌পাস্' পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতা জানিতে পারিয়াছেন। রুশ-প্রভাবাধীন পূর্ব্ব-ইউরোপের জন্য কোন পূরাপূরি পরিকল্পনা গ্রহণের অভিপ্রায় রাশিয়ার আছে কি না, সে-সম্বন্ধে সঠিক কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আমেরিকার মত বিপুল অর্থব্যয়-সাপেক্ষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা রাশিয়ার সম্ভব কি না, তাহাও উপেক্ষার বিষয় নয়। রুশ-প্রভাবাধীন ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া এবং হাঙ্গারী এই আটটি দেশ মার্শাল পরিকল্পনার বাহিরে থাকাই সঙ্গত মনে করিয়াছে। এই আটটি দেশের লোক-সংখ্যা ১০ কোটি। ইহা ব্যতীত জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার রুশ-অধিকৃত অঞ্চল তো আছে। অষ্ট্রিয়া প্যারী সম্মেলনে যোগদান করিয়াছে বটে, কিন্তু মস্কো হইতে তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, অষ্ট্রিয়ার রুশ-অধিকৃত অঞ্চলে মার্শাল পরিকল্পনা যেন প্রবর্ত্তন করা না হয়। জার্ম্মাণী মার্শাল পরি-কল্পনার এক বড় সমস্যা। প্যারী সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে, সেনাপতিগণ এবং কণ্ট্রোল কাউন্সিলের সদস্যগণের নিকট জার্ম্মাণীর সম্পদ ও প্রয়োজন সম্বন্ধে বিবরণ চাওয়া হইবে। রুশ প্রধান সেনাপতি যে জার্ম্মাণীর রুশ-অধিকৃত অঞ্চলের সম্পদ ও প্রয়োজনের কোন বিবরণ প্রদান করিবেন না, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

রাশিয়া এবং রুশ-প্রভাবিত পূর্ব্ব-ইউরোপ ইউরোপের এক বৃহত্তর অংশ। এই বিস্তৃত অঞ্চলকে বাদ দিয়া ইউরোপের পুনর্গঠন অর্থহীন। কিন্তু ইউরোপের খাদ্যশস্য-উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলি পূর্ব্ব-ইউরোপেই অবস্থিত। সাইলেশিয়া ও মোরাভিয়ার শিল্পাঞ্চল রূঢ়ের শিল্পাঞ্চলের মতই গুরুত্ব লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ব্ব-ইউরোপের পুনর্গঠন কার্য্য মার্শাল পরিকল্পনা অপেক্ষাও অধিকতর সাফল্যলাভ করিলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। ইতিমধ্যে রাশিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া এবং হাঙ্গেরীর সহিত যে বাণিজ্য-চুক্তি করিয়াছে এবং পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে ইস্পাত-সংক্রান্ত যে চুক্তি হইয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য। রাশিয়া চেকোশ্লোভাকিয়াকে গমের পরিবর্ত্তে সাধারণ কলযন্ত্র ইত্যাদি প্রদান করিবে। রাশিয়া ও বুলগেরিয়ার মধ্যে পেট্রোলিয়াম ও রবর আদান-প্রদানের চুক্তি হইয়াছে। হাঙ্গেরীর সহিত রাশিয়ার যে চুক্তি হইয়াছে তদনুযায়ী রাশিয়া হাঙ্গেরীকে খনিজ লৌহ, কোক কয়লা, আয়রণ এয়লজ, কৃত্রিম সার, বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্য, লবণ এবং অন্যান্য পণ্য সরবরাহ করিবে। আর হাঙ্গেরী রাশিয়াকে দিবে তৈলজাত দ্রব্য, রোল্ড ইস্পাত, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পজাত দ্রব্য, ইলেক্‌ট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি, তূলা-জাত দ্রব্য, তামাক, মত্ত এবং কৃষিজাত পণ্য। এই সকল চুক্তি কল্পিত মলটভ পরিকল্পনার পূর্ব্বাভাষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। মার্কিণ পণ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া পূর্ব্ব-ইউরোপকে জব্দ করিবার চেষ্টা আমেরিকা এখনই হইতে করিতেছে। কিন্তু ইহার ফলে মার্কিণ পণ্যের একটি বড় বাজার যে আমেরিকার হাত-ছাড়া হইয়া গেল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ব্ব-ইউরোপ ইহাতে যতখানি জব্দ হইবে তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন মাকিণ শিল্পপতিরা।

ইঙ্গ-রুশ আলোচনা ব্যর্থ :—

বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য-চুক্তির জন্য যে আলোচনা চলিতেছিল তাহা অবশেষে ব্যর্থ হইয়াছে। আলোচনা ব্যর্থ হওয়া যতখানি বিস্ময়কর তাহা অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর ব্যর্থ হওয়ার কারণ। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার যে কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন রাশিয়ার সরকারী সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান 'টাস এজেন্সী' তাহা হইতে স্বতন্ত্র কারণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রাশিয়া বৃটেনকে আগামী চার বৎসর ধরিয়া যথেষ্ট পরিমাণে গম সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হয়। গমের দাম লইয়া প্রথমে মতভেদ হইলেও পরে তাহার মীমাংসা হইয়াছিল। গমের পরিমাণ এবং জাহাজে বোঝাই করিয়া চালান দেওয়ার ব্যাপারেও মতৈক্য হওয়া কঠিন হয় নাই। অর্থাৎ বাণিজ্য-সংক্রান্ত সমস্ত সর্ত্তের সন্তোষজনক মীমাংসা হওয়া সত্ত্বেও আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের মতে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার কারণ এই যে, ১৯৪১ সালে বৃটেনের নিকট রাশিয়া যে ঋণ করিয়াছিল রাশিয়া তাহার সুদের হার হ্রাস করিবার দাবী করে, কিন্তু বৃটেন তাহাতে রাজী হইতে পারে নাই। কিন্তু 'টাস এজেন্সী' আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছে তাহা বিশেষ ভাবেই প্রণিধানযোগ্য।

রাশিয়া বৃটেনের নিকট কি কি দাবী করিয়াছিল' টাস এজেন্সী' তাহার একটা তালিকা দিয়াছেন। রাশিয়া বৃটেনের নিকট কাষ্ঠ ও

তৈলশিল্পের জন্ত আগামী তিন বৎসর যন্ত্রপাতি দাবী করে। ইহা ব্যতীত রাশিয়া ৫০ হাজার টন স্ট্যাণ্ডার্ড গজের রেল এই বৎসরে এবং ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরে এক লক্ষ টন স্ট্যাণ্ডার্ড গজের রেল এবং ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর এক লক্ষ টন পাইপ লাইন চাহে। দশ কোটি পাউণ্ড ঋণ প্রদান সম্পর্কেও আলোচনা চলে। রাশিয়া শতকরা অর্দ্ধ পাউণ্ড সুদ দিতে চাহে। ঋণের মেয়াদও রাশিয়া বৃদ্ধি করিবার দাবী করে। ইহার পরিবর্ত্তে রাশিয়া নিম্নলিখিত জিনিষগুলি প্রদান করিতে রাজী হয়:—(১) গম—বর্ত্তমান বৎসরে ১০ লক্ষ টন, আগামী বৎসর ১৫ লক্ষ টন এবং ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালে বৎসরে ২০ লক্ষ টন। (২) টিনের কৌটায় রক্ষিত মৎস্য—বর্ত্তমান সময় হইতে ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত ২০ লক্ষ বাক্স। কাষ্ঠ—বর্ত্তমান বৎসরে ৫৩ হাজার ষ্ট্যাণ্ডার্ড এবং অতঃপর আরও বর্দ্ধিত হারে। রাশিয়া গমের জন্ত যে দাম চাহিয়াছিল তাহা কানাডার গমের বর্ত্তমান দর অপেক্ষা তো কম বটেই, বৃটেন আর্জ্জেণ্টাইনের গম যে দরে কিনিয়াছে তাহা অপেক্ষাও অনেক কম। রাশিয়ার সর্ত্ত যে বৃটেনের পক্ষেই অনুকূল ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কাষ্ঠ ও তৈলশিল্প-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি দেওয়া সম্পর্কে বৃটেন কোন প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী না হওয়াতেই আলোচনা ফাঁসিয়া গিয়াছে। অবশ্য ঋণের সুদ হ্রাস ও মেয়াদ বৃদ্ধি সম্বন্ধে রাশিয়ার প্রস্তাবেও বৃটেন রাজী হয় নাই। বৃটেন বর্ত্তমানে যে গুরুতর অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়াছে তাহা সত্বে রাশিয়ার প্রস্তাবে রাজী না হওয়া খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ ব্যাপার।

মার্কিণ সাম্রাজ্য :—

দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম শেষ হওয়ার পর হইতেই মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা 'রাশিয়ার সম্প্রসারণ' এবং 'রুশ সাম্রাজ্যবাদে'র ধ্বনি তুলিয়া বিশ্ববাসীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, রাশিয়া সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। খ্যাতনামা মার্কিণ লেখক লুই ফিসার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের মনে কাল্পনিক রুশ সাম্রাজ্য ও কম্যুনিজম-ভীতি সৃষ্টি করিবার জন্ত দিনের পর দিন অক্লান্ত ভাবে লেখনী চালনা করিয়া চলিয়াছেন। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রাক্তন মার্কিণ দূত মিঃ উইলিয়ম বুলিট গত ১০ই জুন এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, শুধু আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিই রাশিয়ার লাল ফৌজকে সমগ্র ইউরোপ দখল করিবার পথে বাধা দিতেছে। আমেরিকার অভিপ্রায় সম্বন্ধে ইউরোপীয় দেশগুলির যে সন্দেহ ছিল না ও নাই তাহা নয়। তাই বর্ণচোরা সাম্রাজ্যবাদী হেনরী ওয়ালেস ডলার-সাম্রাজ্যের কঠোর নিন্দা করিয়া এক দিকে ইউরোপীয় দেশগুলির বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছেন, আর এক দিকে আমেরিকাকেও অধিকতর সন্তর্পণে, আরও বেশী আত্মগোপন করিয়া তাহার সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইয়াছে মিঃ মার্শালের ইউরোপকে সাহায্য দানের পরিকল্পনার মধ্যে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এখন তিনি স্বকীয় সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপ প্রকাশ করিয়া গত ১৬ই জুন রাশিয়াকে তাহার সম্প্রসারণ নীতির জন্য সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু রাশিয়া কি সত্যই সাম্রাজ্যবাদী হইয়া উঠিয়াছে? সত্যই কি রাশিয়া সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করিয়াছে? ইউরোপের কয়েকটি দেশে এবং মাঞ্চুরিয়ার কম্যুনিজমের প্রতি অনুরাগী বামপন্থী দল শাসনযন্ত্র দখল করিয়া বসিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু ইহাতেই ঐ দেশগুলি সোভিয়েট রাশিয়ার তাঁবেদার হইয়াছে, এ কথা মনে করিবার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়। ঐগুলিকে রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতি নামে অভিহিত করিয়া বিশ্বব্যাপী মার্কিণ সাম্রাজ্যকে গোপন রাখাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশ মার্কিণ সাম্রাজ্যের অধীন, এই প্রশ্ন মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং পৃথিবীর মানচিত্রে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া এ কথাও অবশ্য বলিবার উপায় নাই যে, এইটুকু আমেরিকার সাম্রাজ্য। আধ্যাত্মিক জাতি হিসাবে ভারতবাসী আমরা সকলেই বিশ্বাস করি যে, ভগবান সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু 'এই যে ভগবান' বলিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশে ভগবানকে দেখাইয়া দিবার সাধ্য কাহারও নাই। মার্কিণ সাম্রাজ্যও তেমনি সমগ্র পৃথিবীব্যাপী, কিন্তু অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে দেখাইয়া দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমেরিকার দেশরক্ষা ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই মার্কিণ সাম্রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সোভিয়েট রাশিয়া, তথা কম্যুনিজমের প্রসার বন্ধ করিবার ধ্বনির অন্তরালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গোপনে এবং নীরবে প্রশান্ত মহাসাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলিতে অতি দ্রুত সামরিক ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিয়াছে। জাপানের আশ্রিত (mandated) দ্বীপ-সমূহের জন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে অছিগিরির চুক্তিপত্র জাতিপুঞ্জসঙ্ঘে উপস্থিত করিয়াছেন তাহা আমরা জানি। জাপানের প্রাক্তন আশ্রিত দ্বীপ ট্রুক, প্যালাউ, গুয়াম, সেইপান, ক্যারোলাইন, মেরিয়ানাস এবং মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিয়া সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগর ও এশিয়ার উপর প্রভাব বিস্তারের ব্যবস্থা করিয়াছে। জাপানের ওকিনাওয়া এবং রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জও এখন আমেরিকার অধিকারে রহিয়াছে। জাপান যে আবার এই দ্বীপ দুইটি ফিরিয়া পাইবে সে ভরসা নাই। এই দ্বীপ দুইটি পীত সাগরের প্রবেশ-দ্বারে অবস্থিত। অন্যান্য দেশের অধিকারে যে সকল দ্বীপ আছে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগ সেগুলিতেও ঘাঁটি নির্ম্মাণের কল্পনা করিতেছে এবং তাহার জন্ত কথাবার্ত্তাও চলিতেছে। এই দ্বীপগুলির নাম—মেনাস্, গুয়াদল ক্যানাল এবং এস্পিরিটু স্যান্টো। আলাস্কায় বোমারু বিমানের ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিয়াও আমেরিকা নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। উত্তর-মেরু অঞ্চলে তাহার দেশরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিবার জন্ত গ্রীনল্যাণ্ডেও তাহার ঘাঁটি প্রয়োজন। গ্রীনল্যাণ্ড ডেনমার্কের অধীন। যুদ্ধের সময় ১৯৪১ সালে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রীনল্যাণ্ড সম্পর্কে ডেনমার্কের সহিত আমেরিকার একটা চুক্তি হইয়াছিল। এখন স্থায়ী ঘাঁটি নির্ম্মাণের জন্ত আমেরিকা ডেনমার্কের নিকট হইতে গ্রীনল্যাণ্ড ক্রয় করিয়া লইতে ইচ্ছুক। যুদ্ধের সময় আফ্রিকা মহাদেশেও আমেরিকা কতকগুলি সামরিক ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিয়াছে। যুদ্ধের পর আফ্রিকার উপকূলে আমেরিকা তাহার অধিকারকে আরও বিস্তৃত ও সুদৃঢ় করিতেছে। মার্কিণ সামরিক বিভাগ মনে করেন, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল এবং লোহিত সাগরও আমেরিকার দেশরক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। ভূমধ্য সাগরেও আমেরিকা তাহার প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠ করিতে চায়। গত ২০শে মে লণ্ডন হইতে আমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেস এই মর্ম্মে এক সংবাদ দিয়াছিল যে, ভূমধ্য সাগর এবং মধ্যপ্রাচীর সামরিক দায়িত্ব

বৃটেন আমেরিকার হস্তে সমর্পণ করিয়া সাম্রাজ্যরক্ষা ব্যবস্থাকে পূর্ব্ব-আফ্রিকায় সরাইয়া লইতে ইচ্ছুক বলিয়া ওয়াকিবহাল মহল জানাইয়াছেন। পরে অবশ্য বৃটিশ পররাষ্ট্র বিভাগের জনৈক মুখপত্র এই সংবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার পরে এ সম্বন্ধে আর কিছুই শোনা যায় নাই। গত ২১শে মে তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী মঃ পেকার তুরস্কের জাতীয় পরিষদে বলিয়াছিলেন যে, কোন এক বৈদেশিক শক্তি তুরস্কের নিকট ঘাঁটি দাবী করিয়াছে। যদিও তিনি এই বৈদেশিক শক্তির নাম করেন নাই, তথাপি সকলেই মনে করিয়াছেন যে, এই বৈদেশিক শক্তি রাশিয়া ব্যতীত আর কেহ নহে। ১৯৪৬ সালে সোভিয়েট রাশিয়া মস্ট্রে চুক্তির সংশোধিত বিধান অনুসারে দাদ্দেনালিস প্রণালীর রক্ষণ ব্যবস্থায় তুরস্কের সহিত যৌথ দায়িত্ব এবং ঘাঁটি দাবী করিয়া পত্র দিয়াছিল। ১৯৪৬ সালের নবেম্বরের পরে রাশিয়া তুরস্কের নিকট এ সম্বন্ধে আর কোন দাবী উপস্থিত করে নাই। কিন্তু আমেরিকার ইউনাইটেড প্রেস গত ৪ঠা জুন আঙ্কারা হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ দিয়াছেন যে, রোডস্ দ্বীপের নিকটবর্ত্তী বোদরুণ বন্দরের নিকটে আমেরিকা একটি 'তুর্কীসিঙ্গাপুর' নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছে। এই ঘাঁটি নির্ম্মিত হইলে দার্দ্দেনালিশ প্রণালী দিয়া ভূমধ্যসাগরের প্রবেশ-পথে আমেরিকার দৃঢ় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে। আঙ্কারা ও বোদরুণের মধ্যে চলাচল ব্যবস্থার পুনর্গঠন করা হইবে। স্মার্ণার পুনর্নির্ম্মাণ এবং আনাতোলিয়া রেলপথের নূতন সংগঠনের জন্ত আমেরিকা না কি ১৫০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করিবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দেশরক্ষা ব্যবস্থার যে সামান্ত আলোচনা আমরা করিলাম, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, মার্কিণ সাম্রাজ্য আজ পৃথিবী জুড়িয়া বিস্তৃত হইয়াছে। আমেরিকা যেন পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্রকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিতেছে, 'সাবধান, পৃথিবীর কোন অংশেই তোমরা কেহ হস্তক্ষেপ করিও না, তাহা হইলে বিশ্বশান্তি বিপন্ন হইবে।' নির্ব্বিঘ্নে পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য উপভোগ এবং মার্কিণ পুঁজিপতিদের নিরাপত্তাই আমেরিকার দৃষ্টিতে বিশ্বশান্তি।

গণতন্ত্র ও আমেরিকা :—

গণতন্ত্র সম্বন্ধে বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে কোন মতভেদ নাই। উভয় দেশই পৃথিবীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্ত উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। মিঃ এটলী বলিয়াছেন, "I have no doubt that in several countries of Eastern Europe human rights are denied and the socalled democratic Government is a travestry." 'পূর্ব্ব-ইউরোপের কতকগুলি দেশে জনসাধারণকে যে মানুষের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তথাকথিত গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট একটা প্রহসনে পর্য্যবসিত হইয়াছে।' পূর্ব্ব-ইউরোপের কোন্ দেশগুলি সম্বন্ধে তাঁহার এই মন্তব্য তাহা নাম-উল্লেখ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। মিঃ এটলী মনে করেন, বৃটিশ সাম্রাজ্য, মার্কিণ সাম্রাজ্য, ফরাসী সাম্রাজ্য এবং ওলন্দাজ সাম্রাজ্যই গণতন্ত্রের উর্ব্বর ক্ষেত্র। এই সকল সাম্রাজ্যের অধীনে ছাড়া আর কোথাও মানুষের অধিকার নিরাপদ নয়, তাঁহার পক্ষে এইরূপ মনে করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতে এবং দক্ষিণ-আফ্রিকায় মানুষের অধিকার কি ভাবে রক্ষিত হইতেছে, ভারতবাসীর মত ভাল করিয়া আর কেহ তাহা জানে না। ফ্রান্স ইন্দোচীনে, মাডাগাস্কারে উত্তর-আফ্রিকায় এবং হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়ায় কি ভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও মানুষের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে, তাহাও বিশ্ববাসীর কাছে অপ্রকাশ নাই। গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকারের ধ্বজাধারী খাস আমেরিকায় কি ভাবে গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার রক্ষিত হইতেছে তাহাও কি আমরা জানি না?

শ্রমিক-বিরোধী আইন মার্কিণ গণতন্ত্রের একটি নমুনা মাত্র। স্বাধীনতার লীলাভূমি আমেরিকায় নিগ্রোদের অবস্থা কিরূপ? সুইডেনের খ্যাতনামা পণ্ডিত গানার মিরডাল (Gunner Myrdal) আমেরিকা ভ্রমণে যাইয়া নিগ্রোদের অবস্থা বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'আমেরিকান ডায়লেমা' (American Dilemma) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "The Negro in America is denied the elementary civil and political rights of democracy." অর্থাৎ 'আমেরিকায় নিগ্রোদিগকে গণতন্ত্রের নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রাথমিক অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে।' খ্যাতনামা মার্কিণ গ্রন্থকার জন গান্থার তাঁহার 'Inside U. S. A' নামক গ্রন্থে আমেরিকায় নিগ্রোদের অবস্থার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ব্ব-ইউরোপের কতকগুলি দেশে গণতন্ত্রের অভাব কল্পনা করিয়া মিঃ এটলী এবং আমেরিকার রাষ্ট্র-নীতিবিদরা ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। কিন্তু মিঃ হেনরী ওয়ালেস গত জুন মাসের মধ্যভাগে ওয়াশিংটনে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "আমি স্বীকার করিতেছি যে, আমাদের সরকারী বিবৃতিতে পূর্ব্ব-ইউরোপের নির্ব্বাচন পদ্ধতির কথা যখন শ্রবণ করি তখন আমি লজ্জিত না হইয়া পারি না এবং দক্ষিণ কেরোলিনা এবং কানসাস সহরের নির্ব্বাচন-ব্যবস্থার প্রতি এবং ওয়াশিংটনে আদৌ কোন নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা না থাকার প্রতিও আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।" যাঁহারা ইউরোপে গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন তাঁহাদের দেশের নিগ্রোরা গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার হইতে বঞ্চিত। আমেরিকাবাসীরা মনে করে, পৃথিবীব্যাপী ডলার-সাম্রাজ্য স্থাপিত হইলেই গণতন্ত্র ও শান্তি নিরাপদ হইবে। গত জুন মাসের মধ্যভাগে নিউ ওরলিয়েন্স আইটেমের প্রেসিডেণ্ট পাবলিসার শ্যামদেশে যাইবার কালে যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "America can buy up not only Russia but the whole world with her money and mineral resources." অর্থাৎ 'আমেরিকা তাহার অর্থ এবং খনিজ সম্পদ দ্বারা শুধু রাশিয়াকেই নয় সমগ্র পৃথিবীকেই ক্রয় করিতে সমর্থ।' আমেরিকা সেই চেষ্টাই করিতেছে এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে সাফল্যও হয়ত লাভ করিয়াছে। কিন্তু অর্থ দ্বারা কম্যুনিজমকে ক্রয় করা আজও সম্ভব হয় নাই। তাই আমেরিকাবাসী নিজেদের দেশ হইতে কম্যুনিষ্ট বিতাড়নের ব্যাপক ব্যবস্থাই শুধু করে নাই, 'বিপজ্জনক চিন্তা-বিরোধী' (Anti dangerous thoughts) আইন প্রণয়নের কথাও ভাবিতেছে।

বৃটেনের অর্থনৈতিক সঙ্কট :—

বর্ত্তমানে বৃটেন যে অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে তাহার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ম্যাকডোনাল্ডের প্রধান মন্ত্রিত্বে দ্বিতীয় শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের সময়ে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছিল তাহার সহিত বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের একটা সাদৃশ্য

আছে বলিয়া মনে হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সঙ্কট-চক্রের আবর্ত্তনের কথা আমরা সকলেই জানি। বৃটেনের এই অর্থনৈতিক সঙ্কট সঙ্কট-চক্রের আবর্ত্তনের ফলে দেখা দেয় নাই। বস্তুতঃ, ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন বর্ত্তমান সঙ্কট তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। দ্বিতীয়তঃ, আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আংশিক সমাজতান্ত্রিক নীতি এবং পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী নীতির মধ্যে যে অসামঞ্জস্য আছে তাহাও এই আর্থিক সঙ্কটের জন্য আংশিক ভাবে দায়ী। এই আসন্ন সঙ্কট হইতে মুক্ত হইবার জন্য বৃটেন তিনটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। (১) কৃষি, শিল্প-বাণিজ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি, (২) আমদানি হ্রাস এবং (৩) দেশে পণ্যের ব্যবহার যথাসম্ভব কমাইয়া রপ্তানি বৃদ্ধি। এই ব্যবস্থা কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হইবে সে-সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা কঠিন।

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পর্য্যাপ্ত শ্রমশক্তি এবং কাঁচা মালের প্রয়োজন। বৃটেনে শ্রমিকের যথেষ্ট অভাব দেখা দিয়াছে। বিশেষ করিয়া কয়লা খনিতে শ্রমিকের অভাব খুব বেশী। বিদেশে বৃটেনের যে সৈন্য আছে তাহা ব্যাপক ভাবে হ্রাস করিতে না পারিলে শ্রমিক সমস্যার সমাধান হইবে না। কিন্তু সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিতে গেলেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করা কঠিন। অর্থ ও সামরিক শক্তির জন্য আমেরিকার উপর তাহার নির্ভরশীলতা ইতিমধ্যেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বৃটেনের যে সকল তৈয়ারী পণ্য ও কাঁচা মাল প্রয়োজন সেগুলি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ক্রয় করিতে হইলে ডলারের প্রয়োজন। আমেরিকার নিকট বৃটেন যে ঋণ করিয়াছিল তাহার অধিকাংশই ইতিমধ্যে ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। তাহার ডলারের অভাব ঘটিয়াছে। ডলার পাওয়ার উপায় আমেরিকার নিকট অথবা যে-সকল দেশের ডলার আছে সেই সকল দেশের নিকট বৃটিশ পণ্য বিক্রয় করা। কিন্তু এখানে মার্কিণ পণ্যের সহিত প্রবল প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা বৃটেনের পক্ষে সহজ হইবে না। আমেরিকার রক্ষা-শুল্কের উচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে কি? মার্কিণ পুঁজিপতিদের দ্বারা প্রভাবিত দেশগুলিতে পণ্য রপ্তানি করিয়া বৃটেন তাহার আর্থিক সঙ্কট কতখানি এড়াইতে পারিবে তাহা বলা কঠিন। বিদেশে বৃটেনের যে মূলধন ছিল যুদ্ধের সময় তাহার অধিকাংশই গিয়াছে। তাহার ঋণের বোঝা হইয়াছে অত্যন্ত ভারী। উত্তমর্ণদিগকে বঞ্চিত করিয়া বৃটিশ আর কত দিন তাহার রপ্তানি-বাজার রক্ষা করিতে পারিবে?

গ্রীসে কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র :—

গ্রীসের আভ্যন্তরীণ সঙ্কট আবার যেন প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে। কম্যুনিষ্টদের বিদ্রোহ করিবার এক ব্যাপক ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে, এই অজুহাতে দুই হাজারেরও অধিক লোককে গ্রেফ্‌তার করিয়া নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। গ্রীসকে আমেরিকার সাহায্য দানের যে ইহা প্রত্যক্ষ পরিণাম তাহাতে আর সন্দেহ কি? মার্কিণ প্রতিনিধি পরিষদের পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ চার্লস এ ইটন গত ১৮ই জুলাই বলিয়াছেন, "অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে কোন মুহূর্ত্তে গ্রীসে যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে পারে।...... হয় গ্রীসে আমেরিকার কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, না হয় সেখানে কর্ত্তৃত্ব করিবে রাশিয়া। গ্রীসে রুশ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে মানব জাতির ভাগ্য বিপন্ন হইবে।" সুতরাং এই কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার মূল কোথায় তাহা অনুমান করা কঠিন নয়!

কিছু দিন পূর্ব্বে ওয়াশিংটন হইতে রয়টার এই মর্ম্মে এক সংবাদ দিয়াছিল যে, কিউবা, গুয়াতেমালা, ভেনেজুয়েলা এবং পুরাটারিকো হইতে কম্যুনিষ্ট বিপ্লবীদের এক বাহিনী রিপাবলিক অব ডোমিনিকা আক্রমণের জন্য কিউবাতে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। এই সংবাদ উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা-প্রসূত বলিয়া মনে হইলেও মার্কিণ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ও দৃঢ়তার জন্য প্রয়োজনীয়তা আছে। গ্রীসের কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্রও এই ধরণেরই একটি ব্যাপার বলিয়া আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়াই মনে হয়।

মিশর-বৃটিশ সংবাদ :—

গত ৫ই আগষ্ট মিশরের প্রধান মন্ত্রী নোকরাশী পাশা নিরাপত্তা পরিষদে মিশর-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছেন এবং বৃটিশ প্রতিনিধি উহার যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহাতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ইঙ্গ-মিশর আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় বৃটেনের পক্ষেই সুবিধা হইয়াছে। মিশরে বৃটিশ সৈন্যের উপস্থিতির জন্য চাপে পড়িয়া মিশর ১৯৩৬ সালের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে, একথা স্যার আলেকজাণ্ডার ক্যাডোগান স্বীকার করেন না। কারণ, সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের সময় ঐরূপ কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার এই যুক্তি অপেক্ষাও অধিকতর বিস্ময়কর উক্তি তিনি করিয়াছেন, বলিয়াছেন যে, বৈদেশিক সৈন্যবাহিনীর অবস্থানের ফলে কোন রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। রাশিয়া অতঃপর বৃটেনের যুক্তি দিয়াই বৃটেনকে জব্দ করিতে পারিবে।

বৃটেন সুদানের স্বায়ত্ত-শাসনের দাবীর কথাও উল্লেখ করিবে, ইহা খুব স্বাভাবিক। সুদানের স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী তুলিয়া সুদানে বৃটিশ শাসন অব্যাহত রাখাই যে বৃটেনের উদ্দেশ্য, নিরাপত্তা পরিষদ যদি তাহা বিবেচনা করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ গঠনের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে।

জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ ও দক্ষিণ-আফ্রিকা :—

নয়াদিল্লী হইতে ৪ঠা আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল স্মাট এক পত্রে পণ্ডিত নেহরুকে জানাইয়াছেন যে, পেগিং অ্যাক্ট বা অন্যান্য ভারতীয় বিরোধী ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হইবে না। ভারত ও দক্ষিণ-আফ্রিকার মধ্যে বিরোধ আপোষে মিটাইয়া ফেলিবার জন্য গত ৮ই ডিসেম্বর (১৯৪৬) জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ নির্দ্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যেও মীমাংসা করিবার জন্য দক্ষিণ-আফ্রিকা কোন আগ্রহ প্রদর্শন করে নাই। ভারতবর্ষ আজ বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্গত ডোমিনিয়নে পরিণত হইলেও অন্য ডোমিনিয়নে তাহার মর্য্যাদার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে দক্ষিণ-আফ্রিকার অঙ্গীভূত করিবার জন্য জেনারেল স্মাট যে দাবী করিয়াছিলেন জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ তাহাও

অগ্রাহ্য করেন এবং ঐ অঞ্চলকে আন্তর্জ্জাতিক ট্রাষ্টিশিপের হাতে অর্পণ করিবার নির্দ্দেশ দেন। কিন্তু জেনারেল স্মাট এই নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে দক্ষিণ-আফ্রিকার অঙ্গীভূত করিবার আয়োজন করিতেছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি এই উদ্দেশ্যে ঐ অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, তিনি এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ তাহাদিগকে পুত্রোপম স্নেহে প্রতিপালন করিবে।

জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের আগামী অধিবেশনে উভয় সমস্যাই আবার উত্থাপিত হইবে। জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ অতঃপর কি করিবেন বিশ্ববাসী তাহা সাগ্রহে লক্ষ্য করিবে।

জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ ও প্যালেষ্টাইন :—

প্যালেষ্টাইন কমিশনের রিপোর্ট ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যেই সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। রিপোর্ট কিরূপ হইবে তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা করিয়া লাভ নাই। মিশর, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, সৌদী আরব, ইয়েমেন এই ছয়টি আরব-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে লেবাননের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ফ্রাঙ্গাই (Mr. Frangich) প্যালেষ্টাইন কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দিয়াছেন। এই ছয়টি আরব-রাষ্ট্র জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা প্যালেষ্টাইনকে বিভক্ত করিবার বিরোধী। তাঁহারা প্যালেষ্টাইনে ইহুদী আমদানী বন্ধ করিবারও দাবী করিয়াছেন। প্যালেষ্টাইনে অবিলম্বে আরবদের আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার তাঁহারা দাবী করিয়াছেন।

প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত আরবদের অনুকূলে না হইলে সশস্ত্র আরব বিদ্রোহের আশঙ্কা আছে। জেরুজেলামের গ্রাণ্ড মুফতি কায়রো হইতে গুপ্ত আরব প্রতিষ্ঠান গঠন করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

চীনে মার্শাল পরিকল্পনা :—

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের বিশেষ প্রতিনিধি লেফ্‌টান্যাণ্ট জেনারেল এলবার্ট উয়েডমেয়ার তথ্য সংগ্রহের কাজে চীনে গিয়াছেন। চীনের জন্য মার্শাল পরিকল্পনা অনুসারে কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য প্রয়োজন তাহা নির্দ্ধারণ করাই এই মিশন প্রেরণের উদ্দেশ্য। এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাঙ্কের মারফৎ চীনকে ৫০ কোটি ডলার ঋণ দিয়া চীন দেশে মার্শাল পরিকল্পনা প্রবর্ত্তন করা হইবে। ইহার ফলে চীনে আমেরিকার রপ্তানি বাণিজ্য বিস্তৃতি লাভ করিবে। এই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে জপান ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনেরও ব্যবস্থা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। চীনা কম্যুনিষ্টরা এই পরিকল্পনার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইহা যে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ তাহাতে আর সন্দেহ কি? চীনের জন্য মার্কিণ পরিকল্পনার সাহায্যে আমেরিকা চীনের অর্থনৈতিক ব্যাপারে আধিপত্য স্থাপনের প্রয়াসী হইয়াছে।

জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি :—

জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পর্কে কাজ আরম্ভ করিবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ১১শে আগষ্ট তারিখে এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিল। সুদূর-প্রাচ্য কমিশনের ১১টি রাষ্ট্রকে নিমন্ত্রণ করা হয়। বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, চীন, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ, নেদারল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, সোভিয়েট রাশিয়া এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই ১১টি রাষ্ট্র সুদূর-প্রাচ্য কমিশনের সদস্য।

ফ্রান্স এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু বৃটেন এই সম্মেলনের তারিখ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছে। জাপানের সহিত সন্ধি-সর্ত্ত সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে বৃটেন ডোমিনিয়নগুলির সহিত এ সম্পর্কে আলোচনা করিতে চায়। তদুদ্দেশ্যে আগষ্ট মাসে অষ্ট্রেলিয়ার একটি সম্মেলন আহূত হইয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসের কোন সময়ে জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বৃটেন অনুরোধ জানাইয়াছে। কিন্তু রাশিয়া এই আমন্ত্রণে আপত্তি করিয়া বলিয়াছে যে, পূর্ব্বে রাশিয়া চীন ও বৃটেনের সঙ্গে আলোচনা না করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একক ভাবে এই সম্মেলন আহ্বান করিতে অধিকারী নহেন; রাশিয়ার আর একটি আপত্তি এই যে, শান্তি-চুক্তির সর্ত্তাদি পররাষ্ট্র সচিব পরিষদে আলোচিত হওয়ার পূর্ব্বে এইরূপ সম্মেলন আহ্বান করা যাইতে পারে না।

আউঙ্গ সান ও ব্রহ্মদেশ :—

গত ১৯শে জুলাই রেঙ্গুনে এক দল লোক হঠাৎ কাউন্সিল চেম্বারে প্রবেশ করিয়া গুলী চালায় এবং ইহার ফলে জেনারল আউঙ্গ সান সহ ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের ছয় জন সদস্য নিহত এবং দুই জন আহত হন। এ সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে রেঙ্গুনের সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল করা হইয়াছিল। শাসন পরিষদের সভা চলিবার সময় একখানা জীপ গাড়ী প্রধান প্রবেশ-পথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। এক ব্যক্তি জীপ গাড়ীতেই থাকে এবং অপর পাঁচ জন ষ্টেন গান ও দুইটি রাইফেল সহ উপর-তলায় কাউন্সিল চেম্বারে প্রবেশ করে। দ্বারের বহির্দ্দেশে এক জন সশস্ত্র প্রহরী দণ্ডায়মান ছিল। সে তাহাদিগকে বাধা দান করিতে চেষ্টা করিলে তাহার প্রতি গুলী নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে গুরুতর জখম করা হয়। প্রকাশ, ষ্টেন গান লইয়া তিন ব্যক্তি পরিষদ-ভবনে প্রবেশ করে এবং গুলীবর্ষণ করিতে থাকে। অতঃপর তাহারা জীপ লইয়া পলায়ন করে।

ব্রহ্মদেশের জনপ্রিয় তরুণ নেতা ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের সহকারী সভাপতি জেনারেল আউঙ্গ সান এবং ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের অপর পাঁচ জন সদস্যের নৃশংস হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত শোচনীয় মর্ম্মান্তিক ঘটনা। ব্রহ্মদেশ যখন একটা বিপুল রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেই সময় জেনারেল আউঙ্গ সানের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জননেতাকে যাহারা হত্যা করিয়াছে তাহারা প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতার বক্ষেই ছুরিকাঘাত করিয়াছে। ব্রহ্মদেশের কম্যুনিষ্টরা কিছু দিন যাবৎ জেনারেল আউঙ্গ সানকে বৃটিশের হাতের ক্রীড়নক বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিতেছিল। তিনি হয়ত বর্ত্তমানে নরমপন্থী নেতাতেই পরিণত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন-শক্তির জন্যই ব্রহ্মের উপজাতীয় অঞ্চলগুলি ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত থাকিতে সম্মত হইয়াছে, শ্যাম, কাচিন, কারেন প্রভৃতি উপজাতীয় অঞ্চলের প্রতিনিধিরা ব্রহ্ম গণপরিষদে যোগদান করিয়াছেন। রেঙ্গুনের ধর্ম্মঘট, মধ্য-ব্রহ্মে অরাজক অবস্থা, আরাকানে ব্রহ্মদেশ হইতে স্বতন্ত্র হওয়ার আন্দোলন হইতে ব্রহ্মের আভ্যন্তরিক

অশান্ত অবস্থা অনুমান করা কঠিন হয় না। কিন্তু কি ভাবে এই অশান্তি দমন করিতে হয় তাহা জেনারেল আউঙ্গ সান ভাল করিয়াই জানিতেন। জেনারেল আউঙ্গ সানের শূন্য আসন পূর্ণ করিবার মত ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও সংগঠন-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্রহ্মদেশে আর কেহই নাই। তিনি নিহত হওয়ার ফলে ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের প্রয়াস যে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

আহত মন্ত্রিগণের মধ্যে হাসপাতালে আরও দুই জনের মৃত্যু হইয়াছে। মিওচিং দলের বহু সদস্য সহ ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী উ সকে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে। দোবামা দলের নেতা থাকিন বা সিনও গ্রেফ্‌তার হইয়াছেন। ডাঃ বা মকেও গ্রেফতার করা হইয়াছে। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের মূলে যে ষড়যন্ত্র ছিল তাহার প্রকৃত স্বরূপ এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। ষড়যন্ত্রের বিবরণ কমন্স সভায় পেশ করিয়া বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী বলিয়াছেন, "হত্যাকারীরা গত ১১ই জুলাই সরকারী গোলা-বারুদের ডিপোটিতে অস্ত্রাদি ও গোলা-বারুদ সংগ্রহ করিয়াছিল। অসামরিক পুলিশের ছদ্মবেশে এবং জাল দলিলপত্রের সাহায্যে এ সকল জিনিষ অপহরণ করা হইয়াছিল। হত্যাকারীদের পরিচয় এবং আক্রমণের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে এখনও তদন্ত চলিতেছে। যাহা হউক, অবস্থা আয়ত্তে আসিয়াছে।"

ব্রহ্ম কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা থাকিন তান্‌ তুন এই রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ এবং বিশ্বাসঘাতকার তীব্র নিন্দা এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং ফ্যাসীবিরোধী গণস্বাধীনতা লীগের মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা সমর্থন করিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে জেনারেল আউঙ্গ সান ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের হত্যার জন্য বৃটিশ আমলাতন্ত্র এবং তাঁহাদের অনুচরবৃন্দকেই দায়ী করিয়াছেন। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও রহস্য যে এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই, সে কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। আউঙ্গ সান ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের হত্যাকারিরূপে ছয় জনকে সনাক্ত করা হইয়াছে। হত্যাকাণ্ডের দিনই ঐ ছয় জনকে উ সর সহিত এবং দলের অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে উ সর বাড়ীতে গ্রেফতার করা হয়। উ স ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের বিচারের সময় এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া ব্রহ্মদেশের নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী ও তথ্য-সচিব—থাকিন নুন ; দেশরক্ষা বিষয়ক পরামর্শদাতা ও দপ্তরহীন মন্ত্রী—কর্ণেল বো লেট ইয়া ; পররাষ্ট্র বিষয়ক পরামর্শদাতা ও দপ্তরহীন মন্ত্রী—থাকিন লুন ব ; স্বরাষ্ট্র ও বিচার সচিব—উ চ নিন ; অর্থ ও রাজস্ব সচিব—উ টিন টাটু ; বাণিজ্য ও সরবরাহ সচিব—উ বা গিয়ান ; যান ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সচিব—উ ময়া ; কৃষি ও গ্রাম্য অর্থনীতি সচিব—থাকিন টিন ; শিল্প ও শ্রম সচিব—মান উইন মাউং ; স্বাস্থ্য সচিব—উ আউং সান ওয়াই ; জাতীয় পরিকল্পনা সচিব—উ ময়া ; পূর্ত ও পুনর্বসতি সচিব—বো পো ডান ; শিক্ষা সচিব—স সাম পো থিন ; সীমান্ত অঞ্চল বিষয়ক পরামর্শদাতা ও দপ্তরহীন মন্ত্রী—সাও থুন কিও (সোন সর্দার)।

শান্‌ রাজ্যের অন্তর্গত ইয়ং হুয়ের ৫১ বৎসর বয়স্ক সেনাধ্যক্ষ সাও শোয়ে থেইকে ব্রহ্ম গণ-পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

হল্যাণ্ডের ইন্দোনেশিয়া আক্রমণ :—

জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ ইন্দোনেশিয়া সংক্রান্ত সমস্যা আলোচনায় যে যথেষ্ট তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের নির্দ্দেশ সন্তোষজনক হইয়াছে এ কথা বলা যায় না। এই সমস্যা আলোচনা করিবার জন্য ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়া নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রস্থ ওলন্দাজ রাষ্ট্রদূত ডাঃ ভ্যান ক্লেফেন্স এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া বলেন যে, ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়া নিরাপত্তা পরিষদে ইন্দোনেশিয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সনদের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার বিবাদ দুইটি সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ নহে—এই যুক্তি দ্বারা তিনি অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন। ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব কিরূপ, এই প্রতিবাদের মধ্যেই তাহার পরিচয় সুপরিস্ফুট। ডাঃ ভ্যান ক্লেফেন্স নিরাপত্তা পরিষদে ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধি গ্রহণেও আপত্তি করেন। এই প্রসঙ্গে আরও দুইটি বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক। বৃটেন ও আমেরিকা এই দুইটি বৃহৎ রাষ্ট্রের কেহই ইন্দোনেশিয়ার প্রসঙ্গ নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি ডাঃ অস্কার ল্যাঙ্গের (পোল্যাণ্ড) জন্যই অতি দ্রুত নিরাপত্তা পরিষদে ইন্দোনেশিয়া প্রসঙ্গ আলোচিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। তিনিই নিরাপত্তা পরিষদের কর্ম্মসূচীতে ইন্দোনেশিয়ার সমস্যাকে প্রথম স্থান প্রদান করেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি ইহাও নির্দ্দেশ করেন যে, ইন্দোনেশিয়া এই আলোচনায় যোগদান করিতে পারিবে কি না সে সম্বন্ধে মীমাংসার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই পরিষদে অষ্ট্রেলিয়ার উত্থাপিত প্রস্তাব আলোচিত হইবে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ওলন্দাজ প্রতিনিধি ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতা মানিয়া লইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন এবং বৃটেনের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করা হয় যে, ইন্দোনেশিয়া সংক্রান্ত আলোচনা বন্ধ রাখিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যস্থতা করিতে দেওয়াই নিরাপত্তা পরিষদের কর্ত্তব্য। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিও ইন্দোনেশিয়ার সার্ব্বভৌমত্ব এবং এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে নিরাপত্তা পরিষদের অধিকারের প্রশ্ন তুলিয়া প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। অবশেষে হল্যাণ্ড ও ইন্দোনেশিয়াকে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করিবার নির্দ্দেশ দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৃটেন, বেলজিয়ম এবং ফ্রান্স এই প্রস্তাবে ভোট দেয় নাই। আর একটি প্রস্তাবে উভয় পক্ষকে সালিশী বা অন্য কোন শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদের মীমাংসা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবেও বৃটেন, ফ্রান্স এবং বেলজিয়ম ভোট দানে বিরত ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনী যেখানে ছিল সেইখানে লইয়া যাইবার অনুরোধ করিয়া রাশিয়া যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল তাহা ভোটে গৃহীত হয় নাই।

উভয় পক্ষের সৈন্য পূর্ব্বে যেখানে ছিল সেইখানে ফিরাইয়া লওয়ার জন্য নির্দ্দেশ না দেওয়ায় যুদ্ধ-বিরতির নির্দ্দেশ অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হল্যাণ্ড এবং ইন্দোনেশিয়া উভয় পক্ষই নিরাপত্তা পরিষদের নির্দ্দেশ মানিয়া লইয়াছেন এবং যুদ্ধ-বিরতির নির্দ্দেশও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়ায় এখনও যুদ্ধ

চালাইতেছে। নিরাপত্তা পরিষদ যেমন শুধু নিজেদের মান বাঁচাইবার জন্য যুদ্ধ-বিরতির অনুরোধ করিয়াছিলেন, হল্যাণ্ডও তেমনি মুখে এই অনুরোধ মানিয়া লইলেও কার্য্যতঃ উহাকে লঙ্ঘন করিতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতার প্রস্তাবে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা একটি আন্তর্জ্জাতিক সালিশী কমিশন প্রেরণের জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে অনুরোধ করিয়াছেন। সৈন্যবাহিনীকে যদি পূর্ব্ব অবস্থানে ফিরাইয়া লওয়ার ব্যবস্থা না হয়, এবং আন্তর্জ্জাতিক কমিশনের পরিবর্ত্তে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই যদি মধ্যস্থতা করে, তাহা হইলে মীমাংসাটা যে কিরূপ হইবে তাহা অনুমান করা খুব কঠিন নয়।

হঠাৎ গত ২১শে জুলাই হল্যাণ্ড যে ইন্দোনেশিয়া আক্রমণ করিয়াছে তাহা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা। রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদা' ২রা আগষ্ট তারিখের সংখ্যায় বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন দেশে বৃটিশ ও আমেরিকা কর্ত্তৃক প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির সমর্থন এবং পূর্ব্ব-এশিয়ায় তথাকথিত ট্রুম্যান-নীতির প্রচারের ফলেই ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীরা ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের উপর আক্রমণ চালাইতে সাহসী হইয়াছে। 'প্রাভদার' এই অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। ইউ-এন-ই-এস-সি-ওর অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ আর কে নেহরুও বলিয়াছেন,—"জাতীয় গবর্ণমেণ্টকে উৎখাত করিয়া নেদারল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা এই কার্য্য করিতেছেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত সমরোপকরণের দ্বারা।" গত ২৭শে মে ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের হাতে চরম পত্র প্রদান করে। উহার সর্ত্তগুলি যে ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক, তাহা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। গত ৭ই জুন তারিখেই 'অবজারভার' পত্রিকার বাটাভিয়াস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন,—"যদি সন্তোষজনক মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে ওলন্দাজরা আক্রমণ আরম্ভ করিবে, এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে।" শুধু যুক্ত পুলিশ-বাহিনী সম্পর্কেই ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের আপত্তি ছিল। কিন্তু তাঁহারা এই প্রশ্নেরও একটা সম্মানজনক মীমাংসার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এমন কি, ডাচ আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেও তাঁহারা সালিশের দ্বারা মীমাংসার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াই ওলন্দাজরা আক্রমণ আরম্ভ করে। আক্রমণ আরম্ভ করিবার পরেই ডাচ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের এই আক্রমণ সমর্থন করিয়া জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের নিকট এক স্মারকলিপি দাখিল করেন। কিন্তু আক্রমণ আরম্ভ করিবার প্রকৃতই যে কোন কারণ ছিল না তাহা ডাচ পার্লামেণ্টের সদস্য ব্যাঙ্ক হাওগার্ড ২৫শে জুলাই ইন্দোনেশিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বৃটেন ও আমেরিকা ইচ্ছা করিলেই এই আক্রমণ নিবারণ করিতে পারিত। কিন্তু তাহারা তাহা করাই শুধু নিষ্প্রয়োজন মনে করে নাই, ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রকে ওলন্দাজ-প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া কার্য্যতঃ ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকেই সমর্থন করিয়াছে। ওলন্দাজরা লিঙ্গাকার্ত্তি চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে এবং যে ভাবে অতি দ্রুত আক্রমণ আরম্ভ করে তাহাতে বুঝা যায়, পূর্ব্ব হইতে ইহার জন্য তাহারা প্রস্তুত হইয়াছিল, শুধু একটা ছলের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার এই সঙ্কট শুধু একা ইন্দোনেশিয়ার সঙ্কট নয়, এশিয়ার সমস্ত পরাধীন দেশের স্বাধীনতা লাভের পথে ইহা এক বৃহত্তম সঙ্কট।

ভারতীয় ডাকোটা বিমান ধ্বংস—

গত ২৯শে জুলাই ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের রাজধানী যোগাকার্ত্তার বিমান-ক্ষেত্রে অবতরণ কালে একটি ভারতীয় ডাকোটা বিমান দুইটি ওলন্দাজ জঙ্গী বিমানের আক্রমণে ধ্বংস হয়। এই বিমানে চারি জন বৃটিশ প্রজা, ৫ জন ইন্দোনেশীয় ও ইন্দোনেশিয়া রেডক্রশের জন্য ঔষধপত্র ছিল। এই নয় জন আরোহীর মধ্যে মাত্র এক জনের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। ২৮শে জুলাই সোমবার পণ্ডিত নেহরু ঘোষণা করেন যে, অবিলম্বে ভারতের আকাশপথে ডাচ-বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করা হইবে। ইহার পরদিনই এই ঘটনা ঘটে। এই বিমান ধ্বংস সম্বন্ধে যে কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে মিঃ বি পট্টনায়ক তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, আন্তর্জ্জাতিক বিমান-চলাচল ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট পথ বলিয়া কিছু নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ভারতীয় বিমানে রেডক্রশের চিহ্ন ছিল না। কারণ স্বাভাবিক সময়ে আন্তর্জ্জাতিক বিমান-চলাচলে উহার প্রয়োজন হয় না। তথাপি পূর্ব্বরাত্রিতে বৃটিশ-নিয়ন্ত্রিত সিঙ্গাপুর রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, ভারতীয় ডাকোটা বিমানখানা মূল্যবান ঔষধ-পত্র লইয়া যোগাকার্ত্তা অভিমুখে যাইবে।

পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুসারেই যে এই ভারতীয় বিমান ধ্বংস করা হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের বিশ্বাস, ভারত গবর্ণমেণ্ট ডাচ গবর্ণমেণ্টের কৈফিয়ৎ মানিয়া লইবেন না।

সনেট

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

সূর্য্যের আশ্চর্য্য রঙে ভরে গেলে দিনের কুহক,
কাশে কাশে আকাশের গন্ধ এসে জড়ো হলে পর

জীবন হারায় ভাষা,—শুধু থাকে অব্যক্ত মর্ম্মর,
হাজার স্বপন-পাখি উড়ে আসে; আরবের রক!
মদির সৌরভ দিয়ে জ্বেলে দেয় অগণন সখ,
অজস্র ঈপ্সার ছাঁচে গড়ে তোলে মনের নগর!
রাজার ঝিয়ারী এসে নীড় বাঁধে তাহার ভিতর;
নরম কথার মেয়ে ফুল ছোঁড়ে, ফুলের কোরক!

অচিন দেশের মেয়ে ফুল খেলে ডাক দিয়ে যায়
রাজার কুমার আমি চলে যাই সাগর ডিঙিয়ে
তের নদী পার হয়ে, পিয়াশাল, শালবন ফেলে
ফুলের পশম রেণু অনুলিপ্ত পালকের পথে
অশ্ববন্না রথ করে স্বর্ণ-রথে ছুটে চলি আমি
সোহাগ-মন্দির রাজ্যে, নির্জ্জনের মনের নগরে!

গোপাল ভাঁড়

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী

৫

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপাচিহ্নিত ছিলেন, সে কথা না বলিলেও চলে। সহজ ধর্ম ও সংস্কার বশে তিনি ছিলেন প্রজাবৎসল, বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্যামোদী, সাহিত্যানুরাগী, গুণগ্রাহী, দানশৌণ্ড, আশ্রিতপালক, কৌতুকপ্রিয় চিরানন্দময় পুরুষ। ধর্মতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য বহু তত্ত্ব তাঁহার সভায় আলোচিত হইত এবং সে আলোচনায় তাঁহার উৎসাহ দান ছিল অসামান্য। তাঁহার সহচর ও অনুচর গোপালের সাহচর্য্য অনেক সময়েই মহারাজা কামনা করিতেন এবং গোপালের পরামর্শ সাগ্রহে গ্রহণ করিতেন। রাজাধিরাজ ও গোপালের মত সামান্য ব্যক্তির মধ্যে প্রীতি ও অনুরাগের বন্ধন কেমন করিয়া যে এমন হইয়াছিল, তাহা অবোধ্য।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইলে এমন বন্ধনের দৃষ্টান্ত অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। এমনটা হওয়ার কারণ নির্ণয়ের ভার মনস্তত্ত্ববিদের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কাব্য, উপন্যাস, নাটকাদিতে এমন সব চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কারণের নির্ণয় নাই।

স্তব-আরাধনায় দেবতা তুষ্ট হ'ন বলিয়া শুনা যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে। স্তাবকতা, মোসাহেবীতে যে ধনী ব্যক্তিরা তুষ্ট হ'ন, তাহা দেখাও যায়, আর শুনাও যায়। স্তাবক দল, ট্যাঁকে টাকাওয়ালা বাঁকিয়া থাকা মানুষকে এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিকে মোসাহেবী মন্ত্রে বশ করিয়া যে স্বার্থসিদ্ধি করে, তাহার প্রমাণও বিরল নহে। কিন্তু ঐ মোসাহেব উপাধি গোপালের উপর ঠিক মত প্রয়োগ করার খুব অসুবিধা। কারণ, দেখা যাইতেছে, আবশ্যক হইলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে অপ্রিয় কথা শুনাইতে অথবা কটূক্তি করিতেও গোপাল পশ্চাৎপদ হইতেন না। সেই কথাটাই বলি।

খেয়াল-বশেই হউক, আর প্রেরণা-বশেই হউক, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরের সন্নিকটে শিবনিবাসে এক বিরাট দেবালয় স্থাপনা করিলেন। বসবাসের জন্য সেখানে প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকাও নির্মিত হইল বিপুল অর্থব্যয়ে। দেবালয় ও অট্টালিকার কারুকার্য্য শুধুই প্রশংসনীয় নহে, হিন্দু-স্থাপত্যের গৌরবের জিনিষ বলিয়া বিঘোষিত হইল। কথাটা কাণে আসিতে মহারাজার আনন্দের আর সীমা রহিল না। নির্মাণকার্য্য শেষ হইতেই কাশীক্ষেত্রে প্রস্তুত এক বিরাট শিবলিঙ্গ আনীত হইয়া দেবালয়ে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইল। বিরাট উৎসবের আয়োজন সে দিন শিবনিবাসের দেবালয়ে। সমারোহ ব্যাপার। ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, স্ত্রীলোক-পুরুষ, শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ আপামর সাধারণের সম্মেলন সেখানে সে দিন। সম্মেলনে অনুপস্থিত কেবল গোপালচন্দ্র।

অনুপস্থিতির কারণ, মহারাজার সহিত গোপালের তর্কদ্বন্দ্ব। মহারাজা বলিয়াছিলেন—শিবনিবাস হইবে দ্বিতীয় কাশীক্ষেত্র। স্ফীতোদর উদর-সর্বস্ব গোপাল উদরের উপর ঘন ঘন হাত বুলাইতে বুলাইতে এবং তাহারই ফাঁকে মুখে-চোখে কৌতুকের ভঙ্গী করিয়া নির্বিকার ভাবে বলিলেন—

'কেউ কিছু যে যাই বলুন কাশীই শিবের বাস,
সে বাস ছেড়ে বাসছাড়া শিব চায় না শিবনিবাস।'

মহারাজার ক্রোধ উপজিল সেই কবিতায়। গোপালের প্রতি অনুজ্ঞা হইল—দেবালয়ে তোমার প্রবেশ নিষেধ। যাও, ঐ অদূরে পুষ্করিণী-তীরে রৌদ্রতপ্ত হ'য়ে মৎস্য ধ'রে খাও সুখে। আমি না ডাকা পর্য্যন্ত তুমি আসবে না আমার কাছে।

"যথা আজ্ঞা মহারাজ" বলিয়া গোপাল কুর্ণিশ করিতে করিতে নির্দ্দিষ্ট পুষ্করিণীর দিকে পাছু হটিতে লাগিলেন! মহারাজা তখন ক্রোধভরে বলিলেন—যাও, তোমার মুখ দেখতে চাই না।

গোপাল পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিতে চলিতে উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—

> কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
> শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
> যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
> স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥

ক্রোধের উপশম হইয়াছিল মহারাজার এই কাব্যকথায়। হাসির ঝিলিক দেখা গিয়াছিল তাঁহার মুখে-চোখে। গোপালকে না ডাকিয়াই কিন্তু তিনি প্রবেশ করিলেন দেবালয়ে জয়ধ্বনির মাঝে, আর গোপাল চলিলেন অদূরস্থ বাপীতটে মহারাজার আজ্ঞা পালন করিতে।

শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার শুভক্ষণের তখনো বিলম্ব ছিল। মহারাজার খেয়াল চাপিল, মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়া তিনি দেখিবেন সেখান হইতে তাঁহার কৃষ্ণনগরস্থ রাজপ্রাসাদের উড্ডীয়মান পতাকা দেখিতে পাওয়া যায় কি না।

উপস্থিত জনমণ্ডলী চকিত ভীত স্তম্ভিত হইল। কিন্তু মহারাজার কথার উপর কথা বলিবার সাধ্য ও সাহস কাহার? নির্ধন হইতে ধনী হওয়া খুদিরাম পুঁটিরাম প্যালারামের খেয়ালে শুভার্থীর বাধা দেওয়াই কঠিন, কথা কওয়াই অসম্মানকে নিমন্ত্রণের আহ্বান; আর তথাকথিত বঙ্গের বিক্রমাদিত্য রাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের খেয়ালী ইচ্ছায় বাধা দিবে কোন্ জন?

সে যাহা হউক, মন্দির-চূড়ায় আরোহণার্থে মহারাজার জন্য লাল-নীল-সবুজ-হরিদ্রা বর্ণের বস্ত্রাবৃত বংশদণ্ডের সিঁড়ি আনীত হইল। মহারাজা তাহার উপর আরোহণ করিলেন সোৎসাহে। রাজপ্রাসাদের পতাকা দর্শন হইয়াছিল কি না জানা যায় নাই; কিন্তু Birdseye view দেখিয়াই তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে অবরোহণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল এক প্রকার অসম্ভব।

হৈ-হৈ হায়-হায় পড়িয়া গেল তখন। হাকিম, এঞ্জিনীয়ার, জমীদার প্রভৃতির বুদ্ধি তলাইয়া গেল কোন্ অতলে মহারাজকে মন্দির-চূড়া হইতে ভূতলে নামাইতে। নির্বাসিত গোপালের খোঁজ পড়িল, ডাক পড়িল আপৎকালে। কিন্তু গোপালের কথা—মহারাজার আহ্বান না হওয়া পর্য্যন্ত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ার সাধ্য নাই তাঁহার। তখন ডাকই পড়িল মন্দিরচূড়া হইতে—"আয় গোপাল, আয় গোপাল।"

গোপালের তখন প্রভঞ্জন বেগে আগমন, বাঁশের সিঁড়িতে আরোহণ এবং মহারাজার প্রতি ভীষণ কটূক্তি বর্ষণ। প্রবাদ—সেই বর্ষণের ফলে মহারাজার মস্তিষ্কের জড়তা কাটিয়া গিয়াছিল এবং মনের বল সঞ্চয় করিয়া গোপালকে শাসন করিবার জন্য সহজ মানুষের মত মহারাজা সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিয়াছিলেন। শাস্তি গ্রহণের পরিবর্তে গোপালজী পুরস্কৃত হইয়াছিলেন রাজসমীপে ও জনসমাজে।

এখন জিজ্ঞাস্য—গোপাল স্তাবক, না কৃষ্ণনগর রাজপ্রাসাদের মঙ্গল-ঘট?

রাশিয়ার

রাশিয়াতে চায়ের দোকানকে চায়-নাইয়া বলে। এই চায়-নাইয়াগুলো রুশদের সামাজিক জীবনের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। আগেকার মত ভডকা পানের রীতি আর বড় নেই, চা-ই এখন ভডকার স্থান দখল করেছে। তাই চায়-নাইয়াতে ভীড় লেগেই থাকে এবং সেখানে সামোবারই যে একমাত্র আকর্ষণ তা বলাই বাহুল্য। অনবরত গরম জলের যোগানের জন্য সামোবার রুশদের অপরিহার্য।

রাশিয়ার অধিবাসীরা পাড়াপ্রতিবেশীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে খুবই ভালবাসেন। প্রতিবেশীর প্রতি এতটা অন্তরঙ্গতার নিদর্শন খুব সম্ভব অন্য কোনো জাতির মধ্যেই সম্ভব নয়। এই জন্যেই তাঁদের সামাজিক জীবনে চায়ের মূল্য খুব বেশি। উপলক্ষ যা-ই হোক না কেন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে দেখাশোনা করতে গেলেই অতিথিকে চা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। রুশদের কাছে "সামোবার" সব সময়ই মস্ত আকর্ষণের বস্তু। "সামোবার" হলো ধাতু দিয়ে তৈরি জল ফোটাবার এবং চা ভেজাবার পাত্র বিশেষ। কাঠকয়লা দিয়ে সামোবারে জল ফোটানো হয়। রকমারি নক্সাকাটা একটি সামোবার বাড়িতে থাকা গৃহস্থ মাত্রেরই গর্বের জিনিস। রুশরা কাপের বদলে সাধারণত লম্বা গ্লাসে করে চা খেতেই ভালবাসেন। তাঁরা চা-তে দুধ ব্যবহার করেন না, তবে চিনির চল আছে। মাঝে মাঝে চিনির বদলে জ্যাম বা মধু ব্যবহার করা হয়। লেবুর রস আর "রাম্" মিশিয়ে চা খাওয়ার রেওয়াজও আছে। আগন্তুকরা বাড়ি থেকে বিদায় না নেওয়া পর্যন্ত প্রয়োজন মত বার বার প্রচুর জল আর চা দিয়ে সামোবার ভরতি রাখা হয়। রাশিয়াতে প্রায় প্রত্যেক ট্রেন লাইনেই বিনামূল্যে চা খাওয়াবার ব্যবস্থা আছে। রুশরা চা খেতে ভালবাসেন বললে সবটা বলা হয় না,—চা না হলে তাঁদের চলেই না, আর তা-ও চাই প্রচুর পরিমাণে।

IM 276

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

এন ডি ডি

আন্তঃ-জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা ঃ—

অমর ও অনন্য প্রতিভা ফুটবল ক্রীড়ার গুরু পরলোকগত দুঃখীরাম মজুমদার মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষ নিখিল বঙ্গ আন্তঃ-জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা চালাইবার ব্যবস্থা করেন। গত বৎসর এই অনুষ্ঠান সুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রাদেশিক সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির জন্য জলপাইগুড়ি জেলার আমন্ত্রণ সত্ত্বেও আই, এফ, এ এই প্রতিযোগিতা বন্ধ রাখিতে বাধ্য হয়। এই বৎসরেও জলপাইগুড়ি জেলা কর্তৃপক্ষ গত বৎসরের প্রত্যাখ্যাত আমন্ত্রণ নূতন করিয়া জানায়। শেষ পর্য্যন্ত জলপাইগুড়ি এই কৃতী ফুটবল-শিক্ষকের স্মৃতি-তর্পণ করিবার প্রথম অধিকার লাভ করে। এ বৎসর মোট দশটি জেলা দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলা দলের অনুপস্থিতিতে মাত্র সাতটি জেলা শেষ পর্য্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়।

২৪ পরগণা যথাক্রমে কুমিল্লাকে ৩-১ গোলে, বগুড়াকে ০-০ ও ২-০ গোলে এবং মালদহকে ১-০ গোলে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উন্নীত হয়। অপর প্রান্তে জলপাইগুড়িতে দিনাজপুরকে ২-১ গোলে ও ফরিদপুরকে পরাজিত করিয়া শেষ পর্য্যায়ে আসিবার গৌরব অর্জন করে। ফাইন্যালে দুই জেলা দল কোন গোল করিতে না পারায় খেলাটি অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে। তুলনামূলক সমালোচনা করিতে গেলে ২৪ পরগণা জেলা দলের অধিকতর প্রশংসা করিতে হয়। পুরোভাগের জড়তার জন্য তাহারা জয়লাভে বঞ্চিত হয়।

প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে মাঠের অবস্থা সাবলীল ক্রীড়াভঙ্গীর অনুপযুক্ত থাকে। ফলে কোন খেলাই খুব উচ্চাঙ্গের হয় নাই। জলপাইগুড়ি জেলা কর্তৃপক্ষ এই অনিশ্চয়তার মধ্যে এবং দেশের এই পরিস্থিতিতে আন্তঃ-জেলা অনুষ্ঠানের গুরুভার বহনের দায়িত্ব যেরূপ যোগ্যতার সহিত গ্রহণ করিয়া স্বর্গগত ফুটবল-শিল্পীর স্মৃতির প্রতি মর্য্যাদা দেখাইয়াছেন, তাহাতে বাঙলার সমস্ত ক্রীড়ামোদী তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহাদের আতিথেয়তা সমস্ত অভ্যাগতদের মুগ্ধ করে। তবে শোনা গিয়াছে যে, খেলাগুলির পরিচালনা না কি বেশ সুষ্ঠু ও সব সময়ে আইনসঙ্গত হয় নাই।

আন্তঃ-জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রচলনের প্রস্তাব গ্রহণের সময়ে আমরা শুনিয়াছিলাম যে, ইহার ফলে জেলাগুলির মধ্যে ফুটবল চর্চার প্রসার হইবে। বিভিন্ন জেলার ফুটবল-প্রতিভা পরস্পরের মধ্যে অনুশীলনের সুযোগ পাইবে। কিন্তু জেলাগুলির বিশেষ সাড়া পাওয়া যায় নাই। অবশ্য এবারের কথা স্বতন্ত্র। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিধ্বস্ত বাঙলায় খেলার কথা মানুষ প্রায় ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এদিকে দ্বিধাবিভক্ত বাঙলায় আগামী বৎসরে আর এই আন্তঃ-জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা চলিবে কি না কে জানে? সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের কথা না কি আই, এফ, এর তরফ হইতে একমাত্র খেলার তালিকা প্রণয়ন ব্যতীত এই ব্যাপারে আর বিশেষ কোন উদ্দীপনা দেখা যায় নাই। খেলার শেষ পর্য্যায়ে আই, এফ, এ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে "দায়ে খালাস" ভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদিত হয় বটে, কিন্তু জেলা দল কি তাহাতে পর্য্যাপ্ত অনুপ্রেরণা পায়? যদি ভবিষ্যতে এই অনুষ্ঠান সম্ভব হয় তবে আমরা আশা করি, আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে আরও একটু মনোযোগ দেওয়ার মত অবসর খুঁজিয়া লইবেন। আরও একটি মজার কথা আমরা শুনিয়াছি যে, কেন্দ্রীয় কার্য্য-পরিচালক সমিতিতে এমন অনেক জেলার প্রতিনিধি আছেন, যাঁহাদের সহিত জেলার সম্পর্ক কালে-ভদ্রে কখনও কোন সপ্তাহান্তে কয়েক ঘণ্টার জন্য। আমাদের মনে হয়, প্রত্যেক জেলার এই সম্পর্কে অবহিত হওয়ার দিন আসিয়াছে।

ইংলণ্ডে দক্ষিণ আফ্রিকা দল ঃ—

ইংলণ্ডে পর্য্যটনকারী দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড দলের অধিনায়কত্ব করার ভার পড়িয়াছে নর্ম্যান ইয়ার্ডলীর উপর। টেষ্ট খেলায় অমীমাংসার পরে উপর্য্যুপরি তিনটি টেষ্টে জয়ী হইয়া ইংলণ্ড এবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে 'রাবার' লাভ করিয়াছে। নূতন দলপতি ইয়ার্ডলীর পক্ষে ইহা শুভ সূচনার কথা। প্রথম টেষ্ট খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকার ৫৩৩ রাণের প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ড মাত্র ২০৮ রাণ করিয়া 'ফলো অন' করিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় দফায় ইংলণ্ড ৫৫১ ও দক্ষিণ আফ্রিকা এক উইকেটে ১৬৬ রাণ করিলে খেলা অমীমাংসিত থাকে। এই খেলায় উল্লেখযোগ্য আগন্তুক অধিনায়ক মেলভিলের দুই দফায় সেঞ্চুরী, ইয়ার্ডলী ও কম্পটনের পঞ্চম উইকেট জুটির রেকর্ড এবং হোলিজ, বেডসার ও টাকেটের মারাত্মক বোলিং।

দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড দশ উইকেটে জয়ী হয়। ইংলণ্ড প্রথমে খেলিয়া ৮ উইকেটে ৫৫৪ রাণে ইনিংস ঘোষণা করে। এডরিচ (১৮৯) ও কম্পটন (২০৮) তৃতীয় উইকেটে ৩৭০ রাণ সংগ্রহ করে। দক্ষিণ আফ্রিকা উভয় ইনিংসে যথাক্রমে ৩২৭ ও ২৫২ রাণ করে। অধিনায়ক মেলভিল প্রথম দফায় ব্যক্তিগত ১১৭ রাণ করিয়া পর পর চারিটি টেষ্ট খেলায় শতাধিক রাণ করিয়া ফিঙ্গলটনের রেকর্ডের সমকক্ষতা করে। রাইট ৯৫ ও ৮০ রাণ দিয়া পাঁচটি করিয়া উইকেট দখল করে। ইংলণ্ডের কেহ আউট না হইয়া ২৬ রাণ হয়।

তৃতীয় টেষ্ট খেলাতেও দক্ষিণ আফ্রিকার ৭ উইকেটে পরাজয় ঘটে। দক্ষিণ আফ্রিকা যথাক্রমে ৩৩৯ ও ২৬৭ রাণ করে। দ্বিতীয় ইনিংসে নোর্সের ১১৫ রাণ উল্লেখযোগ্য। এডরিচ মোট ৮টি উইকেট পায়।

ইংলণ্ড প্রথমে ৪৭৮ ও তিন উইকেটে ১৩০ রাণ করিয়া জয়ী হয়। এবারেও কম্পটন (১১৫) ও এডরিচ (১৯১) জুটি তৃতীয় উইকেটে ২২৮ রাণ করে। কম্পটন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেষ্টে সেঞ্চুরী করে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তাহার এই প্রথম আত্মপ্রকাশ।

চতুর্থ টেষ্টেও ইংলণ্ড ১০ উইকেটে জয়লাভ করে। দক্ষিণ আফ্রিকা দুই বারে ১৭৫ ও ১৮৪ রাণ করে। বাটলারের বোলিং খুব কার্য্যকরী হয়। ইংলণ্ড ৭ উইকেটে ৩১৭ ও কেহ আউট না হইয়া ৪৭ রাণ করে। হাটনের প্রথম ইনিংসে ১০০ রাণ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম সেঞ্চুরী।

সাহিত্যিক সম্বর্দ্ধনা

গত ৮ই শ্রাবণ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চাশৎ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক শ্রীযুত সজনীকান্ত দাসের উদ্যোগে শ্যামবাজার ট্রেডার্স ব্যুরোর প্রাঙ্গণে একটি আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। উৎসব-স্থল ধূপ-ধূনায় সুরভিত ও রজনীগন্ধায় সুসজ্জিত করা হয়। তারাশঙ্করকে মাল্যভূষিত ও চন্দনচর্চ্চিত করার পর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন আশীর্বচন পাঠ করেন। তার পর এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে তারাশঙ্করের দীর্ঘজীবন ও উৎসবের সাফল্য কামনা করিয়া শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, বনফুল, শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ যে শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন সেগুলি পঠিত হয়। তার পর শ্রীঅমল হোম, শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমনোজ বসু, শ্রীপ্রবোধ সান্যাল, শ্রীগোপাল হালদার, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র তারাশঙ্করের সাহিত্যের বিভিন্ন দিক্ আলোচনা করিয়া ও তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া বক্তৃতা করেন। সভায় বনফুলের প্রেরিত একটি কবিতা ছাড়া শ্রীযুত সজনীকান্ত "অর্দ্ধেক শতাব্দী ধরি জীবধাত্রী ধরিত্রীর স্নেহ, তোমারে করেছে রক্ষা, মাটিরে করনি অস্বীকার" শীর্ষক একটি কবিতা পাঠ করেন।

সম্বর্দ্ধনার উত্তর দিতে গিয়া তারাশঙ্কর বলেন, "আমার জন্মদিনে যে প্রীতি ও আন্তরিকতার সঙ্গে পঞ্চাশের পরে নবজীবন আরম্ভ করবার প্রেরণা আপনারা জানালেন সে আমার অবশিষ্ট দিনগুলির জন্য পাথেয় হয়ে রইল। সাহিত্যসেবার আসরে এসে প্রথম প্রহরে যে গ্লানি যে বেদনা অন্তরে জমা হয়েছিল সে সমস্তই ধুয়ে-মুছে গেল। সব চেয়ে বড় পুরস্কার দিলেন বন্ধুজনেরা; অনেক ক্ষেত্রে সংশয় ছিল—সে আমারই ক্ষুদ্রতা—বন্ধুজনের অকপট প্রীতির প্রকাশে আমার সে ক্ষুদ্রতা দূর হয়ে গেল। জীবনের সংশয়-কণ্টক ও বন্ধুরতাপূর্ণ প্রান্তরে বন্ধুজনেরা প্রেমের সম্পদ-প্রাচুর্য্যে দেবালয় গড়ে ছিলেন। জানতে পারলাম—কত ভালবাসা আমি পেয়েছি। সাহিত্য-সাধনার মূল্য যাচাই হবে কালের বিচারে, কিন্তু আমার মানব-জীবনের সাধনার মূল্য এমন স্নেহে—শ্রদ্ধায়—ভালবাসায় পেয়ে জন্মকে সার্থক বলে মনে করছি। এই টুকুই তো পরম কামনার ধন। আপনারা যাঁরা আমাকে সে ধন দিলেন তাঁরা হয়ে রইলেন আমার কাছে জীবন-দেবতার দূত। ভালবাসা যাঁরা দিতে পারেন—যাঁরা এমন অজস্রধারে দিলেন তাঁরাই তো দাতা। আমি গৃহীতা। আমি আপনাদের দানে ধন্য, কৃতজ্ঞ। দানগ্রহণকারী যে অধিকারে আশীর্বাদ জানায় দাতাকে সেই অধিকারে আমি আপনাদের আশীর্বাদ জানাইলাম—পরম সম্পদে ভরে উঠুক আপনাদের জীবন।

"আমি প্রথম জীবন আরম্ভ করি রাজনীতিক কর্ম্মের মধ্য দিয়ে। তার পর ১৯৩০ সালে জেল থেকে বাহির হয়ে আসার পর রাজনীতির ক্ষেত্র আমার কাছে অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত বোধ হওয়ায় রাজনীতি থেকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সরে এলাম। এই ইচ্ছা নিয়েই এ ক্ষেত্রে প্রবেশ করলাম যে, যে পরাধীনতার বেদনায় হাজার হাজার মানুষ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বিনিদ্র রাত্রি যাপন করছে সেই বেদনার কথা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বলে দেশের সেবা করব। তখন সাহিত্যে
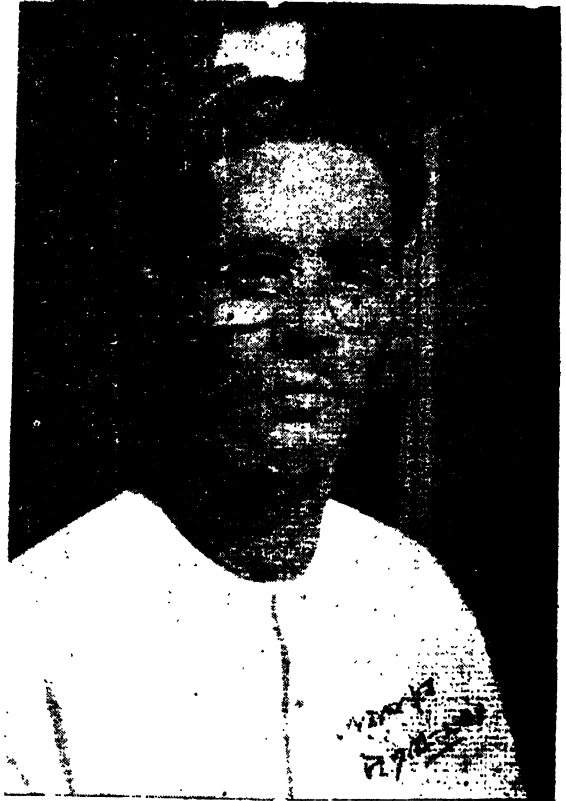
রাজনীতির স্পর্শ খুব প্রসন্ন ভাবে গৃহীত হত না। এর পূর্ব্বে রাজনীতির আবর্ত্তে পড়ে পুলিশের চাপে লেখাপড়া ছাড়তে হয়েছিল। এই কালেই শৈলজানন্দ আর প্রেমেন্দ্রের দু'টি গল্প পড়ে আমি গল্প লেখার দিকে আকৃষ্ট হই। তার পরবর্ত্তী কালে সজনীকান্তকে পেলাম পরম সহানুভূতিসম্পন্ন বন্ধুরূপে। তিনি আমার সাহিত্য-জীবনে নানান্ দিক্ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন।

"আজ বাংলা সাহিত্যে গর্ব্ব করবার মত বহু শক্তিমান্ লেখকের আবির্ভাব হয়েছে। আজ আমাকে যে সম্মান আপনারা দিলেন তার কারণ শ্রেষ্ঠত্ব নয়, আমি জ্যেষ্ঠ তাই সর্ব্বাগ্রে আমাকে সম্মান করে, আমার কনিষ্ঠদের সম্মান করবার ব্যবস্থাও আপনারা করে রাখলেন।"

ভারতের স্বাধীনতা

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। অবশ্য যে স্বাধীনতার জন্য আমরা সংগ্রাম করিয়াছিলাম, ইহা সেই ধরণের স্বাধীনতা নয়। ১৯৩৫ সালের রিফর্মেরই ইহা একটা সংস্করণ মাত্র। ঠিক ইহার জন্য আমাদের দেশের শত শত নরনারী হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করে নাই। অমূল্য জীবন দীপান্তরে অথবা বৃটিশ কারাগারের অন্ধকূপে বিসর্জ্জন দেয় নাই। কংগ্রেস আমাদের যে স্বাধীনতার অমৃত বাণী শুনাইয়াছিল, নেহরু-প্যাটেল-প্রমুখ নেতৃবর্গ যে স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবেন না বলিয়াছিলেন, ইহা তো সেই স্বাধীনতা নয়। কংগ্রেস চাহিয়াছিল অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। পাইয়াছে খণ্ডিত ভারতের ছেলে-ভুলানো ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস। কংগ্রেস তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। শ্রেয়ঃ ছাড়িয়া প্রেয়কে বরণ করিয়াছে। কিন্তু কেন? জনসাধারণের মনে এই সন্দেহ হওয়া কি অস্বাভাবিক যে, কংগ্রেস হয় শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে অথবা ব্যক্তিগত শক্তিলাভের আশায় আদর্শ ত্যাগ করিয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর কূট জালে তাঁহাদের নেতৃবৃন্দ সানন্দে পা বাড়াইয়া দিয়াছেন। খণ্ডিত ভারত যে 'Divide and Rule'-এরই রূপান্তর তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতেছেন না অথবা স্বীকার করিতেছেন না। বৃটিশ সৈন্য ভারত ত্যাগ করিতেছে ভারতকে স্বাধীনতা দিবার জন্য নহে, বিলাতের সরকার সৈন্যব্যয়ভার কমাইতে বাধ্য হইয়াছে বলিয়া। পাকিস্থান, রাজস্থান ইত্যাদিতে যে চৌরী দল হাঙ্গামা বাধাইবার ফ্যাক্টরী বসাইতে চাহেন সে কথা সকলেই বুঝিতে পারে। একবার যাহা ভাঙ্গে, তাহা আর জোড়া লাগে না— ক্রমাগত ভাঙ্গিতেই থাকে; যদিও কোন অভিনব উপায়ে জোড়া যায় তবু দাগ রহিয়া যায়।

১৫ই আগষ্ট ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক প্রদেশেই স্বাধীনতা প্রাপ্তি ঘোষণা করিয়া নানাবিধ উৎসব ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইংরেজের প্রত্যক্ষ শাসন হইতে মুক্তিলাভ যে আনন্দের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালের সাম্রাজ্যবাদী শূল আমাদের চক্ষুশূল হইয়া রহিল। বৃটিশ সরকারের সদুদ্দেশ্যের বহুবিধ প্রশংসা করিবার পরও মহাত্মাজীকে স্বীকার করিতে হইতেছে—"এত আনন্দ কিসের? পূর্ণ স্বরাজ এখনও বহু দূরে। স্বরাজ কি আমরা পাইয়াছি? স্বরাজের অর্থ কি শুধু এই যে, ইংরেজেরা এ দেশ ছাড়িয়া যাইবে? এ কথা আমি কখনও মনে করি নাই; কিন্তু অপরের আনন্দ প্রকাশে আমি কেমন করিয়া বাধা দিব? আমার পক্ষে সবরমতী এখনও দূরে। নোয়াখালিই কাছে।"

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, দেশকে নানা খণ্ডে বিভক্ত করা স্বাধীনতা লাভের পন্থা নয়। আজ মহাত্মা গান্ধীও তাহারই প্রতিধ্বনি করিতেছেন। নোয়াখালি পাকিস্থানের প্রতীক। তাহার পুরাতন স্মৃতি এবং ভবিষ্যৎ চিন্তা দুই-ই পীড়াদায়ক। পাকিস্তানবাসী হিন্দুরা ভাবিতেছেন যে, তাঁহারা এত দিন ছিলেন ইংরেজের দাস, এখন হইতে হইলেন ইংরেজের দাসের দাস। ব্যক্তিবিশেষের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া মনকে চোখ ঠারিবার চেষ্টা করা বৃথা। অসুরের আনুগত্য স্বীকার করিলেই তাহার আসুরিক প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হয় না। তোষামদে অথবা অর্থের লোভে চিরকাল তাহাকে তুষ্ট রাখা যায় না। ক্রমাগত ভয়ে পিছাইয়াও নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয়। তবে এই সকল হিন্দুদের পরিত্রাণের উপায় কোথায়? আজ আমরা যে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি, তাহা অতীত কালের গোঁজামিল দিবার চেষ্টারই অনিবার্য্য পরিণাম। কংগ্রেস ভাবে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় আমরা বহু দিন প্রচার করিয়াছি যে, মুসলমানদের সাহায্য ব্যতীত আমাদের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নয়। তারই ফল আমাদের স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে স্বাধীনতার ভ্যাংচানি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে।

এই মিথ্যার মোহ যে আমাদের মনে কত দূর প্রবল, তাহা মৈমনসিংহের কংগ্রেস-কর্ম্মী সম্মেলনের কয়েক জন বক্তার উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ বলিয়াছেন—"সাম্প্রদায়িক সমস্যার আশু সমাধানের জন্যই কংগ্রেস ৩রা জুনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। এখন ভারত ইউনিয়নের কাজ হইবে স্থায়িভাবে সাম্প্রদায়িক সমস্যাটি সমাধান করা।" কিন্তু সত্য কথা এই যে, এত দিন কংগ্রেস যে মুসলিম তোষণ-নীতি অনুসরণ করিয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হওয়ায় কংগ্রেসকে বাধ্য হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও ৩রা জুনের পরিকল্পনা মানিয়া লইতে হইয়াছে। এই ব্যর্থতার পর সোজাসুজি স্বীকার করা উচিত ছিল যে, কংগ্রেস এ পর্য্যন্ত যে নীতি অনুসরণ করিয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহা ভ্রান্ত ও পরিত্যাজ্য। বাঙ্গালা কংগ্রেসের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় বলিয়াছেন—"যদি পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে পূর্ণ অধিকার দান করে এবং কার্য্যতঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ বজায় রাখিতে যত্নবান হয়, তাহা হইলে পাকিস্তান ডোমিনিয়নকে শক্তিশালী করিবার ব্যাপারে সংখ্যালঘুদের সহযোগিতা করিতেই হইবে।" কিন্তু সুবিধা মত "যদি"র সৃষ্টি করিয়া সমস্যার সমাধান করা যায় না। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়াই স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। পাকিস্তানের লীগ নেতৃবৃন্দের মনে সুবুদ্ধি উদ্রেকের আশায় বসিয়া থাকিলে দুঃখের মাত্রা বাড়িতেই থাকিবে।

১৫ই আগষ্ট বিভক্ত ভারতের উভয় খণ্ডেই স্বাধীনতা প্রাপ্তি উপলক্ষে আনন্দোৎসব হইল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই স্বাধীনতার স্বরূপ এমনই অপূর্ব্ব যে এক খণ্ডের লোকের পক্ষে অপর খণ্ডের উৎসবে সরল ভাবে যোগদান করা কঠিন। যে সমস্ত পাকিস্তান-পন্থীকে ভারতবর্ষের ভিতর থাকিয়া যাইতে হইয়াছে অথচ যাঁহারা

মনে মনে ইসলামী রাষ্ট্রেরই পক্ষপাতী, তাঁহারা কি সর্ব্বান্তঃকরণে ভারতীয় স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দিতে পারিয়াছে? অবশ্য লীগ কর্ত্তৃপক্ষ যোগদানের জন্য উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু কেবল মাত্র উপদেশেই কি মনের গ্লানি দূর হইবে? যদি তাহা সম্ভব হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিবার কি উদ্দেশ্য? কয়েক জন নেতার দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তিই যদি পাকিস্তান আন্দোলনের মূল কথা হয়, তাহা হইলে উহার জন্য সারা দেশকে এত অশান্তির ভিতর টানিয়া লইয়া যাওয়া কি স্বজাতিপ্রেমের পরিচায়ক?

১৪ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার রাত্রি ১২টায় গণ-পরিষদ শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে। ভারতে সুদীর্ঘ দুই শত বৎসরব্যাপী কুখ্যাত বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে। আজ আমরা স্বাধীন। স্বাধীনতা লাভের প্রারম্ভেই আমরা অন্তরের গভীর শ্রদ্ধার সহিত সেই সকল আত্মোৎসর্গকারীকে স্মরণ করিব—যাঁহারা এই স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য অকাতরে হাসিতে হাসিতে নিজেদের অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, যাঁহাদের অপরিসীম ত্যাগ ও দুঃখবরণের ফলস্বরূপ আজ আমরা লাভ করিয়াছি স্বাধীনতা।

বহু দিনের অনাস্বাদিত স্বাধীনতা আজ আমাদের করতলগত। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের বিপুল আনন্দোৎসবের মধ্যেও কোথায় যেন একটু ফাঁক রহিয়া গিয়াছে—আমাদের অন্তরের গভীর অন্তরতম প্রদেশে আমরা যেন কিসের বেদনা অনুভব করিতেছি। স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু ভারতবর্ষকে আমরা অখণ্ড রাখিতে পারি নাই—ভারত বিভক্ত হইয়াছে। উৎসবের বিপুল আনন্দের মধ্যেও এই কথাটা আমরা কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না—থাকিয়া থাকিয়াই বিভক্ত ভারতের কথা আমাদের অন্তরে জাগিয়া উঠিতেছে। ভারত বিভক্ত হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা গভীর বেদনার বিষয় ভারতবাসীর আর কিছু হইতে পারে না। তথাপি আমাদের পরাধীনতার ইতিহাসের যবনিকাপাত হইয়াছে। আমরা এত দিন ধরিয়া যে পূর্ণ স্বাধীনতা চাহিয়াছিলাম, তাহাও অবশ্য আমরা পাই নাই; কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার প্রথম অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে, সমাপ্ত হইয়াছে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক গুরুত্ব-পূর্ণ অধ্যায়। আমরা যাহা চাহিয়াছিলাম, ঠিক তাহা পাই নাই বলিয়া আজ ক্ষোভ করিবার সময় নয়, কেন পাই নাই সেই বিতর্ক-মূলক বিষয়ের কোন উল্লেখ করাও আজ অসঙ্গত। আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহা ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস। কিন্তু ভারতীয় গণ-পরিষদ এবং পাকিস্তান গণ-পরিষদ এই ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসকেই পূর্ণ স্বাধীনতায় রূপান্তরিত করিতে সমর্থ। আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহারই উপর দাঁড়াইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের দায়িত্ব আমাদেরই। স্বাধীনতা লাভ শুধু উৎসবানন্দেরই বিষয় নয়, স্বাধীনতা এক কর্ত্তব্য-কঠোর দায়িত্ব। বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্ত হওয়ার পর আজিকার এই স্বাধীনতা উৎসবের মধ্য দিয়া আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু হইল। আজিকার এই স্বাধীনতা উৎসব স্বাধীন জাতির কঠোর কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে, স্মরণ করাইয়া দিতেছে—ধনে-জনে-সম্পদে দেশকে শক্তিশালী, ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তুলিবার মহান্ দায়িত্বের কথা। স্মরণ করাইয়া দিতেছে—বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্ত হওয়াতেই আমাদের সকল সমস্যার সমাধান হয় নাই। স্মরণ করাইয়া দিতেছে—দেশ স্বাধীন হইলেই ক্ষমতা জনগণের হস্তগত হয় না। স্বাধীনতাকে রক্ষা করা, নির্বিঘ্ন করা যেমন স্বাধীন জাতির এক কঠোর দায়িত্ব, তেমনি জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করিয়া তাহাদের জীবনযাত্রার নিরাপত্তা বিধান করাও স্বাধীন জাতির আর এক মহান কর্ত্তব্য। আমরা কিষাণ-মজদুর রাজের কথা শুনিয়াছি; 'সকল ক্ষমতা জনগণের,'—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের এই মহতী বাণী আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। স্বাধীনতা উৎসবের শেষে এই আদর্শ লক্ষ্য করিয়া সেই প্রকৃত স্বাধীনতার পথে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম যাত্রাপথের এখনও অবসান হয় নাই—আমাদের সাধনার সিদ্ধি এখনও দূরবর্ত্তী। সিদ্ধির দুর্গম পথে যে-সকল প্রতিবন্ধক আছে, যে-সকল দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আছে, সেগুলির পরিচয় আমাদের লাভ করিতে হইবে। বিভক্ত ভারত আবার কবে অখণ্ড ভারতে পরিণত হইবে, কবে সেই শুভ সম্ভাবনা আমাদের জীবনে সার্থক হইয়া উঠিবে, তাহা ভাবিয়া বিষণ্ণ হইবার দিন ইহা নহে। কিন্তু যাহা পাইয়াছি, তাহা লইয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। আমাদের গড়িয়া তুলিতে হইবে—দুর্দ্ধর্ষ শক্তিশালী রাষ্ট্র, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বিভেদ-বিদ্বেষহীন, দুঃখদারিদ্র্যশূন্য স্বচ্ছল সমাজ-ব্যবস্থা, অন্নসমস্যার ক্লেশশূন্য সুখী পরিবার এবং সুস্থ ও সবল নরনারী। আমাদের এই কর্ত্তব্য যত দুঃসাধ্যই হউক না কেন, পথে যত বাধাই আসুক না কেন, আমাদিগকে তাহা নির্ভীক ভাবে বলিষ্ঠ সাধনা দ্বারা অতিক্রম করিতে হইবে। তবেই আজিকার এই স্বাধীনতার উৎসব সার্থক হইয়া উঠিবে, স্বাধীন ভারত সত্যই হইবে স্বাধীন।

বিভক্ত ভারত স্বাধীন ভারতবাসীর সম্মুখে যে দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু কি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, কি পাকিস্তান রাষ্ট্র—উভয় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কগণকে একই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। উভয় রাষ্ট্রের জনগণের সম্মুখেও দেখা দিবে একই সমস্যা। ভারতের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বিভাগ যতটা সহজ হইয়াছে, সামরিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিভাগ তত সহজ নয়। এত দিন অখণ্ড ভারতের পটভূমিতেই দেশরক্ষা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। দেশ-শাসন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হইয়া পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়করাও বিভক্ত ভারতের অসুবিধা উপলব্ধি না করিয়া পারিবেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার কথাও আজিকার আনন্দ উৎসবের মধ্যে আমাদের অন্তরে কাঁটার মতই বিদ্ধ হইতেছে। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জনগণ যদি সত্যই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের চেতনা লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারের দাবীও তাহাদের স্বীকার করিতে হইবে। উভয় রাষ্ট্রেরই জনগণের প্রকৃত সমস্যা এক এবং অভিন্ন। স্বাধীন ভারতের জনগণকে যদি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অর্জ্জন করিতে হয়, তবে উভয় রাষ্ট্রের জনগণকে একই কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইয়া সংগ্রাম করিতে হইবে। এই সংগ্রাম কি রূপ গ্রহণ করিবে, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু আমাদের এই অর্জ্জিত স্বাধীনতাকে যদি পূর্ণ স্বাধীনতায় রূপান্তরিত করিতে হয়, স্বাধীনতা, সুখ-শান্তি যদি সমাজের সর্ব্বস্তরে প্রসারিত করিতে হয়,

তবে এই সংগ্রাম অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে যদি আমাদের নেতৃবৃন্দ সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে অসমর্থ হন। জনসেবার আড়ম্বরের মধ্যে দরিদ্র জনগণের দুঃখ-দুর্দ্দশা শুধু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই লাভ করে। প্রকৃত সমস্যার সমাধান তাহাতে হয় নাই। বঞ্চিতকে বঞ্চনা হইতে মুক্ত না করিয়া জনগণের কল্যাণ সাধন কোন দিনই সম্ভব নয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি যত দিন জনগণের হাতে না আসিতেছে, তত দিন জনগণকে বঞ্চনা হইতে মুক্ত করাও অসম্ভব। আজিকার স্বাধীনতা উৎসবের মধ্যে অতৃপ্ত অশান্ত জনগণ সেই বৃহত্তর সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার দিকেই তাকাইয়া আছে। এই স্বাধীনতা উৎসবের মধ্যেই আরম্ভ হউক আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের পথে স্বাধীন ভারতের জনগণের অপ্রতিহত অগ্রগতি।

বন্দে মাতরম্। জয় হিন্দ্!!

খণ্ডিত ভারত

ভারতবর্ষ দুই ভাগে খণ্ডিত হইয়াছে—ভারত ডোমিনিয়ন ও পাকিস্তান ডোমিনিয়ন। ভারত ডোমিনিয়নের গভর্ণর জেনারেল হইয়াছেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এবং প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। পাকিস্তান ডোমিনিয়নের গভর্ণর জেনারেল হইয়াছেন মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না এবং প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন মিঃ লিয়াকৎ আলি খান্। ভারত ডোমিনিয়নকে ইউ, এন, ও, সভ্য হিসাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। পাকিস্তান ডোমিনিয়নকে সভ্য হইবার জন্য আবেদন করিতে হইবে। প্রকাশ, সেপ্টেম্বর মাসের শেষ নাগাদ তাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য হইয়া কার্য্যকরী হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ভারত ডোমিনিয়নের মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু—প্রধান মন্ত্রী ও বৈদেশিক মন্ত্রী। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল—দেশীয় রাজ্য, স্বরাষ্ট্র, প্রচার ও বেতার। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ—খাদ্য ও কৃষি। সর্দ্দার বলদেব সিং—দেশরক্ষা। শ্রীযুক্ত সন্মুখম্ চেট্টি—অর্থ। ডাঃ আম্বেদকর—আইন। ডাঃ জন মাথাই—রেলওয়ে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি—শ্রম-শিল্প ও সরবরাহ। মিঃ এ, সি, এইচ, ভাবা—বাণিজ্য। মিঃ এন, ভি, গ্যাডগিল—পূর্ত্ত, খনি ও বিদ্যুৎশক্তি। মিঃ রফী আহমেদ কিদোয়াই—যোগাযোগ। রাজকুমারী অমৃত কাউর—স্বাস্থ্য। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ—শিক্ষা। শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম—শ্রম।

সামরিক বাহিনী বণ্টন

সাঁজোয়া

ভারত—সাঁজোয়া বাহিনীর মোট ১২টি, গোলন্দাজ বাহিনীর মোট ১০টি ইউনিট এবং ইঞ্জিনিয়ার মোট ৩০টি গ্রুপ ও কোম্পানী।

পাকিস্তান—সাঁজোয়া বাহিনীর মোট ৬টি, গোলন্দাজ বাহিনীর মোট ৫টি ইউনিট এবং ইঞ্জিনিয়ার মোট ১৭টি গপ ও কোম্পানী।

পদাতিক

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ভারতীয় বাহিনীর পদাতিক সৈন্য বিভাগ ব্যবস্থা সৈন্য দলগুলির গঠন প্রকৃতির দ্বারাই স্থির হইয়াছে।

ভারত—পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট, মাদ্রাজ রেজিমেণ্ট, ইণ্ডিয়ান গ্রেনেডিয়ার্স, মারহাট্টা লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি, রাজপুতানা রাইফেলস্, রাজপুত রেজিমেণ্ট, জাঠ রেজিমেণ্ট, শিখ রেজিমেণ্ট, ডোগ্রা রেজিমেণ্ট, রয়েল ঘাড়োয়াল রাইফেলস্, কুমায়ুন রেজিমেণ্ট, আসাম রেজিমেণ্ট, শিখ লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি, বিহার রেজিমেণ্ট, ও মহর রেজিমেণ্ট।

পাকিস্তান—১ম পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট, ৮ম পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট, বালুচ রেজিমেণ্ট, ফ্রণ্টিয়ার ফোর্স রেজিমেণ্ট, ফ্রণ্টিয়ার ফোর্স রাইফেলস্, ১৪শ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট, ১৫শ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট ও ১৬শ পাঞ্জাব রেজিমেণ্ট।

নৌ

ভারত—

শ্লুপ: সাটলেজ, যমুনা, কৃষ্ণা, কাবেরী।
ফ্রিগেট: তীর, কুকরী।
মাইন সুইপার: উড়িষ্যা, ডেকান, বিহার, কুমায়ুন, খাইবার, রোহিলখণ্ড, কর্ণাটিক, রাজপুতানা, কঙ্কন, বোম্বাই, বেঙ্গল, মাদ্রাজ।
করভেট: আসাম।
ট্রলার: নাসিক, ক্যালকাটা, কোচিন, অমৃতসর।
সার্ভে ভেসেল: ইনভেষ্টিগেটর।
মোটর মাইন সুইপার: সংখ্যায় ৪টি।
হারবার ডিফেন্স মোটর লঞ্চ: সংখ্যায় ৪টি।
সমস্ত বর্ত্তমান ল্যাণ্ডিং ক্রাফ্ট।

পাকিস্তান—

শ্লুপ: নর্ম্মদা, গোদাবরী।
ফ্রিগেট: সম্বর, ধন্নুস।
মাইন সুইপার: কাথিওয়ার, বেলুচিস্তান, মালোয়া, আউধ।
ট্রলার: রামপুর, বরদা।
মোটর মাইন সুইপার: সংখ্যায় ২টি।
হারবার ডিফেন্স মোটর লঞ্চ: সংখ্যায় ৪টি।

ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজগুলি অপেক্ষা পাকিস্তান নৌবাহিনীর জাহাজগুলি আধুনিক ও উন্নত ধরণের। সংখ্যায় কম হইলেও অধিকতর কার্য্যকরী।

বিমান

বিমান বিভাগ এখনও বিবেচনাধীন।

গভর্ণরদের তালিকা

ভারত ডোমিনিয়ন

মাদ্রাজ—লেঃ জেনারেল স্যার আর্চিবল্ড নাই; বোম্বাই—স্যার ডেভিড জন কোলভিল; আসাম—স্যার মহম্মদ সালে আকবর হায়দারী; পশ্চিম বাঙ্গালা—চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী; পূর্ব্ব পাঞ্জাব—স্যার চণ্ডুলাল মাধবলাল ত্রিবেদী; মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—মিঃ মঙ্গলদাস পাকরাশা; বিহার—জয়রামদাস দৌলতরাম; ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু; যুক্তপ্রদেশ—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

পাকিস্তান ডোমিনিয়ন

পশ্চিম পাঞ্জাব—স্যার রবার্ট ফ্রান্সিস মুডী; সিন্ধু—মিঃ গোলাম হোসেন হিদায়েতুল্লা; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—স্যার জর্জ ক্যানিংহাম; পূর্ব্ব-বাঙ্গালা—স্যার ফ্রেডারিক বোর্ণ।

যুক্তরাষ্ট্র হইতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর হিসাবে কার্য্য করিবেন। প্রদেশের গভর্ণর পদে মহিলা নিয়োগ ইহাই সর্ব্বপ্রথম।

নূতন গভর্ণরদের পরিচয়

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের গভর্ণর শ্রীযুক্ত মঙ্গলদাস মনোহররাম পাকরাশা ১৮৮২ সালের ৭ই মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন, বোম্বাইয়ের এলফিনষ্টোন স্কুল ও কলেজে বিদ্যাভ্যাস করেন। বি, এ পরীক্ষায় ধীরজথান মথুরাদাস বৃত্তি এবং এল, এল, বি পরীক্ষায় আরনল্ড বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৩২ সালে ১৪ মাস, ১৯৪০ সালে ১ বৎসর এবং ১৯৪২-৪৩ সালে ১৭ মাস জেল খাটিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মঙ্গলদাস বোম্বাইয়ের আইন সভার ও কমিটির প্রেসিডেণ্টরূপে কাজ করিতেছেন।

পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার চন্দুলাল ত্রিবেদী কে-সি-এস-আই-কে-টি বর্ত্তমানে বিহারের গভর্ণর। ১৮৯৩ সালের ২রা জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। বোম্বাইয়ের এলফিনষ্টোন কলেজ ও অক্সফোর্ডের সেণ্ট জনস্ কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯১৭ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন এবং ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত মধ্য-প্রদেশের এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩২-৩৫ সাল পর্য্যন্ত ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী, ১৯৩৭-১৯৪২ মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের চীফ সেক্রেটারী এবং ১৯৪২-১৯৪৬ পর্য্যন্ত ভারত গভর্ণমেণ্টের সমর বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন।

উড়িষ্যার গভর্ণর ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু এম-এ এল, এল ডি। বর্ত্তমানে যুক্তপ্রদেশের আবগারী, শিল্প ও কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, ১৮৮৭ সালের ১৭ই জুন জন্মগ্রহণ করেন। বার হাই স্কুল, লাহোরের ফোর্ম্মাণ ক্রিশ্চিয়ান কলেজ ও মুইর সেণ্ট্রাল কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৮-১৪ সাল পর্য্যন্ত কাণপুরে ওকালতি করেন এবং ১৯১৫ সাল হইতে এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৯১৯ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব ল' ডিগ্রীলাভ করেন। ১৯২১ সালে হাইকোর্টের এডভোকেট হন। কয়েক বৎসর যুক্তপ্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন এবং ১৯৩৫ সালে এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে ১৮ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কয়েক বার বিদেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এম-ডি, এম-আর-সি-পি, এফ-আর-সি-এস (ইংলণ্ড) কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক। তিনি গোঁড়া কংগ্রেসপন্থী। অসহযোগ আন্দোলনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। বাঙ্গালায় স্বরাজ্য পার্টি গঠনে স্বর্গীয় দেশবন্ধুকে সাহায্য করেন। ১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়া কারাবরণ করেন। আইন-সভার নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠনে তিনি গান্ধীজী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে সম্মত করান। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের তিনিই প্রথম সেক্রেটারী। ১৯৩১ সালে কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত হন; কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ভূতপূর্ব্ব সদস্য; অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল কাউন্সিলের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চ্যান্সেলার। মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গুরুতর পীড়ায় বরাবরই ডাঃ রায়ের ডাক পড়ে। তিনি বাঙ্গালার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট।

বিহারের গভর্ণর পদে নিযুক্ত শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম এক জন সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্ম্মী। ১৮৯২ সালে হায়দ্রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৫ সালে আইন পাশ করিয়া করাচীতে ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৯১৬ সালে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে এবং ১৯১৯ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১৭ সাল হইতে রাষ্ট্রীয় সমিতির সভ্য আছেন। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে করাচী 'হিন্দু' পত্রিকার এবং ১৯২৫-২৬ সালে 'হিন্দুস্থান টাইমসে'র সম্পাদকের ভার লন। ১৯৩০—৩৪ সালের রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে ৪ বার কারাবরণ করেন। গণ-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

পশ্চিম-বাঙ্গালার নবনিযুক্ত গভর্ণর চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী ১৮৭৯ সালে সালেম জেলার অন্তর্গত এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাঙ্গালোরের সেন্ট্রাল কলেজ, মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী ও ল' কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ১৯০০ সালে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৯১৯ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে এবং ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। গান্ধীজী কারারুদ্ধ হইলে তিনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ১৯২১-২২ সালে জাতীয় কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী এবং কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হন। ১৯৩৭ সালে মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী হন এবং ১৯৩৯ সালে অন্যান্য কংগ্রেসী মন্ত্রি-সভার সহিত পদত্যাগ করেন। কংগ্রেসের ওয়ার্দ্ধা অধিবেশনের পর কংগ্রেসের সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য পদে ইস্তফা দেন। ১৯৪০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ১ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৪৪ সালে গান্ধী-জিন্না আলোচনায় গান্ধীজীর সাহায্য করেন।

পশ্চিম ও পূর্ব্ব-বাঙ্গালার আয়তন ও লোকসংখ্যা

সীমা সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বি, এন, ব্যানার্জী এক বিবৃতি প্রসঙ্গে রোয়েদাদ প্রদত্ত পশ্চিম ও পূর্ব্ব-বাঙ্গালার মুসলমান ও অমুসলমান জনসংখ্যা এবং অঞ্চল বিভাগ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন (পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ইহার অন্তর্ভুক্ত)। কলিকাতাস্থ ভারতীয় ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের কয়েক জন কর্ম্মীর সহায়তায় উক্ত হিসাব প্রদত্ত হইল :—

	পশ্চিম বাঙ্গালা	পূর্ব্ব বাঙ্গালা	মোট	পশ্চিম-বাঙ্গালার মোট সংখ্যার শতকরা হার	পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় মোট সংখ্যার শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬
মুসলমান	৫৩০১০২০	১১৭০৪৪১৪	৩৩০০৫৪৩৪	১৬'০৬	৮৩'৯৪
অমুসলমান	১৫৮৯৩৫৯৩	১১৪৭৪৯৮	২৭২০১০৯১	৫৮'২২	৪১'৭৮
মোট	২১১৯৪৬১৩	৩৯১১১৯১২	৬০৩০৬৫২৫	৩৫'১৪	৬৪'৮৬
মুসলমানের মোট সংখ্যার শতকরা হার	২৫'০১	৭০'৮৩	৫৪'৭৩	...	...
অমুসলমানের মোট সংখ্যার শতকরা হার	৭৪'৯৯	২৯'১৭	৪৫'২৭	...	...
বর্গ-মাইল হিসাবে আয়তন	২৮০৩৩	৪৯৪০৯	৭৭৪৪২	৩৬'২০	৬৩'৮০
বর্গ-মাইলে জনসংখ্যার ঘনতা	৭৫৬	৭৯২	৭৭৯	...	...

রোয়েদাদ অনুসারে মোট অঞ্চলের শতকরা ৩৬'২০ ভাগ ও মোট জনসংখ্যার ৩৫'১৪ ভাগ পশ্চিম-বাঙ্গালার ভাগে এবং যথাক্রমে শতকরা ৬৩'৮০ ভাগ ও ৬৪'৮৬ ভাগ পূর্ব্ব-বাঙ্গালার ভাগে পড়িবে। মোট মুসলমান জনসংখ্যার ১৬'৬ ভাগ পশ্চিম-বাঙ্গালায় এবং ৮৩'৯৪ ভাগ পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় পড়িয়াছে। বাঙ্গালার মোট অমুসলমান জনসংখ্যার শতকরা ৫৮'২২ ভাগ পশ্চিম-বাঙ্গালায় এবং ৪১'৭৮ ভাগ পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় পড়িয়াছে। পশ্চিম-বাঙ্গালার সাম্প্রদায়িক হার এইরূপ:—মুসলমান শতকরা ২৫'১০ ভাগ ও অমুসলমান শতকরা ৭৪'৯৯ ভাগ। পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় ঐ হার যথাক্রমে—মুসলমান শতকরা ৭০'৮৩ ও অমুসলমান শতকরা ২৯'১৭ ভাগ।

বঙ্গীয় সীমা কমিশনের সিদ্ধান্ত

অপ্রত্যাশিত বিলম্ব করিয়া বঙ্গীয় সীমা নির্দ্ধারণ কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। কি নীতি অনুসারে এই বিভাগ করা হইয়াছে, তাহাও উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র বর্দ্ধমান বিভাগ পশ্চিম-বঙ্গকে না দিয়া সীমা নির্দ্ধারণ কমিশনের অবশ্যই কোন উপায়ান্তর ছিল না বলিয়াই বোধ হয় সমগ্র বর্দ্ধমান বিভাগকে পশ্চিম-বঙ্গকে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ পূর্ব্ববঙ্গকে দেওয়া হইল কেন? অস্থায়ী বিভাগ অনুসারেই পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম হিন্দু-বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। উহাকে পূর্ব্ববঙ্গের অঙ্গীভূত করিবার কোনই সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। অস্থায়ী বিভাগ অনুসারে সমগ্র খুলনা জেলাই হিন্দু-বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সমগ্র খুলনা জেলাকে পূর্ব্ববঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। প্রেসিডেন্সী বিভাগের শুধু ২৪ পরগণা, কলিকাতা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার সমগ্র অংশ পশ্চিম-বঙ্গকে দেওয়া হইয়াছে। প্রেসিডেন্সী বিভাগের নদীয়া ও যশোহর জেলাকে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং কতক অংশ দেওয়া হইয়াছে পশ্চিম-বঙ্গকে এবং কতক অংশ পূর্ব্ববঙ্গকে দেওয়া হইয়াছে। রাজসাহী বিভাগের দার্জ্জিলিং জেলা অবশ্য ষোল আনাই পশ্চিম-বঙ্গ পাইয়াছে; কিন্তু অস্থায়ী বিভাগ অনুসারে সমগ্র জলপাইগুড়ি জেলা পশ্চিম-বঙ্গকে দেওয়া হইলেও কমিশন উহাকে বিভক্ত করিয়া কতক অংশ পূর্ব্ববঙ্গকে দিয়াছেন। রাজসাহী বিভাগের অন্যান্য জেলাগুলির মধ্যে কেবল দিনাজপুর ও মালদহ জেলার কতক অংশ মাত্র পশ্চিম-বঙ্গ পাইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গকে দেওয়া হইয়াছে সমগ্র ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজসাহী বিভাগের রংপুর, বগুড়া, পাবনা এবং রাজসাহী জেলার সমগ্র অংশ, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ও মালদহ জেলার কতক অংশ এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগের সমগ্র খুলনা জেলা এবং নদীয়া ও যশোহর জেলার অংশ। ইহার উপর শ্রীহট্ট জেলার অংশ পূর্ব্ববঙ্গ পাইয়াছে।

কমিশনের সদস্যরা সীমানা সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই বলিয়া চেয়ারম্যানের উপরেই তাঁহারা সমগ্র ভার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। চেয়ারম্যান তদন্তের সময় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন না। তদন্তের সময় তাঁহার অনুপস্থিতি সিদ্ধান্তের উপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া আমরা অবশ্যই মনে করি না। কিন্তু সীমা নির্দ্ধারণের জন্য যে সকল যুক্তি তিনি দিয়াছেন, তাহা আমাদের বোধগম্য হইল না। বঙ্গ-বিভাগের জন্য স্বাভাবিক কোন সীমান্ত পাওয়া কঠিন, এ কথা না হয় স্বীকারই করিলাম। তাই বলিয়া হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ চব্বিশ পরগণা জেলার সহিত সংলগ্ন খুলনা জেলাকে পূর্ব্ববঙ্গে দেওয়ার পক্ষে কোনই ন্যায়সঙ্গত যুক্তি থাকিতে পারে না। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ জেলা পশ্চিম-বঙ্গকে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অমুসলমান গরিষ্ঠ দুইটি জেলা খুলনা ও চট্টগ্রাম দেওয়া হইয়াছে পূর্ব্ববঙ্গকে। মুর্শিদাবাদ জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও উহার কতক অংশে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু খুলনা জেলার কতক অংশে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, এমন কোন কথা পর্য্যন্ত বলা চলে না। যে দুইটি থানা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাহা পূর্ব্বে বরিশালের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ঐ দুইটি থানাকে পুনরায় বরিশালের অন্তর্ভুক্ত করিতে কাহারও কোন আপত্তি ছিল না। চট্টগ্রাম হইতে খুলনা পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গোপসাগরের উপকূল এবং সুন্দর-বনের অংশ পূর্ব্ববঙ্গকে দিবার জন্যই কি এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে? পরস্পর সংলগ্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের নীতি অনুসারে যে এই সিদ্ধান্ত করা হয় নাই, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। বস্তুতঃ, রাজসাহী জেলার হিন্দুপ্রধান অংশ পশ্চিম-বঙ্গকে না দেওয়ার ন্যায়সঙ্গত কোন কারণ থাকিতে পারে না। মালদহ ও দিনাজপুর জেলার কতক অংশ পশ্চিম-বঙ্গকে দেওয়া হইয়াছে কিন্তু তাহাও দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার সহিত সংযোগ রক্ষা করিবার জন্য নয়। অস্থায়ী বিভাগ অনুযায়ী জলপাইগুড়ি জেলার সমগ্র অংশই পশ্চিম-বঙ্গ পাইয়াছিল। পূর্ব্ব-বঙ্গকে উহার অংশ দিবার জন্যই এই জেলাকে বিভক্ত করা হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গ আসাম হইতে শ্রীহট্ট জেলার বৃহত্তর অংশ পাইয়াছে। আবার অস্থায়ী বিভাগ অনুযায়ী যে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম সমগ্রই পশ্চিম-বঙ্গ পাইয়াছিল, তাহা ষোল আনাই দেওয়া হইয়াছে পূর্ববঙ্গকে। অস্থায়ী বিভাগ অনুযায়ী জলপাইগুড়ি জেলার সমগ্রই পশ্চিম-বঙ্গ পাইয়াছিল, কিন্তু পূর্ববঙ্গকে তাহারও অংশ প্রদান করা হইয়াছে। অধিকন্তু, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ খুলনা জেলা সমগ্রই পাইল পূর্ববঙ্গ। এই ভাবে যে সীমা নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে তাহা প্রাকৃতিক সীমা অনুসারে করা হইয়াছে তাহা বলা যায় না। পরস্পর সংলগ্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের নীতি অনুসারে যেমন এই সীমানা নির্দ্ধারণ করা হয় নাই, তেমনি প্রাকৃতিক সীমা এবং পশ্চিম-বঙ্গের রেল-লাইন ও জলপথে চলাচল ব্যবস্থার প্রতিও লক্ষ্য করা হয় নাই—যদিও এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিভাগ করার কথা রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে।

পশ্চিম-বঙ্গ ও সীমা কমিশন

সীমা কমিশনের সিদ্ধান্ত পশ্চিম-বঙ্গের দিক্ হইতে শুধু অসন্তোষজনকই হয় নাই, পশ্চিম-বঙ্গ তাহার ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে। সমগ্র বাঙ্গালা দেশে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৪৬ জন। সেন্সাসে যে ভুল আছে, তাহা যদি বিবেচনা করা নাও হয়, তাহা হইলেও পশ্চিম-বঙ্গের অর্থাৎ নূতন হিন্দু-বঙ্গ রাষ্ট্রের সমগ্র বাঙ্গালার অন্ততঃ শতকরা ৪৬ ভাগ জমি পাওয়া উচিত ছিল। পশ্চিম বঙ্গের জমির অনুর্ব্বরতা এবং লোকসংখ্যার তুলনায় জমির স্বল্পতার কথা বিবেচনা করিলে বাঙ্গালার সমগ্র ভূভাগের অন্ততঃ অর্দ্ধেক তো পশ্চিম-বঙ্গের পাওয়াই উচিত। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ৩রা জুন তারিখে প্রকাশিত পরিকল্পনায় অস্থায়ি ভাবে বাঙ্গালার যে বিভাগ করা হইয়াছিল, তাহাতে পশ্চিম-বঙ্গের ভাগে পড়িয়াছিল মাত্র ৩৩০৭৬ বর্গ-মাইল। অর্থাৎ শতকরা ৪৬ ভাগেরও অনেক কম। সীমানা-নির্দ্ধারণ কমিশনের তদন্তের ফলে এই ত্রুটি সংশোধিত হইবে, ইহাই আমরা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অস্থায়ী বিভাগে পশ্চিম-বঙ্গ যে-পরিমাণ ভূমি পাইয়াছিল, সার সিরিল র‍্যাডক্লিফ তাহা অপেক্ষাও অনেক কম ভূমি পশ্চিম-বঙ্গকে দিয়াছেন। বস্তুতঃ পক্ষে পশ্চিম-বঙ্গ বোধ হয়, সমগ্র বাঙ্গালার এক-চতুর্থাংশের বেশী ভূমি পায় নাই। অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশই পূর্ববঙ্গের ভাগে পড়িয়াছে। বাঙ্গালার আবাদী জমির দিক হইতে অস্থায়ী বিভাগ-ব্যবস্থাই পশ্চিম-বঙ্গের পক্ষে অত্যন্ত অসন্তোষজনক ছিল। সীমা-নির্দ্ধারণ কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পশ্চিম-বঙ্গ আরও কম ভূমি পাওয়ায় আবাদী জমির দিক হইতে উহা অধিকতর অসন্তোষজনকই শুধু হয় নাই, পশ্চিম-বঙ্গে খাদ্যশস্যের ঘাটতি আরও বৃদ্ধি পাইবে। পশ্চিম-বঙ্গের জমি এমনিই তো পূর্ববঙ্গের জমি অপেক্ষা অনুর্ব্বর। ইহার উপর জমির পরিমাণ ন্যায্য ভাবে যাহা পাওয়া পশ্চিম-বঙ্গের উচিত ছিল, তাহা অপেক্ষা কম পাওয়ায় অপরিশোধনীয় ক্ষতি হইয়াছে। উর্ব্বর এবং খাদ্যশস্য আবাদের ভাল ভাল জমি যাহা সংলগ্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হিসাবেই পশ্চিম-বঙ্গের পাওয়া উচিত ছিল, তাহাও পশ্চিম-বঙ্গকে দেওয়া হয় নাই।

জলপাইগুড়ি জেলায় মুসলমান শতকরা ২৩.৮ জন আর অমুসলমান শতকরা ৭৬.২ জন; সুতরাং জলপাইগুড়ি জেলাকে ভাগ করিয়া পূর্ববঙ্গকে এক অংশ দেওয়ার পক্ষে কোন যুক্তিই থাকিতে পারে না। জলপাইগুড়ি জেলার কিয়দংশ পূর্ববঙ্গকে কেন দেওয়া হইল? এই অংশটুকু দিনাজপুর জেলার সংলগ্ন! জলপাইগুড়ি জেলার এই অংশ যাহাতে পূর্ববঙ্গে পড়ে, সেই উদ্দেশ্যেই যে দার্জিলিং জেলার ফাঁশি-দেওয়া থানা ও জলপাইগুড়ি জেলার তেঁতুলিয়া থানার মধ্যকার সীমা যেখানে বিহার প্রদেশকে স্পর্শ করিয়াছে, সেইখান হইতে বরাবর কুচবিহার পর্য্যন্ত সীমারেখা টানিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তার পর জলপাইগুড়ি জেলার এই অংশের সহিত সংলগ্ন দিনাজপুর জেলার অংশ পূর্ববঙ্গকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে দিনাজপুর জেলার হরিপুর ও রায়গঞ্জ থানার মধ্যবর্ত্তী সীমানা যেখানে বিহার প্রদেশকে স্পর্শ করিয়াছে, সেখান হইতে ২৪ পরগণা ও খুলনা জেলার মধ্যবর্ত্তী সীমারেখা যেখানে বঙ্গোপসাগর স্পর্শ করিয়াছে, সেই পর্য্যন্ত একটি রেখা টানিয়া সীমা-নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কোন্ যুক্তি ছাড়া কেন এইরূপ সীমারেখা টানিবার ব্যবস্থা হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তবে এইটুকু আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, মালদহ ও দিনাজপুরের যে অংশ পশ্চিম-বঙ্গ পাইয়াছে, তাহার সহিত দার্জিলিং জেলা ও জলপাইগুড়ির পশ্চিম-বঙ্গের প্রাপ্ত অংশের সহিত কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ যাহাতে না থাকে, তাহারই জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।" নতুবা এই ভাবে সীমারেখা আবদ্ধ হওয়ার স্থান নির্দ্দেশ করার কোন অর্থই হয় না। বঙ্গীয় সীমা-নির্দ্ধারণ কমিশনের রিপোর্টে সার সিরিল র‍্যাডক্লিফ বলিয়াছেন, "রেলপথ ও নদী বিভক্ত না করিয়া যেখানে পারা যায়, সেখানে সেখানে সেগুলিকে অবিভক্ত রাখিয়া সীমারেখা টানিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কারণ, প্রদেশের অস্তিত্বের পক্ষে তাহা অপরিহার্য্য। কিন্তু উহা করিতে যাইয়া আমাদের জন্য নির্দ্ধারিত নীতির কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। প্রদেশের অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য্য রেলপথ ও নদী বিভক্ত না করিবার অজুহাতে নির্দ্ধারিত নীতির, অর্থাৎ সীমা-নির্দ্ধারণের জন্য সংলগ্নতা ও কোন সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি তিনি লঙ্ঘন করিয়াছেন, অথচ কার্য্যতঃ রেলপথ ও নদী তাঁহাকে বিভক্ত করিতেই হইয়াছে। অথচ যে চলাচল ব্যবস্থা প্রদেশের পক্ষে একান্তই অপরিহার্য্য, জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশ এবং ঐ অংশের সহিত সংলগ্ন দিনাজপুর জেলার কতক অংশ পূর্ববঙ্গকে দিয়া পশ্চিম-বঙ্গের সেই চলাচল ব্যবস্থাকেই ব্যাহত করা হইয়াছে। সার সিরিল র‍্যাডক্লিফ চলাচল ব্যবস্থার অখণ্ডতার উপর জোর দিয়া সংলগ্নতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি ক্ষুণ্ণ করিয়া পশ্চিম-বঙ্গকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য দেন নাই, আরও পশ্চিম-বঙ্গের এক অংশের সহিত আর অংশের সংযোগ যাহাতে না থাকে, সেই ভাবে জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর জেলার যে অংশ পশ্চিম-বঙ্গের প্রাপ্য তাহাই দিয়াছেন পূর্ববঙ্গকে। পশ্চিম-বঙ্গ তাহার ন্যায্য প্রাপ্য ভূভাগ পায় নাই, অনেক হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংলগ্ন অঞ্চল হইতেও পশ্চিম-বঙ্গ বঞ্চিত হইয়াছে। পশ্চিম-বঙ্গের দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি অঞ্চলকে পশ্চিম-বঙ্গের অবশিষ্ট অঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। পশ্চিম-বঙ্গের এই দুই অংশের মধ্যে লোক যাতায়াত ও মাল প্রেরণ হয় পাকিস্তান রাষ্ট্র, না হয় বিহার প্রদেশের মধ্য দিয়া করিতে হইবে। ইহাতে শাসন পরিচালন এবং সংবাদ আদান-প্রদানের পক্ষেও গুরুতর অসুবিধা হইবে।

বঙ্গীয় সীমানা-কমিশনের সিদ্ধান্ত যে পশ্চিম-বঙ্গের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিজনক হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ বিভাগের ফলে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কতকটা সফল হইয়াছে এবং রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক উভয় দিক হইতেই পশ্চিম-বঙ্গকে অনেক রকম অসুবিধায় পড়িতে হইবে। পশ্চিম-বঙ্গ তাহার ন্যায্য প্রাপ্য ভূভাগ পায় নাই, অথচ পূর্ব্ববঙ্গের বহু হিন্দু পশ্চিম-বঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। সীমা-নির্দ্ধারণ কমিশন এই সমস্যা আদৌ বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই। কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গ এই বাড়তি লোকদিগকে কোথায় স্থান দিবে? তাহাদের জন্য অন্নের ব্যবস্থাই বা করিবে কিরূপে? ভবিষ্যতে আরও বহু হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিম-বঙ্গে আসিবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে বাসস্থান ও অন্ন সংস্থান করাই পশ্চিম-বঙ্গের এক কঠোর সমস্যা হইয়া উঠিবে। বঙ্গীয় সীমানা-কমিশন যে ভাবে সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহারই জন্য পশ্চিম-বঙ্গকে এই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। কি ভাবে এই সমস্যার প্রতিকার করা সম্ভব, এখন হইতেই তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। বাঙ্গালার যে পরিমাণ ভূভাগ পশ্চিম-বঙ্গের পাওয়া উচিত ছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক কম পাইয়াছে। অথচ পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট জেলার কতক অংশ দেওয়া হইয়াছে পূর্ব্ববঙ্গকে। ভাষা ও সংস্কৃতির দিক হইতে মানভূম ও সিংভূম বাঙ্গালারই অঙ্গবিশেষ। পূর্ণিয়া জেলাতেও বাঙ্গালীর সংখ্যাই বেশী। বাঙ্গালা দেশ অনেক দিন ধরিয়াই এই তিনটি জেলা বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দাবী করিয়া আসিতেছে। ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশের সীমা নির্দ্ধারণ কংগ্রেসেরও নীতি। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আজ কংগ্রেসেরই আধিপত্য। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ যদি তাঁহাদের এই নীতি কার্য্যকরী করেন, তাহা হইলে মানভূম, সিংভূম এবং পূর্ণিয়া জেলা এবং সাঁওতাল পরগণা জেলা বাঙ্গালার পক্ষে পাওয়া আদৌ কঠিন হইবে না। এই অঞ্চলগুলি পাইলে পশ্চিম-বঙ্গের স্থানাভাব অনেকখানি পূরণ হইবে এবং পশ্চিম-বঙ্গের অবশিষ্ট অংশের সহিত দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির যে বিচ্ছিন্ন অবস্থা, পূর্ণিয়া জেলা পাওয়া গেলে তাহাও দূর হইবে।

জিতেন্দ্রনারায়ণ রায় ইনফ্যাণ্ট নার্সারি স্কুলে লেডী মাউণ্টব্যাটেন, লেডী রানোজ, ডাঃ এইচ, এন রায় ও বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী মৃন্ময়ী রায়

দিল্লী যাত্রার প্রাক্কালে হাওড়া ষ্টেশনে ভারতীয় ইউনিয়নের মন্ত্রিসভার নির্ব্বাচিত সদস্য ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিপুল ভাবে অভ্যর্থিত হন। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের জন্য স্পেশাল সেলুনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সেলুনের দ্বারদেশে হিন্দু-মহাসভার পতাকা উড্ডীয়মান ছিল।

ডাঃ মুখোপাধ্যায়কে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবার জন্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ছবিতে শ্রীযুক্ত ভবতোষ ঘটক, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে দেখা যাইতেছে।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গাগরী ভরণে — টমাস

নারী —ফণিভূষণ দাশগুপ্ত

ওয়াহ ! গুরুজীকি ফতে !
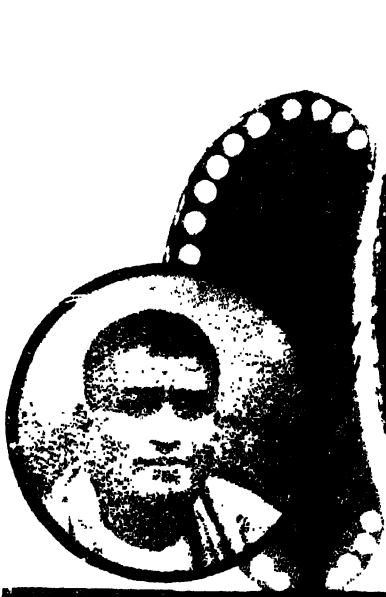
"আবার উঠতে হলে ভারতকে হতে হবে বলিষ্ঠ—হতে হবে অখণ্ড ! জীবন্ত সব শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। এ অঘটন ঘটাবার জন্যই আমার সন্ন্যাস !······

"খোঁজ—কি উপাদানে আমাদের সত্তা। সন্ধান কর—প্রতি শিরার শোণিত-প্রবাহের বৈশিষ্ট্য ! সে শোণিত বৈশিষ্ট্য অস্বীকার ক'রো না। এই শোণিত-প্রবাহ অতীতে কি অঘটন ঘটিয়েছে তা অস্বীকার ক'রো না। এই আস্থা ও বিশ্বাস—অতীতের মহত্ত্ব ও সমৃদ্ধির এই উপলব্ধি ও চেতনা থেকে গড়্‌ব এমন ভারত, যা অতীতের ভারত থেকে হবে আরও সমৃদ্ধ—আরও গরীয়ান—আরও মহীয়ান !···"

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্‌ নিবোধত

—স্বামিজী

রুদ্র ভারতের মুক্তি-সাধনা

তারানাথ রায়

প্রায় ৭০ বৎসর আগে—

এটম বোমা। মহাবিপ্লবীর অনন্য সংগঠন। বারুদখানার হিংসাবাদী শিখ প্রহরীরা যে অদ্ভুত বিপ্লবীর কথা প্রচার করল, গত অর্দ্ধ শতাব্দীর রুদ্র ভারত করল তার সাধনা। এ বিপ্লবী সেকালের সব নামজাদা দুনিয়ার উপকার করনেওয়ালা, লোকশিক্ষা দেনেওয়ালা—লেকচার-বিশারদদের যাচাই করে দেখছিলেন—আর গগনে কণ্ঠ তুলে অনাগত যুব-ভারতকে আহ্বান করেছিলেন—"কে কোথায় আমার আছিস, আয় আয়!"

আবির্ভূত হয়েছিল বীরভদ্রের দল।

* * * "এত বড় আবির্ভাবের ফলে ঘটে বড় বড় ঘটনা। অনেকের অগ্নি-পরীক্ষা হইবে, এই পরীক্ষায় খাঁটি সোনাও কম মিলিবে না···

বিধির তূর্য্য উঠিল বাজিয়া পলায়ন নহে পলায়ন।"

(কর্ম্মযোগীন—শ্রীঅরবিন্দ)

'ইয়ং বেঙ্গলের' দীক্ষা মনে-বনে-কোণে।

বললেন গুরু—'নরেন মহাবীর, বিশ্বকে দুই মুঠোতে ধরে ওর রূপ বদলে দেবে।'

*　　*　　*　　*

৫০ বছর আগে।

বিপ্লবী ভারতের ঘোষণা।

"The time has come to become dynamic—Shall we stand by whi'st alien hands attempt to destroy the fortress of the Ancient Faith ?···Shall we remain passive, or, shall we become agressive ?···Shall we remain enclosed within the narrow confines of our own social groups and provincial consciousness, or, shall we branch out into the thought world of the oth r peoples, seeking to influence these for the benefit of Bharatvarsha ? In order to rise again India must be strong and united and must focus all its living forces. To bring this about is the meaning of my Sannyasa."

"এসেছে সেদিন···রুদ্রশক্তিতে বলিষ্ঠ হবার দিন আগত। সনাতন সংস্কৃতির দুর্গ ধ্বংস করতে চাচ্ছে বিদেশীরা—আমরা দাঁড়িয়ে দেখব ?···রইব নিষ্ক্রিয় ? না, করব আক্রমণ ?···আমাদের সামাজিক ঘোঁট আর প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীতে রইব আটকে ? না, অপর জাতগুলোর ভাব-জগতে নানা দিক দিয়ে পদপ্রসারণ করব, আর ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য বাইরের এ সব ভাবের উপর প্রভাব প্রয়োগ করব ? আবার যদি উঠতে হয় ভারতকে হতেই হবে বলিষ্ঠ, ভারতকে তার সব জীবন্ত শক্তিকে করতে হবে কেন্দ্রীভূত। এ অঘটন ঘটাবার জন্যই আমার সন্ন্যাস।"

Cyclonic হিন্দুর বিদ্যুত প্রেরণা।

"From that day the awakening of the torpid Colossus began. If the generation that followed, saw, three years after Vivakananda's death, the revolt of Bengal, the prelude to the great movement of Tilak and Gandhi, if India to day has definitely taken part in the collective action of organised masses, it is due to the initial shock, to the mighty

'Lazarus, comeforth !'

of the Message from Madras.

(—Romain Rolland)

"সেই দিন থেকে অচল কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হতে আরম্ভ হ'ল। এর পর যারা জন্মাল, তারা যদি দেখে থাকে বিবেকানন্দের মৃত্যুর তিন বছর পরে তিলক ও গান্ধীর মহা আন্দোলনের মুখবন্ধে বাঙ্গলার বিদ্রোহ—আজকের ভারত যদি সংগঠিত গণশক্তির সমবেত সংগ্রামে নিশ্চিত ভাবে যোগ দিয়ে থাকে, তবে তা সম্ভব হয়েছে সেই প্রাথমিক বিদ্যুৎ-প্রেরণায়, মাদ্রাজের বাণীর সেই মহা আহ্বানে—"ল্যাজেরাস্, বেরিয়ে এস!"

নেতার নির্দ্দেশ।

আগামী পঞ্চাশ বৎসর এই মাতৃভূমিই তোমাদের এক মাত্র আরাধ্য দেবী হউন।"

*　　*　　*

যুগ-সন্ধি।

ফরাসী বিপ্লব। গণ-নারায়ণের স্ফুলিঙ্গ। ধ্বনি—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা! ভারতে সে প্রভাবের বিদ্যুৎ-স্পর্শ। ইংরেজের স্তাবক নেতাদের বুকে আতঙ্ক জাগিয়ে নূতন বিপ্লবীর ঘোষণা—

"The coming prophet must not shrink from proclaiming the only truth as to how nations are made and regenerated which according to Robespierre strikes terror into the heart and conjures up horrors of a chaos."

(—Aurobindo, 1906

চাই "purification by blood and fire."

(Aurobindo—1893)

প্রভাব—রাজনারায়ণ ! প্রভাব—সতীশ মুখোপাধ্যায় ! প্রভাব—বঙ্কিমচন্দ্র ।

"যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?
হরে মুরারে ! হরে মুরারে !"

*   *   *

৪০ বছর আগে ।

তবঙ্গ রোধের আয়োজন । যন্ত্র—মুসলমান । যন্ত্র—মডারেট । যন্ত্র—ইংরেজ শাসনতন্ত্র । যন্ত্র—সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন !

"বিপ্লবী ভারত বললে—তুমি ইংরেজ—শিক্ষিত ভারতবাসীকে ভেড়া বানাইয়াছ ; তুমি ইংরেজ—পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানকে লেলাইয়া দিয়াছ । (—যুগান্তর)

"It is the knowledge of our weakness that this despotism be it of a Government or of a community thrives and the necessity of replacing it by strength is the one moral of these repeated happenings in the domain of God."

(—বন্দে মাতরম্)

*   *   *   *

আরম্ভ হ'ল কাজ ।

দেশ ঘোষণা করল বৃটিশ বয়কট ।

"৭ই আগষ্ট ১৯০৭ । ভারতের স্বাধীনতা জীবন্ত সত্য—ভারতের স্বাধীনতা সুদূরের কল্পনা-বিলাস নয় । বাংলা ইহা আবিষ্কার করিল ভারতের জন্য । ৭ই আগষ্ট—বয়কট ঘোষণা করিয়া সেই চরম কাম্য লাভের জন্য বাংলা ব্রতী হইল । বয়কট স্বাধীনতার অনুশীলন । ৭ই আগষ্ট যখন আমরা এই বয়কট ঘোষণা করিলাম, তখন উহা আর আমাদের আর্থিক অর্থনীতিক বিদ্রোহ রহিল না । এই বয়কট হইল জাতীয় স্বাধীনতার অনুশীলন । ভারতের জাতীয়তা-বোধের জন্ম এই দিন ।···বয়কটে ঘৃণা-বোধ নাই । বয়কট আমাদের স্বাধীনতা—আমাদের জাতীয় পৃথক্ সত্তার দাবী-প্রকাশ মাত্র ।"

প্রথম নেতৃত্বের অবসান । তরুণ ভারতের প্রতি নায়কের উপদেশ—

"Work tha She may prosper. Suffer that She may rejoice." (—Aurobinda)

Work আরম্ভ । রক্ত ! ফাঁসী ! নির্ব্বাসন !

"চল রে চল রে চল রে সবাই জীবন-আহবে চল ।
বাজবে সেথায় রণ-ভেরী আসবে প্রাণে বল !"

"দুঃখ করিও না—এই ব্রতের এই কথা"

(—সতীশচন্দ্র)

"I pity my enemies, for these
Do not know that iron bars
Can not shut out my beloved."

(—অশ্বিনীকুমার)

যুগবাণী ।

"যে বাঁধনে দেশকে জড়িয়েছে টান মেরে মেরে সেটা ছিঁড়তে হয় । প্রত্যেক টানে চোখের তারা উলটে যায়, কিন্তু এ ছাড়া বন্ধন-মুক্তির অন্য উপায় নেই ।···ভীষণের দুর্ব্বৃত্ততাকে আমরা ভয় করি, সে ভয়ের মধ্যেও সম্মান আছে, কিন্তু কাপুরুষের দুর্ব্বৃত্ততাকে আমরা ঘৃণা করি । বৃটিশ সাম্রাজ্য আজ আমাদের ঘৃণায় ধিক্‌কৃত । এই ঘৃণায় আমাদের জোর দেবে, এই ঘৃণার জোরেই আমরা জিতবো ।"

(—রবীন্দ্রনাথ)

বন্ধন । বন্দিশালা । লৌহশৃঙ্খল । জাতির বাণী বিগ্রহের সান্ত্বনা—"ঐ যে বন্দিশালার লৌহ-শৃঙ্খলের কঠোর ঝঙ্কার শুনা যাইতেছে—দণ্ডধারী পুরুষদের পদশব্দে কম্পমান রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে—ইহাকেই অত্যন্ত বড় করিয়া মানিয়ো না । যদি কান পাতিয়া শোন তবে কালের মহাসঙ্গীতের মধ্যে ইহা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যায় ।···ভয় করিব না, ক্ষুব্ধ হইব না, ভারতবর্ষের যে পরম মহিমা সমস্ত কঠোর দুঃখ-সংঘাতের মধ্যে বিশ্বকবির সৃজনানন্দকে বহন করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে—ভক্ত সাধকের ধ্যান-নেত্রে তাহার অখণ্ড মূর্ত্তি উপলব্ধি করি ।" (—রবীন্দ্রনাথ)

মহাপ্রেরণা ।

"তুমি দেশকে যথার্থ ভালবাস—তাহার চরম পরীক্ষা, তুমি দেশের জন্য মরিতে পার কি না ।···ধনীর যথার্থ পরীক্ষা দানে, যাহার যথার্থ প্রাণ আছে তাহার যথার্থ পরীক্ষা প্রাণ দিবার শক্তিতে ।······দুই রাস্তা আছে, এক ক্ষত্রিয়ের রাস্তা, আর এক ব্রাহ্মণের রাস্তা । যাহারা মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে, পৃথিবীর সুখ-সম্পদ তাহাদেরি, যাহারা জীবনের সুখকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, তাহাদের আনন্দ মুক্তির ।···হয় বীর্য্যের সঙ্গে বলিতে হইবে "চাই !" নয় বীর্য্যের সঙ্গে বলিতে হইবে "চাই না !" (—রবীন্দ্রনাথ)

নবীন ভারত সমন্বয় করল ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ-বুদ্ধির ।

তার পর ?

তার পর মুক্তি সাধনার দ্বিতীয় অধ্যায় । পরে বলব ।

রাত্রি

তিঙ্ লিঙ্

আস্তিনায় সবগুলি ভেড়াকেই এনে জড়ো করা হয়েছে। চাঙদের কুমারী মেয়ে তখনও মেটে ঘরের প্রবেশ-মুখে বসে জুতা মেরামত করছে। থেকে থেকে মাথা ঘোরাচ্ছে, ফলে রূপোর দুল দু'টি কাঁধে এসে লাগছে, আর জোরে এদিক-ওদিক দোল খাচ্ছে। ভেড়াগুলো খোঁয়াড়ে ঢুকবার জন্যে দরজার সামনে ঠেলাঠেলি করায় যারা ধাক্কা খাচ্ছিল তারা ভ্যা-ভ্যা সুরু করল।

নির্বাচনী কমিটির সভ্যরা সকলে এসে খাং-এ জমায়েৎ হয়েছিল, এখন এক জনের পর এক জন জানলা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ল। সভার কাজ শেষ হয়েছে, কিন্তু তখনও আলোচনা চলছিল। চিঙ বসে বসে জুতো সেলাই করছে, আর এক একবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে, তার সে চাউনির মধ্যে ছিল একটি ব্যঙ্গ-মেশানো হাসি।

সভ্যেরা নানা সমস্যার আলোচনা করে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আকাশের দিকে চেয়ে দেখল যে, দেরী হয়ে গেছে, চার দিক থেকে রান্নাঘরের চিমনির নীল ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রামের অপর প্রান্তে গিয়ে খাওয়া সারবে ঠিক করল, কেন না, পরের দিন তাদের আর একটি নির্বাচনী সভার ব্যবস্থা করতে হবে। উপদেষ্টা এদের সঙ্গে না গিয়ে অভাবনীয় কারণে বাড়ী যেতে বাধ্য হল। তিন-চার দিন সে বাড়ী-ছাড়া। বাড়ীর কোন খোঁজই রাখতে পারেনি। তার একটি মাত্র গাই গরু আছে, সেটি আসন্নপ্রসবা। স্ত্রীর বয়স চল্লিশের উপর, সংসারের রান্না-বান্নার কাজ করে, আর কিছু দেখবার ফুরসৎ তার হয় না।

বাড়ীর কর্তা বুড়ীকে যাঁতার দিকে ঠেলে দিয়ে ছুটে এসে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'বা রে, খাবার তৈরি, আর তোমরা যে বড় চলে যাচ্ছ? বৌয়েদের হাতের রান্না কি এতই মধুর?' এই বলে সে অস্থায়ী হাকিমের একখানি হাত খপ্ করে ধরে ফেলে। হাকিম সম্প্রতি এক সুন্দরী পঞ্চদশীকে বিয়ে করেছে, কাজেই বন্ধুজনের কাছ থেকে তাকে হামেশাই এ রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুনতে হয়।

ঠিক এই সময় চিঙ্ ফটকে এসে দাঁড়িয়ে দূর পাহাড়ের ফলবান কুল গাছগুলির দিকে তাকালে। গায়ে একটি কালো রঙের জ্যাকেট, নানা রকম ফুলের চিত্রে সুশোভিত, হাতা লম্বা। লম্বা ভাঁজের সঙ্গে মানানসই করে গোলাপী উলে বাঁধা। হাত দু'খানি মাথার উপরে দরজার চৌকাঠে ন্যস্ত। বয়স তার ষোল, কিন্তু দেখলে পরিণত বয়সের বলেই মনে হয়—যেন একটি ফোটা ফুল। বিবাহের বয়স হয়েছে বই কি।

কমিটির সভ্যরা পুলের কাছে গিয়ে বিদায় নিল। হো হবা-মিঙ ছাড়া আর সকলেই দক্ষিণ দিকে চলল। সে গেল উত্তর দিকে—তার বাড়ীতে। চিঙ্ তখনও নিঃশব্দে দূরের পানে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখা গেল। হো-র মনে একটা অদ্ভুত ভাবের উদয় হল। এতক্ষণ সভায় যে সব সমস্যা এসে তাকে বিব্রত করে তুলেছিল এখন সে সব-কিছুই তার মন থেকে দূরে সরে গেছে, সে যেন কেমন একটু খুশী হয়ে উঠল। ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে শিস দিতে লাগল। তার পর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে অনেকটা আত্মগত ভাবেই বলে উঠল, 'মেয়েটা একেবারে গেঁয়ো, অশিক্ষিত জমিদারের মেয়ে, আগামী শীতকালীন শিক্ষাপ্রচারের কাজেও ওকে রাজী করানো যাবে না। দূর হোক্ গে ছাই! চাঙ-এর টাকা আছে, তাই বিয়ের বয়স হলেও মেয়ের বিয়ের গরজ তার নেই।'

মাথাটা ঝাঁকুনি দিয়ে চুলগুলি আন্দোলিত করে দু'হাতে কানের পাশের চুলগুলি ভাল করে পিছনের দিকে গুছিয়ে রাখল—যেন এমনি করেই নিজের মনের সব কিছু গ্লানি ঝেড়ে ফেলল। চার দিকে একবার তাকাল। আঁধার ঘনিয়ে আসছে। দূরে দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটি গাঢ় নীল

মেঘ যেন ঝুলে আছে, আর সেখানে সোনালী ঢেউ ঝিকিমিকি করছে। রঙের সঙ্গে পাহাড়ের বাহ্য-রেখা মিলে একাকার হয়ে গেছে। তার মনটা গভীর বিষণ্ণতায় ভরে গেল, অনেক কথাই তার মনে পড়ল। পশ্চিম দিকের পাহাড়ের চূড়ায় তখনও সূর্যের আলো রয়েছে, চাষীরা তখনও লাঙল চালাচ্ছে। কেউ কেউ লাঙল কাঁধে নিয়ে বলদগুলি তাড়িয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরছে। যখন থেকে সে চাষ-বাসের উপদেষ্টার পদে নির্বাচিত হয়েছে তখন থেকেই তো হবা-মিং নিজের জমিতে লাঙ্গল দেওয়ার সুযোগ পায়নি। গত বিশ দিন ধরে জেলায় নির্বাচনের হিড়িক চলেছে, ফলে সে এত ব্যস্ত যে, নিয়মিত বাড়ীতেও যেতে পারেনি, আর পাহাড়ে তার যে জমি আছে সেখানেও চাষ সুরু করা সম্ভব হয়নি। ফলে, যে দু-দু'-এক বার বাড়ী এসেছে, তখন শুধু গাল-মন্দই শুনতে হয়েছে।

সত্য বলতে কি, কাউকে জমি চাষ করতে দেখলেই তার মনে হয়, তার জমিও আবাদের জন্যে পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটাও তার মনে হল যে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে সে তার জমির প্রতি নজর দেওয়ার সময় পাবে না। কথাটা মনে হতেই একটা অবর্ণনীয় বেদনা অনুভব করল। নিজের চাষ-আবাদের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সে প্রাণপণে তা এড়িয়ে যেতে চায়। লোক-জনের মাঝে বাড়ী বা চাষের কথা তার মনেও থাকে না।

তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও রিপোর্ট তৈরি চলে। এমন কি, কোন এক গ্রামে নির্বাচনীসভা উপলক্ষে তার নবান্ন নৃত্যের ফরমায়েশ আসে। সুকণ্ঠ বলে সমগ্র জেলায় ওর প্রসিদ্ধি থাকায় গানও দু'-একটা গাইতে হয়। কিন্তু নিজের জমির চাষ সম্পর্কে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করার প্রবৃত্তিও তার হয় না। নির্বাচন শেষ হলেই সে পাহাড়ে যাবে, আবাদ করবে। এখন জমি, মাটির গন্ধ, অত্যুজ্জ্বল সূর্যালোকে, গরুর হাম্বা রব—সব কিছুই যেন তার কাছে জীবন্ত হয়ে উঠল, এ সবই যেন তার জীবনের অপরিহার্য অংশ।

উপত্যকার আড়-পারের কাছাকাছি পৌঁছতেই চারি দিক আঁধারে ছেয়ে গেল, সে জোর পায়ে এগিয়ে চলল। অন্ধকার হলেও বহু দিনের অভ্যাসে পথ চিনে যেতে তার কোন অসুবিধাই হল না। তার কল্পনাও তারই মত দ্রুত চলেছে। এই গভীর নিস্তব্ধতাপূর্ণ উপত্যকায় আসতেই তার কত কথাই মনে পড়ল। ছেলেবেলায় এক দিনের কথা তার মনে হল। একবার একটা হরিণের পিছু ধরে ছুটতে ছুটতে সে গিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। সেখানে একটি ছোট বাঘের সঙ্গে তার ভীষণ লড়াই হয়। এরও অনেক বছর পরের কথা, এক দিন একটি ছোট্ট বোচকা কাঁধে নিয়ে সে শ্বশুর-বাড়ী গিয়েছিল বিয়ে করতে। তখন তার বয়স ত্রিশ আর বৌয়ের পঁয়ত্রিশ, কিন্তু তা হলেও ওর মনে বৌয়ের সম্বন্ধে কি ধারণা হয়েছিল, আজ এত দিন পরে সে কথা তার মনেও পড়ে না।

কয় দিন পরে গাধায় চড়ে সে বৌকে নিয়ে বাড়ী ফিরল। আঁধার যতই হোক না, কোথায় ওর এক বছরের ছেলেটিকে আর চার বছরের মেয়েটিকে কবর দিয়েছিল স্পষ্ট করেই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। মাত্র এক বছর আগেও রাত্রিতে বৌকে নিয়ে সে উপত্যকায় বেড়াত। ওই বড় গাছটার কাছেই না ওঁৎ পেতে থেকে সৈন্যদলের অধ্যক্ষকে হত্যা করা হয়েছিল? তখন ও নিজেও ছিল সৈন্যদলের এক জন। যে দিন থেকে ও উপদেষ্টার পদে নির্বাচিত হয়েছে, সে দিন থেকে প্রায়ই ওর বাড়ী ফিরতে খুব দেরি হয়। অতীতের স্মৃতি তিক্ত-মধুর ও সুতীব্র, তাই ওর কাছে আজ তা মহা সান্ত্বনার বিষয়। মনটা বিশেষ ক্লান্ত, তার উপর নানা জটিল রাজনৈতিক সমস্যার গুরু দায়িত্বে ও বিভ্রান্ত; যখনই ও এই নির্জন অন্ধকার পথে চলাফেরা করে, তখন ছাড়া এ সব কথা ওর মনে আদৌ জাগে না।

পথের দু'পাশে উঁচু পাহাড়। যতই ও এগিয়ে চলল, ততই গাছ-পালার সংখ্যা বাড়তে লাগল। পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে-বেঁকে একটি ঝরণা কল-কল শব্দে বয়ে চলেছে। পাহাড়ে ঢাকা পড়ে আকাশ সংকীর্ণ হতে হতে একটি সরু ফালিতে রূপান্তরিত হয়েছে, দু'একটি সঙ্গিহীন তারা মিট-মিট করে তাকায়। মৃদু দখিণা হাওয়া তার পিঠে এসে লাগছে আর সে হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসছে নাম-না-জানা চেনা সুগন্ধ। দূরে গ্রাম্য কুকুরগুলি ঘেউ-ঘেউ করছে, দু'টি হলদে আলো অন্ধকারকে বিদীর্ণ করছে। তার গ্রামখানি বড় গরীব, হয়ত সারা জেলার মধ্যেই সব চেয়ে গরীব, তবু সে গ্রামখানিকে ভালবাসে। গ্রামপ্রান্তের শুকনো কাঠের স্তূপটি তার নজরে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গেই একটি গর্ব ও স্নেহের ভাব এসে তাকে

অভিভূত করল। তার গর্বের আরও কারণ এই যে, গ্রামের বিশটি পরিবারের আটাশটি লোককেই সে তার ঘনিষ্ঠ সাথী বলে গণ্য করে।

একটি মসৃণ প্রশস্ত গড়ানের কাছে এসে পৌঁছতেই তার গতিবেগ বেড়ে গেল। এ কথাটা ভেবে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না যে, এতক্ষণ তার গরুটির কথা সে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। তার মনে সাগ্রহ প্রশ্ন জাগল: নিরাপদে কি বাচ্চা হয়েছে, না, কোন বিপদ-আপদ ঘটেছে?

কল্পনায় কত বার সে অনাগত বাছুরটিকে দেখেছে—ঠিক তার মায়ের মত, তবে তার চেয়ে অনেকটা নধর। কিন্তু আজ তার ছায়াটুকুও আর মনে ছিল না। আরও জোর-পায়ে সে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল এবং ছুটে গোয়ালের দিকে গেল।

গোয়াল-ঘর থেকে ফিরে এসে দেখতে পেল, বৌ খাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে বিছানা পেতে রেখে চুল্লীর পাশে বসে আছে, তার যেন ঘুমোবার কোন মতলবই নেই। জিবটাকে সংযত করে সে ফ্যাল-ফ্যাল করে স্বামীর দিকে চেয়ে রইল। বৌয়ের মুখের প্রতিটি বলি-রেখায় এই আভাসই পাওয়া যাচ্ছে যে, একটা ঝড় আসন্ন! কাজেই এখন এর হাত থেকে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়—জামা-কাপড় পরে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া, আর পূর্ব অভিজ্ঞতায় এই শিক্ষাই সে পেয়েছে। তবে আজ সন্ধিই বড় দেরী হয়ে গেছে, আর গরুটা··· হঠাৎ বৌয়ের টাক-মাথাটির দিকে নজর পড়তেই তার মনটা বিস্বাদে ভরে গেল। ঝগড়ার কোন সুযোগই দেওয়া হবে না স্থির করে সে বৌয়ের দিকে না তাকিয়েই শুয়ে পড়ল। 'আঃ, কি গরম!' কথাটা বলার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, ঝগড়ার সুযোগ দিতে সে আদৌ চায় না। সে পরিশ্রান্ত, তাই আশা করেছিল বৌ তাকে শান্তিতে থাকতে দেবে।

এক ফোঁটা কি যেন মাটিতে পড়ল: বৌ কাঁদছে! একটির পর একটি—গাল বেয়ে অবোরে চোখের জল ঝরতে লাগল। মিটমিটে তেলের প্রদীপের আলোয় সে দেখতে পেল, বৌয়ের ধূলি-ধূসরিত বাদামি চুল, শীর্ণ একখানি হাতে চিবুক ন্যস্ত—দেখলেই মনে হয় যে, সেখানে মৃত্যুর পাণ্ডুরতা নেমে এসেছে। হয়ত নিজের দুর্ভাগ্য স্মরণ করেই নিঃশব্দে বিলাপ করছে।

'তোর বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। কি দুর্ভাগিনী তুই! যে লোক তোর পরনের কাপড় দেয় না, পেটে দেয় না খাবার, তোর ভাগ্যে কেবল তেমনি সোয়ামীই জুটবে। এই তোর ভাগ্যের লেখন······'

স্বামী কিছুই বলতে চাইল না, গরুটার কথা ছাড়া তার মনে তখন আর কোন চিন্তাই স্থান পায়নি। কাজেই সে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। সে ভাবছিল: এই বুড়ী ডাইনিকে দিয়ে আর্থিক কোন লাভই হচ্ছে না, গরুর বাচ্চা হয়, কিন্তু ও কি?—যে মুরগী ডিম পাড়ে না, ও তারই সামিল। হ্যাঁ, ওই বুড়ী তাই, সন্তান ধারণের যোগ্যতা ওর নেই। কথাটা সে সম্প্রতি ডেপুটি সেক্রেটারীর কাছ থেকে শিখেছে।

তারা দু'জনেই সাগ্রহে আর একটি সন্তান কামনা করে। স্বামীর কাজে সাহায্য করবার জন্যে সে পুত্র চায়, আর ভবিষ্যতে নির্ভর করতে পারে এমন এক জন স্ত্রীর কাম্য। কিন্তু তাদের উভয়ের সম্পর্কটা দিন-দিনই যেন ঘোরালো হয়ে উঠছে! স্ত্রীর অভিযোগ: স্বামী যথাসাধ্য রোজগার করছে না, সংসারের অভাব-অনটনের দিকে তার কোন দৃষ্টি নেই। অপর পক্ষে স্বামী স্ত্রীকে অশিক্ষিতা গেঁয়ো ভূত বলে তাচ্ছিল্য করে, পশুর লেজ যেমন সব সময়ই অপরিহার্য ভাবে তার পিছনে ঝুলে থাকে, তেমনি স্ত্রী স্বামীর পিছনে ঝুলে আছে। যবে থেকে স্বামী জেলার চাষ-বাসের উপদেষ্টার পদ পেয়েছে তবে থেকেই উভয়ের মধ্যে সদ্ভাবে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

আগে তারা দু'জনেই সমানে ঝগড়া করত, কিন্তু এখন দিন-দিনই স্বামী নীরব হয়ে যাচ্ছে। ফলে বৌ আরও মুষড়ে পড়ছে। স্বামী দেখে মনে হয় তার মেজাজ অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে, আর বৌর তিরিক্ষে। বৌ বুঝতে পেরেছে যে, স্বামী যেন দিন-দিনই তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, ও যেন আর স্বামীর নাগাল কোন দিনই পাবে না। বৌ চায় সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে, আর স্বামী? বৌ তা বুঝতে পারে না। তার মনে হয়, এ নিছক অত্যাচার! বৌ যখন বুঝতে পারল যে সে বুড়ী হয়ে গেছে, আর স্বামী তখন যুবক; আর তাই সে স্বামীকে খুশী করতে পারছে না, তার অনুরাগ উদ্রেক করতে পারছে না।

তার ফোঁপানি ক্রমে প্রবল হয়ে উঠল। বৌ আশা করল যে, ধাক্কা দিয়ে গালাগালি দিয়েই তাকে জাগিয়ে তুলতে পারবে। কিন্তু স্বামী প্রাণপণ চেষ্টায় মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে নিঃশব্দে বিছানায় শুয়ে রইল। তার পর তার অজ্ঞাতসারেই তার মনে একটা দুষ্ট চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল:

'আমার যে যৎসামান্য জায়গা-জমি আছে তা সবই ওকে দান করে দিব! শুধু রেঁধে দেওয়ার জন্যে আমার কাউকে চাই নে। আমি কুমারের জীবন যাপন করব। ওই রান্না-ঘর, এই কুঁড়ে-ঘর, এই বাসন-কোসন—সব কিছুই ওকে দান করব। সামান্য একটা বিছানা আর খান কয়েক জামা-কাপড় মাত্র সঙ্গে নেবো। ছেলেপিলে ত আর নেই। জমি-জায়গা আসবাব-পত্র ওর থাকবে। ও বরং একটা পুষ্যি নেবে, আর আমি···' তার সর্বাঙ্গ হালকা হয়ে গেল, পাশ ফিরল। তার পাশে যে মেনি বেড়ালটা ঘুমোচ্ছিল, সেটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল কিন্তু আবার পরক্ষণেই শুয়ে পড়ল। এই বিড়ালটাকে তারা তিন বছর ধরে পুষছে। ও নিজে আদৌ বিড়াল পছন্দ করে না কিন্তু এই ধোঁয়া রঙের বিড়ালটাকে কেন যেন ভালবেসে ফেলেছে। কাজ-কর্মের শেষে ঘরে ফিরে বিশ্রামের জন্যে যখন খাড-এর উপর বসে খাওয়ার প্রতীক্ষা করে তখন এই বিড়ালটা তার গা ঘেঁসে শুয়ে থাকে।

বৌ তখনও রেগে আছে। তার অবহেলায় স্বামীর মনে দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। স্বামীর ভয় হল, হয়ত সে কাচের বৈয়মটি ভেঙে ফেলেছে। এই বৈয়মে শিমের অঙ্কুর রাখা হত। স্বামী শিমের অঙ্কুর অত্যন্ত ভালবাসে। সে কথা কইতে চাইল না, পাশ ফিরে শুয়ে রইল। খাটের শেষ প্রান্তে যে দিকে পা থাকে, সেখানে একটা ঝুড়ির মধ্যে মুরগীর বাচ্চাগুলি ছিল, পা ছড়াতে গিয়ে ঝুড়িটা পায়ে ঠেকল। বাচ্চাগুলি ভয়ে সজোরে আর্ত-চীৎকার করে উঠল।

'তুমি জান যে আমি অসুস্থ, বেশী দিন আর বাঁচব না, অথচ তবু আমাকে এতটুকু সাহায্য পর্যন্ত দিচ্ছ না। আমি কত দিক সামলাই বল। ঘাস কাটব, গরুর হেপাজত করব। গরুটার বাচ্চা হবে, সেদিকে তোমার এতটুকুও খেয়াল নেই···' কথাগুলি বলতে বলতে বৌ উঠে দাঁড়াল। হয়ত তার দিকেই আসছে মনে করে সে চট্

করে থাও থেকে নেমে সোজা উঠোনে ছুটে গেল। তার মনের যা-কিছু উৎসাহ সবই ঠাণ্ডা মেরে গেল। আপন মনেই বলে উঠল: 'গরু-বাছুর সব কিছুই তোমার রইল।…'

পাহাড়ের ও-পাশে কুমড়োর ফালির মত চাঁদ উঠেছে, তারই জ্যোৎস্নায় উঠোনের একাংশ বেশ আলোকিত হয়েছে। উঠোনের মাঝখানে একটা কুকুর শুয়ে আছে, মুনিবকে দেখতে পেয়েই এক পাশে সরে গেল। আপনা থেকেই সে গোয়াল-ঘরের দিকে গেল; গোয়াল ভরতি ঘাস রয়েছে। গরুটা অন্ধকারে কাশছে আর জোরে জোরে নিশ্বাস টানছে। 'ধুত্তোর, বাছুর এখনও বেরিয়ে আসছে না কেন?' সঙ্গে সঙ্গে পরের দিনের সভার কথা মনে করে সে চিন্তিত হয়ে পড়ল।

গোয়াল থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে একটা ছায়া-মূর্তির সঙ্গে ধাক্কা লাগল, সঙ্গে সঙ্গে ছায়া-মূর্তি ফিস-ফিস করে বলে উঠলো, 'কি বাচ্চা হল?' ছায়া-মূর্তির এক হাতে একটা ঝুড়ি, আর এক হাতে চৌকাঠ ধরে ওর পথ রোধ করল।

'কে, হোআ কোয়াইং, তুমি?' কথাটা সে খুব আস্তেই বলল, তার বুকটা তখন ঢিব-ঢিব করে উঠেছে।

হোআ কোয়াইং তার পড়শী, যুবক-সমিতির সভাপতির স্ত্রী। স্বামীর বয়স আঠার আর স্ত্রীর তেইশ। কাজেই তাদের মিলন সুখের হয়নি। স্ত্রী তালাকের কথা বলেছে। সে নারী-সমিতির পরিচালক-মণ্ডলীর এক জন সদস্য, জেলার জনসভায় মনোনীত হয়েছে।

এবার নিয়ে ও তিন-চার বার হো-র সঙ্গে এই গোয়ালেই কথা বলবার চেষ্টা করেছে। এমন কি, দিনের বেলায়ও যখন তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছে তখন হো আর চোখ দু'টিতে হাসি ফুটে উঠেছে। হো কিন্তু হোআকে আদৌ পছন্দ করে না, বলতে গেলে ঘৃণাই করে; কিন্তু সময় সময় মনে হয়েছে যে হোআকে জোর করে ধরে এনে দলে পিষে ফেলে।

তার বব্‌-করা চুলে ও উদলা কাঁধে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। হোআ নিজের ঠোঁট দু'টি আস্তে আস্তে কামড়াতে কামড়াতে হো-র দিকে তাকিয়েছিল। হাবা ছেলের মত হো দাঁড়িয়ে রইল।

'তুমি…'

হো-র সর্বাঙ্গে একটা সাংঘাতিক বেড়ে উঠছে বলে সে অনুভব করল। এমন একটা কিছু সে করতে চাইল যা বীভৎস, দুঃসাহসিক ও নির্ভীক। কিন্তু সহসা আর একটা ঝোঁক এসে তাকে পেয়ে বসল। সে হোআকে বাধা দিল।

'না, হো-আ কোয়াইং, তা হয় না। শীগ্রই তুমি কাউন্সিলের সদস্য হবে। আমাদের উভয়ের উপরই গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত। আমাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা হবে।' হো তাকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে নিজে কুঁড়ের দিকে এগিয়ে গেল, পিছন ফিরে আর তাকাল না পর্যন্ত। বৌ তখন শুয়ে পড়েছে। হয়ত তখনও কাঁদছে।

'হেই!…' আর কিছু না বলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে-ও শুয়ে পড়ল। এই মাত্র যা ঘটেছে তা যেন আর এর সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই। ঝড়ের অব্যবহিত পরে যেমন স্থিরতা আসে, ঠিক তেমনি স্থির ভাবে কথাটা সে ভাবল। তার মনে হল, সে ঠিকই করেছে। বৌকে ডেকে বলল, 'এখন ঘুমোও, বাচ্চা এখনও হয়নি। হয়ত কাল সকালের দিকে হবে।'

স্বামীকে স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলতে দেখে সে কান্না থামাল, প্রদীপটাও নিবিয়ে দিল।

'এই বুড়ী কোন কাজের নয়, তবু ও থাকুক, রান্না করুক। তালাক দিলে লোকের মনে খারাপ ধারণার সৃষ্টি হবে।'

আঙিনায় মোরগগুলো ডাকছে। বৌ জামা-কাপড় ছেড়ে তার পাশে শুয়ে আছে। আবদারের সুরে জানতে চাইল, 'তুমি কি কাল ভোরেই বেরিয়ে যাচ্ছ? সভার কি আর শেষ নেই?…গাইটাকেও ত দেখা-শুনা দরকার?'

কিন্তু তখন আর গাইয়ের কথা ভাববার সময় ছিল না, ঘুমোনো দরকার। চোখ বুজে প্রাণপণে ঘুমোবার চেষ্টা করল, কিন্তু সভা আর জনতা ছাড়া আর কিছুই তার নজরে পড়ল না, তার মাথায় নানা রকম শ্লোগান গিস্‌-গিস্‌ করতে লাগল:

'যথাযোগ্য প্রচারের অভাব।' 'গ্রামটা অশিক্ষিত।' 'মেয়েদের মধ্যে কাজ এখনও শুরু হয়নি।'

যেই এ-সব মনে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে সে অস্থির হয়ে উঠল। গ্রামের উন্নতি কেমন করে হবে? কর্মীর অভাব এত বেশী! কিন্তু সে একা কি করতে পারে, কতটুকু পারে সে? সে নিজে, বলতে গেলে, কিছুই জানে না। কোন দিন স্কুলেও যায়নি, লিখতে-পড়তেও জানে না। একটি ছেলে পর্যন্ত নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আজ জেলার চাষীদের উপদেষ্টা, কাল তাকে সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হবে।

দেয়ালের কাগজগুলো ক্রমেই সাদা হয়ে আসছে। পাশের বাড়ীর কে যেন ঘুম থেকে উঠল। আর সেই মাত্র হো হবা-মিং তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েছে। তার জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধা স্ত্রী তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তার কোটরগত চোখের কোণে তখনও এক ফোঁটা অশ্রু রয়েছে। হো-র পাশে বেড়ালটা শুয়ে গড়-র গড়-র করছে। ঘরখানি বেশ উত্তপ্ত, শান্তিপূর্ণ।

ক্রমে দিনের আলো দেখা দিল। *

অনুবাদক: পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

* পারিবারিক শয্যা-স্থান। ঘরের এক পাশে উঁচু বেদীর উপর শয্যা রচিত হয়। বেদীর নীচে একটি চুল্লিতে সামান্য আগুন রাখা হয়, তাতে ঘরে শীত কম লাগে। চীন দেশে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের প্রত্যেকের বাড়ীতেই থাও থাকে। লোক-জন এলে এখানেই বসতে দেওয়া হয়। পাশেই একটি জানলা থাকে।

হো-আ কোয়াইং—নারী জাতির রক্ষাকর্ত্রী দেবী, প্রেমের দেবতা।

জলকে চল — চিত্তরঞ্জন দাস

প্রবেশ করিল। ট্রেণখানি পূর্ণরূপে থামিবার পূর্ব্বেই একখানি কামরা লক্ষ্য করিয়া পা বাড়াইয়া দিয়া বীণা কহিল, চলে এসো আমার সঙ্গে।

অগ্রে কুলী ও পশ্চাতে রঞ্জন চলিতে আরম্ভ করিল। কিছু দূর আসিয়া যাত্রীর ভীড়ের মধ্যে রঞ্জন সহসা বীণাকে হারাইয়া ফেলিল। সন্দিগ্ধ ভাবে কয়েক পদ আগে ও পিছে হাঁটিয়া কোন দিকেই যেন সে বীণার কোন চিহ্ন-ই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। কি আশ্চর্য্য, বীণুটা গেল কোথায়?

এই সময়ে ঠিক পাশের একটি জানালার মধ্য হইতে মাথা বাহির করিয়া বীণা চীৎকার করিয়া উঠিল, মেজদা,—ও মেজদা —এই যে— ঢুকে পড় শীগ্‌গীর!

তাই ত! চক্ষের সম্মুখে বীণুটা কখন যে গাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, রঞ্জনের তাহা নজরেই পড়ে নাই।

রঞ্জন গাড়ীতে ঢুকিল। জানালা দিয়া কুলী ততক্ষণে বড় স্যুটকেশ ও বেডিংটা ভিতরে চালান দিয়াছে। সেগুলি ধরিয়া নামাইতে নামাইতে রঞ্জন কহিল, এগুলো রাখছি আমি, তুই আমার পকেট থেকে ব্যগটা বের করে ওকে দামটা দিয়ে দে।

স্যুটকেশখানা উপরে রাখিয়া বেডিংটা সে দুই বেঞ্চের মধ্যের ফাঁকে নামাইয়াছে মাত্র, এমন সময়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠের ধমকে সে চমকাইয়া উঠিল, ওটা ওখানে রাখছেন কেন? জলের কুঁজো আছে দেখতে পাচ্ছেন না?

রাগ ও অনুরাগ

হেমেন্দ্র মল্লিক

অবশেষে ট্রেণের চিহ্ন দেখা গেল।

হাত-ঘড়িতে সময় দেখিয়া রঞ্জন কহিল, তোরই জিৎ হয়ে গেল রে বীণু। সাড়ে এগারোটার মধ্যেই গাড়ীটা এসে গেছে। ঠিক বত্রিশ মিনিট লেট্!

সপ্তদশী বীণা চিন্তিত ভাবে কহিল, সে তো হল, তুমি এবার স্যুটকেসটা নিয়ে ঠিক তৈরী থেকো মেজদা। দরজা খোলা মাত্র ঢুকে পড়বে আমার পেছন পেছন। ভিড় দেখে যেন ভড়কে যেরো না। আজকাল সব ট্রেণেই ভীড় থাকে।

ট্রেণের শব্দ ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। পিছন ফিরিয়া বীণা উচ্চ কণ্ঠে কহিল, এই কুলী, দেখ্‌তা নেই, গাড়ী আ গিয়া? বেডিং লেকে ইধার আও!

বীণার নেতৃত্বে রঞ্জন ও কুলী দুই জনেই আসানসোল ষ্টেশনের গভীর রাত্রের স্বল্পালোকিত প্ল্যাটফর্মের প্রান্তভাগে গিয়া দাঁড়াইল। স্যুটকেসটা হাত-বদল করিয়া রঞ্জন কহিল, আমিই উঠে পড়ব আগে, কি বলিস্ রে বীণু?

ব্যস্ত ভাবে বীণা কহিল, না না, তুমি বাপু আমার পরেই উঠো। তোমায় আগে রাখলে গাড়ীতে আজ ওঠাই হবে না।

ক্রুদ্ধ দানবের মত গর্জ্জন করিতে করিতে দীপ্তি এক্সপ্রেস্ ষ্টেশনে

সন্তর্পণে চোখ তুলিয়া রঞ্জন বিস্মিত হইল। বেঞ্চের শেষ প্রান্তে গরম আলোয়ান মুড়ি দেওয়া ও সুপ্রতিষ্ঠিতরূপে আসীনা তরুণী তরুণীই যে এই ভাবে তাহাকে ধমক দিল ইহা বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু, তাহার এ ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়া পরক্ষণেই অধিকতর রূঢ় স্বরে তরুণীটি কহিলেন, দেখছেন মোটে জায়গা নেই, তবু, এ গাড়ীতে না উঠলেই চলছিল না?

শান্ত স্বরে রঞ্জন কহিল, অন্ধকারে গাড়ীর বাইরে থেকে ঠিক ঠাহর করা যায় না। অপরাধ নেবেন না, আপনাদের কোন অসুবিধা আমরা করব না। ব্যবস্থা একটা আপনিই হয়ে যাবে।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তরুণীটি কহিলেন, এমনি আর কি করে হবে ব্যবস্থা? ভর্ত্তি বেঞ্চ তো আর খালি হয়ে যাবে না?

কামরাটি ক্ষুদ্র। এদিকের বেঞ্চে একটি প্রৌঢ় ও তিনটি আধবয়সী মহিলা মুড়িশুড়ি দিয়া বসিয়াছিলেন, অপর দিকে তরুণীটি ও তাঁহার পাশে দু'টি বালক। তাহারা বেশ আরামেই নিদ্রা যাইতেছিল। পরিপূর্ণরূপে জাগ্রত দেখা গেল কেবল তরুণীটিকেই, সম্ভবতঃ পাহারা দিবার জন্যই।

জানালার ঠিক ধারের বর্ষীয়সী মহিলাটি সঙ্কুচিত ভাবে সরিয়া বসিয়া বীণাকে ডাকিয়া কহিলেন, এই যে মা, বসো এইখেনে, শীতের সময়ে হয়ে যাবে'খন।

বীণা বসিল। রঞ্জন দাঁড়াইয়াই রহিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে ট্রেণ চলিবার পর সম্মুখের বেঞ্চে নিদ্রিত বালক দু'টির দিকে আঙুল দেখাইয়া বীণা কহিল, ওদের একটু সোজা হয়ে বসতে বলো না মেজদা, তোমারও বসবার জায়গা হয়ে যাবে।

কিন্তু রঞ্জনের পক্ষে এ কাজ তত সহজ নয়, বীণা নিজেও তাহা জানিত। সে নিজেই ছেলে দু'টিকে নাড়া দিয়া তুলিতে যাইবে এমন সময় তরুণীটি পুনরায় তীক্ষ্ণ স্বরে কহিয়া উঠিলেন, এখানে জায়গা কই যে ওদের তুলছেন? উঠেছেন যখন, তখনই জানি যে বসবারও চেষ্টা করবেন। একটু দেখে-শুনে উঠলেই কাবো এত কষ্ট পেতে হয় না।

পাঁচ জনের বেঞ্চে দু'টি বালক ও একটি মহিলা বসিলে যে আর এক জনেরও জায়গা হয় না, তরুণীটির এ-উক্তি যে কত দূর স্বার্থদুষ্ট তাহা বোধ হয় তাঁহার মুহূর্তের জন্যও লক্ষ্য হয় না।

রাগত ভাবে বীণাও এইবার কি যেন বলিতে যাইতেছিল কিন্তু রঞ্জন শান্ত স্বরে কহিল, থাক রে বীণু।

বড় বেডিং-টার উপরে বসিয়া পড়িয়া রঞ্জন গায়ের তুষখানা ভালো করিয়া জড়াইয়া লইল।

২

ঘণ্টা দুই পরে।

বর্ষীয়সী মহিলাটির পাশে পশমের স্কার্ফ মুড়ি দিয়া বসিয়া বসিয়া বীণা ঢুলিতেছে। বেঞ্চের প্রান্তদেশে সেই তরুণীটিও চোখ বন্ধ করিয়াছেন। মনে হয়, ক্ষুদ্র কম্পার্টমেন্টের মধ্যে একা রঞ্জন ছাড়া সকলেই নিদ্রার বিভিন্ন স্তরে অল্প-বিস্তর আরাম উপভোগ করিতেছে।

একখানি পুস্তকে মনোনিবেশ করিয়া রঞ্জন সম্ভবতঃ অনিদ্রার কষ্টটাকে এড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল।

এই সময়ে একটি ষ্টেশনে প্রবেশ করিয়া ট্রেণ থামিল। ষ্টেশনের নানা প্রকার কোলাহলে রঞ্জনের নিকটবর্ত্তী বালকটি ধড়মড় করিয়া জাগিয়া বসিল। তার পর পায়ের আলোয়ানটি পাশে রাখিয়া বেঞ্চের নীচে পা দু'টি নামাইয়াছে মাত্র, এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত তরুণীটি মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে কহিলেন, কোথায় যাবি রে নন্তু, বাথরুমে?

বালকটি মাথা নাড়িতেই তিনি পুনরায় কহিলেন, এখন যেতে হবে না। গাড়ীটা ছাড়তে দাও, তখন যেও, কে কোথায় উঠে পড়ে জায়গাটা দখল করে বসবে, তখন খুব সুখ হবে!

বীণা চোখ খুলিয়া একবার তাঁহার ও একবার রঞ্জনের দিকে চাহিল। তাহার দৃষ্টিতে ক্রোধ ও ঘৃণার আতিশয্য দেখিয়া রঞ্জন ব্যস্ত ভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, তোর কোন কষ্ট হচ্ছে না তো রে বীণু? আমি তো দিব্যি আরামসে বসে আছি।

ট্রেণ ছাড়িল। বালকটি পুনরায় জুতা পায়ে দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তরুণীটি কহিলেন, আলোয়ানটা বেশ করে ছড়িয়ে রেখে যাও তোমার জায়গায়, নন্তু!

রঞ্জন মনে মনেই হাসিল।

ট্রেণের মধ্যে এই প্রকার স্বার্থপর হীন আচরণ সে বহু বার লক্ষ্য করিয়াছে। কোন মতে আগে উঠিয়া পড়িতে পারিলেই ইচ্ছামত বসিবারও জায়গা দখল করিবার অধিকার আছে—এই ধারণাটা অধিকাংশ যাত্রীর মনেই বদ্ধমূল। রঞ্জন বুঝিতে পারে না যে, সুশিক্ষিত ও ভদ্র-শ্রেণীর মধ্যেও অনেকে বিনা সঙ্কোচে ট্রেণে ভ্রমণ করিবার সময়ে এইরূপ জঘন্য আচরণ করেন কি করিয়া। আজ এই সদ্বংশীয়া ও সুশ্রী তরুণীটির ব্যবহারেও সে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইল না। সন্তর্পণে একবার বীণুর দিকে চাহিয়া লইল মাত্র।

রঞ্জন শান্ত-প্রকৃতির মানুষ, কোন প্রকার বিসম্বাদ বা শান্তিভঙ্গ তাহার স্বভাবে সহ্য হয় না। বীণুর উপরে যথেষ্ট নজর রাখিতে না পারিলে সামান্য একটু বসিবার জায়গার প্রশ্নকে উপলক্ষ করিয়া সে যে রীতিমত অশান্তি করিতে পারে—এ সন্দেহ তাহার প্রবল ভাবে ছিল।

নন্তু ফিরিয়া আসিল। জুতা খুলিয়া বেঞ্চে পুনরায় বসিবার সময়ে একবার রঞ্জনের দিকে চাহিয়া সে বোধ হয় একটু সরিয়া বসিতেছিল, কিন্তু অভিভাবিকা তরুণীটি মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে কহিলেন, যেমন ছিলে তেমনি ঠিক হয়ে বোসো নন্তু, তোমায় আর দালালি করতে হবে না!

বাধ্য হইয়া নন্তু আলোয়ান জড়াইয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ আধ-শোওয়া ভঙ্গিতে দেহ এলাইয়া দিল।

৩

আরও ঘণ্টা তিনেক পরে।

তিমিরাচ্ছন্ন শীতের রাত্রির অবসানপ্রায়। পূর্ব্বাকাশের অস্পষ্ট আলোকাভাষে আর একটি বিচিত্র সম্ভাবনাপূর্ণ দিবসের সূচনা বুঝিতে পারা যাইতেছে!

রঞ্জন তাহার পুস্তকখানি প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে। বীণাও কিছুক্ষণ আগে আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া মাথার বিশ্রস্ত কেশগুচ্ছকে গুছাইয়া বাধ্য-বশীভূত করিয়া লইয়াছে। হাতের আড়ালে সুদীর্ঘ একটি হাই তুলিয়া সে কহিল, গোমোয় এখনও পৌঁছুইনি, না মেজদা?

গোমো কি রে, কোডার্মাও ছাড়িয়ে এসেছি। এবারই তো গয়া!

রীতিমত চমকাইয়া বীণা উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর ব্যস্ত ভাবে নিজের পোষাকের গোছগাছ করিতে করিতে কহিল, সে কি—এইবারই গয়া? বলোনি কেন এতক্ষণ?

বললে করতিস্ কি? আগেই নেমে পড়তিস্ না কি?

সহযাত্রী পরিবারটির বহু পূর্ব্বে বিছানা-পত্র বাঁধা-ছাঁদা হইয়া গিয়াছে। মনে হয়, তাহারাও গয়াতেই নামিবেন। সেই দিকে চাহিয়া বীণা মৃদু হাসিয়া বলিল, দেখছো না, ওঁদের কখন সব গোছানো হয়ে গেছে?

কোন উত্তর না দিয়া রঞ্জন একবার বেঞ্চের উপরে ও নীচে সারি সারি সাজানো লগেজের দিকে চাহিল মাত্র।

তরুণীটি বীণার দিকে চাহিয়া কহিলেন, এতে আর হাসবার কি আছে? বেশী জিনিষ থাকলেই আগে থেকে ঠিক করে নিতে হয়।

বীণাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া ফেলিল, তাতে তো আপনাকে কেউ বাধা দেয়নি, আপনি রাগ করছেন কেন?

রঞ্জন শঙ্কিত ভাবে নিম্নস্বরে কহিল, কি হচ্ছে বীণু! এইটুকু আর পাচ্ছিস্ না চুপ করে থাকতে?

রাগত ভাবে বীণা চুপ করিয়া রহিল। স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল যে, অপরিচিতা তরুণীটির সঙ্গে একপ্রস্থ কোঁদল করিবার জন্য

তাহার সমস্ত অন্তরটি লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে! অন্যায়ের প্রতিবাদ না করিয়া বীণা থাকিতে পারে না কোন কালেই। ভাই-বোনদের মধ্যে সপ্তদশী বীণাই সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী ও নির্ভীক। বোধ হয়, সেই জন্যই শান্ত-প্রকৃতি ও লাজুক স্বভাবের এই মেজদা বেচারীর জন্য তাহার চিন্তা ও দুর্ভাবনার অন্ত নাই। ঘরে ও বাহিরে মেজদাকে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন ও অসম্মানের হাত হইতে বাঁচাইয়া চলিবার জন্য সে যেন সর্ব্বদাই সজাগ ও সচেষ্ট!

দীল্লি এক্সপ্রেস গয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিল।

ট্রেণ সম্পূর্ণরূপে থামিবার পূর্ব্বেই দশ-বারো জন যুবক তাহাদের কম্পার্টমেন্টের সম্মুখে আসিয়া ভীড় করিল। দরজা খুলিয়া প্ল্যাটফর্মে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রবর্ত্তী ভদ্রলোকটি সবিনয়ে কহিলেন, আপনিই কি রঞ্জন বসু?

বিস্মিত স্বরে রঞ্জন কহিল আজ্ঞে হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

যুবকের দল রঞ্জনকে এক প্রকার ঘিরিয়া ফেলিল। পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটি কহিলেন, গয়া সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ থেকে আহ্বান জানাতে এসেছি আমরা! ইনি বোধ হয় কুমারী বীণা বসু?

ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া বীণা মাথা নাড়িল।

এই সময়ে কম্পার্টমেন্টের দরজার দিকে চাহিয়া ভদ্রলোকটি কহিয়া উঠিলেন, আরে, তোরাও যে এই গাড়ীতে দেখছি? আয়, আয়— চিঠি দিস্‌নি কেন? এই কুলী—

প্ল্যাটফর্মে জিনিষ-পত্র নামানো হইলে ভদ্রলোকটি পুনরায় নিকটে আসিয়া সহাস্যে কহিলেন, আমার নাম শ্রীপরেশচন্দ্র মিত্র, সম্মেলনের সেক্রেটারী। আমার বোন ইলার সঙ্গে বোধ হয় পথেই আলাপ হয়ে গেছে? এক কম্পার্টমেন্টেই আপনারা এলেন যখন? ইলা, ইনিই সাহিত্যিক রঞ্জন বসু!

ইলা মিত্র এতখানির জন্য প্রস্তুত ছিল না! বেচারা কর্ণমূল পর্য্যন্ত সমস্ত মুখখানি প্রভাতী সূর্য্যের মত টকটকে রাঙা করিয়া কোন মতে একটি নমস্কার করিল মাত্র!

রঞ্জন হাসিয়া কহিল, হ্যাঁ, আলাপ একটু হয়েছে, তবে, পরিচয়টা হয়নি, কি বলেন মিস্ মিত্র?

বীণা সকৌতুকে কহিল, তুমি তো ঠিক উল্‌টোটাই বললে মেজদা! পরিচয়টাই হয়েছে, আলাপই হয়নি?

৪

অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটা।

সম্মেলনের সেক্রেটারী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বেঙ্গলী হোটেলে রঞ্জনের জানালা-দরজা বন্ধ করা প্রায়ান্ধকার কক্ষে প্রবেশ করিয়া বীণা ডাকিল, মেজদা—ও মেজদা—

সমস্ত রাত্রি ট্রেণে বসিয়া থাকিবার ক্ষতিপূরণ করিতেছিল রঞ্জন বসু। বেলা এগারোটার পর হইতেই সে ঘুমাইতেছে। বীণার চেঁচামেচিতে চোখ মেলিয়া সে কহিল, কি রে বীণু, অত হল্লা করছিস্ কেন?

নিকটে আসিয়া নিম্নস্বরে বীণা কহিল, তোমাকে একটু উঠে বসতে হবে মেজদা, অতিথি এসেছেন!

অপেক্ষাকৃত সজাগ হইয়া রঞ্জন কহিল, অতিথি কি রে? কে এসেছেন বল তো?

ইলাদি আর বৌদি!

কি বললি?

হাসিয়া ফেলিয়া বীণা কহিল, মিস্ ইলা মিত্র, মানে গত রাত্রে যে তোমাকে ট্রেণে বসতে পর্য্যন্ত দেয়নি, আর, তার বৌদিদি। সম্ভবতঃ পরেশ বাবুর স্ত্রী! ওঁরা এসেছেন মিনিট পনেরো-কুড়ি হবে। এতক্ষণ আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন।

সভয়ে রঞ্জন কহিল, খুব কোঁদল করে নিয়েছিস্ তো? সুদে-আসলে প্রতিশোধ—

কেন করব না? কিন্তু জানো মেজদা, ভারী চমৎকার লোক ইলাদি। যে ক'রে ক্ষমা চাইলেন আমার কাছে তার পরে ঝগড়া করতে কি আর পারা যায়? এইখানেই ডেকে আনি, কি বলো?

দাঁড়া, একটা জানালা আগে তুলে দে, একটু আলো আসুক ঘরে।

মিনিট দুই পরে ইলা মিত্র একাই কক্ষে প্রবেশ করিল। রঞ্জন তাহার বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়া উঠিয়া বসিয়াছে। ইলার নমস্কারের উত্তরে সহাস্যে কহিল, আসুন—আসুন মিস্ মিত্র, এখানে বসবার অনেক জায়গা আছে।

অপরাধীর মত নিকটে আসিয়া ইলা কহিল, মৌখিক ক্ষমা চেয়ে বা দুঃখ প্রকাশ করে আমার অপরাধের মীমাংসা হবে না, রঞ্জন বাবু! একটা কিছু শাস্তি যদি আপনি দিতে পারেন, খুসী হয়ে তা গ্রহণ করতে আমি রাজী আছি।

শাস্তি? সে আবার কি কথা? এমনি ক্ষমা করলে সুখী হবেন না আপনি?

না, তেমন অপরাধ আমার নয়। শাস্তিই আমি চাই আপনার কাছে—

মুগ্ধ ভাবে ইলার মুখের দিকে চাহিয়া রঞ্জন কহিল, সে আপনি বলতে পারেন, কিন্তু আমারও তাতে কিছু অপরাধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। জানেন তো, শাস্তির মধ্যে প্রায়ই প্রতিশোধের প্রবৃত্তি গা-ঢাকা দিয়ে থাকে?

তা হোক। সোজাসুজি ক্ষমা হয় তো আপনি করেই বসে আছেন, কিন্তু তাতে আমার তৃপ্তি হবে না। আমার অভদ্রতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন মনে হবে।

কি শাস্তি দিতে পারি, বলুন তো?

এইবার ইলার মুখে একটা ক্ষীণ হাস্যরেখা দেখা দিল। সে মুখ তুলিয়া কহিল, আজ সম্মেলনের পরে রাত্রে আমাদের ওখানে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ জানাতে আসছেন বৌদিদি। সেখানে, সকলের সামনে কালকের ব্যাপারটা আপনাকে বলতে হবে। প্রকাশ্য ভাবে আমার অপরাধের জন্য আমি অপমান ভোগ করতে চাই!

আচ্ছা বেশ! কৃচ্ছ্র সাধন না হয় হল। তার পর আমার সঙ্গে আর বাক্যালাপ করবেন না তো?

তা করব না কেন? ট্রেণের ঘটনাটা ঘটেনি বলেই ধরে নেব তার পর। এইখানেই আপনার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছে আমার— এই ভাবেই কথা বলব আপনার সঙ্গে।

রঞ্জন ভীত ভাবে হাসিয়া কহিল, সে আমার দ্বারা হবে না ইলা দেবি! আপনি ধরে নিতে পারেন, কাল আপনাদের সঙ্গে এক গাড়ীতে আমরা আসিনি! এইখানেই পরিচয় হয়েছে আমাদের।

গম্ভীর মুখে ইলা কহিল, মনে হচ্ছে, আমাকে মুক্ত করতে আপনি চান না!

কেন চাইবো না? আমার দিক্ থেকে তো আপনি মুক্তই! আচ্ছা মিস মিত্র, না-হয় থাকুনই না আমার কাছে একটু অমুক্ত হয়ে! বীণুকে দেখেছেন তো? আপনার মত ওকেও আমি ভয় করি মনে মনে। ভয়ের মানুষদের যতটা পারা যায় বেঁধে রাখাই নিরাপদ! আপনি জানেন না, আমি বড্ড ভীতু মানুষ!

এই সময়ে অগ্রে বীণা ও পিছনে ইলা মিত্রের বৌদিদি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সহাস্যে বীণা কহিল, কি হল ইলাদি, মেজদার ক্ষমা পেয়েছেন তো?

বৌদিদি রঞ্জনকে একটি ক্ষুদ্র প্রতি-নমস্কার করিয়া কহিলেন, সব শুনেছি আমি, রঞ্জন বাবু! ওকে ক্ষমা না করাই ভালো। ক্ষমা করলেই আরও বৃদ্ধি হবে ওর। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল না, ক্ষমা কিসের বলুন তো?

৫

গয়া সাহিত্য সম্মেলনের কর্তৃপক্ষেরা রঞ্জন বসুর মত উদীয়মান ও প্রতিভাশালী সাহিত্যিককে প্রধান অতিথিরূপে নিমন্ত্রণ করার মধ্যে আরও একটি অভিসন্ধি পোষণ করিয়াছিলেন, ইহা জানা গেল প্রথম অধিবেশনের পরই। গয়ার শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের সম্মিলিত ইচ্ছা যে, তাঁহারা একটি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকার প্রবর্তন করেন এবং রঞ্জন বসুই তাহার সম্পাদক হউন।

বাংলা দেশের লেখক-মহলে পুরাতন না হইলেও বিগত তিন-চার বৎসরের মধ্যেই সাময়িক পত্রিকার ভিতর দিয়া রঞ্জন বসু যে শক্তি ও কুশলতার পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে সম্পাদক হিসাবে তাহার যোগ্যতাকে অস্বীকার করা যায় না। গয়ার শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই তাহা অবগত ছিলেন।

রাত্রে নিমন্ত্রণ-গৃহে পরেশ বাবু স্পষ্টই বলিলেন, আপনি থেকেই যান রঞ্জন বাবু! টাকার দিক থেকে কোন অসুবিধা আপনাকে পেতে হবে না। পত্রিকার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও কেউ আপনার ওপর কোন কথা বলবেন না। কলকাতায় যদি অপর কোন এনগেজমেণ্ট আপনার না থাকে তাহলে আমাদের অনুরোধ, আপনি এইখানেই থেকে যান!

পরদিন প্রাতে পরেশ বাবু আসিলেন ইলা মিত্রকে সঙ্গে লইয়া এবং বীণা ও রঞ্জনকে নিজেদের গাড়ীতে গয়ার বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান দেখাইয়া ও বেড়াইয়া আনিলেন।

দেখা গেল, রঞ্জনের ধারণাই ঠিক। রুচি ও কৃষ্টির দিক হইতে ইলা মিত্র কাহারও অপেক্ষাই কম নয়। ট্রেনের বিসদৃশ ঘটনাটা যেন তাহার চরিত্রের এমন একটা দিক—যে দিকটা অত্যন্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ভাবেই তাহারা দেখিয়া ফেলিয়াছে। অপরিচিত পুরুষকে তরুণী মাত্রেই প্রথমে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চক্ষে দেখে। যেন সতর্ক ও সাবধান না থাকিলে তাহারা লুণ্ঠতরাজ করিতে সদাই প্রস্তুত! মধ্য রাত্রে ট্রেনের উক্ত আরামের মধ্যে অবাঞ্ছিত উপদ্রব ও ব্যাঘাতের মূর্ত্তি ধরিয়া সুদর্শন রঞ্জনের প্রবেশ হয়তো এই কারণেই ইলাকে সতর্ক ও আত্মরক্ষণোদ্যতা করিয়া তুলিয়াছিল এবং সেই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যেই বেচারা তাহার মানসিক স্থৈর্য্য ও সংযম হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

বীণার সঙ্গে ইলা মিত্রের বন্ধুত্ব যেন বিধি-নির্দ্ধারিত ভাবেই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। দুই জনের চরিত্রের কোথায় একটা অলক্ষ্য সাদৃশ্য থাকায় পরস্পরের পরিচয় যেন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়া গেল।

সন্ধ্যায় সাহিত্য অধিবেশনের শেষে সে পরেশ বাবু ও ইলাকে কহিল, কাল সকালে আসবেন পরেশ বাবু আমাদের হোটেলে। বৌদিকেও আনবেন, চা-এর নিমন্ত্রণ আপনাদের।

রাত্রে রঞ্জনের কক্ষে ঢুকিয়া বীণা কহিল, ভারী মুস্কিলে পড়ে গেছ, না মেজদা? সম্পাদক হবার ইচ্ছা, তোমার চিরকালের, অথচ একা এই বিদেশে থাকবেই বা তুমি কেমন করে?

চিন্তিত মুখে রঞ্জন কহিল, এখানে একটা কলেজ থাকলে তোকে থাকতে বলতাম। কিন্তু, তা যখন নেই—না, একা আমার চাকরী করা চলবে না এখানে! যা, শুতে যা বীণু, রাত হয়েছে—

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বীণা বলিল, তুমি একটা বিয়ে করো না মেজদা! না, হাসি না, তাহলে কিন্তু সব গোল চুকে যায়। দিব্যি সম্পাদক সেজে বসতে পারো এখানে!

যা যা, ফাজলামি করতে হবে না, শুগে যা।

ফাজলামি নয় মেজদা, বলছি ভেবে দেখো একটু। দেখা শোনা করার লোকের অভাব তো নেইকো? মা তো আর বাড়ী ছেড়ে আসতে পারবেন না? আমারও তো কলেজ? একটা বৌ থাকলে সব গণ্ডগোল চুকে যায় না?

সহাস্যে রঞ্জন কহিল, এক কাজ কর। মাকে লিখে দে, চট্ করে একটা বৌ কলকাতা থেকে ডেকে পাঠিয়ে দিক্। ব্যাস্—সব ঠিক হয়ে যাবে। যা যা, শুতে যা—

যাচ্ছি—যাচ্ছি! আচ্ছা মেজদা, ইলাদিকে তোমার পছন্দ হয়? অমন সুশ্রী, অমন তেজস্বী মেয়ে ইলাদি!

ক্ষেপেছিস্ তুই বীণু! সম্পাদকেরও একটা সীমা থাকা উচিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার! ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের মেয়ে ইলা মিত্র সেটা মনে রাখিস্।

সে আমি জানি! ইলাদিকে পছন্দ হয় কি না, বলো না?

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রঞ্জন কহিল, পছন্দ তো লাট সাহেবের মেয়েকেও হয়—কিন্তু—কি হাসছিস যে?

বীণা এইবার আরও জোরে হাসিতে লাগিল।

কতকটা অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে রঞ্জন কহিল, বেকায় ফোকোড় হয়ে পড়ছিস তুই বীণু! শুতে যাবি কি না বল?

হাসিমুখে বীণা কহিল, যাচ্ছি শুতে! ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের মেয়ে ইলা মিত্র তোমাকে মাথায় করে রাখবে, তুমি দেখে নিও!

রাত্রে নিজের বিছানায় শুইয়া বহুক্ষণ বীণা ঘুমাইতে পারিল না। তিনটি দাদার মধ্যে বড় দাদাকে বাল্যকাল হইতেই ভয় ও সমীহ করিয়া আসিয়াছে। ছোড়দাকে মাত্র কয়েক বৎসরের বলিয়া কতকটা সমান সমানই জ্ঞান করে। কিন্তু কোমল স্বভাবের এই মেজদাই তাহার ভক্তি ও ভালবাসার দাদা? এই মেজদাকেই সে বরাবর টানিয়া ও রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। রঞ্জনের নারীসুলভ কোমলতা ও ভদ্রতা যেমন এক দিকে তাহাকে অনেকের অবজ্ঞা ও হাসির বস্তু করিয়া তুলিয়াছিল, অপর দিকে তেমনি প্রখর

ব্যক্তিত্বশালিনী ও অনুগত ভগিনী বীণার আশ্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণের বস্তু করিয়া রাখিয়াছিল। সাংসারিক বহু বিষয়েই রঞ্জনের নিস্পৃহ ও অনাসক্ত ভাব বীণাকেই পীড়া দিত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী! তাহার পকেট হইতে টাকা-পয়সা চুরি যায়, ছেঁড়া ও ফাঁশা জামা পরিয়াই দিব্য প্রফুল্ল ভাবে সে সর্ব্বত্র ঘুরা-ফিরা করে—বাল্যকাল হইতেই সে ইহা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। যে দিন একসঙ্গে তাহার হাত-ঘড়ি ও সোনার কলম চুরি গেল, সেই দিনই সে দৃঢ় ভাবে বুঝিল যে, মেজদা অনেক গুণসম্পন্ন ও জনপ্রিয় সাহিত্যিক হইলেও একা বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি লইয়া সে জন্মগ্রহণ করে নাই! অথচ, রঞ্জনকে এই সকল ক্ষতি ও অসম্মানে কোন দিনই বিন্দুমাত্র উত্তেজিত বা দুঃখিত দেখা যাইত না! চাওয়া ও পাওয়ার সংকীর্ণ গণ্ডির বাহিরে অবস্থিত এই সন্ন্যাসী দাদাটি যে হাসিমুখেই সব কিছু ভোগ করিবার মহান্ দীক্ষায় দীক্ষিত, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কনিষ্ঠা বীণা তাহার নারীসুলভ স্নেহ ও মমতা দিয়া সর্ব্বদাই চেষ্টা করিত—মেজদার সমস্ত অসুবিধা ও ক্ষতিকে যথাসাধ্য সামলাইয়া চলিতে।

৬

প্রাতঃকালে পরেশ বাবু, ইলা মিত্র ও বৌদিদি যথাসময়েই আসিলেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে।

চা-এর পালা শেষ করিয়া পরেশ বাবু ও মেজদার জন্য দ্বিতীয় পেয়ালার আদেশ দিয়া বীণা নিজের চেয়ারে বসিতে বসিতে বলিল, ইচ্ছা থাকলেও আপনাদের সম্পাদক হওয়া মেজদার চলবে না, বৌদিদি!

ইচ্ছা থাকলেও না? কেন বলো তো বীণা?

মেজদা হচ্ছেন রাজপুত্র। রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখা-শুনার কেউ না থাকলে মেজদা স্বর্গে গেলেও বাঁচবে না। পড়া-শুনা ছেড়ে আমি তো আর থাকতে পারবো না মেজদার কাছে?

পরেশ বাবু হাসিয়া উঠিলেন।

সচকিত ভাবে বীণা লক্ষ্য করিল, সে হাসিতে বৌদিদি আংশিক ভাবে যোগ দিলেও ইলাদি গম্ভীর ভাবে একবার মেজদার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল মাত্র।

বীণা স্নিগ্ধ স্বরে কহিল, হাসচেন, পরেশদা! মেজদা সত্যিকারের ভাবুক, সত্যিকারের আদর্শবাদী সাহিত্যিক। হোটেলের খাওয়া মেজদার সহ্য হবে না, অথচ কোন আপত্তি না করেই মেজদা তাই খেয়ে যাবে। মেজদার অনেক জামা-কাপড়, কিন্তু সময় মত হাতের কাছে না পেয়ে ছেঁড়া ও ময়লা জামা পরেই দিব্যি হাসিমুখে দিন কাটিয়ে দেবে। মেজদা একটু ভিন্ন স্তরের মানুষ, ওকে ডেকে খেতে বসাতে হয়, পরিষ্কার জামা-কাপড় হাতের কাছে এগিয়ে দিতে হয়, অপরিচিত ও অবুঝ লোকের টিকা টিপ্পনীর হাত থেকে বাঁচিয়ে চলতে হয়—

আপত্তির সুরে রঞ্জন কহিল, কি আরম্ভ করলি বীণু, আমার চাকরীটা গোড়াতেই ভেস্তে দিচ্ছিস্ যে?

পরেশ বাবু কহিলেন, ভয় করবেন না রঞ্জন বাবু। আপনিই আমাদের পত্রিকার একমাত্র সম্পাদক। কি করলে আপনাকে এখানে রাখতে পারা যায়, বলুন?

ইলার দিকে আড় চোখে চাহিয়া বীণা কহিল, ঝি-চাকরে হবে না, মেজদার একটা বিয়ে দিতে পারেন, পরেশদা?

রঞ্জন গম্ভীর মুখে কহিল, বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস্ বীণু।

বৌদিদি বীণার পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া কহিলেন, বাড়াবাড়ি কিছুই নয়, রঞ্জন বাবু! বীণা ঠিকই বলছে। কোন পাত্রীর সন্ধান জানা আছে, বীণা? বলো, আমরা সবাই মিলে সাহিত্যিক মশাই-এর একটা বিবাহ দিয়ে দিই,—ওকে রাখতেই হবে।

বীণা কহিল, মেজদার দাম বুঝতে না পারলে যার-তার হাতে পড়ে অশেষ দুর্গতি হবে বেচারার। ইলাদিকেই আমার পছন্দ। ওঁর আপত্তি না থাকলে—ওঁর হাতেই আমি ছেড়ে দিতে পারি মেজদাকে। খুব সম্ভব, উনি খানিকটা চিনতে পেরেছেন মেজদাকে।

পরেশ বাবু গম্ভীর হইয়া রহিলেন। রঞ্জন পরম ঔদাসীন্যের সহিত কহিল, বীণুর মাথার পোকা নড়েছে আবার। ওকে সঙ্গে আনাই ভুল হয়েছে আমার। গোড়া থেকেই বড্ড দালালি করছে আমার ওপরে। ওর কথায় আপনারা—

বাধা দিয়া ইলা কহিল, বীণাকে সঙ্গে না নিলে আপনি ট্রেণে উঠতে পারতেন আসানসোলে?

বৌদিদি পরেশ বাবুর দিকে চাহিয়া কৌতুকের স্বরে কহিলেন, কি গো, বলো না, তোমার মত আছে তো? তোমার মতই তো বাবা আগে জানতে চাইবেন?

পরেশ বাবু কহিলেন, ইলার সম্মতি থাকলে বাড়ীর কারোরই অমত হবে না, সেটা আমি বলতে পারি।

সকলের সম্মিলিত দৃষ্টি এইবার পড়িল ইলা মিত্রের উপর। সুন্দরী ইলা অকস্মাৎ যেন সহস্র গুণে অধিক সুন্দরী ও মনোহারিণী হইয়া উঠিল। লজ্জা-রক্তিম মুখখানি বীণার দিকে ফিরাইয়া সে চুপি-চুপি কহিল, তোমার মেজদা যদি আমায় ক্ষমা করে থাকেন,—

সহাস্যে বৌদিদি কহিলেন, ট্রেণে বসতে জায়গা দাওনি, এবারে হৃদয়-আসনে তো বসতে দিচ্ছ বাপু! এতে আর ক্ষমা করবেন না কেন শুনি?

কাপড়

সুখময় সেনগুপ্ত

'প্রাইমারী' কথাটার র-ফলা নিয়েই নিধুর যত মুস্কিল। লম্বা সাদা সার্ট, হাঁটুর নীচ পর্যন্ত কোঁচা, এমন কি, পায়ে এক জোড়া জুতো লাগিয়ে, নিধু এই র-ফলার রেহাই চায়। কিন্তু হয় না তা।

তু'-একটা কথা বলেই, অনেকেই ফস্ কোরে বলে বসে,—মশয়ের কদ্দুর পর্যন্ত—? বাকিটুকু আর বলতে হয় না, 'পাইমারী পর্যন্ত' বলে নিধু সোজা হোয়ে বসে। আদমপুরের লোকেরা প্রায় সবাই মানে নিধুকে। তার ওপর সরকার চিনেছে ওর প্রতিভা।

আদমপুর ফুড কমিটির সম্পাদক এই নিধিরাম বাগদি।

তোদের কাপড় এবার নেই। সব খ আর গ—বাগদিপাড়ার এক-পাল বেয়াক্কেলে মেয়েকে নিধু শাসিয়ে দেয়।

বিপ্‌নে ডিলারের দোকানে সেদিন কাপড়-বিলির তারিখ। 'খ' আর 'গ'-দের চৌকিদার দিয়ে চুপি-চুপি খবর দেওয়া হয়েছে। ঢোল পেটানো হয়নি, বাজারে নোটিশ লট্‌কানো হয়নি, তবু ছোট-লোকেরা কোত্থেকে বিলির গন্ধ পেয়ে ভিড় করেছে বিপ্‌নের দোকানে। কয়েক জন 'খ' আর 'গ' বিপ্‌নের দোকানের ভিতর বসে ইনস্‌পেক্টর সাহেবের প্রতীক্ষা করছে আর গল্প-গুজব।

নিধু সেক্রেটারী একবার ভেতরে যাচ্ছে, একবার বাইরে এসে দেখছে তার ইনস্‌পেক্টর সাহেব এলেন কি না। বাজে মাগিরা জালিয়ে খেলো নিধুকে।

'নিধু দাদা, আজ কাপড় না লিয়ে উঠছি নাই! আসুক তোমার সাহেব। ঘরে কি তার মা-ভন্ নাই?'

নিধু তেড়ে আসে মারতে। 'ছোট মুখে বড় কথা? সাহেবের কাপড়ের কল আছে না কি? সরকার কাপড় পাঠাল্লে তবে তো সাহেব।'

ছোটলোকদের ধমকে-নিধু বাগদি বিপ্‌নের দোকানের ভিতর গিয়ে বসলো। বিড়ি নয়, সিগারেট ধরিয়ে ঘন ঘন ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো।

ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং। সাইকেল-যানে সাহেব এলেন। কাপড়-বিলির ইন্‌সপেক্টার সাহেব। চিনি-কেরোসিনও এঁরই মর্জি।

সাহেব নাবলেন সাইকেল থেকে। বিপ্‌নে ডিলার ছুটে এসে সেলাম দিয়ে সাইকেল ধরলো। কালো রোদের-চশমা খুলে সাহেব বল্লেন—'এরা কেন নিধু বাবু? আজ তো শুধু 'খ' আর 'গ'।'

কাকের মত নোংরা ক-শ্রেণী দেখলেই চেনা যায়। নিধু সেক্রেটারী চেঁচিয়ে উঠলো—'হুজুর, বলেছি বেটিদের একশো বার, তবু কি শোনে? যত সব ছোটলোক কোথাকার!'

কয়েকটা মেয়ে এগিয়ে এলো সাহেবের দিকে। ফস্ কোরে বুকের আঁচল খুলে মেলে ধরলো সাহেবের নাকের ওপর। জীর্ণ, মলিন, শতছিন্ন!

সাহেব পিছু হটে গেলেন।

'কাপড় না-লিয়ে আজ আর যাবো নাই হুজুর।'

'আরে, আজ তো 'খ' আর 'গ'—দাঁত বের কোরে সাহেব হাস্‌তে লাগলেন।

চটে উঠলো ময়না, চটে উঠলো রঙ্গী আর ক্ষেমী। 'চার খেপ ধরে শুধু খ আর গ-এর কাপড়! আর সেই জামার কাপড়ের জ্যাল্‌জেলে টুকরাগুলা শুধু আমাদের লেইগে—?'

সাহেব একটু থম্‌কে গেলেন। বিপ্‌নে ডিলার পাশ থেকে বল্লে—'হুজুর, এবার তো ক'খানা মোটে ধুতি-শাড়ী এসেছে। তার ওপর সবগুলোই তো—'

'এই যে দেখুন না'—নিধু-সেক্রেটারী তার নোট্‌বই খুলে পড়তে লাগলো।—'মনোরঞ্জন' বারো জোড়া, 'বড়বাবু' ন'জোড়া, 'চাঁদবদন' সাত জোড়া আর এদিকে 'নয়নতারা' ত্রিশ, 'ভালোবাসা' চোদ্দ, 'ভুলো-না-আমায়' আট। তা এ সব ধুতি-শাড়ী গতর বিকুলেও ওরা কিন্‌তে পারবে না, হুজুর!'

পাকা সেক্রেটারী ফাঁকা কথা বলে না। সাহেব তাই স্বল্পেই সমঝে নিলেন; মেয়েগুলোকে মিঠে কথায় আশ্বাস দিলেন। এবার কাপড় এলেই ওদের মিলবে। এক-এক কোরে সকলের নাম টুকে নিলেন সাহেব। বাগদি মেয়েরা হন্-হন্ কোরে চলে গেলো। কাপড় সামলানোর এতটুকু দায়িত্বও যেন ওদের নেই। নির্লজ্জতার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ওরা ওদের কাপড়ের দীনতা জাহির করতে চায়; বলতে চায়, অবিচার হচ্ছে ওদের ওপর।

'খ' আর 'গ'-রা প্রায় সবাই এসেছিল কাপড় নিতে। বগলে ভাঁজ করা কাপড়খানা চেপে বারে বারে তারা সেলাম জানালো তাদের সাহেবকে।

সন্ধ্যা হয়। সাহেব ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। যেদো ডিলারের দোকানে যেতে হবে। সেখানেও বিলি-পর্বে উনিই পুরোহিত।

নিধু বাবু আর বিপ্‌নেকে আড়ালে ডেকে জরুরি সরকারি কথায় মেতে উঠলেন সাহেব। আনন্দে, উচ্ছ্বাসে ব্যস্ত হোয়ে উঠলো নিধু আর বিপ্‌নে।

'একটুও ভাববেন না, স্যার। আমরা থাকতে থাকতে—' আত্মবিশ্বাসী সেনাপতির মত অভয় দিলে নিধু-সেক্রেটারী। সাহেব হাতের সিগারেট ফেলে আবার সিগারেট ধরালেন।

'অমন ঢের-ঢের দেখেছি'—আবার গর্জ্জন কোরে উঠলো নিধু—'তু বল্লে পা জড়িয়ে ধরবে, স্যার!'

সাহেব অনেকগুলো দাঁত একসঙ্গে বের করে' বোঝালেন তিনি আপ্যায়িত হয়েছেন। ভারি গাল দু'টো ফুলে উঠলো। সিগারেটের

ডগাটা লাল টুকটুকে হোয়ে জ্বলে উঠলো সন্ধ্যার অন্ধকারে। সাইকেল-যানে সাহেব চলে গেলেন।

২

দু'হপ্তার ওপর হোয়ে গেছে তবু কাপড় আসতে ঢের দেরী এখনও। সাহেব খাতায় নাম টুকে নিয়েছেন—এই ভরসায় নাম-টোকা মেয়েগুলো মাঝে-মাঝে হানা দেয় তার কুঠীতে। সাহেব আজকাল আর চটে ওঠেন না, বরঞ্চ সুখ-দুঃখের নানা কথা শুধিয়ে নিজের দরদী মনটা খুলে ধরেন ছোট-লোকের মেয়েগুলোর কাছে।

এ ক'টা বেহায়া ছাড়া অবান্তর কারো আসবার হুকুম নেই সাহেবের কুঠীর ত্রি-সীমানায়। শুধু আসে যায় সেই সব লোক, জন-সেবার কঠিন ব্রতে দীক্ষা যাদের—সেই সব ফুড কমিটি আর ইউনিয়ন বোর্ডের চাঁইরা।

সেদিন বিকেলে বৃষ্টি হোয়ে গেছে। রাতের খাওয়া জলদি সেরে লম্বা-চওড়া খাতা খুলে কী যেন সব লিখছেন সাহেব। নিধু ঝড়ের মত ঘরে এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম কোরে উঠে দাঁড়ালো।

'হুজুর'—গদগদ হোয়ে নিধু আর কিছু বলতে পারলো না।

সাহেব চমকে উঠলেন। নিধুর চোখে-মুখে যুদ্ধজয়ের একটা জলজ্বলে ভাব!

'এই ?'—

নিধু ফিরে দরজার দিকে মুখ বাড়িয়ে ডাকলো কাকে। একটা সাদা ধুতির খানিকটা দেখা গেল দরজার আড়ালে। নিধু নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। অদ্ভুত কর্মী এই নিধু বাগদি। মুখ ফুটে একবার বললে গন্ধমাদন হাজির করতে পারে। দরকার হোলে জান্ দিয়ে দিতে পারে তার সাহেবের জন্য।

সিগারেট ধরিয়ে গায়ের পাতলা গেঞ্জিটা টেনে দিয়ে সাহেব ডাকলেন,—'শোনো।'

উজ্জ্বল আলোটা একটু কমিয়ে দিলেন সাহেব। ময়না এগিয়ে এলো। সাদা ধবধবে ধুতিটায় অদ্ভুত দেখাচ্ছে ময়নাকে। সেদিনের ময়না ছেঁড়া শাড়ীটা ওর সোমত্ত শরীরটাকে ছাই-ঢাকা কোরে রেখেছিল। আজকের সাদা ধুতিটা যেন ওর দেহরক্ষার জন্য উঁচিয়ে আছে।

সাহেব ইতস্ততঃ করলেন একটু।

'কাপড় নেই তোমার ?'—সাহেবী-কোরে সাহেব প্রশ্ন করলেন।

'হাঁ হুজুর!'

'ঘরে কে আছে তোমার ?'

'খোকার বাপ।' ময়নার কপালে জ্বলে উঠলো জ্বলন্ত কয়লার টুকরোর মত সিঁদূরের ফোঁটাটা।

'কী করে সে ?'

'বাতে পড়ি আছে আজ দু'বছর। কাজ-কাম করতে পারে নাই, হুজুর।'

সাহেব ইসারায় কাছে ডাকলেন ময়নাকে। আস্তে ওর কাঁধে হাত তুলে দিয়ে নিজের সিংহাসন থেকে বললেন.—'কোনো ভয় নেই তোর, কোনো অভাব থাকবে না।'

আলোটা আরও একটু কমিয়ে দিলেন সাহেব।

'তার নেইগেই তো ঘর ছেড়ে এলুম সাহেব।' ময়না কেঁদে ফেললো। ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগলো ময়না।

'কী আপদ!'—সাহেব বিব্রত হোয়ে পড়লেন। এ তো ঘাটে জল খাওয়া সাহেব এমন ঘোলাটে ঘাট দেখেননি কখনো। আরও কাছে টেনে গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন—'কাঁদছিস কেন, বলেছি তো কোনো অভাব আর থাকবে না।'

'কোনো অভাব তোমাকে মিটাতে হবেনি। শুধু একটি কাপড় তুমি—। সাত বছর যাকে আঁকড়ে লিয়ে আছি, আর সে টানতে পারছে নাই। রোজকার রোজ খেইটে, সরকারের ডোল্ লিয়ে দিন চল্‌ছে। কিন্তু একটা কাপড় না রইলে, আঁধার ঘরে ঝাঁপ ফেইলে মরতে হবে।'

ময়না তার ধবধবে ধুতির ভেতর থেকে একটি ছোট্ট শতছিন্ন কাপড়ের টুকরো বের করে ধরলো। সাহেব একবার তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিলেন। হাতের জীর্ণ কাপড়টা মেঝেতে রেখে এগিয়ে এলো ময়না। সাহেবের মুখোমুখি চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ। দু'টো প্রকাণ্ড থানার কাপড়ের দেবতা এই সাহেব! শুধু বস্ত্রহীনের নয়, বস্ত্রবানেরও। ইচ্ছে করলে বস্ত্র দান করতে পারেন, ইচ্ছে করলে বস্ত্র হরণ করতে পারেন।

এমন দেবতাকে অনেক কাছে পেয়ে মুখ খুলে গেলো ময়নার। সাহেব শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে শুনলেন সব। পরের পুকুরে দিনের স্নান সে রাতের অন্ধকারে সেরে নেয়। দরজা বন্ধ করে ঘরের ভেতর বসে থাকে দিন-রাত। এ হাল্ চলছে অনেক দিন কিন্তু আর সে পারে না।

শুধু তাই নয়। চৌকিদার, ফুড কমিটির চাঁইরা দরদ্ দিতে আসে, মিহি শাড়ীর স্বপ্ন দিতে আসে, এক টুকরো কাপড় দিতে আসে না। পান খেতে দেয় পকেট থেকে বার করে, পয়সা দিতে চায় ট্যাক থেকে খুলে। ময়না পয়সা ছুঁড়ে দেয় ওদের গায়ে, পান ছড়িয়ে দেয় ভুঁয়ে। নিধাই বাগদী কতো দিন ধ'রে ওর পিছু নিয়েছে। ঝাঁটা দিয়ে ওর চোখা মুখটা ভোঁথা করে দিতে পারেনি—এই ওর দুঃখ। এবার আবার ঘুরছিলো নিধাই ওর পেছন-পেছন। শুধু সাহেব ডেকেছে শুনে ও চলে এসেছে। সাহেব ওকে প্রথম কুল-ছাড়া করলে, যত দিন সাহেব থাকবে এখানে ওকে পা-ছাড়া যেন না করে।'

বালিশ থেকে মাথা তুলে সাহেবের পা জড়িয়ে ধরলো ময়না।

রাত ফুরিয়ে এলো। বাড়ী ফিরবে ময়না।

পাঁচ টাকার একটা নোট্ সাহেব গুঁজে দিলেন ময়নার হাতে।

'টাকা লিয়ে সিঁদুর কালো করতে আসিনি, সাহেব!'—গর্জে উঠলো ময়না। নোট্টা ছুঁড়ে দিলো মেঝের ওপর।

সাহেব পাঁচ টাকার নোটটা কুড়িয়ে নিয়ে চুপ করে রইলেন।

'আমি তো পেট ভরাতে টাকা চাইনি, গতর ঢাকতে এক টুকরা কাপড় খুঁজ্‌ছিলাম।'—কাঁদ-কাদ হয়ে ময়না বললে।

সাহেব একটু ভেবে হাসিমুখে খুসি করে বিদায় দিলেন ময়নাকে। অনেক আশ্বাস কাঁপতে লাগলো ময়নার চার পাশের গুমট্ বাতাসে।

৩

খগেন দারোগার সাপের মত চক্‌চকে চোখ। খরগোসের মত চোখা কান। উইচিংড়ের কারসাজি দেখতে পায় ঐ চোখে, টিক্‌টিকির প্রেম শুনতে পায় ঐ কানে। চৌকিদারেরা খবরদারি করে খগেন

দারোগার। খবর পৌঁছয় ময়নার। ময়না আজকাল লাল-নীল শাড়ী পরে' সেবা করে স্বামীর। দিনের স্নান রাতে সেরে নিতে হয় না তাকে। ছোট-খাটো চুনো-পুঁটি পাশ ঘেঁষে না ময়নার।

খগেন দারোগা ইন্‌স্‌পেক্টর দত্ত-সাহেবের বন্ধু ছিলো গোড়ার দিকে। কিন্তু যখন ন্যাংটা দেশটায় কাপড়ের সাহেব হোলো ভগবান আর খাঁকির মাহাত্ম্যে হোলো খাঁকৃতি, তখন নেকড়ের মতো ওঁত পেতে রইলো খগেন দারোগা। সুযোগের সাপ-ব্যাং, কিছুই সে ছাড়বে না।

সুযোগও এলো। মস্ত এক দরখাস্ত, একটা মরিয়া গ্রামের মারমুখো লোকগুলোর। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠানো, খগেন দারোগাকে রিপোর্ট করতে হবে সত্য-মিথ্যে।

ঠোঁটের ওপর ছোট্ট শান্ত কালো পাখীর মত প্রজাপতি-গোঁফটা চেপে ধরলো খগেন দারোগা, ডান হাতের মধ্যমা আর তর্জনী দিয়ে। রিপোর্টের রাজা এই খগেন দারোগা। এরই কলমের জোরে কত বিষ-খেয়ে মরা কলেরায়-মরা হোয়ে গেছে; কত আঁধারের খুন আলোয় এসে হার্টফেল্ হোয়েছে; কত মাঝ-রাত্তিরের বৌ-চুরি পরকীয়া-পলায়ন হোয়ে গেছে।

সেদিন সকাল না হোতেই খগেন দারোগা দত্ত ভায়ার টেবিলের ওপর দরখাস্তটা মেলে ধরলো। 'ব্যাপারটা দেখেছো ব্রাদার?'—ভস্‌ভসে-কাঁচি সিগরেটের টুক্‌রোটা বুটের নীচে ছুঁড়ে, পিষে খগেন দা বললো—'এনকোয়ারি কোরে দেখ্‌লুম। কেস্ কিন্তু সুবিধের নয়।'

চোখ কুঁচকে দত্ত সাহেব দরখাস্তটা পড়তে লাগলেন।

'এই দেখো না,' খগেন দা তার নোটবই বের করলো—বাইশ জোড়া ধুতি-শাড়ী বেরিয়েছে বিপ্‌নের দোকানে হলুদের বস্তার ভেতর থেকে। দু'টো জামার থান গুড়ের হাঁড়ির ভেতর থেকে। তেরোটা শাড়ী মধু পঞ্চায়েতের ধানের খামার থেকে। তাছাড়া ছুটকো এখানে-সেখানে দু'-চারটার খবর তো আছেই।'

ব্যস্ত হোয়ে উঠলেন দত্ত সাহেব। সব বাদ দিয়ে চা-সিগরেটের আপ্যায়ন সুরু হোলো। দত্ত সাহেব তার খগেন দার মুখে একটু হাসি দেখতে চান!

কিন্তু পুরানো খাঁকির মত ম্যাট্‌মেটে স্যাঁতা খগেন দার মুখখানা। দত্ত সাহেব উচ্চাঙ্গের আপ্যায়নের আভাস দিলেন। আশ্বাস দিলে আয়োজন করতে পারেন কালই। খগেন দার ভারি মুখের ভারি ঠোঁট দু'টো ফাঁক হোলো একটু। খগেন দা কথা বললেন। তার পর নীচু ভারি-গলায় অজস্র আলাপ, অনেক হাসি আর আনন্দ।

অনেক পরে হাসিমুখে সিগারেট টানতে টানতে দত্ত সাহেবের খগেন দা চলে গেলেন।

পরদিন সন্ধ্যার পর থেকে সরগরম হোয়ে উঠলো দত্ত সাহেবের নিরালা কুঠীর আবহাওয়া। নিধু সেক্রেটারী আছে, বিপ্‌নে ডিলার আছে, আর তাদের সহায়তা করবার জন্য খগেন দার তরপের আট নম্বর দফাদার আর পাঁচের-ছয় ও সাতের-তিন চৌকিদার। আসল ভিড়টা রান্নাঘরে!

দত্ত সাহেবের আর্দালি দম ফেল্‌বার সময় পাচ্ছে না।

রাত একটু ঘনিয়ে উঠতেই নিধু এসে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুক্‌লো। সেলাম দিয়ে পেছনের ময়নাকে সামনে এগিয়ে দিলো। দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে গেলো নিধু।

ময়নার আজকাল সঙ্কোচ নেই অতো। তা ছাড়া, বড় বাবুর কথা নিধুর কাছেই শুনেছে। দারোগা সাহেব চেয়ারে হেলান দিয়ে অভিধান উজাড় কোরে জড়িয়ে জড়িয়ে প্রশংসা করলেন ময়নাকে। ভারি-গলা নাবিয়ে-চড়িয়ে ভালোবাসার সব রকম জানা কথা বললেন। উপর্যুপরি অনেক ঢোক্ পরিচ্ছন্ন 'টালি' টলিয়ে দিচ্ছে বড় বাবুর মাথাটা।

দত্ত সাহেব জড়িয়ে ধরলো তার খগেন দাকে। 'এবারটা মাপ করো দাদা; এক মায়ের পেটের ভাই আমরা'—টেনে টেনে দত্ত সাহেব বললে।

ওদের আত্মীয়তার আতিশয্যে বিব্রত ময়না হয়তো একটু হাসলো।

* * * *

রোগা ভাতারের আঁধার ভিটে ছেড়ে অনেক দিন আলোয় নেবে এসেছে ময়না।

পুরানো পালা ঘরটুকুর লাগাও সরকারের দেওয়া লম্বা-চওড়া ঘর। সেই সরকারি ঘরে সরকারি ময়না চলে এসেছে। মাঝে-মাঝে আঁধার চিরে আলো জ্বলে ওঠে সেই ঘরে।

ময়নার কপালে জ্বলজ্বল্ কোরে ওঠে কুঙ্কুমের টিপটা; হাতে ঝলমল্ করে কেমিকেল আর কাচের চুড়ি।

স্বপ্ন-বালিকা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

জীবন তারে চেয়েছিল স্বপ্নে দেখা পেয়েছিল,
চিত্ত যে তাই গেয়েছিল গান,
কল্পনাতে ফুল-বাড়ীতে রং দিয়েছি তার সাড়ীতে—
রূপসায়রে নেয়েছিল প্রাণ।

আকাশ থেকে, বাতাস থেকে, চাঁদিমা আর সুবাস ছেঁকে,
সামনে যে তার দিলাম ডালিকা,
দিলাম তারে মুখের গীতি, দিলাম তারে বুকের প্রীতি,
সে যে আমার স্বপ্ন-বালিকা।

সেই যেখানে ঝর্ণাতলায় কারা হীরার পিদিম জ্বলায়,
নাম-না-জানা হাজার ফুলের ভিড়,
সেই যেখানে বনের সাথে কুসুমী রায় ছন্দ গাঁথে,
পাপিয়াদের সপ্ত স্বরের মীড়।

সেই যেখানে রঙিন মাসে এগিয়ে গেলাম তাহার পাশে,
পরিয়ে দিতে বাহুর মালিকা······
চমকে দেখি, কেউ নেই হায়, পালিয়ে গেছে কখন্ কোথায়—
স্বপ্ন টুটে স্বপ্ন-বালিকা!

শ্রীতুষাররঞ্জন পত্রনবীশ

সরকারী অধিকার ও কর্তৃত্ব

প্রথম যুদ্ধের (১৯১৪—১৮) পর হইতেই বিভিন্ন দেশে সরকার সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের উপর অধিকার ও শাসন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে চাহিতেছে। ডেনমার্ক ও নিউজিল্যাণ্ডে ১৯৩৬ সালে সরকার সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলিকে ব্যক্তিবিশেষের অধিকার হইতে সম্পূর্ণ নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে লইয়া আসে। সেই বৎসরই ইতালীতে যে সকল জনসাধারণ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের শেয়ারের মালিক ছিল তাহাদিগের নিকট হইতে শেয়ারসমূহ কিনিয়া সরকার ব্যাঙ্কটিকে সরকারী প্রতিষ্ঠানরূপে পরিণত করে। ক্যানাডাতেও সেই বৎসর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের (ব্যাঙ্ক অব ক্যানাডা) মূলধনের উপর সরকারী অধিকার অনেকখানি বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে জনসাধারণের অধিকৃত সেয়ারগুলি সরকার কিনিয়া লইয়া ব্যাঙ্কটিকে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠান করিয়া লইল।

ব্যাঙ্কের শাসন-ব্যাপারেও সরকারী কর্তৃত্ব ক্রমবর্দ্ধমান। নিউজিল্যাণ্ডে পূর্বে যেখানে সাত জন ডিরেক্টারের মধ্যে সরকারী সুপারিশে মাত্র তিন জন নিযুক্ত হইত, সেখানে বর্তমানে সাত জনই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়, এবং ট্রেজারীর সেক্রেটারী বর্তমানে বোর্ডের এক জন ভোটাধিকারপ্রাপ্ত সদস্য—১৯৩৬ সালের পূর্বে এই ভোটাধিকার সেক্রেটারীর ছিল না। ইহা ছাড়াও বর্তমানে এমন আইন হইয়াছে যাহাতে নিউজিল্যাণ্ডের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ককে (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক) অর্থসচিবের নির্দেশ মত সরকারী অর্থব্যবস্থা পরিচালনা করিতে হয়। ক্যানাডাতেও বর্তমানে সব কয় জন ডিরেক্টারই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়। আগে যেখানে নয় জনের মধ্যে মাত্র তিন জন নিয়োগের অধিকার সরকারের ছিল।

যদিও মূলধনের অধিকার ব্যাপারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জার্মাণী, ফ্রান্স ও গ্রীসে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই, তথাপি শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সে সব দেশের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে সরকারী ক্ষমতা ক্রমেই বাড়ান হইয়াছে ও হইতেছে। পূর্বে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহের (ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক) প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নিয়োগ ব্যাপারে ডিরেক্টর বোর্ডের কোনই কর্তৃত্ব ছিল না, বর্তমানে সেখানে ঐ সকল নিয়োগ ফেডারেল-রিজার্ভ-সিষ্টেম অনুসারে গভর্ণর-বোর্ডের অনুমোদন-সাপেক্ষ; এবং গভর্ণর-বোর্ডের সাত জন সদস্যই যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হয়। ইহা ছাড়াও পুরাতন ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কিং নীতি সম্পর্কে যে সকল ক্ষমতা ছিল না সে সব ক্ষমতাও নূতন গভর্ণর-বোর্ডের হাতে আসিয়াছে। যথা—ডিস্‌কাউণ্ট হার-নির্ণয়, ওপন্ মার্কেট কারবার ইত্যাদি। জার্মাণীতে ১৯২৪ সালে এক আইন পাশ করিয়া বলা হয় যে, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক সরকারী নিয়ন্ত্রণের বহির্ভূত থাকিবে, কিন্তু ১৯৩৭ সালে এই আইন রদ করা হয় এবং এক নূতন আইন করিয়া সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ককে প্রত্যক্ষ ভাবে ফুয়েরার ও চ্যান্সেলারের কর্তৃত্বাধীনে আনা হয়। ফ্রান্সে আগে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের (ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স) জেনারেল কাউন্সিলের ১৫ জন সদস্যই অংশীদারগণ কর্তৃক নিযুক্ত হইত, কিন্তু ১৯৩৬ সালে সেই বিধির আমূল পরিবর্তন করিয়া ব্যাঙ্কের শাসন ব্যাপারে সরকারী কর্তৃত্ব বিস্তৃত করা হয়। গ্রীসে ১৯৩২ সালের পূর্বে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের গভর্ণর, ডেপুটী গভর্ণর ও সাব-হইতেই [illegible] এই সকল নিয়োগ করা হইতেছে।

অপর দিকে আবার আর্জেণ্টিনায় ১৯৩৫ সালের পূর্বে যে সকল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিংএর কাজ একটি সরকারী ব্যাঙ্ক দ্বারা সমাধা হইত, ১৯৩৫ সালের পরে সেই সকল কাজে সাধারণ কমার্শিয়্যাল ব্যাঙ্কসমূহও সমান অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। চীনে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক সরকারী প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও ১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসের এক বিশেষ বিধানে সেই সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কটিকে 'সেন্ট্রাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব চায়না' নামে পুনর্গঠিত করার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং নবগঠিত ব্যাঙ্কের অংশীদার বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও জনসাধারণ হইতে পারিবে বলা হইয়াছিল। সুতরাং চীনে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব সরকারের হাত হইতে জনসাধারণের হাতে দিবার ব্যবস্থা হইলেও এই বিধানের বিরুদ্ধে বিশেষ প্রবল আপত্তি উত্থিত হওয়ায় ইহা কার্য্যকরী করা সম্ভব হয় নাই।

উপরের এই কয়টি ব্যতিক্রম বাদ দিলে সাধারণ ভাবে দেখা যাইবে যে, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের মূলধন ও শাসন এই উভয় ব্যাপারেই সরকারী কর্তৃত্ব ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। গ্রেট বৃটেনে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের (ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড) জাতীয়করণ (ন্যাশানেলাইজেশান্) সম্পর্কে যে সাম্প্রতিক আইন পাশ হইয়াছে তাহাতেও এই লক্ষণ সুপরিস্ফুট। সরকার কর্তৃক অধিকার ও নিয়ন্ত্রণের ক্রমপ্রসারের কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, ১৯৩০ সালের মন্দাই ইহার মূল। ১৯৩০ সালের মন্দা, ১৯৩১ সালের মধ্য-ইউরোপে অর্থসংকট, এবং স্বর্ণমান পরিত্যাগ এই তিন সমস্যার চাপে পড়িয়া বিভিন্ন সরকার অনুভব করিল যে, দেশের আর্থিক ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উপর নিজেদের অধিকার বিস্তৃত করিতে না পারিলে এইরূপ মন্দা ও সংকটের আবির্ভাব অনিবার্য্য। সরকারী কর্তৃত্বের ক্রমপ্রসারের ফলে এইরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, বর্তমানে যে কোন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের হিসাব-নিকাশ (ব্যালান্স শীট) পরীক্ষা করিলে শুধু সরকারকে ঋণদানের অঙ্কই দেখা যাইবে এমন নয়, পরন্তু এই ঋণদানের পরিবর্তে ব্যাঙ্কের হিসাবে কোম্পানীর কাগজ ও ট্রেজারী বিলের স্ফীতাঙ্কের প্রতিও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

যদিও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের উপর সরকারী অধিকার ও কর্তৃত্বের প্রসারের হেতু হিসাবে উপরে তিনটি কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে তথাপি প্রকৃত পক্ষে স্বর্ণমান পরিত্যাগই সরকারের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক-প্রীতির প্রধান কারণ। স্বর্ণমান থাকা কালে দেশের আর্থিক ব্যবস্থা বিশেষতঃ মুদ্রানীতির উপর আপনা-আপনিই শৃঙ্খলা আসে; আবার এই স্বর্ণমান পরিহার করার ফলে মুদ্রানীতির উপর তেমনি বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়—সরকার তখন প্রয়োজন মত নির্বিচারে বাজারে মুদ্রা ছড়াইতে থাকে—ফলে সৃষ্টি হয় মুদ্রাস্ফীতির। কারণ মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা অভাব মোচনই আপাত দৃষ্টিতে সরকারের কাছে সহজতম উপায়। প্রয়োজন মত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সাহায্য গ্রহণ করিয়া মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা অভাব মিটানকে রাজনীতির যূপকাষ্ঠে অর্থনীতিকে বলিদানরূপে অভিহিত করা যাইতে পারে। তবে ভরসার কথা, সরকারী প্রয়োজনে নির্বিচারে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ককে এই ভাবে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের প্রতিবাদের ফলে এ বিষয়ে একটা আপোষের আভাষ দেখা যাইতেছে। এমন চিহ্ন দেখা যাইতেছে যে, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকিলেও উহা নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বে পর্য্যবসিত হইবে না। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কসরকারের যুক্তিসঙ্গত সমস্ত প্রয়োজনে সহায়তা করিলেও, বিভিন্ন দেশে আইন করিয়া সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ককে এমন ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে, যাহাতে ব্যাঙ্ক সরকারের

প্রয়োজনকে জাতীয় স্বার্থের নিরিখে সত্যিকারের প্রয়োজন কি না তাহা বিচার করিতে পারে এবং সেই মতে সাহায্য দানে অগ্রসর হইতে পারে।

জনসাধারণের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ

পূর্বে বিভিন্ন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং ছাড়াও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কিংএর কাজ করিত, কিন্তু আধুনিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে আমরা দেখিতে পাই—সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কিং ছাড়িয়া দিয়া ক্রমেই সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কেই ব্যাপৃত আছে। ১৯৩৬ সালে এক আইন দ্বারা 'ব্যাঙ্ক অব ইটালী' এইরূপ ভাবে পুনর্গঠিত হয় যে, উহা সাধারণ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কিং ত্যাগ করিয়া শুধু সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিংএই উহার কাজ-কর্ম্ম সীমাবদ্ধ করে। চীনেও ১৯৩৫ সালে নভেম্বর মাসে আর্থিক সংস্কার পরিকল্পনা (মনিটারী রিফর্ম প্রোগ্রাম) অনুসারে ঠিক হয়, সেখানকার সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব চায়না ও সেন্ট্রাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কসমূহের ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করিবে এবং কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কিং হইতে বিরত থাকিবে।

১৯১৪—১৮ সালের যুদ্ধের কিছু দিন পর পর্য্যন্তও অষ্ট্রেলিয়ায় কমনওয়েলথ ব্যাঙ্ক যথেষ্ট কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কিং করিয়াছিল, কিন্তু ১৯২৪ সালে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে রূপান্তরিত হওয়ার পর হইতে ইহা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কেই শুধু কাজকর্ম্ম করিতেছে। ১৯৩০ সালের পর হইতে আর ইহা অন্যান্য কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের সহিত প্রতিযোগিতা করে নাই। যে ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স ফরাসী দেশে অনেক কাল ধরিয়া বিল ডিস্কাউণ্টিং এবং জামীন রাখিয়া কর্জ—এই দুই ব্যাপারে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কসমূহের সঙ্গে প্রবল প্রতিযোগিতা করিয়া আসিতেছিল, উহাও বর্ত্তমানে এই দুই ক্ষেত্র হইতে অনেকটা অপসরণ করিয়াছে এবং নূতন কাজ আর গ্রহণ করিতেছে না বলিলেও চলে।

ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনের পূর্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কই সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কএর কাজ করিতেছিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কিংও করিতেছিল। এই ব্যবস্থা ব্যাঙ্কিং নীতির আদর্শানুযায়ী না হওয়ায় ১৯৩৫ সালে 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট' নামে আইন পাশ হয় এবং সম্পূর্ণ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিংএর কাজ করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে যে, ভারতের ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প বিষয়ে ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের বিশেষ জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল ডিসকাউণ্টিং বা কর্জদান করিবে না।

প্রায় সকল দেশেই সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ককে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে এবং সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিংএর বিশেষ কাজ করিবার নিমিত্ত নূতন ও পৃথক্ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক গঠিত হইয়াছে। কিন্তু যে সব দেশে, যথা—অষ্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো, বলিভিয়া ও প্যারাগুয়ে—কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কসমূহ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিংও করিতেছিল, সে সব দেশে সরকার সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ককে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে পৃথক্ করার উদ্দেশ্যে ঐ সব কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ককে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক হিসাবে পুনর্গঠিত করিয়াছে।

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কিংএর কারবার জনসাধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত, কিন্তু সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সম্পর্ক জনসাধারণের সঙ্গে ততটা থাকে না যতটা থাকে অন্যান্য ব্যাঙ্কএর সঙ্গে—ইহাই মূলতঃ কমার্শিয়াল ও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে প্রভেদ। উপরে দেখান হইয়াছে যে, জনসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক বিষয়ে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহ দূরে সরিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ কি? প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

(১) দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের আর্থিক নিরাপত্তা রক্ষা করা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রধান দায়িত্ব হওয়ায় উহা জনসাধারণের নিকট ঋণ-কর্জ দিয়া নিজের তহবিল নিয়োগের ঝুঁকি নেয় না; সুতরাং ইহার ঋণ-কর্জ সীমাবদ্ধ থাকে অপেক্ষাকৃত সুপরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহের সহিত।

(২) কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কসমূহ জনসাধারণের কাছে ঋণ-কর্জ দিয়া নিজেদের তহবিল নিয়োজিত রাখে বলিয়া সময় সময় এই সব ব্যাঙ্ককে বিপদে পড়িতে হয়। সে সময় রি-ডিসকাউণ্টিং এবং অন্যান্য প্রথা অবলম্বন করিয়া সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কসমূহকে সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু যদি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কও জনসাধারণকে ঋণ-কর্জ দান করিতে থাকে, তবে উহার বিপদে উহাকে কে সাহায্য করিবে?

(৩) দেশের আর্থিক নিরাপত্তার খাতিরে ইহা খুবই বাঞ্ছনীয় যে, কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কসমূহ উহাদের অতিরিক্ত তহবিল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিবে, কিন্তু যদি এ সম্পর্কে কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম না থাকে তবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কসমূহ উহাদের অতিরিক্ত নগদ তহবিল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিবে, ইহা আশা করা যায় না। আবার এই রকম কোন নিয়ম করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্ম্মক্ষেত্র ও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের কর্ম্মক্ষেত্র পৃথক্ করা দরকার। কারণ, যদি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কিং দ্বারা নিজেকে বিপদের সম্মুখীন করে তবে উহার কাছে টাকা জমা রাখিয়া কি লাভ?

(৪) সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ককে সুষ্ঠু ভাবে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের সহযোগিতা কামনা করিতে হয়; কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যদি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের সঙ্গে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রতিযোগিতা করিতে থাকে তবে এই সহযোগিতা পাওয়া যাইতে পারে না, সুতরাং সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের কর্ম্মক্ষেত্র পৃথক্ না হইয়া উপায় নাই।

ওপন্ মার্কেট কারবার

১৯২০ সাল হইতেই যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে কোম্পানীর কাগজে ওপন্ মার্কেট কারবার ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু অন্যান্য দেশে এই কারবার মাত্র অধুনা প্রসার লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। বর্ত্তমানে ওপন্ মার্কেট কারবার শুধু মাত্র ব্যাঙ্করেটকে কার্য্যকরী করিবার জন্যই নহে, পরন্তু ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের প্রধান পন্থা হিসাবে প্রায় সকল দেশেই চলিতেছে।

ওপন্ মার্কেট কারবারের প্রসার সম্পর্কে নিম্নলিখিত কারণসমূহ উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

(১) অর্থনীতি ক্ষেত্রে সরকারী অধিকারের ক্রমবিস্তার, স্বর্ণমান পরিত্যাগ ও অন্যান্য পরিবর্ত্তনের দরুণ ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে ডিস্কাউন্ট রেটের প্রাধান্য কমিয়া যায়; (২) বিভিন্ন মূল্যের ও বিভিন্ন প্রকার সর্ত্তসম্বলিত কোম্পানী কাগজের প্রচলন এবং অল্পমেয়াদী ট্রেজারী বিলের ব্যাপক ব্যবহারের দরুণও ওপন্ মার্কেট কারবার প্রসার লাভ করিতে সুবিধা পায়; (৩) প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে অর্থনীতি ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও কর্ত্তৃত্ব নামমাত্রই ছিল এবং সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সরকারের আর্থিক সাহায্যেরও বিশেষ প্রয়োজন পড়িত না। কারণ, অর্থব্যবস্থা তখন এরূপ জটিল

ছিল না; কিন্তু ১৯২০ সাল হইতে ক্রমেই সরকার আর্থিক সাহায্যের জন্য সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের মুখাপেক্ষী হইতে লাগিল বলিয়া অর্থনীতি ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বও বাড়িতে লাগিল। ফলে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কও ওপ্‌ন্ মার্কেট কারবার বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

ব্যাপক ভাবে ওপ্‌ন্ মার্কেট কারবারের পক্ষে প্রধান প্রয়োজন কোম্পানীর কাগজের বিস্তৃত ব্যবহার। যদিও বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক দেশেই কোম্পানীর কাগজের ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, তথাপি প্রকৃত পক্ষে একমাত্র গ্রেট বৃটেন এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত আর কোথাও খাঁটী ওপন্ মার্কেট কারবারের তেমন প্রচলন হয় নাই। অন্যান্য দেশে ডিস্‌কাউন্ট-রেট নীতির সঙ্গে সঙ্গে ওপন্ মার্কেট কারবার দ্বারা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে। ওপন্ মার্কেট কারবারের ব্যাপক ব্যবহারের পক্ষে অল্পমেয়াদী ট্রেজারী বিলের প্রচলন খুব সহায়তা করে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

নগদ তহবিলের কেন্দ্রীকরণ

১৯১৩ সালে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ্যাক্ট দ্বারা আমেরিকায় নিয়ম করা হয় যে, কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলিকে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিকট নগদ তহবিলের একটা ন্যূনতম অংশ জমা রাখিতে হইবে। যদিও বর্তমানে প্রত্যেক দেশেই সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিংএর ইহা একটি অপরিহার্য অঙ্গ তথাপি প্রথমে ইহা আমেরিকায়ই প্রবর্তিত হয়। এই ভাবে তহবিল কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য সাধারণত: সব দেশেই একটা নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করা হয়। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কসমূহের দায়গুলিকে সাধারণত: দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—অল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী। দীর্ঘমেয়াদী দায়গুলির একটা ক্ষুদ্র অংশ সাধারণত: শতকরা দুই ভাগ ও অল্পমেয়াদী দায়ের কিছু বেশী অংশ (ভারতে শতকরা পাঁচ ভাগ) সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিকট নগদ তহবিলে গচ্ছিত রাখিতে হয়। যদিও নগদ তহবিলে এইরূপ জমা রাখাই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু সুইডেন, নরওয়ে এবং ফিনল্যাণ্ডে সহজে পরিবর্তন যোগ্য (লিকুইড) তহবিলেও ইহা রাখা যায়।

নগদ তহবিলের কেন্দ্রীকরণের মূল্য হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, (১) কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কসমূহের নগদ তহবিল বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া না রাখিয়া যদি কোন নির্ভরযোগ্য কেন্দ্রে জমা রাখিতে পারা যায় তাহা হইলে এই তহবিলের ঝুঁকি অনেক কমিয়া যায় এবং প্রয়োজন মত এই তহবিলকে যুক্তিযুক্ত ভাবে নিয়োগ করিয়া অর্থসংকট এড়ান যাইতে পারে; (২) সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক কর্তৃক রি-ডিসকাউন্টিং সুবিধা দেওয়ায় এই তহবিল কেন্দ্রীকরণ দ্বারা যে শুধু ঝুঁকিই কমে তাহা নহে, কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কসমূহের সহজে পরিবর্তনযোগ্য তহবিলের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়; (৩) তহবিল কেন্দ্রীকরণের ফলে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের মূলধন সংগ্রহে সুবিধা হয় এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উপর সাধারণ ভাবে নিয়ন্ত্রণও সহজ হয়।

তহবিল কেন্দ্রীকরণ ব্যাপারে নবতম বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই আমরা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক কর্তৃক কোন বিশেষ ব্যাঙ্কের নগদ তহবিল জমা রাখার পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতার প্রয়োগে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ইহা ১৯৩৩ সালে প্রথম প্রয়োগ করা হয়। ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে যখন ওপন্ মার্কেট কারবারে আশানুরূপ ফল না পাওয়া যাইবে, সেখানে এই বিধি প্রয়োগ করিয়া ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে। কোন কোন দেশে ইহাও মনে করা হয় যে, তহবিল জমা রাখার ন্যূনতম হারের হ্রাস-বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা যদি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের থাকে তাহা হইলে ইহার প্রয়োগ ছাড়াও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কসমূহের উপর নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে সহযোগিতার প্রসার

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহের ভিতর যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন আছে এবং এইরূপ সহযোগিতা দ্বারা যে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যে সহায়তা হয়, তাহা ১৯২০ সালে ব্রাসেলস্ কনফারেন্স, ১৯২২ সালে জেনোয়া কনফারেন্স, ১৯৩১ সালে ম্যাকমিলান কমিটি, ১৯৩২ সালের লীগ অব নেশনস্ গোল্ড ডেলিগেশন কমিটি, ১৯৩৩ সালের ওয়ার্লড ইকনমিক কনফারেন্স এবং সম্প্রতি সংঘটিত ব্রেটন উডস্ কনফারেন্সে বিশদ করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ১৯৩৩ সালের বিশ্ব-অর্থনৈতিক সম্মেলনে এক প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, বিভিন্ন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ভিতর নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতা বজায় রাখিতে হইবে এবং বিভিন্ন দেশের ভিতর প্রচলিত পরস্পর বিবদমান বিভিন্ন অর্থনৈতিক মত ও পথের এক সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত ব্যাঙ্ক ফর ইণ্টারন্যাশনাল সেটল্‌মেণ্টকে এক নিখিল বিশ্ব-সেন্ট্রাল ব্যাঙ্করূপে কাজ করিতে হইবে। এইরূপ সহযোগিতার প্রস্তাব প্রায় সকল দেশেই বিশেষ সমাদরে সমর্থিত হইয়াছে এবং বি, আই, এস ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই বিভিন্ন দেশের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহের ভিতর সহযোগিতা বজায় রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন দেশে দেশে পুনর্গঠনের নিমিত্ত প্রভূত পরিমাণ অর্থের দরকার হইল তখন এক দেশের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অপর দেশের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সহায়তা করিয়া এই পুনর্গঠনের কাজ অনেক সহজ করিয়াছে। ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড নিউ ইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে কুড়ি কোটি ডলারের এক ঋণ গ্রহণ করে ১৯২৫ সালে। পর-বৎসর বেলজিয়ামের ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সঙ্গে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড, ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স, রাইখস্ ব্যাঙ্ক ইত্যাদি ব্যাঙ্ক এক চুক্তি করিয়া বেলজিয়ামের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে দুই কোটি পাউণ্ড ঋণ দান করে। ইটালী ও পোল্যাণ্ড ১৯২৭ সালে এবং রুমানিয়াও ১৯২৯ সালে এইরূপ ভাবে ঋণ পাইতে সমর্থ হয়।

ঋণদান ব্যতীত অন্যান্য বিভিন্ন উপায়েও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহ একে অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে পারে, যথা—এক দেশের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অন্য দেশের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের এজেন্টের কাজ করিতে পারে। বস্তুত:, বিভিন্ন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ভিতর এই ব্যবস্থা ভাল ভাবেই প্রচলিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া চিঠি পত্র, তার, সম্মেলন, রিপোর্ট ইত্যাদির মাধ্যমে বিনিময় - বাজার সম্পর্কে সংবাদ আদান-প্রদানের বিষয়েও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহ একে অন্যকে সাহায্য করে।

উপসংহারে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ব্রেটন্ উডস্-এর সম্মেলনের ফলে যে ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে, বিভিন্ন দেশের অর্থ ব্যবস্থার ত্রুটির সমাধান-কল্পে উহার দান অসামান্য হইতে পারে এবং বিভিন্ন দেশের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ভিতর সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেও এই নব-প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক অনেক কাজ করিতে পারে যদি কোন বিশেষ দেশের বা কোন বিশেষ বিশেষ দেশ-সমষ্টির সঙ্কীর্ণ স্বার্থ সাধনে ইহা নিয়োজিত না হইয়া সমগ্র জগতের আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ছোট-বড় সকল দেশের প্রতিনিধি লইয়া প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে ইহা পরিচালিত হয়।

এই তো জীবন

নীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ক'দিন থেকেই বাড়াবাড়ি চলছিল খুব, মারা গেল আজই বিকেলে। তিন বছরের মেয়েটি! মুখে মিষ্টি একটু হাসি লেগে থাকত, বাপ-মা-আদর করে ডাকত, ডলি। রঙীন ফ্রকটা পরে সাদা মোজা আর ছোট্ট জুতো-জোড়াটা পায়ে দিয়ে যখন বেড়াত উঠানে, মনে হোত বিলিতি পুষ্টিকর কোন খাদ্যের বিজ্ঞাপনের ছবি একটা।

ফ্ল্যাট বাড়ি, ওপর-নীচে আটটি ফ্ল্যাট, মধ্যবিত্ত পরিবার সবাই, সুখ-দুঃখের ভাগাভাগিও আছে, আবার মন-কষাকষিরও বিরাম নেই। সকলের সঙ্গে সকলের অন্তরঙ্গতাও আবার সমান নয়, বেশি-কম আছে।

ছোট ছোট পরিবার সব। ওপরের চারটি ফ্ল্যাটের কোণেরটিতে তিনটি প্রাণী নিয়ে সংসার, মনীষা, ছোট্ট একটি খোকা, আর স্বামী। পাশে সুলতা, কন্যা গীতা আর গীতার পিতা। সুলতাদের পাশে রেবা, পড়ে কলেজে, দাদা প্রভাত, ল কলেজে যাতায়াত আছে, ওদের মা আর বাবা। রেবাদের পাশে দেবা-দেবী, ছেলে-পিলে নেই, মিহিরকুমার আর স্ত্রী সুপ্রভা।

মারা গেল নীচের মাঝের একটা ফ্ল্যাটে, ডুকরে কেঁদে উঠল মা! সমস্ত পরিবারেই একটা অস্বস্তির ছায়া। মারা যাওয়ার সময়টা একেবারেই অসময় তাদের পক্ষে, মানে, নীচে গিয়ে একবার অন্তত আহা-উহু করে সান্ত্বনা জানিয়ে আসার পক্ষে।

মনীষা এক তাল আটা নিয়ে রুটি বেলতে বসেছে, উনুন ধরে গেছে প্রায়, এখন গেলে আধ ঘণ্টা অন্তত বসতে হবেই, কিন্তু কয়লা পাওয়ার যা কষ্ট!

সুলতার কাজ কম, তবে স্বামী আসবেন এখুনি, জলখাবার চা দিতে হবে, খাবার সময় বসতেও হবে সম্মুখে। পাউডার মেখে, চোখে কাজল দিয়ে, ভাল একটা শাড়ি পরে এই সময় রোজই তাকে প্রস্তুত থাকতে হয় অফিস থেকে স্বামীর আসবার অপেক্ষায়। চাকর তরকারী কুটছে, সাজ-গোজ হয়ে গেছে সুলতার। এখন যদি তাকে নীচে শোকাহতা মায়ের কাছে গিয়ে বসতে হয়, স্বামী অফিস থেকে ফিরে তাকে না পেয়ে অসন্তুষ্ট হবেন, অথচ একই বাড়ি বললেই হয়, না যাওয়াটা খুবই বিসদৃশ দেখায়! উভয় সঙ্কট, কি করবে দিশে পায় না বেচারা! বুদ্ধি করে মনীষাকে খবর পাঠাল, মনীষা যখন যাবে, তখন যেন ডেকে নিয়ে যায় তাকে!

রেবারা সাজ-গোজ করছিল, সিনেমায় যাবে, কর্তা, গিন্নি, রেবা, প্রভাত সবাই। গিন্নি একটু স্থূলকায়া, রবিবারের অমৃতবাজারের খুড়োর অর্দ্ধাঙ্গিনীর হাস্যরসাত্মক ভাবটুকু বাদ দিলে যে রকম দেখতে হয়, অনেকটা সেই রকম। রেবা রাণী বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে তার বিভিন্ন কোণ থেকে বিভিন্ন ভঙ্গীতে মুখের প্রতিচ্ছবি দেখতে দেখতে, ক্রীম মাখা সাঙ্গ করে, কোটা পাউডার ঘষছে, এমন সময় কানে এল মাতৃ-হৃদয়ের করুণ আর্তনাদ। গুন্-গুন্ করে গাইছিল, 'আর একটু সরে বসতে পার', গানটা যেন হঠাৎ হোঁচট খেয়ে থমকে গেল!

মা বললেন, মেয়েটা বোধ হয় মারা গেল রে? তাড়াতাড়ি নে রেবা, এত সাজ-গোজ করে যেতে নীচের সিঁড়িতে ওদের কারও সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে, লজ্জায় পড়তে হবে।

হাঁ মা, টপ করে নাও, চুপি-চুপি আমরা বেরিয়ে পড়ি, কাঁধের কাছে সাড়ির কুঞ্চিত অংশ থেকে সোণার পিনটা তৃতীয় বার খুলে আবার লাগাতে লাগাতে কন্যা বললে।

মা রেবার দিকে পিছন ফিরে ঢাকাই সাড়িটা তাঁর গোড়ালি দু'টো ঠিক মত ঢেকেছে কি না কন্যাকে জিজ্ঞাসা করে স্বামীর উদ্দেশে হাঁকলেন, কই গো, হোল তোমার, বুড়ো বয়সে তোমার আবার এত সাজবার ঢং কেন শুনি?

রেবার সাজ প্রায় সমাপ্ত, বাকি শুধু আঁখির প্রসাধন। আয়নার অতি সন্নিকটে মুখটা নিয়ে গিয়ে চোখে সুরমা আঁকতে আঁকতে মা'র পায়ের গোড়ালি ঢাকার উত্তরে বললে, হুঁ! মা'র সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়, নিজের প্রসাধনেই ব্যস্ত মেয়ে, কটমট করে মেয়ের দিকে চেয়ে তার উত্তরের প্রতিধ্বনি করে বলেন, হুঁ! একটু ভাল করে চোখ মেলে দেখতেও পারছ না?

তার পর রেবাকে সরিয়ে দিয়ে আয়নার প্রতিবিম্বে সম্মুখ দিকটার বেশ-বিন্যাস সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে, ঘাড়টা ফিরিয়ে চোখ দু'টোর দৃষ্টি যতটা সম্ভব পশ্চাতে নিক্ষেপ করে পিছনটা দেখে নিলেন, শারীরিক স্থূলতা হেতু দৃষ্টি কিন্তু নিতম্বেই আটকে যায়, গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছায় না।

মায়ের ভাব দেখে মেয়ে হাসে, বলে, মা চল, দেরী হয়ে যাচ্ছে যে!

বেরিয়ে পড়ল সকলে চুপি-চুপি, কিন্তু সিঁড়িতে নামতে গিয়ে যে ভয় তারা করছিল ঠিক তাই। ডলির পিতা, উস্কুখুস্কু চুল, মুখে সমস্ত পৃথিবীর বিষাদ; উঠছেন সিঁড়ি দিয়ে, ফ্ল্যাট বাড়ির সাধারণ সিঁড়ি, বোধ হয় ওপরের ভদ্রলোকদের সাহায্য প্রার্থনা করতে সৎকারের ব্যবস্থা করবার জন্যে। একেবারে চোখোচোখি। কিছু না বলা অত্যন্ত অশোভন, রেবার পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছিল ডলির?

সদ্যসন্তানহারা পিতার বুকে মানুষ-বিশেষের ওপর অভিমান বোধ হয় থাকে না, অবিবেচক মানুষের ওপরও নয়, সমস্ত অভিমান ফাঁকা মাঠে বৃষ্টির জলের মত ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে চার দিকে, সমস্ত বিশ্বে। সান্ত্বনাও ভগবান, অভিমানও তাঁরই ওপর!

ঢোক গিলে ডলির পিতা বললেন, টায়ফয়েড, কান্নার একটা ঝলক যেন উছলে পড়ল তাঁর গলা থেকে! পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে গেলেন। সিঁড়িতেই শুরু হোল গবেষণা রেবার মা এবং বাবায়। ডলির বাবা দেখেই যখন ফেললেন, তখন একবার সদ্য-মরা মেয়েটার মা'র কাছে না গিয়ে একেবারে সোজা সিনেমায় যাওয়াটা বোধ হয় ভাল দেখায় না, একই বাড়িতে থাকা যখন! রেবার বাবা এবং প্রভাত দাঁড়িয়ে রইলেন বাইরে, রেবা এবং মা, জর্জেট আর ঢাকাই সাড়ি-পরা দেহে এবং টয়লেট-করা মুখে যতটা সম্ভব শোকের ছায়া এনে ঢুকল সন্তানহারা মায়ের ঘরে! একটা ফর্সা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকা ডলির, মুখটা খোলা, সকালের ফোটা ফুল সন্ধ্যায় শুকিয়ে ঝরে পড়েছে যেন! শিশুকে আগলে বসে আছে মা, চোখে পলক নেই, মুখে নেই ভাষা, পাশে সুপ্রভা, মিহিরকুমারের স্ত্রী। ঢুকে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এরা! রেবার মা একটু অপেক্ষা করে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন, বললেন, আহা! মৃতার মায়ের অজ্জিত মলিন বেশ আর বিষাদ-মাখা শুকনো মুখের পাশে পাউডার-মাখা মুখের কৃত্রিম দীপ্তি! সদ্য সন্তানহারা মাকে ফুলের তোড়া উপহার যেন! মানসিক আবিলতায় এরা নিজেরাই সঙ্কুচিত!

নীচের পাশের ফ্ল্যাটের একটি মুখরা মেয়ে এসে বললে, আপনাদের সিনেমার দেরী হয়ে যাচ্ছে বোধ হয়?

লজ্জায় চকিত হয়ে উঠলেন রেবার মা; স্তব্ধতার মধ্যে আর একবার 'আহা' বলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে 'এই তো জীবন' দেখতে।

অপুত্রক মিহিরকুমার কান্নার শব্দ শুনে নিজেই প্রস্তুত হচ্ছিলেন ডলিদের ওখানে যাওয়ার জন্যে, স্ত্রী দুপুর থেকেই বসেছিল ডলির মা'র কাছে। কাল রাতেও পালা করে রাত জেগে মেয়েটির শুশ্রূষা করেছেন মিহিরকুমার। পরের ব্যথায় ঝাঁপিয়ে পড়ার অভ্যাস তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। ডলির বাবা আসতেই কাপড়ের খুঁট গায় দিয়ে, খালি পায়েই বেরিয়ে গেলেন তাঁর সঙ্গে। সৎকারের ব্যবস্থা তিনিই করলেন, সুপ্রভা রইল কন্যাহারা মায়ের ব্যথায় প্রলেপ দিতে। দিগন্ত-বিস্তৃত অকরুণ ধূসর মরুতে ছোট্ট এক খণ্ড মেঘের আবির্ভাব যেন! থেকে থেকে ডুকরে কেঁদে উঠছে মেয়েটির মা।

এর মধ্যে রান্না শেষ করে মনীষা,—আর স্বামীকে চা জলখাবার খাইয়ে সুলতা, সমবেদনা জানাতে এল। সবই মায়া, কেউ কারও নয়, পৃথিবীর অসারত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথাই তারা বললে। সুলতার মামাতো বোনের ছেলেটি মারা গেলে কি করেছিল, কত টাকা ডাক্তারকে ফি দিতে হয়েছিল, আর মনীষার আঁতুড়ে ছেলেটি যখন মারা যায়, তখন তারই বা কি অবস্থা হয়েছিল, এ সব বর্ণনাও বাদ গেল না। মামাতো বোনের ছেলেটির মারা যাওয়ার প্রসঙ্গে বোনটির বিয়ের সময় কি রকম ঘটা হয়েছিল, তারও একটু বর্ণনা নেহাৎ প্রসঙ্গ ক্রমেই এসে পড়ল! শেষে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে, 'যাই, আবার অনেক কাজ বাকি আছে,' বলে উঠে পড়ল তারা।

মায়ের বুক নিঙড়ে বেরিয়ে-আসা একটা হাহাকার বাড়িময় ছড়িয়ে পড়ে! রাত্রের আহারের পর উচ্চ একটা ঢেকুর তুলে আঁচাতে আঁচাতে মনীষার স্বামী বললেন, আজ ডিমের বড়াগুলো খুব নরম হয়েছিল তো, বেশ লাগল খেতে।

মনীষা মাথাটা দুলিয়ে উৎসাহের সঙ্গে বললে, মাখন আর সোডা দিয়েছিলুম মশাই, এমনি হয়নি!

সুলতার স্বামীর লুচি গিয়েছিল ঠাণ্ডা হয়ে, খেতে খেতে বিরক্ত হয়ে বললেন, বলেছি না তোমায়, ঠাণ্ডা লুচি আমি খেতে পারি না, কি এমন রাজকার্যে ব্যস্ত থাকো, ঠাকুরের রান্নাটাও একটু দেখতে পার না? অপরাধীর মত চুপ করে যায় সুলতা।

কলরব করে সিনেমা থেকে ফিরল রেবারা। তখনও থেকে থেকে ভেসে আসছে মৃতার মায়ের বুকভাঙা কান্নার এক একটা ঝলক!

আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে কাপড় ছাড়ছে রেবা। মুখে সদ্য-শোনা 'এই তো জীবনের' একটা গান, গুন্‌-গুন্‌ করে গাইতে গাইতে বললে, কি করুণ বইটা মা! 'টি বি'র শুশ্রূষা করে স্বামীকে বাঁচিয়ে বউটা মারা গেল শেষে, বড্ড করুণ বই, আমি তো কেঁদেই ফেলেছিলুম। মা বললেন, আমিও!

সত্যি, এই তো জীবন।'

তুমি নাই

"ভাস্কর"

তুমি নাই,
সত্যই তুমি নাই।
কবির কল্পনা, দুর্বলের মোহ,
রুগ্ন নৈরাশ্যের নিষ্ফল স্বপন,
ভাবুক প্রাণের অলীক কামনা,
গড়েছে তোমার অরূপ রূপ,
রয়েছে তোমার নাম
অগণিত কথা, সুর গানে।
সত্যই থাকিতে যদি,
তাহলে এমন হয় কি কখনো?
আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে,
অন্তরে-বাহিরে, শুধু
মিথ্যার জঞ্জাল,
শুধু পাকৃত বিভীষিকা!
মানবের রূপ ধরি এ কি বিড়ম্বনা!
হিংস্র শ্বাপদের দল
লজ্জায় লুকায় মুখ
দেখি দেবতার বীভৎস নর্তন।
লীলা! থাক্, আর ভুলায়ো না,
দর্শন-তত্ত্বের বড় বড় কথা
শিকায় থাক্ গে তোলা!
চক্ষু, কর্ণ, মন, বুদ্ধি
প্রসারি' আপন পাশে
তরাসে, ঘৃণায়,
নির্মল হৃদয়-ছেঁড়া অব্যক্ত ব্যথায়
গুমরি' গুমরি ম'রে, অসহায়
নিরাশ্রয়, অশনি-আহত।
দূরে বসি' দেখিতেছ? মিছে কথা।
ওতপ্রোত রয়েছ জড়ায়ে?
কেমনে বিশ্বাস করি, ছি ছি, তোমারি দেহে
এত মলিনতা, এত বীভৎস তাণ্ডব?
এ তো নহে মাত্র অবিশ্বাস,
এ যে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণ
তোমারি নাহিত্বের।
ফুটায়েছ ফুল,
দিয়েছ রবির কর,
নীলাকাশে ভাসায়েছ রৌপ্য থালি,
হরিৎ প্রান্তরে বহায়েছ
স্নিগ্ধ সমীরণ?
জননীর স্নেহভরা বুক, পিতার আশ্বাস,
ভ্রাতা ভগিনীর মধুময় বাণী
সবই দিয়েছ তুমি?
থাক্, তাই যদি সত্য হ'ত,
মানুষকে কেন তুমি মানুষ করনি?

বোবা-বধূর চোখ-ইশারা

স্বামী কৃষ্ণানন্দ

অতীতের কবে, সুদূরের কোন্ পারে, নীলাকাশের তলে কোথায়, মধুযামিনীর কখন, কি নেশায় বিভোর হইয়া বিশ্বের কে কিসের আশায় কার হৃদয়-সাগর মন্থিত করিয়া কেমনে যে প্রেমের কায়াহীনা কমলা-মূর্ত্তিকে সর্ব্বপ্রথম উঠাইয়া আমাদের এই বন্ধ্যা বসুন্ধরাকে চিরসৌভাগ্যবতী ও স্বর্গাদপি গরীয়সী করিয়া দিয়া গিয়াছেন—তাহার সঠিক ইতিবৃত্ত কেই বা আজ আমাদিগকে শুনাইতে পারেন ?

হৃদয়-জলধি হ'তে উঠিবেন যে দিন
প্রেমের কমলা-মূর্ত্তি,
"বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া
প্রথম প্রেমের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি শিহরি।.........
চৌদিকে বাজিতেছিল মধুর রাগিণী
জলে স্থলে নভস্তলে ; সুন্দর কাহিনী
কে যেন রচিতেছিল ছায়ারৌদ্রকরে
অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মর্ম্মরে,
বসন্ত দিনের কত স্পন্দনে কম্পনে
নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ভাবে আভাসে গুঞ্জনে
চমকে ঝলকে। যেন আকাশ-বীণার
রবিরশ্মি-তন্ত্রীগুলি সুরবালিকার
চম্পক-অঙ্গুলিঘাতে সংগীত-ঝঙ্কারে
কাঁদিয়া উঠিতেছিল,—মৌন স্তব্ধতারে
বেদনায় পীড়িয়া মূর্চ্ছিয়া। তরুতলে
স্খলিয়া পড়িতেছিল নিঃশব্দে বিরলে
বিবশ বকুলগুলি ; কোকিল কেবলি
অশ্রান্ত গাহিতেছিল,—বিফল কাকলী
কাঁদিয়া ফিরিতেছিল বনান্তরে ঘুরে
উদাসিনী প্রতিধ্বনি।"

—রবীন্দ্রনাথ

তার পর যুগে যুগে কত প্রেমিক-প্রেমিকাবৃন্দ আসিয়া নিজ নিজ জীবনের সব সুখ-দুঃখ ভাঙ্গিয়া চোখের জলে ও মুখের হাসিতে প্রেমের অনুপমা মনোময়ী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া কত ভাবে ইঁহার কত যে অর্চ্চনা করিয়া গেলেন এবং "অখিল মানস-স্বর্গে অনন্তরঙ্গিনী" ঐ ভুবনমোহিনী ভাবময়ী মূর্ত্তির চৌদিকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আজ পর্য্যন্ত কত যে—

"মধুমত্ত ভৃঙ্গ সম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে
উদ্দাম সংগীতে।"

—রবীন্দ্রনাথ

—ইঁহাদের সংখ্যাই বা আজ আমাদিগকে কে গণিয়া বলিয়া দিতে পারেন? প্রথমে প্রেমিক-প্রেমিকারা ইঁহার ভাবময়ী বা মনোময়ী মূর্ত্তির গঠন করিলেন ; অতঃপর কবির দল ইঁহাকে বাঙ্‌ময়ী বা ছন্দোময়ী করিয়া তুলিলেন অর্থাৎ হৃদয় হইতে বাহির করিয়া ইঁহাকে সোনার ছন্দে বাঁধিয়া ফেলিলেন। তার পর বিশ্বের যত উন্মত্ত গায়ক-বাদকদের দল আসিয়া ইঁহার চারি পাশে আসর জমাইয়া তাঁহাদের পাগ্‌লা বংশী-বীণায় নানা ভাবের যে সব বিচিত্রা মধুময়ী রাগিণীর মোহন ঝঙ্কারের আবেগময় স্পন্দন উঠাইলেন, তাহার সর্ব্বগ্রাসী প্লাবনে জল, স্থল ও নীলাভ্রের সর্ব্বাংশ যেন চিরদিনের মত করুণায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল ; তাই আজিকার এই স্বার্থান্ধ জগতেও আমরা যেন ঐ সব কুহকিনী রাগিণীর কিছু কিছু আভাসের অনুভব সর্ব্বত্র এখনও অল্পবিস্তর করিতে থাকি।

"—সুখদুঃখ-নীরে
বহে অশ্রু-মন্দাকিনী ; মিনতির স্বরে
কুসুমিত বনানীরে ম্লানচ্ছবি করে
করুণায় ; বাঁশরির ব্যথাপূর্ণ তান
কুঞ্জে কুঞ্জে তরুচ্ছায়ে করিছে সন্ধান
হৃদয়-সাথীরে।"

—রবীন্দ্রনাথ

সর্ব্বাগ্রে কায়াহীনা প্রীতিরাণীর ভাবময়ী বা মনোময়ী মূর্ত্তি হইল, তার পর বাঙ্‌ময়ী বা ছন্দোময়ী মূর্ত্তি হইল—এখন আবার ইঁহার সুরময়ী বা রাগময়ী মূর্ত্তিও হইল। "যার ছেলে যত পায় তার ছেলে তত চায়,"—যেমন যেমন রসিকের রসলিপ্সা নানা ভাবময়ী হইতে লাগিল, তেমনি তেমনি ইনিও নানা মূর্ত্তি ধারণে লাগিলেন।

"আমি সকল অঙ্গের চাহি হে পরশ"

—রবীন্দ্রনাথ

—ইঁহাকে স্পর্শ করিতে না পারিলে ত আর হৃদয়ের আশা নিবারিত হয় না ;

"নিখিল জগৎ কাঁপিছে তোমার
পরশ-রস-তরঙ্গে।"

—রবীন্দ্রনাথ

তাই এখন আমাদের এই বোবা-বধূটির ইঙ্গিতে

"সুরভি-আলয় বিহরে মলয়
সবাকার তাপ হরি'
মন-প্রাণ করি সুশীতল।"

—দেবেন্দ্র বসু

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই হৃদয়-জুড়ান মলয়-হাওয়া সদা সর্ব্বত্র সুলভ নহে ; তাই ইঁহাকে সুলভ করিবার জন্য প্রথমে শিল্পীর দল আসিয়া পাখার সৃষ্টি করিলেন, পরে উচ্চশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক-সঙ্ঘ আসিয়া বৈদ্যুতিক পাখার আবিষ্কার করিলেন—এই ভাবে শিল্পীরা ও বৈজ্ঞানিকেরা মিলিয়া প্রেমের ঐ রাগময়ী বা সুরময়ী মূর্ত্তিকে ধীরে ধীরে স্পর্শময়ী করিয়া দিলেন। ইঁহার এই সুখময় স্পর্শে কথঞ্চিৎ সুস্থ ও শীতল হইয়া চিত্রকর, ভাস্কর প্রভৃতির দল বসিয়া বসিয়া ইঁহাকে নানা রূপে রূপময়ী বা বর্ণময়ী করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এই সব পরিশ্রমের কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহাদের পেটে দাউ-দাউ করিয়া জঠরাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল ; তাই এখন মোদকের (ময়রার) দল আসিয়া ঐ রূপময়ীকে ধীরে ধীরে মধুময়ী বা রসময়ী করিলেন এবং কিছু

পরেই মনোরঞ্জনের পূর্ণতা সম্পাদনের জন্ত রাসায়নিকের দল আসিয়া আতর-গোলাপজল ছিটাইয়া ঐ রসময়ীকে গন্ধময়ী করিয়া তুলিলেন—এখন আমাদের মন, কর্ণ, ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা, এই সব জ্ঞানেন্দ্রিয়ই একে একে পরিতৃপ্ত ও চরিতার্থ হইল।

প্রেমের প্রথম বন্যার মুখে পড়িয়া প্রেমিক-প্রেমিকারা ভাসিয়া গেলেন এবং নানা ভাবে চুবন খাইয়া হাঁপাইয়াও উঠিলেন। পরে যখন সেই বন্যাবেগের কিছু উপশম হইল, তখন তাঁহারা কিছু কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে প্রেমের পাত্র হইতেছে বাহিরের বস্তু, উহা তাঁহাদিগের হইতে ভিন্ন বা পর; সেই হেতু, উহা আসে, থাকে, আবার চলিয়াও যায়—সর্ব্বগ্রাসী মহাকালের করাল কবল হইতে উহার রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব হয় না; কিন্তু প্রেম আমাদের বড়ই আপনার জন, অন্তরের ধন, নূতনের মাঝে চির-পুরাতন।

"পীরিতি পীরিতি, কি রীতি মূরতি,
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে পীরিতি না ছাড়ে,
পীরিতি গড়ল কে?"

—চণ্ডীদাস

তাই বৃন্দাবনে সখীর দল মিলিয়া-মিশিয়া কোমর বাঁধিয়া কৃষ্ণের সামনেই রাইকে ধরিয়া জোর করিয়া রাজা করিয়া দিলেন; কবির দলও সর্ব্বান্তঃকরণে সখীদের এই কার্য্যের পূর্ণ সমর্থন করিলেন এবং প্রেমের পাত্র অর্থাৎ প্রিয় অপেক্ষাও এই মহামহিমময়ী প্রীতিরাণীকে প্রশস্ততর উচ্চাসন দেওয়ায় বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ বা লজ্জানুভব না করিয়া দৃঢ়চিত্তে সর্ব্বসমক্ষে মহাহ্লাদে উচ্চকণ্ঠে এক সুরে গাহিয়া উঠিলেন—

"এ জীবনে যে যাহারে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে,
উচ্চে হোক্‌, তুচ্ছে হোক্‌, দূরে কিম্বা হোক্‌ তার কাছে,
পাত্রে বা অপাত্রে হোক; প্রেমেই প্রেমের সার্থকতা।
বিশ্বজয়ী প্রেম কভু জানে না ক' আপন ব্যর্থতা।"

—বিস্মৃত

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম কীটাণুকীট হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর জীব পর্য্যন্ত সকলেই ইঁহাকে নানা ভাবে ও বহুবিধ উপচারে চিরদিন পূজা করিয়া আসিতেছেন এবং সর্ব্বগ্রাসী কাল যাহাতে এই কোমলাঙ্গী প্রীতিরাণীকে গ্রাস করিয়া ফেলিতে না পারে, তার জন্ত তাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধ্যানুসারে কত কি-ই করিয়া গেলেন—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুতেই কিছু হইল না। এমন যে মধুময়ী রমণীয়া প্রীতির কমনীয়া মূর্ত্তি, ইহাও কালের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় চলিয়া যায়—মনোময়ী বা ভাবময়ী, বাঙ্‌ময়ী বা ছন্দোময়ী, সুরময়ী বা রাগময়ী, স্পর্শময়ী, বর্ণময়ী বা রূপময়ী, গন্ধময়ী, ইহাদের মধ্যে কোন মূর্ত্তিটিকেই আজ পর্য্যন্ত কেহই ক্ষুধার্ত্ত কালের নিষ্ঠুর কবল হইতে বাঁচাইতে পারিলেন না। ইহা দেখিয়া ক্রোধে, লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে, প্রতিহিংসায় অধীর ও উন্মত্ত হইয়া প্রেমের উপাসকবৃন্দ মিলিয়া-মিশিয়া ও যুক্তি-পরামর্শ করিয়া ইহার বুদ্ধিময়ী বা স্মৃতিময়ী গঠন করিয়া সকলে মিলিয়া উহারই পূজা করিতে লাগিলেন এবং মুখর কবির দল ঐ উদ্ধত, নির্লজ্জ, সর্ব্বভুক্‌ কালটার দর্পচূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে উহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া প্রেমের এই বুদ্ধিময়ী বা স্মৃতিময়ী মূর্ত্তির অমরত্বের গাথা সকলে সগর্ব্বে ও সম্মিলিত ভাবে গাহিয়া উঠিলেন :—

"গলাও ভূধর, সিন্ধু জমাও গিরিতে,
ব্যাঘ্র চরে পূর্ব্বের নদীতে;
সব পার, কাল, তুমি পার কি মুছিতে
প্রেম-স্মৃতি প্রেমীর হৃদিতে?
অভ্যাসে ভূপাল পারে ভোগ ভুলিবারে,
ভুলে ভিক্ষু ঝুলি আপনার;
অকপটে ভালবেসে ভুলিতে কি পারে
প্রেমী কভু প্রিয় মুখ তার?"

—সুরেন্দ্রমোহন

প্রেমের উপাসকবৃন্দের সহিত কালের এইরূপ ভীষণ যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখিয়া অপূর্ব্ব কৌশলময়ী রসবতী আমাদের এই বোবা-বধূটি (মহামায়া বা প্রকৃতি) কিছু কৌতুক করিবার অভিপ্রায়েই যেন একবার স্মিত-হাস্যে একটু চোখ টিপিলেন মাত্র—ব্যস্‌, আর যাবি কোথা! অমনি চারি দিকে হুলুস্থুল—এক ঢিলেই দুইটি পাখী পড়িল অবনীতলে। তাঁর এই কটাক্ষরূপ সম্মোহন বাণে বিদ্ধ ও জর্জ্জরিত হইয়া কাল ও প্রেমের উপাসক, উভয় পক্ষীয় সকলেই এককালে অভিভূত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। যুদ্ধ ক্ষণকালের জন্য থামিয়া গেল এবং দুই দলের সকলেই একসঙ্গে প্রগাঢ় সুষুপ্তিতে নিমগ্ন হইয়া অনুভব করিতে লাগিলেন যে, ঐ সুষুপ্তির মাঝে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সায়াহ্ন, দিবা, রাত্রি, প্রহর, দণ্ড, পল প্রভৃতি কালপক্ষীয় সকলেই যেন মিলিয়া মিশিয়া একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে এবং প্রেমের এই যে সব অসংখ্য প্রতিহিংসাপরায়ণ উপাসক, ইঁহারাও সকলে যেন ঐ কালপক্ষীয়দের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া অভেদে একাকার হইয়া গিয়াছেন—সব ভোঁ ভোঁ, ঐ সুষুপ্তির দেশে কাহারও চুলের টিকিটি পর্য্যন্ত আর দেখা যাইতেছে না। সেখানে আর কালপক্ষীয় এক জনও নাই এবং প্রেমের উপাসকদলের মধ্যেও কেহই নাই; সেখানে আর যুদ্ধক্ষেত্রও নাই; যুদ্ধের কারণও নাই, যুদ্ধও নাই, যোদ্ধাও নাই, যুদ্ধের কোন ফলাফলও নাই; সেখানে আর প্রেমও নাই, প্রেমের কোন পাত্রও নাই, প্রেমের কোন আধারও নাই, প্রেমের কোন মূর্ত্তিও নাই, প্রেমের কোন উপাসকও নাই, প্রেমের কোন উপাসনাও নাই, প্রেমের কোন পিপাসাও নাই, প্রেমের কোন স্মৃতিও নাই, প্রেমের কোন অনুভূতিও নাই;

"পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ, মিলন,
বৃন্দাবন-গাথা; এই প্রণয়-স্বপন
শ্রাবণের শর্ব্বরীতে কালিন্দীর কূলে
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
সরমে সম্ভ্রমে।"

—রবীন্দ্রনাথ

এই সব প্রেমের অনন্ত ভাবের মধ্যে সেখানে আর একটিও নাই—সেখানে সব স্তব্ধ, স্থির, একাকার।

"স্নিগ্ধ শান্ত সুগভীর নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যু-সম নীল নীর স্থির বিরাজে।
নাহি রাত্রি, দিনমান, আদি, অন্ত, পরিমাণ
সে অতলে গীত-গান কিছু না বাজে।"
—রবীন্দ্রনাথ

দুই দলেরই দর্পচূর্ণ হল, উভয় পক্ষেরই চৈতন্য হইল। কাল দেখিলেন যে তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বগ্রাসী নহেন—কেন না, সুষুপ্তাবস্থায় তিনি নিজেই অন্য কর্তৃক গ্রস্ত হইয়া যাইতেছেন। প্রেমের উপাসকগণও দেখিলেন যে তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত প্রেমের যত যত মূর্ত্তির গঠন সযত্নে করিয়া আসিতেছেন তাহাদের কোনটিই চিরস্থায়ী হইতে পারে না; কারণ যে মন ও যে বুদ্ধি যে সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই প্রেমের কল্পনা ও রচনা করিতেছে এবং ইহার ধারণ করিয়া রহিতেছে, সেই সব ইন্দ্রিয় ও সেই মন-বুদ্ধি, ইহারা নিজেরাই অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর, "এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।" রঙ্গময়ী বোবা-বধূটির এই সুষুপ্তিরূপ চোখ-ইশারা হইতে বিবাদমান উভয় পক্ষীয় সকলেই ইহাও সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহারা সকলেই স্বরূপতঃ সমান, একবস্তুসার জ্ঞান মাত্র এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সেই যথার্থ জ্ঞানটিকে কালেরও যিনি কাল অর্থাৎ সুষুপ্তিকালীন ঐ একসার অজ্ঞান, তিনিও স্পর্শ করিতে না পারিয়া থতমত খাইয়া ঐ জ্ঞানের সম্মুখে লজ্জায় জড়সড় হইয়া জ্ঞেয়রূপে আঁধারমুখে যেন এক কোণে চুপটি করিয়া অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। অতএব আমাদের মধ্যে যদি বুদ্ধিমান কেহ কোন দিন এই প্রেমের জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি কোন উপায়ে একবার গড়িয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে কালেরও কাল আর ইহাকে ছুঁইতে পারিবেন না, আমাদের বড় সাধের এই বোবা-বধূটিরও মুখে কথা ফুটিয়া উঠিবে এবং আমাদের অন্তরের আমি-রূপ এই 'বৌ-কথা-কও' পাখীটিও চিরদিনের মত চুপ হইয়া যাইবে; কেন না, একমাত্র জ্ঞানই হইতেছে এমন বস্তু, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের থাকারূপ ও না-থাকারূপ লুকোচুরি-খেলাকে দেশকালের পরপারে বসিয়া সাক্ষী হইয়া চিরদিন এক ভাবে দেখিয়া আসিতেছেন।

"অনন্ত আঁধার মাঝে কেহ তব নাহিক দোসর;
পশে না তোমার প্রাণে আমাদের হৃদয়ের আশ,
পশে না তোমার কানে আমাদের পাখিদের স্বর—
সহস্র জগতে মিলি রচে তব বিজন প্রবাস,
সহস্র শবদে মিলি বাঁধে তব নিঃশব্দের ঘর।
হাসি, কাঁদি, ভালবাসি, নাই তব হাসি, কান্না, মায়া,
আসি, থাকি, চলে যাই—কত ছায়া, কত উপচ্ছায়া।"
—রবীন্দ্রনাথ

রোমাণ্টিক

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

গানের কলি সহসা দেয় নাড়া
দোলা যে লাগে সাত নিরালা নীড়ে।
চকিত হৃদয় হ'য়েছে আত্মহারা,
সুরের কাঁপন উঠেছে মিড়ে-মিড়ে।

রাতের আঁধার মিশেছে গভীর নীলে,
মেঘের চাঁদের অবাধ লুকোচুরি।
জাগর রজনী কাটাই অনেকে মিলে,
কখনো নীরবে পথের কিনারে ঘুরি।

কোথায় যেন সহসা সাড়া জাগে,
গানের কলি এখানে বসে শুনি।
কতো যে কুসুম নীরব অনুরাগে
শুনেছে গানের গভীর যতো ধ্বনি।

এখানে তুমিও আমার সাথে এসে
বসেছো সাথে, নয়নে গভীর নীল।
আকাশের নীলে যেখানে পৃথিবী মেশে,
সেখানে নীলিম তোমার চোখের মিল।

গানের কলি হৃদয়ে দেয় নাড়া,
তুমি তো কাছেই, তুমি-ই গাও গান।
তোমাকে দেখি না, হৃদয়-গভীরে হারা
কেবল তোমার গলার নিগূঢ় তান।

আজিও রাতের আকাশে চন্দ্র দিক
আগেকার মতো এখনো ক্ষয়হীন।
ভুলো না আমরা জন্ম-রোমাণ্টিক,
যদিও রাতের পিছনে বন্ধ্যা দিন।

দেখেছি যুগের অনেক হানাহানি,
খেয়েছি কালের অনেক কঠিন তাড়া।
তবু তো আজো হৃদয়ে জানাজানি,
গানের কলি সহসা দেয় নাড়া।

—বোর্ণ এণ্ড সেফার্স

শরাল

মনোতোষ রায়

ফুলের হাসি —[illegible] গুহরায়

নিয়মাবলী

প্রত্যেক মাসে প্রতিযোগিতায় একমাত্র সৌখীন (এ্যামেচার) আলোকচিত্র-শিল্পীদের ছবি গৃহীত হইবে।

ছবির আকার ৬" × ৮" ইঞ্চি হইলেই আমাদের সুবিধা হয় এবং যত দূর সম্ভব ছবি সম্বন্ধে বিবরণ থাকাও বাঞ্ছনীয়। যথা, ক্যামেরা, ফিল্ম, এক্সপোজার, এ্যাপারচার, সময় ইত্যাদি।

যে কোন বিষয়ের ছবি লওয়া হইবে। অমনোনীত ছবি ফেরৎ লওয়ার জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট সঙ্গে দেওয়া চাই। ছবি হারাইলে বা নষ্ট হইলে আমাদের দায়ী করা চলিবে না, সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। খামের উপর "আলোক-চিত্র" বিভাগের এবং ছবির পিছনে নাম ও ঠিকানার উল্লেখ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

প্রথম পুরস্কার দশ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার আট টাকা, তৃতীয় পুরস্কার পাঁচ টাকা এবং অন্যান্য বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হইবে।

ফুল-লতা-পাতা

—নীরোদ রায়

দেখিস্, কেউ যদি এসে পড়ে — প্রথম পুরস্কার।

এ মাসের প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিটিতে আলোক-চিত্র-শিল্পী নিজের নাম দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। আমরা শিল্পীকে নাম জানাইবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

আমি সব দেখছি — রবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(দ্বিতীয় পুরস্কার)

আলোকচিত্র পাঠাইবার সময় ছবির পিছনে নাম দিতে ভুলিবেন না। এইরূপ বহু নামহীন ছবি অফিসে জমা হইয়া রহিয়াছে। প্রেরকদের প্রতি এই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।—সম্পাদক

গেরস্থের —সমরেন্দ্রনাথ মিত্র

(তৃতীয় পুরস্কার)

—অমিয় ঘোষ

গো-ধূলি

—সমর সরকার

রাস্তায়
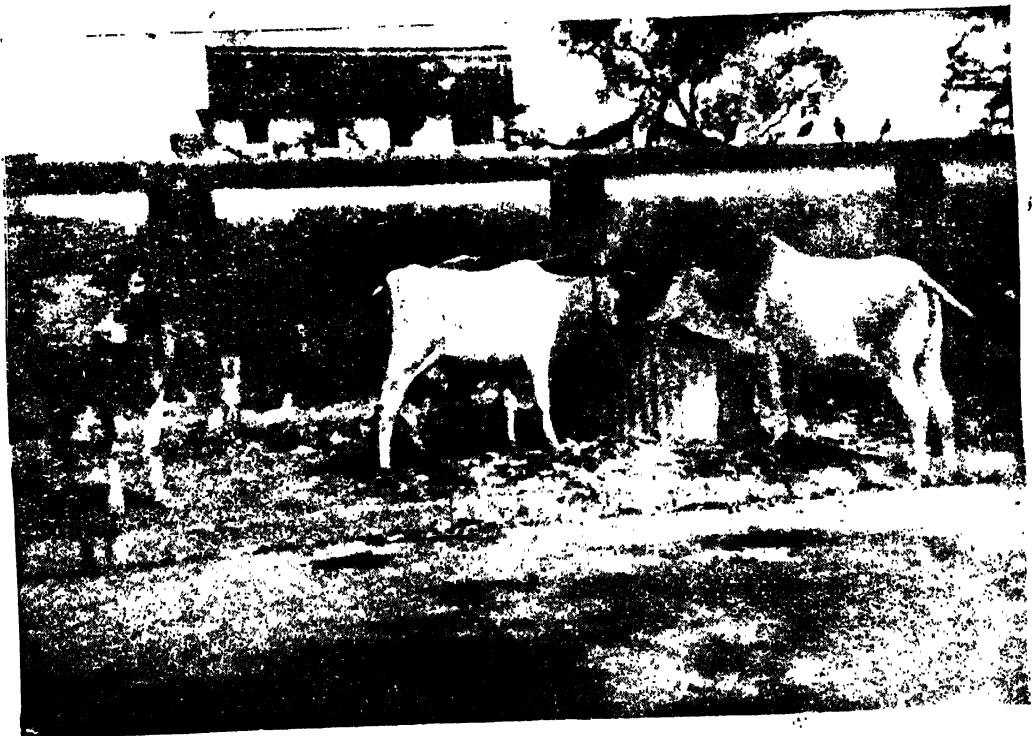
সব-হারানোর-দেশে —মনোবীণা রায়

নব্য ভারতের ধর্ম্মসন্ধান

শ্রীদেবব্রত রেজ

ভারতের বর্ত্তমান যুগকে বিভ্রমের যুগ বলা যেতে পারে। জাতি-বর্ণ-দল ও কৃষ্টিগত বহু বিভ্রমে ভারত আজ বিভ্রান্ত। সবার উপর ধর্ম্ম-বিভ্রম।

বিগত যুগের অবয়ব অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইয়া আছে: ভবিষ্যৎ দুর্জ্ঞেয়। বর্ত্তমানের সেতু চলতি যুগের হাওয়ায় দুলছে, যখন-তখন ভেঙে প'ড়তে পারে। বর্ত্তমান কালের এই সেতুর এক প্রান্তে অতীত, অপর প্রান্তে ভবিষ্যৎ। এক প্রান্ত অতীত কালের কুয়াশায় আচ্ছাদিত, অপর প্রান্ত অসম্পূর্ণ। এক এক যুগের আলোকে সম্মুখের দিকে নূতন নূতন অংশের যোজনা হচ্ছে এই সেতুতে। আকাশলগ্ন অসম্পূর্ণ এই সেতু-মুখে মানুষ কর্ম্মে ব্যস্ত—তার কর্ম্ম-কৌশলে এই সেতুতে বৃত্তাংশের পর বৃত্তাংশ যুক্ত হ'চ্ছে—সেতুর শেষ অজ্ঞাত। নিম্নে ধ্বংসের অতল। মানুষ যুগে যুগে অসম্পূর্ণ ইন্দ্রধনুর মত এই বর্ত্তমানের সেতুর পুরোভাগে নূতন নূতন বৃত্তাংশের যোজনা ক'রে চলেছে। সন্ধান ক'রে অতীতের ভিত্তি চিনলে এই সেতুর বর্ত্তমানের বৃত্তাংশ কোন্ মুখে ভবিষ্যের দিকে স্থাপিত করতে হবে, তার সন্ধান জানা যাবে। অতীতকে চিনতে হবে; ভবিষ্যৎকে সেই চেনার আলোক দিয়ে চিনতে হবে।

বিদ্বানদের এক দল বলেন, অতীতের এই ভিত্তি সনাতন ধর্ম্ম। (যেন কোনো ধর্ম্ম সনাতন হ'তে পারে!) অপর দল বলেন, সব ঝুটা, সাঁতরে যাও,—সময়ের স্রোতে সাঁতরে যাও, যেখানে পা ঠেকবে সেখানেই খুঁটো পোতো, এমনি করে নূতন বাতাবরণ বানিয়ে নাও।

দুটোর কোনোটাই ঠিক নয়। কোনো ধর্ম্ম সনাতন নয়, আর কালস্রোতের নীচে চোরাবালির অভাব নাই। তার চেয়ে বরং সন্ধান করব শক্তিমান্ সংস্কারমুক্ত ভারতীয় মন ভারতের অতীত সমুদ্র সন্তরণ কালে কোন্ চুম্বকের টান অনুভব ক'রেছে। বলেছি, শক্তিমান্। আরো ব'লেছি, সংস্কারমুক্ত। অর্থাৎ লঘু (আলোর মত লঘু) নিরাবরণ মন। ভারাক্রান্ত মন যেখানে সেখানে ডুববে। তাই তো দেখি, কেউ ডুবল মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে, কেউ ডুবল পুরাণে, কেউ ডুবল প্রাচীন সাহিত্যের কবোষ্ণ প্রবাল-সমুদ্রে, আর কেউ ডুবল বেদান্তের অতল গভীরে, আর ডুবে নিশ্চিহ্ন হোল। যারা ডুবল তাদের ভাঙ্গা ঢেউয়ে ডুবে লাভ নেই।

মানুষ ধর্ম্মনিষ্ঠ হ'লেই চলবে না। ধর্ম্মকেও মনুষ্যনিষ্ঠ হ'তে হবে। ধর্ম্ম জাতিকে রক্ষা ক'রবে: জাতির অন্তর্নিহিত গুণকে রক্ষা ক'রবে; তার বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা ক'রবে—জাতির সর্ব্বশ্রেয়ঃকে রক্ষা ক'রবে: সেই শ্রেয়সের নব নব রূপে অভ্যুদয়কে ধারণ ক'রবে। জাতির শ্রেয়দের এই নব নব রূপে অভ্যুদয় যে সামাজিক বিপ্লবের জন্ম দেবে, সেই বিপ্লবের মধ্যেও জাতির অস্তিত্ব ও মৌলিক গুণকে রক্ষা ক'রবে জাতির ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম উত্তরোত্তর জাতিকে শক্তিশালী ক'রবে; জাতির রাষ্ট্রকে রক্ষা ক'রবে, পরিপুষ্ট ক'রবে এবং সেই রাষ্ট্রকে আদর্শ রূপ গ্রহণে সহায়তা ক'রবে।

ধর্ম্ম রাষ্ট্রকেও উত্তরোত্তর শক্তিশালী ক'রবে। রাষ্ট্রতন্ত্রকে আশ্রয় ক'রে ধর্ম্ম জাতির মধ্যে জীবন্ত হ'য়ে বিরাজ ক'রবে। যে ধর্ম্ম রাষ্ট্রকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা ক'রতে পারে না সে ধর্ম্মের মর্ম্মস্থল শূন্য হ'য়ে গিয়েছে বুঝতে হবে। ধর্ম্মে ও রাষ্ট্রে কোনো বিরোধ নাই। যাঁরা ধর্ম্মকে শোষক শ্রেণীর তন্ত্র আখ্যা দিয়াছেন তাঁরা ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেননি: তাঁরা ধর্ম্মকে জাতির মর্ম্মের মধ্যে সন্ধান করেননি, তাঁরা ধর্ম্ম সন্ধান ক'রেছেন গীর্জ্জায়, মসজেদে, মন্দিরে। রাষ্ট্র জীর্ণ হ'য়েছে যখনই ধর্ম্ম জীর্ণ হ'য়েছে। যখনই জাতির ধাতুর সঙ্গে ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরোধ ঘটেছে তখনই ধর্ম্ম জাতির মর্ম্ম থেকে স'রে মন্দিরে গীর্জ্জায় আশ্রয় নিয়েছে।

ইসলাম যখন পরিপূর্ণ প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত তখন মুসলমান রাষ্ট্রের অসি-ঝলক ইতিহাসের দিগন্তকে উদ্ভাসিত ক'রেছিল। তার পর ইসলামের পতন ও রাষ্ট্রলুপ্তি। আপাতঃ অশ্রুপরিপ্লুত হ'লেও খৃষ্ট ধর্ম্মের অন্তরে অন্তরে বহ্নি। খৃষ্টানের রাষ্ট্র মেরুবিস্তীর্ণ। কিন্তু বৌদ্ধ মোঙ্গল জাতি তার রাষ্ট্রকে বহু দিন হারিয়েছে। এই মোঙ্গলদের চেঙ্গিস খান এক দিন নভগরড থেকে শ্যাম পর্য্যন্ত তার উল্কা-পুচ্ছের দ্বারা আবরিত ক'রেছিল: তার বংশধর কুবলাই খানকে ফ্রাঙ্করাও ভেট দিয়ে যেত। সেই তারা বৌদ্ধ হোল: আজ তাদের রাজ্য নাই; রাষ্ট্র নাই: পর-রাষ্ট্রের হাতে ক্রীড়নক। আজ মোঙ্গলদের অধিকাংশ পুরুষ উর্গা থেকে তিব্বতের লাসায় তীর্থযাত্রা ক'রেছে এবং লাসা-উর্গার পথে জীবনের শেষ ক'রছে। ভারতের অবস্থা সর্ব্বজনবিদিত। সোমনাথ লুণ্ঠন থেকে মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন ও তারও পরের ইতিহাস কলঙ্কের এক অবিচ্ছিন্ন কাহিনী।

এই কলঙ্ক-কাহিনীর অবসরে অবসরে ধর্ম্মপ্রচারক জন্মেছেন ও ধর্ম্মপ্রচার ক'রে গেছেন। কিন্তু, তাঁরা সকলেই সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। জাতি গঠনের দিকে তাঁদের দৃষ্টি ছিল না। তাঁদের মধ্যে অনেকে রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে মানুষ হ'য়েছেন কিন্তু রাষ্ট্র-বুদ্ধি তাঁদের চিন্তার পরিধি থেকে বহিষ্কৃত। শুধু ব্যক্তিগত কৈবল্যের দিকে অনুগামীদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, পরে এরাই ক্লৈব্যগ্রস্ত হোল। কৈবল্য ও ক্লৈব্যের বহিঃপ্রকাশ অনুরূপ ব'লেই দুটোর মধ্যে প্রভেদ সাধারণ মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। ব্যক্তিগত মুক্তির নেশায় সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল ভারতীয়েরা সমাজকে খণ্ড-বিখণ্ড ক'রে চ'লেছে; ব্যক্তিগত চিন্তায় সমাজকে ভুলেছে, রাষ্ট্রকে ভুলেছে।

বুদ্ধের "সংঘ"কে ধ্বংস ক'রল যা'রা, যা'রা আপন আপন অনুভব-ক্ষেত্রে অনন্তের কেন্দ্র স্থাপন ক'রলে, যারা প্রচার ক'রলে "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" ইত্যাদি, সেই নিষ্ঠুর সমাজবিধ্বংসী দলের প্রভাবে ভারত-রাষ্ট্র চুরমার হ'য়ে গেল, জাতি চুরমার হোল: বর্ণভেদ তীব্র ও উগ্র হোল—তাদের দুষ্ট "মায়ার" শ্মশানে সমস্ত প্রাণবীজ নিরঙ্কুর থেকে গেল। দাক্ষিণাত্য সভ্যতার ভেদবুদ্ধি (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত দাক্ষিণাত্য!), দাক্ষিণাত্যের নিষ্ঠুর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ এক কৃষ্ণকায় তথাকথিত ব্রাহ্মণের রূপে আর্য্যাবর্ত্তকে তথা আর্য্যত্বকে তথা বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে গ্রাস ক'রল। সেই দুর্দ্ধর্ষ তার্কিক রাহুর আবির্ভাব ভারতের ইতিহাসে অন্ধকার যুগের সূচনা রচনা ক'রে গেল। অখণ্ড ভারত-রাষ্ট্রের চিতাভস্ম মেখে সেই পরম শৈব যুক্তির ত্রিশূলের খোঁচায় অমিতাভের ধর্ম্মকে হিমালয়ের পরপারে নির্ব্বাসিত ক'রে দিলেন। এত কাল তারই প্রায়শ্চিত্ত চ'লেছে।

আধুনিক কাল নিয়ে বিচার করা যাক্। ইতিহাসের কুয়াসায় বহু সত্য মিথ্যা বলে মনে হ'তে পারে, বহু মিথ্যা সত্য ব'লে মনে হ'তে পারে। তা ছাড়া সুদূর কালের দূরত্বের মোহরাগ ত' আছেই!

স্থান অযুত পঙ্কল-দূষিত বেণুকুঞ্জছায়ান্ধকার অস্বাস্থ্যকর বাঙ্গলা

দেশ। ভারতের পূর্ব্ব প্রত্যন্ত। কাল, আধুনিক। এই দেব-বর্জ্জিত দেশে দেববর্জ্জিত কালে দেবোপম মহাপুরুষের আবির্ভাব বিস্ময়কর। রাজা রামমোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ, ভাগীরথীর মুখে ভারতবর্ষ আত্মসন্ধান শুরু ক'রেছে। রামমোহন সমাজ-জীবনে, রবীন্দ্রনাথ কাব্যে, অরবিন্দ আধ্যাত্মিক উল্লাসে যুগ-যুগান্তরজয়ী আর্য-সত্তাকে পুনরাবিষ্কার ক'রেছেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

মধুসূদনের লঙ্কাপুরী, বৃত্রের অমরাবতী (হেমচন্দ্র), নবীন সেনের রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাসকে পাশ কাটিয়ে ভানু সিংহের আলখাল্লা গায়ে শ্রীরবীন্দ্রনাথ গোবিন্দ দাস, শেখর ও লোচনদাসের বৈরাগী দলে ভিড়ে গিয়েছিলেন। অলক্ষ্যে জীবন-দেবতা হেসেছিলেন। গোবিন্দদাস-শেখর-লোচনের বৈরাগী দলে মন টিকল না। হৃদয়াবেগের উষ্ণ কূপ থেকে তাঁর মুক্তি হোল অনন্ত নভে—সেই আর্য দ্যৌ—সেই বরুণের নভঃ—তাঁর যাত্রা শেষ হোল বশিষ্ঠের লোকে—তাঁর কাব্য যাত্রা বাঙলার মনোভুবন থেকে ভারত-মনোভুবনে কিংবা আর্যমন-ভুবনে।

এই আর্য-মন নিঃশঙ্ক জীবনের রস-গাঢ় পাত্রটির চতুর্দ্দিকে লুব্ধের মত আর্য-আত্মা ঘুরিয়া ফিরিয়া মরে নাই। মরণের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে। জীবনের সঙ্গে মরণকে অনুভব ক'রেছে। অবশ্যম্ভাবী বিনাশ আর্য-মনকে ভীত শঙ্কাতুর ক'রে তোলেনি। যে শঙ্কা থেকে ধর্ম্মের উৎপত্তি ব'লে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত ক'রেছেন সে শঙ্কা আর্য-মনের শঙ্কা নয়, আর্যেতর মানব-মনের শঙ্কা। জীবন ও মৃত্যুর মৈত্রীতে আর্য মন সার্থক। যে জীবনকে অপরাপর মানুষ চরম সত্য ব'লে গ্রহণ ক'রেছে সেই জীবনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হ'য়ে পুনর্জন্মহীন মৃত্যুর মধ্যে আত্মবিলুপ্তির কল্পনা একমাত্র আর্য-মনকে আকৃষ্ট ক'রেছে। মৃত্যুকে অমৃতের পাথেয় ব'লেছে আর্য। আর্য-কল্পনায় খণ্ড খণ্ড মৃত্যু-স্রোতস্বতী এক অমৃত সমুদ্রে সার্থক হ'য়েছে।

বাঙলার মধ্যযুগে—মঙ্গল কাব্যের যুগে—বাঙালীর মন-গ্রহ আর্য-আকাশ থেকে স্খলিত ও অনার্য ভাবের পঙ্কিলতায় ও তার সদা শঙ্কিলতায় মগ্ন—আকণ্ঠ মগ্ন—তাই বাঙালীর কণ্ঠে সে দিন কোনো মৃত্যুঞ্জয়ী সুরোচ্ছাস উচ্ছ্বিত হয়নি।

সমাজে মানুষে মানুষে বিনিময়ের প্রতি পথ যখন বিচ্ছিন্ন, তখন সমাজরক্ষার জন্য ভয় দেখানো ছাড়া সমাজের গুরুদের আর হয়ত উপায়ান্তর ছিল না। যে সভ্যতায় ও ধর্ম্মে মানুষকে নীতিপথে ধ'রে রাখবার জন্য ভয় দেখাতে হয় সে সভ্যতা ও ধর্ম্ম অতি নিম্নস্তরের। শঙ্কাতুরতা অসভ্যতার চিহ্ন,—মানুষের বুদ্ধির পরাজয়, তার চিন্তার দীনতা। এই দীনতা ভারতের মনকে বহু কাল আচ্ছন্ন করেছিল—ভারতের পরাধীনতার মূলে, তার নিদারুণ ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের মূলে এই ত্রাস ও এই ত্রাস থেকে উদ্ভূত অতিপ্রাকৃত শক্তির উপর নির্ভর। মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে এই ভীরুতা সুপ্রকট। যখন প্রতীচী জ্ঞান-অঞ্জনশলাকায় মনের এই শঙ্কার অন্ধকার দূর ক'রছে তখন বাঙলার মন রসসিক্ত ভীরুতার পাত্রপার্শ্বে ক্ষীণ সুরে গুঞ্জনে রত। রায়মঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, মনসা কাব্য ইত্যাদি যে মনস্তর থেকে কল্পিত, তার স্বরূপ এত শঙ্কাতুর যে স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ হয়। অর্ব্বাচীন শাস্ত্রের মুখবন্ধে, অর্ব্বাচীন কাব্যের মুখবন্ধে, টীকায়, ভাষ্যে, তন্ত্রে, সর্ব্বত্র ত্রাস। মৃত্যুত্রাস।

এই বিশ্বভুবন-আঁধার-করা ত্রাস ভক্তি চিন্তুবের মনের ফসল। এই ত্রাস থেকে মুক্ত হয়েছে আর্য। আর্যেতর মানুষ যখন সদা সশঙ্ক,—আর্যেতর মানুষ যখন দেবতার উদ্যত বজ্রের শঙ্কায় নতজানু, যখন বন্যা ঝড়-ভূকম্পের ভয়ে বিপর্যস্ত বুদ্ধি, যখন বিশ্বের আনাচে-কানাচে শুধু ভয় আর্যেতর মানুষের মনকে আচ্ছন্ন ক'রেছিল, আর্য তখন ভয়কে উচ্চহাস্যে উড়িয়ে দিয়েছে; মৃত্যুকে স্বীকার ক'রেছে হাস্যমুখে। আর্য-ভাবধারা মানুষের মনকে প্রথম শঙ্কামুক্ত করেছে—আর্যের দর্শন তাই শক্তিতের দর্শন নয়—প্রেমিকের দর্শন বা দ্রষ্টার দর্শন। আর্যেতর মানুষের ঈশ্বর বজ্রধর দেবতার শেষ সংস্কৃত রূপ।

তমসঃ পরস্তাৎ আদিত্যবর্ণ পরম সত্তার কল্পনা, আর্য-কল্পনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথের মন আর্য-মন। রবীন্দ্রনাথের কল্পলোকে জীবন-মৃত্যুর যে অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটেছিল তার পূর্ণ চিত্র এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। স্বল্পের মধ্যে শুধু ধারা নির্দ্দেশ হ'তে পারে।

রবীন্দ্রনাথের সমন্বয় এই বাণীরূপ ধারণ ক'রেছে: যথা—

"ধূসর গোধূলি লগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্ত সূত্র গ্রন্থি দিয়ে বাঁধা—
চিনিলাম তখনি দোঁহারে।"

কিংবা,

রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায়, বেদনায়;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালবাসিলাম—
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এই জীবন—
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ ক'রে দিতে।" (১১৪১)

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বাঙলার মনের শঙ্কামুক্তি। বহু যুগের বহু শঙ্কার উর্ণা থেকে পরিচ্ছন্ন রবীন্দ্রনাথের মন স্বাধীন মানুষের আলোকোজ্জ্বল মনঃনভে রূপ-রস-গন্ধের উল্লাসে পরিমুক্ত। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভারতের আত্ম-আবিষ্কার। নিঃশঙ্ক যোদ্ধার উন্মুক্ত তরবারির মত শাণিত শঙ্কামুক্তি।

জন্ম মৃত্যুর অন্তরালটুকুর মধ্যে প্রবহমান তাঁর প্রাণস্রোত দুই কূলকে সমান প্রেমে আলিঙ্গন করে সমান সুরের ঝঙ্কার তুলেছে।

"বাইরে আমার দখিণ ধারে সূর্য্য ওঠার পরে
বাঁয়ের ধারে সন্ধেবেলায় নামবে অন্ধকার।
আমি কইব মনের কথা দুই পারেরি সাথে—
আধেক কথা দিনের বেলা, আধেক কথা রাতে।"
("ইচ্ছামতী" শিঃ ভো)

এই মৃত্যুঞ্জয় রবীন্দ্র-মন যোগীর মনের মত নির্ব্বিকল্প নহে। কখনো তাঁর চিত্ত দোলে সন্দেহে:

"তখন বিরাট বিশ্বভূবনে
দূরে দুরান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে
এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই—
"তুমি সুন্দর"
"আমি ভালবাসি"।
বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা ক'রতে
যুগ-যুগান্তর ধ'রে।
প্রলয় সন্ধ্যায় জপ ক'রবেন—
"কথা কও, কথা কও,"
বলবেন—"বলো তুমি সুন্দর"
বলবেন—"বলো আমি ভালবাসি"?

কিংবা—"এবার কি তবে শেষ খেলা হবে নিশীথ অন্ধকারে?
মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি অমাবস্যার পারে?
মালতী লতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে
তারায় তারায় তারি লুকাচুরি রাতে?
সুর বেজেছিল যাহার পরশপাতে নীরবে লভিব তারে?
দিনের দুরাশা স্বপনের ভাষা রচিবে অন্ধকারে?"

কখনো জীবনের সায়াহ্নে বিচ্ছেদের ক্ষণটিতে তাঁর মন বিধুর·········

"হঠাৎ তোমার চোখে দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে
আমার সময় আর নাই,
*   *   *   *
ফিরিয়া যেয়ো না, শোনো, শোনো,
সূর্য অস্ত যায়নি এখনো।"

মৃত্যুর শীতল সমুদ্রের মুখের কাছাকাছি—ঘরের খেয়ায়—তাঁর মন যেন বারেকের জন্য পরিত্যক্ত জীবনের—প্রবাসটির জন্য বিধুর—অন্যেরা জীবনের স্রোতে পাড়ি দিয়ে যাচ্ছে ঘরে—জীবনের ঘাটে ঘাটে যে ঘর—তাঁর তরীর ঠিকানা নেই—অকূল দরিয়ায় ভাসবে তার তরী—

"দাঁড়ের শব্দ ক্ষীণ হ'য়ে আসে ধীরে,
মিলায় সুদূর নীরে।
সেদিন দিনের অবসানে সজল মেঘের ছায়ে
আমার চলার ঠিকানা নাই, ওরা চলল গাঁয়ে।"

কখনো চ'লেছেন বধূরূপে মরণের পাণিতে জীবনের পাণি সমর্পণ করতে—তবু যাবার সময় যাঁদিকে ফেলে যাচ্ছেন, তাঁদিকে ডাকছেন—

"আয় রে ওরে মৌমাছি আয়, আয় রে গোপন মধুহরা—
চরম দেওয়া সঁপিতে চায় ওই মরণের স্বয়ম্বরা।"

যেন বধূর পতিগৃহযাত্রার পূর্ব্বক্ষণটির বিধুরতা।

কখনো মৃত্যুর অভিষেকে পরিশুদ্ধ মন উদাত্ত কণ্ঠে স্তবরত।

"শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও;
ফিরে নাহি চাও:
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয়;
নাই শোক, নাই ভয়,—
পথের আনন্দ বেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।
যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই,
পবিত্র সদাই।
তব নৃত্য মন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি' করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।
নিঃশেষ নির্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন।"

কখনো জীবনে ও মৃত্যুতে ভেদ গেছে ঘুচে; পরস্পর পরস্পরকে সুন্দর ক'রে দিয়েছে আপন আপন আলো-অন্ধকারে। কবি নিঃশঙ্ক বৈরাগ্যের চরম সৌন্দর্য-লোকে আসীন—কবি তখন শুদ্ধ দ্রষ্টা। বিদায়ের বিধুরতা নাই; অবসানের গোধূলির আকাশ সারা জীবনের বর্ণসম্ভার আসন্ন অন্ধকারের সঙ্গে গুলে' দিয়েছে—ক্ষোভহীন মন পৃথিবী ছেড়ে বিদায়ের পর এই বিচিত্রিতার ছবিকে কল্পনায় এঁকে চ'লেছে—

"আমারও যখন শেষ হবে দিনের কাজ,
নিশীথ রাত্রের তারা ডাক দেবে
আকাশের ওপার থেকে—
তার পরে?
তার পরে রইবে উত্তর দিকে
ওই বুকফাটা ধরণীর রক্তিমা,
দক্ষিণ দিকে চাষের ক্ষেত,
পূব দিকের মাঠে চ'রবে গোরু।
রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে
গ্রামের লোক যাবে হাট ক'রতে।
পশ্চিমের আকাশ প্রান্তে
আঁকা থাকবে একটি নীলাঞ্জন রেখা।"
(খোয়াই)

কবি নিজের কথা বিস্মৃত। যে জীবনের জয়গান গেয়েছেন এত দিন সেই জীবন চলবে অব্যাহত তাঁকে বাদ দিয়ে। তবু এখানে নিজের জন্য ব্যাকুলতা নাই। আপনার আত্মার গতিবিধি সম্বন্ধে তার মন প্রশ্নহীন। জীবনের চরম ক্ষণে শুধু আপনাকে নিয়ে থাকবার ক্ষুদ্রতা তাঁর নাই। তাই নিজেকে অবান্তর ক'রে নেপথ্যে ফেলে এসেছেন।

"সমস্ত জন্মের সত্য একখানি রত্নহাররূপে
দেখি ওই নীলিমার বুকে।" ("খুলে দাও দ্বার" ১১৪০)

এই তাঁর শেষ দিনের দর্শন। মৃত্যুর বুকে তার সমগ্র জীবনের একখানি সত্যচ্ছবি তিনি দেখে গেলেন! মৃত্যু বিরাট পটভূমি, জীবন এই অন্ধকার জমির উপর প্রাণের রঙ-রসের বুনোন। মৃত্যু অন্তরঙ্গ। জীবন-মৃত্যুর বিচ্ছেদ ঘুচে গেছে: প্রশ্ন ঘুচে গেছে; শুধু টিকে আছে শুদ্ধ দেখা—দর্শন। বাঙলার আত্মা রবীন্দ্রনাথের অসীম বিস্ময়ে অসীম পুলকে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে। হয়ত এ বাঙলার মন নয়। কিংবা হয়ত বাঙলার নূতন যুগারম্ভ।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ মূলতঃ মিষ্টিক। শ্রীরবীন্দ্রনাথও মিষ্টিক তবে উভয়ের মিষ্টিসিজম বিভিন্ন। "পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে

মম, কস্তুরী মৃগ সম", এই ছিল নবীন রবীন্দ্রনাথের মিষ্টিসিজম : প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ স্থির, তিনি দ্রষ্টা, বিশ্বলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় অন্তর্লোকে অধিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের সাধনা বিস্তারের সাধনা, রামকৃষ্ণের সাধনা ঘনত্বের সাধনা। রামকৃষ্ণের অনুভূতিতে বিশ্বলোক ঘনীভূত হ'য়ে অন্তর-পুত্তলিকায় পরিণত : রবীন্দ্রনাথের সাধনায় অন্তর-পুত্তলিকা বিশ্বলোকে ব্যাপ্ত। দুই বিপরীত সাধনা। দুই ভিন্ন পথ। রবীন্দ্রনাথের পথ বশিষ্ঠের পথ, আর্যের পথ, বেদের পথ, ভারতবর্ষের শাশ্বত সাধনার পথ। রামকৃষ্ণের পথ যোগের পথ, তন্ত্রের পথ, অনার্যের পথ—হয়ত পীত জাতির পথ।

বাঙলা দেশে মিষ্টিকদের একটা জন্মপরম্পরা লক্ষ্যণীয়। কাহ্নুপাদ, মীননাথ (চর্য্যাপদের মিষ্টিক), চণ্ডীদাস, মুসলমান আমলের ফকির দরবেশ, এঁদের শ্রেণী বাঙলা দেশ থেকে কোনো দিন লুপ্ত হয়নি : রামকৃষ্ণ এঁদেরই উত্তরাধিকারী। উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরাধিকারী। রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থানের সন্নিকটে রাজধানী হ'তে মাত্র বিশ ক্রোশ দূরে তাঁর জন্ম। চর্য্যাপদের মিষ্টিকদের "ডোম্নী", "শবরী", ধামা-ধুচুনি-হাঁড়ি-কলসীর ব্যঞ্জনায় ভাবপ্রকাশের ধারা আউল বাউল দরবেশদের মুখে মুখে রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত গড়িয়ে এসেছে। অবশ্য মার্জ্জিত আকারে। তাই বরবধূ ক্ষীরের পুতুল এদের ব্যঞ্জনায়, রামকৃষ্ণের মিষ্টিসিজমের ব্যাখ্যা। রামকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনতে পারেননি : বিদ্যাসাগরকে দেখতে গিয়েও হতাশ হ'য়েছিলেন।

মহেন্দ্র গুপ্ত, গিরিশ ঘোষ এবং তাঁদের শ্রেণীর ভাবানুরাগীদের অন্তরে তাঁর প্রভাব ফুটেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বাঙালী। আর্যমন-ভূবনে তাঁর অধিষ্ঠান নয়। মিষ্টিকরা কোনো ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারেন না। তাঁরা সুন্দর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। জাতি-সংগঠক নহেন। তাঁরা সংসারনিরপেক্ষ, পুত্র-কলত্রনিরপেক্ষ, সমাজনিরপেক্ষ, রাষ্ট্রনিরপেক্ষ।

রামকৃষ্ণও বাঙলার আত্মা। কিন্তু এ বাঙলা গোপালদেবের বাঙলা নয়। এ বাঙলা দরিদ্র, পরাধীন ; তার শিল্প লুপ্ত, সাহিত্য লুপ্ত ; বাণিজ্য লুপ্ত, ধর্ম্ম লুপ্ত,—এ বাঙলায় প্রধান, সওদাগরী অফিসের কর্ণধার, বিদেশী-অনুগ্রহপুষ্ট বাঙালী, কিংবা ব্যসনে মগ্ন জমীদার ; তীর্থ কালিঘাট : দালাল শৌণ্ডিক বণিক ও বেশ্যা-প্রধান সহর। নীলকরের উচ্ছিষ্ট বাঙলা। উপক্রত অধঃপতিত বাঙলা। জাতির মন এই জীর্ণতা থেকে মুক্ত হোল রামকৃষ্ণে। বহির্জগতে তার বিস্তার বন্ধ। আপনার মধ্যে রসসমুদ্র সন্ধান ক'রেছে সে। বাঙলার মন রসপ্রধান। তাই এই সময়ে বাঙলা দেশে রামকৃষ্ণের জন্ম।

রামকৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় হ'য়েছে—এই মতবাদ বাঙলায় চলিত। এটা অত্যুক্তি। বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত সমন্বয় কোনো ঈশ্বরবাদী ধর্ম্মের সম্ভব নয়।

তথাকথিত ধর্ম্মসমন্বয় সাধারণতঃ সুফল প্রসব করে না। তিব্বতের ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে আদি তিব্বতীয় ধর্ম্মের সমন্বয়। মহাচীনে কনফুসিয়াসের শিক্ষা, লাওৎসের প্রচার বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হ'য়ে মহত্তর রূপ পরিগ্রহ করেনি। চীনের ইউরোপীয় কলোনিগুলিতে প্রাচীন চীনা আকাশ-দেবতার ধারণা যিশুর ঈশ্বরের সহিত সমন্বিত হ'য়ে অপরূপ রূপ ধারণ ক'রেছে। চীনা খৃষ্টানকে "সমন্বিত খৃষ্টান" বলা যেতে পারে।

যাভাতেও ধর্ম্মে ধর্ম্ম মিশেছে—বৌদ্ধ-হিন্দু-ইসলামের অপূর্ব্ব সমন্বয়। ধর্ম্ম কিছু দেশ-কাল ও জাতি-নিরপেক্ষ নয় যে বহু ধর্ম্মকে একত্র সন্নিবেশিত করা সম্ভব।

অসভ্য, সভ্য, অর্দ্ধসভ্য প্রত্যেক মনুষ্যগোষ্ঠীর ধর্ম্মকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখা গেছে ধর্ম্মের মূল ত্রিবিধ। মানুষের সত্তানুভূতির তিন ধারার সঙ্গে ধর্ম্মের তিন মূল লগ্ন : প্রথম ভৌতিক অনুভূতি, দ্বিতীয় আধিভৌতিক অনুভূতি, তৃতীয় পরিশুদ্ধ নৈতিক মননবৃত্তি। প্রথম অনুভূতি থেকে প্রকৃতি পূজার উৎপত্তি, দ্বিতীয় থেকে উৎপত্তি দেহচ্যুত পিতৃপুরুষদের আত্মার উপাসনার, তৃতীয় বিশ্বনিয়ামক এক বিরাট সত্তার অনুভূতি। এই শেষোক্ত বিরাট শক্তি মঙ্গলময়—সকল নীতির উৎস—নৈতিক জীবনের নিয়ন্তা। এই তৃতীয় মূল থেকে ঋক্‌বেদের বরুণের উৎপত্তি, জরথুষ্ট্রের আহুর মাজদার উৎপত্তি, জুপিটারের উৎপত্তি।

L. Von Schoeder এর ভাষায় (Arische Religion Erster Band, H. Haessel verlag in Leipzig, 1914, p 113) "So entspricht offebar die Natur verchneng dein siunliches, der Seelen-und Geister kult dein geistigen, der Glaube an ein lochstes gutes (en) und das Gute for derndes Wesen dein sittlichen Peile der Menschen Natur."

মর্ম্মার্থ—মনুষ্য-প্রকৃতির তিন অংশ—এক অংশে ইন্দ্রিয়ানুভূতি এখান থেকে উদ্ভূত প্রকৃতি-উপাসনা—আর এক অংশে আধিভৌতিক অনুভূতি এখান থেকে উৎপত্তি প্রেতপুরুষের উপাসনার—তৃতীয় অংশে নীতিবোধ, সেখান থেকে এক মঙ্গলময় মঙ্গলবিধায়ক অদ্বিতীয় সত্তার অনুভূতির উৎপত্তি।

এক এক ধর্ম্মে মনুষ্য-প্রকৃতির এক এক দিক্ প্রাধান্য লাভ করে। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ব'লে কিছু নাই। সর্ব্বধর্ম্মের মূল মনুষ্য-প্রকৃতির এই তিন অংশে নিবদ্ধ। এই প্রেরণাত্রয়ী পরস্পর সংমিশ্রিত হ'য়ে বহু বিচিত্র ধর্ম্মের সৃষ্টি ক'রেছে।

বেদের মরুৎ, রুদ্র ভৌতিক দেবতা। বরুণ পরম সত্তা। ঋতের ধারক। প্রাক্‌বেদ-কালের আর্য দেবতা "দ্যৌপিতর"কে নির্ব্বাসিত ক'রে বরুণ বরেণ্য হ'য়ে উঠেছেন ঋক্‌বেদের কালে। এই 'দ্যৌপিতরে'র পিতা আধিভৌতিক। এই পিতার ধারণা বরুণের মধ্যে গৌণ। "দ্যৌপিতর" থেকে বরুণের অভ্যুদয় এক ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন। এই প্রাচীন "দেবঃ অসুরঃ" থেকে আহুর মাজদার অভ্যুদয় আর এক ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন। আবার আত্মন্-ব্রহ্মন্ (আত্মন্ আধিভৌতিক) থেকে বুদ্ধের অপসরণ আর এক ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন। যুগে যুগে এই তিন মনস্তরের একটিকে আশ্রয় ক'রে নব নব ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে এসেছে। সমন্বয় সাধন নূতন নয়। প্রত্যেক মৃত বা জীবিত ধর্ম্মের মধ্যে ভৌতিক আধিভৌতিক ও নৈতিক এই তিন স্তরের মিশ্রণ অবিসংবাদিত। সমন্বয় কথাটা অনর্থক রামকৃষ্ণের ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হ'য়েছে। আসলে রামকৃষ্ণ মিষ্টিক। তাঁহার জ্ঞাত সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের পারিভাষিকে তিনি তাঁর মিষ্টিসিজমের ব্যাখ্যা ক'রেছেন। একে সমন্বয় বলে না। তাঁহার মিষ্টিসিজমের পরিভাষা (vocabulary) অসাধারণ ভাবে সমৃদ্ধ।

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দ ভারতবর্ষের সর্ব্বাধুনিক ধর্ম্মপ্রচারক। এবং শক্তিমান্ ধর্ম্মপ্রচারক। ভৌতিক, আধিভৌতিক ও নৈতিক সত্তার মধ্যে

তিনি সমন্বয় সন্ধান ক'রেছেন। ধর্মের এই ত্রিবিধ প্রেরণাকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন স্বাধীন প্রেরণা ব'লে তিনি মনে করেন না। এই ত্রিবিধ প্রেরণাকে এক বৃহৎ প্রেরণার মূলে সন্ধান ক'রেছেন। বস্তু, মন ও আত্মা এই তিন স্তরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন তাঁর সাধনা।

সৃষ্টি সমাপ্ত নয়, চিরকালের জন্য সিদ্ধ নয়। মানুষের মধ্যেও সৃষ্টি চ'লেছে অব্যাহত। বস্তু-সৃষ্টির আদি স্তর; পরবর্ত্তী স্তর মন তারও পরবর্ত্তী স্তর আত্মা (আত্মন্)। "পরবর্ত্তী" কথাটা ঠিক এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ এ অভিব্যক্তি কালপরম্পরার অভিব্যক্তি নয়। এই তিনের প্রকাশ একই অস্তিত্বের বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তি। সেই একমেব সত্তার বিশেষ বিশেষ প্রকাশ অর্থাৎ সৃষ্টি। এবং সমকালিক সৃষ্টি। অরবিন্দের সাধনা প্রকাশের সাধনা, সৃষ্টির সাধনা। তাঁর মতবাদ ধ্বংসমূলক নয়, জৈব সত্তাকে ধ্বংস ক'রে তার উপর মনন ও মনকে ধ্বংস ক'রে বা রুদ্ধ ক'রে আত্মার (আত্মন্) বিকাশ তাঁর সাধনার পথ নয়। বস্তু সৎ, মন চিৎ আনন্দ সর্ব্বোপরি। সৎ চিৎ আনন্দ এক সত্তা। সৃষ্টিতে তথা মানুষের মধ্যে বিকাশের সমাপ্তি ঘটে নাই। তাই তাঁর কল্পনায় অতিমানুষ একটি সত্য সম্ভাবনা। মানুষ বিকশিত হবে। সেই বিকাশের পথ নির্দ্দেশ ক'রেছেন তিনি। এই বিকাশের পথ সত্তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয়। মানুষের এই পরবর্ত্তী সাধনা। সত্তার বিভিন্ন আপাতবিরুদ্ধ স্তরকে এক সুরে বেঁধে দিতে হবে।

জৈব বিবর্ত্তনে বিপরীত মনস্তরের মধ্যে পরস্পর মিলন ঘটছে। উদাহরণ, পশুজগৎ ও বিহগ-জগতে প্রণয়লীলার ক্রমবিকাশ। পক্ষীদের মধ্য এই প্রণয়লীলা বিচিত্র। নিছক জৈব প্রবৃত্তির সঙ্গে আনন্দ এমন ভাবে বিজড়িত যে পক্ষিদের প্রণয়ের মধ্যে রসলীলার সূত্রপাত হ'য়েছে বলা যায়। পশুদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যৌন-প্রবৃত্তি অন্য প্রবৃত্তি থেকে স্বতন্ত্র—পক্ষিদের মধ্যে যৌন-লীলার সঙ্গে যৌন-প্রবৃত্তিবহির্ভূত নিছক উল্লাস-বিজড়িত। মানুষের মধ্যে এই প্রবৃত্তি "প্রেম"এর রূপ ধারণ ক'রেছে: মনের উচ্চতম স্তরে পর্য্যন্ত এই জৈব স্তরের স্পন্দন সঞ্চারিত। উচ্চতম হতে নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত এক সুরস্পন্দন মানুষের প্রেমকে বৈচিত্র্য দিয়েছে। এই ভাবে মনের মধ্যে স্তরের পর স্তর পরস্পরের সঙ্গে এক ধ্বনিতে মিলিত হ'য়ে আসছে। জার্ম্মাণ ভাষায় এই মিলনার্থক একটি সুন্দর কথা আছে—Einklang.

মানুষ আপনাকে সৃজন ক'রছে—মানুষ ঈশ্বর-সৃজন ক'রছে। মানুষের অন্তরে বহু স্তর-ভেদ—এক এক স্তর যেন এক এক বিবর্ত্তন-যুগের সৃষ্ট স্তর—যেন বহুস্তরা ধরিত্রী—এক এক যুগের নিদর্শন এক এক মৃত্তিকা-স্তর—মানুষের অন্তরে বহু স্তরভেদ।

মানুষের মনের এক এক স্তর যেন এক এক সুরে বাঁধা। তাই মানুষের মন এত "বেসুরো", এত বিপর্য্যস্ত। এই বিক্ষিপ্ত অস্তিত্বকে এক অখণ্ড অস্তিত্বে আনয়ন, এই হোল মানুষের নূতন বিবর্ত্তন—সমস্ত স্তরের এক সুরে ঝঙ্কার। এই হোল বিশ্বকবির সাধনা, অরবিন্দের সাধনা, আর্য-সাধনা। তাই অরবিন্দ Superman, অতিমানুষকে অসম্ভব কল্পনা ব'লে উড়িয়ে দেননি, সম্ভব কল্পনা ব'লে মেনেছেন। Supermanএর প্রসঙ্গে Nietzscheর কথা আগে মনে পড়ে। তিনিই প্রথম Supermanএর কল্পনাকে সম্ভাব্য ব'লে প্রমাণ করেছেন।

নীট্শে

গ্রীসীয় নগররাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে নীট্শে প্রথম Superman আদর্শের মূল সূত্র আবিষ্কার করেন। রাষ্ট্রের ভিত্তি দাস। রাষ্ট্র এক কথায় বহু সংখ্যক দাস-পরিচালক একক প্রভু কিংবা প্রভুসম্প্রদায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে দাস্য সহজাত। সহজাত দাস্য রাষ্ট্রের ভিত্তি। এই দাস্যে চালিত হ'য়ে সাধারণ মানুষ রণক্ষেত্রে প্রাণ দেয়; দেশাত্মবোধ এই অনুভূতির একটা বৃহত্তর রূপ। সাধারণ মানুষ নিজের ক্ষুদ্রতা সম্পর্কে সজ্ঞান ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান। দাস্যভাব এই ক্ষুদ্রতাবোধজনিত। নিজেদের স্বাধীনতা অর্থাৎ যথেচ্ছ আবরণের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে সাধারণ রাষ্ট্রীয় মানুষ নেতার নেতৃত্ব স্বীকার ক'রে নেয়। নিজেকে ধ্বংস করে সাধারণ মানুষ কোন বৃহৎ মানুষের, কোনো শক্তিধর পুরুষের যাত্রাপথ সরল ও সহজগম্য ক'রে দেয়। এই যে নেতার জন্য সাধারণের আত্মবিলোপের প্রবৃত্তি ইহা শাশ্বত দাস্যভাব। রাষ্ট্রের লক্ষ্য শক্তি। সাধারণ প্রজা নিজেদের দাসত্বকে তীব্রতর ক'রতেও পশ্চাৎপদ হয় না, যদি সেই দাসত্বের ফলে তাদের রাষ্ট্র আরও শক্তিমান্ হয়।

মানুষ শক্তির তপস্যা করছে। নিজের মধ্যে পূর্ণ সাফল্য অসম্ভব বলে রাষ্ট্রের মারফৎ নেতার মাধ্যমে তার শক্তি সাধনা চলেছে। এই রাষ্ট্রের বাতাবরণে সুপারম্যানের জন্ম হবে।

এই সূত্র থেকে Supermanএর জন্ম। "Also sprach "Zarathustra" ("অথ জরথুস্ত্র উবাচ")তে এই সুপারম্যানের পরিপূর্ণ বিকাশ। মহামানব পরিপূর্ণ শক্তি ("Wille"); সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতাকে নিঃশেষে ভস্মীভূত করেছেন তিনি: শক্তির কোনো সীমা তাঁর গতিকে রুদ্ধ করে না! মানবগোষ্ঠীর কালো মেঘে তিনি অশনি, সমস্ত কিছু মানবীয়তার উর্দ্ধে তিনি—স্নেহ-প্রীতিবন্ধন, মায়া-দয়া,-করুণা মানব-শক্তির এই সব সীমা তাঁকে স্পর্শ করে না। তিনি দারুণ নিষ্ঠুর, রুদ্রের রুদ্র—সমগ্র মানব সমাজ তাঁর পদতলশায়ী—তাঁর বহ্নিকে পরিবর্দ্ধিত করার জন্য আপনাকে ভস্মীভূত করাই সাধারণ মানুষের ধর্ম্ম। মায়া-দয়া-করুণা দুর্ব্বলের সহিত শক্তিমানের আপোষ। মহামানব এই আপোষের অতীত।

তিনি মানব নহেন। মানবত্বের কোনো মানদণ্ডে তাঁর পরিমাপ হয় না। মানুষের ভস্মস্তূপ হতে তাঁর উদ্ভব। মনুষ্যসৃষ্ট সমাজ, মনুষ্যসৃষ্ট শিল্প-সাহিত্য, মনুষ্যসৃষ্ট রাষ্ট্র, মনুষ্যকল্পিত ঈশ্বর কোনো কিছু এবং কেহ তাঁহার শক্তির সীমা নির্দ্দেশ ক'রতে পারে না। তাঁর মধ্যে মানুষী দুঃখ-সুখ, বিষামৃত, হিংসাদ্বেষ চরমতম ও শেষ পরিণতি লাভ ক'রেছে।

অরবিন্দের মহামানব ও নীটশের মহামানবের মধ্যে একটা যোগ আছে। অরবিন্দের মহামানবের মধ্যে মানবীয় অস্তিত্বের ভিন্ন ভিন্ন স্তর এক মহা সুরে ঝঙ্কৃত; এই ঝঙ্কার কোনো বিশেষ প্রবৃত্তি-স্তরের ঝঙ্কার নয়, ভৌতিক বা আধিভৌতিক স্তরের ঝঙ্কার নয়, এ ঝঙ্কার কল্পনাতীত—সৃষ্টিতে অভিনব।

নীটশের মহামানবের মধ্যে সমস্ত প্রবৃত্তির চরম বহ্নি-বিকাশ—এক অশনিছন্দে তাঁর সত্তা স্পন্দমান। অরবিন্দের মহামানব ঈশ্বরকে আবিষ্কার ক'রেছেন কিংবা আপনার মধ্যে সৃজন ক'রেছেন, নীটশের মহামানব মানুষী ঈশ্বর চেনেন না, তিনিই তাঁর শেষ পরিণতি। নীটশের মহামানবের পরপারে কোনো অস্তিত্ব নেই। জীব তথা

মনুষ্য অভিব্যক্তির শেষ পরিণতি নীটশের মহামানব। মানুষের অভিব্যক্তির পূর্ণচ্ছেদ। মানুষ ও মানুষী সভ্যতা মহামানবের যাত্রা-পথে একটা গর্ভাঙ্ক মাত্র।

শ্রীযুত অমিয় চক্রবর্ত্তীকে বার্ণার্ড শ' এক পত্রে লিখেছিলেন: (নববর্ষ সংখ্যা বসুমতী ১৩৫৩), "তোমাকে তিনি (ঈশ্বর) নিশ্চয়ই সৃষ্টি ক'রেছেন তাঁরই প্রকাশের যন্ত্ররূপে—তাঁর ইচ্ছাকে জয়ী করার জন্য তোমার সৃষ্টি, তা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নাই। তুমি তাঁকে নিরাশ ক'রেছো, কেন না তাঁকে সাহায্য না ক'রে তুমি নিজের প্রতি দয়া ক'রছ আর দোষ দিচ্ছ তাঁকে। কিন্তু নিরাশ হওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁর বারংবার ঘটেছে। যখন তিনি গোখরো সাপ তৈরী ক'রেছিলেন তাঁর মনে হ'য়েছিল পৃথিবীকে উদ্ধার ক'রবে ঐ সাপ, কিন্তু তা হোল না, তখন তিনি সাপকে মারবার জন্যে বানালেন বেজীকে। তুমি যদি সাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ না দাও, তা হ'লে তিনি মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু বানিয়ে তোমাকে হত্যা ক'রবেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।"

এই "মানুষের থেকে বড়ো" নীটশের মহামানব (Ubermanen) এই মহামানব বা অতিমানব মানুষকে ধ্বংস ক'রবে। বার্ণার্ড শ' ব'লেছেন 'সাপকে "মারবার" জন্যে বেজীকে বানালেন'। অভিব্যক্তি-পথের বাঁকে বাঁকে এই ধ্বংসলীলা। বার্ণার্ড শ' ঈশ্বরকে সৃষ্টির এই অভিব্যক্তির মূল সংঘটক ব'লে গ্রহণ ক'রেছেন। ঐ চিঠির এক জায়গায় লিখেছেন, "তুমি দেখছ নির্ব্বুদ্ধিতা, মূর্খতা এবং দুর্ব্বলতা দ্বারা তাঁর প্রকাশ ব্যাহত হ'চ্ছে। তুমি কি স্পষ্ট বুঝতে পারছো না যে ঈশ্বর স্বয়ং এই সব বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করছেন, সৃষ্টির অভিব্যক্তি হ'লো তাঁর চেষ্টার দীর্ঘ ইতিহাস—তিনি চান এমন হাত, এমন বুদ্ধি বানাতে যার দ্বারা পরাজিত সংসারকে তাঁরই দিকে আনা যায়। তুমি কি আমার ম্যান এণ্ড সুপারম্যান নাটকের তৃতীয় অঙ্ক পড়োনি? যদি না প'ড়ে থাকো তাহ'লে আমার কাছে পরামর্শের জন্য কেন এলে?"

নীটশের দর্শনে এই ঈশ্বর নেই। নীটশে-জরথুষ্ট্র ঈশ্বরকে অনুমান ব'লে উড়িয়ে দিয়েছেন। মানুষকে একমাত্র, অদ্বিতীয় ব'লে গ্রহণ ক'রেছেন। এই মানুষ আপনাকে স্বেচ্ছায় নিঃশেষিত ক'রবে মহামানব সৃষ্টির তাগিদে। এই হোল মানুষের ধর্ম্ম। মানুষ চাইবে "এমন হাত, এমন বুদ্ধি বানাতে" যার দ্বারা মানুষ ধ্বংস হ'য়ে যাবে, আর সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে যুগবিধ্বংসী অনলশিখার মত মহামানবের অভ্যুদয় হবে। নীটশে-জরথুষ্ট্র ব'লেছেন, "Man should dance over his own head", মানুষ আপনাকে অতিক্রম ক'রে আপনার শীর্ষে নৃত্য ক'রবে। আমাদের চেনা এই মনুষ্য প্রকৃতিকে ভস্মসাৎ ক'রে সেই অতিপ্রাকৃত মহামানব জ্বলে উঠবেন।

লক্ষ লক্ষকে মহা কুরুক্ষেত্রে আহুতি দিয়ে মহামানব আপনাকে সৃজন ক'রবেন। প্রতিভা জয়ী হবে; প্রকৃতি বিজিত হবে। মৃত্যু বিজিত হবে, ভয় জিত হবে; জিত হবে কোটি কোটি কুটিরকোণাশ্রয়ী মনুষ্যকীট। শক্তি, পূর্ণশক্তি, শুদ্ধ শক্তি, will.

* * * *

আত্মবিলুপ্তি (বিভিন্ন অর্থে) প্রত্যেক ধর্ম্মের মর্ম্মকথা। কোথাও দেখি পরার্থে আত্মবিলুপ্তি, কোথাও ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব সমর্পণ, কোথাও রাষ্ট্রের মধ্যে আত্মবিলুপ্তি। আত্মবিলুপ্তি ধর্ম্মের মর্ম্মকথা।

নিজেকে অস্বীকার ক'রবে, নিজেকে পীড়ন ক'রবে, নানা ধর্ম্ম আত্মবিলুপ্তিকে নানা প্রকারে উৎসাহিত ক'রে এসেছে। কেহ কেহ বিদ্রোহ ক'রেছেন। এ দেশে অরবিন্দ বলেছেন: "Denial of the Ascetic", জার্ম্মাণীতে নীটশে এই আত্মলোপ প্রচারকারীদের নাম দিয়েছেন "Preachers of Death"—এদের প্রতি তাঁর দুর্জ্জয় ব্যঙ্গ প্রমত্ত শিখের কৃপাণের মত ঝলসে উঠেছে।

সৃষ্টির দুই দিক্, বিলোপ ও স্ফূর্ত্তি। ধর্ম্ম শুধু বিলুপ্তির সাধনা নহে। তাই নীটশের অতিমানুষের স্ফুরণে সহায়তা মানুষের উদ্দেশ্য ও সেই উদ্দেশে সাধারণ মানুষের তথা সকল মানুষের আত্মলুপ্তি। ধর্ম্ম নূতন সৃষ্টির সহায়ক না হ'লে সে ধর্ম্ম চূড়ান্ত অধর্ম্ম। ধর্ম্ম বন্ধন নয়। ধর্ম্ম কোনো মানুষকে বা সমাজকে এক বিশেষ কালে, এক বিশেষ বাতাবরণে বন্দী ক'রে রাখে না। ধর্ম্মের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মুক্তির সুর। যে ধর্ম্ম মানুষের অভিব্যক্তিকে পূর্ণতার দিকে প্রেরণা দেয় না সে ধর্ম্ম মিথ্যা। এবং যে ধর্ম্ম রাষ্ট্রকে রক্ষা ক'রতে পারে না সে ধর্ম্ম ব্যর্থ। কারণ, রাষ্ট্র জনসাধারণের অভিব্যক্তির সোপান।

সভ্যতায় সমাজে, মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে এক কালীন বিলোপ ও বিকাশ চ'লেছে। বিকাশটাই মুখ্য: এই বিকাশের জন্য বিলোপ। কাহার বিকাশ? নীটশের ভাষায় "Wille" (will) এর বিকাশ। ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টি নয়। ধ্বংসের জন্য সৃষ্টি। সৃষ্টির জন্য ধ্বংস। নূতন সৃষ্টির মধ্যে পুরাতনের চিহ্ন থাকে না। পুরাতনের চিহ্ন থাকলে বুঝতে হবে ধ্বংস সম্পূর্ণ হয়নি, নূতন সৃষ্টিও হয়নি। প্রকৃতি যুগ যুগ ধ'রে ধ্বংস ক'রে চ'লেছে। ধরিত্রী স্তরে স্তরে প্রাচীন সৃষ্টির কঙ্কালের হাহাকার বহন ক'রে চলেছে।

নূতন "সৃষ্টির" মধ্যে যারা পুরাতনকে নবীন রূপে দেখতে চায় বা নূতন সৃষ্টির মধ্যে পুরাতনকে নব রূপে পুনরুজ্জীবিত ক'রতে চায় তারা ভ্রান্ত। নূতনের সঙ্গে পুরাতনের কোনো আপোস হ'তে পারে না: ধ্বংসের সহিত সৃষ্টির আপোষ চ'লে না। প্রদীপের তেলের সঙ্গে তার শিখার কোনো আপোস চলে না।

যারা পুরাতনকে নবীন রূপে বিলুপ্তি হ'তে রক্ষা ক'রতে চায় তারা সভ্যতার শত্রু, তারা অভিব্যক্তির বাধা। তাদেরও ধ্বংস অনিবার্য্য। পরিপূর্ণ ধ্বংস না হ'লে সত্য নূতন সৃষ্টি সম্ভব নয়।

আজ পৃথিবীর সমাজে, সভ্যতায়; ব্যক্তির জীবনে বহু পুরাতন, বিধ্বস্ত, গলিত অবস্থায় বিরাজ ক'রে অভিব্যক্তির স্রোতমুখ আটকে আছে। সেই ধ্বংস সম্পূর্ণ হোক—সেই গলিত পুরাতনের শব নিশ্চিহ্ন হোক। সাহিত্যে, কলায়, বিশ্বাসে, রীতিতে পুরাতনের পূতিগন্ধ—এই পূতিগন্ধের বিনাশ হোক। পুরাতনের ধ্বংস হোক। আপোষ করবে না। এই হোল নীটশের বাণী। মহামানবের অভ্যুদয়ের সোপান। তাই নীটসের Ubermann নিষ্ঠুর, কালের চেয়েও নিষ্ঠুর: কাল পূতিগন্ধ বহন করে। মহামানব নিঃশেষে ধ্বংস করে। এই ধ্বংস মানুষের ধর্ম্ম। মহামানবের বেদীমূলে মানবের স্বেচ্ছায় পূর্ণ আত্মাহুতি। টুক্‌রা টুক্‌রা পুরাতনকে বহন ক'রে চলেছে আমাদের এই নবীন কাল—মহামানব অভ্যুদিত হয়ে নবীন কালস্রোতকে পরিচ্ছন্ন ক'রবেন।

রামকৃষ্ণের মধ্যে ধ্বংস নাই। তিনি অসীম মমতায় জননীসুলভ বাৎসল্যে নবীন-প্রাচীন-জীবন্ত-শবীভূত সকলকে অনুভূতির ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়েছেন;—মমতার আপোষ! অরবিন্দের মধ্যে ধ্বংস ও সৃষ্টি অভিন্ন—সচ্চিদানন্দের ইচ্ছাতরঙ্গবিলাস;—বুদ্ধির আপোষ!

এই মানুষী মমতা, মানুষী বুদ্ধি পুরাতনকে বিলয় থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ধ্বংসকে সম্পূর্ণ হ'তে দেয়নি। তাই জীবন ভারাক্রান্ত—সভ্যতা ভারাক্রান্ত—ভারতের অন্তরাকাশ বিগত কালের স্তূপীকৃত জঞ্জালে অপরিচ্ছন্ন। ভারতবর্ষের আত্মা যেন সনাতন শববাহক।

যাকে আমরা সনাতন শাশ্বত বলি তা শুধু প্রাচীনের নামান্তর। প্রাগৈতিহাসিক (?) যুগের নিঃশ্বাসার্থক "আত্মন্" শব্দ পরবর্ত্তী যুগ-পরম্পরায় বহু কল্পনায় পরিপুষ্ট হ'য়ে শেষে "আত্মন্-ব্রহ্মন্"এ পরিণতি লাভ ক'রেছে। এই "আত্মন্" সত্য সনাতন ব'লে কাল একে বাঁচিয়ে রাখেনি। সত্যই কাল কিছুকে বাঁচিয়ে রাখে না। বাঁচিয়ে রাখে মানুষ কালের বিরুদ্ধে। মানুষের মধ্যে জড়তা আছে ব'লে পুরাতনকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রবৃত্তি তার মধ্যে এত পরিস্ফুট। এই জড়তাকে ধ্বংস ক'রে অতিমানুষের জন্ম হবে।

মমতা বা প্রেম পুরাতনকে ধ্বংসের হাত হ'তে বাঁচিয়ে এসেছে। তাই মমতা ও প্রেম মহামানব-অভিব্যক্তির পরিপন্থী। বুদ্ধিও পুরাতনকে নূতন মর্ম্মার্থে ভাববান ক'রে বাঁচিয়ে রাখে। বুদ্ধিও মানুষকে বিভ্রান্ত করে। বুদ্ধিও মহাপুরুষ অভিব্যক্তির পরিপন্থী। কাব্য? কাব্য কোনো দিন ধ্বংস করে না। যুগযুগান্তর থেকে আহৃত মৃত পুরাতনের—পুরাতন ভাব, পুরাতন কাহিনী, পুরাতন অনুভব—পুরাতনের ভগ্নাংশ দিয়ে কাব্যে গজদন্তস্তম্ভ তৈরী। কাব্যে মুক্তি নাই। মানুষ আপনাকে ভালবেসেছে: আপনাকে ধ্বংস করার চিন্তা মানুষের সহজ নয়। এই আত্মরতি থেকে মানুষ মুক্ত না হ'লে বিবর্ত্তন বন্ধ হ'য়ে যাবে। কিংবা বিবর্ত্তন বিপরীত দিক্‌গামী হবে। এই রতিকে ধ্বংস করবার উপায় বৃহৎ-রতির মধ্যে এই আত্মরতির বিলোপ। আত্মরতিকে তার বিপরীত কিছুর দ্বারা ধ্বংসের প্রণালী অভিব্যক্তির পশ্চাদ্‌গামী প্রণালী। রতিকে রতি দ্বারা অতিক্রম ক'রতে হবে। আত্মরতিকে রাষ্ট্ররতির মধ্যে বিলুপ্ত ক'রতে হবে। রাষ্ট্ররতি মহামানব-রতির মধ্যে বিলুপ্ত হবে। রতিকে বিপরীত কিছু দ্বারা বিনষ্ট করতে গেলে উদ্দেশ্য সফল হবে না। পুরাতন রতি—রতির মমতায়, কাব্যের কুঞ্জচ্ছায়ায় বেঁচে থাকবে।

ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র

জীবন ও মৃত্যুর ব্যাখ্যা মানুষের চিরন্তন সমস্যা। সভ্যতার প্রথম হ'তে মানুষ জীবনের ব্যাখ্যা সুরু ক'রেছে। যে বিচিত্র প্রাণরস বহু রূপে বিশ্বে উচ্ছ্রিত হ'য়ে প'ড়েছে তার উৎস সন্ধান করেছে মানুষ যুগে যুগে। জীবনের উৎস সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরী করার পর মানুষ জীবনের উদ্দেশ্যকে নির্ণয় ক'রতে চেষ্টা ক'রেছে। জীবনের উৎসে এক পরমপিতাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছে: কারণ মানুষের পিতার সঙ্গে পরিচয় প্রত্যক্ষ এবং পিতা নবজন্মের মূলাধার। তাই ঈশ্বর পিতা। তাই প্রাচীন আর্যদের ঈশ্বর "দ্যৌপিতর"—আকাশও পিতা। আকাশের মত উর্দ্ধাসীন, পৃথিবীর অমঙ্গল ক্লেদ-ধর্ম্মের অতীত, সমস্ত পাপের অতীত—পরমপিতা। পিতৃত্ব ধারণার চরম পরিণতি। জীবনের উদ্দেশ্য আপাত দৃষ্টিতে অনির্দ্দেশ্য। বৃত্তের ধারণা সভ্যতার সহজাত, তাই বৃত্তাকারে আত্মার (প্রেত) পরিভ্রমণ মানুষের কল্পনায় প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রেছে। জীবন পরমপিতা থেকে উৎসৃত হ'য়ে পরমপিতাতে বিলীন হবে। এক এক জীবন এই বহু কালব্যাপী বৃত্ত-নাট্যের একটা গর্ভাঙ্ক (Interlude).

জীবন শুধু মানুষে আবদ্ধ নাই: জীবনের অশেষ প্রকাশ। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে জীবনের কল্পনা করেছে মানুষ। তাই মানুষের চক্ষে বায়ু-জল-মৃত্তিকা সমস্তই প্রাণবন্ত। এক পরমপুরুষ দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট। জীবন সম্বন্ধে এই সহজ ব্যাখ্যা মানুষের বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। জীবন যত জটিল হ'য়েছে জীবনের ব্যাখ্যান তত দুরূহ হয়ে উঠেছে। জীবন কোনো ঋতের ধার ধারে না। যে ঋতা চন্দ্রসূর্য্যগ্রহ-নক্ষত্রকে সুশৃঙ্খলে চালনা ক'রছে সেই ঋত জীবনের মধ্যে প্রকট হোল না কেন? মানুষের অন্তরে, বাহিরে, তার চিন্তায়, তার সামাজিক জীবনে পরস্পর-বিরোধী বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির ও বিরুদ্ধ গতির প্রকাশ পাচ্ছে অহরহঃ। এই দুর্জ্জয় বিরোধের মূল সন্ধান ক'রেছে মানুষ। বিরোধকে ব্যত্যয় ভেবেছে। বিরোধকে মায়াপ্ররোচিত বলে মনে করেছে। কোনো ধর্ম্ম বিরোধকে মানুষের শিক্ষা ব'লে প্রচার করেছে: কিন্তু এই বিরোধকে কেহ অস্বীকার করেননি। এই বিরোধ মানুষকে অনুভূতির বৈচিত্র্য দান করেছে। দিবানিশি এই অন্তর্বিরোধ—মানুষের অন্তর্লোকে প্রবৃত্তিতে প্রবৃত্তিতে বিরোধ—সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ—কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের বিরোধ—দর্শনের সঙ্গে জীবনের বিরোধ—এই অন্তর্বিরোধকে আশ্রয় ক'রে মানুষের কাব্য-মহাকাব্য গড়ে উঠেছে। কিন্তু বিরোধকে মানুষ অমঙ্গল ভেবেছে।

সমস্ত বিরোধের উপরে জীবন ও মৃত্যুর বিরোধ। মৃত্যুকে জীবনের বৃহত্তর অয়নচক্রের মধ্যে স্থাপন করে মানুষ এই বিরোধের মীমাংসা করবার প্রয়াস পেয়েছে। জীবনের উদ্দেশ্যের মত মৃত্যুর উদ্দেশ্য তার কাছে কুয়াসাচ্ছন্ন থেকে গেছে। তাই বিনা দ্বিধায় মানুষ জীবনকে মৃত্যুর পরপার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ক'রেছে। জীবনকে মহিমান্বিত করেছে—মৃত্যুকে এক তুচ্ছ সাময়িক ছেদ বলে গ্রহণ করেছে—মৃত্যুর অন্ধকার অবকাশটি জীবনের দীপমালার মধ্যে মধ্যে গেঁথে দিয়ে গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রেছে।

মৃত্যুকে প্রশস্ত করার কথা মানুষের মনে হয়নি কেন? মৃত্যুর পরপারে জীবনকে স্থাপন করা ও জীবনের পরে মৃত্যুকে স্থাপন করার মধ্যে মূলতঃ কোনো প্রভেদ নাই। জীবন সর্ব্বকাল-প্রসারী হতে পারে, মৃত্যু সর্ব্বকালপ্রসারী হবে না কেন? জীবনকে মৃত্যুর অনন্ত অন্ধকারে ক্ষণ-খদ্যোতিকা ব'লে মনে হয়নি কেন? কারণ, মানুষ জীবনকে ভালবেসেছে—কারণ, মৃত্যুতে সব অভিমানের অবসান। এক অর্থে জীবন নিছক একটা অভিমান। জীবিতদের অভিমান দর্শন সৃষ্টি ক'রেছে। অনন্ত শূন্যতায় আপনার ক্ষণিক আলোকের অভিমানকে বিস্তৃত ক'রেছে মানুষ।

যাই হোক, মানুষের কল্পনায় জীবন জয়ী হ'য়েছে—এই জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী ও পূর্ণতর ক'রবার বাসনায় মানুষ রীতি উদ্ভাবন ক'রেছে। এই জীবনকে রক্ষা করবার জন্য সমাজের উৎপত্তি। সেই সমাজ-বন্ধনকে সুশৃঙ্খল করার জন্য নীতির আবিষ্কার।

বিভিন্ন যুগে মানুষ বিভিন্ন ভাবে জীবনের মূল্য উপলব্ধি ক'রেছে। জীবনের মর্ম্মও সে উপলব্ধি ক'রেছে বিভিন্ন ভাবে। জীবনের এই মর্ম্মোপলব্ধির অনুসরণে রীতি তৈরী ক'রেছে: মানুষ তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত ক'রেছে জীবনের মর্ম্মোপলব্ধির অনুসরণে। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে সেই জীবনের মর্ম্ম দেশ-কাল অনুযায়ী যত দূর সম্ভব ব্যাখ্যা ক'রে সেই মর্ম্ম অনুযায়ী সামাজিক

বিধি-নিষেধের সৃষ্টি। জীবন-দর্শনের সহিত মানুষের সামাজিক বিধি-নিষেধ জড়িত।

এই জীবন-দর্শন যুগাপেক্ষী। স্বয়ং-উদ্ভূত কোনো দর্শন নয়। তাই সমাজের গঠন বদলেছে যুগে যুগে।

জীবনের মূল্য নির্দ্ধারিত হবার পর জীবনের অন্যান্য আনুষঙ্গিক ও পরিপোষক অবস্থা ও ভাবের পৃথক্ পৃথক্ মূল্য (value) নির্দ্ধারিত হ'য়ে গেছে। ধর্ম্ম প্রাকৃত ভাবে এই মূল্য-সমষ্টি। জীবন-দর্শনের ভিত্তিতে গঠিত হোল সামাজিক আচরণ, এই আচরণ সমষ্টি বিশেষ কালের ধর্ম্মের রূপ গ্রহণ ক'রেছে।

জীবন-দর্শন যখন বদলায়, তখন মানুষের আচরণ বদলায়—মানুষে মানুষে আচরণ, সমাজে মানুষে আচরণ—আর সঙ্গে সঙ্গে বদলায় ব্যবহারিক ধর্ম্ম।

এই জীবন-দর্শন হোল ধর্ম্মের মূল। এই জীবন-দর্শন বাহিরে সমাজের অবয়বে (structure of society) আত্মপ্রকাশ করে। যে কোনো জাতির জীবন-দর্শনের বাহ্য অবয়ব তার সমাজ। এই সমাজ ধর্ম্মসূত্রের উৎপত্তি স্থল।

আজ মানুষ জীবনের তথা মনুষ্য জাতির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান। স্বল্পকালের মধ্যে আজ মনুষ্য-জীবন বিলুপ্ত হ'তে পারে। আজ মানুষের জীবন-দর্শন অভিনব আকার ধারণ ক'রেছে: তার ধর্ম্মসূত্র বদলাচ্ছে।

আজ মানুষ দেখেছে মৃত্যুর পর জীবন নহে, জীবনের পর মৃত্যু। অনন্ত মৃত্যুর মধ্যে জীবন ক্ষণ-খদ্যোতিকা। অনন্ত মৃত্যুর মধ্যে জীবন তুচ্ছ আবির্ভাব। এই তুচ্ছতা হ'তে জীবনের মুক্তি চাই। জীবনকে আজ মৃত্যুর একটা প্রকাশ ব'লে গ্রহণ ক'রতে হ'য়েছে। তাই নীটশের শক্তির সাধনা। তাই Superman-কল্পনার জন্ম। সেই চরম মৃত্যুর দিকে মনুষ্য-সমাজ ধাবিত। জীবনের উদ্দেশ্য এই দারুণ মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বিচার ক'রতে হ'চ্ছে।

মৃত্যু আজ সত্য। আর জীবনের সেই নিরুপদ্রব বিস্তার নাই।—জীবন জটিল—জীবনের প্রবাহে—দেহের কেন্দ্রে কেন্দ্রে—সমাজের কেন্দ্রে কেন্দ্রে মৃত্যুর অন্ধকার দানা বেঁধে উঠেছে—আজ মানুষ এই অনুভব ক'রছে। তাই আজ নূতন ক'রে ধর্ম্মসন্ধান।

আজ জাতির জীবনকে রক্ষা ক'রতে শুধু গোষ্ঠী পারগ নয়, শুধু সমাজ পারগ নয়, তাই রাষ্ট্রের সর্ব্বগ্রাসী অভ্যুদয়। মানুষ পূর্ব্বে যেমন সমাজকে আশ্রয় ক'রেছিল আজ তেমনি রাষ্ট্রকে অবলম্বন ক'রেছে। আরো শক্তি চাই। মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামে আরো শক্তি চাই। রাষ্ট্রের পর কি? নীটশে ব'লেছেন Ubermann, অর্থাৎ মহামানব। শুধু শক্তি, শুদ্ধ শক্তি, পূর্ণ শক্তি।

Bertrand Russal এর "A Freeman's Worship" প্রবন্ধে যুগ-যুগান্তের মোহমুক্তির উল্লাস ধ্বনিত হ'য়েছে। মৃত্যুর পর জীবনকে স্বীকার ক'রে নয়, জীবনের পর মৃত্যুকে নিঃসংশয়ে স্বীকার ক'রে নিয়ে। তিনি লিখেছেন:

"বিনা কারণে কার্যের উৎপত্তি হয় না। ধরাপৃষ্ঠে মানুষের উৎপত্তিরও কারণ আছে। তোমরা বল এক সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, ন্যায়বান ও করুণাময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় মানুষের উৎপত্তি। মানুষ সৃষ্টি ক'রবার ইচ্ছা তাঁর মনে উদিত হ'লে, তাকে কি রূপ দেবেন, তা তিনি মনে মনে কল্পনা ক'রেছিলেন। মানুষের সৃষ্টিও সেই কল্পনার অনুরূপ হ'য়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ ইচ্ছা ও কল্পনা ক'রে কেউ মানুষ সৃষ্টি করে নাই। যে যে কারণের সমবায়ে মানুষের উৎপত্তি, তা'তে উদ্দেশ্য কিংবা কল্পনা থাকবার সম্ভাবনা নাই। কেন না তারা সকলেই জড় ও অচেতন। মানুষের উৎপত্তি, মানব সমাজের বৃদ্ধি ও উন্নতি, মানুষের আশা ও ভয়, তার ভালবাসা ও বিশ্বাস—সবই, শুধু পরমাণুপুঞ্জের আকস্মিক সমবায়ের ফল। উৎসাহ, শৌর্য, চিন্তা ও ভাবের তীব্রতা কিছুতেই মৃত্যুর পরপারে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন রক্ষা ক'রতে পারে না। মানুষের যুগ-যুগান্তরব্যাপী সাধনা, তার নিষ্ঠা, তার প্রেরণা, মানবীয় প্রতিভার মাধ্যাহ্নিক জ্যোতি; সমস্তই, সৌর জগতের বিরাট মৃত্যুর মধ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে এবং মানব-কীর্ত্তির সমগ্র সৌধ বিধ্বস্ত বিশ্বের ধ্বংসাবশেষের নিম্নে অনিবার্য সমাধি প্রাপ্ত হবে। এই মত সর্ব্বসম্মত না হ'লেও নৈশ্চিত্যের এত সান্নিধ্যবর্ত্তী যে, একে বর্জ্জন ক'রে কোনোও দর্শনের টিকে থাকা অসম্ভব। কেবল এই সত্যের পরিধির মধ্যেই এবং অনমনীয় নৈরাশ্যের ভিত্তির উপরেই এখন হ'তে আত্মার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা সম্ভব হ'তে পারে।"

যুগযুগান্তের সংশয়মুক্ত নিরভিমান এই বিরাট নৈরাশ্যের ভিত্তির উপরে মানুষের সমস্ত উল্লাসকে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হবে।

অতল অন্ধকারের, গভীর মৃত্যুর কিনারে মানুষের দীপ্তিমান্ অস্তিত্ব। পদসংলগ্ন গভীর মৃত্যুর গাঢ়ত্ব এই কাল-খদ্যোতিকাকে অপূর্ব্ব মহিমা দান ক'রেছে। মানুষের সাধনা এই বহ্নিশিখাকে চরম জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করার সাধনা। এই বহ্নিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহপাত্রে ধূমায়িত ক'রে রাখা মৃত্যুকে জয় করা। এক মহা-মানবের পাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহ্নিশিখাকে আহৃত ক'রে এক যুগবিসর্পী অশনিরূপে পরিণত ক'রতে হবে; এই হোল নীটশের সাধনা।

পূর্ব্বকালে দর্শনের মূলে ছিল জীবন, জীবনের পূর্ব্বে জীবন, পরে জীবন, পরপারে অনন্ত জীবন, সৃষ্টির কেন্দ্রলোকে অপরিমেয় জীবন। আজ দর্শনের মূলে মৃত্যু। জীবনের পূর্ব্বে মৃত্যু, পরে মৃত্যু, পরপারে মৃত্যু, সৃষ্টির কেন্দ্রলোকে সৃজনহীন গাঢ় মৃত্যু। যুগে যুগে মানুষের ধাতু বদলায়: সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-প্রত্যয় বদলায়। মানুষের ধাতু দেশ-কালের সীমার মধ্যে রূপ গ্রহণ করে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির ধাতু পৃথক্। সমাজের অন্তর্নিহিত এই ধাতু হ'তে তার সর্ব্বপ্রকার প্রত্যয়ের উৎপত্তি, এই প্রত্যয়কে আশ্রয় ক'রে তার সামাজিক আচরণ নির্দ্দিষ্ট।

মুদ্রা ও ধর্ম্মবিশ্বাস

বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন সময়ের মুদ্রা পৃথক্, মুদ্রামূল্যও পৃথক্। এই মুদ্রাকে ভিত্তি ক'রে জাতীয় অর্থনৈতিক জীবন চালিত। মুদ্রা জাতির অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। অর্থনৈতিক জীবন মুদ্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থনৈতিক জীবন ও মুদ্রার এই পরস্পর নিয়ন্ত্রণের মত, সামাজিক রীতি ও সমাজের ধাতু পরস্পরকে নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজের ধাতু তার অভিজ্ঞতা-খনি হ'তে লব্ধ।

অর্থনৈতিক পরিধি-বহির্ভূত সমাজের যে জীবন তার ধাতু অভিজ্ঞতা, মুদ্রা ধর্ম্মবিশ্বাস বা ধর্ম্মরীতি। আধ্যাত্মিক জীবনের এই মুদ্রা ব্যবহারিক জীবনের বাইরে মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও মানুষে সমাজে সম্পর্ককে ধারণ করে ও সমস্ত আচরণকে বিশিষ্ট রূপদান

করে। ধর্ম্মবিশ্বাসকে অধ্যাত্ম জীবনের অর্থাৎ বিষয়-বহির্ভূত জীবনের মুদ্রা ব'লেছি।

সমাজ-জীবনের প্রয়োজনীয়তা থেকে এই দুই প্রকার মুদ্রার উৎপত্তি। বিষয়ভূত ও বিষয়-বহির্ভূত দুই জীবনে দুই মুদ্রার প্রভাব। অর্থনৈতিক জীবনের বিপ্লবের পর মুদ্রার সংশোধন প্রয়োজন, সেইরূপ বিষয়-বহির্ভূত সমাজ-জীবনে বহু মানুষের অভিজ্ঞতা-ক্ষেত্রে বিপ্লবের পর ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিবর্ত্তন ক'রতে হয়। প্রাচীন মুদ্রা চিরকাল চলে না।

মুদ্রার রূপ সরল সহজবোধ্য ও সর্ব্বস্বীকৃত না হ'লে অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। অনুরূপ ভাবে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মধ্যে সরলতা ও সর্ব্বজনগ্রাহ্য এক রূপের অভাব হ'লে জাতীয় আধ্যাত্মিক জীবন বিপর্যস্ত হবে। ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনের বিপর্যয়ের মূলে এই এক ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অভাব। বিভিন্ন শ্রেণীর লোক, এক শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন লোক আপন আপন ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ইচ্ছানুরূপ বিশ্বাসকে গ্রহণ ক'রেছে। এবং তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কোনো নির্দ্দিষ্ট রূপ নাই। যত মত তত পথ। এই বিশ্বাসের জগতে অরাজকতা আমাদের অধঃপতনের মূল। শৈবের সহিত বৈষ্ণবের ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব নয়। ভাবের আদান-প্রদান শুধু ব্যবহারিক জীবনে সীমাবদ্ধ হ'লে ও বিষয়-বহির্ভূত জীবনে ভাবের আদান-প্রদানের পথ রুদ্ধ হ'লে ঐক্য বিনষ্ট হবে। জাতি, রাষ্ট্র লোপ পাবে। সামাজিক জীবনের মধ্যে পূর্ণতা প্রয়োজন। জীবনের এক অংশে কপাট রুদ্ধ করে অপর দ্বারের মধ্যস্থতায় মানুষ পরস্পরের সহিত বিনিময় চালাতে পারে না। সামাজিক বিনিময় পূর্ণ বিনিময়: জীবনের প্রত্যেক পরিধিতে এই বিমিময়ে পূর্ণ প্রকাশ না হ'লে সমাজ বিনষ্ট হবে। তাই অন্য দেশে সমাজ থেকে রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হোল—কিন্তু ভারতবর্ষের রাষ্ট্র অঙ্কুরে বিনষ্ট হোল—সমাজ চূর্ণ হোল। সামাজিক লোকের জীবন এক অংশে সঙ্কুচিত ও বাহিরের সঙ্গে বিনিময় রহিত হ'লে সমাজ-জীবন তার দ্বারা অসম্ভব।

বুদ্ধদেব এক দিন মানুষে মানুষে বিনিময়ের পথ সম্পূর্ণ প্রশস্ত করতে চেয়েছিলেন, তাই বর্ণ ভেঙেছিলেন, এমন কি জাতির পরিধিও ভেঙেছিলেন। তাই বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধ

জাতিভেদধারক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের ফলে ভারতের রাষ্ট্রের অবসান। তার পর ভারতে একরাষ্ট্র সম্ভব হয়নি। বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার লাভের মূলে বোধ হয় তাহার সরলতা ও সমাজ-সজ্ঞানতা। ধর্ম্মজগতে বুদ্ধদেব কয়েকটি সরল, সুবোধ্য বিশ্বাসের মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন, তাই মানুষে মানুষে আত্মবিনিময় সুসম্পূর্ণ হয়েছিল।

বুদ্ধদেবের বৈশিষ্ট্য আত্মপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর দ্বেষহীন বিদ্রোহ। মৃত্যুপরম্পরায় আত্মার বিবর্ত্তন তিনিও স্বীকার করেছিলেন। ঈশ্বরকে প্রশান্ত গাম্ভীর্যে সহজ ভাবে স্বীকারের বাইরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

আত্মা নাই: তবু কবির ছাড়পত্র নিয়ে বলতে ইচ্ছে হয়—অমিতাভের আত্মা পৃথিবীর চিদাকাশে পুনরুদিত।

নির্ব্বাণ ব্রাহ্মণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য—তটিনীউচ্ছলা রসময়ী ধরিত্রীর বাৎসল্যে, ক্ষত্রিয়ের বাহুবলে সুরিত থেকে রক্ষিত ব্রাহ্মণ অস্তিত্বকে অনন্ত কাল ধরে "কায়েম" করে রাখার পক্ষপাতী।

ব্রাহ্মণ সমাজের কেন্দ্র—অতএব ব্রাহ্মণের আত্মা সৃষ্টির কেন্দ্র। বুদ্ধদেব আধ্যাত্মিক জগতের গালিলিও। তাই ব্রাহ্মণ তাঁর শত্রু।

ব্রাহ্মণের দর্শন প্রকৃতির প্রাচুর্যের মধ্যে রচিত, জীবনের নিরবরোধ প্রসারের মধ্যে। বুদ্ধের দর্শন মৃত্যুর মুখোমুখী রচিত। তাই বুদ্ধদেব জীবনকে বহু কাল বহু জন্ম-প্রসারী মনে করলেও নিঃসঙ্কোচে এই শেষ অমিতাভের সম্মুখে নির্ব্বাণ অর্থাৎ চরম অবসানের রূপ দেখতে পেয়েছেন। সাধারণ মানুষ জন্মবিবর্ত্তনে অমিতাভরূপে প্রকাশের পর নির্ব্বাণে বিলুপ্ত।

এই জীবনকে জন্মান্তর সূত্র থেকে মুক্ত করে জীবনের বহু প্রকাশকে এই সমাজের ও এই কালের পরিধির মধ্যে স্থাপিত ক'রলে বুদ্ধবাদ মহামানববাদের সহিত আশ্চর্য্য ভাবে মিলে যাবে।

জীবনের পর মৃত্যু, এই পরমসত্য বুদ্ধদেব উপলব্ধি করেছিলেন। এই নির্ব্বাণের সাধনা ধর্ম্ম। এই শূন্যতার অবসান, আত্মার এই নিদারুণ পরিণতিবাদ প্রচার করিলেও এত কোটি মানুষ তাঁর শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিল তার কারণ সমাজের মধ্যে মানুষে মানুষে ভাব বিনিময়কে তিনি পূর্ণভাবে সফল করবার পন্থা নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছিলেন। সামাজিক জীবনের পূর্ণতায় মানুষ নির্ভয়ে নির্ব্বাণের চূড়ান্ত পরিণতির দিকে দৃষ্টিপাত করতে সমর্থ হয়েছিল।

সামাজিক জীবন যেখানে অপূর্ণ, পরস্পর আত্মবিনিময়ের পথ যেখানে বহু দ্বারে প্রতিরুদ্ধ, সেখানে মানুষের যাচ্ঞা মৃত্যুর পরের জীবনের দিকে যে আকুল ভাবে ছুটে যাবে তাতে বৈচিত্র্য নাই। জন্মান্তর ও জন্ম-শৃঙ্খলের শেষে অনন্ত আনন্দস্বরূপ পরমব্রহ্মে বিলীন হবার আশাকে তর্ক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত না করলে ভেদবুদ্ধিপুষ্ট ব্রাহ্মণ-সভ্যতা এক দিনের জন্য সমাজকে আকৃষ্ট ক'রতে পারতো না। জীবনের দীনতা মানুষের পক্ষে অসহ্য হ'য়ে উঠত যদি পরমব্রহ্মের অতলান্তিক আনন্দে অবগাহনের আশা তার বিলুপ্ত হোত। ব্রাহ্মণ্য সমাজের মধ্যে পুঞ্জীভূত বিরোধকে মায়া ব'লে উড়িয়ে দেবার প্রবৃত্তি জন্মেছে এই ব্রাহ্মণপ্রাধান্যকে সনাতন ক'রে স্থায়ী করবার জন্য।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার থেকে প্রমাণিত হয়, মানুষ নিদারুণ নির্ব্বাণকেও সহাস্যে মেনে নিতে পারে—যদি তার সমাজ-জীবনে পরস্পর আত্মবিনিময় পূর্ণতা লাভ করে। এই সমাজ-জীবনের পূর্ণতার জন্য বৌদ্ধধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হলেও অশোক-রাষ্ট্রের বিপুলত্ব ও মহত্ব। রাসেল কথিত "নৈরাশ্যের" ভিত্তিতে ধর্ম্মসূত্র নির্ম্মাণ করা সম্ভব হবে যদি মানুষে মানুষে সামাজিক আত্মবিনিময়ের পথ সরল ও সুন্দর ক'রে তোলা যায়।

আজ পৃথিবীর মানব-সভ্যতায় তাই বিশ্বাসের সমস্ত জটিলতা মুক্ত ক'রে মানুষে মানুষে সরল সহজ সম্পর্ক স্থাপন করার প্রচেষ্টা চ'লেছে। রাষ্ট্রবিপ্লবের পর নূতন ভিত্তিতে মানুষে মানুষে বৈষয়িক ও বিষয়বহির্ভূত জীবন-ক্ষেত্রে বিনিময়কে সহজ ও সরল করার উপযোগী নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব হ'চ্ছে। পৃথিবীর ইতিহাস ও রাষ্ট্র-বিবর্ত্তনের ব্যাখ্যা গ্রহণ ক'রলে সমস্ত সমস্যা সহজ ও সুবোধ্য হ'য়ে যাবে।

রুশের জনসাধারণ আজ রাষ্ট্রের কাছে আত্মবিলুপ্তি মেনে নিয়েছে। কেন না, তাদের মধ্যে সামাজিক জীবন পরিপূর্ণতর হ'য়ে উঠেছে ও

রাষ্ট্র প্রভৃতশক্তিশালী হ'য়ে উঠেছে। রুশের প্রতি নকার আমাদের বিভেদবুদ্ধি-পরিপুষ্ট অসামাজিক বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে তাই এত পরিস্ফুট। জর্ম্মণীর সাধনারও সেই পথ। তবে সমাজে পরস্পর আত্মবিনিময়ের সূত্র জর্ম্মণ-সভ্যতায় ভিন্ন। জর্ম্মণ-সভ্যতায় এই আত্মবিনিময়ের সূত্রকে প্রথম নীট্শে দার্শনিক রূপদান ক'রেছেন। অর্থাৎ বর্ত্তমান জর্ম্মণীর ধাতু থেকে আচরণের "মুদ্রা" তৈরী হ'য়েছে।

বিভিন্ন জাতির ধাতু তার অভিজ্ঞতার সমষ্টি। জর্ম্মণ জাতি শক্তির উপাসক। বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে জীবনের নির্ব্বাণ সেই বর্ত্তমান কালে সর্ব্বপ্রথম বুঝেছে। তাই তার মধ্যে ধ্বংসকে, বিনাশকে ভিত্তি ক'রে পৃথিবীর প্রথম দার্শনিক মতবাদ অর্থাৎ নীটশে-মতবাদ অভ্যুত্থিত হ'য়েছে। এক দিন সমস্ত পৃথিবী এই চরম নির্ব্বাণকে ভিত্তি ক'রে দর্শন তৈরী ক'রবে ও সেই অনুসারে আচরণকে নিয়ন্ত্রিত ক'রবে ও মানুষে মানুষে আত্মবিনিময়ের নূতন সত্য আবিষ্কার ক'রবে। দেশে দেশে মনস্বীরা এই সূত্র আবিষ্কার ক'রছেন।

ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব প্রথম পথ-প্রদর্শক। তাঁর জন্মান্তরে বিশ্বাস কত দূর সত্য তা প্রমাণ করা কঠিন। একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন জন্মে অমিতাভ ও তথা নির্ব্বাণের দিকে চ'লেছে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন আত্মার, একের সাধনাকে সোপান ক'রে অপরের মধ্যে, অমিতাভের দিকে গতি কি না তা সঠিক নির্দ্ধারিত করার কোনো উপায় নাই: মানুষের পর মানুষ বিলুপ্ত হ'চ্ছে। হয়ত এক অমিতাভ নির্ম্মাণ ক'রতে বহুতর আত্মা বিনষ্ট হ'চ্ছে। এক আত্মার জন্মচক্র পরিভ্রমণ নয়; এক এক আত্মার স্ফূর্ত্তি ও শেষ—এই দীর্ঘ সূত্রের শেষে অমিতাভ। নিম্ন আত্মা থেকে উচ্চ আত্মার বিবর্ত্তন—এক আত্মায় নহে, অপর আত্মায়।

নিম্ন আত্মা থেকে উচ্চতর, নির্ব্বাণের নিকটবর্ত্তী আত্মার বিবর্ত্তন—এই হোল সৃষ্টির পথ। জাতকের বুদ্ধ এক বুদ্ধ নহেন। বহু বার তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। প্রতি জন্মে তাঁর পুনরভ্যুদয়। এক আত্মার পুনরভ্যুদয় নহে: বিভিন্ন আত্মার একটা বিবর্ত্তন-পরম্পরা।

বুদ্ধদেব এই বিবর্ত্তনের সূত্র নির্দ্দেশ ক'রেছেন সরল সূত্রে—'সংঘং শরণং গচ্ছামি', ইত্যাদি—অর্থাৎ সামাজিক আত্মবিনিময় সহজ হোক—সামাজিক আত্মবিনিময়ের রাজপথে উচ্চ-নীচে মিলন হোক। তখন উচ্চের কাছে নীচ নির্ব্বিবাদে আত্মবলি দেবে।

বিলুপ্তি ও নির্ব্বাণে পার্থক্য এই যে, অনভিব্যক্ত আত্মা বিলুপ্ত হয়, পূর্ণ অভিব্যক্ত অমিতাভ—অমিত জ্যোতি—নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হ'ন। জগতে বহু মানুষ বিলুপ্ত হোল—নির্ব্বাণ হোল একাকী বুদ্ধের। সমাজের উদ্দেশ্য এই বুদ্ধে বিবর্ত্তন। সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব ও নীটশের অতিমানবের মধ্যে বহুতর প্রভেদ। মিল শুধু এইখানে যে, উভয়েই অমিত জ্যোতি—উভয়েই নির্ব্বাণের কিনারে উদ্ভাসিত। উভয়কেই বিবর্দ্ধিত ক'রতে বহু মানুষ নিঃশেষিত।

এই বুদ্ধ আর্য। এই নীটশে আর্য। উভয়ের ধর্ম্মের আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ সমাজের চিত্র পূর্ণ ভাবে অঙ্কনের প্রয়াস আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মে আদর্শ পুরুষ বুদ্ধ আদর্শ সমাজ (বুদ্ধ বিবর্ত্তক সমাজ) "সংঘ"। নীটশের আদর্শ মানব, মহামানব—অমিত-জ্যোতি—নীটশের অমিতাভ। নীটশের আদর্শ সমাজ রাষ্ট্র—যোদ্ধৃ রাষ্ট্র। বুদ্ধের সমাজের আধ্যাত্মিক বিনিময়ের পথ অহিংসা। নীটশের সমাজের আধ্যাত্মিক বিনিময়ের পন্থা—মহামানবের অগ্রদূত হিসাবে আত্মোৎসর্গ।

বৌদ্ধ বুদ্ধে আত্মোৎসর্গ ক'রেছে। নীটশের মানুষ উচ্চতর মানুষের কাছে আত্মোৎসর্গ ক'রেছে।

বুদ্ধের সমাজের লক্ষ্য বুদ্ধ। নীটশের সমাজের লক্ষ্য Uber-mann—মানবাতীত মানব।

এই বুদ্ধ-উদ্ভাবনের জন্য বৌদ্ধ সমাজের নীতির প্রতিষ্ঠা আর নীটশের এই মহামানব উদ্ভাবনের জন্য সমাজের নূতন নীতির উদ্ভাবন। আদর্শ অনুযায়ী নূতন নীতির উদ্ভাবন করতে হবে। মৃত্যুকে সত্য ও শ্রেয়ঃ বলে গ্রহণ ক'রে এই নূতন নীতি নির্ম্মাণ করতে হবে। এবং এই আদর্শ নির্দ্ধারণের জন্য আমাদের আর্য ধাতুর প্রকৃতি নির্ণয় করতে হবে। এই আর্য ধাতু অনুযায়ী নবীন যুগের ভারতীয় দার্শনিক আদর্শ নির্দ্দেশ করেছেন, মহামানব। এই নবীন যুগের দার্শনিক অরবিন্দ। কিন্তু অরবিন্দের দর্শন নিরভিমান নৈরাশ্যের ভিত্তিতে গঠিত নয়, তাঁর দর্শনে ব্রাহ্মণ্য ভাব প্রবল। বৌদ্ধের ঐতিহ্যকে তিনি পাশ কাটিয়ে গেছেন। অরবিন্দের দর্শন যুগোপযোগী ব্রাহ্মণ-দর্শন। আজ পৃথিবীতে সিদ্ধার্থ-দর্শন প্রয়োজন।

ভারতকে সরল অল্প কয়েকটি সূত্রের নির্দ্দেশ দিতে হ'বে। এবং তার অভিব্যক্তির আদর্শস্বরূপ স্থাপন করতে হবে নীটশের মহামানবকে। নীটশের মহামানববাদ কেন? কারণ ফলস্বরূপ আমাদের রাষ্ট্রলাভ সম্ভব হবে। ব্যক্তিগত অভিব্যক্তির ধারণা ত্যাগ না করলে ভারতবর্ষে সামাজিক মন-বিনিময় সুসাধ্য হয়ে উঠবে না। তাই ব্যক্তিগত অভিব্যক্তিকে বাদ দিতে হবে। সামাজিক অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে মহামানবের উৎপত্তি। এই হবে আমাদের নব্য ভারতের আদর্শ। এই আদর্শ নীটশের আদর্শের অনুরূপ মনে হতে পারে কিন্তু সত্যই এ আদর্শ বুদ্ধের আদর্শ। শুধু বুদ্ধের জন্মপরম্পরাগত অভিব্যক্তিকে আমরা সামাজিক অভিব্যক্তি—বহু জনের অভিব্যক্তি-পরম্পরা বলে গ্রহণ ক'রেছি।

এই ভাবে বুদ্ধের নির্ব্বাণকে পূর্ণ নির্ব্বাণের রূপ দিতে সমর্থ হব। এবং এই আদর্শ আজ পৃথিবীর চিন্তা-বিপর্যয়ের মধ্যে একমাত্র স্থির বিন্দু। পৃথিবীর মানব-সমাজ আপনার অজ্ঞাতসারে এই অভিব্যক্তির দিকে চলেছে।

এই পথ বৃহত্তর সমাজের পথ—অর্থাৎ রাষ্ট্র-পথ—সর্ব্বগ্রাসী রাষ্ট্রের পথ। সমাজ রাষ্ট্রে, রাষ্ট্র সর্ব্বগ্রাসী রাষ্ট্রে পরিবর্ত্তিত হ'চ্ছে, আত্মবিলোপের ক্ষেত্র পরিবর্দ্ধিত হ'চ্ছে।

ভারতের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এই অভিব্যক্তির পথে বাধা। ভারত এখনও অরাষ্ট্রক। এই রাষ্ট্রপথ আর্যপথ। পুরাকালে আর্যেরা "অরাত্ত" (Aratta)দিগকে অনার্যের অধম ব'লে ভাবতেন। (সেকেন্দারের আক্রমণের সময়ও এই "অরাত্ত"দের নগরীর অস্তিত্ব ছিল সিন্ধুতে)

* * * *

জীবন ও মৃত্যুর উভয়ের মুখোমুখী নূতন ভঙ্গীতে দাঁড়াতে হবে। এত দিন অরাষ্ট্রক অস্তিত্বের সমস্ত অভিজ্ঞতা চুঁইয়ে নূতন সামাজিক সামঞ্জস্যের নীতি নির্দ্ধারণ ক'রতে হবে। মানুষে মানুষে বা ভারতীয়ে ভারতীয়ে নূতন আত্মবিনিময়ের সূত্র আবিষ্কার ক'রতে হবে।

জীবনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে নূতন ভাবে স্থাপন ক'রতে হবে, মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্ককেও। আজ শুধু জীবনকে নয়, জীবন ও মৃত্যু উভয়কেই সমান সত্য ব'লে গ্রহণ ক'রতে হবে। গাঢ় মৃত্যুর তিমিরের মধ্যে জীবনকে স্থিরশিখ ক'রে ধ'রে রাখতে হবে। নারীর প্রতি, যুদ্ধের প্রতি, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যকে স্থির ক'রতে হবে। সর্ব্বোপরি স্বাধীনতা অর্জ্জন ক'রতে হবে। ভয় থেকে স্বাধীনতা। ধ্বংসের ভয় থেকে মুক্তি। বিশ্বের কেন্দ্রকে নিজের অন্তর থেকে উন্মুলিত ক'রে যথাস্থানে স্থাপন ক'রবার দুঃসাহস অর্জ্জন ক'রতে হবে। জীবনযাত্রার পথে পথে যে সঙ্গীত, কাব্য, শিল্প অভিযান চ'লেছে মৃত্যুর পথে পথে, মৃত্যুকে পাশে রেখে সেই জয়যাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হবে।

আমরা মুক্তি চাই; যুগ-যুগান্তরের মোহ থেকে মুক্তি চাই। জীবনের মোহ থেকে, শুধু বেঁচে থাকার মোহ থেকে; মুক্তি চাই আত্মাভিমান থেকে, মুক্তি চাই বর্ত্তমান সমাজের আত্মকেন্দ্রিক সমস্ত সঙ্কোচন থেকে; মুক্তি চাই পুরানো ঈশ্বর থেকে; মুক্তি চাই নির্ব্বাণের আতঙ্ক থেকে। মোহমুক্তি চাই।

নিজের প্রতি মমতা থেকে মুক্তি চাই; আপনার মধ্যে যা কিছু রুগ্ন তার প্রতি বাৎসল্য থেকে মুক্তি চাই; মানুষ থেকে মুক্তি চাই—আমাদের মধ্য হ'তে মহামানবের বীজকে মুক্ত ক'রে দিতে চাই। মহামানবের দূতকে সফলতায় উত্তীর্ণ ক'রতে নিঃশেষে ম'রতে চাই—সেই মৃত্যুকে ধর্ম্মের কেন্দ্রে স্থাপন ক'রতে চাই।

মানুষ একটি Postulate মাত্র। মানুষ সম্বন্ধে মনগড়া ধারণার শৃঙ্খলে অভিব্যক্তির গতিকে অমঙ্গল ব'লে ভাববো না। মানুষ কিছু স্বতঃসিদ্ধ সত্তা নয়: মানুষ অসম্পূর্ণ সৃষ্টি, মুহূর্তে মুহূর্তে তার অবয়বরেখার পরিবর্তন হচ্ছে: মানুষ নিমেষে নিমেষে বদলাচ্ছে—সেই পরিবর্ত্তনকে বর্জ্জন করে 'শুদ্ধ' মানুষ হবার দুরূহ ও ভ্রান্ত সাধনায় বিবর্তনকে ব্যাহত করব না।

নিজেকে ভয় করব না। নিজের ভয় থেকেও মুক্তি চাই। আমি যা আমি তাই। আমার কোনো স্বতঃসিদ্ধ বা পূর্ব্বসিদ্ধ রূপ নাই—আপনাকে অনুসরণ করব। পরস্পরের মধ্যে সমস্ত কাল্পনিক বাধা ভেঙে দেব। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভয় থেকে মুক্তি চাই। উচ্চকে পরিবর্দ্ধিত করতে যে আত্মবিলুপ্তি প্রয়োজন সেই আত্ম-বিলুপ্তিতে থাকবো নিঃশঙ্ক!

স্বামীজি স্মরণে

শ্রীহরগোবিন্দ নিয়োগী

ভূভারত ত্যজি ভারতের বুকে র'য়ে আজি সমাসীন,
ত্যাগের মন্ত্রে মা ভৈঃ তন্ত্র তব দেহে হ'ল লীন,
　　কুহকী স্বর্গেরে দিয়ে তুমি ডালি,
　　সকলের তরে আপনারে ভুলি,
লাজ মান ভয় সবে অবহেলি বিকায়ে দিয়েছ প্রাণ।
নিকটের ডাকে দূরে দিলে ফেলে প'ড়ে পাওয়া আহ্বান॥

শুনেছি পুরাণে দধীচির ত্যাগ ঋত্বিকের গুণ-গান,
তোমারি ত্যাগেতে তাদেরি মহিমা আজি হয়ে গেছে ম্লান;
　　চারণের গাথা প্রতাপের গীতি,
　　মদনের ত্যাগ আজও ভাগীরথী,
কল কল নাদে গেয়ে যায় স্তুতি, তুলি মঞ্জুল তান,
সুদূরের ব্যথা বুকে বাজে আজও স্রোতোহীনে বহে বান।

কন্যাকুমারে শিলোপরি হের নয়নের গাঁথা লোর—
কালেরে জিনিয়া রুধিরের ফোঁটা আজও হয়ে আছে ঘোর,
　　সাগরের পারে মহাসভা মাঝে,
　　কম্বুকণ্ঠে দুন্দুভি বাজে,
আকাশ বাতাস করি মুখরিত, আজও গায় জয়গান,
ভারতের ছেলে বিশ্বের হৃদে সেদিন জাগাল প্রাণ।

জন্ম-বাসরে আজিকার তব শ্রীচরণে মাগি বর,
অমোঘ তেজের এক কণা হৃদে দেহ মোর যতিবর—
　　শক্তি সাহসে হৃদে ভর করি,
　　ভীতি-বিভীষিকা দূরে অপসারি,
ন্যায়ের পতাকা তু'টি করে ধরি, গেয়ে যাই বরাভয়।
সাম্য যেখানে, সত্য সেখানে, সেথা নহে পরাজয়।

হে নব যুগের নবীন পান্থ, সাড়া দাও সাড়া দাও
উষ্ণ রুধিরে ভাসিছে ভারত, বারেক ফিরিয়া চাও—
　　ভুলিয়া ত্যাগে সে মোহন বাণী,
　　ভায়ে ভায়ে আজি করে হানাহানি,
অঝোর নিঝরে কাঁদিছে জননী করিতেছে হাহাকার;
বিধুবদনা নয়নের লোরে বহায়েছে পারাবার।

মিলন পথের হে মহাযাত্রী প্রাণে প্রাণে উঠ জাগি,
বিদূরিত হোক কলুষ-কালিমা তোমার পরশ লাগি,
　　বিভেদ ভুলিয়া ভাই ভাই বলি,
　　সবে যেন আজি ক'রি কোলাকুলি,
ত্যাগের বেদীতে দিয়ে প্রাণবলি, করি যেন পূজা দান-
সার্থক তবে গাঁথা ফুলহার—সার্থক গাওয়া গান॥

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

পঞ্চানন ঘোষাল
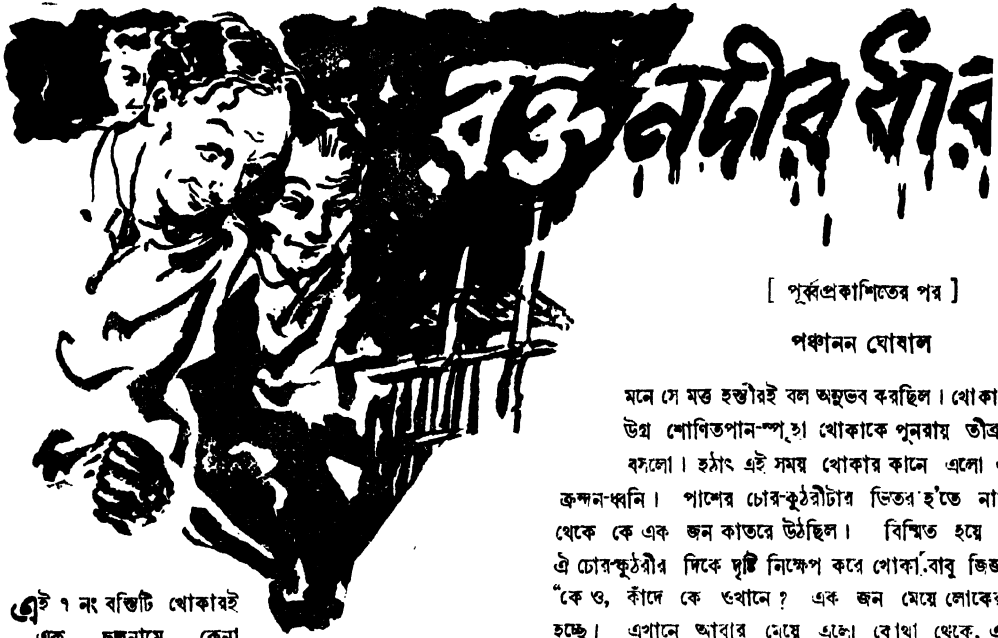
এই ৭ নং বস্তিটি খোকারই এক চন্দ্রনামে কেনা হয়েছে। বস্তির উপরকার ঘরগুলি গুদাম-ঘররূপেই ব্যবহৃত হয়। এর প্রত্যেকটি ঘরে ঠাসা রয়েছে খড়-বিচালি, লোহা-লক্কড়, মায় চুন-সুরকী পর্য্যন্ত। ঘরগুলি গবাক্ষের অভাবে এমনিই অন্ধকার, বিজলী আলো তো দূরের কথা, কোনও আলোই ভিতর পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। এ-ঘরে ও-ঘরে দুই-একটা করে লোহার চিমনি মেঝে হতে উঠে ছাদ ফুঁড়ে বার হয়ে গেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে এখানে পূর্ব্বে কোনও ফ্যাক্টরী বা কলকারখানা ছিল, কিন্তু এখোন তা গুদামরূপেই ব্যবহৃত হচ্ছে। বস্তির এক অন্ধকার ঘরের তালা খুলে ঢুকে পড়ে খোকা ও কেষ্টো দুইটা করে দেশলাইএর বাটি জ্বেলে নিলে এবং তার পর মেঝের উপরকার কাঠের সিন্দুকটা সরিয়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। উপরে অন্ধকার থাকলেও নীচে অন্ধকারের লেশমাত্রও নেই। নিম্নতলের প্রতিটি কক্ষ উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকমালায় উদ্ভাসিত দেখা যায়। চিমনির পথে হাওয়াও খাসে প্রচুর। এ ছাড়া কক্ষে কক্ষে মজুত করা বস্ত্র ও খাদ্যেরও অভাব নেই। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসা মাত্র প্রায় জন-ত্রিশ ষণ্ডামার্কা বিভিন্ন প্রদেশের ব্যক্তি তাদের প্রিয় নেতা খোকাকে অভিবাদন করে এগিয়ে এলো। লোকগুলির দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ ক'রে গোপী বললো, "রেইলওয়েতে ডাক লুঠ করবার জন্যে মজিদ মিয়া এদের ডেকে এনেছে। কাছাকাছি এক নির্জ্জন জায়গাতে এদের রাত্রিযোগে চালান করতে হবে। তা, তুই যা বলিস্, তাই হবে। কি বলিস্ তুই? নিজেই যাবি, না আমাদেরই কাউকে পাঠাবি?"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খোকা বাবু লোকগুলির আপাদ-মস্তক একবার নিরীক্ষণ করে নিয়ে উত্তর করলো, "না, নিজেই অমি যাবো। খান-দুই ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিটও কিনে এনেছিস্ তো?"

উত্তরে গোপী বললো, "তা এনেছি বই কি? এখোন যা কিছু বাকি তা রওনা হওয়ার। সব কিছুই ঠিক-ঠাক, এখোন যা কিছু অপেক্ষা তা তোর হুকুমের।"

খোকা এতোক্ষণে পূরাপূরি ভাবেই আত্মস্থ হতে পেরেছে। মনে মনে সে মত্ত হস্তীরই বল অনুভব করছিল। খোকার অন্তর্নিহিত উগ্র শোণিতপান-স্পৃহা খোকাকে পুনরায় তীব্র ভাবে পেয়ে বসলো। হঠাৎ এই সময় খোকার কানে এলো একটি করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি। পাশের চোর-কুঠরীটার ভিতর হ'তে নারীকণ্ঠে থেকে থেকে কে এক জন কাতরে উঠছিল। বিস্মিত হয়ে পাতালপুরীর ঐ চোরকুঠরীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে খোকা বাবু জিজ্ঞাসা করলে, "কে ও, কাঁদে কে ওখানে? এক জন মেয়ে লোকের গলা মনে হচ্ছে। এখানে আবার মেয়ে এলো কোথা থেকে, এ সব আবার কি, এ্যাঁ?"

খোকার এইরূপ প্রশ্নে ভীত হয়ে দলের মধ্য থেকে এক জন উত্তর করলো, "এজ্ঞে, ওকে ঠক্করলাল এখানে নিয়ে এসেছে। আমরা কিন্তু বারণই করেছিলাম।"

ঠক্করলাল নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিল। খোকা বাবু এগিয়ে এসে তার গলাটা টিপে ধরে জিজ্ঞাসা করলো, "চালাকির আর জায়গা পাওনি, না? কোথা থেকে ওকে এনেছিস্? যা এক্ষুনি রেখে আয় ওকে সেখানে। পাজী নচ্ছার কোথাকার?"

ঠক্করলাল খোকাদের দলে নূতন ভর্ত্তি হয়েছে, খোকা ও তার প্রধান সাকরেদদের অবর্ত্তমানেই এক অসহায় নারীকে সে এখানে টেনে এনেছিল। খোকাকে সে দলের সর্দ্দাররূপেই চিনতো এবং সে এ-ও জানতো, খোকার দল একটি নয়, অনেকগুলি। কিন্তু খোকার প্রকৃতির সহিত পরিচিত হওয়ার সে অবকাশ পায়নি! খোকার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে ঠক্করলাল বলে উঠলো, "ছোড়িয়ে দেন মশয়। আমি নেহি থাকমু এখানে। হামি ভি এক বহুৎ বড়া শেয়ানা আছে। চোর গুণ্ডা হামি ভি আছে। দেন ছোড়ে দেন। আরে ছোড়েন শীগ্‌গিরি।"

হতভাগ্য ঠক্করলাল জানতো না যে খোকার দলে একবার প্রবেশ করে জীবিত অবস্থায় আর ফিরে যাওয়া যায় না। এইরূপ একটা লোককে দলে ভর্ত্তি করবার জন্য বিরক্তিসূচক একটা দৃষ্টি হেনে খোকা বাবু তার পকেটের মধ্যে ডান হাতখানা পূরে দিয়ে ইস্পাত নির্ম্মিত দস্তানাটা পরে নিলে, তার পর সকলকে চমকিত করে দিয়ে তাঁর লৌহাবৃত বজ্র-মুঠি ধাঁই করে ঠক্করলালের ঠিক রগের উপর বসিয়ে দিলেন। অস্ফুট আর্ত্তনাদে ঠক্করলাল জ্ঞানহারা হয়ে জমীর উপর লুটিয়ে পড়লো। খোকা বাবু বজ্র-গম্ভীর স্বরে দলের কাল্লুকে হুকুম করলো, "যা, একে তুলে নিয়ে ঐ সুড়ঙ্গের ভিতরকার পাতকোর মধ্যে ফেলে দিয়ে একটা পাথর চাপা দিয়ে চলে আয়। আর এই মানুয়া, তুই এক্ষুনি মেয়েটাকে ঠিক তোর নিজের মেয়ের মতনই মনে করে বাইরে বা'র করে দিয়ে আয়। একটা রুমাল দিয়ে

ওর চোখ দু'টো ঢেকে দিয়ে ওকে বার করে নিয়ে যাবি, বুঝলি? আর সকলকেই তোদের আমি বলে রাখছি, খবরদার, সকল সময়ই মনে রাখবি, আমাদের এটা একটা প্রধানতম ডেরা, এটা আড্ডা-ঘর বা হুল্লোড়ের জায়গা নয়। হাঁ, আরও একটা কথা, আমাকে না জানিয়ে আর এক জন মাত্রও নূতন লোক দলে ভর্ত্তি করা যেন না হয়। সাবধান, কাযের মধ্যে ভুল হলে আমি কাউকেই আর ক্ষমা করবো না, হাঁ—"

খোকা বাবুকে সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ বা নিরাময় হয়ে কঠিন হস্তে পুনরায় দলের নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করতে দেখে দলের প্রধানদের মধ্যে সকলেই খুসী হয়ে উঠলো। গোপী এগিয়ে এসে খোকার গলাটা জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো, "যাক্ বাঁচা গেলো। একেই তো বলে লক্ষী ছেলে, কিন্তু, মাঝে মাঝে তুই যা ভয় দেখাস্ মাইরী, মনে হয় বুঝি বা তুই চিরতরেই আমাদের ছেড়ে চলে গেলি। এ কয় দিন আবার সুধীরটারও এই অদ্ভুত রোগে ধরেছে। খালি বলে, আমাকে ছেড়ে দেন, আমি চলে যাই; কতো কষ্টের তৈরী জিনিষ ও, চলে গেলেই হলো অমনি?"

"তাই না কি", খোকা বাবু জিজ্ঞাসা করলো, "কই, সুধীর কোথায়? তাকে তো পার্কেই রেখে এসেছি, ফিরেছে না কি সে?"

সুধীর নিকটেই অপেক্ষা করছিলো, একটু এগিয়ে এসে উত্তর করলো, "এই যে খোকা বাবু, অনেকক্ষণ এসে গিয়েছি আমি।"

খোকা বাবু জিজ্ঞাসা করলো, "কি রে, এতো করে বুঝালাম, তাতেও তোর চৈতন্যোদয় হলো না? কোথায় যেতে চাস্ তুই, দেশে?"

উত্তরে সুধীর বাবু বললো, "দেশে? না খোকাদা, দেশে যাবো না। দেশে যাবো আর কোন্ মুখ নিয়ে, বরুণা কি সেই মুখ আর আমার রেখেছে?"

হঠাৎ সকলে লক্ষ্য করলো, খোকা বাবু পুনরায় শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করেছে। বরুণা এবং হেনা দত্ত,—এই দুইটি নাম তার মনের মধ্যে মন্ত্রপূত ঔষধের ন্যায়ই ক্রিয়া করে। বরুণার নামটা তার কাণে যাওয়া মাত্র খোকা বাবু যেন আনমনা হয়ে উঠলো। গোপী এবং কেষ্টো সভয়ে উপলব্ধি করলে, নিম্নতন পৃথিবীর স্থূল পর্দ্দা ধীরে ধীরে খোকা বাবুর চোখের উপর হ'তে পুনরায় সরে যাচ্ছে। খোকা বাবুর মনের মধ্যে বরুণার শেষ অনুরোধটি তাজা ফুলের ন্যায়ই ফুটে উঠলো। খোকা বাবু একটু চিন্তা ক'রে সুধীরকে বললো, "তা তোর মনে যখন সন্দেহ জেগেছে, তখন তোর এই দস্যু-দলে না থাকাই ভালো। আশা করা যায়, এই রেইলওয়ে রবারিটাতে অন্ততঃ লাখ ত্রিশেক টাকা পাওয়া যাবে। এই টাকাটা দলের সকলকে সমান ভাবে ভাগ ক'রে দিয়ে মনে করছি, আমিও এইবার ঊর্দ্ধতন পৃথিবীতে এসে গা-ঢাকা দেবো। তবে তার আগে প্রণব দারোগাকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার, তা না হলে কোনও পৃথিবীতে এসেই আমি শান্তি পাবো না। তবে দল হয়তো এইবার আমি সত্য সত্যই ভেঙে দেবো।"

কথা কয়টি বলে খোকা বাবু একটা নোটের বাণ্ডিল সুধীরের হাতে তুলে দিয়ে বললো, "এই বাণ্ডিলটার মধ্যে উনিশ হাজার টাকা আছে। এইটে নিয়ে চট্‌পট্ তুই সরে পড়। এখানে থাকলে পুলিশ তোকেও অতিষ্ঠ করে তুলবে। যা, দেশেই চলে যা। দেশের লোককে না হয় বলবি, বরুণা মারা গিয়েছে। বাংলা দেশে মেয়েরও অভাব নেই, একটা বিয়েও ক'রে নিস্, বুঝলি? কি রে, দাঁড়িয়ে রইলি যে, যা শীগ্‌গির বেরিয়ে।"

খোকার ইচ্ছার বা আদেশের প্রতিবাদ দলের কেউ কখনও করেনি। সুধীরের এই সৌভাগ্যে সকলে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেও মুখে এ জন্য কেউ কোনও প্রতিবাদই জানালো না। সুধীর কাঁদতে কাঁদতে বার হয়ে গেলে গোপী বলে উঠলো, "ওপরতলার পৃথিবী? ভ্যালা নাম দিয়েছিস্ বটে। কিন্তু সেখানে আছে কি বল তো? কি-ই মধু আছে সেখানে? যতো সব ভদ্রলোকের ভীড়, ঐ সব মানুষের ঘেঁস্ সহ্যও তোর হয়? হাঁপিয়েও উঠিস্ না তুই? তা করে-কম্মে তো খেতে হবে? ওরা তো আমাদের খেতে দেবে না, ওরা তো আমাদের ঘেন্নাই করবে, আশ্রয় দেওয়া তো দূরের কথা।"

হঠাৎ খোকার মনে পড়ে গেল একটা প্রয়োজনীয় দরখাস্তের কথা। সেটা তো এখনোও পাঠানো হয়নি। ঊর্দ্ধতন পৃথিবীতে অবস্থান করার সময় খোকা প্রায়ই বিশ্বভারতী পত্রিকাতে অপরাধ ও অপরাধীদের সম্বন্ধে বহুবিধ প্রবন্ধ লিখেছে। এই সকল পাণ্ডিত্য-পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ-বিজ্ঞানের অধ্যক্ষের পদটি গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন। খোকা বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেশ মত ঐ পদটির প্রার্থিরূপে একটি দরখাস্তও লিখে ফেলেছিলো। কিন্তু, এই সময় হঠাৎ অধস্তন পৃথিবীতে নেমে আসবার জন্য তাগিদ আসায় খোকা বাবু সকল কথা বিস্মৃত হ'য়ে চলে এসেছে। দরখাস্তটির কথা তার আর মনেও পড়েনি।

অধস্তন পৃথিবীর ডাকের ন্যায় ঊর্দ্ধতন পৃথিবীর ডাকও খোকা বাবু উপেক্ষা করতে পারে না। খোকা বাবুর মনে হচ্ছিলো, সে যেন একটি নিকৃষ্টতম ঘৃণ্য জীবনের মধ্যে এসে গেছে। তার স্থান যেন এখানে নয়, তাঁর স্থান এর অনেক উপরে।

অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠে খোকা বাবু গোপীকে বললো, "না ভাই, শরীর আমার আবার খারাপ হচ্ছে। হঠাৎ যদি ভালো হয়ে যাই, তা হলে কালই আবার ফিরে আসবো। কিন্তু যদি আমি না-ই আসি তা হলে কালকের কাজটাতে তোকেই নেতৃত্ব করতে হবে। হাঁ, ভালো কথা সুধীর। সুধীর কই, সুধীর আবার গেলো কোথায়?"

উত্তরে গোপী বললো, "সুধীরকে তুই একটু আগে নিজেই তো বিদেয় করে দিলি। আবার সুধীর সুধীর করে চেঁচাচ্ছিস্ কেন?"

একটু ভেবে নিয়ে খোকা বাবু বললো, "তাই না কি? তা হবে। কিন্তু এতো বিস্মরণ আসছে কেনো বল তো? না না, গোপী, এই দল-টল এইবার ভেঙে দে, আমি আর না-ও ফিরতে পারি। যা কিছু সব তোদের রইলো, এইবার হতে আমি সাধু-জীবনই অতিবাহিত করবো। যদি পারিস্ তোরাও ভাই তাই করিস্, বুঝলি? তা হলে চললাম আমি এখোন বিদায়, ভাই বিদায়!"

সকাল তখন সাতটা। আফিসে ব'সেই চা পান করতে করতে প্রণব বাবু খবরের কাগজ পড়ছিলেন. কল্যাকার খোকার সহিত গুলী-বিনিময়ের ঘটনাটা বেশ ফলাও ক'রেই কাগজে কাগজে ছাপানো হয়েছে। খবরের কাগজে বর্ণিত ঘটনা পড়তে পড়তে প্রণব বাবু নিজের কাহিনীতে নিজেই শিউরে উঠছিলেন, শাস্তাও

হয়তো এতক্ষণ কাগজে বর্ণিত কল্যকার ঘটনাটি পড়ে ফেলেছে। প্রতিশ্রুত মত তিনি যে শাস্তার একটি কথাও রাখেননি এবার আর তা তার বুঝতে বাকি থাকবে না। হয়তো অসুস্থ শরীরেই সে চলে আসবে। প্রণব বাবু ভাবতে থাকলেন। এক্ষুনি তাকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে একটা চিঠি লিখে দিবেন কি না। সত্যিই তো আজ যদি প্রণব বাবু নিহতই হন তাহলে শাস্তার কি হবে? হয়তো কিছু দিন পর সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ পুনর্বিবাহ না করা পর্য্যন্ত প্রতি মাসে সে সামান্য কিছু ভাতা পাবে। পুনর্বিবাহ? পুনর্বিবাহের প্রচলন থাকলে হয়তো ভালোই হতো, কোনও পক্ষেরই এই জন্য এতোটা দুশ্চিন্তার কারণ থাকতো না। কিন্তু প্রণব বাবু আর ভাবতে পারলেন না। মনে মনে তিনি প্রতিজ্ঞা করে ফেললেন এ সব ঝঞ্ঝাটে তিনি আর একেবারেই থাকবেন না। মাইনে তো তিনি একা খান না, আরও তো দশ জন অফিসার আছেন, ধরুন না তারা খোকা গুণ্ডাকে। মনে মনে সংকল্প ঠিক করে নিয়ে প্রণব বাবু পুনরায় চায়ের কাপে চুমুক দিলেন, এমন সময় বিষণ্ণ মনে শৈলেশ বাবু অফিস-ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

একটু আমতা আমতা করে শৈলেশ বাবু বললেন, "একটা কথা বলবো স্যার?"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "কি কথা? মাধো সিং-এর সেই ব্যাপারটা তো?"

শৈলেশ বাবু উত্তর করলেন, "ভালো কথাই মনে করিয়ে দিলেন, স্যার! সিপাহীটা শেষকালে দীপ্তিকে গিয়ে ধরেছে, তাকে এবারকারের মতন মাপ করে দিতে হবে। যাকগে স্যার, বাঁচিয়েই দিন ওকে, ও-রকম কাজ ও আর করবে না।"

বিব্রত হয়ে প্রণব বাবু বললেন, "আমাদের বৌমা দেখছি শাসন ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করলেন। তা তিনিই না হয় এই চেয়ারটায় এসে বসে পড়ুন।"

লজ্জিত হয়ে শৈলেশ বাবু উত্তর করলেন, "না স্যার, ওঁর ফাই-ফরমাসটা ও বড্ড খাটে কি না? তা ছাড়া দীপ্তির বড্ড দয়ার শরীর। তার ওপর রোজ ও 'মা মা' ক'রে ওর ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কি না, তাই। কিন্তু আজ আর আমি এ জন্য আসিনি স্যার? আমি এ-সেছি—"

বিস্মিত হয়ে প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কি শৈলেশ, বলেই না হয় ফেলো। এতো সংকোচই বা কিসের? তুমি কি নূতন হয়ে এলে না কি?"

শৈলেশ বাবুর হাতে একটা দরখাস্ত ন্যস্ত ছিল, দরখাস্তটা প্রণব বাবুর দিকে ঠেলে দিয়ে শৈলেশ বাবু বলে উঠলেন, "এতে আমি ৬ মাসের ছুটি চেয়েছি, স্যার, দয়া করে এটা ফরোয়ার্ড করে দেবেন। ছুটি আমার চাই-ই।"

দরখাস্তটা উল্টে-পাল্টে দেখে নিয়ে প্রণব বাবু বলে উঠলেন, "না না, ছুটি-টুটি এখোন হতে পারে না, ভাই। ছুটি আবার কিসের? ওঃ বুঝেছি, বড্ড কাওয়ার্ড তো তুমি? এতো ভয়ই বা কিসের? মরতে তো এক দিন হবেই। ও-সব থাক এখোন। চা খাবে? দাঁড়াও, আর এক কাপ চা আনাই। এসো এসো, আরে বসো।"

শৈলেশ বাবু এই দিন বদ্ধপরিকর হয়েই এসেছিলেন। দৃঢ়স্বরে শৈলেশ বাবু বললেন, "ছুটি আমি নেবোই। এ জন্য যদি হাসপাতালেও যেতে হয় তা'ও আমি যাবো।"

বিরক্ত হয়ে প্রণব বাবু বললেন, "ছুটি চাইলেই বুঝি তা পাওয়া যাবে? হাসপাতালে গেলেও তা তুমি পাবে না।"

উত্তরে শৈলেশ বাবু বললেন, "বেশ, তা হলে স্যার আমাকে 'রিজাইন' করতেই দিন। পুলিশের কায আমার এমনিই ভাল লাগে না, আমি ছেড়েই দোব এ কায। আমার ইস্তফাই নিয়ে নিন। যে খাটুনিটা সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত পরের জন্য আমি খাটি তার শতাংশের একাংশও যদি আমি নিজের জন্য খাটতে পারি, তা হলে এখানে আমি যা পাই তার চেয়ে ঢের বেশী অর্থই বাইরে থেকে উপায় করতে পারবো।"

শান্ত-স্বভাব শৈলেশ বাবুকে এই ভাবে তার কথার ওপর কথা বলতে শুনে প্রণব বাবু অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন, কিছুটা বিরক্তও। রুক্ষ স্বরে প্রণব বাবু উত্তর দিলেন, "নিজের জন্যে কি তুমি এতো খাটুনি খাটতে না কি? কক্ষনো তা তুমি খাটতে না। জোর করে খাটিয়ে নেয় তাই খাটো। আর ইস্তফা দিবারই যদি ইচ্ছা ছিলো তো দশ-বারো বছর আগে দিলেই তো পারতে? জীবনের এই কয় বছর এমন ভাবে নষ্ট না করলেই পারতে। আর কয়েক বছর কাটাতে পারলেই তো হাফ পেন্‌সন নিতে পারবে। যাও যাও, মাথা ঠাণ্ডা করে বিশ্রাম করোগে।"

উত্তরে শৈলেশ বাবু বললেন, "আপনার কাছে আমি উপদেশ চাইতে আসিনি, স্যার, আপনি আমার গার্জেনও নন, আপনি এটা ফরোয়ার্ড করবেন কি না তাই বলুন। অন্য চাকরী আমি ঠিক করেই তবে এসেছি। এ ছাড়া ছুটি আমার পাওনাও আছে।"

শৈলেশ বাবুর স্ত্রী দীপ্তি দেবীর এক মাতুলের একটা নাম-করা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ছিল। বেগতিক দেখে দীপ্তি দেবী নিজেই গিয়ে স্বামীর জন্য ২০০ টাকা বেতনে একটা চাকরী ঠিক করে এসেছে। ছুটি না পেলে শৈলেশ বাবুর উপর তাঁর কাযে ইস্তফা দেবারই নির্দ্দেশ ছিল। একমাত্র চাকুরীর খাতিরেই ঊর্দ্ধতন অফিসারদের অধস্তন অফিসাররা মান্য করে থাকে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেই প্রশ্ন উঠে না, কারণ শৈলেশ বাবু এদিন এই চাকুরীতে ইস্তফা দিতে প্রস্তুত। তা না হয় হলো, কিন্তু, প্রণব বাবুর সঙ্গে কি তার শুধু কর্ম্মগত মান্যের সম্বন্ধই ছিল? স্নেহের সম্বন্ধ কি কিছুই নেই? প্রণব বাবু সকরুণ ভাবে শৈলেশ বাবুর দিকে চেয়ে দেখলেন। সত্যি কথা বলতে গেলে এই কয় বছর তাঁরা মায়ের পেটের ভাইএর মতই কায করে যাচ্ছিলেন। পরস্পরের প্রতি তাঁদের ব্যবহার দেখে লোকে মনে করতো, এরা শুধু ভাই নয়, বন্ধুও বটে। প্রণব বাবুর এই সকরুণ দৃষ্টিটুকু শৈলেশ বাবুরও নজর এড়ায়নি। লজ্জিত হয়ে উঠে তিনি অধোবদন হলেন। মুখ তুলতেই প্রণব বাবু দেখতে পেলেন, শৈলেশ বাবুর চোখ দু'টো সজল হয়ে উঠেছে।

উভয়েই এইবার উপলব্ধি করতে পারলেন যে, দুইটি অসৎ প্রকৃতির পৃথক্ ব্যক্তি তাঁদের দেহ হ'তে বার হয়ে এসে উভয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি কটূ উক্তি করে তারা পুনরায় তাঁদেরই দেহের মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করে মিলিয়ে গেলো।

শৈলেশ ও প্রণব বাবু উভয়েই এইবার বুঝতে পারলেন, দ্বৈত বা বহু ব্যক্তিত্ব অল্পবিস্তর সকল মানুষেরই মধ্যে বিরাজ করছে। তা না

হলে এতো দিন পরে এই ভাবে তারা কলহ করে পরস্পর পরস্পরকে কষ্ট দিতে কখোনই পারতো না। প্রণব বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতে শৈলেশ বাবুর পিঠটা স্নেহের সহিত আঁকড়ে ধরে বলে উঠলেন, "কি মিছামিছি মন খারাপ করছো? ছুটি চাই, এই তো? তা বেশ। ছুটির জন্যে আমি এখুনিই লিখে দিচ্ছি, কিন্তু একটা কথা, আমাকে এই বিপদের মাঝে একা ফেলে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারবে তো? যদি পারো তো যাও। আমি কোনও আপত্তিই আর করবো না।"

এতক্ষণে শৈলেশ বাবুর স্ত্রী সুগায়িকা দীপ্তি দেবী কোয়ার্টারের পারলারে বসে গান গাইতে সুরু করে দিয়েছেন। প্রতিদিন এই সময়টাতেই তিনি গীত গেয়ে থাকেন। এ দিনও তিনি একটা বিরহের গানই গাইছিলেন। দূর হতে এই গানের সুমিষ্ট সুর এই দিনও আফিস-ঘর পর্য্যন্ত এসে পৌছুলো। আফিসের আর পাঁচ জনের মত প্রণব এবং শৈলেশ বাবুও তা শুনতে পাচ্ছিলেন। বিরহের গান শেষ করে দীপ্তি দেবী এইবার একটা মিলনের গান গেয়ে চলেছেন।

সঙ্গীতের মধ্যে কি ক্ষমতা আছে জানি না। গানের এই করুণাত্মক সুর উভয়ের মন আর্দ্র করে তুললো। এইবার একটু এগিয়ে এসে শৈলেশ বাবু প্রণব বাবুকে বললেন, "আপনিও কয় দিন ছুটি নেন না, স্যার? সকলে মিলে পুরী-টুরী বা অন্য কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি।"

একটু ম্লান হাসি হেসে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, "দু'জনাকেই একসঙ্গে ছুটি দেবে? দিলে তো ভালোই হতো, তোমাদের নিয়ে শান্তাদের ওখানেই কয় দিন বেড়িয়ে আসতাম। আচ্ছা ভাই, তোমরাই না হয় ক'দিন ঘুরে এসো। কিন্তু বেশী দিনের জন্যে নয়। জানো তো, আমাদের শত্রু পদে পদে। তোমাকে ছাড়া কায-কর্ম্মে আর কাউকেই যে আমি বিশ্বাস করতে পারি না। মুস্কিল যে এইখানেই। আচ্ছা, যাও। এবার ওপরে যাও। বৌমাকে আর একটা গান গাইতে বলো গে। এইখান থেকেই ভালো শুনা যাবে! গান শুনতে শুনতেই ডাকের কাগজগুলো সই করে ফেলা যাক্।"

এখুনিই ছুটি নেওয়ার অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে দীপ্তি দেবীকে একটু বুঝিয়ে বলবার জন্যে শৈলেশ বাবু উপরে উঠে গেলে প্রণব বাবু টেবিলের উপর রক্ষিত স্তূপীকৃত কাগজ-পত্রগুলির আশু বিলি-ব্যবস্থা করবার জন্যে মনোনিবেশ করলেন। একটার পর একটা কাগজ উল্টাতে উল্টাতে প্রণব বাবু তা সই করে যাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একটা রঙিন লেফাফা তাঁর নজরে এলো। সুপরিচিত হস্তাক্ষরে তাঁরই শিরোনামা চিঠিটার উপর লেখা রয়েছে। তাড়াতাড়ি চিঠিখানা খুলে ফেলে প্রণব বাবু বুঝলেন, প্রায় এক সপ্তাহ হলো, চিঠিখানা বন্ধ অবস্থাতেই আফিসে এসে পড়েছিলো। অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে প্রণব বাবু চিঠিটা পড়তে সুরু করে দিলেন। চিঠির এক স্থানে লেখা ছিল—"খালি কায আর কায! বেশ, কায নিয়েই তুমি থাকো। আমি তা হলে চললুম। ইচ্ছা করলে তুমি নিশ্চয়ই ছুটি পেতে। বেশ, আমি তা'হলে চলেই যাই, তুমি বসে বসে তখন কেঁদো, বেশ হবে তখোন। খু-উব মজা হবে। শুধু কায নিয়ে ভুলে থাকতে তখন পারবে তো?" সর্ব্বশেষে শান্তা জানিয়েছে, "আমার শরীর দিন-দিন খারাপ হয়ে আসছে। তুমিই তার একমাত্র কারণ। ছুটি নিয়ে এখানে এলে কিন্তু আমি নিশ্চয়ই সেরে উঠতাম, ইত্যাদি—"

"সত্যই তো, কায আর কায! যাদের তৃপ্তি বা সুখ-শান্তির জন্যে এই কাজ করা",—প্রণব বাবু ভাবতে থাকেন, "তাদেরই যদি সুখী না করা গেলো, তা হলে এই কায করারই বা সার্থকতা কি?"

প্রণব বাবু একবার ভাবলেন তিনি ছুটিই নেবেন, কিন্তু যা সামান্য ক্ষণমাত্র পূর্ব্বে তিনি শৈলেশ বাবুকে প্রদান করতে অস্বীকৃত হলেন, তা তিনি নিজে নেন কি করে? প্রণব বাবুর অনেক কথাই মনে আসছিল। শান্তার কতো টুকরা টুকরা কথাই না তাঁর মনের মধ্যে উঁকি দিতে থাকে। এক দিন শান্তা তাঁকে বলেছিলো, "আচ্ছা, আমাকে কেউ কোথায় নিয়ে যেতে চাইলে তো তাতে তুমি কিছুতেই রাজী হও না, বলো, আমায় ফেলে তুমি থাকতেই পারবে না। কিন্তু বাড়ীতে তো তুমি এক মুহূর্ত্তই থাকো না, খালি কায কায করে বাহিরে বাহিরেই সময় অতিবাহিত করো, এতে তোমার লাভ হয় কি বলতে পারো?" উত্তরে প্রণব বাবু বলেছিলেন, "লাভ? শোন বলি তবে, তোমার তো অনেক ভালো ভালোই গহনা আছে, সেগুলো কি তুমি সব সময় পরো? পরো না তো? কিন্তু তা সত্ত্বেও কি তুমি সেগুলো কাছ-ছাড়া করো? কক্ষনো তা করো না, কারণ তুমি জানো কাছে থাকলে যখন ইচ্ছা তুমি সেগুলো বার করে পরতে পারবে। আমিও ঠিক এই জন্যেই তোমাকে কাছ-ছাড়া করতে চাই না। বুঝলে?"

এমনি কতো কথাই না প্রণব বাবুর মনে পড়তে থাকে। প্রণব বাবু বার বার করে কাযে মনোনিবেশ করতে চাইলেন, কিন্তু কিছুতেই তা তিনি পেরে উঠলেন না। কিসের একটা চিন্তা ও সেই সঙ্গে একটা আশঙ্কাও থেকে থেকে তাঁকে অস্থির করে দিচ্ছিলো। বুক ফেটে যেন তাঁর হৃৎপিণ্ডটা বেরিয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু, এইরূপ অস্থিরতা পূর্ব্বে তো তাঁর মধ্যে কখনও আসেনি? এইরূপ অহেতুক উদ্বেগের প্রকৃত কারণ যে কি প্রণব বাবু তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। পরিশেষে বিরক্ত হয়ে প্রণব বাবু তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলোর কথা আর না ভেবে কাগজের ফাইলগুলো টেবিলের এক পাশে সরিয়ে রেখে শান্তাকে একটা চিঠি লিখতে বসলেন। অত্যন্ত দুঃখের সহিত ত্রুটি স্বীকার করে তিনি শান্তাকে জানাচ্ছিলেন—এইবার তিনি ছুটি নেবেনই। ঠিক এমন সময় দূরের টেবিলের টেলিফোনটা ক্রীঙ্, ক্রীঙ্, করে বেজে উঠলো। টেলিফোন-মুন্সীই টেলিফোনটা ধরেছিলেন। তিনি ছুটে এসে প্রণব বাবুকে বললেন, "বড় বাবু, শীগ্‌গির আসুন, ট্রাঙ্ক কল।"

কি বললে? "ট্রাঙ্ক কল? আমাকে ডাকছে?" প্রণব বাবু নিজের অজ্ঞাতেই শিউরে উঠলেন, তাড়াতাড়ি ছুটে এসে রিসিভারটি তুলে নিয়ে প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ্ঞে হাঁ, আমিই প্রণব বাবু, তা কোথা থেকে বলছেন আপনি? ওঃ, ভাল আছে তো সে, কি বললেন?" যন্ত্রের ওপার থেকে উত্তর এলো, "আজ্ঞে না। একটা দারুণ দুঃসংবাদ দিচ্ছি আপনাকে। আপনার স্ত্রী এইমাত্র মারা গেলেন—হার্ট ফেইল করে।"

ও-পারের লোকটা আরও অনেক কথা বলে গেলো, কিন্তু আর কোনও শব্দই প্রণব বাবুর কানে এসে পৌছলো না। ঝপাৎ করে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে প্রণব বাবু পাশের বেঞ্চিটার উপরে এসে বসে পড়লেন। তার পর টলতে টলতে কোথায় এসে পড়লেন, তা তিনি জানতেই পারলেন না। ঘুরপাক খেতে খেতে পরিশেষে তিনি

নিজের নির্দ্দিষ্ট সিটেতে ফিরে এসে কাঠ হয়ে বসে পড়লেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, তাঁর পিছনে যেন কে এসে দাঁড়িয়েছে, তিনি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছেন তার তপ্ত নিশ্বাস। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে, কিন্তু দেখা দিচ্ছে না। পিছন ফিরলেই সে যেন দূরে চলে যায়। অস্ফুট স্বরে কে যেন তাঁকে বলে উঠে, "তুমি আমায় কিচ্ছু ভালোবাসো না। বেশ, হয়েছে তো এখোন, এইবার? এইবার তুমি করবে কি? কি, কথা কইছো না যে?"

প্রণব বাবুর মনে হয়, কে যেন তার গলাটা টিপে ধরলে, জোরে—জোরে—আরও জোরে। প্রণব বাবুর দম বন্ধ হয়ে এলো। অন্ধকার, চারি দিকে শুধু অন্ধকার! আলো? না না, আলো নেই, কোথাও তা নেই। কিন্তু হাওয়া আছে—হাওয়া, শুধু হাওয়া। কারা তাঁকে তুলে ধরলো—আরও উপরে—আরও। সিঁড়ি দিয়ে কারা যেন তাঁকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায়? বৃষ্টি পড়ছে, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি—তাঁর মাথায়, পায়ে ও গায়ে। শুনা যাচ্ছে কাদের মৃদু গুঞ্জন, কিন্তু কারা—কারা ওরা? চোখ মেলে চাইবামাত্র প্রণব বাবু দেখতে পেলেন, তিনি শোবার ঘরের খাটের উপর শুয়ে আছেন। তাঁর চতুর্দ্দিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, শৈলেশ বাবু, দীপ্তি, সিপাই, জমাদার এবং আরো কতো লোক, প্রণব বাবু প্রথমটায় বুঝতে পারলেন না, তাঁর কি হয়েছে। ক্ষীণ স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে আমার? এতো ভীড় কেনো, এ্যাঁ?"

মূক ভাষাহীন জনতা নিরুত্তর হয়েই দাঁড়িয়ে রইলো। প্রণব বাবুর কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দেবার ক্ষমতা কারুরই আর সেদিন ছিল না।

সকাল তখন পাঁচটা হবে। পূর্ব্ব দিনগুলির মত এই দিনও সেই একই ভাবে ভোরের আলো মুক্ত জানালার পথে ঘরে ঢুকে প্রণব বাবুর ঘুমটা ভাঙ্গিয়ে দিলে। চক্ষু উন্মুক্ত করে প্রণব বাবু চেয়ে দেখলেন অনেকক্ষণই সকাল হয়েছে। উদাস দৃষ্টিতে তিনি বাতায়নের পথে চেয়ে দেখলেন নীল ও সাদা মেঘের কয়েকটি ছোট ছোট টুকরা আকাশ-মার্গে ভেসে চলেছে। চারি দিকেই যেন একটা থমথমে ভাব। হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন বুকের মধ্যে কিসের একটা অব্যক্ত বেদনা। প্রণব বাবু উঠে পড়তে চাইলেন কিন্তু চেষ্টা করেও তিনি উঠতে পারলেন না; কিসের একটা ব্যথা জগদ্দল পাথরের মত তার বুকটা যেন নিষ্পেষিত করে দিচ্ছে। কিন্তু ব্যথাটা যে কিসের তা তিনি সহসা মনে করতে পারছিলেন না। সহসা তাঁর লক্ষ্য পড়লো, ঘরের একটা দেওয়ালের দিকে। দেওয়ালের গায়ের একটা পেরেকে শান্তার মাথার এক গোছা চুল তখনও পর্য্যন্ত ঝুলানো রয়েছে। কল্যকার প্রতিটি ঘটনা তাঁর স্মৃতিপথে এইবার ধীরে ধীরে উদয় হতে থাকে। সমস্ত ব্যাপারটি পুনরায় তাঁর কাছে দিনের আলোর মতই পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রণব বাবু জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চিন্তা করতে থাকলেন তাঁর অদৃষ্টের কথা। অনেক কথাই প্রণব বাবুর স্মৃতিপথে ভেসে আসছিল। সেই দিনকার এক শান্ত সকালের কথা সুস্পষ্ট ভাবেই তাঁর মনে পড়ে। ঘরে ফিরে প্রণব বাবু এই দিন দেখতে পেলেন এক জন ভদ্রমহিলা শান্তাকে বিনিয়ে বিনিয়ে তাঁর মনের দুঃখ জানাচ্ছে। শান্তার কাছে সব কথা শুনে প্রণব বাবু সেই দিন বলেছিলেন, 'কি বলছো তুমি শান্তা, তা-ও কি কখনো হয়? ওঁর স্বামী এক সাঙ্ঘাতিক কেইসের আসামী। কতো কষ্ট করে এবার তাকে আমরা বাগে পেয়েছি। জেলে তাকে এবার পাঠাবই আমরা। ওঁকে বরং বলে দাও, এবার আর তাঁর স্বামীর কিছুতেই রক্ষা নেই।' বিক্ষুব্ধ হয়ে শান্তা বলে উঠেছিলো, 'স্ত্রীর কাছ হতে স্বামীকে, মায়ের কাছ হতে পুত্রকে তোমরা কি করে ছিনিয়ে আনো বল তো? অন্যায় না হয় ওঁর স্বামীই করেছেন, কিন্তু উনি তো কোনও অন্যায় করেননি? অথচ শাস্তি যা পাবার তা তো উনিই পাবেন? পারো না তুমি ওঁর স্বামীকে বাঁচিয়ে দিতে, সত্যি। উঃ, কি নিষ্ঠুর গো তোমরা, একটুও কি দয়া আসে না তোমাদের? আচ্ছা, তোমার বউকে যদি কেউ তোমার কাছ হতে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়, তাহলে?' শান্তার এই কথায় গর্ব্বভরে প্রণব বাবু বলেছিলেন, 'কার সাধ্যি আছে তোমাকে আমার কাছ হতে নিয়ে যায়।' উত্তরে শান্তা বলেছিলো, 'কেনো, ভগবান? ভগবান যদি আমাকে কেড়ে নেন, তা হলে? সতী লক্ষ্মীদের মনে কোনও দুঃখ দিতে নেই, বুঝলে? পাপ হয় এতে জানো? উনি তো বলছেন, স্বামীকে ও-পথে তিনি আর কিছুতেই যেতে দেবেন না। তবে? না, না, যে রকম করেই হোক, ওঁর স্বামীকে তোমাকে বাঁচিয়ে দিতেই হবে। না, না, আমি কোনও কথাই তোমার শুনবো না।'

প্রণব বাবুর স্পষ্ট মনে পড়ে শান্তার একটি অনুরোধও শুধু সেই দিন কেন, কোন দিনই তিনি রাখতে পারেননি। কতো লোকের মাতাকে, কতো লোকের স্ত্রীকেই না তিনি তাদের স্বামী ও পুত্রের জন্য তপ্ত অশ্রু ফেলতে দেখেছেন। কতো হতভাগ্য পুত্রকেই না তিনি মাতার আলিঙ্গন পাশ থেকে ছিনিয়ে এনেছেন। কিন্তু প্রণব বাবুর মনে সন্দেহ জাগে, তিনি এইবার ভাবতে থাকেন, হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে তিনি অনেকেরই মনে ব্যথা দিয়েছেন, কিন্তু তা তো তিনি দিয়েছেন বাধ্য হয়েই। এবং যত ব্যথা তিনি তাঁদের দিয়েছেন, তার চেয়ে ঢের বেশী ব্যথা তিনি নিজে পেয়েছেন। কিন্তু তা সত্বেও কি এ জন্য তাঁকে শাস্তি পেতে হবে? প্রণব বাবু তাঁর মনের পথে পিছিয়ে আসতে থাকেন, অনেক দূর—আরও অনেক দূর, কিন্তু কৈ, এমন একটি পাপও তিনি করেছেন বলে তো মনে আসে না, যার জন্যে কি না তিনি এতো বড়ো একটা শাস্তি পেতে পারেন? অথচ যে সকল ব্যক্তি স্বার্থের খাতিরে জঘন্যতম অপরাধও করতে কুণ্ঠা বোধ করেনি, তারা তো বেশ সুখেই আছে—কৈ, তাদের গাত্রে তো একটি আঁচড়ও লাগে না? সুবিচার—কোথায় সুবিচার? প্রণবের ধারণা হলো, ভগবানের পৃথিবীতে সুবিচার বলে কোনও পদার্থ ই নেই। এই জঘন্য পৃথিবীতে—এই পাপের পৃথিবীতে কিছুতেই তিনি আর থাকবেন না। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেলো, তাঁর গুলীভরা পিস্তলটার কথা। সর্ব্বনাশ, ঐ খোলা ড্রয়ারটাতে সেই দিন হতেই আগ্নেয় অস্ত্রটা পড়ে রয়েছে! কেউ চুরি করে নিয়ে গেলো না তো? প্রণব বাবু তাড়াতাড়ি ড্রয়ারটা খুলে দেখলেন, পিস্তলটা সেখানে নেই। হতভম্ব হয়ে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে প্রণব বাবু দেখলেন, শৈলেশ বাবু এবং আরও জন দুই অফিসার কখোন তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

চিন্তিত ভাবে প্রণব বাবু শৈলেশ বাবুর দিকে চাহিবা মাত্র,

শৈলেশ বাবু বলে উঠলেন, "পিস্তলটা খুঁজছেন, স্যার? ওটা ঐ দিনই আমি নীচের মালখানায় রেখে এসেছি।"

নিশ্চিন্ত হয়ে প্রণব বাবু বলে উঠলেন, "ওঃ, তাই। কিন্তু কেন ওটা তুমি নিয়ে গেছো? তুমি কি মনে করেছিলে, আমি আত্মহত্যা করবো?"

সলজ্জ ভাবে শৈলেশ বাবু উত্তর করলেন, "না না, তা কেন? তবে—"

"হুঁ, বুঝেছি", প্রণব বাবু বললেন, "আত্মহত্যাই আমি করবো, তবে এ ভাবে নয়। সত্যি, বাঁচতে আমার আর ইচ্ছে করে না। চাকরী করতে তো নয়ই। তবে নিজের গুলীতে আমি কখনোই মরবো না, মরিই যদি তো পরের গুলী খেয়েই মরবো। আর সুযোগেরও যে অভাব হবে না, তা'ও ঠিক। কাল থেকে আবার আমরা নিয়ম মত রোঁদে বার হবো এবং এবার হ'তে প্রতি বারেই পুলিশ-বাহিনীর পুরোভাগেই থাকবো আমি।"

"কি আর হবে স্যার," শৈলেশ বাবু বললেন, "কয় দিন রেষ্টই না হয় নিলেন, এ কয় দিন আমিই সব দিক সামলে নেবো। আপনি তো উপরেই রইলেন, দরকার-টরকার হলে জিজ্ঞেস করে যাবো এখন।"

"না শৈলেশ, তা হয় না", প্রণব বাবু উত্তর করলেন, "কাযের মধ্যে ডুবে না থাকলে আমি পাগোল হয়ে যাবো। তুমি কি চাও, আমি পাগোল হয়ে বেড়িয়ে বেড়াই?"

পিতৃ-মাতৃ বা ভ্রাতৃবিয়োগ যে কোনও বিয়োগই হোক না কেন, স্ত্রীবিয়োগের সহিত কোনও বিয়োগ-ব্যথারই তুলনা হয় না। বিবাহ-জীবন বেশী দিনের হলে মানুষের এই ক্ষতি হয় অপূরণীয়। প্রণব বাবু ভাবতেও পারছিলেন না, যে শান্তা নেই। মনের এই আচ্ছন্ন ভাব তখনও তাঁর কাটেনি। আসল ব্যথা অনুভব বা হৃদয়ঙ্গম করতে এখনও অনেক বাকি। প্রণব বাবু তাই উদাস ভাবে শৈলেশ বাবুর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "হাঁ, তার পর? কি রকম কায কর্ম্ম তোমাদের চলছে বলো। অসুবিধা হলেই আমাকে তা জানিয়ে যেও, বুঝলে? বড় সাহেব এসে আর চেঁচামেচি করেননি তো?"

"হাঁ স্যার ভালো কথা মনে পড়ে গেল", শৈলেশ বাবু উত্তর করলেন, "বড় সাহেব এসেছিলেন, আপনাকে ডাকছিলেনও, কিন্তু আপনি ঘুমাচ্ছিলেন বলে ডেকে দিইনি। বলে দিয়েছি, এখোন আপনি আসতে পারবেন না। উপরেও আসতে চাইছিলেন, বোধ হয় সন্ধ্যার দিকে একবার আসবেনও।"

প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তা নিয়ে এলে না কেন?"

উত্তরে শৈলেশ বাবু বললেন, "এসেই তো সেই মার্ডার কেইসগুলোর কথা তুলবেন।"

"কিছু বলছিলেন না কি?" প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

উত্তরে শৈলেশ বাবু বললেন, "বলছিলেন, ডাইরীগুলো না হয় বুঝিয়ে দিয়েই যাক্, আমাকে। না হয় অন্য কাউকেই তদন্ত করতে দিই। জরুরী কেইস ফেলে রাখা তো যায় না।" এই সব, আর কি!"

"হুঁ" বলে প্রণব বাবু পাশ ফিরে শুচ্ছিলেন, এমন সময় দরোজার সিপাই এসে জানিয়ে গেলো, "হুজুর, এক মেম সাহেব আ গিয়া, নাম বোলতা মিস্ দত্ত, উনকো বাপ ভি সাথমে আয়া। কেয়া বোলা, রায় বাহাদুর, কহি জান-পছন আদমিই হোগা। লে আয় উপরমে?"

শৈলেশ বাবুর দিকে চেয়ে প্রণব বাবু বললেন, "বুঝেছি, মিস দত্ত এবং তাঁর পিতা এসেছেন। আচ্ছা, আসতেই বলে দাও, আসুক উপরে।"

মিস্ হেনা দত্ত এবং তাঁর পিতা প্রণব বাবুর পত্নীবিয়োগের সংবাদ পেয়ে সহানুভূতি জানাতে এসেছিলেন। এইরূপ ক্ষেত্রে সহানুভূতি জানিয়ে যাওয়া বর্ত্তমান সভ্যতার একটি অবশ্য কর্ত্তব্য বলেই তাঁরা মনে করেন। এই নির্জীব সহানুভূতির কোনও প্রয়োজনই প্রণব বাবুর ছিল না। সহানুভূতি জানাবার ঠেলায় কয় দিন যাবৎ তিনি অস্থির হয়েই উঠেছিলেন। লোকের ভীড় যেন তাঁর আর সহ্য হয় না। একটু একা থেকে কেঁদে নেবারও কি তাঁর উপায় নেই? পিতার সহিত ঘরে ঢুকে ছোট্ট একটা নমস্কার করে সংকোচের সহিত মিস্ হেনা দত্ত প্রণব বাবুর শয্যার এক পাশে এসে দাঁড়ালেন।

ঘরের মধ্যকার একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে মিঃ দত্ত বলে উঠলেন, "আই এ্যাম সো সরি মাই বয়! বাট্ ইউ মাষ্ট বিগিন্ ইয়োর লাইফ এ্যানিউ। তা, যা হবার তা তো হয়েই গেলো কিন্তু জীবনটা তা বলে তো তুমি নষ্ট করতে পারো না? ঠিক্ আছে —আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। হেনাকে তাই আমি বলছিলাম, তুই গেলে প্রণব একটু শান্তি পাবে। আর হেনাও আসবার জন্যে খুবই ব্যস্ত। হেনাই না হয় এবার থেকে তোমার দেখা-শুনা করুক, কেমন? তা এতে আমার কোনও আপত্তি নেই, আমি এতে রাজীই আছি। তা কি বলিস্ হেনা, ভেবে দেখ। আঃ, মাই পুয়োর বয়, ভেরি স্যাড—ভেরি-ই স্যাড।"

পিতার কথায় মিস্ হেনা দত্ত সলজ্জ ভাবে তাঁর মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন, কিন্তু পিতার এই কথার কোনও প্রত্যুত্তর করলেন না। দত্ত সাহেবের কথায় প্রণব বাবু বিষণ্ণ মনে একটু হাসলেন মাত্র, কারণ প্রত্যুত্তরে তাঁরও কিছুই বলবার ছিল না।

মিঃ দত্তের এই নির্লজ্জ অভিব্যক্তি শৈলেশ বাবুরও বিরক্তি উৎপাদন করেছিলো, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি চুপ করেই তা শুনলেন। শুধু তাই নয়, এঁদের চা পান দ্বারা আপ্যায়িত করে দিতেও তিনি ভুলে গেলেন না।

দরজার সিপাই এইবার আর একটি ভিজিটিং কার্ড এনে শৈলেশ বাবুর হাতে দিয়ে গেলো। কার্ডখানিতে লেখা ছিল, "ভেরি সরি ফর দি লস্" অর্থাৎ কি না, "আপনার দুঃখে আমি অত্যন্ত ব্যথিত, ইতি খোকন?"

শৈলেশ বাবু সিপাইয়ের পিছন পিছন ধাওয়া করে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই, কাঁহাসে ই কার্ড মিলা, কোন্ দিয়া এই কার্ড?"

উত্তরে সিপাই জানালো, "উ তো কভ্ চলা গিয়া। একদম ঠারতা ভি নেহি, উ গোরা গোরা পাতলা এক বঙ্গলী বাবু থে।"

খোকা বাবুর এই স্পর্দ্ধা ও বেপরোয়া ভাব প্রণব এবং শৈলেশ বাবুকে হতভম্বই করে দিলো। আশ্চর্য্যের বিষয় থানাতে এসেও সে কি না ফিরে যেতে পারলো। প্রণব বাবুর ধারণা হয়েছিলো, খুনে গুণ্ডাটা শেষে কি না শান্তাকে নিয়েও ঠাট্টা ক'রে গেলো। প্রণব বাবুর পিছনে আর কোনও বন্ধনই নেই। শান্তাকে দেওয়া

প্রতিশ্রুতিও তাঁর কাছে আজ অমূলক। বেঁচে থাকা বা না থাকা তাঁর কাছে আজ সমান কথা, কিন্তু তার পূর্ব্বে খোকাকে একবার তিনি দেখে নেবেন। এই খোকা শিউচরণকে হত্যা করেছে। আজ সে শাস্ত্রাকে পর্য্যন্তও অবমাননা করতে সাহসী হয়। উঃ, ভেবেছে কি বেটা, গুণ্ডা কি ও একাই? প্রণব বাবুর মনে একটা বিজাতীয় ঘৃণা ও প্রতিশোধের স্পৃহা জেগে উঠলো। প্রণব বাবু এইবার তাঁর সকল দুঃখ ভুলে গিয়ে খাড়া হয়ে উঠলেন। কিন্তু, খোকার এই আগমনের কথা, তাঁদের উভয়ের কেউই আর মিস্ ও মিঃ দত্তকে ভেঙে বললেন না। কে জানে, হয় তো খোকা এদের পিছন পিছনই থানায় এসে থাকবে।

এ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করে প্রণব বাবু হেনা দেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের সেই খোকন বাবুর সঙ্গে আর দেখা হয় না তো? দেখবেন, সাবধান, লোকটা একেবারেই কিন্তু সুবিধার নয়।"

হেনা দেবী চুপ করেই প্রণব বাবুর এই সতর্ক বাণীটি শুনে গেলেন, কিন্তু কোনওরূপ উত্তর দিলেন না। উত্তর দিলেন, হেনা দেবীর পিতা মিঃ দত্ত। বিরক্ত হয়ে তিনি বলে উঠলেন, "পাগোল হয়েছো, আর আমি ওকে ওর সঙ্গে মিশতে দিই। বেটা খুনে স্বদেশী ডাকাত। এই স্বদেশী-ফদেশী আমি ছোটবেলা থেকেই ঘৃণা করি। আমরা বলে কি না তিন পুরুষের রায় বাহাদুর। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো প্রণব বাবু, আমি তাকে বাটীর ত্রিসীমানায়ও আর আসতে দিই না। এলেই বেটাকে ধরিয়ে দেবো না?"

প্রণব বাবু বুঝতে পারলেন যে শেষ বরাবর কন্যাকে আর সামলাতে না পেরে কেলেঙ্কারী এড়াবার জন্যে মিঃ দত্ত তাকে এইবার তাঁর ঘাড়েই চাপাতে চান। মিঃ দত্তের এই উক্তিতে প্রণব বাবু একটু হাসলেন মাত্র, মুখে কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি কোনওরূপ উচ্চবাচ্য করলেন না।

এর পর ধন্যবাদ সহকারে পিতা-পুত্রীকে বিদায় দিয়ে প্রণব বাবু শৈলেশ বাবুকে কাছে ডেকে বললেন, "মনে করেছিলাম, অন্ততঃ সপ্তাহ খানেকও ছুটি নেবো, কিন্তু তা আর নেবো না। আজ হ'তেই কাজে লেগে যাবো। দেখি, কি করতে পারি। আমাদের দু'জনার এক জনকে দেখছি এইবার বিদায় নিতে হবেই।"

প্রণব বাবু নীচে নামবার জন্যে উঠেই বসেছিলেন, এমন সময় জমাদার রামসিং এসে জানালো, "হুজুর, একঠো জব্বর খবর মিল গিয়া। লেকেন আপকো তবিয়েত তো ঠিক নেহি, হুজুর। মে সমঝতা কি ছোট বাবুকো ভেজ দেনে ভি কাম হোনে শেখতা।"

প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ঠিক হ্যায়। লেকেন কেয়া খবর উ তো পয়লা বাতায়ো।"

উত্তরে জমাদার রামসিং বললে, "খবর তো হুজুর শিউচরণিয়কা জেনানাকো হ্যায়। লেকেন ই খবর বহুত সাচ্চা হ্যায় হুজুর। উনকো তো হুজুর আভি দোসরা এক দাগী আদমী গিয়া মাহিনাসে রাখ লিয়া। উহি দাগী আদমীসেই উনকো ইস্ পাত্তা ভি মিল গ'য়া, হুজুর।"

প্রণব বাবুর মত আরও একটি লোক খোকা বাবুর পিছনে লেগেই আছে। এই লোকটি কোনও পুরুষ লোক নয়, এক জন স্ত্রীলোক মাত্র। স্ত্রীলোকটি হচ্ছে শিউচরণিয়ার বিধবা স্ত্রী মহুয়া বেওয়া। এতো দিন পরে পেটের দায়ে নিকা করে নিলেও স্বামীকে সে এক দিনের জন্যও ভুলেনি, তার মনের মধ্যে খোকার প্রতি একটা বিজাতীয় রাগ ও প্রতিশোধ-স্পৃহা জেগেই রয়েছে।

মহুয়া সংক্রান্ত এই ব্যাপারটি প্রণব বাবুর জানা ছিল। আগ্রহ সহকারে প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "হাঁ, হাঁ, বলিয়ে, ই সাচ বাত হ্যায়? কেয়া বাতায়া উ?"

উত্তরে জমাদার রাম সিং বললে, "উস্ রোজ রাতমে রেইলওয়েকো এক ডাকাতি হুয়া না? উ কাম তো উনলোকই কিয়া হ্যায়। উনলোককো বহুত রূপেয়া ভি ইসমে মিল গিয়া। আভি শুনতা কি উনলোক কোলকাতাসে হট্ যাতা হ্যায়। লেকেন আভি নিকালতা তো বয় আদমীকো আপলোক পকড়ানে ভি শেখতা। উনলোক, শুনা কি তিন বাজেতক্ শান্তিভাঙ্গা লেনকো এক কুঠিমে ঠাঁয়রাঙ্গে। উসকো বাদ উনলোক—"

লিলুয়াতে যে একটা বড় রকমের রেইলওয়ে ডাকাতি হয়ে গেছে তা সেই দিনকারই কাগজে তো বেরিয়েছেই, তা ছাড়া এ সম্বন্ধে টেলিফোন-যোগে থানায় থানায় হৈ-চৈ নোটিশও এসেছিল। বিস্মিত হয়ে শৈলেশ বাবু বললেন, "আরে, এ আবার কি? এ সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার তো! এই সবের মধ্যেও আবার খোকা বাবু আছে না কি? আমি তো শুনেছিলাম ওটা একটা রাজনৈতিক ডাকাতি। গোয়েন্দা বিভাগের যতীন বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি তো আমাকে এই খবরই দিলেন।"

চুপ ক'রে কিছুক্ষণ বসে থেকে প্রণব বাবু তাঁর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ভেবে নিলেন এবং তার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে শৈলেশ বাবুকে বললেন, "তা হলে এক্ষুনিই বেরিয়ে পড়া যাক, শৈলেশ, আমার মন বলছে, এদের এক জন না এক জন এইবার ধরা পড়বেই।"

সিপাই-শান্ত্রী এবং সমগ্র পাহারার সাহায্যে যথা সত্বর শান্তিভাঙ্গা লেনের বস্তি-বাড়ীটা ঘেরোয়া করে ফেলতে প্রণব বাবুদের একটু মাত্রও অসুবিধা হয়নি। বস্তিটার তিন দিকে তিন লরী সিপাহী-শান্ত্রী এক সঙ্গে নামিয়ে দেওয়া মাত্রই তারা নিজেরাই পূর্ব্ব নির্দ্দেশ মত দৌড়ে এসে কথিত বস্তিটা ঘেরাও করে ফেললে। প্রণব এবং শৈলেশ বাবুও চতুর্থ লরীটা করে বস্তিটার সম্মুখ ভাগে এসে এই একই সময়েই হানা দিয়েছেন। একটি মাত্র প্রাণীরও বিনা এত্তালাতে বস্তির কোনও ঘর হতেই বার হয়ে আসবার আর উপায় নেই।

হুড়-মুড় করে নির্দ্দিষ্ট বাড়ীখানির মধ্যে শান্তিরক্ষকরা সকলে মিলে ঢুকে পড়ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তিকে বাটীর ছাদ হ'তে ঝপ করে নীচের উঠানে লাফিয়ে পড়তে দেখা গেল। পুলিশ দলের মধ্য থেকে এক জন সহসা ভয় পেয়ে বলে উঠলো, "হুজুর, খোকা—খোক্—খোকা বাবু-উ।"

খোকা বাবুর নাম কানে যাওয়া মাত্র অলক্ষ্যে প্রণব বাবুর মুখ থেকে বার হয়ে এলো—"ফায়ার"। পিছনেই এক জন গোরা সার্জ্জেণ্ট দাঁড়িয়েছিল। আদেশটি শুনতে পাওয়া মাত্র ঐ লোকটিকে লক্ষ্য ক'রে সে তার পিস্তলের ঘোড়াটি নির্ব্বিবাদেই টিপে দিলে, আওয়াজ হলো—বড় দড়াম্! গুলীটা লোকটার দেহে এসে বিঁধলো কি না তা বোঝা গেলো না, কিন্তু তাকে নিশ্চল ভাবেই শুয়ে থাকতে দেখা গেলো। প্রণব বাবু বলে উঠলেন, "মলো না কি, যাক, বাঁচাই গেলো।"

কিন্তু সকলে মিলে এগিয়ে এসে দেখতে পেলেন, লোকটা

খোকা বাবু তো আদপেই নয়, এমন কি তাকে খোকার কোনও দলের লোক বলেও মনে হয় না। সর্ব্বনাশ! তাহলে খুনী ধরতে এসে শেষে কি নিজেরাই একটা খুন করে বসলে না কি? প্রমাদ গুণে প্রণব বাবু গোরা সার্জ্জেণ্টকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, "হোয়াট্ হ্যাভ্ ইউ ডান, ম্যান।" উত্তরে সার্জ্জেণ্ট সাহেব জানালো, "আই ডোণ্ট নো, ইউ হ্যাভ অর্ডারড মি।" অর্থাৎ কি না, "আমি কি জানি মশাই, আপনিই তো হুকুম দিলেন।" প্রণব বাবু এইবার ফাঁপরে পড়লেন, যত দূর মনে পড়ে এই রকম একটা শব্দই তাঁর মুখ দিয়ে বার হয়ে এসেছিল। প্রণব বাবু এইবার চট্ করে মনে মনে একটা মতলব এঁটে নিয়ে বললেন, "নেভার মাইণ্ড, আই উইল লিগেলাইজ ইট্।" প্রণব বাবু চট্ করে ব্যাগ থেকে একটা বড়ো ছুরী বার করে সেটা মৃত ব্যক্তিটির হাতের মধ্যে গুঁজে দিচ্ছিলেন, এমন সময় সহসা লোকটা নড়ে উঠে ধাঁই করে প্রণব বাবুর পদদ্বয় লক্ষ্য করে একটা লাথি কসিয়ে দিলে। প্রণব বাবু এ জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাল সামলাতে না পেরে তিনি উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। ঠিক সেই সময় সম্মুখের একটা কামরা থেকে কে এক জন তার পিস্তল ছুড়লো। গুলীটা প্রণব বাবুর ঠিক মাথার উপর দিয়েই ছুটে এসে তাঁর পশ্চাদ্‌ভাগে দণ্ডায়মান এক সিপাহীর বক্ষস্থল বিদীর্ণ করে দিয়ে পাঁচিলের মধ্যে সেঁদিয়ে গেলো।

জমাদার রামসিং নিহত সিপাহীর ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বেই দাঁড়িয়েছিলো। সে এইবার প্রণব বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে চীৎকার করে উঠলো, "হুজুর, খোকাকো দোস্ত, গোপীনাথ গুলী চালাকে অভি উস্ ঘরমে ঘুস গেয়া, হুজুর।"

প্রণব বাবু তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে পিছনের সিপাহীটার দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। দেহটিতে যে আর প্রাণ নেই তা তাকে দেখলেই বুঝা যায়। প্রণব বাবু দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পিস্তল উঁচিয়ে জমাদার-নির্দ্দেশিত ঘরখানি লক্ষ্য করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় শৈলেশ বাবু পিছন দিক থেকে তাঁকে ধরে ফেলে বললেন, "কি করছেন, স্যার? যাচ্ছেন কোথায়? দাঁড়ান। বাইরের শান্ত্রীরা আগে এসে যাক্।" কিন্তু প্রণব বাবু কারুর কোনও কথা না শুনে জোর করে শৈলেশ বাবুর হাত ছাড়িয়ে ঐ ঘরটার মধ্যেই ঢুকে পড়লেন।

দল বেঁধে সাহস দেখানো খুবই সহজ। যে সাহস একা দেখানো যায় না, দল বেঁধে তা সহজেই দেখানো যায়, এমন কি দল বেঁধে মৃত্যুবরণ করতেও কেহ ভয় পায় না। দারুণ উত্তেজনার মধ্যে পড়লে মৃত্যুভয় হ'তে মানুষ এমনিই অব্যাহতি পেয়ে থাকে। জনপ্রিয় অফিসার প্রণব বাবুকে মৃত্যুপণ করে দস্যু-অধ্যুষিত ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়তে দেখে জমাদার রামসিংও এসে ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়লো। শুধু রামসিং কেন, শৈলেশ বাবু পর্য্যন্তও এঁদের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং সেই সঙ্গে আরও অনেকেই সাহস করে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।

ঘরের মধ্যে গোপী একলা ছিল না। তার সঙ্গে তার রক্ষিতা ডলি, ডলির মাতা এবং তাঁর প্রিয় বন্ধু কেষ্টও সেইখানে মজুত ছিল।

পরিকল্পনা অনুযায়ী এতক্ষণে কলিকাতা ছেড়ে তাদের চলে যাবারই কথা। কিন্তু তার প্রিয় রক্ষিতা ডলিকেও সঙ্গে নেবার জন্য গোপী বিপদ বরণ করেও এই দিন এখানে এসেছিলো। অবস্থা গতিকে কেষ্টও এই দিন এদের সঙ্গে এসে গিয়েছে। এমন ভাবে সংবাদটি যে ভিতর থেকে বাইরে চলে যেতে পারে তা তারা কল্পনাও করেনি। গোপী এবং কেষ্ট ছিলখোকা বাবুর সুযোগ্য সাকরেদ, তার উপর প্রণব বাবুর উপর তাদের রাগও ছিল অকৃত্রিম, খোকার ন্যায় উহা অনুরাগমিশ্রিত ছিল না। আত্মরক্ষার জন্য গোপী নিমিষের মধ্যে তার আগ্নেয় অস্ত্রের সাহায্য নিলো এবং সেই সঙ্গে প্রণব বাবুও। চারি দিককার আকাশ-বাতাস আলোড়িত করে উভয়েরই পিস্তল একসঙ্গেই গর্জ্জন করে উঠলো।

গুলীর মুহুর্মুহু আওয়াজে বহির্দেশে পাহারায় নিযুক্ত সশস্ত্র সিপাহীরা দ্রুত কুচ করে বাড়ীটার ভিতর ঢুকে পড়লো, সেই সঙ্গে বাহিরের একটা বিরাট জনতাও। উপস্থিত সকলে ঘরে ঢুকে দেখলো, একটি মাত্র গুলী প্রণব বাবুর বাম বাহু ঘেঁসে বেরিয়ে গেছে এবং আঘাত একেবারেই গুরুতর নয়। কিন্তু আসামী গোপী তাঁর প্রথম গুলীতেই নিহত হয়েছে, এবং গোপীর গুলীতে নিহত হয়েছে প্রভুভক্ত জমাদার রামসিং। এই দিন একমাত্র কেষ্টোকেই জীবিত অবস্থায় গ্রেপ্তার করা সম্ভব হলো, কিন্তু তাও সম্ভব হলো—দুই দুই জন অধস্তন কর্ম্মচারীর জীবনের বিনিময়ে।

আঘাত সামান্য হলেও প্রণব বাবু তাঁর বাম বাহুতে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন। বেশী খানিকটাই মাংস গুলীর মুখে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। যন্ত্রণায় অস্থির হয়েও তিনি সিপাহীদ্বয়ের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। তাদের দু'জনার কেহই সেই দিন সেখানে মরবার জন্যে আসেনি। মৃত্যু কামনা একমাত্র প্রণব বাবুই করেছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, যে কি না মরতেই চায় সেই বেঁচে থাকে জয়মাল্য নিয়ে। প্রণব বাবুর যন্ত্রণা-কাতর মন বহু দূরে—দূরে—আরও দূরে—বাঙ্গালার বাহিরের একখানি শান্তি-পূর্ণ পল্লীগ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে চাইলো; যে পল্লীটিতে কি না এই হতভাগ্য দরিদ্র ব্যক্তিদ্বয়ের স্ত্রী-কন্যারা তাদের চিঠি এবং মণিঅর্ডারের অপেক্ষায় মাসের পর মাস অধীর হয়ে এ যাবৎ কাল অপেক্ষা করে এসেছে।

এই বীর মানুষ দুইটি প্রণব বাবুরই হঠকারিতার জন্যে অকালে চলে গেল, কিন্তু প্রণব বাবু, যাঁর জন্যে কাঁদবার মত আজ একটি লোকও নেই, তিনিই রইলেন বেঁচে। একেই কি না বলে অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাস!

[ক্রমশঃ।

ঋগ্বেদের পরিচয়

হিন্দু ইউরোপীয় পুরাণ

স্বামী বাসুদেবানন্দ

এক্ষণে আর্য্য সভ্যতার আদি ধর্মগ্রন্থে যে দেবতাদের উল্লেখ আছে তাহা কি ভাবে রূপান্তরিত হইয়া নানা জাতীয় আর্য্য পুরাণের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আমরা পাঠক-পাঠিকাদের নিকট বিবৃত করিয়া দেখাইব। যেদিন ইউরোপে প্রথম ঋগ্বেদের আলোচনা আরম্ভ হইল তাহার পরই এক বিস্ময়কর ব্যাপার হিন্দু ও ইউরোপীয় আর্য্যগণের নিকট প্রতিভাত হইল। সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত বার্ণফ্ (Burnouf) প্রথম আবিষ্কার করিলেন যে জেন্দ আবেস্তার ঈজিম, থ্রেতেয়ন এবং কেরেশাসংশ ঋগ্বেদের যম, ত্রৈতন এবং কৃশাশ্ব। এক্ষণে আমরা হিন্দু-ইউরোপীয় আর্য্য ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের সাহায্যে ঋগ্বেদীয় দেবতাগণের নাম ভাষান্তরিত বা বিকৃত হইয়া কিরূপে ভারত ও ইউরোপের পুরাণের সৃষ্টি হইয়াছে তাহারই আলোচনা করিব। আমাদের সহিত সকল বিষয়ে মিল না হইলেও রমেশ দত্ত মহাশয় তাঁহার অনুবাদে ইহার বিস্তার আলোচনা করিয়াছেন।

১। অগ্নি। ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তেই অগ্নি দেবতার উল্লেখ আছে। ইনি ইরাণী (প্রাচীন পারসিক) গ্রীক্, রোমক্ প্রভৃতি জাতির নিকট পূর্বে পূজিত হইতেন। ইরাণীরা তাঁহাকে আহুরো (অসুর) মজদের পুত্র এবং অতর নামে উপাসনা করিতেন। কারণ ঋক্-সংহিতার ১ম।১৩ সূক্তের ৩য় ঋকে আছে—"এই যজ্ঞে প্রিয় নরাশংস নামক অগ্নিকে আহ্বান করি।" 'নরাশংস' অর্থে মানব প্রশংসিত (রমেশ দত্ত)। ইরাণী ধর্মশাস্ত্র জেন্দ আবেস্তায় অগ্নিকে 'অতর' নাম দেওয়া হইয়াছে। পুনরায় উহাতে অগ্নিকে 'নৈর্য্যোসজ্ঞ' শব্দেও অভিহিত করা হইয়াছে। উহা বৈদিক নরাশংস শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। জেন্দ অবেস্তা দ্বিতীয় সিরোজের একটি স্তুতিতে আছে, 'আমরা আহুরোমজদের পুত্র অতরকে যজ্ঞ প্রদান করি। আমরা সকল অগ্নিকে যজ্ঞ প্রদান করি। রাজাদের নাভিতে যিনি বাস করেন সেই নৈর্য্যসজ্ঞকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি।'

পুনশ্চ ঋ বে ১।১২।৬ ঋকে অগ্নিকে "কবিগৃহপতির্যুবা" বলা হইয়াছে এবং ১।২২।১০ ঋকে "হে যবিষ্ঠ (যুবক অগ্নি)! হোত্রা ভারতী বরণীয়া ধিষণাকে আনয়ন কর"—এইরূপে "যবিষ্ঠ" শব্দে অগ্নিকে আহ্বান করা হইয়াছে। সায়ন 'যবিষ্ঠ' শব্দের অর্থ যুবোত্তম করিয়াছেন। এক্ষণে গ্রীকদের বিশ্বকর্মার নাম Hephaistos (Vulcan in Latin)। এই 'হেফেইস্টস্' শব্দটি 'যবিষ্ঠ' শব্দের রূপান্তর।

কক্সের মতে অগ্নির সংস্কৃত "প্রমন্থ" (কাষ্ঠঘর্ষণে বা মন্থনে উৎপন্ন) নাম—গ্রীকদিগের Prometheus (প্রমিথিয়াস—ইনি স্বর্গ হইতে মনুষ্যলোকের জন্য অগ্নি চুরি করিয়া আনেন)। সংস্কৃত "ভরণ্যু" গ্রীকদিগের অগ্নিদাতা সদাচার নিয়ন্তা Phoroneus, এবং সংস্কৃত "উল্কা" রোমানদের Vulcan শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে।১

মুইরের মতে সংস্কৃত "অগ্নি" ল্যাটিন Ignis এবং শ্লাভদিগের Ogniতে রূপান্তরিত হইয়াছে।২

কিন্তু Prometheus শব্দের যথার্থ উৎপত্তি আমরা ঋগ্‌বেদের অন্যত্র দেখিতে পাই। ১।৬০।১ ঋকে "মাতরিশ্বা এই অগ্নিকে মৃত্যুর ন্যায় ভৃগুবংশীয়দিগের নিকট আনিলেন"—এইরূপ আছে। যাস্ক ও সায়ন "মাতরিশ্বা" শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বসতি প্রাণিতি বর্ত্ততে ইতি যাবৎ ইতি মাতরিশ্বা বায়ু।" Titan Japeusএর পুত্র Prometheus, যিনি স্বর্গ হইতে অগ্নি চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, এই বৈদিক 'বায়ু' 'মাতরিশ্বা' শব্দের রূপান্তর। কিন্তু ঋ বে ১।৯৬।৪ ঋকের 'মাতরিশ্বা' শব্দের অর্থ সায়ণ করিয়াছেন—"মাতরি সর্বস্য জগতো নির্ম্মাত্র্যন্তরীক্ষে শ্বসন্ বর্ত্তমানঃ"—এখানে অগ্নি অর্থই স্বীকৃত হইয়াছে। পুনশ্চ ঋ বে ৩.২৯.২ ঋকে 'মাতরিশ্বা' শব্দের অর্থ সায়ণ করিয়াছেন, "অন্তরীক্ষরূপ মাতৃক্রোড়ে বিদ্যুৎরূপে গমনাগমন করেন বলিয়া অগ্নির আর একটি নাম মাতরিশ্বা।" বেদার্থযত্ন নামক গ্রন্থের সাহায্যে এই রূপকটি আরও পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায়,—"মাতরিশ্বা বিদ্যুতাগ্নি, স্বর্গলোক হইতে ভূমিতে পতিত হইয়া পার্থিব অগ্নি উৎপন্ন করে।" কিন্তু ঋবে ১.৬০।১ ঋকের 'মাতরিশ্বা' শব্দের 'বায়ু' অর্থ আমাদের যথার্থ বলিয়া বোধ হয়, কারণ বিদ্যুতাগ্নিকে বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়াই আগমন করিতে হয়।৩ আর 'মাতরিশ্বা' শব্দের 'অগ্নি' অর্থ গ্রহণে Prometheusএর সহিত রূপক ঠিক যোজিত হয় না।

পুনশ্চ ঋবে ১।১২৮।২ ঋকে আছে—"মাতরিশ্বা মনুর জন্য দূর হইতে অগ্নিকে আনিয়া দীপ্ত করিয়াছিলেন সেইরূপ দূর হইতে আমাদের যজ্ঞশালায় তিনি আসুন" এবং ঋবে ১।৭১।২ ঋকে আছে, "অঙ্গিরা নামক আমাদের পিতৃগণ মন্ত্র দ্বারা অগ্নির স্তুতি করিয়া বলবান ও দৃঢ়াঙ্গ পণি নামক অসুরকে স্তুতি (উক্থ) শব্দ দ্বারাই বিনাশ করিয়াছিলেন।" এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতামত টীকায় উদ্ধৃত করিলাম।৪

১। In this name Yavishtha, which is never given to any other Vedic God, we may recognise the Hellenic Hephaistos. Note thus with the exception of Agni all names of the fire and the fire god were carried away by the western Aryans: and we have Prometheus answering to 'Pramatha', Phoroneus to Bharanyu and the Latin Vulcan to Sanskrit Ulka—(Cox's Mythology of the Aryan Nation Vol II Chap. iv Sec 1.)

২। Agni is the god of fire; the Ignis of the Latin, the Ogni of the Slavonians. (Muir's Sanskrit Text Vol V (p. 884) 1199.)

৩। Bothlingk ও Roth তাঁহাদিগের জগদ্বিখ্যাত অভিধানে বলেন যে মাতরিশ্বার দুইটি অর্থ বেদে দেখা যায়। প্রথম মাতরিশ্বা এক জন, যিনি বিবস্বানের দূতরূপে আকাশ হইতে অগ্নি আনিয়া ভৃগুবংশীয়দিগকে দেন। দ্বিতীয় মাতরিশ্বা অগ্নিরই একটি গুপ্ত নাম। তাঁহারা আরও বলেন যে মাতরিশ্বা 'বায়ু' অথর্ববেদের কুত্রাপি ব্যবহার হয় নাই।—রমেশচন্দ্র।

৪। "This and the proceeding stanza are corroborative of the share borne by the Angirasas in the organisation, if not in the origination, of the worship of fire—Wilson.

২। বায়ু। ঋগ্বেদের আর একটি দেবতা 'বায়ু'! প্রাচীন পারসিকদের অবেস্তা ধর্মগ্রন্থেও ইঁহার নামোল্লেখ আছে—"এই বায়ুকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি, এই বায়ুকে আমরা আহ্বান করি।" "তিনি তাঁহার নিকট একটি বর প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, 'হে উর্দ্ধবিচারী বায়ু! আমাকে এই বর দাও যেন আমি তিন মুখ ও তিন মস্তকযুক্ত অজি দহকে (সংস্কৃত অহি দহকে) পরাস্ত করিতে পারি।' উর্দ্ধবিচারী বায়ু তাহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা অহুরো মজদের আজ্ঞা অনুসারে সেই বর দিলেন॥" কোন কোন পণ্ডিত বলেন, গ্রীক্ Pan, লাটিন Favonius সংস্কৃত পবনেরই বিকৃতি।

৩। সোম। ঋগ্বেদে সোমরসের কথা আছে। ইরাণীদের আবেস্তায়ও ইহা 'হওমা' নামে পরিচিত। যথা—"আমরা কাঞ্চনবর্ণ ও সুদীর্ঘ হওমাকে যজ্ঞ দান করি, আমরা হর্ষদাতা হওমাকে যজ্ঞদান করি, তিনি জগৎকে বৃদ্ধি করিতেছেন; আমরা হওমাকে যজ্ঞদান করি, তিনি মৃত্যুকে দূরে রাখিয়াছেন।—জেন্দ আবেস্তা ২য় সিরোজ। "অহুর (অসুর) দ্বারা সৃষ্ট বেরেথ্রঘ্নকে (সং—বৃত্রঘ্নকে) আমরা যজ্ঞদান করি, হওমা মস্তক রক্ষা করেন; আমি তাহা অর্পণ করি; হওমা জয়শীল, আমি তাহা অর্পণ করি; আমি সুরক্ষককে অর্পণ করি; হওমা আমার শরীর রক্ষা করেন, আমি তাহা অর্পণ করি; যে মনুষ্য হওমা পান করিবে সে যুদ্ধে শত্রুদিগকে জয় করিবে॥"—জে আ বহরাম যাস্ত।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন, "বোধ হয় ইরাণীয় আর্য্যেরা সোমরস স্বাভাবিক অবস্থায় (unfermented) ব্যবহার করিতেন এবং ভারতীয় আর্য্যেরা সোমরস মাদক অবস্থায় (fermented) পান করিতেন। এই দুই আর্য্যজাতির বিবাদের অনেক কারণের মধ্যে ইহা একটি।

ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী অথর্ববেদ ও শতপথব্রাহ্মণে 'চন্দ্রকে' নানা স্থানে 'সোম' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আর পুরাণে 'সোম' শব্দের অর্থ চন্দ্র ইহা আমরা সকলেই জানি। লাটিন্ mensis, গ্রীক men, ইংলিশ moon, বোধ হয় সংস্কৃত সোমেরই অপভ্রংশ। বেদান্তে সোম, মনের অধিপতি।

সমস্ত ঋগ্বেদের অগ্নি ও সোমতত্ত্ব বিবেচ্য। এই অগ্নি ও সোমেতেই সৃষ্টি অবস্থিত। এই উত্তাপ ও শৈত্যে জগৎ ওতপ্রোত—উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ সকলেরই উৎপত্তি এই অগ্নি ও সোমে—প্রাণ ও প্রাণপক্ষ শুক্রে—জীবন ও যৌবনে। এই অগ্নিই হইতেছেন ঋ বে ১০।১৯০।৩ ঋকে তপঃ (তাপ), যাহা হইতে সত্য ও ঋত (সৃষ্টি শৃঙ্খলা) জন্মাইল। উপনিষৎ এই তপঃ শক্তির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"সৃষ্টিতে প্রজাপতির পরিশ্রমবোধ হইল, সেই সন্তাপ বা উষ্মা হইতে তেজোরস বা দৈবী শক্তির উদ্ভব হইল। সৃষ্টির পূর্বে এ সংসার ছিল না, এ জগৎ মৃত্যুর দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। তিনি মন সৃষ্টি করিলেন। পরে তাঁহার ভোগোপাদান কারণ-বারি সৃষ্টি হইল—সেই বারি হইতে সূর্য্য চন্দ্র সৃষ্টি হইল এবং তিনি তেজোঃস্বরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন (বৃহদা উপনি ১।২।১, ২)। ঋ বে ১০।৮২।৫-৬ ঋকে এই জল কি তাহা বলা হইয়াছে—"এই জল সমস্ত দেবগণের গর্ভস্বরূপ। এই ভ্রূণ বিশ্বকর্মার নাভিতে বর্ত্তমান ছিল। আর ঐ অগ্নি স্বর্গে সূর্য্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ এবং পৃথিবীতে অগ্নি বলিয়া পরিচিত।" অগ্নিরের তপস্যা (ঋ বে ১০।১২১।৩) তাহারই সূক্ষ্মরূপ; যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি। পার্থিব সোম হইল অমৃতের প্রতীক। যিনি সেই অগ্নিকে জানেন, তিনিই সেই সোমকে প্রাপ্ত হন। এই সোম পান করিয়াই লব ইন্দ্র আত্মস্তুতি করিয়াছিলেন—"এক পক্ষ আমার স্বর্গে, অপর পক্ষ আমার অধস্তলে—আমি কি সোম পান করিয়াছি।" (ঋ বে ১০।১১৯।১১-১২)। তৈত্তিরীয় সংহিতার ৩।৫।৭।১ মন্ত্রে আছে "সোম এখান হইতে তৃতীয় দ্যুলোকে ছিল, গায়ত্রী তাহা আহরণ করেন। তাহার একটি পাতা ছিন্ন হইয়া ভূমিতে পড়ে; তাহাই পর্ণ (পলাশ)। সরস্বতী শ্যেনরূপে সোমাপহরণ কালে সোমপালক কৃশানু (অগ্নি) শরক্ষেপ করেন, তাহাতে তাঁহার বাম পদের নখ ছিন্ন হয় (ঋ বে ৪.২৭.৩ সায়ণ ভাষ্য)।৫

কিন্তু পার্থিব সোমকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তবে উহার অধিপতি দেবতা সম্বন্ধে ঋগ্বেদে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়—"আকাশে দেবসদনে সোমের নিবাস"—(৮।১৩।২)। "সোমের পরম পদ আকাশে (৯।৮৬।১৫)॥ "দ্যুলোক হইতে শ্যেন পক্ষী কর্ত্তৃক সোম আহৃত" (৯।৭৭।১৪-৪।২৬।৬)॥ "সোম সঙ্কেত করিয়া আকাশের উপর হইতে আগমন করেন" (৯।৬৪।৮)। "দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে সংস্থাপিত হইয়া ইনি চতুর্দ্দিকে গমন করেন।" (৯।৭০।৫)। "আকাশ হইতে তাঁহার কিরণ যেন সহস্র ধারায় পৃথিবীতে বর্ষিত হয়" (৯।৭৭।৫)। "তিনি বৃষভের ন্যায় নভঃ প্রদেশ দিয়া গমন করেন" (৯।৭১।৩)। "গন্ধর্ব্বেরা সোমকে রক্ষা করেন, সোমদেব সন্ততিদের রক্ষা করেন" (৯।৮৩।৪)। "দ্যুলোকের উপরে থাকিয়া নক্ষত্রগণকে দীপ্তিশীল করেন" (৯।৮৫।৯)। "ইনি ধর্ত্তা ও দ্যুলোক হইতে ক্ষরিত হন" ৯।৭৬।১)।

"That priestly family or school (Angirasas) either introduced worship with fire or extended and organised it in the various forms in which it came alternately to be observed."—(Wilson's Introduction to the Rig-Veda.)

Muirএর (মুইরের) মতেও মনু, অঙ্গিরা, ভৃগু, অথর্ব, দধীচি প্রভৃতি বংশীয়েরাই ভারতে প্রথম অগ্নি ও হোমাদির বিস্তার করেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও ঋবে ১।১২৮।৬ ঋকের টীকায় একই মত পোষণ করিয়াছেন।

৫। আবেস্তার 'হওমা' বর্ণনা দেখিয়া Max Muller বলেন, "Haoma tree might remind us of the tree of life, considering that Haoma as well as the Indian Soma, was supposed to give immortality to those who drank its juice. (Chips from German Workshop Vol I.)

"Plainly speaking Soma is the fruit of the tree of knowledge forbidden by the jealous Elohim to Adam and Eve or Yahin lest man should become as one of us."—(M. Blavatsky, Secret Doctrine Vol II.)

"মধুজিহ্বা বেণগণ (পৌত্র পৃথু রাজা) সোমকে দ্যুলোকের যজ্ঞে দোহন করেন" (৯।৮৫।১০)। "আকাশে চলনশীল শিশু সোমকে বেনগণ স্তুতি করেন" (৯।৮৫।১১)। ঐ ঊর্দ্ধ গন্ধর্ব, সূর্য্যের বিশ্বরূপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শুক্রের সহিত দ্যুলোকে সতেজে দীপ্তি পান" (৯।৮৫।১২)। তিনি দ্যুলোকস্পর্শী তেজোরূপ বসনে আবৃত হইয়া নভস্তল অতিক্রম করিয়া যান" (৯।৮৫।১৪)। "ইঁহার গতি আকাশস্থিত চলনশীল অন্য সকলের অপেক্ষা অধিক; ইনি বায়ুর ন্যায় অনবরত গমন করেন এবং সূর্য্যের ন্যায় মানসবেগে গমন করেন" (৯।৮৮।৩)। "ইঁনি সিন্ধুর অগ্রে ধাবিত হন, বাক্যের অগ্রে ও গোগণের অগ্রে গমন করেন" (৯।৮৪।১২)। "দ্যুলোকে সোমের গমনের পথ নির্দ্দিষ্ট আছে" (৯।৯৬।১৫)। "তাঁহাকে ঋতের (বিধানের) পথ বলে" (৯।৮৬।৩৩)। সেই বিস্তীর্ণ মার্গে গমনশীল সোম প্রভাত, স্বর্গ ও কিরণ দান করেন" (৯।৯০।৪)। সোম সতর্ক হইয়া ক্রমশঃ পূর্বদিকে অগ্রসর হন, ইঁহার রথ সূর্য্যরশ্মির দ্বারা সংযুক্ত, দেবলোকে জাত ও দর্শনীয়" (৯।১১১।৩)। "ধনুর ন্যায় মার্গে ইনি গমন করেন" (৯।১১১।১)। "তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ হইয়া সোম ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হন" (৯।৭।১)। "তিনি সূর্য্যের কিরণ দ্বারা মার্জ্জিত হন" (৯।৮৬।৩২)। অতএব ঋগ্বেদের সোম দেবতা কেবল লতা (Accdo Asclepias or Sarcostema Viminalis or Semitia Genia) নয়।৬

৪। ইন্দ্র। ঋগ্বেদের আর এক দেবতার নাম ইন্দ্র। ইনি দীর্ঘকুন্তল, যুবা, অশ্বদ্বয়যুক্ত রথী (১।১০।৩। ইন্দ ধাতু বর্ষণে, ইন্দ্র অর্থে বৃষ্টিদাতা আকাশ। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যেরা আকাশকে দ্যু ও বরুণ বলিয়াও উপাসনা করিতেন দেখা যায়। ক্রমে ইন্দ্র দেবতার উত্থানে দ্যু ও বরুণ দেবতা ক্ষীণ হইয়া পড়েন। ইহাও ভারতীয় আর্য্য ও ইরাণী আর্য্যদের বিবাদের আর একটি কারণ। এই দ্যু শব্দই রূপান্তরিত হইয়া গ্রীকদের Zeus। লাটিন Jovis বা Ju (Piter = পিতা) এংগ্লোস্যাক্সনদের Tiu। জার্মাণদের Zio দেবতাদের নাম সৃষ্টি করিয়াছে। ঋগ্বেদে যে দ্যু বা আকাশ দেবতার উপাসনা আছে, তিনি ইন্দ্রাদি সকল দেবতার জনক কিন্তু ইন্দ্র দেবতা কেবল আকাশরূপেই উপাসিত। এবং অপরাপর দেশের আর্য্যেরা এই দ্যু দেবতাকে সকল দেবতার পিতৃরূপে উপাসনা করিতেন। কাজে কাজেই বলিতে হয়, এই আকাশরূপ ইন্দ্র দেবতা কেবলমাত্র ভারতীয় আর্য্যগণ কর্তৃক নবরূপে উপাসিত হইতেন।৭

ইরাণীরাও প্রথমে ইঁহার যজ্ঞভাগ কল্পনা করিতেন, কিন্তু পরে তাঁহারাও তাঁহাকে ত্যাগ করেন। ঋগ্বেদের এক স্থলে ইন্দ্র ত্বষ্টাপুত্রের তিনটি মস্তক ছেদন করেন, এইরূপ বৃত্তান্ত আছে। ইহা হইতেই ভাগবতাদি পুরাণে বৃত্রোপাখ্যানে ত্বষ্টাপুত্র বিশ্বরূপের মস্তক ছেদনের কথা উৎপন্ন হইয়াছে। ঋবে ১।৩২।১৪ ঋকে আছে, "হে ইন্দ্র! অহিকে হনন করিবার সময় যখন তোমার হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হইয়াছিল, তখন তুমি অহির অন্য কোনও হন্তার জন্য কি প্রতীক্ষা করিয়াছিলে?" সায়ণের মতে ইন্দ্র বৃত্রাসুর বা অহিকে বধ করিবার সময় দ্বিধা-বোধ করেন। বিষ্ণুভাগবতে লেখা আছে যে, বৃত্রাসুর ব্রাহ্মণ বলিয়া ইন্দ্র তাহাকে বধ করিতে ইতস্ততঃ করেন। ঋবে ১।৬।৫ ঋকে আছে, "হে ইন্দ্র! দৃঢ় স্থানের ভেদকারী এবং বহনশীল মরুৎদিগের সহিত তুমি গুহায় লুক্কায়িত গাভী সমুদয় অন্বেষণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে।" পণি নামে খ্যাত এক অসুর দেবতাদের গাভী হরণ করে। ইন্দ্র ও মরুৎগণ উহাদের অন্বেষণের জন্য সরমা নাম্নী এক কুক্কুরীকে নিযুক্ত করেন। সরমা অসুরদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া উহাদের সন্ধান ইন্দ্রকে বলেন। ইন্দ্র মরুৎগণের সাহায্যে গাভীগণের উদ্ধার করেন।—" (সায়ন)। মোক্ষমূলারের মতে গ্রীক ভাষায় হোমর-লিখিত ট্রয়ের যুদ্ধ-কাহিনী ইহারই রূপান্তর। সরমা—Gk. Helena: বিলু (পণিদের দুর্গ)—Gk. Ilium: পণিস—Gk. Paris: বৃসয়—Gk. Brises. ইত্যাদি।৮

মোক্ষমূলরের আর একটি মত আছে। সরমা—উষা :: দেবগণের গাভী—সূর্য্য-রশ্মি :: অসুর—অন্ধকার রাত্রি :: ইন্দ্র—আলোক দেবতা।৯

ঋবে ১।৯৩।৪ ঋকে আমরা 'বৃসয়' ও 'পণিস্' শব্দ দেখিতে পাই—"হে অগ্নি ও সোম! তোমাদের যে বীর্য্যের দ্বারা পণির নিকট হইতে গোরূপ অন্ন অপহৃত করিয়াছিলে, যে বীর্য্যের দ্বারা বৃসয়ের পুত্রকে ধ্বংস করিয়া, সকলের উপকারের জন্য একমাত্র জ্যোতিঃপূর্ণ সূর্য্যকে প্রাপ্ত হইয়াছিলে, তাহা আমাদের বিদিত আছে।" আবার

৬। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম-এ লিখিত "ঋগ্বেদে সোম" দেখুন। ৯।৭১।৯-৯।৭৬।৮-৯।৮৬।৩২ ঋকগুলির দ্বারা Hillebrandt তাঁহার Vedische Mytholozic. At 463—66p সোম সূর্য্যকিরণের দ্বারা দীপ্ত প্রমাণ করেন। Thibaut's Astronomic Astrologie and Mathamatik P 6 দ্রষ্টব্য।

৭। "ভারতীয় আর্য্যেরা যখন আকাশকে ইন্দ্র বলিয়া নূতন নাম দিলেন, সেই অবধি ইন্দ্রের উপাসনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আকাশের পুরাতন দেবতা 'দ্যু'র তত গৌরব রহিল না। * * * ভারতবর্ষে নদীর জল, ভূমির উর্বরতা, ধান্য ও খাদ্যদ্রব্য, মনুষ্যের সুখ ও জীবন, সমস্তই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে, অতএব বৃষ্টিদাতা আকাশের গৌরব অধিক। 'দ্যু' আর্য্যদিগের পুরাতন আকাশদেব, 'ইন্দ্র' হিন্দুদের নূতন বৃষ্টিদাতা, আকাশদেব, সুতরাং বৃষ্টিদাতার উপাসনা ক্রমে বৃদ্ধি পাইল।"—শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

৮। The seige of Troy is but a repetition of the daily seige of the East by solar powers that every evening are robbed of his brightest treasures in the West—Max Mulle's Science of Language (1882) Vol II pp 513 to 516.

৯। In the Veda, before the bright powers reconquer the light that had been stolen by Paris, they are said to have conquered the offspring of Brisaya. That daughter of Brises is restored to Achilles when his glory begins to set, just, as the first lores of solar heroes return to them in the last moment of their earthly carier.—Max Muller's Science of Language (1882) Vol II p. 575.

১।১১।৫ ঋকে, "হে বজ্র যুক্ত ইন্দ্র! তুমি গাভীহরণকারী বল নামক অসুরের গহ্বর উদ্ঘাটিত করিয়াছিলে।" সায়ন বলেন, "বল নামক এক অসুর দেবতাদের গাভী চুরি করিয়া এক গুহায় লুকাইয়া রাখে। সসৈন্য ইন্দ্র তাহাদের উদ্ধার-সাধন করেন। এ সম্বন্ধে ডাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "Aryan Witness" নামক গ্রন্থে বলেন, যে আসিরীয় ব্যাসিলনাধিপতি 'ব্যাল' (Bal) বৈদিক 'বল' এবং আসিরীয় 'অসর' (Assur) বৈদিক অসুর শব্দের একত্ব প্রতিপাদক। কিন্তু এখানে প্রমাণ মাত্র শব্দের সাদৃশ্যতা ছাড়া আর কিছুই নাই এবং আসিরীয় Baal ছাড়া অন্য 'বল' তাহারও পূর্বে ছিল না এরূপ প্রতিজ্ঞাও বড় অনিশ্চিত।

ঋ বে ১।৩২।৫ ঋকে বৃত্রের কথা আছে। "জগতের আবরণকারী বৃত্রকে ইন্দ্র মহা ধ্বংসকারী বজ্র দ্বারা ছিন্নবাহু করিয়া বিনাশ করিলেন, কুঠার-ছিন্ন বৃক্ষ-স্কন্ধের ন্যায় অহি পৃথিবী স্পর্শ করিয়া পড়িয়া আছে।" এই ঋকই পৌরাণিক বৃত্রাসুর বধোপাখ্যানের মূল। ইরাণীরাও এই গল্প তাহাদের সপ্তসিন্ধু (ইরাণীয় হপ্ত-হিন্দু) ত্যাগের সময় লইয়া যান।[১০]

আবেস্তায় আছে—"আহুরের সৃষ্ট বেরেথ ঘ্নকে (সং,—বৃত্রঘ্ন) আমরা যজ্ঞ প্রদান করি। জারাথুস্ত্র (সং জরৎ ত্বষ্টৃ) অহুরোমজ্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে সদয়-চিত্ত আহুরো মজ্দ! হে জগতের সৃষ্টিকর্তা পবিত্রাত্মা! স্বর্গীয় উপাস্যদের মধ্যে কে সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী? আহুরো মজ্দ উত্তর দিলেন, হে স্পিতিমা (সং—পিতৃম অর্থাৎ প্রজাপতি) জরাথস্ত্র! অহুরের (সং—অসুরের বলশালীর) সৃষ্ট বেরেথ ঘ্ন।"—বহরামযাস্ত। ঋ বে ১।১০৬।৬ ঋকে আছে, "কূপে নিপতিত কুৎসঋষি রক্ষণের জন্য বৃত্রহন্তা ও শচীপতি ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এখানে 'বৃত্রহন্' শব্দ আছে। সায়ন শচীপতি শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"শচীপতি কর্মনাম। সর্বেষাং কর্মণাং পালয়িতারং যদ্বা শচ্যা দেব্যা ভর্তারম্।" ইন্দ্র যজ্ঞের পতি তাই শচীপতি। অথবা শচীদেবীর পতি ইন্দ্র। পুরাণে দ্বিতীয় অর্থই গৃহীত হইয়াছে। আর পাশ্চাত্য পণ্ডিত Coxএর মতে বৈদিক 'অহিঃ' গ্রীক Echis or Echidna।[১১]

কিন্তু সায়ণ যে ভাবে ১।৩২।৪ ঋকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বৃত্রাসুর বধটি রূপক বলিয়া বোধ হয়। "যখন তুমি অহিদিগের (ইরাণী—অজি) মধ্যে প্রথম জাতকে হনন করিলে তখন তুমি মায়াবীদিগের মায়া বিনাশ করার পর সূর্য্য, উষা ও আকাশকে প্রকাশ করিয়া (জনয়ন্) আর শত্রু রাখিলে না।" সায়ন মূলের 'জনয়ন্' শব্দের অর্থ করিয়াছেন, "আবরকমেঘনিবারনেন প্রকাশয়ন্" এবং পঞ্চম মন্ত্রের "বৃত্রং বৃত্রতরং" অর্থ করিয়াছেন। "বৃত্রতরং"—"অতিশয়েন লোকানাং আবরকং অন্ধকাররূপম্।" তার পর ৬ মন্ত্রের অর্থ এইরূপ—"দর্পযুক্ত বৃত্র তাহার সমকক্ষ যোদ্ধা নাই, ভাবিয়া মহাবীর ও বহুবিনাশশীল ও শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল। ইন্দ্রের সংহার হইতে রক্ষা পাইল না, ইন্দ্র-শত্রু বৃত্র নদী সকলে পতিত হইয়া পিষিয়া ফেলিল।[১২] (এই প্রবন্ধে ১৭ নং ত্বষ্টার ইতিহাস দেখুন)। Wilson ইহার রূপক ভাঙ্গিয়া অর্থ করিয়াছেন মেঘ বর্ষিত হইয়া নদীর উভয় কূল প্লাবিত করিল।[১৩]

১০। ঋ বে ১।৭১।৭ ঋকে 'সপ্ত যহ্বীর' কথা আছে—এই সপ্ত নদী সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হয়। ইহারা সরস্বতী, শুতুদ্রি (শতদ্রু), পরুষ্ণী (ইরাবতী—যাস্ক), মরুদ্ বৃধা (দৃষদ্বতী), অসিক্নী (চন্দ্রভাগা), বিতস্তা, আর্জীকীয়া (বিপাশা—যাস্ক) সুষোমা (সিন্ধু—যাস্ক)। সিন্ধু বাদে, 'সপ্ত সিন্ধু' ইরাণীদের 'হপ্ত হিন্দু'। ১০।৭৫।৫ ঋকে গঙ্গা, যমুনারও উল্লেখ আছে। ইহারা সকলে সিন্ধুর পূর্বকূলে। কিন্তু সিন্ধুর পশ্চিম দিকেও (আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানেও) আরও সাতটি নদী সিন্ধুতে মিলিত হইয়াছে দেখা যায়। ১০।৭৫।৬ ঋকে তৃষ্টোমা, সুসর্ত্তু (সুবাস্ত), রসা, শ্বেতী, কুভা (কাবুল), গোমতী (গোমল) ও মেহত্নুসংযুতা ক্রুমু (কুরম্) এই সাতটি নদীর নামোল্লেখ আছে।

১১। "Ahi reappears in the Greek, Echis, Echidna, the dragon which crushes its victim with its coil"—Cox's Introduction to Mythology and Folklore P. 34 note. [এই প্রবন্ধে আবেস্তার বঙ্গানুবাদগুলি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত।]

"But besides Kerberos (যমের কুকুর সরমা বা সারমেয়) there is another dog conquered by Hercules, and he (like Kerberos) is born of Typhaon and Echidna (অহি)......The second dog is known by the name of Orthoros, the exact copy, I believe of the Vrtra. That the Vedic Vrtra should re-appear in Greece in the shape of a dog need not surprise us...Thus we discover in the Hercules the victor of Orthros, a real Vrtrhan"—Max Muller's Chips from a German Workshop Vol II (1867) p. 184-85.

১২। Quite opposed to this, the solar theory is that proposed by Prof. Kuhn and adopted by the most eminent mythologians of Germany, which may be called the meteorological theory. This has been well sketched by Mr. Kelly in his Indo-European tradition and Folklore. 'Clouds' he writes, 'Storms rains lightening and thunder were spectacles that above all others impressed the imagination of the early Aryans and busied it most in finding terrestrial objects to compare with their ever varying aspect'—Max Mullers' Science of Languages (1882) vol II p.565-66.

১৩। "The banks were broken down by the fall of Vrtra by innundation occasioned by the descent of the rain"—Wilson.

. বৃত্র, অহি, শুষ্ণ, নমুচি, পিপ্রু, শম্বর, উরণ, কুযবথ, বর্চী, অর্বুদ প্রভৃতি অসুরদের সহিত ইন্দ্রযুদ্ধ বৃষ্টিপাতের উপমা সম্বন্ধে Roth's Illustration of the Nirukta, P. 150 and Muir's Sanskrit Texts Vol V p.95, 96 দেখুন।

এই ইন্দ্রকে লইয়াই ভারতীয় আর্য্যদের সহিত ইরাণীদের বোধ হয় বিবাদের সূত্রপাত হয়। ইরাণীরা ইন্দ্রকে পরবর্ত্তী কালে ঘৃণা করিত, তাহার প্রমাণ—"আমি ইন্দ্রকে সৌরুকে (সং—সর্ব) ও দেব নক্ষত্য (সং—নাসত্য) এই গৃহ হইতে, এই পল্লী হইতে, এই নগর হইতে, এই দেশ হইতে······এ পবিত্র অখণ্ড জগৎ হইতে দূর করিয়া দেই।" জেন্দ আবেস্ত, দশম ফার্গার্দ। কিন্তু পূর্বে তাঁহারা ইন্দ্রকেও যজ্ঞ প্রদান করিতেন। এই সময় হইতে অসুর (বলশালী) বরুণকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।১৪

শ্রীযুক্ত রমানাথ সরস্বতী ১৩২।১ ঋকের টীকাতে বলেন, "বৃত্র এক জন আসিরীয়া দেশীয় দলপতি। পারস্য গ্রন্থ অবেস্তাতে লিখিত আছে যে, বৃত্রাসুর বাবু নগরের (Babylon) সমস্ত আর্য্য ভূমি (Ari na) একেবারে জনশূন্য করিবার নিমিত্ত উপজাপ করিয়া আর্দ্বিশুর নাম্নী দেবীকে জয়ের নিমিত্ত প্রার্থনা করে। কিন্তু তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়। বৃত্র তথাপি নিজ কুচক্রে নিরত থাকে এবং অবশেষে ইন্দ্রদেব কর্ত্তৃক সবংশে নিপাতিত হয়। যদ্যপি এইরূপ কোন তুমুল সংগ্রাম ঘটিয়া থাকে তবে তাহা অবশ্যই আর্য্য জাতি এবং সমিতিক (Seme ic) জাতির মধ্যে ঘটিয়া থাকিবে। যে হেতু ইন্দ্র আর্য্যদিগের রক্ষক এবং বৃত্রাসুর সমিতিকদিগের দলপতি। এই ঘোর যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য ইন্দ্রদেবকে "বেরেথ্রঘ্ন" উপাধিতে জেন্দাবেস্তায় উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। জেন্দাবস্তান্তর্গত "বহ্রাম যহত" বা বাহারাম্ যাস্ত সমস্তই বেরেথ্রঘ্ন ইন্দ্রের স্তুতি পরিপূর্ণ। ইহাতে বৃত্রকে "অহি দাহক" (বেদের অহিঃ দাসঃ) বলা হইয়াছে।"

তার পর ১৩২৮ ঋকে আছে "নদীর জল সমূহ ভগ্নকূলের উপর যেমন বেগের সহিত প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ নদীর উপর পতিত বৃত্রাসুরের দেহের উপর জল প্রবাহিত হইয়াছিল। বৃত্রাসুর জীবদ্দশায় যে জল সমূহ বলের দ্বারা রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, সেই জল সমূহের নিম্নে মৃত্যুর পর তাহার দেহ পতিত রহিল।" এ সম্বন্ধে সরস্বতীজী বলেন, "পারস্যের রাজা সাইরস (Cyrus) যেমন টাইগ্রীস্ নদীর প্রবাহ প্রতিরোধ করিয়া ব্যাবিলোন নগর জয় করেন, বৃত্রাসুরও বোধ হয় সেই প্রকারে আর্য্যভূমি জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় বলেন, "প্রাচীন গ্রীক্‌দিগের 'জিয়স' দেবতার সহিতও অনেকে ইন্দ্রের তুলনা করিয়া থাকেন। ইন্দ্রের ন্যায় জিয়সও বজ্র ধারণ করিতেন। 'দানবদলন' ইন্দ্রের সাহায্যার্থ মহর্ষি দধীচির পবিত্র অস্থি লইয়া বিশ্বকর্ম্মা যেরূপ বজ্র প্রস্তুত করিয়া ছিলেন, আর সেই বজ্রে যেমন ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে হনন করিয়াছিলেন, গ্রীক্‌দের 'জিয়স' সম্বন্ধেও তদ্রূপ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। জিয়সের পুত্র 'হিফেষ্টস,' পিতার যুদ্ধের জন্য বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাতে 'টিটানকুল' নির্ম্মূল হইয়াছিল। গ্রীক্‌দিগের আপোলো দেবতাদের সহিতও অনেকে ইন্দ্রের সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। ইন্দ্রের ন্যায় আপোলোর সুবর্ণ-নির্ম্মিত তূণীর ছিল। আপোলো সূর্য্যের ন্যায় মেঘ হইতে বৃষ্টি উৎপাদন করিতেন, এবং তদ্দ্বারা পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইত। ইন্দ্রের ন্যায় গ্রীক্ দেবতা ফ্যোয়েবাসের কশা ছিল; ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদের 'হেলিয়স' দেবতা অগ্নিময় রথে পরিভ্রমণ করিতেন।"

কেহ কেহ বলেন, অহিরূপ বৃত্র ও দেবেন্দ্রের যুদ্ধই যারাথুষ্ট্র, য়াহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান ধর্মে পর পর রূপকে সয়তান ও ঈশ্বরের যুদ্ধরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু মোক্ষমূলর জেনেসিসের তৃতীয় অধ্যায়ের সয়তানকে ও পারসিক অহিকে এক মনে করেন না।

ইন্দ্রের সহিত বৃত্র, বল, প্রভৃতি অসুরগণের সহিত যে যুদ্ধ হয় তাহাতে যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে সাধারণতঃ বৃত্র, শুষ্ণ, বলাদি অসুরকে অনাবৃষ্টিরূপেই পরিচয় দিয়াছেন। এবং ইন্দ্র বৃষ্টি এবং বজ্রের দেবতা, ইন্দ্র বৃত্রকে বজ্র দ্বারা বধ করিয়া মেঘগহ্বরে লুক্কায়িত গাভীরূপ বারিকে মোচন করেন,—যাস্কের এক মতকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা (Oriental Scholars Storm Theory (ঝড়বাদ) বলেন। কেলি ও রোথের মতে—"Ashuras are demons of dr ught who holds fast the waters that had evaporated and condensed in clouds and Indra as a god of thunder and rain is said to pierce through the cloud and loosen the waters in showers."

আর মোক্ষমূলরের মতে যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে তাহাকে ইংরাজীতে Dawn Theory (উষাবাদ) বলে। অধ্যাপক হাইলব্রাণ্ডের (Hillebrandt) মতকে ইংরাজীতে Vernal theory (ঋতুবাদ) বলে—বৃত্রাদি অসুর হইতেছে শীত ঋতু, জলকে কঠিন করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখে। ইন্দ্র বসন্তের এবং গ্রীষ্মের (সূর্য্য রূপ) দেবতা, তিনি জলরূপ গাভী মুক্ত করিয়া দেন, সমুদ্রকে তাড়িত করেন "The Vrtra is the winter monster who solidifies and holds captive the rivers on the heights of glacier mountains and that Indra is no other than the Spring or Summer Sun who free or liquifies the frozen waters which run in floods towards the sea and set in motion the oceanic waters." মহাত্মা তিলকের মতবাদকে Light and Darkness Theory (আলোকান্ধকারবাদ বলে। তাঁহার মতে আর্য্যেরা যখন উত্তর মেরুতে বাস করিতেন, তখনকার দীর্ঘ ছয় মাস অন্ধকার (দক্ষিণায়ণ) হইতেছে অসুর এবং দীর্ঘ ছয় মাস (উত্তরায়ণ) আলোক ইন্দ্র। গাভী হইতেছে আকাশব্যাপী জলকণা বা সৃষ্টি উপাদান। আলোক-দেবতা ইন্দ্র প্রলয়ের অন্ধকার নাশ করিয়া আবদ্ধ সৃষ্টি-বারিকে মুক্ত করিয়া দেন এবং চন্দ্র-সূর্য্যাদি গাভী বিচরণ করিয়া বেড়ায়। "The annual struggle between light and darkness, for in the polar

১৪। ছান্দোগ্য উপনিষদে ৮।১ আছে, অসুর বিরোচন ও ইন্দ্রদেব আত্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রজাপতির কাছে যান। বিরোচন দেহকেই আত্মা বলিয়া বুঝেন এবং মৃত্যুর পর সেই জন্য দেহকে বসনালঙ্কারাদির দ্বারা সজ্জিত করিয়া মৃত্তিকায় নিহিত করিতে লাগিলেন। এই আত্মতত্ত্ব ও দেহ-সৎকার লইয়াও বোধ হয় উঁহাদের মধ্যে বিবাদ ঘটে।

দ্রষ্টব্য :—পূর্বোক্ত জেন্দ আবেস্ত-কথিত ইরাণী 'সৌরু'—বৈদিক সর্ব বা সরু—বিনি মৃত্যুর বাণ বা নিদর্শন। ইরাণী—নক্ষত্য, বেদের নাসত্য ও দস্র অর্থাৎ অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

regions a long night of six months is followed by a long day of an equal length with comparatively long twilights at both ends. If, therefore, Indra is described as a leader or a releaser of waters, the waters are not those in the clouds but the watery vapours which pervade the universe and from out of which it was created……… released the waters of the rivers to go along their aerial way and brought out the sun and the dawn or the cows from their place of confinement." তার পর রেল (V. C. Rele) রুডল্‌ফ রোথের (Rudolf Roth—১৮২১—১৮৯৫) Los Von Sayana (সায়নের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ কর) এই বাক্য স্মরণ করিয়া ঋগ্বেদের Biological Theory (শারীরবাদ) আবিষ্কার করিয়াছেন। বৃত্রাদি অসুর হইতেছে মস্তিষ্কের অন্তর্গত অজ্ঞান-ভূমি, ইন্দ্র জ্ঞান-ভূমি এবং জল হইতেছে automatic nervous system in the floor of the fourth ventricle। তিনি বলেন, "The subconscious activities were unconsciously regulating the conscious activities. To establish its supremacy the conscious wages war against the subconscious and a grim fight ensuses between the two. Indra is the conscious force residing in the cortical layer of the brain and Vrtra and his allies, the wicked demons and serpents are the subconcious forces in the nerve centres which appear as elevated projections on the floor of the fourth ventricle behind the medulla oblongata. In order to govern these subconscious activities, Indra tries to liberate the pent-up waters in the fourth ventricle by slaying the eldest of the serpents that guard the opening." বৃহদারণ্যকের ২ অধ্যায়ের ২ ব্রাহ্মণে দেখা যায়, সমস্ত দেবতা ও ঋষিদের মস্তকের বিভিন্ন স্থানে নির্দেশ করা হইয়াছে।

রমানাথ সরস্বতী বলেন, "পণি নামক অসুরগণ দেবলোক হইতে বৃহস্পতির বহুসংখ্যক গাভী হরণ করিয়া তাহাদিগকে অন্ধকারাবৃত দুর্গম গুহাতে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। মরুদ্‌গণের সহিত ইন্দ্র তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান উদ্দেশ করিয়া এই ঋক্‌ উক্ত হইয়াছে। বেদের ১০ম মণ্ডলের ১০৮ সূক্তে লিখিত আছে যে বল নামক অসুর-দলপতির আজ্ঞাবহ পণি নামক অসুরগণ দেবগুরু বৃহস্পতির গাভী সকল অপহরণ পূর্ব্বক কোন গুপ্ত গহ্বরে লুকাইয়া রাখিলে পর ইন্দ্র, সরমা নাম্নী স্বর্গীয় কুক্কুরীকে সেই গো সকলের উদ্দেশে পাঠাইয়াছিলেন। সরমা, একটি নদী পার হইয়া বল দলপতির রাজধানীতে গমন পূর্ব্বক গো সকলের অন্বেষণ করিয়া, পণিদিগের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। এই সরমা অতি উৎকৃষ্ট চরের কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ গ্রীক-গ্রন্থকার সফোক্লিস্‌ আজাক্সা নামক বীর কর্ত্তৃক হত পশুদলের ইথাকা দ্বীপাধিপতি যে অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেই অনুসরণকে স্পার্টাদেশীয় কুক্কুরীর সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। আসিরিয় দলপতির রাজধানী ব্যাবিলন নগর ইউফ্রেটিস্‌ নদীর তীরস্থিত। ব্যাবিলনের নৃপতিদিগকে "বেলস" বলিত। তাহাদিগের আদি পুরুষের, "পিনিউস" নামে এক সন্তান ছিল। ইহার বংশজাতদিগকে "পিনিডেস্‌" বলা হইত। আসিরিয় শঙ্কুসন্নিভ খোদিত লিপি সকলে ভূয়োভূয়: দেখিতে পাওয়া যায় যে, আসিরিয়েরা পশু প্রভৃতি হরণ করিত। ঋগ্বেদের পণি: ও বল বোধ হয় আসিরিয় লোকবিশেষ।"

যাহা হউক, ক্রমে ইন্দ্র পরমেশ্বররূপেও পূজিত হইয়াছেন—"সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিভূত এই ইন্দ্র বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি পৃথক্‌ ভাবে প্রকাশিত হয়েন। তিনি মায়ার দ্বারা বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া যজমানের নিকট উপস্থিত হন। (ঋ বে ১।৬।৪৭)।

[ক্রমশঃ।

শেষ প্রশ্ন

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভগ্নপৃষ্ঠ শ্লথগতি সরীসৃপ-সম
বুকে হেঁটে যাবো না কো বিধাতার পায়ে,
কঠিন প্রস্তরদ্বারে হানি' করাঘাত
চাহিব বলিষ্ঠ মুখে নিষ্পাপ নির্ভীক্‌।

উন্মীল সমীরস্নিগ্ধ সান্ধ্য জোয়ারের
মৃদুদোল শীকরাদ্র উজ্জ্বল আবেশে
ভাসিব না; পাড়ি দেবো দম্ভের উল্লাসে
স্ফীতবক্ষ নাবিকের অশান্ত ভৃঙ্কার।

আনীল তরঙ্গভঙ্গে মধ্যমণি চাঁদ
শুভ্র কুমারীর বাহু—অনর্থ ছড়ালে
উত্তাল আবর্ত্ত মাঝে ধূসর-সবুজ
ফেনিল চূড়ায় বসে স্রষ্টাকে দেখিব—

বলিব: 'এসেছি ফেলে মহিমা-জড়িমা,
বলো তো আর কি আছে ঘুম-পাড়ানিয়া?'

ভরত-নাট্য

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

'ভরত-নাট্য' শব্দটির ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হওয়া উচিত—নাট্যশাস্ত্রকার মহর্ষি ভরতের প্রবর্ত্তিত রীতিতে প্রযুক্ত নাট্য বা অভিনয়-কলা। কিন্তু বর্ত্তমানে দাক্ষিণাত্যে 'ভরত-নাট্য' বা 'ভারত-নাট্য' শব্দ উক্ত অর্থে প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না। তাহার কারণ, মহর্ষি ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'নাট্য'-শব্দটি অভিনয়-কলা অর্থের বাচক। তাঁহার মতে নৃত্য নাট্যের অঙ্গ হইলেও নাট্য ও নৃত্য শব্দ পর্য্যায়রূপে তাঁহার গ্রন্থে ব্যবহৃত হয় নাই। অথচ বর্ত্তমানে দক্ষিণ-ভারতের বহু ভরত-নাট্য-সম্প্রদায়েই নাট্যকলার লেশও দৃষ্টিগোচর হয় না—কেবল ভাবাভিব্যঞ্জক নৃত্য-বিশেষকেই তাঁহারা 'ভরত-নাট্য' নাম দিয়া চালাইয়া থাকেন। এই নৃত্য-কলার উপরেও যে মহর্ষি ভরতের নাট্যশাস্ত্রে কথিত করণ-অঙ্গহার-রেচক-পিণ্ডীবন্ধ অথবা বিভিন্ন দৃষ্টি কিংবা ষড়্‌বিধ অঙ্গাভিনয় বা ছয় প্রকার উপাঙ্গাভিনয়ের কোন প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছে—এমন কথাও বলা যায় না।

সাধারণতঃ সংস্কৃত-সাহিত্যে 'নাট্য'-শব্দটি 'নৃত্য'-শব্দের পর্য্যায়রূপে ব্যবহৃত হয় না। নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয়-দর্পণে' নাট্য-নৃত্য-নৃত্তের ভেদ যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এ প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

'নাট্য' বলিলে বুঝায় নাটকাদি অভিনেয় বস্তু—উহা পূজার্হ ও পূর্ব্ব-কথা-যুক্ত ("নাট্যং তন্নাটকঞ্চৈব পূজ্যং পূর্ব্বকথাযুতম্"—অভিনয়-দর্পণ, শ্লোক ১৫)।

পক্ষান্তরে, ভাবাভিনয়হীন নটন 'নৃত্ত' নামে অভিহিত হইয়া থাকে ("ভাবাভিনয়হীনং তু নৃত্তমিত্যভিধীয়তে"—অ: দ:, শ্লোক ১৫)।

আর যে নটন রস-ভাব-ব্যঞ্জনাদিযুক্ত, তাহারই নাম 'নৃত্য' ("রসভাবব্যঞ্জনাদিযুক্তং নৃত্যমিতীর্য্যতে"—অ: দ:, শ্লোক ১৬)।

মহর্ষি ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অবশ্য নৃত্ত-নৃত্যের কোন ভেদ সূচিত হইতে দেখা যায় না; কিন্তু নাট্য-নৃত্তের ভেদ ঐ গ্রন্থে অতি বিশদ-ভাবে বিবৃত হইয়াছে। নৃত্ত নাট্যের অঙ্গমাত্র—নাট্য অবয়বী, নৃত্ত তাহার অবয়ব। অবশ্য নাট্যাতিরিক্ত স্বতন্ত্র নৃত্তের অবতারণা সম্ভব বটে; কিন্তু পরিপূর্ণাঙ্গ নাট্যের প্রবর্ত্তনে নৃত্তের একান্ত প্রয়োজন।

পরবর্ত্তী যুগের সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের প্রায় প্রত্যেকেই অনুরূপ মত স্ফুট বা অস্ফুট ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। 'ভাবপ্রকাশন'-গ্রন্থের রচয়িতা শারদাতনয় নৃত্ত-নৃত্যের ভেদ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—উভয়ই নাট্যের উপকারক। 'দশরূপক'-কার ধনঞ্জয় নাট্য-নৃত্য-নৃত্তের পরস্পর পার্থক্য যে ভাবে দেখাইয়াছেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবোধ্য ও সমীচীন মনে হয়। নাট্য রসাশ্রয়, নৃত্য ভাবাশ্রয় ও নৃত্ত তাল-লয়াশ্রয়—ইহাই এ তিনের সংক্ষিপ্ত ভেদ।

অবশ্য ভরত-মতে নৃত্ত-নৃত্য-ভেদ স্বীকৃত না হইলেও নাট্য-নৃত্ত-ভেদ ত উপেক্ষিত হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে যাহা 'ভরতনাট্যম্' নামে সমগ্র ভারতে প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা দেখিলে মনে হয় না যে—নাট্য ও নৃত্যের (বা নৃত্তের) কোনরূপ পার্থক্য এই সকল ভরত-নাট্যের প্রযোজক-মণ্ডলী বা শিল্পিবৃন্দের নিকট পরিজ্ঞাত আছে।

মোটের উপর অদ্যতন যুগের 'ভরত-নাট্য' মহর্ষি ভরতের নাট্য-শাস্ত্রে ধারাবাহিক-রূপে বিবৃত নাট্যকলার অনুসরণ করে না—এমন কি ভরতোক্ত অঙ্গাভিনয় বা নৃত্তপদ্ধতিকেও ইহা আদর্শরূপে স্বীকার করিয়া লয় না। এ কারণে ভরতনাট্যকে খাঁটি 'মার্গনৃত্য' (Classical Dance) বলা অসঙ্গত। উত্তর-ভারতের 'কত্থক' নৃত্য ও দক্ষিণ-ভারতের 'কথাকলি' (যথাযথ উচ্চারণ—প্রায় কঠকড়ি) যেমন লোকনৃত্য হইলেও অলঙ্কারের বাহুল্যহেতু ও দর্শক-সমাজের অনভিজ্ঞতার সুযোগ পাইয়া ক্রমশঃ মার্গনৃত্যের শ্রেণীতে উন্নীত ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, বর্ত্তমানের ভরতনাট্যও সেইরূপ দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচলিত বিবিধ প্রাচীন মার্গনৃত্য-পদ্ধতির অপভ্রংশ-মাত্র হইলেও মহর্ষির নামমহিমায় ও আমাদিগের অজ্ঞতার প্রশ্রয়ে মার্গনৃত্যের আসনে চাপিয়া বসিয়াছে।

ভরতনাট্য সম্বন্ধে অন্যতম বিশেষজ্ঞ ত্রিঃ বেঙ্কটাচলম্ মহর্ষি ভরত হইতে ভরতনাট্যের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই।* নৃত্য-প্রযোজকের নামানুসারে নৃত্যটির নামকরণ হইয়া থাকিতেও পারে—এইরূপ একটা 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের কৈফিয়ৎ দিবার পর তিনি বলিয়াছেন—হয়ত ইহা আসলে 'ভরত-নাট্য'ই নহে—'ভারত-নাট্য' অর্থাৎ ভারতের নৃত্যকলা; আর যদি ইহার 'ভরতনাট্য' নামই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও কোন কোন পণ্ডিতের মতানুযায়ী ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—'ভ' (ভাবের আদ্যক্ষর—স্বরসংযোগ ব্যতীত), 'র' (রাগের আদ্যক্ষর—উহাতেও আকার-সংযোগ নাই) ও 'ত' (তালের প্রথম অক্ষর—স্বরসংযোগ ইহাতেও নাই); এইরূপে ব্যুৎপত্তি দেখাইলে আর ভরতোক্ত নাট্যশাস্ত্রের সহিত বর্ত্তমান ভরতনাট্যের গরমিলের নিমিত্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হয় না।

আসল কথাটা কি জানেন? বর্ত্তমানে যে নৃত্যকলা 'ভরতনাট্য'—এই প্রাচীন আর্যগন্ধী গালভরা নামের ছাপ অঙ্গে ধারণ করিয়া উত্তর ভারতের অনভিজ্ঞ দর্শকবৃন্দের অন্তরে চমক লাগাইতেছে, তাহার সে নামকরণ ব্যাপারটি অতি আধুনিক। বংশানুক্রমে বা সম্প্রদায়ক্রমে যাহারা এই নৃত্যকলার অভ্যাস করিয়া থাকে, দাক্ষিণাত্যের সেই 'নট্‌বন্' বা দেবদাসীগণ এখনও এ নৃত্যকলাকে অন্য নামেই অভিহিত করিয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন নৃত্যশিক্ষক ও নর্ত্তকী সম্প্রদায়ে ইহার নাম—'কেলিকই' বা 'শিলম্বম্'। তামিলে ইহার নাম—'কূত্‌' বা 'আট্টম্' (নাট্যম্-এর অপভ্রংশ)। সব কয়টি শব্দের অর্থই 'নাট্য'। 'ভরতনাট্য' শব্দটি আজ মাত্র ২০।২৫ বৎসর ধরিয়া ব্যবহৃত হইতেছে—তাহার পূর্ব্বে এ শব্দটি সম্পূর্ণ অপ্রচলিত ছিল।

তামিল ভাষায় লিখিত নৃত্য-নাট্যের একখানি সুপ্রাচীন গ্রন্থ 'শিলপ্‌পাদিকারম্' (অর্থাৎ নূপুর-কিঙ্কিনী অধ্যায়)। তামিল পণ্ডিতগণ গ্রন্থখানির বয়স প্রায় আঠার শত হইতে দুই হাজার বৎসর বলিয়া দাবী করেন। যাহাই হউক, গ্রন্থখানি যে অতি প্রাচীন—ইহাতে সন্দেহ কেহ করেন না। ঐ গ্রন্থে এই নৃত্যকলার নাম পাওয়া যায়—'কূত্‌' বা চাকিয়ার্‌-কূত্‌ম্'। 'চাকিয়ার'গণ দাক্ষিণাত্যের একটি প্রাচীন নর্ত্তক-সম্প্রদায়। তাঁহারা আঙ্গিক-বাচিক-আহার্য্য (বেশ)-সাত্ত্বিক এই চতুর্ব্বিধ অভিনয়ের সাহায্যে বহু প্রাচীন সংস্কৃত নাট্য ও দেশী ভাষায় সঙ্কলিত নাট্যের রূপারোপ করিয়া থাকেন। চাকিয়ার্‌গণের অভিনয়ের মধ্যে নৃত্যই অঙ্গী—পাঠ্য-সঙ্গীত-বাদ্যাদি অঙ্গ। তাহাদের অভিনীত নৃত্যনাট্য—'চাকিয়ার্‌-কূত্‌ম্'। এখনও একমাত্র মালাবারে দাক্ষিণাত্যের

---

* ROOPALEKHA (III. 1) পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বেঙ্কটাচলম্-এর প্রবন্ধের নিকট ঋণ স্বীকার্য্য।

প্রাচীন শিল্প-সংস্কৃতি ও ভাষা যতদূর সম্ভব মিশ্রণের হাত এড়াইয়া নিজ নিজ প্রাচীন শুদ্ধরূপ রক্ষায় সচেষ্ট রহিয়াছে। মালাবারে আজও এই নৃত্যনাট্যাভিনেতা চাকিয়ারগণের 'আট্টম্' (নাট্য) পূর্ণোদ্যমে প্রচলিত। মালাবার-মন্দির-সমূহে নৃত্যমণ্ডপের নাম—'কুথ্-আম্বলম্'।

অবশ্য নৃত্যকলার প্রাচীনতম দেশী গ্রন্থ তামিল 'শিলপ্-পাদিকারম্' দক্ষিণ-ভারতীয় নৃত্যের উৎস-স্বরূপ হইলেও মহর্ষি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের গৌরব কোন সম্প্রদায়ই অস্বীকার করেন না। মহর্ষি ভরতের সম্প্রদায় ব্যতীত নন্দিকেশ্বরেরও পৃথক্ সম্প্রদায় ছিল। সে সম্প্রদায়ের একখানি গ্রন্থ 'অভিনয়দর্পণ' বাঙ্গালা ও ইংরাজি অনুবাদ সহ প্রকাশিতও হইয়াছে। কিন্তু এই সকল শাস্ত্রগ্রন্থের নির্দ্দেশ সম্প্রতি দক্ষিণ-ভারতেও প্রায়ই পুঁথির পাতার মধ্যে অথবা মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ পাষাণ-প্রতিমার অঙ্গভঙ্গীতেই সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। অধুনা-প্রচলিত নাট্যকলা দেশী গ্রন্থ দ্বারাই অধিক প্রভাবিত। তাই বর্ত্তমানের ভরতনাট্যের মূল খুঁজিতে হইলে তামিল গ্রন্থ 'ভরতচূড়ামণি' 'নড়নথি বাদ্যরঞ্জনম্' ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। এই সকল গ্রন্থ ভরতানুযায়ী বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেও ভরতোক্ত পদ্ধতি হইতে ইহাদিগের প্রদর্শিত পন্থার ভেদ অতি স্পষ্ট।

ভরতচূড়ামণি গ্রন্থের রচয়িতা স্বয়ং অগস্ত্যমুনি বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মাদুরার রাজা রাজশেখর পাণ্ড্যের উদ্দেশে ইহা উৎসৃষ্ট। ইহাতে 'নাট্যবয়োকাব্যবেথনিরূপণম্', 'মেলকার্থাশ্বিস্বরলক্ষণম্' 'চতুরঙ্গষোড়শাঙ্গ তাললক্ষণম্'—ইত্যাদি সঙ্গীতাঙ্গ স্বরতালাদি-সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনীয় বহু জ্ঞাতব্য তথ্য বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি 'আর্য্য-দ্রবিড়-ভরতশাস্ত্র' নামে খ্যাত। মাদুরা ও তিরুনেল্ভেল্লী অঞ্চলে যে শ্রেণীর লোকনৃত্য অধুনা প্রচলিত, তাহার পর্য্যাপ্ত বিবরণ এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। বিগত যুগের বহু বিখ্যাত দক্ষিণী নর্ত্তকের (নটুবনের) নাম ইহাতে উল্লিখিত থাকায় ইহাকে দাক্ষিণাত্যের অধুনাতন যুগে সঙ্কলিত একখানি 'নৃত্যকলা-কল্পদ্রুম'-জাতীয় গ্রন্থ বলা চলে।

এই গ্রন্থ-মতে দেবদাসীগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) রাজদাসী (২) দেবদাসী ও (৩) স্বদাসী। রাজদাসীগণ সাধারণতঃ ধ্বজস্তম্ভের পুরোভাগে নৃত্য করিয়া থাকেন। দেবদাসীগণ নৃত্য করেন শিবমন্দিরে। স্বদাসীগণ কেবল বিশিষ্ট উৎসব উপলক্ষে (যথা—কুম্ভাভিষেক অর্থাৎ নূতন মন্দিরোৎসর্গ ইত্যাদি) নৃত্য প্রদর্শন করেন। নৃত্যপ্রদর্শন (অরঙ্গাট্রল্) করিতে হয় গণেশমূর্ত্তির সম্মুখে। নটরাজের সম্মুখে দেবদাসীর সমর্পণ-নৃত্য-প্রদর্শন নিষিদ্ধ। কারণ, বোধ হয়—নটরাজ দেবদাসীগণের পিতৃস্থানীয়; পিতার নিকট কন্যার আত্মসমর্পণ নিষিদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক।

এই গ্রন্থানুযায়ী ভরতনাট্য দ্বাদশবিধ তাণ্ডবের অন্যতম। ইহার মূল রস শৃঙ্গার। এ কারণে ইহার আর একটি নাম 'শৃঙ্গার-তাণ্ডব'। নর্ত্তকী ব্যতীত নর্ত্তকের এই নৃত্যে অধিকার নাই।

এই অংশেই ভরতনাট্যশাস্ত্রের সহিত ভরতনাট্যের একটি বিরাট পার্থক্য। মহর্ষি ভরতের মতে—তাণ্ডব পুংনৃত্ত ও উদ্ধত নৃত্ত। এ কারণে শৃঙ্গাররসে তাণ্ডব প্রযোজ্য নহে—আর নারীরও তাণ্ডবনৃত্তে অধিকার নাই। শৃঙ্গাররসে নারী-কর্ত্তৃক প্রযোজ্য নর্ত্তনের নাম 'লাস্য'।

যাহা হউক, দেশী মতে—দ্বাদশ তাণ্ডবের নাম—১ আনন্দতাণ্ডব (সম্যগ্জ্যোতিঃ নাট্য), ২ সন্ধ্যাতাণ্ডব (গীতনাট্য), ৩ শৃঙ্গার-তাণ্ডব (ভরতনাট্য), ৪ ত্রিপুরতাণ্ডব (পেরণি নাট্য), ৫ ঊর্দ্ধ-তাণ্ডব (চিত্রনাট্য), ৬ মুনিতাণ্ডব (নয়নাট্য), ৭ সংহারতাণ্ডব (সিংহলনাট্য), ৮ উগ্রতাণ্ডব (রাজনাট্য), ৯ ভূততাণ্ডব (পট্টস-নাট্য), ১০ প্রলয়তাণ্ডব (পবই), ১১ ভুজঙ্গতাণ্ডব (পীঠনাট্য) ও ১২ শুদ্ধতাণ্ডব (পাদচারীনাট্য)।

এই মতে রস নয়টি—শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়, রৌদ্র, বীভৎস ও শান্ত। আসন পাঁচ প্রকার—পদ্ম, সিংহ, ভোগ, বীর ও সিদ্ধ (?)। জানুভঙ্গ চারি প্রকার—মণ্ডল, অর্দ্ধমণ্ডল, সমমণ্ডল ও নৃত্তমণ্ডল। পাদসংস্থান তিন প্রকার—অঞ্চিত, কুঞ্চিত ও উথঞ্চিত (?)। ভঙ্গ ত্রিবিধ—সম, ললিত, ও বলিত। অঙ্গ-বেথম্ (অঙ্গভেদ—অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার অঙ্গভঙ্গী)—তিন প্রকার—অঙ্গভেদ (অঙ্গ—মস্তকাদি), উবঙ্গবেথম্ অর্থাৎ উপাঙ্গভেদ (উপাঙ্গ—নয়নাদি), ও প্রথিঅঙ্গবেথম্ অর্থাৎ প্রত্যঙ্গভেদ (প্রত্যঙ্গ—গ্রীবা ইত্যাদি)। নন্দিকেশ্বরের অভিনয়দর্পণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-উপাঙ্গ-ভেদ বর্ণিত থাকিলেও নাট্যশাস্ত্রে প্রত্যঙ্গগুলির নাম দৃষ্ট হয় না। 'প্রত্যঙ্গ' শব্দটির উল্লেখ অবশ্য নাট্যশাস্ত্রেও আছে। পরবর্ত্তী যুগে নাট্যশাস্ত্রের অনুসরণে শার্ঙ্গদেব-কর্ত্তৃক রচিত 'সঙ্গীতরত্নাকরে' অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-উপাঙ্গভেদ প্রায় অনুরূপ ভাবেই বিবৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, দেশী নামগুলির যথাযোগ্য সংস্কৃত রূপই উপরে প্রদত্ত হইল। কেবল যে যে স্থলে মূল সংস্কৃত শব্দটি ধরা যায় নাই, মাত্র সেই সেই স্থলেই দেশী শব্দগুলি যথাযথ ভাবে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া দ্রবিড়ী শব্দগুলির যথাযোগ্য উচ্চারণ বাঙ্গালা বর্ণমালার সাহায্যে প্রদর্শন করাও অসম্ভব—এ কথাটি অবশ্য ভুলিলে চলিবে না।

দাক্ষিণাত্যের দেখাদেখি আজকাল উত্তরাপথেও নানা স্থানে ভরত-নাট্যের প্রচলন হইতেছে দেখা যায়। চিদম্বরের নটরাজ-মন্দিরের গোপুরে উৎখাত ভরতনাট্যশাস্ত্রোক্ত অষ্টোত্তরশত করণের ভগ্নাবশেষ আয়ত্ত করিয়া বা অজন্তা-ইলোরা প্রভৃতি গুহার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী-মণ্ডিত নারীচিত্রগুলির অনুকরণ করিলেই যে ভরতনাট্যে বিশেষজ্ঞ হওয়া যায় না—ইহা নৃত্যপ্রদর্শনকারীদিগের বুঝা উচিত। প্রথম প্রথম অনেক ভেল্কি নূতনত্বের দোহাই দিয়া জনসাধারণের চিত্তে চমক জাগাইয়াছে সত্য; কিন্তু ক্রমশঃ জনগণও জ্ঞানার্জ্জন করিতেছেন—অতি শীঘ্রই এ সকল ফাঁকি ধরা পড়িয়া যাইবে। প্রস্তরমূর্ত্তি বা চিত্র দর্শনান্তে ভরতনাট্যের পুনরুদ্ধার করিতে যাওয়া আর প্রাচীন যুগের কোন লুপ্ত অতিকায় জীবের প্রস্তরীভূত অস্থিখণ্ড হইতে সেই জীবটির জীবনযাত্রার ধারা আবিষ্কার করা প্রায় সমানই পণ্ডশ্রম। প্রস্তর-খোদিত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অঙ্গভঙ্গী হইতে একটি পুরা নাচের পালা গড়িয়া তোলা অসম্ভব। প্রত্যেকটি ভঙ্গী হইতে অপর ভঙ্গীটিতে পৌঁছিতে হইলে মধ্যে যে সকল বর্ত্তনার প্রয়োজন—খোদিত মূর্ত্তিতে তাহার কোন সন্ধানই মিলে না। বিশেষতঃ মূর্ত্তিতে সঙ্গীতের পটভূমিকার অভাব। সঙ্গীত সম্বন্ধে যাঁহার সূক্ষ্ম জ্ঞান নাই, তাঁহার পক্ষে নৃত্যকলায় অভিজ্ঞতার দাবী করা হাস্যকর প্রয়াসে পরিণত হয়।

বর্ত্তমানের ভরতনাট্য ভরত-নাট্য-শাস্ত্রের ব্যাবহারিক রূপারোপ নহে—একথা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। তবে এ সম্বন্ধে একটি

কথা বলিয়া রাখা ভাল। হয়ত প্রাচীন যুগে আধুনিক ভরতনাট্যের মূল উৎস ছিল এই ভরত-নাট্যশাস্ত্রই। কিন্তু নৃত্যকলার যাঁহারা প্রদর্শক, তাঁহারা প্রায়ই অল্পশিক্ষিত (বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষায় অশিক্ষিতই বলা চলে) হইয়া থাকেন। গুরু-শিষ্য-ক্রমে এই নৃত্য-কলার শাখা বিস্তার ঘটিতে থাকিলে দেশ-কাল-পাত্র-নিমিত্ত-ভেদে একই মূল নৃত্যকলা ক্রমশঃ যে রূপান্তর পাইয়াছে—ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ফলে আজ পরিবর্তন এত অধিক হইয়াছে যে, বর্ত্তমান ভরতনাট্যের পারিভাষিক বৈশিষ্ট্যের সহিত ভরত-নাট্য-শাস্ত্রোক্ত পারিভাষিক বিশেষত্বের মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাঁহারা একটু বিশ্লেষক চিত্ত লইয়া পদাবলী-কীর্ত্তন শুনিতে অভ্যস্ত, তাঁহারাই লক্ষ্য করিবেন যে পেশাদার কীর্ত্তনীয়ার হাতে মহাজন-পদাবলীগুলির মূল ভাষার কি দারুণ পরিবর্তনই না ঘটিয়া থাকে! ব্রজবুলি ও মৈথিলীর রূপান্তর হয় আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায়। একবার 'কথাকলি' নৃত্য দর্শনের সময় নৃত্য-সূচীতে 'মন্মুতরা' নামে একটি অংশের উল্লেখ দেখিয়া উহা কি ব্যাপার জানিবার জন্য কৌতূহল জন্মে। সম্প্রদায়ের গুরু শঙ্করন্ নম্বুদ্রিকে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পাই—উহা জয়দেবের গীতগোবিন্দের একটি গানের প্রতীক। বাড়ী আসিয়া তন্ন তন্ন করিয়া গীতগোবিন্দ ঘাঁটিয়া 'মন্মুতরা' শব্দটি আবিষ্কার করিতে না পারিয়া প্রায় হতাশ হইয়া পড়িতেছি ও জয়দেবের গীতগোবিন্দের দ্রবিড়ী পাঠভেদের কল্পনা করিতেছি—এমন সময় হঠাৎ মনে পড়িল—ইহা 'মঞ্জুতরকুঞ্জতল-কেলিসদনে'—এই প্রসিদ্ধ গান নহে ত! পরদিন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম অনুমান ব্যর্থ হয় নাই। তথাপি বহু মনোযোগ-সহকারে শুনিয়াও গানের পদ ও অক্ষরগুলির অনুসরণ করিতে পারি নাই। কথাকলির সঙ্গীতাংশের রূপান্তরে দৃষ্টান্তটি ধরা পড়িল বলিয়া বুঝিয়াছিলাম। ভরতনাট্যেও বহু যুগ, বহু সম্প্রদায়, ও বহু দেশের মধ্য দিয়া যে কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে—তাহা কে বলিতে পারে?

অনেকের ধারণা—বর্ত্তমানে প্রচলিত ভরতনাট্যের রূপটি অন্ধ্র দেশ হইতে দক্ষিণের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। এরূপ ধারণার মূল কারণ—নট্টুবনদিগের ব্যবহৃত গ্রন্থগুলি প্রায়ই তেলেগু ভাষায় লিখিত, ভরতনাট্যের অধিকাংশ গীতের বর্ণ-পদ-শব্দগুলি তেলেগু ভাষা হইতে গৃহীত, আর ভরতনাট্যের প্রচারিকা তাঞ্জোর-রাজসভার কতিপয় শ্রেষ্ঠা দেবদাসী তেলেগু রমণী ছিলেন। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও বলিতে হয়—'শিলপ্পাদিকারম্' গ্রন্থে উল্লিখিতা সুপ্রসিদ্ধা নৃত্যপটীয়সী মাধবী তেলেগু নারী ছিলেন না—তাঞ্জোর-নৃত্য-রাজ্ঞী প্রথিতনাম্নী নেল্যসরস্বতী সম্ভলা দেবীও অন্ধ্র-রাজকুমারী ছিলেন না। ইহা ছাড়া দাক্ষিণাত্যের অসংখ্য পাষাণমূর্ত্তি বা ধাতবমূর্ত্তির উপর—বিশেষ করিয়া সুবিখ্যাত নটরাজমূর্ত্তির উপর—অন্ধ্র প্রভাবের কোন সুস্পষ্ট ছাপ আছে কি?

ভরতনাট্যের যে রূপ আজ আমরা দেখিতে পাই—সেই রূপটি গড়িয়া তুলিতে তাঞ্জোর-রাজসভার অন্তর্ভুক্ত চার জন সঙ্গীতজ্ঞ নর্ত্তক বহু প্রয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। এই চারি জন সঙ্গীতজ্ঞের নাম দাক্ষিণাত্যে বহু প্রসিদ্ধ—ছিন্না, পোন্নিআ, শিবনন্দম্ ও বাদিবেলু (ভাদিভেলু)। চারি ভ্রাতায় মিলিয়া 'ভরতনাট্য' পালা গড়িয়া তুলেন। তৎকালীন ত্রিবাঙ্কুর-রাজ স্বামী থিরুনল ও ভাদিভেলুর মধ্যে বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। ভাদিভেলুর বংশে সম্প্রদায়ক্রমে ভরতনাট্যের শুদ্ধ সুমার্জ্জিত রূপটি অধ্যবসায়-সহকারে আজও পর্য্যন্ত অভ্যস্ত ও সুরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ঐ বংশের নর্ত্তকগণ বর্তমানে পন্দনল্লুরে বাস করেন। ঐ বংশের আচার্য্য বিদ্বান্ মীনাক্ষিসুন্দরম্ পিল্লে এ যুগে ভরতনাট্যের শ্রেষ্ঠ নট্টুবনর (অর্থাৎ নৃত্যশিল্পী)। তিনি ও তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে ভরতনাট্যের যে রূপটি দৃষ্ট হয়, দাক্ষিণাত্যের নৃত্যসমালোচকগণ একবাক্যে তাহাকেই ভরতনাট্যের শ্রেষ্ঠ ও শুদ্ধ রূপ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

দক্ষিণের বিশেষতঃ তাঞ্জোরের নৃত্যকলার মূলতঃ দুইটি অংশ—(১) নৃত্ত ও (২) অভিনয় (অঙ্গাভিনয়)। কর্ণাটী সঙ্গীতের সহিত তাঞ্জোর-নৃত্যের গঠন-সাদৃশ্য প্রণিধানযোগ্য। তাঞ্জোর-নৃত্যের পল্লবী, অনুপল্লবী, চরণম্, পাঁচটি জেথী (যথা—তিস্রম্, মিশ্রম্, কাণ্ড, সঙ্কীরণম্ ও সথ্ইআসিরম্), সাতটি তাল (যথা—আদি, আদ, ধ্রুব, মধ্যম অর্থাৎ মধ্য, রূপক, ত্রিপুট ও জম্প অর্থাৎ ঝম্প—ঝাঁপতাল), ও রাগ—রাগমালিকা—এই সকল দিক্ হইতে তাঞ্জোর-নৃত্য কর্ণাটী সঙ্গীতের অনুগামী। খাটি নৃত্ত অংশে রাগ অপেক্ষা তালের প্রভাব পরিস্ফুটতর।

এইবার ভরতনাট্যের কয়েকটি অংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা যাইতেছে।

(১) নৃত্যারম্ভ পর্ব্বের নাম—'অলরিপ্পু'—ইহা দেবতার আবাহন বা মঙ্গলাচরণ। সম্ভবতঃ, ইহা তেলেগু শব্দ 'অলরিম্পু'র অপভ্রংশ। তেলেগু শব্দটির অর্থ—পুষ্প-দ্বারা শোভিতকরণ। এই অবস্থায় নর্ত্তকী তাহার পদদ্বয় কিছু ব্যবধানে রাখিয়া মাথার উপর হাত জোড় করিয়া দাঁড়ায়। তাহার পর গ্রীবা, নয়ন ও হস্তযুগলের সমতালে বিচিত্র ভঙ্গী দেখাইতে থাকে। এই ভঙ্গীগুলির সাধারণ পারিভাষিক নাম—'রেচক' (ভরত-নাট্যশাস্ত্রেও রেচকের বিবরণ আছে)। মধ্যে একবারে অর্দ্ধোপবিষ্টভাবে নর্ত্তকী রেচকের সৃষ্টি করে ও পরে উঠিয়া 'ধিগি ধিগি'—এই তাল ও অন্যান্য তালানুযায়ী দ্রুত পিছাইয়া যায়। ইহা হইল খাঁটি নৃত্তাংশ।

(২) দ্বিতীয় অংশ—'জেথীশ্বরম্'—ইহাতে সঙ্গীত ও অঙ্গভঙ্গীর বিশেষ পরিপাট্য আছে। 'জেথী'—কাল—পরিমাণ বা মাত্রা।

জেথী পাঁচ প্রকার—তিন, চার, পাঁচ, সাত ও নয় বার আঘাত ধরিয়া ভিন্ন জেথী ধরা হইয়া থাকে। সমগ্র নৃত্যটি এক বা একাধিক জেথীতে বাঁধা থাকে। নর্ত্তকীর পশ্চাতে অবস্থিত নৃত্যশিক্ষক জেথী গণনা করিতে থাকেন। মর্দ্দল-বাদক নানাপ্রকার তালের কসরৎ দেখান। আর সেই তালের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া নর্ত্তকী পদক্ষেপ করে ও সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী দেখাইতে থাকে। গ্রীবারেচক, নেত্রভঙ্গী, হস্তের করণ—মুদ্রাগুলির সহিত তালানুগ পদ-বিন্যাসের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে নৃত্য অগ্রসর হইতে থাকে; ও পরিশেষে 'থিরমনম্'-এ হয় নৃত্যের পরিসমাপ্তি।

(৩) তৃতীয় অংশ—'শব্দম্'—শৃঙ্গার-রস-বহুল গীতের নৃত্যে অভিব্যক্তি। গীতগুলি প্রায়ই তেলেগু ভাষায় রচিত। প্রত্যেকটি ভাবের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পাদতালের পরিবর্তন ঘটে। সাধারণতঃ ভরতনাট্য-প্রদর্শনাতে এ অংশটি পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী অংশ 'বর্ণম্' দেখাইতে হইলে 'শব্দম্'-এর বিশেষ প্রয়োজন। কারণ—'বর্ণম্' সুদীর্ঘ-কালব্যাপী বিরাম বিহীন নৃত্যাভিনয়। উহা দেখাইবার পূর্ব্বে 'শব্দম্'-এর আশ্রয়ে নর্ত্তকীর পদযুগল মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম পাইতে পারে, ও ভাবের পরিবর্তনের

উদ্দেশ্যে মধ্যে মধ্যে অবকাশও পাওয়া যায়। শব্‌দম্ সবিরাম—বর্ণম্ অবিরাম।

(৪) বর্ণম্ (উচ্চারণ—প্রায় ভর্ণম্)—ভরত-নাট্যের এই চতুর্থ অংশটি সর্ব্বাপেক্ষা কৌশলপূর্ণ ও কঠিন। ইহা নৃত্ত ও অভিনয়ের সংযোগে গঠিত—অন্ততঃ একটি পূরা ঘণ্টার কমে এ অংশের সুষ্ঠু প্রদর্শন সম্ভব নহে। পটভূমিকায় যে গীত প্রযুক্ত হয়—অধিকাংশ স্থলেই তাহা শৃঙ্গাররসবহুল। নৃত্য যতই সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হয়, ততই সর্ব্বশরীরের অঙ্গভঙ্গী বিদ্যুদ্বিলাসের মত দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতে থাকে—পাদবিন্যাসের তালগুলি ঘন ঘন পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। এই সময় মর্দ্দল বা ঢক্কাজাতীয় বাদ্যে যে জ্বেথী প্রদর্শিত হয় তাহার নাম —'থিরমনম্'—উহার মাত্রাগুলি অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতি। জ্বেথী অনুযায়ী তালে তালে দ্রুত চরণক্ষেপ করিতে হয়। উহার সহিত যদি বিশুদ্ধ অথচ অতি বিরল রাগের (যথা—কল্যাণী বা নবরত্নমালিকা) সমন্বয় ঘটে, তবে ত আর কথাই নাই। মনে হয় যেন—নর্ত্তকী বিনা আয়াসে নাচের আনন্দে নাচিয়া যাইতেছে—সে নৃত্যের বিরামও নাই, অবসানও নাই—সে নৃত্যভঙ্গীগুলি যেমন নয়নবিমোহন, সে তালগুলি তেমনই শ্রবণ-সুখকর, আর মধুর ভাবাভিব্যঞ্জক রাগ-প্রদীপ্ত সে সঙ্গীত তেমনই হৃদয়মর্ম্মস্পর্শী। নদীর স্রোতের মতই এ অপরূপ নৃত্যচ্ছন্দঃ অবিরামগতিতে একটানা বহিয়া যায়—নর্ত্তকীর মুখ দেখিয়া বুঝা যায় না যে, সে নৃত্য দেখাইবার জন্য অণুমাত্রও আয়াস স্বীকার করিতেছে—এমনই সহজ সলীল এ নৃত্যের গতি। শ্রীমতী শান্তার নৃত্যে এই সুসমঞ্জস স্বতঃস্ফূর্ত্ত নৃত্যের রূপটি প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। ইহা আয়ত্ত করিতে হইলে প্রয়োজন—গুরু-শিষ্য-সম্প্রদায়ক্রমে স্বয়ং সুশিক্ষিত উপযুক্ত আচার্য্যের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘকাল নৃত্যশিক্ষা ও সুদীর্ঘ কাল তাহার কঠোর অভ্যাস বা সাধনা। নতুবা 'বর্ণম্' অংশের সুষ্ঠু প্রদর্শনী হইতে পারে না। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই যে অল্প-শিক্ষিতা নর্ত্তকী গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া হাঁফাইতে থাকে, তাহার পক্ষে 'ভরতনাট্য' প্রদর্শনের চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র।

(৫) তথাপি এ কথা স্বীকার্য্য যে, নর্ত্তকী যতই সুশিক্ষিতা হউক না কেন, সুদীর্ঘ কাল কঠিন রাগ-তাল-মান অনুযায়ী বিরামহীন নৃত্য প্রদর্শনের পর শ্রান্তি তাহাকে অভিভূত করিবেই করিবে। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই কারণে ভরতনাট্যের পঞ্চম অংশ—অভিনয়। ইহাতে নর্ত্তকীর পদযুগল বিশ্রামের অবসর পায়। নেত্র, মুখ, হস্ত প্রভৃতি অঙ্গ, উপাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গগুলির সাহায্যে নর্ত্তকী ভাবের অভিব্যক্তি করিতে থাকে। সচরাচর ইহাকে উত্তর-ভারতে 'ভাও বাত্‌লান' বলা হয়। ইহাতে যে সকল গানের ভাব অভিব্যক্ত করা হয়, সেগুলি শৃঙ্গারাদি নানা রসমূলক অথবা ভক্তি-রসাশ্রিতও হইতে পারে। এই গানগুলির নাম—'পদম্'। জয়দেবের গীতগোবিন্দের বহু গান 'পদম্'-এর অন্তর্ভুক্ত। ইহা ছাড়া পুরন্দর দাস, মুথু তাণ্ডবর, ভারতী প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ প্রাচীন দক্ষিণী কবির গান 'পদম্'-মধ্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

(৬) উপসংহারাংশ—'তিল্লন'। তিল্লন খাঁটি নৃত্ত। উহাতে কঠিন পাদতালের ব্যবহার হয়। উহার প্রত্যেকটি ভঙ্গী এত সুন্দর, যেন মনে হয়—অজন্তার গুহাচিত্র হইতে উঠাইয়া আনা হইয়াছে। ভরতনাট্যের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য—শক্তি ও সৌন্দর্য্য তিল্লনের মধ্য দিয়াই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কালবিভাগ (অর্দ্ধমাত্রা, সিকিমাত্রা ইত্যাদি), ও উহার সহিত তাল রাখিয়া জ্যামিতিক পরিশুদ্ধতানুযায়ী সুনিপুণ বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী—এক তিল্লনেই দেখা যায়। তিল্লনের প্রতিটি অংশ যেন এক একখানি চিত্র—প্রস্তরে খোদিত করিয়া রাখিবার উপযোগী। অথচ বর্ত্তমানের নর্ত্তকীকুল—রুক্মিণী দেবী, শ্রীমতী শান্তা প্রভৃতি তিল্লনকে পরিহার করিয়াই চলেন। ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা গোপালকৃষ্ণভারতী-কর্তৃক রচিত বসন্তরাগে গেয় সুবিখ্যাত 'নটনমন্দিনর্' সঙ্গীতে নৃত্যসমাপ্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কেন ভুলিয়া যান যে—'নটনমন্দিনর্' আবাহন-গীতি—উহাতে নৃত্যসমাপ্তি করিলে নৃত্যের পারিভাষিক চ্যুতি ঘটে!

সমগ্র ভরতনাট্য দেখাইতে আজকাল প্রায় আড়াই ঘণ্টা হইতে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। অবশ্য, মধ্যে মধ্যে সঙ্গীতাংশের মিশ্রণ থাকে। কোন কোন নর্ত্তকী প্রথম ঘণ্টায় নৃত্তাংশ শেষ করিয়া শেষের দুই ঘণ্টায় অভিনয়-কৌশল দেখান। ইহাতে কিন্তু ফাঁকি দেওয়া হয় মাত্র। ভরতনাট্যের যথার্থ রূপ দেখাইতে হইলে দুই ঘণ্টা নৃত্ত ও এক ঘণ্টা অভিনয় দেখান উচিত। কারণ, ভরতনাট্য মূলতঃ ভরতের নাট্যশাস্ত্রোক্ত অভিনয়কলা নহে—ইহা নৃত্যকলা। অতএব ইহাতে নৃত্তাংশের প্রাধান্য-রক্ষার একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য ভরতনাট্যে অভিনয়ের দিকটাও উপেক্ষণীয় নয়। ইহা কথক-নৃত্যের মত কেবল তালমূলক নহে। তথাপি একথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে—যখন নৃত্তাংশে (শব্‌দম্ ও বর্ণম্-এর মধ্যে) অভিনয়ের পর্য্যাপ্ত অবকাশ পাওয়া যায়; তখন আবার পদম্-এর অংশটি বিস্তৃততর করিয়া নৃত্তাংশ অপেক্ষা অভিনয়াংশ প্রধানতর করার কোন সার্থকতা আছে কি? যদি অবশ্য নর্ত্তকীর বয়স ত্রিশের অধিক হইয়া উঠে (যে বয়সে দীর্ঘকাল অবিরাম নৃত্তে বয়স্কা নর্ত্তকী শ্রান্ত হইয়া পড়ে), কিংবা স্বভাবতঃই যদি নর্ত্তকীর শরীর একটু স্থূলভাবাপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে অধিক নৃত্ত অপেক্ষা অধিক অভিনয় প্রদর্শনের প্রবৃত্তিকে কথঞ্চিৎ মার্জ্জনা করা চলে। তবে সে ক্ষেত্রেও ইহা দেখিতে হইবে—সত্যই নর্ত্তকী গ্রীবা, মুখ, নেত্র, হস্তাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-উপাঙ্গ চালনায় বিশেষরূপে অভিজ্ঞা কি না। যাহার নৃত্তেও শক্তি নাই, অভিনয়েও অভিজ্ঞতা নাই—ঈদৃশ নর্ত্তকী ভরতনাট্যে বর্জ্জনীয়।

পন্দনল্লুরসম্প্রদায়ের সুপ্রাচীন আচার্য্য বিদ্বান্ মীনাক্ষিসুন্দর পিল্লে—নৃত্ত ও অভিনয়ের যথাযথ সামঞ্জস্য-বিধান-দ্বারা ভরতনাট্যের এই শুদ্ধ রূপটি আজও তাঁহার শিষ্যগোষ্ঠীতে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। কথাকলি-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য সম্প্রতি পরলোকগত শঙ্করন্ নম্বুদ্রির ন্যায় আচার্য্য মীনাক্ষি-সুন্দরম্ পিল্লের নাম দক্ষিণ-ভারতে সুবিখ্যাত।

অবশ্য তাঞ্জোরে ও অন্যান্য স্থানে ভরতনাট্যের নানা সম্প্রদায় বিদ্যমান। তবে এই সকলের অধিকাংশগুলিতেই নৃত্যমধ্যে কমনীয়তা ঢুকাইবার উদ্দেশ্যে ভরতনাট্যের শুদ্ধরূপের বিকৃতি ঘটান হইয়াছে ও হইতেছে—ইহা নিতান্তই বিড়ম্বনার বিষয় সন্দেহ নাই!

আর একটি বিশেষ বিড়ম্বনা—ভরতনাট্যে অসংখ্য শিশু-নর্ত্তকের বা বালিকা নর্ত্তকীর আবির্ভাব। অবশ্য শিক্ষার প্রারম্ভ অল্প বয়সে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নতুবা বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ও পেশীগুলি কঠিন হইয়া উঠে—ইচ্ছামত উহাদিগকে নমনীয় করা চলে না। কিন্তু তাই বলিয়া পাঁচ, ছয়, সাত, আট এমন কি

আশরাফ সিদ্দিকী

একটি অশথ গাছ এখনো দাঁড়িয়ে আছে, এইখানে, এই ছোট নদীটির তীরে!
জনহীন মজা নদী—মশকের রাজধানী—তবুও-গাঁয়ের বধূ নয়নের নীরে
কলসী ভরিয়া নেয়।
ধ্বংস-যাওয়া একখানি প্রস্তর-বাঁধানো ঘাট, অশথের ঠিক নীচে নদীর উপর—
আজো কোন সুদিনের মূক সাক্ষ্য দেয়।

কোনো দিন এইখানে, এই বাঁধা ঘাট 'পরে, এই বুড়ো অশথের শ্যামল ছায়ায়
শরতের একখানি কাকলি-মুখর দিন বাঁধা পড়েছিল বুঝি সবুজ মায়ায়।
তরল-তরুণী দল কলস ভাসায়ে জলে এইখানে, আহা, এই ঘাটের উপর
সোনার কাঁকন আর গহনার মিঠি বোলে, হাসি-গানে কাটায়েছে কত না পহর।

কোনো দিন এইখানে, এই অশথের তলে গেয়েছিল মানুষেরা বসন্তের গান;—
এসেছিল মোগল-পাঠান···
বর্গী আর তাতারের দুরন্ত অসির ঘায়ে কভু ভেংগেছিল এর দু'-একটি ডাল:
আবার বসন্ত-বায়ে সবুজ পাতার গানে উড়ায়েছে এ অশথ প্রাণের মশাল!

এইখানে, এই ছোট নদী পার দিয়ে—
সেদিন যে সব লোক আমাদেরি হাতে বোনা ঢাকাই মস্‌লিন্ আর উত্তরী উড়িয়ে
তাম্বূল-রাঙানো ঠোঁটে উড়ন্ত হাসির মত খেয়া-নদী পার হ'য়ে হেঁটে হেঁটে যায়—
অন্নহীন, বস্ত্রহীন তাহাদের বংশধর এই পথে হাটে আজ ভরা বেদনায়!
এখন তাদের সব হাড় গোণা যায়!

এই গাছ বেদনায় কাঁদে শন্-শন্—
এই গাছ মেলে দিয়ে সহস্র নয়ন
দূর···দূর···বহু দূর···কি যেন তাকিয়ে দেখে···আশা আর নিরাশায় দোলে নিরবধি:
: আবার রাজার ছেলে পংখীরাজ ঘোড়া বেঁধে এই অশথের তলে দাঁড়াতো যদি—
: এই সব মরা নদী, মরা গ্রাম, মরা মাঠ আবার তরংগ তুলে জাগ্‌তো যদি—
: এই সব মাঠে মাঠে লুটোপুটি সোনা ধান মানুষ পাখীর মত খুঁটে খেত যদি—
: পাখীদের গানে মাঠ ভ'রে যেত যদি···।

তা'হলে তখন বুঝি এই গাছ—ভাংগা গাছ—আবার নতুন ক'রে মেলে দেবে পাখা:
বারুদের গন্ধহীন নিটোল পাতার ফাঁকে অসংখ্য সুখের নীড় গড়বে বলাকা!
আরো ঘনো—আরো স্নিগ্ধ—আরো সুবৃহৎ—
এই গাছ ছায়া দেবে অসংখ্য পথিক দলে। তখন নোতুন দেশে নোতুন শরৎ।

দশ-বার বৎসরের বালক-বালিকার পক্ষে ভরত-নাট্য-প্রয়োগ হাস্যকরই হইয়া উঠে। ভরতনাট্য মূলতঃ শৃঙ্গারনাট্য। অতএব, প্রাপ্ত-যৌবনা নর্ত্তকী ব্যতীত বালক বা বালিকার পক্ষে উহার প্রদর্শন বিড়ম্বনায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অথচ শিশুনৃত্যের পৃষ্ঠপোষকগণ ও শিশুনর্ত্তকের বা বালিকা-নর্ত্তকীর অভিভাবকবৃন্দ এ তথ্যটি উপেক্ষা করিয়া প্রত্যেকটি শিশু-নর্ত্তককে দৈবশক্তির আধার বলিয়া চালাইয়া দিতে যেন আজকাল বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছেন। ভরতনাট্য, কথাকলি, কথক, আধুনিক নৃত্য—সর্ব্বত্রই এই একই ব্যাপার। শ্রীনটরাজ এই দারুণ বিপদের কবল হইতে শুদ্ধ নৃত্যকলাকে রক্ষা করুন!!!

জীবন-জল-তরঙ্গ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

২৫

ফাল্গুনের শেষাশেষি এবার দোল-পূর্ণিমা। এ গাঁয়ে উৎসবটা পূর্ণিমার পরও দিন কয়েক ধরে চলে। আমের বোল ঝরে ছোট ছোট গুঁটি কচি-পাতার ফাঁকে আত্মপ্রকাশ করছে; অশ্বত্থের গাছের মাথায় সকালের রোদে মনে হয় আগুনের শিখাগুলি কাঁপছে, সব জায়গায় সবুজের সমারোহ। দক্ষিণ-বাতাসে দেহের শিরায় বইছে নতুন রক্তের ধারা। প্রকৃতিকে খুবই ভাল লাগছে, আর ভাল লাগছে একটা কিছু করতে। প্রকৃতির এই পট-পরিবর্তন মানুষের মনেও জাগাচ্ছে নতুন শক্তি—নতুন উৎসাহ—নতুন করে ভালবাসার নেশা।

এমনি নতুন দিনে ঠিক দোলের দু'দিন আগে পুরন্দরের পিসিমা চীৎকার করতে করতে বাড়ি ফিরে এলেন।

আবাগীর বেটিদের আস্পর্দ্ধা কত! বলে এক-ঘরে করবো—ঠাকুর-পূজোর ফুল আর তোমায় দিতে হবে না। আমার সোনার চাঁদ ছেলে—তার নামে কলঙ্ক! বামুন-কায়েতের ঘরে করুক দেখি বার অমন একটি ছেলে? অলপেয়ে ড্যাকরাদের মুখে বাসি আকার ছাই দিতে হয় না!

কৌতূহলী জনতায় উঠোন ভরে উঠলো। পুরন্দরের মা ঘোমটা টেনে বাড়ির ভেতর থেকে বার হয়ে এসে পিসিমার হাত ধরে বললেন,—ভেতরে এসো। ধেই-ধেই করে নাচলেই লোকে জব্দ হবে না।

পিসিমা চীৎকার করে বললেন, নাচি সাধে! ড্যাকরাদের কথা শুনে হাড়-পিত্তি রি-রি করে জ্বলছে বউ। বলে কি না—

আচ্ছা, বাড়ির ভেতরে এসো—শুনছি। জনতার কৌতূহল নিবিয়ে দিয়ে তিনি ননদের হাত ধরে বাড়ির মধ্যে এসে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুয়োরটা দিলেন বন্ধ করে।

পিসিমা কাঁপতে কাঁপতে দাওয়ায় বসে পড়ে হঠাৎ চোখের জল মুক্ত করে দিলেন। ধরা-গলায় ডাকলেন, বউ!

পুরন্দরের মা বললেন, ফুলের মোড়ক সব ফিরিয়ে আনলে যে?

পিসিমা হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন, গাল দিচ্ছি কি সাধে! ও মোড়ক কেউ নিলে না।

কেন?

পিসিমা তীর-বেগে সোজা হ'য়ে উঠলেন। চোখের জল তাঁর হৃদয়ের উত্তাপে বুঝি শুকিয়ে গেল। খনখনে গলায় বললেন, হারামজাদাদের আস্পর্দ্ধা কি কম! বলে—তোমাদের কালো শত্যিক জাতের সঙ্গে মেশে, কুঁকড়ো খায়—মোছলমান বাড়িতে যায়—

মা বললেন, তা বলুক। অসাক্ষাতে রাজার মাকে কে না ডাইনি বলছে, ঠাকুরঝি! তা ফুলের কি দোষ হ'লো?

হোল না? পিসিমা দম দেওয়া পুতুলের মত বেজে উঠলেন, হোল না দোষ? যে বাড়ীর ছেলে কুঁকড়ো খায়—মোছলমান-বাড়িতে যায়—সে বাড়ির ফুলে ঠাকুরপূজো হবে কি করে? বলে—এক-ঘরে করবো।

পুরন্দরের মা বললেন, তুমি একটু চুপ কর। কালোকে ডেকে জিজ্ঞাসা করছি ব্যাপার কি।

বারমুখী জ্বালা ঘরমুখে ফিরে এলো। পিসিমা বললেন, ও আবার জিজ্ঞেস করাকরির আছে কি! যায় না ও শত্যিক জাতের বাড়িতে?

পুরন্দরের মা বললেন, লোকের বাড়ি···হিন্দুই হোক মোছলমানই হোক—কে না যাচ্ছে। শত্যিক জাত ছুঁলেই কিছু জাত যায় না।

পিসিমা বললেন, তোমার আস্কারাতেই ওর এত বাড়। কেন, মালীর ছেলে—যা জাত-বিত্তি তাই করে খা' না। না হয় পাস দিলি তিনটে, চাকরি কর। তা না এ সব হতচ্ছাড়াগিরি কেন?

মা বললেন, সব ফুলই ফিরিয়ে এনেছ—না সব বাড়িতে যাওনি?

পিসিমা বললেন, বাজারের বারোয়ারি তলায় সবাই বসেছিল। ছিধর, ভূপনে, শশে, চারু আচার্যি, আমাদের চক্কোত্তি মশাই, গোয়ালাদের তারণ ঘোষ—সব ড্যাকরাই তো বললে, মালি-বউ, ভারি গোলমালের কথা শুনছি। তোমাদের কালো না কি মোছলমানদের সঙ্গে ভাত খায়—ফিষ্টি করে কুঁকড়ো খায়। তা সে বাড়ি থাকলে তোমার ফুলে কি করে ঠাকুর-পূজো হয় বল? আজ থেকে ফুল আর না।

মা বললেন, তা যাক্, ফুল না হয় না-ই দিলে—

বাধা দিয়ে পিসিমা বললেন, ফুল না দিলে খাব কি বাসি আকার ছাই! কালো খাওয়াবে তোমায় চাকরি করে?

মা বললেন, এক কাজ কর—মেজ বাবুর কাছে যাও। উনি আমাদের অভিভাবকস্বরূপ। ওঁর কাছে গিয়ে একটা পরামর্শ নেয়া আমাদের উচিত।

মেজ বাবু সব জানে। যোলটা মোড়া গুণে দিয়েছিলে তো? উই দেখ—একটা কম। আঙুল দিয়ে ভূপতিত মোড়া ক'টা তিনি দেখালেন।

ফুল নিয়েছেন উনি! আশায় পুরন্দরের মায়ের স্বর উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো। কি বললেন মেজ বাবু?

বললেন, মালি-বউ, এ বড় কঠিন ঠাঁই। দেবতার নাম করে ওরা সমাজের মাথায় বসে হুকুম চালাতে চায়। তোমার ছেলের দোষ সত্যি কি মিথ্যে জানি নে, কিন্তু আমার দেবতা বিঘ্ননাশন। সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা। ওঁকে পতিত করবে তোমার ছোঁয়া ফুল—এ আমি মানতে পারলাম না।

আহা, বড় তেজী লোক মেজ বাবু। মা উৎফুল্ল মুখে মন্তব্য করলেন।

কিন্তু—ওঁর সে ক্ষ্যামতা নেই যে আমাদের পুষবেন।

মা বললেন, মরা হাতী লাখ টাকা ঠাকুরঝি।

পিসিমা মুখ বাঁকিয়ে বললেন, শুধু কথায় তো চিঁড়ে ভেজে না বউ। ওঁকে রোজ দু' পয়সার ফুল দিয়ে সংসারের কি সুসার হবে

বল তো? একটু থেমে বললেন, যাই হোক, জিগগেস্ কর ছেলেকে। ও টো-টো করে ঘুরে বেড়াবে—

আচ্ছা জিগগেস্ করছি—তুমি হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হও।

এমন সময় বাইরের কড়া নেড়ে পুরন্দর ডাকলে, মা—মা!

দুয়োর খুলে মা বললেন, আয়।

পিসিমা কি বলতে যাচ্ছিলেন, মা বাধা দিয়ে বললেন, তুমি নেয়ে নাও ঠাকুরঝি।—বলে তাঁকে কুয়ো-তলা দেখিয়ে দিলেন। বক্-বক্ করতে করতে পিসিমা চলে গেলেন।

মা বললেন, এ সব কি শুনছি কালো?

ঠিকই শুনেছ মা! পুরন্দর হেসে জবাব দিলে।

কি ঠিক? তুই মোছলমান-বাড়ি ভাত খেয়েছিস্?

পুরন্দর হাসিমুখে বললে, যদি খেয়েই থাকি তুমি কি ত্যাগ করবে আমাকে?

যদির কথা নয় কালো; সত্যি কথা শুনতে চাই আমি।

মায়ের দৃঢ়-কঠিন কণ্ঠস্বর পুরন্দরের কানে বাজলো। এ স্বর ওঁকে মানায় না।

পুরন্দর বললে, তার আগে আমার একটা কথা শুনবে?

মা বললেন, বেশ ত।

পুরন্দর বললে, খুব ছেলেবেলার কথা আমার মনে পড়ে। পথ থেকে বাড়িতে এসে ঢুকলে তোমরা আমায় কাপড় ছাড়িয়ে পা ধুইয়ে মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে তবে ঘরে ঢুকতে দিতে।

মা মাথা নাড়লেন।

পুরন্দর বললে, তার দশ-বারো বছর পরে শুধু পা ধুয়ে ঘরে ঢুকতে পারতাম।

মা বললেন, তাতে কি?

পুরন্দর বললে, আজ চার-পাঁচ বছর থেকে সেটুকুও আর করি না—তোমরাও আপত্তি কর না। সেকালে যা পাপ বলে কি অন্যায় বলে মনে হ'তো, আজ তা মনে হয় না কেন মা?

মা একটু ভেবে বললেন, তোরা বড় হয়েছিস্, জ্ঞান , তাই আমাদের অত টিক-টিক করতে হয় না।

পুরন্দর বললে, না মা, এ তোমার ঠিক উত্তর হ'লো না।

মা ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, ঠিক জবাবটা কি হ'লো?

পুরন্দর হেসে বললে, ঠিক জবাব দেওয়ার জন্য তোমায় দোষ দিচ্ছি না মা। তুমি অনেক কিছু লক্ষ্য করলেও সকলের চুপিসারে যে কাল বদলে যাচ্ছে তা বুঝতে পারনি। তোমাদের কালে আর আমাদের কালে তফাৎ অনেক। তোমরা দেখেছ—মানুষের চেয়ে বড় হয়েছে ধর্ম্ম। ধর্ম্মও ঠিক নয়—কতকগুলি আচারপ্রথা। তাকেই ধর্ম্ম বলে মেনে নিয়ে মানুষকে ছুঁয়ে মানুষ অশুচি হয়েছে সেদিন। আজ মানুষ—

মা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, হাঁ, সেকালের থেকে একালের ছোঁয়া-ছুঁয়ির ব্যাপারটা আল্‌গা হ'য়েছে বলেই মানুষ ভাল হয়েছে—এ কথা মানতে পারি না। কলির শেষে চার-পো পাপ পূর্ণ হলে এ তো হবেই। শাস্ত্রে লেখা আছে।

পুরন্দর বললে, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ো না মা!

মা বললেন, ঠাকুরঝি এখুনি নেয়ে আসবেন। সবাই যদি আমাদের এক-ঘরে করে—তুই যদি চাকরি না করিস্—কি করে সংসার চলবে বলতে পারিস্?

বেশ তো, তাঁকে যখন বিশ্বাস কর তখন এ ভারটাও তাঁর ওপর ফেলে দাও না মা!

মা গম্ভীর স্বরে বললেন, ঠাকুর-দেবতা নিয়ে ঠাট্টা করবি নে কালো। তোরা নাস্তিক হ'লেই ওঁরা উড়ে যাবেন না।

গভীর বিশ্বাসের মূলে আঘাত দিয়ে কোন লাভ নেই। পুরন্দর জানে, তর্কে মার মন টলবে না—সেখানে জমবে শুধু বেদনা। মাকে আশ্বস্ত করবার জন্য ও বললে, মুসলমান-বাড়ি যাই বটে, তবে সেখানে আজ পর্য্যন্ত খাইনি।

মার মুখ প্রসন্ন হ'লো। বললেন, তাই বল।

পুরন্দর ভাবলে, ঠিক সত্য কথা বলা হ'লো না। মুসলমান-বাড়ি খাইনি মানে খেতে আপত্তি আছে তা নয়—খাবার সুযোগ ঘটেনি বলেই তথাকথিত শুচিতা বা জাতিরক্ষা সম্ভবপর হ'য়েছে। কিন্তু যদি কেউ ডাক দেয়—এস খাবে। 'না' বলবার হেতু সে খুঁজে পাবে না। তবু মনের কথা মনেই রয়ে গেল—অন্তরের সত্য সুযোগ পেয়েও বাইরে আসতে পারলে না। মা'র মনে কষ্ট দিতে ওর বাজছে। এটা দুর্ব্বলতারই নামান্তর। তা হোক, রূঢ় না হ'য়ে—ত্বরা না করে—আস্তে আস্তে জটিল বাঁধনগুলো খুলতে দোষ কি!

সাহস করে মা-ও আর মুরগী খাওয়ার কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন না—পুরন্দরও বললে না।

পিসিমা স্নান সেরে এলে মা হাসিমুখে বললেন, ঠাকুরঝি, লোকের মিছে কথা। কালোকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—

পিসিমা বললেন, সে না হয় তুমি বুঝলে—আমিও বুঝলাম, ও অলপ্‌-পেয়েদের বোঝাবে কে?

২৬

তার পর আরও দু'টি মাস গেছে, ওঁদের কেউ বোঝাতে পারেনি। সামাজিক শাস্তি আরও কঠোর হোক এই ছিল ওঁদের ইচ্ছা, সে ইচ্ছা পূর্ণ হ'লো না—সমাজের শহর-মুখীনতার জন্য। ধোপা এখানে হিন্দু-মুসলমান জড়িয়ে নিয়ে চলে—নাপিতেরও অবস্থা তাই; দোকানী সামনের বাজারের চেয়ে পিছনের হাতছানিতেই প্রলুব্ধ, এখানে এক-ঘরে করার চেষ্টা পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কি! আজকাল নিমন্ত্রণের পাট উঠে গেছে, যা আছে তাতেও ষোল আনা সামাজিকতার রেওয়াজ দুঃসাধ্য। লোক-লৌকিকতা না হ'লেই লোকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবে—বাঁচলাম। আর মিত্র-বাবুদের জিদও বেয়াড়া। গ্রামের সবাই যদি চলে পূর্ব্বমুখে—উনি পা বাড়াবেন পশ্চিমে। সবাই ঠাকুরের ফুল নেওয়া বন্ধ করলেন বলেই উনি ফুলের বরাদ্দ বাড়িয়ে চার গুণ করলেন। এই সব অসাম্য নিয়ে কখনও দোষীর দণ্ডবিধান করা সম্ভব এ গ্রামে! তবু ওঁরা যতটা পারলেন, ঠাকুরের ফুলের যোগান বন্ধ করে—আর বারোয়ারির সাজের বায়নাটা বাতিল করে পুরন্দরকে জব্দ করবার চেষ্টা করলেন।

আয় কিছু কমলো। পিসিমা মেজ বাবুর কাছে বার দুই ধরণা দিয়ে এলেন। মেজ বাবু ডেকে পাঠালেন পুরন্দরকে।

পুরন্দর এলে বললেন, তুমি বাহাদুর ছেলে মানলাম, কিন্তু কত দিন এ ভাবে পাল্লা দিতে পারবে?

পুরন্দর বিনীত স্বরে বললে, পাল্লা দেবার চেষ্টা তো করিনি আমি। আমার কি ক্ষমতা ওঁদের সঙ্গে সমান তালে চলবো?

মেজ বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, খবরদার, নিজেকে নীচু মনে করবে না কোন দিন।

পুরন্দর বললে, পাল্লা না দিলেই কি নীচু হয়ে যায় মানুষ?

কণ্ঠে জোর দিয়ে মেজ বাবু বললেন, যায়। লক্ষ্মী চঞ্চলা, ধন কারও চিরদিন থাকে না। কিন্তু মান বা ক্ষমতা—এ সব রাখবার ভার মানুষের নিজের।

পুরন্দর বললে, ক্ষমতা বা মান—তাই কি চিরদিনের জন্য থাকে?

মেজ বাবু তীব্র দৃষ্টিতে পুরন্দরের মুখের পানে চেয়ে রইলেন মিনিট দুই। তার পর গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন, এ কথা তুমি বিশ্বাস কর—না কোন বইয়ের হিতোপদেশ থেকে আউড়াচ্ছ?

পুরন্দর বললে, ইতিহাস আমাদের যা শিক্ষা দেয়—

মেজ বাবু বললেন, তাতে মান বা ক্ষমতা রক্ষার দৃষ্টান্তই বেশি নজরে পড়ে। রাণা প্রতাপকে ভাব।...দুর্য্যোধনের কথা মনে কর। আর সেকাল যদি না-ই মনে ধরে, এই বিশ্বযুদ্ধটা কি? জার্ম্মাণী তো যায় যায়—হিটলার সূচ্যগ্র জমি এমনি ছাড়ছে?

পুরন্দর কি বলতে যাচ্ছিল—বাধা দিয়ে মেজ বাবু বললেন, শঙ্করবাদ আমাদের খেয়েছে। ওই 'মা কুরু ধনজন-যৌবনে'র ভূত সবারই কাঁধে। তার পর শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়া-ভাসানো প্রেম। শক্তির সাধনাকে ও ধর্ম্ম একেবারে মাটিতে শুইয়ে দিলে।

পুরন্দর বললে, চৈতন্যদেবের নিন্দা করবেন না, ওঁর ধর্ম্মের শক্তি আমরা আজ অস্বীকার করে পারি না।

মেজ বাবু হেসে বললেন, তোমরা যে স্বদেশী করছো—সত্যাগ্রহ। ওই ধর্ম্মকে একটু এদিক ওদিক বদলে—'মেরেছ বেশ করেছ' বলে মন বদলে-দেওয়ার সাধনায় নেমেছ। কিন্তু সাবধান করছি তোমাদের। মানুষ হয়ে ও সাধনা—

পুরন্দর বললে, মানুষ হ'য়েই শ্রীচৈতন্য ওই সাধনা করেছিলেন।

মেজ বাবু বললেন, তার ফল হ'লো কি? কতকগুলি নেড়া-নেড়ির সৃষ্টি। এই ভণ্ড ভূপেন সেনের দল বেড়েছে। ওরা 'তৃণাদপি সুনীচেন'-এর ভাণ করে মানুষকে কম কষ্টটা দিচ্ছে! কি বলবো, কোম্পানীর আইনে বাধে নইলে ওদের আমি গুলী করে মারতাম। মেজ বাবুর চোখ জ্বলে উঠলো। গড়গড়ার ডাক বন্ধ হয়ে গেল।

খানিক পরে তিনি বললেন, যাক—তারা, তারা! শোন—চৈতন্যদেবের ত্যাগ আর তেজ মানুষে নিতে পারেনি, তাই তাঁর ধর্ম্ম নিষ্ফল হ'য়েছে। গান্ধীবাদও তোমরা নিতে পারবে না। তোমরা সাধারণ মানুষ—চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে রাজনীতি মিশিয়ে কঠিন হৃদয়কে নরম করবে—এ তোমাদের দুরাশা। রক্তপায়ী রাজাকে হরিনাম শুনিয়ে বশীভূত করা যায় না। দেহের রক্ত না কমলে কি আত্মিক শক্তির কাছে কেউ মাথা নামায়? অসুখ হ'লে যেমন আমরা ভগবানকে মানত করি! বলে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

পুরন্দর বললে, পরীক্ষা না দিয়ে ফলাফল সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না।

মেজ বাবু গড়গড়ার নলটা নামিয়ে রেখে বললেন. কুতর্ক ভাল নয় কালো। তোমার সংসারের যা অবস্থা তাতে কিছু উপার্জ্জন করা তোমার কর্ত্তব্য।

পুরন্দর বললে, সে চেষ্টা করবো।

মেজ বাবু বললেন, দরখাস্ত এনেছ?

পুরন্দর বললে, চাকরি তো করব না আমি। মালির ছেলে জাত-ব্যবসা যা পারি—

ভাল—ভাল! জাত-ব্যবসা বলে এখন কিছু আছে? যে বামুন আগে ঠাকুর পূজো করতো সে এখন তাঁত বুনছে, চাষ করছে, ঠাকুরের সাজ তৈরী করছে। ধোপার ব্যবসা—মুচির ব্যবসা—তাও দেখে এলাম কলকাতায় দিব্যি চালাচ্ছে।

পুরন্দর বললো, তা হ'লেও আমরা ক'জন খাটতে পারলে সংসার কোন রকমে চলে যাবে।

মেজ বাবু বললেন, কোন রকমের চেয়ে যাতে ভাল রকমে চলে সে চেষ্টা করা কি উচিত নয় তোমার?

পুরন্দর মাথা নামিয়ে বললে, মানুষের ইচ্ছার কি শেষ আছে?

বুঝেছি—বুঝেছি, ওই চৈতন্যবাদই তোমাদের খেয়েছে! গড়গড়াটা তুলে নিয়ে উপর্য্যুপরি কয়েকটা টান দিয়ে বললেন, দুঃখবাদ—অদৃষ্টবাদের এ-পিঠ ও-পিঠ। ওকে স্বীকার করেই আমাদের আজ এই দশা!

পুরন্দর ধীরে ধীরে চলে এলো সেখান থেকে। ভাবলে, আমাদের বলতে মেজ বাবু কা'দের কথা বলছেন। ওঁর কাছে নিজের নিজের স্বাধীনতাই সর্ব্বস্ব!

পাশের জানালা থেকে নম্রতা ডাকলে, আসুন এ ঘরে। অপূ-দা' রয়েছেন।

ঘরের মধ্যে এসে পুরন্দর দেখলে অপূর্ব্ব একখানা মোটা কেতাবে নিবিষ্ট-চিত্ত।

পুরন্দরকে দেখেও সে মুখ তুললে না, শুধু বললে, বসুন।

নম্রতা বললে, জল খাবেন?

পুরন্দর বললে, চা খাই না বলে তার বদলে জলই খাই, এ ধারণা আপনার হ'লো কেন?

নম্রতা হাসলে। বললে, বাঃ রে, কিছু না খেলে গৃহস্থের পক্ষে ভদ্রতা রক্ষা করা কি মুশকিল, জানেন?

পুরন্দর বললে, ভদ্রতা অবশ্য ভদ্রলোকের জন্য—মানছি।

নম্রতার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ঈষৎ গম্ভীর হ'য়ে বললে, তা জানি।

পুরন্দর কৌতুক বোধ করলে ওর গাম্ভীর্য্যে—কথায়। বললে, আমি তো আর চাকরি করি না।

নম্রতা আরও গম্ভীর হয়ে তীব্র দৃষ্টিতে তার পানে চাইলে। তার পর কোন কথা না বলেই ঘর থেকে চলে গেল অকস্মাৎ।

অপূর্ব্ব হেসে উঠলো।

পুরন্দর তার পানে চেয়ে বললে, হাসচেন যে?

বই পড়তে পড়তে একটা কথা মনে হ'লো। কম্যুনিজম্ আর সোস্যালিজম্—এ দু'টোর মধ্যে বেশ খানিকটা তফাৎ রয়েছে তো? সেদিন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তর্ক হ'চ্ছিল। তিনি বললেন, যে সোভিয়েটের বড়াই কর তোমরা তা কম্যুনিজম থেকে বেশ খানিকটা দূরে রয়েছে। মার্কসকে পুরোপুরি নিলে ওরা জাতিগত পার্থক্যও মানতো না। কিন্তু শুধু চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে—রাশিয়া ক্যাপিটালিজম্ আর কম্যুনিজমের মাঝামাঝি রাস্তা সোস্যালিজমটাই বেছে নিয়েছে।

আপনি কি উত্তর দিলেন ?

কোন উত্তর দিইনি। কাগজের রিপোর্ট পড়ে দেশের রীতি-নীতি আন্দাজ করা যায়, ঠিক বোঝা যায় না তো। রাশিয়া আর যাই হোক, থাক সে মাঝামাঝি রাস্তায়, তবু ক্যাপিটালিজম্‌এর দিকে মুখ ফেরাবে না, এ বিশ্বাস করি।

পুরন্দর বললে, সে তো আপনার বিশ্বাস আর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা। চোখের সামনে যা ঘটছে—

অপূর্ব্ব বললে, তাই হাসছিলাম। চোখের সামনে যা ঘটে তাই সত্য হয় না সব সময়ে। কার্য্যের সঙ্গে কারণের যোগ থাকে—কার্য্য ঘটে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার গুণে।

নম্রতা ফিরে এলো দু'কাপ চা আর প্লেটে কিছু হালুয়া নিয়ে। দু'জনের সামনে কাপ প্লেট নামিয়ে দিয়ে বললে, চা কিন্তু খুব গরম নেই, লম্বা তর্কের ভার সইবে না—সরবৎ হয়ে যাবে।

অপূর্ব্ব বললে, পুরন্দর বাবুকেও যে—

নম্রতা বললে, উনি এইমাত্র বললেন—যখন-তখন জল খেলে সর্দ্দি হয়। বলে মুখ ফিরিয়ে সে টিপে-টিপে হাসতে লাগলো।

পুরন্দর অগত্যা চায়ের কাপ তুলে নিলে। প্রতিজ্ঞা করে সে চা ত্যাগ করেনি; এমনি ভাল লাগে না বলে খায় না।

অপূর্ব্ব চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, আপনার সঙ্গে তর্ক হওয়ার পরই আপনার কর্ম্মকেন্দ্র উত্তরপাড়ায় গিয়েছিলাম, পুরন্দর বাবু!

পুরন্দর বললে, কি দেখলেন ?

দেখলাম—মার্কস্‌বাদ সকলের মনের তলাতেই থিতিয়ে রয়েছে। আর যারা বঞ্চিত—দরিদ্র, তাদের এ জিনিষের আশা খুবই স্বাভাবিক। তবে ভীরু মন—অজ্ঞ মানুষ! ও জিনিষ হিংসার মত তাদের মন ছেয়ে আছে, ওর বলিষ্ঠ রূপটি ওদের চেতনায় ভাসে না।

পুরন্দর বললে, আপনি একটু ভুল বুঝেছেন। মনের তলায় যা থিতিয়ে আছে তা সমাজ-সচেতনা নয়, নির্জ্জলা হিংসা।

কেমন করে বুঝলেন ?

বেশ করে দেখুন—ওদের মধ্যে যারা ধনী ও পদমর্য্যাদায় বড়, তারা কি করে।

সেই বড়দের বিরুদ্ধেই তো ওদের ক্ষোভ।

পুরন্দর হেসে বললে, না, বড় না হ'তে পেরে ওদের ক্ষোভ। আজ ওদের বড় করে দিন তো—সমাজ-সচেতনা কোথাও আর খুঁজে পাবেন না।

অপূর্ব্ব কি ভাবতে লাগলো।

পুরন্দর বললে, ওদের কাছে মার্কস্‌বাদ প্রচার না করাই ভাল। যে আগুন কন্‌ট্রোল করা যায় না, তা বনেদ পর্য্যন্ত ছাই করে দেয়।

অপূর্ব্ব বললে, না পুরন্দর বাবু, আপনার কথায় সায় দিতে পারলাম না। আপনারা যেমন পরীক্ষা চালাচ্ছেন সত্যাগ্রহের, লোকের মনের পরিবর্ত্তন করে জগৎকে ফিরিয়ে আনবেন রাম-রাজত্বে—এই কল্পনায় মশগুল হয়ে আছেন। আমরাও পরীক্ষা করবো এই অশিক্ষিত অজ্ঞ নির্য্যাতিত মাস্‌কে নিয়ে—যদি ওদের মনে সাম্যবাদের চেতনা আনতে পারি। পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস না হ'লে মানুষের মঙ্গল নেই।

পুরন্দর ভাবলে, শশীরা তার আনুগত্য ছেড়ে দূরে সরে গেল কি এই প্রলোভনে? অপূর্ব্ব ওদের কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কে জানে?

নম্রতা উলের একটা প্যাটার্ণ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও ওদের আলোচনা শুনছিল। অপূর্ব্বর কথা শেষ হলে বললে, খাবারগুলো খেয়ে অন্ততঃ নিজেদের মঙ্গল কর। তোমরা তো মানুষ ছাড়া নও।

দু'জনে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলো। অপূর্ব্ব বললে, নম্রতার গুণ এই—ঘা দিতে পারলে ও ছাড়ে না।

নম্রতা বললে, গুণই তো। দেশোদ্ধারের ধুঁয়ো তুলে তোমরা আমাদের হেনস্থা কর, তা বুঝি আমরা জানি না।

ইস্‌—হেনস্থা! কমরেড—কমরেড। বলে হাত বাড়িয়ে সে চেয়ার ছেড়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালে।

নম্রতা উলের প্যাটার্ণ সমেত ছিটকে চলে গেল ঘরের বাইরে।

চেয়ারে বসে প্লেট টেনে নিয়ে অপূর্ব্ব হাসতে হাসতে বললে, আসুন, নাস্তির উপদেশ পালন করা যাক।

পুরন্দর জিজ্ঞাসা করলে, কমরেড বললে উনি রাগ করেন কেন?

অপূর্ব্ব বললে, নীল রক্তের গুণ। দেশের সেবা করতে চায় নাস্তি, কিন্তু মঞ্চের ওপরে আসন পেতে।

পুরন্দর বললে, বঝলাম না।

অপূর্ব্ব বললে, যে ভিক্ষে দেয় আর যে ভিক্ষে নেয়, কার আনন্দ বেশি, পুরন্দর বাবু?

পুরন্দর বললে, দু'জনেরই আনন্দ!

অপূর্ব্ব বললে, বেশি কার? যে দেয়—তার না? দেয়ার গৌরবের সঙ্গে নেওয়ার দীনতাকে মেশাবেন না দয়া করে। সার্থক হওয়া আর কৃতার্থ হওয়া এক নয়। নাস্তিদের দেহে নীল রক্ত বইছে—ওরা গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে থাকতেই ভালবাসে।

নীল রক্ত তো আপনারও ধমনীতে—

হাঁ, বইছে। তবে নীল রক্তের বিষ-ক্রিয়াকে আমরা ঘৃণা করতে শিখেছি। রক্ত লাল না হ'লে পৃথিবীর পরিত্রাণ নেই, এ তত্ত্ব আমরা প্রচার করি।

পুরন্দর বললে, পৃথিবী কিন্তু আপনাদের সেবার দ্বারাও মুক্তি লাভ করবে না।

অপূর্ব্ব হাসলে, বললে, দেখা যাক্‌।

২৭

বিকেলে আশু গোঁসাইয়ের মেয়ে রমা বেড়াতে এলো। পুরন্দর তখন জল-চৌকিতে ডাকের সাজ তৈরীর সরঞ্জাম নিয়ে একমনে কাজ করছিল। এ গাঁয়ের পুজোর বায়না বাতিল হ'য়ে গেলেও গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরে অনেক প্রতিমা হয়। তাদের মধ্যে ডাকের সাজের প্রতিযোগিতা এই যুদ্ধের বাজারেও বেশ চালু আছে। পুরন্দরের এক সহপাঠী ওকে চিঠি লিখে সাজ তৈরীর বায়না দিয়ে কিছু টাকা আগাম পাঠিয়েছিল। হাতে সময় যথেষ্ট। চেষ্টা করলে তিন জনে আরও দু'খানা প্রতিমার সাজ তৈরী করে দিতে পারে।

রমা পৈঠার নীচে দাড়িয়ে বললে, তোমার সাজ তৈরী করে শেষ হবে বল তো?

পুরন্দর মুখ তুলে বললে, কেন রে বুড়ি?

বাঃ, আমি বুঝি বুড়ি! সাজ তৈরী করে চোখের মাথাও খেয়েছ বুঝি? বারো বছর বয়স হ'লে কি হয়—রমার কথাই পাকা গিন্নীর মত! কুঁদুলে বলে ওর মায়ের নাম-ডাক আছে গাঁয়ে, খাটতে পারে বলে লোকে খাতিরও করে যথেষ্ট। ছেলেবেলা

থেকে রমাও খাটতে শিখেছে, কোঁদল করতে শিখেছে আর ওর পাকা পাকা কথার ঠেলায় বড় বড় লোকও নাস্তা-নাবুদ হয়। ছোট মেয়ে বলে সবাই হেসে উড়িয়ে দেয়—কৌতুক করে ওকে নিয়ে।

মেয়েরা বলেন, যেন সাত কালের পাকা গিন্নী!

যাদের ভাল লাগে না—তারা বলে, মেয়ে যে ঘরে যাবে, সে ঘর ভেঙ্গে সাতখানা যদি না হয় তো কি বলেছি!

সামনে বললে রমা সমান তালে উত্তর দেয়, কি আমার ঘর জোড়া দিউনিরা গো! তবু যদি ভাশুর-দেওর নিয়ে ঘর করতে! জানতে তো আমার বাকি নেই কাউকে!

পারত পক্ষে কেউ ঘাঁটায় না ওকে।

পুরন্দর বললে, চেহারায় নয় রে, কথাতে তোর বুড়িপনা গেল না।

নাও, জ্বালিও না বাপু। কবে তোমার পোড়া সাজ তৈরী শেষ হবে, বল না? রমা মুখ বেঁকিয়ে প্রশ্ন করে।

পুরন্দর বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে বলে, ঠাকুর-দেবতাকে গাল!

বাঃ, গাল দিলাম! তোমার সাজ তৈরীর জ্বালায় যে আমার ঠাকুরের অজ্জল অম্বল অবস্থা সে তো দেখছো না? মুখের ভাবে যথেষ্ট দুঃখ টেনে এনে সে গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লে।

তোমার ঠাকুরের আবার কি হলো?

কি আবার হবে? নিশেনটা ছিঁড়ে দিয়েছে কোন্ মুখপোড়া কে জানে? ঘুড়ি ধরবার আর যেন লগা ছিল না গাঁয়ে। এতে ওদের ভাল হবে—?

পুরন্দর বললে, আর একটি নিশেন চাই?

মাথা নেড়ে খুশী-ভরা চোখে ও পুরন্দরের পানে চাইলে।

আচ্ছা, এবার একটা ভাল লাল রঙের নিশান তৈরী করে দেব।

দূর, লাল কি হবে? নীল রঙা দিও।

পুরন্দর বললে, কিন্তু আমার নিশান তোমার হরি ঠাকুরকে দিলে তোমার বাবা বকবে না?

বাবা? কেন বকবেন?

ছোট মেয়ের কাছে সে কথা বলতে ইতস্তত: করলে পুরন্দর। জাতির পাঁতি সম্বন্ধে ওর জ্ঞান কতটুকুই বা! তবু পাছে ওই নিশান টাঙানোর জন্যে কোন রকম লাঞ্ছনা ওকে সইতে হয় তাই একটু ভেবে নিয়ে পুরন্দর বললে, তোমার বাবা আর গাঁয়ের সবাই মিলে আমাদের একঘরে করেছেন যে।

পাকা গিন্নী হ'লেও এ-কথার অর্থ বুঝলে না রমা। বললে, বাঃ রে, তোমাদের তো অনেকগুলো ঘর। একঘরে কি করে হবে?

পুরন্দর বললে, আমাদের বাড়ির ফুলে কেউ ঠাকুর-পূজো করে না, জান তো?

রমা বললে, ওঃ, তাই? তা ফুলে ঠাকুর-পূজো না হোক গে—নিশেন টাঙালে কি এমন ভাঁড়ে থাঁড় খাবে! ঠোঁট উল্টে বললে, ভারি তো! বাবাকে ভয় করে চললেই হয়েছে আর কি! বাইরে বাবা যতই লাফাক ঝাঁপাক না, বাড়ির মধ্যে মা'র কাছে তোতা মুখ ভোঁতা!

পুরন্দর হাসলে, আচ্ছা, তৈরী করে দেব নিশান। কিন্তু বেছে বেছে তিন রঙটাই তোর পছন্দ কেন বলতে পারিস্?

রমা বললে, আমার পছন্দ বুঝি? বাঃ রে মশাই, খুব জানেন আপনি! ঠাকুর আমায় স্বপন দেননি বুঝি?

কৌতুক-ভরা কণ্ঠে পুরন্দর বললে, কি স্বপ্ন?

রমা বললে, স্বপন কাউকে বললে ফলে না। ঠাকুর পাপ দেন।

স্বপ্ন ফলবে—বল না রে। বলে হেসে উঠলো পুরন্দর।

ধ্যেৎ, আমায় ভোলানো হচ্ছে? বলে এক ছুটে সে পথে গিয়ে উঠলো। সেখান থেকে চেঁচিয়ে বললে, কাল যদি নিশান্ তৈরী করে দাও, তোমার খুব ভাল হবে। কাল আসব কিন্তু।

পুরন্দর হাসতে লাগলো'।

বাসব এলো সন্ধ্যের সময়। বললে, দাদা, এবার গাজিমের মেলায় তাল-পাতার সেপাই তৈরী করবো। খুব বিক্রী হবে।

না, মেলায় গিয়ে বসতে হবে না।

বাসব বললে, মেলায় বসবো না তো, পাইকের কিনে নিয়ে যাবে বাড়ি থেকে।

শোয়া দিয়ে ঠাকুরের আঁচলায় জরি বসাতে লাগলো পুরন্দর। কোন উত্তর দিলে না।

বাসব বললে, তা হ'লে তৈরী করবো না?

দু' মিনিট চুপচাপ। অবশেষে কাঁচি দিয়ে একটা সোলার টুকরোকে কেটে পুরন্দর বললে, তা তৈরী করিস্।

বাসব আনন্দে পাক খেয়ে নেমে এলো।

সম্মতি দিতে পুরন্দকে একটু ভাবতে হ'য়েছিল বৈ কি। গাজিমতলায় যে কাণ্ড হয় তা ভাবলেও তার রুচিকে আঘাত করে। বলতে গেলে এই পর্ব্বকে উপলক্ষ করে মদ খেয়ে—অশ্লীল ছড়া কেটে—বাজনার তালে তালে নেচে একটা নারকীয় ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়! ওখানে যারা আসে তারাও খুব উঁচু জাতের নয়। কিন্তু নীচু বলে কাউকে ঘৃণা করবার অধিকার পুরন্দরকে কে দিলে? এ কি সেই অপূর্ব্ব-কথিত নীল রক্তের ক্রিয়া নয়? পুরন্দর অভিজাত নয়—গোত্র-গরিষ্ঠে ওদের স্থান ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের অনেক নীচে। উপর থেকে অবজ্ঞা পেয়ে পেয়ে ওর মনে জমেছিল গ্লানি। কিন্তু যে গ্লানি নিজে বইতে পারছে তারই ভার চাপিয়ে দিতে চায় ও তার চেয়েও যারা নীচে পড়ে আছে তাদের মাথায়। তাদের ভালবাসার ক্ষমতা নেই অথচ ঘৃণা করবে পরিপূর্ণ ভাবে? এ অন্যায়—এ অন্যায়!

খানিক পরে বাসব ফিরে এসে বললে, দাদা,—দাদা, শীগ গির এসো, মাধব কাকাকে বাজারের মোড়ে—

প্রদীপের আলো পড়েছে বাসবের মুখে। পুরন্দর সেদিকে চেয়ে চমকে উঠলো। কপালের দু'পাশ দিয়ে সরু-মোটা গোটাকতক ধারা নেমে এসেছে ওর গালে—নাকে—চোখের পাতায়, টক্‌টকে লাল রক্তের ধারা।

পুরন্দর স্তম্ভিত হয়ে গেল। শুষ্ক স্বরে বললে, এ সব কি বাসু?

বাসব কেঁদে বললে, ওরা আমায় মেরেছে, দাদা।

কারা মারলে? কেন?

বাসব বললে, সন্ধ্যার অন্ধকারে মাধব কাকা দোকানে গিয়েছিল রং কিনতে। ময়রাদের আর বামুনদের ক'জন ছেলে মিলে ওকে ক্ষেপাতে লাগলো। মাধব কাকা বুঝি গাল দিয়ে ওদের তেড়ে মারতে গিয়েছিল, এই যায় কোথায়! সবাই মিলে ইট দিয়ে—লাঠি দিয়ে—

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলে বাসব।

পুরন্দর বললে, তুই বুঝি ঠেকাতে গিয়েছিলি?

ঘাড় নেড়ে বাসব বললে, শীগ্‌গির চল দাদা; নৈলে মাধব কাকাকে ওরা মেরে ফেলবে।

পুরন্দর উঠোনে নেমে বললে, তুই বাড়ির ভেতর যা—

বাসব ব্যগ্র স্বরে বললে, লাঠি নিয়ে যাও, দাদা।

পুরন্দর মুখ ফিরিয়ে বললে, লাঠির দরকার হবে না।

বাসব এ কথায় প্রবোধ মানলো না। চালের বাতায় গোঁজা বেতের ছড়িখানা নিয়ে পুরন্দরের পাছু নিলে।

সত্যিই লাঠির দরকার ছিল না।···রক্তাক্ত কলেবরে মাধব পথের ধুলোয় লুটোচ্ছিল। ছ'পাশে তার জনতা নানাবিধ মন্তব্যে হায় হায় করছে···এক জন এক ঘটি জল এনে ঢেলেছে মাধবের মাথায় —পথের ধুলোয় কাদা জমেছে। সে কাদা মাধবের চুলে ও গায়ের জামায় লেগেছে। আততায়ীর দলের চিহ্ন মাত্র নেই।

পুরন্দরকে দেখে এক জন আধাবয়সী লোক বললে, এই যে বাবা, দেখ তো, জীবন আছে কি না?

সেই ভয়েই হয়তো কেউ মাধবকে ছোঁয়নি। সামনে রাত্রি, যদি-ই মাধব মরে গিয়ে থাকে—ওকে ছুঁয়ে কি শেষে এই অবেলায় স্নান করতে হবে! তার ওপর পুলিশের ভয়। কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা!

হাঁটু গেড়ে পুরন্দর মাধবের মাথার কাছে বসলো। ছ'হাতে মাথাটা তুলে আস্তে আস্তে নাড়া দিয়ে ডাকলে, মাধব কাকা, মাধব কাকা—

অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর এলো, উঁ।

বড্ড লেগেছে কি? ডাক্তার ডাকবো?

মাথা নাড়লে মাধব। ওর জ্ঞান অনেকক্ষণ ফিরে এসেছে। অবসন্ন হয়ে পড়েছে বলে উত্তর দিতে ভারি কষ্ট বোধ হচ্ছে।

পুরন্দর মাধবকে বসিয়ে দিলে। এক জন আর এক ঘড়া জল নিয়ে এলো—এক জন নিয়ে এলো পাখা। পাখা দিয়ে সজোরে বাতাস দিতেই মাধব ঠক্‌-ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগলো। বললে, বড় শীত।

অদূরে বাইকের বেল বেজে উঠলো ক্রিং ক্রিং করে।

জনতা ছ'ভাগ হয়ে সরে গেল। অস্ফুট গুঞ্জন-ধ্বনি উঠলো, দারোগা বাবু—দারোগা বাবু।

দারোগা বাবু নয়—ডাক্তার। সুশীল ডাক্তার—ছ' ক্রোশ দূর থেকে রোগী দেখে ফিরছিলেন। সহজে ময়লা হবে না বলে—দূর গ্রামে যাবার সময় উনি খাকির হাফ্‌ প্যাণ্ট ও হাত-কাটা জামার ওপর একটা ছাই রঙের কোট চাপিয়ে—মাথায় শোলার হ্যাট দিয়ে বাইকে চেপে রোগী দেখতে যান। অস্পষ্ট অন্ধকারে ওঁর খাকির হাফ প্যাণ্ট দেখে সবাই দারোগা বলে ভুল করেছিল।

ডাক্তারের বয়স সাতাস-আটাশ। রোগীর সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার করেন। গরিব দেখলে ফিয়ের টাকা নেন না—ওষুধের দাম যথাসম্ভব কম নেন, ক্ষেত্র-বিশেষে মাপও করেন। যে কোন দেশহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওঁর যোগ আছে। সময়ে কুলোলে প্রত্যেক সভাতেই হাজিরা দেন।

ডাক্তার এগিয়ে এসে বললেন, ব্যাপার কি?

পুরন্দর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, কাকাকে কারা মেরেছে।

ওঃ! বলে আর বাক্যব্যয় না করে ডাক্তার রোগীর ওপর ঝুঁকে পড়লেন। পকেট থেকে টর্চ্চ বার করে—সেই আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভাল করে দেখলেন আঘাতের স্থানগুলি।

বললেন, এ ধুলোর ওপর তো চিকিৎসা চলবে না। তোমরা ক'জনে মিলে ধরাধরি করে ওকে এই রোয়াকটার ওপর নিয়ে এসো।

জনতা পাতলা হয়ে গেল—ছ'জন ক্ষীণজীবী ছেলে শুধু এগিয়ে এলো।

পুরন্দর বললে, আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলতে পারবে না মাধব কাকা?

মাধব ঘাড় নেড়ে বললে, পারবো।

ডাক্তার সাহায্য করলেন মাধবকে।

প্রাথমিক চিকিৎসার পর মাধব সুস্থ বোধ করলে। ডাক্তার বললেন, ওঁকে বাড়িতে রেখে ডিস্‌পেনসারিতে যেয়ো—ঘুমের একটা ওষুধ দেব। ভয় নেই। আঘাতটা সিরিয়স নয়।

রোয়াকের ধারেই ঠেসানো ছিল ডাক্তারের বাইক। বাইকের কাছে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল বাসব। ডাক্তার নেমে আসতেই সে সরে গেল।

ডাক্তার হাঁকলেন, কে? কে? তাঁর সন্দেহ হলো হয়তো কেউ বাইক চুরি করতে এসেছিল।

বাসব ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বললে, আমি বাসব। মাধব কাকার কোন ভয় নেই তো?

না। তা তুমি ওখানে না গিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

রোয়াকের ওপর থেকে পুরন্দর বললে, ডাক্তার বাবু, ওকেও মেরেছে। এক বার দয়া করে দেখবেন তো?

বটে! বলে ডাক্তার টর্চ্চ জ্বেলে বাসবের মুখের ওপর ফেললেন।

ইস্‌, আশ্চর্য্য ছেলে! এমন লেগেছে—তবু দাঁড়িয়ে আছ চুপ-চাপ? দেখি—দেখি?

পরীক্ষায় ওর মাথা থেকে বেরুলো ইটের টুকরো। আঘাতটা মনে হলো ওরই বেশি। অথচ এই ক্ষীণজীবী ছেলেটি যন্ত্রণায় একটুও টুঁ শব্দ করেনি।

ডাক্তার রোয়াকের ধারে এসে বললেন, বাসুকে আমি ডিস্‌পেন্সারিতে নিয়ে যাচ্ছি—একটা ইন্‌জেকসান দেওয়া দরকার।

পুরন্দর বললে, বলেন কি? ওর আঘাতটা তা হ'লে—

ডাক্তার বললেন, একটু বেশি। যাই হোক, ভয় পেয়ো না। ভগবানকে ধন্যবাদ দেও যে ঠিক সময়ে এসে পড়েছি।

ভগবানকে ধন্যবাদ দেবে? কোন্‌ ভগবানকে? মানুষ ছোট হয়ে যাঁর মহিমাকে উঁচুতে তুলে ধরেছে সেই কল্পনা-সৃষ্ট অপ্রত্যক্ষ দেবতাকে—না, মানুষের দেহে সদ্‌বৃত্তির আধারে বসে আছেন যে নরোত্তম—তাঁকে?

পুরন্দর ছ'হাত জোড় করে সামনের অন্ধকারকেই একটি সকৃতজ্ঞ নতি জানালে। চোখে তার জল টল-টল করছে।

[ক্রমশঃ।

(কথা-চিত্র)

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

২৯

খেয়ালের ঝোঁকে মায়া সেদিন এক কাণ্ড করে বসলো।

দুপুর বেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর ঘণ্টা কয়েকের জন্য এ-বাড়ীর সকলেই চিরাভ্যস্ত দিবা নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে। মায়ার পক্ষে এই সময়টুকু খুবই অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। মৃগেনের অসংখ্য স্মৃতি—তার রচিত নাটকের চরিত্রগুলি মূর্তি ধরে তাকে যেনো বিহ্বল করে তোলে; কিছুতেই সে বাড়ীতে তিষ্ঠাতে পারে না তখন। এই সময়টুকু কি আনন্দেই কাটত—জমিদার বাবুদের পোড়ো ভূতের বাগানটিতে। মৃগেনের নিরুদ্দেশ যাত্রার পর সে বাগানের ত্রিসীমাতেও কোন দিন যায়নি মায়া, অথচ প্রতিদিনই এই সময় বাগানের পরিবেশগুলি তাকে যেনো হাতছানি দিয়ে ডাকে—মায়া অস্থির হয়ে ওঠে; কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে যায়—এ আকর্ষণ নিরর্থক, তবুও উপলক্ষ মানুষটির অদ্ভুত প্রভাব উপলব্ধি করে সে অভিভূত হয়—মুখখানা আঁচলে চেপে গুমরে গুমরে কাঁদে, চোখের জলে আঁচল ভিজে যায়! সেদিন এমনি অবস্থার মধ্যে বাগানের অশোক গাছটি এবং তার কাণ্ডকে বেষ্টন করে পাথরের বেদীটি এমনি সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে অনেক দিন পরে সেটিকে আর একবার দেখবার প্রলোভন কিছুতেই সে দমন করতে পারল না। নিঃশব্দে খীড়কির দরজাটি খুলে বাইরে এসে সন্তর্পণে খোলা পাল্লাটি বন্ধ করে সতর্ক দৃষ্টিতে একবার চার দিক দেখে নিল, তার পর দ্রুতপদে এগিয়ে চলল অদূরবর্তী বাগানটি লক্ষ্য করে। কয়েক মাস জন-সমাগম না হওয়ায় বনপথ দুর্গম হয়েছিল, প্রবেশ করবার সময় পায়ে কাঁটা বিঁধল, কোমল অঙ্গের দুই-তিন স্থানে নখখাগড়ার আঁচড় লাগল, একটা বেতান গাছের কণ্টকময় শাখায় লেগে শাড়ীর আঁচলের খানিকটা ছিঁড়ে গেল। কোন রকমে মুক্ত হয়ে ফাঁকা জায়গাটায় এসে দাঁড়াল সে। ঐ ত তাদের মিলন-পীঠ—পাথরের সেই পরিচিত বেদী, সর্বাংশ অশোকের বিবর্ণ ফুলে ও শুকনো পাতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে, কেমন একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ মৃদু-মন্দ বাতাসে ভেসে আসছে। এই বেদীতে প্রতিদিনই মৃগেন আগে এসে বসে থাকতো তার প্রতীক্ষায়, কোন দিন বা তন্ময় হয়ে নূতন রচনায় নিবিষ্ট হয়ে থাকত, আবার এক এক দিন ছুরির ডগা দিয়ে অশোক গাছের কাণ্ডটির উপর কত কি লিখত। ঐ যে এখনো তার নিদর্শন রয়েছে···একটি দুটি তিনটি···পর পর পাশাপাশি। এগিয়ে গিয়ে বেদীর ওপর উঠে বদ্ধ-দৃষ্টিতে দেখতে লাগল—মৃগেনের সিদ্ধহস্তের চিহ্নগুলি আজও কত সন্তর্পণে বহন করছে তাদের মিলন-সাথী এই প্রাচীন গাছটি। চোখের দৃষ্টি প্রখর করে মায়া পড়তে লাগল···'মায়া-মৃগ'; 'শিব-দুর্গা'; 'রাম-সীতা' 'যশোরেশ্বরী'; 'বাঙ্গলার হলদিঘাট'···এমনি কত অন্তরস্পর্শী শব্দ! পড়তে পড়তে মায়ার অন্তরটিও দুলে ওঠে,···এই সব শব্দ দিয়ে কত কথাই হোত, কত ব্যাখ্যাই করত মৃগেন···

গাছের গায়ে অমন করে কি দেখা হচ্ছে?

পিছন থেকে ব্যঙ্গের সুরে এই পরিচিত কণ্ঠের প্রশ্নটি শুনেই চরকীর মত মায়া ঘুরে দাঁড়ালো—কানাই যে তার অনুসরণ করে এই দুর্গম বনে এসে দাঁড়িয়েছে, ঘুণাক্ষরেও সে তা জানতে পারেনি। আসবার সময় সতর্ক-দৃষ্টিতে চারি দিক্ দেখেই পথে নেমেছিল—কই, তখন ত এই অসভ্য ও অবাঞ্ছিত মানুষটা তার চোখে পড়েনি? তবে কি সে আগে থেকেই এখানে ছিল কিংবা তার অজ্ঞাতেই বাড়ীর কানাচ থেকেই অভদ্রের মত পিছু নিয়েছিল! ক্ষণকাল বিমূঢ় দৃষ্টিতে সে কানাইয়ের অশিষ্ট মুখখানার পানে চেয়ে রইল, তার পর সুশ্রী সুঠাম কপালটি একটু কুঞ্চিত করে মুখে কোন কথা না বলে অশোক গাছের কাণ্ডটির পাশ দিয়ে বেদী থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ল—তার সংস্পর্শ থেকে পালাবার উদ্দেশ্যে।

কানাই বেদীর ওপর ওঠেনি, নিচেই ছিল। সংগে সংগে সে-ও বেদীটা ঘুরে এক দৌড়ে মায়ার সামনে গিয়ে পথ আটক করে দাঁড়াল, নির্লজ্জের মত হাসতে হাসতে বলল: আমি কি বাঘ, যে দেখেই হরিণের মতন লাফিয়ে পালাচ্ছ?

দৃপ্ত কণ্ঠে তর্জন করে উঠল মায়া: পথ ছেড়ে দাও বলছি!

নারীকণ্ঠের তর্জনে কিছুমাত্র অপ্রতিভ বা লজ্জিত না হয়ে ইতরের মত বিশ্রী একটা ভংগি করে হাসতে হাসতে কানাই বলে উঠল: মাইরি না কি—হাতে পেয়ে এক-কথায় ছেড়ে দোবো! ক'দিন ধরে এমনি একটা ফুরসৎ খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, একটি দিনও বাগে পাইনি; আজ বিষহরি মুখ রেখেছেন।

এমন জায়গাটিতে কানাই পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে যে, পাশ কাটিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। এক নজরে দুই পাশ দেখে অবস্থাটা বুঝে মায়া মনে মনে একটু শংকিত হোল, কিন্তু সে ভাব মুখে প্রকাশ না করে নির্ভীক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল: তোমার মতলব কি শুনি?

দন্তপাটি বিকশিত করে হিঃ হিঃ করে হাসতে হাসতে কানাই বলল; মাইরি, রাগলে তোমাকে কি সোন্দর দেখায়। হ্যাঁ, মতলব কি তা বুঝতে পারনি—সত্যি? ভূতের বাগানে আমরা দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি—এ তল্লাটে এখন কেউ নেই······

মুখখানা শক্ত করে রুক্ষ কণ্ঠে মায়া বলল: তোমার মতন ইতরের সংগে এখানে দাঁড়িয়ে নেকামী করবার আমার সময় নেই, ভালয় ভালয় পথ ছেড়ে দাও কানাইদা, নইলে······

অবলার এরূপ অশোভন শৌর্যে কানাইয়ের পৌরুষ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, মুখের হাসি মুখেই বিলীন করে সামনের দিকে একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল সে: নইলে করবে কি মায়ারাণী? জানো, এখন আমার মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছ তুমি—চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও কেউ এখানে আসবে না; আর এলেও এর পর এমন খোয়ার করব যে বাড়িতে সেঁধুবার আর রাস্তা পাবে না; লোকের সামনে জাঁক করে বলবো—মেয়েটা নষ্ট, নৈলে ভূতের বাগানে পীরিত করতে আসে?' আজ ঝগড়া হয়েছে তাই—

কানাইকে আর কথাটা শেষ করতে হোল না। তার কল্পিত বিশ্রী কথাটা শুনেই মায়ার চোখ দু'টো দপ্-দপ্ করে জ্বলে উঠল এবং এই ধরণের কথার প্রতিবাদের যা মোক্ষম অস্ত্র—দুর্জয় সাহসে তাই সে প্রয়োগ করে বসল। কথাগুলো বলতে বলতে কানাই আরো

খানিকটা এগিয়ে এসেছিল, এ অবস্থায় মায়ারই পিছিয়ে যাবার কথা, কিন্তু সে এটাকে সুবিধা ভেবেই তার নিটোল সুডৌল ডান হাতখানি বিদ্যুদ্বেগে চালিয়ে দিল কানাইয়ের মুখের থুতনিটি লক্ষ্য করে। যন্ত্রণাব্যঞ্জক একটা অস্ফুট আওয়াজ করে কানাই ঠোঁট দু'টো চেপে ধরল।

শৈশব থেকেই এই মেয়েটির অটুট স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক দৈহিক শক্তির খ্যাতি ছিল—এই দুইটি ঐশ্বর্যের জন্যই তার সৌন্দর্য এতখানি চক্ষুচমৎকারী হয়ে উঠেছে। এই উদ্যানে বসেই সে কল্পনার দৃষ্টিতে অতীত বাংলার তেজস্বিনী কিশোরীদের সাহস ও শক্তিদীপ্ত মূর্তি প্রত্যক্ষ করেছে—সেই সংগে তাদের আদর্শে নিজের প্রকৃতিকে গড়ে তুলতে চেয়েছে. কাজেই মুখের সামনে এক অবাঞ্ছিত যুবার এই ইতর উক্তি অম্লান বদনে পরিপাক না করে হাতে হাতেই সে উপযুক্ত উত্তর দিয়ে কল্পনাকে বাস্তব করে তুলল। শুধু তাই নয়, পরক্ষণেই ক্ষিপ্রহস্তে পায়ের কাছ থেকে একখণ্ড পাথর তুলে নিয়ে কানাইয়ের মাথার দিকে টিপ করে জোর-গলায় হুমকি দিল: হাতের ঘা শুকাতে না শুকাতেই আবার ইতরামি সুরু করেছ, কিন্তু ভুলে যেও না—আমি ভয় পাবার মেয়ে নই; ফের বাড়াবাড়ি করলেই এই পাথর ছুঁড়ে মুখখানা জন্মের মতন থেঁতো করে দেব।

কানাইয়ের জানা ছিল, মেয়েরা সহজে হাত চালায় না, আর চালালেও বড় জোর ঠোনা পর্যন্ত তার এক্তিয়ার। কিন্তু নারীর পেলব হাতের চাঁপার কলির মত আঙুলগুলি যে এমন শক্ত ঘুষিতে পরিণত হয়ে থুতনির দু'খানা ঠোঁটকে আড়ষ্ট করতে পারে, এ ধারণা তার কোন দিনই ছিল না। এর পর মুখখানা চেপে প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে চোখ দু'টো পাকিয়ে তাকাতেই মাথা তার ঘুরে গেল; বুঝতে বিলম্ব হল না যে, ঘুষি চালিয়ে যে মেয়ে তার মত বলিষ্ঠ জোয়ান ছেলের দু'খানা ঠোঁট জখম করতে পারে, পাথর ছুঁড়ে মাথাটাকে ঘায়েল করা তার পক্ষে অসাধ্য ত নয়ই—বরং যে ভাবে ছোঁড়বার মত জায়গার ব্যবধান রেখে রুখে দাঁড়িয়েছে তাতে তার দিকে আর এক পা এগিয়ে গেলেই, মুখে যা বলেছে কাজেও তা হাসিল করতে কিছুতেই সে পিছপাও হবে না। মনে মনে কানাই নিজের বুদ্ধিকেই দোষ দিল—সুযোগটাকে ঠিক মত সে কাজে লাগাতে পারেনি, সুরুতেই মেয়েটাকে রাগিয়ে দিয়ে সে মস্ত ভুল করেছে; এখন তাকেই নীচু হয়ে ব্যাপারটার মোড় ফেরান চাই। তাই সে তৎক্ষণাৎ অত বড় অপমান অনায়াসে পরিপাক করে রুষ্ট ও ক্লিষ্ট মুখে হাসি ছড়িয়ে বলে উঠল: মারতে ইচ্ছে হয় মারো—মাথা আমি পেতে দিচ্ছি; তা বলে তোমার সংগে মারামারি করবার ইচ্ছে আমার নেই জেনো। সত্যি, আমায় ত চেনো, ঠাট্টাঠুট্টি ভালোবাসি—কথার ছলে ঠাট্টাটা একটু বেফাঁস বলে ফেলেছিলুম; কিন্তু তাই বলে অমন করে ঘুষি মারতে হয়? দেখ না—দু'টো ঠোঁটের গোড়ায় রক্ত জমে গেছে, দেখতে দেখতে ফুলে উঠেছে? বা-বা! তোমার হাত এতো শক্ত, আর ঘুষির এতো জোর···

এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা বলে ফেলল কানাই, আরও কি বলতে যাচ্ছিল; কিন্তু এইখানে বাধা দিয়ে মায়া বলল: জোরটা চেষ্টা করেই করতে হয়েছে—ইজ্জতে ঘা পড়লে যাতে রুখতে পারি! তোমার যদি লজ্জা থাকত, হাত পোড়ার পর আর এমন করে মুখ পোড়াতে আসতে না।

দৃঢ় মুষ্টিতে ধৃত পাথরখানা কানাইয়ের মাথার দিকে টিপ করেই মায়া কথাগুলি বলল! কানাই কোঁচার খুঁটে আহত থুতনিটা চেপে ধরে মায়ার কথাগুলি শুনছিল, এখন কাপড় সরিয়ে চোখের দিকে তুলেই শিউরে উঠল; পরক্ষণে সেই দৃষ্টিতে মিনতি ফুটিয়ে সে বলল: তোমার রাগ এখনো পড়লো না মায়া—আমাকে এমন করে মেরেও? আমি ত স্বীকার করছি—খুবই অন্যায় হয়েছে, কিন্তু তার শাস্তিও তুমি কম দাওনি, এই ছাখ—কি করেছ!···বলতে বলতে কানাই তার কোঁচার কুঞ্চিত অংশটা খুলে মায়াকে দেখাল।

মায়ার চোখ দু'টো বড় হয়ে উঠল! সে বুঝল, কানাইয়ের নিচের ঠোঁটটা দাঁতে লেগে কেটে গেছে, সেই রক্তে কোঁচার খুঁটের খানিকটা লাল হয়ে উঠেছে। অমনি তার নারী-মন বেদনায় টন্-টন্ করতে লাগল, তথাপি সে লক্ষ্য হারাল না, কানাইকে সে ভাল ভাবেই চেনে এবং আজ যে পরিস্থিতির সম্মুখীন তাকে হতে হয়েছে, এখনো সে তা থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। তাই হাতের টিপটি বজায় রেখে এবং মনের বেদনা মুখে না ফুটিয়ে দৃঢ় স্বরেই সে বলল: তোমার ভাগ্য ভাল যে দাঁতে লেগে ঠোঁটটা একটু কেটেছে—দাঁত ভাঙেনি একটাও।

আর্তস্বরে কানাই বলল: দাঁত ভাঙলেই তুমি বোধ হয় বেশী খুসি হতে—নয়? কিন্তু হাতের পাথরখানা ধরেই থাকবে, নামাবে না?

মুখখানা শক্ত করে মায়া জানাল: না, তোমাকে বিশ্বাস কি? তুমি যেমন আছ ঠিক অমনি দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ না আমি বাগান থেকে বেরিয়ে যাই—

কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কোমল করে সবিনয়ে কানাই বলল: বিষহরির দিব্যি করে বলছি মায়া, আমাকে বিশ্বাস কর। এমন কোন কাজ আমি করব না—ঐ পাথরখানা যার জন্যে ছোঁড়বার দরকার হবে। ক'দিন ধরেই আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—নিরিবিলিতে গুটিকয়েক কথা তোমাকে শোনাব বলে, সে কথাগুলো তোমার ভালোর জন্যেই।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কানাইয়ের মুখখানার দিকে চেয়ে পাথর-শুদ্ধ হাতখানা নামিয়ে মায়া বলল: কিছু বলবার থাকলে তুমি বড়দাকে বলনি কেন? বড় বৌদির সংগে ত তোমার কথা চলে—তাঁকেও ত বলতে পারতে।

কানাই বলল: সেদিনের হাংগামার পর আমার সংগে যে ওঁরা আর কথা কন না—বড় বৌদি আমাকে দেখলেই কথা বলবার ভয়ে তাড়াতাড়ি সরে যান।

মায়া বলল: হাংগামা ত আমাকেই নিয়ে—তবুও আমার সঙ্গে কথা বলা চাই! কি এমন কথা শুনি?

কানাই একটু উৎসাহিত হয়ে বলল: কথাটা হচ্ছে তোমার বাবার সেই দেনাটা নিয়ে। আমার মামা নালিস করে সমন চেপে ডিক্রী পেয়েছে। এর পর তোমাদের সর্বস্ব নিলেম করে নেবে।

স্থির হয়ে মায়া কথাগুলো শুনল, কিন্তু কোনরূপ চাঞ্চল্য বা ঔৎসুক্য প্রকাশ না করে উপেক্ষার সুরে বলল: নেয় নেবে, এ কথা আমাকে শুনিয়ে কি হবে? শুনেও আমি মুখ বুজিয়ে থাকব—কাউকেই এ কথা বলব না।

এত বড় একটা বিপদের কথা শুনেও চেপে যাবে—কাউকে বলবে না?

কি দরকার? তোমার মামা ত এ বিপদের কথা জানিয়েই গেছেন—সর্বস্ব যাবে এ ত জানা কথাই!

তবুও এর বিহিত করা ত চলে? তুমি মনে করলেই—

এ পর্য্যন্ত বলেই মায়ার পানে চাইতে তার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চমকিত হয়ে কানাই মুখ বন্ধ করল। সেই দৃষ্টি কানাইএর মুখে নিবদ্ধ করে মায়া ব্যঙ্গের সুরে বলল: আমার মনে করবার কিছু নেই; কিন্তু তুমি কি মনে করে কথাটা আমার কাছে পেড়েছ সেটা বোঝবার মত বুদ্ধি আমার ঘটে অবিশ্যি আছে। তবে তুমি যা ভাবছ তা হবে না। সেদিন বড়দা যে কথা বলেছেন, আমারো সেই কথা জেনো। আমি সাত জন্ম আইবুড়ো থাকবো তবুও···

কথাটা আর মায়া শেষ করল না, কিন্তু কথার সংগে সংগে মুখ-চোখ ঘৃণায় বিকৃত করে যে ভংগিতে সে কানাইএর পানে তাকালো, তাতেই বাকি কথাটা বুঝে নিতে কানাইয়ের বিলম্ব হোল না। সে তখন সজোরে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে উঠল: আমার দুর্ভাগ্য মায়া, এত করেও তোমার মন পেলুম না। ঘর বাড়ী বিষয়-আসয় টাকা-কড়ি মান-সম্ভ্রম—কি আমার নেই বল? শুধু বানিয়ে বানিয়ে ছড়া বাঁধতে পারে বলে মেগার জন্যেই তুমি পাগল? কিন্তু ছড়ায় কি পেট ভরবে? তার পর ওদিকে ত শুনচি গুণের তার চারা নেই—একটা বেশ্যাকে নিয়ে ঢলাঢলির পরও তুমি তাকে···

এ কথায় মায়ার চোখে পুনর্বায় বহ্নির আলো ঝলমল করে উঠল; তর্জ্জনের সুরে সে ধমক দিল: থামো বলছি—ইতরামিরও একটা সীমা আছে। মনে রেখো, তোমার মা আর মামা ঢাক পিটে ও-কথা রটালেও কেউ বিশ্বাস করবে না; চাঁদের কলংক আছে, কিন্তু পৃথিবীর কোন কলংক কস্মিন্ কালেও মৃগদাকে স্পর্শ করবে না—যত চেষ্টাই তোমরা কর।

বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথাগুলি বলেই মায়া অকুতোভয়ে কানাইয়ের পাশ কাটিয়ে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত চলে গেল। স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে অপস্রিয়মান মূর্ত্তিটির পানে চেয়ে রইল কানাই।

৩০

দুর্গোৎসবের মত শ্রীপঞ্চমীও যাত্রা-সম্প্রদায়ের বিশেষ স্মরণীয় মরশুম। পৌষ মাসের শেষ থেকেই এই উৎসবের জন্য বড় বড় দলগুলির বায়না হয়ে যায় এবং দালালদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। বউরাণীর দলে বহু দিন পরে একখানি উৎকৃষ্ট পালা খোলা হচ্ছে—লোকের মুখে-মুখেই খবরটা চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। নদীয়ার রাজবাড়ীতে তৎকালে কলিকাতার শ্রেষ্ঠ দলকেই সর্ব্বোচ্চ হারে বায়না করা হোত—তখনকার মহারাজা যাত্রার সমঝদার শ্রোতা ছিলেন, আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সপারিষদ আসরে বসে সমগ্র পালা শুনতেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী এবং নাট্য-রসিক সমাজও আমন্ত্রিত হয়ে আসরের শোভাবর্দ্ধন করতেন; এহেন আসরে রসোত্তীর্ণ পালার খ্যাতি সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ত, পালা রচয়িতা এবং দলের অধিকারী বিশেষ ভাবে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হতেন। এই জন্যে এ পর্যন্ত কোন সম্প্রদায় সুপরীক্ষিত ও প্রশংসিত পালা ভিন্ন আনকোরা নূতন কোন পালার উদ্বোধন করে এখানকার আসরে ভাগ্য-পরীক্ষায় সাহস পাননি। কিন্তু বউরাণীর বিচারসিদ্ধ যুক্তির সংগে অন্য সম্প্রদায়গুলির মতসাম্যের অভাব প্রায়ই দেখা যেত। এবারকার নূতন পালাটির সংগে আরম্ভ থেকে তিনি সুপরিচিত থাকায় এবং তার মহলাগুলি পর্যবেক্ষণ করবার সুযোগ ঘটায় অন্যান্য স্থানের বায়না ত্যাগ করে স্থানীয় রাজবাটীতে শ্রীপঞ্চমী-বাসরে নূতন গীতাভিনয়ের বায়না নেবার নির্দ্দেশ দিলেন। এই সূত্রে সহরে রীতিমত সাড়া পড়ে গেল, দলের মধ্যেই নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি হোল।

বউরাণী মৃগেনকে বললেন: আপনার পানে চেয়েই এত বড় দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলিছি। কষ্টি-পাথরে ঘষে যেমন সোনা যাচাই হয়, নদের রাজবাড়ী আর নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর সামনে যাত্রার পালারও সে অবস্থা ঘটে; এদের বিচারে পালার সুখ্যাতি হলে তার আর মার নেই; এক পালা লিখেই আপনি নামজাদা হয়ে যাবেন, আমার দলও কেঁপে উঠবে; এখন আমার বরাত আর আপনার হাত-যশ।

মৃগেন সবিনয়ে বলল: যশ যদি হয় আপনার বরাতেই হবে। আমি এর জন্যে নিজের যোগ্যতাকে মোটেই বাড়াতে চাইনে। গুণী লোক-জন যোগাড় করে অজস্র পয়সা ঢেলে আপনি পালাখানিকে জাঁকাবার যে ব্যবস্থা করেছেন, আমার পক্ষে সে ত কল্পনাতীত ব্যাপার! আমি কী আর করেছি, খানকতক কাগজ, এক দোত কালি আর একটা কলম—এই ত আমার মূলধন মা, এই নিয়ে হিজিবিজি লিখে গেছি বই ত নয়, কিন্তু আপনি এর পেছনে কত টাকা ঢেলেছেন বলুন ত? মোটা-মোটা মাইনে-করা অত সব লোক, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি, আগাগোড়া দামী দামী পোষাক—নিজের চোখেই ত সব দেখেছি, বই যদি জমে আপনার জন্যেই।

মৃদু হেসে বউরাণী বললেন: কিন্তু আপনার ঐ সামান্য মূলধনে এক অমূল্য ধন তৈরী করতে পেরেছেন বলেই না আমি এর জন্যে এত পয়সা ঢেলেছি। খনি থেকে মণি যখন বেরিয়ে আসে, তাকে শোধন করতে অনেক কিছু করতে হয় জানি, কিন্তু তাতে মণির গৌরবই বাড়ে। যত খরচই আমি করি, আপনার লেখা বইয়ে বস্ত থাকলে তবে তা সার্থক হবে, সেটা জেনেছি বলেই না দরাজ হাতে খরচ করিছি।

পাশের ঘর থেকে এই সময় সীতা বেরিয়ে এসে বলল: আপনি যে বিনয়ে কালিদাসকেও হারিয়ে দিলেন মৃগেন বাবু! কাগজ কালি আর কলম সম্বল করে খালি হিজিবিজিই লিখেছেন না কি? সত্যিই কি আপনি ধারণা করতে পারেননি আপনার পালাটা কি ভাবে উতরাবে? জানেন, অশোক বাবু পর্যন্ত আপনার লেখার ভক্ত হয়ে পড়েছেন—অভিনয়ে যাতে কোন দিক দিয়ে খুঁৎ না থাকে তার জন্যে তিনিও উঠে-পড়ে লেগেছেন?

মৃগেন বলল: আপনি বিনয়ের কথা বললেন না, সত্যকার বিনয় দেখালেন অশোক বাবু—আমার মতন শিক্ষাদীন অভাজনের লেখার সুখ্যাতি তিনি যখন সবার সামনে করেন, লজ্জায় আমি এতটুকু হয়ে যাই!

ভ্রূভংগি করে সীতা বলল: ঐ লজ্জাটি এখন আপনাকে খাটো করতে হবে। লেখকদের অতটা বিনয় আর লজ্জা সত্যিই অশোভন। এখন শুনুন—পালাটার উপরি উপরি গোটা কয়েক ফুল রিহার্সেল দিন নিজে বসে থেকে, শেষেরটা চুল-পোষাক পরে সেজে-গুজেই করা চাই; আমরাই আগাগোড়া দেখে সেদিন বিচার করবো, কি বলেন?

বউরাণীর দিকে চেয়ে মৃগেন বলল : মা যেমন বলবেন তাই হবে। তবে এ প্রস্তাব খুব ভালো।

স্মিতমুখে বউরাণী বললেন : আপনার পালা খোলা না হওয়া পর্যন্ত সীতার চোখে আর ঘুম নেই ; কিসে অভিনয় ভাল হবে, কি করলে গোড়া থেকেই পালা জমে যাবে, সবাই ধন্য ধন্য করবে—এ ছাড়া ওর আর কোন ভাবনা নেই—অথচ, প্রথমে আপনাকে ও-ই পাত্তা দিতে চায়নি।

মুখখানা ভার করে সীতা বলে উঠল : বা-রে, তখন বুঝি জেনেছিলুম উনি বর্ণ-চোরা আম—এত গুণ সব চেপে রেখেছিলেন ? এখন যদি তদ্বিরের দোষে ওঁর বইএর অপযশ হয় আমাদেরই লজ্জা রাখবার আর জায়গা থাকবে না যে! সেই জন্যেই ত আমার এত ভাবনা।

বউরাণী বললেন : বেশ ত, যে রকম করে মহলা দিলে পালা ভাল করে উতরাবে মনে কর, সেই মত ব্যবস্থাই তুমি করবে—তোমার কথার ওপরে দলের কেউ কথা বলবে না।

বিস্ফারিত চোখে মৃগেনের দিকে চেয়ে সীতা বলল : শুনলেন ত মৃগেন বাবু, তাহলে আসুন একটা চার্ট তৈরী করা যাক্—কোন্ দিন কোন্ সময় রিহার্সেল বসবে, ভুলগুলো কি ভাবে নোট করা হবে। আপনাকে কিন্তু খুব শক্ত হওয়া চাই—যত বড় য়্যাক্টর বা গাইয়ে হোন না কেন, ভুল হলে তখুনি ধরে দেবেন আপনি যখন অথার, তার ওপর অভিনয় আর গান দু'টোতেই ওস্তাদ—আপনার কাছে কারুর চালাকি চলবে না। আসুন ত, চার্টটা এখুনি তৈরী করে ফেলি দু'জনে বসে।

সীতার পীড়াপীড়িতে মৃগেনকে তার পিছু-পিছু পাশের ঘরটিতে যেতে হোল। এখানি সীতার পড়বার ঘর। কাচের দু'টি আলমারীতে সাজানো বইগুলি ঝক-ঝক করছে। দেওয়ালে দেশের মনীষীদের ছবি। সুশ্রী একখানি সেক্রেটেরিয়েট টেবিল, কুসন দেওয়া চেয়ারগুলির উপর কারুকার্যখচিত সাদা আবরণ। সামনের চেয়ারে মৃগেনকে বসিয়ে সীতা বিপরীত দিকে তার চেয়ারে বসল। প্যাড ও ফাউন্টেন পেনটি মৃগেনের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল : লিখুন।

মৃগেন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল। ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করল : অশোক বাবুকে আজ দেখছি না যে ?

এক-মুখ হেসে সীতা বলল : শোনেননি বুঝি—তিনি লাইব্রেরীতে গেছেন কি একখানা বইয়ে সিন্ধুটিহু সেঙ্কুরীর বাংলার অস্ত্র-শস্ত্র আর যোদ্ধাদের পোষাক পরিচ্ছদের ছবি বেরিয়েছে—সেটা খুঁজে বের করতে! ওঁর একান্ত ইচ্ছা, সেই ছবির আদর্শে আপনার নাটকের পোষাক-পত্র ও অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী হয়।

আনন্দে ও বিস্ময়ে মৃগেনের মুখভংগি বদলে গেল। তার বইএর জন্য অশোক চৌধুরীর মত এক জন উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তির এতখানি আন্তরিকতায় সে যেনো অভিভূত হয়ে পড়ল, সত্যই এটা তার পক্ষে একেবারেই অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত। সীতার দিকে চেয়ে মৃদু স্বরে সে বলল : আমি কিন্তু অবাক হয়ে যাচ্ছি, মুখে কথা ফুটছে না।

ঠিক এই সময় প্রকাণ্ড একখানা বই হাতে করে অশোক চৌধুরী সবেগে ঘরে ঢুকল, তার পর বইখানা টেবিলের উপর রেখে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল : এই যে মৃগেন বাবু, দেখুন আপনার জন্যে পাঠাগার তোলপাড় করে এক গন্ধমাদন বহে এনেছি। সীতার কাছে আমার অভিযানের কথাটা শুনেছেন বোধ হয় ?

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে অশোকের দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত ভাবে মৃগেন উত্তর করল : এইমাত্র এই কথাই হচ্ছিল! সত্যি চৌধুরী মশাই, আপনি যে আমার বইয়ের জন্যে এমন করে মাথা ঘামাচ্ছেন আমি তা ভাবতে পারিনি। আপনার ঋণ—

পাশের চেয়ারখানায় বসতে বসতে সহাস্যে অশোক চৌধুরী বলল : না—আপনাকে নিয়ে আর পারা যায় না দেখছি, নিজের সম্বন্ধে একেবারে অচেতন! আরে মশাই, বই যদি আমার উতরে যায়—একটা রেকর্ড তৈরী করে, তাহলে আপনার কাছে এঁরাই থাকবেন ঋণী! জানেন ত, লেখার নেশাটা নিজেরও আছে। আপনাকে দিয়ে এখন লাইনটা যদি ক্লীয়ার করতে পারি, এর পরে আমার পক্ষে এগোনো সহজ হবে। আপনার সংস্পর্শে এসে আমি লোক-সাহিত্যের একটা দিক আবিষ্কার করে ফেলেছি তা জানেন? এখন আসুন—এই বইখানার ছবিগুলো আপনাকে দেখাই—এর পর ড্রেসারকে ডেকে এ থেকে ডিজাইন নেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

টেবিলের উপর বইখানা খুলে ফেলল অশোক চৌধুরী—সীতা ও মৃগেন সংগে সংগে সকৌতুকে ঝুঁকে পড়ল প্রত্নতত্ত্বের সেই বিরাট ইতিহাসখানার উপরে। [ক্রমশঃ।

হৃদয়-তীর্থ-তীরে

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

সবাই আমার আপনার ভাই, পরাণে পরাণখানি :
সবার অশ্রু-জোয়ার আমার বুকে করে কানাকানি।
কেউ দূর নয়, কেউ নয় হারা—
ওরে অভিমানী, ওরে দিশেহারা!
ফিরাও, ফিরাও বিধুর নয়ান
কবির নয়নে আমি।

ধরার দেবতা মাটীর মানুষ আর সে ত' কেহ নয়—
ধরণীর মাঝে যে-দেবতা নাই মিছে তার পরিচয়।
যে আছ যেথায় এসো রে সবাই—
সকলের হাতে দু'হাত মিলাই,
হৃদয়ে-হৃদয়ে স্বরগ-রচনা
বিফল হবে না জানি।

দি গুড আর্থ

শ্রীশিশির সেনগুপ্ত ও শ্রীজয়ন্ত ভাদুড়ী

৩৪

তার পর নেববার আগে প্রদীপ যেমন একবার দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি করেই পীয়ার ব্লসমের প্রতি ওয়াঙের কামনা তীব্র হয়ে উঠল। কিন্তু সে শিখার দীপ্তি যেমন দ্রুত উজ্জ্বল হয়েছিল, তেমনি দ্রুতই নির্বাপিত হয়ে গেল। ওয়াঙের হৃদয়ের আকুতি মরে গেল, শুধু রইল একটু স্নিগ্ধ প্রীতি।

শিখার উত্তাপ কমে যেতেই কেমন যেন হিম হয়ে গেল বুক। বার্দ্ধক্য এল শরীরে। তবু ঐ কচি মেয়েটি যে তারই মহলে ঘুরে বেড়ায়, বয়সের অনুপাতে অনেক বেশী ধৈর্য নিয়ে তার সেবা করে, এই মধুর বিশ্বাসে ওয়াঙের স্নেহ তার দিকে যায়। কেমন একটা কোমল কারুণ্য হয় মেয়েটির প্রতি, আর দিনে দিনে সেই করুণা রূপান্তরিত হয়ে ওঠে বাৎসল্যে।

ওয়াঙ ভালবাসে, তাই পীয়ার ব্লসমও হতভাগী মেয়েটির প্রতি স্নেহময়ী হয়। এক দিন ওয়াঙ তার মনের কথা খুলে বলে। বহু দিন ধরে ওয়াঙ, মনে মনে তোলপাড় করত যে যেদিন সে মরবে ঐ হতভাগী মেয়েটির কি হবে। তার প্রতি এ সংসারের কারুরই কোন প্রীতি নেই, সে খেয়ে পরে বেঁচে আছে অথবা না খেয়ে মরে গেল, সেদিকে এ-বাড়ীর কারুরই ভ্রূক্ষেপ নেই। ওয়াঙ তাই দোকান থেকে এক রকম শ্বেত রঙের বিষের গুঁড়ো কিনে এনে রেখেছিল। স্থির করেছিল যে, যখন নিজের মৃত্যু আসন্ন বোধ হবে, ওয়াঙ হতভাগীকে সেই বিস খাইয়ে দেবে। তবু নিজের মৃত্যুর চেয়ে সে আশঙ্কা তার কাছে ছিল ঢের বেশী বেদনাদায়ক। তাই এখন পীয়ার ব্লসমের আচরণে ওয়াঙ গভীর সন্তোষ বোধ করলে মনে।

এক দিন। ব্লসমকে ডেকে ওয়াঙ বললে—'আমি মরে গেলে ঐ হতভাগীকে তুমি তুলে নেবে হাতে। ও অনেক দিন বাঁচবে, কেন না, ওর ত কোন ভাবনা নেই মনে, এমন কোন সংসারের জ্বালা নেই যা ওকে তিলে তিলে দগ্ধ করতে পারে। আমি ভালো ভাবেই জানি যে আমি চোখ বুজলে কেউ ওকে যত্ন করবে না, খাওয়াবে না, শীতে বর্ষায় ওকে আশ্রয় দেবে না। হয়ত পথে পথে ঘুরে বেড়াবে মেয়েটা, হয়ত—তবু ঐ হতভাগী ত এত দিন অবধি তার মা-বাপের সব স্নেহ-যত্ন ভোগ করেছে। তাই তোমাকে বলে রাখছি, আমি মরে গেলে তুমি ঐ কাগজে মোড়া গুঁড়ো ওর ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। ঐ খেয়ে মেয়ে আমার কাছেই চলে আসবে, আমারও শান্তি হবে।'

ওয়াঙের হাতের মোড়কটি দেখে ভয়ে সরে এল দাসী মেয়েটি। নরম গলায় বললে—'একটা পোকা মারতে পারি না আমি, কি করে একটা জ্যান্ত মানুষের প্রাণ নেবো? তা আমি কিছুতেই পারব না। আপনি এক দিন আমায় এত দয়া করেছেন, যত দয়া জীবনে আমি পাইনি, তারই বিনিময়ে ওকে আমি তুলে নোবো।'

এ কথা শুনে আনন্দে ওয়াঙের কাঁদতে ইচ্ছা হোল। এত নিশ্চিন্ত এর আগে তাকে কেউ করেনি। মেয়েটিকে বুকে চেপে ধরতে ইচ্ছা হোল ওয়াঙের। সে শুধু বললে—'তাই হোক—তাই হোক। তোমার মত বিশ্বাস আর কাউকে করি না। আমার ছেলের বৌরা ত দিবারাত্রি বাচ্চা-কাচ্চা আর ঝগড়া নিয়ে মেতে আছে—আর আমার ছেলেরা হোল পুরুষ মানুষ, তাদের সময় কোথায় এ সব ভাবনা ভাববার। তবু বলে রাখছি, তুমি যখন মরবে, ওকে তুমি এই গুঁড়োটুকু খাইয়ে দিও—ও শান্তি পাবে।'

এ কথার অর্থ বুঝেই বুঝি মেয়েটি হাত বাড়িয়ে মোড়কটি হাতে নিলে। ওয়াঙ নিশ্চিন্ত হোল যে তার বিশ্বাসী একটি মানুষের হাতেই তোলা রইল তার হতভাগী মেয়ের ভবিষ্যৎ।

সেদিন থেকে বয়সের ভার আর জরা নিয়ে ওয়াঙ আপনার মধ্যে আপনি গুটিয়ে যেতে লাগল। শুধু তার দু'টি টান রইল বাইরে, একটি হোল পীয়ার ব্লসম আর একটি তার হতভাগী মেয়ে। কখনো কখনো তার মনের ভিতর অশান্তির ঝড় উঠত। পীয়ার ব্লসমকে ডেকে বলত ওয়াঙ—'বড্ড নিরিবিলি ঠেকে তোমার, না?'

কিন্তু ব্লসম জবাব দেয় কৃতজ্ঞ মৃদু কণ্ঠে—'তা হোক। নিরিবিলি আর নির্ভাবনা।'

'কিন্তু আমি যে বুড়ো হয়ে গেলাম—আমার আগুন সব ছাই হয়ে গেল।'

'তবু আপনি আমায় এত দয়া করেন। আর আমি কিছু চাই না।'

এক দিন এমনি জবাবে ওয়াঙের বড়ো কৌতূহল হোল। সে বললে—'আচ্ছা বলত আমায়, এই কচি বয়সেই এমন কি দেখলে তুমি যে পুরুষের সম্বন্ধে তোমার এমন আতঙ্ক হোল?'

এ কথার জবাব শোনার জন্য চোখ তুলতেই—ওয়াঙ দেখতে পেল সেই দু'টি কিশোরী চোখে এক আশ্চর্য ভয়। দু'টি হাতে মুখ ঢেকে মেয়েটি ফিসফিস করে বললে—'আপনাকে ছাড়া সব পুরুষকেই আমি ঘেন্না করি। নিজের বাপ যে আমাকে বেচে দিয়েছিল তাকে অবধি ঘেন্না করি। পুরুষ মানুষরা কত খারাপ আমি সব জানি, আর জানি বলেই এত ঘেন্না আমার।'

অবাক হয়ে ওয়াঙ বলে—'কিন্তু আমার সংসারে তুমি ত আরামে দিন কাটিয়েছ।'

মেয়েটি তবু বললে—'ছোকরাদের আমার ভাল লাগে না—তাদের ওপরেও আমার ঘেন্না।'

ওয়াঙ বসে বসে ভাবতে লাগল নিজের মনে। হয়ত কমলিনী নিজের জীবনের কাহিনী বলে এই কচি মেয়েটির মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে, হয়ত কোকিলার উদাহরণ তার আতঙ্কের কারণ, হয়ত এমন কোন গোপন কিছু ঘটেছে ইতিমধ্যেই তার জীবনে। কিংবা হয়ত অন্য কিছু।

তবু মন থেকে এ সব এলোমেলো চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিল ওয়াঙ। সে শান্তি চায় বাকী জীবনটুকুতে, দিন কাটাতে চায় এদের দু'টির কাছে কাছে।

এমনি করে দিন যায়, বর্ষ যায়, বয়সের ভারে ওয়াঙ স্থবির হয়ে পড়ে। তার বাপ যেমন ভাবে বসে থাকতেন, তেমনি ভাবেই ওয়াঙ রোদে বসে ঝিমোয় আর ভাবে তার দিন ফুরিয়ে এল। সুখী হয়েছে সে জীবনে।

কখনো কখনো হয়ত অন্য মহলে যায় ওয়াঙ। ক্বচিৎ কখনো কমলিনীর মহলে। কিন্তু এই কচি দাসীটির কথা নিয়ে আলোচনা হয় না কখনো। আর কমলিনী নিজেও বুড়ী হয়ে পড়েছে, এখন খাবার, মদ আর রুপো নিয়েই সে খুসী হয়ে থাকে। আজকাল কোকিলা আর কমলিনী আগের মত দাসী আর কর্ত্রীর মত নেই।

এখন দু'জনে একসঙ্গে খাওয়া-বসা হয়। সখীর মত দুজনে নীচু গলায় বিগত দিনের এটা-ওটা নিয়ে গল্প করে আর খায় দায় ঘুমোয়।

ছেলেদের মহলে যেদিন যায় ওয়াঙ, ছেলেরা বাপকে সেবা-যত্ন করে, চা দেয়। ওয়াঙ বলে, ছোট নাতিটিকে আমার কাছে আনো ত। মনে থাকে না তার, তাই একশ' বার করে জিজ্ঞাসা করে—'ক'টি নাতি-নাতনী হোল আমার?'

'আটটি নাতি আর এগারোটি নাতনী সবশুদ্ধ।'

খক্-খক্ করে হেসে ওয়াঙ বলে—'প্রতি বছরে দু'টি করে বাড়লেই, কটি হোল ঠিক গুণে পাব, না?'

নাতি-নাতনিরা দাদুর দিকে চেয়ে দেখে—তাকে ঘিরে দাঁড়ায়। আর ওয়াঙ বিড়-বিড় করে আপন মনে—'ওটিকে দেখতে হয়েছে ঠিক আমার বুড়ো দাদুর মতো। ওটি হয়েছে লিউর ধাঁচে। আর এটির আদল হোল ঠিক আমার।'

বলে ওয়াঙ, 'তোমরা পড়তে যাও ত?'

সমস্বরে বলে সবাই, 'হ্যাঁ, দাদু।'

'চতুর্তন্ত্র পড়ছ ত?'

বুড়ো দাদুর কথায় নাতিদের মুখে বিদ্রূপের হাসি আসে। তারা বলে, 'না দাদু, বিপ্লবের পর থেকে ও সব আর কেউ পড়ে না।'

এ কথায় ওয়াঙ বলে—'তা ঠিক। বিপ্লবের কথা আমিও শুনেছি, কিন্তু আমার সময় ছিল কম। মাটী-জমি নিয়েই এত ব্যস্ত ছিলাম আমি।'

নাতিরা এ কথায় উপহাসের হাসি হাসে। বোঝে ওয়াঙ যে এদের মাঝখানেও বাইরের অতিথি মাত্র।

আর সে যায় না ছেলেদের মহলে। শুধু মাঝে মাঝে কোকিলার কাছে সে খবর নেয়—'বৌমারা কেমন আছে? তাদের বেশ মিল হয়েছে ত?'

কোকিলা মাটীতে থুতু ফেলে জবাব দেয়, 'ওদের কথা বলছ? মুখোমুখী দু'টো বেড়ালের মত ওরা ওৎ পেতে বসে থাকে দিন-রাত্তির। আর তোমার বড় ছেলের এমন অশান্তি সে আর কি বলব। বড় বৌ দিন-রাত্তির বাপের বাড়ীর বড়ো বড়ো কথা শোনায় তাকে। শুনছি, বড় ছেলে না কি আবার ঘরে নতুন মেয়েমানুষ আনবে! আজকাল চায়ের দোকানে ঘন ঘন যাতায়াত করছে।'

আবার কোকিলাকে সে বলে, 'ছোট ছেলেটি এত দিন কোথায় গিয়ে রইল, সে খবর জান?'

'চিঠি-পত্তর সে ছেলে তোমার কখনো দেয় না। তবে দক্ষিণ দেশ থেকে লোকের মুখে শুনেছি, সে না কি সৈন্যদলের মস্ত চাঁই হয়েছে। কি সব বিপ্লবের কাজে আছে। আমি বাপু ও-সব বুঝি না, আমার মনে হয়, বোধ হয় ও কিছু কাজ-কারবার করছে।'

কিন্তু ওয়াঙ এখন এমন বুড়ো হয়ে পড়েছে যে কোন কিছুতেই তার মন স্থির হয়ে থাকতে পারে না। সন্ধ্যা হচ্ছে, হাওয়া বইছে শুকনো ঠাণ্ডা। এখন গরম এক কাপ চায়ের কথাই ত মনে হচ্ছে। আর তা ছাড়া ভালো চা আর ভালো খাবার, এই দু' চিন্তাতেই তার বৃদ্ধ-মন প্রখর হয়ে থাকে বেশী সময়। শুধু রাত্রে—যখন শীতে শরীর জমে আসে আর পীয়ার ব্লসমের তরুণ উষ্ণ দেহ তার শরীরের সঙ্গে ঘেঁসে থাকে, তখন ওয়াঙ কেমন একটা আনন্দ পায়, যা তার বয়সকে তপ্ততা দিয়ে ঘিরে রাখে।

বসন্ত ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে। প্রচ্ছন্ন থেকে প্রত্যক্ষ বোধ হয় মনে। সব কামনা মন থেকে ঝরে যায় শুধু যেতে চায় না মাটীর প্রতি তার অনুরাগ। আজ সে জমি থেকে সরে এসেছে, বাসা বেঁধেছে সহরে। চাষা ছিল, হয়েছে সহুরে ধনী। কিন্তু মাটীতেই সত্তার মূল। মাসে মাসে ঋতুচক্র ঘুরে যায়, কিন্তু বসন্ত মাস এলেই মাটীর ডাক শুনতে পায় ওয়াঙ। জমিতে না গিয়ে থাকতে পারে না সে। এখন নিজে হাতে লাঙল ধরতে পারে না বটে, কিন্তু অন্য কেউ যে মাটী চষছে এ দেখার আনন্দটুকু থেকে সে বঞ্চিত হতে চায় না। কখনো কখনো চাকর তার বিছানা বয়ে নিয়ে যায়। যে মাটীর ঘরে এক দিন সে শুয়েছে, যেখানে তার সংসার ভরে উঠেছে, যে বিছানায় শুয়ে ওলান তার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে, সেইখানে শুয়ে থাকে সে। খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায়, মাঠে এসে হয়ত একটি উইলো শাখা কিংবা একটা পীচ-মঞ্জরী তুলে নেয় ওয়াঙ, সারা দিন আর হাতছাড়া করে না তাদের।

এক দিন শেষ বসন্তে মাঠে ঘুরতে ঘুরতে ওয়াঙ সেখানে এসে পড়ে—যেখানে নীচু পাহাড়ের নীচে ঘেরা জমিতে ঘুমিয়ে আছে তার একান্ত আপনার মানুষগুলি। লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপে ওয়াঙ। একে একে সবার কথা তার মনে পড়ে। তার মনে হয় যে, সহরের বাড়ীতে তার ছেলেদের চেয়েও এই মৃত মানুষগুলি তার বেশী আপনার—বেশী কাছের। মন তার অতীত দিনগুলিতে বেঁচে ওঠে। তার মেজো মেয়ে, যার খোঁজ অনেক দিন সে পায়নি, তাকেও কত কাছে পায় সে। ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটি, পাতলা রাঙা ঠোঁটে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা বাড়ীতে; তার মতই একান্ত কাছে মনে হয় এই চির-ঘুমন্ত মানুষগুলিকে। আপন মনে বলে ওয়াঙ—'এবার আমার পালা।'

ঘেরা জমিটুকু ভালো করে দেখলে ওয়াঙ। মনে মনে ভাবলে, তার বাবার সমাধির নীচে কাকার কাছে, চীং-এর ঠিক ওপরে, ওলানের থেকে বেশী দূরে নয়, সে শেষ ঘুম ঘুমুবে। সেই মাটীটুকুর দিকে দেখতে দেখতে সে যেন আপনাকে সেইখানে দেখলে, দেখলে মাটীর কোলে আবার ফিরে গেছে সে চিরদিনের মতো।

'এইবার আমার কফিনের ব্যবস্থা করতে হবে।'

মনে যত দুঃখই হোক, এই চিন্তা আঁকড়ে ধরে রইল ওয়াঙ। সহরে ফিরেই বড় ছেলেকে সে ডেকে পাঠালে।

'তোমায় একটা কথা বলব।'

'বলুন। আমি ত রয়েছি।'

কিন্তু বলার সময় মুখ দিয়ে তার কথা বেরুল না। যে দুঃখের কথা সে মনের ভিতর আঁকড়ে ধরে ছিল, তা কখন নিঃশব্দে বিস্মরণ হয়ে গেছে, তা ভেবে দু'চোখ তার আকুল অশ্রুতে ভরে গেল। পীয়ার ব্লসমকে ডেকে বললে ওয়াঙ—'আমি কি বলব বলে ডেকেছিলাম ওকে?'

মেয়েটি মৃদু কণ্ঠে বললে—'কোথায় ছিলেন সারা দিন?'

মেয়েটির মুখের দিকে নিশ্চল দৃষ্টি রেখে ওয়াঙ বললে—'গিয়েছিলাম জমিতে।'

'কোন্ জমিতে?'

তখন ওয়াঙের মনে পড়ল। অশ্রুভরা চোখে হেসে উঠল ওয়াঙ —'এবার মনে পড়েছে। আমার সমাধির জমি আমি ঠিক করেছি। এবার আমার কফিন দেখে তবে আমি মরতে পারব।'

বাপের কথায় ছেলে কর্ত্তব্যের ভঙ্গিমায় বললে, 'অমন কথা আপনি বলবেন না বাবা। অবশ্য আপনার কথা আমি অমান্য করব না।'

ছেলে সুগন্ধ ওক কাঠের একটা অলঙ্কার দেওয়া কফিন আনলে। সে কাঠ লোহার চেয়ে শক্ত, মানুষের অস্থির চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী। দেখে আশ্বস্ত বোধ করল ওয়াঙ।

নিজের ঘরে কফিনটা রাখলে ওয়াঙ। প্রতিদিন সেটিকে দেখতে লাগল।

তার পর এক দিন আর এক চিন্তা তার মাথায় এলো। ওয়াঙ বললে—'এ কফিন নিয়ে যেতে হবে আমাদের মাটীর বাসায়। জীবনের বাকী ক'টা দিন আমি সেখানেই কাটাব।'

ছেলেরা যখন দেখলে যে বাপের মন তারা ফেরাতে পারবে না, তখন বাপের কথামতই কাজ করলে তারা। কিছু দাস-দাসী নিয়ে ওয়াঙ পুরোনো বাসায় ফিরে গেল। তার সঙ্গে গেল পীয়ার ব্লসম আর সেই হতভাগী মেয়েটি। সেদিন থেকে তার পুরোনো বাসায় বসবাস সুরু করলে ওয়াঙ। যে সংসার সে প্রতিষ্ঠা করেছে, তাদের হাতেই সে তুলে দিলে তার সহরের প্রাসাদ।

বসন্ত বিদায় নিল। গ্রীষ্মের দিনে ফসল উঠল খামারে। শীত হোল আসন্ন। তার বাবা যেখানে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে রোদে বসে থাকতেন, ওয়াঙ সেইখানে বসেই রোদ পোহায়। খাওয়া-পরা আর জমি ছাড়া আজকাল আর কোন চিন্তাই নেই তার। আর তা ছাড়া জমির সম্বন্ধে সে আর ফসল কি বীজ বোনার কথা ভাবে না। একটুখানি মাটী হাতে তুলে নিয়ে তালুতে ধরে থাকে ওয়াঙ। এক আশ্চর্য প্রাণ-স্পন্দন সে অনুভব করতে পারে আপন আঙুলের স্পর্শে। যে স্পন্দন-মৃত্তিকার প্রাণের সঙ্কেত। সে মাটী হাতে নিয়ে কেমন নিশ্চিন্ত শান্তি অনুভব করে ওয়াঙ। তার মন পড়ে থাকে সেই জমিটুকুতে, যেখানে স্নেহময়ী মাটী তার প্রতীক্ষায় আছে।

ছেলেরা যেদিন না আসে ওয়াঙ পীয়ার ব্লসমের কাছে অনুযোগ করে বলে—'ওদের এত কি কাজ, বলো ত ?'

পীয়ার ব্লসম হয়ত বলে—'বড় ছেলে সহরের বড়লোকদের সঙ্গে অফিসার হয়েছে। আর আপনার মেজ ছেলে নিজে একটা বড়ো ধানের দোকান করেছে।'

কিন্তু এ সব কথা ওয়াঙ বুঝতে পারে না। বুঝলেও জমির দিকে তাকালেই তার সব বিস্মরণ হয়ে যায়।

এক দিন সব যেন বেশী পরিষ্কার মনে হোল ওয়াঙের। ছেলেরা সেদিন এসেছিল। বাপকে প্রণাম করে তারা দুই ভাই বাড়ীর সংলগ্ন জমির ওপর বেড়াতে লাগল। বাপ যে নিঃশব্দে তাদের পিছনে পিছনে আসছেন তারা তা জানতেও পারল না। নরম মাটীর উপর বাপের লাঠির শব্দও তাদের কানে গেল না। মেজো ছেলে বলছে শুনতে পেল ওয়াঙ—

'এই জমিটা আমরা বেচে দু'জনে টাকাটা ভাগ করে নেবো। তা ছাড়া এখন রেল কাছে এসেছে, আমার পক্ষে বাইরে চাল রপ্তানী করা সহজ হবে, আমি—'

কিন্তু বুড়ো বাপের কানে একটি মাত্র কথা গেল—'জমি বেচব।' রাগ চেপে রাখতে পারলে না ওয়াঙ, ভাঙা-গলায় চীৎকার করে উঠল সে—'হারামজাদা গেঁতো ছেলে, জমি বেচবে ?'

গলা বুজে এল ওয়াঙের। ছেলেরা না ধরলে হয়ত মাটীতে টলে পড়ে যেত সে। ছেলেরা ধরতেই আকুল কান্না ঠেলে এল বৃদ্ধের দু'চোখে।

ছেলেরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বার বার বলতে লাগল—'না, না— জমি আমরা বেচব না—কখনো না—কখনো না—।'

কান্না-ভাঙা কণ্ঠে বললে ওয়াঙ—'জমি যেদিন বেচবি সেদিন সংসারও তোদের ভেঙে পড়তে শুরু হবে। এ মাটী থেকে আমরা জন্মেছি— এই মাটীতেই আমাদের শেষ। এই মাটী আঁকড়ে ধরে থাকবি, তোদের কেউ মারতে পারবে না, কেউ কেড়ে নিতে পারবে না—'

নীচু হয়ে এক তাল মাটী কুড়িয়ে নিয়ে ওয়াঙ আবার বললে— 'এ জমি বেচলে, সব শেষ হয়ে যাবে।'

দু' ছেলে দু' পাশে তাকে ধরে রইল। আর ওয়াঙ ধরে রইল দৃঢ় মুঠিতে সেই উষ্ণ ঝুরো মাটী। আর দুই ভাই একশ' বার করে বাপকে বলতে লাগল, 'তুমি ভেবো না বাবা—ভেবো না। এ জমি আমরা বেচব না।'

কিন্তু বৃদ্ধ বাপের মাথার উপর দিয়ে দুই ভাইয়ের চোখ নিঃশব্দ হাসিতে মুখর হয়ে উঠতে লাগল।

শেষ

একটি কবিতা

অমিতাভ চৌধুরী

যাহারে দেখিলে পরে প্রাণ শুধু হাসে
মন উড়ুউড়ু
সকলি মধুর লাগে যখনি সে আসে
নাই লঘুগুরু।

আলাপ করিতে গেলে মরো তবু ত্রাসে
বুক দুরু দুরু
তখনি বুঝিবে সখা কহি তব পাশে
প্রেম হলো সুরু।

ছোটদের অবাধ্যতা

দীপিকা পাল

ছোটদের অবাধ্যতা মায়েদের কাছে সব চেয়ে বিরক্তিকর ব্যাপার। শিশুরা যদি মায়েদের কথা না শুনে, গুরুজনদের কথামত না চলে, তবে মায়েরা তাদের ঠিক মত মানুষ করে তুলবেন কি করে? কিন্তু শিশুরা অবাধ্য হয় কেন? অবাধ্য হয়েই নিশ্চয় তারা জন্মগ্রহণ করে না। একটা কথা আমাদের সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে, শিশুরা কলের পুতুল নয়। আমরা যা বলব তারা তাই শুনবে, এইটা হলেই খুব ভাল হয়। কিন্তু তা কখনই হয় না এবং হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না-যে, শিশুরা ছোট হলেও তাদেরও একটা মন বলে জিনিস আছে। আমাদের মত তাদেরও ভাল লাগা না-লাগা বোধ, ইচ্ছা অনিচ্ছা সবই আছে। আমাদের নিজেদের ইচ্ছানুসারে তাদের মন চালিত হতে পারে না। আমরা যখন যেটা চাই না চাই, শিশুরাও যে ঠিক তখন সেইটাই চাইবে এমন ধারণা করা খুবই ভুল। আর সব ক্ষেত্রেই শিশুর ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকে তার আদর-আবদার বলে উড়িয়েও দেওয়া যায় না। সুতরাং জোর করে আমাদের মতটা তাদের ঘাড়ে চাপালেই চলবে না, তাদের কথাটাও আমাদের একটু বিবেচনা করে দেখতে হবে।

শিশু যখন খেলায় অতিরিক্ত রকম মগ্ন, তখন তাকে পড়বার সময় হয়েছে বলে ডাকলে সে যদি এখন পড়ব না বলে আপত্তি তুলে, তাহলে এই অবাধ্যতাকে তার একটা মস্ত স্পর্দ্ধা বলে মনে করে লওয়ার কোন কারণ নেই, কিংবা এ বিষয়ে তখনি তাকে বাধ্য করে তোলারও কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই এই কারণে যে, জোর খাটিয়ে এ সব ক্ষেত্রে কোন ফল পাওয়া যায় না। ছোটদের কাছ থেকে মিষ্ট কথা ও মধুর ব্যবহারের দ্বারা অতি কৌশলে কাজ আদায় করতে হয়, জোর করে বা পীড়ন করে তাদের দিয়ে কোন কিছুই করানো যায় না, বরং তাতে তারা আরও অবাধ্য হয়ে উঠে। পীড়নের ভয়ে কিংবা বকুনির ভয়ে যদিও সে খেলা ছেড়ে উঠে আসে, কিন্তু মন তার পড়ায় কিছুতেই বসতে চাইবে না—অন্যমনস্ক সে হবেই। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কিছুটা তার খুশী মত চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তার খেলা-পর্ব্ব শেষ হলে তার পর তাকে পড়াতে বসানই ভাল।

আর একটা জিনিষ প্রায়ই দেখা যায় যে, ছোটদের ঠিক যে কাজটি করতে নিষেধ করা হয়, চোখের আড়াল হতে না হতেই ঠিক সেইটাই তারা করে বসে। শিশুর এই ধরণের অপরাধ বা অবাধ্যতার মূলে থাকে শিশুর অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি। সব কিছু জানবার ও বুঝবার অদম্য প্রবল ইচ্ছা যে শিশু মনে থাকে তা অনেকেই জানেন। এমন কোন কাজ যদি তাদের করতে নিষেধ করা হয়, তা হলে সে সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল ও ঔৎসুক্য আরও বৃদ্ধি পায়। আর সেই কৌতূহল-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হয়েই তারা ঠিক সেই কাজটাই করে ফেলে। তখন সেটা যে করা উচিত নয় সে জ্ঞান তাদের থাকে না। তাই কোন বিষয় থেকে তাদের নিবৃত্ত করতে হলে কেবল 'এটা করো না', 'ওটা করো না' বললেই তাদের তা থেকে নিবৃত্ত করা যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে কেন করবে না সেটাও তাদের একটু বুঝিয়ে দিতে হবে। তাদের অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তির কিছুটা সন্তুষ্টিবিধান করতে হবে।

অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার প্রবৃত্তি শিশু-মনে বেশ প্রবল। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার ও সর্বসমক্ষে নিজেকে প্রচার ও জাহির করার ইচ্ছা (exhibitionism) মানব-মনে চিরন্তন এবং ছোটদের মনেও এর প্রভাব কিছু কম নয়। সেই কারণেও অনেক সময় ছোটরা নিষেধ সত্ত্বেও অনেক কাজ করে থাকে। বরং তাকে যত নিষেধ করা হয় ততই সে বাড়াবাড়ি করে তোলে। এ সব ক্ষেত্রে অভিভাবকদের উচিত, সব সময়ে শিশুদের ভাল কাজে ভাল বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া ও মন্দ বিষয়ে কোন রকম উৎসাহ না দিয়ে, প্রশ্রয় না দিয়ে অবহেলার ভাব দেখিয়ে তাদের নিরুৎসাহ করা।

জিগীষা-প্রবৃত্তি অর্থে বুঝায় জয় করার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি। অনেক সময় দেখা যায়, শিশুদের ক্ষুধা পেলেও তারা খাবার সময় মায়েদের বড়ই বিরক্ত করে। কিছুতেই তারা খেতে চায় না—যত কান্না, যত গোলমাল খাবার সময়। আর এ-ও দেখা যায়, যতই তাদের জোর করে খাওয়াতে যাওয়া যায়, তারা ততই অবাধ্যতা করতে থাকে। তাদের খাওয়ায় অনিচ্ছা ততই যেন বেড়ে যায়। মায়েরা তাদের যতই ভোলাতে থাকেন, সাধাসাধি করতে থাকেন ও তোষামোদ করতে থাকেন, মনে মনে তারা ততই বেশ আত্মতৃপ্তি বোধ করে। একটা জয়ের আনন্দ, বড়দের উপর কর্ত্তৃত্ব করা ও প্রভুত্ব করার আনন্দ তারা উপভোগ করে। আর খেয়ে যেন তারা বাড়ীর সকলকে বাধিত করল এ রকম একটা ভাবও তাদের মনে এসে যায়। খাওয়াটা যে তাদের নিজেদেরই একটা প্রয়োজন এটা তাদের বুঝতে দিতে হবে। বেশী সাধাসাধি করবার দরকার কি? শেষ পর্য্যন্ত 'আর একবার সাধিলেই খাইব' ছাড়া পথ থাকবে না।

আবার অনেক সময় শিশুরা অবাধ্যতা করে যখন তারা দেখে, অভিভাবকদের শাসন অর্থহীন বা তার মধ্যে সত্য কিছু নেই। তাঁরা কথায় কথায় ছোটদের বলেন, এটা করলে 'মারব', ওটা করলে 'পিটব'। কিন্তু সেটা করার পরেও হয়ত তারা বেশ মার ও পিটুনী থেকে রেহাই পেয়ে যায়। এতে তাদের সাহস বেড়ে যায়—নিষিদ্ধ কাজকে আর তত অন্যায় বলে মনে করে না এবং তাই অনবরতই অভিভাবকদের অবাধ্যতা করে বসে। মিথ্যা শাসন করা, মিথ্যা ভয় দেখানো খুবই অন্যায়। যদি বলা হয়, এটা করলে মারব তাহলে সেটা করবার পর তাকে অবশ্যই মারা উচিত। আর নয়ত 'মারব'—এ কথা বলাই উচিত নয়।

যত দিন ছেলেমেয়েরা ছোট থাকে, তত দিন তারা সব কিছুই প্রবৃত্তির (instinct) বশে করে থাকে। বিচার-বুদ্ধি ও বিবেচনার স্থান সেখানে নেই বললেও চলে। সুতরাং তাদের সকল কাজকে সহানুভূতির মন দিয়ে দেখতে হবে এবং তাদের আচরণের সকল দোষ-ত্রুটি মধুর কথায় বুঝিয়ে দিতে হবে। তাদের অবুঝ ও অপরিপক্ক মনে হঠাৎ একটা আঘাত দেওয়া (যেমন রূঢ় ভাবে বকা ঝকা

কিংবা কিছু না বুঝেই অমনি মার-ধর আরম্ভ করা) অন্যায় তো বটেই, এরূপ করলে বরং ছোটদের মন আরও বিদ্রোহী হয়ে উঠে !

সর্বশেষে যেটা সব চেয়ে প্রয়োজনীয় সেটি হচ্ছে শিশুদের বাধ্যের মধ্যে আনতে হলে আমাদের সর্বাগ্রে তাদের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করতে হবে। আর তাদের মন জয় করতে হলে তাদের সঙ্গে সর্বদাই মধুর ও সহৃদয় ব্যবহার করতে হবে।

স্বাধীনতা দিবস

শ্রীমতী শান্তিলতা দেবী

বাজাও আজিকে স্বাধীন ভারতে, বিজয়-শঙ্খ রমণীগণ,
স্বাধীনা ভারত-জননীকে মোদের বরণ করিয়া কর আহ্বান ॥

ভারতবাসীর স্বাধীন হিয়া ভরি,
কনক-মন্দির আলোকিত করি ;—
স্বাধীন রত্ন-সিংহাসনোপরি, করেছেন রাণী উপবেশন।
অরুণ বরণ জননী-চরণে নতি করি কর অরঘ দান ॥

কত নর-নারী দানিয়া রক্ত, ভারত-মায়েরে করেছে মুক্ত,
এস গো সকল মাতৃভক্ত, উড়ায়ে বিজয় মহা নিশান।
(আজ) বন্দনা কর, অর্চ্চনা কর, কুসুমাঞ্জলি করিয়া দান।
মুখরিত করি দিগ্-দিগন্ত, গাহ সবে মিলি বিজয় গান ॥

গগনে পুরিছে বিজয়-গীতি, টুটেছে হিয়ার বন্ধন-ভীতি,
(আজ) মুক্ত ভারতে স্বাধীন নীতি কর সবে অনুষ্ঠান।
(আজ) স্বাধীনানন্দে মিলন ছন্দে, দুন্দুভি নাদে নাচিছে প্রাণ,
ঐ যে স্বাধীনা ভারত-জননী সিংহাসনোপরি অধিষ্ঠান ॥

চল্লিশ কোটি কণ্ঠছন্দে, উঠিছে গীতি বিজয়ানন্দে,
আকাশ-বাতাস মৃদুল-মন্দে, স্বাধীন গম্ভীরে ধরেছে তান,
স্বাধীনোৎসবে, স্বাধীন মন্ত্রে, ধর নর-নারী খর কৃপাণ,
চক্রধারী পার্থ-সারথির এই ত স্বাধীন অভিযান ॥
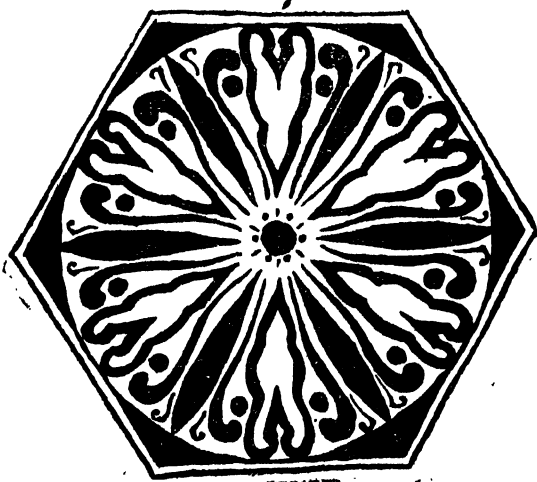
—কাজলী চট্টোপাধ্যায়

নিভৃত নির্জ্জন চারি ধার

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রমীলা রায়চৌধুরী

তিন

সেই দিনের পরে, অনেক দিন চলে গিয়েছে। ভবানীপ্রসাদ নিজে ডাক্তার বলেই শারীরিক অসুস্থতার কথা জানতে পেরেছিলেন। অসুস্থতার দোহাই দিয়ে রাত্রে বের হওয়া তিনি এখন একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন ; দিনেও মাত্র ৫।৬ ঘণ্টার জন্য বের হন।

ডাক্তার ভবানীপ্রসাদ আজকাল তাঁর বিশ্রামের অখণ্ড অবসরে নিজের ফেলে-আসা দিনগুলির চিন্তাতেই তন্ময় হয়ে থাকেন। ছোটবেলা ভাগাভাগি করে মানুষ হওয়া, একটি ঘরে ভাগাভাগি করে পড়া-শোনা করা, পরীক্ষায় পাস করা, একান্ত গোপন ইচ্ছার বশবর্ত্তী হয়ে ডাক্তারী পড়া, সকলের মতে এবং তাঁর নিজের অমতে বিবাহ, বধূ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন থাকা, জিদের বশে বিলাত যাওয়া, চামেলীর সাহায্য এবং তার পরের পরের সব ঘটনাগুলি ছায়াচিত্রের মত মনের মাঝে যাওয়া-আসা করে। এর সঙ্গেই আর একটি অতি প্রয়োজনীয় কথা এসে পড়ে—সেটি সুরভির বিয়ে। শরীরের অবস্থা দিন-দিন যেমন খারাপ হচ্ছে, তাতে তাঁর যদি হঠাৎ কিছু হয়ে যায়, তবে তাঁর অত সাধের সুরভি সংসারের আবর্ত্তে পড়ে কোথায় তলিয়ে যাবে ! পৃথিবী থেকে যাবার আগে তাকে পাত্রস্থা করা দরকার, না হলে শুধু স্নেহ-মমতায় যে লতিকাটিকে পুষ্ট করে তুলেছেন, উপযুক্ত সহকারের আশ্রয় না পেলে সে শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেও পারে। আরামের শয্যা তাঁর বিষের মত লাগে ; ভেবে ভেবে মনের মত পাত্র তিনি কিছুতেই বের করতে পারেন না।

দিন-দুই পরে ; আবার সেই আকাশ ঘিরে মেঘের ঘটা—যে "তপনহীন ঘন তমসায়" আজীবন মনে রাখা মনের কথা অক্লেশেই বলে ফেলা যায়, সেই বাদলায় ভিজে রমেন আবার ভবানীপ্রসাদের বাড়ী এলো।

বর্ষার জলো হাওয়ায় ভবানীপ্রসাদ কিছু দিন থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। রমেন এসেই তার বর্ষাতিটি খুলে রেখে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলো, "আজ কেমন আছেন স্যর ?"

মৃদু হেসে ভবানী বললেন, "ভাল বিশেষ নয়। আজ তোমাকে আমার কয়েকটি কথা বলব, দেরী হলে তোমার অসুবিধে হবে না তো ?"

কুণ্ঠিত হয়ে রমেন বললো, "আপনার শরীর অসুস্থ, এ সময়ে উত্তেজক কোন কথা না হওয়াই ভাল।"

"তা হলে আরে এ জন্মে হবে না। আমি ডাক্তার, শরীরের অবস্থা বুঝি, যে কোন সময়েই এর ক্রিয়া হয়তো বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তা বলে এখুনি ভয়ের কিছু নেই। তুমি বসো।"

রমেন অগত্যা বসে পড়লো। ভবানী সংক্ষেপে তাঁর অতীত জীবনের কথা বলে চললেন। কথা শেষ করলেন এই বলে যে, কন্যা সুরভির ভবিষ্যৎ ভাবনাই এখন তাঁর প্রবল হয়ে উঠেছে—তাঁর অভাবে কে তাকে দেখবে।

বাইরের ঝিপ্‌-ঝিপে বৃষ্টি, ঘন অন্ধকার, রোগীর ঘরের আবহাওয়া, সর্ব্বোপরি ভবানীপ্রসাদের অসহায় কণ্ঠস্বর রমেনকে গভীর আলোড়ন দিয়ে গেল। সে খুব মৃদু স্বরে বললে, "আপনি সুরভি দেবীর বিয়ে দিয়ে ওঁর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত এবং আপনার এক জন নিজের লোক পেতে পারেন তো ?"

"হ্যাঁ, তা তো পারিই বাবা ! ক'দিন ধরে এই কথাই আমার কেবল মনে হচ্ছে, কিন্তু তুমিই বলো তো আমি কি যা'কে-তা'কে আমার সুরভি মাকে বিলিয়ে দিতে পারি ? এত দিন ধরে অনেককেই যাচাই করলাম, মনের মত কাউকে তো পেলাম না মনের মধ্যে !"

"এ আপনি কি কথা বলছেন স্যর ! আপনার ইচ্ছা প্রকাশ হলে কত ছেলে যে উপযাচক হয়েই আপনার কাছে আসবে।"

"হ্যাঁ, আসবে তা আমিও জানি ; কিন্তু তারা আসবে আমার টাকার লোভে। সে রকম পাত্র আমি তো চাই না যারা টাকাকেই 'বড়' করে দেখবে ?"

রমেন চিন্তাকুল হয়ে বসে রইলো—ভবানীপ্রসাদের মন তখন সুদূর অতীতে চলে গিয়েছে। কল্পনায় দেখলেন, মৃত্যুশয্যায় চামেলী ! বাঁচার কত সাধ মনে ! জীবনের তিক্ত দিনগুলি কেটে সবেমাত্র মধুর দিনের উদয় ! এমন সময়ে এলো 'পরপারের ডাক !' প্রাণ কি যেতে চায় ! সুখের সংসার, মায়ার মধুর বন্ধন ! সব ছিন্ন করে চামেলীকে নিয়ে গেল—দিয়ে গেল এতটুকু 'সুরভি !' যখনই মন অবসন্ন হয়ে পড়েছে—ছোট্ট সুরভির কথা মনে করে দ্বিগুণ উৎসাহে খেটে চলেছেন। তাঁর সুদৃঢ় পক্ষপুটের আশ্রয়ে যে সুরভি এত দিন ধরে বেড়ে উঠেছে, তাকে তিনি প্রাণ ধরে কার হাতে দেবেন ! সেই নির্ব্বাচনই প্রবল হয়ে উঠেছে। স্তিমিত চোখ ঝাপসা হয়ে এলো—দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলেন রমেন একই ভাবে বসে আছে।

সুরভির গলার স্বর ভেসে এলো। ঘরে ঢুকে সে বললে, "দেখ বাবা, শঙ্কর বাবুকে ধরে আনলাম। উনি বলছিলেন যে আজও যদি এখানে কবিতা পড়া হয় তো উনি থাকতে পারবেন না, ওঁর ভয়টা কিন্তু ভেঙে দেওয়া উচিত, রমেন বাবু ! আপনার সেদিনের প্রতিশ্রুতি মনে আছে ?"

ব্যথিত সুরে রমেন বললো, "আছে, কিন্তু আজ নয় ! স্যর অসুস্থ—সামান্য উত্তেজনাও ওঁর পক্ষে অনিষ্টকর।"

বিদ্রূপ-ভরা গলায় শঙ্কর বললো, "ওঃ আপনি যে এঁদের খুব হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেছেন দেখছি !"

শান্ত গলায় রমেন বললে, "ঠিক বলেছেন, হিতাকাঙ্ক্ষী তো বটেই, তা ছাড়া আপনি জানেন বোধ হয় যে, মেডিক্যাল কলেজ এক বছর পরেই আমাকে ডাক্তার বলে ছাড়পত্র দেবে, সেই ভাবী ডাক্তারের অভিজ্ঞতা নিয়েই বলছি, এ ঘরে উত্তেজনা মোটেই চলবে না।"

"অঃ ! আপনি হবু ডাক্তার ! তা তো জানতুম না।"

"জানেন বৈ কি ! শুধু স্বীকারেই আপনার আপত্তি।" বলে রমেন যাবার জন্ম উঠে দাঁড়ালো। ভবানীপ্রসাদ মৃদুস্বরে বললেন "কথা সব শেষ হলো না, কাল একবার এসো রমেন।"

"আসতে বিশেষ চেষ্টা করব"—বলে রমেন চলে গেল।

সুরভিকে ইঙ্গিতে শঙ্কর জিজ্ঞাসা করলো, "কি ব্যাপার ? এত কি private কথা আপনার বাবার এই 'লোফার'টার সঙ্গে ?'

মধুর হেসে সুরভি বললে, "বাবার কথা, বাবা-ই জানেন। জিজ্ঞাসা করুন না। আর একটা কথা আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি—আমাদেরই বাড়ীতে, আমাদের অতিথিকে অসম্মান করে উল্লেখ করার অধিকার আপনাকে কে দিলো ?"

"আপনাদের অতিথি ও আতিথেয়তা যে সীমা লঙ্ঘন করে যাচ্ছে তাই—তাই—জানেন ? জানেন আপনি আপনার এই পূজ্য অতিথিটির বাড়ীর খবর ?"

"ধন্যবাদ ! জানার আমার দরকার নেই। কিন্তু আপনিই বা ওঁর বাড়ীর এবং হাড়ীর খবর কি করে রাখলেন ? আপনাদের বাড়ী বুঝি একই দেশে ?"

খুব রেগে বেরিয়ে যেতে যেতে শঙ্কর বললো, "দেখুন সুরভি দেবি ! আপনি বিশ্বাস করবেন না হয় তো—অন্যায় আমি মোটে সহ্য করতে পারি নে। কিছু দিন থেকে দেখছি, আপনার ও আপনার বাবার গগনে একটি মাত্র নক্ষত্রের উদয় হয়ে সেটি ধ্রুবতারার মত অচল হয়ে রয়েছে। বিচারশূন্য হয়ে আপনারা তাঁকে পরামর্শ-সভায় ডেকে নিয়েছেন, হয়তো শেষ পর্য্যন্ত পরামর্শদাতা মন্ত্রী আপনাদের কাছে বরেণ্য হয়েই উঠবেন। একটা কথা আছে না 'Think before you leap.' খারাপ লাগলেও আমার কথাটা ভেবে দেখবেন।"

অকৃত্রিম হেসে সুরভি বললে, "নিশ্চয়ই দেখব। আপনি তো আমাদের বন্ধু, সময় থাকতে যে সাবধান করে দিচ্ছেন, এর দাম কি কম ? আমার মনে থাকবে।"

চোখ-মুখ লাল করে শঙ্কর রাস্তায় পড়লো।

চার

ভবানীপ্রসাদের অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকেই চললো। সুরভি নিজের মনকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলো, তার আশ্রয়-তরু কখন ভেঙে পড়ে ! এখন তাকে দেখলে আর আগের 'সুরভি' বলে বোঝা যায় না ! তার আচার-ব্যবহার, কথা-বার্ত্তা, চাল-চলনে গুরু দায়িত্বের ছাপ এসে পড়েছে। বাহিরের সঙ্গ বর্জ্জন করে সে একান্ত ভাবে পিতাকেই আশ্রয় করেছে—যেন সেই শুষ্কপ্রায় মহীরুহ থেকে যতক্ষণ পারা যায় রস সঞ্চয় করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা ! তার পর ? তার পরের কথা সে আর ভাবতে পারে না।

রোগ-শয্যায় পড়ে ভবানীপ্রসাদ নিজের ফেলে-আসা দিনগুলির কথা মনে করে কষ্ট পাচ্ছিলেন ! ভাবছিলেন, এমন করে যদি বাড়ীর সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হয়ে না যেতো, তবে সুরভির ভাবনা এমন করে ভাবতে হতো না। 'ভাল বরে' বিয়ে হওয়ার সংস্থান তিনি তো যথেষ্টই করেছেন। সুরভির বিয়েও হয়ে যেতে পারতো, শুধু তাঁর দুর্ব্বল মনকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়েই তা হয়ে ওঠেনি। আজ যদি হঠাৎ তাঁর ডাক এসে যায়, তবে সে কার কাছে থাকবে ?

মন যখন এমনি ধারা চিন্তায় আকুল হয়ে আছে, ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে রমেন ঢুকলো—"এসো" বলে আহ্বান করে ম্লান হেসে ভবানীপ্রসাদ বললেন, "তুমি বুঝি মরণের তীর পর্য্যন্ত ডাক্তারের হাত ধরে নিয়ে যাবে ? কিন্তু কিছুই হবে না।"

বাধা দিয়ে রমেন বললে, "আপনি অত কথা বলবেন না—দুর্ব্বল শরীর।"

ডাক্তার যথারীতি পরীক্ষা করে চলে গেলেন। তাঁকে গাড়ীতে তুলতে এসে রমেন শুনলে—"আর বেশী দিন নয়।"

চিন্তিত মুখে রোগীর ঘরে ঢুকতে গিয়ে সে দেখলো, সুরভি তাকে আহ্বান করছে। খুব মৃদু স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলো। "ডাক্তার কি বলে গেলেন—কোন আশাই কি নেই রমেন বাবু?"

নতমুখে রমেন চুপ করে রইলো—অধীর হয়ে সুরভি আবার জিজ্ঞাসা করলো, "বলুন আমাকে দ্বিধায় রাখবেন না। মাথার ওপর আমার বিপদ যে ঘনিয়ে এসেছে তা' তো বুঝছিই; তবুও ক্ষীণ কোন আশাই কি নেই?"

নতদৃষ্টি তুলে রমেন সান্ত্বনার সুরে বললো, "না সুরভি দেবি! কোন আশাই নেই—আমাদের ডাক্তারী শাস্ত্র এখানে 'ফেল'। আপনি ধৈর্য্য ধরুন—সাহস আনুন মনে।"

"আমি কি অধৈর্য্য হয়েছি, বলুন তো? আমার একমাত্র আশ্রয়-তরু ভেঙে পড়ছে দেখেও আমি স্থির হয়েই তো আছি।" —উদ্বেলিত কান্না চেপে সুরভি সামনের ঘরটায় ঢুকে গেল, রমেন ধীরে ধীরে ভবানীপ্রসাদের ঘরের উদ্দেশে চললো।

অতি ক্ষীণ শব্দটুকুও আজকাল তাঁর কান এড়ায় না। রমেন চেয়ারে বসতেই তিনি সে দিকে ফিরে বললেন, "এসো—আমি তোমারই অপেক্ষা করছি। ওষুধ-বিসুধ খাইয়ে এই জীর্ণ প্রাণটা আর ক'দিন বাঁচিয়ে রাখবে, বাবা? তার চেয়ে আমার সঙ্কল্পের কথাটা তোমাকে বলেই রাখি। কি জানি। কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে জীবন-দেবতা তাঁর পাওনা আদায় করে নিবেন। আর আমি তো সাগ্রহে সেই 'ডাকের' অপেক্ষা করছি—বিশ্বকবির সেই কবিতাটি আমাকে শুনিয়ো তো এক দিন 'মরণ রে! তুঁহু মম শ্যাম সমান!' হ্যাঁ, কি বলছিলাম, শোনো রমেন, আমি মরে গেলে আমার এই ল্যাবোরেটরী, আমার এই সব ডাক্তারী বই এবং আমার সুরভি মায়ের যে কী অবস্থা হবে, তাই ভেবে আমি মনে মোটে শান্তি পাচ্ছি না। সে আমার একেবারেই ভেসে যাবে। রমেন, আজ আমার মনে আর কোন দ্বিধা নেই, আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে আমাকে দায়মুক্ত করবার জন্যই ভগবান ছাত্ররূপে তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমার সুরভি মায়ের সকল ভার তোমার ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। বল তুমি আমাকে, তাকে গ্রহণ করে নিশ্চিন্ত করবে কি না?"

রমেন এই মৃত্যুপথযাত্রীর কাতরতায় বিচলিত হয়ে বললো, "শুনুন, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করে সুরভি মায়ের উপযুক্ত পাত্র খুঁজে দেব। আমাকে আপনি এই অনুজ্ঞা করবেন না—আমি আপনার এই স্নেহের একেবারেই অনুপযুক্ত।"

"রমেন, তুমি আমার ইচ্ছায় 'বাধা' হয়ো না—চর্ম্মচক্ষে না দেখলেও, কল্পনায় আমি তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখে শান্তি পাচ্ছি।"

"কিন্তু আপনি জানেন না, আমার বাড়ীর অবস্থা, আমার পড়ার খরচ চালাতে আমাকে কি struggle করতে হয়! এই অবস্থায় কি গুরু দায়িত্ব নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? 'মানুষ' না হয়ে?"

"মানুষ তুমি হবে-ই—আর struggle?" বলে তিনি মৃদু হাসলেন—"Struggle কার জীবনে নেই? আমাকেও জীবনে অনেক ঝাপটা পার হয়ে আসতে হয়েছে। আচ্ছা রমেন, তুমি কি কিছুই লক্ষ্য করো না, কিছুই বোঝো না যে, বুড়ি তোমার আবৃত্তি শুনতে, তোমার সাহচর্য্য পেতে, এক কথায় তোমার companionship কতটা পছন্দ করে? আমার তো সেটুকু বুঝতে কিছু বাকি নেই, তবুও তুমি কেন যে—" আবেগে ভবানীপ্রসাদের গলা ধরে এলো।

বাধা দিয়ে রমেন বললো, "দেখুন, আপনি এই সব আলোচনা আমার সঙ্গে করে, আমাকে যথেষ্ট সম্মানিত করেছেন। ধরুন, আপনার সব কথাগুলি যদি মেনে নেওয়াই যায়, তা হলেও আমার বর্ত্তমান অবস্থায় বিয়ে করা আমার পক্ষে একটু অগৌরব হয় না কি? স্ত্রী যিনি হবেন—যথার্থ শ্রদ্ধা কি তিনি আমাকে দিতে পারবেন? আমি চাল-চুলাহীন, এক রকম পরের দয়ায় লালিত; আপনার স্নেহপুষ্ট স্নিগ্ধ লতিকা যে আমার দারিদ্র্যের উত্তাপে একেবারে শুকিয়ে যাবে। তাই বলি কি, আপনি আমাকে এতটা সম্মানের গৌরব না দিয়ে বরং সুরভি দেবীর উপযুক্ত পাত্র খুঁজে বের করার, যাতে তাঁর সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ হয় তাই করার অনুমতি দিন্।" কথার শেষে রমেন বাইরে দৃষ্টি মেলে দেখলে যে, সুরভি সুদূর আকাশে তার চোখ দু'টি মেলে দিয়েছে—মুখের এক পাশ দেখা যাচ্ছে—তা' যেমন শুভ্র, তেমনি পাণ্ডুর।

তার এই অসহায় মূর্ত্তিখানি রমেনের মনে ব্যাকুলতা এনে দিলো, এমন ইচ্ছাও হলো যে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে দু'-একটি আশার বাণী ওকে শোনায়। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো যে, দুর্দ্দিন তার কালো ডানা মেলে মাথার ওপর ঘনিয়ে এসেছে জেনেও যে এমন আত্ম-সমাহিতা, তাকে আর আশার বাণী সে কি শোনাবে? জোর করেই সে চোখ দু'টি ফিরিয়ে ভবানীপ্রসাদের মুখে রাখলো।

তিনি তখন তার দিকে আগ্রহ ভরেই চেয়েছিলেন। রমেন মনের ভিতর অনেকখানি বোঝা নিয়েই তাঁর কাছে বিদায় জানিয়ে বাইরে এলো। সুরভিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় বলে গেল, "আজ আসি। দরকার বোধ করলে রাত্রে খবর দিবেন। সকালেই আবার আমি আসব।"

সুরভি মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালো।

কয়েক মিনিট পরেই সেই পথ দিয়ে বেগে শঙ্কর প্রবেশ করলো। সিঁড়ির মুখে উঠেই সুরভিকে দেখে সে বললো, "এই যে, ভালোই হলো আপনাকে একা পেয়ে। আপনাদের সম্মানিত অতিথির সব খবরই জেনে এলাম যে! এ ক'দিন সেই জন্যই আসতে পারিনি।" কথা শেষ করে সে আগ্রহ ভরে সুরভির দিকে চাইলো।

ধীর গম্ভীর সুরে সুরভি বললো, "আপনার অযাচিত উপকারের জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু বলুন তো, আপনাকে এই 'স্পাইং' করতে কেউ অনুরোধ করেছিলো কি? আজ আমার মাথার ওপর দুর্দ্দিন ঘনিয়ে এসেছে, অন্য কথা আমার মনে আসছে না, তবুও তবুও—আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, এইমাত্র যাঁর 'হাঁড়ীর' খবর এনে আমাকে অবাক্ করে দেবেন ভাবছিলেন, বাবা একটু আগেই আমাকে এবং তাঁর সাধের—জীবনের চেয়েও প্রিয় এই ল্যাবোরেটরীকে তাঁরই জিম্মায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। আর আমি? হ্যাঁ, আমারও কোন আপত্তি নেই।" সুরভির চোখ দু'টি দীপ্ত হয়ে উঠলো।

ক্রূর হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে শঙ্কর বললো, "এবং আশা করি, তিনি সানন্দে এবং সাগ্রহেই তা' গ্রহণ করেছেন!"

"আপনার কথার উত্তরে 'হ্যাঁ' বলতে পারলেই সুখী হতাম, কিন্তু পাছে বাবার কথায় তাঁকে সম্মত হতে হয়, এই ভয়েই তিনি যেন এক রকম পালিয়েই গেলেন।"

"আর আপনি বুঝি তাই প্রোষিত-ভর্তৃকার মত এখানে দাঁড়িয়ে আছেন? Sorry! মেজাজটা আমি ঠিক রাখতে পারছি নে, কিন্তু কবিতা আবৃত্তি শুনে আর বাইরের দু'-চারটে 'বুলি' শুনে শুকনো পেটে থাকতে পারবেন তো?"

ম্লান হাসি হেসে সুরভি বললো, "শুকনো পেটে থাকতে হবেই কেন? বাবার সম্পত্তির পরিমাণের আন্দাজ একটা আপনার নিশ্চয়ই আছে—আপনি এত কাঁচা লোক ন'ন্ যে সে সব খোঁজ না নিয়েই শুধু-শুধুই আসা-যাওয়া করছেন?—সুতরাং ও-প্রশ্ন অবান্তর।"

আঁধার মুখে শঙ্কর বললো, "অঃ! তাই বলুন,না হলে ভেবেই পাচ্ছিলাম না যে এটা কি করে হতে পারে? স্ত্রীর ধনে বড়মানুষ! এর চেয়ে 'pitiable' অবস্থা। তা engagementটা হচ্ছে কবে? আমরা আত্মীয় না হলেও বন্ধু তো?"

"জানতে আপনারা পারবেন বই কি? আপনি তো আজ দেখছি অন্য ধরনের "মুড" নিয়েই ঢুকেছেন, চলুন ঘরে বসবেন।"

"নাঃ, বসব না, অন্য কাজ আছে" বলে শঙ্কর যেমন বেগে এসেছিলো তেম্নি বেগেই চলে গেল।

পাঁচ

সন্ধ্যার গুমট কেটে গিয়ে মাঝের রাত্রি থেকে জোর বাতাস উঠলো। যে মেঘ ধীরে ধীরে জমে উঠেছিল বাতাসের জোর নিয়ে তার থেকে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। সন্ধ্যা থেকেই এসে অবস্থা খারাপ দেখে রমেন আর ফিরে যেতে পারেনি।

ভবানীপ্রসাদ বুকের মধ্যে একটা ব্যথা অনুভব করলেন, কি যেন একটা শ্বাসরোধ করে ফেলছে। অতি মৃদু স্বরে তিনি ডাকলেন, "মা—মা, এ যন্ত্রণার শেষ করে দাও।" তাঁর মৃদু বিলাপের শব্দটুকু সুরভির কান এড়ালো না। চমকিয়ে উঠে বসে সে ঘরের বড় আলোটি জ্বাললো।

ঘরে আলো জ্বলতে দেখে রমেনও ব্যস্ত হয়ে ঘরে এসে ঢুকলো, কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলো, "কেমন বোধ কচ্ছেন, স্যর?"

"ভালো তো নয় বাবা, তোমাকে দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে, আমি জানতাম তুমি আসবে। মা বুড়ি, এ দিকে আয়, না না, তোর কোন লজ্জা করতে হবে না, আজ তুই খুব ভাল ক'রে ভেবে একবার বলতো মা, রমেনকে পেলে তুই সুখী হতে পারবি কি না? না না, আমি যে বাবা—মা—একাধারে সবই—তোর সংকোচের তো কিছু নেই!"

বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে সুরভি বললো, "তুমি আমার ভালোর জন্য যা বলবে, আমি তো তার কোন দিনই অবাধ্য হইনি, বাবা! তুমি আশীর্বাদ কর, আমি যেন মায়ের মত হই।"

মরণ-পথযাত্রী ভবানীপ্রসাদের চোখে জল উথলে এলো। বললেন, "রমেন, আর তো বাবা তোমার কোন দ্বিধা হবে না, আমি আমার বুড়িমাকে তোমাকে দিয়ে গেলাম। ওর মা ওর নাম রেখেছিলেন—'সুরভি' আশীর্বাদ করি, তোমার জীবনে ওর সেই নামটুকু সার্থক হয়ে উঠুক।"

রমেন ও সুরভি দু'জনে তাঁর বিছানার পাশে নতজানু হলো, গভীর স্নেহে তিনি দু'জনের মাথায় হাত রাখলেন। একটা কঠিন সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাওয়ায় সেই রাত্রেই তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ফেললেন।

এক বৎসর পরে ল্যাবোরেটরীতে রমেন গবেষণায় ব্যস্ত। রাত্রি অনেক হয়েছে, বন্ধ ঘরের দরজা ঠেলে লঘু পায়ে সুরভি ঘরে ঢুকলো। কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি বললো, "ওগো বৈজ্ঞানিক! রজনী গভীরা—ঘুম পায় না?"

হাতের 'টিউব'টা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে রমেন বললো, "সে কি? তুমি শোওনি?"

হাসিমুখে সুরভি বললো, "কি করে শোবো? ল্যাবোরেটরীর হাতে তোমাকে সঁপে দিয়ে ঘুম আমার আসে কি করে? বিয়ে করে আর আমার কি লাভ হলো? যে একা—সেই একাই আছি, আমার চেয়ে ল্যাবোরেটরীর ওপরই তোমার টানটা বেশী।"

'রিভলভিং' চেয়ারখানা ঘুরিয়ে নিয়ে রমেন সুরভিকে টেনে বসালে—'টেবল ল্যাম্পটা' নিবিয়ে তার একটি হাত নিজের গলায় জড়িয়ে নিয়ে বললো "এ ঘরটার ওপর কি তোমার সপত্নী-বিদ্বেষ জন্মালো না কি?"

রমেনের হাতের বাঁধনের মাঝে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে সুরভি বললো, "হ্যাঁ, হচ্ছেই তো! তুমি এটার কথা যত ভাব, তার সিকি অংশও আমার কথা ভাবো না।"

"ভাবি না—না?" রমেন হাসলো।

"ভাববে কেন? তোমার কত উঁচু আদর্শ ছিল—বাবার জন্য সব নষ্ট হয়ে গেল। দায়ে পড়ে আমাকে বিয়ে করতে হলো!"

"তোমারও তো দায়ে পড়ে বিয়ে করতে হলো আমাকে! কোথায় শঙ্করকে—"

হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে সুরভি বাধা দিলো রামনকে, "আবার ঐ সব?"

"তুমি কেন বললে?"

"বেশ করেছি, এখন চলো, আমার ঘুম পাচ্ছে।"

"চলো"—বলে রমেন সস্নেহে তার হাতটা ধরে শোওয়ার ঘরে গেল।

ঘরে স্নিগ্ধ সবুজ আলো, মৃদু সুগন্ধ ভেসে আসছে। রমেন চেয়ে দেখলে, মেহগনির একটা 'টিপয়ের' ওপর 'ইবনাইটের' ওভ্যাল ফ্রেমে তারই একটা ছবি এনলার্জ করা—তার নীচে ধূপদানীতে মহীশূরী ধূপ পুড়ছে।

রমেন হাসলো—বললো, "কি ব্যাপার বল তো? তোমার ঘুম বুঝি এই জন্যই আসছিল না?"

নবোঢ়ার মত লজ্জায় ও অপরিসীম আনন্দে গলে গিয়ে সুরভি বললো, "মনে নেই? আজকের দিনেই আমরা বাবার আশীর্বাদ পেয়েছিলাম? তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে, একা আমি কি আজ এই ঘরে ঢুকতে পারি? না—আমার ভালোই লাগবে?"

রমেন সুরভিকে পাশে টেনে নিলে—সবল বাহুর বাঁধনে বেঁধে সে সুরভির কানে কানে বললো, "এ দিনের কথা কি ভুলে যাবার?"

সুরভির মাথাটা নীচু হয়ে রমেনের কোলে আশ্রয় নিলো—পরম স্নেহে সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তার সৌভাগ্যের কথা ভাবতে লাগলো—মহীশূরী ধূপ, ধূপদানীতে পুড়ে ছাই হয়ে তার সুমিষ্ট গন্ধটুকু ঘরময় ছড়িয়ে দিলো।

রং ও ঘর

শ্রীঅরুণা আলী

সভ্যতার সাথে সাথে আমাদের বাসভূমির অনেক পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধনও সুরু হয়েছে···যে গৃহে আমরা বাস করি তাহা আমাদের ব্যক্তিগত রুচি অনুসারেই আমরা তৈরী করি। সুন্দর পোষাক আমাদের খুবই আনন্দ দেয়, সেইরূপ সুশ্রী একখানা ঘর পেলেও আমরা কতই না সুখী হই। অনেকের ধারণা, সুন্দর ও বেশ সাজানো ঘর তৈরী করতে অনেক অর্থের দরকার এবং তা শুধু বড়ো লোকদেরই সাজে। কিন্তু ঘর সাজানো প্রধানতঃ রুচির উপরই নির্ভর করে এবং অনেক টাকা খরচ না করলেও সুন্দর একখানা ঘর তৈরী করা খুব শক্ত হয় না। কত সহজে শুধু রং-এর এ-দিক সে-দিক পরিবর্ত্তন এবং ঘরে আলো কিরূপ আসছে তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে কি ভাবে সুন্দর করে ঘর সাজানো যায় সে সম্বন্ধে মোটা-মুটি ভাবে কিছুটা আলোচনা করা যাক্।

প্রথম রং-এর কথাই ধরুন।

বিবিধ বর্ণ (রং) আমাদের মনের উপর বিভিন্ন প্রভাব প্রকাশ করে। অনেক সময় দেখা যায়, যাঁহারা দুর্ব্বল কিংবা অসুস্থ, অথবা যাঁহারা খুব সহজেই কোন কিছুতে অভিভূত হয়ে পড়েন, রং-এর প্রভাব তাঁহাদের উপরই গভীর ভাবে প্রকাশ পায়। খুব সুন্দর নয়নমুগ্ধকর রং দেখলে আমরা খুবই আনন্দিত হই—আবার কোনরূপ বিশ্রী রং দেখলে আমরা মোটেই সন্তুষ্ট হই না, বরং ইহাতে অনেক সময় চোখে ব্যথা অনুভব করি।

রং বিশেষতঃ দুই প্রকার। কতকগুলো আমাদের আনন্দ দেয় আবার অন্যগুলো আমাদের চোখে বিরক্তিকর মনে হয়। কতকগুলো সমতাল এবং কতকগুলো অসমতাল। যে কোন একটি রং বা মিশ্রিত অনেক রকম রং দেখলেও আমরা আনন্দিত হই, আবার অন্য কতকগুলো রং আছে তাহাদের সংমিশ্রণে আমাদের চোখে বেশ ক্লেশ অনুভব করি।

কোন্ কোন্ রং আমাদের আনন্দ দেয় এবং কোন্ কোন্ রং তা' দেয় না তা বলা খুবই শক্ত। কারণ, ইহা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যক্তিগত রুচির উপরই নির্ভর করে। কেউ হয়ত কোন একটি বিশেষ রং পছন্দ করেন আবার কেউ হয়ত তা' মোটেই ভালবাসেন না।

ইহা সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে, আলোই রং-এর একমাত্র ভিত্তি—সূর্য্যালোক ছাড়া রং-এর কোন অস্তিত্বই নেই। কাজেই কোন কামরায় কি ভাবে আলো আসছে তার উপরই বিবিধ রং মানিয়েছে কি মানায়নি প্রধানতঃ নির্ভর করে। আমাদের দেশ বেশ গরম। এখানে সূর্য্যের তেজও বেশ প্রখর। প্রথম সূর্য্যালোকে খুব কড়া রংও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তা ছাড়া সূর্য্যের আলোতে সব রকম রং-এর উপরই হলদে এবং শাদা আভা মিশ্রিত হয়ে কিছুটা বিবর্ণ করে দেয়।

পূর্ব্বদিকের জানালা দিয়ে ঘরে যে আলো আসে ইহা বেশ উজ্জ্বল এবং আমাদের বেশ আনন্দ দেয়। কারণ, প্রভাত কালীন সূর্য্যের আলো খুবই মনোমুগ্ধকর। কিন্তু সূর্য্যের গতির সাথে সাথে প্রভাত কালীন আলো গরম ও উজ্জ্বলতর হতে থাকে, আবার যখন পশ্চিম দিকের দেয়ালের জানালা দিয়ে যে আলো আসে তাহা গরম থাকার জন্য আমাদের বিরক্তিকর মনে হয়। সূর্য্যাস্তের সাথে সাথে সেই আলো ক্রমশই বিবর্ণ হতে থাকে। সুতরাং পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিকের কামরাকে বিভিন্ন রং-এ সজ্জিত করা উচিত—পশ্চিম দিকের কামরায় অপেক্ষাকৃত গাঢ় রং দেওয়াই বিধেয়।

ঠিক সেইরূপ উত্তর দিকের আলো সব সময়ই শীতল থাকে। আবার দক্ষিণ দিকের আলো পরিমিত ভাবে গরম থাকে এবং ঋতু পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে কখনও ইহার উজ্জ্বলতার হ্রাস আবার কখনও বৃদ্ধি হয়। কাজেই উত্তরমুখো কামরায় ঠাণ্ডা রং অর্থাৎ নীল (Blue), ধূসর-নীল (Grey Blue), সবুজে নীল (Green Blue) রং ব্যবহার করা অনুচিত। বরং হলুদ, সবুজ, ফ্যাকাসে লাল (Light rose), ঘি (Cream) রং ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। গরম কামরায় সব সময় ঠাণ্ডা এবং শান্ত রং ব্যবহার করা উচিত।

তার পর ধরুন জানালার কথা। মনে করুন, কামরার তুলনায় জানালার মাপ বড়। জানালা বড় থাকায় ভিতরে আলোর তেজও বেশী আসায় রং-এর তীব্রতা অনেকটা কমে যায় এবং দেখতেও অনেকটা ফিকে দেখায়। কাজেই বড় জানালাযুক্ত কামরার জন্য উজ্জ্বল ও গাঢ় রং ব্যবহার করা দরকার। আবার যে সমস্ত কামরা অন্ধকার স্থানে অবস্থিত কিংবা যেখানে কামরার তুলনায় জানালা ছোট ও সংখ্যায় কম, সেখানে এমন রং ব্যবহার করা উচিত, যাহা সহজে প্রতিফলিত হয়ে অন্ধকার দূর করার সাহায্য করে। অন্ধকার কামরার ছাদ যদি এমন রং-এর হয় যাহা সহজেই অল্প আলোতে প্রতিভাত হয়, তা'হলে আরও ভাল হয়।

কামরার ভিতর লম্বা ও চওড়ায় বড় দেখাবার জন্য ছাদ, দেয়াল, মেজে ইত্যাদিতে একই রং ব্যবহার করতেও অনেক সময় দেখা যায়।

কোন তৈরী ঘরের উপযোগী যদি রং পছন্দ করতে হয় অথবা সেই ঘরের কামরার রং-এর যদি অদল-বদল করতে হয়, তা'হলে এ কাজটা বাস্তবিকই শক্ত।

সাধারণতঃ শোবার ঘরে খুব স্নিগ্ধ বা শান্ত রং—যেমন সবুজ, সবুজে-নীল ধূসর-নীল, থাকা উচিত, অবশ্য যদি উত্তর দিকে না হয়। উত্তর দিকে হলে ঘি, ফিকে গোলাপী, হলুদ কিংবা ফিকে সবুজ রংই ভাল মানাবে।

খাবার ঘরের রং কিন্তু মনোমুগ্ধকর হওয়া দরকার। ফিকে গোলাপী, হলুদ এবং কমলা রং খুব উপযোগী হয়।

রান্নাঘরেও বেশ পসন্দসই রং হওয়া দরকার। কিন্তু রান্নাঘরে এমন কোন রং দেওয়া উচিত নয় যে রং রান্নার ধুঁয়াতে শীগ্‌গির নষ্ট বা বিশ্রী হয়ে যায়। খুব কড়া নীল কিংবা কড়া-ছাই (Deep Grey) রং রান্নাঘরে ভালই মানায়।

স্নানের ঘরের রং খুব নির্ম্মল ও সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ শাদা অথবা ঘি রং-এর হওয়া উচিত। স্নানের ঘরের দেয়ালের উপর ভাগে রঙ্গিন বর্ডার থাকা ভাল। ছাদেও গোলাপী রং থাকলে উহা প্রতিফলিত হয়ে কামরাকে আরও সুন্দর দেখায়।'

গৃহসজ্জায় শুধু রংয়ের এ-দিক সে-দিক পরিবর্ত্তন করে কত সহজেই না আমরা ঘরে স্নিগ্ধ ও শান্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারি। প্রত্যেক গৃহিণীরই সময় ও সুযোগ অনুসারে এই সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

শ্রীচরণদাস ঘোষ

তেরো

পরদিন প্রভাতেই ভাঁটুর দলবল মলিনের মাকে আসিয়া ধরিল—'সন্দেশ!'

মলিনের মা লজ্জায় পড়িয়া কহিলেন, "সন্দেশ খাওয়াবারই তো কথা, বাবা! আজকে আমার কি দিন—মলিন পাশ করেছে!"

"পাশ করেছে কি বলছ, বড়মা! পাশ তো সবাই করেছে—আমরা করিনি? কিন্তু মলিনদা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম হয়েছে! কি বলছ, তুমি?"—ভাঁটুর চক্ষু দিয়া যেন হু-হু করিয়া দুঃসহ আনন্দ ও গর্ব্বের আলোকচ্ছটা নির্গত হইতে লাগিল। বড়মার দিকে মিনিট খানেক চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ তেমনি করিয়াই বলিয়া উঠিল, "তোমার মাথায় গোবর-পোরা, বড়মা—তুমি এ-সব বুঝবে না, বাংলা কোরে বলি শোনো, এবার বত্রিশ হাজার ছেলে ম্যাট্রিক দিয়েছিল, শুনছ, বড়মা, বত্রিশ হাজার—ত্রিশ আর দুই, তাকে বলে 'বত্রিশ'—এই 'বত্রিশ' হাজার ছেলের ভেতর মলিনদা' হয়েছে—'ফার্ষ্ট'! আজ বাংলা দেশে এমন কেউ নেই যে, মলিন ঘোষের নাম জানে না! তুমি তারই মা, তুমি আমাদের সন্দেশ খাওয়াবে না?"

মলিনের মা—তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দর-দরধারে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল! তাঁহার মলিন—

ভাঁটু ধমক দিয়া উঠিল—"বড়মা, ও-সব কান্না-টান্না আমরা মানবো না—"

বড়মা চমকিয়া উঠিলেন! হয়তো আজই তাঁহাকে দুই মুঠি চাল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া হাঁড়িতে দিতে হইবে; তিনি কেমন করিয়া কি করিবেন? ঘরে দুই-একটি পিতল-কাঁসাও নাই যে, বন্ধক দিবেন। তত্রাপি আজ তাঁহার কি দিন! বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছিয়া কহিলেন, "সন্দেশ তোমাদের তোলাই আছে, বাবা! মলিন বড় হোক্, চাকরী-বাকরী করুক—"

"ও-সব শুনবো না—ও-সব শুনবো না। টাকা বার করো—" ছেলেগুলা নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিল।

মলিন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সরিয়া আসিয়া ভাঁটুর হাত ধরিয়া অনুনয় কণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁ রে, মা টাকা কোথায় পাবেন—মা গরীব, তোরা তা জানিস্ না?"

ভাঁটু সবলে হাত ছাড়াইয়া রুখিয়া বলিয়া উঠিল, "তার মানে?—গরীব? গাঁয়ের লোক বলে—তাই? তুই যাঁর ছেলে—তিনি গরীব?" মলিনের প্রতি এক সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়াই মুহূর্ত্তে সুরু করিল, "নিয়ে আয় দাঁড়ি-পাল্লা, এক দিকে রাখ বড়মাকে, আর এক দিকে তোল্ বাংলার সমস্ত বড়লোককে—দেখ দিকিনি, দাঁড়ির ঝোঁক্ ধরে কোন্ দিকে? মলিন, তুই এক আস্ত 'ইডিয়ট্'!" বলিয়াই বড়মার দিকে ফিরিয়া জেদ্ ধরিল—"বার করো টাকা—"

"এই যে! সোনার চাঁদেরা এখানে!"—দুলে-বউ উঠি-পড়ি করিয়া ছুটিতে-ছুটিতে আসিয়া প্রবেশ করিল, তার পর সকলের দিকে আনন্দোজ্জ্বল নেত্রে এক-এক বার করিয়া তাকাইয়াই বলিয়া উঠিল, "আমি, বাবা, তোমাদের বাড়ী-বাড়ী খুঁজে আসছি—এইখানেই যে আমার চাঁদের হাট-বাজার!" অতঃপর পেট-কাপড়ের গাঁট খুলিয়া দশ টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া বলিল, "তোমরা, বাবা, সন্দেশ খাও!"—বলিয়াই নোটখানা আলগোছে ভাঁটুর হাতে ফেলিয়া দিল।

মলিনের মা ও মলিন উভয়েই স্তব্ধ হইয়া দুলে-বউর দিকে তাকাইল। ভাঁটু সহর্ষে বলিয়া উঠিল, "তাকাচ্ছ কি, বড়মা? টাকা ছাপ্পড় ফুঁড়ে বেরিয়েছে!—মলিনদা, একটু দাঁড়া, আমরা সন্দেশ নিয়ে আসি—" বলিয়াই সঙ্গীদের ডাকিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

মলিনের মা দুলে-বউকে প্রশ্ন করিল, "দুলে-বউ, টাকা কোথায় পেলি?"

দুলে-বউ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "আমাদের সেই বকনা-বাছুরটা—"

"বিক্রী কর্‌লি?"

"কর্‌বো না? আমার মলিনের সাথী-সঙ্গী—ওনাদের মিষ্টিমুখ করাতে হবে না? আজ একটা দিন!"

মলিনের মা এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তা' জানি, দুলে-বউ! কিন্তু, তোর আর কি রইলো?"

"কি বলছ তুমি গো!"—দুলে-বউএর চোখ দুইটা বড় হইয়া উঠিল। মলিনের মায়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সুরু করিল, "ছাগলই বলো আর গরুই বলো—ও-সব আবার হবে, কিন্তু আজকের দিনটা তুমি কি আর ফিরে পাবে, মলিনের মা? নাও, নাও—আর দাঁড়িয়ে থেকো না, ছেলেরা সব 'রে-রে' কোরে এসে পড়লো বোলে! আমি কলাপাতা কেটে আনি, তুমি বঁটি বার করো—" বলিয়াই পিছন ফিরিয়া হন্-হন্ করিয়া খানিকটা গিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল, তার পর কি মনে করিয়া দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিয়া মলিনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সগর্বে বলিয়া উঠিল, "মলিনের মা! একবার ওই মুখটির দিকে চাও দিকিনি—ও তোমার মলিন নয়? আজ এই বিশ্ব-বাংলার ছেলে, তাদের মায়ের মনে কি হচ্ছে জানো—মলিন যদি তাদের পেটেরটি হতো! সত্যি, মলিনের মা, চন্দর-সূয্যি উঠছে, আমার বাক্যির এক বর্ণও মিথ্যে নয়—দোকানে এই দেখে এলাম, কাতার দিয়ে লোক—সব্বাই এই বাক্যি বলছে!" আর দাঁড়াইল না।

ছেলেরা আসিয়া পড়িল। সন্ধ্যা পূর্ব্বাহ্নেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহার উপর ভার পড়িল সন্দেশ বিলি করিবার। ডিস্‌ও নাই, প্লেটও নাই—এক-এক টুকরা কলাপাতায় সন্ধ্যা সকলকার হাতে-হাতে সন্দেশ দিল। তার পর বাল্‌তি ও ঘটি লইয়া সকলকার হাতে জল ঢালিয়া দিতে যাইবে, নিবারণ আসিয়া দেখা দিল এবং অতি-বড় আত্মীয়ের ন্যায় মলিনের মাকে বলিয়া উঠিল, "কৈ গো, বড় বউ, আমার মিষ্টিমুখ কৈ?"

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি একটা পাতা করিয়া গোটা চারেক সন্দেশ আনিয়া নিবারণের হাতে দিল, নিবারণও রাক্ষসের ন্যায় একসঙ্গে সব কয়টা মুখে ফেলিয়া দিয়াই মলিনের মাকে বলিয়া উঠিল, "বড় বউ, তোমাকে একটা সুখবর দিতে এলাম—"

"সুখবর? এর চেয়েও সুখবর আমি তো চাইনি, নিবারণ!"—মলিনের মা সতর্ক-নেত্রে নিবারণের দিকে চাহিলেন।

নিবারণ সন্ধ্যার হাত হইতে ঘটিটা টানিয়া লইয়া ঢক্-ঢক্ করিয়া

এক ঘটি জল খাইয়াই বলিয়া উঠিল, "আমাদের স্কুলে এক জন মাষ্টারের চাকরী খালি হয়েছে—মলিনকে আমরা নিয়ে নেব! মাইনে কত শুনবে—পঁচিশ!"

সমস্ত ছেলেদের শঙ্কা-ব্যাকুল দৃষ্টি মলিনের মায়ের দিকে পড়িল। মলিনের মা গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "মলিন এখন পড়বে।"

"Here you are!"—ছেলেরা আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। নিবারণের দিকে ফিরিয়া বিনীত কণ্ঠে কহিল, "মলিনদা ইউনিভার্সিটির ফার্ষ্ট বয়, ও পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে পঁচিশ টাকার মাষ্টারী করবে—কি বলেন, স্যার?"

নিবারণ চটিয়া উঠিল। উষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "তর্ক কোরো না। বলি, কি করবে বাপু প'ড়ে? এবে নিলাম—বি-এ, এম্-এ পাশই করলো। গরীব?—রিক্‌শ টানবে তো? গ্র্যাজুয়েট হয়ে কত ছোঁড়া 'রিক্‌শ' টানছে—সে খবর রাখো?"

একটি ছেলে শান্ত কণ্ঠে কহিল, "রাগি স্যার! সে তার choice of occupation, কিন্তু, আগে সে—গ্র্যাজুয়েট, তার পর—'রিক্‌শ-পুলার!"

"তুমি একটি অকালপক্ক—এঁচড়ে-পাকা!"—নিবারণ মুখখানা বিকৃত করিয়া সরোষে বাহির হইয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দলও মলিনের দিকে কিল তুলিয়া বলিয়া উঠিল—"খবরদার!" আর দাঁড়াইল না।

* * * *

সংসারে কাজ আছে। রান্নাঘরের ছিটে-বেড়ার দেওয়ালের খানিকটা হেলিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, মলিনের মা ভোর রাত্রে উঠিয়া একটু কাদা করিয়া রাখিয়াছিলেন—সেই দেওয়ালে তিনি হাত দিয়াছেন। মলিন অদূরে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছিল। দেখা গেল—তাহার মুখে এক ম্লান ছায়া পড়িয়াছে। সরিয়া গিয়া কহিল, "মা, আমি খানিক দেওয়াল দেব? আমি পারি।"

মায়ের চোখে কাদার ছিটা লাগিয়াছিল, কাপড়ের খুঁটে মুছিয়া স্মিত মুখে জবাব দিলেন, "বাপ, রে! তোমার লেখা-পড়ার হাত!"

"হলেই বা।"

"না।"—মা পুনশ্চ কাজে মন দিলেন।

মলিন কি-যেন বলি-বলি করিতেছিল। ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, "মা, একটা কথা বলবো?"

মা মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, "ভালো কথা তো?"

"কাকাবাবু সে দিন যা বললেন—"

"চাকরী?"—মায়ের মুখখানা কঠিন হইয়া উঠিল।

মলিন একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "পঁচিশ টাকা—"

"এই রইলো—" মায়ের সম্মুখে যেন সহস্র আশীবিষ ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাড়াতাড়ি বালতির জলে হাত ধুইয়া আপন-মনে বলিয়া উঠিলেন, "ফুল-বউ আসুক, বলি—একটা মজুর দেখ।" অতঃপর আঙুল তুলিয়া বলিলেন, "চল্ দিকিনি এখান থেকে, চল্—"

"কি বড়মা—" সন্ধ্যা কতকগুলা পাতিলেবু হাতে করিয়া বাড়ী ঢুকিতেছিল, এদিকে ছুটিয়া আসিয়া পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, "বড় মা, কি?"

"আমার মুণ্ডু! মলিন মাষ্টারী করবে! আমাকে দেওয়াল দিতে দেখেছে কি না?"—মলিনের মা যেন কাঁদ-কাঁদ হইয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যারও চোখের দৃষ্টি খর হইয়া উঠিল। বলিয়া উঠিল, "করুক্ না, বড়মা! আমিও এক প্যাচ শিখেছি—শুনবে?" লেবু কয়টি নামাইয়া রাখিয়া বড়মার কানের কাছে মুখ আনিয়া একবার মলিনের দিকে আড়চোখে তাকাইল, তার পর তাহাকে শুনাইয়া-শুনাইয়া কহিল, "স্কুলের সব ছেলে, সব্বাইকে বলে দেব—মলিনদা' এত্তোটুকু ছেলে, ওর কাছে কেউ তোমরা পড়ো না।" বলিয়াই এক কাল্পনিক আনন্দে হাততালি দিয়া উঠিল।

"মলিন, মলিন—"

ঊর্দ্ধশ্বাসে ভাঁটু প্রবেশ করিল এবং হাওয়ার ন্যায় মলিনের কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল, "শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর—"

এদিককার তিনটি প্রাণী বিভ্রান্তের ন্যায় ভাঁটুর দিকে তাকাইতেই, সে এক মিনিটে পঞ্চাশটা কথা বলার মত দ্রুত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "প্রেস-রিপোর্টার—ফটোগ্রাফার—" চট্ করিয়া বড়মার দিকে ফিরিয়া তেমনি করিয়াই বলিতে লাগিল, "বড়মা, কলকাতা থেকে খবরের কাগজের লোক এসেছে। মলিনদার ছবি তুলবে।—এই মলিনদা, শীগ্‌গীর ঘরে ঢোক—ময়লা কাপড়-চোপড়!" বলিয়াই মলিনকে ঘরের ভিতর টানিয়া লইয়া গেল। অতঃপর, অত্যল্প কাল পরেই প্রবেশ করিল—'প্রেস-ফটোগ্রাফার' ও গ্রামখানা ভাঙিয়া লোক।

ঘরের মেঝেতে মলিনকে দাঁড় করাইয়াই ভাঁটু নিজের গরদের পাঞ্জাবীটা খুলিয়া ফেলিয়া কহিল, "এই জামাটা গায়ে দিয়ে নে, চট্ কোরে—"

ভাঁটুর হাতে কলের পুতুলের মতই মলিন এতক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া ছিল, এই বার কথা কহিল। বলিল, "তোর জামা?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ! ফটো উঠবে, খবরের কাগজে!"

"না। আমার তো জামা রয়েছে!" বলিয়াই মলিন মৃদু হাসিয়া দেওয়ালের গায়ে পেরেকে টাঙানো তালি-দেওয়া জিনের কোটটা টানিয়া লইল।

ভাঁটু চোখ-মুখ কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "টেরিবেল! ওই কোট গায়ে দিয়ে ক্যামেরার মুখে দাঁড়াবি?"

স্রোতের টানের ন্যায় সন্ধ্যাও আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছিল। কহিল, "দাঁড়াবে না কেন, বলো! তোমার জামা গায়ে দিয়ে মলিনদা তো আর পরীক্ষা দিতে বসেনি?"

মলিন হাসিয়া সন্ধ্যার দিকে তাকাইল।

কিন্তু রাগিয়া উঠিল ভাঁটু। কহিল, "তবে যা খুশি তাই কর্—"

মলিন আবার একটু হাসিল। তার পর সেই পরনের কাপড়খানাই কোঁচা দিয়া পরিয়া ও সেই কোটটি গায়ে দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ফটোগ্রাফার বিস্ময়ে মলিনের দিকে তাকাইয়া কহিল, "এ ছেলেটি?"

ভাঁটু সগর্ব্বে উত্তর দিল—"হ্যাঁ!"

ফটোগ্রাফার নিঃশব্দে 'ফটো' তুলিল, তার পর মলিনের প্রতি এক পরিপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া নিঃশব্দেই বাহির হইয়া গেল।

আর অধিক দিন নাই, মলিনকে কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে কিন্তু, কোথায় গিয়া উঠিবে, তাহার আলোচনা এত দিন হয় নাই কথাটা এক দিন পাড়িল ভাঁটু।

মলিন অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল, "মেসেই উঠবো।"

সন্ধ্যাও উপস্থিত ছিল। মলিনের প্রস্তাবটা বুঝি বা তার মনোমত হইল না। কহিল, "কেন, যাঁদের বাড়ী ছিলে আগে—যাঁরা টেলিগ্রাম করলেন?"

মলিন মুখখানা নীচু করিয়া জবাব দিল, "এখন স্কলারশিপ পেয়েছি, টাকা পাবো—যদি তাঁরা না রাখেন?"

"তা বটে!" মলিনের মা-ও কথাটার সমর্থন করিলেন। পরক্ষণেই থাম্‌কা বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু ওই জায়গাটি তোর তীর্থস্থান!"

মলিন চুপ করিয়া রহিল। ভাঁটু প্রসঙ্গটাকে শেষ করিতে গিয়া মলিনকে কহিল, "তা হলে, মেসই ঠিক করলি?"

"না। যেখানে ছিলাম।" বলিয়াই মলিন ভাঁটুকে টানিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

অতঃপর কয়েক দিন অতিবাহিত হইতেই মলিন কলিকাতা যাত্রা করিল—এক শুভ দিনে।

* * * *

কিন্তু মলিন যে আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই হইল। সে নির্ম্মলদের বাড়ীতে উঠিবা মাত্র বীণা বলিল—'না।' তাহার কথায় স্পষ্টই বোঝা গেল যে, তাহার ওই আপত্তিটা পূর্ব্ব হইতেই রচিত হইয়াছিল।

নির্ম্মল কহিল, "কেন? হাঁড়ির ভাতই ত্ব'টি তো?"

বীণা গম্ভীর হইয়া জবাব দিল, "হলেই বা। এখন তো ও স্কলারশিপ পাবে!"

"সে টাকা ক'টাও বরং ওর মাকে দিতে পারবে!"

একটি মাটির প্রদীপ, তাহার দুর্ব্বল-শিখা, তাহা যেমন এক দমকা হাওয়া নিমেষে নিবাইয়া দেয়, তেমনি স্বামীর প্রস্তাবটা বীণা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া কহিল, "তা' হলে, তুমি বলছো—ছেলেটার চাকরী হলো?"

"কি মুস্কিল!"

বীণা স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকাইয়া বলিয়া উঠিল, "কিছুই নয়! কোন তর্কই ওঠে না!" পরক্ষণেই একান্ত সহজ কণ্ঠে সুরু করিল, "তা' হলে ওর মা, ওঁর দুঃখ-কষ্টের জোর কমবে, কমলে যে-জীবন ছেলেটাকে বরণ করতে এগিয়ে আসছে, সে চমকে উঠবে! মা-বাপের দুঃখ-কষ্ট, সংসারের অভাব-অনটন ছাত্র-জীবনে যাকে আচ্ছন্ন কোরে না রাখে, সে ভবিষ্যৎ-জীবনে মানুষ হয় না। কঠোর দারিদ্র্য, মাতৃ-অঙ্গে তার কশাঘাত—এই প্রত্যক্ষ অনুভূতিই মলিনের আত্ম-নির্ম্মাণের সম্বল—এই পরম বস্তুকে আমি বন্দী কোরে রাখতে চাই নে। এখানে একটা প্রশ্নই আসে। জন-সাধারণের মাটি, তারই ওপর এক দরিদ্র-সন্তান—তারই প্রশ্ন!"

"তা জানি। কিন্তু—" একটু ইতস্তত: করিয়াই নির্ম্মল বলিয়া ফেলিল, "কিন্তু, কুঞ্জর মুখে যা শুনেছ সেটাও তো সত্যি?"

এক অনির্ব্বচনীয় আলোকে বীণার সারা মুখ সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "এর চেয়েও আর একটা বড় 'সত্যি' রয়েছে। বাপ-মায়ের চিতাভস্ম, তারই ওপর সন্তানের গোলাপ ফুল ফোটে!"

এর উপর আর কথা চলে না। পরদিন মলিন একটি ছাত্রাবাসে গিয়া উঠিল।

চৌদ্দ

মলিনের উপর মা-সরস্বতীর বুঝি বা একরোখা দৃষ্টিই পড়িয়াছিল। সে আই-এ ও বি-এ পরীক্ষাতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। অতঃপর এম-এ পরীক্ষা দিয়া আজ সে এইমাত্র গৃহে ফিরিয়াছে।

কলেজে ঢুকিয়া প্রতি দীর্ঘ ছুটিতেই সে নিয়মিত বাড়ী আসিত। কিন্তু আসে নাই কেবল এই দীর্ঘ ছুই বৎসর। তাহার একটু কারণ ছিল—

বি-এ পরীক্ষার সংবাদ পাইয়া যখন সে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন সন্ধ্যার এক অতি কঠিন অথচ নির্ভয় নির্দ্দেশ তাহার উপর পড়ে—এম-এ পরীক্ষা দিয়া তবে যেন এবার সে বাড়ী আসে!

মলিন এই মেয়েটিকে শ্রদ্ধা করিত—এর বাক্যে একটা যে অর্থ আছে, ওজন আছে, তাহা সে অবহেলা করিতে পারিত না। তথাপি প্রশ্ন করিয়াছিল, "কেন?"

সন্ধ্যা জবাব দিয়াছিল—"এবার তোমার শেষ পরীক্ষা! এক-মন হয়ে পড়াশোনা করা দরকার!"

কথাটা মলিন হাসিয়া উড়াইয়া দিবারই চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা পারে নাই। সন্ধ্যা কড়া অভিভাবিকার ন্যায় বলিয়াছিল—"মনে করো না, বি-এ পর্য্যন্ত ফার্ষ্ট হয়েছ বোলে মা-সরস্বতীকে নগদ টাকা দিয়েই কিনে রেখেছ! এমন ত হতে পারে—হতে পারে কেন, এম্‌নিই হয়—কিনারায় এসে—ওই যাঃ! কিন্তু শেষ রক্ষেই রক্ষে!"

মলিন সন্ধ্যার নির্দ্দেশ-কঠিন মুখটার দিকে চমকিয়া তাকাইতেই সে পুনশ্চ তেমনিই দৃঢ় কণ্ঠে বলিয়াছিল, "তোমার মনকে দ্বিখণ্ড করলে চল্‌বে না!"

"কিন্তু মাকে দেখবে কে—পূরো ত্ব' বৎসর?"

সন্ধ্যার মাথায় বুঝি বা দুষ্টা সরস্বতী চাপিয়াছিল। হাসিয়া উঠিয়া কহিয়াছিল, "ধরো, এক বাড়ীতে মাত্র দুইটি প্রাণী—এক-জনের মা আর তার বউ। সেই 'এক জন' গেছেন চাকরী নিয়ে, কোথায় কোন্ বম্মা মুলুকে। তিনি ত্ব'বছর ছেড়ে চার বছর বাড়ী এলেন না! আচ্ছা, বলো দিকিনি, ওই অত দিন ওই 'এক জন বেচারার' মাকে কে দেখতো?"

মলিন 'স্কলার'—প্রচুর বুদ্ধি! তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়াছিল, "কেন, বউ!"

প্রতি-জবাব দিতে সন্ধ্যারও দেরি হয় নাই। তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিল, "কিন্তু যার ঘরে বউ নেই, তার না-হয় আর এক জন দেখবে!"

মলিন বিস্ময়ে সন্ধ্যার দিকে তাকাইতেই, সন্ধ্যা মুহূর্ত্তে বলিয়াছিল—"আমি।"

"তুমি?"

"অগত্যা।"

কথাটা বলিয়া সন্ধ্যা চলিয়া যাইতেই মলিন তাড়াতাড়ি আর একটা প্রশ্ন করিয়াছিল। বলিয়াছিল—"কিন্তু আর একটা কথা। শুনছি, তোমার না কি শীগ্‌গীর বিয়ে—দেশ-বিদেশ থেকে সম্বন্ধ আসছে! ধরো, এর মধ্যে যদি তোমার বিয়ে হয়ে যায়, তুমি শ্বশুর-বাড়ী যাও—তখন?"

কথাটা ঠিক্। বিগত চার বৎসর হইতেই সন্ধ্যার পাত্র-নির্ব্বাচন চলিয়াছে। কিন্তু কেন যে এত দিন পাত্র মিলে নাই, তাহা বলি—

মলিন যখন কলেজে ভর্ত্তি হয়, তখনই নিবারণ সন্ধ্যার বিবাহ দিয়া একটি উচ্চ-শিক্ষিত জামাই আনিয়া স্বীয় গৃহে প্রতিষ্ঠা করিতে

কৃতসঙ্কল্প হয়। এই সঙ্কল্পের মূলে একটা যে বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, তাহা ইহাই যে, যদিই বা এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে মলিনের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে পারে!

প্রস্তাবটায় সরস্বতী কিন্তু একটু হাসে! বলে—"তা পারবে না। কোনো ছেলেই শ্বশুরের মুখ উজ্জ্বল করতে বাপের মুখে কালি দেবে না।"

নিবারণ সদম্ভে বলিয়াছিল—"আলবৎ পারবো। গরীবের ছেলে আন্‌বো—যার মাথায় জুতো মারবো টাকার।"

সরস্বতীর মুখে হাসি থামে নাই। কহিয়াছিল—"কিন্তু তুমি এটা কি বুঝতে পারো—আত্মসম্মান, আত্মমর্য্যাদা—এর জ্ঞান—এর অভিমান বড়লোকের ছেলের চেয়ে গরীব লোকের ছেলেরই বেশি?"

"সম্পত্তি, টাকা—এই সব পেলে কত ব্যাটার ছেলে এসে জুটবে!"

"তুমি আমার গুরুজন, বেশি কিছু বললে অপরাধ হয়। পারো তো—ভালোই।"

এর পর দীর্ঘ চার বৎসর ধরিয়া নিবারণ ত্রিভুবন অনুসন্ধান করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু 'উচ্চ'টা বাদ দিয়াও শিক্ষিত কোনোও একটি ছেলেকে এ-তাবৎ কাবু করিতে পারে নাই।

মলিনের কথাটায় সন্ধ্যার মুখখানা লজ্জারক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু অবিলম্বেই নিজেকে স্বাভাবিক মাত্রায় দাঁড় করাইয়া হাসিয়া জবাব দিয়াছিল—"তখন? তার পূর্ব্বেই আমি রেজিষ্ট্রী কোরে তোমাকে পদত্যাগের পত্র পাঠিয়ে দেব।"

অতঃপর মলিন আর কোন দ্বিধা করে নাই, নিশ্চিন্ত হইয়াই এই দীর্ঘ দুই বৎসর কলিকাতায় অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছে!

বাড়ী ঢুকিয়াই মলিন ডাকিল—"মা—"

"মলিন?"—মা ছুটিয়া আসিলেন। ছেলের চন্দ্রানন দেখিয়া তাঁহার আনন্দ আর ধরে না। কহিলেন, "আয়, বাবা! ঘর-দোর আমার অন্ধকার হয়ে আছে এত দিন—আয়।"

ছেলেকে আহ্বান করিয়া পশ্চাৎ ফিরিতেই মলিন সকৌতুকে প্রশ্ন করিল, "মা, কেমন পরীক্ষা দিলাম, তা তো জিজ্ঞাসা করলে না?"

মা স্মিতমুখে জবাব দিলেন, "ও আমি জানি।"

মলিন আর কথা কহিল না। নিঃশব্দে কয়েক পদ গিয়াই বাড়ীখানার দিকে চোখ পড়িতেই সে দমিয়া গেল। দেখিল, চালে খড় নাই, বাঁশ-বাখারীও জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এই ঘরে বাস করেন—মা? ম্লান মুখে কহিল, "বাড়ী-ঘর আর না সারালে চলে না, নয় মা?"

মা তৎক্ষণাৎ একমুখ হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তার যোগাড়ও সব ঠিক হয়েছে, বাবা—ওই দেখ না?" উঠানের এক প্রান্তে স্থাপিত কতকগুলি বাঁশ ও খড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন—করিয়া কহিলেন, "ও-সব যোগাড় কোরে এনেছে কে জানিস্?—ভাঁটু।"

"চেয়ে?"

"হ্যাঁ। ভাঁটুকে সবাই ভালোবাসে কি না। যাকেই ও বলেছে—বড়মার ঘর পড়ে যাচ্ছে, তোমাকে দু'খানা বাঁশ, দু'গোণ্ডা খড় দিতে হবে, সে অমনি—তৎক্ষণাৎ!" মা দ্রুতপদে ঘরের দুয়ারে উঠিয়া মলিনকে বসিতে একখানি কাঠের পিঁড়ি পাতিয়া দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "তুই জামা-জুতো খোল, আমি চট্ কোরে আস্‌ছি—"

এমন সময়ে দ্বারদেশে যুক্তকণ্ঠের কলরব উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিল ভাঁটু—তৎসঙ্গে গ্রামের আরও দশ-পনরটি ছেলে, এবং সকলের অগ্রে সন্ধ্যা—তাহার কাঁখে একটি মৃত্তিকা কলস, কলস-গাত্রে কাগজে লেখা—'দরিদ্র-নারায়ণ!'

মা তাড়াতাড়ি সন্ধ্যার কাছে গিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "এই আমি দেখতে যাচ্ছিলাম—বাঁচলাম, মা!" বলিয়াই কলসটি লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন, যেন তাঁহার বুক হইতে একখানা ভারি পাথর নামিয়া গিয়াছে!

মলিনকে দেখিয়াই ছেলের দল আনন্দে লাফাইয়া উঠিল—"আরে, মলিনদা' যে! কখন্ এলি?" বলিতে বলিতে সকলেই দুয়ারে উঠিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

ব্যাপারটা যে কি, তাহা মলিনের বুঝিতে বাকী রহিল না—মুষ্টি-ভিক্ষায় মায়ের দিন চলিতেছে! কিন্তু এই ব্যবস্থাটা অস্বাভাবিক নহে, তত্রাপি তাহার বুকের ভিতর যেন হাতুড়ির ঘা পড়িল—ধিক্ তাহাকে! সে আর মাথা তুলিতে পারিল না—লজ্জায়, ঘৃণায়, মানসিক যন্ত্রণায় চুপ করিয়াই রহিল।

ছেলেরা ঝড় তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "মলিনদা, চুপ কোরে রইলি যে? এবারেও তো ফার্ষ্ট ক্লাস্ ফার্ষ্ট?"

মলিনের আনত-নেত্র হইতে জল পড়িল—টপ, টপ, টপ!

মলিনের বক্ষস্থলের সমস্ত অংশই ভাঁটুর চোখে দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত হইল। সে ব্যাকুল হইয়া মলিনের কাছে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "ও কি! তুই কাঁদ্‌চিস্, মলিনদা'? তুই তো আচ্ছা নাবালক!" মলিনের মুখখানা নিজের কোঁচার কাপড়ে মুছাইয়া দিয়া পুনশ্চ সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল, "তুই কি মনে করেছিস্, গ্রামের বড়লোকের কাছে হাত পাতি আমরা—'নেভার'! 'দরিদ্র-নারায়ণের' কলসী কারা ভর্ত্তি করে জানিস্—যাদের কিছুই নেই, যারা এক মুঠো থেকে আধ মুঠো দেয়—তারা।"

মলিন একবার চমকিয়া উঠিয়া একটি বার চোখ তুলিয়াই আবার নতচোখ হইল। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাঁটু আবার সুরু করিল, 'এ ভিক্ষে নয়, মলিনদা'! এ হচ্ছে—ভক্তের নিবেদন! এখানে, দেব্‌তা তুইও নোস্, বড়মাও নন্! দেবতা হচ্ছেন—স্বয়ং দারিদ্র্য! তাঁরই ভক্ত—ওরা! আর আমরা—দারিদ্র্যের শিক্ষানবিশ!"

মলিনের মুখখানা সহসা এক অনির্ব্বচনীয় আলোকে চক্-চক্ করিয়া উঠিল। স্পষ্টই টের পাওয়া গেল, তাহার ভিতর হইতে এই একটু পূর্ব্বেকার সমস্ত গ্লানিই কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছে। সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তোরা মাকে এম্‌নি কোরেই বাঁচিয়ে রেখেছিস্?—তোদের আমি আর কি বল্‌বো, ভাই!" বলিয়াই সকলের দিকে চাহিয়া জোড়-হাত করিল।

ছেলের দল যেন ক্ষেপিয়া উঠিল! তাহারা চোখ-মুখ রক্তবর্ণ করিয়া উঠিল, "এই—এই!—এই ষ্টুপিড্—ও কি? তোর না-হয় মা', আর আমাদের যে বড়মা, রে! তা' জানিস্?"

মলিন কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, জানি।" তাহার সম্মুখেই ছিল ভাঁটু, ভাঁটুকে জিজ্ঞাসা করিল, "কত দিন থেকে এই ব্যবস্থা চলেছে,

"কত দিন আর—এই বছর খানেক !"

"আমাদের ত জমি-জমা দু'-এক বিঘে যা-হোক ছিল—ধান-পান হয়নি বুঝি ?"

"জমি কি মানুষের সব সময় থাকে ? তোদের আগে ছিল—এখন নেই !"

"জমি—নেই ?"

নির্ব্বোধ লোককে যেমন করিয়া কথা বুঝাইতে হয়, তেম্‌নি ভাবে ভাঁটু বলিয়া উঠিল, "কি কোরে থাক্‌বে ? যে-দেশে জমিদার আছে, সে-দেশে প্রজার জমি থাকে ? ওরা টাকায় মরে, টাকায় বাঁচে—মানুষ যে কি বস্তু, মানুষের অভাব-অনটন যে কি, মানুষের দারিদ্র্য জগতের যে কত-বড় সম্পদ—তা ওরা বোঝে না !" একটু থামিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, "তুইও গেলি, জমিদারও শমন দিয়ে গেল ! আমি ঠিক করলুম, তোকে চিঠি লিখি ! সন্ধ্যা বল্‌লে—'না।' বড়মাও আবার তেম্‌নি, বল্‌লেন—সন্ধ্যা যা বলে, তাই কর্‌ !' ভোট ওদেরই বেশি, কাজেই—"

"কাজেই, তুমি চুপ ?"—বলিতে বলিতে সন্ধ্যা ফুড়িয়া আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার হাতে একখানি রেকাবী করিয়া গোটা-চারেক সন্দেশ ও এক গ্লাস জল।

ভাঁটু এক পাশে সরিয়া গিয়া গম্ভীর ভাবে কহিল, "কারণ—'পাওয়ার অফ্‌ এটর্ণি' তো আমার নামে নয় !" সন্ধ্যার প্রতি এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার বলিয়া উঠিল, "এই যে চাল তোলাতুলি, এই 'দরিদ্র-নারায়ণের' কল্‌সী, বড়লোক—এদের পরিত্যাগ করা—এ সমস্ত কার স্কীম ?—আমার, না সন্ধ্যারাণীর ?"

"থামো, থামো !"—সন্ধ্যা ভাঁটুর দিকে এক কৃত্রিম রোষ-কটাক্ষ করিল। তার পর মলিনের দিকে ফিরিয়া চটিয়া উঠিয়া কহিল, "আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌বো ?"

মলিন একদৃষ্টে এতক্ষণ এই মেয়েটির দিকে চাহিয়াছিল, কহিল, "তা হলে এই সব ব্যবস্থা তোমার ?"

সন্ধ্যা যেন আর পারে না ! বিরক্তির ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ,—হ্যাঁ—হ্যাঁ ! আদালত খোলা আছে, আর ফাঁসীকাঠ সস্তা—এর পরে যত পারো আমাকে ঝুলিয়ে দিয়ো ! এখন আমাকে ছেড়ে দাও দিকিনি—" বলিয়াই রেকাবীখানা আগাইয়া ধরিল।

মলিন এক গোপন নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ও এখন থাক্‌।"

"থাক্‌বে কেন ! মুখের গোড়ায় সন্দেশ—ও কি রাখতে আছে ?" ভাঁটু তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিয়া জেদ ধরিল।

মলিন ম্লানমুখে হাসিয়া কহিল, "ক্ষিদে নেই, ভাই।"

ভাঁটু সব দিক হিসাব করিয়া কথা বলে। অবিলম্বেই জবাব দিল, "না থাক্‌বারই কথা ! খেয়ে বেরিয়েছ সেই সূর্য্যি যখন ওঠে, আর এসে পৌঁছলে এই সূর্য্যি যখন ডোবে—এ আর কতক্ষণ। সন্ধ্যা তোর পেটের আন্দাজ তো জানে না !" একটু থামিয়াই অনুনয়-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কেন ভাই, ওর রাগ বাড়াবে ?—সন্দেশ ক'টা ফেলেই দাও না মুখে।"

অন্যান্য ছেলেরাও ভাঁটুকে সমর্থন করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাপ ! সন্ধ্যাদি' ভালো থাক্‌লে—গঙ্গাজল, রাগলে—লঙ্কাকাণ্ড !"

মলিন প্রশান্ত কণ্ঠে কহিল, "অসম্মান আমি করিনি !" একবার সন্ধ্যার দিকে তাকাইয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "ওঁর কাছে আমি চির-কৃতজ্ঞ !"

দেখা গেল সন্ধ্যার মুখখানা আড়ষ্ট হইয়া উঠিতেছে। উহা ভাঁটুর লক্ষ্য এড়াইল না। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ও-সব লম্বা-লম্বা সহুরে বুলি রাখ্‌ ! সন্ধ্যা হাতে কোরে এনেছে, আজকের মতন ওর মান রাখ্‌ তো !"

"মাপ করো ভাই ! আমার মায়ের মুখে ভিক্ষার অন্ন !"—শেষের দিকটায় মলিনের গলাটা ভারি হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যা চমকিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাত কাঁপিয়া রেকাবিখানা পড়িয়া গেল। আর সে দাঁড়াইতে পারিল না, কোনওরূপে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখে এক সুস্পষ্ট আতঙ্কের কালি পড়িয়া গেল। ক্ষণকাল পরে ভাঁটু নিস্তেজ কণ্ঠে কহিল, "কি করলি, মলিন ! সন্ধ্যাকে তুই বুঝতে পারলি নে !" বেদনা-বিক্ষুব্ধ দৃষ্টিটুকু মলিনের মুখের উপর রাখিবার চেষ্টা করিতে করিতে পুনশ্চ সে সুরু করিল, "সন্ধ্যা কি করেছে, জানিস্‌ ?—যেদিন থেকে 'দারিদ্র-নারায়ণের' কল্‌সী আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে, সেই দিন থেকেই ও গা-হাত খালি করেছে—দেখলি ওর অঙ্গে এতটুকুও সোনার কুচি ? সকলকে বোলে বেড়িয়েছে—যদি হারিয়ে যায়, তাই। কিন্তু ওর মনের বিপ্লব আমার কাছে গোপন থাকেনি, মলিন।" সহসা তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। গলা ঝাড়িয়া আবার আরম্ভ করিল—"ওর বিধি-নিষেধে গ্লানি ছিল না, দৈন্য ছিল না, থাক্‌লে আমরা এতগুলো পুরুষ-বাচ্ছা একটা অমন কম-বয়সী মেয়ের কথায় এমন কোরে মেতে উঠতাম না। মলিন, বৈষ্ণবের দান গ্রহণকে তুই যদি ভিক্ষাই বলিস্‌, তা'হলে বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভিক্ষুক গৌরাঙ্গদেবও তোর বিচারে পতিত। আর তা যদি না হয়, তা হলে সেই বৈষ্ণবের ঝুলিই কাঁধে নিয়েছিল সন্ধ্যা।"

ব্যাপারটা যে এত দূর গড়াইবে, তাহা মলিন বুঝিতে পারে নাই; অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "সন্ধ্যা যে রাগ করবে—"

"দূর—" ভাঁটু তাড়াতাড়ি জিব্‌ কাটিয়া বলিয়া উঠিল, "সন্ধ্যা রাগ করে না। ওর ভেতর রাগ-অভিমান বোলে কোনো পদার্থই নেই। রাগ-অভিমান করে কোন্‌ মেয়ে জানিস—যে দুর্ব্বল, যার ভেতর সর্ব্বক্ষণই অভাব-অনটন, যে মুহুর্মুহুঃ অপরকে লুট কোরে নিজেকে ভরিয়ে রাখতে চায় ! কিন্তু সন্ধ্যা সে-দলের মেয়ে নয়। ও দুর্ব্বলও নয়, অভাব-অনটনও ওর মধ্যে একটি ফোঁটাও নাই—ওর ভাণ্ডারে এত রত্ন যে, কতকগুলো বিলিয়ে দিতে পারলেই ও বাঁচে !" ভাঁটুর মুখখানা আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তেই আবার এক অস্বাভাবিক হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "রাগ কোরে সন্ধ্যা ঠক্‌বে না—সে-মেয়েই ও নয়। কিন্তু, ঠকলি তুই। আচ্ছা, 'গুড নাইট্‌'—" বলিয়াই ভাঁটু সকলকে ডাকিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

[ক্রমশঃ।

গোপাল ভাঁড়

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

৬

কেহ কেহ বলেন—গোপাল বিলাতে জন্মগ্রহণ করিলে **Knighted** হইতেন। দেশী ও বিলাতী ভাঁড়ের ঠোকাঠুকি এইখানে। বিলাত ও ভারতের মাঝখানে এত বড় কালো পর্দ্দা পড়িয়া গেল এ যুগে, 'অবোধ্য পাকিস্তানী মাহাত্ম্যে, তথাপি বিলাতী মোহ কাটিল না এত বড় আঘাতেও, এ বড় আশ্চর্য্য কথা! জ্ঞানানুশীলনে শুধু ও দেশটা কেন, সকল দেশ ও সকল জাতির ভাষা শিখিতে খুব রাজী; কিন্তু নহে নহে অন্য কিছু আর। বিসর্জ্জনের বাদ্যে বিদায়পর্ব্ব শেষ হইয়াছে; আবার বিলাতী সম্মানের আকাঙ্ক্ষা কেন? গোপাল গোপালই থাকুন, তাঁহাকে আর বিলাতী ভাঁড় করিয়া লাভ নাই। তবে সেক্সপিয়ারের দেশকে চিরদিন শ্রদ্ধা করিবে আমার দেশ। কারণ, ওদের ভাষাতেই আন্দোলন করিয়া, বিক্ষোভ দেখাইয়া আমরা কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিয়াছি। এই সময়ে গোপালের মত এক জন গোপাল থাকিলে ত্রিবর্ণ ও গৈরিক পতাকা-তলে দণ্ডায়মান ক্লান্ত-দেহ অবসন্ন-মন কর্ম্মিগণ বোধ হয় বেশ তাজা হইয়াই উঠিতেন।

আর একটা কথা এই সঙ্গে কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে। সে পূর্ব্বপুরুষ চাণক্য-বুদ্ধি ভবানন্দ রায় মজুমদার। বঙ্গের শেষ বীর রাজাধিরাজ প্রতাপাদিত্যের ধ্বংসের মূলে ভবানন্দের বিশেষ হাত ছিল দিল্লীশ্বরের সেনাপতি রাজা মানসিংহের দক্ষিণ-হস্ত হওয়ায়। কথাটা যখন ঐতিহাসিক সত্য, তখন তাহা তর্ক-যুক্তিতে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা অন্যায় এবং বৃথা। তবে এইটুকু মাত্র বলা চলে, রাজনীতির পথ কণ্টকময়। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যিনি সে পথে চলিতে চান, সাধারণ ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করিতে বসিলে আকাঙ্ক্ষী উদ্যোগী পুরুষের কাজ চলে না। অভিমতবিশেষে রাজনীতির মধ্যে ধর্ম্মের স্থান নাই। সেখানে জোর যা'র, মুলুক তা'র।

এই সঙ্গে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও মহারাজা নন্দকুমার, রাজা নবকৃষ্ণ ও নবাব সিরাজদ্দৌলা এবং এই ছাপের অনেকের কথাই উঠিবার সম্ভাবনা। সে সম্বন্ধে যুক্তি-তর্ক ও অভিমত বোধ হয় একই রকমের হইবে। এ শ্রুতিলিখন মাত্র হাতিশুঁড়োর কলমে। দাঙ্গা করিতে হয়, বেদব্যাসের সঙ্গে করাই উচিত।

সে যাহা হউক, ভগবৎকৃপায় কৃপান্বিত না হইলে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র দশের প্রিয় দেশের প্রিয় হইয়া যে রামরাজত্বের সৃষ্টি করিতে পারিতেন না, এ কথা খুব জোর করিয়াই বলা চলে। সে যুগ লর্ড ক্লাইবের যুগ। মুসলিম-প্রভাব কমিয়া আসিলেও সেদিক হইতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আশঙ্কা খুব অল্প ছিল না। তবে সে সংগ্রাম 'লড়কে লেঙ্গে'র মত নহে। তখন ইউ এস মার্কা ছোরাছুরি গুপ্ত ঘাতকের দ্বারে দ্বারে বিতরিত হইত না কোনো এক সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করিবার প্রয়াসে। তবে তেঁতুল মিষ্ট নহে প্রাকৃতিক নিয়মে। তদ্ধেতু গোলযোগ ঘটার অভাব হইত না কারণ বা অকারণে। কৃষ্ণচন্দ্রকে তাল সামলাইতে হইত কালের তালে পা ফেলিয়া। আর সেই তালে তাল দিতে হইত বেচারা গোপালকে। পঞ্চরত্নের অন্যান্য রত্ন কাব্য বা সাধন-মার্গে সাধন-প্রদীপ দেখাইয়াই ছুটি পাইতেন।

প্রবাদ—সিদ্ধ-সাধক রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাইয়ের সম্বন্ধ ছিল অহি-নকুলের।* কবির লড়াই চলিত তাঁহাদের মধ্যে। বিগতাত্মা বন্ধুবর পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি গোঁসাইজীর তারিফ করিতেন পঞ্চমুখ হইয়া। আমি তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতাম—"পণ্ডিত, তোমার সমালোচনার ধারা বোধ হয় প্রভুপাদের পাদমূল থেকেই পাওয়া।" এ রঙ্গে যোগদান করিতেন কবি অক্ষয় বড়াল, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, এটর্ণী-প্রবর রাজচন্দ্র চন্দ্র ও অন্যান্য বহু বন্ধু-বান্ধব। বহু ভাষাবিৎ হরিনাথ দে-ও এ বৈঠকে যোগদান করিতেন। বৈঠক চলিত স্বনামধন্য এটর্ণী স্বর্গত গণেশ-চন্দ্র চন্দ্রের গৃহে—রাজচন্দ্র ওরফে গোঁড়া বাবু—কিরণ বাবুর বৈঠক-খানায়। অপ্রাপ্তবয়স্ক নির্ম্মলচন্দ্র ও কমলচন্দ্র ছুটিয়া আসিত হাসির তাণ্ডবে চমকিত হইয়া। কবেকার কথা কবে আসিয়া গড়াইল কোথাকার জল কোথাকার মত!

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, সাধক কবি রামপ্রসাদের সহিত আজু গোঁসাইয়ের যে এমন লড়াই চলিল, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাহা নিবারণ করিতেন না কেন? কেহ কেহ মন্তব্য প্রকাশ করেন, এই দ্বন্দ্বাগুনে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেন কূটবুদ্ধি গোপাল। গোপাল-বুদ্ধিতে মহারাজাও হয়ত তাহাতে যোগদান করিতেন।

কথাটা অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখা যাইতেছে না। কবি ও কাব্যের দ্বন্দ্বে রস-প্রপাত উপভোগ্য। গোপাল যদি সে নাটকে নারদের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা অযৌক্তিক হয় নাই। তাহার বিপরীত হইলে বরং তাহা অশোভন, অসুন্দর ও অস্বাভাবিকই হইত।

এখন কথা হইতেছে, সমালোচনার কশাঘাতে আজু গোঁসাই ও রামপ্রসাদের মধ্যে মনান্তর ঘটিয়াছিল কি না এবং গোপাল আয়াগো (Iago)-চরিত্রের অভিনয় করিয়াছিলেন কি না? ইহার উত্তরে বলা যায়, রামপ্রসাদ ছিলেন ভাবুক কবি ও সাধক। তাঁহার অহংটা মুছিয়া গিয়াছিল কৈবল্যদায়িনী শ্যামার কৃপায় ও মাতৃমন্ত্রের শক্তিতে। গোঁসাই প্রভুও ছিলেন রসরাজ সমালোচক। পরস্পরের উত্তর-প্রত্যুত্তরের ভাবধারায় মনে করিতে পারা যায়, মতান্তরে তাঁহাদের মনান্তর ঘটে নাই আদৌ। সুতরাং গোপাল সসম্মানে রেহাই পাইলেন ভীষণ অভিযোগ হইতে এবং মুক্তিলাভ করিলেন আয়াগো-চরিত্রের কলঙ্ক হইতে।

কিন্তু যে রামপ্রসাদের সঙ্গীতধারায় পাগল হইয়া উঠিয়াছিল সারা দেশ; যাঁহার স্বর-লহরীতে আকৃষ্ট হইয়া নবাব সিরাজদ্দৌল্লাকেও দাঁড়াইতে হইয়াছিল উৎকর্ণ হইয়া; খর্পর-করা ভয়ঙ্করা, নৃমুণ্ডমালিনী কালী করালিনী যাঁহার সাধনা ও গানের সুরে বাঁধা পড়িয়াছিলেন ভক্ত-গৃহে; মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, কবি ভারতচন্দ্র ও গোপাল প্রভৃতি যাঁহাকে দেখিতেন শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করিতে আজু গোঁসাই কোমর বাঁধিয়াছিলেন কোন্ সাহসে? হিংসাবশে আজু

গোঁসাই এ কায করিলে নিস্তার পাইতেন না কোনো মতেই। দেবতার অভিশাপ ও দেশের লোকের তাড়নায় গোঁসাই প্রভু হইতেন অতিষ্ঠ। সুতরাং এ সমস্যার সিদ্ধান্ত—রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাইয়ের মধ্যে যাহা ঘটিত, তাহা "রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব" নহে।

গোপাল ছিলেন বিদূষক-চরিত্র। ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আত্মগোপন। এ চরিত্রের মানুষ সাধু-প্রকৃতিরই হইয়া থাকেন এবং প্রেম, করুণা, সদালাপ, লোকহিতৈষিতা, আনুগত্য তাঁহাদের গুণ ও ধর্ম। এ সকল গুণ হইতে গোপাল বঞ্চিত ছিলেন না। রস পরিবেশনে তাঁহার ছিল অসাধারণ নৈপুণ্য ও কৃতিত্ব।

গোপাল মুখে বলিতেন—রামপ্রসাদের শক্তিপূজায় তাঁহার তেমন আস্থা নাই। কিন্তু মনে মনে ছিলেন তিনি শক্তি উপাসক এবং রামপ্রসাদের অনুরাগী ভক্ত। এ অনুরাগ সত্ত্বেও আজু গোঁসাইয়ের আক্রমণ হইতে রামপ্রসাদকে রক্ষা করিতে তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ অঙ্গুলীও উত্তোলন করিতেন না। তাঁহার ধারণা ও বিশ্বাস ছিল, সাধক রামপ্রসাদ নিজেকে নিজে রক্ষা করিতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সমর্থ কালীনামে দিয়ে ব্যাড়া। মহারাজারও ছিল সেই বিশ্বাস। মহারাজার বিশ্বাসেই গোপালের বিশ্বাস।

"রামপ্রসাদ" নাটক, সুপ্রসিদ্ধ "কালিকা" থিয়েটারে সমারোহে ও কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে ও নির্ব্বন্ধাতিশয্যে "রামপ্রসাদের" অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। আজু গোঁসাইকে সেখানে দেখিতে পাই নাই। "কালিকার" প্রাণস্বরূপ শ্রীমান্ রামচন্দ্র চৌধুরীকে চিম্‌টী কাটিয়া কথাটা বলিয়া আসিয়াছিলাম। "দাদুর" চিম্‌টী নিদ্রালু রামচন্দ্রকে সজাগ করিয়াছিল। গোপাল ও অন্যান্য ভূমিকা সম্বন্ধেও নানা মন্তব্য করিয়া আসিয়াছিলাম। নাটককারও উপস্থিত ছিলেন মন্তব্য অভিমত প্রকাশের কালে। আমার প্রস্তাব তাঁহাদের ঔদার্য্যের গুণে সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। গোপাল ভাঁড় সম্বন্ধে নাটক রচনাটাও বিচারাধীন করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলাম। নাটকীয় মাল-মশালা গোপালচরিত্রে অনেক আছে। কিন্তু তাহা সংগ্রহ করা খুব কঠিন। তবে কথা—রামচন্দ্রের জয়যাত্রায় সাগর বন্ধন হয়, আর চৌধুরী রাম গোপালকে পাকড়াও করিয়া রঙ্গমঞ্চের উপর নায়ক খাড়া করিয়া দিতে পারিবেন না কি?

"খেলাঘর" নাটকের উদ্বোধন কালে মহামান্য কলিকাতা হাই-কোর্টের তিন জন বিচারপতি উপস্থিত ছিলেন রঙ্গমঞ্চের উপর খেলাঘরের বিচার করিতে। আমার স্থান হইয়াছিল তাঁহাদের পাশে বক্তৃরূপে। বক্তৃতা প্রসঙ্গে রামপ্রসাদের নামোল্লেখ করিয়াছিলাম শ্যামা মায়ের রং-এর খেলায় খেলুড়েরূপে। তাহার কিছু দিন পরেই "রামপ্রসাদের" অভিনয় দেখা গেল "কালিকায়"। "রামপ্রসাদ" অভিনয় দেখিতে যাইয়া গোপালের নামটা খুব সন্তর্পণে করিয়া আসিয়াছিলাম। ডাক্তার হীরালাল দত্ত দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন সেদিনের অভিনয়-ক্ষেত্রে। কিন্তু সাক্ষ্য দিতে নাই আর হীরালাল গোপালের কথা বলিতে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার লক্ষ্য-বস্তু হইয়া হীরালাল এমন জায়গায় চলিয়া গিয়াছেন এখন, যেখানে অস্ত্রের আঘাত অথবা বিষ স্পর্শ করে না লোকান্তরিতকে। হায় হীরালাল, ত্রিতলে দাঁড়াইয়াও তুমি আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইয়া সাক্ষ্য দেওয়ার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলে, কিন্তু দেশ আজ গোপালহারা। সন্তপ্তের অনলবর্ষী অভিশাপ অভিশপ্তকে কোন্ নরকে দহন করিবে, সে সংবাদ বহন করিয়া আনিবার লোক নাই অবশ্য। কিন্তু এ কথা নিশ্চয়, সহজ জ্ঞানে অকারণে হত্যাপরাধী কোন দিনই নিস্তার পায় নাই অদৃশ্য হস্তের কঠিন শাসন হইতে। সেক্‌সপিয়র তাহা দেখাইয়াছেন ম্যাক্‌বেথের চিত্রে। চণ্ডাশোককেও ধর্ম্মাশোক হইতে হইয়াছিল রক্তনদী অবলোকনানন্তর। অন্যায়ের প্রতিকারে ব্রুটাসও জুলিয়াস সিজারকে অন্তর্হিত করিয়াছিলেন মরধাম হইতে।

গোপালের এ সকল কথা ও কাহিনী হয়ত জানা ছিল না সেকালের লেখাপড়ায়। কিন্তু যেটুকু বিদ্যা তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে এ জ্ঞান তাঁহার হইয়াছিল, অন্যায় করিলে, দুর্ব্বুদ্ধিবশে অত্যাচার করিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্তের কড়ি গণিয়া দিতে হয় কড়ায়-গণ্ডায়। ইহার আর কেন, কি বৃত্তান্ত নাই। এই বুদ্ধিবশে চলিতেন বলিয়াই রাজদ্বারে ও সমাজে অবস্থার অনুরূপ মর্য্যাদা পাইতেন তিনি। তাঁহার সহিত কাহারও মর্মান্তিক বিবাদ বিসম্বাদের কাহিনী কাহারও মুখেই শুনিতে পাওয়া যায় নাই—সেকালেও আর একালেও। গোপাল সে স্বভাবের হইলে রসের পরিবেশন কিছুতেই করিতে পারিতেন না তিনি। উদারচেতা না হইলে মানুষকে আনন্দ দেওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

রাখী-বন্ধন

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

মিলাইয়া জনে জনে মিলনের রাখীবন্ধে সবে
পাকাইয়া প্রেমসূত্র পাশাপাশি বাঁধহ মানবে।
সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা ত্রিবর্ণের জয়ধ্বজা রথে
তদুপরি জগন্নাথ প্রতিষ্ঠিয়া বিশাল ভারতে,
হিমাদ্রি সিন্ধুর মাঝে যে বিরাজে ক্রোড়ে তার আছি
নারী-নরে যুগ্ম করে টানো ধ'রে সে রথের কাছি,

মানো ধন্ধ টানো রথ সকলের সাথে এক প্রাণে
এক মহাজাতি মোরা মিলিয়াছি সমন্বয় গানে।
নির্ভীক ভৈরবী চক্রে পান করি প্রাণ-মদিরায়
দেশ মহাপাত্রে ঢালি, শুদ্ধ করি দুগ্ধ সমতায়,
কর দান কর পান নর নারী অধরে অধরে
মারো টান রথচক্র অবিশ্রাম ছুটুক ঘর্ঘরে।

সমুখে মুক্তির তীর্থ পুরুষোত্তমের পানে চাহি—
অধমে উত্তমে চলি—কুতূহলী ভেদ নাহি নাহি।

ছোটদের আসর

জ্যাকোবাবাদে দার্জিলিং

মনোজ সান্যাল

প্রবন্ধের নাম দেখে নিশ্চয়ই তোমরা খুব হাসছো,—নয় কি? ভাবছো, এ আবার কি আজগুবি কথা! অনেকে হয়তো এ ও ভাবছো, নিশ্চয়ই লোকটা পাগল। নয়তো নিরেট মুখ্যু; ভূগোলের সাধারণ জ্ঞানটুকুও নেই। ওর চেয়ে আমাদের সাথী, মুক্তি, চানুবা ঢের ঢের বেশী জানে।

একশো বছর আগে হোলে তোমরা অবশ্য আমায় বোকা বানাতে পারতে, কিন্তু আজকাল আর পার না। বিজ্ঞানের যুগ যে এটা, ভুলে যাচ্ছ কেন সে কথা? বৈজ্ঞানিকদের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। তাঁদের মগজ বুদ্ধিতে বোঝাই। তাঁরা শুধু ভাবেন: কি ক'রে আমাদের আরামে রাখবেন, কিসে আমাদের সুবিধে হবে, এই সব। তাঁদের বুদ্ধির কাছে প্রকৃতিও হার মেনেছেন। তাই আজ গোটা পৃথিবীটা চ'লে এসেছে আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে। ভৌগোলিক পাঁচীল দিয়ে তাকে আর টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে রাখা সম্ভব নয়। এমন কি দুরন্ত যে ঋতু সেগুলোও পর্য্যন্ত পোষা বেড়ালের মত হ'য়ে গেছে! ডাকলেই কাছে আসে। কামড়াতে পারে না একটুও।

কি ক'রে এই ছয় ঋতুকে পোষ মানান সম্ভব হোয়েছে সেই কথাই আজ তোমাদের বলবো। পড়তে পড়তে মনে হবে, ঠিক যেন হারুণ-অল্ রসিদের গল্প।

তোমরা সকলেই জান দার্জিলিং খুব ঠাণ্ডা। আর সিন্ধু প্রদেশের জ্যাকোবাবাদ শহরটি তেমনি আবার ভারতবর্ষের মধ্যে গরমের রাজা। যে কোন দিন খবরের কাগজের পাতা ওল্টালেই আমার কথা বিশ্বাস হবে। দেখবে, জ্যাকোবাবাদের টেম্‌পারেচার সব সময় চ'ড়েই আছে। নামবার নামটিও নেই। কি এক বিদ্‌ঘুটে দেশ ভাব তো একবার! দিন-রাত শুধু শরীরটাকে ঠাণ্ডা রাখতেই ব্যস্ত; কাজ করবার সময় কোথায়? অথচ, সেখানেই ঘরে ব'সে তোয়ালে দিয়ে গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে তুমি যদি দার্জিলিংএর ঠাণ্ডার আমেজটুকু পাও তাহোলে তোমার আর স্ফূর্ত্তির সীমা থাকে না,—নয় কি? ওদিকে দার্জিলিংএ সাতখানা কম্বল মুড়ি দিয়েও যখন হাড়ের কাঁপুনি থামলো না, তখন যদি পুরীর চির-বসন্তের হাওয়া কিম্বা জ্যাকোবাবাদের গরম আর শিলংএর একটুখানি ঠাণ্ডা মেশান বেশ খানিকটা ফুরফুরে আবহাওয়া পাও, তাহোলে আর তোমার দার্জিলিং ছেড়ে পালাবার ইচ্ছে করে না একটুও। বরং জানলা দিয়ে বরফ-ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘার ধবধবে চূড়ার দিকে চেয়ে স্বপ্ন দেখ—পুরীর অসীম নীল সমুদ্রের। ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত লাগছে,—তাই না? আসলে কিন্তু তোমরা এটা অনেকেই উপভোগ ক'রেছ এবং লক্ষ্যও করেছ কেউ কেউ,—মেট্রো, লাইট-হাউস কিম্বা ঐ ধরণের বড় বড় সব সিনেমা-হলে। গরম কালে ওখানে পাখার বালাই নেই, —অথচ বেশ ঠাণ্ডা। আবার শীত কালে দিব্বি গরম। ছবি দেখতে একটুও কষ্ট হয় না দর্শকদের। তার কারণ, ঐ সব হলে 'এয়ার কণ্ডিশানিং' হয়েছে, অর্থাৎ কি না, ঘরের আবহাওয়া ইচ্ছে মত নিয়ন্ত্রণ করা হ'য়েছে।

'এয়ার কণ্ডিশানিং' বললেই সাধারণতঃ আমাদের মনে হয়, ঘরের ভেতরকার বাতাসের তাপ-নিয়ন্ত্রণের কথাটা অর্থাৎ তাপ কমান কিম্বা বাড়ানর কথাটা। আসলে কিন্তু জিনিষটা অত সোজা নয়। 'এয়ার কণ্ডিশানিং' বললে অনেক কিছুই বোঝায়! যেমন ধর,—বাতাসের তাপ-নিয়ন্ত্রণ, বাতাসে যে জলীয় বাষ্প আছে তার পরিমাণ কমান কিম্বা বাড়ান, বাতাস-চলাচলের সুব্যবস্থা করা এবং বাতাসকে বিশুদ্ধ করা,—যাতে কোন দুর্গন্ধ কিংবা ধুলো বালি প্রভৃতি ময়লা না থাকে। মোট কথা, 'এয়ার কণ্ডিশানিং' বললে এই বোঝায় যে ঘরের আবহাওয়াকে সব দিক থেকে আরামদায়ক এবং স্বাস্থ্যের উপযোগী করে তোলা।

তোমরা অনেকেই শুনেছ এবং পড়েছ যে, অনেক সময় মানুষের দেহটাকে তুলনা করা হয় ইঞ্জিনের সঙ্গে। ইঞ্জিনের যেমন কয়লার দরকার আমাদেরও ঠিক তেমনি চাই খাদ্য। আমরা রোজ যে খাবার খাই সেইটাই ভেতরে গিয়ে কয়লার মত জলে আর তাই থেকে আমরা পাই শক্তি। দিন-রাত চলে এই দহন-ক্রিয়া, আর তার ফলে ভেতরে যে খুব তাপের সৃষ্টি হবে সেটা তো জানা কথা। যত বেশি আমরা পরিশ্রম করি তত বেশী হয় দহন-ক্রিয়া আর তত বেশী হয় তাপের সৃষ্টি। অথচ যখনই গায়ে হাত দাও তখনই দেখবে, গায়ের তাপ কিন্তু একই ভাবে আছে। এটা কেমন করে হয়? খুব সোজা: শরীরের বাড়তি তাপটুকু ছড়িয়ে পড়ে বাইরে আর সেটুকুকে টেনে নেয় চার পাশের বাতাস। তবে সেই বাতাসেরই উত্তাপ যদি বেশী থাকে, তাহোলে শরীরের তাপ টেনে নেবার ক্ষমতাও তার কমে যায়। এর দরুণ হয় কি শরীরের তাপটুকু আর বাইরে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। ফলে আমাদের অসুবিধে হয় খুবই।

এ ছাড়া তোমরা সবাই জান যে, বাতাসে সব সময়ই কিছুটা জলীয় বাষ্প থাকে। সূর্য্যের তাপে নদী-নালা থেকে বাষ্পাকারে জল উঠে গিয়ে বাতাসে জমা হয়ে থাকে। এখন, বাতাসে যদি জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুব বেড়ে যায় তাহোলে আরো বেশী জলীয় বাষ্প ধারণ করবার ক্ষমতা আর তার থাকে না। তখন আমাদের কি অবস্থা হয় ভাবতো? গায়ের ঘাম শুকোয় কি করে? বৈজ্ঞানিকরা

পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন,—একটা লোকের শরীরের বাড়তি তাপ-টুকুর শতকরা ৪৬ ভাগ দূর হয় বাতাসে ছড়িয়ে প'ড়ে আর ২৪ ভাগ দূর হয় বাষ্পাকারে ঘাম শুকোনোর ফলে। এই সব ব্যাপার থেকেই তোমরা মোটামুটি বুঝতে পারছো যে, চার পাশের বাতাসের সঙ্গে আমাদের শরীরের কতখানি ঘনিষ্ঠতা রয়েছে আর কতখানি আমাদের নির্ভর করতে হয় তার ওপর। তবেই দেখ, 'এয়ার কণ্ডিশানিং' যে শুধু একটা বিলাসিতা, তা' নয়। স্বাস্থ্যের দিক থেকেও নেহাৎ দরকারী।

এ তো গেল আরাম এবং স্বাস্থ্যের কথা; ওদিকে ব্যবসা, বাণিজ্য এবং শিল্পের দিক থেকে দেখতে গেলে 'এয়ার কণ্ডিশানিং' নিতান্ত প্রয়োজনীয়; ব্যবসার উন্নতি ক'রতে গেলে ব্যবসায়ীকে সব সময়ই নজর রাখতে হয় জনসাধারণ কিসে সন্তুষ্ট হয় সেই দিকে! তাই আজ বড় বড় আপিস থেকে শুরু করে হোটেল, সিনেমা, রেষ্টুরেণ্ট, এমন কি ট্রেণের কামরাগুলোয় পর্য্যন্ত 'এয়ার কণ্ডিশানিং'এর ব্যবস্থা হ'য়েছে।

রাজপুতানার মরুভূমির ভেতর দিয়ে ট্রেণ চলেছে বোশেখের কাঠ-ফাটা রোদ্দুরে। দামী টিকিট কিনে তুমি বসেছ সব চেয়ে ভাল কামরায়,—যেটাতে আছে আলাদিনের প্রদীপের মত মজার কল লাগান। চোখ বুজে ভাবছো: তুমি চলেছ ফাল্গুনের শস্য-শ্যামলা বাংলার ভেতর দিয়ে। কিন্তু চোখ খোল, দেখবে তোমার চার পাশে সীমাহীন ধূসর মরুভূমি,—জনপ্রাণী নেই কোথাও। থাকবে কি করে? বালি-তাতান আগুনে-হাওয়ায় কি কেউ বেরোতে পারে কখনও? অথচ এতটুকু আঁচও লাগছে না তোমার গায়ে! ব্যাপারটা ভূতের গল্পের মত আজগুবি মনে হচ্ছে,—তাই না?

শিল্পে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ যে কত বেশী দরকারী তা লিখে শেস করা প্রায় অসম্ভব। দু'-এক পাতায় আর কুলোবে না। পাতার পর পাতা লেগে যাবে। তাই খুব ছোট্ট ক'রে কয়েকটা কথা বলি শোন।

কাগজের কারখানায় 'এয়ার কণ্ডিশানিং' খুব দরকারী। কাগজ তৈরির সময় বাতাসে যদি বেশী জলীয় বাষ্প থাকে তাহোলে কাগজ সেটা ব্লটিংএর মত শুষে নেয়। আর মোটা হ'য়ে খারাপ হ'য়ে যায়। আবার জলীয় বাষ্প খুব কম থাকলে কাঁচা অবস্থায় কাগজটা চট্ ক'রে শুকিয়ে ওঠে। ফলে তার ধারগুলো যায় বিশ্রী ভাবে কুঁকড়ে।

খনি যখন প্রথম খোলা হয়, তখন তার ভেতরটা যে কি পরিমাণ গরম থাকে তা' বোধ হয় তোমাদের অনেকেরই ধারণা নেই। এক-একটা তামার খনির তাপ হয় ১৫০ ডিগ্রী। ফুটন্ত জলের চেয়েও দেড় গুণ বেশী গরম। উঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার ভাবতো একবার? মানুষ তার ভেতর কাজ ক'রবে কি ক'রে? আগেকার দিনে তাই খনির ভেতর কমসে-কম তিনটি বছর ধ'রে হাওয়া চালিয়ে তবে সেটাকে ঠাণ্ডা করা হোত। তবে আজকাল 'এয়ার কণ্ডিশানিং'এর দৌলতে এক মাসের কমেই খনিকে জুড়িয়ে জল ক'রে ফেলা হয়। ব্যস্, অমনি চট্ ক'রে শুরু হয় তামা তোলার কাজ।

যে সব কারখানায় ঘড়ি, এরোপ্লেনের ছোট ছোট কল-কব্জা কিম্বা ঐ ধরণের অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরি হয় সেই সব কারখানায় 'এয়ার কণ্ডিশানিং' খুবই দরকারী, নইলে অসুবিধে হয় অনেক। মনে কর, কোন শ্রমিক চুলের মত সূক্ষ্ম একটা যন্ত্র তৈরি করছে। কারখানার গরমে সে বেচারী ঘেমে উঠেছে। তার আঙ্গুলের ঘাম লাগলো যন্ত্রে। সে কিন্তু টের পেল না কিছুই। অথচ কিছু দিন না যেতেই মরচে ধরে যন্ত্রটা হ'য়ে গেল অকেজো। তা ছাড়া এমনও হয়: ধর দার্জ্জিলিংএর কারখানায় তৈরি-করা একটা যন্ত্র জ্যাকোবাবাদে যেই নিয়ে গেলে কিছুতেই আর সেটা ফিট্ করলো না। ক'রবে কি ক'রে? গরমে যে সেটা বেড়ে গেছে। এমন অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্র আছে যেগুলো ১ ডিগ্রী তাপের কম-বেশীতে ছোট-বড় হয়ে যায়।

এ ছাড়াও 'এয়ার কণ্ডিশানিং' দরকার রেশম-শিল্পে, লিথো-গ্রাফিতে, ছাপার কাজে, হসপিটালে, এবং আরোও অনেক জায়গায়।

এতক্ষণ 'এয়ার কণ্ডিশানিং'এর গুণের কথা অনেক বললাম। আর নয়। এবার বরং কি ক'রে ওটা করা হয় তাই বলি। ব্যাপারটা খুবই জটিল, তবু যা হোক মোটামুটি একটা ধারণা হবে। বড় হোলে অনেক শিখবে।

প্রথমে একটা ফ্যানের সাহায্যে বাইরের কিছুটা বাতাসের সঙ্গে ভেতরের বাতাস মেশান হয়। তার পর সেই বাতাসকে ইচ্ছে মত গরম কিম্বা ঠাণ্ডা করা হয়। গরম ক'রতে হোলে বাতাসকে চালান করে দেওয়া হয় 'হিটারে।' 'হিটারে' অনেকগুলো প্যাঁচান প্যাঁচান পাইপ থাকে আর তার ভেতর সব সময় ফুটন্ত জলের বাষ্প চলাচল করে। ফলে বাতাসটা গরম হয়। ঠাণ্ডা করতে হোলে বাতাসকে পাঠান হয় 'কুলারে' অর্থাৎ 'রেফ্রিজারেটারে'। শেষের কথাটা নিশ্চয়ই তোমরা জান। দেখনি, বড় বড় খাবারের দোকানে দই রাখে 'রেফ্রিজারেটারে?' 'কুলারে'র ভেতর একটা আবদ্ধ পাত্রে সালফার-ডাই-অক্সাইড কিম্বা ফ্রিয়ন গ্যাস থাকে। এই গ্যাসকে খুব চাপ দিয়ে ছুঁচের মত সরু ছিদ্রপথ দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। গ্যাসটা বাইরে এসে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তার তাপ যায় কমে। যেমন ফুটবল ব্লাডার থেকে হাওয়া বেরোবার সময় হাওয়াটা ঠাণ্ডা লাগে। আবার সেই ঠাণ্ডা গ্যাসকে ঐ রকম চাপ দিয়ে ঠেলে দেওয়া হয়। এই ভাবে চলাচল করে গ্যাসটা ক্রমশঃই ঠাণ্ডা হতে থাকে। আর এরই ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডা হয় আমাদের বাতাস।

জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়াতে হোলে বাতাসকে পাঠান হয় আর এক জায়গায়। সেখানে শক্ত একটা ধাতুর প্লেটের ওপর সরু পিচকিরির মত জল ছোঁড়া হয়। প্লেটে ধাক্কা খেয়ে জলটা গুঁড়িয়ে যায় ছোট ছোট কণায়, তখন আর তাকে দেখাই যায় না। বাতাস এই অদৃশ্য জলকণাকে বহে নিয়ে যায়।

বাতাসের ময়লা দূর করার কাজ খুবই সোজা। আমরা যেমন ক'রে জল পরিষ্কার করি ফিল্টার করে, অনেকটা তেমনি। তবে কাগজের ছাঁক্‌নীর বদলে পশুর লোম, তুলো কিংবা রেশমের আঁশ, এই সব ব্যবহার করা হয়। তবে দুর্গন্ধ থাকলে বাতাসকে আবার আর এক রকম ছাঁক্‌নীতে পাঠান হয়। সেখানে থাকে নারকোলের মালা পোড়ান কয়লা। বাতাসে যে সব বদ্ গ্যাস থাকে সেগুলোকে শুষে নেয় সেই কয়লা।

আজকাল 'এয়ার কণ্ডিশানিং' এর অনেক উন্নতি হয়েছে, এবং ভবিষ্যতে আরো হবে। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, এমন দিন না কি আসছে যেদিন আমাদের সকলেরই ঘরে ঘরে হবে 'এয়ার কণ্ডিশানিং'এর ব্যবস্থা। আর আমরা আমাদের খেয়াল মত ভোগ করবো নানান্ রকম আবহাওয়া। জ্যাকোবাবাদে বসে বসে খাবো দার্জিলিংএর হাওয়া। সুইচ্ টিপে তাড়িয়ে দেবো দুষ্টু শীতকে আর আদর ক'রে ডাকবো বসন্তকে।

বন্ধুদের কবিতা

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

বন্ধু গো বন্ধু !
ঝলোমলো ঝলোমলো চঞ্চল কিশলয়, বন্ধু !
বয়েসের গাড়ীখান পাঁই-পাঁই ছুটছে :
মুঠো মুঠো বালি এসে দুই চোখে ফুটছে,
তোমাদের দলে তাই আর মোর নাম নেই—
তবু, ভাই, সমানেই চেয়ে আছি সামনেই ;
তোমরা যে-পথ সেধে দল বেঁধে চ'লছো :
যে-পথের প্রান্তে খুসী ভ'রে ট'লছো।
বন্ধু !
হে আমার প্রভাতের কচি-কচি কিশলয়, বন্ধু !

আমাদের দিন ত' অবসান—
মেঘে-মেঘে থম্‌থমে ম্রিয়মান ;
আমরা ত' জীবনের ভাঙা-রথে সওয়ারী,
তোমরা তুফান নও-জোয়ারী।
যেথা মোর হয়রান :
তোমাদের ময়দান
সেখানে আকাশ থেকে হঠাৎ যে নামলো—
আমাদের পথ যেই থামলো।

তবু, ভাই, আজো চাই তোমাদেরি সাথে হাত মিলাতে—
তোমাদেরি, মত, ভাই, মুঠো মুঠো ভালোবাসা বিলাতে ;
যারা গেছে বুড়িয়ে,
গেছে তারা ফুরিয়ে,
নেহাৎ সে পুরোনো।
পুরোনোকে ঘষি যদি নোতুনের শিলাতে—
আর কি গজায় পাতা সে সবুজ লীলাতে,
পাতাগুলি যে-গাছের মুড়োনো ?

তোমাদেরি জন্য—
আজো মোর সারা প্রাণ সংগ-অনন্য।
তোমাদেরি সংগে
ভারতে ও বংগে
নাও না আমাকে ভাই জোর ক'রে ছিনিয়ে—
'সব-পেয়েছির-দেশ' নিয়ে চলো চিনিয়ে।

ম্যাজিসিয়ানের শেষ খেলা

দেবকুমার ঘোষ

রাত সাড়ে নটায় মাদ্রাজ মেল থেকে নামলুম অমরদা রোড় ষ্টেশনে। সঙ্গে বাদল। যাব আমরা বারিপদায়। ময়ুরভঞ্জ ষ্টেটের রাজধানী বারিপদা।

ষ্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে খবর নিয়ে জানলুম, এখান থেকে রাত বারটায় বাস ছাড়ে। সেই বাসেই পঁয়ত্রিশ মাইল ছুটে রাত প্রায় আড়াইটের সময় বারিপদায় পৌছান যায়।

অগত্যা বাদলকে বললুম, 'ব্যাপার সুবিধে মনে হচ্ছে না। দেখছি সারা রাত্রিতে একটুও চোখ বুজতে পারব না।'

বাদল বলল, 'ঘাবড়াও মাত্‌। ষ্টেশনে বসেই আড়াই ঘণ্টা স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। এক রাত্রি ঘুমুতে না পেলেই বা কি হয়!'

বাদলের কথাগুলি শুনতে মন্দ লাগল না। আবার ষ্টেশনের মধ্যে ঢুকে একেবারে রেল-লাইনের পাশে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম।

রাত্রির ষ্টেশন। নিস্তব্ধ। সারি সারি কতগুলি ঝাউ গাছ মাথা উঁচু করে অন্ধকারে যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে রয়েছে। ঝাউ গাছের মাথায় মাথায় বাতাস বয়ে চলেছে সাঁ-সাঁ শব্দ জাগিয়ে।

রাত্রি। অন্ধকার আর অন্ধকার। অন্ধকার প্লাবিত হয়ে চলেছে চারি দিকে। যাত্রীরা যারা এসেছিল, তারা প্রায় সকলেই যে যার যাবার জায়গায় চলে গেছে। শুধু আমাদের মত দু'-এক জন যারা আছে, তারা ষ্টেশনের বিশ্রাম-ঘরে অপেক্ষা করছে।

ষ্টেশনের এক পাশে দৃষ্টি পড়তেই বাদলকে বললুম, 'ওখানে কিসের আলো জ্বলছে রে, বাদল? দু'-এক জনের গলার স্বরও তো শুনতে পাচ্ছি?'

বাদল বলল, 'চল না, ওদিকেই পা বাড়ান যাক্‌।'

'চল্‌'।

গিয়ে দেখলুম, ছোট একটি চায়ের দোকান। ভেতরে একটি কেরোসিন তেলের টেমি জ্বলছে। এক পাশে একখানি ভাঙ্গা তক্তাপোস। তার একধারে কিছু খাবার সাজান রয়েছে। দোকানের একাংশে উনুনের উপর ছোট ড্রামে চায়ের জল চাপান আছে। তক্তাপোষের উপর অল্প জায়গা জুড়ে দোকানী ঝিমুতে ঝিমুতে জেগে থাকবার চেষ্টা করছে।

দোকানটি পাশে খুবই অপ্রশস্ত কিন্তু লম্বায় বেশ বড়। দোকানের প্রায় মাঝখানে খানকয়েক চেয়ার একটি পুরোন টেবিলকে কেন্দ্র করে পাতা। চেয়ারে বসে দু'জন ভদ্রলোক তৃতীয় এক ভদ্রলোকের কথা শুনছেন এবং কৌতূহল প্রকাশ করছেন। কথা-বলায় রত ভদ্রলোকের বেশ গোছগাছ চতুর চেহারা। ফুল-প্যান্ট ও শার্ট-কোট পরিধানে। হাতে ছোট একটি চামড়ার স্যুটকেশ। ভদ্রলোক ডান হাত নেড়ে খুব ভঙ্গী করে কথা বলছেন।

আমি ও বাদল দোকানের দরজার কাছেই বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলুম তাঁর কয়েকটি কথা। বলছেন, 'দেখুন, ম্যাজিক জিনিষটা শুধু বুদ্ধির খেলা। মাথায় বুদ্ধি হাতের কৌশল আর দু'-একটি অন্য কৌশল, এই নিয়েই আমাদের ম্যাজিসিয়ানদের সব কিছু।'

বুঝতে আর বাকী রইল না, ভদ্রলোক এক জন ম্যাজিসিয়ান।

বাদলকে বললুম, 'চল না ভেতরে, ভদ্রলোককে বাগিয়ে কয়েকটা খেলা দেখে নেওয়া যাবে'খন।'

দু'জনে দোকানের ভেতর গেলুম। কোনো দ্বিধা না করে আমরা দু'টো চেয়ার টেনে বসে পড়লুম।

দোকানদার আধ-জাগা অবস্থায় জিজ্ঞেস করল, 'কি দেব স্যার? চা,—রসগোল্লা,—সন্দেশ? কিছু দেব কি?'—বলতে বলতে দোকানী আবার একটু ঝিমিয়ে নিয়ে জাগবার চেষ্টা করল।

বললুম, 'শুধু দু' কাপ চা হলেই চলবে।'

ইতিমধ্যে ম্যাজিসিয়ান ভদ্রলোকের কথার স্রোত থেমে গেছে। ভাবলুম, ভদ্রলোকের সঙ্গে আমরাই সেধে আলাপ করব। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হ'ল না।

তিনিই প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন, 'মাদ্রাজ মেলে এলেন বুঝি আপনারা?'

বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোথায় যাবেন?'

'বারিপদা।'

'ও-হো-হো, সে তো যেতে হবে রাত বারোটার বাসে। মহা হ্যাঙ্গামা আর কি!'

'হ্যাঙ্গামা বৈ কি!—আপনি যাবেন কোথায়?'

'আমি?' ভদ্রলোক থামলেন। তার পর বললেন, 'আমি যাব অনেক দূরে, মানে সে আরও মুস্কিল।—মেঘাসন পাহাড় যেতে হলে যে কি মুস্কিল! এখান থেকে রাত তিনটের ছাড়ে বাস। এখন তিনটে পর্য্যন্ত বাসের ধ্যান করি আর কি।'

ভদ্রলোক হাসলেন।

হেসে বললুম, 'যখন উপায় নেই, তখন ধ্যান করা ছাড়া আর কি-ই বা করবেন!'

ভদ্রলোক বললেন, 'উপায় নেই বলেই তো নিরুপায়। আবার দেখুন কি হাঙ্গামার ব্যাপার,—রাত তিনটের বাসে চেপে ভোর ন'টায় গিয়ে পৌঁছুব। ব্যস্, পৌঁছেই আবার দেখাও খেলা। 'রেষ্ট' নেবার সময় পাব না একটুও। এ সব 'ট্রাবলসে'র মধ্যে কে যায় বলুন? কিন্তু না গিয়েও উপায় নেই। মেঘাসন পাহাড়েই 'ফরেষ্টে' মামা কাষ করেন। মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন ওখানে বসেই। মস্ত আয়োজন করেছেন। গান-বাজনা ইত্যাদিরও না কি খুবই ব্যবস্থা করেছেন। তাই আমাকে যেতেই লিখেছেন খেলা দেখাবার জন্ম। এখন মামার কথা তো ফেলতেও পারি না।'

বললুম, 'তা তো নিশ্চয়ই।' একটু থেমে কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করে, যদিও আগেই জানতুম ভদ্রলোক এক জন ম্যাজিসিয়ান, বললুম, 'খেলা দেখাবার কথা যে বললেন, কিসের খেলা?'

ভদ্রলোক বিনীত কণ্ঠে বললেন, 'আমি ছোট-খাট ম্যাজিক দেখিয়ে থাকি। কয়েকটি খেলা শিখেছিলুম এক বড় ম্যাজিসিয়ানের কাছ থেকে।'

আনন্দ প্রকাশ করে বললুম, 'তাই বলুন! তা হলে আর আমাদের ভাবনা কি! যে সময়টা হাতে আছে, আপনার কয়েকটা খেলাই দেখা যাক না।—কি বলিস্ বাদল?'

বাদলের দিকে তাকালুম।

বাদল বলল, 'বেশ বেশ, সে তো খুব ভাল প্রস্তাব।'

দোকানের অন্য দুই ভদ্রলোকও এ প্রস্তাব খুসী মনে সমর্থন করলেন। ম্যাজিসিয়ান হাসলেন। বললেন, 'তা হলে যে স্যুটকেশ-ফুটকেশ খুলে একাকার করতে হয়।'

বললুম, 'কষ্ট না হয় একটু করলেনই। দু' মিনিটের পরিচয়, এর পরে কে কোন্ দিকে পা বাড়াব তার তো ঠিকানা নেই।'

ভদ্রলোক এবার রাজী না-হ'য়ে পারলেন না। বললেন, 'আচ্ছা, যখন বলছেন, দু'-চারটে খেলা দেখাবার চেষ্টা করি।'

তিনি নিজেই একটি চেয়ার টেনে নিয়ে দোকানের ষ্টেশনের দিকের দরজার কাছে রাখলেন। আমরা বসে আছি কিছু দূরে দোকানের মাঝামাঝি জায়গায়।

ভদ্রলোক চেয়ারের উপর স্যুটকেশটি রেখে খুলে দু'টো ডিম বার করে নিলেন। বললেন, 'ম্যাজিক একটু দূর জায়গায় দাঁড়িয়ে না হ'লে দেখান অসুবিধে। কোনো কোনো খেলা তো কাছে দাঁড়িয়ে দেখানই যায় না। আচ্ছা, আমি এবার 'ডিম ও হাঁস' নামে একটি খেলা দেখাচ্ছি।'

বাদল আমার কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বলল, 'তুই কথা বলে লোককে বেশ বাগিয়ে নিতে পারিস্ বাস্‌।'

বাদলের গায়ে মৃদু আঘাত করে বললুম, 'খেলা তো দেখে নেওয়া যাবে। সময়টাও কাটবে বেশ, কি বলিস্?'

'ভাল কাটবে বলেই তো মনে হচ্ছে।'

ম্যাজিসিয়ান ভদ্রলোক বললেন, 'দেখুন, কি দেখছেন?'

সকলেই সমস্বরে বললুম, 'দু'টো ডিম।'

'বেশ। ডিম দু'টো কিসের?'

'হাঁসের।'

ভদ্রলোক ডিম দু'টোকে আমাদের দিকে ছুঁড়ে মেরেই হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'ডিম কোথায়?'

চেয়ে দেখি সত্যিই হাতে ডিম নেই। আমাদের দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলেন, কিন্তু এদিকেও ডিম আসেনি।

বিস্মিত হয়ে বললুম, 'ডিম গেল কোথায়?'

হেসে ভদ্রলোক বললেন, 'ডিম দু'টো ছুঁড়ে মারবার সঙ্গে সঙ্গেই দু'টো হাঁস হয়ে ফিরে এসে আমার পেটের ভেতর ঢুকেছে।'

সকলেই হেসে উঠলুম।

বললুম, 'হাঁস হয়ে গেছে? কই, বার করুন দেখি?'

'উঁহু। পেট চিরে কি আর বার করা যায়? আর ওরা ভয়ে বাইরে বেরুবেও না।'

বাদল বলল, 'তবে কি করে বুঝব যে সত্যিই হাঁস হয়েছে?'

'আচ্ছা বেশ! আপনি এদিকে চলে আসুন তো?'

ভদ্রলোক বাদলকে হাত ইসারা করে ডাকলেন। বাদল তাঁর কাছে এগিয়ে গেল।

ম্যাজিসিয়ান ভদ্রলোক বললেন, 'এসেছেন? বেশ। আমার পেটের এখানটায় দু'টো হাঁসই জড়াজড়ি করছে। একটু টিপুন তো?'

পেটের নিম্ন অংশ তিনি অঙ্গুলী নির্দেশ করে দেখালেন। বাদল ম্যাজিসিয়ানের পেটের সেই অংশে টিপ দিতেই দু'টো হাঁস একসঙ্গে প্যাক্-প্যাক্ করে উচ্চরবে ডেকে উঠল। পর-মুহূর্তেই হাঁসের ডাক যেন পেটের উপরের দিকে উঠতে লাগল। তার পর থেমে গেল।

সকলেই খুব একচোট হাসলুম।

ম্যাজিসিয়ান বললেন, 'হাঁস দু'টো চাপ খেয়ে বুকের কাছে এসে হাবুডুবু হয়ে বসে আছে। আরও টিপলে বেরিয়েই আসবে দেখছি।'

বাদল বললে, 'একটু টিপে দেখি তা হলে।'

বলেই বাদল ম্যাজিসিয়ানের পেট আবার টিপে ধরল। অমনি দু'টো হাঁস ভীষণ প্যাক-প্যাক করতে করতে যেন বাইরে বেরিয়ে এল।

ম্যাজিসিয়ান বললেন, 'এই যে, আপনার পেটের ভেতর ঢুকে গেছে।'

বাদল কৌতূহলী চোখে নিজের পেটের দিকে তাকাতে লাগল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে নিজেই নিজের পেটে দু'-চার বার গুঁতো মেরে নিরাশ হয়ে বলল, 'কই, এবার তো হাঁস ডাকছে না ?'

'উঁহু, হাঁস আর হাঁস নেই।' সকলের দিকে চেয়ে ম্যাজিসিয়ান বললেন, 'এই ভদ্রলোকের পেটের আবহাওয়াই এমন যে হাঁস দু'টো পেটে ঢুকেই ডিম বনে গেছে।'

বলেই বাদলের পেট জোরে টিপে ম্যাজিসিয়ান ভদ্রলোক পর পর দু'টো ডিম বার করে সকলকে দেখালেন।

সকলেই কৌশল দেখে বিস্মিত হলুম। বাদলও বিস্মিত কলেবর নিয়ে নিজের জায়গায় এসে পড়ল।

খেলাটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সবাই জেঁকে ধরলুম আর কয়েকটি খেলা দেখাবার জন্যে। ম্যাজিসিয়ান নারাজ হলেন না।

হাসিমুখে বললেন, 'আচ্ছা, আর একটা মজার খেলা দেখাচ্ছি। খেলাটা খুব ইনটারেষ্টিং। কি করে নোটকে রূপোর টাকায় পরিবর্ত্তন করে আবার নোটে ফিরিয়ে আনতে হয় আমি সেই খেলা দেখাব।'

সকলে সোৎসাহে বললুম, 'এ তো বেশ খেলা !'

ম্যাজিসিয়ান নিজের পকেট হাতড়ে দেখে বললেন, 'ও-হো-হো, একটা জিনিষ ভুলে বাড়ী ফেলে এসেছি। আচ্ছা সে যাক— আপনারা কয়েকখানা নোট দিতে পারেন ? কিছু বেশী নোট হলেই খেলা দেখাবার সুবিধে।'

পকেটে হাত দিয়ে দেখলুম পথ-খরচা ও অন্যান্য খরচ বাবদ পকেটে দশ টাকার পাঁচখানি নোট ও কিছু খুচরা টাকা-পয়সা আছে। তার থেকে চারখানি দশ টাকার নোট এগিয়ে গিয়ে ম্যাজিসিয়ানের হাতে দিয়ে বললুম, 'এই নিন এবার দেখান। এ টাকায় হবে তো ?'

ম্যাজিসিয়ান বললেন, 'যথেষ্ট যথেষ্ট।'

আমি নিজের চেয়ারে এসে বসলুম।

ম্যাজিসিয়ান স্যুটকেশ খুলে কি যেন করে স্যুটকেশটি আবার বন্ধ করে রাখলেন। তার পর হাত উঁচু করে জিজ্ঞেস করলেন, 'হাতে কি দেখছেন ?'

সকলে জবাব দিলুম, 'কতগুলি নোট।'

'আচ্ছা বেশ।'

বলে নোট ক'খানি সশব্দে অন্য হাতে চেপে ধরেই আবার হাত উঁচু করে এক হাত থেকে অন্য হাতে অনেকগুলি রূপোর টাকা ঢেলে দিলেন। ঝন্-ঝন্ শব্দ হল। নোট কোথায়ও নেই।

আবার রূপোর টাকাগুলিকে চেয়ারের উপর ঢেলে দিয়ে কতগুলি নোট তুলে আনলেন। চেয়ার শূন্য। কোথায়ও রূপোর টাকা নেই।

ম্যাজিসিয়ান বললেন, 'কেমন লাগল ?'

বিস্মিত হয়ে আমরা ক্রমশই তন্ময় হয়ে পড়ছিলুম। যত দেখছি, ততই বিস্ময় বেড়ে যাচ্ছে !

বললুম, 'চমৎকার খেলা।'

ম্যাজিসিয়ান ভদ্রলোক বাঁ হাতে তার হাতঘড়ির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। বললেন, 'এবার আমি আর একটি খেলা দেখাব।' সকলে তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইলুম। দোকানের ভিতর টুঁ শব্দটিও নেই। মাঝে মাঝে দোকানী ঢুলছে আর টেমিটি বার বার দপ-দপ করে জ্বলে উঠছে।

ম্যাজিসিয়ান চোখ বুজে একেবারে অনড় হয়ে দাঁড়ালেন। যেন ধ্যানরত হলেন। অদূরে রেল-লাইন থেকে ট্রেণ আসার শব্দ পাওয়া গেল।

অন্য যে দু'জন ভদ্রলোক, তাদের ভেতর এক জন বললেন, 'পুরী প্যাসেঞ্জার আজ যেন তাড়াতাড়ি এল বলে মনে হচ্ছে ?'

অন্য ভদ্রলোক বললেন, 'তাড়াতাড়ি কোথায় ? রাত দশটা পঁয়ত্রিশে পুরী প্যাসেঞ্জার এখানে আসে। দশটা পঁয়ত্রিশ কি এখনও বাজেনি বলছ ?'

আবার দোকান-ঘর নীরব হল।

চোখ খুলে ম্যাজিসিয়ান বললেন, 'এবার আমি দেখাব অদৃশ্য হবার খেলা। খুবই শক্ত খেলা। আমাদের দেশে অল্প ম্যাজিসিয়ানই দেখাতে জানে। তবে কৌশল শিখতে পারলে খেলাটি সোজা।— খেলাটি হচ্ছে, মানুষ কি করে অদৃশ্য হ'য়ে আবার দৃষ্টির ভেতরে ফিরে আসে।'

আমরা বিস্ময়-কৌতূহলে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম।

তিনি চোখ আবার বুজলেন, তার পর চোখ খুলে আমাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'এবার আমি অদৃশ্য হচ্ছি।' ব'লে হাতের নোট ক'খানি পকেটে রেখে, স্যুটকেশটি এক হাতে তুলে নিয়ে ম্যাজিসিয়ান ধীরে ধীরে দোকানের বাইরে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

প্রথমটায় তন্ময় হয়ে আমরা বসেছিলুম। কিছুক্ষণ পরে যখন চমক ভাঙ্গল আমি আর বাদল যেন ঝাঁপ দিয়ে এসে ষ্টেশনে পড়লুম। পেছনে ভদ্রলোক দু'জনও ছুটে এলেন।

ইতিমধ্যে পুরী প্যাসেঞ্জার ষ্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য। সেই ভীড়ের মধ্যে কোথায়ও ম্যাজিসিয়ানকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

আবার পুরী প্যাসেঞ্জার চলতে সুরু ক'রে দিল। ষ্টেশন আবার নির্জ্জন হয়ে এল। নির্জ্জন ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আমার দশ টাকার নোট চারিখানির ম্যাজিসিয়ানের সাথে অদৃশ্য হবার কথা ভেবে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লুম। চলমান পুরী প্যাসেঞ্জারের এঞ্জিনের হুস্-হুস্ শব্দের সঙ্গে আমার দীর্ঘনিশ্বাস যেন আমাকে বিদ্রূপ করতে করতে দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে গেল।

গল্প হলেও সত্যি

মীনা মুখোপাধ্যায়

স্বদেশী আন্দোলনের যুগ, বাঙালীরা ঠিক করলো তারা আর সরকারী স্কুলে পড়বে না, এমন একটি জাতীয় কলেজ তারা প্রতিষ্ঠা করবে, সেখানে শুধু কেরাণী তৈরী না হয়ে সত্যিকারের মানুষ মানুষ হবে। কলেজ করবো বললেই ত আর করা যায় না ? বাড়ী-ভাড়া, অধ্যাপকের মাহিনা ও অন্যান্য খরচ চলবে কি করে? টাকা চাই।

চাঁদার খাতা ছাপা হলো, কিছু কিছু চাঁদা আদায় হলো, কিন্তু দু'-চার টাকায় ত কলেজ হবে না, লাখ লাখ টাকা চাই।

তা'হলে কি স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে ?

প্রথমে দিলেন—ময়মনসিংহের মহারাজ সূর্য্যকান্ত চৌধুরী এক লাখ। তার পর রাজা সুবোধ মল্লিক, ব্রজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী দিলেন।

শরত এল শেষে

শ্রীঅনাথকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভাঙ্গন-ধরা মাটির ঘরে
খোকন-সোনা দাওয়ায় বসে আপন মনে পড়ে,
বিশ্বকবির "বঙ্গে শরৎ"খানি।
নোতুন দিনের বাণী,
শস্য-ভরা সোণার বরণ মাঠ
হাস্যমুখর গাঁয়ের এ পথ-ঘাট;
উতল হাওয়া আসি
জাগিয়ে যে দেয় প্রাণের গোপন তান।
দোয়েল সাধে নোতুন সুরে গান
সবার মুখেই দুঃখ-নিশার শেষে উঠছে ফুটে হাসি।
তর সহে না আর
খোকন-সোনা তাই তো বারম্বার,
পুঁথি ফেলে ধূলার পরে ব্যাকুল হয়ে জানি
মাকে ডেকে শুধায় সে যে শরৎ কালের বাণী।
প্রশ্ন কত করে,
"আচ্ছা মা গো, তখন সবে আমরা অনাহারে
থাকব না ত আর?
এত দিনের এই যে হাহাকার
মিলিয়ে যাবে অনেক দূরে দুঃস্বপনের মত?"
প্রশ্ন শুনে চক্ষু করে নত
হাসির সুরে বেদন ঢাকি কহেন তাহারে,
"প্রার্থনা তোর জানাস্ বাছা দয়াল ঠাকুরে।
ওরে তাই যেন রে হয়
নোতুন দিনের স্পর্শে যেন তোদেরি হয় জয়।
দুঃখ-নিশার হয় যেন রে শেষ
সোনার বাঙ্গলা দেশ
কবির সুরে বিশ্ব-সভায় বাজাক তাহার বীণ।"
বোশেখের এই রৌদ্রে-পোড়া দিন
ফাটল ক্রমে ক্রমে।
অনেক জীবন ছিনিয়ে নিল ভীষণাকার যমে।
মরণ-পথে বাজিয়ে বাঁশি
বর্ষা আসি,
স্নেহের জলে ভিজিয়ে দিল ধরা।
দাওয়ায় বসে সুর করে সেই পড়া
তেমনি করে চলছে অব্যাহত।
জমাট-বাঁধা মনের স্বপ্ন কত
এবার পাবে সফলতার বাণী
আসছে শরত-রাণী
অনেক দিনের পরে।
পুঁথির পাতা জাপটে বুকে ধরে
মায়ের প্রাণে জাগায় আশা, জাগায় মনের বল।
গোপন করি চোখের অশ্রু-জল
ফুটিয়ে তোলেন হাসি।
শিউলি যবে ফুটল গাছে মৌমাছিরা আসি
বাঁধল সেথায় বাসা।
মরণ তখন করছে যাওয়া-আসা
খোকনদের ঐ ঘরে।
অনাহারে কাটিয়ে ক'দিন পরে,
অবশ দেহে খোকন-সোনা জড়িয়ে পুঁথি তার,
শরত কালের শুধায় বাণী আজকে বারম্বার।
পঁচিশ তারিখ পার না হতেই শেষে
মরণ-রাজার শমন হাতেই এসে
দূতেরা সব আঘাত করে দ্বারে।
মায়ের ও মুখ পরে
বারেক তুলে আঁখি;
চপল খোকন স্বর্গ পানে উঠল দোয়েল ডাকি।
স্বপ্ন তাহার বিফল হল ঝরল প্রাণের আশা।
বিশ্ব-কবির অপূর্ব সেই ভাষা
অপূর্ব সেই গান,
সফল হল দু'দিন পরে জাগল মধুর তান।
ভাবী কালের গাইতে আগমনী
মহাকালেই পড়ল ঢলে আধফোটা সেই মণি,
তারই দেহের পরে
শরত এলো বিজয়-রথে সেই সে মাটির ঘরে,
আজকে সে আর নাই
শুষ্ক পুঁথির উড়ছে পাতা আপন মনেই তাই।

দ্ব-শুদ্ধ তিন লাখ টাকায় কলেজের কাজ আরম্ভ হ'ল, কলেজ পরিচালনার ভার নিলেন ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী। কিন্তু সমস্যা হল কলেজের অধ্যক্ষ হবেন কে? যে-সে লোককে অধ্যক্ষ করলে ত চলবে না, প্রথম জাতীয় কলেজ, শিক্ষার দিক থেকে যিনি জাতির স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে পারবেন, সে রকম মনীষী চাই। তিন লাখ পুঁজি, মাইনেও বেশী দেওয়া চলবে না, সে রকম যোগ্য লোক মিলল না।

কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপা হল। পঁচাত্তর টাকা মাহিনার অধ্যক্ষ চাই—অবশেষে দরখাস্ত এলো।

কিন্তু যে-সে লোকের আবেদন নয়, স্বয়ং বরোদা কলেজের অধ্যক্ষ, বিলেতেই তিনি মানুষ, আই, সি, এস পরীক্ষায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, কিন্তু স্বদেশীভাবাপন্ন, সেই জন্য চাকুরী পাননি, বরোদার মহারাজা তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে, তাঁর নিজের কলেজের অধ্যক্ষের পদে সাড়ে সাত শত টাকা মাহিনায় নিযুক্ত করেন, কিন্তু বাঙালী জাতির সেবার জন্য পঁচাত্তর টাকা মাহিনায় তিনি স্বদেশ-জননীর কোলে ফিরে আসতে চান।

কোথায় সাড়ে সাতশো, কোথায় পঁচাত্তর! এ যুগে এমন ত্যাগ কেউ কোথাও দেখেনি, সবাই ধন্য ধন্য করে উঠলো। ঐ ত্যাগী যুবকটি কি চান, আমাদেরই বাংলা মায়ের কোলে জন্ম তাঁর, ঋষি শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

স্বাস্থ্যের সাধনা

শ্রীমনতোষ রায়

স্বাস্থ্য শিক্ষা সেবাই আমাদের স্বাস্থ্য-সাধনার প্রধান অঙ্গ, এই তিনের মিলন যখন দেহে হয় তখনই তার আনুসঙ্গিক কর্ম্মাদির উৎকর্ষ সাধিত হয়, যথা—ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা, সরলতা, অহিংসা, গুরুভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা ইত্যাদি। আমাদের স্বাস্থ্য-সাধনায় ফলবতী না হবার একমাত্র কারণ আর কিছুই না, মাত্র স্থৈর্য্য-ধৈর্য্য-সংযমের অভাব।

আমরা স্বাস্থ্যোন্নতির পরিকল্পনায় অগ্রসর হই, ক্ষণিক বাদেই অধৈর্য্যের প্রবলতায় পিছ-পা দিতে বাধ্য হই—যেহেতু আমাদের মন দুর্ব্বল, নানারূপ ভ্রান্ত ধারণায় সত্যকে মিথ্যার চোখে দেখি।

প্রথমত আমরা ইন্দ্রিয় সংযমে যত্নবান হতে পারলেই আহার-বিহার-নিদ্রায় সংযম স্বভাবতই আসবে, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রাদিজনিত রোগ, অতিভোজন এবং আলস্য অপব্যয়াদিসম্ভূত দারিদ্র্য ইত্যাদির প্রকোপ ক্রমশই বৃদ্ধি পায় এবং মনুষ্যত্ব লাভের বিঘ্ন ঘটায়। ইহা নিবারণের একমাত্র উপায় সুনীতি শিক্ষা,—এই সুখদুঃখময় সংসারে সম্পদ সহিষ্ণুতা সুনীতি শিক্ষা ব্যতিরেকে আসতে পারে না, সহিষ্ণুতা জীবনের তুলাদণ্ডস্বরূপ, সুস্থ স্বাস্থ্যের সংঘর্ষে এবং নীতিশিক্ষার প্রভাবে গড়ে উঠে এক মহামানবীয় জীবন।

বাজি ধরে বাহাদুরি নিতে অতিভোজনাদি গোঁড়ামী এ সব অসংযম ইন্দ্রিয়সেবার জন্য বহুরূপী রোগ অকাল গ্রাসে সাদর আহ্বান জানায়।

প্রথমে আমাদের জানা দরকার, ইন্দ্রিয় সংযম কাহাকে বলে এবং এই ইন্দ্রিয় সংযমের সাথে স্বাস্থ্যরক্ষার কি সামঞ্জস্য আছে? ইন্দ্রিয় পাঁচটিকে নিজের অধীনে চাকুরি দেওয়ার নাম সংযম। দেহ শুদ্ধ করতে হলে দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ঘষা-মাজার প্রয়োজন, লালসা বাসনা কামনা তৎসম্প্রদায়ভুক্ত। বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিবর্গ উপভোগে অসমর্থ—তাদের উপভোগ নাই কিন্তু বাসনার অভাব নাই। অবিশ্যি এখানে আমি তাদের সম্বন্ধে বলবার প্রত্যাশা করি না।

এরূপ নীতিশিক্ষায় সংযম শিক্ষা দেবভক্তি প্রসারণের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। আমার গুরুদেব নব বিধি অনুসারে "ভারতের দান যোগাসন"এর অভ্যাস থাকলে ও করলে ঈশ্বরানুরাগ স্বভাবতই আসবে; আসতে বাধ্য—যদি অবশ্য সৎ প্রবৃত্তি চিত্তে জাগে। এই ঈশ্বরানুরাগ জন্মিলে বিষয়ানুরাগ প্রভৃতি নারকীয় যন্ত্রণাদি দূরীভূত হয়; চিত্ত নির্ম্মল ও পবিত্র হয়, এবং ইন্দ্রিয়াদি স্বআয়ত্তে আসে,—এ ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয় সংযমের ঔষধ আছে—এক বিশ্বাস আর ভক্তি॥

ইন্দ্রিয়াসক্তিতে দেহের সর্ব্ব শক্তি হ্রাস হয়। এ রোগ নিবারণের ঔষধ উপরে যাহা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে স্বাস্থ্যচর্চ্চা করতে হবে। স্বাস্থ্যচর্চ্চা এবং তার ক্রমোন্নতির এমনই মহিমা, উহা দেহের মায়া-মমতা আনিয়া নিজকে সজাগ রাখে—এ জাগরণে ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ হয়ে পড়ে, তখন কাম ও বিষয়াসক্তি সমুদয় দেহাশক্তির অধীনে থাকে, এ দেহাশক্তির আবির্ভাবে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যের বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তবে আমরা যদি মনে করি, এরূপ সংযমাদির অভ্যাস করলেই স্বাস্থ্যোন্নতি হবে সেটা ভুল, ইহা সাহায্য করে উন্নতির পথে অগ্রসর হবার কিন্তু তার সঙ্গে দরকার প্রয়োজন মত খাদ্য খাওয়া। একটা মোটর গাড়ীর ধূলা-বালি প্রভৃতি ধুয়ে-মুছে রাখলেই গাড়ী বেশী দিন টিকবে না, তাকে চালাতে গেলেই গলদ ধরা পড়বে, মোটরের কলকব্জায় যদি উপযুক্ত তেল না দেওয়া যায় তা হলে কিছু দিন বাদেই ঘষায় ঘষায় ভেঙ্গে-চুরে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তেল দিতে হলেও যন্ত্রাদির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নাদি দরকার, নয় তো ধূলা-বালি-জড়িত ঘর্ষণে যন্ত্রাদির ক্ষয় অপেক্ষাকৃত বেশী ও বিপদ সম্ভাবনা থাকে, তেমনি আমাদের দেহটা একটা মোটর গাড়ীর স্বরূপ। তার ঘষা-মাজা—সর্ব্ব বিষয়ে সংযম; তেল তার—সুখাদ্য। অতএব দুইটি জিনিষেরই একান্ত প্রয়োজন দীর্ঘজীবন লাভের আশায়। তবে এখন আমাদের জানা দরকার, কিরূপ খাদ্য খেলে পরে সুস্বাস্থ্যের অগ্রগামী হতে পারবে, এবং সংযমরক্ষায় কি সহায়তা করে।

দেহের খাদ্য বলতে মুখগহ্বরে যাহা প্রবেশ করানো যায় তাহাই খাদ্য নহে, স্থান-কাল-পাত্রবিশেষে খাদ্যের বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। এমন কতগুলি খাদ্য আছে যাহা কাহারো পক্ষে গুরুপাক কাহারো পক্ষে লঘুপাক। এ গুরুপাকের দরুণই যৌবনের পথে নানারূপ বাধা প্রদান করিয়া থাকে, কাজে-কাজেই খাদ্যদ্রব্যের গুরুত্ব লঘুত্ব আমাদের বুঝা উচিত।

খাদ্যকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, যথা—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক, এবং তাহার তিনটি গুণ, যথাক্রমে—শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক, দোষও যথাক্রমে তিন পর্য্যায়ে বিভক্ত—জাতিগতদোষ, আশ্রয়জনিত দোষ, আর নিমিত্ত-দোষ। অতএব এত সব বিচার করে খাদ্য গ্রহণ করলে খাদ্যের সারাংশে দেহোৎকর্ষ সাধিত হয়, অন্যথায় বিপরীত ফল প্রমাণিত হয়। জাতিগত দোষ:—যেমন অধিক পরিমাণে পেঁয়াজ, রসুন মসলা অর্থাৎ উত্তেজক দ্রব্যাদি সকলকে বুঝায়। আর নিমিত্ত-দোষ:—যেমন ময়রার দোকানে একশ' গণ্ডা মাছি-মশা পড়ে মরে আছে খাবারের উপরে, রাস্তা-ঘাটের ধূলা-জাল উড়ে পড়ছে যত সব প্রিয় খাদ্যাদির উপরে ইত্যাদি। এবং আশ্রয়জনিত দোষটি—অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন লোকের দ্বারা খাদ্যাদিকে দোষিত করা। অতএব আমরা জীবন ধারণের জন্য যে সব খাদ্যাদি গ্রহণ করবো, সবগুলিতেই বিচার আছে—সে সব বিচার করে খাদ্যাদি গ্রহণ করলে রোগমুক্ত থাকা যায়।

খাদ্যাখাদ্যের চাহিদার উপরও আমাদের মনের, দেহের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়, কাজেই সেখানে প্রথমে সুনীতি শিক্ষা পাওয়া কর্ত্তব্য; তবেই স্বাস্থ্যলাভে সংযমাদি কষ্টের জন্য চিন্তান্বিত হতে হবে না।

ইন্দ্রিয়দমন, দুষ্প্রবৃত্তিদমনমূলক শিক্ষা না পেয়ে কেবল বি,-এ, এম-এ পাশ করেই চরিত্রবান, নম্র, শিক্ষিত গুণবান বলে পরিচয় দেওয়া যায় না। এরূপ শিক্ষার কোন ভিত্তি নাই।

আত্মসংযম পালন পূর্ব্বক উচ্চশিক্ষা আহার নিদ্রার যথাযোগ্য সংযমই সুগঠিত মানব-দেহপ্রার্থীদের—জীবনোদয় পথে যাবার নিষ্কলঙ্ক পথ।

"সূক্ষ্ম শরীর মনের সংযম মাংসপিণ্ডময়-স্থূল শরীরের সংযম হ'তে উচ্চতর কার্য্য বটে; কিন্তু সূক্ষ্মের সংযম করতে হলে অগ্রে স্থূলের সংযম করা একান্ত প্রয়োজন। অতএব ইহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হচ্ছে যে খাদ্যাখাদ্যের বিচার মনের স্থিরতারূপ উচ্চাবস্থা লাভের জন্য অতিশয় দরকার। নয় তো সহজে স্থিরতা লাভ করা যায় না। কিন্তু আজকাল আমাদের অনেক সম্প্রদায়ে আহারাদি ব্যাপারে এতই বাড়াবাড়ি এবং এতই অপদার্থ নিয়মের গণ্ডিতে বদ্ধ, এত গোঁড়ামী যেন সবটুকুন ধর্ম্ম রান্নাঘরের অন্দর মহলে পুরিয়াছেন,

এ সব কর্ম্ম কর্ম্ম নয়, ধর্ম্ম নয়, ভক্তিও নয়—ভণ্ডামী মাত্র"। (স্বামী বিবেকানন্দ)

এখন আমাদের জানা দরকার সংযম-ক্রিয়াদি অভ্যাস পূর্ব্বক দেহরক্ষায় খাদ্যের কি পরিমাণ কেলোরিজ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বয়সানুপাতে তাহার তালিকা দেওয়া হল।—

ঠাকুরদাদা ধরুন ৭০—৮০ বৎসরের মধ্যে ১৫২৫—১৮১০ কেলোরিজ

পিতা	৩০১০ কেলোরিজ
মাতা	২৫০০ "
১৫—৩০ বৎসরের বালক-বালিকাদের	৩৫০০ "
১৩ বৎসরের বালক-বালিকাদের	৩০০১ "
৯—১১ " " "	২৫১০ "
১০—৭ " " "	২১০৯ "
৩—৪ " " "	১১১০—১৪০০ "

উপরোক্ত তালিকা সাধারণের জন্য, তবে যারা শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম অপেক্ষাকৃত বেশী করেন, তাঁদের সতর্কতাবলম্বনে একটি প্রয়োজনীয় তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

উল্লিখিত নিয়মানুসারে দেহ-সাধনায় জড়িত হতে পারলে সংযমাদির জন্য কোন ভাবনা করতে হয় না, কারণ প্রকৃতিই সংযম-গণ্ডির মধ্যে টানিয়া লয়। হজম-শক্তির জন্য এখানে আমি দুইটি আসন ব্যবহার কচ্ছি—সর্ব্বাবস্থায়ই করা সম্ভব হতে পারে একাগ্রতার সহিত ১নং ময়ূরাসন—উপুড় হয়ে শোও, কনুইদ্বয় পেটের মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক হাতের তালুতে দেহের ভর রাখিয়া দম নিয়ে বন্ধ করে মাথা, পা, কোমর সমান্তরাল ভাবে উপর দিকে উঠিবে এবং মনে মনে ২৫।৩০ গুণতে হবে এরূপ ৪ বার করবে, ও পরে শুয়ে দেহকে শিথিল করে ঐ ৩০ গণনা করতে হবে। ইহাতে হজম-শক্তি বৃদ্ধি হয়। বিশ্রামটিকে শবাসন বলা হয়।

২নং কূর্ম্মাসন—হাঁটু গেড়ে বসে নিশ্বাস নিয়ে হাত দু'টি মাথার উপর তুলে, আস্তে আস্তে সম্মুখ দিকে ঝুঁকে পড়ে পেটটি পায়ের উরুতের মধ্যে ঠেকায়ে দিয়ে সাধারণ নিশ্বাস তখন নিতে নিতে ৩০ গণনা করতে হবে, পরে পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় শুয়ে পড়ে ৩০ গণনা করতে হবে সাধারণ নিশ্বাস নিয়ে। এতে হজম-শক্তি ও উপরন্তু পেটে বায়ু জন্মালে তার উপশম হয়। অনেক সময় সঙ্গে সঙ্গে নির্গত হয়ে যায়।

কর্ম্ম	বয়স	উচ্চতা ফিট—ইঞ্চি	ওজন পাউণ্ড	বিশ্রামের সময় প্রতি ঘণ্টায় প্রয়োজনীয় কেলোরিজ	দেহের ওজনের প্রতি পাউণ্ডে প্রতি ঘণ্টায় প্রয়োজনীয় কেলোরিজ	কর্ম্মব্যস্ততায় প্রতি ঘণ্টায় প্রয়োজনীয় কেলোরিজ	সর্ব্বসমেত এক দিনে কেলোরিজ গ্রহণ। তবে ৮ ঘণ্টা কর্ম্মে ১৬ ঘণ্টা বিশ্রামের নিমিত্ত
			পুরুষ				
মুচী	৬০—৫৬	৫—০	১৪০	৭২	·৫০	১৭৩	২৭৫০
"	৩০—৩৫	৫—৬-৭	১৩৯	৮২	·৬২	১৭২	২৭৬৩
দর্জ্জি	৩০—৩৯	৫—৫	১৪২	৭৩	·৫২	১২৮	২১৪৫
"	৪০—৪৬	৫—৮,৯,১০	১৬০	১০৪	·৬৫	১৩৮	২৭২০
দপ্তরী	১৪—২৫	৬—০					
		৫—৪।	১৪২	৮৪	·৫৯	১৩৪	২৭০০
কেরাণী ও মানসিক পরিশ্রম যারা করেন	২৫—২৭	৫—৫	১৪০	৮২	·৫৯	২০০	৩০৩৩
চিত্রকর	২৪—৩০	৫—১১	১৫০	১১০	·৭৫	২৩০	৩৫৬১
		৫—৬	১৫১	৮১	·৫৫	২২০	৩০০০
ছুতার মিস্ত্রী	২০—৪৪	৫—৭					
		৫—৮					
করাতি	৩৪—৪৫	৫—৫	১৫২	৮০	·৫৬	৫০০	৫১০০
			স্ত্রীলোক				
হাত সেলাইকারক	৩৫—৫৫	৫—৫	১৪০	৭২	·৫২	১৮৫	১৪০০
মেসিন "	১৬—৫০	৫—৩	১৩৯-১১০	৭০	·৫০	১১৫	২০০০
ধোপানী	১৮—৪৪	৫—৩	১৫৫-১১০	৭০	·৫০	২৮৫-১৮৬	৩৪৮০-২৫১২
পরিচারিকা	১৮—৪৪	৫—৩	১২৫-১১০	৭০	·৫০	২২৪-১৪৩	৩০০০-২১৭০
দপ্তরিণী	২২	৫—৩	১১০	৬৯	·৬০	২২৫	২৯১০

দেশের কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'পাঞ্চজন্য' পত্রিকায় প্রকাশ :—"পোষ্টেল ডিপার্টমেন্টের পরম কৃপা ও সত্বর কার্য্যকলাপের অপূর্ব্ব নমুনার নিদর্শন বহন করিয়া কলিকাতার ভবানীচরণ দত্ত লেইন হইতে ২২।১।২২ ইং তারিখে চট্টগ্রাম বার এসোসিয়েসনের প্রেসিডেন্টের নিকট একখানি পোষ্টকার্ড গত শনিবার ২৪।৫।৪৭ ইং তারিখে (অর্থাৎ ২৫ বৎসরের পর) বিলি হইয়াছে। এই চিঠির লেখক হইতেছেন শ্রীএইচ, এস, ভট্টাচার্য্য, (লাইফ ইনসিওরেন্স এজেন্ট)। তিনি পাঞ্জাবীদের বিষয়ে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন এবং চিঠিতে গান্ধিজী ও স্বর্গীয় দেশবন্ধু দাশ এবং যাত্রামোহন সেনের উল্লেখও আছে।

অপর একখানি চিঠি উড়িষ্যার রাজধানী কটক হইতে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক তাঁহার ভ্রাতা উকিল শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত ১০।৪।৪৬ ইং পোষ্টকার্ড ১৪।৫।৪৭ তারিখে অর্থাৎ ৩৫ দিনে এখানে বিলি হইয়াছে।"

* * * * * *

ঢাকা হইতে প্রকাশিত পাক্ষিক 'আহমদী' পত্রিকা আবেদন জানাইতেছেন :—"ভারতের সর্ব্বত্র যেরূপ ক্রম-বর্দ্ধমান সাম্প্রদায়িক অশান্তি এবং তদনুষঙ্গিক রক্তপাত, লুণ্ঠন, অগ্নিদাহ, অগণিত নরনারী এবং শিশুহত্যার তাণ্ডবলীলা চলিতেছে, তাহা নিরসনের সকল ব্যবস্থাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। পুলিশ বা মিলিটারীর দিবারাত্রি সশস্ত্র প্রচেষ্টা বা অভিযান বা পাহারা, নেতৃবৃন্দের আবেদন নিবেদন, দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের একান্ত আগ্রহ, সান্ধ্য আইন, ১৪৪ ধারা কিছুতেই কোন ফল হইতেছে না। বরং উপরোক্ত সব প্রচেষ্টাই যেন সাম্প্রদায়িক দাবানলে ঘৃতাহুতির কার্য্য করিতেছে। আমরা পরস্পর দোষারোপ করিয়া এই দাবানলে ইন্ধন যোগাইতে চাই না। কে দোষী, কে নির্দ্দোষী, কে বা কাহারা কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য এই আত্মঘাতী ভ্রাতৃবিরোধ জিয়াইয়া রাখিতেছে, তাহা নিরপেক্ষ পর্য্যবেক্ষকের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। শান্তিপ্রিয় সকল মানুষের এবং সকল জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হিসাবে আমরা জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে আজ সকলের নিকট এই আবেদন করিব যে ভ্রাতৃহত্যা এবং আবালবৃদ্ধবনিতা-নির্ব্বিশেষে এই যে সাম্প্রদায়িক হত্যালীলা চলিতেছে, তাহাতে কোন জাতির অমঙ্গল বই মঙ্গল হইবে না। সর্ব্ব জীবের স্রষ্টা ও অধিপতি এবং সকল জীবের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভাবধারা এবং অনুভূতি-সমূহের যিনি জ্ঞাতা এবং নিয়ামক, একমাত্র সেই বিশ্বপ্রভুই মানব-মনের এই অগ্নি-প্রবাহকে স্নিগ্ধ স্নেহ-মমতার ফল্গুধারায় পরিণত করিতে পারেন। সুতরাং সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহার নিকটে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিবার জন্য আমরা আজ সকল জাতির নরনারীকে অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতের ধর্ম্মপ্রাণ এবং দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শান্তিকামী সমস্ত নাগরিক আমাদের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধ ভাববর্জ্জিত হৃদয়ে এবং ধীর স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।" এ আবেদনে মন্তব্য করিবার কোন অবকাশ নাই। আশা করি, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় 'আহমদী'র আবেদন ব্যর্থ হইবে না। আমরাও শান্তিকামী। কাজেই 'আহমদী'র আবেদনকে আন্তরিক সমর্থন দিতেছি।

*

আলহাজ খাজা নাজিমুদ্দীনের পূর্ব্ব-পাকিস্তানের দলপতি নির্ব্বাচিত হওয়া সম্পর্কে সহযোগী 'মিল্লাত' মন্তব্য করিতেছেন :—"এই নির্ব্বাচন লইয়া গত কয়েক দিন যাবৎ বেশ আলোড়নের সৃষ্টি হইলেও নিরপেক্ষ মহলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মিঃ সোহরাওয়ার্দ্দী বিপুল ভোটে জয়লাভ করিবেন।

মিঃ সোহরাওয়ার্দ্দীর দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। সিলেটের সদস্যগণ একযোগে দাবী করেন যে, পূর্ব্ব-পাকিস্তান সরকারে সিলেট হইতে তিন জন মন্ত্রী ও তিন জন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী লইতে হইবে। কিন্তু মিঃ সোহরাওয়ার্দ্দী সিলেট হইতে এক জনের বেশী মন্ত্রী গ্রহণে অসম্মতি জানাইলে তাঁহারা খাজা নাজিমুদ্দীনের নিকট উক্ত দাবী পেশ করেন। খাজা নাজিমুদ্দীন সিলেট হইতে তিন জন মন্ত্রী ও অন্ততঃ তিন জন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী গ্রহণ করিতে রাজি হইলে তাঁহারা খাজা সাহেবের পক্ষে ভোট দেন।

শোনা যায়, প্রবল টাকার খেলা চলে। বহুসংখ্যক কনট্রাক্টর ঢাকায় রাজধানী ও চট্টগ্রামে বন্দর স্থাপনের কনট্রাক্টরী পাইবার অঙ্গীকারে বিস্তর টাকা আমদানী করেন। বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব-বাংলার অমূল্য সম্পদ পাটের একচেটিয়া ব্যবসায় জনৈক কোটিপতিকে দেওয়া হইবে, এই প্রতিশ্রুতিতে তিনিও কয়েক লক্ষ টাকা খাজা শাহাবুদ্দিনের হাতে দেন বলিয়া প্রকাশ। এইরূপে শুধু মাত্র এক রাত্রিতেই দশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। এতদ্ব্যতীত খাজা নাজিমুদ্দীনের দল উনিশ জনকে মন্ত্রিত্ব দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তাঁহারাও মিঃ সোহরাওয়ার্দ্দীর বিপক্ষে ভোট দেন।"

আমরা একান্তই বাহিরের লোক, কাজেই সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন কার্য্য হইলেও—মুসলিম সাপ্তাহিক 'মিল্লাতে'র পক্ষে ইহা সহজসাধ্য। অধিক মন্তব্য করার প্রয়োজন নাই।

* * * * * *

'জনশক্তি' মন্তব্য করিতেছেন :—"অনেক হিন্দু নরনারী পল্লী ও সহর ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, ইহা শুধু হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের লজ্জার কথা নহে—ব্যক্তিস্বার্থ-কেন্দ্রিক অসামাজিক সেই সব লোকদেরও লজ্জার পরিচায়ক। তবে একথাও স্বীকার করিতেই হইবে, যাহারা দেশ ও বাড়ীঘর ছাড়িয়া যাইতে লোককে প্রকাশ্যে উপদেশ দেন, তাহারাই নিজেদের স্ত্রী-পুত্র পরিবারকে

বিদেশে পাঠাইয়া যে প্রতারণা করেন, তাহাতে লোক বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। লোকে প্রশ্ন করে এইরূপ নির্লজ্জ ধাপ্পা আর কত দিন চলিবে?" এ-ধাপ্পা তত দিন চলিবে যত দিন সাধারণ লোকে তাহাদের স্বাভাবিক ক্ষমতার স্বাভাবিক ব্যবহার না করিবে। বর্ত্তমান জগতে কেহ কাহারো ভাল করে না, কাজেই নিজের ভাল নিজেদেরই করিতে হইবে, একথা মনে রাখা দরকার।

* * * * * *

'জনশক্তির' মতে :—"কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও এখন পরিবর্ত্তিত অবস্থাধীন নূতন ভাবে চিন্তা করিতে হইবে। এখন তাহাকে জন-প্রতিষ্ঠানরূপে বাঁচাইয়া রাখিবার প্রয়োজনও নাই, সেই চেষ্টাও হইবে বৃথা চেষ্টা। আবার স্বাধীন দেশে অর্থনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতেই দল গঠিত হইবে, কারণ সংগ্রাম শেষ হইয়াছে। আর অতীতের সেই সংগ্রামশীল গণ-প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে না।" সহযোগীর কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের কবলে পড়িয়া কি 'জনশক্তির' মত-পরিবর্ত্তন হইল? স্বাধীনতা লাভ করিবার পর কংগ্রেসের দায়িত্ব আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল এবং জন-প্রতিষ্ঠানরূপে ইহার প্রয়োজনীয়তাও সমভাবে বর্দ্ধিত হইল। তাহা ছাড়া, ক্ষমতা লাভ করিয়াই কোন রাজনৈতিক দলকে ভাঙ্গিয়া দিবার প্রয়োজন পৃথিবীর অন্য দেশে যখন হয় না, এখানেই বা কেন হইবে? 'জনশক্তি' লীগ সম্বন্ধে কোন প্রকার মত প্রকাশ করেন না কেন?

* * * * * *

'নবযুগ' অন্যান্য কথার মধ্যে বলিতেছেন :—"……কংগ্রেস একটি ত্যাগশীল ও সেবাপরায়ণ প্রতিষ্ঠান হইলেও উহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিক্রিয়াশীল উপকরণ রহিয়াছে। আর লীগের ত কথাই নাই। সেখানে ষোল আনার স্থলে আঠারো আনা হইতেছে ত্যাগ-বিমুখ স্বার্থ-সন্ধানী উপকরণ। এই দুইটি দলের চালিত গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যেটি সরল চিত্তে দরিদ্রের সেবা করিয়া তাহাদের দুঃখ ঘুচাইতে পারিবেন জনগণ সেইটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে। আর যদি তাঁহারা সেই দায়িত্ব পালন করিতে না পারেন তাহা হইলে জনগণ যে উভয় গবর্ণমেণ্টের গঙ্গা-যাত্রার ব্যবস্থার জন্য বিপ্লবের অনলকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিবে এবং সেই বিপ্লবের মধ্য দিয়া সত্যকারের গণ-জাগরণ ও জনগণ মননসই প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্ভবপর হইবে সে বিষয়ে আমাদের মনে তিল মাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

"বলা বাহুল্য, তখন আর এই সকল ছেদ ও ভেদাভেদের কোন চিহ্ন থাকিবে না, কোটি কোটি সর্ব্বহারা দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমান ভাইয়ের ন্যায় কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সেই বিপ্লবে ঝাঁপ দিবে এবং যতক্ষণ সর্ব্বপ্রকার পুঁজিবাদ ও তজ্জন্য পুঁজিস্বরূপ কপটবাদ ও চতুরালিবাদের অবসান ঘটাইয়া উহার ভস্মস্তূপের উপর প্রকৃত মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিবে, ততক্ষণ তাহারা নিরস্ত হওয়ার নামও মুখে আনিবে না।" কংগ্রেস নেতাদের ভাবিবার কথা। লীগের সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রকার মন্তব্য নাই।

* * * * * *

"বীরভূম-বাণী" বলিতেছেন :—"বাংলার পাকিস্তান অংশ থেকে অনেক হিন্দু-পরিবার বীরভূমে এসে বাস করবার বা সাময়িক ভাবে বসবাস করবার চেষ্টায় আসছেন। অনেকে এই সময়ে জমির দাম বেশ বাড়িয়ে দিয়ে দাঁও মারবার চেষ্টা করছেন। আমরা এই মনোবৃত্তির নিন্দা করি। আর যাতে ভীত হয়ে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের হিন্দুদিগকে বাসভূমি ছেড়ে আসতে না হয় তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করবার জন্য বর্ত্তমান পশ্চিম-বঙ্গ মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকট আমাদের দাবী জানাচ্ছি।" বাগে পাইয়া যাহারা দাঁও মারিবার চেষ্টা করিতেছে, কেবলমাত্র তাহাদের নিন্দা করিলেই চলিবে না। কলিকাতাতে বাড়ী ভাড়ার ব্যাপার লইয়াও এই প্রকার কালো-বাজারী কারবার চলিতেছে। পশ্চিম-বঙ্গ সরকার অবিলম্বে এদিকে দৃষ্টিদান করিয়া প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন—এ আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি।

* * * * * *

তিলক-স্মৃতি সম্বন্ধে 'বীরভূম-বাণীর' মন্তব্য :—"তিলক মহারাজ গান্ধীজীকে ১৯২০ সালে এক পত্রে লেখেন :—

"রাজনীতি সাংসারিক লোকদের জন্য, সাধুদের জন্য নহে। এখানে 'অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্' নীতি অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' নীতির আমি অধিকতর পক্ষপাতী।"

তিলক মহারাজের মতবাদের পরিবর্ত্তে গান্ধীজীর অহিংসা নীতি কংগ্রেস কর্ত্তৃক গৃহীত না হইলে আজ বোধ হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ভারতে হইত না—ভারত আজ বিভক্ত হইত না। আজ তিলক মহারাজের পুণ্যস্মৃতি কংগ্রেসের অনেক নেতা ও সেবকের কাছে উপেক্ষিত, কিন্তু হিন্দু জনসাধারণ মহারাজ তিলককে ভুলিবে না। আমরা বিশ্বাস করি সেই দিন আসিতেছে, যেদিন নবজাগ্রত বিরাট জনমতের চাপে বর্ত্তমান কংগ্রেসকেও তিলক মহারাজের হিন্দু জাতীয়তা-মূলক নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা এই প্রার্থনা করিয়াই তিলক মহারাজের স্মৃতি উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।" উপরি-উক্ত মন্তব্যে দোষ ধরিবার বা আপত্তি করিবার মত কিছু নাই। আমরাও দেশবাসীর দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

* * * * * *

'ঢাকাপ্রকাশ' প্রকাশ করিতেছেন :—শান্তিরক্ষা সম্পর্কে মুস্লিম লীগ নেতৃবৃন্দের আশ্বাস এবং ভাল ব্যবহার সত্ত্বেও পল্লী অঞ্চলের সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বহু লোক বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকের অনর্থক হুমকীই যে ইহার প্রধান কারণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে বিভিন্ন স্থান হইতে নানারূপ কথা শুনা যাইতেছে। ক্ষেতের ধান, ভিজান পাট, বাড়ীঘরের চাল ও দরজা জানালা, গৃহস্থের অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি অপহরণ, স্ত্রীলোকদের প্রতি ইতর ইঙ্গিত, মাঝে মাঝে খুন-জখম

প্রভৃতি বহু সংবাদ গ্রামাঞ্চল হইতে পাওয়া যায়। কর্তৃপক্ষ কঠোর হস্তে গুণ্ডাদমনে অগ্রসর হইলে এই সকল বিশৃঙ্খলা ও সংখ্যালঘিষ্ঠদের আতঙ্ক দূর হইবে।" লীগ পত্রিকাগুলি পাঠ করিলে পূর্ব্ববঙ্গ সম্বন্ধে আমরা অন্য প্রকার সংবাদ লাভ করি। ঐ প্রদেশে কোন প্রকার অশান্তি নাই বলিয়াই ধারণা হয়। পূর্ব্ব-বঙ্গের অমুসলমান সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি যথাসময়ে পাইতেছি না। যাহা হাতে আসিতেছে, তাহাতে 'সংবাদ' চাপা হইতেছে বলিয়া মনে হয়। 'ঢাকাপ্রকাশে'র প্রকাশিত সংবাদ সম্বন্ধে লীগ সরকার কি বলেন ?

* * * * * *

'পাঞ্চজন্য' মন্তব্য করিতেছেন :—"সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনে নারীর দায়িত্ব সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলের এক মহিলা সভায় যাহা বলিয়াছেন তৎপ্রতি এই দেশের নারী জাতির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি। মহাত্মাজী অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্বন্ধে নারী জাতির বিরাট দায়িত্বের কথাও তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'আমরা হিন্দু হইতে পারি, কিন্তু সকলের চাইতে বড় কথা আমরা মানুষ—এই কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।' ভারত আজ স্বাধীন, স্বাধীন ভারতে পুরুষের ন্যায় নারীদেরও অনেক কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব রহিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে ভারতের নারী ও পুরুষ উভয়কেই স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিতে হইবে, এই কথা কি নারী জাতি বিস্মৃত হইতে পারেন ?" সহজ, সরল এবং পরম সত্য ও যুক্তিযুক্ত কথা। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

* * * * * *

'নবসজ্ঘ' পত্রিকার শ্রদ্ধেয় মতিলাল রায় বলিতেছেন :—"শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষের অধিনায়কত্বে পশ্চিম-বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলীকে অভিনন্দিত করার অনুষ্ঠানে এক শ্রেণীর যুবকের যে অশিষ্ট আচরণের কথা কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানের সঙ্কট-যুগে অসহিষ্ণুতারই নামান্তর বলিতে হয়। ভারত সংগ্রাম করিয়া বলপূর্ব্বক স্বাধীনতা-লাভের পথে অগ্রসর হইতেছে না। জগতের ইতিহাসে ভারতের স্বাধীনতা-লাভের এই প্রয়াস অভিনব এবং অনবদ্য। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বাণী লীগের ; কংগ্রেসের নহে। ১৫ই আগষ্টের উৎসবে চন্দননগরের এক শ্রেণীর অধিবাসী কংগ্রেসের নামে কংগ্রেসকে ধোঁকা দিয়া লীগপন্থীদেরই নীতি আশ্রয় করিতে যদি চাহে, সে ধোঁকায় কেহই ভুলিবে না। কংগ্রেসের নেতৃ-পুরুষগণ ত্যাগ ও তপস্যার হোমানল বুকে ধরিয়া নির্য্যাতনের পর নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। তাঁহাদের নামে সজ্যর্ষ-নীতি আশ্রয়ণীয় হইলে, কংগ্রেসপন্থিগণই তাহার বিরুদ্ধ হইবেন।" এ-বিষয় আমরাও একমত। কিন্তু যাঁহাদের উদ্দেশ্য করিয়া মন্তব্য করা হইতেছে, তাঁহাদের দৃষ্টি-বিকার এবং মনোবিভ্রম ইহাতে দূর হইবে কি ?

* * * * * *

'মেদিনীপুর-হিতৈষী' বলেন :—"স্বাধীনতা কি, তাহা আমরা জানি না। জনসাধারণও জানে না। স্বাধীনতার অর্থ কি, স্বরূপ কি, তাহা সাধারণে জানে না। যাঁহারা জানেন—তাহার অর্থ বুঝেন, স্বরূপের ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তাঁহাদিগের নিকট আমরা স্বাধীনতার অর্থ বুঝিতে চাই কথায় নয়—কার্য্যে। আমরা জনসাধারণ—আমাদিগকে স্বরূপ বুঝাইতে হইলে আমাদের অভাব অভিযোগ দূর করিতে হইবে। আমাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে হইবে, ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। রোগ নিরাময় জন্য ডাক্তার কবিরাজের ও শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। জাতীয় শিক্ষায় জাতিকে সুবিধা সুযোগ দান করিয়া সমুন্নত করিতে হইবে। স্বধর্ম্মে একনিষ্ঠ হইবার শিক্ষায় দয়া, মায়া, স্নেহ মমতাদি সদ্গুণে বিভূষিত হইবার আদর্শ প্রদর্শন জন্য বিনয় ব্যবহারে জনসাধারণকে পুত্রবৎ পালন করিতে হইবে। বাহ্যাড়ম্বর, বিলাসিতা, শুষ্ক বক্তৃতা পরিহারের পন্থা প্রদর্শন করিতে হইবে। জনসাধারণের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান জন্য দৈনন্দিন কার্য্যে সর্ব্বপ্রকার বাধা অপসারণ করিতে হইবে। আশু চাউল-বস্ত্রাদি নিয়ন্ত্রণ—অন্ততঃ গ্রাম নগর হইতে উঠাইয়া দিতে হইবে। লীগ গবর্ণমেণ্ট বিগত বৎসর লোককে চাষের ধান গৃহে আনিতে না দেওয়ায় জনসাধারণের কষ্টের সীমা নাই। অর্দ্ধ মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং অধিক মূল্যে চাউল ক্রয় করিতে হইয়াছে। ইহা যে কত বড় জুলুম, তাহা না বলিলেও চলে! এই জুলুমের জন্যই প্রজাসাধারণ লীগ গবর্ণমেণ্টের নামে ভীত হয়। মনুষ্যত্বের দিক দিয়া সর্ব্বপ্রকার জুলুম পরিহার না করিলে, লোকে স্বাধীনতার মর্ম্ম বুঝিবে না। বাক্যমনের স্বাধীনতা থাকিলে লোকে স্বতঃই মিথ্যা পরিহার করিবে এবং সত্যনিষ্ঠ হইতে অভ্যস্ত হইবে। সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে রাজ্য হইতে দুর্নীতির অবসান হইবে। তবে, শিক্ষা দীক্ষায় সত্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ প্রদর্শন জন্য সর্ব্বপ্রকার সুবিধার প্রয়োজন।" মফঃস্বল অঞ্চলের পত্রিকার কথা হইলেও বাঙ্গলা সরকার ইহাতে চিন্তার খোরাক কিছু পাইবেন বলিয়া মনে করি। সহযোগীর কথায় জনগণের দাবীর আভাষও রহিয়াছে। আশা করি, বর্ত্তমান বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দ্বারা ইহাই প্রমাণ করিবেন যে, গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের লোক, হৃদয়হীন শাসক নহে। ইহার বেশী আশা বর্ত্তমানে আমাদের নাই।

* * * * * *

"বগুড়ার কথা"—মুসলিম পত্রিকা হইলেও সত্য ভাষণ করিয়া থাকেন। সহযোগী নির্ভীক, সেই জন্য ভয় হয়, 'বগুড়ার কথা' আর কত দিন এই ভাবে জনসেবা করিতে পারিবেন। 'বগুড়ার কথা' বলিতেছেন : "১৯৪৩ সালের ন্যায় এবারেও আমরা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইয়াছি। বগুড়ার ন্যায় বাড়তি জেলায় চাউলের দাম প্রতি কাঁচি-মণে ২০ কুড়ি টাকা উঠিয়াছে অর্থাৎ প্রতি পাকি-মণ প্রায় পৌনে সাতাশ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চাউলের দর যে আরো বাড়িবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৃষ্টির অভাবে আউসের আবাদ ও ফলন ব্যর্থ হইয়াছে, আমনের ক্ষেতগুলি শুকাইয়া গিয়াছে। সামনের তিনটি মাসের অবস্থা ভয়াবহ হইয়া উঠিবে। পাটের দাম মারাত্মক ভাবে কমিতে আরম্ভ করিয়াছে, এক মণ পাট বেচিয়া এক মণ চাউল কিনিবার পয়সা যোগাড় করা চলে না। পাট কয়েক দিন ঘরে

ধরিয়া রাখিয়া মূল্যবৃদ্ধির জন্য যে অপেক্ষা করা যাইবে এমন অবস্থা কৃষককুলের নাই, তাই তাকে জলের দরে পাট বেচিয়া তার দ্বারা চাউল কিনিতে হইতেছে। কিন্তু এভাবে তিন মাস চলিবে না, আমন ধান উঠিবার পূর্ব্বেই জেলাময় চুরি, ডাকাতি, ভিক্ষা ও আত্মহত্যার হিড়িক লাগিয়া যাইবে। জনসাধারণের যাঁহারা নেতৃত্ব করেন তাঁহারা আজ "রাজা উজীর মারিতে" ব্যস্ত, পাকিস্তান আর স্বাধীনতাকে কি ভাবে ঘরে বরণ করিয়া লওয়া হইবে তাহা লইয়া দিন-রাত জল্পনা কল্পনা করিতে মত্ত, পতাকা কেমন হইবে, রুট-মার্চ্চ কোন্ কায়দায় করিতে হইবে, জনসভার ভীড় ও স্ফীতির ব্যবস্থা কি ভাবে করা হইবে, বক্তৃতার স্বরে মিলন বাঁশীর সুর ফুটাইয়া তোলা হইবে, না বিসর্জ্জনের বাজনায় আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া হৃৎকম্প সৃষ্টি করা হইবে, মৃৎপ্রদীপে গৃহে গৃহে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা হইবে, না চারি দিক আলোয় আলোকময় করা হইবে, সেই চিন্তায় তাঁহারা বিনিদ্র-রজনী যাপন করিতেছেন। যাহাদের জন্য এই পাকিস্তান, এই স্বাধীনতা, তাহারা ঘরে আজ উপবাসী থাকিতেছে কি না, জলের দামে স্বর্ণসূত্র পাটকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে কি না, তাহারা বস্ত্রহীনতার জন্য ঘরের বাহিরে আসিতে পারিতেছে কি না, গৃহে স্ত্রী-কন্যা-পুত্রবধূদের আবরু রক্ষা হইতেছে কি না, সে চিন্তা আমাদের নেতাদের মনের কোণেও উঁকি দিতেছে না, তাঁহাদের চিত্তকে পীড়িত করিতেছে না। এক দিকে পেশাদার নেতৃবর্গের জনসাধারণের দুঃসহ দুর্গতির প্রতি অপরিসীম ঔদাসীন্য ও ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে অনন্যসাধারণ ও অলীক কল্পনা-বিলাস, অন্য দিকে খাদ্য বস্ত্র সংগ্রহ এবং বণ্টন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বেতনভুক সরকারী কর্ম্মচারীদের সীমাহীন অযোগ্যতা ও দুর্নিবার অর্থলোলুপতা মিলিয়া আজ দরিদ্র জনসাধারণকে উন্মার্গগামী করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। চাউল, বস্ত্র, সূতা প্রভৃতি লইয়া বিবেক ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিহীন সরকারী কর্ম্মচারীদের চোখের সামনে অতিলোভী অসামাজিক ব্যবসায়ীর দল বিরাট চোরা-কারবার ফাঁদাইয়া বসিয়া চর্ম্মমাত্রাবশেষ দরিদ্র জনসাধারণকে নির্ম্মম ভাবে শোষণ করিতেছে। আশঙ্কা হইতেছে, সমগ্র দেশের হিন্দুস্থানী শ্মশান ও পাকিস্তানী ভাগাড়ে পরিণত হইবার আর বুঝি বিলম্ব নাই।" একমাত্র মন্তব্য এই যে, 'বগুড়ার কথা'র সম্পাদকদ্বয় হিন্দুস্থান-এর বিষয় বিশেষ চিন্তা করিবেন না। পাকিস্তানের সমস্যা গুরুতর এবং বহুবিধ। তাহার সমাধান চেষ্টা করিলে—হয়ত কিছু কাজ হইবে।

* * * * * *

নোয়াখালীর 'দেশের বাণী'র আশা-নিরাশার ও আনন্দ বেদনার কথা :—"হিন্দু-মুসলেম-রক্তরঞ্জিত কলিকাতা নগরীর রাজপথ আতর-গোলাপ জলে শোধিত ও পরিষ্কৃত হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া পূর্ব্বের স্মৃতি ভুলিয়া যাইতে, আত্মবিরোধ ভুলিয়া যাইতে একে অন্যকে অনুরোধ করিতেছে। দুই শত বৎসরের ইংরেজ শাসনের অবসান হইয়াছে, আমাদের পরাধীনতা বন্ধন মোচন হইয়াছে, যদিও ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড স্বাধীন ভারত আমাদের সাধনার লক্ষ্য ছিল আমরা তাহা পাই নাই। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রহিত করার আন্দোলন যে জাতির জীবনে দেশপ্রাণতার উন্মেষ যোগাইয়াছিল আজ দ্বিধাবিভক্ত বাঙ্গালাকেই তাহাদের মানিয়া নিতে হইল। স্বাধীনতার উৎসব আজ স্বজন-বিচ্ছেদ বেদনায় ক্ষুব্ধ। এই ব্যথা-বেদনা আশাভঙ্গজনিত মনস্তাপ ভুলিয়া গিয়া আমরা সেদিনের প্রতীক্ষায় থাকিব, যেদিন হইতে প্রাত্যহিক জীবনে দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটিবে, অশিক্ষা কুশিক্ষা, স্বাস্থ্যহানি, অকালমৃত্যু, দারিদ্র্যের অবসান হইয়া জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।" আমাদের কথাও ঐ একই প্রকার।

* * * * * *

'দেশের বাণী' বলিতেছেন :—"মুসলেম লীগ নেতৃবৃন্দ কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমান নাগরিকদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিতে মহাত্মা গান্ধীকে নোয়াখালী ভ্রমণ স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। গান্ধীজী ঐ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলায় প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দি (তাঁহার উক্তিমতে) গান্ধীজীর পদতলে বসিয়া শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিতেছেন। শান্তিকামী ব্যক্তি মাত্রই ইহাতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবে। গান্ধীজী ইতিপূর্ব্বে আরো কয়েকবার কলিকাতা আসিয়াছিলেন। সুদূর নোয়াখালীর পল্লী অঞ্চলে শান্তির বাণী প্রচার করিয়াছেন, মিঃ সুরাবর্দ্দি যদি তখন এরূপ শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হইতেন তবে সহস্র সহস্র লোকের জীবন ধন সম্পত্তি বিনষ্ট হইত না।" সত্য কথা, কিন্তু এখন আর গত কালের কথা লইয়া চিন্তা করিয়া লাভ কি? ভবিষ্যৎ যাহাতে কল্যাণকর হয়, সেই চেষ্টাই আজ প্রয়োজন-বলিয়া মনে করি।

* * * * * *

জলপাইগুড়ির 'ত্রিস্রোতা' পত্রিকার পূর্ব্ব এবং পশ্চিম-বঙ্গের সীমানা-নির্দ্ধারণ বিষয়ে সুচিন্তিত এবং সুযুক্তিপূর্ণ মন্তব্য সকলের পাঠ করা উচিত।—"স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের এক কলমের খোঁচায় জলপাইগুড়ি রাতারাতি পাঁচটি থানা হারাইল। জলপাইগুড়ির এই পাঁচটি থানার একটি অর্থাৎ পাটগ্রাম রংপুরের সহিত যুক্ত হইল এবং তেঁতুলিয়া, পচাগড়, বোদা ও দেবীগঞ্জ দিনাজপুরের সহিত যুক্ত হইল। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তর স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ নিজেও দিতে পারেন নাই। তাহার এই সীমা-নির্দ্ধারণের রিপোর্ট র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই অপূর্ব্ব রিপোর্ট উহার রাজ-সংস্করণ বলা যাইতে পারে। সীমা-নির্দ্ধারণ কমিশনের অধিবেশনে যিনি এক দিনও বসিয়া কোন পক্ষের বক্তব্য শুনিলেন না এবং যিনি বাঙ্গলা দেশের বিভক্ত অংশগুলির প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও জানেন না, তিনি যে ভাগ বাঁটোয়ারার ব্যাপারে এরূপ কৃতিত্ব দেখাইবেন তাহা জানা কথা। কমিশনের সভাপতি যিনি তিনি যদি বিচারপতিগণের মতামত গ্রহণ না করিয়া নিজেই এইরূপ ভাগ বাঁটোয়ারা করিতে পারেন তবে তিনি দয়া করিয়া কমিশনের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া পক্ষগণের সুবিধা অসুবিধার কথা শুনিলেন না কেন? এই প্রহসনের রহস্য সাধারণ লোকের বোধশক্তির বাহিরে। যদি সীমা-নির্দ্ধারণ কমিশনের সভাপতির জেলা রদ-বদলের এত অসীম ক্ষমতাই ছিল তবে ভাইসরয় লর্ড মাউণ্টব্যাটনের ৩রা জুনের ঘোষণার অর্থ কি? সীমা-নির্দ্ধারণ

কমিশনের রিপোর্ট দৃষ্টে মনে হয় যে, ইহা স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের নিজস্ব বাঁটোয়ারা কমিশন এবং ইহা মোটেই সীমা-নির্দ্ধারণ কমিশন নহে। তাহা না হইলে খুলনা পূর্ব্ববঙ্গে এবং মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গে পড়ে কি করিয়া? অন্যান্য কয়েকটি এলাকা সম্বন্ধেও এই ব্যাপারই ঘটিয়াছে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম স্যার সিরিলের বিচারে পড়িয়াছে পূর্ব্ববঙ্গে। জলপাইগুড়ি জনসংখ্যার শতকরা ২৩·০৮ জন মুসলমান। ভাইসরয়ের ৩রা জুনের ঘোষণায় সমগ্র জলপাইগুড়ি জেলা পশ্চিমবঙ্গে পড়ে। দার্জ্জিলিংএর জনসংখ্যার শতকরা ২·৪২ জন মুসলমান। দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাদ্বয় পশ্চিমবঙ্গে পড়ায় এই জেলাদ্বয়ের সহিত পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্নতা রক্ষাই যখন সীমা-নির্দ্ধারণের মূল কর্ত্তব্য ছিল তখন কি নীতি অনুসারে ও কোন্ যুক্তিবলে ইহাকে পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল, তাহা সহজে কাহারও বোধগম্য হইবে না। তাহা ছাড়া দার্জ্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি হইতে জলপাইগুড়ির প্রবেশ-পথে অবস্থিত তেঁতুলিয়া থানাকে নির্ব্বিবাদে স্যার সিরিল পূর্ব্ববঙ্গে দিয়া গিয়াছেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে পচাগড়, বোদা ও দেবীগঞ্জ যাহাতে বিহারের সহিতও জলপাইগুড়ির সংযোগ নষ্ট হয়। কোন একটা অভিসন্ধি না লইয়া যে তিনি ইহা করিয়াছেন তাহা মনে হয় না। কারণ বৃটিশ কখনও অভিসন্ধি ছাড়া কিছু করে না। এক দিকের চারটি থানাকে দিনাজপুরের সহিত যোগ করিয়া দিয়া অপর দিকে একটি থানা পাটগ্রামকে রংপুরের সহিত যোগ করিয়া তিনি জলপাইগুড়ি সম্বন্ধে তাহার নিজ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। এ বিষয়ে নিজের মতামত ও বিচার-বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়াই যে তিনি ইহা করিয়াছেন তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। না বলিলেও ইহা বুঝা কিছু কঠিন ছিল না। তাহা না হইলে এরূপ অপূর্ব্ব ভাগ হইবে কেন? এই জেলার থানাগুলির অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা থাকিলে জলপাইগুড়ি সম্বন্ধে (অন্ততঃ পক্ষে ৩রা জুনের ঘোষণায় যে নীতিকে ভিত্তি করা হইয়াছে) এইরূপ অবিচার হইত না এবং পশ্চিম-বঙ্গ হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করা হইত না। স্যার সিরিল কাহাদের জন্য ইহা করিলেন? কেন ইহা করিলেন? ইহার উত্তর পাইতে দেরী হইবে না। কিন্তু ইহাতে জলপাইগুড়ি জেলার যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। স্যার সিরিলের বাঁটোয়ারার কবলে (সীমা নির্দ্ধারণের নয়) জলপাইগুড়ির যে পাঁচটি থানা বিসর্জ্জন দিতে হইল এবং যে ভাবে ইহা দিতে হইল তাহাতে জেলাবাসীর প্রতি পদে পদে অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। কে জানে ইহাই বৃটিশের শেষ খেলা কি না।" ইহাই বৃটিশের শেষ খেলা, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে এই খেলার দীর্ঘস্থায়ী ঠেলা আমাদেরই সামলাইতে হইবে—ইহাও পরম সত্য কথা। দুঃখের কথা এই যে, কংগ্রেস এবং লীগ হাই-কমাণ্ডদের মত লইয়াই র‍্যাডক্লিফকে নির্ব্বাচন করা হয়। কাজেই কিল খাইয়া হজম করা ছাড়া আর কি আমরা করিতে পারি?

* * * * * *

বাঙ্গালার সীমানা-নির্দ্ধারণের রায় সম্পর্কে 'দেশের বাণী' মন্তব্য করিতেছেন:—"বিদায়কালীন পদাঘাত—বাঙ্গলার সীমা-নির্দ্ধারণ কমিশনের রায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তে কোন পক্ষই সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। কলিকাতায় সাম্প্রতিক মিলনের অন্তরায় যাহাতে না হয় উভয় পক্ষের নেতৃবর্গ এই সিদ্ধান্ত মানিয়া নিতে সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রয়োজন বোধে নিজেদের মধ্যে একটা আপোষ-রফা করিয়া নেওয়ার কথাও তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন। যদি তাই সম্ভব হয়, তবে বিলাতের এক জন বুনো ব্যারিষ্টারকে সালিশ মানার প্রয়োজন হইল কেন? ৪ জন ভারতীয় জজ একমত হইতে পারেন নাই, সুতরাং বিলাতের এক জনের অবাঞ্ছিত অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত ঔষধের মত গলাধঃকরণ করিতে হইবে, জাতির স্বার্থের খাতিরে। করাচির মুসলেম লীগ হাই-কমাণ্ডের কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহা ইংরেজের "পদাঘাত করিয়া বিদায় গ্রহণ" (Parting keek), জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থবোধ তাঁদের জন্মিলে ভারত বিভাগ হইত না। ভারত বিভাগ সিদ্ধান্ত ও সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত বৃটিশের একই রাজনৈতিক বিবেচনাপ্রসূত ফল। ভারত বিভাগটাও ইংরেজের বিদায়কালীন পদাঘাত। এক রাষ্ট্রে স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত সংখ্যালঘিষ্ঠদের নিরাপত্তার জন্য অপর রাষ্ট্রে অন্য সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘিষ্ঠগণকে জামিনস্বরূপ গণ্য করার পরিকল্পনা শুধু অযৌক্তিক নয়, বিবেকবুদ্ধি-সম্মতও নয়। তৃতীয় পক্ষের সালিশিতে ইহাও আমাদিগকে মানিতে বাধ্য করিয়াছে।" আমরা আর বেশী কি বলিব? স্বীকার যখন করিতেই হইবে, তখন বৃথা অস্বীকার করিয়া লাভ কি?

* * * * * *

'ত্রিস্রোতা'য় প্রকাশ:—"মুস্লীম লীগ দাবী করিয়াছিল যে আরাকান প্রদেশকে ব্রহ্মদেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়া ভারতবর্ষের পাকিস্তান অংশের মধ্যে দেওয়া হউক। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে শতকরা মাত্র তিন জন মুসলমান তবুও তাহাকে পূর্ব্ব-পাকিস্তানভুক্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্ব-পাকিস্তানকে আরাকানের মুসলমানপ্রধান অংশের সীমা সংলগ্ন করা হইয়াছে। অনুরূপ ভাবে বিহার প্রদেশের পূর্ণিয়া জেলার মুসলমানপ্রধান পূর্ব্বাংশের সহিত পূর্ব্ব-পাকিস্তানের সীমা সংলগ্ন করা হইয়াছে। বিহার মুসলিম লীগ দাবী করিয়াছিল যে ঐ অংশকে বিহার প্রদেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়া পূর্ব্ব-পাকিস্তানভুক্ত করা হউক। র‍্যাডক্লিফ তথা বৃটিশের উদ্দেশ্য পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। বিশ্বাসহন্তা মীরজাফরের মুর্শিদাবাদ ও কৃষ্ণচন্দ্রের নদীয়া পশ্চিম-বঙ্গভুক্ত করা হইল। ধান-চাউলের "গোলা" খুলনা পূর্ব্ব-পাকিস্তানে দেওয়া হইল—আর মীরজাফরের বংশধরগণকে যে "খাজনা" বা "তমকা" দেয় তাহা পশ্চিম-বঙ্গের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইল। কৃতজ্ঞতা ব্রিটিশের নাই কে বলে? তবে তাহার দায়টা দুষমনের ঘাড়ে।" অতএব দায় বহন করিতেই হইবে—অন্য পথ কি আছে?

* * * * * *

'দেশের-বাণী'র (নোয়াখালী) এক সংবাদে প্রকাশ:—"গত ১৫ই আগষ্ট খিলপাড়ায় যথারীতি স্বাধীনতা উৎসব পালিত হয়। পাকিস্তান পতাকা উত্তোলিত হয়। সন্ধ্যার পর স্কুল-গৃহে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু গভীর রাত্রে ঐ গ্রামের সুরেন্দ্র গুহের বাড়ীতে ৭।৮ জন দুর্বৃত্ত দা, ছেনি ইত্যাদি নিয়া হানা দেয়। এবং সুরেন্দ্র গুহের সন্ধান করে। সুরেন্দ্র গুহ বাড়ী নাই বলাতে তাহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাস করে। সোরগোল শুনিয়া লোকজন আসিয়া পড়ায় দুর্বৃত্তগণ সুরেন্দ্র গুহের

মাতার শরীরে কয়েক স্থানে অস্ত্রের আঘাত করিয়া প্রস্থান করে। এই সম্পর্কে দুর্বৃত্তগণের কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিয়া স্থানীয় ক্যাম্পের পুলিশের নিকট এজাহার করা হইয়াছে।" ঐ পর্য্যন্তই। পূর্ব্ব-বাঙ্গলা সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নবলব্ধ স্বাধীনতার ব্যবহার বা অপব্যবহারে হস্তক্ষেপ করিবার সাহস পাইবেন বলিয়া মনে হয় না। ইচ্ছাও না হইতে পারে।

* * * *

'পাঞ্চজন্য' দৈনিক পত্রে 'স্পষ্ট-ভাষী' বলিতেছেন :—"চট্টগ্রাম ঘাটতি জেলা। তিন মাসের খাদ্য তাহাকে বাহির হইতে আনিতে হয়, কিন্তু এবার আউস ধান সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে—আমন ধান শতকরা ২০ ভাগ হইবে কি না সন্দেহ। কেন না আমন ধানের চারা নষ্ট হইয়াছে, কৃষকের বীজ-ধান নাই এবং বীজ-ধান ফেলিবার সময়ও গত হইয়াছে। আগামী বছর চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিবে একথা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা ইতিমধ্যেই অনশন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—ভিক্ষাপাত্র হাতে লইতে যাহারা পারে তাহারা পথে বাহির হইয়াছে—বিভিন্ন থানায় বে-সরকারী কেণ্টিন খোলা হইয়াছে কিন্তু চট্টগ্রামবাসীকে অনশনের হাত হইতে রক্ষা করিবার ব্যাপক ও সম্মিলিত কোন প্রচেষ্টা এখনো হয় নাই বলিতে পারি। রিলিফ প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক ক্ষেত্রেই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের সুখ্যাতির দিকেই বেশী নজর দিতেছে, দুঃস্থ সাহায্যের দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনার কথা চিন্তা করিতেছেন কি না সন্দেহ। অন্নসংস্থানের পর আসে মেডিক্যাল রিলিফ, বস্ত্রসমস্যা ও গৃহনির্ম্মাণ। পানীয় জলের অভাবই সর্ব্বত্র। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারী সাহায্যে লোকের অভাব দূর হইতেছে কি না সন্দেহ। বারে বারে চট্টগ্রামে বন্যা হয় কেন? বন্যারোধের কাজে সরকারের কি কোন দায়িত্ব নাই? বন্যার কারণ অনুসন্ধান অবিলম্বে আরম্ভ হওয়া উচিত নয় কি?"

নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু এই ভীষণ উচিত 'কর্ত্তব্য' পালন করিবে কে? পাকিস্তান সরকারের এখন এ-সব সামান্য বিষয়ে দৃষ্টি দান করিবার সময় নাই। নব রাষ্ট্রের বৃহত্তর ব্যাপার লইয়া পাকিস্তানী রাষ্ট্রনায়কগণ ব্যস্ত আছেন। তবে আরো দুই-চারিটা বন্যা হইয়া যাইবার পর হয়ত চট্টগ্রামবাসীদের বরাত ভাল হইতে পারে। এই আশায় তাঁহারা জীবন ধারণ করিতে পারেন।

* * * *

নোয়াখালীর 'দেশের বাণী' দুঃখ করিয়া বলিতেছেন :—"এ জিলায় পাঞ্জাবী পুলিশের আমদানী করা হইয়াছে। সম্প্রতি এই পুলিশদের অপ্রীতিকর কয়েকটি আচরণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আশা করি, জেলা কর্ত্তৃপক্ষ ইহাদের সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। অনেক মুসলমান ভদ্রলোকও পাঞ্জাব হইতে পুলিশ আমদানী করায় আপত্তি জ্ঞাপন করিতেছেন। ইহাদের ভাষা সকলের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। অনেক নিরীহ লোক তাহাদের কথা বুঝিতে না পারিয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিতে পারে।" পাঞ্জাবী পুলিশের বিষয় আমাদের পাঠকবর্গকে নূতন পরিচয় দান করিতে হইবে না। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলিম জনসাধারণ, কলিকাতায় সুরাবর্দ্দি সাহেব কর্ত্তৃক পাঞ্জাবী পুলিশ আমদানী কালে, অত্যন্ত খুশী হইয়াছিলেন। লীগ পত্রিকাগুলিও এ-কার্য্যে শহিদ সাহেবের পরম সমর্থক ছিল! এ-পাপ বিদায় করিতে হইলে পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বসাধারণকে একযোগে বাধ্য করিতে হইবে। জনমত যদি অভিন্ন হয়, নাজিমুদ্দীন সাহেব তাহার কাছে নতি স্বীকার করিতে অবশ্যই বাধ্য হইবেন।

* * * *

'দেশের বাণী'তে প্রকাশ যে—"সদর থানার এনং ইউনিয়নে কিছু দিন যাবৎ লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ক্ষেতের ধান কাটিয়া নেওয়া হইতেছে। গত ৭ই আগষ্ট রাত্রে নোয়াল্লই গ্রামের শ্রীনরেন্দ্র মজুমদারের আট গণ্ডা জমির ধান দুর্বৃত্তরা কাটিয়া নিয়াছে; থানায় এজাহার দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় মাতব্বর লোকদিগকেও জানান হইয়াছে। কিন্তু কোনরূপ সহানুভূতিসূচক ব্যবহার পাওয়া যায় নাই।" আশায় থাকুন। লীগ নেতারা বলিয়াছেন—সংখ্যালঘুদের সকল ভার তাঁহারা লইবেন। সর্ব্বপ্রথম ধান্য লইয়াই হয়ত কর্ত্তব্য পালন সুরু হইয়াছে। তাহার পর গরু-ছাগল আছে।

* * * *

উপরি-উক্ত সংবাদই শেষ নহে। 'দেশের বাণীতে' এক জন পত্র-প্রেরক অভিযোগ করিতেছেন :—"লোকমুখে শুনি, আমরা এখন আর বৃটিশের প্রজা থাকিব না—এইবার পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধিবাসী হইব। পাকিস্তানের নামেই সংখ্যালঘুরা আতঙ্কিত। ভাবিতেছি এইবার আমাদের দেশছাড়া করিবে। নানা প্রকার গুজব ছড়াইয়া সংখ্যালঘুর মনের বল একেবারেই ভাঙ্গিয়া দিতেছে। এমন অবস্থা সৃষ্টি হইতেছে যে, প্রকাশ্য দিবালোকেও সংখ্যালঘুর জিনিষপত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কোনও দুর্বৃত্ত লইয়া গেলেও তাহাকে ধরিবার কেহ থাকিবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নেতারাও সংখ্যালঘুকে রক্ষা করিবার জন্য বড় বড় বিবৃতি দিয়াই খালাস। প্রধান প্রশ্ন হইতেছে—এই বিবৃতিকে কাজে খাটাইবে কে? গত আশ্বিন মাসের পর হইতে আমাদের উপর যে অত্যাচার চলিতেছে অবিলম্বে ইহার প্রতিকার ব্যবস্থা না হইলে আমাদের ঘরবাড়ী ছাড়িয়া আমাদের শিশু-সন্তান লইয়া গাছতলায় আশ্রয় লইতে হইবে। গত পৌষ ফসলের সময় হইতে আমাদের উপর অত্যাচার সুরু হয়। প্রথমতঃ মাঠ হইতে দল বাঁধিয়া ধান কাটিয়া লইয়া গেল, তার পর গরুর খাওয়ার 'খড়ের চীন' পোড়াইয়া দিল, হালের গরু চুরি করিয়া নিয়া গেল। এরূপ আরও কত অত্যাচার। প্রতিবারই থানায় এজাহার দিতে আসিয়াছি কোন দিন তাড়া খাইয়া চলিয়া গিয়াছি কোনও দিন লিখিত এজাহার দিয়া গিয়াছি। বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট সাহেবকে জানাইয়াছি স্থানীয় গণ্যমান্য হিন্দু মুসলমান নেতাদেরও জানাইয়াছি, কিন্তু কিছুতেই অভাগার অত্যাচারের উপশম হইল না। এবারও আবার আউস ফসল জমি হইতে কাটিয়া লইয়া যাইতেছে। আবার থানায় গেলাম; বোর্ডেও জানাইলাম কিন্তু প্রত্যাশার কিছুই পাইলাম না। এখন জিজ্ঞাস্য, ইহাই কি সংখ্যালঘুর ভবিষ্যৎ?" নাজিমুদ্দীন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন। তবে জিজ্ঞাসা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় মহাশয়ের মারফৎ পাঠাইলে হয়ত শীঘ্র জবাব পাইতে পারেন। কিন্তু নোয়াখালীতে সংঘটিত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অত্যাচারের কাহিনী হিন্দু নেতাদের জানাইয়া লাভ কি হইবে?

★ তিমিরবরণ
ভট্টাচার্য সালে
কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।
প্রথম থেকেই তিনি সরোদ
শিখতে আরম্ভ করেন এবং মাত্র
১৮ বৎসর বয়সেই এই যন্ত্রে
অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি
ওস্তাদ আমীর খাঁ ও আলাউদ্দীন
খাঁর ছাত্র। তিমিরবরণ সালে
উদয়শঙ্করের শিল্পীসংঘে যোগদান
করেন এবং তাঁর সঙ্গেই আমেরিকা,
বৃটেন এবং ইউরোপের সর্বত্র পরিভ্রমণ
করেন। সে সব দেশে সঙ্গীতের গুণগ্রাহী
মাত্রেই তিমিরবরণের প্রতিভার প্রশংসা
করেছেন। ভারতীয় সঙ্গীতে ঐকতানবাদনের
একজন অভিনব পথপ্রদর্শক হিসেবে তিমির-
বরণ যথেষ্ট খ্যাতি ও সমাদর লাভ করেছেন।
তিমির বরণ... সুরশিল্পী
প্রখ্যাত সুরকার তিমিরবরণ সুর-সংমিশ্রণের একটি অভিনব ধারা প্রবর্তন করে' ভারতীয় ঐকতান সঙ্গীতকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। চা সম্বন্ধে তিনি বলেন:
'কল্পনার তারে যে নব নব সুরের অস্পষ্ট গুঞ্জন ধ্বনি শুনি তাকে যন্ত্রের তারে বেঁধে পরিপূর্ণ রূপে ঐকতানের ছন্দে ঝঙ্কৃত করে' তুলতে চা আমাকে অনেকখানি প্রেরণা দেয়।'
চা
প্রেরণার উৎস
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

ডাক্তার বল্লেন
চিন্তা করুন
পরে
"আপনার স্ত্রী বেশ সেরে উঠছেন। কপাল ভালো যে ধাত্রীর সাথে এক শিশি ডেটল ছিল, প্রসবের সময় সংক্রমণের ভয় বড্ডোই মারাত্মক কিনা।"
"ধন্যবাদ ডাক্তার, কথা দিচ্ছি ভবিষ্যতে সব সময় বাড়িতে ডেটল এক শিশি রাখবো।"
"আমার দেশের প্রত্যেক মা-বোনের কাছে আমি শুধু এই বলি যে তাঁরা যেন তাঁদের প্রত্যেক শারীরিক ব্যাপারে ডেটল ব্যবহার করেন: এমনকি গূঢ় ব্যাপারেও। এতে বিষ নেই, ব্যবহারের পরে দাগও লাগে না। শিশুদের পক্ষেও ডেটল পরম উপযোগী। বাড়িতে সর্বদা হাতের কাছে ডেটল রাখেন প্রত্যেক বিচক্ষণ গৃহস্থ।
ANTISEPTIC
DETTOL
'DETTOL'
TRADE MARK
ডেটল আধুনিক বীজাণুপ্রতিষেধক
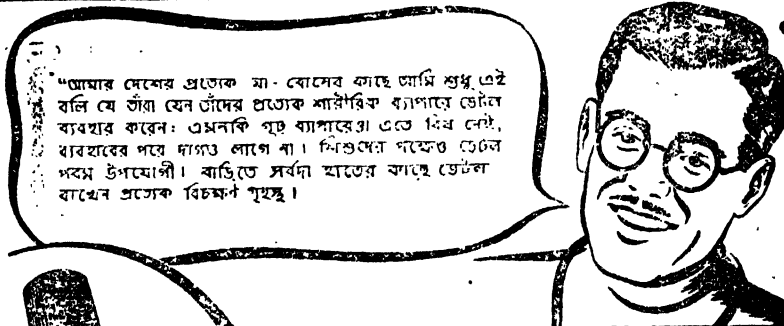
এস, ডি, ডি

স্বাধীনতা-দিবসে খেলার মাঠ :—

বিগত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে সারা ভারতের উৎসব অনুষ্ঠানে কলিকাতার বিভিন্ন ক্লাব ও স্পোর্টস এসোসিয়েশন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। ময়দানে বিভিন্ন ক্লাবের অঙ্গনে উড্ডীয়মান-জাতীয় পতাকা এই উৎসবের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। জাতীয় ক্লাবসমূহের অগ্রণী মোহনবাগান ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করেন পশ্চিম-বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সভাপতি শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার, মহঃ স্পোর্টিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মিঃ এস, এম, ইয়াকুব এবং ভবানীপুর ক্লাবে স্যার অশোক রায় পতাকা উত্তোলন করেন। উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতা স্পোর্টিং পরিচালকগণের উদ্যোগে নিজ নিজ মাঠে পতাকা উত্তোলিত হয় এবং বিশেষ প্রদর্শনী ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য বিভিন্ন ছোট-বড় এবং সমস্ত ইউরোপীয় ও এংলো-ইণ্ডিয়ান ক্লাবসমূহ নিজ নিজ এলাকায় পতাকা উত্তোলন করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা যে, পার্শী ক্লাব ও ব্রিটিশ শাসনকালীন শ্বেতবর্ণ পুলিশ সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশেষ ক্লাব অজ্ঞাত কারণে কোন পতাকা উত্তোলিত করে নাই।

নিখিল বঙ্গ আন্তঃ-জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা :—

প্রথম দিনে অমীমাংসার পরে জলপাইগুড়ীতে স্থানীয় জেলা দলকে অনায়াসে ৩—০ গোলে পরাজিত করিয়া ২৪ পরগণা জেলা দল নিখিল বঙ্গ আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানে বিজয়ীর গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। প্রথিতযশা ও অসামান্য প্রতিভাশালী ফুটবল-শিক্ষক উমেশ মজুমদার (দুঃখীরাম বাবু) মহাশয়ের স্মরণার্থে উৎসর্গীকৃত কাপ ও জলপাইগুড়ী টাউন ক্লাব কর্তৃক প্রদত্ত তাহাদের প্রাক্তন খেলোয়াড় ও কর্ম্মী মাখনলাল রায়ের নামে কাপ যথাক্রমে বিজয়ী ও বিজিত দল দুইটিকে পশ্চিম বাঙলার অন্যতম মন্ত্রী মাননীয় মোহিনীমোহন বর্ম্মণ মহাশয় উপহার দেন। বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও জলপাইগুড়ীর ক্রীড়োৎসাহিগণ এই প্রতিযোগিতা যোগ্যতার সহিত চালাইয়া সারা বাঙলার ফুটবল-অনুরাগীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

আই, এফ, এ শীল্ড ও অন্যান্য প্রতিযোগিতা :—

কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রশমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আই, এফ, এ, কর্তৃপক্ষের মধ্যে নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা ট্রেডস্‌, কুচবিহার ও ইয়ঙ্গার কাপের এবং ইলিয়ট শীল্ডের ক্রীড়াসূচী প্রণয়ন করেন। এই প্রতিযোগিতাগুলিতে যথাক্রমে ১৪টি, ১২টি এবং ১৫টি বিভিন্ন দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। ইলিয়ট শীল্ডে মোট ১৭টি কলেজ দল যোগদান করিয়াছে। এই প্রতিযোগিতাগুলির যথাযথ অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আই, এফ, এর কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ শীল্ড প্রতিযোগিতা আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর হইতে চালাইবার উপযোগী বন্দোবস্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হ'ন। বহিরাগত শক্তিশালী বিভিন্ন প্রাদেশিক দলসমূহকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু উদ্যোগ-পর্ব্বের প্রায় সূচনাতেই আকস্মিক ভাবে কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক অবস্থার শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছে। ফলে, আই, এফ, এ শীল্ডের যাত্রাপথ এ বৎসর সুগম হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। এ-দিকে নিখিল ভারত ও আন্তঃ-প্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানও এ বৎসর কলিকাতায় হইবার কথা হইয়াছে। কিন্তু এই অতর্কিত উন্মাদনার ফলে বিলম্বিত ফুটবল-আসর জমিবে কি?

ইতিমধ্যে আই, এফ, এ, দুইটি বিশেষ প্রদর্শনী ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করে। প্রথম খেলায় আই, এফ, এ, ভারতীয় একাদশ ব্রিটিশ সামরিক একাদশকে ৫—০ গোলে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে। ভারতীয় ও ইউরোপীয় বাছাই দলের মধ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা দ্বিতীয় খেলাটি বাংলার বন্যাপীড়িত ও দাঙ্গা-দুর্গতদের সাহায্যকল্পে অনুষ্ঠিত হয়। অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, মানবতার এই আহ্বানে বাঙলার ফুটবল-পিয়াসী জনসাধারণের মোটেই আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নাই। উপরন্তু, অনেকে বিনা টিকিটে খেলার মাঠে প্রবেশ করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার নিদারুণ অভাবের চরম পরিচয় দেয়। এংলো-ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড় লইয়া গঠিত ইউরোপীয় নামধারী দলটি ৩—০ গোলে পরাজয় বরণ করে।

দক্ষিণ-আফ্রিকার পঞ্চম টেষ্ট খেলা :—

ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ-আফ্রিকার পঞ্চম টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হইয়াছে। মাত্র ২৮ রাণের জন্য সময়াভাবে আগন্তুক দল জয়লাভে বঞ্চিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই ইংলণ্ড দল 'রাবার' জয়ের গৌরব অর্জ্জন করে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবীণ খেলোয়াড় ব্রুস্‌ মিচেল যথাক্রমে উভয় ইনিংসে ১১০ ও নট আউট ১৮৯ রাণ করে। দ্বিতীয় ইংনিসে মিচেল সাত ঘণ্টা খেলিয়া অপরাজিত থাকে এবং নোর্সে'র সহযোগিতায় তৃতীয় উইকেটে ১৮৪ ও অষ্টম উইকেট জুটীতে টাকেটের সাহচর্য্যে ১০৯ রাণ সংগ্রহ করে। মিচেল টেষ্ট খেলায় ইতিহাসে হার্বি টেলরের মোট ২৯৩৬ রাণের রেকর্ডও ভঙ্গ করে। ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ-আফ্রিকার টেষ্ট পর্য্যায়ে এবার কম্পটন পাঁচটি খেলায় মোট চারিটি সেঞ্চুরী করিবার গৌরব অর্জ্জন করে। বোলিংয়ে উভয় পক্ষে ম্যান, রাওয়্যান, হাওয়ার্থ ও কপসন যথেষ্ট দক্ষতা দেখায়।

ইংলণ্ডের কাউণ্টী চ্যাম্পিয়নসিপ :—

নর্দ্যাম্পটন সাম্বারকে শেষ খেলায় পরাজিত করিয়া মিডলসেক্স দীর্ঘ ২৬ বৎসর পরে কাউণ্টী ক্রিকেটে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। দক্ষিণ-ইংলণ্ডের কোন দলেরও ২৬ বৎসর পরে এই জয়-গৌরব। ১৯২০ ও ২১ সালে মিডলসেক্সের শ্রেষ্ঠত্বের পরে ইয়র্কশায়ার ১১ বার, ল্যাঙ্কাশায়ার ৫ বার এবং নটিংহ্যাম ও ডার্বিশায়ার একবার করিয়া কাউন্টী চ্যাম্পিয়ন হয়।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

আন্তঃ-আমেরিকা সম্মেলন—

এক শত বৎসর পূর্ব্বে ১৮৪৭ সালে কার্ল মার্কস তাঁহার 'সাম্যবাদী ফতোয়া'র (Communist Manifesto) প্রারম্ভে বলিয়াছিলেন, "A spectre is haunting Europe—the spcetre of Communism." অর্থাৎ "একটা বিভীষিকা ইউরোপকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে! এই বিভীষিকা সাম্যবাদের।" এক শত বৎসর পরে ১৯৪৭ সালে শুধু ইউরোপ নয়, সমগ্র পৃথিবীই সাম্যবাদের বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে কম্যুনিজম বা সাম্যবাদ ভীতি তাহার মধ্যে সুপরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর সমস্ত দেশকেই রাশিয়া তথা কম্যুনিজমের প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমেরিকা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। আমেরিকার এই সর্ব্বগ্রাসী নীতির স্বরূপ জানিয়া বুঝিয়াও বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতিরা কম্যুনিজম হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মার্কিণ মূলধনের সহিত সর্ব্বনাশা সহযোগিতা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। গ্রীস, তুরস্ক ও পারস্যকে সাহায্যদানের মধ্যে, মার্শাল পরিকল্পনার মধ্যে তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য আমেরিকা তাহার সামরিক শক্তিকে অধিকতর সুদৃঢ় করিতে চায়। সম্প্রতি আমেরিকান লিজিয়নের সম্মেলনে (The Convention of American Legion) জেনারেল আইসেন হাওয়ার যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে আর একটা বিশ্বসংগ্রামের জন্য আমেরিকাবাসীর মন যে প্রস্তুত হইতেছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কোথায় শত্রু? কে আমেরিকা আক্রমণ করিবে? কাহার বিরুদ্ধে এই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি? এই সকল প্রশ্ন আমেরিকার কাছে অবান্তর। কোন শত্রুর অস্তিত্ব না থাকিলেও কল্পিত শত্রুর অস্তিত্ব সৃষ্টি করা পৃথিবীতে কোন নূতন কৌশল নয়। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী কালে হিটলার এবং মুসলিনীও এই নীতিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমেরিকা তাহার পৃথিবীব্যাপী কূটনৈতিক প্রতিপত্তি বিস্তারের প্রয়োজনে কি সেই নীতিই অনুসরণ করিতেছে না? সমগ্র পৃথিবীতে তাহার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব প্রসারিত করা এব অক্ষুন্ন রাখার জন্য তাহার সামরিক শক্তি ও প্রভাবকে সুদৃঢ় রাখা প্রয়োজন। শুধু এই পথেই পৃথিবীর অদ্বিতীয় রাষ্ট্রশক্তিরূপে আমেরিকা তাহার প্রতিপত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ। সম্প্রতি ব্রাজিলের রাজধানী রিও-ডে-জানেরোতে যে আন্তঃ-আমেরিকা সম্মেলন হইয়া গেল তাহার মধ্যেও আমেরিকার এই উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

আক্রমণের বিরুদ্ধে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সমস্ত রাষ্ট্রের সম্মিলিত রক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনাই এই আন্তঃ-আমেরিকা সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে। আমেরিকার কুড়িটি রাষ্ট্র এই সম্মেলনে যোগদান করেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আজ আর তাহার সীমান্তের মধ্যেই আবদ্ধ নাই। প্রশান্ত মহাসাগরে, আটলাণ্টিক মহাসাগরে, ভারত মহাসাগরে, ভূমধ্য সাগরে, উত্তর মেরুতে— এক কথায় পৃথিবীর সুদূর অঞ্চলে তাহার আত্মরক্ষার জন্য ঘাঁটি প্রস্তুত করা হইতেছে। আমেরিকার সামরিক নেতৃবর্গ এই অভিমত পোষণ করেন যে, তৃতীয় মহাযুদ্ধ হইবে পৃথিবীর সুদূর উত্তর অঞ্চলে—উত্তর মেরুতে। জেনারেল আরনল্ড বলিয়াছেন, "If there is a third world war its strategic centre will be the North Pole. অর্থাৎ "তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম যদি হয় তবে উহার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হইবে উত্তর মেরু।" তৃতীয় মহাযুদ্ধ রাশিয়ার সহিত হওয়ার সম্ভাবনাই এই উক্তির মধ্যে সূচিত হইয়াছে। তৃতীয় মহাযুদ্ধ যে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যেই হইবে, সে সম্বন্ধে কাহারও কোনই সন্দেহ নাই এবং আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে উভয় দেশের মধ্যে সোজা পথ উত্তর মেরুর গুরুত্ব যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? উত্তর মেরুর পথে রাশিয়া হইতে কানাডাই পড়িবে প্রথম। কাজেই কানাডার সহিত আমেরিকার যুক্ত রক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়। কিন্তু রাশিয়া দক্ষিণ আমেরিকার পথে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করিবে তাহার সুদূর সম্ভাবনাও দেখা যায় না। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে, দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির সহিত একসঙ্গে মিলিত রক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। কিন্তু এই সম্মিলিত রক্ষা-ব্যবস্থার মূলে যে রক্ষা-ব্যবস্থা ছাড়াও গভীরতর উদ্দেশ্য রহিয়াছে তাহা অনুমান করা খুব কঠিন নয়।

সম্মিলিত রক্ষা-ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্য্যায়ে অস্ত্র-শস্ত্র, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম এবং সামরিক শিক্ষা আমেরিকার আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিকে এই সকল ব্যাপারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপর অনেকখানি নির্ভর না করিলে চলিবে না। দক্ষিণ আমেরিকার প্রত্যেক দেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামরিক বিভাগের যথেষ্ট প্রভাব। সামরিক শিক্ষাদানের ভিতর দিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সামরিক বিভাগের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিবে। ইহার পরিণামস্বরূপ দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির রাষ্ট্রনীতিতে আমেরিকা প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে। দক্ষিণ আমেরিকায় বামপন্থী দলগুলির প্রভাব কম

নয়, অবশ্য এক আর্জ্জেণ্টিনা বাদে। এই বামপন্থী দলগুলির প্রভাবের জন্যই ১৯৪১ সালে রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি (আর্জ্জেণ্টিনা বাদে) জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। যুদ্ধ হইতে রাশিয়া শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে বাহির হওয়ায় এই বামপন্থী দলগুলির শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কা দক্ষিণ আমেরিকার পুঁজিপতিরা উপেক্ষা করিতে পারেন না। এই আশঙ্কার জন্য আমেরিকার সহযোগিতা করিতে তাহাদের আপত্তি হইবে না এবং আমেরিকারও তাহা কাম্য। আমেরিকায় উদ্বৃত্ত মূলধন প্রচুর রহিয়াছে এবং দক্ষিণ আমেরিকায় রহিয়াছে মূলধন নিয়োগের বিস্তৃত ক্ষেত্র। মার্কিণ পুঁজিপতিরা দক্ষিণ আমেরিকার পুঁজিপতিদের সহিত সহযোগিতা দ্বারা দক্ষিণ আমেরিকায় কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি বামপন্থী দলকে নির্ম্মূল করিতে পারিবেন, সঙ্গে সঙ্গে মার্কিণ মূলধনও বেশ খুঁটি গাড়িয়া বসিতে পারিবে। পশ্চিম গোলার্দ্ধের সম্মিলিত রক্ষা-ব্যবস্থার নাম করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকার সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে। দক্ষিণ মেরুর দিক হইতে আক্রান্ত হওয়ার কোন আশঙ্কাই আমেরিকাবাসী করে না। কিন্তু সম্মিলিত রক্ষা-ব্যবস্থার নামে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া দক্ষিণ আমেরিকাকে রাশিয়া তথা কম্যুনিজমের প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার আশা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই করে।

আন্তঃআমেরিকা সম্মেলনে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বলিয়াছেন, "We find a number of nations are still subjected to the type of foreign domination which we fought to overcome. Many of the remaining peoples of Europe and Asia live under the shadow of aggression." 'যে শ্রেণীর বৈদেশিক প্রভাব হইতে মানব জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য আমরা সংগ্রাম করিয়াছি, আমরা দেখিতে পাইতেছি, কতকগুলি জাতি এখনও সেই শ্রেণীর বৈদেশিক শক্তির প্রভাবাধীন রহিয়াছে। ইউরোপ ও এশিয়ার অবশিষ্ট অধিবাসীরা সশস্ত্র আক্রমণের আশঙ্কার মধ্যে বাস করিতেছে।' পৃথিবীর অল্প সংখ্যক যে কয়েকটি দেশে বামপন্থীরা শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেছেন সেই কয়েকটি দেশকে লক্ষ্য করিয়াই প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এই মন্তব্য করিয়াছেন। যত গণ-তান্ত্রিকই হউক না কেন, বামপন্থীদের শাসন তাঁহার দৃষ্টিতে ডিক্‌টেটারশিপ ছাড়া আর কিছুই নয়। বামপন্থীদের শাসনকে তিনি রাশিয়ার অধীনতা বলিয়াই মনে করেন। রাশিয়া ও কম্যুনিজম ভীতি সৃষ্টি করিয়া পৃথিবী হইতে তিনি বামপন্থীদিগকে উচ্ছেদ করিতে চান। পৃথিবী হইতে বামপন্থীর উচ্ছেদ না হইলে বিশ্বশান্তি এবং স্বাধীন মানুষের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না, এই কথাই তিনি বিশ্ববাসীকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু বামপন্থীদিগকে উচ্ছেদ করিয়া বিশ্বশান্তি ও স্বাধীন মানুষের শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় কি? একমাত্র উপায় যে আমেরিকার পতাকাতলে সমবেত হওয়া, একথা প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান গোপন রাখেন নাই। আন্তঃ-আমেরিকা সম্মেলনে পশ্চিম গোলার্দ্ধের সমস্ত জাতিকে বিশ্বশান্তি এবং স্বাধীন মানুষের শান্তির জন্য আমেরিকার সহিত একসঙ্গে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানাইয়াছেন। আমাদের দৃষ্টিতে আমেরিকার সহিত একসঙ্গে দণ্ডায়মান হওয়া আর আমেরিকার পতাকাতলে সমবেত হওয়ার মধ্যে আসলে কোন তফাৎ নাই! আমেরিকা শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কথা বলে বটে, তাহা শুধু বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতি তাহার অনুরাগকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য। আর বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতিরাও কম্যুনিজম হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আমেরিকার আহ্বানে সাড়া না দিয়া পারে না। কিন্তু আমেরিকার এই আত্মপ্রসারণের নীতিই আর একটি মহাযুদ্ধকে টানিয়া আনিয়া স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করিবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের পুঁজিপতিরা পৃথিবীকে অতিদ্রুত তৃতীয় মহাসমরের পথে আগাইয়া দিতেছেন!

ত্রিশক্তি বৈঠক—

জার্ম্মাণীর বৃটিশ ও মার্কিণ এলাকায় শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির বিষয় আলোচনা করিবার জন্য গত ২২শে আগষ্ট লণ্ডনে বৃটেন, আমেরিকা এবং ফ্রান্স এই ত্রিশক্তির যে বৈঠক আরম্ভ হইয়াছিল ২৭শে আগষ্ট তাহা সমাপ্ত হইয়াছে। এই বৈঠকে জার্ম্মাণীর বৃটিশ ও মার্কিণ এলাকায় শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির যে পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা ১৯৩৬ সালে জার্ম্মাণীর শিল্পোৎপাদনের প্রায় সমান! এখানে ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ১৯৩৬ সালে হিটলার তাঁহার ক্ষমতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমাসীন ছিলেন। ১৯৪৫ সালে পটস্‌ডাম সম্মেলনে স্থির হইয়াছিল যে, সমগ্র জার্ম্মাণীতে ইস্পাৎ-শিল্পের উৎপাদন ৭৫ লক্ষ টনের বেশী হইবে না। কিন্তু লণ্ডনের এই ত্রিশক্তির বৈঠকে শুধু জার্ম্মাণীর ইঙ্গ-মার্কিণ এলাকাতেই ইস্পাৎ-শিল্পের উৎপাদন ১ কোটি ৭ লক্ষ টন করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। ইস্পাতের এই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এত অধিক পরিমাণে কয়লার প্রয়োজন হইবে যে, এই প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে রূঢ় অঞ্চলের কয়লা ও কোকের রপ্তানি যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করিতে হইবে। ফ্রান্সের শিল্পোৎপাদনের জন্য রূঢ়ের কয়লা একান্ত ভাবেই অপরিহার্য্য। এই নূতন পরিকল্পনায় জার্ম্মাণীর ইঙ্গ-মার্কিণ এলাকায় ইস্পাতের উৎপাদন পটস্‌ডাম সম্মেলনে নির্দ্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবে বটে, কিন্তু কয়লার অভাবে ফ্রান্সের মিলগুলির কাজ বন্ধ হইবার উপক্রম হইবে। ফ্রান্সের নিরাপত্তার দিক্ হইতে বিবেচনা করিয়া ফ্রান্স যে এই সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হইয়াছে, ইহা খুব স্বাভাবিক। ফ্রান্স তাহার নিরাপত্তা সম্বন্ধে যে দাবী করিয়াছিল লণ্ডন বৈঠকে তাহা রক্ষিত না হওয়ায় ফ্রান্স অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছে। রূঢ় অঞ্চলকে আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার দাবী ফ্রান্স অনেকখানি নরম করিয়াছে, কিন্তু রূঢ়ের কোক্ কয়লার রপ্তানি সম্পর্কে ফ্রান্স যে প্রস্তাব করিয়াছিল লণ্ডন বৈঠকে তাহা রক্ষিত হয় নাই। ফ্রান্সের প্রস্তাব বিবেচনা করিবার জন্য বৃটেন এবং আমেরিকা বার্লিনে বিশেষজ্ঞদের এক সম্মেলন আহ্বানের উদ্যোগ করিয়াছেন। কিন্তু এই সম্মেলনের ফল সম্বন্ধে কেহই বিশেষ কোন আশা পোষণ করেন না। অনেকেই মনে করেন, ফ্রান্স যাহাতে লণ্ডন বৈঠকের সিদ্ধান্ত গলাধঃকরণ করে, বার্লিন বৈঠকে হইবে তাহারই ব্যবস্থা।

লণ্ডনের ত্রিশক্তির বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তে রাশিয়াও যে সন্তুষ্ট হইবে না, ইহা জানা কথা। রাশিয়া ইতিপূর্ব্বেই এইরূপ বৈঠকের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইয়াছে। রাশিয়ার অভিমত এই যে, জার্ম্মাণীর শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি ও রূঢ় অঞ্চলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা কেবল

চতুঃশক্তি সম্মেলনেই হইতে পারে। বৃটিশ এবং আমেরিকা কেহ-ই রাশিয়ার আপত্তিতে কর্ণপাত করে নাই। বস্তুতঃ, লণ্ডন বৈঠক বিভক্ত হওয়ার পথে জার্ম্মাণীকে যে অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিম জার্ম্মাণীর শিল্পই যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের পুনর্গঠন কার্য্যের প্রধান স্তম্ভে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বিভক্ত জার্ম্মাণী যে ইউরোপে শান্তি-রক্ষার প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিবে ইহাও অবশ্যই স্বীকার্য্য। জার্ম্মাণীর বৃটিশ এলাকাতেই রূঢ় এবং জার্ম্মাণীর শিল্পপ্রধান অঞ্চল অবস্থিত। বৃটিশ জার্ম্মাণীর শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি করিতে খুবই ইচ্ছুক। আমেরিকার ইচ্ছাও যে কিছু কম তাহা নয়! জার্ম্মাণীর কয়লার খনি, ইস্পাতের কারখানা, রসায়ন-শিল্পের কারখানার কোন মালিক এখন নাই। পূর্ব্বে যাঁহারা এইগুলির মালিক ছিলেন তাঁহাদিগকে জার্ম্মাণীতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতেছে না। জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট বলিয়াও এখন কিছু নাই। বৃটেন জার্ম্মাণীর শিল্পগুলিকে সোশ্যালাইজড্ করিবার পক্ষপাতী, কিন্তু আমেরিকা উহার বিরোধী। অর্থনৈতিক দিক হইতে আমেরিকার উপর বৃটেনের নির্ভরতার জন্য বৃটেনের পক্ষে আমেরিকার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কিছু করা সম্ভব নয়। রাশিয়া ও কম্যুনিজমের বিরুদ্ধেও আমেরিকার সহিত সহযোগিতা বৃটেনের অপরিহার্য্য। লণ্ডন বৈঠকের সিদ্ধান্তের ফলে পশ্চিম জার্ম্মাণী রাশিয়া ও কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হইবে এবং আমেরিকার উদ্‌বৃত্ত মূলধন নিয়োগেরও হইবে অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র।

মার্শাল পরিকল্পনার পথে—

মার্শাল পরিকল্পনার ভিত্তিতে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য যোড়শ রাষ্ট্রের যে কমিটি গঠিত হইয়াছে, তাঁহারা পরিকল্পনার একটি কাঠামো খাড়া করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই পরিকল্পনার কাঠামোটি তিনটি স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তর আগামী বসন্ত কাল পর্য্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে কি ডলার দ্বারা কি অন্য উপায়ে ইউরোপকে কোন সাহায্য দান করা আমেরিকার পক্ষে সম্ভব হইবে না? সুতরাং পরিকল্পনার এই স্তরে ইউরোপের এই যোলটি দেশকে নিজেদের যাহা কিছু আছে তাহারই উপর নির্ভর করিতে হইবে। ভবিষ্যতে মার্কিণ সাহায্যের শুভ দিন আসিতেছে এ কথা স্মরণ করিয়াই পরিকল্পনার প্রথম স্তরে ক্ষুধার জ্বালা ভুলিবার জন্য তাহাদের চেষ্টা করিতে হইবে। পরিকল্পনার দ্বিতীয় স্তর হইবে চারি বৎসরব্যাপী—১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫১ সালের শেষ পর্য্যন্ত। ইউরোপের কি প্রয়োজন এবং নিজেদের চেষ্টার কতটুকু ফল আছে তাহার একটি তালিকা কমিটি গঠন করিয়াছেন। পরিকল্পনার তৃতীয় স্তর আরম্ভ হইবে ১৯৫২ সাল হইতে। এই সময় হইতেই ইউরোপের যোলটি দেশকে সংহত করিবার কার্য্য প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হইবে। এই সংহতি কিরূপ আকার গ্রহণ করিবে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় আন্তঃ-ইউরোপীয় কাষ্টম ইউনিয়ন গঠনের জন্য ইটালীর প্রস্তাবের মধ্যে।

সম্প্রতি মন্ট্রে সহরে সংযুক্ত ইউরোপ কংগ্রেসের যে অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে তাহার কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। চারি দিন অধিবেশনের পর ৩০শে আগষ্ট (১৯৪৭) এই অধিবেশন শেষ হইয়াছে। এই অধিবেশনের ফলে একটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনের পথ অনেক সহজ হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। অধিবেশনের আলোচনায় ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, শুধু অর্থনৈতিক ফেডারেশন গঠনের পথে খাঁটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন সম্ভব নয়। কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক হইতে যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠিত হইবে, রাশিয়া ও রুশ-প্রভাবিত অঞ্চলগুলি যে উহা হইতে বাদ পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সুইজারল্যাণ্ড বা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ কোন ইউরোপীয় ফেডারেশন গঠন সম্ভব কি না, তাহা অবশ্যই ভাবিবার বিষয়। কিন্তু মার্শাল পরিকল্পনার কথাও আমাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য। এই পরিকল্পনা প্রত্যক্ষ ভাবে মার্কিণ নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য্যকরী করা হইবে এবং ইউরোপের উল্লিখিত যোলটি রাষ্ট্রের প্রত্যেকটির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবে আমেরিকার প্রভুত্ব। এই পথে যে-ইউরোপীয় ফেডারেশন গঠিত হইবে তাহা একটি মার্কিণ তাঁবেদার ফেডারেশন ছাড়া আর কিছুই হইবে না এবং উহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি পশ্চিমী ব্লক গঠন করা। উহার পরিণাম ভবিষ্যৎ শান্তির পক্ষে কতখানি উপযোগী হইবে, তাহা বুঝিতেও বেশী দিন বিলম্ব হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

বৃটেনের আর্থিক সঙ্কট ও আমেরিকা—

গত ২০শে আগষ্ট বৃটেনের লর্ড প্রেসিডেণ্ট অব দি কাউন্সিল মিঃ মরিসন বৃটেনের অর্থনৈতিক সঙ্কট সম্বন্ধে সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছিলেন, "Despite all the efforts by all concerned the crisis is still getting graver. We shall have to face worse things before we are through." অর্থাৎ 'সংশ্লিষ্ট সকলের সকলপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও সঙ্কট অধিকতর গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। সঙ্কট মুক্তির পূর্ব্বে আমাদিগকে অধিকতর দুর্গতির সম্মুখীন হইতে হইবে।' বৃটেনের এই অনস্বীকার্য্য সঙ্কট সত্ত্বেও গত জুলাই মাসে বৃটেনের রপ্তানির পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে। অবশ্য বৃটেনের আমদানির পরিমাণও যে বেশী হইয়াছে তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রাক্-যুদ্ধ যুগে বৃটেনের আমদানির পরিমাণ যাহা ছিল বর্ত্তমানে তাহার শতকরা ৩০ ভাগ হ্রাস করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে বৃটেনের আমদানির পরিমাণ প্রাক্‌যুদ্ধ যুগের আমদানির শতকরা ৭০ ভাগ মাত্র। আমদানি যেমন শতকরা ৩০ ভাগ কম করা হইতেছে তেমনি রপ্তানি বৃদ্ধি করা হইয়াছে প্রাক্‌যুদ্ধ যুগের রপ্তানির শতকরা ১২ ভাগ। কাজেই বৃটেনের এই সঙ্কট এমন একটা অবস্থার সূচনা করিয়াছে যাহার কারণ অন্যত্র সন্ধান করা আবশ্যক। বৃটেন আমেরিকার নিকট ১৯৪৫ সালে ৩৭৫ কোটি ডলার ঋণ করিয়াছে, এই ঋণ-করা অর্থের প্রায় সবটাই বৃটেন খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। ১০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের ডলার মাত্র অবশিষ্ট আছে। বৃটেনের নিকট অন্য দেশের চলতি পাওনা ষ্টার্লিং যে-কোন দেশের মুদ্রায় পরিবর্ত্তিত করার যে-সর্ত্ত ইঙ্গ-মার্কিণ ঋণ-চুক্তিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে তাহা কার্য্যকরী হইয়াছে গত ১৫ই জুলাই হইতে। এই সর্ত্ত অনুযায়ী গত ১৫ই আগষ্ট যে পাঁচ দিন শেষ হইয়াছে ঐ পাঁচ দিনে বৃটেনের দিতে হইয়াছে ১৭ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার। ডলার বাঁচাইবার জন্য বৃটেনকে সাময়িক ভাবে ষ্টার্লিংকে ডলারে পরিবর্ত্তিত করার ব্যবস্থা স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। বৃটেনকে ডলার-সঙ্কট হইতে রক্ষা করিবার জন্য অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড প্রভৃতি ডোমিনিয়নকে বৃটেন হইতে

আমদানি যথাসম্ভব হ্রাস করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অনুরোধ করিয়াছেন। আমেরিকা হইতে পণ্য আমদানি করাও যথাসম্ভব হ্রাস করিবার জন্য বৃটেন চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু বৃটেন যে ভাবে ডলার-জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে আরও অধিক পরিমাণে আমেরিকার নিকট আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত বৃটেনের আর কোন গত্যন্তর আছে কি না সন্দেহ। এই জন্যই আমেরিকার নিকট বৃটেনের ঋণ এবং বৃটেন অর্থনৈতিক সঙ্কট সম্বন্ধে মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এক আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

মার্শাল পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা বৃটেনের পক্ষে সম্ভব হইবে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারী বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ স্নিডার গত ২০শে আগষ্ট বলিয়াছেন যে, বৃটেন আমেরিকার নিকট নূতন কোন ঋণের প্রস্তাব করে নাই। ঋণের অর্থ ফুরাইয়া গেলে বৃটেন কি করিয়া চালাইবে, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রাইভেট ব্যাঙ্ক, মার্কিণ এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাঙ্ক, বিশ্ব-ব্যাঙ্ক অথবা আন্তর্জ্জাতিক তহবিল হইতে বৃটেন ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু বিশ্ব-ব্যাঙ্ক হইতে বৃটেনের ডলার পাওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। গত ২৫শে আগষ্ট বিশ্ব-ব্যাঙ্কের এক জন বিশিষ্ট কর্মকর্ত্তা বলিয়াছেন যে, আগামী শীতকালীন সঙ্কটের সময় বৃটেনের চল্‌তি ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য বিশ্ব-ব্যাঙ্ক হইতে বৃটেনকে ডলার দেওয়ার সম্ভাবনা নাই। তবে ষ্টার্লিংকে ডলারে পরিবর্ত্তিত করার এবং আমদানি সম্পর্কে কোন বৈষম্য মূলক ব্যবস্থা না করার যে দুইটি সর্ত্ত ইঙ্গ-মার্কিণ ঋণ-চুক্তিতে আছে তাহা বৃটেন সাময়িক ভাবে লঙ্ঘন করিলেও আমেরিকা তাহা দেখিয়াও দেখিবে না, এইরূপ একটা সম্ভাবনা আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। অনেকে আশা করেন, আমেরিকা হয়ত বৃটেনকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শান্তিকালীন ঋণ ইজারা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে পারে। কিন্তু আমেরিকা কি ভাবিতেছে তাহা কে জানে? আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে 'নিউইয়র্ক টাইমস' বলিয়াছিলেন যে, আমেরিকার নিকট হইতে বৃটেন যে ঋণ করিয়াছে তাহার শেষ ডলার নিঃশেষ হইয়া গেলেও বৃটেনের বিদেশ হইতে ক্রয়-ক্ষমতা শেষ হইয়া যাইবে না। উক্ত পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন, "We hear a great deal about the way these dollars are dwindling; we hear little about the glod stock Britain has building up at the same time." অর্থাৎ 'এই সকল ডলার কি ভাবে শেষ হইয়া যাইতেছে সে-সম্বন্ধে আমরা অনেক কথাই শুনিতে পাই, কিন্তু বৃটেন যে স্বর্ণ মজুত করিয়াছে তাহার কথা কিছুই আমরা শুনিতে পাই না।' উক্ত পত্রিকার মতে ১৯৪৬ সালে বৃটেনের মজুত স্বর্ণের মূল্যের পরিমাণ ২৫০ কোটি ডলার। কিন্তু বৃটেন তাহার মজুত সোনা দিয়া ডলার-ঘাটতি পূরণ করিতে অনিচ্ছুক। বৃটেন যদি আমেরিকার নিকট সাহায্য না পায়, যদি মজুত স্বর্ণ দিয়া ডলার-ঘাটতি পূরণ করিতেও অনিচ্ছুক হয়, তবে কি ভাবে বৃটেন এই সঙ্কট এড়াইবে?

১৯৪৮ সালের ৩০শে জুন যে বৎসর শেষ হইবে সেই বৎসরে বৃটেনের বাণিজ্যিক প্রতিকূল উদ্বৃত্ত অর্থাৎ বহির্ব্বাণিজ্যে ঘাটতি হইবে ৩৫ হইতে ৪০ কোটি পাউণ্ড। কিন্তু ডলার দেশগুলির সহিত বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৬০ কোটি পাউণ্ড। খাদ্য, বিদেশ ভ্রমণ, পেট্রোল এবং অন্যান্য জিনিষের উপর যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করা হইয়াছে তাহাতে এই ঘাটতির পরিমাণ ৪০ কোটি পাউণ্ডে দাঁড়াইবে। রপ্তানি বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বাড়াইয়া আমদানী হ্রাস করিয়া অবশিষ্ট ৪০ কোটি পাউণ্ড ঘাটতি পূরণ করা বড় সহজ হইবে না। বৃটেনের আমেরিকার নিকট ঋণের মধুচন্দ্রিকা (American loan honeymoon) যে শেষ হইয়াছে তাহা একরূপ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। কাজেই এই অর্থনৈতিক সঙ্কট এড়াইবার জন্ত অনেকে বৃটেনের সৈন্যসংখ্যা ব্যাপক ভাবে হ্রাস করিবার পক্ষপাতী। বৃটিশ সৈন্যসংখ্যা ব্যাপক ভাবে কমাইতে হইলেই বিদেশ হইতে সৈন্য সরাইয়া আনা আবশ্যক। কিন্তু বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন গত ৩রা সেপ্টেম্বর সাউথপোর্টে বৃটিশ টেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বার্ষিক সভায় বিদেশ হইতে বৃটিশ সৈন্য সরাইয়া আনা যে কি বিপুল সমস্যা তাহা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রথমতঃ চুক্তি দ্বিতীয়তঃ 'ভারতীয় সমস্যাই' উহার পক্ষে প্রবল বাধা। বৃটেন সাম্রাজ্য রক্ষার খাতিরেই সৈন্যসংখ্যা কমাইবে না। তবে উত্তমর্ণ দেশগুলিকে বঞ্চিত করিয়া বৃটেন হয়ত এই সঙ্কট পাড়ি দিয়া উঠিতে পারিবে। কিন্তু ডলার-ঘাটতির সমস্যা শুধু সাময়িক সমস্যা নয়। মার্কিণ ধনতন্ত্রের ভবিষ্যৎও উহার সহিত জড়িত। উহাই বোধ হয় বৃটেনের শেষ ভরসা। কিন্তু মিঃ বেভিন কমনওয়েলথ কাষ্টম ইউনিয়ন গঠন এবং মার্কিণ স্বর্ণ পুনর্ব্বণ্টনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমেরিকায় তাহাতে অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছে। ফোর্ট নক্সে আমেরিকার যে স্বর্ণ মজুত আছে তাহার মূল্য ৫৪০ কোটি পাউণ্ড। কমনওয়েলথ কাষ্টম ইউনিয়ন ভারতের পক্ষে যে ক্ষতিকর হইবে এখানে তাহা আলোচনা করিবার স্থান নাই। কিন্তু আমেরিকাও উহাকে তাহার রপ্তানি বাণিজ্যের বাধাস্বরূপ বলিয়া মনে করিবে। মার্কিণ সরকারী মহলের ধারণা, মিঃ বেভিন তাঁহার প্রস্তাবকে মার্শাল পরিকল্পনার সহিত সংযুক্ত করিয়া উক্ত পরিকল্পনাকেই বিপদগ্রস্ত করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাব মার্কিণ কংগ্রেসে মার্শাল পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার অন্তরায় সৃষ্টি করিবে।

প্যালেষ্টাইন কমিটির রিপোর্ট—

৩১শে আগষ্ট (১৯৪৭) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের প্যালেষ্টাইন সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট এবং সুপারিশ স্বাক্ষর করিয়া জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কমিটি প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে ১২টি সাধারণ মূল সুপারিশে উপনীত হইয়াছেন। তন্মধ্যে ১১টি সুপারিশ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। একটি সুপারিশ সম্পর্কে গুয়াতেমালা এবং উরুগুয়ে অন্যান্য সদস্যদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। সাধারণ মূল সুপারিশ সম্পর্কে দুইটি সদস্য ছাড়া আর সকলেই একমত হইলেও ভাবী গবর্ণমেণ্টের সংগঠন এবং আঞ্চলিক ব্যবস্থা (territorial provisions) সংক্রান্ত সুনির্দ্দিষ্ট (specific) পরিকল্পনা সম্পর্কে কমিটির রিপোর্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের প্রস্তাব এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সদস্যদের প্রস্তাব এই দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি কোন পরিকল্পনার পক্ষেই ভোট দেন নাই। কানাডা, চেকোস্লোভাকিয়া, গুয়াতেমালা, নেদারল্যাণ্ডস্, পেরু, সুইডেন এবং উরুগুয়ে এই সাত জন সদস্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাই

সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের প্রস্তাব। ভারতবর্ষ, পারস্য এবং যুগোশ্লাভিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ সদস্যদের প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের পরিকল্পনার সহিত ১৯৩৭ সালের পীল কমিটির পরিকল্পনার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এই পরিকল্পনায় প্যালেষ্টাইনকে আরব-রাষ্ট্র, ইহুদী-রাষ্ট্র এবং জেরুজালেম সহর এই তিন ভাগে বিভক্ত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ১৯৪৭ সালে ১লা সেপ্টেম্বর হইতে দুই বৎসর পরে আরব-রাষ্ট্র এবং ইহুদী-রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করিবে। তাহাদের স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়ার পূর্ব্বেই উভয় রাষ্ট্রকে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে হইবে এবং উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ব্যবস্থা এবং প্যালেষ্টাইন অর্থনৈতিক ইউনিয়ন গঠন করিয়া একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে। অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের নিয়ন্ত্রণাধীনে বৃটেনই প্যালেষ্টাইনের শাসনকার্য্য পরিচালন করিবে এবং প্রয়োজন মনে করিলে এই ব্যাপারে বৃটেন জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সদস্য এক বা একাধিক রাষ্ট্রের সাহায্যও গ্রহণ করিতে পারিবে। অন্তর্ব্বর্ত্তী কালের শেষে জেরুজালেম সহরটি আন্তর্জ্জাতিক ট্রাষ্টিশিপের অধীনে আসিবে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ শাসনকার্য্য পরিচালন করিবেন। এই পরিকল্পনায় পীল কমিটির প্রস্তাব অপেক্ষা গ্যালিলীর বৃহত্তর অংশ আরবদিগকে দেওয়া হইয়াছে এবং ক্ষতিপূরণস্বরূপ আরব সংখ্যাগরিষ্ঠ প্যালেষ্টাইনের দ্বিতীয় বন্দর জাফা দেওয়া হইয়াছে ইহুদীদিগকে। সংখ্যালঘিষ্ঠ সদস্যদের প্রস্তাবের সহিত এক বৎসর পূর্ব্বেকার ইঙ্গ-মার্কিণ বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। ইঙ্গ-মার্কিণ বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করে নাই। সংখ্যালঘিষ্ঠ সদস্যদের রিপোর্টে জেরুজালেমকে রাজধানী করিয়া একটি স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সুপারিশ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় অন্তর্ব্বর্ত্তী কাল ধার্য্য করা হইয়াছে তিন বৎসর। অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে প্যালেষ্টাইনের শাসন-কর্ত্তৃত্ব কাহার হাতে থাকিবে তাহা স্থির করিবেন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ। অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়েই জনসাধারণের ভোটে গণপরিষদ গঠিত হইবে এবং গণপরিষদ কর্ত্তৃক শাসনতন্ত্র রচিত হওয়ার পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ প্যালেষ্টাইন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করিবেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের কাঠামো কিরূপ হইবে রিপোর্টে সে-সম্বন্ধেও প্রস্তাব করা হইয়াছে। অন্তর্ব্বর্ত্তী কাল সম্পর্কে একটা কথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৯ সালের বৃটিশ শ্বেতপত্রে অন্তর্ব্বর্ত্তী কাল ১০ বৎসর হওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে পরিকল্পনা গঠন করিয়াছিলেন তাহাতে অন্তর্ব্বর্ত্তী কাল ৫ বৎসর হওয়ার প্রস্তাব ছিল।

প্যালেষ্টাইনে ইহুদী প্রেরণ সমস্যাই বোধ হয় প্যালেষ্টাইনের সর্ব্বাপেক্ষা জটিল সমস্যা। আরবরা প্যালেষ্টাইনে ইহুদী প্রেরণ একেবারেই বন্ধ করিতে চায়। ইহুদীরা প্যালেষ্টাইনে যত অধিক সম্ভব ইহুদী প্রেরণের পক্ষপাতী। সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপোর্টে অন্তর্ব্বর্ত্তী কালে দেড় লক্ষ ইহুদী প্যালেষ্টাইনে প্রেরণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। অন্তর্ব্বর্ত্তী কাল যদি দুই বৎসরের বেশী হয়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর ৬০ হাজার ইহুদী প্যালেষ্টাইনে প্রেরিত হইবে। এ স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইহুদী এজেন্সী দ্বারা প্রভাবিত হইয়া প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অবিলম্বে এক লক্ষ ইহুদী প্যালেষ্টাইনে পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে ইঙ্গ-মার্কিণ তদন্ত কমিটি যে সুপারিশ করেন তাহাতেও প্যালেষ্টাইনে অবিলম্বে এক লক্ষ ইহুদী প্রেরণের প্রস্তাব ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপোর্টে ইহাও প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, ভূমি হস্তান্তর সম্বন্ধে যে বিধি-নিষেধ আছে অন্তর্ব্বর্ত্তী কালে ভাবী ইহুদী রাষ্ট্রে তাহা বিলোপ করিতে হইবে। ইহুদী প্রেরণ সম্বন্ধে সংখ্যালঘিষ্ঠ রিপোর্টে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁহারা কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার প্রস্তাব করেন নাই। প্যালেষ্টাইনে আর কি পরিমাণ ইহুদীর স্থান হইতে পারে তদনুযায়ী ইহুদী প্রেরণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এবং কি পরিমাণ ইহুদীর স্থান হইতে পারে তাহা স্থির করিবার জন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক কমিশন গঠন করিতে হইবে। নয় জন সদস্য লইয়া এই কমিশন গঠিত হইবে। তন্মধ্যে তিন জন থাকিবেন আরব সদস্য এবং তিন জন ইহুদী সদস্য। অপর তিন জন সদস্য নিযুক্ত করিবেন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ। এই প্রস্তাবটি যে খুবই সমীচীন তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্যালেষ্টাইন কমিটির রিপোর্টে আরবদের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। আরব উচ্চতন কমিটির সহকারী সভাপতি মিঃ জামাল হোসেনী বলিয়াছেন যে, আরবগণ কমিটির রিপোর্ট অথবা প্যালেষ্টাইন বিভাগ সংক্রান্ত কোন সুপারিশ মানিবে না। আরব লীগের সাধারণ সম্পাদক মিঃ আবদুল আজম পাশা রিপোর্টে বর্ণিত সমস্ত প্রস্তাবকেই অসঙ্গত ও অবাস্তব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আরব সংখ্যাগরিষ্ঠ জাফা বন্দরটি ইহুদী-রাষ্ট্রভুক্ত করার প্রস্তাবে প্যালেষ্টাইনের আরবদের মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। কমিটির রিপোর্টে ইহুদীরা প্রথমে অসন্তুষ্ট হইলেও ক্রমে রিপোর্ট সম্বন্ধে তাহাদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছে। 'টাইমস'পত্রিকার জেরুজালেমস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, কমিটির রিপোর্টে ইহুদীরা সন্তুষ্ট হইয়াছে।

জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে প্যালেষ্টাইন কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া সম্ভব হইবে কি না, তাহা অনুমান করা কঠিন। জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ যদি কমিটির রিপোর্ট গ্রহণ করেন তবে বৃটেন প্যালেষ্টাইন হইতে চলিয়া আসিতে রাজী হইবে কি? আরবদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বে জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ প্যালেষ্টাইন কমিটির রিপোর্ট গ্রহণ করিতে পারিবেন না কি? সংখ্যালঘিষ্ঠ রিপোর্টই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী হইতে রচিত হইয়াছে। আরব, ইহুদী ও বৃটেন এই তিন পক্ষ যদি ঐ রিপোর্ট গ্রহণ করিতে রাজী হন, তবেই প্যালেষ্টাইন সমস্যার সমাধান সম্ভব। কিন্তু এইরূপ সম্ভাবনা কতটুকু?

চীনের ভবিষ্যৎ—

চীন হইতে কোরিয়া যাত্রার প্রাক্কালে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের খাস প্রতিনিধি লেফ্‌টেনাণ্ট জেনারেল ওয়েড মেয়ার ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য চীনের রাষ্ট্রনেতাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। চীনে কুয়োমিণ্টাং শাসনের স্বরূপ পৃথিবীর কোন দেশের নিকটেই আর অজানা নাই এবং সুদূরপ্রসারী ব্যাপক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাও সহজেই

উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু কাহারা এই সংস্কার সাধন করিবে, কিরূপে করিবে, ইহা-ই চীনের প্রধান প্রশ্ন। চীনের পরিত্রাণের জন্য অনুপ্রেরণামূলক নেতৃত্ব (inspirational leadership) এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পুনর্জ্জীবনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লেফ্‌টেনান্ট জেনারেল ওয়েড মেয়ারের সহিত কাহারও মতানৈক্য হইবে না। কিন্তু এই নেতৃত্ব গড়িয়া উঠিবে কিরূপে? কুয়োমিন্টাং দলের নেতাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "শুধু প্রতিশ্রুতিতে আর চলিবে না, প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত করাই আজ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। দুর্নীতি পরায়ণ ও অযোগ্য সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে নিঃশেষে অপসারিত করিতে হইবে।" কিন্তু যাঁহারা অপসারণ করিবেন, তাঁহাদের মধ্যেই যে দুর্নীতির ব্যাপক প্রসার হইয়াছে। দুর্নীতি, দুর্ম্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতা চীনের জনগণের জীবন দুর্বিসহ করিয়া তুলিয়াছে। অবিলম্বে তাহারা এই অবস্থার অবসান চায়। চীনে দুর্নীতি যে কিরূপ ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে, জনৈক পরিব্রাজক চীন হইতে বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহার একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন। একটি বাড়ী যখন পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছিল তখনও ফায়ার ব্রিগেড নিশ্চেষ্ট ভাবে ঐ বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। কারণ, ঘুষ সম্পর্কে বাড়ীর মালিকের সঙ্গে তাহাদের মীমাংসা হইতেছিল না। ইহা-ই যে-দেশের অবস্থা, সে-দেশে সাধারণ লোকের যে কি দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। লেফ্‌টেনান্ট জেনারেল ওয়েড মেয়ার জনগণের কথাও চীনের নেতাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, "Throughout China there is as passionate longing for peace—early peace and lasting peace." 'চীনের সর্ব্বত্র শান্তির জন্য উদগ্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। জনগণ অতি সত্বর শান্তি চায়, তাহারা চায় স্থায়ী শান্তি।' চীনের জনগণের মনোভাব তিনি যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু যে-পর্য্যন্ত চীনের গৃহযুদ্ধের অবসান না হইবে সে-পর্য্যন্ত চীনে শান্তি ফিরিয়া আসিবে না, দুর্নীতি দূর করা সম্ভব হইবে না, জনগণের দুর্দ্দশাও ঘুচিবে না। গৃহযুদ্ধ অদূর ভবিষ্যতে থামিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে কি?

লেফ্‌টেনান্ট জেনারেল ওয়েড মেয়ার চীনের কম্যুনিষ্টদিগকেও লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে চীনা কম্যুনিষ্টরা যদি সত্যই দেশপ্রেমিক হন, দেশের কল্যাণই যদি তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে বলপ্রয়োগে আদর্শবাদ স্থাপন করিবার সঙ্কল্প হইতে স্বেচ্ছায় তাঁহারা বিরত হইবেন।' খুবই শ্রুতিসুখকর উপদেশ সন্দেহ নাই। কিন্তু গৃহবিবাদের জন্য কি শুধু চীনা কম্যুনিষ্টরাই দায়ী? চীনা কম্যুনিষ্ট নিঃশেষে নির্ম্মূল হইলেই কি চীনদেশ শান্তিতে ও ধনে-সম্পদে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে? আমেরিকার আর্থিক ও সামরিক সাহায্যপুষ্ট হইয়াও চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট আজিও চীনা কম্যুনিষ্টদিগকে ধ্বংস করিতে পারেন নাই। শীঘ্র যে পারিবেন সে ভরসাও নাই। যে কুয়োমিন্টাং দল চীনে তাহাদের ডিক্‌টেটরশিপ ও স্বৈরচারিতা প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত তাহাদের নিকট চীনা কম্যুনিষ্টরা আত্মসমর্পণ করিলেই কি চীনে শান্তি ফিরিয়া আসিবে? চীনের এই গৃহবিবাদের মূলে যে বৈদেশিক শক্তির প্ররোচনা রহিয়াছে লেফ্‌টেনান্ট জেনারেল ওয়েড মেয়ার সে-সম্বন্ধে নীরব রহিয়াছেন। কুয়োমিন্টাং দলকে শক্তিশালী করিতে আমেরিকার প্রচেষ্টার ফল কাহারও অজ্ঞাত নাই বলিয়াই বোধ হয় এ সম্পর্কে নীরব থাকাই তিনি সমীচীন মনে করিয়াছেন।

নিরাপত্তা পরিষদে ইঙ্গ-মিশর বিরোধ—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে ইঙ্গ-মিশর বিরোধ সংক্রান্ত আলোচনার ধারা দেখিয়া উহার পরিণাম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আশা পোষণ করা কঠিন। এ কথা বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ১৯৪৬ সালের ২৮শে জুলাই মধ্য-প্রাচীস্থিত বৃটিশ বাহিনীর প্রধান সেনাধ্যক্ষ ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই মিশর হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারিত করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই ঘোষণার পর কায়রো দুর্গ হইতে বৃটিশ সৈন্য সরাইয়া লওয়া হয়। কিন্তু সৈন্য অপসারণ কার্য্য ইহার অধিক দূর আর অগ্রসর হয় নাই। বৃটিশ এখন মিশর হইতে শেষ বৃটিশ সৈন্য অপসারণের শেষ তারিখটি যত অধিক সম্ভব দূরবর্ত্তী করিতে ইচ্ছুক। ইহা আমরা সকলেই জানি যে, মিশর হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণের সমস্যাই ইঙ্গ-মিশর বিরোধের মূল কারণ নয়। সুদান সহ সমগ্র নীল নদের উপত্যকা হইতে বৃটিশের সম্পূর্ণ অপসারণেই মিশরের দাবী এবং বৃটিশও সুদান হইতে সরিয়া আসিতে রাজী নয়। সুদানে যে-সকল বৃটিশ তুলা-উৎপাদক আছেন তাঁহারা সুদানবাসীদের মধ্যে একটি দলের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই দল সুদানের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করিতেছিল। তাঁহাদের এই দাবীর উপরেই বৃটিশ সুদান ত্যাগ না করিবার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে মিশরের দাবী সংক্রান্ত আলোচনা যে-পথে চলিয়েছে তাহা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ।

নিরাপত্তা পরিষদে ব্রাজিলের প্রতিনিধি এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন যে, ইঙ্গ-মিশর বিরোধটা মিশর এবং বৃটেনের ঘরোয়া ব্যাপার এবং এই ঘরোয়া ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের হস্তক্ষেপ করা অনধিকার-চর্চ্চা। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই প্রস্তাবটি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, চীন এবং বেলজিয়মের সমর্থন লাভ করিয়াছে। প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছে শুধু সোভিয়েট রাশিয়া এবং পোল্যাণ্ড। আর একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি। এই প্রস্তাবে ইঙ্গ-মিশর বিরোধ মীমাংসার জন্য বৃটেন, মিশর এবং সুদান এই ত্রিপক্ষীয় আলোচনার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ব্রাজিল এবং অষ্ট্রেলিয়ার প্রস্তাবের মূল উৎস কোথায় তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। নিরাপত্তা পরিষদে মিশরের দাবীর পরিণাম কি হইবে তাহারও ইঙ্গিত এই প্রস্তাব দুইটির মধ্যে পাওয়া যায়। মিশরের তরুণ এবং প্রগতিশীল দল নিরাপত্তা পরিষদে মিশরের দাবীর পরিণাম অনুমান করিয়াই কায়রোতে জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন। মিশর কর্ত্তৃপক্ষ দৃঢ় হস্তে এই বিক্ষোভ দমন করিয়াছেন। মিশরের যে-সকল জাতীয় নেতা জাতীয় আন্দোলনকে স্বাভাবিক পরিণতি পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে রাজী নহেন, তাঁহারা বৃটিশের সহিত মীমাংসা একটা হয়ত করিবেন। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে তাঁহাদের দাবীকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে মিশরীয় প্রতিনিধির প্রস্তাব করা উচিত যে, সুদান মিশরের সহিত সংযুক্ত থাকিবে কি না তাহা সুদানের গণভোট দ্বারাই স্থির করা হউক, কিন্তু গণভোট গ্রহণের

পূর্ব্বে সুদান হইতে বৃটিশ সৈন্য সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিতে হইবে। এইরূপ প্রস্তাব এক দিকে যেমন গণতন্ত্রসম্মত, আর এক দিকে তেমনি বৃটিশের আপত্তি করিবার কোন পথ থাকিবে না।

এই প্রসঙ্গে মিশরের সৈন্য এবং বিমান-বাহিনীকে সামরিক শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণের জন্য প্রধান মন্ত্রী নোকরশী পাশা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে যে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমেরিকার সামরিক বিদ্যালয়ে মিশরের অফিসারদিগের শিক্ষার ব্যবস্থাও করিতে পারিবেন বলিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছেন। মিশরের এই প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে ইঙ্গ-মিশর বিরোধের আলোচনার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিবে বলিয়া মনে হয় না। তবে দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পর হইতে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকা তাহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে মিশরের প্রস্তাব এই নীতির অনুকূল।

নিরাপত্তা পরিষদ ও ইন্দোনেশিয়া—

হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার অভিযোগে মীমাংসা ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদে আরম্ভটা ভালই হইয়াছিল। অত্যন্ত তৎপরতার সহিত নিরাপত্তা পরিষদ উভয় পক্ষকে সংঘর্ষ বন্ধ করিতে এবং সালিশী বা অন্য কোন শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসা করিতে নির্দ্দেশ দেন। কিন্তু সংঘর্ষ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে উভয় পক্ষের সৈন্য যেখানে ছিল সেইখানে ফিরাইয়া লওয়ার নির্দ্দেশ দিতে নিরাপত্তা পরিষদ অসমর্থ হওয়ায় তাহার দুর্ব্বলতাই শুধু প্রকাশ পায় নাই, এই দুর্ব্বলতার সুযোগেই যুদ্ধবিরতির নির্দ্দেশ মানিয়া লইয়াও হল্যাণ্ড এই নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিয়াছে এবং ইন্দোনেশিয়ার উপর আক্রমণ চালাইতেছে। ফলে ইন্দোনেশিয়ার অবস্থার একটুকুও পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধি ডক্টর শারীরকে নিরাপত্তা পরিষদে ইন্দোনেশিয়ার অভিযোগ সমর্থন করিতে দেওয়া হইয়াছে এবং আলাপ-আলোচনার ব্যাপারে ইন্দোনেশিয়াকে হল্যাণ্ডের সমকক্ষ করা হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে ইহা যে একটা নীতিগত জয়লাভ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে ওলন্দাজদের আক্রমণ যদি চলিতেই থাকে, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত এই নীতিগত বিজয় অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইবে।

যুদ্ধ-বিরতি সম্পর্কে পরিদর্শনের ব্যবস্থা এবং সালিশ মীমাংসা এই উভয় ব্যাপার সম্বন্ধেই নিরাপত্তা পরিষদ দৃঢ়তা প্রকাশ এবং সন্তোষজনক করিবার বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন নাই। যুদ্ধ-বিরতি পরিদর্শন সংক্রান্ত রাশিয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া অষ্ট্রেলিয়া ও চীন কর্ত্তৃক উত্থাপিত যুক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করার ফল যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থিত রাষ্ট্রদূতদের (Consuls) উপর যুদ্ধ-বিরতি পরিদর্শনের ভার দেওয়ার অর্থ ইন্দোনেশিয়ায় হল্যাণ্ডের কর্ত্তৃত্ব যাঁহারা সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে চান তাঁহাদেরই শক্তি বৃদ্ধি করা। হল্যাণ্ড নিজেই উপযাচক হইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে সালিশ মানিতে রাজী হইয়াছিল। এইরূপ সালিশের নির্দ্ধারণ নিরপেক্ষ হওয়ার আশা করা যায় না। কাজেই ইন্দোনেশিয়া উহাতে রাজী হইতে অসম্মত হয়। আমেরিকাও অবশ্য অবশেষে সালিশী করিতে অস্বীকার করিয়াছে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার সমস্যা মীমাংসা করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়টি নিরাপত্তা পরিষদ গ্রহণ করিতেছেন না। তদন্ত-কমিশন ও সালিশী ট্রাইবুন্যাল গঠনের জন্য রাশিয়া যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিল, তাহাই ছিল মীমাংসার উৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু উহার পরিবর্ত্তে সালিশ সম্বন্ধে আমেরিকার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া নিরাপত্তা পরিষদ ওলন্দাজ-ইন্দোনেশিয়ার বিরোধের মীমাংসার ব্যাপারে মধ্যস্থতার আসন হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। সালিশ নির্ব্বাচনে নিরাপত্তা পরিষদের কোনই হাত থাকিবে না। এই সালিশ কমিটিতে তিনটি দেশের প্রতিনিধি থাকিবে। তন্মধ্যে ইন্দোনেশিয়া ও হল্যাণ্ড প্রত্যেকে এক জন করিয়া মনোনীত করিবে এবং আর এক জনকে মনোনীত করিবে উভয় দেশ মিলিয়া। তৃতীয় সালিশ মনোনয়নে অচল অবস্থার উদ্ভব হওয়ার আশঙ্কা যথেষ্টই রহিয়াছে। আমেরিকার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া নিরাপত্তা পরিষদ স্বেচ্ছায় জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ন করিয়াছেন।

জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের সময় লিটন কমিশন গঠিত হইয়াছিল। এই কমিশন জাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকার করা বন্ধ করিতে পারেন নাই। মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারে ব্যর্থতাই লীগ অব নেশন্‌সের কালস্বরূপ হইয়াছিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ লীগ অব নেশন্‌সেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন।

ব্রহ্ম-সংবাদ—

গত জুলাই মাসের (১৯৪৭) মাসের মধ্যভাগে জেনারেল আউঙ্গ সান এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ নিহত হওয়ার পর হইতে ব্রহ্মদেশের সংবাদ বাহিরে খুব কমই প্রকাশিত হইতেছে। যে-টুকু সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যাইতেছে, উল্লিখিত হত্যাকাণ্ডের পরেও হিংসাত্মক কার্য্যের ব্যাপক চেষ্টা চলিয়াছিল। ব্রহ্মদেশের নূতন মন্ত্রিসভার সদস্যদিগকেও হত্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে এবং নিরাপত্তার প্রয়োজনে ব্যাপক ভাবে গ্রেফ্‌তার করিয়া বহু লোককে আটক রাখা হয়। ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে এক অভূতপূর্ব্ব আকারে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল একটি সরকারী ইস্তাহারে সে-কথা স্বীকৃত হইয়াছে। ব্যাপক গ্রেফতারের ফলে এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে এবং ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহারা নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু আরাকানের অবস্থা এখনও শান্ত হয় নাই। আরাকান হইতে নূতন অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ইহার উপর আছে ব্রহ্মদেশের আর্থিক সঙ্কট। অভূতপূর্ব্ব বন্যার ফলে ধান-আবাদের কার্য্য কতক পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে। এই সকল অশান্তি ও বিপদের মধ্যেও ব্রহ্মদেশ হইতে একটি সুসংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ব্রহ্ম গণ-পরিষদে সকল দল মিলিয়াই শাসনতন্ত্রের খসড়া সংক্রান্ত মূলনীতি গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশ বিভক্ত হওয়ার আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছে।

গণপরিষদের অধিবেশনে কাচিন, কারেন, চিন এবং শান প্রতিনিধিরা যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইয়াছে। এক জন কারেন-প্রতিনিধি বলিয়াছেন যে, তাঁহারা সর্ব্বদাই বর্ম্মীদের সহিত সহযোগিতা করিবেন। এক জন কাচিন-প্রতিনিধি বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করিয়াছেন যে, সীমান্ত অঞ্চলগুলিকে দশ বৎসর পরে পৃথক হইবার অধিকার দেওয়ার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কম্যুনিষ্ট-প্রতিনিধিরাও জাতীয় সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। গণপরিষদের পরবর্ত্তী অধিবেশনে শাসনতন্ত্রের মূলনীতি-সম্বলিত বিল উপস্থাপিত হইবে।

খসড়া শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ব্রহ্মদেশ একটি সার্ব্বভৌম স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হইবে এবং উহার নাম হইবে ব্রহ্ম যুক্তরাষ্ট্র। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মের স্বাধীনতা মানিয়া লইতে রাজী হইয়াছেন এবং আগামী অক্টোবর কি নবেম্বর মাসেই ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার উপযোগী আইন বৃটিশ পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত হইবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে ব্রহ্মদেশ এবং বৃটেনের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ হইবে সে-সম্বন্ধে কোন চুক্তি বর্ত্তমান বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এ সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য লর্ড লিষ্টওয়েল রেঙ্গুণ আসিয়াছেন। রাজনৈতিক, সামরিক এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে বৃটেনের সহিত ব্রহ্মদেশের চুক্তি হইবে। ব্রহ্ম গণ-পরিষদের সিদ্ধান্ত বৃটেন মানিয়া লইতে স্বীকৃত হওয়ায় এবং ব্রহ্মদেশ বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে থাকার সিদ্ধান্ত করায় রাজনৈতিক দিক হইতে বৃটেন ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে একটি মৈত্রী চুক্তি হইবে। গত আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে বৃটেনের সহিত ব্রহ্মদেশের একটি সামরিক চুক্তি হইয়াছে। কাজেই লর্ড লিষ্টওয়েলের প্রধান কাজ হইবে বৃটেন ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে একটা অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পন্ন করা।

ব্রহ্মদেশ ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তবর্ত্তী প্রতিবেশী। তাহার স্বাধীনতা প্রাপ্তির সম্ভাবনায় ভারতের মত সুখী আর কেহ হইবে না। কিন্তু ব্রহ্মদেশে ভারতীয়দের যাওয়া সম্পর্কে যে কড়া বিধান করা হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় ইউনিয়ন এবং পাকিস্থান উভয় অঞ্চলেই অসন্তোষ সৃষ্টি না হইয়া পারে নাই।

দক্ষিণ-আফ্রিকা জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘে—

দক্ষিণ-আফ্রিকার সহিত আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার বিবরণ সহ ১৮ পৃষ্ঠা-ব্যাপী এক স্মারকলিপি জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের নিকট ভারত গবর্ণমেণ্ট পেশ করিয়াছেন। গত এপ্রিল ও মে মাসে পণ্ডিত জওহর লাল নেহরুর সহিত ফিল্ড মার্শাল স্মাটের যে পত্রালাপ হইয়াছে তাহাতে এই আলোচনাকে এড়াইবার প্রচেষ্টাই তিনি (ফিল্ড মার্শাল স্মাট) করিয়াছিলেন। অতঃপর জুন ও জুলাই মাসে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং ফিল্ড মার্শাল স্মাটের মধ্যে যে সকল পত্রালাপ হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ফিল্ড মার্শাল স্মাট সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সঙ্ঘের প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতের সহিত কোন আলোচনা চালাইতে ইচ্ছুক নহেন। শুধু তাই নয়, পণ্ডিত নেহরুর নিকট পত্রে তিনি জাতিপুঞ্জ সঙ্ঘ, সঙ্ঘের কর্ম্মপদ্ধতি এবং অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই সমালোচনা কার্য্যতঃ জাতিপুঞ্জ সঙ্ঘকেই মরণ আঘাত হানিয়াছে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সঙ্ঘ ভারতের স্মারকলিপি পর্য্যালোচনা করিয়া কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন তাহা অনুমান করা সহজ নয়। এই স্মারকলিপিতে জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের গৃহীত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার দাবী করা হইয়াছে। কিন্তু এই স্মারকলিপি সম্পর্কে জাতিপুঞ্জ-মণ্ডলের ধারণার কথা রয়টার যাহা জানাইয়াছেন তাহাতে ভরসা করার মত কিছুই আমরা দেখিতে পাইতেছি না। ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং মিশর এই তিন দেশের অভিযোগের প্রতিবিধান করা যদি জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের হাতের যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। হয়ত লীগ অব নেশনস্ অপেক্ষা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ অধিকতর অল্পায়ু হইবে।

জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ ও আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাপুঞ্জের গতি—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের যে সাধারণ অধিবেশন শীঘ্রই আরম্ভ হইবে সাধারণ পরিষদের উহাই তৃতীয় অধিবেশন। গত এপ্রিল-মে মাসে সাধারণ পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্যার আলোচনার জন্য বৃটিশ যুক্তরাজ্যের অনুরোধে এই অধিবেশন হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সঙ্ঘের প্রধান অঙ্গ ছয়টি: (১) সাধারণ পরিষদ, (২) নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council), (৩) অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল, (৪) ট্রাষ্টিশিপ কাউন্সিল, (৫) আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice) এবং (৬) দপ্তরখানা। ইহা ব্যতীত উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করিয়া অনেকগুলি কমিশন, কমিটি এবং বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান আছে। সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্র লইয়া সাধারণ পরিষদ গঠিত হইয়াছে এবং চূড়ান্ত পূর্ণক্ষমতা এই সাধারণ পরিষদের হাতেই ন্যস্ত। ১৯৪৭ সালের ৩০শে জুন তারিখে যে-বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরের সে-বার্ষিক বিবরণী জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে এবং সাধারণ পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে যে সকল সমস্যা আলোচিত হইবে সেগুলির কথা বিবেচনা করিলে আন্তর্জ্জাতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব বেশী আশা পোষণ করা সম্ভব নয়।

বৃহৎ রাষ্ট্র পঞ্চক এখনও জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার সহিত সন্ধি সর্ত্ত সমূহের খসড়া রচনা করিতে এ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের আসন্ন সাধারণ অধিবেশনেও অনেকগুলি গুরুতর জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। বস্তুতঃ জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার সহিত সন্ধি-সর্ত্ত রচনা এবং জাতিপুঞ্জ সঙ্ঘের আসন্ন সাধারণ পরিষদের সমস্যা একই মূল সমস্যার দুইটি বিভিন্ন দিক মাত্র। গত এক বৎসরে যে-সকল সমস্যার সমাধান না হইয়া জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে সাধারণ পরিষদের এই অধিবেশনে যদি সেগুলির সমাধান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যে-অবস্থার উদ্ভব হইবে তাহা কখনই শান্তির পক্ষে অনুকূল হইতে পারিবে না। এই অধিবেশনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের ইতিহাসের যে নূতন অধ্যায় রচিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের সম্পর্কে বৈষম্য-মূলক আইন লইয়া ভারতের সহিত দক্ষিণ-আফ্রিকার যে বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে তাহা আপোষে মীমাংসা করিবার জন্য সাধারণ পরিষদ যে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট কার্য্যতঃ তাহা প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ইহা লইয়া সাধারণ পরিষদে যে তুমুল বিতর্ক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার আশ্রিত রাজ্য (mandated territory) সম্পর্কে ট্রাষ্টি শিপ চুক্তি পেশ করিবার জন্য সাধারণ পরিষদে যে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন দক্ষিণ-আফ্রিকা তাহাও লঙ্ঘন করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছে। ইহা লইয়াও সাধারণ পরিষদে বিতর্ক বড় কম হইবে না। ইহা ব্যতীত সাধারণ পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে আরও যে-সকল জটিল ও গুরুতর বিষয় উত্থাপিত হইবে আমরা সেগুলির কয়েকটি মাত্রই এখানে উল্লেখ করিবার স্থান পাইব।

(১) বলকান সমস্যা—গ্রীসের উত্তর সীমান্ত অঞ্চলে যে অশান্ত অবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে নিরাপত্তা পরিষদ তাহার কোন সমাধান

করিতে পারেন নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি মিঃ হার্শেল জনসন ইতিপূর্ব্বেই নিরাপত্তা পরিষদে এই মর্ম্মে এক নোটিশ দিয়াছেন যে, সাধারণ পরিষদ এ সম্পর্কে আলোচনার পর জাতিপুঞ্জ সঙ্ঘ সনদের ৫১ ধারা অনুসারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। এই ধারায় নিরাপত্তা পরিষদকে বাদ দিয়া একক বা সম্মিলিত ভাবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

(২) ভেটো সমস্যা—অষ্ট্রেলিয়া ও আর্জেণ্টিনা ভেটো ক্ষমতা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছে। সাধারণ পরিষদে এই প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হইবে। অনেকগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্র এই প্রস্তাব সমর্থন করিবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হইয়াছে। ভেটো ক্ষমতার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ ভোট আবশ্যক। এই দুই-তৃতীয়াংশ ভোট বৃহৎ রাষ্ট্র-পঞ্চককে লইয়াই। সুতরাং ভেটো ক্ষমতা পরিবর্ত্তনের ব্যাপারেও ভোট দেওয়া চলিবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভেটো ক্ষমতা একটি গুরুতর বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি সংখ্যায় যত বেশী হউক না কেন, তাহাদের নীতি নির্দ্ধারণের কোন শক্তি নাই। তাহারা কোন না কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের উপগ্রহ মাত্র। নীতি নির্দ্ধারণের শক্তি আছে প্রধানতঃ তিনটি বৃহৎ রাষ্ট্রের। এই তিনটি বৃহৎ রাষ্ট্র বৃটেন, আমেরিকা ও রাশিয়া। তাহারা একমত না হইলে পৃথিবীতে শান্তি রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। নীতি নির্দ্ধারণের ব্যাপারে তাহারা যাহাতে একমত হয় তাহারই জন্য ভেটো ক্ষমতা। ভেটো ক্ষমতা না থাকিলে মতৈক্য হওয়ার প্রয়োজন হইবে না বটে, কিন্তু শান্তিরক্ষার জন্য সৃষ্টি হইবে আর একটি ব্যাপক অশান্তি।

(৩) প্যালেষ্টাইন সমস্যা:—সাধারণ পরিষদের এই অধিবেশনেই জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ প্যালেষ্টাইন সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে পারিবেন বলিয়া অনেকেই আশা করিতেছেন। বৃটেন ও আমেরিকা প্যালেষ্টাইন বিভাগের পক্ষপাতী। সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপোর্টে প্যালেষ্টাইনকে বিভক্ত করিবার সুপারিশ করা হইয়াছে। কিন্তু আরবরা প্যালেষ্টাইন বিভাগ স্বীকার করিবে না। সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে বৃটেন এ কথা স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছিল যে, সাধারণ পরিষদ যদি প্যালেষ্টাইন বিভাগের সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করিবার জন্য জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘকে সামরিক সাহায্যও করিতে হইবে। কারণ, এই দায়িত্ব প্রতিপালনের উপযোগী সৈন্যবাহিনী বৃটেনের নাই। জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের মিলিটারী ষ্টাফ কমিটি গঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সামরিক শক্তির গোড়া-পত্তনই এখনও বাকী রহিয়াছে।

(৪) সদস্য গ্রহণ সমস্যা—জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সদস্য হইবার জন্য দশটি দেশের আবেদন এখনও মঞ্জুর হওয়া বাকী আছে এবং এই আবেদনগুলি লইয়া নিরাপত্তা পরিষদে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বৃটেন এবং চীন নিম্নলিখিত পাঁচটি দেশের আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়াছে:—মঙ্গোলিয়া, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া এবং হাঙ্গেরী। রাশিয়া নিম্নলিখিত পাঁচটি দেশের আবেদন সম্পর্কে আপত্তি করিয়াছে:—আয়ার, পর্ত্তুগাল, ট্রান্স-জর্ডোয়ান, ইটালী ও অষ্ট্রিয়া।

পশ্চিম সামোয়া স্বায়ত্ত-শাসন দাবী করিয়াছে এবং এ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ একটি কমিশন প্রেরণ করিয়াছেন। পশ্চিম সামোয়া নিউজীলাণ্ডের অধীন। সুতরাং বৃটেন ও আমেরিকা যে পশ্চিম সামোয়ার স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্যতা স্বীকার করিবে সে সম্বন্ধে ভরসা কোথায়? যে সকল পরাধীন দেশ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছে জাতি-পুঞ্জ-সঙ্ঘ তাহাদের জন্য কিছুই করিতেছে না। লেক সাকসেস্ হইতে গত ১২ই আগষ্ট তারিখে প্রেরিত এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার এক সংবাদে প্রকাশ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল ফ্রান্সের স্বৈরাচার-মূলক শোষণ হইতে ইন্দোচীন, উত্তর-আফ্রিকা এবং মাডাগাস্কারকে রক্ষা করিবার জন্য তিনটি প্রতিষ্ঠানের একটি যুক্ত আবেদন পাইয়াছেন। এই আবেদনে স্বাক্ষর করিয়াছেন ভিয়েটনাম ফ্রেণ্ডশিপ এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী ফাম্ ভ্যান আম, উত্তর আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিনিধি মেহ দি বেনতনা এবং নর্থ আফ্রিকা কমিটির সেক্রেটারী আবেদ বওহাফর। জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ-সনদের ১১ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন অনুরোধ করা হইয়াছে। এই আবেদনের ভাগ্য সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহই আমাদের নাই।

যেমন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের ভিতরে তেমনি বাহিরে শুধু অচল অবস্থার সৃষ্টি হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি। জাপানের সহিত সন্ধি-সর্ত্তের খসড়া তৈয়ারীর জন্য সম্মেলন আহ্বানের ব্যাপারেই গোড়াতেই গোলযোগ সৃষ্টি হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় সম্প্রতি বৃটিশ কমনওয়েলথের যে সম্মেলন হইয়া গেল তাহাতে জাপানের সহিত সন্ধি-সর্ত্ত রচনায় সুদূর প্রাচ্য কাউন্সিলকে আমন্ত্রণ করা সম্পর্কে এই সম্মেলন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত একমত হইয়াছেন। কিন্তু রাশিয়া এইরূপ আমন্ত্রণে সম্মত হয় নাই। ইহাতে সম্মত হইবার জন্য রাশিয়ার নিকট আমেরিকা পুনরায় এক অনুরোধ-পত্র দিয়াছিলেন। তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। আগামী অক্টোবর কি নবেম্বর মাসে জাপানের সহিত সন্ধি-সর্ত্ত নির্দ্ধারণের জন্য সম্মেলন হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। রাশিয়া এই সম্মেলনে যোগদান না করিলে ফল কি দাঁড়াইবে বলা কঠিন। কোরিয়া সম্পর্কেও রাশিয়া ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একমত হইতে পারেন নাই। রুশ-মার্কিণ কমিশন কোরিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দ্বিতীয় বার একমত হইতে না পারায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই সমস্যা সমাধানের জন্য বৃটেন, রাশিয়া, চীন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে লইয়া এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু রাশিয়া তাহাতেও সম্মত হইতে পারে নাই। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, কোরিয়ার সমস্ত গণতান্ত্রিক দল ও সাধারণ প্রতিষ্ঠান-সমূহের প্রতিনিধি লইয়া একটি অস্থায়ী নিখিল কোরিয়া পরিষদ গঠনের জন্য রাশিয়া প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু মার্কিণ সরকার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। আমেরিকার কথা এই যে, কোরিয়ায় দক্ষিণপন্থীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। রাশিয়া প্রস্তাব মানিয়া লইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দক্ষিণ-পন্থীদিগকে উপেক্ষা করিয়া বামপন্থীদিগকেই প্রাধান্য দেওয়া হইবে। রুশ-মার্কিণ যুক্ত কমিশনের চেষ্টা এই ভাবে ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯৪৫ সালে মস্কো সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী চতুঃশক্তি সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছিল। কিন্তু এই চতুঃশক্তির মধ্যে চীন আমেরিকার তাঁবেদার ছাড়া আর কিছুই নয়। আমেরিকার উপর বৃটেনের একান্ত নির্ভরতার জন্য বৃটেনও যে আমেরিকার মতেই মত দিবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। কাজেই কার্য্যতঃ এই চতুঃশক্তি সম্মেলন রুশ-মার্কিণ সম্মেলন ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।

গান্ধীজীর অনশন ভঙ্গ

কলিকাতা মহানগরীর অবস্থা শান্ত হইয়াছে, মহাত্মা গান্ধী অনশন ত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালা তথা সমগ্র ভারতের জনসাধারণের মন হইতে এক বিরাট উদ্বেগ নামিয়া গেল। গান্ধীজীর অমূল্য জীবন বাঁচাইবার জন্য সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, ছাত্র, শ্রমিক ও নেতৃবৃন্দ যে আকুল আবেদন জানাইয়াছিলেন, সমগ্র কলিকাতা তাহাতে সাড়া দিয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধীর কাম্য শান্তি ও মৈত্রী স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠা করাই এখন দেশবাসীর প্রধান কর্ত্তব্য। শান্তি প্রতিষ্ঠায় পুলিশও অনেকটা তৎপর হইয়াছে, কর্ত্তৃপক্ষ সামরিক সাহায্যও গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু যে শান্তি ও মৈত্রী মহাত্মা গান্ধীর কাম্য, তাহা এখনও ফিরিয়া আসে নাই। নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিকগণ, ছাত্রগণ, কংগ্রেস এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সকলেই মহাত্মা গান্ধীর অমূল্য জীবন রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতার শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছেন। শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনের উপযোগী মনোভাব ও আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য উহার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু কলিকাতার পুলিশ কমিশনার তাঁহার অনুমতি ব্যতীত শান্তি-শোভাযাত্রা বাহির করা চলিবে না বলিয়া যে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন, তাহার সার্থকতা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। পুলিশের হুকুম লইয়া শান্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজন আর পুলিশের হুকুম লইয়া শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়িল না। পুলিশ ও সামরিক শক্তি অস্ত্রবলে হাঙ্গামা দমন করিতে পারে: কিন্তু শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না।

সুরাবর্দ্দী মন্ত্রিমণ্ডলী কারফিউ জারীর যে নীতি দীর্ঘ এক বৎসর ধরিয়া চালাইয়া আসিয়াছিলেন, ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষও সেই নীতিরই নকল করিতেছেন। গত এক বৎসরের অভিজ্ঞতায় ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কারফিউ কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না—নিরীহ নাগরিকদের উপর উহা জুলুম মাত্র। কলিকাতায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম-প্রয়োজন গুণ্ডাদিগকে আটক করা কিংবা বহিষ্কৃত করা। কলিকাতার প্রত্যেক থানায় গুণ্ডাদের তালিকা আছে। কাজেই তাহাদিগকে আটক করা বা বহিষ্কৃত করা কঠিন কার্য্য নয়। এই ভাবেই ১৯২৬ সালের দাঙ্গার সময় সহজেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইয়াছিল। নূতন গুণ্ডা আমদানী করা হইয়া থাকিলেও পুলিশের তাহা অজ্ঞাত থাকিবার কারণ নাই। গুণ্ডাদিগকে আটক করিতে বা বহিষ্কৃত করিতে মিঃ সুরাবর্দ্দীর যে আপত্তি ছিল, তাহা বোধ হয় কাহারও অজ্ঞাত নাই। কিন্তু ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের এ-সম্বন্ধে আপত্তি হওয়ার কোন কারণ থাকা সঙ্গত নয়। মন্ত্রিসভায় তাঁহার দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে তিনি যেরূপ উদ্যোগী, তাহার কিছুটাও যদি তিনি গুণ্ডা দমনে নিয়োজিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে নাগরিকদের শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস অনেক সহজ হইত।

রোগের মূল

ভিতরে কি ঘটিয়াছিল, তাহা ভগবানই জানেন। ১৫ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতাবাসী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতে পাইল যে, বাঙ্গালার মন্ত্রিমণ্ডলী হইতে সদ্য-বিতাড়িত সুরাবর্দ্দী সাহেব নিতান্ত শান্তশিষ্ট মেষশাবকের মতো মহাত্মাজীর পাশে আসিয়া অবনতমুখে বসিয়া আছেন, আর মহাত্মাজী সকলকে বুঝাইতেছেন যে, অতীতের দুঃখ-যন্ত্রণা-লাঞ্ছনার কথা মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া লোকে যদি ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকার সহিত মুসলিম লীগের অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পাকিস্তানী পতাকা বাঁধিয়া দেয়, তাহা হইলে দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলিকাতা মুহূর্ত্ত মধ্যেই নন্দনকাননে পরিণত হইতে পারে। পরে ১৫ই ভাদ্র কলিকাতা আবার রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল। কেন?

গত বৎসরের উৎপীড়নের ফলে হিন্দু জনসাধারণের মনে যে সন্দেহ ও তিক্ততা জমা হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া না গেলেও যে বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল, তাহাও নিঃসন্দেহ। কলিকাতায় শান্তি স্থাপন করা যদি সুরাবর্দ্দী সাহেবের এখন প্রকৃত অভিপ্রায় হইত তাহা হইলে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য তাঁহার পক্ষে লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস করিতেন। মহাত্মাজী সকলেরই ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র এবং তাঁহার সমস্ত মতামত যাঁহারা নির্ভুল বলিয়া স্বীকার না-ও করেন, তাঁহারাও যে প্রীতির অর্ঘ লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু মহাত্মাজীর পার্শ্বে সুরাবর্দ্দী সাহেবকে সমাসীন থাকিতে দেখিলে স্বতঃই সকলের মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, এই শান্তি প্রচারণার ভিতর হয়ত কি একটা রাজনৈতিক চাল প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। কুখ্যাত বস্তীগুলিতে যে শত শত পেশাদারী গুণ্ডা সহস্র সহস্র নিরপরাধ ব্যক্তির রক্তে কলিকাতার পথ-ঘাট এত দিন ভাসাইয়া দিয়াছে, সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে তাহাদিগকে অভয় দান করিলে কি প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা হইবে? কংগ্রেসী নেতারা এখনও পর্য্যন্ত এই আশা পোষণ করেন যে, ভারতবর্ষকে বিভক্তিকরণের প্রয়োজন এক দিন দূর হইবে এবং পাকিস্তান আবার ভারতবর্ষের সহিত মিলিত হইবে। পাকিস্তানের কোনও নেতা এ-পর্য্যন্ত এ কথা বলেন নাই; বরং পাকিস্তানের সর্ব্বাধিনায়ক জিন্না সাহেব এ কথা স্পষ্ট ভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাকিস্তানকে চিরস্থায়ী করিতেই তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এরূপ ক্ষেত্রে মুসলিম লীগকে শক্তিমান করিয়া তোলা আর ভারতবর্ষের বিভক্তিকরণ চিরস্থায়ী করা যে একই কথা, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহাত্মাজী জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণকেও মুসলিম লীগে যোগ দিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই

উপদেশের স্বপক্ষে তিনি যে যুক্তি দিয়াছেন, তাহা মোটেই বিচারসহ নহে। তিনি কংগ্রেসের নীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণকে মুসলিম লীগে যোগ দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কংগ্রেস এক জাতীয়তাবাদী ও মুসলিম লীগ দুই জাতীয়তাবাদী, এ-কথা জানিয়াও যে তিনি কেমন করিয়া জাতীয়তাবাদী মুসলমানদিগকে মুসলিম লীগে যোগ দিতে অনুরোধ করিতে পারেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। মুসলিম লীগকে পুষ্ট করিবার জন্য মুসলমান জনসাধারণের শেষ আশাস্থল জাতীয়তাবাদী মুসলমানদিগকে তিনি লীগে যোগ দিতে উপদেশ দিয়াছেন, এবং সুরাবর্দ্দী সাহেব বা তাঁহার দলভুক্ত দুই-এক জন মুসলমানকে পশ্চিম-বাঙ্গালার মন্ত্রিমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য উঠিয়াপড়িয়া লাগিয়াছেন।

আজ কংগ্রেসের নামে যাঁহারা পশ্চিম-বঙ্গ শাসন করিতেছেন, যেন-তেন-প্রকারেণ মুসলিম লীগকে তুষ্ট করিলেই তাঁহাদের চলিবে না। শান্তিরক্ষার জন্য নিরপেক্ষ ভাবে দুষ্টের দমন করা যে তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, একথা তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। এখন কলিকাতায় পাঞ্জাবী পুলিশ নাই, বারোজ সাহেব নাই, লীগ দলভুক্ত মন্ত্রিমণ্ডলীও নাই। এখনও যদি কলিকাতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, আমাদের বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী যাঁহাদের হাতে শান্তিরক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তাঁহারা একেবারে অকর্ম্মণ্য। কলিকাতার পুলিস বিভাগ যে মন্ত্রিমণ্ডলীর উপর নানা কারণে অসন্তুষ্ট, একথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। পুলিস বিভাগ যদি সুপরিচালিত না হয়, তাহা হইলে আবার শান্তি স্থাপনের আশা বৃথা।

মহাত্মাজীর কৃপাদৃষ্টির ফলে যাঁহারা বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছেন, তাঁহারা এই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাকে সুরক্ষিত পর্দ্দার আড়ালে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া রাখিবারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দাঙ্গা-হাঙ্গামার পুনরাবির্ভাব তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল। লোকের মনে আজ এই সন্দেহ জাগিয়াছে যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামার কলকাঠি যাঁহাদের হাতে তাঁহারাই আপন আপন স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে কয়েক দিনের জন্য সুইচ টিপিয়া শান্তির আলো জ্বালাইয়াছিলেন; আজ সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবার ভয়ে আবার তাঁহারাই সুইচ টিপিয়া কলিকাতাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন।

গোঁজামিল দিয়া প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না। কলিকাতার পুলিশ বিভাগে উপযুক্ত গোয়েন্দা কর্ম্মচারীর অভাব নাই। তাঁহাদিগকে বাজে কাজে ঠেলিয়া দিয়া স্বজনপ্রীতির আতিশয্যে স্ব-স্ব লোকের উপর শান্তিরক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না। কুখ্যাত বস্তীগুলি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে না পারিলে এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার বীজ নষ্ট হইবে না। যাহারা শত শত প্রাণীকে অপরের প্ররোচনায় নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিয়াছে, সাম্প্রদায়িক মিলনের আশায় তাহাদিগকে শাস্তি দিতে বিরত থাকিলে কোন সুফলই ফলিবে না। রোগের বীজ আবিষ্কার করিতে না পারিলে চিকিৎসা নিষ্ফল হইতে বাধ্য।

গণতন্ত্রের প্রহসন

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের ছায়া-মন্ত্রিমণ্ডলী কায়া পাইয়াছে, কিন্তু প্রাণ পায় নাই। তাই কেবল পুতুলের মত পরের ইঙ্গিতে হাত-পা নাড়িতেছে। প্রফুল্ল বাবুর প্রধান গুণ এই যে, তাঁহার চোখ, কান এবং মাথা সবই অপরের নিকট বাঁধা। নিজে কিছুই করিবার ক্ষমতা এবং সাহস তিনি রাখেন না। তাঁহার হাতে গণতন্ত্র একটি প্রহসনে দাঁড়াইয়াছে মাত্র। মন্ত্রিমণ্ডলীর তিন জন সদস্য শ্রীযাদবেন্দ্র পাঁজা, শ্রীরাধানাথ দাস এবং শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতিকে বিদায় দেওয়া হইল। তাঁহাদের স্থলে এখন পর্য্যন্ত দুই জনকে লওয়া হইয়াছে—শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী ও শ্রীভূপতি মজুমদার। এই রদ-বদল সম্পর্কে তাঁহার দলের সভ্যদের পর্য্যন্ত কিছু বলিবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। কৃপালনীর উপস্থিতি এবং হুমকীই বোধ হয় ইহার কারণ। আর সংবাদপত্রকে তো কোন কথা বলিতেই বারণ করা হইয়াছে। গণতন্ত্র পিষিয়া মরিয়াছে কংগ্রেস বৃহৎ নেতৃত্বের পদতলে।

২০শে ভাদ্র পশ্চিম-বঙ্গের কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের প্রথম বৈঠকে পশ্চিম-বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকারের পদের জন্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরদাস জালান, ডেপুটি স্পীকারের পদের জন্য শ্রীযুক্ত আশুতোষ মল্লিক কংগ্রেস দলের মনোনীত প্রার্থিরূপে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই বৈঠকে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার ছিল না। কাজেই এই সর্ব্বসম্মতির যথার্থ স্বরূপের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে আমরা বঞ্চিত। কংগ্রেসী দলের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন ও পরিষদের স্পীকার ও ডেপুটী স্পীকার পদের জন্য দলীয় প্রার্থী মনোনয়নই এই দিনের সভার আলোচ্য বিষয় ছিল। আমরা ইহাও শুনিয়াছিলাম যে, বিগত ১৫ই আগষ্ট পশ্চিম-বঙ্গের যে মন্ত্রিসভা ছিল, বর্ত্তমান মন্ত্রিসভাকে সেই ভাবে পুনর্গঠিত করিবার দাবী করিয়া এবং পদত্যাগী মন্ত্রিত্রয়ের উপর আস্থা জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাবও এই সভায় উপস্থিত করা হইবে। কিন্তু শুধু আলোচ্য বিষয় লইয়া সভার কাজ চালাইবার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া কৌশলে ঐ প্রস্তাব দুইটিকে বাদ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরদাস জালান সম্পর্কে কোন কথা এখানে আমরা আলোচনা করিব না। আমরা শুধু জিজ্ঞাসা করিতে চাই, কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়াই পশ্চিম-বঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকারের পদের জন্য প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত জালানের নাম স্থির করিয়াছিলেন তো? কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন করা হইয়াছে বলিয়া পশ্চিম-বঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যদের যদি কিছু বলিবার থাকা সঙ্গত না হয়, তাহা হইলে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের পদের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন ব্যাপারে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের সভা আহ্বান করিয়া গণতন্ত্রের অভিনয় না করিলেই কি চলিত না? পশ্চিম-বঙ্গের কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের নেতা এবং প্রধান মন্ত্রী তাঁহার দলের সহিত কোন পরামর্শ না করিয়া মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করিয়া গণতন্ত্র-বিরোধী কার্য্যই শুধু করেন নাই, পশ্চিম-বঙ্গে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়াছেন। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকিলেই যদি সমস্ত দোষ কাটিয়া যায়, গণতন্ত্রের সম্মান রক্ষিত হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের জন্য সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া প্রধান মন্ত্রী মহোদয়ই কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের পরামর্শ ক্রমে সমস্ত সদস্য মনোনীত করিলেই তো নির্বাচনের হাঙ্গামা ও ব্যয় হইতে দেশবাসী রক্ষা পাইতে পারে।

পশ্চিম-বঙ্গের কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের সভায় আরও একটি যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ, তাহাতেও গণতন্ত্রের স্বরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রস্তাবে বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের ডেপুটি লীডার সহ অন্যান্য কর্মকর্তা নির্বাচনের ভার দলের নেতা ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের উপর দেওয়া হইয়াছে। যাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি ডেপুটি লীডার ও অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগ করা সঙ্গত মনে করেন, তাঁহাদিগকেই তিনি নিয়োগ করিবেন। তাহা হইলে আর এই সভা আহ্বান করিবার প্রয়োজনই বা কি ছিল? প্রধান মন্ত্রী কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া সবই যদি করিতে পারেন, তাহা হইলে ব্যবস্থা পরিষদেরই বা আর প্রয়োজন কি? পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদে ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহারই আভাস আমরা পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের বৈঠকে পাইলাম। সাধারণ নির্বাচন আজ দূরে থাকিতে পারে, নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হওয়ার পূর্বে আর নির্বাচন হয়ত হইবে না। কিন্তু অনন্ত কালের জন্য নির্বাচন ঠেকাইয়া রাখা চলিবে না। নির্বাচক মণ্ডলীকেও তাহাদের স্বাধীনতা ও কর্তব্য সম্বন্ধে কথা ভাবিতে হইবে। এখন হইতেই সে ভাবনা করার সময় তাঁহাদের আসিয়াছে।

পুলিসে সংস্কার

লীগ-মন্ত্রিসভার আমল হইতে এই পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক অশান্তি নিবারণে অক্ষমতার জন্য কলিকাতার পুলিস যথেষ্ট দুর্নাম কিনিয়াছে। বৃটিশ আমলে যাহারা সামান্য রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা দেখিলেই সক্রিয় ও চঞ্চল হইয়া উঠিত,—বড় বড় রাজনৈতিক আন্দোলন যাহারা অতি নিখুঁত ভাবে দমন করিয়া ফেলিত, তাহারা কয়েকটা গুণ্ডাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। পুলিসের এই অক্ষমতা শক্তির অভাবের জন্য ঘটে নাই—ইহা স্বেচ্ছাকৃত। লীগ-মন্ত্রিসভার আমলে এই স্বেচ্ছাকৃত সাম্প্রদায়িক অশান্তি নিবারণে অক্ষমতার যে সূত্রপাত হইয়াছিল, ডক্টর ঘোষের মন্ত্রিসভা চালু হইবার পরও সে অবস্থার যে প্রতিকার হয় নাই, কলিকাতার বিগত বিশৃঙ্খলাপূর্ণ দিনগুলিতে তাহার অনেক লক্ষণ দেখা গিয়াছে। পুলিসের আচরণ সম্বন্ধে যে সকল অভিযোগ উঠিয়াছে, সম্ভবতঃ সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া আচার্য্য কৃপালনী বলিয়াছেন, পুলিস শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া, সমাজবিরোধীদের শাস্তি দিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদের সহিত ভিড়িয়া পড়ে, তাহাকে সমাজের বন্ধু, না শত্রু—কোন্ নামে অভিহিত করা হইবে?—যে সব পুলিস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সমাজবিরোধী শক্তির সহিত সহযোগিতা করে—তাহারা পুলিস নহে, খুনে।"

ইতিপূর্ব্বে পশ্চিম-বঙ্গের গভর্ণর শ্রীরাজাগোপালাচারীও পুলিসকে নূতন ভাবধারার সম্বন্ধে সচেতন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পুলিসের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উঠিয়াছে, তাহার সত্যতা ও শাসন-ও শৃঙ্খলার কর্ণধারগণ একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই সব অভিযোগ স্বীকার করিয়া লওয়া কিংবা কেবল পুলিসের উদ্দেশে উচ্ছ্বাসপূর্ণ উপদেশ দেওয়াই এই ক্ষেত্রে বড় কথা নহে। পুলিসের ভিতর সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার বৃটিশ ও লীগ আমলের অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি। আজ যদি সেই পুরানো আমলের বিষকে দূর করিতে হয়, তবে পুলিস-ব্যবস্থাকে একেবারে ঢালিয়া সাজিতে হইবে, আজ কংগ্রেস দেশের শাসন-ভার পাইয়াছেন বটে, কিন্তু সেই পুরাতন আমলের আইন-কানুন ও অফিসারেরা পুলিস-বাহিনীতে কর্তৃত্ব করিতেছে। বৃটিশ আমলে যাহারা স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারীদের নির্ম্মম নির্য্যাতন করিয়া হাত পাকাইয়াছে—স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিপথগামী করিবার জন্য সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করিবার কাজে উৎসাহী হইয়াছে, তাহারা কিংবা তাহাদের আত্মীয়স্বজন আজও পুলিসের পরিচালনা করিতেছে। ফলে পুলিসের পুরাতন মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন সাধন সম্ভব হইতেছে না।

আচার্য্য কৃপালনী পুলিসের উদ্দেশে বলিয়াছেন, "কোন্ গভর্ণমেণ্ট আদেশ জারী করিতেছে, সেদিকে তাহার দৃষ্টি দিবার আবশ্যকতা নাই। রাজনীতি সম্বন্ধে তাহার কোন আগ্রহ থাকিবে না। শাসন-পরিচালক হিসাবে কেবল শাসনকার্য্য চালানই হইবে তাহার কাজ। আইনের সাহায্যে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা ভাল কি মন্দ, সে বিষয়ে তাহার মাথা-ঘামান নিষ্প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্ট যে ধরণের হৌক না কেন, পুলিসকে তাহার হুকুম তামিল করিতে হইবে।"

পুলিসের মধ্যে রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতনতার অভাবের ফলেই এত দিন বৃটিশ কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহাকে জনসাধারণকে দমনের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা সম্ভব হইয়াছিল—আজও জনসাধারণ পুলিসের নিকট হইতে উপযুক্ত কাজ পাইতেছে না। পুলিসকে রাজনীতি হইতে দূরে রাখিয়া নয়—পুলিসকে তাহার রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিয়া, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া, তাহারা যে শুধু ভাড়াটিয়া শান্তিরক্ষক নহে, এই সত্য বুঝাইয়া দিয়াই সাম্প্রদায়িকতার ছোঁয়াচ মুক্ত করা সম্ভব। পুলিস-বাহিনীর লোকেরা যন্ত্র নহে, তাহারাও মানুষ। পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তন তাহাদের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। রাজনীতি হইতে দূরে রাখিবার নামে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা যদি তাহাদের সমাজবোধ জাগ্রত করিবার চেষ্টা না করেন, তবে তাহারা পুরাতন আমলের অভ্যাস আজও কাটাইয়া উঠিতে পারিবে না। আগেকার দিনে পুলিস বা সৈন্যবাহিনীকে সমাজের সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখা হইত, কারণ সেগুলি দমননীতির অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করাই ছিল শাসকবর্গের উদ্দেশ্য। কিন্তু কংগ্রেস মন্ত্রিসভা যদি পুলিসকে সেই দমননীতির যন্ত্র হিসাবে রাখিতে না চাহেন, তবে পুরাতন দমন-নীতি-বিশারদ অফিসারদের বিতাড়িত করিতে হইবে, পুলিস ও জনসাধারণের মধ্যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, তাহাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিতে হইবে।

দুর্ম্মূল্যতা ও চোরাবাজার

যুদ্ধের সময় জিনিষপত্রের যে দাম চড়িয়াছিল আজও তাহা কমিল না। চাউল, আটা, মাছ, কাপড়, কাঠ, কয়লা—সাধারণ ব্যবহার্য্য কোন জিনিষই আজ কিনিবার সাধ্য মধ্যবিত্তের নাই। এই দুরবস্থার জন্ম বড় বড় কৈফিয়ৎ অবশ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু আমাদের মতে এক সরকারী অক্ষমতা ভিন্ন সত্যকার কোন কৈফিয়ৎ নাই। একথা সত্য যে, যুদ্ধের পর ভারতে বিভিন্ন জিনিষের উৎপাদন যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। জিনিষপত্রের অভাব দেশে আছে বটে, কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ অভাবের তুলনায় অনেক অধিক। সরকার হইতে বিভিন্ন দ্রব্যের যে কনট্রোল মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, অধিকাংশ বস্তুই সেই মূল্যে পাওয়া যায় না; কিন্তু তাহার দুই-তিন গুণ মূল্য দিলে জিনিসের অভাব ঘটে না। কলিকাতায় রেশনের দোকানে হাজার মাথা খুঁড়িয়াও লোকে কাপড় পান না—কিন্তু কলিকাতার রাজপথেই প্রকাশ্যে অধিক মূল্যে কাপড় বিক্রয় হইতেছে। সরকারী হিসাবে কয়লার মণ-প্রতি দর এক টাকা নয় আনা, কিন্তু বাজারে আড়াই টাকা তিন টাকা মণ। বাঙ্গালার পল্লী অঞ্চলে যে চাউল আজ ত্রিশ টাকা দরেও বিক্রয় হইতেছে।

আজ যে সর্ব্বব্যাপী দুর্ম্মূল্যতা দেখা দিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে চোরাকারবারীদের ষড়যন্ত্র। যুদ্ধের সময় অসাধু আমলাতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় লোকের জীবনের বিনিময়ে যে প্রচুর মুনাফা তাহারা লুটিয়াছে, আজও সেই অবাধ লুণ্ঠন চালাইয়া যাইতে তাহারা বদ্ধপরিকর। সাধারণ লোকে ভাবিয়াছিলেন, লীগ-রাজত্বের অবসানের পর কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে এই অসহনীয় অবস্থার বুঝি প্রতিকার হইবে; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেই প্রতিকারের বিন্দুমাত্র লক্ষণ কেহ দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। প্রধান মন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁহার সহকর্ম্মিবৃন্দ বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতায় জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার ভাল ভাল প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তাঁহারা এই সব সংকার্য্য করিবার জন্ম সময় চাহিয়াছেন; কারণ এত দিনকার অভাব তো আর এক দিনে ঘুচিতে পারে না। উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতি কাজগুলি যে সময়সাপেক্ষ, তাহাতে ভুল নাই। কিন্তু চোরাবাজার দমন করিয়া জিনিষপত্রের দর কমাইবার চেষ্টা তো অবিলম্বে করিতে পারা যায়। মন্ত্রিসভা এই দিকে তাঁহাদের উৎসাহের কোন পরিচয় যদি দিতেন, তবে তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি পালনের সূত্রপাতের লক্ষণ দেখিয়া সাধারণে হয়ত কিছু আশ্বস্ত হইতে পারিত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে মৌখিক বিষোদ্গার করা ভিন্ন ডক্টর ঘোষের মন্ত্রিসভা আর কিছু কি করিয়াছেন? বিগত দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালার লোক না খাইয়া মরিয়াছিল, কিন্তু একটি প্রতিবাদ করে নাই। আজ দেশে আবার পঞ্চাশের মন্বন্তরের অবস্থার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় সকলে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু এই অবস্থা নীরবে স্বীকার করিয়া উপবাসে আত্মহত্যা করিবার মনোভাব জনসাধারণের যে নাই, ডক্টর ঘোষ ও তাঁহার মন্ত্রিসভা এই সত্য হৃদয়ঙ্গম যত শীঘ্র করেন ততই মঙ্গল। চোরাবাজার দমনে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার চেষ্টা না করিলে অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিবে।

কিছু দিন ধরিয়া কলিকাতার বাজারে মাছের দর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল; ইহার ফলে ক্রেতারা কলিকাতার বিভিন্ন বাজারে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অতিলোভী আড়তদার ও মালিকেরা যাহাতে সস্তায় মাছ সরবরাহ করিতে বাধ্য হন, সে ব্যবস্থা ডক্টর ঘোষের মন্ত্রিসভা গ্রহণ করিবেন, এই আশাই সাধারণ লোকে করিয়া থাকে। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, মৎস্য বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর না কি বলিয়াছেন, এই বিষয়ে তাঁহার করিবার কিছু নাই। শুধু তাহাই নহে, তিনি বস্তুতঃ পক্ষে জলার মালিক ও বড় বড় আড়তদারদের চোরাকারবারের কথাও অস্বীকার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নস্করের 'ফিসারি' আছে এবং যাঁহারা ভেড়ী নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনিও তাঁহাদের অন্যতম বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রিসভার মধ্যে তাঁহার উপস্থিতি সত্ত্বেও মাছের যদি এই চোরাবাজার চলিতে থাকে, তবে কংগ্রেস-মন্ত্রিসভার সুনাম নিশ্চয় বৃদ্ধি পাইবে না। ব্যক্তিগত স্বার্থ এই ক্ষেত্রে জনসাধারণের স্বার্থের অপেক্ষা যদি বড় হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত লজ্জার কথাই হইবে।

চোরাবাজারের বিরুদ্ধে আজ জনসাধারণের যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তাহার সহায়তায় চাউল, কয়লা, কাপড় মাছ ও অন্যান্য চোরাবাজার অতি সহজেই গভর্ণমেণ্ট দমন করিতে পারেন। পুলিস এখনো যে চোরাকারবারীদের সহায়তা করার অভ্যাস ত্যাগ করে নাই, তাহা জানা কথা—সুতরাং পুরাতন আমলাদের সাহায্যে চোরাকারবার দমনের চেষ্টা পূর্ব্বের ন্যায় প্রহসনে পরিণত হইতেই বাধ্য। সুতরাং চোরাকারবার দমনের সত্যকার ইচ্ছা থাকিলে জনসাধারণের উপরই গভর্ণমেণ্টকে নির্ভর করিতে হইবে।

পশ্চিম-বঙ্গের সরকারী শ্রমনীতি

কিছু দিন পূর্ব্বে দিল্লী প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতে শ্রমিক ধর্ম্মঘট সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, শ্রমিকদের অভিযোগের যথার্থ কারণ আছে; তবে ইহাও সত্য যে, ধর্ম্মঘটের ফলে দেশের সম্পদ হ্রাস পায়। দেশ এখন পণ্যের ব্যাপক ঘাটতির সম্মুখীন হইতেছে। ডক্টর সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জীও সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন, শ্রম-বিরোধের জন্ম ১৯৪৬ সালে সমগ্র বাঙ্গালায় ৪৭ লক্ষ ঘণ্টার কাজ নষ্ট হইয়াছে। দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইলে শ্রম-বিরোধকে যে সমূলে ধ্বংস করা প্রয়োজন, এ সম্পর্কে তাঁহার সহিত আমাদের মতবিরোধ নাই। কিন্তু মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি লইয়া তিনি যে প্রত্যেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক 'ওয়ার্কস কমিটি' গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার ফলে শ্রম-বিরোধের সম্ভাবনা কি সত্যই সমূলে বিনষ্ট হইবে, না শ্রমিকদের কণ্ঠরোধ করিয়া তাহাদের অভিযোগ প্রকাশের পথ রুদ্ধ করা হইবে?

ডক্টর ব্যানার্জী বলিয়াছেন যে, ওয়ার্কস কমিটিতে যে শ্রমিক প্রতিনিধি থাকিবেন তিনি বাহিরের লোক হইতে পারিবেন না, তাঁহাকে ঐ কারখানার শ্রমিক হইতে হইবে। এই ভাবেই তিনি শ্রমিকদের মধ্যে খাঁটি ট্রেড ইউনিয়ন মনোভাবের সৃষ্টি করিতে চান। গত ১৮ বৎসর ধরিয়া তিনি শ্রমিকদের হইয়া কাজ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কোন দিন কোন কারখানায় শ্রমিকের কাজ তিনি করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। এত দিন তিনি

বাহিরের লোক হইয়াই শ্রমিকদের উপর নেতৃত্ব করিয়াছেন, তাহাদিগকে পরিচালন করিয়াছিলেন এবং তাহাদের প্রতিনিধিত্বও করিয়াছেন এবং করিতেছেন। বাহিরের লোক যদি ওয়ার্কস কমিটিতে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করিতে না পারেন তবে আইন সভাতেও বাহিরের লোকের শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করা উচিত নয়। এ সম্বন্ধে ডক্টর ব্যানার্জীর অভিমত কি? বস্তুতঃ তিনি দেশপ্রেম নীতি ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা আসলে কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্বের শ্রম-নীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্ব ভারতীয় শিল্পপতিদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, এই সরল সত্য মনে রাখিলে বাহিরের লোকের প্রতি ডক্টর ব্যানার্জীর বীতস্পৃহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। খাঁটি ট্রেড ইউনিয়ন মনোভাব বলিতে তিনি কি বুঝিয়া থাকেন তাহাও বুঝিতে কষ্ট হয় না। মালিকদের পক্ষে কে প্রতিনিধিত্ব করিবেন, তাহা তিনি কিছু বলেন নাই। ইহার জন্য কিছু আসে যায় না। যিনিই প্রতিনিধিত্ব করুন, তিনিই যে বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে তাঁহাদের সমকক্ষ লোক শ্রমিকদের মধ্যে পাওয়া অসম্ভব, কাজেই এইরূপ ওয়ার্কস কমিটির পরিণাম যে কি হইবে, তাহাও অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু ডক্টর ব্যানার্জী জানেন যে, ওয়ার্কস কমিটিতে বাহিরের লোক শ্রমিকদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব না করিলেও বাহিরের লোকের পরামর্শ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন না। কাজেই ওয়ার্কস কমিটিতে মালিক পক্ষের প্রতিনিধির কথাই যে শ্রমিক প্রতিনিধিরা মানিয়া লইবেন, সে-সম্বন্ধে নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু বিরোধ মীমাংসার জন্য সর্ব্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনালের সালিশী ব্যবস্থা সত্যই যে অতি চমৎকার ব্যবস্থা তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রম-বিরোধের মূল যেখানে, সেইখানটা ডক্টর ব্যানার্জী আদৌ লক্ষ্য করেন নাই, কেবল শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট কি উপায়ে বন্ধ করা যায়, সে-কথাই ভাবিয়াছেন।

শ্রমিক-বিরোধের মূল কারণ আমাদের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই রহিয়াছে। আমরা শ্রমিকদিগকে জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী মজুরী দিতে রাজী নই কিন্তু ডিরেক্টরদের লভ্যাংশ অনায়াসেই দিয়া থাকি। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান যদি উন্নত করা সম্ভব না হয়, তাহাদের জীবিকা যদি নিরাপদ করা না যায়, তাহা হইলে কাজ করিবার উপযুক্ত প্রেরণা শ্রমিকরা কোথায় পাইবে? শ্রমিকদিগকে জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী বেতন দিবার জন্য শিল্পপতিদিগকে বাধ্য করিতে ডক্টর ব্যানার্জী অসমর্থ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি এক জন শ্রমিক-নেতা হইয়াও শ্রমিকদিগকে দমন করিতে বদ্ধপরিকর। ডক্টর ব্যানার্জী মালিকদের ন্যায্যতঃ প্রাপ্য লভ্যাংশ বাদে অতিরিক্ত মুনাফা হইতে ছিটা-ফোঁটা শ্রমিকদিগকে দেওয়ার প্রস্তাবের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু মালিকের প্রাপ্য ন্যায্য লভ্যাংশ স্থির হইবে কিরূপে, সে-সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই। বোধ হয়, মালিকরা যাহা ন্যায্যতঃ প্রাপ্য লভ্যাংশ বলিয়া স্থির করিবেন, তিনি তাহাই মানিয়া লইবেন। কাজেই তাঁহার প্রফিট শেয়ারিং ব্যবস্থা দ্বারা শ্রমিকের খাওয়া-পরার সুব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব। শিল্পগুলিকে ধীরে ধীরে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার কথা যাহা তিনি বলিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা এবং শিল্পকে সোস্যালাইজড করা যে এক জিনিষ নয়, তাহা বোধ হয় তিনিও জানেন। কিন্তু শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিলে শিল্পপতিদের প্রকৃতপক্ষে কোন ক্ষতি হইবে না, বরং অনেক সঙ্কট হইতে তাঁহারা মুক্ত থাকিবেন। ইহাই শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার মূল উদ্দেশ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুঁজিপতিরা যত দিন গবর্ণমেণ্ট নিয়ন্ত্রণ করিবেন, তত দিন শিল্পগুলিকে গবর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণে আনার কোন সার্থকতা নাই।

দেশীয় রাজ্যে পীড়ন-নীতি

দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি কংগ্রেসের উর্দ্ধতন নেতারা উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে কসুর করেন নাই; যে সব বামপন্থী দল দেশীয় রাজ্যের স্বেচ্ছাচারী রাজন্যবর্গকে সায়েস্তা করিবার জন্য তীব্র আন্দোলন আরম্ভের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছে, তাহাদের প্রতি রক্তচক্ষু প্রদর্শন করিতে কোন ত্রুটি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং শ্রীযুক্ত পট্টভী সীতারামিয়া করেন নাই। কিন্তু তাহাতে সমস্যার কোন সমাধান যে হয় না—ভারতের দুইটি দেশীয় রাজ্যে নিরঙ্কুশ ও নির্লজ্জ প্রজা-পীড়নই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। হায়দ্রাবাদ রাজ্য আজও বিশিষ্ট দেশী ও বিদেশী মহলের প্ররোচনায় ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করে নাই। হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর নিরপেক্ষ মহাপুরুষের ভূমিকা অভিনয় করিয়া হায়দ্রাবাদকে বৃটিশ সমরাস্ত্র ও পুঁজির ঘাঁটিতে পরিণত করিতেছেন—এই সংবাদ কাহারো আজ আর অজ্ঞাত নাই। হায়দ্রাবাদের জনসাধারণ ইহারই প্রতিবাদে হায়দ্রাবাদকে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবী লইয়া আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। মহীশূরের অবস্থা কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। এই রাজ্যটি বর্ত্তমানে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিয়াছে বটে, কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে গণতন্ত্রের কোন অস্তিত্বই এখানে নাই। মহীশূর রাজ্যে সত্যকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও স্বৈরাচারের বিনাশের উদ্দেশ্যেই আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে।

এই অবস্থার জন্য কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের নৃপতি-তোষণ নীতিই যে সম্পূর্ণ দায়ী, তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। দেশীয় রাজাদের ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের পরিবর্ত্তে তাঁহারা অনেক আপত্তিকর সর্ত্তই মানিয়া লইয়াছেন। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রদেশগুলির উপর যখন কড়া কর্ত্তৃত্ব করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, তখন দেশীয় রাজ্যগুলিকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ কেন্দ্রীয় সরকার করিবেন না। ইহার ফল যে কত দূর শোচনীয় হইতে পারে, মহীশূরই তাহার নবতম নিদর্শন। বিশেষতঃ এই সর্ত্তে দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিতে দেওয়ার ফলে লাভের অপেক্ষা ক্ষতিই যে প্রবল হইবার সম্ভাবনা, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। আজ ভারতীয় গণ-পরিষদে প্রাচীন উদারনৈতিক নেতা ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিনিধিদের প্রভাব নিতান্ত কম নহে। দেশীয় রাজ্যের পক্ষ হইতে ইঁহারাই যদি ভবিষ্যতে কেন্দ্রে প্রতিনিধিত্ব করিতে থাকেন, তবে প্রত্যেক প্রগতিশীল প্রচেষ্টা তাঁহারা ব্যাহত করিতে পারিবেন। ১৯৪৮ সালের পর বৃটিশ

কমনওয়েলথ হইতে ভারতের বাহির হইয়া আসিবার প্রশ্ন যখন উঠিবে, তখন দেশীয় রাজ্যের এই সব প্রতিনিধিরা নিশ্চয় আপত্তি উঠাইবেন এবং ভয় দেখাইবেন যে, বৃটিশ কমনওয়েলথ হইতে যদি ভারত বাহির হইয়া আসে, তবে দেশীয় রাজ্যগুলিও ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে বাহির হইয়া আসিবে। প্রাচীন উদারনৈতিক দল এবং কংগ্রেসের গোঁড়া দক্ষিণপন্থীদের অনেকেও যে পূর্ণ স্বাধীনতা অপেক্ষা ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের অধিক ভক্ত, সে তথ্য অনেকেই জানেন। সুতরাং ইঁহাদের সম্মিলিত চাপে অবস্থা কি দাঁড়াইবে, তাহা বলা কঠিন। এই ধরণের সম্ভাবনা বন্ধ করিতে হইলে যে সকল দেশীয় রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিতেছে সেই সব রাজ্যে প্রকৃত জনপ্রিয় সরকার গঠন করা এবং গণ-পরিষদে প্রকৃত জন-প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। দেশীয় রাজ্যে আজ যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহার গুরুত্ব তাই শুধু স্থানীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়—ভারতীয় ইউনিয়নের ভবিষ্যৎও তাহার উপর অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার যাহাতে এই সব আন্দোলনকে সক্রিয় সমর্থন করেন এবং তাঁহাদের বর্ত্তমান নিষ্ক্রিয় নীতি ত্যাগ করেন, সে জন্য প্রবল দাবী করিবার সময় আসিয়াছে।

—

আসন্ন খাদ্য-সঙ্কট

২৩শে ভাদ্র এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের অসামরিক সরবরাহ সচিব শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী জানাইয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে দুর্ভিক্ষের কোন আশঙ্কা নাই। তবে আগামী দুই মাসকাল খুব সঙ্কটের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইবে বলিয়া তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা উক্তি হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কলিকাতাসহ সমগ্র রেশনিং অঞ্চলকেই এই সঙ্কটের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে, কিন্তু মফঃস্বলে কোন সঙ্কটের আশঙ্কা তিনি করেন না। এই সঙ্কট পাড়ি দিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট যে ছয় দফা কর্ম্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন তাহারও লক্ষ্য শুধু কলিকাতাসহ সমগ্র রেশনিং অঞ্চলকে সঙ্কট হইতে মুক্ত রাখিবার প্রচেষ্টা। কিন্তু চাউল পাওয়া যাইবে কোথায়, এ সমস্যা বড় কঠিন সমস্যা। অন্যান্য প্রদেশ, বিশেষ করিয়া আসাম, উড়িষ্যা এবং পূর্ব্বাঞ্চলের দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে সরবরাহ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করিবার জন্য মন্ত্রিসভা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা খুবই সমীচীন হইয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট অথবা চাউলকলগুলির নিকট যাহারা ধান বিক্রয় করিবে তাহাদিগকে ৭ই অক্টোবর পর্য্যন্ত মণ-প্রতি এক টাকা এবং অতঃপর ২১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত মণ-প্রতি ৮০ আনা বোনাস দিবার যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য যে ধান বিক্রয় করিতে অনুপ্রাণিত করা, সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃষকরা এই বোনাসের সুযোগ কতটা পাইবে, তাহা বলা কঠিন। আমরা গত দুর্ভিক্ষ ও তৎপরবর্ত্তী কালের অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে, সরকারী সংগ্রহকারীর বেনামীতে বহু চাউল ক্রয় করিয়া মজুত করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, যে অঞ্চল হইতে চাউল ক্রয় করা হইবে সে অঞ্চলে কি পরিমাণ চাউল আছে এবং ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য কি পরিমাণ চাউল প্রয়োজন, তাহা স্থির করিয়া উদ্বৃত্ত ধান ও চাউল ক্রয়ের ব্যবস্থা না করিলে মফঃস্বল চাউলশূন্য হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। অসামরিক সরবরাহ-সচিব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, চোরাকারবারের জন্য চাউল সংগ্রহ কার্য্য বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বোনাসের ব্যবস্থায় চোরাকারবার বন্ধ হইবে না, বরং বোনাসের লোভে চোরাকারবার আরও বাড়িয়া চলিবে। তবে এই ব্যবস্থায় গভর্ণমেণ্ট ধান ও চাউল পাইবেন, চোরাকারবারী পাইবে বোনাস, কিন্তু কৃষকরা যে ন্যায্য মূল্যও পাইবে সে সম্বন্ধে আমরা ভরসা করিতে পারি না।

এখন প্রধান বিবেচনার বিষয়, কিরূপে চাউলের সরবরাহ বৃদ্ধি করা যায়। দ্বিতীয় বিবেচনায় বিষয় বণ্টন ব্যবস্থা। রেশন অঞ্চলে রেশন ব্যবস্থার মারফৎ চাউল বণ্টন করা হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু পরিমাণ যাহাতে আর হ্রাস করিতে না হয়, মন্ত্রিসভাকে তাহারই জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব্বোপরি চোরাকারবারীদের সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে সরবরাহ ব্যবস্থাও সাফল্যলাভ করিতে পারিবে না।

—

শহীদ শচীন্দ্রনাথ ও স্মৃতীশচন্দ্র

কলিকাতায় দাঙ্গার আগুন নিবাইতে গিয়া কংগ্রেস সাহিত্য-সঙ্ঘের যুগ্ম সম্পাদক ও দেশকর্ম্মী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মিত্র যেরূপ শোচনীয় ভাবে নিহত হইয়াছেন, তাহাতে দেশবাসীর ন্যায় আমরাও মর্ম্মাহত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত স্মৃতীশচন্দ্র ব্যানার্জ্জীও এই দাঙ্গা নিবারণের প্রচেষ্টায় আত্মাহুতি দিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পরও দেশে আজ শান্তি স্থাপিত হয় নাই। দীর্ঘ দুই শতাব্দীব্যাপী বিদেশী শাসন ভারতের বুকে যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করিয়াছিল, আজ বৃটিশ-শাসনের অবসানের পরও তাহার বিষাক্ত ফল ভারতবাসী ভক্ষণ করিতে বাধ্য হইতেছে। কলিকাতায় যখন স্বাধীনতা দিবসের অভূতপূর্ব্ব উৎসব আনন্দের পর আবার অকস্মাৎ সমাজ-বিরোধী গুপ্ত সর্পের দল ফণা বিস্তার করিয়া সমাজ-দেহের সর্ব্বত্র ছোবল মারিতে উদ্যত হইল, তখন অনেকে নীরবে হা হুতাশ করিয়াছেন, অনেকে হাত গুটাইয়া বসিয়া অসহায় বোধ করিয়াছেন; কিন্তু শচীন্দ্রনাথ ও স্মৃতীশচন্দ্র এই মূঢ় আত্মঘাতী সংগ্রামে নীরব দর্শক হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহারা দাঙ্গা নিবারণ প্রচেষ্টায় আরো অনেকের ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক বিকৃতবুদ্ধি হত্যাকারীদের হস্তে তাঁহাদের অমূল্য জীবনের অবসান ঘটিয়াছে। তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত আত্মীয়স্বজন ও অগণিত বন্ধু-বান্ধবদের সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমাদের নাই—সে ব্যর্থ চেষ্টাও আমরা করিব না। কিন্তু এই আশাই করিব যে, যাহাদের দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া এমন অমূল্য দুইটী জীবন নষ্ট হইল, তাহাদের যেন কঠোর হস্তে দমন করিবার ব্যবস্থা জনসাধারণ গ্রহণ করেন।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মে... ...যণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বৈষক-দলনি, সন্তান-পালিনি
জয় জয় দুর্গে দুর্গতি-নাশিনী —বঙ্কিমচন্দ্র

—সুভো ঠাকুরের সংগ্রহ

নিঃসঙ্গ —বিতান মিত্র

আমার উদ্দেশ্য এই যে, ভারতান্তর্গত বা ভারত-বহির্ভূত মনুষ্য জাতি যে মহৎ চিন্তারাশি সৃজন করিয়াছেন, তাহা অতি হীন, অতি দরিদ্রের নিকট পর্য্যন্ত প্রচার। তার পর তারা নিজেরা ভাবুক। চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতাই জীবন, উন্নতি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের একমাত্র সহায়। যেখানে তাহা নাই, সেই মানুষ, সেই জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।

জাতিভেদ থাকুক বা নাই থাকুক, কোন প্রণালী বদ্ধ মত প্রচলিত থাকুক বা নাই থাকুক, যে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী বা বর্ণ বা জাতি বা সম্প্রদায় অপর কোন ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও কার্য্যের শক্তিতে বাধা দেয়, সে অন্যায় করিতেছে বুঝিতে হইবে এবং তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

কাজে লাগো। আমাদের কার্য্যের এই মূল কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখিবে—জনসাধারণের উন্নতি বিধান—ধর্ম্মে এক বিন্দু আঘাত না করিয়া। মনে রাখিবে দরিদ্রের কুটীরেই আমাদের জাতির জীবন। কিন্তু হায়, কেহই ইহাদের জন্য কিছুই করেন নাই।

—স্বামী বিবেকানন্দ

ট্রেড সো

[অপ্রকাশিত]

কাজি নজরুল ইসলাম

'ট্রেড সো' দেখিতে গেছিনু সেদিন সকালে রূপবাণীতে
সাতশ' তরুণ "সরুন সরুন" চিৎকারি চারি ভিতে,
লুটাপুটি করে লুটাপুটি খেয়ে ছুটাছুটি করে সবে,
একটেরে রহি চাহি—মহাত্মা গান্ধী কী এল তবে ?
এল রবীন্দ্রনাথ কি—এল কি সুভাষ, জহরলাল ?
গুঁতোগুঁতি করে সাতশ' তরুণ
জুতি ধুতি ছেঁড়া অতি সকরুণ
খুন চড়ে গিয়ে নয়ন অরুণ
যে মদমাতোয়াল।
এল কি সুভাষ, এল কি জহরলাল ?
কোথায় সুভাষ ! সুবাস ছড়ায়ে আসে ছায়ানট-নটী,
যাঁরা জহরৎ শাড়ী পরে লাল বেগুনী ও বরবটী।
হিন্দু-মুসলমানের এমন মিলন দেখিনি আর,
বিড়িওলা আর অফিসের বাবু হয়ে গেছে একাকার।
টিকিতে দাড়িতে জড়াজড়ি হয়, ছড়াছড়ি পান-বিড়ি,
কোট-প্যান্ট-লুঙ্গি-ধুতি ঠাসাঠাসি সারা ফুটপাথ সিঁড়ি।
কেহ বলে, "খ্যাঁদা দ্যাখ দ্যাখ ওই অনুরাধা-টিপ পরা,
ওই যে কি বলে, উনি এন-টির নয়া-তারা আনকোরা !
ভাগ্যচক্র শাড়ী বিজড়িত ওই যে অমুক দেবী—
এ্যালবামে রাখি উহারি প্রতিমা আমি দিবানিশি সেবি।"
কর্দ্দম অনুলিপ্ত ভূষণ ভিড়ঠেলা ঘামে চুবা
অভিনয়-হিরোমার্কা পিরাণ পরা কয়জন যুবা
বলে, "ওই ওই পাহাড়ি, দুর্গাদাস, সাইগল ওই,
ওই পঙ্কজ, অমর বড়ুয়া—দেবকীকুমার কই ?"
কেহ বলে, "বীত-শোক হইয়াছি অশোককুমারে দেখে
মনে হয় যাই দূর বোম্বাই অঙ্গে ভস্ম মেখে।"
'বনকি চিড়িয়া' কোরাসে গাহিয়া একদল যুবা কহে,
"বলিতে পার কি দাদা অচ্ছুৎকন্যা কোথায় রহে ?"
হায় রে বিংশ শতাব্দী, হায় বাঙলার যৌবন।
নিপট কপট ছায়াপট প্রেমে পড়িয়াছে জনগণ।
বাণীচিত্রে যা ফুটে ওঠে তা'কি এই জীবনের ছায়া ?—
এই বিকৃতি—কাগজের ফুল এই মরীচিকা মায়া ?
পর্দ্দায় দেখি যে সব পুরুষ নারী ঘোরা দিবানিশি,
বলিতে পার কি, চিনিতে পার কি এরা সব কোন্ দিশি ?
ইহাদের বলা, ইহাদের চলা, ইহাদের হাবভাব
দেখেছ কি কেহ—দেখেছ ফলেছে ওকগাছে যেন ডাব !
পাইন-শাখায় ওল ঝুলিতেছে, আমগাছে পিচ ঝুলে,
ট্যাসফিরিঙ্গী বাজাইবে বাঁশী কবে যমুনার কূলে ?

যদিও মেঘ চরাই

প্রেমেন্দ্র মিত্র

●

হয়ত আকাশে শুধুই মেঘ চরাই,
কখনো বৃষ্টি কখনো আলো ছড়াই
অথবা রং চড়াই।
তবুও ভেবো না ভেবো না
যার যা খাজনা দেবো না ;
ক্ষেতের ফসল আমিও কেটেছি
শূন্য নয় মরাই।

যদিও বাঁধন না মেনে হই উধাও,
গরল যেমন তেমনি চাখি সুধাও,
কিম্বা যা কিছু দাও।
তবুও ভেবো না ভেবো না,
মেলার মুজরো নেবো না ;
দল ছাড়া বলে বদলেছি কি না
ও কথা মিছে শুধাও।

●

তোমরা যারা ভাবছ মোদের
পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে দেবে
কামান দেগে উড়িয়ে দেবে
দিও
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম…।
আমরা অতি ক্ষুদ্র
শূদ্রাদপি শূদ্র
এক ধমকে দৌড়ে পালাই
বাসন মাজি লাঙল চালাই
ডলাই মলাই চোলাই ঢালাই
আমরা করি
ঘোরাই ঘানি, ঘোরাই জাঁতা
সবার শিরে নানান ছাতা
আমরা ধরি
তোমরা যখন যুদ্ধ কর
আমরা মরি
দিও দিও দিও
তোমরা যারা চাবুক চালাও
কামান চালাও
হুকুম চালাও
পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে দিও
কামান দেগে উড়িয়ে দিও
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম!
তোমরা যারা ভাবছ মোদের
পিঠ চাপড়ে নাচিয়ে দেবে
মিষ্টি কথায় বাঁচিয়ে দেবে
দিও
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম… !
আমরা অতি মূর্খ
নেই বুদ্ধি সূক্ষ্ম
আমরা কুলি মজুর চাষা
পাই না দিশা পাই না ভাষা
কিন্তু ভব পারের আশা
আমরা করি
পাল ফাঁসলে ঝড়ের মুখে
ভগ্ন-তরীর হালটা রুখে
আমরা ধরি
তোমরা যখন তর্ক কর
আমরা মরি

দিও দিও দিও
তোমরা যারা বুকনি চালাও
হুজুক চালাও
কাগজ চালাও
পিঠ চাপড়ে নাচিয়ে দিও
মিষ্টি কথায় বাঁচিয়ে দিও
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম ॥

তোমরা যারা ভাবছ মোদের
ডুবিয়ে দেবে উঠিয়ে দেবে
ঝরিয়ে কিংবা ফুটিয়ে দেবে
শোন
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম··· !

চাবুক-ধারী ভক্ত
কিম্বা দরদ-যুক্ত
নাই কারুকে চিনতে বাকী
আদ্ধি রেশম খদর খাকী
কোন দেবতার ধরণটা কি
আমরা বুঝি
দন্ত-হাসি কয় কি বাণী
ভুক্ত-ভোগী আমরা জানি
আমরা বুঝি
নিজের মাঝে শক্তি কেবল
আমরা খুঁজি

শোন শোন শোন
তোমরা যারা ভদ্রবেশী
ছদ্মবেশী
অর্দ্ধ-দেশী
ডুবিয়ে দেবে ? উঠিয়ে দেবে ?
ঝরিয়ে কিম্বা ফুটিয়ে দেবে ?
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম সেলাম !

তোমরা যারা ভাবছ মোদের
দাবড়ানিতে দাবিয়ে দেবে
চোমরানিতে ফাঁসিয়ে দেবে
শোন
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম···!

সার বুঝেছি ভাই রে
শক্তি যে নেই বাইরে
নিজের জোরে উঠব মোরা
নিজের জোরে কুটব মোরা
নিজের জোরে ফুটব মোরা
ডরব না কো
দয়া কিম্বা দাবড়ানিতে
আহ্লাদে বা ধাবড়ানিতে
মরব না কো
দমব না কো থামব না কো
সরব না কো

শোন শোন শোন
তোমরা যারা শক্তিধারী
বক্তৃতারই
ভক্তিধারী
কোনও চালই চলবে না কো
কোনও ডালই গলবে না কো
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম।

সুভাষচন্দ্র

অমিয় চক্রবর্তী

নেতাজি সুভাষচন্দ্র আমাদের অনেকেরই কাছে আত্মীয়-স্বজনের মতো, তিনি আমাদের চিত্তের আপনতায় চিরপ্রতিষ্ঠ। দেশনায়করূপে তাঁর যে মহীয়ান্ মূর্তি সর্ব-ভারতীয় মানসে প্রকাশ হয়েছে, তার ভূমিকা প্রধানতঃ বহির্দেশীয় এবং যুগসঙ্কটের বিদ্যুৎ অন্ধকারে দূর হতে ধ্যানদৃষ্টিগোচর। স্বদেশও তিনি তাঁর নেতৃত্ব-শক্তি দ্বারা প্রতিভাত হন, সেই শক্তিই জয়বাহিনী সেনা সংগঠনের বহু সাম্প্রদায়িক একত্বে এবং দৃঢ়তায় শেষ উজ্জ্বল-তমরূপে দেখা দিল। এই আশ্চর্য কাহিনী সকলের হৃদয়-মন অধিকার করে আছে। কিন্তু বাঙালির ছেলে সুভাষচন্দ্র তাঁর শিক্ষায় সৌকুমার্যে সামাজিকতায় একটি ঘনিষ্ঠ পরিচয় বহন করে আমাদের ঘরে ঘরে অনির্বাণ প্রীতি-প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন। তাঁর সেই পরিচয় আজ স্মরণ করি।

কটকে এবং কলকাতায় সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবনগত অধ্যায় আমরা পারিবারিক সংসর্গসূত্রে জানতাম। কৈশোরের প্রারম্ভেই তাঁর মধ্যে তাপসিক ভাব পরিস্ফুট হয়, নিভৃত বৈরাগ্যের ভাব তিনি তাঁর অনুভূতিপ্রবণ হৃদয়ে ধারণ করতেন। কটকে তাঁদের বাড়িতে বহু রাত্রি পর্যন্ত একাকী ছাতে জেগে থাকা এবং নির্লিপ্ত অথচ প্রসন্ন ভাব নিয়ে একাকী বাহিরে বেড়াবার অভ্যাস তাঁর ছিল। শিশুকাল হতে অধ্যয়নশীল ছিলেন বলে তাঁর আরো একটি একাকিত্বের অন্তর্লোক তৈরি হয়েছিল, যেখানে তিনি জ্ঞানের তন্ময় সাধনায় প্রবৃত্ত হতেন। বাড়িতে অজস্র প্রীতি উৎসাহের ধারায়, বন্ধুজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা-তর্কে তিনি যোগ দিতেন, কিন্তু নিজের এবং পারিবারিক অথবা সভ্যতার মণ্ডলী অতিক্রম ক'রে তাঁর হৃদয়াবেগ জনসাধারণিক জীবনের দিকে সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকত। যেখানে সর্বজনের দুঃখসুখজনিত জীবিকার সংগ্রাম চলেছে তারই সঙ্গে এক হবার জন্যে তিনি ব্যাকুল হতেন। সেইখানেই তাঁর স্বাদেশিকতার ভিত্তি, ভৌগোলিক উপাসনায় নয়, অথবা ইতিহাসের তথাকথিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় নয়; মানবিক ভারতবর্ষ তাঁর কাছে খুব সত্য ছিল। ইতিহাসের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণের প্রধান কারণ এই যে, তার মধ্য দিয়ে তিনি ভারতবর্ষের এবং অন্যান্য দেশীয় সমাজ ও রাষ্ট্রিক জীবনের যথাযথ রূপ দেখতে পেতেন, বর্তমানের ধারণা তাঁর কাছে স্পষ্টতম হয়ে উঠত। ভারতবর্ষের প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির সঙ্গে তাঁর যোগ রক্ষার কারণও ছিল সমগ্র ভারতীয় স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের চেষ্টা, বিশুদ্ধ শিল্পজ্ঞানের জন্য নয়। বিশেষ ভাবে গীতিকবিতা এবং গানের দিকে তাঁর গভীর প্রবণতার বিষয় অনেকেই জানেন—বৈষ্ণব কাব্য এবং রামপ্রসাদী হতে রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা ও গান তাঁকে মুগ্ধ করত। বলা যেতে পারে শিল্পের মধ্যে গানেই তাঁর ছিল সব চেয়ে নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ, বাংলা গানে তিনি বাঙালি হৃদয়ের অব্যবহিত স্পর্শ পেতেন।

বাঙলার লোকসাহিত্য একই কারণে সুভাষচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, চৈতন্যভাবিত বাংলা দেশের গ্রাম্য গাথা আখ্যান তিনি অন্তরে গ্রহণ করে জনজীবিকার গভীরতম সন্ধান পেতেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনার যে দিক সমাজচিত্রাঙ্কন এবং বিবেকানন্দের বাণীতে যেখানে অধ্যাত্মদৃষ্টির সঙ্গে লৌকিক সেবায় যোগ বিশেষ ভাবে, তাতেই সুভাষচন্দ্র আকৃষ্ট হতেন। আমার মনে আছে, সুভাষচন্দ্র যখন শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের কাছে আসতেন, তখন রাষ্ট্রিক আলোচনাকে অতিক্রম ক'রে বাংলার গ্রাম্য-জনের সুখদুঃখের প্রশ্ন এবং ভারতীয় সমাজের চির-দৈনিক সমস্যাগুলিই বড়ো হয়ে উঠত। কঠোর বীর্যশীল নেতার অন্তর্নিহিত কোমল স্বভাবের পরিচয় রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন, ত্যাগে কর্মে অচল নিষ্ঠ তাঁর সেই হৃদয়বৃত্তিকে কবি কত বড়ো শ্রদ্ধার অর্ঘ দিয়ে গেছেন। দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ গদ্য প্রশস্তি লিখে তাঁকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আবাহন করবার আয়োজন করেছিলেন, সেই রচনাটিতে স্নেহের শঙ্খ বেজে উঠেছে, বহুদিন পর্যন্ত তা বাঙালির হৃদয়ে ধ্বনিত হবে। বাঙালির তারুণ্যমণ্ডিত তার নূতন নেতাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনের মঙ্গলমাল্য পরিয়ে গেলেন, তখনো সুভাষচন্দ্রের শিখরগৌরব প্রকাশিত হয়নি। সুভাষচন্দ্রের মহা ভারতীয় মূর্তি আজ আমাদের আর্দ্র দৃষ্টির সম্মুখে বিরাজমান কিন্তু তাঁর সহজ প্রকাশের পুরাতন অনুষঙ্গ আমাদের নানা ভাবে মনে রাখা দরকার। যেখানে ভাইয়ের দাক্ষিণ্য, মায়ের ভগিনীদের চিরন্তন মঙ্গল প্রদীপের অনুপ্রেরণায় এবং অগণ্য সহকর্মীর কল্যাণী বাণীতে তিনি দেশের প্রত্যেক পরিবারের একান্ত নিজের মানুষ, সেখানেও তিনি অমরাবতীর অধিকারী।

য়ুরোপে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ১৯৩৫-৩৬ সালে প্রায়ই আমার দেখা হয়েছে। তখন তিনি কার্লসবাদ ও প্রাগ্ শহরে স্বাস্থ্যের জন্যে থাকতেন, প্রয়োজন মতো মধ্য-য়ুরোপের নানা কেন্দ্রে যাতায়াত করতেন। কত অবিস্মরণীয় তাঁর তখনকার একাকী বীর্যমূর্তি। বিদেশে গিয়ে তাঁর প্রীতি আচরণের পূর্ণতর পরিচয় পেলাম। কার্লসবাদ শহরে যে-হোটেলটিতে উঠেছিলাম, তার বাগান যখন গোলাপে পরিপূর্ণ, অপরাহ্নের স্বচ্ছ নীলান্ত হাওয়ায় ফুলের ঐশ্বর্য দেখছি এমন সময় খবর পেলাম **Herr Burgomaster** অর্থাৎ মেয়র, সুভাষচন্দ্র দেখা করতে চান। তাঁকে অনেকেই কলকাতার পূর্ববর্তী মেয়র এই পরিচয়ে অভিহিত করত, যদিও মুক্তিবিপ্লবী ভারত-নেতারূপেই তাঁর নাম য়ুরোপে সর্বত্র ছড়িয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় কেউ তাঁর সহরে এসে উপস্থিত জানলে তিনি তৎক্ষণাৎ খোঁজ না নিয়ে পারতেন না, শুধু অনুসন্ধান নয় প্রবাসী বাঙ্গালীর সব দায়িত্ব গ্রহণ না করে তিনি স্বস্তি পেতেন না। হেসে বলেছিলাম, আপনি তো

এখনো চেকোশ্লোভিয়ার প্রেসিডেণ্ট নন, এই দেশে এলেই কি আপনার রাজ্যে আসা হল, আতিথ্যের জবাবদিহি আপনারই ? কিন্তু উপায় নেই, যত রকম সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া এবং শত রকমে গৃহস্বামিত্বের ভার নেওয়াই ছিল তাঁর স্বভাব। সামান্য অতিথির জন্যে তিনি কী করলেন, তা বলতে গেলে সুভাষচন্দ্রের হৃদয়বান মহত্বের পরিচয় দেওয়া হয়। পরদিন সকালে নগরীর পথে পথে তাঁর সঙ্গে চললাম, সুন্দর গাছ-ঘেরা পথ, হাওয়ায় আলোয় উজ্জল মদিরা মেশানো। হাতে তাঁর একটি লম্বা শাদা কাচের গেলাস, নানা উৎস-ধারার যন্ত্রমুখ থেকে মিনেরাল ধাতব জল ভ'রে নিবেন, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেশের এবং য়ুরোপে প্রবাসী ভারতীয়ের বিষয়ে জানতে চান। মধ্যে ঈষৎ ইঙ্গিত ক'রে বললেন, পথের জলপায়ীর দলে বিচিত্র য়ুরোপের ধনী-ধনিনী আছেন, কায়িক আয়তন কমানোই তাঁদের বিশেষ উদ্দেশ্য। দোকানে রহস্য চিত্রের মধ্যে প্রকটভাবে ঝোলানো লঘুগুরুর নানাবিধ নক্সা যেন জলপানের পূর্ব্বের এবং পরের অবস্থা। তিনি যে কোনো দলেই নন, কেবল পেটের বেদনাটা যাচ্ছে না, এই বলেই নীরব হলেন। নিজের সম্বন্ধে আর একটিও কথা নয়। সহর দেখানোর দায়িত্ব কোনো মতেই তাঁর নয় তা কিছুতে বলে বোঝানো গেল না, অগত্যা, চড়লাম তাঁর সঙ্গে ফ্যানিকুলার অর্থাৎ পর্বতারোহী লিফ্‌ট যন্ত্রের বাক্সে —সেখানে উঁচুতে গিয়ে কাটা আকাশ, আশ্চর্য নীচুতে শ্যাম-শ্যামল দৃশ্য; নদী, সৌধ, শৈল মেলানো চতুর্দিকে কারিগরি। কফির ছোট টেবিল খাড়াই নীল আকাশের কার্ণিসের কাছে পাতা সেখানে বসা গেল, সুন্দর দেশ দেখিয়ে তাঁর তৃপ্তি। বললেন, বাংলা দেশ কত সুন্দর কিন্তু এমন কবে হবে, মানুষের হাতের সঙ্গে এই রকম প্রকৃতির মিল। এর জন্যে শ্রী সাধনা চাই, কিন্তু সর্বোপরি স্বাধীনতা। তা না হলে কিছুই হবে না। এই ব'লে চেয়ে রইলেন—মনে হল দশ-বারো হাজার মাইল আকাশদেশের পারে পরাধীন বাংলা দেশ তাঁর ব্যথিত হৃদয়ের অতি কাছে রয়েছে। সেদিন সন্ধ্যায় মৃদু শীতের চন্দ্রাতপ তলে একটি বাগানে অবস্থিত রেস্তরাঁয় খেতে নিয়ে গেলেন, বললেন, এখানে বাজনাটাও ভালো।

সেদিন ধীরে ধীরে ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামের কথা কিন্তু বলেছিলেন। দেশোদ্ধারের দুই উপায়, কোনোটাই বাদ দেওয়া চলবে না। জনশক্তির জাগরণ, এবং বহিঃশক্তির যোগে ভারতবাসী ইংরেজের বিরুদ্ধে বাহির থেকে অভিযান। গান্ধীজি জাগিয়েছেন জনশক্তিকে কিন্তু সংগঠনের কাজে কংগ্রেস সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেনি, আরো ভয়ানক একতা গড়তে হবে। সেই কাজেই তিনি নেমেছিলেন দেশে থাকবার সময়ে। কিন্তু চলে আসতে হল। এখন বাহির থেকে যা করবার সেই দ্বিতীয় পন্থায় তিনি রত। উপায় খুঁজছেন। এই ব'লে চুপ করলেন। পরে তাঁর কথায় বুঝলাম গান্ধীজির অহিংস আন্দোলন তিনি মানেন কিন্তু চরম ভাবে নয়, এখনকার অবস্থায় তা চলুক। হেসে বলেছিলেন, দেখুন অনেকে আমাকে টেররিষ্ট মনে করে কিন্তু সত্যি বলছি আমি মানুষ মারিনি। অন্যকে মারতেও বলিনি। তবে দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রশত্রু কেউ মরলে যে রোদন করেছি, তাও নয়। কথা-প্রসঙ্গে টেগার্টের নাম উল্লেখ করে বললেন, আমাকে বধ করবার চেষ্টা কেবলমাত্র একবার দু'বার হয়নি। মনুমেণ্টের কাছে ঘোড়সওয়ার সিধে আমার দিকেই চালিয়ে মারবার চেষ্টা হল,—মস্ত জনারণ্য—ঠিক কারো বেশি লাগল না। গায়ে চোট লেগেছিল। কিন্তু এ সব কেন ? দেশকে বাঁচাতে চাই, সেই জন্যে মৃত্যুদণ্ড ? ওদের দেশে হ'লে কি ওরা স্বাধীনতা চাইত না ? দেখুন, বৃটিশ সাম্রাজ্য চূর্ণ হবে, কিন্তু এমনিতে নয়। প্রশ্ন করলাম, বাহিরের আনুকূল্য শেষ পর্যন্ত কথা এবং ছাপানো-কথার চেয়ে বেশি দূর যাবে—কি না। তখনও তিনি বিশ্বাস করতেন বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদীদের মর্মগত ঈর্ষা ও স্বার্থ-বিরোধই তাদের পক্ষে মৃত্যুশেল হবে ; সুতরাং সাম্রাজ্যবাদীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো দেশকে ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামে সহায়তা করানো চাই। যথার্থ আদর্শবাদী বড়ো সভ্যতা হয়তো বেশি কিছু করবে না। ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দিলেন, এমন কি আধুনিক চেকোশ্লোভাকিয়া থেকেই ; রাশিয়ায় পর্যন্ত মরণজীবন দ্বন্দ্বকালে এই রীতি অক্টোবর রেভল্যুশনের আগে পরে মানা হয়নি ? একথা জোরের সঙ্গেই বললেন।

জওহরলালজির সঙ্গে যখন সেই বৎসর সুভাষচন্দ্রের এ বিষয়ে কথা হত, অমিল ঘটত শুধু ঐ এক জায়গায়। মুসোলিনী হিটলার এরা ভারতবর্ষের জন্যে কিছুই করবে না জওহরলালের ছিল সেই নির্ধারণ। ডি ভ্যালেরার কাছে সুভাসচন্দ্র পরে যখন দেখা করেন, আইরিশ স্বাধীনতার প্রতীক তিনি সুভাসচন্দ্রকে এই ধরণের কথা বলেই নিরাশ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, শুনেছিলাম তিনি সুভাসচন্দ্রকে বলেন, ইংরেজের সঙ্গে তোমরা সম্মুখ সমরে নেমো না। তাতে পারবে না। আমরা ওদের কাকা ভাইপোর একই সম্বন্ধ, একই রকম দেখতে, ভাষায় ধর্মে প্রায় এক, তবু আমাদের যদৃচ্ছা বধ করতে তারা দ্বিধা করেনি। সেই ইতিহাস অক্ষরে অক্ষরে লেখা আছে। তোমরা জন-আন্দোলনের চাপে আদায়ের পরিমাপ ক্রমে দ্বিগুণ অগণ্য গুণ করো—সেই তোমাদের পথ। দেশের বাহির থেকে নীতি-কথা ছাড়া অন্য সাহায্য পাবে না। কিন্তু যদিও মুসোলিনীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের অনেকবার দীর্ঘ আলোচনা হয়, কোন দিনই তিনি ভাবেননি যে, ডিক্টেটরগুলি স্বার্থান্বেষী ব্যতীত আর কিছু। যদি কোনো নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে তাদের যোগাযোগ এবং সাহচর্য পৃথিবী জোড়া আসন্ন অন্ধ বিপ্লবের সময় ভারতবর্ষ লাভ করে, নেতাজির ছিল এই চেষ্টা। হিটলার সেবারে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখাই করলেন না। হেস তখন ছিলেন জর্মাণ ভাগ্যহন্ত প্রাইভেট সেক্রেটারির মতো, তিনি দুঃখিত হয়ে সুভাষচন্দ্রকে জানালেন যে, তাঁদের ফ্যুরর ভারতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে উদাসীন, অতএব, ইত্যাদি ! রএবার

-মাখন দত্তগুপ্ত

মহাযুদ্ধের সময় সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে হিটলারের মন বদলেছিল, কিন্তু হিটলারের সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের মনোভাব কোনো দিনই বদলায়নি, তাতে সন্দেহ নেই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেশেও এই প্রসঙ্গে আজ পর্যন্ত অনেকে সুভাষচন্দ্রকে ভুল বুঝেছেন। কাঁটার কাছে অন্য কাঁটা তোলবার জন্যে যাওয়ার অর্থ এ নয় যে, কণ্টককে ভুলে ভেবেছি পুষ্প। কাউকে ব্যবহার করা এবং তাকে যথার্থ গ্রহণ করা একই নীতি নয়। জাপানীদের ব্যবহারেও সম্পূর্ণ জানা গেল "ব্যবহার" করবার নীতি কত ভয়ঙ্কর সমূহ বিপদসঙ্কুল, কিন্তু প্রখরবুদ্ধি সুভাষচন্দ্র এ বিষয়ে চক্ষুষ্মান্ হয়েই ভুল করেছিলেন। এক দিনের জন্যেও তিনি হিটলার-মুসোলিনীর সমর্থক ছিলেন না। প্রথম হতেই নাৎসি-প্রবর্তিত ইহুদি-বিদ্বেষ, পরজাতিঘৃণাকে তিনি ঘৃণাই করেন।

সুভাষচন্দ্রের মত ছিল এই যে, সামরিক ব্যাপারে কোন পক্ষ কী ভাবে সুবিধামতো শত্রু-মিত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করবে সেটা রাষ্ট্রিক কৌশলের অন্তর্গত। উদ্দেশ্য যেমনই হোক ষ্টালিন-রিবেনট্রপ, ষ্টালিন-মাটসুকয়ার মৈত্রীস্থাপন পর্বগুলি সম্ভব হয়েছিল। জিৎ হল বলেই জিৎ, যদি সোভিয়েটরা হারত তাহলে ঐ সকল "ব্যবহারগত" নীতিকে লোকে নৈতিক শতকণ্ঠে দোষী করত। সুতরাং আর যারাই হোক, আধুনিক কোনো দেশ, কোন রাষ্ট্রদলেরই বলার অধিকার নেই যে, সুভাষচন্দ্রের নীতি নীতিবিরুদ্ধ। জওহরলালজি সেবারে মধ্য-য়ুরোপে ভ্রমণকালে যখন খুবই সশ্রদ্ধ অথচ দৃঢ়চিত্তে সুভাষচন্দ্রের কাছে অন্য নীতির সমর্থন করতেন, তখন তিনি মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত নূতন রাষ্ট্রিক সংগ্রামপন্থার অনুগত্যেই তর্ক করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর পথ আজ অভাবিত উপায়ে ভারতবর্ষে জয়ী হল। কিন্তু য়ুরোপীয় অথবা ভারতীয় যাঁরা সুভাষচন্দ্রের নীতির সমালোচনা করতে সাহসী হন, তাঁরা কি সকলে এই অভাবিত নূতন উপায়ের আন্তরিক সমর্থক ছিলেন?

সেবার কার্লসবাদ থেকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার পূর্ণ সমৃতি নিয়ে অক্সফোর্ডে ফিরেছিলাম। লতামণ্ডিত তাঁর বসবার ঘরটিতে গিয়ে বিদায় নিলাম। তিনি **'The Indian Struggle'** বইখানি লেখায় নিযুক্ত ছিলেন। দরজার কাছে এসে শেষ কথা বললেন—কবে আমাদের ভারতবর্ষে দেখা হবে।

দেশে ফিরে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে লাহোরে ডাক্তার ধর্মবীরের বাড়িতে এবং পরে কলকাতায় বহু বার দেখা হয়েছিল। আরেক পর্ব, তার কথা এখানে নয়। কিন্তু একটি প্রসঙ্গ বলি। একদিন টেলিফোনে আমাকে ডাক দিলেন; চৌরঙ্গী Y. M. C. A.তে তখন ঘর নিয়ে কিছুদিন ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর উদ্বিগ্ন। বললেন আমি সুভাষচন্দ্র বসু, একবার আমার এখানে আসুন। রবীন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে যে টেলিগ্রাম পাঠান, সেই সম্বন্ধে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। পরদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে জোড়াসাঁকোয় দেখা করেন এবং সুভাষচন্দ্রের মনোভাব কবি সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য ছিল এই যে, যুদ্ধশান্তির জন্য আমেরিকা দুই পক্ষকে নিবৃত্ত হতে বলুক। রাশিয়া এবং আমেরিকা একত্র হয়ে যুদ্ধ রোধ করতে পারে —এই হত রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত বাণী। রবীন্দ্রনাথের আহ্বান আমেরিকাকে যুদ্ধে নামানোর আহ্বান হতে পারে না। টেলিগ্রামে তিনি তাঁর আপন বক্তব্য ঠিক প্রকাশ করেননি, কবির কাছে সেদিন শুনলাম। টেলিগ্রাম পাঠিয়ে পরে রবীন্দ্রনাথ মনঃকষ্ট পান; ঐ সময়ে আমাকেও একটি দীর্ঘ পত্র লিখে জানান যে, তিনি যুদ্ধের কোনো পক্ষকেই সমর্থন করেন না। ঐতিহাসিক তথ্য রক্ষার জন্যে এই ব্যাপারের উল্লেখ করলাম। কিছুদিন পরেই সুভাষচন্দ্রের উপর যবনিকা পতন হল—তিনি নিরুদ্দেশ। একথা এখন বলা যেতে পারে যে, সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান সম্বন্ধে ব্যাকুল হয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বস্তসূত্রে খবর নেন, এবং কয়েক দিনের মধ্যেই জানতে পারেন যে, নির্বিঘ্নে সুভাষচন্দ্র অন্য দেশে গিয়ে পৌঁচেছেন। আর কিছু রবীন্দ্রনাথ জানতে চাননি। তার পর সুভাষচন্দ্রের পালা শেষ হয়ে নেতাজির অভ্যুদয়। দিগন্তে অবিশ্বাস্য উজ্জল তারা উঠল। দূর থেকেই আমরা দেখলাম। যাঁরা কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁদের কাহিনী ফুরোয় না, শুনেও তৃপ্তির শেষ নেই। নেতাজির জয়। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ঘরোয়া চেহারাও কোনো দিন ম্লান হবে না, ধুতি পাঞ্জাবি পরা তিনি চিরন্তন বাঙালি ঘরের ছেলে।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র পৃথিবী ছেড়ে গেছেন, আজ আর সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু গভীরতর অর্থে তিনি সমস্ত ভারতবর্ষের ভূমিতে বেঁচে রইলেন। "জয় হিন্দ" মন্ত্র তিনিই উচ্চারণ করেছিলেন, সেই মন্ত্রের ধ্বনি আজ ভারতের কোটি কণ্ঠের স্বাধীনতা-অভিনন্দনে জেগে উঠল। এই মন্ত্রের সঙ্গে তাঁর প্রাণশক্তি অনন্তকালের মতো ভারতবর্ষে রয়ে গেল।

শিল্পগতপ্রাণ হরেন ঘোষ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

যাঁরা নৃত্য এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেন পাশ্চাত্য দেশে তাঁরা Impesario বা প্রমোদ-পরিচালক নামে বিখ্যাত হন। এবং শ্রেষ্ঠ প্রমোদ-পরিচালক বলতে তাঁকেই বুঝায়, যিনি দেশ-বিদেশ থেকে নূতন নূতন প্রতিভাবান শিল্পীকে আবিষ্কার করতে পারেন।

এ দেশে প্রমোদ-পরিচালক কথাটি নূতন। ঐ নামে ডাকতে পারি, স্বর্গীয় হরেন ঘোষের আগে এখানে এমন কেউই ছিলেন না। এবং আজ তাঁর অকালমৃত্যুর পর সারা ভারতবর্ষ খুঁজলেও পাওয়া যাবে না আর এক জন সত্যিকার প্রমোদ-পরিচালক।

য়ুরোপে-আমেরিকায় প্রমোদ-পরিচালককে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ব'লে বিবেচনা করা হয়। শক্তিধর শিল্পী পৃথিবীর সব দেশেই আছেন, কিন্তু তাঁদের নাম হয়তো শেষ পর্য্যন্ত একটি মাত্র দেশ বা প্রদেশের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যায়। তাঁদের আবিষ্কার ও দেশ-বিদেশে পরিচিত করবার ভার গ্রহণ করতে পারেন সত্যিকার প্রমোদ-পরিচালকই।

প্রমোদ-পরিচালকরূপে য়ুরোপের সার্জ্জ পাবলোভিচ ডায়াসিলেফ এবং আমেরিকার সালোমন হুরক্ সাহেবের নাম অমরত্ব অর্জ্জন করেছে। শিল্পী না হয়েও তাঁরা যে কোন প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর চেয়ে অল্প-বিখ্যাত নন।

ডায়াসিলেফের জন্ম রুশিয়ায়। তিনি নিজে নর্ত্তক বা সঙ্গীতবিদ্ বা চিত্রকর নন, কিন্তু আনা পাবলোভা, ভাস্লাভ নিজিনস্কি ও কার্সাভিনার মত নৃত্যশিল্পী, লিয়ন বাকৃষ্ট ও এম, লারিয়োনভের মত নাট্য-চিত্রকর এবং ইগর ষ্ট্রাভিনস্কির মত সঙ্গীতবিদের নাম আজ বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছে তাঁরই চেষ্টায় ও উদ্যোগে।

নিজিনস্কি পাবলোভা ও কার্সাভিনা—আধুনিক "Ballet"এ বা নৃত্য-নাট্যে এই তিন জনের তুলনা নেই। এঁরা ছিলেন রুস-সম্রাটের নিজস্ব নাট্যশালার শিল্পী। যাঁরা সেই রঙ্গালয়ের দর্শক ছিলেন তাঁদের মধ্যে তাঁরা ছিলেন জনপ্রিয়। কিন্তু ডায়াসিলেফ তাঁদের নিয়ে রুসিয়ার বাইরে পদার্পণ না করলে সমস্ত পৃথিবীর কাছে তাঁরা হ'তে পারতেন না আজ সুপরিচিত। পৃথিবী কি আজ সেসিনস্কায়ার নাম জানে? অথচ তিনিই ছিলেন তখন উক্ত নাট্যশালার সর্ব্বপ্রধান নর্ত্তকী। কিন্তু তিনি রাগ ক'রে ডায়াসিলেফের সঙ্গে রুসিয়ার বাইরে যাননি। তাই পৃথিবীও তাঁকে চেনে না।

ডায়াসিলেফ সাধারণ শিল্পী ছিলেন না, কিন্তু তিনি গোড়ার দিকে ছিলেন সাহিত্যিক। তাঁর সম্পাদনায় "কলা-জগৎ" (The World of Art) নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হ'ত। ঐ পত্রিকায় নানা শ্রেণীর আর্ট নিয়ে নিয়মিত আলোচনা থাকত। প্রায়ই তিনি শিল্প-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতেন। তিনি বলতেন, "আর্টের একমাত্র কর্ত্তব্য হচ্ছে আনন্দ দান করা এবং তার একমাত্র হাতিয়ার হচ্ছে, সৌন্দর্য্য।"
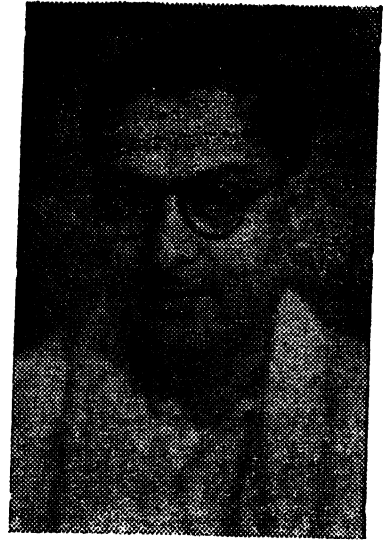
সঙ্গীত, চিত্র ও নাট্য-কলায় এবং সাহিত্যে পরিপূর্ণ রসানুভূতি নিয়েই তিনি প্রমোদ-পরিচালনায় করেছিলেন হস্তক্ষেপ, তাঁকে খুসি করতে না পারলে যে কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীও তাঁর কাছে পাত্তা পেতেন না। প্রত্যেকটি জিনিষ নিজের নখদর্পণে রেখে তবেই তিনি করতেন জনসাধারণকে আমন্ত্রণ এবং সর্ব্বোপরি কাজ করত তাঁর অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব। শিল্পী না হয়েও তাই তিনি বিখ্যাত হয়েছেন "Maker of Modern Ballet"রূপে।

সালোমন হুরক্ও জাতে রুসীয় ইহুদী, কিন্তু তাঁর কর্ম্মস্থল হচ্ছে আমেরিকায়। শিল্পশাস্ত্র সম্বন্ধে নিজের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি আত্মচরিতে কোন পরিচয় দেননি। কিন্তু য়ুরোপের এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশে দেশে ভবঘুরের মত ঘুরে অজানা ও অখ্যাত জায়গা থেকে নূতন নূতন কিংবা অল্প-বিখ্যাত শিল্পীদের আবিষ্কার বা সংগ্রহ ক'রে তাঁদের মাথায় পরিয়ে দিয়েছেন তিনি যশের মুকুট। নিজের আর্থিক ক্ষতি হবে জেনেও জনসাধারণের কাছে পরিবেশন করেছেন তিনি উচ্চশ্রেণীর শিল্পীদের আর্ট। তাঁর আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ ঐ সব কাহিনী হচ্ছে 'রোমান্সে'র মত চিত্তগ্রাহী। ললিত কলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম দৃষ্টি না থাকলে হুরক্ সাহেব নিশ্চয়ই ঐ ভাবে গুণীদের নির্ব্বাচন করতে পারতেন না। হয়তো তাঁর ব্যক্তিত্ব ডায়াসিলেফের মত অসাধারণ ছিল না। কিন্তু তিনি যত শ্রেণীর যত কলাবিদ্ নিয়ে বার বার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন, ডায়াসিলেফও তা পারেননি। প্রসঙ্গ ক্রমে ব'লে রাখি, আমাদের উদয়শঙ্কর যখন একটি মাত্র ছোট্ট নাচে ("রাধা-কৃষ্ণ") আনা পাবলোভার নৃত্যসঙ্গিরূপে পাশ্চাত্য জনসাধারণের সামনে সর্ব্বপ্রথমে আত্মপ্রকাশ করেন, হুরক্ সাহেবের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তখনই তাঁর মধ্যে আবিষ্কার করতে পেরেছিল সম্ভাবনার ইঙ্গিত। পরে তাঁরই আমন্ত্রণে সম্প্রদায় নিয়ে উদয়শঙ্কর দুই-দুই বার আমেরিকায় গিয়ে জয় ক'রে আসেন ওখানকার জনসাধারণের হৃদয়।

ডায়াসিলেফ ও হুরক্—ওঁদের দুই জনেরই বিশেষত্ব আমি দেখেছি হরেন্দ্রনাথ ঘোষের মধ্যে।

ইস্কুল থেকেই আরম্ভ হয়েছিল হরেন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনা। হেয়ার ইস্কুলের 'ম্যাগাজিনে'র তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। অল্প বয়সেই তিনি একখানি গল্প-পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করেন। পরিণত বয়সেও তিনি যখন প্রমোদ-পরিচালকের জীবন যাপন করছেন তখনও সাহিত্যচর্চ্চা ছাড়তে পারেননি। মাঝে মাঝে একটি বা দু'টি গল্প রচনা ক'রে আমাকে শুনিয়ে যেতেন। গল্পগুলির ভিতরে বস্তু ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখনো সেগুলি প্রকাশিত হয়নি। তাঁর সম্পাদনায় "ফোর আর্টস্ অ্যান্নুয়েল" নামে একখানি ইংরেজী বাষকী দুই বার বাজারে বেরিয়েছিল। বিভিন্ন ললিত কলা সম্পর্কীয় আলোচনা সেই সচিত্র বার্ষিকী দু'খানিকে বিচিত্র ও অপূর্ব্বরূপে অলঙ্কৃত ক'রে তুলেছিল। সে-রকম বার্ষিকী বাংলা দেশে আর বেরিয়েছে ব'লে জানি না। ঐ বার্ষিকীর মধ্যেই পাওয়া যায় হরেন্দ্রনাথের শিল্পী-মন ও গভীর রসানুভূতির সুন্দর পরিচয়। ইংরেজী রচনাতেও তাঁর হাত ছিল পাকা।

তাঁর সঙ্গে বহু বিষয় নিয়ে বহু বার আমার আলোচনা হয়েছে। বরাবরই লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, সাহিত্য ও ললিত-কলার বাইরেকার রূপ নিয়ে তিনি মেতে থাকতে চাইতেন না, একেবারে প্রবেশ করতেন তার অন্তঃপুরের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারের মধ্যে। কাব্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে ও নৃত্যে হালকা ও জনপ্রিয় কোন-কিছু দেখে ভোলবার পাত্র ছিলেন না তিনি, যথার্থ বস্তুর সন্ধান না দিলে কোন নাম-করা কলাবিদ্‌ও তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারত না। এই রকম রসিক-মন ছিল ব'লেই তিনি বার বার বিপুল অর্থব্যয় ক'রে এমন সব শিল্পীকেও জনসাধারণের সামনে এনেছেন, যাঁরা শ্রেষ্ঠ হয়েও তাঁকে আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারেননি। তাঁকে মানা করলেও তিনি শুনতেন না, বলতেন, "হোক আমার লোকসান তবু লোকে এক জন খাটি আর্টিষ্টকে দেখে আনন্দ পাবে তো!" লোকে খাটি আর্টিষ্টদের কতখানি চিনেছে বলতে পরি না, কারণ সাধারণ দর্শক খাটি আর্টকে ভালোবাসতে পারে বলে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু এটা দেখেছি যে শ্রেষ্ঠকে পরিচিত করতে গিয়ে হরেন্দ্রনাথ নিজে হয়েছেন বিশেষরূপে ঋণগ্রস্ত। তবু তাঁর মুখের হাসি হয়নি মলিন, বার বার ঠেকেও কিছুই শেখেননি তিনি। শূন্য গ্যালারির কথা তিনি একটুও ভাবতেন না, বাছা বাছা জন কয় রসিক খুসি হ'লেই শূন্য পকেটের কথা ভুলে তিনি যেন হাতে পেতেন আকাশের চাঁদ।

হুরকের কথা স্মরণ হচ্ছে। য়ুরোপ-আমেরিকায় যাঁরা শিল্পীদের শিরোমণি, তাঁদের আসরে আমন্ত্রণ ক'রে এনে বসিয়ে মোটা মোটা টাকা দক্ষিণা দিয়ে তিনি হয়ে পড়লেন ফতুর। হোটেল থেকে হলেন বিতাড়িত। রাতের পর রাত কাটাতে লাগলেন খোলা আকাশের তলায় সরকারি বাগানের বেঞ্চির উপরে শুয়ে। কিন্তু তবু তিনি সুখী, কারণ সত্যিকার কলাবিদ্‌দের সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় সাধন ক'রে দিতে পেরেছেন। তিনি বলছেন, "I was broke, and I was alone. But oddly enough I was not sad."

এক বারের কথা জানি। কলকাতার বিখ্যাত রঙ্গালয়ে হরেন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ শিল্পীর জন্য আসর পাতলেন। সহরের চারি-দিকে সচিত্র বিজ্ঞাপন-পত্রের ছড়াছড়ি, খবরের কাগজে কাগজে সুখ্যাতির ঢেউ, রসিকের দল প্রশংসায় পঞ্চমুখ!

তার কয়েক দিন পরেই হরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা। প্রসন্ন মুখে তাঁর মিষ্ট হাসি।

শুধালুম, "খবর কি?"

হরেন্দ্রনাথ বললেন, "এবারের show খুব successful হয়েছে। সবাইকে খুসি করতে পেরেছি।"

বললুম, "তা এ জন্যে তোমার খরচও তো বড় কম হয়নি! লাভ-টাভ কিছু হ'ল?"

শুনলুম, "অত্যন্ত। পকেটে একটা কানা কড়িও নেই!"

হরেন্দ্রনাথের বয়স যখন বাইশ-তেইশ, তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার জানা-শোনা। কিন্তু তখন ছিল খালি মৌখিক আলাপ। কেমন ক'রে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো, সে কাহিনীও পাঠকদের মন্দ লাগবে না।

রাত্রে এক হোটেলে আহার করতে গিয়েছি। পাশের কামরা থেকে একাধিক ডিসের উপরে একাধিক ছুরি-কাঁটার শব্দ এবং একাধিক কণ্ঠের গল্প ও হাসির ধ্বনি ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে "বয়, পেগ লে আও!" ব'লে আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। হোটেলের নৈশ জীবনে যারা অভ্যস্ত, এ-সবের দিকে তারা কাণ দেয় না, আমিও দিলুম না।

নিজের মনে একখানা বিলাতী ছবির কাগজের পাতা ওল্‌টাচ্ছি, হঠাৎ পাশের কামরা থেকে ভেসে এল সংস্কৃত কাব্যের আবৃত্তি! কালিদাসের "মেঘদূতে"র শ্লোক!

এমন জায়গায় এর জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। মিনিট খানেক অবাক হয়ে শুনলুম। এ কেমন মাতাল, হোটেলে ইয়ারদের সঙ্গে ব'সেও "মেঘদূত" আবৃত্তি করতে ভোলে না! কণ্ঠস্বরও মধুর ও মার্জ্জিত। লোকটিকে দেখবার লোভ সামলাতে পারলুম না। বাইরে এলুম। পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, মদ্য এবং খাদ্য নিয়ে চেয়ারের উপর উপবিষ্ট কয়েকটি যুবক—কারুর মুখ দেখা গেল, কারুর গেল না। কিন্তু এক জনকে দেখেই চিনলুম। তিনি হরেন্দ্রনাথ। মাতাল বন্ধুদের মাঝখানে বসে মেতে আছেন কাব্যের নেশায়! অথচ তিনি নিজে জীবনে কোন দিন মদ্য—এমন কি ধূম পর্য্যন্ত পান করেননি।

সেই দিনই হরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করলুম। লজ্জিত মুখে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। বললুম, "হরেন, তোমাকে কবি ব'লে জানতুম না। কার্লাইলের মতে কেবল কাব্যের লেখক নন, পাঠকও হ'চ্ছেন কবি। ধরা যখন পড়েছ, মাঝে মাঝে দেখা হ'লে খুসি হব।"

তার পর তিনি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা বা পরামর্শ করতে আসতেন। এক দিন একটি তরুণ ও সুশ্রী যুবককে

নিয়ে আমার বাড়ীতে এসে বললেন, "দাদা, এঁর নাম উদয়শঙ্কর, ইনি নৃত্যশিল্পী। ইনি কলকাতায় নাচ দেখাতে চান, কিন্তু এখানে কেউ এঁকে চেনে না, আমলও দেয় না। কেমন ক'রে এঁকে পরিচিত করা যায়, তাই নিয়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি।" পরামর্শের ফলে যা স্থির হ'ল, তা কিছু কাল আগে 'মাসিক বসুমতী'র "উদয়শঙ্করের" প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে লিখেছি। এখানে আর দ্বিতীয় বার উল্লেখ করবার দরকার নেই।

উদয়শঙ্করকে রসিক-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে হরেন্দ্রনাথ যে যত্ন-চেষ্টা-পরিশ্রম করেছিলেন, তা বিস্ময়কর বললেও অত্যুক্তি হবে না। এর মধ্যে হরেন্দ্রনাথের স্বার্থ-সিদ্ধির কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কারণ যে সময়ে এবং যে ভাবে এ দেশে উদয়শঙ্কর প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তাঁর নৃত্য দু'-চার জন বাছা বাছা রসিককে আকৃষ্ট করলেও তা যে জনপ্রিয় হবে, কেহই এমন সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেননি। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে তখন অল্প-স্বল্প নাচ দেখবার আগ্রহ জেগেছে বটে, কিন্তু তা হচ্ছে তরুণী মেয়েদের নাচ। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে সব নাচের আসরে তখন কারুর টিকিট কেনবার দরকার হ'ত না।

ভালো কাব্য কেবল নিজে প'ড়ে এবং ভালো ছবি কেবল নিজে দেখে পূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যায় না, তা আরো দশ জনকে ডেকে পড়াতে ও দেখাতে সাধ যায়। ঠিক এই রকম ইচ্ছা নিয়েই হরেন্দ্রনাথ সকলের কাছে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন উদয়শঙ্করের আর্টকে।

কিন্তু কেহই উদয়শঙ্করের আর্ট নয়, বাঙালীদের নৃত্য-কলার স্বরূপ বোঝবার জন্যে অক্লান্তকর্ম্মী হরেন্দ্রনাথকে প্রৌঢ় বয়সেও দেখেছি, বিপুল আগ্রহে তরুণ যুবকদের মত বৃহৎ ভারতের পূর্ব্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণের দেশে দেশে ছুটাছুটি ক'রে বেড়াতে। "কথাকলি" ছিল দক্ষিণ ভারতের একটি প্রাদেশিক নাচ, মাদ্রাজের বাইরে কে আগে জানত "কথাকলি" এবং গুরু শঙ্করম্ নম্বুদিরির নাম? সেরাইকেলা শিল্পীদের বিচিত্র নৃত্য-প্রতিভা ভারতের বাইরে কালাপানির ও-পারেও বিকসিত হবার সুযোগ পেয়েছে কেবল হরেন্দ্রনাথেরই চেষ্টায় এবং আগ্রহে। তার পরেও কত আর নাম করব—ব্রহ্মদেশীয় শিল্পিগণ, বালা সরস্বতী, রুক্মিণী দেবী ও শান্তা দেবী প্রভৃতি আরো অনেকেই বাংলা দেশে আসতেন না ভারতের অদ্বিতীয় প্রমোদ-পরিচালক হরেন্দ্রনাথ না থাকলে। সব দিক দিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখিয়ে, বাঙালীকে হরেন্দ্রনাথই শিখিয়ে গিয়েছেন কাব্য, সঙ্গীত, চিত্রাদির মত নৃত্যও হচ্ছে একটি কত বড় ললিত কলা এবং কতখানি অপূর্ব্ব-সুন্দর তার রূপবৈচিত্র্য! আমি অকুণ্ঠিত কণ্ঠে বলতে পারি, বাংলা দেশে নৃত্যকলাকে জনপ্রিয় ও প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে হরেন্দ্রনাথ একান্ত ভাবে যে স্বার্থহীন ও আশ্চর্য্য চেষ্টা ক'রে গিয়েছেন, আর কোন বাঙালী তা করেননি এবং আর কোন বাঙালী অদূর-ভবিষ্যতে তা করতে পারবেন কি না সে বিষয়েও আছে যথেষ্ট সন্দেহ!

কেবল শিল্প নয়, শিল্পীদেরও প্রতি ছিল তাঁর কি গভীর অনুরাগ! কেবল নৃত্যশিল্পী নয়, সকল শ্রেণীর শিল্পীকেই তিনি আপন-জন ব'লে মনে করতেন। তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা ক'রে তাঁদের কারুকেই হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়নি কোন দিন। নিজের কাছে টাকা নেই, পরের কাছে ধার করে টাকা এনে দুঃস্থ শিল্পীর অভাব মোচনের চেষ্টা করেছেন। যে সম্প্রদায়ের আততায়ীর হস্তে তিনি নিহত হয়েছেন, সেই সম্প্রদায়েরই একাধিক শিল্পীকে স্বচক্ষে দেখেছি, তাঁর কাছে দীন ভাবে শূন্যহস্তে পেতে হাসিমুখে ফিরে যেতে পূর্ণহস্তে। শিল্পীকে তিনি কেবল শিল্পী বলেই ভালোবাসতেন, সে হিন্দু কি মুসলমান কি খ্রিশ্চান তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না একটুও। আমার সুদীর্ঘ জীবনে আমি এ দেশের সর্ব্বশ্রেণীর অসংখ্য শিল্পীকে চেনবার ও জানবার সুযোগ পেয়েছি ঘনিষ্ঠ ভাবে। কিন্তু শিল্পীদেরও চেয়ে শিল্প ও শিল্পীকে ভালোবাসতে দেখেছি একমাত্র হরেন্দ্রনাথকেই।

এবং তাঁর কার্য্যালয় ছিল এক অপূর্ব্ব ঠাঁই। সেখানে রাজা আর মহারাজা, অর্থী আর প্রার্থী আর রাম-শ্যাম-যদু-মধু প্রভৃতির অল্প-বিস্তর উপদ্রব করবার চেষ্টা যে ছিল না, তা নয়। ছিল। এমন কি মাঝে মাঝে তারা করত দ্বন্দ্বভঙ্গের আয়োজনও। কিন্তু পরিবেশ-প্রভাবের ফলে সে সব হয়ে যেত নগণ্য। কারণ সেখানে সর্ব্বদাই প্রাধান্য লাভ করত সাহিত্যিক, কবি, চিত্রকর, গায়ক, বাদক ও নর্ত্তক এবং অন্যান্য শিল্পীর ও শিল্প-রসিকের জনতা! কেবল পুরুষ নয়, মহিলাও। কেবল ভারতের দেশ-বিদেশের বাসিন্দাই নয়, অভারতীয় শ্বেতাঙ্গ নর-নারীও।

তার মধ্যে সর্ব্বদাই চোখে-মুখে হাসি নিয়ে ব'সে আছেন প্রিয়দর্শন হরেন্দ্রনাথ, মাঝে মাঝে কোন প্রার্থীর জন্যে 'চেক-বুকে'র পাতায় করছেন কলম চালনা এবং তার পরেই বলছেন, "দাদা, কাল রবীন্দ্রনাথের একটি নতুন কবিতা পড়লুম। এই বয়সে এমন কবিতা পৃথিবীর আর কোন কবিই লিখতে পারতেন না।"

সেই ছবিই আজ আমার মনের পটে করছে জ্বল্-জ্বল্। এ ছবিকে লুপ্ত করতে পারবে একমাত্র চিতার অগ্নি। কেবল প্রমোদ-পরিচালক বললে হরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। নিজে গাইতেন না, বাজাতেন না, আঁকতেন না ও নাচতেন না, কিন্তু অধিকাংশ গায়ক, বাদক, চিত্রকর ও নর্ত্তকেরই চেয়ে মনে-প্রাণে ছিলেন তিনি উচ্চতর শিল্পী।

গত দুই বৎসর তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন কলকাতায় একটি জাতীয় রঙ্গালয় স্থাপন করবার জন্যে। সে চেষ্টা বেশ-খানিকটা অগ্রসরও হয়েছিল। কিন্তু সেই অগ্রগতি রুদ্ধ করে দিলে নির্ব্বোধ হত্যাকারীদের নিষ্ঠুর হিংসা। তারা বুঝলে না যে অমূল্য প্রাণের প্রদীপ নিবিয়ে দিচ্ছে, সে জানে না ও মানে না হিন্দু-মুসলমান-খ্রিশ্চান ব'লে কোন বিশেষ জাতিকে, জাতি হিসাবে তার কাছে প্রধান কেবল মাত্র শিল্পী-জাতি।

মুচি-বায়েন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সব যাক, কিন্তু নামটুকু যেন না যায়। দেবতা-গোঁসাইর কাছে কত মিনতি করেছে, বিমুখ হয়ো না বাবা। অভাবে-অসম্ভাবে থাকি, থাকব, কিন্তু নামটুকু যেন বজায় থাকে। গাঁয়ে-বাছুরে সুখ থাকলে বনে গিয়ে দুধ দেয়। যদি নামটুকু থাকে, হাতটুকু থাকে, তবে পয়সায় টানা পড়বে না কোনো দিন। হেই বাবা রুদ্দুদেব।

চোরের উপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খেয়েছে আজ ভোলানাথ। রোজগারের পয়সা দিয়ে কাঁচি মদ কিনে খেয়েছে। থমথমে পায়ে বাড়ি ফিরেছে সনজে-বেলা। নিঝঝুমের মত।

নিশ্চয়ই দেখতে পাবে গোরাশশী ঘরে নেই। ঘরে তালা লাগিয়ে আঁচলে চাবি ঝুলিয়ে গেছে নিশ্চয়ই পাড়া বেড়াতে। বা, কারু ঘরে রসবিলাসের গল্প করতে। ঢুলন করতে।

এমন সময় ফেরবার কথা নয় ভোলানাথের! এবারে, এত দিনে, ঠিক ধরে ফেলবে কোরকাপ।

আর যদি একবার ধরে ফেলতে পারে—ভোলানাথের চোখ দুটো ঘুরন দিয়ে উঠল। গায়ে এল যেন বুনো দাঁতালের গোঁ।

যা ভেবেছিল। গোরাশশী ঘরে নেই। দরজা হাট করা।

কাঁথা মুড়ি দিয়ে ছেলেটা ঘুমুচ্ছে অবেলায়। বোধ হয় জর এয়েছে। আর সেই ফাঁকে—

'বাড়ী থেকে একবার বার হলে ঘরকে ফিরতে আর মন সরে না, লয়?'

গোরাশশীর কান বড় খর। কাঁধ থেকে ঢোল নামিয়ে রাখতেই শব্দ পেয়েছে। ঘাটে গিয়েছিল সে বাসন মাজতে। ফিরতে তার এক পলক দেরি হল না।

'ফিরতে রাত হবে কথা ছিল। কিন্তুক'—ভোলানাথের গলাটা কেমন ধরে এল। রাগ-বিরাগের ছোপ চলে গিয়ে মনে লাগল মন-খারাপের ছোঁয়া। বললে, 'আমি বাড়ীতে না থাকলে তুর বেশ মজাই হয়, লয় বৌ?'

'ক্যানে?'

'আমি না থাকলে ইদিক্-সিদিক্ করতে পারিস্ আধেক খানেক—'

'ক্যানে? আমার মন থাকলে তু কি বাড়িতে বসে আগলাতে পারিস? তুইই তো মাঠে-ঘাটে শহরে-বাজারে ঘুরে বেড়াস, কুথা কুন কীত্তিকর্ম্ম করিস তা কে জানে?'

না, ঝগড়া করবে না ভোলানাথ। গোরাশশী তার বুড়ো বয়সের সাঙা করা পরিবার। রঙে-রসে ডগমগ যৌবতী মেয়ে। যৌবতী মেয়ে বলেই সন্দ করতে হবে না কি?' ভোলানাথেরই মন ছোট, ছোঁচ-পড়া। 'কুকুর যদি রাজা হয়ে বসে সিংহাসনে, তল চোখে-তল চোখে তাকায় ছেঁড়া জুতার পানে।'

ফতুয়ার পকেট থেকে বিড়ি-দেশলাই বার করে ধরালে দাঁতে চেপে। ঢোল নিয়ে বসল। চাঁটি দিয়ে দেখতে লাগল বারে বারে। কোথায় কী বেকল হয়েছে? চামড়ার দলগুলিতে কি টান নেই? আওয়াজ কি জুড়িয়ে গেছে? হাতে আর সেই ফুর্তি ফোটে না?

'সি কি? সাত আজ্যি ঘুরে এসে আবার ই ঢোল নিয়ে বসেছিস? গয়ার পাপ! বলি খাবি নে?' গোরাশশী ঝংকার দিয়ে উঠল।

'যদি দিস তো খাই। পেচণ্ড খিদে পেয়েছে।' কিন্তু তার কোনোই প্রমাণ পাওয়া গেল না। চোখ বুজে চাঁটি মেরে কেবল বোল পরখ করছে। চোখ মেলে পরখ করছে আঙুলের গিঁটে-গিঁটে কিসের এ দুর্বলতা?

'খিদে পেছে তো পয়সা-টাকা দে। ঘরে চাল নেই। তুলসীর ঠেঁয়ে কিছু কিনে আনি গে।'

'সেই ফাঁকে একটু—'

'তোর রঙ্গ থো। গায়ে জলুনি ধরে আমার। দে কি দিবি।'

পকেট থেকে সামান্য কিছু রেজকি বের করল ভোলানাথ।

'অনেক ওজকার করেছিস তো? এবার আর রূপদস্তার চুড়ি লোব না, সোনার ভাটিয়া চুড়ি চাই! বুললি?'

ঠাট্টার খোঁচাটা বুকের মধ্যে এসে ঠিক লাগল! ভোলানাথ বিড়িতে টান দিতে গিয়ে দেখল নিবে গিয়েছে। বলল, 'এবার ওজকার হয়নি। যাও হয়েছিল মদে ঠুকে দিয়েছি।'

'বেশ করেছিস। ই রকম বেশি ঠুকতে গেলেই মাথামুড় নেপাট হয়ে যাবে।'

স্তি-লোক শুধু রোজগারই বোঝে। বোঝে শুধু সাধ-আমোদ। বোঝে কি করে একটু ডঙ্কা মেরে বেড়াবে।

আরে টাকাই যদি সব, তবে ঢোল ফেলে দিয়ে লাঙল তুলে নিলেই তো হয়। বলি, মান-খাতিরটা কিছু নয় দুনিয়ায়? শুধু টাকা হলেই কি মন ওঠে? পেট ভরলে কি বুক ভরে? দশটা গাঁয়ের লোক যবে সুখ্যাত করে, তার দাম কি টাকায় ধরা যায়?

কিন্তু কেন এমন হল?

'জানিস বৌ, আজ আমি হেরে গেইছি।' ভোলানাথ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ভেঙে পড়ল।

'কি হেরে গেইছিস? মামলা ছিল না কি কোর্টে? কই বলিসনি তো?'

'মামলা লয়, ঢোলের বাজনায় হেরে গেইছি।'

গোরাশশী হেসে উঠল হুল্‌কে-হুল্‌কে। বললে, 'ঢোল! ওটাতে তো বাজালেই শব্দ হয়, ওটার বাজনায় আবার বাহাদুরি কি! বলি, হারলি কার কাছে?'

'পাল্লাদার জুটেছে—ই ময়ূরপুর গাঁয়ের বাজিয়ে। নাম তারাপদ বায়েন। হাত বড় মিষ্টি রে, বাজানোর ঢংও বলেহারি। মাইরি, হেরে গেলাম উর কাছে। সবাই বললে হেরে গেলাম।' ভোলানাথ কাতর চোখে তাকাল স্ত্রীর দিকে।

গোরাশশীর সেই হাসি এখনো সরে যায়নি চোখের থেকে।

আবার তাতে ঝিলিক পড়ল। বললে, 'ঢোলের আবার হারজিৎ কি। মামলা-টামলা হয়, লড়াই-যুদ্ধ হয়, বুঝি। তুইও বাজাবি ঢোল উ-ও বাজাবে ঢোল—দুজনের বাজনাতেই কানে তালা লাগবে—দুজনেই সমান ওস্তাদ। চোখ-খেগোদের বিচেরকে বলেহারি।'

গোরাশশী বুঝবে না তার অন্তরের দগ্ধানি।

কিন্তু কেন বুঝবে না?

'এমন তো লয় যে বায়নার টাকা কম দেছে। মদ খেয়ে উড়িয়েছিস, তা ঢোলের দোষ কি?' গোরাশশী আবার অন্তরটিপনি ঝাড়লে।

টাকা হলেই যে সব হয় না এ মোটা কথাটা গোরাশশী বোঝে না কেন? রূপ হলে কী হয় যদি অন্তরে না রঙ থাকে?

তারাপদ কত বাহবা পেল সভায়। মালা পেল। ইনাম-বকশিস পেল। লোকে কত গুণ গাইলে। ভোলানাথের দিকে কেউ দেখেও দেখলে না।

'লে, খো এবার। ভাত আঁদা আছে, খাবি চ।'

গ্রাহ্য করে না ভোলানাথ। কেন এমন হল, বারে-বারে চাঁটি মারে ঢোলে। আঙুলে জং ধরে গিয়েছে। ভোমরার পাখার মত নাচে না আর।

না, সকাল-সনজে রোজ মহড়া দিতে হবে। ঐ মতিভ্রষ্ট স্ত্রীর কথায় কান দেয়া নয়।

'রাত-দিন ঠকর-ঠকর আর ভাল লাগে না।' একেক দিন জোর-গলায় নালিশ করেছে গোরাশশী।

'ঠকর-ঠকর না হলে হপর-হপর খাবা চলবে কি দিয়ে?'

'তার চেয়ে কিষেন-মান্দেরি করলে লক্ষ্মীর পাঁজ পড়ত সংসারে।'

কৃষেন-মান্দেরির আবার নাম কি! মর্য্যেদা কোথায়? কিন্তু ঢুলীর নামে দিশ-বিদিশ আমোদ হয়। রাজ্যে ঢোল পড়ে যায়। দেশ-ঘাট থেকে কত লোক দেখতে আসে। মেলা-খেলায় কত লোক ঘাড়-মাথা নেড়ে-নেড়ে তারিফ করে। শিগগির আর তেহাই পড়তে চায় না। এ সবের দাম কি টাকায় হয়? টাকা দিয়ে কি অন্তরের সন্তোষ কেনা যায়?

গোরাশশীর ব্যাভারে ভোলানাথের বুকের মধ্যিটা গুরগুর করতে থাকে। মন মাতিয়ে ঘর-সংসার করতে সাধ যায় না। ইচ্ছে হয় কোন দিকে চলে যাই। যে স্ত্রী স্বামীর মনের দুখ-শোক বোঝে না তার সঙ্গে কি মন বসে?

অথচ যৌবনে দলমল করছে গোরাশশী। করুক। দোলন-হেলন ঠমক-চমকে তার কী হবে যদি না পায় মনের প্রণয়!

সত্যি, গুরগুরিয়ে বাজে না আর ঢোল। নিজের মনেই আর জোর লাগে না বাজনা শুনে। কী হল ভোলানাথের। গুরুবল কমে গেল না কি?

'হেসেলে-চাতালে বাজাগে যা।' গোরাশশী এবার পষ্টাপষ্টি খেঁকিয়ে উঠল; 'ছেলেটার দুপরে জর এসেছে হি হি করে। ঘামন্তু গায়ে ঘুমুচ্ছে এট্টু এখুন। তুই রজ তুলে ওকে জাগিয়ে দিগনি খবরদার। বলে চলে গেল অন্য কাজে।

গায়ের কাঁথা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গৌরহরি উঠে বসল ঘাই মেরে। ছ-সাত বছরের ছেলে। বুড়ো বয়সের নামলা ছেলে ভোলানাথের। বড় আদরের।

'জর আর নেই বাবা। ঘাম দেছে। একটো বিড়ি দে কেনে এ ছামু।'

ভোলানাথ মুখের এঁটো বিড়িটা ছেলেকে এগিয়ে দিলে। তন্ময়ের মত ঢোলে চাঁটি মারতে লাগল।

'কী সোন্দর তুর বাজনা বাবা।' গৌরহরি উঠে পড়ল। দ্রুত কটা টান মেরে বিড়িটা ফেলে দিয়ে বাপের গলা জড়িয়ে ধরলে। বললে, 'আমাকে ঢোল বাজানো শেখাবি তুর মত?'

ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ভোলানাথ আলো দেখতে পেল। হ্যাঁ, ই ছেলেই তার নাম ফিরিয়ে আনবে—তার আর ভয় কি। পিছনে হাত বাড়িয়ে ছেলেকে পিঠের সঙ্গে জাপটে ধরে ভোলানাথ বললে, 'নিশ্চয় শেখাব। দেখে লিস এমুন ওস্তাদ বানিয়ে দেব কেউ তোকে পাল্লা দিতে পারবে না। কিন্তুক—' হঠাৎ গলা নামাল ভোলানাথ: 'তুর মা কি আজ্জি হবে? ঢোল যে উর দু চক্ষের বিষ।'

'মা না আজ্জি হয়, মাকে তু ছেড়ে দিবি।'

কান বড় খর গোরাশশীর।

'কি বুললি? হতভাগা আঁটকুড়োর বেটা। নামুনে, জকা, তিন্দুশে। তুর বাপ আমাকে ছাড়বে? তুর বাপকে আমি ছাড়তে পারি না? তুর বাপ একটা কী! ঢোলের পাল্লায় হেরে যায় উ কি একটা মরদ? শ্যাল-কুকুর।'

হঠাৎ কি হয়ে গেল ভোলানাথ নিজেই বুঝতে পারল না। ঢোলের কাঠি দিয়ে পিটতে লাগল গোরাশশীকে। কোথাকার কি এক নিরুদ্ধ যন্ত্রণা ফেটে পড়ল এতক্ষণে। অনেক মনস্তাপ, অনেক অপমান, অনেক দগ্‌দগি।

'তুকে আমি ছাড়তে পারি না? এখুনি পারি। দূর হ মাগি ছেনাল, দূর হয়ে যা। যে পরিবার স্বামীর দুখ-সুখ বোঝে না তাকে দিয়ে লাভ কি পিথিমীতে?'

গোরাশশীও ছেড়ে দেবার পাত্তর নয়। হাতের কাছে যা পেল হাতা-লতা তাই ছুঁড়ে মারতে লাগল ভোলানাথের গায়ে-মাথায়। মুখে খই-ফুটন্ত গালাগাল: 'বারোজেতে, বাঁশচাপা, কাঁচা-বাঁশে-যা—'

কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল গৌরহরি।

কাঁধে আসে কাঁধে যায়, উলটে পড়ে মার খায়।

ঢোলের মতই সম্মান ছিল গোরাশশীর, অথচ ঢোলের মতই সে পড়ে পড়ে মার খেল।

চৈত্রে গাজন-বোলান, রথে সারি, পাল-পরবে কবিগান—কত ডাক-হাঁক ছিল ভোলানাথের। নহবতের সঙ্গে সঙ্গত করতে তার আর কেউ জুড়ি ছিল না। দশখানা গাঁ তার নামে 'ম'-'ম' করত। সেই ঐশ্বর্য্যের দিনেই তো এসেছিল গোরাশশী। কিন্তু এক দিনে হঠাৎ সব উপে যাবে কেন? পর্বত এড়িয়ে এসে শেষে সর্ষে বিঁধবে?

আজ তিন দিন ভোলানাথ বাড়ি-ছাড়া। সংসার ছেড়ে বিবাগী হয়ে যখন সে যাবে তখনো কাঁধে তার ঢোল চাই।

'তুর বাবা যদি আজ আলছে তো আলছে, নইলে চ কালকে আমরাও চলে যাই গোবরহাটি—তুর মামাবাড়ি।' গোরাশশী বললে গৌরহরিকে।

'ভাই চ।' স্বচ্ছন্দে ঘাড় নাড়ল গৌরহরি। বিজ্ঞের মত মুখ করে বললে, 'বাবা যদি ফিরে এসে তুকে দেখে আবার না তোকে মারধোর করে।'

'উঃ, তুর বাবা এক পেকাণ্ড ঠেঙাড়ে এয়েছে। এবার তবে আমি বঁটি দিয়ে কোপা করব।'

মায়ের গা ঘেসে সরে বসল গৌরহরি। চিন্তিত মুখে গম্ভীর গলায় বললে, 'সিদিন লেবারণের মা কি বলছিল জানিস?'

'কি?'

'বাবা না কিনি সাঙা করে বাড়ি ফিরবে।'

'ঘর বাঁধতে দড়ি, বিয়ে করতে কড়ি। তুর বাবা টাকা পাবে কুথা। বুড়ো-হাবড়ার কাপ কত! একটা বৌ আনতে পারে না তার আবার সাঙা। একবার ঘরকে ফিরুক না পোড়ারমুখো।'

'কিন্তু সাঙা করলে তুকে তখুন তেড়িয়ে দেবে যে?'

'আমিও অমুনি পেহ্লাদ মুচিকে সাঙা করব। ফুটো কলসী আর বিড়বিড়ে ভাতার লিয়ে আর ঘর করব না। চাষে-বাসে পেহ্লাদ মুচির সচ্ছল-বচ্ছল অবস্থা, সুখে থাকব। আর থাকব এই গাঁয়ের উপরেই, তুর বাবার চোখের ছামুতে—'

হঠাৎ আঙিনায় কার ছায়া পড়ল।

আর কার। ভোলানাথের। সঙ্গে আবার ও কে?

'তুর লজ্জা করে সান কাড়তে হবে না।' মোলায়েম গলায় বললে ভোলানাথ: 'ইয়ার নামই তারাপদ—সিই নামকরা বাজিয়ে। লজ্জা নেই, উ আমার ভাই হয়, জাত-জ্ঞাত লয়, একেবারে গাঁত-ভাই—বুললি? বলি, ভাত-টাত কিছু আছে?'

এ কী বিঘটন!

ঘোষহাজরাদের বাড়িতে কবিগানের বায়না জুটে গিয়েছিল ভোলানাথের। পাল্লাদার সেই তারাপদ। ঐ দূরের গোঁসাই-পুরেও তারাপদের বায়না! এরি মধ্যে খুব নাম ছড়িয়েছে তো ছোকরা। ভোলানাথের মাথাটা ঠিক খাবে এত দিনে। ভরা-ডুবি করাবে।

ন', ল্যাজ গুটোবে না ভোলানাথ। এবারে ঠিক টক্কর খাওয়াবে ছোকরাকে। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি টঙ্ক এ কথা মেনে নেবে না কিছুতেই। একবার হেরেছে বলে বারে বারে হারবে এ বিধেন হতে পারে না দেবতার। হেই বাবা রুদ্দুদেব!

গানের শেষে তারাপদ নিজেই এসে দাখিল হল ভোলানাথের সামনে।

'দাদা কি বাড়ি চলল। আজই?'

'ছেরে গেইচি, আমাকে আর খাতির করে কে নেমন্তন্ন করবে বলো? তুমার কথ আলাদা। তুমার ছোকরা বয়েস, সোন্দর চেহারা, তোমাকে পায় কে। তুমি এখুন ইনাম লেবা বকশিস লেবা তবে তো যাবা। আমি কালা মুখ দেখাতে থাকব ক্যানে এ ঠিঁয়ে?'

'উ শালোরা কী বোঝে শুনি?' তারাপদ রাগ করে উঠল: 'উয়ারা যে রায়ই দিক, আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি তুমি আমার চেয়ে ঢের বেশি ওস্তাদ। ওস্তাদ ছাড়া ওস্তাদের গুণ কেউ বুঝে না। তুমি আমার গুরু, আমি তুমার শিষ্য-সলা।' তারাপদ হেঁট হয়ে পা ছুঁতে গেল ভোলানাথের। 'কারু জলে যশ কারু দুধে ঠস। ও-সব বিচের-আচার কিছু লয়।'

ভোলানাথের মন মধু হয়ে গেল মুহূর্তে। ছেদ্দাভক্তি আছে ছোকরার। প্রবীণ লোককে মান্য করতে জানে:

'আমাকে তুমি শিখিয়ে-পড়িয়ে দাও। তুমার পায়ের তলায় বসে আমি এখুনো দু-দশ বচ্ছর শিখতে পারি।' তারাপদ বললে গদগদ হয়ে। ওর সরলতায় ভোলানাথের বুক শীতল হয়ে গেল।

'পীরের চেয়ে খাদিম জিন্দে।' পথের লোককে টিপ্পনি কাটলে।

সত্যিই তো। তারাপদ নিজে স্বীকার করলে কি হয়, দেশিয়ে দশ জন তো তা স্বীকার করছে না। তারাপদের নিজের স্বীকারে কী যায়-আসে। ভোলানাথের প্রাধান্য মেনে নিয়ে সে তো আর কিছু কম বাজাবে না, না হেরে যাবে না তো ইচ্ছে করে।

'চলো কেনে দাদা মদের দোকান পানে। গা'টা বড্ড ম্যাজম্যাজ করছে—'

দু'জনে গেল মাতালশালায়। গলা পর্যন্ত মদ খেলে। গলায়-গলায় ভাব হয়ে গেল দু'জনের। তারাপদ ভবঘুরে বাউণ্ডুলে। চি পুত্ত-ভাই-বুন কেউ নাই, নাই ঘর-দোর কপাট-চৌকাট। ইখানে-উখানে ঘুরে বেড়ায় আর ঢোল বাজায়। রং-টপ্পা গায়েন করে।

'বলেহারী বাবা ভোলানাথ, তু একটা গোটা মরদ বটে।' তাদেরই গাঁয়ের শুকদেব মদ খেয়ে ঢোল হয়েছে। বললে জড়ানো জিভে, 'আঃ, কী মারটাই না মারলি। তা জব্দ করতে তুই জানিস বটে বাপ!'

'দূর দাদা।' তারাপদ নালিশ করে উঠল: 'মেয়েলোকের গায়ে হাত তুলবি ক্যানে? যা বলতে হয় লুলুপুতু করে বলবি। আগ চণ্ডাল। ঠিঁয়ে-অঠিঁয়ে লেগে গেলে বাবা কী হয় বলা যায় না। কথায়ই বলে, মুখে এলে বাক্যি আর ঠাঁই দেখে মার।'

ভোলানাথ থমথমে গলায় বললে, 'ফতুরে মরুক চামচিকে, বসে আছেন ছিরাধিকা। তুমি শালো যত খেটে মর বোর কিছুতে মন পাবে না। হাতে কি আর অনর্থক মার আসে?'

'মনের বেপারে কামটা কী আমাদের? যৌবন বৈমুখ না হলেই হল। কি বল?' কনুই দিয়ে পাশের লোকটাকে তারাপদ গুঁতো মারলে।

হঠাৎ ভোলানাথ উপর-পড়া হয়ে জিগগেস করলে তারাপদকে : 'আমার বাড়ি যাবি ?'

আড়ালে পেয়ে গোরাশশী ঝাঁজিয়ে উঠল : 'ই আপদ জোটালে ক্যানে ?'

ভোলানাথ বললে গম্ভীর হয়ে, 'আমার খুশি।'

'তুর মুণ্ডু। একে পিতিদিন ভাত এঁদে দিতে হবে না কি আমার ?'

'হবে, নিশ্চয় হবে। উ আমার ছোট ভাই, আমার সাগরেদ।'

'ছুঁচোর সাগরেদ চামচিকে। আমি লারব ভাত আঁদতে।'

'লারবি তো পথ ত্যাগ। আমি আমার পথ অ্যানেক আগেই দেখে লেছি।'

ধাপচালায় শোবার জায়গা হয়েছে তারাপদর।

নিশুতি রাত ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কুটুরে পেঁচা ডাকছে কোথায় ঘাপটি মেরে। ঝাঁপ ঠেলে টুক করে ঢুকে পড়ল গোরাশশী।

বুকে যেন কে তার ঢেঁকি কুটছে। গলা ডুবিয়ে বললে, 'কি গো, লজ্জরে ধরে আমাকে ?'

তারাপদ আকাট, অসাড় হয়ে রইল।

'কি, আনারে ঠিক ঠাহর হলছে না ? দিনমানে দেখে হিয়ের ভেন্তরটা খলবলিয়ে ওঠেনি এটটু ? কি রে, আ কাড়িসনে ক্যানে ? শরীলে সান নেই ?'

তারাপদ যেন পাথারে পড়েছে। এ কবি কালদমন, সারি-বোলান, ছড়া-পাঁচালি নয়। এ একেবারে অদ্ভুত ! আরেক রকম !

'শুন, আমার গা ছুঁয়ে পিতিজ্ঞে কর—এ তল্লাটে আর আসতে পারবি না। ই দেশ-গাঁ ছেড়ে চলে যাবি ভিন দেশে। কি, আজ্ঞি ?'

আজকের ই আত ছাড়া আর সব ছাড়তে পারব।' ধরা-গলায় বললে তারাপদ।

'শুন, তুর জ্বালাতেই আমাদের সব যেতে বসেছে। ঘরে সুখ নাই মনে সুখ নাই। ক্যাবল ওজকারে কি হয়, যদি লাম না হয় ভোমণ্ডলে ? ভেরেণ্ডা বনে শ্যাল-রাজা ছিল্লু, তু কেন বাদ সাধতে এলি ? কথা দে, যদি পিত্তের পুত্তু হোস, এ মুলুক ছেড়ে চলে যাবি নিয্যনেদ হয়ে।'

'আর ল্যাই করিসনে। বুলছি চলে যাব, কথা রাখব।'

'তুর ভাবনা কি। তুর গুণ আছে, যেথা থাকবি সেথা ক'রে খেতে পাবি তু। আমাদের বড্ড অভাবের সংসার—দেখতেই পেছিস, তাই ব্যাগত্তা করছি তুকে—'

'তুর ভয় নেই। আমি ঠিক চলে যাব। ওস্তাদের সেঁখো আমরা, কথায় লড়চড় জানি না।'

কুটুরে পেঁচাটাও থেমে গেছে এতক্ষণে। আঁধার যেন দম বন্ধ করে বসে আছে ঘন হয়ে।

'এই লে, টাকা লে।' তারাপদ একটা দশ টাকার নোট ধরল এগিয়ে।

'আ মর, টাকা লেব ক্যানে ? তুর কাছে ই-র দাম দু-দশ টাকা বটে, কিন্তু আমার কাছে তার হিসাব নাই। তুকে হাটে গিয়ে দশবার বিচতে পারে এমুন নোকের অভাব হত না আমার কখুনো। বুললি ? কাল ঠিক চলে যাস কিন্তুক। চলে যাস বেপাত্তা হয়ে। মনে থাকে যেন। তুর ধর্ম্ম তুর ঠাঁই।'

'কিন্তুক কি বলে চলে যাব ? কিছু তো বলতে হবে দাদাকে।'

এক পলক স্থির হয়ে দাঁড়াল গোরাশশী। বললে, 'লোটটা তবে দে।'

সকাল বেলা চৌকাঠের নিচে আঙিনাতে গোরাশশী মাডুলি দিচ্ছে, তারাপদ বেরিয়ে এল। বললে, চললাম, জন্মের মত চললাম—'

'দাঁড়া, পাড়াশুদ্ধু লোক ডাকছি এখুনি, তোর এত বড় আস্পদ্দা!' গোরাশশী ফণা-তোলা সাপের মত হিসহিসিয়ে উঠল : 'তু আমাকে টাকা দেখাস ? হারহাবাতে পিণ্ডিখেকো, টাকা তুর বেশী হয়েছে, লয় ? বেরো তু আমার বাড়ি থেকে—'

'আমি যেছি, তুই কুট কাটিস নে। দে আমায় টাকা ফিরিয়ে দে।' তারাপদ হাত বাড়াল।

'লে—খালভরা, নামুনে—'নখের ডগায় গোরাশশী নোটটা টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। উড়িয়ে দিল চার দিকে।

গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল ভোলানাথের। দেখল তারাপদ বাড়ি নেই। উঠানে ছেঁড়া নোটের টুকরো।

কী ব্যাপার ?

'তুর সেই কমবক্তা হতভাগা বন্ধু আমাকে নোট দেখায়।

দেখাবেই তো। তাই তো উয়ার সঙ্গে কথা। ঘর-দরজা নেই, মা-বুন-স্তি পুত্ত নেই, এইখানেই খাবে থাকবে। ভাত-মদ দেব, যত্ন আত্তি করবি। আর উ পাল্লাদারি করবে না। আমার মুখ ছোট করবে না, কালি দেবে না নামে। বায়না যদি লেয় বিদেশে লেবে, আমার ইলেকায় লয়। তু তাকে ভাগিয়ে দিলি ? টাকা যদি দেয়, ভাড়া দিয়েছে আগাম। ইর মধ্যে অন্যায়টা কোথায় ? আমাকে না দিয়ে তুকে দিয়েছে। স্বামীকে না দিয়ে তার পরিবারকে দিয়েছে। দেবেই তো একশো বার। যা বয়-শয় তাই হয়। তাই হবে। তাইতেই উ এয়েছে। উকে লিয়ে এসেছি। ইতে এত ত্যাজ ক্যানে ? ঘরে ভাত নেই, ধম্মের উপোস।'

ভোলানাথ দু হাতে পিটতে লাগল গোরাশশীকে। আশ্চর্য, গোরাশশী উত্তর দিলে না এতটুকু। না সাড়া না ধারা নিথর হয়ে পড়ে রইল।

'হা টে শালি, আমার নাম বড়, না তুর নাম বড় ?'

ভোলানাথের নাম বড়। গোরাশশী তা জানে। মর্ম্মে-মর্ম্মে জানে।

বাঙলার রবি —সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সৌজন্যে

হাতবদল

—নীতি সরব

—তারক চট্টোপাধ্যায়

দুই পাখী

—শ্রীনীতিন্দ্রনাথ দত্ত

—ইউনিভার্সাল আর্ট গ্যালারি

বিহ্বল —নলিন দেব

আমিও —কিশোরী সাউ

ভাই আমিও —শি, সু, বসু

চেহারা (মনোতোষ রায়) —শীতল ষ্টুডিও

—শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়
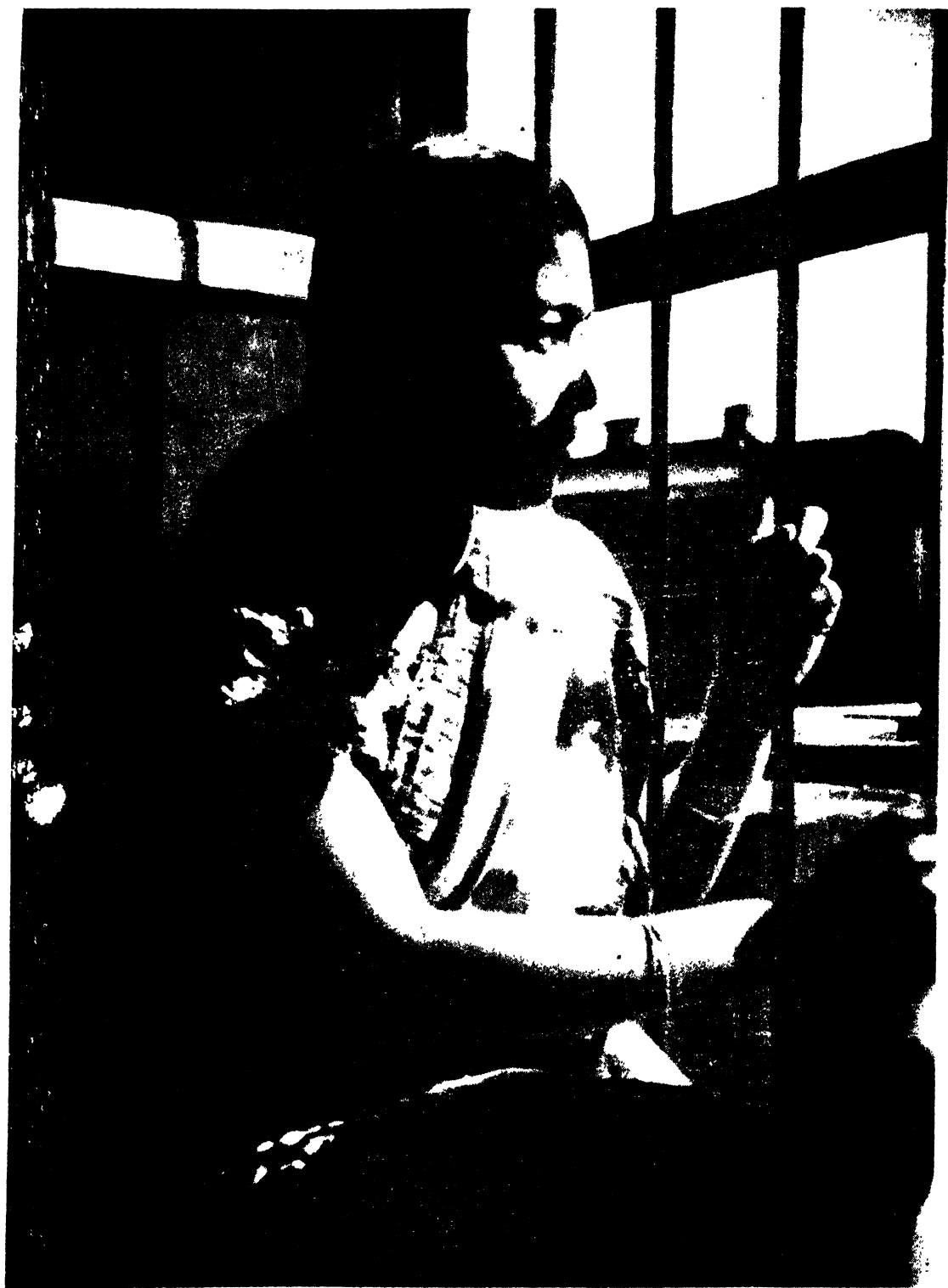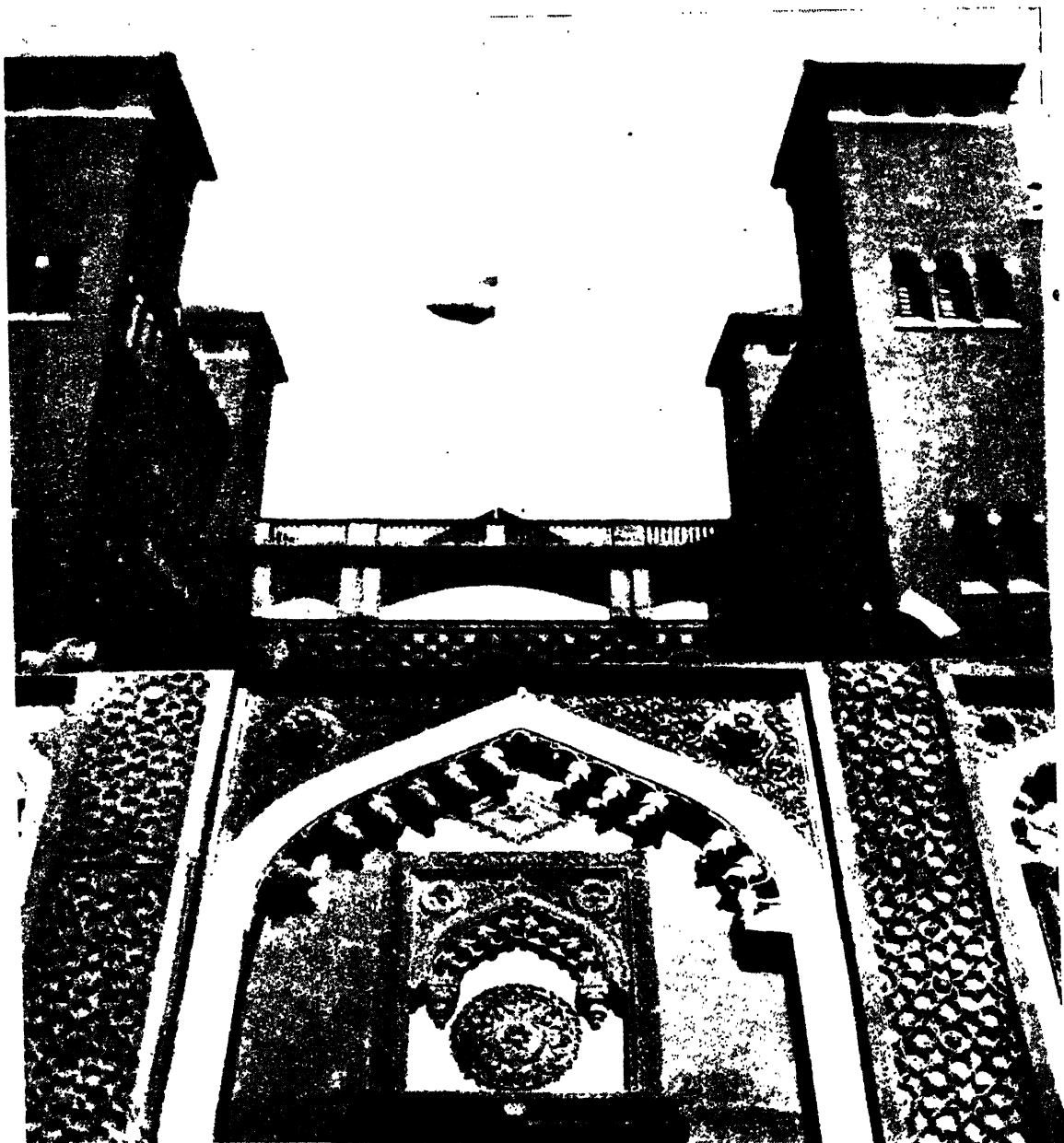
আকাশ-চাঁচা —অজ্ঞাতনামা

অথ অশ্বমেধ-ফলপ্রাপ্তি

শ্রীজগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য

অবিশ্বাস্য হলেও কথাটি অসত্য নয়। বিশ বৎসর দাম্পত্য জীবনের পরে এক দিন সামান্য একটু তর্ক-বিতর্কের ফলে নিস্তারিণী স্বামিগৃহ থেকে পিত্রালয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এ পর্য্যন্ত হয়ত কোন রকমে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করা যায় না যে হারাধন মোক্তার এ জন্য কিছুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। শুধু তাই নয়, স্ত্রী ভুলক্রমে যে সকল গয়নাগাটি রেখে গিয়েছিলেন, সেগুলি বিক্রয় করে তিনি চড়া দামে একটি ঘোড়া কিনে নিয়ে আসলেন। একে ঘোড়া ব'লে পরিচয় দিলে হয়ত অভিজাত ঘোড়া-মহল আপত্তি করবেন। বলবেন, এমন রুগ্ন, নিষ্কর্ম্মা ও হাড়-গোড়-বের-হওয়া জন্তুকে আমরা আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত বলে স্বীকার করি না। কিন্তু স্বীকার না করলেই সত্য মিথ্যা হয় না। এটি যে ঘোড়া, তা জীব-বিজ্ঞানে নিঃসন্দেহে স্বীকৃত হবে—যদিচ, রস-বিজ্ঞান বলবে যে, গর্দ্দভ-মহলেই ওর পিতৃপুরুষের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

ঘোড়াটির নাম সে রাখল রতনবাঈ। ছেলেবেলায় যাত্রা শুনতে গিয়ে এই নামটি হারাধন শুনেছিল এবং স্মৃতির এক নিভৃত কোণে এটিকে আটক রেখেছিল। বহু বৎসর পর, বহু সুদিন ও দুর্দ্দিন অতিক্রম করে আজ সে মনের কোণ থেকে নামটি বের করে নিয়ে আসল এবং পত্র-পুষ্প ও বহু শুভ কামনা সহ ঘোড়াটিকে তা' উপহার দিয়ে বলল: তোকে আমি রতনবাঈ বলেই ডাকব।

পত্র-পুষ্প ও ফুল-হার চিরকালই ভালবাসার দৌত্য করে এসেছে। হারাধন মোক্তার বনাম নব-ক্রীত অশ্বের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। রতনবাঈ হারাধনের শুভ কামনাগুলিকে মুখ-ঝামটা দিয়ে দূরে ফেলে দিল ও পত্র-পুষ্প-হারের সদ্ব্যবহার করে চলল।

নূতন প্রেমিকের পক্ষে এটা আনন্দের ব্যাপার হল না। কিন্তু হারাধন মোক্তার তা' সহ্য করল। ঘোড়াটির চিবুক ধরে আদর করে বলল: মিষ্টি কথা বুঝি তোমার পছন্দ হয় না?

শ্যালক অদ্বৈতচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাষ্ঠাসনে বসে আজ তিন বৎসর যাবৎ যোগ-বিদ্যার চর্চ্চা করছেন। কিন্তু তিন বৎসর পর ফলপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিয়োগেরই প্রাদুর্ভাব দেখা গেল। পণ্ডিত মশায় 'উন্নতির বিবরণী' বা **Pogress Report**এ লিখে দিলেন—"শ্রীমানকে যোগ শেখাতে গিয়ে দেখা গেল বিয়োগের দিকেই তার ঝোঁক বেশী। কড়াকিয়া ও গণ্ডাকিয়া সে অনায়াসেই বিস্মৃত হয়েছে।"

অতএব হারাধন মুখুয্যে অতঃপর অদ্বৈতকে পাঠশালা থেকে নিয়ে এসে অশ্বশালায় নিযুক্ত করেলন। বললেন, "সারা জীবন পাঠশালাতেই কাটাতে হবে, এমন কোন কথা নাই। অশ্বশালাতেও অদৃষ্ট প্রসন্ন হতে পারে।"

অদ্বৈতর উপর আদেশ হল, ভোর বেলা উঠে রতনবাঈকে দুগ্ধ ও চিনি সহযোগে এক বাটি চা' দিয়ে আসবে। বেলা দশটায় প্রচুর পক্ক ফল, চিনি ও ঘৃত সহযোগে সের দশেক সরু দানার ছোলা। বেলা দুইটায় বিশ্রামের পর আবার ছোলা। চারটায় রতনবাঈয়ের বৈকালী ভ্রমণ। ভ্রমণ হ'তে প্রত্যাবর্ত্তনের পর খাঁটি ছানার সন্দেশ দু ডজন, ঘৃতের পরোটা এক ডজন, কচি ঘাস ও নরম পাতা সের পাঁচেক, প্রচুর পরিমাণ পরিস্রুত জল। ছয়টায় বৈকালী চা', মাঝে মাঝে কাফি বা কোকো ও সাহেব কোম্পানীর বিস্কুট। রাত্রি আটটায় খাঁটি ব্রাণ্ডি দু' বোতল। নয়টায় বিশ্রাম।

অদ্বৈত হুকুমটি মেনে নিল। তথাপি ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলল: "এত বেশী খেলে রতনবাঈর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়বে না?"

মূর্খ শ্যালকের এই ঔদ্ধত্য দেখে হারাধন অবাক্ হলেন। ধমক দিয়ে বললেন, "সে বিচার তোমার নয়, আমার। রতনের ব্যাপারে তুমি কিছু বলতে এসো না।"

অদ্বৈত ভৎর্সনাটি হজম করে নিল। বলল: "তা নাই বা বললাম। কিন্তু সামান্য একটি ঘোড়ার জন্য এমন সর্ব্বস্ব পণ করতে আমি আর কাউকেই দেখিনি।"

হারাধন মোক্তার পাল্টা জবাব দিয়ে বলল : "মাটির নিচে ট্রেণ চলাচল করে, তা-ও তুমি দেখোনি কোন দিন? তাই বলে সেটা মিথ্যা হয়ে গেল?"

প্রাইমারী স্কুলের অনুত্তীর্ণ শ্যালক মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জামাই বাবুর নিকট তর্ক-যুদ্ধে পরাস্ত হল। কিন্তু শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের কালে পরাজিত শত্রুরও বক্তব্য পেশ করবার অধিকার আন্তর্জাতিক আইনে আছে।

অদ্বৈত বলল : "কিন্তু একটি কাজ থেকে আপনি আমাকে রেহাই দিন। রাত আটটায় ব্রাণ্ডী খাওয়াবার কাজটি আপনিই গ্রহণ করুন।"

শত্রুর প্রতিও স্থানবিশেষে অনুগ্রহ দেখাতে হয়। হারাধন বললেন : "আচ্ছা, রাত আটটার প্রোগ্রাম আমিই নিলাম। ওটা আমার special subject হল।"

পাঠশালা থেকে অশ্বশালা, ভাব-জগতে পার্থক্য খুব বেশী হলেও ব্যবহারিক জগতে তেমন কিছু পার্থক্য দেখা গেল না। কাজটি অদ্বৈতর ভালই লাগল, তা' ছাড়া জামাই বাবু আছেন। মক্কেল সাধনা থেকে এবার তিনি অশ্ব সাধনায় নেমে এসেছেন।

এক এক দিন গভীর রাত্রিতে অশ্বশালায় জামাই বাবুর কণ্ঠ শোনা যায় "রতন, তোমাকে অভিনন্দন জানাই। তোমার পূর্ব্ব-পরিচয় যাই হউক, আমার কাছে তুমি অনন্ত শুভ সম্ভাবনার প্রতীক। তোমার নিশ্চর্ম্ম মসৃণ পৃষ্ঠদেশে সূর্য্যালোক ঝলমল করে, আমি নির্বাক্ বিস্ময়ে চেয়ে থাকি। তুমি আমার হস্ত থেকে তৃণখণ্ড তুলে নাও, আমার আত্মা পরিতৃপ্ত হয়ে উঠে। তোমাকে আমি আমার জীবনে অভ্যর্থনা জানাই।"

অশ্ব-মন্দির থেকে জামাই বাবুর নিষ্ক্রমণের পর অদ্বৈত ওদিকে এগিয়ে যায়। অশ্বের পদপার্শ্বে বসে সে-ও বলতে থাকে, "পাঠশালা থেকে অশ্বশালায় বদলী হয়েছি আমি, সে কি একেবারেই নিরর্থক হয়ে উঠবে? রতনবাঈ, তুমি সুস্থ ও সবল হয়ে ওঠো তোমার বলিষ্ঠ ও পুষ্ট অঙ্গের দিকে তাকিয়ে আমার চোখ জুড়িয়ে যাবে—তোমাকে নিয়ে আমি দেশ-দেশান্তরে পরিক্রমায় বেরোব এক দিন।"

একদা গভীর রাত্রিতে অকস্মাৎ বিছানা ছেড়ে উঠলেন হারাধন মোক্তার হাঁক-ডাকে পাড়াটিকে জাগিয়ে তুলে তিনি বললেন, "অদ্বৈত, ও অদ্বৈত, এইমাত্র এব অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম আমি। তোমার দিদি রতনের পিঠে চড়ে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছেন। না, এ কিছুতেই চলবে না অদ্বৈত, তোমার দিদিকে লিখে দাও, রতনবাঈর সামাজিক, পারিবারিক ও ঐতিহাসিক মর্য্যাদা আমি কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হতে দেবো না।"

অদ্বৈত চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল: "একটা স্বপ্নের উপর নির্ভর ক'রে এ ধরণের চিঠি লেখা..."

হারাধন মোক্তার ক্ষেপে উঠলেন। ধমক দিয়ে বললেন, "ও অভ্যাসটা তুমি কিছুতেই ছাড়তে পারলে না, অদ্বৈত! রতনবাঈ সম্পর্কে আমি কোনরূপ যুক্তি-তর্ক শুনতে চাই না। যাও, তোমার দিদিকে লিখে দাও, রতনবাঈর পৃষ্ঠে আরোহণের যদি কোন স্বপ্ন তাঁর থাকে, তবে তা' নিতান্তই দুঃস্বপ্ন।"

অদ্বৈত তার দিদিকে চিঠি লিখতে বসল। প্রাইমারী স্কুলের প্রথম ধাপের বিদ্যায় চিঠি লেখা চলে না। তথাপি অক্ষরে পর অক্ষর সাজিয়ে সে তিনটি ফুলস্কেপ কাগজে যা' লিখল, তার মোটামুটি অর্থ দাঁড়ায় এরূপ :—"রতনবাঈকে নিয়ে আমরা দুজনে বিশেষ ব্যস্ত আছি, তার আহার-বিহারের কিছু-মাত্র ত্রুটি হবার যো নাই। তাতে জামাই বাবু শুধু অসন্তুষ্টই হন না—ক্রোধে ও ক্ষোভে তিনি এক এক সময় আত্মহত্যাও করতে যান। প্রাকটিস্ তিনি ছেড়ে দিয়েছেন—রতনবাঈ তার ইহকাল ও পরকাল জুড়ে বসে আছে।...তুমি যদি কোন দিন আস এখানে, তবে রতনবাঈকে খাতির করে' চলতে হবে।"

কনিষ্ঠ সহোদরের পত্র পেয়ে নিস্তারিণী জ্বলে উঠলেন। কিন্তু তা তুষের আগুন, শিখা নাই, তেজ আছে। মনে মনে বললেন, "আচ্ছা, দেখা যাবে।" কনিষ্ঠ ভ্রাতার চিঠির জবাবে তিনি স্বামীকে লিখলেন :—"তোমার অধঃপতনের কথা চিন্তা করে আমার বিস্ময়ের অবধি নাই। উঃ, কী শোচনীয় কথা! সদ্বংশ-জাত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-সন্তান শেষে কি না রতনবাঈয়ের সঙ্গে...।"

নিস্তারিণীর ইচ্ছা হ'ল, এখনই ছুটে যান এবং যে তার স্বামির হৃদয়ে বে-আইনী প্রবেশ করেছে, তাকে হিংস্র নখদন্তে কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে ফেলেন। কিন্তু মাঝখানে অন্ততঃ পঞ্চাশ মাইলের ব্যবধান। নিস্তারিণী থাবা গুটিয়ে নিলেন।

চিঠির উপসংহারে তিনি স্বামীকে লিখলেন, "আমার দিন এক রকম চলছে। আজ কৃষ্ণবল্লভ আমার সাথী। ওর হৃদয়ে আমার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। ওর প্রীতির দান আমি কি এ জীবনে পরিশোধ করতে পারব?"

আঘাত পেলেই মানুষের সুপ্ত শক্তি জেগে ওঠে। হারাধন মোক্তারের শুষ্ক পঞ্জরে এত দিন একটি নিরীহ ও গো-বেচারী স্বামী ঘুমিয়ে ছিল। আজ অকস্মাৎ সে জেগে উঠল। ঘরের দাওয়ায় বোসে হারাধন মোক্তার চীৎকার করে উঠলেন : "অদ্বৈত, ও অদ্বৈত, তোমার দিদির ঔদ্ধত্য দেখেছ? রতন-বাঈয়ের কথা শুনে সে জ্বলে-পুড়ে মরছে। তা' মরুক। রতনবাঈকে আমি ভালবাসব,—দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, হাজার বা লক্ষ গুণ বেশী ভালবাসব। তা নিয়ে তোমার দিদি যদি গলায় দড়ি দেয়, ত, দিক্।"

এক মুহূর্ত্ত কি-যেন চিন্তা করে' তিনি হুকুম জারী করলেন : "আজ থেকে রতনের 'রেশন' দ্বিগুণ করে দাও। যেখানে দিতে দশ সের ছোলা, সেখানে দিবে আধ মণ।"

অত্যধিক আদর-আপ্যায়ন ও আহার-বিহারে জীর্ণ রতন বাঈয়ের প্রতিবাদ জানাবার মত ভাষা নাই। তার হাড়গুলি এখন আরও বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; সামনের দিকে সে আরও বেঁকিয়ে পড়েছে। প্রচুর দুষ্পাচ্য ও দুর্মূল্য খাদ্য ও অখাদ্য

(অশ্ব সম্প্রদায়ের পক্ষে—মানব সম্প্রদায়ের পক্ষে নহে) গলাধঃকরণ করে সে ক্রমশঃই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অদ্বৈত এ কথাটি বুঝতে পেরেছে, তাই বলল: "দ্বিগুণ 'রেশন' দিতে গেলে যে ও ম্রারা পড়বে, জামাই বাবু। ও হজম করতে পারবে না।"

শ্যালকের উক্তি শুনে মোক্তার বাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। কিন্তু তিনি ভাঙবেন, তবু নুয়ে পড়বেন না। দৃঢ় ভাবে বললেন: "পারবে, আলবৎ পারবে, পারতেই হ'বে। এতে যদি রতনের মৃত্যুও হয়, তথাপি আমি দুঃখ করব না। তার শ্মশানে আমি স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে প্রস্তর-ফলকে লিখে রাখব: 'এখানে ঘুমিয়ে আছে সে অশ্বশ্রেষ্ঠ, যে পৃথিবীর অন্ততঃ একটি মানুষের হৃদয়েও স্থান পেয়েছিল। তার নধর কান্তি ও অনাবিল চোখের দিকে তাকিয়ে আমি কতই না সান্ত্বনা পেয়েছিলাম। সে সান্ত্বনার বাণীটিকেই আজ কয়েক খণ্ড ইট-পাথরের মুখে রেখে গেলাম। পৃথিবীর ব্যর্থ প্রেমিক নর-সমাজ, তোমরা এই স্মৃতি-মন্দিরের দিকে তাকিয়ে অন্ততঃ একবার মস্তক অবনত ক'রো'।"

অদ্বৈত সব কথা বুঝতে পারল না। হাবার মত দাঁড়িয়ে রইল। হারাধন মোক্তার আবার আর্ত্তনাদ করে উঠলেন: "দাঁড়িয়ে রইলে কেন, অদ্বৈত! চারটা বেজে গেল। রতনের চা' দেওয়া হয়নি ত।"

অদ্বৈত তাড়াতাড়ি চায়ের বাটি হাতে নিয়ে রতনবাঈ সমীপে উপস্থিত হ'ল। কিন্তু ক্যাফেইন, দুগ্ধ ও চিনির সংমিশ্রণে উৎপন্ন এই উত্তপ্ত পদার্থটির প্রতি রতনের বিরূপতা আজ একটু বেশীই প্রকাশ পেল। জামাই বাবুকে ডেকে অদ্বৈত বলল: "রতন আজ কিছুতেই চা খেতে চায় না জামাই বাবু।"

কী সর্ব্বনাশ! হারাধন মোক্তার মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। যুগে যুগে প্রেম কি এ ভাবেই ব্যর্থ হবে? নিষ্কর্ম্মা কবিরা কাব্য ও অপদার্থ গাল্পিকরা গল্প লিখলেই কি ব্যর্থ প্রেমের সমুচিত জবাব দেওয়া হ'ল? কিন্তু মানুষের সহজাত পৌরুষ এই ব্যর্থতাকে নিঃশব্দে সহ্য করতে কিছুতেই পারে না। যতটুকু ভালবাসা তিনি দিয়েছেন, তার দ্বিগুণ তিনি আদায় করে' নিবেন। রতনবাঈয়ের এই আকস্মিক অভিমান পুরুষ জাতির প্রতি অবজ্ঞারই নামান্তর।

হারাধন মোক্তার ছুটে গেলেন। বহু অনুনয়-বিনয় ও অনুরোধ করলেন। কিন্তু রতন অভিমান ত্যাগ করল না। চিরকাল নার জাতি যা   এসেছে সে তাই করল। হারাধনের দুর্ব্বলতার সুযোগে সে আরও শক্ত, আরও অনড় হয়ে উঠল।

রতনবাঈয়ের আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসলেন হারাধন মোক্তার। জামা-জুতা ও ছাতা নিয়ে তিনি তন্মুহূর্তেই দশ মাইল দূরে সহরের দিকে যাত্রা করলেন। অদ্বৈতকে বললেন: "বারোটার মধ্যেই আমি ফিরে আসচি অদ্বৈত। রোগ-বীজাণু। তাই ওর এত অভিমান, এ ɔ অসম্মতি। যাই, সহর থেকে একটি 'ফিডিং পাইপ ও লিভার এক্সট্রাক্ট' নিয়ে আসি। লিভারের কমপ্লেনটাই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। জিভের বর্ণটা দেখে আমি আর ভেবেই বাঁচি না, অদ্বৈত! ভগবানই এখন ভরসা!"

ভগবানের উপর ভরসা রেখে মোক্তার বাবু যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু রাত দু'টোয় ফিডিং পাইপ, ওষুধ ও কিছু তাজা ফল নিয়ে গৃহে ফিরে এসে ভগবানের উপরও তার কোন ভরসা রইল না, রতনবাঈ অদৃশ্য হয়েছে এবং তারই সন্ধানে হয়ত অদ্বৈতও অদৃশ্য হয়েছে।

শূন্য গৃহে মোক্তার বাবুর প্রাণ ছটফট করে উঠল। বিছানার উপর একখানা চিঠি পড়ে আছে দেখে তিনি সাগ্রহে তা' তুলে নিলেন। ভাবলেন, হয়ত অদ্বৈত এই চিঠি রেখে গেছে এবং তা' থেকে রতনের একটা কিছু সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু কপাল এমনই মন্দ যে, ওখানা নিস্তারিণীর লেখা চিঠি। বহু বিনিয়ে নিস্তারিণী লিখেছে:—

"সীতার অভিশাপে স্বর্ণলঙ্কা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল এক দিন। সতী নারী আজ তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছে, তুমি ও রতনবাঈ মিলে যে স্বর্ণলঙ্কা গড়ে তুলেছ তা-ও তেমনি ভাবেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।—কৃষ্ণবল্লভকে নিয়ে বেশ আনন্দেই আমার দিন কেটে যাচ্ছে।"

কৃষ্ণবল্লভ! ভাগ্যিস্ হারাধনের শক্তি নাই। নইলে লগুড় ও মুষ্ট্যাঘাতে সে কৃষ্ণবল্লভের বল্লভ প্রাণটি একেবারে গুঁড়া করে দিত এবং সে প্রাণের পাউডারগুলি সতী-শ্রেষ্ঠ নিস্তারিণী দেবীকে উপহার দিত। কোথাকার কে-না-কে কৃষ্ণবল্লভ, তাকে নিয়ে শয্যাসঙ্গী করে! মুখে সীতা-সাবিত্রীর কথা বলতে লজ্জা হয় না নিস্তারিণীর!

ঘোটকীর সন্ধানে গ্রামে গ্রামে দূত প্রেরিত হল। কিন্তু অদ্বৈত বা রতনের সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না। সবাইর মুখে কেবল এক কথা—নাই, নাই—রতন নাই! এ বিরাট পৃথিবী আজ নিতান্তই রতন-হীন!

অবশেষে এক দিন হারাধন মোক্তারও বেরিয়ে পড়লেন। সংকল্প করলেন, হয় রতনবাঈকে খুঁজে বের করবেন, নইলে মৃগয়া-সন্ধানে এই ছার প্রাণ বিসর্জ্জন দিবেন। সপ্তাহ খানেক এখানে-সেখানে, হাটে-বাজারে পথে-ঘাটে তিনি রতনের সন্ধান করলেন। কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না। অতঃপর প্রাণ বিসর্জ্জনের কাজটা আপাততঃ স্থগিত রেখে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছার মধ্যে ঘরে এসে গুটিয়ে বসলেন।

ইতিমধ্যে এক "অজ্ঞাত স্থান" থেকে নিস্তারিণীর নামে অদ্বৈত এক লম্বা চিঠি লিখল। জানাল, এক পক্ষ কাল যাবৎ রতনবা নিখোঁজ এবং তারই সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে হারাধন মোক্তার আজ   দিন হ'ল গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন।

নিস্তারিণীর মন হাততালি দিয়ে ह़েল। পৃথিবীতে সতী-

যে তারা পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে, হারাধন মোক্তারের জীবনটাই তার প্রমাণ।

পুরুষ সমাজের প্রতি আজ বড় অনুকম্পা হ'ল নিস্তারিণীর। এরা মূখ, অবিবেচক ও অসহায়! স্ত্রীলোকের দু'টি মধুর কথায় বা দু'ফোঁটা চোখের জলে এরা আগুনেও ঝাঁপ দিতে যায়।

কিন্তু নিস্তারিণীরও এবার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। এবার সে এগিয়ে যাবে। হারাধনের বুকের যে সিংহাসনে এত দিন রতনবাঈ অধিষ্ঠিত ছিল, এবার গিয়ে নিস্তারিণী সেটা দখল করবে। না, আর বিলম্ব করা চলবে না। বিলম্ব করলে হয়ত রতনকে খুঁজে পাওয়া যাবে, হয়ত রতন ফিরে আসবে—হয়ত তার জন্য আবার দোর বন্ধ হয়ে যাবে।

কৃষ্ণবল্লভকে নিয়ে নিস্তারিণী যাত্রা করলেন—অরণ্য আশ্রম থেকে নির্বাসিতা সীতা এক দা যে ভাবে যাত্রা করেছিলেন, ঠিক সে ভাবেই নিস্তারিণী যাত্রা করলেন

পথে পথে এ তাঁর আশঙ্কা, যদি রতনবাঈ ফিরে এসে থাকে, যদি তাকে গৃহে প্রবেশ করতে না দেয় সে।

বহু দিন পর আজ বাড়িতে প্রবেশ করতে গিয়ে নিস্তারিণী শঙ্কিত ভাবে এ-দিক্ ও-দিক্ তাকালেন। যদি রতনের পুনরাবির্ভাব ঘটে থাকে! যদি তার হাতের চুড়ির শব্দ পাওয়া যায় বা তার শাড়ীর আঁচল দেখা যায়।

দীর্ঘ বিরহের পর হারাধন ও রতনের পুনর্মিলন মুহূর্ত্তে তার উপস্থিতিকে যদি তারা নিতান্তই আমল না দেয়!

ধীরে ধীরে পা ফেলে তিনি উঠান পার হয়ে উঠে গেলেন বারান্দায়, বারান্দা থেকে ধীরে ধীরে ঘরে উঠে তিনি অনেকটা স্বচ্ছন্দ ভাবে নিশ্বাস ফেলতে পারলেন। অদূরে দণ্ডায়মান বিস্মিত ও বিমূঢ় স্বামীর দিকে তাকিয়ে তিনি বেশ স্পষ্ট কণ্ঠেই ঘোষণা করলেন, "কৃষ্ণবল্লভকেও নিয়ে আসলাম। ওকে ফেলে আসা যায় না।"

হারাধন মোক্তার হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে খড়ম নিয়েই তাড়া করলেন। কিন্তু নিস্তারিণীকে নয়, কৃষ্ণবল্লভই তার লক্ষ্য। আর্ত্তনাদ করে বললেন, "ও হতভাগাকে এক্ষুনি দূর করে' দাও। ব্যভিচারের স্থান এ'টা নয়।"

তিনি নিস্তারিণীকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে বারান্দায় নেমে আসলেন। কিন্তু কোথায় কৃষ্ণবল্লভ! তাকে দেখাই গেল না! শুধু দেখা গেল, একটি নূতন কালো বিড়াল বারান্দা থেকে নেমে অশ্বশালার দিকে ছুটে চলেছে।

কাল্পনিক কৃষ্ণবল্লভকে মনে মনে যথেচ্ছ পাদুকাঘাত করে' হারাধন হৃষ্টচিত্তে ঘরে এসে চৌকিতে বসলেন।

কিন্তু এ সময় অকস্মাৎ অদ্বৈতর আবির্ভাব হ'ল। উঠানে দাঁড়িয়ে জামাই বাবুকে ডেকে সে বলল, "রতন এসেছে জামাই বাবু! রতনবাঈকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি।"

হারাধন যেন স্বর্গ হাতে পেল। কিন্তু ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য। বলল, "এসেছে? তা বেশ, কোথায় সে? নিয়ে এসো তাকে এখানে,—তোমার দিদিও যে একটু আগেই আসলেন!"

হারাধন মোক্তার আর কোন দিকে না তাকিয়ে কোন কথা না বলে' সোজা অশ্বশালায় প্রবেশ করলেন।

হাতের কাছে বিষ নাই যে নিস্তারিণী তা' পান করে' মৃত্যুর স্নেহ-আশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এমন কোন অস্ত্র নাই যা' দিয়ে তার পূজনীয় স্বামী ও স্নেহভাজন কনিষ্ঠ সহোদরকে আক্রমণ করে' প্রতিশোধ নিবেন।

অগত্যা যা নারী সমাজের সহজাত, সে অস্ত্রটি নিয়েই তিনি অগ্রসর হলেন। নাকি সুরে ক্রন্দন আরম্ভ করে' দিয়ে কৃষ্ণবল্লভকে ডেকে বললেন: "চল্ রে কৃষ্ণবল্লভ, এ মরণ-পুরীতে আমাদের থাকা চলবে না।"

সহজাত অস্ত্রটি ব্যর্থ হ'ল দেখে তিনি স্বামীর পরিত্যক্ত পাদুকাটি হাতে নিয়েই অশ্বশালার দোরে এসে দাঁড়ালেন। এ পাপ-পুরী ছেড়ে চলে যাবার আগে রতনবাঈকে ভাল রকমের শিক্ষা দিয়ে যেতে হ'বে।···কিন্তু সেখানে একটি অস্থিচর্ম্মসার অশ্বকে জড়িয়ে ধরে তার স্বামিপ্রবর বিনিয়ে বিনিয়ে কত কথাই না বলে চলেছেন।

পাদুকাটি এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিস্তারিণীও ঘোড়াটাকে এক পাশে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, "এসো রতনবাঈ, আমরা 'গঙ্গাজল' পাতাব।"

বাইরে দাঁড়িয়ে অদ্বৈত বিদ্রূপ করে বলল, "হাঁ, গঙ্গাযাত্রার পূর্ব্বে কাজটি সেরে রাখাই ভাল।"

স্বামি-স্ত্রী দু'জনেই ধমক দিয়ে উঠলেন: "এমন অলক্ষুণে কথা মুখে আনিস্ না অদ্বৈত। তুই যা, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়ার বই নিয়ে পণ্ডিত মশায়ের কাছে গিয়ে বোস্ গে। যোগ অঙ্কটা যে তোর এত দিনেও রপ্ত হ'ল না।"

দধীচি

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

প্রহ্লাদের আর পৈত্রিক গ্রাম না ছেড়ে উপায় রইল না বুঝি—; ভূমিহীন কিষাণের ঘরে উনিশ বছরের ছেলে প্রহ্লাদ, ওর মিশ্‌মিশে কালো রঙের ওর বিকট আকৃতিতে আদিম মানুষের পরিচয়টা সুস্পষ্ট রয়েছে, চোয়াল বের করা, উঁচু হাঁ মুখ আর উঁচু কপালের মধ্যে চওড়া নাক আর কোটরগত চোখ দু'টিতে ঠিক ওকে গরিলার মত দেখতে মনে হয়।

ওর বাপ গোবিন্দ মণ্ডল তিন-পুরুষ বংশানুক্রমে বর্গা জমীতে ভাগে চাষ-আবাদ করছিল, অর্ধেক ফসল ওরা ঘরে তুলে আনে। উদ্‌বৃত্ত অর্ধেক জমীর মালিক জোতদারকে পৌঁছে দিয়ে আসে।

বঞ্চিত মানুষের আকাশে আকাশে যে স্তূপাকার মেঘরাশি পুঞ্জিত হয়েছিল, ইতিমধ্যে ঘন দুর্য্যোগ নেমে এল। তেভাগা আন্দোলনে বিপ্লবী ঝড় উঠলো,—কিষাণ-মজদুরগণের উচ্ছ্বাস আর আনন্দের অন্ত নেই, এবার ওরা জীবন-জীর্ণ করা শ্রমের যোগ্য পুরস্কার পাবে,—ফসলের তিন ভাগ গোলায় তুলতে পারবে।

হৈমন্তিক ধান কাটা সুরু হয়েছিল, ইতিমধ্যে জমীর মালিক জোতদার সতীশ চৌধুরী পুলিশ নিয়ে মাঠে এগিয়ে এল। পুলিশ-পেয়াদার জুলুম-বাজ, নির্মম অত্যাচারের নির্য্যাতনকে প্রতিরোধ করবার সাধ্য কি দুর্বল চাষী গোবিন্দ মণ্ডলের,—সতশ জোতদার পুলিশের সাহায্যে দূর-দূরান্তর থেকে কিষাণ-মজদুর আনিয়ে হৈমন্তিক পাকা ধানে গোলা ভর্ত্তি করে ফেললো। জাগরণের জোয়ার বুঝি ভূমিহীন চাষী গোবিন্দ মণ্ডলকে উন্মত্ত প্লাবনে দিশেহারা করে তুলেছিল,—সে জোতদার সতীশ চৌধুরর জমী বে-আইনি দখল করতে যেয়ে, তার গোলার ধান লুঠ করতে যেয়ে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের কবলে বন্দী হয়ে গেল।

ভূমিহীন কিষাণের ছেলে উনিশ বছরের প্রহ্লাদের সম্মুখে নিরন্ধ্র অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে এল। জননীকে বললো—"ইবারে আমারে যাতি দে'মা বিদেশে, টাকা রোজগার করা তোলাগবি,—মালদয়ে হারাণ কাকারে পত্তর দি,—তেনা একডা কাম ঠিক করায়ে দেবনা—"

সাতভাবারা জী কল্পিপ্রিয়া কী উত্তর দেবে? গ্রাম্য রমণী সে; অন্তরে ব্যাকুলতা, দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ ওর অসহা মুখের রেখায় নৈরাশ্যের ভাবব্যঞ্জনায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

অস্ফুট কণ্ঠে সে বললে—"মানুষটারে ধরি লইয়া গেল। কে জানে কবে ছাড়ান দেবানে,—বিদেশে তুরে যাতি তো হবি, হারাণরে পত্তর পাঠায় দে—"

হারাণ মণ্ডল এই গ্রামেই কৃষকদের ছেলে। ওর বিঘে কয়েক জমী ছিল, বার বার দুই বার যখন প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে ফসল ঘরে তুলতে পারলো না, সেই সময় ওদের গ্রামের ননী সান্যাল শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়ে মালদহে বসবাস করবার আয়োজন করছিল। এই সময় নিঃসঙ্গ হারাণ ননী সান্যালের সঙ্গী হয়ে বলেছিল—"ঠাকুর মশায়, কার লাগি আর গাঁয়ে থাকতি হবি কয়েন,—জমীতে ফসল নাই,—বউটাও মারা পড়লো—"

ননী সান্যাল শ্বশুরের সম্পত্তির সঙ্গে খান পাঁচ-ছয়েক এক্কা গাড়ীও পেয়েছিল। হারাণকে সে গাড়োয়ানের কাজে নিযুক্ত করে নিয়েছিল।

দিন কয়েকের মধ্যে প্রহ্লাদ হাটে যেয়ে হারাণের চিঠির উত্তর নিয়ে এল।

হারাণ লিখেছে—"ঠাকুর মশায়ের একখানা গাড়ী আস্তাবলে পড়ি রয়েছে,—তুই যদি আসিস, কামটা হয়ে যাবানে—ত্রিশ টাকা বেতন খাওয়া-পরা পাবানে।"

ভূমিহীন নিঃস্ব প্রহ্লাদের কী আর আপত্তি থাকতে পারে? কূল-হারানো অথৈ জলে ও যেন তৃণখণ্ড লাভ করলো, জননীকে বললো,—"গাঁয়ের পিরত্তিবেশীদের তুকে দেখবার লাগি কয়ে দিলাম। পত্তর পাঠাস,—বাবার কত দিনের হাজত-বাস হবি, খবর জানাস,—আমি বেতন পালি তুরে পাঠায়ে দেবানে।"

নিরুত্তর হরিপ্রিয়া কী উত্তর দেবে? আসন্ন নিঃসঙ্গতার একটা অব্যক্ত রিক্ততা যেন মাকড়সার জালের মত ওর চতুর্দ্দিকে বিস্তার করেছিল,—অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর,—মূক ওষ্ঠপ্রান্ত, সে নিঃশব্দ অশ্রু-সজল দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

° ° ° °

গ্রাম্য প্রহ্লাদের দূরান্তরের যাত্রা—

ভাগীরথী ও গঙ্গার শাখা-প্রশাখা নদ-নদীগুলি অতিক্রম ক ইছামতী ও ভৈরবের প্রান্ত বেয়ে, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, রাজসাহী প্রভৃতি জেলাগুলির সীমানা ছাড়িয়ে, সীমাহীন উত্তাল তরঙ্গায়িত পদ্মা নদীর গৈরিক স্রোতে শীর্ণা মহানন্দার নীলাভ জল যেখানে এসে মিশেছে,—তারই উপকূলে মালদহের প্রান্তে প্রহ্লাদের বিপর্যস্ত ভাগ্য-তরণী এসে ভিড়লো।

সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশ অনভ্যস্ত জীবনযাত্রা! লাঙ্গল ছেড়ে প্রহ্লাদ এবার ঘোড়ার লাগাম ধরলো।

হারাণ বললো,—"দিন কয়েক আমার সাথে সাথে যাবানে,—পথ-ঘাট চিনি নিতি পারবানে,—লাগামও দুরস্ত হয়ে আসবানে।"

প্রহ্লাদের গরিলার মত বিকৃত আকৃতি মুখ খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো,—ছোট্ট ছোট্ট চোখ দু'টি বার বার ওঠা-নামা করছিল

ননী সান্যাল মহকুমা মোক্তার,—প্রচুর সম্পত্তি,—পাঁচ-সাতখানা টাঙ্গা গাড়ীর মালিক সে,—প্রকাণ্ড বাড়ী,—এক প্রান্তে ঘোড়ার আস্তাবল,—গাড়ীর ঘর,—গাড়োয়ান-সহিসের খুপরিগুলি নিয়ে একটি ছোট-খাটো বস্তি গড়ে উঠেছে।

ভূমিহীন কিষাণ প্রহ্লাদ, টাঙ্গা গাড়ীর গাড়োয়ান হয়েছে, বিস্তৃত উন্মুক্ত মাঠে কয়েক দিন গাড়ী চালিত করে লাগাম-অনভ্যস্ত হাত সে আয়ত্তাধীন করে নিল, বন্য ঘোড়ার শীর্ণ গায়ে মমতার হাত বুলিয়ে নিয়ে তাকে নিকট-আত্মীয়ের মত আদর করতে লাগলো।

তবে ওর বিপর্যস্ত ভাগ্যের প্রভাবে বুঝি ঘোড়াটির ডান দিককার পায়ে একটি ঘা ছিল,—সেই ক্ষতস্থানটির প্রতিও প্রহ্লাদের যত্নের অন্ত রইল না।

হারাণ ওকে সতর্ক করে দিয়ে বললো "মঙ্গলবার করি পশুর ডাগদর বড় সড়কের ধারে দাঁড়ায়ে রবানে, উরে এড়ায়ে যাতি চেষ্টা করবানে। গলার স্বর নামিয়ে আরও চুপি-চুপি হারাণ বললো—"যদি ধরা পড়িস লাইছেন্স কাড়ি নিবে,

— [illegible]—"

একটু ভয় পেয়েছিল বৈ কি প্রহ্লাদ,—গরিলার মত ওর ছোট চোখ দু'টি ভীরু-চঞ্চল হয়ে উঠলো,—একটু আক্ষেপ প্রকাশ করে বললো,—"খোঁড়া ঘোড়া কেউ নিতে চায় না,—তাই আমারে গছায়ে দিলি? আমি গাঁয়ের বোকা-হাবা ছাওয়াল কি না?"

হারাণ ব্যস্ত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলে উঠলো—"না না, তা লয় রে, তুই পথ-ঘাট না চিনস,—দূরে দূরান্তে যাতি পারবানে ভাই মালিক ইটা তুরে দিবার লাগি কইল"।

নিরীহ প্রহ্লাদের গ্রাম্য মন এই যুক্তিকেও সমর্থন করতে পারলো না; আবার সে আগ্রহ প্রকাশ করে প্রশ্ন করলো—"মালিক ধনী লোক, আর একটা ঘোঁড়া কিনতি পারি,—সব ডাগতর তো ঘুস না লয়, যদি বা গাড়ী-ঘোড়া দখল করি লেয়?"

হারাণ বললো—"বড়লোকের মতি আমরা না বুঝি,—তুই না ঘাবরাস, মঙ্গলবার করি দুপুরের সময় সড়কের ধারে না যাস—ধরা পড়বার ভয় নাই।"

প্রহ্লাদ ক্রমশ সদরের গন্তব্য স্থানগুলি জেনে নিল,—থানা, আদালত, ব্যাঙ্ক, বাজার ইত্যাদিও যাতায়াত করে,—পশু-চিকিৎসকের গতিবিধি সে আয়ত্তাধীন করে নিয়েছিল,—আত্মগোপন করবার কৌশলটা তাই সহজ হয়ে এসেছিল।

প্রত্যহ সে দশ কী বা বারো টাকা উপার্জন করে,—মালিকের হাতে তুলে দেয়, ত্রিশ টাকা বেতন বাড়ীতে মা'কে মণি-অর্ডার যোগে পাঠায়

হরিপ্রিয়া প্রায় তাকে চিঠিতে জানায়,—"ত্রিশ টাকায় একটা প্রাণীর স্বচ্ছন্দে না হোক, কায়ক্লেশে চলে,—চালের দাম ক্রমেই বেড়ে চলেছে,—বাড়ীর খাজনার জন্যে পেয়াদা অত্যন্ত জুলুম সুরু করেছে—"

সেদিন বিকেল বেলা আস্তাবলে গাড়ী তুলে দিয়ে প্রহ্লাদ নিবিষ্ট মনে যেটুকু অক্ষর পরিচয় ছিল, তারই সাহায্যে বানান করে, মা'র একখানা চিঠি পড়ছিল।

প্রহ্লাদ নূতন গাড়োয়ান, সকাল দশটায় গাড়ী বের করে,—পাঁচটায় আবার তুলে দেয়, কিন্তু পুরাতন গাড়োয়ানদের গাড়ী চালনা সম্বন্ধে কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই।

এই সময় হারাণ বাইরে গাড়ী রেখে ঘরে ঢুকলো, গাঁজায় সে কয়েকটা টান দিয়ে খানিকটা শ্রমশক্তি সঞ্চয় করে নেবে।

গাঁজার কলকেতে কয়েকটা টান দিয়ে হারাণ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞেস করলো—"গাঁয়ের কী খবর রে?"

"খবর ভালো নয় হারাণ কাকা"—বিমর্ষ ম্লান মুখে প্রহ্লাদ বললো,—"খাজনা ইবার না দিতে পারলি ভিটে-মাটি খাস হয়ে যাবে"

বলতে বলতে প্রহ্লাদের বিকৃত আকৃতির কালো রঙের মুখ ঔৎসুক্যের আতিশয্যে চঞ্চল হয়ে উঠলো,—"হারাণ কাকা, প্রচুর টাকা উপায় করতি হবি, একটা পথ কয়ে দেবার পারবানে—"

গাঁজার কলকেতে আরও দু'টি সজোর টান দিয়ে হারাণ

লো—"পারবানে ক্যান? ঘাটের মড়ার লাগি গতর বিলায় দে,—প্রচুর অর্থ কামাইতে পারবানে,—বিহান বেলা মনিবের কাছে গাড়ী জমা নেবানে,—ঘোড়ার দানা-পানি লিয়ে লবানে সাথে; বহু দূরে, গ্রামের মধ্যি চলি যাবানে, রোজ বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ টাকা পাবানে,—মালিক টাকা-পিছু চারি আনা তুরে কমিশন দেবানে।"

প্রতি টাকায় চারি আনা কমিশন,—মনে মনে হিসাব-নিকাশ করলো প্রহ্লাদ, আশাতীত অর্থ সে উপার্জন করতে পারবে,—মুখ খুশির প্রাচুর্যে উজ্জল হয়ে উঠলো; তবু একটু চিন্তা-বিবর্ণ মুখে সে বললো—"ক্ষুধার সময় ভাত না পালি যে খাটতে যে না পারি হারাণ কাকা,—শরীরডা কেমন যেন অবশ হইয়্যা আসতি চায়—"

হারাণের বহুদূর গ্রামান্তরে আদালত ফেরত আরোহীদের নিয়ে যেতে হবে, ত্রস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বললো—"তু নিশ্চিন্ত র, তুরে আমি খাটবার কৌশল শেখায়ে দেবানে—"

গাঁজার কয়েকটি টানে প্রভূত দৈহিক শ্রম-শক্তি অর্জন করে নিয়ে হারাণ বাইরে বের হয়ে পড়লো।

এই সময় মালিক মোক্তার ননী সান্যালের ভৃত্য কয়েক জন নূতন গাড়োয়ানকে জানাল, "ওরা স্নান করে নিক্—ভাত আনবে পাচক ঠাকুর।"

এক দিকে ঘোঁড়া ও গাড়ীর আস্তাবল, অপর দিকে গাড়োয়ান ও সহিসদের ছোট-ছোট খুপরী ঘর,—মধ্যেকার ছোট নোংরা প্রাঙ্গণে কয়েক জন গাড়োয়ান খেতে বসেছে, মোটা রাঙা চালের ভাত,—পাতলা ডাল, একটু চচ্চড়ী,—তাই ওরা পরম পরিতোষের সঙ্গে খাচ্ছে,—পাচক ঠাকুর পরিবেশন করছে, আদালত-ফেরৎ ননী মোক্তার তদারক করে করে বেড়াচ্ছেন। প্রহ্লাদ এক সময় চুপি-চুপি বল্লো—"বাবু খুব ভালো, ভাবতার মত জন-মজুরের প্রতি দয়া—"

পাচক ঠাকুর মনিবের তত্বাবধানে পরিবেশন করতে রাজী নয়, তাই সে নিম্ন কণ্ঠস্বরে আহ্লাদের কথার উত্তর দিয়ে বল্লো—"দয়া না করলে বাবুর ব্যবসা যে অচল হয়ে যাবে,—বাবুরা নিজেরা তো আর লাগাম ধরতে পারবে না—তবু ভালো খাদ্য তো তোরা কিছুই পাস না—"

আস্তাবলে তখন ঘোড়ার খুরের আর হ্রেষা রবের একটা সম্মিলিত শব্দ শোনা যাচ্ছিল, পরিশ্রান্ত ঘোড়াগুলিও তৃপ্তির সঙ্গে দানা চিবুচ্ছিল। আস্তাবলের দুর্গন্ধ অন্ন-ব্যঞ্জনের সুগন্ধকেও যেন বিষাক্ত করে তুলেছিল।

* * * *

অসাধারণ দৈহিক শ্রমশক্তি অর্জ্জন করবার গোপন কৌশলকে আয়ত্তাধীন করতে প্রহ্লাদের দেরী হয়নি।

প্রভূত অর্থ ওকে উপার্জন করতে হবে,— পিতা অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্দী, কবে মুক্তি পাবে, তার জানা নেই,—ভিটে-মাটির খাজনা পাঠাতে হবে, তা নাহলে ঘর-বাড়ী খাস হয়ে নিলামে উঠে যাবে।

কৃতিত্ব হেসে হারাণ বলেছিল,—"এবারে পিছলেদ আর ভাবনা নাই রে, তুই ঘাটের মড়া বনে গেছিস, যত খুশি খাটতে পারবানে, এক ফোঁটা পিপাসাও তুর ঠাওর হবিনে।"

সত্যিই তাই।

প্রহ্লাদের বিড়ি ছাড়া আর কিছুই নেশা ছিল না,—সকালে সে কয়েক কলকে গাঁজায় টান দেয়,—একটু ভাঙ,—সন্ধ্যের পর গাড়ী তুলে দিয়ে এক বোতল মদ নিঃশেষে পান করে।

প্রহ্লাদ যেন মৃত সঞ্জীবনী সুধার সন্ধান পেয়েছে,—একটু জলের পিপাসা, একটু ক্ষুধা সে অনুভব করতে পারে না,—ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ী চালায়, সদর, মহকুমা পার হয়ে, দূর-দূরান্তরে, গ্রাম-গ্রামান্তরে যায়,—পরিশ্রান্ত ঘোড়া দানা খায়, জল পান করে কয়েক বার,—মুখে যখন তার ফেনা নির্গত হয়,—গাছের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করে, কিন্তু প্রহ্লাদ মধ্যাহ্নের তপ্ত রৌদ্রে শীতল জলের কূপের পাশে দাঁড়িয়েও এক ফোঁট জল পান করে না।

প্রহ্লাদ নিজেও এই সঞ্জীবনী সুধা—মদ, ভাঙ আর গাঁজার প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞ,—এই নেশাই তাকে অসীম দৈহিক শ্রম-শক্তি দিয়েছে,—ক্ষুধা-পিপাসা সে অনুভব করতে পারে না। প্রচুর অর্থ উপার্জন করে, টাকা-প্রতি চার আনা কমিশন সে পায়,—যদি তার অভিরুচি হয় অনেক টাকাই সে মালিককে ফাঁকি দিতে পারে,—কিন্তু গাড়োয়ান সে কিন্তু চোর নয়, মালিক ননী মোক্তার ওকে প্রত্যেক দিন নেশার জন্যে তিনটে টাকা হাতে তুলে দেয়;—জীবনের বিনিময়ে ওরা অর্থ উপার্জন করুক না কেন। মালিক ননী মোক্তার গাড়োয়ানদের অপরিসীম ভালোবাসে। দিন ও রাত্রির মধ্যে একবার সে ভাত খায়,— যত রাত্রে সে ফিরুক না কেন,—পাচক ঠাকুর ওর ভাত গরম রাখবেই।

অনেকগুলি অর্থ সঞ্চয় করেছে প্রহ্লাদ, খাজনা বাবদ দেনাগুলি ডাকযোগে পাঠাতে সে ভরসা পায় না। গ্রামে তস্কর ডাকাতের দলের অভাব নেই। ও নিজে ছুটি নিয়ে দেশে যাবে।

ওরা—গাড়োয়ানরা পর্য্যায়ক্রমে ছুটি পায়,—আবদুল গণি ফিরলে সে দেশে যাবে।

দিন এগিয়ে চলে—

সেদিন প্রহ্লাদ দূরান্তর যাত্রার এক বায়না পেয়েছিল,—কয়েক জন সহরের আরোহী নিয়ে ওকে ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য স্থান গৌড় যেতে হবে, ঘোড়ার ক্ষতস্থানে মলম লাগিয়ে তার দানা ও জল সঙ্গে নিয়ে রাত্রি তিনটের সময় সে বের হয়েছে। নিজে এক কলকে গাঁজা টেনে নিয়েছে।

দুই সারি রোপিত আম্রকুঞ্জের মধ্যে দিয়ে শীর্ণ ঘোড়া ছুটে চলে, থেকে থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দাঁড়িয়ে যায়—প্রহ্লাদ ওকে চাবুকের পর চাবুক আঘাত করে তবু সে নড়ে না,—আবার আঘাত,—তবু অনড় অচল ওর পা দুটি! প্রহ্লাদ ভাবে,—এই পশুগুলো কেন মদ গিলে দৈহিক শক্তি অর্জ্জন করতে শিখেনি।

[illegible] রাস্তা প্রহ্লাদ পরিভ্রমণ করতে

চেয়েছিল, তা হয়ে উঠলো না,—পশুর স্বাধীন চলার উপর সে হস্তক্ষেপ করতে পারলো না,—স্বাধীন বাঙলার স্মরণীয় রাজধানীর ভগ্নস্তূপ,—গড় আর পরিখা-বেষ্টিত জঙ্গল-আকীর্ণ গৌড়েশ্বরের রাজ-প্রাসাদের প্রান্ত ঘুরে সন্ধ্যের প: সে আস্তাবলে ফিরলো।

মহানন্দার নীল জলের তীরে সে আরও তিনটি যাত্রী পেয়েছিল, কিন্তু বিদ্রোহী ঘোড়ার স্তব্ধ পা দু'টি অনড় অচল—এক ইঞ্চিও সে আর নড়বে না। বাড়ী পৌঁছে আস্তাবলের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে প্রহ্লাদ হঠাৎ জননীকে দেখে একান্ত ভাবে চমকে উঠলো—"এ কি মা, তুই,—হেথায় আলি যে?"

"কী করি বাপ—" ম্রিয়মাণ মুখে হরিপ্রিয়া বললো—"বাকী খাজনার লাগি প্যায়দা আসি বাড়ী-ঘর পোড়ায়ে দেয়া গেলনে,—প্রাণডা লয়ে পথের মানুষরে শুধাইতে শুধাইতে তুর কাছে পালায়ে আলাম—"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে প্রহ্লাদ ঘোড়ার সাজগুলি খুলতে সুরু করলো। হরিপ্রিয়া অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললো—"তু খাটে আলি, সহিসকে দে, উ ইবার করবানে।"

প্রহ্লাদ ওর গরিলার মত বিকৃত আকৃতি মুখে একটু হেসে বললো—"আট ক্রোশ রাস্তা লয়ে যাতি যে :বুক উরে কষছি,—আমারেই সবগুলা বেদনা নামায়ে দিতি হবানে—নতুবা মুখে উ দানা না কাটবি,—ঘোড়া শুকায়ে গেলে বাবু রাগ করবানে—" এবার প্রহ্লাদ ঘোড়াটিকে দলাই-মলাই করতে সুরু করলো।

মা এবার দুঃখ প্রকাশ করে বললো—"তু রাত তিনডা থাকৃতি বার হয়েছিস্, প্যাটে কিছু নাই—চান করে মুখে দুডা ভাত দে বাবা—"

মৃদু হেসেই প্রহ্লাদ বললো—"আমারে কথা ছাড়ি দাও মা,—ক্ষিদে-তেষ্টা ভুলায়ে গিছি,—ব্যাটের মড়া ছাড়া মুই আর কিছু লয়—"

মা আর কী বলবে? নিরুত্তরে শ্রান্ত পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে বুঝতে পারে না, প্রহ্লাদ এত কর্মক্ষমতা কী উপায়ে অর্জন করলো? পান্তা হোক্ বাসি হোক্—দিনে তিন বার ভাত না পেলে যে হাল-আবাদ করতেই পারতো না।

ইদানিং হরিপ্রিয়াকে এমনি ধাক্কা প্রায় পেতে হয়—আস্তাবলের পাশেই বস্তির মধ্যে সে ঘর ভাড়া নিয়েছে,—মা ও ছেলে থাকে। ননী মোক্তার প্রহ্লাদের খোরাকী বাবদ টাকা নগদ দিয়ে দেয়। হরিপ্রিয়া সকালে পুত্রকে করকরা ভাত দিতে যেয়ে আবার আঘাত পায়। প্রহ্লাদ বলে—"বিহান বেলা ভাত খালি ছরীর ভারী হয়ে যাবানে,—গাড়ী হাঁকাতে না পারব—" মায়ের দৃষ্টির আড়ালে যেয়ে কয়েক কলকে গাঁজা টেনে প্রভূত শ্রমশক্তি অর্জন করে নেয়,—তার পর এক গেলাস ভাঙ, সন্ধ্যের পর এক নিশ্বাসে এক বোতল মদ নিঃশেষে পান করে স্নায়ুতে স্নায়ুতে পরম তৃপ্তির এক অনুভূতি;—ও গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়ে। জেগে উঠে স্নান করে যখন সমস্ত দনের পর একবার ভাত খায়,—মা ওর দিকে বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না—প্রহ্লাদ এই অমানুষিক শ্রম করবার প্রভূত শক্তি কী উপায়ে অর্জন করলো? হরিপ্রিয়ার জানা ছিল না, এমনি করেই এক দিন দধীচি মুনির পুণ্য হাড়ে বজ্র নির্মিত হয়েছিল, সেই বজ্রেই দেবরাজ ইন্দ্র মহাবলশালী দানবরাজ বৃত্রকে সংহার করেছিলেন।

আস্তাবলে ঘোড়ার খুট্-খুট আর হ্রেষা রবের সম্মিলিত শব্দ নির্জন পল্লীকে চকিত করে তুলছিল। এই মূক পশুগুলো কবে প্রাচুর্য নেশার বিনিময়ে প্রভূত দৈহিক শ্রমশক্তি অর্জন করে পুঁজিপতিদের সঞ্চয়ের ঘর স্ফীত আর সমৃদ্ধ করে তুলবে? সে কবে?

আশাবাদী

অরুণবরণ চক্রবর্ত্তী

অবসন্ন দেহ-মন: রণক্লান্ত সৈনিকের মত।
রাত্রির শিবির ঘিরে যদিও শুক্লজ্যা ধীরে নামে
আঁধারের কোল ঘেঁষে, তবু মনে ঝড় অবিরত
কোথা শান্তি আমরণ সংগ্রামের ক্ষণিক বিরামে।

ভোর হয়—সূর্য্য জাগে—সুরু হয় লড়াই দিনের।
বাঁশী শুনে কলে ছোটা: কিংবা অফিসের ঘানি-ঘরে:
কন্টোলের নিত্য জ্বালা: রোগ হলো ডাক মরণের:
তার পর সাম্প্রদায় হানাহানি—গ্রামে ও সহরে।

এই তো জীবন আজ: মাধুর্য্যের কণা মাত্র নাই।
আশা নাই:—ভাষা নাই স্বপ্ন সব ঝরে গেছে মরে।
সব চেয়ে বড় যেন কোন মতে নিছক বাঁচাই।
প্রাণ থেকে উদ্দীপনা নিঃশেষে গিয়েছে তাই ঝরে।

রাহুগ্রস্ত এ জীবন রাহুমুক্ত হবে এক দিন
তবু মনে এই আশা একেবারে হয়নি বিলীন।

ফল্গু নদী

শ্রীপ্রশান্তি দেবী

হাসপাতালের অভিজ্ঞতা মোটের উপর মন্দ লাগছে না অঞ্জনার কাছে। পান্থশালার মত এখানেও আনা-গোণার শেষ নেই, কত জন আসছে যাচ্ছে, সকলের সঙ্গে আলাপ জমানই কি আর সম্ভব? নিজের বেডে শুয়ে শুয়ে আশে-পাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে তার ভারি ভাল লাগে। ছ'টার মধ্যে সব রোগীদের হাত-মুখ ধুইয়ে গা মুছিয়ে দেওয়া হয়। আটটার আগে থেকেই ডাক্তার বাবুর দল আসতে থাকেন, কেবিনের মেয়েটিকে 'পেনিসিলিন' দেওয়া হচ্ছে—তার গন্ধ ভেসে আসতে থাকে। টুং-টুং করে কোথায় যেন ঘণ্টা বাজে, সিস্টারের দল একে একে বদলে যায়।

বাসি বিছানার উপর বসে, বাসি কাপড়েই দুধ-রুটি খেতে হয়। অঞ্জনার কাছে এক এক সময় কেমন-যেন আশ্চর্য্য লাগে, বাড়ীতে থাকলে সে নিজে তো বটেই, শ্যামলকে পর্য্যন্ত ভোরে স্নান করিয়ে তবে রান্নাঘরের দিকে পা দিতে দিত।

সিস্টারদের সঙ্গেও একটু একটু করে আলাপ হয়ে যাচ্ছে। অঞ্জনার প্রকৃতিটি মিশুক—আর ওদেরও কি আর সব সময় কাজ করতে বা মুখ বন্ধ করে বসে থাকতে ভাল লাগে? মানুষ তো সকলেই।

ওয়ার্ডের কোল ঘেঁসে লম্বা বারান্দা চলে গিয়েছে, সেখানে দাঁড়ালেই সামনের খোলা জায়গাটুকুর দিকে লক্ষ্য পড়ে সবুজ ঘাসে-ঢাকা ছোট্ট এক ফালি মাঠ, দু'পাশ দিয়ে সাজান ফুলের গাছ। ভাঙ্গা একটা টুলের উপর বসে অঞ্জনা বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল।

ডিউটী শেষ হয়ে গেছে। কোয়ার্টারে ফিরে যাবার আগে আশা সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করছিল একটু দূরে দাঁড়িয়ে। অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে ভারি মায়া হ'তে লাগল, আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এল, ষ্টাফ দেখলে বকুনি জুড়ে দেবেন—পেসাণ্টদের সঙ্গে কথা বলা তাঁর পছন্দসই নয়।

"কি করছেন একা-একা বসে?" আশা হাসল, "ভাল লাগছে না বুঝি?"

অঞ্জনাও হাসল একটু। তারও আশাকে ভারি ভাল লাগে। ওর চেহারা থেকে সুকুমার ভাবটা আজও মুছে যায়নি, কথার ভাবে একটা আন্তরিকতার ভাব আছে—যেটা অন্যদের কাছে নিতান্ত দুর্লভ।

"কত লোক আসছে, যাচ্ছে, তাই দেখছিলাম। সারা দিন একা একা বসে বসে ভাল লাগে না।"

"বই-টই পড়েন না কেন ? পড়বেন ?"

"দিন্ না, আমার কাছে আর বই নেই, থাকলে কি আর শুধু শুধু বসে থাকি ? বই আমার ভারি ভাল লাগে।"

"আচ্ছা দেখ ছি—লাইব্রেরীটা খোলা আছে কি না।" হাত মুছতে মুছতে আশা চলে গেল, একটু বাদে খান-দুই পুরানো প্রবাসী এনে দিল।

সেখানে বসেই অঞ্জনা প্রবাসীর পাতা ওল্টাতে লাগল। ক'টা বা পাতা আছে ? এক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ করে ফের বারান্দার ধারে এসে বসল।

"এখানে বসে আছেন যে"—কর্কশ গলায় কে বলে উঠল, "যান্, আপনার বেডে যান্ বারান্দায় ঘুরতে কে বলুলে ?"

অঞ্জনা অবাক্ হয়ে তার দিকে তাকিয়েই বুঝল ইনিই প্রবল প্রতাপান্বিতা ষ্টাফ সরোজা। রূঢ় আচরণ আর কটু ভাষণের জন্য এঁকে কেউ পছন্দ করত না। নার্স'রা সকলেই তাকে যমের মত ভয় করে—আর রোগীদের তো কথাই নেই। শুধু অঞ্জনার কেমন যেন একটা দুঃখ বোধ হত সরোজার জন্য। বকাবকি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে বেচারা যখন দু'-এক মুহূর্ত্তের জন্য বারান্দায় নিঃসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন তার চশমা-ঢাকা কঠিন দৃষ্টি পর্য্যন্ত এমন অসহায় হয়ে ওঠে যা দেখলে দুঃখ বোধ হয়। যেন প্রথম জীবনে বহু আঘাত পেয়ে পেয়ে জীবনের মধ্যাহ্নে এসে রীতিমত পাকা-পোক্ত হয়ে উঠেছেন। এমন কি, চেহারাতেও একটা কঠিনতার ছাপ পড়ে গেছে। ওর বিসদৃশ আচার-ব্যবহারের ভিতর থেকে শুধু এই কথাটাই জানিয়ে দেয় যে, সে কত-বড় অসহায় স্বজন-হীন! রাগ করতে যেয়েও অঞ্জনা রাগতে পারল না, আস্তে আস্তে টুল ছেড়ে উঠে পড়ল।

সরোজাই ফের বললে, "যান, খেয়ে শুয়ে থাকুন গে। পড়ে-টড়ে আবার আমাদের সুখ বাড়াবেন না!"

"না, পড়ব কেন ?" মৃদু ভাবে একটু প্রতিবাদ করতে না করতেই সরোজা প্রায় গর্জ্জন করে উঠল,—"না পড়ব কেন ? ন্যাকা, কোত্থেকে সব বুনো এসে জোটে তা কে জানে ? আজই আমি আর, এসকে বলব, এমন করলে কি আর মানুষে পারে ? যত সব—" বকতে বকতেই ওয়ার্ডে ঢুকলো।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ওয়ার্ডটা একেবারে নিঃস্তব্ধ হয়ে গেল। অঞ্জনাই বসে থেকে কি করবে ? নড়তে-চড়তে গেলে প্রতি পদে যদি তাড়া খাবার ভয় থাকে তাহলে ঘুমের আরাধনা করা অনেক বেশী বুদ্ধির কাজ হবে। অবশ্য এদের কথাবার্ত্তা যে তার কাণে এসে পৌঁছাতে না লাগল এমন নয়।

"আশা, চল্লিশ নম্বরকে এনিমিয়া দিয়েছিস্ ?" ঘুরতে ঘুরতে সরোজা চল্লিশ নম্বরের মাথার কাছে একটু থামল।

আশা ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল, "কাল রাত্রি থেকে ওঁর পেন আরম্ভ হয়েছে যে—"

"তাতে এনিমিয়া বন্ধ রাখতে কে বললে তোকে ? চার্টে যখন লেখা আছে, তখন পেসাণ্ট মরল কি বাঁচল তা দেখবার [illegible] কি ? দিয়ে দে।"

তবুও আশা ইতস্ততঃ করছে দেখে সরোজা ধমক দিয়ে উঠল, "এটা দয়া-মায়ার জায়গা নয়, এটা হাসপাতাল। অত যাকে বিবেচনা করতে হবে, সে আসে কেন এখানে ? সব সময় মনে রাখবি, ওরা মরুক্—ভুগুক্, তোদের দেখবার দরকার নেই। শুধু নিজের ডিউটী করে যাবি।"

আশা আর কি বলবে ? সরোজার একটা রিপোর্টের উপর তার চাকরীর স্থায়িত্ব নির্ভর করছে। সেও গরীব গৃহস্থের মেয়ে, বাড়ীতে বুড়ো মা, অসুস্থ বাবা, ছোট ভাই-বোন আছে, কোন মতে চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হলে সে-ই কি আর এখানে চাকরী করতে আসত ?

এনিমিয়া দেওয়া সুরু হল, ওরা নির্ব্বিকার। কেবল রোগিণীর কাতরানী শুনতে শুনতে অঞ্জনার চোখে জল এসে গেল। আর কিছু করা যেত না ? আধুনিক চিকিৎসার এত প্রণালী বেরোচ্ছে কিন্তু কষ্টভোগটা কমে না কেন ?

সন্ধ্যার সময় সরোজা ঘণ্টাখানেক ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়াত। দাই বুড়ী ওকে মোটেই দেখতে পারত না, বলত "ডাইনী বুড়ী সব সময় খিটি-খিটি করবেই করবে।"

তেতাল্লিশ নম্বরের ছেলে হয়েছে, ভারি সুন্দর। বেড়ে এসে পর্য্যন্ত ফুলো-ফুলো গালে প্রায় বুজে-যাওয়া পাপড়ির মত চোখ মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দাই, নার্স, অন্য রোগীরা ফাঁকমত এসে ওর সঙ্গে আলাপ করে যাচ্ছে। নূতন মা হবার আনন্দে মেয়েটির শুকনো মুখে আনন্দের আভাষ লেগে আছে।

"তোমার নাম কি গো দিদি ? খোকাটি হয়েছে যেন রাজপুত্তুর, আহা বেঁচে থাক্!"—জলের গ্লাস নিয়ে যেতে যেতে দাইটা থমকে দাঁড়াল। মেয়েটি হাসল একটু। অঞ্জনা উৎসুক হয়ে উঠল,—"ছেলের নাম রাখবে কি ভাই ? যেমন ছেলে, তেমনি নাম হওয়া চাই তো আবার—নইলে মানাবে কেন ? কি বল গো দাইমা ?"

সারা দিন কাজ আর হরেক রকম ফরমাস খেটে-খেটে ক্লান্ত দাইমা সুযোগ পেলেই এদের কাছে এসে গল্প জমাত, কথা বলবার সুযোগ পেয়ে এক-গাল হেসে উত্তর দিল, "ঠিক বলেছ দিদি—ঠিক বলেছ।"

নিজের দুঃখ-কষ্ট আর হাসপাতালের বর্ণনা দিতে দিতে দাইমা এদের প্রায় মুগ্ধ করে ফেলেছে, এমন সময় সরোজার চোখে সেটা ধরা পড়ল—"যা ভেবেছি তাই গল্প জুড়ে দিয়েছেন সবাই মিলে। জানেন এটা হাসপাতাল, আড্ডা দেবার জায়গা নয়। এই দাই, তোর কোন কাজ নেই ?"

অঞ্জনা চুপ করে রইল কিন্তু অন্য মেয়েটি পাড়াগেঁয়ে বউ, অত সহজে চুপ করবার পাত্রী সে নয়। তা ছাড়া তার মতে নার্স'রা যখন গৃহস্থ নয় তখন তাদের অবজ্ঞা করা চলে।

"কথা বললে কি হবে ?" বাসনা জিজ্ঞাসা করল।

অঞ্জনা তো অবাক্, সরোজাও। এ পর্য্যন্ত তার দিকে তাকিয়ে কেউ প্রশ্ন করতে সাহসই পায়নি, তাতে আবার

এমন অসঙ্কোচে। ভীষণ রেগে উঠল সে-ও—"নিয়ম নেই, তা জানেন?"

"কি করে জানব? আপনাদের আইন-কানুন একখানা করে ঝুলিয়ে দেন না কেন?" মেয়েটি ভ্রূ-কুঞ্চিত করে উত্তর দিল।

"আবার মুখেরউ পর কথা?" সরোজা রেগে ফেটে পড়ল প্রায়—"অত মেজাজ দেখাবেন বাড়ীতে পয়সা খরচ করে লোক রেখে। এখানে ও-সব ফাজলেমী খাটবে না।"

"আপনিও তো রুগী ঘাঁটবার জন্যে মাইনে নেন, মেজাজ দেখাবার জন্যে নয়, এটা জেনে রাখবেন।"

সরোজা আর কথা বাড়াল না, গট-মট করে বেরিয়ে চলে গেল। তখন দাই-টাই চুপি চুপি এসে বলে গেল—"ভাল করলে না দিদি, এসটাফ দিদি যদি বলে দেয় ডাক্তার বাবু তোমাকে ছুটি দিয়ে দেবে, এই বেলা ডেকে ঠাণ্ডা করে নাও।"

কিন্তু বেচারীর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল না, তাই মাপ চেয়ে মিটমাট করে নেবার আগেই তার মেয়াদ ফুরিয়ে গেল। শুধু তাই নয়, অন্য সকলেরও অসুবিধা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। অবশ্য অঞ্জনার বিশেষ কিছুই এসে-যেতো না, সে নিজেই চলা-ফেরা করে বেড়াতে পারত বলে। কিন্তু আর সকলেই ষ্টাফের উদাসীনতার ফল ভোগ করতে লাগল।

বত্রিশ নম্বরকে বেড-প্যান না দিয়েই সুশীলা বাড়ী চলে গেছে—এদিকে রাত্রির জমাদারণী দুলারী তখনও এসে পৌছায়নি। বেচারীর কি কাহিল অবস্থা—কাঁদ-কাঁদ হয়ে ডাকতে লাগল, "ও দিদিমণি, দিদিমণি, আমায় একটু দেখুন না, আমি আর থাকতে পারছি না।"

দিদিমণি এক-মনে নিজের কাজ করে যেতে লাগল, ও-সব বাজে ব্যাপারে নজর দেবার মত সময় তার এখন নেই। অঞ্জনা আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে এল—"আপনি আমায় ধরে ধরে যেতে পারবেন বাথরু-মে? তাহলে চলুন আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

অন্যদের ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে, তা ছাড়া নাসরাও বকতে পারে ভেবে দু'জনে খুব আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এল। মাঘ মাসের শেষ রাত্রি, অন্ধকারের রংটা তরল হয়ে আসছে, তার সঙ্গে বইছে ঠাণ্ডা হাওয়া। শীত যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে।

খানিকটা এগিয়ে দু'জনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনেই ক্যাপ্টেন চৌধুরীর পাশে একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে দাঁড়িয়ে সরোজা। ধরা পড়বার ভয়ে অঞ্জনারা দু'জনেই ঘুরে এল। আচ্ছা, এমন কেন হয়? ওরা কি উপায়হীন না প্রবৃত্তিই ছোট, কে জানে?

পরদিন সকাল বেলা। রোজকার মত অঞ্জনা বারান্দায় বেড়াচ্ছে। প্রতিদিনকার সূর্য্যোদয় ওঠা না দেখলে ওর তৃপ্তি হত না। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল সরোজা, আজ বোধ হয় মেজাজটা একটু ভালই ছিল—"কি? মর্ণিং ওয়াক করছেন না কি?"

অঞ্জনা ভীত কণ্ঠে বললে, "বসে বসে ভাল লাগে না কি না, আমার আবার বাড়ীতে অনেক কাজ করার অভ্যাস ছিল কি না।"

সরোজা একটু হাসল, "কি কাজ করতেন? রান্না-বান্না? সেলাই-ফোঁড়াই? জানেন এ-সব?"

অঞ্জনাও একটু হাসল, "গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, একটু না জানলে কি চলে? মোটামুটি সবই জানি, আছে না কি কিছু সেলাই আপনাদের? দিন্ না, করে দেব এখন।"

সরোজা জীবনে এমন সমীহ করে কাউকেই কথা বলেনি। "সেলাই করতে জানেন? করে দেবেন? আঃ, আগে বলেননি কেন? আমার কত সেলাই জমে আছে।" কথার ভাবে একটা অনুনয়ের সুর ভেসে উঠল।

অঞ্জনার হাসি আসতেই সামলে নিল—"দেবেন, আমি তো বসেই থাকি, না হয় আপনি একটু দেখিয়েই দেবেন।"

বারান্দায় বেড়ান, ভাঙ্গা টুলে বসা, অসময়ে স্নান করা, ইত্যাদি দু'-চারটে জিনিষে স্বাধীনতা পেয়ে অঞ্জনার আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু সেলাই-এর পরিমাণ দেখে তারও চক্ষুস্থির হবার উপক্রম। সরোজা কি তাকে দর্জ্জি-টর্জ্জি গোছের মত কিছু একটা ভেবে নিয়েছে না কি? ডজন খানেক শেমিজ, ব্লাউজ, পেটিকোট থেকে আরম্ভ করে গোটা দুই লেশ পর্য্যন্ত। রীতিমত একটা মোট।

একটু বাদে সরোজা স্বয়ং এসে হাজির—"আপনার জিনিষ পেয়ে গেছেন? বেশ বেশ, চট-পট করে করে ফেলুন—পরে আরও দেব।"

তার চলে যাবার পরেই একচল্লিশ নম্বরের বউটি মুখ বাড়াল, "করেছেন কি দিদি, এই মোট আপনি সেলাই করতে পারবেন? রাজী হলেন কেন?"

হতাশ ভাবে অঞ্জনা উত্তর দিল, "কি করব বলুন? ভাবলাম দেবীকে তুষ্ট করি, তা দেবী যে এমনই ছোটলোক—পর্ব্বত-প্রমাণ বোঝা চাপাবে, তা কি আর জানতাম! বড় জোর একটা ব্লাউজ কি দু'টো রুমাল দেবে তাই ভেবেছিলাম। ভীষণ ইনডিসেণ্ট।"

"ওদের আবার ডিসেন্সির জ্ঞান", চল্লিশ নম্বরের তরুণীটি বললে, "করতে এসেছে ধাইগিরি, আবার কথা কি চ্যাটাং চ্যাটাং—আমাকে কম্প্রেস করে দেবার কথা প্রত্যেক দিন, তা আজও দিল না।"

উনচল্লিশ নম্বর বললেন, "তোমরা তো ভাই ছেলেমানুষ, ওদের রকম তো আর জান না, তা কি করবে। ওরা তো আর আমাদের মত ঘরের মেয়ে নয়, ছ্যাঁচড়ামী করার স্বভাব যাবে কোথায়।"

দাইটিও অবাক্ হয়ে গালে হাত দিয়ে বললে, "আর সব দিদিদের গায়ে তবু একটু মানুষের গন্ধ আছে, কিন্তু এনার তা-ও নেই। আজ বাদে কাল হবে, এমন সময় কেউ এত সেলাই করতে দেয়?"

বোকা বনে যেয়ে অঞ্জনাই প্রতিবাদ করল, "থাক্ গে, দিই যা পারি করে, বেটির মাথা যদি একটু ঠাণ্ডা থাকে।"

"ওটি যে মনসা দেবী—হিমালয়ের সমস্ত বরফেও কুলোবে না।"—আর এক জন মন্তব্য প্রকাশ করল।

রাত্রে একটা সিজারিয়ান্ কেস এসে পড়ায় ওয়ার্ড-শুদ্ধ সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। ডাক্তার, নার্স, ষ্টুডেণ্টদের ছোটা-ছুটি শেষ হলে রোগীর দল উৎসুক হয়ে উঠল। তা ছাড়া বাচ্চাটা ভীষণ কাঁদতে আরম্ভ করেছে, ঘুমোয় কার সাধ্য!

দাইটা জিজ্ঞাসা করল, "একটু জল-টল খাইয়ে দেব না কি দিদিমণি? ওটার বোধ হয় খিদে পেয়েছে?"

রাত্রের ডিউটী ছিল লীলার, কান্নার চোটে একেই বিরক্তি বোধ হচ্ছে তার তাতে আবার অসময়ে আবদার শুনে রেগে উঠল—"তুই যদি অত জানিস্ তাহলে তুই-ই ব্যবস্থা করগে না, আমাকে বিরক্ত করিস্ কেন?"

সকাল বেলা লীলা আর কল্যাণী দু'জন মিলে বাচ্চাদের স্নান করাতে লেগে গেছে। চ্যাঁ-ভ্যাঁ কান্নার সুরে ঘুম ভেঙ্গে যেতেই বিরক্ত ভাবে অঞ্জনা উঠে বসল। উঃ, কত দেরী হয়ে গেছে, রোদ উঠে পড়েছে। আজকে আর সূর্য্যোদয় দেখা হবে না। আর নার্সরাও এমন—না হয় একটু কোলেই নিয়ে চুপ করাল, তা কিছুতেই করবে না, জ্বালাতন!"

"কি খবর, এমন ভাবে শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে কি করছেন? শরীর খারাপ, না মন ভাল না?" পাশ থেকে সরোজার গলা পাওয়া গেল।

অঞ্জনা চমকে ফিরে তাকাল, ছোট্ট একটি মেয়ে কোলে করে সরোজা দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত মুখে সকাল বেলার নির্ম্মল আলোর মতই হাসির আভাষ লেগে আছে। চোখের রুক্ষ দৃষ্টি বদলে ঝরে পড়ছে পরিচিত সুষমা, স্নেহে পরিপূর্ণ। ব্যাপার কি?

"আজ চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে যে?" সরোজা প্রশ্ন করল, "অন্য দিন তো খুব ঘুরে বেড়ান।"

"এমনই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোক-জন দেখছিলাম, কোলে ওটি কে? আমার কাছে দিন্ না একটু—"অঞ্জনা হাত বাড়াল।

দিব্যি কুটকুটে মেয়েটি অঞ্জনার মুখের দিকে তাকিয়ে "তা,—তা" করতে করতে হেসে উঠলো।

"বয়স কত? কথা বলতে সুরু করেছে যেন।"

সরোজা মেয়েটির দিকে তাকাল, "বাবুলমণি, বাবুল, ওর বয়স সাত মাস হবে—কথা ফুটবে না বলেন কি? কথা বলে, ঝগড়া করে, নাক খায়, চুল টানে। একটু ভাব হোক্ না দেখবেন।"

"সুন্দর মেয়েটি! আপনার কে হয় এটি?"

"আমার মেয়ে, আমার বাবুলমণি, আমার খোকন।" সরোজা হাত বাড়াতেই বাবুল ঝাঁপিয়ে তার কোলে গেল, মুখের সঙ্গে মুখ ঘসতে ঘসতে সরোজা বললে,—"বাবুল, মাম বলো—মাম।" প্রতিধ্বনির মত বাবুল বলে উঠল, মাম্, মাম্, মাম্।

সরোজা দুই হাতে বাবুলকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল—"মাম, মাম, মাম, আমার বাবুল, মাম কই?"

বাবুল হেসে সরোজার কাঁধের উপর মুখ লুকাতে লাগল। সরোজা তাকে কোলে করেই ওয়ার্ডে ঢুকল। মেয়েটি কি সত্যই ওর? প্রতিদিনের পরিচিত ষ্টাফ-সরোজার সঙ্গে এই মাতৃমূর্ত্তির যেন কোথায় একটা গরমিল আছে। অঞ্জনার কাছে কি রকম ঠেকতে লাগল।

আশাই তাকে জানিয়ে দিল বাবুলের ইতিহাস। চোখের উপর হতে একটা পরদা সরে গেল যেন। সঙ্গে সঙ্গে নূতন রূপ দেখা গেল সরোজার—তার মধ্যে গ্লানি, মালিন্য নেই, সে-ও জননী, চিরমৌন ধৈর্য্যশীলা। ধরিত্রীর প্রতিমূর্ত্তি যেন। কোন্ অশুভ লগ্নে এক অভাগিনীর কোলে জন্ম নেয় ফুলের মত নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক শিশুটি। অবোধ দৃষ্টি মেলে জন্মদাত্রীর পরিচয় সে দিতে পারেনি, মানুষের সমাজ তাকে স্থান দিতে রাজী হয়নি সেখানে। কিন্তু রাস্তার ধারের আবর্জ্জনার স্তূপ হ'তে তাকে আবার কুড়িয়ে নেয় মানুষেই।

ডিউটী সেরে ফিরছিল সরোজা, সেই কোলে তুলে নিল তাকে। বঞ্চিত জীবনে শত অবহেলা, অবজ্ঞার ভিতর দিয়ে যার মৃত্যু হয়নি—সেই মাতৃত্বই আবার হাত মেলে বাইরে এসে দাঁড়াল, কুড়িয়ে নিল পথে-পাওয়া মেয়েটাকে।

আজ আর তারা কেউ কোথাও নেই, সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে বাবুলমণি আর তার মা। ভবিষ্যতের সমাজ কি চোখে দেখবে তাদের তা কে জানে? পরিচয় না থাক তাদের মধ্যে কোন পাপ নেই, স্বার্থের কামনা লুকিয়ে নেই, হাজার হাজার ঘরের আনন্দ-প্রদীপের মত তারাও মা আর তার সন্তান।

অঞ্জনার চোখে জল ভরে এল। আকাশে সূর্য্যোদয় দেখা হয়নি, কিন্তু কে জানত আরও মহিমময় হয়ে তারই উদয় হবে। চোখের সামনে আর অত বড় দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে রইল শুধু সেই? অঞ্জনার সৌভাগ্যই কি কম?

বালু-ভরা ফল্গু নদী—রস নেই, কষ নেই, উত্তপ্ত মরুভূমি যেন। কিন্তু ভূমিকম্পের মত প্রবল আলোড়নে যখন তার বুক ফেটে পড়ে তখন দেখা যায়, অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনী ধারার। কাজল-কালো গভীর প্রাণ-বন্যায় ভরা সে ধারাগুলি, দিকে দিকে বয়ে চলে অনুর্ব্বরা ধরিত্রীকে উর্ব্বরা করে তোলবার জন্য। বন্ধ্যা পৃথিবীকে জননীরূপে পরিণত করে তুলবার আশায়। ক'জনের চোখে ধরা পড়ে তারা!

শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে—তোমার ঘৃণা নেই, বিচার নেই, তুমি শুধু স্নেহময়ী জননী, তুমি কল্যাণের প্রতিমা। হে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদী, আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

উত্তরাপথ

সমীর ঘোষ

আজ আমার মাষ্টার মশায়কে সবথেকে বেশি মনে পড়ছে। তাঁকে সম্পূর্ণ মনে করতে পারছি না। মাথা থেকে পায়ের ঋজুতা ছাড়া আর সেই সাধারণ চেহারার বিশেষত্ব মনে পড়ছে না। তবু আজ আমার তাঁকেই মনে পড়ছে। যেদিন প্রথম এসেছিলেন, সেদিনের একটা আবছা ছবি এখনো স্মৃতিপটে আছে—অনেক চেষ্টা করে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি মাথার চুল এলোমেলো, চোখে কাচ-কড়ায়ের চশমা—টরটয়েজ শেল বললে যার জাত বোঝাতে পারবো। আর পায়েতে ছিল বোধ হয় সাধারণ স্যাণ্ডেল। গায়ের আধ-ময়লা জামাটা খদ্দরের পাঞ্জাবী, কাপড়খানা মিলের মোটা ধুতি।

যাঁর সবটা মনে পড়ছে না কেমন করে তাঁর বেশভূষার এতো বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছি? কেন দেবো না? মাষ্টার মশায়ের এই তো ছিল অভ্যস্ত পরিচ্ছদ। শুধু দেখেছি বৃষ্টি পড়লে অথবা বৈশাখের রোদ খাঁ-খাঁ করে উঠলে হাতে তাঁর ছাতা উঠতো।

বলতে লজ্জা নেই আমরা হেসেছিলুম। মাষ্টার মশায় চলে গেলে অমিত্রা বাড়ীর ভেতর এসে দাদা কিছু বলার আগে দাদাকে জিগ্যেস্ করেছিল, এই অধ্যাপককে কোথায় পেলে দাদা?

—কেন?

—উনি তো পাগল।

—পাগল!—দাদা হাসলেন, বললেন, তা হোক্ পড়ায় ভারি চমৎকার। দাদা সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হোয়ে গেলেন।

মাষ্টার মশায় সত্যি ভালো পড়াতেন। আর বলতেন গল্প। বাইরের কেউ যদি কখনো আমাদের সেই পড়ার মধ্যে দাঁড়াতো, দেখতো মাষ্টার মশায় শুধু গল্প বলছেন। মায়ের কানে এক দিন এই পড়ার বদলে গল্পের আসরের কথা পৌঁছাল। বলা বাহুল্য, তিনি তৎক্ষণাৎ আপত্তি তুললেন। তবুও কেন জানি না, মাষ্টার মশায় আমাদের যথারীতি পড়িয়ে চললেন—আর গল্প বলা—তা-ও বন্ধ রইলো না।

প্রতিদিনের পড়া শেষ হলে অমিত্রা কখনো নাক বেঁকাত, কখনো হাসতো, আর কোনো কোনো দিন গম্ভীর হয়ে যেত! আমার বেশ মনে পড়ে, যেদিন সে গম্ভীর হোত, সেদিন কেউ তার থেকে কোন কথা শুনতে পেত না। কোন দিকে সে লক্ষ্য দিত না, এমন কি চেয়ে দেখত না স্কুলে যাওয়ার সময় তার শাড়ীর পাট কুঁচকে আছে কি না। রুমাল ডাইংক্লিনিং থেকে আনা হয়েছে তো।

আমার সে দিদি—বয়সে আমার থেকে এক বছরের বড়ো। আমি কিন্তু কোন দিন ওকে দিদি বলে ডাকিনি। মা কখনো হয়ত বলতেন, আরে, ও যে তোর দিদি হয়।

আমি ঠোঁট ফোলাতুম, ভারি তো দিদি—এক বছরের তো বড়ো! আমি ওর আগে হোলে ও কি আমায় দিদি বলতো?

এই ছিল ছেলেবেলার যুক্তি। আজ যদিও সেই দিনটাকে

ছেলেবেলা বলছি, আজ কিন্তু সেই সঙ্গে বেশ অনুভব করছি সেদিন আমরা সত্যিকারের ছেলেমানুষ ছিলুম না। বাইরের যে জগৎ মানুষ নিয়ে নিত্য আবর্ত্তিত তার সম্বন্ধে তখন কিছু জানতুম না বলেই এমনতর যুক্তি সেদিন প্রয়োগ করতে পেরেছি।

সেই ছেলেমানুষের দিন বলো আর যা-ই বলো না কেন, সেদিনও কিন্তু একটা জিনিষ আমাকে ঘা দিতো। মাষ্টার মশায় এসে গম্ভীর কণ্ঠে যখন ডাকতেন 'সুমিত্রা', আমি তখন কিছুতে সেই আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারতুম না। আমার সমস্ত সত্তা সেই আহ্বানে এক মুহূর্ত্তে স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে যেতো, মনে হতো এইবার কে যেন কি নিয়ে আসবে।

কেউ আসেনি। অন্ততঃ আমার জীবনে প্রতীক্ষা করে আজ পর্য্যন্ত কিছু লাভ করতে হয়নি। এসেছে অমিত্রার জীবনে। এই আগমনীকে সকলে বলে দুঃখের কথা। আমিও তাদের সঙ্গে এক-মত হোয়ে বলে এসেছি সত্যি কি দুঃখের কথা! কেন বলবো না? শ্রীকুমার যেদিন আমার হাত ধরে বলেছিল, সুমিত্রা কি সুন্দর তুমি!—সেদিন অমিত্রা কোথায় ছিল তা কি আমি আজো বিস্মৃত হোয়েছি? আমার সমস্ত মুখ লজ্জায় লাল হোয়ে উঠেছিল, আনন্দে স্পন্দিত বুকের দ্রুতগতি নিয়ে 'আসছি' বলে পালিয়ে এসেছিলুম আমাদের ঘরে। সূর্য্য তখন অস্তোন্মুখ, বর্ষার মেঘে রঙ ধরেছে, চার পাশে গোধূলির সোনা ছড়িয়ে গেছে। অমিত্রাকে দেখলুম জানলার সামনে বসে আছে কোলে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'তপতী'।

আমি ওকে একেবারে জড়িয়ে ধরলুম, ডাকলুম, ভাই অমিদি!

আমার দিদি ডাক একেবারে হঠাৎ, বলতে পারো চমক

াগানো। আশ্চর্য্য হোয়ে মুখ তুললো অমিত্রা। আমার দিকে য়ে বললো, কি হোয়েছে রে, মুখ তোর অতো লাল কেন?

আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলুম, বললুম, কিছু না। বড়াতে যাবি না?

—না।

—না নয়, চল্। কি যে বই পড়তে আরম্ভ করেছিস্? —হাত ধরে টানলুম।

সেদিন ও বেড়াতে যায়নি। আমরা কিন্তু বেড়াতে ায়েছিলুম। শ্রীকুমার শোনে না—কি করবো। বাড়ী ফরে শুনলুম 'তপতী' পড়া শেষ করে অমিত্রা 'ঘরে বাইরে' ড়ছিল বলে দাদা রাগ করেছেন। অমিত্রা দাদার সঙ্গে র্ক করেনি, অথবা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোনো কথা বলেনি। অভিযোগ তুললে বলেছে, যখন লেখাপড়া করছি, তখন প্রয়োজন অথবা যার সত্যিকারের দাম আছে তা পড়বো ই কি।

সব কথা ভুলে গেছি। মাষ্টার মশায় তো আমার সেই রোনো দিন থেকে এক রকম মুছে গেছেন—অমিত্রার সব থাও কি আমার মনে আছে?

তবুও সেই 'ঘরে বাইরের' দিনের কথা আমি পরিষ্কার নে রেখেছি। মাষ্টার মশায়ের কাছে আমরা পড়ছি, এমন ময় দাদা ঘরে ঢুকলেন। আমাদের ডিমের ছাঁদের গোল টবিলটায় যে চেয়ারখানা খালি ছিল সেটাতে তিনি বসলেন। ক একটা বিষয় বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন মাষ্টার মশায়। সেটা শেষ ওয়া মাত্র দাদা বললেন, মাষ্টার, তোমার ছাত্রীদের স্বাধীনতা য অবাধ হোয়ে গেছে।

—কি রকম?

শুনলেন সব চুপ করে। তার পর কিন্তু মাষ্টার মশায় াসতে লাগলেন। বললেন, ভালো, ভালো সুকান্ত! ভাবুক— ম্ভীর হোয়ে মেয়েরাও কিছু ভাবুক। তা না হোলে দেখছো া সামনে কি ভয়ানক অন্ধকার! আমরা কেমন করে এ অন্ধকার পার হবো।

দাদা শঙ্কিত হোয়ে উঠলেন, উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন, তুমি আজ কাল ওই সব শেখাচ্ছো না কি?

দাদার উৎকণ্ঠিত প্রশ্নে মাষ্টার মশায়ের সেই গম্ভীর গলা যেন হাসিতে রিন্ রিন্ করে উঠলো, হাসতে হাসতে বললেন, সুকান্ত, ভয় পেয়ো না। আমি যদিও আলো চাই, তবে জেনো অন্ধকার পথে আমার স্নেহশীলদের টেনে নিয়ে গিয়ে আলোর সন্ধানে লাগাবো না। তবে আমি ইতিহাসের গল্প বলি। এই ইতিহাস অবশ্য ছাপার অক্ষরে নেই, তবে যারা শিখতে ায়, তাদের জন্যে এই শ্রুতির আবৃত্তি করতে হয়। তোমাকেও তো কতো দিন এই আবৃত্তি শুনিয়েছি।

কিন্তু—

ভয় পেয়ো না সুকান্ত। শুধু বলো হাওয়ার গতি বদলেছে। আই উইল গো উইথ দি উইণ্ড।

আমার আর কিছু বলার নেই। দাদা উঠে চলে গেলেন।

একটা নিশ্বাস ফেলে মাষ্টার মশায় বললেন, এসো অমিত্রা, এসো সুমিত্রা। অনেকখানি সময় গেছে, পড়া করে নাও। আর দেখো, যা শিখতে চাও, আমার কাছ থেকে যা পেতে পারো এই বেলা নাও। আমার যাবার সময় এসেছে।

না মাষ্টার মশায়, আপনি যাবেন না। আমাদের অনেক কিছু জানতে হবে। আপনি চলে গেলে সে সব জানতে পারবো না।

চেয়ে দেখি, অমিত্রার চোখ জ্বলছে। আমার চাইতে দেখতে ও অনেক বেশি সুন্দর। সেই সুন্দর রূপের ওপর এই দাবীর আলোক পড়ে ও যেন অপরূপ হোয়েছে। ওর উদ্ভাসিত মুখের দিকে চেয়ে মাষ্টার মশায়ের গম্ভীর গলা যেন রিন্-রিন্ করে কাঁপলো, বললেন, হোয়াট ক্যান নট বি মাই ফ্রেণ্ড—মাষ্ট গো আই।

অমিত্রা সেদিন কি ভেবেছিল, তা আমি জানি না। আমি কোনো কথা জিগ্যেস্ করিনি। তবে আমি কল্পনাও করিনি যে মাষ্টার মশায় চলে যাবেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার আর মাত্র পাঁচ দিন আছে। সেদিন ইংরাজী পড়তে পড়তে মাষ্টার মশায় হঠাৎ নীরব হোয়ে গেলেন। তার পর অমিত্রার দিকে চেয়ে বললেন, আমার যাবার পালা এসেছে। পড়ানো আমার কাজ নয়, শেখানো আমার ধর্ম্ম। যা হোক, তোমাদের পরীক্ষার পড়া করিয়ে দিয়েছি। আমি যদি কাল থেকে না আসি তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

—আপনি কি কাল আসতে পারবেন না?—অমিত্রা জিগ্যেস্ করলো।

—ঠিক নেই।

—আর কিছু না বলে মাষ্টার মশায় আবার পড়াতে আরম্ভ করলেন। গল্পটা আমার মোটে ভাল লাগলো না। একটা কুকুর—মাত্র একটা কুকুরকে নিয়ে এতো কথা কার ভালো লাগে?—মানুষ হলেও বা কথা ছিল। কিন্তু সেদিনের কথা উঠলে অমিত্রা আমাকে একবার বলেছিলো, কি অপূর্ব্বই পড়ানো মাষ্টার মশায় সেদিন পড়িয়েছিলেন।

অমিত্রার কথা আজ আমি বুঝতে পারছি আর অক্লান্ত ভাবে স্মৃতির দুয়ার উন্মোচিত করে সেই কণ্ঠ স্বর, সেই গল্পে বর্ণিত পটভূমিতে গিয়ে দাঁড়াবার নিষ্ফল, ব্যর্থ চেষ্টায় হার মানছি। "মাই ফ্রেণ্ড জ্যাক" আর সময় নেই—যেতে হবে। কর্ণওয়ালের প্রকৃতি বদলেছে, পাতা ঝরেছে, ফল মরেছে, জুন মাসও তো চলে গেল—আমাকে ওই সঙ্গেই যেতে হবে।

মাষ্টার মশায় সত্যি চলে গেলেন। প্রবেশিকার প্রথম দিনের পরীক্ষা দিয়ে আমরা বই-খাতা নিয়ে আমাদের পড়ার টেবিলে যথারীতি বসেছি সন্ধ্যার পর এমন সময় দাদা এসে বললেন, ওরে, মাষ্টার আসতে পারবে না। দুপুরে বলে গেছে কলকাতার বাইরে কি একটা কাজ আছে।

—কাল আসবেন তো?—অমিত্রা জানতে চাইলো।

—হ্যাঁ। বলেছে তো কাল আসবে। তবে ওর কথার

কিছু ঠিক নেই।—দাদা চলে গেলেন। পড়া-শোনায় চির-দিন তাঁর অবহেলা তাই বোধ হয় জিগ্যেস করলেন না আমরা কেমন পরীক্ষা দিলুম।

মাষ্টার মশায় আর কোন দিন এলেন না। কয়েক দিন পরে পুলিশ দাদার খোঁজে এলো—থানায় নিয়ে গিয়ে মাষ্টার মশায় সম্বন্ধে অনেক কথাও জিগ্যেস্ করলো। কি একটা বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওর যোগসূত্র না কি পুলিশ সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে।

মাষ্টার মশায়কে আমরা ভুলে গেলুম। অবশ্য আমার সেদিনের ধারণাও ভুল। আজ অমিত্রার মাত্র একটি কথায় আমার এই ভুল ধরা পড়েছে। ও বলে, মনে কর আমাদের মাষ্টার মশায় এসেছিলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতাও বেড়ে গেল; আজ বেশ মনে পড়ে, আমি সেদিন নিজেকে পর্য্যন্ত ভুলে গেছলুম। বলতে লজ্জা কি—শ্রীকুমার যতোবার হাত বাড়িয়ে আহ্বান করেছে, মিষ্টি কথায় আমাকে ডেকেছে, ততো বার তার সেই ডাকে সাড়া দিয়েছি; কোথায় না যেতুম ওর সঙ্গে। এক দিন তো যশোর রোড ধরে ঝিকরগাছা পেরিয়ে চলে গিয়েছিলুম। কি অপূর্ব্ব রাত্রি ছিল সেটা! পরিষ্কার নীল আকাশের গায়ে চাঁদ যেন সোনার বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। আর আমরা—আমরা কি করেছিলুম বলবো না। বলে কি হবে। আমরা সেদিন যে স্বপ্নে আত্মহারা হয়েছিলুম—তা তোমাদের কাছে নতুন না হোতে পারে, কিন্তু আমার আর শ্রীকুমারের কাছে সে এক অনাস্বাদিত নব জীবনের মদিরাক্ত উন্মোচন। প্রতিদিন আমি শাড়ীর রং বদল করতুম। কাণের পাশা দু'-তিন দিন এক প্যাটার্ণের পরে থাকলে শ্রীকুমার জানি না কোথা হোতে অন্য এক গড়নের নতুন এক জোড়া পাশা এনে উপস্থিত করতো। দু'গাছার বেশী চুড়ি পরতুম না। তা হলে কি হয়। বড়ো জোর পনের কিম্বা কুড়ি দিন। মা নিজে থেকে এক দিন বদল করে দিতেন, বলতেন, দে, পালিশ করতে পাঠাই—কত দিনের পুরোনো, একেবারে ম্যাক-ম্যাক করছে।

তোমরা বলবে—তোমার দিদি, হ্যাঁ, অমিত্রা তখন কোথায়? সে কি করছিল?

তোমাদের আমি কেমন করে বলি সে তখন কি করছিল। আমি তো তখন হারিয়ে গেছি নিজের মধ্যে—চোখ মেলে কে কোথায় কি করছে দেখার মতন অবকাশ কি আমার আছে? তবুও শোনো বলি একটা দিনের কথা। একটা ব্রোকেটের জামার উপর-মুর্শিদাবাদী রেশমী শাড়ী পরেছিলুম জড়িয়ে জড়িয়ে অনেকটা স্কার্টের ধরণে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হোল, ভারি সুন্দর মানিয়েছে। পাশে শোবার ঘরে ঢুকে দেখি অমিত্রা জানালার সামনে বসে বই পড়ছে।

ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম, ভাখ না অমিদি, কেমন সেট করেছে?

আমার আহ্বানে সে চোখ তুললো, কৌতুহলহীন চাহনী আমার সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে নিয়ে আস্তে বললো, বেশ।

অতো সংক্ষিপ্ত প্রশংসায় আমি তৃপ্তি পেলুম না। বললুম, কি বাজে বই পড়ছিস্?—সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে টেনে নিলুম বইটা। হ্যাঁ, বইটার নাম বলবো, 'ফরাসী-বিপ্লব'—এনেছে কলেজের লাইব্রেরী থেকে।

বইটার নাম পড়ে আমার উত্তেজনা কমে গিয়েছিল। এইবার ভালো করে চেয়ে দেখলুম অমিত্রার দিকে। পরিষ্কার মনে আছে, তার সেই নির্লিপ্ত অথচ জ্যোতির্দীপ্ত চোখের কথা আর মুখের প্রশান্ত স্নিগ্ধতা। আর একটা জিনিষ সেদিন দেখেছি তবে মনে করে রাখার মতো বলে মনে হয়নি। আজ এই গোধুলির শেষতম মুহূর্ত্তে—সেই দেখাকে আবার যেন নূতন করে দেখতে পাচ্ছি। আমার সারা অঙ্গে সেদিন ঐশ্বর্য্যের আর লাস্যলীলার তরঙ্গ উচ্ছলিত হোয়ে পড়ছিল আর অমিত্রার হাতে ছিল সেই সর্ব্বনেশে বইখানা; অঙ্গে ছিল লাল পাড় সাদা শাড়ী, কানে ইয়ারিং আর হাতে দু'বছর আগে পরা সেই সোনার চুড়ি—সংখ্যায় তারা সর্ব্বশুদ্ধ দু'গাছা।

মা এসে ঘরে ঢুকলেন, কি রে অমি, এখনো গা ধুস্‌নি, কাপড় ছাড়িস্‌নি, বেড়াতে যাবি কখন?

সামান্য হাসলো অমিত্রা, আমি কি না রোজ বেড়াতে যাই?

মা রেগে গেলেন, বললেন, রোজ যাস্ না বলেই তো আজ বলতে এলুম। বইয়ে মুখ দিয়ে দিন-রাত পড়ে থাকতে কি যে আমোদ পাস্?—মা একবার থামলেন, আবার বললেন, সুমির দিকে চেয়ে দেখ দেখি—ও তো পড়ছে, রেজাল্টও এমন কিছু খারাপ নয়।

নীচের গাড়ী-বারান্দায় মোটর এসে থামলো। অমিত্রা আমার প্রতি চেয়ে বললো, ঐ কুমার এসে গেছে। যা, তুই আর দেরী করিস্‌নি। আমি আর কোথায় যাবো—পথে পথে বেড়াতে আমার ভালো লাগে না। বিকেলটা বই নাড়া-চাড়া করে বেশ কাটে।

—তা বলে তুই কাপড় বদল করবি না?—মা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এসেছেন।

—কেন কলেজের কাপড়ে তো আমি নেই। অমিত্রার উত্তর বেশ পরিষ্কার।

আমাদের কোন আত্মীয়ার নাম করে মা বললেন, তিনি এসে অমিত্রার ওই পরিধেয় দেখে কি ভাববেন।

—সুমি, তুই ভাই একটু সকাল সকাল ফিরিস্। ভদ্র-মহিলা তোকে দেখলে অন্য কিছু ভাবতে সাহস করবেন না।

মা চলে গেলেন। আমিও গেলুম। সেদিন কিন্তু আমি অমিত্রার এই সংসারের প্রতি অবহেলাকে সহ্য করতে পারিনি। শ্রীকুমারকে বলেছিলুম অমিত্রার ওই সব বই পড়ার কথা। শ্রীকুমার আমার সঙ্গে এক-মত হোয়েছিল যে অমিত্রা কোথায় যেন বদলে গেছে—ও যেন ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে।

আই-এ পরীক্ষা শেষ হোলে শ্রীকুমারের আবেদন মা মঞ্জুর করলেন। বিদেশী ডিগ্রী না থাকলেও রেলওয়েতে

একটা মেডিক্যাল অফিসারের কাজও পেয়েছে। কাজে যোগ দেওয়ার আগে ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়।

আমি শ্রীকুমারের সঙ্গে গেলুম। মা, দাদা অনেক বোঝালেন, অমিত্রার কিন্তু এক কথা, বললো, দাও না সুমির বিয়ে—আমি এখন পড়বো।

আই-এ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হোল। আমি পাশ করতে পারিনি। এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামালো না। কিন্তু অমিত্রা যে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করলো এইটাই হোল আশ্চর্যের এবং আলোচনার বিষয়। পড়ালেখায় ও কোনো দিন ভালো ছিল না। তবে আজকাল ও যে অবিশ্রান্ত বই পড়ছিল তাতে অন্ততঃ প্রথম বিভাগ হওয়া উচিত ছিল।

আমরা ম্রিয়মাণ। অমিত্রার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। যথারীতি সে থার্ড-ইয়ারে ভর্ত্তি হোল। মা এ পাশে একেবারে অস্থির। ছোট মেয়ের তো বিয়ে হোয়ে গেল। কিন্তু বড়ো মেয়েকে নিয়ে তাঁর আর ভাবনার অন্ত নেই। নিজে কয়েক বার চেষ্টা করে হার মানবার পর আমাদের ওপর ভার দিলেন অমিত্রার মত করাবার। আমি আর শ্রীকুমার দরবার করলুম অনেক বার। তবে আমাদের সেই আবেদনের সঙ্গে ব্যর্থতা বেশ পরিষ্কার শীলমোহর লাগিয়ে গেল। শুধু তাই নয়, ও এতো গম্ভীর হয়ে উঠলো যে ওর সঙ্গও আমাদের আর ভালো লাগলো না। আমাদের হাসি, মান-অভিমানের পালা, পার্টি আর প্রীতিভোজ সব কিছুর বাইরে গিয়ে ও বসলো। বসলো কোথায়—ওর পড়বার ঘরে। আমি সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি। সেখানে ও-ই এখন একেশ্বরী। শ্রীকুমার বলে, দিদির ঘরটা হোচ্ছে পুথি-রাজ্য। আমরা কেউ সে-ঘর মাড়াই না। কি হবে ও-ঘরে গিয়ে—অর্থনীতি আর ইতিহাস পড়তে হয়তো তোমাদের ভালো লাগতে পারে, আমার কিন্তু লাগে না। তবে ভরসা হোচ্ছে কিছু কাব্যও আছে। আমি মাঝে মাঝে তাই নিয়ে আসি। শ্রীকুমার পড়ে। তবে সে পড়া খুব বেশী হলেও কুড়ি-পঁচিশ লাইনের অধিক অগ্রসর হয় না। যে-কোন একটা জায়গায় অর্থ করা নিয়ে আমাদের বিতর্ক সুরু হয়, তার পর সেই বিতর্ক অকস্মাৎ গতিপথ পরিবর্ত্তিত করে নিখাদ বিশ্রম্ভালাপে আমাদের অজ্ঞাতে পরিণত হয়।

এরি ফাঁকে কখনো কখনো অমিত্রা আসে। আমরা সচকিত হোয়ে উঠি ওর কণ্ঠস্বরে। শুনি লঘুকণ্ঠে হাসতে হাসতে ও বলছে, তাই তো কাব্য-কুজন কোথায়—এ যে শুধু কুজন।

লজ্জা পায় শ্রীকুমার, বলে, আসুন দিদি, আসুন।

ওর মুখের এই 'দিদি' ডাক শুনলে আমার কেমন হাসি পেতো। একটু নড়ে বসে আমি হাসতে হাসতে অমিত্রার খোঁচাটা ফিরিয়ে দিই, বলি, এ কি অমিদি, পথ ভুলে গেছিস্?

—কেন?

—আমাদের এখানে এলি যে?

—তোদের সংসার দেখতে এলুম।

—আমরা তো সংসারের চেষ্টা দেখছি। কিন্তু তোর কি হলো?

—হবে রে হবে।

—কবে, বুড়ি হোলে?

—উঃ, বিয়ের পর তুই আজকাল যা হোয়েছিস্। কুমার, ওকে একটু শাসন করতে পারো না। ওর মুখ কি রকম হোয়েছে দেখছো?

—আমার শাসন, আমার কুশ্রী মুখকে সুন্দর করা দেখতে তোর মোটে ভালো লাগবে না। আর ও কি করবে, লজ্জা পাবে।

—দূর মুখপুড়ী! অমিত্রা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

শ্রীকুমার বাধা দেয়। বলে, বসুন দিদি, যাবেন না।

অমিত্রা কি ভেবে বসে। কবিতার বইখানা ঠেলে দেয় শ্রীকুমারের দিকে, বলে, পড়ো।

শ্রীকুমার পড়ে, কিন্তু তার গলা কাঁপে। আমার কাছে যেমন ও সহজ ভঙ্গীতে পড়ে কথার ওপর কথা ছুড়ে দিয়ে ঝংকার তোলে, ওই সহজ ছন্দ, সাবলীল গতি এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

পড়া শেষ হোয়ে যায়, অমিত্রা উঠে দাঁড়ায়, বলে, বসো তোমরা।

তার পর ও চলে যায়। ওর সেই শান্ত ধীরগতির দিকে চেয়ে আমরা এক অসাধারণ জীবনের আভাস পাই। দু'জনেই অনুভব করি, আমাদের সঙ্গে তার দিন-রাত্রি অতিবাহিত হোলেও, সে আমাদের নয়। সমস্ত সংযোগে বিচ্ছিন্ন হোয়ে গেছে। আমার শাড়ী সিল্কের, আমার পায়ে দামী হানটিং-সু, চোখে নামমাত্র পাওয়ারের চশমা। আর তার পরনে শাড়ী মিলের সাধারণ লাল পাড়ের, পায়ে অতি সাধারণ সোয়েটের চটি। হাতে মাত্র দু'গাছা চুড়ি আর কোথাও কোন অলঙ্কার নেই। শ্রীকুমারের রুমালে বোকের গন্ধ বায়ুস্তরে উচ্ছ্বাস তোলে, তাই বোধ হয় কবিতা পড়ার সময় তাঁর গলা কাঁপে।

আমরা কলকাতা ছাড়লুম। শ্রীকুমার চাকরিতে যোগদান করলো। দু'বছর পর আবার আমরা কলকাতায় ফিরে এলুম বিয়ের উৎসবে যোগদান করতে। দাদা বিয়ে করলেন। আমরা যেদিন কলকাতা থেকে ফিরলুম, মা সেদিন জোর করে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন অমিত্রাকে। শ্রীকুমারের ছুটি তখনো শেষ হয়নি। অমিত্রার পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাস তখনো আরম্ভ হয়নি। আমরা তাই এসে উঠলুম ঘাটশিলায়। বাবা যখন বেঁচেছিলেন, তখন এখানে একটা বাড়ী কিনেছিলেন—আমরা সেই বাড়ীতে এসে উঠলুম।

সামনে সুবর্ণরেখা। তার ওপারে নীল পাহাড়শ্রেণী মৌনী বুদ্ধের মতো ধ্যাননিমগ্ন। চার পাশ শান্ত, স্তব্ধ। মাঝে মাঝে যখন শালের বনে বাতাস শাখা দোলাতে আরম্ভ করে, তখন যেন কোথা হতে খানিকটা উচ্ছ্বাস ছুটে এসে আমাদের বাড়ীর প্রাঙ্গণে ঝরে ঝরে পড়ে। দু'বছর আগে যে অমিত্রাকে দেখে গিয়েছিলুম, তার থেকে অনেক গম্ভীর একটা মানুষকে দাদার বিয়েতে এসে দেখলুম। তার মুখে কোন কথা নেই, আচরণে অশোভনতা কিছু নেই, তবুও সেই শান্তশ্রীর মধ্যে এক দুরবগাহ সত্তার যেন আবির্ভাব হয়েছে।

এখানে কিন্তু সেই গম্ভীর মানুষটি কোথায় অন্তর্হিত হোল। আমার এক বছরের খুকুর সঙ্গে সে-ও যেন বয়সটাকে সমান্তরালে নামিয়ে আনলো। খুকুর খিল-খিল হাসির সঙ্গে অমিত্রার রিন-রিন হাসি সমস্ত বাড়ীটাকে একখানা উজ্জ্বল শাড়ী পরিয়ে দিলো। শ্রীকুমার মাঝে মাঝে বলতে আরম্ভ করলো, দিদিকে খুকু কেমন চিনেছে দেখেছো?

খুকু কি ভাবে চিনেছিল জানি না, আমরা কিন্তু অমিত্রাকে চিনতে পারিনি। সেদিন রাত্রিতে আমরা খাবার টেবিলে বসেছি এমন সময় এক জন অতিথি এলেন। মাঝারি দোহারা চেহারা, রং শ্যামল, চোখ দু'টো বেশ উজ্জ্বল। পরনে হ্যাফ প্যান্ট, গায়ে হাফ-হাতা সার্ট আর তার ওপর কালো সার্জ্জের কোট। রাত্রির মতোন আশ্রয় তাঁর চাই। শ্রীকুমার জানতে চাইলো পরিচয়।

বেশ দীর্ঘ এবং ক্লান্তিজনক পথ তিনি অতিক্রম করেছেন বলে বোধ হোল। শ্রীকুমারের প্রশ্নে ক্লান্ত স্বরেই বললেন, চোর-ডাকাত নই। পুলিশ বলে তার চাইতে মারাত্মক না কি আমরা।

—তার মানে?

ম্লান হাসলেন আগন্তুক, বললেন, আরো মানে বলতে হবে?

—না, যতোটা বলেছেন তাই যথেষ্ট বরং বেশি হোয়ে গেছে বলবো আমি। অমিত্রা বললো।

—আপনি!—ভীষণ চমকে উঠে আগন্তুক সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে নীরব হোয়ে গেলেন।

—কুমার উনি আজ থাকুন। বন মোটে নিরাপদ নয়, আর আমার মনে হয় উনি একান্ত অসহায়। অমিত্রা যা বললো, ও প্রস্তাব নয় আদেশের রূপান্তর। শ্রীকুমারের ইতস্ততঃ ভাব সেই আদেশে অন্তর্হিত হোল।—আমার প্রতি চেয়ে সে বললো, ওর থাকার একটা ব্যবস্থা করে দাও।

—সে ব্যবস্থা হবে। তার আগে উনি আমাদের সঙ্গে টেবিলে বসুন। আমি পরোক্ষ ভাবে অতিথিকে খাবার টেবিলে আহ্বান করলুম।

—খাবার আমি খাবো। বেশ কিছুক্ষণ অনাহারে আছি। তবে আগে আমি বাথরুমে যাবো—আমার একটু গরম জলের দরকার। দিতে পারবেন কি?

একটু অপেক্ষা করুন আমি ব্যবস্থা করছি। অমিত্রা চলে গেল। গরম জলের কথা শুনে মনে হয় শ্রীকুমারের ডাক্তারি সত্তাটি সচেতন হোয়ে উঠলো। সে অতিথির সর্ব্বাঙ্গে অনুসন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো। অতিথিও বুঝতে পারলেন, শ্রীকুমার তাকে দেখছে। সেই পরিচিত ম্লান হাসি তিনি হাসলেন—মৃদু স্বরে বললেন, আপনি যা খুঁজছেন তা আমি দেখাতে পারি, কিন্তু আপনার কি তা ভালো লাগবে? কথা শেষ করে ডান পা থেকে তিনি একটা খাকি রঙের পটি ধীরে ধীরে খুলে ফেললেন। রাত্রির অন্ধকারে আর ঘরের কেরোসিন তেলের স্বল্প আলোকে ওই পটিকে আমরা মোজা বলে ভুল করেছিলুম। মোজা যখন পটি হোয়ে সরে গেল পায়ের ওপর থেকে, তখন যে ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠলো, সেই অনগ্রসর আলো-কেও তা আমাদের দেহে শিহরণ জাগিয়ে তুললো। পায়ের পেশীর কাছে প্রায় এক ইঞ্চি স্থান মনে হোল পুড়ে গর্ত্ত হোয়ে গেছে। আর সেই গর্ত্তের চার পাশ একেবারে ঝলসে গেছে। রক্ত পড়ছে না বটে তবে কালো কালো ঝলের মতো মোটা সেইখানে রয়েছে।

—কি করে এমন হোল? আমার মুখ দিয়ে আর্ত্তনাদের মতো প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল।

কোন উত্তর না দিয়ে অতিথি শুধু হাসলেন।

অমিত্রা ঘরে ঢুকলো, বললো, আপনার গরম জল তৈরী—আসুন।

শ্রীকুমার কিন্তু বাধা দিলো, বললো, না, এ পায়ের ব্যাপার আগে দেখুন দিদি।

—ইস্! কুমার কোন ব্যবস্থা করতে পারো না?

—নিশ্চয় করবো। শ্রীকুমার ঘর থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

অতিথির দৃষ্টিতে প্রশ্ন জেগে উঠলো, অমিত্রা হেসে উত্তর দিলো, ভাইটি আমার ডাক্তার।

—ডাক্তার! অতিথি প্রায় বিহ্বল হোয়ে পড়লেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত করে বললেন, এ-জীবনের প্রয়োজন এখনও আছে—বাঁচবো, আমাকে আরো বাঁচতে হবে।

শ্রীকুমার ফিরে এলো। এক হাতে ডাক্তারি ব্যাগ। অন্য হাতে এ্যান্টি-ব্যাকট্রিনের শিশি। একটা এ্যান্টি-টিটানাস ইনজেক্‌সান দিয়ে সে অমিত্রাকে বললো, গরম জলটা এখানে নিয়ে আসুন দিদি!

শ্রীকুমারের ডাকে আমার ঘুম ভাঙলো। বিছানার ওপর উঠে বসলুম: জানালার বাহিরে দেখি, সেই ঘননীল পর্ব্বত-শ্রেণী সূর্য্যের সোনার রোদে যেন সমস্ত তপস্যা শেষ করে বুদ্ধত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হোয়েছে আর তারি পায়ের কাছে বালি আর পাথরের কোলে কোলে অভ্রের শুভ্রতায় নেচে নেচে চলেছে কলস্বরা সুবর্ণরেখা। পাশের ঘর থেকে ভেসে এলো অমিত্রার গলা আর খুকুর কল-কল হাসি।

মনে পড়লো গতরাত্রির কথা। অতিথি—আমাদের অতিথি কোথায়?—অতিথি চলে গেছেন। কখন গেছেন কেউ জানে না। চাকরটাকে ডেকে শুধু বলে গেছেন দরোজাটা বন্ধ করতে আর সঙ্গে নিয়ে গেছেন সেই এ্যান্টি-ব্যাকট্রিনের শিশিটা। লিখে রেখে গেছেন, না বলেই নিলুম, ক্ষমা করবেন।

সকালের সেই সোনা রোদ এখন আর সোনা নেই। আমি জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছি ওই রোদে রঙ্ লেগেছে—আনারের রঙ্—একেবারে গাঢ় টক্‌টকে লাল রঙ্। পাহাড়ের ওপারে এবার সূর্য্য নেমে যাবে।

বিকেলের দিকে পুলিশ এসেছিল। তারা না কি সংবাদ পেয়েছে,

কাল রাত্রিতে কোনো পলাতক রাজবন্দী আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছিল। শ্রীকুমার থানায় গিয়ে জবানবন্দী দিয়ে এলো—অমিত্রাও তার সঙ্গে গিয়েছিল। বারণ করলুম শুনলো না, আমাকেও সঙ্গে নেয়নি।

সত্যি বলছি, আমি বুঝতে পারিনি তার এই যাওয়ার পেছনে কি অভিসন্ধি থাকতে পারে। আমি কোনো-ক্রমে অতি সামান্য আভাসও পায়নি যে, সে আশ্রয়দানের সমস্ত দায়িত্ব নিজের ওপর নেবে—এ-বাড়ী তার বলে শ্রীকুমারকে কোন কথা বলতে দেবে না। সত্যি আমি জানতুম না মা, আর দাদা দু'জনে মিলে তাকে এই বাড়ী দিয়েছেন।

শ্রীকুমারের সঙ্গে থানায় গিয়ে আমি ফিরে এলুম। আমার শত আবেদনের উত্তরে সে বলেছে একটি কথা, আমার জন্যে ভাববার কিছু নেই রে। তবে এতো আনন্দময় দিনের মধ্যে এমন একটা ঘটনা স্থান পেতো না যদি না আমার মনে পড়তো মাষ্টার মশায়কে।

—তার মানে?

—কাল রাত্রিতে ওই ভদ্রলোক যখন এসে দাঁড়ালেন, তখন ওর কণ্ঠস্বরে আমি যেন মাষ্টার মশায়কে ফিরে পেলুম, মনে হোল তিনি যেন বলছেন, আমি এসেছি—তুমি পরীক্ষা দাও।

—কিন্তু তুই?

—চুপ। অমিত্রা ঠোঁটে আঙুল স্থাপন করলো। ওর তর্জ্জনীর দিকে চেয়ে আমি নীরব হোয়ে গেলুম।

শ্রীকুমার কলকাতায় টেলিগ্রাম করতে গেছে। আমি জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছি তার প্রত্যাবর্ত্তনের পথ চেয়ে। নীল পাহাড় কালো হোয়ে এসেছে—সূর্য্যের অঙ্গেও আর সেই রক্তবর্ণ নেই। আমার শুধু বার বার মনে হচ্ছে সন্ধ্যার ছায়া পড়ছে—রাত্রি এলো। কোন জংগলের দুর্ভেদ্যতা ভেঙ্গে আমাদের অতিথি চলেছেন। কোথায় আজ তার আশ্রয়। অমিত্রার মতো মাষ্টার মশায়ের কি আরো ছাত্রী আছে, যারা রচনা করবে এই দুর্য্যোগের আকাশের নীচে নিরাপদ আশ্রয় রাত্রি-যাপনের জন্যে।

জানি না। রাত্রি সমাগত। নিশি তিমিরাবৃত কালো রাত্রি। অতিথি আমাদের কোন্ পথে চলেছেন—ওই হরিণ-ডুংগরীর পথ পার হোয়ে গভীর থেকে গভীরতর অরণ্যে, না রেল-লাইনের পাশে পাশে রাঁচীর পর্ব্বতাভিমুখে।

জানি না। আরো জানি না—অমিদি আমার কোন্ পথে চলেছে। মাষ্টার মশায়ের দেখানো পথ—হয়তো তাই হবে। আমি মাষ্টার মশায়কে ভুলে গেছি, তাঁর কিছুই জানি না।

সাম্য-গীতি

[পশ্চিম-পঞ্জাবের দশা স্মরণে]

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

গাহ সাম্যের গান।
সুর-মাধুরীর লহরে লহরে শিহরিবে তনু-প্রাণ।
বন্ধু! হের গো সিন্ধুর দেশে মিলে হিন্দু-মুসলমান।
ডাকে রক্তের বান,
পঞ্চনদের জল-তরঙ্গে উঠিল খুন-তুফান।
ঝলকিয়া উঠে মনের গুমটে ছোরাছুরি-বম্-কৃপাণ।
বন্ধু যা' খুশি গাও
নেশায় নিশীথ-স্বপন-আবেশে যতই সবেগে ধাও
যত কবিতার ছন্দিত ভাষা ধাপ্পা ধাঁসাই দাও;
ঘুচিবার নহে, মুছিবার নহে, মানুষে মানুষে ভেদ,—
এ যে সনাতন সত্যরতন—দেখাল পুরাণ বেদ।
সাম্যের বাণী ঘোষিল কোরাণ, আবেস্তা ও ত্রিপিটক
গ্রন্থ সাহেব বাইবেল আর ক্যাথলিক প্রচারক।
তবু দেখ ওই মোগল-পাঠানে ক্রীশ্চানে-ক্রীশ্চানে
মাতিছে দ্বন্দ্বে পার্শী-ইহুদী-শিখে ও মুসলমানে।
মিছা কেন এ সাম্যের গান,—লেখনী-ধারণ বৃথা,
দোকানদারীর রকম-ফেরীর এ-ও এক নব প্রথা।
হৃদয়-সাগরে ডুব দিয়ে দেখ—এখানেই সয়তান
দ্বন্দ্বের বিষে ভরিয়া গাগরী গাহে সাম্যের গান॥

হের ঐ কালকূট
যুগে যুগে ফেরে সত্যের রূপে আর সব যেন ঝুট।
হৃদয়-গভীর-গহ্বর হ'তে উঠে যত কাল-সাপ
শুনায় সাম্যের হিস্-হিস্ ধ্বনি দানিছে বিশ্ব তাপ।
দংশনে করে জর্জর-দেহ আকুল কালিমাময়
সৃজে অশান্তি অনন্ত দুঃখ যতেক হিংসা-ভয়।
হৃদয় হ'তেই উঠিছে ভীষণ নরকের পূতি গন্ধ,
গির্জা-মসজিদ্—কাবা-গুরুদ্বার মন্দিরে যত সন্দ?
ক্রন্দন করে চন্দন-তরু শুকায় তুলসী-পত্র
হৃদয়ের জ্বালা ঘেরিছে বিশ্বে—রহিনু মুদিত-নেত্র।
তুচ্ছ করিনু স্বচ্ছ তীর্থ ত্যজিনু শৌচ-স্নান,
হৃদয়ের কূট ভণ্ডামি দিয়ে রচিনু পাকিস্তান!
হৃদয় শোধিতে ভাই,
সাধুর সঙ্গ পুণ্যতীর্থ কাবা-মন্দির চাই!
তাঁর দয়া বিনা সাম্য-সাধনা কেহ কভু দেখে নাই।
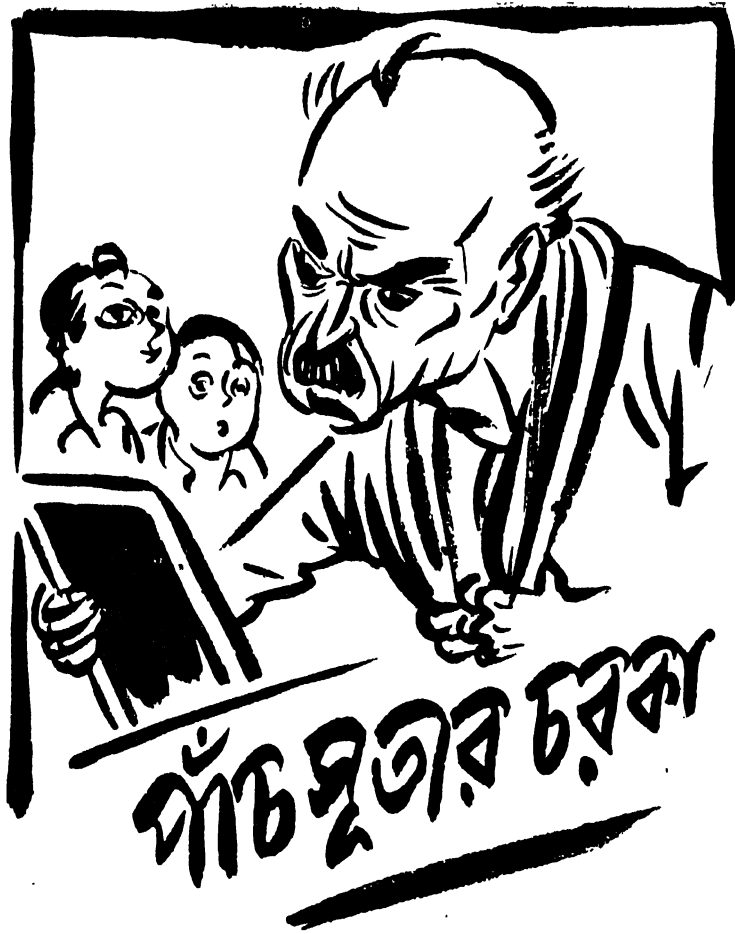
শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

গ্রামের পাঠশালা। চৌচালা ঘর। শালের পুরোনো খুঁটিতে ধরেছে উই, দেয়ালে ফাটল। ছাউনির অভাবে চালের ছেঁদাগুলো বেড়েই চলেছে। ফাঁক দিয়ে গ্রীষ্মের রোদ গলে পড়ে, বর্ষার জল চুয়িয়ে নামে টসা-টস্ করে'।

ভাঙা রথ—সারা বছর থাকে অযত্নে পড়ে, রথের দিনে সাজ-সজ্জায় চোখে তাক্ লাগে। ইস্কুল-ঘরও তেমনি ফিটফাট্ সাজানো হয়। খুঁটিতে খুঁটিতে দড়ি বেঁধে আম পাতার মালা ঝলানো, দু'টো মেটে কলসীতে সহকার-শাখা, দেবদারু পাতায় মোড়া তোরণ। ঘরের ভিতর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বসে গেছে সারি সারি, কেউ মাটিতে, কেউ বেঞ্চের উপর। চেঁচিয়ে কথা কয়, সুর করে পড়ে দুলে দুলে—এ ওকে চিমটি কাটে আর হাসে।

সনাতন মাষ্টার খালি বসে আর ওঠে; যেন থেকে-থেকে বিছের কামড়ায়। আধ-ময়লা খদ্দরের জামার ওপর ভাঁজ-করা খদ্দরের চাদরখানা কাঁধের দু'ধারে লম্বালম্বি ঝুলানো। দু'টি মুঠোয় ধরে' চাদর ভর করে চলে সে, পাছে হোঁচট খায়। ভাঙা-চোরা অদ্ভুত ধরণের চলন—রোজ দেখে ছেলেরা, হাসি-টিটকিরিও করে রোজ দিন। একবার এক রসিক ছেলে সেলেটে আঁকলে—গরুর পিছনকার দু'টো বাঁকা ঠ্যাং, তার ওপর বসালে কোলা ব্যাংএর মাথা আর ধড়টা। নীচে লিখে দিলে,—সাধু সনাতন!

দৈবাৎ মাষ্টার ছবিখানা দেখে ফেলে। ঠিক দৈবাৎ নয়,—চোখের সামনেই সেলেট হাতে-হাতে ঘোরে, ছেলেরা দেখে আর খিল-খিল করে হাসে। সনাতন চটেই লাল। লিক্‌লিকে বেতটা তুলে হাঁকে, কার পিঠ সুড়-সুড় করছে—আয় এদিকে। ঘাড়-কামানো ছেলেটার ভয়-ডর নেই। এগিয়ে আসে আবার স্বীকারও করে। পণ্ডিত অবাক্। তাকেই দেখবে, না ছবির পানে চাইবে, ঠাউরে উঠতে পারে না। শেষে গাম্ভীর্য্য হারিয়ে ফিক্ করে হেসে বলে, বাঃ, বেশ এঁকেছিস্ ত। বেত রেখে খড়ি দিয়ে সেলেটে লেখে, পুরো নম্বর—দশের মাথায় দশ।

রথের জগন্নাথ সাব-ইনস্‌পেক্টর সায়েব। গাঁয়ের লোকেরা আনে তাকে সমাদর করে, খোড়াতে খোড়াতে সনাতন বাইরে এসে করে তাঁর অভ্য-র্থনা; খাতির করে বসায়। ইনস্‌পেক্টর নতুন লোক—পণ্ডিতের পানে খর-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, যেন পরি-দর্শনের প্রথম বস্তুই তার খাটো চেহারা-খানা। কুৎসিত কুঁজো খঞ্জ—সরস্বতীর বাহন পেঁচা হল কেমন করে? নাঃ—কোন কম্মের নয়।

গ্লোব নেই, ম্যাপও নেই। এমন ইস্কুল রেখে লাভ? তিনি বললেন, হ্যাঁ হে মাষ্টার! তুমি ত খোড়া। ড্রিল আছে, রায়বেঁশে আছে—ও-সব শেখাও কেমন করে?

ড্রিলের কথায় ছেলেরা হেসেই খুন। এ পড়ে ওর গায়ে লুটিয়ে। দু'-এক বার দেখেচে তারা—মনে পড়ে যায়, পণ্ডিতের বিকলাঙ্গ দেহের অদ্ভুত কসরৎ।

ছেলেদের বেয়াদপি দেখে সনাতন পায় ভয়। কত বার বারণ করেছে কেউ যেন না হাসে।

বিরক্ত হয়ে ইনস্‌পেক্টার বলেন, উচ্ছৃঙ্খল—ডিসিপ্লিন নেই।

পণ্ডিত হাত কচলায়, ঢোক গেলে আর কাঁপে।

যা-ইচ্ছে-তাই লিখে গেলেন ইনস্‌পেক্টর, আবার অপ-মানও করলেন। আগে থেকে কাণভারি করে রেখেছে তাঁর শিবু সরকার, সনাতন তা বুঝেই বা করবে কি? তুচ্ছ ব্যাপার, তা-ও যে এত দূর গড়াবে কে তা ভেবেছিল?

ছেলের সঙ্গে ছেলের ঝগড়া মারামারি ত কতই হয়। শিবুর ছেলে পঞ্চা মার খেল বিধুর হাতে। কেঁদে গিয়ে পড়লো মা'র কাছে। ষাট্-ষাট্! কে মেরেছে—বিধু? মাষ্টার কিছু বলেনি। অথব্ব অলপ্পেয়ে কোথাকার!

পঞ্চার মা এসে বলে বিধুর মাকে,—তোর ছেলে আমার ছেলেকে মেলে যে? কুষ্ঠ বেয়াদি হক, হাত খসে পড়ুক।

বিধুর মা-ও ছেড়ে কথা কয় না। চোখ দু'টো ডাগর করে বলে, কী—আমার ছেলেকে গাল? ভে-রাত্তির পেরুবে না বলচি।

জটলা করে না কপাটি খেলে। দু'জনাই কোমর বাঁধলে। এ দু' পা এগোয় ত ও পিছোয় চার পা—মাঝখানের ফারাকটা বাড়তে থাকে। ছুটে আসে চুলের ঝুঁটি ধরতে, নাগাল পায় না। মুখে ছোটে অশ্রাব্য ভাষার তুবড়ি। কুকুর থেকিয়ে ওঠে। আঁস্তাকুড়ে মোরগটা নোংরা ঠুকে খায়, কুকুর তাকে তেড়ে যায়। কোঁক কোঁক—মোরগ উড়ে উড়ে ছোটে, আর ছুটে ছুটে ওড়ে।

ধান কাটার সময় শিবু ছিল মাঠে। ফিরে এসে শুনলে সব। হম্বিতম্বি করে বলে, বটে—দেখে নিচ্ছি! এস্পার কি ওস্পার!

সনাতনকে গিয়ে বলে যে, বিধু যে পঞ্চাকে মারলে, বলি —শাসন-টাসন করেছ কিছু। বেত মেরেছ পাছার কাপড় তুলে? জল-বিচুটি লাগিয়েছ?

রাধামাধব! ও-কাজ কি সে করতে পারে কখনো?

তা পারবে কেন? কী মাষ্টারই না রেখেছে সরকার মাইনে দিয়ে। এর চেয়ে বলুগ গে, রাখাল ডেকে ছেলেকে চরতে পাঠাও মাঠে।

পণ্ডিত ভয়কাতুরে। চুপটি করে থাকে মুখ গুঁজে।

হুমকি দিয়ে বলে ওঠে শিবু—শোন বলি, বিধুর নামটা কেটে দাও ইস্কুল থেকে। নাম কাটা সেপাই হোক। তখন বুঝবে মজা।

হঠাৎ হুঁস হয় পণ্ডিতের। সে বলে, লেখা-পড়া বন্ধ—সে হবে কেমন করে?

শিবু ধমক দেয়—হবে, আলবাৎ হবে। কাটো বলচি—নৈলে বলচি—নৈলে নিস্পেক্টরকে লিখবো। উড়ো চিঠি দেব ম্যাজিষ্টরকে। থানায় টেলিগেরাম করবো।

ইস্কুল থেকে ফিরে সনাতন রোজই ডাকে চম্পাকে। সম্পর্কে বোন, আপন নয়। বয়সে অনেক ছোট। পাহাড়ের নুড়ি ঝরণার জলে গড়িয়ে গড়িয়ে থামে একটুখানি সমতটের প্রান্তে——বনের ছায়ায় বিশ্রাম করে। চম্পারও হয়েছে তাই। বরাতে ছিল অকাল বৈধব্য—শ্বশুর-ঘর, মাসী-পিসীর বাড়ী গড়িয়ে পার হয়ে এসেছে সে এই দাদাটির আশ্রয়ে। সনাতনের অদৃষ্ট এমন—জীবন চলে খোঁড়া পা দু'টোরই মত উঠে-পড়ে। স্বদেশীতে যোগ দিয়েছে, জেলও খেটেছে। সে সব অতীত কথা, এখন আর তা কারু মনেও নেই। খদ্দর বেচা, খবরের কাগজের হকারি, এমনি কত-সব কাজ খতম করে' শেষে বসলো বিদেশে বিভুঁয়ে, এই গ্রামে মাষ্টার হয়ে। জীবনের অপরাহ্ণ, ব্যাধির প্রকোপ দেখা দিয়েছে—বে'-থা আর তার হয়ে ওঠেনি। সে-বার যখন বড় একটা অসুখে পড়েছে—সংসারে কেউ নেই, চম্পা এল তার শুশ্রূষা করতে। সেই যে এল আর ফেরেনি।

সনাতন বলে, তুই আছিস্ বোন। নৈলে এই ডেঙ্গুরটার কি উপায় হত বল ত'। কথায় বলে না, কাণা-খোঁড়া-ডেঙ্গুর —হাসতে হাসতে কাদা-মাখা সরু বাঁকা পা তুলে দেখায়।

দাদা ঐ রকম! নিজের অঙ্গবিকার নিয়ে নিজেই রঙ্গ করে।

ঘটি-ভরে জল আনে চম্পা। পা ধুয়ে দেয়, গামছায় মোছে। দাওয়ায় উঠে সনাতন বসে চরকা নিয়ে। আর যেমন পাঁচটা—চর্কার পাকে পেঁজা তুলো থেকে একটি মাত্র স্থতো বেরিয়ে আসে, এ-চরকা সে-চরকা নয়। ঘরোয়া রকমের, তেমন চরকা নিয়ে তুষ্ট থাকবার পাত্র কি—সে? পাঁচ স্থতোর চরকা তার—একটা নয়, পাঁচ-পাঁচটা স্থতো—হেঁ হেঁ, দস্তুর মত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার!

যন্তরটি চম্পাকে দেখিয়ে বলে যায়,—এই দ্যাখ, গুটির পর গুটি সারি সারি পাঁচটা বসানো লোহার শিকে লাগানো, সব ঘোরে একসঙ্গে। তুলো পেঁজে রাখা, এই খুপড়ির ভেতর—কেমন কি না। এইবার ঘোরাও চরকা, ঘরর-ঘরর। ঐ যা—কেটে যায় যে সবগুলো। তাই ত, এ কি হলো রে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওগুলো সব—বুঝলি কি না—এই ধর্ গে—

চাকাগুলি সব খুলে ফেলে সে। আবার বসে নতুন করে' সাজাতে—লাগাতে—জোড়া দিতে।

চম্পা মুখ টিপে হাসে। কী বাতিকেই না পেয়েছে দাদাকে। রোজই সেই এক জিনিষ, দেখে-দেখে সে হদ্দ। দাদার ধৈর্য্য অফুরন্ত। কত আশা করে' বসে প্রতিদিন—চরকায় একসঙ্গে পাঁচ স্থতো কাটবে। তার পর ভাঙার পালা, ভাঙার পর আবার গড়া। এমনি—বলিহারি!

কাজ বন্ধ করে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে সে, পাজি—বদমাস—

ও কি দাদা? গাল দিচ্ছ কাকে?

শিবু—লাগিয়েছে ইন্স্পেকটরের কাছে। আজ চায় সবাই মাইনর ইস্কুল। নিম্ন-প্রাইমারিও ছিল না এক দিন। গড়ে' তুলবার বেলায় এই সনাতন মাষ্টার—কেমন? দোরে দোরে যাও—চাঁদা তোল।

ভিক্ষের পাত্র নিয়ে আবার বেরুতে হল সনাতনকে। গ্লোব নেই, ম্যাপ নেই—ইনস্পেক্টর বলেছে এমন স্কুল রেখে লাভ? গাঁয়ের লোকও যে চায় তাই—উঠে যাক এটা; মাইনর ইস্কুল হবে। আরে মর্—হোক না মাইনর ইস্কুল—একটা ছেড়ে পাঁচটা। তা বলে উচ্চ-প্রাইমারি উঠবে কেন? বনিয়াদ! বনিয়াদ দাও ভেঙে, আকাশে তোল ইমারত—হুঁঃ, যত সব—! ভাল ভাল শিক্ষক আসবে, আই-এ ফেল হেড

মাষ্টার আসবে—বেশ ত! নীচের দু'টো ক্লাস—তাই নিয়ে সে থাকবে না কেন?

অনেক ঘোরাঘুরির ফলে যোগাড় হলো; খড়, বাঁশ, আর গোটা কত টাকা। যথেষ্ট মোটেই নয়, তবু মন্দের ভালো। এক দিন এই ইস্কুল-ঘর তুলতে লোকে কি আগ্রহ ভরেই চাঁদা দিয়েছে সনাতনকে। যেখানে গেছে, সেখানেই খাতির পেয়েছে—ঘর তুলে, ইস্কুল বসিয়ে সে করছে তাদেরই উপকার। কোথা গেল সে বদান্যতা? যা-কিছু দান, সে যেন দাতব্য—গরজ পণ্ডিতের, তাদের নয়। সবাই বসে আছে সরকারের মুখ চেয়ে। কবে মাইনার ইস্কুল করে দেবে, গাঁয়ে।

মুদিখানায় হুঁকো টানতে টানতে বিপ্রদাস বলে, দোকান রাখা মস্ত ল্যাটা। চাঁদা দাও, আর ট্যাক্স দাও।

শিবু বলে ওঠে, দিলে কেন চাঁদা? পই-পই করে' বারণ করলুম—মাষ্টারের দফা এবার রফা, বুঝেছ কি না। নিস্‌পেকটর এসেছিল, জানতে বাকি নেই কিছু। বলি শোন—

মুদির কানে কানে শিবু কি বললে।

রাম—রাম। বল কি খুড়ো?

কি আর বলি—বল। কলি যুগ—জান ত? এখন কি আর সত্যিকার ভীষ্মদেব খুঁজে পাবে কোথাও? জাল ভীষ্ম—বুঝেছ হে, ও জাল ভীষ্ম।

কথাটা বিশ্রী ভাগাড়ে গরু-পচা দুর্গন্ধের মতই ছড়িয়ে পড়ে। চম্পার কানে যেতে দেরি হল না।

সানপুকুরের ঘাটে চান করতে গেছে সে, দেখেই পঞ্চার মা বলে উঠলো, অ ভাল মানুষের মেয়ে—এ ঘাটে নয়। ঐ বাউরিদের ঘাটে যাও গে।

আর সব মেয়ে যারা ছিল সেখানে—ইঙ্গিত-ইসারায় এ চায় ওর পানে।

হ্যাঁ গা, তোমাদের দেশটা কেমন বল্ ত? পর-পুরুষের সঙ্গে ভাই-বোন পাতানো চলে বুঝি?

চম্পা থ হয়ে দাঁড়ালো। মেয়েগুলো হেসে ঢলে পড়ে।

কি বললে তুমি?—হঠাৎ রুখে বসে সে। বলি, গলায় এক গাছ দড়িও জোটে না তোমার।

ছুটে বাড়ি এল চম্পা। কাঁদো-কাঁদো সুরে বললে, দাদা—ওরা সব বলে কি জানো? ছি ছি, মানুষ না পশু?

ভাঙা চরকা জোড়া দেয় সনাতন। চাকা বসায়, ঠোকে, ঘোরায়। মুখ না তুলেই বলে, কি হলো রে? পশু যে মানুষেরই পূর্ব্বপুরুষ।

চম্পা হাঁপায়। বলে, তুমি আমার ভাই, ও-কথা মিছে। পর-পুরুষ—এমনি কত কি। পাপ হয় শুনলে—

চরকাটা খসে পড়ে হাত থেকে। খানিকক্ষণ থম ধরে বসে' বলে সে, কেন বোন কানে তুলিস্? পাঁকে পা দিলেই না কাদা লাগে। আকাশে উড়ন্ত পাখীর কাদার ভয় কি?

কথার কথা। মন মানে না, বিষের জ্বালায় পুড়তে থাকে।

শিবুর কথাই ফললো। সনাতনের চাকরি গেল, তার জায়গায় নতুন পণ্ডিত এসে কাজে যোগ দিলে। চতুর চটপটে লোক। চাঁদার টাকা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিয়ে জিজ্ঞেস্ করলে, মোটে এই? ভাঙোনি ত কিছু?

সনাতন মনে মনে বলে, ভাঙতুম তোমার মাথাটা—নির্ঘাৎ।

দাদার কাজ নেই, অপমান-লাঞ্ছনাও কত সইতে হয়েছে। এখানে থেকে আর কি হবে?

চম্পা বলে, দাদা, যাই চল এ গাঁ ছেড়ে।

সনাতন বলে ওঠে, একটু সবুর কর বোন। চরকাটা আগে তৈরি হোক্। পাঁচ সুতোর চরকা—সোজা নয়। একবার বাজারে বেরুলে হয়। তখন দেখবি—

ঘর্‌র্-ঘর্‌র্। চরকা ঘোরে, সুতো যায় ছিঁড়ে, কেটে আর বেরোয় না। টুকরোগুলিকে খুলে সে বসে সাজাতে। এত পরিশ্রম, অধ্যবসায়—কোন দিন দেখবে, সব গেছে সোনা হয়ে, খ্যাপার পরশ-পাথরের মত। একখানা বই-এ পড়েছে, ফ্লাই সাট্‌ল্, ষ্টীম এঞ্জিন—এমনি কত কি আবিষ্কার করেছে বিজ্ঞান-শিক্ষা যারা পায়নি কখনো—তারাই। হোক না অবৈজ্ঞানিক—কেন পারবে না সে? ভগবানের বিচারে উদ্ভাবনী শক্তি ত আর বৈজ্ঞানিকের একচেটে নয়।

ইস্কুল-ঘর মেরামত সুরু হয়েছে। নতুন পণ্ডিত দাঁড়িয়ে দেখে এটা-ওটা হুকুম করে। আড়াল থেকে সনাতন থাকে চেয়ে। ইচ্ছে হয়, খুঁতগুলি সব ধরিয়ে দেয়। কাছে যেতে সঙ্কোচ করে, লজ্জাও লাগে। সিঁড়িটা আরও চওড়া করে না কেন? কত ছেলে হোঁচট খায়—সে তা দেখেছে। কাঠ ক'খানা অসার, বাতাগুলো সরু। করেছে কি! আরে রামঃ—

বিধু—অ বিধু—

ছেলেটা ফিরে দাঁড়ায়। খোড়া মাষ্টারকে দেখেও আর হাসে না, এ-দিক্ ও-দিক্ চায়।

পড়া-শুনো—বলি, পণ্ডিত মশায় কেমন রে? ভারি কড়া, না?

পিঠে কাটা দাগটার ওপর বিধুর হাত পড়ে।

অ্যাঁ, মেরেছে? আহা, দেখি দেখি—

ঝুঁকে পড়ে হাত বুলোয় সনাতন। অবোধ অপোগণ্ড শিশু—আহা! মাষ্টার—না, জল্লাদ?

বিধুর চোখে জল—মুছতে মুছতে চলে যায়। দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে সনাতনের।

বাড়ি ফিরে চম্পাকে বলে, এই ক'দিন। এরই মধ্যে ইস্কুলটা হয়ে উঠেছে কসাইখানা। ও কি রে, চাল কোথা পেলি?

কাপড়ে বাঁধা কয়েক সের চাল, চম্পা হাঁড়ি নিয়ে বসেছে চাল ভরতে। হেসে বলে, ও আমি পেয়েছি দাদা।

পেয়েছিস্ ত। কোথা পেলি ভাই না জিজ্ঞেস্ করছি। রায়দের বাড়িতে ধান ভাঙে চম্পা। গিন্নী মানুষ ভালো

আড়াই সেরে দেয় এক-পো করে চাল—খুদটা-আসটা অমনি। সংসার যায় এই ভাবে কেটে। সনাতন দেখেনি কোন দিন পান থেকে চুণ খসতে।

সে বলে, হুঁ। কী মতিচ্ছন্নই হয়েছে আমার। চাল নেই, তুই মরিস্ পরের বাড়ি খেটে। ঘরে দু' পয়সা আসে কিসে, সে ভাবনা ভাবি কৈ?

আশ্বাস দিয়ে চম্পা বলে, হোক তোমার পাঁচ সুতোর চরকা—মা দুগ্‌গো করুন। তখন আর অভাব থাকবে না দাদা।

সনাতনের শুকনো মুখটিতে ফুটে ওঠে একটুখানি ম্লান হাসি।

চৈত্র মাস। মার্তণ্ড দেব ওপর থেকে আগুন ছড়াচ্ছেন। আকাশ ঝলসায়, ঝলঝল করে—ধক-ধক লক-লক করে। সেই উনুনে-তাতা কড়াই থেকে ধূলোর ধোঁয়া ওঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে। গাছের পাতা হলদে, চালের খড়-কুটো হয়ে বাতাসে ওড়ে। শুকনো পুকুর, পাঁক শুকিয়ে কাঠ।

আগুন!

চার দিকে চীৎকার উঠলো,—আগুন! হায় হায়—

চম্পা ছুটে এসে বললে, দাদা, আগুন লেগেছে!

কোথা?

ইস্কুল-ডাঙ্গায়। চালাখানা বুঝি ধরলো।

অ্যাঁ—সনাতন ছুটলো খোঁড়াতে খোঁড়াতে।

ইস্কুলের পাশের বাড়ীর ঘরগুলি দাউ দাউ করে পুড়ছে। আগুনের লিক-লিকে শিখাগুলি লট-পট করছে ঝাণ্ডার মত, ঝড়ো বাতাসে। হলকা উঠছে যেন কামারের হাপর থেকে, স্ফুলিঙ্গগুলি বাতাসের সঙ্গে উড়ে উড়ে যায় ইস্কুল-ঘরের দিকে। দেখতে দেখতে চালা ধরে উঠলো।

নতুন পণ্ডিত নিরুপায় ভাবেই বলে উঠলো, ঐ রে—ঐ গেল—

গেল ত। করব কি বাঁচাবার জন্য?—পাশটিতে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে সনাতন বলে।

কি করবো? জল নেই যে!

সনাতন তার হাতখানা শক্ত করে' চেপে ধরে। রুক্ষ স্বরে বলে, লজ্জা করে না দাঁড়িয়ে দেখতে? এস শীগ্‌গির।

কোথা?

আগুন নেবাবে চল।

সে কি? কেমন করে?

গর্জ্জে ওঠে সে,—দু'টো হাত দিয়েছেন ভগবান তোমায়—কিসের জন্য? শুধু কি ছেলেগুলোকেই পিটবে? জোয়ান মানুষ—চল আমার সঙ্গে। হাত দিয়ে পিটিয়ে নেবাবো আগুন।

ক্ষেপেছ? পুড়ে মরবে। আগুন নিববে না।

সনাতন প্রকৃতিস্থ হল। তা বটে! আগুনের যে তাপ, কাছে যায় সাধ্য কার? কি করবে সে? খড় চালা কাঠ খুঁটি—সব জ্বলে যায়। তার বুকের পাঁজরগুলিও জ্বলে বুঝি।

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবেই বাড়ি ফিরে এল সে। বরখাস্ত হয়েছে কবে, ইস্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচলো তার—এত দিনে।

চম্পাকে বললে, "গুছিয়ে নে বোন, কাল সকালেই যাব এখান ছেড়ে।"

গরুর গাড়ি এসেছে। চম্পা জিনিষ-পত্র বের করে' আনলে। পাঁচ সুতোর চরকা—সনাতন দেখে সেটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। কোথা সে উদ্যম, উৎসাহ—উদ্ভাবনী শক্তি? অতীত সত্য নয়—সে ত চোখের উপর পুড়ে ছাই হয়েছে। ছলনা করবে শুধু কি ভবিষ্যতের কল্পনা-বিলাস?

চরকা সে জঞ্জালে ফেলে দিলে।

নিরক্ষর

শ্রীচরণদাস ঘোষ

পনেরো

মাস দেড়েক অতিবাহিত হইয়াছে। এক দিন দ্বিপ্রহরে ভাঁটু যেন ঝড় তুলিয়া 'বড়মার' কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, "দেখো বড়মা, তোমাকে একটা কথা শিখিয়ে রাখ্‌ছি। মা যদি এসে বলে—'মলিন একবার চলো'—কখ্‌খনো মলিনদা'কে যেতে দিয়ো না।"

ভাঁটুকে দেখিয়া মলিনও কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মাতা-পুত্র উভয়েরই চোখ সপ্রশ্ন হইতে ভাঁটু বলিয়া উঠিল, "আমাদের বাড়ী গো, আমাদের বাড়ী! সন্ধ্যার আজ পাকা দেখা।"

সন্ধ্যার বিবাহ, তাহার পাকা দেখা—আনন্দে বড়মা'র চক্ষুর্দ্বয় বড় হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ভাঁটুর মুখ দিয়াও যেন শিলাবৃষ্টি বহিয়া গেল—"গ্রামের সক্কলকার নেমন্তন্ন হলো—কেউ বাদ পড়লো না, বাদ পড়লো কেবল—মলিনদা' ?"

বড়মা এক-মুখ হাসিয়া কহিলেন, "সন্ধ্যার আশীর্ব্বাদ! তা' বলে' মলিন গিয়ে একবার বসবে না?"

"নেভার—না! মলিনদা' কি দশ জনের ভেতর এক জন নয়?"—ভাঁটু যেন ক্ষেপিয়া উঠিল।

বড়মার মুখখানা এইবার যেন একটু আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। কহিলেন, "পয়সা না থাকলে মানুষ দশ জনের এক জন হয় না ভাঁটু! ভগবান যদি দিন দেন, মলিনও আমার দশ জনের এক জন হবে এক দিন। কিন্তু এ যে সন্ধ্যার বিয়ে, বাবা। আজ আমরা তো রাগ-অভিমান নিয়ে থাকতে পারি না!"

"এইটুকুই আমার বুকের বল, দিদি!" বলিতে বলিতে সহসা সরস্বতী প্রবেশ করিল।

মাকে দেখিয়াই ভাঁটু বলিয়া উঠিল, "এই যে—মা, এসেছে! মা, মলিনদা'কে তুমি যেতে বলতে পাবে না, বলছি।"

সরস্বতী ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "না, রে না, আমি তো আর ক্ষেপিনি!"

"That's good! my mission is fulfilld! good by, malinda—" বলিয়াই ভাঁটু হর্ষে নৃত্য তুলিয়া বাহির হইয়া গেল। মলিনও সেখানে আর দাঁড়াইল না।

অতঃপর সরস্বতী একবার এদিক্‌-ওদিক্‌ চাহিয়া সকুণ্ঠ মুখে কহিল, "সন্ধ্যার আজ পাকা দেখা—মলিন আমার আসর-শোভা করে বসবে! সে আমার কত আহ্লাদ, কিন্তু উনি কি বুঝলেন—জানি না, কিন্তু তুমি কিছু মনে কোরো না দিদি—" বলিয়াই মলিনের মা'র হাত ধরিল।

মলিনের মা জিব কাটিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "করিস্ কি সরস্বতি! নাই বা আমাদের বললে—তাই বোলে দুঃখ করবো আমি? হাত ছাড়াইয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন, "আমার যদি পয়সা থাক্‌তো, সন্ধ্যাকে কি আমি আর বারুর ঘরে যেতে দিতাম? আমার এই অন্ধকার ঘর—ওই তো আলো কোরে থাক্‌তো বোন্!"

সরস্বতী চমকিয়া উঠিল, যেন তাহার বুকের ভিতর এক-সঙ্গে এক সহস্র শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "দুঃখ তুমি করবে না তা আমি জানি, দিদি! সন্ধ্যা তো তোমারই—আশীর্ব্বাদ করো, ও যেন সুখী হয়!"

মলিনের মা হাসিয়া কহিলেন, "তুই যতক্ষণে বল্‌বি, ততক্ষণে আশীর্ব্বাদ করবো—নইলে করবো না? কি বলিস্?"

সরস্বতী অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "মায়ের মন!"

"সন্ধ্যার মা তুই একলা, আমি বুঝি নই?—হ্যাঁ রে, ছেলেটি কেমন?"

"ভালো। দু'-তিনটি পাশ করা। তবে বাপ-মা নেই—বাড়ীর অবস্থাও যে খুব ভালো, তা' নয়। তবে, 'ওঁর ইচ্ছা—পরে কিছু জমি-যায়গা দিয়ে এইখানেই ছেলেকে বাড়ী-ঘর করে দেবেন।"

"সেটা হয়ে উঠবে না।"—মলিনের মা হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "শিক্ষিত ছেলে শ্বশুর-বাড়ীতে থাকতে রাজী হবে না। আজ-কালকার ছেলেদের আত্মসম্মান যে কত বেড়ে গেছে, ভাঁটুকে দেখে বুঝছিস্ নে?"

"আমিও তাই ওঁকে এক দিন বলেছিলাম।" বলিয়াই সরস্বতী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

* * *

বিবাহের দিনস্থির হইয়া গিয়াছে। সম্মুখে অকাল বলিয়া মাঝে মাত্র একটি মাস।

ইহার পর হইতে সন্ধ্যা বড় একটা মলিনদের বাড়ী আসে না। মলিনও প্রায় আর বাড়ী হইতে বাহির হয় না। তাহাকে দেখিলেই মনে হয়, যেন সে সর্ব্বদাই অবসন্ন, সর্ব্বক্ষণই বিমর্ষ, যেন নিজেকে জাগ্রত করিয়া রাখিবার আগ্রহ তাহার মূর্ত্তি হইতে কবে কখন্ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। ঠিক এমনিই সময়ে তাহার পরীক্ষার সংবাদ আসিল—'ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট'!

পরদিনই মলিন মাকে কহিল যে, সে কলিকাতায় যাইবে—চাকরীর চেষ্টায়।

মায়ের মনে আবার এক নূতনতর আনন্দের প্রবাহ বহিয়া গেল—মলিন চাকরী করিবে, কাঠকড়ির বাড়ী-ঘর হইবে, জমি-যায়গা কেনা হইবে। তার পর একটি টুকটুকে—বউ! তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়া কহিলেন, "বেশ ত বাবা!"

"কিন্তু—"

"কিন্তু—কি?"

মলিন একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "কিন্তু, গেলেই তো আর চাকুরী হবে না—হয়তো দুই-এক মাস দেরিও হতে

পারে।" সহসা এক দুর্লজ্ঘ্য নিরাশায় তাহার মুখখানা আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। দুই-একটা ঢোঁক গিলিয়া কহিল, "দুই-এক মাসের মেস্-খরচ তো চাই—গোটা পঞ্চাশেক টাকা।"

মায়ের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, তার পর দেখা গেল, তাঁহার মুখে এক প্রচণ্ড আশার দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "ভাবনা কি—দেব এনে!"

"পাবে ?"

মা হাসিয়া জবাব দিলেন, "তুই পেলেই তো হলো!"

মলিন মুখটি নীচু করিয়া কহিল, "দু'-এক মাসের ভেতর একটা চাকুরী পাবোই। প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই শোধ করে দেব! মাত্র দু'টি মাস!"

অতঃপর ইহাই দাঁড়াইল যে, মা টাকার যোগাড় করিলেন নিবারণের কাছে—বাস্তুভিটাটুকু বন্ধক দিয়া। এক পাকা দলিল সম্পাদিত হইল সন্ধ্যার নামে। দলিলে সর্ত্ত রহিল—তিন মাসের ভিতর যদি টাকা পরিশোধ করা না হয়, তাহা হইলে উক্ত দায়বদ্ধ সম্পত্তির স্বত্ব-স্বামিত্ব অধমর্ণের আর রহিবে না। মলিনের বুকের ভিতরটা একবার দুলিয়া উঠিল—বাস্তুভিটা পৈতৃক বাসস্থান! এতাদৃশ মনের অবস্থা লইয়া দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া মলিন যে-দিন গৃহে ফিরিল, সেই দিনই অপরাহ্ণে সন্ধ্যা তাহাদের বাড়ী আসিল। মা তখন বাড়ী ছিলেন না। মলিন বসিয়াছিল একা, বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল তাহা সে-ই জানে, যেন বা জগতের এক অনাবিষ্কৃত 'দর্পণ' আজ তাহার চোখের কাছে রাশি রাশি অক্ষর লইয়া সরিয়া আসিয়াছে!

সন্ধ্যা মলিনের নিকট গিয়া ডাকিল, "মলিনদা'!"—

অনেক দিনের পর, বোধ করি বা এক যুগ, তাহারও অধিক—অকস্মাৎ!

মলিন তাহার দিকে দৃষ্টি তুলিল—অলস অচঞ্চল! সে দৃষ্টিতে আমন্ত্রণও ছিল না—উপেক্ষাও ছিল না! কহিল, "মাকে ডাকছ ?—মা তো বাড়ী নেই ?" বলিয়াই অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

সন্ধ্যা ক্ষণকাল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, "কলকাতা যাচ্ছ—সত্যি ?"

মলিন অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল—"হু!"

"আমি যদি বলি—যেয়ো না ?"

মলিন সন্ধ্যার দিকে মুখ ফিরাইল।

সন্ধ্যাও মুহূর্ত্তেই কণ্ঠ দৃঢ় করিয়া কহিল, "চাকরী তোমার হবে না।"

মলিনের মুখখানা কাঁপিয়া উঠিল, যেন হঠাৎ তাহার বুকে ঘা লাগিয়াছে। বাল্যের স্মৃতি বলিয়া পৃথিবীতে যে জনশ্রুতি আছে, তাহা মলিনের কানে আজ যেন হঠাৎ পৌঁছিল। এক দিন এই মেয়েটিই ছিল তার সঙ্গী—ছায়া!

সন্ধ্যা যেন আজ অতিরিক্ত স্পষ্ট, অতিরিক্ত সহজ। আপন মনেই বলিয়া উঠিল, "অত লেখাপড়া শিখে উনি যাবেন পরের গোলামী করতে—ছাই হবে চাকরী।"

মলিন তাকাইয়া ছিল, চোখ নামাইল—কথার কোন জবাব দিল না।

সন্ধ্যা তেমনিই সুরু করিল, "এ যদি সত্যি হয় যে, কেউ অসাধারণ ছাত্র হয়ে ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছেন, তা হলে এটাও অক্ষরে অক্ষরে সত্যি যে, তিনি অসাধারণ মানুষ হয়েই বড় হবেন! কিন্তু যারা চাকরীর খাতায় নাম লেখায় তারা ও-দলের নয়, তারা চোদ্দ শাকের ভেতর কাঁটা নটে।"

এবারেও মলিন কথা কহিল না।

সন্ধ্যা যেন জ্বলিয়া উঠিল। এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া অধিকতর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "রামায়ণের সেই রাণী যে রামকে শাপ দিয়েছিল—তার সঙ্গে সই পাতাতে আমার এমনই ইচ্ছে করে! আমি ত বলছি—এক জনের চাকরী হবে না—হবে ন'—হবে না।"

মলিনের মুখ দিয়া এইবার একটু হাসির আভা বাহির হইল। কিন্তু, সে-হাসি নিষ্প্রভ। তাহার মর্ম্মটা বুঝি বা ইহাই যে, এক দিনকার এক জন কান্নার ছায়া, চোখের দৃষ্টি হইয়া থাকিলেও, টাকার জন্য—মাত্র পঞ্চাশটি টাকা, তার জন্য ভবিষ্য কালের সাংসারিক দুনিয়ায় সে-ও আত্মবিস্মৃত হয় না—সন্ধ্যাও তাই। মলিন অনাসক্ত কণ্ঠে কহিল, "তোমারই লাভ।"

সন্ধ্যার মুখখানা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। কহিল, "হ্যাঁ, ফাঁকি দিয়ে এক জনার বাস্তুভিটে।" একটু চুপ করিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, "হাতের একটা রিষ্টওয়াচ আর আঙুলের একটা আংটি—এতেই যাদের নরজন্মের সার্থকতার মাত্রা ঠিক হয়, তারা যেন পরজন্মে ভগবানের কাছে এই 'বর' মাগে—ভগবান আমাদের আর 'মানুষ' করে পৃথিবীতে পাঠিয়ো না।"

এমনিই সময়ে মলিনের মায়ের গলার আওয়াজ আসিতেই, সন্ধ্যা জিব কাটিয়া সরিয়া গেল। [ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভূমিকা

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ভারতে শক্তিপূজা প্রচলিত। পাঁচ সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে পাঞ্জাবের হারাপ্পা এবং সিন্ধুদেশের মহেঞ্জোদারো নগরে দেবীপূজা হইত। উক্ত প্রাচীন নগরদ্বয়ের যে ধ্বংসাবশেষ সিন্ধুনদের তীরে ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে অসংখ্য মৃন্ময়ী দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। দেবী ছিলেন উক্ত দুই নগরের অধিবাসিগণের প্রধান দেবতা।

বেদে শক্তিবাদ

বৈদিক যুগেও শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্ত এবং সামবেদের রাত্রিসূক্ত হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক যুগে শক্তিবাদ বর্ধিত হইয়াছিল। অষ্টমন্ত্রাত্মক দেবীসূক্তের ঋষি ছিলেন মহর্ষি অম্ভৃণের কন্যা ব্রহ্মবিদুষী বাক্। বাক্ ব্রহ্মশক্তিকে স্বীয় আত্মারূপে অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমিই ব্রহ্মময়ী আদ্যাদেবী ও বিশ্বেশ্বরী।' ঋগ্বেদীয় রাত্রিসূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন ঋষি কুশিক। ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্ত্র ঋগ্বেদে আছে। এই দেবীর বিভিন্ন মূর্তি আছে। ঋগ্বেদে বিশ্বদুর্গা, সিন্ধুদুর্গা ও অগ্নিদুর্গা এবং অন্যান্য দেবীর উল্লেখ আছে। ব্রহ্ম ও তৎশক্তি অভেদ—এই শাক্ত সিদ্ধান্তটি সামবেদীয় কেনোপনিষদের নিম্নোক্ত উপাখ্যান হইতে জানা যায়। দেবাসুর-সংগ্রামে ব্রহ্মের দ্বারাই দেবতাদের বিজয় হইল। স্বশক্তিতে জয়লাভ হইয়াছে মনে করিয়া দেবগণ গৌরবান্বিত হইলেন। তাঁহাদের মিথ্যাভিমান অপনোদন করিবার জন্য স্বশক্তি প্রভাবে ব্রহ্ম বিস্ময়কর মূর্তিতে দেবগণের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। দেবগণ আবির্ভূত পূজ্যরূপকে জানিতে না পারিয়া অগ্নিকে তৎসমীপে প্রেরণ করেন। পূজ্যরূপী ব্রহ্ম অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম ও শক্তি কি?' অগ্নি বলিলেন, 'আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয় আমি দগ্ধ করিতে পারি।' ব্রহ্ম অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিয়া উহা দগ্ধ করিতে বলিলেন। অগ্নি সর্বশক্তি প্রয়োগেও তৃণদল দগ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া অবনতমস্তকে দেবতাগণের সমীপে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রহ্ম সমীপে বায়ু গমন করিলে ব্রহ্ম পূর্ববৎ তাঁহার নাম ও শক্তি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, 'ইনি বায়ু এবং পৃথিবীর সব কিছুই উড়াইয়া লইতে সমর্থ।' ব্রহ্ম এক খণ্ড তৃণ বায়ুর সম্মুখে রাখিলেন। কিন্তু বায়ু স্বশক্তিপ্রভাবে উহা উড়াইতে অসমর্থ হইয়া লজ্জিত ভাবে পলায়ন করিলেন। অনন্তর ইন্দ্র ছদ্মবেশী ব্রহ্মের সমীপে উপস্থিত হইলে ব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলেন এবং তৎপরিবর্তে আকাশে ইন্দ্র সুশোভনা উমা হৈমবতী দেবীকে দর্শন করিলেন। ইন্দ্র ধ্যানে জানিতে পারিলেন যে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ ও ব্রহ্মশক্তির দ্বারা দেবতাগণ শক্তিমান্ এবং অসুর-সংগ্রামে বিজয়ী।

বৌদ্ধধর্মে শক্তিবাদ

হিন্দুতন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধতন্ত্রেরও অসংখ্য গ্রন্থ আছে। মূল কল্পতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র নামক দুইখানি প্রাচীনতম বৌদ্ধতন্ত্র যথাক্রমে ১ম ও ৩য় শতাব্দীতে রচিত হয়। চীনদেশীয় ত্রিপিটকে (বৌদ্ধশাস্ত্রে) চীনা ও তিব্বতী ভাষায় অনূদিত কয়েকটি তন্ত্রগ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। নালন্দা ও বিক্রমশিলা নামক বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। হিন্দুদের নিত্য পাঠ্য ধর্মগ্রন্থ চণ্ডীখানি এক সময় বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের প্রিয় হইয়াছিল। জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর স্বহস্তে লিখিত একখানি চণ্ডী নেপালে পাওয়া গিয়াছে। উহা প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্বে লিখিত। বাংলাদেশেই বৌদ্ধতন্ত্র সমৃদ্ধ হয়। ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য তাঁহার Introduction to Buddhist Esotericism গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, হিন্দু তন্ত্র নানা বিষয়ে বৌদ্ধতন্ত্রের নিকট ঋণী। কয়েকখানি প্রসিদ্ধ হিন্দুতন্ত্রে কালী, তারা, ষোড়শী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা—এই দশ মহাবিদ্যার যে বর্ণনা আছে তৎসমুদয় বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত; ইহা বৌদ্ধতন্ত্র 'সাধনমালা' পরিদৃষ্টে বুঝা যায়। উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী, ভদ্রকালী এবং তারা—দেবীর এই অষ্ট রূপের মন্ত্রাবলীও বৌদ্ধতন্ত্র হইতে প্রাপ্ত। সরস্বতী ও কালী বাংলার এই জনপ্রিয় দেবীদ্বয়ও বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টি। হিন্দু তন্ত্রের অনেক মন্ত্র বৌদ্ধতন্ত্রস্পৃষ্ট মন্ত্রের অপভ্রংশ। বৌদ্ধধর্মের পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের এক একটি শক্তি আছে। তাহাদের নাম লোচনা, মামকী, পাণ্ডারা, আর্য্যতারা ও বজ্রধাত্রীশ্বরী। হিন্দুতন্ত্রে যেমন বামাচার ও দক্ষিণাচার—এই দুই বিভাগ আছে, বৌদ্ধতন্ত্রেরও তদ্রূপ ক্রিয়াতন্ত্র, চর্য্যাতন্ত্র ও যোগতন্ত্র প্রভৃতি চারি বিভাগ আছে। বৌদ্ধতন্ত্রমতে মহাশূন্য হইতে বীজমন্ত্রের সৃষ্টি হয় এবং এক একটি বীজমন্ত্র এক একটি দেবতার রূপ ধারণ করে। বৌদ্ধতন্ত্রে ৮৪ জন সিদ্ধপুরুষের নাম আছে। তাঁহারা ৭ম, ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া সান্ধ্যভাষায় তন্ত্র প্রচার করেন। এই বৌদ্ধতন্ত্র বা বজ্রযান ৩য় শতাব্দীতে মৈত্রেয়নাথ কর্তৃক স্থাপিত হয়। বাংলার কামাখ্যা ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রাচীন কেন্দ্র ছিল। হিন্দুতন্ত্রে যেমন আগম ও যামল নামক দুই বিভাগ আছে, তেমনি বৌদ্ধতন্ত্রেরও বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান নামক তিনটি প্রধান বিভাগ আছে। কালচক্রযানের বিস্তৃত দর্শন ও ইতিহাস তিব্বতী ভাষায় সুপণ্ডিত রুশদেশীয় বৌদ্ধতত্ত্ববিৎ ডাঃ জর্জ রোরিক (George Roerich) কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বৌদ্ধ সরস্বতীর তিন মুখ ও ছয় হাত। বৌদ্ধ জগতে বাগীশ্বর মঞ্জুশ্রীর শক্তি সরস্বতী। সাধনমালা নামক বৌদ্ধতন্ত্রে মহাসরস্বতী, বজ্রবীণা সরস্বতী, বজ্রসারদা ও আর্য্য সরস্বতীর ধ্যান আছে। 'সাধনমালা'য় মহাসরস্বতীর বর্ণনা এইরূপ,—"ভগবতী, শরদিন্দুকরাকারা, সিতকমলোপরি চন্দ্রমণ্ডলস্থা, স্মেরমুখী, অতিকরুণাময়ী, শ্বেতচন্দন-কুসুম-বসনধরা মুক্তাহারোপশোভিতহৃদয়া, নানালঙ্কারবতী, দ্বাদশবর্ষাকৃতি, স্ফুরদনন্তগভস্তি ও ব্যূহাবভাসিতলোকত্রয়া।"

জৈনধর্মে শক্তিবাদ

জৈনধর্মেও শক্তিবাদ প্রবেশ করিয়াছিল। রাজপুতানার আবু পাহাড়ে যে বিখ্যাত শ্বেত প্রস্তর-নির্মিত সুবৃহৎ জৈন মন্দির আছে তাহার চূড়াতে ষোলটি জৈন দেবীর বিভিন্ন মূর্তি খোদিত আছে। কাথিয়াবাড়ের গিরনার পর্বতে পাষাণ-নির্মিত সরস্বতীর মূর্তি ছিল। জৈনধর্মের উভয় সম্প্রদায়ের মন্দিরে সরস্বতী ও অন্যান্য দেবীর মূর্তি দেখা যায়। জৈনগণ সরস্বতীকে শাসনদেবীরূপে ভক্তি করেন। জৈনদের নিকট সরস্বতী বিদ্যাদেবী, জ্ঞান ও কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। রত্নসাগর নামক জৈন ধর্মগ্রন্থে সরস্বতীর যে ধ্যান আছে তাহাতে সরস্বতীকে বিশ্বরূপিণী বলা হইয়াছে। আর একটি জৈনগ্রন্থে সরস্বতীর নিম্নোক্ত ধ্যান আছে—

কুন্দেন্দু-গোক্ষীর-তুষারবর্ণা
সরোজহস্তা কমলে নিষণ্ণা।
বাগীশ্বরী পুস্তকবর্গহস্তা
সুখায় সা নঃ সদা প্রশস্তা॥

খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে জৈনগণ সরস্বতীর বহু স্তোত্র, মন্ত্র ও অষ্টক প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। জৈনগণ সরস্বতীকে ভারতী, সারদা, বাগীশ্বরী, ব্রহ্মাণী, ব্রহ্মবাদিনী ও ব্রতচারিণী ইত্যাদি ষোলটি নাম দিয়াছেন।

মহাভারতে শক্তিবাদ

মহাভারতে দেবী উপাসনার বিষয় উল্লিখিত আছে। ভীষ্মপর্বের ২৩শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়লাভের জন্য যুদ্ধারম্ভের পূর্বে দুর্গাদেবীকে প্রণাম ও প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ভীষ্মপর্বোক্ত অর্জুনকৃত দুর্গা-স্তোত্রে দুর্গাকে সরস্বতী বলা হইয়াছে। কুমারী, কালী, কপালী, মহাকালী, চণ্ডী, কান্তারবাসিনী প্রভৃতি দেবীর বহু নাম মহাভারতে পাওয়া যায়। প্রথমে দেবী বিন্ধ্যাচলের অরণ্যবাসিগণ কর্তৃক কুমারীরূপে পূজিতা। শীঘ্রই তিনি শিবসঙ্গিনীরূপে পরিগণিতা এবং উমা নামে পরিচিতা হন। বিরাটপর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির কর্তৃক রচিত একটি দেবীস্তুতি আছে। উহাতে দেবীকে মহিষাসুরনাশিনী, বিন্ধ্যবাসিনী, মদমাংসবলিপ্রিয়া বলা হইয়াছে। মহাভারতের বিরাটপর্বের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, বিন্ধ্যাচলই দেবীর আবাসস্থল। বিন্ধ্যাচলে অদ্যাপি বর্তমান বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির ও দেবীপীঠ হইতে তাহা সমর্থিত হয়। দেবীর বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী নামটি চণ্ডীতেও আছে। মহাভারতে দেবী শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণবর্ণা ভগিনীরূপেও বর্ণিতা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ও হরিবংশে শক্তিবাদের পরিপুষ্টি হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়কেই চণ্ডী বলে। হরিবংশের ৫৭ এবং ১৬৬ অধ্যায়দ্বয়ে দেবীস্তুতিতে শক্তিবাদ সুস্পষ্ট। মহাভারতে দেবীর ভদ্রকালী ও চণ্ডী প্রভৃতি নামও আছে; কিন্তু দেবীর চামুণ্ডা নামটি মহাভারতে পাওয়া যায় না। ভবভূতির 'মালতীমাধবে'র ৫ম অঙ্কে উল্লিখিত আছে যে, চামুণ্ডা দেবী নরবলি সহ পূজিতা হইতেন এবং তাঁহার মন্দির পদ্মাবতী নগরীর বাহিরে শ্মশান-পার্শ্বে বিদ্যমান; পদ্মাবতী বর্তমান উজ্জয়িনী এবং সপ্ত মোক্ষধামের অন্যতম। 'মালতীমাধব' শ্রীশ্রীচণ্ডীর পরবর্তী। সুতরাং দেবীর চামুণ্ডা নাম ও চণ্ডিকা মূর্তি সর্বপ্রথম চণ্ডীতেই পাওয়া যায়।

রামায়ণে শক্তিবাদ

কৃত্তিবাসকৃত বাংলা রামায়ণ অনুসারে রাবণ ও রাম উভয়েই দেবীভক্ত ছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণে উহা নাই। রাবণ-রচিত বলিয়া একটি গঙ্গাস্তোত্র এখনও প্রচলিত। দুর্গাপূজার মন্ত্রে আছে, "রাবণস্য বিনাশায় রামস্যানুগ্রহায় চ অকালে বোধিতা দেবী।"

শারদীয়া পূজা কৃত্তিবাসের কল্পিত নহে। বহু কাল হইতেই বাংলাদেশে এই প্রবাদ প্রচলিত। কাহারো মতে ভাগবত পুরাণ হইতে এই আখ্যান কৃত্তিবাস গ্রহণ করিয়াছেন। প্রবাদ অনুসারে রামই শরৎকালে দেবীর অকাল বোধন করেন রাবণবধের জন্য। রাবণ ও মেঘনাদ উভয়েই দেবীর আরাধনা করিতেন। রামের আরাধনায় সম্প্রীতা হইয়া দেবী রাবণকে পরিত্যাগ করেন। এই মতে বাসন্তী পূজাই প্রকৃত দেবীপূজা। কিন্তু, শ্রীশ্রীচণ্ডীর মতে শরৎকালেই সুরথ ও সমাধি দেবীপূজা করেন। দেবীভাগবত মতে শরৎকালেই দুর্গাপূজার উৎপত্তি। সে যাহাই হউক, রামচন্দ্র ১০৮ পদ্মদ্বারা দেবীপূজার সংকল্প করেন। আবশ্যকীয় সংখ্যক পদ্ম সংগৃহীত হইল। দেবী ভক্তের ভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য ছলনা করিলেন। তিনি একটি পদ্ম লুকাইয়া রাখিলেন। পূজার সময় একটি পদ্মের অভাব হওয়ায় রামচন্দ্র বিপদে পড়িলেন। পূজা পূর্ণাঙ্গ না হইলে দেবী সন্তুষ্ট ও সংকল্প সিদ্ধ হইবে না। রাম পদ্মলোচন নামে অভিহিত। সেই জন্য নিজের একটি চক্ষু উৎপাটিত করিয়া উহাকে পদ্মরূপে শ্রীমায়ের চরণে অঞ্জলি দিবেন—এইরূপ স্থির করিলেন। তিনি ধনুর্বাণ হস্তে চক্ষু উৎপাটন করিবার উপক্রম করিতেই দেবী আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন। দুর্গাপূজা যে এক সময় বাংলার গ্রামে গ্রামে হইত তাহার প্রমাণ ধনী হিন্দুর বাড়ীতেই এক একটি চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। নবদ্বীপের মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্তের চণ্ডীমণ্ডপে চৈতন্যদেব টোল খুলিয়াছিলেন। বৈষ্ণবাচার্য নিত্যানন্দ খড়দহে স্বগৃহে প্রতিমায় মহাশক্তির আরাধনা করিতেন। কবি চণ্ডীদাস দেবী বাসুলির অনুরক্ত সেবক ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে তাহির বংশের রাজা কংসনারায়ণ সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজগুরু রমেশ শাস্ত্রীর পৌরোহিত্যে প্রতিমায় বিরাটভাবে দুর্গোৎসব করেন। বাংলার নানা স্থানে দ্বিভুজা হইতে অষ্টাদশভুজা পর্যন্ত দুর্গামূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

বাংলা ভাষায় শাক্ত সাহিত্য

শাক্ত ভাবের স্রোত সমগ্র ভারত প্লাবিত করিলেও বাংলা দেশে ইহা বিশেষ পরিপুষ্ট হইয়াছে। বাংলার ধর্মগঙ্গার দেবী-ভক্তি অন্যতম প্রধান ধারা। বাংলা ভাষায় প্রাচীন কাল হইতে বিশাল শাক্ত সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে। বাংলা দেশে চণ্ডীর বহু অনুবাদ ও সংস্করণ হইয়াছে ও হইতেছে। চণ্ডীর একটি পদ্যানুবাদও দেখিয়াছি।

বর্তমান যুগে চণ্ডীর যে সকল বঙ্গানুবাদ হইয়াছে তন্মধ্যে অবিনাশ মুখোপাধ্যায়, ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার প্রভৃতি কৃত অনুবাদ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণের শাক্ত সঙ্গীত বাংলা ভাষার অমূল্য সম্পদ্। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় বিশাল শাক্ত সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে। এই পাঁচ শত বৎসর চণ্ডী, দুর্গা, অম্বিকা, সরস্বতী, ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, গঙ্গা প্রভৃতি দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারোদ্দেশ্যে বহু কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন তাঁহার "বাংলা সাহিত্যের কথা" নামক গবেষণাপূর্ণ পুস্তকে বলেন, 'সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত দেবীমাহাত্ম্য-সূচক প্রায় সকল কাব্যই মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দুর্গা সপ্তশতী বা চণ্ডী অবলম্বনে রচিত। তখন ঐ কাব্যের সমাদর খুব বেশী ছিল।' দ্বিজ কমললোচনের চণ্ডিকামঙ্গল, অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ রায়ের দুর্গামঙ্গল, গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গল, শিবচরণ সেনের গৌরীমঙ্গল, হরিশ্চন্দ্র বসুর দেবীমঙ্গল, রামশঙ্কর দেবের অভয়ামঙ্গল, বালদুর্লভের দুর্গাবিজয়, হরিনারায়ণ দাসের চণ্ডিকামঙ্গল, এবং জগৎরাম বন্দ্য ও তৎপুত্র রামপ্রসাদ-রচিত দুর্গাপঞ্চরাত্রি চণ্ডী অবলম্বনে রচিত। দীনদয়ালের দুর্গাভক্তিচিন্তামণি এবং দ্বিজ রামনিধির দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী দেবীভাগবত পুরাণ অবলম্বনে লিখিত। দ্বিজ কালিদাসের কালিকামঙ্গল, সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহের ভারতীমঙ্গল, কৃষ্ণজীবন মোদকের অম্বিকামঙ্গল, মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল, ভবানীশঙ্কর দাসের মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, জয়নারায়ণ সেনের চণ্ডিকামঙ্গল, রামানন্দ গোস্বামীর চণ্ডীর গীত, কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গল, নারায়ণদেবের কালিকা-পুরাণ প্রভৃতি এই শ্রেণীর কাব্য। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের দুর্গামঙ্গল ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। শাক্ত সাধক রামপ্রসাদের প্রচলিত শ্যামাসঙ্গীত ব্যতীত কালিকামঙ্গল নামে একখানি কাব্য আছে। কালিকামঙ্গল ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের পরবর্তী। কলিকাতার প্রাচীনতম কবি রাধাকান্ত মিশ্রের শ্যামাসঙ্গীত কাব্যও উল্লেখযোগ্য। উহা ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।

চণ্ডীমঙ্গল

চণ্ডীমঙ্গল নামে বহু শাক্ত কাব্য এই সময়ে বাংলায় রচিত হয়। মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত। সপ্তগ্রাম নিবাসী মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দ। চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতাগণের মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী অবিসংবাদিত ভাবে শ্রেষ্ঠ। তিনি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। মুকুন্দরামের পিতা হৃদয় মিশ্র বহু পুরুষ হইতে বর্ধমান জেলার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে দামিন্যা গ্রামের অধিবাসী। শাসকগণের অত্যাচারে মুকুন্দরাম পৈতৃক গ্রাম ত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। রঘুনাথ রাজা হইলে তাঁহার উৎসাহে ষোড়শ শতাব্দীর অন্তে মুকুন্দরাম স্বপ্নে দেবী কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। মঙ্গলচণ্ডী দেবীর মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উদ্দেশ্য। চণ্ডীমঙ্গলে ব্যাধ কালকেতুর কাহিনী এবং বণিক্ ধনপতির উপাখ্যান—এই দুইটি স্বতন্ত্র আখ্যায়িকা আছে। এই দেবীমাহাত্ম্য কাহিনী কোন সংস্কৃত গ্রন্থে নাই, ইহা বাংলা দেশে বহু দিন হইতে প্রচলিত ছিল। সুদরিদ্র কালকেতু পত্নী ফুল্লরার সহিত ব্যাধবৃত্তি করিয়া জীবিকানির্বাহ করিত। দেবী চণ্ডী সুন্দরী বালিকা বেশে ধার্মিক দম্পতীকে দর্শন দানপূর্বক একটি মূল্যবান অঙ্গুরী উপহার দিয়া অন্তর্হিত হন। অঙ্গুরী বিক্রয় করিয়া কালকেতুর দুর্গতি দূর হইল, এবং তিনি ধনী হইলেন। ধনপতি বাণিজ্যার্থে সিংহল যাত্রা করেন। সে জলপথে সমুদ্রগর্ভে 'কমলে কামিনী' দর্শন করিল। সে দেখিল, সুবৃহৎ প্রস্ফুটিত কমলের উপর এক ষোড়শী কামিনী একটি হস্তীকে গ্রাস ও পরক্ষণে উদ্গীর্ণ করিতেছে। তৎপুত্র শ্রীমন্তও সিংহল যাত্রার পথে সমুদ্রবক্ষে অনুরূপ দৃশ্য দেখিল। পিতা ও পুত্র সিংহলের রাজাকে 'কমলে কামিনী' দেখাইতে না পারিয়া কারাবদ্ধ ও প্রাণদণ্ডার্থ শ্মশানে নীত হইল। কিন্তু চণ্ডীদেবীর কৃপায় উভয়েই মুক্ত হইল। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীমঙ্গল এবং দ্বিজ জনার্দনের মঙ্গলচণ্ডী-পাঁচালীতে শুধু ধনপতির উপাখ্যান আছে, কালকেতুর কাহিনী নাই।

মনসামঙ্গল, সরস্বতীমঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল শীর্ষক অন্যান্য শাক্ত কাব্যও বাংলা ভাষায় রচিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রাধান্য

অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা হিন্দু ধর্মেই শাক্তবাদ সমধিক সমৃদ্ধ। হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রেই শাক্ত দর্শন বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত এবং চণ্ডীতেই ইহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। হিন্দুতন্ত্রশাস্ত্র বিশাল; শত শত তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত আছে। মহাসিদ্ধসার তন্ত্রমতে ভারতবর্ষ প্রাচীন যুগে বিষ্ণুক্রান্তা রথক্রান্তা ও অশ্বক্রান্তা—এই তিন ক্রান্তাতে বিভক্ত ছিল। শক্তিমঙ্গলতন্ত্রমতে বিন্ধ্যপর্বত হইতে পূর্বদিকে জাভাদ্বীপ পর্য্যন্ত সকল দেশ বিষ্ণুক্রান্তা নামে এবং বিন্ধ্যপর্বত হইতে পশ্চিমে পারস্য, মিশর ও রোডেসিয়া প্রভৃতি দেশ অশ্বক্রান্তা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সুদূর মিশরদেশেও মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেক ক্রান্তাতে ৬৪ খানি তন্ত্রের প্রচার ছিল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে চৌষট্টিখানি হিন্দুতন্ত্রোক্ত প্রধান প্রধান সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

অনেকের অনুমান, প্রপঞ্চসার তন্ত্রখানি শঙ্করাচার্যের রচনা এবং উক্ত তন্ত্রের উপর আচার্যদেবের শিষ্য পদ্মপাদের একটি টীকাও আছে। সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের সারতত্ত্ব চণ্ডীর মধ্যে নিহিত আছে। সেই জন্য তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে শ্রীশ্রীচণ্ডী অতি সারবান ও সমাদৃত গ্রন্থ। গীতার ন্যায় উহা হিন্দুর নিত্য-পাঠ্য। ভারতের একান্নটি পীঠস্থানে বা শক্তিসাধনার কেন্দ্রে চণ্ডী নিয়মিত ভাবে পঠিত হয়। চণ্ডীপাঠ দেবীপূজার প্রধান অঙ্গ।

সার জন উডরফ সাহেবের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টায় বহু হিন্দুতন্ত্র ইংরাজি ভাষায় অনূদিত এবং তন্ত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ ইংরাজিতে লিখিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যেও ইদানীং শ্রীশ্রীচণ্ডীর সমাদর দিন দিন বাড়িতেছে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিবলোথিকা ইণ্ডিকাতে মার্কণ্ডেয় পুরাণের যে বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে ডক্টর কে, এম, ব্যানার্জি-লিখিত একটি বিস্তৃত ভূমিকা আছে। উহাতে চণ্ডীর তারিখ, উৎপত্তি-স্থান প্রভৃতি বিষয় সর্বপ্রথম আলোচিত হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব সংস্কৃতাধ্যাপক এফ, ইডেন পার্জিটার সাহেব এবং কলিকাতার শ্রীমন্মথনাথ দত্ত সমগ্র মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও তদন্তর্গত চণ্ডী ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। পার্জিটারের ইংরাজি অনুবাদ কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল কর্তৃক ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। পার্জিটার তাঁহার অনুবাদে যে বিস্তৃত উপক্রমণিকা দিয়াছেন তাহাতেও চণ্ডীর উৎপত্তি-কাল ও জন্মস্থানাদি বিষয় বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। গীতা যেমন মহাভারতের অংশ, চণ্ডী তদ্রূপ মার্কণ্ডেয় পুরাণের অংশ। মার্কণ্ডেয়-পুরাণের ৮১ হইতে ৯৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ অধ্যায়ের নামই 'চণ্ডী'। দেবীমাহাত্ম্য ও দুর্গাসপ্তশতী চণ্ডীর অপর দুইটি নাম। দুর্গাহোমে সপ্ত শত আহুতি প্রদানের নিমিত্ত শ্রীশ্রীচণ্ডী সপ্ত শত শ্লোকে বিভক্ত হইয়াছে। এই কারণে ইহার একটি নাম সপ্তশতী; কিন্তু দেবীমাহাত্ম্যই ইহার মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত নাম। ইহাতে সাত শত মন্ত্র, অথবা ৫৭৮টি শ্লোক আছে। রুদ্রযামল তন্ত্রের 'রুদ্রচণ্ডী' এবং বাণভট্টের 'চণ্ডীশতক' দেবীমাহাত্ম্য অবলম্বনেই লিখিত। এই প্রসঙ্গে আনন্দবর্ধনের 'দেবীশতক'ও উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রাচীনত্ব

দেবীশতকের উপর মহাভাষ্যটীকাকার কৈয়টের টীকা আছে। আনন্দবর্ধন ধ্বনিপ্রস্থাপনাচার্য্য নামে অভিহিত এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রধান স্তম্ভ। বাঙ্গালী পণ্ডিত শরণদেব ১১৭২ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাকরণবিচারের জন্য চণ্ডী হইতে অনেকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। নেপালের রাজকীয় গ্রন্থাগারে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দশম শতাব্দীতে প্রাচীন নেওয়ারী অক্ষরে লিখিত একখানি চণ্ডী পাইয়াছেন। ৮ম শতাব্দীতে জিনসেন তাঁহার আদিপুরাণে সকল হিন্দুপুরাণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ডাক্তার ভাণ্ডারকর বলেন, সপ্তম শতাব্দীর 'গথ মঙ্গলইড' (Goth-mongoloid) অক্ষরে লিখিত চণ্ডীর প্রসিদ্ধ শ্লোক 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে…' লিখিত হইয়াছিল। দণ্ডী, ভবভূতি ও বাণভট্ট ৭ম শতাব্দীতে তাঁহাদের গ্রন্থে চণ্ডীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ৬৭৮ খ্রীঃ রবিসেন তৎকৃত "জৈন পদ্মপুরাণে" মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রমুখ হিন্দু পুরাণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে নাগার্জুনী গুহায় এক শিলালিপিতে 'দেবী কর্তৃক অবজ্ঞাভরে মহিষাসুরের মস্তকে চরণ স্থাপন করেন' ইহা লিখিত হইয়াছিল। উপরোক্ত পার্জিটার সাহেবের মতে চণ্ডী খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত। অতএব প্রাচীন বৌদ্ধতন্ত্র 'গুহ্যসমাজতন্ত্র' ও 'চণ্ডী' একই শতাব্দীতে সৃষ্ট। বারাহীতন্ত্র, স্কন্দপুরাণ, দেবীপুরাণ, দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, বামনপুরাণ ও বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণাদিতে চণ্ডীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। চণ্ডীর ১১।৪২ মন্ত্রে আছে যে, দেবী নন্দগোপগৃহে যশোদাগর্ভে আবির্ভূতা হইবেন। ইহা হইতে মনে হয়, ভাগবতের পূর্বে চণ্ডী রচিত। 'শঙ্করদিগ্বিজয়' গ্রন্থে চণ্ডীর উল্লেখ আছে। সুতরাং চণ্ডী সম্ভবতঃ ৩য় শতাব্দীতে বা তৎপূর্বে রচিত হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে শকগণ মধ্যদেশের (মধ্যভারতের) অধিবাসী। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, মথুরা-অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় অব্দের পূর্বে ও পরে শক্তিশালী শকগণ বাস করিতেন। ৪র্থ শতাব্দীতে গুপ্ত রাজবংশের উদ্ভবের পূর্বেই উক্ত শকবংশ অন্তর্হিত হয়। সেই জন্য রাজপুতানা মিউজিয়ামের কিউরেটরের অভিমত এই যে, চণ্ডীর উৎপত্তি-কালকে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় ৩৫০ শতাব্দীর মধ্যে নির্দেশ করা অযৌক্তিক নহে। চণ্ডীর ৮ম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ মন্ত্রের মৌর্য্যশব্দের এবং ১ম অধ্যায়ের ৫ম ও ৬ষ্ঠ মন্ত্রে কোলাবিধ্বংসী শব্দের উল্লেখ আছে। কোন কোন টীকাকার মতে যবনগণই কোলাবিধ্বংসী। মৌর্য্যগণের আবির্ভাব ও যবনগণের আগমন খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতে আরম্ভ হয়। এই যুক্তিতে চণ্ডীর উৎপত্তি-কাল খ্রীষ্টপূর্ব বা খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে ধরিলে অমূলক হয় না। চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রক্ষিপ্ত নহে, উক্ত পুরাণের প্রকৃত অংশ—অধ্যাপক ভাণ্ডারকর নানা যুক্তি দ্বারা ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন।

বাংলাই চণ্ডীর জন্মস্থান

কাহারও কাহারও মতে চণ্ডী নর্মদা অঞ্চলে বা উজ্জয়িনীতে উৎপন্ন। কিন্তু অধ্যাপক দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ঐতিহাসিক যুক্তি দ্বারা উক্ত মত খণ্ডন করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ বাংলাদেশেই চণ্ডীর জন্মস্থান। ভারতবর্ষে প্রচলিত গৌড়ীয়, কেরলীয়, কাশ্মীরী ও বিলাসী—এই চারি প্রকার তন্ত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে গৌড়ীয় মতের প্রাচীনতা ও প্রাধান্য সর্বাপেক্ষা অধিক। পাল রাজাদের সময় বাংলায় তন্ত্রের বিপুল প্রভাব ছিল। একটি তন্ত্রে আছে—'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা' অর্থাৎ গৌড়ে (বঙ্গদেশে) তন্ত্রবিদ্যার উদ্ভব হয়। বরদাতন্ত্রের ১০ম পটলে বাংলা অক্ষরের বর্ণনা আছে। আবার অধিক সংখ্যক প্রাচীন পীঠস্থানগুলি বঙ্গভূমিতেই অবস্থিত। বাংলার অধিকাংশ ভূভাগ দীর্ঘকালের জন্য জঙ্গলপূর্ণ ছিল। এই সকল জঙ্গলের

আদিম অধিবাসিগণকে 'কিরাত' বা 'শবর' বলিত। 'কাদম্বরী' 'হরিবংশ', 'দশকুমারচরিত', 'ভবিষ্যোত্তরপুরাণ' ও 'কালিকা-পুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থের অভিমত এই যে, চণ্ডী-বর্ণিত দেবতা কিরাত ও শবরগণেরই উপাস্যা দেবী ছিলেন। সুতরাং কিরাত দেশেই অর্থাৎ বাংলা দেশেই চণ্ডীর আবির্ভাব বলিয়া মনে হয়। পুরাণের অংশ হইলেও চণ্ডী তন্ত্ররূপে গৃহীত। যখন প্রধান প্রধান সকল তন্ত্রই বাংলায় উৎপন্ন তখন চণ্ডীও সম্ভবতঃ বাংলায়ই উদ্ভূত। এই মতের অনুকূলের আর একটি বলবান যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। চণ্ডীর ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দশম শ্লোকে আছে—সুরথ ও সমাধি মহামায়ার 'মহীময়ী' মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। মৎস্যপুরাণে দুর্গামূর্তি নির্মাণের ব্যবস্থা আছে। মহীময়ী মূর্তি বাংলাদেশে প্রচলিত মৃন্ময়ী প্রতিমা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বাংলাদেশ ব্যতীত ভারতের অন্য কোন প্রদেশে মৃন্ময়ী প্রতিমায় দুর্গাপূজার প্রচলন নাই। অন্যান্য প্রদেশে ধাতু, কাষ্ঠ বা প্রস্তর-নির্মিত মূর্তিপূজাই সমধিক প্রচলিত।

বাংলাদেশে প্রতিমায় দুর্গাপূজা সহস্র বৎসরাধিক প্রাচীন

অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রীর মতে বাংলায় প্রতিমায় দুর্গাপূজা অন্ততঃ সহস্র বৎসরেরও অধিক প্রাচীন। জনসাধারণের বিশ্বাস, প্রতিমায় দুর্গাপূজা নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারাই আরম্ভ হয়। কিন্তু এই প্রবাদ ভিত্তিহীন। আলিবর্দি খাঁ এবং তৎপৌত্র সিরাজউদ্দৌলার সমসাময়িক ছিলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। অথচ বাংলার উক্ত নবাবদ্বয়ের শাসনকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বলিয়া ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট। শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক বিখ্যাত বাঙ্গালী স্মৃতিনিবন্ধকার রঘুনন্দন পঞ্চদশ শতকে আবির্ভূত হন। রঘুনন্দনের 'দুর্গোৎসব তত্ত্ব' এবং 'দুর্গাপূজা তত্ত্ব' নামক মৌলিক গ্রন্থদ্বয়ে দুর্গাপূজার সম্পূর্ণ বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। রঘুনন্দন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি পূর্বতন পণ্ডিত ও প্রবাদসমূহ হইতে তাঁহার গ্রন্থদ্বয়ের অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি কালিকাপুরাণ বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণ হইতেও বহু বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। মিথিলার প্রসিদ্ধ স্মার্তপণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার 'ক্রিয়া-চিন্তামণি' গ্রন্থে বাসন্তী দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বাচস্পতি রঘুনন্দনের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি তাঁহার 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' গ্রন্থে ১৪৭৯ খ্রীঃ মৃন্ময়ী দেবীর পূজাপদ্ধতির বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও উক্ত গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না, তথাপি তৎপ্রদত্ত পূজাপদ্ধতি বর্তমানে বহু শাক্তপরিবারে চলিয়া আসিতেছে। রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথের 'দুর্গোৎসব বিবেক' গ্রন্থে উক্ত পদ্ধতির আলোচনা পাওয়া যায়। শূলপাণি তাঁহার 'দুর্গোৎসববিবেক' ও 'বাসন্তী-বিবেক' এবং জীমূতবাহন তাঁহার 'দুর্গোৎসবনির্ণয়' গ্রন্থে মৃন্ময়ী দেবীপূজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলার এই ব্রাহ্মণ-ত্রিতয় পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন। শূলপাণি তাঁহার পূর্ববর্তী স্মৃতিনিবন্ধকারদ্বয় জীকন ও বালকের বাক্যাবলী উদ্ধার করিয়াছেন। বাংলার প্রাচীনতম স্মৃতিনিবন্ধকার ভবদেব ভট্ট তাঁহার গ্রন্থে জীকন, বালক ও শ্রীকরের বহু বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। জীকন ও বালক বাংলার সেন রাজাদেরও পূর্ববর্তী ছিলেন এবং ভবদেব ভট্ট ছিলেন একাদশ শতকের রাজা হরিবর্ম দেবের প্রধান মন্ত্রী। সুতরাং উপরোক্ত প্রমাণ-সমূহ হইতে নিঃসন্দেহে প্রতীত হয় যে, প্রতিমায় দুর্গাপূজা বাঙ্গালা দেশে দশম বা একাদশ শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর টীকাবলী

গীতার ন্যায় চণ্ডীরও প্রায় ত্রিশটি টীকা আছে। আত্মারাম ব্যাস, আনন্দপণ্ডিত, একনাদ ভট্ট, কামদেব, কাশীনাথ, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য, গোপীনাথ, গোবিন্দরাম, গৌড়পাদ, গৌরীবর চক্রবর্ত্তী, জগদ্ধর, জয়নারায়ণ, জয়রাম, নারায়ণ, নৃসিংহ চক্রবর্তী, পীতাম্বর মিশ্র, ভগীরথ, ভাস্কর রায়, ভীমসেন, রঘুনাথ মস্করী, রবীন্দ্র, রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, রামানন্দ তীর্থ, ব্যাসাশ্রম, বিদ্যাবিনোদ, বৃন্দাবন শুক্ল, বিরূপাক্ষ, শঙ্কর শর্মা ও শিবাচার্য্য চণ্ডীর উপর টীকা লিখিয়াছেন। তাঁহাদের টীকাবলীর হস্তলিখিত গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়। বাংলার বিখ্যাত শাস্ত্রানুবাদক পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের 'দেবীভাষ্য' নামে টীকাখানি অতি বিশদ। বাঙ্গালী পণ্ডিত শ্রীগোপাল চক্রবর্তীর 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নামক টীকাও হৃদয়গ্রাহী। উক্ত টীকাদ্বয় কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভাস্কর রায়ের গুপ্তবতী টীকা, নাগোজী ভটের টীকা, জগচ্চন্দ্রিকা টীকা, দংশোদ্ধার টীকা, শান্তনবী টীকা ও চতুর্ধরী টীকা—এই ছয়টি টীকা-সম্বলিত চণ্ডীর একটি উপাদেয় সংস্করণ বোম্বাই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস প্রকাশ করিয়াছেন। বরিশালের ৺সত্যদেব ঠাকুর-বিরচিত চণ্ডীর বাংলা ভাষ্য 'সাধনসমর' অতি চমৎকার ও মৌলিক। চণ্ডীর উপর গৌড়পাদের 'চিদানন্দ কেলিবিলাস' নামক টীকা ছিল। ভাস্কর রায় তাঁহার 'ললিতাসহস্রনাম ভাষ্যে' চিদানন্দ কেলিবিলাসের উল্লেখ করিয়াছেন। গৌড়পাদ-রচিত উক্ত টীকার সম্পূর্ণ গ্রন্থ তাঞ্জোরে রক্ষিত ছিল। এখন কবচ, কীলক ও অর্গলাটীকা ব্যতীত উহার অপর অংশ অপহৃত হইয়া গিয়াছে।

নাগোজী ভট্ট ও ভাস্কর রায় সমসাময়িক ছিলেন। উভয়ের আবির্ভাব কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। উভয়ে সম্ভবতঃ পরস্পর পরিচিত ছিলেন।

নাগোজী ভট্ট পাণিনি ব্যাকরণ দর্শন সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান আচার্য্য। ভাস্কর রায় নাগোজী ভট্টের নাম শ্রদ্ধান্তরে উল্লেখ করিয়াছেন। নাগোজীর 'বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত-মঞ্জুষা,' ও চণ্ডীর টীকার অংশ-বিশেষ ভাস্কর রায় কর্তৃক স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। নাগোজীর অন্যতম শিষ্য উমানন্দনাথ, ১৭৭৫ খ্রীঃ 'পরশুরাম কল্পসূত্রে'র টীকা 'নিত্যোৎসব' রচনা করেন। ভাস্কর রায় স্বয়ং উক্ত টীকা সংশোধন করিয়া দেন। আবার উমানন্দনাথ 'ভাস্করবিলাস' নামে ভাস্করের একটি

জীবনী রচনা করিয়াছিলেন। উহা সম্প্রতি বোম্বাই নির্ণয়-সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত ভাস্কর রায়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ললিতা-সহস্র-নাম ভাষ্যে'র পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। নাগোজী ভট্ট এক জন অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ। তাঁহার পিতা ছিলেন শিব ভট্ট, মাতা সতী এবং গুরু হরি দীক্ষিত। শৃঙ্গ-বেরীরাজ রায় ইঁহার প্রতিপালক ছিলেন। ইঁহার পৌত্র মণিরাম ১৮০৪ খ্রীঃ বিদ্যমান ছিলেন। নাগোজী ভট্টের রচিত প্রায় পঞ্চাশখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। কাত্যায়নীতন্ত্র ইঁহারই রচনা। উক্ত তন্ত্রে চণ্ডীর বিস্তৃত মন্ত্রবিভাগকারিকা আছে। নাগোজী ভট্টের চণ্ডীর টীকাও প্রসিদ্ধ। চণ্ডীর ১৩।২৯ মন্ত্রের টীকায় নাগোজী লিখিয়াছেন, 'বক্ষ্যমাণ কাত্যায়নীতন্ত্রাৎ'। উহা হইতে জানা যায় যে, কাত্যায়নীতন্ত্র চণ্ডী-টীকার পরে রচিত। কাত্যায়নীতন্ত্রে চণ্ডীর প্রত্যেক মন্ত্রটি স্পষ্টভাবে বিভাগ করা হইয়াছে। উক্ত তন্ত্রে চণ্ডীর প্রয়োগবিধিও প্রসিদ্ধ। বারাহীতন্ত্রে ও রুদ্রযামলে চণ্ডীর মন্ত্রবিভাগ সংক্ষিপ্ত। কাত্যায়নী তন্ত্রসম্মত মন্ত্রবিভাগই মদনুদিত চণ্ডীতে * গৃহীত এবং বিশেষ প্রচলিত। কাত্যায়নীতন্ত্রে আছে—

তস্মাৎ এতৎ পঠিত্বৈব জপেৎ সপ্তশতীং পরাম্।
অন্যথা শাপমাপ্নোতি হানিং চৈব পদে পদে॥
রাবণাদ্যাঃ স্তোত্রমেতৎ অঙ্গহীনং নিষেবিরে।
হতা রামেণ তে যস্মাৎ নাঙ্গহীনং পঠেৎ ততঃ॥

অনুবাদ—চণ্ডীপাঠের সঙ্গে চণ্ডীর ষড়ঙ্গ (কবচাদিত্রয় ও রহস্যত্রয়) পাঠ বিধেয়। ষড়ঙ্গহীন চণ্ডীপাঠকের উপর দেবীর শাপ পতিত হয় এমং পদে পদে বিপদ আসে। রাবণাদি অঙ্গহীন চণ্ডী পাঠ করায় রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত হন। সুতরাং সংকল্পপূর্বক অঙ্গহীন চণ্ডীপাঠ অনুচিত।

শৈব নীলকণ্ঠ

শ্রীশ্রীচণ্ডীর ষড়ঙ্গের উপর শৈব নীলকণ্ঠের ষট্‌ক ব্যাখ্যান আছে। ইহার দুইখানি পুঁথি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালায় আছে। নীলকণ্ঠ তাঁহার দেবীভাগবত টীকায় সপ্তশত্যঙ্গ ষট্‌ক ব্যাখ্যানের উল্লেখ বহু বার করিয়াছেন। নীলকণ্ঠ কাত্যায়নীতন্ত্রেরও একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের ২০-২৩ পটলের একটি পুঁথি কাশ্মীরের রঘুনাথ টেম্পল লাইব্রেরীতে আছে। সপ্তশত্যঙ্গ টীকা ব্যাখ্যানের প্রারম্ভে নীলকণ্ঠ শক্তি উপাসনার রহস্য সুন্দর ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার মতে দেবী ব্রহ্মস্বরূপা, সর্ববেদান্ত-তাৎপর্য্যভূমি। দেবী ব্রহ্মবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী, জীবদশার নাশই এই বিদ্যার লক্ষ্য। ইহাই দেবীর সম্মুখে পশুবলির উদ্দেশ্য। মানুষের অন্তর্নিহিত পশুভাবকে দেবীর চরণে বলি দিয়া দেবভাব প্রতিষ্ঠাই শাক্ত সাধনার চরম লক্ষ্য।

* উহার তৃতীয় সংস্করণ কলিকাতা উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

ভাস্কর রায় মখী

ভাস্কর রায় মখী আধুনিক যুগের এক জন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিকাচার্য্য। তিনি বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, মন্ত্রশাস্ত্র, স্মৃতি, ব্যাকরণ, কাব্য, ছন্দ, স্তোত্রাদি বিষয়ে প্রায় ৪৫ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ললিতাসহস্রনাম ভাষ্যের' রচনা ১৭৮৫ সংবতের আশ্বিন শুক্লা নবমীতে সমাপ্ত হয়। বামকেশ্বর তন্ত্রের টীকা 'সেতুবন্ধ'ই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। উক্ত টীকা ১৬৫৫ শকের শিবরাত্রি তিথিতে শেষ হয়। বিখ্যাত মীমাংসক চণ্ডদেব কৃত 'ভাট্টদীপিকা' গ্রন্থের উপর ভাস্কর রায় 'ভাট্টচন্দ্রোদয়' নামক টীকা রচনা করেন। প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক অপ্পয় দীক্ষিতের নাম ভাস্কর রায় শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করিয়াছেন। অপ্পয় দীক্ষিতের শিষ্য ভট্টোজী দীক্ষিত ভট্টোজীর শিষ্য বরদারাজ কৃত 'মধ্য সিদ্ধান্তকৌমুদীর' উপর ভাস্কর রায়ের 'রসিকরঞ্জিনী' নামক টীকা আছে। ভাস্করের জন্ম হয় ভাগা নগরীতে। তাঁহার পিতা গম্ভীর রায় এবং মাতা কোন মাম্বা। কাশীধামে উপনয়ন হইবার পর তিনি পণ্ডিত নৃসিংহাধ্বরী ও গঙ্গাধর বাজপেয়ীর নিকট নবন্যায়াদি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আনন্দ নাম্নী বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং পাণ্ডুরঙ্গ নামে তাঁহাদের একটি পুত্র লাভ হয়। নৃসিংহানন্দ নাথের নিকট ভাস্কর শ্রীবিদ্যাপঞ্চদশাক্ষরী মন্ত্রে দীক্ষিত হন। দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি ভাসুরানন্দ নাথ নামে পরিচিত হন। ইহার পর তিনি শিবদত্ত শুক্লের নিকট পূর্ণাভিষেক লাভ করেন। কাশীধামে সোমযাগ সম্পাদন করিয়া স্থানীয় পণ্ডিতসমাজে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার এক সামন্ত শিষ্য চন্দ্রসেনের অনুরোধে তিনি কিছু কাল কৃষ্ণা নদীর তীরে বাস করেন। পরে তিনি তাঁহার বৃদ্ধ অধ্যাপক গঙ্গাধর বাজপেয়ীর সহিত চোলদেশে কাবেরীর দক্ষিণ তীরবর্তী তিরুবালঙ্কটু গ্রামে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। তাঞ্জোরের মারহাট্টা-রাজ ভাস্করকে কাবেরীর উত্তর তীরবর্তী ভাস্কররাজপুরম নামক এক খানি গ্রাম দান করেন। এই গ্রামেই তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। তিনি পরিণত বয়সে মধ্যার্জন ক্ষেত্রে (বর্তমান তিরুবিতৈ মরুতুর) দেহত্যাগ করেন। ভাস্করের চণ্ডীর টীকা 'গুপ্তবতী' বিশেষ প্রসিদ্ধ। গুপ্তবতী ১৭৪১ খ্রীঃ রচিত হয়। উক্ত টীকা সংক্ষিপ্ত অথচ তত্ত্ববহুল। 'গুপ্তবতী'র উপোদ্ঘাতে ভাস্কর অপ্পয় দীক্ষিতের অধুনালুপ্ত 'রত্নত্রয়পরীক্ষা' নামক গ্রন্থ হইতে শ্লোকোদ্ধার করিয়াছেন। চণ্ডীর টীকাকারগণের মধ্যে একমাত্র ভাস্করই রহস্যত্রয়ের টীকা লিখিয়াছেন। উহাতে শাক্ত দর্শনের সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহের আভাস আছে। গৌড়পাদের ন্যায় ভাস্করের দেবী কবচের উপরও একটি টীকা আছে।

রুদ্রচণ্ডী

রুদ্রযামল তন্ত্রের পুষ্পিকা কল্পে তুর্য্যখণ্ডে 'রুদ্রচণ্ডী' আছে। ইহা শ্রীশ্রীচণ্ডী অবলম্বনে রচিত। উহাতে চণ্ডীর উল্লেখও দেখা যায়। রুদ্র দেবীকে বলিতেছেন, 'পূর্বে তোমাকে যে দেবীমাহাত্ম্য বলিয়াছি, তাহা তুমি মনোযোগ সহকারে

শোন নাই। তাই তোমাকে পুনরায় উহা সংক্ষেপে বলিতেছি।' রুদ্রচণ্ডীর উপর ব্রহ্মা ও কৃষ্ণের অভিশাপ পতিত হয়। সেই জন্য চণ্ডীর দুইটি শাপবিমোচন মন্ত্র আছে। রুদ্রচণ্ডীর শাপোদ্ধার মন্ত্র, গায়ত্রী ও কবচ শ্রীশ্রীচণ্ডীর কবচাদি হইতে পৃথক্। রুদ্র-চণ্ডীর তিনটি অবচ্ছেদ আছে। প্রথম অবচ্ছেদ ৪৭ শ্লোকবিশিষ্ট; উহাতে চণ্ডীরহস্য কথিত এবং সমাধি ও সুরথের উপাখ্যান এবং মধুকৈটভাদি বধ বর্ণিত। মধ্যম অবচ্ছেদ মাত্র ৩৭টি শ্লোকযুক্ত; উহাতে সাধনরহস্য কথিত। অন্তিম অবচ্ছেদে ১০৫টি শ্লোক আছে। উহাতে রুদ্রচণ্ডী পাঠের ফল ও প্রলম্বাসুর বধের উপাখ্যান উক্ত। প্রলম্বাসুরের উল্লেখ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে। দুর্গাসপ্তশতীর বহুল প্রচার মানসে সম্ভবতঃ রুদ্রচণ্ডীর উৎপত্তি। উহাকে চণ্ডীর সংক্ষিপ্ত ও সরল সংস্করণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কোথাও কোথাও রুদ্রচণ্ডী পাঠ এখনও প্রচলিত আছে। রুদ্রচণ্ডীর ধ্যানটি এইরূপ—

রক্তবর্ণাং মহাদেবীং লসচ্চন্দ্রবিভূষিতাম্।
পট্টবস্ত্রপরীধানাং সর্বালঙ্কারভূষিতাং।
বরাভয়করাং দেবীং মুণ্ডমালাসুশোভিতাং ॥১
কোটীচন্দ্রসমাভাসাং বদনৈঃ শোভিতাং পরাম্।
করালবদনাং দেবীং কিঞ্চিজ্জিহ্বাগ্রলোহিতাং ॥২
স্বর্ণবর্ণমহাদেবহৃদয়োপরিসংস্থিতাং।
অক্ষমালাধরাং দেবীং জপকর্মসমাহিতাম্ ॥৩

অনুবাদ:—রুদ্রচণ্ডী দেবী রক্তবর্ণা, ললাটে চন্দ্রভূষণা, পট্টবস্ত্রপরিহিতা, অলঙ্কারশোভিতা, বরাভয়করা, গলে মুণ্ডমালা-ধারিণী, কোটিচন্দ্রবৎ জ্যোতির্ময় বদনযুক্তা, করালবদনা, জিহ্বাগ্র কিঞ্চিৎ রক্তলিপ্তা, সুবর্ণ কান্তি শিরোপরি সংস্থিতা, জপমালাধরা ও জপে নিযুক্তা।

চণ্ডীর সপ্তশতী নামের সার্থকতা

চণ্ডীর অন্যান্য টীকাকার পৌরাণিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেও পণ্ডিতপ্রবর ভাস্কর রায় দীক্ষিত তাঁহার গুপ্তবতী টীকাতে শ্রুতি-প্রমাণের দ্বারাই শাক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহাই গুপ্তবতী টীকার বৈশিষ্ট্য। উক্ত টীকাতে 'চণ্ডী' আখ্যার নিম্নোক্ত অর্থ করা হইয়াছে। এই দুর্গাসপ্তশতী চণ্ডী দেবীর স্বরূপবাচক মন্ত্র শরীররূপে নানা তন্ত্রে প্রসিদ্ধ। এইজন্য ইহার নাম চণ্ডী। চণ্ডী = চণ্ড + স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ = পরব্রহ্মমহিষী বা ব্রহ্মশক্তি। চণ্ড শব্দের অর্থ দেশকালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্ম। 'চণ্ডভানু,' 'চণ্ডনাদ' ইত্যাদি পদে 'চণ্ড' শব্দটি ইয়ত্তা বা সীমা দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন অসাধারণ গুণশালীত্ব অর্থে সূচিত হইয়াছে। ধর্ম ও ধর্মী, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভিন্ন হইলেও দ্বিধারূপে ব্যবহৃত হয়। ব্রহ্মশক্তিই চণ্ডী। সৃজনোন্মুখ ব্রহ্মের ঈক্ষণাদি সমস্ত ধর্মকে লক্ষ্য করিয়া চণ্ডী, আদ্যাশক্তি, মহামায়া প্রভৃতি নাম প্রযুক্ত হইয়াছে। 'স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ'—এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মধর্ম ও ধর্মীব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক অভিন্নরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন। ব্রহ্মের ধর্মত্বহেতু এই জ্ঞানাদি শক্তিত্রয়রূপে অভিহিত হয়। এই ধর্ম পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রোক্ত চোদনালক্ষণ জড়ধর্ম নহে। পরন্তু উহা ব্রহ্মধর্ম বা চিৎশক্তি। জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া—এই শক্তিত্রয়ের সমষ্টিভূতা ব্রহ্মাভিন্না তুরীয়া চণ্ডী বা চণ্ডিকা নামে প্রসিদ্ধা। তন্ত্রান্তরে চণ্ডী দেবীর অন্যান্য বহু নাম আছে। ব্যষ্টিভূতা জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি যথাক্রমে মহাসরস্বতী, মহাকালী ও মহালক্ষ্মী নামে নির্দিষ্টা হইয়াছেন। সেই পরম সত্তা চণ্ডীই বিশ্বব্যাপিনী এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তিরূপিণী। এই দেবীর সত্তা পারমার্থিকা ও ত্রিকালাবাধিতা।

চণ্ডীর প্রতিপাদ্য বিষয়

মহামায়াতত্ত্বই সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। তন্ত্র-শাস্ত্রের সারস্বরূপা চণ্ডীর প্রতিপাদ্য বিষয়ও মহামায়ার স্বরূপ। মদনুদিত চণ্ডীর পাদটীকায় নানা স্থানে মহামায়ার মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বর্ণিত এবং বিভিন্ন তন্ত্র হইতে বাক্যোদ্ধারপূর্বক তাহা সমর্থিত। মহামায়াতত্ত্বটি নানা শাস্ত্রে কিরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'মহামায়া' নামক তাঁহার ইংরাজি গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের 'মা' নামক ইংরাজি গ্রন্থখানিও চণ্ডীতত্ত্বের একটি সুললিত ব্যাখ্যা। মহামায়া শব্দ চণ্ডীতে আট বার ব্যবহৃত হইয়াছে। চণ্ডীতে যোগমায়া শব্দটির উল্লেখ নাই। কিন্তু মহামায়া শব্দের পরিবর্তে যোগনিদ্রা ও বিষ্ণুমায়া শব্দদ্বয়ের ব্যবহার কয়েক বার দেখা যায়। অথচ তন্ত্রশাস্ত্রে মহামায়া, যোগমায়া, যোগনিদ্রা ও বিষ্ণুমায়া এই শব্দচতুষ্টয় একার্থবোধক। গীতাতে যোগমায়া শব্দটি মাত্র একবার আছে। গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন যে, অবতার পুরুষ যোগমায়া-সমাবৃত হইয়াই লীলাদি কার্য্য করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যোগমায়া ও বিষ্ণুমায়া শব্দের বহুবার উল্লেখ আছে। মহামায়া কাত্যায়ন-শ্রমে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়া চণ্ডীতে তিনি কাত্যায়নী নামেও অভিহিতা। এই কাত্যায়নীই ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং ব্রজাঙ্গনাগণ মনোমত পতিলাভের জন্য তাঁহার আরাধনা করিতেন। ভাগবতে কাত্যায়নী দেবীকে চণ্ডিকা, ভদ্রকালী ও নারায়ণী প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে। ভাগবতের টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে মহামায়া ও যোগমায়া পৃথক্।

বেদান্তের মায়া ও তন্ত্রের মহামায়া সমানার্থক নহে। বেদান্তের মায়ার পারমার্থিক সত্তা নাই। ইহার কেবল ব্যবহারিক সত্তা আছে। কিন্তু তন্ত্রের মহামায়া ত্রিকালাবাধিত সত্তারূপিণী ব্রহ্মময়ী। অবশ্য, বেদান্ত ও তন্ত্রে কোন বিরোধ নাই। কারণ, প্রথমটি সিদ্ধান্তশাস্ত্র ও দ্বিতীয়টি সাধন-শাস্ত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ ও রামপ্রসাদ একটি বাক্যেই মহামায়া-তত্ত্বটি অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মই কালী ও কালীই ব্রহ্ম। যাঁহাকে বৈদান্তিকগণ ব্রহ্ম বলেন, তান্ত্রিকগণ তাঁহাকেই জগজ্জননী মহামায়ারূপে আরাধনা করেন। ব্রহ্ম ও মহামায়া অভেদ।

শাক্ত সিদ্ধান্ত

ভাস্কর রায় তাঁহার গুপ্তবতী টীকার উপোদ্ঘাতে শাক্ত সিদ্ধান্তটি অতি সুন্দর ভাবে নিম্নোক্তরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক অদ্বিতীয় নিরতিশয় চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম অনাদিসিদ্ধ মায়ার

আবরণে ধর্ম এব ধর্মিরূপে প্রতিভাসিত হন। নানা উপনিষদে ব্রহ্মের ঈক্ষণ বহুভাবে বর্ণিত। এই ঈক্ষণই ব্রহ্মের নিত্য জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া। ইহাকে সার জন উড্রফ Crea ive imagination বলেছেন। এই জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াই ব্রহ্মধর্ম। ধর্ম স্বরূপতঃ ধর্মী হইতে অভিন্ন। অগ্নি ও তাহার উত্তাপকে যেমন পৃথক্ করা যায় না ধর্ম ও ধর্মী হইতে তদ্রূপ স্বতন্ত্র হয় না। এই ধর্মের অপর নাম শক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, যেমন জল ও তাহার তরলতা, দুগ্ধ ও তাহার শ্বেতত্ব, মণি ও তাহার জ্যোতিঃ, সমুদ্র ও তাহার তরঙ্গ অভিন্ন, ব্রহ্ম ও শক্তি তেমনি অভেদ। গতিহীন ও গতি-বিশিষ্ট সর্প যেমন একই, নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় ব্রহ্মও তদ্রূপ এক। ব্রহ্মধর্ম উপাসকভেদে পুরুষরূপে বা নারীরূপে প্রতিভাত হন। পুরুষরূপে তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তিই ব্রহ্মা, স্থিতিশক্তিই বিষ্ণু, এবং সংহার-শক্তিই শিবরূপে উপাসিত হন। ব্রহ্মধর্ম নারীরূপে আদ্যাশক্তি ভবানী। স্বচ্ছ স্ফটিকে লাল জবা ফুলের প্রতিবিম্ব পড়িলে যেমন উহা লাল দেখায়, তদ্রূপ ধর্মের কর্তৃত্বাদি গুণের প্রভাবে নিষ্ক্রিয় ধর্মীও কর্তৃত্বাদি-বিশিষ্টরূপে প্রতীত হন। ব্রহ্মরূপ ধর্মীর ধর্ম জড় নহে, জীবও নহে। পরন্তু উহা চিতি, চৈতন্য। চণ্ডী (৫।৩৪) তে আছে—'চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতৎ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ'—চিতিরূপে আদ্যাদেবী সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত। শক্তিসূত্রেও বলা হইয়াছে—'চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বোৎ-পত্তিহেতুঃ'—চিৎশক্তিই স্বতন্ত্ররূপে জগৎসৃষ্টির কারণ। শাক্ত সিদ্ধান্তের মতে চিৎশক্তিই জগৎ সৃষ্টি করেন। বেদান্তমতে মায়াশক্তিশবলিত ব্রহ্মই জগৎ প্রসব করেন। এই বিষয়ে উভয় সিদ্ধান্তে মূলতঃ ভেদ নাই। উভয় মতের পার্থক্য এই যে, বেদান্তমতে ব্রহ্মধর্ম মায়িক, কিন্তু শাক্ত মতে ধর্মী ও ধর্ম, শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন, এক। ধর্ম চিদ্রূপা, পারমার্থিক। শাক্ত সিদ্ধান্তের সার তত্ত্ব এই যে, মহাশক্তি ব্রহ্মধর্মরূপা। ধর্ম জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া চিদ্রূপিণী, সদ্রূপিণী ও আনন্দময়ী এবং এই জগৎ ব্রহ্মশক্তির পরিণাম।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব

চণ্ডীর বাক্যাবলী দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয়, দেবীকে চণ্ডীর ১।৫৪ মন্ত্রে জগন্মূর্তি, ১।৭৭ মন্ত্রে জগন্ময়ী, ১১।৪ মন্ত্রে মহীস্বরূপা এবং ১১।৩৩ মন্ত্রে বিশ্বরূপা বলা হইয়াছে। ইহাই বিশ্বদেবীর বিরাট রূপ। টীকাকার নাগোজী ভট্টের মতে এই সকল বাক্যে দেবীর জগদতিরিক্ত মুখ্য শরীরাভাব ধ্বনিত এবং দেবী জগদাশ্রয়ভূতা শক্তি। শাক্তসিদ্ধান্ত বিবর্তবাদ অপেক্ষা পরিণামবাদের অধিকতর পক্ষপাতী। মুণ্ডক উপনিষদে (২।২।১১) আছে, 'ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্' —এই জগৎ শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই। পূজার আসনশুদ্ধির মন্ত্রে পৃথিবী দেবীরূপে সম্বোধিতা। দেবীসূক্তের শেষে আছে যে, ব্রহ্মময়ী দেবী পৃথিবী ও আকাশের অতীত হইয়াও পরিদৃশ্যমান বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন। মহামায়া দেবী মহালক্ষ্মী, ও মহাসরস্বতী ও মহাকালী—এই তিন রূপে প্রকাশিত। মহাকালী তামসী ও ঋগ্বেদরূপা। মহালক্ষ্মী রাজসী ও যজুর্বেদরূপা এবং মহাসরস্বতী সাত্ত্বিকী ও সামবেদরূপা। সচ্চিদানন্দময়ী দেবীর গুণভেদে তিনটি ব্যষ্টিরূপ মূলতঃ এক ও অভেদ। শাস্ত্রে আছে—

> মহাসরস্বতী চিতে মহালক্ষ্মী সদাত্মকে।
> মহাকাল্যানন্দরূপে তত্ত্বজ্ঞানসিদ্ধয়ে॥
> অনুসন্দধ্মহে চণ্ডি বয়ং ত্বাং হৃদয়াম্বুজে॥

অর্থাৎ মহাসরস্বতী চিদ্রূপা, মহালক্ষ্মী সদ্রূপা এবং মহাকালী আনন্দরূপা। হে চণ্ডিকে, তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য তোমাকে হৃদয়পদ্মে ধ্যান করি।

দেবীর নামাবলী

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীর নিম্নোক্ত নামাবলী আছে। চণ্ডিকা, চামুণ্ডা, নারায়ণী, শাকম্ভরী, সরস্বতী, সনাতনী, মহামায়া, শতাক্ষী, রক্তদন্তিকা, ভগবতী, জগদ্ধাত্রী, বিশ্বেশ্বরী, দেব-জননী, বেদজননী, সাবিত্রী, মহাদেবী, মহাসুরী, পরমেশ্বরী, তামসী, রাজসী, সাত্ত্বিকী, শিবা, সিংহবাহিনী, খড়্গিনী, কালী, গদিনী, ভদ্রকালী, শঙ্খিনী, শূলিনী, চক্রিণী, চাপিনী, অম্বিকা, ঈশ্বরী, বরদা, শ্রী, মহেশ্বরী, ত্রয়ী, দুর্গা, গৌরী, লক্ষ্মী, অলক্ষ্মী, অপরাজিতা, মহাসুরী, পার্বতী, কল্যাণী, ভীমাক্ষী, ভৈরবনাদিনী, ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী, শিবদূতী কাত্যায়নী, সর্বেশ্বরেশ্বরী ইত্যাদি।

দেবীর রূপ

মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভুজা, মহাকালী দশভুজা, ও মহাসরস্বতী অষ্টভুজা। বৈকৃতিকরহস্য মতে দেবী সহস্রভুজা হইলেও তিনি অষ্টাদশভুজারূপে পূজ্যা ও ধ্যেয়া। এখানে সহস্র শব্দ অনন্তবাচী। সুতরাং দেবী অনন্তভুজা অর্থাৎ বিশ্বব্যাপিনী। চণ্ডীর অন্য এক স্থলে দেবীকে সহস্রনয়না অর্থাৎ বিশ্বতশ্চক্ষু বলা হইয়াছে। চণ্ডীর ৫ম অধ্যায়ে দেবতাগণ মহামায়াকে স্তব করিবার সময় বলিয়াছেন যে, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, মাতা, তুষ্টি, ও ভ্রান্তিরূপে দেবী সর্বভূতে বিরাজিতা। শুধু তাহাই নহে, মানবদেহের প্রত্যেক অঙ্গে এবং বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতে দেবী প্রকাশিতা।

মহামায়া বিশ্বব্যাপিনী হইলেও নারীমূর্তিতে তাঁহার সমধিক প্রকাশ—ইহা চণ্ডীর নারায়ণীস্তোত্রে উক্ত দেবীর অংশে নারীমাত্রেরই জন্ম। অল্পবয়স্কা, সমবয়স্কা বা বয়োবৃদ্ধা নারীমূর্তি জগদম্বার জীবন্ত-বিগ্রহ। প্রত্যেক নারীতে মাতৃবুদ্ধি করা এবং প্রত্যেক নারীকে দেবীমূর্তিজ্ঞানে শ্রদ্ধা করাই মহামায়ার শ্রেষ্ঠ উপাসনা। এই জন্যই দুর্গাপূজাতে কুমারীপূজার বিধি। প্রতিমাতে দেবীর আবির্ভাব চিন্তা করা যেমন আবশ্যক, নারীমূর্তিতে দেবীর প্রকাশ অনুধ্যান করাও তেমনি কর্তব্য। সেই জন্য ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় সহধর্মিণী সারদা দেবীকে জগজ্জননীজ্ঞানে ফুল, চন্দন ও মন্ত্রাদি দ্বারা বিধিবৎ পূজা করিয়াছিলেন।

> যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
> নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

দেবদানবের সমুদ্রমন্থন

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

দেবতারা ঘোরতর ভাবনায় পড়ে গেছেন, কি উপায়ে দানবদের চিরদিনের জন্য তাঁবেদার করে রেখে নিজেদের স্বর্গরাজ্যটি কায়েম করা যায়। অগ্নি, বায়ু, বরুণ, যম প্রভৃতি ছোট-বড় দেবতাদের নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র যখন-তখন পরামর্শ আঁটেন ; কখনো দেবসভায় বসে প্রকাশ্যে, কখনো বা নন্দন-কাননে বসে গোপনে। কিন্তু ভাল কোন উপায়ই ঠিক হয় না। দানবদের বাগে আনতে পারা যায় না কিছুতেই। দেবতারা নিজের নিজের শক্তি সঞ্চয় করবার জন্য নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে কয়েক বার তপস্যাও করেছিলেন, যাতে দানবদের কাবু করা যায়। কিন্তু এতেও কোন ফল হয়নি। দানবগুলো এমনই দুর্দান্ত যে তাদের সঙ্গে কথা বলাই দায়। এমন নিরেট বুদ্ধি যে, কোন যুক্তিই তাদের মাথায় ঢোকে না। আর এমনিই অবুঝ যে, তাদেরই সুখ-সুবিধার কথা বলতে গেলেও তারা মারমুখী হয়ে ওঠে। তাদেরও চলে গোপন পরামর্শ। তারা চায় দেবতাদের উচ্ছেদ করতে। একেবারে উচ্ছেদ করে দিয়ে স্বর্গের ভেতর দানব-রাজ্য কায়েম করতে। কিন্তু এ একটা কথাই নয়। কেন না, স্বর্গ হোল দেবতাদেরই নিজস্ব। স্বর্গের অধিকার অপরে নেবে কি রকম! দু'দলে বেড়েই চলে কোন্দল আর রেষারেষি, মিটমাট আর হয় না।

দেবরাজ ইন্দ্র এক দিন বাছা বাছা কয়েক জন দেবতাকে নিয়ে বহুক্ষণ ধরে পরামর্শ করলেন। কিন্তু কিছুই ঠিক করতে না পেরে সবাই মিলে চললেন পিতামহ ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা তাঁর চার মুখ আর দাড়ি-গোঁফ নেড়ে দেবতাদের স্বাগত জানালেন। জিজ্ঞাসা করলেন—"সবাই মিলে যে হঠাৎ আমার কাছে? ব্যাপার কি?"

ইন্দ্র করযোড়ে বললেন, "পিতামহ, বড়ই গোলমেলে ব্যাপার! দানবদের সঙ্গে কিছুতেই মিটমাট হচ্ছে না যে! তারা চায় খুব বড় বখরা—ধরতে গেলে স্বর্গের সবটাই তারা চায়। আপনি এর একটা উপায় করে দিন।"

ব্রহ্মা বললেন—"বটে, বটে! তা আমি আর কি উপায় করবো। চল যাই দেবাদিদেবের কাছে।"

দেবাদিদেব বলতে ভগবান বিষ্ণু। আপদে-বিপদে উদ্ধার করতে, বুদ্ধি দিতে, ফন্দী-ফিকির বাতলাতে বা ঠিক-ঠিক পরামর্শ দিতে এই বিষ্ণুদেবই হলেন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি অর্থাৎ সকল দেবতারই একমাত্র ভরসার স্থল। ব্রহ্মার মুখে সকল কথা শুনে বিষ্ণু কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, "দেখ, মহামুনি শুক্রাচার্যের অনুগ্রহ পেয়ে দানবেরা এখন বিশেষ ভাবে বলশালী হয়ে উঠেছে। তাদের সঙ্গে এবার পেরে উঠবে কি তোমরা? সোজা পথে গেলে কাজ হবে না বলে দিচ্ছি। পথটাকে একটু ঘোরালো করে নিতে হবে। একটা কাজ করতে পারবে? সমুদ্র-মন্থন করতে পারবে? তা যদি পারো তো সকল সমস্যার সমাধান হয়।"

বিষ্ণুর এই কথা শুনে দেবতারা মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। সমুদ্র-মন্থন! সে আবার কি!

দেবতাদের এই ভাব দেখে বিষ্ণু বললেন, "অবাক হয়ে গেলে যে সব? ওই যে ক্ষীরোদ সমুদ্র, ওকে মন্থন করতে হবে। মন্থনের উপায় আমিই বাতলে দিচ্ছি। দানবদের সঙ্গে যেমন করে পার একটা আপোষ করে ফেল, আর তাদের নিয়ে এই কাজের জন্য তৈরী হও। দানবদের শরীরে খুব বেশী জোর, তা স্বীকার কর তো? তাদের না নিলে তোমরা দেবতারা একা-একা সমুদ্র-মন্থন করতে পার, সে সাধ্য কি?"

পিতামহ এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার আমতা আমতা করে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা—তা—প্রভু, আমি বুঝতে পারছি না, সমুদ্র-মন্থনের কথা কেন বলছেন?"

বিষ্ণু খুব মুরুব্বিয়ানা ভাবে বললেন, "এর ভেতর মস্ত এক ব্যাপার আছে। সমুদ্র-মন্থন করতে করতে দুর্লভ দুর্লভ সামগ্রী সব উঠবে সমুদ্র থেকে। তার ভেতর অমৃত হোল সব চেয়ে সেরা। ঐটিই হোল আমাদের লক্ষ্য বস্তু। এই অমৃত যে একবার পান করে, তার মৃত্যু হয় না, আর সে হয়ে ওঠে মহা শক্তিশালী। সমুদ্র-মন্থন করে এই অমৃত তোমরা পান কর, তা হলেই তোমরা হবে অমর আর অজেয়।"

ব্রহ্মা এই কথা শুনে দাড়ি-গোঁফ আর চারটি মাথা নেড়ে খুব ব্যস্ত হয়ে বললেন, "তা প্রভু, দানবরাও তো অমৃতের ভাগ পাবে? তারাও তো অমর হবে? তা হলে—?"

বিষ্ণু বললেন, "আহা, অত ব্যস্ত হন কেন। কোন রকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের দিয়ে কাজটা উদ্ধার করুন তো আগে। তার পরে আমি আছি। আমি সহায় হব আপনাদের। বুঝলেন তো?"

দেবতারা আশ্বস্ত হয়ে বিদায় নিলেন।

সমুদ্র-মন্থনের আয়োজন করবার জন্য ইন্দ্র এবার দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে দানবরাজ বলির সঙ্গে দেখা করতে চললেন। বলি রাজার দানব-সেনারা দেবতাদের দেখতে পেয়েই অস্ত্র উঁচিয়ে দৌড়ে এলো তাঁদের ঘায়েল করতে। দেবতাদের

হাতে অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই ছিল না; তাঁরা শান্ত ভাবেই এগিয়ে চলেছেন। বলি তাঁর লোকদের নিষেধ করলেন, "আহা, অত উদ্ধত হও কেন? শোনই না আগে ওঁরা কি বলতে চান।"

তার পর বলি রাজার সঙ্গে ইন্দ্রের কথা হতে লাগলো। দেবরাজ বলিকে বুঝিয়ে বললেন যে, একযোগে সমুদ্র-মন্থন করলে দুই পক্ষেরই লাভ।

বলি রাজা দেখলেন, সমুদ্র থেকে অমৃত পাওয়া যাবে, আর তা পান করলে অজয় অমর হয়ে থাকা যাবে চিরকাল। কাজেই এ সুযোগ ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। বলি রাজা সমুদ্র-মন্থনে রাজি হয়ে গেলেন আর যত সব দানবকে আদেশ দিলেন সমুদ্র-মন্থনে যোগ দিতে।

কিন্তু সমুদ্র-মন্থন তো বড় সোজা ব্যাপার নয়। মন্থন করতে হলে প্রথমেই চাই একটা মন্থন-দণ্ড। যে-সে দণ্ডে তো হবে না। ঠিক হোল যে মন্দর পর্বতকে মন্থন দণ্ড করা হবে। তখন দেবতা আর দানব দুই দলে মিলে অনেক পরিশ্রম করে বিরাট মন্দর পর্বতকে উপড়ে এনে সেটাকে সমুদ্রের গর্ভে ফেলা হোল। সমুদ্র-গর্ভে ফেলতেই সেটা ডুবে যেতে লাগলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অতি বিপুল আকারের ও অদ্ভুত রকমের একটা কচ্ছপ সমুদ্র থেকে বেরিয়ে পড়ে নিজের পিঠ পেতে দিয়ে পর্বতটাকে ধরে রাখলো। তার আশা, অমৃত যখন উঠবে, সে-ও ভাগ পাবে।

এবার চাই মন্থন-দড়ি—যেটা দিয়ে মন্দর পাহাড়কে একবার এ-দিকে, একবার ও-দিকে টেনে টেনে ঘোরানো যাবে। কিন্তু অত বড় বিরাট পাহাড়কে ঘোরাবার মত লম্বা আর মজবুত দড়ি পাওয়া যাবে কোথায়? তারও উপায় হোল। সর্পরাজ বাসুকি তাঁর বিপুল দেহ সমেত এসে বললেন, তিনি হবেন-মন্থন-রজ্জু। তবে কিন্তু অমৃতের ভাগ তাঁকেও দিতে হবে। ভাগ দিতে অরাজি কেউ হলেন না।

তখন বাসুকিকে নিয়ে মন্দর পাহাড়টাকে বেড় দিয়ে সমুদ্র-মন্থনের জন্য তৈরী হলেন দেবতা ও দানবেরা। দেবতারা ধরলেন বাসুকির মুখের দিক আর দানবদের ধরতে দেওয়া হোল লেজের দিক। এইবার টানবার পালা। কিন্তু হঠাৎ দানবেরা বেঁকে বসলো। তারা বললে, "আমাদের লেজের দিকটা ধরতে দেওয়া হোল যে বড়? আমরা কি হীন যে লেজের দিকটা ধরবো? আমরা শাস্ত্র পড়ি, বেদ পড়ি, বংশ-মর্য্যাদায় আমরা ছোট নই মোটেই। দেবতাদের চেয়ে আমরা কম কিসে যে আমরা লেজ ধরতে যাব? আমাদের মুঁখের দিকটা চাই, নইলে টানবো না তো আমরা কিছুতেই।" এই বলে দানবেরা হাত গোটালে।

বিষ্ণু গোড়া থেকেই আছেন দেবতাদের সঙ্গে সঙ্গে। সবই তিনি দেখছেন। তিনি হেসে বললেন, "বেশ তো, সে জন্য এত আপশোষ কেন? মুখের দিকটাই ধর না তোমরা। বাধা কিসের?"

দানবেরা তখন মহা খুসি হয়ে মুখের দিকে ধরলে, আর দেবতারা ধরলেন লেজের দিক। বিষ্ণু এই দেখে মনে-মনে মহা খুসি। তিনি দেবতাদের দিকে চেয়ে চোখ টিপে হাসলেন।

এবার চললো বিপুল উদ্যমে সমুদ্র-মন্থন। দানবের শরীরে ভয়ানক শক্তি। দেবতারাও দুর্বল নন। বাসুকি অতটা ভাবেননি। অনবরত ঘর্ষণের ফলে তাঁর চোখ-মুখ-নাক দিয়ে বিষাক্ত ধোঁয়া আর আগুন বেরুতে লাগলো গল-গল করে। দানবেরা রয়েছে মুখের দিকে। বিষাক্ত আগুন আর ধোঁয়ার চোটে তাদের তো এবার প্রাণ-সংশয়। এবার তারা বুঝতে পারলে, মুখের দিক ধরে কি বোকামিই না করেছে! এখন তো আর ছেড়ে দেওয়া চলে না।

আবার আর এক বিপদ উপস্থিত। মন্থন করতে করতে সমুদ্র থেকে উঠে পড়লো হলাহল নামে এক অতি তীব্র বিস। সে বিষ এমন ভয়ানক যে, একবার তা হাওয়ায় ভেতর ছড়িয়ে পড়লে কোন প্রাণীই বাঁচবে না। দেবতারা মহা ভাবনায় পড়লেন। বিষ্ণু বললেন, এই তীব্র হলাহল ধারণ করতে পারেন একটি মাত্র দেবতা, তিনি দেবাদিদেব মহাদেব। এ পর্যন্ত মহাদেবের কথা মনে হয়নি কারো, তাঁকে কেউ ডাকেওনি। এখন সবাই তাঁর শরণ নিলেন, আর তাঁর স্তব-স্তুতি আরম্ভ করে দিলেন। মহাদেব আপন-ভোলা। দেবতাদের স্তবে ভুলে গিয়ে সেই তীব্র হলাহল তিনি খেয়ে ফেললেন। হলাহলের তেজে তাঁর গলা নীলবর্ণ হয়ে গেল। সেই থেকে তিনি নীলকণ্ঠ।

এই বিপদ কেটে গেলে পর আবার উৎসাহের সঙ্গে চললো সমুদ্র-মন্থন। এবার জল থেকে উঠতে লাগলো দুর্লভ দুর্লভ সামগ্রী। প্রথমে উঠলো সুরভি নামে এক দুগ্ধবতী গাভী। গাভীটি কে নেবে? ঋষিরা যাগ-যজ্ঞ-হোম করেন। সে জন্য গাভীটি ঋষিদের ভাগে দেওয়া হোল। সুরভির পর উঠলো উচ্চৈঃশ্রবা নামে অতি সুন্দর এক সাদা ঘোড়া। দানব-রাজ বলির ইচ্ছা হোল এই ঘোড়াটি নেবার। কিন্তু কি ভেবে লোভ সম্বরণ করলেন। এর পর উঠলো ঐরাবত হস্তী। তার পর উঠলো কৌস্তুভ মণি। তার পর উঠলো অতি মনোহারী বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হয়ে অপূর্ব্ব সুন্দরী অপ্সরাগণ। এর পর শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী জল থেকে উঠলেন—রূপে দশ দিক আলো করতে করতে। সব শেষে উঠলেন ধন্বন্তরি, সকলের বাঞ্ছিত বস্তু অমৃত-ভাণ্ড হাতে নিয়ে হাসিমুখে। এবার কোলাহল পড়ে গেল।

এতক্ষণ ধরে যে সব সামগ্রী উঠেছিল, তা দুর্লভ হলেও দানবেরা সে দিকে তেমন লোভ দেয়নি। দেবতারাই সে সব নিয়েছেন, দানবেরা কিছুই পায়নি। এরা এঁচে রয়েছে, কখন অমৃত ওঠে। কেন না, সেইটাই আসল বস্তু। এখন যেই দেখেছে ধন্বন্তরির হাতে অমৃত-ভাণ্ড, আর যায় কোথায়! ধাঁ করে তাঁর হাত থেকে অমৃত-ভাণ্ড ছিনিয়ে

নিয়ে নিজেদের এক্তারের মধ্যে করে নিলে দানবেরা। দেবতারা পড়লেন ফাঁপরে। যে জন্য এত কষ্ট, এত উদ্যোগ,—যে অমৃত তাঁদের না হলেই নয়, সেই অমৃত চলে গেল বিপক্ষের কবলে। সবাই তখন হতাশ হয়ে বিষ্ণুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। বিষ্ণুদেবকে দেখা গেল নির্বিকার। দেবতাদের আশ্বাস দিয়ে তিনি বললেন, "তোমরা ভেবো না কিছুই। সব এবার ঠিক হয়ে যাবে।"

ওদিকে দানবদের ভেতর ঝগড়া সুরু হয়ে গেছে। যে সব দানব দুর্বল, তারা দেখলে যে, অমৃতের কলসী গিয়ে পড়েছে এমন সব বলবানদের হাতে, যারা সবই নেবে, এরা ছিটে-ফোঁটাও পাবে না। এরা তখন আপত্তি তুলে বললে, "এ অত্যন্ত অন্যায় হচ্ছে। দেবতারাও তো সমানে মেহনত করেছে। তাদের বঞ্চিত করা চলবে কি? তা হলে দানব-কুলের বদনামের আর সীমা থাকবে না।"

দানবদের ভেতর এই নিয়ে বাদানুবাদ চলছে, এমন সময় দেবাদিদেব বিষ্ণু গিয়ে উপস্থিত হলেন সেখানে। তাঁর অতি মনোহর বেশ, অতি অপূর্ব্ব রূপ। মিষ্ট কথায় তিনি দানবদের বোঝাতে লাগলেন। তিনি বললেন, তিনি নিরপেক্ষ হয়ে এমন ভাবে অমৃত পরিবেশন করে দেবেন সকলের মধ্যে, যাতে দানব বা দেবতা কেউ খালি যাবে না, কেউ বাদ পড়বে না, কেউ হবে না বঞ্চিত।

বিষ্ণুর প্রভাব এড়াবার সাধ্য হোল না দানবদের। তারা বিনা ওজরে মেনে নিলে তাঁর কথা। "বেশ তো, আপনি নিজে যখন ভার নিচ্ছেন, তখন আর ভাবনা কিসের? আপনার উপরেই সব নির্ভর। এখন যা করেন আপনি।" এই বলে অমৃত-ভাণ্ডটি তাঁর হাতে তুলে দিলে।

বিষ্ণু হাসি-হাসি মুখে বললেন, "আমার উপর সব ছেড়ে দিলে তো? অশান্ত বা উদ্ধত হবে না তো? যা বলি শোন। যা করতে বলি কর। সবাই এখন ধীর-স্থির হয়ে সারি সারি বসে যাও তা হলে। আমি এক দিক থেকে বাঁটতে সুরু করি।"

এই বলে বিষ্ণুদেব অমৃত পরিবেশন করতে আরম্ভ করে দিলেন। আরম্ভ করলেন কিন্তু দেবতার দিক থেকে। দেবতারা আগে-ভাগে অমৃত খেতে পেরে মহা খুসি। বিষ্ণু ধীরে-সুস্থে দিচ্ছেন, পরিবেশন করছেন তো করছেনই। দানবের দল ওদিকে ছট্‌ফট্ করছে। দেরী হচ্ছে দেখে অধীর হচ্ছে। আঃ, দেবতাদের দিকটা যে আর শেষই হয় না। শেষ অবধি দেবতাদের বাঁটতে বাঁটতেই অমৃত-ভাণ্ড খালি হয়ে গেল। যেটুকু বাকি রইলো, বিষ্ণু নিজের মুখে তার সবটুকু ঢেলে দিয়ে ঢক-ঢক করে খেয়ে ফেললেন।

অমৃত-বণ্টনের ফলে দেবতারা হলেন অমর। আজও তাঁরা অমর হয়েই রয়েছেন। আর দানবেরা? তারা শুধুই দুর্দ্ধর্ষ, আর কিছুই না।

বিদ্রোহের গান

[অপ্রকাশিত]

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

বেজে উঠলো কি সময়ের ঘড়ি?
এসো তবে আজ বিদ্রোহ করি,
আমরা সবাই যে যার প্রহরী
উঠুক ডাক;

উঠুক তুফান মাটিতে পাহাড়ে
জ্বলুক আগুন গরীবের হাড়ে
কোটি করাঘাত পৌঁছোক দ্বারে;—
ভীরুরা থাক।

মানবো না বাধা, মানবো না ক্ষতি,
চোখে যুদ্ধের দৃঢ় সম্মতি
রুখ্‌বে কে আর এ অগ্রগতি,
সাধ্য কার?

রুটি দেবে নাকো? দেবে না অন্ন?
এ লড়াইয়ে তুমি নও প্রসন্ন?
চোখ-রাঙানিকে করি না গণ্য
ধারি না ধার।

খ্যাতির মুখেতে পদাঘাত করি,
গড়ি, আমরা যে বিদ্রোহ গড়ি,
ছিঁড়ি দু'হাতের শৃঙ্খল—দড়ি,
মৃত্যু-পণ।

দিক্ থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে,
ব'সে থাকবার বেলা নেই মোটে
রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে
পূর্ব-কোণ।

ছিঁড়ি, গোলামীর দলিলকে ছিঁড়ি,
বেপরোয়াদের দলে গিয়ে ভিড়ি,
খুঁজি কোনোখানে স্বর্গের সিঁড়ি,
কোথায় প্রাণ।

দেখবো, ওপরে আজো আছে কা'রা,
খসাবো আঘাতে আকাশের তারা,
সারা দুনিয়াকে দেবো শেষ-নাড়া,
ছড়াবো ধান।

জানি রক্তের পেছনে ডাকবে সুখের বান॥

দিল্লী হনুজ দূর অস্ত্

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

"দিল্লী এখনও দূরে"—নেতাজী যে দিল্লী যেতে চেয়েছিলেন এবং যে স্বাধীনতার প্রতীকস্বরূপ জাতীয় পতাকা লালকেল্লায় ওড়াতে চেয়েছিলেন, আজও সে দিল্লী দূরে রয়েছে। ১৫ই আগষ্ট তারিখে একটি ইলেক্‌ট্রিক বোতাম টিপে পণ্ডিত জওহরলাল যে পতাকাটিকে লাল কেল্লার উপর উড়িয়েছিলেন তার উত্থানের ইতিহাসে কত শহীদের ত্যাগ, কষ্ট ও মৃত্যুবরণের করুণ কাহিনী জড়িত রয়েছে, ভাবলে চোখে জল আসে। সেই মহাপ্রাণ জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত নর-নারীর দল প্রাণে বেঁচে নেই, আমরা যারা বেঁচে থেকে এই উৎসবে যোগদান করতে পেরেছি, আজ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চিত্তে সেই পূর্ব সাধকদের স্মরণ করি এবং ভক্তিভরে প্রণাম করি।

মনে পড়ে মেদিনীপুরের 'বুড়ী গান্ধী' মাতঙ্গিনী হাজরার কথা, পদ্ম গোয়ালিনীর আত্মদান। ৭৩ বৎসরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী গাঁয়ের ছেলেদের পিছু নিল—বর্ব্বর ব্রিটিশ সৈন্য গুলী চালাচ্ছে, ছেলেরা বুড়ীকে বারণ করলো, কিন্তু কে শোনে—এক হাতে শঙ্খ আর এক হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে বৃদ্ধা মিছিলের পুরোভাগে চলল। বাম হাতে একটি গুলী লাগলো, শঙ্খটি পড়ে গেল, ডান হাতে আর একটি গুলী লাগলো, কিন্তু তখনো জোর হাতে পতাকা ধরে আছে, মুখের মধ্যে গুলী মারলো তবুও বজ্রমুষ্টিতে পতাকা ধারণ করে মৃত্যু বরণ করে সে জাতির সম্মান রাখলো।

যে আদর্শ মনে নিয়ে বাংলার এই গ্রাম্য বৃদ্ধাটি এমন ভাবে প্রাণ দিয়েছিল—স্বাধীনতার সমাগমে আমাদের সে আদর্শ পূর্ণ হয়েছে কি? নেতাজীর নেতৃত্বে পূর্ব্ব-এশিয়া হতে যে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরের দল "দিল্লী চলো" বলে কর্দ্দমময় পর্ব্বতপথে কদম কদম অগ্রসর হয়েছিল, তাঁদের অনেকে আজও বেঁচে আছেন কিন্তু প্রাণের আদর্শ তাঁদের প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি? সত্যি বটে ভারত এখনও পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেনি—দু'টি ডোমিনিয়নে বিভক্ত হয়ে সেই স্বাধীনতার পথে পা বাড়াতে চলেছে মাত্র। এখনও সে হাঁটি-হাঁটি পা-পা, দাঁড়াতে বা দৌড়তে অনেক দেরী।

ভারতীয় গণ-পরিষদ নির্ব্বাচিত হল তাদের দ্বারা যারা জনগণের শোষক শ্রেণীভুক্ত এবং তাদের শতকরা ১৩ ভাগ মাত্র। অবশিষ্ট ৮৭ জনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা এদের ভাবধারায় পূর্ণ প্রতিফলিত হতে পারে কি? তাই দেখি থিয়েটারের পুত্র-শোকাতুরা জননীর মত দরিদ্রের জন্যই এদের মায়াকান্না!

আজ যে নূতন গভর্ণমেণ্ট হয়েছে তার মন্ত্রিসভায় দেখি কেবলই ধনী এবং ধনীর দালালদের প্রাধান্য। বাহ্যতঃ ভিন্ন ভিন্ন দলের হ'লেও এরা মূলতঃ এক, শ্রেণি-স্বার্থের টানে এরা ভারতের জনগণের শোষণ ও শাসনের পথে এক হয়ে রাষ্ট্র রথের দড়ো টানছে।

"সাগরের কূলে পুরী তব দারু মূরতি জগন্নাথ
রথের চাকায় লোক পিষে যায়, তোমার নাহিক হাত।"

ব্রিটিশ পুঁজিবাদীর সমগোত্রীয় এরা নূতন শাসনতন্ত্র [illegible] রাখলো ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন। কয়েকটি মডারেট মাদ্রাজী নাইট এই শাসনতন্ত্রের কাঠামো বজায় রেখে গণ-পরিষদকে দিল এক নতুন বোতলে পুরাতন সুরা উপহার। ১৯২১ সালে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের [illegible] সংকল্পে উপাধি ত্যাগের ব্যবস্থা করেছিল—এরা তার পর এক একটি করে সরকারী খেতাব যোগাড় করতে করতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত ভৃত্যরূপে নিজেদের প্রমাণিত করেছে, তার পর গণ-পরিষদে কংগ্রেসী হয়ে নির্ব্বাচিত হয়ে এসে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বরাত্রে সব উপাধি বর্জন করে বৃদ্ধকালে তপস্বিনী রমণীবিশেষের ন্যায় স্বদেশ-সেবক হয়েছে। এদের রসনায় সরস্বতী বাস করেন, এদের বুদ্ধি ক্ষুরধার, এরা ইংরেজের সৃষ্ট সবাক টকীযন্ত্র, তাই গণ-পরিষদে এরাই প্রাধান্য লাভ করলো। বাংলা থেকে বেছে বেছে মূক-বধির বিদ্যালয়ের সভ্যগণকে গণ-পরিষদের সদস্য করা হ'ল। বাংলার একমাত্র সবাক নেতা শ্যামাপ্রসাদকে মন্ত্রিত্বের গদিতে বসিয়ে মুখ বন্ধ করে দিলেন।

ফলে হ'ল যে আইনের প্রস্তাব তাতে বিনাবিচারে বন্দী করার ধারাও বজায় রইল। ব্যক্তি-স্বাধীনতার এই অপমান-জনক ধারা পৃথিবীর কোনও সভ্যদেশে যুদ্ধের সময় ব্যতীত প্রচলিত হয়নি। কিন্তু আমাদের স্বাধীন শাসনতন্ত্রে ১ নং স্থান হ'ল এর—যার বিরুদ্ধে আমরা ষাট বছরের অধিক কাল এত চীৎকার করে এসেছি। নির্ব্বাচিত প্রাদেশিক গভর্ণর নিজের ইচ্ছেমত মন্ত্রী বেছে নেবেন প্রস্তাব হয়েছে, জন-সাধারণ-নির্ব্বাচিত আইন সভা, এই মন্ত্রীদের বরখাস্ত করতে পারবেন না, সংখ্যাধিক পার্টির নেতারও এই মন্ত্রী নির্ব্বাচনে কোনও হাত থাকবে না, তাহলে উপায় কি হবে?—সর্দ্দার প্যাটেল বললেন, গবর্ণর যদি তেমনই অন্যায় করে তাকে গুলী করে মারা ছাড়া উপায় কি?

প্রদেশের সঙ্গে কেন্দ্রের যে সম্বন্ধ প্রস্তাবিত হয়েছে, তাতে ভিখারী ও দাতার সম্বন্ধ মাত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রের হাতেই প্রায় সব ক্ষমতা থাকবে—প্রদেশকে হাত পেতে, মুখ চেয়ে সব সময়েই চলতে হবে। মহাত্মাজী বলেছেন, অস্ত্রশস্ত্র শুধু থাকবে পুলিশ ও সৈন্যদের হাতে, লোকের হাতে থাকবে না। প্রস্তাব হয়েছে, লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের হাতে আর থাকবে না—সে ক্ষমতার অধিকারী হবেন কেন্দ্র।

পাকিস্তানে তাঁদের নেতা হলেন গভর্ণর জেনারেল, ভারতীয় ডোমিনিয়নে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনই থাকলেন। আমরা কূট নৈতিক চাল দিলাম বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম। পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল বিনা মাইনায় কাজ করবেন

মায়ের প্রাণ —রমা চক্রবর্ত্তী

বললেন, আমাদের বিলাতী গভর্ণর জেনারেল বোধ হয় সেই তিন লাখ টাকা মাইনায় বহাল রইলেন।

সেই অনুপাতে তাই বুঝি হল প্রাদেশিক দেশী গভর্ণরদের মাহিনা কম করে বাৎসরিক ৬৬ হাজার টাকা, বাংলার গভর্ণর বাস করলেন ১৪০টি কামরাযুক্ত প্রাসাদে, ব্যক্তিগত ষ্টাফে থাকবেন ২০০ কর্ম্মচারী, প্রাইভেট সেক্রেটারী হলেন এক জন ঝুনো সিভিলিয়ান। সেই "হিজ একসেলেন্সির" বড়লোকদের নিয়ে উৎসব অনুষ্ঠান, খানাপিনা, ভেট-মোলাকাৎ চলতে লাগল। ১৪টি জেলার জন্য বাংলায় রাখা হ'ল ৭৭ জন আই, সি, এস এঁরা নৈবিদ্যির সন্দেশের মত উঁচু হয়েই দেশের ঘাড়ে চেপে থাকলেন।

যারা দেশের লোককে চিরদিন ঘৃণা করে এসেছে, ভার্ণাকুলার সাহেব হয়ে স্বজাতির স্বাধীনতা আন্দোলনকে পদে পদে পিষে মারবার চেষ্টা করেছে, তারাই আজ নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণধার। যে সকল পুলিশ কর্ম্মচারী পুরুষানুক্রমে স্বদেশীওয়ালাদের বিরুদ্ধে কত হীন চক্রান্ত ও অত্যাচার করেছে, তারাই প্রমোশন পেয়ে হয়েছে পুলিশ বিভাগের বড় কর্ত্তা। সার্জেণ্টদের দল খোস মেজাজে বহাল তবিয়তে বজায় আছে। তার ফলে দেশের হৃদয়হীন শাসনতন্ত্র আগে যে ভাবে চলছিল এখনো সেই ভাবেই চলছে। লোকে স্বাধীনতার আস্বাদ কিছুই পেল না, সেই চোরাবাজারীর রাজত্ব, সেই ঘুষের কারবার, সেই কন্‌ট্রোলের পেষণে প্রাণ ওষ্ঠাগত, সেই ১৪৪ ধারা বর্ত্তমান। সবই না কি পেলাম— কেবল থেকে গেল যা কিছু অভাব অন্ন-বস্ত্রের। সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার কথা শুনতে শুনতে কাণ ঝালাপালা হয়ে গেল, হয়ত আর একটি রাষ্ট্র-বিপ্লবের পর আমাদের সেদিন আসবে, তাই বলি—

বৈষ্ণব পদাবলীর জীবনাদর্শ

অমিতা মিত্র

বাংলার সামাজিক তথা রাষ্ট্রগত জীবনে মানুষ যখন নানা ভাবে লাঞ্ছিত অপমানিত বিপর্য্যস্ত হয়ে আর্ত্ত-নাদ করে বেড়াচ্ছিল এবং কঠোর সাধনা করেও যখন দৈব-কৃপা লাভ সুদূর-পরাহতই রয়ে গেল তখন স্বভাবতই তাদের মন গভীর হতাশায় ভরে উঠল। এমনি মুহূর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্ম মানুষকে তার গভীর বেদনা ও নৈরাশ্যের হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্য বাইরে দেবতার অনুসন্ধান না করে নিজের ভেতরই তাঁর সন্ধান করতে নির্দ্দেশ দিল। বৌদ্ধযুগের পর শঙ্করাচার্য্যও সেই উদ্দেশ্যে তাঁর শুদ্ধব্রহ্মবাদ, অদ্বৈতবাদ আকারে দেশময় প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। এক দিকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে লোকের মনে জগতের প্রতি একটা নিরাসক্ত ভাব এবং অপর দিকে শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ লোকের মনকে যখন সমাচ্ছন্ন করে ফেলেছে তখন সেই মুহ্যমান ভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে চণ্ডীরূপা শক্তির আরাধনা প্রবর্ত্তিত হতে সুরু হলো।

মুসলমান বিজেতাদের অত্যাচারের প্রতিকারার্থ জাতি যখন নিশ্চেষ্ট দেবতা শিবের বা বুদ্ধ-প্রচারিত দর্শনের কাছ থেকে কোনই শক্তি পাচ্ছিল না, তখন তাঁরা প্রচণ্ড শক্তিময়ী চণ্ডীর আরাধনা শুরু করল। দেবীও ভক্তের প্রতি যেমন অনুগ্রহ দেখিয়েছেন, অভক্তের প্রতিও তেমনি নিগ্রহ করতে এতটুকুও কার্পণ্য করেননি। তাঁর অনুগ্রহে কত অভাজন সঙ্কট কাল উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এবং তাঁর বিরাগে কত জন ধ্বংস হয়েছে তার প্রমাণ আমরা পাই মঙ্গলকাব্যগুলিতে।

কিন্তু এতেও কি নির্য্যাতিত বেদনাহত মানুষ পরিপূর্ণ সুখ-শান্তি বা আশার বাণী পেল? না, তাও পায়নি। তার পর এল বৈষ্ণব ভাবের প্লাবন। বৌদ্ধ ধর্ম্মকর্ম্মবাদ প্রচার করে লোকের মনে যে আশা ও আনন্দের সঞ্চার করতে পারল না, শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদ প্রচার করেও যা পারলেন না, বৈষ্ণবধর্ম্ম এ দুয়ের কোন পথই অবলম্বন না করে তাই করল। বৈষ্ণবধর্ম্ম যেন এক মুহূর্ত্তে সকল সমস্যার সমাধান করে নরনারীর আকুল প্রাণে এক অপূর্ব্ব আনন্দের শিহরণ জাগিয়ে তুললো। এত দিন নির্গুণ পরমব্রহ্মের উপাসনা সাধারণ মানুষকে তৃপ্ত করতে পারছিল না, বৌদ্ধধর্ম্মের নিষ্ক্রিয়তাও মানুষকে সত্য আনন্দের অধিকারী না করে সমাচ্ছন্ন করে ফেলছিল। এতেও তারা তৃপ্ত হয়নি, আবার শিব বা শক্তি দেবীর আরাধনাতেও তারা সান্ত্বনা বা ভরসা হয় তো পেতো কিন্তু সে আরাধনা ভয়মিশ্রিত ছিল, প্রেমমিশ্রিত ছিল না। কাজেই আরাধ্য দেবতাকে দূরে রেখেই ভক্তিমাল্য রচনা করে দূর থেকেই নিবেদন করে দিয়েছে, জপ-তপের ভেতর দিয়ে স্বর্গের দেবতাকে স্বর্গেই রেখেছিল, বুকে টেনে নিতে ভরসা পায়নি। কিন্তু বৈষ্ণবধর্মে মানুষকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখিয়ে দিল নিজের প্রিয়জনের মধ্যেই রয়েছেন সেই 'রসো বৈ সঃ'—দূরের দেবতা, স্বর্গের দেবতাকে কত কাছের করে, কত অন্তরতররূপে পাওয়া যায়। তিনি আপামর সকলের দ্বারে ভিখারিরূপে, ব্যথার ব্যথীরূপে, প্রিয়তমরূপে কত বার কত রূপে আসছেন। বৌদ্ধ ও শাক্ত-ধর্ম্মের খরস্রোতকে মন্দীভূত করে, এত দিনের পুঞ্জীভূত জড়ত্ব ও অসহায়ত্বকে ভুলে গিয়ে মানুষ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রেমের বন্যায় সহজেই ভেসে গিয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করল। অন্তরের মধ্যে বিশ্বমানবতার এক মহান্ ধ্বনি শুনতে পেয়ে মন অপূর্ব্ব আনন্দে ভরে গেল। প্রেমিক বৈষ্ণবরা বল্লেন—"প্রেমই যদি হল তবে আর 'এক উচ্চ আর তুচ্ছ' থাকবে কেন? তিনি যদি আমাকে প্রেম করেন, তবে তাঁকেও আমার প্রেম-লীলায় সমান হতে হবে। নইলে উচ্চ স্থানে বসে যে দাবি তাতে তো প্রেম হয় না। তা হল শক্তি ও বৈভবের জুলুম মাত্র। রাজাও যদি দাসীকে প্রেম করে, সেই মুহূর্ত্তে দাসীর দাস্য মোচন হ'য়ে সে স্বাধীন হ'য়ে যায়। কাজেই প্রেম লীলাময় প্রেমের সাধনায় তাঁর বৈকুণ্ঠ এমন কি মথুরার রাজসিংহাসন ছেড়ে ব্রজে এসে গোপ তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে সমান হ'য়ে যান। যতক্ষণ তিনি মানবীয় ভাবে ধরা না দিলেন ততক্ষণ তিনি আমাদের কে?"

তাই বৈষ্ণব সাহিত্যে আমরা দেখি, বৈষ্ণবদের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারীও নন বা নির্গুণ পরম-ব্রহ্মও নন—তিনি তাঁদের পরম আত্মীয়। বৈষ্ণব ভক্তরা ভগবানের বাণী শুনতে পেলেন—

> "মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
> এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ ভক্তি॥
> মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
> অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥
> সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ
> তুমি কোন বড়লোক তুমি আমি সম॥
> এই শুদ্ধ ভক্তি লঞা করিমু অবতার।
>
> (চৈঃ চঃ আদির চতুর্থে)

তাঁদের মতে ভগবানের সর্ব্বোত্তম স্বরূপ হল তাঁর মানব স্বরূপ, কারণ মানবরূপেই প্রেমের লীলা চলে। কৃষ্ণদাসও বলেন—ভগবানের সর্ব্বোত্তম লীলা তাঁর নর-লীলা। 'কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা।' মানবরূপে ভরপুর কৃষ্ণ-চরিতই বাংলা দেশের আসল কৃষ্ণ-চরিত। বৈষ্ণব সাধকরা দেবতার সঙ্গে দাস, সখা, পুত্র, প্রেমিকা ইত্যাদি নিবিড় সম্পর্ক পাতিয়ে তাঁকে আরও কাছে পেতে চেয়েছেন। বৈষ্ণব কবিতা পরমাত্মীয়ের আরাধনা, তাই এর সুর প্রেমের সুর, ভালোবাসার সুর। বৈষ্ণবগণ শাস্ত্র বা বিধি-নিষেধের ধার বড় একটা ধারতেন না, তাঁদের কাছে প্রেমই ছিল মুখ্য, মানুষই ছিল শ্রেষ্ঠ। মানুষই সার তত্ত্ব এই উপলব্ধি প্রথম জেগেছিল চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিদের মধ্যে। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষের প্রেমের মধ্যেই মানুষ জীবন্ত সত্য হ'য়ে উঠতে পারে। মানুষকে বাদ দিলে পরম সুন্দরের সন্ধান কোন দিনই পাওয়া যায় না। কারণ জীবনের সুখ-দুঃখ, স্নেহ-প্রেম ইত্যাদি যত প্রকার রসানুভূতি আছে তা

প্রকাশ হয় মানুষের গভীরতম অনুভূতির দ্বারা এবং গভীরতম এক একটি অনুভূতির মধ্য দিয়ে মানুষ বিশ্বরূপ দর্শন করে। সেই সময় মানুষ 'একমেবাদ্বিতীয়ম'কে বিভিন্নরূপে দেখতে পায়। কখনও প্রভুরূপে, কখনও পুত্ররূপে, কখনও প্রিয়তম-রূপে তিনি 'দয়া করে ইচ্ছা করে আপনি ছোট হয়ে' মানুষের ক্ষুদ্রতম কুটীর-প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ান। তখন প্রিয় ও দেবতা একাকার হয়ে যায়। প্রেম মানব-হৃদয়ের এক অনন্ত সম্পদ, এক অগাধ রহস্য। যে এই প্রেমের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্জ্জন করে দিতে পারে সে প্রেমাস্পদকে অনন্তরূপেই অনুভব করে। বৈষ্ণব সাহিত্যে এই রকম প্রেমের পরিচয়ই আমরা পাই। বৈষ্ণব সাধকগণ তাঁদের সুতীব্র অনুভূতির দ্বারা সাধনার প্রথম ধাপেই বুঝেছিলেন, মানুষই সত্য, তার উপর কোন সত্যই নেই। পরমপুরুষকে উপলব্ধি করতে হলেও মানব-ভাবের মধ্য দিয়েই করতে হবে, তা না হ'লে মানুষের পক্ষে উপলব্ধি হয়ে উঠবে অসম্ভব। শ্রীভগবানের প্রতি চণ্ডীদাসের প্রেম 'রজকিনী রামী'কে কেন্দ্র করেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। রামীকে তিনি কোন দিনই স্বকীয়া নারী বলে গ্রহণ করেননি, রামী তাঁর কাছে সহজ সাধনের সঙ্গিনী ছিলেন। তাই তিনি অতি সহজেই বলতে পেরেছিলেন—

> 'তুমি হও পিতৃমাতৃ তুমি বেদমাতা গায়ত্রী,
> তুমি সে মন্ত্র, তুমি সে তন্ত্র—
> তুমি উপাসনা রস।'

রামী ছিলেন তাঁর কাছে 'উপাসনা রস'। বৈষ্ণব-কবিরা মানবীয় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, কান্তা ভাবের দ্বারা আরাধনা করে ভগবানকে কাছের মানুষরূপে পেতে চেয়েছিলেন—তুমি প্রভু আমি দাস। শ্রীদাম সুদাম বলেছেন—তুমি সখা। যশোদা বলেছেন—তুমি আমার পুত্র। রুক্মিণী বলেছেন, তুমি আমার দয়িত। রাধা ও ব্রজ-গোপীরা বলেছেন, তুমি আমাদের প্রিয়। এই পঞ্চরসের অভিব্যক্তি মানবীয় রসেরই একটি উন্নত সংস্করণ মাত্র।

বৈষ্ণব-ভক্তেরা দাসের যোগ্য সেবার অধিকার নিয়ে ভগবানের কাছে যায় এবং সমস্ত সর্ত্ত ত্যাগ করে নিজেকে প্রভুর পায়ে নিবেদন করে বলে—

> "এ হরি বন্দো তুঅ পদ নায়
> তুঅ পদ পরিহরি পাপ পয়োনিধি
> পারক কওন উপায়।"

বৈষ্ণব-ভক্তেরা সেবার ভেতর দিয়ে প্রেম দিয়েছেন। প্রেম ও পূজা তাঁদের কাছে এক হয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সখা, মথুরায় যাবার কালে সখাদের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে সুবল সখাকে বলছেন—

> "শুনহ সুবল মরম-বেদন
> তোমারে না দেখি যবে।
> হিয়া জর জর করয়ে অন্তর
> দেখিলে জুড়াই তবে॥"

কৃষ্ণ মথুরায় গিয়ে রাজা হয়েছেন, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের জগতে গিয়েও মাধুর্য্যের জগৎকে বিস্মৃত হতে পারেননি। তাই স্বপ্নে সুবলের সঙ্গে কথা বলছেন—

> "এ বোল বলিতে সুবল সঙ্গেতে
> কহিতে কাহিনী যত,
> সুবল না দেখি নিশির স্বপন
> সেহ ভেল অনুচিত॥"

তার পর সুবল মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণ সখার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

> চণ্ডীদাস কহে সুবলের স্তুতি
> দেখিয়া নাগর রায়।
> করেতে ধরিয়া নিল উঠাইয়া
> আলিঙ্গন ভেল তায়॥"

এই ভাবে পদাবলীতে বহু জায়গাতেই সখাদের প্রাধান্য দেখা যায়।

যশোদাও এমনিতর স্নেহের আবেগে গোপালকে মাতৃহৃদয়ে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন। তাই মথুরার রাজা অতুল ঐশ্বর্য্য ফেলে ব্রজের দুলাল হয়ে যশোদার অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাই তিনি সখা শ্রীদাম সুদামকে বলছেন—

> 'মায়ে না বলিয়া আমি যদি যাই গোঠে।
> মরিবে আমার মা পড়িবে সঙ্কটে॥
> একদিন ননী খাইয়া ছিলাম লুকায়্যা।
> মরিতেছিলেন মা আমায় না দেখিয়া॥'

শ্রীকৃষ্ণ যশোদার প্রাণধন। পুত্রের জন্য মাতার যে সকরুণ উৎকণ্ঠা আবেগ তাকে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি অখিল রসামৃত শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত উপেক্ষা করতে পারেননি।

পদাবলীর রাধা কৃষ্ণ-প্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ। রাধার পূর্ব্বরাগ, মান, বিরহ, মিলন এ সবের ভেতর দিয়েই বাস্তব প্রেম জীবনের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"কৃষ্ণ-রাধার বিরহ-মিলন সমস্ত বিশ্ববাসীর বিরহ-মিলনের আদর্শ।" প্রিয়তমের বিরহে রাধা বলেছেন :

> "এখন তখন করি দিবস গমাওল
> দিবস দিবস করি মাসা।
> মাস মাস করি বরিখ গমাওল
> ছোড়ল জীবনক আশা॥"

রাধার এই যে করুণ কাকুতি, সুতীব্র বেদনার হাহাকার এ কি বিশ্ব-বিরহিণীদেরও হৃদয়-চাঞ্চল্য ঘটায় না? বৈষ্ণব পদাবলী যেন মানব-প্রেমেরই মরম-কথা।

পদাবলীর পদগুলি যদিও মর্ত্ত্যের মানবীকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে, তবু এগুলিকে সাধারণ আদিরসের পদ বলে আমরা অভিহিত করতে পারি না। এগুলিকে শুদ্ধমাত্র প্রাকৃত নর-নারীর ভোগ-বাসনা অথবা লালসা-সাহিত্য বলে অভিহিত করলে বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে তথা ভারতীয় ধর্ম্মকে বুঝতে ভুল করাই

হবে। বৈষ্ণব পদাবলীতে যৌনপ্রেমের যত বৈচিত্র্য দেখা যায় এমন বোধ হয় অন্য কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না; কিন্তু এতে যে সব লীলা-বৈচিত্র্য আছে সবই যেন অপ্রাকৃত বর্ণে অতিরঞ্জিত। "বৈষ্ণব কবিতা আত্মহারা প্রেমের গান, কিন্তু সেখানে বাসনার প্রবল ঝড়ে বাহিরের আকাশ-বাতাস বিক্ষুব্ধ হয় নাই। ভোগ এখানে অন্তর্মুখী, বাসনা আত্মস্থ, দেহ আত্মবশ। তাই বিরোধ নাই, মৃত্যু নাই। এই সাধনাই আমাদের দেশের ভারতীয় প্রকৃতির উপযোগী। আমাদের আদর্শ যুদ্ধ নয়, বাহিরকে জয় করা নয়, সকল কর্ম্ম সংহরণ করিয়া অহংমদমত্ততার উচ্ছেদ। ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিকতার মূল মন্ত্র। ইহারই প্রভাবে প্রেমের সাধনাতেও যে একটি অপূর্ব্ব রস আমাদের সাহিত্যে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার তুলনা নাই।" বৈষ্ণবেরা প্রেমের ব্যাপারে দেহকে কোন দিন অস্বীকার করেননি, পরন্তু দেহের দেউলেই প্রেমের আরতি করেছেন। তাই বিদ্যাপতির পদে রাধা বলছেন—

'পিয়া জব আওব ই মঝু গেহে।
মঙ্গল জতহু করব নিজ দেহে॥
কনআ কুম্ভ করি কুচজুগ রাখি।
দরপন ধরব কাজর দেই আঁখি॥
বেদি বনাওব হম অপন অকসে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
কদলি রোপব হম গরুঅ নিতম্ব।
আম-পল্লব তাহে কিঙ্কিনি সুঝম্প॥"

দেহকে অবলম্বন করে এ প্রেম গড়ে উঠলেও বারে বারে দেহোত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাই চণ্ডীদাস বলতে পেরেছেন—'রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়।"

বৈষ্ণব পদাবলী আগাগোড়া যেন বেদনারই কাহিনী। পূর্ব্বরাগ থেকে আরম্ভ করে মাথুর পর্য্যন্ত সমস্তই বেদনার গভীর রঙে অনুরঞ্জিত। জীবনের যে অধ্যায়টি সব থেকে মধুর, সব থেকে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যময়, সেই অধ্যায়টি বর্ণনা করতে গিয়েও কবি অশ্রুসজল হয়ে উঠেছেন। তাই রাধার পূর্ব্বরাগে আমরা দেখতে পাই যে, শ্রীকৃষ্ণকে দেখবার পর থেকেই রাধার 'মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন'। শুধু তাই নয়, 'মন্দাকিনী পারা কত শত ধারা ও দু'টি নয়নে বহে' অথবা 'হিয়ার ভিতরে লোটায়্যা লোটায়্যা কাতরে পারণ কাঁদে।' এমন কি, পরিপূর্ণ মিলনেও অশ্রু বাধা মানে না—'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।'

যশোদার মধ্যেও আমরা দেখি, তিনি তাঁর প্রাণ-ধন গোপালকে ভুবন-মোহনরূপে সাজিয়ে দেবার পর পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে গিয়ে নেহারি গোপাল মুখ কাতর পরাণি।' গোপালকে বুকের একান্ত সান্নিধ্যে নিয়েও অশ্রু বাঁধ মানে না। গোষ্ঠ-বিহারে রাখালদের ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যেও কান্নার অবধি নেই। শ্রীকৃষ্ণকে সখা বলে ডাকতে শ্রীদামের চোখে জল আসে। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শুনে ব্রজ-গোপীদের মন কোন এক রহস্যময় বেদনায় আকুল হ'য়ে ওঠে।

ভাব-সম্মিলনে রাধার যে উল্লাস দেখা যায়, তার ভেতরেও অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মত বেদনার প্রস্রবণ বয়ে যাচ্ছে। কিসের এই কারুণ্য? একে কি আমরা প্রাকৃত কারুণ্যের সঙ্গে তুলনা করতে পারি?

যার সঙ্গে অন্তরের মিলন ঘটবে বলে রাধা—

"টীর চন্দন উরে হার না দেলা
সো অব গিরি নদী আঁতর ভেলা।"

এই যে হাহাকার, এ কি শুধু যমুনার এ-পার ও-পারের দূরত্বের কথা? জনম অবধি যে রূপ দেখল, লক্ষ লক্ষ যুগ হৃদয়ে হৃদয় রেখেও অতৃপ্তির কাঁটা বিঁধেই রইল তবে এ কিসের বেদনা? এ সেই চিরন্তন একের সঙ্গে মানবাত্মার চির বিচ্ছেদ—বেদনার মর্ম্মকথা। মানবাত্মার এই ট্র্যাজেডিই পদাবলীর মাথুর।

পদাবলী-সাহিত্যে বংশীধ্বনির দুর্দমনীয় আকর্ষণীয় কথা বার বার ধ্বনিত হয়েছে, এই বাঁশির সুরে কুলনারীদের চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কোন্ অজানা সুরলোক থেকে এই সুর ভেসে আসছে, বাঁশির মর্ম্মকথা কি তা তারা কিছুই বোঝে না, কিন্তু তবুও সমস্ত সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করে এই বংশীবাদনের চরণপদ্মে তিল-তুলসী দিয়ে আত্ম-সমর্পণের আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত প্রাণ ব্যগ্র-ব্যাকুল হয়ে উঠল। রাধা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে 'মহাযোগিনীর পারা' হয়ে সেই একমাত্র প্রিয়ের চরণে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করে দিয়ে বললেন, "আমি কানু-অনুরাগে এ দেহ সঁপিনু তিল-তুলসী দিয়া।' ভুমার মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার একটি আকুল আকাঙ্ক্ষা সব সময়েই মানুষের মধ্যে থাকে। যখন সেই সুরলোক থেকে বিশ্ববিমোন বাঁশি কানে এসে পৌছায় তখন কারও সাধ্য নেই গৃহকর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তখন সে আপনা ভুলে তাঁরই পায়ে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করতে চায়। রাধা এই বংশীধ্বনি শুনে বড়াইকে জিজ্ঞাসা কচ্ছেন—

'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বে-আকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পায়ে নিছিব আপনা॥"

দাসী হ'য়ে তাঁর পায়ে নিজেকে সমর্পণ করবার জন্য রাধা লোকলজ্জা-ভয়-সংকোচ প্রভৃতি সাংসারিক জ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়ে সংসারাতীত আনন্দ লাভের জন্য ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥'

এমন করে একমাত্র তাঁরই পায়ে নিজেকে উৎসর্জ্জন করা যায়, যিনি পরম এক, চির হৃদয়বাঞ্ছিত, সেই 'রসো বৈ সঃ'র।

পদাবলী-সাহিত্য আগাগোড়াই সর্ব্বস্ব সমর্পণ ও আত্মবিস্মরণের মহিমায় মহিমান্বিত হ'য়ে উঠেছে। এই জন্যই বৈরাগী সর্ব্বত্যাগী কবিদের জীবনের সঙ্গে এর সংযোগ ও সামঞ্জস্য ঘটতে পেরেছে এবং শ্রীচৈতন্যের সাধক-জীবনে এ সহায়তা করেছে।

বৈষ্ণব কবিদের রূপানুরাগ এবং তার বিচিত্র অভিব্যক্তি পদাবলী-সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। বৈষ্ণব কবিরা রাধাকে জগৎ-সৌন্দর্য্যের প্রতীক করে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাঁকে গড়ে তুলেছেন। জগতের যেখানে যত কিছু সুন্দর বস্তু আছে তার থেকে কিছু কিছু সঞ্চয়ণ করে তাঁরা তিলোত্তমা সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা রাধাকে জগৎ-সৌন্দর্য্যের প্রতীক করে গড়ে তুলে তাঁর সৌন্দর্য্য আকণ্ঠ পান করেছেন। যে অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য দেখে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পাগল হয়েছিলেন সেই রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বৈষ্ণব কবিরা যেন দিশেহারা হ'য়ে পড়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের ভুবন-মোহন রূপ দেখে রাধাও আত্ম-সম্বিত হারিয়েছে। তাই রাধা বলেন —'পুলকে আকুল দিক নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি।' এই রূপ-পিপাসা এ কামনাময় দেহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও দেহকে অতিক্রম করে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমরা যাহাকে ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা। সমস্ত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত আছে। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন করে, প্রিয়তম ও প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে, তখন এই সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়াছে।"

পদাবলী-সাহিত্য প্রেমধর্ম্মেরই সাহিত্য। একমাত্র মানবীয় প্রেমের ভিত্তিতেই তাঁকে আস্বাদন করা সম্ভব। চণ্ডীদাসের কথায় বলা যায়—

"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন কেহ না চিনয়ে তারে।
প্রেমের আরতি যে জন জানয়ে, সেই সে বুঝিতে পারে॥"

ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে এই প্রেমতত্ত্বই নিহিত। সমগ্র পদাবলী-সাহিত্য মানবিকতার আবরণে একখানি আধ্যাত্মিক মহাকাব্য। শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবুর মতে চণ্ডীদাসের 'ভাব-সম্মিলনের পদাবলী স্তোত্ররূপে পাঠ করা যায়। সেগুলির মত প্রেমের সুগভীর মন্ত্র ধর্ম্মপুস্তকেও বিরল।'

কাব্য ও সঙ্গীত রসের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনার এমন অপূর্ব্ব সমন্বয় জগতের অন্য কোন সাহিত্যে আছে কি না সন্দেহ।

স্বাধীন ভারত

শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ

এক দিন হেরেছিনু মানস-নয়নে
ভারত স্বাধীন হবে বিধির কৃপায়,
কে যেন কহিয়াছিল কানে কানে মোরে
প্রেমবলে জয়ী হবে মিথ্যা ইহা নয়।

হিংসামত্ত বসুন্ধরা উন্মত্ত মানব
চিরদিন এই দৃশ্য থাকিতে পারে না,
থাকিলে তা ধ্বংস হবে অচিরে ধরণী
বিশ্বের ঈশ্বর তাহা কখনো সবে না।

প্রলয়-পয়োধিজলে দাঁড়ায়ে উল্লাসে
যে জন তুলিয়া দিল অপূর্ব্ব পৃথিবী!
স্বেচ্ছায় সহসা সে কি পারে মুছে দিতে
স্বরচিত অপরূপ মনোহর ছবি?

না এলে প্রলয়-লগ্ন হেথা পুনরায়
কার সাধ্য নাই ধ্বংস করিবে ধরণী,
মোহ-মদে মহা মত্ত হয় যবে কেহ—
মনে ভাবে আমি প্রভু ডুবাব তরণী।

আমার ইচ্ছায় যদি না চলে সবাই—
ভুল—ভুল—হেন ভুল আর কিছু নাই।
জগতের শান্তি তরে প্রেমের সাধনা—
যে করিবে জয়ী হবে তারি আরাধনা।

এ সত্য আজিও হেথা প্রদীপ্ত উজ্জ্বল
অহিংসায় পরাজিত হিংসা-হলাহল,
বিস্ময়-চকিত নেত্রে হেরিল জগৎ
প্রেমবলে মহাবলী স্বাধীন ভারত।

জীবন-জল-তরঙ্গ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

২৮

এ সংবাদ রাষ্ট্র হতে দেরি হ'লো না যে—পুরন্দরের বিপক্ষ দল তাকে জব্দ করবার জন্য মাধব আর বাসবকে রাস্তায় ধরে ঠেঙিয়েছে। বিপক্ষ দল কারা—এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনাও চললো ক'দিন ধরে। শশীপদ বাড়ি ছিল না—পটোলের চালান নিয়ে গিয়েছিল শহরে। যতীন আলু আনতে গিয়েছিল কালনায়। বাজারের রাস্তায় শশীকে দেখে যতীন বললে, শুনেছ শশী, কাল্‌দার ভাই বাসুকে আর কাকা মাধবকে পথে একলা পেয়ে কারা ঠেঙিয়েছে।

শশী বললে, কারা ঠেঙিয়েছে কেউ বলতে পারলে না?

যতীন বললে, সবাই তো সন্দেহ করছে—এ সব শ্রীধর শশীকান্তর দলের কাজ।

শশীপদ দাঁতে দাঁত রেখে বললে, সন্দেহ! এ নির্ঘাত ওই শালাদের কাজ। তুই আবার বলিস্‌ ওদের সাহায্য করতে?

যতীন বললে, দেশে ছিলাম না তাই, নইলে এক একটাকে ধরতাম আর জরাসন্ধ বধ করতাম। যত সব—অশ্লীল একটা গাল দিয়ে সে খানিকটা তৃপ্তি বোধ করলে।

শশীপদ বললে, চ, দেখে আসি।

চ। যেতে যেতে যতীন বললে, এর কি কোন উপায় নেই?

শশী বললে, উপায় আছে। দু'বার জেল খেটেছি, না হয় আর একবার খাটবো। ও শালাদের জব্দ করা কি এমন শক্ত।

যতীন বললে, কাল্‌দা রাজী হবে না।

শশীপদ বললে, 'ওই তো দুঃখু রে। ও-সব নিরিমিষ হাঙ্গামা বুঝি না। শুধু বন্দে মাতরম্‌ বলে চেঁচালে কোন শালার গায়ে আঁচড় লাগবে না।

দু'জনে বাজার দিয়ে যেতে যেতে শুনলে, হাবুলের দোকানে কালকের কথাই আলোচনা হ'চ্ছে। তাঁতীদের ফকির বলছে, তাহলে হাবুল ভাই, এ আকৃচা-আকৃচির ব্যাপার। আমরাও তাই বলাবলি করছিলাম কাল, দেশের মধ্যে অমন ছেলে খুঁজে মেলা ভার, তার পিছনে লাগবে—এমন লোকও ভু-ভারতে আছে?

হাবুল বললে, পেছনে দল আছে বই কি। না হ'লে সাধ্যি কি রাজ-রাস্তার ওপর ইট মেরে নিদ্দ বীকে পার পেয়ে যায়?

তা কালো কেন কাউকে সোবে কয়ে পুলিশে খবর পাঠালে না?

সবাই বলছিল খবর দিতে, উনি কিছুতে রাজী হ'লো না। ভালো মানুষের ছেলে, হাঙ্গামায় যেতে চাইলে না।

যতীন আর শশীপদ এসে দাঁড়ালো দোকানের সামনে।

শশীপদ বললে, তোমায় দোকান থেকে সবই তো দেখা যায়। 'কোন্ কোন্ লক্ষী ছিল বল তো হাবুল?

হাবুল ওদের উগ্রমূর্ত্তি দেখে ভয় পেলে। যদিও শ্রীধর আর ভুপেন সেনের ওপর ওর রাগ আছে, তবু গোঁয়ার কৈবর্ত্তদের উসকে দিতে ওর সাহস হ'লো না। বললে, তখন ঝুঁজকো বেলা—রাস্তায় আলো তো নেই—নজর হ'লো না। খুব হৈ-চৈ হচ্ছিল, অনেক লোক জুটেছিল, আমারও দোকানে খদ্দেরের ভিড়—

যতীন বললে, বলতে সাহস হ'চ্ছে না বুঝি?

হাবুল বললে, সাহসের কথা নয়, যথা ধর্ম্ম বলবো তার আর ভয়টা কি! তবে ঠিক না চিনেও তো নামটা করা যায় না। অধর্ম্ম যাতে হয় তেমন কাজে হাবুল ময়রা নেই। কি বল ফকির ভাই—ঠিক কি না?

ফকির মাথা নেড়ে বললে, ঠিকই তো।

আসল কথা হাবুল পাকা ব্যবসাদার। সে ভাল ভাবেই জানে, দোকানীকে কোন পক্ষ নিতে নেই। পক্ষ নিলে ব্যবসায়ের ক্ষতি। যদিও গেল বার মাতৃশ্রাদ্ধে শ্রীধর ওর কাছে ষাট টাকা দরে রসগোল্লা ও আশী টাকা দরে সন্দেশ বায়না করে দাম মিটিয়ে দিল—পঞ্চান্ন আর পঁচাত্তরে, এবং তার দরুণ লোকসান না হোক লাভ তেমন করতে পারেনি ও। কাঁদা-কাটা করেও একটি টাকা বেশী আদায় করতে না পেরে প্রতিজ্ঞা করেছিল—আচ্ছা এক মাঘেই কিছু জাড় (শীত) পালায় না। আবার আসুক কাজ, তখন নগদ টাকা না নিয়ে মাল ছাড়ছি না। আর যেমন করে হোক, তোমাকে জব্দ করবই। কিন্তু জেল-খাটা গোঁয়ার কৈবর্ত্তদের কাছে সে ভয়ে কিছু ভাঙতে পারলে না। আর ভুপাল সেন…

শশীরা চলে গেলে ফকির বললো, সোনার ওজন করলে হাবুল, একখানা বাতাসা দাও—দাও।

হাবুলকে সমর্থন করেছে সে। সুতরাং দাবি তার অন্যায্য নয়। বাতাসা ফাউ দিয়ে হাবুল বললে, ওরা গেল কোথায় ফকির?

দেখছি। বলে ফকির নিজের পাড়ার পথ ধরলে।

তর্ক হচ্ছিল ধাইপাড়ার গলির মধ্যে—মিস্ত্রি করাতি ঘরামিদের মধ্যে।

কর্নিক দিয়ে পাটার সুরকি চাঁচতে চাঁচতে পাঁচু বললে, ক' ব্যাটা ময়রা আছে গাঁয়ে—কারো ভালো দেখতে পারে না। মাছি টিপে গুড় বার করে টাকা করেছে কি না, তাই রব্বানি খুব।

রহমৎ আলি করাতের দাঁতে উকো ঘসছিল। মুখ তুলে বললে, পুলিশকে পান খেতে দিয়ে ওদের বাঁধিয়ে দিতে হয়।

ওলন্‌-দড়িতে পাক দিতে দিতে নুর মহম্মদ বললে, দূর আহাম্মক, দারোগা পান খায় কাদের কাছে?

বাঁধানো দরগায় বসেও ওই কথা হচ্ছিল।

লতিফ বললে, যাই বল, এ অন্যায়।

ইব্রাহিম বললে, অন্যায় কিসের? এ গাঁয়ে খ্যাপাচ্ছে না কে কাকে? না ক্ষেপলেই তো কি হতো না?

আলিজান দশ-পঁচিশের কড়ি মালায় পুরে নাড়তে নাড়তে বললে, জাহান্নমে যাক্। একটা দশ পড়লে সব ক'টা ঘুঁটি ঘরে গিয়ে চিৎ হয়। দশ—দশ—

লতিফ বললে, ক্ষেপানোটা খুব ভাল?

ইব্রাহিম বললে, ও-রকম রগড় না হ'লে মানুষ কি নিয়ে থাকবে? ও-সব আল্লার পয়দা মানুষ না থাকলে দুনিয়ায় থাকতাম কি নিয়ে ভাই?

আলিজানের ঘুঁটি ইচ্ছা-মত দান দিলে না। সে বললে, দুত্তোরি রগড়। মেলা ফ্যাচ-ফ্যাচ কর তো উঠে যাও এখান থেকে।

তাঁতীপাড়ার রজনী বললে, যেচে পরোপকার করতে গেলে এমনই হয়। অনেক লোক চরিয়ে বহুৎ আক্কেল হয়েছে ভাই। কথায় আছে না—আক্কেল নেওয়া ভাল তো কাউকে দেওয়া ভাল নয়।

অনন্ত দাস বললে, তোমাকেও বলেছিল না ব্ল্যাক মার্কেট করলে সাজা হয়।

রজনী মৃদু হাস্যের সহিত বললে, হ্যাঁ। বোকা না হলে আর বলে ও কথা। আরে ভাই, যা কালো, তা কখনও আলোয় আসে?

হরিহর বললে, ধরাও তো পড়ছে অনেকে।

রজনী চোখ পিট-পিট করে হাসলে, হ্যাঁ, কিপটেমি করে এ পথে পা বাড়িয়েছ কি শ্রীধর? এ মার্কেটে চুনো-পুঁটি থই পায় না হে—রুই কাতলা হওয়া চাই।

অনন্ত বললে, পাঁকাল হ'লে—দি গ্রাণ্ড!

সাধারণ তাঁতীরা বললে, ওদের ধরে আগাপাশতলা বিতিয়ে ঠাণ্ডা করে দেওয়া উচিত।

ভজহরি প্রবল উৎসাহে মাথা নেড়ে বললে, নিশ্চয়—নিশ্চয়।

ভজহরির কথায় কান্ত ঘোষ মুখ টিপে হাসলে।

হাসিটা ভজহরির নজর এড়ালো না। সে রুখে উঠে বললে, হাসচো যে মেলা—যাইরি?

হাসবো না। ওরা যা বলে তা শুধু তোমায় ক্ষেপান নয়। সব তাঁতীকেই বোঝায়।

বোঝায় সবাইকে? চোখ পাকিয়ে ভজহরি তার পানে চাইলে।

কান্ত ঘোষ এক জন প্রাচীন তাঁতীকে সাক্ষী মানলে, আচ্ছা বল তো কেষ্ট দাদা, এ কথায় কি বোঝায়?—বলে আবৃত্তি করলে:

তাঁতী তাঁত বুনতে মন।
দু'টো কেষ্ট-কথা শোন।

ভজহরি ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, মুখ সামলে কথা বলবি কান্তে! ভেমো গোয়ালা কোথাকার।

কেষ্ট দাদা হুঁকোটা দেওয়ালে ঠেসিয়ে রেখে ভজহরির হাত ধরে বললে, কথাটা খারাপ কিসের হে? কাজের ঠেলায় পড়ে ভগবানকে ডাকবার সময় পাই না তো, তাই—

ভজহরি রাগ করে বললে, তুমি ডাক গে ভগবানকে। তিন কাল গিয়ে গিয়ে এক কালে ঠেকেছে—তুমি ডাক গে।

গ্রামের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত পাক খেয়ে ঘুরতে লাগলো জনরব।

শশীকান্তর বৈঠকখানায় ভুপেন সেন মালা জপতে জপতে বললেন, হরি হে, সবই তোমার ইচ্ছা। পৃথিবীতে নানা রকমের মানুষ সৃষ্টি করে নানা ভাবে লীলা করচো। সবই তোমার ইচ্ছাতে ঘটছে, হাত-পা বাঁধা জীবের সাধ্য কি আঙুলটি নাড়ে!

ফটিক বললে, যাই হোক, থানা-পুলিশ করবে না কেলে মালী। আর পুলিশ এসে করবেই বা কি? প্রমাণ আছে? হ্যালাক্ষ্যাপা লোককে সবাই ও-রকম করে।

শশীকান্ত বললেন, যাই হোক, গাছের ক্ষতি করতে না পেরে ডাল ধরে নাড়ার কোন মানে হয় না। ওদের হাতে উত্তরপাড়ার দল আছে জান তো?

ফটিক বললে, এ ইংরেজের রাজত্ব, ডাকাতি করে কাউকে পার পেয়ে যেতে হয় না। ও-পাড়ার সবাই তো চিহ্নিত হয়ে আছে।

ভুপেন সেন বললেন, থাক, ও-সব কথার কাজ নেই। যে আগুনে হাত দেবে তারই হাত পুড়বে। আমাদের অত-শতয় কাজ কি।

মোহন দাস বললে, গাঁয়ে থাকলে চোখ-কান বুজে থাকা চলে না। মালীর ছেলে হ'য়ে ওর অহঙ্কার হয়নি? বন্দে মাতরমের হুজুগ তুলে ও চায় গ্রাম শাসন করতে!

শশীকান্ত বললেন, গ্রাম শাসন এত সোজা নয় হে দাস।

ফটিক বললে, ওর কি সৎকাজ আছে যে, মানবে ওকে গাঁয়ের লোক? ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা, দাতব্য হাসপাতাল, লাই-ব্রেরি কি দোল-দুর্গোৎসবে কাউকে খাওয়ানো কোন কালে করেছে কেউ ওর বংশে? বলে—পৌটাচুন্নির ছেলে চন্নন-বিলেস—এ-ও হ'য়েছে তাই!—বলে ঠোঁট উল্টে উপেক্ষার হাসি হাসলে।

ভুপাল সেন বললেন, গাঁয়ের লোককে তো জানি, কে দোষী কে নির্দ্দোষী বুঝবে না—হৈ-চৈ করতে পেলেই বর্ত্তে যায়। শ্রীধর কোথায় হে?

ফটিক বললে, জামাই বাবু কলকাতায় গেছেন। এবার কেরাসিনের চালানে কি গোলমাল হ'য়েছে—তাই।

ভুপাল বললে, তাই তো! আজ তিন দিন থেকে বাড়িতে আলো জলচে না। চৈতন্যচরিতামৃতখানা রাত্তিরে পড়ি খানিকটা, তা প্রভুর ইচ্ছা—প্রভুই বোঝেন।

ফটিক বললে, আর তেল দেওয়ার যো নেই। সব ফুড-কমিটির হাতে। আপনি বরং এক কাজ করুন। আপনার ওয়ার্ডের কমিশনারের কাছ থেকে একখানা শ্লিপ লিখিয়ে নিয়ে—

ভুপাল সেন বললেন, খোসামোদ তোষামোদ করে হদ্দ দেবে এক বোতল তেল, তাতে ক'দিন চলবে?

ফটিক বললে, এই এক বোতল তেলের জন্য কত লোক ফুড-কমিটির পায়ে বাটি-বাটি তেল ঢালছে সেনদা—

শশীপদ ও যতীন পুরন্দরের বাড়ি এসে বললে, তুমি শুধু একবার তাদের নাম কর কালুদা, আমরা দেখে নেব সে কত বড় মরদ।

পুরন্দর বললে, তার শাস্তি হ'লে মাধব কাকার কি বাস্তুর যন্ত্রণা কমবে? ও সব কাজ ভাল নয়।

শশীপদ বললে, এই জন্যেই তোমার সঙ্গে আমাদের বনে না। কথায় বলে—মারের চোটে ভুত ভাগে। এ সব বদমায়েস লোকেদের শায়েস্তা করতে এই হ'চ্ছে ওষুধ।

পুরন্দর বললে, লোকের মনে হিংসা জাগিয়ে কোন রোগ সারে না, ভাই।

শশীপদ বললে, তবে তোমার সঙ্গে এই শেষ।—বলে দুম-দুম করে পা ফেলে ওরা চলে গেল।

পুরন্দর কি করবে—এ হুকুম সে প্রাণ থাকতে দিতে পারবে না। চোখের বদলে চোখ—দাঁতের বদলে দাঁত—এই প্রতিশোধ-বাসনা বহু কাল থেকে চলে আসচে। অথচ শাস্তির ভয়ে—তা সে যত কঠোরই হোক—মানুষ শান্ত হ'য়েছে কি? একটা জীবন শেষ হলে মনে হ'য়েছে আগুন নিবে গেল, কিন্তু আর একটা তরুণ জীবনে জ্বলে উঠেছে শিখা। এক জাতি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে পৃথিবী থেকে, অন্য জাতি সেই ধ্বংস-কাহিনী থেকে সংগ্রহ করেছে কিসের ইন্ধন? অরণি কাষ্ঠে যজ্ঞের জন্য রক্ষা করা হোত পবিত্র অগ্নিকে—যে আগুন মানুষের পরম সম্পদ্। হিংসাও কোন্ আদিযুগ থেকে তেমনি পরম দুর্ভোগের মত মানুষের বৃত্তি-অরণি-কাষ্ঠে সংরক্ষিত হ'য়ে আসছে। একে বাড়তে দেওয়া অন্যায়, বাড়তে দেওয়া পাপ। ইন্ধন না পেয়ে পেয়ে নিস্তেজ হ'য়ে আসুক আগুন। রক্তস্নানে—আত্মদানে পরিশুদ্ধ হোক বৃত্তি—শান্তি আসুক পৃথিবীতে। বৃত্তিজয়ের এই সাধনা যতই ছড়িয়ে পড়বে চার দিকে ততই ভারমুক্ত হবে মানুষ—নতুন মূর্ত্তিতে জেগে উঠবেন মা বসুমতী।

মিত্রদের বৈঠকখানার পাশ দিয়ে শশীপদ আর যতীন হন্-হন্ করে চলেছিল। ওদের মন ভার—মুখে কথা নেই।

অপূর্ব্ব ডাকলে, শশী—শশী—যতীন—

ওরা শুনতে পেলে না—এক-মনে চলতে লাগলো।

অপূর্ব্ব ছুটে এসে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে বললে, এত ডাকচি, শুনতে পাও না?

শশী বললে, মন ভাল নেই বাবু!

অপূর্ব্ব বললে, আমারও মন ভাল নেই, তাই তো তোমাদের ডাকচি।

শশী বললে, এ গাঁয়ে কি মানুষ আছে—না বিচার আছে?

অপূর্ব্ব তার হাত ধরে বললে, এসো আমাদের বৈঠকখানায়, কথা আছে।

বৈঠকখানায় ফরাসের ওপর ওদের বসিয়ে অপূর্ব্ব বললে, গরিব মানুষ যারা, তারা বড়লোকদের কাছ থেকে কি বিচার আশা করতে পারে? কিছু না। বড়লোক প্রতিবেশী চায়—গরিবরা তার পায়ের তলায় পড়ে ল্যাজ নাড়ুক। যত টাকা তার ব্যাঙ্কে জমা হোক্—যত জমি তার দখলে আসুক—তুমি না খেতে পেয়ে মরছো—তাদের কি? যদি পেটের দায়ে তাদের বাড়তি জিনিষে হাত দিয়েছ—আইনের নাম করে তোমাকে পুরবে জেলে। যদি না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে তোমার বউ-ছেলে, ডেকেও জিজ্ঞাসা করবে না—কেন এমনটা হ'লো। বলবে—অদৃষ্টের ফল, গেল জন্মের পাপের ফল!

অপূর্ব্বর কথা দু'জনের প্রাণে সান্ত্বনা এনে দিলে। এমনি কথাই তো তারা শুনতে চায়। তাদের কাজে কিছু না করুক, মুখে দু'টো কথা বলুক—এমন লোকই বা কোথায়? উচ্ছ্বাসে ওদের মন নরম হয়ে উঠলো।

যতীন গদগদ কণ্ঠে বললে, বাবু, আমরাও তাই বলছিলাম কালুদাকে। এক জন অন্যায় করবে আর এক জন কেবল স'য়ে যাবে—এ কেমন কথা?

অপূর্ব্ব বললে, রবি বাবুকে তোমরা বোধ হয় জান না। তিনি মস্ত বড় কবি—পৃথিবীর সব জাত তাঁকে মানে। তিনি বলেন:

> অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—
> তার পাপ তারে যেন বজ্রসম দহে।

অন্যায় করা যেমন পাপ—অন্যায় সহ্য করা তার চেয়ে আরও বেশি পাপ।

শশীপদ ও যতীন অভিভূত হয়ে উঠলো—চোখ দিয়ে ওদের জল গড়াতে লাগলো।

অপূর্ব্ব বললে, তোমরা বোস, আমি আসচি।

অপূর্ব্ব ফিরে এসে দেখলে, ওরা তেমনি ঘেঁষা-ঘেঁষি করে বসে আছে। চোখে জলের ধারা তখনও শুকোয়নি—ঘোর লেগে রয়েছে দৃষ্টিতে।

চায়ের কাপ ও প্লেট দু'টো চৌকির ওপর নামিয়ে দিয়ে অপূর্ব্ব বললে, চা খাও।

ওদের ঘোর কাটলো। ত্রস্তে দু'জনে নেমে এলো মেঝের ওপর। হাত জোড় করে বললে, সে কি বাবু, আপনার সঙ্গে বসে চা খাব এত বড় আস্পদ্ধা আমাদের?

অপূর্ব্ব ওদের হাত ধরে টানতে টানতে বললে, নিজেকে ছোট মনে করবে না কোন দিন। তোমরাও মানুষ। তোমরা আমার ভাই। চা না খেলে দুঃখু পাব।

তবু ওদের সঙ্কোচ কাটলো না। ওরা কিছুতেই চৌকির ওপর উঠে বসলে না—যদিও চায়ের পেয়ালাটা টেনে নিলে।

চা' পান শেষ হ'লে শশীপদ বললে, কালুদা বলে—মার খাওয়া ভাল, তবু মানুষকে মারা ভাল নয়।

অপূর্ব্ব বললে, তোমাদের কালুদা যা বলে, তা মানুষের কথা নয়—সাধু-সন্ন্যাসীদের কথা। সংসারে বাস করতে হ'লে নিজের হক্ বুঝে নিতে হবে। দাবি জানাতে হবে ন্যায্য পাওনার। তাতে মার খেতেও হবে—মার ফিরিয়ে দিতেও হবে। নিজেকে রক্ষা না করা পাপ। দেখ এক-একটা জন্তুকে। ওদের সহজাত অস্ত্র রয়েছে আত্মরক্ষা করবার জন্য।

অনেক কথা বললে অপূর্ব্ব। গীতার কথা—পুরাণের কথা—ইতিহাসের কথা—মার্কসের কথাও। ওরা সব বুঝতে পারছে না জেনেও অপূর্ব্ব বলতে লাগলো। বলতে তার ভাল লাগছিল। ও বুঝেছে, এরা খাঁটি ইস্পাতের অস্ত্র। অস্ত্রে শাণ দিয়ে নিলে বৃহৎ আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব।

শশীপদরা সন্তুষ্ট হ'য়ে ঘরে ফিরলে।

যতীন বললে, বাবু ত শহরে থাকে—অনেক লেখাপড়া করে—তাই জ্ঞান-বুদ্ধি খুব। ঠিক কথাই বলেছে।

শশীপদ বললে, এই যে বললে—মুনি-ঋষিদের কথা, তা ওনারাও তো অনেক বড়। সেকালের রাজা-রাজড়া ওনাদের মত না নিয়ে কাজ করতেন না।

যতীন বললে, আমরা তো আর মুনি-ঋষি নই?

শশীপদ বললে, না—তাই বলছি। ওনাদের মতটাও তুচ্ছ করবার নয়। তা ওনাদের মত নিয়ে ওনারা থাকুন—আমাদের মত নিয়ে আমরা থাকি।

যতীন বললে, চল, মাঠ ঘুরে যাওয়া যাক্। কোন্ বাঁশ-ঝাড়ে পাকা বাঁশ আছে—

শশী বললে, লাঠি তো কত গণ্ডা ঘরেই রয়েছে।' আমি শুধু ভাবছি—ও শালাদের জব্দ করা যায় কিসে।

[ক্রমশঃ।

বিশ্ববাসী চাহে তব সুবিচার

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

সেই সূর্য্য আজো ওঠে আলো-ভরা গরিমায়
সেই গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, নর্ম্মদা, কাবেরী, সিন্ধু
আজো তরঙ্গে তরঙ্গে নাচে; আজো সেই ইন্দু
ভরি' দেয় পূর্ণিমায়, স্নিগ্ধতার মহিমায়!

বৃক্ষ-লতা পত্র-পুষ্পে তেমনই সুশ্যামল;
প্রকৃতি-অঙ্গনে আজো সেই ঋতু-উৎসব;
পাখিকুল কলকণ্ঠে সেই আকুলিত রব;
সেই মহাধ্যানমগ্ন গিরিরাজ হিমাচল!

বিপুল অনন্ত প্রাণ খেলে তোমাদের প্রাণে!
শুনি, কভু শুনি না ত প্রাণভরা মহা রব!
অনন্ত প্রাণের খেলা মহাধ্যানে অনুভব;
বুঝিতে পারি না হায়, ধরিতে পারি না ধ্যানে!

নিভৃত অন্তরে মম কথা কও—কথা কও!
জাগ্রত কি মহাকাল? বলো, কোথায় বিচার?
বলো—বলো, দেখিছ না প্রাণঘাতী অত্যাচার?
মহাকালের তোমরা সবাই সাক্ষী কি নও?

নররক্ত-তপ্তাপ্লুত শিহরিত বসুন্ধরা
জাগায়নি কি বিকম্পন তোমাদের দেহে প্রাণে?
শব্দ-স্পর্শ-ক্ষম, বলো, শোনোনি তোমরা কানে
সকরুণ আর্ত্তনাদ আকাশ-বাতাস-ভরা?

হেরনি কি দিকে দিকে মানব দানবরূপে
নিরীহে সংহার করে? দুর্ব্বিষহ পরিতাপ!
ক্ষয় ক্ষতি অপচয়, নাহি তার পরিমাপ!
আলো-ভরা সভ্যতারে টেনে আনে অন্ধকূপে!

যোগনিদ্রা পরিহরি ন্যায়াধীশ বিচারক
জাগো—জাগো, আসেনি কি আজো বিচার-সময়?
দুর্ব্বলে দিবে না বল? ভয়ার্ত্তে শান্ত অভয়?
সত্য ও ন্যায়ের তুমি নও কি গো নিয়ামক?

ধর্ম্মে যে বা রাখে, ধর্ম্ম তাকে কোথা রাখে আজ?
নারীর লাঞ্ছনা চলে পবিত্র কুটীর ঘেরি'
সতীর সতীত্ব নাশ, শিশুর নিধন হেরি'
কেমনে নিষ্ক্রিয় আজো আছ তুমি ধর্ম্মরাজ?

সর্ব্বজ্ঞাতা, আর্ত্তত্রাতা, জনগণ-নারায়ণ,
জাগো—জাগো, বিশ্ববাসী চাহে তব সুবিচার!
যে যার খুঁজিছে শুধু নিজ নিজ সুবিচার,
কথার ফাঁদেতে রচে সুজটিল কারা-মন!

কবি সত্যেন্দ্রনাথ

শ্রীশান্তি পাল

কবিগণ চিরকালই সুন্দরের পূজারী। এই সুন্দরকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা কত গাথা, কত গীতি, কত নাটক এবং কত কাব্য রচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহাদের সৌন্দর্য্য সৃষ্টির বিরাম নাই। কবি তাঁহার কাব্য-সৃষ্টির ভিতর দিয়ে এমন রসের অবতারণা করেন যে, সেই রস মানব-হৃদয় আপ্লুত করিয়া মানবকে সুন্দরের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। রসহীন রচনাকে কাব্য বলিয়া অভিহিত করা যায় না। এই রস সঞ্চয়ের জন্য কবির মন নিরন্তর ছুটাছুটি করিতেছে—কখনও অন্তরের দিকে, কখনও বা অনন্তের দিকে।

কাব্য বলিতে আমরা কি বুঝি? কাব্য বলিতে আমরা এই বুঝি যে, যে রচনায় ছন্দযুক্ত বাক্য ব্যবহার হয় এবং সেই বাক্য রস সৃষ্টি করে অর্থাৎ প্রাণের অনুভূতিকে ঠিক ঠিক যায়গায় পৌঁছাইয়া দেয় অর্থাৎ পাঠকের প্রাণে পৌঁছাইয়া দিতে পারে তাহাই কাব্য। কাব্যের একটি বিশেষ গুণ হইতেছে যে, তাহাতে বিশেষ করিয়া একটি রূপের প্রাধান্য থাকিবে। যে কোন ভাবই হউক না কেন, কবির কাজ সেই ভাবটিকে চোখের সম্মুখে রং-এ-রেখায় মূর্ত্তিমন্ত করিয়া তোলা। কবি যদি ভাবটিকে প্রাণবন্ত করিতে পারেন তাহা হইলে তাহা কাব্য হইয়া উঠে।

মোট কথা, চিত্রকর সুনিপুণ হইলে নানাবিধ বিচিত্র বর্ণেরও প্রয়োজন হয় না। কেবল আলো এবং ছায়ার দ্বারাই অপূর্ব্ব শিল্প বিরচিত হইতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার একটি অনুবাদ-কবিতায় বলিতেছেন :—

"আমরা চাহি গো শুধু লীলায়িত ছায়া-সুষমায়
রঙে প্রয়োজন নাই, কি হবে রঙীন তুলি নিয়ে?
ছায়া-সুষমাই শুধু বিচিত্রের মিলন ঘটায়
বাঁশী আর শিঙা রবে স্বপনে স্বপনে দেয় বিয়ে।"

সত্যেন্দ্রনাথের কথা আওড়াইয়া এবং তাঁহার কবি-চিত্তের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া দেখা যাইতেছে যে, অতিশয় সূক্ষ্ম নিরাকার নিরবয়ব ভাবকেও আকার এবং অবয়ব দেওয়া যাইতে পারে। তবে কবির মনের প্রকৃতি অনুসারে অনেক সময় ভাবগুলি এমন হয় যে, সেগুলি রং-এ রেখায় ফুটাইতে পারা যায় না। তথাপি এমন একটি ভঙ্গিতে বাঁধিয়া দেওয়া হয় যে, নিরাকার ভাবও ঠিক সেই নিরাকার অবস্থাতেই আমাদের প্রাণে রসসঞ্চার করে। অলঙ্কারশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম," অর্থাৎ যে বাক্যে রস আছে সেই বাক্যই হইল কাব্য। কেবল কতকগুলি কথাকে ছন্দে আর মিলে গাঁথিলেই যে কবিতা হয় তাহা নহে। কবিতার মধ্যে কথার মার-প্যাঁচ ও ছন্দের মার-প্যাঁচ দেখাইলে তাহা ছড়া হইতে পারে, কিন্তু কবিতা হইবে না। রচনায় ভাবের উৎস থাকা চাই। ভাব, ভাষা ও ছন্দ এই তিনের সমন্বয়ে কবিতা দানা বাঁধিয়া উঠে। ইহার কোনটিকে বাদ দিলে অথবা উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

কবি সকল কথা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করেন না। অনেক সময় তিনি গান করেন। সত্যেন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলিতেছি :—

"শব্দের ললিত লীলা সমাদর সর্ব্বযুগে তার
উড়িয়া চলিবে শ্লোক মুক্ত-পাখা পাখীর মতন
পাওয়া যাবে সমাচার প্রয়াণ চঞ্চল চেতনার,
আরেক নূতন স্বর্গ, ভালবাসা—আরেক নূতন।"

কবির ভাষার চেয়েও আভাস থাকে বেশী—

"কবিতা সে হবে শুধু সঙ্কেতে সঙ্গীতে উদ্বোধন—
আভাসের ভাষাখানি প্রভাতের মঞ্জিল বাতাস।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভাব, ভাষা ও ছন্দ এই তিনের সমন্বয়ে কবিতা দানা বাঁধিয়া উঠে। ছন্দ বলিতে আমরা কি বুঝি? আর ছন্দের রূপ বলিতেই বা আমরা কি বুঝি? ছন্দ বলিতে আমরা এই বুঝি যে, একটি বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষ। কোন জিনিষ দেখিলেই আমাদের অন্তরে যে দোলা দেয় সেই দোলা হইতেই ছন্দের উৎপত্তি হয়। এই দোলা ছন্দে রূপ পরিগ্রহ করিয়া এবং কবির হাতে পড়িয়া কাব্যরূপ ধারণ করে। ছন্দ অমনি একটি আকার ধারণ করিয়া তাল-লয় ও মাত্রায় বিভক্ত হইয়া চলিতে থাকে। এই মাত্রাবিশিষ্ট রচনাকেই আমরা কবিতা বলি এবং বিশেষ বিশেষ মাত্রাকে বিশেষ বিশেষ ছন্দ বলিয়া থাকি। ছন্দোবিদ্ পণ্ডিতেরা বলিতেছেন :—সঙ্গীতে ও নৃত্যে যাহা তাল কবিতায় তাহা ছন্দ। তাল যেমন সঙ্গীতের ও নৃত্যের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক, ছন্দও তেমনি কবিতার উৎকর্ষক। সঙ্গীতে যেমন মাত্রাই তাল-নির্দ্দেশক, কবিতাতে তেমনিই মাত্রা ছন্দ-নির্দ্দেশক। মাত্রাভেদে তাল যেমন নানাবিধ, মাত্রাভেদে কবিতায় ছন্দও নানাবিধ।

কবির কাজ শিক্ষকের কাজ। কবি উচ্চৈঃস্বরে ঢাক-ঢোল পিটাইয়া উপদেশ দেন না। তাঁহারা সুন্দর সুন্দর কথা বাছিয়া তাহা ছন্দে গাঁথিয়া এমন রং চড়াইয়া বলেন যে, সেই কথাগুলি সকল মানবের অন্তরে অনন্তকালের জন্য গাঁথিয়া যায়। প্রাচীন কাব্য-সমালোচকেরা বলিতেছেন :—"কবি সৃষ্টি বিধাতৃ সৃষ্টির অতিবর্ত্তিনী। কবি সমাজের যে পরিমাণ উপকার করেন, শত বৎসর যাবৎ শত-সহস্র বাগ্মী তারস্বরে বক্তৃতা করিয়া তাহার কিয়দংশও সাধিত করিতে পারেন না। কবিগণ চরিত্র সৃষ্টি করেন, লোকে সেই আদর্শ চরিত্রের অনুকরণে নিজ নিজ সমাজ গঠন করিয়া লয়। কবিগণ সাহিত্য সৃষ্টি করেন, লোকে সেই সাহিত্য পাঠ করিয়া আপন আপন সত্তাকে গঠন করেন। পরোক্ষ ভাবে কবিগণই সমাজের গঠনকর্ত্তা—মানুষের পরম হিতৈষী"।

বর্ত্তমান যুগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথা ছাড়িয়া দিয়া রবীন্দ্রোত্তর যে সকল কবি ছন্দ লইয়া কারবার করিয়াছেন, তন্মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার কয়েকটি অপ্রকাশিত ছড়ার ছন্দে লিখিত কবিতা এস্থলে পাঠকদের উপহার দিলাম। ছন্দ কবির হাতে পড়িয়া কি সুন্দর রূপ, রং, ও শক্তিতে বিকশিত হইয়াছে তাহা এই কয়েক ছত্র পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

(১)

"সকালে কার মুখ দেখেছি—আহা কি ভাগ্যি,
আমি বলি কপাল-দোষে হলে বা মাগ্যি !
তুমি সিঁদুর-চুপড়ি সেজে আসছ রঙন ফুল,
আমি বলি জুঁই বুঝি বা মেখেছে হিঙ্গুল !"

(২)

"সিংহলে যাস্, বিজয় সিংহ বঙ্গ যুবরাজ
মায়ের দেওয়া অশোক ফুলটি নিয়ে বুকের মাঝ,
সে ফুল থেকে সহস্রদল রাজসই অশোক
উঠল ফুটে সিংহলেতে জুড়িয়ে গেল চোখ।"

(৩)

"জর্দ্দন গোলাপ ! মর্দ্দানি রাখ পাঁচিল থেকে নাব !
শুন্‌বিনেক' কথা ?—বলি, কেমন এ স্বভাব ?
জর্দ্দন বলে, উঠলুমই বা—ছুঁড়ছিনে তো ঢিল,
ভয়টা কিসের ?—জানো, আমার নাম মার্শ্যাল নীল।"

সত্যেন্দ্রনাথের শব্দবিন্যাস ও ছন্দবৈচিত্র্য সম্পর্কে কবি মোহিতলাল বলিতেছেন :—"শব্দের মার্জিত মুকুরে বস্তুর বস্তুরূপ, এবং ভাবের অর্থ-শ্রী উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইহাও প্রতিভা-সাপেক্ষ, ইহাও কবিকর্ম্ম। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগুলি ধীর ভাবে পাঠ করিলে স্বীকার করিতেই হয় যে, তাহাতে যে সাধনা ও শক্তির পরিচয় রহিয়াছে, তাহা সামান্য নয় ; সেই বাগার্থের নিপুণ যোজনা, ভাষার বৈভব, ও ছন্দের বৈচিত্র্য বাঙলা সাহিত্যের যে অভাব পূরণ করিয়াছে, তাহা আর কাহারও দ্বারা সম্ভব হইত না।

"শুভ্র তোমার অঙ্গবিভা অগাধ শূন্যে মূর্চ্ছা পায়
রঙীন সে হয় তবেই যবে অশ্রু আমার কূল ছাপায়।"

এই অশ্রুই বাঙালা কবিতায় শব্দের মুক্তামালা হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কবিতার আর এক দিক্—ধরণীর রূপ-রং রেখার দিক—পঞ্চেন্দ্রিয় সাক্ষী প্রকৃতির বহুবর্ণের ঘাঘরী, এবং তাহার নৃত্যচপল চরণযুগের মঞ্জীর ধ্বনি। সত্যেন্দ্রনাথ এই রূপের সন্ধান সর্ব্বত্র করিয়াছেন—যেমন শিল্পে, তেমন নিসর্গে ; এবং শব্দের "মণিরতনের সঙ্গে মনোযতন' মিলাইয়া ভাষার যে কলাকৌশলে তাহাকে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাও বাঙলা কাব্যের একটি সম্পদ্ হইয়া আছে। রং ও রূপের সন্ধানে যেমন তাহার চোখের ক্লান্তি নাই, তেমনই কানেরও কি পিপাসা।

বাংলা দেশের দুই জন মহামনীষী সত্যেন্দ্রনাথকে কি চক্ষে দেখিতেন তাহা তাহাদের ভাষাতেই প্রকাশ করিতেছি :—

এক জন বলিতেছেন :—

"বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্ব্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি দিবে না সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে ? আজিকার কাজরী গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায় ;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে বাণী
বিদ্যুৎ নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি'
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি পরে ?
আশ্বিনে উৎসব-সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে,
প্রতি বর্ষে দিত সে যে শুক্ল রাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে
ভালে তব বরণের টীকা ; কবি, আজ হতে সে কি
বারে বারে আসি' তব শূন্য কক্ষে, তোমারে না দেখি'
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশির-সিঞ্চিত পুষ্পগুলি
নীরব-সঙ্গীত তব দ্বারে ?
জানি তুমি প্রাণ খুলি'
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালবেসেছিলে। তাই তারে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সঙ্গীতের হারে।"
—রবীন্দ্রনাথ।

সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে কবির চিত্র উন্মোচন উপলক্ষে আর এক জন বলিতেছেন :—"বাংলার গীতি-কবিতার ধারা-বাহিক ইতিহাস অনুসরণ করিয়া নিশ্চয় বলিতেছি যে, সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা তাহাতে স্থান পাইবে—এবং উচ্চস্থান পাইবে। যে মহাপ্রাণ কবি তাঁহার অকাল মৃত্যুর দ্বারা আমাদিগকে এমন ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া গেলেন, তাঁহাকে আমরা এত সহজে ভুলিতে পারি না। কাজি নজরুল ইসলামের অভ্যুদয়েও আমরা সত্যেন্দ্রনাথকে ভুলিতে পারি না। কেন না, স্বতন্ত্র গৌরবে বাঙলা সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে এবং থাকিবে। আমি সমস্ত দিক্ হইতে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য সমালোচনা এইক্ষণে করিয়া উঠিতে না পারিলেও তাঁহার কোন কোন কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার কবিত্বের দুই একটা বিশেষ দিক্ এবং তাঁহার মহাপ্রাণতার কথঞ্চিৎ পরিচয় আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব। আপনারা শুনিয়া থাকিবেন, আমি বাঙালী সভ্যতার কথঞ্চিৎ পক্ষপাতী বলিয়া এমন কি সাহিত্যেও আমার একটা দুর্নাম আছে। আমি আগেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, চিরকাল বলিব—যে বাঙ্গালার জল, বাঙ্গালার মাটির মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য যুগে যুগে আপনাকে নব-নব রূপে নব-নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে। শত-সহস্র পরিবর্ত্তন, আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিতেছে। সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যেও আমি দেখিয়াছি যে, সেই সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথ গাহিয়া গিয়াছেন—

'বিফল নহে এ বাঙ্গালী-জনম, বিফল নহে এ প্রাণ'। আমাদের বাঙ্গালী-জনম বিফল নয়। আমরা বাঙ্গালা মায়ের যে বন্দনা-গীতি এই বাঙ্গালার কবি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। সমুদ্র যেমন শত শত তরঙ্গভঙ্গীতে আমার এই বঙ্গজননীর চরণ প্রান্তে অশ্রান্ত অনন্ত কলরবে নিরন্তর বন্দনা-গীতি গাহিতেছে, সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-সমুদ্র হইতেও

এই বন্দনা-গীতিধ্বনি আমার কর্ণে বাজিতেছে। আমি কিছুমাত্র দ্বিধা করিতেছি না যে, এই বন্দনা-গীতি—কানের ভিতর দিয়া আমার মরমে পশিতেছে। জীবনে আমার এমন প্রহর আছে, যখন এই বন্দনা-গীতি আমাকে প্রায় পাগল করিয়াছে। আপনারা কি তাহা শুনিবেন?

"মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে"।

* * * *

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।
আমাদের সেনা যুদ্ধ ক'রেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দশানন জয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়,
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়।
এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।
জ্ঞানের নিধান আদি বিদ্বান্ কপিল সাঙ্খ্যকার,
এই বাঙ্গলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার।
বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙ্গালী দীপঙ্কর।
বাঙ্গলার রবি জয়দেব কবি কান্ত-কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন কোকনদে।"

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা—দুরবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার পরিণত মনের ভাব তাঁহারই অনুপম ছন্দে বঙ্গ-সাহিত্যকে উপঢৌকন দিয়া গিয়াছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঐ সমস্ত কবিতার কোন বিশেষ সম্মান, তাঁহার সত্যেন্দ্র-প্রতিভার বন্দনা-গীতিতে করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বর্ষা ও শরতের আবির্ভাবে সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা যেরূপ বিকাশিত হইয়াছে, তাহারই অভিবাদনের জন্য তিনি তাঁহার উদার হস্ত সম্প্রসারণ করিয়াছেন। কিন্তু যে বিরাট মনুষ্যত্ব—বজ্রের নির্ঘোষে কোন দেবতার প্রতি বিদ্যুৎ ভরা কটাক্ষ বর্ষণ করিয়া গিয়াছে—দুঃখের বিষয় তাহার বন্দনা-গীতি (?) করেন নাই।

"বিদেশীর দরজায় পেয়ে উঞ্ছ উচ্ছিষ্টের কণা—
থেমে গেল অকস্মাৎ তুণ্ড-পুটে সিংহের গর্জ্জন!
স্বদেশ একদা যারে দিয়েছিল ফুলের মুকুট,
একি হায় সেই তুমি? মর্য্যাদায় রাজার অধিক—
দিল যেই? এ কি ভিক্ষাবৃত্তি আজ? একি ঝুটমুট
ঝুটা সম্মানের লাগি, সম্মানীয় লাঞ্ছনা, হা ধিক!
জীয়ন্তে জালিয়াবাগে পুতে ফেলে ভারতমাতায়,
শ্রাদ্ধে দেবে স্বর্ণ-ধেনু; অগ্রাহ্য সে অমানুষ দান;
ভাটেরা আসুক ছুটে, দলে দলে ক্ষতি নাই তায়,
তুমি যে ভিড়েছ সঙ্গে, এই দাগা, এই অপমান।
না লুকাতে রক্তচিহ্ন না শুকাতে নয়নের পাণি,
প্রবীণ স্বদেশভক্ত! যেচে গিয়ে হলে অগ্রদানী।"

ইহার পর শুধু প্রহ্লাদ-জননী—রাক্ষস-রাজরাণীর মুখ দিয়া কবি সত্যেন্দ্রনাথ যে কথা বলাইয়াছেন, তাহাই উল্লেখ করিয়া আপনাদের নিকট বিদায় লইব।

"আত্মা চাহে শিশুর রূপে প্রাপ্য যাহা তার,
বিদ্রোহ নয়, বিপ্লবও নয়, ন্যায্য অধিকার।
উচিত বলে দণ্ড নিবার দিন এসেছে আজ,
উচিত করে পরতে হবে চোর-ডাকাতের সাজ।
চিত্ত বলের লড়াই সুরু পশুবলের সাথ,
বন্যাবেগের হানার মুখে কিশোর তনুর বাঁধ!
প্রলয় জলে বটের পাতা! চিত্ত চমৎকার!
তীর্থ হ'ল বন্দিশালা, শিকল অলঙ্কার।"

—চিত্তরঞ্জন।

আগ্নেয়-নবীন

দিলীপ দাশগুপ্ত

এস পুষ্প, এস—এস মধুক্ষরা দিন।
হেথায় বিলীন
হয়েছে তোমার লীলা: শূন্য যে ভাণ্ডার!
ধরিত্রীর অন্তরের তার—
স্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছে দুর্ভাগ্যের পানে।
তবু যেন নভোচারি অলক্ষ্য সে-গানে
ডাকিয়া উঠিতে চাই তুচ্ছ করে মর্ত্ত্যের বিলাপ;
যতো অভিশাপ
শির পেতে বারে বারে নিল মহাপ্রাণ—
হারায়েছে বারে বারে সম্মান মহান—
তত বার কেন মোরা চাই ঊর্দ্ধে হায়?
সে কি কোনো মহতের মহা তপস্যায়।

এস কবি, শিল্পী এস, এস কর্ম্মী জ্ঞানী—
হেথাকার বাণী
যাঁহার চরণ-প্রান্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে রয়েছে লুকায়ে
তারে হেরি মাতৃস্তন্য যদি বা শুকায়ে
নেমে আসে আর্ত্ত-মুখে তৃষ্ণা নিবারিতে—
তারে প্রাণ দিতে
এস আজ, এস সবে হাতে তুলি লব উপহার।
আঁখিতে যাঁহার
ঝরিবে না কোনো ফুল, মরিবে না কোনো সে আত্মীয়—
এমন দুর্দিনে হেরি—তবু শত্রু হবে প্রেম-প্রিয়:
ঘনঘোর কেটে যাবে—তাই এস মধুক্ষরা দিন!
পুরানো মাটির বুকে এস এস আগ্নেয়-নবীন!

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এবং খাস চট্টগ্রাম জিলা উভয়ের প্রকাণ্ড প্রভেদ। যাঁহারা এই দুইটি স্থান দেখিয়াছেন তাঁহারা যতখানি উপলব্ধি করিবেন অন্যের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে; খাস চট্টগ্রাম সম্পূর্ণরূপে মুসলমান-প্রধান স্থান। অন্য দিকে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে মুসলমান নাই বলিলেই হয়। তথায় শতকরা ৩ জন মুসলমান আছে কি না তাহাতেও সন্দেহ জাগিতে পারে। এই অমুসলমান অঞ্চলকে পাকিস্থানভুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে কি না সে বিচার আমরা করিব না। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম আখ্যায় অভিহিত বঙ্গভূমির এই অজ্ঞাত অঙ্গ বা অংশটির একটি চিত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে প্রসারিত করিতে প্রয়াস করিব। বঙ্গের জিলাগুলির মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তুষারশুভ্র অভ্রভেদী উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার দেশ দার্জ্জিলিঙে লক্ষ লক্ষ লোক গমন করিয়া থাকে কিন্তু পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের নিভৃত বক্ষে অতি অল্পসংখ্যক পর্য্যটককে আমরা যাইতে দেখি। যাওয়াও সহজ নহে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করা বাহিরের লোকদের পক্ষে বিশেষ কঠিন কাজ।

বঙ্গভূমির আলেখ্য আমরা আমাদের কল্পনা-চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত করিতে প্রয়াস করিলে এই আদিবাসী-অধ্যুষিত পর্ব্বতাকীর্ণ দুর্গম অঞ্চলটির কথা আমরা প্রায়ই বিস্মৃত হই। অথচ কান্তারকুন্তলা শৈলমালায় সমাবৃত পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকে নিরুপম নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের লীলাস্থলী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ছোটনাগপুরের আদিবাসী-অধ্যুষিত জিলাগুলি যাঁহারা দেখিয়াছেন, পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সৌন্দর্য্য তাঁহাদের নিকটেও অভিনব বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের মত নদীমাতৃক প্রদেশ ছোটনাগপুর নহে। শৈলমালার সহিত পূর্ব্ববঙ্গসুলভ জলধারা সম্মিলিত হইয়া পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অপরূপ রূপকে ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য ও আরণ্য প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছে বলিলে সত্যই বলা হয়।

যখন খাস চট্টগ্রামের অধিবাসীরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, তখন এই দুর্গম পর্ব্বতাকীর্ণ অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়রা আপনাদের প্রাচীন মতবাদে অবিচলিত রহিল, ইহা অনেকের নিকট বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। পর্য্যটকের ন্যায় প্রচারকের পক্ষেও প্রবেশ করা সহজ নহে বলিয়াই কি এইরূপ হইল, না অসভ্য, অনার্য্য পার্ব্বত্য ও আরণ্য জাতিরা ধর্ম্মান্তর গ্রহণে অসম্মতি জানাইল? যোগকের কয়েকটি মণি-খনির মালিক এক বর্ম্মীজ বন্ধুর সহিত আমরা কক্সবাজার হইতে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তর ভাগে ভ্রমণার্থ গিয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গে ছিল এই অঞ্চলের অধিবাসী এক কুকী কুলীর সর্দ্দার। বর্ম্মীজ বন্ধুর অধীনে যোগকের মণি-খনিতে এই কুকী-সর্দ্দার (নাম কিংক্ল) কাজ করিত।

কিংক্ল না থাকিলে আমাদের পক্ষে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া ভ্রমণ করা কখনও সম্ভব হইত না। আমরা সমুদ্রপথে আসিয়া এই অংশে প্রবেশ করিয়াছিলাম। উপকূলের পর সলিল-সিক্ত পথহারা প্রান্তর আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। এই প্রান্তর পার হইবার পর আমরা অরণ্যাকীর্ণ পাহাড়শ্রেণী দেখিতে [illegible]। [illegible] এই অঞ্চলকে [illegible] অংশে বিভক্ত করা যায়, উপত্যকাংশ ও শৈলাংশ। নিম্নবর্ত্তী উপত্যকাগুলিতে অতীতে বর্ম্মা হইতে আগত মগেরা বাস করে এবং শৈলাংশে বা পাহাড়গুলির আশে-পাশে কুকী, ম্রো প্রভৃতি পাহাড়িয়া বা অরণ্যচারী সম্প্রদায়ের বাস। দিগন্ত-বিস্তৃত জলসিক্ত প্রান্তরগুলি পার হওয়াও সহজ নহে বলিয়া উপকূল হইতে যাঁহারা আসেন তাঁহাদের পক্ষেও এই অঞ্চলে প্রবেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আমরা প্রান্তরটি অতিক্রম করিয়া পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তর ভাগে উপস্থিত হইলেও আগাইবার মত পথ দেখিতে না পাইয়া কিংক্লকে প্রশ্ন করিলে সে যাহা বলিল তাহার অর্থ, আমরা যেরূপ পথের সহিত পরিচিত এই পাহাড় ও জঙ্গল বা পাহাড়ী ও জঙ্গলী জাতিদের দেশে তাহা দেখিতে পাইবার আশা করিতে পারি না। পথচিহ্ন বা পথরেখাই এই প্রদেশের পথ। এই অঞ্চলের লোকই এই পথচিহ্ন অবলম্বন করিয়া আগাইয়া যাইতে সাহস করিবে। বাহিরের লোক পদে পদে পথহারা হইয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে।

কিংক্ল প্রান্তর হইতে অভ্যন্তরের দিকে প্রবাহিত একটি জলধারা দেখাইয়া জানাইল, উহাই তাহাদের দেশের প্রধান প্রবেশ-পথ। ঐ প্রবাহিণীর তীরে তীরে আগাইয়া যাওয়াই আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। জলধারাগুলি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া অসংখ্য জলপথ সৃষ্টি করিয়াছে। এই জলপথগুলিও বাহিরের লোকের পক্ষে ব্যবহার আদৌ সহজ নহে। কোন্ দিকে যাইতে হইবে, কোন্ জলপথ অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা বুঝা কঠিন। এই জলপথগুলিই এই দেশের রাজপথ। এক অংশ হইতে আর এক অংশে ইহাদের সাহায্যে যাওয়া যায়। তবে বিদেশীয়দিগের পক্ষে সর্ব্বদাই দেশীয় পথপ্রদর্শক দরকার।

বাহির হইতে আসিলে অরণ্যশীর্ষ শৈলমালা ও দিগন্ত-বিস্তৃত সলিল-ধারা, উভয়ের এই সম্মেলন অত্যন্ত বিচিত্র দর্শন বলিয়া বোধ হওয়া স্বাভাবিক। জলপথের সাহায্যে পাহাড়ের দেশ পরিভ্রমণ করাকে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা বলা চলে। কিংক্ল না থাকিলে আমাদের পক্ষে আধ মাইল আগাইয়া যাওয়াও সম্ভব হইত না। এক এক জায়গায় জলধারা তীর ছাপাইয়া সকল পথ-চিহ্নই ডুবাইয়া দেওয়ার জন্য গ্রামে প্রবেশ করাই দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হয়। অবশ্য কিংক্লর পক্ষে দুঃসাধ্য নহে। মধ্যে মধ্যে জলের ভিতর দিয়া আমাদিগকেও আগাইয়া যাইতে হইয়াছিল। কিংক্ল আমাদিগকে স্কন্ধে লইয়া পার করিবার প্রস্তাব করিলেও আমরা উহাতে সম্মত হই নাই। অনেক সময় অভিনব অভিজ্ঞতা আনন্দই দান করে সন্দেহ নাই।

সত্যই এইরূপ দুর্গম শৈলসমাবৃত, জঙ্গলাকীর্ণ অথচ জলপূর্ণ অঞ্চলে ইসলামীয় বা খৃষ্টীয় প্রচারকগণের পক্ষে প্রচারকার্য্য পরিচালন অত্যন্ত কষ্টকর কাজ। প্রধানতঃ দুর্গম নিসর্গের জন্যই বোধ হয় এই অঞ্চলের অধিবাসীরা শত শত বৎসর ব্যাপিয়া একই অবস্থায় স্থাণুবৎ অবস্থান করিতেছে। ধর্ম্মমতের, আচার-ব্যবহারের কোন পরিবর্ত্তনই হাজার হাজার বৎসরেও হয় নাই। ভারতবর্ষে, বঙ্গদেশে কত প্রবল পরিবর্ত্তন-প্রবাহ বহিয়া গেল কিন্তু ইহারা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেমন ছিল আজিও ঠিক তেমনই রহিয়াছে। কিংক্লর মত এক এক জন মাঝে মাঝে বাহিরে গিয়া বাহিরের পরিবর্ত্তনের সংবাদ ইহাদিগকে জানায় বটে, কিন্তু ইহারা উহা শুনিয়া শুধু হাসে বা বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়ে। যেন তাহারাই ঠিক কাজ করিতেছে, যাহারা পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে তাহারা নির্ব্বোধ। পিতৃপুরুষেরা যাহা করিয়াছে তাহা করাকেই তাহারা অবশ্য করণীয়

কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। কিংক্রর মুখে শুনা গেল, কয়েক বার ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করাইবার জন্ত চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু কুকীরা কিছুতেই সম্মত হয় নাই। তাহারা প্রহারের ভয় দেখাইলে প্রচারের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া প্রচারকগণ পলায়ন করিয়াছিল।

এই অঞ্চলের পার্ব্বত্য ও আরণ্য সম্প্রদায়রা 'ঝুমিং' প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করে। আগা, গারো, কাচিন প্রভৃতি পূর্ব্ব-ভারতের অন্যান্ত অঞ্চলের আদিবাসীরাও এই প্রণালীই অবলম্বন করে। এই প্রণালী অনুসারে বসন্ত-কালে পাহাড়ের পার্শ্বস্থ জঙ্গলের একটি অংশকে জঙ্গল কাটিয়া পরিচ্ছন্ন করা হয়। জঙ্গলের গাছগুলিকে অগ্নি সংযোগে পুড়াইয়া যে ছাই জন্মে তাহা সারের কাজ করে। ঐ জঙ্গলশূন্ত পরিচ্ছন্ন স্থানে ধান্তের বীজ ছিটাইয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক বৎসর এক একটি স্থান ঝুমিং প্রণালীতে চাষ করিবার জন্ত নির্ব্বাচিত হয়। কোন্ গ্রাম কোন্ কৃষিকার্য্য করিবে তাহাও নির্দ্ধারিত হয়। এই সভ্যতালোকশূন্ত আর্য্যেতর আদিবাসী সম্প্রদায়দের মধ্যে এক প্রকার সাম্যবাদ অর্থাৎ সোশিয়ালিজম্ বা কমিউনিজম হাজার হাজার বৎসর ব্যাপিয়া প্রচলিত আছে। এক একটা গিরি-গাত্র এক একটা গ্রামের অধিবাসীরা কৃষিকার্য্য করিবার জন্ত প্রাপ্ত হইবে। প্রত্যেক কাজ গ্রামের সকলে মিলিয়া করিয়া থাকে। এক একটি গ্রাম যেন এক একটা পরিবার। যাহা আজ রুশরা প্রচার করিতেছে সেই সাম্যমন্ত্র ক্ষুদ্রাকারে ইহাদের মধ্যে কোন্ স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, কে জানে?

কচুরিপানার ন্যায় এক প্রকার জলজ পুষ্প-লতা এই জল-ধারাগুলিকে জড়াইয়া ধরিয়া অশেষ অনিষ্ট অনুষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করিতেছে। 'ওয়াটার হায়েসিন্থ' বা কচুরিপানা এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অনিষ্টকারী এই 'আগেরাটাম' শ্রেণীর পুষ্পজ উদ্ভিদ উভয়ই ইউরোপের আমদানি। কবে কে বা কাহারা নিজের উদ্যান বা গৃহের শোভা-বর্দ্ধনের জন্ত ইউরোপের হায়েসিন্থ ও আগেরাটাম এই দেশে আমদানি করিয়াছিল, তাহারা জানিত না তাহাদের আনীত এই মনোরম পুষ্পপ্রসূ জলজ উদ্ভিদদ্বয়ের দ্বারা এই দেশের অপূরণীয় অনিষ্ট অনুষ্ঠিত হইবে। প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া আগেরাটামের বীজ কেমন করিয়া পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম বক্ষে ছড়াইয়া গিয়াছিল তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। কিংক্র জানাইল, ইহারা কুকী কৃষকদের সর্ব্বনাশ করিতেছে বলা চলে। ইহারা তাহাদের ঝুমগুলিকে, অন্যান্ত বৃক্ষলতাসমূহকে প্রাণান্তকর আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহকে পূর্ব্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে। মানুষ-শত্রুকে নাশ করা অপেক্ষা এই উদ্ভিদ-শত্রুকে নষ্ট করা লক্ষ গুণ দুঃখদায়ক। বিনষ্ট করিলেও কিছু কাল পরে কেমন করিয়া আবার সৃষ্ট হয় তাহা কিংক্র জানে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উপত্যকায় মগরা বাস করে। ইহারা দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ হইতে আসিয়া এই অঞ্চলে বাস করিতেছে, এইরূপ অনেকের অভিমত। পার্শ্বেই ব্রহ্মের আরাকান অঞ্চল। সুতরাং দুই শত বৎসরের পূর্ব্ব হইতে এখানে মগের বাস অসম্ভব নয়। ইহাদের আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ খাস ব্রহ্মের নর-নারীর মতই। অবশ্য সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণে কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না তাহা নহে। আমরা পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই উপত্যকাংশে অবস্থিত একটি মগ-গ্রামে উপনীত হইলাম। এই গ্রামের একটি লোক বর্ম্মীজ বন্ধুটির 'রুবি মাইনে' পূর্ব্বে কাজ করিত। তাহারই বাড়ীতে কিংক্র আমাদিগকে লইয়া গেল। গ্রামের পথে নানা বর্ণে বিচিত্র লুঙ্গি-পরা এবং মাথায় রঙ্গীন ও রেশমী বস্ত্রখণ্ড বাঁধা লোকগুলি ব্রহ্মের স্মৃতিই আমাদের অন্তরে উদ্রিক্ত করিল। তরুণ এবং তরুণী উভয়ের মুখেই লম্বা চুরুট। তরুণ-তরুণীর হাস্য-পরিহাসে গ্রামের পথগুলি সর্ব্বদা মুখরিত। তরুণরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাস্য-কৌতুক করিয়া কাটাইবে। আগামী কল্যের চিন্তা একবারও তাহাদের মনে উদিত হইবে না। শুধু তরুণ কেন, প্রবীণেরাও ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া ম্লান মুখে বসিয়া থাকা পছন্দ করে না। খাস ব্রহ্মের মত এখানকার স্ত্রীলোকরাই অধিক কর্ম্মকুশলা ও চিন্তাশীলা।

মগ-সম্প্রদায়ের কৃষক-কন্যা বা কৃষক-পত্নী সেরূপ জমকালো পরিচ্ছদ পরিধান করে না। তাহারা অত্যন্ত পরিশ্রমপরায়ণা বলিয়া বেশ-ভূষার দিকে মনোযোগ দিবার অবকাশই কম। মগ-রমণীদের মধ্যে যাহারা মগ-সর্দ্দারের দরবারে যাতায়াত করে তাহাদের পরিচ্ছদের জাঁক-জমক বিস্ময়জনক। বর্ম্মীজ তরুণীরা স্বভাবতঃই বর্ণবৈচিত্র্য ও আড়ম্বর ভালবাসে। সর্দ্দারের দরবারে যাহারা যাতায়াত করে তাহারা ব্রহ্মসুলভ সেই ধনৈশ্বর্য্য ও অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। সর্দ্দারের দরবারে যে সকল অনুষ্ঠান বা আচার-ব্যবহার অনুষ্ঠিত বা অবলম্বিত হইতে দেখা যায়, তাহা খাস ব্রহ্মের স্মৃতিই জাগরূক করে। যাঁহারা ব্রহ্মদেশে যান নাই তাঁহারা বাঙ্গলার অন্তর্গত এই মগের মুলুকে গমন করিলে তাহার আভাষ অনেকটা প্রাপ্ত হইবেন। আমরা যে গ্রামে গিয়াছিলাম তথা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরবর্ত্তী বৃহত্তর গ্রামখানিতে বহমং আখ্যায় অভিহিত মগ-সর্দ্দার বাস করেন। বহমং উপাধিটি এই সর্দ্দার-বংশ পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বহমং শব্দের অর্থ 'সেনাপতি-গণের প্রভু।'

মণি-খনির মালিক আমাদের বর্ম্মীজ বন্ধুটির আগমনবার্ত্তা শুনিয়া বহমং আমাদিগকে তাঁহার দরবারে সাদরে আহ্বান করেন। মনোজ্ঞ বেশে সারি সারি দণ্ডায়মান বিচিত্র ছত্রধারী নর-নারী আমাদের চক্ষে অভিনব বলিয়া বোধ হওয়া স্বাভাবিক। ছত্রধারিণী তরুণীরা দরবারের সৌন্দর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি করিয়াছিল। সর্দ্দার আমাদিগকে আহারের আমন্ত্রণ জানাইলে আর সকলেই উহা আগ্রহে গ্রহণ করিলেন, সম্পূর্ণ নিরামিষাষী বলিয়া আমাকে বিনীত ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সহিত অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে হইল। খাস বর্ম্মীজদের ন্যায় মগরাও প্রায় সর্ব্বপ্রকার মৎস্য-মাংস ভক্ষণ করে বলিয়া সম্পূর্ণ নিরামিষ ভোজনের কথা শুনিয়া তাহারা বিস্মিত হয়। হয়তো মনে করে, দুনিয়ায় এমন নির্ব্বোধও আছে যাহারা এই সকল পরম উপভোগ্য ভোজ্য হইতে আপনা-দিগকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত করে। শুধু নানা প্রকার মৎস্য-মাংস নয় মগদের জাতীয় পানীয় চাউল হইতে প্রস্তুত এক প্রকার সুতীব্র সুরাও দরবারের ভোজে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে দেখিলাম। বিস্ময়ের বিষয়, তরুণীরাও এই তীব্র সুরা পুনপুনঃ পান করিয়া এরূপ অবিকৃত ও অবিচলিত ভাবে হাস্য-কৌতুক করিতে লাগিল যে মনে হইল মদ্য নহে, তাহারা দুগ্ধ পান করিতেছে। দুই-এক জন

বয়স্ক ব্যক্তি কিঞ্চিৎ মত্ততার পরিচয় দিতে লাগিল। যতই মত্ত হউক বহমংএর সম্মুখে কোন মাতলামি কেহই করিবে না। এই সকল আমন্ত্রিতের মধ্যে প্রায় সকলেই সম্ভ্রান্ত মগ।

বহমং যেখানে যান এক জন পরিচারক তাঁহার মাথায় সর্ব্বদা ছাতা ধরিয়া থাকে। কেহ তাঁহার সহিত কোন বিষয়ে কথা কহিতে ইচ্ছা করিলে সে তাঁহার যতই পরমাত্মীয় হউক, জানু পাতিয়া এবং মস্তক ভূতলে স্পর্শ করিয়া তবে কথা বলিতে আরম্ভ করিবে। সর্দ্দারের পুত্র-কন্যাকেও এই প্রথা মানিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যাপার আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হওয়া নিয়ম। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বহমংএর সম্মুখে কেহই মাতলামি করিবে না কিন্তু হাস্য-পরিহাস কিঞ্চিৎ অশ্লীল হইয়া পড়িলেও এই দেশের প্রথানুসারে তাহা অসম্মানজনক বিবেচিত হইবে না। প্রত্যেক গ্রামের মণ্ডল আসিয়া সর্দ্দারকে কর প্রদান করিবার উহা নির্দ্ধারিত দিনগুলির অন্যতম। বহমং উচ্চ স্থানে বসিয়া রহিলেন এবং মণ্ডলগণ একে একে দরবারে আসিয়া কর-সম্পর্কিত কর্ম্মচারীদিগকে কর দিতে লাগিল। এই আদান-প্রদান কার্য্য সমাপ্ত হইলে হাস্য-কৌতুক ও নৃত্য-গীত সর্দ্দারের সম্মুখেই আরম্ভ হইল। গ্রাম্য মণ্ডলগণের জন্য সর্দ্দারের আদেশে মদ্য আনীত হইল এবং তাঁহারা উহা পান করিতে করিতে উচ্চ হাস্যধ্বনিতে দরবার-গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিল।

বহমং এবং তাঁহার প্রজা মগ জনসাধারণ সকলেই বুদ্ধদেবের অনুরক্ত উপাসক। বুদ্ধদেবের লীলাস্থলী সুবিশাল ভারতবর্ষের সকল অংশ হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম বিদায় লইয়াছে, শুধু এই দুর্গম ও নিভৃত কোণটিতে এখনও উহা রহিয়াছে। পীতবর্ণ পরিচ্ছদধারী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে ভিক্ষা-ভাণ্ড হস্তে লইয়া গ্রামের পথে পথে ভ্রমণ করিতে দেখিলে খাস ব্রহ্মদেশকে এবং দূর অতীতের বৌদ্ধ ভারতকে আমাদের স্বতঃই মনে পড়ে। গ্রামে প্রান্তে অরণ্যের অন্তরালে অর্দ্ধ প্রচ্ছন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাগোডাগুলি মগদের বুদ্ধানুরাগের পরিচয় প্রদান করে। প্যাগোডাগুলিতে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিলে বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে প্রার্থনা ও উপাসনার জন্য মগ নরনারী দলে দলে মন্দিরের দিকে যাইতে আরম্ভ করে। এই দৃশ্যটি আমাদের পক্ষে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। ক্ষুদ্রকায় প্যাগোডা বুদ্ধমন্দিরগুলি ব্রহ্মের প্যাগোডাগুলির মতই।

মগ-পল্লীতে তিন দিন অবস্থানের পর কিংরু আমাদিগকে কুকী প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাসস্থলী শৈলাঞ্চলে যাইতে অনুরোধ করে। আমরা উপত্যকাংশ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর প্রদেশে আরোহণ করিয়া যে স্থানে পৌঁছিলাম উহাকে কুকীদের দেশ বলা চলে। অবশ্য কুকীরা শুধু পার্ব্বত্য চট্টগ্রামেই থাকে না। ব্রহ্ম-সীমান্তের অন্যান্য অংশেও ইহারা বাস করে। নাগাদের দেশে ভ্রমণের সময়েও আমরা কুকী-পল্লী দেখিতে পাইয়াছি, কতকটা যাযাবর প্রকৃতির বলিয়া ইহারা এক স্থানে থাকিতে ভালবাসে না। ঝুমিং প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করে বলিয়া যেখানে যখন চাষের সুবিধা সেইখানে স্ত্রী-পুত্র লইয়া চলিয়া যায়। মণিপুর বা নাগা পাহাড়-শ্রেণীর নাগা সম্প্রদায় অপেক্ষা কুকীরা অধিকতর যাযাবর প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করে। কুকীরা গোটা গ্রামখানাকেই ফেলিয়া হাসি-মুখে অন্যত্র চলিয়া যায়। একটুও মমত্ববোধ করে না। পিতৃ-পুরুষের অবলম্বিত ধর্ম্মমত কিছুতেই ছাড়িতে না চাহিলেও পিতৃপুরুষের বাসস্থান এবং সমাধিক্ষেত্র ছাড়িতে উহাদের মনে কোন কুণ্ঠাই জাগে না।

কিংরুর পিতাকে অতিবৃদ্ধ বলা চলে। সে আমাদিগকে জানাইল, কুকীরা ঠিক এই দেশের আদিবাসী নহে। তাহারা কোন সময়ে দূর উত্তর হইতে ক্রমশঃ আগাইয়া অবশেষে বঙ্গোপসাগরে বাধা পাইয়া এই পার্ব্বত্য প্রদেশে রহিয়া গিয়াছে। কবে হিমাদ্রি-পাদমূল হইতে তাহারা ক্রমশঃ দক্ষিণে অগ্রসর হইয়াছে তাহা অবশ্য জানা যায় না। কিংরুর পিতা ইহাও জানাইল, কুকীরা ক্রমশঃ দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে আগাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং কয়েক শত বৎসরের মধ্যে আবার আদিবাসস্থলে পৌঁছান তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। উপত্যকাবাসী মগদের মত অত্যন্ত হাস্য-কৌতুক-প্রিয় না হইলেও কুকীরা স্মিতমুখে থাকিতে ভালবাসে। কুকীরা নাগাদের মত ভীষণ দর্শন ও গুরুগম্ভীর নয়। স্ত্রীলোকেরা কটিবাস মাত্র পরিধান করে। কিন্তু পুরুষেরা কটিবস্ত্র ছাড়া একপ্রকার কোটও ব্যবহার করে। আফ্রিকায় এক প্রকার সম্প্রদায় আছে তাহাদের পুরুষে কেশ রাখে এবং স্ত্রীলোকে মস্তক মুণ্ডন করে। কুকীরা বস্ত্র বা পরিচ্ছদ যাহাই ব্যবহার করুক সমস্তই স্বহস্তে প্রস্তুত করে। অধিকাংশ কুকীদের গৃহেই বস্ত্রবয়নের যন্ত্রপাতি রহিয়াছে। পুরুষ অপেক্ষা কুকী-রমণীই বস্ত্রবয়নে অধিক নিপুণা। কতকটা মগদের মতই পুরুষরা অপেক্ষাকৃত অলস এবং নারীরা কর্ম্মপটু।

কুকী অপেক্ষা ম্রোরা সভ্যতর। এই সম্প্রদায়কে যাযাবর বলিয়া মনে হয় না। এক স্থানে পুরুষানুক্রমে আছে বলিয়াই ইহারা এক-প্রকার নিম্ন শ্রেণীর সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। যাযাবর জীবন আদৌ সভ্যতার অনুকূল নহে। ম্রো ভাষাকে তিব্বতী বর্ম্মান ভাষার প্রশাখা বলা চলে। ইহাদিগকে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত আদিবাসী বলা যায়। হাজার হাজার বৎসর ব্যাপিয়া একই আচার-ব্যবহার ইহারা অনুসরণ করিতেছে। কুকীদিগকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করা চলে, কিন্তু ম্রোকে পরিবর্ত্তিত করা অসম্ভব। ম্রোদের পোষাক-পরিচ্ছদ প্রায়ই কুকীদের মত কিন্তু কেশ-প্রসাধনের প্রথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মস্তকের একটি পাশে কেশগুলিকে উচ্চ গুচ্ছ বা চূড়ার আকারে পরিণত করিয়া রাখা এবং উহাতে পাগড়ীর অনুরূপ বস্ত্রখণ্ডে আচ্ছাদিত করা মেয়ে-পুরুষদের নিয়ম। ম্রো-নারীরাও কুকী-রমণীদের মতই কটিবস্ত্র পরে। গলায় লাল রঙের মাদুলির মালা ধারণ করিতে ম্রো-রমণীরা অত্যন্ত ভালবাসে। পাথর বা কাচের শোণিত-লোহিত খণ্ডগুলিতে কণ্ঠ ও বক্ষস্থল মণ্ডিত করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে ইহাদের আনন্দের সীমা থাকে না। যখন ম্রো-নর-নারী পার্ব্বত্য প্রবাহিণীতে দলে দলে স্নান করে তখন তাহারা উভয়েই সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হইয়া ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। বস্ত্রখণ্ডকে তীরবর্ত্তী কোন প্রস্তরে বা বৃক্ষে রাখিয়া দিয়া সম্পূর্ণ নগ্নদেহে নদীতে নামিতে ইহারা বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হয় না। পরস্পর গায়ে জল ছিটাইয়া হাস্য-পরিহাস, ক্রীড়া-কৌতুক করিতে করিতে ইহারা অবগাহন ও সন্তরণ সম্পাদন করে।

আমরা প্রবন্ধের সূচনাতেই বলিয়াছি, এই প্রায়ই সম্পূর্ণ অমুসলমান অঞ্চলকে পাকিস্থানভুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে কি না সে বিচার আমরা করিব না, কিন্তু তবুও আমাদের মনে হয়, পার্ব্বত্য ও আরণ্য প্রকৃতির এই সকল কৃত্রিমতাশূন্য সরল হৃদয়

শহীদ শচীন্দ্রনাথ

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

ভুলবো না ! তোমায় ভুলবো না !
ভুলবো না এই সেপ্টেম্বরের কোলকাতা !
রক্ত-আঁখরে সাজিয়ে রাখলাম স্মৃতির পাতা
রক্ত-তুলিতে রাঙিয়ে রাখলাম বুকের কোণা !
ভুলবো না, এই সেপ্টেম্বরের কোলকাতা !

পশুর মতন মৃত্যু দেখেছি এই রাজপথে
সন্ত বিধবা, অবুঝ শিশুর আর্ত্তনাদ
অযুত মায়ের অশ্রুপাত···
সাত আসমানে ব'য়ে চলেছে আজো বায়ু-স্রোতে !
সার্কুলার রোড, ফিয়ার্স লেনে, কলুটোলায়
কলেজ ষ্ট্রীটে, ইণ্টালী আর মাণিকতলায়···
আজকে সেই শহীদরা সব উঠে এসেছে অশ্রু-চোখে
পশুর মতন ধড়-কাটা আর ছিন্ন লাশ সেই হিঁদু-মুসলিম
আজকে তোমায় প্রাণ ভরে জানায় তসলিম।
পশুর মতন মৃত্যু দেখেছে এই রাজপথ
কিন্তু দেখেনি এমন রক্ত-শপথ
ভাইয়ের খুনে কলঙ্কিত করে যারা আপন হাত
তাদের প্রায়শ্চিত্তের বলিদান
করে গেলে কি আজ বীর শহীদ শচীন্দ্রনাথ ?

সার্কুলার রোড, মাণিকতলায়, কলুটোলায়···
শহীদরা সব তোমায় ফিরে আশিষ জানায়
আকাশ হ'তে দেবতারা সব পুষ্প ঝরায়
মহাভারতের অযুত কোটি প্রাণ-কুসুম
আজকে তোমায় দিক্‌-দিগন্তে শ্রদ্ধা জানায়
হৃদয়ে হৃদয়ে রক্ত-কথার শপথ পাঠায় :

ভুলবো না !
ভুলবো না এই সেপ্টেম্বরের কোলকাতা
রক্ত-আঁখরে সাজিয়ে রাখলাম স্মৃতির পাতা!

যে শিশু জন্ম নিলো কাল রাতে
যে শিশু আসবে তার পশ্চাতে
তাদের কানে কানে আমরা বলবো তোমার কথা
জানাবো তোমার আশীর্বাদ :
ভুলবো না ! ভুলবো না তোমায় শচীন্দ্রনাথ !
চেয়ে দেখো দিকে দিকে জাগে জনতা মিছিল—
দধীচি ! অস্থি দিয়ে গেছো তা'দের তরে
আমরা সেই আয়ুধ নিয়ে এগিয়ে যাবো
দানবের পৃথিবীতে মানবের জয়ের পতাকা উড়াবো ;
নিষ্পাপ মানুষের প্রাণ নিয়ে যারা পাঞ্জা খেলে
পৃথিবীর সবুজ প্রান্তরে রক্ত ঢেলে চলে—
সে সব আততায়ীদের আমরা ক্ষমা কোরব না !

ভবিষ্যতের স্বাধীন শান্ত-সুন্দর পৃথিবীতে
চল্লিশ কোটি সূর্য্যমুখীর কুঁড়ি যখন ফুটে উঠবে
সমস্ত বিকার শেষ হ'য়ে আসবে
সেদিন সিরাজ, মীরমদন, মোহনলালের সাথে
অভিরাম, ক্ষুদিরাম শহীদদের সাথে
তোমারও নাম লেখা থাকবে ইতিহাসের পাতে
তর্পণ জানাবো নূতন প্রাতে।

শচীন্দ্রনাথ !
ভুলবো না ! ভুলবো না এই রক্তপাত !
ভুলবো না এই সেপ্টেম্বরের কোলকাতা !
রক্ত-আঁখরে সাজিয়ে রাখলাম স্মৃতির পাতা !

সন্তানগণকে পাকিস্থানের শাসনাধীন না করিয়া ইহাদের চিরন্তন স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রাখিলে বা ইহাদিগকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিলেই বোধ হয় ভাল হইত। কিংরুর অতিবৃদ্ধ পিতা আমাদিগকে জানাইয়াছিল, তাহারা সবংশে মরিবে তবুও স্মরণাতীত সময় হইতে পুরুষানুক্রমে অবলম্বিত প্রাচীন ধর্ম্ম-মত কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না। কাহাকেও জোর পূর্ব্বক ধর্ম্মান্তর গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা হিন্দুদের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক সম্প্রদায়দের পক্ষে হিন্দু-শাসন যেরূপ নিরাপদ, পাকিস্থানী শাসন সেরূপ নহে, এই সত্যে আজ সংশয় করিবে কে ?

আমরা দরবারে যাইলে মগ-সর্দ্দার 'বহমং' আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম—আমরা যখন বৌদ্ধ তখন আমাদিগকে এক শ্রেণীর হিন্দু বলিয়া মনে করা চলে। মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক বা সাদৃশ্য নাই। এক জন বৃদ্ধ মগ বলিয়াছিল, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে একবার খাস চট্টগ্রাম হইতে কতকগুলি ইসলামী প্রচারক আসিয়া মগদিগকে মুসলমান করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কুকী প্রভৃতি পার্ব্বত্য সম্প্রদায়রাও ধর্ম্মান্তর গ্রহণে কিছুতেই সম্মত হয় নাই। কুকী, ম্রো প্রভৃতি সম্প্রদায়রাও আপনাদিগকে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মেরই নিকটবর্তী বলিয়া মনে করে। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের সহিত ভারতের পার্ব্বত্য ও আরণ্য জাতিদের ধর্ম্মমতগত সাদৃশ্য আমরা একটু পর্য্যবেক্ষণ করিলেই উপলব্ধি করিতে পারি। এরূপ ক্ষেত্রে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করা গভীর ভাবে চিন্তা ও সূক্ষ্মভাবে বিচারের অভাবের কথা বিজ্ঞাপিত করিতেছে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলার এই আরণ্য ও পার্ব্বত্য পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তটিকে পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত করা অসুবিধাজনক না হইতে পারে কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অনায়াসে করা চলিতে পারিত এবং এখনও চলিতে পারে।

রক্তনদীর ধারা

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

পঞ্চানন ঘোষাল
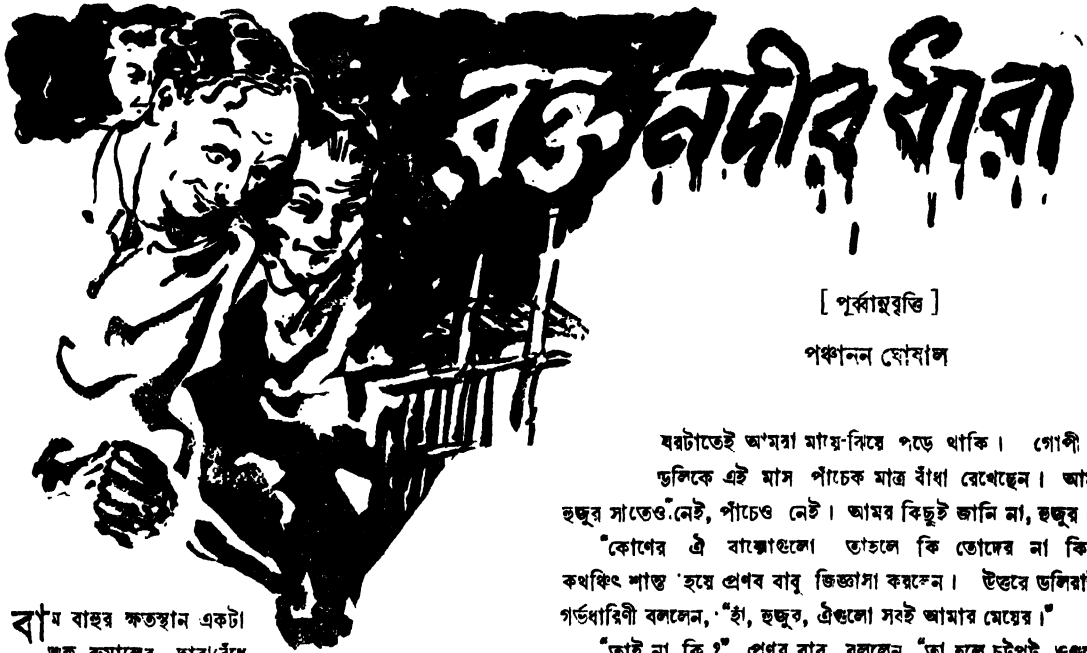
বাম বাহুর ক্ষতস্থান একটা শুভ্র রুমালের দ্বারা বেঁধে ফেলে প্রণব বাবু গোপীর রক্ষিতা ডলি এবং তার মাতা তারাসুন্দরীর দিকে চাইলেন। স্ত্রীলোক দুইটি এতক্ষণ ভীত হরিণের মত চক্ষু মুদ্রিত ক'রে দেওয়ালের এক পাশে দাঁড়িয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপতে সুরু করেছে। এদের মতো এতো কুৎসিত স্ত্রীলোক প্রণব বাবু ইতিপূর্ব্বে খুব কমই দেখেছেন। চতুর্দ্দিকের বীভৎসতা এদের উপস্থিতিতে যেন আরও বেড়ে গেছে। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে প্রণব বাবু গোপীর রক্ষিতা ডলিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি নাম তোর, এ্যাঁ? থাকিস্ কোথায় তুই? কথা কইছিস্ না যে?"

কাঁপতে কাঁপতে ডলিরাণী উত্তর করলে, "এ্যাজ্ঞে, আমার নাম ডলি।"

ডলি? এই রকম কুরূপা একটা স্ত্রীলোকের নাম ডলি! প্রণব বাবু ক্ষেপে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "ডলি? কে রেখেছে এই নাম তোর?"

উত্তরে ডলিরাণী বললো, "আজ্ঞে, আমার মা-আ।"

"কে তোর মা, এই মাগীটা?" অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে প্রণব বাবু হুকুম দিলেন, "এই কৌন হ্যায়, পাকড়ো। পাকড়ো ইস্‌কো।"

প্রণব বাবুর হুকুম শুনে জন দুই-তিন সিপাই যমদূতের মতই এগিয়ে এলো। সহকর্ম্মিদ্বয়ের মৃত্যুতে এদের প্রত্যেকেই ক্রোধোন্মত্ত হয়ে অপেক্ষা করছিলো। প্রতিশোধের দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা তাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে। হুকুমের অপেক্ষায় তারা এতোক্ষণ ঘন ঘন কেষ্টোর দিকে তাকাচ্ছিল। কেউ কেউ ডলি এবং তার মায়ের দিকেও ঘৃণার দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সিপাইদের মধ্যে এক জন বলে উঠলো, "ঠিকসে ইন লোককো দাওয়াই দেনে চাহি, হুজুর! নেহি তো আসলি বাত উন লোক কভি নেহি বাতলায়েঙ্গে।"

ডলির মা ভয়ে এমনিই অস্থির হয়ে উঠেছিল। প্রণব বাবুর রাগটা শেষ বরাবর তার উপরই পড়তে দেখে সে ছুটে এসে প্রণব বাবুর পায়ের উপর আছড়ে পড়ে কেঁদে উঠে বললো, "দোহাই হুজুর, আপনি ধর্ম্মাবতার, আমাদের কোনও দোষ নেই, হুজুর! এই ঘরটাতেই আমরা মায়-ঝিয়ে পড়ে থাকি। গোপী বাবু ডলিকে এই মাস পাঁচেক মাত্র বাঁধা রেখেছেন। আমরা হুজুর সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। আমরা কিছুই জানি না, হুজুর।"

"কোণের ঐ বাক্সোগুলো তাহলে কি তোদের না কি?" কথঞ্চিৎ শান্ত হয়ে প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে ডলিরাণীর গর্ভধারিণী বললেন, "হাঁ, হুজুর, ঐগুলো সবই আমার মেয়ের।"

"তাই না কি?" প্রণব বাবু বললেন, "তা হলে চট্‌পট্ ওগুলো খুলে ফেলো শীগ্‌গির।"

প্রণবের আদেশ পাওয়া মাত্র ডলির মা ডলির আঁচল থেকে চাবির গোছাটা খুলে নিয়ে চটপট করেই তাদের বাক্সোগুলো খুলে ফেললে। প্রণব বাবু হেঁট হয়ে একটা বাক্সের ভিতরকার খানকতক কাপড় উল্টে ফেলতেই তিনি এক অদ্ভুত জিনিষ দেখতে পেলেন। রক্তমাখা কাপড়ে-মোড়া একটা কৌটা বাক্সের নীচে সযত্নে রক্ষিত রয়েছে। কৌটাটির ঢাকনা খুলে প্রণব বাবু একটা ছক-আঁকা লিপিকাও পেলেন। লিপিকাটি কোনও এক গণৎকার ঠাকুর লিখে দিয়েছেন, লিপিকাটি লিখিত হয়েছে প্রায় সাত দিন পূর্ব্বে। লিপিকার তারিখ হ'তে অন্ততঃ তাই মনে হয়। উহাতে লেখা ছিল যে, সাত দিনের মধ্যে যদি গোপী ধরা না পড়ে, তা হলে পৃথিবীতে এমন কোনও ব্যক্তি নেই যে তাকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হবে।

লিপিকাটি লেখা হয়েছিল সাত দিন পূর্ব্বে এবং সাত দিন পরে উহা পুলিশের হস্তগত হলো। কিন্তু যাহার জন্যে উহা লেখা হয়েছে সে তখন পুলিশ তো দূরের কথা, পৃথিবীর মানুষ মাত্রেরই নাগালের বাইরে চলে গেছে। গণক ঠাকুর তো তা'হলে ঠিকই গণনা করেছেন। সত্যই তো, পৃথিবীতে এমন কোনও ব্যক্তিই নেই যে আজ তাকে ধরে আনতে পারে।

লিপিকাটি বার-কতক উল্টে-পাল্টে দেখে নিয়ে প্রণব বাবু রক্তমাখা বস্ত্রখানিও একবার পরীক্ষা করে নিলেন। তার পর একটু চিন্তা করে বললেন, "মনুষ্যরক্তই মনে হয়, তবে পুরান দিনেরই রক্ত। কয় দিনে অনেকগুলো লোককেই তো ওরা খুন করলো। কোন্ হত্যাকাণ্ডের রক্ত যে এতে লেগে আছে কে জানে? যাই হোক, ওটাকে একবার রক্ত-পরীক্ষকের কাছে পাঠানোও দরকার।"

উত্তরে শৈলেশ বাবু বললেন, "হাঁ স্যার, মানুষের না হয়ে পাঁঠার রক্তও হতে পারে। তুক-তাকের ব্যাপার হওয়াও আশ্চর্য্য নয়।"

উত্তরে ডলিরাণী জানালেন, "না কর্ত্তা। ও মানুষেরই রক্ত। এক দিন তিনি রাত্রি দুটার সময় ফিরে এলেন। তাঁর কাপড়ে তাজা রক্ত দেখে আমি চমকে উঠি।"

প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসের রক্ত জিজ্ঞাসা করেছিলি?"

"হাঁ কর্ত্তা, করেছিলাম বৈ কি?" ডলি রাণী উত্তর করলে, "কিন্তু তিনি ধমকে উঠে বলেছিলেন, চুপ কর শালী। কাল রাত্রে একটা কাণ্ড হয়ে গেছে। খবরের কাগজে দেখবি এখন। এখোন ষ্টোভ জ্বেলে কাপড়টা চটপট কেচে দে। সাবান দিয়ে কাচার পর ঐ কাপড়টাই আমি বাক্সে তুলে রেখেছি কর্ত্তা।"

শৈলেশ বাবু বললেন, "তা হলে তো। কাপড়টা রক্ত-পরীক্ষকের কাছে পাঠাতেই হবে। কি বলেন স্যার?"

"তা না হয় পাঠিয়ো, কিন্তু"—প্রণব বাবু বললেন, "এখানে অপেক্ষা করার আর কোনও প্রয়োজন নেই। স্ত্রীলোক দু'টিকে এবং আসামী কেষ্টোকে এখোন সাবধানে থানায় নিয়ে চলো। এর মধ্যে আবার অন্ত কথাও আছে। এই কেইসগুলিতে তো আমরা নিজেরাই সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়লাম। সুতরাং এইগুলোর তদন্তের কায আমাদের দ্বারা আর হতেই পারে না। এতে অনেক অপ্রীতিকর কথাই উঠতে পারে। বড় সাহেবকে এইবার খবর দাও, অন্ত অফিসারকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি এই খুনগুলোর তদন্তের ব্যবস্থা করুন, বুঝলে।"

সদ্য-করণীয় কার্য্যগুলি সমাপ্ত করে প্রণব বাবু যখন সদলে আসামী সহ থানায় ফিরলেন, রাত নয়টা তখন বেজে গেছে; স্ত্রীলোক দু'টিকে থানার আফিস-ঘরে বসিয়ে রাখবার জন্তে নির্দ্দেশ জানিয়ে প্রণব বাবু হুকুম করলেন, "এইবার এই কেষ্টোটার নামে একটা কেইস লিখে দিয়ে হাজতে পাঠিয়ে দাও। কিছুক্ষণ ও থাক হাজতে। রস-টস মরুক আগে। তার পর যা হয় করা যাবে।"

শৈলেশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ওর একটা বিবৃতি বা বয়ান এখোনই লিখে নিলে হয় না, স্যার?"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "তাতে লাভ? জিজ্ঞেস করলেই ও সব কথা বলবে? জিজ্ঞাসা করে দেখো, ও কোন কিছুই স্বীকার করবে না বিবৃতি আদায় করা এতো সহজ নয় হে, এতো সহজ নয়। এরা হচ্ছে যাকে বলে পাকা শেয়ানা, সহজে এরা কোনও কিছু বলে না, বিশেষ এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে না উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত ওরা কোনও বিবৃতিই দেবে না। আমাদের এখোন সাবধানে লক্ষ্য করতে হবে এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তটি ওর মধ্যে কখোন আসে।"

"ওকে ঠেঙালে হয় না, স্যার", শৈলেশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রণব বাবু বললেন, "আজ্ঞে না, এরা হচ্ছে এক-এক জন স্বভাব-অপরাধী। মার-ধর করলে এরা স্বীকারোক্তি তো করবেই না বরং এতে এরা আরাম বোধই করবে। তা ছাড়া এতে আইনগত বাধাও আছে। স্বীকারোক্তি যদি রসগোল্লা খাইয়েই আদায় করা যায়, তা হলে মার-ধরের আর প্রয়োজনই বা কি আছে?"

বিস্মিত হয়ে শৈলেশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "রসগোল্লা? রসগোল্লা খাওয়াবেন কি স্যার? আসামীকে আপনি মার না দিয়ে রসগোল্লা খাওয়াবেন?"

প্রণব বাবু উত্তর করলেন—"হাঁ, তা'ই, রসগোল্লাই খাওয়াবো।"

শৈলেশ বাবুকে অবাক্ করে দিয়ে প্রণব বাবু দরজার সেপাইকে বাজার হতে সত্য সত্যই সের আড়াই রসগোল্লা আনতে বললেন, সেই সঙ্গে খানকতক লুচি এবং কিছু তরকারীও।

প্রয়োজনীয় রসগোল্লা ও লুচি-তরকারী আনা হলে প্রণব বাবু এক জন সিপাহীকে হুকুম করলেন, "আভি লে আও আসামী কেষ্টোকো, জলদী।"

শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায়ই কেষ্টো প্রণব বাবুর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। আসামী কেষ্টোর হাতের হাত-কড়ার দিকে লক্ষ্য করে প্রণব বাবু তার সঙ্গের সিপাহীকে মৃদু ভর্ৎসনা করে বললেন, "আরে-এ, এ কেয়া কিয়া? হাতকড়ি লাগায়া কাহে? ই মামুলী আসামী নেহি হ্যায়, ভাই। ই আসামী বড়ি ঘরকা লেড়কা হ্যায়। বহুৎ বড়ি খানদান আদমী। সমঝা হ্যায়?"

এতোটা মধুর ব্যবহার থানায় এসে পাবে খুনি আসামী কেষ্টো তা কল্পনাও করেনি। প্রণব বাবুর সদ্ব্যবহারে তার চোক দু'টো সজল হয়ে উঠলো। প্রণব বাবু বুঝলেন, আকাঙ্ক্ষিত দুর্ব্বল মুহূর্ত্তটি আসামীর মধ্যে এইবার আগতপ্রায়। জোর করে চোখ-মুখে একটা বিষণ্ণ ভাব ফুটিয়ে প্রণব বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, তোমার বাপের নাম তারাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় না? তুমি তো বেলঘরের পূব-পাড়ার হরি বন্দ্যোর ছোট মেয়েকে বিবাহ করেছ?"

বলা বাহুল্য, প্রণব বাবু এই সব খবর তদন্তের দ্বারা সংগ্রহ করেছিলেন। মাত্র কয়টি বাক্য দ্বারা প্রণব বাবু কেষ্টোকে তার জীবনের পথে বহু দূর পর্য্যন্ত পিছিয়ে আনলেন। কেষ্টো হতভম্ব হয়েই দাঁড়িয়ে রইলো, তার মুখ দিয়ে আর কথা বার হল না। একটি একটি করে তার বহু কথাই মনে আসছিল। সে কবে—কতো দিন পূর্ব্বে একটি মাত্র সন্তান সহ তার স্ত্রীকে পিত্রালয়ে রেখে চলে এসেছে, এ পর্য্যন্ত সে তাদের কোনও খবরই নেয়নি। হুল্লোড়, মদ, স্ত্রীলোক, জুয়া এবং অপরাধ এই নিয়েই এতো দিন তার জীবন কেটেছে। ঘর-বাড়ী বা সংসারের কথা তার এখোন স্বপ্নের মতই মনে পড়ে।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে কেষ্টো জিজ্ঞেস্ করলো, "আপনি স্যার, কে? বলুন না, কে আপনি?"

প্রণব বাবু বললেন, "ভয় নেই, বসো ওখানে। আমার বাবা তোমার বাবারই বন্ধু ছিলেন। একটু আগেই তোমার বড়দা এসেছিলেন। তোমাকে দেখবার জন্তে তিনি ব্যস্ত হয়েছেন। তোমার স্ত্রীও তোমাকে দেখতে চায়। তোমার দাদা তাই তেনাকে আনতে গেছেন।"

নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ ভাবে কেষ্টো বাবু সামনের বেঞ্চিটার উপর ধপাস্ করে বসে পড়লো। এতো দিন পরে যেন তার এই প্রথম ক্লান্তি এসেছে। হাজত-ঘরে ঢুকে সে যেন এই প্রথম বিশ্রামের দরকার অনুভব করলো। এখোন আর কেউ-ই তাকে স্থান হতে স্থানান্তরে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরবে না, নিশ্চিন্ত মনে সে ঘুমাতে পারবে। তাকে গ্রেপ্তার করার জন্ত প্রণব বাবুকে এমনিই তার ধন্তবাদ জানাতে ইচ্ছে করছিল। এখোন তাঁর কাছ থেকে স্ত্রীপুত্রের খবর পেয়ে তাঁকে তার এক জন নিকট-আত্মীয়ের মতোই মনে হতে লাগলো। প্রণব বাবুর এই অভিনয়-চাতুর্য্যের একটুকু অংশও তার কাছে অভিনয়রূপে প্রতীত হয়নি।

কেষ্টোর এই বিশেষ চিত্ত-বিক্ষোভ সাবধানে লক্ষ্য ক'রে প্রণব বাবু বললেন, "দেখি, পারি যদি তোমার সাক্ষী করে নেবো। তোমার দাদাকে এ সম্বন্ধে কথাও দিয়েছি। আহা বেচারা, এই কয় বছর ধরে তিনি তোমায় কি খোঁজাটাই না খুঁজেছেন। তোমার কি একটু

মায়া-দয়াও নেই, ভাই। যাক্ গে যাক্, ও-সব কথা থাক, এখোন এইবার লক্ষ্মী ছেলের মত এইগুলো খেয়ে ফেল দেখি।"

কেষ্টো কিন্তু কিছুতেই এই সব খাবার খেতে চাইলো না। খিদে যে তাঁর পায়নি তা-ও নয়। কিন্তু এক ঘুমানো ছাড়া আর কোন ইচ্ছাই তার এই সময় আসছিল না। খাদ্যের অভাবে কেবল মাত্র ঘুমের দ্বারা ক্ষুধা মেটানোর ব্যাপারে সে অনভ্যস্তও ছিল না। কিন্তু প্রণব বাবু নাছোড়বান্দা। এমনি কথায় কথায় তাকে ভুলিয়ে দিয়ে তিনি বেশী কিছুই খাইয়ে দিলেন। খাওয়ানোর পর্ব্ব শেষ হলে প্রণব বাবু বললেন, "এই বার তা'হলে তোমাকে হাজতে নিয়ে যাক্, কেমন? আমি খেয়ে-দেয়ে একটু গড়িয়ে নিয়ে রাত্রেই আবার নীচে নামবো এখন। নীচে নেমে আমি একটু কায করবো এবং ততক্ষণে তোমাকে বার করে নিয়ে আমার কাছেই আবার বসিয়ে রাখবো, কেমন? ক'দিন তোমার একটু কষ্টই হবে, তা আর কি করা যাবে বলো? সবই ভাই তোমার অদৃষ্ট! এইবার থেকে কিন্তু তোমাকে ভালো ভাবেই থাকতে হবে। কেইস-টেইস মিটে গেলে দাদার সঙ্গে তুমি বাড়ী চলে যাবে, কেমন?"

প্রণব বাবু কেষ্টোর সহিত এক জন নিকট-আত্মীয়ের মতই কথা কইছিলেন। তাই কেইসের কথা তিনি তার কাছে একবার মাত্রও উত্থাপন করেননি। শৈলেশ বাবুকে এই বার আড়ালে ডেকে তিনি বললেন, "এইবার এক কায করো। আমি উপরে চলে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে তুমি আর বীরেন বাবু মিলে ওকে প্রশ্নে প্রশ্নে অতিষ্ঠ করে তোলো। দশটা থেকে রাত্রি দু'টো পর্য্যন্ত পালা করে এক এক জন ওকে প্রশ্ন করবে। একটু মাত্রও ও যেন বিশ্রাম না পায়, ভাববার সময় তো নয়ই। তোমাদের কাছে অবশ্য ও কোন কথাই বলবে না, কিন্তু তবুও প্রশ্ন ওকে করা চাই। রাত্রি দু'টোর পর তোমরা শুতে যেও আমায় ডেকে দিয়ে। এর পর আমি ওকে নিয়ে পড়বো, কিন্তু অন্য ভাবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রাত্রি তিনটে নাগাদ ও একটা স্বীকার উক্তি আমার কাছে করতে বাধ্যই হবে। ইংরাজীতে একে বলে সাইকোলজিক্যাল এক্সপ্লয়েটেশন, আমেরিকাতে একেই বলে থার্ড ডিগরী মেথড, বুঝলে?"

"কিন্তু স্যার, ওকে আপনি রসগোল্লা খাওয়ালেন কেন, এই সব পৈচাশিক অপরাধের শাস্তি কি রসগোল্লা প্রদান?" সন্দিগ্ধ চিত্তে শৈলেশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "আরে ভাই, ধৈর্য্য ধরো, ধৈর্য্য ধরো। কালই সব জানতে পারবে। এই রসোগোল্লা খাইয়েই ওকে আমি গোল্লায় খাওয়ালাম, বুঝলে?"

প্রণব বাবু আর অপেক্ষা না ক'রে উপরে চলে এলেন। দরজা খোলাই ছিল। চাকরটা ততক্ষণে অঘোরে ঘুমিয়ে প'ড়েছে। তাকে অযথা আর তিনি ডেকে তুলতে চাইলেন না। পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে শয়নঘরে ঢুকে তিনি দেখলেন, ঘরের এক কোণে টেবিলের উপর তাঁর আহার্য্য ঢাকা রয়েছে। ঘরের চারি দিকে এবং শয্যার উপর অতর্কিত ভাবে কাকে যেন তিনি খুঁজে নিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই অপ্রস্তুতের মত একটু ম্লান হাসি হাসলেন। কোনও রকমে খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে প্রণব বাবু বিছানায় এসে শুলেন বটে, কিন্তু ঘুমাতে পারলেন না। একে একে পরিচিত এবং অপরিচিত স্বপক্ষীয় বা বিপক্ষীয় প্রত্যেকটি নিহত ব্যক্তির কথাই তাঁর মনে আসছিল। সারা দেহটা তাঁর কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে। বিজলী বাতিটি তিনি নিবিয়ে দিয়েই শুয়েছিলেন। বিব্রত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাতিটা তিনি পুনরায় জ্বেলে দিলেন। শুয়ে শুয়ে মনের মধ্যে একটা দারুণ অস্বস্তি নিয়ে প্রণব বাবু ভাবতে থাকলেন, নিহত হবার পর এদের আত্মাগুলো গেলো কোথায়? বিপক্ষীয়ের ন্যায় স্বপক্ষীয় ব্যক্তিরাও তো এই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। অন্যমনস্ক হয়ে প্রণব বাবু চিন্তা করতে থাকেন, আচ্ছা, বিগতপ্রাণ হওয়ার পরেও কি এদের মধ্যে আর কোনওরূপ বিরোধ আছে? নিশ্চয়ই পরলোকে গিয়ে এরা নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে আর হানাহানি করছে না। হয়তো বা জীবিত লোকেদের প্রতি অনুকম্পার দৃষ্টি হেনে তারা এতক্ষণে হাতে হাত মিলিয়ে পথ চলতে সুরু করেছে। কিন্তু, পরলোকের পথে শান্তার সঙ্গে যদি তাদের দেখা হয়ে যায়! প্রণব বাবু ভাবতে থাকলেন, না না, তা'ও কি কখনও হতে পারে? শান্তা তার নিষ্পাপ মন নিয়ে স্বর্গে গেছে, আর এরা হয়তো চলেছে নরকের পথে। প্রণব বাবুর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এলো। তাঁর সমস্ত দেহটা যেন শীর-শীর করছে, কে যেন তাঁর সমস্ত শরীরে একটা ঠাণ্ডার প্রলেপ মাখিয়ে দিচ্ছে, কাঁপুনি আর থামে না। প্রণব বাবু বুঝলেন, তাঁর স্নায়ুর শক্তি রাত্রের প্রভাবে আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। শান্তাকে হারানোর পর হ'তে এইরূপ দুর্ব্বলতা তাঁর মনে পূর্ব্বেও এসেছে এবং তা এসেছে এই রাত্রকালেই। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে প্রণব বাবু বাথ্-রুমে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু, সেখানেও যেন একটা থমথমে ও গুমোট ভাব। একবার ভাবলেন, চাকরটাকে ডেকে তুলেন, কিন্তু তা হলে সে-ই বা ভাববে কি? তাড়াতাড়ি মাথাটা ধুয়ে ফেলে গামছা দিয়ে মাথা মুছে চুল আঁচড়ে নীচে নেমে এসে প্রণব বাবু দেখলেন, রাত্রি দু'টা প্রায় বাজে আর কি।

সহকারী শৈলেশ বাবু এবং থার্ড অফিসার ধীরেন বাবু তখনও পর্য্যন্ত খুনী আসামী কেষ্টোকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছেন, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত তার কাছ থেকে তাঁরা একটা কথাও বার করতে পারেননি। প্রণব বাবুকে আফিসে ঢুকতে দেখে উভয়ে সমস্বরেই বলে উঠলেন, "এতো সকালেই নামলেন কেন, স্যার। ঠিক দু'টার সময়েই তো আমরা আপনাকে ডেকে আনতাম।"

ঘুমের অভাবে সহকারীদের ন্যায় প্রণব বাবুরও চোখ দু'টো বুজে আসছিল। দুই হাতে চোখ দু'টো রগড়ে নেওয়ার পর, তাঁর দুর্ব্বল মন পুনরায় সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। তাঁর পূর্ব্ব দুর্ব্বলতার কথা স্মরণ করে তিনি বরং লজ্জিত হয়ে উঠলেন। আফিস-ঘরের চোখ-ঝলসানো আলোকরশ্মি তাঁর স্নায়ুগুলিকে পুনরায় সক্রিয় করে তুলেছে।

"কি আর করবো বলো," প্রণব বাবু বললেন, "ঘুম তো আর কিছুতেই আসে না, বিছানায় শুয়ে থাকাই সার। তা, তোমরা এইবার উপরে যাও, আমি দেখি, ও কি বলে।"

উত্তরে শৈলেশ বাবু বললেন, "এ তো কিছুই বলতে চায় না। না ঠেঙালে ও কিছু বলবেও না। বেশ করে ওকে ধোলাই দেওয়া দরকার।"

প্রণব বাবু সহকারীদের প্রতি একটা চোখের ইসারা ক'রে উত্তর করলেন, "সে কি কথা হে? ভদ্রলোকের ছেলেকে

মারবেই বা কেন? ও যা জানে তাই তো ও বলবে, ও যা জানে না, তা আর ও কি করে তোমাদের বলবে বলো ?"

শৈলেশ বাবু এবং ধীরেন বাবু প্রণব বাবুর নির্দ্দেশ মত বিশ্রামের জন্ম উপরে চলে গেলে প্রণব বাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে আসামী কেষ্টোকে বললেন, "এখোন তুমি পুলিশকে কোনও বিবৃতি দিও না, কাল তোমার দাদা উকিল নিয়ে এলে, তিনি যা বলতে বলবেন তাই বলো, বুঝলে ?"

ইতিমধ্যে আমি একটা ডায়েরী লিখে ফেলি, তুমি ততক্ষণ ঐ ডেক-চেয়ারটায় শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও। কেষ্টোকে একখানা ডেক-চেয়ারে শুইয়ে দিয়ে প্রণব বাবু কিছুক্ষণ ধরে ডায়েরী লিখলেন এবং তার পর একটির পর একটি ক'রে কথা বলে, তিনি কেষ্টার সহিত আলাপ জুড়ে দিলেন। সাংসারিক কথাবার্ত্তার ফাঁকে ফাঁকে তিনি কেইস সংক্রান্ত দুই-একটা কথা যে পাড়ছিলেন না তা'ও নয়।

অনেকেই জানেন, দিনে কেউ ভূত বিশ্বাস না করলেও রাত্রে তারা তা করে থাকে। তার কারণ রাত্রে স্নায়ু তথা মন দুর্ব্বল থাকে। রাত্রিকালে মানুষের মন অত্যন্ত বাক্-প্রয়োগশীল বা সাজেস্‌সিভ্‌ হয়, এই কারণে রাত্রে মানুষকে যা-তা বিশ্বাস করানোও সম্ভব। প্রণব বাবু এই বিশেষ দুর্ব্বলতারই সুযোগ নিতে চাইছিলেন। কেষ্টোকে পেট ভ'রে রসগোল্লা খাওয়ানোর মধ্যেও একটা উদ্দেশ্য ছিল। খুব বেশী আহার করলে মস্তিষ্কের রক্ত উদরে নেমে আসে উদরকে সুপরিচালিত করবার জন্যে। রক্তের অভাবে মস্তিষ্কের প্রতিরোধ-শক্তির হ্রাস ঘটে। ফলে মস্তিষ্ক এমনিই বাক্-প্রয়োগশীল হয়ে উঠবে। এইরূপ অবস্থায় আসামী তার গোপনতম কথাও বলে ফেলতে বাধ্য। তাকে ডেক-চেয়ারের উপর শোয়ানোরও একটা কারণ ছিল। আরাম-কেদারায় শুলে স্নায়ুগুলি শিথিল হয়ে পড়ে, এইরূপ অবস্থায় মানুষ আর তর্ক করতে পারে না।

প্রণব বাবু জানতেন, কখোন, কবে এবং কোথায় আঘাত হানতে হবে। এ-কথা ও-কথার পর বাক্-প্রয়োগের দ্বারা প্রণব বাবু অচিরেই কেষ্টোকে অভিভূত করে ফেললেন। ইতিমধ্যে কেষ্টো প্রণব বাবুকে এক জন নিকট-আত্মীয়ের মতই মনে করতে সুরু করেছে। কেষ্টো তার কল্পিত ভ্রাতাটির আগমনের জন্ম আর অপেক্ষা না করেই তার এই অসতর্ক মুহূর্ত্তে অনেক গোপন কাহিনীই প্রণব বাবুকে জানিয়ে দিলে। এমন কি নেতাজী খোকন বাবুর বর্ত্তমান আবাস-স্থলেরও একটা হদিস সে বিনা দ্বিধায় প্রণব বাবুকে বলে ফেললে।

প্রণব বাবু নিবিষ্ট মনে আসামী কেষ্টোর দীর্ঘ বিবৃতিটুকু দ্রুত-গতিতে টুকে নিচ্ছিলেন।

টিক্-টিক্ করে আফিসের ঘড়ীর কাঁটা পলে পলে সরে যায়, মাঝে মাঝে ঘন্টারও আওয়াজ হয়, ঢং ঢং। তিনটার পর চারটা বাজে, ঘড়ীর কাঁটা পাঁচটার কাছাকাছি এসেছে, এমন সময় টেলিগ্রামের তারের উপর উড়ে এসে একটা কাক, 'কা কা', করে ডেকে উঠলো। প্রণব বাবু বুঝলেন ভোর হয়ে আসছে। সন্ত্রস্ত হয়ে কলমের গতি তিনি আরও বাড়িয়ে দিলেন। ভোর হওয়ার পূর্ব্বেই কেষ্টোর বিবৃতিটির লিপিবদ্ধের কাজ তিনি শেষ করে ফেলবেনই। ভোরের হাওয়া এবং সেই সঙ্গে ভোরের আলো আসামী কেষ্টোর গাত্র স্পর্শ করা মাত্র কিন্তু কেষ্ট সচেতন হয়ে উঠলো। কেষ্টো ভাবছিলো, এ কি করলে? অনুশোচনায় কেষ্টো অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। সে নিজে তো মরেছে সেই, শেষে কি-না তার গুরুজীর প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করে বসলেন। ক্ষেপে উঠে প্রণব বাবুকে গাল পেড়ে কেষ্ট বাবু বললো, "আপনি আচ্ছা শয়তান তো মশাই? ফাঁকি দিয়ে কথা বার করে নিচ্ছেন। যা খুসী আপনি করতে পারেন। আমি আর কিছুই বলবো না।"

কিন্তু কেষ্টোর কিছু বলবার বা না বলবার জন্যে এখোন আর তাঁর কিছুই যায়-আসে না। প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু ইতিমধ্যেই প্রণব বাবু জেনে নিয়েছেন।

বিস্মিত হয়ে প্রণব বাবু লক্ষ্য করলেন, আসামী কেষ্টো রাগে, ক্ষোভে অভিমানে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, শুধু তাই নয়, সে টেবিলের কাণার উপর জোরে জোরে মাথা ঠুকতে শুরু করেছে। বিব্রত হয়ে প্রণব বাবু দরজার সিপাহীকে হুকুম করলেন, "এই দরজা-আ। লে যাও ইনকো বহুৎ জলদী। ইনকো জলদী হাজতমে ঘুসায় দেও।"

হুকুম পাওয়া মাত্র সিপাহী মহারাজ কেষ্টোকে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে টেনে এনে হাজত-ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে। দূর হ'তে হাজত-ঘরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে প্রণব বাবু সাফল্যের আনন্দে চক্ষু দুইটি একবার মুদ্রিত করলেন, কিন্তু তা ক্ষণেকের জন্যে। রাত্রের এই সাফল্য তাঁর কায তো কমালোই না, বরং তাঁর কাযের মাত্রা এতে আরও বাড়িয়েই দিল। বিশ্ববিখ্যাত ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন নব-নিযুক্ত অপরাধ-বিজ্ঞানবিদ অধ্যাপকের শান্ত এবং সৌম্যমূর্ত্তি থেকে থেকে তার চক্ষুর উপর উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল। প্রণব বাবু আর দেরী না করে কর্তৃপক্ষের কাছে এ সম্বন্ধে একটি স্মারকলিপি লিখতে বসলেন—যাতে করে তিনি খোকা বাবুর খোঁজে যা সত্বর সেখানে রওনা হতে পারেন।

ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়টি ভারতবর্ষের গৌরব বললেও অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীর নানা দেশ হ'তেই সেখানে ছাত্র এবং ছাত্রীগণ অধ্যয়ন করতে আসেন। প্রাচীন ভারতের অনুকরণেই বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিকল্পিত হয়েছে।

পরিব্রাজকের ছদ্মবেশে রাত্রি আট ঘটিকায় প্রণব বাবু শৈলেশ বাবুকে নিয়ে তথাকার পান্থশালায় এসে উপস্থিত হলেন।

ম্যানেজার বাবুকে তাঁদের আগমন-বার্ত্তা জানিয়ে প্রণব বাবু বললেন, "আমরা দু'জনাই কলিকাতা থেকে আসছি। য়ুনিভারসিটিতে রিসার্চ্চের কায করি। যদি দয়া করে এখানে থাকার বন্দোবস্ত করে দেন।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে ম্যানেজার বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তা আপনারা চিঠি লিখে এসেছেন?"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "আজ্ঞে না, এমনিই চলে এসেছি।"

বিরক্ত হয়ে ম্যানেজার বাবু বললেন, "আশ্চর্য্য লোক তো আপনারা? যদি এখানে সিট্ খালি না থাকতো তাহলে? তাহলে কি-ই মুস্কিলই আপনাদের হতো বলুন দিকি? যান, সোজা ঐ ঘরটাতে চলে যান। এবার যদি কখনও আসেন তো চিঠি লিখে তবে আসবেন।"

ম্যানেজার বাবু চলে গেলে চতুর্দ্দিকের বৈদ্যুতিক আলোকের সারির দিকে তাকিয়ে শৈলেশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এ তো দেখছি

স্যার, একটা মেকানিক্যাল টাউন, আমরা শুনেছিলাম প্রতিষ্ঠানটি একটি শান্তিপূর্ণ আশ্রম, কিন্তু তা তো এ নয়?"

প্রণব বাবু বললেন, "হ্যাঁ, আমিও তো তাই শুনেছিলাম। এ-ও শুনেছিলাম, যে মহাপুরুষ এই বিদ্যালয়ের প্রথম পরিকল্পনা করেন, তিনি চেয়েছিলেন স্বল্প পরিচ্ছেদে ও সাধারণ আহারে সন্তুষ্ট থেকে মাটীর ঘরে বাস করে গ্রাম্য আবহাওয়ার মধ্যেই ছাত্র-ছাত্রীরা এমন ভাবে উচ্চ-শিক্ষা লাভ করবে যাতে করে কি না শিক্ষা পেয়েও শিক্ষার অভিমান তাদের মধ্যে বর্ত্তাতে না পারে। যে পরিবেশের মধ্যে পল্লীর ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণতঃ মানুষ হয়ে থাকে, সেই একই পরিবেশের মধ্যে থেকে তারা বিদ্যাশিক্ষাও করবে এইটেই ছিল তাঁর মনের ইচ্ছা। কিন্তু এখানে এসে দেখছি, তাঁর এই ইচ্ছা উত্তরকালে ফলবতী হয়নি।

দূর থেকে একটা উৎকট ঘণ্টার আওয়াজ আসছিল। এর আগেও এইরূপ একটা ঘণ্টা বেজে গেছে। ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে শুনতে শৈলেশ বাবু বললেন, "কিন্তু, এটা যে স্যার উদ্যোগ-শিল্পের যুগ, আশ্রম বা কুটীর-শিল্প এ যুগে অচল, আশ্রমের বদলে নগর স্থাপন যুগেরই একটা স্বাভাবিক পরিণতি। এতো হতেই হবে, কিন্তু এতক্ষণ ধরে ঘণ্টা বাজে কেন? ঐ দেখুন স্যার, ম্যানেজার বাবু আসছেন। আবার হয়তো জিজ্ঞাসা করবেন, চিঠি লিখে আসিনি কেন?"

"আপনারা তো আচ্ছা লোক," রুক্ষ ভাবে ম্যানেজার বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "চিঠি লিখে তো আসেননি, আবার এখনও এখানে বসে রয়েছেন? শুনছেন না, খাবার ঘণ্টা পড়ছে। খেতে যাবেন না, আপনারা? যান, দু'খানা টিকিট কিনে আনুন। টিকিট না দেখালে খেতে দেবে না, তা জানেন?"

হতভম্ব হয়ে প্রণব এবং শৈলেশ বাবু ম্যানেজার বাবুর কথা শুনলেন। মানুষগুলোকে কি এরা মেশিন করে তুলেছে না কি? প্রণব বাবু বুঝলেন তাঁদের ধারণা অমূলক। আশ্রমবাসীরা পিছিয়ে তো নেই-ই বরং আধুনিকতার দিক্ হতে বর্ত্তমান কাল হতেও এঁরা এগিয়েই চলেছেন। অদৃষ্টের এমনিই পরিহাস! যুগধর্ম্মকে উপেক্ষা করে মানুষ করতে চায় এক, কিন্তু তা হয়ে যায় সম্পূর্ণ পৃথক্ আর একটি জিনিষ।"

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নির্দিষ্ট ঘরটায় ফিরে এসে প্রণব এবং শৈলেশ বাবু ঠিক করলেন খাটিয়া দুইটা বাইরে টেনে এনে তাঁরা শয়ন করবেন এবং গাছতলায় শয্যা রচনা করে তাঁরা স্থানটি যে আশ্রমই তা প্রমাণ করে দেবেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাঁরা সবেমাত্র শয়ন করেছেন, এমন সময় ম্যানেজার মশাই আবার সেখানে এসে হাজির। বোধ হয় চৌকিদারের মারফৎ খবর পেয়েই তিনি ছুটে এসেছেন, বিরক্ত হয়ে ম্যানেজার বাবু বললেন, "কি মশাই, চিঠি লিখে তো আসেননি, তার উপর আবার গাছতলায় শুচ্ছেন। শীঘ্র ভিতরে চলে যান।"

প্রণব এবং শৈলেশ বাবু যে সত্য সত্যই পরিব্রাজক এইরূপ অদ্ভুত ব্যবহার দ্বারা তাঁরা তা প্রমাণ করতে চাইছিলেন। শত অনুরোধেও তাঁরা তাঁদের নির্দ্দিষ্ট ঘরে আর প্রবেশ করতে চাইলেন না। তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, রাত্রের স্তব্ধতার মধ্যে স্থানীয় আবাসস্থলগুলি ভালোরূপে দেখে নেওয়া। ম্যানেজার বাবু কিন্তু নাছোড়বান্দা; চিঠি লিখে না আসা অথিতিদ্বয়ের এই ধৃষ্টতা তিনি কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। পরিশেষে নাচার হয়ে তিনি পুলিশের ভয়ও দেখালেন।

"সর্ব্বনাশ! পুলিশ? এখানেও তা হলে পুলিশ?" প্রণব বাবু ভাবলেন, এইবার পুলিশের হাতে পড়ে তাঁদের ছদ্মবেশ না খসে পড়ে। গোয়েন্দা পুলিশদের কপাল বা ভাগ্য এই রকমই। পরের হাতে নির্য্যাতন ভোগ তো তাঁরা করেনই, এমন কি নিজেদের লোকদের হাতে নির্য্যাতিত হওয়াও তাঁদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

উভয়কে চুপ করে থাকতে দেখে ম্যানেজার বাবু বললেন, "পুলিশ না হয় নাই ডাকলাম, কিন্তু ওখানে শুলে যে সাপে খাবে। চিঠি লিখে এলে জানতে পারতেন এখানে কি রকম সাপের উৎপাত। এতো গরমই যদি আপনাদের লাগে তো চলুন ২নং পান্থশালায়। ওখানে অধ্যাপক খোকন বাবুও এসে উঠেছেন। ওঁর পাশের ঘরটাই না হয় খুলে দেবো এখন।"

"অধ্যাপক খোকোন বাবু? কি বললেন? অধ্যাপক—" চমকে উঠে প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "উনি কিসের অধ্যাপনা করেন এখানে?"

বিস্মিত হয়ে ম্যানেজার বাবু বললেন, "আপনারা কোন্ কলেজের ছাত্র মশাই? অধ্যাপক খোকনের নামও শোনেননি। আপনারা বিশ্ব-ভারতী পত্রিকা পড়েন না? অপরাধ এবং অপরাধীদের সম্বন্ধে ওঁর মতন বিশেষজ্ঞ এ দেশে আর কে আছে? লাইব্রেরী থেকে পত্রিকা-গুলো নিয়ে ওঁর প্রবন্ধগুলি পড়ে ফেলবেন। অনেক সাধ্য-সাধনা করে ওঁকে এখানে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে। কাল বেলা তিনটেয় ইনিষ্টিটিউটের হলে ওঁর বক্তৃতা আছে। মনে করে শুনতে যাবেন। চিঠি লিখে আসবেন না তো এ সব জানবেন কি করে?"

প্রণব বাবু এতক্ষণে যেন নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন। ম্যানেজার বাবুকে ব্যস্ততার সহিত তিনি প্রশ্ন করলেন, "তা, অধ্যাপক খোকন এখানে আর কতো দিন পর্য্যন্ত আছেন, স্যার?"

ম্যানেজার বাবু বললেন, "অপরাধ-বিজ্ঞানের অধ্যাপনার জন্য তো ওঁকে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই বিভাগটি নূতন খুলবেন; কিন্তু তাতে উনি রাজী হচ্ছেন কৈ? দেখা তো যাক। তা, আপনারা এই ঘরেই শোবেন, না ২নং পান্থশালাতে যাবেন?"

প্রণব বাবু জানালেন, "না, এখানেই শোবো। আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। চিঠি লিখে যখন আসিনি, তখন এইটুকু অসুবিধা আর এমন কি?"

ম্যানেজার বাবুকে বিদায় দিয়ে প্রণব বাবু বললেন, "শুনলে তো শৈলেশ। তোমরা তো বিশ্বাসই করো না। এমন দ্বৈত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তি পৃথিবীতে খুব কমই দেখা যায়। অধস্তন পৃথিবীর মানুষের সহিত ঊর্দ্ধতন পৃথিবীর ঐ একই মানুষটির যেন কোনও সম্পর্কই নেই। এদের একটি মানুষ অপরাধী এবং অপরটি নিরপরাধ, অথচ দুইটি মানুষই একই দেহে বাস করে। শাস্তি পেতে হলে কিন্তু এদের এই দেহটিই তা পাবে এবং এর ফলে দেহ মধ্যে অবস্থিত এই দুইটি ব্যক্তিত্বই এ জন্য সমান ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এক জনের অপরাধের জন্য শাস্তি পাবে অপর আর এক জন। তাজ্জব ব্যাপার আর কি! যাকগে যাক্। যা হয় কাল উঠে করা যাবে

এখোন এসো তো একটু ঘুমিয়ে নি। এ তো আর থানা নয় যে কখোন এসে কে ডেকে তুলবে। এত দিন পরে নিশ্চিন্ত হয়ে যা হোক একটু ঘুমাতে পেলাম। আঃ আঃ!"

কোনওরূপ আর বাক্য-বিনিময় না করে স্ব স্ব শয্যায় শুয়ে উভয়েই এইবার চোখ বুজলেন। কিন্তু ঘুম এলো না। অচেনা জায়গায় মানুষ ঘুমাতে পারে না। কারণ অচেনা জায়গায় এসে মানুষ অসতর্ক হয়ে পড়ে প্রকৃতিরাণী তা চান না। চুপ করে শুয়ে শুয়ে প্রণব এবং শৈলেশ বাবু পরদিনের করণীয় কাজগুলি সম্বন্ধেই ভাবছিলেন। মধ্যে মধ্যে ঘুমের আমেজও যে তাঁদের না আসছিলো তা-ও নয়। এর মধ্যে একবার গাঢ় ভাবে ঘুমিয়ে পড়ে আবার কখন যে তাঁরা জেগে উঠলেন তা তাঁরা টেরও পাননি। হঠাৎ তাঁদের কানে এলো ভোরের কাকলি শব্দ। একটা কাক 'কা কা' করে ডেকে যাওয়ার পরই সুরু হলো পাখীর কিচিমিচি আওয়াজ। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া তাদের গায়ে এসে পড়ছে। জোর ক'রে কে যেন আবার তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিতে চায়। কিছুক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করে পুনরায় উভয়ে গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন।

কতক্ষণ তাঁরা ঘুমিয়েছেন, কে জানে! এক ঝলক রৌদ্রও তাঁদের মুখে, বুকে ও হাতে এসে পড়ছে। পাখীর কাকলির বদলে মনুষ্য-কণ্ঠের কলধ্বনি তাদের কানে এলো। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চেয়ে উভয়েই অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছেন। একটা হাই তুলে প্রণব বাবু বললেন, "কি হে, তুমিও এই উঠলে না কি? ওদিকে খবর পেয়ে বেটা সরে না পড়ে।"

অপ্রস্তুতের সহিত শৈলেশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানেই ওকে গ্রেপ্তার করবেন না কি?"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "পাগোল, তাই কখনো হয় না কি? সমস্ত ভারতবর্ষ এই স্থানটিকে পবিত্র মনে করে। আশ্রমের গুরুজীর মত বড় কবি ও দার্শনিক সারা পৃথিবীতে আর এক জনও নেই। সমস্ত ভারতবর্ষ নব্য যুগের এই ঋষিকে শ্রদ্ধা করে থাকে। এঁর এই পবিত্র আশ্রমে রক্তপাত করা একেবারেই চলবে না। আমাদের ওকে ফলো করে করে আশ্রমের বাইরে এসে তবে ওকে গ্রেপ্তার করতে হবে। কিন্তু খুবই সাবধান-দেখো, খোকার সামনে না গিয়ে পড়ি আবার। ও যেন কোনও রূপে আমাদের না দেখতে পায়; দেখতে পেলেই কিন্তু সর্ব্বনাশ!"

বেশ-ভূষা শেষ করে প্রণব বাবু ভাবছিলেন শৈলেশ বাবুকে নিয়ে একটু বার হবেন। কিন্তু কোন্ পথে যে বার হবেন তা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। কোনটি যে প্রবেশ-পথ এবং কোনটি যে নির্গমনের পথ, রাত্রের অন্ধকারে তাঁরা ঠিক ঠাওর করেও নেননি। একটু এগিয়ে আসতেই একসঙ্গে অনেকগুলি কণ্ঠস্বর তাঁরা শুনতে পেলেন। পাখীর কাকলি-কূজনের ন্যায়ই কারা কথা বলে চলেছে।

ভড়কে গিয়ে শৈলেশ বাবু বললেন, "বাগানের মধ্যে বোধ হয় হোষ্টেলের মেয়েরা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এধার দিয়ে বার হবেন স্যার?"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "দোষ কি তাতে? তা এতে ওঁরা কিছু মনে করবেন না।"

কক্ষের বাহিরের অলিন্দার উপর এসে দাঁড়ান মাত্র প্রণব এবং শৈলেশ বাবুর সকল ভুলই ভেঙে গেল। একটা বটবৃক্ষের নিয়ে এই সময় ছেলে-মেয়েদের ক্লাশ হচ্ছিলো। এক পার্শ্বে ছেলেরা এবং অপর পার্শ্বে মেয়েরা বসে পড়াশুনা করছে। মধ্যস্থলের একটি আসনে বসে অধ্যাপক অধ্যাপনা করছেন। হঠাৎ প্রণব বাবু লক্ষ্য করলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের সহিত অধ্যাপকও দাঁড়িয়ে উঠলেন। বিস্মিত হয়ে প্রণব বাবু এবং শৈলেশ বাবু লক্ষ্য করলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্রেটারীর পিছন পিছন সেখানে এসে গেছেন স্বয়ং খোকা বাবু ওরফে অধ্যাপক খোকন।

তাড়াতাড়ি কনুইএর একটা গুঁতা দিয়ে শৈলেশ বাবুকে পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে প্রণব বাবু নিজেও পিছিয়ে এলেন, তার পর উভয়েই কক্ষ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অতি সন্তর্পণে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালেন।

এর পরই সুরু হলো খোকা বাবুর এখানকার পাঠ্য-রীতির পরিদর্শন। সেক্রেটারী বিমলানন্দ বাবু খোকা বাবুকে বুঝাচ্ছিলেন, "প্রত্যক্ষরূপ শিক্ষা প্রদান, ইংরাজীতে যাকে বলে 'ডিরেক্ট মোড অব টিচিং', তাই হচ্ছে এখানকার শিক্ষারীতি। হাউস মানে বাড়ী, এই ভাবে আমরা শিক্ষা দিই না। আমরা সোজাসুজি বাড়ীটাকেই দেখিয়ে বলি, এইটেই হচ্ছে হাউস্। এই দেখুন না, ডলি-ই!"

একটি ছোট্ট মেয়ে নিকটেই দাঁড়িয়েছিল। এগিয়ে এসে সে উত্তর করলো, "জী-ই।" অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলেন," হুইচ ইজ দি ট্রি?" একটি বৃক্ষকে স্পর্শ করে ডলি উত্তর করলো, "দিইস ইজ দি ট্রি।" এইবার অধ্যাপক বললেন, 'ক্লাইম্ব অন দি ট্রি।' হুকুম পাওয়া মাত্র বালিকাটি বৃক্ষের একটা শাখার উপর উঠে পড়ে বললো, "আই ক্লাইম্ব অন দি ট্রি।"

প্রণব বাবু এবং শৈলেশ বাবু সাবধানে লক্ষ্য করলেন, গাছে উঠার এই দৃশ্য খোকা বাবুকে উতলা করে দিলে। বিড়াল-চৌর্য্যবৃত্তিতে অভিজ্ঞ খোকা বাবুর বোধ হয় তাঁর পূর্ব্ব-কথা মনে প'ড়ে গেল। এইরূপ কতো বৃক্ষে আরোহণ করে তিনি দ্বিতল বা ত্রিতল ছাদে উঠে গৃহস্থদের অর্থ অপহরণ করেছেন। বেশ বুঝা গেলো, খোকন বাবুর অন্তরের মধ্যে একটা দুর্দ্দমনীয় অপস্পৃহা এসে যাচ্ছে। খোকা বাবু এই গাছটাতেই যেন উঠে প'ড়ে তাঁর এই অন্তর্দ্বন্দ্বের নিরসন করতে চান।

অস্ফুট স্বরে প্রণব বাবু বলে উঠলেন, "এই খেয়েছে। গণ্ডগোল বাধলো আর কি। উঁহু শৈলেশ, প্রস্তুত থেকো। হয়তো এখুনিই ওকে 'ফলো' করতে হবে।"

উত্তরে শৈলেশ বাবু বললেন, "না স্যার, ঐ দেখুন সামলে নিচ্ছে। মুখ-চোখ ওর আবার স্বাভাবিক হয়ে এলো।"

খোকা বাবু চলে গেলেও প্রণব এবং শৈলেশ বাবু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির হলেন না। আসলে তাঁরাই যেন অপরাধী এবং খোকা বাবু এক জন নিরপরাধ ভদ্রলোক। শুধু তাই নয়, এক জন সর্ব্বজনবরেণ্য পণ্ডিতও বটে।

এমনি আরও ঘণ্টা কয়েক অতিবাহিত হওয়ার পর শৈলেশ বাবু বললেন, "মধ্যাহ্ন ভোজনেরও সময় হয়ে এসেছে। খাদ্য-সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় টিকিট এর মধ্যে সংগ্রহ না করলে আবার চিঠি না লিখে আসার জন্যে দশটা কৈফিয়ৎ শুনতে হবে। তা ছাড়া আমরা এখানে এসেছি দর্শকরূপে। এখোন একটু-আধটু এধার-ওধার ঘুরে বেড়ানও দরকার। তা না হলে আমরাই লোকের কাছে সন্দেহ-জনক হয়ে উঠতে পারি।"

শৈলেশ বাবুর এই কথায় যথেষ্ট যুক্তি ছিল। প্রণব বাবু আর দেরী না করে বললেন, "হাঁ, সে কথা ঠিক। তবে এসো, বেরিয়েই পড়ি।"

বিভিন্ন ভবন ও শিক্ষায়তনগুলি পরিদর্শন করে সর্ব্বাধ্যক্ষের আশ্রম-ভবনে এসে উভয়ে দেখলেন, গেটের এক পাশে লেখা রয়েছে, "প্রবেশ নিষেধ।" তাঁরা ভাবছিলেন ভিতরে প্রবেশ করবেন কি না! এমন সময় এক বিদেশী ছাত্র এসে তাঁদের জিজ্ঞাসা করলো, "আপনারা কি ভিতরে যেতে চান? তা যান না, দেখে আসুন।"

একটু ইতস্ততঃ করে প্রণব বাবু "প্রবেশ নিষেধ" লিখনটির প্রতি ছাত্রটির দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। হো হো করে হেসে উঠে বিদেশী ছাত্রটি বলে উঠলো, "ওঃ, এই জন্যে? দেখুন, আমাদের গুরুদেব কখনও স্কুলে যাননি, তাই এতো ডিসিপ্লিনও (নিয়মতান্ত্রিকতা) তিনি পছন্দ করেতন না। আপনি স্বচ্ছন্দে ভিতরে যেতে পারেন।"

হঠাৎ আবার ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠলো। বিদেশী ছাত্রটিও আর দেরী না করে স্থানত্যাগ করলো, বোধ হয় ঐ ঘণ্টারই আহ্বানে। একটু হেসে শৈলেশ বাবু বললেন, "স্থান সম্বন্ধে এদের বাধা-নিষেধ বা ডিসিপ্লিন জ্ঞান না থাকলেও সময় সম্বন্ধে তা বেশ আছে। একমাত্র এই ব্যাপারেই দেখছি, পাশ্চাত্য এবং পূর্ব্বদেশীয় সভ্যতার এখানে মিলন ঘটান হয়েছে। এতো ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে বাস করতে হলে আমি তো পাগলই হয়ে যেতাম।"

সর্ব্বাধ্যক্ষের বাস-ভবনের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবেশ করে প্রণব এবং শৈলেশ বাবু যা দেখলেন, তাতে তাঁরা অবাকই হয়ে গেলেন। বিশ্ববরেণ্য মনীষী, কবি ও দার্শনিক সর্ব্বাধ্যক্ষের সঙ্গে অধ্যাপক খোকন বাবু মোটরে উঠছেন। খোকন বাবুর এই ভাগ্যে প্রণব এবং শৈলেশ বাবুর ক্রোধ এলো না, এলো ঈর্ষ্যা। এক জন স্থানীয় কর্ম্মচারী এতোক্ষণ শৈলেশ এবং প্রণব বাবুর গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন। তিনি এইবার এগিয়ে এসে বললেন, "আজ্ঞে, এখানে তো সভা হবে না।' আপনারা সভায় যাবেন তো? বক্তৃতা-ভবনে সভা হবে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গুরুদেবের সঙ্গে খোকন বাবু সভায় পৌঁছিবেন। আপনারা যান, সোজা এই রাস্তা ধরেই চলে যান!"

উভয়েই বুঝলেন, এখানে অপেক্ষা করা আর সমীচীন নয়। তাড়াতাড়ি তাঁরা স্থান পরিত্যাগ ক'রে বক্তৃতা-ভবনে এসে উপস্থিত হলেন।

বক্তৃতা-ভবন বা ইনিষ্টিটিউট্ হল বলতে এখানে একটি বৃহৎ প্রাসাদোপম ভবনের সম্মুখের উদ্যানই বুঝায়। রৌদ্র বা বৃষ্টি না হলে সভা-সমিতি হলঘরে না হয়ে বৃক্ষরাজি শোভিত উন্মুক্ত প্রান্তরেই তা হয়ে থাকে। বক্তৃতা ভবনের সংলগ্ন উদ্যানে সেই দিন আর তিল ধারণেরও স্থান নেই। অধ্যাপক খোকনের বক্তৃতা শুনবার জন্যে ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকার ভিড় তো আছেই এ ছাড়া দূর দূর গ্রাম হ'তেও বহু লোক এসে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। মানুষ মাত্রেরই অবচেতন মনে কম-বেশী অপরাধ-স্পৃহা বর্ত্তমান। এই জন্যেই বোধ হয় অপরাধ এবং অপরাধীদের গল্প শুনতে মানুষ মাত্রেরই ভালো লাগে।

ধীরে ধীরে সমাগত জনতার কলধ্বনি থেমে এলো। প্রণব এবং শৈলেশ বাবু চেয়ে দেখলেন, বর্ত্তমান ভারতের শীর্ষস্থানীয় ঋষিতুল্য সর্ব্বাধ্যক্ষের সঙ্গে বক্তৃতা-মঞ্চে এসে খোকা বাবু আসন গ্রহণ করছেন।

সহস্র হস্তের করতালি-ধ্বনির মধ্যে ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাধ্যক্ষ দণ্ডায়মান হয়ে খোকন বাবুর সহিত শ্রোতৃমণ্ডলীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে জানালেন, "যদি আম-পাতা এঁকে তার তলায় লিখে দাও কাঁটাল-পাতা, তা হলে সে আমও নয় কাঁটালও নয়, সে তোমার মনের পাতা। আজ ইনি যা আপনাদের শুনাবেন তা আপনারও কথা নয়, আমারও নয়, আমাদের কাউরই তো নয়ই এমন কি তা ওঁর নিজের কথাও নয়, তা মানুষ মাত্রেরই অন্তরের গোপনতম স্তরের কথা। এখোন আমি অধ্যাপক খোকনকে অনুরোধ করছি, এইবার তিনি আমাদের এই গোপন তথ্য শুনাতে থাকুন।

করতালির মধ্যে আশ্রম-গুরু বসে পড়লে, তেমনি করতালির মধ্যেই অধ্যাপক খোকন বক্তৃতা করতে উঠলেন। মুগ্ধ হয়ে জনতা খোকন বাবুর বক্তৃতা শুনতে থাকলেন। খোকন বাবুর বক্তৃতার ভঙ্গিতে প্রণব এবং শৈলেশ বাবুও কম মুগ্ধ হননি।

জলদ-গম্ভীর স্বরে খোকা বাবু জানাচ্ছিলেন—"নিরপরাধদের দর্শনের ন্যায় অপরাধীদেরও এক পৃথক্ দর্শন আছে। ইহাকে বলা হয় অপরাধ-দর্শন। উপদেশাদির দ্বারা তাদের এই দর্শন যে ভুল তা প্রমাণ না করলে অপরাধীদের নিরপরাধ করা অসম্ভব। ধরুন, আমার যদি খাদ্য না থাকে তা হলে কি আমি অপরের খাদ্য হ'তে কিছুটা ভাগ নিতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি। যদি তোমার খাদ্যের অভাব ঘটে এবং তুমি যদি সেই খাদ্য আয়ত্তের মধ্যে পেয়েও অপহরণ না করো তা হলে তুমি বোকা। প্রয়োজনের সময়, প্রত্যেক জিনিষই প্রত্যেকের—এই বিশেষ সত্যটি অনুধাবন করো এবং সুখী হও। অপরাধীদের এইরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস পরিবর্ত্তন করতে হলে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে। আসলে যে দেশে চোরের সংখ্যা কম থাকে, সেই দেশকেই সুশাসিত দেশ বলা যেতে পারে। দেশের অভাব ও দারিদ্র্য যে পরিমাণে কমে যাবে, সেই পরিমাণে দেশের চোরের সংখ্যাও কমবে। কিন্তু পৃথিবীতে চোরেদের প্রয়োজন আছে! ঈশ্বর তাদের পাঠিয়েছেন লোভী ধনি-সম্প্রদায়কে শাস্তি দেবার জন্যে। এরা ঈশ্বর-প্রেরিত দূত মাত্র। এ ছাড়া এই চোর-ডাকাত না থাকলে জজ সাহেবরাই বা কিরূপে দিন গুজরাণ করতেন? অপরাধীদের এই সকল উক্তিকেই অপরাধ-দর্শন বলা হয়। অবশ্য এই সকল মতবাদ আমার নিজের না, এইগুলি অপরাধীদের মুখ হ'তেই আমি শুনেছি।"

খোকন বাবু তখনও তাঁর বক্তৃতা শেষ করেননি। এই অপরাধ-দর্শন সম্বন্ধে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আরও অনেক কিছু তাঁর বলবার কথা। কিন্তু মধ্যপথে হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ প্রণব এবং শৈলেশ বাবুকে দেখে তিনি বিব্রত হয়ে উঠেছেন। মুহূর্ত্তে তাঁর এই বিব্রত ভাব ক্রোধে পরিণত হলো এবং অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তাঁর আকৃতিরও আমূল পরিবর্ত্তন ঘটলো, তাঁর প্রকৃতির পরিবর্ত্তন তো ঘটলোই! তাঁর পশু-সুলভ চাহনি এবং ক্রূর ভাব দেখে কেউ আর বিশ্বাস করতে পারলো না যে এই লোকটিই এতক্ষণ বক্তৃতা করছিলেন। সম্মুখের একটি আসনে মায়ের কোলে বসে একটি শিশুও তার বক্তৃতা শুনছিল। হঠাৎ খোকন বাবুকে এইরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করতে দেখে সে ভয়ে চীৎকার করে উঠলো। হঠাৎ শিশুটিকে কেঁদে উঠতে দেখে, জানি না, কেন, খোকন বাবু

প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলেন এবং খোকা বাবু পুনরায় অধ্যাপক খোকন বাবুতে রূপান্তরিত হলেন। অপ্রস্তুত হয়ে খোকা বাবু বলে উঠলেন, "কিছু মনে করবেন না, এটা অভিনয় মাত্র। এইবার আপনাদের মানুষের অন্তর্নিহিত অপস্পৃহার কথা বলবো। উগ্র অপস্পৃহার হঠাৎ আগমনে মানুষের প্রকৃতি তো বদলায়ই, এমন কি এমনি করে তার আকৃতি পর্য্যন্তও বদলে দিতে পারে। এখানে যদি কোনও পুলিশ অফিসার থাকেন এবং তাঁরা যদি আমাকে এক জন খুনে ডাকাতরূপে ভুল করে আমাকে গ্রেপ্তার করতে চান, তাহলে কিন্তু তাঁরা ভুলই করবেন কিংবা তাঁরা যদি আমার প্রতি গুলী বর্ষণও করেন, অবশ্য সেইরূপ চেষ্টা করলে হয়তো শ্রদ্ধেয় সভাপতি মশায়ই নিহত হবেন। আমি তাদের সাবধান করে দিচ্ছি, তাঁরা যেন এই ভাবে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হবার চেষ্টা না করেন।"

বক্তৃতার শেষাংশটি শ্রোতৃমণ্ডলী ঠাট্টার সামিলই মনে করে নিলেন। কেউ কেউ উচ্চহাস্যও করে উঠলেন। দুই-এক জন আবার এ-ধার ও-ধার চেয়েও দেখলেন, সত্য সত্যই কোনও টিকটিকি পুলিশের আবির্ভাব হয়েছে কি না?

"ওহে শৈলেশ" প্রণব বাবু চুপি-চুপি শৈলেশ বাবুকে জানালেন, "বেটা বলে কি শোনো। বেটা চিনেছেই যখন, তখন একটু এগিয়েই যাওয়া যাক্। তুমি ততক্ষণে বক্তৃতা-মঞ্চের পিছনে গিয়ে দাঁড়াও। আমি ওর ঠিক ডান পাশে এসে দাঁড়াবো। বক্তৃতা শেষ করেই কিন্তু ও ঠিক সরে পড়বে।"

উত্তরে শৈলেশ বাবু বললেন, "তা হলেই হয়েছে আর কি। এখানে গুলী-বিনিময় করা অসম্ভব, স্যার। একটাও যদি ছিটকে এসে গুরুদেবের গায়ে লাগে, তা হলে আর ইতিহাস তৈরী করতে হবে না। গুরুদেবের অসংখ্য ভক্তদের হাতে পড়ে আমাদেরও নিহত হতে হবে, ডালহাউসী স্কোয়ার পর্য্যন্ত আর পৌঁছুতে হবে না।"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "চুপ করো। ঐ দেখো, আর দেরী নেই, শীগ্‌গির এগিয়ে যাও, শীগ্‌গির—এসো, এসো, আর একটু দেরী করলেই, মৃত্যু।"

উভয়ে এইবার ভীত হয়েই খোকন বাবুর দিকে তাকালেন। খোকা বাবুর এইরূপ ভীষণ মূর্ত্তি পূর্ব্বে তাঁরা কখনও দেখেননি। খোকা বাবুর মুখের ও গ্রীবার পেশীসমূহ স্ফীত হয়ে উঠেছে এবং চোখ দু'টো হয়ে গেছে কোটরগত। মুখটাও যেন তাঁর ছুচলা হয়ে উঠলো। সমাগত সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে খোকন বাবু চীৎকার করে উঠলেন "তুই কি আমাকে কিছুতেই ভালো ভাবে থাকতে দিবি না? তোকে শেষ করে দিতে পারলেই আমি বরাবরের জন্যই নিরাময় হয়ে যেতাম। তবে রে শয়তান, এইবার দেখ, তোর আমি করি কি।"

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলে খোকা বাবু আধুনিক যুগের কোনও অস্ত্রই ব্যবহার করতেন না। সনাতন ছুরিকাই তখন হতো তাঁর একমাত্র অস্ত্র। নিমেষে আস্তিনের তলা হতে ছুরিখানা বার ক'রে একবার মাত্র সেটা ঘুরিয়ে দিয়ে প্রণব বা'বুর মস্তক লক্ষ্য করে সাঁ করে সেটা ছুঁড়ে দিলে।

প্রণব বাবু এতক্ষণে বক্তৃতা-মঞ্চের দক্ষিণ দিকের একটি বৃক্ষের নিম্নে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ছুরিখানা তীরবেগে ছুটে এসে প্রণব বাবুর মস্তকের কেশ ঘেঁসে বৃক্ষের কাণ্ডের উপর আমূল ভাবে বিদ্ধ হয়ে গেল।

শৈলেশ এবং প্রণব বাবু যে প্রস্তুত হয়েই সেখানে এসেছেন খোকন বাবুর বুঝতে তা আর বাকি থাকেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরের বাইরে গুর্খা সৈন্য থাকাও অসম্ভব নয়, তা ছাড়া এই ঘটনার পর সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীও তাঁদের সাহায্য করতে পারে। খোকা বাবু অচিরে তাঁর কর্ত্তব্য স্থির করে নিলেন। তিনি এখোন আর খোকন নন, পুরাপুরিই তিনি খোকা বাবু। পুনরায় তাঁর ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটেছে। সম্যক্‌রূপে বিষয়টি সকলের বোধগম্য হবার পূর্ব্বেই তিনি উপরের দিকে একটা উল্লম্ফন দিলেন এবং তার পর শূন্যের উপরই একটা ডিগবাজী খেয়ে বিকটরূপ একটা চীৎকার করে নিকটের বৃক্ষের একটা নীচু ডালের উপর এসে দাঁড়ালেন। তার পর ক্রমান্বয়েই উপরের দিকে উঠে পরিশেষে মগডালের উপর এসে বসলেন। জনতার মধ্যে অনেকেই বৃক্ষের উপর যে কে উঠলো তা বুঝতে পারেননি। কেউ কেউ তাঁকে মানুষরূপে দেখলেও পাগোলই মনে করলো। এদিকে বহু লোকই এসে বৃক্ষের তলায় জড় হয়েছে, কেউ কেউ ইট-পাটকেলও ছুঁড়তে থাকে। খোকা বাবুর কিন্তু কিছুতেই আর ভ্রুক্ষেপ নেই। কিছুক্ষণ এ-গাছ ও-গাছ করে কোথায় যে তিনি উধাও হয়ে গেলেন, তা কেউ আর টেরও পেলেন না।

কালো সন্ধ্যা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ফুরালো প্রথম দিন, অনাত্মীয় আত্মীয়ের চোখে
পাণ্ডুর বিহ্বল কোনো শিকারীর মতো চোখ রেখে।
শ্রান্ত ভীষ্ম, ক্লান্ত ভীম; নত মুখ অস্থির অর্জ্জুন:
বিগত দিনের স্মৃতি মৃত্যু হ'য়ে প্রেম দিলো ঢেকে!

শিবিরে শিবিরে সূর্য্য অস্তমিত! মিটি মিটি জ্বলে
হিংসার স্তিমিত শিখা। পরিত্যক্ত পথচারী একা
কর্ণ খোঁজে;—সূর্য্যহীন অন্ধকার জাহ্নবীর তীরে
একদা প্রার্থনা শেষে কার সাথে হ'য়েছিলো দেখা?

ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, ভগদত্ত সন্ধ্যারতি শোনে;
দূরে কোনো দিক্‌চক্র রেখা হ'তে বিস্মৃত পাখীর
অতি মৃদু গান আসে। রণক্লান্ত অশান্ত মননে
ওঠে জ্ব'লে গৃহপ্রান্তে দীপ-শিখা অক্লান্ত রাত্রির।

একাকী শকুনি তৃপ্ত; কুরুক্ষেত্রে আহতের ভীড়ে
খোঁজে সে মৃত্যুর পাশা।...তৃপ্ত আর শ্রীকৃষ্ণ, শিবিরে।

শেয়ার বাজারের মন্বন্তর

শ্রীকালীপ্রসাদ ঠাকুর

দিন যায় রাত্রি আসে। রাত্রি প্রভাতে আবার নূতন সূর্য্যের উদয় হয়। মানুষের জীবনে এমনি ধারা কত সহস্র দিন-রাত্রি আসে যায় যাহার হিসাব রাখার মানুষ কোন আবশ্যক বোধ করে না। প্রকৃতির একটা নিয়ম বই তো অন্য কিছু নয়।

তবুও মানুষের জীবনে কোন কোন দিনকার স্মৃতি যেন সুপ্ত হইয়াও লুপ্ত হয় না, বিস্মৃতির অতল তলে সে দিনগুলির ঘটনাবলি তলাইয়া যায় না। এমনি একটি দিন বিগত ১৯৪৬ সনের ১৬ই আগষ্ট। মুসলিম লিগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" দিবস। সে দিনের কথা ভারতবাসীর মনে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ে চিরদিন জাগরুক থাকিবে। সে দিনের রক্তপাতে কত সোনার ছেলের জীবনাহুতি এবং কত স্বর্ণ লুণ্ঠিত হইল ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিবে নিশ্চয়ই, কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে দিনগুলি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবার খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিল না—সে থাকিবে মানুষের মনে মসীলিপ্ত।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মূল অভিসন্ধি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে কি না তার বিচার করিবেন রাষ্ট্রনৈতিক সমালোচকেরা। সে সমালোচনার দিন আসতে এখনও বিলম্ব আছে। মুসলিম লিগের সার্ব্বভৌম বাংলার কল্পনা বাস্তবে পরিণত হয় নাই। বাংলা আজ খণ্ডিত। আমাদের আলোচনা সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক—রাজনীতির আওতার বাহিরে। তবুও প্রশ্ন উঠে, অর্থনৈতিক আলোচনার সহিত রাজনীতির কি কোনই সংশ্রব নেই? রাজনীতির প্রভাব কি অর্থনীতির উপর ছায়াপাত করে না? হয় তো করে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে "অনাস্থা প্রস্তাব" নাকচ হওয়ার সাথে সাথে পাটকলের শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন-ক্ষমতা কংগ্রেস গ্রহণ করায় পুঁজিপতিরা ব্যস্ত হইয়া উঠেন। এ তো সে দিনের কথা। আর এইরূপ হওয়াটাকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কেন না, শেষ পর্য্যন্ত দেশের অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা রাজনীতিজ্ঞরাই নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। তা ছাড়া ইহার আরও একটা দিক আছে যাহা একেবারে ভুলিলে চলিবে না। মানুষ অনেক সময় রাজনৈতিক পর্দ্দার অন্তরালে যাহা কিছু ভাবিয়া থাকে তাহারই রূপ দিতে চায় অর্থনৈতিক ব্যবহারে। ধনী ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গি অভিনব। রঙ্গিন কাচের চশমা চোখে দিলে যেমন সব কিছুই রঙ্গিন দেখায় তেমনি ধনীরা দুনিয়ার সব কিছুরই পরিমাপ করেন টাকা-পয়সার ওজনে। কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় গভর্ণমেন্ট গঠন হওয়ায় ভাল-মন্দের কথা তলাইয়া দেখিবার অবসর তাঁহাদের থাকে না, তাঁরা শুধু ভাবেন হয়তো বা কয়েকটি জন-মঙ্গল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সরকারের হাতে চলিয়া যাইবে। বাঙ্গালা দেশে জমীদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধনে বাঙ্গালীর যথার্থ কোন উপকার হইবে কি না সে কথা তাঁরা ভাবিয়া দেখেন না, তাঁরা শুধু ভাবেন, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন হইলে তাঁহাদের "মেদিনীপুরের জমিদারী কোম্পানীতে" যে টাকা লাগান আছে তাহার পরিমাপ কম হইয়া যাইবে কি না? আরজেনটাইনে ভাল ফসল হইলে বা যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপানে ভূমিকম্প হইলে শেয়ার বাজারে পাটকল ও তুলার কলের শেয়ারের দাম বাড়িয়া যাইত। কেন না, আরজেনটাইনে ভাল ফসল হইলে ভারতবর্ষ হইতে বস্তার রপ্তানীর আধিক্য হইবে আর ভূমিকম্পের ফলে জাপানের তুলার কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ভারতের বাজারে জাপানী মালের আমদানি কম হইবে, ফলে ভারতীয় কারখানাজাত মালের বিক্রয় বৃদ্ধি পাইবে।

১৯৪৬ সালের শেষার্দ্ধ শেয়ার বাজারের বেপারীদের কাছে চিরস্মরণীয় থাকিবে। এই বৎসরে শেয়ার বাজারের দর এরূপ ভাবে বৃদ্ধি পায় যাহার কাছে পূর্ব্ব-পূর্ব্বকার সব শেয়ারের দরের পরিমাপ নগণ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। আবার এই সময়েই শেয়ারের দাম এমন ভাবে নামিয়া যাইতে থাকে যাহা পূর্ব্বে কল্পনারও অতীত ছিল! এক কথায় শেয়ার বাজারের দর হাউইবাজির মত উর্দ্ধে উঠিয়া এক তৃণখণ্ডের ন্যায় ভূপতিত হয়। কি ভাবে এই শেয়ার বাজারের দর উঠা-নামা করিয়াছিল নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহার কিছু আভাষ পাওয়া যাইবে।

শেয়ারের নাম	শেয়ার প্রতি আদায়ী টাকার পরিমাণ	বাজার দর ১৪-১২-৪৫	বাজার দর ২৫-৭-৪৬	বাজার দর ১৪-৮-৪৬	১৪-১২-৪৫ হইতে দর বৃদ্ধির শতকরা পরিমাণ	নিম্নতম দর ২৬-১১-৪৬	মূল্যহ্রাসের শতকরা পরিমাণ
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	১০০৲	১৫৮৷৹	১৭৭৷৹	১৭৪৲	১২	—	—
বেঙ্গল কোল	১০০৲	৮৩৪৲	১২০০৲	১১৭০৲	৪৪	৯৬০৲	২০
হাওড়া জুট	১০৲	১১৮৷৶০	১৬৮৲	১৭১৲	৪৫	১৩০৲	২৪
বরাহনগর জুট	৬৫।৬৬৲	৩৭১৲	৭০০৲	৭০০৲	৮৯	৫০০৲	২৮
ইঃ আয়রণ	১০৲	৪৮৸৴	৭০৷৴০	৬৬৷০	৪৫	৪৮৲	৩১
ষ্টীল করপোরেশন	১০৲	৪৩।০	৬৩।৴০	৬০৲	৪৬	৪০৲	৩৬
বৃটিশ ইণ্ডিয়া করপোরেশন	১৲	৮৷৶০	১৮৸০	১৮৷০	১২৫	১০৷০	৫৫
ন্যাশনাল টুব্যাকো	১০৲	৩৮৲	৭৫৲	৮৪৲	১২১	৬০৲	২৮
ক্যাল্ক কোং	১০৲	৩৫৶	৪৪৲	৪২৲	২৬	২৯৲	৩৪
টিটাগড় পেপার	১০৲	৩৭৸০	৮৫৷৶০	৯০৲	১৩৭	৬০৲	৩৩১/৩
শোন ভ্যালী	৫৲	—	২৫৷০	২৩৲	—	১৬৲	৩৬
ইণ্ডিয়া ষ্টিম	১০৲	—	৩০৶০	৩১৷০	—	১৯৲	৫১
ইঃ কপার	২ শিঃ	৫৷০	—	৬৸০	২২	৪৷০	৩৩১/৩
মেদিনীপুর জমিঃ	১০০৲	২০৯৲	—	২১০৲	৪	১৪৫৲	৩৩
পাত্রাকোলা টি	১০০৲	১৫০০৲	—	২০৪০৲	—	১৪০০৲	১২
ডানবার কটন	১০০৲	৪৫৭৲	—	৭০০৲	৫৩	৪৬০৲	৩

উপরোক্ত তালিকা হইতে ইহা লক্ষ্য করা যায় যে ফাট্‌কাবাজির শেয়ারগুলির দর যথা, হাওড়া, ইণ্ডিয়ান আয়রণ প্রভৃতি গড়পড়তা শতকরা ৪৫৲ টাকা বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য শেয়ারের দর তাই বলিয়া কিছু পড়িয়া থাকে না। টিটাগড় শেয়ারের দাম শতকরা বৃদ্ধি পায় ১৩৭৲ টাকা, ন্যাশনাল টুব্যাকো ১২১৲ টাকা আর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া করপোরেশনের দাম বাড়ে শতকরা ১২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। শেয়ার বাজারের দর কেন এমন ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল এ প্রশ্ন সাধারণতঃই আমাদের মনে জাগে। ইহার যথাযথ উত্তর দিতে হইলে আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন সেই সব কারণ—যাহার জন্য ফাট্‌কাবাজদের ছাড়াও সাধারণ লগ্নিদারদের নিকট শেয়ার বাজার বেশ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। শেয়ার বাজারের কার্য্যাবলি সম্বন্ধে অর্থনৈতিকেরা একমত হইতে পারেন নাই। বিপক্ষ দল বলেন ইহা এক প্রকার জুয়ার আড্ডা। সেখানে বড় বড় দালালরা বাজার দরের এরূপ উঠা-নামা করায় যাহার ফলে জনসাধারণ উহার প্রতি আকৃষ্ট হয়—যে ভাবে আকৃষ্ট হয় উইপোকা আগুনের দিকে। এই সম্প্রদায়ের মতে শেয়ার বাজার অর্থনীতির দিক দিয়াও কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য সমাধান করে না—ধর্ম্মনীতির দিকটা না হয় ছাড়িয়াই দিলুম; কেন না, বস্তুতঃ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ধর্ম্মনীতির কোন স্থান নাই।

সপক্ষ দলের বক্তব্য শেয়ার বাজার একটা বাজার ভিন্ন অন্য কিছু নয়। শাক-সব্‌জি, মাছ-মাংস, জামা-কাপড় প্রভৃতির যেমন নানাপ্রকার বাজার আছে সেখানে তরি-তরকারি খাবার-দাবার জিনিষ-পত্র ক্রয়-বিক্রয় হয় তেমনি শেয়ার বাজারে জনসাধারণ একত্রিত হয় নানাপ্রকারের শেয়ার কোম্পানীর কাগজ কেনা-বেচা করিবার জন্য। বছর খানেকের মধ্যে কলিকাতা শেয়ার বাজারে যে বিবর্ত্তন হইয়া গেল তাহার ফলে বিপক্ষ দলের যুক্তি অনেকাংশে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে দৈনন্দিন মুদ্রা-স্ফীতির চাপে পড়িয়া সাধারণ গৃহস্থ যথাসম্ভব পরিশ্রম করিয়াও দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। যাঁহারা কর্ম্ম-জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পেন্‌সন্‌ ভোগ করিতেছিলেন বা যাঁহারা নিজেদের সঞ্চিত অর্থের আয়ের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, তাঁহারা সেই অর্থের দ্বারা সংসার ভরণ-পোষণ করিতে যথেষ্ট ক্লেশ পাইতেছিলেন। এই সম্প্রদায়ের কাছে শেয়ার বাজার এক অভিনব স্থানরূপে দেখা দেয়—যেখান কিছু না করিয়া কিছু পাওয়া যাইত। যুদ্ধের সময়ে প্রবর্ত্তিত নানাবিধ বিধি-নিষেধের জন্য কার্য্যতঃ সকল প্রকার ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যায়। যাহা কিছু কারবার অবশিষ্ট ছিল তাহাও এখন সরকারের কুক্ষিগত হইয়া পড়ে। মুদ্রা-স্ফীতির জন্য চলতি নোটের পরিমাপ দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলে। টাকা কেউ ঘরে রাখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে না; তাই অধিকাংশ সঞ্চিত অর্থই শেয়ার বাজারে আসিয়া জমা হয়।

এই সময়ে অবিশ্যি সরকারী ঋণে বহু অর্থ নিয়োজিত হয়। তাই বলিয়া কোনও সময়ে শেয়ার বাজারে অর্থের টানাটানি অনুভব করা যায় নাই। যুদ্ধের সাত বছরের মধ্যে সরকারী ঋণে যে টাকাটা আবদ্ধ হইয়াছিল তাহার পরিমাণ একেবারে নগণ্য নয়। ১১৩৮।৩৯ সনে সরকারী ঋণের পরিমাণ ছিল ১২০৫.৭৭ কোটি মুদ্রা আর ১১৪৪।৪৫ সনে সরকারী ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৮১১.০২ কোটি টাকা অর্থাৎ নিট নিয়োগের পরিমাণ হয় ৬১৩'২৭ কোটি টাকা মুদ্রা।

১১৪৫ সনে যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার বাজারে এক বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং দিনে দিনে শেয়ারের দর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১১৪৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব বাহির হইলে শেয়ার বাজারের অবস্থায় বিশেষ উন্নতি হয়। আশাতিরিক্তরূপে আয়করের লাঘব হয়। অতিরিক্ত মুনাফা-কর সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যাওয়ায় বাজারের অবস্থা "তেজী" হয় এবং প্রতিদিনই শেয়ারের দর দুই-এক টাকা করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জনসাধারণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির পূর্ব্বেকার আয় যদি বজায় থাকে আর অতিরিক্ত মুনাফা-করের চাপ কমিয়া যায় তাহা হইলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের অংশীদারদিগকে অধিকতর মুনাফা দিতে সক্ষম হইবে। উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে এই কারণেই টিটাগড় পেপার, বৃটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন, ন্যাশনাল টোব্যাকো প্রভৃতি কোম্পানীগুলির শেয়ারের দর শতকরা ১৩৭৲, ১২৫৲, ১২১৲ হারে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়।

বাজারের এই উন্নতির পথে সরকারের ঋণ-গ্রহণ নীতি যথাসম্ভব সহায়তা করে। ফলে শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের মুনাফার উপর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। ১১৪৫ সালের শেষে শেয়ার বাজারের যে দর ছিল তাহা হইতে নিম্নোক্ত মুনাফা লাভ করা যাইত—

শেয়ারের নাম	১১৪৫ সনের ডিভিডেণ্ট শতকরা	মুনাফা শতকরা
বেঙ্গল কোল	৩৬	৪'৩১
হাওড়া	৩৫	২'১৬
ইণ্ডিয়ান আয়রণ	১৭'৫	৩'৬৪
বৃটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন	২৫	৩'১২
কেরু এণ্ড কোং	১৫	৪'২৮
টিটাগড় পেপার	৩০	৪'০৫
মেদিনীপুর জমিদারী	৮৲	৩'১৮
পাত্রাকোলা টি	৬০	৪
ডানবার	১২	২'৬২

সমসাময়িক কালে ৩৷০ দরের কোম্পানীর কাগজের মূল্য ছিল ১০৩৲ আর ৩ টাকা দরের কাগজের দর ছিল ৯১।০। উভয় ক্ষেত্রে মুনাফা হইত শতকরা ৩.৩১৪ এবং ৩.০০৪ টাকা মাত্র। এই ভাবে দেখা যায়, সেদিনকার খরিদারগণ শেয়ারের জন্য শতকরা ৪ টাকা ও কোম্পানীর কাগজের উপর শতকরা ৩ টাকা গড়পড়তা লাভ পাইলে সন্তুষ্ট হইত।

ইতিমধ্যে সরকারের ঋণগ্রহণ নীতি বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়। বছরের পর বছর ঋণের পরিমাণ উত্তরোত্তর যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকে সাথে সাথে সুদের পরিমাণ তেমনই হ্রাস পাইতে থাকে। ১১৪০ সালের জুন মাসে তিন টাকা সুদের ১১৪৩ সনের বণ্ড বিক্রয় হয় শতকরা ১ টাকা বর্দ্ধিত হারে। ইহা অল্প-মেয়াদী ঋণ। কেন্দ্রীয় সরকার ইহার পর একে একে তিন টাকা সুদের অনেকগুলি ঋণ গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে উহার মেয়াদ ৫ বছরের জায়গায় ১৫ বছর হইয়া পড়ে।

১১৪৬ সালের মে মাসের ২৪ তারিখে সরকার ঘোষণা করেন যে, সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখের মধ্যে ৩৷০ টাকা সুদের সমস্ত

কোম্পানীর কাগজ ৩ টাকা সুদের কাগজে পরিবর্ত্তিত হইবে। এই ঘোষণার সহিত গুজব রটে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দাদনের হারও পরিবর্ত্তিত হইবে। উপরোক্ত দুই কারণে শেয়ার বাজারের অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। তখনও শেয়ারের উপর মুনাফা কোম্পানীর কাগজ হইতে কিঞ্চিৎ বেশী ছিল। সুতরাং ক্রেতার নজর শেয়ারের উপর পড়ে। সরকার যখন সাফল্যের সহিত শতকরা ২।• টাকা সুদে ১৯৪১ সালে ঋণ গ্রহণ করিলেন তখন বাজারের বদ্ধমূল ধারণা হইল, শেয়ারের মুনাফার অঙ্ক চিরদিনের জন্যই কমিয়া গেল। তখন সচরাচর শোনা যাইত যে ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর অতি শীঘ্রই ৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইবে। সত্য সত্যই ১৯৪৬ সনের ২৫শে জুলাই উহার দর ৭০I/• টাকা হয়।

গত বছরের শেষার্দ্ধের মাঝখানে কলিকাতা শেয়ার বাজারের অবস্থা বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। তখন লক্ষ্য করা যাইত, দালালদের ব্যবহারের কী বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! যুদ্ধের পূর্ব্বে এমন কি যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরও দালালরা ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ব্যাঙ্ক ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ও লগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলির দরজায় দরজায় হানা দিত। কিন্তু এই সময় তাহাদিগকে কাজের জন্য এমন ভাবে আর ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইত না। বস্তুতঃ দালালরা তখন খুবই কর্ম্মব্যস্ত থাকিত। সাধারণতঃ শেয়ার বাজার খোলা হইত মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের জন্য, তাহারই ভিতর তাহাদের করিতে হইত সহস্র সহস্র কেনা-বেচার কাজ। বড় বড় লেন-দেন লইয়াই তাহারা ঘামিয়া উঠিত, ছোট-খাট ব্যাপারী তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন কাজ করিয়া উঠিতে পারিত না। ফলে কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েসনের টিকিটের দাম যাহা ছিল কিছু দিন পূর্ব্বে টিকিট-প্রতি ৮০ হাজার টাকা, তাহাই হইল ১৯৪৬ সনে ২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা।

এই সময় যদি কোন বুদ্ধিমান দালালের নিকট কেনা-বেচার পরামর্শ চাওয়া যাইত, সে বলিত নূতন করিয়া কোন কিছুতে হাত দেবেন না, সমস্ত শেয়ারই এখন বড় বেশী দামের হইয়া আছে। পরের দিনই দেখা যাইত শেয়ারের দাম আরও একটু বাড়িয়া গিয়াছে। যাহারাই আগের দিনে কিছু কিনিয়াছিল তাহারাই আজ কিছু মুনাফা করিয়া লইল। বাজারের যখন এই অবস্থা, তখন ক্রেতারা কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে? বাজারে এখন কেনা-বেচার হিড়িক পড়িয়া গেল। ফলে কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ারের মধ্যে লাভের পার্থক্য বিশেষ কিছু রহিল না।

নিম্নে তালিকা দেওয়া গেল :—

শেয়ারের নাম	প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের সমসাময়িক দাম	শতকরা লভ্যাংশ
বেঙ্গল কোল	১২০০৲	৩
হাওড়া জুট	১৭১৲	২.০৪
ইঃ আয়রণ	৭০I/•	২.৫
বিঃ ইঃ করপোরেশন	১৮।•	১.৩১
কেন্দ্র কোং	৪৪৲	৩.৪
টিটাগড় পেপার	৯০৲	৩.৩৩
মেদিনীপুর জমিদারী	২১০৲	৩.৮
পাত্রাকোলা টি	২০৪০৲	২.১৪
ডানবার কটন	৭০০৲	১.৭

এই ভাবে শেয়ারের মুনাফার পরিমাপ শুধু কমিয়াই ক্ষান্ত রহিল না—কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন হাওড়া, বিঃ ইঃ করপোরেশন, ডানবার প্রভৃতি মুনাফার অংশ কোম্পানীর কাগজ হইতেও হ্রাস পাইল।

শেয়ার বাজারের এই মতিচ্ছন্ন ফাটকাবাজি চালু রাখিতে ব্যাঙ্কগুলি কম সাহায্য করেনি। যুদ্ধের প্রয়োজনে নানাবিধ বিধি-নিষেধের প্রবর্ত্তনে ব্যবসায়-বাণিজ্য সরকারের হাতে চলিয়া যায়। ইহার ফলে ব্যাঙ্কগুলির দাদনের ক্ষেত্র ক্রমশঃই সঙ্কুচিত হইয়া শুধু কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ারের উপর আসিয়া বর্ত্তে। মুদ্রা-স্ফীতির জন্য ব্যাঙ্কগুলির নিকট গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ যতই বেশী হইতে লাগিল শেয়ারের উপর দাদন দেওয়া ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কয়েক বৎসর যাবৎ ব্যাঙ্কগুলির নিকট শেয়ার বাজারের দালালরা এক প্রকার সম্ভ্রান্ত গ্রাহক বলিয়া পরিগণিত হইত। সাধারণের নিকট যখন শেয়ারের উপর বাজার দরের শতকরা ৬০৲ টাকা ঋণ দেওয়া হইত, তখন দালালরা পাইত শতকরা ৭০৲ টাকা পর্য্যন্ত। তাহার উপর ইহারা পাইত আর এক প্রকার সুবিধা। যে সমস্ত চেক তাহারা তাহাদের খাতায় জমা দিত সেই সমস্ত চেকের, "ভাঙ্গান" পাওয়ার আগেই তাহারা উহার উপর চেক কাটিতে পারিত। অনেক ক্ষেত্রে অবিশ্যি ইহাতে কোন অসুবিধা হইত না। কারণ যে সমস্ত চেক জমা দেওয়া হইত সবগুলি চেকই একই সময়ে ফেরত হইত না। কিন্তু কোন কোন ব্যাঙ্ক এই ব্যাপারে কিছুটা বাড়াবাড়ি করিত! রামের চেকের উপর রহিমের চেক পাশ করিলে ক্ষতির সম্ভাবনা কম থাকে। রামের চেকের উপর রামেরই চেক পাশ করা রামকে বিনা বন্ধকে টাকা ধার দেওয়ারই সামিল।

দালালদের তৃতীয় নম্বরের সুবিধা ছিল কোম্পানীর কাগজ গচ্ছিত রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দাদন হারের নিম্ন সুদে টাকা ধার নেওয়া। বহু ক্ষেত্রে এই সকল ঋণের পরিমাণ লক্ষ লক্ষ টাকা হইত। এই সকল ঋণের উপর ইহাদিগকে শতকরা বার্ষিক ২৲, ২।• বা ২৸• হারে সুদ গুণিতে হইত। কোম্পানীর কাগজে ৩৲ মুনাফা পাওয়া যাইত। টাকার পরিমাণ বেশী হওয়ায় অল্প লাভে দালালরা দু'পয়সা এই প্রকারে কামাইয়া লইত।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের পরেই ব্যাঙ্কগুলি টাকা-পয়সা লেন-দেন ব্যাপারে বেশ একটু সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। ব্যাঙ্কগুলির কার্য্য-কলাপ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেন সত্য সত্য কোন গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। রাতারাতি তাহারা সুদের হার বাড়াইয়া ক্ষেত্র বিশেষে শতকরা ৪৲ টাকা কিংবা ৫৲ টাকা স্থির করিল। শুধু তাই নয়, শেয়ারের বাজার দরের উপরে দালালদের তাহারা শতকরা ৭০ টাকার পরিবর্ত্তে ৬০৲ টাকা মাত্র দাদন দিতে লাগিল। শেয়ারের উপর নূতন দাদনের প্রস্তাব কার্য্যতঃ প্রত্যাখ্যান করা হইতে লাগিল। পুরাতন দেনাদারদের উপর চাপ দেওয়া হইতে লাগিল তাহাদের হিসাব মিটাইবার জন্য। ব্যাঙ্কের পরিচালকবৃন্দ কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিতেন না, কেন তাঁহারা এই প্রকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলে আধ-আধ ভাষায় উত্তর দিতেন—রাজনৈতিক অবস্থার জন্য এই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। কারণ যাহাই হউক, এ কথা স্থিরীকৃত হইয়া গেল যে রাজনৈতিক আবহাওয়া অর্থনৈতিক ভাবধারাকে বিষাক্ত করিতে পারে। শেয়ার বাজারের দর এমন

পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়াছিল যে, একটুমাত্র আঘাতেই তাহা ভূলুণ্ঠিত হইতে পারিত। আর সেই সুযোগ আনিয়াছিল আগষ্ট মাসের কলিকাতার নারকীয় হত্যাকাণ্ড। বাজার দর যে এক দিন নামিবে সে সন্দেহ অনেকের মনে জাগিয়াছিল, কিন্তু সে কবে এবং কি ভাবে তাহা কেউ সঠিক ধারণা করিতে পারে নাই। আর এত শীঘ্রই যে সে সময় উপস্থিত হইবে তাহা ধারণারও অতীত ছিল। যখন সেই বিপদ সত্য সত্যই আসিয়া পড়িল, তাড়াতাড়ি যে যাহার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে তৎপর হইয়া উঠিল। এই ব্যস্ততায় কোনও সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা গেল না। যে সব ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারিবৃন্দ বাজার ও তাহাদের গ্রাহকদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক খবর রাখিত তাহারা তত ব্যস্ত হইল না। অপর পক্ষে সেই সব ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর তেমন জ্ঞান ছিল না তাঁহারাই অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলি শেয়ার বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। বিক্রেতার সংখ্যা কম বেশী হওয়ায় শেয়ারের দর আরও নামিয়া যায়। ১৯৪৬ সনের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে অবস্থা যাহাতে আরও খারাপ না হইয়া পড়ে সেই জন্য শেয়ার বাজারের পরিচালকবৃন্দ শেয়ারের সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে লাগিল যে, এই ব্যবস্থা ভালই হইল। যে সমস্ত শেয়ারের কাজ শুধু কলিকাতা শেয়ার বাজারে হইত— যেমন, পাটকল ও কয়লা খনির শেয়ারগুলি, তাহাদের সম্বন্ধে বলা যায়, সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দেওয়ায় মন্দ হয় নাই। অপর পক্ষে যে সব শেয়ার বোম্বাই বাজারেও ক্রয়-বিক্রয় হয়—যেমন, ইঃ আয়রণ, ইঃ কপার, তাহাদের অবস্থা অন্য রকম দাঁড়াইল। বোম্বাই বাজারে কোন বাঁধা-ধরা দর না থাকায় শেয়ারের দাম সেখানে সত্যিকারের চাহিদার উপর নির্ভর করিত। এই কারণে দেখা গেল, যদিও কলিকাতা শেয়ার বাজারে ইঃ আয়রণের দর ছিল শেয়ার প্রতি ৪৮৲ টাকা, বোম্বাই বাজারে উহার দর ছিল ৪৬৲ টাকা মাত্র। বোম্বাই বাজারের দর সুবিধা থাকায় কলিকাতায় শেয়ার-প্রতি ২৲ টাকা বেশী দরে কোন ক্রেতাই পাওয়া যাইত না। ফলে খোলাখুলি ভাবে ইঃ আয়রণের কোন কাজই হইত না। কাট্‌নী বাজারে বোম্বাইয়ের দরের সহিত তাল রাখিয়া এই শেয়ারের কেনা-বেচার কাজ হইত।

'বাজার এই ভাবে কেন পড়িয়া গেল?' এই প্রকারের প্রশ্ন সে সময় খুবই উঠিত। এ প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া যাইত নানা প্রকারের উত্তরদাতার প্রকৃতি ও ধারণার তারতম্যে।

শেয়ার দর প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে তার "ডিভিডেণ্ড" দেবার ক্ষমতার উপর। আর সেই "ডিভিডেণ্ড" দেবার ক্ষমতা নির্ভর করে নানাবিধ ঘটনার উপর। কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন জিনিষের যদি বাজারে খুব কাট্‌তি থাকে, বিদেশজাত দ্রব্যের সহিত যদি প্রতিযোগিতা করিতে না হয় বা সেই প্রতিযোগিতার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য যদি সরকারের রক্ষা-কবচরূপে প্রয়োজন অনুযায়ী শুল্ক প্রবর্ত্তিত হয় তবে সেই প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত ডিভিডেণ্ড দিতে সক্ষম হয়। এইরূপ ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের ব্যবসায়-বাণিজ্যে এমন কিছু ঘটে নাই যাহার জন্য শেয়ার বাজারে এই প্রকার বিবর্ত্তন সম্ভব হইতে পারে। প্রথমত কাপড়ের কলের কথা বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যদিও আমরা জাপানীদের নিকট হইতে কিছুটা প্রতিযোগিতা আশঙ্কা করিতে পারি তথাপি এ কথা ঠিক যে, যুদ্ধান্তে নিজের প্রয়োজন মিটাইয়া ইংরেজ ব্যবসায়ীরা খুব বেশী মাল রপ্তানী করিতে পারিবে না। তাহার উপর লক্ষ্য করিতে হইবে যে জাপান হইতে কোন প্রকার প্রতিযোগিতা হইবার আশঙ্কা আজ আর নাই। বর্ত্তমানে বর্ম্মা, মালয় এমন কি অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচুর কাপড় রপ্তানীর সুযোগ রহিয়াছে। এই সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিলে ভারতীয় কাপড়ের কলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে। যদি ভারতীয় মিল-মালিকেরা আমাদের দেশের প্রয়োজন মত বিবিধ কাপড়ের চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হয়, তবে ভারতবাসী স্বদেশী জিনিষ ছাড়িয়া বিদেশী জিনিষের ফাঁস সাধ করিয়া কেন গলায় পরিতে যাইবে?

যদি ইয়োরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে কল-কারখানার যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় তবে অতিরিক্ত মুনাফার কর বাবদ সরকারের নিকট হইতে যে মোটা টাকা ফেরত পাওয়া যাইবে তাহা দ্বারা নূতন নূতন জিনিষ প্রস্তুত করা কিছুমাত্র কঠিন হইবে না।

চিনির কলগুলির সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। জাভা হইতে আমরা আগামী কয়েক বৎসর অবধি কোনরূপ প্রতিযোগিতা অনুভব করিব বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানে আমাদের নিজের দেশে চিনির যে চাহিদা তাহাই চিনির কলগুলি মিটাইতে পারিতেছে না। এই কারণে সরকার প্রত্যেক প্রদেশে চিনির কল স্থাপনের জন্য উৎসাহ দিতেছেন।

চা-বাগানগুলি সম্বন্ধে একই কথা সাজে। বর্ত্তমান বছরের জানুয়ারী মাস হইতে সরকার ব্যক্তিগত ভাবে চা রপ্তানীর বাধা-নিষেধ তুলিয়া দেওয়ায় চায়ের দাম প্রতি পাউণ্ডে ।৵০ হইতে ।০ আনা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যুদ্ধোত্তর কালে যদি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান করিতে হয় তবে লোহা, সিমেণ্ট ও কয়লার প্রয়োজন অত্যধিক। আমরা চাই নূতন নূতন রাস্তা-ঘাট, কল-কারখানা, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদক যন্ত্রপাতি—যাহার জন্য ঐ সব জিনিষের চাহিদা হইবে বিরাট।

পাটকলের কথা বিশদ ভাবে না বলিলেও চলিবে। বাঙ্গলা দেশ পাটের একমাত্র পরিবেশক। তবু কেন শেয়ারের দর নিম্নগামী? সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দেওয়ায় শেয়ারের উপর মুনাফা নিম্নলিখিত ভাবে দাঁড়াইয়াছে—

শেয়ারের নাম	সর্ব্বনিম্ন দর	মুনাফা—শতকরা
বেঙ্গল কোল	৯৬০৲	৪'১
হাওড়া জুট	১৩০৲	৩'৫
ইঃ আয়রণ	৪৮৲	৩'১
বিঃ ইঃ করপোরেশন	১০।০	২'৩
কেক কোং	২৯৲	৫
টিটাগড় পেপার	৬০৲	২'৩
মেদিনীপুর জমিদারী	১৪৫৲	৫'১
পাত্রাকোলা টি	১৮০০৲	৪'৩
ভানবার কটন	৪৬০৲	৩'৫

আগষ্ট মাসের হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গড়পড়তায় শেয়ারের উপর কম করিয়া শতকরা ২।০ টাকা মুনাফা হইত, কোন কোন ক্ষেত্রে উহা ৬৷০ আনা পর্য্যন্ত দেখা যাইত। সেই মুনাফা আগষ্ট বিপ্লবের পর গড়পড়তায় দাঁড়াইল ৩।০ আনা মাত্র। কোন কোন

ক্ষেত্রে শতকরা ৫৮/° টাকা পর্যন্ত। শুধু মুনাফা বৃদ্ধি পাইলে কি হয়? বাজারের অবস্থার ইতর-বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইতেছিল না। বাজারে ক্রেতার অভাব। যাহারা সাধ্যাতীত ক্রয় করিয়া বসিয়াছিল তাহারা সেই সুযোগ খুঁজিতেছিল—যাহাতে মুহূর্তে শেয়ারগুলি বিক্রয় করিয়া মূলধন বজায় রাখিয়া বাহির হইয়া আসা যায়। আজও অবস্থা একই রূপ। এই মনোবৃত্তি যত দিন বজায় থাকিবে তত দিন বাজারের অবস্থার উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। যাত্রীরা নামিয়া না গেলে যেমন পথচারীর পক্ষে ট্রামে-বাসে উঠা কষ্টকর, তেমনি নূতন ক্রেতার আবির্ভাব না হইলে বিক্রেতার বাহির হইয়া আসা এক প্রকার অসম্ভব। তাই বলিয়া এ কথা ভাবা যায় না যে, শেয়ার ক্রয় করিবার উপযুক্ত অর্থ বাজারে নাই। এই তো সেদিন 'জার্ডিন হ্যাণ্ডারসনে'র শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য কি উন্মাদনা দেখা গেল। প্রয়োজনের দ্বিগুণ অর্থ সংগ্রহ করিতে কোম্পানীর বিন্দুমাত্র বেগ পাইতে হয় নাই। অবস্থা ভাল হইলে এই ভাবে যে অর্থের আমদানী হইবে না, এ আশঙ্কা করিবার উপযুক্ত কারণ নাই।

এ যাবৎ টাকা-পয়সার উৎস ছিল ব্যাঙ্কগুলি। তাহারা হঠাৎ হাত-টান করায় টাকা-পয়সার বাজারে অনেকটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যে সকল ব্যাঙ্ক সুদের অঙ্ক বৃদ্ধির সাথে দাদনের অংশও কমাইয়া দিয়াছে তাহাদের কার্য্য কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না। শেয়ার বাজারের আলোড়ন সত্য সত্যই টাকার বাজারে হাহাকার সৃষ্টি করতে পারে নাই। ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে চাহিবা মাত্রই "দেয়" টাকার সুদের হার এখনও শতকরা বার্ষিক ৷৹ মাত্র, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, দাদনের হার ৩ টাকাই রহিয়াছে।

সুদের হার বাড়াইবার পক্ষে যদিও বা কোন প্রকার যুক্তি দেখান যায়, দাদনের পরিমাণ কমান কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে। শেয়ার বাজারে দর যখন বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার উপরে নামমাত্র কিছু হাতে রাখিয়া সমস্ত টাকাটাই দেনাদারকে দিতে পারিলে অবস্থার একটা বিশেষ রকম পরিবর্তন ঘটান যাইত। বিপক্ষে যুক্তি দেওয়া যায় আজ যাহা বাজারে সর্ব্বনিম্ন দাম, কাল যে তাহাই বজায় থাকিবে এমন তো আশা করা যায় না? যদি সত্য সত্য শেয়ারের দাম আরও পড়িয়া যায় তাহা হইলে ব্যাঙ্কগুলিকে বিশেষ ভাবে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রকার অচল অবস্থার হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে প্রয়োজন—ব্যাঙ্ক ও শেয়ার বাজারের পরিচালকদের মধ্যে একটা খোলাখুলি আলাপ-আলোচনার বিনিময়। ব্যাঙ্কগুলি যদি তাহাদের হাত অল্প পরিমাণে ঢিলে করে তাহা হইলে শেয়ার বাজারে পক্ষাঘাত-গ্রস্ত ব্যবসায়ীরা নূতন শক্তি লাভ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এমন অনেক চালু শেয়ার আছে যাহার উপর অধিকাংশ ব্যাঙ্ক ধার দেন না। এই সমস্ত চালু শেয়ারের উপর ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এমনও দেখা যায়, একই শেয়ারের উপরে সমস্ত ব্যাঙ্কগুলি ধার দেন না। ইহার জন্য ব্যবসায়ীদের কম অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির উচিত একই ব্যবসা-পদ্ধতি অবলম্বন করা।

সব কিছু বলা-কওয়ার পরে এই কথাই সত্য বলিয়া মনে হয় যে, অর্থনৈতিক ব্যাপারে সত্যাসত্যের কোনই স্থান নাই। সচরাচর দেখা যায় যে, সমস্ত শেয়ারের প্রকৃতই কোন মূল্য নাই তাহাদের দরও ফাট্‌কাবাজির আওতায় পড়িয়া দিনের পর দিন বাড়িয়া চলে। এ-ও দেখা যায়, প্রকৃত ভাল শেয়ারের দর বিনা কারণে হ্রাস পাইয়া থাকে। একবার দর বাড়িতে থাকিলে অন্ততঃ কিছু কাল যাবৎ সেই দর বাড়িয়াই চলে আর যদি ঐ দর হ্রাস পাইতে থাকে তাহা হইলে তাহাকে থামা দেওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এক কথায় বলা যায়, বিশ্বাসই বিশ্বাস আনয়ন করে অন্যথায় নয়। বর্ত্তমানে শেয়ার বাজারের ইহাই সমস্যা। ক্রেতারা বিশ্বাস হারাইয়া ফেলার জন্য শেয়ার বাজারে নূতন ভাবে অর্থ নিয়োজিত হইতেছে না, ফলে লেন-দেন বন্ধ। ক্রেতার অভাব হওয়ার জন্য শেয়ারের চাহিদাও নাই, যাঁহারা ক্রয় করিয়া বসিয়াছে, তাঁহারাও বিক্রয় করিতে পারিতেছেন না। এই ভাবে এক অচলায়তনের সৃষ্টি হইয়াছে।

বিগত ২৬শে নভেম্বর কলিকাতা শেয়ার বাজারের কমিটি শেয়ারের সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দেন। কমিটির এই কার্য্য সর্ব্বসম্মতি ক্রমে হইলেও সবাই ইহার পক্ষে মত দেয় নাই। যাহারা ইহার পক্ষে মত দিয়াছিল তাহারা বলেন, ঐ সময়ে শেয়ারের দর বাঁধিয়া না দিলে দর এমন ভাবে পড়িয়া যাইত যাহার ঘাত-প্রতিঘাতে অনেকেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইত। যদিও প্রথম প্রথম এই শ্রেণীর লোকের কথা সত্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল, শেষ পর্য্যন্ত ইহার সার্থকতা বজায় রহিল না। বাজারের অচল অবস্থার জন্য যাহারা কষ্ট সহ্য করিয়া শেয়ার ধরিয়া বসিয়াছিল তাহারা উহা আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। নিত্য-নূতন বিক্রয়ের চাপে শেয়ারের দর আরও নামিয়া যাইতে লাগিল, বাঁধা-ধরা দামে কাজ করা বন্ধ হইয়া গেল। কাটনি বাজারে ফাট্‌কা শেয়ারের দর—যথা, ইঃ আয়রণ, ষ্টিল করপোরেশন, হাওড়া প্রভৃতি, ৬৲।৮৲ টাকা কম হইয়া দাঁড়াইল।

অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় কমিটি ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে পাটকল, কয়লা এবং ইঃ আয়রণ ব্যতীত আর সমস্ত শেয়ারের দরের উপর বিধি-নিষেধ তুলিয়া লইলেন। ফলে সমস্ত শেয়ারের দরই আরও নামিয়া গেল—ব্যাঙ্ক, ইন্‌সিওরেন্স ও প্রেঃ শেয়ারও বাদ পড়িল না।

নিম্নে ক্ষুদ্র তালিকা দেওয়া গেল—

শেয়ারের নাম	প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পূর্ব্বকার দর	৬-২-৪৭ তারিখের দর	মূল্য হ্রাসের শতকরা হিসাব
শোন ভ্যালী সিমেণ্ট	২৫৷৹	১৩৸৹	৪৬
ইঃ ষ্টীম সিপ	৩৯৷৹	১৬৲	৫১
মেদিনীপুর জমিদারী	২১০৲	১৩৪৲	৩৬
ইঃ কপার	৬৸৹	৩৸৹	৪৪

যে সমস্ত শেয়ারের দর বাঁধিয়া দেওয়া ছিল, তাহাদের প্রকৃত বাজার দর অনেক কম ছিল। যদিও ইঃ আয়রণের দর বাঁধা ছিল শেয়ার-প্রতি ৪৮৲ টাকা উহার দর "কাটনী" বাজারে ছিল শেয়ার-প্রতি ৪২৲ টাকা মাত্র।

অল্প কয়েক দিন পরে কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন বাজারের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশিত হয়। শেয়ার বাজারের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নিদারুণ ভাবে। গত বছর অতিরিক্ত মুনাফা-কর রহিত হওয়ায় শেয়ার বাজারে যেমন উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছিল তেমনি নূতন বছরে ব্যবসারে উপর শতকরা ২৫৲ টাকা কর ধার্য্য

হওয়ায় বাজারের দ্রুত অবনতি ঘটিতে থাকে। দেশের বড় বড় ব্যবসায়ী, অর্থনীতিবিদ্ দালাল প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে এই কর নিয়োগের বিরুদ্ধে অভিমত জানান। তাঁহারা বলেন, এই কর নিয়োগের ফলে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প-প্রচেষ্টা চিরতরে ব্যাহত হইবে।

দেশবাসীর এই প্রবল প্রতিবাদের ফলে আয়করের পরিমাণ শতকরা ২৫৲ টাকা স্থলে ১৬৲ টাকা ১০ আনা ৮ পাই ধার্য্য হয়। আয়করের লাঘব হওয়া সত্ত্বেও শেয়ার বাজারের দরের ইতর-বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেল না, বরং দিনের পর দিন শেয়ারের দর নামিতেই থাকে। "কাটনী" বাজারে ইঃ আয়রণের দর নামিয়া দাঁড়াইল শেয়ার-প্রতি ৩৬৲ টাকা মাত্র আর হাওড়া পাটকলের শেয়ারের দাম হইল শেয়ার-প্রতি ১০৲ টাকা মাত্র। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিষয়টা একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, শেয়ার বাজারের এই প্রকার অবনতির বিশেষ কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। নূতন আয়কর ধার্য্য হইবার পূর্ব্বের অবস্থা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ব্যবসায়ের আয়ের শতকরা ৩৭।০ টাকা দিতে হইত সরকারকে কর হিসাবে গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ছিল শতকরা ৩২।০ টাকা মাত্র। বাদ বাকী ৩০৲ টাকা দিতে হইত অংশীদার-দিগকে "ডিভিডেণ্ট" বাবদ। শতকরা ২৫৲ টাকা মুনাফা-কর ধার্য্য হইলে, মোট করের পরিমাণ দাঁড়াইত শতকরা ৫৭৲ টাকা মাত্র। গচ্ছিত অর্থের খাতে যাইত শতকরা ১২৲ টাকা কিন্তু অংশীদারদের পাওনার পরিমাণ বজায় থাকিত শতকরা ৩০৲ টাকা হারে। পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত প্রস্তাব অনুযায়ী এই করের পরিমাণ দাঁড়াইবে নিম্নলিখিত ভাবে :

মোট করের পরিমাণ শতকরা ৫০৲ টাকা মাত্র। মোট গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ শতকরা ২০৲ টাকা মাত্র। মোট "ডিভিডেণ্টের" পরিমাণ শতকরা ৩০৲ টাকা মাত্র। সুতরাং লক্ষ্য করা যাইবে যে, লিয়াকৎ আলী খাঁ সাহেবের ব্যবস্থায়ও অংশীদারগণ যাহাতে শতকরা ৩০৲ টাকা ডিভিডেণ্ট পাইতে পারেন তাহার পথে কোন বাধার সৃষ্টি করা হয় নাই। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি যদি পূর্ব্বের মত মুনাফা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয় তবে শুধু মাত্র সরকারের কর ধার্য্য নীতির চাপে পড়িয়া তাহাদিগকে অল্প পরিমাণ ডিভিডেণ্ট দিতে হইবে না। ব্যবসায়ী মহল, দালালবৃন্দ হয়ত এ কয়টি কথা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিবার মত অবকাশ পান নাই। তাহা না হইলে শুধু মাত্র "বাজেটের" জন্য তাঁহাদিগকে এমন ভাবে নিরাশ হইতে হইত না।

তবু আশাবাদী মানুষ সহজেই নিরাশ হইতে চায় না। বর্ত্তমানে শেয়ার বাজারের যে অবস্থা, মনে পড়ে এমনি অবস্থা হইয়াছিল ইহার বছর দশেক আগে ১১৩৭ সনে। সে দিনও শেয়ার বাজারে মানুষের আনাগোনা খুবই ছিল। ব্যবসায়ী মহল মনে করিত, শেয়ার বাজারে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যায়। বিক্রেতা ও ক্রেতার প্রতিযোগিতার ফলে সে বছরেও এপ্রিল মাসে ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর শেয়ার-প্রতি হইয়াছিল ৭৯৫০ টাকা পর্য্যন্ত। হঠাৎ বাজার পড়িয়া যায়। বিক্রেতার চাপ এমন হইল যে সেই আয়রণের দর এপ্রিল মাসের শেষে দাঁড়াইল ৪৩৷০ আনায়। তার জন্য আয়রণের দর চিরকালের জন্য ৪৩৷০ আনায় নিশ্চল থাকে নাই। বাজার আবার উঠিয়াছে। এখনও আমরা ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারি—যদি শেয়ার বিক্রয় না করিয়া থাকিতে পারা যায়। বাজার কখনও এমন ভাবে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় থাকিতে পারে না। আর তার জন্য চাই নূতন ব্যবস্থা—নূতন পন্থা।

শেয়ার বাজারকে এই দুর্যোগ হইতে রক্ষা করিতে হইলে চাই সোজা খোলাখুলি ব্যবস্থা। আর সেই ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করা উচিত ছিল এক দিকে ব্যাঙ্ক আর অন্য দিকে দালালবৃন্দের। ব্যাঙ্কের সাহচর্য্য ব্যতিরেকে বাজারের অবস্থা ভাল করা খুবই শক্ত হইয়া উঠিবে। শেয়ার বাজারের কর্ণধারেরা হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে, সর্ব্বনিম্ন দাম বাঁধিয়া দিলেই এ যাত্রা রেহাই পাওয়া যাইবে। সে বিশ্বাস তাহাদের একান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সর্ব্ব-নিম্ন দর বাঁধিয়া দেওয়ার সব চেয়ে বড় ক্ষতি এই যে, ইহাতে শেয়ার বাজারের সচল অবস্থা নিশ্চল হইয়া পড়ে। ক্রেতারা মনে করে, দাম যখন বাঁধা রহিয়াছে তখন বেশী দামে মাল কেন কিনিতে যাইব? ফলে দর উঠিতে পারে না। এক দিন দু'-চার আনা দর বাড়ে, পরের দিন আবার উহা আরও পড়িয়া যায়। ব্যাঙ্কগুলি তখনই আবার চাপ দেয় তাহাদের দেনাদারদের। চাপ দিলেই তো তারা অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান করিতে পারে না, ফলে ব্যাঙ্কগুলি নিজের স্বার্থের দিকে নজর রাখিয়া দেনাদারের গচ্ছিত শেয়ার বাজারে বিক্রয় করিয়া দেয়। এই প্রকার বিক্রয়ের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় আবার বাজারের উপর। দর নামিয়া যাইতে থাকে।

ব্যাঙ্কগুলি বর্ত্তমানে যে পন্থায় চলিতেছে তাহা প্রকৃত পক্ষে উদ্ধারের পন্থা নয়। উচিত ছিল ব্যাঙ্কগুলি ও দালালদের একত্রে কাজ করা, প্রয়োজন অনুসারে লইতে পারিত তারা সরকারের সাহচর্য্য—যাহাতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেনাদারমণ্ডলী কিছু দিনের জন্য টিকিয়া থাকিতে পারে।

কার্য্যক্ষেত্রে এই প্রকার কোন সহযোগিতা পরিলক্ষিত হয় নাই। বস্তুতঃ, আমাদের জাতীয় জীবনে ইহা এক কলঙ্ক। বছর দুই পূর্ব্বে ব্যাঙ্ক-বিল পাশ হইলে দেশের সত্য সত্যই উপকার হইত, দুর্ভাগ্য বশতঃ আজও তাহা আইনে পরিণত হইল না। কিন্তু ১১৪৬ সালে কত ব্যাঙ্কই না 'লাল বাতি' জ্বালাইল? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা ছাড়া অন্য কিছু অংশ গ্রহণ করে নাই বা করিতে পারে নাই।

শেয়ার বাজারের এই দুর্দ্দিনে সরকার হইতে কোন প্রকার সাহায্য পাওয়া যায় নাই। ঘটনার আবর্ত্তনে শেয়ার বাজারের দর নামিতে লাগিল, যদিও কাগজে-কলমে তাহার দর বাঁধা রহিল। এক সময় ইঃ আয়রণের দর হইয়াছিল শেয়ার প্রতি ২৭৲ টাকা মাত্র। অবশেষে নিরুপায় হইয়া শেয়ার বাজারের কমিটি ১৬ই জুন ১১৪৭ হইতে শেয়ারের সর্ব্ব-নিম্ন দাম উঠাইয়া লইলেন। শেয়ারের কেনা-বেচা এবার তার প্রকৃত বাজার দরে হইতে লাগিল। বাজারের কেনা-বেচা হওয়া এক জিনিষ আর বাজার দর বৃদ্ধি পাওয়া অন্য এক জিনিষ। তবে প্রথমটা হইতেই দ্বিতীয়টার উৎপত্তি, এ আশা করা যায়।

১১৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় এক বছর কাটিয়া গেল, শেয়ার বাজারে প্রাণ এখনও ফিরিয়া আসিল না।

নূতন বছরের বাজেটের চাপে কোনও কোনও কোম্পানী হয়ত ডিভিডেণ্ড কিছু কমাইয়াছে; তবুও শেয়ারের দর এত মন্দা হইবার কোন সঙ্গত কারণ উপস্থিত হয় নাই।

সান ইয়াৎ-সেন

হেমেন মল্লিক

চীন দেশে ১৮৬৬ সালে "ব্লু-ভ্যালী"র "ছোয় হুঙ" গ্রামে যখন সান ইয়াৎ-সেনের জন্ম হয় তখন তাঁর পিতা-মাতা তাঁর নাম রাখেন "সান-ওয়েন" অর্থাৎ বুদ্ধির বংশধর। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নামের পরিবর্ত্তন করে রাখেন "সান ইয়াৎ-সেন" (Sun-yat-cns) অর্থাৎ অমর অবকাশের বংশধর। গরীবের ঘরে সন্তান-সন্ততিদের এরূপ আশীর্ব্বাণী করা তখনকার লোকেদের পক্ষে ছিল দুরাশা। কিন্তু সান-ওয়েনের ছিল না একটুও অবকাশ। ক্রমাগত সাত দিন বিদ্যালয়ের পর পিতার কৃষিক্ষেত্র ছিল তাঁর অবকাশ স্থল। তাঁর পিতা বলতেন, "বড় হয়ে সান-ওয়েন সাগর-মানবের দেশ আমেরিকায় যাবে জাহাজে চড়ে, সেখানে সে করবে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন, তার পর এই ব্লু-ভ্যালীর গ্রামে ফিরে এসে করবে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন।" অপর দিকে তাঁর পিসীমা সদা সর্ব্বদা তাঁকে এই সকল সাগর-মানবদের বিষয়ে সতর্ক করতেন। তিনি বলতেন, "তারা সব অদ্ভুত লোক এবং অদ্ভুত তাদের বেশ-বাস। তাদের মস্তকের পিছে আমাদের মত নেই কোন পৃষ্ঠবেণী এবং তারা যখন খায় তখন আমাদের মত কাঠির (chopstick) পরিবর্ত্তে তারা মুখের ভিতর দেয় লোহার কাঁটা-চামচ। এই সকল বর্ব্বর লোকেদের কাছ থেকে দূরে থেকো সান ওয়েন।" এই সকল কথা শুনে সান-ওয়েনের মনে জাগত কৌতূহল। "তারা বর্ব্বর হতে পারে কিন্তু খুব কৌতুক-জনক।" আমেরিকা-প্রত্যাগত লোকেদের মুখ থেকে সে শুনত—"তাদের দেশ আমাদের মত মাঞ্চু-রাজা দ্বারায় শাসিত হয় না—তারা নিজেরা নির্ব্বাচন করে তাদের শাসক যাকে তারা বলে 'প্রেসিডেণ্ট', সংব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা এবং বলপূর্ব্বক তাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করার কোন অধিকার নেই এই প্রেসিডেণ্টের।" কিছু দিন পরে এই ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেল সান-ওয়েন। হঠাৎ এক দিন দেখা গেল যে মাঞ্চু-রাজার লোকেরা এসে গ্রামের কয়েক জন ধনী ব্যক্তির সম্পত্তি অধিকার করে বলপূর্ব্বক তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

সান-ওয়েন তার পিতাকে জিজ্ঞাসা করল—"বাবা এদের কি হবে?"

"এদের মাথা কাটা যাবে।"

"কি এদের অপরাধ?"

"বিনা অপরাধে।"

"কেন মাঞ্চুরা এ রকম করল?"

"কারণ খুব সোজা, স্বর্গপুত্র মাঞ্চু-রাজার এই সম্পত্তির হয়েছে প্রয়োজন এবং সেই জন্যই এদের মাথা যাবে।"

এই কথাগুলো সান-ওয়েনের মনে গাঁথা রইলো। তখন থেকেই সে উৎসুক হয়ে পড়লো আমেরিকাবাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। সে ভাবতে লাগলো, "হয়তো তারা এত বর্ব্বর নয়।"

১৩ বৎসর বয়সে সান-ওয়েন আমেরিকাবাসীদের সঙ্গে মিশবার পেল প্রথম সুযোগ। তাঁর বড় ভাই "দা-কো" (Da ko) ছিলেন "হনোলুলুর" এক ব্যবসায়ী। সেই ব্যবসায় সাহায্যের জন্য তিনি সেখানে যান। এখানে সুরু হল সান-ওয়েনের এক নূতন জীবন। সকালে মিশনারি স্কুলে অধ্যয়ন এবং বৈকালে ভাইয়ের ব্যবসায়ে সাহায্যকরণ এবং সঙ্গে সঙ্গে সাগর-মানবদের সঙ্গে পরিচয়। পরিচয়ের পর সে দেখলো যে তারা মোটেই অসভ্য নয়, বরং তারা এমন এক সম্পদের অধিকারী যা তার নিজের দেশে একেবারে অজ্ঞাত আইনের অধীনে স্বাধীনতা। হায় এই মহামূল্য সম্পদ যদি একবার তাদের দেশে আনা যায়।

সান-ওয়েনের চরিত্রে একটি গুণ প্রকট ভাবে দেখা যায় তা হচ্ছে "সবলকে নির্ভয়ে বাধা দান এবং দুর্ব্বলের প্রতি ধীর ও শান্ত ভাব প্রদর্শন।" এ বিষয়ে তাঁর বড় ভাই এক জায়গায় বলেছেন, "যখন আমার এই ছোট ভাইটি বড় হবে আমার বিশ্বাস সে তখন হবে জগতের এক গণ্যমান্য ব্যক্তি।"

১৬ বৎসর বয়সে সান-ওয়েন সুরু করেন তাঁর সাবালক জীবন-যাত্রা। হনোলুলুতে তিন বৎসর অধ্যয়ন করে তিনি ইংরাজি ভাষায় করেন প্রভূত দখল স্থাপন, গণিতে দক্ষতা এবং ইতিহাসে প্রগাঢ় জ্ঞান। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি লাভের পর সর্ব্বোত্তম অধ্যয়নের জন্য তাঁকে দেওয়া হয় এক বিশেষ পুরস্কার। তাঁর বিদ্রোহী ভাবকে সতর্ক করে দেবার জন্য তাঁর ভাই বলেছিলেন—"এক জন সম্ভ্রান্ত-বংশীয় চীনবাসীর পক্ষে তুমি বড় বেশী পাশ্চাত্যাবলম্বী হয়ে পড়ছ।" এর প্রতিবাদে তিনি বলেছিলেন, "আমাদের এই চীনবাসীদের

দোষ এই যে আমরা দীর্ঘদিনব্যাপী অতি সম্ভ্রান্ত হয়ে আছি। এই সম্ভ্রান্তের আবরণের নীচে মাঞ্চুরা কয়েক শতাব্দী যাবৎ আমাদের কশাঘাত করে আসছে। তারা আমাদের অনবরত হুকুম করে আসছে 'এটা কর, ওটা কর না।' আর যদি তুমি অন্যথা কর তাহলে তুমি ভাল লোক নয়, সমগ্র চীনদেশকে এই রকম ভাল মানুষ হতে দেখে আমি সত্যই অন্তরে দুঃখ বোধ করছি, আমি চাই এই দেশকে স্বাধীন মানুষের দেশ করতে।" "এত বড় স্পর্দ্ধার কথা! তুমি চাও শতাব্দীর পথ পরিবর্ত্তন করতে? তুমি চাও আমাদের এই চীন-প্রথার বিরুদ্ধগামী হতে? তুমি কি জান না যে এ দেশে বহু কালের প্রবর্ত্তিত প্রথাকে পবিত্র বলে গ্রহণ করা হয়।" "বহু কালের প্রচলিত অত্যাচারিত প্রথার মধ্যে কোন পবিত্রতা নেই দাদা!" কিন্তু দা-কো এ বিষয়ে ভাইয়ের সঙ্গে এক-মত হতে পারলেন না। মাথা নেড়ে বললেন "তোমার মনের মধ্যে দেখছি আমেরিকাবাসীদের অধৈর্য্য ভাব অত্যধিক ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, তুমি হয়ে পড়েছ অত্যন্ত চঞ্চল।"

১৮ বৎসর বয়সে সান-ওয়েন হয়ে পড়লেন পূর্ণ বিদ্রোহী। দেশবাসীর নিকটে গিয়ে তাদের সহস্র বৎসরের নিদ্রা থেকে করতে লাগলেন জাগরিত। তিনি উত্তেজিত করতে লাগলেন দেশকে সম্রাটের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। তিনি বলতেন, "এই লোকটা আপনাদের কাছে নিজেকে স্বর্গপুত্র বলে প্রচার করে··· আমি বলি সে নরকপুত্র। সে আপনাদের ওপর তার হুকুম চালায় কেবল শুল্ক আদায়ের জন্য, আপনাদের মস্তক অবনত করার জন্য। আপনারা কি কেহ দেখেছেন যে আপনাদের এই শুল্ক অর্থ যায় কোথায়? সেই অর্থ কি আপনাদের ব্যবহারের জন্য বিদ্যালয়, পথ, বাটী প্রভৃতিতে ব্যয়িত হয়? না তা হয় না। এ-সব খালি বৃদ্ধি করে তার ধনাগার আর প্রশ্রয় দেয় তার অমিতাচারকে।" এই সকল কথা শুনে পুরাতন প্রথা অবলম্বীরা বলতে লাগল "পাপ কথা" কিন্তু সান-ওয়েন তাঁর লক্ষ্য থেকে বিচলিত হলেন না। যখনই সম্ভব তিনি জলন্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে লোককে বুঝিয়ে বলতেন। পকেট থেকে হঠাৎ একটি তাম্র মুদ্রা বার করে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন—"এই মুদ্রা কে তৈরী করেছে?"

"চীনের শাসক।"

"চীনের শাসক কে?"

"স্বর্গপুত্র।"

"তিনি কি আমাদের মতই এক জন?"

"আমাদের মধ্যে কে আছে যে স্বর্গপুত্র হবার যোগ্যতা রাখে?"

পরক্ষণেই সান-ওয়েন মুদ্রাটি তুলে ধরতেন—"এর উপর মুদ্রিত শব্দগুলির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন ত? এগুলি কি চীন-ভাষা?"

"না"

সত্যই না। এগুলি মাঞ্চু ভাষা, বিদেশী শব্দ। চীনদেশ বিদেশী দ্বারা শাসিত।

আশ্চর্য্য সংবাদ। অধিকাংশ লোকই এ বিষয়ে এত অজ্ঞ যে তারা এত দিন খেয়ালই করেনি যে তাদের শাসক এক বিদেশী। তখন তারা মন দিয়ে সান-ওয়েনের কথা শুনতে লাগল।

কিন্তু কখনও কখনও সান-ওয়েনের কথা বড় রূঢ় মনে হত। তিনি কেবলমাত্র স্বর্গপুত্রের বিরুদ্ধাচরণ করতেন না, কখনও কখনও স্বর্গেরও বিরুদ্ধাচরণ করতেন। দেশকে অন্ধ বিশ্বাসের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি চেয়েছিলেন দেবতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে। গ্রামের মন্দিরে যে সব দেব-দেবীর মূর্ত্তি ছিল তিনি তাদের ধ্বংসসাধন করতে চেয়েছিলেন। চীনদেশকে অগ্রগামী করতে হলে দেশের সর্ব্বত্র এই মূর্ত্তিগুলির ধ্বংসসাধন সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন। এই উদ্দেশে তিনি তাঁর দলবল নিয়ে প্রথমে সুরু করলেন তাঁর নিজ গ্রামের মন্দির থেকে। তিনি বললেন "শুনুন বন্ধুগণ! এই দেবতাদের আজ কোন ক্ষমতা নেই তোমাদের এক জনকেও সাহায্য করতে। আপনাদের সাহায্য করা দূরে থাকুক, তিনি নিজেকে নিজে সাহায্য করতে অক্ষম।" এই বলে তিনি কাষ্ঠদেবতার অঙ্গুলিগুলি একে একে খুলতে লাগলেন। "দেখুন আমাকে প্রতিরোধ করবার তাঁর কোন ক্ষমতা নেই। তিনি আমাকে মেরে ফেলতে পারেন না। এমন কি আমার মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে অক্ষম।" এই দৃশ্যে তার সঙ্গীরা হয়ে পড়ল ভীত। ক্রমে সমস্ত গ্রামময় রাষ্ট্র হল এই সংবাদ। পিতামাতারা যে যার ছেলেমেয়েকে সাবধান করতে লাগলেন এই পাগলা মূর্ত্তিভঞ্জকারী থেকে দূরে থাকতে। গ্রামের লোকেরা সান-ওয়েনের পরিবারকে উদ্ব্যস্ত করে তুলল তাদের এই ছেলেকে গ্রাম-ছাড়া করবার জন্য। যদি সে এখানে থাকে তাহলে আমাদের সকলের ঘটাবে দুর্ভাগ্য। সুতরাং এক সুপ্রভাতে ধার্ম্মিক পিতার পাপী সন্তান ব্লু-ভ্যালীর গ্রাম পরিত্যাগ করল।

দেশত্যাগী হয়ে এবার তিনি এলেন হংকংএ তাঁর অসমাপ্ত অধ্যয়নকে সমাপ্ত করতে এবং প্রচার করতে বিদ্রোহাত্মক বাণী। কুইন্স কলেজ থেকে ডিগ্রী উপাধিতে স্থান অধিকার করার পর তিনি ক্যাণ্টন মেডিক্যাল স্কুলে অস্ত্র-চিকিৎসকের কার্য্যে ব্রতী হলেন। অধ্যয়নে কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তাঁর কাছে থাকত প্রচুর অবকাশ রাজনীতি প্রচারের জন্য। চেং সে-লিয়াং নামক তাঁর এক সহপাঠীর সাহায্যে তিনি এক ছাত্রদল গঠন করলেন যাদের ব্রত হল চীনকে স্বাধীন করা। এই ছাত্রদল সুরুতে খুব কার্য্যক্ষম না হলেও সান-ওয়েনের নেতৃত্বে পরে বেশ ভাল ভাবেই বৃদ্ধি পায় এবং ১৮৯৫ সালে চীনের মাঞ্চু রাজার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আনয়ন করে। এ আন্দোলন সাফল্য লাভ করতে অক্ষম হওয়ায় মাঞ্চুরাজা সান-ওয়েনের মস্তকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করলেন কিন্তু তিনি তখন পলাতক। সান-ওয়েন সেখান থেকে পালিয়ে প্রথমে এলেন হাওয়াই দ্বীপে এবং পরে আমেরিকায়, সঙ্গে সঙ্গে চলল তাঁর পরিকল্পনা, বক্তৃতা প্রদান এবং পুনরায় স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য অর্থসংগ্রহ। শেষ পর্য্যন্ত যে তাঁর জয় হবে এ বিষয়ে তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহ। নেপোলিয়নের বাণী স্মরণ করে তিনি বলতেন "এই রকম ভাবেই এক দিন চীনদেশ হবে অগ্রসর এবং যখন সে অগ্রসর হবে তখন সে সমগ্র পৃথিবীকে করাবে অগ্রসর।"

আমেরিকায় তাঁর উদ্দেশ্য সফল হলে তিনি গেলেন ইংলণ্ডে এবং সেখানে হলেন চীনা দূত কর্ত্তৃক অপহৃত। এ বারেও তিনি পলায়ন করতে সমর্থ হলেন। এ বিষয়ে তাঁর এক অনুচর লিখেছেন—"সান ভীত শব্দের অর্থ কি জানে না।" এবারে তিনি নিজ নির্ভীকতা

ও কর্ম্মতৎপরতার উপায় দ্বারা অনুচরদের উত্তেজিত করতে লাগলেন। শত্রুপক্ষের তুলনায় স্বীয় ক্ষুদ্র দলের ক্ষমতা কতটুকু তা চিন্তা করে তিনি প্রাচীন কুস্তীবীরদের উপায় অবলম্বন করে মাঞ্চুশক্তিকে পরাজিত করতে সক্ষম হলেন। ১৮৯৯ সালে তিনি 'ইয়োকোহামায়' চীন-দূতের বাসস্থান হতে মাত্র কয়েক গজ দূরে তাঁর প্রধান কর্ম্মস্থল স্থাপন করে অসীম সাহস ও চতুরতার প্রমাণ দেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর তিনি জনতাকে উত্তেজিত করতে লাগলেন এই বলে—"সম্রাটের কোন বৈধ অধিকার নেই দেশবাসিগণকে শাসন করবার। দেশের শাসনাধিকার দেশবাসিগণের নিজেদের হাতে। সমগ্র দেশবাসী যদি সম্রাটকে অমান্য করে তবে তিনি তাঁর নিজ দুর্ব্বলতায় মারা যাবেন।" তিনি এই বাণী প্রচার করে চললেন যত দিন না সমগ্র দেশবাসীরা এমন কি মাঞ্চুরা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে সুরু করল। তারা তখন অনুভব করলো যে তাদের পায়ের তলার মাটি কাঁপছে। করুণ স্বরে রাজদরবারে আবেদন করে তারা জানতে পারল যে রাজদরবার সান ইয়াৎ-সেনের কৃপাপ্রার্থী। আর এই মুক্তি সৈন্য-বাহিনী তাদের করে তুলল অকর্ম্মণ্য। সর্ব্বত্রই খবর পাওয়া যেতে লাগলো যে দলে দলে লোক জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হবার জন্য উন্মুখ। দশ বার সান ইয়াৎ-সেন চেষ্টা করেছিলেন চীনদেশকে প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা করতে কিন্তু প্রতিবারের ব্যর্থতা তাঁকে এগিয়ে দিয়েছে সফলতার পথে। মাঞ্চুরা উপলব্ধি করেছিল যে তাদের দিন ঘনিয়ে আসছে।

তার পর এল ১৯১১ সালের সেপ্টেম্বর। সান ইয়াৎ-সেন তখন আমেরিকায় ভ্রমণ করছেন। একটি সংবাদপত্রের শিরোনামায় চোখ পড়তেই তাঁর মন উল্লসিত হয়ে উঠল—"বিদ্রোহী কর্ত্তৃক উচাং অধিকৃত।" তবে কি তার স্বপ্ন এত দিনে সার্থক হল, মাঞ্চু-রাজত্বের ঘটল অবসান?

তার পর এল ১৯১২ সালে ১লা জানুয়ারী যখন সান ইয়াৎ-সেনকে চীন প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট বলে ঘোষণা করা হল। এই সময় জর্জিয়াতে ওয়েসলিয়ান কলেজে প্রসিদ্ধ সুং-পরিবারের চিং-লিং নামে একটি মেয়ে অধ্যয়ন করছিলেন। চীন বিদ্রোহের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি স্কুলের পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লিখেছেন "এ যুগের মহাবিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে চীনের মুক্তি প্রদান ············সহস্র বৎসরের দাসত্ব থেকে চার কোটি আত্মার মুক্তি··· সমগ্র জগৎ উৎসুক নয়নে চেয়ে আছে চীন প্রজাতন্ত্রের প্রতি।··· প্রতি স্বদেশহিতৈষী চীনবাসীর অন্তরে জেগে উঠেছে মাঞ্চু-রাজ্যের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব।" ১৯১৩ সালে চিং-লিং স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং সান্ ইয়াৎ-সেনের সহিত পরিচিতা হওয়ার পর কিছু দিন তাঁর কর্ম্ম-সঙ্গিনী হিসাবে কাজ করেন, পরে ইনি সান ইয়াৎ-সেনের জীবন সঙ্গিনী হন।

কিন্তু সান ইয়াৎ সেনের জীবনে সুখ বেশী দিন স্থায়ী হ'ল না, শত্রুদের পরাজিত করার পর তাঁর বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে করলেন বিশ্বাসঘাতকতা। নিজ কর্ম্মচালনায় সন্দেহ হওয়ায় তিনি প্রেসিডেণ্টের পদ য়ুয়ান শিঃ-কাইয়ের হস্তে প্রদান করেন। ইনি ছিলেন প্রাক্তন মাঞ্চুরাজার এক কর্ম্মচারী। স্বীয় অভিলাষ সিদ্ধকরণের জন্য তিনি মাঞ্চুদের সিংহাসনচ্যুত করেন। প্রেসিডেণ্ট হওয়ার পর থেকেই তিনি দেখাতে থাকেন তাঁর যথেচ্ছাচার ক্ষমতা। অনেক পরে সান ইয়াৎ-সেন বুঝতে পারলেন যে য়ুয়ানের অভিলাষ হচ্ছে চীনের নূতন সম্রাটের পদ। তখন থেকেই তিনি তাঁকে বাধা দিতে সুরু করলেন, কিন্তু সমস্ত সৈন্য এখন য়ুয়ান শিঃ-কাইয়ের হস্তে। শীঘ্রই সান ইয়াৎ-সেনকেই আইনভঙ্গকারী হিসাবে তাঁহার মস্তকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হল। আবার তাঁকে গ্রহণ করতে হল পলায়নের পথ। এবারে তিনি জাপানে এসে চীনকে স্বাধীন করার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে ১৯১৫ সালে য়ুয়ান শিঃ-কাই নিজেকে সম্রাট্ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু তিনি বেশী দিন রাজত্ব ভোগ করতে পারলেন না। কিছু দিন রাজত্ব করার পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলেন কিন্তু রেখে গেলেন অসংখ্য অনুচর! দেখতে দেখতে চীনের আকাশ ভরে গেল অন্তর্যুদ্ধের কালো মেঘে।

এই ভাবে হৃতস্বাধীনতার উদ্ধারকল্পে তিনি তাঁর শেষ জীবনের আরও দশ বৎসর অতিবাহিত করেন। কিন্তু তিনি কখনও নিরাশ হননি, এমন কি, ১৯২৫ সালে যখন তিনি মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। তাঁর স্বদেশসেবায় নিযুক্ত দলের মধ্যে চিয়াং কাই-শেক নামে ছিল এক যুবক যার উপর ছিল তাঁর প্রভূত বিশ্বাস। মরণকালে তিনি তাঁকে উদ্দেশ করে বলেছেন—"বন্ধু, এ দৃশ্য থেকে আমি আজ বিদায় গ্রহণ করছি কিন্তু কাজ শেষ করার জন্য রেখে যাচ্ছি তোমাকে। আমি আশা করি তোমার অক্লান্ত সেবায় এই চীনদেশ এক দিন স্বাধীন হয়ে জগতের সামনে মাথা তুলবে।"

বারি ঝরে ঝর ঝর

অমিতাভ চৌধুরী

ঝর ঝর ঝরিতেছে অবিরল বৃষ্টি
দূর বন পথ-ঘাট যায় যত দৃষ্টি,
বৃষ্টির জলে আজ নদীগুলো টলমল
শ্যামলিমা মাঠ সব নেয়ে উঠে ঝলমল।
কাগজের ভেলাগুলো ভাসে তাল পুকুরে
জলে ভিজে নেচে উঠে যত খোকা-খুকুরে।
শাসনের বেড়া নেই—আজ সব ছুটলো।
গড়াগড়ি দিয়ে জলে হেসে নেচে উঠলো।
হাঁসগুলো একমনে পুকুরেতে ভাসছে
গাছগুলো নেয়ে উঠে সুখে যেন হাসছে।
কুসুমের কুঁড়ি ওই বাগানেতে জাগছে
কচি পাতা ভরা ডাল অপরূপ লাগছে।
গ্রীষ্মের মরা পাতা আজ সব যা' ঝরি
ডালে ডালে ওই শোন পাখী গায় কাজরী।
ঝিমিঝিম্ রিমিঝিম্ ঝরে জল অঝোরে।
ডাকে দেয়া গুরু-গুরু ওই শোন সজোরে।
উৎসব-সুর যেন বাজে মেঘ-মাদলে
বাঁধ-ভাঙা ধরা ওরে আজ ভরা বাদলে।
নেচে উঠে প্রাণ-মন চঞ্চল লগনে
মন তাই উড়ে যায় শ্রাবণের গগনে।
ওই শোন কেকা রব সাজ সবে সাজলো,
বর্ষার উৎসবে ছুটে যাই 'আজ লো'।

শ্রীরবিনর্ত্তক

২৪

রাক্ষসের সব চেষ্টাই একে একে ব্যর্থ হয়েছে শুনে তিনি মুসড়ে পড়লেন। অত বড় বুদ্ধিমান্ পুরুষ—তাঁরও চোখ বেয়ে নেমে এল জলের ধারা। অসহায় বালকের মতই কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন—'না, আর কোন আশা নেই! দৈবই প্রতিকূল—কি নিয়ে লড়ব'!

বিরাধগুপ্ত তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন—'ছিঃ, মন্ত্রিবর! আপনি ও-রকম অধীর হ'লে আমরা দাঁড়াব কোথা'?

রাক্ষস—'বন্ধু! আর কি কোন পথ আছে? আমাদের অন্যান্য সহায়কদের খবর কি'?

বিরাধগুপ্ত ম্লান হাসি হাস্‌লেন—সে হাসি রাক্ষসের মনের ভিতর গিয়ে শোকের আর্তনাদের মতই আঘাত দিলে। বিরাধ গুপ্ত বলে চল্‌লে—'আর কি খবর দোব? সবই প্রায় শেষ'!

রাক্ষসের উৎকণ্ঠা তখন চরমে পৌঁছেছে—'কি রকম'?

বিরাধ—'প্রথমেই ধরুন, আমাদের বিশেষ বন্ধু ও গুপ্তচর ক্ষপণক জীবসিদ্ধিকে...'।

রাক্ষস—'মেরে ফেলেছে না কি'?

বিরাধ—'না মন্ত্রিবর! সন্ন্যাসী বলে তাঁকে প্রাণে মারেনি। তবে খুব অপমান ক'রে নগর থেকে দূর ক'রে দিয়েছে'।

রাক্ষস স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন—'এ ত তবু সহ্য হয়। আচ্ছা, বন্ধু! কোন্ অপরাধে তাঁকে তাড়ান হ'ল? একটা অভিযোগ নিশ্চিত তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়েছে'।

বিরাধ—'সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? মন্ত্রিবর! জীবসিদ্ধি আপনার চর। আপনার পাঠান বিষকন্যাকে নিয়ে গিয়ে পর্ব্বত-রাজের প্রাণ নষ্ট করেছেন তিনি—এই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল'।

রাক্ষস হঠাৎ অট্টহাসি হেসে উঠলেন—'সাধু! কৌটিল্য! সাধু! যে বদনাম তোমার ঘাড়েই চাপ্‌ত, তা তুমি কৌশলে এড়িয়ে গেলে! উল্‌টে সে অপবাদ চাপালে আমাদেরই মাথায়। তার পর অর্দ্ধেক রাজ্যের দাবীদার পর্ব্বতক—তাঁকে কৌশলে সরালে। যার শিল, যার নোড়া—তারি ভাঙি দাঁতের গোড়া! অদ্ভুত! অপূর্ব্ব তোমার কূটনীতি! এর একটি বীজে কতই না ফল ফলে! তার পর—তার পর—'?

বিরাধ—'তার পর? হাঁ—তার পর শুনুন। এই সব দারুবর্ম্মা প্রভৃতি গুপ্তঘাতকদের কাজে লাগাবার জন্যে দায়ী ক'রে বেচারী শকটদাসকে শূলে চাপান হয়েছে'।

রাক্ষস এ সংবাদে আর স্থির থাক্‌তে পারলেন না। মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন মূর্চ্ছিত হ'য়ে। বিরাধগুপ্ত চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আন্‌লে পর তিনি কাঁদ্‌তে লাগলেন—'হায়! সখা শকটদাস! তোমার এমন শোচনীয় মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল না। না—না—শোচনীয় মরণ তোমার কেন হ'তে যাবে? অতি গৌরব-ময় মরণকে তুমি আলিঙ্গন করেছ, বন্ধু! তোমার প্রভুভক্তির তুলনা নেই। প্রভুর কাজে প্রাণ দিয়েছ—বীর তুমি!—তোমার কীর্ত্তি তোমাকে অমর ক'রে রাখবে! হতভাগা শুধু আমি!—যে প্রভু-গোষ্ঠীর মরণের পরেও এখনও এ দুর্ভাগা দেহটাকে বহন ক'রে বেড়াচ্ছে—বৃথা দুরাশায়'!—রাক্ষস পাগলের মত কপালে ও বুকে আঘাত ক'রে লাফিয়ে উঠলেন।

বিরাধগুপ্ত অনেক কষ্টে তাঁকে শান্ত ক'রে বসিয়ে বললেন—'প্রভু! এত উতলা হন কেন? আপনিও ত নন্দরাজাদের হত্যার প্রতিশোধ নিতেই বেঁচে রয়েছেন—সেই প্রতিশোধের চেষ্টাতেই ত আপনার বাকী জীবনের প্রতিক্ষণ ব্যয় হচ্ছে'!

রাক্ষস তখনও বেশ অস্থির—'মহারাজারা সব গেলেন পরলোকে অথচ আমি এখনও প্রতিশোধ না নিয়ে বেঁচে আছি—এতে আমার পক্ষে কি কৃতঘ্নতা দেখান হচ্ছে না প্রভুদের প্রতি? যাক্ গে—বল শুনি আর কোন্ বন্ধুর কি বিপদ্ ঘটল? এবার পাথর হ'য়ে গেছি—আর কিছু দুর্ঘটনা শুন্‌লে মনে লাগবে না'।

বিরাধ—'এই সব ব্যাপার শুনে চন্দনদাস আপনার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সব গোপনে লুকিয়ে রেখেছেন'।

রাক্ষস উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—'সর্ব্বনাশ! ভাল করেননি তিনি—এতে যে তাঁর নিজেরই বিপদ ঘট্‌তে পারে! ক্রুর কৌটিল্যের সঙ্গে শত্রুতা করা উচিত নয়'।

বিরাধ—'কিন্তু বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ত আরও বেশী অনুচিত'।

রাক্ষস—'তার পর বল—শুনি'।

বিরাধ—'তার পর মিষ্টি কথায় যখন চাণক্য তাঁর কাছে চেয়েও আপনার স্ত্রী পুত্রের কোন সন্ধান বার করতে পারলেন না, তখন—'

রাক্ষস—'নিশ্চয়—মেরে ফেলেননি'? রাক্ষস আবার উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন।

বিরাধ—'শান্ত হোন্। না—না, তাঁকে মারা হয়নি বটে; তবে সব সম্পত্তি তাঁর বাজেয়াপ্ত হয়েছে রাজ-সরকারে—আর সপরি-বারে তিনি এখন কারাবাস করছেন'।

রাক্ষস—'সখে! তবে কেন বললে যে রাক্ষসের স্ত্রী-পুত্রকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বরং বল যে—স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে রাক্ষসও চাণক্যের হাতে ধরা পড়ছে'!

এই সময় রাক্ষসের এক জন গুপ্তচর বিশেষ উদ্‌ভ্রান্তের মত সেখানে ছুটে এল এই বলতে বলতে—'মন্ত্রি মশায়ের জয় হোক! মন্ত্রি মশায়! না বলে আপনাদের ঘরে ঢুকছি—অপরাধ নেবেন না। শকটদাস সদর দরজায় অপেক্ষা করছেন।'

রাক্ষস আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চরটির দু'হাত চেপে ধরে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভদ্র, এ কি সত্যি কথা'?

চর বেচারী ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল এই ব্যাপারে। সে ত জান্‌ত না যে, রাক্ষস একটু আগে খবর পেয়েছেন বিরাধগুপ্তের কাছে—শকটদাসকে শূলে চড়ান হয়েছে। বিরাধগুপ্ত ও শকটদাসকে শূলে চড়াতে দেখে আসেননি নিজের চোখে। খালি কানে শুনেছিলেন তার দণ্ডাদেশের কথা। তার পরই তিনি চ'লে আসেন। শকট-দাসকে যে তার পর সিদ্ধার্থক বাঁচিয়েছে, এ ত তিনি জান্‌তেন না। কাজেই রাক্ষসের এই বিস্ময়! যাই হোক্, সাম্‌লে নিয়ে চরটি বললে—'আমি কি আপনার সঙ্গে মিথ্যে বলতে পারি মন্ত্রি মশায়'?

রাক্ষস বিরাধগুপ্তের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'সখে বিরাধগুপ্ত! এ কি ব্যাপার? তুমি যে বললে শকটদাস শূলে চড়েছে'?

বিরাধগুপ্তও অপ্রস্তুত। আম্‌তা আম্‌তা করে জবাব দিলেন—'আমি অবশ্য তার দণ্ডের কথা শুনেই সরে পড়েছিলুম। সত্যি মরার খবরটা তখনও পাইনি। হয়ত কোন কৌশলে বেঁচেছে'।'

রাক্ষস—'এ যে যমের গ্রাস থেকে বাঁচা'।

বিরাধ—দৈব যাকে বাঁচান, সে এই ভাবেই বাঁচে।

এর পর রাক্ষস চরকে বললেন—'প্রিয়ংবদক! বড় প্রিয় খবর আনলে আজ তুমি। যাক্, আর দেরী কেন? শীগ্‌গির শকটদাসকে নিয়ে এস'।

'যে আজ্ঞা' বলে প্রিয়ংবদক ত ছুটে বেরিয়ে গেল। প্রায় নিমেষের মধ্যে আবার ছুটে এসে ঢুকল—পিছনে তার সশরীরে শকটদাস।

এগিয়ে গিয়ে শকটদাস রাক্ষসকে প্রণাম করে হাতজোড় করে বললেন—'মন্ত্রি মশায়! আপনার জয় হোক'!

রাক্ষসের নিজের দু'চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছিলো না—সত্যিই ত শকটদাস! আবেগে তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বললেন—'সখে শকটদাস! কৌটিল্যের কবল থেকেও তোমায় আজ ফিরিয়ে পেলুম! কি ভাগ্য! এস, আমায় আলিঙ্গন কর'।

শকটদাস অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে করজোড়ে এগিয়ে যেতেই রাক্ষস সস্নেহে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। বহুক্ষণ সে আলিঙ্গন চলল। তার পর বললেন—'ব'স ভাই! এই আসনে'।

দু'জনে বসবার পর রাক্ষস জিজ্ঞাসা করলেন—'বন্ধু! কি করে ছাড়ান পেলে, বল, শুনি'!

শকটদাসের পেছন পেছন আর এক জন লোক ঘরে এসে ঢুকে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল। আনন্দের ঝোঁকে রাক্ষস বা বিরাধগুপ্ত কেউ-ই সেদিকে লক্ষ্য করেননি। শকটদাস তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—'এই আমার প্রাণের বন্ধু সিদ্ধার্থকের কৃপায় এবার প্রাণদান পেয়েছি। ইনি মহাবীরত্ব দেখিয়ে জল্লাদদের হঠিয়ে দিয়ে মশান থেকে আমায় নিয়ে পালিয়ে এসেছেন'।

রাক্ষসকে মলয়কেতু যে গয়নাগুলি পাঠিয়েছিলেন পরবার জন্যে একটু আগে, সেগুলি তাঁর গায়েই ছিল। এক এক ক'রে সেগুলি নিজের গা থেকে খুলে সিদ্ধার্থকের গায়ে পরিয়ে দিতে লাগলেন। সিদ্ধার্থক একটু ইতস্ততঃ করায় ব'লে উঠলেন—'না, না, আমি কোন আপত্তি শুনব না তোমার। এ কি-ই বা দিচ্ছি আমি তোমায়! যে প্রিয় কাজ করেছ তুমি আজ আমার, তার প্রতিদান দেবার মত অর্থ-সামর্থ্য আমার নেই। তবু এই গয়নাগুলি আমার কৃতজ্ঞতার দান হিসেবে তোমায় নিতেই হবে'।

সিদ্ধার্থক গয়নাগুলি গায়ে প'রে রাক্ষসের পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

[ক্রমশঃ।

চিত্রা আর চাঁদ

(রূপকথা)

শ্রীইন্দিরা দেবী

আমার রাজ্যে আর একখানিও আয়না থাকবে না—বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে রাজা মশাই আদেশ দিলেন।

আশ-পাশের সবাই এ ওকে প্রশ্ন করে, ও একে প্রশ্ন করে—'কেন গো রাজামশাই এমন হুকুম দিয়েছেন?'

সকলে তো সব কথা জানে না, তাই কেবল প্রশ্নের পর প্রশ্নই চলে।

অবশেষে জানা গেল, ঐ রকম সুন্দর ও সুদর্শন বংশে রাজার এক কুরূপা কন্যা জন্মেছে।

ওঃ—তাই? কিন্তু তাতে কি হবে? আয়না নষ্ট করে দিলে তো মেয়ের রূপ ফিরে আসবে না। প্রজাদের মধ্যে আলাপ চলে।

যাই হোক, সমস্ত রাজ্যে আয়না আর রইল না।

এখন হয়েছে কি, রাজার সত্যি এক মেয়ে জন্মেছে, যাকে দেখতে একটুও ভাল নয়, কালো, মুখে সব ছিট্‌ছিটে দাগ, আবার নাকটাও থাঁদা, চোখ দু'টো পর্য্যন্ত কুতকুতে ছোট।

রাজ-পরিবারের সকলেই অসাধারণ রূপ-লাবণ্যের অধিকারী, একটা ছোট ছেলেও দেখতে খারাপ নয়, বিরাট পরিবার—আর এই বিরাট পরিবারের সকলেই সুন্দর। এমনি এক বাড়ীতে জন্মাল কি না কুরূপা কালো মেয়ে! অথচ সন্তানকে তো ফেলে দেওয়া যায় না। অনেক ভেবে রাজা মশাই ঠিক করলেন রাজ্যে একটিও আয়না থাকবে না।

মেয়ে বড় হতে থাকে, যত বড় হয় রূপ তার একই থাকে, রাণী মেয়ের দিকে চেয়ে ভাবেন, আহা, কেন যে এমন হলো, এ মেয়ের তো বিয়ে দিতে পারবো না, চিরদিনই কাছে রাখতে হবে—বড় হয়ে মেয়ের মনই বা কি হবে যখন সে বুঝতে পারবে—সে কুশ্রী কুরূপা হয়ে জন্মেছে। এই সব ভেবে রাণীর মনে সুখ নেই।

দাসী ছাড়াও মেয়ের জন্য রাণী সঙ্গিনীর ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন, মেয়ের লেখাপড়া, খেলাধুলো সব কিছুর জন্য বেশী ব্যবস্থা অন্য ছেলে-মেয়ের চেয়ে। রাজকন্যা চিত্রা এই সব নিয়েই বড় হয়—কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সে জানতে পারে না তার রূপের কথা, বরং পরিবারের সকলকে দেখে তার মনে সুনিশ্চিত ধারণা হয় সে-ও ওদের পরিবারের প্রত্যেকের মতই অসাধারণ সুন্দরী।

পড়া-লেখা, খেলা-ধুলা করলে কি হবে, ছোট থেকেই চিত্রা খুব ফুল ভালবাসতো। বাগানের ফুল নিয়ে মালী যখন অন্তঃপুরে আসতো, চিত্রা গিয়ে মালীর সঙ্গে গল্প করতো, ফুল কেমন করে ভাল হয়, গাছ পুঁতলে কেমন করে বাঁচাতে হয়—সে কোথায় থাকে, বাগানই বা কত দূরে ইত্যাদি।

বুড়ো মালী চিত্রার সঙ্গে গল্প করতে করতে ঘরে ঘরে ফুল সাজিয়ে দিয়ে যেতো। মালীর সঙ্গে মাঝে মাঝে মালীর ছোট ছেলেও আসতো, চিত্রার চেয়ে কিছু বড় হলেও চিত্রা তার সঙ্গে খুব ভাব করে নিলো।

চিত্রার যেমন ফুলের ঝোঁক, গাছের খেয়াল, ফুল টাট্‌কা রাখার উপায় জানা এই সব সখ, মালীর ছেলেটার ঠিক উল্টো, সে মোটেই এ সব ভালবাসে না। মালীও তাকে স্কুলে দিয়েছে, লেখাপড়া শেখাচ্ছে, তার কেবল ইচ্ছা বৈজ্ঞানিক উপায়ে সব জিনিষ তৈরী করা। ছোট বেলায় সে এই জন্য আর ফুলের গল্প বলেনি বলে মার খেয়েছিল চিত্রার হাতে, তার পর কত দিন যায়নি, আবার গেছে, চিত্রার সঙ্গেও ভাব হয়ে গেছে।

মালীর ছেলে রাজার মেয়ের সঙ্গে খেলবে—এ স্পর্দ্ধা নিয়ে ঝি-চাকররা আলোচনা করেছে, রাণী এ কথা শুনে খুব ধমকে দিয়েছেন, একে তাঁর আদরের মেয়ে তার উপর আবার দেখতে

ভালো নয়—সে কথা মনে হলেই তাঁর কষ্ট হয়, মেয়ে যাতে এতটুকু কষ্ট না পায়, দুঃখ না পায় সেই দিকে সব সময় লক্ষ্য দেন।

চিত্রার মনে আছে ছোট বেলায় মালীর সঙ্গে অন্দর মহল ছেড়ে, রান্নাবাড়ীর পিছন দিয়ে সে কেমন চুপি চুপি বাগানে চলে যেতো, কত ফুল তুলে আনতো, বাগানে বেড়াতো, খেলা করতো, মালীর ছেলেকে গাছে উঠিয়ে চাঁপা ফুল পাড়াতো। মালীর ছেলের আসল নাম কি তা জানিনে কিন্তু সবাই তাকে চাঁদ বলে ডাকতো, চাঁদ চিত্রার সব কথাই শুনতো কিন্তু ফুলের কাজ সে কিছু জানতো না; চিত্রা সে সব জিজ্ঞাসা করলেই চটে যেতো, আসলে ও-সব তার ভালই লাগে না।

সে সব ছোট বেলার দিন চলে গেছে, চিত্রা আর চাঁদ দু'জনেই বড় হয়েছে। এখনও চিত্রা চাঁদকে মাঝে-মাঝে ডাকিয়ে আনে, বাগানে যেতে বলে, ফুলও পাড়িয়ে নেয়।

এক দিন বাগানে বেড়াতে বেড়াতে চিত্রা বললে: জানো চাঁদ, আমি কী সুন্দর দেখতে বলো তো?

চাঁদ সে কথার জবাব দেয় না।

চিত্রা আবার বলে: কি, কথা বলছো না যে? আমি খুব সুন্দর নয়?

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে চাঁদ বলে: আয়না বলে এক রকম জিনিষ আছে জানো?

—আয়না? সে আবার কি চাঁদ? এমন কথা শুনিনি তো?

—হ্যাঁ আছে, আয়না—তাতে নিজের চেহারা দেখা যায়।

—কিন্তু কই আমি তো কখনও শুনিনি। আয়না—আয়না—চিত্রা দু'-চার বার শব্দটা উচ্চারণ করলে—বেশ কথাটা তো! তার পর একটু ভেবে বললে, কোথায় পাওয়া যাবে?

চাঁদ বললে, বাবা বলেছে এ রাজ্যেই না কি আয়না নেই।

চিত্রা অবাক্ হয়ে বললে: তা আবার হয় না কি? আচ্ছা মাকে বলবো আমি।

—মাকে বলে কোন ফল হবে না, শেষে আমাকে ডেকে বলবেন: তুমি কোথায় জানলে? আমি বকুনী খেতে পারবো না।

—তাহলে কি হবে? আমার যে চাই।

—আচ্ছা সে আমি দেখবো চেষ্টা করে, কিন্তু তুমি কাউকে বলতে পাবে না।

—আচ্ছা, কাল তুমি তাহলে নিয়ে এসো।

সারা রাত চিত্রা ঘুমুতে পারেনি, আয়না কেমন জিনিষ? তাতে মুখ দেখা যায়? কই, কখনও তো শুনিনি—কাল চাঁদ আয়না আনবে, আমি আমার এই সুন্দর চেহারা দেখতে পাবো,—এই সমস্ত ভেবে উত্তেজনায় চিত্রার প্রতিটি মুহূর্ত্ত কাটতে লাগলো। তার মনে হচ্ছিল এখখুনি গিয়ে চাঁদকে বলে—শিগ্গীর আয়না দেখাও।

পরের দিন চিত্রা আগেই বাগানে গিয়ে বসে আছে।

এখন চাঁদের হয়েছে কি—সে তার বাবার মুখে শুনেছিল রাজা মশাই-এর আদেশের কথা—কিন্তু মায়ের কাপড়ের বাক্সের নীচে একটা ছোট আয়না লুকোনো আছে দেখেছিল—তা'ছাড়া সে বই পড়েও সব জেনেছে। মালীর ছেলে বলে সে তো বোকা নয়! সে এখন কত জিনিষ-পত্তর তৈরী ক'রতে পারে। চুপি চুপি আয়নাটা বার করে নিয়ে চাঁদ চিত্রার কাছে গেল।

চাঁদকে দেখে চিত্রা তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বলছে: কই দাও চাঁদ, আয়নাটা দাও।

উত্তেজনায় চিত্রার সমস্ত দেহ থর-থর করে কাঁপছে। আয়নাটা হাতে নিয়েই জোরে নিশ্বাস বেরিয়ে কাচটা ঝাপসা হয়ে গেল, কিছুই দেখা যায় না।

—এ কি হালো চাঁদ, কিছু তো দেখা যায় না—চিত্রা অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

চাঁদ আয়নাটা মুছে দিয়ে আবার চিত্রার হাতে দিলো। কিন্তু যত বারই যে মুখ দেখতে চায় অধীর উত্তেজনায় নিশ্বাস ফেলে—আয়নাটা ঝাপসা হয়ে যায়।

নিরুপায় হয়ে চাঁদ বললে: অত ব্যস্ত হলে চলবে না, আজ থাক, কাল এসো।

—কাল? সে তো অনেক পরে?

—আমি কি করবো? তাহলে চুপ করে বোসো কিছুক্ষণ।

অগত্যা চিত্রা চুপ করে বসে রইল—এবার সে আর নিশ্বাস ফেলবে না।

কথা বলতে বলতে এক সময় চাঁদ চিত্রার সামনে আয়নাটা ধরলো, বললে: দেখো।

চিত্রা বিস্ময়ে অবাক! ও মেয়েটা কে? এত বিশ্রী দেখতে? এত কালো, এত মুখে দাগ, নাক নেই, এ কখনও তার চেহারা নয়। আয়না বলে তাহলে কোনো জিনিষ নেই—চাঁদের মিছে কথা।

—দেখেছ? চাঁদ জিজ্ঞাসা করলো।

—ও কে? ঐ বিশ্রী মেয়েটা?

—বিশ্রী কি না জানি না, কিন্তু ওটা তোমারই চেহারা!

—আমার? চীৎকার করে উঠলো চিত্রা।

চাঁদ চুপ করে রইল।

—বলো সত্যি করে চাঁদ—ও কার চেহারা?

চিত্রার ব্যাকুলতা দেখে চাঁদ আর কথা বলতে পারে না।

—বলো, বলো শিগগীর। চিত্রা আবার প্রশ্ন করলো।

চাঁদ আস্তে আস্তে বললে: তোমার চেহারা, কিন্তু তুমি অমন করছো কেন?

—তুমি কি বলছো চাঁদ? আমাদের বাড়ীতে সবাই কী সুদর্শন। সুন্দরী বলে আমাদের পরিবারের নামে খ্যাতি আছে মা'র কাছে জেনেছি, আমি তাহলে—

—তুমি তাহলে আরো সুন্দর!

—তামাসা করছো চাঁদ আমায়?

—শোনো চিত্রা, তোমাদের বাড়ীর সকলে এত সুন্দর যে দেখে দেখে চোখ কি রকম জ্বালা করে, সেই জন্য তাদের মাঝখানে তোমাকে নতুন দেখায় আর ভালো লাগে বলেই তুমি সকলের চেয়ে সুন্দর।

চিত্রা চুপ করে কথাগুলো শুনে আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল।

চিত্রার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে রাণীমা এক দিন জিজ্ঞাসা করলেন: কি হয়েছে তোমার চিত্রা? খাও না, খেলা-ধুলো করো না, কান্না-কাটি কর কেন? কিসের তোমার অভাব?

চিত্রা চুপ করে থাকে, কথা বলে না।

রাণী অনেক পীড়াপীড়ি করে অবশেষে সব জেনে নেন।

রাগে অন্ধ হয়ে তখনি তিনি রাজাকে ডেকে সব বলে চাঁদকে ধরে এনে মেরে ফেলতে বলেন।

—"এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার আদেশ অমান্য করে আয়না রাখা, আবার আমার মেয়েকে দেখানো?" রাজা মশাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ হলো—ভুবন মালীর ছেলে চাঁদকে ধরে আনার।

কিন্তু সমস্ত রাজ্য খুঁজেও চাঁদকে পাওয়া গেল না। ভুবন মালীর অনেক লাঞ্ছনা হলো, শেষ পর্য্যন্ত তাকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হলো। বেচারী মালী কিছুই জানতো না, কিন্তু অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলো না।

ক্রমশঃ অন্তঃপুরে চিত্রার কানে সব পৌছল। চিত্রা জানতো না, এর জন্য চাঁদদের এত শাস্তি হবে, তাহলে অনেক দুঃখ পেলেও সে বল্‌তো না। চাঁদ যে তার ছোট বেলার বন্ধু, তাকে যে সে সত্যি ভালবাসে। মালীর জন্য তার খুব দুঃখ হয় কিন্তু চাঁদকে পাওয়া যায়নি এ কথা মনে করে তার মনটা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।

*　*　*　*

পূরো দশটা বছর কেটে গেছে। চিত্রাদের রাজ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। তার সব সুন্দরী বোনদের ভিন দেশের রাজপুত্রদের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে—ভাইদেরও বৌ এসেছে। রাজা-রাণীও বুড়ো হয়ে এসেছেন কিন্তু চিত্রার আজো বিয়ে হয়নি। ও রকম অসুন্দর মেয়েকে কে বিয়ে করবে? চিত্রাও চায় না তাকে ঘেন্না করে কেউ বিয়ে করুক। চাঁদএর কথা তার মাঝে-মাঝে মনে হয়—সে বলেছিল সুন্দর দেখে চোখে জ্বালা ধরে গেছে তাই তুমি সুন্দর। চিত্রা ভাবে চাঁদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে গেছে।···এমনি করে দিন কাটে।···এক দিন অন্তঃপুরে খবর এলো অন্য দেশ থেকে এক সুদর্শন যোদ্ধা এসেছে—সে না কি রাজকন্যা চিত্রাকে বিয়ে করতে চায়, রাজা মশাই স্বয়ং তার সঙ্গে আলাপ করে খুসী হয়েছেন, টাকা পয়সা তার খুব নেই তবে বিজ্ঞানের নানাবিধ জিনিষ শিক্ষা আছে, রাজামশাই না কি সে সব দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। সে শুধু দু'টি দাবী জানিয়েছে, একটি ভুবন মালীর মুক্তি অন্যটি একখানা গ্রাম নিয়ে একটি সাজানো বাগান। রাজা মশাই তাতেই সম্মতি দিয়েছেন।

অনিচ্ছা সত্বেও চিত্রার বিয়েতে সম্মতি দিতে হলো। বিয়ে করতে তার একেবারে ইচ্ছা নেই কিন্তু বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলবে সে সাহসও নেই।

ধূম-ধাম সারা রাজ্যে। রাজকন্যা চিত্রার বিয়ে, অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার, কাজেই সমস্ত রাজ্য জুড়ে আনন্দের বন্যা বয়ে যেতে লাগলো।

শুভদৃষ্টির সময় চোখ তুলে চিত্রা অবাক্ হয়ে দেখলো—তার সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে চাঁদ।

"গোবিন্দ মেমোরিয়াল" চ্যালেঞ্জ কাপ

প্রভাত বসু

ভোম্বলরাম　　দর্জ্জিপাড়ার
ছোট ছেলেদের সর্দ্দার;
ফুটবল ম্যাচে　　কাপ দিতে হ'বে
মত নিতে গেল বড়দার।

বড়দা বল্লেন,　　"তা বেশ, তা বেশ,
বল, কত চাই চাঁদা?"
ভোম্বল বলে　　এক-গাল হেসে
"তোমারি ত ক্লাব, দাদা!"

মণিব্যাগ খুলে　　বড়দা দিলেন
দশটি টাকার নোট;
"গোবিন্দ বাবু　　ক্লাব-প্রেসিডেণ্ট"
সব ছেলে দিলে ভোট।

প্রতিযোগিতার　　নামটি উপরে
নীচে গোল ফুটবল;
ভোম্বল চলে　　দাদারে দেখাতে
পিছে চলে তার দল।

বড়দা তখন　　পড়তেছিলেন
লীগের খেলার খবর;
ছেলেদের দেখে　　বলে উঠলেন,
"কাপ, ত হয়েছে জবর!"

তার পর যেই　　চোখ পড়ে গেল
প্রতিযোগিতার নামে—
চোখ দু'টি তাঁর　　হ'ল ছানাবড়া
কপাল ভরল ঘামে।

চ্যালেঞ্জ কাপের　　নাম যে রেখেছে
"গোবিন্দ মেমোরিয়াল"
দশ টাকা দিয়ে　　বেঁচে থেকে মরা
এই হ'ল শেষে হাল।

(কথা-চিত্র)

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৩১

সংসারে এক শ্রেণীর মানুষ আছে—যারা ভাবে, নিয়মের রাজ্য যেমন নিয়ম মেনে চলেছে, দিনের পর রাত—তার পর দিন আসে, একটা ঋতুর পর ঠিক তার পরের ঋতুটি এসে হাজির—এর জন্যে কোন গোলযোগ নেই, দিব্যি স্বাভাবিক ভাবে এই পরিবর্ত্তন ঘটছে—কোথাও এতটুকু ফাঁক বা গলদ নেই ;—মানুষের জীবনযাত্রাও এমনি নিয়ম মেনে চলবে ; যার যা প্রাপ্য ঠিকমত পাবে, যার সংগে যার যেমন বাধ্য-বাধকতা—ঠিক তাই বজায় থাকবে, কেউ কাউকে ফাঁকি দেবে না—কাজের মজুরীর জন্যে কাউকে ঝগড়া-ঝাঁটি করতে হবে না—ঐ প্রাকৃতিক নিয়মের মতই গড়িয়ে যাবে—যেমন হয় দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, একটা মাসের পর আর একটা মাসের আসা-যাওয়া। যারা মনে মনে নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাত্রার এই সহজ গতির স্বপ্ন দেখে থেকে—পীতাম্বর অধিকারীকেও এই দলে ফেলা যায়।

নিষ্ঠাবান ভক্ত যেমন ভক্তির সংগে দেবপূজা করে তৃপ্তি পায়, ভাবে—এই তার ধর্ম্ম ও সাধনা—জীবনযাত্রার একটা স্বাভাবিক পন্থা। পীতাম্বরও তেমনি তার পেশাকে জীবনের একটা সাধনা ভেবেই আনন্দ পান। তাঁর ধারণা—নিষ্ঠার সংগে তিনি করবেন কাজ, সেই দিকেই তাঁর মনটি ষোল আনাই লিপ্ত থাকবে। আর এই কাজের যিনি উপলক্ষ, শ্রদ্ধার সংগেই তাঁর ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দেবেন—এই নিয়ে দর-কষাকষি বা ভাঁড়াভাঁড়ির কি আছে? আর সাধনার উপচার—দেবতার প্রতিমা, পূজার ফুল—এ সব কি দর করে কেনা-বেচা চলে ?

এ সব ব্যাপারে পীতাম্বর বরাবরই এক কথার মানুষ। এ পর্যন্ত কোন দিন তাঁকে কেউ দরাদরি করতে দেখেনি। সে বার আচার্য বাবুদের বাড়ী থেকে লক্ষ্মী প্রতিমা গড়বার বরাত নিয়ে আসে তাঁদের এক গোমস্তা। জিজ্ঞাসা করলেন তিনি—'দাম কি নিবেন অধিকারী ঠাকুর ?' পীতাম্বর বললেন—দাম নয়, দান বলুন। কাজ ত আপনাদের নতুন নয়—আমার কাছেই না হয় নতুন এসেছেন। যা ন্যায্য হয় তাই দেবেন—হাত পেতে নেব।' কিন্তু গোমস্তা বাবু পীড়াপীড়ি করলেন।—'যেটা ন্যায্য আপনিই বলুন অধিকারী—কি রকম প্রতিমা হবে সে ত আগেই বলেছি।' পীতাম্বর বললেন—'তাহলে দশ টাকাই দেবেন।' দর শুনে গোমস্তা মনে মনে খুসিই হয়েছিলেন, কারণ, যে রকম প্রতিমার বাবুদের বরাত, তাতে দর অন্যায় বলেননি, এর চেয়ে কম দরে ভাল প্রতিমা পাবার কথা নয়। কিন্তু সকলেই ত আর পীতাম্বর অধিকারী নয়—পাটোয়ারী বুদ্ধি চালিয়ে অনুরোধ করলেন—'দু'টো টাকা কমিয়ে আটে নামুন—এই নিন বায়না।' অধিকারী তখন ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন—বায়নার টাকা দু'টো উঠানের দিকে ছুঁড়ে ফেলে বিকৃত কণ্ঠে বলে উঠলেন—'বায়নার দরকার নেই। পূজোর আগের দিন মায়ের প্রতিমা নিয়ে যাবেন—এক পয়সাও দিতে হবে না।' গোমস্তা অবাক্! এর পর অনেক তোষামোদ আর ত্রুটি স্বীকার করে—অধিকারীর আগের কথাই বজায় রেখে একটা নতুন শিক্ষা নিয়ে ফিরে গেলেন। এমনি অনেক নজির পাওয়া যায় পীতাম্বর অধিকারীর দীর্ঘ জীবন-যাত্রায়।

কিন্তু এ-ভাবে নিয়মের তালে তালে পা ফেলে অনেক জায়গায় অধিকারীকে ঠকতেও হয়েছে ; তার জন্যে অদৃষ্টে দুর্ভোগও কম আসেনি—কিন্তু পীতাম্বর তাতে বিচলিত হয়নি। এ দিক্ দিয়ে তাঁর ধারণা হচ্ছে—জীবনে যেটা পাবার কথা, সেটা যে কোন পথে আসবেই। এক জন ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করলেও, নিয়মের তোষাখানায় সেটা সঞ্চিত হয়ে থাকবেই—এক সময় সুদে-আসলে আর এক জনের হাত দিয়ে সেটা ঠিক হাতে এসে যাবে।

পরেশ পালের কাছে প্রতারিত হয়ে যদিও পীতম্বর অধিকারী প্রথমে বহ্নির মত জ্বলে উঠেছিলেন, কিন্তু তার পর নিজেকে সামলে নিয়ে নিয়মের যিনি অদৃশ্য চালক—তাঁরই অমোঘ ইচ্ছার অধীনে আপনাকে সমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু এবারকার আঘাতটা প্রথমেই হৃদয়ে একটা প্রচণ্ড ঘা দিয়েছিল—যেটা তাঁর দেহের পক্ষেও মারাত্মক হয়ে ওঠে। অর্ধাহারে—অনিদ্রায়—উদ্দাম একটা উৎসাহকে সাথী করে দিনের পর দিন—অর্ধরাত্রি পর্যন্ত তুলি চালিয়ে যে কঠোর সাধনা তিনি করেছিলেন, তার বেদনাদায়ক ব্যর্থতা—তিনি উপেক্ষা করতে চাইলেও দীর্ঘ দিনের অনিয়মজনিত ত্রুটিগুলি সময় বুঝে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। হাতে একটি পয়সা নেই, যে উৎসাহ বার্ধক্যক্লিষ্ট দেহটাকে কোন রকমে কর্মলিপ্ত করে রেখেছিল,—সেও অদৃশ্য হয়েছে, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি এক সংগেই বুঝি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে—হস্ত-পদ অসাড়, চক্ষুর দৃষ্টি নিষ্প্রভ, চলার পথে পদক্ষেপেরও সামর্থ নেই, আশ্রয় নেবার স্থান নেই, প্রবৃত্তিও নেই। তথাপি যেন সর্বনিয়ন্তার ওপর অভিমান করেই পীতাম্বর অধিকারী ক্ষিপ্তের মত তাঁর দুর্বহ দেহটাকে জোর করে ঠেলে নিয়ে যেতে চান সামনে—সামনে।

দু'টো দিন দু'টো রাতের পর,—এই অভিমানী উন্মত্ত পথিকের উদ্দেশ্যহীন যাত্রা যে স্থানে সহসা স্তব্ধ হয়ে মহাযাত্রিকের শয্যা রচনা করল, সে স্থানটি তখন বহিরাগত অসংখ্য যাত্রি-সমাগমে বিরাট এক মেলায় পরিণত হয়েছে। পথের ধারে এক প্রাচীন ব্যক্তি—আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যটুকু যার লোকচক্ষুকে আকৃষ্ট না করে পারে না—সহসা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তেই চার দিক থেকে লোক-জন ছুটে এলো এবং এ ক্ষেত্রে যেটা স্বাভাবিক—তাই ঘটল। অর্থাৎ উৎসাহী মানুষগুলি কৌতূহলের আগ্রহে মূর্চ্ছাতুর মানুষটিকে চার দিক্ দিয়ে এমন ভাবে ঘিরে দাঁড়াল যে বায়ু সঞ্চালনের পথটুকুও যাতে বন্ধ হয়ে যায়।

—তাই ত হে—কি হোল ?

—আসতে আসতে হঠাৎ কেন পড়ে গেল ?

—বিদেশী বলে মনে হচ্ছে যে !

—কিন্তু ভদ্র লোক—

—আরে বামুন বামুন—ঐ যে গায়ের জামার ফাঁক দিয়ে পলার পৈতেটা দেখা যাচ্ছে।

—তাহলে বদ্যি কিম্বা বৃগীও হতে পারে।

মূর্চ্ছিত মানুষটিকে ঘিরে কৌতূহলী বিজ্ঞদের এই ভাবে গবেষণা চলেছে—কিন্তু তাকে তুলে অন্তত নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া,

কিম্বা সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে কেউ ব্যস্ত নয়—স্পর্শ করতেই তারা যেন সংকুচিত।

সতেরো-আঠোরো বছর বয়েসের একটি ছেলে রামপ্রসাদী গান একখানা আপন মনে গাইতে গাইতে এই পথে আসছিল। ভীড় দেখে থমকে দাঁড়াল সে। তার পর—যেই শুনল, একটা অচেনা লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে—মারা গেছে মনে করে কেউ ছুঁতে ভরসা করছে না,—অমনি ছেলেটির চেহারা যেন পালটে গেল। কোঁচাটা কর্-কর্ করে খুলে কোমরে বেঁধেই ভীড়ের ভেতরে সেঁধুল—সংগে সংগে মুখখানা বেঁকিয়ে চড়া সুরে বলল: ছোঁবে না ত সংয়ের মতন ঘিরে দাঁড়িয়ে আছ কি করতে শুনি? পথ ছাড়—জানো ত ও সব ছোঁয়া-ছুঁয়ির পরোয়া আমি করি নে।

জনতার মধ্যে অমনি একটা গুঞ্জন উঠল: 'ওরে, কেষ্টা—বকা কেষ্টা! সন্ধান করে ঠিক এসে জুটেছে!'

এ অঞ্চলে ছেলেটি সব-চিন। নাম কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। কিন্তু জন সমাজে 'বকা কেষ্টা' নামে পরিচিত। যেহেতু ঘরের খেয়ে পরের মোষ তাড়ানোই তার স্বভাব। ভয়-ডরের পরোয়া রাখে না, লোকনিন্দা গ্রাহ্য করে না। যে কোন জাতের আপদ-বিপদে বুক দিয়ে পড়ে—নিজের ঘর-বাড়ী কাজ-কর্ম ছেড়ে প্রয়োজন বুঝে পরের চরকায় তেল দিতে এর আর জুড়ি নেই; শব-সংকারে এমন করিতকর্মা লোক অল্পই দেখা যায়—খবর গেলেই হোল, কোমরে গামছা বেঁধে এসে হাজির! পড়া-শোনার দিক্ দিয়ে শিক্ষা এর সামান্য কিন্তু দেহের ও মনের শক্তি অসামান্য। বাপ মাতুলালয়ে মানুষ—মামাদের অবস্থা স্বচ্ছল, কিন্তু এই অমানুষ ভাগনেটির জন্যে তাঁরা খুবই চঞ্চল—দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। যেহেতু, কেষ্টো শাসন মানে না এবং মামাদের ওপর সম্পর্কগত অধিকার ত্যাগ করতেও রাজি নয়। অগত্যা মামার বাড়ীতে থেকেও তাকে যেন 'এক-ঘরে' হয়েই থাকতে হয়। বাইরের একখানা ছোট ঘর মামারা তাকে ছেড়ে দিয়েছেন, সেই ঘরেই মামারা তার দু'বেলার আহার্য রেখে যান—মামার বাড়ীর সংগে ভাগনের সম্বন্ধ এই পর্যন্ত। দুর্মুখ দুর্জন গোঁয়ার ভাগনের সংগে এই ভাবে একটা রফা করে মামারা কতকটা আশ্বস্ত হয়েছেন।

কেষ্টোর গায়ে যেমন অসীম শক্তি, মনেও তেমনি দারুণ সাহস। সবাই এই গোঁয়ার প্রকৃতি ছেলেটিকে এড়াতে চান। তার আবির্ভাব আর হুমকীর সংগেই জনতা পাতলা হয়ে গেল। কেষ্ট ঠেলে-ঠুলে ধাক্কা দিয়ে ভীড় সরিয়ে মূর্চ্ছিত পীতাম্বরের মাথাটি কোলে নিয়ে বসল—মূর্চ্ছিত ব্যক্তির চৈতন্য সঞ্চারের কতকগুলি প্রক্রিয়া তার জানা ছিল; সেগুলি প্রয়োগ করতে করতে সে কাছের লোকটিকে বলল: ঐ দোকান থেকে শীগ্‌গীর এক ঘটি জল আনুন ত!

এক জনের স্থলে তিন জন তখন ছুটল জল আনতে। মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিতে দিতেই কেষ্ট বুঝল, শুশ্রূষার ফল হয়েছে—সংজ্ঞা ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। তখন জনতার দিকে চেয়ে কেষ্ট বলল: ইনি বেঁচে আছেন, আর চেষ্টা করলে এঁকে হয়ত সারিয়ে তোলাও যাবে। কিন্তু এখন এঁকে তুলি কোথায়?

সকলেই নির্বাক্। নিকটেই যাদের বাড়ী বা বিপণি, তারা অতঃপর ধীরে ধীরে সরে পড়ল। এক ব্যক্তি যুক্তি দিল: বাঁচবার আশা যদি থাকে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই ভালো।

কেষ্ট বলল: তাহলে একখানা গাড়ী বা পাল্কী আনতে হয়। এর ভাড়াটা আপনারা কেউ দিন, এর পর আমি দোব। আমার ট্যাঁকে দু'আনা মাত্র পয়সা আছে।

কিন্তু কেষ্টোর প্রস্তাব সম্বন্ধে কাউকে উৎসাহী দেখা গেল না—সমবেতদের মধ্যে আরও কয়েক জন এই সময় পা ঘসতে ঘসতে সরে পড়ল।

ঘটনাচক্রে এই সময় নূতন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হল। এমন একখানা বাড়ীর গাড়ীর উপর জনতার দৃষ্টি পড়ল—এ পথে প্রায়ই যার গতিবিধি হয় এবং একই আকৃতির দু'টি বড় বড় তেজীয়ান ঘোড়া ও গাড়ীখানির বাহ্যিক সৌন্দর্য এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের সুপরিচিত।

গাড়ীর ঘন্টাধ্বনি শুনেই এক জন বলে উঠল: 'বৌরাণীর গাড়ী!'

আর এক জন সোৎসাহে বলল: 'এক কাজ করলে হয় না—বোসে-কোরে ঐ গাড়ীখানায় যদি—'

কথাটা শুনেই কেষ্ট বলল: 'ঠিক বলছেন—ভগবানই গাড়ী পাঠিয়েছেন, ঐ গাড়ীতেই এঁকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাবো। আপনারা পথ আটক করে গাড়ী থামান। তার পর যা করবার—আমি করছি।'

ইতিমধ্যেই গাড়ীখানা রাস্তা কাঁপিয়ে কাছে এসে পড়ল, তার পর পথের ওপর এতগুলো লোকের সমাগম দেখে কোচোয়ান সবলে রাশ টেনে গাড়ীর গতি থামাল।

গাড়ীর ভিতরে ছিল একমাত্র আরোহী—বৌরাণীর যাত্রা সম্প্রদায়ের নতুন 'অথর' মৃগেন রায়। এই গাড়ী এসে এই অঞ্চল থেকেই এই ভাগ্যবান্ ছেলেটিকে নিয়ে যায় ও পৌঁছে দেয় এবং ছেলেটি যে কেউ-কেটা নয়—ওস্তাদ লিখিয়ে, ভারি এলেমদার—এরই মধ্যে এ সব কথা জানা-জানি হয়ে গেছে। কাজেই, ছেলেমানুষ হলেও মৃগেনকে সকলেই খুব সম্ভ্রম করে—শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে—গাড়ী চেপে যখন এই রাস্তা দিয়ে সে যাতায়াত করে, কেউ কেউ নমস্কারের উদ্দেশে হাতও যুক্ত করে। কেষ্টোও কত বার এ গাড়ী দেখেছে—গাড়ীর আরোহীকেও। সে-ও শৈশব থেকে যাত্রার ভক্ত—কোথাও যাত্রা হচ্ছে শুনলে আর রক্ষা নেই, সে আসরে কেষ্টোকে হাজির হতে হবেই—অবিশ্যি কোন মহাযাত্রার ব্যাপারে তার আহ্বান যদি না হঠাৎ এসে পড়ে।

আস্তে আস্তে পীতাম্বরের মাথাটি কোল থেকে নামিয়ে কেষ্টই ছুটে গেল গাড়ীর কাছে। মৃগেনও জনতা দেখে ব্যাপার কি জানবার জন্যে নামবার উদ্যত হয়েছে, এমন সময় কেষ্ট গাড়ীর পাদানি ঘেঁসে মিনতির সুরে জানাল: 'দেখুন, একটি রাহি লোক মারা যেতে বসেছে—হাসপাতালে পাঠাতে পারলে বোধ হয় বাঁচতে পারে। আপনি যদি দয়া করে গাড়ীখানা—'

কেষ্টকে আর কিছু বলবার ফুরসত না দিয়েই মৃগেন বলে উঠল: 'তার জন্যে কি হয়েছে—গাড়ী ত হাসপাতালের সামনে দিয়েই ফিরে যাবে—চলুন ত দেখি—'

ক্ষিপ্রপদে মৃগেন উঠে দাঁড়াল—গাড়ীর দ্বারের ছিটকিনি খুলে দেবার জন্যে সহিস ছুটে আসছিল, কিন্তু তার আগেই মৃগেন সলক্ষে নিচে নেমে পড়ল।

ঠিক এই সময় পীতাম্বরের কণ্ঠ থেকে একটা আর্তস্বর নির্গত হয়ে জনতাকে ক্লিষ্ট এবং মৃগনকে স্তব্ধ করল: 'অম্মা—মায়া, রে!'

চেনা স্বর, জানা সুর, জপের মন্ত্রের মত অতি বাঞ্ছিত নাম! শুনেই মৃগেনের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কেঁপে উঠল। পরক্ষণে আত্মহারা হয়ে সে পথপার্শ্বে শায়িত মূর্তির দিকে পাগলের মত ছুটে গেল। জনতা অবাক্, কেষ্ট পর্যন্ত—ব্যাপার কি?

আর্ত কণ্ঠের পরিচিত স্বর শুনে মৃগেন স্তব্ধ হয়েছিল, এখন যে মুখ থেকে সে স্বর নির্গত হয়েছিল—তার ওপর দৃষ্টি পড়তেই বুঝি ভেঙ্গে পড়বার যো হল। কিন্তু স্থান ও সময় বুঝে মৃগেন তখনি আপনাকে সামলে নিল।

বিপদে মন স্থির করে উপযুক্ত উপায় নির্ধারণে চির দিনই সে অভ্যস্ত। তাই জনতার সমক্ষে বিচলিত না হয়ে প্রথমেই সে গাড়ী ফিরিয়ে দিল। তার হুকুম পেয়ে কোচয়ান প্রফুল্ল হয়ে এবং সমবেত উৎসাহী মানুষগুলিকে নিরুৎসাহ করে সে মোড় ফিরিয়ে গাড়ী নিয়ে গেল। তার পর মৃগেন বলল: 'দেখুন, কাছেই আমার বাসা—জায়গা যথেষ্ট আছে। হাসপাতালে নিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই; তার কারণ—সকলেই হাসপাতালে যাওয়া পছন্দ করেন না। আর গাড়ীতে তুললে এঁকে কষ্ট দেওয়াই হবে—তার চেয়ে আসুন আমরা দু'-তিন জনে ধরাধরি করেই একে নিয়ে যাই আমার বাসায়।'

কেষ্ট বলল: 'তা যেন নিয়ে গেলেন, কিন্তু চিকিৎসার কি হবে?'

মৃগেন বলল: 'সে ভার আমার। এখন কথা এই—একে সারিয়ে তুলতেই হবে। তার জন্যে আমি আমার বাসাতেই হাসপাতাল বসাব, চিকিৎসার ত্রুটি হবে না, সব খরচ আমার। এখন আসুন, একে নিয়ে বাসায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করি।'

মৃগেনের কথা শুনে সকলেই উৎফুল্ল হয়ে 'সাধু—সাধু' বলে উঠল—আর কেষ্ট হেঁট হয়ে মৃগেনের পায়ের দিকে হাতখানা বাড়িয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল: 'পায়ের ধুলো দিন আপনি—নতুন এয়েছেন, জানি আপনি লিখিয়ে—পালা বাঁধেন, কিন্তু প্রাণটাও যে এত দরাজ তা জানতাম না—পায়ের ধুলো দিন স্যার—মাথায় মাখি।'

তাড়াতাড়ি মৃগেন কেষ্টোর হাতখানি ধরে দৃঢ় স্বরে বলল: 'করছ কি—ছি! ওঠ। গাড়ী থামিয়ে তুমি যদি আমাকে না নামাতে ভাই—তাহলে হয়ত আমার জীবনে এ সুযোগ আসতো না। মরণাপন্ন মানুষকে বাসায় তুলে তাঁকে বাঁচিয়ে তোলার সৌভাগ্য ক'জনের অদৃষ্টে ঘটে বল ত? এর উপলক্ষ তুমি, আর এঁরা সবাই। এখন চল—ওঁকে হাতে হাতে ধরাধরি করে বাসায় নিয়ে যাই।'

পীতাম্বরের অবচেতন অন্তরে তখন ধীরে ধীরে সংজ্ঞার অস্পষ্ট আলো পড়েছে—তারই আভায় আবৃত দু'টি চোখের মুদিত পাতা অল্প অল্প মুক্ত হচ্ছে; ক্ষীণ দৃষ্টির স্বল্প পরিধির মধ্যে যেন ভেসে উঠছে একখানা মুখ—অতি বাঞ্ছিত অতি পরিচিত মুখ!

[ক্রমশঃ

অনাথিনী

শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

কাল রাতে তুমি বসেছিলে বুঝি আমার পায়ের কাছে!
ঘুম থেকে উঠে ভোর বেলা দেখি—পায়ের উপরে পড়ে
কাচপোকা টিপ, সিঁদুরের গুঁড়ো, কাজলের কালো রেখা—
তার সাথে বুঝি দু'-ফোঁটা অশ্রু।
সত্য কি এসেছিলে?

নিষেধ কারোর না শুনি' তোমাকে বিয়ে করেছিনু বটে,
তিন কুলে তব কেউ ছিল নাক' ছিলে নারী অনাথিনী!
বুড়ী-মা তোমার কেঁদে পড়েছিল: করো বাবা উদ্ধার!
তরুণ-বয়সে, ছি ছি, মোহবশে দেখিনিক' আগে ভেবে;
দয়া হয়েছিল, মায়া হয়েছিল! (মরণ হয়নি কেন!)

বছর না যেতে বুঝিনু, হায় রে সুখ নেই, সুখী নই।
উপবাসী মন গোপনে বিরহে স্বপনচারিণীরূপে!
মোহবশে, ছি ছি, ভেবেছিনু: প্রেমে কুরূপা-ও রূপময়ী,
ভাবিনিক' ছাই—শুধু প্রেমে কভু পুরুষ তৃপ্ত নয়।

তাই তো সেদিন ভিন দেশে পুনঃ জাগি ললিতার রূপে—
মা'র ভয়ে তারে গৃহে আনিবারে সাহস হতো না প্রাণে।
সেদিন ললিতা জোর করে যবে আমাদের গৃহে এলো,
গোলমাল কিছু হলো বটে, তবু থেমে গেল দুই দিনে।

ললিতার রূপে বাড়ীর সবাই মুগ্ধ কেন না হবে?
তার মতো রূপ তুমি-ই বলো না ক'জনের দেখা যায়?
গুণে তার চে'য় তুমি ছো'ট, কেউ এ-কথা বলে না বটে,
তবু রূপে-গুণে একত্র করি' ললিতা তো অনুপমা।...

সংসারে তাই ক্রমশঃ সেই তো হয়ে গেল আপনার—
বাড়ীর সকলে তাকেই তো চায়, শুধু কি আমার দোষ?

বহু দিন হলো, যায়নি ললিতা বাপের বাড়ীতে,—কাল
জরুরী কি কাযে গেল সে, আমারে চাইল সঙ্গে নিতে!
আফিসের কায, বড়বাবু কড়া···তুমি তো পারিতে যেতে,
গেলেই পারতে, কেন যে গেলে না, কেন এত ছোট মন!
রাত্রি গভীর। দুয়ারে বুঝি বা খিল দিতে গেছি ভুলে—
স্বপনে ললিতা কাছে এসে যেন কইছে কত না কথা!
দু'দিন পরেই আসবে সে ফিরে বিলম্ব হবে নাক'—
কইছে ললিতা, এমন সময় তুমি কি স্বপ্নে এলে?
স্বপনেও তুমি আসতে ছাড় না···সত্য কি তুমি এলে?
মুখ ম্লান করে পায়ের তলায় বসলে কাতর হয়ে?

পায়ে মুখ রেখে ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে কাঁদলে সারাটা রাত?
ভোর হতে কার দুয়ারে মিলাল বেদনার নিশ্বাস?
সত্য কি তুমি এসেছিলে তবে? বসেছিলে পা'র তলে?
ঘুম থেকে উঠে ভোর বেলা দেখি পায়ের উপরে প'ড়ে
কাচপোকা টিপ, সিঁদুরের গুঁড়ো, কাজলের কালো দাগ···
কাল রাতে কেন ওগো অনাহূতা এসেছিলে মোর কাছে!

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

পরিবর্তন

শ্রীমতী মৃণালিনী দাশগুপ্তা

দুই বোন। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারের তরুণী দু'টি মেয়ে। আর্থিক অবস্থা প্রায় আমাদের দেশের এই শ্রেণীর শতকরা নিরানব্বই জনের যে অবস্থা তার চেয়ে কিছু ভাল তো নয়ই বরং খারাপ বলা চলে। কৈশোরে পা দেবার সাথেই তাদের বাপ মারা যায়, বিধবা মায়ের এই দু'টি মেয়ে ছাড়াও আরও তিনটি মেয়ে আছে, তবে তারা এখনও বালিকা। একমাত্র ছেলে আই, এ, পাশ করে যুদ্ধের বাজারে কি একটা অস্থায়ী অফিসের কাজে ঢুকেছে। তারই আয়ের উপর নির্ভর করে থাকে এই ক'টি বোনের ও তাদের মায়ের জীবিকা-নির্বাহ।

শ্যামা—বড় বোন। বাবা কালো মেয়ের আদর করে নাম দিয়েছিলেন শ্যামাঙ্গী, শ্যামা বলে ডাকতেন। কে জানত যে এই কালো রংই তার জীবনের একটা অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। গ্রাম্য মেয়ে, লেখাপড়া শেখার সুযোগ-সুবিধা খুবই অল্প, তার পর সে রকম প্রচলনও নাই গ্রাম্য ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে। শ্যামা অল্প সামান্য পড়া-শুনা করেছিল তার বাপের কাছে। গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজ সে তার মা'এর সাথে করে। দাস-দাসী রাখবার সামর্থ্য তাদের নাই, বড় সহর নয় বলে সে সব রেওয়াজও বড় একটা নাই। শ্যামা প্রায় সংসারের সব কাজই করে। দুপুরে যেটুকু সময় পায়, বোনেদের জামা সেলাই করে, শীতের জন্য কাঁথা সেলাই করে, টুকিটাকি আরও কত কি করে সময় কাটায়। একটুকু সময় সে নিজেকে একলা রাখে না। নিঃসঙ্গ জীবনটার সাথে মুখোমুখী হতে তার সত্যিই ভয় করে। যৌবন তার দেহে এক দিন এসেছিল। যেমন বসন্তের প্রথমে সামান্য নাম-না-জানা লতাটাও নীল ফুলে ভরে যায়, তেমনি তার দেহেও যেদিন ষোড়শীর তরুণিমার রং লেগেছিল, সেদিন কালো হলেও তাকে সুশ্রী দেখিয়েছিল হয়তো। হয়তো তখন কারো না কারো চোখে তাকে ভাল লাগতেও পারত। কিন্তু বরপক্ষের কর্তার চোখে শুধু সেই রূপটুকুই যথেষ্ট নয়, যদি তার সাথে উপযুক্ত পরিমাণে রূপা না থাকে। তাকে অনেক বারই অনেক পক্ষ হতেই যাচাই করে গেছে, রূপ এবং রূপা এ দুই-এর অসামঞ্জস্যের জন্য আজ পর্যন্ত শ্যামার নিঃসঙ্গ জীবন।

কালো হলেও তার একটা মন আছে, ম্যালেরিয়ায় রক্তহীন দুর্বল দেহ হ'লেও তার মধ্যে প্রাণ আছে—শ্যামারও বেঁচে থাকবার ইচ্ছা করে, এ রকম নিঃসঙ্গ ভাবে নয়, মানুষের মতন সে বাঁচতে চায়। পাশের কুঁড়ের ঐ বাগদী বউকেও তার ঈর্ষা হয়, তার মতন শ্যামাও চায় তার জীবনকে—তার যৌবনকে ফুলে-ফলে ভরে তুলতে। সে যদি ঐ বাগদীদের সমাজের মেয়ে হ'ত, যার সাথে খুশী বেরিয়ে গিয়ে ঐ রকম ভাবে সংসার পেতে বসত। মাঝে-মাঝে তার সমস্ত মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু অশিক্ষিতা গ্রাম্য সাধারণ মেয়ে সে, সমাজকে ভাঙবার মতন সাহস তার কোথায়?

শ্যামার পরের বোন রমা,—শ্যামারই মতন গায়ের রং, মুখশ্রী। শ্যামার চেয়ে বছর দু'-একের ছোট সে। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে যখন পড়ত, মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে সদরের বালিকা বিদ্যালয়ে পড়তে আরম্ভ করে। সেখান হতে ফ্রীশিপে পড়ে সে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। দিদির অবস্থা দেখেই তার শিক্ষা হয়েছে। সে জানে, তাদের মতন রূপহীনাদের বিবাহের বাজারে স্থান নাই। সে কোনও প্রকারে সকলের সাহায্য নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য সচেষ্ট। দু'-এক জনের সাহায্যে সে সদরের কলেজেও ঢুকতে সফল হয়েছে। তার জীবনে তবু আনন্দ আছে। যতক্ষণ কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে সে থাকে সব ভুলে থাকে। কিন্তু বাড়ী এসে শ্যামার করুণ মুখখানার দিকে সে তাকাতে পারে না। সে তার অবস্থা খুবই উপলব্ধি করতে পারে। দিদির কাছে কলেজের বন্ধু-বান্ধবদের নানা গল্প ক'রে সে চায় তাকে খুশী করতে একটুখানি।

শ্যামার তরুণী-মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে পুরুষের সান্নিধ্য-লাভের আকাঙ্ক্ষায়। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে যে কেউ পুরুষ যখন আসে, সবাই রমাকে ডেকে কথা বলে, রমার সাথে গল্প করে। শ্যামা চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, তাদের কথা শোনে। বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়াতে পারে না, তাড়াতাড়ি একটা অজুহাত দেখিয়ে রান্নাঘরে চলে যায়। সেও চায় পুরুষকে সঙ্গী হিসাবে পেতে, পুরুষকে ভালবাসতে, তার সাথে সংসার পাততে, হোক্ না তার সংসার যত সামান্য। ছোট্ট শিশুকে কোলে করে আদর করতে, নাচাতে, খাওয়াতে, সেও চায়। কী তার অপরাধ, কী করেছে সে সমাজের কাছে—যার জন্য নারী-জীবনের সামান্যতম আকাঙ্ক্ষাও তার জীবনে পূর্ণ হবে না?—কেন? তার রূপের জন্য সে দায়ী নয়, রূপা তাদের বাড়ীতে নাই, তার জন্য সে দায়ী নয়, তবে তার এই অবস্থার জন্য সে কেন দায়ী হবে? সে ভেবে পায় না কোথায় তার অপরাধ!

এই রকম শত শত 'শ্যামা' বাংলা দেশের সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে দিনের পর দিন কষ্ট পায়, নীরবে তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠতম দিনগুলি অতিবাহিত করছে নিঃসঙ্গ ভাবে। যারা সহরে থাকে, বা অর্থকরী শিক্ষায় শিক্ষিতা হবার মতন সুযোগ যারা পায়, তারা তবুও চাকরীর সন্ধান করে নিজে অর্থ উপার্জন করে, তাতে করে

আমোদ-প্রমোদ, যথেচ্ছা ভ্রমণ—সব কিছু করবার মতন সুযোগ তারা পায়। এটা অবশ্য নারী-জীবন চরিতার্থতার একটা বিকৃত রূপ। সুন্দর সুষ্ঠু জীবনযাত্রা একে আমরা বলতে পারি না। কিন্তু এই ভাবে আর কত দিন চলবে? দিনে দিনে সমাজে এই রকম শ্যামার সংখ্যা বেড়েই চলেছে, কমছে না।

এই যে উপযুক্ত বয়সে মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না, এতে করে সমাজের একটা বৃহত্তর ক্ষতি হচ্ছে, সে বিষয়ে আমরা ভেবে দেখি না। যে সব স্বাস্থ্যপূর্ণ শিক্ষিত শিক্ষিতা যুবক-যুবতীর সন্তান দেশের ও সমাজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে তুলতে পারত, তাদের বিবাহ হয় না, আর যারা স্বাস্থ্যহীন অশিক্ষিত শ্রেণী, তারাই দিনের পর দিন আমাদের সমাজের লোক-সংখ্যার ভারসাম্য বজায় রেখে যাচ্ছে—তারাই মরছে শিশু-মৃত্যুতে, কলেরা, বসন্ত, মহামারীতে, দুর্ভিক্ষে। আর আমরা যারা আর্থিক ভাবে তাদের থেকে উন্নত স্তরে বিবাহের অভাবে বিকৃত ভাবে, অসুন্দর ভাবে যৌবনকে উপভোগ করছি।

শ্যামা এই সব নানা কথা ভাবে। যৌবন তার শেষ হয়ে চলেছে, তার অদৃষ্ট বোধ হয় স্বামীর ঘর করা আর হয়ে উঠবে না। কিন্তু সে আরও ভাবে রমার কথা। রমার সাথে তার কথা হয়। রমা বলে, "দিদি, আমরা রূপহীনা, আমাদের অর্থ নাই, এই জন্যই হয়তো আমাদের যৌবন ফলে-ফুলে ভরে উঠবে না। কিন্তু তাই বলে আমি আমার জীবন তোমার মতন ব্যর্থ হতে দেব না।" কোনও প্রকারে বি, এ, পাশ করতে পারলেই কাজ একটা তার জুটবেই সে জানে। তাকে আর দাদার গলগ্রহ থাকতে হবে না। সে আর কিছু না পারুক অন্ততঃ নিজের ইচ্ছামত নিজের জীবনকে উপভোগ করতে পারবে। রমা দেখেছে তার স্কুল-কলেজের ছাত্রী-জীবনে কত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষিতা মেয়েকে এই ভাবে জীবন চালাতে। তাদের মতন জীবনই এখন রমার আদর্শ ও কাম্য। কিন্তু রমার বুদ্ধি এখনও শ্যামার মতন পরিণত নয়, তাই সে বুঝেও বুঝতে পারে না, কেন তার স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরা তাকে বার বার নিষেধ করতেন, সে উচ্চশিক্ষিতা হোক্ তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁদের মতন জীবন যেন তার না হয়। রমা ভেবে পায় না—তবে কি তারাও তার দিদির মতন অসুখী?

বছর দুই পরে। রমা বি, এ, পাশ করে তারই শৈশবের বিদ্যালয়ে চাকুরী করছে। নিজের চেষ্টায় সে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে একটা ক্লাব করেছে। কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু উপরওয়ালার চোখ-রাঙানীতে দমে যাবার মেয়ে সে নয়, কারণ অনেক বাধার মধ্য দিয়ে তাকে আজ এত দূর এগিয়ে আসতে হয়েছে। স্কুলের বাইরেই সে তার ক্লাবের কাজ চালায়, শরীর-চর্চ্চা করায় মেয়েদের খেলা-ধূলার ভিতর দিয়ে, লাঠি খেলে, ছোরা খেলে। পাঠচক্রের ব্যবস্থা করেছে, মধ্যে মধ্যে বিতর্ক-সভা ডাকে। প্রতি রবিবার বয়স্কা মেয়েদের নিয়ে একটি সভা করে, সেখানে নানান্ দেশের মেয়েদের কথা, ঘর-গৃহস্থালীর সুব্যবস্থার কথা, গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য সম্বন্ধে, শিশু-পালন সম্বন্ধে, প্রভৃতি পরিচর্য্যা সম্বন্ধে কত কী আলোচনা করে। এই ভাবে রমা তার নিজের জীবনকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োগ করেছে, কোথাও এতটুকু ফাঁক রাখেনি সে। তার ইচ্ছা, তার হাতে গড়া প্রত্যেকটি মেয়ে হবে এক-একটি স্ফুলিঙ্গ, তারা পুরাতনের সব-কিছু আবর্জ্জনা পুড়িয়ে ফেলে নতুন ভাবে সংসার গড়বে।

শ্যামার বিয়ে হলো শেষ পর্য্যন্ত এক তৃতীয় পক্ষের প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সাথে। এক ঘর ছেলে-মেয়ের মা হয়ে নূতন বউ শ্যামা তার স্বামীর ঘরে গেল তাঁর অসীম বৈষয়িক লালসা চরিতার্থ করতে। কিন্তু এত সুখও তার কপালে বেশী দিন স্থায়ী হল না। প্রৌঢ় চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবারে নিজেই মারা গেলেন শ্যামাকে বিধবা রেখে। এই খবর যেদিন রমার কাছে এল, সেদিন সে আর স্থির থাকতে পারলে না, সে ছুটে এল তার দিদির শ্বশুরবাড়ী। দিদিকে দেখে সে অবাক্ হয়ে গেল। কোথাও কোনও দুঃখের চিহ্ন নাই তার মুখে। তার মুখ দেখে মনে হয় না কারো বিরুদ্ধে তার কোনও অভিযোগ আছে বলে, তার নিজের ভাগ্যের জন্য সে কাকেও দোষী করতে চায় না। রমা তাকে বুকে জড়িয়ে বললে—দিদি, আর আমি তোমাকে সহ্য করতে দেব না মুখ বুজে এত অত্যাচার। এই ধনতান্ত্রিক অর্থসর্বস্ব স্বার্থপর সমাজকে ভাঙবার দিন আজ এসেছে। আর এ ভেঙ্গে ফেলবার ভার আমাদের, বাইরের লোক এসে এ কাজ করবে না। তুমি কিছুতেই পারবে না এই ঘর আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে, তোমার জীবন নষ্ট করতে।

শ্যামা তবু একবার আপত্তি করে—এ যে আমার স্বামীর ভিটা, আমি হিন্দুর মেয়ে, এ ভিটা ছেড়ে চলে যাওয়াটা আমার পাপ।

রমা তার মনের দ্বন্দ্ব বুঝতে পেরে বলে, জানি দিদি, তোমার দ্বন্দ্ব কোথায়, মনে। কিন্তু দিদি, কে তোমার স্বামী? স্বামি-স্ত্রী সম্বন্ধ আমাদের ধর্ম্মে, মানুষের ধর্ম্মে অনেক বড় আদর্শ—সে কেবল হাতের লোহা, মাথার সিঁদুর ও স্বামীর ঐ ভিটার মাটিটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ঐ প্রৌঢ় অর্থলোভী চরিত্রহীন লোকটাকে তুমি সত্যিই কোনও দিন স্বামী বলে মেনে নিতে পেরেছিলে কি? কোনও দিন তোমাদের মনের মিলন হয়েছিল? সত্যিই কি তুমি তার জীবন-সঙ্গিনী হতে পেরেছিলে? কতকগুলো সংস্কারান্ধ লোক বসে দেখল আর তোমরা দু'জন মন্ত্র পড়লে বলেই কি সে তোমার ইহকাল পরকালের দেবতা হয়ে গেল? না দিদি, তা হয় না। এই বদ্ধ সমাজের ক্ষুদ্র ভিটা আঁকড়ে পড়ে থাকলে চলবে না, তোমাকে আসতেই হবে কাজের মধ্যে। নূতন সমাজ গড়তে হবে,—যে সমাজে দুঃখিনী শ্যামা-রমা থাকবে না। যে সমাজে যৌবনের যথার্থ সম্মান থাকবে, সুন্দর ভাবে তরুণ-তরুণীরা তাদের জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যাবে—সত্য ও সুন্দরের উপাসনা করে, সমাজে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করে। সে কাজের মধ্যে বিপদ আসতে পারে, চেষ্টায় একবার ব্যর্থতা আসতে পারে, কিন্তু অকল্যাণ নাই।

শ্যামা জিজ্ঞাসা করে—আমার খাওয়া-পরা চলবে কি ভাবে? রমা বলে,—তুমি আমার কাছে থাকবে, তুমি নার্সিং শিখবে, বা অন্য কোনও কার্য্যকরী শিক্ষা নিতে পারবে। যে কোনও স্বাধীন উপজীবিকা তুমি গ্রহণ করবে, তুমি এগিয়ে চলবে। এ রকম ভাবে সঙ্গিহীন হয়ে তুমি তিলে তিলে মরতে পারবে না। বাঁচবো যত দিন মানুষের মতন বাঁচব। মরতে যখন হবে মানুষের মতন মরব।

সমস্ত রাত্রি ধরে তারা দুই বোনে অনেক আলোচনা করলে। শ্যামা বুঝতে পারে, রমা আর সে আগেকার রমা নাই। সে কত বিষয়ে জানে, কত পড়াশুনা করেছে, কত দেশের খবর সে জানে। কত ভিন্ন সম্প্রদায়ের—ভিন্ন দেশের নারী-সমাজের সে খবর রাখে।

রমা যে কাজের মধ্য দিয়েই পথ বেছে নিয়েছে, সে কথা শ্যামা বুঝতে পারে। তাদের দেশের কি শিক্ষিতা, কি অশিক্ষিতা সব

মেয়েদের কি রকম অবস্থা সব সে রমার কাছ হতে শোনে। সকলের সাথে নিজেকে এক পর্য্যায়ে ফেলে সে অনেকটা সাহস ও বল পায়।

পরদিন ভোর হল। তখন আকাশে আলো ফুটে ওঠেনি। দুই বোনে হাত ধরে বেরিয়ে পড়ল সামান্য কিছু সম্বল নিয়ে। শ্যামার সামনে নূতন অজানা পথ—যে পথ ধরে গেলে সে জানে তারই মতন হতভাগ্য তরুণ-তরুণীরা পারবে এই সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলতে, এ রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বিপ্লব আনতে, যাতে করে তাদের জীবন ফুলে-ফলে ভরে না উঠলেও ভবিষ্যতে তাদেরই মতন ছেলে-মেয়েরা সুন্দর জীবন-প্রভাত দেখতে পাবে।

লক্ষ্য-ভ্রষ্ট

শ্রীমতী শোভা দেবী

ভারতের স্বাধীনতা যুগ-সন্ধিক্ষণে
ভ্রান্ত হলে হিন্দু-মুসলমান
অস্তে গেল জ্ঞান-সূর্য্য, লক্ষ্য-ভ্রষ্ট
হলে হতমান।
ধ্বস্ত হল মুসলিম গৌরব
ধ্বংস হল হিন্দুর বৈভব
কাঁদে দেশ শোকে ম্রিয়মাণ।
স্বাধীনতা-হোম-যজ্ঞে বলি দিলে
ধর্ম্ম, সত্য, জ্ঞান
রক্ত-রাঙা ভ্রাতৃ-হৃদি
সে অগ্নিতে হবি দিলে দান।
কেন হলে এমন বিকল ?
উদয়ের রাঙা পথে
কেন ডাক তীব্র অমঙ্গল।
স্বর্গ কি গড়িলে নব ?
নারীত্বের করি অপমান,
আপনার সর্ব্বনাশ নিজ হস্তে
করিলে নির্ম্মাণ,
নিজ ভাগ্য করিলে সৃজন
জননীর অশ্রুজলে আপনার করিছ তর্পণ।
শকুনিরে খাদ্য দিলে,
শনি রাজা সিংহাসনে হাসে
নাই অন্ন, বস্ত্র নাই
সবই গেল রাহু-কেতু-গ্রাসে,
শিব আজি হয়েছেন শব
বক্ষে তাঁর ছিন্নমস্তা
নাচিছেন প্রলয় তাণ্ডব।
কে তাঁরে থামাবে আজি
ওগো হিন্দু ওগো মুসলমান—
কর তাঁরে শান্ত আজি
এক হয়ে কর স্তবগান।
মিলনের নব অভ্যুদয়,
বিস্মৃতি সাগর হতে
এনে দিক্ চির শান্ত, চির জ্যোতির্ম্ময়।

জামাই-ষষ্ঠী।

শ্রীমতী অমিয়া দেবী

তখন সবে মাত্র বেঙ্গল টাইমে ভোর ৫টা হইয়াছে—খোকা মায়ের ঘরের দরজা ঠেলাঠেলি সুরু করিয়া দিল, "মা, ও মা, কখন উঠবে বল ত, কখন সকাল হয়ে গেছে!" মায়ের কোন উত্তর পাওয়া গেল না। শয়ন-ঘরের দুয়ার খুলিয়া একটি ১৭।১৮ বৎসরের কুমারী বাহির হইয়া আসিল। মেয়েটির পরনে একখানি লাল পাড় আধ-ময়লা শাড়ী, কর-প্রকোষ্ঠে দু'গাছি সরু সোণার চুড়ি, কঠোর দারিদ্র্যের ছাপ ভেদ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে একটা যৌবন-শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে দেখিবা মাত্র খোকা বলিয়া উঠিল—"ছোড়দি, এতক্ষণে ঘুম ভাঙ্গল তোমার ? আমি সেই কখন থেকে জেগে বসে আছি, আর আজ যে জামাই-ষষ্ঠী, দিদি আর জামাই বাবুকে আনতে যাবার কথা, সে বুঝি ভুলে গেছ ? মা এখনও ঘুমোচ্ছেন।" নিদ্রালস কণ্ঠে মেয়েটি উত্তর দিল—"দিদিকে আনতে যাবার এখনও অনেক সময় আছে রে খোকা, মা কাল সারা রাত মশার কামড়ে ঘুমোতে পারেননি, এখন একটু ঘুমোচ্ছেন, তুই অত চেঁচাস্ নে ত।" "যা, রে, আমি বুঝি শুধু শুধু চেঁচালাম।"—খোকা মুখ ভার করিল।

সলিলকুমার ওরফে খোকার বয়স অনুমান ১৫ বছর হইবে, মুখখানিতে এখনও বালসুলভ সরলতা লাগিয়া আছে, শ্যাম বর্ণ, শীর্ণকায়, দেখিলে মনে হয় অভাব যেন তাহার কঠিন হস্তের নিষ্পেষণে ছেলেটির কৈশোরের কমনীয়তাটুকু শোষণ করিয়া লইয়া তাহার দেহে আপন জয়ের পতাকা উড়াইয়া দিয়াছে। শৈশবে পিতৃহারা এই ভাই, দুই দিদির স্নেহের পুতলী, অভাব-অনটনের সংসার, অর্দ্ধেক দিন অর্দ্ধাশনে কাটে কিন্তু তবুও তাহারই মধ্যে যতখানি সম্ভব দুই বোনে ছোট ভাইটিকে অভাবের তীব্রতা হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করে। বহু চেষ্টায় বড় বোনটিকে গত মাঘ মাসে পাত্রস্থ করা হইয়াছে। জামাই তাঁহার মাতা ও নববধূকে লইয়া কলিকাতাতেই বাসা ভাড়া করিয়া থাকেন। আজ জামাই-ষষ্ঠী, খোকার মায়ের বড় ইচ্ছা, মেয়ে-জামাইকে আনিয়া আজিকার কল্যাণ-কর্ম্ম করিবেন। তাহারই জন্য খোকার এত ব্যস্ততা।

খোকার মুখ ভার দেখিয়া ছোড়দি চঞ্চল হইয়া উঠিল, খোকার পিঠে হাত রাখিয়া সস্নেহে কহিল—"দেখ, কি বললাম—ছেলের অমনি রাগ হয়ে গেল! আর তুই হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নে, মা ততক্ষণে উঠবেন।"

* * * *

বাহির হইবার পূর্ব্বে খোকা ডাক দিল—"ও ছোড়দি, শুনে যাও ত একবার।" ছোড়দি আসিলে এ-দিক ও-দিক চাহিয়া খোকা নিম্নস্বরে কহিল—"আচ্ছা বল ত জামাই বাবু কি খেতে ভালবাসেন খুব ?" তাহার বলার ধরণ দেখিয়া ছোড়দি হাসিয়া ফেলিয়া কহিল—"মস্ত গোপন কথা ত ? তা তিনি যা খেতে ভালবাসেন খাওয়াবি বুঝি তুই ?" খোকা একটু অপ্রতিভ ভাবে কহিল—"আমার তিনু কাকা দোলের সময় একটা টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন সেটা তোমার কাছে আছে, আমাকে দাও, ফেরবার পথে জামাই বাবুর জন্য কিছু নিয়ে আসব।" ছোড়দি কোন কথা না বলিয়া টাকাটা বাহির করিয়া

দিল। সত্যই, নূতন জামাইকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইতেছে, তাহার মান রক্ষা করা ত চাই! মায়ের হাতে যাহা আছে তাহাতে ত শাক-ভাত ছাড়া আর কিছুই হইয়া উঠিবে না। তবে খোকা বেচারীর সঞ্চিত টাকাটা খরচ হইয়া যাইবে, মা জানিলে বড় ব্যথা পাইবেন, কিন্তু উপায় কি? গরীবের আবার ব্যথা! অতি দুঃখেই ছোড়দির অধর-প্রান্তে একটু ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। সাবানে কাচা শতছিন্ন জামাটি গায়ে দিয়া, চটী পায়ে, খোকা মহা উৎসাহে জামাই বাবুকে আনিতে চলিল, বলিয়া গেল,—"মায়ের ঘরে আমার একটা কাপড় আছে সেটা সাবান দিয়ে রেখ ছোড়দি, ওবেলা জামাই বাবুকে নিয়ে বেড়িয়ে আসব।"

এই ত সুকিয়া ষ্ট্রীটের মোড়, ঐ যে বাঁ-হাতি হলদে রঙের বাড়ীখানা, ওটাই না দিদির শ্বশুরবাড়ী? হ্যাঁ, ওই বাড়ী-ই ত, ওই যে ছাদে বড়দির সেই বাদামী রঙের শাড়ীখানা শুকাইতেছে, জানালায় কে যেন দাঁড়াইয়া আছে, বড়দি না?

"কে রে ছোকরা, পথ দেখে চলতে জানে না"—সহসা চিন্তা-সূত্রে বাধা পড়িল, পথে কাহার সহিত ধাক্কা এবং তার সঙ্গে ধমক খাইয়া খোকা থমকিয়া দাঁড়াইল। মুখ ফিরাইতেই ভর্ৎসনাকারীর সহিত চোখো-চোখী হইয়া গেল, খোকা উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল, "জামাই বাবু, আপনি? আপনাদেরই ত আনতে যাচ্ছি আমি।" খোকার এই নিমন্ত্রণে জামাই বাবু নামধের খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ লোকটির বিশেষ কোন উৎসাহের লক্ষণ দেখা গেল না, উপরন্তু তিনি উপেক্ষাসূচক একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিতে গিয়া, কি যেন ভাবিয়া অর্দ্ধপথে থামিয়া গেলেন, কেবল বলিলেন—"আমার ত যাবার সময় হবে না।" খোকার মুখে ম্লান ছায়া পড়িল। কিন্তু পরক্ষণেই হাসিয়া কহিল—"আপনি না হয় কাল যাবেন জামাই বাবু, আজকে বড়দিকে ত নিয়ে যাই?" "মাকে জিজ্ঞেস করে দেখ গিয়ে, পাঠাবার মালিক তিনি।" প্রভুত্বসূচক স্বরে এই ক'টি কথা বলিয়া তিনি যে পথে চলিতেছিলেন সেই পথে চলিয়া গেলেন।

বড়দি সত্যই জানালা হইতে খোকাকে দেখিতে পাইয়াছিল, আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। খোকা তাহাকে দেখিয়াই পুলকিত কণ্ঠে বলিল—"বড়দি, তোমাকে নিতে এলাম।" বড়দি সে কথার উত্তরে কেবল বলিল—"চল, ভিতরে চল।" তাহার পর ভিতরে লইয়া গিয়া নিম্নস্বরে কহিল—"ওই ঘরে শাশুড়ী আছেন, প্রণাম করে আয়।" তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া শ্বশ্রূমাতা নিজেই অগ্রসর হইয়া আসিতেছিলেন, খোকা গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। অদূরে উঠানে বসিয়া ঝি বাসন মাজিতেছিল, প্রশ্ন করিল—"ছেলেটি কে, মা?"

"বউএর ভাই"—অবজ্ঞার সুরে এই ক'টি কথা বলিয়া তিনি বোধ করি যে কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া আসিয়াছিলেন তাহাই করিতে চলিয়া গেলেন। খোকা কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল, এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া দেখিল বড়দি কোথায় যেন লুকাইয়াছে। মিনিট পাঁচেক পরে কর্ত্রী ঠাকুরাণী বাহিরে আসিলেন এবং খোকাকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন—"দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাছা, যাও না বোনের কাছে।" খোকা সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিয়া ফেলিল—"আমি দিদিকে নিয়ে যেতে এলাম।"

"কার হুকুমে?"

সাংসারিক রীতি-পদ্ধতিতে অনভ্যস্ত খোকা কি বলিবে বুঝিতে না পারিয়া সঙ্কুচিত স্বরে বলিল—"মা বলে দিলেন।"

শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণী বহু কষ্টে এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়াছিলেন, এইবার তিনি যেন রোষে ফাটিয়া পড়িলেন—মা বললেন! "যার সিকি কড়ার মুরোদ নেই তার আবার এত দরদ কেন, বাছা, মেয়ের উপর? একটি মাত্র ছেলে আমার, তার বিয়ে দিলাম, কত সাধ-আহ্লাদ করবে, তা নয়, এমন হাভাতে ঘরের মেয়ে এনেছি যে দোলে একটা তত্ত্ব নেই, জামাই-ষষ্ঠীতে একটা তত্ত্ব নেই, খালি হাত-নাড়া দিয়ে ভাই এসে দাঁড়ালেন, দিদিকে নিতে এলাম, নিয়ে যেতে এসেছ যাও নিয়ে, আর নিয়ে এস না, এই আমি বলে দিলাম।"

খোকা স্তম্ভিত, অদূরে থামটার আড়ালে বড়দি দাঁড়াইয়া, চোখে তাহার জলের ধারা নামিয়া আসিতেছে, তাহা গোপন করিতেই বুঝি মুখ ফিরাইয়া লইল।

জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড রৌদ্রে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর খোকা ম্লান মুখে ধীরে ধীরে বাড়ীর পথে চলিতেছে, ওদিকে খোকার ছোড়দি তখন জীর্ণ বাড়ীর অন্ধকার ঘরগুলা গুছাইয়া গাছাইয়া যথাসম্ভব শ্রীযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে—হাজার হোক, জামাই আসিতেছেন।

সংগ্রাম

বেলা বসু

রক্ত-রাঙা শতাব্দীর শুষ্ক পর্ণপুটে
অন্তরের অগ্নি-জ্বালা কাব্য হয়ে ফুটে।
স্তব্ধ সুর; জেগে ওঠে তীব্র আর্ত্তনাদ
জীবনের পাত্র ভরি মরণের স্বাদ।

অপমৃত্যু, অপমান, অবিচার শত
অন্যায় বন্ধনে প্রাণ শ্বসিছে নিয়ত।
তবু রচি স্তবগান তাদের উদ্দেশে
বিপ্লবের বহ্নি যারা জ্বালাইল দেশে,

তুচ্ছ করি জীবনের সমস্ত কল্যাণ
পথেরে জানিল ধ্রুব—তাহাদের দান
অক্ষয়, অমর জানি; জানি সে সংগ্রাম
দিকে দিকে ছড়াইবে অগ্নি অবিরাম।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ—

১৬ই সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। পৃথিবীর ৬০টি কঠিন সমস্যা মীমাংসিত হওয়ার জন্য এই অধিবেশনের সম্মুখে উপস্থাপিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্যালেষ্টাইন, বলকান-সীমান্ত, ভেটো ক্ষমতা, স্পেন, দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রতি আচরণ, দুর্ব্বল দেশগুলির অবস্থা এবং নিরস্ত্রীকরণ ও পরমাণু-শক্তির আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ, এই সাতটি সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য। এই অধিবেশনের নির্ব্বাচিত সভাপতি ব্রাজিলের প্রতিনিধি সেনর অসওয়াল্ডো আরানহা তাঁহার উদ্বোধন অভিভাষণে বলিয়াছেন, "The truth is that the United Nations has been able to do very little since the last session. The agenda contains a great many items, but it narrows down to the question whether the road selected will lead to peace or strife. অর্থাৎ 'সত্য কথা বলিতে কি, অধিবেশনের পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বিশেষ কিছুই করিতে পারে নাই। কার্য্য-সূচীতে অনেক বিষয় স্থান পাইয়াছে, কিন্তু উহা একটি মাত্র ক্ষুদ্র প্রশ্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, গৃহীত পন্থা শান্তি না সংগ্রামের দিকে লইয়া যাইবে।' ডক্টর আরানহার রোগ-নির্ণয় যে ঠিকই হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যাধিটা কাহার, রোগের নিদানই বা কি, কি এই রোগের ঔষধ, এই তিনটি প্রশ্নের কোন উত্তর তিনি দেন নাই। মার্কিণ রাষ্ট্র-সচিব মিঃ জর্জ্জ মার্শাল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি পুনর্গঠনের যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যাইতেছে রোগটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের। তাঁহার বক্তৃতা হইতে ইহা অনুমান করিলে ভুল হইবে না যে, রাশিয়া ও ভেটো ক্ষমতাকেই তিনি রোগের নিদান বলিয়া মনে করেন। ঔষধের ব্যবস্থা তিনি করিয়াছেন, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের পঞ্চান্নটি জাতির সদস্য লইয়া একটি অস্থায়ী ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন এবং ভেটো দানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা। মিঃ মার্শাল তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "সর্ব্বসম্মতিক্রমে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হইলে কোন কাজ হইবে না বলিয়া যে বিধান আছে তাহার অপব্যবহারের ফলে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান তাহার অনেক দায়িত্ব প্রতি-পালন করিতে অসমর্থ হইয়াছেন।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সদস্য একটি রাষ্ট্রের যখন বাহির হইতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে, তখন এই পরিষদ দর্শকের মত নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না।" কিন্তু তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘে যে ব্যাপক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে চাহিতেছেন তাহাতে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সত্যই আছে কি?

জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ তাহার অনেক গুরু দায়িত্ব প্রতিপালন করিতে অসমর্থ হইয়াছে, এ কথা সত্য। কিন্তু এই দুর্ব্বলতার কারণ জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের মধ্যে খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না। জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের বাহিরে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের দুর্ব্বলতা তাহারই প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই সংখ্যাধিক্যের ভোট দ্বারা ভেটোর ক্ষমতাকে বিলোপ করিলেও জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের দুর্ব্বলতা দূর হইবে না। ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপারে তো ভেটোর প্রশ্ন উঠে নাই! ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ আক্রমণের বিরুদ্ধে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যই রাশিয়া প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন তাহাদের অনুগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সহযোগিতায় যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদকেই শক্তিশালী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের বাহিরে জাতিপুঞ্জসঙ্ঘকে উপেক্ষা করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতি কোন্ পথে পরিচালিত হইতেছে, ট্রুম্যান-নীতি ও মার্শাল-পরিকল্পনার মধ্যেই আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। উহার উদ্দেশ্য যে সমগ্র পৃথিবীতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা, সে বিষয়েও কাহারও কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, বিশ্বশান্তির যে সর্ত্ত আমেরিকা দাবী করিয়াছে, তাহা পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী লোকের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি না করিয়া পারে নাই। জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের বাহিরে আমেরিকা যে নীতি অনুসরণ করিতেছে জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘকেও সেই নীতি অনুসারে পরিচালিত করিবার অভিপ্রায়েই মিঃ মার্শাল জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির পুনর্গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ ট্রুম্যান-নীতি কার্য্যকরী করিবার প্রধান অস্ত্রে পরিণত হইবে।

বৃহৎ রাষ্ট্রপঞ্চক একমত না হইলে পৃথিবীতে শান্তি রক্ষা করা সম্ভব নয়, এই নীতির ভিত্তির উপরেই ভেটো ক্ষমতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু মিঃ মার্শাল মনে করিতেছেন যে, বৃহৎ রাষ্ট্রপঞ্চকের একমত হওয়া অপেক্ষা সংখ্যাধিক্যের ভোটের উপরেই পৃথিবীর শান্তি নির্ভর করিতেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই যখন আমেরিকার খাতক, তখন অধিকাংশ ভোটের উপর তাঁহার গভীর আস্থা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ভেটোর বাধা মুক্ত হইয়া আমেরিকা যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের উপর অবাধ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, তাহা হইলে এই প্রতিষ্ঠানটি দ্বিতীয় লীগ অব নেশান্সে পরিণত হইবে। ফলে শান্তিরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইবে তৃতীয় মহাযুদ্ধের।

'শাইলক-পরিকল্পনা'—

ওয়াশিংটন হইতে প্রেরিত ইউনাইটেড প্রেস অব আমেরিকার ৪ঠা অক্টোবর তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, মস্কো গেজেটে মঃ পোগোদিন কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধে মার্শাল-পরিকল্পনাকে 'শাইলক-পরিকল্পনা' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। মঃ পোগোদিন লিখিয়াছেন, "There never was a 'Marshal Plan' but there was a Shylock Plan." অর্থাৎ 'মার্শাল-পরিকল্পনা বলিয়া কোন পরিকল্পনা নাই, আছে শুধু শাইলক-পরিকল্পনা।' দুর্গত ইউরোপের পুনর্গঠনের নামে মার্কিণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আসন্ন অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে রক্ষা করাই যে মার্শাল-পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য, তাহা বুঝিতে খুব কষ্ট হয় না। তাহার 'পাউণ্ড অব ফ্লেস' ষোল আনা আদায়ের সুব্যবস্থা না হইলে ইউরোপ যে আমেরিকার সাহায্য পাইবে না, তাহা ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। মার্শাল-পরিকল্পনা সম্পর্কে ইউরোপের ষোড়শ রাষ্ট্র মিলিয়া যে রিপোর্ট বা পরিকল্পনা করিয়াছেন, মার্কিণ অর্থনৈতিক বিভাগের সহকারী সেক্রেটারী মিঃ ক্লেটনের দৃষ্টিতে তাহা shoping list অর্থাৎ 'বাজারের ফর্দ' ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। ইউরোপের ষোড়শ রাষ্ট্র কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে হিসাব করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য চতুর্ব্বার্ষিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইলে আমেরিকার নিকট হইতে ৩ শত কোটি ডলার প্রয়োজন হইবে। কিন্তু মিঃ ক্লেটনের মুখে ঐ মন্তব্য শুনিয়া কমিটির সদস্যরা ভড়কিয়া গিয়াছেন। আমেরিকাকে খুসী করিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিয়া হিসাবটাকে আরও খাটো করিয়া ২২০ কোটি ডলার করিয়াছেন। কিন্তু মিঃ ক্লেটনের দৃষ্টিতে উহাও অত্যন্ত বেশী বলিয়া মনে হইয়াছে। শেষ পরিণাম কি হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন। ইউরোপের বিশেষজ্ঞরা আমেরিকায় যাইয়া এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। আমেরিকাও অবশ্য চুপ করিয়া বসিয়া নাই। এই পরিকল্পনার শৃঙ্খলে ইউরোপের ষোলটি দেশকে শৃঙ্খলিত করিয়া কিরূপে আমেরিকার পদানত রাখা যায় তাহার জন্য তোড়জোড় ভাল ভাবেই চলিতেছে। কিন্তু এই পরিকল্পনা আমেরিকা কর্তৃক তাহার মনের মত করিয়া সংশোধিত হইয়া কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হইতে যে-সময় লাগিবে সেই সময়ের জন্য অন্তর্ব্বর্ত্তী সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

অন্তর্ব্বর্ত্তী সাহায্যের জন্য কি পরিমাণ ডলার প্রয়োজন হইবে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কমিটির রিপোর্টে তাহারও একটা হিসাব দেওয়া হইয়াছে। এই হিসাবে দেখা যায়, ১৯৪৮ সালে নিম্নলিখিত দেশগুলির নিম্নলিখিতরূপ ডলার ঘাটতি হইবে:—বৃটেন ২৬৩ কোটি ডলার; ফ্রান্স ১৭৬ কোটি ডলার; জার্ম্মাণীর ইঙ্গ-মার্কিণ এলাকা ১১৫ কোটি ডলার; বেলজিয়ম ৩২ কোটি ডলার; ডেনমার্ক ২১ কোটি ডলার; জার্ম্মাণীর ফরাসী এলাকা ১২ কোটি ডলার; গ্রীস ৫১ কোটি ডলার; ইটালী ৯৩ কোটি ডলার; নেদারল্যাণ্ড ৬৩ কোটি ডলার; নরওয়ে ৫ কোটি ডলার এবং সুইডেন ১৫ কোটি ডলার। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ফ্রান্স, ইটালী ও অষ্ট্রিয়াকে অন্তর্ব্বর্ত্তী সাহায্য দিবার জন্য প্রচার-কার্য্য করিতেছেন। তিনি মনে করেন, ইংলণ্ডের অবস্থা বর্ত্তমানে তেমন গুরুতর নয়। ফ্রান্স, ইটালী ও অষ্ট্রিয়াকে যে ৫৮ কোটি ডলার অন্তর্ব্বর্ত্তী সাহায্য দিবার চেষ্টা চলিতেছে তাহাও অনেকে পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু মার্শাল-পরিকল্পনাকে মিঃ বেভিন দুই বাহু বাড়াইয়া গ্রহণ করা সত্ত্বেও আমেরিকা বৃটেনের আর্থিক দুর্গতি দেখিয়াও নিশ্চেষ্ট কেন? আমেরিকার অভিপ্রায় অনুমান করা সত্যই কি খুব কঠিন?

আমেরিকার নিকট বৃটেন যে ঋণ করিয়াছিল তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। বৃটেন এখন খরচ করিতেছে তাহার মজুত সোণা ও ডলার হইতে। এই ভাবে আর বেশী চলিতে পারে না। কিন্তু আমেরিকা যদি সহজেই বৃটেনকে ঋণ দিতে রাজী হয়, তাহা হইলে আমেরিকা তাহার সুবিধা-মত সর্ত্ত আদায় করিতে পারিবে কেন? আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে বৃটেন যাহাতে 'ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্সে'র দাবী পরিত্যাগ করে আমেরিকা সেই চেষ্টাই করিতেছে। বৃটিশ কমনওয়েলথের জন্য মিঃ বেভিন কাষ্টম ইউনিয়নের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাই পাল্টা প্রস্তাব হিসাবে আমেরিকা বৃটেনের নিকট ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনের দাবী করিয়াছে। এই দাবী পূরণ না করিলে আমেরিকা বৃটেনের ডলার-ঘাটতি পূরণের দাবী পূরণ করিবে কি?

বৃটিশ মন্ত্রিসভার সংস্কার—

বৃটিশ শ্রমিক মন্ত্রিসভার বহু প্রত্যাশিত সংস্কার সম্প্রতি সম্পূর্ণ হইয়াছে। সংস্কারের প্রথম ধাপে ব্যবসা-বাণিজ্যের পাঁচটি বিভাগের উপর কর্তৃত্ব দিয়া অর্থনৈতিক ব্যাপার সংক্রান্ত একটি নূতন মন্ত্রিপদ সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স এই নূতন মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। স্যার জেমস উইলসন স্যার ক্রিপসের স্থলে বাণিজ্য-বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। দপ্তরহীন মন্ত্রী স্যার আর্থার গ্রীণউডকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সমর-সচিব মিঃ বেলেঞ্জার এবং সরবরাহ-সচিব মিঃ জন উইলমটও পদত্যাগ করিয়াছেন। লর্ড ইনম্যান পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে ভাইকাউণ্ট এডিসন লর্ড প্রিভিসিল হইয়াছেন। মিঃ ফিলিপ নোয়েলবেকার ভাইকাউণ্ট এডিসনের স্থলে কমনওয়েলথ রিলেশন্স মন্ত্রী হইলেন। মিঃ আর্থার উডবার্ণ স্কটল্যাণ্ডের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হইলেন এবং বিমান বিভাগের মন্ত্রী হইলেন মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন। পেনশান বিভাগের মন্ত্রী মিঃ জন হাইণ্ড পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থানে মিঃ জর্জ্জ বুকানন নিযুক্ত হইয়াছেন। মন্ত্রিসভার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রদ-বদল জ্বালানী বিভাগের মন্ত্রী মিঃ শিনওয়েলের পদত্যাগ এবং তাঁহার স্থানে মিঃ গেইটস্কেলের নিয়োগ। মিঃ শিনওয়েল সমর-সচিব হইয়াছেন, কিন্তু মন্ত্রিসভায় তাঁহার আসন নাই। মন্ত্রিসভার সদস্য-সংখ্যা ১৯ জন হইতে কমাইয়া ১৮ জন করা হইয়াছে।

জ্বালানী বিভাগের মন্ত্রীর পদ হইতে মিঃ শিনওয়েলের অপসারণ বৃটিশ শ্রমিক মন্ত্রিসভা সংস্কারের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। বৃটিশ পত্রিকা-সমূহ মিঃ শিনওয়েলের অপসারণে খুব খুশী হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। গত শীতকালে কয়লার অভাব হওয়ার জন্য মিঃ শিনওয়েল অনেকের অপ্রীতিভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু জ্বালানী বিভাগের মন্ত্রীর পদ হইতে তাঁহাকে অপসারণ করার উহাই একমাত্র কারণ নহে। 'ইয়র্কশায়ার পোষ্ট' পত্রিকা আবিষ্কার করিয়াছেন যে, ১৯২১ সালে মিঃ শিনওয়েল বলিয়াছিলেন, ব্যাঙ্কসমূহ জাতীয় করণের ব্যাপারে পুঁজিপতিরা বাধা দিলে সৈন্যবাহিনী দ্বারা তাঁহাদিগকে দমন করা উচিত। মিঃ শিনওয়েল

ট্রেড ইউনিয়নপন্থী। বৃটিশ শ্রমিক দলের যে অংশ মনে করে যে, আমেরিকার পরিবর্ত্তে রাশিয়ার সহিত বৃটেনের সহযোগিতা করা কর্ত্তব্য, মিঃ শিনওয়েল সেই অংশের অন্তর্ভুক্ত। শ্রমিক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে টোরী দলের প্রধান আক্রমণের কারণই হইল মিঃ শিনওয়েল। তাঁহার প্রতি বিলাতের খনি-মজুরদের যথেষ্ট আস্থা আছে। কিন্তু শ্রমিক মন্ত্রিসভার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থকরা তাঁহাকে পছন্দ করেন না। বৃটিশ মন্ত্রিসভা হইতে মিঃ শিনওয়েলের অপসারণ ফরাসী মন্ত্রসভা ও ইটালীর মন্ত্রিসভা হইতে কম্যুনিষ্ট সদস্যদের অপসারণের তুল্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। খনি-মজুররা মিঃ শিনওয়েলের অপসারণে দৃঢ়তার সহিত আপত্তি করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মন্ত্রিসভার এই সংস্কারে আমেরিকা সন্তুষ্ট হইবে কি?

পেটকোভের ফাঁসী—

গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধে বুলগেরিয়া গবর্ণমেন্টের বিরোধী দলের নেতা নিকোলা পেটকোভকে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে। এই ঘটনাটি আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যে কিরূপ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে তাহা বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিবার বিষয়। পেটকোভকে গত ৬ই জুন গ্রেফ্‌তার করা হয়। জাতীয় পরিষদ তাঁহাকে পার্লামেন্টারী অধিকার হইতে বিচ্যুত করিলে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের দিক্‌ হইতেই প্রথম প্রতিবাদ উত্থাপন করা হয়। অতঃপর বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এবং মার্কিণ গবর্ণমেন্ট বহু বার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই ব্যাপারটি লইয়া এক দিকে রাশিয়া আর এক দিকে বৃটেন এবং আমেরিকার মধ্যে নূতন আর একটি বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। বৃটেন এবং আমেরিকা মনে করে, পেটকোভের ফাঁসী শুধু সভ্যতার বিরুদ্ধেই অপরাধ নয়, ইহা দ্বারা ইয়াল্টা চুক্তিও ভঙ্গ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই ফাঁসীর ফলে বুলগেরিয়ান শান্তিচুক্তির ২ ধারার সর্ত্তও বুলগেরিয়া লঙ্ঘন করিয়াছে। বুলগেরিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি মনে করে, জনগণ ও জাতির স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য পেটকোভকে ফাঁসী দেওয়া অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।

বুলগেরিয়া রাশিয়ার প্রভাবাধীন দেশ হইলেও এখানে কম্যুনিষ্ট ডিকটেটরশিপ প্রতিষ্ঠিত নাই। হাঙ্গেরী ও রুমানিয়ার ন্যায় এখানে যে শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত তাহা 'নয়া গণতন্ত্র' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রের সহিত নয়া গণতন্ত্রের পার্থক্য এখানে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, নয়া গণতন্ত্রও বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রের মতই শ্রেণীগত ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বৃহৎ ব্যক্তিগত শিল্প প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব এখানে নাই। ছোট ও মাঝারি ব্যক্তিগত শিল্প প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব অবশ্যই আছে। ভূমি-ব্যবস্থায় জমিদারের কোন স্থান নাই। কৃষকরাই জমির মালিক, কাজেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা সমাজতান্ত্রিক নয়, অথচ ধনতন্ত্রের অস্তিত্বও বিলোপ করা হয় নাই। এইরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইয়াছে তাহারই নাম নয়া গণতন্ত্র। কাজেই এইরূপ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বুর্জ্জোয়াদের সহিত কম্যুনিষ্টদের বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করিবে ইহা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এই সকল নয়া গণতান্ত্রিক দেশে কম্যুনিষ্টরাই শক্তিশালী বেশী। আবার একেবারেই আত্মবিলুপ্তির আশঙ্কায় বুর্জ্জোয়া ও পাতি বুর্জ্জোয়ারা যদি একেবারে মরিয়া হইয়া উঠে তাহাতেও বিস্মিত হইবার কিছু নাই। বুর্জ্জোয়ারা যখনই মাথা তুলিবার চেষ্টা করে তখন বাধ্য হইয়াই কঠোর ভাবে তাহাদিগকে দমন না করিলে চলে না। হাঙ্গেরীতেও আমরা তাহাই দেখিয়াছি। পেট্‌কোভের ফাঁসীও অনুরূপ ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়। হাঙ্গেরীর ন্যায় বুলগেরিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির পিছনে রাশিয়ার শক্তি রহিয়াছে বলিয়াই বৃটেন এবং আমেরিকা উহাকে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। পূর্ব্ব-ইউরোপ অঞ্চলে ধনতন্ত্রের প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। পেটকোভের জীবনের মূল্য অপেক্ষা বৃটেন ও আমেরিকার পুঁজিপতিদের কাছে উহারই গুরুত্ব বেশী। পেটকোভের জন্য তাহাদের যাহা কিছু দরদ সমস্তই পূর্ব্ব ইউরোপের ধনতন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্য হইতেই প্রসূত।

কোমিণ্টার্ণের পুনরুজ্জীবন—

৫ই অক্টোবর (১৯৪৭) তারিখে যুগোশ্লোভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড হইতে প্রেরিত রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ইউরোপের নয়টি দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি মিলিত হইয়া ১৯৪৩ সালের জুন মাসে কম্যুনিষ্ট ইণ্টারনেশন্যাল ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পর প্রথম আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড, সোভিয়েট রাশিয়া, ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, ইটালী এবং হাঙ্গেরী এই নয়টি দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিগণ পোল্যাণ্ডের ওয়ারস সহরে এক সম্মেলনে সমবেত হইয়াছিলেন। এই সম্মেলনে বেলগ্রেড সহরে একটি স্থায়ী ইন্‌ফরমেশন ব্যুরো প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই ইন্‌ফরমেশন ব্যুরো প্রতিষ্ঠাকেই আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট প্রতিষ্ঠান গঠন বলিয়া অভিহিত করা হইলেও উহা যে কম্যুনিষ্ট ইণ্টারনেশন্যালেরই পুনরুজ্জীবন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ব্যুরোর মারফৎ বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট পার্টি তাহাদের অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান করিবে এবং প্রয়োজন হইলে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে তাহাদের কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে সংযোগ বিধান করা হইবে। বেলগ্রেড হইতে প্রকাশিত উক্ত সম্মেলনের এক ইস্তাহারে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের নিকট নূতন যুদ্ধ সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সম্মিলিত কার্য্যসূচী গ্রহণের আবেদন জানান হইয়াছে।

নূতন কম্যুনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়ায় বৃটেন, আমেরিকা এবং ফ্রান্সে উহার প্রতিক্রিয়া খুব তীব্র আকারেই দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের গঠনকেই মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণ নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বলিয়া প্রচার করিবার উদ্দেশ্য কম্যুনিজম্‌-ভীতিকে আরও ব্যাপক ও তীব্র করিয়া তোলা ছাড়া আর কিছুই নয়। ৬০টি দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি লইয়া কমিণ্টার্ণ বা কম্যুনিষ্ট ইণ্টারনেশনাল গঠিত হইয়াছিল। সে তুলনায় ইউরোপের মাত্র নয়টি দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে সংহত করিবার চেষ্টা নগণ্য মাত্র। কিন্তু মার্কিণ ডলারের আক্রমণের বিরুদ্ধে ইউরোপের বামপন্থীদিগের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা হইতেই উল্লিখিত ইন্‌ফরমেশন ব্যুরো গঠন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ইউরোপের কম্যুনিষ্টদের মতবাদের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছিল। বুর্জ্জোয়া কোয়ালিশন গবর্ণমেন্টে যোগদান করাই এই পরিবর্ত্তন। হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ায় যে কোয়ালিশন গবর্ণমেন্ট গঠিত হইয়াছে তাহার কথা আমরা এখানে উল্লেখ করিতেছি না। এই

কয়টি দেশের কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্টের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। ফ্রান্সে ও ইটালীতেও কম্যুনিষ্টরা বুর্জ্জোয়া কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু মার্কিণ পুঁজিপতিদের একরূপ প্রকাশ্য প্ররোচনার ফলেই মন্ত্রি-সভা হইতে তাঁহাদিগকে অপসারিত করা হইয়াছে। ট্রুম্যান-নীতি ও মার্শাল-পরিকল্পনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে ইউরোপে বামপন্থীদের আর কোন অস্তিত্বই থাকিবে না। রাশিয়ার পক্ষেও একান্ত অসহায় হইয়া থাকা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকিবে না। ট্রুম্যান-নীতি ও মার্শাল-পরিকল্পনার মধ্য দিয়া আমেরিকা যে চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করিয়াছে আত্মরক্ষার জন্য তাহার বিরুদ্ধে একটা সাধারণ নীতি ও কর্ম্ম-পদ্ধতি গ্রহণের উদ্দেশ্যেই উল্লিখিত ইন্‌ফরমেশন ব্যুরো গঠন করা হইয়াছে।

সিংহলের নূতন নির্ব্বাচন—

সোলবারী শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সিংহলের সাধারণ নির্ব্বাচন গত ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে শেষ হইয়াছে এবং ইউনাইটেড নেশন্যাল পার্টির নেতা মিঃ ডি, এস, সেনানায়কের প্রধান মন্ত্রিত্বে ২৫শে সেপ্টেম্বর নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। এই সাধারণ নির্ব্বাচনে বিভিন্ন দলের অবস্থা নিম্নলিখিতরূপ হইয়াছে:—ইউনাইটেড নেশন্যাল পার্টি—৪২; ট্রটস্কীপন্থী সমসমাজ পার্টি—১০; বলশেভিক লেনিনিষ্ট পার্টি—৫; কম্যুনিষ্ট—৩; তামিল কংগ্রেস—৭; সিংহল ভারতীয় কংগ্রেস—৬; স্বতন্ত্র—১৮; স্বতন্ত্র সমাজতন্ত্রী দল—৫; শ্রমিক দল—১। মোট দশটি দল এই নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল। দুইটি দলের একটি প্রার্থীও নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না। যাঁহারা স্বতন্ত্র বা স্বাধীন ভাবে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ১৮ জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সিংহলে যে-সকল ভারতীয় বাস করেন তাঁহাদের সংখ্যা সিংহলের মোট জনসংখ্যার এক-ষষ্ঠাংশ। ভারতীয় কংগ্রেসের টিকিটে ভারতীয় নির্ব্বাচন-প্রার্থীদের ৬ জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বামপন্থীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত। তাঁহাদের এই দুর্ব্বলতা নির্ব্বাচনের মধ্যে বিশেষ ভাবেই পরিস্ফুট হইয়াছে। সকল বামপন্থী দল মিলিয়া ১৮টি আসনের বেশী দখল করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে আবার বহুনিন্দিত ট্রটস্কীপন্থী সমসমাজ দলই ১০টি আসন দখল করিয়াছেন। কম্যুনিষ্ট দলের মাত্র তিন জন প্রার্থী নির্ব্বাচিত হইতে পারিয়াছেন। বলশেভিক-লেনিনিষ্ট পার্টি দখল করিয়াছেন ৫টি আসন।

মিঃ সেনানায়কের ইউনাইটেড নেশন্যালিষ্ট পার্টিই বর্ত্তমানে সিংহলের সুগঠিত শক্তিশালী রাজনৈতিক দল। কিন্তু এই দলও নির্ব্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে পারেন নাই। এই দল মোট ৪২টি আসন দখল করায় বিভিন্ন দলের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াছেন বটে। নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সিংহলের প্রতিনিধি-পরিষদের মোট সদস্য-সংখ্যা ১০১ জন। তন্মধ্যে নির্ব্বাচিত সদস্য ৯৫ জন এবং ৬ জন মনোনীত হইবেন। মনোনীত সদস্য ৬ জনই যেইউনাইটেড নেশন্যাল পার্টিরই সদস্য হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি এই দলের পক্ষে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সম্ভব হইবে না। মিঃ সেনানায়ক কোন দলের সহিত কোয়ালিশন করিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করেন নাই। ১৪ জন সদস্য লইয়া গঠিত তাঁহার মন্ত্রিসভায় যে এক জন মুসলমান এবং তামিল সদস্য আছেন, তাঁহারা স্বাধীন ভাবে নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন।

সিংহলে নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথম নির্ব্বাচন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই গত ১৮ই জুন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সিংহলকে সীমাবদ্ধ ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। নির্ব্বাচনের শেষে মিঃ সেনানায়ক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "বৎসরের শেষেই আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিব।" আগামী পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যেই সিংহলের দেশরক্ষা ব্যবস্থা এবং পররাষ্ট্র ব্যাপার সম্পর্কে বৃটেনের সহিত সিংহলের চুক্তি সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী সিংহলবাসীর হাতে শাসন-ক্ষমতা অর্পিত হইবে।

ব্রহ্মনেতাদের হত্যার বিচার—

পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম কারাগার বলিয়া কথিত রেঙ্গুনের ইনসিন জেলের ভিতর ৮ই অক্টোবর হইতে ব্রহ্মদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী উ স এবং তাঁহার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নয় জন সদস্যের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। গত ১৯শে জুলাই ব্রহ্ম শাসন পরিসদের ডেপুটি চেয়ারম্যান জেনারেল আউঙ্গ সান এবং তাঁহার সহকর্ম্মীকে হত্যা এবং ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র করা অভিযোগে তাঁহারা অভিযুক্ত হইয়াছেন। উ স ১ নং আসামী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং প্রকৃত হত্যাকারী বলিয়া মিওচিং দলের চারি জন সদস্যের নাম করা হইয়াছে। তাঁহাদের বিচারের জন্য স্পেশ্যাল ট্রাইবুনাল গঠিত হইয়াছে। উ স ব্যতীত অভিযুক্তদের সকলেই তরুণ বয়স্ক। এক জনের বয়স মাত্র ১৮ বৎসর। আসামীর তালিকায় যাঁহাদের নাম আছে তাঁহাদের মধ্যে এক জনকেই শুধু স্পেশ্যাল ট্রাইবুনালের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় নাই। এই আসামীটি না কি রাজসাক্ষী হইয়াছেন এবং তাঁহাকে সর্ত্তাধীনে ক্ষমা করা হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশের ভূম্যধিকারীদের মধ্যে উ স'র বহুসংখ্যক অনুগামী আছেন। তাঁহার অনুগামীরা তাঁহাকে ছিনাইয়া লইয়া যাইতে পারে অথবা অন্য কোন উপায়ে বিচার-কার্য্যে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে এই আশঙ্কায় খুব কড়া পাহাড়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এমন কি, জেলের ভিতরে অবস্থিত বিচার-গৃহকে সুরক্ষিত করা হইয়াছে। বিনা শরীর-তল্লাসীতে কাহাকেও ঢুকিতে দেওয়া হয় নাই। বিলাত হইতে তাঁহার ব্যবহারজীবীর আগমন সাপেক্ষে উ স দুই সপ্তাহের সময় প্রার্থনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, ব্রহ্মদেশের অনেক ব্যবহারজীবী তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু ভীতি প্রদর্শন করায় তাঁহারা কেহই উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বিলাত হইতে উ স'র ব্যবহারজীবীর আগমন সাপেক্ষে মামলা সাত দিনের জন্য মুলতুবী রাখা হয়। এই মামলায় সরকার পক্ষে অন্যূন ১২০ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইবে। সুতরাং এই মামলা যে অনেক দিন ধরিয়া চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নিরাপত্তা পরিষদ ও ইন্দোনেশিয়া—

ইন্দোনেশিয়ার যুদ্ধ-বিরতির আদেশ যে লঙ্ঘিত হইয়াছে ছয় জন কন্সাল কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রাথমিক রিপোর্টে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ইন্দোনেশিয়ার যুদ্ধ-বিরতির অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া উক্ত ছয় জন কন্সাল গত ২৪শে সেপ্টেম্বর বাটাভিয়া হইতে তাঁহাদের প্রাথমিক রিপোর্ট নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির নিকট প্রেরণ করেন। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ২০শে জুলাই হইতে ৪ঠা আগষ্ট পর্য্যন্ত ওলন্দাজ

সৈন্যবাহিনী বর্শা-ফলকের আকারে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ফলে প্রজাতন্ত্রী সৈন্যবাহিনীর মূল অংশ পশ্চাদপসরণ করিলেও ওলন্দাজ ব্যূহের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের বহু সৈন্য রহিয়া গিয়াছে। ইন্দোনেশিয়দের বিরুদ্ধে পোড়া-মাটি নীতি গ্রহণ ও অবস্থান-ভূমিতে চীনাদিগকে লুণ্ঠন করার অভিযোগও করা হইয়াছে বটে, কিন্তু এ কথাও রিপোর্টে স্বীকার করা হইয়াছে যে, ওলন্দাজগণ ইন্দোনেশিয়দিগকে উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা করায় যুদ্ধ-বিরতির নির্দ্দেশ সত্ত্বেও সংগ্রাম চলিতেছে। এই রিপোর্টকে নিরপেক্ষ বিবরণ বলিয়া স্বীকার করা কঠিন। ইন্দোনেশিয়ার অবস্থার গুরুত্বও লঘু করিবার প্রয়াস ইহাতে দেখা যায়। বস্তুতঃ রুশ প্রতিনিধি মঃ আঁদ্রে গ্রমিকো উক্ত রিপোর্টের বিরুদ্ধে এই অভিযোগই উপস্থিত করিয়াছেন। তথাপি ওলন্দাজরাই যে নিরাপত্তা পরিষদের নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিয়াছে, কন্‌সালদের রিপোর্ট হইতে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, নিরাপত্তা পরিষদের আদেশ লঙ্ঘন করিবার দুঃসাহস ওলন্দাজরা প্রদর্শন করিতে পারিল কিরূপে? রুশ-প্রতিনিধি বলিয়াছেন, কতিপয় গবর্ণমেণ্টের সমর্থন আছে বলিয়াই নেদারল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্ট নিরাপত্তা পরিষদের নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইয়াছে। তাঁহার অভিযোগ যে বাস্তব সত্য তাহা অস্বীকার করিবার উপায় আছে কি?

নিরাপত্তা পরিষদে ছয় জন কন্সালের রিপোর্ট সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে তাহা হইতে ইহা বেশ ভাল ভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহাদের নির্দ্দেশ লঙ্ঘিত হওয়ায় নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হন নাই। অষ্ট্রেলিয়ার সদস্য অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করিবার জন্য তিন সদস্যের এক কন্‌সিলিয়েশন কমিটি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। রুশ-প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন যে, যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে উভয় পক্ষের সৈন্য-বাহিনী যেখানে ছিল সেইখানে প্রত্যাবর্ত্তনের নির্দ্দেশ দেওয়া হউক। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদ্ অষ্ট্রেলিয়ার প্রস্তাবই গ্রহণ করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়ম এবং অষ্ট্রেলিয়াকে লইয়া এই কন্‌সিলিয়েশন কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি যে মীমাংসার নামে ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজদের কায়েমী স্বার্থ-রক্ষারই ব্যবস্থা করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গত ২৪শে সেপ্টেম্বর ডাচ প্রধান মন্ত্রী মিঃ বীল ডাচ পার্লামেণ্টের সেকণ্ড চেম্বারে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের নূতন রাজনৈতিক গঠনের উপযোগী করিয়া ডাচ শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তনের পরিকল্পনা গঠন করিতেছেন। ডাচ শাসনতন্ত্রের এই পরিবর্ত্তন যে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা প্রাপ্তির অনুকূল হইবে না, তাহা অনায়াসেই ধরিয়া লইতে পারা যায়। সুমাত্রা ও জাভার একাংশে তাঁবেদার গবর্ণমেণ্ট গঠনের আয়োজনও চলিতেছে। সুতরাং ইন্দোনেশিয়া আজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের সম্মিলিত ফ্রণ্টের সম্মুখীন হইয়াছে।

ইরাণ-রুশ তৈলচুক্তি সমস্যা—

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর বিশ্ববাসী বিস্মিত হইয়া শুনিতে পাইল যে, পারস্যের উত্তর-সীমান্তবর্ত্তী সোভিয়েট এলাকায় প্রবল সামরিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে। ট্যাঙ্ক, মেসিন-গান ও সন্ধানী আলোর মহড়া চলিতেছে দিবারাত্র। সেই সঙ্গে ইহাও শোনা গেল যে, তেহরাণস্থিত মার্কিণ রাষ্ট্রদূত মিঃ জর্জ এলেন ঘোষণা করিয়াছেন যে, পারস্যকে তাহার নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ্ রক্ষার কার্য্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সর্ব্বথা সাহায্য করিবে। তাঁহার এই ঘোষণার পর পারস্যের উত্তর-সীমান্তে তিন ব্যাটেলিয়ন বহুসজ্জিত সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে বলিয়াও সংবাদে প্রকাশ। যুদ্ধ বুঝি আবার বাধিয়া উঠিল—এরূপ আশঙ্কাজনক উল্লিখিত সংবাদগুলির পটভূমিতে রহিয়াছে পারস্যের সহিত সোভিয়েট রাশিয়ার তৈলচুক্তি। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে পারস্যের সহিত রাশিয়ার যে তৈলচুক্তি হইয়াছে, গত ১২ই আগষ্ট তেহরানস্থ সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত তাহা পারস্যের মজলিস (পার্লামেণ্ট) কর্ত্তৃক অনুমোদন করাইয়া লওয়ার দাবী জানান। উহারই এক মাস পরে উল্লিখিত সংবাদ প্রকাশ খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। অতঃপর ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে তেহরান হইতে প্রেরিত ইউনাইটেড প্রেস অব আমেরিকার সংবাদে প্রকাশ—পারস্যের সীমান্তবর্ত্তী সোভিয়েট এলাকায় সোভিয়েট সৈন্যদের মহড়া চলিতেছে এবং পারস্যের আস্তারা সহরের বিপরীত দিকস্থ সোভিয়েট এলাকায় প্রচুর সমর-সম্ভার সমাবেশ করা হইয়াছে এবং ইরাণ-তুর্কী সীমান্তবর্ত্তী বাস্তরগানে ইরাণী সৈন্যের শক্তি-বৃদ্ধির জন্য আরও সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ যে, 'আজাদ' পত্রিকায় বলা হইয়াছে, পারস্যের উত্তর দিক হইতে কোন অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিলে পারস্যের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনটি মার্কিণ রণতরী ভারত মহাসাগর হইতে পারস্য উপসাগরে উপস্থিত হইয়াছে।

ইরাণী গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত যে তৈলচুক্তি করিয়াছিলেন নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে মজলিস কর্ত্তৃক তাহা অনুমোদন করাইয়া লওয়া হয় নাই। সুতরাং ইরাণী গবর্ণমেণ্ট যে তৈলচুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন, এ কথা অস্বীকার করা সম্ভব নহে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায়, ইতিমধ্যে সোভিয়েট সৈন্য পারস্য হইতে চলিয়া গিয়াছে, আজের-বাইজানের সদ্য লব্ধ স্বায়ত্ত-শাসন বিলুপ্ত হইয়াছে এবং মার্কিণ অর্থ সাহায্যে পারস্যের প্রতিক্রিয়াশীল দল উঠিয়াছে মাথা চাড়া দিয়া। এক সময়ে রাশিয়ার সহিত বন্ধুত্বই মঃ সুলতানেকে পারস্যের প্রধান মন্ত্রীর আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আজ তাঁহার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে আমেরিকার হাতে। আমেরিকার অর্থ সাহায্যে পারস্যের সামরিক ব্যবস্থা আধুনিক সামরিক কায়দায় গড়িয়া উঠিতেছে। পারস্যের মজলিস ইরাণ-সোভিয়েট তৈলচুক্তি অগ্রাহ্য করুক, ইহা-ই যে আমেরিকা চায় তাহা তেহরানস্থ মার্কিণ রাষ্ট্রদূতের উল্লিখিত ঘোষণা হইতে অনুমান করিলে ভুল হইবে না। বৃটেন কিন্তু এ বিষয়ে মার্কিণ-নীতি পুরাপুরি সমর্থন করিতেছে না। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। আমেরিকার দ্বারাই যদি কাজ হাসিল হয় অর্থাৎ আমেরিকার চাপে ইরাণী মজলিস যদি রাশিয়ার সহিত তৈলচুক্তি বাতিল করিয়া দেয়, তবে বৃটেন আর কেন ঝামেলার মধ্যে যাইতে চাহিবে?

পারস্যের তৈল-সম্পদ আহরণ করিতেছে আমেরিকা ও বৃটেন। সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত তৈলচুক্তি পারস্য বাতিল করিয়া দিলে অতি-নিকট প্রতিবেশী রাশিয়ার সহিত পারস্যের গভীর মনোমালিন্য সৃষ্টি হইবে। ইহার উপর রাশিয়ার সহিত তৈলচুক্তি বাতিল করিয়া পারস্য যদি উত্তর-ইরাণের তৈল সম্বন্ধে আমেরিকার সহিত চুক্তি করে, তবে অবস্থা আরও গুরুতর হইয়া উঠিবে। তবে এইরূপ

হইতে পারে যে, উত্তর-ইরাণের তৈল সম্বন্ধে রাশিয়ার সহিত চুক্তি বাতিল করার পরই পারস্য আমেরিকার সহিত ঐ তৈল সম্বন্ধে চুক্তি করিবে না। কিন্তু পারস্য যে ভাবী তৃতীয় মহাসমর আরম্ভ হওয়ার একটি কেন্দ্র হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দুর্য্যোগের সম্মুখে প্যালেষ্টাইন—

প্যালেষ্টাইন একটা ভয়ানক অবস্থার সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে। সামান্য কিছু সংশোধন করা হইলে তদন্ত কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপোর্ট ইহুদীরা মানিয়া লইতে রাজী আছে। কিন্তু আরবরা প্যালেষ্টাইন বিভাগ কিছুতেই মানিয়া লইবে না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত আরব এবং ইহুদী উভয় পক্ষ মিলিয়া গ্রহণ না করিলে বৃটেন ম্যাণ্ডেট পরিত্যাগ করিবে এবং প্যালেষ্টাইন হইতে বৃটিশ সৈন্য সরাইয়া লওয়া হইবে। বৃটিশ-বাহিনী প্যালেষ্টাইন পরিত্যাগ করিলেই পার্শ্ববর্ত্তী আরবরাষ্ট্র সমূহ হইতে প্যালেষ্টাইনে অভিযান প্রেরণের আয়োজন চলিতেছে। প্যালেষ্টাইন রক্ষার জন্য দামাস্কাসের উপকণ্ঠে ৪৫ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী গঠন করা হইতেছে। বৃটিশ সৈন্য প্যালেষ্টাইন পরিত্যাগ করিলে অনেক বৃটিশ অফিসার স্বেচ্ছাসৈনিকরূপে প্যালেষ্টাইনে থাকিয়া আরবদিগকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক। বর্ত্তমানে ইহাই প্যালেষ্টাইনের অবস্থা।

জাতিপুঞ্জসঙ্ঘে প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ১১ই অক্টোবর তারিখে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া প্যালেষ্টাইন কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী প্যালেষ্টাইনকে আরব ও ইহুদী-রাষ্ট্রে বিভক্ত করার এবং প্যালেষ্টাইনে ইহুদী গমনের পরিকল্পনা সমর্থন করিয়াছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করিবার জন্য আন্তর্জ্জাতিক পুলিশ-বাহিনী গঠনেরও প্রস্তাব করা হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সঙ্ঘ যদি সর্ব্বসম্মতিক্রমেও প্যালেষ্টাইন বিভাগ ও প্যালেষ্টাইনে ইহুদী গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী হইবে, ইহা আশা করা সম্ভব নহে।

প্যালেষ্টাইনের এই আসন্ন দুর্য্যোগের জন্য বৃটিশ-দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাঁহারাই প্যালেষ্টাইনে লক্ষ লক্ষ ইহুদী আমদানী করিয়াছেন। অতঃপর আরব ও ইহুদী উভয় পক্ষকে বিবদমান করিয়া তুলিয়া প্যালেষ্টাইন হইতে সরিয়া আসিতে চাহিতেছেন। কিন্তু বৃটিশ সামরিক অফিসাররা স্বেচ্ছাসৈনিকরূপে সাহায্য করিবে আরবদিগকে। এই ভাবে প্যালেষ্টাইন হইতে বৃটিশ সৈন্যের অপসারণ প্যালেষ্টাইন হইতে ইহুদী অপসারণের তুল্যই হইবে। কিন্তু ইহুদীদের যাওয়ার স্থান কোথায়?

নিরাপত্তা পরিষদে মিশরের ব্যর্থতা—

ইঙ্গ-মিশরীয় বিরোধের সমাধানের জন্য মিশরের প্রধান মন্ত্রী নোকরশী পাশা নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্ততঃ পক্ষে বর্ত্তমানে তাঁহাকে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। বৃটেন এবং মিশর উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা দ্বারা মীমাংসার জন্য চীন যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। অতঃপর কোন্ পন্থা গ্রহণ করা হইবে, কে নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করিবে, তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। সুতরাং নোকরশী পাশার আবেদন লইয়া নিরাপত্তা পরিষদে সৃষ্টি হইয়াছে অচল অবস্থা। চীনের প্রস্তাবটি যে আদৌ সঙ্গত প্রস্তাব নহে তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু কোন্ পথে ইঙ্গ-মিশরীয় বিরোধের অবসান হইবে, কবে হইবে, সে সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করিবার উপায় নাই। নিরাপত্তা পরিষদে মিশরের ব্যর্থতায় মিশরের যে অবস্থার সৃষ্টি তাহাও অত্যন্ত গুরুতর।

নিরাপত্তা পরিষদ বৃটেনের বিরুদ্ধে মিশরের দাবী মানিয়া না লওয়ায় কায়রো এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ এবং মিলের শ্রমিকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছেন। বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় 'বৃটিশ ক্রীড়নক নোকরশী পাশা নিপাত যাউক' তাঁহারা এই ধ্বনি করিয়াছেন। পোর্ট সৈয়দে বৃটনিয়া ক্লাব, বৃটিশ স্কুল ও বৈদেশিক বাইবেল সোসাইটি এবং মার্কিণ কনসালের অফিসের উপর লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কায়রোতে ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ছাত্ররা জনগণকে বিদ্রোহ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছেন। ইহাই মিশরের অবস্থা।

ইন্দোচীনে ফরাসী তৎপরতা—

ভিয়েটনাম-ফরাসী সংগ্রামে দীর্ঘ স্তব্ধতার পর সম্প্রতি ফ্রান্সের দিক হইতে নূতন আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। কিছু দিন ধরিয়া ফ্রান্সের শরৎকালীন আক্রমণ এবং ইন্দোচীনের সহিত মীমাংসার প্রচেষ্টার কথা আমরা শুনিয়া আসিতেছিলাম। উপযুক্ত শাসকদের হাতে ইন্দোচীনের শাসন-ভার অর্পণ করিতে ফরাসী সরকারের ইচ্ছা এবং সেই সঙ্গে ভিয়েটনামীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ ব্যাপার। হংকং-এ নির্ব্বাসিত আনামের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ বাওদাই-এর নেতৃত্বে ইন্দোচীনে একটি অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠনের আয়োজন ফ্রান্সের প্ররোচনাতেই যে চলিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই এইরূপ গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইলে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাহা স্বীকার করিয়া লইবেন। ইন্দোচীনের বৈদেশিক নীতি ও দেশরক্ষার ব্যবস্থা ফ্রান্সের হাতেই থাকিবে।

সাংহাই হইতে প্রেরিত ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের ইউ-পি-এর সংবাদে প্রকাশ, 'সানপাও' নামক একটি পত্রিকায় হংকং হইতে প্রেরিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ফরাসীরা ইন্দোচীনের ভিয়েটনাম নেতা হো-চী-মিনকে বন্দী করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে। অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে এই সংবাদ না কি প্রকাশ করা হইবে না। এই সংবাদ সত্য হইলে বাওদাইয়ের গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাই যে এই অনুকূল অবস্থা, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সামরিক এবং রাজনৈতিক উভয় ফ্রন্টেই ভিয়েটনাম গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতেছে। রাজনৈতিক ফ্রন্টে বাওদাই গবর্ণমেণ্ট গঠনের আয়োজন এবং সামরিক ফ্রন্টে ভিয়েটনাম গবর্ণমেণ্টের হেড কোয়ার্টার্স বাক্কান দখলের চেষ্টা চলিতেছে। ভিয়েটনাম গবর্ণমেণ্ট নিয়ন্ত্রিত রেডিওতে বলা হইয়াছে, "আমাদের বিরুদ্ধে ফরাসীদের শরৎকালীন আক্রমণ পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইয়াছে। ভিয়েটনামীরা সর্ব্বপ্রকারে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিবে।"

শারদোৎসব

শারদীয়া পূজা আসিতেছে কিন্তু প্রাণে আনন্দ আসিতেছে কই? বাঙ্গালী আজ ম্রিয়মাণ। মুখে হাসি নাই! অন্ন-কষ্টে বস্ত্র-সঙ্কটে অর্দ্ধমৃত। স্বাধীনতা আসিয়াছে, কিন্তু শান্তি আসে নাই। ভারত বিভক্ত হইয়াছে। কেবল ভৌগোলিক বিভাগ নহে, ভারতবাসীর মনেও ফাটল ধরিয়াছে। তাই পূজার আনন্দ মনে রঙ ধরাইতে পারিতেছে না। সকল সময়ই মনে খচ-খচ করিতেছে, পূর্ব্ব-বাঙ্গালার অথবা পশ্চিম পাঞ্জাবের যথা লাহোর, রাওলপিণ্ডি ইত্যাদি স্থানের বাঙ্গালীরা হয়ত' এইবার দুর্গোৎসব সুসম্পন্ন করিতে পারিবে না। কয়েক দিন পূর্ব্বে ঢাকায় জন্মাষ্টমী মিছিল বন্ধ করা হইয়াছে। সেই জন্যই আমাদের এই ভয়। দুর্গে দুর্গতিনাশিনী মা! ভারতের বাঙ্গালীরা যেন সুষ্ঠু ভাবে বৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব পালন করিতে পারে, তোমার চরণে এই প্রার্থনা।

গান্ধী-জয়ন্তী

ভারতের মুক্তি-যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক, অহিংসা মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি, বিশ্ববন্দিত মহামানব মহাত্মা গান্ধীর ১৫ই আশ্বিন ছিল উনাশীতম জন্মতিথি। তাঁহারই নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা-সংগ্রামে অর্জ্জিত স্বাধীন ভারতে তাঁহার জন্মতিথি উৎসব এই প্রথম। পৃথিবীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে মহাত্মাজীর সংগ্রাম-কৌশল এক অভিনব পদ্ধতি। অতীত ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের বিপুল সামরিক শক্তিকেও পরাজিত করিয়া তিনি জয়-গৌরব অর্জ্জন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার সংশয়হীন বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অন্তস্পর্শী গভীরতা পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সমাজ-বিপ্লবের শক্তিরূপে তাঁহার নেতৃত্বে যে অভিব্যক্তি হইয়াছে দেশবাসীর আনুকূল্যের দ্বারাই তাহা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে। এই আনুকূল্যের অভাবে অর্জ্জিত স্বাধীনতাকে যেন আমরা ব্যর্থ হইতে না দিই। মহাত্মাজীর উনাশীতম জন্মতিথিতে আমরা তাঁহাকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। আরও দীর্ঘকাল তিনি আমাদের মধ্যে থাকিয়া স্বদেশী কায়েমী স্বার্থের শাসন ও শোষণ হইতে দরিদ্র জনগণকে মুক্ত করিবার সংগ্রামে নেতৃত্ব করুন, মহাত্মাজীর জন্মতিথিতে ভগবানের কাছে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব

স্বাধীন ভারতের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্ত্তন উৎসবে চ্যান্সেলার হিসাবে প্রথম ভারতীয় গভর্ণর চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী, বলিয়াছেন, এত দিন যে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহা দাস-মনোভাব গড়িবার শিক্ষা। নূতন গ্রাজুয়েটদিগকে আজ স্বাধীন ভারতের নাগরিকরূপে গড়িয়া উঠিতে হইবে। ভাইস-চ্যান্সেলার নূতন গ্রাজুয়েটদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা আজ এক বৃহৎ সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। নবজাত ভারতকে শৌর্য্যে-বীর্য্যে তরুণ ভারতরূপে গড়িয়া তুলিতে তাঁহাদের দায়িত্বের কথাও তিনি নূতন গ্রাজুয়েটদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। দেশকে অজ্ঞতা ও দরিদ্রতার শোচনীয় অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া সভ্য জগতের যথাযোগ্য আসনে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে নূতন গ্রাজুয়েটদের দায়িত্বের কথাও তিনি স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলেন নাই। বিজ্ঞপ্রবর ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বিভক্ত বাঙ্গালায় শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া সংযুক্ত বাঙ্গালা গঠনের জন্য কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রধান ভূমিকা গ্রহণের এবং বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। এই সকল উপদেশ যে খুবই মূল্যবান, মানুষের জীবনে এগুলির সার্থকতা যে অপরিসীম, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ কাহারও নাই; কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নূতন গ্রাজুয়েটগণ অবিলম্বেই যে সমস্যার সম্মুখীন হইতে চলিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে কেহই কিছু বলেন নাই। এই সমস্যা তাঁহাদের জীবিকার সমস্যা।

চ্যান্সেলার রাজাজী শিক্ষাকে চাকুরী সংগ্রহের জন্য নয়, সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিবার জন্য যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা খুবই মূল্যবান। বিশ্ববিদ্যালয়কে এত দিন সকলেই চাকুরীয়া সৃষ্টির কল বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছে। চাকুরী সংগ্রহ করাই পরীক্ষা পাশের উদ্দেশ্য। শিক্ষা-পদ্ধতিই ইহার জন্য দায়ী বলিয়া এ-পর্য্যন্ত সমালোচনাও বড় কম হয় নাই। মাঝখানে বৃত্তিশিক্ষা বা ভোকেশনেল ট্রেনিং-এর একটা আন্দোলন সুরু হইয়াছিল। তার পর হইতে বহু যুবক এই বৃত্তিশিক্ষার পথে পা বাড়াইয়াছেন। কিন্তু বৃত্তিশিক্ষা শেষ করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত সেই চাকুরীর জন্যই সরকারী অফিস বা সওদাগরী অফিসের সম্মুখে ধর্ণা দিতে হয়। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে প্রথমে খাইয়া-পরিয়া বাঁচিয়া থাকা প্রয়োজন। অবশ্য জীবিকা অর্জ্জনের জন্য চাকুরীই করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য জীবিকার যে ব্যবস্থা ছিল, বর্ত্তমানে আমাদের সেই ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবিকা নির্ব্বাহের যে উপায়, তাহাও আমাদের দেশে সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠে নাই। কাজেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের অবস্থা হইয়াছে ত্রিশঙ্কুর মত। বিদ্যালয় হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাহির হইবার পূর্ব্বেই যুবকদের জীবিকা অর্জ্জনের ব্যবস্থা যাহাতে প্রস্তুত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এত দিন রাষ্ট্র বলিয়া আমাদের কিছু ছিল না। আজ আমরা স্বাধীন হইয়াছি। স্বাধীন রাষ্ট্রের গভর্ণমেন্ট এই দায়িত্ব পূরণের কি করিবেন, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু জীবিকার সন্ধানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত দেহ-মনের পক্ষে জীবনের

মহত্তর উত্তেজনা সাধন করা কতটুকু সম্ভব, নূতন গ্রাজুয়েটদিগকে উপদেশ দেওয়ার সময় সে কথা মোটেই ভাবেন নাই। জীবিকার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই তাঁহাদের পক্ষে শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের কাজে আত্মনিয়োগ করা সম্ভব। দেশের সম্মুখে আজ যে কঠোর পরীক্ষা উপস্থিত, এ-সম্পর্কে রাজাজীর সহিত আমাদের মতভেদ নাই। আমরা স্বাধীন হইয়াছি বটে, কিন্তু ভারত বিভক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা সকলেই দুর্ভাবনার মধ্যে দিন কাটাইতেছি।

চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত রাজাজী বাঙ্গালা ভাষাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহন করিবার জন্য যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা খুবই সময়োচিত হইয়াছে। কিন্তু গত ২৭ বৎসর ধরিয়া চেষ্টার পরও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে অতি সামান্যই অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষাকে ঘরে-বাহিরে সকল রকম কাজ চালাইবার উপযোগী করিতে না পারিলে উহাকে শিক্ষার বাহন করাও সম্ভব নয়। শুধু যে পরিভাষার প্রশ্নই আছে, তাহা নয়। সমস্ত রকম জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বাঙ্গালা সাহিত্যে আহরণ করিতে না পারিলে বাঙ্গালা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিয়া শিক্ষার মান উন্নত রাখা বড় সহজসাধ্য ব্যাপার হইবে না। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা সহজসাধ্য না হইলেও অসাধ্য নয়। গভর্ণমেণ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় উভয়ের সহযোগিতায়ই এই দায়িত্ব পূরণ করা সম্ভব। বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিতে হইলে বহু জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিদেশী গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে, বহু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিতে হইবে। এই সকল কাজের উপযোগী লোকাভাব অবশ্যই হইবে না। কিন্তু ইহার জন্য প্রয়োজন হইবে প্রচুর অর্থব্যয়ের। বাঙ্গালা দেশ বিভক্ত হওয়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় কমিয়া গিয়াছে। রাজাজী সরকারী সাহায্যের আশ্বাস অবশ্যই দিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণমেণ্টেরও যে অর্থসঙ্কট আছে, সে-কথাও তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশে দানশীল ধনী ব্যক্তির যে অভাব নাই, তাহাও আমরা জানি। সুতরাং অর্থাভাবের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি এবং বাঙ্গালা ভাষাকে শিক্ষার যোগ্য বাহন করিবার কাজ ব্যাহত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না।

—

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশনের আভ্যন্তরীণ গলদ ও দুর্নীতি সম্বন্ধে আলোচনা এই পর্য্যন্ত অনেক হইয়াছে, কিন্তু জনসাধারণের বাদ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই গলদ দূর করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি পদত্যাগের পর কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের সেক্রেটারীর নিকট তাঁহার সুদীর্ঘ পত্রে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে গুরুতর। এই অভিযোগ বাহিরের কোন আনাড়ি লোকের নিকট হইতে আসে নাই। কলিকাতার মেয়রের পক্ষে কর্পোরেশনের নাড়ী-নক্ষত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবেই জানিবার কথা। অতি সরল এবং স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলিয়াছেন, "কর্পোরেশনের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি, অপদার্থতা, দালালবৃত্তি ও আত্মীয়-স্বজনের অপসারণ ক্ষমতা আমাদের আছে, কিন্তু একা মেয়রের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। সেই জন্য শুধু মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের মধ্যেই নহে, কাউন্সিলারদের মধ্যেও পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। কিন্তু গত ছয় মাস ধরিয়া ঐ সহযোগিতার একান্ত অভাব আমার পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়াছে।"

জনসাধারণের স্বার্থের দিক দিয়া ব্যাপারটা এতই গুরুতর যে অবিলম্বে ইহার প্রতিবিধান হওয়া অত্যাবশ্যক। মেয়র মহাশয় এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্বন্ধে জনসাধারণকে যে সচেতন হইবার সুযোগ দিয়াছেন সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। কেবল তদন্ত কমিটি বসাইয়া যে কোন ফল হয় না, ইতিপূর্ব্বে অভিজ্ঞতা হইতে সেটুকু বুঝিবার ক্ষমতা আজ কলিকাতাবাসী সঞ্চয় করিয়াছে—শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরীও তাঁহার পত্রে সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। কর্পোরেশনের ভিতর কাউন্সিলার-গোষ্ঠীর সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য লইয়াই যে দুর্নীতি, কুটুম্ব-তোষণ, চুরি-জুয়াচুরি চলিয়া থাকে এই সত্য অতি পুরাতন—এই সম্বন্ধে নূতন করিয়া অনুসন্ধান এবং তদন্তের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। বছরের পর বছর যে সব কাউন্সিলার পকেট-ভোটের সাহায্যে কর্পোরেশনের কায়েমী আসন অধিকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সরাইয়া নূতন জনপ্রিয় লোকের প্রবেশের পথ প্রশস্ত করিয়া না দিলে কর্পোরেশনের দুর্নীতির রাজত্ব অবসান হইবার সম্ভাবনা নাই। কাউন্সিলার নির্ব্বাচনে সর্ব্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের নীতি প্রবর্ত্তিত না হইলে এই গোষ্ঠী-রাজত্ব ও ক্ষমতার অপব্যবহারের শেষ হইবে না! পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্পোরেশনের জন্য যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের নীতি এখনও স্বীকার করেন নাই। কলিকাতার জনসাধারণের পক্ষ হইতে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আজ এই দাবী মন্ত্রিসভার নিকট উপস্থিত করিবার সময় আসিয়াছে।

কর্পোরেশনকে বর্ত্তমান পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে হইলে কয়েকটি কাজ একান্ত প্রয়োজন। প্রথমটি কর্পোরেশনের দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করা। ইহার জন্য বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিতে হইবে। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল ইহাতে যতই চীৎকার করুক না কেন, কলিকাতাবাসীরা এই দাবী কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না। নিরপেক্ষ তদন্তের মতামত অনুযায়ী কর্পোরেশনকে ঢালিয়া সাজিতে না পারিলে কলিকাতার বর্ত্তমান দুর্গতি দূর হওয়া একেবারেই অসম্ভব। যে মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী কর্পোরেশনের কাজ চলিতেছে, আজিকার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাহার রদ-বদল করিতে হইবে। সর্ব্বোপরি কাউন্সিলার নির্ব্বাচন পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহলের চক্রান্তের হাত হইতে কর্পোরেশনকে উদ্ধার করা যাইবে না। বর্ত্তমানে যে সঙ্কীর্ণ ভোটাধিকার আছে, তাহাতে কাউন্সিলারদের পক্ষে পকেট-ভোট ও অন্যান্য কারসাজি করিয়া বছরের পর বছর কর্পোরেশনের গদী আঁকড়াইয়া থাকা অতি সহজ। যুক্ত নির্ব্বাচনের সহিত প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা হইলে নির্ব্বাচনের ব্যাপারে অধিক সংখ্যক ভোটারের উপর কাউন্সিলারদের নির্ভর করিতে হইবে। কর্পোরেশনে এখন বাস্তবিক পক্ষে কলিকাতার জনসাধারণের বিশেষ কোন প্রতিনিধিই নাই। ভোটার-তালিকা প্রস্তুতের ব্যাপারে নিরপেক্ষ বাহিরের লোক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

মনোনয়ন প্রথা বাতিল এবং ইউরোপীয়ানদের প্রতিনিধি-সংখ্যা হ্রাস করা সত্ত্বেও ঝানু বাস্তুঘুঘুদের কবল হইতে কর্পোরেশনকে মুক্ত করার কোন ব্যবস্থাই তাঁহারা করেন নাই, সুতরাং এ কথা বলিলে নিশ্চয় অন্যায় হইবে না যে, কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন সংক্রান্ত নূতন ব্যবস্থায় মূল রোগের কোন প্রতিকার করাই হয় নাই। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের নীতি যে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভবপর হইয়াছে, তাহার একটি কারণ এই যে, জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই বিষয়ে তেমন জোরাল দাবী এখনও উত্থাপিত হয় নাই।

কর্পোরেশনকে সত্যকার জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার দায়িত্ব আজ কলিকাতার জনসাধারণের। মন্ত্রিসভার নিকট তাঁহারা দাবী করুন, যাহাতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কাউন্সিলার নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা অবিলম্বে ঘোষণা করা হয়। যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া জনসাধারণ চোরাকারবারীদের শায়েস্তা করিবার কাজে অগ্রসর হইয়াছেন, সেই উৎসাহ লইয়া যদি কর্পোরেশনের গলদ দূর করিবার কাজে অগ্রসর হন, তাহা হইলে কর্পোরেশনে কায়েমী স্বার্থের ষড়যন্ত্র চূর্ণ করিতে মোটেই বিলম্ব ঘটিবে না।

দেশীয় রাজাদের ঔদ্ধত্য

জুনাগড়ের মোট লোকসংখ্যা মাত্র ৬,৭১,০০০ এবং ইহার মধ্যে শতকরা ৮১ জনই অমুসলমান। কাথিয়াবাড়ের অন্যান্য সকল রাজ্যই ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিলেও জুনাগড় অকস্মাৎ পাকিস্তানে যোগদান করিয়া বসিয়াছে। জুনাগড়ের নবাব সাহেব জনসাধারণের ইচ্ছার কোন ধার ধারেন নাই। ভারতীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে সে সাক্ষাৎকার প্রার্থনাও তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই অবস্থা যে নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে ভারত সরকারের পক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভব নহে, সম্প্রতি ভারত সরকারের জুনাগড় সম্পর্কিত বিবৃতিই তাহার প্রমাণ। এই বিবৃতিতে তাঁহারা স্পষ্ট করিয়াই দেখাইয়াছেন যে, ভৌগোলিক দিক হইতে জুনাগড় পাকিস্তানের পক্ষে যোগ দিলে কেবল অচল অবস্থা সৃষ্টি হইবে মাত্র। যে সব রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিয়াছে, তাহাদের অনেকের ভূখণ্ডের অংশ জুনাগড়ের সীমানার ভিতর অবস্থিত, আবার জুনাগড়ের কয়েকটি দ্বীপ ভবনগর, নবনগর, গোন্দল এবং বরোদার সীমানায় পড়িয়াছে। এইরূপ অবস্থায় জুনাগড় যদি ভারতীয় ইউনিয়নের ভিতর পাকিস্তানের সামরিক ঘাটাতে পরিণত হয়, তবে কাথিয়াবাড়ের অন্যান্য রাজ্যের স্বার্থের খাতিরে ভারত গভর্ণমেণ্টকে এই সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইতে হইবে।

ভারত গভর্ণমেণ্ট জুনাগড় রাজ্যের প্রজাদের গণ-ভোটে ভারত বা পাকিস্তানে যোগদানের প্রশ্নের মীমাংসা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবে কে? জুনাগড়ের নবাব পাকিস্তান সরকারের সাহায্যপুষ্ট হইয়া এই প্রস্তাবে যে কর্ণপাতও করিবেন না, তাহা জানা কথা। সেইরূপ অবস্থায় ভারত সরকার এবং কংগ্রেস নেতারা কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন? বস্তুতঃ পক্ষে দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের সহিত আপোষ মীমাংসার নীতি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা গ্রহণ করার ফলে আজ অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে সমস্যার সমাধানও আবিষ্কার করা যাইবে না। এত দিন পরে ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়া দেশীয় রাজাদে সম্বন্ধে বলিতে গিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৫ই আগষ্টের পর দেশীয় রাজ্যের রাজা ও দেওয়ান বাহাদুরদের সুবুদ্ধি হইবে এবং তাঁহারা ঠিক পথে চলিবেন বলিয়া তিনি এবং তাঁহার সমপর্য্যায়ভুক্ত নেতারা যে আশা করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। ১৯৪২ হইতে ১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশে যেরূপ নির্য্যাতন চলিয়াছিল, আজ দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের উপরও সেইরূপ নিপীড়ন চলিয়াছে। তবে ডক্টর সীতারামিয়া ইহার জন্য ভাগ্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়াই নিশ্চিন্ত হইতে চাহিয়াছেন। নিজেদের অদূরদর্শিতার ফলে যে এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা তিনি গোপন রাখিতে চাহিলেও সাধারণ লোকে এত সহজে এই সত্য বিস্মৃত হইবে না। এখন তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন যে, বিভিন্ন রাজ্যে আন্দোলন আরম্ভ না করিয়া উপায় ছিল না, কারণ, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে আপোষ চাহিলেও দেশীয় রাজারা তাঁহাদের সেই আপোষ-প্রচেষ্টার কোন মূল্য দেন নাই। এখনও পর্য্যন্ত দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের কাজে কংগ্রেসের ঊর্দ্ধতন নেতারা অগ্রসর হন নাই। দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলনের সহিত কংগ্রেস পরিচালিত ভারতীয় ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট যদি সক্রিয় সহযোগিতা করিতেন, তবে জুনাগড় তো তুচ্ছ, কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ, মহীশূরের মহারাজ, নিজাম ও নবাবদের ঔদ্ধত্য ধূলায় লুটাইতে বেশী বিলম্ব হইত না।

কিন্তু কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতি পরিবর্ত্তিত না হইলে কি হায়দ্রাবাদ আর কি জুনাগড়, কোন রাজ্যের শোষণ-নীতিকে পরাস্ত করা সম্ভব হইবে না। জুনাগড় সম্বন্ধে গণ-ভোটের যে প্রস্তাব ভারত সরকার করিয়াছেন, তাহা জুনাগড়ের নবাব মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলে ভারত গভর্ণমেণ্ট কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন? জুনাগড়ের প্রজাদের সক্রিয় সাহায্যদানে কি তাঁহারা সম্মত আছেন? বোম্বাই-এ জুনাগড়ের জনসাধারণের এক সভায় নবাবের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করিয়া এক অস্থায়ী সরকার গঠিত হইয়াছে। এই সরকার ভারত সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে নবাবের হস্তে যে সকল ক্ষমতা ছিল, তাহা নিজেদের হাতে গ্রহণ করিয়াছেন। ভারত সরকারের প্রস্তাব উপেক্ষিত হইলে তাঁহারা বোম্বাই-এর এই অস্থায়ী সরকারকে কি জুনাগড়ের ন্যায়সঙ্গত গভর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত হইবেন? বস্তুতঃ পক্ষে ইহার জন্য নৈতিক সমর্থনের অধিক আরো কিছু প্রয়োজন। কিন্তু সাধারণ ভাবে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত নীতির পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়া কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তথা ভারত সরকার কি ভাবে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের সাহায্য করিতে পারেন, তাহা আমরা ভাবিয়া পাইতেছি না। তাঁহারা কিল খাইয়া কিল চুরি করার নীতি এ ক্ষেত্রেও অনুসরণ করিলে অমঙ্গল বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র হেতু নাই।

পাকিস্তানের স্বরূপ

বৃটিশ শাসনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া কংগ্রেস বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে বলিয়াছিলেন—Quit India—"তোমরা ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া যাও। তাহা না করিলে আর আমাদের পক্ষে ভদ্র ভাবে জীবন যাপন করিবার উপায়ান্তর নাই। আমাদের দেশ আমরা যেমন

করিয়া পারি, শাসন করিব। আমাদের উপর মোড়লী করিবার কোন নৈতিক অধিকার তোমাদের নাই।"

কংগ্রেসের দেখাদেখি মুসলিম লীগও বলিয়াছিলেন—"ভাল কথা। ভারতবর্ষ স্বাধীন হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু Divide and quit। এ দেশ ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে ইহাকে হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া দাও। মুসলমানেরা হিন্দু হইতে পৃথক্ জাতি; অতএব ইহাদের জন্য একটা পৃথক্ রাষ্ট্র চাই। হিন্দুদের নিকট হইতে ন্যায়বিচার পাইবার কোন আশা আমাদের নাই। হিন্দুদের সঙ্গে মিশিয়া এক রাষ্ট্রের অধীন হইয়া থাকিলে আমাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব, হে ইংরেজ, তোমরা এ দেশ ছাড়িবার পূর্ব্বে ভারত বিভাগ করিয়া দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন কর।"

ঘটনাচক্রের পেষণে ইংরেজ যখন ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল, তখন দেখা গেল যে, এ দেশকে ত্যাগ করা অপেক্ষা এ দেশকে ভাগ করার দিকেই তাহার আগ্রহ অধিক। দেশ ধর্ম্মমতের ভিত্তিতে বিভক্ত হোক, ইহা কংগ্রেস কোন দিনই কামনা করেন নাই। এমন কি, কংগ্রেসের অনেক নেতা এ কথা বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই যে, রক্তারক্তির ভয়েও তাঁহারা দেশ বিভাগ মানিয়া লইবেন না। কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহারা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশই মানিয়া লইলেন—পাকিস্তান ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও মুসলিম লীগের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে এই ভাগাভাগি বন্ধ করিতে পারা যাইত কি না, আজ সে প্রশ্ন বিচার করিয়া লাভ নাই। সম্ভবতঃ কংগ্রেসের কর্ত্তারা মনে করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা অখণ্ড ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে দেশে আপাততঃ যে অরাজকতার সৃষ্টি হইবে, তাহার অপেক্ষা আপোষ-নিষ্পত্তির দ্বারা খণ্ডিত ভারতের পক্ষে ডোমিনিয়ন মর্য্যাদা লাভ করাই ভাল। রাষ্ট্রনৈতিক পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ অপেক্ষা অহিংসার আদর্শ যে শ্রেষ্ঠ, এ কথা মহাত্মাজী বহু বার বলিয়াছেন, এবং অহিংসার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃই হোক্ বা অন্য কোন কারণেই হোক্, কংগ্রেসের কর্ম্ম-পরিষদ কার্য্যকালে তাহা মানিয়া লইয়াছিলেন।

কিন্তু আজ ধীরে ধীরে অনেক চিন্তাশীল মুসলমান নেতার মনে এই সন্দেহ গজাইয়াছে যে, পাকিস্তান শুধু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ও কয়েক জন স্বার্থান্বেষী মুসলমান নেতার চক্রান্তের ফল মাত্র। ইহাদের কাঁদে পা দিয়া মুসলমানেরা ভুল করিয়াছে। যত দিন এই স্বার্থান্বেষী নেতারা প্রবল হইয়া থাকিবেন, তত দিন ভারতবর্ষের সহিত পাকিস্তানের পুনর্ম্মিলন সম্ভব হইবে না।

আজকাল অনেকে বলিতেছেন যে, পাকিস্তানে ও ভারতবর্ষে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত যাহাতে উভয় রাষ্ট্রে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি সদ্ভাবে বাস করিতে পারে। ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তারা যে প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিতেছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু পাকিস্তানের কর্ত্তারা পাকিস্তানের মূল নীতি লঙ্ঘন না করিয়া যে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোককে সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার দিতে পারিবেন, তাহা মনে করিবার বিশেষ কারণ এখনও দেখা যাইতেছে না। কংগ্রেস দুই জাতি নীতিতে বিশ্বাস করেন না; কাজেই সব সম্প্রদায়ের লোককে সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার দিতে তাঁহাদের কোনই আপত্তি হইবে না। কিন্তু ভারতবর্ষের যে সমস্ত মুসলমান এত দিন পর্য্যন্ত আপনাদিগকে হিন্দু হইতে পৃথক্ জাতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং ভারতীয় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র পাকিস্তান দাবী করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে রাতারাতি আপনাদের মত পরিবর্ত্তন করিয়া আন্তরিক ভাবে ভারত গভর্ণমেণ্টের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইবেন, তাহা বিশ্বাস করা সহজ নহে। পশ্চিম পাঞ্জাবে ও পূর্ব্ব পাঞ্জাবে মিশ্র মন্ত্রিসভার ব্যবস্থা করিয়া বা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সরকারী চাকরী বণ্টন করিয়া সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি দূর করিবার চেষ্টা করা বৃথা। পণ্ডিত জওহরলাল সোজাসুজি বলিয়া দিয়াছেন—

"যাঁহারা এই দেশের প্রতি অনুগত নহেন এখানে তাঁহাদের কোন স্থান নাই, তাঁহারা যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পারেন। এইরূপ স্থানান্তর গমনে সরকার তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিবেন।" প্রকৃতপক্ষে দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়ালই ভাল।

মহাত্মাজী চিরদিনই সাম্প্রদায়িক প্রীতি স্থাপনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কেমন করিয়া পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ পাশাপাশি অবস্থান করিতে পারে, তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য তিনি সারা উত্তর ও পূর্ব্ব-ভারতে ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন। আজ পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের ভাবগতিক দেখিয়া তিনিও অতি দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "পাকিস্তানের নিকট হইতে ন্যায়বিচার লাভের যদি অন্য কোনও পন্থা না থাকে, পাকিস্তান যদি তাহার ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও উহা অস্বীকার করিয়া চলে এবং উহার গুরুত্ব লাঘব করিতে থাকে, তাহা হইলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে উহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে হইতে পারে।" কি গভীর বেদনা পাইয়া যে মহাত্মা এ কথা বলিয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

—

পাকিস্তানের লক্ষ্য

পাঞ্জাবে ও সিন্ধুদেশে যে সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটিতেছে, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ পাইবার সম্ভাবনা আপাততঃ আছে বলিয়া মনে হয় না। পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মকর্ত্তারা মাঝে মাঝে যে বিবৃতি প্রচার করিতেছেন, সেগুলি বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় যে, ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ করিয়া বিশ্বের নিকট আপনাদের সাধুত্বের পরিচয় দেওয়া ভিন্ন সেগুলির আর অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। করাচী হইতে যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহা আশাপ্রদ নহে। অধিকাংশ দুর্ঘটনার সংবাদই সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে দেওয়া হয় না··· সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা পাছে তাহাদিগকে শেষে বস্ত্রমাত্র সম্বল করিয়া দেশত্যাগ করিতে হয়, এই ভয়ে এখন হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এদিকে পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে হিন্দু ও শিখ প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও ওখানকার মুসলিম লীগের কর্ত্তারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। যে মালিক ফিরোজ খাঁ নুন পাকিস্তানী প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে পাকিস্তান না পাইলে তিনি এ দেশে চেঙ্গিস খাঁর ধ্বংসলীলার পুনরভিনয় আরম্ভ করিবেন, সম্প্রতি তিনি আবার মুখ খুলিয়াছেন। পাঞ্জাব মুসলিম লীগের সমস্ত সভ্যকে তিনি বলিয়াছেন যে, শত্রু কর্ত্তৃক পাকিস্তান আক্রমণের যখন সম্ভাবনা রহিয়াছে।

তখন প্রত্যেক মুসলমানেরই সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা উচিত।

এদিকে শান্তিস্থাপনের জন্য পণ্ডিত জওহরলাল প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের মধ্যে লোক-বিনিময়ের নীতির যৌক্তিকতা স্বীকার না করিলেও তিনি মুসলিম লীগের তুষ্টি সাধনের জন্য আপাততঃ সেই নীতি অনুসারে কাজ করিতেছেন। সাম্প্রদায়িক প্রীতি পুনঃস্থাপনের জন্য মহাত্মাজীর চেষ্টার অবধি নাই। কিন্তু একতরফা তো আর শান্তি স্থাপন করা চলে না। মুসলিম লীগের কোন কোন নেতা মুখে শান্তির বাণী প্রচার করিলেও প্রকৃতপক্ষে এমন কিছুই করিতেছেন না, যাহার দ্বারা পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি নির্ভয়ে পাকিস্তানে বাস করিতে পারে।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই যে পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু মুসলিম লীগকে তুষ্ট করিয়া শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই যে কংগ্রেসের কর্ত্তারা ভারত বিভাগে রাজী হইয়াছিলেন, তাহাও ধ্রুব সত্য। এখনও পর্য্যন্ত কংগ্রেসের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারা পাকিস্তানকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু জোর করিয়া যে পাকিস্তান দখল করিতে হইবে এ কথা কেহ স্বপ্নেও চিন্তা করেন না। হিন্দু, মুসলমান, শিখ আবার প্রীতির সম্বন্ধে আবদ্ধ হউক এবং সকলে মিলিয়া বন্ধুভাবে এক রাষ্ট্র গঠন করুক, ইহাই কংগ্রেসের কাম্য। সুতরাং ভারতবর্ষের এক দল লোক যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া বা অন্যবিধ উপায়ে পাকিস্তানের শত্রুতা করিতে চায়, এরূপ ধারণার কোন ভিত্তি নাই।

কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে এক দল লোক যে পাকিস্তান পাইয়াও তুষ্ট হইতে পারেন নাই এবং তাঁহারা ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমানকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংস্রব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে ১০।১২টি মুসলমান রাষ্ট্র স্থাপনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। পাকিস্তান পরিকল্পনার প্রথম প্রবর্ত্তক রহমৎ আলি চৌধুরী কিছু দিন আগে বলিয়াছেন,—"আমরা শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া যাইব। অপরে যদি আমাদিগকে সাহায্য করে তো ভাল কথা। যদি না করে তো আমরা একাই যুদ্ধ চালাইব।"

বর্ত্তমান পাকিস্তানপন্থীদিগের ভিতর যে রহমৎ আলি চৌধুরী সাহেবের দলভুক্ত অনেকে আছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পরে যদি ভারতবর্ষের লোকে পাকিস্তানী লীলা একটু সন্দেহের চক্ষে দেখে, তাহা হইলে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া কি সঙ্গত? সেদিন মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনান্তিক সভায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন···"পশ্চিম পাকিস্তান হইতে যে সমস্ত শিখ ও হিন্দু বাধ্য হইয়া পূর্ব্ব পাঞ্জাবে চলিয়া আসিতেছেন, পাকিস্তানের গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহাদিগকে পশ্চিম পাঞ্জাবে থাকিতে অনুরোধ করেন না কেন?"···এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। ইহার পরেও যদি লোকে সন্দেহ করে যে লোকাপসরণই বর্ত্তমান দাঙ্গার লক্ষ্য, তাহা হইলে তাহাদিগকে দোষ দিবে কে?

ভারত গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব পাঞ্জাবের সংখ্যালঘুদের রক্ষায় প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যবস্থা করিতে যাইয়া পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখদের রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য কিছুই করেন নাই। তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, পূর্ব্ব পাঞ্জাবে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার সুব্যবস্থা হইলেও পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে হিন্দু ও শিখরা বিতাড়িত হইতেছে। এত দিন পরে এই অবস্থার প্রতি মহাত্মাজীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা খুবই আশার কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবেন কিরূপে? ইহাই প্রশ্ন।

মহাত্মাজী এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেন নাই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "যাঁহাদের সাহস ছিল, যাঁহারা শক্তিশালী বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন আজ তাঁহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন কেন?" এই প্রশ্নের উত্তর মহাত্মাজী কংগ্রেসের নীতির মধ্যে খুঁজিয়া পাইবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। স্বাধীনতার সংগ্রামকে তাহার শেষ পরিণতি পর্য্যন্ত লইয়া না যাইয়া অর্দ্ধপথে সংগ্রাম থামাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আপোষ-মীমাংসায় হইয়াছে ভারত বিভক্ত। পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখরা ভাবিতেছে, স্বাধীনতা লাভের পর তাহাদের এ কি ভীষণ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল, আজ তাহাদের ধন-প্রাণ বিপন্ন, মাথা গুঁজিবার পর্য্যন্ত তাহাদের স্থান নাই। তাহারা কি এই কথাই ভাবিতেছে না যে, ইহার জন্যই কি তাহারা বৃটিশসিংহের সহিত লড়াই করিয়াছিল? মহাত্মা গান্ধী এই প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারেন কি? বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা অর্জ্জনের আশায় কংগ্রেস সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করিয়া আপোষ করিয়াছে। কিন্তু রক্তের স্রোতে আজ পাঞ্জাব ভাসিয়া যাইতেছে। আপোষে স্বাধীনতা পাওয়ার ইহাই পরিণাম। মহাত্মা গান্ধীই এক দিন বৃটিশকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "ভারতকে ভগবান এবং অরাজকতার হাতে রাখিয়া তোমরা চলিয়া যাও।" কিন্তু বৃটিশ তাহা করে নাই। নিয়মতান্ত্রিক পথে গঠিত ভারত ও পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের হাতে তাহারা ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে। তবু কেন পাঞ্জাবে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে? এই প্রশ্নের উত্তর কঠিন নয়। কিন্তু আজ যে অবস্থায় আসিয়া আমরা দাঁড়াইয়াছি, তাহাতে প্রতিকার করা বড় কঠিন। কায়েদ-ই-আজম মিঃ জিন্না শুধু পাকিস্তানই দাবী করেন নাই, অধিবাসী বিনিময়ও দাবী করিয়াছেন। পাঞ্জাবে গায়ের জোরে সেই অধিবাসী বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হইতেছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা না করিলে ভারতে মুসলমানগণ এবং পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখগণ দুরবস্থায় পতিত হইবে এবং এই অবস্থা চলিতে থাকিবে বংশানুক্রমে। স্বাধীন ভারতের সম্মুখে কি সুন্দর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ! কিন্তু সংখ্যালঘুদের এই দুরবস্থার পরিণামে ভারত ও পাকিস্তান উভয়ই ধ্বংস হইলে তাহা বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। বৃটিশের তাহাই কাম্য। পাকিস্তান সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যও ইহাই।

পাঞ্জাবের ন্যায় বাঙ্গালায় যাহাতে তীব্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ফুটিয়া না উঠে, তাহার জন্য পূর্ব্ববঙ্গবাসী কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন; এবং মুসলিম লীগের দুই-এক জন নেতাও সেইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব যে ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিল বাহির করাইতে পারেন নাই, এ কথাও আমাদের ভুলিয়া গেলে চলিবে না। সম্প্রতি পত্রান্তরে প্রকাশ যে, ঢাকায় 'জেহাদের ডাক' নাম দিয়া একখানি ইস্তাহার বিলি করা হইতেছে এবং ইহাতে এই দাবী জানান হইয়াছে যে, "আমাদের পাকিস্তান সরকার যেন হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে অবিলম্বে যুদ্ধ-ঘোষণা করেন।" এ কথাও বলা হইয়াছে যে, "যদি সরকার আপন কর্ত্তব্য পালন না করেন, তবে আমরা, জনসাধারণ, তাহা হইতে

বিচ্যুত হইব না। ইসলামের ও আল্লাহতালার আদেশ পালন করা আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।" ইহার পরেও যখন পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন কংগ্রেসী নেতা উপদেশ দেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের পক্ষে পূর্ব্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধার চর্চ্চা করা উচিত, তখন স্বভাবতই: মনে হয় যে, তাঁহারা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন। যে রাষ্ট্র সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত, তাহার প্রতি কোন জাতীয়তাবাদীরই শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না।

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের সমস্যা

পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যে একটা অবাঞ্ছনীয় অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে বাস করিতেছে এবং এই অবাঞ্ছনীয় অনিশ্চিত অবস্থার জন্যই তাঁহাদের মন যে আতঙ্কশূন্য হইতে পারে নাই, বাহিরের অশান্ত অবস্থার মধ্যেও তাঁহাদের অন্তরের অন্তস্তলে যে সর্ব্বদা সশঙ্ক অবস্থা বর্ত্তমান রহিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই।

পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠদের এমন নীতি গ্রহণ করা উচিত, যাহাতে সংখ্যালঘুরা নিজেদের ধন-প্রাণ, মান-মর্য্যাদা নিরাপদ বলিয়া মনে করে। আইনে সংখ্যালঘুদের অধিকার স্বীকৃত হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে তাহা লঙ্ঘিত হইয়া থাকে, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ইহা ব্যতীত ভারতের অন্যত্র যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা চলিতেছে, তাহার প্রতিক্রিয়ার কথাও আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। সম্প্রতি ফরিদপুর জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মৌলবী ইউসুফ আলি চৌধুরী (মোহন মিঞা) যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ার যে কারণ বিবৃত হইয়াছে, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা আমাদের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা অবগত হইলাম, এক দল অবিমৃষ্যকারী যুবক 'মুসলিম নওজোয়ান বিপ্লবী সঙ্ঘ' নাম দিয়া প্রচার করিতেছে যে, হিন্দুরা যদি অন্যান্য মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশে হত্যাকাণ্ড বন্ধ না করে, তবে তাহারা পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এ দেশ ছাড়িয়া যাইতে নির্দ্দেশ দিতেছে, অন্যথায় তাহারা উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে।" সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের মনের আতঙ্ক ভাব যে অকারণ নয়, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

'মুসলিম নওজোয়ান বিপ্লবী সঙ্ঘ' পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে তাহাদের সাত পুরুষের ভিটা-মাটি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলিয়াছেন বটে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে উহার শেষ পরিণতি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। বাঙ্গালায় যদি অধিবাসী-বিনিময় আরম্ভ হয়, তাহা হইলে উহার প্রতিক্রিয়ায় বিহার, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রদেশেও অধিবাসী-বিনিময়ের দাবী উত্থিত হইবে এবং কংগ্রেসী গভর্ণমেন্টের লীগ তোষণ-নীতি সত্ত্বেও এই দাবী ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না। সমগ্র ভারতে একটা বিরাট ওলট-পালট সৃষ্টি হইবে। ভারতের নয় কোটি মুসলমানের স্থান পাকিস্তানে সঙ্কুলান হইবে কি?

গভীর ষড়যন্ত্র

পাঞ্জাবের হাঙ্গামার মূলে যে একটা সুদূরপ্রসারী গভীর ষড়যন্ত্র রহিয়াছে, ক্রমশঃ ধীরে ধীরে তাহার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। এই ষড়যন্ত্রের বহু-বিস্তৃত জালকে যে ক্রমে গুটাইয়া আনা হইতেছে, গুরুতর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সংক্রান্ত জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য বৃটেন ও অন্যান্য ডোমিনিয়নের নিকট পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের আবেদনের মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পশ্চিম পাঞ্জাবেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রথম আরম্ভ হইয়াছে। তাহারই প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব্ব পাঞ্জাবে হাঙ্গামা আরম্ভ হইলেও হাঙ্গামা দমনের জন্য ভারত গভর্ণমেন্টের কঠোর ব্যবস্থা এবং মহাত্মা গান্ধীর বিপুল ব্যক্তিত্ব পূর্ব্ব পাঞ্জাবের অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনিয়াছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের উপর পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট 'আয়রণ কার্টেন' বা লৌহ আবরণ চাপাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও ভিতরের গুরুতর অবস্থার অনেক সংবাদ অপ্রকাশ রাখা সম্ভব হয় নাই। পাঞ্জাবের হাঙ্গামার প্রধান দায়িত্ব পশ্চিম পাঞ্জাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের, তাহারাই এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাকে প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছে। পশ্চিম পাঞ্জাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু ও শিখদের উপর আক্রমণ বন্ধ করিলেই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা থামিয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যজনক ব্যাপার এই যে, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সংক্রান্ত গুরুতর সমস্যা সমাধানের জন্য পাকিস্তান গভর্ণমেন্টই বৃটেন ও অন্যান্য ডোমিনিয়নগুলির নিকট আবেদন পেশ করিয়াছেন। এই আবেদন আসলে ভারত ডোমিনিয়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভারতের ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যাহাতে হস্তক্ষেপ করে, তাহার জন্য লীগপন্থীরা যে একটা প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন, কয়েক দিন পূর্ব্বে স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁয়ের উক্তির মধ্যে তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। আমাদের আশঙ্কা হয়, উহা অপেক্ষাও গভীরতর উদ্দেশ্য এই প্রচার-কার্য্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তকে সুদৃঢ় করার জন্য মিঃ ফিরোজ খাঁ নুন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাকেও অর্থহীন বাচালতা বলিয়া আমরা উপেক্ষা করিতে পারি নাই। টুকরা লোহা পাঠাইবার নাম করিয়া বৃটেন হইতে করাচীতে ট্যাঙ্ক প্রেরিত হওয়ার সংবাদের কথাও আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী মিঃ খুরো সে দিন এমন ভাবে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন যেন সিন্ধুর হিন্দু ও শিখরা চক্রান্ত করিয়া সিন্ধুকে নিঃস্ব করিবার জন্য তাঁহাদের সমস্ত ধনদৌলত লইয়া বিনা কারণে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে, অস্থাবর ধনসম্পদ তো তাঁহারা লইয়া যাইতে পারিতেছেন না, অধিকন্তু তাঁহাদের স্থাবর ধনসম্পত্তি দ্বারা সিন্ধুর সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়েরই লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, শিখদের ক্ষতি মুসলমানদের লাভে পরিণত হইয়াছে। মুসলমানরা হিন্দুদের সম্পত্তি প্রচুর পরিমাণে পাইয়াছে।

পশ্চিম পাঞ্জাবের দাঙ্গার ফলে সংখ্যালঘু শিখ ও হিন্দুরা তাহাদের বাড়ী, ঘর, সম্পত্তি ফেলিয়া শুধু প্রাণ লইয়া চলিয়া আসিতেছে। অধিকন্তু সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি বিনা আয়াসে সংখ্যাগরিষ্ঠদের হস্তগত হইতেছে। কাজেই হাঙ্গামার ফলে পশ্চিম পাঞ্জাবের অর্থনৈতিক

ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ হওয়ার কোন কারণ নাই এবং ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কাও পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট করেন না। কিন্তু পাঞ্জাবের হাঙ্গামার ইহাই একমাত্র ফল নয়। উহার মূলে আরও গভীরতর উদ্দেশ্য রহিয়াছে। যাহা ছিল সাম্প্রদায়িক অশান্তি, ভারত বিভাগের ফলে তাহাই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চিরস্থায়ী বিরোধ সৃষ্টির কারণে পরিণত হইয়াছে। ইহার মূলে সাম্রাজ্যবাদের সহিত পাকিস্তানের একটা চক্রান্ত রহিয়াছে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করেন। ভারত হইতে পাকিস্তানে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানী হওয়ার আশঙ্কা কি সত্যই ভিত্তিহীন? কেন্দ্রীয় অর্ডিনান্স ডিপোর মেজর হকিজকে দিল্লীতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, তাঁহার গৃহ খানাতল্লাস করিয়া ১৪ হাজার কার্তুজ ও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের দিবস হইতে পশ্চিম পাঞ্জাবে হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে। পাকিস্তান রাষ্ট্র যে পশ্চিম পাঞ্জাবের আশ্রয়-প্রার্থীদিগকে নিরাপদে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন না, তাহা একরূপ স্বীকৃতই হইয়াছে। পারস্পরিক আলোচনা দ্বারা এই সমস্যার সমাধান আজও হয় নাই। অথচ এক পক্ষ অন্যায় করিতেছেন আবার ভারত ডোমিনিয়নের উপর দোষ চাপাইতেছেন। সহস্র সহস্র আশ্রয়প্রার্থীর মৃত্যু এবং দুর্দ্দশার ফলে এই যে তিক্ত অবস্থা সৃষ্টি হইতেছে, তাহার পরিণাম কোথায় যাইয়া গড়াইবে? 'ডেলী টেলিগ্রাফ' বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পুনরায় ভারতের কর্তৃত্ব গ্রহণের ইঙ্গিত দিয়াছেন, রুশিয়া ভারতের প্রতি নজর রাখিতেছে, এ কথাও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতেই তৃতীয় মহাসমরের সূচনা হইবে কি না, তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত পাকিস্তানের যে ষড়যন্ত্র পাঞ্জাবের হাঙ্গামার কারণ বলিয়া অনেকে মনে করেন, এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে না পারিলে আমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।

—

সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও বৃটিশ অফিসার

ভারতবাসীরা যে সুষ্ঠু ভাবে শান্তিতে রাজ্য পরিচালনায় অক্ষম, দয়াময় বৃটিশ প্রভুরা ভারত ত্যাগ করিলে ভারতের যে সর্ব্বনাশের সীমা থাকিবে না, টোরী-গোষ্ঠীর এই প্রচারকার্য্য নূতন নয়। সুতরাং আজ ভারতে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে হত্যার কাজে যখন অন্ধ আবেগে লিপ্ত, তখন তাহাদের উল্লাসের কারণ অবশ্য সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মিঃ চার্চ্চিল এবং বুনো রক্ষণশীল দলের কাগজগুলি যে প্রচারকার্য্যে উৎসাহভরে কোমর বাঁধিয়া নামিয়াছেন—তাহার মূল কথা অতি সরল।—"দেখিলে তো, আমরা তখনই বলিয়াছিলাম।" এই ধরণের মিথ্যা জয়ঢাকের নিরন্তর আওয়াজ ভারতবাসীদের তীব্র ঘৃণারই উদ্রেক করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাই আজ যথেষ্ট নহে। টোরী দলের এই আনন্দের খোরাক জোগাইবার জন্য এ দেশে অবস্থিত বৃটিশ সামরিক ও পুলিশ কর্ত্তারা কোন্ ভূমিকা অভিনয় করিয়াছে, সে সম্বন্ধে সচেতন হইবার সময় আসিয়াছে। পাঞ্জাবের শোচনীয় ঘটনাবলীতে বৃটিশ গভর্ণর হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিশ কর্ত্তা জেঙ্কিন্স প্রভৃতির হস্তক্ষেপ এই দিকে প্রথমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। পাঞ্জাব বাউণ্ডারী ফোর্সের কার্য্যকলাপ সকলকে বৃটিশ অফিসারদের কীর্ত্তিকাহিনী সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে থাকে। কিন্তু তখনও অনেকেই সাম্প্রদায়িক অশান্তিকে ব্যাপক করিয়া তুলিবার জন্য পাঞ্জাবের বৃটিশ অফিসারদের চেষ্টাকে কয়েক জন কুমতলবী লোকের কাজ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এই সমস্ত ব্যাপারকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ভিন্ন অন্য কোন কিছু বলিয়া অভিহিত করেন নাই।

কিন্তু বৃটিশ অফিসারদের কীর্ত্তিকলাপ পাঞ্জাবেই শেষ হয় নাই, দিল্লী এবং অন্যত্র তাহারা কি ভাবে গভর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত করার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার পরিচয় লইলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ভারতের সর্ব্বত্র বৃটিশ পুলিশ ও সামরিক কর্ত্তারা পরিকল্পনা মাফিক সাম্প্রদায়িক সজ্ঘর্ষ বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। পাঞ্জাবে জেঙ্কিন্স বা বেনেট যে কাজের আরম্ভ করিয়াছিল, অন্যত্রও বৃটিশ অফিসারেরা সেই কাজেরই জের টানিয়া চলিয়াছে। দিল্লীতে আশ্রয়-প্রার্থী সমস্যা লইয়া ব্যতিব্যস্ত গভর্ণমেণ্টকে পঙ্গু করিয়া দিবার জন্য যান-চলাচল ব্যবস্থা এমন ভাবে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, শেষ অবধি রেলওয়ে চীফ কমিশনার মিঃ এমার্সনকে বিদায় দিতে পণ্ডিত নেহরু বাধ্য হন। দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক খুনোখুনির চরম মুহূর্ত্তে বৃটিশ অধিবাসীরা বিদেশে প্রচারকার্য্যের জন্য কি ভাবে ফটো তুলিয়া বেড়াইয়াছে, তাহার সংবাদ লইলেও জঘন্য ষড়যন্ত্রের কিছুটা আভাষ পাওয়া যাইবে। সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহকারী বৃটিশ অফিসারেরা ধরা পড়িয়াছে। মধ্যপ্রদেশে দাঙ্গাকারীদের জব্বলপুরের বন্দুক ও টোটা-বারুদের ডিপো হইতে অস্ত্র সরবরাহ করার অপরাধে যাহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেক উচ্চপদস্থ বৃটিশ ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের নামই চোখে পড়িবে। স্পেশাল আর্ম্ড কনষ্টাবুলেটরির কমাণ্ডাণ্ট লেঃ কর্ণেল জোন্স এবং বিশেষ সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাপ্টেন পাওয়েলের বাড়ী তল্লাস করিয়া ৬০ হাজার রাউণ্ড কার্ত্তুজ এবং অনেক আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কার হইয়াছিল। জব্বলপুরের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর টনি মেণ্ডেজকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের এক জন মেজরকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিবার সময় তিনি আত্মহত্যা করিয়া আইনকে ফাঁকি দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন চিনঘার সেণ্ট্রাল অর্ডিন্যান্স ডিপোর মেজর জেনারেল বুকিজ এবং ইণ্ডিয়ান সিগন্যাল কোরের মেজর কুপারও একই ধরণের অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। বস্তুতঃ পক্ষে ঘটনাগুলি এমনই ব্যাপক এবং পরস্পর সংশ্লিষ্ট যে, কেবল ব্যাখ্যার প্যাঁচ কষিয়া এই সবের অন্তর্নিহিত সত্য অস্বীকার করিবার কোন উপায়ই নাই। ভারতের যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার জন্য বিলাতের টোরী-গোষ্ঠীর প্রাণে শোকের বন্যা উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা যে এ দেশে অবস্থিত রক্ষণশীল দলের সেনাপতি মিঃ চার্চ্চিলের শিষ্য-বর্গের সক্রিয় উস্কানীর ফলেই মারাত্মক আকার ধারণ করিতেছে—এই সত্য স্মরণ রাখিলেই মিঃ চার্চ্চিলের চেলা-চামুণ্ডদের ভণ্ডামির স্বরূপ চিনিতে বিলম্ব হইবে না। ভারতের হাঙ্গামাকে কেন্দ্র করিয়া বৃটিশ শাসকেরা বিশ্ববাসীকে বুঝাইতে চাহেন যে, বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ আবার ভারতে পুরোপুরি শিকড় গাড়িতে না পারিলে ভারতবাসীর দুর্দ্দশার সমাপ্তি ঘটিবে না। কিন্তু ভারতবাসীর বক্তব্য ইহার উত্তরে অতি সরল। পুরাতন আমলের বৃটিশ কর্ত্তাদের যদি ঝাড়ে-বংশে ভারত হইতে বিদায় করা গোড়াতেই হইত, তবে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এমন সাম্প্রদায়িক যুদ্ধে পরিণত হইতে পারিত না।

ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্তকে উপলক্ষ করিয়া মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ

কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার কথা বহু বার ভারতবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু বাধ্য হইয়া যেটুকু ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে হইয়াছে, তাহাকে কার্য্যতঃ বানচাল করিবার চেষ্টা যে বৃটিশ কর্ত্তারাই পুরা দমে চালাইয়াছে, এই সত্য গভর্ণমেণ্টের পক্ষে আর অস্বীকার করা সম্ভব হইতেছে না। কিছু দিন পূর্ব্বে পণ্ডিত কুঞ্জরু বৃটিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে যে সকল গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা প্রমাণ করিবার জন্ত তাঁহাকে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। অবশ্য সামরিক কর্ত্তারা ইহার পর এক বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন, পণ্ডিত কুঞ্জরুর অভিযোগ কোন কোন ক্ষেত্রে সত্য হইলেও সাধারণ ভাবে বৃটিশ অফিসারদের পক্ষে প্রয়োগ করা চলে না। কিন্তু ইহা কি কার্য্যতঃ অভিযোগের স্বীকৃতিই নহে? বস্তুতঃ পক্ষে এই কথা আজ বুঝিতে হইবে যে, বৃটিশ অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল রাখিয়া যে ভুল ভারতীয় নেতারা করিয়াছেন, শীঘ্র সংশোধিত না হইলে তাহার ফলে ভারতের উন্নতি চিরতরে ব্যাহত হইবার আশঙ্কা আছে। পাকিস্তানের বৃটিশ-ভক্ত নেতারা যেভাবে ছল-ছুতা খুঁজিয়া ভারতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্ত আবেদন-নিবেদন আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে ভারত হইতে বৃটিশ পুলিস ও সামরিক কর্ত্তাদের বিদায়-দানের আবশ্যকতা আরো জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকারের যুক্ত বিবৃতিতে ১লা অক্টোবর হইতে তিন মাসের নোটিশে বৃটিশ অফিসার ও সৈন্তদের সশস্ত্র বাহিনীতে কাজ শেষ হইবে বলিয়া জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে, খুবই ভাল কথা, কিন্তু পরে আবার চুক্তির মারফৎ ইহাদের বাহাল রাখার যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহাকে অভিনন্দিত করা কঠিন। ভারতে সামরিক অফিসারের কাজ করিবার মত ভারতীয়ের অভাব নাই, ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর অফিসারদের এই কাজে সহজেই ব্যবহার করা চলিতে পারে। প্রতিভাবান নিম্নপদস্থ ভারতীয় অফিসারদের শিক্ষাদান করিয়া প্রমোশনের ব্যবস্থা করাও আজ একান্ত প্রয়োজন। বৃটিশ সামরিক ও পুলিস অফিসারেরা আজ যে ভূমিকা অভিনয় করিতেছে, তাহাতে তাহাদের উপর বিন্দুমাত্র নির্ভর করিলে শেষে কপালে দুর্ভোগ অনিবার্য্য হইবে তাহাতে ভুল নাই।

কংগ্রেসের পুনর্গঠন

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতে কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্ব যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে কংগ্রেসের মধ্যে বৃহৎ নেতৃত্বের একনিষ্ঠ সমর্থক ছাড়া অপর কোন দলের তিষ্টিয়া থাকা আর সম্ভব হইতেছে না। বৃটিশ কায়েমী স্বার্থবাদীরা ভারতীয় কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাতে ভারতের শাসন পরিচালন-ক্ষমতা অর্পণ করায় কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্ব নিরঙ্কুশ ভাবে আপনাদের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে যত্নবান হইবেন, ইহা খুব স্বাভাবিক।

ভারতের শাসন পরিচালন-ক্ষমতা আজ কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্বেরই হস্তগত। যে ভাবে তাঁহারা তাঁহাদের আদর্শ ও নীতিকে কার্য্যে পরিণত করিবেন, তাহারই মধ্যে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎকে প্রতিফলিত দেখিতে পাইব। স্পেশ্যাল কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার আইন-সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই কংগ্রেসের নূতন আদর্শ হইবে। ভারতীয় গণ-পরিষদে কংগ্রেসই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রীক আদর্শে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোন কথা নাই। শাসনতন্ত্রে সে-কথা না থাকিলেও কংগ্রেসের পক্ষে ভারতে সমাজ-তন্ত্রী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা আদৌ কঠিন নহে। কিন্তু কংগ্রেসের এই সমাজতন্ত্রটা কোন্ ধরণের সমাজতন্ত্র হইবে, তাহাই আসল কথা। স্পেশ্যাল কমিটি মনে করেন, মহাত্মা গান্ধী যে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাই খাঁটি সমাজতন্ত্র। কিন্তু তাঁহারা যে কার্য্যসূচী উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে গান্ধীবাদী অর্থনীতির কোন পরিচয় আমরা পাইলাম না, বরং উহাকে মিঃ মাসানীর মিশ্র অর্থনীতি বলিয়াই আমাদের ধারণা জন্মিল। সমবায় কৃষি প্রতিষ্ঠান গঠন করা খুবই ভাল কথা। সমবায়ের পথে এক দিন যৌথ যান্ত্রিক কৃষিক্ষেত্র গড়িয়াও উঠিতে পারে; কিন্তু প্রধান সমস্যা শিল্প লইয়া। বৃহৎ শিল্প ও বড় বড় কলকারখানাকে জাতীয় সম্পত্তি করিবার চেষ্টা করা হইবে; কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্র ও গবর্ণমেণ্টের আকৃতি ও প্রকৃতিকে বাদ দিয়া বৃহৎ শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা সহজ নয়। গভর্ণমেণ্ট পুঁজিপতিদের কার্য্যকরী সমিতি—মার্কসের এই উক্তি আজিও মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট গঠন ও পরিচালনে যত দিন পুঁজি-পতিদের অপ্রতিহত ক্ষমতা থাকিবে, তত দিন কলকারখানাগুলিকে জাতীয় সম্পত্তি করা এবং শিল্পপতিদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না। কংগ্রেস যত দিন পুঁজিপতিদের অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হইবে, তত দিন ভারতীয় গণতন্ত্রও ভারতীয় ধনতন্ত্রের রাজনৈতিক রূপ ছাড়া আর কিছুই হইবে না।

পরলোকে মৃণালকান্তি ঘোষ

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ সাংবাদিক ভক্তিভূষণ মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের পরলোক গমনের ফলে বাঙ্গালার সাংবাদিক জগতের এক জন দিক্‌পালের তিরোভাব ঘটিল। এ দেশের হিসাবে ৮৭ বৎসর সুদীর্ঘ জীবন বলিতে হইবে—কিন্তু তথাপি আজও যেন তাঁহার ন্যায় লোকের প্রয়োজন ফুরায় নাই। যে নিয়ম-নিষ্ঠা, আত্মত্যাগের দ্বারা তিনি বাঙ্গালার সংবাদপত্র-জগতের উন্নতির জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, যে ভাবে কোনরূপ প্রচার ও প্রশংসার অপেক্ষা না করিয়া এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত নিরলস ভাবে তিনি কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান কালের সংবাদপত্রসেবীদের নিকট এক বিস্ময়কর ঘটনা; ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও তাহা প্রেরণা জোগাইবে। বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল প্রচুর। বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধ ও আলোচনা বাঙ্গালা সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ। মৃণালকান্তির পরলোক-গমনে বাঙ্গালার প্রাচীন পুরুষের এক জন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধির তিরোধান হইল। তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।